Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ

প্রথম খন্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

الـمـوسـوعـة الاسـلا مـيـة
بـالـلـغـة الـبـنـغـالـيـة
الـمـجـلـد الاول

ইসলামী বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড

অন্ধকূপ হত্যা—‘আবদুল্লাহ ইবন মায়মূন

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড) (পৃষ্ঠা ৮০০)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের
আওতায় সংকলিত ও প্রকাশিত

ইফাবা প্রকাশনা ১২৩৮/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৩
ISBN : 984-06-0955-6

প্রথম প্রকাশ
জুমাদা আল-আওয়াল ১৪০৬
মাঘ ১৩৯২
জানুয়ারী ১৯৮৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০০
ভাদ্র ১৪০৭
জুমাদা আছ-ছানী ১৪২১

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১১
জুমাদা আল-আওয়াল ১৪২৫
জুন ২০০৪

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
গ্রাফিক আর্টস (জু.)
২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা মাত্র

Islami Bishwakosh (1st Volume) (The Encyclopaedia of Islam in Bengali) Edited by the Board of Editors and published by A. S. M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarrarm, Dhaka-1000. Phone : 9551902 June 2004

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 590.00 ; US $ 30

সম্পাদনা পরিষদ (১ম সংস্করণ)

জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী	সভাপতি
ডঃ সিরাজুল হক	সদস্য
জনাব আহমদ হোসাইন	"
ডঃ মোহাম্মদ এছহাক	"
ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী	"
জনাব এম. আকবর আলী	"
ডঃ ছৈয়দ লুৎফুল হক	"
অধ্যাপক শাহেদ আলী	"
জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	"
ডঃ কে.টি. হোসাইন	"
ডঃ এস. এম. শরফুদ্দীন	"
জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	"
ডঃ শমশের আলী	"
জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	"
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদনা পরিষদ (২য় সংস্করণ)

জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	সভাপতি
মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম	"
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

আমাদের কথা

বিশ্বকোষ বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ হইল ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামের ব্যাপক বিষয় ইসলামী বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম সীমিত অর্থে কোন ধর্মমাত্র নহে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি অনুপম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়াছে একটি নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে আমরা পাইয়াছি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জ্বল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব।

সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান সকল কিছুর শীর্ষে। জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে উহার বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আর সেইজন্যই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক।

ইসলামের এই ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজে ইহার ব্যাপক সাড়া ও চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কালে পঁচিশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে ষোলতম খণ্ড দুই ভাগে এবং চব্বিশতম খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মোট ২৮ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ এই প্রকাশনার কাজটি ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে উহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাদের জ্ঞানগবেষণা চালাইয়া যাইতে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই বৃহত্তর প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ অপ্রতুল থাকিয়া যাওয়া, আবার কোনটি তথ্য ও উপাত্ত না পাওয়ার কারণে উহাতে স্থান না পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আরও সমৃদ্ধ আকারে ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্বকোষেরই ধর্ম।

ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ইহার সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করানো হইয়াছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখানো হইয়াছে।

এইরূপে আজ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার সহিত জড়িত লেখক, সম্পাদক, প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য তাহাদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলকেই তাহাদের এই কষ্টের বিনিময়ে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি, পেশ করিতেছি অসংখ্য রুকূ ও সিজদা। কেবল তিনিই তওফীক দানকারী এবং তাঁহার বান্দাদেরকে মনযিলে মকসূদে পৌঁছাইতে একমাত্র তিনিই সাহায্যকারী। এতদসঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল মুযনিবীন আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিসীম কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি আর পৃথিবীর মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ সঠিক জীবনবোধ।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক তাহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন। বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরাজী, আরবী, ফারসী ও উর্দূসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় একুশ কোটি বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক বিশ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রমও গ্রহণ করে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ (পঁচিশ) খণ্ডে উন্নীত হয়।

১৯৮২ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলে আগ্রহী পাঠক ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর পাঠকদের নিরন্তর তাকীদ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের আলোকে আরও ৬৯টি নিবন্ধ সহযোগে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পরম আনন্দের বিষয়, প্রকাশের অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণটিও নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রতি পাঠক সমাজের এই বিপুল আগ্রহ যেমন আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে তেমনি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশে উৎসাহিত করে, নিরন্তর পরিশ্রমে করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আর ইহারই ফলে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে ইহার সর্বশেষ খণ্ড হিসাবে ২৬ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৬তম খণ্ডটি ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ) ও ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ) এবং ২৪তম খণ্ডটি ২৪তম খণ্ড (১ম ভাগ) ও ২৪তম খণ্ড (২য় ভাগ) নামে দুই অংশে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার জগতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে ইহাকে অনন্য নজীরই বলিতে হইবে। স্মর্তব্য, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অন্যথায় আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" (দা.মা.ই.) সংকলন ও প্রকাশনায় ৪০ বৎসরের মত সময় লাগিয়াছে।

পরম আনন্দ ও সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ও সচেতন পাঠক সমাজ কর্তৃক আমাদের এই উদ্যোগ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত ইহার সমুদয় কপি দ্রুত নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি নিঃশেষ হইবার প্রেক্ষিতে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে ইহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এধরনের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই ২০০০-২০০৫ সালের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে গৃহীত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ-এর কাজ শুরু হয় এবং ইহার আওতায় ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়। অতঃপর চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদের নিকট ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি পরিপূর্ণ অবস্থায় এক্ষণে আমাদের আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমরা পুনরায় আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে অশেষ হাম্‌দ ও শোকর আদায় করিতেছি।

নব পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ) ১ম খণ্ড সংকলন ও প্রকাশের পেছনে যাহাদের অনস্বীকার্য অবদান রহিয়াছে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। বিশেষ করিয়া বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক, শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী, বিশ্বকোষ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমরা তাহাদের জন্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে ইহার উপযুক্ত বিনিময় কামনা করি এবং তিনি ইহা তাঁহার শান মুতাবিক দিবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

সম্পাদনা পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি আমরা আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান খণ্ডের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। এতদসঙ্গে সম্মানিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের প্রতিও আমরা আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বর্তমান খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁহার উৎসাহ ও অবদান সর্বাধিক তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান মহাপরিচালক পরম শ্রদ্ধেয় জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেব। কেবল বর্তমান খণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের গোটা আয়োজন ও উদ্যোগের পেছনে তাঁহার ঐকান্তিক ও সযত্ন প্রয়াস ছিল সর্বাধিক। ১৯৭৯ সালের ২৭ জুলাই হইতে ১৯৮২ সালের জুলাই-এর ৩০ তারিখ পর্যন্ত মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশসহ ২০ খণ্ডে সমাপ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা শীর্ষক একটি পৃথক প্রকল্প গৃহীত, অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর তৎকালীন সরকার কর্তক অনুমোদিত হয়। অতঃপর তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অব্যাহত তাকীদে ১৯৮২ সালের মে ও জুন মাসে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ" দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইসলামের জন্য নিবেদিত এই অক্লান্ত কর্মবীরের প্রতি আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা তাই অপরিসীম। এতদসঙ্গে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সচিব জনাব বদরুদ্দোজা, অর্থ পরিচালক জনাব লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক জনাব আবদুর রব, লাইব্রেরিয়ান জনাব সিরাজ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব সাহাবুদ্দীন খানের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু অত্র বিভাগে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, গবেষণা সহকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ আমার সকল সহকর্মীর প্রতি তাহাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। অতঃপর মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্সকে কম্পোজ ও আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সকে মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং প্রুফ রীডারবৃন্দকে ইহার নির্ভুল প্রকাশে সহযোগিতা দানের জন্য জানাইতেছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দিন, ইহাই আমাদের একান্ত মুনাজাত।

পরিশেষে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতে চাই, বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। আল্লাহর অপার রহমত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দু'আ ও সহযোগিতা আমাদের সম্বল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইহার নানা পর্যায়ে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সতর্ক ও সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়িবে। তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমাদের বিনীত আবেদন, মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিবেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য করিবেন।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বকোষ বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বলা হয়; Encyclopaedia গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) Paideia (শিক্ষা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহ।

জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় যে গ্রন্থে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয় তাহাকে প্রায়শ সাধারণ বিশ্বকোষ বলা হয়। তেমনি কোন এক বা একাধিক সমজাতীয় জ্ঞানশাখার তথ্য সংকলনকে সেই বিশেষ জ্ঞানশাখার বিশ্বকোষ নাম দেওয়া হয়। সন্ধানকার্যে সুবিধার জন্য বর্তমানে বিশ্বকোষের প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অভিধানের শব্দ বিন্যাসের মত বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং "হাওয়ালা" (reference)-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে শ্রেণীক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রাচীন বিশ্বকোষগুলির প্রায় সবই শেষোক্ত ধরনের অর্থাৎ শ্রেণীক্রমে বিন্যস্ত এবং সাধারণত বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর শিষ্যদ্বয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus, আনু. ৩৩৯ খৃ. পূ.) এবং এরিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খৃ. পূ.) উভয়েরই বিশ্বকোষ প্রণেতা বলিয়া খ্যাতি আছে। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষের কিছু খণ্ডিত অংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা এরিস্টোটল স্বীয় শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী বিষয় পরম্পরানুক্রমে কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভ্যারো (Marcus Terentius Varro, ১১৬-২৭ খৃ. পূ.) সাহিত্য, অলংকার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত Disciplinarum Libri IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাঁহার দর্শন বিষয়ক De Farma Philosophiae Libri III এবং সাত শত গ্রীক ও রোমানের জীবনী সংকলন গ্রন্থ Imagines বিশেষ প্রসিদ্ধ। রোমের "সবজান্তা" পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Naturalis নামে একটি বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে সংকলন করেন। ইহাতে কয়েক শত গ্রন্থকারের রচনা হইতে সংগৃহীত বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত আধুনিক বিশ্বকোষ রচনা ধারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মধ্যযুগে সেভিলের (Seville) বিশপ Isidore (আনু. ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Originum sive Etymologiarum Libri XX গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাদি সংকলন করেন। 'ঈসা ইব্ন য়াহ্'য়া আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) প্রাচ্যের অন্যতম খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদ। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে 'আরবীতে "আল-মিআঃ ফি'স্-স'না'আতিত'-তি'ব্বিয়্যা" নামে এক শত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইব্ন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) ও আল-বীরূনীর (খৃ. ৯৩৭-১০৪৮) শিক্ষক ছিলেন। ফরাসী দেশীয় Vincent of Beauvais (আনু. ১২৬৪ খৃ.) তাঁহার রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতাব্দীর সমুদয় বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। William Caxton-এর Myrrour of The World (১৪২২-১৪৯১ খৃ.) উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইহা সর্বপ্রাচীন ইংরাজী বিশ্বকোষগুলির অন্তর্ভুক্ত। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী Brunetto Latini (আনু. ১২১২-১২৯৪ খৃ.) ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ইতালীয় অনুবাদ Li Livers don Tresor।

সর্বপ্রথম যেসব গ্রন্থের নামে Encyclopaedia শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৬৩৮ খৃ.)-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত Encyclopaedia Septemtomis Distincta তাহাদের অন্যতম। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতক ও ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বকোষ রচনার ধারা বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Johann Jacob Hofmann-এর Lexicon Universal (১৬৭৭-১৬৮৩ খৃ.)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ হইতেছে John Harris (আনু. ১৬৬৭-১৭১৯ খৃ.) কৃত Lexicon Technicum (১৭০৪-১৭১০ খৃ.)। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ হিসাবে Ephraim Chambers's Cyclopaedia

(১৭২৮ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বহু বিশেষজ্ঞের রচিত প্রবন্ধ সংকলনের পদ্ধতি এবং প্রতি-বরাত (cross reference) সংযোজনের নীতি গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নত ভাষাসমূহে অসংখ্য সাধারণ ও বিশিষ্ট বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে। সবদিক দিয়া বিচার করিলে ইংরাজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের বহু সাধারণ বিশ্বকোষের মধ্যে Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২ খৃ., প্রথম সংস্করণ ৩ খণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশিষ্ট বিশ্বকোষগুলির মধ্যে Encyclopaedia of Religion and Ethics, 12 vols. & Index, ed. James Hastings ; Oxford Companion to English Literature, ed. Paul Harvey; Encyclopaedia of World Art, e. Massimo Pallotion; Encyclopaedia of the Social Sciences, 15 vols., ed. Edwin R. A. Seligman; Encyclopaedia of World Politics, ed. Walter Theimer; Pears Medical Encyclopaedia, ed. J.A.C Brown; The Universal Encyclopaedia of Mathematics with Foreword by Jamesdia R. Newman; Larouse Encyclopaedia of World Geography; Larouse Encyclopaedia of Earth, of Astronomy, of Pre-Historic and Ancient Art, of Byzantine and Medieval Art, of Renaissance and Baroque Art, of Ancient and Medieval History, of Modern History, of Mythology বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

কুরআন মাজীদ বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানের এবং আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছে। ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-তাপসগণের অনেকেই বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইসলামী দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং 'আরবী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ (দাইরাতু'ল-মা 'আরিফ বা মাওসূ'আত - موسوعات) রচনা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিকিৎসক আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযী (২৫১ হি./৮৬৫ খৃ.-৩১৩ হি./৯২৫ খৃ.) 'কিতাবু'ল-হাবী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানির ৩য় সংস্করণ ১৯৫৫ খৃ. হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) ছাপা হয়। কার্ডোভাবাসী আবূ 'উমার মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী (২৪৫ হি./৮৬০ খৃ.-৩২৮ হি./৯৪০ খৃ.) "আল-'ইক্'দু'ল-ফারীদ" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড এক একটি মণিমুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা, কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন তারখান আবু'ন-নাস্'র আল-ফারাবী (২৬০ হি./৮৭৩ খৃ.-৩৩৮ হি./৯৫০ খৃ.) "ইহ্'স'াউ'ল-'উলূম" নামে একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইহাতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩২ খৃ. সংশোধিত আকারে ছাপা হয়। "রাসাইল ইখওয়ানি'স'-স'াফা" গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার বিশ্বকোষ। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৫২টি পুস্তিকার সমষ্টি এবং আনু. ৩৫০ হি./৯৬১ খৃ. বহু জ্ঞান-গুণীর রচনা-সম্ভারে সংকলিত। ইরাকের মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক ইব্ন আবী য়া'কূ'ব আন-নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খৃ.) "ফিহ্রিস্ত আল-'উলূম" (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ বিবরণী প্রণয়ন করেন।

আবু'ল-ফারাজ 'আলী ইবনু'ল-হু'সায়ন আল-ইস'ফাহানী (২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৭ খৃ.) রচিত "কিতাবু'ল-আগ'ানী" মুখ্যত সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানিতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত রচিত যত আরবী কবিতায় সুর সংযোজিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধৃতি রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী ইত্যাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম ২০ খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. ও একবিংশ খণ্ড ১৮৮৮ খৃ. মিসরে ছাপা হয়।

আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আল-কাতিব আল্-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৩৮৭ হি. ৯৯৭ খৃ.) অন্যতম প্রাচীন মুসলিম বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি "মাফাতীহু'ল-'উলূম" নামে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে চর্চিত জ্ঞানের ১৫টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার অনেকাংশে গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত তথ্যের সংযোগ ঘটিয়াছে। ১৮৯৫ খৃ. লাইডেন হইতে Van Vloten ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ হ'ায়্যান 'আলী আত-তাওহ'ীদী (মৃ. ৪১৪ হি./১০২৩ খৃ.) "আল-মুক'াবাসাত" নামে একটি বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিদ্যা-সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের আলোচনা করেন। গ্রন্থখানি বোম্বাই, শীরায ও কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

ইসমা'ঈল আল-জুর্জানী (মৃ. ৫৩১ হি./১১৩৯ খৃ.) রচিত "য'াখীরা আল-খাওয়ারিয্ম শাহী"৯ খণ্ডে বিভক্ত চিকিৎসা বিষয়ক ফারসী বিশ্বকোষ; উহাতে পরে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। সিসিলীর মুসলিম পণ্ডিত আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-ইদ্রীসী (৪৯৪ হি./১১০০ খৃ.-৫৬২ হি./১১৬৬ খৃ.) 'নুযহাতু'ল-মুশ্তাক' ফী ইখ্তিরাকি'ল-আফাক' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত

ভূগোল বিশেষজ্ঞ য়াকূ'ত ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ আল-হ'মাবী (৫৭৫ হি./১১৭৯ খৃ.-৬২৭ হি./১২১৯ খৃ.) ও "মু'জামু'ল-বুল্‌দান" নামে একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৮৬৬ খৃ. লাইপ্‌থসিকে (Laipzig) ছাপা হয়। এই গ্রন্থকারের "মু'জামু'ল-উদাবা" (বা ইরশাদু'ল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একখানি বিশ্বকোষও রহিয়াছে। ইহা ১৯১৬ খৃ. Margoliouth কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইব্‌নু'ল-কি'ফতী (৫৬৮ হি./১২৪৮ খৃ.) তাঁহার "কিতাব ইখবারি'ল-'উলামা বিআখবারি'ল-হু'কামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে পূর্ববর্তী ৪১৪ জন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু বিদ্যাবিশারদ নাসী'রুদ্‌- দীন মুহ'াম্মাদ আত'-তূ'সী (৫০৮ হি./১২০১ খৃ.-৬৭৩ হি./১২৭৪ খৃ.) খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুলাগূ খাঁর আদেশে তিনি মারাগাতে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে "আত-তায্‌'কিরাতুন-নাসী'রিয়্যাঃ" নামে একখানি বিশ্বকোষ সদৃশ গ্রন্থ রচনা করেন। পারস্যের ভূগোলবিদ যাকারিয়্যা আল-ক'ায্‌বীনী (আনু. ৬৮৩ হি./১২০৩ খৃ.-৬৮২ হি./ ১২৮৩) দুইখানা বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ ('আজাইবু'ল-মাখ্‌লূক'াত ওয়া গ'ারাইবুল মাওজূদাত ও 'আজাইবু'ল-বুল্‌দান) রচনা করেন।

মিসর দেশের আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহ্‌মাদ আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩৩ হি./১৩৩১ খৃ.) মিসরের মামলূক বংশীয় খ্যাতনামা বাদশাহ্‌ আন-নাসি'র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'ালাউনের রাজত্বকালে (খৃ. ১২৯৩-৯৪, ১২৯৮-১৩০৮, ১৩০৯-১২৪০) উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "নিহায়াতু'ল-আরাব ফী ফুনূনি'ল-আদাব" নামক ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থটি 'আল্লামা নুওয়ায়রীর বিরাট কীর্তি। গ্রন্থখানি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্তঃ (১) জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; (২) মানবজাতি, তাহাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ; (৩) প্রাণীজগৎ; (৪) উদ্ভিদ জগৎ (দ্রব্যগুণ আলোচনাসহ) ও (৫) ইতিহাস। শামসুদ্দীন আহ্‌'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান (৬০৮ হি./ ১২১১ খৃ.-৬৮১ হি./১২৮২ খৃ.) একটি জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ (ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আনাবাইয-যামান) সংকলন করেন। ইহাতে ৬৮৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। দামিশকবাসী ইব্‌ন ফাদ্‌'ল্লিাহ আল-'উমারী (৭০০হি./১৩০১ খৃ.-৭৪৯ হি./ ১৩৪৯ খৃ.) মিসরের সুলতান কালাউনের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত বিশ্বকোষ "মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসার" সুপরিচিত। "মাশাহীর মামালিক 'উববাদ আস'-স'ালীব" তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। ফিলিস্তীনী পণ্ডিত স'লাহ্‌'দ-দীন খালীল আস-সাফাদী (৬৯৬ হি./১২৯৭ খৃ.-৭৬৪ হি./১৩৬৩ খৃ.) তাঁহার 'আল-ওয়াফী বি'ল-ওফায়াত' নামক গ্রন্থে চৌদ্দ হাজারেরও অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিসরীয় বিজ্ঞানী আদ-দামীরী (১৩৪৪-১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ (কিতাব হ'য়াতি'ল-হ'ায়াওয়ান) রচনা করিয়াছেন। মিসরীয় পণ্ডিত আহ্‌'মাদ আল-ক'লক'াশান্দী (৭৫৬ হি./১৩৫৫ খৃ.-৮২১ হি./১৪১৮ খৃ.) ইতিহাস, ভূগোল ও প্রশাসন সম্পর্কে "সুব্‌হু'ল-আ'শা ফী সিনাই'ল-ইন্‌শা" নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা কায়রো হইতে ১৪ খণ্ডে (১৯১৩-২খৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী পণ্ডিত হ'াজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬১ হি./১৬৫৮ খৃ.) তাঁহার "কাশ্‌ফু'জ'-জু'নূন" পুস্তকের জন্য বিখ্যাত। এই পুস্তকে ঐ সময়ে জ্ঞাত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বুত্‌রুস আল-বুস্তানী (১২৩৪ হি./১৮১৯ খৃ.-১৩০০ হি./১৮৮৩ খৃ.) তৎপুত্র সালীম আল-বুস্তানী (১২৬৩ হি./১৮৪৭ খৃ.-১৩০১ হি./১৮৮৪ খৃ.) প্রমুখ পণ্ডিত ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ" নামক একখানি বিশ্বকোষের ১১ খণ্ড 'উছমা'নিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। পরে ফুআদ আকরাম বাকী অংশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। খৃ. বিংশ শতাব্দীতে মুহ'াম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী "দাইরাতু মা'আরিফ আল-ক'ারনি'ল-'ইশ্‌রীন" নামে আরবী ভাষায় আর একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া তিনি এই ধরনেরই "কানযু'ল-'উলূম ওয়াল-লুগ'াত" নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষাতেও কয়েকখানি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস্‌ কেরী (Felix Carey) 'বিদ্যাহারাবলী' নামে বিশ্বকোষের দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড (শারীরস্থান ঃ Anatomy) ১৮১৯ খৃ. ১ অক্টোবর ও দ্বিতীয় খণ্ড (স্মৃতিশাস্ত্র) ১৮২১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের এক কপি Indian National Library-তে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি কলিকাতা বংগীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইনিই বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। Encyclopaedia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠা ইংরেজী অন্য পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় রচিত। ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রোমের ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ২য় খণ্ড জ্যামিতি, প্রথম ভাগ; ৩য় খণ্ড বিবিধ, প্রথম ভাগ; ৪র্থ খণ্ড রোমের ইতিহাস, ২য় ভাগ; ৫ম খণ্ড জীবনী সংগ্রহ, ১ম ভাগ; ৬ষ্ঠ খণ্ড মিসর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক মৌলিক আর কতক অনুবাদ।

২২ খণ্ডে সমাপ্ত "বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী ২১ খণ্ডে ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৩৪২-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির কয়েক খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাধারণ বিশ্বকোষ "জ্ঞান ভারতী" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খৃ. "নবজ্ঞান ভারতী" নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে সংযোজনী খণ্ডসহ ১১ খণ্ডে বিষয়ানুক্রমে ছেলে-মেয়েদের বিশ্বকোষ "শিশু ভারতী" প্রকাশ করেন। কলিকাতাস্থ বংগীয় সাহিত্য পরিষদ "ভারত কোষ" নামে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছে; ইহার প্রথম খণ্ড ডঃ সুনীল কুমার দের সম্পাদনায় ১৯৬৪ খৃ. এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম 'বাংলা বিশ্বকোষ"-এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ সনে, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৩ সনে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় এবং ঢাকাস্থ ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম্স-এর তত্ত্বাবধানে রচিত।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১০ খণ্ডে শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ১ম খণ্ড 'জ্ঞানের কথা' নামে ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সার্থক ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে The Royal Netherlands Academy; ১৯০৮ হইতে ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ (চারি খণ্ডে সমাপ্ত) Leiden হইতে প্রকাশ করে। এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ ও উহার পরিশিষ্ট হইতে ইসলামী শারী'আত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংকোচন, সংশোধন ও সংযোজনসহ "Shorter Encyclopaedia of Islam" নামে ১৯৫৩ খৃ. লাইডেন হইতেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি The Royal Netherlands Academy-এর পক্ষ হইতে H.A.R. Gibb ও J.H. Kramers কর্তৃক সম্পাদিতও E.J. Brill, Leiden কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

লাইডেন হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam-এর 'আরবী অনুবাদ মিসরে ১৯৩৩ খৃ. হইতে "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুহ'াম্মাদ ছা'বিত আল-ফান্দী, আহ'মাদ শান্‌শারী, ইব্‌রাহীম যাকী খুরশীদ ও 'আব্‌দু'ল-হ'ামীদ য়ূনুস এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে মূল প্রবন্ধগুলির অনুবাদে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে তুর্কী ভাষায় "Islam Ansiklopedisi" নামে একখানি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা শুরু হয়। এই গ্রন্থখানি লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-কে ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও সম্পাদক ইহাকে বহু মূল্যবান সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দূ ভাষাও এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-এর উর্দূ অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনসহ "দাইরা মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" নামে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ

বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে বাংলা একাডেমী লাইডেন হইতে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ উপসংঘ গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সদস্য সমবায়ে এই উপসংঘ পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত উপসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৯৫৮ সন হইতে এই উপসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদ কর্ম শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সনে উপসংঘ এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করে। তাঁহাদের পাণ্ডুলিপিতে মোট ৬৯১ টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ছিল Shorter Encyclopaedia of Islam হইতে ৫০৮টি নিবন্ধের অনুবাদ, উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দাইরা-ই-মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া) হইতে ৩৫টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং ৩৭টি মৌলিক নিবন্ধ। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইহার প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন জনাব শাইখ শরফুদ্দীন ও মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন।

নানা কারণে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিবন্ধ গুলি নূতনভাবে নিরীক্ষার জন্য ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ প্রতিটি নিবন্ধ পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিকর, অসংগত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন বা বর্জন করে, প্রয়োজনবোধে বহু স্থানে সংযোজন করে। অধিকন্তু ৪২টি নূতন প্রবন্ধ পরিষদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। প্রধানত Shorter Encyclopaedia of Islam এবং উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া ইহার নিরীক্ষা কার্য চলে; তবে খান বাহাদুর

আবদুল হাকিম সম্পাদিত "বাংলা বিশ্বকোষ" এবং The Encyclopaedia of Islam (Luzac, New Edition) ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যও পর্যাপ্ত গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৯৫ টি নিবন্ধ সহযোগে ইহা "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে অতিরিক্ত ৬৯টি নিবন্ধ সংযোজন করিয়া "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-পরিশিষ্ট" ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান মতামত, সমালোচনা এবং পরামর্শ সুধী পাঠক মহলের নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে সেইগুলি আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিয়া ২০ (বিশ) খণ্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রণয়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতঃপর ফাউন্ডেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের উপর ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। পরিষদ দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের সহায়তায় এই কার্য শুরু করে। অনূদিত নিবন্ধসমূহের ক্ষেত্রে পরিষদ লাইডেন (Leiden) হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam (পুরাতন ও নূতন সংস্করণ) এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দা. মা. ই.) গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। প্রয়োজনবোধে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ E.J. Brill, Leiden, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি এবং ফ্রাংকলীন বুক প্রোগ্রাম্স-এর নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহারই দরবারে আমাদের গভীর শুকরিয়া পেশ করিতেছি। এতদ্সঙ্গে আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইলে অবশিষ্ট খণ্ডগুলিও পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতে সক্ষম হইব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বকোষ প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইতেছে। বর্তমান খণ্ডে মোট ৭৬৩টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে মৌলিক নিবন্ধ ১৯০, ইংরাজী হইতে অনুবাদ ৪৫৩, উর্দূ হইতে ৫৬, ইংরেজী/উর্দূ হইতে অনুবাদ ১০, বাংলা বিশ্বকোষ হইতে ৪৫ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ হইতে ১৯টি।

ইসলামী বিশ্বকোষের এই বৃহত্তর খণ্ডে বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের মুসলিম মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মসাধক এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কিত স্থান ও ব্যক্তিবর্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংরাজী ও উর্দূ বিশ্বকোষে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাহাবায় কিরামের জীবনী না থাকায় ইহার প্রতি আমরা বিশেষ জোর দিয়াছি এবং শুধু 'আ' বর্ণেই মোট ১১০ জন সাহাবীর জীবনচরিত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিশ (২০) খণ্ডে প্রকাশিতব্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ইহা ১ম খণ্ড। আশা করা যায়, ইসলামী বিশ্বকোষ একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলমানগণের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানানুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হইবে, অন্যদিকে অমুসলিমগণও ইহা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবেন। বিশেষত যাঁহারা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আগ্রহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁহাদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার্য হইবে এবং তদ্দরুন এই ধরনের রচনা ও গবেষণা উৎসাহ লাভ করিবে। ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে।

সাধারণত বিশ্বকোষ ও অভিধান জাতীয় গ্রন্থ কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন হইতে পারে না। বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের প্রত্যাশা, এইবারও তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ দান করিবেন এবং ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে সহায়তা করিবেন।

ইসলামী বিশ্বকোষ

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

اَ = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
اِ = ই i	چ = চ c	ژ = ঝ· zh	غ = গ· gh	ن = দ n
اُ = উ u	ح = হ· h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক· k.q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স· s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত r	ڈ = ড d́	ض = দ·/য- d	گ = গ g	ے = ‹ ay
ث = ছ· th	ذ = য· dh	ط = ত· t	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ· z		
	ڑ = ড় ŕ			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (َ) আ , া = احد = আহা'দ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = া حلال = হ'লাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক'াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দাা,

যের (ِ) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = 'ঈসাা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ (ُ) উ / ু احد = উহ'দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = لهٗ = লাহূ

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু'ঊদ, موسى = মূসাা,

যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যা بَيَّنَ = বায়্যানা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যি سَيِّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যু حى = হ'ায়্যু, যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স'াওওয়ারা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত وّ = ব্বি' مُصَوِّر = মুসাব্বির / মুসাব্বির পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাস'াওউফ, যবরের পর أ = সাকিন رَأْس = রা'স, যেরের পর أ সাকিন بِئْسَ = বি'সা, পেশের পর أ সাকিন مُؤْمِن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া وَلِى = ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وِتْر = বি'ত্‌র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ (উযূ'-);

খাড়া যবর = া قَتَلَ = ক'াতালা, اوى = আাওয়া,

খাড়া যের = ী, رَبِّهٖ = রব্বিহী, يُحْيِى = য়ুহ'য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جَنَّة = জান্নাঃ, জান্‌নাঃ, عائشة = 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন = হ্ اللّٰه = আল্লাহ্ نامه = নাামাহ।

ع = و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ　　عبد = 'আব্দ

ع = 'ই　　علم = 'ইলম

ع = 'উ　　عثمان = 'উছ'মান

عا = 'আ　　عابد = 'আবিদ

عى = 'ঈ　　عيد = 'ঈদ

عو = 'ঊ　　عود = 'ঊদ

وَ = ওয়া　　ولد = ওয়ালাদ

وِ = বি　　وتر = বি'ত্র

وْ = ·　　وحى = 'ওয়াহ্‌য়ি

وُ = উ　　وضوء = উদূ'(উযূ')

و + الف = ওয়া　　واجب = ওয়াজিব

و + عْ = ওয়া'　　وعظ = ওয়া'জ'

و + ى = ওয়ায়　　وَيْل = ওয়ায়ল

يَ = য়া　　يهود = য়াহুদ　　ى + و = য়ূ　　يوسف = য়ূসুফ　　ى + يْ = য়ায়　　يَيْئَس = য়ায়'আস্

a এ = া, আা I= ী ঈ U = ূ = উ

অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে

ব্যতিক্রম

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল 'আরবী, শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্‌তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ; তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্‌যিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহমত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজদা, সুন্নত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

অনু. .... অনুবাদ, অনূদিত

'আ .... 'আরবী

আনু. .... আনুমানিক

আবি. .... আবির্ভাব

('আ) .... 'আলায়হিস্-সালাম

ই. .... ইত্যাদি

ইং .... ইংরাজী

ঐ. .... ib. ibid, و هى كتاب

খৃ. খ্রী. .... খৃস্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দে, ع

খৃ. পূ. .... খৃস্টপূর্ব

জ. .... জন্ম
ড. ডঃ. .... ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ. .... ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি. .... তারিখবিহীন n.d.
তু. .... তুলনীয় cf. قب
দ্র. .... দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. رك بان
নং. .... নম্বর, No.
প. .... পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. ببعد
পরি. .... পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ডু. .... পাণ্ডুলিপি, MS.
পূ. গ্র. .... পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. كتاب مذكور
পূ. স্থা. .... পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব.ব. .... বহুবচন
বি. স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র. .... মুদ্রণ
মূ. ধা. .... মূল ধাতু
মৃ. .... মৃত, মৃত্যু = م
(র). .... রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা). .... রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু
(স). .... সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং. .... সংস্করণ
সম্পা. .... সম্পাদিত, ed.
স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে, passim, بمواضع كثيره
হি. .... হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র. .... পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক. .... id. Idem, وهى مصنف
শা/ধা. .... section mark, فصل
শিরো, ধাতু. .... শিরোনামে, بذيل مادة s.v.
পত্র, পত্রক. .... fols.
তথা. .... Sc.
মূ. পা. .... Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র. .... Line. লাইন, س
ক. .... a
খ. .... b
১খ. ৪০ .... প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ ঃ ৭ .... সূরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)

৪৫০/১০৫৮......... হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

'আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগ'নী[১] অথবা[২] অথবা[৩]= আবুল ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, আল-আগ'নী, বূলাক ১২৮৫ হি.; [২] কায়রো ১৩২৩ হি.; [৩] কায়রো ১৩৪৫ হি.।

আগ'নী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par 1. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।

আগ'নী, Brunnow=কিতাবুল-আগানী, ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।

আবুল-ফিদা, তাক'বীম=তাক'বীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা, তাক'বীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আন্‌বারী, নুযহা=নুযহাতু'ল-আলিব্বা ফী ত'াবাক'াতি'ল-উদাবা , কায়রো ১২৯৪ হি.।

'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগা'রাফিয়া লুগাতি, ইস্‌তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।

ইদরীসী, মাগ'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

ইব্‌ন কু'তায়বা, আশ-শি'র=ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার=কিতাবুল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, বূলাক ১২৮৪ হি.।

ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।

ইব্‌ন খালদূন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইব্‌ন খাল্লিকান=ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বাউ আবনাই'য্‌-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies).

ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক=the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।

ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফায়াতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ.।

ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্‌=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজূমুয-যাহিরা ফী মুলূক মিস'র ওয়াল-ক'াহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=the Same, সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প.।

ইব্‌ন বাত্'তূ'তা=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স'-সি'লা ফী আখবার আইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।

ইব্‌ন রুসতা=আল-আ'লাকু'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।

ইব্‌ন সা'দ=আত'-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ.।

ইব্‌ন হ'াওক'াল=কিতাব সূ'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।

ইব্‌ন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1859-60.

ইব্‌নু'ল-আছ'ীর=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ.।

ইব্‌নুল-আছীর, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.

ইব্‌নুল-আব্বার=কিতাব তাকমিলাতি'স'-সি'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।

ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায'ারাত=শায'ারাতু'য-য'াহাব ফী আখবার মান য'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries).

ইব্‌নুল-ফাক'ীহ্‌=মুখতাস'ার কিতাব আল-বুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।

য়াকূ'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI).

য়াকূ'ত=মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)

য়া'কূ'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.

য়া'কূ'বী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII).

ইস্‌ত'াখরী=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।

কুতুবী, ফাওয়াত= ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি.।

খাওয়ানদামীর=হ'াবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।

ছা'আলিবী, য়াতীম=য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র ফী মাহ'াসিনিল-'আস'র, দামিশক ১৩০৪ হি.।

জুওয়ায়নী=তারীখ-ই জিহান গুশা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ক'াযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)

তা-'আ. (TA), তাজুল-'আরূস, মুহ'াম্মাদ মুরতাদ'া ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।

ত'াবারী=তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.

তারীখ-ই গুযীদা=হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-ক'াযবীনী, তারীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.

তারীখ দিমাশক'=ইব্‌ন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।

তারীখ বাগদাদ=আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।

দাওলাত শাহ্=তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।

দাব্বী=বুগ্য়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহ্লিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).

দামীরী=হায়াতুল-হায়াওয়ান (quoted according to title of articles).

ফারহাংগ=র'যমারা ও ন'াওতাশ, ফারহাং-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।

ফিরিশ্তা=মুহাম্মদ ক'াসিম ফিরিশ্তা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।

বালাযু'রী, আনসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ., ৫খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein, জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।

বালাযু'রী, ফুতূহ'=ফুতূহু'ল-বুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

মাককারী, Analects=নাফহু'ত্-তীব ফী গুস্নিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la littereature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।

মাস'ঊদী, তানবীহ = কিতাবুত-তান্বীহ্ ওয়াল-ইশ্রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).

মাস্'ঊদী, মুরূজ = মুরূজুয'-য'াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।

মীর খাওয়ানদ=রাওদ'াতু'স'-স'াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।

মুক'াদ্দাসী=আহ'সানুত-তাক'াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক'ালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).

মুনাজ্জিম বাশি=স'াহ'াইফুল-আখবার, ইস্তাম্বুল ১২৮৫ হি.।

যাহাবী, হু'ফ্ফাজ'=আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ', ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।

যুবায়রী, নাসাব=মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।

লি. 'আ. (LA)=লিসানুল-'আরাব।

শাহ্রাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান্-নিহ'াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।

সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্সাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).

সার্কীস=মু'জামুল মাত'বূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।

সিজিল্ল-ই'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।

সুয়ূত'ী, বুগ্'য়া=বুগ্য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।

হ'াজ্জী খালীফা=কাশফুজ'-জু'নূন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।

হ'াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা=ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।

হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্ফুজ' জু'নূন, Leipzig 1835-58.

হামদানী= সি'ফাতু জাযীরাতিল 'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Lciden 1884-91.

হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কু'লূব, সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)

হ'দূদুল 'আলাম=The Regions of the World, অনু. V. Minorsky, London 1937 (Gms. N. S. Xi).

Abbreviated Titles
Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.

Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV vc XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.

Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold, Turkestan^2=the same, 1st edition, London 1958.

Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.

Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.

Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.

Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.

Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Sa'di, London 1908.

Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.

Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.

Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.

Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.

Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.

Dozy, Recherches[8]=Recherches sur l'lristoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.

Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).

Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.

Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.

Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.

Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.

Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90

Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.

Goldziher, Vorlesungen[2]=2nd ed., Heidelberg 1925.

Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.

Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.

Hammer-Purgstall Gor[2]=the same, 2nd ed., Pest 1840.

Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.

Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.

Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.

Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.

Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.

Lane=E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).

Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.

Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.

Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.

Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.

Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.

Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.

Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).

Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.

Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.

Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.

Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.

Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.

Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.

Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.

Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.

Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.

Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.

Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.

Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.

Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.

Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.

Snouck Hukrgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.

Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.

Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.

Spuler, Iran=B. Spuler. Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.

Spuler, Mongolen^2=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.

Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.

Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.

Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.

Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.

Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.

Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.

Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).

Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen,

Abh.K.M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr, Ak. W.=Abhandlungen der preussischen AKademir der Wissenschaften.

Afr.Fr.-Bulletin de Comite de 1'Afrique francaise.

AIEO Alger=Annales de 1'Institut d'Etudes Orientale de 1'Universite d'Alger N.S. from 1964.

AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.

AO=Acta Orientalia.

ArO=Archiv Orientalni.

ARW=Archiv Fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaeological Survey of India.

ASI, NIS=ditto, New Inperial Series.

ASI, AR-ditto, Annual reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.

BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.

BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).

BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de 1'Institut Francais de damas.

BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.

BIE=Bulletin de 1'Institut d'Egypte.

BIFAO-Bulletin de 1'Institut Francais d'Archeologie Orientale de Caire.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.

BSE^2=the same, 2nd ed.

BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.

BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.
COC=Cahiers de 1› Orient Contemporain.
CT=Cahiers de Tunisie.
EI[1]=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.
EIM=Epigraghia Indo-Moslemica.
ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.
GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.
GMS=Gibb Memorial Series.
Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.
IA=Islam Ansiklopedisi.
IBLA=Revue de 1' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.
IC=Islamic Culture.
IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.
IHQ=Indian Historical Quraterly.
IQ=The Islamic Quarterly.
Isl.=Der Islam.
JA=Journal Asiatique.
JAfr. S=Journal of the African Coeiety.
JAOS=Journal of the American Oriental Society.
JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JE=Jewish Encyclopaedia.
JESHO=Journal of the Economic and Social Historyt of the Orient.
J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.
JNES=Jouranal of Near Eastern Studies.
JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.
JQR=Jewish Quarterly Review.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.
J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.
JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.
JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.
JSS=Journal of Semitic Studies.
KCA=Korosi Csoma Archivum.
KS=Keleti Szemle (Oriental Review).
KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).
LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).
MDOG=Mitteillungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.
MEA=Middle Eastern Affairs.
MEJ=Middle East Journal.

MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de 1' Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO =Milanges de 1'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE-Memoires de 1' Institut d'Egypte.
MIFAO=Memoires publics par les membres de 1' Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.
MO=Le monde Oriental.
MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.
MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.
MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orentalische Sprachen, Westasiatische Studien.
MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
OC=Oriens Christianus
OLZ=Orientalistische Literaturzietung.
OM=Oriente Moderno.
PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraghie arabe.
REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHE=Revue de 1'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de 1'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue Monde Musulman.
RO=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de 1"Orient Chretien.
ROL=Revue de 1'Orient Latin.
RSO=Rivista degli Studi Orientali.
RT=Revue Tunisienne.

SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akadekemie der Wissenschaften.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.

SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physixalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der dizinischen Sozietat in Erlangen.

SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl.-Studia Islamica.

S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).

TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi Instituta Etnografiy(Works of the Institute of Ethnograpgy).

TM=Turkiyat Mecmuasi.

TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.

Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.

Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI'n. s.=The same, new series.

Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.

ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.

ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

সূচীপত্র

ই.বি.—১/১০০

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ ০৯/ইবিপ্র/পুনমু/১/২০০৩(উন্নয়ন)/৩২৫০

ইসলামী বিশ্বকোষ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

অ

অন্ধকূপ হত্যা ঃ নওয়াব সিরাজুদ দাওলার বিরুদ্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েলের সাজানো একটি উপাখ্যান। নওয়াব কর্তৃক ১৭৫৬ খৃ. জুন মাসে কলিকাতার ইংরেজ দুর্গ দখলের পর ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া হত্যা করা হয় বলিয়া এই উপাখ্যানে দাবি করা হয়।

ঘটনার প্রেক্ষাপট ঃ সকল ঐতিহাসিকই এই ব্যাপারে একমত যে, তরুণ নওয়াবের সিংহাসন আরোহণকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা স্বাভাবিকভাবে মানিয়া নিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের কূটনৈতিক নিয়ম বহির্ভূত আচরণে। বিশেষত (১) নওয়াবের দরবারে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ না করা, (২) সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া দুর্গ নির্মাণ ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, (৩) সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদেরকে নওয়াবের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান ও অভ্যুত্থানের প্রয়াস, (৪) বাণিজ্যক্ষেত্রে দেশীয় নিয়ম অমান্য ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন, (৫) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গভর্নর রজার ড্রেক কর্তৃক রাজদ্রোহী কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি ঘটনা নওয়াবকে ইংরেজ দমনে উদ্যোগী হইতে বাধ্য করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে প্রথম ও শেষ কারণটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নওয়াব আলীবর্দী খানের অসুস্থ হওয়ার পর হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত বাংলার শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন সিরাজুদ দাওলা (দ্র.)। তখন তিনি গোপন সূত্রে খবর পান, ঢাকা অঞ্চলের রাজস্ব কর্মকর্তা রাজা রাজবল্লভ দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী তহবিল তসরুপে লিপ্ত। নওয়াব হিসাবের সমস্ত কাগজপত্র নিরীক্ষা করার জন্য রাজবল্লভকে ডাকিয়া পাঠান। ভীত-বিহ্বল রাজবল্লভ তিপ্পান্ন লক্ষ টাকাসহ পুত্র কৃষ্ণদাস ও পরিবারের সকল সদস্যকে গোপনে ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতা পাঠাইয়া দেয়। কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দানের পিছনে কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) তাহার সঙ্গে আনীত তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা কোম্পানীর পুঁজি বৃদ্ধির সহায়ক হইবে, (২) কলিকাতা কর্তৃপক্ষের কতক অফিসার কর্তৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়া ঘুষ লাভ, (৩) ঘসেটি বেগমের উপর রাজবল্লভের প্রভাব যাহার মাধ্যমে আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিংহাসনের দাবিদার শওকত জঙ্গের ক্ষমতারোহণ নিশ্চিত করা (স্বার্থলোভী অমাত্য ও পরিবারের সদস্যরা শওকত জঙ্গকে ক্ষমতাসীন করা সমর্থন করিত), যাহাতে কোম্পানী সরকারের নিকট হইতে বিপুল আর্থিক ও ব্যবসায়িক সুবিধা লাভে সমর্থ হইতে পারে।

অপরপক্ষে ইংরেজরা ১৭৫৫ খৃ. দুরভিসন্ধিমূলকভাবে কলিকাতার দুর্গ সম্প্রসারণ ও শহরের চারিপাশে পরিখা খনন করিতে থাকে। কৃষ্ণদাস ও দুর্গ নির্মাণের ঘটনায় নওয়াব স্পষ্টতই বুঝিতে পারেন, ইংরেজরা তাঁহার সিংহাসন লাভের অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। তাই ১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের দিনই নওয়াব ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গভর্নর রজার ড্রেককে দুর্গ নির্মাণ স্থগিত ও কৃষ্ণদাসকে নওয়াবের হাতে সোপর্দ করার ফরমান পাঠাইয়া দেন। ড্রেক পত্রবাহক নারায়ণ সিংহকে অপমানিত করিয়া ফেরত পাঠায়। তথাপি নওয়াব যুদ্ধের পথ পরিহারপূর্বক শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করেন। তাই তিনি খাজা ওয়াজিদ নামক আর্মেনিয়ান দূত মারফত ইংরেজদেরকে জানাইয়া দেন, "ইংরেজরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করিতে চায় এবং নওয়াবের সহযোগিতা চায় তবে তাহারা যেন অনতিবিলম্বে নবনির্মিত দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠায়, নচেৎ আমি সুবা হইতে ইহাদের বহিষ্কার করিতে বদ্ধপরিকর।" উল্লেখ্য, এই পত্রটি ২৮ মে, ১৭৫৬ সালে প্রেরিত হয়।

খাজা ওয়াজিদকেও নারায়ণ সিংহের মত দুর্ব্যবহারের শিকার হইতে হয়। শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে এই ধরনের মিশন কলিকাতা গেলে দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হইতে হইবে বলিয়াও মিঃ ড্রেক হুমকি দেয়।

এই অবস্থায় নওয়াব সামরিক অভিযান ভিন্ন মিঃ ড্রেকের ঔদ্ধত্য দমনের বিকল্প দেখিলেন না। তাই ৩ জুন, ১৭৫৬ সালে তিনি ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব-পদক্ষেপ হিসাবে কাসিম বাজার দুর্গ অবরোধ করেন। ফ্যাক্টরী প্রধান মিঃ ওয়াটস আত্মসমর্পণ করিলে নওয়াব অধিকৃত ফ্যাক্টরীর সকল মালামাল তালিকাবদ্ধ করিয়া অফিস সীল করিয়া দেন যাহাতে নওয়াবের অনুপস্থিতিতে লুটতরাজ হইতে না পারে।

কাসিম বাজার পতনেও মিঃ ড্রেক সিরাজের সাথে আলোচনায় বসিতে রাজী হয় নাই, বরং ১০ জুন, ১৭৫৬ সালে নওয়াবের ঘাঁটি শোকসাগর ও থানা আক্রমণ করে। ইহার পরও নওয়াব আলোচনার পথ পরিহার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই সংলাপ প্রয়াসকে মিঃ ড্রেক দুর্বলতার লক্ষণ হিসাবে দেখিয়া ভুল করে। ড্রেকের ধারণা ছিল নওয়াবের সমরশক্তি দুর্বল এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস তাঁহার নাই।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইংরেজ বিরোধী অপরাপর ইউরোপীয় শক্তি, বিশেষত ওলন্দাজ ও ফরাসী শক্তিকে নওয়াব নিজ পক্ষে

আনার চেষ্টা করেন এবং ইহাতে আংশিক সফলও হন। সার্বিক প্রস্তুতি সমাপনান্তে ১৬ জুন, ১৭৫৬ সালে ৩০ হাজার সৈন্যের বাহিনী লইয়া নওয়াব সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন।

ইংরেজ বাহিনীতে ছিল মাত্র আড়াই শত ইউরোপিয়ান ও এক হাজার ভারতীয় সেপাই। দূরপাল্লার কামান ছিল পঞ্চাশটি। সিরাজের সঙ্গে গভর্নর ড্রেকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের তুলনায় তার সমরশক্তি ছিল খুবই অল্প। নওয়াবের বিশাল বাহিনী চারিদিক দিয়া কলিকাতা শহর ও দুর্গ ঘিরিয়া ফেলে। প্রথম দিনের গোলাগুলীতে সিরাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তাই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ইংরেজদের পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া দেশীয় সেপাইগণ নওয়াবের বাহিনীতে যোগ দেয়। তৃতীয় দিনে ড্রেক শহর রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা পরিহার করিয়া শুধু 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু নওয়াবের গোলন্দাজ বাহিনী ইংরেজদেরকে পতনের দ্বারপ্রান্তে লইয়া যায়। ড্রেক এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয় যে, তাহার চেহারায় সৃষ্ট আতঙ্কের ছাপ দেখিয়া অন্য সবাই পালাইবার চেষ্টা শুরু করে। রাতের অন্ধকারে নোঙ্গর করা জাহাজে ড্রেকের পিছনে একসাথে এত লোক উঠিতে গিয়া অনেকে পদপিষ্ট হইয়া, কেহ বা পানিতে পড়িয়া মারা যায়। নোঙ্গর তুলিতে যাইয়া পলায়নপর সর্বশেষ জাহাজ প্রিন্স চড়ায় আটকাইয়া যায়। এই আটকাইয়া পড়া জাহাজে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ছিল রিচার্ড পার্কস, জন হলওয়েল, এডওয়ার্ড আয়ার, লরেন্স উইথারিংটন, ডেভিড ক্রেটন প্রমুখ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ। হলওয়েল অবশ্য পরে দাবি করে, সে ও তাহার সঙ্গীরা ইচ্ছা করিয়াই জাহাজে থাকিয়া যায়। হলওয়েলের এই দাবি পরিচিত মহলে হাস্যাম্পদ মনে করা হয়। ২০ জুন তারিখে বিকাল ৪টায় কলিকাতার চূড়ান্ত পতন ঘটে। অতিরিক্ত মদ্যপান, নৈরাশ্য আর আতঙ্কের কারণে বন্দী ইংরেজরা নওয়াব বাহিনীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এইসব অস্বাভাবিক আচরণের বন্দীদেরকে একটি কক্ষে ২০ জুন দিবাগত রাত্রে আটক রাখা হয়। এই আটক বন্দীদের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জন হলওয়েল 'অন্ধকূপ হত্যা' উপাখ্যানটি সৃষ্টি করে।

জন জেফানায়া হলওয়েল কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, যদিও পদবীর দিক হইতে ছিল বেশ নিম্নে। পলায়নপর প্রিন্স জর্জের অন্যান্য বন্দীর সাথে সেও আটক হয় এবং ইংরেজ বন্দীদের সঙ্গে কথিত অন্ধকূপে সেও ২০ জুনের দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত করে। সে বন্দী অবস্থায় কৃতকর্মের শাস্তি পাওয়ায় এবং নিজেদের নির্মিত দুর্গের গারদখানায় কষ্টকর সময় যাপন করায় নওয়াব ও নওয়াব বাহিনীর প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। তাই সে নওয়াবকে ঘৃণা, অবজ্ঞা আর নিন্দার পাত্র বানাইবার উদ্দেশে অন্ধকূপ হত্যার কল্পিত লোমহর্ষক কাহিনী রচনা করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করে। সে বলে, ঐদিন রাত্রে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গারদখানায়, যাহার আয়তন ১৮ ফুট × ১৪ ফুট ১০" ইঞ্চি, ১৪৬ জন বন্দীকে গাদাগাদি করিয়া রাখা হয়। গ্রীষ্মের রাত্রে ভীষণ গরমে ১২৩ জন বন্দী চরম অমানবিক কষ্টে মারা যায়, জীবিতদের অবস্থাও ছিল করুণ।

তাহার বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হলওয়েল সাহেব হেরে গিয়েও কল্পনার জোরে সিরাজ উদ্দৌলার উপর টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেছেন। তিনি অনেক বাড়িয়ে চড়িয়ে অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে, অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে জ্বলন্ত ভাষায় এই অন্ধকূপ হত্যার এক বিচিত্র কাহিনী রচনা করে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু ঐ রকম একটা ছোট ঘরে ১৪৬ জন ষণ্ডামার্কা ইউরোপীয়ানকে একসঙ্গে পোরা যে এক অসম্ভব ব্যাপার। তাহা ছাড়া তখন অতগুলো ইউরোপীয়ান একসঙ্গে পাওয়া গেলই বা কোথা থেকে?

"গোড়া থেকেই তো কলকাতায় ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তার উপর চিৎপুরের এক যুদ্ধে, লালদিঘীর প্রথম যুদ্ধে, ফোর্টের কাছে লালদিঘীর দ্বিতীয় যুদ্ধে বড় কম লোক তো মারা যায়নি। তার চেয়েও বেশী লোক আবার পালিয়েছে। ফোর্টের লড়াই শেষ হবার পরেও অনেক ইউরোপীয়ান ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়েছিল। সবশুদ্ধ ষাটের বেশী লোক কিছুতেই ফোর্টে থাকতে পারে না। আসল কথা, পরে যারই কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি তাকেই অন্ধকূপে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। এরকম করলে, গণিতের নিয়ম অনুসারে অঙ্ক তো বেড়ে যাবেই।"

হলওয়েলের গাঁজাখুরি গল্পের প্রতি রসিকতা করিয়া শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "খবর পাওয়া যায়, মিসেস ক্যারী বলে একটি স্ত্রীলোক তার স্বামীকে ছেড়ে যেতে না চাওয়ায় স্বামীর সঙ্গে তাকেও অন্ধকূপে যেতে হয়েছিল। ভাগ্যিস সকালবেলা তিনি জ্যান্ত বেরিয়েছিলেন আর পরেও তার দেখা পাওয়া গিয়েছিল, নইলে লোকে এখনো হলওয়েল সাহেবের কাহিনীতে বিশ্বাস করতো যে, ঐ মহিলা সিরাজ উদ্দৌলার অন্তঃপুরে নবাবের ভোগে লেগেছিলেন।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম বলেন, "সমস্যাটির পূর্ণ পরিসংখ্যান যাচাই করে গুপ্ত (Brijen K. Gupta) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বড়জোর চৌষট্টিজন লোককে ২৬৭ বর্গফুটের একটি ঘরে বন্দী করা হয়। এদের মধ্যে একুশজন জীবিত থাকে আর বাকী বন্দীরা মারা যায়। যারা মারা যায় তাদের অনেকেই ছিল যুদ্ধে কমবেশী আহত। একথা মনে রাখা উচিৎ যে, যারা মারা যায় তারা ছিল সব যুদ্ধবন্দী এবং পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধবন্দীদের বিশেষ ক্ষেত্রে হত্যা করা বা অমানবিক ব্যবহার করা বিরল কিছু নয়। সিরাজ উদ্দৌলাহকে জড়িয়ে তথাকথিত এ অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে যত লেখা হয়েছে অনুরূপ অন্য কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। এর একটি কারণ ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ববোধ। একটি এশীয় দেশের শাসক কর্তৃক ইউরোপীয়রা এমনভাবে পরাজিত হবে, লাঞ্ছিত হবে এটা ছিল তাদের ভাবনার অতীত। এশিয়া-আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপন করতে গিয়ে, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে ও বর্বরোচিত দাস ব্যবসায় সমকালীন ইউরোপীয়রা যে নৃশংসতা, পৈশাচিকতা প্রদর্শন করে এর উপমা কোথায়? কিন্তু সে যুগের ইউরোপীয়রা ছিল এমনি বর্ণবাদী যে, কৃষ্ণকায়ের উপর নির্যাতনকে তারা নির্যাতনই মনে করেনি। কারণ তাদের কাছে কৃষ্ণকায়রা ছিল পশুতুল্য। সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রতি বৃটিশ বণিকদের যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনোভাব লক্ষ্য করি, তাদেরকে আইনের অধীনে আনার প্রচেষ্টায় সিরাজ-উদ-দৌলাহর যে অর্থ ব্যয় ও লোকক্ষয় হয় সে পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র একুশজন লোকের অনভিপ্রেত মৃত্যু স্বৈরাচারী নৃশংসতার পরিচয় বহন করে কি?"

হলওয়েলের মিথ্যা রটনা অনুযায়ী নবাব সিরাজুদ দাওলার নির্দেশে ১৮ × ১৪ ফুট মাপের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। ঐ ক্ষুদ্র কক্ষে মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র জানালা ছিল। হলওয়েলের ভাষ্য অনুযায়ী শ্বাসরুদ্ধকর ঐ পরিবেশে বন্দী করিয়া ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৬ জনই সেই রাত্রিতে মারা যায়।

তথাকথিত এই ঘটনা যে অবান্তর ও সত্যবিবর্জিত তাহা সহজেই অনুমেয়। একটি ১৮ × ১৪ ফুট কক্ষে অর্থাৎ ২৫২ বর্গফুটের মধ্যে ১৪৬ জন ব্যক্তিকে যে ঠাসাঠাসি করিয়া আবদ্ধ রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয় তাহা কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ড. সি.-আর. উইলসন জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন, মাথাপিছু দেড় ফুটের কিছু বেশি জায়গা প্রত্যেকের ভাগে পড়িয়াছিল। সুতরাং এসবই নিছক মনগড়া কাহিনী (Dr. C.R. Wilson, Old Fort William in Bengal, vol. II, p. 59)।

হলওয়েল নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, গোলন্দাজ বাহিনীর ৩১জন সৈন্য ২০ জুনের দুপুরের পূর্বেই নিহত হয় (S.C. Hill, Bengal in 1756-57, Indian Record Series, Vol. I, p. 114)। অপরদিকে মিলস দাবি করেন, দুর্গের পতনের সময় ১৮ জন সৈন্য পলায়ন করে অর্থাৎ একজনের বর্ণনার সহিত অন্যজনের বর্ণনার কোন মিল নাই। প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকদের গবেষণাপ্রসূত হিসাবে প্রতীয়মান হয়, শেষ পর্যন্ত ঐ দুর্গে ৮ থেকে ১০ জন মাত্র ইংরেজ জীবিত ছিল। হলওয়েলের কল্পনাপ্রসূত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী কত বাস্তবতা বিবর্জিত তাহা উল্লিখিত তথ্যসমূহ হইতে সহজেই প্রমাণিত হয়।

প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ করা যায়, ফোর্ট উইলিয়াম হইতে ইংরেজ 'বীরপুরুষদের' পলায়নের বিবরণ বা সিরাজুদ দাওলার প্রতি পিগটের পত্রে অথবা তাঁহাকে লিখিত ওয়াট্স-এর পত্রেও অন্ধকূপের কোন উল্লেখ নাই। তাহা ছাড়া নবাব সিরাজুদ দাওলাকে লিখিত ইংরেজদের অন্যান্য পত্রেও অন্ধকূপ সম্পৃক্ত কোন অভিযোগ বিধৃত হয় নাই। "আলীনগরের সন্ধি" পত্রেও তথাকথিত অন্ধকূপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমন কি ক্লাইভ "কোর্ট অফ ডিরেক্টরস"-এর নিকট সিরাজুদ দাওলাকে কেন সিংহাসনচ্যুত করা হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতেও অন্ধকূপ হত্যার কোন বিবরণ সন্নিবেশিত হয় নাই।

কোর্ট অফ ডিরেক্টরস-কে লেখা হলওয়েলের পত্র হইতে প্রমাণিত হয়, সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে কলিকাতা দুর্গে মাত্র ৬০ জন ইউরোপীয়ান ছিল। ঐ ষাটজনের মধ্যে গভর্নর ড্রেক, সেনাপতি মিলচিন, চার্লস ডগলাস, হেনরী ওয়েডারব্যারন, লেঃ মেপলটফট, রেভারেন্ড ক্যাস্টন, ম্যাকেট, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, মানিবৃহাম, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট প্রমুখ দশজন 'বীরপুরুষ' পলায়ন করিয়াছিল অর্থাৎ হলওয়েলের বর্ণনাই সাক্ষ্য প্রদান করে, সিরাজের হাতে বড়জোর পঞ্চাশজনের প্রাণহানি হইতে পারে (Holwell's Letter to the Hon'ble Court of Directors, 30th November, 1756, p. 36)।

কল্পনাপ্রসূত অন্ধকূপ হত্যার সমর্থনে দাবি করা হয়, ড্রেকের কলিকাতা দুর্গ পরিত্যাগের পর ১৭০ জন ইউরোপীয়ান ঐ দুর্গে জীবিত ছিল যাহাদের মধ্যে ১৪৬ জনকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী গ্রে বলেন, ১৯ জুন রাত্রে একজন ইংরেজ সৈন্য ৫৭ জন ওলন্দাজ সৈন্যসহ শত্রুপক্ষে যোগদান করে (Gray's Letter, Hill, vol. 1, P. 108)। উপরন্তু হিলের বর্ণনা হইতে একথাও প্রমাণিত হয়, ড্রেকের দুর্গ ত্যাগের পর ও দুর্গের পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীরের উপরেই নিহত হয় ৫০ জন সৈন্য (Hill, ibid, vol. 1, p. 88)।

"অক্সফোর্ড হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া" গ্রন্থেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, "We owe the traditional story of the Black Hole to the descriptive powers of V.Z. Holwell, the defender of Calcutta and a plausible and none too reliable man (T.G.P. Spear's "Note on the Black Hole". Oxford History of India, 3rd ed., p. 479)।

Oxford History of India এই মর্মেও সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "For fifty years little notice was taken of the incident, but it then became a convenient material for the compilers of an imperialist hagiology." অর্থাৎ "দীর্ঘ ৫০ বৎসরে ঐ ঘটনার খুব সামান্যই জানা গিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের জীবনীকারদের জন্য এসব তথ্য সুবিধাজনক হইয়া উঠে" (T.G.P. Spear, ibid, p. 479)।

শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্র যথার্থই উল্লেখ করিয়াছেন, "মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহারা না হয় স্বজাতির কলঙ্ক বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারে। কিন্তু যাহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করিল তাহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরেজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?"

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বর্ণনানুযায়ী ১৯১৫ খৃস্টাব্দে ঐতিহাসিক জে.এইচ. লিটল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন, হলওয়েলের বর্ণনার আদৌ কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নাই এবং তাহার কল্পকাহিনী ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরপুর। ব্রিটানিকার ভাষায় ঃ "According to Holwell, 146 people were shut up, and 23 emerged alive. The incident was held up as evidence of British heroism and the Nawab's callousness. In 1915 J.H. Little pointed out Holwell's unreliability as a witness and other discrepancies, and it became clear that the Nawab's part was one of negligence only. There is no foundation to the charge that the Nawab was personally responsible for the incident....... The details of the incident were thus opened to doubt." (হলওয়েলের মতে ১৪৬ জনকে বন্দী করা হয় এবং ২৩জন

মাত্র বাঁচিয়া থাকে। এই ঘটনাকে বৃটিশ বীরত্ব ও নওয়াবের ঔদাসীন্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯১৫ সালে জে.এইচ. লিটল সাক্ষী হিসাবে হলওয়েলের অনির্ভরযোগ্যতা ও অন্যান্য অসামঞ্জস্য তুলিয়া ধরেন এবং একথা স্পষ্ট হয়, এই ঘটনার জন্য নবাবের শুধু অবহেলাই ছিল। নওয়াব যে ব্যক্তিগতভাবে এই ঘটনার জন্য দায়ী, এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই............., ফলে এই ঘটনার বিবরণীসমূহ সন্দেহের উদ্রেক করে)। স্বভাবতই ইতিহাসবেত্তা লিটল তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যাকে "A gigantic hoax" বা "সুবিশাল ধোঁকা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

একথা সহজেই প্রতীয়মান হয়, নবাব সিরাজুদ দাওলাকে একজন নৃশংস, বিবেক বিবর্জিত, মানবতাহীন ব্যক্তিরূপে জনসমক্ষে উপস্থাপন করার ঘৃণিত প্রয়াসে হলওয়েল এই মিথ্যা রটনা শুরু করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক, নবাব সিরাজুদ দাওলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস আজও অব্যাহত রহিয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত Tower of London-এ (যেখানে Crown Jewels-এর সঙ্গে কোহিনূর হীরকটিও সংরক্ষিত আছে) পলাশীর ঐতিহাসিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একটি হস্তীর অবয়বের নিম্নে লিপিবদ্ধ আছে, ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া সিরাজুদ দাওলা বৃটিশদের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযান চালান (The Nobab conspired with the French against the British)। অথচ একথা সর্বজনবিদিত, মীরজাফর, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া বৃটিশরাই সেই অমিততেজ স্বাধীনচেতা নবাবকে পরাজিত করিয়া অন্যায়ভাবে এই দেশ দখল করে।

শুধু বাংলার ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও নবাব সিরাজুদ দাওলা এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলিয়া বিবেচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও তিনি স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন। অন্যায়, ভয়-ভীতি; লোভ-লালসা বা চক্রান্তের কাছে কোন দিনও তিনি মাথা নত করেন নাই। যুক্তরাজ্য ও এই উপমহাদেশের নগণ্য সংখ্যক ইতিহাসবেত্তা এই মহান চরিত্রে হলওয়েলের ন্যায় কল্পিত কাপুরুষতা ও অযথা অত্যাচারের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া কলংক লেপনে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে, নবাব সিরাজুদ দাওলা যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের দুর্ব্যবহার ও ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি নজিরবিহীন সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও ঔদার্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

S.C. Hill তাহার Bengal in 1756-57 শিরোনামীয় গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন, নবাব হিসাবে সিরাজুদ দাওলার অভিষেকের ক্ষেত্রে এবং তৎকর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের গভর্নর রজার ড্রেকের নিকট প্রেরিত পত্রের উত্তরে বৃটিশরা অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী আচরণ করে। William Tooke তাহার পত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, "I have already observed by which means Seir Raja Doulet (Sirajuddoulah) came to the Nababship, upon which occasion it is usual according to an old Eastern custom on being appointed Prince of the country to be visited by the different foreign nations and proper presents made him. This in the first place we neglected doing, and gave him no small vexation." (S.C. Hill, ibid, Vol. I, p. 278)।

হলওয়েল শুধু মিথ্যা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং কোম্পানীর বিজয়োত্তর ১৭৬০ খৃ. সে কলিকাতার গভর্নর হইলে অন্ধকূপ উপাখ্যানকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিমে 'ব্লাকহোল মনুমেন্ট' স্থাপন করে। ইহা পরে ভারতীয়দের নিকট হলওয়েল মনুমেন্ট নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ দাওলাকে হেয় করার মানসে হলওয়েল যে মিথ্যা রটনা শুরু করে তাহা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবাব বাহিনী কলিকাতা ত্যাগ করিলে সে কলিকাতাস্থ রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম দিকে একটি 'স্মৃতিসৌধ' গড়িয়া তোলে। তদানীন্তন ভারতবাসী এই অবমাননাকর 'মনুমেন্ট'-এর অস্তিত্ব মানিয়া নিতে কোনদিনও সম্মত হয় নাই। তাহাদের সুতীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড হেস্টিংস ১৮২১ সালে উক্ত 'মনুমেন্ট' অপসারণ করেন। কিন্তু বৃটিশ চক্রান্তকারীদের প্রবল চাপের মুখে লর্ড কার্জন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পূর্বের স্থানেই একটি নূতন মার্বেল পাথর নির্মিত 'স্মৃতিসৌধ' স্থাপন করেন।

লর্ড কার্জন কর্তৃক সংস্থাপিত 'হলওয়েল মনুমেন্ট'-এর বিরুদ্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ১৯৪০ সালে তাহা বিস্ফোরণ্মুখ হইয়া উঠে এবং একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। এই গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪০ সালের ২৯ জুন কলিকাতার Albert Hall-এ অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, ৩ জুলাইয়ের মধ্যে কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট সরকার কর্তৃক অপসারিত না হইলে জনগণই তাহা অপসারিত করিবে। এই আন্দোলন নস্যাৎ করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করে। কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত হওয়া তো দূরের কথা, তাহা অধিকতর বেগবান হইয়া উঠে। সুভাষচন্দ্র বসুর সাময়িক অনুপস্থিতিতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সুযোগ্য সহকর্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা। মিছিলের পর মিছিল স্রোতের মত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অভিমুখে আগাইয়া গেলে বৃটিশ সরকারের পুলিস বাহিনী নৃশংস অত্যাচার চালায়। সম্মিলিত হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এসব মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সিংহভাগই ছিল মুসলমান। ১৩ জুলাই, ১৯৪০ তারিখে সৈয়দ বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশ পুলিস সেখানেও নৃশংসতার স্বাক্ষর রাখে। ইহার প্রতিবাদে সৈয়দ বদরুদ্দোজা ২৩ জুলাই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলীতে একটি ভাষণ প্রদান করেন। বৃটিশ সরকারের এহেন অমানবিক ও অসভ্য আচরণ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা প্রদান করেন, কুখ্যাত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণ করা হইবে। অতএব, কুখ্যাত ও জনধিকৃত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' চিরতরে অপসারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, অন্ধকূপ হত্যা ঘটনা ছিল একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

যাহার মাধ্যমে নওয়াব সিরাজকে নরঘাতক, রক্তপিপাসু ও জঘন্য চরিত্রের লোক হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করা হয়। অন্ধকূপ ছাড়াও আরও বহু মিথ্যা অপবাদ রচনা করিয়া নওয়াবের চরিত্রকে কলংকিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষ গবেষণা ইংরেজদের সকল ষড়যন্ত্রের দ্বার উন্মোচন করিলেও পলাশীর নির্মম পরিণতি রোধ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় নাই [আরও জানার জন্য দ্র. নবাব সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি নিবন্ধ]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) অধ্যাপক কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ৪৬৫- ৬৬; (২) তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশির যুদ্ধ, নাভানা, কলিকাতা, জুন ১৯৮১, পৃ. ১১৮-২৭; (৩) সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ১৭৫৭-১৮৫৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, পৃ. ১৮-২৪; (৪) Brijen K. Gupta, Sirajuddaullah and the East India Company, 1966, পৃ. ৫৩-৮০; (৫) মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১৬-১৮; (৬) মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ১৯০১-১৯৩০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রু. ১৯৭৭, পৃ. ৪২৪; (৭) সৈয়দ আশরাফ আলী, 'হলওয়েল ও অন্ধকূপ হত্যা' শীর্ষক নিবন্ধ দ্র., ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২ খৃ., পৃ. ২৯-৩৫।

শেখ মাহবুবুল আলম

অমরকোট (امر كوٹ) ঃ (তু. عمر كوٹ ঃ 'অমরকোট) ঃ পাকিস্তানের থারপরকার জেলার অন্তর্গত ২৫.২২ উ. অক্ষাংশে ও ৬৯.৭৫ পূ. দ্রাঘিমায় অবস্থিত শহর (জনসংখ্যা ১৯৫১ সনে ১৯৪৭ জন মুসলিমসহ ৫১৪২)। জনশ্রুতি আছে, সম্রাট 'আলাউদ্দীন খাল্‌জীর শাসনকালে (৬৯৪/১২৯৪- ৭১৬/১৩১৬) সূমরা রাজপুতদের একটি উপদল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজপুতদের সোদা (Soda) গোত্র ৬২৪/১২২৬ সনের সূমরাদের নিকট হইতে শহরটি অধিকার করে, কিন্তু ৭১৩/১৩৩০ সনে তাহাদের দ্বারা তথা হইতে বিতাড়িত হয়। অতঃপর ৮৪৩/১৪৩৯ সনে সোদাগণ আবার সেখানে ক্ষমতায় আসে। যুদ্ধে শের শাহের হাতে পরাজিত হওয়ার পর সম্রাট হুমায়ূন অমরকোটের তদানীন্তন বীরসাল প্রসাদ কিংবা পারসিয়া নামক সামন্ত নৃপতির কাছে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৫ রাজাব, ৯৪৯/২৩ নভেম্বর, ১৫৪২ সনে আকবর অমরকোটে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে 'আবদুর রাহীম খান-ই খানান সিন্ধু জয় করিলে অমরকোট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, কিন্তু ১০০৮/১৫৯৯ সনে অরগূন সামন্ত নৃপতি আবুল কাসিম সুলতান কর্তৃক মুগল সৈন্যাধ্যক্ষ বিতাড়িত হন। ১১৪৯/১৭৩৬ সনে সিন্ধুর অধিপতি নূর মুহাম্মাদ কালহোরা সর্বশেষ সোদা শাসককে বিতাড়িত করিয়া শহরটি দখল করেন। ১১৫২/১৭৩৯ সনে দিল্লী নগরীর ধ্বংস সাধন করিয়া ইরানে ফিরিবার পথে নাদির শাহ নূর মুহাম্মাদকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। পরবর্তী কালে কালহোরা বংশীয় জনৈক নৃপতি যোধপুর-রাজের নিকট দুর্গটি বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে তালপুর গোত্রের লোকেরা ১২২৮/১৮১৩ সনে উহা দখল করে। ইহার পর হইতে আর দুর্গটির সামরিক গুরুত্ব রহিল না। ১৮৪৩ সনে সিন্ধু বিজয়ের সময় হইতে ইহা বৃটিশ অধিকারে আসে। যে পুরাতন দুর্গে আকবর জন্মগ্রহণ করেন, ১৭৪৬ সনে নূর মুহাম্মাদ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং বর্তমান দুর্গটি তিনিই নির্মাণ করেন। শহরটির উত্তর-পশ্চিমে অর্ধ মাইল দূরবর্তী স্থানে ১৮৯৮ সনে আকবরের জন্মস্থান নির্দেশক প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Gazetteer of Sind, B. ৬খ., ৩৪; (২) Imp. Gaz. of India, ২৪খ., ১১৭-৮; (৩) গুলবাদান বেগম, হুমায়ূননামাহ, পৃ. ৫৮; (৪) আবুল ফাদল, আকবারনামাহ, ১খ., ১৮২; (৫) তারীখ-ই মা'সূমী, পৃ. ১৭৭; (৬) জাওহার আফতাবচি, তাযকিরাতুল ওয়াকি'আত, উর্দূ অনু. মুঈনুল হক, ১৯৫৫, পৃ. ৭৪-৫; (৭) Erskine, Hist. of India under Baber and Humayun, ২খ., ২৫০; (৮) আলী শের কানি, তুহফাতুল কিরাম, ৩খ., ৩৬, ১০৯; (৯) Journal of the Sind Hist. Society, ২খ., ৪খ.; (১০) Goldsmid, Historical Memoir on Shikarpur, পৃ. ১৭-৮; (১১) H.T. Sorley, Shah Abdul Latif of Bhit, পৃ. ৩০; (১২) তারীখ রিগিস্তান (সিন্ধী ভাষায়), করাচী ১৯৫৬, পৃ. ৬৯প.; (১৩) V.A. Smith, Akbar, পৃ. ১৩; (১৪) J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, লন্ডন ১৯১৪, ২খ., ২৫৩; (১৫) D. Seton, History of the Caloras.

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2]) / মুহম্মদ ইলাহি বখশ

অমৃতসর ঃ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলা সদর। শহরের জনসংখ্যা (১৯৭১ খৃ.) ৪,৩২,৬৬৩ জন, সমগ্র জেলার জনসংখ্যা ১,৮২২,৬০৬ জন। দেশ বিভাগের পর এই জেলার মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসে। সম্রাট আকবারের প্রদত্ত স্থানে ৪র্থ শিখ গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১ খৃ.) এই শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। গুরু এখানে "অমৃত সরস" (অমরত্ব লাভের দিঘি) নামে একটি দিঘি খনন করেন। তাহা হইতে এই শহরের নামকরণ। প্রথমদিকে ইহার নাম ছিল গুরু কা চক বা চক গুরু ও রামদাসপুর। পরবর্তী গুরু অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬ খৃ.) এইখানে শিখদের প্রধান উপাসনালয় "হরমন্দির" (ইংরেজীতে যাহাকে The Golden Temple = স্বর্ণমন্দির বলা হয়) প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত করেন। ১৭৬২ সালে আহমাদ শাহ দুররানী এই মন্দির ও দিঘি ধ্বংস করেন। কিন্তু শিখরা অতি সত্বর ইহাদের পুনর্নির্মাণ ও পুনর্খনন করে। ১৭৬৪ সালে স্বাধীন শিখ শক্তি প্রতিষ্ঠার পর এই শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী শিখ শাসকগণ, বিশেষত রঞ্জিত সিং এই মন্দিরের জন্য প্রভূত সম্পত্তি দান করেন। ১৮৪৯ সালে এই শহর বৃটিশ শাসনাধীন আসে। প্রায় দুই শতাব্দী যাবত আড়তদারি বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ইহা গুরুত্বপূর্ণ শহর বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Imperial Gazetteer, v/319 ff.; (২) Sarkar, Fall of the Mughal Empire, ii/487; (৩)

H.R. Gupta, Studies in Later Mughal History of the Punjab; (৪) Cunningham, A History of the Sikhs; (৫) Gurmukh Singh, A Brief History of the Harimanda or Golden Temple of Amritsar, 1894; (৬) Ratan Sing Bhangu, Prachin Panth Parkash, 1830 (in Gurmukhi); cf. also Bibliogr. under Shikhs.

Nurul Hasan (E.I.²)/এ. এইচ. এম. রফিক

অযোধ্যা (Oudh/Awadh) ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ ও ফায়যাবাদ বিভাগ লইয়া গঠিত অঞ্চল। ইহার আয়তন ২৪,১৬৮ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১,৫৫,১৪,৯৫০। তন্মধ্যে ১,৪১,৫৬,১৩৯ জনই গ্রামের অধিবাসী (ভারতের আদমশুমারী, ১৯৫১ খৃ.)। প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর ভারতের বিশাল পাললিক সমভূমির অংশ অযোধ্যা হিন্দু সভ্যতার একটি নিজস্ব ভূমি ছিল। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মধ্যদেশ মোটামুটি এই অঞ্চলটিই ছিল। এই স্থানেই মহাকাব্য যুগের দেবতা ও নায়কগণ বসবাস করিত যাহাদের কর্মকাণ্ড মহাভারত ও রামায়ণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং এই স্থান হইতেই যাজকতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে অসংখ্য ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কুতবুদ্দীন আয়বাকের রাজত্বকালে অযোধ্যা মুসলিম শক্তির পদানত হয় এবং ঐ সময়ই দিল্লীর সাল্তানাত-এর সহিত ইহার সংযুক্তি ঘটে। ইহার পূর্বে অবশ্য গায্নার সুলতান মাহ্মূদের মানাইচ (Manaic) আক্রমণ ও সালার মাস্'উদ গাযীর কৃতিত্বের কথা আবদুর রহ্মান চিশ্তীর মিরআত-ই মাস'উদীতে উল্লিখিত রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্ন তুগ্লুকের সময় অযোধ্যা তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে উহা জৌনপুরের শার্কী সাল্তানাত-এর শাসনাধীনে চলিয়া যায় এবং দিল্লীর লোদী সুলতানগণ পুনর্দখল না করা পর্যন্ত উহা উক্ত রাজ্যের অধীন ছিল। আকবারের শাসনামলে অযোধ্যা মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবুল ফাদ্ল-এর বর্ণনা অনুসারে অযোধ্যা পাঁচটি 'সরকার' ও আটত্রিশটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা হইতে উত্তর-পূর্বে গণ্ডক পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সাই নদী হইতে উত্তরে নেপালের 'তারাই' পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল (আঈন-ই আক্বারী, ২খ., ১৭০-৭, Jarrett, H. S., Bib. Ind., ১৮৯১)। অযোধ্যার স্থানীয় লোককাহিনী উপরে বর্ণিত মুসলিম বিবরণ হইতে ভিন্ন। উহা হইতে প্রতীয়মান হয়, রাজপুত প্রধানগণ মুগল আমলব্যাপী নিজেদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল (W.C. Benett, The Chief Clans of the Roy Bareilly District, ১৮৯৫)। আওরঙ্গযেব (দ্র.)-এর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কারণে অযোধ্যার নওয়াবগণ স্বাধীনতা ঘোষণার সুযোগ পান, অবশ্য তখনও তাঁহারা মুগল সম্রাটের কর্তৃত্ব নামমাত্র স্বীকার করিতেন।

অযোধ্যার নওয়াব বংশের প্রতিষ্ঠাতা সা'আদাত খান বুরহানুল্ মুল্ক নীশাপুরের এক সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (খাফী খান, মুন্তাখবুল্ লুবাব, ২খ., ৯০২)। তাঁহার নওয়াবী আমলে (১৭২২-৩৯) বেনারস, গাযীপুর, জৌনপুর ও চুনার তাঁহার শাসনাধীনে আসে। তাঁহার উত্তরাধিকারী সফ্দার জংগ (১৭৩৯-৫৪) ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে মুগল সাম্রাজ্যের উযীর নিযুক্ত হন। তিনি রোহিলাদের সমর্থনপুষ্ট ফার্রুখাবাদের বাঙ্গাশ পাঠানদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মারাঠাদেরকে আমন্ত্রণ জানান। এই সময়ে তাঁহার ও মারাঠাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিই পরবর্তী কালে রোহিলাখণ্ডের উপর মারাঠা দাবির ভিত্তিরূপে কাজ করে। সফ্দার জংগ-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী নওয়াব উযীর শুজা'উদ্দাওলা (১৭৫৪-৭৫) তৎকালীন উদীয়মান শক্তি ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে বক্সারে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। ফলে অযোধ্যা কোম্পানীর অধিকারে চলিয়া যায়। এলাহাবাদ চুক্তি দ্বারা (১৭৬৫) ক্লাইভ কোরা ও এলাহাবাদ ব্যতীত অযোধ্যার বাকী অংশ শুজা'উদ্দাওলার নিকট প্রত্যর্পণ করেন এবং কোরা ও এলাহাবাদ মুগল সম্রাটকে তাঁহার মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য প্রদান করেন। শুজা'উদ্দাওলার সহিত এই মিত্রতা সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ছিল। অযোধ্যার সহিত পরবর্তী কালে সম্পাদিত সকল সম্পূরক মৈত্রী চুক্তির উৎস ছিল এই চুক্তিটি। কারণ কোম্পানীর সরবরাহকৃত সকল সৈন্যের প্রচুর ব্যয়ভার শুজা'উদ্দাওলাকেই বহন করিতে হইত। এইরূপে মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে অযোধ্যাকে একটি মধ্যস্থ রাজ্যে (Buffer State) পরিণত করা হয়। মোটের উপর ইহা ছিল একটি সুস্থ নীতি। কৌশলগত দিক হইতে ইহার প্রধান দুর্বলতা মুগল সম্রাটের নিকট কোরা ও এলাহাবাদ হস্তান্তরের মধ্যে নিহিত ছিল। কারণ অযোধ্যা রক্ষার জন্য এই জেলা দুইটির প্রতিরক্ষা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। শুজা'উদ্দাওলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল। কারণ অযোধ্যা সংযোজন করিয়া শাসন করার মত অবস্থা তখন কোম্পানীর ছিল না। বেনারস চুক্তি (১৭৭৩) দ্বারা ওয়ারেন হেস্টিংস তদানীন্তন বাংলাদেশ ও মারাঠাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাফার রাষ্ট্রের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করেন। ভবিষ্যতে ইহার শাসককে তাহার দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোম্পানীর সৈন্যদের সকল প্রকার খরচ বাবদ মাসিক ২,১০,০০০ টাকা জোগাইতে হইবে। কারণ মোগল সম্রাট তখন কোম্পানীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন এবং কোরা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার শাসনকর্তার নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দেন (এই সকল বন্দোবস্তের জন্য দ্র. The Benares Diary of Warren Hastings, সম্পা. C. Collin Davies, Camden Miscellany, Royal Historical Society, ৭৯খ., ১৯৪৮)।

অযোগ্য শাসক আসাফুদ্দাওলার ক্ষমতা প্রাপ্তির ফলে (১৭৭৫-৯৭) ওয়ারেন হেস্টিংসের অযোধ্যা নীতি তাহার কাউন্সিলের সংখ্যাগুরু বিরোধী সদস্যগণ পরিবর্তন করিতে সমর্থ হন। ফায়যাবাদ চুক্তি দ্বারা (১৭৭৫) কোম্পানীর সৈন্য ব্যবহার বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ মাসিক ২,৬০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয় এবং নূতন নওয়াবকে বাধ্য করা হয় রাজা চৈৎ সিংহের বেনারস, জৌনপুর ও গাযীপুরের জমিদারীর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দিতে। হেস্টিংস ইতোমধ্যে স্বীয় কাউন্সিলের উপর নিজ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং চুনার চুক্তি (১৭৮১) দ্বারা তিনি অযোধ্যায়

অবস্থানকারী ইংরেজ সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে আসাফুদ্দাওলার নিকট শাসন সংস্কার করিবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নওয়াব সরকারের দুর্বলতার দরুন ইহা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হেস্টিংস স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় বাহিনীই সেইখানে রাখিতে বাধ্য হন। জায়গীর পুনরাধিকারে ও অযোধ্যার বেগমদের অর্থাৎ আসাফুদ্দাওলার মাতা ও স্ত্রীর ধনভাণ্ডার অপসারণে হেস্টিংসের অংশগ্রহণ তাহার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগসমূহের অন্যতম।

অযোধ্যার সহিত হেস্টিংস কর্তৃক কোম্পানীর সম্পর্ক নির্ধারণ হইতে কতকগুলি উপসংহারে উপনীত হওয়া যায়। বাফার রাষ্ট্রটির দক্ষতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এবং কোম্পানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে এইরূপ যে কোন কাজে বাধা প্রদান তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তিনি মনে করিতেন, বিদ্রোহী কিংবা অযোগ্য শাসনকর্তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার কোম্পানীর রহিয়াছে। তিনি বৃটেনের সহিত সম্পর্কের অনুকূল মতাবলম্বী মন্ত্রিগণের নিয়োগের জন্যও চাপ প্রয়োগ করিতেন। অযোধ্যার ইংরেজ রেসিডেন্ট মিড্‌লটন (Middleton) ও ব্রিসটো (Bristow) উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করিতে তিনি যে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝা যায়, দ্ব্যর্থহীন ও অপব্যাখ্যার অবকাশমুক্ত ভাষায় লিখিত নির্দেশ দান কত দুরূহ! অযোধ্যা ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। অযোগ্য শাসক আসাফুদ্দাওয়ার অধীনে অযোধ্যা কোম্পানীর সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে অক্ষম ছিল। মারাঠা লুণ্ঠন হইতে দেশটি কোনক্রমেই রক্ষা করা যাইত না।

মোটের উপর হেস্টিংসের নীতি লর্ড কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শোর অনুসরণ করেন। কর্নওয়ালিস অযোধ্যার উপর কোম্পানীর দাবির পরিমাণ বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় হ্রাস করেন। কিন্তু সা'আদাত আলী খানের ক্ষমতারোহণে (১৭৯৮-১৮১৪) শোর এই দাবির পরিমাণ ছিয়াত্তর লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সা'আদাত আলী খানকে রোহিলা খণ্ড, ফাররুখাবাদ, মাইনপুরী, এতাওয়াহ্, কানপুর, ফতেহ্‌গড়, এলাহাবাদ, আযমগড়, বাসতী ও গোরখপুর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। ফলে অযোধ্যা আর বাফার রাজ্যরূপে অবশিষ্ট রহিল না। কারণ একমাত্র নেপাল সীমান্ত ব্যতীত উহা সর্বত্র বৃটিশ রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। এই সংযুক্তির মূলে ওয়েলেস্‌লীর অজুহাত ছিল বাফার রাজ্যরূপে অযোধ্যার দুর্বলতা। সা'আদাত আলী খানের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাযিদ্দীন হায়দার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনিই অযোধ্যার প্রথম শাসক ছিলেন যিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। অযোধ্যার অন্যান্য রাজা ছিলেন নাসীরুদ্দীন হায়দার (১৮২৭-৩৭), মুহাম্মাদ 'আলী শাহ (১৮৩৭-৪২), আমজাদ 'আলী শাহ (১৮৪২-৪৭) ও ওয়াজিদ 'আলী শাহ (১৮৪৭-৫৬)।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে অযোধ্যা শাসনকর্তার এমন এক প্রশাসন ব্যবস্থা তাঁহার দেশে জারী করার কথা ছিল যাহা প্রজাসাধারণের সমৃদ্ধি অর্জন, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক হইবে। কিন্তু বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই এবং সরকারী অব্যবস্থা পুরা মাত্রায় চলিতে থাকে। এই সকল কারণে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ওয়াজিদ 'আলী শাহ পেন্‌শন প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। সেই স্থানে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার উপাধিরও সমাপ্তি ঘটে। অযোধ্যা সংযুক্তিকরণ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। এই সংগ্রাম চলাকালে লাক্ষ্ণৌ ও কানপুরে কয়েকটি প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

অযোধ্যা সংযুক্তিকরণের পর হইতে উহা চীফ কমিশনার দ্বারা শাসিত হইত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের আগ্রা ও অযোধ্যা একই প্রশাসকের অধীনে ন্যস্ত হয়। তাহার পদবী হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর ও অযোধ্যার চীফ কমিশনার। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যা মিলিয়া যুক্তপ্রদেশ গঠিত হইলে চীফ কমিশনার উপাধি পরিত্যক্ত হয়। তবে ১৯২১ খৃ.-এর পূর্বে এই প্রশাসনের মর্যাদা গভর্নরের প্রদেশে উন্নীত করা হয় নাই।

সংযুক্তির পর প্রথম ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়া হয় প্রদেশের মহান তালুকদার পরিবারগুলোর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া, যাহার ফলে তাহারা স্ব স্ব ভূসম্পত্তির অধিকাংশ হইতে উৎখাত হন। সিপাহী যুদ্ধের পর ইহা বাতিল করা হয়। তখন লর্ড ক্যানিং তালুকদারি বন্দোবস্তের পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং সনদ দ্বারা তালুকদারদের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

মুসলমানগণ পূর্বে যেই স্থানে ক্ষমতায় ছিল বর্তমানে অযোধ্যায় তাহারা প্রধানত সেই সকল স্থানেই অবস্থান করে। নগর জীবন তাহাদের পসন্দ বলিয়া তাহাদেরকে প্রধান প্রধান শহরেই দেখা যায়। প্রাচীন তালুকদারি প্রথা এখন বিলুপ্ত এবং সেই স্থলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইনের বদৌলতে নূতন গ্রামীণ কর্মকর্তা ও গ্রাম সংস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে। ১,৫০০ জনসংখ্যার এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি "গাঁও সভা" গঠিত হয়। স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা এই সভার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। একাধিক "গাঁও সভা" একটি পঞ্চায়েৎ আদালত-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং উহার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বিদ্যমান। অযোধ্যায় বর্তমানে প্রায় ৯,৪৬৬টি "গাঁও সভা" ও ২,১৮০টি 'পঞ্চায়েৎ আদালত' রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ অযোধ্যার ইতিহাস সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় প্রামাণ্য গ্রন্থ সম্পর্কে দ্র. (১) Storey, ১খ., ৭০৩-১৩; (২) C.U. Atchison, Treaties, Engagements and Sanads ১, কলিকাতা ১৯০৯; (৩) P. Basu, Oudh and the East India Company ১৭৮৫-১৮০১, লাক্ষ্ণৌ ১৯৪৩; (৪) W. Crooke, The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh, ৪ খণ্ডে, কলিকাতা ১৮৯৬; (৫) C.C. Davies, Warren Hastings and Oudh, অক্সফোর্ড ১৯৩৯; (৬) The Benares Diary of Warren Hastings, Royal Historical Society, ৭৯খ., ১৯৪৮; (৭) D. Dewar, Handbook of the Records of the United Provinces, ১৯১৯; (৮) C. A. Elliott, Chronicles of Oonao, এলাহাবাদ ১৮৬২; (৯) M. R. Gubbins, The

Mutinies in Oudh, লন্ডন ১৮৫৮; (১০) তাফদীহুল গাফিলীন, অনু. W. Hoey, এলাহাবাদ ১৮৮৫; (১১) মুহাম্মাদ ফাইয বাখ্শ, তারীখ-ই ফারাহ বাখ্শ, অনু. W. Hoey, Memoirs of Dehli and Faizabad, ২ খণ্ডে, এলাহাবাদ ১৮৮৮-৯; (১২) H. C. Irwin, The Garden of India, লন্ডন ১৮৮০; (১৩) W. Knighton, The Private Life of an Eastern King, অক্সফোর্ড ১৯২১; (১৪) খায়রুদ্দীন মুহাম্মাদ, তুহ্ফা-ই তাযাহ্ (বালওয়ান্তনামাহ); (১৫) W. Oldham, Historical and Statistical Account of the Ghazeepoor District, এলাহাবাদ ১৮৭০; (১৬) Papers relating to Land Tenures and Revenue Settlement in Oudh, কলিকাতা ১৮৬৫; (১৭) Papers respecting a reform in the administration of the government of ....the Nawab-Wazir, লন্ডন ১৮২৪; (১৮) Parliamentary Papers, Oudh, ৪৩খ., ১৮৫৭-৮; (১৯) Report on the United Provinces of Agra and Oudh, এলাহাবাদ, বর্ষে বর্ষে প্রকাশিত; (২০) W.H. Sleeman, A Journey through the Kingdom of Oudh in ১৮৪৯-১৮৫০, ২ খণ্ডে, ১৮৫৮; (২১) A.L. Srivastava, The first two Nawabs of Oudh, লাক্ষ্ণৌ ১৯৩৩; (২২) ঐ লেখক, শুজা'উদ্দাওলা, ২ খণ্ডে, কলিকাতা ১৯৩৯-৪৫ খৃ.।

C. Collin Davies (E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

অসহযোগ আন্দোলন : (Non Co-operation movement, ১৯২০-২১ খৃ.) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধীনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত এক সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন। বৃটিশ সরকারের নিকট সঙ্গত ও ন্যায্য বিবেচনা লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়া মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি ভারতীয়দের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে যে সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন তাহাই অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগের সহিত গান্ধীর অহিংস নীতি এই আন্দোলনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগ কালে সংকল্পে অটল থাকিয়া প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করাই ইহার উদ্দেশ্য (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫)। গান্ধী ১৯২০ সালে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান যুগপৎ অংশগ্রহণ করে এবং ব্যাপকভাবে আন্দোলন গড়িয়া তোলে।

১৯১৯ খৃ. ভারত শাসন আইন তথা মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই আইনে ভারতীয়দেরকে স্বায়ত্তশাসন না দিয়া দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে। কংগ্রেস এই আইনকে হতাশাজনক বলিয়া অভিহিত করে। ১৯১৯ খৃ. রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ দমনের জন্য রাওলাট আইন পাস হয়। ইহা ছিল মূলত কালাকানুন। ভারতীয় জনগণ ইহাকে নাগরিক অধিকারের মৃত্যুদণ্ড হিসাবে আখ্যায়িত করে। এই আইনের প্রতিবাদে সর্বত্র জনসাধারণ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে (রাম গোপাল, Indian Muslims, Political History, পৃ. ১৩৪)। এরূপ নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের দাবিতে গান্ধী ৩০ মার্চ, ১৯১৯ খৃ. ব্যাপক হরতালের ডাক দেন। তাঁহার এ আহবানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সাড়া দেয়। উন্মত্ত জনতাকে সামাল দিতে না পারিয়া বৃটিশ সরকার গুলি বর্ষণ করে। দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর, অমৃতসর ও আহমাদাবাদে কয়েক হাজার লোক মারা যায় (মুহামদ ইনাম উল হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৭০৭-১৯৪৭, পৃ. ১৭১)। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে বৃটিশ সৈন্যদের গুলিতে নিহত ভারতীয়দের আত্মার সদগতি এবং এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ খৃ. প্রায় দশ হাজার লোক অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে এক সভায় মিলিত হয়।। জলন্ধর বিগ্রেডের কমান্ডার জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে উক্ত সভায় সমবেত জনতার উপর গুলি চালান হয়। ইহাতে প্রায় চারি শত নিহত এবং এক হাজারের অধিক লোক আহত হয় (ঐ, পৃ. ১৭২)। এ জঘণ্য হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারতবাসী বৃটিশ সরকারের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। এই ঘটনার পর তুরস্কের খিলাফত প্রশ্নে মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব অসহযোগ আন্দোলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মনোভাব খুব প্রবল ছিল। তাহারা তুরস্কের সুলতানকে খলীফা বলিয়া মান্য করিত এবং তাঁহাকে মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক মনে করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর সহিত যোগ দিয়াছিল এবং পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক তুরস্কের রাজ্য সীমানা অখণ্ড রাখা হইবে এবং খিলাফতের উপর কোন আঘাত হানা হইবে না। যুদ্ধশেষে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া বৃটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড করার আয়োজন করে। তাহারা তুরস্কের উপর সেভার্স সন্ধি চাপাইয়া দেয়। ভারতীয় মুসলমানরা খলীফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক আন্দোলন গড়িয়া তোলে। এই আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত (এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭, পৃ. ১৮২)। গান্দী খিলাফত আন্দোলনের সহিত অবচ্ছেদ্যরূপে একত্বতা ঘোষণা করেন। এইভাবে গান্ধী তাহার দক্ষতাপূর্ণ রাজনৈতিক চতুরতার দ্বারা অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন আদায় করেন (বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৭২-৭৩)।

১৯২০ খৃ. ২৮ মে বোম্বাইতে খিলাফত কমিটির বৈঠক বসে। এই সভায় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯২০ খৃ. ২২ জুন গান্ধী ভাইসরয়কে লেখা এক চিঠিতে ইংরেজ শাসককে সাহায্য প্রদান প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে প্রজাবৃন্দের স্বীকৃত অধিকারের কথা দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেন। চরম পত্রে প্রদত্ত সতর্কীকরণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন শুরু করা হয় (ঐ, পৃ. ৭৩)। গান্ধী তাহার কায়সার-ই হিন্দ পদক প্রত্যাখ্যান করেন (Constitutional Development and National Movement in India (1919-47) Part I, p.

44)। ১০ আগস্ট সেভারম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা ৩১ আগস্টকে সমগ্র উপমহাদেশে খিলাফত দিবস হিসাবে পালন করে। বস্তুত ইহাই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের শুরু (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৭৭)। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ ১৯২০ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় তাহাদের বিশেষ অধিবেশন আহবান করে এবং এই বিশেষ অধিবেশনে তাহারা অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, পৃ. ১৮৩)। শীঘ্রই সমগ্র ভারতে যুগপৎ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৭৭)। অসহযোগ ও খিলাফত এই দুই সম্মিলিত আন্দোলন গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। গান্ধী কেন খিলাফত আন্দোলন জোরদার করার জন্য তৎপর ছিলেন এই প্রশ্নটি সমকালে হিন্দু-মুসলিম উভয় মহলে বেশ আলোচিত হইয়াছে। বস্তুত গান্ধী মনেপ্রাণে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, এককভাবে কংগ্রেস বা হিন্দুদের সংগ্রাম দ্বারা ভারতে স্বাধনিতা অর্জন সম্ভব হইবে না এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া ভারতের কোন আন্দোলন জোরদার হইবে না। তাই একজন সুচতুর রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি একজন মুসলমানকে মুসলমান হিসাবেই গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তুর্কী সামাজ্যের অখণ্ডতা ও খিলাফতের মর্যাদা সমুন্নত রাখার পক্ষে সমর্থন দেন (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৭৭-১৭৮)।

অসহযোগ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ খেতাব ও সরকারী পদ ত্যাগ করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের মনোনীত পদসমূহ হইতে ইস্তফা প্রদান করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা বর্জন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃটিশ আদালত প্রত্যাখ্যান, মাদকতা বর্জন, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও নীতি বিরুদ্ধ আইন অমান্যের দ্বারা সরকারকে দুর্বল ও অচল করা। দেশীয় ব্যবস্থায় জাতীয় স্কুল-কলেজ স্থাপন, নিজস্ব সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা, নিজেদের অর্থে দেশে হাতে তৈয়ারী বস্ত্র শিল্পের প্রসার, গ্রাম সংস্কার ও সংগঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা (বাংলাপিডিয়া, ১খ., ৭৩; বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৮০)।

১৯২০ খৃ. ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ সভায় অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত কলিকাতার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। এই সম্মেলনে ২২ হাজার প্রতিনিধি নূতন সংগ্রামের উদ্দীপনা লইয়া উপস্থিত হয়। উক্ত অধিবেশনে দলীয় সংগঠনের উন্নতি সাধনের উপর গুরত্ব দেওয়া হয়। মাত্র চার আনা চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সকলের, বরং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য কংগ্রেসের সদস্যপদ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। স্বল্প কালের মধ্যে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। জনগণের নিকট হইতে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। গান্ধীজী এবং তাহার সহযোগিগণ সমগ্র দেশ সফর করিয়া এই আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করিতে শুরু করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় গান্ধীর সহিত ভারতের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন এবং শত শত জনসভায় ভাষণ দেন। আলীগড়ের এই দুইজন প্রাক্তন ছাত্র আলী ভ্রাতৃদ্বয় কলেজ কর্তৃপক্ষকে সরকারী সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইহাতে ব্যর্থ হইয়া তাঁহারা ইহার অনতিদূরে তাঁবু খাটাইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহাই পরবর্তী কালের জামিয়া মিল্লিয়া (The Khilafat Movement, A history of the Freedom Movement, vol. III, Part I, পৃ. ২২৬)। দেশের ছাত্র সমাজও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে হাজার হাজার ছাত্র তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে। প্রথম মাসে ৯০০০ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে এবং সমগ্র দেশব্যাপী গড়িয়া তোলা আট শতেরও অধিক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। চিত্ত রঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বাংলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন বিশেষভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়। পাঞ্জাবও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের ডাকে সাড়া দেয় এবং এই ব্যাপারে লালা লাজপৎ রায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। অন্যান্য যে সকল এলাকা অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ছিল সেইগুলি হইল বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা। আসাম ও মাদ্রাজে আন্দোলনের প্রতি ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায় নাই (বাংলাপিডিয়া, ১খ., পৃ. ৭৩)।

দেশের বহু খ্যাতনামা আইনজীবী আদালত বর্জন শুরু করেন এবং তাহাদের অনেকেই সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। আইনজীবীদের আদালত বর্জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের মত এতটা সফল ছিল না। সি. আর. দাস, মতিলাল নেহেরু, এম. আর. জয়কর, এস. কিসলু, ভি. প্যাটেল, আসিফ আলী খান ও অন্যান্যদের মত অনেক বিশিষ্ট আইনজীবী তাহাদের লাভজনক ব্যবসা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের এই ত্যাগস্বীকার অনেকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। সংখ্যার দিক হইতে বাংলার অবস্থান ছিল সর্বশীর্ষে এবং ইহার পরে অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক ও পাঞ্জাবের অবস্থান (ঐ, পৃ. ৭৩)।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রাথমিক অগ্রতি সাধিত হয় সংস্কারকৃত কাউন্সিলসমূহের নির্বাচন বর্জনের ক্ষেত্রে। ভোটদাতাগণ উক্ত নির্বাচনে ভোটদান হইতে বিরত থাকে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রার্থীগণও এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিরত থাকেন। মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের আন্দোলন ও পাঞ্জাবে গুরুদ্বারের সংস্কার প্রচেষ্ঠা ইহারই দৃষ্টান্ত। সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় কোটি টাকার স্বরাজ তহবিল। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ও স্বরাজের জন্য এই তহবিলে তাহাদের মুখের গ্রাস তুলিয়া দেয়, নারীরা তাহাদের অলংকার খুলিয়া উক্ত তহবিলে দান করে। আর দেশে চালু করা হয় ২০ লক্ষ চরকা। জনগণ বিদেশী বস্ত্র ও পোশাক পোড়াইয়া দেয়। বিলাতী বস্ত্র পোড়ানো বৃটিশ শাসনের ধ্বংসের প্রতীক বলিয়া গৃহীত হয় (ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, পৃ. ২৭৩)।

দেশব্যাপী এই ধরনের আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়া বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উন্মত্তের মত চারিদিকে দমন নীতি শুরু করে। ১৯২১ খৃ. এপ্রিল মাসে দক্ষিণ ভারতের কালিকট শহরে একটি বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে সর্বজনমান্য মুসলিম নেতা ইয়াকুব হাসানকে গ্রেফতার করিয়া বোম্বাই শহরে আনয়ন করা হইলে ৭০ হাজার জনতা সমবেত হইয়া

তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও আলিমগণ অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তাহাদের উপদেশে ১৮০০০ মুসলমান ১৯২১ খৃ. আগস্ট মাসে আফগানিস্তানে হিজরত করে। ইহাদের অনেকে পথে দুর্দশাগ্রস্থ হইয়া মারা যায়। তাহাদের অধিকাংশই সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অঞ্চলের অধিবাসী (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৬৭-১৯৪৭, পৃ. ১৮৪)। ১৯২১ খৃ. শুরুতেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক ভয়াবহ রূপ লাভ করে। কলিকাতায় ৩,০০০ ছাত্র ধর্মঘট করে এবং জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। সুভাষ বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দেন এবং এই কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যোগদান করেন। বৃটিশরা দমন নীতির অংশরূপে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে; অপরদিকে শত শত লোক স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। সমগ্র ভারতে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও গান্ধী উভয় সম্প্রদায়ের অবিভাজ্য নেতায় পরিণত হন। সেই সময়ের জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল "আল্লাহু আকবার, মহাত্মা গান্ধী কি জয় এবং মুহাম্মাদ আলী শওকত আলী কি জয়" (The Khilafat Movement : A history of the Freedom Movement, Vol III, part I, পৃ. ২২৯)। আন্দোলনে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জোরালো বক্তৃতা জনমনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহাতে বৃটিশ সরকার শংকিত হয়। নূতন ভাইসরয় লর্ড রিডিং ও গান্ধীর মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯২১ সালের মে মাসে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আসামে এক নূতন আন্দোলনের সূচনা হয় এবং অচিরেই তাহা ভারতবর্ষকে কাপাইয়া তোলে। ইংরেজ মালিকগণ আসামে চা বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিককে বিনা অজুহাতে অতর্কিত বরখাস্ত করে এবং পরে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধা দেওয়ার ফলে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে শত শত শ্রমিক আহত এবং কয়েক শত মহিলা শ্রমিককে তাহাদের শিশু সন্তানসহ নদীর পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ অত্যাচারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঝড় উঠে। ভারতের জনসাধারণ ইহার প্রতিকারের জন্য যতীন্দ্র মোহন সেনের নেতৃত্বে এক প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করে। অচিরেই এই আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে সরকারের সম্মুখে একটি নূতন চ্যালেঞ্জ আসে। ৮ জুলাই করাচীতে খিলাফত কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন আরও জমজমাট হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অসহযোগের উপর আলিমগণের ফতওয়া পাঠ করা হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী এক জোরালো বক্তৃতায় বৃটিশ সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত মুসলমানদিগকে চাকুরী ছাড়ার আহবান জানান। এই সভা তুরস্কের আঙ্কারায় প্রতিষ্ঠিত মুস্তাফা কামাল পাশার সরকারের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেয় যে, বৃটিশ সরকার আঙ্কারা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে ভারতীয়রা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবে এবং কংগ্রেসের আসন্ন আহমাদাবাদ সম্মেলনে ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করিবে। এই বক্তৃতার ফলে বৃটিশ সরকার মাওলানা মুহাম্মাদ আলীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহার সহিত মাওলানা শওকত আলী, ডাঃ সাইফুদ্দীন কিসলু, জগৎগুরু শংকরাচার্য, মাওলানা নিছার আহমাদ, পীর গুলাম মুজাদ্দিদ ও মাওলানা হুসায়ন আহমাদ কারারুদ্ধ হন (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৮০)। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর বক্তৃতা রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে পুনঃ প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে নির্দেশ দেয়। ইহাতে কংগ্রেসের অনেক সদস্য গ্রেফতার হয় এবং সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করে (ঐ, পৃ. ১৮০)।

১৯২১ খৃ. ১৭ নভেম্বর বোম্বাইতে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর আগমন উপলক্ষ করিয়া ভীষণ গোলযোগ হয়। তিনি যেদিন বোম্বাই আগমন করেন সেই দিন ভারত ব্যাপী হরতাল পালিত হয়। তিনি যেইখানেই গমন করেন সেইখানেই রাস্তাঘাট জনশূন্য ও দরজা-জানালা অর্গলবদ্ধ রাখার মাধ্যমে তাহাকে এক ভিন্নরূপে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সরকারের এক অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতায় সাফল্য অর্জন করিয়া অসহযোগকারীরা ক্রমেই অধিকতর আক্রমণাত্মক হইয়া উঠে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও সরকারী পুলিশ বাহিনীর প্রতিপক্ষ একটি শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (বাংলাপিডিয়া, ১খ., পৃ. ৭৩)।

১৯২১ খৃ. আগস্ট মাসে মালাবারের মোপলা মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। মোপলাগণ আরব-ভারতীয় মিশ্র জাতি। মোপলা ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত বলিয়া খ্যাত ছিল। ধর্মের নামে তাহারা উদ্বুদ্ধ ছিল। বৃটিশ আমলে প্রায় পঁয়ত্রিশ বার সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয় (Hindo-Muslim Relations in Bengal, 1905-47, পৃ. ৪৫)। তন্মধ্যে ১৯২১ খৃ. আগস্ট মাসে সংঘটিত দাঙ্গা ছিল সর্বাধিক ভয়াবহ (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৮১)। বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর কয়েক দিনের মধ্যে তাহারা বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ এবং খিলাফতের পতাকা উত্তোলন করে এবং এরনাদ ও ওয়ালুভানাদ তালুক দুইটি সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া নেয়। সেখানে তাহারা পতাকা উত্তোলন করে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইংরেজদের বর্বর আক্রমণের ফলে মোপলাগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। গান্ধীজী মোপলাদের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সমর্থন না করিলেও তাহাদিগকে সাহসী ধর্মভীরু বলিয়া আখ্যায়িত করেন (Hindu-Muslim Relations in Bangal, 1905-47, পৃ. ৪৫)।

হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য সরকার মোপলা মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গার উস্কানি প্রদান করে। হিন্দু ও মোপলা মুসলমানদের ভুল বুঝাবুঝির কারণে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ফলে গান্ধীর কাঙ্ক্ষিত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে দুর্বলতার সূত্রপাত হয় (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৮১)। আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। বোম্বাই-এর হিংসাত্মক ঘটনায় অন্তত ৫৩ জন নিহত এবং ৪০০ জন আহত হয়। গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। সেপ্টেম্বর মাসে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অপর কয়েকজন মুসলিম নেতা

রাজদ্রোহমূলক অপরাধে গ্রেপ্তার হন। এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে প্রতিবাদের ঝড় বহিতে থাকে। অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিচারে তাহাদের দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

হিংসার আভাস সত্ত্বেও ১৯২২ খৃ. নাগাদ গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ আইন অমান্য ও করদান বন্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, গুজরাট বারদৌলি তালুকায় সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। সরকারী রিপোর্ট মোতাবেক সমগ্র ভারতে ষাটটি স্থানে শৃংখলাহীন জনতা হিংসার পথ অবলম্বন করে। ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খৃ. এক ক্রুদ্ধ জনতা গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে। ইহার ফলে কয়েকজন পুলিশ গৃহের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। গান্ধী অনুভব করেন যে, শুধু জনতা নহে, স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেস কর্মীও পরোক্ষভাবে হইা সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করিয়াছে। তাই তিনি সুরাট জেলার বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় (১১-১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন রহিত ঘোষণা করেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবেও সীমিত ক্ষেত্রে অমান্যের আদেশ রহিয়া যায় (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১৮০)। এই দিন হইতেই গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে দেখা যায় (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ১৮১)। ১৯২২ খৃ. ১০ মার্চ গান্ধী গ্রেফতার হন এবং ছয় বছরের সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন হইতে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যম কমিয়া সংকুচিত হইতে হইতে ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। বাংলা, বোম্বাই, কেরালা, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে; সামগ্রিক গণ-আন্দোলনের পর্ব স্থগিত হয় (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১৮১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম খান, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৭০ খৃ.; (২) বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১খ., পৃ. ৭১-৭৪; (৩) মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩; (৪) এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৯৪; (৫) লিওনার্ড মোজলে, ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭; (৬) সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, বুক ওয়ার্ল্ড, ৬১ তীতারাম স্ট্রীট, কলিকাতা ১৯৯৬; (৭) রাম গোপাল, Indian Mislims, A Political History, পৃ. ১৩৪; (৮) শ্রী গোবিন্দ মিশ্র, Constitutional Development and National Movement in India (1919-47), Part I; (৯) এস. মঈনুল হক, The Khilafat Movement : A history of the Freedom Movement, part I; (১০) হোসাইনুর রহমান, Hindu-Muslim Relations in Bangal. (1905-47); (১১) Dr. Majumdar Raychaudhury Datta. An Advanced History of India, London 1965; (১২) Saehchidanonda Bhatacharya, A Dictionary of Indian History, University of Calcutta 1972, P. 691-92; (১৩) আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পলাশী থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান পাবলিকেশনস ১৯৬৮ খৃ.।

মুহাম্মদ আবূ তাহের

আ

আইন (اَئِين) ঃ বহু পুরাতন ফারসী শব্দ। 'আব্বাসী যুগে ইহা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা 'কানূন, প্রথা, দেশাচার ও নিয়ম' অর্থে ব্যবহৃত হইত। আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১১৮, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে (খৃ. অষ্টম শতাব্দী) ইবনুল মুকাফ্‌ফা কর্তৃক সংকলিত পাহলবী হইতে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থসমূহের তালিকায় আঈন নামাহ্ নামক একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নামের অনুবাদ অনেক সময় আরবীতে 'কিতাবুর রুসূম' করা হইয়াছে। খুদাঈ নামাহর ন্যায় এই গ্রন্থও অর্ধ-সরকারী মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। ইহাতে সম্ভবত সাসানী শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অধিকারের উল্লেখ ছিল। ইহাতে দরবারী জীবনের ও দরবারী আদব-কায়দা ও রীতিনীতির বিস্তারিত বর্ণনাও ছিল। এইজন্যই Christensen ইহাকে পুরাতন বাদশাহী কর্মসূচী (le vieil almanach royal) নামকরণ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই শিক্ষাপ্রদ ও উপদেশমূলক ছিল। ইব্ন কুতায়বা রচিত 'উয়ূনুল আখ্‌বার' নামক গ্রন্থে আঈন নামাহ্‌র উপরিউক্ত অনুবাদের কয়েকটি উদ্ধৃতি রক্ষিত আছে। Inostranzev এই গ্রন্থে আলোচিত যুদ্ধবিদ্যা, তীরন্দাযী, পোলো খেলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব যে, এই বিরাট সরকারী আঈন নামাহ্‌র সঙ্গে বিন্যস্ত বিশিষ্ট বিষয়সমূহ সম্বলিত পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা বর্তমান ছিল যাহাতে দরবারী জীবনের শিক্ষার প্রতিটি দিকের উপর স্বতন্ত্র আলোচনা ছিল। আল-ফিহ্‌রিস্ত-এ উল্লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম পাঠ করিলে উপরিউক্ত ধারণাই জন্মে। উদাহরণ ঃ 'আঈনুর-রাম্‌ই' (তীরান্দাযীর নিয়ম) ও আঈনুদ-দারব বিস-সাওয়ালিজা (গলফ খেলার নিয়ম)। ইহাও ধারণা করা যায়, এইগুলি বৃহৎ আঈন নামাহ্‌র খণ্ড বা তাহা হইতে সংকলিত গ্রন্থ। আল-মাস্'উদীও (তান্‌বীহ, পৃ. ১০৪-১০৬) সাসানী আঈন নামাহ্‌র উল্লেখ করিয়াছেন। আল-জাহিজ-এর 'কিতাবুত-তাজ ফী আখ্‌লাকিল মুলূক'-এ যেখানে সাসানীদের আঈন ও আদব সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে আঈনুল ফুরূস নামক গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যায়, যদিও উহা হইতে সরাসরি কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নাই।

পরবর্তী কালে ফারসী ভাষায় রচিত অন্যান্য গ্রন্থও আঈন নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামী ইতিহাস, ইসলামী নিয়ম-কানূন ও প্রথা। যথা, আবুল ফাদ্ল 'আল্লামী কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আক্বারনামাহ'র ঐ অংশের নাম 'আঈন-ই আক্বারী' যাহাতে আকবারের দরবারের আদব ও রীতিনীতির বর্ণনা আছে।

কিন্তু বহু পূর্বেই ইসলামী আইনের লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের কার্য শুরু হইয়াছে, বাদশাহ আকবারের সময় হইতে নহে। আল-মাওয়ারদী আশ-শাফি'ঈর 'আল আহকামুস-সুল্তানিয়্যা' ও তাঁহার সমসাময়িক আবূ ইয়া'লা আল-ফার্রা আল-হাম্বালীর একই নামীয় (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা) গ্রন্থেও হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর এবং আরও পরবর্তী কালের নজীর রহিয়াছে। সর্বপ্রথম ইসলামী আইন স্বয়ং নবী (স)-এর যুগেই প্রথম হিজরী সনে তাঁহার মদীনায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিধিবদ্ধ ও কার্যকরী হইয়াছিল। ইহাই কোন শাসনকর্তার পক্ষ হইতে বিধিবদ্ধ ও জারীকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত আইন। এরিস্টোটলের আইন গ্রন্থ এথেন্সে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা কোন শাসনকর্তার পক্ষ হইতে জারীকৃত আইন ছিল না। ইহা এক দার্শনিকের অভিজ্ঞতা ও আইন সংক্রান্ত প্রথা সম্বন্ধে রচয়িতার ব্যাখ্যামাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহানবী (স)-এর যুগের পূর্বোল্লিখিত আইনগুলিকে ইতিহাস রক্ষা করিয়াছে। উহার পাঠ ইব্ন ইস্হাক, ইব্ন খায়ছামা ও আবূ 'উবায়দের বর্ণনা পরম্পরায় বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ৫২তম দফায় এই সংবিধান দেশে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জাতি (امة واحدة من دون الناس) প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রহিয়াছে। এই জাতি মুসলিম ও অমুসলিম প্রজা দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। ইহার পর পরিচালক ও পরিচালিতদের অধিকার, কর্তব্য, সুবিচার, আইন গঠন, বিদেশের সহিত সন্ধি ও যুদ্ধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও বৈশিষ্ট্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং অপর এমন সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে বিধান ইহাতে রহিয়াছে যাহা সেই সময় মদীনার নাগরিক জীবন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ছিল। সুবিচার স্থাপনের এমন একটি বৈপ্লবিক আদেশও দৃষ্টিগোচর হয় যে, বিচারক আদালতের কাজ শুধু সত্য প্রকাশের জন্যই করিবেন না, বরং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যও করিবেন এবং অধিকার প্রদান ব্যক্তিবিশেষের কাজ নহে, বরং উহা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীনের কাজ। আইন রচনার কাজে প্রথা, দেশাচারের ও পঞ্চায়েতের মত প্রদানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বিধানদাতাকে প্রতিটি ব্যাপারে (তোমরা যে কোন বিষয়ে মতভেদ কর—مهما اختلفتم فيه) আইন গঠন ও আদেশ প্রদানের অধিকারপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক যুগে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের লিখিত সংবিধানের রচনা শুরু করা হয় তুর্কী সুলতানগণ কর্তৃক। রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে মানসিক পরাধীনতা সৃষ্টি হওয়ায় কতক মুসলিম রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য নীতিকে ভিত্তি করিয়া সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হয়। কিন্তু ক্রমশ ঐগুলির অনৈসলামী অংশগুলির সংশোধনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Inostranzev : Sasanidskie Etiudi, St. Petersburgh, ১৯০৯, পৃ. ২৫-৮০; (২) F. Gabrieli, Lopera di Ibn al-Muqaffa, RSO, ১৯৩২, বিশেষত পৃ. ২১৩-২১৫; (৩) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, আল-ওয়াছাইকুস সিয়াসিয়্যা, ১ম ওয়াছীকা ও সেখানে বর্ণিত সূত্র; (৪) ঐ লেখক, 'আহ্দ-ই নাবাবী কা নিজাম-ই হুকমরানী, ২য় সং., হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান শিরোনামে; (৫) ঐ লেখক, The First Written Constitution of the World, Islamic Review, আগস্ট-নভেম্বর ১৯৪১ খৃ., ওকিং ১৯৪১।

F. Gabrieli ও হামীদুল্লাহ (দা.মা.ই.)/অনুবাদ

সংযোজন

ইসলামী আইন ঃ ধর্মই হইল আইনের মূল ও আদি উৎস। ধর্মই মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আইন মানিয়া চলিতে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মই মানুষকে সুষ্ঠু, সুন্দর, সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে। আদি মানব হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যেমন কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا "আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম (বস্তুজগতের জ্ঞান) শিক্ষা দিলেন" (২ ঃ ৩১)।

কারণ তিনি ছিলেন পৃথিবী নামক এই জগতে তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি। যেমন কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

"আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতে চাই" (২ ঃ ৩০)।

সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করিতে হইলে এই পার্থিব সমাজ পরিচালনার জন্য আদম (আ)-এর প্রয়োজন ছিল কিছু নিয়ম-কানুন ও বিধিব্যবস্থার। তাই আদম দম্পতিকে পৃথিবীতে প্রেরণকালে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট পথনির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না" (২ ঃ ৩৮)।

বস্তুত এই পথনির্দেশই (হিদায়াত বা Guide) হইল আধুনিক পরিভাষায় আইন বা নিয়ম-কানুন। পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন মাফিক নিয়ম-কানুন পাঠাইতে থাকেন। নবীগণের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহই হইল উক্ত আইনের সমষ্টি। আদি আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে যেইগুলিকে বর্তমানেও আসমানী কিতাব বলিয়া শনাক্ত করা যায়, যেমন তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ইত্যাদি, সেইগুলির মধ্যেও প্রচুর সামাজিক বিধিমালা বিদ্যমান আছে। এই আসমানী কিতাবসমূহের সর্বশেষ হইল আল-কুরআন। আল-কুরআন মানবজাতির জন্য আইনের এক ব্যাপক ভিত্তি রচনা করিয়াছে, ইসলামের পরিভাষায় ইহা ইসলামী আইন নামে পরিচিত।

বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে যে আইন কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, দেশ, কাল ও জাতিভেদ সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যকার প্রচলিত আইনের মধ্যে ব্যাপক আন্তঃসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার প্রধান কারণ হইল, প্রথমত গোটা মানবজাতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একইরূপ বিধান লাভ করিয়াছিল। তাহারা ছিল এক অভিন্ন উম্মত।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

"মানবজাতি ছিল এক উম্মতভুক্ত" (২ ঃ ২১৩)।

কালের প্রবাহে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া উক্ত ঐশী আইনে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেদের পছন্দমত উহাতে রদবদল করিতে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রচলিত বিধিমালার মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাহার প্রধানতম কারণ হইল ঐশী আইনে মানুষের উক্ত হস্তক্ষেপ। কুরআন মজীদে ইহার সাক্ষ্য বিদ্যমান।

وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ.

"ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে" (৪ ঃ ৪৬; আরও দ্র. ৫ ঃ ১৩, ৪১; ২ ঃ ৭৫)।

দীন ইসলামই হইল একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যাহা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গাঁথিয়া রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরী'আতে যে সকল নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাই 'ইসলামী আইন'।

ইসলামী আইনের প্রধানতম দুইটি উৎস ঃ মহান আল্লাহ্র কিতাব 'আল-কুরআন' ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'হাদীছ'। প্রথমোক্ত উৎসে সমাধান না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় উৎসে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই উৎসেও সমাধান না পাওয়া গেলে ইজ্তিহাদের পালা আসিবে। প্রথমোক্ত উৎসদ্বয়ের সহিত প্রায় সকলেই পরিচিত। তাই আমরা এখানে আলোচনা করিব ক্রমানুসারে ইজমা', কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালা, 'উরফ (প্রথা), ইজতিহাদ ও ইসতিদলাল সম্পর্কে। শেষোক্ত দুইটি বিষয় আইনের উৎস নহে, বরং ইজতিহাদ বলিতে আইন সংক্রান্ত গবেষণা বুঝায় এবং ইসতিদলাল বলিতে গবেষণার অনুকূলে যুক্তি প্রদানকে বুঝায়।

ইজমা' (اجماع) ঃ ইসলামী আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইল ইজমা'। ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণে ফকীহ্গণের মতভেদ আছে। "নির্দিষ্ট কোন যুগে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে সমকালীন ফকীহ্গণের ঐকমত্যকে ইজমা' বলে"।

কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ দ্বারা ইজমা'র বৈধতা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ.

"তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বের অধিকারিগণের" (৪ ঃ ৫৯)।

فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানিগণকে জিজ্ঞাসা কর" (১৬ ঃ ৪৩; ২১ ঃ ৭)।

মহানবী (স) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِى أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ.

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে কখনও অন্যায়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করিবেন না। আল্লাহ্র (হেফাজতের) হাত ঐক্যবদ্ধদের উপর প্রসারিত" (তিরমিযীর বরাতে মিশকাত, ১খ., নং ১৬৪)।

وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ.

"সাবধান! তোমরা বিচ্ছিন্ন (গিরি) পথে যাইবে না। তোমরা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে এবং জনসাধারণের সহিত থাকিবে" (মুসনাদে আহমাদের বরাতে মিশকাত, ১খ., নং ১৭৫)।

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ.

"যে ব্যক্তি মুসলিম সমষ্টি হইতে বিঘত পরিমাণও পৃথক হইয়া গেল সে নিজের ঘাড় হইতে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করিল" (মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাঊদের বরাতে মিশকাত, ১খ., নং ১৭৬)।

ইজমা'র সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহতে অনুরূপ অনেক উক্তি বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী একমাত্র দীন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী ঘোষণা করিয়াছেন। মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য আইনের প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, কুরআন ও সুন্নাহতে উহার প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক সমাধান বিদ্যমান নাই। এই অবস্থায় উক্ত দুইটি উৎসের আলোকে উদ্ভূত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের এখতিয়ার মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। এমন অনেক বিষয় আছে যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ নীরব। এই নীরবতা সরাসরি এই কথার প্রমাণ বহন করে, মহান আইনদাতা আল্লাহ এই ক্ষেত্রে মানুষকে নিজস্ব রায় বা বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বালী মাযহাবমতে সমকালীন মুজতাহিদ ফকীহ্গণের সকলে কোন বিষয়ে একমত হইলে চূড়ান্ত ইজমা' গঠিত হয়। অবশ্য অধিকাংশ ফকীহ একমত হইলেও ইজমা' গঠিত হইতে পারে। হানাফী, শাফি'ঈ ও মালিকীগণ মনে করেন, যাহারা একমত হইতে পারেন নাই তাহারা সংখ্যায় খুব বেশি না হইলে অধিকাংশের ঐকমত্য ইজমা' হিসাবে গণ্য হইবে। ইহাকে চূড়ান্ত ইজমা' বলা যাইবে না বটে কিন্তু ইহা মান্য করা বাধ্যতামূলক। রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবে একজন ফকীহ হয়ত ভুল করিতে পারেন, কিন্তু যখন বহু সংখ্যক ফকীহ একত্র হইয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদের মতের বিশুদ্ধতা মানিয়া লওয়া যায়। হানাফী, মালিকী ও অধিকাংশ শাফি'ঈ ফকীহ্র মতে যথেষ্ট সময় লইয়া মুজতাহিদ ফকীহগণ পূর্ণ বিচার-বিবেচনা করিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উহা ইজমা'য় পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তাহাদের মত পরিবর্তনের আর অবকাশ থাকে না এবং তাহারাও উহা মানিতে বাধ্য। হাম্বালী ও কতিপয় শাফি'ঈ ফকীহ বলেন, ঐকমত্যে উপনীত হওয়া ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উহা ইজমা'র মর্যাদা লাভ করিবে না। কারণ

তাহাদের কেহ বা সকলে জীবদ্দশায় যে কোন সময় স্বীয় মত পরিবর্তন করিতে পারেন। সুতরাং তাহাদের সকলের মৃত্যুর পরই তাহাদের সিদ্ধান্ত ইজম'র মর্যাদা লাভ করিবে।

এক কালের ইজমা' প্রয়োজনবোধে পরবর্তী কালের ইজমা' দ্বারা রহিত হইতে পারে। ইহাই ইসলামী আইনের স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করে। বস্তুত স্থানিক, কালিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত মুজতাহিদ ফকীহগণের উপর প্রভাব ফেলিতে বাধ্য। কারণ তাহারা সর্বপরিণামদর্শী নহেন। স্থান-কাল ও প্রেক্ষিত পরিবর্তিত হইলে পূর্ববর্তী ইজমা'র সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি রাখে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ববর্তী ইজমা'র কার্যকারিতা থাকিবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের ইজমা' পরবর্তী কালেও রহিত করা যায় না। তাঁহাদের ইজমা'র অনুসরণ উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক। ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, যেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ একমত হইতে পারেন নাই সেইসব বিষয়ে পরবর্তী কালের ইজমা' অনুষ্ঠান বৈধ নহে। কিন্তু হানাফী ফকীহগণের মতে কোন বিষয়ে সাহাবীগণ একমত হইতে না পারিলে পরবর্তী কালের মুজতাহিদগণের সেই বিষয়ে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নাই। মালিকী ফকীহগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের মতে এইরূপ ঘটনা বিরল। কোন বিশেষ যুগে একটি বিষয় সম্পর্কে দুইটি মত প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে সেই বিষয়ে তৃতীয় মত গ্রহণ সংগত নহে। যেমন গর্ভবতী বিধবার 'ইদ্দাতের মেয়াদ সম্পর্কে দুইটি মত বিদ্যমান ঃ (১) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'ইদ্দাত শেষ হইয়া যাইবে এবং (২) সন্তান প্রসব অথবা স্বামীর মৃত্যুর তারিখ হইতে চার মাস দশ দিন—এই দুইটি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদটি হইবে উক্ত নারীর 'ইদ্দাতকাল।

ইজমা' বাচনিকও হইতে পারে, আচরণগতও হইতে পারে। ফকীহগণ একত্রে বসিয়া আলোচনার মাধ্যমে কোন বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হইলে তাহা বাচনিক (কাওলী) ইজমা' হিসাবে গণ্য। একই সমাবেশে একদল ফকীহ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং উপস্থিত অপর দল ফকীহ নীরব থাকিলে সেই অবস্থায়ও বাচনিক ইজমা' গঠিত হইতে পারে। কোন বিষয়ে সকল মুজতাহিদ একইরূপ আচরণ করিলে এবং অপরাংশ উহার প্রতিবাদ না করিলে এই অবস্থায় যে ইজমা' গঠিত হয় তাহাকে আচরিক (ফে'লী) ইজমা' বলে। এই উভয় প্রকার ইজমা'র প্রথম অবস্থাকে 'আযীমাত (অটল) এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে রুখসাত (ঐচ্ছিক) ইজমা' বলে। হানাফী, মালিকী ও কিছু সংখ্যক শাফি'ঈ ফকীহ 'আযীমাত ও রুখসাত উভয় প্রকার ইজমা'র অনুসরণ বাধ্যতামূলক বলেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে কোন খলীফা কোন আইন প্রবর্তন করিলে, আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিলে বা সমাবেশে ভাষণে উহার ঘোষণা দিলে তাহার প্রতিবাদ না হইয়া থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে, উক্ত বিষয়ে ঐ সময়ে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালের শাসকদের বেলায় এইরূপ অবস্থায় অনুরূপ আচরণ ইজমা' হিসাবে গণ্য হইবে না। কারণ খুলাফায়ে রাশিদীনের সামনাসামনি মানুষ যেভাবে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে ও নিরাপদে তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিতে পারিত, সেইরূপ অবস্থা তাঁহাদের পরে আর অবশিষ্ট থাকে নাই।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইজমা'কে কোন কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নহে। যে কোন কালে পূর্বতন ইজমা'র অনুরূপ কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে পরবর্তী যুগেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিয়াস (قياس) ঃ ইহা ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামী আইনের ব্যাপকতর ও নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে স্বীকৃত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র পরে কিয়াস হইল ইসলামী ফিক্হ-এর একটি উৎস। উদ্ভূত কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র মধ্যে পাওয়া না গেলে সেই বিষয়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরী হইয়া পড়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিনটি উৎসে উদ্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কিত বিধান না পাওয়া গেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎসম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন করা হয়।

কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অনুমান করা', 'সামঞ্জস্যপূর্ণ করা', 'সমন্বিত করা', 'যুক্ত করা', 'শুরু হওয়া' ইত্যাদি। ফিক্হশাস্ত্রে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাম কিয়াস (ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ Analogy)। যেমন এমন কতগুলি বিষয় উদ্ভূত হইয়াছে যেইগুলি সম্পর্কিত বিধান শরী'আতে সরাসরি বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু উক্ত বিষয়গুলির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলি বিষয় সম্পর্কিত বিধান বিদ্যমান আছে। এই অবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলীর কারণসমূহ নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর উক্ত কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয়সমূহের মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে ঐ একই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

শহীদ আবদুল কাদির 'আওদাহ বলেন, "কিয়াস এই, যে বিষয় সম্পর্কে শরী'আতের নস বিদ্যমান নাই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সহিত মিলানো যাহার সম্পর্কে শরী'আতের নসভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে" (আত-তাশরী'উল জানাইল ইসলামী, ১খ., পৃ. ১৮২, ধারা নং ১৩৫)।

আল্লামা বায়দাবী (র) লিখিয়াছেন, "কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে একটি বিষয়ের নির্দেশকে অপর বিষয়ের নির্দেশ সাব্যস্ত করার নাম কিয়াস"। মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, "কারণসমূহ বিবেচনাপূর্বক নির্গত বিধানকে মূল বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ করার প্রক্রিয়াকে কিয়াস বলে" (আল-মুখতাসার, ২খ., পৃ. ২০৪)।

যাহারা কিয়াসকে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে চার মাযহাবের ইমামগণ উল্লেখযোগ্য। ইব্‌ন হায্মসহ একদল হাম্বালী ফকীহ কিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অবশ্য কিয়াস শরী'আতের দলীল হওয়ার বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র অনুকূল সমর্থন বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ.

"অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (৫৯ঃ২)।

অনন্তর কুরআন মাজীদের আরও যেইসব আয়াতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার আহ্বান জানানো হইয়াছে সেইসব আয়াত হইতেও কিয়াসের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই বিষয়ে হাদীছ হইতেও সমর্থন পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে হাদীছে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (দ্র. সুনান আবী দাউদ, কিতাবুল আকদিয়া, নং ৩৫২৯)।

খুলাফায়ে রাশিদীনের কার্যক্রম হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন হযরত 'উমার ফারূক (রা) বিচারপতি শুরায়হ (র)-কে লিখিত পত্রে বলেন, "কিতাব, সুন্নাত ও প্রবীণদের সিদ্ধান্তের মধ্যেও কোন সমাধান না পাওয়া গেলে নযীরের অনুসরণ কর" (নাসাঈ)।

যাহার মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলী পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে, তিনিই কিয়াস করার যোগ্য বিবেচিত হইবেন। কোন বিষয়ে নসভিত্তিক নির্দেশ বিদ্যমান না থাকিলে কেবল সেই ক্ষেত্রে কিয়াসভিত্তিক নির্দেশ গ্রহণযোগ্য হইবে।

ইসতিহ্সান (استحسان) ঃ ফকীহ্গণের পরিভাষায় "কোন বিষয়ের দুইটি দিকের মধ্যে কোন একটি দিককে যুক্তিসংগত দলীলের ভিত্তিতে অপর দিকের উপর অগ্রাধিকার প্রদানকে ইসতিহ্সান বলে"। ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) কোন বিধান প্রণয়নের জন্য ইসতিহ্সানকে শরী'আতের দলীল (হুজ্জা) মনে করেন। ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত আছে, "ইসতিহ্সান জ্ঞানের উনিশ ভাগের এক ভাগ" (আল-ই'তিসাম, ২খ., পৃ. ১১৮)। ইমাম শাফি'ঈ (র) ইসতিহ্সানের সমর্থক নহেন, বরং ঘোর বিরোধী, কঠোর সমালোচক। ইসতিহ্সান শব্দের অভিধানিক অর্থ কোন কাজ বা বিষয়কে কল্যাণকর বা ফায়দামূলক মনে করা ('আদ্দুশ শায় হাসানান)। সদরুশ শরী'আর মতে সুস্পষ্ট কিয়াসের বিপরীত দলীল ইসতিহ্সান হিসাবে গণ্য (হুওয়া দালীল বিমাকাবিলিল কিয়াসিল জালিয়্যি)। ইমাম সারাখসী বলেন, কিয়াস পরিত্যাগ করিয়া মানুষের কল্যাণের সহিত সংগতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হইল ইসতিহ্সান (হুওয়া তারকুল কিয়াস ওয়াল-আখযু বিমা হুওয়া আওফাকু' লিন্নাস)। ইসতিহ্সানের সমর্থনে অথবা ইহার প্রতি ইঙ্গিতবাহী আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে। যেমন ঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ.

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাগণকে যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে" (৩৯ ঃ ১৭-১৮)।

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا.

"এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণের নির্দেশ দাও" (৭ ঃ ১৪৫)।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ হইতে ইসতিহ্সানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই" (২২ ঃ ৭৮)।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না" (২ ঃ ১৮৫)।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

"আল্লাহ কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না" (২ ঃ ২৮৬)।

সুন্নাহ হইতেও ইসতিহ্সানের অনুকূলে সমর্থন পাওয়া যায়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীছে বলা হইয়াছে ঃ

مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ.

"মুসলমানগণ যাহা উত্তম বিবেচনা করে তাহা আল্লাহ্র নিকটও উত্তম।"

হানাফী ফকীহ্গণের মতে ইসতিহ্সান ইসলামের সাধারণ নীতিমালারই অনুগত, উহার বিপরীত কিছু নহে। যেমন ইসলামের সাধারণ মূলনীতি হইল ঃ

১. "ক্ষতিগ্রস্ত হইও না এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিও না।"
২. "অনিবার্য পরিস্থিতি নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করে।"
৩. "কষ্ট-কাঠিন্য সহজের প্রসূতি।"

এই কারণেই প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুজতাহিদ আবূ বাক্র আল-জাসসাস (র) বলেন, "যেইসব বিষয়ে আমাদের হানাফী ফকীহ্গণ ইসতিহ্সানের সমর্থক তাহার সবই যুক্তি ও মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল। উহার কোনটির মধ্যেই তাহাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক–প্রবণতা ও লালসার লেশমাত্র নাই।

ইসতিহ্সানের আলোচনা করিতে গিয়া ফকীহ্গণ কিয়াসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ কিয়াসে জালী ও কিয়াসে খাফী। এই বিষয়ে ইমাম সারাখসী (র) বলেন, "ইসতিহ্সান মূলত কিয়াসেরই দুইটি দিক। উহার একটি হইল জালী যাহার প্রভাব দুর্বল এবং ইহাকে বলে কিয়াস; অপরটি খাফী যাহার প্রভাব শক্তিশালী এবং ইহাকে বলে ইসতিহ্সান" (আল-মাবসূত, ১০খ., পৃ. ১৪৫)।

১. কিয়াসে জালীর বিপরীতে নস-এর প্রমাণ হিসাবে বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)-এর উদাহরণ পেশ করা যায়। কিয়াসে জালী অনুযায়ী এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়া উচিত নয়। কারণ যে পণ্য বিক্রয় করা হয় তাহা তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যমান থাকে না, অথচ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীর (নস) ভিত্তিতে কিয়াসকে পরিহার করিয়া ইসতিহ্সান-কে অনুসরণ করা হইয়াছে ঃ

مَنْ سَلَفَ (اَسْلَمَ مِنْكُمْ) فَلْيُسْلِفْ (فَلْيُسْلِمْ) فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ.

"যে ব্যক্তি অগ্রিম (ক্রয় করিবার জন্য) মূল্য প্রদান করে সে যেন ওজন ও মাপ নির্দিষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উহা প্রদান করে" (বুখারী, নং ২০৮০-৮৪, আধুনিক প্রকাশনী সংস্করণ)।

২. কিয়াসে জালীর বিপরীতে ইজমা' ও প্রথার দৃষ্টান্ত ঃ যেমন মূল্য নির্ধারণ করিবার পর কোন ব্যক্তি মুচিকে জুতা তৈরি করার নির্দেশ প্রদান

করিল। কিয়াসে জালী অনুযায়ী এই লেনদেনও বৈধ হওয়া উচিত নহে। কারণ জুতা পরে তৈরি করা হইবে এবং তাহা লেনদেন চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় অস্তিত্বহীন। কিন্তু এই জাতীয় লেনদেন সমাজে এতই ব্যাপক যে, মনে হয় ইহার বৈধতার উপর তাহাদের ঐকমত্য (ইজমা') প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রেও কিয়াস পরিহার করিয়া ইসতিহ্সানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উদাহরণের মধ্যে 'প্রচলিত প্রথা'র দৃষ্টান্তও বিদ্যমান।

৩. কিয়াসে জালীর বিপরীতে প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত ঃ কূপের পানি নাপাক হইয়া গেলে কিয়াস অনুযায়ী উক্ত কূপকে নাপাকমুক্ত করা সম্ভব নহে। কারণ যতই পরিষ্কার করা হউক না কেন, নাপাকির কিছু না কিছু কূপে অবশিষ্ট থাকিয়াই যাইবে। আবার কূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থায় কিয়াস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষতি দূরীভূত করার জন্য ইসতিহ্সানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধৌত করার পর কূপের পানি পাক গণ্য করা হইয়াছে।

৪. কিয়াসে জালীর বিপরীতে কিয়াসে খাফীর দৃষ্টান্ত ঃ যে জীবের গোশত হারাম উহার উচ্ছিষ্টও হারাম। কারণ উচ্ছিষ্টের মধ্যে উহার দেহ হইতে নির্গত উহার মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতে নখর বা থাবাযুক্ত শিকারী পাখির উচ্ছিষ্টও হারাম হওয়া উচিত। কারণ উহার গোশতও হারাম। কিন্তু কিয়াসে খাফী (সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি) হইল, পাখি ঠোঁট দ্বারা আহার করে এবং ঠোঁট হইল শক্ত (যৎকিঞ্চিত)। তাই উহার ঠোঁট খাদ্য বা পানীয়ে ডুবাইলে ইসতিহ্সান অনুযায়ী তাহা নাপাক গণ্য হইবে না।

কিয়াসকে পরিহার করিয়া ইসতিহ্সানকে গ্রহণ করিতে হইলে কয়েকটি শর্ত অবশ্যই মানিয়া চলিতে হয়। যেমন কিয়াস-এর বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত উভয় দিক অযথার্থ (ফাসিদ) হইলে সেই ক্ষেত্রে ইসতিহ্সান গ্রহণযোগ্য হইবে। কিয়াস-এর কোন একটি দিক অযথার্থ হইলে ও উহার বিপরীতে ইসতিহ্সানের উভয় দিক যথার্থ হইলে অথবা কিয়াস-এর বাহ্যিক দিক যথার্থ কিন্তু অন্তর্নিহিত দিক অযথার্থ এবং ইসতিহ্সানের বাহ্যিক দিক অযথার্থ কিন্তু অন্তর্নিহিত দিক যথার্থ হইলে ইসতিহ্সানই গ্রহণযোগ্য হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে কিয়াসই গ্রহণযোগ্য।

ইসতিহ্সানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ স্থান-কাল-পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। ইহার সমাধান চারটি স্থায়ী উৎসে পাওয়া গেলে তো যথেষ্ট, অন্যথায় ইহার সমাধান পেশ করা একটি কঠিন বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থার সুরাহা করার জন্য হানাফী ফকীহগণ প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শরী'আতের এমন দলীল-প্রমাণের প্রবর্তন করেন যাহা মানুষের জন্য যথেষ্ট উপকারী সাব্যস্ত হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের কর্মকে সহজতর করিতে অবদান রাখিয়াছে। ইসতিহ্সান এই প্রকারের দলীলেরই অন্তর্ভুক্ত। হানাফী ফকীহগণের মতে যদিও ইহা কিয়াস-এর শ্রেণীভুক্তই (কিয়াসে খাফী), কিন্তু তথাপি কিয়াসে জালীর (সারীহ্) স্থায়ী নীতিমালা অনুযায়ী কোন কোন বিষয়ের সমাধান মানুষের জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। তাই সামগ্রিক কল্যাণ, প্রয়োজন, রেওয়াজ ও প্রথার কথা বিবেচনা করিয়া এই ক্ষতি ও অসুবিধার প্রতিরোধের জন্য ইসতিহ্সান-এর আশ্রয় লওয়া হয়। ইমাম সারাখসী (র)-এর ভাষায়, "জনগণের সর্বাধিক উপকারের কথা বিবেচনা করিয়া কিয়াসকে গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ করার নামই হইতেছে ইসতিহ্সান"(তারকুল কিয়াস ওয়াল-আখযু বিমা হুওয়া আওফাকুন-নাস)।

মাসালিহ্ মুরসালা (مصالح مرسلة) ঃ ইমাম গাযালী (র)-এর মতে ইহা ইসতিসলাহ (استصلاح), ইমামুল হা'রামায়ন ও ইব্ন সাম্'আনীর মতে ইসতিদলাল (استدلال), অপর একদল আলিমের মতে 'ইসতিদলাল মুরসাল' নামে পরিচিত। "যে মূলনীতির (اصول) সমর্থনে অথবা বিরুদ্ধে শরী'আতের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান বিদ্যমান নাই তাহাকে মাসালিহ্ মুরসালা বলে।" ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) বলেন, "মুজতাহিদ যে কর্মের মধ্যে অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছে বলিয়া অনুভব করেন এবং শরী'আতে উক্ত কর্মের বিপরীত কোন নির্দেশ বিদ্যমান নাই তাহাকে 'মাসালিহ্ মুরসালা' বলে" (মাজমূ'আতুর রাসাইল ওয়াল-মাসাইল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২)। ইমাম গাযালী (র) বলেন, "বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তই হইল মাসালিহ্ মুরসালার ভিত্তি এবং উহার প্রমাণের জন্য কোন সর্বসম্মত মূলনীতি বিদ্যমান নাই।" খাওয়ারাযমী (র) বলেন, জনগণের অসুবিধা দূরীভূত করিয়া শরী'আতের উদ্দেশ্যের হেফাজত করাই মাসালিহ্ মুরসালার লক্ষ্য। মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে সার্বিক জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সাধারণ অর্থবোধক নস বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে এমন কোন মৌলিক নীতির (ضابطة معنوى) সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম মাসালিহ্ মুরসালা, যাহার ফলে উহা জনস্বার্থ ও শরীআর উদ্দেশ্য উভয়টির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে। মাসালিহ্ মুরসালা হইল সেই সার্বিক কল্যাণকর জিনিস যাহা আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, শুধু 'কল্যাণ'-কে ভিত্তি করিয়া বিধান রচনা করার নাম হইতেছে মাসালিহ্ মুরসালা। ইসতিহ্সানের ক্ষেত্রেও জনস্বার্থ ও জনকল্যাণের দিকটি বিবেচনায় রাখিতে হয়। তবে ইসতিহ্সানের তুলনায় মাসালিহ্ মুরসালার পরিধি অধিক বিস্তৃত। যেই বিষয়ে শরী'আতের সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান আছে সেই বিষয়টি মাসালিহ্ মুরসালার আওতাভুক্ত হইবে না। কোন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা অথবা কোন মারাত্মক ক্ষতি প্রতিরোধ বা দূরীভূত করা, শরী'আর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা এবং যেসব মূলনীতির উপর শরী'আর ভিত্তি স্থাপিত তাহার পূর্ণতা সাধন করাই মাসালিহ্ মুরসালার উদ্দেশ্য। ইহার অর্থ আইন প্রণয়নের অবাধ অনুমতি নহে, বরং মাসালিহ্ মুরসালার আওতায় আইন প্রণয়নকালে তিনটি শর্ত অপরিহার্যভাবে মানিয়া চলিতে হয় ঃ

১. এই পন্থায় যে আইন প্রণয়ন করা হইবে তাহা শরী'আতের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে, উহার পরিপন্থী হইতে পারিবে না;

২. যখন তাহা জনগণের সামনে পেশ করা হইবে তখন তাহা সাধারণ বুদ্ধি-বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে;

৩. তাহা কোন প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ অথবা কোন প্রকৃত অসুবিধা দূর করার জন্য প্রণীত হইতে হইবে (ইমাম শাতিবীর আল-ইতিসাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১৪)।

উক্ত শর্তত্রয় অনুসরণ পূর্বক তিন পর্যায়ে মাসালিহ মুরসালার আওতায় আইন প্রণীত হইয়া থাকে। যেমন, (১) কোন বিষয় যথার্থ হওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের সমর্থন বিদ্যমান আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রবল বৃষ্টির কারণে অথবা সফররত থাকার কারণে দুই ওয়াক্তের নামায (যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও 'ইশা একই সময়ে পরপর) একত্রে পড়ার বিষয়টি শরী'আত অনুমোদন করিয়াছে। যেমন হজ্জের সময় আরাফাত ময়দানে যুহর ও আসর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশা একসাথে পড়া হয়।

(২) কোন বিষয় অযথার্থ হওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে। যেমন রোযার কাফফারাস্বরূপ দাসমুক্ত করার নির্দেশ প্রদানের পরিবর্তে অপরাধীর প্রতি কঠোরতা আরোপের উদ্দেশে তাহাকে রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করা। যেমন ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদ ইয়াহ্ইয়া (র) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামকে রোযা ভঙ্গের কাফফারাস্বরূপ দাসমুক্তির পরিবর্তে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৩) এমনও কিছু বিষয় আছে যাহার যথার্থ বা অযথার্থ হওয়ার পক্ষে শরী'আতের কোন সাক্ষ্য বা সমর্থন বিদ্যমান নাই। এই অবস্থাটিই সাধারণভাবে মাসালিহ মুরসালার ব্যাপক প্রয়োগের পথ প্রশস্ত করে।

মাসালিহ মুরসালা ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি 'উপকার' ও 'ক্ষতি' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত 'উপকার', যেমন সুস্বাস্থ্য, সচ্ছলতা, আনন্দ, বুদ্ধিজ্ঞান, লাভ ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত 'ক্ষতি', যেমন স্বাস্থ্যহানি, বিপদাপদ, লোকসান, অজ্ঞতা ইত্যাদি। মাসালিহ মুরসালা কোন শর'ঈ অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে তাহা 'নির্দেশ' অথবা 'নিষেধাজ্ঞা'র মানদণ্ড হিসাবে গণ্য হয়।

একটি সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের জন্য কতকগুলি বিষয়ের সংরক্ষণ বা হেফাজত অত্যন্ত জরুরী। সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ (১) ধর্মের হেফাজত, (২) জীবনের হেফাজত, (৩) বুদ্ধি বা মেধার হেফাজত, (৪) মানব বংশধারার হেফাজত ও (৫) সম্পদের হেফাজত। এই পাঁচটি বিষয়ের কোন একটির অনুপস্থিতিতে সমাজ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, বরং সমাজ ব্যবস্থার পতন ত্বরান্বিত হয়।

অতএব, মানব সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য উক্ত বিষয়গুলির হেফাজতের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে তাহাই ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে কল্যাণ (মাসালিহ) হিসাবে গণ্য হইবে এবং যেসব বিষয় উহার প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হইবে তাহাই অকল্যাণ (ক্ষতি) হিসাবে গণ্য হইবে। উক্ত পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণতা ও হেফাজতের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহা গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুসারে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

এক ঃ আবশ্যকীয় পদক্ষেপ। যেমন মানব জীবনের হেফাজতের লক্ষ্যে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড, জ্ঞান ও বোধশক্তির হেফাজতের লক্ষ্যে মাদক গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ বেত্রদণ্ড, মানব বংশের সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ ক্ষেত্রভেদে বেত্রদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড এবং ধন-মালের হেফাজতের লক্ষ্যে চুরি, ডাকাতি, আত্মসাত, গসব জবরদখল ইত্যাদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ক্ষেত্রভেদে হস্ত কর্তন ও জেল- জরিমানার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দুই ঃ পরিপূরক পদক্ষেপ। পরিপূরক পদক্ষেপ বলিতে বুঝায় উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয়ের হেফাজতের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ অতি আবশ্যকীয় না হইলেও প্রয়োজনীয়। এই জাতীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন ও উহার পূর্ণতা সাধন সহজতর হয় এবং বাধা-বিপত্তি, কষ্ট-কাঠিন্য ও অসুবিধা দূরীভূত করা হয়। যেমন শরী'আতে যেসব জিনিস হারাম করা হয় নাই তাহার ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় না হইলেও মানব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য উহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

তিন ঃ সৌন্দর্য বা পূর্ণতা বিধায়ক পদক্ষেপ। যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে কোন ক্ষতি বা লোকসান হয় না ঠিকই কিন্তু মানবীয় ভদ্রতা ও সৌজন্য উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে উত্তম বিবেচনা করে। যেমন ক্ষমা, উদারতা, উত্তম আচরণ, নম্র ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়সমূহ আবশ্যকীয় না হইলেও মানব জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। তাই ইসলামী শরী'আতে এই জাতীয় বিষয়সমূহ অবলম্বনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে। এই তিন ধরনের প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়াই মাসালিহ মুরসালার আওতায় আইন প্রণীত হইয়া থাকে।

প্রথা (عرف) ঃ প্রথাকে শরীআর ভাষায় 'আদাহ (عادة), 'উরফ (عرف) বা তা'আমুল (تعامل) বলে। 'উরফ অর্থ প্রচলিত রীতি বা প্রথা, 'আদাহ অর্থ অভ্যাস এবং তা'আমুল অর্থ (অভ্যাসগত) কাজ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া কুরআন মজীদ নাযিল হওয়াকালে আরব সমাজে যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত অনেক প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহা সরাসরি নিষিদ্ধ করেন নাই। খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে বহু অমুসলিম এলাকা মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণ ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কোন প্রথা যদি ইসলামী শরী'আর পরিপন্থী না হইত তবে তদনুযায়ী আচরণ করিতে জনগণকে বাধা দেওয়া হইত না।

কয়েক ব্যক্তি বা কয়েক শ্রেণীর মানুষ বা কয়েক মহল্লার মানুষ যে আচরণ করে আইনের দৃষ্টিতে তাহা প্রথা নহে। একটি গ্রামের বা একটি শহরের আচরণও প্রথা হইতে পারে না। মাঝে মাঝে মানুষ যাহা করে তাহাও প্রথা নহে। সমগ্র দেশে অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্বজনস্বীকৃতভাবে যে অভ্যাস প্রচলিত থাকে তাহাকে প্রথা গণ্য করা যায়। কত কাল প্রচলিত থাকিলে কোন আচরণকে প্রথা বলা যায় তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। স্মরণকালের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব হয় এবং সেই সময় হইতে অব্যাহতভাবে মুসলমানগণ তাহা অনুসরণ করিতে থাকিলে উহাকে প্রথার মর্যাদা দেওয়া যায়। 'রদ্দুল মুহ্তার' গ্রন্থকারের মতে যাহা সর্বদা আচরণ করা হয় তাহাই প্রথা।

কোন আচরণ রাসূলুল্লাহ (স) বা তাঁহার সাহাবীগণের যুগ হইতে প্রচলিত হইলেই তাহা প্রথার মর্যাদা পাইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতাও নাই। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতির পরিপন্থী না হইলে প্রথাভিত্তিক আইন সকলে মানিতে বাধ্য। অবশ্য ইজমা'র মধ্যে মুজতাহিদ

ফকীহগণের গবেষণার অবদান বিদ্যমান আছে, যাহা প্রথার মধ্যে নাই। তাই প্রথার তুলনায় ইজমা'র মর্যাদা অনেক বেশি। তবে কিয়াস ভিত্তিক আইনের তুলনায় প্রথা ভিত্তিক আইনের উচ্চতর মর্যাদা স্বীকৃত। ইসলামী আইনের গবেষকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, ইসলামী আইনের বিকাশে প্রথার অবদান অতি বৃহৎ। সাহাবায় কিরাম ও তাবি'ঈনের আমলে যেসব প্রথা সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইত সেইগুলি আইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ (উসূলিয়্যূন) প্রথাকে আইনের একটি উৎস মনে করেন। কুরআনের যেসব আয়াত ও যেসব সুন্নাহ দ্বারা ইজমা'কে প্রামাণ্য গণ্য করা হয়, প্রথাকেও ঐগুলির ভিত্তিতে প্রামাণ্য বলা হয়। 'হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে স্পষ্ট আয়াত বা সুন্নাহ্র অনুপস্থিতিতে প্রথাকে ইজমা'র সমস্থানীয় মনে করা হয়।

ইসতিদলাল (استدلال) ঃ উক্ত শব্দের অর্থ দলীল বা যুক্তি প্রদান, এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু অনুমান করা। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফীগণ এই শব্দটির ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে ইসতিদলাল বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কুরআনের ব্যাখ্যা বা কিয়াসের আওতায় আসে না। ইহাকে যুক্তির মাধ্যমে নির্ণীত সিদ্ধান্ত বলা যায়।

ইসতিদলাল তিন পর্যায়ে হইতে পারে ঃ (১) একটি বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের যোগ ঘটিলে এবং সেই যোগের পশ্চাতে কোন কার্যকরী কারণ বিদ্যমান না থাকিলে সেই যোগের প্রকাশকে এক ধরনের ইসতিদলাল বলা হয়; (২) কোন বস্তু বা তাহার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত বিলোপ বা স্থগিত না করা যায় ততক্ষণ ধরিয়া লইতে হইবে, উক্ত বস্তু বা তাহার অবস্থা বহাল আছে; (৩) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যে আইন প্রত্যাদিষ্ট তাহা প্রামাণ্য।

প্রথম পর্যায়ের ইসতিদলাল চার শ্রেণীভুক্ত ঃ (১) যখন দুইটি ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যেমন কোন ব্যক্তি আইনসিদ্ধ তালাক প্রদানের যোগ্য হইলে সে আইনসিদ্ধ যিহারও করিতে পারে।

(২) যখন দুইটি নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রকার ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যেমন নিয়াত ব্যতীত উযু সিদ্ধ হওয়ায় নিয়াত ব্যতীত তায়াম্মুমও সিদ্ধ।

(৩) একটি ইতিবাচক বিষয়ের সহিত একটি নেতিবাচক বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে এক প্রকারের ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যেমন, যাহা হালাল তাহা হারাম হইতে পারে না।

(৪) একটি নেতিবাচক বিষয়ের সহিত একটি ইতিবাচক বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে এক প্রকারের ইসতিদলাল কার্যকরী হয়। যেমন, যাহা হারাম তাহা হালাল নহে।

যাহার বিরতি বা বিলোপ প্রমাণ করা হয় নাই তাহা বহাল থাকার নীতি সম্পর্কিত একটি উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে, কোনক্রমেই তাহার খোঁজ-খবর পাওয়া যাইতেছে না। শাফি'ঈ মাযহাবমতে আইনত ঐ ব্যক্তিকে জীবিত গণ্য করিতে হইবে, তাহার মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। এই ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার ওয়ারিসগণের মধ্যে বণ্টিত হইবে না। কিন্তু সে তাহার নিখোঁজকালে মৃত আত্মীয়ের ওয়ারিস হইবে। হানাফী মাযহাবমতে বিরতি বা বিলোপ প্রমাণের অভাবে বিদ্যমানতার নীতি বর্তমান স্বত্বকে রক্ষা করিলেও ভবিষ্যত স্বত্ব সৃষ্টি করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁহার ওয়ারিসগণের মধ্যে যেমন বণ্টিত হইবে না, তেমন সেও কাহারও ওয়ারিস হইবে না।

ইজতিহাদ (اجتهاد) ঃ এই শব্দটির অর্থ অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, প্রয়াস, কঠোর শ্রম ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না পাওয়া গেলে সেই বিষয়ে সঠিক বিধান নির্ণয়ের জন্য মুজতাহিদ ফকীহ্ যখন তাহার সার্বিক শক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন তখন উক্ত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে "ইজতিহাদ" বলে। ইজতিহাদ আইনের স্বতন্ত্র কোন উৎস নহে, বরং আইন সম্পর্কিত গবেষণা। ইজতিহাদ প্রসূত অভিমত সাধারণত সঠিক বলিয়া গণ্য হয়, তবে ইহা নির্ভুল নাও হইতে পারে। এই কারণে ইজতিহাদ প্রসূত অভিমতকে অনুমান ভিত্তিক ব্যবস্থা বলা হয়। কোন মুজতাহিদ সততার সহিত আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তিনি অপরাধী গণ্য হইবেন না। কারণ তিনি তাহার চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই, যদিও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। ইহা দুর্ভাগ্যজনক হইলেও অপরাধজনক নয়। উসূলের মূলনীতি হইল ঃ "মুজতাহিদ ভুলও করিতে পারেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছিতে পারেন"।

অবশ্য 'ইজতিহাদ' ও 'গবেষণা' শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী শরী'আ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাকে ইজতিহাদ বলা হয় এবং এই ক্ষেত্রে গবেষণাকারীকে অপরিহার্যরূপে মুসলমান হইতে হয়। কিন্তু গবেষণা যে কোন বিষয়ে হইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে গবেষকের মুসলমান হওয়া শর্ত নহে। অতএব, গবেষণা শব্দটি ব্যাপকার্থক এবং ইজাতিহাদ শব্দটি বিশিষ্টার্থক।

ইসলামী আইন প্রণয়নে মানববুদ্ধির প্রয়োগ

মহানবী (স)-এর যুগে ওহীর ভিত্তিতে ফয়সালা হইত। এই ওহী দুই ধরনের ছিল। কুরআন মজীদকে "ওহী মাতলূ" এবং মহানবী (স)-এর হাদীছকে "ওহী গায়র মাতলূ" বলা হয়। অতএব, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কর্তৃক কোন বিষয়ে বিধান প্রদত্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে মুসলমানগণের নিজস্ব বুদ্ধিপ্রসূত বিকল্প বিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নাই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যখন কোন ব্যাপারে ফয়সালা করিয়া দেন তখন কোন মুমিন পুরুষ বা কোন মুমিন স্ত্রীলোকের নিজেদের সেই ব্যাপারে ভিন্নরূপ ফয়সালা করার এখতিয়ার নাই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হইল" (৩৩ ঃ ৩৬)।

ওহী গায়র মাতলূ অর্থাৎ মহানবী (স) কর্তৃক বিধান প্রদানের বিষয়টিও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত এবং উহার অনুসরণ অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক" (৫৯ : ৭)।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى.

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না; ইহা তো ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়" (৫৩ : ৩, ৪)।

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীছ) হইতে প্রাপ্ত আইনের বিপরীত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে মুসলমানরা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথে ধাবিত হইবে। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা এই হইবে, সংশ্লিষ্ট বিধানের সফল বাস্তবায়ন কিভাবে করা যাইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করা। যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ নীরব, একাধিক অর্থবাহী বা অস্পষ্ট বা স্থানিক ও কালিক, সেখানে মানববুদ্ধির প্রয়োগে আইন প্রণয়নকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই, বরং উহাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) প্রদত্ত নীতি-বিধানের প্রাধান্য দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। এই সর্বোচ্চ আইনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মানুষের বুদ্ধির প্রয়োগে আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা রহিয়াছে।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে এমন কতগুলি বিষয় রহিয়াছে যেই সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান বিদ্যমান আছে অথবা উপরিউক্ত উৎসদ্বয় কোন মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আবার এমন অনেক বিষয় রহিয়াছে যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পূর্ণ নীরব। এই নীরবতা সরাসরি এই কথার প্রমাণ বহন করে, মহান আইনদাতা আল্লাহ এই ক্ষেত্রে মানুষকে নিজস্ব রায় বা বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজ এমনভাবে পরিচালিত হইবে যেন তাহা ইসলামের প্রাণশক্তি ও ইহার মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, উহার মেজাজ-প্রকৃতি ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতির বিপরীত না হয় এবং তাহা যেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে সংস্থাপিত হইতে পারে। আইন প্রণয়নের এই কাজ ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখে এবং যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে উহার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। এক বিশেষ ইল্মী তাহ্কীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এই কাজ করা যাইতে পারে। ইসলামের পরিভাষায় এইরূপ কর্মতৎপরতাকেই ইজতিহাদ বলে। মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যক্রম দ্বারা ইজতিহাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত।

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ قَالَ اَقْضِىْ بِمَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ اَجْتَهِدُ رَاْيِىْ وَلاَ اٰلُوْا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ (স) যখন মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান তখন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিভাবে ফয়সালা করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাবে যে হিদায়াত রহিয়াছে তদনুযায়ী। তিনি বলিলেন, যদি আল্লাহ্র কিতাবে না পাওয়া যায়? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। মহানবী (স) বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাতেও যদি না পাওয়া যায়? তিনি বলিলেন, আমি আমার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে (যথার্থ সত্যে পৌঁছার) পূর্ণ চেষ্টা করিব এবং মোটেই অবহেলা করিব না। মহানবী (স) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তওফীক দিয়াছেন যাহা আল্লাহ্র রাসূলের পছন্দনীয়" (তিরমিযী, আবওয়াবুল আহ্কাম, ৩ নং বাবঃ মা জাআ ফিল-কা'দী 'কায়ফা ইয়াকদী, নং ১৩২৭; আবূ দাঊদ, কিতাবুল কা'দা', ১১ নং বাবঃ ইজতিহাদির রায় ফিল-কা'দা', নং ৩৫৯২)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, "কিন্তু যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার বিধান আল্লাহ্র কিতাবেও নাই, মহানবী (স)-এর অনুরূপ সিদ্ধান্তও নাই এবং সালিহীনের (উম্মাতের যোগ্য ও সৎ কর্মপরায়ণ লোক) নিকট হইতেও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না, তাহা হইলে সেই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্ণ চেষ্টা (ইজতিহাদ) করিবে। কিন্তু এই কথা বলিবে না, "আমি ভয় করিতেছি, আমি ভয় পাইতেছি" (নাসাঈ, কিতাবু আদাবিল কু'দা'ত)। বিচারপতি শুরায়হ' (র)-এর নামে প্রেরিত একটি পত্রেও হযরত 'উমার (রা) অনুরূপ কথা বলিয়াছেন (নাসাঈ, কিতাবু আদাবিল কু'দা'ত-১১, বাব'আল-হুক্ম বিইত্তিফাক আহ্লিল 'ইল্ম, নং ৫৩৯৯-৫৪০১)। যে ইজমা' ও কিয়াস ইসলামী আইনের তৃতীয় ও চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে স্বীকৃত তাহার বিষয়বস্তুও মূলত ইজতিহাদপ্রসূত।

মানববুদ্ধি প্রয়োগের শর্তাবলী

ইজতিহাদ অর্থাৎ মানববুদ্ধি প্রয়োগে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে বুদ্ধি প্রয়োগকারীর মধ্যে কতগুলি অপরিহার্য গুণ বা যোগ্যতা থাকিতে হইবে। ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত করা যতখানি প্রয়োজনীয়, ততোধিক সতর্কতা অবলম্বনও জরুরী।

(এক) আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের উপর বুদ্ধি প্রয়োগকারীর দৃঢ় ঈমান থাকিতে হইবে, তাহা মানিয়া চলার একনিষ্ঠ সংকল্প থাকিতে হইবে, তাহার বন্ধন ছিন্ন করার খায়েশমুক্ত হইতে হইবে এবং ইসলামী শরী'আত হইতে পথনির্দেশ লাভ করিতে হইবে।

(দুই) আরবী ভাষা, উহার ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্পর্কে বুদ্ধি প্রয়োগকারীর সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ কুরআন এই ভাষায় নাযিল হইয়াছে এবং মহানবী (স)-এর সুন্নাত ও ইসলামী আইনের উপর যে কাজ হইয়াছে, এই ভাষাই সেই সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বাহন।

(তিন) বুদ্ধি প্রয়োগকারীর জন্য কুরআন ও সুন্নাহর এমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাহার মাধ্যমে শরী'আতের মর্মমূলে পৌঁছা যায়।

(চার) রাসূলুল্লাহ (স) ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে ইসলামী আইনের উপর যে কাজ হইয়াছে এবং মুজতাহিদগণ যুগের পর যুগ ধরিয়া যেভাবে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ সাধন করিয়াছেন, সেই সম্পর্কেও বুদ্ধি প্রয়োগকারীর গভীর জ্ঞান থাকিতে হইবে। ইজতিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য শুধু এই জ্ঞানের প্রয়োজন নহে, বরং আইনের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যও ইহার প্রয়োজন। ইহার

মাধ্যমে জানা যাইবে, বিভিন্ন যুগে সমসাময়িক পরিস্থিতির সহিত কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং ব্যাপক ভিত্তিতে কী কী আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

(পাঁচ) বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে বুদ্ধি প্রয়োগকারীর গভীর প্রজ্ঞা থাকিতে হইবে। কারণ এইগুলির উপরই শরী'আতের নির্দেশ ও মূলনীতি প্রযোজ্য হইবে।

(ছয়) বুদ্ধি প্রয়োগকারীকে নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে। চরিত্রহীন লোকের ইজতিহাদ জনগণের নিকট বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তাই চরিত্র ভ্রষ্টকারী প্রভাবসমূহ হইতে নিরাপদ অবস্থানে থাকার শক্তি তাহার থাকিতে হইবে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহের অধিকারী আলিম ব্যক্তির ইজতিহাদের মাধ্যমেই সঠিক কাঠামো অনুযায়ী ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ হইতে পারে। ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি হইল, "আইন বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর, যাহা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে তাহা হইতে বিরত থাক এবং যাহা সম্পর্কে শরী'আত প্রণেতা (আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল) নীরব সেই সম্পর্কে তোমরা নিজেদের সঠিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাধীন" (দ্র. শাতিবী, আল-ই'তিসাম, ২খ., পৃ. ১১৫)।

আইন প্রণয়নে শূরার ভূমিকা

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে "শূরা" আইন বিধিবদ্ধ করিবে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করার সময় তিনটি শর্ত অবশ্যই পালন করিতে হইবে ঃ (১) আইন প্রণয়ন কালে ইসলামের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও সার্বিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে অর্থাৎ আইন এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যে, প্রয়োজনও পূর্ণ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও মেজাজ-প্রকৃতির (Spirit) সহিতও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, ইহার পরিপন্থী হইবে না।

(২) উক্ত আইন যখন জনগণের সামনে পেশ করা হইবে তখন তাহা সাধারণ জ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে।

(৩) কোন প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশে অথবা কোন প্রকৃত অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য উক্ত আইন প্রণীত হইবে।

খুলাফায়ে রাশিদার শাসনামলে এই জাতীয় আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূরা বা সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রণীত হইত। যেমন কুরআন মজীদে মাদক দ্রব্য হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার ব্যবহারজনিত অপরাধের শাস্তির সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই। মহানবী (স)-ও ইহার কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি নির্ধারণ করেন নাই, বরং তিনি যে অপরাধীকে যতটুকু শাস্তি প্রদান উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাকে তদনুরূপ শাস্তি দিয়াছেন। হযরত আবূ বাক্র ও 'উমার (রা) নিজ নিজ শাসনামলে চল্লিশ বেত্রাঘাত শাস্তি নির্ধারণ করেন, কিন্তু রীতিমত আইন প্রণীত হয় নাই। হযরত উছমান (রা)-র শাসনামলে এই অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে তিনি সাহাবীগণের পরামর্শ পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করেন। হযরত 'আলী (রা) তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আশি বেত্রাঘাত নির্দ্ধারণ করার প্রস্তাব করেন। পরামর্শ পরিষদ তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া উহাকে আইনে পরিণত করে (আল-ই'তিসাম, ২খ, পৃ. ১০১)।

শিল্পী, কারিগর, ধোপা, দর্জি ইত্যাকার পেশাজীবীর নিকট কোন জিনিস তৈরি করার জন্য কোন মাল অর্পণ করা হইলে এবং তাহার নিকট হইতে উহা হারাইয়া গেলে ইহার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কোন বিধান ছিল না। হযরত 'আলী (রা) তাঁহার ভাষণে বলিলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন অবহেলা বা অপতৎপরতা ব্যতীত উহা হারাইয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে তাহাকে দায়ী করা উচিৎ নহে। কিন্তু তাহাকে দায়ী না করা হইলে উহার প্রতি তাহার অবহেলার মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ার আশংকা আছে। তাই সামগ্রিক কল্যাণের দাবি অনুযায়ী তাহাকে উক্ত জিনিসের জামানতদার সাব্যস্ত করা হইবে এবং উহা হারাইয়া গেলে তাহার উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য হইবে। তাহার এই মতও ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে (আল-ই'তিসাম, ২খ, পৃ. ১০২)।

অতএব, শূরা যখন নস-এর কোন ব্যাখ্যা ও ফকীহ বা মুজতাহিদের কোন কিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহ্সান অথবা মাসালিহ মুরসালা প্রসূত কোন রায় আহ্লুল-হাল্ল ওয়াল-'আক্দ (শূরার সদস্যবৃন্দ)-এর সকলের বা অধিকাংশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করিবে তখনই তাহা মুসলিম রাষ্ট্রের আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিবে।

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ঃ ইসলামী আইনে আল্লাহ তা'আলাই হইলেন সকল ক্ষমতার উৎস। পাশ্চাত্যপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাহাকে 'সার্বভৌমত্ব' বলা হয় উহার নিরংকুশ মালিক হইলেন আল্লাহ। মানুষ তাঁহার প্রতিনিধি (খলীফা) হিসাবে কেবল ঐ ক্ষমতার (প্রশাসনিক) বাস্তবায়ন করে মাত্র। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ.

"কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ" (৬ ঃ ৫৭)।

২. ইসলামী আইন অবিভাজ্য ঃ ইসলামী আইন মানব জীবনের যাবতীয় আচরণকে নিজের আওতাভুক্ত করিয়াছে। এখানে পার্থিব ও পারলৌকিক, 'ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচরণ, 'আকীদা-বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয় ইসলামী আইনের আওতাভুক্ত। সরকারী কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আইনসমূহ যেমন ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি 'ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধানও ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই আইনের আওতায় মানুষের ধর্মীয় জীবন ও একান্তই পার্থিব কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনই তাহার ধর্মীয় জীবন। এই আইনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান পোষণ ও কিছু অংশ অস্বীকার ও অমান্য করা কুফরী। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ.

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এইরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে" (২ : ৮৫; আরও দ্র. ২ : ১৫৯-৬০; ১৭৪-৫; ৪ : ১৫০-৫১ ও ৫ : ৪৪-৪৫ ও ৪৭)।

৩. ইসলামী আইন বিশ্বজনীন : ইসলামী আইন কাঠামো গোটা বিশ্বের যে কোন দেশের, যে কোন পরিবেশের, যে কোন অবস্থার এবং যে কোন কালের সহিত সামঞ্জস্যশীল অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের জন্য ইসলামী আইনের অনুসরণ সহজেই সম্ভব। ইসলামের বিধানও গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সহজে অনুসরণযোগ্য করা হইয়াছে :

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল" (৭ : ১৫৮)।

মহানবী (স) বলেন :

بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً (كَافَّةً).

"আমি সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি" (বুখারী, তায়াম্মুম, বাব ১, নং ৩৩৫; সালাত, বাব ৫৬, নং ৪৩৮; নাসাঈ, গোসল ও তায়াম্মুম, বাব ২৬, নং ৪৩২; দারিমী, সালাত, বাব ১১১, নং ১৩৮৯)।

অতএব, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহার আনীত বিধানাবলীও তাহাদের সকলের অনুসরণ উপযোগী হওয়াই স্বাভাবিক।

৪. ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ : মানব জীবনের সার্বিক দিক পরিচালনার জন্য ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। ইসলামের গণ্ডিতে জীবন যাপনের জন্য দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ হইতে কিছু ধার করার প্রয়োজন নাই। আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া মানব জাতির ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে মহানবী (স)-এর যুগ তথা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক ইহাতে পূর্ণাঙ্গতা ও চিরন্তনতা দান করা হইয়াছে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম" (৫ : ৩)।

উপরিউক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা শেষ নবীর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবন ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। এই জীবন ব্যবস্থা অপর সকল প্রকারের জীবন ব্যবস্থা ও মতবাদকে বাতিল করিয়াছে।

৫. স্থায়ী : ইসলামী আইনের যে অংশ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নায় বিধৃত হইয়াছে সেইগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। স্থান-কালের পরিবর্তনে তাহাতে সংশোধনের কোন সুযোগ নাই। উদাহরণস্বরূপ মানুষ হত্যার শাস্তিস্বরূপ কুরআন মজীদে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এবং পাশাপাশি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতার সুযোগও রাখা হইয়াছে। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা না হইলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। শাসনকর্তার ইহাতে রদবদল করার কোন এখতিয়ার নাই।

৬. নমনীয়তা : ইসলামী আইনের উপরিউক্ত অংশ চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় হইলেও মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করত ইহাতে নমনীয়তার সুযোগ রাখা হইয়াছে, যাহাতে উদ্ভূত নূতন সমস্যার সমাধানে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন অচল ও স্থবির হইয়া না যায়। উদাহরণস্বরূপ কুরআন মজীদে মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে (দ্র. ২ : ১৭৩ এবং ১৬ : ১১৫)। কিন্তু নিরূপায় অবস্থার ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশের পরপরই বলা হইয়াছে :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ বিদ্রোহী বা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২ :১৭৩; আরো দ্র. ১৬ : ১১৫)।

৭. পরিবর্তনশীলতা : ইসলামী আইনের এমন একটি অধ্যায়ও আছে যাহা স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনযোগ্য। ইসলামী আইনের আদি ও মৌল উৎসদ্বয় কুরআন ও সুন্নাহ-এর পর এতদুভয়ের উপর ভিত্তিশীল আইনের অপরাপর উৎস, যেমন ইজমা', কিয়াস, মাসালিহ মুরসালা, ইসতিহ্সান, ইসতিদলাল ইত্যাদির আলোকে যেসব আইন প্রণীত হইয়া থাকে সেইগুলির কোন কোন অংশ স্থান-কাল-পরিস্থিতি ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্র জনগণের নিকট হইতে যাকাত ও উশর (কৃষিজ উৎপাদনের এক-দশমাংশ) আদায় করার পরও রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনা, জরুরী অবস্থা মোকাবিলা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক অভিযানের ব্যয়বহন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচলনার জন্য তাহাদের উপর বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ করিতে পারে এবং সরকার প্রয়োজন মনে না করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ কর মওকুফও করিতে পারে।

৯. সমঝোতার ব্যবস্থা : বিবদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পূর্বে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার ভিত্তিতে উহার মীমাংসা করার সুযোগ প্রদান ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিবদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পরও বিচারকের সহায়তায় বা মধ্যস্থতায়ও পক্ষবৃন্দ সমঝোতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে (দ্র. ২ : ১৭৮)। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا.

"তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করিলে তোমরা তাহার (স্বামীর) পরিবার হইতে একজন এবং ইহার (স্ত্রীর) পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন" (৪ : ৩৫)।

এই সমঝোতার সুযোগ বিশেষভাবে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

৮. বিশ্বাসের স্বাধীনতা : ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিধর্মী নাগরিকগণ (যিম্মী) স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম পালন করিতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে আগত বিধর্মিগণ মুসতামান। ইসলামী আইনের আওতায় তাহারা ব্যাপকভাবে তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করে।

৯. গতিশীলতা : ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গতিশীলতা, স্থান-কালের ব্যবধান ইহার গতিকে রুদ্ধ বা স্তব্ধ করিতে পারে না। সমস্যা যতই কঠিন ও সর্বাধুনিক হউক, যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হউক, সব ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের একটি স্পষ্ট বক্তব্য আছে। কুরআন ও হাদীছে উদ্ভূত বিষয়ের আইন বিধৃত না থাকিলে অবশ্যই তাহাতে আইনের একটি ব্যাপক ও স্পষ্ট মূলনীতি বিদ্যমান আছে, যাহার ভিত্তিতে মুজতাহিদ আইনজ্ঞগণ (ফকীহবৃন্দ) উদ্ভূত পরিস্থিতির সহিত সংগতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম। এখানেই আইন প্রণয়নে মানববুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ ব্যাপক।

এইভাবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির অধীনে বিশেষজ্ঞ আইনবিদগণ তাহাদের গবেষণা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে সচল, সক্রিয় ও গতিশীল রাখেন।

১০. সংগতি : ইসলামী আইনে কোন অসংগতি নাই, ইহার গোটা আইন ব্যবস্থাই স্থান-কালের উর্ধ্বে মানবজাতির জন্য সংগতিপূর্ণ। উক্ত আইন ব্যবস্থা মানব সমাজে দীর্ঘ কালের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষিত। ইতিহাসের প্রমাণ যে, মহানবী (স) ও খিলাফতে রাশেদার পরও উমায়্যা শাসন, বৃহৎ আব্বাসী, উছমানী ও মুগল শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়াছে এই আইন দ্বারা শত শত বৎসর ধরিয়া, এমনকি মুগল শাসনের পূর্বেও উপমহাদেশের সুলতানী শাসন ব্যবস্থাও পরিচালিত হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আইন দ্বারা। শুধু তাহাই নয়, ইউরোপ মহাদেশের স্পেনীয় জনগণ দীর্ঘ আট শত বৎসর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হইয়াছে। স্থান-কাল-পাত্রের এই দীর্ঘ পরীক্ষায় ইসলামী আইন সফলভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইসলামী আইনের অনুরূপ আরও বহু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি, মানব জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে ইসলামী আইন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের উপর।

গ্রন্থপঞ্জী : বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

আইন-ই আকবারী (آئين اكبرى) : ভারতীয় মুসলিম দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও মুগল সম্রাট আকবার (দ্র.)-এর নবরত্নের অন্যতম আবুল ফযল 'আল্লামী (ابو الفضل علامى) [দ্র.] রচিত রাষ্ট্রনৈতিক ও দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাকে কেহ কেহ 'আকবারনামাহ্ (দ্র.)-এর তৃতীয় খণ্ড বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু বাস্তবে ইহা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; তবে ইহাকে প্রথমোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে গণ্য করা যায়। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হইল : ১। দরবার ও হেরেমের নিয়ম-কানূন ও বর্ণনা; ২। সভাসদবর্গের পরিচয়, দায়িত্ব ইত্যাদি; ৩। ইলাহী সন, অর্থনৈতিক বিবরণ, বিভিন্ন প্রদেশ ও শাসনকর্তাদের সম্পর্কিত তথ্যাদি, ৪। ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক অবস্থান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, হিন্দুস্তানের উপর বহিরাক্রমণ, রাষ্ট্রের নানাবিধ পরিসংখ্যান, বিভিন্ন পর্যটক ও মুসলমান সূফী সাধকদের আগমন ও পরিচয়, ৫। আবুল ফযল সংকলিত আকবার-এর বাণীসমূহ।

বহু সংখ্যক সরকারী কর্মচারীর সহায়তায় দীর্ঘ ৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আবুল ফযল এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ বিভিন্ন বিচারে শুধু এশিয়াতেই নয়, এমনকি ইউরোপেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকে ইহাকে শুধু ইতিহাস গ্রন্থই নয়, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য গ্রন্থ হিসাবেও বিবেচনা করেন। আর এই কারণে তিনি ভারত তথা মুসলিম বিশ্বেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীও ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফারসীর গণ্ডি পার হইয়া বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মাসুদুল মান্নান, মুসলিম শাসনে ভারত ও বাংলাদেশ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ. ২৫৯; (২) ড. আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৭৪, পৃ. ৪৮৬, ৪৮৮; (৩) S.M. Edwards, H.L.O. Garrett, Mughal Rule in India, S. Chand & Co., Calcutta, India, pp. 218-20; (৪) Vinchent A. Smith, Akbar the Great Mughal, 1542—1605, Chand & Co, Delhi 1962, পৃ. ৩, ৪, ৩০২, ৩৩৭-৩৮; (৫) আখতার ফারুক, আকবরের নবরত্ন, পরিবেশক : বুক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ৬৫-৬৬; (৬) S. Abul Hasan Ali Nadvi, Muslims in India, Academy of Islamic Research & Publications, Lucknow, India 1980, পৃ. ৪৪-৪৫; (৭) ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ., ইসলামী বিশ্বকোষ প্রসঙ্গ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ২৯-৩০; (৮) Ibn Hasan, The Central Structure of the Mughal Empire And Its Practical working up to the year 1657, pp. 9-10.

শেখ মাহবুবুল আলম

আইভরি কোস্ট (কোত্ দ্য'ইভয়র) : দেশটি একটি প্রজাতন্ত্র এবং ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি সংঘের সদস্য। দেশটি গিনি উপসাগর উপকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্বে ঘানা, পশ্চিমে লাইবেরীয়া ও গিনি এবং উত্তরে মালি ও বুরকিনা ফাসো বা সাবেক আপার ভোল্টা। মোটামুটি আয়তাকার দেশটির আয়তন ৩,২২,৪৬৩ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা অর্ধ লক্ষের মত, অনাফ্রিকীয়সহ প্রায় এক কোটি (১৯৮৪ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার)।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপকূলভাগে প্রথম ফরাসী জনপদ গড়িয়া উঠিলেও উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৮৯৩ সালে আইভরি কোস্ট স্ব-শাসিত উপনিবেশে পরিণত হয়।

১৯০০ সালে ইহা ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার গভর্নর জেনলারেলের শাসনাধীনে আসে। ১৯৫৭ সালে আইভরি কোস্টে ফরাসী উপনিবেশ এলাকাগুলির অধীনে এক আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার জন্য আবিদজানে একটি ব্যবস্থাপক সভা ও সরকার পরিষদ গঠিত হয়। ইহার ব্যবস্থা তৎকালীন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অবশিষ্টাঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার অনুরূপ ঃ সার্কেল, মহকুমা ও কমিউন। ১৯৫৮ সালে দেশে এক গণভোটের রায় সাপেক্ষে দেশটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং উহা মালির (সেনেগাল ও ফরাসী সুদানের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্র) সহিত যোগদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং তৎকালীন আপার ভোল্টা, দাহোমী ও নাইজার রাষ্ট্রের সহিত বেনিন সাহেল মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করে। ১৯৬০ সালের ৭ আগস্ট আইভরি কোস্ট পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ডেমোক্রাটিক পার্টির হূফুয়ে বয়নি সর্বসম্মতিক্রমে দেশের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

উত্তর-পশ্চিমের মান হইতে ওদিয়েন অবধি গিনি পার্বত্যাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র আইভরি কোস্ট এক বিশাল মালভূমিবিশেষ, যে মালভূমি আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রলম্বিত এক সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী অঞ্চলে বেশ কয়েকটি লেগুন বা অশ্ব-খুরাকৃতি হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির পরে আছে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এক গভীর অরণ্য এবং সবশেষে সুদানের মত তৃণভূমি বা সাভানা অঞ্চল। দেশের দক্ষিণে গিনীয় ও অ্যাপোলোনীয় এবং উত্তরে সুদানী ও ভোল্টীয় জনগোষ্ঠীর লোকজনের অধিবাস।

আইভরি কোস্টের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর (কফি, কোকো, আনারস, কলা, কাঠ, তেল, তুলা ও রাবার)। কিছু গবাদি পশু পালন ও মৎস্য চাষও দেখা যায়। দেশটিতে আধুনিক শিল্পের তেমন প্রসার ঘটে নাই। অবশ্য খনিজ সম্পদ আহরণের কিছু উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। প্রধান শহর আবিদজান (রাজধানী ও বন্দর নগরী), বুয়াকে, গ্রান্ড বাস্সাম, ডালোয়া, ডিমবোকরো, বদ বন্দূকূ, মান ও ওদিয়েন।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খৃস্ট ধর্মের প্রভাব ব্যাপক। বর্তমানে খৃস্টান জনসংখ্যা আনুমানিক দশ লক্ষ। ক্যাথলিকগণ সংখ্যাগুরু। প্রটেস্ট্যান্ট ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও লোক আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্রান্ড বাস্সামে দেশের প্রথম ক্যাথলিক মিশন স্থাপিত হয়। পরে প্রটেস্ট্যান্ট মিশনগুলিও কাজ শুরু করে। মুসলিম জনসংখ্যা ২০ লক্ষাধিক। ইহাদের বাস প্রধানত উত্তরাঞ্চলে, বিশেষত মালিন্‌কি, দিউলা, সেনুফো ও মানদিংগা উপজাতির লোকেরা মুসলমান। তবে সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে প্রকৃতিপূজক উপজাতীয় লোকজন ও শহরাঞ্চলে আগত লোকজনের মধ্যে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে।

আইভরি কোস্টে আদি মুসলমান বসতি অবশ্যই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে। ঐ সময় দেশের উত্তরাঞ্চলে মালির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তূবা, কং, বন্দূকূ, ওদিয়েন ও সিগুয়েলা ছিল মুসলিম প্রধান জনপদ। মালিন্‌কি উপজাতির রাজশক্তির পতনের পর (১৫শ শতাব্দী) ঐসব অঞ্চলে মুসলিম প্রভাব দৃশ্যত হ্রাস পায়। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম সুদানে আল-হাজ্জ ওমর তালের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাপক হইয়া উঠিলে ঐ অঞ্চলেও মুসলিম শক্তির পুনরুত্থান ঘটে। শতাব্দীর শেষভাগে সামোরি তূরে সাময়িকভাবে হইলেও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার ও প্রচারের বদৌলতে উত্তরাঞ্চলের সেনুফো প্রকৃতিপূজক উপজাতির লোকদের একাংশকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এক্ষেত্রে কিছু বল প্রয়োগের ঘটনাও ঘটে। তবে একই সঙ্গে তাঁহার বিজয়াভিযানে বাধা দেওয়ায় তিনি বহু সংখ্যক মালিন্‌কি মুসলমানকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। সর্বোপরি, তিনি ১৮৯৭ সালে ঐ অঞ্চলে ইসলামী কৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র কং রাজ্য ধ্বংস করেন। সামোরির পরাজয়ের পর ইসলাম আবার সাময়িকভাবে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। তবে উপনিবেশ স্থাপন প্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক যুগসন্ধির সুবাদে বেশ অচিরেই আবার ইসলামের পুনরুত্থান ঘটে।

দিওউলা, মালিন্‌কি কিংবা কোনও কোনও সময় হাউসা উপজাতির লোকজন, যাহারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ বরাবর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং প্রধানত ঐ অঞ্চলে বনাঞ্চল হইতে আগত চাষীদের বাদাম জাতীয় ফসল কেনাকাটার ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের প্রভাবেই ইসলাম বিস্তার লাভ করে। প্রতি বৎসরই ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ইসলামের প্রসার ঘটিতে থাকে, এমনকি উপকূলীয় জনপদের অধিবাসীরাও ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে। ঐতিহ্যগত ইসলামী কেন্দ্রগুলি ছাড়াও আধুনিক কালে মান, বুয়াকে, গাগনোয়া, বউনা, ডালোয়া, সামাতেগুয়েলা, বউন্দিয়ালা ও আবিদজানেও গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

একমাত্র মান ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানগণ প্রধানত তিজানিয়্যা তরীকার অনুসারী। তিজানিয়্যা তরীকার অনুসারিগণ আবার কম-বেশী সমান ১২টি ও ১১টি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। ১২ উপগোষ্ঠীর মুসলিমদের নেতা হইতেছেন আল-হাজ্জ ওমর; আর ১১ উপগোষ্ঠী বা হাম্বালী মুসলিমগণ শায়খ হামা আল্লাহ-এর অনুসারী। হাম্বালী মতবাদ আবার ইয়া'কূবীয় নামে এক নূতন তরীকার জন্ম দিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকূবা সিলিয়া। তাঁহার মতবাদ বা শিক্ষা অনেকটা সেনেগালের আহমাদোন বামবার মূরীয়গণের শিক্ষার (শায়খের পক্ষে তালিব রচিত, অর্থনৈতিক কাজকর্মের গুরুত্ব) অনুরূপ।

আইভরি কোস্টের সকল অঞ্চলেই কাদিরিয়া তরীকার লোকজন দেখা যায়। তবে তাহাদের প্রাধান্য কেবল মান-এ লক্ষ্য করা যায়। এই তরীকা ওয়াহ্হাবীদের জন্য অনুকূল বিবেচিত। ১৯৪৬ সালের পর হইতে মক্কায় গমনকারী ধনী হজ্জযাত্রী এবং মিসর ও আরবে শিক্ষিত কারোমোকো পণ্ডিতদের কল্যাণে ওয়াহ্হাবী মতবাদের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ওয়াহ্হাবী মতবাদের প্রধান কেন্দ্র বুয়াকে।

কোথাও কোথাও কিছু মাহদীপন্থী মুসলমান আইভরি কোস্টে আছেন। তাহারাও ওয়াহ্হাবী মতবাদে প্রভাবিত। উপকূলীয় এলাকাগুলিতে খৃস্টান, মুসলিম ও সর্বপ্রাণবাদী প্রভাবে প্রভাবিত কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী অধিবাসীও আছে।

তরুণ ওয়াহ্হাবী ও হাম্বালীদের সাম্প্রতিক কালের প্রয়াস সত্ত্বেও সামোরি তূরের নির্বিচার নরহত্যা সংঘটিত হওয়ার আগে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি যে পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল সেই পর্যায়ে ফিরাইয়া আনা আর এ যাবৎ সম্ভব হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Marty, Etudes sur l'Islam en Cote d'ivoire, Paris 1922; (২) Gouilly, L'Islam dans

l'AOF, Paris 1952; (৩) Le Grip, Aspects actuels de l'Islam en AOF, in L'Afrique et l'Asie, Paris 1953 and 1954; (৪) Cardaire, L'Islam et le terrior africain, Koulouba (Soudan) 1954; (৫) Trimingham, Islam in West Africa, Oxford 1958; (৬) Africa Review, 1986, World of Information, England; (৭) Worldmark Encyclopaedia of the nations, Africa, New York.

P. Alexander (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

আইস্‌সাওউআ (দ্র. ঈসাওয়া)

'আইয ইব্‌ন 'আম্‌র (عائذ بن عمرو) ঃ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল্‌-মুযানী (রা), একজন সাহাবী। তাঁহার উপনাম (কুন্‌য়া) আবূ হুরায়রা এবং তাঁহার ভ্রাতার নাম রাফি'। তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বস্‌রাতে বসবাস করিতেন। সেইখানে তিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার শাসনামলে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। কূফার তদানীন্তন গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ পদাধিকারবলে যেন তাঁহার জানাযার সালাতে ইমামতি করিতে না পারে সেইজন্য তিনি ওসিয়াত করিয়াছিলেন, আবূ বারযা আল-আস্‌লামী (রা) যেন তাঁহার জানাযার সালাতে ইমামত করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে তিনি বায়'আতুর্‌-রিদ্‌ওয়ান (দ্র.)-এ শরীক ছিলেন। হাসান, মুআবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা, আমিরুল আহ্‌ওয়াল, আবূ হাম্‌যা আদ-দাবাঈ প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, ৩খ., ৯৮; (২) ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, আল্‌-ইসাবা, ১খ., ২৬২, নং ৪৪৪৮; (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল-খাতীব, আল-ইক্‌মাল ফী আস্‌মাইর রিজাল, করাচী, তা. বি., পৃ. ৫৩৫।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

'আইয ইব্‌ন মা'ইস (عائذ بن ماعص) ঃ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জালাদা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক আল-আনসারী আয্‌-যুরাকী (রা), একজন সাহাবী। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মু'আয উভয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়ামামা যুদ্ধে (দ্র.) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মতান্তরে তিনি বি'র মাঊনার যুদ্ধে শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ও সুওয়ায়বিত ইব্‌ন হারমালাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, ৩খ., ৯৯; (২) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ২৬৩, নং ৪৪৫১।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

'আইয ইব্‌ন সা'ঈদ (عائذ بن سعيد) ঃ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুন্‌দুব ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল হারিছ আল-জাস্‌রী (রা), একজন সাহাবী। তাঁহার নামের সঙ্গে আল্লাহ শব্দ যোগ করিয়া তাঁহাকে আইযুল্লাহ নামে ডাকা হইত। তিনি তাঁহার গোত্রের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন এবং জামাল ও সিফ্‌ফীন-এর যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হন (৩৭ হি.)। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে বনূ মুহারিবে ঝাণ্ডা তাঁহার হাতে ছিল। ইতোপূর্বে তিনি কাদিসিয়া ও জালূলার যুদ্ধেও শরীক হইয়াছিলেন।

তাঁহার স্ত্রী উম্মুল বানীন হইতে বর্ণিত আছে, 'আইয প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার চেহারায় হাত বুলাইয়া দিতে ও তাঁহার জন্য দু'আ করিতে বলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই আবেদন রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার চেহারায় একটি বিশেষ দীপ্তি পরিলক্ষিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, ৩খ., ৯৭; (২) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ., ২৬২, নং ৪৪৪৪।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

'আইযুল্লাহ্‌ (عائذ الله) ঃ ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র (রা), একজন সাহাবী। তাঁহাকে ইয়াযুল্লাহ নামেও ডাকা হইত। নবম হিজরীতে হুনায়ন যুদ্ধের দিন তাঁহার জন্ম। তিনি বিদ্বান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে সিরিয়ায় আবুদ-দার্‌দা (রা)-এর পরেই তাঁহার স্থান ছিল। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, আবুদ্‌-দারদা, উবাদা ইব্‌নুস সামিত, বিলাল, আবূ যার্‌র, আওন ইব্‌ন মালিক, হুযায়ফা, ছাওবান, মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। যুহ্‌রী, রাবীআ ইব্‌নই য়াযীদ, বিশ্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌, আবূ হাযিম ইব্‌ন দীনার, মাকহূল প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ৮০ হি. সনে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছী'র, উস্‌দুল গ'াবা, তেহ্‌রান, ৩খ., ৯৯; (২) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ., নং ৬১৫৭।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

আইয়ূব আলী (ايوب على) ঃ ডক্টর, এ.কে.এম., পূর্ণ নাম আবুল খায়র মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী। আদর্শ শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত, নীরব সাধক। ১ এপ্রিল, ১৯১৯ খৃ. পিরোজপুর জিলার অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া থানাধীন তেলিখালি গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা মৌলভী 'আবদুল ওয়াহেদ ছিলেন একজন দানশীল, পরহেযগার ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় ঐ এলাকায় একটি খাঁটি ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি তাঁহার তিন ছেলেকেই মাদরাসায় লেখাপড়া শিখান। বড় ছেলে মুহাম্মদ 'আলী কামিল পাস করিয়া কিছুদিন শর্ষিনা দারুস সুন্নাত আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ফাযিল মাদ্‌রাসায় আমৃত্যু অধ্যাপনা করেন। ডঃ আইয়ূব আলী মেজো ছেলে। ছোট ছেলে ইউনুস আলী তেলিখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং নিজ বাড়ীর মাদ্‌রাসার অধ্যাপক।

ড. আইয়ূব আলী ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা হইতে প্রথম বিভাগে ১৯৩৩ সালে 'আলিম, ১৯৩৬

সালে ফাযিল ও ১৯৩৮ সালে কামিল পাস করেন। ১৯৪৩ খৃ. ঢাকা বোর্ড হইতে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করেন। ১৯৪৩ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে বি. এ. অনার্স পাস করেন। এ পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি অনুষদের অনার্স পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনার্স ও সাবসিডিয়ারী বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কারণে "রাজা কালী নারায়ণ স্কলারশীপ" (K.N.S.) লাভ করেন। তিনি নীলকান্ত সরকার (N.K.S) স্বর্ণপদকও লাভ করেন। ১৯৪৪ খৃ. এম. এ. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাস করায় তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫৯ খৃ. তিনি প্রাইভেট পরীক্ষায় ফার্সী বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৫১ খৃ. তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থে মিসর যান। সেখানে তিনি প্রথমে জামি আল-আযহারে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৫৩ খৃ. Theology and Islamic Philosophy -তে 'আলিমিয়্যা ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর তিনি ১৯৫৫ খৃ. কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "Origin and development of Islamic Theology with special reference to Imam Abu Mansur al-Maturidi" শীর্ষক বিষয়ে আরবীতে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করিয়া পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত থাকাকালে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

এম.এ. পাস করার অব্যবহিত পরই তিনি ঢাকা কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। এখানে তিনি ২৪ আগস্ট হইতে ১০ অক্টোবর, ১৯৪৪ খৃ. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৫ সনের ২৫ জানুয়ারী হইতে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি হুগলীতে রেভিনিয়্যু অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁহার পিতার নির্দেশে উক্ত চাকরিতে ইস্তফা দিয়া তিনি ঢাকা চলিয়া আসেন এবং ৫ ডিসেম্বর ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) আরবীর শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এখান হইতে ১৯৫১ সনের ১৭ নভেম্বর উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া ৪ বৎসরের শিক্ষা ছুটিতে কায়রো যান এবং ১৯৫৫ সনের ৩০ মে দেশে ফিরিয়া আসিয়া উক্ত কলেজে যোগদান করেন। তিনি ২০ জুন, ১৯৫৫ হইতে ৪ জুলাই, ১৯৫৮ পর্যন্ত East Pakistan Junior Education Service [E.P.J.E.S.]-এ প্রভাষক হিসাবে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কর্মরত ছিলেন। ৫ জুলাই, ১৯৫৮ হইতে ৩ আগস্ট, ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি East Pakistan Education Service (E.P.E.S.)-এ রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। ৪ আগস্ট, ১৯৬৯ হইতে ২৬ অক্টোবর, ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি East Pakistan Senior Education Sevice (E.P.S. E.S)-এ বি. এল. কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা-এর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ২৭ অক্টোবর, ১৯৭০ হইতে ২২ জুলাই, ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি B.S.E.S.-এ সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। ২৩ জুলাই, ১৯৭৩ হইতে ৩১ মার্চ, ১৯৭৯ পর্যন্ত তিনি সরকারী মাদ্রাসা-ই আলীয়া, ঢাকা-এর অধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার ছিলেন। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর বিভিন্ন পদে সরকারী চাকুরী করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি অবসর জীবনও শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন তিনি ছিলেন বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য। আমৃত্যু তিনি এই প্রকল্পে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'আল-কুরআনুল কারীম" প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি "আল-কুরআনের সরল তরজমা" প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদেরও একজন সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বৃহত্তর তাফসীর প্রকল্প, Islam in Bangladesh Through Ages প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য ও যাকাত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক কমিটিতে তিনি সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যবান অবদান রাখেন। তিনি কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন, মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটি ইত্যাদিতেও সদস্য ছিলেন।

তিনি ছিলেন ইংরাজী, উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন অনতিক্রম্য বাগ্মী ও লেখক। বক্তৃতা ও লেখায় তাঁহার ছিল সমান দক্ষতা। রেডিও-টেলিভিশনের তিনি ছিলেন বিশেষ আলোচক। তিনি বিভিন্ন ভাষায় অনেক অমূল্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইংরাজী রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ঃ

1. Maturidism' Imam Abu Mansur al-Maturidi and his Scholastic Philosophy.

2. Tahawism' Imam Abu Jafar al-Tahawi and his Scholastic Philosophy.

পাকিস্তান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস ১৯৬৩ সনে এই দুইটি প্রবন্ধ "A History of Muslim Philosophy", Vol. I., Book III, Chapter XII and XIII-এ প্রকাশ করিয়াছে।

3. History of Traditional Islamic Education in Bangladesh ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশ করিয়াছে।

4. Contribution of Islam to the Advancement of Knowledge and Development of Educational Institutions. ইসলামাবাদ, পাকিস্তান হইতে ১৯৮১ খৃ. প্রকাশিত।

তাঁহার আরবী রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ঃ

১। আকীদাতু'ল-ইসলাম ওয়া'ল-ইমাম আল-মাতুরীদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খৃ.।

২। মাকানাত বায়তি'ল-মাক·দিস ফি'ল-ইসলাম, বাগদাদ হইতে ১৯৭৬ খৃ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-মাজাল্লা আল-'আরাবীয়্যাতে ১৯৯৩ খৃ. প্রকাশিত।

তাঁহার বাংলা রচনাবলীর মধ্যে "কাশ্‌ফুল হক", আলী প্রকাশনী ১৯৬৩ খৃ. প্রকাশ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ২৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ খৃ.তাঁহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদকে ভূষিত করেন।

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। যেমন ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জর্ডান, সৌদি আরব, লেবানন, মরক্কো, সিরিয়া, সিঙ্গাপুর, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ইত্যাদি। তিনি ১৯৭৫ খৃ. ১০-২৫ ফেব্রুয়ারী বাগদাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 'উলামা' সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন; ১০-১৯ মার্চ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সীরাত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন; ১১-২৪ নভেম্বর তাশকন্দে অনুষ্ঠিত "মধ্যএশিয়া ও কাযাকিস্তান মুসলিম এসোসিয়েশন"-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৬ খৃ. ১১-২৪ নভেম্বর মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭৮ খৃ. ৪-৯ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ায়, ৯-১৬ ডিসেম্বর মালয়েশিয়ায় এবং ১৬-১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে শিক্ষা সফর করেন। ১৯৮১ খৃ. ৭-১০ মার্চ ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুসলিম স্কলারস কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১২-২৪ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খৃ. ১৪-১৭ এপ্রিল বাগদাদে অনুষ্ঠিত পপুলার ইসলামিক কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ খৃ. ১৬-১৮ জানুয়ারী মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ ইসলামিক সামিট কনফারেন্সে যোগদান করেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করিয়া তিনি মূল্যবান বক্তব্য ও প্রবন্ধ পেশ করেন।

ডঃ এ.কে.এম. আইয়ুব আলী ৭৬ বৎসরের এক সফল জীবন যাপন করিয়া ১৪১৬/১৯৯৫ সালের ১৮ নভেম্বর ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে ঢাকার বনানী গোরস্তানে দাফন করা হয়। তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

তিনি ছিলেন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন একজন রুচিশীল মানুষ। তাঁহার বলনে-চলনে, আহারে-বিহারে ছিল স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, অল্পে তুষ্ট, নির্লোভ, নিরহংকারী, আত্মপ্রচারবিমুখ, সদা আল্লাহ্ অভিমুখী। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা ছিল তাঁহার জীবনের নিয়ামক। পদমর্যাদা, লোভ কিংবা ভয়ভীতি কখনও তাঁহাকে নীতিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার চাকুরী জীবনে কখনও কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন তাহারা তাঁহাকে একজন সহৃদয় অভিভাবক হিসাবে মনে করিতেন।

ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

'আইলা (عائلة) ঃ পরিবার। শব্দটির মূল আরবী عول বা عيل। এই শব্দটি কুরআন শরীফে শুধু (৯ ঃ ২৮) পাঠান্তরক্রমে বা রূপান্তরিত আকারে عيلة (দারিদ্র্য অর্থে) উল্লিখিত। কিন্তু আল-ক'মূসুল মুহীত' (২য় সং, ৪খ., ২৪)-এর পাদটীকা এবং ইমাম গাযালী কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীছ শব্দটির 'পরিবার' অর্থ সমর্থন করে। আধুনিক নব-ক্লাসিক ভাষায় ইহার অবাধ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় সম্ভবত উছমানী তুর্কীদের দিওয়ানী বিধান (মাজাল্লা) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই। উদাহরণস্বরূপ হুকূক-ই 'আইলা-ই কারার নামিসি, উছমানী পরিবার বিধি (J.O. Ottoman, ১৪ মুহাররাম, ১৩৩৬) লক্ষণীয়। অবশ্য আজকাল মার্জিত ভাষায় উস্‌রা শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়।

সমাজভিত্তিক সূত্রসমূহ ঃ আরব বংশতত্ত্ব বিশারদগণের সম্মিলিত গ্রন্থসমূহ নিঃসন্দেহে এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, 'গোত্র' পরিবারেরই বর্ধিত আকার। Robertson Smith এই অতি সহজীকৃত ধারণাটির যথোচিত মূল্য উপলব্ধি করেন, আপাতদৃষ্টিতে যাহার ভিত্তি সাধারণ জ্ঞানের উপর। অতি সাম্প্রতিক কালে Bichr Fares (L, Honneur chez les Arabes, Paris 1932, 49-50) স্বীকার করিয়াছেন, "প্রাচীন আরবদের সামাজিক সংগঠন (morphology) অধ্যয়ন করা প্রায় অসম্ভব।" যাযাবরগণ তাহাদের সামাজিক সংগঠনের যে চিত্র দেয় তাহার সহিত এই চিত্রের সাযুজ্য রহিয়াছে। বাস্তবানুগ সামী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজা ও মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার অস্তিত্ব, সমাজ বিজ্ঞানী Renan-এর নিকট বিতর্কিত বিষয় হইলেও A. Lods বাইবেলীয় পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে এবং I. Goldziher আরব বিশ্ব সম্পর্কে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির প্রতি ভক্তি পরিবারের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কারণ অনুরূপ সংস্কারের পুরোহিত সেবায়েতগণ স্বভাবত পরিবারভুক্ত সদস্যবৃন্দ হইতে মনোনীত হয়। উপরন্তু এই কারণেও, উহার স্থায়িত্বের জন্য বংশধরদের অস্তিত্ব অপরিহার্য, এমনকি ইহা অসম্ভব নয় যে, পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে এই মতবাদের কিছুটা ভূমিকা রহিয়াছে, বিশেষত পরিবারকে সামাজিক অনুষ্ঠানসমৃদ্ধ একটি ধর্মীয় একক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইসলাম প্রথম হইতেই পূজার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মৃতের তুষ্টিকরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্ভুল নিদর্শন আজকাল পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যমান। পুত্র সন্তানের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উক্ত মতবাদের একটি চূড়ান্ত স্মারক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অপরপক্ষে পীরপূজা, মাযার ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে পূর্বপুরুষ পূজার সহিত অভিন্ন মনে করা হইলে মতানৈক্যের উদ্রেক হইতে পারে।

সামী মানবগোষ্ঠীর সামাজিক বুনিয়াদের ভিত্তিগত একক হইল গোত্র (হিব্রু মিশপাহা, আরবী হ'ায়্যি দ্র.)। মাতৃগত গোত্রসমূহের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সংক্রান্ত টোটেমীয় সূত্র Robertson Smith (Kinship and Marriage in early Arabia, Cambridge 1885) অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। Noldeke (ZDMG, 1886, 148-87) উক্ত পুস্তকের পর্যালোচনা করিতে গিয়া জীব-জন্তুর নামানুসারে গোত্রসমূহের নামকরণের উপর আরোপিত গুরুত্বকে অস্বীকার করেন। সমালোচকের ভাষায়, "লেখকের রচনায় যতদূর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তুলনামূলকভাবে উহা তদপেক্ষা বিরল।" কিন্তু ভাষাগত প্রমাণাদি ব্যতীতও (যাহার ভিত্তি সেই সকল শব্দের উপর যেইগুলি দ্বারা স্বগোষ্ঠীজাত নাম

প্রকাশ করিবার কালে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অথবা যাহার ভিত্তি দুইটি সমান্তরাল সম্পর্ক তথা পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আত্মীয়তার উপর) এই পর্যন্ত যেই সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে উহা হইতে কোন শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মাতৃশাসিত সমাজের বৈবাহিক প্রথাসমূহ এই উপদ্বীপে অপেক্ষাকৃতভাবে বহুদিন বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পিতৃসূত্রে অজাচার (incest) সম্পর্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার অভাবজনিত কারণকে R. Smith (ঐ, পৃ. ১৬৩) যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাইলেও Wellhausen (Die Ehe bei den Arabern, Nachr. Von d. konigl. Ges. d. Wiss. u.d. Georg-August Univ. zu Gottingen 1893, 431-82)-এর মতে, ইহা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণ করা হয় নাই, এমনকি কেহ সুদূর অতীতে টোটেমীয় সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকাল হইতেই পিতৃপ্রধান শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তৎপূর্বকালীন অভ্যাস-আচরণের যে উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ পরবর্তী কালে টিকিয়া আছে তাহা জটিল সমস্যার অবতারণা করে। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই বর্তমানে পারিবারিক শাসন পিতৃপ্রধান।

ইসলামে পরিবার ঃ যে সামাজিক পরিবেশে ইসলাম আবির্ভূত হয় উহার রীতিনীতি ইসলাম সৃষ্টি করে নাই। কাজেই প্রথমেই ঐ সকল রীতিনীতির নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য ইসলাম প্রচেষ্টা চালায়। মদীনায় তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে হয় এবং মামলার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আইনের মর্যাদাসহ ক্রমে ক্রমে নিয়ম-কানূন প্রবর্তন করিতে হয়। G. H. Stern-এর (Marriage in Early Islam, London 1939) গ্রন্থে দেখা যায়, পৌত্তলিক আরবদের উচ্ছৃংখল রীতিনীতির তিনি আমূল সংস্কার সাধন করেন। আদিম ব্যবস্থায় পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ, তবে বড় বড় শহরের বাশিন্দাদের মধ্যে ইহা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই পিতৃপ্রধান কর্তৃত্বই বিবাহ বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ প্রভৃতি আইনের মূল সূত্র। পর্দা প্রথা (হিজাব), যাহার প্রচলন সুদূর প্রাচীন কালেও ছিল, পারিবারিক আইন-কানূনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক নহে, যদিও ইহা তাহাদের পিতৃপ্রধান পরিবারের বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত গ্রন্থগুলির সহিত সেমিটিক পূরাতত্ত্বের উপর লিখিত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্র. ঃ (১) Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, London 1889 (re-ed. S.A. Cook, 1927); (২) Ignaz Goldziher, Le Gulte des ancetres et le culte des morts chez les Arabes, in RHR, 1884, 332-59; (৩) A. Lods, La croyance a La, vie future.... and especially le Culte des morts dans l'antiquite hebraique, Paris 1906; আধুনিক কালের জন্য দ্র. (৪) H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago 1947 (ফরাসী অনু. Paris 1949); (৫) R. Paret, Zur Frauenfrage in der arabische islamischen Welt, Stuttgart 1934; (৬) Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, London 1895; (৭) Kazem Deghestani, Etude sociologique sur la famille musulmane contemporaine en Syrie, Paris তা. বি.; পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (৮) J. Lecerf, Note sur la famille dans le monde arabe et Islamique, Arabica 1956/1.

J. Lecerf (E.I.[2]) শাব্বীর আহমদ

'আইশা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (عائشة بنت ابى بكر) ঃ উম্মুল মু'মিনীন (রা), নাম 'আইশা, উপাধি সিদ্দীকা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তিনি নবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ শাওওয়াল হি. পূ. ৯ সাল/জুলাই ৬১৪ খৃ. মক্কা মুকাররামায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভাগিনেয় 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র-এর নাম অবলম্বনে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার উপনাম রাখিয়াছিলেন উম্মু 'আবদুল্লাহ, যাঁহাকে হযরত 'আইশা (রা) পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আইশা (রা)-এর পিতা ছিলেন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) ও মাতা উম্মু রূমান (রা)। পিতার দিক হইতে তাঁহার বংশধারা সপ্তম পুরুষে এবং মাতার দিক হইতে ১১শ পুরুষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের সহিত মিলিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রচেষ্টা চালান প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত 'উছমান ইব্‌ন মায'উন (রা)-এর স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা)। হযরত খাদীজা (রা)-এর ন্যায় একজন সঙ্গিনী ও সমব্যথী স্ত্রীর ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই বিষণ্ন ও বিমর্ষ থাকিতেন। এই অবস্থা দেখিয়া সাহাবীগণ চিন্তিত হন। তাই কিছুদিন পর হযরত খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরয করিলেন, আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করুন এবং সাওদা বিন্‌ত যাম্'আ (রা) ও 'আইশা বিন্‌ত আবী বাক্‌রের নাম পেশ করেন। সাওদা (রা) হাবশার মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী সাকরান ইব্‌ন 'আমর (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই প্রস্তাবের সহিত মতৈক্য পোষণ করিলেন। ইহার পূর্বে জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম ইব্‌ন 'আদিয়্যি-এর সহিত 'আইশা (রা)-র বিবাহের কথাবার্তা হইতেছিল। জুবায়র-এর পরিবার তখনও মুসলমান হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রস্তাব পাওয়ার পর আবূ বাক্‌র (রা) তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া সমীচীন মনে করিলেন। মুত'ইম-এর স্ত্রী এই কথা ভাবিয়া, এই মেয়ে ঘরে আসিলে ইসলাম তাহার ঘরে অনুপ্রবেশ করিবে, নিজেই উক্ত সম্বন্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। সুতরাং উক্ত সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত 'আইশা (রা)-এর বিবাহ হয় নবূওয়াতের ১০ম বৎসরে, মোহর নির্ধারিত হয় পাঁচ শত দিরহাম। হযরত 'আইশা (রা)-র স্বামীগৃহে গমন অনুষ্ঠান হিজরতের কয়েক মাস পর অর্থাৎ শাওওয়াল ১/এপ্রিল ৬২৩ সালে মদীনা মুনাওওয়ারায় অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তখন 'আইশা (রা)-র বয়স ছিল নয় বৎসর (ভিন্ন মতের জন্য দ্র. আল-'আককাদ, আস-সিদ্দীক বিন্‌তুস-সিদ্দীক, রায্‌যাক আল-খায়রী, মুসলমানু কে মায়ে)। এই বিবাহ দ্বারা আরবদের কয়েকটি অমূলক ধারণা সংশোধিত হইয়া যায়, যথা: তাহারা মুখডাকা ভাইয়ের

কন্যাকে বিবাহ করা ভাল মনে করিত না। রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ বাক্র (রা)-কে أنت اخى فى الاسلام (তুমি আমার ইসলামী ভাই) বলিয়া এই ধারণার অবসান ঘটান। এমনিভাবে আরববাসী শাওওয়াল মাসে বিবাহ করাকে অশুভ মনে করিত। কারণ প্রাচীন যুগে শাওওয়াল মাসে প্লেগ মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 'আইশা (রা)-এর বিবাহ এবং স্বামীগৃহে গমন উভয়ই এই মাসে হইয়াছিল। এমনিভাবে এই ধরনের ধারণা বাতিল হইয়া যায়। মদীনা মুনাওওয়ারায় স্বামীগৃহে যাওয়ার পর 'আইশা (রা) মসজিদে নববীর পার্শ্বে নির্মিত একটি হুজরায় অবস্থান করেন। 'আইশা (রা) আজীবন এই হুজরাতেই বসবাস করেন। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর পরিবার সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। তাই 'আইশা (রা) মুসলিম পিতা-মাতার ক্রোড়েই চোখ খোলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বাধিক প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন, গায়ের রং ছিল লাল ও সাদা মিশ্রিত, তাই তাঁহার এক উপাধি ছিল হুমায়রা' (লাল বর্ণধারিণী)। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গভীর ভালবাসা লাভ করিয়াছেন, তাহা শুধু এইজন্য নয় যে, তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন, নারী সৌন্দর্যও রূপের মধ্যে লুক্কায়িত। প্রকৃত বিষয় হইল, 'আইশা (রা) বাল্যকাল হইতেই অশেষ মেধাবী, বুদ্ধিমতী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। ধর্মীয় মাসআলা-মাসাইল-এর জ্ঞান ও হুকুম- আহ্কামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানে তিনি অন্য পত্নীদের তুলনায় বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারিণী ছিলেন। তিনি দীনের খেদমত ও শরী'আতের আহ্কাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। এই সকল কারণেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খুবই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। হাদীছ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, কুরআন কারীমের তাফসীর, 'ইলমে হাদীছ, ফিক্হ, 'আকা'ইদ, দীনের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, ফাতাওয়া ও ইরশাদ, বিশেষত মহিলা সম্পর্কিত মাসআলা- মাসাইলের উপর 'আইশা (রা)-এর ছিল গভীর জ্ঞান। ফলে তিনি একজন খ্যাতনাম্নী বিদুষী সাহাবীর মর্যাদায় উন্নীত ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام [মুসলিম, বাব ফী ফাদলি 'আইশাঃ; 'আইশা (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব গোটা নারী জগতের উপর এইরূপ যেমন ছ'রীদ নামক খাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্যের উপর। আল-বুখারী, কিতাব ফাদাইলি আসহাবি'ন-নাবী (স), বাব, ৩০]।

হযরত 'আইশা (রা)-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল, তাঁহার উপর সর্বৈব মিথ্যা অপবিত্র অপবাদ রটনা যাহার উল্লেখ কুরআন কারীমে 'আল-ইফ্ক' শব্দ দ্বারা করা হইয়াছে (৪৪ ঃ ১১)। বর্ণিত আছে, এই ঘটনা ৫/৬২৭ সালে বানু'ল-মুসতালিক যুদ্ধে সংঘটিত হয়। এই সফরে 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। মদীনা হইতে কয়েক মনযিল পূর্বে 'আইশা (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ছাউনি হইতে কিছু দূরে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি জানিতে পারিলেন, যে হারটি তিনি স্বীয় সহোদরা আসমা' বিন্ত আবী বাক্র (রা)-এর নিকট হইতে ধারস্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন উহা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। তাই উহা তালাশ করিতে তাঁহার কিছু সময় লাগিয়া গেল। ইতোমধ্যে কাফেলার রওয়ানার নির্দেশ পাইয়া 'আইশার শিবিকা উটের পিঠে উঠান হয়। তাঁহার শরীর এত হাল্কা-পাতলা ছিল যে, তাঁহার শিবিকা উঠাইয়া উটের উপর যাঁহারা রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহও হয় নাই যে, উহা খালি। তাই তাঁহার অনুপস্থিতির কথা কেহ জানিতে পারিলেন না। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন কাফেলাকে না পাইয়া ঘাবড়াইয়া গেলেন; কিন্তু এই ধারণা করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া সেখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন যে, লোকজন যখন তাঁহাকে শিবিকায় পাইবে না তখন তাহারাই তাঁহাকে লইতে আসিবে। সাফওয়ান ইবনু'ল মু'আততাল (রা) নামক এক সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ (স) এই দায়িত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেন যে, সেনাদলের পিছনে পড়িয়া থাকা জিনিসপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য। তিনি সেনাবাহিনীর পশ্চাতে থাকিবেন। 'আইশা (রা) সকাল পর্যন্ত সেখানেই শুইয়া রহিলেন। প্রত্যূষে সাফওয়ান (রা) জাগ্রত হইতেই দূরে ময়দানের মধ্যে একটি কালো জিনিস পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। নিকটে আসিতেই তিনি চিনিতে পারিলেন, উম্মুল মুমিনীন 'আইশা বিনত আবী বাক্র (রা)। তিনি জোরে انا لله وانا اليه راجعون বলিয়া উঠিলেন। 'আ'ইশা (রা) আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সাফওয়ান স্বীয় উটটি 'আইশা (রা)-এর নিকটে আনিয়া বসাইয়া দিলেন এবং তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন। সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরিয়া রওয়ানা হইলেন এবং দুপুর নাগাদ কাফেলার সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। এই ঘটনা মুনাফিক সর্দার 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বর্ণনা করিতে থাকে, আর কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ সাহাবীও ইহাতে জড়াইয়া পড়েন, যাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মিসতাহ ইব্ন উছাছা ও কবি হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)। 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর হিংসা-বিদ্বেষ এবং ইসলাম ও নবী আকরাম (স)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা পূর্বেই নিশ্চিতরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই ফিতনা ছড়ানো দ্বারা মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূল আকরাম (স) ও আবূ বাক্র (রা)-এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে কুধারণা জন্মাইয়া দেওয়া এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া মদীনাবাসীকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া রাখা। 'আইশা (রা)-এর উপর অপবাদ দেওয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য শুধু একজন পাক-পবিত্র ও সতী-সাধ্বী মহিলার দুর্নাম করা ছিল না, বরং আসল উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (স) এবং ইসলামের ক্ষতি সাধন করা। এই অপবাদ অবান্তর, বেহুদা, অবিবেচনা প্রসূত এবং সর্বৈব মিথ্যা ছিল, কোন সম্ভ্রান্ত লোক ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। 'আইশা (রা)-এর নির্দোষিতা ছিল দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট। এই ব্যাপারে কয়েক দিন পর যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) ও সমগ্র মুসলিম জাতি উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন কুরআন কারীমের সূরা আন- নূর নামে একটি দীর্ঘ সূরা নাযিল হয়, যাহাতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা 'আইশা (রা)-এর পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং মুনাাফিক ও ইসলামের শত্রুদেরকে জনসাধারণের নিকট অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। কুরআন কারীমে এই সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে سبحانك هذا بهتان عظيم "আল্লাহ তো পবিত্র, ইহা একটি বড় ধরনের অপবাদ" (১৬ ঃ ২৪) বাক্য দ্বারা স্মরণ করা হইয়াছে।

হযরত 'আইশা (রা)-এর দাম্পত্য জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (যাহাতে অন্য পত্নিগণও শামিল ছিলেন) হইল "ঈলা ও এখতিয়ার

প্রদান"-এর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনযাত্রা ছিল যুহদ (দুনিয়া ত্যাগ) ও কানা'আত (অল্পে তুষ্টি)-এর সর্বোচ্চ নমুনা। সাজসজ্জা ও শান-শওকতের সামান্যতম চিহ্নও তাঁহার গৃহে ছিল না। নবী-পত্নি (রা)-গণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভের বদৌলতে সকল বস্তুবাদী বিলাস সামগ্রীর উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মানবিক চাহিদা অনুযায়ী কখনও কখনও তাঁহাদেরও মনের কোণে উঁকি দিত যে, দুনিয়ার কিছুটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করাতে কোন দোষ নাই। বিশেষত বিজয়ের পরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে যখন সচ্ছলতা ও সুখের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল তখন নবী-পত্নিগণের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরও কিছু খোরপোষ বাড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হইল। ইহা দাবি আকারে উপস্থাপিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) এক মাস কাল একাকী জীবন যাপন করার সংকল্প করেন এবং পত্নিগণের কক্ষে গমন হইতে নিবৃত্ত থাকেন। এক মাস অতিক্রান্ত হইবার পর এখতিয়ার প্রদানের আয়াত (৩৩ ঃ ২৮, ২৯) নাযিল হয়। উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্নীদেরকে দুনিয়ার ভোগবিলাস অথবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য ও আখিরাতের যিন্দেগী- এই দুইটির মধ্য হইতে যে কোনও একটি বাছিয়া লওয়ার এখতিয়ার প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম 'আইশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুম অবগত করান। 'আইশা (রা) বলিলেন, "আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে গ্রহণ করিলাম।" পরে অন্য সকল পত্নীই এই একই উত্তর প্রদান করেন।

হাদীছের গ্রন্থসমূহে হযরত 'আইশা (রা)-এর ফাদাইল ও মানাকিব (শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য) সম্পর্কিত বহু রিওয়ায়াত রহিয়াছে। উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে গভীরভাবে ভালবাসিতেন এবং তিনিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য মন-প্রাণ উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল মুসলিম পরিবারের যে কোন একজন মহিলার জন্য আদর্শস্বরূপ, যিনি স্বীয় গৃহের সব কিছুই দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করিতেন এবং নিজের জীবনকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তবে রূপায়িত করিতে সর্বক্ষণ নিয়োজিত ছিলেন। 'আইশা (রা) সতীনদের সন্তান-সন্ততির সহিতও অত্যন্ত উত্তম ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। মানবিক চাহিদামতে কয়েকটি সাধারণ ও আকস্মিক ঘটনা ছাড়া এই পূত-পবিত্র সত্তার আন্তরিক দুঃখ-ক্লেশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহারা সকলেই ছিলেন সদিচ্ছা ও পবিত্র অন্তরের আকর এবং তাঁহারা একে অন্যকে খুবই সম্মান করিতেন। মোটকথা ধারণা করা হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্নীদের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একটির নেতৃত্বে ছিলেন 'আইশা (রা) ও হাফসা বিন্‌ত 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন উম্মু সালামা (রা) ও যায়নাব (রা)। তবে এই উভয় দলের পারস্পরিক ঈর্ষার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। কোন জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকালের পূর্বে মাত্র তের দিন অসুস্থ ছিলেন, যাহার শেষ দশ দিন তিনি 'আইশা (রা)-এর কক্ষে অতিবাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যান্য পত্নী সন্তুষ্ট চিত্তে 'আইশা (রা)-এর কক্ষে তাঁহাকে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। 'আ'ইশা (রা) অসুস্থতার সময়ে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সেই কক্ষেই দাফন করা হয় এবং পরবর্তী কালে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও হযরত 'উমার (রা)-কেও উক্ত কক্ষে দাফন করা হয়।

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পত্নীদের বার্ষিক খরচের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর সম্পূর্ণ জাযীরাতুল 'আরাব ইসলামী শাসনের অধীনে আসিয়া যায়, বহু ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হস্তগত হয় কিন্তু এই সময়েও রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পুণ্যবতী পত্নিগণ অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করেন, কখনও পার্থিব সুখ-শান্তির প্রতি আগ্রহ দেখান নাই। অবশ্য হযরত 'উমার ফারূক (রা) তাঁহার খিলাফাতকালে উম্মুল মু'মিনীনদের জন্য সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম হইতে অধিক ভাতা নির্ধারণ করেন। সকল নবী-পত্নীর জন্য দশ দশ হাজার এবং হযরত 'আইশা (রা)-এর বারো হাজার বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করেন। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। উম্মতের মধ্যে নবী-পত্নীদের খুবই সম্মান ও মর্যাদা ছিল। তাঁহারা উম্মুহাতুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মাতা) [দ্র. ৩৩ ঃ ৬] উপাধিতে ভূষিতা ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁহাদেরকে অন্য কাহারও সহিত বিবাহ বসিবার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই (দ্র. ৩৩ ঃ ৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় হযরত 'আইশা (রা)-এর বয়স ছিল আঠারো বৎসর (সুলায়মান নাদবী, সীরাতু 'আইশা, পৃ. ৯৭)। তাঁহার কোনও সন্তান হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁহার পিতা হযরত আবূ বাক্‌র (রা) দুই বৎসর কাল খলীফা ছিলেন এবং তাঁহার পর হযরত 'উমার (রা) দশ বৎসর যাবত খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা পাওয়া যায় না যে, এই খলীফাদ্বয়ের আমলে হযরত 'আইশা (রা) কখনও কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের প্রথম ছয় বৎসর বেশ শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত অতিবাহিত হয়। কিন্তু ইহার পর এক শ্রেণীর লোক হযরত 'উছমান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তাহারা বিদ্রোহের সূচনা করে। উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার কারণে লোকেরা হযরত 'আইশা (রা)-এর নিকটও আসিয়া হযরত 'উছমান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। কিন্তু তিনি সকলকে ধৈর্য ধারণ করিতে উপদেশ দেন, কখনও তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।

হযরত 'উছমান (রা)-কে যুল-হিজ্জা ৩৫/জুন ৬৫৬ সালে বিদ্রোহিগণ হত্যা করে। এই ফিতনার সময়ে হযরত 'আইশা (রা) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাত মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। হযরত 'আইশা (রা) এই ঘটনা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। মদীনা মুনাওওয়ারায় হযরত 'আলী (রা)-এর হাতে খিলাফাতের বায়'আত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্দিক হইতে তৃতীয় খলীফার হত্যার প্রতিশোধ লওয়ার দাবি উঠিতেছিল। হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) মদীনা হইতে আগমন করিয়া সেখানকার অবস্থা বিস্তারিত তাঁহাকে অবহিত করিলেন।

হযরত 'উছমান (রা) শহীদ হওয়ার প্রায় চার মাস পর হযরত 'আইশা (রা) প্রতিকার ও সংশোধনের আহ্বানে বসরা রওয়ানা হন। তাঁহার সঙ্গে হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বসরা গমনের সংবাদ শুনিয়া হযরত 'আলী (রা)-ও সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। যদিও উভয় দলের কেহ ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াইবে, কিন্তু নানাবিধ কারণে (যাহার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দেখা যাইতে পারে) জুমাদা'ল-আখিরা ৩৬/ডিসেম্বর ৬৫৬ সালে হযরত 'আইশা (রা) ও হযরত 'আলী (রা)-এর অনুগামীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহা ইসলামের ইতিহাসে জামাল (উট) যুদ্ধ (দ্র.) নামে প্রসিদ্ধ। কারণ সমগ্র যুদ্ধের শক্তি সেই উটের চারিপাশেই নিহিত ছিল যাহার পৃষ্ঠস্থ শিবিকায় হযরত 'আইশা (রা) সওয়ার ছিলেন। এই যুদ্ধে হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) শহীদ হন এবং হযরত 'আলী (রা) জয়লাভ করেন।

এই যুদ্ধ যদিও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিকার ও সংশোধনের এই প্রচেষ্টায় হযরত 'আইশা-এর ভূমিকা সঠিক হয় নাই বলিয়া তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এইজন্য প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন। ইব্‌ন সা'দ-এ উল্লিখিত আছে, তিনি যখন কুরআন কারীমের এই আয়াত পড়িতেন (৩৩ ঃ ৩৩) وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ (আর তোমরা তোমাদের স্বগৃহে অবস্থান করিবে) তখন এত বেশী ক্রন্দন করিতেন যে, তাঁহার আঁচল ভিজিয়া যাইত। এই যুদ্ধে বীর যোদ্ধাগণ যেই সকল কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং নিজের জান কুরবান করিয়াছিলেন সেই সকল কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। প্রায়ই সেই সকল কবিতা আবৃত্তি করিয়া তিনি কাঁদিতেন। একবার নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিয়া তিনি অঝোর ধারায় কাঁদিলেন ঃ

يا أمنا ياخير أم نعلم + أما ترين كم شجاع يكلم
وتختلى هامته والمعصم

"হে আমাদের মাতা! হে আমাদের উত্তম মাতা! যাহাকে আমরা জানি, তুমি কি দেখিতেছ না যে, কত বীর আহত হইতেছে? আর তাহার মস্তক ও হস্ত ঘাসের মত কাটিয়া পড়িতেছে?" (সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাত-ই 'আ'ইশাঃ, পৃ. ২৫৬-২৫৭)।

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত 'আলী (রা) ও হযরত 'আইশা (রা) উভয়ে জনসাধারণের সম্মুখে অন্তর পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার কথা স্বীকার করিলেন। আত-তাবারী (৬ খ.)-এর বর্ণনামতে হযরত 'আইশা (রা) মুখে বলিলেন 'আলী (রা)-র প্রতি আমার কোনরূপ ক্ষোভ নাই। আর হযরত 'আলী (রা)-ও এই জাতীয় শব্দ বলিলেন।

যুদ্ধের পর হযরত 'আলী (রা) উম্মুল মু'মিনীন (রা)-কে সম্মানের সহিত হিজায রওয়ানা করাইয়া দিলেন। জীবনের অবশিষ্ট অংশ তিনি মদীনা মুনাওওয়ারায় অত্যন্ত নীরবে দীনী শিক্ষার প্রচার প্রসারে নিয়োজিত থাকিয়া অতিবাহিত করেন। তিনি ১৭ রমযান ৫৮/১৩ জুলাই, ৬৭৮ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার ওয়াসিয়াত অনুযায়ী মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল-বাকী'তে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

হযরত 'আইশা (রা) ইসলামী চরিত্রের অতি উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার লালন-পালন সঠিক অর্থে হযরত নবী আকরাম (স)-এর সাহচর্যে হইয়াছিল। এই কারণেই তিনি আরাধনা ও নেক আমলের উত্তম নমুনারূপে বিবেচিত হইতেন। নম্রতা, দানশীলতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহ্‌র 'ইবাদত ও মানবিক সমবেদনার গুণাবলী তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি 'ইলম ও ফযলের দিক দিয়া একক ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল প্রশংসিত গুণ ও উন্নত চরিত্রের কারণেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে অধিক হাদীছ রিওয়ায়াতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হাদীছের মোট সংখ্যা ২২১০। তন্মধ্যে ২৮৬ টি হাদীছ সাহীহায় (বুখারী ও মুসলিম)-এ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নিকট কুরআন কারীম-এর একটি হস্তলিখিত কপিও বিদ্যমান ছিল, যাহা তিনি স্বীয় গোলাম আবূ য়ূনুস-এর দ্বারা লিখাইয়াছিলেন। কিরাআত-এর কোন কোন পদ্ধতিও তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত আছে। তাবি'ঈগণের মধ্যে বড় বড় 'আলিমের অধিকাংশই ছিলেন তাঁহার ছাত্র। তন্মধ্যে 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদির- রাহমান, মাসরূক ভ্রাতুষ্পুত্রী 'আমরা, সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা ও 'আইশা বিন্‌ত তালহা (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতার প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ ও আগ্রহ ছিল এবং প্রসঙ্গানুযায়ী কবিতা আবৃত্তি করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাঁহার ছিল। তাঁহার ফাসাহাত (শুদ্ধ ভাষা) ছিল প্রসিদ্ধ। আরবের ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাফসীর গ্রন্থসমূহের সূরা আন-নূর ও আল-আহযাব দ্র.; (২) হাদীছ গ্রন্থসমূহ আল-বুখারী, আস-সাহীহ; মুসলিম, আস-সাহীহ; আত-তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ; আবূ দাঊদ, আস-সুনান; হাকিম, আল-মুসতাদরাক (বিভিন্ন বাব, বিশেষত আবওয়াবুল মানাকিব ও আবওয়াবু ফাদাইলিস-সাহাবা); ইব্‌ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ, ৬খ., ২৯-২৮৬; (৩) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুর- রাসূল (স), নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৮খ., ৩৯-৫৬; (৫) আল-বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., ৪০৯-৪২২; (৬) আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ২খ., ৯৮-১৪১; (৭) আত-তাবারী, আত-তারীখ, ৩খ., পৃ. ৬৭; (৮) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ৫খ., ৫০১-৫০৪; (৯) আস-সুয়ূতী, আয়নুল-ইসাবা ফী মাসতাদরাকাতহুস-সায়্যিদা 'আইশা আলাস-সাহাবা.....; (১০) ইব্‌ন আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতীআব; (১১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; (১২) আল-মাসঊদী, মুরূজুয-যাহাব; (১৩) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৬৯১.; (১৪) ইব্‌ন তায়মিয়্যা, মিনহাজুস-সুন্না, ২খ., ১৮২-১৮৩; (১৫) আল-কালকাশন্দী, সুবহুল-আ'শা, ৫খ., ৪৩৫; (১৬) আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ২খ., ৪৩; (১৭) ইব্‌নুল-জাওযী, সিফাতুস-সাফওয়া, ২খ., ৬; (১৮) 'উমার আবুন-নাসর, 'আলী ওয়া 'আইশা (রা), কায়রো ১৯৪৭ খৃ. (উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ আহমাদ পানীপাতী, লাহোর ১৯৬১ খৃ.); (১৯) 'উমার রিদা কাহ্‌হালা, আ'লামুন-নিসা, ২খ., ৭৬০; (২০) আব্বাস মাহমূদ আল-আককাদ, আস-সিদ্দীকা বিনতুস-সিদ্দীক (রা), কায়রো ১৯৪৯ খৃ. (উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ আহমাদ পানীপাতী, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.); (২১) মালিক মুহাম্মদ আদ-দীন সীরাতু 'আইশা সিদ্দীকা (রা), লাহোর ১৯১৮ খৃ.; (২২) সায়্যিদ সুলায়মান

নাদবী, সীরাতু 'আইশা (রা), আজামগড়, ১৩৭২ হি.; (২৩) সাঈদ আনসারী, সিয়ারুস-সাহাবিয়াত, আজামগড় ১৯৫৩ খৃ.; (২৪) রাযিক আল-খায়রী, মুসলমানু কে মায়ে', করাচী ১৯৬৩ খৃ.; (২৫) মুহাম্মাদ 'আলী, খিলাফাত-ই রাশিদা।

আমীনুল্লাহ ওয়াছীর (দা.মা.ই.)/আবদুল জলীল

'আইশা বিন্ত তালহা (عائشة بنت طلحة) : অন্যতম বিখ্যাত আরব মুসলিম মহিলা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর খ্যাতনামা সাহাবী তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (দ্র.) আত-তায়মী (রা)-এর কন্যা। তাঁহার মাতা হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর অন্যতমা কন্যা উম্মু কুলছূম। এই হিসাবে তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা)-এর বোন-ঝি। বংশ মর্যাদার সঙ্গে তাঁহার মধ্যে অতুলনীয় সৌন্দর্য ও তেজোদ্দীপ্ত মনোভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। উমার ইব্ন আবূ রাবী'আ (১খ., ৮০), কুছায়্যির আয্যা, ইব্ন কুতায়বা (শি'র, পৃ. ৩২২), 'উরওয়া ইব্নুয্ যুবায়র (আগানী, ১০খ., ৬০) প্রমুখ গাযাল রচয়িতাগণ কবিতায় তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। 'আইশা যাহাতে তাওয়াফ শেষ করিতে পারেন সেইজন্য মক্কার শাসক আল-হারিছ ইব্ন খালিদ আল-মাখ্যূমী সালাতের সময় কিঞ্চিৎ বিলম্বিত করিতে রাজি হওয়ায় তিনি পদচ্যুত হন (আগানী, ৩খ., ১০০, ১০৩, ১১৩)। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় মামাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাক্রের সঙ্গে, পরে মুস্'আব ইব্নুয যুবায়র-এর সঙ্গে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর 'উমার ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার আত-তায়মীর সঙ্গে। তাঁহার ওফাতের সঠিক তারিখ জানা যায় না। কিছু গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বর্ণনাদি পাওয়া যায়; কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেইগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ১০২-৩; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ৮খ., ৩৪২; (৩) বালাযুরী, আন্সাব, ১১খ., ১৬, ২০৪-৫, ২২২; (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ, ১৩৬১/১৯৪২, পৃ. ৬৬, ১০০, ৪৪২; (৫) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৬) নাওয়াবী, তাহ্যীব, পৃ. ৮৫০; (৭) A. von Kremer, Culturgesch. des Orients unter den Chalifen, i. 29, ii, 99.

Ch. Pellat (E.I.[2])/ হুমায়ূন খান

'আইশা বিন্ত ইউসুফ (দ্র. আলবানী)

'আইশা আল-মান্নুবিয়্যা (عائشة المنوبية) : ৭ম/১৩শ শতকের তিউনিসিয়ার মহিলা সূফী; পূর্ণ নাম আইশা বিন্ত ইমরান ইব্নুল হাজ্জ সুলায়মান। যে নিস্বা দ্বারা তিনি সুপরিচিত তাহা তাঁহার স্বগ্রাম মান্নুবা (Manouba) হইতে গৃহীত। গ্রামটি তিউনিসের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। তিনি সাধারণভাবে (বিশেষত তিউনিসে) সম্মানসূচক "আস-সায়্যিদা" উপাধিতে পরিচিত। হাফ্সী রাজবংশের আমলে তিনি জীবিত ছিলেন।

সমসাময়িক হাফ্সী বংশের ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু তাঁহার প্রশংসা সম্বলিত রচনার (মানাকিব) একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলন পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থটিতে কথ্য ভাষার প্রভাব খুব বেশী। লেখক একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি সম্ভবত এই মহিলা দরবেশের জীবনকাল বা তাঁহার মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে মান্নুবার মসজিদের জনৈক ইমাম কর্তৃক রচিত অপর একটি সঙ্কলনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালেই 'আইশার জীবনে এমন কতিপয় কারামাত প্রকাশ পায় যাহাতে তাঁহার প্রতি লোকের মনে শ্রদ্ধা জাগে এবং তাঁহার ভবিষ্যত সম্ভাবনার ইংগিত পাওয়া যায়। বিবাহের বয়স হইলে তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহার চাচাত ভাইয়ের সহিত বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সূফী মানসিকতার বশে এই বিবাহে অসম্মত হন এবং তিউনিসে পলায়ন করিয়া এক কায়সারিয়্যা (এক প্রকার সরাইখানা)-তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা পুরাতন বাব আল-ফাল্লাক-এর বহির্দেশে শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী কালে ইহার নাম হয় বাব আল-গুরজানী। এইখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন এবং দরবেশরূপে, বিশেষত সাধারণ লোকের মধ্যে সূফী হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন, যদিও কতিপয় আলিম তাঁহার বিরোধিতা করেন। জনশ্রুতিমতে তিনি সুবিখ্যাত সূফী আবুল হাসান আশ-শাযিলীর নিকট সূফীতত্ত্বে শিক্ষা লাভ করেন। সূফী আবুল হাসান এই দরবেশের জীবনকালে তিউনিসেই বসবাস করিতেন। কিন্তু আইশা সম্পর্কীয় মানাকিব বা আবুল হাসানের শাগরিদগণের লিখিত মানাকিব সূত্রে এই বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তিনি পরিণত বয়সে ২১ রাজাব, ৬৫৫/২০ এপ্রিল, ১২৫৭ (মতান্তরে ১৬ শাওয়াল, ৬৫৩/১৯ নভেম্বর, ১২৫৫) তারিখে ইনতিকাল করেন। তৎকালে 'মাক্বারাতুশ শারাফ' নামে পরিচিত গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে তাঁহার জনৈক ভক্ত দাবি করেন, তিনি তাঁহার কবর চিহ্নিত করিতে পারিয়াছেন। তিনি সেইখানে একটি কাঠের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই ইহা তিউনিসের মহিলাগণের অতি প্রিয় যিয়ারতগাহ-এ পরিণত হয়।

দরবেশ 'আইশা যে এলাকায় বাস করিতেন সেইখানে এখনও তাঁহার ভক্তগণের, বিশেষত মহিলাগণের সমাগম হয় এবং স্থানটি আল-মান্নুবিয়্যা নামে এখনও পরিচিত। পুরাতন কায়সারিয়্যার চারিদিকে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অনেক ছোট ছোট দালান-কোঠা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইখানে ইবাদতগাহ, মেহমানদের কক্ষ, ব্যক্তিগত বাসগৃহ, এমনকি দোকানপাট ইত্যাদি রহিয়াছে। পুরুষগণ বৃহস্পতিবার ও মহিলাগণ সোমবার মাযার যিয়ারত করিয়া থাকেন। আধুনিক ধরনের কতিপয় ভবন নির্মিত হওয়ায় স্থানটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আল-মান্নুবা গ্রামের যে ঘরে এই মহিলা দরবেশের জন্ম, তাহাও পবিত্র স্থানে পরিণত হইয়াছে। হুসায়নী বে মুহাম্মাদ আস-সাদিকের শাসনামলে (১৮৫৯-৮২ খৃ.) সেইখানে একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করা হয়। তাহাতে একটি যাবিয়া (নির্জনে উপাসনার কতকগুলি প্রকোষ্ঠের সমষ্টি) এবং বিভিন্ন ভ্রাতৃসংঘের ব্যবহারের জন্য একটি ছাদবিশিষ্ট চত্বর রহিয়াছে। আঞ্চলিক আরবী ভাষায় এই মহিলা দরবেশ আস্-সায়্যিদা লাল্লা আইশা আল-মান্নুবিয়্যার সম্মানে বহু ভক্তিমূলক কবিতা রচিত হইয়াছে। সন্নেক

(Sonneck, Chants arabes du Maghreb, i, 5-7, ii, 36-9) এই ধরনের কবিতার কিছু কিছু উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। তিউনিস এলাকার অনেক বালিকার ডাকনাম রাখা হয় আল-মান্নুবিয়্যা বা আস্-সায়্যিদা। এই মহিলা দরবেশের নামের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অনেক বালকেরও ডাকনাম রাখা হয় আল-মান্নুবী।

আধুনিক কালে ফকীর-দরবেশদের প্রবর্তিত তরীকার প্রতি পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা না থাকায় মান্নুবিয়্যার খান্‌কাহ ও ইহার দালান-কোঠা জীর্ণ দশা প্রাপ্ত, কারণ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) অজ্ঞাত লেখক, মানাকিবুস্-সায়্যিদা 'আইশা আল-মান্নুবিয়্যা, তিউনিস ১৩৪৪/১৯২৫, পৃ. ৪৪ (শুধু তিউনিসেই এই বইয়ের একাধিক পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে); (২) মুহাম্মাদ আল-বাজী আল-মাস্'উদী, আল-খুলাসাতুন নাকিয়্যা ফী উমারা ইফ্রীকিয়্যা, তিউনিস ১৩২৩/১৯০৫, পৃ. ৬৪; (৩) এইচ. এইচ. আবদুল ওয়াহ্হাব, শাহীরাতুত তুনুসিয়্যাত, তিউনিস ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ৭৭-৮; (৪) R. Brunschvig, Hafsides, ii, 329।

H.H. Abdul Wahhab (E.I.[2])/ হুমায়ূন খান

আঈর (أئير) ঃ অথবা আয়র যাহাকে আসবেনও বলা হয়, অক্ষাংশের ১৭°-২১° উত্তর ও দ্রাঘিমার ৭°-৯° পূর্বে অবস্থিত, সাহারা মরুভূমির একটি পার্বত্য এলাকা। ইহা তিনটি পৃথক অঞ্চল লইয়া গঠিত ঃ (ক) উত্তর আঈর সম্পূর্ণ সমতল ও মালভূমি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত; (খ) মধ্য আঈর পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ একটি পর্বতশৃঙ্গসহ সমপ্রকৃতির অসমান স্থলভাগের সমন্বয়ে গঠিত এবং (গ) দক্ষিণ আঈর সুদান অভিমুখী ঢালু শিলাময় মালভূমিসমূহ লইয়া গঠিত। সাহারার অবশিষ্টাংশ হইতে আঈর-এ অধিকতর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া (জুন হইতে আগস্ট পর্যন্ত বর্ষাকাল) উহার ভূ-গর্ভস্থ জলাশয়সমূহে পানি সরবরাহ হয় যাহা অনেক মূল্যবান উদ্ভিদকে (গঁদবৃক্ষ) সজীব রাখে। কৃষিকার্য যৎসামান্য হইলেও সাহারার অর্থনৈতিক জীবনে ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে, বিশেষত মরুযাত্রী পথে অবস্থিত থাকায়। ইহাতে উষ্ণ প্রস্রবণ এবং ইহার ভূগর্ভে শ্লেটের স্তর রহিয়াছে। এইখানে আদিম হস্তশিল্পের কাজ এখনও প্রচলিত আছে।

আঈর-এর অধিবাসিগণ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ নিগ্রো (হাউসা, Hausa) ও বারবার তথা কেল আঈর (Kel Air)। ইহা সাতটি প্রধান তৌরেগ (Tuareg) গোত্রের একটি; কেল গেরেস (Kel Geres) ও কেল উই (Kel Ewey) তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের শেষোক্ত গোত্রটি অধিক হারে হাউসাদের সাথে আন্তগোত্রীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ।

১৯৩৩-৮ সালের আদমশুমারী অনুসারে কেল আঈরের জনসংখ্যা ছিল ২৭,৭৬৫। ইহারা গ্রামে অথবা প্রাচীন কালের শিবিরে বসবাসকারী আধা স্থায়ী লোক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত আঈরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর আগাদেস (Agades)। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের পর ইহা কেল উই সালতানাতের রাজধানীতে পরিণত হয়। কেল উই ঐ সময়ে কেল গেরেসদেরকে উৎখাত করিয়াছিল। আগাদেস বর্তমানে নাইজার (দ্র.) এলাকার প্রধান শহর; ইহার এক অংশ হইল আঈর।

এখানকার জনসংখ্যার সকলেই মুসলিম এবং নবম/পঞ্চদশ শতক হইতে এখানে কেল গেরেস জাতির বাস। এখানে ধর্মীয় কার্যকলাপ বেশ জোরদার। কারণ বহু সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কতিপয় ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Barth, Reisen und Entedeckungen in Nord-und Central Africa, Gotha ১৮৫৭ (ফরাসী অনু. প্যারিস ১৮৬০); (২) E. de Bary, in Zeitsch. d. geog. Gesellsch. ১৮৮০ (ফরাসী অনু. Schirmer, Journal de Voyage, প্যারিস ১৮৯৮); (৩) Schirmer, On the ethnography of Air, Scott. geogr. Mag., ১৮৯৯, পৃ. ৫৩৮-৪০; (৪) E. Foureau, D' Alger au Congo par le Tchad, প্যারিস ১৯০২; (৫) ঐ লেখক, Documents scientifiques de la Mission saharienne, প্যারিস ১৯০৫; (৬) E. F. Gautier, Le Shahara, প্যারিস ১৯২৮; (৭) A. Buchanan, Exploration of Air out of the world North of Nigeria, লন্ডন ১৯২১; (৮) F.R. Rodd, People of the veil, লন্ডন ১৯২৬; (৯) Y. Urvoy, Histoire des populations du Soudan central. প্যারিস ১৯৩৬; (১০) L. Chopard et A. Villiers, Contribution a l'etude de l' Air, Memoire de l. I. F. A. N., no. 10, প্যারিস ১৯৫০, বিশেষত Ethnologie des Touarag de l'Air, by F. Nicolas and H. Lhote, ঐ পৃ. ৪৫৯-৫৩৩; (১১) Lhote, Les Touaregs du Hoggar, প্যারিস ১৯৪৪ (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (১২) L. Massignon, Annuaire du Monde Musulman, F.[4] প্যারিস ১৯৫৫, পৃ. ৩৩১।

G. Yver-R. Capot-Rey (E.I.[2])/ আলী আহমদ

আ'উযু বিল্লাহি (اعوذ بالله) ঃ পবিত্র কুরআনে আসিয়াছে فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "যখন তুমি কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে" (১৬ ঃ ৯৮)।

আরও আসিয়াছে, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ "তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ" (৪১ ঃ ৩৬)।

প্রথম আয়াতের নির্দেশ অনুসারে ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, কুরআন তিলাওয়াত শুরু করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌র পূর্বে আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) বলা ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতও একই। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও আরও কতিপয় বুযুর্গ উপরিউক্ত আয়াতের বরাতে اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পাঠ করা শ্রেয় মনে করেন। বায়হাকী তাঁহার সুনান-এ বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) রাত্রে

জাগরিত হইবার সময় তিনবার তাকবীর বলিবার পর উপরিউক্ত বাক্য পাঠ করিতেন। ইমাম ছাওরী ও ইমাম আওযা'ঈ নিম্নোক্ত বিন্যাস অধিক পসন্দ করিতেন ঃ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم। সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করিবার পূর্বে এবং পরবর্তী সূরা শুরু করিবার পূর্বে আ'উযু বিল্লাহ পাঠ করা আবশ্যক কিনা সেই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম মিহরাবে বসিয়া দু'আ করিবার পূর্বে নিম্নোক্তরূপে আউযু বিল্লাহ পাঠ করিয়া থাকেন ঃ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم যেই সমস্ত ব্যাপারে বিসমিল্লাহ পঠিত হয় ইহাদের পূর্বে আ'উযু বিল্লাহ পঠিত হইয়া থাকে (দ্র. ইবনুল জাযারী, আন্-নাসরুল কাবীর, দামিশ্ক ১৩৪৫ হি., ১খ., ২৪২০২৫৮; দিময়াতী, ইত্হাফ, মিসর ১১১৭ হি., ১২ পৃ.)।

দা.মা.ই./আবদুল হক ফরিদী

আল-আওয়া (দ্র. নুজূম)

আওয়াল (اول) ঃ (স্ত্রী, উলা, ব.ব. আওয়াইল), অর্থ—প্রথম। (এক)—দার্শনিক পরিভাষারূপে মুসলিম চিন্তাজগতে আওয়াল শব্দটি অনুপ্রবেশ করে এরিস্টোটল ও প্লোটিনাস-এর 'আরব অনুবাদকগণের মাধ্যমে। এইভাবে এরিস্টোটলের ভ্রান্ত ধর্মতত্ত্বের অর্থাৎ প্লোটিনাসের সর্বশেষ তিন পর্বের (Enneads) আরবী অনুবাদে আওয়াল আদি সত্তা অথবা আদি সৃষ্টি বুঝায়। একইভাবে আল্লাহ হইতে উদ্ভূত প্রথম কারণ বুঝাইতে ইখ্ওয়ানুস-সাফাতে আমরা ইতিমধ্যেই 'আল-কাসদুল আওয়াল' এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখিতে পাই। একই শব্দগুচ্ছ আবার পাওয়া যায় ইব্ন সাব'ঈন-এর বুদদুল 'আরিফ ও Sicilian Questions গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে। আওয়াল শব্দটি মুতাযিলীগণ, আল-কিন্দী ও আল-ফারাবী কর্তৃক অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইব্ন সীনা দার্শনিক পরিভাষায় ইহার ব্যবহার পদ্ধতি বিন্যস্ত করিয়াছেন। পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইব্ন সীনার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের মধ্যে এই 'আওয়াল' শব্দটির ব্যবহার প্রথাগত হইয়া দাঁড়ায়।

(দুই)— 'আওয়াল' শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম 'সত্তা' এই অর্থে আল্লাহকে বুঝাইয়া থাকে। পরম বা আবশ্যিক সত্তা (واجب الوجود) এই উক্তি দ্বারা আল্লাহ্র নাম বুঝাইয়া থাকে এবং এই অর্থে মুসলিম দার্শনিকগণ প্রায়শ ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। সচরাচর এই অর্থে শব্দটি (الاول) পৃথকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যদিও সময় সময় আল-মাবদাউ'ল-আওয়াল তথা প্রথম মূলসূত্রের মত পুনরাবৃত্তি সূচক শব্দের সাক্ষাত মিলে।

(তিন)—কতিপয় যুক্ত শব্দে 'আওয়াল' শব্দটি দ্বারা অপরিহার্যভাবে কারণিক পূর্বগামিতা এবং গৌণভাবে কালিক পূর্বগামিতা বুঝায়, যেমন বুঝায় 'আল-হারাকাতুল উলা (প্রথম গতি) যুক্ত শব্দগুলিতে।

(চার)—বহুবচনে ব্যবহৃত হইলে আওয়াইল দ্বারা কালের দিক দিয়া প্রথমগুলিকে বুঝায় এবং দর্শনে ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী যুগসমূহের চিন্তাবিদগণকে বুঝায়।

(পাঁচ)—অনুরূপভাবে বহুবচনে আওয়াইল দ্বারা সত্তা এবং জ্ঞানের স্তরে মূল সূত্রকে নির্দেশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল-মাবাদী আল-উলা সত্তার অথবা পৃথক বুদ্ধির ক্রম অনুসারে প্রথম মূল সূত্রকে বুঝায় অথবা 'আল-মাকূলাত আল-উলা' প্রাথমিক বোধগম্য সত্তাসমূহ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রথম মূল সূত্রকে নির্দেশ করিয়া থাকে।

(ছয়)—আওয়াল হইতে গুণবাচক বিশেষ্য আওয়ালিয়া উদ্ভূত (বহুবচন—আওয়ালিয়্যাত), দার্শনিকদের ভাষায় ইহা দ্বারা 'যাহা প্রথম' তাহার 'সত্তাসার' বুঝায়।

(সাত)—বহুবচনে আওয়ালিয়্যাতের অনুবাদ করা হইয়া থাকে ঃ প্রজ্ঞার ক্রমানুসারে মূল সূত্রসমূহ অর্থাৎ ইহা প্রতিজ্ঞা ও বিচার বুঝাইয়া থাকে যাহা স্বয়ং তাৎক্ষণিকভাবে সুস্পষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাসাইলু ইখ্ওয়ানিস-সাফা, কায়রো ১৩৭৪/১৯২৮, ৪খ., ১৪-১৮; (২) ফারাবী, রিসালা ফী আরা আহ্লিল-মাদীনা আল-ফাদিলা (সম্পা. Dieterici in Al Farabis Abhandlung der Musterstadt, Leiden ১৮৯৫), ১৭-২৩, ২৭-২৯; (৩) ঐ লেখক, 'উয়ূনুল মাসাইল (সম্পা. Dieterici in Al Farabis philosophischen Abhandlungen, Leiden ১৮৯০), ৫৭-৬০; (৪) ইব্ন সীনা, শিফা (lith. সং. তেহরান ১৩০৩/১৮৮৬), ১খ., ২৯২-২৯৩; ২খ., ৪৩৯, ৫৮১, ৪৮৯, ৬০৫-৬০৮, ৬২০-৬২৫; (৫) ঐ লেখক, নাজাত, কায়রো ১৩৩১/১৯১৩, পৃ. ১০০-১০৩, ২৩৩, ২৭০, ৩৫৫, ৪০৪, ৪২৪, ৪৫১-৪৫৩, ৪৬১, ৪৭৯; (৬) ঐ লেখক, কিতাবুল ইশারাত ওয়াত্-তান্বীহাত (সম্পা. Forget, Leiden ১৮৯২, অনু. A.M. Goichon), 55-59, 167-169; (৭) ঐ লেখক, তাফ্সীরুস-সামাদিয়া (সম্পা. জামিউল-বাদাই, কায়রো ১৩৩৫/১৯১৭), ১৯; (৮) ঐ লেখক, রিসালা ফিল-ইশক (একই সম্পা.), ২খ., ৭২; (৯) ইব্ন হায্ম, কিতাবুল-ফিসাল, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১খ., ২১-২৫; (১০) ইবনুস-সীদ আল-বাতালয়াওসী, কিতাবুল হাদাইক (সম্পা. Asin, in Andalus, v. 1940), ৬৩-১৫৪; (১১) ইব্ন রুশদ, Djami de la Metaphysique (সম্পা. Quiros, মাদ্রিদ ১৯১৯), ১৩১-১৫৪; (১২) A.M. Goichon, Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sina, প্যারিস ১৯৩৮, নং ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৯১, ৯৯, ১৪৩, ৪৪৩, ৪৫০, ৫৭২; (১৩) ঐ লেখক, Vocabulaires compares d'Aristotle d'Ibn Sina, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ২; (১৪) M. Cruz Hernandez, Historia de la filosofia hispano-musulmana. মাদ্রিদ ১৯৫৭, ১খ., ৮৩, ৮৭, ৮৯, ১৩১, ২৬০, ৩১৭, ২খ., ১৫০, ১৫৪, ৩০২, ৩০৭।

M. Cruz Hernandez (E.I.[2])/মোঃ ইউনুস

আওকাফ (দ্র. ওয়াক্'ফ)

আওজ (দ্র. নুজূম)

আওজিলা (اوجلة) ঃ এই নাম একটি মরূদ্যান এবং তিনটি খেজুর বাগানের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা (আওজিলা) মরুবাসী

যাত্রীদের একটি ঐতিহ্যবাহী কাফেলা-পথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই পথটি Cyrenaica-র দক্ষিণে, বিংশতম ও উনবিংশতম সমাক্ষ রেখার মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করিয়া মিসরের অন্তর্ভুক্ত সীওয়া ও জারাবুবকে মারাদা এবং জোফ্রা দ্বারা ত্রিপলীতানিয়া ও ফিজ্জানের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছে। হিরোডটাস (৪খ., ১৭২, ১৮২) ও প্রাচীন গ্রীকো-রোমান গ্রন্থকারদের রচনায় খেজুরের প্রাচুর্যের জন্য ও ভ্রমণ বিরতির স্থান হিসাবে আওজিলা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আরবগণের মাগ্‌রিব (আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল) বিজয়ের পর হইতে ভ্রমণ বিরতির স্থান হিসাবে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইব্‌ন হাওকাল (অনু. de Slane, JA, 3rd series, xiii, 163) চতুর্থ/দশম শতাব্দীতে সাম্প্রতিক কালের বার্‌কা প্রদেশের অন্তর্গত একটি ছোট শহর হিসাব ইহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। দুই শতাব্দী পর আল-ইদ্‌রীসী উহার অনুরূপ বর্ণনা দান করিয়াছেন (অনু. Jaubert, i, 248)। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীতে আল-বাক্‌রী (Description de l' Afrique Septentrionale, অনু. de Slane, 32) ইহাকে বহু মসজিদ ও বাজার সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্থান হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, আওজিলা একটি জিলার নাম এবং আর্‌যাকি'য়্যা উহার অন্তর্গত একটি শহর। দশম/ষোড়শ শতাব্দীতে মিসর হইতে খাদ্যশস্য এখানে আমদানী করা হইত (Leo Africanus, Description de l'Afrique, অনু. Epaulard, 4564)। ১৬৪০ খৃস্টাব্দে তুর্কীগণ কর্তৃক আওজিলা অধিকৃত হইয়াছিল। পর্যটক Hornemann (১৭৯৮), Hamilton (১৮৫২), Beurmann (১৮৬২) ও Rohlfs (১৮৬৯ ও ১৮৭৯) এই স্থান পরিদর্শন করিয়া ইহার বর্ণনা দান করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আপোষহীন সানূসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব; Rosita Forbes ও Hassenein-bey (১৯২০) ব্যতীত এই অঞ্চলের সকল ইয়ূরোপীয় পর্যটকের আগমন রোধ করিয়াছে। এই স্থানটি ইতালী কর্তৃক অধিকৃত (১৯২৮-১৯৪৩) হওয়ার ফলে আওজিলা সম্পর্কে গবেষণা শুরু হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ভৌগোলিক Scarin কর্তৃক ইহা আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর আওজিলা লিবিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আওজিলা নাম দ্বারা কেবল পশ্চিমাংশের মরূদ্যানটিকে বুঝায়, অথচ সমগ্র অঞ্চলটির নাম জালো (ইহার পরিধি ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে আল-ইর্‌গ ও আল-লিব্বি পর্যন্ত বিস্তৃত) এবং ৩৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত জিকের্‌রা-র সাধারণ মরূদ্যান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বালু ও নুড়ি পাথরের একটি বিশাল জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যস্থলের স্বল্প চারণযোগ্য কিঞ্চিৎ নিম্নভূমিতে তিনটি মরূদ্যান অবস্থিত যাহাদের আবহাওয়া অতি শুষ্ক এবং ইয়ূরোপ মহাদেশীয় জলবায়ুর অনুরূপ। এইসব মরূদ্যানে বায়ু প্রবাহ অত্যন্ত মৃদু। ১৯৩১ হইতে ১৯৪০ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই স্থানের বৃষ্টিপাতের গড়ছিল ১১.৭ মিলিমিটার।

এই স্থানে পানি ভূপৃষ্ঠ হইতে সামান্য নীচের স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দুই প্রক্রিয়ায় মাটির নীচ হইতে পানি উত্তোলন্ করা হয়ঃ তুলনদণ্ডের সাহায্যে এবং টানা-কূপ হইতে গাধার সাহায্যে। প্রধানত এই পানি ব্যবহৃত হয় খেজুর বৃক্ষের সেচকার্যে, আর কখনও কখনও আনার ও ডুমুর বাগান এবং শস্য, ঘাস ও শাক-সজির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের সেচকার্যে। পশু পালনের ব্যবস্থা আশাব্যঞ্জক নহে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও ক্রমাবনতির দিকে। এক শতাব্দীব্যাপী জালো আওজিলার স্থান দখল করিয়া সুদান ও মিসরের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেও উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। দেশত্যাগ জনিত কারণে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং জনসংখ্যার হারে যে অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা ইতালীয়দের দ্বারা রোধ করা হইয়াছিল। তাহারা আল-ইরগে (জালো) বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং মরূদ্যানগুলিকে ২৭০ কিলোমিটারের একটি দীর্ঘ রাস্তা দ্বারা আজদাবিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল (আজদাবিয়া হইতে ১৯০ কিলোমিটারের একটি দীর্ঘ পথ বেনগাযী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে)।

আওজিলা ধ্বংসের কবলে পড়িলেও ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে উহার খর্জুর বৃক্ষের সংখ্যা আঠার হাজার, উদ্যানের সংখ্যা এক শত সত্তর এবং জনসংখ্যা এক হাজার পাঁচ শত ছিল। এই জনগোষ্ঠী বার্বার ভাষাভাষী ছিল এবং তাহারা চারিটি দলে বিভক্ত হইয়া চারিটি সংলগ্ন পল্লী ঃ আস্-সুব্‌কা, আস্-সারাহ্‌না, আল-হাতী ও আয-যিগাগ্‌না-তে বাস করিত। এতদ্ব্যতীত আরবীভাষী মাজাবরা (গোত্র)-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ খর্জুরকুঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। জালো আওজিলার ন্যায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয় নাই। উহার খর্জুর বৃক্ষের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার এবং বাগানের সংখ্যা এক শত তেইশ। ১৪টি পরিবারে বিভক্ত হইয়া এই স্থানে দুই হাজার সাত শতজন লোক বাস করিত। তাহাদের বসবাসের দুইটি গ্রামের মধ্যে আল-ইর্‌গের বাসগৃহ বিক্ষিপ্ত এবং আল-লিব্‌বার বসতি কিছুটা কেন্দ্রীভূত। এই দুই গ্রাম ছাড়াও ইহাদের অনেকেই মরূদ্যান জুড়িয়া বিক্ষিপ্তভাবে নির্মিত গৃহে বাস করিত। ইহাদের অধিকাংশ মাজাব্‌রা, যাহারা পূর্বে যাযাবর জীবন যাপন করিত, কিন্তু পরবর্তী কালে আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। জিকের্‌রা একটি খর্জুরকুঞ্জ (তের হাজার খর্জুর বৃক্ষ) এবং নিয়মিতভাবে উহাতে পানি সেচনের ব্যবস্থা নাই। এই স্থানে কতিপয় অতি দরিদ্র পরিবারের (চারি শত অধিবাসী) বাস। তবে খেজুর সংগ্রহের মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমের 'ওয়াদী ফারেগ' অঞ্চলের যূইয়া যাযাবর জাতির আগমন ঘটে। এই সকল বসতির গৃহসমূহ কাঁচা ইট এবং কদাচিৎ শিথিল প্রস্তর দ্বারা নির্মিত একতলা বাড়ী। এইখানকার রাস্তাগুলি ক্ষুদ্র ও আঁকাবাঁকা এবং এইখানে বেশ কয়েকটি সরু ও অন্ধগলি বিদ্যমান। উদ্যান হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত খেজুর পাতায় কুঁড়েঘরসমূহ সাধারণত পূর্বতন ক্রীতদাসদের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ও গ্রাম্য বৈশিষ্ট্যের মসজিদসমূহ সানূসিয়্যা প্রভাবের ফলে সংখ্যায় বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আওজিলার মসজিদসমূহে সাধারণভাবে অনেক গম্বুজ থাকে। জিকের্‌রার মসজিদ ও উহার মিনার খেজুরপাতা দ্বারা নির্মিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Hornemann, The journal of Frederick Hornemann's travels from Cairo to Mourzouk.., London 1802; (২) Pacho, Relation d'un voyage dans la Marmarique et la

Cyrenaique et les oasis d'Audjilah et Maradeh, Paris 1927; (৩) J. Hamilton, Wanderings in North Africa, London 1856; (৪) Beurmann, Moritz von Beurmann's Reise von Bengasi nach Udschila und von Udschila nach Murzuk, Petermann Mitt., Erganzungsband II, Gotha 1863; (৫) G. Rohlfs, Von Tripolis nach Alxandrien, Bremen 1871, and Reise von Tripolis nach der oase Kufra, Leipzig 1881; (৬) Hassenein-bey, The lost oases, London 1925; (৭) E. de Agostini, Notizie sulla zona di Augila-Gialo, Benghazi 1927; (৮) E. Scarin, Le oasi cirenaiche del 29° parallelo, Florence 1937। আওজিলায় যে বার্বার ভাষা প্রচলিত সেই সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন পূর্ণ সমীক্ষা করা হয় নাই। এই উপভাষার উপর খণ্ড খণ্ড আলোচনার জন্য দ্র. A. Basset, La langue Berbere, in Handbook of African Sanguages, Oxford 1952, 69-70.

J. Despois (E.I.2)/ এ.কে. ইয়াকুব আলী

আওতাদ (اوتاد) ঃ 'আ. 'ওয়াতাদ' (وتد)-এর ব. ব.। ওয়াতাদ-এর শাব্দিক অর্থ কীলক, যথা তাঁবুর কীলক, অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত কীলক। ক্রিয়ারূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়, যথা 'ওয়াতাদ্‌তুহু' (وتدته ঃ আমি উহাকে কীলক লাগাইয়া মজবুত করিয়া দিলাম)। কুরআন শরীফে (৭৮ ঃ ৭) পাহাড়সমূহকে পৃথিবীর আওতাদ (কীলকরাজি) বলা হইয়াছে। রূপক (استعارة) হিসাবে আওতাদ কোন অঞ্চলের শক্তিশালী, প্রধান ব্যক্তিগণ বা রাজদরবারের অমাত্যবর্গকে বুঝায়। এই রূপক অর্থে কুরআন মাজীদে (৩৮ ঃ ১২, ৮৯ ঃ ১০) ফির্'আওনকে যুল-আওতাদ (ذوالاوتاد) বলা হইয়াছে (আয্-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, ৩খ., ৩৬২)।

সূফীদের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক জগতের কৃতিত্বসম্পন্ন অদৃশ্য ব্যক্তিগণের (رجال الغيب দ্র. গায়ব) যাঁহারা ৩য় স্তরের ওয়ালী (ولى), তাহাদেরকে আওতাদ 'উমদ (একবচন 'আমূদ [عمود = স্তম্ভ]) বলা হয়। আল্লাহ্র ওয়ালীগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চে আছেন কু'ত্ব (দ্র. আব্দাল)। তাঁহার নির্দেশানুযায়ী আওতাদ স্ব স্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবে বিশ্বজগতের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন (দ্র. ওয়ালী)। এতদ্ব্যতীত কু'ত্‌ব, আওতাদ ইত্যাদি স্তরের ওয়ালীগণের মাধ্যমেই বিশ্ববাসীর উপর আল্লাহ্র করুণা বিভিন্নরূপে বর্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক যুগেই তাহারা পৃথিবীতে বিদ্যমান (আল-গাযালী, আল-মুন্কিয, পৃ. ৭৭)। আওতাদের সংখ্যা সম্পর্কে সূফী শায়খগণ একমত নহেন। ওয়ালীগণ আধ্যাত্মিক মর্যাদার যত উচ্চ স্তরেই উপনীত হউন না কেন, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও অন্যান্য নবী অপেক্ষা পদমর্যাদায় নিম্ন স্তরের।

'ইল্মুল 'আরূদ' (عروض)-এর পরিভাষায় আওতাদ শব্দ আরবী কবিতার চরণের বিভিন্ন অংশের গঠন প্রকৃতি বুঝায়। ইহার বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'আরূদ শীর্ষক নিরন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম বির-রাস্মিল উছমানী, মুদ্রণ কায়রো তা.বি.; (২) আয্-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, কায়রো ১৯৬৬, ৩খ.; (৩) আল-বায়দাবী, আন্ওয়ারুত্ তান্যীল ওয়া আস্রারুত তাবীল, কায়রো ১৯২৩; (৪) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, জামি'উল বায়ান 'আন তাবীলি আয়িল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৪, ১২খ.; (৫) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আল-মুস্নাদ, কায়রো তা.বি., ১খ., ১১২; (৬) আবূ নুআয়ম আল-ইসফাহানী, হিল্য়াতুল আওলিয়া, কায়রো ১৯৩২, ১০খ.; (৭) আবূ তালিব আল-মাক্কী, কূতুল কুলূব, কায়রো ১৯৬১, ২খ.; (৮) আবূ হামিদ আল-গাযালী, আল-মুনকিয মিনাদ-দালাল, ইং. অনু. R. J. McCarthy S. J., Boston তা. বি.; (৯) ঐ লেখক, ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, কায়রো ১৩৪৬ হি., ৪খ.; (১০) আল-হুজবীরী, কাশ্ফুল মাহজূব, অনু. R.A. Nicholson, Leyden ১৯১১; (১১) ইব্নুল আরাবী, ফুতূহাত মাক্কিয়্যা, ২খ., ৯; (১২) হাসান আল-আদাবী, আন্-নাফাহাতুশ্-শাযিলিয়্যা, ২খ., ৯৯প.; (১৩) আল-ফীরূযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, কায়রো ১৯২৫, ৪খ.; (১৪) আল-জুর্জানী, আত্-তা'রীফাত, সম্পা. G. Flugel, Leipzig 1845; (১৫) আত-তাহানাবী, আল-কাশ্শাফ, বৈরূত ১৯৬৬; (১৬) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ শানাব, তুহ্ফাতুল আদাব ফী মীযানি আশ্'আরিল 'আরাব, প্যারিস ১৯৫৪; (১৭) দা. মা. ই., লাহোর ১৩৯৬/১৯৭৬, ১৩খ., পৃ. ২৭৮-৩০৭, বিশেষত ২৮০-৮৫; (১৮) Mohammed Ben-Brahm, La Metrique arabe, Paris 1907; (১৯) Trumelt, Les Saints de l'Islam, Paris 1881; (২০) L. Massignon, Passion d'al-Hallaj, p. 754; (২১) ঐ, লেখক, Issai, পৃ. ১১২; (২২) Asin Palacias, El Mistico Murciano Abenarabi, ii, Madrid 1926; (২৩) J.W. Mcpherson, The Movlids of Egypt, Cairo 1941.

ডঃ মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

আওনী (দ্র. মুহাম্মাদ, ২য়)

আওদাগোস্ত অথবা আওদাগোশ্ত (اودغوست বা اودغوشت) ঃ আফ্রিকার একটি শহর, অধুনা ইহার অস্তিত্ব নাই। আল-বাক্রীর মতে ইহা নিগ্রোদের দেশ এবং সিজিলমাস্সার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। মরূদ্যান হইতে ইহা প্রায় ৫০ দিনের এবং ঘানা হইতে ১৫ দিনের পথ ছিল। Barth মনে করেন, ইহা নিশ্চয় ১০°-১১° দ্রাঘিমা পশ্চিম এবং ১৮°-১৯° অক্ষাংশ উত্তর-এর মধ্যে, কসার (Ksar) ও বার্কা (بركة)-র অনতিদূরে অর্থাৎ ফরাসী মৌরিতানিয়ার তিজিক্জা ঘাঁটির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

ঘানা রাজ্যের উত্তর সীমান্তে যেনাগা (সান্হাজা) গোত্র কর্তৃক প্রথমে বাণিজ্য উপনিবেশ হিসাবে স্থাপিত বলিয়া প্রতিভাত এই শহরটি সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষে যেনাগা গোত্র কর্তৃক ঘানা রাজ্যের এক বিরাট অংশ বিজিত হইবার পর আওদাগোস্ত একটি শক্তিশালী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ৩৫০-৬০/৯৬১-৭১ সালে

উহার শাসক ছিলেন একজন সানহাজী এবং তাঁহার অধীনস্থদের মধ্যে ৩০ জনের বেশী ছিল নিগ্রো সামন্ত, আর তাঁহার সাম্রাজ্যের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যুগ্ম পরিমাণ ছিল ৬০ দিনের পথ। পরবর্তী শতাব্দীতে আল-মুরাবিত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইব্ন ইয়াসীন কর্তৃক আওদাগোস্ত আক্রান্ত হয়। প্রচণ্ড আক্রমণে শহরটি অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয় এবং ইহার অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় (৪৪৬/১০৫৪-৫)। সেই সময় হইতে যেনাগা গোত্রের ক্ষমতা ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহাদের রাজ্য সুসু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে তাহারা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অথবা অধীনস্থ হইয়া কর প্রদান করিতে বাধ্য হয়। আল-বাকরীর সময়েও (৫ম/১১শ শতাব্দী) আওদাগোস্ত ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী শহর। ইহার বাসিন্দা ছিল সংখ্যায় পর্যাপ্ত এবং তাহারা ছিল মাগ্‌রিবী ও ইফ্‌রীকী আরব, বারবার্ (বের্‌কা-জেন্নাহ, লাওয়াতা, যানাতা, নাফ্‌সা, বিশেষ করিয়া নাফ্‌যাওয়া) এবং নিঃসন্দেহে কৃষ্ণাঙ্গগণ সমন্বিত। শহরটি ছিল বাগান ও খর্জুরকুঞ্জবনের উপকণ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত। শহরের মধ্যে ছিল মসজিদ, বিদ্যালয়, সুদৃশ্য সরকারী ইমারত, মনোরম বাসগৃহ ও কর্মচঞ্চল বাজার। সেখানে মুসলিম দেশসমূহের খাদ্যশস্য ও ফল, আটলান্টিক উপকূল হইতে আনীত মোম জাতীয় অম্বর নামক সুগন্ধি দ্রব্য, তাম্র ও স্বর্ণ তন্তুজাত সামগ্রীর গুরুত্বপূর্ণ বাজার গড়িয়া উঠে এবং সেখানে স্বর্ণরেণু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হইত। আল-ইদ্‌রীসীর সময় হইতে (ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দী) ইহার অবনতির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, জনসংখ্যা হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্য কমিয়া যায় এবং অধিবাসীরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উট পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আওদাগোস্তের বিলুপ্তি এবং সেই স্থানের অধিবাসী যানাতা গোত্রের ক্ষমতার অবসান একই সময়ে ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাক্‌রী, Description de l'Afrique septentrionale, অনু. de Slane, ৩৪৯ ও স্থা.; (২) ইদ্‌রীসী, সম্পা. ও অনু. Dozy and De Goeje, ৩৪; (৩) Barth, Reisen, iv, appendix ix, 602-4 (সা'দীর তারীখুস্ সূদান অনুসারে); (৪) P. Laforgue, Notes sur Aoudaghost, Bull. Soc. Geog. Oran, 1943; (৫) R. Mauny, Les ruines de Tegdaost et la question d'Aoudaghost, in Notes Africaines (IFAN), Oct. 1950.

G. Yver (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

আওফাত (اوفات) ঃ অথবা ওয়াফাত; ইথিওপীয় ঐতিহাসিকগণের নিকট ইফাত হাওয়াশ উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত ঢালু ভূমিসহ পূর্ব শোয়া (Shoa)-র মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত একটি আবিসিনীয় মুসলিম রাষ্ট্র (১২৮৫-১৪১৫ খৃ.)। সপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র পূর্ব শোয়ায় বিদ্যমান ছিল। সাম্প্রতিক কালে E. Cerulli কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি দলীলমতে ঐ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র (কিংবদন্তী অনুযায়ী যাহার মাখ্‌যূমী রাজবংশ ২৮৩/৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল) যাহার পতন অত্যাসন্ন ছিল, ওয়ালাস্‌মা বংশীয় উপাধিধারী একজন সামন্ত শাসক কর্তৃক ৬৮৪/১২৮৫ সালে বিজিত হইয়াছিল। আদালের যাযাবর রাষ্ট্রসহ শোয়া ও আফারের বিভিন্ন অঞ্চলকে পদানত করিবার উদ্দেশে তিনি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইব্ন সাঈদ আওফাত নামে পুনর্গঠিত রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, এই অঞ্চল জাবারা (জাবার্‌তা) নামেও পরিচিত ছিল। ইহা প্রতীয়মান হয়, আওফাত পরপর শক্তিশালী পৌত্তলিক রাজ্য দামুত ও আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্যের করদ রাজ্য হিসাবে গণ্য হইত এবং কোন কোন সময় ইহা স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদাও লাভ করিয়াছিল। উত্তরের শেষ প্রান্তের কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের (হাদিয়া, ফাতাজার প্রভৃতি) পর ইহা একটি ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (buffer state) হিসাবে আবিসিনীয় শক্তির দক্ষিণ দিকের সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক ছিল। আম্‌দা সায়উন-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে হাক্কুদ্দীন পরাভূত হইয়াছিলেন এবং আওফাত আবিসিনিয়ার করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সমসাময়িক কালের আল-উমারীর বিবরণ হইতে জানা যায়, আওফাতের সীমা পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যায়লাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল। আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম বিদ্রোহ চলিতেছিল। কিন্তু সা'দুদ্দীন-এর নেতৃত্বে ইহার স্বাধীনতা অর্জনের শেষ প্রচেষ্টা ৮১৭/১৪১৫ সালে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যুতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ফলে এই রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল এবং উহার মূল ভূখণ্ড আবিসিনিয়ার সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইয়ামানে স্বল্পকালীন নির্বাসিত জীবন যাপনের পর যখন ওয়ালাস্‌মা আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাঁহারা পূর্বের আদাল-যায়লা প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি নূতন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। প্রথমে দাকান্ন এবং পরে হারারে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহারা আদাল অথবা যায়লা-র রাজা উপাধি গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-উমারী, মাসালিকুল আব্‌সার, অনু. Gaudefroy-Demombynes, 1927, 1-14; (২) আবুল ফিদা, তাকবীম, ১৬১, অনু. ২খ., ২২৯; (৩) ইব্ন খালদূন (de Slane), i, 262, অনু. ২খ., ১০৭-৯; (৪) কাল্‌কাশান্দী, সুব্‌হ, ৫খ., ৩২৫-৩৩২; (৫) মাক্‌রীযী, আল-ইল্‌মাম বি-আখ্‌বারি মান বি-আর্‌দিল হাবাশা মিন মুলূকিল ইসলাম, কায়রো ১৮৯৫ খৃ.; (৬) E. Cerulli, Studi Etiopici, ১খ., ৫প.; (৭) ঐ লেখক, Documenti Arabi per la Storia dell Etiopia, Mem. Linc., 1931; (৮) ঐ লেখক, II Sultanato dello Scioa nel Secolo XIII, Ressegna di Studi Etiopici, 1941, 5-42; (৯) J. Perruchon, Histoire des Guerres d' Amda S. yon, JA, 1889; (১০) J.S. Trimingham, Islam in Ethiopia, 1952, 58-60, 67-75.

J.S. Trimingham (E.I.²)/ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

'আওফ ইবনুল হারিছ (عوف بن الحارث) ঃ আল-আনসারী সাহাবী (রা)। মদীনার খায্‌রাজ গোত্রের নাজ্জার শাখাসম্ভূত, পিতার নাম হারিছ ইব্ন রিফা'আ এবং মাতার নাম 'আফ্‌রা' বিন্ত উবায়দ ইব্ন ছা'লাবা, যিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। যে ছয়জন আনসার নবুওয়াতের একাদশ

বর্ষে মক্কায় হজ্জের মৌসুমে নবী করীম (স)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন 'আওফ ছিলেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি তাঁহার সেই পাঁচ সঙ্গীসহ মদীনায় ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়াছিল (ইব্ন সা'দ, ১খ., ২১৯)।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে আবার রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য তিনি অন্য এগার ব্যক্তির সহিত মক্কায় আগমন করেন এবং রাত্রিবেলা মিনায় আকাবার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কাহাকেও শরীক করিবেন না, চুরি করিবেন না, ব্যভিচার করিবেন না, কাহাকেও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিবেন না এবং সৎ কাজে তাঁহার (রাসূলুল্লাহ্র) অবাধ্য হইবেন না (ইব্ন সা'দ, ১খ., ২২০)। ইহাই বায়'আত-ই 'আকাবা-ই উলা বা আকাবার প্রথম আনুগত্যের শপথ বলিয়া পরিচিত।

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা)-এর নেতৃত্বে পঁচাত্তর ব্যক্তির সহিত তিনি আবার হজ্জ পালন করিবার জন্য মক্কায় আগমন করেন এবং পূর্ববর্তী বৎসরের সেই স্থানেই সকলের সহিত তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়া আকাবার দ্বিতীয় আনুগত্য শপথেও শরীক হন।

বদর যুদ্ধে তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতা মু'আয ও মু'আওবিযসহ অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃগণও এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। যুদ্ধের সময় যখন উভয় পক্ষ সারি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল তখন মুশরিকদের মধ্য হইতে শায়বা ইব্ন রাবী'আ, 'উতবা ইব্ন রাবী'আ ও ওয়ালীদ ইব্ন 'উত্বা সম্মুখে আসিয়া মুসলিমগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে মুসলিম পক্ষে আনসার হইতে মু'আয, মু'আওবিয ও 'আওফ এই তিন ভাই তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হন (ইব্ন সা'দ, ২খ., ১৭)। মুশরিকদের সহিত প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুহাজিরগণ অবতীর্ণ হইবেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই অভিপ্রায় ছিল। অপরপক্ষে মুশরিকগণও চাহিতেছিল তাহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা কুরায়শদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে। তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের তিন ভাইয়ের এই বীরোচিত উদ্যমের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদেরকে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দিলেন।

অতঃপর এক সময় 'আওফ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কোন কার্যে সর্বাপেক্ষা বেশী খুশী হন তাহা জানিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ কোন পোশাক পরিধান না করিয়াই জিহাদের ময়দানে শত্রুর রক্তে বান্দাকে হাত রঙীন করিতে দেখিলে" (ইদ্রীস কান্ধহ্লাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., ৫৬১)। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লৌহবর্ম খুলিয়া ফেলিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করেন। এই যুদ্ধেই তাঁহার দুই ভ্রাতা মু'আয ও মু'আওবিয (রা) আবূ জাহ্লকে হত্যা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২১৯, ২খ., ১৭, ৩খ., ৪৯২, ৮খ., ১৬৪; (২) শিহাবুদ্দীন ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৪২; (৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮, ৩খ., ৩২৩; (৪) ইদ্রীস কান্ধহ্লাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ., ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৭, ৫৪৮, ৫৬১।

ডঃ আবদুল জলীল

আল-'আওফী (العوفى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন তাহির ইব্ন উছমান আল-'আওফী আল-বুখারী আল-হানাফী, ষষ্ঠ হিজরী শতকের শেষাংশের এবং সপ্তম হিজরী শতকের প্রারম্ভ কালের প্রখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার উপাধি কোথাও নূরুদ্দীন, কোথাও সাদীদুদ্দীন এবং কোথাও জামালুদ্দীন বলিয়া উল্লেখ আছে। ফারসী ভাষায় তাঁহার প্রশস্তি রচয়িতা তাঁহার সমসাময়িক জনৈক লেখক তাঁহার উপাধি জামালুদ্দীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তবে আরবী ভাষায় তাঁহার প্রশস্তি রচয়িতা জনৈক লেখক সাদীদুদ্দীন উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মশহুর সাহাবী আবদুর রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-এর বংশধর ছিলেন। এই কারণে তাঁহার বংশ 'আওফী নিস্বা (সম্বন্ধবাচক উপনাম) গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তিনিও এই উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তাঁহার পিতামহ কাদী শারাফুদ্দীন আবূ তাহির ইয়াহ্য়া ইব্ন 'উছমান আল-'আওফী মা-ওয়ারাউন নাহর-এর অন্যতম খ্যাতনামা আলিম ছিলেন এবং রিজালশাস্ত্রে (হাদীছের সনদে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জ্ঞান) ও হাদীছ বর্ণনাকারিগণের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণে (জার্হ ওয়া তা'দীল) দক্ষ ছিলেন। তাঁহার মাতুল শারাফুয্ যামান মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন দিয়াউদ্দীন আদনান সুরখাকাতী একজন চিকিৎসক ছিলেন যিনি মা-ওয়ারাউন নাহ্র-এর আফ্রাসিয়াব বংশ অর্থাৎ খান বংশের জনৈক বাদশাহ কালীজ তামগাজ খান ইবরাহীম ইবনুল হুসায়ন-এর সভাসদ ও বিশেষ চিকিৎসক ছিলেন।

'আওফী বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই শিক্ষালাভ করেন (তাঁহার জন্মের সঠিক তারিখ অজ্ঞাত)। অতঃপর তিনি শিক্ষা সমাপ্তির জন্য ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের দর্শনেচ্ছায় মা-ওয়ারাউন নাহ্র, খুরাসান, হিন্দুস্তান, সামারকান্দ, আমুই (আমূল), খাওয়ারিয্ম, নীশাপুর, হিরাত, ইস্ফাযার, আস্ফারাইন, শাহ্র-ই নাও, নাসা, সীস্তান, ফারাহ, লাহোর, গায্নী, খামবায়াত [ক্যাম্বে] (এখানে তিনি কিছুকাল কাদীর পদে সমাসীন ছিলেন) এবং নাহ্রওয়াল্লাহ ও দিল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে একাধিকবার সফর করেন। তিনি বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্যে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করেন। অধিকন্তু তিনি সমসাময়িক অনেক রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তাদের দরবারেও মর্যাদা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বুখারায় সম্ভ্রান্ত হানাফী বংশের অন্তর্ভুক্ত বুর্হান পরিবারের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মধ্যে ইমাম বুরহানুল ইসলাম তাজুদ্দীন উমার ইব্ন মাস'উদ ইব্ন আহমাদ ও ইমাম রুক্নুদ্দীন মাস'উদ ইব্ন আহমাদ। শেষোক্ত জন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন এবং তিনি ৬১৭/১২২০ সনে বুখারায় মোঙ্গল হামলায় শহীদ হন। অপর একজন শিক্ষক ছিলেন যশস্বী সূফী শায়খ মাজদুদ্দীন আবূ সা'দ শারাফ ইব্ন মুআয়্যিদ ইব্ন আবুল ফাতহ আল-গালিব আল-বাগদাদী আল-খাওয়ারিয্মী, যিনি জুমাদাল উখ্রা ৬০৭/ ১২১০-এর শেষদিকে খাওয়ারিয্ম-এ নিহত হন।

তাঁহার প্রথম সফর ছিল সামারকান্দ-এ ৫৯৭/ ১২০১ সালে। সেখানে তিনি কালীজ তাম্গা খান-এর পুত্র সুলতানুস সালাতীন নামে সমধিক পরিচিত কালীজ আর্সালান খাকান নুস্রাতুদ্দীন উছমান ইব্ন ইব্রাহীম-এর নথিপত্রাদি বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং সুলতানের সহিত সাহিত্যালোচনা করিতেন। ৬০০/১২০৩ সালে তিনি খুরাসানের অন্তর্গত নাসা শহরে, ৬০৩/১২০৬ সালে নীশাপুরে এবং ৬০৭/১২১০ সালে ইস্ফাযারে ছিলেন। খুরাসান যাওয়ার পথে দস্যু কর্তৃক তিনি লুণ্ঠিত হন। অতঃপর তিনি পদব্রজে শূন্য হস্তে আস্তারাবাদ ও খাওয়ারিয্ম-এর মধ্যবর্তী শাহ্র-ই নাও-এ পৌঁছেন। ঐ এলাকার সুপ্রসিদ্ধ আমীর নীল বর্ণের জামা পরিহিত নুস্রাতুদ্দীন তাঁহাকে সাহায্য করেন। সম্ভবত ৬০৭ হিজরীতে তিনি মোঙ্গল হামলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সিন্ধু গমন করেন এবং নাসিরুদ্দীন কুবাচার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ৬০২/১২০৬ হইতে ৬২৫/১২২৭ সাল পর্যন্ত শিহাবুদ্দীন কিংবা মুইয্যুদ্দীন গোরীর নিযুক্ত সিন্ধুর শাসনকর্তা। মোঙ্গল হামলার বিভীষিকার সময়ে খুরাসানের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় এবং বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ৬১৭/১২২০ সালে তিনি কুবাচার অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং ৬২৫/১২২৭ সাল পর্যন্ত ভাওয়ালপুরের অন্তর্গত কুবাচার শাসনাধীন 'উচ' নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি 'লুবাবুল আল্বাব' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং কুবাচার মন্ত্রী ইয়ামীনুল মুল্ক ফাখ্রুদ্দীন আবূ বাক্র আল-আশ্'আরীর নামে উৎসর্গ করেন।

৬২৫/১২২৭ সালে সুলতান শাম্সুদ্দীন ইল্তুত্মিশ, যিনি গোরী বংশেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং দিল্লীতে শাম্সী শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নাসিরুদ্দীন কুবাচার সংগে যুদ্ধ করার জন্য সিন্ধুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। নাসিরুদ্দীন কুবাচা স্বীয় সেনাবাহিনী ও ধনরত্নসহ ভাক্কার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্গটি সিন্ধু নদের মধ্যভাগ শিকারপুরের নিকটবর্তী সুক্কর (سکر) ও রোহ্ড়ীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। সেই দুর্গে তিনি অবস্থান করিতে থাকেন। শাম্সুদ্দীন ইল্তুত্মিশ স্বীয় উযীর নিজামুদ্দীন কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাক্র আল-জুনায়দীকে ভাক্কার দুর্গ অবরোধ করিতে পাঠান। নাসিরুদ্দীন কুবাচার পরাজয়ে দুর্গের পতন হইলে কুবাচা স্বীয় পুত্র আলাউদ্দীন ফীরোয শাহের মাধ্যমে তাঁহার ধনরত্ন ইল্তুতমিশের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহেন।

ইল্তুত্মিশ দাবি করিলেন, কুবাচা স্বয়ং যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি এই অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। সোমবার ১৯ জুমাদাল উখ্রা রাত্রে দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া তিনি নৌকাযোগে সিন্ধু নদ পাড়ি দিলেন, কিন্তু নৌকাডুবি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ধনৈশ্বর্য এবং সিন্ধুও সুলতান শাম্সুদ্দীনের করতলগত হয়।

যেসব লোক নাসিরুদ্দীন কুবাচার সঙ্গে ভাক্কার দুর্গে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আওফীও ছিলেন। সেই সময় কুবাচা তাঁহাকে জাওয়ামিউল হিকায়াত ওয়া লাওয়ামিউর রিওয়ায়াত' নামক গ্রন্থ রচনায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। আওফী ভাক্কার দুর্গের পতন ও নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ঐ গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত করেন এবং নিজামুল মুলক জুনায়দীর নামে উৎসর্গ করেন। ৬২৫/১২২৭ সালের পরে আওফী দিল্লীতে ইলতুত্মিশের অধীনে চাকুরী করিতেন। শেষ ঘটনাটি যাহার বিষয়ে জাওয়ামিউল হিকায়াত ওয়া লাওয়ামিউর রিওয়ায়াতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল, ইলতুত্মিশের বিরুদ্ধে লাখনৌতির শাসনকর্তা মালিক ইখ্তিয়ারুদ্দীন দাওলাত শাহ বুলুক্কা ইব্ন হিশামুদ্দীন বা গিয়াছুদ্দীন খাল্জীর বিদ্রোহ এবং ৬২৮/১২৩০ সালে তাঁহার মৃত্যু। ইহার পর আওফীর সম্বন্ধে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

মুহাম্মাদ আওফী সমসাময়িক কালের ইরানের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনা 'লুবাবুল আল্বাব'। ইহা প্রথম হইতে সপ্তম হিজরীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ইরানী কবিদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আলেখ্য। বেশ কয়জন প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের কবিতা সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা ঐ পুস্তকটির মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। এই পুস্তকটিতে ২৯৯ জন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কিছু কবিতা সংকলন পাওয়া যায় এবং ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের চারিটি অধ্যায়ে রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী ও পণ্ডিতগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের চারিটি অধ্যায়ে কবিদের জীবনচরিত ও কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আওফী এই গ্রন্থটি ৬১৮/১২২১ সালে হিন্দুস্তানে রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ জাওয়ামিউল হিকায়াত ওয়া লাওয়ামিউর রিওয়ায়াত চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতিটি খণ্ডে পঁচিশটি করিয়া অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থটি বহু মূল্যবান ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির আকর। তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে ঐ সকল তথ্যের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই কালে কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের কাল অবধি পৌঁছায় নাই। সেইজন্য এই গ্রন্থটিকে ইসলাম, ইরান ও হিন্দুস্তানের ইতিহাসের এবং গ্রন্থকারের কাল পর্যন্ত প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনচরিত সম্বন্ধে একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলা যাইতে পারে। পুস্তকটির শেষাংশে উল্লিখিত ঘটনাটি যেহেতু ৬২৮/১২৩০ সালের— ইহাতে প্রতীয়মান হয়, পুস্তকটি সেই সময়কার রচনা। অনেক পাণ্ডুলিপি ইরানে, তুরস্কে, হিন্দুস্তানে ও ইয়ূরোপের বহু পাঠাগারে রক্ষিত আছে। এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুস্তকটি ছাপা হয় নাই। আওফীর লেখা অন্য একটি আরবী পুস্তক 'আল-ফার্জু বা'দাশ শিদ্দা'-এর ফার্সী অনুবাদ কাদী আবূ আলী মুহসিন ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন দাঊদ আত্-তানূখী (মৃ. ৩৮৪ হি.) করিয়াছিলেন। আওফী স্বয়ং জাওয়ামিউল হিকায়াত-এ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উক্ত পুস্তকের ফার্সী অনুবাদ করিয়াছেন এবং উক্ত পুস্তকে তাঁহার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে (এই অনুবাদক [নাফীসী] ৬২০/১২২৩ সালে খাম্বায়াত-এ ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানে কাদী ছিলেন)। কিতাবুল ফার্জ বা'দাশ শিদ্দা-এর ফার্সী অনুবাদ দ্বিতীয়বার করিয়াছিলেন হুসায়ন ইব্ন আস্'আদ ইব্ন হুসায়ন মু'আয়্যিদী দাহিস্তানী আওফীর ইন্তিকালের পঞ্চাশ বৎসর পর হিজরী অষ্টম শতকের শেষের দিকে। এই অনুবাদটি বর্তমানেও বিদ্যমান আছে, কিন্তু আওফীর অনুবাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ আল-আওফী, লুবাবুল আলবাব, প্রথমার্ধ, Edward Brown, Leiden ১৯০৬ খৃ., দ্বিতীয়ার্ধ, Edward

Brown, Leiden ১৯০৩ খৃ.; (২) মুহাম্মাদ নিজামুদ্দীন, Introduction to the Jawami ul Hikayat wa Lawami ul Riwayat of Sadidu'd din Muhammad al Awfi, London ১৯২৯ খৃ.; (৩) মুহাম্মাদ আল-আওফী, মুন্‌তাখাব জাওয়ামিউল হিকায়াত ওয়া লাওয়ামিউর রিওয়ায়াত, মুদ্র. মুহাম্মাদ তাকী বাহার, তেহরান ১৯২৩ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, ঐ পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায়, মুদ্র. মুহাম্মাদ রামাদানী, তেহরান ১৩৩৫ হি.; (৫) ঐ লেখক, কিতাবু লুবাবিল আলবাব, সম্পূর্ণ গ্রন্থ টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসহ, সম্পা. সাঈদ নাফীসী, তেহরান ১৩৩৫ হি.; (৬) মুহাম্মাদ আল-আওফী সাদীদুদ্দীন, জাওয়ামিউল হিকায়াত ওয়া লাওয়ামিউর রিওয়ায়াত, ১খ., মুদ্র. মুহাম্মাদ আমীন, তেহরান ১৩৩৫ হি.; (৭) Encyclopaedia of Islam, নূতন সং., ১খ., ৭৬৪, ৭৬৫, আওফী নিবন্ধ।

সাঈদ নাফীসী (দা.মা.ই.)/মোহাম্মদ গোলাম রসুল

আওয (দ্র. ইওয়ায)

আল-আওযা'ঈ (الأوزاعى) ঃ আবূ 'আম্‌র 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আম্‌র (র) ফিক্‌হশাস্ত্রের সিরীয় চিন্তাগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার নিস্‌বা দামিশ্‌কের শহরতলী আল-আওযা' হইতে উদ্ভূত। দক্ষিণ আরবের একটি গোত্র বা কতিপয় গোত্রের সমষ্টিগত নাম হইতে এই আল-আওযা শব্দটির উৎপত্তি। এই গোত্রগুলি এইখানে বাস করিত (ইব্‌ন আসাকির, তারীখ দিমাশ্‌ক, সম্পা. আল-মুনাজ্জিদ, ১৯৫৪, ২খ., ১৪৪; ইয়াকূত, ১খ., ৪০৩ প.)। তাঁহার এক পূর্বপুরুষকে ইয়ামানে বন্দী করা হইয়াছিল (আল-মাসঊদী, মুরূজ, ৬খ., ২১৪)। তিনি দামিশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয় এবং আল-ইয়ামামাতে তিনি তাঁহার অধ্যয়নের অন্তত কিছু অংশ সমাধা করিয়াছিলেন এবং সেইখানে সরকারী চাকুরী লইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বৈরূত চলিয়া যান এবং সেইখানে ১৫৭/৭৭৪ সালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। বৈরূতের নিকট হান্‌তুস গ্রামে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এইখানে তাঁহার মাযার এখনও লোকেরা যিয়ারত করিয়া থাকে (Heffening, পৃ. ১৪৮, টীকা ৪)।

আল-আওযা'ঈ তাঁহার রচনাসমূহ শিষ্যদের দ্বারা শ্রুতলিখনের সাহায্যে লিখাইয়াছিলেন। তাঁহার রচনাগুলি মধ্যে ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২২৭-এ কিতাবুস সুনান ফিল-ফিক্‌হ ও কিতাবুল মাসাঈল ফিল-ফিক্‌হ-এর উল্লেখ আছে, মূলরূপে সংরক্ষিত হয় নাই। তাঁহার 'মুস্‌নাদ' (হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ১২০০৬) এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকের মত সম্ভবত পরবর্তী কালে রচিত হয়। যাহা হউক, আল-আওযাঈর মতামত ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে ঃ (১) আবূ ইয়ূসুফের "আর-রাদ্দ 'আলা সীরাতিল আওযা'ঈ" (কায়রো ১৩৫৭ হি., অধিকন্তু শাফি'ঈর 'কিতাবুল উম্ম', বূলাক ১৩২৫ হি., ৩০৩-৩৩৬, তাঁহার মন্তব্যসহ; তু. হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ২৫১), আবূ হানীফার (র) মতামত সম্পর্কে আল-আওযা'ঈর সমালোচনার খণ্ডন; আল আওযা'ঈর কিতাবুস্ সিয়ার-এর মূল কপি যাহা তাঁহার জনৈক প্রত্যক্ষ শিষ্য দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং যাহা একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (Heffening, ১৪৯ প.)। (২) আত্-তাবারীর কিতাব ইখ্‌তিলাফিল ফুকাহা (সম্পা. F. Kern, কায়রো ১৯০২; ঐ J. Schacht, Leiden ১৯৩৩)।

সাধারণত আল-আওযাঈর মতামত ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রে গৃহীত প্রাচীনতম সমাধানের প্রতিনিধিত্ব করে। আল-আওযাঈর মতামতের প্রাচীন রীতি দ্বারা ইহাই সম্ভবত প্রমাণিত হয়, তিনি আবূ হানীফা (র)-এর সমসাময়িক হইলেও তাঁহার পূর্ববর্তীদের শিক্ষাকেই সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার পূর্বেকার যুগের লোক হিসাবে কেবল নামেই আমাদের নিকট পরিচিত। তাঁহার পদ্ধতিগত যুক্তিসমূহ সুস্পষ্ট হইলেও তাহা প্রাথমিক পর্যায়ের এবং ইহা হাদীছের উপর তাঁহার নির্ভরশীলতা দ্বারা অতিশয় প্রভাবান্বিত। তিনি 'সর্বোৎকৃষ্ট যুগ' (خير القرن)-কে সীমিত রাখেন ১২৬/৭৪৪ সালে উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয়ই ইয়াযীদের পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালীদ-এর হত্যা এবং তাঁহার পরে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত, যাহাতে উমায়্যা আমলের অধিকাংশ সময় ইহার আওতায় পড়ে।

আল-আওযাঈ তখন পর্যন্ত বিন্দুমাত্র উমায়্যা বিরোধী মনোভাব দেখান নাই। অথচ এই ধরনের ভাব প্রকাশ আব্বাসীদের শাসনামলে প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহা সম্ভব, আব্বাসীদের প্রতি তাঁহার মনোভাব ছিল আবেগমুক্ত। আব্বাসী বিজয়ী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতকার সম্পর্কিত একটি কাহিনীতে এই বিষয়টি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, যদিও ইহা উপকথা বলিয়াই মনে হয় (তু. Barthold, Isl., ১৮খ., ২৪৪)। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নূতন শাসকদের, বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ খলীফা শাহ্‌যাদা আল-মাহ্‌দীর, সম্ভবত যাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল, শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক বন্দী, বৈরূতের জনসাধারণ ও অন্যান্য লোকদের পক্ষ হইতে তিনি যে আবেদনপত্রসমূহ এই শাহযাদা, খলীফা আল-মানসূর ও রাজদরবারের অন্যান্য প্রভাবশালী লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন (ইব্‌ন আবূ হাতিম, তাকদিমাতুল মা'রিফা, ১৮৭ প.) সেইগুলি নিঃসন্দেহে অকৃত্রিম। ইব্‌ন সুরাকা (উমায়্যা দ্বিতীয় ওয়ালীদ ও আব্বাসী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর পক্ষে দামিশ্‌ক-এর গভর্নর; তু. আস্-সাফাদী, উমারা দিমাশ্‌ক, সম্পা. আল-মুনাজ্জিদ, দামিশ্‌ক ১৯৫৫, পৃ. ৫৫) আল-আওযা'ঈকে বৈরূত হইতে দামিশ্‌ক-এ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া যে ধারণাটি প্রচারিত (ইব্‌ন আবূ হাতিম, ঐ, ১৮৭), আল-আওযা'ঈর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অল্প যাহা কিছু জানা যায়, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন।

ইয়াকূত (১খ., ৭৮৫ প. দ্র., বৈরূত) আল-আওযা'ঈর কিছু সংখ্যক শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের মধ্যে আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মায়্যাদ (মৃ. ২০৩ হি.) প্রসিদ্ধ। ফিক্‌হশাস্ত্রের অন্যান্য মাযহাবের উদ্ভব যেইভাবে হইয়াছিল, অনুরূপভাবে সিরীয়দের এই প্রাচীন মাযহাবটি আল-আওযাঈর মাযহাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহা কেবল সিরিয়াতেই বলবৎ ছিল না, বরং আল-আনদালুসে (ইসলামী স্পেনসহ মাগ্‌রিবে)-ও প্রচলিত ছিল। তবে পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় (নবম) শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে আল-মাগ্‌রিবে ও ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষের দিকে সিরিয়াতে ইহা মালিকী মাযহাব দ্বারা অপসারিত হয় (J. Lopez Ortiz, La recepcion

de la escuela malequi en Espana, Madrid 1931, 16 ff.; R. Castejon Calderon, Los juristas hispano-musulmanes, Mdrid 1948, 32, 43 ff.; Heffening, 148; Barthold, ঐ)। বিতর্কে আল-আওযাঈ ইমাম মালিককে কিরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন সেই সংক্রান্ত উপাখ্যান হইতে (ইব্ন আবূ হাতিম, ঐ, ১৮৫ প.) দুইটি মায্হাবের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৬/২ খ., ১৮৫; (২) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, ২৪৯; (৩) আত-তাবারী, ৩খ., ২৫১৪; (৪) ইব্ন আবূ হাতিম আর-রাযী, তাক্দিমাতুল মাআরিফ, হায়দরাবাদ ১৯৫২, ১৮৪ প.; (৫) ঐ লেখক, কিতাবুল জাব্হ ওয়াত্-তা'দীল, ২/২, হায়দরাবাদ ১৯৫৩ খৃ., ২৬৬ প.; (৬) আবূ নুআয়ম, হিল্য়াতুল আওলিয়া, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ৪খ., ১৩৫ প; (৭) আস-সাম'আনী, ৫৩ প.; (৮) ইব্ন আসাকির, তারীখ দিমাশ্ক (পাণ্ডুলিপি; তু. ইয়ূসুফ আল-ইশ্শ ফিহরিস মাখতূতাত দারিল কুতুব আয-যাহিরিয়্যা [তারীখ], দামিশ্ক ১৯৪৭, পৃ. ১১৩); (৯) আন্-নাওয়াবী, তাহ্যীবুল আস্মা, সম্পা. Wustenfeld, Gottingen ১৮৪২-৪৭, পৃ. ৩৮২ প.; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, দ্র. আবদুর রাহ্মান; (১১) আযা-যাহাবী, তায্কিরাতুল হুফ্ফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৩ হি., ১খ., ১৬৮ প.; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো ১৩৫১-৮ হি., ১০খ., ১১৫ প.; (১৩) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, তাহ্যীব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৬খ., ২৩৮ প.; (১৪) নামবিহীন, মাহাসিনুল মাসাঈ, সম্পা. শাকীব আর্সালান, কায়রো ১৩৫২ হি. (তু. O. Spies, ZS, 1935, 189 প.); (১৫) W. Heffening, Das islamische Fremdenrecht, Hanover ১৯২৫, ১৪৮ প.; (১৬) O. Spies, Beitrage zur arabischen Literatur geschichte, Leipzig 1932, 522 প.; (১৭) J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudencc, Oxford 1953, নির্ঘণ্ট, দ্র. Auzai.

J. Schacht (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইউনুস

'আওয়ালী (عوذلى) ঃ ব.ব. 'আওয়াযিল, কথ্য 'আওয়ায়িল্লা, তু. আল-আওদ; (ذ -এর স্থলে ل আল-হাম্দানী স্থা.)। (ক) একটি গোত্রের বংশগত উপাধি, (খ) পশ্চিম এডেনের একটি জেলা (আয়তনে প্রায় ২০০০ বর্গ কিলোমিটার, অধিবাসী ১০,০০০)। ইহা নিম্ন ইয়াফিঈ (পশ্চিম), ফাদলী (দক্ষিণ) ও আওলাকী (পূর্ব) এলাকার মধ্যবর্তী স্থান। উত্তরে, ১৯৩৪ সালের "স্থিতাবস্থা সীমারেখার বাহিরে দাহির (দাহ্র) [জাহির শব্দ হইতে উদ্ভূত, তু. আল-হাম্দানী] ও রাস্সাস (রাজধানী, বায়দা অর্থাৎ মিস্ওয়ারা) জেলা অবস্থিত। দাহিরের অংশবিশেষ (ইহার কেন্দ্র আর্‌য়াবসহ) ও দাছীনা-কে (কুলায়তাসহ) আওযিল্লা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সারব হিম্য়ার ও সারব মাদ্হিজ-এর মধ্যে অন্তরাল হিসাবে সুউচ্চ আল-কাওর (কোর) পর্বত ইহার উত্তর সীমান্তে বিরাজমান (আল-হাম্দানী, ৮০, অনু. Forrer, ১০২ঃ কুর, ভুল স্বরচিহ্নসহ) এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ২০০০ মিটার। মুকায়রাস ও লূদারের চতুর্দিকে (উত্তর কিন্তু আল-কাওর হইতে দক্ষিণ) পাহাড়ের ঢালু স্থানে ও উর্বর মালভূমিতে রপ্তানির জন্য ফল ও শাক-সব্জি উৎপন্ন করা হয়। দেশের একটি প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্য মধু। ইহার জলবায়ু প্রায় উষ্ণ। সুলতান প্রাচীন হায়ছাম গোত্রের শাখা আওয়াসিজ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সেইহেতু তাঁহার বংশগত নাম ইবনুল আওসাজী। তাঁহার বাসস্থান লূদারে (গুদরও বলা হয়)। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পারিবারিক গোলযোগের অবসানে (Landberg, Datina, 1624) দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়। ১৯১২ সালে সালিহ ইব্ন হুসায়ন জিবিল বৃটিশদের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন করেন। স্বাধীন গোত্রগুলি দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশ এবং তাহারা কেবল যুদ্ধের ব্যাপারেই সুলতানকে মানিয়া চলে। সীমান্তবর্তী দেশসমূহের (বিশেষভাবে দাছীনা) স্থানীয় শায়খগণ প্রায় স্বাধীন। যারা নামক স্থানে একটি শারী'আ আদালত এবং জেলাতে দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয় ও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। লূদার ও মুকায়রাসে দুইটি বিমান অবতরণক্ষেত্র আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. von Maltzan, Reise nach Sudarabien, Braunschweig 1873, 275-282 (মানচিত্রসহ); (২) A. Sprenger. Die alte Geographie Arabiens 1875, 206, 269; (৩) C. Landberg, Arabica, iv, 54; (৪) ঐ লেখক, Etudes, ২খ., স্থা., বিশেষত নির্ঘণ্ট, ১৮০৭, ১৮২৮, ১৮৩৪; (৫) Wyman Bury, The Land of Uz, ১৯১১, পৃ. ১০৯, ১৩৭ প. (মানচিত্রসহ); (৬) Doreen Ingrams, A Survey of social and economic conditions in the Aden protectorate, 1949, স্থা. (মানচিত্রসহ)।

O. Lofgren (E.I.[2])/ মোখলেছুর রহমান

আওয়ামী মুসলিম লীগ (عوامى مسلم ليگ) ঃ পাকিস্তান আমলের গোড়ার দিকের বিরোধী দলীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। বৃটিশ যুগের উপমহাদেশীয় মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কয়েকজন প্রবীণ নেতার উদ্যোগে সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এই একই নামে দুইটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠিত হয় উপমহাদেশ বিভাগের দুই বৎসরের ব্যবধানে। সাবেক আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মরহুম মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে সাংগঠনিক কমিটির আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। মূল মুসলিম লীগ সংগঠনের প্রবীণ ও নবীন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত এই সাংগঠনিক কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ। মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান, ঢাকার প্রবীণ আইনজীবী মরহুম সাখাওয়াত হোসেন ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের তৎকালীন সদস্য আইনজীবী মরহুম আলী আহ্মদ খান।

কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই ছিলেন বৃটিশ যুগের মুসলিম ছাত্র ও যুব আন্দোলনের অগ্রসারির নেতা। ১৯৪৯ সালে ২৬ এপ্রিল টাংগাইলে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপনির্বাচন বিজয়ী তরুণ জননায়ক মরহুম শামসুল হক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এই প্রথম কমিটির সাধারণ সম্পাদক। যুগ্মসম্পাদক ছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন খন্দকার মুশতাক আহ্‌মদ ও এ. কে. এম. রফিকুল হোসেন। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী মরহুম ইয়ার মুহাম্মদ খান।

আওয়ামী মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন কালের এই প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী জনাব এ. কে. এম. বশীরের গোপীবাগস্থ রোজ-গার্ডেন ভিলায়। জনাব বশীর ছিলেন কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং দলের এক কালের স্বনামখ্যাত ক্রীড়াবিদ এবং অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। উক্ত সম্মেলনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীসহ প্রায় তিন শত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বিশেষ আমন্ত্রণে সম্মেলনে উপস্থিত হন। সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। শেরে-বাংলা ছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এডভোকেট জেনারেল। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উপলক্ষে কারাগারে আটক থাকায় শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহাকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরের দিনই (২৪ জুন, ১৯৪৯) ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলীয় প্রধান মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী। এই সভায় ক্ষমতাসীন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অনুসৃত নীতিসমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়। মরহুম নূরুল আমীন ছিলেন সে সময় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের উযীরে-আলা তথা মুখ্য মন্ত্রী। উপমহাদেশ বিভাগের সময় জনাব নূরুল আমীন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের স্পীকার। সে সময় অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, আইনবেত্তা ও সাবেক নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা জনাব হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী। মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন ছিলেন সুহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত অবিভক্ত বাংলা মুসলিম লীগ সরকারের একজন প্রবীণ মন্ত্রী। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক-সাহিত্যিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং ইসলামী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক রাজনীতিবিদ জনাব আবুল হাশিম ছিলেন বংগীয় মুসলিম লীগের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। চল্লিশের দশকের শুরু হইতেই বংগীয় মুসলিম লীগ দুইটি উপদলীয় শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একটি উপদলের প্রধান নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম।

জনাব আবুল হাশিমই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই উপদলটির মধ্যমণি। ইসলামের বৈপ্লবিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের প্রশ্নে তাঁহার সুস্পষ্ট বক্তব্য তদানীন্তন মুসলিম তরুণ ও ছাত্রসমাজকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁহার নেতৃত্বে বংগীয় মুসলিম লীগ একটি গতিশীল সংগঠনে পরিণত হয়। ছাত্র ও কর্মীদের বেশির ভাগই ছিল তাঁহার ও শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর সমর্থক। এই গ্রুপটি "শহীদ হাশিম গ্রুপ" নামে পরিচিতি ছিল। মাওলানা ভাসানী এই গ্রুপের সমর্থক ছিলেন।

মুসলিম লীগের দ্বিতীয় উপদলটির নেতা ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দীন। এই গ্রুপটিকে বলা হইত "আকরম খাঁ-নাজিমুদ্দীন গ্রুপ"। জনাব নূরুল আমীন ছিলেন এই গ্রুপের সমর্থক। ইহা ছাড়া মুসলিম লীগের অধিকাংশ রক্ষণশীল নেতা এই গ্রুপটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উপমহাদেশ বিভাগের প্রাক্কালে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ হইতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ইস্তফা প্রদান, উক্ত শূন্য আসনে আবুল হাশিম ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট পূর্বপাক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনে শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম লীগের মধ্যকার বিভেদ আরও তীব্র হইয়া উঠে। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নির্বাচনে ৭৫-৩৯ ভোটের ব্যবধানে খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে পরাজিত হন জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী। আইন পরিষদে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট খাজা নাজিমুদ্দীন অভিষিক্ত হন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রীর পদে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের কাছে প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের রক্ষণশীল দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে শ্রমিক দলের নেতা ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল ৭ সদস্যের শ্রমিক দলীয় মন্ত্রীসভা। এই সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াছিলেন আর্নেস্ট বেভিন এবং অর্থ-দফতরের দায়িত্ব লাভ করেন হিউ ড্যাল্টন। ভারত সংক্রান্ত ও নৌ দফতরের দায়িত্ব পাইয়াছিলেন যথাক্রমে লর্ড পেথিক লরেন্স ও মিঃ আলেকজান্ডার। বাণিজ্য মন্ত্রী হইয়াছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স। এই মন্ত্রীসভার আমলেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাংগনে ১৯৪৫ সালের ২৮ আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বৃটেন পূর্ব প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিলেন শ্রমিক সরকার। ইহারই পটভূমিতে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হইল ভারতে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের প্রধান ইস্যু ছিল উপমহাদেশ বিভাগ এবং মুসলিম প্রধান ও হিন্দু প্রধান অঞ্চলসমূহ লইয়া যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুইটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। এই নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলা মোট ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ দখল করে ১১২টি আসন। অন্যদিকে পাঞ্জাবে ৮৬টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৭৫টি, সিন্ধুতে ৩৫টির মধ্যে পায় ২৮টি, আসামে পায় ৩৪টির মধ্যে ৩১টি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টি আসনের মধ্যে লাভ করে ১৭টি। সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ ছিল 'সীমান্ত গান্ধী' নামে খ্যাত কংগ্রেস সমর্থক খান আবদুল গাফফার খান ও তাঁহার ভাই ডাঃ খান সাহেবের জনপ্রিয়তা। ইঁহারা ছিলেন সীমান্তের লালকোর্তা দলের নেতা।

সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের অভুতপূর্ব বিজয়ই প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীকে নেতা নির্বাচন করে। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালে শেরে বাংলার নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক প্রজা পার্টি ও হিন্দুমহাসভার সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর খাজা নাজিমুদ্দীন কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে বংগীয় প্রাদেশিক আইনসভার বাজেট অধিবেশনে স্পীকার সৈয়দ নওশের আলীর এক রুলিং-এর ফলে খাজা নাজিমুদ্দীনকে পদত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর আর কোন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় নাই। সুহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নির্বাচন-পরবর্তী নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় ৯৩-ক ধারা অনুসারে গভর্নরের শাসন চালু ছিল।

১৯৪৬ সালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বৃটেনের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা এবং উপমহাদেশ বিভাগের মূলনীতি সম্পর্কে শীর্ষ পর্যায়ের আলোচনা। এই উপলক্ষে ঐ বৎসরের ২৪ মার্চ উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার বাণিজ্যমন্ত্রী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি মন্ত্রী-মিশন ভারতে পাঠায়। মিশনের অন্য দুইজন সদস্য ছিলেন ভারত বিষয়ক মন্ত্রী লর্ড পেথিক লরেন্স ও নৌ-দফতরের মন্ত্রী স্যার এ. ভি. আলেকজান্ডার। ১৯৪৬ সালের ৩ এপ্রিল হইতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বৃটিশ মন্ত্রী মিশন মুসলিম লীগ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও শিখ আকালী দলসহ ভারতের তদানীন্তন মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা বিষয়ে এক মাসেরও অধিক সময় ব্যাপিয়া আলাপ-আলোচনা করিলেন। কিন্তু সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন পরিকল্পনা তাহারা উপস্থাপন করিতে পারিলেন না। মুসলিম লীগ উত্থাপিত ভারত-বিভাগ তথা পাকিস্তান পরিকল্পনাও তাহারা গ্রহণ করিলেন না। সর্বশেষে তাহারা ভারতকে 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিনটি গ্রুপ বা অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া একটি কনফেডারেশন ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন।

প্রস্তাবিত 'ক' গ্রুপের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ ছিল ঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ। এই গ্রুপের আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ধরা হইল ১৮৭। তন্মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২০। 'খ' গ্রুপের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু। আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ধরা হইল ৩৫। মুসলিম আসন হইল ২২। 'গ' গ্রুপে ছিল বাংলা ও আসাম। আইন পরিষদের মোট আসন ধরা হইল ৭০। মুসলিম আসন ৩৬। পরিকল্পনায় বলা হইল, গ্রুপগুলি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। ফেডারেল সংবিধান রচনা করিবে একটি কেন্দ্রীয় গণপরিষদ। এই পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন তিনটি গ্রুপের আইন পরিষদসমূহের সদস্যদের ভোটে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় ন্যস্ত করা হইবে। কোন গ্রুপ ইচ্ছা করিলে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে এই রকম ব্যবস্থাও পরিকল্পনায় ছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছিলেন তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি পরিকল্পনাটি সমর্থন করেন। মুসলিম লীগও পরে ইহাতে সম্মত হয়। ইহার ভিত্তিতে মন্ত্রী-মিশন ও ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল লীগ ও কংগ্রেসের সময়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। কথা ছিল মুসলিম লীগ হইতে পাঁচজন ও কংগ্রেস হইতে সাতজন সদস্য লইয়া মোট ১২ সদস্যের মন্ত্রীসভা হইবে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ জুন মন্ত্রীদের নামের যে তালিকা ঘোষণা করা হইল তাহাতে দেখা যায়, মন্ত্রিসভায় চৌদ্দজনের নাম রহিয়াছে এবং কংগ্রেসকে সাতের স্থলে নয়টি আসন দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদান হইতে বিরত থাকিল। ইতোমধ্যে পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবিত গ্রুপভিত্তিক ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে মুসলিম লীগও পরিকল্পনাটি নাকচ করিতে বাধ্য হইল। এই পরিস্থিতিতে লর্ড ওয়াভেল একতরফাভাবে পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের লইয়া ১২ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। ওয়াভেল মুসলিম লীগ সভাপতি কাইদ-ই আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে মন্ত্রিসভায় লীগ প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। জিন্নাহ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে পাঁচজনের নাম পাঠাইলেন। ইঁহারা ছিলেন লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব্ব নিশ্‌তার, গযনফার আলী খান, ইসমাঈল চুন্দ্রীগড় ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ইঁহাদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেন। ফলে কংগ্রেসের ৯ জন ও মুসলিম লীগের ৫জনের সমন্বয়ে মোট ১৪ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। ১৯৪৬ সালের ২৬ অক্টোবর গঠিত হইল এই নূতন লীগ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভায় তফশিলী সম্প্রদায়ের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ব্যতীত পূর্ব বাংলা হইতে অন্য আর কাহাকেও লওয়া হইল না। বংগীয় মুসলিম লীগ হইতে সর্বভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থে ইহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা না হইলেও পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের প্রথম সূত্রপাত হইল প্রশাসনিক ক্ষমতা বণ্টনের এই ঘটনাটির মাধ্যমে।

কেন্দ্র লীগ-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি অনিশ্চিত হইয়া থাকিল। কংগ্রেস গ্রুপ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করায় এবং বৃটিশ সরকার পাকিস্তান প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন বর্জন করিল। রাজনৈতিক এই অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়া শ্রমিক দলীয় সরকার বৃটিশ নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বাংলা, বিহার ও পাঞ্জাবে সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাংগার জের তখনও অব্যাহত ছিল। এই সময় পাঞ্জাবের শিখেরা পাঞ্জাব ভাগ করিয়া পৃথক একটি শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুলিল। এইদিকে হিন্দু মহাসভা বাংলা বিভাগের দাবি তুলিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিলেন। ঘোষণায় বলা হইল, ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন নামক দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন

করা হইবে এবং ৬ জুন (১৯৪৭ খৃ.)-এর মধ্যে লীগ ও কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া বৃটিশ সরকার তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে বলিয়া সরকারী ঘোষণা দেওয়া হইল। বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাব বিভাগ এবং দুই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্তও লওয়া হইল। একই সময়ে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ নামক একজন বৃটিশ আইনবেত্তা সীমানা-নির্ধারণ কমিশিনের প্রধান হইলেন।

কংগ্রেস মাউন্ট ব্যাটেন পারিকল্পনা মানিয়া লইয়া উপমহাদেশ বিভাগে সম্মতি প্রদান করিল। মুসলিম লীগ বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৯৪৬ সালের ৩ জুন দিল্লীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করিল। এই বৈঠকে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের আওতায় একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন এবং সেই অনুসারে উপমহাদেশ বিভাগের দাবি তুলিবার জন্য তীব্র চাপ সৃষ্টি করিলেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী বৈঠকে আবুল হাশিমের বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত পাকিস্তানভিত্তিক মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। আবুল হাশিম ও সুহ্‌রাওয়ার্দী দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৃহত্তর বাংলা গঠনের পরিকল্পনা লইয়া আন্দোলন শুরু করেন। হিন্দু নেতাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাই) ও কিরণ শংকর রায়সহ কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই পরিকল্পনার পক্ষে ছিলেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও হিন্দু মহাসভা ছিল বাংলা বিভাগের প্রবল সমর্থক, অথচ ১৯০৫ সালে তাহারাই বংগ ভংগ রোধের জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বংগীয় মুসলিম লীগের আকরম খাঁ-নাজিমুদ্দীন গ্রুপ বৃহত্তর বাংলা আন্দোলনের পরোক্ষ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নেহেরু ও প্যাটেলসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করায় ইহার অপমৃত্যু ঘটিল। জুলাই মাসে (১৯৪৬) সুহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ঢাকাকে পূর্ববংগ প্রদেশের রাজধানী হিসাবে মনোনীত করার কথা ঘোষণা করিলেন এবং ঢাকা শহরের বিশ মাইল এলাকা এই উদ্দেশে অধিগ্রহণের হুকুম জারী করিলেন। কলিকাতা গেজেটে এই নির্দেশনামাটি প্রকাশিত হয়।

দলীয় সংঘাত ঃ আগস্ট মাসের (১৯৪৭) ৫ তারিখে পূর্ববংগ আইন পরিষদের নেতা নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন বিজয় লাভ করিলে ক্ষমতা হইতে সুহ্‌রাওয়ার্দীকে নাটকীয়ভাবে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন নূতন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার মুখ্য মন্ত্রী হন এবং আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতা হইতে প্রশাসনিক দলিলপত্র ঢাকায় স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা দেশ-বিভাগ কাউন্সিল হইতে জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দীকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থলে জনাব হামিদুল হক চৌধুরীকে মনোনীত করেন। এইসব ঘটনার ফলে মুসলিম লীগ আরও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কাইদ-ই আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র নিকট বৃটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন করাচীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেন। ঐ দিনই ঢাকায় পূর্ব বংগ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারীভাবে পূর্ববংগ নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতায় তখনও সাম্প্রদায়িক দাংগা অব্যাহত ছিল। জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে কলিকাতায় থাকিয়া গেলেন। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা গান্ধীর সঙ্গে একযোগে তিনি ভারতের দাংগা-বিধ্বস্ত মুসলিম অঞ্চলসমূহ সফরে ব্যাপৃত হইলেন। জনাব আবুল হাশিম গ্রহণ করিলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব। কিন্তু উভয় নেতাকেই ভারতে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইতে হইল। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী আততায়ীর গুলীতে গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটিল। এই অবস্থায় ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বাস্তুহারা হইয়া জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের লাহোর গমন করেন এবং পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। জনাব আবুল হাশিমও সর্বস্ব হারাইয়া ১৯৫০ সালের দিকে ঢাকায় আগমন করেন।

বিরোধী রাজনীতির সূচনা ঃ ১৯৪৮ সালের আসাম হইতে মাওলানা ভাসানীর ঢাকা আগমন এবং ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে সুহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের আগমনের ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশে বিরোধী দলীয় রাজনীতি চাংগা হইয়া উঠে। জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী লাহোরে মামদোতের নওয়াব ইফতিখার হোসেন খানের সহযোগিতায় গঠন করিলেন জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ। সীমান্ত প্রদেশে মানকী শরীফের পীর সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত হইল আওয়ামী মুসলিম লীগ। সিন্ধুতে গঠিত হইল তিনটি বিরোধী দল ঃ জিন্নাহ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী জামাত ও সিন্ধু দস্তর পার্টি। পূর্ববংগে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালেই গঠিত হইয়াছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের উভয় অংশের এই বিরোধী দলগুলির প্রধান সংযোগসেতু। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও ছাত্র নেতাদের লইয়াই মূলত গঠিত হইয়াছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। এই সংগঠনের প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগের ভাসানী ও সুহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের। ক্ষমতাসীন নাজিমুদ্দীন-নূরুল আমীন গ্রুপ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাইদ-ই আজম মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ্‌র আকস্মিক তিরোধানের ফলে পূর্ববংগের মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। জনাব লিয়াকাত আলী খান প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের শূন্য পদে পূর্ববঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী হইলেন জনাব নূরুল আমীন। তখন নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন লিয়াকাত আলী খান। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর ফলে মুসলিম লীগ নেতৃত্বে যে বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, লিয়াকাত আলী খানের পক্ষে তাহা পূরণ করা সম্ভব হইল না। প্রধানত এই কারণেই মুসলিম লীগের নেতৃত্বের কোন্দল তীব্রতর হইতে থাকে এবং মুসলিম লীগ হইতে দলত্যাগী নেতৃবৃন্দ ও কর্মিগণ আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন বিরোধী দল গঠন করেন। ১৯৪৮ সালের অক্‌টোবর মাসে লিয়াকাত আলী খান ঢাকা আগমন করেন। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকট ছিল। ইহার প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকায় আর্মানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগ এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। লিয়াকাত আলী খান ঢাকার গভর্নমেন্ট

হাউসে অবস্থান করিতেছিলেন। পরিস্থিতির প্রতি প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাওলানা ভাসানীর পরিচালনায় সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল গভর্নমেন্ট ভবনের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিস পথে মিছিলটিকে বাধা দান করে এবং মাওলানা ভাসানী ও আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্পাদক জনাব শামসুল হকসহ অনেককে গ্রেফতার করে। শেখ মুজিবসহ দলের নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন। লাহোরে সুহরাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাতশেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারী আত্মগোপন থাকাকালে শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। এই সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ সহ-সভাপতি এডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন ও সহ-সম্পাদক রফিকুল হোসেন আতংকগ্রস্ত হইয়া দলত্যাগ করেন। এইসব কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগের তৎপরতা স্তিমিত হইয়া পড়ে। এই দিকে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে কার্জন হলের কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম লীগে আরও ভাংগন দেখা দেয় এবং অর্থ মন্ত্রীর পদ হইতে জনাব হামিদুল হক চৌধুরীকে অপসারণ করা হয়। ১৯৫০ সালে জনাব চৌধুরীসহ আরও কয়েকজনকে দল হইতে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতরা বিভিন্ন বিরোধী দলে যোগদান করেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরী যোগদান করিলেন শেরে বাংলা কৃষক শ্রমিক পার্টিতে। এই দলটিকে সংক্ষেপে কে.এস.পি. বলা হইত।

বিরোধী দলীয় সংবাদপত্র ঃ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর ইংরেজী দৈনিক 'দি পাকিস্তান অবযার্ভার' (বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পত্রিকাটি 'দি বাংলাদেশ অবযার্ভার' নাম গ্রহণ করে) এই সময় বিরোধী দলীয় মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবদুস সালাম ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। নূরুল আমীন সরকারের রাষ্ট্রনীতি, খাদ্যনীতি, বিরোধী দলসমূহের উপর নির্যাতন, প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান কর্তৃক গঠিত পাকিস্তানের সংবিধান বিষয়ক মূলনীতি কমিটির কার্যক্রম, মূলনীতি কমিটির প্রকাশিত সুপারিশমালা প্রভৃতি ইস্যু লইয়া এই পত্রিকায় কঠোর সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও খবরাখবর প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, এমন কি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগও ইহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করে। কারণ রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবিসহ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কেন্দ্রীয় সরকারে ন্যায়সংগত প্রতিনিধিত্বের অধিকারের সহিত জড়িত বহু দাবি উপেক্ষিত হয়। মূলনীতি কমিটির সুপারিশালা বাতিল করিয়া একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের দাবিতে ঢাকায় বিরোধী দলসমূহের উদ্যোগে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন সুহ্রাওয়ার্দী-হাশিম-ভাসানী গ্রুপের বিশিষ্ট নেতা জনাব কামরুদ্দীন আহমদ। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জনাব আতাউর রহমান খান, অবযার্ভার সম্পাদক জনাব আবদুস সালাম, জনাব অলি আহাদ, জনাব সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত দুইদিন ব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলনে একটি বিকল্প মূলনীতি প্রণয়ন করা হইল এবং ইহার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক এক ফেডারেশন পরিষদ তথা 'কাউন্সিল ফর ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন' গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগও মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সংশোধনের দাবি জানাইয়া কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে। ১৯৫১ সালের ২০ জানুয়ারী গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের এক সভায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবি জানানো হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাধীন বিষয়সমূহ সংক্রান্ত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সাবকমিটির সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকার ও রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে রিপোর্টে কোন উল্লেখ না থাকায় সভায় একটি তীব্র নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয় (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, পৃ. ১২০-২৭)। উক্ত সভায় শেরে বাংলা ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য, এই সাংবিধানিক মূলনীতি সংক্রান্ত বিতর্ক ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল, কাইদ-ই আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র ভগিনী ফাতিমা জিন্নাহ্র রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ। কোন দলে যোগদান না করিলেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মপন্থার সমালোচনা করিতে শুরু করেন। জনাব সুহ্রাওয়ার্দীসহ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করিতে থাকেন। এই সময় কয়েকটি সমাবেশেও তিনি ভাষণ দেন। ক্রমেই বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ধারার সহিত তাঁহার যোগাযোগ গভীর হইয়া উঠিতে থাকে। এই সমস্ত কারণে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মাদার-ই মিল্লাত ফাতিমা জিন্নাহ্র প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন। ১৯৫৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কাইদ-ই আজমের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ফাতিমা জিন্নাহ্র প্রদত্ত বেতার ভাষণের কিছু অংশ সরকারী নির্দেশে সেন্সর করা হইলে জনমনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই সময় লিয়াকাত আলী-সুহ্রাওয়ার্দী সম্পর্কেরও চরম অবনতি ঘটে।

বিভাগপূর্বকালীন যুগ হইতে এই দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত চলিয়া আসিতেছিল। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এই সংঘাতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। লিয়াকাত আলী খান বাংলা বিভাগের প্রাক্কালে নাজিমুদ্দীন গ্রুপকে মদদ যোগান যাহার ফলে লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচন লইয়া সুহ্রাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। নাজিমুদ্দীন নেতা নির্বাচিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী হওয়ার পর কাইদ-ই আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ জনাব সুহ্রাওয়ার্দীকে কেন্দ্রের লিয়াকাত আলী মন্ত্রীসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলে বিক্ষুব্ধ সুহ্রাওয়ার্দী সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেন নাই।

পরবর্তীকালে 'ন্যাশনাল লীগ' গঠনের উদ্যোগ এবং নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার প্রশ্ন লইয়া লিয়াকাত আলী খান ও কেন্দ্রীয় লীগ নেতাদের সঙ্গে সুহ্রাওয়ার্দী গ্রুপের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যায়। সুহ্রাওয়ার্দী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে মুসলিম লীগ ভাঙ্গিয়া দিয়া তদ্স্থলে ন্যাশনাল লীগ গঠনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল ভারত বিভক্ত হওয়ায় সর্বভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী নিখিল ভারত মুসলিম লীগ রাজনৈতিক তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। একইভাবে পাকিস্তানের অন্তর্গত

অঞ্চলসমূহে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেসও তাহার রাজনৈতিক তাৎপর্য হারাইয়াছে। সুতরাং এই দুইটি সংগঠনের বিলোপ সাধন করিয়া বৃহত্তর ভিত্তিতে ন্যাশনাল লীগ গঠন করা হইলে এই রাজনৈতিক শূন্যতা দূর হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়কে একই প্লাটফরমে একত্র করা যাইবে।

এই উদ্যোগের প্রতি কাইদ-ই আজামের সমর্থন ছিল বলিয়া জানা যায়। এই কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ডাকিতে তিনি ছয় মাস বিলম্ব কলিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তিনি করাচীতে অধিবেশন আহ্বান করেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে একটানা সাত দিন ধরিয়া অধিবেশন চলে। ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ লইয়া নানারকম সংবাদ প্রচারিত হইলে ২৮ ফেব্রুয়ারী গভর্নর জেনারেল ভবন হইতে প্রচারিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়া বলা হইল, "মুসলিম লীগ কাউন্সিলের গোপন বৈঠক সম্পর্কে ভুল সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। প্রকৃত অবস্থা হইল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য। মুসলিম লীগ তখন সারা ভারতের সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। ভারত বিভক্ত হওয়ায় মুসলিম লীগ এখন একটি পার্টি হিসাবে কাজ করিবে। আগের মত গোটা মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবে না। ইহার ভিত্তিতেই মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে।"

ইশ্‌তিহারটি প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মোটামুটি স্বস্তিবোধ করেন। তাহাদের ধারণা হইল কাইদ-ই আজম মুসলিম লীগ বজায় রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতার মনেই সন্দেহ থাকিয়া যায়। ন্যাশনাল লীগ গঠনের প্রস্তাব উঠায় পূর্ববঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রস্তাবিত সংগঠনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন ও তাঁহার মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্যগণ কংগ্রেস ভাঙ্গার প্রচেষ্টা হইতে বিরত রাখেন শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জীসহ প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের (দ্র. আবুল মনসুর আহ্‌মদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ. ২৩৬-২৩৯)।

চৌধুরী খালীকুজ্জামান ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারত হইতে বাস্তুত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে আসেন। আটচল্লিশ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কাইদ-ই আজমের ইনতিকালের পর তাঁহাকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি করা হয়। কিন্তু করাচীতে মুহাজিরদের বিক্ষোভের মুখে অল্পকালের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান কেন্দ্রীয় লীগ সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে আসিয়া জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী নিয়মিত আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক তৎপরতায়ও নিয়োজিত থাকেন। তাঁহার নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকিলে লিয়াকাত আলী খান তাঁহার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁহাকে 'ভারতের লেলাইয়া দেয়া কুকুর' বলিয়া অভিহিত করেন এবং বিরোধী দলীয় নেতাদের 'মস্তক চূর্ণ কর' কথা বলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দীর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও তাঁহার উপর নানারকম বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হইতে থাকে। ১৯৫০ সালের ১৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব শামসুল হকের নির্বাচনী মামলা পরিচালনার জন্য জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় আসেন। নূরুল আমীন সরকার তাঁহার সংবর্ধনার জন্য আয়োজিত জনসভা ১৪৪ ধারা জারি করিয়া বন্ধ করেন এবং মামলার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশে বলা হইল, আইন পেশার দায়িত্বের বাহিরে কোন রকম রাজনৈতিক তৎপরতায় তিনি জড়িত হইতে পারিবেন না।

জনাব শামসুল হকের মামলা, ৩৫ টি উপনির্বাচন স্থগিত রাখার ইস্যু এবং লবণ কেলেংকারির ঘটনা এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করিতেছিল। টাংগাইল উপনির্বাচনে সুবিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পরও জনাব শামসুল হককে আইন পরিষদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি নির্বাচন পরিষদে মামলা দায়ের করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার নির্বাচন খারিজ ঘোষিত হয়। অসৎ চক্রের কারচুপিতে ১৯৫৮ সালে লবণের সের ষোল টাকায় উঠে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও রাজনীতিক জনাব আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় তখন সবিস্তার তুলিয়া ধরা হইত পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী। ইহার ফলে পত্রিকাটি এইখানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস পরিচালিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমর্থন করে 'দৈনিক ইত্তেহাদ'। কলিকাতা হইতে মাওলানা আকরম খাঁর 'দৈনিক আজাদ' ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে এইখানে কোন দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না। ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর 'আজাদ' ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের 'সাপ্তাহিক সৈনিক' এবং ভাষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সম্পাদিত অর্ধ সাপ্তাহিক 'ইনসান' ছিল সে সময় সরকারবিরোধী জনপ্রিয় পত্রিকা। ১৯৫১ সালে মাওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসাবে সরকারবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পত্রিকাটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব ইয়ার মুহাম্মদ খান। তাঁহার ১৮ নং কারকুন বাড়ি লেনের বাসাটি ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সদর দফতর। এইখান হইতেই সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' প্রকাশিত হইত। কলিকাতার দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ১৯৫১ সালে ঢাকা আগমন করিলে ঐ বৎসরের ১৪ আগস্ট মাওলানা ভাসানী তাঁহাকে পত্রিকাটির সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। অচিরেই সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইহা দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভুক্ত বিরোধী দলসমূহের বিজয়ে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অসামান্য। মাওলানা ভাসানী, জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী ও ইয়ার মুহম্মদ খান দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫০ সালে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধে কঠোর মন্তব্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা

হয়। ১৯৪৬ সালের ২৩ জুলাই জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইহা ছিল একটি উন্নত মানের সংবাদপত্র। ইহার বেশির ভাগ পাঠকই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। এইখানে প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পত্রিকাটি আর বেশি দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। সেই সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনার জন্য উপমহাদেশের স্বনামখ্যাত সাংবাদিক জনাব আলতাফ হোসেন সম্পাদিত ও কাইদ-ই আজাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক 'ডন' (The Dawn) পত্রিকার উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল।

১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডি সামরিক ষড়যন্ত্র সারা পাকিস্তানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। কাশ্মীর যুদ্ধের (১৯৪৮) সেনানায়ক মেজর জেনারেল আকবার খান ছিলেন এই ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের নায়ক। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র নামে কথিত এই অভ্যুত্থান-প্রয়াস আগেই ৯ মার্চ, ১৯৫১ ফাঁস হইয়া যায় এবং লিয়াকাত আলী খানের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আকবার খানসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন 'দি পাকিস্তান টাইম্‌স' পত্রিকার সম্পাদক জনাব ফায়দ আহ্‌মাদ ফায়দ' ও পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী সাজ্জাদ জাহীর। আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী।

১৯৫১ সালের ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক যুব সম্মেলনে আসাম মুসলিম লীগের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাহমুদ আলীকে সভাপতি ও জনাব অলি আহাদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ। বিরোধী দলীয় আন্দোলনে এই যুব সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন লিয়াকাত আলী খান। আততায়ী সায়্যিদ আকবার খানকে ঘটনাস্থলেই জনৈক পুলিশ অফিসার গুলি করিয়া হত্যা করে। ফলে হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয় নাই। লিয়াকাত আলী খানের হত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল নাজিমুদ্দীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক জরুরী বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং অর্থমন্ত্রী জনাব গুলাম মুহাম্মাদ হইলেন গভর্নর জেনারেল। তাঁহাদের দুইজনের মতবিরোধ পরিস্থিতিকে ক্রমেই জটিল করিয়া তুলিতে থাকে। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহাম্মাদ প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মুহাম্মদ আলীকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন।

পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ : এই বৎসরই (১৯৫৩) লাহোরে জিন্নাহ্‌ আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করে। নীতিগত মতভেদের দরুন জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগঠক নওয়াব ইফ্‌তিখার হুসায়ন খানকে সম্মেলনের সিদ্ধান্তক্রমে বহিষ্কৃত করা হয় এবং জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। প্রতিষ্ঠানের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির আহ্‌বায়ক হইলেন সুহ্‌রাওয়ার্দী। পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হইলে জনাব মাহ্‌মুদুল হক উছমানী হইলেন সেক্রেটারী জেনারেল। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান হইলেন পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে রদবদল হইল। শেখ মুজিবুর রহমান হইলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী। মাওলানা ভাসানী সভাপতি পদে বহাল থাকিলেন। জনাব আতাউর রহমান খানের সহিত নূতন কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি হইলেন দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সাবেক সম্পাদক জনাব আবুল মনসুর আহ্‌মদ। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা সংগঠিত হইলেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মসূচী ছিল অনেকাংশেই আলাদা। ফলে কেন্দ্রের সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল নামেমাত্র। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ স্বাধীনভাবে নিজস্ব কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইত। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনকালে মাওলানা ভাসানীসহ অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা এবং খিলাফতে রব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও যুব লীগসহ বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। ২১ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় ছাত্র মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ এবং কয়েকজন ছাত্রের শাহাদাত বরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভের ঝড় বহিয়া যায়। পরপর কয়েক দিন ধরিয়া প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আইন সভার সদস্য পদ ও মুসলিম লীগ সদস্য পদ হইতে ইস্তিফা দেন দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ২৩ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা-শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নূরুল আমীন সরকারের নীতির সমালোচনার জন্য সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' ও 'পাকিস্তান অবযার্ভার' পত্রিকার প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও সম্পাদক আবদুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়। গণবিক্ষোভের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারী নূরুল আমীন সরকার পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ব্যাপারে সুপারিশ পেশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়াই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ বৃহত্তম বিরোধী দলে পরিণত হয়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সংগঠন হিসাবে প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। গণদাবীর মুখে নূরুল আমীন সরকার ১৯৫৩ সালের শেষদিকে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয়, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে শেরে বাংলা তাঁহার সমর্থকদের লইয়া ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই গঠন করিলেন পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি। শেরে বাংলার সাবেক কৃষক-প্রজাদলের অনেক নেতা ও কর্মী যোগদান করিলেন নূতন পার্টিতে। ৪ ডিসেম্বর শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন মুকাবিলার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান খিলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হইল যুক্তফ্রন্ট। ২১ দফা কর্মসূচীর

ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলি। ২১ দফার খসড়া প্রণয়ন করেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ। দফাগুলির মধ্যে ছিল ঃ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায় বিচারের আদর্শের ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ ও সুষম হারে জমির খাজনা নির্ধারণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ আলাদাকরণ, জননিরাপত্তা আইন ও নির্যাতনমূলক আইনসমূহ বাতিল, বিনা বিচারে আটক রাখার নীতি বাতিল, ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ঘোষণা, বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা, ভাষা-শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ, আইন পরিষদের শূন্য পদে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান প্রভৃতি। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে। ২৩৭টি মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করেন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থিগণ। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ বিজয়ী হন। ৭২টি অমুসলিম আসনের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস পায় ১৫টি, তফসীলী ফেডারেশন পায় ২৭টি, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি ও গণতন্ত্রী দল পায় ৩টি আসন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ৫ জন নির্বাচিত স্বতন্ত্র সদস্য যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন। স্বয়ং মুখ্য মন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন নির্বাচনে পরাজিত হইলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ দলীয় তরুণ প্রার্থী জনাব খালেক নওয়াজ খানের কাছে। ২ এপ্রিল (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের সভায় শেরে বাংলাকে পার্লামেন্টের নেতা নির্বাচিত করা হয়। তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত হইল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু শেখ মুজিবকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে শেরে বাংলার আপত্তি থাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বর্জন করিল। পরে ১৫ মে (১৯৫৪) আপোস-রফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত হইল এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের আতাউর রহমান খান, আবুল মনুসর আহমদ, আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও হাশিমুদ্দীন মন্ত্রিসভায় যোগদান করিলেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ মে আদমজী জুট মিলে সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় প্রায় দেড় হাজার লোক প্রাণ হারায়, শাসন-শৃংখলা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগে ৩০ মে (১৯৫৪) গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহাম্মাদ শেরে বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করিলেন এবং একই সঙ্গে ৯২-ক ধারা জারি করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করিলেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে সরাইয়া প্রদেশের নূতন গভর্নর করা হইল প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যাকে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানী এই সময় বার্লিন বিশ্বশান্তি সম্মেলন উপলক্ষে ইউরোপ সফরে যান। কেন্দ্রীয় আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী পেটের পীড়ার চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডের জুরিখ হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। আর শেরে বাংলাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখা হইল। এইদিকে মাওলানা ভাসানীকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেই গুলী করিয়া হত্যার হুমকি দিলেন গভর্নর ইস্কান্দার মির্যা। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হইল। প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মাদ 'আলী এই সময় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল করিয়া দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলেন ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর। প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মাদ আলীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান গভর্নর জেনারেল। নূতন মন্ত্রীসভায় যোগদান করিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আয়্যুব খান, পূর্ববঙ্গের গভর্নর ইস্কান্দার মির্যা, রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডাঃ খান সাহেব, শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার, মুসলিম লীগের এম. এইচ. ইস্পাহানী ও মীর গুলাম আলী তালপুর, কেন্দ্রীয় সরকারের মহাসচিব চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী। এই মন্ত্রীসভায় আইন মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী, আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হইলেন ইস্কান্দার মির্যা।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে বগুড়ার মুহাম্মাদ আলীর মন্ত্রীসভা বাতিল করিয়া চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহাম্মাদ। এই মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন শেরে বাংলা। রুগ্ন গুলাম মুহাম্মাদকে সরাইয়া এই সময় গভর্নর জেনারেল হইলেন ইস্কান্দার মির্যা। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ নবগঠিত গণপরিষদে অনুমোদিত হইল পাকিস্তানের সংবিধান এবং পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হইল। সংবিধান রচনায় শেরে বাংলা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী এই সময় কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী দলীয় নেতা হিসাবে সরকারী মর্যাদা লাভ করেন এবং বগুড়ার মুহাম্মাদ আলী যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত হইলেন।

এইদিকে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহারের পর ১৯৫৫ সালের জুন মাসে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবূ হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ইহার পূর্বেই আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে সংঘাতের ফলে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া যায়। আবূ হোসেন মন্ত্রীসভা এক বৎসর স্থায়ী হওয়ার পূর্বেই জিঞ্জিরা ভুখা মিছিলে গুলী বর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আইন পরিষদে অনাস্থার সম্মুখীন হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। এই পরিস্থিতিতে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সরকার ক্ষমতায় ছিল। কেন্দ্রে মুসলিম লীগের অধিকাংশ পার্লামেন্ট সদস্য ডাঃ খান সাহেবের রিপাব্লিকান পার্টিতে যোগদান করায় চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীও একইভাবে অনাস্থার সম্মুখীন হন। প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে ইস্তিফা দিয়া তিনি নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান করেন। রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন পাইয়া ১২ সেপ্টেম্বর জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যার সহিত মতবিরোধের পটভূমিতে রিপাবলিকান পার্টি সমর্থন প্রত্যাহার করায় ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর জনাব সুহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন। ইহার পর কেন্দ্রে সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মন্ত্রীসভা গঠন করেন আই. আই. চুন্দ্রীগড় ও ফীরোয খান নূন।

নাম পরিবর্তন ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তিত হয় ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। এই মাসের একুশ, বাইশ ও তেইশ তারিখে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে অসাম্প্রদায়িক করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। জনাব সুহ্রাওয়ার্দী ইহার বিপক্ষে ছিলেন। ২২ অক্টোবর সুহ্রাওয়ার্দী তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিলে 'মুসলিম' শব্দ খারিজ হইয়া এই প্রতিষ্ঠান 'আওয়ামী লীগে' রূপান্তরিত হইল। কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদেরকে লইয়া গঠিত হইল নূতন পরিষদ ঃ মাওলানা ভাসানী (সভাপতি,) আতাউর রহমান খান (সহ-সভাপতি), আবুল মনসুর আহমদ (ঐ), খয়রাত হোসেন (ঐ), শেখ মুজিবুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক), অলি আহাদ (সাংগঠনিক সম্পাদক), অধ্যাপক আবদুল হাই (প্রচার সম্পাদক), আবদুস সামাদ (শ্রম-সম্পাদক), তাজউদ্দীন আহমদ (সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক), মিসেস সেলিনা বানু (মহিলা সম্পাদিকা), মোহাম্মদ উল্লাহ (অফিস সম্পাদক), ইয়ার মুহাম্মদ খান (কোষাধাক্ষ)। পঁচিশ জনকে লইয়া গঠিত হইল কর্মপরিষদ।

মাওলানা ভাসানীর পদত্যাগ ঃ ১৯৫৬ সালে সিয়াটো চুক্তি ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থায় পাকিস্তানের যোগদানের প্রশ্নে সুহ্রাওয়ার্দী-ভাসানী মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী টাংগাইলের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে এই সমস্ত প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। জনাব সুহ্রাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। তিনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে তাঁহাকে সমর্থন করেন। ভাসানী-মুজিব বিরোধও এই সময় তীব্রতর হইয়া উঠে। ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগ সম্পাদকের কাছে লিখিত এক পত্রে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দলের সভাপতি পদ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তিফা প্রদান করেন। ২৫ জুলাই (১৯৫৭) আওয়ামী লীগের বামপন্থী অংশের সমন্বয়ে তিনি গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। এই দলটিও বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়। ১৯৭৭ সালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাওলানা ভাসানী ছিলেন ন্যাপ ভাসানী গ্রুপের সভাপতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর; (২) মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়; (৩) ঐ লেখক, সাংবাদিকের রোজনামচা; (৪) অলি আহাদ , জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫-৭৫; (৫) বিভিন্ন রাজনৈতিক নিবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকা।

সানাউল্লাহ্ নূরী

আওয়ার (দ্র. আভার)

আওয়াইল (اوائل):আওওয়াল (أول) শব্দের ব. ব., অর্থ প্রথম। পারিভাষিকভাবে শব্দটি বিভিন্ন ভাবধারা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, যথাঃ দার্শনিক বা দৈহিক বিশ্বয়ের "প্রাথমিক উপাত্ত"; প্রাক-ইসলামী বা ইসলামের প্রাথমিক যুগের "প্রাচীন বস্তু বা ব্যক্তিগণ" এবং বিভিন্ন বস্তুর "প্রথম আবিষ্কারকগণ" (অথবা প্রথমে আবিষ্কৃত বা প্রস্তুত বিভিন্ন বস্তু)।

শেষোক্ত অর্থে শব্দটি আদাব, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত মুসলিম সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র শাখাকে বুঝায়। মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র ১০ম/১৭শ শতাব্দীতে হাজ্জী খালীফাঃ (Flugel), ১খ., ৪৯০; ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৩, Col. ১৯৯৬, আওয়াইলকে ইতিহাস ও আদাব সংক্রান্ত একটি পৃথক "বিজ্ঞান"-রূপে বর্ণনা করেন।

কোন কিছুর মূল সম্পর্কে জানিবার কৌতূহল প্রাচীন সামীদের ঐতিহাসিক সচেতনতার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত ছিল এবং তাহা তাওরাত ও ইঞ্জীলের ন্যায় সাহিত্যের মাধ্যমে আরবদের নিকট পৌছে। প্রথম আবিষ্কারকগণের সম্বন্ধে গ্রীকদের একটি সাহিত্য বিদ্যমান ছিল (Peri Heurematon, অতি সাম্প্রতিককালের জন্য দ্র. A. Kleingunther, Protos Heuretes, in Philologus, Supplementband ২৬, ১, ১৯৩৪), আর তাহা ছিল বিজ্ঞানেরই ইতিহাস, যেমন ঔষধের আদি কথা তন্মধ্যে অন্যতম। এই সাহিত্য সরাসরি অনুবাদের মাধ্যমে ইসলামের পরিচিতি লাভ করে (দ্র. ইস্হাক ইব্ন হুনায়ন, তারীখুল আতিববা, Oriens-এ প্রকাশিত ১৯৫৪, ৫৫-৮০, তাহার উৎস ছিল Ps. Galen-এর Commentary on the Hippocratic oath অথবা আরও সাধারণভাবে আবূ সুলায়মান আস্-সিজিস্তানী-র সিওয়ানুল-হিক্মাঃ গ্রন্থের ভূমিকায় সংরক্ষিত প্রচুর উপাদান)। মুসলমানদের জন্য "প্রথম" সম্পর্কে জ্ঞান মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনেতিহাসের সহিত জড়িত এবং ইসলামের প্রারম্ভকালীন বিষয়গুলি অনেক ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী আইনানুগ ও প্রায়োগিক গুরুত্বের অধিকারী ছিল, আর ইতোমধ্যেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত সংক্রান্ত সর্বপ্রথম জ্ঞাত সাহিত্য ইহার প্রতি মনোযোগ দান করে। গোঁফ কাটা, দাঁতের খেলাল ব্যবহার ইত্যাদি মুসলিম রীতিনীতিসমূহ অতীতের মহান ধর্মীয় নেতাগণ, এই ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক উহাদের প্রথম ব্যবহারের কারণে যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় (তু. আছ্-ছা'আলিবী, লাতাইফুল মা'আরিফ (De Jong), ৬)। কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসেই নহে, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতিও মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান হারে মনোযোগ আকর্ষণের ফলে (তু. বিশেষত ফিহ্রিস্তের প্রতিটি অধ্যায় আলোচিত বিজ্ঞানের মূল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের প্রাথমিক মন্তব্য) শীঘ্রই প্রথম কে ছিল— এই প্রশ্নটি প্রতিটি কল্পনাসাধ্য বিষয় সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হইতে থাকে, আর ইহার উত্তরও প্রদান করা হয়; তবে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পনাপ্রসূত। তাহা সত্ত্বেও আওয়াইল গ্রন্থসমূহ উহাদের রচয়িতাগণের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ইতিহাস জ্ঞানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত এবং উহারা মূল্যবান উপাদান ও কৌতূহলোদ্দীপক অন্তর্দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। বিষয়টির যে ব্যাপক বুদ্ধিদীপ্ত আবেদন রহিয়াছে তাহার প্রমাণ মিলে এই তথ্য হইতে, খ্রিস্ট সনের প্রারম্ভ হইতেই চীনাদেরও বিষয়াদির আদি রূপ সম্পর্কে একটি সাহিত্য বিদ্যমান ছিল (তু. J. Needham, Science and Civilization in China, ১খ., ৫১ পৃ., কেম্ব্রিজ ১৯৫৪) এবং পুনরায় শেষ মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রথম আবিষ্কারকের উপর অনেক সাহিত্য কর্ম রচিত হইয়াছে, যথা ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর Guglielmo da

Pastrengo-এর De Virisillustridus হইতে শুরু করিয়া আবিষ্কারকদের উপর বর্ণনানুক্রমে সজ্জিত অধ্যায় (De originibus rerum শিরোনামে ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে প্রকাশিত, পত্র ৭৮ক-৮৯ক) এবং Polydore Vergil -এর বিখ্যাত ও সুপঠিত গ্রন্থ De originibus rerum, ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

মুসলিম আওয়াইল সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাচীনতম জ্ঞাত পুস্তকটি রচিত হয় ৩য়.৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে। আবূ বাক্র ইব্ন আবী শায়বা-র (মৃ. ২৩৫/৮৪৯; Brockelmann. SI, ২১৫) বৃহৎ মুস ান্নাফ-এর শেষে (কিংবা শেষের কাছাকাছি) আওয়াইল সম্পর্কে একটি অংশ ছিল বলিয়া কথিত আছে এবং উহা আশ্-শিব্লী রচিত "মাহাসিনুল- ওয়াসাইল্ ইলা মা'রিফাতিল আওয়াইল" গ্রন্থের একটি উৎসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের আওয়াইল এবং মুসলিম ইতিহাস ও রীতিনীতির উৎপত্তি সম্পর্কে উক্ত অংশে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অংশটির শেষটুকু বার্লিন ৯৪০৯ নং পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে; মুসান্নাফ-এর বৃহৎ খণ্ডগুলির অধ্যয়ন সম্ভব হয় নাই।

একই সময়ে কিতাবুল আওয়াইল শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন হিশাম ইবনুল কালবী (ইয়াকূত, ইরশাদ, ৭খ., ২৫২), আল-মাদাইনী (ফিহ্রিস্ত, ১০৪); আল-হাসান ইব্ন মাহ্বুব (ফিহ্রিস্ত, ২২১)। ইহার গ্রন্থ তালিকা ইয়াকূত, ইরশাদ ২খ., ৩২,-এ পুনরুক্ত হইয়াছে আহ্মাদ আর-রাক্কী ও অজ্ঞাত সময়কার জনৈক সাঈদ ইব্ন সাআদুন আল-আত্তার-এর নামে (ফিহ্রিস্ত, ১৭১)। ইহাদের কোন গ্রন্থই আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত অথবা পরবর্তী আওয়াইল সাহিত্যে উদ্ধৃত করা হয় নাই। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সন্দেহজনক, এখানে যে অর্থে আওয়াইল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, সে অর্থে তাহারা আওয়াইল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন কিনা (অথবা যে কোনভাবেই হউক, কিছু আওয়াইল উপাদান তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে কিনা)। ফিহ্রিস্তের ১৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর আল-মার্যুবানী রচিত কিতাবুল আওয়াইল-এ প্রথম আবিষ্কারকদের স্থলে বরং প্রাচীন পারস্য ও মু'তাযিলা-র ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

৩য়/৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ইব্ন কুতায়বা তাঁহার মা'আরিফ (Wustenfeld, পৃ. ২৭৩-৭) গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আওয়াইল-এর উপর নিবন্ধ প্রণয়ন করেন (আরও দ্র. পরবর্তী সময়ের আছ-ছা'আলিবী, পূ. গ্র., ৩-১৭)। আদাবের প্রেক্ষিতে আওয়াইল সম্পর্কে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথম দিকে আল-বায়হাকীর মাহাসিন (Schwally), (পৃ. ৩৯২-৬) গ্রন্থে একটি অধ্যায় পরিদৃষ্ট হয়। ধর্মীয় আওয়াইল গ্রন্থসমূহ প্রায় সেই সময়েই আবূ 'আরূবা (দ্র.) ও আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০/৯৭১, Brockelmann SI, ২৭৯) কর্তৃক লিখিত হয়।

আদাব সাহিত্যের এই বিষয়টিতে লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হইতেছে আবূ হিলাল আল-'আস্কারীর (মৃ. ৩৯৫/১০০৫) কিতাবুল আওয়াইল। তিনি দাবি করেন, এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী আর কোন লেখক নাই। তিনি পারস্য ও বাইবেলের কিছু তথ্য উল্লেখসহ আরব ও মুসলিম ইতিহাসের উপাদানের মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখিয়াছেন এবং 'গ্রীক' সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি মুসলিম ঐতিহাসিকগণের এই মতকে সুস্পষ্টরূপে খণ্ডন করিতে সমর্থ হন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাল আবিষ্ক্রিয়াই প্রাক-ইসলামী ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত হইয়াছে এবং পরবর্তী যুগে নিয়ম অনুযায়ীই তুচ্ছ ও অবাঞ্ছিত আবিষ্ক্রিয়াদির জন্ম হয়। আল্-'আসকারীর গ্রন্থটি অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত প্রামাণ্য পুস্তকরূপে টিকিয়া থাকে এবং এইটি ৮ম/১৪শ শতাব্দীর আল-আতাইকী ও আস্-সুয়ূতীর আওয়াইল গ্রন্থগুলির ন্যায় পরবর্তী প্রয়াসসমূহের ভিত্তিরূপে কাজ করে (দ্র. Brockelmann, I, 1[illegible]; SI, 193 f.)।

আওয়াইল সাহিত্যে দুই শতাব্দী যাবত শূন্যতা বিরাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবার আমরা আল-মাওসিলীর গায়াতুল ওয়াসাইল ইলা মা'রিফাতিল আওয়াইল গ্রন্থখানা দেখিতে পাই (তু. Brockelmann. SI, ৫৯৭; H. Ritter, in Oriens, ১৯৫০, পৃ. ৮০)। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শিব্লীর উপরোল্লিখিত মাহাসিন গ্রন্থটি আওয়াইল পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত একখানি ঐতিহাসিক তথ্যবহুল পুস্তিকা (তু. Brockelmann, II, পৃ. ৯০; S II, ৮২ F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography. ১২৯, পাদটীকা ১)। আশ্-শিব্লীর সাহিত্যিক প্রয়াস কবি ইব্ন খাতিব দারায়্যা অব্যাহত রাখিয়াছেন বলিয়া পরিলক্ষিত হয় (তু. Brockelmann II, পৃ. ১৭; S II, ৭; হাজ্জী খালীফা (Flugel), ১খ., ৪৯০)। অপর দিকে ৯ম/১৫শ শতাব্দীর কিছু সংখ্যক মনীষীর ধর্মীয় প্রবণতা তাঁহাদের আওয়াইল গ্রন্থসমূহে প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে সম্ভবত ইব্ন হাজার-এর ইকামাতুদ্-দালাইল্ 'আলা মা'রিফাতিল আওয়াইল গ্রন্থখানি নেতৃত্ব দান করিয়া থাকিবে (গ্রন্থটি এখনও পুনরুদ্ধার করা যায় নাই, তু. হাজ্জী খালীফা, পূ. গ্র.)। সুতরাং আবূ বাক্র ইব্ন যায়দ আল-জিরাঈ (মৃ. ৮৮৩/১৪৭৮, তু. আস-সাখাবী, দাও, ১১খ., পৃ. ৩২) তাঁহার কিতাবুল আওয়াইল (পাণ্ডুলিপি বার্লিন ৯৩৬৮) কম বেশী হাদীছশাস্ত্রের অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং আস্-সুয়ূতী ও তাঁহার শিক্ষামূলক ওয়াসাইল ইলা মা'রিফাতিল আওয়াইল গ্রন্থে একই রূপ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থটি কিয়ৎ পরিমাণে 'আল-আস্কারীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। পালাক্রমে আস্-সুয়ূতীর গ্রন্থখানি আলী দেদে আল-বোস্নাবী (মৃ. ১০০৭/১৫৯৮, তু. Brockelmann, II, পৃ. ৫৬২; S II, ৬৩৫) কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, যিনি কোন কোন পরবর্তী লেখকের ন্যায় "সর্বশেষ অনুষ্ঠিত বিষয়সমূহও (আওয়াখির)" সংযোজন করেন (তু. এই সম্পর্কে আস্-সাখাবী, ই'লান, দামিশ্ক ১৩৪৯/১৯৩০-১, ১৩; F. Rosenthal, পূ. গ্র., ২১৪); আস্সুয়ূতীর আরও ব্যবহারকারীর জন্য দ্র. G. Vajda, in RSO, ১৯৫০, ৩)। ঐ সময়ের অপর এব মহান ঐতিহাসিক ইব্ন তুলূন (মৃ. ৯৫৩/১৫৪৬) 'উন্ওয়ানুর রাসাইল ফী মা'রিফাতিল-'আওয়াইল শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন (পাণ্ডুলিপি কায়রো

তায়মূর, তারীখ ১৪৬৭; তু. ইব্ন তূলূন, আল-ফুলকুল মাশ্হূন, দামিশ্ক ১৩৪৮/১৯২৯-৩০)।

'ওয়াসাইলুস্ সাইল ইলা মা'রিফাতিল আওয়াইল' শীর্ষক গ্রন্থে বিষয়টিকে ছন্দোবদ্ধও করা হইয়াছে (তু. হাজ্জী খালীফা=Flugel, ৬খ., ৪৩৫)। এই গ্রন্থটি কায়রোতে পাণ্ডুলিপি আকারে মাজামী ৪৭৪, পত্র ২৮খ., ৩৬খ.-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়। কায়রো পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম শাম্সুদ্-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবিল-লুত্ফ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহ্যত পিতা অথবা পুত্র যথাক্রমে ৯৭১/১৫৬৪ ও ৯৯৩/১৫৮৫ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন (তু. ইব্নুল 'ইমাদ, শাযরাতে; Brockelmann, II, ৩৬৭; S II, ৩৯৪)। বিষয়টিতে সক্রিয় সাহিত্যিক কৌতূহল আধুনিক কালেও অব্যাহত রহিয়াছে (তু.এম. আত-তিহ্রানী, আয্-যারী'আ ইলা তাসানীফিশ-শী'আ, ২খ., ৪৮১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Gosche, Die Kitabal-awail; (২) Eine Lilerarhistorische Studie, Halle ১৮৬৭, আস্-সুয়ূতীর একটি ক্ষুদ্র অংশের সংস্করণ ইহার অন্তর্ভুক্ত; (৩) আস্-সুয়ূতী, আল-ওয়াসাইল ইলা মা'রিফাতিল আওয়াইল, কায়রো ১৯৫০। কোন স্বতন্ত্র আওয়াইল গ্রন্থ এ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সম্পাদিত হয় নাই; (৪) Brockelmann, I, পৃ. ১৩২, S I, পৃ. ১৯৩, S III, ১পৃ. ২৬৫; S I, পৃ. ২৭৯; S I, পৃ. ৫৯৭; II, পৃ. ৯০, S II, পৃ. ৮২; II, পৃ. ২০৩; S II, পৃ. ১৯৭; II, পৃ. ৫৬২, S II, পৃ. ৬৩৫; (৫) A. J. Wensinck ও অন্যান্য, Concordance, ১খ., পৃ. ১৩৪; (৬) Ahlwardt, Catalogue Berlin নং ৯৩৬৮-৭৬ (৯৩৭৬ নং-এর অধীনে উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই আওয়াইল গ্রন্থ নহে); (৭) MMIA, ১৯৪১, ৩৫৭-৯, 'আবদুর রাহমান আল-বিস্তামী (Brockelmann, II, পৃ. ৩০০, S II, পৃ. ৩২৩), আল ফাওয়াইহুল মিস্কিয়্যা-র যে অংশে আওয়াইল প্রসঙ্গে আলোচনা রহিয়াছে তৎসম্পর্কিত বিবরণ; (৮) আল-কাল্কাশ্নদী, সুবহ্, ১খ., ৪১২-৩৬, ইনি আওয়াইলকে সরকারী সচিবের ঐতিহাসিক উপাদানের অংশরূপে গণ্য করিয়াছেন; (৯) মুসলিম আমলের একটি সংক্ষিপ্ত প্রাচীন সিরিয় ভাষার পাঠ রহিয়াছে, E. Sachau, Verzeichniss d. syr. Hss., ৩৩১, বার্লিন ১৮৯৯।

F. Rosenthal (E.I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

'আওয়ানা (عوانة) ঃ ইব্নুল হাকাম আল-কাল্বী, আরব ঐতিহাসিক, মৃ. ১৪৭/৭৬৪ বা ১৫৩/৭৭০। তাঁহার বংশ তালিকা ও বংশ বৃত্তান্ত বিতর্কিত। তাঁহার পিতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে আল-হাকাম ইব্ন আওয়ানা ইব্ন ইয়াদ ইব্ন বিয্র (ইয়াকূত, ৬খ., ৯৩; তু. জাম্হারা, Levi-Provencal, ৪২৮ ও ফিহ্রিস্ত, ১৩৪)। যাহা হউক, আবূ উবায়দা দাবি করেন, আল-হাকাম-এর পিতা জনৈক দাস-দর্জি ছিলেন (ইয়াকূত, ঐ, যুর্রুম্মা-র কবিতার উদ্ধৃতি দিয়া, তু. ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাতুশ্-শু'আরা, (এম. শাকির, ৪৮২ ও আগানী, ১৬খ., ১২১)। আল-হাকাম খুরাসানে ১০৯/৭২৭ সালে আসাদ আল-কাস্রী-র প্রতিনিধি ছিলেন (তাবারী, ২খ., ১৫০১; বালাযুরী, ফুতূহ ৪২৮)। পরবর্তীকালে তিনি সিন্ধুর গভর্নর ছিলেন, যেথায় তিনি আল-মাহ্ফূজাঃ ও আল-মান্সূরা নামক দুইটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেন (বালাযুরী, ৪৪৪)। ইব্নুন নাদীম-এর মতে আওয়ানা ছিলেন কূফার অধিবাসী একজন অন্ধ বর্ণনাকারী (راوى) এবং কবিতায় ও বংশ-বৃত্তান্তে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি দুইখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংকলন করেন ঃ মু'আবিয়া-র জীবনী ও উমায়্যাদের ইতিহাস। এই দুইটির গ্রন্থের সহিত আমাদের পরিচয় কেবল পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ইহাদের উল্লেখের মাধ্যমে; আত্-তাবারী ৫১টি স্থানে আওয়ানা-র উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইহাদের সমস্তই (উমার [রা] ও উষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কিত দুইটি অংশ ব্যতীত) মু'আবিয়া (রা) হইতে 'আব্দুল মালিক পর্যন্ত ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কিত; আল-বালাযুরীও প্রায় একই ঘটনাবলীর জন্য তাঁহার উল্লেখ করেন, অধিকন্তু তিনি ফুতূহুল বুলদান-এ সুলায়মান-এর খিলাফাত কালে ইরাক ও তাবারিস্তান বিজয় সম্পর্কীয় কতগুলি উদ্ধৃতির সংযোজন করেন। তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগের উমায়্যাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। তিনি কদাচিৎ তাঁহার উৎসসমূহের উল্লেখ করেন, কিন্তু ঘটনাবলীর তারিখ নির্ধারণে ছিলেন যত্নবান। তাঁহার রচনাভঙ্গি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল এবং তাঁহার বর্ণনাসমূহ প্রায়ই বিশদ। কবিতা ও সাহিত্যকর্মেরও তিনি অনুরাগী ছিলেন (এইজন্য আগানী ও অন্য সাহিত্য গ্রন্থাবলীতে তাঁহার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়)। অনুরূপভাবে সামাজিক জীবন ও প্রশাসনের প্রতিও তাঁহার আগ্রহ ছিল। যদিও তাঁহার সম্বন্ধে উছ্মানী ও উমায়্যাদের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয় (য়াকূত, ৬খ., ৯৪), তবুও তাঁহার গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ হইতে উমায়্যাঃ কূফাবাসী অথবা কাল্ব গোত্রের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই অভিযোগ প্রধানত হিশাম ইব্নুল কালবী আল-মাদাইনী ও আল-হায়ছাম ইব্ন 'আদীর মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। কিছু সংখ্যক অন্যান্য পণ্ডিতকেও এই ধরনের অভিযোগ করিতে দেখা যায়। য়াকূতের জনৈক বর্ণনাকারী তাঁহাকে আল-মাদাইনী-র অধিকাংশ তথ্যের উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সত্য নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত ঃ (১) যুবায়দী, তাবাকাতুননাহ্ বিয়্যীন, ২৪৬; (২) ইবনুল কিফ্তী, ইন্বাহুর রুওয়াত, ২খ., ৩৬১-৩ (তাঁহার পুত্র ইয়াদ-এর জীবনী); (৩) D. S. Margoliouth, Arabic Historians, কলিকাতা ১৯৩০, ৮৩; (৪) J. Wellhausen, Arab. Reich Intro. Vi; (৫) আহ্মাদ আমীন, দুহাল ইসলাম; (৬) F. Wustenfeld, Die Geschichtsschreiber Der Araber, Gottingen 1882, no 27; (৭) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1952, index.

Saleh El-Ali (E.I.²)/ সৈয়দ লুৎফুল হক

'আওয়ামির (عوامر) ঃ এ. ব. 'আমিরী (عامرى), দক্ষিণ ও পূর্ব আরবের বেদুঈন ও পল্লীবাসীদের একটি গোত্র। এই গোত্র তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত এবং তাহারা নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে বসবাসরত ঃ (১)

আর্-রুব্‘উল-খালীর দক্ষিণ প্রান্ত ও ওয়াদী হাদ্রামাওত-এর মধ্যখানে অবস্থিত আল-কাফ্ফ, (২) কাতার ও আল-বুয়ায়মীর মধ্যবর্তী আজ্ জাফ্রা দক্ষিণাংশ এবং (৩) দলগুলি একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। তাহাদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা খুব সামান্যই হইয়া থাকে, যদিও তাহারা নিজেদের অভিন্ন জ্ঞাতিত্বের কথা স্বীকার করে। গোত্রটির আল-বাদর ও আল-লায্য নামক দুইট প্রধান বিভাগ তিনটি দলের প্রতিটিতেই বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলীয় দলের এলাকা পশ্চিমে তামীস কূপের নিকটবর্তী আস্-সায়আর এবং পূর্বে ছামূদ কূপের নিকটবর্তী আল-মানাহীলের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দলের লোকেরা প্রধানত যাযাবর কিন্তু তাহারা আর-রুব্‘উল-খালীর বালুকাময় স্থানে পশুচারণে অভ্যস্ত নহে যাহা এই অঞ্চলের অধিকাংশ বেদুঈন গোত্রের লোকজনই করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রধান (তামীমা) আল-বাদ্‌র বিভাগের ইবনুত-তাবাযা। আরবদেশের এই অংশে বসবাসরত অধিকাংশ আরবদের ন্যায় দক্ষিণাঞ্চলীয় আওয়ামিরগণও শাফি‘ঈ মায্হাবের অনুসারী। কেন্দ্রীয় দলের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে যাযাবর। তাহারা আর-রুব্‘উল-খালীর পূর্বাংশের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী মরুবাসী। তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ায় যে, তাহাদের নিজস্ব এলাকা বলিয়া দাবি করিবার মত কিছুই নাই। আল-বাদ্‌র বিভাগের ইব্‌নু’র-রাক্কাদ-এর নেতৃত্বাধীন শায়খ শাসিত বংশের জন্য মূল গোত্রের বাহিরে বলিয়া কথিত। এই আওয়ামির-এর কেহ কেহ হাম্বালী মায্হাবের অনুসারী এবং অবশিষ্টাংশ শাফি‘ঈ মাযহাব অবলম্বী। পূর্বাঞ্চলীয় দলের প্রায় সকলেই গ্রামে বাস করে। আল-হাজার পর্বতমালার সামাইল গিরিপথের দক্ষিণে ওয়াদী হাল্ফীন ও ওয়াদী ‘আন্দামের মধ্যবর্তী এলাকায় ইহাদের বাস। এই শ্রেণীর কতকাংশ আল-বাতিনা, আজ্-জাহিরা ও মাস্কাটের পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও বসবাস করে। এই শ্রেণীর দুইজন মুখ্য প্রধান রহিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন কাল‘আতুল আওয়ামিরে আল-বাদ্‌র বিভাগের ইব্‌ন খামীস্ ও আল-হুমায়দাতে আল-লায্য বিভাগের ইব্‌ন সুলায়মান। ইবাদী হিসাবে পূর্বাঞ্চলীয় আওয়ামিরগণ উমানের ইবাদী ইমামকে স্বীকার করে এবং আশ্-শারকিয়্যাস্থ তাঁহার সহকারী সালিহ ইব্‌ন ‘ঈসা আল-হারিছীর পার্থিব কর্তৃত্বকে মানিয়া চলে। কথিত আছে, এই আওয়ামিরগণ বহুকাল পূর্বে নাজ্দ হইতে আগমন করিয়াছিল। তাহাদের সমর-ধ্বনি “ইয়া আওলাদ ‘আমির ইব্‌ন সা‘সা‘আ” প্রাচীন কালের বিখ্যাত এক গোত্রের বংশধর বলিয়া নিজেদের দাবির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে (দ্র. ‘আমির ইব্‌ন সা‘সা‘আ)। পূর্ব আরবের কোন কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, যথা আল্-সিলম ও বায়ত কায়আল-এর মধ্যে নিজদেরকে আওয়ামিরের সহিত সম্পৃক্ত করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত ইহা একটি গৌরবময় নামের প্রতি আকর্ষণের কারণে হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Arabian American Oil Co., Oman and the Southern Shore of the Persian Gulf, কায়রো ১৯৫২; (২) S. Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, লন্ডন ১৯১৯; (৩) Memorial of the Government of Saudi Arabia [Buraimi Arbitration], ১৯৫৫ খৃ.।

R. L. Headey (E.I.[2])/ মু. আব্দুল মান্নান

আল-‘আওয়াযিম (العوازم) ঃ এ. ব. ‘আযিমী, উত্তর-পূর্ব আরবের একটি নীচু জাতের বেদুঈন গোত্র। কারণ ইহার উৎপত্তি অন্যান্য গোত্র কর্তৃক খাঁটি (আসীল) বলিয়া বিবেচিত নয়। খাঁটি জাতের আরবরা ‘আওয়াযিমদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করিলেও গোত্রটি তাহাদের মরু-জ্ঞান ও যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ১৩৩৩-৪৮/১৯১৫-২৯ সালে পূর্ব আরবের অন্যান্য গোত্রের সহিত ‘আবদুল ‘আযীয আলু ‘সাউদের যুদ্ধের সময় এই গোত্রটি ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সক্রিয় সমর্থনকারীদের অন্যতম। ইতোপূর্বে ‘আওয়াযিমগণ প্রভাবশালী উজমান গোত্রের আশ্রিত ছিল, কিন্তু এই সময় তাহারা সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে। সাঊদী আরবে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের উত্তরাংশ, বিশেষ করিয়া আস্-সূদা ও আর-রাদাইফ অঞ্চল এবং কুওয়ায়তের উপকূল ও দুই দেশের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ অঞ্চলের মধ্য দিয়া ‘আওয়াযিমগণ অবাধে পরিভ্রমণ করে। কুওয়ায়তের শাসকের ব্যক্তিগত অনুচর হিসাবে বেশ কিছু সংখ্যক ‘আওয়াযিম থাকিলেও গোত্রটি সা‘উদী আরবের কর্তৃত্বাধীন আইনত স্বীকৃত। এই গোত্রের সদস্যরা অধিকাংশই মালিকী মায্হাবের অনুসারী। গোত্রটির প্রধান কেন্দ্রস্থলগুলি ছাজ, আল-হিন্নাহ ও উতায়্যিক-এ অবস্থিত। ইহার প্রধান (১৯৫৭) ঈদ ইব্‌ন জামি‘।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Dickson, The Arab of the desert, London 1950; (২) ফুআদ হাম্যা, কাল্‌ব জাযীরাতিল আরাব, কায়রো ১৩৫২ হি.; (৩) M. Y. Oppenheim-W. Caskel, Die Beduinem, iii, Wiesbaden 1952; (৪) আল-আযাবী, আশা‘ইরুল ইরাক, পৃ. ৩২০; (৫) আল-আলুলী, তারীখ নাজ্দ, পৃ. ৯০; (৬) ‘আবদুল জাব্বার, আল-বাদিয়া, পৃ. ১৯১।

W. E. Mulligan (E.I.[2])/ মোখলেছুর রহমান

আওয়াযিলা (দ্র. ‘আওযালী)

‘আওয়ারিদ (عوارض) ঃ একটি পারিভাষিক শব্দ যাহা উছমানী আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-চতুর্থাংশ পর্যন্ত সুলতানের নামে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক আদায়কৃত বিভিন্ন রকমের কর অর্থে ব্যবহৃত এবং এইগুলি প্রায়ই ‘আওয়ারিদ-ই দীওয়ানিয়্যা (عوارض ديوانية) বলিয়া উল্লিখিত। উছমানী জায়গীর প্রথা কেন্দ্রীয় সরকারকে সামন্ত বাহিনী এবং অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাহিনার জন্য কর আদায় করা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল, অন্যদিকে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান অনুরূপভাবে সব রকমের জনহিতকর কাজকর্ম প্রতিষ্ঠাকরণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হইতে ইহাকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল; কিন্তু এই উভয় ব্যবস্থা ইহাকে অগাধ রাজস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল এবং শারী‘আতর বিধান মতে যেইসব করের আদায়করণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন রহিয়া গেল সেইগুলি প্রায়ই প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইত। অতএব, প্রথম দিকে কেবল জরুরী অবস্থায় পরবর্তী কালে বার্ষিক হারে কেন্দ্রীয় সরকার সুলতানের উরফী (عرفى) বা প্রচলিত ক্ষমতাবলে সাধারণ করদাতাগণ হইতে অথবা কোন নির্দিষ্ট একটি এলাকার করদাতাগণ হইতে জোরপূর্বক টাকা আদায়ের, বিনা পারিশ্রমিকে কার্যাদায়ের অথবা উৎপন্ন দ্রব্য দিয়া কর

আদায়ের সুযোগ গ্রহণ করিত। 'আওয়ারিদ শব্দটি এই প্রকার দাবির প্রতি ব্যবহৃত হইত বাহ্যত, যেহেতু সরকারের আবশ্যকমত মোট উশুলকৃত অর্থের তারতম্য হইত, সেইহেতু ইহাকে মনে করা হইত আরিদ (عارض) "আপতিক"।

'আওয়ারিদ স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে ধার্য করা হইত না। এইগুলি ধার্য করা হইত তথাকথিত 'আওয়ারিদ খানাহ (عوارض خانه)-সমূহের উপর। সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে "পরিবার" ছিল না, বরং "কর আদায়ের একক"; সুতরাং উদাহরণস্বরূপ একটি গোটা গ্রাম কিংবা শহরের একটি মহল্লা এইগুলির কোন একটির এক ক্ষুদ্রাংশের অধিক কিছু ছিল না। যখন 'আওয়ারিদ প্রথম ধার্য করা হইত অথবা অন্তত যখন ইহাদের ধার্যকরণ আইনসিদ্ধ করা হইত তখন এই বিষয়টি খেয়াল রাখা হইত যেন করদাতাদের বোঝা তাহাদের আয়ের উৎসসমূহের একটি ন্যায্য অংশ হয় এবং কালক্রমে কোন কারণে আয়ের ঐ উৎসসমূহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সরকারের দাবি অনুরূপভাবে সমন্বিত করা হইত।

ইহা অনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, 'আওয়ারিদ কি একদিকে মূলত মুদ্রায় পরিশোধ্য ছিল, না অন্যদিকে এইগুলি উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা আদায় করা হইত। যাহাই হউক না কেন, অবশেষে যেসব 'একক' কাজকর্ম সম্পন্ন করিত অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত, তাহারা নগদ টাকায় পরিশোধ (আওয়ারিদ আক্চাহ্সী (عوارض أقچه سى) করা হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। এই শেষোক্তগুলি সম্বন্ধে বলা হয়, যখন কোন জরুরী অবস্থায় কত টাকার প্রয়োজন তাহার সিদ্ধান্ত লওয়া হইত তখন মোট টাকা সব সংশ্লিষ্ট 'আওয়ারিদ খানা-র উপর ভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং প্রাদেশিক কাযীদেরকে ইহাদের প্রতিটি হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইত। 'আওয়ারিদ প্রথা অনুযায়ী যাহারা রাষ্ট্রীয় কার্যে আত্মনিয়োগ করিত, সেইগুলির মধ্যে কূরাক্চিস (Kurekcis) বাহিনী (যুদ্ধবন্দী ও কয়েদীদের সম্পূরক, অনুরূপভাবে রাজকীয় রণতরীতে নিয়োজিত নাবিক), তাহাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, স্বীয় 'আওয়ারিদ খানার অন্য সদস্যদের নিকট হইতে আদায়কৃত কর দ্বারা তাহাদের কার্যকালে তাহাদের প্রত্যেকের ভরণ পোষণ করা হইত। 'আওয়ারিদ হিসাবে সরবরাহকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিকদের জন্য যব, খড় ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, ইহাদের যাতায়াতের জন্য পশুসমেত গাড়ী; প্রধান নৌ-সেনাপতির দফতরের জন্য কাঠ, পিচ, পালের কাপড় ইত্যাদি, রাজকীয় রন্ধনশালার জন্য বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য ও পদাতিক সৈন্যদের উর্দির জন্য কাপড়।

যে সকল 'একক' সাধারণত কাজকর্ম সম্পন্ন করিত অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত, যদি কোন কারণবশত তাহারা এইসব সম্পন্ন করিতে অপারগ হইত কিংবা তাহাদের এইসব করার দরকার না হইত, তবে তৎপরিবর্তে তাহাদেরকে রাজকোষে নগদ টাকা পরিশোধ করিতে হইত। এই ধরনের কর পরিশোধ প্রথার জন্য বাদাল (بدل ব.ব. بدلات) শব্দটি প্রয়োগ করা হইত (বাদাল দ্র.)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এইগুলি ক্রমেই স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং এই সময় হইতে 'আওয়ারিদ আদায় করা আর একটি সাময়িক ব্যাপার রহিল না এবং এই সকল বাদালাত (নগদ) 'আওয়ারিদ আক্চাহ্সী হইতে আলাদা ছিল বলিয়া 'আওয়ারিদ মূলত নগদ কর বুঝাইত বলিয়া মনে হয় যাহা হইতে এককগুলি ক্ষতিপূরণস্বরূপ কাজকর্ম সম্পাদন বা খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত এবং এই নিষ্কৃতি বলিতে গেলে ঐ এককগুলিকে ওজাক (odjak)-এর মর্যাদা দান করিত। পুনরায় 'আওয়ারিদ আক্চাহ্সী আদায় না করিয়া বাদালাত আদায়ের মাধ্যমে ইহারা এই মর্যাদা রক্ষা করিত।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে করদাতাগণ হইতে বিভিন্ন নামে নূতন নূতন 'উরফী (দস্তরী) কর আদায় করা হইত এবং যেহেতু ঐ সময় করদাতাগণ ধার্যকৃত কর আদায়ে সক্ষম কিনা এই দিকে লক্ষ্য রাখা হইত না, অনেকের উপর উহা কষ্টকর হইয়া পড়িত। অতএব, দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একটি প্রথা প্রচলিত হইয়া গেল যে, যখন তাহারা কোন সম্পত্তির ওয়াক্ফ করিত তখন ইহার সম্পূর্ণ আয় কিংবা আয়ের একটি অংশ এইরূপ দরিদ্র করদাতাদের সাহায্যার্থে নির্ধারিত করিয়া দিত এবং এই ধরনের সংস্থাকে 'আওয়ারিদ ওয়াক্ফী (عوارض وقفی) নামে অভিহিত করা হইত। যাহা হউক, কালক্রমে এইরূপ ওয়াক্ফসমূহের আসল উদ্দেশ্য প্রায়ই বিস্মৃত হইয়া যাইত এবং উক্ত আয়গুলি সংশ্লিষ্ট গ্রামের অথবা শহরের মহল্লার অপরাপর অভাব পূরণে ব্যয়িত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুলায়মান সূদী, দেফ্তের-ই মুকতেসিদ, ১খ., ৭৮, টীকা; (২) মুস্তাফা নূরী, নাতাইজুল উকূ'আত, ১খ., ৬৬; ২খ., ১০১; (৩) 'আব্দুর রাহ্মান ওয়েফীক, তাকালীফ কাওয়াইদী, ৬৯-৯৯, ১৮২, ২৯৫; (৪) Hammer-Purgstall, Desosmanischen Reichs Staatsverfassung, ১খ., ১৮০, ২৫৭, ২৯৫, ৩০৪; (৫) D' Ohsson,Tableau de l'Empire ottoman, ৭খ., ২৩৯; (৬) J. H. Mordtmann, Diejudischen Kira im Serai der Sultane, MSOS, ৩২/২ ১৯২৯, ২০ পৃ.; (৭) H. A. R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and the West, নির্ঘণ্ট; (৮) I. A. দ্র. (O.L. Barkan- এর প্রবন্ধ)।

H. Bowen (E.1.²)/সৈয়দ লুৎফুল হক

'আওয়ালিক (দ্র. 'আওলাকী)

আল-'আওয়াসিম (العواصم) ঃ সীমান্ত এলাকার এক অংশের নাম, যাহা সিরিয়ার উত্তর ও পূর্বদিকে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য এবং খলীফাদের সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে বিস্তৃত ছিল। এই এলাকায় অগ্রবর্তী স্থানের দুর্গগুলিকে আছ-ছুগূর (الثغور) [দ্র.] বা যথার্থভাবে সীমান্ত দুর্গসমূহ নামে অভিহিত করা হয়। অপর দিকে দূরবর্তী পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত দুর্গগুলিকে বলা হয় আল-'আওয়াসিম (العواصم), আভিধানিক অর্থে "রক্ষাকারিণিগণ" (এ. ব. আল-আসিমা- العاصمة)।

সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় আরবদের দ্রুত বিজয়ের পর তাহারা কিছুকাল রাজ্য সম্প্রসারণে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই এবং আমানুস্ (اللكام) [দ্র.] ও তাওরুস (Taurus) পর্বতের অপর দিকে বায়যান্টাইন ভূখণ্ডে তাহাদের আকর্ষণ সীমাবদ্ধ রাখে। হযরত 'উমার (রা) ও 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে মুসলিম সীমান্তবর্তী দুর্গগুলি আনতাকিয়া

(Antioch) ও মান্‌বিজ-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল, যেইগুলি পরবর্তী কালে আল-'আওয়াসিম নামে অভিহিত হয়'। অপরদিকে ঐ সকল দুর্গ যেইগুলিকে সঠিকতরভাবে আছ-ছুগূর বলা যাইত সেইগুলি এমন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল যাহা উভয় দলের মধ্যস্থলে বিদ্যমান এবং যাহা আনতাকিয়া ও আলেপ্পোর উত্তর দিকে তারসূস ও তাওরূস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিরাক্ল (Heraclius) যখন সিরিয়া পরিত্যাগ করেন তখন তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া এই অঞ্চলের শহরগুলি জনশূন্য করিয়া দিয়াছিলেন। বায়যান্টাইনরা এইখানে কেবল পাহারা কার্যের জন্য অনিয়মিত সেনাবাহিনী (المارادية)-এর কতগুলি চৌকি (مسالح) স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারাই সম্ভবত জারাজিমা (جراجمة) [দ্র.] ছিল, যাহারা কখনও কখনও বায়যান্টাইনের পক্ষাবলম্বন করিত, আবার কখনও কখনও আরবদের ও তাহাদেরকে পাহারা চৌকি (مسالح) ও গুপ্তচর বাহিনীও সরবরাহ করিত। এই অঞ্চলটি যাহা পুনঃপুনঃ মুসলিম আক্রমণে বিধ্বস্ত হইত তাহা আরব কর্তৃক আদ–দাওয়াহী (الضواحی) বহির্দেশ, বহিরাঞ্চল বা দাওয়াহির়রূম (ضواحی الروم) নামে অভিহিত হইত (আত্-তাবারী, ২খ., ১৩১৭; তু. ইবনুল আছীর, ৯৮-এর অধীনে)। এই শব্দটি আব্বাসী যুগেও কবি আবূ তাম্মাম ও কবি বুহ্তুরী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। বানূ উমায়্যা আন্তাকিয়ার অধিকতর দূরবর্তী এই এলাকায় তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিল এবং বহু রাস্তার সংযোগস্থলে ও গিরিপথের মুখে অবস্থিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ দখল করিতে লাগিল। Theophanes (সম্পা. Bonn, ৫৫৫-৬, A. M. 6178)-এর মতে Justinian II-এর সহিত 'আবদুল মালিক-এর সন্ধি অনুসারে আল-মারদিয়্যা বাহিনী সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ফলে সম্পূর্ণ অঞ্চলটি অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়া যায় এবং পরবর্তী কালে ইহা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক হইয়া পড়ে।

প্রথম দিকে এই সীমান্ত এলাকার সম্পূর্ণটি হিম্স জুন্দ (সেনানিবাস)-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার আমল হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং কি‌ন্নাস্রীন নামে একটি আলাদা জুন্দ গঠিত হইল। ১৭০/৭৮৬ সালে হারূনুর রাশীদ বায়যান্টাইন আক্রমণের পক্ষে উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশে, কোন প্রকার আক্রমণের উদ্দেশে নহে, (কেননা প্রতিরক্ষার জন্য তিনি অগ্রবর্তী এলাকা সংগঠন করিয়াছিলেন), কি‌ন্নাস্রীন জুন্দ হইতে মান্‌বিজ, দুলূক, রাবান, কুরুস, আন্তাকিয়া, তীযীন নামক কিছু সংখ্যক দুর্গ আলাদা করিয়াছিলেন এবং তিনি এইগুলিকে 'আওয়াসিম নামে অভিহিত করিতেন, যেহেতু মুসলিমগণ এইগুলির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিত এবং তাহাদের যুদ্ধাভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করার ও সীমান্ত এলাকা (ثغر) পরিত্যাগ করার পর তাহারা এইগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিত (আল-বালাযুরী)। ইব্ন শাদ্দাদ কর্তৃক ইহার অন্য একটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, "যেহেতু শত্রুপক্ষ হইতে কোন বিপদের আশংকা হইলে সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহের অধিবাসিগণ (اهل الثغور) এইগুলির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিত" এবং আল-কাল্কাশান্দী প্রদত্ত ইহার আর একটি সংজ্ঞা, "তাহারা তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত (دونها) মুস্লিম ভূখণ্ড শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত, কেননা এইগুলি অবিশ্বাসীদের দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল।" এই একই গ্রন্থকার মনে করেন, আছ-ছুগূর ও আল-'আওয়াসিম শব্দদ্বয় একই স্থানের দুইটি ভিন্ন নাম। ইহা নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ স্থান সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং অতীতেও নিশ্চয় এইরূপই ছিল। কিন্তু যেহেতু আল-'আওয়াসিম প্রদেশটি গঠনের সময় 'আব্বাসী 'আব্দুল মালিক ইব্ন সালিহ হিজরী ১৭৩ সাল হইতে ইহার গভর্নর ছিলেন, তাঁহার প্রধান কার্যালয় ছিল মান্‌বিজে এবং প্রধান প্রধান দুর্গও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এইজন্য শব্দদ্বয় একটি অপরটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত (দ্র. আত-তাবারী, ৩খ., ৬০৪; হারূনুর রাশীদ জাযীরা ও কি‌ন্নাস্রীনের সীমান্তবর্তী দুর্গগুলি পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে পরিণত করেন এবং ইহাদের নামকরণ করেন আল-'আওয়াসিম)।

'আওয়াসিম ও ছুগূর অনেকবার একই অধিনায়কের অধীনে একত্র হইয়াছে। কোন কোন সময়ে কি‌ন্নাস্রীন জুন্দ-এর সহিত, অন্যান্য সময় আবার ছুগূর স্বতন্ত্র প্রদেশ রহিয়াছে। কোন্ কোন্ এলাকা 'আওয়াসিমের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার সংখ্যা সম্বন্ধেও ভূগোলবিদগণ একমত নহেন। ইব্ন খুর্‌রাদাযবিহ ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন আল-জুমা, বূকা, বালিস্ ও রুসাফাত হিশাম-কে, আর ইব্ন হাওকাল বালিস্, সান্জা, সেমোসেট (سميساط) ও জিস্‌র মান্‌বিজকে। ইব্ন শাদ্দাদ এতদ্ব্যতীত বাগরাস্, দার্‌বাসাক, আর্তাহ কায়সুম তাল্ল কাব্বাসীন-এর নাম উল্লেখ করেন। ইয়াকূত অন্যান্য স্থানও অন্তর্ভুক্ত করেন। ১০ম শতাব্দীতে আল-'আওয়াসিম-এর রাজধানী ছিল আন্তাকিয়া (Antioch)।

আছ-ছুগূর এলাকার ন্যায় আল-'আওয়াসিম এলাকা বায়যান্টাইন ও আরবদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দৃশ্যপট ছিল; ইহা Nicephorus Phocas কর্তৃক পুনঃবিজিত হয়, যিনি আলেপ্পোর আমীরকে অঞ্চলটির পশ্চিম ও উত্তরাংশ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। সেই সময় হইতে আল-'আওয়াসিম শব্দটি কেবল একটি ভৌগোলিক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রুসেডের ও মামলূকদের সময়ে আরব ভূগোলবিদগণ কর্তৃক এইভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার যে সামান্য তথ্য আমাদের নিকট আছে, ইহা হইতে মনে হয় অঞ্চলটি 'আব্বাসী যুগে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইব্ন খুর্‌রাদাযবিহ্-এর মতে কি‌ন্নাস্রীন জুন্দ ও আল-'আওয়াসিম হইতে একত্রে করের মোট আয় ছিল ৪,০০,০০০ দীনার এবং কুদামা-এর মতে ৩,৬০,০০ দীনার। জনসংখ্যা ছিল খুবই মিশ্র। ইহাতে রহিয়াছে মূল দেশীয় অধিবাসী (নগর ও উপনিবেশসমূহের খৃষ্টানগণ, আমানুস-এর জারাজিমা) ব্যতীত কতগুলি অন্যান্য বংশোদ্ভূত সম্প্রদায় যাহারা সেইখানে বহিরাগত ছিল কিংবা নির্বাসনে আসিয়াছিল, 'আরব গোত্রসমূহ, বিশেষত কায়স গোত্র যাহারা সেইখানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, দুলূক পর্যন্ত সম্প্রসারিত কিলাব গোত্র, মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়া ভারত হইতে আগত বিদেশী বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়, যেমন মু'আবিয়াঃ (রা) কর্তৃক আনীত আনতাকিয়াঃ অঞ্চলের সায়াবিজা (দ্র.) সম্প্রদায় ও যুত্ত (Zott) [দ্র.] সম্প্রদায়ও একই অঞ্চলে মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক এবং পরবর্তী কালে ওয়ালীদ ইব্ন আব্দিল

মালিক কর্তৃক আনীত হইয়াছিল। জানা গিয়াছে, এই অঞ্চলে ছোটদের বসবাস করাইবার (যেমন সাইলিসিয়ায় দ্বিতীয় ইয়াযীদ ও মু'তাসিম কর্তৃক তাহাদের বসতি স্থাপন) অন্যতম কারণ ছিল, এই সম্প্রদায়টি মহিষ পালন করিত এবং এই সকল মহিষের উপস্থিতি জলাভূমিগুলি যেমন আন্তাকিয়ার ও সাইলিসিয়ার আমুক (দ্র.) সিংহের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত যাহা এই অঞ্চলগুলির প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতেছিল (দ্র. আল-বালাযুরী, ফুতূহ, ১৬২, ৩৭৬; Wellhausen, Das Arabische Reich, ৪১৫; M. Hartmann, Das Liwa Haleb, ৭১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ১৩২, ১৪৪, ১৫৯ (জারাজিমা); (২) ইস্‌তাখ্‌রী, ৫৬, ৬২; (৩) ইব্‌ন হাওকাল, ১০৮, ১১৯; (৪) মুকাদ্দাসী, ১৮৯; (৫) ইব্‌নুল ফাকীহ, ৩খ., ১২০; (৬) ইব্‌ন খুররাদায্‌বিহ, ৭৫; (৭) কুদামা, ২৪৬; (৮) ইব্‌ন রুস্‌তা, ১০৭; (৯) তাবারী, ১খ., ২৩৯৬, ৩খ., ৬০৪, ৭৭৫, ১৩৫২, ১৬৯৭, ২১৮৭; (১০) আবুল ফিদা, তাক্‌বীম, ২৩৩; (১১) দিমাশ্‌কী, সম্পা. Mehren, ১৯২, ২১৪; (১২) ইব্‌ন শাদ্দাদ, আল-আলাকুল খাতীরা, সম্পা. Ch. Ledit, in Al-Mashrik, xxx,....(1935), ১৭৯-২২৩; (১৩) ইব্‌নুশ শিহ্‌না, আদ-দুররুল মুন্‌তাখাব, বৈরূত ১৯০৯, পৃ. ৯, ১১, ১৫৮, ১৯০, ২০১, ২২১ ইত্যাদি (নির্ঘণ্ট দ্র.); (১৪) ইয়াকূত, ১খ, ১৩৬, ৯২৮, ৩খ., ২৪০-৭৪১ ও স্থা. (নির্ঘণ্ট দ্র.); (১৫) কাল্‌কাশান্‌দী, সুব্‌হুল আ'শা, ৪খ., পৃ. ৯১, ১৩০ ২২৮; (১৬) G. Le Strange, Palestine Under The Muslims, ২৫-৭, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৫-৭; (১৭) Sachau, in Sitz. Ber. der Berl. Akad., ১৮৯২, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৭; (১৮) Wellhausen, Die Kampfe der Araber mit den Romaern in der Zeit der Umaijiden, in Nachr. der Gettinger Ges. Der Wiss., ১৯০১, ৪১৫, ৪২৯-৩১; (১৯) Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks, ৯-১০, ৩১, ৯৫, ২১৭; (২০) Honigmann, Die Ostgrenze des byz. Reiches, ৩৯-৪১; (২১) M. Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, ১খ., পৃ. ২২৪।

M. Canard (E.I.[2])/সৈয়দ লৎফুল হক

আওয়াহ্‌ (آوه) ঃ অথবা আভাহ, আভেহ (Avah, Aveh), মধ্য ইরানের দুইটি শহরের নাম।

১। আওয়াহ নামের একটি শহর—বর্তমান নাম আওয়াজ-কায্‌বীনের ৭০ মাইল (১১১ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে হামাদান অভিমুখী রাস্তার ধারে ৩৫°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৪৯°১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। উচ্চতার কারণে শহরটি শীতপ্রধান অঞ্চলের (সারদ্‌সীর) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে এই শহরে আনুমানিক ১৮০০ ফারসী ও তুর্কী ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল।

মধ্যযুগের ভূগোল গ্রন্থে শহরটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। ইয়াকূত এখানকার আওয়াকী নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। শাহ 'আব্বাসের আমলে নির্মিত একটি সরাইখানার পুরাতন ভবনই মাত্র ইহার নিকট অবস্থিত।

২। আওয়া নামের অপর শহরটি যাহা আভেহ্‌ নামেও পরিচিত, বর্তমানে সাওয়া জেলার জা'ফারাবাদ উপজেলার একটি গ্রাম এবং কুমৃম-এর আনু. পৌণে ১৯ মাইল (৩০ কিলোমিটার) পশ্চিমে সাধারণত শুষ্ক গাওমাহা নদীর তীরে ৩৪°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৫০°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মধ্যযুগের ভৌগোলিকগণ সাওয়ার সহিত একত্রে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। শহরটি মোঙ্গলগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় এবং বাহ্যত উহার গুরুত্ব পুনরায় ফিরিয়া পায়, অবশ্য সেখানে ঈল্‌খানি মুদ্রা প্রস্তুত হইত, ইহা যদি সেই আওয়া হয় (দ্র. B. Spuler, Die Mongolen In Iran, বার্লিন ১৯৫৫, পৃ. ১২৯)।

১৯৫০ খৃস্টাব্দে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৮৮৫ জন এবং তাহারা শহরটির আগেকার লোকদের ন্যায় শী'আ মতাবলম্বী। আওয়ার সন্নিকটে অনেক প্রাচীন কৃত্রিম টিলা রহিয়াছে এবং গ্রামটিতে একটি পুরাতন "ইমামযাদা" বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, ১৯৬, ২১১; (২) P. Schwartz, Iran im Mittelalter, ৫, ৫৪৯, ৫৪২; (৩) হাম্‌দুল্লাহ মুস্‌তাওফী, নুযহা, ৬০,২২১ (শুধু দ্বিতীয় আওয়া); (৪) রায্‌মারা, ফারহাঙ্গ-ই জুগ্‌রাফিয়া-ই ঈরান, ১খ., (তেহরান ১৯৫০), ২৬-৭; (৫) P. Schwartz, Drei Ortsagen in NordIran, in Isl. ৮,. ১৯১৮, ১৮ (শুধু প্রথম আওয়া=Udi).

R.N.Frye (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আওরংগযেব (اورنگ زیب) ঃ আবুল মুজাফ্‌ফার মুহাম্মাদ মুহ্‌য়িদ্‌ দীন আওরাংগযীব 'আলামগীর বাদশাহ গাযী (১০২৭-১১১৮/ ১৬১৮-১৭০৭) ষষ্ঠ মুগল সম্রাট এবং ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত নরপতি, দক্ষ রাষ্ট্রনীতিবিদ, রণনিপুণ সৈনিক, সুশাসক, সুপণ্ডিত ও উন্নত চারিত্রিক গুণের অধিকারী। তাঁহার শাসনকালে মুগল সাম্রাজ্য ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। উত্তর হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র সীমা এবং পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম হইতে পশ্চিমে কাবুল পর্যন্ত তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারত উপমহাদেশের আর কোন নরপতি কোন যুগেই এত বড় সাম্রাজ্য শাসনের গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই। তৎকালীন ইউরোপের বিখ্যাত নরপতি ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই (Louis XIV, ১৬৪৩-১৭১৫ খৃ.) ও রাশিয়ার মহামতি পিটার (১৬৮২-১৭২৭ খৃ.) তাঁহার সমসাময়িক, কিন্তু উন্নত আদর্শ, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতে তিনি তাঁহার সমকালীন সকল নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শুধু শাসক হিসাবেই নয়, ইসলাম ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসাবেও তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। আকবর ও জাহান্‌গীরের উদার ধর্মনীতির ফলে উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

আওরংগযেব পঞ্চম মুগল সম্রাট শাহ্জাহান ও সম্রাজ্ঞী মুমতায মহল-এর তৃতীয় পুত্র। ১৬১৮ খৃ., ৩ নভেম্বর মালওয়ার যুদ-এ তাঁহার জন্ম, ১৬৫৮ খৃ., ২১ জুলাই দিল্লীতে তাঁহার সিংহাসন লাভ এবং ১৭০৭ খৃ., ২ এপ্রিল দাক্ষিণাত্যের আহ্মাদনগরে তাঁহার মৃত্যু। শাহ্জাহান ও মুমতায মহলের চারি পুত্র (দারা, শুজা, আওরাংগযীব ও মুরাদ)-এর মধ্যে নিঃসন্দেহে আওরংগযেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ও যোগ্য। বাল্যকাল হইতে তিনি জ্ঞান সাধনা, ধর্মপ্রবণতা, সাহস, দৃঢ় মনোবল ও বীরত্বের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে একদা তাঁহার দিকে ধাবমান এক ক্ষিপ্ত হস্তীকে তিনি বীরত্বের সহিত কাবু করেন এবং স্বীকৃতিস্বরূপ শাহ্জাহান তাঁহাকে "বাহাদুর" (বীর) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭ বৎসর বয়সে (১৬৩৫ খৃ.) তিনি দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হিসাবে বুন্দেলখণ্ডে জুজার সিংহ বুন্দেলার বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮ বৎসর বয়সে (১৬৩৬ খৃ.) তিনি দাক্ষিণাত্যের মত বৃহৎ ও বিদ্রোহ-বিশৃংখলাপূর্ণ এলাকার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং আট বৎসর সফলতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাঁহার কার্যাবলীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শাহ্জাহানের প্রিয়পুত্র দারার অহেতুক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে তিনি ১৬৪৪ খৃ. তাঁহার দায়িত্ব পালন বন্ধ করিয়া দেন এবং সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সূফী সাধকদের কঠোর সংযমী জীবনের অনুসরণ শুরু করেন। তাঁহার এই সংসার বিরাগী মনোভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া শাহ্জাহান তাঁহাকে সুবাদারের পদ হইতে অপসারিত করেন এবং তাঁহার জায়গীর বাজেয়াফত করেন ও ভাতা বন্ধ করিয়া দেন। যাহা হউক, শীঘ্রই তিনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়া আসেন এবং পিতার অনুগ্রহে ফেব্রুয়ারী ১৬৪৫ খৃ. গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৪৬ খৃ. গুজরাট হইতে বদলি হইয়া তিনি মধ্যএশিয়ায় সদ্য মুগলাধিকৃত বল্খ ও বাদাখশান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বাল্খ ও বাদাখশানের শাসনকর্তা হিসাবে তিনি প্রশাসনে এবং দুর্ধর্ষ উযবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যের পরিচয় দেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও স্থায়ী উযবেক বিরোধিতার চাপে বেশী দিন মধ্যএশিয়ায় টিকিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। ১৬৪৮ খৃ. তিনি মুলতান-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এই সময়ে শাহ্জাহানের নির্দেশে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ 'আব্বাসের দখল হইতে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দুই দুইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৬৫২ খৃ. তিনি দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের মুগল এলাকা তখন খান্দেশ, বেরার, তেলিনগানা ও দৌলতাবাদ— এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং আওরংগেযেব এই গোটা এলাকার সুবাদার ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মোট দুর্গ ছিল ৬৪টি এবং ইহার বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকা। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসাবে তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি বিশৃংখল প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করিয়া তিনি তাহাদের স্থলে সৎ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের জায়গীর বাজেয়াফ্ত করেন। সুযোগ্য দীওয়ান মুর্শিদ কুলী খানের সাহায্যে তিনি রাজস্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। কৃষি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তিনি কৃষকদেরকে কৃষি কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন এই সমস্ত জনকল্যাণমুখী সংস্কারের ফলে দাক্ষিণাত্যের কৃষি ব্যবস্থার ও কৃষক সম্প্রদায়ের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় আয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন, ১৬৫৮ খৃ. আওরংগাবাদ (আওরংগযেবের রাজধানী)-এর নিকটে একখণ্ড জমিও পতিত পড়িয়া থাকিত না এবং কৃষিজাত দ্রব্যের সরবরাহ এতই পর্যাপ্ত ছিল যে, গম ও ডাল টাকায় ২½ মণ, জাওয়ার ও বাজরা টাকায় ৩½ মণ; গুড় টাকায় ২½ মণ এবং ঘি টাকায় ৪ সের করিয়া বিক্রয় হইত (Sarkar, J.N., History of Aurangzeb, ১খ., পৃ. ১৭৩)। প্রশাসনিক সংস্কারের পর আওরংগযেব দাক্ষিণাত্যের শী'আ মুসলিম রাষ্ট্র গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণ করেন। শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে এই দুইটি রাজ্যের সুল্তানগণ বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেও তাঁহারা প্রায়ই কর প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন এবং সুযোগমত মুগল স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হইতেন। গোলকুণ্ডার সুল্তান আবদুল্লাহ কুতুব শাহের কর প্রদানে শৈথিল্য, পারস্যের সাফাবী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের সহিত তাঁহার মুগল বিরোধী সম্পর্ক এবং তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী মীর জুম্লা ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কারণে শাহ্জাহানের নির্দেশে আওরংগযেব ১৬৫৬ খৃ. গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ করেন। কতিপয় অঞ্চল অধিকার করিবার পর তিনি দ্রুত গতিতে গোলকুণ্ডা রাজ্যের রাজধানী অবরোধ করেন। তাঁহার প্রবল আক্রমণের মুখে রাজধানীর পতন আসন্ন দেখিয়া সুল্তান কুতুব শাহ্ দূত মারফত আওরংগযেবের বিজয় সাফল্যে ঈর্ষাপরায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার শরণাপন্ন হন। দারার অনুরোধে শাহ্জাহান আওরংগযেবকে আসন্ন বিজয়ের মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দেন। আওরংগযেব সম্রাটের আদেশ মানিয়া নেন। গোলকুণ্ডার সুলতান মুগল সম্রাটকে দশ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বকেয়া কর পরিশোধ, আওরংগযেবের পুত্র মুহাম্মাদ সুলতানের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দান, ভবিষ্যতে মুগলদের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ও নিজ রাজ্যের কিছু অংশ আওরংগযেবকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন (১৬৫৬ খৃ.)। এই সময় বিজাপুর রাজ্যে ব্যাপক অরাজকতা ও বিজাপুরের সুল্তানেরও কর প্রদানে অনিয়মের কারণে শাহ্জাহানের নির্দেশে আওরংগযেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন (জানুয়ারী ১৬৫৭ খৃ.)। বীদর ও কল্যাণী দুর্গের সহজেই পতন ঘটে। বীদর দুর্গে আওরংগযেব নগদ ১২ লক্ষ টাকা, ৮ লক্ষ টাকার গোলাবারুদ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং ২৫০টি কামান হস্তগত করেন। তিনি দুর্গ প্রাচীরের উপর মুগল পতাকা উত্তোলন করেন এবং দুর্গের ভিতরের মসজিদে সম্রাট শাহ্জাহানের নামে খুত্বা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বিজাপুর রাজ্যের রাজধানী আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময় দারার অনুরোধে শাহ্জাহান আবার আওরংগযেবকে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। বিজাপুরের সুল্তান মুগল সম্রাটকে এক কোটি টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া এবং বীদর, কল্যাণী ও পরেন্দা দুর্গ আওরংগযেবকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন (১৬৫৭ খৃ.)। নিশ্চিত বিজয়ের প্রাক্কালে আওরংগযেবকে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য

অধিকার করা হইতে বঞ্চিত করিয়া শাহ্জাহান দাক্ষিণাত্যে মুগল স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতি করেন। শাহ্জাহানের রাজত্বকালে আওরংগযেব যদি এই দুইটি রাজ্য মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যে মুগল বিরোধী মারাঠা শক্তির উদ্ভব সম্ভব হইত না। এই দুইটি রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগেই মারাঠা শক্তির উদ্ভব ঘটে এবং মারাঠারা পরবর্তী কালে মুগলদের মারাত্মক স্থায়ী শত্রু হইয়া দেখা দেয়।

১৬৫৭ খৃ. ৬ সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। সম্রাট কয়েক দিন রাজ-দরবারে না বসাতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুজব রটিয়া যায়, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং দারা পিতার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিয়া পিতার নামেই রাজ্যশাসন করিতেছেন। এইদিকে দারা নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশে পিতার অসুস্থতার খবর বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে সুবাদার পদে নিযুক্ত তাঁহার ভাইদের কাছে গোপন রাখেন এবং রাজধানী হইতে ঐসব অঞ্চলের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দেন; এমনকি রাজধানীতে নিযুক্ত ভাইদের প্রতিনিধিদেরকে তিনি বন্দী করেন। দারার এইসব কার্যকলাপের ফলে দূরবর্তী প্রদেশে অবস্থানরত শাহযাদাদের মনে পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ আরও বাড়িয়া যায়। এমতাবস্থায় মুগলদের মধ্যে উত্তরাধিকার প্রশ্নে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি না থাকায় প্রত্যেক শাহ্যাদার মনে সিংহাসন লাভের বাসনা জাগিয়া উঠে। শুজা' বাংলার রাজধানী রাজমহলে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। মুরাদ গুজরাটের রাজধানী আহ্মাদাবাদে সম্রাট উপাধি ধারণ করেন, ছয় হাজার সৈন্য লইয়া সুরাট আক্রমণ করেন এবং সুরাটের দীওয়ান 'আলী নাকীকে হত্যা করেন। আওরংগযেব পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক খবর না পাওয়াতে তাড়াহুড়া করিয়া অবিবেচকের মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলেও মুরাদের সহিত এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হন যে, সত্যই যদি পিতার মৃত্যু হইয়া থাকে তবে তাঁহারা একযোগে দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন এবং জয়ী হইলে দুইজনের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবেন। চুক্তি অনুসারে মুরাদ গুজরাট হইতে এবং আওরংগযেব দাক্ষিণাত্য হইতে সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হইয়া উজ্জয়িনীর নিকট দিপালপুরে মিলিত হন এবং ধরমাত নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। দারা রাজপুত রাজা জসওয়ান্ত সিংহ ও সেনাপতি কাসিম খানের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী আওরংগযেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দারা আরও একটি সৈন্যবাহিনী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান শুকোহ্ ও রাজপুত রাজা জয় সিংহের নেতৃত্বে শুজা'-র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেনারসের নিকট বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শুজা' বাংলাদেশের দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন (৬ ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮ খৃ.)। কিন্তু আওরংগযেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত দারার সৈন্যবাহিনী ধরমাতের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় (১৫ এপ্রিল, ১৬৫৮ খৃ.)। বিজয়ী আওরংগযেব ও মুরাদ চম্বল নদী অতিক্রম করিয়া আগ্রার আট মাইল দূরে সামগড় নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং দারা ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিপাহর শুকোহ্-এর নেতৃত্বে ৫০,০০০ সৈন্যর এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করিয়া আগ্রায় প্রবেশ করেন (২৯ মে, ১৬৫৮ খৃ.)। আগ্রায় আওরংগযেব বাগ-ই নূরে শিবির স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তখন আগ্রায় অবস্থানরত পিতার নিকট ক্ষমা চাহিয়া একটি পত্র পাঠাইলেন। পত্রে তিনি ভ্রাতৃযুদ্ধের জন্য দারাকেই দায়ী করেন। শাহ্জাহান আওরংগযেবকে 'আলামগীর (বিশ্ব বিজয়ী) নামে একটি তলোয়ার উপহার পাঠাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একই সংগে শাহ্জাহান দারাকে আওরংগযেবের বিরুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য দিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এই দ্বৈত নীতির জন্য আওরংগযেব তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া তাঁহাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করেন। ইতোমধ্যে মুরাদ আওরংগযেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। আগ্রাতে পিতাকে বন্দী করিয়া আওরংগযেব দারার বিরুদ্ধে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে মথুরার নিকট রূপনগরে মুরাদকে কৌশলে বন্দী করেন। পরে তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠান হয় এবং সেখানে দীওয়ান 'আলী নাকীকে হত্যা করার অপরাধে মুরাদকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (১৬৬১ খৃ.)। দিল্লীতে পৌঁছিয়া আওরংগযেব আবার দারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া মুলতান পর্যন্ত গমন করেন। ইতোমধ্যে শুজা' পূর্বাঞ্চলে আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া সিংহাসন লাভের জন্য দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া আওরংগযেব ও তাঁহার সেনাপতি মীর জুম্লা দারার পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত হইয়া শুজা'র বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং এলাহাবাদের নিকটে খাজওয়াহ নামক স্থানে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শুজা'-কে পরাজিত করেন (৫ জানুয়ারী, ১৬৫৯ খৃ.)। অতঃপর মীর জুম্লাকে শুজা'র বিরুদ্ধে মোতায়েন রাখিয়া আওরংগযেব আবার দারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এইদিকে মীর জুম্লা শুজাকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে তাড়াইতে আরাকানে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। আরাকানের মগরাজা শুজাকে সপরিবার হত্যা করে (১৬৬১ খৃ.) (Cambridge Hist. of Ind., iv, 226, 480-81)। ইতোমধ্যে আওরংগযেব আজ্মীরের নিকটে দেওরাই নামক স্থানে দারাকে আবারও পরাজিত করেন (২৩ মার্চ, ১৬৫৯ খৃ.)। বারবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দারা ভগ্নহৃদয়ে দেশ ছাড়িয়া কান্দাহারের দিকে যাত্রার পথে দাদর (Dadar)-এর আফ্গান নেতা মালিক জিওয়ান খানের আশ্রয়প্রার্থী হন। জিওয়ান খান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক দারাকে বন্দী করেন এবং আওরংগযেবের সেনাপতি বাহাদুর খানের হাতে তুলিয়া দেন। বাহাদুর খান দারাকে দিল্লীতে লইয়া আসেন এবং আওরংগযেব-এর নির্দেশে একটি কুৎসিৎ হাতীর পিঠে উঠাইয়া দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া চরমভাবে অপমানিত করেন। শীঘ্রই আওরংগযেব দারার বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলিম আইনবিশারদদের রায় অনুসারে ধর্মত্যাগের অপরাধে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (৩০ আগস্ট, ১৬৯ খৃ.) (Camb. Hist. of Ind., vi, 227)।

ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আওরংগযেব ১৬৫৮ খৃ.-এর ২১ জুলাই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেক দুইবার অনুষ্ঠিত হয়ঃ প্রথম অভিষেক আগ্রা অধিকারের পর ১৬৫৮ খৃ.-এর ২১ জুলাই এবং দ্বিতীয় অভিষেক খাজওয়াহ ও দেওরাই-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৬৫৯ খৃ.-এর ৫ জুন। তাঁহার রাজত্বকালকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

১৬৫৮-১৬৮১ খৃ. ও ১৬৮২-১৭০৭ খৃ.। রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি ছিলেন উত্তর ভারতে এবং উত্তর ভারতের সমস্যাই তখন তাঁহার অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগে তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যে এবং দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারেই তিনি তখন বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর রাজত্বকাল তাঁহার সংগ্রামী জীবনের ফিরিস্তি। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি নিজের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশে ও বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমনে যুদ্ধক্ষেত্রেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সংক্ষেপে এইটুকুই বলা যায়, তিনি ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে মুগল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি সাধন করেন। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তাঁহার সেনাপতি ও বাংলার সুবাদার মীর জুম্‌লা কুচবিহার ও আসাম রাজ্য আক্রমণ করিয়া (১৬৬১-৬৩ খৃ.) রাজা জয়ধ্বজকে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। সন্ধি অনুসারে রাজা স্বীয় রাজ্যের এক বিরাট অংশ মীর জুম্‌লাকে ছাড়িয়া দেন এবং মুগল সম্রাটকে বাৎসরিক কর ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। আসাম জয়ের পর ঢাকা ফিরিবার পথে মীর জুম্‌লার মৃত্যু হয় (১৬৬৩ খৃ.)।

মীর জুম্‌লার পরবর্তী বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করিয়া সন্দ্বীপ ও আরাকানের মগদেরকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন (১৬৬৬ খৃ.)। আওরংগযেবের ইচ্ছানুসারে চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ (আ. করীম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা ১৯৭৪, ২য় সং, পৃ. ৩৯৯)। দক্ষিণ ভারতে (দাক্ষিণাত্যে) আওরংগযেব তাঁহার পূর্ববর্তী মুগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের রাজ্যবিস্তার নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মারাঠা শক্তির সংগে ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া মারাঠা রাজ্যও অধিকার করেন। তৎপর দাক্ষিণাত্যের সুদূর দক্ষিণে তানজের ও ত্রিচিনোপলী (Trichinopoly) রাজ্যের হিন্দু রাজাদেরকেও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে ও তাহাদেরকে কর দিতে বাধ্য করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে বিশাল মুগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অন্যায়ের সহিত আপোষ করা উচিৎ নয় এই নীতির অনুসরণে এবং সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৬৬৯ খৃ. মথুরার জাঠরা গোকলা-র নেতৃত্বে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। তাহারা মুগল ফৌজদার 'আব্দুন নবীকে হত্যা করিয়া সা'দাবাদ পরগনা লুণ্ঠন করে এবং সমগ্র মথুরাতে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে। মুগল সেনাপতি হাসান 'আলী খান জাঠদের পরাজিত করেন। তাহাদের নেতা গোকলা ধৃত হইয়া আগ্রাতে নীত হন এবং সেখানে তাহাকে হত্যা করা হয় (১৬৭৬ খৃ.)। জাঠরা ১৬৮৫ খৃ. রাজা রামের নেতৃত্বে আবার উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করে এবং ১৬৮৮ খৃ. তাহারা সিকান্দ্রাতে আকবরের সমাধি লুণ্ঠন করে। মুগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে রাজা রাম পরাজিত ও নিহত হন। রাজা রামের পরেও জাঠ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নাই। জাঠরা রাজা রামের ভ্রাতুষ্পুত্র ছুরামনের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয় এবং আওরংগযেবের মৃত্যুর পর মথুরাতে মুগল শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে।

১৬৭২ খৃ. নারনল ও মেওয়াতের সতনামী সম্প্রদায় একজন মুগল পদাতিক সৈনিক কর্তৃক তাহাদের একজন সাধারণ কৃষক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে মুগল শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহারা নারনলের মুগল ফৌজদারকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া নারনল লুণ্ঠন করে এবং মসজিদ ধ্বংস করে। সতনামীদের বিরুদ্ধে মুগল সৈন্যরা প্রথমদিকে যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারায় মুগলদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সত্‌নামীরা যাদুমন্ত্রবলে মুগল বাহিনীকে হটাইয়া দেয়। মুগল সৈন্যবাহিনীর এই অহেতুক ধারণার প্রতিষেধক হিসাবে আওরংগযেব দু'আ-তাবীয লিখিয়া তাহাদের পতাকায় গাঁথিয়া দেন। এইবার মুগল বাহিনী বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া সত্‌নামীদেরকে পরাজিত করে। প্রায় দুই হাযার সতনামী যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং বিদ্রোহ দমিত হয় (Cambridge Hist. of Ind., iv, 243-44)।

১৬৭৫ খৃ. পাঞ্জাবে শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর আওরংগযেবের কতিপয় আদেশ-নির্দেশের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের হিন্দুদেরকে বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তেগ বাহাদুরের পুত্র দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। তিনি শিখ যুবকদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় আক্রমণ শুরু করেন। তাহার এই বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ মুগল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয় এবং তিনি পরাজিত হইয়া কিছুদিন পলাতক থাকেন। পরে আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া আনন্দপুরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে বসবাস করিতে থাকেন। আওরংগযেব তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে গুরু গবিন্দ সিংহকে তাঁহার দরবারে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু গুরু দাক্ষিণাত্যে পৌছিবার পূর্বেই আওরংগযেব ইনতিকাল করেন।

সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্‌গান উপজাতিদের বিদ্রোহ আওরংগযেবের রাজত্বকালের একটি প্রধান ঘটনা। দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনতাপ্রিয় আফ্‌গান উপজাতিরা মুগল শাসনের প্রতি কখনও স্থায়ীভাবে অনুগত ছিল না। সুযোগ পাইলেই তাহারা মুগল অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিত এবং লুটতরাজে লিপ্ত হইত। আওরংগযেবের পূর্ববর্তী মুগল সম্রাটগণ কখনও সামরিক শক্তি প্রয়োগে এবং কখনও উৎকোচ ও পারিতোষিক প্রদানের মাধ্যমে উপজাতিদেরকে বশীভূত রাখিতেন। পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী উপজাতিদের সংগে সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত মুগল সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না। যাহা হউক, আওরংগযেবের রাজত্বকালে ইয়ূসুফযাঈ, আফ্রীদী, খট্টক প্রভৃতি উপজাতি বিদ্রোহে মাতিয়া উঠে। ১৬৬৭ খৃ. ইয়ূসুফযাঈ উপজাতি তাহাদের নেতা ভাগু-এর নেতৃত্বে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া হাযারা জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রমণ করে। তাহাদের বিরুদ্ধে আওরংগযেব কামিল খান, শাম্‌শীর ও মুহাম্মাদ আমীন খান নামক তিনজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। মুগল বাহিনী আক্রমণকারীদেরকে শুধু পিছনে হটিতেই বাধ্য করে নাই, বরং তাহাদের আবাসভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। নিরুপায় হইয়া ইয়ূসুফযাঈ উপজাতি মুগলদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শীঘ্রই আফ্রীদী উপজাতির নেতা আক্‌মাল খান (তিনি নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন) পেশাওয়ার, বান্নু ও কোহাট অঞ্চলের

খট্টক নেতা খোশহাল খান ও আরও অনেক উপজাতীয় নেতার সহিত মিলিত হইয়া ব্যাপকভাবে মুগল বিরোধী সংগ্রাম শুরু করে। মুগল সেনাপতি আমীন খান যুদ্ধে আক্‌মাল খানের নিকট মারাত্মকভাবে পরাজিত হন। আমীন খানের পরাজয়ের সংবাদে আওরংগযেব লাহোরের মুগল শাসনকর্তা ফিদাঈ খানকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পেশাওয়ারে ও সেনাপতি মাহাবাত খানকে কাবুলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সেনাপতি মাহাবাত খান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুদের সহিত মিত্রতা শুরু করাতে আওরংগযেব সেনাপতি শুজা'আত খানকে মাহাবাত খানের স্থলাভিষিক্ত করেন। শুজা'আত খান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হওয়ায় আওরংগযেব নিজেই বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া রাজধানী হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে রওয়ানা হন। ১৬৭৪ খৃ.-এর জুন মাসে তিনি পেশাওয়ারের নিকট হাসান আবদালে পৌঁছেন। তাঁহার সংগে শাহ্‌যাদা আক্‌বার, ওয়াযীর আসাদ খান, সেনাপতি আগর খান এবং আরও অনেক বিখ্যাত সেনাপতি বিদ্রোহী আফ্‌গান এলাকায় প্রবেশ করেন। একই সংগে যুদ্ধ, কূটনীতি ও পারিতোষিক প্রদানের মাধ্যমে তিনি অনেক আফ্‌গান সর্দারকে বশীভূত করেন, অনেক সর্দারকে জাগীর ও অনেককে মনসব প্রদান করা হয়। এইভাবে যুদ্ধ ও কৌশল প্রয়োগে আফ্‌গান বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া আওরংগযেব ১৬৭৫ খৃ.-এর শেষের দিকে রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সেনাপতিরা আফ্‌গানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। ১৬৭৮ খৃ. তিনি আমীন খানকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আমীন খান আপোষ নীতি অনুসরণ করিয়া আফ্‌গান রাজ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। আফ্‌গান যুদ্ধে আওরংগযেবের সামরিক শক্তি ও বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। তবে এই যুদ্ধের বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রাজপুত বিদ্রোহ আওরংগযেবের রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজপুতদের প্রতি মুগল সম্রাটগণ বরাবরই উদার নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহারা বহু রাজপুত রাজার রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত না করিয়া করদান ও অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাঁহাদের অধীনেই রাখিয়া দেন। এইভাবে মেওয়ার, মারওয়ার প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যের রাজারা মুগল সাম্রাজ্যের অধীনে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। তাহারা যুদ্ধের সময় মুগল সম্রাটকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতেন এবং মুগল শাসনাধীনে উচ্চ মনসব ভোগ করিতেন। এইসব সুবিধা সত্ত্বেও রাজপুতগণ মুগল শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসানের পর হইতেই রাজপুতরা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেষ্ট হইয়া উঠে। খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭ খৃ.) বাবরের নিকট রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে সম্মিলিত রাজপুত শক্তির পরাজয় উপমহাদেশে হিন্দু আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসের মূলে চরম কুঠারাঘাত করে। আকবরের উদার নীতির পরও রাজপুতদের স্বাধীনতা-স্পৃহা বিনষ্ট হয় নাই। মেওয়ারের রানা প্রতাপ সিংহের দীর্ঘকাল ধরিয়া মুগল বিরোধী সংগ্রাম ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। জাহান্‌গীরের আপোষ নীতির ফলে রাজপুত বিরোধিতা সাময়িক প্রশমিত হইলেও আওরংগযেবের রাজত্বকালে তাহা আবার তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। ১৬৭৯ খৃ. মারওয়ারের রানা জাসওয়ান্ত সিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়াতে আওরংগযেব রানার ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্র সিংহকে মারওয়ারের সিংহাসন দান করেন। কিন্তু এই সময় জাসওয়ান্ত সিংহের দুই বিধবা রাণীর দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে; একটি পুত্র জন্মের পরেই মারা যায় কিন্তু অপরটি (অজিত সিংহ) জীবিত থাকে। জাসওয়ান্ত সিংহের প্রধান অনুসারীরা এই শিশুপুত্র অজিত সিংহ ও রাণীমাতাদ্বয়কে লইয়া দিল্লীতে আওরংগযেবের দরবারে উপস্থিত হন এবং অজিত সিংহকে মারওয়ারের সিংহাসন প্রদানের আবেদন জানান। কিন্তু আওরংগযেব নির্দেশ দেন, অজিত সিংহ মুগল রাজদরবারে প্রতিপালিত হইবে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে মারওয়ারের সিংহাসন দেওয়া হইবে। রাজপুতগণ আওরংগযেবের এই নির্দেশ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিল, সম্রাট অজিত সিংহকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই তাহারা অজিত সিংহ ও রাণীমাতাদ্বয়কে লইয়া মুগল দরবার হইতে পলায়ন করিয়া মারওয়ারে উপস্থিত হয় এবং মুগল শাসনের বিরুদ্ধে মারওয়ারের রাজপুতদেরকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দুর্গাদাস নামক এক সাহসী ও রণকুশলী রাজপুত বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। রাজপুত বিদ্রোহ দমনের জন্য আওরংগযেব তাঁহার তিন পুত্র শাহযাদা, আক্‌বার, আ'জাম ও মু'আজ্জামকে তিনটি সৈন্যবাহিনীসহ মারওয়ারে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে দিল্লী হইতে আজ্‌মীরে উপস্থিত হইয়া মুগল বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে থাকেন। মুগলদের প্রবল আক্রমণে মারওয়ার রাজ্য ক্ষত-বিক্ষত হইল , কিন্তু তবুও রাজপুতরা দমিল না। তাহারা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া গেরিলা যুদ্ধে তৎপর হইয়া উঠিল। এই সময় পার্শ্ববর্তী মেওয়ার রাজ্যের রাজপুতরাও মারওয়ারের বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দেয়। আওরংগযেব কাল বিলম্ব না করিয়া মেওয়ার আক্রমণ করেন এবং মেওয়ারের রাজধানী চিতোর ও অন্যান্য দুর্গ অধিকার করেন। মেওয়ারের রাজপুত বিদ্রোহ কিছুটা দমন করিয়া তিনি আজ্‌মীরে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এই সময় শাহ্‌যাদা আক্‌বার মারওয়ারের রাজপুতদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাহাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে নিজকে সম্রাট বলিয়া দাবি করেন। আওরংগযেব কূটকৌশলে রাজপুতদের সহিত আক্‌বারের মিত্রতা নস্যাৎ করিয়া দেন। রাজপুতরা আক্‌বারকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া তাহার পক্ষ ত্যাগ করে। নিরুপায় হইয়া আক্‌বার দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। এইদিকে মেওয়ারের সংগে যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং ১৬৮১ খৃ.-এর জুন মাসে মেওয়ারের রাজা জয়সিংহ আওরংগযেবকে কয়েকটি জেলা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু মারওয়ারের রাজপুতদের সহিত মুগলদের যুদ্ধ আওরংগযেবের মৃত্যুর দুই বৎসর পর পর্যন্ত চলিতে থাকে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুগল শাসনামলে উপমহাদেশের বহির্বাণিজ্যে দেশীয় বণিকরা কখনও অবদান রাখিতে পারে নাই। মুগল আমলে আরব ও পারস্য দেশীয় মুসলমান বণিকরা ইয়ুরোপের ও পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরাই উপমহাদেশের বহির্বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করে। আওরংগযেবের রাজত্বকালে ইংরেজ বণিকরাই বাণিজ্যক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আওরংগযেব ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নীতি অনুসরণ

করেন। ১৬৬৪ খৃ. শিবাজীর সূরাত আক্রমণকালে তথাকার ইংরেজ বণিকরা শিবাজীর বিরোধিতা করায় আওরংগযেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বাণিজ্য শুল্ক কমাইয়া দেন। ১৬৮০ খৃ. তিনি এক ফরমান জারী করিয়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে শতকরা দুই ভাগ বাণিজ্য শুল্ক এবং আরও অতিরিক্ত দেড় ভাগ জিয্য়া কর প্রদানের বিনিময়ে মুগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। আওরংগযেবের নীতির অনুসরণে বাংলার মুগল সুবাদার শায়েস্তা খানও ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সর্বদা সততার পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহারা বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিত, দেশীয় বণিকদের সহিত দুর্ব্যবহার করিত, সমুদ্রপথে মুসলমানদের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে তাহারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপমহাদেশে বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করে। ইংরেজ বণিকদের এইসব জঘন্য কার্যকলাপের ফলে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান ১৬৮৫ খৃ. ইংরেজদেরকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। ১৬৮৮ খৃ. সূরাতস্থ ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির অধিনায়ক স্যার জন চাইল্ড করোমণ্ডল উপকূলে কতিপয় মুগল জাহাজ আটক করাতে আওরংগযেব মুগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইংরেজ বণিকদেরকে গ্রেফ্তার ও তাহাদের বাণিজ্য কুঠি অধিকার করার নির্দেশ দেন। সম্রাটের নির্দেশে বাংলাদেশের হুগলীতে মাদ্রাজ উপকূলের মাসুলি পত্তনে ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি অধিকার করা হয় এবং উদ্ধত ইংরেজ বণিকদের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। স্যার জন চাইল্ড তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া আওরংগযেবের নিকট কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, মুসলমানদের আটক জাহাজগুলি ফেরত দেন এবং দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। আওরংগযেব সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ইংরেজ বণিকদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং আবার মুগল সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন (১৬৯০ খৃ.)। তাঁহার নির্দেশে বাংলার তৎকালীন সুবাদার ইব্রাহীম খান বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির প্রধান জব চার্নক (Charnock)-কে আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি প্রদান করেন। জব চার্নক ১৬৯০ খৃ. হুগলীর অদূরে কালিকাটা (কালিঘাটা) গ্রামের নিকট সুতানুটীতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। ইহাই পরবর্তী কালে বিখ্যাত কলিকাতা নগরীতে পরিণত হয়। আওরংগযেবের রাজত্বের পরবর্তী বৎসরগুলিতে ইংরেজ বণিকরা আর কোন উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকে।

দাক্ষিণাত্যের মারাঠা জাতির সহিত সংগ্রাম আওরংগযেবের রাজত্বকালের একটি বিশেষ অধ্যায়। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে মারাঠারা বসবাস করিত এবং এই অঞ্চলটি ছিল মূলত আহমাদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক কারণেই মারাঠারা ছিল খুবই সাহসী, কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজী নামক এক ধূর্ত ও অসীম সাহসী মারাঠা যুবকের নেতৃত্বে মারাঠাদের জাতীয় জাগরণ শুরু হয়। গেরিলা যুদ্ধ-কৌশলে মারাঠাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়া শিবাজী একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাইয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করিবার পর শিবাজী যখন মুগলাধিকৃত অঞ্চলে হানা দিতে শুরু করে তখন আওরংগযেব তাহাকে দমন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের মুগল সুবাদার শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দেন। ১৬৬০ খৃ. শায়েস্তা খান শিবাজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পুনা ও চাকন দুর্গ এবং উত্তর কোনকন ও কল্যাণ জেলা অধিকার করিয়া পুনাতে শিবির স্থাপন করেন। শায়েস্তা খানের সহিত সম্মুখযুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ধূর্ত শিবাজী ১৬৬৩ খৃ.-এর ১৫ এপ্রিল গভীর রাত্রিতে ৪০০ অনুচরসহ অতর্কিতে শায়েস্তা খানের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে আহত এবং তাঁহার পুত্র আবুল ফাত্‌হ ও তাঁহার শিবির রক্ষীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শায়েস্তা খানের বিপর্যয়ের পর শিবাজীর সাহস ও উচ্চাভিলাষ বাড়িয়া যায়। সে ১৬৬৪ খৃ.-এর জানুয়ারীতে মোগল অধীনস্থ সুরাত বন্দর লুণ্ঠন করে এবং প্রায় এক কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি হস্তগত করে। ১৬৬৫ খৃ. মুগল সেনাপতি রাজপুত রাজা জয় সিংহ ও দিলীর খান শিবাজীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করিয়া পুরন্দর দুর্গ অধিকার করেন এবং শিবাজীর সদর দফ্তর রায়গড় অবরোধ করেন। মুগল আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব দেখিয়া শিবাজী জয় সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেয়। ফলে ১৬৬৫ খৃ.- এর ২২ জুন পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি অনুসারে শিবাজী মাত্র ১২টি দুর্গ নিজ দখলে রাখিয়া ২৩টি দুর্গ মুগলদের ছাড়িয়া দেয় এবং মুগল বাহিনীকে বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সন্ধিতে আরও উল্লেখ করা হয়, শিবাজী-পুত্র শম্ভুজী মুগল সম্রাটের অধীনে পাঁচ হাযারী মসনব ও উপযুক্ত জাগীর প্রাপ্ত হইবে এবং মুগল সম্রাট ফরমান জারী করিয়া কোনকন ও বালাঘাটের কিছু অঞ্চলে শিবাজীর আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলে শিবাজী ১৩ কিস্তিতে সম্রাটকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবে। অতঃপর শিবাজী জয় সিংহের অনুরোধে আওরংগযেবের সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশে ১৬৬৬ খৃ.-র মে পুত্র শম্ভুজীসহ আগ্রাতে পৌছে। মুগল দরবারে শিবাজীর আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। সম্ভবত মোগল সম্রাট, মুগল দরবার ও মুগল শক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশে শিবাজী মুগল দরবারে গমন করে (Sardesai, Main Current of Maratha History, p.71)।

যাহা হউক, মুগল দরবারে আওরংগযেব শিবাজীকে তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদারদের সারিতে দাঁড়াইতে দেওয়ায় শিবাজী নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করে এবং রাজদরবারে আওরংগযেবের বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করায় আওরংগযেব তাহাকে নজরবন্দী কবিরার নির্দেশ দেন। শিবাজী কৌশলে প্রহরীদেরকে ধোঁকা দিয়া পুত্র শম্ভুজীসহ আগ্রা হইতে পলায়ন করে (Ishwari Prasad, A Short Hist. of Muslim Rule in India, Allahabad 1939, p. 467) এবং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়। স্বীয় রাজ্যে পৌছিয়া শিবাজী তিন বৎসর মুগল বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকে। আওরংগযেব তাহাকে বশীভূত রাখার উদ্দেশে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন (১৬৬৮ খৃ.) এবং তাহার পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচ হাযারী মনসব ও বেরারের জাগীর প্রদান করেন। কিন্তু ১৬৭০ খৃ. শিবাজী আবার মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। পুরন্দরের

সন্ধির ফ.ল যেই দুর্গগুলি তাহার হস্তচ্যুত হয় সেইগুলি সে পুনরুদ্ধার করে এবং দ্বিতীয়বার সুরাত বন্দর লুণ্ঠন করে। ১৬৭৪ খৃ. সে 'ছত্রপতি' (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করিয়া মহাসমারোহে রায়গড়ে সিংহাসনে আরোহণ করে। এই সময়ে আওরংগযেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় দাক্ষিণাত্য সমস্যার প্রতি নজর দিতে পারেন নাই। এই সুযোগে শিবাজী দাক্ষিণাত্যে তাহার আধিপত্য সম্প্রসারণ করে। ১৬৮০ খৃ. শিবাজীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শম্ভুজী মারাঠাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং এই সময় আওরংগযেবের বিদ্রোহী পুত্র আক্‌বার শম্ভুজীর দরবারে উপস্থিত হওয়াতে আওরংগযেব দাক্ষিণাত্য সমস্যার ব্যাপারে নূতন নীতি গ্রহণ করেন। মারাঠা দরবার হইতে আক্‌বারকে বিতাড়ন, মারাঠাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পতনোন্মুখ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য মুগল সাম্রাজ্যভুক্তকরণের উদ্দেশে আওরংগযেব ১৬৮১ খৃ.-এর ৮ সেপ্টেম্বর উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের দিকে রওয়ানা হন। ১৬৮২ খৃ.-এর ১ এপ্রিল তিনি আহমাদনগর উপস্থিত হইয়া সেইখানে তাঁহার সদর দফতর স্থাপন করেন। আহমাদনগর পৌঁছিবার পরপরই তিনি বিজাপুর ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রায় চার বৎসর যুদ্ধের পরেও মুগল বাহিনী মারাঠাদের কতিপয় দুর্গ অধিকার করা ব্যতীত বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। মুগল বাহিনী বিদ্রোহী আক্‌বারকে ধরিতেও পারে নাই। (আক্‌বার এই সময় পারস্য দেশে গমন করেন এবং সেখানে ১৭০৪ খৃ. তাহার মৃত্যু হয়)। ১৬৮৫ খৃ. আওরংগযেব স্বয়ং আহমাদনগর হইতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৬৮৬ খৃ. তিনি বিজাপুর ও ১৬৮৭ খৃ. গোলকুণ্ডা রাজ্য অধিকার করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকারের পর তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং ১৬৮৯ খৃ.-এর মধ্যে মারাঠা রাজধানী রায়গড়সহ প্রায় সমস্ত মারাঠা রাজ্য মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শম্ভুজী মুগল সেনাপতি মুকাররাব খান-এর হাতে ধৃত ও বন্দী হয়। মহানবী (স) ও আওরংগযেবের বিরুদ্ধে অশ্লীল উক্তি করার অপরাধে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শম্ভুজীর মৃত্যুর পরও মারাঠা বিরোধিতা নির্মূল হয় নাই। শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজা রাম ও রাজা রামের মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী তারা বাঈ-এর নেতৃত্বে মারাঠারা মুগল বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধ বয়সে আওরংগযেবের স্বাস্থ্য ভাংগিয়া পড়ে এবং তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় ১৭০৬ খৃ. তিনি রণাঙ্গন ছাড়িয়া আহমাদনগরে ফিরিয়া যান এবং সেখানে ১৭০৭ খৃ.-এর ২ এপ্রিল ইন্‌তিকাল করেন। দৌলতাবাদে বিখ্যাত সূফী সাধক শায়খ বুরহানুদ্দীনের সমাধির পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

শক্তিধর শাসক হিসাবে আওরংগযেবের কৃতিত্ব অপেক্ষা নিষ্ঠাবান মুসলমান ও আদর্শ মুসলিম নরপতি হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী একজন পরম ধার্মিক মুসলমান। ইসলামের আদেশ-নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও রীতিনীতি কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রণাঙ্গনে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও তিনি সালাত আদায় করা হইতে বিরত থাকিতেন না। মধ্যএশিয়ায় বাল্‌খের রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে তিনি একদা নিজের ঘোড়া হইতে নামিয়া নির্বিঘ্নে যুদ্ধের ময়দানে জায়নামায বিছাইয়া সালাত আদায় করেন এবং এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষ বুখারার উযবেক রাজা অবাক হইয়া মন্তব্য করেন, এইরূপ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা নিজের নিশ্চিত বিপদ ডাকিয়া আনা ছাড়া আর কিছুই নহে। রমযান মাসের শেষ দশ দিন তিনি মসজিদে ই'তিকাফ করিয়া দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে হজ্জ পালন করিতে না পারিলেও তিনি হজ্জে গমনেচ্ছু লোকদেরকে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। সমুদ্র পথে মক্কা শরীফে গমনের পথ নির্বিঘ্ন করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট থাকিতেন এবং এই কারণে ইয়ুরোপীয় বণিকদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাঁধে এবং তিনি তাহাদের শায়েস্তা করেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তিনি কম খাইতেন, কম ঘুমাইতেন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করিতেন, কিন্তু সাদাসিধা জীবন যাপন করিলেও তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল উন্নত মানের। কেহ তাঁহার সামনে হাসি-ঠাট্টা করিতে, মিথ্যা কথা বলিতে বা অন্যের কুৎসা রটনা করিতে সাহস পাইত না। ধর্মপ্রাণ খলীফাদের মত তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে জনগণের সম্পত্তি মনে করিতেন এবং নিজের সুখ-সুবিধার জন্য রাজকোষ হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিতেন না। নিজ হাতে টুপি সেলাই করিয়া তিনি নিজের জীবিকার খরচ যোগাইতেন, এমনকি মৃত্যুর পর তাঁহার দাফন-কাফনের খরচ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী নিজের সামান্য রোজগারের সঞ্চিত অর্থ হইতে বহন করা হয়। তাঁহার ধর্মপ্রবণতায় মুগ্ধ হইয়া মুসলমানগণ তাঁহাকে 'যিন্দা পীর' (জীবন্ত পীর) বলিয়া শ্রদ্ধা করিত।

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধান অনুসরণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তিনি সেইগুলি কার্যকরী করিবার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদেরকে শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে তিনি বহু ইসলামী বিধি-নিষেধ জারি করেন। রাজদরবার হইতে তিনি তাঁহার শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন। প্রথমে রাজদরবারে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাটদের আমল হইতে প্রচলিত অনৈসলামী রীতিনীতি রহিত করেন। তিনি নওরোয উৎসব (নববর্ষের উৎসব আকবর পারস্য সম্রাটদের অনুকরণে ইহার প্রবর্তন করেন), ঝারোকা দর্শন (প্রত্যহ সকালে মুগল সম্রাটগণের রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রাসাদের সম্মুখে অবস্থানরত জনগণের সালাম গ্রহণের রীতি) এবং মুগল সম্রাটদের জন্মদিনে তাঁহাদেরকে সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের ওজনে ওজন করার রীতি বন্ধ করিয়া দেন। রাজদরবারে তিনি সঙ্গীত ও গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেন এবং পূর্ববর্তী সম্রাটদের আমলে নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক ও বাদকদেরকে বরখাস্ত করেন। জ্যোতিষীদেরকে তিনি হেয় চোখে দেখিতেন এবং তাহাদেরকেও চাকুরীচ্যুত করেন। আকবর প্রবর্তিত ইলাহী সালের পরিবর্তে তিনি হিজরী সালের প্রবর্তন করেন এবং রাজদরবারে মুসলিম অভিবাদন রীতি হিসাবে সালাম ব্যতীত অন্যান্য রীতি নিষিদ্ধ করেন। মুগল সম্রাটদের মুদ্রায় কলেমা অঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু

অমুসলমানেরা মুদ্রা ব্যবহার করায় তাহাদের হাতে কলেমার পবিত্রতা নষ্ট হইত বলিয়া তিনি মুদ্রায় কলেমা অঙ্কন রীতি রহিত করেন।

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ভাবধারা জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি তাহাদের বহু অনৈসলামী কুসংস্কার, যেমন মুহাররামের উৎসব পালন, ফকীর-দরবেশদের সমাধিতে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আলো জ্বালানো এবং স্ত্রীলোকদের সূফী সাধকদের মাযার যিয়ারাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র মদ উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন এবং মদ ব্যবসায়ীদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা কার্যকরী করিবার জন্য তিনি মুহ্তাসিব-এর পদ সৃষ্টি এবং উক্ত পদে কর্মচারী নিয়োগ করেন। মুহ্তাসিবগণ মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিতেন, তাহাদেরকে সালাত ও সাওম (রোযা) প্রভৃতি ধর্মীয় কাজে উৎসাহ দিতেন এবং মদ্যপান, জুয়াখেলা, অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রভৃতি ইসলাম ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বিরত রাখিতেন। ইসলামের আইন-কানুন অনুসারে মুসলমানদের জীবন পরিচালিত করিবার উদ্দেশে আওরংগযেব ইসলামী আইন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনবিশারদদের সাহায্যে 'ফাতাওয়া আলামগীরী' নামক বিখ্যাত আইন গ্রন্থের সংকলন করেন যাহা এখনও মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। তিনি পুরাতন মসজিদ ও খানকাহসমূহ মেরামতের নির্দেশ দেন, ইমাম ও মুআয্যিনদের নিয়মিত বেতন দানের ব্যবস্থা করেন, 'উলামা' সম্প্রদায়কে সমাজ ও রাজদরবারে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ধর্মত্যাগী দারা শুকোহ্র সহিত জড়িত সূফীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইসলামে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য এবং এই কর্তব্য অমুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, কারণ অমুসলমানরা ইসলামের আইন বহির্ভূত। কিন্তু তাহারা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ না করিয়াও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত এবং ইহার বিনিময়ে তাহাদের উপর জিয্য়া কর ধার্য করা হইত। আকবর হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশে জিয্য়া কর রহিত করেন, কিন্তু আওরংগযেব শারী'আর বিধান মতে ইহা পুনঃপ্রবর্তন করেন (১৬৭৯ খৃ.)। একজন ধনী অমুসলমান (যাহার বাৎসরিক আয় ছিল দুই হাযার টাকা) বৎসরে সোয়া ১৩ টাকা হারে, একজন মধ্যবিত্ত অমুসলমান (যাহার বাৎসরিক সঞ্চয় বায়ান্ন টাকা) বৎসরে সোয়া ৬ টাকা হারে এবং একজন স্বল্প আয়ের অমুসলমান বৎসরে সাড়ে ৩ টাকা হারে জিয্য়া কর প্রদান করিত। সরকারী প্রশাসনে ও সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত অমুসলমান, খারাজ কর প্রদানকারী অমুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নারী, শিশু, পংগু ও গরীবেরা জিয্য়া হইতে অব্যাহতি পাইত।

শাসকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সকল সময় সচেতন থাকিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, শাসক আল্লাহ্র প্রতিনিধি; শাসিতের দুঃখ-কষ্টের জন্য তাঁহাকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। তিনি বলিতেন, "শাসকের কখনও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে" এবং এই নীতি তিনি নিজে পুরাপুরি অনুসরণ করিতেন। ৮০ বৎসর বয়সেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেন এবং আশা করিতেন, তাঁহার কর্মচারীরাও তাঁহার মত পরিশ্রম করুক। ইয়ুরোপীয় পর্যটক Gamelli Careri (Camb. Hist. of Ind., iv, 318) তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রতিদিন রাজদরবারে বসিয়া খালি চোখে জনগণের আবেদনপত্র পড়িতে এবং আবেদনপত্রের উপর তাঁহার মন্তব্য নিজ হাতে লিখিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী ও মনোযোগী। প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পরপরই তিনি প্রজাদের করভার লাঘবের জন্য ৮০ রকম কর রহিত করেন এবং এইগুলির অধিকাংশই অমুসলমানদের উপর ধার্যকৃত ছিল, যেমন তাহাদের ধর্মীয় উৎসব, যাত্রা ও মেলার উপর কর।

কৃষির উন্নতি বিধান ও কৃষকদের কল্যাণ সাধনে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে কৃষকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে এবং রাজস্ব কর্মচারীরা যাহাতে কৃষকদের নিকট হইতে নির্ধারিত করের অতিরিক্ত কিছু আদায় করিতে না পারে সেইজন্য তিনি মাঝে মাঝে ফরমান জারী করিয়া তাহাদিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক করিয়া দিতেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার দৈনন্দিন ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য তিনি ওয়াকি'আ-নাবীস ও সাওয়ানিহ-নিগার নামক পদ প্রবর্তন করেন এবং তাঁহাদের প্রেরিত খবরের উপর ভিত্তি করিয়া সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করিতেন। আইনের প্রতি তিনি ছিলেন পুরাপুরি শ্রদ্ধাশীল। আইনের চোখে ধনী-দরিদ্র ও আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে তিনি কোন ভেদাভেদ করিতেন না। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি রাজার পবিত্র কর্তব্য মনে করিতেন। প্রতি বুধবার তিনি রাজদরবারে বিচারে বসিতেন এবং যে কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিযোগ পেশ করিতে পারিত। বাদী-বিবাদীর অভিযোগ তিনি ধৈর্য সহকারে শুনিতেন এবং ইসলামের বিধান অনুসারে বিচারের রায় দিতেন।

মুগল সম্রাটদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের জন্যও তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁহার সময়ে একজন বিখ্যাত আলিম। আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর। তাঁহার ফারসী পত্রাবলীতে তাঁহার অসাধারণ ফারসী জ্ঞান পরিস্ফুট। শায়খ সা'দী ও কবি হাফিজের গ্রন্থাবলীর প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (স)-এর বহু হাদীছ তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি সুন্দররূপে নাস্তা'লীক' ও শিকাস্ত লিপি লিখিতে পারিতেন। তিনি নিজ হাতে কুরআন শরীফ নকল করিয়া মক্কা, মদীনা প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পাঠাইতেন।

কোন কোন অমুসলিম ঐতিহাসিক আওরংগযেবকে ধর্মান্ধ, সংকীর্ণমনা ও হিন্দুবিদ্বেষী শাসক হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং তাহাদের মতে, হিন্দু-নির্যাতন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাঠ, সতনামী, শিখ, রাজপুত ও মারাঠাজাতি মুগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং ইহার পতন ত্বরান্বিত করে। তাহারা আরও মন্তব্য করেন, শী'আদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আওরংগযেব দাক্ষিণাত্যের শী'আ মুসলিম রাজ্য বিজাপুর ও

গোলকুণ্ডা মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং শী'আদেরকে সরকারী চাকুরী হইতেও বরখাস্ত করেন।

ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে এই সকল অভিযোগ মোটেই সত্য নহে। অসদাচরণের অভিযোগে তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর বহু কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করেন। ইহা তাঁহার হিন্দু-পীড়ন নীতির পরিচায়ক নহে। তাঁহার রাজত্বকালে বহু হিন্দু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং উচ্চ মনসব লাভ করে। রাজা জসওয়ান্ত সিংহ, রাজা জয় সিংহ, রাজা রাম সিংহ ও আরও অনেক রাজপুত রাজা তাঁহার পদস্থ সামরিক অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। হিন্দু বিদ্রোহ দমনের সময় সামরিক অভিযান চলাকালে ও অন্যান্য কারণে (যেমন ১৬৬৯ খৃ. থাট্টা, মুলতান ও বেনারসের হিন্দু স্কুল ও মন্দিরের ব্রাহ্মণরা মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিত বিধায় তিনি ঐ সকল জায়গায় হিন্দু স্কুল ও মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেন)। তাঁহার সময়ে কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যের সর্বত্র মন্দির ধ্বংসের জন্য তিনি কখনও সাধারণ নির্দেশ জারী করেন নাই। তাঁহার আমলে নির্মিত বহু মন্দির এখনও উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান। অনেক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্য তিনি যে জমি ও অর্থদান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায় (Jnan Chandra, 'Alamgir's Grant to a Brahmin, Journal of Pakistan Historical Society, vii, 1959, 99-100).

শারী'আর বিধান অনুসারে সামরিক কর হিসাবে তিনিই হিন্দুদের উপর জিয্য়া ধার্য করেন। হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কিংবা প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করিলে এই কর হইতে মুক্তি পাইত। সুতরাং জিয্য়া কর প্রবর্তনের পশ্চাতে তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষ নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ধর্মীয় কারণে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন নাই, বরং তাঁহার পূর্ববর্তী মুগল সম্রাটদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করিয়াই তিনি এই রাজ্য দুইটি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে শী'আ মুসলিম পীড়নের অভিযোগও ভিত্তিহীন। বহু শী'আ মুসলমান তাঁহার প্রশাসনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী এবং পরে বাংলার সুবাদার মীর্ জুম্লা ছিলেন একজন শী'আ মুসলমান।

ব্যাপক হিন্দু বিদ্রোহের জন্যও তাঁহার তথাকথিত হিন্দু-পীড়ন নীতিকে দায়ী করা যায় না, কারণ জিয্য়া প্রবর্তনের বহু পূর্বেই জাঠ, সতনামী, শিখ, রাজপুত ও মারাঠারা বিদ্রোহী হয়। বস্তুত আকবরের সময় হইতে উপমহাদেশে হিন্দু জাগরণের সূত্রপাত হয়, আওরংগযেবের সময় তাহা ব্যাপক মুগল বিরোধী বিদ্রোহের আকার ধারণ করে এবং অমুসলিম ঐতিহাসিকরা ইহাকে আওরংগযেবের তথাকথিত হিন্দু বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। আওরংগযেব শক্ত হাতে হিন্দু বিদ্রোহ দমন করিয়া মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া তিনি মারাঠা শক্তিকে মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত করিয়া না দিলে তাঁহার রাজত্বকালেই মুগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইত। মুগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গযেব দায়ী নহেন, বরং তিনি মুগল সাম্রাজ্যের পতন রোধ করেন। হিন্দু জাগরণ ও আওরংগযেবের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতাই মুগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খাফী খান, মুন্তাখাবুল লুবাব; (২) মুহাম্মাদ কাসিম, 'আলামগীর নামাহ, কলিকাতা ১৮৬৮; (৩) সাকী মুস্তা'ইদ খান, মা'আছির-ই 'আলামগীরী, ইংরেজী অনু. যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ১৯৪৭; (৪) শিব্লী নু'মানী, আওরংগযীব 'আলামগীর পার এক নাজার, আজমগড়; (৫) Manuci, Storia do Mogor, Eng. tr. w. Irvine, London 1906; (৬) Bernier, Travels, trans. Arch. Constable 1891; (৭) John Fryer, New Account of India, London 1698; (৮) Edwardes and Garrett, Mughal Rule in India, Delhi 1962, pp. 71-109; (৯) Elliot and Dowson, History of India. vol. VII, 174-180; (১০) The Cambridge History of India, vol. IV, 222-255, 281-308; (১১) The Encyclopaedia of Islam, New ed., Leiden, I, 768-69, (১২) Elphinstone, History of India; (১৩) Lanepoole, Aurangzib; (১৪) Grant Duff, History of the Marathas, London 1826; (১৫) Jadunath Sarkar, A History of Aurangzeb, Calcutta 1912-1924, vols. I-V; (১৬) Jadunath Sarkar, Studies in Mughal India, Calcatta 1919; (১৭) Ishwari Prashad, A Short History of Muslim Rule in India, Allahabad 1939, pp. 434-500; (১৮) R.C. Majumdar, An Advanced History of India, pp. 481-510; (১৯) Sarma, the Religious Policy of the Mughal Emperors, Oxford 1940; (২০) Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford 1964, pp. 191-220; (২১) Jnan Chandra, 'Alamgir's Grant to a Brahmin, Journal of Pakistan Historical Society, vii (1959), 99-100.

মোখলেছুর রহমান

আওরাঙ্গাবাদ (اورنگ آباد) ঃ আওরাঙ্গ আবাদ, ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের একটি জেলা ও জেলা শহর। আয়তন (জেলা) ৬৩১৪ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা (১৯৭১) [জেলা ১৯,৫৮,০৩৬ (Encyc. Brit., 1974, 1,654]। জেলার উত্তরে সাহিয়াদ্রি পর্বতমালা এবং উহার অংশ অজন্তা পাহাড় অবস্থিত। গোদাবরী নদী জেলার দক্ষিণ সীমান্ত ধরিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অন্যান্য নদী পূর্ণা ও দুধানা অজন্তা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় সেন্ট্রাল রেলওয়ে এই জেলার উপর দিয়া গিয়াছে। জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য গম, জোয়ার, তুলা ও তৈলবীজ। এখানকার তাঁত শিল্প, পশম বুনন কারখানা ও হিমরু বা সোনার ব্রোকেডের

কারখানা বিখ্যাত। বিখ্যাত অজন্তা ও ইলোরা গুহাচিত্রাবলী এবং ১৩শ শতকের বিখ্যাত কিল্লা দওলতাবাদ এই জেলাতে অবস্থিত।

ইতিহাস 'আলাউ'দ্-দীন খাল্জীর আমলে দাক্ষিণ্যত্যের এই অঞ্চলের হিন্দু রাজা মুসলিম বিজেতাকে কর দিতে বাধ্য হন। ১৩৪৭ খৃ. ইহা বাহমনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাহমনী রাজ্যের পতন ঘটিলে ইহা আহ্মাদনগরের নিজামশাহ সুলতানের অংশে পরিণত হয়। হাব্শী উযীর মালিক 'আম্বারের নেতৃত্বে আহ্মাদনগর বাহিনী মোগল শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে (১৬২৬ খৃ.) আহমাদনগর মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮শ শতকের প্রথমার্ধে মুগল সাম্রাজ্যের পতনের পরে হায়দরাবাদে নিজামের স্বাধীন রাজ্য গঠিত হইলে আওরাঙ্গাবাদ নিজামের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ খৃ. ইহাকে ভারতের বোম্বাই প্রদেশভুক্ত করা হয়; ১৯৬০ সালের ১ মে হইতে ইহাকে মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শহর আওরাঙ্গাবাদ জেলার সদর দফতর, কাউন নদীর তীরে, বোম্বাই হইতে ২০৭ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। জনসংখ্যা (১৯৭১) ১,৫০,৫১৪ (পূ. গ্র.)। ইহা হায়দরাবাদ-গোদাবরী লাইনের একটি রেল-স্টেশন। শহরটির আদি নাম খিরকী। ইহা ১৬১০ সালে মালিক 'আম্বার কর্তৃক স্থাপিত হয়। তাঁহার সময়ে ইহা আহমাদনগর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৬১২ সালে মুগল বাহিনীর আক্রমণে শহরটি ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পরে ইহা পুনঃনির্মিত হয় এবং আওরংগযেবের নামে ইহার নামকরণ করা হয় আওরাঙ্গাবাদ। আওরংগযেব শাহযাদা থাকাকালে দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইলে তখন এই শহরে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী দিল্রুখ বেগমের মাযার এখানে অবস্থিত। মাযারসৌধ তাজমহলের শিল্পরীতিতে নির্মাণ করা হইয়াছে। এই শহরেরই নিকটবর্তী খুলদাবাদে বাদশাহ আওরংগযেবের মাযার অবস্থিত। একই স্থানে মালিক 'আম্বার ও হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা আসাফজাহ-এর মাযারও রহিয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমে কিছুকাল ইহা নিজামের রাজধানী ছিল। ১৯৫৬ সালে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার পরে ইহা বিভাগীয় সদর দফতরও ছিল। ১৯৫৮ সালে এখানে মারাঠাওয়াডা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এক সময়ে শহরটি সোনার অলঙ্কার নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভারতের বিহার প্রদেশের গয়া জেলাতেও এই নামে আর একটি ছোট শহর আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Encyclopaedia Britannica, 1974 ed., i, 654, Art. Aurangabad; (২) Encyc. of Islam, i, 768, Art. Awrangabad; (৩) Imperial Gazetteer of india, VI, 142-50.

হুমায়ুন খান

আওরাঙ্গাবাদ সায়্যিদ (اورنگ آباد سيد) ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলার একটি ছোট শহর। ১৭০৪ সনে সায়্যিদ জালালুল হুসায়ন বুখারীর বংশধর সায়্যিদ 'আবদুল আযীয এই শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

C. Collin Davies (E.I.[2]) হুমায়ুন খান

আওরাবা (أوربة) ঃ মরক্কোর একটি বারবার উপজাতি। ইব্ন খালদূন-এর 'ইবার গ্রন্থ, ফরাসী অনুবাদ de Slane, ১খ., ২৮৬ হইতে আমরা ইহাদের প্রাথমিক ইতিহাস কিছু জানিতে পারি। ইহারা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বারানী (দ্র.) গোত্রের একটি শাখা। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু সম্ভবত খৃস্টান ছিল মুসলিম বিজয়ের কালে ইহাদের কর্মশক্তি ও যোদ্ধাগণের বীরত্বের জন্য ইহারা উত্তর আফ্রিকার বারবার উপজাতি বা গোত্রসমূহের মধ্যে অগ্রণী ছিল। ইব্ন খালদূন গোত্রটির প্রধান প্রধান শাখার নাম এবং আরব বিজয়ের পূর্বে তাহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সুবিদিত সর্দার বা গোত্রপতি ছিলেন তাহাদের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত কুসায়লা (দ্র.) ইহাদের বারানীদের আমীর ছিলেন। সম্ভবত ইনি খৃস্টান ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (৬২/৬৮২)। তাহার মৃত্যুর পরে আওরাবা (বা আওরিবা) গোত্রীয়গণ আক্রমণকারীদের কোন বিরোধিতা করে নাই।

এই উপজাতীয়গণ মরক্কোর ইতিহাসে প্রথম বাস্তবভাবে শী'ঈ মতবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, যদিও ইহার পূর্ব শতাব্দীতে বার্বারগণ যে খারিজী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার সহিত এই ঘটনার সংগতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই আওরাবাগণের প্রধান আবূ লায়লা ইসহাক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল হামীদের আশ্রয়েই 'আলী বংশীয় আশ্রয়প্রার্থী ১ম ইদরীস (দ্র.) ১৭২/৭৮৮ সালে নিজেকে ওয়ালিলাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ওয়ালিলা একটি প্রাচীন রোমক শহর (বর্তমান ভলুবিলিস), মেকনেসের উত্তরে ক্ষুদ্র পর্বতরাজি যারহূনে অবস্থিত।

এই পার্বত্য অধিবাসিগণ নিজদেরকে কুসায়লার মৃত্যুর পরে মধ্য মাগ্রিব হইতে বিতাড়িত আওরেস-এর আওরাবার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। যাব (দ্র.) ও ওরসেনিস (Oursenis) এলাকায় তাহাদের বসতি দেখা যায়।

উত্তর মরক্কোর আরও কয়েকটি উপজাতির ন্যায় আওরাবাগণও মু'তাযিলী মতবাদ গ্রহণ করে। ফলে তাহারা 'আলীপন্থিগণের সুদৃষ্টি লাভ করে এবং সম্প্রদায়ের জন্য একজন ইমাম মনোনয়ন অত্যাবশ্যক বলিয়া তাহারা মনে করিত। এই কারণেই আবূ লায়লা যারহূনে ইদরীসের আগমনের কয়েক মাস পরেই নিজেকে অনায়াসেই স্বীয় গোত্র ও পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি গোত্রের (৪ রমযান, ১৭২/৫ ফেব্রুয়ারি, ৭৮৯) সার্বভৌম ইমাম বলিয়া ঘোষণা করিতে সক্ষম হন। আওরাবাগণ অতঃপর সাফল্যের সঙ্গে ১ম ইদরীসের ইসলামীকরণ কার্যে অংশগ্রহণ করে। ২য় ইদরীস তাঁহার পিতার উপকারীর প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এইভাবে, আল-কায়রাওয়ানের আগ্লাবী শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার অভিযোগে, ২০ বৎসর পরে তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন। আগ্লাবী শাসক শী'আদের শত্রু 'আব্বাসীগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনাটি নিঃসন্দেহে স্থানীয় রাজনীতিরই পরিণতি।

২য় ইদরীসের মৃত্যুর পর (২১৩/৮২৮) ও তাহার পুত্রগণের মধ্যে মরক্কোর দুর্ভাগ্যজনক বিভক্তির পর সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আওরাবা ও বার্বারগণ মিলিতভাবে

ফাস-এর শাসক নয় বৎসর বয়স্ক আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া সেই গোলযোগ (২২১/৮৩৬) থামাইয়া দেয় এবং কিশোর ইমাম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। 'আলী ১৩ বৎসর শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করিবার পর মারা যান। এইবারে নূতন বিবাদে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহের মধ্যে মরক্কো বিভক্ত হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত ২৫১/৮৬৬ অব্দে আওরাবাগণ 'আলীর চাচাত ভাই 'আলী ইব্‌ন 'উমারকে নূতন শাসক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়।

আওরাবাগণ তখন পর্যন্ত নুকুর (দ্র.) রাজ্যের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল এবং মধ্যযুগে তাহাদেরকে আলজিরিয়া, নিকাওস (N`gaous) ও বোন (Bone) অঞ্চলে দেখা যায়। কোন সময়েই তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বারংবার আবির্ভূত হয়, যেমন আল-মুওয়াহ্‌হিদূন-এর অধীনে। প্রথমে (৫৫৯/১১৬৪) তাহারা জনৈক বিদ্রোহীকে সমর্থন দান করিয়া আল-মুওয়াহ্‌হিদূন-এর বিরোধিতা করে, কিন্তু অতঃপর ৫৮০/১১৮৪ সালে স্পেনে গমন করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য পুনরায় তাহাদের সংগে যোগ দেয়। মারীনীদের শাসন আমলে তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়, আল-আন্দালুসে গিয়া ধর্মযুদ্ধ করিবার প্রসংগে বিশেষভাবে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যে একজন 'ধর্মের জন্য স্বেচ্ছাসৈন্য' হিসাবে বিখ্যাত এক বাহিনীর সেনাপতি হন। ৭০৭/১৩০৮ অব্দে সিংহাসনের মিথ্যা দাবিদারের বিদ্রোহের সংগে জড়িত থাকিবার অভিযোগে সুলতান আবূ ছাবিত-এর আদেশে কয়েকজন আওরাবা সর্দারের প্রাণদণ্ড হয় এবং তাহাদের শূলবিদ্ধ মৃতদেহ মার্‌রাকুশের নগর প্রাকারের উপর ঝুলাইয়া রাখা হয়। বর্তমান কালে ইহাদের সাবেক গোত্রের কোন কোন দল (লাজায়াগণ, মায়াতাগণ ও রাগিওয়াগণ) যারহুনের উত্তরে ওয়াদী ওয়ার্‌গার তীরে বসবাস করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আন্-নাসিরী, কিতাবুল ইসতিক্‌সা, নির্ঘণ্ট; (২) 'আবদুল্লাহ গান্নুন, আল-উমারা' ইদরীস, মাশাহির রিজালি'ল মাগ্‌রিব, নং ৩৩; (৩) এতদ্ব্যতীত বারানী, বার্‌বার , ইদরীস ১ম ও ২য়, ইদরীসী, কুসায়লা, ওয়ালীলা, প্রসঙ্গসমূহ দ্র.

G. Deverdum (E.I.2)/হুমায়ুন খান

আওরাদ (দ্র. বির্‌দ)

আওরেস (দ্র. আওরাস)

আওরাস (اورا س) ঃ আলজেরিয়ার নিবিড় সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী। ইহা পূর্ব সাহারার আট্‌লাস পর্বতমালার একটি অংশ। আওরাস শব্দের অর্থ আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

(E.I.2) ১/৭৭০

আওরাস ৮০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি ঘন পর্বতশ্রেণী। ইহা নিম্ন সমতল ভূমি হইতে আরম্ভ হইয়া বাত্‌না (Batna) হইতে বিস্‌ক্রা (Biskra) -এর খেনচেলা (Khenchela) এবং দক্ষিণ কনস্টানটাইন (Sbakh)-এর উচ্চ সমতলভূমি ও যিবানের সাহারীয় খাদের মধ্যবর্তী ওয়াদিল 'আরাব উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার চূড়া (জিবাল চেলিয়া Dijbal Chelia) ২৩২৭ মিটার এবং কেফ মাহমেল ২৩২১ মিটার, আলজেরিয়ার সর্বোচ্চ চূড়া ও শৈলশ্রেণী "দক্ষিণ আরাসিয়ান (Aurasian)" খাদ হইতে প্রায় ১০০০ মিটার উচ্চ। পশ্চিম আওরাস দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বদিকে প্রসারিত তিনটি দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত। ইহা আবদি-র গভীর উপত্যকাসমূহ ও আল-আবিওর্দ-এর পার্বত্য ঝরনা দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সরু গিরিখাত হইয়া সাহারা পর্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব আওরাস আরও প্রকাণ্ড। ইহার উচ্চতা ও আকৃতির পার্থক্য বিচিত্র জৈব-ভৌগোলিক অঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ঢালসমূহ ছোট ও খাড়া। নিঃসন্দেহে এখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় এবং সেচ ছাড়াই চাষাবাদ করা যায়। এইগুলি চিরসবুজ ওক বৃক্ষের বনে আচ্ছাদিত এবং প্রায়ই চূড়াসমূহের উপর চিরহরিৎ বৃক্ষ ও পাহাড়ী ঘাসের বন বিদ্যমান। দক্ষিণের ঢালগুলি অনেক বেশী দীর্ঘ ও শুষ্ক— ইহা তিনটি অঞ্চলে বিস্তৃত। এইগুলির সমতলভূমিতে সেচের সাহায্যে ফসল উৎপন্ন করা হয়। ইহাদের একটি শীতল অঞ্চল ১৫০০ মিটার উচ্চ এবং ইহা প্রায়ই বরফে আচ্ছাদিত থাকে। ইহা চিরসবুজ ওক বৃক্ষের বন, চারণভূমি, গ্রীষ্মকালীন ফসল ও কাঠবাদাম গাছ দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। মধ্যবর্তী অঞ্চল খুবই অবহেলিত, আলেপ্পো পাইন বৃক্ষের ঝোপ ও জুনিপার বন দ্বারা চিহ্নিত। ইহার পাদদেশে শীতকালে (বার্লি ও গম) এবং গ্রীষ্মকালে (ভুট্টা ও সরগুম) খাদ্যশস্য, ডুমুর ও খোবানী উৎপাদিত হয়। ৮০০ মিটার নিচে ওয়াদী ব্যাপিয়া পর্বতের পাদদেশে প্রথমে পাম বৃক্ষের বন দেখা যায়; ঢালের পাদদেশে মাঝে মাঝে কেবল জুনিপার, আলফার ঝোপ ও অত্যন্ত নিম্নমানের চারণভূমি দৃষ্ট হয়।

আওরাসের অধিবাসিগণ পর্বতে এবং উত্তর (Chara) ও দক্ষিণ (সাহারা) ঢালের পাদদেশে তাহাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য, ফল, কিছু শাকসব্জী ও পশু-পালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের পালিত পশুর মধ্যে ভেড়া অপেক্ষা ছাগলের গুরুত্ব বেশী। খাদ্যশস্য চাষাবাদের জন্য লোকজন উত্তরের ঢাল হইতে পর্বতের পাদদেশে পশুপালকে নেওয়ার সময় ইহাদের সহিত অর্ধ যাযাবর জীবনযাত্রার মত পরিবারবর্গকেও লইয়া যায়। পূর্বাঞ্চল ব্যতীত আওরাসের অধিবাসীরা গ্রামবাসী। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা বনে বিক্ষিপ্ত গার্বিস (gourbis)-এর ছোট ছোট পাড়ায় বাস করে। তাহাদের গ্রামগুলি প্রায়ই পাহাড়ের পাশে নির্মিত এবং ছাদবিশিষ্ট বাড়ীগুলিতে কখনও কখনও গুয়েলার (কাল'আ, সুরক্ষিত শস্যভাণ্ডার)-এর প্রাধান্য লক্ষণীয়। সীমান্তবর্তী এলাকা ছাড়া আওরাসের জনগণ এখনও বারবার ভাষাভাষী। সীমান্তবর্তী এলাকায় আরবীকৃত গোত্রসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। আরবগণ এই বারবারদের শাবিয়া নামে অভিহিত করে। স্ত্রীলোকেরা এখনও বারবার ভাষায় কথা বলে, তবে পুরুষেরা পরিবারের বাইরে আরবীতে কথা বলে।

কর্তিত প্রস্তর হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরাতন প্রস্তর (Old Neolithic) যুগ হইতে আওরাসে জনবসতি চলিয়া আসিতেছে। চৌবাচ্চা ও সেচখালের ধ্বংসাবশেষ, তৈল-কল, পেষণ-পাথর প্রভৃতি দ্বারা সেইখানে রোমক প্রভাবের অস্তিত্ব প্রতীত হয়। আওরাসের উত্তরমুখী

পাদদেশ ব্যাপিয়া বায়যানটীয়রা এক সারি দুর্গ নির্মাণের মধ্যেই নিজদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে। মুসলিম সেনানী 'উক্‌বা ইব্‌ন নাফি' যখন মাগরিবে প্রবেশ করেন তখন বার্‌বারগণ তাঁহার ভয়ানক ক্ষতি সাধন করে এবং তিনি পশ্চিমে তাঁহার বৃহৎ অভিযান হইতে ফিরিবার পথে আওরাসের নিকটবর্তী তাহূদাতে শাহাদাত বরণ করেন। কুসায়লা (দ্র.) রাজ্যের ধ্বংসের পর আওরাস মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানরা কেবল দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাহিনা-র কাহিনী জড়িত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর উহা দমন করিতে সক্ষম হয়। এইসব যুদ্ধের পর ত্রিপলিতানিয়া ও ইফ্রিকিয়ার দক্ষিণাংশ হইতে আগত বারবারগণ আওরাসে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিলেও তাহাদের স্বাধীনতার স্পৃহা বজায় রাখে। ধর্মবিরোধী মতবাদের প্রতি তাহাদের আগ্রহ দ্বারা এই স্পৃহা প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় /অষ্টম শতাব্দীতে তাহারা 'ইবাদী মতবাদ' ও চতুর্থ/দশম শতব্দীতে 'নাক্কারী' মতবাদ গ্রহণ করে। এই আওরাস হইতেই আবূ ইয়াযীদের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহার বিদ্রোহ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ফাতিমী সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটায়। হিলালী অভিযান সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের আরবী করণে অবদান রাখে, কিন্তু জনগণ হাফসীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরবর্তী তুর্কী আধিপত্য এড়াইয়া তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে সফল হয়। তুর্কীগণ অবশ্য তাহাদের নীতির প্রতি অনুরক্ত কতিপয় দলপতিকে উক্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। দশম/ ষোড়শ শতাব্দী হইতে মরক্কোর সর্বদক্ষিণ হইতে আগত ধর্ম প্রচারকগণ আওরাসে ইসলামের যেই রূপদান করে তাহা ৯৩৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ইহা ছিল একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামোর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ধর্ম। এই শেষোক্ত তারিখে আলজেরীয় আলিমবর্গ, বিশেষত পীর-পূজারী দরবেশবাদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন।

আওরাসের অধিবাসিগণ সর্বদাই তাহাদের গ্রামভিত্তিক পুরাতন রাজনৈতিক সংগঠন বজায় রাখে। ইহা ছিল গণপরিষদ কর্তৃক শাসিত একটি খাঁটি পৌর প্রজাতন্ত্র বা জামা'আ যাহা কাবিলিয়াতে প্রচলিত পৌর শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ, যদিও উহা অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। ফরাসী দখল কেবল আপাতদৃষ্টিতে এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটায়। ১৮৪৫ সালে ডাক ডি অমালে (Duc d`Aumale) মশুনেশ (Mshunesh) দখল করেন, অন্যদিকে বিদোঁ (Bedeau) প্রধান গোত্রগুলিকে ফরাসী প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন। ১৮৪৮-৪৯ ও ১৮৫০ সালে অবশ্য একটি বিদ্রোহ দেখা দিলে ফরাসী বাহিনীকে আবার হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ১৮৬৬ খৃ. আওরাসে মালিকী বিচার ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় এবং কাদীদের সেখানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ফরাসী ফৌজদারী আইন ও ইসলামী আইনের পরিপূরক হিসাবে স্থানীয় প্রথাগত আইন ব্যবহৃত হইতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Fallot, Etude sur les monts Aures, in Bull. de la Soc. de Geog. de Marseille, 1886; (২) Col. de Lartigue, Monographie de l'Aures, Constantine 1904; (৩) C. Latruffe, Les Monts Aoures, in the Bull. De la Soc. de Geog. de Paris, 1880; (৪) A. Papier, La Guelaa de kebaich et I'oasis de Mechounech, Paris 1894; (৫) M. Besnier, La Plaine d'Arris, in the Ann. de Geog., 1899; (৬) H. Busson, Les vallees de I'Aures, in the Ann. de Gog. 1900; (৭) E. Masqueray, De Aurasio monte, Paris 886; (৮) ঐ লেখক, Formation des cites chez les populations sedentaires de I' Afrique septentrionale, Paris 1886; (৯) ঐ লেখক, Documents hist. sur I'Aures, in R. Afr. 1877; (১০) ঐ লেখক, Voyage Dans l'Aouras, in the Bull. de la Soc. De Geog. de Paris, 1876; (১১) ঐ লেখক, Tradition de l' Aouras oriental, in the Bull. de Corr. Arf. 1885; (১২) Sierakowski, Das Schawi, Dresden 1871; (১৩) Lettre du Mal de St. Arnaud sur ses compagnes dans l'Aures, Paris 1855; (১৪) Cne de Margon, Insurractions dans la province de constantine de 1870 a 1880, Paris 1883; (১৫) G. Mercier, Moeurs et traditions de l' Aures, in JA, 1900; (১৬) F. Stuhlmann, Ein Kulturgeschichtlicher Ausflug in den Aures, Hamburg 1912; (১৭) M.W. Hilton Simpson, The Berbres of the Aures Mountains, in Scottish Geog. Mag., xxxviii, 1922; (১৮) G. Rozet, L' Aures, escalier du desert, Algiers 1934; (১৯) G Surdon, Institutions et coutumes des berbers du Maghreb², Tangier-Fez 1938, 406-29; (২০) M. Gaudry, La Femme chaouia de l'Aures Paris 1929, নির্ঘণ্টসহ; (২১) R. Lafitte, Etude geologique de l' Aures, Algiers 1939; (২২) G. Tillion, Les societes berberes dans l'Aures meridional, in Africa, 1938; (২৩) T. Riviere, l' Habtation chez les Ouled Abderrahman, in Africa, 1938; (২৪) G. Marcy, Observ. sur I'evolution politique et sociale de l'Aures, in Politique etrangere, 1938; (২৫) ঐ লেখক, Cadre geog. et genre dee vie en pays chaouia, in Educ. algerienne, 1942; (২৬) T. Riviere, J. Faublee and M. Faublee-Urbain, in jour. Soc. African, 1942, 1943, 1951, 1955; (২৭) P. Rognon, La basse vallee de l'oued Abdi, in Trav. del' inst. de Rech. Sahar...., 1954. আলজেরিয়া, আটলাস ও বার্‌বার্‌ নিবন্ধগুলিও দ্র.।

G. Yver (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আলী আসগর খান

আওল (عول) ঃ শব্দার্থ-বিচ্যুতি বা ব্যত্যয়। খলীফা হযরত উমার (রা)-এর সময় হতে ইহা যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহা হইলঃ কুর্আনের বিধান মুতাবিক মৃতের সম্পত্তি বণ্টনে কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়ারিছগণের প্রাপ্য অংশসমূহের সমষ্টি মোট সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক হওয়ার দরুন যে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তজ্জনিত সমস্যার সমাধান কল্পে গৃহীত পন্থা। সূরা নিসা'র তিনটি আয়াতে (৪ ঃ ১১, ৪ ঃ ১২, ৪ ঃ ১৭৬) মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের নীতি বর্ণিত হইয়াছে। এই তিন আয়াতে কতিপয় আত্মীয়কে সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ (যথা ঃ $\frac{১}{৩}, \frac{২}{৩}, \frac{১}{৬}, \frac{১}{২}, \frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৮}$) প্রদানের স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। এই ওয়ারিছগণের নামকরণ করা হইয়াছে "যাবিল ফুরূদ" অর্থাৎ 'নির্ধারিত অংশীদারগণ'। কোন কোন সময় এই শ্রেণীর আত্মীয়গণকে তাহাদের নির্ধারিত অংশ দিতে গেলে মূল সম্পত্তি অপেক্ষা তাহাদের প্রাপ্য অংশ অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ফলে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। উদাহরণত এক ব্যক্তি দুই কন্যা, পিতা, মাতা ও এক স্ত্রী রাখিয়া মারা গেল। বিধান অনুযায়ী মোট সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ দুই কন্যার প্রাপ্য, পিতার প্রাপ্য $\frac{১}{৬}$, মাতার প্রাপ্য $\frac{১}{৬}$ আর স্ত্রীর প্রাপ্য $\frac{১}{৮}$ অংশ। দেখা যাইতেছে, দুই কন্যার ($\frac{২}{৩}$) ও পিতা-মাতার ($\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{১}{৩}$) অংশ দিলেই সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়, স্ত্রীর জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সমস্যাটি সমাধানের জন্য যে নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ অংশীদারগণের অর্থাৎ দুই কন্যা, পিতা, মাতা ও স্ত্রীর প্রাপ্য অংশের সমষ্টি $\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৮}=\frac{১৬+৪+৪+৩}{২৪}=\frac{২৭}{২৪}$ অংশ। এখানে "লব" ২৪-এর অধিক (অর্থাৎ ২৭) হওয়াতে সম্পত্তির সঠিক বণ্টন সম্ভব হইতেছে না। কারণ সম্পত্তি রহিয়াছে ২৪ অংশ, কিন্তু বণ্টন করিতে হইবে ২৭ অংশ। "হর"-কে ২৭ ধরিলে (অর্থাৎ মোট সম্পত্তিকে ২৪ ভাগের স্থলে ২৭ ভাগ করিলে) বণ্টন সম্ভব হয়। তখন দুই কন্যা, পিতা, মাতা ও স্ত্রীর অংশ হইবে যথাক্রমে $\frac{১৬}{২৭}, \frac{৪}{২৭}, \frac{৪}{২৭}$ ও $\frac{৩}{২৭}$ সমষ্টি $\frac{২৭}{২৭}$। বণ্টনের এই নিয়মকে 'আওল' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই নীতিতে প্রাপ্য অংশসমূহের "হর"-কে এমনভাবে বর্ধিত করা হয় যাহাতে উহা অংশসমূহের সমষ্টির "লব"-এর সমান হয়। কথিত আছে, হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে একদিন হযরত আলী (রা) যখন খুত্বা দানের জন্য মিম্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি সমস্যাটি তাঁহার নিকট পেশ করেন। আলী (রা) উল্লিখিতভাবে বণ্টনের তাৎক্ষণিক ফয়সালা প্রদান করেন। এইজন্য ইহাকে "মাসআলা মিম্বারিয়্যা" বলা হয়।

বিভিন্ন গ্রন্থ ঃ (১) আই.এ.খায়রুল্লাহ, The Law of Inheritance in the Republic of Syria and Lebanon, বৈরূত ১৯৪১ খৃ.; (২) আস-সিরাজিয়্যা; (৩) M.B.A. Bagri, Division of Inheritance, পাকিস্তান রিসার্চ সেন্টার, ১৯৬৬ খৃ.; (৪) A.A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, দিল্লী ১৯৮১ খৃ. ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত মোট ৩২টি 'আওল' দৃষ্টান্তের উল্লেখ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান করিয়াছেন। সেইগুলি হইতেছে ঃ

(১) ওয়ারিছ=স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী,

তাহাদের নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}=\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}=\frac{৭}{৬}$

'আওল প্রয়োগে প্রদত্ত অংশ $\frac{৩}{৭}+\frac{৪}{৭}$।

(২) ওয়ারিছ=স্বামী+মাতা+১ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{৩}{৬}=\frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৭}+\frac{১}{৭}+\frac{৩}{৭}$।

(৩) ওয়ারিছ=স্বামী+পিতামহ/পিতা+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{৩}{৬}=\frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৭}+\frac{১}{৭}+\frac{৩}{৭}$।

(৪) ওয়ারিছ=স্বামী+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৭}+\frac{৩}{৭}+\frac{১}{৭}$।

(৫) ওয়ারিছ=স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৭}+\frac{৩}{৭}+\frac{১}{৭}$।

(৬) ওয়ারিছ=স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৭}+\frac{৩}{৭}+\frac{১}{৭}$।

(৭) ওয়ারিছ=মাতামহী+২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+১ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{৬}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}+\frac{২}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{১}{৭}+\frac{২}{৭}+\frac{৩}{৭}+\frac{১}{৭}$।

(৮) ওয়ারিছ=স্বামী+দুই পূর্ণ ভগ্নী/ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৮}+\frac{৪}{৮}+\frac{১}{৮}$।

(৯) ওয়ারিছ=স্বামী+মাতা+১ পূর্ণ ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}+\frac{২}{৬}+\frac{৩}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৮}+\frac{২}{৮}+\frac{৩}{৮}$।

(১০) ওয়ারিছ=পিতা+মাতা+৩ পূর্ণ ভগ্নী+৩ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{৪}{৬}+\frac{২}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{৪}{৮}+\frac{২}{৮}$।

(১১) ওয়ারিছ=স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $=\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{২}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $=\frac{৩}{৮}+\frac{৩}{৮}+\frac{২}{৮}$।

(১২) ওয়ারিছ=স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী/ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী/মাতা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{৮}+\frac{৪}{৮}+\frac{১}{৮}$।

(১৩) ওয়ারিছ=স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী/১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভাই বা ২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{২}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{৮}+\frac{৩}{৮}+\frac{২}{৮}$।

(১৪) ওয়ারিছ=স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}+\frac{২}{৬}=\frac{৯}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{৯}+\frac{৪}{৯}+\frac{২}{৯}$।

(১৫) ওয়ারিছ=স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{২}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৯}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{৯}+\frac{৩}{৯}+\frac{২}{৯}+\frac{১}{৯}$।

(১৬) ওয়ারিছ=স্বামী+মাতা+২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{২}+\frac{১}{৬}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{৪}{৬}+\frac{২}{৬}=\frac{১০}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১০}+\frac{১}{১০}+\frac{৪}{১০}+\frac{২}{১০}$।

(১৭) ওয়ারিছ=স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা.

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}$

$= \frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}+\frac{২}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{১০}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১০}+\frac{৪}{১০}+\frac{২}{১০}+\frac{১}{১০}$।

(১৮) ওয়ারিছ=স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}+\frac{২}{১২}=\frac{১৩}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৩}+\frac{৮}{১৩}+\frac{২}{১৩}$।

(১৯) ওয়ারিছ=স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+মাতা/মাতামহী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}+\frac{২}{১২}=\frac{১৩}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৩}+\frac{৮}{১৩}+\frac{২}{১৩}$।

(২০) ওয়ারিছ=স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}+\frac{৪}{১২}=\frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৫}+\frac{৮}{১৫}+\frac{৪}{১৫}$।

(২১) ওয়ারিছ=স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$

$= \frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}+\frac{২}{১২}+\frac{২}{১২}=\frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৫}+\frac{৮}{১৫}+\frac{২}{১৫}+\frac{২}{১৫}$।

(২২) ওয়ারিছ=স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}$

$= \frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}+\frac{৪}{১২}+\frac{২}{১২}=\frac{১৭}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৭}+\frac{৮}{১৭}+\frac{৪}{১৭}+\frac{২}{১৭}$।

(২৩) ওয়ারিছ=স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী/ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভাই/ভগ্নী+মাতা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}$

$= \frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}+\frac{৪}{১২}+\frac{২}{১২}=\frac{১৭}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৭}+\frac{৮}{১৭}+\frac{৪}{১৭}+\frac{২}{১৭}$।

(২৪) ওয়ারিছ=৩ স্ত্রী+২ মাতামহ/পিতামহ+৪ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+৮ পূর্ণ ভগ্নী।

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৩}+\frac{২}{৩}$

$= \frac{৩}{১২}+\frac{২}{১২}+\frac{৪}{১২}+\frac{৮}{১২}=\frac{১৭}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৭}+\frac{২}{১৭}+\frac{৪}{১৭}+\frac{৮}{১৭}$।

(২৫) ওয়ারিছ=মাতা+পিতা+২ কন্যা+স্ত্রী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৮}$

$= \frac{৪}{২৪}+\frac{৪}{২৪}+\frac{১৬}{২৪}+\frac{৩}{২৪}=\frac{২৭}{২৪}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৪}{২৭}+\frac{৪}{২৭}+\frac{১৬}{২৭}+\frac{৩}{২৭}$।

(২৬) ওয়ারিছ=স্ত্রী+পিতা+মাতা+১ কন্যা+১ পৌত্রী

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৮}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}$

$= \frac{৩}{২৪}+\frac{৪}{২৪}+\frac{৪}{২৪}+\frac{১২}{২৪}+\frac{৪}{২৪}=\frac{২৭}{২৪}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{২৭}+\frac{৪}{২৭}+\frac{৪}{২৭}+\frac{১২}{২৭}+\frac{৪}{২৭}$।

(২৭) ওয়ারিছ=মাতা+পিতা+স্বামী+২ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}$

$= \frac{২}{১২}+\frac{২}{১২}+\frac{৩}{১২}+\frac{৮}{১২}=\frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{২}{১৫}+\frac{২}{১৫}+\frac{৩}{১৫}+\frac{৮}{১৫}$।

(২৮) ওয়ারিছ=মাতা+স্বামী+২ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৬}+\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}=\frac{১}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{১}{৮}+\frac{৩}{৮}+\frac{৪}{৮}$।

(২৯) ওয়ারিছ=মাতা+স্বামী+৩ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৬}+\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}=\frac{১}{৬}+\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}=\frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{১}{৮} + \frac{৩}{৮} + \frac{৪}{৮}$।

(৩০) ওয়ারিছ=মাতা+পিতা=স্বামী+৩ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৮} + \frac{২}{৩}$

$= \frac{৪}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{৩}{২৪} + \frac{১৬}{২৪} = \frac{২৭}{২৪}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৪}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{৩}{২৭} + \frac{১৬}{২৭}$।

(৩১) ওয়ারিছ=স্বামী +পিতা +মাতা + ৩ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৪} + \frac{২}{৩}$

$= \frac{২}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} = \frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{২}{১৫} + \frac{২}{১৫} + \frac{৩}{১৫} + \frac{৮}{১৫}$।

উক্ত তালিকায় নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটিও সংযোজন করা যায় ঃ

(৩২) ওয়ারিছ=স্বামী + পিতা + মাতা +১ কন্যা

নির্ধারিত অংশ $= \frac{১}{৪} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{২}$

$= \frac{৩}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৬}{১২} = \frac{১৩}{১২}$

প্রদত্ত অংশ $= \frac{৩}{১৩} + \frac{২}{১৩} + \frac{২}{১৩} + \frac{৬}{১৩}$।

'আওল নীতি প্রয়োগের ফলে কুর্আনে প্রদত্ত নির্দিষ্ট অংশ পুরাপুরি বজায় না থাকিলেও ওয়ারিছদের মধ্যে সমানুপাতিকভাবে সম্পত্তি বণ্টনের ইহা একটি সহজ ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা। তবে আওলের বিরুদ্ধে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) [মৃ. ৬৮ হি.] 'আওলকে কুরআনী বিধানের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি বলিতেন, "আল্লাহ 'আলিজ মরুভূমির প্রতিটি বালিকণার হিসাব জানেন, তিনি সম্পত্তি বণ্টনে কখনও দুই-অর্ধাংশের সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশের বিধান দিতে পারেন না।... আমি তাহাদের অংশই কমাইয়া দিব যাহাদের দাবি কিছুটা দুর্বল। এই ধরনের অংশীদারগণ হইতেছে কন্যাগণ ও ভগ্নিগণ। কারণ তাহাদের অংশ নির্দিষ্ট হইতে অনির্দিষ্টে পরিবর্তিত হইয়া যায়" (সায়্যিদ শারীফ জুরজানী, আশ-শারীফিয়্যা, পৃ. ৫৫)। কিন্তু তাঁহার এই মত তৎকালে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

সুন্নী মুসলিমগণের সকলেই আওল-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইবাদিয়াগণও ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের মতে হযরত 'উমার (রা) 'আওল নীতির প্রবর্তক। অন্যপক্ষে ইছনা 'আশরিয়া শী'আ সম্প্রদায় 'আওল-কে বর্জনযোগ্য গণ্য করেন এবং তাহারা কন্যা/কন্যাদের অংশ কিংবা পূর্ণ বা বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীর/ভগ্নীদের অংশ হ্রাস করেন না (দ্র. E.I.2, Awl নিবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধের যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

মোহাম্মদ ফেরদাউস খান

'আওলাকী (عولقي) ঃ (ব.ব. আওয়ালিক, অশিষ্ট মাওয়ালিক, শব্দ-প্রকরণের জন্য দ্র. Landberg, ii, ১৯৮৪ প.)। (ক) গোত্রীয় যৌথরাষ্ট্র ও (খ) দক্ষিণ 'আরবের এলাকা যাহা ভারত মহাসাগর ও মরুভূমি (Ramlat Sabateyn) -র মধ্যে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম এডেনের পূর্ব প্রান্তিক জেলা। সীমানা-পশ্চিমে ফাদলী, আওয়ালী ও বায়হানী জেলাসমূহ, পূর্বে ইরকা অঞ্চলের যীবী (Dhiebi), বালহাফ-এর ওয়াহিদী সালতানাত এবং জেরদানের অনির্ধারিত এলাকা, শাব্ওয়াহ, ইরমা (উরমা) ও আলু বুরায়কসহ। এলাকাটি কাওরুল আওদ (কাওর আওযিল্লা-র বর্ধিতাংশ) দ্বারা দুইটি বিভিন্ন প্রকারের দুই অর্ধে বিভক্ত।

১। উচ্চ আওলাকী অঞ্চলটি (আনু. ১,০০,০০০ বর্গ কি.মি., জনসংখ্যা ৩০ হাজার— ৫০ হাজার) সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। ইহার আবহাওয়া অত্যুষ্ণ এবং উর্বর জমিতে গম, ভুট্টা, তামাক ও নীল উৎপাদিত হয়। উত্তরের আর্দুল মাহাজির এই গোত্রীয় যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত (তু. আল-হামদানী, পৃ. ৮৯)। এই রাষ্ট্রের মধ্যে রহিয়াছে মারাযীক, রাবীয, হাম্মাম, দায়্যান ও দাকূকার উপগোত্রসমূহ। ইহারা আন্সাব (নিসাব)-এর চতুর্দিকস্থ জেলায় বসবাস করে। আওয়ালিকের উচ্চতর এলাকার সুলতানের বাসস্থানও এইখানে অবস্থিত। তিনি আর্দ মার্খা-র প্রশস্ত মালভূমি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এখানে ওয়াসিত, হাজার ও হুজায়র- এ নিসিয়্যীন বেদুঈনগণ বসবাস করে। প্রধান উপত্যকাসমূহ হইতেছে আবাদান, দুরা, খাওরা ও মারখা। উত্তর-পশ্চিম দিকে বায়হানুল-কাসাব-এর অদূরে খাব্ত-এর সমৃদ্ধ লবণ খনিসমূহ বিদ্যমান। অপর বৃহৎ গোত্র সম্মেলন (federation) মা'ন অথবা মা'আন (তু. মা'ঈন, মা'আন, "Minaeans") নামক অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রাচীন শহর (সূক) য়েশবুম-এর চতুষ্পার্শ্বে যূথবদ্ধ রহিয়াছে। উচ্চতর আওয়ালিক-এর শায়খ দ্বিতীয় গোত্রপ্রধান এইখানে বাস করেন। সুলতানের ন্যায় তিনি সর্বদাই মা'ন গোত্র হইতে নির্বাচিত হন। ইহাদের উপগোত্র মাদ্হিজ, বূবাকরর, বারাস, আতীক, সুলায়মান, তাওসালা, মিকরাহা ও ছাওবান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল গোত্র স্বাধীন কাবীলীস (kabilis)। ইহারা যুদ্ধপ্রিয় এবং প্রায়শই বিদেশে ভাড়াটিয়া যোদ্ধারূপে যোগদান করে। য়েশবুম-এর শায়খ মুহসিন ইব্ন ফারীদ ১৯০৩ খৃ. ও আন্সাব-এর সুল্তান আওয়াদ ইব্ন সালিহ ১৯০৪ খৃ. ব্রিটিশদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন। আন্সাবে একটি বিমান বন্দর রহিয়াছে।

২। নিম্ন আওলাকী অঞ্চলটির (আনু. ৮০ হাজার বর্গ কি.মি., ১২ হাজার–১৫ হাজার অধিবাসী) অধিকাংশই শুষ্ক ও অনুর্বর। উপত্যকাগুলি প্লাবিত হইবার জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টি কদাচিৎ পর্বতগুলিতে হইয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপত্যকাশ্রেণী ওয়াদী আহওয়ার (উছরুব নামেও পরিচিত)। দাছীনা হইতে আগত ওয়াদী জাহর ও ওয়াদী দীকা (লায়কা)-এর সহযোগে ইহা গঠিত। এই উপত্যকা হাব্বান (দ্র.)-এর দক্ষিণে শুরু হইয়া মুন্কাআর উচ্চ ভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে হিম্য়ারী উপগোত্রগুলি (মাশাইখ) বসবাস করে অর্থাৎ ওয়াদী লাবাখাতে বাস করে কুমুশ ও য়েশবুম-এর দক্ষিণে মাহফিদ-এ আহল শামআ। এই অঞ্চলের সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণভাগে বসবাসকারী বাকাযিম গোত্রের আদিম বেদুঈনগণের উপর তাঁহারা কিছুটা কর্তৃত্ব করিত। ওয়াদী দীকা-র অন্যান্য শহর খাবর, শাজমা কুল্লিয়্যা। উপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে মৎস্যজীবীদের বাস। সুলতান উপকূল হইতে আনু. ৫ কি.মি. দূরে এবং ওয়াদী হইতে সামান্য পূর্বে অবস্থিত আহওয়ার (হাওয়ার)-এ বসবাস করেন। আব্য়ান ও

লাহজ-এর ন্যায় আহওয়ার সঠিকভাবে সমগ্র জেলাটি নির্দেশ করে এবং তৎপর ইহার কেন্দ্র আল-মজাবী (Landberg-II-এর মতে, ২খ., ২৭৩, ৩২৬, ১৮৩৪) বুঝায়, যাহা প্রকৃতপক্ষে শহর নহে, বরং কতিপয় গ্রামের সমষ্টি। ইহার জনসংখ্যা (আনু. ৫ হাজার) প্রধানত কৃষিজীবী। বৃটিশের সহিত ১৮৮৮ খৃ. সম্পাদিত একটি চুক্তি সুলতান আয়দারূস ইব্ন 'আলী (১৯৪৮ খৃ. নিহত) ১৯৪৪ খৃ.-এ নবায়ন করেন। এই পরামর্শ প্রদানমূলক চুক্তির ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং কৃষি ও বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। এখানে একটি বেতার কেন্দ্র ও একটি বিমান বন্দর আছে এবং একটি নিম্ন মানের ও একটি দেশীয় বিদ্যালয় আছে বলিয়া জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. von Maltzan, Reise nach sudarabien, Braunschweig ১৮৭৩ খৃ., ২৩৯-২৫ (মানচিত্রসহ); (২) C. Landberg, Tribus du Sultanat des, Awaliq superieurs (= Arabica, ৪খ, ৪৩৭-৫৪) ; (৩) ঐ লেখ, Etudes, ii (Datina) ১৭৩৫, স্থা.; (৪) Wyman Bury, The land of Uz, ১৯১১ খৃ., ১৫৬-২৩০, ২৮০ প. (মানচিত্রসহ); (৫) আমীন রীহানী, মুলূকুল আরাব, ১খ., ১৯২৯, ৩৮৪; (৬) Doreen Ingrams, A survey of social and economic conditions in the Aden Protectorate, ১৯৪৯, স্থা. (মানচিত্রসহ)।

O. Lofgren (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

আওলাদ (اولاد) ঃ ওয়ালাদ-এর ব.ব., অর্থ সন্তান-সন্ততি। শব্দটির পরে সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রধান পূর্বপুরুষের নাম ব্যবহৃত হয়। দ্র. যে কোন গোত্রপ্রধানের নামযুক্ত নিবন্ধ।

E.I.[2]/আ.মু.মু. নুরুল ইসলাম

আওলাদুন-নাস (اولاد الناس) ঃ শাব্দিক অর্থ মানব সন্তান, মাম্লূকদের উচ্চ শ্রেণী যাহা একটি স্বতন্ত্র ও একচেটিয়া সমাজে পরিণত হয়। কেবল সেই ব্যক্তি যে কাফিররূপে জন্মগ্রহণ করিত, বিদেশ হইতে শিশুদাসরূপে আনীত হইত, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ও সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপনের পর মুক্তিপ্রাপ্ত হইত এবং যে সাধারণত আরব নাম বহন করিত সেই ব্যক্তিই এই সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত। এই সকল বিধিমালার তাৎপর্য এই যে, মাম্লূক উচ্চ শ্রেণী হইবে অ-বংশানুক্রমিক অভিজাত। কারণ মাম্লূকগণের ও মাম্লূক আমীরগণের পুত্রগণ ছিল মুসলিম এবং জন্মগতভাবেই স্বাধীন। তাহাদের জন্ম ও লালন-পালন হইত মাম্লূক সালতানাতের সীমার মধ্যে। তাহাদের নাম হইত 'আরবী। এমতাবস্থায় তাহারা উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না এবং আপনা আপনিই তাহা হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহাদেরকে হাল্কা (حلقة-চক্র) [দ্র.] নামক একটি অ-মাম্লূক দলের সহিত সংযুক্ত করা হয়। এই দলটি সামাজিকভাবে বিশুদ্ধ মাম্লূক দলের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। হাল্কা-র অভ্যন্তরে আমীর-পুত্র ও মাম্লূক-পুত্রগণের অবস্থান ছিল উচ্চতর। ইহারাই আওলাদুন-নাস "মানব সন্তান" নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ মানবের সন্তান, সম্ভ্রান্ত মানবের সন্তান"। কারণ এই স্থলে 'মানব' বলিতে মাম্লূকগণকে বুঝাইত যাহারা ছিল একটি অতি সীমিত শ্রেণীবিশেষের সদস্য।

অতি সামান্য সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত আওলাদুন্-নাস দশ-ওয়ারী ও চল্লিশ-ওয়ারী আমীরের পদের ঊর্ধ্বে উঠিতে সমর্থ হয় নাই। মাঝে মাঝে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে আওলাদুন নাস-এর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। উদাহরণস্বরূপ সুল্তান আন্-নাসির হাসান (৭৪৮/১৩৪৭-৭৫২/১৩৫১) মাম্লূক আমীরগণের তুলনায় আওলাদুন-নাস উদ্ভূত আমীরগণের প্রতি অধিকতর আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন। অবশ্য সুলতান হাসানের রাজত্বকালে আওলাদুন-নাসের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল ব্যতিক্রমবিশেষ এবং অন্য সুলতানগণের রাজত্বে তাহাদের মর্যাদার সহিত ইহা ছিল বিশেষভাবে বৈপরীত্যমূলক। যেহেতু স্বাভাবিক কারণেই তাহারা মাম্লূকগণের সমমর্যাদা হইতে বঞ্চিত ছিল সেইহেতু তাহাদের অগ্রগতি ও গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সময়ের গতিধারায় তাহাদের অবনতি ঘটিতে থাকে যেমন ঘটিতে থাকে হাল্কা-র লোকদের এবং তাহাদের প্রতি একই প্রকার বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়। যথাঃ বেতন হ্রাস, তাহাদের জায়গীর বিক্রয়, নগদ অর্থের (বাদীল) বিনিময়ে তাহাদের সামরিক অভিযান হইতে অব্যাহতি, তাহাদের প্রশিক্ষণ নিম্ন মানের প্রমাণিত করিবার জন্য তীরান্দাজীর পরিকল্পিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে তাহাদের বাধ্য করা যাহাতে তাহারা পূর্ণাঙ্গ সৈনিকের সকল সুবিধা পাইবার অযোগ্য বিবেচিত হয়। মাম্লূক আমলের শেষের দিকে হাল্কা নামটি পরিত্যক্ত হয়, অথচ আওলাদুন-নাস নামের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

আওলাদুন-নাস-এর মধ্যে ও হাল্কা-র অন্য সদস্যদের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা ও আখিরাতের ব্যাপারে প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের অনেকেই সামরিক পেশা পরিত্যাগ করিয়া পরবর্তী কালে 'আলিম ও ফাকীহ্তে পরিণত হন (দ্র. D. Ayalon, Studies on the Structure of the Mamluk Army, in DSOAS, ১৯৫৩, ৪৫৬-৫৮ ও ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় উল্লিখিত হাওয়ালাসমূহ)।

D. Ayalon (E.I.[2]) / আবদুল বাসেত

আওলাদুল-বালাদ (اولاد البلد) ঃ সুদানী মাহ্দিয়্যা আমলে (১৮৮১-৯৮) ব্যবহৃত এই শব্দটি দ্বারা উত্তরের নদী অঞ্চল হইতে আগত উপজাতিকে বুঝাইত। ইহাদের মধ্যে দানাক্লা ও জালিয়্যীন এই দুই সম্প্রদায়ই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আদি উপজাতীয় বাসভূমি ত্যাগ করিয়া এই জাতির অনেক লোক মূল নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। প্রধানত শ্বেত নীল (নীল আব্য়াদ) অঞ্চলে দানাক্লারা নৌকা প্রস্তুতকারী ও নাবিকের কাজ করিত। পক্ষান্তরেহ্ কুর্দুফান, বারুল গাযাল ও দারফূর অঞ্চলে দানাক্লা ও জালিয়্যীন উভয় সম্প্রদায়ই সওদাগর ও দাস ব্যবসায়ী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। আওলাদুল-বালাদ সম্প্রদায়ের লোক, বিশেষ করিয়া যাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে মাহ্দী মুহাম্মাদ আহ্মাদ অনেক সাহায্য-সহযোগিতা পাইতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই মাহ্দীর অধীনে শাসক শ্রেণীর কাজ চালাইত। ১৮৮৫ সনের জুন মাসে

মাহ্দীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খালীফা আবদুল্লাহ্র হাতে ক্রমে ইহারা উচ্চ পদ হইতে অপসারিত হইতে লাগিল। তবে মাহ্দিয়্যা শাসনের ক্রান্তিকাল পর্যন্ত করণিক ও অন্যান্য নিম্নতর পদ তাহাদের দ্বারাই প্রধানত পূরণ করা হইত। মাহদীর আত্মীয় আশরাফ ছিল আওলাদুল বালাদ-এর সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। খলীফা মুহাম্মাদ শরীফ নামেমাত্র ইহাদের দলপতি ছিলেন। ১৮৮৬ সনে এই দল আবদুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে গিয়া অকৃতকার্য হয়। ১৮৮৯ সালে টুশ্কী অঞ্চলে মাহ্দী কর্তৃক মিসর আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার পর হইতে আওলাদুল-বালাদ সম্প্রদায়ের শক্তি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কেননা ঐ অভিযানে তাহারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যদল এবং ইহাতে তাহাদের দলপতি সেনাপতি আবদুর রাহ্মান আন্-নুজূমীসহ বহু লোক নিহত হয়। ১৮৯১ সালে আশরাফ ও দানাক্লা সম্প্রদায়ের আর এক অভ্যুত্থান আবদুল্লাহ কর্তৃক পর্যুদস্ত করিয়া দেওয়ার পর তাহারা নির্যাতিত হইতে থাকে। ১৮৯৭ সালে দলনেতা 'আবদুল্লাহ সা'দ-এর অধীনে আল-মাতাম্মা শহরের জালিয়্যীন সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কিচনার (Kitchener)-এর অধীনস্থ ইঙ্গ-মিসরীয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। কিন্তু মাহ্মূদ আহ্মাদের নেতৃত্বে একদল মাহ্দিয়্যা সৈন্য এই বিদ্রোহ দমন করিয়া শহরটি লুণ্ঠন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ F. R. Wingate (J. Ohrwalder), Ten years captivity in the Mahdi's camp, London 1892, বহু সংস্করণ। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার আওলাদুল-বালাদ শব্দের বিশেষ তাৎপর্য উল্লেখ করিয়াছেন।

P.M. Holt (E.I.[2])/আ. মু. মু. নূরুল ইসলাম

আওলাদুশ্-শায়খ (أولاد الشيخ) ঃ বনূ হামাবিয়া (হামাবিয়া বংশ) নামেও পরিচিত। ইহা মূলত একটি ইরানী সূফী পরিবার। তাঁহারা ছিলেন শাফি'ঈ মায্হাব অনুসারী ফুকাহা। ইহাদের একটি শাখা সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে এবং শেষদিকের আয়্যূবী শাসক আল-মালিকুল কামিল (৬১৫-৩৫/১২১৮-৩৮) ও তাঁহার বংশের অন্য উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে সেখানে বেশ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই বংশের প্রথম যে ব্যক্তি ইতিহাসে পরিচিত তাঁহার নাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন হামাবিয়া (ফরাসী রূপ হামাওয়ায়হ) আল-জুওয়ায়নী। তিনি ৫৩০/১১৩৫-৩৬ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত সূফী ও ফকীহ ছিলেন অধ্যাত্মবাদের উপর বেশ কয়েকখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন (আস্-সাম'আনী; ইবনুল আছীর, ৯খ., ৩০; আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাজাম, হায়দরাবাদ, ১০খ., ৬৩-৬৪; ইয়াকূত, ২খ., ৪২৫; হাজ্জী খালীফা, সং. Flugel, ৩খ., ৬১২, নং ৭২৩১)। তাঁহার পৌত্র 'ইমাদুদ্দীন আবুল ফাত্হ 'উমার ইব্ন 'আলী (মৃ. ৫৭৭/১১৮১) দামিশ্ক গমন করেন এবং নূরুদ্দীন (৫৪১-৬৯/১১৪৬-৭৪) তাঁহাকে ৫৬৩/১১৬৭ সালে দামিশ্ক, হামাহ্, হিম্স, বা'আলবাক্ক ও অন্যান্য সিরীয় এলাকার সূফী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার বংশধররা সিরিয়া ও মিসরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা তাহাদের পরিবারের ইরানী শাখার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত (সিব্ত ইবনুল জাওযী, মিরআতুয যামান, হায়দরাবাদ, পৃ. ২৭২)। ইহাদের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল ওয়াহিদ (মৃ. ৫৮৮/১১৯২; ইব্নুল ফুরাত, cod. Vind, iv, 146a) ও ভ্রাতার পৌত্র সা'দুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৫০/১২৫২; E.I.[2] ২খ., ২৬০ ও ৪খ., ৩৩; সিব্ত ইবনুল জাওযী, ৬৬১) ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত। 'ইমাদুদ্দীন উমারের দুই পুত্র শায়খুশ্ শুয়ূখ সাদ্রুদ্দীন আবুল হাসান মুহাম্মাদ (৫৪৩-৬১৭/১১৪৮-১২২০) ও তাজুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ (৫৭২-৬৪২/১১৭৭-১২৪৪)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খুশ্-শুয়ূখ সাদ্রুদ্দীন আবুল হাসান মুহাম্মাদ খুরাসানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার সহিত দামিশ্কে আগমনের পর পিতার উত্তরাধিকারী হন। তিনি বিখ্যাত কাযী ইব্ন আবূ 'আসরূন (মৃ. ৫৮৫/১১৮৯; ইব্ন খাল্লিকান, নং ৩৩৪; অনু. De Slane, ২খ., ৩২-৩৫)-এর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহারা চারটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। এই পুত্র চতুষ্টয় ও তাহাদের বংশধররাই আওলাদ শায়খিশ্-শুয়ূখ বা বনূ শায়খিশ্-শুয়ূখ নামে পরিচিত। সাদ্রুদ্দীন সুলতান আল-মালিকুল 'আদিল (৫৯৫- ৬১৫/১১৯৮-১২১৮)-এর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি মিসর গমন করেন এবং সেখানেও সেই দায়িত্বই লাভ করেন যে দায়িত্বে তিনি সিরিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন। সুল্তান আল-মালিকুল কামিল রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দিয়া তাঁহাকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। বাগদাদ যাওয়ার পথে মাওসিল নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার ছোট ভাই তাজুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (৫৭২-৬৪২/১১৭৭-১২৪৪) ৫৯৩/১১৯৬ সালে আল-মাগরিব (আরবের পশ্চিম দিকস্থ আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)-এ গমন করেন এবং সেখানে আল-মুওয়াহ্হিদ সুল্তান আল-মান্সূর ইয়া'কূব (৫৮০-৯৫/১১৮৪-৯৮) ও নাসির মুহাম্মাদ (৯৫৯-৬১০/ ১১৯৮- ১২১৩)-এর অধীনে সাত বৎসর যাবত সামরিক বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর তিনি দামিশ্কে ফিরিয়া আসেন এবং পিতা ও ভ্রাতার মতই সিরীয় রাজধানীর সূফী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তিনি ইতিহাসের উপর কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহাদের শুধু নামগুলি অবশিষ্ট আছে। ইব্ন খাল্লিকান ৬৬৮/১২৬৯ সালে দামিশ্কে স্পেনের উপর লিখিত তাঁহার একখানা গ্রন্থের উপর তাঁহার স্বহস্তে লিখিত নাম দেখিয়াছিলেন (ইব্ন খাল্লিকান, নং ৮৩৯, অনু. de Slane, ৪খ., ৩৩৭)।

সাদরুদ্দীন-এর চার পুত্রের কারণেই এই পরিবার ইতিহাসে অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার ফাখ্রুদ্দীন ইয়ূসুফ অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ৫৮০/১১৮৪ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়োপ্রাপ্তির পর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। আল-কামিল ৬১৪/১২১৭ সালে তাঁহাকে দূত হিসাবে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। একজন দক্ষ কূটনীতিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং Hohenstaufen সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দরবারে ৬২৪/১২২৯ সাল হইতে জেরুসালেম সংক্রান্ত চুক্তির সম্পাদন পর্যন্ত (১৮ ফেব্রুয়ারী, ১২২৯) সুলতান আল-কামিলের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে সম্রাটের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সম্রাট তাঁহার সহিত অরাজনৈতিক সমস্যা লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন, এমনকি তাঁহার ইটালীতে ফিরিয়া আসার পর সম্রাট তাঁহাকে দুইখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন (ইব্ন নাজীফ

আল-হামাবী, তারীখুল মান্সূর, M. Amari, Bibl. Sic. App., ২খ., ২৫)। সুলতান আল-কামিলের রাজত্বের শেষভাগে ফাখ্রুদ্দীন ইয়ূসুফ বিভিন্ন উচ্চ রাজপদে সমাসীন হন। রাজার মৃত্যুর (রাজাব ৬৩৫/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১২৩৮) পর তিনি দামিশ্‌কে রাজকীয় পরিষদের সদস্য হন। দক্ষতার সহিত বিভিন্ন রাজকীয় দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও সুলতান আল-কামিলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান দ্বিতীয় 'আদিল তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, এমনকি বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ৬৪৩/১২৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি দায়িত্বমুক্ত অবস্থায় থাকিবার পর 'আদিলের উত্তরাধিকারী শাসক তাঁহার ভ্রাতা সুলতান নাজ্মুদ্দীন আয়্যুব ইব্নুল কামিল (৬৩৭-৪৭/১২৪০-৪৯) তাঁহাকে পূর্ব মর্যাদায় সমাসীন করেন। নূতন সুলতান তাঁহাকে মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদেও নিয়োগ করেন। ১২৪৯ সালে ফ্রান্সের একাদশ লুই যখন মিসর আক্রমণের হুমকি দেয়, তখন ফাখ্রুদ্দীন ইয়ূসুফের উপর মিসরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু নীল বদ্বীপে ফরাসী আক্রমণের পর তিনি দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনীকে দক্ষিণে আল-মানসূরার দিকে পশ্চাদপসরণ করান। ইহার অল্প কিছুদিন পরই সুলতান সালিহ মৃত্যুবরণ করেন (সোমবার ১৪ শা'বান, ৬৪৭/২২ নভেম্বর, ১২৪৯)। সুলতানের মৃত্যুর পর ফাখরুদ্দীনকে সুলতানা শাজারুদ্-দুর্‌র নূতন সুলতান আল-মু'আজ্জাম তুরান শাহ্ ইব্ন নাজ্মুদ্দীন আয়্যুব-এর অভিভাবক নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে ক্রুসেডাররা ধীরে ধীরে আল-মানসূরার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং এক ত্বরিৎ আক্রমণে নীলনদ অতিক্রম করিয়া নগরীতে প্রবেশ করে। যুদ্ধে ফাখরুদ্দীন শাহাদাত লাভ করেন। সেইদিন ছিল বৃহস্পতিবার ৪ যুলকা'দা, ৬৪৭/৮ ফেব্রুয়ারী, ১২৫০। ফাখ্রুদ্দীন-এর তিন ভ্রাতা ইমাদুদ্দীন 'উমার, কামালুদ্দীন আহমাদ ও মু'ঈনুদ্দীন হাসান সুলতান আল-কামিলের রাজত্বের শেষদিকে তাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বে তাঁহারা কায়রোতে শাফি'ঈ মাযহাবের কিতাবাদি শিক্ষাদান কার্যে নিজদেরকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। সুলতান আল-কামিলের মৃত্যুর পর তাঁহারাও দামিশ্‌কের রাজকীয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হন। 'ইমাদুদ্দীন 'উমার অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। মরহুম সুল্তানের ভ্রাতুষ্পুত্র জাওওয়াদ ইয়ূনুস ইব্ন মাওদূদ ইব্নুল 'আদিল (মৃ. ৬৪১/১২৪৩) দামিশ্‌কের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি সুলতান দ্বিতীয় 'আদিলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই অবস্থায় সুলতান জাওওয়াদকে তাঁহার দাবি পরিত্যাগের ব্যাপারে চাপ দিবার জন্য 'ইমাদুদ্দীনকে দামিশকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার দামিশ্‌কে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই জাওওয়াদ তাঁহাকে গ্রেফতার করেন এবং ২৬ জুমাদাল উলা, ৬৩৬/৪ জানুযারী, ১২৩৪ তারিখ বৃহস্পতিবার তাঁহাকে হত্যা করেন।

চার ভ্রাতার মধ্যে কামালুদ্দীন আহ্মাদ সর্বাপেক্ষা কম খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সুলতান আস-সালিহ ৬৩৭/১২৪০ সালে তাঁহাকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন এবং জাফ্ফা-র Count Theobald ও Navarre-এর রাজার সহিত এক শান্তিচুক্তি আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। ইহার পর সুল্তান দামিশ্‌ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিয়োজিত এক বাহিনীর সেনাপতি পদে তাঁহাকে নিয়োগ করেন। কিন্তু জাওওয়াদ ও নাসির দাঊদ ইব্নুল মু'আজ্জাম (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)-এর সহিত যুদ্ধে কামালুদ্দীন পরাজিত হন (যুলকা'দা, ৬৩৮/মে-জুন ১২৪৯) এবং বন্দী হন। ইহার এক বৎসর পর ১৩ সাফার, ৬৪০/১২ আগস্ট, ১২৪২ তারিখে তিনি গাযযায় মৃত্যুবরণ করেন।

ছোট ভাই মু'ঈনুদ্দীন হাসান ৬৩৭/১২৪০ সালে সুলতান আস্-সালিহ-এর উযীর নিযুক্ত হন। চার বৎসর পর তিনি সুলতানের প্রতিনিধি নিযুক্ত এবং দামিশ্‌ক উদ্ধারের অভিযানে প্রধান সেনাপতি হন। ৬৪২ হিজরীর শেষের দিকে/১২৪৫ সালের মে মাসে অবরোধ আরম্ভ হয় এবং ছয় মাস অবরোধের পর মু'ঈনুদ্দীন, 'ইমাদুদ্দীন ইস্মা'ঈল ইব্নুল 'আদিলকে (মৃ. ৬৪৮/১২৫০-৫১) সিরীয় রাজধানী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। 'ইমাদুদ্দীন ৬৩৭/১২৩৯ সাল হইতে এই শহরটি দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন। মু'ঈনুদ্দীন তাঁহার বিজয়ের পর মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন এবং ২৪ রমযান, ৬৪৩/১২ ফেব্রুয়ারী, ১২৪৬ তারিখ সোমবার টাইফয়েড রোগে মারা যান।

তাজুদ্দীন মুহাম্মাদ-এর দুই পুত্রের মধ্যে বড় পুত্র সা'দুদ্দীন খিদ্‌র (৫৯২-৬৭৪/১১৯৬-১২৪৬) একখানি ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই গ্রন্থ হইতেই ঐতিহাসিক সিব্‌ত ইব্নুল জাওযী ও আয্-যাহাবী বনূ শায়খিশ্ শুয়ূখ সম্পর্কে তাঁহাদের অধিকাংশ তথ্য গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, সিব্‌ত ইব্নুল জাওযী, ইব্ন ওয়াসিল, আবূ শামা ইব্নুল ফুরাত, আন্-নুওয়ায়রী, আল-মাক্রীযী প্রমুখ লেখকের ইতিহাস গ্রন্থসমূহ; (২) আল-মাক্রীযী, আল-খিতাত (বূলাক), ২খ., ৩৩-৪; (৩) আস্-সুব্কী, তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাতিল কুব্রা, Cl. Cahen, Une source lcur L'histoire des croisades: Les Memoires de Sad addin ibn Hamawiya Juwaini, in Bulletin de la Faculte des Lettres de Strasbourg, xxviii (1950), 320-37; (4) H. L. Gottschalk, Die Aulad Saih as-suyuh (Banu Hamawiya), in Wzkm, Liii (1965), 57-87.

H.L. Gottschalk (E.I.[2]) । মনিরুল ইসলাম

আওলিয়া (দ্র. ওয়ালী)।

আওলিয়া আতা (اوليا اتا) ঃ তুর্কী, "পবিত্র পিতা)" বিখ্যাত কাযাখ কবি জাম্বুল জাবায়ের (১৮৪৬-১৯৪৫ খৃ.)-এর নামানুসারে ১২৩৮ খৃ. হইতে জাম্বুল নামে পরিচিত শহরটির প্রাচীন নাম। শহরটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাযাখ প্রদেশের তালাস নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ১৯১৭ খৃ. পর্যন্ত ইহা রুশীয় তুর্কীস্তানের সীর দরিয়ার জেলা সদর ছিল। 'কারাখান" নামক একজন সূফীর সমাধির জন্যই ইহার এইরূপ নাম করা হইয়াছে। ঐ সূফীর উল্লেখ সপ্তদশ শতাব্দীতেও পাওয়া যায়, (দ্র. মাহ্মূদ ইব্ন ওয়ালী, বাহ্রুল আস্রার, ইন্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৫৪৫, পত্র ১১৯ আর)। তাঁহার সমাধিসৌধ খৃ. উনিশ শতক হইতে বিদ্যমান এবং তাহাতে কোন

লিখিত ফলক নাই। পক্ষান্তরে "কিচিক আওলিয়া" (ছোট পীর)-এর মাযারে ৬৬০/১২৬২ সালে লিখিত ফলক রহিয়াছে। মাযারটি শাহযাদা উলুগ বিলগে ইক্‌বাল খান দাউদ বেগ ইব্‌ন ইল্‌য়াস কর্তৃক নির্মিত (এই ফলকে উৎকীর্ণ লিপি Zap. Vost. Otd. Imp. Russk. Arkheol. Ob. va., ১২খ., ৫ম অংশে প্রকাশিত হইয়াছে)। আতা শহরটি উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃ. ১৮৬৪ সালে রুশগণ ইহা জয় করে এবং ইহা একটি দুর্গে পরিণত হয়। ১৮৯৭ খৃ. এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ১২০০৬। শহরটি ফল উৎপাদন, গবাদি পশু ও পশম ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আওলিয়া আতা-র চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাগুলিতে (আয়তন ৭১,০৯৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২,৯৭,০০৪, তারিখ অজ্ঞাত) প্রাচীন তুর্কী ভাষায় উৎকীর্ণ কতিপয় ফলক পাওয়া যায় (খৃ. ১৮৯৬) (Zap., ১১খ.)।

বর্তমানে জাম্‌বুল শহর তুর্কসিব-এর দিকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কির্‌গিয সীমান্তের সরাসরি উত্তর দিকে অবস্থিত। ১৯২৬ খৃ. ইহার লোকসংখ্যা ছিল ১৯,০০০ এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯ খৃ. তাহা ৬২,৭০০-তে দাঁড়ায়। এইখানে একটি চিনি উৎপাদনের, একটি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের এবং কয়েকটি অন্যান্য কারখানা রহিয়াছে। উপরন্তু ইহা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র (খৃ. ১৯৩৬ হইতে)। জাম্‌বুল জেলার আয়তন ১,৩৮,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। ইহার দক্ষিণাংশ পাহাড়ী এলাকা এবং উত্তরে "বাদ পাক দাল" নামক এক বিশাল বৃক্ষহীন তৃণ প্রান্তর রহিয়াছে।

আওলিয় আতা বা জাম্‌বুলের নিকটেই তারায (দ্র.) শহর বিদ্যমান ছিল; ইহাকে আওলিয়া আতা-র আদি শহর মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A.I. Dobromysov, Goroda Syr-Dar'-Inskoy oblasti, তাশকান্দ ১৯২২ খৃ.; (২) M. Mendikulov, Nekotorye dennye ob istoriceskoy arkhitekture Kaxakhstana, Izvestiya Akad. Bauk Kazakhskoy SSR, ১৯৫০ খৃ., ২খ., সংখ্যা ৮০; (৩) W. Barthold ১২ Vorlesungen zur Gesch. der Turken Mittelasiens, বার্লিন ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২০৬; (৪) Writschaftsgeographie der Ud- SSR, ১০ খ., Die Republiken Mittelasiens, বার্লিন ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১১৩, ১৩৯-১৪১; (৫) Brockhaus-Efron Entsiklope-diceskiy Slovar, ২খ., ৪৬৭ প. ; (৬) Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya, ২য় সংস্করণ, ১৯৫২ খৃ., ১৪ খ., পৃ. ২০৬, ২০৮-২১০ (জেলার ছবি ও মানচিত্রসহ)।

W. Barthod-[B. Spuler] (E.I.[2])/যোবায়ের আহমদ

আওলিয়া চালাবী (اوليا چلبى) ঃ দরবেশ মুহাম্মাদ জিল্লী-র পুত্র, জন্ম ১০ মুহাররাম, ১০২০/২৫ মার্চ, ১৬১১; মৃত্যু ১০৯৫/৬৮৪- এর পূর্বে হয় নাই (তু. WZKM, ১৯৪৮-১৯৫২ খৃ., ৫১, ২২৬; Anm. ১৩৭ ও TM, ১৯৫৫ খৃ., ১২খ., ২৬১); জন্মস্থান ইস্তাম্বুল। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত (১০৫০/১৬৪০ কিংবা তৎপূর্ব কাল ১০৪০/১৬৩০-৩১ সাল হইতে, যখন তিনি ইস্তাম্বুলে ঘোরাফেরা করিতে আরম্ভ করেন, ১০৮৭/১৬৭৬ সাল পর্যন্ত) তিনি যে পর্যটন করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত পর্যটন ছিল কখনও ব্যক্তিগত, কখনও সরকারী কার্য উপলক্ষে বা উছমানী সরকারের আমীরদের সমভিব্যাহারে। এই সকল সফর তিনি করিয়াছিলেন উছমানী রাজ্যে ও ইহার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আওলিয়া চেলেবী এই সকল বৃত্তান্ত সমাবেশ করিয়াছিলেন তাঁহার দশ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থখানায়, যাহা সাধারণত সিয়াহাতনামাহ্ নামে অথবা ভিয়েনা পাণ্ডুলিপি অনুসারে (Flugel, নং ১২৮১) তারীখ-ই সায়্যাহ (পর্যটকের বিবরণ) নামে বিখ্যাত। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতার জন্য সিয়াহাতনামায় তাঁহার স্বলিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, কিন্তু উহা সর্বক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নহে (পরে দেখুন)।

আওলিয়া চেলেবীর ব্যক্তিগত নাম অজ্ঞাত, আওলিয়া তাঁহার লিপি নাম। উহা তিনি স্বীয় উস্তাদ দরবারী ইমাম আওলিয়া মুহাম্মাদ আফিন্দী-র সম্মানার্থে গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দরবারের প্রধান স্বর্ণকার (সারযার্‌গারান) ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল দার্‌বেশ মুহাম্মাদ জিল্লী (তু. ১, ২৮) [এইখানে ও পরবর্তী বর্ণনায় ইস্তাম্বুল সংস্করণের বরাত দেওয়া হইয়াছে; পরবর্তীতে দেখুন]। তিনি ইনতিকাল করেন জুমাদা ২য় ১০৫৮/জুন-জুলাই ১৬৪৮ সালে (তু. ২খ, ৪৫৮) এবং আওলিয়ার বিবরণানুসারে তাঁহার বয়স ১১৭ চান্দ্র বৎসর হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি সুলতান সুলায়মানের শেষদিকের অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সুলতানদের জন্য তিনি স্বর্ণকারের কাজ করিয়াছেন (তু. ১খ., ২১৮; ৪খ., ১০২; ৬খ., ২৬৯; ১০খ., ২৯৮)।

আওলিয়ার পিতা নিশ্চয় একজন রঙ্গপ্রিয় ও কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ এই সুবাদে তিনি দরবারের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। আওলিয়া চেলেবী যেই পৈতৃক বংশ তালিকার দাবি করিতেন সেইটি অসংগতিপূর্ণ, অবিশ্বাস্য (তু. ১খ., ৪২৪-৫; ৩খ., ৪৪৪; ৬খ., ২২৬; ১০খ., ৯১৫)। তাঁহার পৈতৃক পূর্বপুরুষগণ সম্ভবত কোতাহিয়া হইতে আগমন করেন। মনে হয় কনস্টান্টিনোপল বিজয় (৮৫৭/১৪৫৩)-এর পর পরিবারটি ইস্তাম্বুলে আগমন করে। কিন্তু কোতাহিয়াতেও তাঁহাদের বাড়ী বর্তমান ছিল, বরং একটি বাড়ী বুরসা (Bursa) -এর ইন্ বে (Ine Bey) মহল্লাতেও ছিল। অধিকন্তু মানীসা (Manisa)- এর সান্‌দেখ-এ তাঁহাদের কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। ইস্তাম্বুলের উনকাপান মহল্লায় চারটি দোকান ও দুইট বাড়ী ছিল এবং ইস্তাম্বুলের নিকট কাযী-কোয়ীতে একটি দ্রাক্ষাকুঞ্জও ছিল (তু. ১খ., ৪৭১; ৬খ., ১৪৬; ৯খ., ৮১)। এই বিবরণী হইতে আওলিয়ার আর্থিক অবস্থার ধারণা করা যায়। উপরন্তু তাঁহার মধ্যে এতখানি বৈষয়িক বিচক্ষণতা নিশ্চয়ই ছিল যদ্দারা তিনি উচ্চ স্তরের লোকদের নিকট করিৎকর্মা ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। উভয়ের সমন্বয় তাঁহাকে তাঁহার ভ্রমণ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। আওলিয়ার মাতা কাফ্‌কায (Caucasus [قافقاز], দ্র. কামূসুল-আ'লাম)-এর অধিবাসিনী ছিলেন। তিনি সুল্‌তান ১ম আহমাদের আমলে (১০১২/১৬০৩–১০২৬/১৬১৭) শাহী প্রাসাদে আগমন করেন এবং

সেইখানে তাঁহার বিবাহ শাহী স্বর্ণকার অর্থাৎ আওলিয়ার পিতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আওলিয়া বলেন, তাঁহার মাতা মালিক আহমাদ পাশার আত্মীয়া ছিলেন (তু. মুহাম্মাদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল 'উছমানী, ৪খ., ৫০৯) যিনি আসলে কাফ্কায সম্ভূত ছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে আওলিয়ার বিবরণ পরস্পর বিরোধী। হয়ত আওলিয়ার মাতা ও মালিক আহমাদ পাশার মাতা পরস্পর ভগ্নী ছিলেন কিংবা আওলিয়ার মাতা মালিক আহমাদ পাশার খালার কন্যা ছিলেন। মাতার দিক দিয়া, আওলিয়ার বর্ণনামতে, অর্থমন্ত্রীর পুত্র মুহাম্মাদ পাশার সহিতও তাঁহার আত্মীয়তা ছিল (তু. সিজিল্ল 'উছমানী, ৪খ., ১৬৮) এবং ইব্শীর মুস্তাফা পাশাও তাঁহার আত্মীয় ছিলেন (তু. ঐ, ১খ., ১৬৬ ; I.H. Uzun Carsili, 'উছমানলী তারীখ, আংকারা ১৯৪৭ খৃ., ৩/২, ৪০৮; তু. সিয়াহাত নামা, ২খ., ৩৭০, ৪৫৩; ৫খ.; ১৬৮)। আওলিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার এক ভ্রাতা ও এক ভগ্নীও ছিল (তু. ৯, ৮১)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সাত বৎসর যাবত ইস্তাম্বুলের শায়খুল ইসলাম আফিন্দীর মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন এবং একটি কুরআন শিক্ষার মাদ্রাসায় এগার বৎসর যাবত অধ্যয়নরত ছিলেন। সেইখানে তিনি কারী হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন (তু. ১খ., ৩৬০)। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে বিভিন্ন হস্তশিল্পও শিক্ষা লাভ করেন (তু. ১খ., ২৪৩, ৪০৪; ২খ., ৪৬৭; ৬খ., ৩৮১)। ১০৪৫/ ১৬৩৬-এর শাব-ই কাদ্‌র-এ আওলিয়া বিশিষ্ট সুমধুর সুরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করত খ্যাতি অর্জন করেন এবং এই শুভ ঘটনাটির মাধ্যমে তৎকালীন অস্ত্রাগার রক্ষক (سلحدار) মালিক আহমাদ আগা তাঁহাকে সুলতান ৪র্থ মুরাদের সংগে পরিচিত করাইয়া দেন যাঁহার আদেশক্রমে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এইখানে তিনি সুলিখন, যন্ত্রসংগীত, আরবী ব্যাকরণ ও তাজবীদ-এর আরও ব্যাপক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি স্বীয় প্রাণবন্ত প্রকৃতি, বুদ্ধিমত্তা ও বর্ণনা দক্ষতার দরুন প্রায়ই সুলতানের দরবারে আমন্ত্রণ লাভ করিতেন। সুলতান ৪র্থ মুরাদ-এর বাগদাদ অভিযান (১০৪৮/১৬৩৮)-এর কিছু দিন পূর্বে তিনি দরবারের একজন সিপাহী নিযুক্ত হন (তু. ১খ, ২৫৮) এবং যোগ্যতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন।

দশ খণ্ডে সমাপ্ত সিয়াহাত নামার ১ম খণ্ডে আওলিয়া কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে খাস ইস্তাম্বুল শহর ও শহরতলী; ২য় খণ্ডে বুরসা, ইয্‌মীদ, বাতুম, তারাবযুন, আবখাযিয়া, ক্রীট, আরযরূম, আযারবায়জান, জর্জিয়া ইত্যাদি; ৩য় খণ্ডে দিমাশ্ক, সিরিয়া, ফালাস্তীন, উরূমিয়া, সীওয়াস, কুর্দিস্তান আর্মিনিয়া ও রূমীলিয়া (বুলগারিয়া, দুবরাজা); ৪র্থ খণ্ডে ওয়ান, তিব্রীয, বাগদাদ, বস্রা ইত্যাদি; ৫ম খণ্ডে ওয়ান (Van), বাসুরা ওক্যাকোফ, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, আনাতোলিয়া, ব্রোসা দার্দানেলিস, আদ্রিয়ানোপল, মোলোবিয়া, ট্রান্সসিলভেনিয়া, বোস্নিয়া, দালমাতিয়া ও সোফিয়া ; ৬ষ্ঠ খণ্ডে ট্রান্সসিলভেনিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, উজ্ওয়ার (Neu hausel) (এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনাও সংযোজন করা হইয়াছে, যাহা নিঃসন্দেহে আওলিয়ার কল্পনাপ্রসূত যে, দশ হাজার তাতারী অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও হল্যান্ডের মধ্য দিয়া উত্তর সাগরে অভিযান চালায়), বেলগ্রেড, হারযেগোভিনা, রাগোসা (Dubrovnik), সানটিনিগ্রো. কানীযসা ও ক্রোসিয়া (Croatia); ৭ম খণ্ডে হাংগেরী, বুদা এরলাও [এইখানে ভিয়েনা ভ্রমণেরও উল্লেখ আছে, যাহা তিনি কারা মুহাম্মাদ পাশার দূতাবাসের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১০৭৫/ ১৬৬৫ সালে সমাপন করিয়াছিলেন, ভিয়েনায় তাঁহার বসবাসের উল্লেখ আছে। এই সফরটি কাল্পনিক যাহা আওলিয়া "সাত বাদশার মুল্ক"-এ সমাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইহা দ্বারা সাতটি নির্বাচন এলাকা মনে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। আসল পাঠে শূন্য স্থান রহিয়াছে], তেমেস্ওয়ার (বানাত, রূম, তিমিসওয়ারা) ট্রান্সসিলভিনিয়া, ওয়াল্লাচিয়া, মোল্দীভিয়া, ক্রাইমিয়া, কাযাক, দক্ষিণ রাশিয়া, কোকায, দাগিস্তান ও আযাক; ৮ম খণ্ডে আযাক; কাফা, বাগচা সারায় (ক্রিমিয়া), ইস্তাম্বুল, ক্রীট, ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস, এথেন্স, ডোডী, কানসেস, পেলোপন্নেসাস, আলবেনিয়া, ডেলোনা, আলবাসান, ওক্রিডা, আড্রিয়ানোপল ও ইস্তাম্বুল; ৯ম খণ্ডে (হজ্জযাত্রা) দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়া, স্মারণা, এফীসুস, মদীনা, মক্কা ও সুয়েয; দশম খণ্ডে মিসর (ঐতিহাসিক স্থানসমূহের পরিদর্শনসহ), কায়রো, দক্ষিণ মিসর, সুদান ও আবিসিনিয়া।

মনে হয়, আওলিয়া মিসরে আট কিংবা নয় বৎসরকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং হয়ত সেইখানে সিয়াহাত নামার শেষ অর্থাৎ দশম খণ্ড সম্পূর্ণ করেন। তিনি ইহার শেষ তারিখ ১ জুমাদা ১ম, ১০৮৭/১২ জুলাই, ১৬৭৬ বলিয়া উল্লেখ করেন, যদিও তিনি এমন সব ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন যেইগুলি ছিল ১০৯৩/১৬৮২ সাল কিংবা তৎপরবর্তী কালের (তু. ১০/১০৪৮, তু. বিস্তারিত বিবরণ উপরে বর্ণিত)। মনে হয় তিনি জীবনের শেষ বৎসর ইস্তাম্বুলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এইখানে তিনি তাঁহার গ্রন্থখানার সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন, যাহা সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প করিয়া লিখিত হইয়াছিল এবং শেষাবস্থায় বিন্যস্ত করার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডুলিপি হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি এই কাজটি সম্পূর্ণ করিতে কখনও পুরাপুরিভাবে সমর্থ হন নাই, অথচ এই কাজটি সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল।

আওলিয়া কল্পনাপ্রবণ লেখক। অদ্ভুত ও বিপদসংকুল ঘটনাবলীর প্রতি তাঁহার ঝোঁক সুস্পষ্ট। নিরস ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে কিংবদন্তী তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি বর্ণনার অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কখনও কখনও বাহাদুরী নেওয়া ও হাস্যরসাত্মক গালগল্পের অবতারণা হইতে বিরত থাকেন নাই। অতএব রম্য সাহিত্যে তাঁহার সিয়াহাত নামা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম স্থান লাভ করে, যাহা সেই যুগের সুধিগণের চিত্ত বিনোদন ও শিক্ষা—এই উভয় প্রয়োজনই পূরণ করে। তিনি কোন কোন সময় ঐতিহ্যপূর্ণ তুর্কী কাহিনী বর্ণনা-পদ্ধতি এবং সপ্তদশ শতকের কথ্য তুর্কী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার সহিত যুক্ত করিয়াছেন আলংকারিক শৈলী ও নির্বাচিত মনোজ্ঞ শব্দাবলী। এই সমস্ত কারণে তাঁহার রচনা পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে বোধগম্য হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি স্পষ্টত ঐতিহাসিক যথার্থতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। তিনি কখনও কখনও এমন স্থানের বিবরণ দিয়াছেন যেইখানে স্পষ্টতই ব্যক্তিগতভাবে যাইতে সক্ষম হন নাই। সাহিত্যিক উচ্চ আশা অনেক সময় তাঁহাকে এমন কিছু বস্তু কিংবা ঘটনার অবতারণা করিতে উদ্বুদ্ধ করে যেইগুলি মনে হইবে যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কিংবা তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ, অথচ সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় প্রকাশ পায়, এইগুলি সম্বন্ধে তাঁহার

জ্ঞান ছিল জনশ্রুতি ভিত্তিক অথবা ইহাদের উৎস এমন গ্রন্থাবলী যাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও সিয়াহাত নামাকে কৃষ্টির ইতিহাস, প্রাচীন লোকাচার ও ভূগোল সম্পর্কে তথ্যাদি পরিপূর্ণ একটি কোষগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। যদি ভাষাগত মূলসূত্রের নির্ধারণ ও গ্রন্থখানার বিষয়াদির আবশ্যকীয় সমালোচনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায় তবে উহার মর্যাদা ও মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। গ্রন্থখানার আকর্ষণের এই কারণটি কম গুরুত্বপূর্ণ নহে যে, ইহাতে সপ্তদশ শতকের তুর্কী ('উছমানী) বিদগ্ধ সমাজের পাশ্চাত্য অমুসলিমদের প্রতি মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে এবং ইহা সমসাময়িক 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রশাসন ও সংগঠনের উপর আলোকপাত করে।

আওলিয়া চালাবীর জীবন-চরিত ও রচনা সম্পর্কে এই যাবৎ সর্বাপেক্ষা গভীর গবেষণার (পরে দেখুন) জন্য আমরা জাবেদ বায়সূন-এর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি মন্তব্য করেন, সিয়াহাত-নামার একটি নূতন সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। তবেই ইহার তথ্যাবলীর ফলপ্রসূ ব্যবহার সম্ভব হইবে। বায়সূন-এর প্রস্তাব আংশিকভাবে এরেন (Meskure Eren)-এর প্রশংসনীয় বিশদ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (পরে দেখুন) এবং যাহা সিয়াহাত-নামার প্রথম খণ্ডে সীমাবদ্ধ। গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এরেন আওলিয়ার কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং সিয়াহাত নামার অনেক শূন্য স্থান ও অসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন যাহা হইতে মনে হয়, গ্রন্থকার স্বীয় রচনাকে আরও সম্প্রসারিত করত উহাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি (এরেন) ইহাও প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, আওলিয়া নিজ বর্ণনার জন্য, এমনকি তাঁহার উদ্ধৃত তারিখ নির্দেশক বাক্যাংশ (chsronograms)- সমূহের জন্যও সাহিত্যিক উৎসসমূহের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি এই সাহিত্যিক উৎসসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যাহা সিয়াহাত নামার প্রথম খণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ (১) আওলিয়া যে সকল উৎসের নাম উল্লেখ করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন; (২) যে সকল উৎস আওলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু উল্লেখ করেন নাই। নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্তঃ 'আলী, কুনহুল-আখবার (তু. Babinger, GOW, ১২৬ প.); ইবরাহীম পেচেবী, তারীখ (তু. Bainger, ১৯২প.); নাওঈ যাদা আতাঈ, হাদাইকুল হাকাইক ফী তাক্মিলাতিশ শাকাইক (তু. Babinger, ১৭১প.); সাঈ, তায্‌কিরাতুল-বুনয়ান (তু. Babinger, ১৩৭প.); 'আওফী, জাওয়ামিউল হিকায়াত, তুর্কী অনু. জালাল যাদা সালিহ (তু. ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি, তোপকাপু সারায়, রেওয়ান কোশকী, সংখ্যা ১০৮৫, ৬৯৩); বাসীরী, লাতাইফ (১০০-১১৪) (কীনালী যাদা হাসান চালাবী কর্তৃক তায্‌কিরাঃ পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃত ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার T.Y. ২৫২৫, ৭৪ক) এবং এরেন কর্তৃক উল্লিখিত বিভিন্ন কবির তারিখ নির্দেশক পদ্য; (৩) যে সকল উৎস আওলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ব্যবহার করেন নাই।

সিয়াহাত নামার পাণ্ডুলিপিসমূহ

ইস্তাম্বুল ঃ পারতাও পাশা সংগ্রহ, সংখ্যা ৪৫৮ হইতে ৪৬২; তোপকাপু সারায় বাগদাত কোশকী, সংখ্যা ৩০০ হইতে ৩০৪; বাশীর আগা ৪৪৮-৪৫২ (১১৫৮/১৭৪৫ সালের অনুলিপি)। এই পাণ্ডুলিপিগুলিতে গ্রন্থখানার পূর্ণ দশ খণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তোপকাপু সারায়, বাগদাত কোশকী, সংখ্যা ৩০৪ (১ ও ২), সংখ্যা ৩০৫ (৩ ও ৪), সংখ্যা ৩০৬ (৯), সংখ্যা ৩০৭ (৪), সংখ্যা ৩০৮ (৭ ও ৮); তোপকাপু সারায়, রেওয়ান কোশকী, সংখ্যা ৩৬৬/১৪৫৭-৩৬৯/১৪৬০ (৬, ৭, ৮ ও ৯); হামীদিয়া, সংখ্যা ৯৬৩ (১০); ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা ২৩৭১; Halis Efendr, সংখ্যা ২৭৫০ (১, ঐ ২৭৫০ Mukerer ৩ ও ৪); ১খ., ১১৭০/১৭৫৬-৭ সালের অনুলিপি); (৫৯৩৯) (১ ও ২),(১১৫৫/১৭৪২-৩ সালের অনুলিপি); য়ালদিয, তারীখ-ই কিস্‌মী, সংখ্যা ৪৮ (১০)। ভিয়েনা জাতীয় গ্রন্থাগার, H. O. ১৯৩ (৪), তু. G. Flugel, Die arabischen persischen und turkischen Handschriften der Kaiscrlich-koniglihen Hofbibliothek zu Wien, ভিয়েনা ১৮৬৫০-৭ খৃ., ২৪৩৩, সংখ্যা ১২৮১; cod mist ১৩৮২ (১)। লন্ডন ঃ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, সংখ্যা ২২ ও ২৩ (১,২,৩ ও ৪)। ম্যানচেস্টারঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, Lindsay সংগ্রহ, সংখ্যা ১৪২ (৩ ও ৪); Basleঃ R. Techudi সংগ্রহ (১, ২ ও ৩)। মিউনিক ঃ Bayr, Staats-bibliothek Th. Menzel সংগ্রহ (১, ২, ৩, ৪ ও ৫)।

সিয়াহাত নামার মুদ্রিত সংস্করণসমূহ

সিয়াহাত নামা ১ম খণ্ডের নির্বাচিত অংশসমূহ ভূমিকাসহ সাধারণ সংস্করণ, মুন্তাখাবাত-ই আওলিয়া চালাবী নামে প্রকাশিত, ইস্তাম্বুল ১২৫৮ হি.(১৫০ পৃ.) ও ১২৬২ হি. (১৪৩ পৃ.); বূলাক ১২৬৪ হি. (১৪০ পৃ.); ইস্তাম্বুল আনুমানিক ১৮৯০ খৃ. (১০৪ পৃ.)। পূর্ণ সংস্করণ ঃ ১-৬, ইস্তাম্বুল ১৩১৪-৮ হি. (ইকদাম প্রেস); ১-৬খ. আহমাদ জাওদাত নাজীব 'আসিম সম্পা. ও ৬ষ্ঠ Karacson-সহ। মুদ্রণ ভ্রান্তি. (-) পরিত্যাগ ও বর্জনের দরুন এই সংস্করণের মান বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ৭ম ও ৮ম খণ্ড বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ও কিলিসলী রিফআত বিলজে দ্বারা সম্পাদিত হইয়া "তুর্ক তারীখ-ই আন্‌জুমানী"-র পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ. (দাওলাত ও ওরখানিয়্যা মুদ্রণালয়)। ৯ম খণ্ড, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ., দাওলাত প্রেস এবং ১০ম খণ্ড, ইস্তাম্বুল খৃ., দাওলাত প্রেস, তুর্কী শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, নূতন তুর্কী বর্ণমালায় মুদ্রিত হওয়ায় ইহার ব্যবহার খুব সীমিত। আরবী বর্ণমালায় মুদ্রিত সমালোচনা ভিত্তিক ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদিত ইহার একটি সংস্করণের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Hammer-Purgstall, Staatsver-Fassung (কালানুক্রমিক), ১ঃ ৪৫৫-৪৭০ (১-৪-এর বিস্তারিত বিষয়সূচী সম্বলিত); (২) ঐ লেখক, Narrative of travels in

Europs, Asia and Africa by Ewliya Efendi, লন্ডন ১৮৩৪-১৮৫০ খৃ. (১ম ও ২য় খণ্ডের অনুবাদ); (৩) M. Bittner, Der Kurdengau Uschnuje und die Stadt Uruimje ভিয়েনা ১৮৯৫ খৃ.; (৪) A. Sopov, Evlija 'celebi, periodicesko Spisanie na Bulgarskoto Knizovno Druzestvo v Sofija-তে, ৬২ খ. (১৯০২ খৃ.); (৫) I. Karacson, Evlia Cselebi torok vilagutozo Magyarorszagi utazasai 1660-1664, বুদাপেস্ট ১৯০৪ খৃ. (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের অধিকাংশের অনুবাদ); (৬) D. S. Cohadzic, putopis Evlije Celebije v srpskim zemljama v XVII v, Spominik Srpske Kraljevske Akademije-তে, ৪২ খ. (১৯০৫ খৃ.); (৭) G. Germanus, Evlija Cselebi a XVII szazadbeli Torokorszagi czehekrol, Karacson, Szemle-তে, ৮খ. (১৯০৭ খৃ.); (৮) I. Karacson, Evlija Cselebi torok viagutazo Magyarorszagi utazasai 1664-1666, বুদাপেস্ট ১৯০৮ খৃ. (ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত খণ্ডের পৃ. ৭-৪৪৬-এর অনুবাদ); (৯) D. G. Gadzanov, Putuvane na Evlija Celebi iz bulgarskite zemi prez sredata na XVII v. Periodicsko Spisanie na Bulgarsko to Knizovno Druzestvo v Sofija-তে, ৭০ খ.; (১০) A.H. Lybyer, The Travel of Evlia Efendi, JAOS-এ, ৩৭ খ. (১৯১৭ খৃ.), ২২৪-৩৯; (১১) G.I. Cialicoff, Din calatoria lui Evliya Celebi, Arhiva Dobrogei-তে, ২খ., ১৯১৯ খৃ.; (১২) R. Hartmann, Zu Ewlija Tschelebi's Reisen im oberen Euphrat-und Tigrisgebiet Isl.-এ, ৯ খ. (১৯১৯ খৃ.), ১৮৪-২৪৪; (১৩) W. Bjorkman, Ofen zur Turkenzeit, Hamburg ১৯২০ খৃ.; (১৪) Carra de Vaux, Les penseursde l'Islam, প্যারিস ১৯২১ খৃ., ১খ.; (১৫) F. Taeschner, Diegeographische Literatur der Osmanen, ZDMG-তে, ৭০ খ. (১৯২৩ খৃ.), ৩১-৮০, ১৪৪; (১৬) 'উছমানলী মু'আল্লিফলেরী, ৩ খ.; (১৭) F. Taeschner, Das anatolische Wegenetz, লাইপযিগ ১৯২৪-৬ খৃ.; (১৮) Babinger, GOW-তে; (১৯) P. Pelliot, Le pretendu vocabulaire mongol des Kaitak du Daghestan, JA-তে, ২১০খ., (১৯২৭ খৃ.); (২০) W. Kohler, Die Kurdenstadt Bitlis nach dem turkischen Reisewerk des Ewlija Tchelebi, মিউনিক ১৯২৮ খৃ.; (২১) F. Taeschner, Die neue Stambuler Ausgabe von Evlija Tschelebis Reisewerk, Isl.-এ, ১৮ খ. (১৯২৯ খৃ.), ২৯৯-৩১০; (২২) F. Babenger, Ewlija Tschelebi's Reisewege in Albanien, MSOS As.-তে, ৩৩খ., (১৯৩০ খৃ.), ১৩৮-১৭৮; (২৩) P. pelliot, Les Formes turques et mongoles dans la nomenclature zoolo, gique du Nuzhatu'l-Kutub, BSOS-এ, ৬ খ. (১৯৩০-৩ খৃ.), ৫৫৫-৮০; (২৪) I. H. Uzuncarcili, কৃতাহিয়া শাহ্‌রী, ইস্তাম্বুল ১৯৩২ খৃ.; (২৫) A. Antalffy, Calatoria lui Evlia Celebi prin Moldava in anul 1659 Buletinul comisiei Istorice a Romaniei, ১২ খ., (১৯৩৩ খৃ.); (২৬) J. Deny, Les peregrinations du muezzin Evliya Tchelebien Roumanie (XVII siecle), Melanges offerts a M. Nicolas Iorga-তে, ১৯৩৩ খৃ.; (২৭) মুহাম্মাদ খালিদ EVliya Celebi'ye gore Azerbaycan sehirleri, Azerbaycan Yurt Bilgisi ২খ., ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ.; (২৮) R. Bleichsteiner, Die kaukasischen Sprachproben in Evliya celebi's Seyaletname, Caucasica-তে, ১১ খ., (১৯৩৪ খৃ.), ৮৪-১১৬; (২৯) P. Wittek, Das Furstentum Mentesche, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ.; (৩০) H. G. Farmer Turkish Instruments of Music in the Seventeenth Century, JRAS-এ, ১৯৩৬ খ., পৃ. ১-৩৪; (৩১) H. Wilhelmy, Kiel Hochbulgarien, ১৯৩৫-৬ খৃ.; (৩২) A. Sakisian, Abdal Khan, Seigreur kurde de Bitlis au XVII's. et ses tresors, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষে, ২২৯ (১৯৩৭ খৃ.), ২৫৩-২৭০; (৩৩) F. Babinger, Rumelische Streifen (Albania), বার্লিন ১৯৩৮ খৃ.; (৩৪) H. J. Kissling, Einige deutsche Sprachproben bei Evliya Celebi, Leipziger Vierteljahrsschrift fur Sudosteuropa, ২খ. (১৯৩৮ খৃ.); (৩৫) V. Garbouzoa, Evliya Tchelebi sur les joaillers turcs au XVII's. Travaux du Departement oriental Musee de l'Ermitage, Leningrad, ৩খ. (১৯৪০ খৃ.); (৩৬) F. Bajraktarevic, Turk- Yugoslav Kultur munasebetleri, Ikinci Turk Tarih Kongresi 1937-এ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (৩৭) A. Bombaci, 11 viaggio in Abissinia di Evliya Celebi (1673), AIUON-এ, নূতন সিরিজ, ২খ. (১৯৪৩ খৃ.), ২৫৯-৭৫; (৩৮) P. Darvingov, Un grand voyageur turc La Bulgarie-তে, ১৬ মে, ১৯৪৩ খৃ.; (৩৯) F. Babinger, Beitrage zur Fruhgeschichte der Turken-herrschaft in Rumelien, Brunn ১৯৪৪ খৃ.; (৪০) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, জাবেদ বায়সূন (M. Cavid Baysun), "আওলিয়া চালাবী" প্রবন্ধ; (৪১) H. W. Duda, Balkanturkische

Studien (Uskub), ভিয়েনা ১৯৪৯ খৃ.; (৪২) R. F. Kreutl, Ewlija Celebis Bericht uber die turkische Grossbotschaft des Jahres 1665 in Wien, Wzkm-এ, ৫১ খ., (১৯৪৮-১৯৫২ খৃ.); (৪৩) জাবেদ বায়সূন, Evliya Celebi'ye dair notlar, TM, ১২ খ., (১৯৫৫ খৃ.); (৪৪) A. Bombaci, Storia della letteratura, Milan ১৯৫৬ খৃ.; (৪৫) H. J. Kissling, Beitrage zur Kanntnis Thrakiens im 17, Jahrhundert, Wiesbaden ১৯৫৬ খৃ.; (৪৬) R. F. kreutel, Im Reiche des goldenen Apfels (Vienna), Graz ১৯৫৭ খৃ.; (৪৭) M. Eren, Evliya Celebi Seyahatnamesi Birinci cildinin Kaynaklari uzerindebir arastirma, ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ.; (৪৮) C. B. Ashurbeyle, Seyahatname Evliya Celebi kak istocnik po izuceniyu sotsial'no-ekonomiceskoi i paliticekoi istorii gorodov Azerbaydjana v pervoy polovine XVII veka (The Seyahatname of evliya Celebi as a Source for the study of the social-economic and political history of the towns of Azerbaydjan in the first half of the 17th century), সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রবন্ধসমূহ যেইগুলি ১৯৬০ খৃ. মস্কোয় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিশারদদের পঞ্চবিংশতিতম সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল; (৪৯) আওলিয়া চালাবী, Kniga putshestviys; perevod i kommentarii, Zemli Moldavii i Ukraini-তে, মস্কো ১৯৬১ খৃ.; অন্যান্য বরাতসমূহের জন্য Pearson, Index Islamica, London, পৃ. ২৭৭ ও পরিশিষ্ট, পৃ. ৮৪ দ্র.।

H.W. Duda ও J.H. Mordtmann, (দা.মা.ই.)/
ডঃ সৈয়দ লুৎফুল হক

আওলোনিয়া (Awlonya) ঃ আলবেনীয় ভাষায় ভলোরা (Vlora), ভেলোনা (Vlona), দক্ষিণ আলবেনিয়ার একটি শহর (দ্র. আরনা উতলুক)। সাধারণত ভেলোনা নামে অভিহিত আওলোনিয়া বর্তমানে আনুমানিক ১০,০০০ জনসংখ্যার একটি শহর। ইহা একই নামীয় উপসাগরের তীরে এবং পোতাশ্রয় হইতে প্রায় আড়াই মাইল (৪ কিলোমিটার) অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতীতে ইহা আওলোন (Avlona) এভলোনা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (তাই আওলোনা)। মধ্যযুগে ইহার ইতিহাস সম্পর্কে তু. Konst.Jirecek, Valona im Mittelalter, in Ludwig, v. Thallcozy, Illyrisch-albanische Forschungen, i, Munich and Liepzig 1916, 168/87. ১৪১৭ সালের জুন মাসে উছমানী ফৌজ ভেলোনা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কানীনা ও বেরাত দুর্গসহ শহরটি অধিকার করে। সেনাপতি হাম্‌যা বেগ আওলোনিয়ার প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং যে উছমানীগণ ইতিপূর্বে আদ্রিয়াতিকে কোন বন্দর দখল করে নাই অনতিবিলম্বে তাহারা সেইখানে জাহাজ নির্মাণ শুরু করে। ১৪১৮ সালে ভেনিসের নাগরিক প্রাক্তন মালিক রুজিনা (Rugina) [ম্রাকসা (Mrksa)]-র ডিউকের বিধবা পত্নীর জন্য আওলোনিয়া পুনরুদ্ধার করিতে ভেনিসের অধিপতি একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। আওলোনিয়া উছমানী শাসনাধীন থাকে। সেইখানে খৃষ্টানদেরকে কর আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। আওলোনিয়া একজন সান্‌জাক বে কর্তৃক শাসিত হয়। ইহা ছিল পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, এমনকি চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার অধিবাসীরা (আলবেনীয় ও স্লাভ ছাড়া) অধিকাংশই ছিল গ্রীক ও সম্প্রদায়গতভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওহরিদ (Ohrid)-এর অঘোষিত প্রধান আর্চবিশপপন্থীদের দলভুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ মাত্র ৪৭ মাইল (৭৫ কিলোমিটার) দূরবর্তী ইটালীয় অঞ্চল আপুলিয়া (Apulia) আক্রমণের জন্য ইহাকে দুইবার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেন (Otranto, cf. F. Babinger . Mehmed II, Der Eroberer und Seine zeit, Munich 1953, 430 ff. and Ital, transl. Maometto II. il Conquistatore, Ed. Il Suo tempo, Turin 1956 , 57 ff.)। সুলতানের প্রতি অনুগত সুযোগ্য সরকারী কর্মকর্তারাই ভেলোনার গভর্নর নিযুক্ত হইতেন। উদাহরণস্বরূপ গেদিক আহমাদ পাশার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ইহাকে ইটালীতে প্রেরিত দূত ও চরদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেন। নিকটবর্তী কানীনা দুর্গে দ্বিতীয় বায়াযীদের সময় হইতে ভলোরাগণ বাস করিত। তাহারা তাঁহার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল (তু. Ekrem Bey Vlora, Aus Berat und Vom Tomor, Sarajevo 1911, Zur Kunde der Balkanhalbinsel, No 13)। তাহারা গাযী সিনান পাশার বংশধর বলিয়া দাবি করিত (তু. F. Babinger, Rumelische Streifen, Berlin 1938, 24 f.)। সপ্তদশ শতাব্দীতে আওলোনিয়া দুর্গটি বহু স্তম্ভবিশিষ্ট উঁচু ও পুরু দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল মহানুভব সুলায়মানের দানে নির্মিত একটি মসজিদ এবং দুর্গের মধ্যভাগে ছিল অবিকল স্যালোনিকার শ্বেত বুরুজের মত একটি বুরুজ। বুরুজটি একই সুলতানের জন্য উছমানী স্থপতি সিনান কর্তৃক নির্মিত বলিয়া অনুমান করা হয়। আওলিয়া চালাবী তাঁহার সময়ের আওলোনিয়া সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন (তু. জার্মান অনু., F. Babinger, Rumelische Streifen, 25f.)। 'বেক্‌তাশী' তরীকা ভেলোনা অঞ্চলে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চার শত বৎসর তুর্কী শাসনের পর ১৯১২ সালে আওলোনিয়াতে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ১৯১৪ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শহরটি ইতালীয়দের দখলে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বলকান অঞ্চলে সামরিক অভিযানের জন্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাপালো (Rapallo) সন্ধি অনুসারে আদ্রিয়াতিকের এই সেতুমুখ ও অট্রান্টো প্রণালীর এই প্রতিবন্ধকটি, সাসেনো দ্বীপ ব্যতীত, আলবেনিয়াকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৩ সালের শরৎকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আওলোনিয়া আলবেনিয়ার বাকী অংশসহ পুনরায় ইতালীয়দের দখলে চলিয়া যায় এবং তৎকর্তৃক শাসিত হইতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া পুরাতন আওলোনিয়ার বর্ণনার জন্য দ্র. pouqueville, W. M. Leake, Lord Holland, L. Heuzey, G. Weigand, C. Patsch-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

F. Babinger (E.I.[2]) / ডঃ মুহাম্মদ আলী আসগর খান

আল-আওস (الاوس) ঃ মদীনার প্রধান দুইটি গোত্রের অন্যতম অন্যটি আল-খায্‌রাজ। এই দুইটি গোত্রই প্রাক-ইসলামী যুগে তাহাদের খ্যাতনাম্নী মাতার নামানুসারে বান, কায়লা নামে পরিচিত ছিল। হিজরতের পর ইহারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাহায্যকারী বা আনসার (দ্র.) নামে অভিহিত হয়। ইব্‌ন সা'দ (৩/২৩১) প্রদত্ত বংশতালিকা অনুযায়ী আল-আওস্ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আম্‌র (মুযায়কিয়া) ইব্‌ন আমির (মাউস্ সামা) ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন ইমরিইল কায়স ইব্‌ন ছালাবা মাযিন ইব্‌নিল আয্‌দ ইব্‌নিল গাওছ ইব্‌ন নাব্‌ত ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহ্‌লান ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশ্‌জুব ইয়ারুব ইব্‌ন কাহ্‌তান।

করিল। মালিকের একজন সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উহায়হা ইব্‌নুল জুলাহ আওসী গোত্রীয় আম্‌র ইব্‌ন আওফের শাখাভুক্ত বানূ জাহ্‌জাবা নামক উপশাখার প্রধান।

ইহা সন্দেহের বিষয়, ঐ সময় আওসের (অথবা খায্‌রাজের) গোত্র হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব ছিল কিনা। এই দুই গোত্রের শাখা-গোত্রগুলিই কার্যকর ছিল বলিয়া মনে হয়, এমন কি শাখাগোত্রগুলি (clans) বংশ-তালিকা অনুযায়ী গঠিত নাও হইতে পারে। কারণ বংশতালিকা বা কুষ্টিনামাসমূহ, যাহা পরবর্তীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, সম্পূর্ণভাবে পিতৃগোত্রজ, যদিও মদীনায় মাতৃগোত্রজ জ্ঞাতি যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহার

নিম্নে প্রদত্ত ছকটি গোত্রের প্রধান বিভাগগুলির বংশতালিকা ভিত্তিক সম্পর্ক প্রদর্শন করিতেছে ঃ
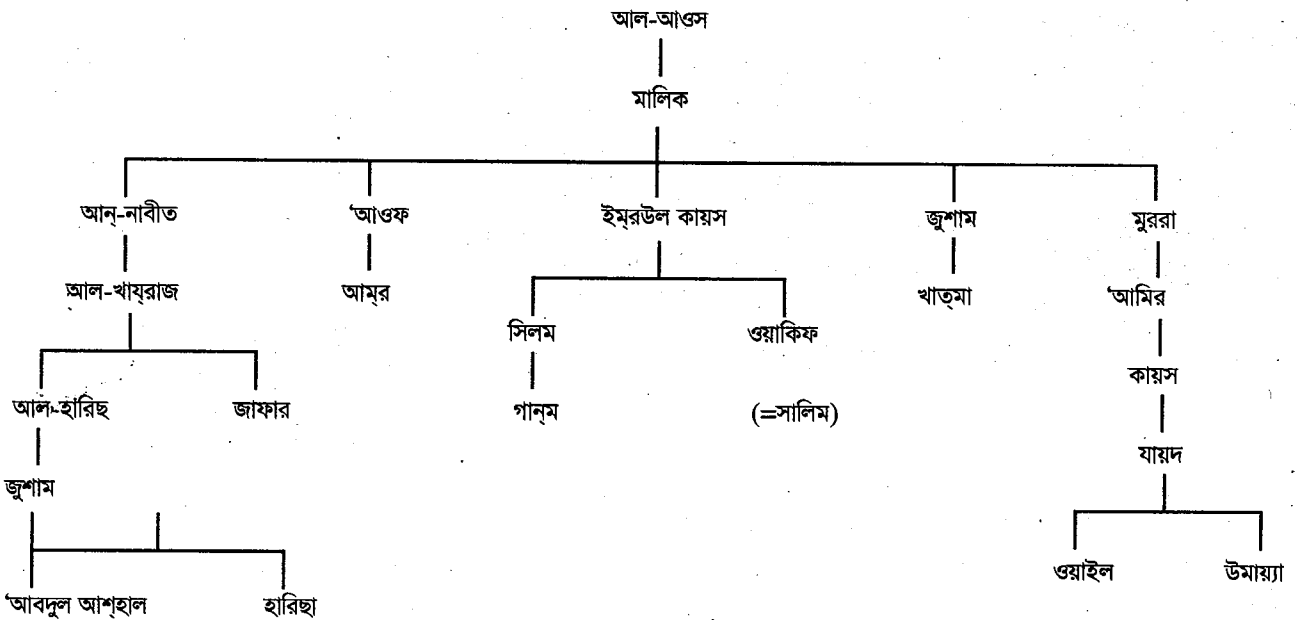
সম্ভবত আল-আওস নামটির অর্থ 'দান', আওস্ মানাত-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, মানাতের দান (মানাত দেবতাকে তাহারা পূজা করিত)। এই পূর্ণ রূপটি ওয়াকিফ, খাত্‌মা, ওয়াইল ও উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ এই গোত্রসমূহের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা হইত এবং ইহা ইসলামী যুগে রূপান্তরিত হইয়া "আওসুল্লাহ"-এ পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই চারিটি গোত্রকে মদীনার শাসনতন্ত্রে বানুল আওস বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৪১-৩)।

প্রচলিত কাহিনী এই যে, ইয়ামান হইতে আগত 'আম্‌র ইব্‌ন মুযায়কিয়ার নেতৃত্বে তাহার অনুসারীরা কিছুকাল পরেই কলহে লিপ্ত হয়। আল-আওস্ ও আল-খায্‌রাজ উভয়ই গাস্‌সান গোত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ইয়াছরিব বা মদীনায় বসতি স্থাপন করে। মদীনা তখন ইয়াহূদী গোত্রসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। বানূ কায়লা কিছুকালের জন্য ইয়াহূদীদের অধীনে ছিল। কিন্তু তাহারা সালিম কাওয়াকিলা শাখার খায্‌রাজী গোত্রের মালিক ইব্‌নুল আজ্‌লানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করিল এবং খেজুর বাগান ও শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহের (আতাম, একবচনে উতুম) একটি অংশ লাভ

অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলা হয়, হিজরাতের পূর্বের দশকগুলিতে দুইটি গোত্রের মধ্যে কোন্দল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বুঝা যায়, বিভিন্ন শাখা-গোত্র ও উপগোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল, এমনকি মদীনার শাসনতন্ত্রেও বিভিন্ন এককগুলিকে রক্তপণের জন্য দায়ী করা হইয়াছে। যাহারা সর্বতোভাবে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা তাহারা আলাদা গোত্র বা কয়েকটি শাখাগোত্রের সমষ্টি, যেমন আন-নাবীত, যাহা 'আবদুল আশ্‌হাল, জাফার ও হারিছা সমন্বয়ে গঠিত। ইহাও সম্ভব যে, আওস্ ও খায্‌রাজের গোত্র হিসাবে ধারণা লালিত হইয়াছিল দুইটি গোত্রের পরস্পরের মধ্যে মিত্রতার বন্ধন ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য এবং ইহা ঘটিতেছিল হিজরতের কিছু পূর্বে, বিশেষভাবে হিজরতের পরে।

হিজরাতের পূর্বের এক পুরুষের মধ্যে আওসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন হুদায়র ইব্‌ন সিমাক। তিনি বংশতালিকায় আবদুল আশ্‌হালের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এক সময়ে দেখা যায়, তিনি আম্‌র ইব্‌ন আওফ গোত্রের নেতা হিসাবে আল-হারিছা শাখার খায্‌রাজ গোত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন। তখন আশ্‌হাল গোত্রের প্রধান ছিলেন মু'আয ইব্‌নুন্-নু'মান। অপর নেতা ছিলেন

ওয়াইল গোত্রের আবূ কায়স ইব্নুল আস্‌লাত। কিন্তু যখন তিনি একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তখন একাধিকবারের ঘটনায় তাঁহার অনুসারিগণ পলাইয়া গিয়াছিল। পরে তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব হুদায়রকে দিলেন, যেইখানে উভয় গোত্রের নেতাই উপস্থিত ছিলেন। এই সময় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন্দল পরস্পর যুক্ত হইয়া একটি বড় সংঘর্ষে পরিণত হইয়াছিল যাহাতে সমগ্র মদীনা ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈন গোত্রগুলিও জড়াইয়া পড়ে। একটি সাংঘাতিক পরাজয়ের পর 'আবদুল আশহাল ও জাফার গোত্র দুইটি মদীনা হইতে বিতাড়িত হয়। তখন আমর ইব্ন আওফ ও আওস্ মানাত পরস্পরের সহিত শান্তি স্থাপন করে। যাহা হউক, বায়াদা খায্‌রাজী নেতা আম্‌র ইব্ন নুমানের দমন নীতি ইয়াহূদী গোত্র কুরায়জা ও আন্-নাদীরকে বহিষ্কৃত দুই উপগোত্রের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ করিল এবং তাহাদেরকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে সক্ষম করিল। তাহারা যাযাবর উপজাতি মুযায়নার সাহায্য প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের সহিত আওসের অন্যান্য উপগোত্রও মিলিত হইল, শুধু হারিছা ব্যতীত, যাহারা আবদুল আশ্‌হাল কর্তৃক দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। পরবর্তী বু'আছ যুদ্ধ আওস ও তাহার মিত্রদের অনুকূলে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নেতা হুদায়র নিহত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরে শান্তিচুক্তি হয় নাই, কিন্তু পরবর্তীতে এই ধরনের কোন ব্যাপক সংঘর্ষ আর হয় নাই।

যখন অবস্থা এইরূপ ছিল তখনই হযরত মুহাম্মাদ (স) আপোস আলোচনা শুরু করিলেন, প্রথমে খায্‌রাজ এবং পরে আওস্ গোত্রের সঙ্গে। যখন প্রায় সকল খায্‌রাজ গোত্রই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইল, তখনও অনেক আওস্ গোত্রীয় পিছনে পড়িয়াছিল, যেমন খাত্‌মা, ওয়াইল, ওয়াকিফ, উমায়্যা ইব্ন যায়দ ও কিছু সংখ্যক আম্‌র ইব্ন আওফ গোত্রীয়। বলা বাহুল্য, আবদুল আশ্‌হাল গোত্রের প্রধান সাদ ইব্ন মুআয (দ্র.) ইব্‌নিন্ নুমানের কথোপকথন মদীনায় ইসলামের প্রসারে একটি সিদ্ধান্তমূলক ঘটনা ছিল এবং বদর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫/৬২৭ সালে তাঁহার শাহাদাত পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বানূ কায়লা বা আনসারদের একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান। আওস ও খায্‌রাজের মধ্যকার শত্রুতা, যাহা দীর্ঘকাল হইতে বিরাজমান ছিল, ক্রমশ বিলুপ্ত হইল এবং হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) খলীফা হওয়ার পর আর এই সম্পর্কে কিছুই শুনা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা, কায়রো ১৯০৮, ১খ., ১১৬-৪০ (Summarised in Wustenfeld, Geschichte der stadt Medina, Gottingen ১৮৬০, ৩২-৪০); (২) ঐ লেখক, খুলাসাতুল ওয়াফা, মক্কা ১৩১৬ হি.; (৩) ইব্নুল আছীর, ১খ., ৪৯২-৫১১; (৪) J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, বার্লিন ১৮৮৯, ৪/১, Medina vor dem Islam'; (৫) A. p. Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme, প্যারিস ১৮৪৭ খৃ., ২খ., ২০২, ২১২, ৬৪৬-৯০।

W. Montgomery Watt (E.I.²)/
এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

আওস্ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন হাজার আল-আস্‌লামী (اوس بن عبد الله بن حجر الاسلمى) ঃ আবূ আওস্ তামীম ইব্ন হাজার আল-আসলামী নামে পরিচিত। মতান্তরে তাঁহার উপনাম আবূ তামীম। আবার কখনও কখনও দাদার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত করিয়া তাঁহাকে আওস্ ইব্ন হাজার নামে ডাকা হইত। আরবের অধিবাসীদের মধ্যে তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পরবর্তী ঘটনা। যখন নবী করীম (স) হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-কে সঙ্গে লইয়া হিজরতের উদ্দেশে মদীনায় যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে জুহ্‌ফা ও হারশার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। তাঁহার দাস মাস্‌উদ মদীনার রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল। অতএব তিনি তাহাকে তাঁহাদের সঙ্গী করিয়া পাঠান এবং তাহাকে এইরূপ কড়া নির্দেশ দেন যে, সে যেন তাঁহাদেরকে মদীনায় পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করে। মাস্‌উদ তাঁহার এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে এবং এইভাবে মদীনায় পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে তাঁহার মনিবের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, ১খ., ১৪৭; (২) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ১খ., ৮৬।

এ. কে. এম. আবদুল্লাহ

আওস্ ইব্ন খাওয়ালিয়্যি (اوس بن خولى) ঃ আনসারী বদরী (রা) প্রথম যুগের সাহাবী। পিতার নাম খাওয়ালিয়্যি ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্নিল হারিছ আল-খায্‌রাজী। মাতার নাম জামীলা বিন্‌ত উবায়্যি। ইব্নুল মাদীনীর বর্ণনামতে তাঁহার উপনাম ছিল আবূ লায়লা। বিখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন সালূল ছিল তাঁহার মামা। বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন (ইব্ন সাদ, ৩খ., ৫৪২)।

মুহাজির সাহাবী শুজা ইব্ন ওয়াহ্‌ব আল-আসাদী (রা)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন (ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, ইসাবা, ১খ., ৮৪)।

আওস্ ইব্ন খাওয়ালিয়্যি (রা)-এর মধ্যে বেশ কিছু সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল; তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল, সাঁতার ও তীরন্দাযীতে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন (ইব্ন সাদ, ৩খ., ৫৪২)।

উমরাতুল কাদার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিবার সময় কুরায়শদের কোন সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রহরায়, অন্য বর্ণনায় অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণে নিযুক্ত দুই শত ব্যক্তির নেতা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে যূতাওয়া-এ মোতায়েন করেন (ইব্ন সাদ, ৩খ., ৫৪২, ইব্ন হাজার আল-আস্‌কালানী, ইসাবা, ১খ., ৮৪)।

এই বৎসরই হযরত মায়মূনা (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আবূ রাফি' ও তাঁহাকে হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন।

হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমার (রা) ও আওস্ ইব্ন খাওয়ালিয়্যির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আপন পরিবার

হইতে এক মাস পৃথক থাকিবার সংকল্পের ঘটনাটি তিনিই প্রথম হযরত উমার (রা)-কে অবগত করান।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর তাঁহাকে গোসল দেওয়ার এবং তাঁহার পবিত্র দেহ কবরে রাখিবার কাজে আনসারগণের পক্ষ হইতে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সাদ, ৩খ., ৬৪২; ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৪)। তিনি হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ তাঁহার অবরুদ্ধ হইবার কিছু পূর্বে মদীনায় ইন্তিকাল করেন (ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, পূ. গ্র., পৃ. ৮৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুব্‌রা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২৭৯, ২৮০, ৩০০; ৩খ., ৫৪২-৪৩; ৮খ., ১৩২, ১৯০; (২) শিহাবুদ্-দীন ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮৪, নং ৩৩৪; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ., ৫খ., ২৬০-৬২; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭১, ১খ., ১০৩।

ডঃ আবদুল জলীল

আওস্ ইব্‌ন খালিদ (اوس بن خالد) ঃ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়্যা (রা) আন্‌সারী সাহাবী। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। ইব্‌নুল কালবীর বর্ণনামতে তিনি দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা)-এর খিলাফতকালে ১৫/৬৩৬ সালে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব সম্পর্কে কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) কবিতার একটি চরণে বর্ণনা করেন, তিনি (ইয়ারমুকের যুদ্ধের) সেই ভীতিপ্রদ দিনে আওস্ ইব্‌ন খালিদকে শত্রুদের উপর বীরবিক্রমে তীব্র আঘাত হানিতে দেখিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা ফী তাম্‌য়ীযিস-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮৩; (২) ইব্‌নুল আছীর উস্‌দুল গাবা, তা. বি., ১খ., ১৪৪; (৩) ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইস্‌তীআব, ১খ.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আওস্ ইব্‌ন খালিদ (اوس بن خالد) ঃ (রা) ইব্‌ন কুরত আল-আনসারী আন্-নাজ্জারী। রিজাল সাহিত্যের অনেকে তাঁহার নাম সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত না করিলেও তিনি যে সাহাবী ছিলেন ইহা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁহার পুত্র সাফওয়ান ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ। তিনি আবূ আয়্যূব আল-আনসারীর কন্যা আমরা ও আর্-রাবী ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আমির-এর কন্যা নাইলা-কে বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মহিলা উম্মু সাফ্ওয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে জাহিলিয়্যা যুগে ইন্তিকাল করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পুত্র সাফওয়ান সাহাবী হইতেন। ইহাতে অনুমিত হয়, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে ইন্‌তিকাল করিয়াছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত মদীনার আন্‌সারীদের মধ্যে কেহই কাফির ছিলেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩৫৮ হি., ১খ., ৮৩।

আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন

আওস্ ইব্‌ন ছালাবা (اوس بن ثعلبة) ঃ আল-আন্‌সারী (রা) একজন সাহাবী। হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহর মতে যে সকল সাহাবী নীশাপুর আগমন করিয়াছিলেন আওস্ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। পরে তিনি এই কাজের জন্য অনুতপ্ত হন এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করেন।

এই যুদ্ধে যাহারা অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে তাঁহাদের সম্পর্কে নিন্দা ও ভর্ৎসনাসূচক আয়াত অবতীর্ণ হয় (৯ ঃ ৯৪)। তখন আওস নিজেকে মস্‌জিদে নববীর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলেন এবং শপথ করেন, যদি রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বন্ধন না খুলেন তাহা হইলে তিনি স্বীয় বন্ধন খুলিবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মসজিদে প্রবেশ করিয়া অন্যদের সহিত তাহাকে বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পান। তিনি ইহার কারণ জানিতে পারিয়া বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন খুলিতে পারিব না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে ক্ষমা সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয় (৯ ঃ ১০২) এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ওজর কবূল করিয়া নেন এবং অন্যদের সহিত আওস ইব্‌ন ছালাবার বন্ধন খুলিয়া দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, তেহরান তা. বি., ১খ., ১৪১; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮১; (৩) আয্-যামাখ্‌শারী, আল-কাশ্‌শাফ, বৈরূত, ২খ., ৩০৬-৭।

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আওস্ ইব্‌ন জুবায়র (اوس بن جبير) ঃ আল-আন্‌সারী (রা), বানূ 'আম্‌র ইব্‌ন 'আওফ গোত্রভুক্ত একজন সাহাবী। তিনি খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নাইম দুর্গ অবরোধকালে শাহাদাত বরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, তেহরান তা. বি., ১খ., ১৪১; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮১।

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আওস্ ইব্‌ন মি'য়ার (اوس بن معير) ঃ নাম আওস্, পারিবারক নাম আবূ মাহ্‌যূরা (ابو محذورة)। এই নামেই তিনি পরিচিত। পিতার নাম মি'য়ার ইব্‌ন লাওযান। মাতার নাম খুযাইয়্যা। মক্কার কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কায় আগমন করেন তখন তিনি তাঁহার দরবারে হাযির হইয়া আযান দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন। যতদিন তাঁহারা মক্কায় ছিলেন ততদিন হযরত বিলাল (রা)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি আযান দিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে হযরত 'আম্‌র ইব্‌ন উম্মি মাক্‌তূম (রা) [তাবাকাত, ৩খ., ২৩৪]। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি তাঁহার অনুমতিক্রমে হিজরত না করিয়া মক্কাতেই থাকিয়া যান এবং আযানের দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর বলেন, ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত মক্কায় আযানের দায়িত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার বংশই পালন করিয়া আসিতেছে (তাবাকাত, ৫খ., ৪৫০)। ৫৯ হিজরীতে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। আওস নামক তাঁহার এক ভ্রাতা (মতান্তরে উনায়স ইব্ন হাজার বিধর্মী ছিল) বদ্র যুদ্ধে নিহত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ২৩৪, ৫খ., ৪৫০; (২) আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৮৭; (৩) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৫০; (৪) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মাইস্ সাহাবা, ১খ., ৩৮; (৫) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাক্ রীবুত্-তাহ্যীব, ১খ., ৮৬।

ডঃ আবদুল জলীল

আওস্ ইব্ন মু'আয (اوس بن معاذ) ঃ ইব্ন আওস্ আল-আন্সারী। উরওয়ার বরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের মতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বির মাউনা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত শাহাদাত বরণ করেন (উস্দুল গাবা, ১খ., ১৫০)। তবে ইমাম যাহাবী তাঁহাকে আনাস ইব্ন মু'আয ইব্ন আনাস বলিয়া উল্লেখ করেন (তাজ্রীদু আস্মাইস্-সাহাবা, ১খ., ৩৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি.; (২) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, তেহরান তা. বি., ১খ., ৩৮; (৩) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মাইস্-সাহাবা, ১খ., ৩৮; (৪) ইব্ন আবদিল বার্র, আল-ইস্তীআব, ১খ.।

ডঃ আবদুল জলীল

আওস্ ইব্ন শারহাবীল (اوس بن شرحبيل) ঃ আল-মাজ্মা গোত্রের একজন সাহাবী। তাঁহার নাম আওস্ ইব্ন শারহাবীল, না শারহাবীল ইব্ন আওস্ এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁহার জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ রহিয়াছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি একজন অত্যাচারীর সঙ্গে, সে যে অত্যাচারী তাহা জানা সত্ত্বেও, তাহার সাহায্যার্থে গমন করে, সে ঈমান হইতে বাহির হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৪৬; (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, ইসাবা, ১খ., ৮৫।

মু. আব্দুল মান্নান

আওস্ ইব্ন সাঈদ আল-আন্সারী (اوس بن سعيد الانصارى) ঃ (রা) একজন আন্সারী সাহাবী। তিনি ঈদের তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৪৫-১৪৬।

মু. আব্দুল মান্নান

আওস্ ইব্ন সা'দ (اوس بن سعد) ঃ আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা) একজন আনসারী সাহাবী এবং উমায়্যা ইব্ন যায়দ গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের সময় তাঁহার বয়স ছিল আটান্ন বৎসর। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) স্বীয় খিলাফতকালে তাঁহাকে সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। উমার-এর খিলাফতকালেই ষোল হিজ্রী সনে চৌষট্টি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৪৫; (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, ইসাবা, ১খ., ৮৫।

মু. আব্দুল মান্নান

আওস্ ইব্ন সা'দ (اوس بن سعد) ঃ ইব্ন আবী সার্হ আল-'আমির (রা) আমিরী বংশীয় একজন সাহাবী। তিনি মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান মদীনার শাসনকর্তা থাকাকালে অথবা তাঁহার খিলাফত কালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, ১খ, ৮৪।

আব্দুল মান্নান

আওস্ ইব্ন সাম্'আন আনসারী (اوس بن سمعان) ঃ আবূ আবদিল্লাহ্ একজন আনসারী সাহাবী। তাঁহার জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আনাস ইব্ন মালিক কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জানান, তাওরাতেও তিনি অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি সম্ভবত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুলগাবা, ১খ., ১৪৬; (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৮৫।

মু. আব্দুল মান্নান

আওস্ ইব্ন সাসাআ (اوس بن صعصعة) ঃ আল-আন্সারী, মদীনার খায্রাজ গোত্রের শাখাগোত্র নাজ্জার-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে ও উহার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং ইয়াওমু'ল-জাস্র (يوم الجسر)-এ শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উমার (রা)-এর সময় ৬৩৪ খৃ. ত্রয়োদশ হিজরীর শা'বান মাসে আবূ উবায়দা আছ-ছাকাফীর নেতৃত্বে ফুরাত-এর পুলের উপর ইরানীদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের নিকট এই যুদ্ধই ইয়াওমুল জাস্র (পুল-এর যুদ্ধ দিবস) নামে খ্যাত (দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া, ৭খ., ২৪৯)।

তাঁহার স্ত্রী ছাবিতা বিন্ত সালীত ইব্ন কায়সও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বায়'আত হন। তাঁহার গর্ভেও 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাসাআ-র ঔরসে আবদুর রাহমান, সালিমা ও মায়মূনা জন্মগ্রহণ করেন (তাবাকাত, ৮খ., ৪২৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ৩খ., ৮৫; (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, ২খ., ৩২৬; (৩) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৮খ., ৪২৩; (৪) দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া, লাহোর,

৭খ., ২৪৯; (৫) হাফিজ ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৭খ., ২৭, ২৮, ২৯; (৬) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মাইস্ সাহাবা, ১খ., ৩১৮।

ড. আবদুল জলীল

আওস্ ইব্ন সা'ইদা আল-আন্সারী (রা) (اوس بن صاعدة الانصارى) ঃ একজন আন্সারী সাহাবী। ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছ হইতে জানা যায়, তাঁহার একাধিক কন্যা সন্তান থাকায় তিনি প্রায়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইলে মহানবী (স) আওস্ (রা)-এর মনোভাব সম্পর্কে জানিতে পারেন। তিনি তখন আওস (রা)-এর নিকট নারী জাতির মর্যাদা ও নানাবিধ গুণের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহার এই মনোভাব পরিবর্তনের আহ্বান জানান। তাঁহার জীবন সম্পর্কে অধিক আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল-গাবা, ১খ., ১৪৫; (২) ইব্ন হাজার, আল-'আস্কালানী, ইসাবা, ১খ., ৮৫।

মু. আব্দুল মান্নান

আওস্ ইব্ন হাওশাব আল-আন্সারী (اوس بن حوشب الانصارى) ঃ (রা) একজন আন্সারী সাহাবী। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। আবূ মূসা আবুস্-সালীল হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা নুকায়র হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে আওস্ ইব্ন হাওশাব নামক জনৈক আন্সারীর গৃহে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। তাল্হা ইব্ন উবায়দিল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যে সকল সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া মক্কা গমন করিয়াছিলেন আওস ইব্ন হাওশাব ছিলেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল ইসাবা ফী তাময়ীযি'স-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮৩; (২) ইবনুল আছীর, উস্দুল গাবা, তা. বি., ১খ., ১৪৪।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আওস্ ইব্ন হাজার (اوس بن حجر) ঃ তামীম গোত্রীয় সর্বশ্রেষ্ঠ জাহিলী কবি। আল-আস্মাঈ বহু স্থানে তাহার কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহার কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপরদিকে আবার একমাত্র আল-বুহ্তুরীর "হামাসা" ব্যতীত প্রাথমিক যুগের অন্য কোন কাব্য সঙ্কলনে তাহার নামোল্লেখও পাওয়া যায় না। আল-ফারায্দাক্ যে সগর্বে বলিয়াছেন, "আমি আওস্ বংশ হইতে বিষের ন্যায় তীক্ষ্ণ রসনা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি", তখন তিনি এই কবিকেই বুঝাইয়াছেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। ইবনুস্ সিক্কীত (দ্র.)-এর সমসাময়িক কালে মাত্র তাহার কাব্যের খণ্ড খণ্ড অংশ পাওয়া যায় এবং সম্ভবত ইব্নুস-সিক্কীতই সর্বপ্রথম তাহার 'দীওয়ানে'র একটি টীকা লিখেন এবং তৎরচিত অভিধান সংক্রান্ত গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ করেন।

প্রাথমিক যুগের সমালোচকগণের মত অনুযায়ী আওসের কাব্য (বন্য) গর্দভ, তীর-ধনুক ও "মহৎ গুণাবলী"র বর্ণনার জন্য বিখ্যাত ছিল। আওস্ লাখ্মী বংশীয় বাদশাহ 'আম্র ইব্ন হিন্দকে তাঁহার নিহত পিতা তৃতীয় আল-মুনযিরের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কাব্যে তিনি আল-কা'ও আস্-সুবানের যুদ্ধেরও উল্লেখ করেন, এই যুদ্ধেই তৃতীয় আল-মুন্যির ৫৪৪ খৃ. নিহত হন। কবির গোত্রীয় লোকেরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বানূ আসাদ গোত্রীয় ফাদালা বিন্ত কালাদার সঙ্গে কবির সম্পর্ক লইয়া চমৎকার লোকশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে। ফাদালার নামে তিনি একটি বিখ্যাত শোকগাথা উৎসর্গ করেন। কবি আওস্ সম্ভবত আন্-নাবিগার পূর্ববর্তী ছিলেন।

লোকশ্রুতি মতে কবি যুহায়র, আওস্ ও তুফায়লুল গানাবী এই উভয় কবিরই রাবী ছিলেন। কোন সূত্রের উল্লেখ না করিয়া Kernkow আবার আওস্কে তুফায়লের রাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। R. Geyer এই কবির দীওয়ান প্রথমবার ১৮৯২ খৃ. প্রকাশ করেন। লিসানুল 'আরাব অভিধানে তাঁহার কবিতার বহু উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Geyer, Gedichte und Fragmente des `Aus b. Harar (SBAK. Wien. phil-hist. Cl. 13, 13-107); (২) তু. GGA 1895, no 5, 371f.; (৩) Zdmg 1893, 323f.; 1895, 85f, 297f, 673f.; 1910, 154f.; (৪) ZA, 1912, 295f.; (৫) তাহা হুসায়ন, ফিল আদাবিল-জাহিলী, পৃ. ২৯৬ প.; (৬) Brockelmann, I, 27, S. I, 55; (৭) G. E. von grunebaum, in Orientalia 1939, 328f.; (৮) গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. জারীর ও ফারাযদাক, নাকাইদ ঃ (৯) al-Asma'i, Fuhula (ZDMG, 1911), 492, 493; (১০) ইব্ন কুতায়বা, আল মা'আনীল-কাবীর; (১১) ইব্ন মায়মূন, মুন্তাহাত-তালাব, ১৯৩৭, পৃ. ৪৩৩ প.।

S. A. Bonebakker (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আওস্ ইব্ন হারিছা (اوس بن حارثة) ঃ আত্-তাঈ; ইব্ন হাজার আল-আস্কালানীর মতে ইসলাম-পূর্ব যুগের একজন লোক। ইসলাম-পূর্ব যুগেই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া তিনি সাহাবী নহেন। অবশ্য তাঁহার পুত্র খুরায়ম সাহাবী ছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ, যেমন 'উর্ওয়াঃ ইব্ন মুদ্রিস ইব্ন আওস্ ও হানী ইব্ন ক্'বায়সা ইব্ন আওস্ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

হুমায়দ ইব্ন মুন্হাব বলেন, আমার পিতামহ খুরায়ম বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনায় গমন করত তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তারীখে মুজাফ্ফারীতে আওস্ ইব্ন হারিছাকে একজন সাহাবী হিসাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ রহিয়াছে, আওস্ ইব্ন হারিছা ইব্ন লাম আত্-তাঈ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমনপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরিউক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী বলেন, হয়ত বা আওস্ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৪১, (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৮১-৮২।

মু. আব্দুল মালেক

আওস্ ইব্ন হুযায়ফা (اوس بن حذيفة) ঃ আছ্-ছাকাফী (রা) তাইফ-এর অধিবাসী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগত বানূ ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন আবূ আওসের পুত্র (আওস্ ইব্ন আবী আওস্) এবং 'আম্র-এর পিতা (বুখারীর তারীখ; ইব্ন হিব্বান; ইসাবা, ১খ., ৮২)। বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁহার নামের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে আওস্ ইব্ন আওস্ নামে উল্লেখ করিয়াছেন (তু. তাক্রীবুত্-তাহযীব, ১খ., ৮৫)। ইমাম আবূ দাউদ (র), নাসাঈ (র) ও ইব্ন মাজা (র) এই সনদেই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে আওস্ ইব্ন আবী আওস ও ইব্ন হুযায়ফা একই ব্যক্তি (তু. আল-ইসতী'আব, ১খ., ৩৯)। কেহ কেহ তাঁহাকে আওস্ ইব্ন আওস্ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সিরিয়াবাসিগণ এই সনদে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

আওস্ ইব্ন হুযায়ফা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে পদদ্বয় মাস্হ্ সম্পর্কিত হাদীছটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার পুত্র 'আম্র, উছমান ইব্ন আব্দিল্লাহ, আবদুল মালিক ইব্নুল মুগীরা প্রমুখ।

আওস্ ইব্ন হুযায়ফা হিজরী ৫৯ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযি'স্ সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮২-৮৩; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবুত্-তাহ্যীব, মদীনা তা. বি., ১খ., ৮৫; (৩) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, তা. বি., ১খ., ১৪২ প.; (৪) ইব্ন আবদিল বার্র, আল-ইস্তীআব, তা. বি., ১খ., ৩৯।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আওস্ ইব্নুল-মুন্যির (اوس بن المنذر) ঃ আল-আন্সারী (রা), সম্ভ্রান্ত নাজ্জার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বায়আতে আকাবাঃয় শরীক ছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত শাহাদাত বরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৫০; (২) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৮৭; (৩) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মাইস্-সাহাবা, ১খ., ৩৮।

ড. আবদুল জলীল

আওস্ ইব্নুল হাদ্ছান (اوس بن الحدثان) ঃ ইব্ন আওস্ ইব্ন রাবীআ (রা) মদীনার অধিবাসী, একজন সাহাবী। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আয়্যামুত্-তাশরীক-এ মিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে এই ঘোষণা শুনাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, "কেবল মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে (উস্দুল গাবা) এবং মিনার দিন হইল পানাহারের দিন।" তাঁহার পুত্র মালিক (রা) তাঁহার নিকট হইতে ফিত্রা সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য ফিত্রা হিসাবে দান কর। আওস্ (রা) বলেন, এই সময় আমাদের খাদ্য ছিল গম, যব, খেজুর ও আংগুর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৮২; (২) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, তা. বি., ১খ., ১৪১ প.; (৩) ইব্ন 'আব্দিল বার্র, আল-ইস্তীআব, ১খ., ৩৯।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আওস্ ইব্নুস্-সামিত (اوس بن الصامت) ঃ (রা) খায্রাজ বংশীয় আন্সারী সাহাবী ও কবি এবং মহানবী (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবী উবাদা ইব্নুস্-সামিত-এর ভ্রাতা। কাব্য রচনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল। তৎকালে তাঁহার রচিত কবিতা লোকমুখে শুনা যাইত। পায়ে দোষ থাকার কারণে তিনি কিছুটা খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন। যাঁহারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের একজন বলিয়া কথিত। তিনি তাঁহার চাচাত ভগ্নী জামীলা (মতান্তরে খুওয়ায়লা বা খাওলা)-কে বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সংগে জিহার (দ্র., আরও দ্র. তালাক) করেন এবং অনুতপ্ত হন। তাঁহার স্ত্রী বিচলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট গমন করেন এবং দাম্পত্য সম্পর্ক পুনস্থাপনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। এই উপলক্ষে কুরআনের জিহার সম্পর্কিত বিধান নাযিল হয় (দ্র. ৫৮ ঃ ১-৪)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে কাফ্ফারা দিয়া স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণের অনুমতি দেন। উল্লেখ্য, ইহাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জিহার। তিনি বায়তুল মাক্দিসে বসবাস করেন এবং হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফাত কালে হিজরী চৌত্রিশ সনে বাহাত্তর (মতান্তরে পঁচাশি) বৎসর বয়সে প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত রাম্লা নগরে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১খ., ১৪৬-৪৭; (২) ইব্ন হাজার, আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৮৫ ও ৮৬।

এ. কে. এম. আবদুল্লাহ

আওস্ আল-কিলাবী (اوس الكلابى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তাঁহার এক পুত্রের নাম হাজিব এবং হাজিবের এক পুত্রের নাম মুআল্লা। হাফিজ ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী প্রণীত আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্-সাহাবা গ্রন্থে উল্লিখিত ইব্ন কানি'-এর বর্ণনা মুতাবিক আওস্ আল-কিলাবী (রা)-এর পিতামহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাফিজ ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্-সাহাবা, ১খ., ৮৮।

মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আওস্ আল-মুরৃঈ (اوس المرئى) ঃ ইম্‌রুউল কায়সের বংশোদ্ভূত সাহাবী। কন্যা উম্ম জামীল (মতান্তরে জামীলা)-এর হাদীছে আওস্ আল-মুরৃঈর উল্লেখ পাওয়া যায়। উম্ম জামীল বর্ণনা করেন, একবার তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংগে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করেন। তখন তাঁহার মাথার সম্মুখভাগে ঝুলন্ত কেশগুচ্ছ ও উপরিভাগে ঝুটি বাঁধা কেশগুচ্ছ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) এই কেশ বিন্যাসকে জাহিলিয়াতের ফ্যাশন আখ্যা দেন এবং তাহার পিতা [আওস্ আল-মুরৃঈ (রা)]-কে কন্যার মাথা হইতে উহা ছাঁটিয়া ফেলিতে এবং তারপর তাঁহাকে পুনরায় লইয়া আসিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ মুতাবিক আওস্ (রা) উম্ম জামীলকে লইয়া পুনরায় মহানবী (স)-এর দরবারে হাযির হইলে তিনি তাঁহার জন্য দু'আ করেন এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাফিজ ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, আল-ইসাবাঃ ফী তাম্‌য়ীযিস-সাহাবা, ১খ., ৮৮।

মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আল-আওহাদ (দ্র. আয়্যূবী)

আওহাদী (اوحدى) ঃ পারস্যের কবি রুক্‌নুদ্-দীন আওহাদী আযারবায়জান-এর অন্তর্গত মারাগা-তে ৬৮০/১২৮১-২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ইস্‌পাহানে বাস করিয়াছিলেন, তাই হাফ্‌ত ইক্‌লীম-এর লেখক তাঁহাকে ঐ শহরের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু তিনি যে ৭৩৮/১৩৩৭-৮ সালে মারা যান সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তাঁহার জন্মস্থানেই তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমাধি আজও এখানে বিদ্যমান।

আওহাদী তাঁহার শিক্ষক কিরমানের শায়খ আওহাদুদ্-দীন-এর নামানুসারে নিজের তাখাল্লুস (কবিনাম) গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় দশ সহস্র কবিতা সম্বলিত একটি দীওয়ান (কাব্য সংকলন)-এর তিনি লেখক। ইহার কিছু কবিতা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ঈলখান আবূ সা'ঈদ ও তাঁহার মন্ত্রী রাশীদুদ্-দীন ফাদ্‌লুল্লাহর পুত্র গিয়াছুদ্-দীন মুহাম্মাদের প্রশংসায় রচিত। তাঁহার একটি কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কবি সাওয়া নিবাসী সাল্‌মান-এর কবি হিসাবে দাবিকে আক্রমণ করিয়া লেখা হইয়াছে।

কবি হিসাবে আওহাদীর মৌলিকত্ব তেমন কিছু নাই। পারস্যের সমালোচকগণ তাঁহার রচনাশৈলীর দুর্বলতার দরুন তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। তদুপরি অধিকাংশ কবিতা, যদিও সেইগুলি একেবারে সৌন্দর্যহীন নহে, প্রায়ই কষ্টকল্পিত এবং শ্রেষ্ঠ ফারসী কাব্যের ন্যায় সুষমা-সৌন্দর্যমণ্ডিত নহে।

আওহাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহার দুইটি মাছ্‌নাবী কাব্য, উহার প্রথমটির নাম দাহ্-নামাহ্ যাহা কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "মান্‌তিকুল-উশ্‌শাক" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে এক কাল্পনিক প্রেমিক কর্তৃক তাহার প্রিয়তমাকে লেখা দশটি পত্র লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সেইগুলিতে বিশেষ কোন অসাধারণত্বের ছাপ নাই। ৭০৬/১৩০৬-৭ সালে তূস-এর নাসীরুদ্-দীনের দৌহিত্র ওয়াজীহুদ্-দীনের নামে এইগুলি উৎসর্গ করা হইয়াছে। অপর মাছ্‌নাবীটি, যাহার নাম জাম-ই জাম (জাম্‌শীদ-এর পাত্র) অধিকতর দীর্ঘ ও সুপরিচিত। ইহাতে উন্নততর প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছে এবং ইহা রচিত হওয়ার পর বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কবি সানাঈ লিখিত হাদীকাতুল-হাকীকার মত ইহাতে নৈতিক শৃংখলা, সন্তান পালন, নাগরিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশসহ নীতিশাস্ত্রের সকল বিষয়ের আলোচনা আছে, কিন্তু শেষাংশে আলোচ্য বিষয়ের পরিবর্তন করত সূফী তরীকা ও সেই সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। জাম-ইজাম ৭৩৩/১৩৩২-৩ সালে রচিত হইয়াছিল এবং গিয়াছুদ্-দীন মুহাম্মাদ-এর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাওলাত শাহ, পৃ. ২১০ প.; (২) Browne, iii, 141-6; (৩) Ethe in the G. I. P., ii, 299; (৪) জাম-ইজাম-এর সংস্করণ; Tehran, 1347/1928-9, (৫) A. S. Usha কর্তৃক দীওয়ান-এর সংস্করণ, Madras 1951.

G. Meredith-Owens (E.I.[2]) / ড. গোলাম রসুল

'আকআক (عقعق) ঃ (ইকআক, কাকা ধ্বনি হইতে নির্গত নাম), ইয়ূরোপীয় ময়না বিশেষ (ইহার শারীরিক গঠন প্রায় ঘুঘুর মত এবং রং সাদা-কাল)। এই পাখী সাধারণত ঝোপ-ঝাড়, বাগানে ও জঙ্গলের আশেপাশে বসবার করে, আর ইয়ূরোপ ও উত্তর এশিয়ায় পাওয়া যায়। আরবগণ যখন এইসব দেশ জয় করেন তখন তাঁহারা ইহার সহিত পরিচিত হন। ইসলাম-পূর্ব সাহিত্যে ইহার কমই উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যযুগে ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিল। পাখীটি এইজন্য বিখ্যাত যে, ইহা চিনার বৃক্ষের পত্রের মধ্যে (ও ছাদের নীচে) বাসা তৈরি করে। উজ্জ্বল দ্রব্যাদি (যেমন অলঙ্কারাদি ও মনিমুক্তাসমূহ) ইহা চুরি করিয়া লইয়া যায়। ইহা নিজের বাসা ও ছানা অন্য পাখীর সঙ্গে পরিবর্তন করিয়া লয় অর্থাৎ অন্য পাখীর বাসায় ঢুকিয়া পড়ে। এইজন্য প্রবাদ বাক্যের ধারায় ইহাকে চোর, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী ও নির্বোধ বলা হইয়া থাকে। ভ্রমণকারীদের ধারণা, উহার ধ্বনি অশুভ লক্ষণ বহনকারী। এমনকি ইয়ূরোপেও বলা হইত, উহার শরীরে ক্ষত আরোগ্য করার ক্ষমতা বিদ্যমান (জার্মানঃ Diakon-issenpulver = এক প্রকারের পাউডার)। ধারণা করা হইত, যদি ইয়ূরোপীয় ময়না পাখীর রক্ত ও মগজ ভক্ষণ করা হয় তাহা হইলে রসনেন্দ্রীয় আলঙ্কারিক বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাও মনে করা হইত, ইহাদের ব্যবহারে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বস্তু বহির্গত হয়। উহার ডিমের হলুদ অংশ চক্ষুর পাতার প্রদাহ দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আদ্-দামীরী, হায়াতুল-হায়াওয়ান আল-কুব্‌রা, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., ২খ., ৫৯-৬০; (২) আল-কায্‌বীনী, 'আজাইবুল মাখ্‌লূকাত ওয়া গারাইবুল মাওজূদাত, সম্পা. Wustenfeld, ১৮৪৯ খৃ., ১খ., ৪১৯;

(৩) Jacob, Studien in asabischen geographen, ৩খ., ১০৯-১১০।

Hell (দা. মা. ই.)/ মুহাঃ আনসার উদ্দীন

'আক্কক (عكك) ঃ 'আরবের একটি প্রাচীন গোত্রের নাম। এইচ. রেকেনডরফ (H. Reckendorf)-এর মতে ইহা একটি স্থানের নাম। ছামূদী শিলালিপিতে ইহা এক ব্যক্তির নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে ইয়ামানের তিহামায় আক্কক গোত্রের আঞ্চলিক সীমানা ওয়াদী মাওর হইতে সুরদুদ অতিক্রম করিয়া ওয়াদী সাহাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (বর্তমান লুহায়্যা ও হুদায়দা-র মধ্যবর্তী এলাকা) যেইখানে ইহা আশআর গোত্রের এলাকার সহিত মিলিত হইয়াছিল। আক্কক ও আশআর গোত্রদ্বয় তখন মক্কার সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করিত। পূর্বে আক্কক গোত্রের একটি উপনিবেশ 'আকীক (তাম্‌রাওয়াদী আদ্-দাওয়াসির)-এ বিদ্যমান ছিল। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের শেষ বৎসরে আল-আস্ওয়াদ আল-আনাসী-র বিদ্রোহে 'আক্কক গোত্রের লোকেরা আল-আসওয়াদের বিরোধিতা করায় মদীনার প্রতিনিধি তাহির ইব্ন আবী হালা-র পক্ষে তাহাদের অঞ্চলেই অবস্থান করা সম্ভব হইয়াছিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আক্কক ও আশ'আর গোত্রদ্বয়ের একটি দল সুহার-এর নিকট আলাব নামক স্থানে (একই নামধারী আক্ককদের এক উপগোত্রের অঞ্চল) সমবেত হয়। কিন্তু তাহির ও আক্কক গোত্রের এক সর্দার তাহাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। ইসলামের বিজয় অভিযানের সময় আক্কক গোত্রের কয়েকটি দল সিরিয়া (তাহারা জর্দান উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে) এবং সেই স্থান হইতে মিসর, "মাগ্‌রিব" এবং পরে কূফা ও পারস্যেও গমন করে। এই গোত্রের লোকেরা মিসর বিজয়ে ও সিফ্‌ফীন-এর যুদ্ধে (সিরীয়দের পক্ষে) বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আরবে গোত্রটি তাহাদের প্রাচীন অঞ্চল সংরক্ষণ করিয়াছিল; উপরন্তু উত্তর ও দক্ষিণে সম্প্রসারিত করিয়াছিল।

Wustenfeld, Table A ২-তে দেশত্যাগী আক্ককদের বিভাগগুলি দেখাইয়াছেন। তুর্‌ফা গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতকে আদিভূমিতে যাহারা বাস করিতেছিল তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। মদীনার (ইব্ন ইস্‌হাক) কিংবদন্তীতে আক্কক গোত্রের লোকদের 'আদ্‌নান-এর এবং খুরাসানী কিংবদন্তীতে তাহাদের আয্‌দ শানুআর (উদছান-এর মাধ্যমে যাহাকে প্রায়ই 'আদ্‌নানে বিকৃত করা হয়) অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া গণ্য করা হইত। উভয় বিবরণই সহজে বুঝা যায়, কূফা প্রতিষ্ঠার সময়ে আক্কক গোত্রকে ইয়াদ (ইব্ন নিযার ইব্ন মা'আদ্দ ইব্ন আদ্‌নান)-এর সপ্তম শাখার সহিত সম্পর্কিত করা হয় এবং খুরাসানে তাহাদেরকে আয্‌দের শামিল করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয্‌রাকী, আখ্‌বার মাক্কা, কায়রো ১৩৫২ হি., ১খ., ১১৭; (২) হাম্‌দানী, জাযীরা, ৬৮ প., ১১২ প.; (৩) ইব্ন হিশাম, সীরা, ৬; (৪) উমার ইব্ন ইয়ূসুফ ইব্ন রাসূল, তুর্‌ফাতুল আস্‌বাব ফী মা'রিফাতিল আন্‌সাব, দামিশ্‌ক ১৯৪৯, পৃ. ৬৪, প.; (৫) তাবারী, ১খ., ১৮৫৫, ১৯৮৫ প., ২৪৯৫; (৬) Lankester Harding and E. Littmann, Some Thamudic Inscriptions, Leiden 1952; (৭) M. Nallino, Le poesie di an-Nabigah al Gadi, Rome 1953, iiia, ৮৭।

W. Caskel (E.I.[2]) /মিনহাজুর রহমান

আক কোয়ুনলু (آق قويو نلو) ঃ শাব্দিক অর্থ "সাদা ভেড়ার লোকেরা", মধ্যএশিয়ার তুর্কোমান গোত্রসমূহের সম্মিলিত ঐক্যজোট। মোঙ্গল-পরবর্তী যুগে (১৪শ শতকে) দিয়ার বাক্‌র অঞ্চলে ইহার উত্থান ঘটে এবং আনু. ৯০৮/১৫০২ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তৎপূর্ববর্তী আমলে এই নামটি পাওয়া যায় না। নামটির উদ্ভব সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চয়তা রহিয়াছে অর্থাৎ ইহা দ্বারা কি বিশেষ জাতের ভেড়াই বুঝায়, নাকি কোন প্রকারের গোত্রীয় প্রতীক (totem)? তুর্কোমানদের কবরের প্রস্তর ফলক অনেক সময়ে ভেড়ার আকারের হয়। কিন্তু উযুন হাসান-এর পতাকায় এইরূপ কোন প্রতীক ব্যবহৃত হয় নাই (দ্র. Uzuncarsili, pl. 49)। উক্ত ঐক্যজোটে বিভিন্ন ওগুয (তুর্কোমান) গোত্র (Bayat, Doger, Cepni, etc.) ছিল যাহারা সম্ভবত সাল্‌জুকদের সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু মোঙ্গলদের অধীনে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল অখ্যাত। এই গোত্রের মধ্যে অবশ্যই বিশেষভাবে চিহ্নিত করিতে হয় বায়ুনদুর (Bayundur) গোত্রকে, যাহাদের হাতে নেতৃত্ব ছিল এবং যাহারা প্রত্যক্ষ অনুগামীদের লইয়া ঐক্যজোট বা ফেডারেশনটি গঠন করিয়াছিল। এই তুর্কোমানদের (আক ও কারা কোয়ুন্‌লু) উভয়ের প্রাথমিক আমলের ইতিহাসের প্রতিফলন পাওয়া যায় তুর্কী মহাকাব্য দাদা কোরকুত [(Dede Korkut)-এ (Rossi), Vatican ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৪৬-৯]। বায়ুনদুর পরিবারের (আমিদ-এর আমীরগণ) প্রথম উল্লেখ করেন ১৩৪০ খৃ. বায়যানটীয় ঐতিহাসিকগণ। তাহারা কয়েকবার ত্রেবিযন্দ (Trebizond) আক্রমণ করিয়াছিল এবং ১৩৫২ খৃ. তুর আলীর পুত্র কুত্‌লু বেগ ত্রেবিযন্দ-এর জনৈকা শাহাযাদীকে বিবাহ করেন, পরে তাঁহার পুত্র কারা য়ুলুক উছমানও অনুরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল (কখনও কখনও তাহাকে কারা য়ুলুক অর্থাৎ "কালো জোঁক" নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে)। এই শেষোক্তজনই প্রকৃতপক্ষে আক কোয়ুন্‌লুর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘকাল যাবত তিনি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিলেন। তিনি আর্‌যিন্‌জান ও সীওয়াস-এর স্থানীয় শাসকগণের অধীনে, এমনকি মিসরের সুল্‌তানগণের অধীনেও কিছুকাল চাকুরী করেন। সাফল্যের সঙ্গে তিনি দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করেন ঃ কারা কোয়ুন্‌লুর প্রধান কারা মুহাম্মাদকে (৭৯১/১৩৮৯) ও সীওয়াসের বুর্‌হানুদ্-দীনকে (৭৯৯/১৩৯৭-এর দিকে)। তিনি তৈমুরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহার পক্ষে আংকারার যুদ্ধে (৮০৫/১৪০২) অংশগ্রহণও করেন যাহার পুরস্কারস্বরূপ তৈমুর তাঁহাকে সমগ্র দিয়ারে বাক্‌র দান করেন। তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (৮৩৯/১৪৩৫) তিনি আর্মেনীয় অধিত্যকাতে দৃঢ়ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বী কারা কোয়ুন্‌লু জোটের উত্থানের ফলে আক কোয়ুন্‌লু সম্প্রসারণ ব্যাহত হইতে থাকে (কারা কোয়ুন্‌লুর আদি কেন্দ্রসমূহ ছিল ওয়ান হ্রদের উত্তরে), বিশেষত তৈমুরের মৃত্যুর পরে কারা কোয়ুন্‌লু-র

প্রধান কারা য়ুসুফ স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, এমনকি (৮১৩/১৪১০) তাঁহার সাবেক রক্ষাকর্তা জালায়িরগণকে বিতাড়িত করেন।

কারা উছমান-এর পুত্রদ্বয় আলী ও হামযার মধ্যে কিছু কালব্যাপী সংগ্রামের পরে আক কোয়ুন্‌লু পুনরায় আলী (৮৭১-৮৩/১৪৬৬-৭৮)-এর পুত্র উযুন হাসান (দ্র.)-এর মাধ্যমে অগ্রগামী হয়। উযুন হাসান উছমানী তুর্কীগণের পূর্বমুখী অভিযান রোধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পূর্বদিকে অতি কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন (তিনি শেষ কারা কোয়ুন্‌লু জিহান শাহকে ৮৭২/১৪৬৭. ও তৈমুরী বংশের আবূ সাঈদকে ৮৭৩/১৪৬৮ সনে পরাজিত করেন। তদুপরি বাগদাদ, হীরাত ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। তাহার পুত্র ইয়া'কূব (৮৮৩-৯৬/ ১৪৭৮-৯০) সামগ্রিকভাবে একজন সফল শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রগণ ও ভ্রাতুস্পুত্রগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইতোমধ্যে সাফাবীগণ বিভিন্ন তুর্কোমান গোত্রের মধ্যে শীআ প্রচারণা চালাইয়া সুন্নী মতাবলম্বী আক কোয়ুন্‌লুর অবস্থান দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল। ৯০৮/১৫০২ সনে শারুর-এ (নাখিচেওয়ানের নিকটে) সংঘটিত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শাহ ইসমাঈল আল্‌ওয়ান্‌দ ইব্‌ন ইয়ূসুফ ইব্‌ন উযুন হাসানকে পরাজিত করেন। ইয়াকূব-এর পুত্র মুরাদ কয়েক বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিতে হয়। ৯২০/১৫১৪ সনে তিনি সুল্‌তান সেলীম কর্তৃক পারস্য অভিযানকালে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু সেই বৎসরই উরফা-র নিকটে মারা যান।

কিছুকাল পর্যন্ত মারদিন (Mardin)-এ একটি স্বায়ত্তশাসিত আক কোয়ুন্‌লু রাজ্য টিকিয়া ছিল। উহার তিন শাহযাদা-হাম্‌যা ইব্‌ন উছমান, জাহাঙ্গীর ইব্‌ন আলী ও কাসিম ইব্‌ন জাহাঙ্গীর। ৯০৯/১৫০৩-এর দিকে শেষোক্ত জন শাহ ইসমাঈল-এর নিকট হইতে পশ্চাদপসরণকালে আলওয়ান্দ কর্তৃক নিহত হন।

গৌরবের দিনে (উযুন হাসান ও ইয়াকূব-এর আমলে) আক কোয়ুন্‌লু জাগতিক ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তাবরীযে রাজধানী স্থানান্তরের পরে পারস্য আবার তাহার রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইয়ূরোপীয় শক্তিসমূহ (বিশেষত ভেনিস) ও পোপ ক্ষমতাশালী উছমানী শক্তির বিরুদ্ধে আক কোয়ুন্‌লুর মিত্রতা প্রত্যাশী হয়। উযুন হাসান প্রবর্তিত কৃষি জরীপ (কানূন-ই হাসান পাদশাহ) কিছুকাল পর্যন্ত পূর্ব তুরস্ক ও পারস্যে প্রচলিত ছিল। বায়ুন্দুর শাসকগণের কালক্রম নিম্নরূপ ঃ

কারা উছমান ৮৩৯/১৪৩৫ সালে আশি বৎসর বয়সে নিহত হন। তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। আলী ৮৪২/১৪৩৮ সালে ও হামযা ৮৪৮/১৪৪৪ মারা যান। জাহাঙ্গীর পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেন ৮৪৮-৭৪/১৪৪৪-৬৯ সাল পর্যন্ত, উযুন হাসান (জন্ম ৮২৮/১৪২৪) ৮৫৭/১৪৫৩ সাল হইতে রাজত্ব করেন, ৮৮২/১৭৪৬ সালে কারা কোয়ুন্‌লুকে উৎখাত করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ৮৮২/১৪৭৮ সালে। ইয়াকূব ৮৮৩-৯৬/ ১২৭৮-৯০; বায়সুনকুর ৮৯৬-৭/১৪৯১-২; রুস্তম ৮৯৭-৯০২/১৪৯২-৭; আহ্‌মাদ গৌদ (Gowde) ৯০২-৩/১৩৯৭ রাজত্ব করেন। আহ্‌মাদ গৌদ-এর মৃত্যুর পরে মুহাম্মাদ, আলওয়ান্দ ও মুরাদ-এর মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে (৯০৩-৭/১৪৯৭-১৫০২)। আলওয়ান্দ ৯০৭/১৫০২ সালে শাহ ইসমাঈল কর্তৃক পরজিত হইয়া দিয়ার বাকরে পশ্চাদ্‌পসারণ করেন এবং সেখানেই ৯১০/১৫০৪ সালে মারা যান। মুরাদ ৯০৮/১৫০৩ সালে শাহ ইসমাঈল কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাগদাদে পলায়ন করেন, যেখানে সাড়ে চার বৎসর রাজত্ব করিবার পরে তিনি দিয়ার বাক্‌রে ও তুরস্কে গমন করেন। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে তিনি সেখানে মারা যান এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই এই রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উযুন হাসান পর্যন্ত এই বংশের প্রাথমিক কালের বিশেষ ইতিহাস হইতেছে (১) আবূ বাক্‌র তিহ্‌রানী রচিত তারীখ-ই দিয়ারবাক্‌রিয়্যা, প্রকা. এফ. সুমার, আঙ্কারা। সুলতান ইয়াকূব-এর শাসনামলের জন্য দ্র. (২) আলামআরা-ই আমীনী, ফাদ্‌লুল্লাহ ইব্‌ন রূয্‌বিহানকৃত (পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় প্যারিস ও ইস্তাম্বুলে রহিয়াছে)। বিস্তারিত সাধারণ জরিপ (৩) গাফ্‌ফারী, জিহানআরা (সংযোজনসহ পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে, নং ওরিয়েন্টাল ১৪১, পত্রী ১৯০v-১৯৬v) এবং (৪) মুনাজ্জিম-বাশী, সাহাইফুল আখ্‌বার (সংক্ষেপিত তুর্কী অনুবাদরূপে, ৩খ., ১৫৪-৬৭)। ফার্সী, তুর্কী, জর্জীয়, আর্মেনীয়, ইটালীয় ও স্পেনীয় ভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও দলীল-দস্তাবেজে বহু তথ্য রহিয়াছে; দ্র. (৫) V. Minorsky, La Perse entre la Turquie et Venise, 1933; (৬) W. Hinz, Irans Aufstieg, 1936 (সাফাবীদের সঙ্গে প্রাথমিক সম্পর্ক বিষয়ে); (৭) আই. এইচ. উযুনচারসিলী, আনাদুলু বেইলিকলারী, ১৯৩৭, পৃ. ৬৩-৯ ও নির্ঘণ্ট; (৮) V. Minorsky, A soyurghal of Qasim b. Jahangir (৯০৩/১৪৮৯), Bsos, ১৯৩৯, পৃ. ৯২৭-৬০; (৯) ঐ লেখক, A civil and military review in Fars in 881/1476, Bsos, ১৯৩৯, ১৪১-৭৮; (১০) ঐ লেখক, The Aq-qoyunlu and land reforms, Bsos, ১৯৫২, ৪৪৯-৬২; (১১) I. A. s. v. by M. H. Inane; ইহাতে অনেক নূতন তথ্য রহিয়াছে। তুরস্কে আক কোয়ুন্‌লু শরণার্থীদের বিষয়ে দ্র. (১২) T. Gokbilgin, Turkiyat Mecmuasi, 1951, 35-46; উযুন হাসান প্রবন্ধও দ্র.।

V. Minorsky (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আক্‌কা (عكا) ঃ ওল্ড টেস্টামেন্টের Acco (Akko), গ্রীকদের Ptolemais, ফরাসীদের Acre; ফিলিস্তীন সমুদ্রোপকূলবর্তী একটি শহর। শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানার অধিনায়কত্বে 'আরবগণ আক্‌কা দখল করে। বায়যানটাইনগণের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে শহরটির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। মু'আবিয়া (রা) ইহা পুনর্নির্মাণ করিয়া সেইখানে একটি পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। পরে খলীফা হিশাম ইহাকে Tyre-এ স্থানান্তর করেন। বন্দরের চতুর্দিকে ইব্‌ন তূলূন বৃহৎ প্রস্তর বাঁধ নির্মাণ করেন। আল-মাক্‌দিসী এই বাঁধ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন ; তাঁহার পিতামহ এই বাঁধটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বন্দরটি সিরিয়ার ফাতিমীদের অন্যতম নৌঘাঁটিতে পরিণত হয়। ক্রুসেডসমূহ এই

বন্দরের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। একটি ব্যর্থ আক্রমণের পর Baldwin I ৪৯৭/১১০৪ সালে বন্দরটি দখল করিতে সফলকাম হন। তৎপর বন্দরটি এই পবিত্র ভূমিতে খৃস্টান অধিকৃত এলাকার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই শহর সম্পর্কে আল-ইদ্রীসীর নিম্নোক্ত বর্ণনাটি এই আমলের। তিনি বলিয়াছেন, আক্কা বহু কৃষি খামার সম্বলিত একটি বৃহদকারের বিক্ষিপ্ত শহর, একটি সুন্দর নিরাপদ পোতাশ্রয় এবং ইহাতে রহিয়াছে মিশ্র জনবসতি। সালাহুদ্দীন কারন হাত্তীন-এর বৃহৎ যুদ্ধে বিজয়ী হইলে ৫৮৩/১১৮৭ সালে আক্কা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আক্কা-র দখল খৃস্টানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থাকায় তাহারা শহরটি পুনরায় অবরোধ করে। দুই বৎসর ধরিয়া অবরোধ অব্যাহত থাকার পরে শেষ পর্যন্ত ১১৯১ খৃ. সেইখানে Philippe Auguste ও Richard Coeur de Lion-এর আগমনের ফলে আক্কা পুনরায় খৃস্টানদের দখলে চলিয়া যায়। ৬২৬/১১২৯ সাল হইতে আক্কা ছিল ফিলিস্তীনে খৃস্টান শক্তির প্রধান কেন্দ্র। এই সময় জেরুসালেমের St. John-এর Knights (বীর ব্রতিগণ) সেইখানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ গীর্জা নির্মাণ করেন এবং আক্কা-র নাম হয় Saintjean d'Acre। ৬৯০/১২৯১ সালে সুলতান আল-মালিকুল আশ্‌রাফ আক্কা দখল করিয়া ফিলিস্তীনে খৃস্টান অধিকারের অবসান ঘটান। এই সময় শহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং দীর্ঘ দিন তথায় ধ্বংসাবশেষ ও কতিপয় বাসিন্দা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। খৃ. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শায়খ জাহির গালিলীতে রাজ্য স্থাপন করত আক্কাকে রাজধানী মনোনীত করিলে ইহার পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। শহরটি পুনর্নির্মিত হয় এবং আহ্‌মাদ আল-জায্‌যার-এর রাজত্বকালে (১৭৭৫-১৮০৪) আক্কা আরও সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাঁহার শাসনামলেই নেপোলিয়ন বৃটিশ নৌবহর রক্ষিত এই বন্দরটিতে একটি ব্যর্থ অবরোধ পরিচালনা করেন। আল-জায্‌যারের উত্তরসুরিদের শান্তিপূর্ণ শাসনামলে আক্কার সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৮৩২ খৃস্টাব্দে শহরটি ইব্‌রাহীম পাশা দখল করিয়া ধ্বংস করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আক্কা আবার উত্থিত হয়। কিন্তু ১৮৪০ খৃ. বৃটিশ ও অস্ট্রীয়দের সমর্থনপুষ্ট তুর্কী নৌবহর উহার উপর বোমা বর্ষণ করে। তাহার পরও এই শহরটি কিছুটা উন্নতি সাধন করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ, ১১৬-১১৭; (২) মাক্‌দিসী, ৩খ., ১৬২-৬৩ (তু. ZDPV, vii, 155-56); (৩) ইদ্রীসী (=ঐ, ৮খ., ১১); (৪) ইয়াকূত, ৩খ., ৭০৭-৯; (৫) নাসির-ই খুস্‌রাও (Schefer), ৪৮ প.; (৬) Other descriptions translated by G. le Strange in Palestine under the Moslems," 328-34; (৭) E. Robinson, Neue biblische Forschungen, 115-29; (৮) Guerin, Galilee i, 502-25; (৯) Palestine Exploration Fund, Survey of Western Palestine, Memoirs, i, 160-7; (১০) Gaudefroy-Demombynes, la Syrie a l'epoque des Mamlouks, Paris 1923; (১১) F. M. Abel, Geographie de la Palestine, Paris 1933-38 (in particular, vol. II, 13); (১২) ঐ লেখক, Histoire de la Palestine depuis la conquete d' Alexandre jusqu'a l'invasion arabe, Paris 1952; (১৩) A. S. Marmadji, Textes geographiques arabes sur la Palestine, Paris 1951, 144-48.

F. Buhl (E.I.[2]) / মিনহাজুর রহমান

আল-আক্‌কাদ (العقاد) ঃ 'আব্বাস মাহ্‌মূদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসরীয় সংস্কৃতির বিকাশে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, তার্কিক ও সমালোচক। তিনি ১৮৮৯ খৃ. আসওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়াই মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি কায়রো গমন করেন। তিনি বেসামরিক দফতরে পরপর কয়েকটি ছোটখাট পদে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করিয়া প্রচলিত প্রথানুযায়ী শিক্ষার অভাব পূরণ করিতে থাকেন। সাহিত্য, দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের মধ্যে ছিল মিসরের তরুণ সমাজকে এই বিষয়গুলি ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সমন্বিত ধারণা দান করা। সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার রচনাবলী ও কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক লেখাতে খ্যাতনামা ইংরেজ কবি ও লেখক হ্যাযলিট, কোলরীজ মেকলে, মিল ও ডারউইনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি লেসিং শোপেনহৌর, নীৎসে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃ. প্রথম দশকের গোড়ার দিকে আক্‌কাদ ইব্‌রাহীম আল-মাযিনীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিল কবিতার প্রতি তাঁহার ভালবাসা (বিশেষ করিয়া Palgrave কর্তৃক সংকলিত ইংরেজী কবিতা গ্রন্থ Golden Treasury-র মত গ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত রোমান্টিক কবিতা) এবং অপরদিকে আহমাদ শাওকী, হাফিজ ইব্‌রাহীম প্রমুখ কবিগণ যেই ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই মিসরীয় নব্য ক্লাসিক্যাল কাব্যধারার প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ। আল-আক্‌কাদ, আল-মাযিনীর প্রথম কাব্য সংকলনের (১৯১৩ খৃ.) ভূমিকা লেখেন এবং সেই দশককালেই ইয়াক্‌জাতুস্-সাবাহ (১৯১৬) ও ওয়াহাজুজ্-জাহীরা (১৯১৭ খৃ.) নামক তাঁহার নিজের দুইখানি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। কবিতা বিষয়ে তাঁহাদের দুই বন্ধুর মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তৃতীয় আরেকজন কবি আব্দুর রাহমান শুক্‌রী, যিনি ছিলেন এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এই তিনজনকে একত্রে অনেক সময়ে দীওয়ান ধারার কবিও বলা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কতকটা ভুল নামকরণ। কেননা আদ্-দীওয়ান-এর রচয়িতা ছিলেন শুধু আল-আক্‌কাদ ও আল-মাযিনী, ইহা একখানা তীব্র সমালোচনা গ্রন্থ। আল-মাযিনী, হাফিজ ইব্‌রাহীমকে পাগলামি ও বিভ্রান্তির দায়ে অভিযুক্ত করেন, আর আল-আক্‌কাদ, শাওকীর সাময়িক কবিতাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেন। কবিতার প্রকৃতি ও ভূমিকা কি হওয়া উচিত সেই বিষয়ে এই তিনজন অভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন, কিন্তু আল-আক্‌কাদই উহার সমালোচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন, যেই কারণে তিনজনের এই দলটিকে মূলত স্মরণ করা হইয়া থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে আল-আক্কাদ ওয়াফ্দ-নেতা সা'দ যাগ্‌লুল-এর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন এবং পার্টির মুখপত্র আল-বালাগে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। সাহিত্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ক সেইসব লেখার অনেকগুলিই পরবর্তী কালে মুরাজাআত ফিল-আদাব ওয়াল-ফুনূন এবং মুতালাআত ফিল কুতুব ওয়াল-হায়াত নামে দুইখানি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইসমাঈল সিদ্‌কীর শাসন আমলে ১৯৩০ খৃ. দশকের প্রথমদিকে যখন শাসনতন্ত্র স্থগিত করা হয় তখন আল-আক্কাদ স্বীয় স্থির বিশ্বাস হইতে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করিয়া যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি লইয়া আল-হুকূকুল মুতলাক ফিল কারনিল ইশ্‌রীন নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেইজন্য তাঁহার নয় মাসের কারাদাণ্ড হয়। এই দশকেই তাঁহার আরও তিনখানি কাব্যগ্রন্থ (ওয়াহ্‌য়ুল আরবাঈন, হাদিয়াতুল কারাওয়ান ও আবির সাবীল), উপন্যাস সারাঃ ও ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক কালের সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণের ধারাবাহিক জীবনী গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থসমূহ ১৯৩০ খৃ. দশকে সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার সূচনা করে, যাহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিসরের বুদ্ধিজীবিগণের দৃষ্টি ধর্মীয় জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয় (সেই সকল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ছিলেন তাহা হুসায়ন ও মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল)।

১৯৩৮ খৃ. আল-আক্কাদ ওয়াফ্দ পার্টি ত্যাগ করিয়া আহ্‌মাদ মাহির ও আন্-নুক্‌রাশীর নেতৃত্বাধীন দলত্যাগী সা'দপন্থী গ্রুপ (Sadist group)-এ যোগদান করেন। তরুণতর বয়সে যে আত্মনির্ভরশীলতা ও স্পষ্টবাদিতা তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিল, বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমেই তাহা সন্দেহবাদ, অহমিকা ও চরম রক্ষণশীল মনোভাবে পরিণত হয়। পরে সা'দপন্থী গ্রুপও ত্যাগ করিয়া তিনি একান্তই নিজস্ব মতামত লইয়া থাকেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উদ্ভূত মুক্ত ছন্দের কবিতার তিনি যে শুধু বিরোধিতাই করিয়াছিলেন তাহাই নহে, বরং তিনি আরবীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁহার মত পরিবর্তন করেন, যদিও এই বিষয়ে জীবনের প্রথম দিকে তিনি নিজেই শুক্‌রীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অপর কয়েকজন রক্ষণশীল সমালোচকের সঙ্গে একযোগে তিনি "নিবেদিত" সাহিত্যের বিরোধিতা করেন। প্রকৃতপক্ষে যেমন David Semah মন্তব্য করিয়াছেন (Four Egyptian Literary Critics, লাইডেন ১৯৭৪ খৃ., পৃ. ২৫), মনে হয়, তিনি নিজের মতামতের বিরোধী কোন রকম সমালোচনাই সহ্য করিতেন না বা তাঁহার পূর্বেকার কোন মতবাদ কেহ অতিক্রম করিয়া যাক তাহাও তাঁহার অসহ্য ছিল।

আল-আক্কাদ-এর সৃজনশীল সাহিত্য ইহার স্বকীয় সাহিত্যিক মূল্যের কারণে ততটা নহে, বরং ঐতিহাসিক ঘটনা ভিত্তিক হইবার কারণেই যেন অধিকতর আকর্ষণীয়। তিনি বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিগত কবিতা রচনা করেন, কিছু সাময়িক বিষয় ভিত্তিক কবিতা রচনা করেন এবং কিছু ইংরেজী কবিতাও আরবীতে অনুবাদ করেন (দ্র. মুস্‌তাফা বাদাবী, A critical introduction to modern Arabic poetry, কেম্ব্রিজ ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ১০৯)। সারাঃ উপন্যাসে তিনি দুই প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিকে এই ধরনের পূর্বেকার অন্যান্য রচনার তুলনায় নূতনতর পরিচ্ছন্ন স্তরে দেখাইয়াছেন। কিন্তু বইখানি জুড়িয়া যে সন্দেহ ও প্রশ্ন প্রকাশ করা হইয়াছে (ছয়টি অধ্যায়ের শিরোনামই প্রশ্নবোধক) তাহাতে উহা প্রায় একটি বিমূর্ত বিশ্লেষণাত্মক অবতলে নামিয়া আসিয়াছে। কয়েকজন ব্যাখ্যাকারী এইরূপও মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই বইয়ে মহিলাগণের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা কিছুটা আত্মজীবনীমূলক-এর অধিক (আহমাদ হায়কাল, আল-আদাবুল কিসাসী ওয়াল-মাসরাহী, কায়রো ১৯৭১ খৃ., পৃ. ১৬৮; Hilary Kilpatrick, The modern Egyptian novel, লন্ডন ১৯৭৪, পৃ. ৩২; আবদুল হায়্যি দিয়াব, আল-মারআ ফী হায়াতিল আক্কাদ, কায়রো ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১০০ প.)।

আল-আক্কাদ তাঁহার বিভিন্ন লেখাতে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক যে মতবাদ জোরালভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন সেই একই মতবাদ বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণ সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার লেখাতেও পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ খৃ.-এর দশকে প্রাচীন কবিগণ সম্বন্ধে তিনি অগণিত প্রবন্ধ রচনা করেন (যেমন ইমরুউল কায়স, আবূ নুওয়াস, বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ ও আল-মুতানাব্বী)। তবে ইবনুর্-রূমী সম্বন্ধে তাঁহার যে পর্যবেক্ষণ ১৯৩১ খৃ. বই আকারে প্রকাশিত হয়, ইব্‌নুর রূমী ঃ হায়াতুহ মিন্ শি'রিহি যাহা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্তি বলিয়া পরিচিত, সেখানে আল-আক্কাদ বলিতে গেলে একজন অবহেলিত কবির বিশ্লেষণ প্রসংগে মনোবিজ্ঞান, মানবজাতি ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যের বিশ্লেষণ আল-আক্কাদ কর্তৃক এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন, যেইগুলি প্রায়শ সাহিত্য বহির্ভূত তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন আমলের আরবী কাব্যের ঐতিহ্যে এক নূতন অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়াছে। যাহা হউক, উহা সাহিত্য কীর্তি অপেক্ষা লেখকের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং সাহিত্যের বিশ্লেষণে খোদ গ্রন্থখানির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করার দায়িত্ব অর্পিত হইল পরবর্তী বংশধর (বিশেষ করিয়া মুহাম্মাদ মানদুর)-এর উপর যখন তাহারা আক্কাদ-এর মতবাদসমূহের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলির সমালোচনার প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন করিবেন।

১৯৬০ খৃ. মিসরীয় সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। শাওকী দায়ফ রচিত মাআল-আক্কাদ গ্রন্থ (ইক্‌রা সিরিজ নং ২৫৯, কায়রো ১৯৬৪)-এ তাঁহার এক ছবিতে দেখা যায়, এই চিরকুমার ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগে বসিয়া বই পড়িতেছেন (পৃ. ৬৫-এর বিপরীত দিকে)। তিনি ১৯৬৪ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত) ঃ (১) শাওকী দায়ফ, আল-আদাবুল আরাবী আল-মুআসির ফী মিস্‌র, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৩৬; (২) আবদুল হায়্যি দিয়াব, আব্বাস আল-আক্কাদ নাকিদান, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (৩) Mounah Khouri; Poetry and the making of moern Egypt. লাইডেন ১৯৭১ খৃ., স্থা.; (৪) S. Moreh, Modern Arabic poetry 1800-1970, লাইডেন ১৯৭৬ খৃ., স্থা.; (৫) নাদাব সাফ্‌রান, Egypt in search of

political identity, কেম্ব্রিজ-ম্যাসাচুসেটস ১৯৬১ খৃ.; (৬) এ. এম. কে. যুবায়দী, Al-Aqqad's critical theories with special reference to his relationship with the Diwan school and to the infiuence of European writers upon him, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ. ডি. থিসিস, ১৯৬৬ খৃ., অপ্রকাশিত; (৭) ঐ লেখক, The Diwan School, JAL, ১ (১৯৭০ খৃ.), পৃ. ৩৬; (৮) সালমা খাদ্‌রা জায়্যূসী, Trends and movements in modern Arabic poetry, লাইডেন ১৯৭৭ খ., ১খ., ১৫৩-৪, ১৬৩-৭৫।

R. Allen (E.I.[2] Supp.) / হুমায়ন খান

আক্কার (اكار) ঃ ('আ.) ব. ব. আকারাঃ (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ইকারাঃ, কৃষি), শাব্দিক অর্থ জমি-চাষী, কৃষক, প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক আরামীয় (Aramaic) ভাষার শব্দ (দ্র. Fraenkel, Die aramaischen Fremdworter im Arabischen, পৃ. ১২৮-৯)। সম্ভবত ইসলাম-পরবর্তী যুগে ইহা আরবীতে গৃহীত হয় (কুর্‌আনে এই শব্দটি নাই) এবং সিরিয়া ও ইরাকের আরামীয়গণকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই আরবদের দৃষ্টিতে শব্দটি নাবাত নামটির ন্যায়ই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইত (দ্র. LAI, ৫খ, ৮৫-৮৬)। এই কৃষকগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাগে জমি চাষ করিত। তাহারা সম্পদশালী জমিদারগণের জমি মুকাসামা (দ্র.) চুক্তির ভিত্তিতে চাষ করিয়া উৎপাদিত ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-সপ্তমাংশ পাইত [দ্র. (১) আবূ ইয়ূসুফ, কিতাবুল খারাজ, বূলাক ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৫২; (২) ইব্‌ন হাওকাল, সুরাতুল আরদ, সম্পা. Kramers, পৃ. ২১৮]। সিরিয়া ও ইরাকের উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূভাগ আরবগণ কর্তৃক বিজিত হইবার পরে আকারা সর্বনিম্ন হারে জিয্‌য়া কর প্রদান করিত জনপ্রতি বাৎসরিক ১২ দিরহাম হিসাবে (দ্র. বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ২৭১)।

'আব্বাসী আমলে আক্কারগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তখন তাহারা কাজের সন্ধানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং জমিদারগণের মধ্যে যাহারা সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক দিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে কাজ করিত (দ্র. সাবী, উযারা, সম্পা. Amedroz, পৃ. ২৫৯)। খৃস্টান পাদ্রীগণের গীর্জা সংলগ্ন জমিতেও তাহারা কাজ করিত (দ্র. শাবুশ্‌তী, আদ-দিয়ারাত, পৃ. ২১৪-১৫)। একটি প্রচলিত গল্প হইতে আমরা জনৈক আক্কার শ্রমিকের কথা জানিতে পারি। সে বসরায় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহ-ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত ছিল; সম্ভবত কৃষি মৌসুমের পরে। তাহার কাজ ছিল ধান ভানা, ষাঁড় ঘুরানো কলে চাউল গুড়া করা এবং উহা দ্বারা মনিবের জন্য রুটি তৈরি করা (দ্র. জাহিজ, বুখালা, কায়রো ১৯৬৩, পৃ. ১২৯)। সেই সময়কার আক্কারদের পরিশ্রমের জীবন ও কাজ আদায় করিবার জন্য মনিবদের কঠোরতা চিত্রিত করিবার জন্যই জাহিজ আক্কারী ও জমিদারের গল্পটি উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত জাহিজ একজন শায়খুল আকারা (আক্কারদের সর্দার)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা হইতে কোন একজন মান্যগণ্য শায়খ-এর অধীনে আকারাদের সংগঠিত সামাজিক দলের ইংগিত পাওয়া যায় (দ্র. হায়াওয়ান, ৫খ., পৃ. ৩২)। অন্তত ইরাকের সাওয়াদ (উর্বর অঞ্চল)-এর গ্রাম এলাকার অধিবাসিগণ ৩য়/৯ম শতক পর্যন্ত এবং সম্ভবত উহার পরেও আরামীয় ভাষাভাষী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে তুলনীয় মাস্'ঊদী, মুরূজ, ৭খ., পৃ. ১১৩-৪/২৭৯৬, আল-মু'তাসিম ও সাওয়াদের জনৈক বৃদ্ধ নাবাতী কৃষকের কাহিনী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত দ্র. (১) তানূখী, আল-ফারাজ বা'দাশ-শিদ্দা, কায়রো ১৯০৩ খৃ., ১খ., ১২৫-৬; (২) ছা'আলিবী, ছিমারুল কুলূব, কায়রো ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৯৫; (৩) আস-সাবী, The historical remains of Hilal al-Sabi, Leiden ১৯০৪ খৃ., পৃ. ৯১, ২১৬, ২৫৪; (৪) আন্-নাওবাখ্‌তী, ফিরাকুশ-শী'আ, ইস্তানবুল ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৬১; (৫) Lane, Lexicon, ১খ., ৭০-৭১; (৬) M. A. J. Beg. Agricultural and irrigational labourers in the social and economic life of Iraq during the Umayyad and Abbasid caliphates, Islamic Culture, January 1973, পৃ. ১৫-২২।

E.I.[2] Suppl. / হুমায়ন খান

আক্ কিরমান (آق كرمان) ঃ "শ্বেত নগর" অথবা শ্বেত বাণিজ্যিক কেন্দ্র। রুমেনিয়ার ভাষায় সেটাটী এলবা, রুশীয় ভাষায় বেল গোরোদ, নিয়েস্তার (Dniester) নদীর মোহনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর। প্রাচীন কালে ইহাকে টায়রাস (Tyras) বলা হইত। কনস্‌টানটাইন পরফিরোজেনেটাস (Constantine Porphyrogenetus) কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত (Moravcsik-Jenkins, 168, 62)-এর মতে দুর্গটিকে শ্বেত দুর্গ বলা হইত। অজ্ঞাতনামা রচয়িতার টোপারচা গোথিকাস (Toparcha Gothicus)-এ (B. Hase (ed.), Leo Diaconus, 496 ff.) ইহাকে মারোকাসট্রোন (Mourokastron) বা কৃষ্ণ দুর্গ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ১২৪১ সালের পর হইতে মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীন জেনোয়ার বণিকেরা এই শহরে ঘন্ ঘন গমনাগমন করিত এবং ইহাকে মারোকাসট্রোম (Mourocastrum) ও এলবুম কাসট্রোম (Album Costrum) নামেও চিহ্নিত করিত। ইব্‌ন সাঈদের অনুসরণে আবুল-ফিদা ইহাকে আক্‌চা কিরমান নামে অভিহিত করেন। আলী (kunh-ul-Akhban, vi, 218) আবুল ফিদাকে উল্লেখ করিয়া লিখেন, আকচা কিরমান বর্তমানে আক-কিরমান নামে পরিচিত। মারো কাসট্রো-মোনকাসট্রো (Maurocastro-Moncastro) একটি জেনোইস দুর্গ ছিল যাহা চতুর্দশ শতাব্দীতে ওফফিসিয়াম গাজারিয়া (Officium Gazariae) (খাযারিয়া-Khazaria)-এর শাসনাধীনে ছিল এবং কৃষ্ণ সাগরের উত্তরের জেনোইস উপনিবেশগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোলদাভীয়রা ও পরে তুর্কীরা এই জোনোইস দুর্গটির সংস্কার সাধন করেন এবং ইহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে শহরটি নবপ্রতিষ্ঠিত মোলদাভিয়া (Turkish Boghdan দ্র.) রাষ্ট্রের শাসক

কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং ১৪৮৪ সাল পর্যন্ত ইহা মোলদাভিয়া কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ১৪২০ সালে একটি উছমানী নৌবহর কর্তৃক দুর্গটি আক্রান্ত হয় এবং ১৪৫৫ সালে ইহার উপর আরও একটি আক্রমণ পরিচালিত হয়। তৃতীয় ভয়ভোদা পেট্রু (Voivodapetru III) মোলদাভিয়ার উপর উছমানী (Ottoman) সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নেন। ৫ রজব, ৮৬০/৯ জুন, ১৪৫৬ সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ একটি রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে সেটাটী এলবার বণিকদের আড্রিয়ানোপল, ব্রুসা ও ইসতামবুলে অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করেন।

সুলতান দ্বিতীয় বায়াযীদ নিজে অভিযান পরিচলনা করিয়া ১৪৮৪ সালের ৪ আগস্ট শহরটি দখল করেন (তু. ফাতহনামা-ই কারা বোগদান, পাণ্ডুলিপি, কায়রো, adab turki, 131, 103 f.; I. Ursu, Stefan cel Mare, Bucarest 1925, 202-4; I. Boghdan, Cronice inedite atingatoare de istoria Ramanilor, Bucarest 1895, 43, 58)। শহরের অধিবাসীদের অধিকাংশই ইস্তাম্বুল ও আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত হয় এবং আক কিরমান রুমেলিয়ার বেলেরবী (Beylerbeyi)-র অন্তর্গত একটি জেলায় (sandjak) পরিণত হয়। ১৫৯৩ সালে যখন ইয়ালেত সৃষ্টি করা হয় তখন eyalet of Ozu (দ্র.)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আইন-ই আলী, কাওয়ানীন-ই আল-ই উছমান (Ayn-i Ali, Kawanin-i Al-i Othman, Istambul 1280, 12)-এর মতে সাঞ্জাকটিতে ৯১৪টি টিমারস ছিল। বন্দরের শুল্ক এই সময়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। আওলিয়া চালাবী (Ewliya Celebi, v. 108 f.) ইহার বর্ণনা দিয়াছেন, যিনি ১৬৫৮ সালের মে মাসে শহরটি পরিদর্শন করেন। তিনি দ্বিতীয় বায়াযীদ, মাংগলী গিরায় খান, প্রথম সালীম কর্তৃক নির্মিত দুর্গ (বীরূনের পরিবর্তে দারুন পড়ুন) ও মসজিদগুলি, প্রথম সালীম কর্তৃক নির্মিত একটি ওয়াইজ জামিঈ (Waiz Djami'i), একটি মাদরাসা এবং দ্বিতীয় বায়াযীদ কর্তৃক নির্মিত একটি হাম্মাম-এর উল্লেখ করেন। নিস্‌তার নদীর অগভীর স্থানে অবস্থিত মায়াক বাবা সুলতানের মাযারের কথাও তিনি (vii, 501) উল্লেখ করেন। মুহাম্মাদ আফেন্দী আক কিরমানী একজন সুপরিচিত তুর্কী দার্শনিক এবং ঐ শহরের আজন্ম অধিবাসী ছিলেন (দ্র. Bursali Mehmed Tahir, Othmanli Mullifieri, i, 214)। আদি অধিবাসী ছাড়াও আক্‌কিরমান শহর ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলায় তুর্কী, ক্রিমীয় ও নগাই তাতারদের বাস ছিল। মোলদাভিয়ার ভয়ভোদা এরোন (Voivoda Aron) কর্তৃক ১৫৯৫ সালে দুর্গটি দখলের চেষ্টার পর হইতে তাতারদের তথায় বসবাস করিতে দেওয়া হয়।

১৫০২ সালে সোনালী গোত্র (Golden Horde)-এর শেষ প্রধান শায়খ আহমাদ তাঁহার সৈন্যদের পুনঃসংগঠনের নিমিত্ত আক কিরমানে পলায়ন করেন। দ্বিতীয় বায়াযীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর উদ্দেশে তৎপুত্র প্রথম সালীম আক কিরমানকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেন (১ এপ্রিল, ১৫১১)। ১৬১০ সালে ক্রিমিয়ার মুহাম্মাদ গিরায় ও শাহীন গিরায় ভ্রাতৃদ্বয় শহরটি ইউক্রেন আক্রমণের ঘাঁটিতে পরিণত করেন। অবশ্য তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রাতা খানজান বে গিরায় কর্তৃক বিতাড়িত হন (তু. I. H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, iii/i, 176)। ১৬১৮ ও ১৬৩৬ সালের মধ্যখানে সিলিসট্রিয়ার পাশা কান্‌তেমির দানিয়ুব ও নিস্তারের মধ্যবর্তী জায়গা নিয়ন্ত্রণ করত আক কিরমানের সমতল ভূমিতে কালগেই হুসাম গিরায়কে পরাজিত করেন (হাজ্জী খালীফা, Fedhlaka, ii, 187); কিন্তু চতুর্থ মুরাদ তাহার শিরশ্ছেদ করেন (Uzuncarsili, 180)। আওলিয়া চালাবী (vii, 497) আক কিরমানের দেওয়ালের অভ্যন্তরে তাতার মুহাম্মাদ গিরায় খান ও আদিল গিরায় খানের মধ্যকার যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করেন।

১৬৮৩ সালে কাযাক প্রধান কুনিকি আক কিরমান পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু সরদান বোসনাক সারী সুলায়মান পাশার চাপে পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য হন (Findiklili Mehmed Agha, Silahdar Tarikhi, Istanbul 1928, i, 397; ii, 127, 185)। ১৭৭০ সালে রাশিয়ান জেনারেল ইগেলস্ট্রোম (Igelstrom) শহরটি দখল করেন, কিন্তু ইহা কুচুক কায়নার্জার (art. 16) চুক্তি মুতাবিক তুর্কী সরকারের কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৭৮০ সালে দুর্গটির সংস্কার করা হয় (Topkapi Arsivi, E. 10, 416; ১৬৪৬ খৃ. হইতে অন্যান্য মেরামতের দ্র. ঐ, E. 5880, 6237)। ১৭৮৯ সালে পোটেমকিন শহরটি আবার দখল করেন (Djewdet, Tarikh.², iv, 332), কিন্তু ইয়াছি (Yassi) শান্তি চুক্তিতে (1792) ইহা তুর্কীর কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়, ইহার পর দুর্গটি শক্তিশালী করা হয়।

১৮০৬ সালে রুশ কর্নেল ফ্রস্টার ও প্রিন্স কান্তাকুজিনো শহরটি দখল করেন; তাতারগণ জেলাটি ত্যাগ করত নিস্তার নদী অতিক্রম করিয়া উহার পূর্ব তীরে চলিয়া যায়। বুখারেস্ট শান্তি চুক্তিতে (১৮১২) আক কিরমান রাশিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হয়। এইখানে ১৮২৬ সালে রুমেনিয়ান দেশীয় রাজ্যগুলি ও সার্বিয়া সংক্রান্ত তুর্কী রাশিয়ার মধ্যকার স্বল্পকালীন স্থায়ী আক কিরমান কনভেনশনটি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তী কালে শহরটি বেসারাবিয়া (Bessarabia)-র বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শরীক হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) N. lorga, Studii istanice asupra Chilieisi Cetatii-Albe, Bucarest 1899; (২) G. I. Bratianu Recherches sur Vicina et Cetatea Alba, Bucarest 1935; (৩) ঐ লেখক, Contributions al' histoire de Cetatea-Alba (Akkerman) aux III et XIV siecles, Acad. Roumaine, Bull. Sect. Hist., xiii, Bucarest 1927, 25 ff.; (৪) B. Spuler, Gesch. d. gold. Horde, 408 (commercial relations with Khwarizm and China in the Genoese period); (৫) Feridun Bey, Munshe'at-i Selatin, i, 312, 319; (৬) Hasan Esiri, MS Millet Kutuphanesi T 803 (cf. Babinger, 267); (৭) A. Decei, Les Fetihname-i Karabogdan des XV et XVI siecles, Actes XII Congr. Orient.; (৮) O. F. V. Schlechta-Wssehrd, Walachei, Moldau Bessarabien etc. in der Mitte

des vorigen Jahrh., SBAK Wien, 1863; (৯) Documente privitoare la istoria Romanilor, by E. de Hurmuzaki, Bucarest 1887 ff.; (১০) আওলিয়া চালাবী, সিয়াহাত নামা, ৫ খ., ১০৮-১১৪, জেওদেত মুদ্রণ; (১১) উর্দু দাইরা-ই মাআরিফ-ই ইসলামিয়্যা, ১ খ., ১৮১-১৮৪; (১২) I. Bowman, Le Monde Nouveau, পৃ. ২৪১।

A. Decel (E.I.²) / মুহাম্মদ তাওহীদ হুসায়ন

আক্‌চা (اقچة) ঃ (ক্ষুদ্র শ্বেত) তুর্কী ভাষায় উছমানী রৌপ্য মুদ্রার নাম, ইয়ূরোপীয় লেখকগণ উহাকে গ্রীক aspron হইতে নির্গত aspre বা asper-রূপে উল্লেখ করিতে অভ্যস্ত। ইরাকের সালজূক মুদ্রাকে দ্বাদশ শতাব্দীতে আক্‌চা বলা হইত (দ্র. রাওয়ান্দী, রাহাতুস্ সুদূর, পৃ. ৩০০; ঐ গ্রন্থে ১০০০ আক্‌চা মূল্যের একটি উপহারের উল্লেখ রহিয়াছে)। তুরস্কের উছমানী আমলের মুদ্রার নাম কোন সময়ই দিরহাম অথবা দীনার ছিল না। প্রথম হইতেই তাহাদের মুদ্রার নাম ছিল আক্‌চা-ই উছমানী যাহার অর্থ ছিল 'শ্বেত উছমানী' মুদ্রা। প্রথমে যে আক্‌চা-ই উছমানী চালু করা হইয়াছিল তাহার ওজন ছিল ৬ কীরাত (৮৫৩ গ্রাম), ইহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ছিল রৌপ্য এবং ব্যাস ছিল ১৮ মিলিমিটার [দ্র. اورجان দা.মা.ই], কিন্তু আক্‌চার ওজন সকল সময় এক রকম ছিল না। সময় অতিবাহিত হইবার সংগে সংগে ইহার মূল্যমানও হ্রাস পায় (দ্র. اسماعيل غالب، تقويم مسكوكات عثمانيه، جلد ٢، استانبول، ١٤٠٧)। উছমানী আমলে দ্বিতীয় মুরাদের শাসনকালে আক্‌চার আকার কিছুটা হ্রাস পাইলেও ইহার মানের বিশুদ্ধতা ও ওজন মোটামুটি ঠিকই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মাহ্‌মূদ, দ্বিতীয় বায়াযীদ ও প্রথম সালীমের অধীনে ইহার মান শতকরা পাঁচভাগ এবং ইহার ওজন শতকরা পৌণে চার ভাগ কীরাত পর্যন্ত হ্রাস পায়। প্রথম সুলায়মান ও দ্বিতীয় সালীমের অধীনে আক্‌চার মান-ক্ষয় রোধ করা হয় এবং এই মূল্যমান একইভাবে তৃতীয় মুরাদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় উছমানের আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ে ইহার মান একই অবস্থায় ও ইহার ব্যাস মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকিলেও ইহার ওজন অনিয়মিতভাবে হ্রাস পাইয়া দেড় কীরাতের বেশী থাকে নাই। ইহার ফলে এই মুদ্রা খুবই হাল্‌কা হইয়া পড়ে। উপরন্তু চতুর্থ মুরাদ, ইবরাহীম ও চতুর্থ মুহাম্মাদের শাসনামলে আক্‌চার রৌপ্যের পরিমাণ প্রথমে শতকরা ৭০ ভাগ এবং পরে শতকরা ৫০ ভাগে হ্রাস করা হয়। অবশ্য ইহার দরুন ওজন ও আকারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। মুদ্রার মান, আকার ও ওজনের এই সকল পরিবর্তনের ফলে অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় যে, প্রথমদিকে একটি উছমানী স্বর্ণমুদ্রার মূল্য যেই স্থানে ৪০ আক্‌চা ছিল, দ্বিতীয় মুস্‌তাফার আমলে মুদ্রা-সংস্কার ও কুরূশ মুদ্রার প্রচলন হইবার পর ঐ একই ওজন ও আকারের স্বর্ণমুদ্রার মূল্য প্রায় তিন শত আক্‌চা হইয়া যায়। পরে আক্‌চার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে পাইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা প্রচলিত মুদ্রা-ইউনিট বা কুরূশের প্রায় সমান হইয়া পড়ে এবং হিসাব রক্ষণের কাজেই শুধু আক্‌চার ব্যবহার হইতে থাকে। তান্‌জীমাত আমলে, এমনকি হিসাবরক্ষণের কাজেও উহা অচল হইয়া পড়ে; কেবল ওয়াক্‌ফ-এর হিসাবের বেলায় উহা প্রচলিত থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর আক্‌চা শব্দটি নগদ মুদ্রার অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং এখন হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আক্‌চা ও কুরূশের হিসাব হইত এইভাবে ঃ এক কুরূশ সমান চল্লিশ পারা, এক পারা সমান তিন আক্‌চা এবং এক আক্‌চা সমান তিন পূল তুর্কী। মুদ্রার একমাত্র মান হিসাবে কুরূশ প্রচলিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আক্‌চা দ্বারাই লেনদেনের সকল কাজকর্ম সম্পন্ন হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক কীসা (থলি) মুদ্রার (অর্থের) মূল্য ধরা হইত ত্রিশ হাযার আক্‌চা, ষোড়শ শতকে এই মূল্য হ্রাস পাইয়া কুড়ি হাযার আক্‌চা হয়, সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা আবার বৃদ্ধি পাইয়া চল্লিশ হাযার আক্‌চা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে পঞ্চাশ হাযার আক্‌চা হয়। কিন্তু এই শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এক থলির মান ৮০ হাযার আক্‌চায় উন্নীত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পাঁচ শত কুরূশকে এক কীসা-ই আক্‌চা (كيسه اتكچه) বলিয়া ধরা হইত।

তুরস্কের ইতিহাসে বিভিন্ন নামে আক্‌চার উল্লেখ রহিয়াছে ঃ য়ূয়ূফ আক্‌চা (زيوف اقچه), কিরপিক আক্‌চা (كرپك اقچه), কিযীল আক্‌চা (قزيل اقچه), মীখানা আক্‌চাহ্‌সী (ميخانه اقچه سى), চিল আক্‌চা (چل اقچه) প্রভৃতি। এই পারিভাষিক নামগুলি আক্‌চার বিভিন্ন মূল্যমান ও ওজন নির্দেশ করে। তাম্র মুদ্রাকে চূরুকে আক্‌চা (অচল মুদ্রা?) বলা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইস্‌মাঈল গালিব, তাক্‌বীম-ই মাস্‌কূকাত-ই উছমানিয়া, ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি.; (২) 'আলী, 'উছমানলী ইমপেরাতু'রলুগুনুন ইলক সিক্কাসী (TOEM. No. 48, 360 প.); (৩) সায়্যিদ মুস্‌তাফা নূরী, নাতাইজুল উকূআত, ১খ., ৬৬, ১৪৮, ২খ., ৯৯, প., ৩খ., ১০৬; (৪) Belin, Essai sur l' Histoire Ecanomique dela Turquie, JA. series vi, vol. iii; (৫) S. Lane-poole, The Coins of The Turks in the British Museum; (৬) আলী, Fatih Zamaninda akce ne idi? TOEM, no. 49; (৭) খালীল ইদ্‌হাম, মাসকূকাত-ই উছমানিয়া ইসতাম্বুল, ১৩৩৪ হি.; (৮) ইসমাঈল হাক্‌কী উযূন চারসীলী, তারীখ-ই লুগাত (যন্ত্রস্থ); (৯) রাওয়ান্দী, রাহাতুস্ সুদূর ও আয়াতুস্ সুরূর, লন্ডন ১৯২১ খৃ., পৃ. ৩০০, ৪৯০; (১০) জাওদাত পাশা, তারীখ, ১খ., ২৫৪ প.; (১১) বাশ বিকালাত আরসাঈবী, আমীরী, তাস্‌নীফী, আহ্‌মাদ ছালিছ দূরী, নং ১৪২৪০; (১২) ইবনুল আমীন তাসনীফী, খারিজিয়া নং ১৩২৯।

চারসীলী (দা.মা.ই.); H. Bowen (E.I.²) / মিনহাজুর রহমান

আক্‌ছাম ইব্‌ন সায়ফী (اكثم بن صيفى) ঃ ইব্‌ন রিয়াহ ইবনিল হারিছ ইব্‌ন মুখাশিন, আবূ হায়দা [বা আবুল হাফফাদ, আনসাব; তবে সেখানে উদ্ধৃত কবিতাকে "কিতাবুল মুআমমারীন," ৯২-এ রাবীআ ইব্‌ন উযায়্য (তিনিও উসায়্যিদী ছিলেন)-এর প্রতি আরোপ করা হইয়াছে], তামীম গোত্রের শাখা উসায়্যিদ বংশীয় ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগের একজন বিচারকও ছিলেন। আক্‌ছাম-এর জীবনী অধিকাংশই কিংবদন্তীমূলক কাহিনীতে পূর্ণ। অসংখ্য জনশ্রুতি হইতে জানা যায়, বিভিন্ন রাজা ও সর্দার তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। আক্‌ছামের বাণীসমূহ

জীবন, বন্ধুত্ব, আচরণ, মহৎ গুণাবলী, নারী ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ কথায় পরিপূর্ণ। এই সকল বাণীতে তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জ্ঞানী লুকমান হাকীম-এর সঙ্গে তুলনীয়। কোন কোন জনশ্রুতিতে তাঁহার নামে প্রচলিত অনেক বাণীই আসলে লুকমান হাকীম-এর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আক্‌ছাম মু'আম্মারীনগণের অন্যতম বলিয়া খ্যাত। কোন কোন মুসলিম আখ্যানে তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং জোর দিয়া বলা হইয়াছে, আক্‌ছাম ইসলাম সমর্থন করিয়াছিলেন এমনকি এরূপও বলা হইয়াছে, তিনি স্বগোত্রীয়গণকে ইসলাম কবুল করার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট গমন করিবার কালে শহীদ হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সকল বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে।

কূফাতে আক্‌ছাম-এর বংশধরগণ বসবাস করিতেন, বিশেষ করিয়া কাদী ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আক্‌ছাম-এর নাম উল্লেখ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জারীর ও ফারায্‌দাক-এর নাকাইদ (Bevan), নির্ঘণ্ট; (২) বালাযুরী, আন্‌সাবুল আশ্‌রাফ, ইস্‌তান্‌বুল পাণ্ডুলিপি, পত্র ৯৬৪r, ১০৭০r-১০৭৫r; (৩) ইব্‌ন হাবীব, আল-মুহাব্‌বার, নির্ঘণ্ট; (৪) সিজিস্‌তানী, কিতাবুল মু'আম্‌মারীন (Goldziher), ৯-১৮; (৫) জাহিজ, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৬) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৯৩৫, ৩৫, ১৩০, ২৪০; (৭) ঐ লেখক, উয়ূন, নির্ঘণ্ট; (৮) মুবার্‌রাদ, কামিল, কায়রো ১৩৫৫ হি., নির্ঘণ্ট; (৯) ওয়াশ্‌শা', ফাদিল, পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়াম, Or. ৬৪৯৯, পত্র ১১৮r, ১২১r; (১০) আগানী, নির্ঘণ্ট-সূচী; (১১) ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহ, ইক্‌দ, নির্ঘণ্ট; (১২) দাব্‌বী, ফাখির (Storey), নির্ঘণ্ট; (১৩) ইব্‌ন হাযম, জামুহারাত আন্‌সাবিল আরাব, ২০০; (১৪) ইবনুল আছীর, উস্‌দ, কায়রো ১২৮০ হি., ১, ১১১-৩; (১৫) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, নং ৪৮২।

M.J. Kister (E.I.2) / হুমায়ূন খান

'আক্‌দ (عقد) ঃ ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'আক্‌দ হইল যথাযথ আইনানুগ কোন চুক্তি, উহা দ্বিপাক্ষিক কোন চুক্তি কিংবা একতরফা কোন ঘোষণা হইতে পারে, যেমন অন্তিমকালীন নির্দেশ (ওসিয়াত)। ইহা সত্ত্বেও আক্‌দ দ্বারা এমন বিশেষ আইনানুগ কাজ বুঝায় যাহাতে দ্বিপাক্ষিক ঘোষণা থাকিবে, যেমন ঈজাব (ايجاب=প্রস্তাব) ও কবূল (قبول=গ্রহণ)। হানাফী মতে ঈজাব দ্বারা কোন বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না। কিন্তু মালিকী বিধান এই ব্যাপারে ভিন্ন। যাহা হউক, আক্‌দ তখনই আইনত কার্যকর হয় যখন ঈজাব-এর মুকাবিলায় কবূলও পাওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে আক্‌দ কিম্বা চুক্তি এবং কেবল অংগীকার যাহা বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত নহে অর্থাৎ ইদাত (عدة=ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি) ও ইবাহাত (সাধারণ অনুমতি)-এর মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণিত হওয়া প্রয়োজন।

আক্‌দ কেবল দ্বিপাক্ষিক মত প্রকাশেরই নাম নহে, প্রতি আক্‌দ-এর জন্য শাব্দিক কাঠামো (সীগা) অথবা কার্য পদ্ধতির প্রয়োজন হয় যাহা দ্বারা উভয় পক্ষ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে পারে। এই মত নীতিগতভাবে মুখ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে যদি কোন পক্ষ বাকশক্তিহীন না হয়। ইহা ছাড়া লিখিত চুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে যতক্ষণ না উভয় পক্ষ উপস্থিত থাকে। আক্‌দ-এর জন্য কোন নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম-পদ্ধতি নাই। সীগা-র ক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট ও ধরা বাঁধা প্রণালী নাই (ফিক্‌হবিদগণ আক্‌দ-এর জন্য সাধারণত অতীত কালের সীগা ধার্য করিয়াছেন)। সকল প্রকারের বাক্যই কার্যকর এই শর্তে যে, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবে। অবশ্য ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, ভবিষ্যত কাল বাচক ক্রিয়াপদ কোন প্রকারেই আক্‌দ-এর দৃঢ়তা সঠিকভাবে প্রকাশ করে না। বর্তমান কাল বাচক ক্রিয়াপদ কেবল তখনই উভয় পক্ষকে বন্ধনে আবদ্ধ করিবে যখন উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির দৃঢ় মনোভাব পূর্ব হইতেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য যদি আক্‌দ অতীত কাল বাচক ক্রিয়াপদবিশিষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে আক্‌দ-এর উদ্দেশ্য প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। আক্‌দ কেবল মুখ দ্বারা ব্যক্ত করিলেই আইনত গ্রহণযোগ্য হইবে।

অতএব, আক্‌দকে পারস্পরিক সমঝোতা ও উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশের মাধ্যম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আক্‌দ সম্পাদিত করার উদ্দেশ্য হইল ঃ উক্ত পারস্পরিক চুক্তিকে আইনসম্মতভাবে গ্রহণ করা। এইভাবে বিক্রয় চুক্তির ফল এই দাঁড়ায়, বিক্রয়কৃত বস্তুর মালিকানা অবিলম্বে বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। মালিকানার এই হস্তান্তর বিলম্বিত হইবার অবকাশ রাখে না, আক্‌দ-এর সংজ্ঞায় ইহা অন্তর্ভুক্ত নহে। আক্‌দ-এর কারণে উভয় পক্ষের মধ্য হইতে কোন এক পক্ষের উপর কিছু দায়দায়িত্ব অর্পিত হইবে। ইসলামী আইনে কিছু নূতন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আক্‌দ-এর প্রধান উদ্দেশ্য নহে, বরং উহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল উভয় পক্ষ হইতে আইনানুগ কাজের মাধ্যমে একটি নূতন আইনসঙ্গত অবস্থার সৃষ্টি করা অথবা বর্তমান আইনানুগ অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করা। এই নূতন অবস্থার দরুন অথবা পুরাতন আইনানুগ অবস্থার পরিবর্তনের ফলে স্বভাবত এমন এক আইনানুগ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে বিক্রীত বস্তু ক্রেতাকে অর্পণ করা হয় এবং ক্রেতা উহার মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকে। বিক্রেতার তরফ হইতে বিক্রয়কৃত বস্তুর হস্তান্তর এবং ক্রেতার তরফ হইতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির ফলাফল (হুক্‌মুল আক্‌দ) নহে, বরং ইহা হইল চুক্তি সম্পর্কিত অধিকার (হুকূকুল আক্‌দ)। যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ হুকূকুল আক্‌দ সম্পাদন করে অর্থাৎ বিক্রেতা বিক্রয়কৃত বস্তু হস্তান্তর করে এবং ক্রেতা উহার মূল্য পরিশোধ করে তাহা হইলে এই আদান-প্রদানকে আক্‌দ নামে আখ্যায়িত না করিয়া মুআতাত (معاطاة=পারস্পরিক লেনদেন) বলা হইবে। লেনদেন নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট উভয় বস্তুর ক্ষেত্রে সম্পাদিত হইতে পারে। ইমাম কারাখী (র) এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহার নিকট লেনদেন নিকৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে সম্পাদিত হয়, উৎকৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে নহে (দ্র. আল্লামা ইবনুল আবিদীন, রাদ্দুল মুহ্‌তার আলাদ-দুররিল মুখ্‌তার দিল্লী, ৪খ., পৃ. ১১)। পারস্পরিক এইরূপ ক্ষুদ্র বস্তুর লেনদেন নিঃসন্দেহে বৈধ।

কিছু মূলনীতির অধীনে এই পন্থা মূল্যবান বস্তুর আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদি উহাতে চুক্তির বাস্তবায়ন অন্ততপক্ষে এক পক্ষ হইতে কার্যকর করা হয়। কিন্তু মূলত আক্দ এমন এক সীগা (শাব্দিক কাঠামো)-র প্রয়োগ কামনা করে যাহা অবশ্যই আইনের ক্ষেত্রে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিক্রেতা ও ক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিবার পর ক্রেতা যদি বিক্রয়কৃত বস্তু লইয়া এমন অবস্থায় প্রস্থান করে যে, সে এখন পর্যন্ত উহার মূল্য পরিশোধ করে নাই অথবা বিক্রেতা মূল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতা এখন পর্যন্ত বিক্রয়কৃত বস্তু গ্রহণ করে নাই, এই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হইয়া যায় যদি উভয় পক্ষের কেহ অস্বীকার করে তাহা হইলে বিচারক তাহাকে বাধ্য করিবে (ঐ)।

এখানে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, এমন কিছু চুক্তি আছে যাহাতে একমাত্র বিক্রয়যোগ্য বস্তু হস্তান্তর করাকে আক্দ সম্পন্ন হওয়ার জন্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বিক্রয়যোগ্য বস্তু হইল যাহা মূল্য দ্বারা ক্রয় করা যায়। ধার করা বস্তু, বন্ধকী বস্তু অথবা দানের বস্তুকে বিক্রয়যোগ্য বলা যায় না। এই সকল বস্তুকে সরঞ্জাম বলা হয়। এই পরিস্থিতি নমুনাসম্পন্ন অথবা নমুনা নাই এমন সব বস্তু ধার করা, বন্ধক রাখা অথবা দান করার ক্ষেত্রে দেখা দেয় যাহা ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রকৃত চুক্তিসমূহের (উকূদ) সমপর্যায়ের বলিয়া ধরা হয়।

আক্দ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সময় ও স্থানের ঐক্য হইল পূর্বশর্ত। আক্দ হইল একটি সামগ্রিক বিষয় যাহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। চুক্তি সম্পাদন "সাফ্কা" এক ও অবিভাজ্য এই অর্থে, প্রস্তাব (ঈজাব) আংশিকভাবে গ্রহণ করা যায় না, যদিও ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনুরূপভাবে একই প্রস্তাবের দুইজন গ্রহীতা থাকিলে একজন উহা গ্রহণ করিবে এবং অপরজন প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহা হইতে পারিবে না। অবশেষে যদি চুক্তিতে এমন কোন বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয় যাহার আদান-প্রদান নিষিদ্ধ সেই ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আক্দ (صفقة) এই ধারণা আক্দকে সুদৃঢ় রূপ দান করিয়াছে। অতএব, আক্দ-এর ক্ষেত্রে একটির অধিক চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না। অন্যদিকে আক্দ-এর চুক্তি একই বৈঠকে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক (যাহাকে মাজ্লিসুল-আক্দ বা চুক্তি সম্পাদনের বৈঠক বলা হয়)। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আক্দ-এর জন্য চুক্তি সম্পাদনকারীদেরকে অবশ্যই একই স্থানে বসিয়া সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই দিক দিয়া আক্দ সম্পন্ন হওয়ার জন্য তিনটি অখণ্ড বিষয়ের প্রয়োজন (দ্র; Ch. Chehata, Theorie generale, সংখ্যা ১১৬)।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আক্দ-এর সহিত কোন শর্তের সংযোগ আইনত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে যতক্ষণ না উক্ত শর্ত স্বয়ং আক্দ-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে, যাহাতে সহজে উহাকে আক্দ-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা যাইতে পারে। এই প্রকারের শর্তগুলোকে আস্লী (জরুরী, essentialia) ও যাতী (naturalia) বলা হয়। অন্যান্য 'আরিদী (আপতনিক, accidentalia) জাতীয় শর্তসমূহ বাতিল বলিয়া ধরা হইবে। অতএব, যদি কোন বিক্রয় চুক্তিপত্রে এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, বিক্রয়কৃত বস্তুর মালিকানা ক্রেতা লাভ করিতে পারিবে না তাহা হইলে উক্ত শর্ত অর্থহীন ও বাতিল পরিগণিত হইবে।

উহার অর্থ কি ইহাই, ইসলামী আইনে সকল চুক্তিপত্রের ধারা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং চুক্তিকারিগণ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এমন কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে না যাহার ধারা সম্পর্কে ইসলামী আইনে (শারা') পূর্ব হইতেই বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই? উহার উত্তর সম্ভবত এইভাবে প্রদান করা হয়, মুসলমানদের কিছু শর্ত মানিয়া চলিতে হয়, কিন্তু একই সাথে সকল প্রকারের চুক্তিকে উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং শারা' অর্থাৎ কুরআন, হাদীছ ও ইজ্মা'-এর ভিত্তিতে উহার বৈধতা অথবা অবৈধতার মীমাংসা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের শর্তাবলী ইসলামী শরী'আতের বিধি-নিষেধের ন্যায় মর্যাদা রাখে এবং আইনবিদগণ চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে যে সকল আইন রচনা করিয়াছেন তাহা বাতিল হওয়ার অবকাশ থাকে, সে ক্ষেত্রে চুক্তির স্বাধীনতা অনেকাংশে সীমিত হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ইহাও ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে, চুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মুসলমানদের সামাজিক নিয়ম দুইটি প্রধান নীতির উপর ভিত্তিশীল ঃ (১) আক্দ সূদ (রিবা) ও সূদের আশংকা (শুব্হাতুর্ রিবা) হইতে মুক্ত হইতে হইবে; (২) আক্দ প্রবঞ্চনামুক্ত হইতে হইবে অর্থাৎ উভয় পক্ষের কাহারও জন্য প্রতারণার আশংকা থাকিবে না।

আক্দ প্রয়োজনীয় শর্তাবলীসহ সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তিগত কোন ত্রুটির কারণে আইনত উহা বাতিল হইতে পারে না যতক্ষণ না উহাতে ইক্রাহ (অবৈধ বল প্রয়োগ) পরিলক্ষিত হয়। ইক্রাহ-এর জন্য ফিক্হশাস্ত্রে একটি পৃথক অধ্যায় আছে। যে পক্ষ ইক্রাহ-এর শিকার হইয়াছে সেই পক্ষ চুক্তিগত অধিকার (হুকূকুল আক্দ) বাতিল করিতে পারে। অপরদিকে চুক্তিতে যদি কোন প্রতারণা দেখা দেয় তাহা হইলে উহাতে কেবল তখনই আপত্তি করা যাইবে, যখন উহার ফলে প্রতারিত পক্ষ অধিক পরিমাণ ক্ষতির (গাবন ফাহিশ) সম্মুখীন হয়। চুক্তিপত্রের সামান্য ভুলত্রুটি সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। যদি কাহাকেও প্রতারণামূলক নিকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করা হয় তাহা হইলে সে উক্ত চুক্তিপত্র কেবল তখনই বাতিল করিতে পারিবে যদি উহাতে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, আর তাহা না দিয়া অন্য রকম দ্রব্য প্রদান করা হয়। এই বাতিল প্রতারণার কারণে নহে, বরং স্থিরীকৃত চুক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে কার্যকর হইবে।

এমন আক্দ যাহা প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করে না আইনত অকার্যকর ও বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইবে। তবে হানাফী মায্হাবে বাতিল ও অনিয়মিত (ফাসিদ) চুক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। আক্দ তখনই বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন উহার এমন কোন শর্ত (রুকন) অকার্যকর থাকে যাহার উপর আক্দ সম্পন্ন হওয়া নির্ভর করে। ইহা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় চুক্তিপত্র (আক্দ) কেবল অনিয়মিত (ফাসিদ) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অনিয়মিত চুক্তি আইনত বাতিল চুক্তির ন্যায় বর্জিত ও অর্থহীন। তবে এই উভয় প্রকারের চুক্তির পার্থক্য হইতে তখনই উপকৃত হওয়া যাইতে পারে যখন তৃতীয় কোন পক্ষের স্বার্থ রক্ষা উহার

সহিত জড়িত থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি অনিয়মিত (ফাসিদ) চুক্তি অনুযায়ী কোন সম্পত্তি লাভ করে, তাহা হইলে সে উহার মালিকানা বৈধ উপায়ে তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করিতে পারিবে এই শর্তে, সে ইতিপূর্বে উক্ত সম্পত্তির অধিকার ভোগ লাভ করিয়া থাকিবে। যদিও এই অবস্থায় মালিকানার হস্তান্তর এমন এক ব্যক্তির তরফ হইতে হইল যে প্রকৃতপক্ষে উহার মালিক নহে, কিন্তু এই হস্তান্তর বৈধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কেননা তৃতীয় পক্ষ যে এই সম্পত্তি উহার মালিক হইতে লাভ করিয়াছে এই ব্যাপারে অজ্ঞ হইতে পারে যে, উহার মালিকানায় অনিয়ম (ফাসাদ) রহিয়াছে। তৃতীয় পক্ষের এই অধিকার সংরক্ষণ হানাফী আইনশাস্ত্রের ফাসিদ চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে (দ্র. Ch. Chehata, in Travaux de le Semaine de Droit Musulman, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩৬ প.)।

যাহা হউক, ইহাও লক্ষণীয় যে, এমন অনেক চুক্তি আছে যাহা না বৈধ, না অবৈধ, বরং উহা আক্‌দ-এর তৃতীয় শ্রেণীর সহিত সংশ্লিষ্ট। এই প্রকারের আক্‌দকে "মাওকূফ" (স্থগিত) আক্‌দ বলে। যেমন, এমন এক চুক্তি যাহা কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক অথচ বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের বৈধ অভিভাবকের মতামত ব্যতিরেকে সম্পাদন করে। বিনিময়হীন বিষয় (যথাঃ হাদ্‌য়া) ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে নাবালেগ, অথচ বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হইবে না। এক্ষেত্রে চুক্তি কেবল অকার্যকর থাকিবে (তু. Art. 108 of the German civil code), তবে বৈধ অভিভাবকের অনুমতি (ইজাযত) সাপেক্ষে উহা পূর্ণরূপে কার্যকর হইবে। অনুরূপভাবে কোন অধিকারপ্রাপ্ত নহে এমন ব্যক্তির সম্পাদিত চুক্তি অকার্যকর থাকিবে যতক্ষণ না প্রকৃত অধিকারী (verus dominus) উহার অনুমতি প্রদান করেন। এমতাবস্থায় এইরূপ চুক্তি কোনরূপ বৈধতার অধিকার রাখে না। এই প্রকারের আক্‌দ উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে এবং একইভাবে তৃতীয় পক্ষের ক্ষেত্রেও অকার্যকর (মাওকূফ) থাকিবে (যতক্ষণ না অভিভাবক অথবা প্রকৃত মালিক অনুমতি প্রদান করেন)।

কোন আক্‌দ (চুক্তি) সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কিম্বা পক্ষের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার জন্য উহাতে প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন পড়ে। হানাফী মতে প্রতিনিধি আইনত স্বীয় মক্কেলের পুরাপুরি স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। আক্‌দ সরাসরি মক্কেলের উপর কার্যকর হওয়ার জন্য প্রতিনিধিকে অবশ্যই নিজ মক্কেলের নামে কাজ করিতে হইবে (alieno nomine)। এই ক্ষেত্রে তিনি কেবল একজন দূত ও মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করিবেন। যদি তিনি স্বীয় নামে (proprio nomine) কাজ করেন যাহা সাধারণত একজন ওয়াকীল করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই অবস্থায়ও আক্‌দ মক্কেলের উপরই কার্যকর হইবে। কিন্তু আক্‌দ-এর কারণে যে দায়-দায়িত্বের উদ্ভব হয়, মক্কেলের জন্য উহা অবশ্য পালনীয় হইবে না, কেবল ওয়াকীলের ক্ষেত্রেই উহা অবশ্য পালনীয় হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তির আইনানুগ প্রতিনিধি যদি তাহার পক্ষ হইতে কোন সম্পদ ক্রয় করে তাহা হইলে তিনি নিজেই উহার মূল্য পরিশোধের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সম্পত্তির মালিক সরাসরি মক্কেলই হইবেন। আহ্‌কামুল আক্‌দ ও হুকূকুল আক্‌দ-এর মধ্যে পার্থক্যের যে বর্ণনা ইতিপূর্বে প্রদান করা হইয়াছে উহার ব্যাখ্যা এইখানে হইয়া যায় (দ্র. Chefik Chehata, La representation dans les actes juridiques en droit musulman hanefite, d'apres les textes de Shaybani, যাহা Proceeding of the Congress of Comparative Law-এ ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে প্যারিস প্রকাশিত হইয়াছে)।

বৈধ আক্‌দ আইনত অবশ্য পালনীয় হইয়া যায়, কিন্তু এই নিয়ম বহির্ভূত কিছু চুক্তিও আছে; যেমন প্রতিনিধিত্ব (ওয়াকালাত), উত্তম ঋণ (কার্‌দ হাসানা), যামানত (কাফালাত), অংশীদারিত্ব (শিরকাত), আমানত, দান ইত্যাদি এমন সব চুক্তি, যাহা মৌলিকভাবে বাতিল হইতে পারে। এই প্রকারের চুক্তিতে অবস্থাভেদে প্রতিটি পক্ষেরই স্বাধীনতা আছে যে, তিনি আক্‌দ-এর বাধ্যবাধকতা হইতে একতরফা ঘোষণা দ্বারা মুক্ত হইবেন। তবে দানের ক্ষেত্রে আদালতের আদেশের প্রয়োজন হইবে। (ইহা একটি বিতর্কিত বিষয়। কোন কোন মুজ্‌তাহিদের দানের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ বৈধ নহে, বরং উভয় পক্ষের ঐকমত্য কিংবা আদালতের আদেশ অনুসারে ফায়সালা হইবে। যদি দানকারী দান করিবার পর দান গ্রহণকারীর মতামত ব্যতিরেকে অথবা আদালতের আদেশের বিপরীত ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে লুণ্ঠনকারী বলা হইবে। যদি দানকৃত বস্তু দানকারীর হাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে দানকারী উহার পণ আদায় করিবে (দ্র. গায়াতুল আওতার, ৩খ., অনু. দুররুল মুখ্‌তার, অনুবাদক মাওলাবী খুররাম আলী, মু. সিদ্দীকী বিরীলী, ২খ., ৫০৪)। দানের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ মাক্‌রূহ তাহরীমী (গায়াতুল আওতার, ৩খ., ৪৯৮)। ইহা ছাড়া ইজারা চুক্তিও বাতিল হইতে পারে যদি উভয় পক্ষে কেহ কোন কারণে গ্রহণযোগ্য ওজর পেশ করে। পরিশেষে বলা যায়, প্রতিটি চুক্তির ক্ষেত্রে স্বভাবত একটি বিশেষ শর্ত আরোপ করা যাইতে পারে যাহার ফলে কোন এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষই সমভাবে এই অধিকার লাভ করিবে যে, সে যখনই ইচ্ছা করিবে তখন স্বীয় চুক্তিপত্র প্রত্যাহার করিতে পারিবে (উহাকে ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিভাষায় খিয়ারুশ্‌ শারত বলে)।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় চুক্তি সর্বদাই বাতিল করা যাইতে পারে। উহাকে ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিভাষায় ইকালা (إقالة) বলা হয় এবং উহার বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। কিন্তু নীতিগতভাবে আক্‌দ এই কারণে বাতিল করা যাইতে পারে না যে, উহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। যেমন বিক্রয়কারী চুক্তিতে কোন বিশেষ শর্তের অনুপস্থিতির কারণে এই দাবি করিতে পারে না, বিক্রয় চুক্তি বাতিল করা হউক এই কারণে যে, ক্রেতা চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ch. Chehata, Esai d'une theorie generale de l' obligation en droit musulman,

১খ., কায়রো ১৯৩৬ খৃ.; (২) D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita, ২খ., রোম ১৯৩৮; (৩) Sim Toledo, Analyse de la theorie des contrats et obligations en droit civil ottoman, thesis, Paris ১৯১৫ খৃ.; (৪) G.G.C. van den Berg, De contractu "do ut des", thesis, Leiden ১৮৬৮ খৃ. (Ital. trans. Gatteschi, Alexandria ১৮৭৭ খৃ.); (৫) Z. A. Rifai, Le consentement et les vices du consentement en droit musulman hanefite, thesis, Nancy ১৯৩৩ খৃ.; আরবী ভাষায় আধুনিক গ্রন্থাবলী ঃ (৬) আলী আল-খাফীফ, আহ্কামুল মু'আমালাতিশ্ শারীআ, ৩য় সং., কায়রো ১৯৪৭ খৃ.; (৭) মুহাম্মাদ আবূ যাহ্‌রা, আল-মিল্কিয়্যা ওয়া নাজারিয়্যাতুল আক্দ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ.; (৮) মুহাম্মাদ ইয়ূসুফ মূসা, আল-আম্ওয়াল ওয়া নাজ্রিয়্যাতুল আক্দ ফিল-ফিক্হিল ইসলামী, ২য় সং., কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৯) সুবহী মাহ্মাসানী, আন-নাজারিয়্যাতুল আম্মা লিল-মূজাবাত ওয়াল-উকূদ, ২খ., বৈরূত ১৯৪৮ খৃ.; (১০) মুস্তাফা আহ্মাদ আয্-যারকা, আল-মাদ্খালুল ফিক্হিল আম্ম ইলাল-হুকূকিল মাদানিয়্যা ফিল-বিলাদিস সূরিয়্যা, ১খ., দামিশ্ক ১৯৫২ খৃ.; (১১) আবদুর রায্যাক আস্-সান্হূরী, মাসাদিরুল হাক্ক ফিল ফিক্হিল ইসলামী, ১খ., সীগাতুল আক্দ-কায়রো ১৯৫৪।

বিশ্বাস সংক্রান্ত তথ্যাবলী অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের মতবাদ অনুযায়ী যে সকল তথ্যের আলোচনা বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে হইয়াছে ঃ (১) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী, আল-আস্ল, কিতাবুল বুয়ূ ওয়াস-সালাম, সম্পা. শাফীক শিহাতা, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (২) আস্-সারাখ্সী, আল-মাব্সূত, ৩০খ., কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৩) আস্-সারাখ্সী, আল-মাব্সূত, ৩০ খ., কায়রো ১৩২৪/১৯০৬; (৪) আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তার্তীবিশ্ শারাই, ৭ খণ্ড, কায়রো ১৩২৮/১৯১০।

Ch. Chehata (E.I.[2]) / মুহম্মদ ইসলাম গণী

আক্দারিয়্যা (اكدرية) ঃ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি সুপরিচিত জটিল আইন বিষয়ক প্রশ্নের নাম, যাহা মাসাইল মুলাককাবা (অর্থাৎ "বিশেষ নামে অভিহিত" বিষয়সমূহ)-এর অন্তর্গত। যখন একজন মহিলা তাহার উত্তরাধিকারী রাখিয়া যায় ঃ (১) স্বামী, (২) মাতা, (৩) পিতামহ ও (৪) ভগিনী [যদি সে তাহার শারীকা (অংশীদার) বা উখ্ত্ লিল-আব অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভগিনী হয়], তখন স্বামী $\frac{১}{২}$ ও মাতা $\frac{১}{৩}$ (তু. কুরআন ৪ ঃ ১২-১৩) পায়। অতএব, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর কেবল $\frac{১}{৬}$ অংশ পিতামহ ও ভগিনীর জন্য অবশিষ্ট থাকে। আসাবাত আইন অনুযায়ী শেষোক্ত দুইজন যখন একই সাথে উত্তরাধিকারী হয় তখন তাহাদেকে সাধারণত এইরূপে বিবেচনা করা হয়, ভগিনী পিতামহের অংশের অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হয়, আর আস্হাবুল ফারাইদকে (কুরআন ঐ উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পত্তির যে অংশ বরাদ্দ করিয়াছে) পুরাপুরি বিতরণের পর তাহারা একসঙ্গে অবশিষ্ট অংশ পায়।

কুরআনের ৪ ঃ ১২-এর প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে পিতামহ যে কোন অবস্থাতেই সমস্ত উত্তরাধিকার সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশের স্বত্ব দাবি করিতে পারে। তখন ভগিনী কিছুই পাইবে না। ইহা মূলত হানাফীদের অভিমত। তাহাদের মতানুসারে পিতামহ এই অবস্থায় ভগিনীকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে। অন্যান্য মাযহাব অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে পিতামহ ও ভগিনী আসাবা হিসেবে গণ্য হইবে না, কিন্তু তাহারা স্বামী ও মাতার ন্যায় কুরআনে তাহাদের জন্য নির্ধারিত অংশটুকু পাইবে। ইহার বণ্টন নিম্নরূপ ঃ

স্বামী	$\frac{১}{২} = \frac{১}{২}$
মাতা	$\frac{১}{৩} = \frac{১}{৩}$
পিতামহ	$\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$
ভগিনী	$\frac{১}{২} = \frac{১}{২}$

এই অংশসমূহের যোগফল $\frac{৬}{৯}$।

আওল (দ্র.) দ্বারা এই নয়-ষষ্ঠাংশকে নয়-নবমাংশে পরিণত করা হইয়াছে।

অতঃপর স্বামী পাইবে	$\frac{১}{২}$
মাতা পাইবে	$\frac{১}{৩}$
পিতামহ পাইবে	$\frac{১}{৬}$
ভগিনী পাইবে	$\frac{১}{২}$

যেহেতু ভগিনী কেবল পিতামহের অংশের অর্ধেকের স্বত্ব দাবি করিতে পারে, সেহেতু এই দুই অংশের সঠিক অনুপাত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহারা একসাথে পাইবে $\frac{৪}{৯} = \frac{১২}{২৭}$, কিন্তু পিতামহ পায় $\frac{৮}{২৭}$ ও ভগিনী $\frac{৪}{২৭}$।

আক্দারিয়্যা নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন, বিষয়টি নিজেই হইল আকদার অর্থাৎ ঝামেলাপূর্ণ, দুর্বোধ্য অথবা এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নীতিসমূহ ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যাঘাতগ্রস্ত। অন্যরা বিশ্বাস করে, আকদার সম্ভবত একজন মানুষের নাম, যাহার নিকট আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এই বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাজুল আরূস, ৩খ., ৫১৮; (২) মুতার্রিযী, আল-মুগ্‌রিব ফী তার্তীবিল মুরিব; (৩) লিসানুল আরাব, ৬খ., ৪৫০; (৪) W. Marcais, Des parents et allies, Rennes ১৮৯৮, ১৫৪ প.; (৫) ইব্ন হাজার আল-হায়ছামী, তুহ্ফা, কায়রো ১২৮২ হি., ৩খ., ১৫; (৬) Santillana Istituzioni, ২, ৫১৭ প.; (৭) ঐ লেখক, Sommario del diritto malechita di Halil Ibn Ishaq, ii, Milan ১৯১৯, ৮২৩; (৮) H. Laoust, Le Precis de droit d' Ibn Qudama, বৈরূত ১৯৫০, ১৩৯; (৯) Sir R. K. Wilson, Anglo-Muhammadan Law, ৬ষ্ঠ সং., ২৩৯ প.।

Th. W. Juynbool (E.I.[2]) / উম্মে সালেমা বেগম

আক্‌দুল আনামিল (দ্র. হিসাবুল আক্দ)

আক্‌দেনিয (দ্র. বাহ্‌রুর রূম)

আকবার (اكبر) ঃ মুগল বংশের তৃতীয় বাদশাহ (৯৪৯/১৫৪২-১০১৪/১৬০৫)। তিনি উনপঞ্চাশ বৎসর আট মাস তিন দিন রাজত্ব করেন (মুনিলাল, আকবর, কলিকাতা ১৯৮০ খৃ., পৃ. ১)। ভারতীয় ধূমকেতু নামে খ্যাত সূর বংশীয় শাসক শের শাহের হস্তে পরাস্ত ও বিতাড়িত হতভাগ্য বাদশাহ হুমায়ূন তাঁহার ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া পারস্য গমনের পথে অমরকোট (দ্র.)-এর রানা প্রসাদের রাজ্যে আশ্রয় লাভ করেন। স্থানটি সিন্ধু অঞ্চলের থর পারকার জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানেই আকবারের জন্ম। মাতার নাম হামিদা বানু বেগম। জওহার রচিত তাযকিরাতুল ওয়াকি'আত অনুযায়ী পূর্ণিমার সময় বৃহস্পতিবার (১৪ শাবান, ৯৪৯ / ২৩ নভেম্বর, ১৫৪২) তাঁহার জন্ম তারিখ। কিন্তু রাজদরবারের জ্যোতিষীর পরামর্শে রবিবার, ৫ রাজাব, ৯৪৯/ ১৫ অক্টোবর, ১৫৪২ সাল, তাঁহার জন্ম তারিখ ঘোষিত হয়। আবুল ফজলসহ প্রায় অনেক ঐতিহাসিকই তারিখটি উল্লেখ করিলেও ঐতিহাসিক V.A. Smith তাঁহার জন্ম তারিখ ২৩ নভেম্বর/ ১৪ শা'বান বলিয়া গুরুত্ব আরোপ করেন (Muni Lal, Akbar, পৃ. ১ দ্র.)। দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য হুমায়ূন পুত্রের নাম রাখেন বদরুদ্দীন (ধর্মের পূর্ণ চন্দ্র)। তাঁহার আকবর নামটি রাখা মাতা হামিদা বানু বেগমের পিতা শায়খ আলী আকবার জামী-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে।

জন্মের পর হইতেই আকবারকে ভাগ্য বিড়ম্বনার মধ্যে কাটাইতে হয়। তাঁহার জন্মের অল্পকাল পরই তৎপিতা হুমায়ূন এই উপমহাদেশ ত্যাগ করিয়া পারস্যে চলিয়া যান এবং ঐ সময় শিশু আকবারের লালন-পালনের ভার অর্পিত হয় হুমায়ূনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্যা আসকারীর স্ত্রীর উপর (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১০৫)। পারস্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হুমায়ূন কাবুল ও কান্দাহার (৯৫২/১৫৪৫) পুনর্বিজয় করেন এবং শিশুপুত্র আকবারকে আসকারীর নিকট হইতে নিজ তত্ত্বাবধানে ফিরাইয়া আনেন।

হুমায়ূন তাঁহার পুত্রের জন্য বাল্যকালে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেও আকবারের পুঁথিগত শিক্ষা লাভের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি অস্ত্রশিক্ষা, শিকার, খেলাধূলা ও অশ্বারোহণের প্রতি আগ্রহ দেখান (প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, ৩য় সং., জানু. ১৯৯১, পৃ. ২৩৮)। এই কারণেই সম্ভবত তিনি 'নিরক্ষর' বাদশাহ বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি যেরূপ বিদ্যানুরাগ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অশিক্ষিত বলিলে নিতান্তই ভুল করা হইবে (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১০৬)।

৯৫৮ হি./১৫৫১ সালে আকবারকে গযনীর শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং এই সময় হিন্দলের কন্যা রুকায়্যা বেগমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ১১ বৎসর বয়সে (V.A. Smith, Akbar the great mogul, পৃ. ১৮)। পরে আকবারকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৯৬৪ হি./১৫৫৬ সালের ২৭ জানুয়ারী পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পতিত হইয়া হুমায়ূন দিল্লীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময় আকবারের বয়স ছিল ন্যূনাধিক তের বৎসর (W. Haig, The Cambridge History of India, ৪খ., পৃ. ৭০)। সেই সময় তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কালানৌর নামক স্থানে। বৈরাম খানসহ তিনি মানকোট দুর্গে আশ্রয়গ্রহণকারী বিদ্রোহী সিকান্দার সূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার করিতেছিলেন। হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ অবগত হওয়ামাত্র বিশ্বস্ত বৈরাম খান অনতিবিলম্বে আকবারকে শুক্রবার, রাবী' ২য়, ৯৬৩/১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬ সালে কালানৌরের উদ্যানে আঠার ফুট দীর্ঘ ও তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ইট নির্মিত ঢিপিকে সিংহাসনের মত করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে দিল্লীর বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন (Akbar The great mogul, পৃ. ২২)। বালক আকবার রাজ্য শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না বিধায় তাঁহার পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক বৈরাম খান তাঁহার রাজপ্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং প্রথম চারি বৎসর তিনি ছিলেন তাঁহার অভিভাবক।

আকবারের সিংহাসনারোহণ অভিষেক শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হইলেও দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ বিশৃংখল ছিল। দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনের শেষভাগে হুমায়ূন দিল্লী ও আগ্রাসহ ভারতের এক সামান্য অংশমাত্র পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত এক সুসংগঠিত সাম্রাজ্য তাঁহার উত্তরাধিকারীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কার্যত বাদশাহ হইবার পূর্বেই আকবারকে তাঁহার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে দমন ও পিতার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার পূর্বক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হইয়াছিল (Akbar the Great Mogul, পৃ. ১০)। সেই সময়ে করাল দুর্ভিক্ষ কবলিত দিল্লী-আগ্রাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। রাজ্যের সর্বত্র তখন বিরুদ্ধ শক্তির পাঁয়তারা চলিতেছিল। দ্বিধাবিভক্ত সূর বংশীয় শাসক সুলতান মুহাম্মাদ শাহ আদিল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদ শাহ আদিল দিল্লী ও আগ্রা হইতে বিতাড়িত হইয়া জৌনপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী হিমু শুধু রাজ্যের শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লী অধিকারের জন্য তৈরী ছিলেন। অন্যদিকে সুলতান সিকান্দর শাহ্ সূরও দিল্লী পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। কাবুলে আকবারের ভ্রাতা মীর্জা হাকিম পিতার জীবদ্দশাতে সুবাহদার নিযুক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন এবং দিল্লীর প্রতিও তাঁহার লোভাতুর দৃষ্টি ছিল। কাশ্মীরে একজন মুসলমান স্বাধীন সুলতান রাজত্ব করিতেছিলেন। সিন্ধু ও মুলতান শের শাহের মৃত্যুর পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাজপুতানায় রাজপুত রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল এবং তাহারা দিল্লীর বাদশাহ্র জন্য কণ্টকস্বরূপ ছিল। তাহাদের মধ্যে মেবার, জয়সালমীর, বুন্দী ও যোধপুরের নরপতিরা বীরত্বের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের ফলে তাহারা আরও শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। মালওয়া ও গুজরাটও স্বাধীন হইয়া যায়। গন্ডোয়ানায় রাণী দুর্গাবতী বেশ নিপুণভাবে শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ, বেরার, বিদর, আহমাদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায়ও স্বাধীন সুলতানগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, দিল্লীর সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আরও দক্ষিণে

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত অঞ্চলে বিজয়নগরের হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। অন্যদিকে পর্তুগীজরা গোয়া ও দিউ অধিকার করিয়া পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করে। বস্তুতপক্ষে ১৫৫৬ খৃ. ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তমসাচ্ছন্ন ও জটিল ছিল। সেইজন্য আকবারের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সিংহাসনের প্রকৃতি ছিল অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক এবং তাঁহার সাম্রাজ্য সংগঠনের কার্যটিও ছিল বাস্তবিকই খুব দুরূহ (R.C. Majumdar and others, An Advanced History of India, ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৪৪৫ দ্র.)। সৌভাগ্যবশত এমন দুর্দিনে আকবার বিপদ ও সঙ্কটের সময় নির্ভরযোগ্য মিত্র পিতৃবন্ধু ও হিতৈষী বৈরাম খানের সার্বিক সহযোগিতা লাভ করেন। খান-ই খানান উপাধিধারী বৈরাম একজন সুচতুর সেনানায়ক ও অভিজ্ঞ শাসক ছিলেন। এই অভিভাবকের সহায়তায় আকবার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন এবং রাজ্যের বিশৃংখলা দূর করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হন।

আকবার সর্বপ্রথম সূরদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। মুহাম্মাদ শাহ্ সূর তখনও শের শাহের শাসনভুক্ত সমগ্র ভূ-ভাগে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি নিজে অকর্মণ্য হইলেও তাঁহার সেনাপতি হিমু একজন অতুলনীয় সাহসী ও অদম্য সমরনায়ক ছিলেন। হিমু নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে মেওয়াতের রেওয়ারী অঞ্চলে সামান্য মুদীর ব্যবসা করিতেন (The Cambridge History of India, ৪খ., পৃ. ৭১)। মেধার কারণে শেষ পর্যন্ত হিমু সুলতান মুহাম্মাদ শাহ আদিলের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবারের নাবালকত্বের সুযোগে হিমু দিল্লী ও আগ্রা জয় করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। হিমু বাহ্যত মাত্র সুলতান আদিল শাহের স্বার্থের খাতিরে আকবারকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চাহিলেন। তবে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় প্রভুত্ব ও হিন্দু প্রতিপত্তি বিস্তার করা। তিনি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও পাঁচ শত হস্তীসহ আগ্রা আক্রমণ করিয়া খুব সহজেই তাহা অধিকার করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী আক্রমণ করেন। তখন তারদী বেগ নামক এক দুর্ধর্ষ সেনাপতির হাতে দিল্লীর শাসনভার ন্যস্ত ছিল। আকবার ও বৈরাম খান তখন সিরহিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। তারদী বেগ হিমুর আক্রমণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাম্ভাল ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী এলাকার মুগল সেনাপতিদেরকে দিল্লী রক্ষার জন্য তাহাকে সহায়তা করার আহ্বান জানান। কিন্তু তাহারা সময়মত দিল্লী পৌঁছিতে না পারিলেও তারদী বেগ হিমুর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও তিনি হিমুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পলায়ন করিয়া আকবারের শিবিরে গিয়া পৌঁছেন। বৈরাম খান তারদী বেগের পলায়নকে সহ্য করিতে পারিলেন না, তাহার আদেশে তারদী বেগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরে কিশোর বাদশাহ এই হত্যাকাণ্ডের বৈধতা দান করেন (I. Prosad, A Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৫৪)। এইদিকে দিল্লী অধিকার করায় হিমুর আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়া গেল।

আফগান সেনাপতি হিমু মুগলদের প্রতি চরম আঘাত হানিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। তিনি দেড় হাজার রণহস্তীসহ এক লক্ষের অধিক এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে মুগলরা হতাশ হইয়া কাবুলে ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলে বৈরাম খান খান-ই খানান মুগল বাহিনীতে সাহস যোগাইলেন এবং যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া মাত্র বিশ হাজার সৈন্যসহ পানিপথের প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। এই পানিপথ প্রান্তরেই মুগলদের একবার ভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছিল। ৯৬৪/৫ নভেম্বর, ১৫৫৬ সালে হিমু বীর বিক্রমে মুগল বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিকে যুদ্ধে তাহার জয় হইতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্য-সূর্য আকবার ও বৈরাম খানের দিকে উদিত হইল। যুদ্ধে হিমুর ডান চক্ষু তীরবিদ্ধ হওয়ায় তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। মুগলগণ এইভাবে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিল। আহত অবস্থায় হিমু ধৃত হইয়া অবশেষে নিহত হন (A Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৫৫; Akbar, পৃ. ৩৬)।

ভারতে মুগলদের ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধে আফগানদের হিন্দুস্তানে প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বহুলাংশে স্তিমিত হইল এবং মুগল-আফগান দ্বন্দ্বের আপাত অবসান ঘটিল (Advanced History of India, পৃ. ৪৪৬)। আকবার বিজয়ী বেশে দিল্লী প্রবেশ করেন। অল্প দিনের মধ্যে আগ্রাও বিনা বাধায় অধিকৃত হয়। মেওয়াতে হিমুর পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ দখল করারও ব্যবস্থা করা হয়। হিমুর মৃত্যুতে সূরা বংশীয় উচ্চাভিলাষীদেরও চরম বিপর্যয় ঘটে। আকবার ও বৈরাম খান পলায়নরত আফগান সুলতান সিকান্দার শাহ সূরকে লাহোরের দিকে তাড়া করেন। তিনি কাশ্মীরের মানকোট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া ৯৬৫/১৫৫৭ সালের মে মাসে তিনি দুর্গদ্বার খুলিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করেন। বৈরাম খান তাঁহার সহিত উদার ব্যবহার করেন এবং কিছু জায়গীর দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। সিকান্দার শাহ সূর প্রায় বার বৎসর পরে নিজ জায়গীরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদিকে অপর আফগান সুলতান মুহাম্মাদ শাহ 'আদিলও বাংলার সুলতানের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। এইভাবে দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি সূর বংশীয় দাবিদারগণ একে একে অন্তর্হিত হইলে আকবার ও বৈরাম খান অন্যান্য দিকে, বিশেষ করিয়া রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগ দিতে সমর্থ হন। সিকান্দার শাহ সূরের পরাজয়ের পরপরই বৈরাম খান গোয়ালিয়র ও জৌনপুর অধিকার করেন।

শী'আ ধর্মমতে বিশ্বাসী বৈরাম খান বাদাখশানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত হুমায়ূন ও আকবারের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৯৪৭/১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া বন্দী হন; পরে কোনভাবে পলায়ন করিয়া হুমায়ূনের পলায়মান জীবনের সঙ্গী হন। হুমায়ূনের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সময় তিনি তাঁহার পাশে ছিলেন এবং তাঁহার পলায়মান জীবনের সকল প্রকার কষ্টের অংশীদার হইয়াছিলেন। একদা হুমায়ূন বৈরাম খানকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আপনার ন্যায় সাহায্যকারী আর কেহ নাই" (Muslim Rule in India, পৃ. ৭১)। এক কথায়, বিপদাপন্ন মুগল সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত করার কৃতিত্ব বহুলাংশে বৈরাম খানেরই প্রাপ্য।

যাহা হউক, হুমায়ূনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান মুগল সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। তিনি ওয়াকীল-ই সালতানাত (প্রধান উযীর)-এর পদ গ্রহণ করেন (A Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৫৬)। সর্বোপরি হুমায়ূন বৈরাম খানকে বালক আকবারের আতালীক (অভিভাবক) নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আকবারের অল্প বয়স হেতু অভিভাবক হিসাবে তিনি সকল কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন। আকবারও তাঁহাকে খান-ই বাবা বলিয়া ডাকিতেন। অনেকেই তাঁহার সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিয়াছেন। সুন্নী ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বাদায়ূনীও শী'আ বৈরাম খানের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বৈরাম খান রাজপ্রতিনিধিরূপে পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার ফলে ক্রমেই ক্ষমতালিপ্সু ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। তিনি বেশ অহংকারী হইয়া পড়েন এবং তরুণ বাদশাহকে সব রাজকীয় ক্ষমতা চালনা করিতে দিতে ইতস্তত করিতেন (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১০৬)।

আকবারের সিংহাসনারোহণের মাত্র চার বৎসরের মধ্যে অনেকেই বৈরাম খানের স্বেচ্ছাচারিতা ও রূঢ় ব্যবহারের ফলে তাহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। ইতোমধ্যে আকবার যৌবনে পদার্পণ করেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং প্রকৃত ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে তাঁহার আচরণে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বৈরাম খান তাহা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হন। বৈরাম খানের সর্বময় কর্তৃত্ব ক্রমেই আকবারের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে (Akbar, পৃ. ৩২)। আকবারের মাতা হামিদা বানু বেগম, ধাত্রীমাতা মাহম আনগা ও তাহার পুত্র আদম খান, দিল্লীর শাসনকর্তা শিহাবুদ্দীন ও আত্মীয়-স্বজন বৈরাম খানের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আকবারকে তাঁহার অভিভাবকের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পরামর্শ দেন (The Cambridge History of India, ৪খ., পৃ. ৭৫)। বৈরাম খানের পতনের অন্তরালে রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। ক্রমে আকবার ও বৈরাম খানের মধ্যকার সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। পীর মুহাম্মাদের প্রতি বৈরাম খানের দুর্ব্যবহার ও পদচ্যুতিতে আকবারসহ রাজপরিবারের সকলে খুবই অসন্তুষ্ট হন। বৈরাম খান তাঁহার শী'আ মতাবলম্বী আত্মীয়-পরিজনকে উচ্চ সরকারী পদে, বিশেষ করিয়া শায়খ গদাঈকে সাদ্রুস্-সুদূর (আইন বিভাগের প্রধান কর্তা, ধর্মীয় ও দাতব্য ব্যাপারে ভূমি দানের ব্যবস্থাপক) নিযুক্ত করায় সুন্নী মতাবলম্বিগণ ঘোরতরভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে এবং তাহার শত্রুসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সময় প্রায় বিনা দোষে বৈরাম খান বাদশাহর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের মৃত্যুদণ্ড দেন। এইদিকে রাজপরিবারের মহিলাগণ, বিশেষ করিয়া ধাত্রীমাতা মাহম আনগা ও তাঁহার সমর্থনকারিগণ বৈরাম খানকে রাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া আকবারকে উত্তেজিত করেন। আকবারের মন বৈরাম খানের প্রতি অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। সন্দেহ করা হইল, বৈরাম খান সর্বময় কর্তা হইয়া আকবারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হুমায়ূনের ভ্রাতা কামরানের পুত্র আবুল কাসিমকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন (A Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৫৬-৫৭)।

আকবার কাসিমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠানের এই ষড়যন্ত্র অবহিত হইলে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। তিনি বৈরাম খানের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় দিল্লী হইতে মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি বৈরাম খানকে আগ্রায় রাখিয়া দিল্লী রওয়ানা হন। তিনি দিল্লী ও লাহোরের শাসনকর্তাদের সমর্থন লাভ করিয়া কাবুল অধিকার করিবার ব্যবস্থা করেন। এইদিকে মাহম আনগা, আদম খান ও শিহাবুদ্দীন বৈরাম খানের পদচ্যুতি ও পতন ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। বৈরাম খান পরিস্থিতি আঁচ করিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে আকবারকে বশে আনিয়া চক্রান্তকারীদের শাস্তি দানের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত করেন, তিনি সারা জীবনের সেবা কলঙ্কিত করিবেন না এবং আকবারের আদেশ শিরোধার্য করিবেন।

আকবার তাঁহার গৃহশিক্ষক মীর 'আবদুল লতীফের দ্বারা পত্র মারফত অভিভাবক বৈরাম খানকে জানাইলেন, "আপনার সততা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরশীল হইয়া রাষ্ট্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করিয়া আমি শুধু আমোদ-প্রমোদেই লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। আপনি যেই বাসনা মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন তদনুযায়ী পবিত্র হজ্জের উদ্দেশে মক্কা রওয়ানা হন। হিন্দুস্তানের পরগনাগুলির মধ্যে একটি যথোপযুক্ত জায়গীর আপনার ভরণ-পোষণের জন্য দেওয়া হইবে এবং ঐ জায়গীরের রাজস্ব আপনার নিযুক্তদের মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে" (Akbar, পৃ. ৩৩)।

মুগল সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সেবক বৈরাম খান নীরবে আকবারের আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া হজ্জে রওয়ানা হইলেন। ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেন, বৈরাম খানকে কোন বিলম্ব করিবার অবকাশ না দিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মক্কার পথে বিদায় দিবার জন্য আকবার পীর মুহাম্মাদকে দায়িত্ব দেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, অনু. W. H. Lowe, ২খ., পৃ. ৩৩)। পীর মুহাম্মাদ ছিলেন বৈরাম খানের ব্যক্তিগত শত্রু এবং তাঁহার অধীনে নিম্নপদস্থ কর্মচারী (An Advanced History of India, পৃ. ৪৪৭)। সুতরাং এহেন ব্যক্তিকে প্রেরণের ফলে বৈরাম খান অপমানিত বোধ করিয়া ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ভাতিন্দাহ দুর্গে পরিবারবর্গকে রাখিয়া তিনি পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জলন্ধরের নিকট আকবারের সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি বিয়াস নদীর তীরে ধৃত হইলেন। তিনি আকবারের নিকট নীত হইলে পরাজিত, বন্দী ও অনুগ্রহপ্রার্থীর প্রতি উদারতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আকবার তাহাকে ক্ষমা করেন। বাদশাহ তাহাকে খেলাত দিয়া সম্মানিত করেন এবং মর্যাদা সহকারে মক্কা শরীফে যাওয়ার অনুমতি দেন। বৈরাম খান রাজপুতানার ভিতর দিয়া মক্কা শরীফের দিকে গমন করেন। গুজরাটের পাতন নামক স্থানে পৌঁছিলে পাতনের শাসনকর্তা মূসা খান ফুলদী তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এইখানে লোহানী আফগান মুবারক খানের নেতৃত্বে আফগান দলের এক আততায়ীর হস্তে বৈরাম খান ৯৬৯/জানুয়ারী ১৫৬১

সালে নিহত হন। মুবারক খান নামক আফগান আততায়ীর পিতা লুধিয়ানা জেলায় মাচিওয়ারার যুদ্ধে ৯৬৩/১৫৫৫ সালে নিহত হন। বৈরাম খান ঐ যুদ্ধে মুগল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। সম্ভবত ঐ আক্রোশের শিকার হইয়া বৈরাম খান নিহত হন (The Cambridge History of India, ৪খ., পৃ. ৭৮; V.A. Smith, Akbar, পৃ. ৩৪)।

বৈরাম খানের হত্যার পর তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করা হয়। আকবারের আদেশে তাঁহার পরিবারবর্গকে সসম্মান দরবারে আনয়ন করা হয়। আকবার বৈরাম খানের বিধবা পত্নী সালিমা সুলতান বেগমকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্র আবদুর রহীমের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। পরে আবদুর রহীম উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং খান-ই খানান উপাধি লাভ করেন।

বৈরাম খানের পতনের পরও আকবার নিজ হাতে রাজ্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দুই বৎসরেরও অধিক কাল (১৫৬০-১৫৬২ খ্রী.) তিনি ধাত্রী মাতা মাহম আনগা ও তাঁহার পুত্র আদম খান, পীর মুহাম্মাদ শিরওয়ানী ও অন্যান্য আত্মীয়ের প্রভাবাধীনে থাকিতে বাধ্য হন। বৈরাম খানের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নীতিজ্ঞানশূন্য, কপট মহিলার নাগপাশে আবেষ্টিত হন (A. Smith : Akbar The Great Mogul, পৃ. ৩৫-৩৬ দ্র.)। প্রকৃতপক্ষে মাহাম আনগাই রাজ্যের সর্বক্ষমতার অধিকারী হন। V. A. Smith ইহাকে পেটিকোট গভর্নমেন্ট (Petticoat government) বা মহিলাদের কর্তৃত্বরূপে বর্ণনা করেন। V. A. Smith আরও মনে করেন এক এই সময়ে মাহাম আনগা বৈরাম খানের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনিও বৈরাম খানের মত স্বীয় দলীয় লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন (Akbar The Great Mogul, পৃ. ৪৩-৪৫)। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ Smith-এর এই মতকে স্বীকার করেন না। আকবার তাঁহার ধাত্রীমাতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাহার পুত্র ও তাহার আত্মীয়দের কিছু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন।

রাজ্য বিস্তার ঃ রাজত্বের প্রথমভাগে আকবার দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর অধিকার করেন। ৯৬৯/১৫৬১ সালে সেনাপতি আদম খান ও পীর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে মুগল বাহিনী মালবের (মোলওয়া) স্বাধীন শাসক রাজবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালব মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন (ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ. ২৪৬)। পরে রাজবাহাদুর মালব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেও আকবারের সেনাপতি আবদুল্লাহ খান উজবেক তাহাকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করিয়া মালব অধিকার করেন।

তিনি মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করেন। মধ্যপ্রদেশের সাগর, দামো, মাণ্ডলা ও নর্মদা উপত্যকা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জব্বলপুরের গড় কাটাঙ্গা ছিল গণ্ডোয়ানার রাজধানী। রাজা দলপত শাহের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্র বীর নারায়ণের অভিভাবিকারূপে তাহার মাতা রাণী দুর্গাবতী গণ্ডোয়ানা শাসন করেন। আকবার কারার গভর্নর আসফ খানকে গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করার আদেশ দেন। আসফ খান গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করিলে রাণী দুর্গাবতী স্বরাজ্য রক্ষার জন্য বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু বীর রাজপুত রমণী ধৃত হইয়া অপমান ও অসম্মানের অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ভাবিয়া ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন (V. A. Smith : Akbar the Great Mogul, পৃ. ৫১)। বালক রাজা বীর নারায়ণও যুদ্ধে প্রাণ দেন। আকবার শেষ পর্যন্ত গণ্ডোয়ানার শাসনভার দলপত শাহ বংশীয় চন্দ্র শাহকে দেন। চন্দ্র শাহ মুগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

গণ্ডোয়ানা জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ৯৭৩/১৫৬৫ সালে জৌনপুরের শাসনকর্তা উজবেক নেতা খান যামান ও মালবের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ খান উজবেক বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাহাদের বিদ্রোহের সুযোগে আকবারের ভ্রাতা মির্যা হাকীমও নিজেকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং পাঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। আকবার উজবেক বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন এবং ভ্রাতা মির্যা হাকীমকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। এই সকল বিদ্রোহ দমনে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

বাদশাহ আকবার রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলিতে মুসলিম মসনবদারদের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে রাজপুত সেনাপতিদের নিয়োগ করেন এবং তাহাদের উপর তাহার আস্থা স্থাপন করেন। রাজপুতদের সহযোগিতায় আকবার উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

আকবারের রাজপুত নীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। জয়পুর, যোধপুর ও বুঁদি তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। অতঃপর তিনি রাজপুতানার মেবার রাজ্য দখল করিতে অগ্রসর হন। মেবার রাজ্য ছিল অন্যান্য রাজপুত রাজ্য হইতে ব্যতিক্রম। মেবারের রানাদের দুর্জয় স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল। ভানুয়ায় রাজা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবুরের যুদ্ধ ছিল তাঁহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিচক্ষণ বাদশাহ আকবার বুঝিতে পারিলেন, মেবারকে বশ্যতায় আনয়ন করিতে না পারিলে রাজপুত রাজ্যগুলি শীঘ্রই মেবারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবে। পলাতক বাযবাহাদুরকে আশ্রয় ও বিদ্রোহী মীর্যা হাকীমকে সাহায্য দান করিবার ফলে আকবার রানা উদয় সিংহের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। মেবারের রানা উদয় সিংহ আকবারের কাছে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ইহা ছাড়া মেবারের রাজধানী চিতোর দিল্লী হইতে গুজরাটের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ নিয়ন্ত্রণ করিত। চিতোরের মত দুর্ভেদ্য দুর্গ বিরুদ্ধ পক্ষের হাতে থাকা আকবার তাঁহার সাম্রাজ্যের জন্য নিরাপদ মনে করিতেন না। মধ্যযুগে ভারতের সামরিক মানচিত্রে চিতোর, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের দুর্গগুলির বিশেষ স্থান ছিল। এই সকল কারণে চিতোর দুর্গের উপর আধিপত্য স্থাপনে আকবার ব্যস্ত হন। তিনি সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া ৯৭৫/১৫৬৭ সালের শীতকালে চিতোর অবরোধ করেন। উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্বতে পলায়ন করেন (গৌরীশংকর ওঝা, রাজপুতনা কা ইতিহাস (হিন্দী), ২খ., পৃ. ৭২৪-২৫; A. Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৬২-৬৩, পাদটীকা)। আকবার দীর্ঘকাল দুর্গ অবরোধ করিলেও রাজপুতদের বিক্রমের সম্মুখে দুর্গ দখল করিতে বিফল হন। উভয় পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অবশেষে আকবার মাটির ভিতর গর্ত করিয়া ইহাতে বারুদ দিয়া আগুনের সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ভাঙ্গা অংশ দিয়া মুগল সেনা প্রবেশের প্রচেষ্টা প্রতিহত করিলে রাজপুত বীর জয়মল ও ফতহ্‌সিংহ শেষ পর্যন্ত লড়াই করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফযলের মতে ত্রিশ হাজার রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। নিহত সংখ্যা অতিরঞ্জিত মনে হয় (An Advanced

History of India, পৃ. ৪৫০)। এই বিজয়ের পর আকবার সেনাপতি আসফ খানকে মেবারের শাসনভার প্রদান করেন।

চিতোরের পতনে অন্যান্য রাজপুত রাজগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভীতির সৃষ্টি হওয়ায় তাহাদের অনেকেই আকবারের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ৯৭৭/১৫৬৯ সালে রণথম্ভোরের চৌহান বংশের রাজপুত রানা সুরজহর ও বুন্দেলখণ্ড ও কালিঞ্জরের প্রধান রাজা রামচাঁদ আকবারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ৯৭৮/১৫৭০ সালে বিকানীর ও জয়শালমীর বশ্যতা জানায়। মারওয়াড়ের অধিপতি চন্দ্রসেনও ৯৭৮/১৫৭০ সালে আকবারের আনুগত্য স্বীকার করে। এইরূপে একে একে প্রায় সকল রাজপুত সর্দারই মুগল বাদশাহ্‌র প্রভুত্ব মানিয়া লয়।

৯৮৪/১৫৭৬ সালে সেনাপতি আসফ খান ও মানসিংহের অধীনে আকবার রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে বিরাট এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। ১৮ জুন হলদিঘাটের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুগল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও প্রতাপ পরাস্ত হন। রানা প্রতাপ তাঁহার প্রিয় অশ্ব "বৈতক"-এ আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। ১০০৬/১৫৯৭ সালে তাঁহার মৃত্যুর আগে বহু দুর্গ ও রাজ্যের বহু অংশ তিনি পুনরুদ্ধার করেন। রানা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র অমর সিংহ মুগল বাদশাহ্‌র সঙ্গে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি মুগল বাহিনীর নিকট পরাজিত হন (১০০৮/১৫৯৯)। অমর সিংহের পরাজয়ের পরও সমগ্র মেবার মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। বাংলা অভিযানে ব্যাপৃত থাকা ও অসুস্থতা হেতু আকবার মেবারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করেন নাই।

বাদশাহ আকবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জন্মগ্রহণ করেন ৯৭৭/১৫৬৯ সালের ৩০ আগস্ট। সেলিমের জন্ম আকবারের জীবনে একটি পরিতৃপ্তির অধ্যায়। কারণ ইতোপূর্বে তাঁহার আরও কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা সকলেই নিতান্ত অল্প বয়সে মারা যায়। সুতরাং আকবার একটি পুত্র সন্তান লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি এই উদ্দেশে প্রায় প্রতি বৎসর আজমীরে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর (র) মাযার যিয়ারত করিতেন। আগ্রার ২৫ মাইল দূরে ফতেহপুর সিক্রি নামক স্থানে শায়খ সালীম চিশ্‌তী নামে একজন সূফী সাধক বাস করিতেন। শায়খ সালীম চিশ্‌তীর প্রতি তিনি এতই অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে, তিনি আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া সিক্রিতে আবাস স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ফলে কালক্রমে সিক্রিতে একটি সুন্দর শহর গড়িয়া উঠে (Akbar The Great Mogul., পৃ. ৭৫-৭৬)। বাদশাহ সিক্রির নাম পরিবর্তন করিয়া ফতেহাবাদ রাখেন। কালক্রমে শহরটি ফতেহপুর সিক্রি নামে অধিকতর পরিচিতি লাভ করে। তিনি এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন। তিনি দিওয়ানী আম, দিওয়ানী খাস, বেগম মহল, বিখ্যাত আমীরগণের বাসস্থান, দপ্তরখানা ও সেনানিবাস স্থাপন করেন। ৯৮২/১৫৭৪ সালে ফতেহপুর সিক্রির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ৯৮১/১৫৭৩ সালে গুজরাট জয়ের পর বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে আকবর ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদে একটি সুউচ্চ সিংহ তোরণ নির্মাণ করেন। এই তোরণটি এখনও স্থাপত্য শিল্পের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। ইহা বুলন্দ দরওয়াযা নামে খ্যাত (Akbar The great mogul, পৃ. ৭৬)।

রাজপুতানা জয়ের পর আকবর গুজরাট বিজয়ের দিকে মনোযোগী হন। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজাফফর শাহ ছিলেন অপদার্থ শাসক। আকবরের সম্ভাব্য চক্রান্তকারীদের গুজরাটে আশ্রয় লাভ, সেইখানকার ধন-সম্পদ, উন্নত ব্যবসা, সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবিধা ও উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, বিশেষ করিয়া অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও রাজনৈতিক অরাজকতা আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাদশাহ হুমায়ূনও গুজরাট অধিকার করিয়াছিলেন। তাই আকবর তাহার পৈত্রিক রাজ্য পুনর্দখল করা উচিত বলিয়া মনে করেন। সুলতানের সহিত রেষারেষি থাকায় উজীর ইতিমাদ খাঁ আকবরকে গুজরাট অভিযানের আমন্ত্রণ জানান। ৯৮০/১৫৭২ সালে আকবরের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ১১ দিনে ৪৫০ মাইল পথ পাড়ি দিয়া আহমাদাবাদ অধিকার করে। আকবর বিদ্রোহী মীর্যাদের পরাস্ত ও বন্দী করেন। তিনি ক্যাম্বে বন্দরে আসিলে পর্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। আকবর দয়াপরবশ হইয়া সুলতানকে মাসিক ত্রিশ টাকা ভাতা মঞ্জুর করেন। ৯৮১/১৫৭৩ সালে তিনি সুরাট অধিকার করিয়া গুজরাট জয় সম্পূর্ণ করেন। তিনি গুজরাটকে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত করেন এবং মীর্যা আযীয কোকা (খান-ই আযম)-কে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই বিজয়ের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং গুজরাটের বিখ্যাত বন্দরগুলি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দিল্লী অঞ্চলের বাণিজ্য গুজরাটের বন্দরগুলির সঙ্গে রাজপুতানার মধ্য দিয়া যুক্ত হয়। শূন্য রাজকোষ গুজরাটের রাজস্ব ও বাণিজ্য শুল্কে স্ফীত হয়।

গুজরাট বিজয়ের পর বাদশাহ আকবর বাংলাদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বাংলাদেশ সর্বদাই বিদ্রোহী প্রদেশরূপে পরিগণিত ছিল। সুলতানী আমলেও বাংলাদেশ দিল্লীর বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্রোহ করিত, এমন কি দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। শের শাহের সময় বাংলাদেশ পুনরায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয় এবং ইসলাম শাহের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশের উপর দিল্লীর অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ আবার স্বাধীন হইয়া যায়। ৯৭২/১৫৬৪ সালে কাচি ভার কররানী বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহারই ভ্রাতা সুলায়মান কারারানী তিনি বাদশাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া আবুল ফয়ল যেই মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সঠিক। তাহার পুত্র দাঊদ কররানীও আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি পিতার ন্যায় যোগ্য ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন না। পিতার সঞ্চিত অর্থ ও বিরাট সৈন্যবাহিনী বলে তিনি সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের জমানিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া বাদশাহ্‌র রোষদৃষ্টিতে পতিত হন (A short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৬৮)। আকবর প্রথমে দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনইম খানকে পাঠাইলে দাউদ শাহ পাটনায় আত্মরক্ষা করেন এবং মুঘল বাহিনী পাটনা দখলে ব্যর্থ হয়। আকবর নদী পথে তাঁহার নতুন বাহিনী লইয়া

নিজে পাটনায় চলিয়া আসেন এবং নিকটস্থ হাজীপুর অধিকার করেন। দাউদ রাজমহল হইয়া উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া যান। মুনইম খান ও টোডরমল বালেশ্বরের তুকরাই বা তুর্কার যুদ্ধে (৯৮৩/১৫৭৫) দাউদ শাহকে পরাস্ত করেন এবং এক সন্ধি সূত্রে তাহাকে বাংলায় ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ দেন।

মুন'ইম খান তান্ডায় বা গৌড়া ফিরিয়া আসিয়া এইখানে তাহার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তিনি প্রাণত্যাগ করিলে মুঘল সেনাদলে অন্তর্বিরোধ ও হতাশা দেখা দেয়। সেই সুযোগে দাউদ শাহ সন্ধি লংঘন করিয়া পুনরায় বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া শেষ পর্যন্ত তাণ্ডা দখল করেন। মুঘল বাহিনী বিহারে পলায়ন করে। আকবরের নির্দেশে মুজাফফর খান তুরবাচী ও খান-ই জাহান আসিয়া টোডরমলের সঙ্গে যোগ দিলে তাহাদের মনোবল ফিরিয়া আসে। রাজমহলের যুদ্ধে (৯৮৪/১৫৭৬) দাউদ শাহ পরাজিত হন। তাহার ধর্মান্তরিত সেনাপতি "কালা পাহাড়" যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। টোডরমল দাউদকে বন্দী করেন এবং মুঘল শিবিরে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতের শাসকদের নিকট চিরকালই এক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। এই পথেই বারংবার মোঙ্গল আক্রমণকারিগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া হামলা করিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আকবরের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কাশ্মীরের পশ্চিম সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের উপকূল রেখা পর্যন্ত বার শত মাইল বিস্তৃত সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা সহজসাধ্য ছিল না। সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক পরিস্থিতির দরুনই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। বেলুচিস্তান হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উজবেক ও ইউসুফজাই আফগান উপজাতিদেরকে দমন করিতে পারিলেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর উপজাতিরাই মুঘল শাসকদের নিকট দুর্ভাবনার মূল উৎস ছিল (A. Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ২৭৮)।

আকবর জঙ্গন খান ও রাজা বীরবলকে ইউসুফযাই উপজাতি দমন করিতে পাঠান। মুঘল বাহিনীর মধ্যে আত্মকলহ থাকায় আফগানেরা মুঘলদের প্রভূত ক্ষতি করে। প্রায় আট হাজার মুঘল সৈন্যসহ স্বয়ং বীরবল প্রাণ হারান। বাদশাহ আকবর বীরবলের মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি রাজা টোডরমল ও যুবরাজ মুরাদকে বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ আফগানদের বিরুদ্ধে পাঠান। তিনি আফগানদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন (An Advanced Historyof India, পৃ. ১৬৫, পৃ. ৪৫৪)।

অতঃপর বাদশাহ আকবর কাশ্মীর জয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি রাজা ভগবান দাস ও কাসিম খানকে পাঁচ হাজার সৈন্যসহ কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাঠান। পার্বত্য এলাকায় অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া মুঘল সেনাপতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইউসুফের পুত্র ইয়াকূব মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং কাবুল প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হয়। ৯৯৮/১৫৮৯ সালে গ্রীষ্মকালে আকবর কাশ্মীর গমন করেন এবং সেইখানকার শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন।

৯৯৯/১৫৯০ সালে বাদশাহ মুলতানের শাসনকর্তা মীর্যা আবদুর রহীমকে সিন্ধু জয় করিবার জন্য সসৈন্য প্রেরণ করেন। ১০০০/১৫৯১ সালে থাট্টা রাজ্যের শাসনকর্তা মির্যা জানী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ৯৯৯-১০০০/১৫৯০-৯১ সালে সিন্ধু ও ১০০৪/১৫৯৫ সালে বেলুচিস্তান মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কান্দাহার অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও দুর্ধর্ষ উজবেগদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া কান্দাহারের শাসনকর্তা মুজাফফর হুসেন মীর্যা ১০০৪/১৫৯৫ সালে বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি শাহবেগ খানের নিকট কান্দাহার সমর্পণ করেন।

এবার আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। ভারতের ইতিহাসে বার বার লক্ষণীয় যে, উত্তরে কোন রাজবংশ প্রভুত্ব পাইলে দক্ষিণে আধিপত্য লাভের জন্য চেষ্টা চালায়। দক্ষিণ ছিল উত্তরের বাদশাহদের অনিবার্য গন্তব্য। সুতরাং আকবর উত্তর ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের পর স্বাভাবিক কারণে দক্ষিণের দিকে দৃষ্টি দেন।

দক্ষিণ ভারতে পর্তুগীজদের অনুপ্রবেশ আকবরকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে। গুজরাট অভিযানের সময় তিনি সর্বপ্রথম পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি পর্তুগীজদের নৌশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। আরব সমুদ্রে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি তাহারা প্রায়ই লুণ্ঠন করিত এবং হজ্জ যাত্রীদের আক্রমণ করিত। পর্তুগীজরা ছিল ধর্মান্ধ। তাহারা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের জোর করিয়া খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত। ৯৮৮/১৫৮০ সালে তাহারা বিজাপুরের সুলতানকে পরাস্ত করিয়া গোয়া দখল করে এবং বহু নিরীহ নর-নারীকে হত্যা করে। আকবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পর্তুগীজদেরকে দেশের আর্থিক সম্পদ ভোগ করিতে ও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে এবং কালক্ষেপণ না করিয়া তাহাদেরকে ভারতের মাটি হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। এদিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি ছিল দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। এইজন্য আকবার দক্ষিণে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া পর্তুগীজদের বহিষ্কারের চেষ্টা করেন।

দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মানী রাজ্য ভাঙ্গিয়া আহ্‌মাদনগর, বিজাপুর, খান্দেশ ও গোলকুণ্ডা এই চারটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই সুলতানী রাজ্যগুলি একতাবদ্ধ হইয়া ৯৭৩/১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে। সেই সময় আকবার রাজপুতনা জয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তালিকোটার যুদ্ধের পর দক্ষিণের সুলতানী রাজ্যগুলি অরাজকতা ও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে। দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মাদনগরের এক শ্রেণীর অভিজাত গোষ্ঠী চাঁদ সুলতানাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং মুগলদের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বেরার হইতে মুগল শক্তির অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হয়। আহ্‌মাদনগরে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। যুবরাজ দানিয়াল ও খান-ই খানানের নেতৃত্বে গোদাবরীর তীরে মুগল বাহিনী দক্ষিণ ভারতীয়দের পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক অরাজক

পরিস্থিতিতে অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্রে চাঁদ বিবি নিহত হন অথবা মতান্তরে বিষ পানে আত্মহত্যা করেন (Akbar The Great Mogul, পৃ. ১৯৬)। ১০০৯/১৬০০ সালে মুগল বাহিনী কর্তৃক আহ্মাদনগর অবরুদ্ধ হয় এবং ইহার একাংশ মুগল শাসনে আসে। ইহার বৃহদংশ একজন স্থানীয় যুবরাজ মুরতাযা কর্তৃক শাসিত হয় (Akbar The Great Mogul, পৃ. ১৯৬)।

আহ্মাদনগরের পতনের পরই আকবার খান্দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। খান্দেশের সুলতান রাজা 'আলী খান আকবারের আহ্বানে তাহার বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হন। ১০০৯/১৬০০ সালে আহ্মাদনগরের যুদ্ধে তিনি মুগল বাহিনীর হইয়া লড়াই করিয়া প্রাণ দেন। তাহার পুত্র মীরন বাহাদুর শাহ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুগলদের প্রতি বশ্যতা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। আকবার তাহাকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। তিনি খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করেন। বাদশাহ্র আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মীরন বাহাদুর দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। আসিরগড় দুর্গ রক্ষায় পর্তুগীজরা মীরন বাহাদুরকে সাহায্য করে। দুর্গটি সমতলভূমি হইতে শতপুরা পর্বতমালার প্রায় ৯০০ ফুট এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৩০০ ফুট উচ্চে একটি শাখা পর্বতের উপর অবস্থিত ছিল (Akbar The Great Mogul, পৃ. ১৯৬)। আকবার ১০০৯/১৬০০ সালের এপ্রিল মাসে শায়খ ফারীদ ও আবুল ফযলকে আসিরগড় অবরোধ করিতে পাঠান। মীরন বাহাদুরকে আকবারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বলা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা আকবার নিজেই আসিরগড় আসিলেন। মুগল বাহিনী প্রায় ছয় মাস দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখে। ইতোমধ্যে দুর্গে মহামারী দেখা দেয় এবং ইহাতে অনেক সৈন্য মারা যায়। প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া মুগলরা মূল আসিরগড় দুর্গের বহির্ভাগের মালিগড় নামক পাহাড়টি দখল করিতে সমর্থ হয়। এমন সময় যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহের সংবাদ আসিলে আকবার ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি আর কালক্ষেপণ করিতে চাহিলেন না। মীরন বাহাদুরকে বাদশাহ্র সহিত সাক্ষাতের জন্য প্ররোচিত করা হইল। তিনি সাক্ষাতের জন্য মুগল শিবিরে আসিলে তাহাকে বন্দী করা হয় এবং শায়খ আবুল ফযলের পুত্র 'আবদুর রহমান তাহার নিকট হইতে দুর্গের চাবি দখল করিয়া লন। মীরন বাহাদুরের বন্দীত্বের সঙ্গে সঙ্গে আসিরগড় দুর্গের পতন হয় এবং ইহার পতনে সমগ্র খান্দেশ রাজ্যের পতন ঘটিল (১০১০/১৬০১)। স্বর্ণ চাবি দ্বারা অজেয় আসিরগড় দুর্গের তোরণ উন্মুক্ত করা হইয়াছিল (An Advanced History of India, পৃ. ৪৫৬; Akbar The Great Mogul, পৃ. ২০১)। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে বেরার, আহ্মাদনগর ও খান্দেশ তিনটি সুবায় পরিণত হয়। শাহ্যাদা দানিয়াল এইগুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। আসিরগড়ই ছিল আকবারের রাজ্য জয়ের শেষতম ঘটনা। অতঃপর তিনি তাহার বিজয়ী তরবারি কোষবদ্ধ করেন এবং বিশাল সাম্রাজ্যের বাদশাহ হইলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার চুতুষ্পার্শ্বস্থ কিছু অঞ্চল ব্যতীত আর কোন অঞ্চলে আকবারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেন।

রাষ্ট্রীয় আইন কাঠামো

সমগ্র মুগল সাম্রাজ্য ইসলামী শরী'আ ভিত্তিক আইন দ্বারা শাসিত হইত। বিচারালয়সমূহও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াসপ্রসূত আইনের সাহায্যে বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করিত। ফৌজদারী মোকদ্দমায় মুসলিম-অমুসলিম সকলের অপরাধ ইসলামী আইনে বিচার হইত। হিন্দুদের বিশ্বাসভিত্তিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন প্রযোজ্য হইত। আকবার 'দীনে ইলাহী' নামক উদ্ভট এক ধর্মের প্রচলন করিলেও এবং ৯৮৭/১৫৭৯ সালে জারিকৃত ফরমানবলে আইন প্রণয়নে সর্বময় কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিলেও তাঁহার পক্ষে ইসলামী আইনকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র আইন কাঠামো গড়িয়া তোলা মোটেই সম্ভব হয় নাই। কারণ তখন ইসলামী আইনের কোন বিকল্প ছিল না।

নবরত্ন ঃ অগ্রগণ্য নয়জন গুণীজ্ঞানী ব্যক্তির সমন্বয়ে আকবারের রাজসভা গঠিত ছিল। ইতিহাসে ইহারা 'নও রতন' নামে সমধিক পরিচিত। তাহারা হইলেন আবুল ফযল 'আল্লামী (আইন-ই আকবারী ও আকাবারনামা-এর যশস্বী রচয়িতা ও আকবারের প্রধান মন্ত্রক), রাজা মানসিংহ (সেনাপতি ও হিন্দী কবি), রাজা টোডরমল (রাজস্ব সচিব), হাকীম হুমাম, ফৈযী (আবুল ফযলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রাজকবি), মোল্লা দোপিঁয়াজা (ভাঁড়) ও তানসেন ৭ (সঙ্গীতজ্ঞ, হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলামে দীক্ষিত)। তাঁহারা বিভিন্নভাবে আকবারের রাজসভাকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিতেন।

বাদশাহ আকবারের শেষ জীবন ছিল দুর্ভাগ্যজনক ও বেদনাবিধুর। নানারূপ দুঃখজনক ও শোকাবহ ঘটনা তাহার শেষ জীবনকে মর্মবেদনায় বিড়ম্বিত করিয়া তোলে। তাহার ঘনিষ্ঠতম প্রিয় বন্ধু ফৈযী ১০০৪/১৫৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাহার দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল ছিলেন মদ্যপ এবং তাহারা উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করিত। শারীরিক অত্যাচারের ফলে মুরাদ ১০০৮/১৫৯৯ ও দানিয়াল ১০১৩/১৬০৪ সালে অকাল মৃত্যুবরণ করে। এই দুই পুত্রের মৃত্যুতে বাদশাহ বিশেষভাবে মর্মাহত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম পিতার মৃত্যুর পূর্বেই সিংহাসন লাভের উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, কিন্তু এইজন্য তাহার পিতামহী মরিয়ম মকানী কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে তিনি আগ্রা ছাড়িয়া এলাহাবাদে গমন করেন। সেইখানে তিনি ১০১০/১৬০১ সালে রাজকীয় উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদের জায়গীর ও খেলাত দিতে থাকেন। ১০১১/১৬০২ সালে আকবারের বিশ্বস্ত হিতৈষী বন্ধু ও পরামর্শদাতা আবুল ফযল দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সেলিমের প্ররোচণায় বীর সিংহ বুন্দেলা কর্তৃক নিহত হন। আবুল ফযলের মৃত্যুতে বাদশাহ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন। বাদশাহ বীর সিংহের শাস্তির উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ব্যর্থ হন। আকবারের মৃত্যুর পূর্বে ১০১২/১৬০৩ সালে সালিমা সুলতান বেগমের মধ্যস্থতায় পিতা-পুত্রের মধ্যে সমঝোতা ফিরিয়া আসে। আকবার তাহাকে ক্ষমা করিয়া উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ইহাতেও সেলিমের চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি পুনরায় এলাহাবাদে গিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে আগ্রায় সেলিমের বিরুদ্ধে কয়েকজন উচ্চপদস্থ

কর্মকর্তা চক্রান্ত আরম্ভ করেন। খান-ই আযম রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে একদল রাজপুত ও রাজদরবারের অন্যান্য কয়েকজন অভিজাত বিদ্রোহী সেলিমের পুত্র শাহযাদা খসরুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া অকৃতকার্য হন। যাহা হউক, অভ্যন্তরীণ এইসব নানা সমস্যায় বাদশাহ্র মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইল এবং তাহার দেহ ও মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত ক্ষীণকায়া আকবারের তখন বাকশক্তি ছিল না। এই সময় সেলিম পিতার সহিত পুনর্মিলনের জন্য আগ্রায় আগমন করেন। বাকশক্তি রহিত আকবার ইঙ্গিতে সেলিমকে বাদশাহ্র পোশাক পরিতে এবং হুমায়ূনের তরবারি লইতে আদেশ দিলেন। রোগাক্রান্ত বাদশাহ আকবার ১০১৪/১৬০৫ সালের ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (আধুনিক গবেষণায় ২৭ অক্টোবর) [Akbar The Great Mogul, পৃ. ২৩৪]। আগ্রার সন্নিকটে সিকান্দ্রায় তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিজেতা বীর আকবারের অতুলনীয় সাংগঠনিক ও শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা প্রশংসনীয়। বাদশাহ বাবুর (দ্র.) ও হুমায়ূন (দ্র.) নব প্রতিষ্ঠিত মুগল সাম্রাজ্যের শাসনের সুব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নাই। আকবারই সর্বপ্রথম মুগল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তাঁহার শাসন প্রতিভা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Smith বলেন, "আকবার যে সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা প্রাচ্যের নৃপতিদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল এবং অন্য দেশের শাসকদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় অনেক বিষয়ে শের শাহের শাসন পদ্ধতির অনুকরণ পরিলক্ষিত হইলেও তিনি স্বীয় বহুমুখী প্রতিভাবলে ভারতীয় পরিমণ্ডলে আরবীয়-পারসিক শাসন পদ্ধতির এক অপূর্ব সমন্বয় (Perso-Arabic System in India Setting) সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন" (R.C. Majumdar and others, An Advanced History of India, পৃ. ৫৫৪)।

প্রকৃতপক্ষে তৎকালে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আব্বাসী অথবা ফাতিমী খলীফাদের শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। পাক-ভারতে মুসলমানরা সাম্রাজ্য স্থাপন করার পর তাঁহারা আব্বাসী শাসন পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তবে রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব ও শাসন ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলার জন্য হিন্দুদের বিশেষভাবে রাজস্ব বিভাগে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করা হইত। হিন্দুদের কিছু রীতি-নীতি ও প্রথাও চালু রাখা হয়, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথা এবং সেই সমাজের হিন্দু আইন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। সুতরাং মুগল শাসন পদ্ধতিতে দেশী-বিদেশী উভয় প্রভাবই সমন্বিতরূপে কার্যকর করা হয়।

সামরিক ও বেসামরিক শাসন বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন বাদশাহ। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, সর্বোচ্চ বিচারপতি ও সর্বপ্রধান ব্যবস্থাপক।

মুগল শাসন ব্যবস্থায় বাদশাহ্র পরেই ওয়াকীল বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তিনি বাদশাহকে রাজ্য শাসনকার্যে পরামর্শ দিয়া সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেন। আকবারের প্রথম জীবনে অভিভাবক বৈরাম খান উক্ত ওয়াকীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (I. H. Giresin, Administration Under The Mughals, পৃ. ৫৬-৫৭)।

মুগল সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নানা বিভাগ ছিল ঃ (১) অর্থ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার উপাধি ছিল দীওয়ান; (২) মীর বাখশীর অধীনে ছিল সামরিক বিভাগ; (৩) বাদশাহ্র গৃহ-বিভাগ ছিল খান-ই সামানের অধীন; (৪) কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল বিচার বিভাগ; (৫) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন সদরুস সুদূর; (৬) জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ বিভাগ ছিল মুহতাসিবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে; (৭) মীর আতিশ বা দারোগা-ই তোপখানা ছিলেন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; (৮) গুপ্তচর ও ডাক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন দারোগা-ই ডাক চৌকি; (৯) মুদ্রা বিভাগও দারোগার অধীনে ছিল। দীওয়ান সাম্রাজ্যের সকল সার্বিক বিষয়ে নযর রাখিতেন। তিনি রাজকীয় কোষাগার, সাম্রাজ্যের আয় ও ব্যয় সকল বিষয়ে তদারকি করিতেন এবং তিনি রাজস্ব বিভাগের সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

মীর বাখশী ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা। পদমর্যাদায় তিনি দীওয়ানের নিচে ছিলেন। বাদশাহ্র নিজস্ব ও রাজদরবারের আয়-ব্যয় তদারকি করার ভার ছিল মীর-ই সামান নামক কর্মকর্তার উপর। বাদশাহ্র অধীনে এই পদটি উযীরের সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল। বাদশাহ ভ্রমণে বাহির হইলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলে মীর-ই সামান (খান-ই সামান) তাঁহার অনুগমন করিতেন।

কাযীউল কুযাত বা প্রধান কাযী ছিলেন বাদশাহর অধীনে সর্বোচ্চ বিচারপতি। বাদশাহ নিজে সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন; কিন্তু তিনি সাধারণত কাযীর বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতেন। প্রকৃতপক্ষে কাযী সকল ফৌজদারী বিষয়ে বিচার করিতেন এবং ইসলামী শরী'আত মোতাবেক বিচার করিতেন।

সদরুস সুদূর ছিলেন ধর্ম বিষয়ক ও দাতব্য বিভাগের মন্ত্রী। তিনি বাদশাহকে মুসলিম ধর্মীয় আইন সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। মুহতাসিবও একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। জনসাধারণ আইন মোতাবেক চলে কিনা বা শরী'আতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে কিনা ইহা দেখাই মুহতাসিবের প্রধান কর্তব্য ছিল। সেই যুগে নগর অধ্যক্ষকে কোতোয়াল বলা হইত। দিবা-রাত্র শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল তাহার প্রধান দায়িত্ব।

শাসনকার্যের সুবিধার্থে বাদশাহ আকবার তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যকে ৯৮৭-৯৮৮/১৫৭৯-৮০ সালে ১২টি সূবা বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়া সুষ্ঠু প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাহার রাজত্বের শেষের দিকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে আরও তিনটি প্রদেশ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে তাহার আমলেই সর্বমোট ১৫টি সূবার সৃষ্টি হয়। সূবাগুলি হইল ঃ আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, মুলতান, কাবুল, আজমীর, বাংলাদেশ, বিহার, আহ্মাদাবাদ, মালব, বেরার, খান্দেশ ও আহ্মাদনগর (ঈশ্বরী প্রসাদ, A Short History of Muslim Rule in India, পৃ. ৩৬২, পাদটীকা)।

প্রদেশ বা সূবাকে শাসন সুবিধার জন্য সরকার বা জেলায় ভাগ করা

হয়। প্রতিটি সরকারের শাসনের দায়িত্ব ছিল একজন ফৌজদারের হাতে। জেলার নিচের স্তর ছিল পরগনা। একজন শিকদার একটি পরগণার আইন-শৃংখলা, শান্তি রক্ষা, বিচার ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা করিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের কলেবরে সন্নিবেশিত তথ্যাদি ছাড়াও (১) Muni Lal, Akbar, University Press Ltd., Dhaka, in association with Vikas publishing home pvt. Ltd., কলিকাতা ১৯৮০; (২) Vincent. A. Smith, Akbar the Great Mogul, S. Chand & Co., New Delhi; (৩) আবুল ফযল আল্লামী, আইন-ই আকবারী, অনু. H. Blochmann and H. S. Jarrett (২খ. ও ৩খ., J. N. Sarkar কর্তৃক পরিবর্ধিত), কলিকাতা ১৯৩৯, ১৯৪৮, ১৯৪৯ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, আকবারনামা, সম্পা. আহমাদ আলী ও আব্দুর রহীম, কলিকাতা ১৮৭৩-৮৬, অনু. H. Beveridge, কলিকাতা ১৮৯৭, ১৯২১; (৫) আব্দুল কাদির বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, সম্পা. আহমদ আলী, কলিকাতা ১৮৬৮; অনু. ১খ., I.S.A. Ranking, কলিকাতা ১৮৯৮; ২খ. ও ৩খ., W. H. Lowe, কলিকাতা ১৮৮৪, ১৯২৫; (৬) খাজা নিজামুদ্দীন আহমাদ, তবাকাত-ই আকবারী, আহমদ ফজলুর রহমান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮, ২খ.; (৭) ঈশ্বরী প্রসাদ, A Short History of Muslim Rule in India, এলাহাবাদ ১৯৬২, পৃ. ২৫২-৩৪২; (৮) W. Haig, The Cambridge History of India, S. Chand & Co., দিল্লী, আগস্ট ১৯৫৭, ৪খ., পৃ. ৭০-১৫৫; (৯) R. C. Majumdar & Others, An Advanced History of India, Yook ১৯৬৫, পৃ. ৪৪৭-৪৬৩; (১০) V. D. Mahajan, Muslim Rule in India, S. Chand & Co., New Delhi ১৯৭০, পৃ. ৬৭-১৩৪; (১১) John Canning, 100 Great Kings, Queens and Rulers of The world, Great Britain 1967, পৃ. ৪২৮-৪৩২; (১২) Ibn Hasan, The Central Structure of the Mughal Empire, Oxford University Press, লাহোর ১৯৬৭; (১৩) আব্দুল করিম, পাকভারতে মুসলিম শাসন, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, জুন ১৯৬৯; (১৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., নওরোজ কিতাবিস্তান, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ঢাকা, পৃ. ১০৫-১০৭; (১৫) ডঃ মোহর আলী, A Brief Survey of Muslim Rule in India, Dhaka, আগস্ট ১৯৬৪, পৃ. ১৮৫-২৪৬ দ্র.; (১৬) প্রভাতাংশ মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, শ্রীধর প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯১, পৃ. ২৩৭-২৭৫।

মুহঃ আবু তাহের

আকবারের ধর্মীয় মূল্যবোধ ঃ আকবার তাঁহার রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে 'আলিম-'উলামা ও আওলিয়া কিরামের সাহচর্য গ্রহণ করিয়া একজন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করেন এবং তাঁহার সভাসদ 'আলিমগণও ছিলেন সুন্নী মতাবলম্বী। তাঁহার মাতা হামীদা বানূ বেগম ছিলেন প্রসিদ্ধ ওয়ালী ও কবি শায়খ আহমাদ জামের বংশধর। ফলে তাহার উপর স্বাভাবিকভাবে তাহার মাতার প্রভাব পড়ে এবং তিনি নিয়মিত সমকালীন আওলিয়ায়ে কিরামের সহিত দেখা-সাক্ষাত করিতেন এবং তাহাদেরকে পর্যাপ্ত উপহার-উপঢৌকন দিতেন, মাযার যিয়ারত করিতেন, এমনকি আজমীরে খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর মাযারে বৎসরে একবার উপস্থিত হইতেন (তারীখ মুহাম্মাদী, পৃ. ৮৮; মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ. ১২৪; রাওদাতুত তাহিরীন, পৃ. ৫৪১ ইত্যাদির বরাতে দীনে ইলাহী আওর উসকা পাসমানজার, পৃ. ৩৩-৩৫)।

তিনি বালক শাহযাদা সেলিমকে কুরআন-হাদীছসহ ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্য শায়খ আবদুন নবীর বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, পৃ. ১০৪-এর বরাত দীনে ইলাহী আওর উসকা পাস মানজার, পৃ. ৩৭-৮)। আলিম-উলামা ও আওলিয়ায়ে কিরামের সাহচর্যের প্রভাবে আকবার নামায-রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখিতেন, ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করিতেন, সত্য-ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধের নির্দেশ দিতেন, আযান দিতেন, ইমামতি করতেন, এমনকি ছওয়াবের আশায় মসজিদে ঝাড়ু দিতেন (মাআছিরুল উমারা, ২খ., পৃ. ৫৬১-এর বরাতে দীনে ইলাহী, পৃ. ৪৭)। তিনি সপ্তাহের জন্য সাতজন ইমাম নিযুক্ত করেন এবং বুধবারের নামাযে তিনি নিজে ইমামতি করিতেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., ২২৭-এর বরাতে দীনে ইলাহী, পৃ. ৪৭)।

তিনি প্রতি বৎসর একজন আমীরুল হাজ্জ (হজ্জে গমনকারীদের দলপতি) নিযুক্ত করিয়া ঘোষণা দিতেন, যে ব্যক্তি হজ্জে গমন করিতে ইচ্ছুক তাহার সমস্ত খরচপত্র সরকার বহন করিবে। তিনি মক্কার হারামের অধিবাসীদের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদও পাঠাইতেন। হজ্জ কাফেলার রওয়ানার দিন তিনি মাথা মুণ্ডন করিতেন, ইহ্রামের পোশাক পরিতেন এবং তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে নগ্নপদে অনেক দূর পর্যন্ত হজ্জ কাফেলার সহিত গমন করিতেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ, ২৩৯, ২৫১; দীনে ইলাহী, পৃ. ৪৮)।

মহানবী (স)-এর প্রতিও তাহার গভীর মহব্বত ছিল। যেই বৎসর শাহ আবূ তুরাব হজ্জ সমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া আসেন, তিনি মহানবী (স)-এর পদচিহ্নযুক্ত একটি পাথর সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। তিনি আগ্রার নিকটবর্তী হইলে আকবার তাহার সভাসদ ও উলামা সমভিব্যাহারে চার ক্রোশ দূরে যাইয়া তাহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ. ৩১০; দীনে ইলাহী পৃ. ৪৮)। আহলে বায়ত (নবীর বংশধর ও পরিবার)-এর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তিনি তাহার দুই যমজপুত্রের নাম রাখেন হাসান ও হুসায়ন (মুনতাখাব, ২খ, পৃ. ৬৯; দীনে ইলাহী, পৃ. ৪৮)।

ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রতিও আকবারের প্রচুর আকর্ষণ ছিল। তিনি কবি-সাহিত্যিকদের অকৃপণ হস্তে সাহায্য করিতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক সমৃদ্ধ একটি পাঠাগারও গঠন করেন। রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তিনি কোন না কোন পুস্তক পাঠ করাইয়া শুনিতেন (মুনতাখাব, ২খ., পৃ. ১৯৮; দীনে ইলাহী, পৃ. ৪৯)।

এই ছিল আকবারের প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মীয় মূল্যবোধ যাহা পরবর্তী পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে গিয়া পৌছে এবং তাহার দ্বারা হিন্দুস্তানের

মুসলমানদের যে অপূরণীয় স্বার্থহানি ঘটে এবং দীন ইসলামের ক্ষতিসাধিত হয় তাহার প্রতিক্রিয়া আজ অবধি বিদ্যমান।

আকবারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাহাকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করিলেও তিনি ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। শিশু বয়সে পরপর দুইজন শিক্ষক তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষাদানে সচেষ্ট থাকিলেও নিরেট উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার কারণে তাহার জ্ঞানার্জন বলিতে কিছুই হয় নাই। রাজ-দরবারের স্বার্থান্বেষী মহল তাহার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিপথগামী করিয়াছে। বিভিন্ন ফেরকার আলিম-উলামার ধর্মীয় বিতর্ক ও রাজ-দরবারে প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং রাজ-দরবারের অমাত্যবর্গের সুযোগ সন্ধানী প্রবণতা, উপরন্তু ইরান হইতে আগত কট্টর শী'আ পণ্ডিতবর্গের বিভ্রান্তি তাহাকে বিপথগামী করিতে ভূমিকা রাখে। প্রধানত এই শেষোক্ত শ্রেণীই আকবারকে চরমভাবে বিপথগামী করে। আবুল ফাদল ও ফায়দী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা মোল্লা মুবারক ছিলেন শীআ ধর্মাবলম্বী। আকবারকে বিপথগামী করিতে শাহী অন্দর মহলের রাজপুত রাণীদের প্রভাবও কম ছিল না।

প্রাথমিক পর্যায়ে আকবার নিতান্তই ধর্মীয় আবেগের বশবর্তী হইয়া ফতেহ্পুর সিক্রিতে ধর্মীয় বিষয়ে আলিম-উলামার নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং তিনিও তাহাতে যোগদান করিতেন। তাহাদের আলোচনা ও ওয়াজ-নসীহতের ধারা ক্রমান্বয়ে ফের্কাগত বিতর্ক ও চরম বিতণ্ডায় পরিণত হয় এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। ইহা আকবারের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তিনি ক্রমান্বয়ে ধর্মবিমুখ, এমনকি দীন ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

একইসঙ্গে আরও একটি ঘটনা আকবারের ধর্মদ্রোহী মনোভাবের বিস্তৃতি ঘটায়। মথুরার কাযী (বিচারপতি) আবদুর রহীম একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেন। এক ব্রাহ্মণ রাত্রের অন্ধকারে ঐগুলি অপসারণ করিয়া তাহা দ্বারা একটি মন্দির নির্মাণ করে। এই বিষয়ে স্থানীয় মুসলমানগণ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে দীন ইসলাম ও মহানবী (স) সম্পর্কে কটূক্তি করিতে থাকে। কাযী সাহেব ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি আবদুন নবীর আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করান হয়। আদালতে হাযির হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়, কিন্তু সে আদালতে উপস্থিত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সম্রাট আকবার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য বীরবল ও আবুল ফাদলকে মথুরা প্রেরণ করেন এবং তাহারা তাহাকে দিল্লীতে লইয়া আসেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩খ., পৃ. ৮০)।

বিবাদের সুরাহা করার জন্য আকবার আবুল ফাদলের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি যথেষ্ট তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রাহ্মণ মূলত অপরাধী। কারণ সে (১) অন্যায়ভাবে মসজিদ নির্মাণের সরঞ্জাম অপসারণ করিয়াছে; (২) মুসলমানরা উহা ফেরত চাহিলে দীন ইসলাম ও মহানবী (স)-কে অশালীন বাক্যে কটাক্ষ করিয়াছে এবং (৩) তাহাকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হইলে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া আদালত অবমাননা করিয়াছে। এই অপরাধের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি তাহাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে সে ছিল এক সময় রানী যোধবাই-এর পুরোহিত। তাই বিষয়টি আকবারকে বিচলিত করে। কিন্তু তবুও তাহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

একদা আকবারের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাহাকে মনোক্ষুণ্ন ও বিমর্ষ অবস্থায় দেখিয়া সুযোগ সন্ধানী মোল্লা মুবারক তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উক্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। এবার মোল্লা মুবারক সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ইতোপূর্বে তিনি দরবারী 'আলিম-'উলামা দ্বারা বহুভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন। তিনি আকবারকে বলিলেন যে, পদাধিকারবলে তিনি 'আলিম-'উলামার পরামর্শ বা নির্দেশ মানিতে মোটেই বাধ্য নহেন। তিনি হইলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মুজতাহিদ (আইন রচয়িতা); বরং আলিম-উলামাসহ সকলেই তাহার নির্দেশ মানিতে বাধ্য। অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি কুরআন ও হাদীছের দলীল পেশ করিয়া আকবারের মনে তাহার বক্তব্য বদ্ধমূল করিয়া দেন। অতএব তাহার পরামর্শে আকবার যে শাহী ঘোষণাপত্র (বরং বলা যায় অধ্যাদেশ) জারী করেন তাহা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য এই যে, রাজকীয় ন্যায়-ইনসাফ ও পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে হিন্দুস্তান পূর্ণ স্বস্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে সাধারণ-বিশেষ সকলে, বিশেষত মুক্তির পথের দিশারী আলিম-উলামা বর্তমানে এখানে সমবেত হইয়াছেন এবং কুরআনের আয়াতের উদ্দিষ্ট 'উতু'ল-'ইলমা দারাজাত' "জ্ঞান লাভকারিগণ মর্যাদায় উন্নত" (৫৮ঃ১১) আরব ও অনারব মুল্ক হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং ইহাকে স্বীয় আবাস বানাইয়াছেন। গরিষ্ঠ সংখ্যক উলামা যাহারা সর্বপ্রকার জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং বৈষয়িক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহে পারদর্শী এবং ঈমানদারি, পরম বিশ্বস্ততা, সারল্য ও সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত। কুরআনের আয়াতঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

["তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী" (৪ ঃ ৫৯)] এবং সহীহ হাদীছ ঃ

["কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ শাসকই হইবেন আল্লাহ্র অধিক প্রিয়" (তিরমিযী, আহকাম, বাব ইমাম 'আদিল, নং ১৩২৯)]

["যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করিল সে আমারই আনুগত্য করিল এবং যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যাচরণ করিল সে আমারই অবাধ্যাচরণ করিল" (বুখারী, জিহাদ, বাব ইউকাতালু মিন ওয়াইল ইমাম, নং ২৯৫৭; আহকাম, ১ম বাব, নং ৭১৩৭; মুসলিম, ইমারাহ, বাব উজূবি তাআতিল ইমাম, নং ৪৭৪৭/৩২ ও ৪৭৪৯/৩৩; আরও দ্র. নাসাঈ, ইব্ন মাজা ও মুসনাদ আহমাদ)] ইত্যাদি প্রমাণসমূহ ব্যতীত অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে ইহা স্বীকৃত হইল এবং অধ্যাদেশ জারী করা হইল যে, আল্লাহ্র নিকট ন্যায়পরায়ণ সুলতানের মর্যাদা মুজতাহিদের

মর্যাদার তুলনায় অধিক এবং বাদশাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবার গাযী যেহেতু সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, উহার ভিত্তিতে তিনি (আকবার) যদি তাহার গভীর প্রজ্ঞা ও সুষ্ঠ বিচারবুদ্ধির আলোকে আদম সন্তানদের অর্থনৈতিক সুবিধা ও পার্থিব ব্যবস্থাপনার সহজীকরণের দৃষ্টিকোণ হইতে মুজতাহিদগণের মতভেদপূর্ণ বিষয়সমূহের কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া উহাকে অনুসরণীয় সাব্যস্ত করেন তবে এই অবস্থায় বাদশাহর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করিতে হইবে এবং প্রজাসাধারণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উহার অনুসরণ বাধ্যতামূলক। (অনুরূপভাবে) কোন কথা কুরআন-সুন্নাহ্র অকাট্য দলীলের বিরোধী না হইলে উহার দ্বারা এবং জগতবাসীর সহায়তা হইলে, এই বিষয়ে বাদশাহ কোন অধ্যাদেশ জারী করিলে তাহা মান্য করা জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য হইবে এবং উহার বিরোধিতা করিলে দীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং আখেরাতে জবাবদিহি করিতে হইবে। এই অধ্যাদেশ ৯৮৭ হিজরীর রজব মাসে জারী করা হইল" (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ.২৭১-২)।

উপরিউক্ত অধ্যাদেশ বা ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আকবার ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। ইহাতে তাহাকে আইনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এই বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ আলিমগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে মোটেই বাধ্য নহেন, বরং তাঁহারাই তাহার নির্দেশ শিরোধার্য করিতে বাধ্য। মোল্লা মুবারক অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল দ্বারা আকবারের অন্তরে তাহার বক্তব্য বদ্ধমূল করেন। এখান হইতেই আকবারের ধর্মবিমুখতা বরং ধর্মদ্রোহিতার প্লাবণ শুরু হয়। তিনি নিত্য নূতন ফরমান জারী করিয়া দীন ইসলামের মর্মমূলে কুঠারাঘাত হানিতে থাকেন এবং ১৫৯২ খৃ. নাগাদ দীন-ই ইলাহীর ভিত্তি স্থাপন করেন (দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, ১খ., পৃ. ৮৮৯-৯০)। উদাহরণস্বরূপ এখানে তাহার ধর্মবিরোধী কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

মুশরিক রমণীদের বিবাহ ঃ কুরআন মজীদ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলমান নারী-পুরুষ সকলকে মুশরিকদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছে, যাবত না তাহারা দীন ইসলাম কবুল করে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ.

"তোমরা মুশরিক নারীদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও নিশ্চয় মুমিন ক্রীতদাসী তাহার অপেক্ষা উত্তম। তোমরা মুশরিক পুরুষদের নিকট তাহারা ঈমান না আনা পর্যন্ত (তোমাদের নারীদের) বিবাহ দিও না। মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও নিশ্চয় মুমিন ক্রীতদাস তাহার অপেক্ষা উত্তম" (২ ঃ ২২১)।

সম্রাট আকবার কুরআনের এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করিয়া হিন্দু রমণীদের কেবল বিবাহ-ই করেন নাই, রাজকীয় অন্দরমহলে তাহাদের পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানের সুষ্ঠ ব্যবস্থাও করিয়া দেন। তাহার এক স্ত্রী ছিল রাজা বিহারী মলের কন্যা ও রাজা ভগবান দাসের ভগ্নী। তাহার অপর স্ত্রী ছিল যোধপুরের রানী যোধবাই। অবশ্য কতক ঐতিহাসিক যোধবাইকে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী বলিয়াছেন। এইসব রমণী আকবারের ধর্মচ্যুতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে (তারীখ দাওয়াত ওয়া আযীমাত, ৪খ.,)। এই সকল রমণীর প্রভাবে আকবার হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মারাত্মকভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং হিন্দু যোগীদের সহিত গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন, এমনকি তাহাদের জন্য তিনি যোগীপুরা নামে একটি স্বতন্ত্র আবাসিক এলাকা নির্মাণ করেন এবং রাজকোষ হইতে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ, পৃ. ২১২-২১৩)। তিনি এমন কিছু মুদ্রাও চালু করেন যাহাতে হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। স্টেইনলি লেনপূল বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত মুগল সাম্রাজ্যের মুদ্রাসমূহের যে তালিকা প্রণয়ন করেন উহার পঞ্চম প্লেটে এমন একটি মুদ্রার চিত্র পরিলক্ষিত হয় যাহাতে রামচন্দ্র হস্তে তীর-ধনুকসহ এবং তাহার পিছনে সীতা একটি লম্বা ঘোংঘট প্রদর্শনপূর্বক দাঁড়াইয়া আছে (The Coins of the Mughal Empires of Hindustan in the British Musium, P. 34)।

হিন্দু ধর্মের প্রতি আকবারের আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পরিকল্পনা মাফিক তাহাদের পুরাতন পুঁথি-পুস্তক হইতে আকবারকে তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী পড়িয়া শুনায় যে, হিন্দুস্তানে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক জন্মগ্রহণ করিবেন যিনি গাভী ও ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিবেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ, পৃ. ৩৬২)। তাহাদের মুখে এই কথা শুনিয়া এবং অতি পুরাতন দস্তাবেয দেখিয়া আকবার ব্রাহ্মণদের প্রতি আরও অধিক শ্রদ্ধাবনত হন এবং গাভীর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকেন। আবুল ফাদল তাহার আইন-ই আকবারী গ্রন্থে 'আইন গাও বিধান' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, বাদশাহ গাভীকে দায়াহ রোযগার জ্ঞান করিয়া মনেপ্রাণে উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসমতে প্রতি বুধবার এবং দেওয়ালী অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাভীদর্শনকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করিতেন (আইন-ই আকবারী, ১খ., পৃ. ১৯৫)। এইভাবে হিন্দু মানসিকতায় প্রভাবিত হইয়া আকবার গরু যবেহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং উহার গোবরকে পবিত্র বস্তু ঘোষণা করেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৪৯; মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ. ৩৭৬)।

কোন কোন ব্রাহ্মণ আকবারের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, একবার খোদা (নাঊযু বিল্লাহ) শূকরের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তাই শূকর দর্শন সৌভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে (আইন-ই আকবারী, ১খ., পৃ. ৩৯৫)।

রাজপুত রানীগণ ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রভাবে আকবার গোশত ভক্ষণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'আইন সুফিয়ানা' অধ্যায়ের অধীনে আবুল ফাদল লিখিয়াছেন যে, বাদশাহর গোশতের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল না (আইন-ই আকবারী, ১খ., পৃ. ৬৩)। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, রন্ধনশালায় গত সাত মাস হইতে গোশত রান্না হয় নাই (মহাভারত, পৃ. ১৩)। তিনি তাহার মুরীদগণকে নির্দেশ দেন যে, নিজ জন্মদিবস ব্যতীত আবান ও ফারওয়ারদীন মাসদ্বয়ে তাহারা যেন গোশতের নিকটেও না যায় (আইন-ই আকবারী, ১খ,

৩৫০; আরও দ্র. ৩খ., পৃ. ৩০৩)। চাঁদ সূরী নামক এক জৈন ধর্মগুরুর প্রভাবে আকবার পিয়াজ-রসুন ভক্ষণ ত্যাগ করেন (Religious policy of Mughal Emperors, পৃ. ২২)।

হিন্দুদের প্রভাবে আকবার সূর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাহাকে এই ধারণা প্রদান করে যে, সূর্যদেবতা রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষক। তাই উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ (আইন-ই আকবারী, ৩খ., পৃ. ২৯৮)। এই কারণে শনিবার যে কোন প্রকার যবেহ বন্ধ থাকিত এবং বাদশাহ ঐদিন তাহার অনুগামীদিগকে লইয়া চিল্লায় মগ্ন হইতেন (আইন-ই আকবারী, ১খ., পৃ. ১৯১)। মুসলমানদের এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সূর্য যদি সম্মানযোগ্য বস্তু না হইত তাহা হইলে কুরআনে উহার উল্লেখ হইল কেন (আইন-ই আকবারী, ৩খ, পৃ. ২৯৮)।

সূর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আকবারকে অগ্নিপূজার স্তরে নামাইয়া দেয়। আবুল ফাদল লিখিয়াছেন যে, আকবারের এইরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণ ধারণা করিতেছিল যে, তিনি পারসী অর্থাৎ অগ্নিউপাসকদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন (আইন-ই আকবারী, ১খ,. পৃ. ৪৭)। আকবারের এই শেরেকী (পৌত্তলিক) কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহার সমসাময়িক শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী (র) লিখিয়াছেন, "কোনও ব্যক্তি কলেমা পাঠ করার পর নবী করীম (স)-এর উত্তম আদর্শ (উসওয়া হাসানা) পরিপন্থী কাজ করিলে অথবা মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাইলে অথবা যিন্নার বাঁধিলে সে নিশ্চিত কাফির" (আশি'আতুল লুম'আত, পৃ. ৩৬)। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী (র) আকবার সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, তিনি ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ) হইয়া গিয়াছিলেন এবং ধর্মদ্রোহীদের (যিন্দীক) অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন (আনফাসুল 'আরিফীন, পৃ. ১৫৪)।

আবুল ফাদল ও বাদাউনী লিখিয়াছেন যে, আকবারের আমলে 'দর্শনিয়া' নামে একটি ফেরকার উদ্ভব ঘটে। তাহারা বাদশাহ আকবারের দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত দাঁত মাজিত না এবং আহারও গ্রহণ করিত না (আইন-ই আকবারী, ১খ., পৃ. ১৮৪; মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ. পৃ. ৩২৬)। বাদশাহ সূর্য দেবতার এক সহস্র নাম জপ করিবার পর ঝরোকায় প্রবেশ করামাত্র তাহারা সিজদাবনত হইত (পূর্বোক্ত বরাত)। মুগল ইতিহাসে 'ঝরোকা দর্শন' একটি পরিভাষায় পরিণত হইয়াছে।

মোটকথা আকবার হিন্দুদিগের অসংখ্য রসম-রেওয়াজের অনুসারী হইয়া পড়েন। তাহার মাতা ইনতিকাল করিলে তিনি হিন্দু রেওয়াজ মুতাবিক ভদরা করান (মিরা'আতুল 'আলাম, পৃ. ৩৫৪ (ক); সাওয়ানিহ আকবারী, পৃ. ১২৪; আকবার নামা, ৩খ., পৃ. ৮৩১)। ইহার ছয় বৎসর পর তাহার দুধমাতা মাহাম আঙ্গার ইনতিকালেও তিনি অনুরূপ অনুষ্ঠান পালন করেন (মা'আছিরুল উমারা, ১খ., পৃ. ৬৮৫)। রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত শাহযাদা সেলীমের বিবাহ অনুষ্ঠান উভয় পক্ষ হইতে রাজপুত নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন হয় (তাযকিরাতুল উমারা, পৃ. ১৩১)। বাদাউনীর লেখা হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ. ৩৪১)। যেহেতু হিন্দু ধর্মে সূদের ব্যবসা হারাম নয়, তাই আকবার সূদী কারবার হালাল ঘোষণা করেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ. ৩৩৮)। হিন্দু ধর্মমতে রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ হওয়ায় আকবার মুসলমানদের জন্যও চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো ও মামাতো বোনকে বিবাহ না করার হুকুম জারী করেন (পূর্বোক্ত বরাত)। হিন্দু ধর্মে একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান না থাকায় আকবার মুসলমানদের জন্যও অনুরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন এবং যুক্তি দেন যে, আল্লাহ এক, স্ত্রীও এক (পূর্বোক্ত বরাত, ২খ., পৃ.. ৩৫৬)। ইসলামী বিধান রহিত করিয়া হিন্দু বিধান চালুর এইরূপ বহু নযীর ইতিহাসে বিদ্যমান। এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচিত হইতে পারে।

দীন ইসলামের মূল পাঁচটি রুকন সম্পর্কেও আকবারের বিরূপ দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য করা যায়। মহাভারত-এর ভূমিকায় আবুল ফাদল আকবারকে খলীফাতুল্লাহ লিখিয়াছেন (মহাভারত, পৃ. ৫)। আকবারের যুগে এককালে মুদ্রার উপর কলেমা তায়্যিবা খোদাইকৃত ছিল। পরবর্তী কালে উহার পরিবর্তে রাম-সীতার মূর্তি অঙ্কিত হয় (দি কয়েনস অফ দি মুগল ইমপেররস অফ হিন্দুস্তান ইন দি বৃটিশ মিউজিয়াম, পৃ. ৩৪)। আকবার শাহী দরবারে এবং শাহী মহলে নামায আদায় করার উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেন (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ, পৃ. ৩১৫)। রোযার ব্যাপারে আকবার তাহার দরবারীদিগকে নির্দেশ দান করেন যে, তাহারা যেন দিনের বেলা প্রকাশ্যে পানাহার করে, পানাহারের ইচ্ছা না থাকিলে যেন মুখে পান পুরিয়া দরবারে হাজির হয় (তাযকিরাতুল মুলুক, পৃ. ২৩১)। মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-এর মাকতুবাত হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। হিন্দুদের বরাতের দিন মুসলামানদের প্রকাশ্যে পানাহারের অনুমতি ছিল না, কিন্তু রমযান মাসে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্যে পানাহারের অনুমতি ছিল (মাকতুবাত ইমাম রব্বানী, ২খ., মাকতূব ৯২)।

দীন ইসলামের চতুর্থ রুকন যাকাত। আকবার এক ফরমানবলে তাহার কর্মচারীদিগকে মুসলমানদের নিকট হইতে যাকাত আদায় নিষিদ্ধ করেন (রুকআত আবুল ফাদল, দফতর আওয়াল, পৃ. ৬২)। হজ্জ গমনেচ্ছুদের উপরও আকবার বিধিনিষিধ আরোপ করেন। আকবারের নিকট হজ্জে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা ছিল মৃত্যুসমতুল্য (মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., পৃ. ২৩৯)। অনুরূপভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উৎস কুরআন মজীদ সম্পর্কেও আকবারের বিরূপ ধারণা ছিল। জাহাঙ্গীর বলেন, আবুল ফাদল আমার পিতার মগজে এই কথা বদ্ধমূল করিয়া দেন যে, কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী নহে, বরং মুহাম্মাদ (স)-এর রচনা (মাআছিরুল উমারা, ২খ., পৃ. ২১৭)। জাহাঙ্গীর তাহার পিতাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আবুল ফাদলকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, আমি বীর সিংহ দেবকে নির্দেশ দিলে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আসার পথে তাহাকে হত্যা করেন। ইহার পর আমার পিতা তাহার এই বিশ্বাস ত্যাগ করেন (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, ৪খ.,। সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান লিখিয়াছেন যে, তুযুক-ই জাহাঙ্গীরির নওল কিশোর সংস্করণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপরিউক্ত ব্যক্তব্য নাই, কিন্তু মেজর ডেভিড ব্রাইস কৃত ইহার ইংরাজী অনুবাদ দ্বারা ইহা সমর্থিত।

আকবারের এই অযাচিত পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-এর নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলেন এবং ইহার ফলে আকবারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দীনে ইলাহীও চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুসতুম, তারীখ মুহাম্মাদী, বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন ওরিয়েন্টাল, নং ১৮২৪; (২) আবদুল কাদির বাদাউনী, মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৮৬৫-৯ খৃ.। মুনতাখাবুত্ তাওয়ারীখ আকবারের শাসনামলের অন্যতম ঐতিহাসিক দলীল। কতিপয় ঐতিহাসিক অন্যায়ভাবে উহার রচয়িতা বাদাউনীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও তথ্য বিকৃতির ভিত্তিহীন অভিযোগ ও অযাচিত মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আকবার ও তাহার সভাসদগণ সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছেন উহার মধ্যে এমন কোন বক্তব্য নাই যাহা সমকালীন অপরাপর ঐতিহাসিক লিখেন নাই। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এক স্থানে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "শাহ সাহেব যাহা কিছু লিখিয়াছেন উহার অতিরিক্ত বাদায়ুনী কোন কথাটি লিখিয়াছেন? অবশ্য শাহ সাহেব সাবধানতা, সতর্কতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাখঢাক করিয়া বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে বাদাউনী সত্য কথন ও যথার্থ বর্ণনা প্রদানে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাস্তব তথ্য উপস্থাপনে কাহারও পরওয়া করেন নাই"। একইভাবে মুজাদ্দিদ আলফে ছানীর মাকতূবাত, আকবারের সভাসদ আবুল ফাদলের আইন-ই আকবারী এবং ফায়াদী সিরহিন্দীর আকবারনামা-তে যখন একইরূপ বিবৃতি বিদ্যমান পাওয়া যায় তখন বাদাউনীকে কি করিয়া দোষারোপ করা যাইতে পারে? (৩) তাহির সাবযাওয়ারী, রাওদাতুত তাহিরীন, বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন ওরিয়েন্টাল ১৬৯; (৪) শাহ্ নিওয়ায খান, মাআছিরুল উমারা, কলিকাতা ১৮৮৮-৯০; (৫) স্টেনলি লেনপুল, দি কয়েন্‌স অফ দি মুগল ইমপায়ারস অফ হিন্দুস্তান ইন দি বৃটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, লন্ডন ১৮৯২; (৬) আবুল ফাদল, আইন-ই আকবারী, লাখনৌ ১৮৬৯ খৃ.; (৭) শ্রী রামশর্মা, রিলিজিয়াস পলিসি অব দি মুগল ইমপেররস, লন্ডন ১৯৪০; (৮) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, আশিআতুল লুম'আত, লাখনৌ ১৩০২ হি.; (৯) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী, আনফাসুল 'আরিফীন, দিল্লী ১৮৯৭ খৃ; (১০) শায়খ মুহাম্মাদ বাকা, মারাআতুল আলাম, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন ই যে ১২৪; (১১) আমীর হায়দার বিলগ্রামী, সাওয়ানিহ আকবারী, বৃটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, ওরিয়েন্টাল ১৬৬৫; (১২) ফায়দী সিরহিন্দী, আকবারনামা, বৃটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, ওরিয়েন্টাল ১৬৯; (১৩) কিওল রাম, তাযকিরাতুল উমারা, বৃটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, এডীশনাল ১৬৭০৩; (১৪) রফীউদ্দীন শীরাযী, তাযকিরাতুল মুলূক, বৃটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, এডীশনাল ২৩৮৮৩; (১৫) হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী, মাকতূবাত ইমাম রব্বানী, লাখনৌ ১৮৭৭ খৃ.; (১৬) রুকআত আবুল ফাদল, তাজ বুক ডিপো., লাহোর তা.বি.; (১৭) প্রফেসর মুহাম্মাদ আসলাম, দীন ইলাহী আওর উসকা পাসমানজার, নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, ১ম সং, উর্দূ বাজার, জামে মসজিদ, দিল্লী ১৩৮৯/১৯৬৯। প্রধানত এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই নিবন্ধটি রচিত হইয়াছে এবং গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত বরাতসমূহও উক্ত গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

আক্‌বার ইব্‌ন আওরংগযেব (اکبر بن اورنگزیب) ঃ মুগল শাহ্‌যাদাহ্, সম্রাট আওরংগযেবের চতুর্থ পুত্র। শাহযাদী যেবুন্নিসা, শাহযাদাহ আজাম এবং তিনি সম্রাটের প্রধানা মহিষী দিল্‌রাস বানূ বেগম-এর গর্ভজাত ছিলেন। তাঁহাকে শিশু অবস্থায় রাখিয়া বেগম ইন্তিকাল করিলে (১৬৫৭ খৃ.) আওরংগযের (দ্র.) অতি স্নেহের সহিত তাঁহাকে লালন-পালন করেন। ১০৯০/১৬৭৯ সালে তাঁহাকে মারাঠাদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রথমদিকে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদের দমন করেন, কিন্তু পরে তিনি বিদ্রোহীগণ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন এবং শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। এই বিদ্রোহের কারণসমূহ জ্ঞাপন করিয়া তিনি ১০৯২/১৬৮১ সালে পিতার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের অনুসৃত নীতির নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই বৎসরই (১৬৮১ খৃ.) তিনি আজমীরে বাদশাহের বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। প্রথমে তিনি মারাঠা শাসক শম্ভুজী (১৬৮০-৯ খৃ.)-এর নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান হইতে পারস্যে গমন করেন। পারস্যের খুরাসানের সীমান্তে ফারাহতে তাঁহার অবস্থানের দরুন পারস্য কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় সম্রাট কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিলেন। আক্‌বার ১১১৬/১৭০৪ সনে পারস্যে মারা যান।

আক্‌বার কর্তৃক পিতাকে লিখিত অনেকগুলি পত্র আওরংগযেবের বিখ্যাত পত্র সংগ্রহ আদাব-ই আলাম্‌গীরীতে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) রক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ হাশিম খাফী খান, মুন্‌তাখাবুল-লুবাব, ২খ., Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৬০-৭৪ খৃ.; (২) আরূদ দাশত, শাহযাদাহ মুহাম্মাদ আক্‌বার কর্তৃক বাদশাহ্ আওরংগযেবকে লিখিত পত্রাবলী, Royal Asiatic Society, লণ্ডন, পাণ্ডুলিপি নং ১৭৩; (৩) আদাব-ই আলামগীরীর অসংখ্য পাণ্ডুলিপি; (৪) দ্র. V. J. A. Flynn. Adab-i-alamgiri, an English translation...., Australian National Univ.., পি-এইচ. ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত), ক্যানবেরা ১৯৭৪ খৃ.; (৫) হামীদুদ্‌দীন খান বাহাদুর, আহ্‌কাম-ই আলাম্‌গীরী, ইংরেজী অনু. স্যার যদুনাথ সরকার, Anecdotes of Aurangzib, কলিকাতা ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২২-২৩, ৬৭।

এম. আতহার আলী (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ুন খান

আক্‌বার এলাহাবাদী (اکبر الہ آبادی) ঃ সায়্যিদ আক্‌বার হুসায়ন (রিদ্‌বী, দ্র. Saksena), জ. বারা (জেলা এলাহাবাদ)-এ ২৭ যু'লক'া'দা ১২৬৩/১৬ নভেম্বর ১৮৪৬। পিতা সায়্যিদ তাফাদ্‌দু'ল হু'সায়ন উরফে ছোট মিয়া একজন সহকারী তাহ্‌সীলদার (Deputy Collector), আলিম ও সূফী মনোভাবাপন্ন লোক ছিলেন; গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। মাতা ছিলেন জগদীশপুর (জেলা গয়া, বিহার)-এর এক জমিদার পরিবারের কন্যা। তিনি ১৮৫৫ খৃ. আক্‌বার-এর শিক্ষার উদ্দেশে এলাহাবাদ আগমন করিয়াছিলেন। আক্‌বার প্রাথমিক আরবী-ফার্‌সী শিক্ষা পিতার নিকট হইতে লাভ করেন। ১৮৫৬ খৃ. তিনি জামনা মিশন স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু ১৮৫৯ খৃ. স্কুল ত্যাগ করেন। তবে তিনি অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন এবং ইংরেজী, দর্শন ও তাসাওউফ-এ যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, চিত্রাংকনের প্রতিও তাঁহার ঝোঁক ছিল।

আক্‌বার প্রথম দিকে কয়েকটি ছোটখাট চাকুরী করেন। ১৮৬৭ খৃ. ওকালতির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন আইন ব্যবসা করেন।

১৮৬৭ খৃ. অস্থায়ীভাবে সহকারী তাহ্‌সীলদার এবং পরবর্তী কালে আবগারির দারোগা (Sub Inspector of Excise) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৭০ খৃ. হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির অফিস সহকারী নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খৃ. ওকালতির উচ্চতর পরীক্ষা পাস করিবার পর ১৮৮০ খৃ. পর্যন্ত ওকাল্‌তি করেন। একই বৎসর তিনি ভারপ্রাপ্ত মুন্‌সিফ নিযুক্ত হন এবং একাধিক পদোন্নতির ফলে ১৮৮৮ খৃ. সাদ্‌রুস্ সুদূর (বিচারকমণ্ডলীর প্রধান), ১৮৯৩ খৃ. ছোট আদালত (small cases court) -এর জজ ১৮৯৪ খৃ. জেলা ও দায়েরা জজ হিসাব এলাহাবাদ, জৌনপুর, মনিপুর, আটাওয়া, বানারস ও সাহারানপুরে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯৮ খৃ. খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৯০৩ খৃ. হাই কোর্ট জজের পদে তাঁহাকে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু চক্ষু রোগের দরুন তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (Fellow)-ও ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯ খৃ. তিনি চক্ষে অস্ত্রোপচার করান। জুন ১৯০৯ খৃ. তাঁহার যুবক পুত্র হাশিম ইন্তিকাল করিলে তিনি বড়ই আঘাত পান এবং অবশিষ্ট জীবন ভগ্ন হৃদয়ে অতিবাহিত করেন। অবশেষে ৬ মুহার্‌রাম, ১৩৪০/৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২১-এ তিনি ইন্তিকাল করেন; তখন তাঁহার বয়স ছিল ৭৫ বৎসর। তিনি এলাহাবাদের খস্‌রুবাদ সংলগ্ন গোরস্তানে সমাহিত হন।

এগার বৎসর বয়সে কাব্য চর্চা শুরু হয় এবং তাঁহার সতের বৎসর বয়সে রচিত গাযাল তাঁহার কাব্য সংগ্রহেও (দ্র. কুল্লিয়াতে আকবার) পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খৃ. হইতে যথারীতি কাব্য চর্চা শুরু করেন এবং ১৮৬৭ পর্যন্ত যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কবি ওয়াহীদ-এর শিষ্য ছিলেন, যাঁহার শিষ্যত্বের ধারা আতিশ পর্যন্ত গিয়া মিলিত হয়। আক্‌বার কাব্য চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে আতিশের রচনাশৈলীর অনুসরণ করিতেন (তালিব, পৃ. ৩০)। আক্‌বার ১৮৭৭ হইতে ১৮৮০ খৃ. পর্যন্ত আ. হ. এলাহাবাদী নামে আওধপাঞ্চ সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহ ব্যতীত তাঁহার পত্রাবলী ও Wilfred Blunt-এর গ্রন্থ The Future of Islam-এর উর্দূ অনুবাদ তাঁহার গদ্য রচনার অন্তর্ভুক্ত।

আক্‌বারের বিশিষ্ট অবদান তাঁহার কাব্য। তাঁহার কৌতুকের বিশিষ্ট ধারা তাঁহাকে উর্দূ সাহিত্যে অনন্য মর্যাদা দান করিয়াছে। তাঁহার গাযালও তাৎপর্য ও কাব্যশৈলীর দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

আক্‌বারের কাব্যকে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : (১) প্রথম হইতে ১৮৬৬ খৃ. পর্যন্ত ঃ ইহা ছিল অনুশীলনের পর্যায়, হইতে প্রাচীনতার ছাপ পরিদৃষ্ট হয়; (২) ১৮৬৬ হইতে ১৮৮৩ খৃ. পর্যন্ত ঃ ইহাতে একই ধারা দৃষ্ট হয়, তবে অধিকতর পরিণতভাবে; (৩) ১৮৮৪ হইতে ১৯০৯ খৃ. পর্যন্ত ঃ এই পর্যায়ে উন্মেষিত হয় নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও কৌতুকের ধারা; (৪) ১৯০৯ হইতে ১৯১২ খৃ. পর্যন্ত ঃ সৌন্দর্য ও প্রেমের পাশাপাশি সত্য উপলব্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বিদ্রূপ ও কৌতুক সূক্ষ্মতর ও রাজনৈতিক শ্লেষ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে। এই সময়ে মীর গুলাম ভীক নায়রাংগ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী মাখযান তাঁহাকে 'লিসানু'ল-'আস'র' উপাধিতে ভূষিত করেন (দ্র. খুতূত); (৫) ১৯১২ হইতে ১৯২১ খৃ. পর্যন্ত ঃ এই সময়ের কবিতায় জীবনের অসারতা ও স্থিতিহীনতার প্রকাশ দেখা যায়, তবে রাজনৈতিক ও বৈঠকী বিদ্রূপ তখনও রীতিমত তীক্ষ্ণ ছিল।

আক্‌বার উর্দূতে বিদ্রূপাত্মক রচনার ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিদ্রূপের ভিত্তি ছিল শৈলী ও উপাদান উভয়ের উপর। তাঁহার উপমাসমূহও অর্থপূর্ণ ছিল। তিনি একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ দ্বারা কৌতুক সৃষ্টি করিতেন। কিন্তু তাঁহার কৌতুককে কেবল শব্দের খেলা বলিলে ঠিক হইবে না, তিনি কল্পনা ও ঘটনারও সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাঁহার জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে শাব্দিক কলাকৌশলের যথেষ্ট অবদান আছে। তবে এই শাব্দিক কলাকৌশল কেবল আনন্দ প্রদানের জন্যই নহে। তাঁহার এই অনুশীলন কোন গভীর অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত, যাহার সম্পর্ক ছিল সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আক্‌বারের বিদ্রূপের মধ্যে কিছুটা আঞ্চলিকতা ও অমার্জিত রুচির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তিনি অপরিচিতকে হাসির বস্তু হিসেবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোথাও আবেগের স্থলে বিদ্রূপ উদ্রেকের কারণ হয় বিশ্বাস, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নহে। তাঁহার ব্যঙ্গ অত্যন্ত গভীর এবং প্রশস্ততর প্রশ্নাবলীর সহিত সম্পৃক্ত যাহাতে প্রাচীন ও আধুনিকতার বিশ্বজনীন দ্বন্দ্ব, বিজ্ঞান ও ধর্মের ব্যাপকতর বিরোধ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু স্বতন্ত্র সমস্যা নিহিত। তিনি মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার এক বিশেষ ধারা পেশ করেন। তাঁহার কৌতুকের বিষয়বস্তু ব্যক্তি অপেক্ষা দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবসমূহ এবং দুইটি স্বতন্ত্র মতবাদের পারস্পরিক সংঘাতের সহিত অধিক সম্পৃক্ত, যাহার পরিধি সমসাময়িক যুগ অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যৎ যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। আক্‌বারের রচনায় কেবল বিদ্রূপের তিক্ততাই নহে, বরং উহাতে রসের মাধুর্যও আছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক, তবে তাঁহার রচনায় আনন্দের উপকরণও ছিল প্রচুর।

আক্‌বার প্যারোডি (parody) রচনার ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন, কোথাও কোথাও তিনি স্পষ্টবাদিতার খাতিরে শালীনতা বিসর্জন দিয়াছেন। তিনি কবিতায় কথোপকথনের রীতি অবলম্বন করিয়া এবং অন্যের কবিতার অনুকরণে কবিতা রচনা করিয়া অভিনবত্বের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন যাহা কৌতুকপ্রদ ও আনন্দদায়ক হইয়াছে। আক্‌বারের কৌতুকাত্মক কবিতায় অন্ত্যমিল, উপমা ও ইংরেজী শব্দসমূহ দ্বারাও বিশেষ রূপক অর্থের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই অভিনবত্বের প্রতি আগ্রহ তাঁহাকে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহিত করিয়াছে। অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

আক্‌বারের গাযাল-এ এক বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হয়। অর্থ ও বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার দরুন তাঁহার গাযালের প্রতি যুগকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। বিখ্যাত কবি আতিশ-এর কাব্যধারার সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল। এই কারণে অনুভূতির বিশুদ্ধতা ও প্রকাশের তীব্রতায় অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়। ভাষা ও বর্ণনায় সৌন্দর্য সৃষ্টির এবং আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ তিনি স্বীয় উস্তাদ ওয়াহীদ-এর মাধ্যমে আতিশ হইতেই লাভ করেন। স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার উপাদান এবং শেষ জীবনের রচনায় জীবন সম্পর্কে অধিক পীড়াদায়ক দুঃখ ও দুশ্চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্যক্তিগত বিপর্যয় ও ব্যথা-বেদনার ফল। আক্‌বারের চতুষ্পদী

(রুবা'ঈ)-ও বেশ সুন্দর; তবে কবিতায় (কিত্আ) তাঁহার মানস অধিক প্রস্ফুটিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তালিব, আক্‌বার ইলাহ্ আবাদী, ২য় সং., ১৯৪৬ খৃ.; (২) রাম বাবু সাকসেনা, তারীখ-ই আদাব-ই উর্দূ, অনু. 'আস্‌কারী; (৩) কামারুদ্দীন আহ্‌মাদ বাদায়ূনী, বায্ম-ই আক্‌বার, আন্‌জুমান তারাক্কী-ই উর্দূ, ১৯৪০ খৃ.; (৪) রিসালা নিগার, এপ্রিল ১৯২৬ খৃ.; (৫) আবদুল মাজিদ দারয়াবাদী, আক্‌বার কী শা'ইরী কা দাওর আখির (মাকালা), রিসালা-ই উর্দূ, এপ্রিল ১৯২৩ খৃ.; (৬) আবদুল কাদিব সারওয়ারী, জাদীদ উর্দূ শা'ইরী; (৭) ওয়াযীর আগা, উর্দূ আদাব মে তানয ও মাযাহ্, পাঞ্জাব একাডেমী ১৯৫৮ খৃ.; (৮) রিসালা-ই যামানা, অক্টোবর ১৯১৮ খৃ.; (৯) রিসালা-ই মা'আরিফ, জুলাই-আগস্ট ১৯১৬ খৃ., জুন-জুলাই ১৯১৭ খৃ.; (১০) সায়্যিদ ইশ্‌রাত হুসায়ন (তাসবীদ), হায়াত-ই আক্‌বার, সম্পা. মুল্লা ওয়াহিদী, করাচী ১৯৫১ খৃ.; (১১) খুতূ'ত-ই আক্‌বার (হাসান নিজামীকে লিখিত), দিল্লী ১৯৫৩ খৃ.; (১২) আবদুল মাজিদ দারয়াবাদী, আক্‌বার নামাহ্ (আক্‌বার মেরী নাজার মে), লক্ষ্মৌ ১৯৫৪ খৃ.; (১৩) আবদুল হায়্যি, গুল-ই রা'না; (১৪) আবদুস সালাম নাদাবী, শি'রুল হিন্দ; (১৫) রাশীদ সিদ্দীকী, তান্‌যিয়াত ওয়া মুদ্'হি'কাত; (১৬) আলীগড় ম্যাগাজিন, আক্‌বার নম্বর, ১৯৫০ খৃ.।

সায়্যিদ আবদুল্লাহ (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

আক্‌বার খান (اکبر خان) ঃ ১৮৪৬-৯৯, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এল. এম. এস. (Licentiats of Medicine and Surgery) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে কলিকাতা মাদরাসা, পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বেংগল গভর্নমেন্টের প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন এবং বিভিন্ন স্থানে অ্যাসিস্‌ট্যান্ট সিভিল সার্জন, মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স-এর শিক্ষক, মেডিক্যাল স্কুলসমূহের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ও সিভিল সার্জন পদে যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। ১৮৯৬-৯৭ খৃ., তাঁহাকে নয়া সৃষ্ট প্রভিন্সিয়াল মেডিক্যাল সার্ভিসের সিনিয়র গ্রেডে উন্নীত নয়া সৃষ্ট প্রভিন্সিয়াল মেডিক্যাল সার্ভিসের সিনিয়র গ্রেডে উন্নীত করা হয়। হুগলীতে কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনীসুয যামান খান মুসলমানদের মধ্যে কলিকাতার প্রথম অ্যাডিশনাল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১০৭।

(সংকলিত)

আক্‌বার খান (اکبر خان) ঃ জন্ম ১৯শ শতকের প্রথম ভাগ, সঠিক জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পুত্র। পেশাওয়ার পুনরুদ্ধারে সাহায্যকারী সেনাদলের আগমনে কাবুলে ফিরিয়া যান (১৮৩৯)। ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের প্রাক্কালে খাইবার অঞ্চল রক্ষায় প্রেরিত হন, কিন্তু গযনী ও কাবুলের পতন ঘটিলে পিতাসহ বুখারায় পলায়ন করেন। দোস্ত মুহাম্মাদের ভারতে নির্বাসনের পর স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানরা আক্‌বার খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। বৃটিশ রেসিডেন্ট ম্যাক্‌নটন সন্ধি করিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা করায় নিহত হন। ইংরেজরা (১৬,০০০-এরও বেশী) কাবুল হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করে, কিন্তু একজন (ডা. ব্রাউডন) ভিন্ন সকলেই পথিমধ্যে নিহত হয় (১৮৪২)। পিতার জীবদ্দশাতেই আক্‌বারের মৃত্যু ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১০৭ (সংকলিত)।

আকবার নামাহ (اکبر نامه) ঃ মুগল সম্রাট আকবার (দ্র.)-এর নবরত্নের অন্যতম ভারতীয় দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আবুল ফযল 'আল্লামী (ابو الفضل علامی) [দ্র.] রচিত রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ। আকবারের পূর্বপুরুষের সংক্ষিপ্ত ও তাঁহার ৪৬ বৎসর রাজত্বকালের বিস্তারিত ইতিহাস। তাঁহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সম্রাটের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় আকবার নামায় স্থান পাইয়াছে। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত মুগল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। আবুল ফযল ফারসী ভাষায় ইহা রচনা করেন। বহু প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহায়তায় গ্রন্থটি রচনা করিতে তাঁহার পাঁচ বৎসরাধিক সময় ব্যয়িত হয়। H. Beveridge ১৯০২ খৃ. ইহার ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৯২১ খৃ. অনুবাদ সমাপ্ত করেন। বহু ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৭৪, পৃ. ৪৮৬, ৪৮৮; (২) শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান ও মাসুদুল মান্নান, মুসলমান শাসনে ভারত ও বাংলাদেশ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ. ২৫৯; (৩) S.M. Edward, H.L.O. Garrett, Mughal Rule in India, S. Chand & Co., Calcutta, Index, pp. 218-20; (৪) Vincent A. Smith, Akbar the Great Mogul 1542—1605, S. Chand & Co., Delhi 1964, pp. 302, 337-38, 3, 4; (৫) আখতার ফারুক, আকবরের নবরত্ন, বুক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৬৫-৬৬; (৬) S. Abul Hasan Ali Nadvi, Muslims in India, Academy Islamic Research & Publications, Luchnow, India 1980, pp. 44-45; (৭) ইসলামী বিশ্বকোষ, ২ খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ২৯-৩০; (৮) Ibn Hasan, The control structure of the Mughal Empire and its Practical working up to the year 1657, Oxford University Press, Pakistan 1967, pp. 7-9; (৯) Abul Fazl's 'The Akbar Namah, Translated by H. Beveridge (ICS), Ess Ess Publications, vol. 1,11 & 111, বিশেষভাবে Introduction দ্র.।

শেখ মাহবুবুল আলম

আক্‌বার শাহ (اکبر شاه) ঃ ১৬শ মুগল সম্রাট (১৮০৬-৩৭), ২য় শাহ আলামের পুত্র। ইনি নামেমাত্র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের বৃত্তিভুক্ত ও অনুগত ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত তাঁহার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না। কারণ লর্ড হেস্টিংস তাঁহাকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের উপরে তাঁহার (আক্‌বার শাহের) কর্তৃত্বসূচক সমুদয় উৎসবানুষ্ঠান বর্জন করিতে নির্দেশ করিলে তিনি নীরবে সেই নির্দেশ পালন করেন এবং অনতিবিলম্বে মুগল সম্রাটের সমস্ত রাজকীয় মর্যাদার অবসান ঘটে। ইহার পুত্র ২য় বাহাদুর শাহ্ শেষ মুগল সম্রাট (১৮৩৭-৫৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১০৭।

(সংকলিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত)

আক্‌বার শাহ খান নাজীব আবাদী (اکبر شاه خان نجیب آبادی) ঃ ১৮৭৫-১৯৩৮, ঐতিহাসিক ও উর্দূ সাহিত্যিক। প্রথমে নাজীব আবাদ মডেল স্কুলে ও পরে সরকারী হাই স্কুলে ফার্সী শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর লাহোরে বসবাস করিতে থাকেন এবং স্বরচিত মির্‌আতুল ইয়াকীন প্রকাশ করেন। কিছু দিন দয়াল সিং কলেজ ও কেম্‌ব্রিজ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুকাল দৈনিক যামীনদার ও মানসূর নামক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদনা করেন। অতঃপর নাজীব আবাদ চলিয়া যান এবং ইব্‌রাত নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তারীখ-ই ইসলাম নামক পুস্তকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রচনা ঃ (১) মিয়ারুল উলামা, (২) মুসলমান-ই উনদুলুস, (৩) নাওয়াব আমীর খান, (৪) বাতিল শিকান, (৫) বেদ আওর উস্‌কী কাদামাত, (৬) লা ইলাহা ইল্লাল্‌লাহ, (৭) ইহ্‌কাক-ই হাক্‌ক প্রভৃতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১০৭।

(সংকলিত)

আক্‌বার, সায়্যিদ মুহাম্মাদ (اکبر سید محمد) ঃ জ. আনু. ১৬৫৭, কবি। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাঁহার একমাত্র রচনা যেবুল মূলক শামারুখ (?) একখানি প্রেমমূলক উপাখ্যান কাব্য। এই কাব্যখানির সমস্ত পাণ্ডুলিপিই ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত হওয়ায় কবিকে ত্রিপুরা নিবাসী বলিয়াই মনে হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও কলিকাতার বটতলা হইতে ছাপা এই কাব্যটি ঘরে ঘরে পঠিত হইত। ফার্সী ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। সম্ভবত ১৭২০ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কাব্যে ফার্সী ভাষার আক্ষরিক সংকেতে গ্রন্থ সমাপ্তির যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা হইতেই মূলত কবির সময়কাল অনুমান করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১০৭।

(সংকলিত)

আক্‌বার হায়দারী (اکبر حیدری) ঃ স্যার, তিনি ছিলেন উপমহাদেশের খ্যাতনামা প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, দূরদর্শী এবং সেই কালের একজন অর্থনীতিবিশারদ ও বিশিষ্ট কর্মবীর। তাঁহার পূর্ণ নাম নাওওয়াব হায়দার নাওয়ায জং বাহাদুর, রাইট অনারেবল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আরব হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পিতা নাযার আলী হায়দার আলী ছিলেন একজন বিশিষ্ট বণিক; চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কয়েকবার তিনি চীনে গমন করিয়াছিলেন। আক্‌বার নিঃসন্দেহে তাঁহার পিতার নিকট হইতে আর্থিক ব্যাপারে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ঐচ্ছিক বিষয় ল্যাটিনসহ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৭ বৎসর বয়সে অনার্সসহ বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ভারত সরকারের অর্থ দফতরের চাকুরীর নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এই বিভাগের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং পরপর নাগপুর, লাহোর, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ খৃ. অক্টোবর মাসে তিনি নিজাম-এর রাজ্যের মহাহিসাবরক্ষক (অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল) হইয়া হায়দারাবাদে আসেন। এই স্থানেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যদক্ষতার স্বাক্ষর রাখিতে সমর্থ হন। শুধু মাঝখানে ফেব্রুয়ারী ১৯২০ খৃ. হইতে জুন ১৯২১ খৃ. পর্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর মহাহিসাবরক্ষক ছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক পূর্বে নয়া দিল্লীতে বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তথ্য ও বেতার দফতরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩০ খৃ. তিনি লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠকে হায়দারাবাদের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাব যোগদান করেন।

১৮৯৩ সনে হাজ্জী নাজমুদ্দীনের কন্যা আমিনার সহিত হায়দারীর বিবাহ হয়। দুইজনেই বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তায়্যিবজী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর বিরামহীন কাজে সর্বদা সাহায্য করিতেন এবং নিজেও বিশিষ্ট সমাজকর্মী ছিলেন।

হায়দরাবাদের নিজাম সরকারের চাকুরীতে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ১৯০৭ খৃ. তিনি অর্থ সচিব ছিলেন। সেইখান হইতে ১৯৩৭ খৃ. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি হন। তিনি শুধু অফিসের কাজকর্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না, জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইত। প্রায়শ তিনি দক্ষিণ ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের ও নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনেরও সভাপতি থাকিতেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দানের জন্য তাঁহাকে আহ্বান জানানো হইয়াছিল। ১৯২৮ খৃ. তিনি নাইট (Sir) উপাধি লাভ করেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯৩০ খৃ. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সিভিল ল' ডিগ্রী (honoris causa) প্রদান করে।

আক্‌বার হায়দারীর কর্মজীবনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রশাসন। সক্রিয় রাজনীতিতে সরাসরিভাবে জড়িত না থাকিলেও তিনি ছিলেন উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং বিভিন্ন উপলক্ষেই তিনি স্বীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৭ খৃ. কলিকাতায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দানকালে তিনি লক্ষ্ণৌ চুক্তি (ডিসেম্বর ১৯১৬)-কে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছিলেন, ইহা দুইটি বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমঝোতা (entente cordiale), সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রগতির

জন্য উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন, "আমাদের এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের মানুষের মনের ঐক্য সৃষ্টি করা অপেক্ষা মহত্তর কাজে কোন ভারতীয় নিয়োজিত থাকিতে পারে বলিয়া আমি ধারণা করিতে পারি না"। সেই একই অনুষ্ঠানে তিনি দাদা ভাই নওরোজীকে সত্যিকার অর্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন, 'জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হইল ভালবাসা, ঘৃণা নহে, বরং সার্বজনীন সহানুভূতি, দলীয় স্বার্থপরতা নহে'। তিনি বিশ্বাস করিতেন, "এক জীবন্ত কার্যকর ঐক্যে যাহাতে উহারা (হিন্দু-মুসলিম, পার্সী, খৃস্টান) একে অপরকে ভাই বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং সকলেই এক ও অভিন্ন ঐতিহ্য, সত্তার উৎকর্ষ ও অগ্রগতির জন্য কাজ করিয়া যাইবে।" আট বৎসর পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি সেই একই বিষয় সবিস্তারে বলেন, "শুধু এক জাতি হিসেবেই আজ আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি। সেই ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ চিরদিন অন্তঃসারশূন্য শব্দমাত্র হইয়া থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, বিনা ঐক্যে স্বরাজ পাওয়া গেলেও তাহা হইবে অভিশাপতুল্য আর সর্বনাশা।" ১৯৩৩ খৃ. উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি আদর্শ সংযুক্ত ভারতকে একটি বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেন, যেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা হইবে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ; ইহারা সকলেই প্রধান কাণ্ড হইতে জীবন-রস আহরণ করিবে। অতএব, তিনি রাজ্যসমূহের, এমনকি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যেরও বিচ্ছিন্ন অবস্থানের বিরোধী ছিলেন এবং একটি ফেডারেল ভারতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, যেই রাষ্ট্রের শক্তি আহরিত হইতে থাকিবে অঙ্গ প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আক্‌বার হায়দারী ভারতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৪০ খৃ. একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতিরূপে তিনি মন্তব্য করেন ঃ আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে ভারতের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার মহানতর উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল। ভারতীয় ইতিহাসের আগাগোড়া একটি ঐক্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য লক্ষ্য করা যায় এবং বিভেদ ও তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট ঘটনা সত্ত্বেও এইগুলি অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু হায়দারী বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইলে কমিটির পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

অপর যে বিষয়টি হায়দারীর প্রিয় ছিল তাহা হইল শিক্ষার মাধ্যম। তিনি বিশ্বাস করিতেন, একমাত্র মাতৃভাষাগুলিই শিক্ষার ফলপ্রসূ মাধ্যম হইতে পারে। এই স্থির বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি শিক্ষার মাধ্যম উর্দূ করিয়া উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। তবে তিনি ইংরেজীকে দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসেবে বহাল রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন এবং যুগপৎ তেলেগু, মারাঠী ও কানাড়ী ভাষা পঠন-পাঠনেরও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন এবং এই সকল ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আধুনিক কলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উর্দূ ভাষার যে দারিদ্র্য রহিয়াছে তাহাও তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশে উর্দূতে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স গ্রন্থাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি হায়দরাবাদ সরকারকে একটি সংকলন ও অনুবাদ দফতর (Bureau of Translation and Compilation) স্থাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য ঠিক কি ধরনের শিক্ষা হিতকর হইবে সেই সম্বন্ধে হায়দারীর কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে (১৯২৫ খৃ.) তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতি, দেশের বর্তমান প্রয়োজন অধিকতর উত্তমরূপে মিটাইতে পারিত যদি ইহাকে দেশের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া নেওয়া যাইত। উহার জন্য দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষিবিদ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, চিকিৎসাবিদ, উৎপাদনকারী, শিল্পী, কারুশিল্পী, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, অর্থাৎ কেরানী ব্যতীত প্রায় সব কিছু।"

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়েই আক্‌বার হায়দারী সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি হায়দারাবাদ রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এমন ব্যক্তিগণেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃ. হায়দারী Sir Robert Glancy-এর নিকট হইতে অর্থ দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বড় রকমের সংস্কার সাধন করিতে আরম্ভ করেন। সেইগুলিকে ত্রৈবার্ষিক চুক্তি অনুযায়ী অর্থনীতির দফতরীকরণ (departmentalisation of finances) বলা যাইতে পারে। প্রতিটি অর্থ ব্যয়কারী দফতরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মঞ্জুরি তিন বৎসর মেয়াদী নির্ধারণ করা হয়। অপরদিকে আকস্মিক খাতসমূহ, যেমন দুর্ভিক্ষ এবং ঋণ মওকুফের জন্য বিশেষভাবে জমা রাখা অর্থের ব্যবস্থা করা হয়। সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ সমতা রক্ষিত হয় এবং ঘাটতি অর্থ ব্যয় সতর্কতার সঙ্গে এড়াইয়া যাওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণীয় দিক ছিল, ইহাতে খাজনা ধার্য করা হইয়াছিল নিম্ন মাত্রায়। তাঁহার অর্থনৈতিক সংস্কার এতই সফল হইয়াছিল যে, তিনি ১৯৩০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে নিজামের নিশ্চয়তা প্রদত্ত রাজ্যের রেলপথ ক্রয় করিয়া লইতে সক্ষম হন। ফলে হায়দরাবাদ রাজ্যের আয় অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

হায়দারী খর্বকায় বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ ছিলেন, তাঁহার চক্ষু ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সকল কিছুতে তিনি সহজে সাড়া দিতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে তিনি ছিলেন বালকসুলভ ব্যবহারের মানুষ, আবার নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন অটল প্রকৃতির, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার সময়ে তিনি পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণের মতের সম্মুখে ছিলেন নমনীয়। বাড়ীতে তিনি অতি সাধারণ কাপড় পরিতেন। নিজের ব্যক্তিগত অফিস কক্ষে কাজ করিবার সময়েও তিনি সাধারণ পোশাকে থাকিতেন, কিন্তু অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজনে তিনি একেবারে নিখুঁত ইয়ুরোপীয় পোশাক পরিধান করিতেন। বাড়ীতে তিনি খোশগল্পে (bonhomie) আনন্দ লাভ করিতেন, আর অবসর সময়ে উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজী কবিতার আবৃত্তি শুনিতে ভালবাসিতেন।

তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান, কখনও নামায ত্যাগ করিতেন না। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তিনি যে শুধু সহনশীল ছিলেন তাহাই নহে, বরং ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুমহলে মুসলিম, হিন্দু, খৃস্টান, আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই ছিলেন।

অর্থ দফতরের মত বস্তুবাদী দফতরের প্রধান হওয়া এবং সদাসর্বদা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হায়দারী সৌন্দর্য চর্চার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং ইহার জন্য সময় খুঁজিয়া পাইতেন। তাঁহার বাড়ী দিলকুশাতে মধ্যযুগের ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার সংগ্রহে ছিল সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী। বিখ্যাত অজন্তা গুহাচিত্রের খনন, সংস্কার ও সংরক্ষণ তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। নিজাম-এর রাজ্যে তিনি প্রত্নতত্ত্বের একটি নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইজন্য অবশ্যই তিনি ঐতিহাসিকগণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়া থাকিবেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আক্‌বার হায়দারীর ভাষণ ও বক্তৃতাসমূহ; (২) উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রসমূহ, ১৯১৭-১৮ খৃ.; (৩) Natesan, Eminent Mussalmans, মাদ্রাজ ১৯২৬; (৪) আর. ভেঙ্কোবা রাও, Ministers of Indian States, ত্রিচিনোপল্লী ১৯২৮; (৫) কে. মুদিরাজ, Prictorial Hyderabad, vol. II, Hyderabad 1934; (৬) স্যার আক্‌বার হায়দারী, নাইট, সেক্রেন্দ্রাবাদ ১৯৩৪; (৭) আলী আক্‌বার, Education under Asaf Jah VII, হায়দরাবাদ ১৯৩৭; (৮) Hyderabad State : Leading Officials, Nobles and Personages, হায়দরাবাদ ১৯৩৭; (৯) Obituary Notices in Islamic Culture, হায়দরাবাদ, এপ্রিল ১৯৪২; (১০) কেশব আয়েঙ্গার, Review of Hyderabad Finance, হায়দরাবাদ ১৯৫১; (১১) ঐ লেখক, Hyderabad Railway Purchase, হায়দরাবাদ; (১২) শেরওয়ানী, Osmania University, First Phase, Yazdani Commemoration Volume, ১৯৬৩; (১৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২।

এইচ. কে. শেরওয়ানী (D. N. B.)/ হুমায়ুন খান

আক্‌রম খাঁ, মোহাম্মদ (اکرم خان محمد) ঃ মোহাম্মদ আক্‌রম খান, (১৮৬৯-১৯৬৮) ছিলেন মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, আযাদী আন্দোলনের নকীব, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, বাগ্মী ও একজন সুসাহিত্যিক।

তিনি ১৮৬৯ সালের জুন মাস মুতাবিক ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ চব্বিশ পরগণা জেলার হাকীমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হন এবং এই প্রেরণাই আগাগোড়া তাঁহার জীবনকে নব নব উদ্যোগ ও প্রেরণার দিকে পরিচালিত করে। তাঁহার পিতা গাযী আবদুল বারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গাযীর গৌরব অর্জন করেন। আক্‌রম খাঁর বয়স যখন এগার বৎসর তখন তাঁহার পিতা ও মাতা মারা যান এবং তিনি নানার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল না। আরবী ভাষার মাধ্যমেই তিনি শিক্ষা লাভে আকৃষ্ট হন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রবেশ লাভ করেন এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতেই এফ. এম. (ফাইনাল মাদ্রাসা) পরীক্ষা পাস করেন। এইজন্য তাঁহাকে মাওলানা বলা হয়। ছাত্র জীবনেই তাঁহার মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই সময় কিছু সংখ্যক অমুসলিম লেখক ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রসূত নানা অপবাদ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ও বিবৃতির মধ্য দিয়াই আক্‌রম খাঁর সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত হয়। স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান (দ্র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৬) 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' তাঁহার এই মানসিক পটভূমি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁহার এই চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি দেখা যায় ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত (১৯০৬) উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে। তিনি তখন ছাত্র। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করেন। এই সম্মেলনের শেষ পর্বে ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি রাজনৈতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম লীগ গঠিত হয়। আক্‌রম খাঁ এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদানের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন।

ছোটবেলা হইতে সংবাদপত্র পাঠে আক্‌রম খাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইহার মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম সমাজ অনুন্নত ও অধঃপতিত, অথচ মুসলিম সমাজের উন্নয়নের দিশারী কোন সংবাদপত্র নাই। ১৯০৪ সালে কুষ্টিয়াবাসী আবদুল্লাহ নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী কলিকাতায় 'মোহাম্মদী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আকরম খাঁর চেষ্টায় পত্রিকাটি ১৯১০ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ইহার মাধ্যমে রাজনীতি পর্যালোচনা, সাহিত্য চর্চা ও ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সারগর্ভ লেখার কল্যাণে অজ্ঞ ও আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয় অনুভূতির সূচনা হয়।

তদানীন্তন বাংলার ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বগুড়ার 'ধানিয়া' গ্রামে আঞ্জুমান-ই উলামা-ই বাংগালা গঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তা ও প্রথম সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (দ্র.)। আক্‌রম খাঁ ছিলেন ইহার সাধারণ সম্পাদক। ১৯১৪ সালে এই আঞ্জুমানের মুখপত্র মাসিক 'আল-ইসলাম' প্রকাশিত হয়। মাওলানা মুনীরুয্‌যামান ইসলামাবাদী (দ্র.) ছিলেন ইহার সম্পাদক। আক্‌রম খাঁ ছিলেন প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক। সাময়িকীটি পাঁচ বৎসর যাবৎ যথারীতি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে আক্‌রম খাঁ তাঁহার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা, স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন এবং মুসলিম সমাজকে ইসলামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

১৯১০ হইতে ১৯১৮ এই আট বৎসরে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক অংগনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯০৫-১১ সালের বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলন, ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন, ১৯১৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস)-এর কনফারেন্স, ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত লীগ-কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ আন্দোলন; উপরিউক্ত প্রতিটি অধিবেশন ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া আক্‌রম খাঁ রাজনীতিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আরম্ভ হয় খিলাফাত ও অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনে (১৯১৯-২১) আক্‌রম খাঁ সক্রিয় ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলন উপলক্ষে তিনি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মুহাম্মাদ আলী ও শাওকাত আলী) সহকর্মীরূপে সারা ভারত সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ খিলাফাত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি বংগীয় কংগ্রেস কমিটি, নিখিল ভারত খিলাফাত কমিটি, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্মীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। খিলাফাত আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশে ১৯২০ সালের ২১ মে তিনি উর্দূ দৈনিক যামানা প্রকাশ করত ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটির প্রকাশনা প্রায় চারি বৎসর অব্যাহত থাকে। বিশ্ব-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য আক্‌রম খাঁ ১৯২১ সালে সেবক নামক একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। একই সময়ে তিনি কিছুদিন সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক যামানা (উর্দূ) ও দৈনিক সেবক— মোট তিনটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও তদানীন্তন ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাধীন ও নির্ভীক মতামত প্রকাশের দরুন 'সেবক' সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে আকরম খাঁকে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তখন হইতে 'সেবক' কিছুদিন বন্ধ থাকে। জেলখানায় থাকা অবস্থায় তিনি কুরআনের ত্রিশতম পারা (عم)-এর বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯২২ সালে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি সেবকের পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন। কিছুদিন পর পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটে। তাই তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে অবলম্বন করিয়াই মসীযুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।

১৯২৩ সালে আক্‌রম খাঁ-সহ অন্যান্য মুসলিম নেতা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের সংগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে অভিহিত হয়। যথাযথভাবে কার্যকরী করা হইলে ইহাতে বাঙ্গালী মুসলমানগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইত। এই প্রেক্ষিতে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' গঠনে আক্‌রম খাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুতে (১৯২৫) ও কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাবের ফলে এই প্যাক্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই।

১৯২৭ সালে আক্‌রম খাঁর সম্পাদনায় কলিকাতায় মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হয়। উন্নত মানের ও প্রথম শ্রেণীর একখানা সাহিত্য পত্রিকা ও ইসলামী সাময়িকীরূপে ইহা স্বীকৃতি লাভ করে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পত্রিকাটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯২৯ সালে তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় সুপারিশ সম্বলিত নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেসী হিন্দু নেতাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিতে শুরু করেন। সি. আর. দাসের মৃত্যুর পর হইতে বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের বিরূপ মনোভাব দেখিয়া তিনি মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং কংগ্রেসের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। স্যার আবদুর রহীম ও মাওলানা আক্‌রম খাঁ যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন। এই সমিতি ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি নাম ধারণ করে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ বেঙ্গল ইউনাইটেড পার্টি গঠন করেন। সেই সময় আক্‌রম খাঁ কৃষক প্রজা পার্টি ত্যাগ করিয়া এই পার্টিতে শামিল হন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার অনুরোধে পরবর্তী কালে 'বেঙ্গল ইউনাইটেড পার্টি' মুসলিম লীগ-এর অঙ্গে পরিণত হয়। এই সময় অপরাপর মুসলিম নেতাদের সংগে আক্‌রম খাঁও মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইতোপূর্বে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর আক্‌রম খাঁ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বাংলা ও আসামের অনুন্নত মুসলিম সমাজের মধ্যে জাগরণ ও আত্মসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাব-এর প্রতি তিনি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং 'দৈনিক আজাদ'-এর ছত্রে ছত্রে আযাদী আন্দোলনের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ১৯৪৮ সালে কলিকাতা হইতে তাঁহার 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' লইয়া ঢাকায় আগমন করেন। তাঁহার 'দৈনিক আজাদ' বাংলা ও আসামের সাংবাদিকতার ইতিহাসে মুসলিম জাগরণের একটি অনন্য দিশারী। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বিতাড়নের পিছনে ইহার অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক। আযাদী আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তিনি ভাস্বর হইয়া থাকিবেন।

আক্‌রম খাঁ ছিলেন প্যান-ইসলামে বিশ্বাসী। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনি খিলাফাত আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কের স্বার্থে লেখনী ধারণ করেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পরম ভক্ত। এই মনোভাব লইয়াই তিনি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আয়্যুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন।

আক্‌রম খাঁ প্রচলিত বিদ'আতসমূহ, যথা পীর পূজা, কবর পূজা ও অন্যান্য রসম, যথা মাতম, সিয়াম, চেহলাম ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দিহলাবীর পথ অনুসরণ করিয়া বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা এবং খাঁটি ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা। স্যার সায়্যিদ আহমাদ ও তাঁহার সহযোগীরা যেভাবে 'তাহ্‌যীবুল আখলাক' পত্রিকার মাধ্যমে উত্তর ভারতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী

হইয়াছিলেন, তেমনি আকরম খাঁ 'মোহাম্মদী'র পাতায় পাতায় মুসলিম বাংলার সামাজিক গলদ শোধরাইবার চেষ্টা করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌ ও মাওলানা কারামাত আলীর যোগ্য উত্তরসুরি।

কেবল পত্র-পত্রিকাই নহে, বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি সংস্কার অভিযান অব্যাহত রাখেন। 'সমস্যা ও সমাধান' নামক পুস্তকে তিনি মুসলিম সমাজের সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া ইসলামের নিরিখে সেই সমস্তের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়াস পান। 'তফসীরুল কুরআন' শীর্ষক গ্রন্থেও তাঁহার এই সংস্কারমূলক মনোভাব ফুটিয়া উঠে। জীবন সায়াহ্নে তিনি 'মোছলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস' লিখিয়া বিজাতীয়দের সংস্পর্শে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট দোষত্রুটি জাতির সামনে তুলিয়া ধরেন।

ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন প্রসার লাভ করুক ইহাই ছিল আকরম খাঁর কাম্য। তিনি বিদেশী তাহযীব-তমদ্দুনের অন্ধ অনুকরণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মতে, সামাজিক জীবন ধর্মীয় জীবন হইতে আলাদা নহে, ধর্মীয় জীবনও জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে আলাদা নহে। তাঁহার ধর্মীয় ভাবধারা ছিল অনেকটা স্যার সায়্যিদ, মুফ্‌তী 'আবদুহ্‌ ও রাশীদ রিদার চিন্তাধারার সদৃশ। ইহাদের ন্যায় তিনিও যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও ইজ্‌তিহাদের প্রবক্তা ছিলেন। এইজন্যই কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি কিছুটা মুজ্‌তাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবধারার দিক হইতে আক্‌রম খাঁকে বাংলার স্যার সায়্যিদ বলা যায়। ইসলাম নিশ্চল নহে, বরং গতিশীল- তিনি ছিলেন এই সত্যের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁহার মতে যুগ, দেশ, স্তর ও অবস্থা নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজের জন্য এই স্থায়ী, শাশ্বত ও আদর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থাই হইল ইসলাম। স্যার সায়্যিদের ন্যায় আকরম খাঁও ইসলাম ও প্রকৃতিকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়াই তিনি প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের আলোকে কুরআন-এর মর্ম অনুধাবনের প্রয়াস পান। আক্‌রম খাঁ ছিলেন অন্ধ অনুকরণের দুশমন। তিনি কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়া ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন। তিনি বলিতেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণের ফলে মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাধারা বিকৃত ও বিপথগামী হইয়া পড়ে।

স্যার সায়্যিদের সংগে আকরম খাঁর মতের কত ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে তাহা উভয়ের রচিত তাফসীর পাঠ করিলেই সহজে উপলব্ধি করা যাইবে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে আকরম খাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জাতিকে অন্ধ অনুকরণের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তিনি অবহিত করেন। আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কাছে কুরআনকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন আক্‌রম খাঁ প্রবলভাবে অনুভব করেন। তিনি তাঁহার জোরদার লেখনীর মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীদের অনেক ইসলাম বিরোধী হামলা প্রতিরোধ করেন। 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম' নামক পুস্তক লিখিয়া তিনি খৃষ্টানদের অপপ্রচারণা প্রতিহত করেন এবং তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করেন।

আক্‌রম খাঁ কেবল সাংবাদিক, রাজনীতিক, ধর্মপ্রচারক ও সংস্কারকই ছিলেন না, একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি অবিরাম ষাটটি বৎসর পশ্চাৎপদ মুসলিম জাতির চৈতন্যোদয়ের জন্য সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য ছিল ইসলাম কেন্দ্রিক। ইসলামী চিন্তাবিদ, নির্ভীক সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিকরূপে আক্‌রম খাঁ সাহেব ছিলেন উপমহাদেশে প্রখ্যাত ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। উল্লেখ্য, আক্‌রম খাঁ আহলে হাদীছ মতবাদের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ৩৮৫-৪২৩; (২) নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ২৬৮; (৩) সওগাত, ৫৮ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ঢাকা ১৩৮৩, পৃ. ৪৮৭-৮৮।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

আক্‌রাম খান বাহাদুর, মুহাম্মদ (اكرم خان بهادر) ঃ আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, বিদ্যোৎসাহী ও পটুয়াখালীর মুসলিম জাগরণের নেতা। জ. ১৮৯৩ খৃ., মৃ. ১৯৭৯ খৃ.। গ্রাম রামনগর, উপজেলা বাউফল, জেলা পটুয়াখালী। পিতা আফছার উদ্দীন। ১৯১৩ খৃ. বরিশাল বি. এম. স্কুল হইতে মেট্রিক, কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই. এ. এবং ১৯২১ খৃ. রিপন কলেজ হইতে ল' পাস করিয়া পটুয়াখালীতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২১ খৃ. তিনি খিলাফাত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার নেতৃত্বে পটুয়াখালীর গ্রামে গ্রামে খিলাফাত আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৩ খৃ. কংগ্রেস নেতা শ্রী সতীন সেনের আহ্বানে পটুয়াখালীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। পটুয়াখালী জামে মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুদের বাদ্যবাজনা ও লতীফ স্কুলে কুরবানী লইয়া পটুয়াখালী হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছিল। মুসলমানগণ মুহাম্মদ আক্‌রামের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধিত। বরিশালের কয়েক স্থানেও হিন্দু-মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। ১৯২৭ খৃ. ২ মার্চ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্লাণ্ডির আদেশে কুলকাটি মসজিদের সামনে গুলী করিয়া ১৭ জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ইহার প্রতিবাদে ১৯২৭ খৃ. ৮ হইতে ১২ মে পর্যন্ত বরিশাল মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মুসলিম নেতা স্যার আবদুর রহীম সভাপতিত্ব করেন। মুহাম্মদ আক্‌রাম বেশ কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক লইয়া কনফারেন্সে যোগ দেন এবং কুলকাটি হত্যায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকার ও হিন্দু-মুসলমান নেতাদের চেষ্টায় ১৯২৮ খৃ. ২৪ জুলাই বরিশালে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। খান বাহাদুর আক্‌রাম এই শান্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছেন। সতীন সেন ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠায় বাধা দিলে মুহাম্মদ আক্‌রাম ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মুসলমানগণ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তিনি ১৯৩৩ খৃ. পটুয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ আমলে পটুয়াখালী পৌরসভার তিনিই প্রথম ও একমাত্র মুসলিম চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য। পটুয়াখালীর শতকরা ৮৫ জন বাসিন্দা ছিল মুসলমান। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারা অনুন্নত ছিল। তিনি পটুয়াখালী মাদ্‌রাসা ও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। তিনি পটুয়াখালী মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন।

দেশ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁহাকে প্রথমে খান সাহেব ও পরে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সৈকতে জীবন কল্লোল, সম্পাদনায় পটুয়াখালী জিলা পরিষদ, পটুয়াখালী, পৃ. ১০-১৮; (২) সওগাত, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩৩, আষাঢ় ১৩৩৪; (৩) Report on the Administration of Bengal, Calcutta 1926-27; (৪) হীরালাল দাস গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, পৃ. ৭৮-৭৯; (৫) সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, বরিশালের ইতিহাস, ২খ., ঢাকা।

সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আকরামুয্যামান খান, খান বাহাদুর (اكرام الزمان خان بهادر) ঃ ১৮৮৫-১৯৩৩, প্রখ্যাত সরকারী কর্মচারী। ঢাকা জেলাস্থ মানিকগঞ্জে অধিবাসী। জন্মস্থান বিহার প্রদেশের (ভারত) সাসারামপুর মহকুমায়। তিনি প্রথমে পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে ও পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৫ খৃ. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৭ খৃ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। চাকুরী উপলক্ষে প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর বিভিন্ন স্থানে কর্মরত থাকাকালে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ১৯১৭ খৃ. তিনি বরিশালের ভোলা মহকুমায় হাই স্কুল ও ১৯২২ খৃ. ফেনীতে নোয়াখালী জেলার প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জস্থ স্কুলসমূহের নানাবিধ উন্নতি তাঁহার শিক্ষানুরাগের পরিচায়ক। তিনি ১৯৩১ ও ১৯৩২ খৃ. একটি স্পেশাল ট্রাইবিউনালের কমিশনার হিসাবে দুইটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দান করেন। দেশে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজহিতকর কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১০৮।

(সংকলিত)

আক মাস্‌জিদ (آق مسجد) ঃ 'সাদা মসজিদ', দুইটি বৃহৎ শহরের নাম ঃ (১) আক মাস্‌জিদ (স্থানীয় উচ্চারণ ঃ আক মেচিৎ (Akmecit)। ইহা ১৭৮৪ খৃস্টাব্দ হইতে কিরীম (ক্রীমিয়া)-এর রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। রুশগণ ইহাকে Sympheropol বলিয়া থাকে। খৃস্টীয় ষোড়শ শতকে কিরীম-এর শাসক এই উদ্দেশে শহরটির পত্তন করেন যাহাতে কিরীম-এর প্রাক্তন রাজধানী বাগচা সারায়-এর আশপাশের বৃক্ষ-লতাহীন বিজন মরুভূমিতে (steppes) যে সকল গোত্রীয় সরদার বসবাস করিত তাহাদের আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকে। আর যেহেতু আক মাস্‌জিদ রাষ্ট্রের যুবরাজের বাসস্থানরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল, সেই হেতু উহা একটি মজবুত কিল্লায় রূপান্তরিত হয়। ইহার পূর্বে খৃস্টের জন্মের আগে তুরানী (Scythian) শাসক স্কীলোরাস (Skiluros)-ও সেই সকল বিজন প্রান্তরের বাসিন্দাদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্য উক্ত জায়গায় নিয়াপোলিস (Neapolis) নামে একটি কিল্লা নির্মাণ করেন (Strabo, ৭খ., ৩১২)। আক্ মাস্‌জিদের কিল্লা নির্মাণের পরও এই পুরাতন কিল্লা যাহা কিরীম-এর শাসনকর্তার সময়ে কিরমেনচিক (Kirmenchik) নামে প্রসিদ্ধ ছিল, নূতন কিল্লার পার্শ্বে একটি গ্রামরূপে অবশিষ্ট ছিল। ১৭৩৬ খৃস্টাব্দে রুশগণ যখন ইহাকে বিধ্বস্ত করে তখন ইহা ছিল ১৮০০ আবাসগৃহের একটি শহর। আক মাস্‌জিদ যুবরাজের আবাসস্থল থাকিলেও ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে ইহার মোট জনসংখ্যা ছিল ৮১৫ জন। আক মাস্‌জিদ বর্তমানে Sympheropol-এর সেই অংশের নাম যেখানে তুর্কীগণের বসতি। রুশগণও এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু সেখানকার তুর্কী বাসিন্দাগণ এই নামটি কখনও ব্যবহার করে না। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে শহরটির তুর্কী ও রুশ অধিবাসিগণের সংখ্যা ছিল সাকুল্য ৮৮,০০০। বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

তূগান (দা. মা. ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

যুবরাজের প্রাসাদের মধ্যভাগে মেংগিলীগিরায়-এর মসজিদ অবিস্থত। আওলিয়া চালাবী (সিয়াহাত নামাহ, ৭খ., ৬৩৮-৬৪১) বর্ণনা করেন, যুবরাজের প্রাসাদ শহরের মধ্যে নহে, বরং শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত যাহা হইতে দক্ষিণে এবং শহর সংলগ্ন।

(২) আক মাস্‌জিদ (آق مسجد) সীর দরিয়ার একটি কিল্লা যাহা খোকান্দের শাসনকর্তার অধীনে ছিল, কিন্তু রুশগণ জেনারেল Parovsky-এর নেতৃত্বে ১৮৫৩ খৃস্টাব্দের ৯ আগস্ট (২৮ জুলাই) আক্রমণ করত জোরপূর্বক ইহা দখল করিয়া লয় এবং এই বৎসরই নূতনভাবে নির্মাণ করিয়া উহার ন্যম Fort Perovsky রাখে। ইহা সীর দরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলার সদর দফ্‌তর, জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। খোকান্দ-এর শাসনকর্তা খোকান্দীয় সর্দারগণকে সীর দরিয়ার নিম্নাঞ্চলে যতগুলি কিল্লা নির্মাণের আদেশ দেন, সবই ছিল আক মাস্‌জিদ-এর শাসনকর্তার অধীনে। যাযাবরগণ যেই কর আদায় করিত তাহা ছাড়াও ওরেনবার্গ (Orenberg) ও বুখারার মধ্যবর্তী রাজপথ ব্যবহারকারী কাফেলাদের পথকরও আক মাস্‌জিদে উসূল করা হইত। মার্চ ১৮৫২ খৃ. এই স্থানের গভর্নর য়া'কূব বেগ (দ্র.) যিনি পরবর্তী কালে কাশগাড়ের শাসক হইয়াছিলেন, তাঁহার নেতৃত্বে খোকান্দী সৈন্যগণ রুশ প্রজা কাযাকীদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ শুরু করে এবং তাহাদের প্রায় এক শতটি অস্থায়ী ক্যাম্প (আউলস- auls) লুণ্ঠন করে। এই বৎসরের জুলাই মাসে রুশ কর্নেল Blaramberg-এর আক্রমণকে য়া'কূব বেগ-এর স্থলাভিষিক্ত বাতির বাসী প্রতিহত করিয়া দেন। পরবর্তী বৎসর রুশ জেনারেল (পরবর্তী কালে কাউন্ট) Perovsky-এর নেতৃত্বে যে রুশ আক্রমণ পরিচালিত হয় উহা প্রতিহত করিতে অতিশয় দূরদর্শিতা ও সতর্কতার সহিত কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইহাতে অকারণে বহু গ্রামের ক্ষতি সাধিত হয়। আক মাস্‌জিদের সম্পূর্ণ দুর্গটিতে ছিল ৫০০ সৈন্য ও তিনটি কামান। দুর্গপ্রধান মুহাম্মাদ আলী (তারীখ-ই শাহরুখী, পৃ. ৯৮; রুশীয় সূত্র অনুযায়ী মুহাম্মাদ ওয়ালী অথবা 'আবদুল ওয়ালী) আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে অধিকাংশ সৈন্যসহ নিহত হন। রুশগণ মাত্র ৭৪ জনকে বন্দী করে, যাহাদের অধিকাংশই ছিল আহত। আক মাস্‌জিদ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে খোকান্দ হইতে মিংগ বাশী (কর্নেল) কাসিম বেগ-এর নেতৃত্বে যেই সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা হয়

তাহারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। রুশদের হাতে আক মাস্‌জিদের বিজয় ছিল মধ্যএশিয়ার ইতিহাসে এক চূড়ান্ত ঘটনা। কারণ সীর দরিয়ার নিম্নাঞ্চলের পর ইহা ছিল তাহাদের বিজিত প্রথম স্থান। সামরিক ইতিহাসে ইহার উল্লেখ সমর-কৌশলের এমন একটি উদাহরণ হিসাব পেশ করা হয় যাহা মধ্যএশিয়ায় একেবারে সংগতিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ১৯২৪ খৃস্টাব্দ হইতে আক মাস্‌জিদ-এর নাম কিযিল আওয়ারদা (قزل أوردا) হইয়া যায়; ইহা ১৯২৮ খৃ. পর্যন্ত কাযাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী থাকে। আজকাল ইহা একটি প্রদেশের রাজধানী।

W. Barthold (দা.মা.ই.) / ডঃ আবদুল জলীল

আল-আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস (الأقرع بن حابس) ঃ (রা) ইব্‌ন ইকাল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আল-মুজাশিঈ আদ্‌-দারিমী (মৃ. ৩১/৬৫১) একজন সাহাবী। তিনি জাহিলী ও ইসলামী যুগে তাঁহার গোত্রের একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল ফিরাস। মাথায় টাক থাকায় তিনি আল-আক্‌'রা' নামে পরিচিত ছিলেন (ইব্‌ন দুরায়দ) এবং খঞ্জ হওয়ার জন্য তাঁহাকে আল-আ'রাজ (الأعرج) বলা হইত (আল-মা'আরিফ; আল-আ'লাকুন নাফীসা)। তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল মুর্‌শিদ ইব্‌ন হাবিস এবং খ্যাতনামা কবি ফারায্‌দাকের মাতা লায়লা বিন্‌ত হাবিস ছিলেন তাঁহার ভগ্নি। আল-আক্‌'রা'-এর চাচাত ভাই ইয়াদ ইব্‌ন হিমার জাহিলী যুগ হইতে নবী করীম (স)-এর একজন বন্ধু ছিলেন। আল-আক্‌'রা'-এর বংশ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। তিনি জাহিলী যুগের অন্যতম বিচারক ছিলেন (ইসাবা, ১খ., ৫৮, নং ২৩১)। তৎকালে উকাজের মেলায় বিচার ও সালিসের দায়িত্ব বানূ তামীম গোত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। বংশানুক্রমে ইসলামের আবির্ভাবের সময় বিচার কার্যের এই দায়িত্ব আল-আক্‌রার উপর অর্পিত ছিল (আসওয়াকুল আরাব, ২৯১)। ইব্‌ন কুতায়বা (আল-মা'আরিফ, ১৯৪) ও ইব্‌ন কালবীর মতে তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মাজূসী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে (মতান্তরে পরে), ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তাইফ-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবী আক্‌রাম (স) হাওয়াযিনের গনীমত হইতে আল-আকরাকে এক শত উট প্রদান করিয়াছিলেন (জাওয়ামিউস সীরা, আল-মুহাববার)। তাঁহার এই উপহার পাইবার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আস-সুলামী একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন (কিতাবুশ-শি'র)। একবার ইয়ামান হইতে কিছু স্বর্ণ উপঢৌকনস্বরূপ আসিয়াছিল। নবী আকরাম (স) চারজন সাহাবীর মধ্যে সেইগুলি বিতরণ করিয়া দেন; তাঁহাদের মধ্যে আল-আক্‌'রা'ও ছিলেন (আল-ইসাবা)। রাসূলুল্লাহ্ (স) আল-আক্‌'রা'কে বানূ দারিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হানজালা গোত্রের রাজস্ব আদায়কারী (আমিল) নিযুক্ত করিয়াছিলেন (আনসাবুল আশ্‌রাফ)। নবম হিজরীর মুহার্‌রাম মাসে মহানবী (স) উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন আল-ফাযারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে তামীম গোত্রের একটি শাখা বানূ আনবার-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঐ গোত্রের লোকেরা অশ্বারোহী বাহিনী দেখিয়া ভীত হইয়া অন্যত্র পলায়ন করে। ফলে মুসলমানদের হাতে ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০টি শিশু বন্দী হয় এবং তাহাদের মদীনায় লইয়া যাওয়া হয়। পরে তামীম গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল বন্দীদের মুক্তি লাভের জন্য মদীনায় উপস্থিত হয়। এই প্রতিনিধি দলে আল-আক্‌রাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (বুখারী; যাদুল মাআদ)। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বন্দীদের মধ্যে তাহাদের নিজেদের পরিবার-পরিজনকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে। তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উচ্চ স্বরে মহানবী (স)-কে ডাকিতে শুরু করে (যাদুল মা'আদ)। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরাতুল হুজুরাতের প্রথম চারিটি আয়াত নাযিল হয় (যামাখ্‌শারী; খাযিন; মাওয়াহিবুর রাহমান)।

এক বর্ণনা অনুযায়ী আল-আক্‌রা' নিজেই নবী (স)-কে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিলেন (মুস্‌নাদ ইব্‌ন হান্‌বাল; লুবাবুন-নুকূল)। আল-আক্‌রা' নিজেই বলিয়াছেন, ঐ সময় আমার মধ্যে জাহিলী ও বেদুঈনী স্বভাব বিদ্যমান ছিল এবং আমি অভদ্রভাবে চীৎকার করিতে শুরু করিলাম ঃ হে মুহাম্মাদ! হুজুরা হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসুন (মাওয়াহিবুর রাহমান)। সম্ভবত আল-আক্‌রার এই একটি রিওয়ায়াতই হাদীছ গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। এই তামীম প্রতিনিধি দলের প্রসংগ ছাবিত (রা) ইব্‌ন কায়স ও হাস্‌সান (রা) ইব্‌ন ছাবিত-এর বিভিন্ন কবিতায় উল্লেখ রহিয়াছে (যাদুল মা'আদ; দীওয়ান হাস্‌সান)। আল-আক্‌রা' বলেন, "নবী (স)-এর বক্তাগণ আমাদের গোত্রের বক্তাগণ হইতে উত্তম এবং তাঁহার কবিগণ আমাদের কবিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ।" আল-আক্‌রা' নবী (স)-এর নিকট বন্দীদের মুক্তির আবেদন করেন। বন্দীদের মুক্তির পর তামীম গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আল-আক্‌রা' অবশ্য পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (জাওয়ামিউস্ সীরা)। আবূ বাক্‌র (রা)-এর সুপারিশক্রমে আল-আক্‌রাকে তামীম গোত্রের নেতা নিযুক্ত করা হয়। নাজরানের প্রতিনিধি দলের সহিত নবী করীম (স) যে চুক্তি সম্পাদন করেন উহাতে আল-আক্‌রা' অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। আল-আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-র সহিত ইয়ামামাসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানা (রা)-র সহিত দূমাতুল জান্‌দালের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ইরাকের যুদ্ধে শরীক হন এবং অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি আন্‌বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন (তাজ্‌রীদ আস্‌মাইস্ সাহাবা, ১খ., ২৬)।

ইয়ারমূকের যুদ্ধে আল-আক্‌রা' তাঁহার দশ পুত্রসহ শাহাদাত লাভ করেন, কিন্তু হাফিজ যাহাবী ও বালাযুরীর মতে 'উছ্‌মান (রা)-এর খিলাফাত আমলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের আল-আক্‌রা'কে সেনাপতি করিয়া খুরাসান অভিযানে প্রেরণ করেন। সেইখানে তিনি ও তাঁহার সৈন্যবাহিনী জূযাজান-এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ১০৭ প.; (২) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর, ১খ., ১৩২৮ হি.; (৩) ইব্‌ন হাযম, জাওয়ামিউস্ সীরা, দারুল মা'আরিফ, মিসর তা. বি., ২৬, ২৪০, ২৪৬, ২৫৯; (৪) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ১খ., ২৮৮, ২৯৪, ৩৫৮, ৪৪৭, ১৫৩, ১৬১; ৪খ., ২৪৬, ২৭৩, ২৮২; (৫) ইব্‌ন আবদিল বার্‌র, আল-ইস্‌তীআব, হায়দরাবাদ ১৩১৮ হি., ১খ., ৪৫; (৬) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবুশ শি'র ওয়াশ-শুআরা (সম্পা.

আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির); কায়রো ১৩৬৪-১৩৬৬ হি., নির্ঘন্ট; (৭) ঐ লেখক, কিতাবুল মা'আরিফ, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., ১৯৪/৩০৫; (৮) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, মিসর ১৯২৮ খৃ., ২খ., ১৫০, ১৮৯, ২০১, ২০৩; ৩খ., ৪০; (৯) ইবনুল কাল্বী, জামহারাতুল আনসাব, বৃটিশ মিউজিয়াম, পাণ্ডুলিপি নং ৩০২, পত্র ৬৫ খ.; (১০) ইব্ন হিশাম, সীরা, নির্ঘন্ট; (১১) বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, ওয়াফ্দ বানী তামীম অনুচ্ছেদ, গায্ওয়াতু উয়ায়না ইব্ন হিসনিল ফাযারী; (১২) ঐ লেখক, আত্-তারীখুস্-সাগীর, এলাহাবাদ ১৩২৫ হি., ৩১; (১৩) আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্, মিসর ১৯৫৯ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, ফুতূহুল বুলদান, কায়রো ১৩১৯, ১৯০১, ৭২, ৪১৩; (১৫) আছ-ছাআলিবী, লাতাইফুল মা'আরিফ, মিসর ১৯৬০ খৃ.; (১৬) আল-জাহিজ, আল-বায়ান, ১খ., ২৩৬; (১৭) হাসসান ইব্ন ছাবিত, দীওয়ান, মিসর ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৪৩, ২৫২, ৩৮৩; (১৮) আল-খাযিন, লুবাবুত তাবীল, মিসর ১৩২০ হি., ৬খ., ৪৩; (১৯) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদ আস্মাইস্ সাহাবা, হায়দরাবাদ ১১৫ হি., ১খ., ২৭; (২০) আয্-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, মিসর ১৩৫৪ হি., ৪খ., ৭; (২১) সাঈদ আহমাদ আকবারাবাদী, সিদ্দীক আক্বার, দিল্লী ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৫৮, ২৬৩; (২২) আস্-সুয়ূতী, লুবাবুন-নুকূল ফী আস্বাবিন-নুযূল, মিসর ১৯৩৫ খৃ., ২০১; (২৩) আত্-তাবারী, তারীখ, নির্ঘন্ট; (২৪) মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, কিতাবুল মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., নির্ঘন্ট; (২৫) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, আবূ বাক্র আস্-সিদ্দীক, মিসর ১খ., ৩৬১ হি., পৃ. ২৩৭, ২৪১, ২৪৩; (২৬) আন্-নাওয়াবী তাহ্যীবুল আস্মা, মিসর, ১খ., ১২৪; (২৭) ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান।

মিনহাজুর রহমান

'আক্'রাব (عقرب) ঃ বৃশ্চিক। Arachnida প্রজাতির এই শাখা ৪৫° উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চল পর্যন্ত দেখা যায়। এশিয়া ও আফ্রিকাতে ইহাদের এমন কিছু উপ-প্রজাতি রহিয়াছে যেইগুলির হুল দংশন মারাত্মক রকমের বিষাক্ত, অনেক সময় মৃত্যুও ঘটায়। এই কারণে বৃশ্চিক সকল সময়েই প্রাচ্য দেশীয় লোকদের কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়াছে, এমনকি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যেও ইহা স্থান করিয়া লইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশিচক্রের অষ্টম রাশি বৃশ্চিক, তাহা ব্যতীত যাদুবিদ্যা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাতেও ইহার ভূমিকা রহিয়াছে। ইহার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানাবিধ ঝাড়-ফুঁক এবং পরে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করা হইত। হাদীছ-এর বিবরণমতে রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষ ক্ষেত্রে কুরআনের বিশেষ সূরা বা আয়াতকে প্রতিষেধকরূপে ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন (মিশ্কাত, সম্পা. মু. নাসিরুদ্দীন, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২য় মুদ্রণ, ২খ., কিতাব ২৩, নং ৪৫২৯ ও অন্যান্য)।

আরব প্রকৃতিবিজ্ঞানিগণ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, বৃশ্চিক কোন যন্ত্রণা বা অত্যধিক উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়া থাকে এবং উহাদের স্ত্রীজাতি নিজ বাচ্চাকে পিঠের উপরে বহন করে এবং শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই মারা যায়। এই পর্যবেক্ষণ আধুনিক যুগেও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের মুকাবিলায় বৃশ্চিকের প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন হুলবিদ্ধের উপর ইহার বিষক্রিয়ার প্রকৃতি প্রাথমিক যুগেই লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের বিভিন্ন উপ-প্রজাতি চিহ্নিত করা হইত। সর্বোপরি ইহার বিষক্রিয়ার চিকিৎসা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। দংশিত স্থান চুষিয়া বিষ বাহির করা ব্যতীত আরও যে ফলপ্রদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত তাহা ছিল বৃশ্চিকটির উদর বিদীর্ণ করিয়া দংশিত স্থানে প্রয়োগ করা। আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বৃশ্চিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইহার ভস্ম পাথরী রোগের ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার ভর্জিত গোশ্ত দ্বারা রীহুস সাবাল নামক চক্ষু রোগের চিকিৎসা করা হইত। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত বৃশ্চিকের তৈল বিভিন্ন রোগে বিশেষ আরোগ্য ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করা হইত। বিষাক্ত ক্ষত, সায়াটিকা (sciatica), পৃষ্ঠের বেদনা, অণ্ডকোষ স্ফীতি ও চুল পড়ার প্রতিষেধক হিসাব এই তৈল ব্যবহার করা হইত। তদুপরি এমন দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ আছে যে, অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, জ্বর ও অন্যান্য কতিপয় রোগও বৃশ্চিক দংশনে আরোগ্য হইয়াছে।

যুদ্ধে বৃশ্চিকের ব্যবহার সম্পর্কে দ্র. (১) আল-জাহিজ, হায়াওয়ান[২], ৫খ., ৩৫৮; (২) Elliot and Dowson, History of India, ৫খ., পৃ. ৫৫০-১; আরবী সাহিত্যে আক্রাব শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়, ইহা সর্বত্রই বিশ্বাসঘাতকতামূলক শত্রুতার প্রতীক (দ্র. হামাসা, সম্পা. Freytag, পৃ. ১০৫, শ্লোক ১; পৃ. ১৫৬, শ্লোক ২; Hudsailian poems, নং ২১, শ্লোক ২৪; মুফাদ্দালিয়্যাত, সম্পা. Thorbecke, নং ১৯, শ্লোক ১২; নাবিগা, সম্পা. Ahlwardt, নং ১, শ্লোক ৪), অথবা বিদ্রূপের নিদর্শন (দ্র. উরওয়া, নং ৫, শ্লোক ৬) অথবা অপবাদ জ্ঞাপক (দ্র. উরওয়া বা, নং ৫, শ্লোক ৬; ফারায্দাক, দীওয়ান, নং ৬১, শ্লোক ৩)। অনুরূপভাবে প্রবাদ-প্রবচনেও আক্রাব-এর উল্লেখ দেখা যায় (দ্র. Freytag, Proverbia, নং ৯০২)। শীতের সর্বাপেক্ষা তীব্র তিনটি দিন (নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের অমাবস্যার দিন)-কে বলা হইত 'তিন বৃশ্চিক' (দ্র. Calendrier de Cordoue, 10)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-জাহিজ, হায়াওয়ান[২], ৫খ., ৩৫৩ প. ও নির্ঘন্ট; (২) দামীরী, ১খ., ১০৬ প.; (৩) কাযবীনী (Wustenfeld), ১খ., ৪৩৯ প.; (৪) ইবনুল বায়তার আল-জামে'বূলাক ১২৯১, ৩খ., ১২৮১; (৫) Dozy, Suppl., ২খ., ১৫২-৩; (৬) Hommel, Ursprung und Alter arab, Sternnamen und Mondstationen, in ZDMG, ১৪, ৬০৫; (৭) A. Benhamouda, Les noms arabs des etoiles, in AIEO, ১৯৫১ খৃ., ১৫৫-৭।

J. Hell (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আক্রাবা আল-জুহানী (عقربة الجهني) ঃ (রা); তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া শাহাদাত লাভ করেন। বিশ্র (মতান্তরে বাশীর) নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল, তিনিও সাহাবী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উস্দুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ৪২২; (২) আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮, ২খ., ৪৯৩।

ডঃ আবদুল জলীল

'আক্রাবা (عقرباء) ঃ 'আরবের দুইটি লোকালয়ের নাম ঃ (১) ইয়ামামার সীমান্তে অবস্থিত একটি স্থান, ইহা একটি সুবিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র। এইখানেই খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসায়লিমাকে ও বানূ হানীফা গোত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইহার নিকটেই একটি বাগিচা (হাদীকা) ছিল, উহা চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। যুদ্ধের পূর্বে বাগিচাটির নাম ছিল রাহ্মানের বাগিচা; পরে ইহাকে মৃত্যুর বাগিচা বলা হইতে থাকে।

(গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ., ১৯৩৭-১৯৪০; (২) বালাযুরী-de Goeje, ৮৮; (৩) ইয়াকূ'ত মু'জাম, ২খ., ২২৬; ৩খ., ৬৯৪।

(২) জাওলান-এর একটি স্থান, গাস্সানী গোত্রের রাজন্যবর্গের বাসস্থান। স্থানটি সম্ভবত বর্তমান জীদুর প্রদেশের আক্রাবার সঙ্গে অভিন্ন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূ'ত, ৩খ., ৬৯৫; (২) Noldeke, in ZDMG, xxix, ৪৩০; তু. in ZDPV, xii, জাবাল হাওরান-এর মানচিত্র, AB 3.

F. Buhl (E.I.[2]) / হুমায়ূন খান

'আক্'রাবায'ীন (عقرابازين) ঃ বা কারাবাযীন, প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক ভাষার 'গাফাযীন শব্দ যাহা গ্রীক graphi diay (অর্থ ক্ষুদ্র নিবন্ধ) শব্দ হইতে আহৃত। আরবগণ ঔষধ প্রস্তুত বা প্রস্তুত প্রণালী সমেত ঔষধের তালিকা বিষয়ক নিবন্ধের শিরোনামরূপে শব্দটি ব্যবহার করিত। আর যে সকল উপাদান ঔষধে এককভাবে (مفردة) ব্যবহার করা হইত, সেইগুলির জন্য তাহারা আল-আদবিয়া আল-মুফরাদা (দ্র.) কথাটি ব্যবহার করিত।

ঔষধ বিজ্ঞান (Pharmacology) ঃ প্রথম হইতে হাসপাতাল-সমূহে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ঔষধ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাদান। বড় বড় হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মধ্যে যে একজন করিয়া ঔষধ প্রস্তুতকারী থাকিত তাহা আমরা বিভিন্ন উৎস হইতে জানিতে পারি। যেমন আল-বীরুনীর আস্-সায়দালা ফিত-তিব্ব। শুধু গ্রীকই নহে, ইরানী ও ভারতীয় উৎস হইতে আহরণের জন্য ভেষজবিদ্যার (Materia Medica) দ্রুত উন্নতি হেতু অবশ্যই বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং চিকিৎসা পেশা হইতে ঔষধ বিশারদগণকে আলাদা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাধারণত বাহিরের রোগী দেখিবার ও চিকিৎসার জন্য হাকিমগণ সম্ভবত নিজেরাই ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং ঔষধের মিশ্রণ (mixture) তৈরি করিতেন (তু. C. Elgood, A medical history of Persia and the Eastern caliphate, Cambridge 1951, 272 প.)। সাধারণত ঔষধের দোকান হইতে আলাদাভাবে ঔষধ ক্রয় করা হইত (দ্র. আল-আত্তার) এবং তারপরে প্রয়োজনীয় মিশ্রণ তৈরী করা হইত। যে সকল পন্থায় ঔষধপত্রে ভেজাল মিশান হইত, মুহ্'তাসিবকে সেইগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইত [দ্র. ইব্নুল উখুওওয়া, মা'আলিমুল কু'রবা (Levy), অধ্যায় ২৫]। কতিপয় একক ঔষধের বিকল্প ঔষধ প্রস্তুতির রীতিও যে প্রচলিত ছিল তাহার সমর্থন পাওয়া যায় দার্শনিক আল-কিন্দীর রচনা হইতে। তিনি দুর্লভ ঔষধের বিকল্প প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় মালমশলা বিষয়ক একখানি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন (কীমিয়াউল ইত্র ওয়াত্ তাস্'ঈদাত - K. Garbers, Leipzig ১৯৪৮)।

ঔষধ বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য ঃ গ্যালেনের "De medicamentorum compositione secundum locos et genera" 'আরবীতে "কিতাব তারকীবিল আদ্বিয়া" নামে অনূদিত হয়, হুনায়ন ইব্ন ইসহাককৃত প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক ভাষা হইতে হুবায়শ উহা অনুবাদ করেন (তু. G. Bergstrasser, Hunain ibn Ishaq uber die Syrischen und arabischen Galenubersetzungen, Leipzig 1925, 23 f.)। বলা হইয়া থাকে, শল্যচিকিৎসকগণের জন্য পেশা শুরু করিবার পূর্বে এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অত্যন্ত ভালভাবে অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক ছিল (দ্র. ইব্নুল উখুওওয়া অধ্যায় ৪৫)।

ঔষধ প্রস্তুত করার প্রণালী সম্বন্ধে নির্দেশ সম্বলিত যে গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম মুসলিম রাজ্যে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে তাহা ছিল খৃষ্টান চিকিৎসক সাবুর ইব্ন সাহ্ল (মৃ. ২৫৫/৮৬৯) কর্তৃক রচিত। তিনি জুনদেসাবুর হাসপাতালে নিযুক্ত ছিলেন। ইব্নুন-নাদীম-এর মতে (ফিহ্রিস্ত, ২৯৭) ইহাতে ২২টি অধ্যায় ছিল, আর ইব্ন আবী উসায়বি'আ-র মতে ('উয়ূনুল আন্বা, ১খ., ১৬১) ছিল ১৭টি অধ্যায়। আমীনুদ্ দাওলা হিবাতুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ ইব্নুত্-তিলমীয (মৃ. ৫৬০/১১৬৫)-এর রচিত "আক্'রাবায'ীন" গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই গ্রন্থখানিই সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। ইব্নুত্-তিল্মীয খলীফা আল-মুক্'তাফী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুসতানজিদ-এর দরবারের হাকীম ছিলেন এবং বাগদাদের আদুদী হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ২০ অধ্যায়বিশিষ্ট "আক্'রাবায'ীন" ছাড়াও তিনি সাধারণ হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য একখানি সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা গ্রন্থ (আল-মুজাযুল বীমারিস্তানী) রচনা করেন (ইব্ন আবী উসায়বি'আ ১খ., ২৭৬)। এই গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি বা পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ পরবর্তী কালে পাওয়া যায় (Brockelmann, I, 642 and S I, 888)। সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযীর রচিত "আক্'রাবায'ীন"-এর পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গিয়াছে (Brockelmann, ১খ., ২৬৯)। প্রাচ্য দেশে রচিত চিকিৎসা গ্রন্থসমূহের মধ্যে বাদ্রুদ্-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন বাহ্রাম আল-ক'লানিসী কর্তৃক ৫৯০/১২৯৪ সালে রচিত "আক্'রাবায'ীন" গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানির কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে লেখক আর্রাযী-র "হাবী" ও "তি'ব্বু'ল-মান্সূ'রী" গ্রন্থের, ইব্ন সীনার কানূন গ্রন্থের ও আরও অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আ, ২খ., ৩১)। নাজ্মু'দ-দীন মাহ্মূদ ইব্ন ইয়াস আশ্-শীরাযী (মৃ. ৭৩০/১৩৩০) কর্তৃক রচিত চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলনের ৫ম খণ্ড, যাহাতে মিশ্র ঔষধ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রহিয়াছে, F. F. Guigues কর্তৃক সম্পাদিত হয় (thesis, Paris 1902)।

মিসরে ইয়াহূদী চিকিৎসক মূসা ইব্নুল, আযার (Moses b. Eleazar) ফাতিমী খলীফা আল-মুইয্য (ইব্ন আবী উসায়বিআ, ২খ.,

৮৬)-এর জন্য একখানি "আক্‌রাবাযীন" রচনা করেন। মিসর, সিরিয়া ও ইরাক-এর হাসপাতালগুলিতে আবুল ফাদ্‌ল ইব্‌ন আবিল বায়ান আল-ইসরাঈলী রচিত "দুসতূরুল বীমারিস্‌তানী" (প্রকাশক P. Sbath, in BIE, 1933, 13-78) সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত, পরে ইব্‌নুল আততার আল-ইস্‌রাঈলীর "মিন্‌হাজুদ্‌-দুক্কান" গ্রন্থখানি উহার স্থান অধিকার করে। এই গ্রন্থখানি কায়রো হইতে ৬৫৮/১২৬০ সালে প্রকাশিত হয় (Brockelmann, I, 648)।

মুসলিম স্পেনে Dioscurides-এর নিবন্ধসমূহের পঠন-পাঠন সম্ভবত একক ঔষধের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাভাজন হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। ইব্‌ন আবী উসায়বিআ (২খ, ৪৯) হইতে জানা যায়, বিখ্যাত হাকীম ইব্‌ন ওয়াফিদ (মৃ. ৪৬০/১০৬৮-এর পরে) খুব কমই মিশ্র ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদিল আযীয আল-বাক্‌রী, যিনি আল-আন্দালুসের লতাগুল্ম ও বৃক্ষ বিষয়ক একখানি বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন (ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, ২খ, ৫২)। তাঁহার মতে ইব্‌ন ওয়াফিদও চিকিৎসা বিষয়ে Dioscurides-এর ঐতিহ্যের একজন উৎসাহী অনুসারী ছিলেন। এই একই কথা মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঔষধবিজ্ঞানী আল-গাফিকী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত Mesue Junior-এর "Grabadin" গ্রন্থখানি (Leo Africanus-এর মতে এই গ্রন্থখানির লেখক জনৈক মাসাওয়ায়হ আল-মারিন্‌দী, যিনি ১০১৫ সালে বাগদাদে মারা যান এবং উহা জনৈক সিসিলীবাসী ইয়াহূদী কর্তৃক অনূদিত হয়) কয়েক শতাব্দী যাবত ইয়ূরোপে ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিষয়ক স্বীকৃত প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল এবং উহাই ছিল পরবর্তী কালে প্রামাণ্য ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ক সকল গ্রন্থের ভিত্তি।

ঔষধের উপাদান ও প্রয়োগ সংক্রান্ত চিকিৎসাতে সূত্রাদির জন্য "তি‌ব্ব" প্রবন্ধ দ্র.।

B. Lewis (E.I.[2]) / হুমায়ূন খান

'আক্‌রাবী (عقربى) ঃ ব. ব. 'আকা‌রিব, এডেনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী দক্ষিণ আরবের একটি গোত্র। সমুদ্র উপকূলবর্তী বি'র আহ্‌মাদ হইতে রা'স ইম্‌রান পর্যন্ত ইহাদের এলাকা খুবই ছোট, মাত্র কয়েক বর্গমাইল। লাহিজ নদীর নিম্নভাগ এই এলাকার উপর দিয়া প্রবাহিত, কিন্তু নদী এখানে প্রায় শুষ্ক। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম বলিয়া এখানকার জমি অনুর্বর এবং তাহাতে সামান্য কিছু ফল উৎপাদিত হয়। প্রধান শহর বি'র আহ্‌মাদে মাত্র কয়েক শত লোক বাস করে। সুল্‌তানের প্রাসাদও এখানেই অবস্থিত।

আল-আশ্‌রাফ আর রাসূলীর মত (তুর্‌ফাতুল আস্‌হাব, Zettersteen, 56, 57) অনুযায়ী আক্‌রাবীরা কুদাআঃ গোত্রভুক্ত, একমতে বানূ মাজেদ শাখাভুক্ত এবং অন্য মতে খাওলান শাখাভুক্ত। A. Sprenger তাঁহার Die alte Geagr. Arabiens-এর ৮০ পৃষ্ঠায় ইহাদেরকে Pliny কর্তৃক উল্লিখিত Agraei-দের সমগোত্রীয় বলিয়া যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন উহা খুবই সন্দেহজনক।

আক্‌রাবীদের এই এলাকাটি বর্তমানে স্বাধীন দক্ষিণ ইয়ামান প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত।

গ্রন্থপঞ্জীঃ H.v. Maltzam, Reise nach Sudarabien, Braunschweing 1873, 314-23; (২) C. U. Aitchisen, A Collection of Treaties etc, xi,. 99, 158 ff.; (৩) F. Elliot, A dictionary of Politics 1969, P. 7.

J. Schleifer-S.M. Stern (E.I.[2]) / হুমায়ূন খান

আকরাম হোসেন, কাজী (اكرم حسين قاضى) ঃ (১৮৯৬-১৯৬৩)। পিতা কাজী আফতাব উদ্দীন আহমদ, খুলনা জেলার পায়গ্রাম কসবায় জন্ম।

গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা মাদরাসার এ্যাংলে-ফার্‌সী বিভাগে ভর্তি হন এবং বাঙালী মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯১৫)। ছাত্রজীবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ গভর্নমেন্টের তরফ হইতে যে আই. ডি. এফ. (Indian Defence Force) বা ভারত রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়, কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি তাহাতে রণবিদ্যা শিক্ষার্থে যোগদান করিয়াছিলেন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি শিবির জীবনের কঠোরতা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উল্লেখ্য, সংগঠক সুভাষচন্দ্র বসু এই সময়ে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় "আযাদ হিন্দ ফৌজে"র প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনিও তাঁহার সহিত ইউনিভার্সিটি পল্টনে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে তিনি বি. এ. (অনার্স) ডিগ্রী লাভ করিবার পর কিছুদিন ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কিছু দিন মাওলানা আকরম খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক সেবক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইয়া ইংরেজীতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল সিরাজগঞ্জ কলেজ (১৯২৩) ও করটিয়া সাআদাত কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৯২৬)। পরবর্তী কালে তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সিরাজগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি ইসলামের ইতিহাস নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন (১৯২৬)। করটিয়া কলেজে অবস্থানকালে তিনি ইসলামের ইতিকথা নামে একখানি বই রচনা করেন। পরে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে থাকাকালে তাঁহার ইসলাম কাহিনী প্রকাশিত হয়। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে নওরোজ (১৯৩৮), পল্লীবাণী (১৯৪৩), পথের বাঁশী (১৯৪৫), আমরা বাঙালী (১৯৪৬) ইত্যাদি গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত মুক্তি (১৯৪৩), যুগবাণী (১৯৪৩), মসনবী রূমী (১৯৪৮), কারীমা-ই সা'দী (১৯৪৮), দীওয়ান-ই হাফিজ (১৯৬১) ইত্যাদি তাঁহার ইসলামী চেতনামূলক অনুবাদ গ্রন্থ। বাংলা ১৩৭০ সাল/১৯৬৩ খৃ. তাঁহার ইন্তিকাল হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪; (২) মুহাম্মাদ মনসুরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা ১৯৮১; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ২খ., ৫৫।

মুহাঃ আবু তালিব

'আক্‌ল (عقل) ঃ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি, ইয়ূনানী গ্রীক (Logos) শব্দের 'আরবী সমার্থক শব্দ। (১) নব্য প্লাটোনীয় মতবাদের (যাহা বিভিন্নভাবে পরবর্তী গ্রীক মতবাদ Logos)-এর সংগে সাদৃশ্যময়। 'আক্‌ল প্রথম, কখনও কখনও দ্বিতীয় সত্তা, যাহা ঐশী সত্তা হইতে প্রথম কারণরূপে উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে প্রজ্ঞাগত সৃষ্টিরূপে "আক্‌ল-এর পরেই নাফ্‌স, তাবিআর ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইয়া প্রথম সৃষ্ট সত্তারূপে 'আক্‌লকে এই দুনিয়াতে স্রষ্টা আল্লাহর "প্রতিনিধি" বা বার্তাবহও বলা হইয়া থাকে। 'আক্‌লই প্রথম সৃষ্টি, এই নব্য প্ল্যাটোনীয় ধারণা আমরা একটি দুর্বল হাদীছেও পাইয়া থাকি ঃ "আল্লাহ সর্বপ্রথম 'আক্‌ল সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি" (দ্র. I. Goldziher, Neuplatonische und gnostische elemente in Hadit ZA, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৩১৭ প.)। আরও দ্র. ফাল্‌সাফা ইখ্‌ওয়ানুস-সাফা শীর্ষক প্রবন্ধ ; ইসমাঈলী মতবাদে আকল-এর ভূমিকা বিষয়ে দ্র. ইস্‌মাঈলিয়্যা ও দুরূয প্রবন্ধ; সূফী ধর্মতত্ত্বে 'আক্‌ল সম্বন্ধে দ্র. ইব্‌ন আরাবী ও আবদুর রায্‌যাক আল-কাশানী প্রবন্ধ; [ইসলামী নীতিশাস্ত্রে 'আক্‌ল-এর ভূমিকা সম্পর্কে ইমাম আল-গাযালীর মতবাদের জন্য দ্র. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম, The Ethics of al-Ghazali ঃ a composite Ethics in Islam, নিউ ইয়র্ক ১৯৭৯, পৃ. ৪৩-১০৪)।

Tj. de Boer (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

(২) ধর্মতত্ত্ববিদগণ (মুতাকাল্লিমূন)-এর মতে 'আক্‌ল জ্ঞানের উৎস এবং এই হিসাবে ইহা নাক্‌ল বা ঐতিহ্যগত বিবরণের বিপরীত (দ্র. I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, অধ্যায় ৩) ; ইহা বুঝাইতে ফিত্‌রা ও তাবী'আ শব্দ দুইটিও ব্যবহৃত হয়। অতএব 'আক্‌ল হইতেছে ন্যায়-অন্যায় জানিবার স্বাভাবিক উপায় এবং তজ্জন্য উহা ওহীর উপর নির্ভরশীল নহে। এই 'আক্‌ল সকল মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে এবং ইহাকে আর-রায়ুল-মুশ্‌তারাকও বলা হইয়া থাকে [দ্র. আল-ফারাবী, রিসালা ফিল-'আক্‌ল (Bouyges)]। 'আক্‌লের অনুরূপ অর্থের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় ফারাবী ও ইব্‌ন সীনা যে বিশেষ অর্থে আকলুল-জামহূর শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন উহাতে। সেই মত অনুসারে 'আক্‌ল দ্বারা মানুষ অবশ্যই প্রশংসনীয় কোন আচরণের দিকে ধাবিত হইবে। সুতরাং একজন মন্দ চরিত্রের লোককে সে যতই প্রতিভাবান হউক না কেন, আকিল ('আক্‌ল-এর অধিকারী) বলা যাইবে না; এখানে 'আক্‌ল অর্থ "প্রজ্ঞা"।

(৩) মুসলিম দার্শনিকগণ 'আক্‌ল-এর বর্ণনা দান ও আলোচনাকালে এরিস্টোটল ও তাঁহার ইয়ূনানী ভাষ্যকারগণকে, বিশেষ করিয়া Aphrodisias-এর Alexander-কে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আক্‌ল হইতেছে আত্মার সেই অংশ (সাধারণভাবে তাঁহাদের মনোবিজ্ঞানের জন্য দ্র. নাফ্‌স প্রবন্ধ) যাহা দ্বারা উহা চিন্তা করে বা জ্ঞান অর্জন করে এবং এই অর্থে ইহা ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধির বিপরীত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্‌ল আদৌ আত্মার অংশ বলিয়াই বিবেচিত হয় না। উহা তখন নীচু পর্যায়ের মানসিক কার্যাবলীর মধ্যে সীমিত হইয়া যায়। কিন্তু দেহাতীত ও কলুষমুক্ত সত্তারূপে ইহা আত্মা হইতে ভিন্নতরঃ ইহাতে ভাবের অস্পষ্টতা থাকিয়া যায় যে অস্পষ্টতা এরিস্টোটলীয় মনস্তত্ত্ব আলোচনায় রহিয়াছে। আক্‌ল মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্তঃ তত্ত্বগত প্রজ্ঞা (আন্-নাজারী) ও ব্যবহারিক বা কার্যগত প্রজ্ঞা (আল-আমালী)। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ইহা বিশ্বজনীন জ্ঞানের সারবস্তুকে বুঝিতে চেষ্টা করে, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইহা ভবিষ্যৎ কর্ম বিষয়ে জানিতে আগ্রহী হয় এবং অনুসন্ধিৎসার তাড়নায় দেহকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে।

মানুষের মধ্যে তত্ত্বগত প্রজ্ঞা বিকাশের বিষয়টি এই মতবাদে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়, খুবই অল্পজ্ঞাত আলোচ্য অংশে (দ্র. De anima, ৩খ., ৫) এরিস্টোটল বলিয়াছেন, কোন মানুষের সুপ্ত প্রজ্ঞা একটি চিরন্তন প্রকৃত প্রজ্ঞা দ্বারা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। (এখানে সাধারণ এরিস্টোটলীয় নীতি প্রযোজ্য হইয়াছে। যে কোন সম্ভাবনকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য একটি প্রকৃত বিকাশ সাধনকারীর প্রয়োজন)। শেষোক্তটি ইহার উপরে ক্রিয়া করে, যেমন ক্রিয়া করে আলোক আমাদের দৃষ্টিশক্তির উপরে কিংবা চিত্রশিল্প তাহার উপাদানের উপরে। এই দুইটি উপমায় নিহিত বৈসাদৃশ্য সক্রিয় প্রজ্ঞা ও নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে এরিস্টোটলের মতকে দুর্বোধ্য করিয়াছে। কিন্তু আলেকজান্ডারের ব্যাখ্যার ফলেই 'আরব দার্শনিকগণের আলোচনার ভিত্তি রচিত হইতে পারিয়াছে। আলেকজান্ডারের মতে (পূ. গ্র.) আমাদের প্রজ্ঞা প্রাথমিক অবস্থায় হইতেছে শুধুই সম্ভাবনা, যাহা সক্রিয় প্রজ্ঞা দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, এই সক্রিয় প্রজ্ঞা হইতেছেন আল্লাহ। আমাদের বাস্তবায়িত প্রজ্ঞা যখন ক্রিয়াশীল না থাকে উহা তখন থাকে Intellecitus in habitu অবস্থায়, আর যাহা ক্রিয়াশীল হয় তাহা হয় intellectus in actu। পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণের অধিকাংশ, বিশেষ করিয়া Themistius ও (ছদ্ম) Philoponus (Stephanus). আলেকজান্ডারের ব্যাখ্যাকৃত কার্যকর প্রজ্ঞার সংগে স্রষ্টার সামর্থ্যের ধারণাকে বাতিল করিয়া দেন এবং বলেন, উহা মানবাত্মারই একটি অংশ। মুসলিম দার্শনিকগণের মতে সক্রিয় প্রজ্ঞা (আক্‌ল ফাআল= عقل فعال) বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার নিম্নতম পর্যায়ের, যাহা বস্তুগত জিনিসকে নির্দিষ্ট আকার দান করে এবং মানব প্রজ্ঞাকে বিশ্বজনীন রূপদান করে। এই কারণে ইহার নামকরণ হইয়াছে ওয়াহিবুস-সুওয়ার-রূপদাতা। আল-ফারাবীর মতে (পূ. গ্র.) বাস্তবায়নের প্রথম স্তরে বস্তু হইতে আকারের বিমূর্তায়ন হয় কার্যকর প্রজ্ঞার জ্যোতি দ্বারা দ্বিতীয় স্তরে তখনই পৌঁছান যায়, যখন এইভাবে বাস্তবায়িত প্রজ্ঞা ('আক্‌ল বি'ল-ফি'ল (Intellectus in effectu) নিজেকে নিজের উপর প্রতিফলিত করে এবং শ্রেণীসমূহের জ্ঞান লাভ করত আক্‌ল মুসতাফাদ (intellectus acquisitus বা adeptus)-এ পরিণত হয়। ইব্‌ন সীনার মতে (আশ-শিফা, De anima) সাম্ভাব্য প্রজ্ঞা ('আক্‌ল বি'ল-কু'ওওয়া বা 'আক্‌ল হায়ূলানী =intellectus potentialis meterialis) উহার বাস্তবায়নের প্রথম স্তরে পৌঁছায় যখন তাহা

স্বতঃসিদ্ধ সত্যসমূহ উপলব্ধি করে (ইহাকে বলা হয় 'আক্'ল বি'ল-মালাকা =intellectus in habitu), দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছায় (ইহাকে বলা হয় 'আক্'ল বিল-ফি'ল=intellectus in acte) যখন উহা প্রাথমিক বোধগম্যতা (intelligibles or axioms) হইতে পরবর্তী দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক বোধগম্যতায় পরিণত হয়, শেষ স্তরে ('আক্'ল মুসতাফাদ= intellectus acquisitus) পৌঁছায় যখন ইহা বাস্তবিক এই সকল স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে আয়ত্ত করে এবং প্রজ্ঞার অনুরূপ হইয়া পড়ে। ইব্ন সীনা নব্য প্ল্যাটোনীয়বাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ হইতে গৃহীত ভাব দ্বারা সার্বজনীনতা অর্জন করা সম্ভব হয় না, সক্রিয় প্রজ্ঞা হইতে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তাহা করা সম্ভব হইতে পারে। মানবের প্রশান্তির চূড়ান্ত পর্যায় তখনই আসে যখন মানুষের প্রজ্ঞা সক্রিয় প্রজ্ঞার সংগে এক হইয়া যায়, যাহা আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনার মতে শুধু মৃত্যুর পরেই ঘটিতে পারে, যদিও ইব্ন রুশদ বলেন, অনুরূপ মিলন পার্থিব জীবনেও সম্ভব।

এই গ্রীক-'আরব মতবাদের প্রধান অসুবিধা হইতেছে প্রজ্ঞার স্বাতন্ত্র্য, যাহাকে তাহারা দেহাতীত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফলে বস্তু অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্যায়নে যে সাধারণ নীতি তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তদনুসারে ইহা বিশ্বজনীন। যদিও ইহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, পৃথক আমি-সত্তা হইতেছে চিন্তার বিষয়- এই উপলব্ধি-নিঃসৃত তাহাদের জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক নীতি, যথা-বিষয়ী ও বিষয়ের পরিচিতি অভিন্ন (এরিস্টোটল কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের বহুনিষ্ঠা [নিরপেক্ষতা] নিশ্চিতকরণের নীতি, ইব্ন সীনা ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন), স্বতন্ত্র অহম গঠনে বাধাস্বরূপ। ইব্ন রুশ্দ-এর রচনায় (De anima) এই অসুবিধাটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি সকল মানবজাতির মধ্যে একই আক্ল (প্রজ্ঞা) বিদ্যমান বলিয়া ঘোষণা করেন। অবশ্য তিনি ইহাও স্বীকার করেন, তাঁহার মতবাদ চিন্তন কার্যের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সুবিচার করিতে পারে নাই।

(৪) মুসলিম দার্শনিকগণ বিভিন্ন প্রজ্ঞা ('উকূ'ল মুফারিক'া)-র স্তর বিন্যাস স্বীকার করেন; নিম্নতর স্তরের প্রতিটি প্রজ্ঞা উহার উচ্চতর স্তর হইতে উদ্ভূত। এই দেহাতীত সত্তাসমূহের সংখ্যা সাধারণত দশ বলিয়া ধরা হয় এবং বিভিন্ন মাত্রায় সেইগুলির প্রাণ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাক্ষমতা ও প্রশান্তি রহিয়াছে। এইগুলি তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রকে সৃষ্টি ও শাসন করে এবং সেই ক্ষেত্রসমূহেরও আত্মা রহিয়াছে। গ্রীক-খৃস্টান চিন্তাবিদগণের ন্যায় (যথা ছদ্ম Philoponus, De anima [Hayduck], পৃ. ৫২৭), মুসলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রজ্ঞাকে কোন কোন ফেরেশ্তা বলিয়া চিহ্নিত করেন, উহাদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থানীয় হইতেছে সক্রিয় প্রজ্ঞা (active intellect), উহার নাম জিবরাঈল। তিনি পার্থিব জগতের প্রধান 'আক্'ল।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) A. Gunsz, Die Abhandl. Des Alex. v. Aphrod. uber den intellect, Leipzig Thesis 1886; (২) আল-ফারাবী, ফিল-আক্ল, সম্পা. Bouyges; (৩) ঐ লেখক, ফী ইছ্'বাতিল মুফারিক'াত, হায়দরাবাদ (ভারত); (৪) ঐ লেখক, আস-সিয়াসাতুল মাদানিয়্যা, হায়দরাবাদ (ভারত); (৫) Dictonary of technical terms, ২খ., ১০২৬ প.; (৬) Maimonides, Le guide des egares, সম্পা. ও অনু. Munk, ১খ., ৩০১ প., ৫১ প., ৬৬ প.; (৭) T. J. de Boer, Zu Kindi und seiner Schule, Arch. f. Gesch, d. Phil. ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ১৭২ প.; (৮) ঐ লেখক, Gesch. d. Phil. im Islam, বিশেষত ৯৪ প., ১০৫ প.; (৯) M. Steinsschneider Al Farabi, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৯ খৃ., পৃ. ৯০ প.; (১০) ঐ লেখক, কিতাব মা'আনিন-নাফ্স, সম্পা. ও টীকা I. Goldziher, Gottingen ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৪১ প.; (১১) ঐ লেখক, La onzieme Intelligence, Rafr, ১৯০৬ খৃ., পৃ. ২২৪ প.; (১২) E. Gilson Les Sources greco-arabes de I' augustinisme avicennisant, Archives d' Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age, ১৯২৯-৩০; (১৩) B. Nardi, S. Tommaso d' Aquino, Trattato sull' Unita dell' intelletto contro gli averroisti, ফ্লোরেন্স ১৯৩৮ খৃ.; (১৪) এফ. রাহমান, Avicenna's Psychology, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩৩-৫৬, ১১৬-২০; (১৫) G. Vadja, Jua ben Nissim ibn Malka, প্যারিস ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৭৪-৯।

F. Rahman (E.I. 2) / হুমায়ুন খান

'আক্'লিয়্যাত (عقليات) ঃ 'ইলমুল কালাম (দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব)-এর একটি পরিভাষাগত পদ। একটি বিশেষ মতবাদ প্রকাশের জন্য এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বুঝাইবার জন্য আক্লিয়্যাত শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ইত্যাকার ব্যবহারের প্রারম্ভ অন্ততপক্ষে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে ফাখ্রুদ্-দীন রাযীর সহিত সম্পৃক্ত এবং ৮ম/১৪শ শতকে ঈজী, তাফতাযানী ও জুরজানী এই ব্যবহারের স্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই পারিভাষিক ব্যবহারের উৎস প্রাচীনতর 'উলূমুল 'আক্'লিয়্যা যাহা ফালসাফা (দর্শন) হইতে গৃহীত এবং ইহার অর্থ আকলী (عقل) 'ইলম বা প্রকৃতিগত জ্ঞান, যাহা অবলোকন (مشاهدة) ও আক্ল দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। আল-গাযালী এই পদটি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. ইহ্'য়া) এবং তিনি ইহাকে আল-'উলূমুশ্-শার'ইয়্যা ওয়াদ্-দীনিয়্যা (প্রত্যাদিষ্ট ও ধর্মীয় জ্ঞান)-এর বিপরীত ভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন।

মু'তাযিলী ঐতিহ্য ও সা'আদিয়া আল-ফায়্যূমী-র মতে 'আক্'লিয়্যা বলিতে বুঝায় যাহা যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, বিশেষ করিয়া নৈতিকতার পর্যায়ে আইন ও নৈতিকতার স্বাভাবিক মূল্য (তু. ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ, বার্লিন MS Glaser 526; G. Vajda কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের মু'তাযিলী পাণ্ডুলিপি আল-মাজমূ ফিল-মুহ'ীত', ১০ম শতাব্দীর শেষে কাদী 'আবদুল-জাব্বার-এর মুহীত-এর সংক্ষিপ্তসার)।

প্রাচীন কালাম-এ এই পার্থক্য ধর্মবিজ্ঞানেও কার্যকর দেখা যায়। মু'তাযিলী বাদানুবাদে যখন 'ইল্ম দীনীকে 'ইল্ম 'আক্'লী ও ইল্ম

শার'ঈ-তে বিভক্ত করা হয় তখন হইতে ইহার সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্যসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। পরবর্তী রচনাসমূহে (আশ্'আরী ও হানাফী-মাতুরীদী মতসমূহে) 'আক্লিয়্যাত বলিতে বুঝায় কালাম (ধর্মীয় বিজ্ঞান)-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের সমষ্টিকে, যাহা যুক্তি ও বুদ্ধি সাপেক্ষ অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ যাহার মৌলিক তত্ত্ব, শার'আর মাধ্যমে প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও, apodictic (কাত'ঈ=অখণ্ডনীয়) যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়। শুধু কুর্আন অথবা হাদীছ ও ইজমা হইতে গৃহীত মূল তত্ত্ব সম্বলিত সাম'ইয়্যাত (ex auditu)-এর সহিত আকলিয়্যাতের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়। সাম্'ইয়্যাতে reason ইহার যথার্থতার যুক্তিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, দুই ধরনের সমস্যাকে আক্লিয়্যাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়ঃ (১) কালাম-এর প্রাথমিক বিষয়সমূহ যাহা অপরিহার্য (جواهر) ও আকস্মিক ব্যাপার (আপতন)-সমূহ (اعراض) পর্যালোচনা করে, যাহা প্রকৃত অর্থে যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যাহা মান্তিক (যুক্তিবিদ্যা), দর্শন (فلسفة) ও প্রকৃতিবিদ্যা (طبيعيات) ও বিশ্বচরাচর সম্বন্ধীয় জ্ঞান (علم الكئنات)-এর সমষ্টি; (২) ইলাহিয়্যাত, যাহা পর্যালোচনা করে (ক) আল্লাহর অস্তিত্ব (উজূদ ও তাঁহার গুণাবলী; তবে পর্যালোচনার বহির্ভূত তাঁহার দৃষ্টি, শ্রবণ, বাকশক্তি এই তিনটি গুণ এবং আল্লাহর দর্শন (রু'য়াত) যেইগুলিকে সাম'ইয়্যাত বলা হয়; (খ) আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলী ও(আফ'আলুহূ তা'আলা)। ইলাহিয়্যাত অবশ্যই ওহী ও হাদীছ ভিত্তিক হইবে, কিন্তু এই ভিত্তিকে বিচারবুদ্ধি (apodictic, স্পষ্ট যুক্তি) দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবে। অন্যান্য বিষয়, যেমন নুবূওয়াত, পরকালতত্ত্ব (echatology), "আইন ও নামসমূহ," 'আদেশ ও নিষেধ' (ইমামা)-কে সাম্'ইয়্যাত বলে। আল-জুর্জানীর বিখ্যাত গ্রন্থ, উদাহরণস্বরূপ শার্হুল মাওয়াকি'ফ (৮ম/১৪শ শতাব্দী)-এর ছয়টি প্রধান খণ্ডের মধ্যে পাঁচটিতে 'আক' লিয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং মাত্র একটি অর্থাৎ শেষ খণ্ডটিতে সাম্'ইয়্যাত বলিয়া কথিত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

L. Gardet (E.I.²) / মুহাঃ আব্দুল কাদের

আক্‌ শামসুদ্-দীন (اق شمس الدين) ঃ পূর্ণ নাম মুহাম্মাদা শামসুল মিল্লা ওয়াদ-দীন [শায়খ শিহাবুদ-দীন সুহরাওয়ারদীর বংশধর (আশ-শাকাইক)]। বায়রামিয়্যার দরবেশ ও কন্সটান্টিনোপলের নিকট হযরত আবূ আয়্যূব আল-আন্স'ারী (রা)-এর কবর আবিষ্কারক। তুর্কী আক শব্দের অর্থ সাদা। তাঁহার পিতার নাম হাম্যা যিনি সিরিয়াতে নানা অলৌকিক কীর্তি দেখাইয়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং পরে আমাসিয়ার নিকটে কাওয়াক জেলায় ইন্তিকাল করেন। আক্‌ শামসুদ-দীন ৭৯২/ ১৩৮৯-৯০ সনে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতা-মাতার সঙ্গে ৭৯৯/১৩৯৬-৯৭ সনে কাওয়াক গমন করেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তখন তিনি ইসলাম সম্পর্কীয় শিক্ষা লাভ শুরু করেন। তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে বাদরুদ্-দীন ইব্ন কাদী সামাওনা সুবিখ্যাত। পরে তিনি 'উছমানজীক নামক স্থানে কুরআন শিক্ষক (মুদাররিস)-এর পদ লাভ করেন। নিষ্ঠাবান শারী'আতপন্থী মুসলিমগণের যুক্তিভিত্তিক ভাবধারার প্রতি অসন্তোষের কারণে তিনি মারিফাতপন্থী উস্তাদের সন্ধানে বাহির হন এবং সেই উদ্দেশে পারস্য হইতে ট্রান্সঅক্সানিয়া (Transozania) পর্যন্ত এলাকা সফর করেন। এমতাবস্থায় একদিন স্বপ্নে যায়নুদ-দীন আল খাওয়াফীর শিষ্যত্ব গ্রহণ না করায় নির্দেশ লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পর তিনি অবশেষে আনুমানিক ৮৩০/১৪২৬-২৭ সালে হ'াজ্জী বায়রাম-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হ'াজ্জী বায়রাম অল্পদিন পরেই তাঁহাকে নিজের খলীফা মনোনীত করেন। এই তারীকার শায়খ ও সহজ প্রাকৃতিক পদ্ধতির চিকিৎসকরূপে তাঁহার কর্মস্থল ছিল আনকারার পশ্চিমে অবস্থিত বেগবাযার (যেইখানে তিনি একটি ছোট মসজিদ ও একটি যাঁতাকল স্থাপন করিয়াছিলেন), ইসকিবিল জেলার উছমানজীক ও গায়নূক জেলার ক্রুসার এই তিনটি স্থান।

তিনি সাতবার হজ্জ করেন, তারিখ জানা যায় না। ৮৫১/১৪৪৭-৮ ও ৮৫৫/১৪৫১-২ এই সময়ের মধ্যে সুলতান ২য় মুরাদের কাদী আস্কার সুলায়মান চেলেবির চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আদ্রিয়ানোপলে আমন্ত্রণ করা হয়। সুলতান ২য় মুহাম্মাদের কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের সময়ে তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে দীনী প্রচারকরূপে যোগদান করেন এবং জনশ্রুতিমতে সেই সময়ে হযরত আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা)-এর কবর আবিষ্কার করেন। এই সময় কোন কোন ব্যাপারে তাঁহার কতক অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সুলতান ২য় মুহাম্মাদের কন্যাকে নিরাময় করিয়া তিনি তাঁহার সুনজর লাভ করেন। কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পরে আক্‌ শামসুদ-দীন গায়নূক প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই রাবীউছ-ছানী মাসের শেষ দিকে ৮৬৩ (১৪৫৯ খৃ.) সালে ইন্তিকাল করেন।

উযুন হাসানের বিরুদ্ধে তেরজান-এর যুদ্ধের পূর্বক্ষণে সুলতানের দেখা একটি স্বপ্নের তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা সত্য নহে, বরং উহা সম্ভবত ফারীদূন-এর মিথ্যা রটনা। আক্‌ শামসুদ্-দীনের সাতজন (অন্য মতে বারজন) পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে কবি হাম্দী সুবিখ্যাত ছিলেন। ইনি কবিতা ছাড়াও চিকিৎসা বিষয়ক ও সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন, সেইগুলি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

বায়রামিয়্যা-র ইতিহাসে আক্‌ শামসুদ-দীন এক মারাত্মক ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেননা তাঁহার সঙ্গে তাঁহারই কিছু সংখ্যক সহচরের মতবিরোধের ফলে বহু সংখ্যক মালামাতিয়্যা দলত্যাগ করে, যাহার ফলে গোটা তরীকার অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাশকুপ্রূযাদে, আশ-শাকাইক্'ন্-নুমানিয়্যা (Tr. O. Rescher, 145 প.) ; (২) আমীর হুসায়ন, মনাকিব আক্‌ শাম্সু'দ-দীন, ইসতান্বুল ১৩০১ হি. (অপর একটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে Unver কর্তৃকও ব্যবহৃত হইয়াছে); (৩) Gibb, ii, 138 প.; (৪) বুরসালী মুহাম্মাদ তাহির, Othmanli Mu'ellifleri, ১খ., ১২প.; (৫) A.S. Unver, Ilim ve sanat bakimndan Fatih drvri notlari, ইসতান্বুল ১৯৪৭, ১খ., ১২৭ প.(Halk menakibine gore Ak-semseddin ve Istanbul hakkinda" তাঁহার অলৌকিক কার্য, বাণী ইত্যাদি

সম্বন্ধে); (৬) H. J. Kissling Aq Sems ed-Din, Ein turkisher Heiliger aus der Endzeit von Byzanz Byzantinische Zeitschrift, 1951, 322 প. (পূর্বেকার প্রামাণ্য উৎস মূহের মতামত হইতে ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিস্তারিত বর্ণনাসমূহে সঙ্কলিত)।

H. J. Kissling (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আক্‌ শেহ্‌র (اق شهر) ঃ আধুনিক তুর্কী বানান অনুযায়ী Aksehir, "সফেদ শহর"।

(১) শহরঃ জনসংখ্যা (১৯৮০) ৩৫,৫৪৪, তুরস্কের মধ্যে আনাতোলিয়াতে সুলতান দাগ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সুপ্রাচীন কালে ইহা ফিলোমেলিয়াম (Philomelium) (দ্র. Pauly-Wissowa) নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন প্রাচীন সূত্রে শহরটির নাম আক্‌শার, আখ্‌শার বা আখ্‌শেহির ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহা সাল্‌জুকগণের ও কারামান-ওগলুগণের অধিকারভুক্ত ছিল। সুলতান ১ম বায়াযীদ ইহা জয় ও উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৬শ-১৭শ শতকে গায্‌যী মার্কী এবং আওলিয়া চেলেবীর ন্যায় বিখ্যাত পর্যটকগণ এই শহরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শহরটি এক সময় একটি সানজাক-এর রাজধানী ছিল, বর্তমানে কোনিয়া বিলায়াতের অন্তর্গত একটি কাদার প্রধান শহর। ইসতানবুল-বাগদাদ মহাসড়কের পার্শ্বে ও বর্তমানে রেলসড়কের একটি স্টেশন হওয়া হেতু স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা কৃষিজ উৎপাদনেরও একটি বড় কেন্দ্র। ১৯৩৫ খৃ. এখানকার জনসংখ্যা ছিল ১০,৩৩৫ (তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া হইতে আগত)। কাদার জনসংখ্যা ছিল ৬০,০০০। এখানকার একটি বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন সুলতান ১ম বায়াযীদ। তাস মাদরাসার শিলালিপিতে সালজুক সুলতান ১ম কায়কাউস (৬১৩/১২১৬)-এর নাম খোদিত থাকিলেও মসজিদটি আরও পরবর্তী কালে নির্মিত। অন্যান্য স্মৃতিসৌধের মধ্যে রহিয়াছে তাক্কা (takke), উহাতে সুলতান ২য় কায়কাউস-এর সময়কার সাহিব আতার খোদিত লিপি রহিয়াছে (৬৫৯/১২৬০); সায়্যিদ মাহমূদ খায়রানীর মাযারসৌধ ও তৎসংলগ্ন অষ্ট কোণাকৃতি পিরামিড (৬২১/১২২৪; ১৫শ শতকের শুরুতে উহার সংস্কার সাধন করা হয়); উলু জামি (১৫শ শতকের শুরু), ইপলিকচি জামি (৭৩৮/১৩৩৭) ও একটি ইমারত। তুরস্কের বিশ্ববিখ্যাত হাস্যরসিক নাস্‌রুদ-দীন খোজা (দ্র.)-এর মাযারের উপর নির্মিত আধুনিক সৌধটির তারিখ খোদিত আছে ৩৮৬/৯২৬।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Cuinet, La Turquie d, Asie, ১খ,. ৮০৩, ৮১৮; (২) Cl. Huart, Konia, প্যারিস ১৮৯৭, পৃ. ১০৯-১৭; (৩) ঐ লেখক, Epigrahie Arabe d'Asie Mineure, Revue Semitique, ১৮৯৪, পৃ. ২৮-৩৪; (৪) Fr. sarre, Reise in Kleinasien, পৃ. ২১ পৃ. (৫) Ch Texier, Asie Mineure, পৃ. ৪৩৫; (৬) Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, ২খ., পৃ. ৬৩; (৭) Hamilton, Researches, ২খ., ১৮৫; (খ) আলী জাওয়াদ, মামালিক উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জোগরাফিয়া লুগাতি, পৃ. ২১; (৮) আওলিয়া চেলেবী. ২খ., ১৫; (৯) Colliers Encyclopaedia, Collier Inc, London 1980, Art. "Trukey".

Cl. Huate-F. Taeschner (E.I.²) / হুমায়ুন খান

(২) আক্‌ শেহির (اق شهر) ঃ (বা আক্‌শার বা আশকার ঃ Pizzigani, ১৩৬৭ খৃ. লিখিয়াছেন, আযকার [Azcar]), তুরস্কের আনাতোলিয়া প্রদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর, কিলকিত ইরমাক নদীর তীরে কয়লু হিসার এবং সুশেহরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। প্রাথমিক যুগের লেখকগণের লেখায় প্রায়ই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কালে কাতিব চেলেবির "জিহাননুমা" (পৃ. ৬২৭) গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক গ্রাম গুয়েলার বা এযবিডার-এর সংগে স্থানটি সম্ভবত অভিন্ন। শহর অপেক্ষা সমতল ভূমির জন্য দীর্ঘকাল যাবত নামটি ব্যবহৃত হইতে থাকে; পরে সমগ্র সমভূমিটিকেই বলা হয় আক্‌শেহির ওয়াসি। উছমানী সৈন্যবাহিনী যখন পারস্য ও জর্জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিত, তখনকার তাহাদের যাত্রাপথের বর্ণনায় নিয়মিতভাবে এই নামটি দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ F. Taeschner, Das anatolische Wegenet, ২খ., ২ (উহাতে আরও অন্যান্য হাওয়ালা রহিয়াছে)।

F. Taeschner (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আক্‌স (দ্র. বালাগা)

আক্‌সারা (দ্র. আক সারায়)

আক্‌ সারাঈ (اق سرای) ঃ কারীমুদ-দীন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সালজুকদের ও ঈলখানীদের আমলের আনাতোলিয়ার ঐতিহাসিক। তাহার জন্ম তারিখ জানা যায় না, ৭২০/১৩২০ সালের দিকে সম্ভবত পরিণত বয়সেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ইলখানিদের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা হিসাবে তিনি মুজীরুদ-দীন আমীর শাহ (সালজুক আনাতোলিয়াতে মোঙ্গলদের অর্থ দফতরের দায়িত্বে নিযুক্ত প্রতিনিধি, পরে ১২৮১ হইতে ১২৯১ খৃ. পর্যন্ত না'ইব পদে নিযুক্ত)-এর সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ১৩০২ খৃ. শেষোক্ত জনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল ছিলেন। গাযান খান অতঃপর তাহাকে সালজুক রাজ্যের আওকাফের নাজির নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত কোন অনির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত তিনি নিজ জন্মশহর আকসারায়-এর কোতওয়াল (দ্র.)-এর দায়িত্ব পালন করেন। স্বীয় জীবনকালের ঘটনাবলীর তিনি একজন চমৎকার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং ৭২৩/১৩২৩ সালে ফারসী ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ মুসামারাতুল আখবার ওয়া মুসায়ারাতুল আখয়ার রচনা করেন। ইহা ও ইব্‌ন বীবীর গ্রন্থ মোঙ্গল আধিপত্য যুগের আনাতোলিয়ার ইতিহাসের প্রধান অত্যাবশ্যকীয় উৎস। এই আমলের কাহিনীই গ্রন্থের চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়, অধ্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইহাই গ্রন্থের তিন-চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহাতে স্বয়ং আল-আক্‌সারাঈর সমকালীন প্রায় ৭৫ বৎসরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গ্রন্থখানির মাত্র দুইটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (আয়াসোফিয়া ৩১৪৩, লিপিকাল ৭০৪/১৩৩৪ ও য়ানিকামি ৮২৭, লিপিকাল ৭৪৫/১৩৪৫, উভয় পাণ্ডুলিপি বর্তমানে ইসতানবুলের সুলায়মানিয়া লাইব্রেরীতে রহিয়াছে)।

পাণ্ডুলিপি দুইখানি পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য Nigde-এর কাদী আহ্মাদ (১৪শ শতক) ও উছমানী সংকলনকারী মুনাজ্জিম বাশী (মৃ. ১৭০২ খৃ.)। অবশেষে খৃ. ১৯শ শতকের শেষদিকে তুর্কী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ইহা পুনরাবিষ্কৃত হয়। সমালোচনামূলক ও সঠিক মূল পাঠের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া উছমান তুরান গ্রন্থকার সম্বন্ধে তাঁহার জানা সকল তথ্যই উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রন্থকার ও গ্রন্থখানি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যতটুকু অধ্যয়ন করা হইয়াছে তাহার বিবরণও প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Musameret U-ahbar. Mogollar zamamnda Turkiye Selcuklari tarihi, Mukaddime ve hasiyelerle tashih ve nesreden Dr. Osman Turan, আঙ্কারা ১৯৪৪; (২) Fikret Isiltan, Die Seltschuken Geschichte des Akserayi, Leipzig ১৯৪৩ খৃ. (ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায়ের জার্মান ভাষায় অনুবাদ-সংক্ষেপসমেত)।

J. L. Bacque Garmmont (E.I.[2] Suppl.) হুমায়ুন খান

আক সারায় (اق سرای) ঃ গুরগাঞ্জ (Vrganc)-এর নিকটস্থ একটি প্রাসাদ, শায়বানিয়াত (সম্পা. Vanbery, ৩৯২,) গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তায়মুর লঙ-এর জন্য শাহর-ই সাব্‌জ নির্মিত এই একই নামের রাজপ্রাসাদের জন্য দ্র. কাশ।

(E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আক্ সারায় (اق سرای) ঃ বা আক্ সারা (اق سرا) অর্থ "শ্বেত প্রাসাদ", আনাতোলিয়ার মধ্যভাগের একটি শহর। ইহার প্রাচীন নাম ছিল Archelais (Pauly-Wissowa দ্র.)। সাল্‌জূক শাসনামলে আক্‌সারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, আর বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদটি নির্মিত হইয়াছিল সুলতান ২য় কীলীজ আরসালান-এর আমলে। পরবর্তী কালে ইহা কারামান-ওগলুগণের ও উছমানী তুর্কীগণের অধিকারে আসে। তুরস্কের সুলতান ২য় মুহাম্মাদ শহরের অধিবাসিগণের এক বিরাট অংশ ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করেন এবং তাহাদের নামানুসারেই শহরের এক মহল্লার নামকরণ করা হয় আক্‌সারায়। শহরটি একটি কৃষি কেন্দ্র; এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গালিচার কারখানা রহিয়াছে। ইব্‌ন বাতূতা ইহা উল্লেখ করিয়াছেন, (২খ., ২৮৬) ইহা নিগ্‌দে (Negde) বিলায়াতের অধীন একটি কাদার সদর দফতর এবং ১৯৩৫ খৃ. ইহার জনসংখ্যা ছিল ৮৩০০ (কাদার জনসংখ্যা ছিল ১৯,০০০)। শহরের উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ ও ভবনের মধ্যে রহিয়াছে উলু জামি (নির্মাণ ১৫শ শতকের প্রারম্ভে, সালজূক আমলের একটি মিম্বার সমেত), যিন্‌জির্‌লি মাদরাসা (নির্মাণ ১৫শ শতকের প্রথমার্ধে), কাদির ওগলু মাদরাসা (নির্মিত হয় সালজূকদের আমলে এবং সংস্কার সাধন করেন কারামান ওগলু ইব্‌রাহীম বেগ), নাক্কাশী জামি (আধুনিক, কিন্তু সংলগ্ন মিনারটি ১৪শ শতকের) ও বিভিন্ন হাম্মামখানা। শহরের নিকটস্থ আরওয়াল তেপে নামক স্থানে কয়লার গুল নির্মিত ইটের তৈরী একটি তুরবা (কবরস্থান) রহিয়াছে। ইহা ১৩শ শতকের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Fr. Sarre, Reise in Kleinasien, পৃ. ৯৩ প.; (২) Ch. Texier, Asie Mineure, ৫০৯, ৫৬৬; (৩) Ainsworth, Travels And researches in Asia Minor, ১খ., ১৯২; (৪) E. Reclus, Nouv. geogr. univ, ৫৭১; (৫) Hamilton, Researches, ii, 22; (৬) গুলশান-ই মা'আরিফ, ১খ., ৫২১, ৫২৪; (৭) 'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই উছমানিয়্যানিন তারীখ ওয়া জোগরাফিয়া লুগাতি, ২১; (৮) W. Ramsay, Asia Minor, ২৮৪; (৯) আওলিয়া চেলেবী, ২খ., ১৯১।

F. Taeschner (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আক্ সুনকুর (اق سنقر) ঃ শ্বেত বাজপাখী, অনেক তুর্কী কর্মকর্তা এই নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন উল্লেখযোগ্যঃ ১. (আবূ সা'ঈদ) আক্ আবদিল্লাহ সুনকুর ইব্‌ন কাসীমুদ্-দাওলা, যিনি আল-হাজিব নামে পরিচিত এবং মালিক শাহ (দ্র.)-এর মাম্লূক ছিলেন। মালিক শাহ তাঁহাকে ৪৮০/১০৮৭ সালে আলেপ্পো (হালাব)-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনি প্রথমদিকে সাল্‌জূক যুবরাজ তুতুশ (দ্র.)-কে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। কিন্তু মালিক শাহের মৃত্যুর পর তিনি উত্তর সিরিয়া ও জাযীরার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথে একজোট হইয়া বার্কিয়ারুক-এর পক্ষ সমর্থন করেন এবং ১ জুমাদাল উলা, ৪৮৭/মে ১০৯৪ সালে তুতুশ কর্তৃক আলেপ্পোর নিকটে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার পুত্র 'ইমাদুদ-দীন যাঙ্গী (দ্র.) যিনি পরবর্তী কালে মুসিলের আতাবেক (শাসনকর্তা) হন এবং ন্যায়নীতি ও সুশাসনের জন্য উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল, কালানিসী (Amedroz) 119-26, অনু., Le Tourneau, Damas de 1075 a 1154, Damascus 1952, 15-27; (২) ইব্‌নুল আছীর, ১০, ৯৮, ১৪৯-৫১, ১৫৭-৮; (৩) ইব্‌ন খল্লিকান, সংখ্যা ৯৯; (৪) ইব্‌নুল 'আদীম, তারীখ হালাব ২খ., দামিশক ১৯৫৪, নির্ঘণ্ট।

H. A. R. Gibb (E.I.[2]) / অহিদুল আলম

আক্ সুনক্'র আল-বুরসুকী (اق سنقر) ঃ (আবু সা'ঈদ সায়ফুদ-দীন ক'াসীমুদ-দাওলা), ছিলেন মূলত বুরসুক (দ্র.)-এর জনৈক মামলূক এবং সালজূক সুলতান মুহাম্মাদ ও মাহমূদ-এর প্রধান কর্মকর্তাগণের অন্যতম। তিনি খ্যাতি অর্জন করেন প্রথমত ইরাকের সামরিক শাসক (শিহনা)-রূপে এবং পরে শেষ জীবনে মাওসিলের শাসকরূপে, যখন এই উভয় পদের দায়িত্বই তিনি একসঙ্গে পালন করেন। ৪৯৮/১১০৫ সালে শিহনা নিযুক্ত হইলে তাঁহার প্রধান কাজ ছিল দুবায়স (দ্র.)-এর মায়য়াদী আরবদের দমন করা; উহারা বাগদাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতেছিল। প্রথমবার মাওসিলের শাসক থাকাকালে (৫০৭/১১১৩) তাঁহার প্রধান দায়িত্ব ছিল সিরিয়ায় সুলতানের নামে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে জিহাদ সংগঠন করা এবং একই সঙ্গে দিয়ার বাকরে, একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সালজূকদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা

করার চেষ্টা করা। এই প্রচেষ্টার প্রথমদিকে কয়েকবার তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হন। কারণ তাঁহার এই সকল উচ্চাশাময় কার্যাবলী জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে, যাহার ফলে ৫০৯-১২/১১১৬-৮ সালে আংশিক অসম্মানিত অবস্থায় তিনি ফুরাত নদী তীরবর্তী তাঁহার জায়গীর আর্‌-রাহ্‌বা-তে কাল কাটাইতে বাধ্য হন। পরে তিনি দুবায়স-এর সহযোগে খৃষ্টান ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণ হইতে আলেপ্পো রক্ষা করিয়া উহার বিশিষ্ট নাগরিকগণের সঙ্গে বুঝাপড়াক্রমে অবশেষে সমগ্র প্রদেশেরই শাসনভার লাভ করিতে (৫১৮/১১২৫) সক্ষম হন। এইভাবে তিনি উত্তর সিরিয়ার সঙ্গে জাযীরার একাংশের একত্রীকরণ নিশ্চিত করেন। উহাই ছিল হামদানী ক্ষমতার ভিত্তি এবং যান্‌কী (দ্র.)-এর ক্ষমতার বড় অবলম্বন।

আলামূতের বাতিনীদের হস্তে তিনি অকালে নিহত হন। কারণ ৫১৯/১১২৬ সনে ইরাকে তিনি উহাদের জনৈক মিত্রের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁহার যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে নাই এবং তাঁহার আরব্ধ গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় যান্‌কীর উপর যিনি অধিকতর কঠোরভাবে উহা পালন করেন। কিন্তু ইতোপূর্বেই আল-বুরসুকী, যানকীরই অনুরূপ, সালজূক শাসনের বৈধতা স্বীকার করিয়াছিলেন যাহা যুবরাজের আতাবেক উপাধি হইতে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে বস্তুত মাওসিলের উপরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি মুসলিম উত্তর সিরিয়ায় অবস্থিত বাহিনীকে জাযীরার বাহিনী দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী করেন। ফলে সিরীয় বাহিনী ফ্রাঙ্ক রক্ষাব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের গোত্রীয় ভাব থাকা সত্ত্বেও উহারা তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Cahen, La Syrie du Nord a I' epo que des Croisades, প্যারিস ১৯৪০ খৃ.; (২) R. Grousset, Histoire des Croisades, ১খ., প্যারিস ১৯৩৪ খৃ.; (৩) S. Runciman, A History of Crusades, ২খ., কেম্ব্রিজ ১৯৫২ খৃ.; (৪) ইব্‌নুল কালানিসী (Amedroz; অনু. Le Tourneau, নির্ঘণ্ট, দ্র. আল-বুরসুকী); (৫) ইব্‌নুল আছীর, ১০খ., ২৭২, ২৯০, ৩৫০-৩, ৩৭৪, ৩৭৮-৮০, ৪১৫, ৪৩৯-৪০, ৪৪৬-৭; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ১০০; (৭) ইব্‌নুল 'আদীম, ২খ., দামিশ্‌ক ১৯৫৪ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্‌ন আবী তায়্যি, অমুসলিম লেখকগণের মধ্যে (৯) Matthew of Edessa; (১০) অন্যান্য তথ্যসূত্র যাহা Cahen উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পূ. গ্র. ভূমিকা।

CL. Cahen (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আক্‌ সূ (اق صو) ঃ পূর্ব তুর্কিস্তানের অর্থাৎ বর্তমান চীন দেশের সিংকিয়াং-এ অবস্থিত একটি শহর। আক্‌ সূ (দ্র.) নদী হইতে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তরে। আনুমানিক ইহার সঙ্গমস্থলের বিপরীত দিকে রহিয়াছে তাওশ্‌কান্‌ দারয়া; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০৬ মিঃ উর্ধ্বে, ৪১.১৪, ৭.উ, ৮০.পূ.; উত্তরাঞ্চলীয় বাণিজ্যপথের উপর মারালবাশী ও কুচা-র মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। আধুনিক শহর হইতে সামান্য উজানে আরও একটি জনবসতি রহিয়াছে, ইহাকেও আক্‌ সূ বলা হয়। এই উভয়ের উত্তর-পূর্বে রহিয়াছে "পুরাতন শহর" সম্ভবত প্রাচীনতর বসতিগুলির মূলে এই দুইটি শহর আবাদ হইয়াছিল এবং ইহাদের নিজস্ব চীনা নামও ছিল (নীচে দেখুন)। মাত্র ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে তুর্কী নামসহ আক্‌ সূ-র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়; টলেমী বর্ণিত আওযাকিয়া (Auzakia)-র সহিত ইহাকে চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা (Deguignes-এর সময় হইতে) অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত। বিভিন্ন চীনা দেশীয় নামের (Toponyms) সহিত ইহাকে সনাক্তকরণের বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে নাই। W. Barthold ইহাকে চিহ্নিত করিয়াছেন (মুখ্যত ইহার বর্তমান চীনা নামের ভিত্তিতে, (নীচে দেখুন) হান যুগের ওয়ান-সু হিসাবে ও হুদূদুল 'আলাম-এর (Minorsky সম্পা., পৃ. ৯৮) এবং গারদীযীর (Barthold, Ottcet o poyezdkye v Srednyuyn Aziyu, সেন্ট পিটারসবুর্গ ১৮৯৭, পৃ. ৯১) বানচুল (বানচুক) হিসাবে। যাহা হউক, পরে তিনি এই অভিমত পরিত্যাগ করেন। P. Pelliot আক সূকে হান যুগের কু-মো হিসাবে সনাক্ত করেন (Hsuan-tsang যুগের পা-লু-কিয়া Tang যুগের Po-huan, আল-ইদরীসীর Bakhuwan)। আক সূর চীনা বণিকদের কথা অবশ্য ১৪০০ সালের দিকেই উল্লিখিত হইয়াছে (নিজাম শামী, জাফারনামাহ্‌)। কিন্তু ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের দিকেও পূর্ব তুর্কিস্তানের অন্যান্য শহরের তুলনায় ইহার গুরুত্ব কম ছিল (W. Barthold 12 Vorlesungen, Berlin ১৯৩৫, পৃ. ২২০); হায়দার মীর্যার তারীখ-ই রাশীদী অনুসারে ১৫৪৭ খৃ.-এর দিকে ইহা দেশের অন্যতম রাজধানী ছিল। আধুনিক কালে শহরটির গুরুত্ব হইল (যদিও য়ারকান্দ, কাশগাড়, তুরফানের সমতুল্য নয়) বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এবং চীন, সাইবেরিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কিস্তান, কাশ্মীর, লাদাখ ও ভারতের মধ্যকার যোগাযোগ পথের সঙ্গমস্থল হিসাবে শহরটির সামরিক গুরুত্ব আছে। বলা হইয়া থাকে, কোন এক সময় শহরটিতে ৬,০০০ গৃহ, ৬টি সরাইখানা, ৫টি মাদরাসা ও চতুর্দ্বারবিশিষ্ট একটি প্রচীর ছিল। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে শহরটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ফলে এখন আর কোন পুরাতন সৌধ সংরক্ষিত নাই। ১৯শ শতাব্দীর পরিব্রাজকগণ কর্তৃক (A.N. kuropatkin, 1876-7; N.M. Przeval'skiy, ১৮৮৫-৬; Carey, ১৮৮৫-৬; F.E. Younghusband, ১৮৮৬; Sven Hedin, ১৮৯৫) শহরটিতে বাশিন্দা সংখ্যা ১৫,০০০ এবং ইহার পরিধি দুই কিলোমিটার বর্ণিত হইয়াছে। ধাতব কর্ম, উন্নত মানের বস্ত্রসামগ্রী (বায্‌য), জিন, ল্যাগাম, অলঙ্কারশিল্প এবং উট, ঘোড়া, অন্যান্য পশু পালন ইত্যাদির মাধ্যাম জনগণ জীবিকা নির্বাহ করে। ১৮৭৭ খৃ.-এর মধ্যে আক সূ কাশগড়ের ইয়াকূব বেগ (দ্র.)-এর অধীনে ছিল। ১৮৬৭ ও ১৮৭৭ হইতে ইহা পুনরায় চীনা কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া আসে (চীনা নাম won-su-chow); চীনারা "চারিটি প্রাচ্য শহর"-এর (আক্‌ সূ, কুচা, কারা শহর ও উঁচু তুরফান) প্রেসিডেন্টের বাসস্থান হিসাবে শহরটিকে মনোনীত করে। বিংশ শতাব্দীতে ইহা পূর্ব তুর্কিস্তানের পরিবর্তনশীল ভাগ্যের শরীক হয়। ইহার বর্তমান বাশিন্দার সংখ্যা (অধিকাংশই সুন্নী, প্রাচ্য তুর্কী বলিয়া অনুমান করা হয়) ২০,০০০ হইতে ৪০,০০০-এর মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহারা কার্পেটও বুনিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. Pelliot, La ville de Bakhouan dans la geographie d' Idirci, Toung-pao, 1906, 553-6; (২) ঐ লেখক, Notes Sur les Anciens noms de Kuca, d' Aq-su et d' Uc Turfan, T'oung-Pao, 1923,126-32; তথ্যগুলিকে হুদূদুল-আলাম গ্রন্থে একত্র করা হইয়াছে, পৃ. ২৯৩-৭, তু. ২৭ প. ও মানচিত্র, পৃ. ২৭৯; (৩) Brockhaus-Efron, Entsiklopediceskiy slovar, St. Petersburg 1890, i, 307 প.; (৪) A. Herrman, Atlas of China, Cambridge (Mass) ১৯৩৫, পৃ. ২৪, ৩৭, ৫৮, ৬০; (৫) Bolshaya sovyetskaya Ensiklopediay[2], 1930, i, 617f.

B. Spuler (E.I.[2]) / মুহাম্মদ আল-ফারুক

আক্‌ সূ (اق صو) একটি মসজিদ, একটি বাজার শেমাখীর ধ্বংসাবশেষসহ সোভিয়েত আযারবায়জানের শেমাখীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম (রুশ শেমাখা)।

B. Spuler (E.I.[2]) /মুহাম্মদ আল-ফারুক

আক্‌ সূ (اق صو) ঃ তুর্কী শব্দযুগল, ইহার অর্থ "সাদা পানি"। (১) নদীর আদি খাতের পারিভাষিক নাম (আক্‌দারয়াও বলা হয়) যাহা হইতে কোন খাল (কারা সূ অথবা কারা দারয়া) নির্গত হয়; (২) তুর্কীভাষী দেশসমূহের কতিপয় নদীর নাম; এই নদীগুলি কখনও কখনও অন্য নামে অধিকতর পরিচিত। নিম্নে কতিপয় নদীর উল্লেখ করা হইল যাহাদের তুর্কী নাম আক্ সূ (ক) আমু দারুয়া (দ্র.)-এর একটি উৎস যাহাকে মুরগাব্ (দ্র.) অথবা কূলাব (দ্র.)-ও বলা হইয়া থাকে; (খ) "জুনুবী" (দক্ষিণ) বুগ (Bug) (ইউক্রেইনী ভাষায় বুহ্ [Boh] ইউক্রেইন দেশে, যাহাকে উছমানী ঐতিহাসিকগণ সর্বত্র আক সূ লিখিয়াছেন, যাহা কৃষ্ণ সাগর (Black Sea)-এ পতিত হইবার সময় নীপার (Dniper) নদীর সহিত একটি অভিন্ন মোহনার সৃষ্টি করে। (৩) পূর্ব তুর্কিস্তানের (সিন্‌কিয়াং) একটি দ্রুত গতিসম্পন্ন পার্বত্য নদী যাহা তিয়েনশান (Tienshan) হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব মুখে তারিম (য়ারকান্দ দারয়া)- এর দিকে প্রবাহিত হইয়া কিছুটা উজানে সিল (Sil)-এর নিকট খোতান (Khotan) দারয়ার সহিত মিলিত হয়। আক্ সূ শহরটি (পূর্ববর্তী প্রবন্ধটি দেখুন) এই নদী হইতে উহার নাম ধারণ করিয়াছে।

B. Spuler (E.I.[2]) / আ. র. মামুন

আক্ হিসার (اق حصار) ঃ (শাব্দিক অর্থ "শ্বেত দুর্গ") অনেকগুলি শহরের নাম। (১) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হইল আনাতোলিয়ার আক হিসার। পূর্বে ইহা ছিল আয়দীন প্রদেশে, ১৯২১ সালের পর হইতে ইহা মানিসা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৫ মিটার উর্ধ্বে গর্দূক নদীর (গেদিয-এর একটি ক্ষুদ্র শাখা) বাম তীরের নিকটে একটি সমতল ভূমিতে ইহা অবস্থিত। ইহা থিয়াতিরা (Thyatira. দ্র. Pauly-Wissowa) নামে পরিচিত। প্রাচীন কালে ও বায়যান্টাইনের সময় পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে অবস্থিত একটি দুর্গের নাম হইতে ইহার তুর্কী নামের উৎপত্তি। ৭৮৪/১৩৮২ সালে উছমানীগণ ইহা দখল করে, কিন্তু তায়মূরের আক্রমণে পরবর্তী গোলযোগের সময় ইহা পুনরায় হাতছাড়া হইয়া যায়। ৮২৯/১৪২৫-৬ সালে খালীল ইয়াখ্‌শী বেগ (হাজ্জী খালীফা, তাক্‌বীমুত তাওয়ারীখ দ্র.) বিদ্রোহী জুনায়দ (দ্র.)-এর নিকট হইতে উহা পুনর্দখল করেন। ১৯১৪ খৃ. পূর্বে আক্ হিসারের লোকসংখ্যা ছিল ১২,০০০; তন্মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ছিল মুসলমান, ১৯৩৫ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় একুশ হাজারে। মানিসা প্রদেশে অবস্থিত আক্‌হিসার মহকুমা (কাদা)-এর জনসংখ্যা কুইনের (Cuinet, Turquie d' Asie, iii, পৃ. 548) বক্তব্য অনুযায়ী ছিল ৩১,৭৪৬। ১৯৩৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় একানব্বই হাজারে।

২। ঘারমারা জেলার আক-হিসারকে বর্তমানে বলা হয় পামুক-ওভা। ইযমিদ (Kodja-eli) প্রদেশের সাকার্‌য়া নদীর বাম তীরে ইহা গেভ (Geyve) মহকুমায় (কাদা) অবস্থিত। ইহা আনাতোলিয়া রেলপথের একটি স্টেশন। উছমানীগণ ৭০৮/১৩০৮-৯ সালে ইহা দখল করে। বর্তমানে পরিত্যক্ত এই দুর্গের সম্মুখে এক বিশাল সমতল ভূমি অবস্থিত। শহরে ও ইহার আশেপাশে অনেক প্রাচীন স্তম্ভ ও অন্যান্য ভবনের ধ্বংসাবশেষ ইহার অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রাচীন নাম অজ্ঞাত। ১৯৩৫ সালে ইহার জনসংখ্যা ছিল ১,৬৬৮ এবং উহার উপকণ্ঠের জনসংখ্যা ৯,৩২৪।

৩। আক্ হিসার পূর্বকালে বসনিয়া (Bosnia)-এর সারাজেভো (Sarajevo)-এর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র বসতির নামও ছিল, যাহা প্রুসেকোতা ও সেমেসকিলিত্‌যা (Semeskilitza) নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহার আধুনিক নাম পল্‌নী (Polnyi অর্থাৎ নিম্ন) ওয়াকুফ। ৯০৭/১৫০১-২ সালে মুস্তাফা পাশা ইহা জয় করেন (J. von Hammer, Rumili und Bosna, 166; Ch. Perturier, La Bosnie, Paris 1822, 222)। K. Sussheim

৪। উত্তর আলবেনিয়ার একটি শহর, তুর্কী ভাষায় ইহাকেও আক্ হিসার বলা হয় এবং আলবেনীয় ভাষায় বলা হয় kruje kroya (নির্ঝরণী কূপ)। পূর্বে ইহা ছিল candjak of Shkodra; Acropolites-এর (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ইতিহাসে Kroas নামে উল্লিখিত এই শহর ১৩৪৩ সালে ছিল ভেনিসের দখলে এবং ১৩৯৫ সালে ইহা কন্সটান্টাইন ক্যাস্ট্রিয়োটা (Constantine Castriota)-এর হাতে চলিয়া যায়। ইস্কান্দার বেগ (দ্র.)-এর বাসস্থান হিসাবে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ১৪৫০, ১৪৬৬ ও ১৪৬৮ সালে ভয়াবহ অবরোধের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত ৮৮৩/১৪-১৫ জুলাই, ১৪৭৮ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ইহা দখল করেন। পরবর্তী কালে ইহা আলবেনিয়ার বাক্‌তাশী (দ্র.) দরবেশদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। Sari Saltik Dede (দ্র.)-এর অনুমিত কবরসমূহের অন্যতম কবর Kroya-তে দেখান হয়। শহরের চতুর্দিকে বাক্‌তাশী দরবেশদের কবরের সংখ্যা অনেক। সবিশেষ সম্মান দেখান হয় হাজ্জী হাম্‌যা বাবা ও বাবা আলীর মাযার (তিক্‌কা বা খান্‌কাহ)-এর প্রতি। রাশীদ পাশার আদেশে ১২৪৮ /১৮৩২ সালে দুর্গটি ভাংগিয়া ফেলা হয়।

আলবেনীয় রাষ্ট্রে শহরটি একটি নিম্নতম প্রশাসকের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়, যাহার অধিবাসী ছিল ১৯৩৮ সালে ৪,৫০০; অধিকাংশই মুসলমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ippen, Skutari, 71 পৃ.; (২) Wissenschaftliche Mittilungen aus Bosuien, vii, 60; (৩) A. Degrand, Souvenirs de Ia Haute-Albanie, Paris 1901, 215, পৃ.; (৪) F. W. Hasluck, in Annual of the British School at Athens, 1915, 121 পৃ.; (৫) F. Babingre, in MSOS, 1930, 149 পৃ.; (৬) ঐ লেখক, Mehmed der Eroberer, নির্ঘণ্ট, দ্র. Kruje: শহরটি বিজয়ের তারিখের জন্য দ্র. সমসাময়িক ইতিহাস Benedetto Dei (in Della decima e delle altre gravezze, della moneta, e della mercatura de Fiorentini, ii Lisbon-Lucca 1765, 270 পৃ.)।

K. Sussheim-F, Babinger (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইনামুল হক

আক্ হিসারী (آق حصارى) ঃ আক্ হিসার নামীয় একাধিক স্থান হইতে উদ্ভূত কয়েকজন তুর্কী লেখকের নিস্‌বা। আয়দীনের আক্ হিসারের লেখকগণের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ

(ক) ইল্‌য়াস ইব্‌ন ঈসা, সাধারণভাবে ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাজ্‌দু'দ্-দীন নামে পরিচিত, ইনি তুর্কী ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক গ্রন্থ কাশ্‌ফ-ই রুমূয-ই কুনূয-এর রচয়িতা। গ্রন্থখানি ৯৬৫/১৫৫৭-৮ সনে উছমানী তুর্কীগণের ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালীন রচিত এবং ইহাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ন থাকিবে। ব্যক্তি নামসমূহের আরবী অক্ষরগুলির সংখ্যাসূচক মূল্য (ابجد) গঠন করিয়া ২০৩৫ হিজরী সাল পর্যন্ত তুর্কী জাতির ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় (তু. Pertsch, Cat. Berlin, নং ৪৫. ৯; Krafft, Cat. Vienna Acad., নং ৩০১; Flugel, Cat, Vienna, নং ১৫০২)। হাজ্জী খালীফা (Flugel) ৩খ., ৪৮০, ৪খ., ১৫৫, ৪১২, ৪৪০। এই লেখকের গদ্যে ও পদ্যে রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মুহাম্মাদ তাহিরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। তিনি ৯৬৭/১৫৫৯-৬০ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বুরসালী মুহাম্মাদ তাহির, 'উছমান্‌লী মুআল্লিফলেরি, ১খ., ১৮।

(খ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাদ্‌রুদ-দীন মুহ্‌য়িদ-দীন আল-মুনশী, ইনি আস্-সারুখানী আর-রূমী বা আল-মুফাস্‌সির নামেও পরিচিত। তাঁহার উপদেশ অনুসারেই সূদী হাফিজ রচিত কাব্যের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ নাযীলুত্-তান্‌যীল (বা তান্‌যীলুন-নাযীল) নামক কুরআনের তাফ্‌সীর। ইহার রচনা শুরু হয় আক্ হিসারে ৯৮১/১৫৭৪ সালে, শেষ হয় ৯৯৯/১৫৯০ সালে। তিনি গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন সুল্‌তান ৩য় মুরাদকে। ৯৮২/১৫৭৪ সালে তিনি মদীনাতে 'শায়খুল হারাম হন, পরে তিনি দামিশকে কিছু দিন বাস করেন এবং সেইখানে ৯৯৮/১৫৮৯-৯০ সালে আল-বূসীরীর কাসীদাতুল বুরদা-র একখানি আরবী ভাষ্য রচনা করেন (Ahwardt, Cat. Berlin, নং ৭৭৯৮)। ১০০০/১৫৯২-এর শেষদিকে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, II, 439, SII, 651; (২) আতাঈ, হাদাইকুল, হাকাইক, ৩২১; (৩) নাঈমা, তারীখ, ৪০; (৪) হাজ্জী খালীফা (Flugel), ২খ., ৩৮০, ৪খ., ৫২৮, ৬খ., ৩৩৯; (৫) মুহিব্বী, খুলাসাতুল আছার, ৩খ., ৪০০; (৬) মুহাম্মাদ তাহির, ২খ., ২০।

(গ) নাসূহ, নাওয়ালী নামে অভিহিত, ইনি ভবিষ্যৎ সুল্‌তান ৩য় মুহাম্মাদ-এর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন, যখন তরুণ শাহ্‌যাদা মাগ্‌নিসার গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্য তিনি শাসকের কর্তব্য বিষয়ক ফারাহ নামাহ্ গ্রন্থ রচনা করেন (Rieu, Cat. Br. Mus., ১১৭);. এরিস্টোটল সম্রাট আলেজান্ডারের জন্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত কিতাবুর রিয়াসা ওয়াস্-সিয়াসা [হাজ্জী খালীফা (Flugel), ৪খ., ৪১১, ৫খ., ৮৯]-এর ইহা তুর্কী সংস্করণ বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে। তিনি আখলাক-ই মুহ্‌সিনীও অনুবাদ করিয়াছিলেন। আল-গাযালীর কীমিয়া-ই সা'আদাত-এর অন্যতম তুর্কী অনুবাদ নাওয়ালীর প্রতি আরোপিত, কিন্তু সম্ভবত ইহা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুস্তাফা আলওয়ানী (মৃ. ১০০০/১৫৯১)-এর গ্রন্থের সঙ্গে বিভ্রান্তির ফল। নাসূহ ১০০৩/১৫৯৪-৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আতাঈ, ৩৯০; (২) মুহাম্মাদ তাহির, ২খ., ৪৩।

(ঘ) বস্‌নিয়া (Bosnia)-এর আক্ হিসারে ছিলেন হাসান, পরিচিত নাম কাফী (কাফী হাসান আফান্‌দী)। তিনি ৯৫১/১৫৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০২৫/১৬১৬ সালে ইন্তিকাল করেন। নিজ শহরেই তিনি বিশ বৎসরের অধিক কাল কাদীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাযার যিয়ারাতগাহে পরিণত হয়। ১০০৪/১৫৯৫ সনে Hungary-তে তিনি এগরি (Egri বা Erlu) অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অভিযান চলাকালে তিনি 'আরবী ভাষায় সুশাসন ও উছমানী প্রশাসনে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার নাম উসূলুল হিকাম ফী নিজামিল আলাম। পরবর্তী বৎসর ১০০৫/১৫৯৭ সালে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের অনুরোধে তিনি উহা তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। উহা ব্যতীত তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক একখানি জনপ্রিয় তথ্যগ্রন্থ রচনা করেন, উহার নাম রাওদাতুল জান্নাত ফী উসূলিল ই'তিকাদাত (সম্পূর্ণ হয় ১০১৪/১৬০৫ সালে)। গ্রন্থখানি সূফী, দরবেশ ও বিদ্‌আতপন্থিগণের বিরুদ্ধে রচিত। তিনি নিজেই আয্‌হারুর্-রাওদাত নামে উহার একটি ভাষ্য রচনা করেন (সমাপ্ত হয় ১০১৫/১৬০৬ সালে)। এতদ্ব্যতীত তিনি নূরুল-ইয়াকীন ফী উসূলিদ্-দীন নামে আত্-তাহাবীর আকীদা গ্রন্থের একখানি টীকা ও আল-কুদূরী গ্রন্থের মুখ্‌তাসারও রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, II 443, S II, 659; (২) Babinger, ১৪৪; (৩) আতাঈ, ৩০৪; (৪) হাজ্জী খালীফা (Flugel), নির্ঘণ্ট দ্র.; (৫) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ্, ৫খ., ৪৪৫ প.; (৬) মুহাম্মাদ তাহির, ১খ., ২৭৭। শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থখানির মুদ্রিত সংস্করণ এবং ফরাসী, জার্মান ও হাংগেরীয় অনুবাদের জন্য দ্র. Babinger, পৃ. গ্র.।

(৭) হাজ্জী নাসীম ওগ্লু আহ্মাদ ইব্ন হাসান, জার্মানীতে ১১৮৬/১৭৭২-৩ সালে বন্দী থাকা অবস্থায় বস্নিয়া অভিযান ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী (১১৪৮-১১৫৬/১৭৩৫-১৭৪৪) বর্ণনা করেন (দ্র. Babinger, পৃ. ২৭৬, টীকা ১)।

K. Sussheim-J. Schacht (E.I.2) / হুমায়ুন খান

আল-'আকাওওয়াক (العكوك) ঃ কবি 'আলী ইব্ন জাবালার ডাকনাম। তিনি ১৬০/৭৭৬ সনে বাগদাদের এক খুরাসানী মাওয়ালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আল-আকাওওয়াক সম্ভবত তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় 'ইরাকে অতিবাহিত করেন। সেইখানে তিনি আবূ দুলাফ আল-ইজ্লী, হুমায়দ ইব্ন আব্দিল হামীদ আত্-তূসী ও উযীর আল-হাসান ইব্ন সাহ্ল-এর স্তুতিকার ছিলেন। দুঃখের বিষয়, প্রথমোক্ত দুইজনের উদ্দেশে রচিত অতিরঞ্জিত প্রশংসামূলক কবিতা খলীফা মামূনের রোষের কারণ হইয়াছিল বলিয়া কবির জিহ্বা কর্তন করা হয়। এই অঙ্গহানির দরুন আল-'আকাওওয়াক ২১৩/৮২৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার দীওয়ান (কাব্য সংকলন) একটি বেশ বড় আকারের রচনা (দ্র. ফিহ্রিস্ত, ১৬৪, ১৩) আমাদের কাছে পৌঁছায় নাই এবং তাঁহার কবিতা কেবল কাব্য সংকলকদের উদ্ধৃতির মাধ্যমেই আমাদের নিকট পরিচিত। আছ-ছাআলিবী কর্তৃক উদ্ধৃত দীর্ঘ কবিতা (ইয়াতীমাতুদ-দাহ্র, দামিশ্ক সংস্করণ, ৩খ.) তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত নহে। তিনি যেই পদ্ধতিতে কবিতা আবৃত্তি করিতেন তাহা আল-জাহিজের নিকট অতীব প্রশংসনীয় ছিল (দ্র. খাতীব আল-বাগ্দাদী ও ইব্ন খাল্লিকান)। কিন্তু এই সৃজনশীল ও উদার লেখক আল-আকাওওয়াকের রচনা হইতে স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল বায়ান ওয়াত্-তাব্য়ীন-এ মাত্র একটি উদ্ধৃতি দেন, অথচ জাহিজের সমসাময়িক ইব্ন কুতায়বা ও আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী আল-'আকাওওয়াককে অসাধারণ প্রতিভাবান কবি বলিয়া গণ্য করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, ৫৫০-৩; (২) আগানী, ১৮খ., ১০০-১৪; (৩) ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ্, আল-ইক্দ ('উরয়ান), ১খ., ২৩৮, ২৪৩; (৪) আল-খাতীব আল-বাগ্দাদী, তারীখ বাগ্দাদ, ১১খ., ৩৫৯; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ., ৩৪৮, সং কায়রো ১৯৪৮, ৪৩৪ নং; (৬) Brockelmann, SI, 120

R Blachere (E.I.2) / মনোয়ারা বেগম

আকান্সূস্ আবূ আবদিল্লাহ (اكنصوص ابو عبد الله) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ মরক্কোর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। দক্ষিণ মরক্কোর সূস-এ বসবাসকারী ইদাউ কান্সূস নামক গোত্রে ১২১১/১৭৯৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফেজ-এ সুবিখ্যাত শিক্ষকগণের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং পরে শারীফী দরবারে সচিবের পদ লাভ করেন। ১২৩৬/১৮২০ সনে পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি উযীর হন এবং তখন সুল্তান মাওলায় সুলায়মান (মূলায় স্লীমান) প্রদত্ত কতিপয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ভার তাঁহাকে প্রদান করেন। কিন্তু ১২৩৮/১৮২২ সনে সুল্তান সুলায়মানের মৃত্যুর পর তিনি পদচ্যুত হন। অতঃপর তিনি মাররাকুশে বসবাস করিতে থাকেন এবং কাব্যর্চচা ও ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি তিজানিয়্যা তরীকার একজন বিশিষ্ট খলীফারূপে পরিগণিত হন। পরিণত বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়েন এবং ২০ মুহার্রাম, ১২৯৪/১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ তারিখে মাররাকুশ শহরেই ইন্তিকাল করেন। বাবুর রাব্ব-এর বহির্ভাগে অবস্থিত তাঁহার মাযার এখনও তিজানিয়্যা তরীকার অনুসারিগণ যিয়ারত করিয়া থাকে।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ইসলামের প্রথম যুগ হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের সাধারণ ইতিহাস। ইহাতে তাঁহার নিজ দেশের, বিশেষ করিয়া মরক্কোর আলী রাজবংশের ইতিহাসকে শুরু হইতে ১২৮২/১৮৬৫ পর্যন্ত বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থের নাম "আল-জায়শুল আরামরাম আল-খুমাসী ফী দাওলাত আওলাদ মাওলানা আলী আস্-সিজিল্মাসী"। গ্রন্থটির সীমিত সংখ্যক কপি ফেয হইতে লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় (১৩৩৬/১৯১৮)। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সুল্তান আবদুর রাহমান ইব্ন হিশাম ও মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দির রাহ্মান-এর শাসনামলের ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনা সর্বপ্রথম স্থান লাভ করে। এই ঘটনাপঞ্জী পরবর্তী কালে আহ্মাদ ইব্ন খালিদ আন্-নাসিরী তাঁহার আল-ইস্তিক্সা গ্রন্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আকান্সূস তাঁহার "জায়শ" গ্রন্থে আল-ইফরানী ও আয্-যায়্যানীর রচনা হইতে বহু উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Chorfa, pp. 200-13 (গ্রন্থপঞ্জীসহ পৃ. ২০০, টীকা ১); (২) ঐ লেখক, Extraits des historiens arabes du Maroc,3 1948, pp. 8-9, 126-7; (৩) Brockelmann, SII, pp. 884-5.

E. Levi-Provencal (E.I.2) / হুমায়ুন খান

আল-'আক'াবা (العقبة) ঃ হাশিমী রাজ্য জর্দানের একমাত্র সমুদ্র বন্দর। 'আকাবা উপসাগরের (১০০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রশস্ত) মুখে পূর্বদিকে এবং জাবাল উম্ম নুসায়লার পাদদেশে অবস্থিত।

আল-'আকাবার পূর্ণ নাম ছিল আয়লা (দ্র.)। শহরটি ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বর্ধিত হইবার সাথে সাথে এই বন্দরটিও গড়িয়া উঠে। আল-আকাবা নামটি 'আকাবাতু আয়লাবা আয়লার গিরিপথ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আয়লার গিরিপথ জাবাল উম্ম নুসায়লার ভিতর দিয়া গিয়াছে এবং উহা আল-আকাবা হইতে ওয়াদী ইছ্ম ও ওয়াদী হিস্মা পার হইয়া উত্তর-পূর্বে মাআন পর্যন্ত বিস্তৃত। তূলূনী বংশের খুমারাওয়ায়হ-এর আমলে (৮৮৪-৯৫ হি.) গিরিপথটির উন্নয়ন সাধিত হয় এবং সেই সময়েই শহরটির এই নামকরণ করা হয়।

'আক'াবাতু আয়লা নামটি আল-ইদ্রীসীর (মৃ. ১১৬৬ খৃ.) গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও শহরটি সাধারণভাবে আয়লা নামে পরিচিত ছিল। ইব্ন বাতত্তা (১৩০৪-৭৭ খৃ.) শহরটির নাম 'আক'াবাতু আয়লা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১খ., ২৫৬; ৪খ., ৩২৪) এবং ১৬শ শতকের ঐতিহাসিক ইব্ন ইয়াস শহরটির বর্তমান নাম আল-'আক'াবা ব্যবহার করিয়াছেন।

মামলূক আমলের শেষভাগে (৯২০/১৫১৪-১৫) সুল্তান কানসাওহ্ আল-গাওরী হজ্জযাত্রিগণকে বেদুঈন দস্যুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার

উদ্দেশে তাঁহার স্থপতি খায়ের বে আল-আলাঈ দ্বারা আল-'আক'াবাতে একটি সুরক্ষিত খান বা সরাইখানা নির্মাণ করান; উহা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে।

তুর্কী শাসনামলে (১৫১৬-১৯১৭ খৃ.) বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের মধ্যে আল-'আক'াবা মাত্র পঞ্চাশটি কাদা ও পাথরনির্মিত কুঁড়েঘর লইয়া গঠিত গ্রামে পরিণত হয়। গ্রামের অধিবাসীরা বাগানের উৎপাদিত ফলমূল ও খেজুরের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। খেজুর আবার হুওয়ায়তাত বেদুঈনদের সঙ্গে সমান সমান অংশে ভাগ করিয়া লইত। অদ্যাবধি খেজুর গাছের মালিকানা বেদুঈনদেরই। ১৮৬৯ খৃ. সুয়েজ খাল খোলা হইলে এবং ১৯০৮ খৃ. হিজায রেলপথ চালু হইলে হজ্জযাত্রিগণের অবস্থানস্থল হিসাবে আল-'আক'াবার যে সর্বশেষ গুরুত্ব ছিল তাহাও লোপ পায়। মুসিল ১৮৯৮ খৃ. আল-'আক'াবা সফরে গিয়া দেখিতে পান, ইহা একটি তুর্কী ফৌজী ঘাঁটি এবং এখান হইতে বৃটিশ অধিকৃত মিসরীয় সিনাই সীমান্ত পাহারা দেওয়া হইতেছে (আল-আকাবা হিজায প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখানে একজন মুহাফিজ জিদ্দার ওয়ালীর অধীনে থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন)।

ইঙ্গ-আরব বাহিনী কর্তৃক ১৯১৭ সনে ৬ জুলাই আল 'আক'াবা দখলের পূর্বে ইংরেজ ও ফরাসী যুদ্ধজাহাজ হইতে বোমা বর্ষণের ফলে শহরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষে আল-'আক'াবা হিজাযের অংশ ছিল, কিন্তু ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে সাউদী আরব বাহিনীর নিকট হিজাযের পতন ঘটিলে এই শহরটি মা'আন জেলা সমেত ট্রান্সজর্দানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপরে ১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত আল-'আক'াবার সামান্যই পরিবর্তন সাধিত হয়। পরে লিবিয়া হইতে অগ্রসরমান অক্ষবাহিনীর নিকট মিসরের পতনের আশঙ্কা দেখা দিলে ইহাকে সরবরাহ বন্দররূপে ব্যবহার করিবার উদ্দেশে বৃটিশ বাহিনী নূতনভাবে ইহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে। এই সময় আল-'আক'াবা হইতে মাআনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নাক্ব শিতার রেল প্রান্ত পর্যন্ত একটি পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৮-৯ সালের ফিলিস্তীন যুদ্ধের পরে এই শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫৪ সালে ইহাকে লোহিত সাগরে জর্ডানের বন্দর হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধকালে ছয় দিনের মারাত্মক সংঘর্ষের পরে ইসরাঈল আল-'আক'াবা সমেত সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করিয়া নেয়। সুদীর্ঘ শান্তি আলোচনার পরে ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে ইসরাঈল সিনাই হইতে সকল সৈন্য ও অধিকার প্রত্যাহার করে। ফলে 'আক'াবায় পুনরায় মিসরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Musil, The Northern Higaz, New York 1926, pp. 81-8: (২) ঐ লেখক, Arabia Petraea, ii/i, Vienna 1907, pp. 257-60; (৩) E. Robinson, Biblical Researches in Palestine, London 1856 pp. 163-72; (৪) T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom. New York 1938, pp.310-4; (৫) C. Leonard Woolley and T. E. Lawrence, The Wilderness of Zin, London 1936, pp. 141-4; (৬) H. W. Glidden, A Comparative Study of Arabic Nautical Vocabulary from al'Aqabah, JAOS, 1942, pp. 69-72; (৭) ঐ লেখক, The Mamluk Origin of the Fortified Khan at al-Aqabah, Jordan, in Archeologica Oriantelia in Memoriam Ernst Herzfeld, Locust Valley, N.Y., 1952, 116; [(৮) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., পৃ. ১০৯; (৯) দা.মা.ই., ১৩খ., পৃ. ৩৯৫]।

H.W. Glidden (E.I.2) / হুমায়ূন খান

আল-'আকাবা (العقبة) ঃ অর্থ পার্বত্য পথ বা দুরারোহ পাহাড়ী স্থান। এই নামে একাধিক স্থান রহিয়াছে, সেইগুলির মধ্যে মিনা ও মক্কা শারীফের মধ্যবর্তী উপত্যকাটি ইসলামের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এই স্থানে হিজরতের পূর্বে মদীনা হইতে আগত প্রতিনিধিগণের সঙ্গে দুইবার গোপনে সাক্ষাত করেন। প্রথমবার (এপ্রিল ৬২১) বনূ খাযরাজ গোত্রের ১০ জন ও বনূ আওস গোত্রের ২ জন, মোট ১২ জন মদীনাবাসী এখানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইহা বায়আতুল আক'াবা আল-উলা নামে পরিচিত। পরের বারে (৬২২ খৃ.) ৭৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা সমবায়ে আর একটি প্রতিনিধি দল আসিলে আকাবাতে মহানবী (স)-এর সঙ্গে তাঁহাদের দ্বিতীয়বার গোপন আলোচনা হয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদীনাতে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং সকলে মিলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহারা সশস্ত্রভাবে সাহায্য করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে নিজেদের জীবন দিয়া তাঁহার নিরাপত্তা বিধান করিবেন। আকাবার এই দ্বিতীয় আলোচনার প্রতিশ্রুতি বায়'আতু'ল-হ'রব বা যুদ্ধের শপথ নামে পরিচিত। মদীনার নও-মুসলিমগণের শপথ ও নিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা শারীফে হিজরত করা স্থির করেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক মত পোষণ করেন, 'আক'াবাতে দুইটি নয়, একটি সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একাধিকবার সাক্ষাৎকার ও পরামর্শই স্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে হয়।

হজ্জের সময়ে আল-আকাবাতে শয়তানের উদ্দেশে যে পাথর নিক্ষেপ করা হয় ইহার জন্য "আল-জামরা" ও 'হজ্জ' দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূ'ত, ৩খ., পৃ., ৬৯২; (২) ইব্ন হিশাম, ২৮৮-৩০০; (৩) ত'াবারী, ১খ., ১২০৯-২৭; (৪) G. Melamede, in MO, xxviii, 17-58; (৫) W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953, 144 পৃ.; (৬) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২, প্রবন্ধ 'আকাবা'।

W. Montgomery Watt (E.I.2) / হুমায়ূন খান

'আকাবাতুন নিসা (দ্র. বাগরাস)

'আক'ার কূ'ফ (عقر قوف) ঃ বাগদাদের ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সমষ্টি। H. Rawlinson ইহাকে খৃ. পূ. ১৪০০ শতকে কাস্সী জাতি (Kassites) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Dur Kurigalzu শহর বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন যাহা ১৯৪২-৫ সনে খনন কার্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে (দ্র. T. Baqir, in Iraq, পরিশিষ্ট, ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ৭৩ পৃ.)। সুউচ্চ দুর্গটি (প্রাচীন zikkurat-এর ধ্বংসাবশেষ) আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহা আল-মান্‌জারা নামে আরব বিজয়ের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে (আল-বালাযুরী, ফুতূহ;, ২৫০; তু আত-তাবারী ২খ., ৯১৭; ৩খ., ৯৪৩)। ইহাকে কায়নানী রাজবংশের সমাধিস্থল (ইব্নুল ফাকী'হ, ইয়াকূ'ত-এ) বলা হইত অথবা কায়কাউস ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন (হাম্‌দুল্লাহ, নুয্হা, ৩৯) কিংবা 'আকারকূফ যিনি তাহ্‌মুরাছ (ইয়াকূত, আল-কাযবীনী) কিংবা ফারিস ইব্ন তাহ্‌মূরাছ (ইব্নু'ল-ফাকী'হ, ১৯৬) কিংবা সাম (আবূ হ'ামিদ)-এর পুত্র ছিলেন। একটি কিংবদন্তী অনুসারে (হ'ামদুল্লাহ্‌তেও ইহার উল্লেখ আছে) নাম্‌রূদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে (দ্র.) যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা ছিল 'আক'ার কূ'ফে এই কারণে ইহাকে কখনও কখনও তেল্ল (Tell) নিম্‌রূদ (নিম্‌রূদের টিলা) বলা হইত। আবূ নুওয়াস একটি কবিতার চরণে 'আক'ার কূ'ফের উল্লেখ করিয়াছেন (দীওয়ান, কায়রো ১৮৯৮, ১০০) এবং আল-মাক'দিসী (২৫৮) আল-কাল্‌বীর বরাতে একটি ফার্সী উপাখ্যান হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ইরাকের সপ্ত শহরের অন্যতম, যাহার অধিবাসিগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (তু. ইবনুল ফাকীহ, (২১০)। তথায় একটি গ্রামও ছিল যেইখানে সা'দ ইব্ন যায়দ আল-খায্‌রাজী বংশের এক বিশিষ্ট পরিবার বাস করিত (ইব্ন সা'দ, ৩/ খ.২, ৯৩; আস্-সাম্'আনী; ইয়াকূ'ত)। ষোড়শ শতাব্দী ও পরবর্তী কালের ইয়ূরোপীয় পর্যটকগণ 'আক'ারকূ'ফকে সাধারণত বাবেলের দুর্গ (Tower of Babel) বলিয়া অভিহিত করিত (দ্র. Ritter, Erdkunde, ১১খ., ৮৪৭-৫২; Tuch, De Nino urbe, Leipzig ১৮৪৫, পৃ. ৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূ'ত, ৩খ., ৬৯৭-৮; (২) সাম্'আনী, ৩৯৫ r; (৩) আবূ হামিদ আল-গার্নাতী, তুহ্‌ফাতুল আল্‌বাব, ৭৯; (৪) আল-ক'ায্‌বীনী, আছারুল বিলাদ, ২৮৪-৫; (৫) ইব্ন আবদিল হাক্ক, মারাসি'দু'ল- ইত'তিলা', ১খ., ২১১, ২খ ২৬৭-৮, ২২৭; (৬) Le Strange, ৬৭; (৭) G. Awwad. in Sumer, ১৯৪৯, আরবী অংশ, পৃ. ৮১।

S. M. Stern (E.I.2) / মনোয়ারা বেগম

'আকাল (দ্র. 'ইমামা)

'আক'াইদ (দ্র. আকীদা)

আক'া খান কির্‌মানী (اقا خان كرمانى) ঃ মীর্যা 'আবদুল হুসায়ন বার্‌দসীরী নামেও পরিচিত (আনু. ১২৭০-১৩১৪/১৮৫৩-৯৬), ইরানের ১৯শ শতকের আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদ। তিনি কির্‌মানের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ফার্সী ও 'আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, ফিক্'হ, উসূল, হাদীছ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন ও মধ্যযুগীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার বিভিন্ন খ্যাতনামা শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন মুল্লা জাফার, হাজ্জী আক'া সাদিক ও সায়্যিদ জাওয়াদ কারবালাঈ। তিনি ইংরেজী, ফার্সী, তুর্কী, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ফার্সী ভাষা কিছুটা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১২৯৮/১৮৮০ সালে তিনি কির্‌মানের রাজস্ব বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ একটি পদ লাভ করেন। তবে তিন বৎসর পরে তিনি হঠাৎ চাকুরীতে ইস্তিফা দিয়া গোপনে কিরমান হইতে ইসফাহান চলিয়া যান। কারণ কির্‌মানের তৎকালীন অত্যাচারী গভর্নর নাসিরুদ-দাওলার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। অতঃপর তিনি ইসফাহানের গভর্নর জি'ল্লু'স্-সুল্‌তান-এর অধীনে কাজ করিতে থাকেন এবং এই সময়ে Jesuit পাদ্রীগণের নিকটে ফরাসী ভাষা শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু নাসিরুদ্ দাওলা তাঁহার জন্য অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলে তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শায়খ আহ্‌মাদ রূহীকে সঙ্গে লইয়া তেহরান চলিয়া যান (১৩০৩/১৮৮৫)। সেইখানেও একই কারণে তিনি টিকিতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি ও রূহী উভয়ে কয়েক মাস মাশ্‌হাদে কাটাইয়া অবশেষে ১৩০৩/১৮৮৬-এর শেষদিকে ইসতাম্বুলে চলিয়া যান। অল্প কাল পরে তাঁহারা উভয়ে সাইপ্রাস (Cyprus) গমন করেন এবং দুইজনে তথাকার সুব্‌হ-ই আযাল নামে খ্যাত বাবী নেতা মীর্যা ইয়াহ্‌য়া নূরীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

ইসতাম্বুলে থাকাকালে আক'া খান দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করিতেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে পৈত্রিক সম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন। অগত্যা তাঁহাকে শিক্ষকতা করিয়া এবং বিভিন্ন ফার্সী সংবাদপত্রে, যথা ইসতাম্বুলে প্রকাশিত আখ্‌তার ও লন্ডনে প্রকাশিত মালকাম খান-এর কানূন পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সামান্য উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। নাসিরুদ্দীন শাহ কর্তৃক ১৮৯০ খৃ. মঞ্জুরকৃত তামাক ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা Persian Tobacco Concession ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানের প্রবল বিরোধিতা করিয়া কির্‌মানী প্রকাশ্যে মন্তব্য করিতে থাকেন এবং শাহের বিরুদ্ধে এমন বিরূপ সমালোচনা করেন যাহাতে ক্রুদ্ধ শাহ মাটিতে পদাঘাত করিয়া ও ঠোঁট কামড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি আক'া খানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবে, আমি তাহার গৃহ ধ্বংস করিয়া তাহার মাথার উপর ফেলিব" (ইয়াহ্‌য়া দাওলাতাবাদী, তারীখ-ই মু'আসি'র ইয়াহ্‌য়াত-ই ইয়াহ্‌য়া, ১খ, তেহরান ১৯৫৭, পৃ. ১২৫)।

পত্র-পত্রিকায় প্রচারাভিযান ব্যতীত আক'া খান শাহের অপর বিরূপ সমালোচনাকারী সায়্যিদ জামালুদ্দীন আসাদাবাদী (আফ্‌গানী)-এর নেতৃত্বাধীন প্যান-ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ইরাকের পারস্য দেশীয় 'আলিমগণের সঙ্গেও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করিতে থাকেন। এই সকল শাহ-বিরোধী কার্যকলাপের কারণে ইরান সরকার তুর্কী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানান যেন আক'া খানকে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিগণসহ বিচারের জন্য ইরানে ফেরত পাঠান হয়। এই ঘটনা ১৮৯৩-৪ খৃ. তুরস্কের আর্মেনীয় বিদ্রোহের একই সময়ে সংঘটিত হয়।

ফলে আক ়া খানকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। উভয় দেশের সরকারের মধ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়, আক ়া খানকে ইরানে আশ্রয় গ্রহণকারী আর্মেনীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে বিনিময় করা হইবে। ইতোমধ্যে (১৩১৪/১৮৯৬) নাসিরুদ্-দীন শাহ্, আফ্গানীর জনৈক সহচর মীর্যা রিদা কির্মানীর হস্তে নিহত হন। এই ঘটনা আক ়া খান-এর ইরানে পুনঃপ্রেরণ ত্বরান্বিত করে। অবশেষে সাফার ১৩১৪/ জুলাই ১৮৯৬ তারিখে আক ়া খানকে তাঁহার অপর দুইজন সহচর রূহী ও হ ়াসান খান খাবীরুল মুল্কসহ তাব্রীযে শিরশ্ছেদ করা হয়। পরবর্তী ইরান সম্রাট মুহাম্মাদ আলী মীর্যা সেখানে উপস্থিত থাকিয়া দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেন।

আক ়া খানকে ইরানের আধুনিক চিন্তাবিদগণের অগ্রদূত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। অন্য সমসাময়িকগণ, যথা মাল্কাম খান, আখুন্দ যাদাহ বা মুস্তাশারুদ্-দাওলা তাব্রীযী অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহার অন্যতম কারণ, তাঁহার অসাধারণ ভাষাজ্ঞান তাঁহাকে ইয়ুরোপীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার ব্যাপক সুযোগ প্রদান করে। প্যান-ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কতিপয় কার্যকলাপ ধর্মবিরোধী ছিল এবং অনেক প্রচলিত রীতিনীতির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

একটি আধুনিক চিন্তাধারা হিসাবে বাবী ধর্মের প্রতি তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল তিনি উহার অনুসারীও ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বাবী ধর্মের বিরোধী হইয়া পড়েন। তিনি সকল ধর্মীয় উপদলকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিতেন (দ্র. ফিরীদূন আদামিয়্যাত, আনদীশাহা-ই মীর্যা আকা খান কির্মানী, তেহরান ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৬৬)। চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ইয়ুরোপীয় চিন্তাবিদ ভল্টেয়ার, স্পেনসার, রুশো, মন্তেস্কিউ (Montesquieu) ও Guizot দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

আকা খানের রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ। তাঁহার রচনাবলীতে জড়বাদ (materialism), নৈরাজ্যবাদ (anarchism), নাস্তিবাদ (nihilism), জাতীয়তাবাদ (nationalism) ও ধর্মীয় দর্শনের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। তিনি ইতিহাসের আধুনিক ব্যাখ্যাও দান করিয়াছিলেন এবং পারস্যের ইতিহাস রচনায় নূতন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের, বিশেষত সাহিত্যের বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, উহা সমাজের নিকট দায়ী থাকিবে এবং উহার প্রতিনিধিত্ব করিবে। সমাজ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, "সম্পদের প্রকৃত উৎস (১) জড় পদার্থ, যথা ধাতু ও খনিজ দ্রব্যাদি ও (২) শ্রমিকের মজুরি। সম্পদের একমাত্র মান শারীরিক ও মানসিক শ্রম, স্বর্ণ বা রৌপ্য নহে। সেইগুলি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম" (ঐ, পৃ. ২৩৭-৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আকা খান কিরমানী, হাশ্ত বিহিশ্ত, তেহরান ১৯৬০ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Haftad-u du millat, বার্লিন ১৯২৪ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, নামা-ই ইব্রাত রাস্তাখীয, ১খ., (১৯২৪ খৃ.) পৃ. ৪০৬-১২; (৪) ঐ লেখক, আইনা-ই সিকান্দারী তারীখ-ই ঈরান, তেহরান ১৯০৬ খৃ.; (৫) Addul Hadi Hairi, European and Asian influences on the Persian Revolution of 1906, in Asian Affairs, N.S. Vi (June 1975), 155-64; (৬) ঐ লেখক, The idea of constitutionalism in Persian literature prior to the 1906 Revolution in Akten des vii. Kongresses fur Arabistik und Islamwissenschaft, Gottingen, 15 bis 22. August 1974. Gottingen 1976, 189-207; (৭) ফিরীদূন আদামিয়্যাত, আইদিওলজী-ই নাহ্দাত-ই মাশরূতিয়্যাত, ১খ., তেহরান ১৯৭৬; (৮) ঐ লেখক, ফিক্র-ই দিমুকরাসী-ই ইজ্তিমাঈ দার নাহ্দাত-ই মাশ্রূতিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৯৭৬ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, সিহ্ মাক্তূব-ই মীর্যা ফাত্হ আলী, সিহ মাক্তূব ওয়া সাদ্ খাতাবা-ই মীর্যা আকা খান, য়াগমা-তে, ১৯ খ. (১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ৩৬২-৭, ৪২৫-২৮; (১০) ঐ লেখক, আন্দীশাহা-ই মীর্যা ফাত্হ আলী আখুন্দযাদাহ, তেহরান ১৯৭০ খৃ.; (১১) এম. মু'ঈন ফার্হাঙ্গ-ই ফার্সী, ৫খ., তেহরান ১৯৬৬ খৃ.; 'আকা খান" শিরোনাম দ্র.; (১২) মুহাম্মাদ তাকী, মালিকুশ্-শুআরা বাহার সাব্ক-শিনাসী, ৩খ., তেহরান ১৯৫৮ খৃ.; (১৩) আহ্মাদ কাস্য়াবী, তারীখ-ই মাশ্রুতা-ই ঈরান, তেহরান ১৯৬৫ খৃ.; (১৪) মাহ্দী মালিক যাদাহ্, তারীখ-ই ইন্কিলাব-ই মাশ্রূতিয়্যাত-ই ঈরান, ১খ., তেহরান ১৯৪৯ খৃ.; (১৫) নাজিমুল ইসলাম কির্মানী, তারীখ-ই বীদারী-ই ঈরানিয়ান, ১/১-৩ খ., ও মুকাদ্দিমা, তেহরান ১৯৬৭ খৃ.; (১৬) Nikki R. Keddie, The origins of the religious-radical alliance in Iran, in past & present : A Journal of Historical Studies, xxxiv (1966), 70-80; (১৭) ঐ লেখক, Religion and irreligion in early Iranian nationalism, in Comparative Studies in Society and History, iv/-4 (1962), 265-95; (১৮) ঐ লেখক, Religion and rebellion in Iran: the Tobacco Protest of 1891-1892, London 1966; (১৯) E.G. Browne, Press and poetry of modern Persia, Cambridge 1914; (২০) ঐ লেখক, The Persian Revolution of 1905-1909 Cambridge 1910; (২১) ঐ লেখক, Materials for the study of the babi religion, Cambridge 1918; (২২) নাস্রুল্লাহ ফাত্হী, তারীখ-ই শান্যমান-ই ঈরান কিতাবী কি মুন্তাসাব বি মীর্যা আকা খান কির্মানী আস্ত...., নিগীন-এ, সংখ্যা ২/৯, ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৩৩-৭; (২৩) ইসমাঈল রাইন, আঞ্জুমানহ-ই সির্রী দার ইন্কিলাব-ই মাশরূতিয়্যাত-ই ঈরান, তেহ্রান ১৯৬৬ খৃ.; (২৪) খান বাবা মুশার, মুআল্লিফীন-ই কুতুব-ই চাপিঈ-ই ফার্সী ওয়া আরাবী, ৩খ., তেহরান ১৯৬২ খৃ., সংখ্যা ৭৫৪-৬; (২৫) হামিদ আল্গার, Mirza Malkum Khan ঃ a biografical study of Iranian modernism, Berkeley 1973; (২৬) বাসতানী পারীযী, তালাশ-ই মাআশ, তেহরান ১৯৬৮ খৃ.; (২৭) খান মালিক সাসানী, সিয়াসাত, গারান-ই দাওরা-ই কাজার, ১খ., তেহরান ১৯৫৯ খৃ.; (২৮) আলী আমীনুদ্ দাওলা,

খাতিরাত-ই সিয়াসী, তেহরান ১৯৬২ খৃ.; (২৯) মুহাম্মাদ কায্বীনী, ওফায়াত-ই মুআসিরীন, ইয়াদগার-এ, সংখ্যা ৩/১০ (১৯৪৭ খৃ.), পৃ. ১২-২৫; (৩০) সাঈদ নাফীসী, দুকতুর আলী আক্বার খান নাফীসী নাজিমুল-আতিব্বা ইয়াদগার-এ, ১১/৪ খ., ১৯৪৬, পৃ. ৫২-৬০; (৩১) J. Morier, Sarguzasht-i-Hadjdjdi Baba-yi Isfahani, অনু. মীর্যা হাবীব ইস্ফাহানী, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.; (৩২) Mangol Bayat Philipp, The concepts of religion and government in the thought of Mirza Aqa Khan Kirmani, a nineteenth-century Persian revolutionary, in IJMES, সংখ্যা ৫, ১৯৭৪., পৃ. ৩৮১-৪০০; (৩৩) মুহাম্মাদ গুলবুন, মাজারা-ই কাতুল-ই মীর্যা আর্কা খান কির্মানী, শায়খ আহ্মাদ রূহী ওয়া মীর্যা হাসান খান খাবীরুল মূল্ক, ইয়াগ্মাতে, সংখ্যা ২৪/৪ (১৯৭১ খৃ.)। আরও দ্র. আযাদী, E.I.[2] Suppl.

Abdul-Hadi Hairi (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ূন খান

আকা গুনদুয (آقا غندز) ঃ তুর্কী লেখক ও ঔপন্যাসিক (১৮৮৬-১৯৫৮ খৃ.), তাঁহার আসল নাম হু'সায়ন আওনী। লেখক হিসাবে তিনি প্রথমে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন আনীস 'আওনী, পরে তাহা পরিবর্তন করিয়া তিনি আকা গুন্দুয, এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন মেজর। তিনি সালোনিকার নিকটবর্তী আলাসোনিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কুলেলী সামরিক উচ্চ বিদ্যালয় ও পরে সামরিক কলেজে (War College, মাকতাবি হ'আরবিয়্যা) পড়াশুনা করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে প্যারিসে পাঠান হয়, সেখানে তিন বৎসরকাল চারু-কারুকলা একাডেমীতে ও আইন অনুষদে পড়াশুনা করেন। সালোনিকাতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যুদ্ধরত বাহিনীতে (Hareket ordusu) স্বেচ্ছামূলকভাবে যোগদান করেন। এই বাহিনীটি ১৯০৯ খৃ., ১৩ এপ্রিলের বিদ্রোহ (৩১ মার্ট ওয়াকআসী) দমনের জন্য ইস্তাম্বুলে প্রেরিত হয়। ১৯১৯ খৃ. পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকরূপে কার্যরত ছিলেন। পরে আনাতোলিয়ার জাতীয়তাবাদিগণের প্রতি সোচ্চার সমর্থন জোগানোর জন্য ইংরেজগণ তাঁহাকে গ্রেফতার করে এবং মাল্টাতে নির্বাসনে প্রেরণ করে। অতঃপর তুরস্কের জাতীয়তাবাদী সরকার তাঁহাকে মুক্তি দান করে। তিনি আঙ্কারাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং জাতীয় সংসদের সদস্যরূপে দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং একই সঙ্গে সাহিত্যে স্বীয় লেখকের পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ৭ নভেম্বর, ১৯৫৮ খৃ., তিনি আঙ্কারাতে ইন্তিকাল করেন।

আকা গুনদুয সালোনিকাতে তাঁহার বন্ধু উমার সায়ফুদ্-দীনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকিয়া কবি, ছোট গল্প লেখক ও নাট্যকাররূপে সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। কিন্তু মূলত তিনি ঔপন্যাসিকরূপেই পরিচিত। কাব্য সংগ্রহ বোযগুন (Debacle বা "বিপর্যয়" ১৯১৩ খৃ.) ও নাটক মুহতারাম কাতিল ("শ্রদ্ধেয় ঘাতক," ১৯১৪ খৃ.) ও মাই য়িলদিরিম ("নীল বজ্রপাত," ১৯৩৪ খৃ.) ব্যতীত তিনি কয়েকখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ গ্রন্থ ও ষাটখানিরও বেশী উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রহিয়াছে দিকমেন য়িলদিযি ("দিকমেনের নক্ষত্র," ১৯২৮ খৃ.), ইকি সুনগু আরাসিনদা ("দুই বেয়োনেটের মধ্যখানে," ১৯২৯ খৃ.), উভে আনা ("সৎ মা," ১৯৩৩ খৃ.) ও ইয়ায়লা কিযি ("মালভূমির মেয়ে," ১৯৪০ খৃ.)। আকা গুন্দুয-এর অন্যান্য সাদামাটা উপন্যাস ও বিগত ছোট গল্পগুলি প্রায় অমার্জিত শিল্পরীতিতে রচিত। সেইগুলি এই শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও সেইগুলির সাহিত্যমূল্য খুব বেশী নাই। সেইগুলিতে বিশেষত সাধারণ মানুষের জীবনের ভাবপ্রবণতা বা বিষাদময় ঘটনাবলীর বাস্তবতা কিছুটা পরিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়েনি য়ায়িন্লার, ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ (তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থের তালিকা সম্বলিত); (২) বেহ্‌কেত নেকাতিগিল (Behcet Necatigil), এদেবিয়াত-তিমিয্দা ইসিমলের সোয্লুগু, ইস্তাম্বুল ১৯৭৫ খৃ.।

Fahir Iz (E.I.[2] Suppl.) /হুমায়ূন খান

আকা নাজাফী (آقا نجفى) ঃ হাজ্জী শায়খ মুহাম্মাদ তাকী ইস্ফাহানী (১৮৪৫-১৯৩১), ইরানের ইসফাহানের এক অতি প্রভাবশালী ধর্মীয় ইমাম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেও উক্ত শহরের একজন প্রভাবশালী ও সম্পদশালী ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তাঁহার পিতাও একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন, পিতার নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নাজাফ গমন করেন এবং সেখানে শীরাযী ও অন্যান্য উস্তাদের নিকটে ফিক্'হ ও উসূ'ল শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৩ খৃ. তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে আকা নাজাফী ইসফাহানের ধর্মীয় নেতারূপে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি শাহ মসজিদে ইমামতি করিতেন এবং বাড়ীতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করিতেন। সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার যে রায় প্রদান করিতেন তিনি তাহা নিজেই কার্যকরী করিতেন। সালাত, ধর্মীয় নৈতিকতা, ফিক্'হ ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ের বহু গ্রন্থ তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়। তাহা ছাড়া তাঁহার অনেক গ্রন্থ তাঁহার নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনেকের ধারণা, প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে সেই সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই (দ্র. মাহ্দী বামদাদ, শারহ-ই হাল-ই রিজাল-ই ঈরান, ৩খ., তেহরান ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩২৭)। নিজে যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন বলিয়া ইসফাহানের সামন্ত গভর্নর জিল্লুস সুল্তান-এর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ মিল ছিল। অনেক সময় উভয়ে একসঙ্গে কাজ করিতেন, যদিও সেই সহযোগিতা আবার কখনও কখনও শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামে পরিণত হইত।

আকা নাজাফীকে ইসফাহান ও ইয়ায্দের দুইটি প্রধান বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হইয়া থাকে। বাবী ও বিধর্মী মতবাদের অভিযোগে বহু লোককে হত্যা করা হইয়াছিল ঃ একবার ১৮৯০ খৃ. ও পুনরায় ১৯০২ খৃ.। ফলে প্রতিবারই আকা নাজাফী তেহরানে নির্বাসিত হন। তিনি আরও অনেকের সঙ্গে ১৮৯০ খৃ. শাহ কর্তৃক একটি বৃটিশ কোম্পানীকে তামাক ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৯০৬ খৃ. পারস্যের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবেরও তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। উভয়

ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্বাধীনতা-প্রেম অপেক্ষা বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সুবিধাবাদী রূপ যাহাতে তাঁহার প্রত্যাশা ছিল, সেই সকল জাতীয় আন্দোলনের সুযোগে স্বীয় সম্মান, ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। নিজের ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত আকা নাজাফী অনেক সময় স্বীয় সমালোচক বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাফির আখ্যা দিতেন, এমনকি খুনও করাইতেন (দ্র. মাহ্দী মালিক যাদাহ্, তারীখ-ই ইন্‌কি'লাব-ই মাশ্‌রূতিয়্যাত-ই ঈরান, ১খ., তেহরান ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১৬৬)। তদুপরি ১৯১১ খৃ. অবধি আকা নাজাফী ও তাঁহার পুত্রগণ অকস্মাৎ সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের মত পরিবর্তন করেন এবং নিজেদের বিপুল ভূ-সম্পত্তি বিদেশীদের হেফাজতে রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন (Cd. 5656, Persia, No I (১৯১১), G. Barclay হইতে E. Grey পর্যন্ত, ২৫ ফেব্রু. , ১৯১১, লন্ডন ১৯১১ খৃ., Ciii, পৃ. ৩০)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবদুল হাদী হাইরী, ShiÈism and constitutionalisn in Iran : a Study of the role played by the Persian residents of Iraq in Iranian politics, Leiden ১৯৭৭; (২) ঐ লেখক, Why did the Ulama Participate in the Persian revolution of 1905-1909?, in WI, xvii (১৯৭৬), ১২৭-৫৪; (৩) হাসান জাবিরী আন্‌সারী, তারীখ-ই ইস্‌ফাহান ওয়া রায় ওয়া হামা-ই জাহান, তেহরান ১৯৪৩; (৪) আগা বুযূর্গ তিহ্‌রানী, তাবাকাত আলামিশ্‌-শীআ, ১খ., নাজাফ ১৯৫৪; (৫) ইয়াহ্‌য়া দাওলাতাবাদী, তারীখ-ই মুআসির ইয়া হায়াত-ই ইয়াহ্‌য়া, ১খ., তেহরান ১৯৫৭; (৬) আহমাদ কাসরাবী, তারীখ-ই ইরান, তেহরান ১৯৬৫; (৭) ঐ লেখক, তারীখ-ই হিজ্‌দাহ্‌সালা-ই আযারবায়জান, তেহরান ১৯৬১; (৮) নূরুল্লাহ দানিশওয়ার আলাবী, তারীখ-ই মাশ্‌রূতা-ই ঈরান ওয়া জুন্‌বিশ-ই ওয়াতান পরাস্তান-ই ইসফাহান ওয়া বাখ্‌তিয়ারী, তেহরান ১৯৫৬; (৯) নাজিমুল ইসলাম কির্‌মানী, তারীখ-ই বিদারী-ই ঈরানিয়ান, ভূমিকা, ১-২, তেহরান ১৯৬৭, ১৯৭০; (১০) মুহাম্মাদ হাসান খান ইতিমাদুস্‌ সাল্‌তানা, রুযনামা-ই খাতিরাত, তেহরান ১৯৭১; (১১) আবদুস্‌ সামাদ খাল্‌আত্‌বারী, শার্‌হ-ই মুখতাসার-ই যিন্দিগানী-ই সিপাহ্‌সালার-ই আজাম মুহাম্মাদ ওয়ালী খান তুনুকাবুনী, তেহ্‌রান ১৯৪৯; (১২) আহ্‌মাদ তাফরিশী হুসায়নী, রূয্‌নামা-ই আখ্‌বার-ই মাশ্‌রূতিয়্যাত ওয়া ইন্‌কিলাব-ই ঈরান, তেহরান ১৯৭২; (১৩) বেনামা, রুইয়া-ই সাদিকা, তা. বি., স্থানের নামবিহীন; (১৪) G.R. Garthwaite, The Bakhtiyari Khans, the government of Iran and the British, 1946-1915 in IJMES, iii (১৯৭২), পৃ. ২৪-৪৪; (১৫) আব্বাস মীর্যা মুলকারা, শার্‌হ-ই হাল, তেহরান ১৯৪৬; (১৬) আবদুল্লাহ মুসতাওফী, শার্‌হ-ই যিন্দিগানী-ই মান, ১খ., তেহরান তা. বি.; (১৭) মুহাম্মাদ আলী সায়্যাহ্‌ খাতিরাত-ই হাজ্জ সায়্যাহ্‌ য়াদাওরা-ই খাওফ ওয়া ওয়াহ্‌শাহ্‌, তেহ্‌রান ১৯৬৭; (১৮) মাহ্‌দী কূলী হিদায়াত, খাতিরাত ওয়া খাতারাত, তেহরান ১৯৬৫; (১৯) মাস্‌উদ মীর্যা জিল্লুস্‌সুল্‌তান, তারীখ-ই সার্‌গুযাশ্‌ত-ই মাস্‌উদী, তেহরান ১৯০৭; (২০) মুহাম্মাদ হির্‌যুদ্দীন, মা'আরিফুর্‌-রিজাল, ২খ., নাজাফ ১৯৬৪; (২১) আলী ওয়াইজ খিয়াবানী, কিতাব-ই উলামা-ই মুআসিরীন, তেহরান ১৯৪৬; (২২) মুহাম্মাদ আলী মুদার্‌রিস, রায়হানাতুল আদাব, ১খ., ৩খ., ১৯৬৭; (২৩) হুসায়ন সাআদাত নূরী, জিল্‌লুস্‌-সুলতান, তেহরান ১৯৬৮; (২৪) হামিদ আলগার, Religion and state in Iran, 1785-1906: the role of the Ulama in the Qajar period, Berkeley 1969; (২৫) E.G. Browne, The Persian revolution of 1905-1909, Cambridge 1910; (২৬) Firuz Kazemzadeh, Russia and Britain in Persia, 1864-1914, New Haven 1968; (২৭) Nikki R. Keddie, Religion and rebellion in Iran; (২৮) A.K.S. Lambton, Persian political societies 1906-11, St. Antony's Papers, No. 16. London 1963, 41-89.

Abdul-Hadi Hairi (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ূন খান

আকা সাদিক (اقاصادق) : ১৮শ শতকে বাংলার সুবাদার শুজাউদ্দীনের আমলে পাটপসরের জমিদার ছিলেন। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলীর নায়েব মীর হাবীব তাঁহার সহযোগিতায় ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ত্রিপুরার রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাহায্যে ত্রিপুরা অধিকৃত ও রাজধানী চণ্ডীগড় বিধ্বস্ত হয়। পরে আকা সাদিক ঐ রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১১১।

(সংকলিত)

আকার (عقار) : আ., ইসলামী আইন বিষয়ক একটি শব্দ, অর্থ "স্থাবর সম্পত্তি" যেমন বাড়ীঘর, দোকান বা জমি (realty অথবা real property)। ইহার বিপরীত মাল মান্‌কূ'ল (অস্থাবর সম্পত্তি)। যে সমস্ত সম্পত্তি আকার পদবাচ্য উহা হুবহু বদলযোগ্য নহে (non-tangible)-ক'ীমী (قيمى) অর্থাৎ কেবল মূল্য প্রদানের মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য। তবে আকার ও ক'ীমী এই শব্দদ্বয় অর্থের দিক হইতে সমবিস্তৃত (co-extensive) নহে, যেমন পশুপক্ষী, আসবাবপত্র ইত্যাদি কীমী পর্যায়ের, কিন্তু 'আকার নহে। আকারের মালিক সম্পত্তির পৃষ্ঠ সংলগ্ন, সম্পত্তির উপরে বা নিম্নে অবস্থিত তাহা যত উর্ধ্বে হউক, তাহা যত গভীরেই হউক, সমস্ত কিছুর মালিকরূপে গণ্য হয়। কাজেই জমির মালিক উহার নিম্নস্থ খনিজ সম্পদ এবং উপরস্থ দালানকোঠা, ঘরবাড়ী ও গাছপালারও মালিক হইয়া থাকেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (personality)-এর ন্যায় ভূসম্পত্তির ইসলামী আইনে যৌথ মালিকানাধীন (মুশা) হইতে পারে, প্রত্যেকের অংশ আলাদাভাবে চিহ্নিত না করিয়াও আধুনিক ইসলামী দেশসমূহে নদীর কিনারা বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গঠিত জাগিয়া উঠা পয়স্তি জমির মালিকানা রাষ্ট্রে বর্তায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুস্‌তাফা আহ্‌মাদ আয্‌-যার্‌কা, আল-ফিক্‌'হুল ইসলামী ফী ছ'াওবিহিল জাদীদ, দামিশ্‌ক ১৯৬৮ খৃ., এবং সেই গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী; (২) আইনের দলীলে আকার সম্পত্তির কিভাবে সংজ্ঞা ও বর্ণনা প্রদান করা হয় সেইজন্য দ্র. R.Y. Ebied and M.J.L. Young. Some

Arabic legal documents of the Ottoman period, Leiden ১৯৭৬ খৃ.।

Ebied ও Young (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ুন খান

'আক্'রিব (দ্র. 'আক্‌রাবী)

'আকিফ পাশা (দ্র. মুহাম্মাদ আকিফ পাশা)

'আকি'ল ইব্ন আবিল বুকায়র (عاقل بن ابى البكير) ঃ (রা) একজন মুহাজির সাহাবী। মক্কার কিনানা গোত্রে আনু. ৫৯০ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবূ মা'শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার-এর বর্ণনামতে তাঁহার পিতার নাম আবুল বুকায়র ইব্ন 'আবদ ইয়ালীল। মূসা ইব্ন 'উক'বা, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ প্রমুখের বর্ণনামতে তাঁহার পিতার নাম বুকায়র ইব্ন 'আবদ ইয়ালীল। তাঁহার বংশলতিকা হইলঃ 'আকি'ল ইব্ন আবিল বুকায়র ইব্ন 'আব্দ ইয়ালীল ইব্ন নাশিব ইব্ন গিয়ারা ইব্ন সা'দ ইব্ন লায়ছ ইব্ন বাক্র ইব্ন 'আবদ মানা ইব্ন কিনানা। তাঁহার পিতা আবুল বুকায়র ইব্ন 'আবদ ইয়ালীল জাহিলী যুগে 'উমার ইব্নুল খাত্তাব-এর দাদা নুফায়ল ইব্ন 'আবদিল 'উয্যা-এর সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেইখান হইতে তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ বানূ নুফায়ল-এর মিত্ররূপে পরিগণিত হন।

ইসলামের সূচনালগ্নে রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন আরকাম গৃহকে ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্ররূপে নির্ধারণ করেন তখন সর্বপ্রথম সেই গৃহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত হন 'আকি'ল ইব্ন আবিল বুকায়র ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা 'আমের, ইয়াস ও খালিদ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'আকি'ল (রা)-এর নাম ছিল গাফিল (অলস)। রাসূলুল্লাহ (স) উহা পরিবর্তন করিয়া তাঁহার নাম রাখেন 'আকি'ল (বুদ্ধিমান)। অতঃপর ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফিরদের পক্ষ হইতে তাঁহার উপর নির্যাতন চরমে পৌছিলে 'আকি'ল (রা) ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা ও তাঁহাদের পরিবারের সকলে এক সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। মক্কায় তাঁহাদের বাসগৃহে আর কেহ অবশিষ্ট না থাকায় বাড়িতে তালা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। হিজরতের পর তাঁহারা রিফাআ ইব্ন 'আবদিল মুনযি'র (রা)-এর গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মুবাশ্শির ইব্ন 'আবদিল মুনযি'র (দ্র.)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। 'আকি'ল (রা) ও তাঁহার এই দীনী ভ্রাতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উভয়ে উক্ত যুদ্ধে শহীদ হন। তখন 'আকি'ল (রা)-এর বয়স ৩৪ বৎসর। মালিক ইব্ন যুহায়র আল-জুশামীর হাতে তিনি শহীদ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৩৮৮; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল- ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৪৭, সংখ্যা ৪৩৬১; (৩) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, তেহ্‌রান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ৭৬-৭৭; (৪) শাহ মু'ঈনুদ-দীন নাদাবী, সিয়ারুস-সাহাবা, লাহোর তা.বি., ২/২ খ., ৩২৬-৩২৭; (৫) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১০ম সং., বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ১খ., ১৮৫-১৮৬, সংখ্যা ১৬; (৬) ইব্ন 'আবদিল বার্‌র, আল- ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৩খ., ১২৩৫, সংখ্যা ২০১৮; (৭) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো, ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩২৭; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১ম সং. ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., ৩২০; (৯) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দার ইহয়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৪৯৯; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, 'আলামুল কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৫৬।

ডঃ আবদুল জলীল

'আকি'ল (দ্র. বালিগ)

'আকি'ল খান রাযী (عـاقل خـان رازى) ঃ মীর মুহাম্মাদ 'আসকারী, মুগল কর্মকর্তা ও সেনাপতি। তিনি খুরাসানের খওআফ-এর সায়্যিদ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ভারতবর্ষে। প্রথম হইতেই তিনি শাহ্যাদাহ আওরংগযেবের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১০৬৮/১৬৫৮ সালে সম্রাট শাহ্জাহান মারাত্মকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে যখন সিংহাসন লইয়া সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার আওরংগযেব 'আকি'ল খানকে সেই প্রদেশের রাজধানী দাওলাতাবাদের দায়িত্বে রাখিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন। পরে বাদশাহ সম্রাট তাঁহাকে ১,৫০০/১,০০০ সৈন্যের মান্‌সাব্‌দার পদে উন্নীত করিয়া দোয়াবের ফাওজদার (দ্র.) নিযুক্ত করেন। ১০৯২/১৬৮১ সনে তিনি দিল্লীর সুবাদার নিযুক্ত হন। সেই পদে থাকাকালে তিনি ৪,০০০/১,০০০ সৈন্যের মান্‌সাব্‌দার পদে উন্নীত হন এবং ১১০৮/১৬৯৬-৭ সালে ইনতিকাল করেন।

'আকি'ল খানকে ওয়াকি' 'আত-ই আলামগীরী বা জাফার নামাহ-ই আলামগীরী নামক গ্রন্থখানির রচয়িতা বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের ও আওরংগযেবের শাসনামলের প্রথম অংশের অতি চিত্তাকর্ষক (অবশ্য স্থানে স্থানে খুবই অতিরঞ্জিত) বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে সব সময়ই যে আওরংগযেবের অতি প্রশংসাসূচক বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা নহে, সরকারী ইতিহাস গ্রন্থ আলমগীরনামাহতে নাই এইরূপ বহু তথ্যও ইহাতে রহিয়াছে। 'আকি'ল সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, কবিতার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; তাঁহার একখানি দীওয়ান ও কিছু সংখ্যক মাছ'নাবী কবিতা রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আকি'ল খান রাযী, ওয়াকি''আত-ই আলমগীরী, সম্পা. জাফার হাসান, আলিগড় ১৯৪৫ খৃ., (দ্র. Storey, ১খ., ৫৮৪-৫); (২) মুহাম্মাদ কাজিম, আলামগীরনামাহ্, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৬৫-৭৩; (৩) সাকী' মুস্তা'ঈদ খান, মাআছির-ই আলাম্গীরী, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৭১ খৃ.; (৪) শাহ নাওয়ায খান, মাআছিরুল উমারা, ২খ., Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৮৮ খৃ.; (৫) এম. আত্হার আলী, The Mughal nobility under Aurangzeb, বোম্বাই ১৯৬৬ খৃ.।

এম. আত্হার আলী (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ুন খান

'আকিলা (عاقلة) ঃ ইসলামী দণ্ডবিধির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের অন্যতম। আইনের উৎস ও সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন উভয় দিক দিয়া ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে 'আকিলা (ব.ব. আওয়াকিল)

শব্দের অর্থ হইতেছে, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করিলে বা আঘাত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাহার যে সকল পুরুষ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ হইতে রক্তের মূল্য ('আক্ল) প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে 'আকিলা বলা হয়। এই ক্ষতিপূরণকে বলা হয় দিয়্যা (দ্র. দিয়াত) বা 'আক্ল (ব.ব. 'উকূল) বা মাকূলা (ব.ব. মা'আকিল)। 'আক্ল-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বাঁধা বা শিকলে বাঁধা। আরবী অভিধান প্রণেতাগণের ব্যাখ্যা এই, প্রাথমিক পর্যায়ে ইহা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের "শিকলবদ্ধ" অবস্থায় যে উটসমূহ দিয়াত স্বরূপ দেওয়া হইত, সেই উটগুলিকে বুঝাইত (তু. ইব্ন কু'তায়বা, আদাবুল কাতিব, হি. ১৩৪৬, ৫২; L.A., xiii, ৪৮৭-৮-এ বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে)। কিন্তু প্রাচীন আইনবেত্তাগণ ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ তথা সংযতকরণের সহিতই এই শব্দটিকে সম্পৃক্ত করিতে পসন্দ করেন (তু. জার্মান শব্দ wergeld)। সম্ভবত মূল অর্থটি প্রাচীন আরবী শব্দসমষ্টি আকলুল-কাতীল (عقل القتيل। নিহত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দান)-এ নিহিত আছে। এই শব্দটির অর্থ প্রাথমিক পর্যায়ে বোধ হয় ছিল "আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে নিবৃত্তকরণ।" এই বিধানটি মূলত প্রাচীন আরবের গোত্রীয় যৌথ দায়িত্বনীতি হইতে উদ্ভূত (Procksch, Uber die Blutrache etc., Leipzig 1899, 56-61; Morand, Etudes de droit mus. Algerien, Paris 1910, 56-7; ঐ লেখক, Introd., a l'etude du droit mus. algerien, Paris 1921, 210-12; Lammens, Arabie occidentale, 189)।

'আকিলার সরাসরি উল্লেখ কুরআন মাজীদে নাই। তবে আমাদের মতে কুর্আনের ৪ ঃ ৯২ আয়াতের সঙ্গে 'আকিলা বিধানকে সম্পৃক্ত করা যায়। উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, "কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের পক্ষে সংগত নহে, তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র এবং কেহ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়— যদি তাহারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ ও এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম (রোযা) পালন করিবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহ্র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

দেখা যাইতেছে, দোষী ব্যক্তি সংগতিহীন হইলে একটানা দুই মাস রোযা রাখিয়াই অব্যাহতি পাইতেছে। কিন্তু যে ক্ষতিপূরণ (রক্তপণ) নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের ন্যায্য প্রাপ্য তাহা হইতে তাহারা যেন বঞ্চিত না হয়, সেইজন্য দোষী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের ('আকিলার) উপর সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব হিসাবে রক্তপণের ভার অর্পণ করা অসংগত নহে। এই ব্যবস্থায় 'আকি'লা' দোষী ব্যক্তির অপরাধের "ভার" বহন করিতেছে না, বরং তাহারা আত্মীয় হিসাবে সমবেতভাবে একটা বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব পালন করিতেছে। সুতরাং এই বিধানটি কুরআনে উল্লিখিত ব্যক্তিগত দায়িত্বনীতি (কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করিবে না- ৬ ঃ ১৬৪)-এর মর্মার্থের পরিপন্থী নহে।

'আকি'লার এই বিধান রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। একদা হুযায়ল গোত্রের দুইজন রমণীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিলে তাহাদের একজন অপরজনকে প্রস্তর দ্বারা তলপেটে আঘাত করায় গর্ভাবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে। অচিরে অন্য রমণীটিরও মৃত্যু ঘটিলে রাসূলুল্লাহ (স) সিদ্ধান্ত দিলেন, রীতি অনুযায়ী তাহার আত্মীয় 'আকি'লা বা আসাবা বা জ্ঞাতিগণকে নিহত রমণীর আত্মীয়দের রক্তের মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

আরবের আদি প্রথা অনুসারে সমগ্র গোত্রই নরহত্যার ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য ছিল (Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, p. 53; O. Procksch, Uber die Blutrache bei den Vorislamischen Arabern, p.56 প.)। ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যায় কোনই পার্থক্য করা হইত না। মুসলিম আইনে কেবল অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্যই আত্মীয়দের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইতে পারে। উপরিউক্ত হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী হুযায়লী রমণীকে তাহার শত্রু অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিয়াছিল। 'আকি'লা অর্থাৎ রক্তমূল্য দিতে বাধ্য কাহারা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, অধিকাংশ মুসলিম আলিম কেবল দুষ্কৃতিকারীর পুরুষ আত্মীয়দেরকেই 'আকি'লা বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু হানাফীদের মতে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দরুন কেবল পরিবারের লোকেরা নহে, বরং যে সকল লোক পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য (যথাঃ দুষ্কৃতিকারী যেই সংঘের লোক তাহার অন্যান্য সদস্য, তাহার প্রতিবেশীবর্গ অথবা শহরের একই অংশের বাশিন্দাগণ) তাহাদের সকলকে ক্ষতিপূরণের অংশ দানে বাধ্য করা উচিত। তাঁহার দ্বিতীয় খালীফার প্রদত্ত দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। দ্বিতীয় খালীফা হযরত উমার (রা) বিভিন্ন জেলার মুসলিম সৈনিকদের তালিকা (দীওয়ান) প্রস্তুত করার আদেশ দিয়াছিলেন। ঐ সকল দীওয়ানে যাহাদের নাম থাকিত, তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের দলের কেহ নরহত্যা করিলে তাহারা সকলেই রক্তের মূল্যের অংশ দানে বাধ্য ছিল। 'আকিলাকে তিন বৎসর সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করিতে হয়। নির্ধারিত মূল্যের অঙ্ককে দিয়া (তু. দিয়্যাত) বলা হয়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিজ অংশে কত টাকা দিবে এই প্রশ্নেরও বিভিন্নরূপে মীমাংসা করা হইয়াছে। হানাফীদের মতে কাহারও পক্ষে তিন বা ঊর্ধ্বপক্ষে চারি দিরহামের অধিক দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শাফি'ঈদের মতে অবস্থাপন্ন লোকদের নিকট হইতে অর্ধ দীনার বা ৫ দিরহাম দাবি করা যাইতে পারে। মালিকী ও হাম্বালীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সাধ্যানুযায়ী অর্থ দানে বাধ্য। এই সকল বিধানের সহিত সময়, সমাজ ও মুদ্রামূল্যের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। দুষ্কৃতিকারীর আদৌ কোন আত্মীয় না থাকিলে সরকারী কোষাগার হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bercher, Les Delits et les peines de droit commun prevus par le Coran, Tunis 1926;

(২) মালিকী মায্হাব সম্বন্ধে দ্র. Arevalo Derecho penal Islamico, Tangier 1639, পৃ. ৪০-৪; (৩) বুখারী, সাহীহ, ৪খ.; কাস্তাল্লানী, ১০খ., পৃ. ৭৭; (৪) শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৬খ., ৩৬৯-৩৭৬; অন্যান্য হাদীছ সংকলন ও বিভিন্ন মায্হাবের ফিক্হ গ্রন্থাবলী ভিন্ন আরও দেখুনঃ (৫) মাওয়ার্দী (Ed. Enger), পৃ. ৩৯৩-৪; (৬) দিমিশ্কী, রাহ্মাতুল উম্মা ফী ইখ্তিলাফিল আইম্মা, বূলাক ১৩০০, পৃ. ১৩৪; (৭) J. Krcsmarik, in ZDMG,lviii, 551-556; (৮) Freytag, Einleitung in das Studium der arab. Sprache, p. 192; (৯) E. Sachau, Muhamm. Recht. nach schafiit. Lehre, pp. 761, 771-3; (১০) M.B. Vincent, Etudes sur la loi musulmane. (Rite de Malek). Legislation Criminelle, pp. 83, 114 প.; (১১) Th.W. Juynboll, Handleiding, 3rd ed., pp. 302, 321.

(সম্পাদনা পরিষদ E.I.2)

'আকীক (عقيق)ঃ (A. ; nomen unitatis: 'Aqiqa), Cornelian-এর আরবী নাম, আরবদেশে বিভিন্ন রঙ ও প্রকৃতির এই মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রক্তাভাযুক্ত আকীক-এর চাহিদাই অধিক। আকীক সুপ্রাচীন কাল হইতে ইয়ামান (আশ্-শিহ্র) হইতে সান্'আ হইয়া ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরসমূহে রফতানী হইত; ভারতবর্ষ হইতেও রফতানী হইত। ইহা আংটি, স্ত্রীলোকের অলংকার এবং অতি মূল্যবান মোজাইক-এ ব্যবহৃত হইত। উদাহরণস্বরূপ (আল-মাক্দিসী, ১৫৭ প. অনুসারে) দামিশ্কের বড় মসজিদের মিহ্রাব-এ ইহা ব্যবহৃত হয়। দাঁতের ক্ষয়রোধকারী ঔষধেও ইহার ব্যবহার হইত। এইরূপও বিশ্বাস আছে, আংটিতে ব্যবহৃত আকীক-এ (বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময়ে) হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়নেরও রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার গুণাবলী রহিয়াছে। ইউরোপেও আকীক (cornelian)-এর অনুরূপ গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রচলিত রহিয়াছে (তু. Handworterbuch d. Deutschen Aberglaubens, s.v. Karneol)। বর্তমান কাল পর্যন্ত আকীক স্ত্রীলোকের কণ্ঠের প্রিয় অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং কাচ, ঝিনুক বা অন্য যে কোন কিছু দ্বারা তৈরী কণ্ঠহার লাল রঙের হইলেই উহাকে বলা হইয়া থাকে আকীক।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-বীরূনী, আল-জামাহির ফী মা'রিফাতিল জাওয়াহির, ১৭২; (২) কায্বীনী (Wustenfeld), ১খ., ২৩৮; (৩) ইব্নুল বায়তার, আল-জামি', বূলাক ১২৯১, ৩খ, ১২৮ ; (৪) তীফাশী, আয্হারুল আফ্কার; (৫) Ta, ৭খ., ১৫; (৬) Dozy, Suppl., ii, 145; (৭) Lane, Modern Egyptians, London 1836, ii, 358; (৮) J.J. Clement Mullet, in JA, 1868, i, 157.

J. Hell (E.I.2) / হুমায়ুন খান

আল-'আকীক (العقيق)ঃ সৌদী আরব ও অন্যান্য দেশে অবস্থিত কয়েকটি উপত্যকা, খনি ও অন্যান্য স্থানের নাম। যখন উপত্যকার প্রতি প্রয়োগ করা হয় তখন 'আকীক' শব্দটি দ্বারা জলস্রোতের বহমান ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট খাত বুঝায়। যখন খনির প্রতি প্রয়োগ করা হয় তখন শব্দটি দ্বারা 'আকীক' পাথর (cornelian) বা আরও সাধারণভাবে, মূল উৎপত্তিস্থল হইতে কাটা যে কোন খনিজ পাথরকে বুঝায়। 'আরব কবিগণ' শব্দটির ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা সব সময় পরিষ্কার করিয়া বুঝান না, 'আকীকে'র বিবিধ অর্থের মধ্যে কোনটির কথা উল্লেখ করা হইতেছে।

সর্বাধিক বিখ্যাত 'আকীক' হইল মদীনার সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের উপত্যকাটি। মদীনা হইতে উহা হার্রাতুল ওয়াব্রা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। উহা উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া ওয়াদিল হাম্দ (দ্র.) বা সুপ্রাচীন কালের ইদাম-এর সঙ্গে মিলিত হইয়া আল-ওয়াজহ-এর দক্ষিণে লোহিত সাগরে পতিত হইয়াছে। মদীনার দক্ষিণস্থ 'আয়র পর্বত আল-'আকীক-এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই স্রোতস্বিনীটির অধিকাংশ পানি নিকটস্থ লাভা স্তর হইতে আসিয়া থাকে। বেশী বৃষ্টি হইলে উপত্যকাটিতে প্রশস্ত নদী প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তখনকার সেই প্রবাহকে ফোরাতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। আর যখন বৃষ্টি হয় না তখন মানুষ, পশু ও গাছ-গাছড়ার প্রাণ রক্ষার জন্য কেবল কূপগুলিতেই পানি সঞ্চিত থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আমলে মদীনা হইতে মক্কাগামী পথের প্রথম ধাপ আল-আকীকের মধ্য দিয়া যুল-হুলায়ফা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে তাহাই আছে। বহু হাদীছে বর্ণিত আছে যে, 'আকীক' বা রহ্মাতের উপত্যকা-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এইখানে একবার আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা তাঁহাকে সালাত আদায় করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। উপত্যকাটি মুযায়না এলাকার অন্তর্গত ছিল বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) স্থানটি 'কাতী'আ' (জায়গীর)-স্বরূপ বিলাল ইব্নুল হারিছকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে এই উপত্যকা পথে বেশ কিছু দূরে অবস্থিত আন্-নাকীতে মুসলিম বাহিনীর অশ্বের জন্য একটি সংরক্ষিত এলাকা (حمى) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিলাল স্থানটির কোন প্রকার উন্নয়ন না করায় খলীফা 'উমার (রা) ইহার অধিকাংশ বিলালের নিকট হইতে লইয়া ইহা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিমগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। অতঃপর কয়েক পুরুষ পর্যন্ত উপত্যকাটির ক্রমাগত উন্নয়ন সাধিত হয়। সেখানে অনেক নূতন কূপ খনন করা হয়, বাগিচা ও শস্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় এবং ইহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গ্রামীণ বাসস্থানে পরিণত হয় (তু. H. Lammens, Bereeau de l' Islam, ৯৪; ঐ লেখক, Le regne de Mo`awia, index—with further references)। হযরত 'আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হইবার পরে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) আল-আকীকে আসিয়া অবসর জীবন যাপন করিতে থাকেন, এখানে তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল।

'আরব কবিগণ আল-'আকীকের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও এখানকার বিখ্যাত কূপগুলির প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন, বিশেষ করিয়া দুইটি কূপের —বি'র রূমা (বর্তমানে ইহা বি'র 'উছ্মান নামে পরিচিত; কেননা হযরত উছমান ইব্ন 'আফফান (রা) কূপটি উহার পূর্বতন

ইয়াহূদী মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া মুসলিমগণকে পানি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন) এবং বি'র 'উরওয়া ইব্নুল-যুবায়র। আল-'আকীকে'র পানি এমন মিষ্টি ছিল যে, তাহা সুদূর ইরাকে খলীফা হারূনুর-রাশীদ-এর নিকট প্রেরণ করা হইত। 'আব্বাসীগণের পতনের পরে আল-হিজায-এ নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উপত্যকাটি ক্রমে আবার প্রাচীন সুপ্তাচ্ছন্ন অবস্থায় নিপতিত হয় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।

অপর একটি 'আকীক', যাহাকে প্রাচীন লেখকগণ কখনও কখনও 'আকীক' যাত 'ইর্ক' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা তাইফ-এর পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে হিজার-এর প্রধান পর্বতমালার ভিতর দিয়া উত্তরমুখে বিস্তৃত। কোন কোন লেখক যদিও বলিয়াছেন, এই উপত্যকা মদীনার 'আকীকে'র সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু সাম্প্রতিক জললেখ বিজ্ঞান বিষয়ক (hydrographic) গবেষণা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত আল-আকূল নামক এক বিশাল জলময় অববাহিকাতে গিয়া নিঃশেষিত হইয়াছে।

মধ্য 'আরবের একটি বড় উপত্যকা প্রাচীন কালে 'আকীক আল-ই-য়ামামা বা 'আকীক' তাম্রা নামে পরিচিত ছিল। যদিও প্রাচীন লেখকগণ ইহার সামান্য মাত্র বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তথাপি উপত্যকাটিকে যে বর্তমান ওয়াদিদ-দাওয়াসির (দ্র.)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের তেমন কোন অবকাশ নাই। এই স্থানটি এখনও তাম্রা নামের সাক্ষ্য বহন করে। ইহার একটু দূরে উপত্যকা শয্যায় একটি লবণ ভূমি এখনও 'আল-আকীক' নামে পরিচিত; আল-হাম্দানী (১খ., ১৫২)-এর মতে তাম্রা ছিল একটি ছোট শহর, সেখানে ২০০ ইয়াহূদীর বসতি ছিল। এই লেখক সম্ভবত ভুলক্রমে উপত্যকাটির নামের সঙ্গে মা'দিনুল আকীক নামক (তাঁহার মতে নিকটস্থ এলাকাতেই অবস্থিত) একটি খনির নামের সংযোগ দেখাইয়াছেন। এই খনির কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। এই একই নামের অন্যান্য খনিরও উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বিবরণগুলি এমনই সাধারণ ধরনের যে, সেইগুলিকে চিহ্নিত করা এক দুঃসাধ্য কাজ।

'আরবে 'আল-আকীক' নামে আরও কয়েকটি উপত্যকা ব্যতীত ইরাকে ফোরাতের দক্ষিণে এই নামের অপর একটি উপত্যকা রহিয়াছে (তু. W. Wright, 'Opuscula arab.', llo; হামাস, ১খ., ৪৬৮; আগানী, ৭খ., ১২৩; আদ্-দীনাওয়ারী, ২৬০)। লোহিত সাগরের সুদানী উপকূলে 'আকীক' নামে (নামের পূর্বে নির্দিষ্টবোধক 'আল' নাই) একটি গ্রাম রহিয়াছে, উহা এই একই নামের উপসাগরের তীরে সাওয়াকিন-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাম্দানী, নির্ঘণ্ট; (২) বাক্রী, মু'জাম, দ্র. 'আল-আকীক' ও আন্-নাকী; (৩) ইয়াকূত, দ্র. 'আল-আকীক; (৪) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৫) সামহূদী, ওয়াফাউল-ওয়াফা, কায়রো ১৩২৬, ২খ., ১৮৬-২২৬; (৬) শাকীব আর্সলান, আল-ইর্তিসামাতুল-লিতাফ, কায়রো ১৩৫০, পৃ. ২১১-১৪; (৭) এম. হুসায়ন হায়কাল, ফী মান্যিলিল ওয়াহয়ি, কায়রো ১৩৫৬, নির্ঘণ্ট; (৮) H. St. J. B. Philby, A Pilgrim in Arabia, London 1946, 50 প.।

G. Rentz (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

'আকীকা (عقيقة) ঃ শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিবসে নামকরণ ও কেশ মুণ্ডন উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম। ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেদিন নবজাতকের নাম রাখা, চুল কাটা ও কুরবানী দেওয়া সুন্নাত। সপ্তম দিনে আকীকা করা না হইলে শিশু বয়স্ক হইলে নিজেও তাহা করিতে পারে। আকীকার পশুর গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ দরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হয় এবং এক ভাগ সন্তানদের পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়গণ গ্রহণ করেন।

প্রাচীনতর 'আলিমদের কেহ কেহ (দাউদ আজ্-জাহিরী প্রমুখ) আকীকাকে অবশ্য করণীয় (ওয়াজিব) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইহাকে শুধু পুণ্যজনক (মুস্তাহাব) বলিয়া বিবেচনা করেন। শিশুর কর্তিত কেশকেও আকীকা বলে। শারী'আতে এই চুলের ওজনের সমান রৌপ্য দান করিতে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে খাত্নাহ, যাব্হ প্রভৃতি ইব্রাহীমী ('আ)-এর প্রথার ন্যায় আকীকাও একটি প্রাচীন প্রথা। মহানবী (স) আকীকাতে বালকের জন্য দুইটি এবং বালিকার জন্য একটি মেষ বা ছাগল কুরবানী করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

Doughty-র মতে (Travels in Arabia Deserta, ১খ., ৪৫২) আকীকা আরব মরুভূমিতে সর্বাধিক অনুষ্ঠিত উৎসবসমূহের অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, সাহীহ; (২) মিশকাত, পৃ.৩৬৩ ও অন্যান্য হাদীছ সংগ্রহ; (৩) বাজুরী, কায়রো ১৩০৭, ২খ., ৩১১ প. ও অন্যান্য ফিক্হ গ্রন্থ; (৪) দিমাশকী, রাহমাতুল উম্মা ফী ইখতিলাফিল-আইম্মা, বূলাক ১৩০০ হি., পৃ. ৬১; (৫) J. Wellhausen, Reste Arabisehen Heidentums, 2nd. ed., p. 174; (৬) ঐ লেখক, Die Ehe bei den Arabern, N.G.W., Gott. 1893, p. 459; (৭) W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 152 প.; (৮) Th. Noldeke, in ZDMG, xi, 184; (৯) Freytag, Einleitung in das Studium der Arab. Sprache, p. 212. এই প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে দেখুন ঃ (১০) G. A. Wilken, Uber das Haaropfer etc., p. 92 (Revue coloniale internationale, 1887, i. 381)। ইন্দোনেশিয়ায় 'আকীকা সম্পর্কে দেখুন ঃ (১১) C. Snouck Hurgronje. De Atjehers, i, 423 (=The Achehnese, i. 384); (১২) Van Hasselt, Midden-Sumatra, p. 269 প.; (১৩) Matthes, Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celebes, p. 67.

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ)

সংযোজন

'আকীকা (عقيقة) ঃ 'আকীকার মূল অর্থ 'সদ্য প্রসূত শিশুর মাথার চুল'। শিশুর জন্ম উপলক্ষে যবেহকৃত বকরীকেও আকীকা বলা হয় এই কারণে যে, বকরী যবেহ করার সময় নবজাতকের মাথার চুল মুণ্ডানো হয়। আরবগণ কখনও একটি বস্তুকে সম্পর্কযুক্ত অপর বস্তুর নামে নামকরণ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যবেহকৃত বকরীকে এইজন্য আকীকা বলা হয় যে, সেই দিন নবজাতকের 'আকীকা (চুল মুণ্ডন) করা হয়। আল্লামা যামাখশারীরও এই অভিমত (তুহ্ফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ, পৃ. ৫২)। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, 'আকীকা শব্দটি 'আক্ক (ফাঁড়িয়া ফেলা, কাটিয়া ফেলা) হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইব্ন আবদিল বার এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই মতের সপক্ষে খাত্তাবী বলেন, শিশুর জন্ম উপলক্ষে যবেহকৃত বকরীকে উহার গলা কাটিয়া ফেলার কারণে 'আকীকা বলা হয়। ইবনুল ফারিস বলেন, নবজাতকের মাথার মুণ্ডনকৃত চুল এবং এই উপলক্ষে যবেহকৃত বকরী উভয়কেই 'আকীকা বলা হয় (তাজুল 'আরূস, ৭খ., পৃ. ১৬; আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২০৩)। আকীকা শব্দটি কখনও নদী, নান্তার থলিয়া, তরবারি, লিঙ্গাগ্রের কর্তনকৃত চামড়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয় (তাজুল 'আরূস, ৭খ, পৃ. ১৬; মিসবাহুল লুগাত, পৃ. ৫৬৫)। শারহুল ইকনা গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, শরী'আতের পরিভাষায় 'নবজাতকের কেশ মুণ্ডনের দিন যবেহকৃত প্রাণীকে আকীকা বলা হয়'। ইহা কোন বস্তুকে তাহার উদ্দেশ্য বা কারণের নামে নামকরণ করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা চুল কর্তনের কারণেই পশু যবেহ করা হয়। আবূ উবায়দ বলেন, কালক্রমে ইহা যবেহকৃত প্রাণীর অর্থে এতখানি প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, এখন আকীকা বলিলে কেহ আর নবজাতকের চুল মনে করে না (আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২০৪)।

عن سلمان بن عامر الضبى قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (صحيح البخارى رقم الحديث-٥٤٧٢)

হযরত সালমান ইব্ন আমের আদ-দাব্বী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "নবজাতকের সঙ্গে আকীকা জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা তাহার পক্ষ হইতে যবেহ কর এবং তাহার (শরীর) হইতে অশুচি দূর কর" (বুখারী, কিতাবুল আকীকা, বাব ইমাতাতিল আযা আনিস-সাবিয়্যি ফিল আকীকা, নং ৫৪৭১)।

عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (السنن لابى داؤد، رقم الحديث ٢٨٣٥)

হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "প্রত্যেক নবজাতক স্বীয় 'আকীকার সহিত বন্ধক থাকে। সপ্তম দিবসে তাহার পক্ষ হইতে পশু যবেহ করা এবং তাহার নাম রাখা ও মাথা মুণ্ডন করা বিধেয়" (আবূ দাঊদ, কিতাবুদ দাহায়া, বাব ফিল আকীকা, নং ২৮৩৪; তিরমিযী, আবওয়াবুল আদাহী, বাব মিনাল আকীকা, নং ১৫২২; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ., পৃ. ৭-৮, নং ২০৩৪৩)।

عن يوسف بن ماهك قال دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة(مسند الامام احمد بن حنبل ٣١/٦ رقم ٢٣٠٨).

হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ছেলের পক্ষ হইতে দুইটি সমবয়সী বকরী ও মেয়ের পক্ষ হইতে একটি বকরী আকীকা করা উচিত" (মুসনাদ আহমাদ, নং ২৪৫২৯; তিরমিযী, আদাহী, বাব আকীকা, নং ১৫১৩)।

عن أم كرز انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا (تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى ٤٨/٥ رقم ١٥٥)

হযরত উম্মু কুরয আল-কাবিয়্যা (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ "পুত্র সন্তানের পক্ষ হইতে দুইটি ও কন্যা সন্তানের পক্ষ হইতে একটি বকরী আকীকা করা উচিত। পশু নর বা মাদী হওয়াতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই" (আহমাদ, নং ২৬৫৯৮, ২৭৯১৭; তিরমিযী, আদাহী, বাব মিনাল আকীকা, নং ১৫৫০)।

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود تحق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة (السنن الكبرى للبيهقى ٣٠٢/٩)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম (স) বলেন, "ইয়াহূদীগণ শুধু পুত্র সন্তানের পক্ষ হইতে আকীকা করিয়া থাকে, কন্যার পক্ষ হইতে করে না। সুতরাং তোমরা (তাহাদের বিপরীতে) পুত্রের পক্ষ হইতে দুইটি ও কন্যার পক্ষ হইতে একটি বকরী আকীকা কর" (বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৯খ, পৃ. ৩০২)।

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كبشا كبشا (عون المعبود شرح سنن ابى داؤد ٣٠/٨ رقم ٢٨٣٨) عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين (سنن النسائى تحقيق : عبد الفتاح ابو غده ١٦٥/٧ رقم ٤٢١٩)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর জন্মের পর তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে একটি করিয়া মেষ আকীকা করিয়াছেন" (আবূ দাঊদ, ২৮৩৮)। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে যে, প্রত্যেকের পক্ষ হইতে দুইটি করিয়া মেষ আকীকা করিয়াছেন (নাসাঈ, ৪২১৯)।

হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পিতা ও তাহার দাদা হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে তাহার নাম রাখিতে, কষ্টদায়ক বস্তু (চুল) পরিষ্কার করিতে ও আকীকা করিতে (তিরমিযী, নং ২৯৮৯)।

হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের কাহারও সন্তান জন্মিলে বকরী যবেহ করিয়া সন্তানের মাথায় উহার রক্ত লেপন করা হইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে দীন ইসলাম দান করিলে আমরা বকরী যবেহ করি, সন্তানের মাথা মুণ্ডন করি ও তাহাতে জাফরান লেপন করি (আবূ দাউদ, নং ২৮৪০)।

ইমাম মালিক (র) স্বীয় মুওয়াত্তা গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর জন্মের পর তাহাদের চুল মুণ্ডন করিয়া চুলের ওজনের সমপরিমাণ রৌপ্য সদাকা করিয়াছিলেন (আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২১৪)।

"প্রত্যেক নবজাতক স্বীয় আকীকার সহিত বন্ধক থাকে"-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তান পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করিবে। কিন্তু যে পিতা-মাতা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আকীকা করিবে না এমতাবস্থায় সন্তান বাল্যকালে মারা গেলে মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করিবে না। যেইভাবে বন্ধকী জিনিস ঋণ পরিশোধের পূর্বে কোন উপকারে আসে না তদ্রূপ সন্তানও আকীকার পূর্বে মারা গেলে কোন উপকারে আসিবে না। কেহ কেহ বলেন, আকীকা করার পূর্ব পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ শিশু নিরাপত্তাহীন থাকে অর্থাৎ বালা-মুসীবত ও হেফাযত লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৫৬-৬১)।

শরীআতের বিধানমতে আকীকা করা ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব নাকি মুবাহ এই সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে। চার মাযহাবের ইমামগণ ব্যতীত কেহ কেহ ইহাকে ওয়াজিব মনে করেন। যেমন ইমাম লায়ছ, দাউদ যাহিরী, আবুয যিনাদ ও ইব্‌ন হাযম। কেহ কেহ উহাকে সুন্নাতে মুআক্কাদা মনে করেন। তবে চার মাযহাবের সকল ইমাম এই বিষয়ে একমত যে, আকীকা করা মুস্তাহাব। যদিও চার মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিলে দেখা যায়, কেহ শুধু সুন্নাত বলেন, আবার কেহ মুস্তাহাব বলেন। তবে সকলের মতে আকীকা করা উত্তম, না করিলে গুনাহ হইবে না।

আকীকা সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে কেহ লিখিয়াছেন যে, তিনি ইহাকে শুধু মুবাহ মনে করিতেন। আল্লামা 'আয়নী (র) বলেন, ইমাম আজম (র) এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা সুন্নাত নহে। তাঁহার এই কথার অর্থ হইল সুন্নাতে মুআক্কাদা নহে, বরং সুন্নাতে যাইদা বা মুস্তাহাব। ইহাই তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত (আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২০৪)।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন হইতে পরবর্তী উলামায়ে কিরামের এই বিষয়ে ঐকমত্য রহিয়াছে যে, আকীকা যেইভাবে পুত্র সন্তানের পক্ষ হইতে করা সুন্নাত তদ্রূপ কন্যা সন্তানের পক্ষ হইতেও করা সমপর্যায়ের সুন্নাত (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৬৫)। হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁহার পিতা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (স) বলেনঃ যদি কেহ স্বীয় সন্তানের পক্ষ হইতে আকীকা করিতে চাহে তাহা হইলে যেন পুত্রের পক্ষ হইতে দুইটি ও কন্যার পক্ষ হইতে একটি বকরী যবেহ করে (আবূ দাউদ, নং ২৮৩৯)। শরীআতে যে সমস্ত বিষয়ে পুত্রকে কন্যার তুলনায় দ্বিগুণ প্রদান করা হইয়াছে তন্মধ্যে আকীকা একটি। যেমন ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হওয়া, সাক্ষ্য প্রদান করা ইত্যাদি (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৬৫-৭)।

আল-মায়মূনী বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে আকীকার উত্তম সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, সন্তান জন্মের ৭ম, ১৪তম অথবা ২১তম দিবস। উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইমামগণের মতে, সপ্তম তারিখের প্রতি খেয়াল রাখিয়া আকীকা করা মুস্তাহাব। তবে ২১ দিনের পর আকীকা করিলে সপ্তমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে মুস্তাহাবের খেলাফ হইবে না। যদি কেহ সপ্তম দিবসের প্রতি খেয়াল না রাখিয়া যে কোন দিন আকীকা করে তাহাতেও কোন অসুবিধা নাই (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৬২; আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, ৪খ., পৃ. ২৩৫)।

আকীকার পশু ও উহার বয়স সম্পর্কে সকল ইমাম একমত যে, আকীকার পশুর বয়স ও শরীরিক সুস্থতা ইত্যাদি শর্তাবলী কুরবানীর পশুর অনুরূপ। সুতরাং ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ ও উট, ইহার নর বা মাদী হইতে যে কোনটি দ্বারা আকীকা করা যায়। ছাগল-ভেড়া-দুম্বার বয়স পূর্ণ এক বৎসর, গরু-মহিষের দুই বৎসর ও উটের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতে হইবে। তব ইমাম মালিক (র) বলেন, আমার নিকট আকীকার জন্য সর্বোত্তম হইল বকরী, অতঃপর গরু, অতঃপর উট। তবে কুরবানীর জন্য সর্বোত্তম হইলে উট, অতঃপর গরু, অতঃপর বকরী (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৮১)।

ইমাম আহমাদ (র) ব্যতীত চার মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, যে সকল পশুতে শরীকানা কুরবানী করা জাইয, সেই সকল পশু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আকীকা করাও জাইয। যেমন একটি গরু, মহিষ বা উটে তিনটি ছেলের ৩×২=৬ অংশ ও একটি মেয়ের এক অংশ করিয়া আকীকা করা জাইয (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, ৪খ., পৃ. ২২৭)। ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, যে কোন প্রকার পশুতে একাধিক আকীকা বৈধ হইবে না (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৭৬)।

যেই ব্যক্তির কুরবানীর অংশ কোন গরু, মহিষ কিংবা উটে থাকিবে তাহার কোন আকীকার অংশ উহাতে রাখা যাইবে না। যদি রাখে তাহা হইলে তাহার সব অংশ মিলিয়া শুধু কুরবানীই হইবে, আকীকা হইবে না, তবে কুরবানীর পশুতে তাহার শুধু 'আকীকার অংশ থাকিতে পারে (রদ্দুল মুহতার, ৬খ., পৃ. ৩৩৬; আহসানুল ফাতাওয়া, ৭খ., পৃ. ৫৩৫)।

ইমাম মালিক (র) ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণের মতে 'আকীকার পশুর হাড়সমূহ ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা না করিয়া জোড়ায় জোড়ায় কাটা উত্তম। ইমাম আবূ দাউদের কিতাবুল মারাসীল-এ জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদের পিতার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফাতিমা (রা) কর্তৃক হযরত হাসান ও হুসায়নের 'আকীকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, ধাত্রীর নিকট বকরীর একটি পাও পাঠাইয়া দাও, উহার গোশত নিজেরা

খাও, অন্যদেরকে খাওয়াও, তবে উহার হাড় ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিও না (সুনানুল বায়হাকী, ৯খ., ৩০২; তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৭৩)। হযরত আবূ কুরয ও উম্মু কুরয উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আবী বাক্র (রা)-এর পরিবারস্থ এক মহিলা বলেন, 'আবদুর রহমানের স্ত্রী সন্তান প্রসব করিলে আমরা তাহার 'আকীকায় একটি উট যবেহ করিলাম। ইহাতে হযরত আইশা (র) বলিলেন, ইহা উত্তম হয় নাই; উত্তম হইল ঃ দুইটি সমপর্যায়ের বকরী পুত্র সন্তানের পক্ষ হইতে ও একটি বকরী কন্যার পক্ষ হইতে 'আকীকা করা, 'আকীকার পশুর হাড় না ভাঙ্গা, উহার গোশ্ত নিজেরা ভক্ষণ করা, অপরকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ানো ও সদাকা করা এই সবকিছু সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে করা। তাহা সম্ভব না হইলে ১৪শ দিবেস, তাহাও সম্ভব না হইলে ২১তম দিবসে করা (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৭৩-৪)।

ইব্ন সীরীন এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আকীকার গোশ্তের ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। তবে সব গোশ্ত নিজে না খাইয়া অন্যকেও খাওয়ানো উত্তম। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আকীকার গোশ্ত যেমন খুশী ভাগ করিতে পার। কুরবানীর গোশ্তের মত তিন ভাগে বণ্টন করা যায়। তবে ধাত্রীর নিকট কিছু গোশ্ত পাঠানো সুন্নাত। তিনি আরও বলেন, 'আকীকার গোশ্ত কাচা না পাঠাইয়া রান্না করিয়া পাঠানো উচিৎ। আকীকার গোশ্ত দ্বারা ওয়ালীমার মত দাওয়াত খাওয়ানো কেহ জাইয মনে করেন এবং কেহ মাকরূহ মনে করেন। আকীকার চামড়ার হুকুম কুরবানীর পশুর চামড়ার অনুরূপ। ইচ্ছা করিলে নিজে ব্যবহার করা যাইবে অথবা কাহাকেও হাদিয়া দেওয়া যাইবে। তবে কুরবানী বা আকীকার গোশ্ত বা চামড়া বিক্রয় করিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সদাকা করা ওয়াজিব (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৭২, ৭৮, ৮০, ৮২; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩খ., পৃ. ৬১৯)।

ইমাম আহমাদ (র) বলিয়াছেন, যদি অসচ্ছলতা বা অন্য কোন কারণে কেহ নিজ সন্তানের 'আকীকা না করিয়া থাকে এমতাবস্থায় সন্তান বড় হইয়া নিজের পক্ষ হইতে আকীকা করিলে উহা মাকরূহ হইবে না, বরং উত্তমই হইবে (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৮১)।

নবজাতকের মাথা মুণ্ডন করিয়া তাহাতে আকীকার পশুর রক্ত লেপন করা একটি জাহিলী প্রথা, তবে জাফরান মাখা উত্তম (আওজায, ৯খ., ২২২-৪)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইয়াতীমের সম্পদ দ্বারা তাহার আকীকা করা জাইয নয়। অবশ্য ইমাম মালিক (র) উহার অনুমতি প্রদান করেন। সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আকীকা করা মুস্তাহাব, কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর মতে মুস্তাহাব নহে (ই'লাউস সুনান, ১৭খ., পৃ. ১২৬)। নবজাতকের মাথা মুণ্ডন ও আকীকার পশু যবেহ করার মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে করিতে হইবে এই বিষয়ে ধারাবাহিকতা নাই (প্রাগুক্ত, ১৭খ, পৃ. ১২৬)। একটি নারীর গর্ভ হইতে একসাথে একাধিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন 'আকীকা করা মুস্তাহাব (ফাতহুল বারী, ৯খ., পৃ. ৫০৬)। যাহার উপর সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাহার উপরই আকীকা আদায়ের দায়িত্ব। তাহার অনুমতিতে অন্য কেহ আকীকা করিলেও যথার্থ হইবে (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, ৪খ., পৃ. ২২৫)।

ইমাম মালিক (র) স্বীয় মুয়াত্তায় জাফর ইব্ন মুহাম্মাদের পিতার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হাসান, হুসায়ন, যয়নব ও উম্মু কুলছুমের মাথা মুণ্ডন করিয়া তাহাদের চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদাকা করিয়াছেন (আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২১২-৪)। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য দান করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)। অতএব নবজাতকের চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদাকা করা মুস্তাহাব (তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৮৯-৯১)। হানাফী আলিমগণের মতে রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণও সদাকা করা যায় (আওজাযুল মাসালিক, ৯খ., পৃ. ২১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, আস্-সাহীহ, কায়রো ১৯৭৮ খৃ., ৯খ., পৃ. ৫৯১, হাদীছ নম্বর ৫৪৬৭-৫৪৭০; (২) আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, মাকতাবা মাজ্জানিয়া, পেশাওয়ার, তা. বি., ৫খ., পৃ. ৮৬-৮৯, হাদীছ নম্বর ১৫৪৯-৫২; (৩) শামসুল হক আযীমআবাদী, আওনুল মা'বূদ, দারুল কুতুব আল-ইলামিয়্যা, বৈরূত, তা.বি., ৮খ., পৃ. ২৫-৩০, হাদীছ নং ২৮৩১-৪০; (৪) ইব্ন আবদিল বারর, আত্-তামহীদ, তাহকীক ঃ মুহাম্মাদ আত্-তারিব, সাঈদ আহমাদ এন্ড কোং, ১৯৭৪ খৃ., প্রকাশকের নামবিহীন, ৪খ., পৃ. ৩০৪-২১; (৫) ঐ লেখক, আল-ইস্তী'আব, তাহকীক ঃ ড. আবদুল মুতী-আমীন কালআজী, দারু কুতায়বা, বৈরূত, তা. বি., ১৫ খ., পৃ. ৩৬৫ -৮৫; (৫) ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ., ৪খ., হাদীছ নং ১৫৭৯৩, ১৫৭৯৬; (৭) ইব্ন হিব্বান, আস্-সাহীহ বিতারতীব ইব্ন বালবান, তাহকীক ঃ শুআয়ব আল-আরনাউত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ., ১২খ., পৃ. ১২৪-৩৩; (৮) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফিঈ, আস-সুনানুল মাছূর, মাকতাবা আল-মা'আরিফ, রিয়াদ ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৪১০; (৯) ইমাম তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর, তাহকীক ঃ হামদী আবদুল মাজীদ আস-সালাফী, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি., ১১খ., পৃ. ২৪৭, হাদীছ নং ১১৮৩৮; (১০) শায়খুল ইসলাম আবূ ইয়ালা আল-মাওসিলী, মুসনাদ, তাহকীক ঃ ইরশাদুল হক আল-আতরী, মুআস্সাসা উলূমিল কুরআন, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ., ৪খ., পৃ. ৩০১-৪৪, হাদীছ নং ৪৫০৪, ৪৬২৯; (১১) আল-হায়ছামী, কাশফুল আসতার আন যাওয়াইদিল বাযযার আলাল-কুতুবিস্-সিত্তা, তাহকীক ঃ হাবীবুর রহমান আ'জামী, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২খ., পৃ. ৭২-৫, হাদীছ নং ১২৩৩-৯; (১২) ঐ লেখক, মাজমাউল্ বাহরায়ন ফী ফাওয়াইদিল মু'জামায়ন, তাহকীক ঃ আবদুল কুদ্দূস ইব্ন মুহাম্মাদ নাযীর, মাকতাবাতুর রাশীদ, রিয়াদ ১৯৯৫ খৃ., ৩খ., পৃ. ৩৩৬, হাদীছ নং ১৯১৭-৮; (১৩) মাওলানা জাফার আহমাদ উছমানী, ই'লাউস্ সুনান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূম আল-ইসলামিয়্যা, করাচী ১৪১৫ হি., ১৭খ., পৃ. ১০১-২৬; (১৪) আবূ জাফর আহমাদ তাহাবী, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, তাহকীক ঃ ড. আবদুল্লাহ নযীর আহমাদ, দারুল বাসাইর আল-ইসলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ., ৩খ., পৃ. ২৩২-৪; (১৫) মাওলানা যাকারিয়া কান্দলবী, আওজাযুল মাসালিক, ইদারায়ে তালীফাতে আশরাফিয়া, মুলতান তা.বি.,

৯খ., পৃ. ২০৪-২৩; (১৬) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, তাহকীক ঃ শুআয়ব আল-আরনাউত ও আবদুল কাদীর আল-আরনাউত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৯৮ খৃ., ২খ., পৃ. ২৯৬-৩০৪; (১৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস্-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ., ৯খ., পৃ. ৯৩-৪; (১৮) ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছা, রিয়াদ, তা. বি., ৮খ., পৃ. ৬৪৩; (১৯) ইব্ন রুশদ আল-কুরতুবী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, তাহকীক ঃ মাজিদ আল-হামাবী, দারু ইব্ন হাযম, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ., ২খ., পৃ. ৮৯৩-৮; (২০) ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, দারুল ফিক্র, বৈরুত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৬৩৬-৪০; (২১) আল-খাতীব আশ-শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৯৯৮ খৃ., ৪খ., পৃ. ৩৬৮-৭৪; (২২) আল-কাসানী আল-হানাফী, বাদাইউস সানাই, আল-মাকতাবুল হাবীবিয়্যা, কোয়েটা ১৯৮৯ খৃ., ৫খ., পৃ. ৭২; (২৩) ইব্ন আবিদীন আশ-শামী, হাশিয়া রাদ্দুল মুহ্তার, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ৬খ., পৃ. ৩৩৬; (২৪) ফাতাওয়া কাদীখান আলা হামিশিল আলামগীরিয়্যা, মাকতাবা রাশীদিয়্যা, কোয়েটা ১৯৮২ খৃ., ৩খ., পৃ. ৩৫০; (২৫) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, ইমদাদুল ফাতাওয়া, তারতীবে জাদীদ, মুফতী শফী, মাকতাবা দারুল উলূম, করাচী ১৪১৩ হি., ৩খ., পৃ. ৬১৮-২২; (২৬) মুফতী রাশীদ আহমাদ, আহসানুল ফাতাওয়া, এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, আদাব মঞ্জিল, করাচী ১৪১৯ হি., ৭খ, ৫৩৫-৭; (২৭) মুফতী আবদুর রাহীম লাজপুরী, ফাতাওয়া রাহীমিয়্যা, দারুল ইশাআত, করাচী ১৯৯৯ খৃ., ২খ., পৃ. ৯০-৪; (২৮) মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানবী, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, কুতুবখানা নাঈমিয়্যা, দেওবন্দ তা. বি., ৪খ., পৃ. ২২৪-৩৯; (২৯) আস-সাহিব ইসমাঈল ইব্ন আব্বাদ, আল-মুহীত ফিল-লুগাত, তাহকীক ঃ আশ-শায়খ মুহাম্মাদ হাসান আল-ইয়াসীন, আলামুল কুতুব, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ., ১খ., পৃ. ৬৮; (৩০) ইব্ন মানযূর, লিসানুল আরাব, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ৯খ., পৃ. ৩২২-৫; (৩১) মুহাম্মাদ মুরাতাদা আয-যুবায়দী, তাজুল আরূস, মানশূরাতু দার মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরূত তা. বি., ৭খ., পৃ. ১৫-১৮; (৩২) ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, আস্-সিহাহ, তাহকীক ঃ আহমাদ আব্দুল গাফূর আত্তার , কায়রো ১৯৮২ খৃ., ৪খ., পৃ. ১৫২৫; (৩৩) মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকূব আল-ফীরূযআবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৯১ খৃ., ৩খ., ৩৮৫; (৩৪) আল-মুনজিদ ফিল-লুগাত ওয়াল-আলাম, পৃ. ৫১৭; (৩৫) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, তুহফাতুল মাওদূদ বিআহ্কামিল মাওলূদ, তাহকীক ঃ বাস্সাম আবদুল ওয়াহ্হাব আল-জাবী, দারুল বাসাইর আল-ইসলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৮৯ খৃ., পৃ. ৪৩-৮৮; (৩৬) মাওলানা রিফআত সাহেব কাসিমী, মাসাইলে কুরবানী ওয়া 'ঈদায়ন, মাকতাবা রাদী, দেওবন্দ ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ২১৭-২৩৭; (৩৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, বাংলা অনু., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৪ খৃ., ৯খ., পৃ. ১১৫-১৮, হাদীছ নং ৪৯৫৮-৬৬; (৩৮) আবদুল্লাহ নাসির আলওয়ান, তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, উর্দূ অনু. ডাঃ হাবীবুল্লাহ মুখতার, দারুত তাসনীফ, জামিয়া উলূমে ইসলামিয়্যা, করাচী ১৯৮৮ খৃ., ১খ., পৃ. ১০৪-১৪ ।

নূর মুহাম্মদ

'আক'ীদা (عقيدة) ঃ আরবী, একবচন। বহুবচন 'আক'াইদ (عقائد), মূল ধাতু 'আক্'দ (عقد), বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস। ধাতুগত অর্থ হইল দুইটি বস্তুর মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করা, ধারণ করা, বাঁধা, দৃঢ় করা, সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন আবরীতে বলা হয়, عقدت طرفى الحبل 'আমি দুইটি রশিকে পরস্পর বাঁধিয়াছি' এমন অবস্থায় যে, একটি রশি অপরটিকে পরস্পর শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। এইজন্য বিবাহ এবং লেনদেনের সময় প্রণীত চুক্তিকে 'আক্দ্ (عقد) বলা হয়। যেহেতু কোন বিশ্বাসকে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা হয় সেইহেতু ইহাকে 'আকীদা (عقيدة) বলা হয় অর্থাৎ বিশ্বাস যাহা অন্তরে বাঁধা অবস্থায় আছে (তু. আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৬১৪)।

'আকীদা' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হইল ঃ বিশ্বাসকে মনে এমনভাবে ধারণ করা, যাহাতে ইহার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আল্লামা সায়্যিদ সাবিক বলেন ঃ

العقيدة من التصديقات بالشئ والجزم به دون شك أو ريب.

"আকীদা হইল কোন একটি বিষয়বস্তু এতটা শক্ত ও দৃঢ়ভাবে মনেপ্রাণে মানিয়া লওয়া যাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই" (আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৮)।

আল্লামা সাম্বলী বলেন,

ان العقيدة ما يعتقده الانسان بقلبه يركن اليه ويرتبط به من فؤاده وينقطع عليه الطلب.

"মানুষ যাহাকে অন্তর দিয়া পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও প্রশান্তি সহকারে গ্রহণ করে এবং যাহার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় বা অন্বেষা থাকে না, তাহাই 'আকীদা" (আল-আকাইদুন নাসাফী, হাশিয়া, পৃ. ২০)।

সুরতাং সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আকীদা-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃত 'আকীদা উহাই যাহাতে ইয়াকীন প্রবল। অন্য কথায় 'আকীদার জন্য ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) অপরিহার্য। এইজন্য কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

"সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই" (৫৩ ঃ ২৮)।

যেইখানে সন্দেহ শেষ, সেইখানে 'আকীদা শুরু। সুতরাং 'আকীদা এমন বিশ্বাস যাহা সন্দেহ-সংশয়ের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। মুহাম্মাদ 'আবদুল্ আযীয ফারহাবী বলেন, عقيدة অর্থ متعقدة (বিশ্বাস্য বিষয়)। তাহার মতে আকীদা হইল ঃ

القضية التى يعتن بعقد القلب عليها ويعلم ان انكارها اثم.

"আকীদা বলিতে এমন বিষয় মনে আঁকড়াইয়া ধরে এবং ইহাও জানে যে, ইহা অস্বীকার করা অপরাধ" (আল্লামা ফারহাবী নিবরাস শারাহ শারহিল

আকাইদিন নাসাফী, পৃ. ২৫)। এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মীয় আকীদায় একটি পবিত্রতা ও বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর মতে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম ও চলাফেরা তাহার চিন্তা ও কল্পনার ফল। আর যে কল্পনা পরিপক্ক, অনড় ও সন্দেহমুক্ত তাহাই আকীদা (সীরাতুন নবী, ৩খ, পৃ. ২০৯৯)।

মোটকথা আকীদা এমন এক ধারণা যাহাতে কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। আকীদার সম্পর্ক অদৃশ্য বিষয়ের সাথে। যাহা দৃশ্যমান তাহাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। ইসলামী পরিভাষায় আকীদার অপর নাম ঈমান। ঈমান আনিয়াছে অর্থ বিশ্বাস করিয়াছে, এই বিশ্বাসে কোন সন্দেহ নাই।

আকীদার পারিভাষিক ব্যাপকতা ঃ পারিভাষিক অর্থে আকীদা শব্দটির ধারণা ব্যাপক। কেননা এই দুনিয়ায় প্রতিটি ধর্মে কোন না কোনভাবে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বিদ্যমান। দুনিয়ায় যেই সমস্ত ধর্ম প্রচলিত আছে সেইগুলির বিভিন্ন রকম আকীদা-বিশ্বাস রহিয়াছে।

আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, আকীদা হইল ইসলামের ভিত্তি ও মূল। আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের জন্য জীবনবিধান। তাই তাঁহার জীবনবিধান মানিতে হইলে সর্বাগ্রে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, আকীদা হইল 'আমল কবুল হইবার পূর্বশর্ত। কেননা যদি আকীদা বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ্র নিকট বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে"।

তৃতীয়ত, আখিরাতে নাজাত লাভের জন্য 'আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আমরা তাহাই বুঝিতে পারি।

চতুর্থত, যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'আকীদা। প্রত্যেক নবী প্রথমে আকীদার দাওয়াত দিতেন। মহানবী (স) এইজন্যই মক্কায় সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। মুসলমান মাত্রই ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হইতে হইবে। যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁহার বিধিনিষেধ মানিয়া চলে সে মুসলমান এবং যে ইহার ব্যতিক্রম করে সে ইসলামের দৃষ্টিতে কাফির বা অবিশ্বাসী। আর মুখে যে ব্যক্তি ইসলামের কথা ঘোষণা করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না এই রকম লোক হইল মুনাফিক। মুনাফিক কাফির অপেক্ষা মারাত্মক ও নিকৃষ্টতর। এইজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে" (৪ ঃ ১৪৫)।

মানব জীবনে আকীদার প্রভাব ঃ আকীদা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আকীদা ছাড়া মানব জীবন কল্পনা করা যায় না। মানুষ আমৃত্যু কোন না কোনভাবে কোন নির্দিষ্ট আকীদা বা বিশ্বাস লালন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আকীদা ব্যতীত ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ইসলামের আলোকে আল্লাহ, তাঁহার রাসূলে ও আখিরাতে বিশ্বাস মানব জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা মানুষের জীবনে অন্তরের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার স্বচ্ছতা বিধান করে। সে সব সময় মনে করে যে, এই দুনিয়াই তাহার জীবনের শেষ নহে। সামনে স্থায়ী জীবন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ফলে জীবন চলার পথে সে আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। আকীদা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং জীবনযুদ্ধে তাহাকে আশাবাদী করিয়া তোলে। ইহা চারিত্রিক দৃঢ়তা, সৎসাহস, ধৈর্য ইত্যাদি মৌলিক গুণাবলী সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইহা ছাড়া, ইহা সৎকাজে ব্রতী হইতে মানুষকে উৎসাহিত করে। কেননা মানুষের নিকট সে কোন প্রতিদান আশা করে না। তাই কোন কল্যাণকর কাজে সে পিছপা হয় না। ইসলামী আকীদা মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে আপোষহীন করিয়া তোলে। ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে মানবজাতির ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ইসলামী আকীদার উৎস ঃ ইসলামী আকীদার একমাত্র উৎস হইল আল-কুরআনুল করীম ও সহীহ হাদীছসমূহ। পরবর্তী যুগে আকীদা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি পদ্যে, যেমন মানকূমাতুল জাওহারা এবং মান্‌জূমাতুল খারিদা ইত্যাদি। আবার কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ "আল-ফিক্‌হুল আক্‌বার"। ইমাম তাহাবী ও আল্লামা নাসাফীর আকীদা বিষয়ক রচনা এবং কতকগুলি বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকামূলক গ্রন্থ, আবার কতকগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ, যেমন মাক'াসিদ ও উহার শরাহ (ব্যাখ্যা) এবং মাওয়াকিফ ও উহার শরাহ। মোটকথা এই সমস্ত গ্রন্থ ইসলামী আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সহায়ক উপকরণ মাত্র। মূলত এইগুলি যুগে যুগে ইসলামী আকীদা সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন এবং বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত সন্দেহ, আপত্তি ও যুক্তির খণ্ডনমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

উল্লেখ্য যে, মৌলিক আকীদার বিষয়গুলি যেহেতু অদৃশ্য বিষয় সেইহেতু সেগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যম হইল ওহী। এই সমস্ত বিষয় মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা ঠিক নহে। সুতরাং পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা আকল আকীদা প্রতিষ্ঠার পথে সহায়ক মাত্র। তাই উল্লেখিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বলা যায়, তাহারা কুরআন-সুন্নাহ ও মানব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছেন ততটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতামত তাঁহাদের নিজস্ব। এইগুলি যে ইসলামী আকীদার অকাট্য মতামত তাহা বলা নিরাপদ নয়। কোন গ্রন্থে কুরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হইলে তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আকীদার মূলনীতিসমূহ ঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদার মূল বিষয় ছয়টি।

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ২. ফেরেশতাগণে ঈমান, ৩. আসমানী কিতাবসমূহে ঈমান, ৪. নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান, ৫. আখিরাতে ঈমান, ৬. তাকদীরের ভাল-মন্দে ঈমান।

হাদীছ শরীফেও উপরিউক্ত ছয়টি বিষয় সম্পর্কে এককভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন হাদীছে জিবরাঈলে। সেই হাদীছে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ঃ مَا الاِيْمَانُ ঈমান কি? রাসূলুল্লাহ (স) তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"তুমি ঈমান আনিবে আল্লাহতে, ফেরেশতাগণে, কিতাবসমূহে, রাসূলগণে, পরকালে এবং ঈমান আনিবে তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ানিল ঈমান ওয়াল-ইহসান, ১১খ., পৃ. ৩৭)।

উপরিউক্ত ছয়টি বিষয় সম্পর্কে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হইল। বিজ্ঞানের সাফল্যে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার যুক্তিসংগত নয়, বরং এই সাফল্য তাঁহারই দান। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

"তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে" (১৭ ঃ ৮৫)।

আল্লাহ্র একত্ববাদ বা তাওহীদের ধারণা ঃ আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট নহে, আল্লাহ্র একত্বের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, যাহাকে বলা হয় তাওহীদ বা একত্ববাদ। তাওহীদ মূলত তিন প্রকার ঃ

১. তাওহীদ ফির-রাবূবিয়্যাহ (توحيد فى الربوبية); ২. তাওহীদ ফিল-আস্‌মা' ওয়াস্-সিফাত (توحيد فى الاسماء والصفات); ৩. তাওহীদ ফিল্-উলূহিয়্যাহ (توحيد فى الالوهية)।

(১) তাহওীদ ফির-রাবূবিয়্যা ঃ স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে তিনি একক অর্থাৎ সকল কিছুর প্রতিপালক আল্লাহ। যেমন সূরা ফাতিহায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র"।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا.

"তিনি (আল্লাহ) আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁহার গুণসম্পন্ন কাহাকেও জান" (১৯ ঃ ৬৫)?

তাওহীদ ফির-রাবূবিয়্যার ব্যাখ্যায় তায়সীর গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, তাওহীদুর রাবূবিয়্যা হইল এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুর মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদানকারী। উপকার বা অপকার সকল কিছুই তাঁহার ইচ্ছাধীন। সমস্ত হুকুমের মালিক তিনি এবং তাঁহার হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার কোন অংশীদার নাই (তায়সীরুল আযীযিল হামীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ৩৩)।

আল্লাহ্র গুণাবলী

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র এমন গুণাবলী রহিয়াছে, যাহা তাঁহার প্রভুত্বের পূর্ণতা জ্ঞাপন করে এবং তাঁহাকে ইবাদতের হকদার সাব্যস্ত করে। এই গুণাবলীতে তিনি অদ্বিতীয় ও অনন্য। ইহাতে তাঁহার কোন শরীক নাই। তদ্রূপ ইবাদতেও তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আল্লাহ পাকের গুণাবলীকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (আল-আক'ইদুল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৫৩)।

১. নেতিবাচক গুণাবলী (الصفات السلبية)

২. ইতিবাচক গুণাবলী (الصفات الثبوتية)

নেতিবাচক গুণাবলী বলিতে ঐ সকল গুণকে বুঝায় যেইগুলি আল্লাহ্র সত্তার পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। এইগুলি নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা অনাদী ও অনন্ত গুণে গুণান্বিত নহে। আল্লাহ এমন সত্তা যিনি অনন্ত কাল হইতে আছেন, যাঁহার পূর্বে কেহই ছিল না এবং অনন্ত কাল থকিবেন, যে থাকার কোন শেষ নাই। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত" (৫৭ ঃ ৩)।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ

"আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল" (২৮ ঃ ৮৮)।

'ইমাম বুখারী ও বায়হাকী ইমরান ইব্ন হু'সায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর নিকট ছিলাম, ইতোমধ্যে বানূ তামীম গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহার পর ইয়ামান হইতে কিছু লোক তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকেও ইসলামের দাওয়াত দেন। তাহারা তাহা গ্রহণ করে এবং বলে, আমরা দীনের জ্ঞান লাভের জন্য আসিয়াছি। সৃষ্টির প্রথম সম্পর্কে জানিতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আদিতে আল্লাহ্ই ছিলেন এবং তাঁহার পূর্বে কোন কিছুই ছিল না। আল্লাহ্র 'আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর আল্লাহ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেন এবং লাওহে মাহফূজে সমস্ত কিছুর তাকদীর লেখা হয়।

২. আল্লাহ্র নেতিবাচক গুণাবলীর ২য় স্তর হইতেছে আল্লাহ কাহারও মত নহেন এবং তাঁহার মতও কেহ নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা" (৪২ ঃ ১১)।

৩. আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার গুণাবলীর সমতুল্য কাহারও কোন গুণ নাই। কার্যে একক হওয়া অর্থ তিনি তাঁহার সমস্ত কার্য সম্পাদনে কাহারও কোন সাহায্য-সহযোগিতা নেন না, বরং সমস্ত কাজ তাঁহার একার ইচ্ছায়ই সংঘটিত এবং তিনি তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই" (১১২ ঃ ১-৪)।

ইতিবাচক গুণাবলী ঃ এই সিফাতগুলি আল্লাহ্র রাবূবিয়্যাত-এর জন্য আবশ্যক।

১। কুদরাত (قدرة) ঃ আল্লাহ অসীম ক্ষমতাবান। কেহ কখনও তাঁহাকে অপারগ করিতে পারে না। এই বিশ্বসৃষ্টিই তাঁহার অসীম কুদরাত ও শক্তির প্রমাণ। তিনি যে কোন সময় যে কোন জিনিসকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন। কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ.

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই" (৫০ ঃ ৩৮)।

وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ.

"তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না" (২৩ ঃ ৮০)?

২। ইরাদা (إرادة) ঃ তিনি স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। আল্লাহ যাহাকে যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। ইহাতে কাহারও কোন হাত নাই এবং তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও হিকমত দ্বারা যেমন খুশী পরিচালনা করেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আমি কোন কিছু ইচ্ছা করিলে সেই বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়" (১৬ ঃ ৪০)।

৩। ইলম (=) তিনি জ্ঞানের অধিকারী। তাঁহার জ্ঞান অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুকেই শামিল করে। কোন কিছুই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নহে। বিশ্বের সবকিছুতে যে সুশৃঙ্খল বিধান কার্যকর রহিয়াছে উহাই তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন" (৫৮ ঃ ৭)?

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত। তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই" (৬ ঃ ৫৯)।

৪। হায়াত (حياة)ঃ আল্লাহ চিরঞ্জীব। জীবন্ত না হইলে তাঁহার জন্য অন্যান্য গুণ, যেমন কুদরত, ইরাদা 'ইলম ইত্যাদি সম্ভব নহে। তাঁহার জীবন হইতেছে পূর্ণ জীবন, উহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যাহার তাৎপর্য সম্পর্কে জানা অসম্ভব। তাঁহার জীবন এমন যে জীবনের কোন শেষ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ.

"তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরিবেন না" (২৫ ঃ ৫৮)।

هُوَ الْحَيُّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

"তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা তাঁহাকেই ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া" (৪০ ঃ ৬৫)।

৫। কালাম (كَلاَم) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই তাঁহার জন্য এই গুণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا.

"মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন" (৪ ঃ১৬৪)।

তাঁহার কথার (জ্ঞানের) কোন সীমা-পরিসীমা নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا.

"বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— আমি ইহার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিলেও" (১৮ ঃ ১০৯)।

৬.৭। সামউন ও বাসারুন (سمع وبصر) ঃ আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন ও শোনেন, এমনকি অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপীলিকাকেও তিনি দেখিতে পান ও ইহার পায়ের শব্দও তিনি শুনিতে পান। উহা এমন যে, একজনের দিকে দেখা বা শোনা অন্যকে দেখা বা শোনায় কোন বিঘ্ন ঘটে না। কোন ভাষা বা শব্দ তাঁহার শোনায় অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু তিনি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কোন কর্ণ দ্বারা শোনেন না।

আল্লাহ্র নামসমূহ ঃ আল্লাহ্র নামসমূহ বান্দার নিকট তাঁহার পরিচয়ের বড় মাধ্যম এবং এইগুলি মানব অন্তরে এমন প্রশস্ত দিক উন্মোচন করিয়া দেয় যেইখানে আল্লাহর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। এই সকল নামের কথাই আল্লাহ তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেনঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

"বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহবান কর বা 'রাহমান' নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার" (১৭ ঃ ১১০)।

আর এই নামেই মহান আল্লাহ তাঁহাকে ডাকিতে আদেশ করিয়াছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

"আল্লাহ্‌র জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাহাকে সেই সকল নামেই ডাকিবে" (৭ ঃ ১৮০)।

এই সকল নামের সংখ্যা হইতেছে ৯৯টি। যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম আছে। যে ব্যক্তি এই নামগুলি মুখস্ত রাখিবে সে বেহেশতে যাইবে। আল্লাহ বেজোড় এবং বেজোড়কে পছন্দ করেন"।

তিরমিযীর বর্ণনায় সেই নামগুলি লিপিবদ্ধ আছে। আল-কুরআনুল করীমে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ পাকের সেই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে (দ্র.ই.বি., আল-আসমাউল-হুসনা প্রবন্ধ)।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত এবং বিশ্বস্ত হাদীছ হইতে প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ ও তাঁহার গুণরাজির উপর কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি ও সাদৃশ্য আরোপ না করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪২ ঃ ১১)।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করিও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না" (১৬ ঃ ৭৪)।

(গ) আল্লাহর উলূহিয়্যাত

ইহা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই হইলেন একমাত্র ইলাহ তথা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই ('ইলাহ' ও 'আল্লাহ' শব্দদ্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ নাই)। আর এই ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইন্‌সান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনে উহা বাস্তবায়িত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন ও মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে" (৫১ ঃ ৫৬-৫৭)।

উল্লেখ্য যে, তাওহীদের উপরিউক্ত তিনটি শাখাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই একচ্ছত্র গুণাবলীর অধিকারী এবং একমাত্র ইলাহ। যিনি ইলাহ হইবেন তাঁহার উপরিউক্ত রাবূবিয়্যাতের যোগ্যতা থাকিতে হইবে (দ্র. শারহু'ল 'আক'ীদাতিত তাহাবিয়্যা, পৃ. ২১)।

আরও উল্লেখ্য যে, মুশরিকগণও আল্লাহ্‌কেই খালিক, মালিক ও অন্যান্য গুণের অধিকারী মনে করে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ.

"তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তবে তাহারা অবশ্যই বলিবে, এইগুলি তো পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন" (৪৩ ঃ ৯)।

কিন্তু মু'মিন ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হইল বিশ্বাসও ইবাদতের প্রক্রিয়াতে। আল-কুরআনের ভাষায়, মুশরিকরা প্রতিমাগুলিকে আল্লাহ্‌র উপাস্যের মাধ্যম মনে করে। কুরআন করীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

"আমরা তো ইহাদিগের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে" (৩৯ ঃ ৩)।

এমনিভাবে ইয়াহূদীরা হযরত 'উযায়র (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে। তাই তাহারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ.

"ইয়াহূদীগণ বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টানগণ বলে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। ইহা তাহাদিগের মুখের কথা, পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে" (৯ ঃ ৩০)।

এইভাবে ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা শিরক করিয়াছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

"যাহারা বলে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই— যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" (৫ ঃ ৭২)।

শেষ পর্যন্ত তাহারা ঈসা (আ)-কে প্রভু মনে করিতে শুরু করে, যেমনি মুশরিকরাও এক পর্যায়ে মূর্তিগুলিকেই তাহাদের প্রভু মনে করিতে থাকে। যদিও তাহাদের ধর্মীয় তাত্ত্বিকরা সেইগুলিকে প্রকৃত ঈশ্বরের নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবেই গণ্য করে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যম মনে করিবে না, শুধুমাত্র ইবাদতকেই মাধ্যম মনে করিবে। তাই মু'মিনগণ বলে, আল্লাহ একমাত্র ইলাহ। ঈমানের মধ্যে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য যাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারাই শিরকের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কেহ আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়" (৪ ঃ ১১৬)।

অতএব মানব জীবনে আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যাতের 'আকীদা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ إِلَيْهِ أَنَّه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

"আমি তোমার পূর্বে যেই রাসূলই পাঠাইয়াছি, তাহাকে এই বার্তাই প্রদান করিয়াছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর" (২১ ঃ ২৫)।

আল্লাহ্ পাকের ঐ উলূহিয়্যাতের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে।

(১) ভালবাসার ক্ষেত্রে ঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ.

"আর মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় উহাদিগকে ভালবাসে। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। জালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর" (২ ঃ ১৬৫)।

(২) তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে ঃ আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"আর তোমরা মু'মিন হইলে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর কর" (৫ ঃ ২৩)।

(৩) ভয় করিবার ক্ষেত্রে ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করা যাইবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ.

"অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর" (৫ ঃ ৪৪)।

(৪) রুকূ'-সিজদায় ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে সফলকাম হইতে পার" (২২ ঃ৭৮)।

(৫) আল্লাহ্‌র আইন মানিবার ক্ষেত্রে ঃ যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ.

"বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়াছেন একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবার জন্য" (১২ ঃ ৪০)।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ঃ ফেরেশতাদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। একজন মুসলমান এই বিশ্বাস স্থাপন করিবে যে, মহান রব্বুল আলামীনের বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রহিয়াছে। ফেরেশতাদের তিনি নিজ আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ফেরেশতাদের বর্ণনা দিয়া মহান আল্লাহ বলিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া কিছু বলেন না ও করেন না। তাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র আদেশানুসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ. لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ.

"তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত বান্দা। তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না এবং তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে" (২১ ঃ ২৬-২৭)।

আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ বিভিন্ন রকম দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন। এক দল তাঁহার আরশ উত্তোলনের কাজে, অপর দল বেহেশত-দোযখের তত্ত্বাবধানে এবং আরেক দল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তাহা ছাড়া আল্লাহ্‌র এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মাঝেও তাহারা নিয়োজিত। কিছু সংখ্যক ফেরেশতার নাম আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলগণ উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল। একাধিক সহীহ হাদীছেও তাহাদের কাহারও কাহারও নামের উল্লেখ আছে। হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে আছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, "ফেরেশতাগণ নূরের সৃষ্টি জিনকুল খাঁটি আগুন হইতে সৃষ্টি এবং আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা যাহা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন" (মুসলিম)।

ফেরেশতাগণের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহারা তাহাদের ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তাহারা রাত-দিন তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না (দ্র. ২১ ঃ ১৯-২০)। মানুষের দৈনন্দিন আমল বা কাজ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য দুইজন ফেরেশতা রহিয়াছেন ঃ

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"স্মরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তাহার ডানে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে" (৫০ ঃ ১৭-১৮)।

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে যে, আল্লাহ পাক মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার নবী ও রাসূলগণের উপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

Contents

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে" (৫৭ ঃ ২৫)।

প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবসমূহ

(১) তাওরাত ঃ এই কিতাব আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিল করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, বানূ ইসরাঈলের ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰتَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.

"নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; ইহাতে ছিল হিদায়াত ও আলো; নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ। কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী" (৫ ঃ ৪৪)।

(২) ইনজীল ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ইনজীল কিতাব নাযিল করিয়াছিলেন। এই কিতাবটি পূর্ববর্তী তাওরাতের পরিপূরক ও সমর্থক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"আমি তাহাকে ইনজীল প্রদান করিয়াছি। ইহাতে ছিল হেদায়াত ও আলো এবং ইহা পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থক এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ" (৫ঃ ৪৬)।

(৩) যাবূর ঃ এই নামীয় আসমানী কিতাবটি আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর উপর নাযিল করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا.

"আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে আমি যাবূর দিয়াছি" (১৭ ঃ ৫৫)।

(৪) আল-কুরআন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করীম নাযিল করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

"ইহাতে (রামাদান মাসে) মানুষের দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হইয়াছে" (২ ঃ ১৮৫)।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

"আমি মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ পথনির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম" (১৬ ঃ ৮৯)।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবকে সব ধরনের সংশয়কারী ও পরিবর্তন সাধনকারীর দুষ্কর্ম হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং অবশ্যই আমিই উহার হিফাজতকারী" (১৫ ঃ ৯)।

অবশ্য কুরআনুল কারীম ব্যতীত পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব অনেকাংশে বিকৃত ও বিস্মৃত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ.

"তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে" (৫ ঃ ১৩)।

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ্ পাক আপন বান্দাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক শুভ সংবাদ দানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সত্যের পথে আহ্বায়ক প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারাই নবী ও রাসূল। যাহারা তাঁহাদের আহবানে সাড়া দিয়াছে তাঁহারাই সফল হইয়াছে। আর যাহারা তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৬৫)।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

"আল্লাহ্র ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি" (১৬ ঃ ৩৬)।

যেই সকল নবী-রাসূলের নাম রাসূলুল্লাহ (স) হইতে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। যেমন ঃ হযরত নূহ, হূদ, সালিহ, ইল্য়াস, যাকারিয়্যা, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইয়ূসুফ, মূসা ও ঈসা (আ) প্রমুখ রাসূলগণ।

আখিরাতে ঈমান

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে এবং আখিরাতের উপর ঈমান আনয়নও উহার অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পর যাহা কিছু ঘটিবে, যেমন কবরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব ও নিয়ামত এবং ভয়াবহতা, পুলসিরাত, মীযান, হিসাব-নিকাশ,

প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে তাহাদের আমলনামা বিতরণ, যাহা কেহ ডান হাতে আবার কেহ বাম হাতে লাভ করিবে ইত্যাদির উপর বিশ্বাসই আখিরাতে বিশ্বাস।

এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য নির্ধারিত হাওযে কাওছার, বেহেশত, দোযখ, মু'মিন বান্দাগণ কর্তৃক তাহাদের প্রভুর দর্শন লাভ এবং তাহাদের সহিত আল্লাহ্‌র কথোপকথনসহ অন্যান্য যাহা কিছু কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও আখিরাতে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে আখিরাতের উপর ঈমানের প্রতিটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইল।

কবরের আযাব

মৃত্যুর পর কর্মফল অনুসারে কবরে সুখ-শান্তি বা শাস্তি প্রদান করা হইবে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

"সকাল ও সন্ধ্যায় তাহাদিগকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং যেই দিন কিয়ামত ঘটিবে সেই দিন বলা হইবে, তোমরা ফিরআওন সম্প্রদায়কে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ কর" (৪০ ঃ ৪৬)।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বলিয়াছেন ঃ

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار.

"কবর হয় জান্নাতের একটি বাগিচা অন্যথায় দোযখের একটি গহবর" (দ্র. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল কিয়ামাহ, ৪খ., পৃ. ৬৪০)।

আমলনামা

ইসলামী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল আমলনামা। আমলনামা হইল কর্মতালিকা যাহা বান্দাকে তাহার পার্থিব আচরণ অনুসারে তাহার ডান হস্তে অথবা পিছন দিক হইতে বাম হস্তে দেওয়া হইবে। আল্লাহ বলেনঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا. وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَاۤءَ ظَهْرِهٖ. فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا. وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا.

"যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে ফিরিয়া যাইবে। আর যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পিঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে সে অবশ্যই তাহার ধ্বংস আহবান করিবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে" (৮৪ ঃ ৭-১২)।

মীযান (ওজনদণ্ড)

ইহা বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক যে, কিয়ামতের দিন মীযান বা ভালমন্দ কর্ম ওজন করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় বা জুলুম করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ. تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ.

"এবং যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম। আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। অগ্নি উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা তথায় থাকিবে বীভৎস চেহারায়" (২৩ ঃ ১০২-১০৪)।

শাফা'আত (সুপারিশ)

রাসূলে কারীম (স)-এর জন্য শাফা'আতে 'উজ্‌'মা (বা মহান শাফা'আত) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁহারই অনুমতিক্রমে এই শাফা'আত এমন এক সময় রাসূলুল্লাহ (স) করিবেন যখন মানুষ হাশরের মাঠে সীমাহীন সংকটের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। মানবমণ্ডলী প্রথমে হযরত আদম (আ)-এর নিকট যাইবে, তারপর হযরত নূহ' (আ)-এর নিকট, তাহার পর হযরত ইব্‌রাহীম, হযরত মূসা, হযরত 'ঈসা (আ) এবং সর্বশেষ রাসূলে কারীম (স)-এর নিকট যাইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মু'মিনদের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে যাইবে তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করিবার ব্যাপারে শাফা'আতের সুযোগ থাকিবে। আর এই শাফা'আত রাসূলে কারীম (স)-সহ অন্যান্য নবী, নেক্‌কার বান্দাহ ও ফেরেশতাদের জন্য নির্দিষ্ট (দ্র. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের আকীদা, পৃ. ৬৫-৬৬)।

হাওয কাওছার

ইহা বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক যে, রাসূলে কারীম (স)-এর জন্য এমন একটি হাওয (ঝর্ণাধারা) নির্দিষ্ট যাহার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মিশকের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণবিশিষ্ট। নবী কারীম (স)-এর উম্মতদিগের মধ্যে মু'মিনগণকে এই হাওয হইতে পানি পান করান হইবে। যে ব্যক্তি এই হাওযের পানি পান করিবে বেহেশ্‌তে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তাহার কখনও পিপাসা লাগিবে না। কুরআনের ১০৮ সূরায় এবং হাদীছ শরীফে এই কাওছারের বিবরণ রহিয়াছে।

পুলসিরাত

এই কথা বিশ্বাস করা যে, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপিত রহিয়াছে। মানুষ তাহাদের আমল অর্থাৎ কার্যকলাপের ভিত্তিতে এই পুলসিরাত অতিক্রম করিবে। প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে ইহা অতিক্রম করিবে। পুলসিরাত পার হওয়া শুরু হইলে রাসূলে কারীম (স) সেখানে দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে আমার রব! (বিপদ হইতে) রক্ষা করুন। বান্দাগণ স্বীয় আমল অনুযায়ী দ্রুত বা ধীর গতিতে উহা অতিক্রম করিবে। যে অতিক্রম করিতে পারিবে না সে জাহান্নামে পতিত হইবে (দ্র. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা, পৃ. ৬৬)।

জান্নাত ও জাহান্নাম

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য জান্নাত এবং পাপিষ্ঠদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করিয়াছেন। জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির স্থান। পক্ষান্তরে জাহান্নাম হইতেছে শাস্তির স্থান। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ.

"তাহাদের কর্মের প্রতিফল হিসাবে চক্ষু শীতলকারী যে সুখসামগ্রী তাহাদের জন্য গোপন রাখা হইয়াছে কোন প্রাণীই তাহা জানে না" (৩২ ঃ ১৭)।

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

"আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি অগ্নি, যাহার বেষ্টনী তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। যদি তাহারা পানীয় প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে ধাতুর ন্যায় গলিত পানীয় দেওয়া হইবে, যাহা তাহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে। ইহা নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়" (১৮ ঃ ২৯)।

কুরআন ও হাদীছে যাহাদের জান্নাতে যাইবার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে তাহারা হইলেন মু'মিন ও মুত্তাকী লোক। অপরদিকে জাহান্নামে যাইবার ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে যাহাদের নাম নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক।

আখিরাতের উপর ঈমান আনয়ন করিবার মাঝেও কল্যাণ রহিয়াছে। একঃ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা, শেষ দিবসের ছাওয়াব ও পুরস্কার লাভের আশায় সৎকাজ করা এবং পরকালের আযাবের ভয়ে পাপ ও অন্যায় হইতে দূরে থাকিবার অনুপ্রেরণা লাভ করা। দুইঃ পরকালের পরম শান্তি ও ছাওয়াবের প্রত্যাশায় দুনিয়ার সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং উপভোগ্য বিলাস সামগ্রীর বঞ্চনায় মু'মিনের শান্ত্বনা লাভ।

তাকদীরের প্রতি ঈমান

তাকদীর হইতেছে আল্লাহ তা'আলার পূর্বজ্ঞান ও হিকমতের দাবি অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ভাগ্যলিপি। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং এইভাবেই সবকিছু চলিতেছে। তাই মানুষের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই এবং তাহাদিগকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কর্মগুলিই সম্পাদন করিতে হইবে। উহার গূঢ়ার্থ এই যে, মানুষকে আল্লাহ পাক ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার দিয়াছেন। সে উহা অনুসারে কাজ করিবে। কিন্তু তাহারা তাহাদের এখতিয়ার অনুসারে কি করিবে তাহা আল্লাহ পাক পূর্ব হইতেই জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞাতা। আর সেই জ্ঞাত বিষয়গুলি পূর্বেই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহার উপর ঈমান আনিতে হইবে। আর ইহাই তাক্দীরের উপর বিশ্বাসের সারকথা যাহা কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়।

তাকদীরের প্রথম পর্যায় আল্লাহ্র 'ইলম-বা জ্ঞান ঃ আল্লাহ তা'আলা হইতেছেন সর্বজ্ঞানী বা সর্বজ্ঞাতা। এই সৃষ্টিজগত কি ছিল, তাহাতে কি হইবে, কিভাবে হইবে এইসব তিনি তাঁহার ইলমে আযালী ও ইল্মে আবাদী অর্থাৎ স্থায়ী ও চিরন্তন অপরিসীম জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে জানিয়া লইয়াছেন। তাই অজানার পর নূতন করিয়া জানা এবং জানিবার পর ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত"(২৯ ঃ ৯২)।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বিধিলিপি ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ পাক যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন উহার সবকিছুই লিখিত রহিয়াছে। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ.

"আমি তো জানি মৃত্তিকা উহাদের ক্ষয় করে কতটুকু এবং আমার নিকট রহিয়াছে একটি সুরক্ষিত কিতাব" (৫০ ঃ ৪)।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ইচ্ছা ঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, আসমান ও যমীনে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হয় নাই। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয়, যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

"আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন" (২২ ঃ ২৮)।

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"আর তোমাদের চাওয়ায় কিছু হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন চাহেন" (৮১ ঃ ২৯)।

চতুর্থ পর্যায় ঃ সৃষ্টি ঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, সমগ্র বস্তুজগত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নাই, নাই কোন প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ পাক এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ. لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ.

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক। আসমানসমূহ ও যমীনের চাবি তাঁহারই নিকট" (৩৯ ঃ ৬২)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ.

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি যে তোমাদিগকে আসমান ও যমীন হইতে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিপথে চলিয়া যাইতেছ" (৩৫ ঃ ৩)?

যেহেতু তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা সেই হেতু মানুষের কর্মগুলির সৃষ্টিকর্তাও তিনি। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ.

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা যাহা তৈরি কর তাহাও" (৩৭ ঃ ৯৬)।

তবে এইখানে সন্দেহ হইতে পারে, যেহেতু আল্লাহ বান্দাগণের কাজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে বান্দাগণ মন্দ কাজ করিলে তাহাদের দোষ কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ পাক বান্দাদিগকে ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

"যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যাহার ইচ্ছা কুফরী করুক" (১৮ ঃ ২৯)।

সুতরাং বান্দা তাহার সেই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যখন কোন কাজ করিতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন আল্লাহ পাক তাহার সেই কাজ করিবার শক্তি তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন।

তাকদীরে বিশ্বাসের উপকারিতা

তাকদীরে বিশ্বাস করিবার মধ্যেও নিহিত আছে অশেষ কল্যাণ। একঃ কোন কাজের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পন্ন করিবার সময় আল্লাহ্র উপর ভরসা করিবার প্রেরণা আসে।

দুই ঃ মনের সুখ ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ। কেননা নিজ দায়িত্ব হিসাবে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পন্ন করিবার পর অন্তর যখন এই কথা জানিতে পারিবে যে, সবই আল্লাহ্র ফয়সালা, তাই অনাকাঙ্ক্ষিত যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, তখন মন নিশ্চিত থাকিবে, অন্তর লাভ করিবে প্রশান্তি, আল্লাহ্র ফয়সালায় থাকিবে সন্তুষ্ট। অতএব তাকদীরে বিশ্বাসী একজন লোক সুন্দর জীবন, শক্তিশালী মন ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়।

তিন ঃ উদ্দেশ্য হাসিল হইলে আত্মগর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করা। কেননা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া আল্লাহ্রই অনুগ্রহ। তাই নেক বান্দা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আত্মগর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করে।

চার ঃ উদ্দেশ্য হাসিল না হইলে কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলে অন্তরের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করা। কেননা বান্দার ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহা আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা, যিনি যমীন ও আসমানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁহার যাহা ফয়সালা তাহা হইবেই। ফলে নেককার লোকেরাই ধৈর্য ধারণ করে এবং পরকালে ইহার পুরস্কার কামনা করে। এইদিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিখিয়া রাখিয়াছি। আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন বিমর্ষ না হও এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে পসন্দ করেন না" (৫৭ ঃ ২২-২৩)।

উল্লেখ যে, ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মূলনীতিগুলি ছাড়াও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের আকীদা অনুসারে আকীদার আরও কিছু বিষয় রহিয়াছে। সেইগুলিও আকীদা হিসাবে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। যথাঃ আম্বিয়া কিরামের মু'জিযা সত্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মি'রাজের ঘটনাও সত্য। আওলিয়ায়ে কিরামের কারামত সত্য (শারহু'ল ফিক'হিল আকবার, পৃ. ১১৪)। কিয়ামতের পূর্ব-লক্ষণসমূহ দেখা দিবে তাহা সত্য (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬)। মূল ঈমান বাড়েও না কমেও না, বরং উহার শাখা-প্রশাখার দিক দিয়া ইহা বাড়ে-কমে। বাস্তব কর্ম কবুল হওয়ার জন্য ইসলামের মৌলিক 'আকীদায় বিশ্বাস থাকা জরুরী। প্রকাশ্য অস্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক কোন আচরণ না পাওয়া পর্যন্ত কেহ ঈমান হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে এই ধরনের উক্তি করা যাইবে না। কবীরা গুনাহকারী দোযখে চিরদিন থাকিবে না, যদি সে আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার করিয়া থাকে, দুনিয়াতে যদিও সে তওবা করিয়া যাইতে পারে নাই। মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিত ব্যক্তিদের দোয়া উপকারে আসে (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)। আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া কুফরী (প্রগুক্ত, পৃ. ২২১)। আল্লাহ চাহেন তো ঈমান আনিব ধরনের সন্দেহযুক্ত উক্তি বৈধ নহে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২)।

আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দেওয়া যাইবে না। আহলে কিবলা হইল যাহারা মুসলিম বলিয়া দাবি করে, কা'বাকে কিবলা জানিয়া সালাত আদায় করে, ইসলামের হারামগুলিকে হালাল মনে করে না, হযরত মুহাম্মাদ (স) যাহা কিছু বলিয়াছেন সবকিছুকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে (দ্র. শারহু' 'আক'ীদাতিত-ত'াহ'াবি'য়্যা, পৃ. ৬২)। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত হিসাবে হযরত 'ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। ইমাম মাহ্দীর আগমন ঘটিবে। নবীগণ একজন অপর জনের চেয়ে মর্যাদায় কম-বেশী হইতে পারেন। তাঁহারা সকলেই মা'সূ'ম (নিষ্পাপ)। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী বিশেষ বিশেষ মহামানব বিশেষ বিশেষ ফেরেশতার উপর মর্যাদাশীল। সকল সাহাবী উত্তম ও দীনের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য (শারহু' ফিক'হি'ল-আকবার, পৃ. ১৬৯)।

ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে যুগে যুগে বিভিন্ন দল ও মতের উদ্ভব ঘটে। তাহাদের কিছু মত আকীদার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যেমন ইমাম (মুসলিম উম্মাহর নেতা) নিয়োগ করা ওয়াজিব। সত্য একক। একই বিষয়ে একাধিক সত্য হয় না। মুজতাহিদ কখনও ভুল করেন আবার কখনও তাহার ইজতিহাদ সঠিক হয়। অত্যাচারী ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া বৈধ, তবে এই বিষয়গুলি সরাসরি আকীদার অন্তর্ভুক্ত নহে।

ইসলামী আক'াইদের শ্রেণীবিভাগ

ইসলামী আকাইদকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একঃ আক্লী (عَقْلِى) বা বুদ্ধিগত, ঐ সকল 'আকীদা যাহা শারী'আতের ভিত্তি মূল হওয়া সত্ত্বেও অনেকাংশে জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। ইসলামের দাওয়াত সুষ্ঠু জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে না পৌঁছিলেও জন্মগত স্বভাব ও জ্ঞান দ্বারাই সে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস। কারণ জ্ঞানী মাত্রই আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখিয়াই তাঁহাকে অসীম 'ইল্ম ও কুদরতের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতও তাই। তিনি বলিয়াছেন, বিচ্ছিন্ন কোন মানব গোষ্ঠী যাহাদের নিকট কখনও কোন রাসূলের দাওয়াত পৌঁছায়নি তাহাদের উপর বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ যদি রাসূলগণকে না পাঠাইতেন তথাপি মানুষের জন্য আক্ল দ্বারা আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করা ওয়াজিব হইত (ইমাম হাকিম হইতে বর্ণিত, দ্র. দামাই, ১৪/১খ., পৃ. ৫৩)।

নবী-রাসূল পাঠাইবার তাৎপর্য, কিয়ামত দিবসে সমস্ত কর্মের হিসাব, ফেরেশতা ও অন্য যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ্র ওহী প্রেরণের সত্যতা, নবীগণের মধ্যে পরস্পর মর্যাদাগত প্রাধান্য থাকা ইত্যাদি আকীদাগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

দুইঃ শ্রুত (سماعى), 'আকীদার দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে ঐ সকল 'আক'ীদা যাহা 'আক্'ল বা বুদ্ধি সম্পর্কিত হইলেও সেইগুলি প্রমাণিত হইয়াছে ওহীর মাধ্যমে। অর্থাৎ সেইগুলি আক্ল-এর পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বা সালাফে সালিহীনের নিকট হইতে কোন প্রকার মতানৈক্য ছাড়া বর্ণিত।

দ্বিতীয় প্রকার আকীদা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) ঐ সকল 'আকীদা যেইগুলির উপর ঈমান না থাকিলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। (খ) উহা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের এক বিশেষ রূপ, যাহার উপর সালাফে সালিহীনের আমল ছিল। এই ধরনের আকীদার মধ্যে আছে আম্বিয়া কিরামের নিষ্পাপ হওয়া, খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে কোন একজনকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এই প্রথম প্রকারের আকীদা আবার তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) যেইগুলি আল্লাহর সত্তা ও তাঁহার গুণাবলী বিষয়ক। যেমন আল্লাহ পাকের ওয়াজিবুল-ওয়াজূদ হওয়া (অর্থাৎ তিনি অত্যাবশ্যকীয় সত্তা, সদা অস্তিত্বশীল এবং সকল অস্তিত্বের উৎস), কোন সৃষ্টতে তাঁহার প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্র কোন তুলনা বা সাদৃশ্য নাই ইত্যাদি।

(২) পরকাল বিষয়ক। যেমন পুনরুত্থান, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সংক্রান্ত আকীদা।

(৩) নবূওয়াত ও রিসালাত বিষয়ক 'আকীদা। ইহার কিছু কিছু 'আক'লী (বুদ্ধিভিত্তিক) হইলেও কিছু কিছু সিমা'ঈ (শ্রুত)। যথা কুফর, শিরক, ফেরেশতাদের মাধ্যমে ওহী আসা।

ফেরেশতাদের পরিচয় সংক্রান্ত আকীদাঃ যেমন তাহারা শুধু নেক কাজ করে এবং সদা আল্লাহর অনুগত, আসমানী গ্রন্থ আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত। নবীগণের কথা মান্য করা। তাঁহাদের মু'জিযা সত্য। ফেরেশতাগণ একজন আরেকজনের উপর মর্যাদাবান হইতে পারেন ইত্যাদি। ঐ সকল বিষয় সরাসরি কুরআন ও হাদীছে মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত যাহার অস্বীকৃতি দীনের অত্যাবশ্যকীয় অংশের অস্বীকারের শামিল।

যুগে যুগে ইসলামী আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন হইল ইসলাম। হযরত আদম (আ) হইতে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল আসিয়াছিলেন সকলেরই ধর্ম ছিল ইসলাম। (ব্যাপকার্থে) ইসলামী 'আকীদা হযরত আদম (আ) হইতেই শুরু হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন আকীদাসহ এই জগত ও জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা তখন হইতেই শুরু হইয়াছিল। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কিত আকীদাগুলি এই পৃথিবীতে মানবজাতির সৃষ্টির মতই প্রাচীন। যদিও যুগে যুগে নবী-রাসূল আসিবার কারণে রিসালাতের বাহকের দিক দিয়া একটি ক্রমবর্ধমান ধারা বর্তমান, যুগে যুগে সকল নবীর দাওয়াতে ঐ সমস্ত 'আকীদা অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহা স্থান-কাল-পাত্রভেদে অপরিবর্তনশীল।

হযরত মুহাম্মাদ (স) আরবে আগমনকালে সেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিদ্যমান ছিল। তাহাদের মধ্যে আহলে কিতাব (ইয়াহূদী, নাসারা), মুশরিক, মাজূসী ও সাবিয়ীরা ছিল। আল-কুরআনে তাহাদের বিভিন্ন 'আকীদা উল্লেখ করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত 'আকীদাগুলিকে অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রমাণ ও পদ্ধতিতে খণ্ডন করা হইয়াছে। সাথে সাথে সঠিক ও বিশুদ্ধ 'আকীদাগুলিকে সাবলীলভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। মহানবী (স)-এর যুগে যাহারা শেরেকী 'আকীদা ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা ইসলামী আকীদাসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং তাহারা জানিত যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলির গোমরাহীর মূলে ছিল 'আকীদা সংক্রান্ত ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা। ইহার পরও আল-কুরআন ও বিভিন্ন হাদীছের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কতিপয় সাহাবী আকীদা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মহানবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই ধরনের বিষয়গুলির মধ্যে ছয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

১. আল্লাহ্র সত্তা, ২. আল্লাহ্র গুণাবলী, ৩. আল্লাহ্র দর্শন, ৪. আল্লাহ্র ফয়সালা ও তাক'দীর, ৫. ঈমান ও আমল, ৬. ঈমান ও ইসলাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ হইতে জানা যায়, মহানবী (স) বলিয়াছেন, মানুষ প্রশ্ন করিতে করিতে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, আল্লাহ এই সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? কাহারও এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হইলে সে যেন বলে, "أمنت بالله" আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম (সহীহ মুসলিম, নব্বীর শরাহসহ, ২খ., পৃ. ১৫৩)।

এই মর্মে হযরত ইব্ন উমার (রা) হইতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, একদল লোক আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতেছিল। তখন মহানবী (স) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করিও না। আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান)।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, চিন্তার স্বাধীনতাকে মহানবী (স) একেবারে বাতিল করেন নাই, বরং মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। আর আল্লাহ্র সত্তা এমনই যাহা মানুষের চিন্তা গবেষণার উর্ধ্বে।

আর এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ একমত হইয়াছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)-এর যুগে আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে কোন রকম বাক-বিতণ্ডা করিতেন না, বরং কুরআনুল কারীমে ও সুন্নাহে যেইভাবে আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা আসিয়াছে ঠিক সেইভাবে তাহারা বিশ্বাস করিতেন (ইব্নুল ক'ায়্যিম, আ'লামুল-মূ'কি'ঈন, ১খ., পৃ. ৫৫)।

এমনিইভাবে আখিরাতে মু'মিনগণের আল্লাহ্র দর্শন সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন রকম মতানৈক্য করেন নাই। তবে রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়াতে আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন কিনা এই ব্যাপারে তাঁহারা মতানৈক্য করিয়াছেন। একদল সাহাবী বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস ও আনাস (রা) তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন। আর একদল সাহাবী বলিতেন, মহানবী (স) স্বচক্ষে আল্লাহ্কে দেখেন নাই, তবে অন্তরদৃষ্টিতে হয়তবা আল্লাহ্কে দেখিয়াছিলেন। 'আইশা (রা) বলেন, যে

ব্যক্তি বলে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন সে মিথ্যা বলে (সহীহ মুসলিম, ৩খ., পৃ. ৮)।

তেমনি তাকদীর সম্পর্কেও কোন কোন সাহাবী (রা) মহানবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন। মহানবী (স) তাহাদেরকে আল-কুরআনের আলোকে উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা কাজ করিয়া যাও। কেননা কাজ করাও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। এই মর্মে প্রচুর প্রমাণাদি হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কেও আলোচনা হইত এই দুইটি এক না ভিন্ন। আল-কুরআনেও এই ব্যাপারে আলোচনা আসিয়াছে। যেমন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا.

"বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনিলাম। বল, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি" (৪৯ ঃ ১৪)।

হাদীছে জিবরাঈলও ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলাদা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কুরআন কারীমে ঈমান ও ইসলামকে এক বলিয়াও দেখান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"সেখানে যত মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আর আমি সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলমান পাই নাই" (৫১ ঃ ৩৫-৩৬)।

এইখানে মুসলমান ও মু'মিন একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। মূলত ঈমান ছাড়া ইসলামকে কল্পনা করা যায় না। তেমনিভাবে ইসলাম ছাড়া ঈমানের কথা ভাবা যায় না। তাই যেইখানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে সেইখানে ইসলাম বলিতে বাহ্যিক আচরণ বুঝান হইয়াছে যাহা সাহাবায়ে কিরাম (রা) কুরআন ও হাদীছের ভাষ্য দ্বারা বুঝিতে পারিতেন। আকীদার ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর যুগে এই যে সচ্ছতা ও দ্বিধাহীনতা বিরাজ করিত, তাহা মূলত আল-কুরআনের সচ্ছ ধারণা ও সেই যুগে মতানৈক্য জনিত ঘটনার স্বল্পতা এবং মহানবী (স)-এর সাহচর্য লাভের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল (আন-নিবরাস শারহু'ল-'আকাইদ আন-নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৪-১৫)।

তাহা ছাড়া কোন রকম সন্দেহ দেখা দিলে তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিয়া উহা নিরসন করিতে সক্ষম ছিলেন।

মহানবী (স)-এর যুগে আকীদার ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের বিরোধিতা দেখা দেয় নাই। আয়াতে মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা করা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ায় কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া নূতন দীন ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের সাথে সাথে নূতন ইসলামী রাষ্ট্রের ইমামত (নেতৃত্ব)-কে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানদের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি হয় তাহা আকীদার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। এই ধরনের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষদিকে খারিজী, শী'আ ও কাদরিয়া ইত্যাদি দল-উপদলের উন্মেষ ঘটে এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোন কোন চরমপন্থী দল অপর দলকে কুফুরী ফতওয়া দিতে শুরু করে। সেই সময়ে আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নোক্ত মতবিরোধের সূচনা হয় ঃ

(ক) খিলাফত ও ইমামত ঃ মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর খলীফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমত মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। খলীফা হযরত আবূ বাক্‌র ও উমারের সময়ে এই মতানৈক্য তেমন জোরদার হয় নাই। কিন্তু হযরত উছমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পর খিলাফতকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ছিল, ১. মধ্যপন্থী, ২. খাওয়ারিজ, ৩. শী'আ। মধ্যপন্থীদের মত ছিল যে, মুসলমানদের পরামর্শের ভিত্তিতে যিনি খলীফা হইবেন তাহার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিতে হইবে এবং মহানবীর একটি হাদীছ الأئمة من قريش (ইমাম হইবেন কুরায়শদের মধ্য হইতে)-এর আলোকে ইমাম হওয়ার জন্য কুরায়শ হওয়ার প্রতি সমর্থন দিয়া আসিতেছিল। কিন্তু খারিজীগণ তাহা অস্বীকার করে। অন্যদিকে শী'আরা দাবি করে যে, মহানবী (স) নিজেই হযরত আলী (রা)-কে খলীফা হওয়ার জন্য ওয়াসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী তিনজন খলীফা অন্যায়ভাবে তাঁহাকে খিলাফতের পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাই তাহারা ইমামতের একমাত্র হকদার হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করা ঈমানের অংশ হিসাবে দেখিতে শুরু করে (ইব্‌ন খালদূন, আল-মুকাদ্দামা, পৃ. ৯৬)।

সাহাবায়ে কিরামের ভিতরে তৃতীয় একটি দলের উদ্ভব ঘটে যাহারা ঐ সমস্ত ফিৎনা-ফাসাদ হইতে বিরত থাকেন এবং পারস্পরিক বিরোধের ফয়সালার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিয়া নীরব থাকেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ আমীনের মতে পরবর্তী যুগে মুরজিয়া দলের উৎপত্তিতে ঐ সকল সাহাবীদের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়াছিল (ফাজরু'ল-ইসলাম, পৃ. ৬৮০)।

(খ) আল্লাহর যাত ও গুণাবলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কোন রকম বাক-বিতণ্ডা করেন নাই এবং কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যায় সাহসী হন নাই। শেষ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর যুগে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ মতামতকে নিজেদের অনুকূলে প্রাধান্য দিতে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে।

(গ) কাদা ও কাদর ঃ (আল্লাহ কর্তৃক ফয়সালা ও তাকদীর) কাদা ও কাদর সম্পর্কেও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মতানৈক্য হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই যুগের শেষদিকে কতিপয় ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়। হযরত উমার (রা) ১৭ হিজরীতে সিরিয়ার মুসলমানদের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। 'সারগ' নামক স্থানে যাওয়ার পর তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, সিরিয়ায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। উমার (রা) মুহাজির সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সিরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন, আবার কেহ

কেহ সেখানে যাইতে পরামর্শ দিলেন। আনসারদের সাথে পরামর্শ করিলে তাহারাও মতবিরোধ করিল। শেষ পর্যন্ত মুহাজিরগণ প্লেগের কারণে মদীনায় ফিরিয়া আসিতে একমত হইলেন এবং উমার (রা) তাহাই মানিয়া নিলেন। আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ' (রা) বলিলেন, ইহা কি আল্লাহ নির্দ্ধারিত তাক'দীর হইতে পলায়ন করা নয়? উমার (রা) বলিলেন, হে আবূ উবায়দা! তুমি ব্যতীত অন্যরা যদি বলে, আমরা আল্লাহ্র এক তাকদীর ছাড়িয়া অন্য তাকদীরে ফিরিয়া যাইতেছি তবে তোমার অভিমত কি?

দেখা যায় যে, সেই যুগেও তাক'দীর সম্পর্কে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ছিল, বিশেষ করিয়া হযরত আলী (রা)-এর যুগে এই ধরনের আরও কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে কুফায় একদিন তিনি মিম্বরে উঠিয়া বলিয়াছিলেন,

ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره.

"যে ব্যক্তি তাক'দীরের ভালমন্দে বিশ্বাস করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়" (ইশারাতুল মারাম, পৃ. ২৭৭)।

তাক'দীর সংক্রান্ত কয়েকটি দল

১। জাহমিয়াঃ জাহম ইব্ন সাফওয়ানের (মৃ. ১২৮ হি.) দল। সে আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করিত এবং কুরআনকে সৃষ্ট বস্তু (মাখলূক) হিসাবে বিশ্বাস করিত (আহমাদ আমীন, দু'হ'াল-ইসলাম, ৩খ., পৃ. ১৬৩)। জাহম ইহাও বিশ্বাস করিত যে, বান্দার কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। সে জড় পদার্থের মত। আল্লাহ তাহার দ্বারা যাহা করাইতে চান তাহাই সে করিতে বাধ্য। এইজন্য তাহাদেরকে জাব্রিয়াও বলা হয় (আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, ১খ., পৃ. ১৬৫)।

২। **মু'তাযিলা** ঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা হইল ওয়াসি'ল ইব্ন 'আত'া (৮০-১৩১ হি.) এবং আমর ইব্ন উবায়দ (মৃ. ১৪২ হি.)। ওয়াসি'ল প্রখ্যাত তাবিয়ী হযরত হাসান বাসরীর ছাত্র ছিলেন। একদিন তাহার সাথে কবীরা গুনাহকারী সম্পর্কে তাহার ছাত্র ওয়াসি'লের বিতর্ক হয়। ওয়াসি'ল বলেন, কবীরা গুনাহকারী মু'মিনও নয় এবং কাফেরও নয়, বরং উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে বিদ্যমান (المنزلة بين المنزلتين)। অবশেষে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তখন ওয়াসি'ল স্বীয় উস্তাদ হইতে আলাদা (اعتزال) হইয়া যান এবং মু'তাযিলা দলের সৃষ্টি করেন, যাহারা 'আক'ল অর্থাৎ বুদ্ধিগত যুক্তিকেই সব কিছুতে সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাহাদের মতে, বান্দা কর্মে স্বাধীন, তাক'দীর বলিতে কিছু নাই। আল্লাহ্র সিফাত দ্বারা আসলে শিরকের দরজা খুলিয়া যায়। তাই তাহারা বলেন, আলাদা গুণাবলী মানা যাইবে না। এই মু'তাযিলাগণ তাক'দীরকে অস্বীকার করিয়া পূর্ববর্তী ক'াদরিয়াদেরই অনুসারী হয় এবং একই সাথে আল্লহ্র গুণাবলী অস্বীকার করিয়া জাহমিয়াদের অনুসারী হয়।

৪। **আল-মুশাব্বিহা** ঃ ইহারা মূলত ইব্ন সাবার অনুসারী শী'আদের উত্তরসুরি। তাহারা আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর বিভিন্ন অবয়ব ও সাদৃশ্য দাঁড় করাইত। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্র হাত, কান ও চোখ আছে, যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বায়ান ইব্ন সাময়ান নামে এক ব্যক্তির একটি ফিরকা (দল) ছিল যাহারা বিশ্বাস করিত যে, আরবী হরফে হিজাঈর মত আল্লাহর চেহারা ও শরীর আছে। আর এই উভয় ব্যক্তিকে খালিদ আল-কাসরী হত্যা করেন (আল-মিলাল, ১খ., পৃ. ৩৮৩)। আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা বলিত যে, আলী (রা) নবী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে তাঁহাকে ইলাহ বলিতে শুরু করিয়াছিল এবং তাহার অনুসারীরাও আলী (রা)-এর বংশধরদের মধ্য হইতে যাহাদের ইমাম মনে করিত (হযরত আলী, হাসান, হুসায়ন, যায়নুল 'আবিদীন, ইমাম জাফর সাদিক প্রমুখ) তাহারা ধারণা করিত যে, তাহাদের ভিতরে ইলাহ-এর অংশবিশেষ স্থানান্তরিত হইয়াছে (দ্র. প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৬৫)।

৫। **মুরজি'আ** ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কবীরা গুনাহকারী মুমিন না কাফির এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া উমায়্যা যুগের প্রথমেই প্রচণ্ড বিভেদের সৃষ্টি হয়। খারিজীরা বলিত, কবীরা গুনাহকারী কাফির (আল-ফারক' বায়নাল ফিরাক', পৃ. ৪৫-৬৭)। মুরজিআগণ, শী'আ ও খারিজীগণের মধ্যবর্তী অবস্থান নেয়। তাহাদের মতে, ঈমান হইল আল্লাহ সম্পর্কে জানার নাম, স্বীকার করার নাম নয়। তাহার পর কবীরা গুনাহকারী কাফির হইয়া যাইবে না। মুরজিআ মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইব্নুল হানাফিয়া (মৃ. ১০১ হি.), মতান্তরে হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ। তাহার মতে, ঈমান হইল একটি স্বীকৃতি। পুণ্য কাজ করা বা পাপ করার বিষয়টি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, বিধায় কবীরা গুনাহকারী কাফির হইবে না (আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, ১খ., পৃ. ২৬৯)।

আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারী সালাফে স'ালিহ'ীন কুরআন-হাদীছের আলোকে উপরিউক্ত ফিরকাগুলির আকীদা বিষয়ক বিভ্রান্তিগুলির যথাযথ জবাব দিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে উমায়্যা যুগে হযরত হাসান বাসরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কুরআন-সুন্নাহ্র পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন দলীলও উপস্থাপন করিতেন। উমায়্যা যুগের শেষদিকে ও আব্বাসীদের প্রথমদিকে হযরত ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) (মৃ. ১৫০ হি.) আকীদা বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে আল-ফিক'হু'ল-আক্বার-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরআন-হাদীছের পর ইসলামী আকীদা বিষয়ে ইহা সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হয়।

আব্বাসী যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। তখন 'আক'াইদ সম্পর্কেও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। মু'তাযিলা (দ্র.) ফিরকার প্রভাব-প্রতিপত্তি আব্বাসী যুগে প্রকট আকার ধারণ করে। সেই যুগে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের বই পুস্তক প্রচুর অনুবাদ করা হয়। তাই মু'তাযিলা সম্প্রদায় গ্রীক দর্শনের তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করে। সাথে সাথে মুসলিম সমাজে অবস্থিত তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় ঐ কৌশলগুলি প্রয়োগ করিতে থাকে। এইভাবে ইসলামী আকীদার সঙ্গে ঐ সমস্ত দর্শনের মূলনীতি প্রবেশ করে এবং তখনই ইসলামী আকীদার বিষয়টি 'ইলমুল কালাম নামে পরিচিত হয়। এই 'ইল্ম 'আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের দলীল উপস্থাপন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহারা ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে মুতাকাল্লিম বলা হয় (আহ'মাদ আমীন, দু'হ'াল ইসলাম, ৩খ., পৃ. ৯-১০)। উল্লেখ্য যে, উমায়্যা যুগের শেষপ্রান্তে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় (যেমন ইয়াহূদী, খৃষ্টান, মাজূসী, মানী ইত্যাদি) গ্রীক দর্শনের ছত্রছায়ায় তাহাদের আকীদা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা চালাইয়াছিল এবং মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াইতে প্রয়াস

পাইয়াছিল। মু'তাযিলাগণ সেই সমস্ত ইসলাম বিরোধী তৎপরতার মুকাবিলায় যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছিল।

উল্লেখ্য যে, খলীফা আল-মা'মূন মু'তযিলাদের মতাবলম্বী হন। ফলে মু'তাযিলীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার রাজত্বকালে (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) মু'তাযিলা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার চেষ্টায় মু'তাযিলা সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। খলীফা আল-মা'মূনের পর তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারী খলীফা মু'তাসি'ম (৮৩৩-৮৪২ খৃ.) ও খলীফা ওয়াছি'ক (৮৪২-৮৪৭ খৃ.)-ও এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মু'তাযিলাদের মতবাদ পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ ১. তাওহ'ীদ ,২. আল-'আদল, ৩. আল-মানযিলাতু বায়ন'ল মানযিলাতায়ন, ৪. আল-ওয়া'দ ওয়াল-ওয়া'ঈদও ৫. আল-আমরু বিল-মা'রূফ ওয়ান-নাহী 'আনিল-মুনকার (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. শিরো. মু'তাযিলা)।

মু'তাযিলাগণ তৎকালীন বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারার দাবিদার ছিল। মু'তাযিলাগণ ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল। তবুও তাহাদের পদ্ধতিগত ভুলের কারণে তাঁহারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয় (দ্র. ড. 'ইরফান, দিরাসাত ফিল্-ফিরাক ওয়াল-'আকাইদ, পৃ. ১৪৫)। ফিক্'হী মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ সকলেই ইসলামী আকীদা রক্ষায় কার্যত তৎপর ছিলেন। তাহাদের অনুসারী অন্যান্য ফাক'ীহগণও সেই কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে দুইটি দলের উদ্ভব ঘটে। কায়ামিয়াহ, মুহাম্মাদ ইব্ন কাব্বাম আস্-সিজিস্তানী (মৃ. ২৫৫ হি.)-এর অনুসারীবৃন্দ (শাহরাস্তানী, ১খ., পৃ. ১৮০) এবং জাহিরিয়া বিশিষ্ট ফাক'ীহ দাঊদ ইব্ন আলী আজ'-জা'হিরী আল-ইসফাহানীর (মৃ. ২৭০ হি.) অনুসারীবৃন্দ (ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ২খ., ২৬)। সময়ের বিবর্তনে আকীদা বিষয়ে মূল চিন্তাধারার বিভিন্নতা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

'আকীদা বিষয়ে যাঁহারা কুরআন-সুন্নাহতে যাহা আসিয়াছে তাহাকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং বুদ্ধির ভূমিকাকে গৌণ মনে করেন তাঁহারা হইলেন অধিকাংশ মুহ'াদ্দিছ' ও ফাক'ীহ। ইহা মধ্যপন্থী একটি ধারা ছিল যাহা কুরআন-হাদীছকে প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে আকীদাগুলির ব্যাখ্যা ও প্রমাণে বুদ্ধিগত যুক্তিও পেশ করিতেন এবং অন্যান্য দলের বিভ্রান্তি ও সন্দেহের অপনোদন করিতেন। তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ইব্ন কিলাব (মৃ. ২৪০ হি.), ইমাম আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়ামান আস-সামারকান্দী আল-হানাফী (মৃ. ২৬১ হি.), হারিছ ইব্ন আসাদ আল-মুহাসিবী, আবুল 'আব্বাস আল-কালানিসী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শাহরাস্তানী তাঁহাদের ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, তাহারা সালাফে সালিহীন কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন বিষয়াদি এবং কালাম শাস্ত্রের বিভিন্ন মূলনীতি যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন (দ্র. আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, পৃ. ১১৮)।

ইমাম আবূ ইয়ূসুফ (র) ও ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বল (র)-এর ভূমিকাকে কেন্দ্র করিয়া মুহ'াদ্দিছ'দের যে দলটির উৎপত্তি তাহারা উপরিউক্ত মধ্যপন্থীদিগকে পছন্দ করিতেন না। মুহ'াদ্দিছ'গণের অনেকে তাহাদের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন (দ্র. মুফতী আবদুহ, রিসালাতুত তাওহীদ, পৃ. ৩০)।

আকীদার মতামতের নানা আলোচনা চলাকালে এক পর্যায়ে আবুল হাসান আল-আশ'আরী (দ্র.; মৃ. ৩২৪ হি.)-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি মনে করিলেন, যথার্থ সত্য রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাস ও বক্তব্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানবিক বুদ্ধি ও জ্ঞান অবশেষে তাঁহাদের বাণীর মধ্যেই সত্যের সন্ধান পায়।

তাঁহার পদ্ধতি ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমরা যাহা বলিতে চাই এবং যে পথ অবলম্বন করিতে চাই তাহা হইল, আল্লাহ্র কিতাব ও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাহ এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবী, তাবিঈ ও মুহাদ্দিছগণের নিকট হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলিকে আকড়াইয়া ধরা। আমরা এই পথ দৃঢ়ভাবে ধরিব এবং আবূ আবদুল্লাহ আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল যাহা বলিতেন তাহাই বলিব (আবুল হ'াসান আল-আশ'আরী, আল-ইবানা 'আন উসূ'লিদ-দিয়ানা, পৃ. ২০)।

আল-আশ'আরী মু'তাযিলা বিরোধী পূর্বোল্লেখিত মধ্যপন্থীদের পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরআন-সুন্নাহতে যাহা আসিয়াছে তাহার ব্যাখ্যার পাশাপাশি মু'তাযিলাদের যুক্তিগুলি বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি মুহাদ্দিছগণের সঙ্গে সম্পর্কিত হইয়া আরও স্পষ্ট করিয়া মতামত তুলিয়া ধরিবার কারণে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া যায়। তিনি আকীদা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আল-ইবানা 'আন উসূ'লিদ দিয়ানা ও কিতাবুল লামআ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। অতঃপর তাঁহার অনেক ছাত্র ও অনুসারী তাঁহার মাযহাবকে আরও পরিমার্জিত করেন এবং নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আ হিসাবে পরিচিত করেন (শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুহ, পৃ. ৩০ ও তাফতাযানী, শারহ'ল, 'আক'াইদিন নাসাফিয়া, নিবরাসসহ, পৃ. ২২)।

আহলে সুন্নাহ অর্থ সুন্নাতে রাসূলের (স) অনুসারী, আর জামা'আ' বলিতে সালাফ স'ালিহ'ীন বা সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হইয়াছে (দ্র. নিবরাস, পৃ. ২২)। মহানবী (স)-এর একটি হাদীছে তিনি বলিয়াছিলেন, "অবশ্যই তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল (ইয়াহূদী-নাসারা) তাহারা ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছে এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। একমাত্র আমি এবং আমার সাহাবীদের যাহারা অনুসরণ করে তাহারা ছাড়া অন্যরা জাহান্নামী" (জামি'উত তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাব মা জাআ ফী ইফ্তিরাকি হাযিহিল উম্মাহ, ৫খ., পৃ. ২৬)।

আবুল হাসান আশ'আরীর ছাত্র ও অনুসারীদের মধ্যে আবূ বাক্র আল-বাকি'ল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.), আবূ বাক্র ইব্ন ফাওরাক (মৃ. ৪০৬ হি.), আবুল মুজাফ্ফার ইসফারাইনী (মৃ. ৪১৮ হি.), আবূ মানসূ'র আবদুল ক'াহির আল-বাগদাদী (মৃ. ৪২৯ হি.), ইমামুল হারামায়ন আবদুল মালিক ইব্ন আবী আবদিল্লাহ আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৭৮ হি.), আবূ হামিদ আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.), আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী (মৃ. ৫৪৮ হি.), ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা আশ'আরীর চিন্তাধারা ও শিক্ষার বিকাশ ও প্রসার ঘটান। আর তাঁহাদের প্রচেষ্টায় আকীদা বিষয়ে আশাইরা নামে একটি

মাযহাবের উৎপত্তি ঘটে, যাহা ছিল ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর চিন্তাধারা প্রসূত বসরা কেন্দ্রিক। অন্যদিকে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর সমসাময়িক আর একটি চিন্তাধারার প্রসিদ্ধি ঘটে মধ্য এশিয়ায় সামারকান্দ কেন্দ্রিক আবূ মানসূর আল-মাতুরীদির (মৃ. ৩৩৩/ ৯৪৪) নেতৃত্বে। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আকীদা সংক্রান্ত চেতনার উন্মেষ ঘটান এবং আকীদা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কিতাবুত তাওহীদ, কিতাবুল মাকালাত, কিতাবুর-রাদ্দি আওয়াইলি আদিল্লা লিল-কা'বী, রাদ্দুল উসূলি'ল খামসা ইত্যাদি। তিনি আশআরীর ন্যায় আকীদা বিষয়ে কুরআন-হাদীছ তথা নাক্'লী দলীলসহ আকলী বা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করিয়া মু'তাযিলাসহ অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন করিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা বা পদ্ধতি মাতুরিদীয়া মাযহাব নামে খ্যাতি লাভ করে। এই দুই ইমামের মাঝে কিছু মতপার্থক্য থাকিলেও মূল পদ্ধতিগত দিক দিয়া উভয়ের আকীদাগত অভিমতগুলি প্রায় এক ও অভিন্ন। এইজন্য উভয়ের অনুসারিগণকে আহলু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আত্ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং পরবর্তী যুগসমূহে এই দুইজন ইমামের অনুসারীদেরই দুইটি ধারা বিরাজমান থাকে।

তবে উভয়ের মাঝে যেই সমস্ত বিষয়ে মতপার্থক্য হইত তাহা হইল, আল্লাহ্র গুণাবলী ব্যাখ্যা করা ঠিক হইবে কি না। আশা'ইরাদের মতে ঠিক নয়। যেমন ইমাম আশ'আরী স্বীয় গ্রন্থ ইবানায় এই মত ব্যক্ত করেন (যদিও তিনি স্বীয় কিতাবুল লাম'আ গ্রন্থে আল্লাহর গুণাবলী ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। এইদিকে মাতুরিদীদের মতে সেইগুলি ব্যাখ্যা করা বা তাহা না করিয়াই দ্বিধাহীনভাবে মানিয়া লওয়া উভয়ই বৈধ। তবে মুশাব্বাহা ও মুজাস্সামা এবং কারামিরা প্রমুখ ফিরকাগুলির মতবাদ তাহাদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। উভয় ইমাম শরঈ নস বা কুরআন-সুন্নাহর বাণী এবং আকলকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আকল কিংবা শারঈ নাসকে গুরুত্ব দিতে তারতম্য করিয়াছেন। যেমন বান্দার কার্যাবলীতে ভাল-মন্দের বিষয়টি। যেইখানে মুতাযিলীগণ মনে করিত, বান্দা নিজের আকল দ্বারাই নিজের কার্যাবলীর ভাল-মন্দ বুঝিতে সক্ষম, সেইখানে আশ'আরীগণ মনে করে, বান্দার স্বীয় কার্যাবলীর ভাল-মন্দ বুঝা "শার'ঈ নস" তথা কুরআন-হাদীছের বর্ণনা নির্ভর। অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ যাহাকে ভাল বলে তাহা ভাল, আর যাহাকে মন্দ বলে তাহা মন্দ। এইদিকে মাতুরিদীগণ বলেন, বান্দার কাজে যাহা ভাল তাহা প্রকৃতিগত ভাল। আর যাহা মন্দ তাহাও প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ। শারী'আত তাহা আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছে। কিন্তু মানুষ আকল দ্বারা কিছু কিছু কাজের ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে। সে সকল কাজের ভাল-মন্দ 'আকল দ্বারা বুঝিতে সক্ষম নহে (দ্র. আইয়ূব আলী, 'আক'ীদাতুল ইসলাম, পৃ. ৩০৩-৪)।

ইমাম মাতুরীদির অনুসারিগণের মাঝে প্রখ্যাত 'আলিম যাঁহারা তাঁহার আকীদা বিষয় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন ঃ কাযী আবুল কাসিম ইসহাক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল (মৃ. ৩৪০ হি., মতান্তরে ৩৪২/৯৫৩)। তিনি হাকীম সামারক'ন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইব্ন সাঈদ আর-রাস্তাগ্ফানী, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল কারীম ইব্ন মূসা আল- বায্দুবী (মৃ. ৩৯০/১০০১), শায়খ আবূ 'আসিম ইব্ন আবিল লায়ছ আল-বুখারী (দ্র. আবদুল হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, পৃ. ১১৬, ১৯৫)। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। যথা হাকীম সামারক'ন্দীর "আক'ীদাতুল-ইমাম, শারহু ফিক্'হিল আক্বার, আস-সাওয়াদু'ল-আ'জ'াম এবং আল্লামা রাস্তাগফানীর কিতাবু ইরশাদিল মুহ্তাদী, কিতাবুয যাওয়াইদ, কিতাব ফিল-খিলাফ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪)।

পরবর্তী কালের ইমাম মাতুরীদির অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে কয়েকজন হইলেন ঃ (১) ফাখরুল ইসলাম আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল কারীম আল-বাযদুবী মৃ. ৪৮২/১০৭৯); (২) তাঁহার ভ্রাতা সাদরুল ইসলাম আবুল ইয়াসার আল-বাযদুবী (মৃ. ৪৯৩/১০০৯) এবং (৩) আবুল মু'ঈন মা'মূন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাক্হূ'লী আন-নাসাফী (মৃ. ৫০৮/১১১৪)। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যথাঃ তায্'কিরাতুল আদিল্লাহ, আত্-তামহীদু লি-ক'াওয়াইদিত তাওহ'ীদ, বাহ'রুল কালাম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, 'আব্বাসী যুগে আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের উৎপত্তি ঘটে। ইসলামী 'আকীদাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করেন। এই যুগে আহলুস-সুন্নাহ ব্যতীত আরও অনেক দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটে, যাহারা 'আকীদার মতবিরোধের সূচনা করে। ইহাদের মধ্যে মুসলিম দার্শনিক ও শী'আদের কথা উল্লেখযোগ্য। দার্শনিকদের মধ্যে আবূ ইয়ূসুফ ইয়া'ক্'ব ইব্ন ইসহ'াক' আল-কিন্দী (মৃ. ২৬০ হি.), আবূ নাস্র আল-ফারাবী (মৃ. ৩৩৫ হি.), ইব্ন সীনা (মৃ. ৪৮১ হি.), ইব্ন রুশ্দ (মৃ. ৫৯৫ হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন রচনাবলীর আলোকে ইসলামী 'আকীদার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। আহলুস্ সুন্নাহর বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ তাঁহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

খুলাফায়ে রাশিদীন ও উমায়্যা আমলে ইব্ন সাবা (দ্র.)-এর অনুসারী সাবাইয়া নামে এক পথভ্রষ্ট দলের আবির্ভাব ঘটে। অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের বিলুপ্তিও ঘটে। হযরত 'আলী (রা)-র ভক্ত শী'আ ফিরকা প্রথমে একটি রাজনৈতিক দল ছিল। পরবর্তী কালে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা ও বিচিত্র 'আকীদা-বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। তাহাদের মধ্যে ইস্মা'ঈলিয়্যা ফিরকা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী দল। তাহাদের মতে ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মাদ আত্মগোপন করিয়াছেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ইহা হইতেই তাহারা ইমাম মাহদীতে বিশ্বাসী। মধ্য এশিয়া, সিরিয়া, লেবানন, হিন্দুস্তান এবং আফ্রিকার কিছু এলাকায় তাহাদের উপস্থিতি এখনও বিদ্যমান। আগা খান তাহাদের নেতা হিসাবে গণ্য (দ্র. ড. 'ইরফান, দিরাসাত ফিল-ফিরাক' ওয়াল-'আক'াইদ, পৃ. ৬৮, ৬৯)। ইরান ও ইরাকে যেসব শী'আ রহিয়াছে তাহারা ইছ'না 'আশারিয়া নামে পরিচিত, তাহারা বার ইমামে বিশ্বাসী।

আব্বাসী যুগে সূফীতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ধারায় ভিন্ন ভিন্ন আকীদা-বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। এইগুলির মধ্যে ওয়াহ্'দাতুল ওয়াজূদ (সর্বেশ্বরবাদ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার উৎপত্তি আবূ ইয়াযীদ বিস্তামীর (মৃ. ২৭১ হি.) 'ফানা ওয়া বাক'া' এবং মানসূ'র হাল্লাজের (মৃ. ৩০৯ হি.) 'আনাল হ'াক্ক' মতবাদ

হইতে, যাহা পরবর্তীতে মুহ্‌ইদ্দীন ইব্‌নুল 'আরাবী আনদালুসীর (মৃ. ৬৩৮ হি.) হাতে দার্শনিক রূপ লাভ করে।

সাথে সাথে চরমপন্থী সূফীদের মাঝে সৃষ্টিজগত নিয়ন্ত্রণে ওয়ালীগণের বিশেষ প্রভাব সম্পর্কে এবং মহানবী (স)-এর নূর সম্পর্কে কিছু আকীদার উদ্ভব হয়। তবে ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসে সূফীতত্ত্বে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারীদের বর্ণিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রভাবও পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে হারিছ আল-মুহাসিবী (মৃ. ২৪৩ হি.), জুনায়দ আল-বাগদাদী (মৃ. ২৯৭ হি.), ইমাম কুশায়রী (মৃ. ৪৬৫ হি.) এবং ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মর্যাদা, ভালবাসা, মু'জিযা এবং ওয়ালীগণের কারামাত ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-হাদীছের আলোকে সীমা নির্ধারণ করিয়া তাঁহাদের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা বিভিন্ন আকীদার কিতাবেও স্থান পাইয়াছে। এই ধরনের তাসাওউফপন্থীদিগকে আহ্‌লুস্-সুন্নাহ্‌রই অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরিয়া নেওয়া হয়।

আহ্‌লুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতে আশ'আরী ও মাতুরিদী এই দুই ধারা আব্বাসী পরবর্তী যুগেও বিরাজমান থাকে। মাতুরিদী ও আশ'আরী আলিমগণ পূর্ববর্তী আলিমগণের গ্রন্থাদি সংক্ষেপণ, ব্যাখ্যা লিখন কিংবা পরিমার্জন, টীকা লিখন ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দেন। সেই হইতে আকাইদ বা কালাম শাস্ত্রে এক স্থবিরতা দেখা দেয়। তবে গ্রীক দর্শনের আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণাগুলি মুসলিম সমাজে প্রবেশের প্রেক্ষাপটে আলিম সমাজ সেইগুলির অসারতা প্রমাণে নিয়োজিত হন। এই ক্ষেত্রে ইমাম গাযালীর চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। তখন হইতে গ্রীক দর্শন 'ইলমুল কালামে প্রবেশ করে। মাতুরিদী ও আশ'আরীর পরবর্তী অনুসারী লেখকগণ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন এবং বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনায় মনোনিবেশ করেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে 'আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.) পূর্বতন হাম্বালী চেতনার উন্মেষ ঘটান এবং কুরআন-হাদীছ নির্ভর আকীদার প্রবর্তন করেন। তিনি দার্শনিক তাসাওউফপন্থী এবং কালামশাস্ত্রবিদদের সমালোচনা করেন। তাঁহার ছাত্র ইবনুল ক'য়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)-ও একই পন্থায় উপরিউক্ত বিষয়গুলির সমালোচনা করেন।

আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে ইসলামী আকীদা বিষয়েও কিছু নূতন ধারণার উন্মেষ ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিশিষ্ট আলিমগণের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংস্কারধর্মী চেতনার প্রকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রখ্যাত 'আলিম শাহ ওয়ালীউল্লাহ (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২)-এর সংস্কার কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "হু'জ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা" ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ইহাতে আকীদা ও তাসাওউফ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন, হাদীছ ও বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তিবাদের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন।

আকীদার ক্ষেত্রে আরও একটি সংস্কার আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহহাবের (মৃ. ১৭৮৭ খৃ.) নেতৃত্বে। তাঁহার কিছু কিছু বিষয় সমালোচিত হইলেও তাওহীদের আলোকে ইসলামী আকীদার যে স্বরূপ তাহা সালাফে স'লিহ'ীনের পদ্ধতি তথা কুরআন-হাদীছ অনুসারে প্রবর্তিত। বর্তমান সময় পর্যন্ত উহার প্রভাব যথেষ্ট জোরালো। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহহাবের 'কিতাবুত তাওহীদ', উস্'লুল ঈমান' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এইগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাঁহার অনুসারীরা। অপরদিকে সায়্যিদ আহমাদ খান এবং আমীর আলীর পাশ্চাত্য দর্শনপ্রীতি ও মুক্তবুদ্ধি চেতনাকে 'আব্বাসী যুগের মু'তাযিলীদের চিন্তা-চেতনার সাথে তুলনা করা হইয়া থাকে (ড. আইয়্যুব 'আলী, 'আক'ীদাতু'ল-ইসলাম, পৃ. ৪৯৩)। অতঃপর ধর্ম ও দর্শন এবং তাসাওউফের মাঝে সমন্বয় সাধনে কবি 'আল্লামা ইকবাল (মৃ. ১৯৩৮ খৃ.)-ও যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার আলোকে কালাম শাস্ত্রকে নবতর রূপ দিতে কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে জামালুদ্দীন আফ্‌গানী (মৃ. ১৮১৭ খৃ.) ও মুফতী মুহাম্মাদ 'আব্‌দুহু (মৃ. ১৯০৫ খৃ.), মাওলানা শিব্‌লী নু'মানী (মৃ. ১৯১৫ খৃ.), মাওলানা সুলায়মান নদবী (মৃ. ১৯৫৩ খৃ.) ও প্রফেসর ওয়াহীদুদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। জামালুদ্দীন আফগানীর আর-রাদ্দ আলাদ-দাহ্‌রিয়া (নাস্তিকদের মতবাদ খণ্ডন), মুহাম্মাদ 'আবদুহুর" রিসালাতুত তাওহীদ, শিব্‌লী নু'মানীর আল-কালাম ও 'ইলমুল কালাম এবং ওয়াহীদুদ্দীনের "ইলমে জাদীদ কি চ্যালেঞ্জ" (উর্দূ) নামক গ্রন্থগুলি গুরুত্বের অধিকারী।

'আব্বাসী যুগের শেষদিকে শী'আদের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। শী'আদের যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নাম ইমামিয়া ইছনা 'আশারিয়া। তাহারা বারজন ইমামে বিশ্বাসী। তাহাদের মতে ইমাম নিষ্পাপ। তাহারা 'আলী (রা)-সহ তাঁহার বংশধরকে ইমামতের একমাত্র হকদার বলিয়া বিশ্বাস করে। ইমামের ওসিয়াতে ইমাম হইবে (দ্র. সায়্যিদ আবুল হাসান নদবী, সূরাতান মুতাযাদ্দাতান, পৃ. ৫৪; ইমাম খোমেনীর লিখিত গ্রন্থ কাশফুল আসরার হইতে উদ্ধৃতির ভিত্তিতে, দ্র. কাশফুল আসরার, পৃ. ১১৪)।

'আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের মূলনীতি ঃ যেই সমস্ত মূলনীতির আলোকে 'আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা হইল ঃ

ক) মুতাওয়াতির বা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক অকাট্য বর্ণনায় (হাদীছে) দৃঢ় আস্থা বা ইয়াকীন থাকিতে হইবে।

খ) 'আকীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা প্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য।

গ) কুরআন ও সুন্নাহ্‌র যেই সকল বাণীতে 'আকীদার বিষয়গুলি বর্ণিত সেইগুলির সাধারণ অর্থ যাহা সহজে বোধগম্য তাহাই উহাদের সঠিক অর্থ। অযথা ব্যাখ্যা করা চলিবে না। এই সমস্ত মূলনীতির উপর ইসলামী আকীদাগুলি নির্ভরশীল।

ঘ) 'আকীদা অন্বেষণকারীকে সত্য ও সঠিক 'আকীদা অন্বেষণে সাধনা করিতে হইবে এবং সঠিক আকীদা প্রাপ্তির পর কোন ব্যক্তিবিশেষের কথায় প্রভাবিত হইবে না।

ঙ) ভ্রান্ত 'আকীদা বা ধ্যানধারণা অন্তর হইতে বিদূরিত করিতে হইবে।

চ) সকল ধরনের প্রভাবমুক্ত হইয়া আকীদা সংক্রান্ত মতামত বিচার করিতে হইবে।

ছ) অকাট্য বিষয়কে সন্দেহজনক বিষয় মনে করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। যেইখানে জ্ঞান খাটাইয়া ও চিন্তা-ভাবনা করিয়া কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব সেইখানে অন্ধ অনুকরণ বর্জনীয়।

জ) মানব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। অদৃশ্য জগতের বিষয় সম্পর্কে অনুমান করিয়া কিছু বলা যাইবে না। অদৃশ্য বা গায়ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক যতটুকু জানাইয়াছেন ততটুকু যথেষ্ট মনে করিতে হইবে।

মাযহাবগুলির মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করিবার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

১। সত্য হইতে হইবে সুস্পষ্ট, যেন সাধারণ সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বভাবতই বুঝিতে পারে। ইহাতে গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন হইবে না।

২। সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করিবার পথে এমন বাধা থাকিবে না যাহার অপসারণ দুষ্কর।

৩। সত্য এমন অবস্থায় বিরাজমান হইতে হইবে কোন রকম বাধা না থাকিলে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যেন তাহা পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করিতে নির্দ্বিধায় সাড়া দেয়।

৪। কথিত সত্যটি এই বিশ্বচরাচর তথা সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শনাবলীর বিরোধী না হওয়া যাহা বাস্তবে লক্ষ্য করা যাইতেছে।

৫। পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হইল, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের মূলনীতিগুলিকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করিয়া যাহা উপরিউক্ত নীতিগুলির আলোকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে হইবে তাহা গ্রহণ করা।

আর সাধারণ মানুষের উচিত হইল আগেকার সময়ে মানুষ যেইভাবে বিভিন্ন নবীগণের বিভিন্ন রকম অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাস করিত, আজিও কুরআন কারীমে ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সীরাতের অলৌকিকত্ব অনুধাবন করিয়া কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে যেই আকীদার কথা বলা হইতেছে তাহাতে বিশ্বাস করা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যেইখানে কুরআন কারীমের বিভিন্ন রায় বা ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে মানিয়া লওয়া হইতেছে, 'আকীদার ক্ষেত্রে সেই কুরআন-সুন্নাহ বাতিল কিছু লইয়া আসে নাই। অতএব এই বিবেচনায় ইসলামী 'আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত তথা বাঞ্ছনীয়ও বটে।

'আকীদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দলের মাঝে নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয় সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, মহানবী (স)-এর একটি হাদীছ হইতে জানা যায়, উম্মতে মুহাম্মাদী ৭৩টি দলে বিভক্ত হইবে। এইগুলির মাঝে একটি দলই আখিরাতে নাজাত লাভ করিবে, বাকীগুলি পথভ্রষ্ট তথা নাজাত লাভ করিবে না। সুতরাং সেই একটি দল কোনটি এই সমস্যা সমাধানের কয়েকটি মূলনীতি রহিয়াছে, যেইগুলির আলোকে বিচার করা যাইবে কোনটি নাজাতপ্রাপ্ত হইবে।

১। সত্যের মানদণ্ড একমাত্র কুরআন কারীম ও সহীহ্ সুন্নাহ (যদিও সহীহ্ সুন্নাহের ব্যাপারে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সহীহ্ হওয়ার মানদণ্ডে যেইগুলির সহীহ হওয়া সম্বন্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইগুলির ব্যাপারে অন্তত আপত্তি না করা। অন্যথায় কোনভাবেই সমাধান না হইলে অন্তত কুরআন কারীমের ভাষ্যের উপর নির্ভর করা)। এই মানদণ্ডের আলোকে যাহার মতামত সঠিক হইবে তাহাই সত্য ও সঠিক।

আর শুধু কুরআন কারীমের নির্দেশ মানিলেই চলিবে না, কুরআন কারীম যাহাদিগকে মানিয়া লইতে বা যাহাদের অনুসরণ করিতে বলিতেছে তাহাদিগকেও মানিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে। এই অর্থেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ জরুরী হয়। কারণ কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলেরও আনুগত্য কর" (৪ ঃ ৫৯)।

তবে রাসূলের কোন হাদীছ দ্বারা কুরআন কারীমের কোন সুষ্ঠু রায় রহিত করা যাইবে না। এই নীতি যাহারা অনুসরণ করে তাহারাই নাজাতপ্রাপ্ত।

২। শারী'আতের হিকমত হইল ইসলাম ও মুসলিম সমাজের মাঝে ঐক্য বিধান করা। অতএব যে দল ইসলামের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য সংরক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী তাহারাই নাজাতপ্রাপ্ত।

৩। মহানবী (স)-কে রাসূল-পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ স্বচক্ষে দেখে নাই। এই দীন ইসলামকে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের মাধ্যমে তাহারা জানিতে পারিয়াছে। অতএব সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁহাদের অনুসারী তাবিঈগণই এই দীনের প্রকৃত বাহক ও রক্ষক। তাঁহারা মহানবী (স)-এর সুন্নাহ হইতে যেই 'আকীদা পাইয়াছেন তাহাই আমাদের নিকট সত্য। সুতরাং যেই দল রাসূলের সুন্নাহ ও তাঁহার সাহাবীদের অনুসারী তাহারাই নাজাতপ্রাপ্ত। এইজন্য মহানবী (স) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তবে নাজাতপ্রাপ্ত দল হইল ما انا عليه واصحابى (যাহারা আমি ও আমার সাহাবীদের পথে চলিবে) (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাব মা জা'আ ফী ইফতিরাকি হাযিহিল উম্মাহ, ৫খ., পৃ. ৩৬)। সুতরাং যাহারা তাঁহাদের নিকট হইতে আকীদা বিষয় গ্রহণ না করিয়া গ্রীক দর্শন বা অন্য কোন মতবাদ হইতে আকীদা গ্রহণ করে তাহারা নাজাতের আশা করিতে পারে না।

৪। ইসলামের অভ্যুদয় প্রথমত মক্কা ও মদীনায় হইয়াছে। সেখানকার অধিবাসীরা যে আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাকেই সঠিক ধরিয়া লওয়া অধিক যুক্তিসংগত। ইসলামী আকীদার অন্য কোথাও হইতে ধার লওয়ার প্রয়োজন নাই।

৫। নাজাতপ্রাপ্ত দলের আরও একটি পরিচয় হইল, তাহারা দীন ইসলামের মৌলিক কোন 'আকীদা (যেমন খতমে নুবুওয়াত ইত্যাদি) অস্বীকার না করিলে কুফরী ফতওয়া দেয় না। বাহ্যত ইসলামের মৌলিক বিষয় মানিয়া লইলে তাহারা কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে না। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ পাকই জ্ঞাত।

মানুষের আকীদা নষ্টকারী বিভিন্ন বিষয় ঃ মানবজীবনে বিভিন্ন বিষয় আছে যাহা তাহার আকীদা-বিশ্বাসকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তন্মধ্যে — (১) প্রচলিত আদত-অভ্যাস যাহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর। (২) মানুষের অন্তর নরম। তাই সে যখন শুধু আবেগের বশবর্তী হইয়া চলে তখন তাহার আকীদায় বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। (৩) কোন কোন মানুষ স্বভাবত সঠিক

আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। (৪) কোন কোন সময় ভুল কথা বারবার প্রচারিত হইলে মানুষ তাহা পরিত্যাগ করিয়া সঠিক আকীদা গ্রহণে অক্ষম হয়। (৫) পূর্বপুরুষদের ইসলাম পরিপন্থী ধ্যানধারণা অনুসারে চলিলে। ৬. ভুল তথ্য পরিবেশনও 'আকীদা বিনষ্ট করিতে পারে। (৭) কোন ব্যক্তির সাহচর্যে ও প্রভাবে সঠিক 'আকীদা লোপ পাইতে পারে। (৮) অসৎ সঙ্গের প্রভাবেও আকীদা নষ্ট হইতে পারে। (৯) সঠিক 'আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তির অসদাচরণেও আকীদা নষ্ট হইতে পারে। (১০) চুলচেরা বিশ্লেষণ বা খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি অনুসন্ধানে অধিক আগ্রহ আকীদা নষ্ট করিতে পারে। (১১) ধারণা বা অনুমান নির্ভর আচরণেও আকীদা নষ্ট হইতে পারে। (১২) দীনের ব্যাপারে বেশী বেশী প্রশ্ন এবং তর্ক-বিতর্কেও আকীদা নষ্ট হইতে পারে। (১৩) আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তির ভুলের কারণেও তাহার অনুসারীদের আকীদা নষ্ট হইতে পারে। (১৪) অর্থনৈতিক সংকটেও আকীদা নষ্ট হইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্-তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, আল-জামিউস সাহীহ, মাত্বা'আতু মুসতাফা আল-হালাবী, কায়রো ১৯৬২/১৩৮২; (২) আন্-নাদাবী, আবুল হাসান 'আলী, সূরাতানি মুতাযাদ্দানি 'ইন্দা আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াশ-শী 'আতিল-ইমামিয়া, ইদারাতু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল ইসলামী, কাতার ১৪০৬/১৯৮৬; (৩) আল্-আশ 'আরীআবুল হাসান, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, মাক্তাবাতুন্ নাহ্দাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০; (৪) আল-আশ'আরী, আল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ দিয়ানা, দারুল আনসার, কায়রো ১৩৯৭/১৯৭৭; (৫) আল-আসকালানী ইব্ন হাজার, ফাত্হুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, আল-মাত্বা 'আতুল আসরয়্যা, কায়রো ১৩০১ হি.; (৬) শায়খ মুহাম্মাদ আস্-সালিহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের আকীদা, অনুবাদঃ আবুল খায়ের মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ঢাকা ১৯৯৪ খৃ.; (৭) মুল্লা 'আলী আল্-ক'ারী, শারহু' কিতাবিল-ফিক'হিল-আক্বার, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪; (৮) আবদুল কাদির, মতবাদ ও মীমাংসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৯) আল-কুরআনুল কারীম, বঙ্গানুবাদঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইফাবা, ঢাকা ১৯৯০, ৪র্থ সংস্করণ; (১০) মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কু'শায়রী, সহীহ মুসলিম, দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.; (১১) ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, ইলামুল-মুওয়াক্কিঈন আর-রাব্বিল আলামীন, মাতবা'আতু মুনীর, দামিশক তা. বি.; (১২) আল-বাগদাদী আবদুল কাহির, আল-ফারক বায়নাল ফিরাক, কায়রো, দারুল আনসার ১৯৪৮ খৃ.; (১৩) আল-বায়াদী কামালুদ্দীন, ইশারাতুল মুয়ায 'আন 'ইয়ায়াতিল ইমাম, কায়রো, মাত্বাআতু মুসতাফা হালাবী, ১৩৬৮/১৯৪৯; (১৪) ড. আয়্যুব আলী, আল-'আক'ীদাতুল ইসলাম ওয়াল-ইমাম মাতুরীদী, ঢাকা, ইফাবা ১৪০৪/১৯৮৩; (১৫) আল-ফারহারী 'আবদুল আযীয, আন-নিবরাস শারহু' শারহি'ল-'আক'াইদিন-নাসাফিয়্যা, মুলতান, মাক্তাবায়ে ইমদাদিয়া, তা.বি.; (১৬) আবদুর রায্যাক শায়খ মুসতফা, তামহীদু লি-তারীখিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা, কায়রো, মাত্বা'আতু লাজনাতিত তা'লীফ ১৩৬৩ হি.; (১৭) শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু, রিসালাতুত-তাওহীদ, কায়রো, দারুল মা'আরিফ, ৩য় সংস্করণ, তা.বি.; (১৮) ড. ইরফান, আবদুল হামীদ, দিরাসাত ফিল-ফিরাক ওয়াল-আকাইদ, বৈরূত, মুআস্সাসাতুর রিসালা; (১৯) আবূ যাহ্রা শায়খ মুহাম্মাদ, তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়া (মিসর, দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি.); (২০) আল-হাফিজ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, কায়রো ১৩৮২/১৯৬২; (২১) আল-মাস্'উদী আবুল হাসান আলী ইব্ন হুসায়ন, মুরূজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনুল জাওহার, কায়রো, মাত্'বা'আতুস সা'আদা ১৯৪৮ খৃ.; (২২) আল-মু'জামুল ওয়াসীত, মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, দিল্লী, কুতুবখানা হুসায়নিয়া, তা.বি.; (২৩) আল-মুরতাদা, আলী ইব্ন হুসায়ন, আল-আমালী, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪; (২৪) আল-লাখনাবী সায়্যিদ আবদুল হায়্যি, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা, কায়রো, মাত্বাআতুস সা'আদা ১৩২৪; (২৫) আশ্-শালাবী ড. আহমাদ, মুকারানাতুল আদ্য়ান, কায়রো, মাক্তাবাতুন-নাহ্দাতিল মিসরিয়্যা ১৯৮৬ খৃ.; (২৬) আশ-শাহরাস্তানী আবুল-ফাত্তাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল কারীম, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, কায়রো, মাত্বা'আতুল আযহার ১৯৪৭/১৩৬৬; (২৭) আস্-সাবিক আস্-সায়্যিদ, আল-'আক'াইদুল ইসলামিয়া, বৈরূত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৬ হি.; (২৮) আস্-সুয়ূতী জালালুদ্দীন, আল-ইত্কান ফী 'উলূমিল কুরআন, কায়রো, আল-মাত্বাআতুল হিজাজিয়্যা, ১৩৬৮ হি.; (২৯) আহমাদ আমীন, ফাজ্রুল ইসলাম, কায়রো, মাতবাআতু লাজনাতিত্ তালীফ ওয়াত-তারজামাতি ওয়ান-নাশ্র ১৯৫০ খৃ.; (৩০) ঐ লেখক, দুহাল-ইসলাম, কায়রো, মাত্বাআতু লাজ্নাতিত-তালীফ, ১৯৫২ খৃ.; (৩১) ঐ লেখক, জুহরুল ইসলাম, কায়রো, মাত্বাআতু লাজনাতিত্ তালীফ ১৯৫২ খৃ.; (৩২) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, কায়রো, আল-মাত্বাআতুল কুবরা ১২৯০ হি.; (৩৩) ইব্ন খালদূন, আল-মুক'াদ্দিমা, কায়রো, মাত্বাআতু মুসতাফা মুহাম্মাদ, তা.বি.; (৩৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, কায়রো, মাত্বাআতুস সা'আদা ১৩৬৭ হি.; (৩৫) ইব্নুন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, কায়রো, আল-মাতবা'আতুর রাহমানিয়্যা ১৩৪৮ হি.; (৩৬) দাইরাতুল মা'আরিফ, লাহোর (উর্দূ), দ্র. শিরো. 'ইলমুল 'আক'াইদ; (৩৭) আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, অনু. এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্শী, দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৯০ খৃ.; (৩৮) ডঃ মাযহারুদ্দীন সিদ্দীকী, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১খৃ.; (৩৯) প্রমোদ সেন গুপ্ত, ধর্ম দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৩য় সং, কলিকাতা ১৯৮৯ খৃ.।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

আকীনজ'ী (آقینجی) ঃ 'উছ্মানী শাসনামলে প্রথম শতাব্দীগুলিতে ইউরোপে অবস্থিত এবং প্রধানত তথায় কার্যরত অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্যদল। এই নামটি ক্রিয়া বিশেষ্য আকীন (Akin) হইতে উদ্ভূত (আকমাক [ak-mak] হইতেও নিষ্পন্ন, প্রবাহিত হওয়া, বাহির হইয়া পড়া অর্থবোধক) যাহার অর্থ দাঁড়ায় "শত্রুর উপর আক্রমণ, শত্রুর এলাকায় আকস্মিক হামলা"। যাহারা বিদেশী ভূখণ্ডে লুণ্ঠন অথবা ধ্বংসাত্মক কাজে সামরিক অভিযানে বহির্গত হইত তাহাদেরকেই "আক'ীনজী" নামে আখ্যায়িত করা হইত (M. Zeki Pakalin, Osmanli tarih

deyimleri ve terimleri sozlugu, Istanbul 1946, 36)।

দ্বিতীয় মুহাম্মাদের খাজাঞ্চি জি. এম. এ্যাংগীওলেল্লো (G. M. Angiolello) উযুন হাসানের বিরুদ্ধে (১৪৭৩) পরিচালিত সামরিক অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শীরা চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন (অনু. Charles Grey)। পাঁচটি বাহিনী সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে সেই বাহিনীগুলি ছাড়াও আগানিয-এর আরও একটি বাহিনী ছিল যাহারা বেতনভোগী ছিল না। গেরিলা যুদ্ধে বিজয়ের পর যে গনীমত তাহারা লাভ করিত উহাই ছিল তাহাদের প্রাপ্য। তাহারা অন্য কোন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সেনা ছাউনিতে বাস করিত না। তাহাদের কাজ ছিল যে কোন বাধা পদদলিত করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে আগাইয়া যাওয়া, লুণ্ঠন করা এবং শত্রু-দেশকে যে কোন্‌ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা। তথাপি তাহাদের নিজেদের মধ্যে চমৎকার শৃংখলা বজায় ছিল এবং এই শৃঙ্খলা ছিল যেমন যুদ্ধের ময়দানে তেমনি অবকাশ যাপনেও। এই বিভাগে ৩০ হাজার সৈন্য ছিল।

এই সাহায্যকারী সৈন্যদল ঐতিহ্যগতভাবে গঠিত হয় আনাতোলিয়ার তুর্কোম্যান (Turcoman) উপজাতি হইতে শুরু করিয়া সাল্‌জূক পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকজনের সমন্বয়ে। আকীনজী সমর্থিত ইর্‌তুগ্রুল ও বায়যান্টাইন-তাতারের মধ্যে ১৩শ শতকের শেষভাগে ব্রুসার প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু খুব সম্ভব বর্ণনাটিতে কিছু সত্য নিহিত আছে। আকীন শব্দটি নৌ-অভিযানকে বুঝাইবার জন্যও ব্যবহার করা হইত। Enweri (সম্পা. M. H. Yinanc, Istanbul 1928, 24) বসফোরাসের সন্নিকটে ৩৫টি যুদ্ধ জাহাজের একটি নৌ-অভিযানের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Neshri-এর বর্ণনায় আকীনজী কাদীলারী (akindji kadilari) বা আকীনজী বিচারকের উল্লেখ আছে। তুর্কীগণ যতই বলকানের উত্তরাঞ্চলের সুরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ জনপদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই উছমানী সৈন্যবাহিনীর এই অনিয়মিত ইউনিটগুলি স্বেচ্ছায় সুসংগঠিত হইতে লাগিল। ভিদিন-এর ফীরূযবে-কে প্রথম বায়াযীদ ওয়াল্লাসিয়া (Wallachia) অভিযানের হুকুম প্রদান করেন। ১৩৯১ খৃ. তুর্কীরা (akindji) প্রথমবারের মত দানিয়ুবের উত্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ৪০ হইতে ৫০ সহস্রের মধ্যে ছিল। এই সকল সৈন্যের পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়াছিলেন বিভিন্ন গোত্রপ্রধান (Bey); ইউরেনোস (Ewrenos) বের বংশধর ইউরানোস ওগুল্লারী (Ewrenos Oghullari) (উত্তর-পশ্চিমে গুমুনজিনা, সেরেজ, ইশকোদ্‌রা), Kose Mikhal-এর বংশধর Mikhal Oghullari, Palaeologi পরিবারের এক নও মুসলিম সার্বিয় হাঙ্গেরী; তুর্খান-ওগুল্লারী (Smederevo- Semendire, গ্রীস, Wallachia ও ভেনেসিয়ান ভূখণ্ডের দিকে); Malkoc ও গুল্লারী মূলত বসনিয়ার অধিবাসী, যেইখানে তাহাদের বলা হইত মালকোভিচ (Malkovitch) [হাঙ্গেরী, Wallachia, Moldavia ও পোলাণ্ড); কাসিম-ওগুল্লারী (ভিয়েনায় ১৫২৯ খৃ.]।

১৬শ শতকের দিকে আকীনজী বাহিনীর গুরুত্ব ও বীরত্ব বেশ কিছুটা হ্রাস পায়। ওয়ালিসিয়ার Mihai Viteazul-এর বিরুদ্ধে প্রধান উযীর কোজা সিনান পাশার দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধ অভিযানের (১৫৯৫ খৃ.) ফলে তাহারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। Giurgiu (Yerkoyu)-তে দানিয়ুব নদীর তীরে রোমান ভূখণ্ডে আকীনজীদের মূলোৎপাটন করা হইয়াছিল এবং তাহারা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। ১৬০৪ খৃ. প্রথম সুল্‌তান আহ্‌মাদ হাঙ্গেরীর অভিযানে যোগদানের জন্য মীখাল ওগ্‌লুর সকল গোত্রপ্রধান (Bey)-কে আদেশ করেন। আকীনজীগণ দ্রুত নূতন সমর পদ্ধতিতে পূর্ণভাবে নিজেদেরকে খাপ খাওইয়া লইল। গোলন্দাজ, অস্ত্রাগার রক্ষক ও গাড়ী চালকরূপে সেনাদলের তালিকায় তাহাদের নাম নথিভুক্ত করিবার এবং নিয়মিত মাসহারা প্রদানের জন্য দাবি জানায়।

উছমানী সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসবেত্তা Koci Bey ১৬৩০ খৃ. লিখিত তাহার রিসালায় (Risale, সম্পা A. Wefik Pasha, London 1279/1862, 17) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আকীনজীগণ বেতনভোগী সৈন্য হিসাবে অথবা নিয়মিত সৈন্য হিসাবে বাকী থাকে অথবা সৈনিকবৃত্তি ছাড়িয়া দেয়; শেষ পর্যন্ত কোনভাবে দুই হাজার আকীনজী সেনাবাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে। উছমানী নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে সংযুক্ত হওয়ায় তাহাদের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় এবং তাহারা উছমানী সেনাবাহিনীর অংশরূপে পরিগণিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Mehmed Zeki, Akinlar weakindjilar, TOEM, viii, 286 প.; (২) Ahmet Refik, Turk akindjilari, Istanbul 1933; (৩) N. Iorga, Notes et extraits pour servir a l' histoire des croisades au XVe siecle, v, Bucharest 1915, 339; (৪) GiovanMaria Angiolello, A short narrative of the life and acts of the King Ussun Cassano, in the Hakluyt coll., A narrative of Italian travels in Persia, in the fifteenth and sixteenth centuries, London 1873, 80; (৫) I. H. Uzuncarsili, Osmanli devleti teskilatina medhal, Istanbul 1941, 250; (৬) Ahmed djewad Pasha, Tarikh i Askrei-yi Othmani, Kitab-i Ewwel : Yeniceriler, Istanbul 1297, i, 4 and French text, 19; (৭) Friedrich Giese, Die attosmanischen anonymen Chroniken in Text und Übersetzung, Breslau 1922, i, 28; (৮) Tarikh-i Naima, Istabuul 1147, i, 68; (৯) Zinkeisen, iii, 185-88; (১০) A. Decei, L. expedition de Mircea cel Batran contre les akinci de Karinovasi (1393) in the Revue des Etudes Roumaines, Paris, i, (1953).

A. Decei (E.I.[2]) / সালেহ উদ্দীন আহমদ

'আকীল ইব্‌ন আবী তা'লিব (عقيل بن ابى طالب) ঃ (রা), হযরত আলী (রা)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বয়সে হযরত আলী অপেক্ষা বিশ বৎসরের বড় ছিলেন। বদর প্রান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া বন্দী হন এবং হযরত আব্বাস (রা) পণ আদায় করত তাঁহাকে মুক্ত করেন। তিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ পরস্পর বিরোধী তথ্য প্রদান করিয়াছে (বালাযু'রীর মতে মক্কা বিজয়ের পর, ইব্‌ন হ'াজারের মতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সামান্য আগে অথবা পরে ইত্যাদি)। খায়বার ও মূতার অভিযানে এবং মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে তাঁহার অংশগ্রহণ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তথ্য প্রদান করা হইয়াছে। হযরত আলী ও হযরত মু'আবি'য়া (রা)-এর মধ্যে বিরোধের সময় তিনি উমায়্যাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাঁহার ভাই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বায়তুল মাল হইতে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আসলে দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও 'আক'ীল (রা) তাঁহার উপস্থিতিতে হযরত আলীকে অবমাননা করিতে দিতেন না।

তাঁহার পরিবার ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উহাতে বহু লোকজন ছিল। সম্ভবত তিনি ৫০/৬৭০ সনে ইন্তিকাল করেন এবং মদীনায় সমাহিত হন। তিনি কতিপয় পুত্র সন্তান রাখিয়া যান যাঁহারা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় হযরত হু'সায়ন (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন যিয়াদের হাতে নিহত মুসলিম ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম এবং অবশিষ্ট ছয় কি নয়জন সকলেই কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। 'আক'ীল কুরায়শদের বংশ তালিকা ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতাবলেই তিনি কুরায়শদের চারিজন মধ্যস্থতাকারীদের অন্যতম (হ'াকাম— حكم) হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন এবং হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় নাম তালিকা (ديوان) সংকলনে সাহায্যকারী হিসাবে আহূত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি অতুলনীয় সহজাত বাগ্মিতার জন্যও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তাৎক্ষণিক ও তীক্ষ্ণ জবাবসমূহ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ৪/১খ., ২৮-৩০ এবং নির্ঘণ্ট; (২) জাহি'জ, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, নির্ঘণ্ট; (৪) বালাযু'রী, আন্‌সাব, ms. Paris, 416r-417v; (৫) ত'াবারী, ৩খ., ২৩৪০ প. ও নির্ঘণ্ট; (৬) ফিহ্‌রিস্‌ত, কায়রো সং, ১৪০; (৭) মাস্‌'উদী, মুরূজ, ৫খ., ৮৯-৯৩ ও নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্‌নুল আছ'ীর, উস্‌দ, কায়রো সং, ৩খ., ৪২২-২৪; (৯) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবা, কলিকাতা, নং ৯৯৯৪, কায়রো সং নং ৫৬২৮; (১০) ঐ লেখক, তাহ্‌যী'বুত্‌-তাহ্‌যী'ব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-২৭ হি., ৭খ., নং ৪৬৩; (১১) আগ'ানী, ১৫ খ., ৪৫ প. ও তালিকা; (১২) বায়হাকী, মাহ'াসিন, ৪৯২; (১৩) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহী, ইক্'দ, বূলাক ১২৯৩, ২খ., ১৩৩ প.; (১৪) সাফাদী, নাক্‌ত, ২০০; (১৫) নাওয়াবী, তাহ্‌যী'বুল আস্‌মা, ৪২৬-২৭; (১৬) H. Lammens, Etudes sur le regne du calife omayade moawia I, Beirut 1906-7, 91, 112-3, 175 প.; (১৭) বালাযু'রী হইতে অনূদিত অনেক কাহিনী (a series of anecdotes), Caitani-র Annali, 37 a. H. and 176-তে পাওয়া যায়, আরও কিছু উদ্ধৃতি তাহার Chronographia, 50 a. H. No. 39, 551-তে রহিয়াছে।

L. Veccia Vagliere (E.I.[2]) / মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

আকূ'নীতুন (اقونيطن) ঃ (গ্রীক akhoniton), চিকিৎসা সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থাদিতে এই শব্দটির ব্যবহার প্রায়শ দেখা যায়। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদের শিকড়লব্ধ মারাত্মক বিষ। ইহা (ক) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে বা (খ) ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত এক প্রকার বস্তুকে বুঝায়। (ক)-এর সমার্থক হইতেছে খানিকুন্‌-নিম্‌র; খানিকুয্‌-যিব, ক'াতিলুন্‌-নিম্‌র ও বিষ। এই শেষোক্ত শব্দটি সাধারণভাবে (খ)-এ উল্লিখিত বস্তুটির নামরূপে গৃহীত হয়। আকূ'নীতুন 'আরবী উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত সাহিত্যের একটি চিরন্তন সমস্যার উদাহরণ। উক্ত নামটি দ্বারা বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ উদ্ভিদকে বুঝায় এবং ইহার সমার্থক গ্রীক শব্দই বা কোন্‌টি ?

(ক) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ঃ গ্রীক রচনায় akhoniton নামক বিষঃ Nicander তাঁহার Alexipharmaca গ্রন্থে (পৃ. ৯৫, ছত্র ১১-৭৩) ইহার প্রতিষেধকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। Theophrastos দুই প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন, (ক) akhoniton নামক উদ্ভিদ যাহার শিকড় চিংড়ি মাছের আকারের; (খ) okhoreion যাহা প্রয়োগে বৃশ্চিকের হুল ফোটানোর বিষের উপশম হয় (HP ৯. ১৬. ৪ ও ৯. ১৮. ২)। তু. paulus of Aegina (ইংরেজী অনু. F. Adams, London 1844-8, iii, 28) Dioscorides-ও অনুরূপভাবে দুই প্রকারের উদ্ভিদ তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, বিপরীতক্রমে প্রায় অনুরূপ বর্ণনায় ঃ (১) উপরের (খ) তৎসহ বিভিন্ন গ্রীক সমার্থক নাম, যথা Khammaron ও অন্যান্য (৪, ৭৭); (২) উপরের (ক) যাহা aukhokhronon-এর সমার্থক (৪,৭৮)। Dioscorides-এর গ্রন্থ যখন 'আরবীতে অনূদিত হয় তখন অঞ্চল ভেদে উদ্ভিদের প্রজাতির প্রকারভেদের সম্ভাবনা সর্বদা বিবেচনা করা হইত না—কোন কোন ইয়ুনানী নামের প্রতিবর্ণায়ন করা হয়। কিন্তু পরে অধিকাংশকে যথাযথ 'আরবী নাম দেওয়া হয়। Julia Anicia পাণ্ডুলিপিতে (৬ষ্ঠ শতক). যেইখানে 'আরবীতে টীকা লেখা রহিয়াছে সেইখানে গ্রীক (akhoniton)-কে বুঝান হইয়াছে ঃ (১) আকূ'নীতুন ও খানিকুন-নিম্‌র-রূপে; (২) খানিকুয-যিবরূপে (পত্রী ৫৬ খ.)।

এই সকল অংশের 'আরবী সংস্করণে (Bodleian MS Hyde 34) (১)-এর সমার্থকরূপে লিখিত হইয়াছে নাব্বাল ও খানিকুন্‌-নিম্‌র (পত্রী ১২৩ক, হাশিয়ায়)। নাব্বাল শব্দটি ইব্‌ন জুল্‌জুল্‌কৃত Dioscorides-এর তাফ্‌সীরে (মাদ্রিদ, Biblioteca Nacional, পাণ্ডুলিপি নং ৪৯৮১, পত্রী ৭ক); ইব্‌ন জুল্‌জুল্‌কৃত Dioscorides-এর পরিশিষ্ট অংশে (পাণ্ডুলিপি Hyde ৩৪, পত্রী ১৯৮ খ.) নাব্বাল-কে একটি বিষাক্ত উদ্ভিদরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার প্রতিষেধক বুস্তান আবরূয (Amaranthus tricolor L.)। তু. F.

J. Simonet, Glosario de voces ibericas y latinas usadas entre los mozarabes, Madrid 1888, 395.

(খ) ভারতবর্ষ ঃ বিষ, যদিও কখনও আকূ'নীতূনের সমার্থক বলিয়া মনে করা হয়, তথাপি ইহা সম্ভবত অনেক অধিক বিষাক্ত কোন উদ্ভিদ (সম্ভবত Aconitum Ferox Wall) এবং ইহাকে তীব্রতম উদ্ভিদ বিষ বলিয়া যাহারা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ছ'াবিত ইব্ন কুররা (যা'খীরা, অধ্যায় ২৫, পৃ. ১৪৩ (২৯৮). জাবির ইব্ন হ'ায়্যান (Gifte, ৫৬=পত্রী ৪৬ ক-খ., ১০৪=পত্রী ৯৫ খ., ১৮৫ পত্রী=১৭৯ক), ইব্ন ওয়াহশিয়্যা (poisons. 84-5. 108), ইব্ন সীনা (কানূন, ১খ., পৃ. ২৭৬, ৩খ., পৃ. ২২৩), আল-বীরূনী (সায়দালা, 'আরবী পৃ. ৮১, ইংরেজী পৃ. ৫৩)। প্রায় সকলে একমত, শ্রেষ্ঠতম প্রতিষেধক (তিরয়াক') প্রয়োগ করিলেও ইহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইব্ন সীনা বিষবৃক্ষ, খানিকুয্-যিব ইত্যাদি নামে পরিচিত উদ্ভিদের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, শেষোক্তটির বর্ণনা তিনি আলাদাভাবে দিয়াছেন (১খ., পৃ. ৪২৪, ৪৬০)।

(গ) সম্ভাব্য পরিচিতি (identification) ঃ যদিও (ক) আকূ'নীতুন-কে প্রায়শ Aconitum sp. বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে (যেমন গালিব ১.৮৬, নং ১৭৫২-৭, Issa 5.I, তু./W. Schmucker, Die Pfianzliche und mineralische Materia Medica im Firdaus al-Hikma des Tabari, Bonn 1969, পৃ. ১২৬, নং ১৫৭, সেইখানে বিষ akhoniton), জনৈক আধুনিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী সম্ভাব্য মনে করেন, akhoniton বলিতে Dioscorides যাহা বুঝাইয়াছেন উহা ছিল একটি Doronicum sp., (২) একটি Derphinium sp., সম্ভবত D. staphisagria বা D. Elatum, (খ) বিষ-এর ক্ষেত্রে উদ্ভিদকে বাড়িবার কালে চিহ্নিত করিতে হয় নাই, 'আরবগণ ইহাকে ভারতবর্ষের মারাত্মক একটি বিষ বলিয়াই জানিত (Issa 8.১৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dioscorides, De materia medica, সম্পা. D. G. Kuhn, Leipzig 1829; (২) ঐ লেখক, Codex Aniciae Iulianae picturis illustratus, nunc Vindobonensis Med. Gr. i, Ieiden 1906 (ফোটা টাইপ সংস্করণ); (৩) La Materia medica de Dioscorides, ii, ed, C, E, Dubler and E, Teres, Tetuan 1952; (৪) Bodleian MS Hyde 34; (৫) Theophrastus, History of Plants ed, and transl, A, Hort, Loeb edn., London 1916; (৬) Nicander, Alexiphar-maca, ed., A.S.F. Gow and A.F. Scholfield, Combridge 1953; (৭) 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্নুল-বায়তার, আল-জামি লি-মুফ্রাদাতিল-আদবি'য়া ওয়াল-আগ্'যি'য়া, কায়রো ১৮৭৪ খৃ.; (৮) ছ'াবিত ইব্ন কুররা, কিতাবুয-য'াখীরা ফী 'ইল্মিত্ তি'ব্ব, সম্পা. জি. সূব্হী, কায়রো ১৯৮২খৃ.; (৯) রাব্বান'আত্'-ত'াবারী, ফিরদাওসুল হি'কমা, সম্পা. এম. জেড. সিদ্দীকী, বার্লিন ১৯২৮; (১০) "The abridged version of the Book Simple Drugs" of Ahmad ibn Muhammad al-Ghafiqi, ed. M. Meyerhof and G. Sobhy, Cairo 1932-40; (১১) Maimonides, শারহ' আস্মাইল-উক্কার, Ed. M. Meyerhof, Cairo 1940; (১২) Das buch der gifte des Gabir Ibn Hayyan, transl. A. Siggel, Wiesbaden 1958, (with facsimile text); (১৩) ইব্ন সীনা, আল-কা'নূন ফিত্-তি'ব্ব, ৩ খণ্ড পুনর্মুদ্রণ বাগদাদ তা.বি. [=১৯৭০?]; (১৪) ইব্ন ওয়াহ্শিয়্যা (অনু.)-M. Levey, Medieval Arabic toxicology : The Book on Poisons of Ibn Wahshiya and its relation to early Indian and Greek texte, philadelphia 1966 খৃ.; (১৫) আল-বীরূনী, কিতাবুস্-সায়দানা ফিত্-ত্বব, সম্পা. ও অনু. এইচ. এম. সাঈদ, করাচী ১৯৭৩ খৃ.; (১৬) M. Levey, Early Arabic Pharmacology, Leiden 1973; (১৭) M. Meyerhof, The article on aconite from al-Beruni's Kitab as-Saydana, in IC, XIX/4, (1995); (১৮) P . Johnstone, Aconite and its antidote in Arabic writings, in Journal for the Histoty of Arabic Science. i.I (1977); (১৯) A. Issa, Dictionnaire des noms des Plantes en latin, francais, anglais et arabe, Cairo 1930; (২০) A. Siggel, Arabisch-Deutsches Worterbuch der Stoffe aus den drei Naturreichen, Berlin 1950; (২১) গালিব, Dictionnaire des sciences de la nature, Beirut 1965.

P. Johnstone (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ুন খান

আক্কেলপুর (عقليور) ঃ জয়পুরহাট জেলার একটি থানা। ইহা জেলা সদর হইতে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ৫টি ইউনিয়ন, ১১৬টি মৌজা ও ১৫৯টি গ্রাম লইয়া এই থানা গঠিত। ইহার আয়তন ১৪১ বর্গ কিলোমিটার। এই থানার উত্তরে জয়পুরহাট সদর থানা ও ক্ষেতলাল থানা, পূর্বে কালাই, দুপচাঁচিয়া থানা, দক্ষিণে আদমদীঘি ও নওগাঁ সদর থানা এবং পশ্চিমে নওগাঁ সদর ও বাদলগাছি থানা অবস্থিত। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে থানার মোট জনসংখ্যা ১,২৬,০৪৬ জন; পুরুষ ৬৬,৬৭৪ জন, নারী ৫৯,৩৭২ জন। থানাটিতে মোট মুসলমান ১,১৫,২৮১ জন, হিন্দু ১০,০৮৮ জন, খৃস্টান ১২১ জন, বৌদ্ধ ১২৪ জন এবং অন্যান্য ৪৩২ জন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মোট মসজিদ রহিয়াছে ২৩৯টি, মন্দির ১৬টি ও গির্জা ১টি। ইউনিয়নসমূহ ঃ (১) সোনামুখী (২) রুকিন্দীপুর (৩) গোপীনাথপুর (৪) রায়কালী ও (৫) তিলকপুর।

নামকরণ ঃ বাংলায় আগমনকারী আওলিয়াকুল শিরোমণি হযরত শাহ মাখদূম রূপোশ (র) রাজশাহীতে পদার্পণ করার পর তাঁহার ইসলাম প্রচার কার্য সেইখানেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ইহার প্রসার ঘটান। তিনি মাঝে মাঝে বর্তমান আক্কেলপুর রেল স্টেশন হইতে অর্ধ

কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তুলসীগঙ্গার তীরে আসিয়া লোকজনকে তাওহীদের বাণী শুনাইতেন। তিনি যখন নৌপথে এই স্থানে আসিতেন, তখন এলাকার লোকদের মধ্যে বিরাট সাড়া পড়িয়া যাইত। তাহারা ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই তাহারা বলাবলি করিত, চল, আমরা মাখদূম সাহেবের নিকট হইতে 'আক্'ল বা জ্ঞান আহরণ করি। লোকজন মাখদূম সাহেবের নিকট আসিলে তিনি তাহাদের মাথায় হাত দিয়া বলিতেন, "তুমহারা 'আক্'ল পুর হো যায়ে" (তোমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হইয়া যাউক)। সেই হইতে স্থানটির নাম হয় আক্কেলপুর।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ আক্কেলপুর থানার ইতিহাস মূলত বগুড়া জেলার ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা পূর্বে ইহা বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার একটি অংশ ছিল। ১৯৭২ সালে ৫টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে আক্কেলপুর থানা গঠিত হয়। তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে এই থানা শহর অবস্থিত। এই থানায় আক্কেলপুর নামে কোন ইউনিয়ন নাই, আক্কেলপুর থানা সদর সোনামুখী ও রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত। এই থানায় অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন বিদ্যমান। ১২,০০০ বর্গমাইল ব্যাপিয়া রাণী ভবানীর যে বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিল এই এলাকাও তাহার অন্তর্ভুক্ত। রাণী ভবানীর আমলে খননকৃত বেশ কিছু দীঘি এই থানায় লক্ষ্য করা যায়। তাহার জন্মস্থান ছাতিয়ানগ্রাম হইতে তিন কিলোমিটার উত্তরেই আক্কেলপুর থানার প্রারম্ভ এবং পনর কিলোমিটার উত্তরে আক্কেলপুর থানা সদর অবস্থিত। ফকীর মজনু শাহের আন্দোলনের প্রভাবও এইখানে পড়িয়াছিল। ফকীর নেতা মজনু শাহের সাথে রাণী ভবানীর সুসম্পর্ক ছিল। ইংরেজদের অত্যাচারের স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়া এবং তাহার একটা বিহিত ব্যবস্থার প্রত্যাশায় রাণী ভবানীর নিকট প্রেরিত মজনু শাহের নিম্নলিখিত পত্রখানিতে তাঁহাদের সুসম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

We have for a long time begged and been entertained in Bengal and we have long continued to worship God at the several shrines and altars without everonce abusingor oppressing anyone. Nevertheless last year 150 Fakirs were without cause put to death formerly the fakirs begged in separate and detached parties but now we are all collected and beg together. Displeased at this method they (English) obstruct us visiting the shrines and other places. This is unreasonable. You are the ruler of the country. We are fakirs who pray always for your welfare. We are full of hopes.

-(Sannayasis and Fakir Raiders in Bengal, Page 41, Jamini Mohan Gosh).

এই চিঠির জওয়াবে রাণী ভবানী কি বলিয়াছিলেন ঐতিহাসিক ঘোষ তাহার উল্লেখ করেন নাই বটে, তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, উক্ত পত্র লেখার অল্প দিন পর রাণী ভবানীর বিশাল জমিদারী বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং তদস্থলে কয়েকটি ক্ষুদ্র ও ভূঁইফোড় জমিদারীর পত্তন হয় (পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, হায়দার আলী চৌধুরী)। তাই এই এলাকাতে মজনু শাহের আন্দোলনের ভিত্তি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য এই থানা যখন আদমদীঘির মধ্যে গণ্য ছিল তখন ফকির আন্দোলনকে প্রতিহত করিবার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস হইয়াছিল এবং তাহারই অংশ হিসাবে ১৮৯৫-৯৭ খৃ. আদমদীঘি থানার অংশবিশেষ রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয় (রাজশাহী গেজেটিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৮)। কালাঞ্জর ও রায়কালী এই থানার দুইটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। রায়কালীতে 'কুষাণ' আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামোঃ এই থানায় ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী কৃষিভিত্তিক মোট জমির পরিমাণ ৩৪,৮৩৬.৭১ একর। ইহার মধ্যে আবাদী জমি ২৭,৫০৬ একর এবং পতিত ৭,৩৩০.৭১ একর। এক ফসলী ১০০০ একর, দুই ফসলী ১২,০০০ একর, তিন ফসলী ১৪,৫০৬ একর। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, আলু, গম ও আখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিল, সরিষা, ডাল, কচু, বেগুন, পিঁয়াজ ও পটল প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই থানার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তুলসী গঙ্গা নদী। 'রামশালা' নামে এক বিরাট বিলও এই থানায় রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ছোট ছোট কিছু খাল, দীঘি ও পুকুর-পুষ্করিণীও এই থানায় রহিয়াছে। এইগুলিতে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এইখানে ৭টি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র রহিয়াছে। এই থানাতে বেশ কিছু তাঁতী পরিবারও রহিয়াছে যাহাদের তাঁতশিল্প বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে। থানায় ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৬৭১৬ জন, চাকুরীজীবীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে দৈনিক বাজার ৯টি, সাপ্তাহিক বা অর্ধ সাপ্তাহিক বাজার ৯টি, ব্যাংক ৯টি ও ডাকঘর ৯৪টি।

যোগাযোগ ঃ আক্কেলপুর থানায় মোট রাস্তা ১৭৫ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে পাকা রাস্তা ১১ কিলোমিটার, আধা পাকা ১৪ কিলোমিটার ও কাঁচা ১৫০ কিলোমিটার। এই থানায় মোট রেলপথ রহিয়াছে ২০ কিলোমিটার। ইহার সম্পূর্ণটাই ব্রডগেজ রেলপথ, যাহা চালু হয় ১৮৭৮ খৃ. সনে। থানাটিতে মোট রেল স্টেশন রহিয়াছে ৪টি। যথা তিলকপুর, জাফরপুর, আক্কেলপুর ও জামালগঞ্জ। এই থানার তুলসী গঙ্গা নদী ও অন্যান্য খাল দিয়া বৎসরের প্রায় আট মাস নৌকাযোগে লোকজনের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন করা হয়।

শিক্ষা-সাহিত্য ঃ আক্কেলপুর থানায় শিক্ষার হার গড়ে ৩৪%। তাহার মধ্যে পুরুষের হার ৪১%, স্ত্রীলোকের হার ২৫.৯০%। এইখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে ৬৩টি, মাধ্যমিক/নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৪টি, মাদরাসা ১৫টি ও কলেজ ৪টি। বেশ কয়েকজন মুসলিম লেখক রহিয়াছেন।

পীর-আওলিয়া সংস্কারক ঃ আক্কেলপুরে অনেক পীর-আওলিয়া ও সংস্কারকের শুভাগমন ও জন্ম হয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বিবরণ দেওয়া হইলঃ

দেওয়ান শাহাদাত হোসেন তুর্কী শাসনামলে সমরকন্দ হইতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে উত্তরবঙ্গে আগমন করেন। বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে তিনি শান্তির ললিত বাণী প্রচার করিতেন। তাঁহার হাতে বহু লোক ইসলাম

কবুল করিয়াছে (বাংলাদেশের সূফী সাধক)। তিনি আক্কেলপুর থানায়ও ইসলাম প্রচারে ছয় মাইল পশ্চিমে নেঙ্গাপীর গ্রামে কাটান এবং এইখানেই তাঁহার মাযার রহিয়াছে।

উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহার নাম শাহ মাখদূম রূপোশ (র)। তাঁহার ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র যদিও রাজশাহী তথাপি তাঁহার পদচারণা ছিল গোটা উত্তরবঙ্গে। অধ্যাপক আবু সুলতানের মতে "শাহ মখদুম (র)-এর (রাজশাহী) সঙ্গী হিসাবে শাহ সুলতানের আগমন হয়। তাঁহারা উভয়ে তুরকান শাহের হত্যার প্রতিশোধ নিতে উত্তরবঙ্গে আসেন" [হযরত শাহ মখদুম (র), পৃ. ২২]। হযরত শাহ মাখদূম (র) রাজশাহী হইতে মাঝে মাঝে আক্কেলপুরে আসিতেন। আক্কেলপুর রেল স্টেশন হইতে অর্ধ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁহার খানকাহ ছিল, ইহার চিহ্নটি আজও খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা আছে।

আক্কেলপুর রেল স্টেশনের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় দুই মাইল দূরে রোয়াইর গ্রামে শাহ সিকান্দার গাযীর (র) মাযার অবস্থিত। তাঁহার গাযী উপাধি কোন জিহাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পৃক্ততা নির্দেশ করে। সিলেট বিজেতা সিকান্দার গাযীর (র) সঙ্গে এই নামের সম্পর্ক আছে কি না ইহা গবেষণার দাবি রাখে। সিলেটের সিকন্দার গাযীর মাযার সিলেট শহরে অবস্থিত। অন্যদিকে 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' গ্রন্থের লেখক কে.এম. মেছের লিখিয়াছেন, ইসলাম প্রচারার্থে ১৩০৩ খৃ. ৩৬০ জন অনুচরসহ শাহজালাল মুজর্রদ ইয়ামনী এই দেশে আগমন করেন। এই প্রসিদ্ধ সাধক শাহজালাল (র)-র ধর্মীয় প্লাবন শুধু আসাম ও পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উত্তরবঙ্গের বগুড়াতেও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল (বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ. ৪১০)।

খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আগমনকারী বাবা আদমের অন্যতম সহচর ছিলেন দেওয়ান গাযী রহমান। তিনি বাবা আদমের নির্দেশে আক্কেলপুর এলাকায়ও কিছু দিন ইসলাম প্রচার করেন। তৎপর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের নিকটে শাহাপুরে স্থায়ী খানকাহ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইখানে ইসলাম প্রচার করেন। শাহাপুরেই তাঁহার মাযার রহিয়াছে। তাঁহার মাযার সংলগ্ন আরও কয়েকজন কামিল পুরুষের মাযার দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের সঠিক পরিচয় জানা যায় নাই।

সম্রাট শাহজাহানের আমলে সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ ভোলা (র) আক্কেলপুর থানার তিলকপুর এলাকায় সুদূর ইরাক হইতে আগমন করেন। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক তিনি ৩০০ বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাযার এই থানার কানচপাড়া গ্রামে বিদ্যমান।

মুগল আমলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে লেঘা পীর আক্কেলপুর থানায় আগমন করেন। তাঁহার জন্মস্থানের বা প্রকৃত নামের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহার মাযার এই থানার তিলকপুরে অবস্থিত।

মাওলানা আবদুর রহমানের জন্ম বাংলা ১২১০ সনে আক্কেলপুর থানার দাড়াকুল গ্রামে। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি হজ্জ করেন বলিয়া তাঁহার খেতাব হইয়াছে বাচ্চা হাজী (আদর্শের সংস্কারক মরহুম হযরত মাওঃ আবদুর রহমান বাচ্চা হাজী)। পরবর্তীতে তিনি আরও দুইবার হজ্জ করেন। তিনি এলাকার অনেক কুসংস্কার দূর করিয়াছেন। ১৯৯৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। আর যে সকল পীর ও আওলিয়া সংস্কারকগণ আক্কেলপুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার ও সংস্কার কার্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শাহ 'আরেফীন, শাহ রায়হান, মাওলানা মানসুর আহমদ, মাওলানা আয়েজুদ্দীন, মাওলানা মুজিবুর রহমান ও মাওলানা মকবুল হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dr. Ashraf Siddiqui (ed.), District Gazetteer, Rajshahi, 1976, P.P. 37-38; (২) Jamini Mohan Gosh, Sannyasís and Fakir Raiders in Bengal; (৩) ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৪) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৯৪ খৃ.; (৫) দেওয়ান মু. ইবরাহীম তর্কবাগীশ, উত্তর বাংলার আউলিয়া প্রসঙ্গ, ২য় সং., ১৩৯৮ হি., সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন, বগুড়া; (৬) কাজী মোহাম্মদ মেছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, ১৯৫৭ খৃ.; (৭) হায়দার আলী চৌধুরী, পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, ই.ফা.বা, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৮) খোন্দকার আবদুর রশীদ, বিস্ময়, ১৯৯৪ খৃ.; (৯) মোঃ সোলাইমান আলী, ভূগোল সমাজ পরিচিতি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, নওগাঁ ১৯৮৬; (১০) কাজী নুর মোহাম্মদ, সোনামণিদের জয়পুরহাট জেলার পরিবেশ পরিচিতি; (১১) আবদুস সাত্তার মৃধা, কচিদের ভূগোল; (১২) মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রত্নময় উত্তর টাঙ্গাইল, ১১শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮৪; (১৩) শহীদুল্লাহ, আদর্শের সংস্কারক মরহুম হযরত মাওঃ আবদুর রহমান (বাচ্চা হাজী), ১৯৯৭; (১৪) বাংলা কবিতা সংকলন, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩; (১৫) অধ্যাপক আবূ তালিব, হযরত শাহ মখদুম (র)।

খোন্দকার আবদুর রশীদ

আখ (দ্র. আইলা ইখওয়ান, মুআখাত)

আখ্‌তারী (اختری) ঃ শাম্‌সুদ্‌-দীন আল-কারাহিসারীর পুত্র মুস্‌'লিহ্‌ দ্‌-দীন (মৃ. ৯৬৮/১৫৬১)-এর কবিনাম (তাখাল্‌লুস্') আখ্‌তারী। তিনি 'আরবী-তুর্কী অভিধান প্রণয়ন করেন (৯৫২/১৫৪৫) যাহা "আখতারী কাবীর" নামে খ্যাত। (ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রহিয়াছে এবং কন্স্টান্টিনোপলে ইহা ছাপা হয় হি. ১২৪২, ১২৫৬ ও ১২৯২ সালে)। তু. Flugel, Die arab. pers. u turk, Hss. zu Wien, I, 119-120.

(E.I.[2]) / মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন

আল-আখ্‌ত'াল (الاخطل) ঃ অর্থ "কাব্যবিশারদ", আরব কবি গি'য়াছ' ইব্‌ন গ'াওছ' ইব্‌নিস্‌-স'াল্‌ত-এর উপনাম, যিনি সম্ভবত ৯২/৭১০ -এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উত্তর সিরিয়ার বিখ্যাত তাগ্‌লিব গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই Monophysite মতাবলম্বী খৃস্টান ছিলেন। তাঁহার মাতা লায়লার মাধ্যমে অপর এক খৃস্টান গোত্র ইয়াদ-এর সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তার যোগ ছিল। তিনি হীরায় অথবা রুসাফার নিকটবর্তী Sergiopolis-এ জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. কিতাবুল-ই আগ'ানী, ৭খ., ১৭০)। তাঁহার সঠিক জন্ম তারিখ অনিশ্চিত, আনুমানিক ২০/৬৪০ সনে

হইতে পারে। তিনি আজীবন খৃস্টান ছিলেন। উমায়্যা বংশের প্রভাবশালী সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টা তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করাইতে ব্যর্থ হয়। তিনি Monophysite খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও সারজূন-এর মেলকী পরিবারের সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাহার কবিতার কতক বৈশিষ্ট্যে তাহার ধর্মীয় উৎসাহ প্রকাশ পায়; ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মমত জাহির করার প্রয়াস দেখা যায় (দ্র. দীওয়ান, স্থা.)। তবে যে সমাজে তিনি বাস করিতেন সেই সমাজের নৈতিকতা হইতে তাঁহার নৈতিকতার মান লক্ষণীয়ভাবে অভিন্ন ছিল। তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ করেন। মনে হয়, তিনি অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন এবং চরিত্রহীন গায়িকাদের সাহচর্যে শুঁড়িখানায় কালাতিপাত করিতেন।

আখ্‌ত াল আজীবন রাজপরিবারের ভাগ্যবানদের অনুসরণ করেন। খলীফা মু'আবি'য়ার আমলে তিনি রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন। তিনি প্রথম ইয়াযীদ-এর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন এবং স্তুতিমূলক কবিতায় তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। হ'াজ্জাজ, যিয়াদ প্রমুখ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদেরও তিনি ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। আব্‌দুল মালিকের সময় তিনি প্রকৃতপক্ষে খলীফার সভাকবির মর্যাদা লাভ করেন (দ্র. কিতাবুল আগানী, ১২খ., ১৭২-৬)। আবদুল মালিকের উত্তরাধিকারীদের চাকুরীতে তিনি বহাল ছিলেন এবং তাহার কবিতায় তিনি রাজবংশের বিরোধীদের সকলকেই আক্রমণ করেন (দ্র. দীওয়ান, ৫৮, ৭৩, ৯৩, ২০৪, ২৭৭ প্রভৃতি)। Lammens এই সকল রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন।

কবির জীবনের এক বৃহৎঅংশ তাঁহার সমকালীন কবি জারীর-এর সঙ্গে বাকযুদ্ধে অতিবাহিত হয়। কবি ফারায্‌দাক' নিজ গোত্র তামীম-এর প্রতি বিরূপ ছিলেন। সুতরাং আখ্‌ত াল তাঁহার প্রতিপক্ষ তামীমী কবি জারীরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ফারায্‌দাকে'র সমর্থন লাভ করেন। এই কবিত্রয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা প্রায় অসম্ভব। ইহা সুস্পষ্ট যে, জারীর ও আখ্‌ত াল বিদ্রূপাত্মক কবিতায় প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্যকে স্থায়ী আসন দান করিয়াছিলেন এবং উভয়ে নিজ নিজ দলের বিশেষ ভাবাবেগকে ভাষায় রূপ দিয়াছেন। আখ্‌ত ালের এই জাতীয় কবিতায় দৃষ্ট হয় কিভাবে প্রাচীন বেদুঈনদের ভাবধারা ধর্মীয় আবেগের ক্ষীণ আবরণ ভেদ করে।

প্রথম ওয়ালীদের আমলে কবি আখ্‌ত াল তেমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন নাই (আগানী, ৭খ., ১৭৯ প.)। সম্ভবত তিনি ওয়ালীদের শাসনকাল শেষ হইবার কিছু পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

আখ্‌ত ালের কবিতারাজি সুক্‌কারী কর্তৃক বিন্যস্ত ও সংশোধিত পাঠের (recension) মাধ্যমে আমরা পাই। তিনি ইব্‌নুল আরাবীর সংগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সংকলন প্রস্তুত করেন (Brockelmann, S I ৯৪; Fihrist ৭৮, ১৫৮)। এই recension কেবল খসড়া কয়েকটি সংস্করণে পাওয়া যায়; সাল্‌হানী (ديوان الاخطل বৈরূত ১৮৯১-৯২) যাহার একটি অংশ একই ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত। দীওয়ানুল আখ্‌তা'ল, বৈরূত ১৯০৫ (বাগদাদের একটি হস্তলিখিত ফটোকপি সংস্করণ) ও Griffini কর্তৃক সংকলিত আল-আখত াল দীওয়ান, বৈরূত ১৯০৬ (একটি ইয়ামানী MS-এর অনুলিপি)। কবি জারীর ও ফারায্‌দাকে'র রচিত ব্যঙ্গ-বিতর্কমূলক কবিতা সংকলনের একটি প্রতিরূপ সৃষ্টির উদ্দেশে কবি আবূ তাম্মাম নাক'াইদু জারীর ওয়াল-আখ্‌তাল (نقائض جرير والاخطل) সংকলন করেন ৩য়/৯ম শতাব্দীতে যাহাতে উভয় বৈরী ভাবাপন্ন কবির বাচনিক বিতর্ক বিধৃত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত কপি ইস্তাম্বুলে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সমসাময়িক রাজনৈতিক বিবাদ, জাতিগত বৈষম্যের চিত্র ও তদানীন্তন নৈমিত্তিক ঘটনাবলী আখ্‌ত ালের কবিতার উৎস ছিল—যেমন ছিল জারীর ও ফারায্‌দাকে'র। বেদুঈন ঐতিহ্য তাহাদের রচনার মধ্যে সর্বত্র প্রতিভাত। কাসীদা আকারে তাহার দীওয়ানে বহু স্তুতিমূলক ও শ্লেষাত্মক উক্তি স্থান লাভ করিয়াছে। তাহার কবিতার কাব্যিক রূপ, গতানুগতিক শব্দসম্ভার ও ভাষা, কিঞ্চিৎ পার্থক্য বাদে, সমসাময়িক কবিদের রচনার সমতুল্য। বাশ্‌শার-এর মতে খুব সম্ভব কবি আখ্‌ত ালের জীবদ্দশায় তাঁহার কবিতা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা ছিল রাবী'আ গোত্রের 'আরবদের তাঁহার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণের ফল। প্রতিদ্বন্দ্বী তামীম ও বাক্‌র গোত্রের কবিদের বিরুদ্ধে বিজয়ী বীর হওয়ার যোগ্যতা আখ্‌ত ালের মধ্যে আছে—এই ভাবিয়া তাহারা ছিল উল্লসিত (আল-মারযুবানী, আল-মুওয়াশ্‌শাহ্‌, ১৮৩)। যাহাই হউক, পরে যখন ইরাকের সাহিত্য কেন্দ্রগুলি তাহাদের কাব্যিক আদর্শ স্থাপন করিল তখন কবি আখ্‌ত াল, জারীর ও ফারাযদাকে'র কবিতার তুলনামূলক আলোচনা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়। মধ্যযুগে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যেই স্বাদটি ছিল প্রায় মজ্জাগত, তুলনামূলক মূল্যায়নের সেই স্বাদ জনগণকে পাইয়া বসিল এবং এই ধরনের তুলনামূলক সমালোচনা নিয়মিত তর্ক-বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হইল। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষে আল-হামাযানী ইঁহার বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করিয়া তাঁহার "মাক'ামাত" রচনা করেন। সম্ভবত ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষে বা ৩য়/৯ম শতাব্দীর শুরুতে কূফা ও বসরার ব্যাকরণবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ কবি আখ্‌ত ালের অগ্রগণ্যতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন (আবূ উবায়দা, আল-আস্‌মা'ঈ ও আল-হ'াম্মাদ আর-রাবিয়া এই তিন ব্যক্তির অভিমত দেখুন, আগানী, ৮খ., ২৭৪ প., ২৯১, ৩০৩)। উত্তরসুরিদের দৃষ্টিতে আল-আখ্‌ত াল 'আরবী সাহিত্যে তাঁহার স্থানটি রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া অনুমিত হয় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ত'াহ'া হুস'ায়ন-এর সতর্ক অভিমত "হ'াদীছু'ল আর্‌বা'আ", ২খ., ৭৭ প.)। এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যে আখ্‌ত াল কেবল জীবনী রচনা সম্পর্কীয় গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া টিকিয়া রহিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগ'ানী, ৭খ., ১৬৯-৮৮; ৮খ., ২৮০-৩২০; (২) মার্‌যুবানী, মুওয়াশ্‌শাহ', ১৩২ প.; (৩) Caussin de perceval, Notice sur les poetes Akhatal, Ferazdaq et Djerir, in JA, xiii, 289 ff., xiv, 5ff.; (৪) Lammens, Le Chantre des Omiades, in JA 1894, 94-176, 193-241, 381-465; (৫) ঐ লেখক, Etudes sur le regne du Calife omaiy ade Moawia Ier, Beirut 1908, 397-404; (৬) I. Krackowskiy, Der Wein in al-Akhtal's Gedichten. Festschrift G. Jacob.

146-64; (৭) আরও বিবরণ ঃ Brockelmann, I, 49-52 and S I, 83ff.; (৮) C.A. Nallino, Raccolta di Scritti, vi, 73-6 (La Litterature arabe des origines a l' epoque de la dynastie umayyade, trans. pellat, Paris 1950, 115-20); [(৯) আল-'ইক্'দুল ফারীদ, পৃ. ১৩৩; (১০) জাম্হারা, পৃ. ১৭০; (১১) আশ্-শি'র ওয়াশ্-শু'আরা, পৃ. ৩০১; (১২) খিযানাতুল আদাব, ১খ., ১২০; (১৩) শু'আরাউন্-নাস'রানিয়্যা বা'দাল-ইসলাম, পৃ. ৮]।

R. Blachere (E.I.2) / সৈয়দ আহমদ আলী

আল-আখ্দ'র (الاخضر) ঃ "সবুজ", উত্তর আফ্রিকায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত আল-খিদ্'র (দ্র.) নামের অমার্জিত রূপ, বিশেষত কুসতিনতিনিয়ার কতিপয় দরবেশ এই নামে অভিহিত হইতেন।

(E. I.2) / সৈয়দ আহমদ আলী

আল-আখ্দ'র ইব্ন আবিল-আখ্দ'র (الاخضر بن ابى الاخضر) ঃ আল-আন্সারী (রা) একজন সাহাবী। ইবনুস্-সাকান তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিম্নবর্ণিত সনদের মাধ্যমে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হারিছ ইব্ন হাসীরা জাবির আল-জু'ফী হইতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্নিল-হুসায়ন হইতে, তিনি নবী (স) হইতে; তিনি বলেন ঃ আমি সংগ্রাম করি কুরআনের অবতরণের জন্য এবং আলী করে ইহার ব্যাখ্যার জন্য। ইবনুস্-সাকান তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন, তিনি সাহাবীগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন না এবং তাঁহার হাদীছের সনদ ত্রুটিপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮, ২খ., ২৫, ক্রমিক নং ৫৯।

ড. ছৈয়দ লুৎফুল হক

আল-আখ্দ'রী (الاخضرى) ঃ আবূ যায়দ 'আব্দুর রাহমান ইব্ন সায়্যিদী মুহাম্মাদ আস্ সাগীর, দশম/ষোড়শ শতাব্দীর একজন আলজিরীয় লেখক। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে (১২) আস্-সুল্লামুল মুরাওনাক (৯৪১/১৫৩৪ সালে রচিত) যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আল-আবহারী (দ্র.) রচিত ঈসাগুজীর একটি সংক্ষিপ্ত পদ্যরূপ। শীঘ্রই পুস্তিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ইহার বহু সংখ্যক ভাষ্য (একটি স্বয়ং লেখক রচিত) ও টীকা রচিত হয়। ফাস, বূলাক, কায়রো ও লক্ষ্ণৌতে ইহা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে; J. D. Luciani-কৃত ইহার ফরাসী অনুবাদ Le Soullam, ১৯২১ সালে আলজিয়ার্স হইতে প্রকাশিত হয়. তাঁহার রচিত (২) আল-জাওহারুল মাকনূন ফী সাদাফিছ ছালাছাতিল-ফুনূনও একটি জনপ্রিয় রচনা। ইহা তালখীসুল মিফ্তাহ'-এর একটি পদ্যরূপ (Brockelmann, I, 531)। লেখক ইহাতে একটি স্বলিখিত টীকা সংযোজন করিয়াছেন (৯৫০/১৫৪৩ সালে রচিত)। এই আকারে অথবা অন্যান্য লেখকের টীকাসহ ইহা বহুবার কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (প্রথম ১২৮৫ হি.)। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে (৩) আদ্-দুররাতুল বায়দ'া ফী আহ'সানিল ফুনূন ওয়াল-আশ্য়া অঙ্কশাস্ত্র, উত্তরাধিকার ও ত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে পদ্যে রচিত একটি গবেষণামূলক ব্যাখ্যা পুস্তিকা (৯৪০/১৫৩৩ সালে লিখিত), (৪) নাজ-মুস-সারাজ ফী ইলমিল ফালাক, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে পদ্যে রচিত একটি পুস্তিকা (৯৩৯/১৫৩২-৩৩ সালে রচিত) ও (৫) মুখতাস'ার ফিল-'ইবাদাত, মালিকী মায্হাবের আচরণবিধি সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় সহজ পুস্তক। তাঁহার আরও কয়েকটি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে। মৃত্যুর পর তাঁহাকে বেনতিয়ুসের সমাধিস্থল যাবিয়ায় দাফন করা হয় (আল-বাক্রী, আল-মুগরিব, ৫২, ৭২)। বিসক্রা (Biskra)-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই স্থানকে বর্তমানে Ben Thious বলা হয়। অদ্যাবধি তাঁহার কবর যিয়ারাতের জন্য লোকের সমাগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S II, 705f.; (২) সারকীস, মু'জামুল মাত্'বূ'আত, ৪০৬ প.; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন আবিল কাসিম আল-হিফ্নাবী, তা'রীফুল খালাফ বি-রিজালিস্ সালাফ, আলজিয়ার্স ১৩২৫-২৭/১৯০৭-৯।

J. Schacht (E.I.2) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-আখ্নাস ইব্ন শুরায়ক (الاخنس بن شريق) ঃ আছ্'-ছা'ক'াফী (রা) একজন সাহাবী, তাঁহার উপনাম ছিল আবূ ছ'া'লাব। তিনি বানূ যুহরার সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল ابى (উবায়্যি) আর আখনাস তাঁহার উপাধি। এই উপাধির কারণস্বরূপ বলা হয়, বদরের যুদ্ধে যখন তাঁহার নিকট খবর আসিল, আবূ সুফয়ান তাহার কাফিলা লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনিও বানূ যুহরাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। বলা হইল, خنس الاخنس ببنى زهرة "অগ্রভাগ উলটান ক্ষুদ্র খাঁদার নাসিকাবিশিষ্ট (اخنس) লোকটি বানূ যুহরাকে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে"। এইজন্য তাঁহার আখনাস উপাধিটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের (مؤلفة القلوب) অন্যতম ছিলেন। তিনি হু'নায়ন-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খলীফা 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের গোড়ার দিকে ইন্তিকাল করেন।

একদা আবূ সুফয়ান, আবূ জাহল ও আল-আখনাস রাত্রিকালে গোপনে সমবেত হইয়া চুপে চুপে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনিতেছিলেন। আল-আখনাস আবূ সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল?" আবূ সুফয়ান উত্তর দিল, "ইহার কিছু স্বীকার করি আর কিছু স্বীকার করি না।" তৎপর আবূ সুফয়ান আল-আখনাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বল?" আল-আখনাস তদুত্তরে বলিল, "আমি ইহাকে সত্য মনে করি।"

ইব্ন 'আতি'য়্যা সুদ্দী হইতে বর্ণনা করেন, আল-আখনাস নবী করীম (স)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, "আল্লাহ জ্ঞাত আছেন, আমি আমার এই ঘোষণায় সত্যবাদী।" অতঃপর আখনাস পলায়ন করে মুসলমানদের এক দলের আবাসস্থলের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে তাহাদের ক্ষেত-খামারে অগ্নি সংযোগ করে এবং উৎকৃষ্ট গবাদি পশু হত্যা করে। এই প্রসঙ্গে কুরআনের যে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়

তাহার অর্থ এই, "মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না। যখন তাহাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যোগ্য। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল" (২ঃ২০৪-৬)।

ইব্ন 'আতিয়্যা বলেন, আল-আখনাস-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি কখনও প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ইব্ন হ'াজার আল-আসকালানী বলেন, "আমি তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি"। এমনও হইতে পারে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে ইহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর উসদুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ৫৬; (২) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৫-৬, নং ৬১।

ড. ছৈয়দ লুৎফুল হক

আল-আখনাস আস্-সুলামী (الاخنس السلمى) ঃ (রা) ছিলেন মা'আন ইব্ন ইয়াযীদ-এর পিতামহ; তাঁহার পিতার নাম হ'বীব মতান্তরে খাব্বাব। তিনি একজন সাহাবী। মা'আন ইব্ন ইয়াযীদের বর্ণনামতে তিনি, তাঁহার পিতা ও পিতামহ নবী কারীম (স)-এর নিকট একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-আখনাস স্বীয় পুত্র ইয়াযীদ ও পৌত্র মা'আনসহ একত্রে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল-আখনাস ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই—যাঁহার তিন পুরুষ এক সংগে মুসলিম অবস্থায় বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ৫৬ ; (২) ইব্ন হাজার আল-ইসাবা মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৫, নং ৬০; (৩) আয'-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ১১, নং ৬২।

ড. ছৈয়দ লুৎফুল হক

আখনুখ (দ্র. ইদ্রীস)

আল-আখফাশ (الاخفش) ঃ (রাতকানা বা অক্ষিপক্ষহীন অর্থাৎ চক্ষুপাতার লোমশূন্য), আস-সুয়ূতীর তালিকাভুক্ত কয়েকজন বৈয়াকরণের উপাধিবিশেষ (মুয্হির, কায়রো তা. বি., ২খ., ২৮২-৩)। যথাঃ আবুল খাত্ত'াব, সা'ঈদ ইব্ন মাস্'আদা ও আলী ইব্ন সুলায়মান (নিম্নে দেখুন); আল-আস্মা'ঈর শাগরিদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী, আহমাদ ইব্ন 'ইমরান ইব্ন সালামা আল-আলহানী (মৃ. ২৫০/৮৬৩ সনের পূর্বে), গ'রীবু'ল-মুওয়াত্ত'া-র প্রণেতা, ব্যাকরণবিদ, আভিধানিক ও কবি (Ben Cheneb, Classes des savants de I' Ifriqiya, ৩৪ দ্র.); হারূন ইব্ন মূসা ইব্ন শারীক, মৃ. ২৭১/৮৮৪-৫; ইব্ন জিন্নীর শিক্ষক আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাওসিলী; ইব্ন 'আবদিল বার্র-এর শিক্ষক আবদুল আযীয আল-আন্দালুসী; আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ইদরীসী, মৃ. ৪৫০/১০৫৮ সনের পরে; খালাফ ইব্ন 'আমর আল-ইয়াশকুরী আল-বালান্সী, মৃ. ৪৬০/১০৬৮ সনের পরে; আলী ইসমা'ঈল ইব্ন রাজা আল-ফাতিমী। এই তালিকাতে আরও সংযোজন করা যায়—আলী ইবনুল মুবারাক (Brockelmann, S I, ১৬৫) ও আল-হুসায়ন ইব্ন মু'আয' ইব্ন হ'ার্ব নামক জনৈক মুহ'াদ্দিছ' (মৃ. ২৭৭/৮৯০), (ইব্ন হ'াজার, লিসানুল মীযান, ২খ., ৩১৩-৪ দ্র.)। ইঁহাদের নিম্নোক্ত তিনজন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে দুইজন বাসরী মতবাদপন্থী।

(১) আল-আখ্ফাশ আল আকবার, আবুল-খাত্ত'াব 'আবদুল-হ'ামীদ ইব্ন 'আবদিল-মাজীদ, মৃ. ১৭৭/৭৯৩, আবূ আমর ইবনুল আলার শিষ্য। কথিত আছে, প্রাচীন কবিতাগুলির প্রতি দুই ছত্রের মধ্যবর্তী স্থলে সর্বপ্রথম তিনিই টীকা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বহু সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করেন। সীবাওয়ায়হ, আবূ যায়দ, আবূ 'উবায়দা ও আল-আসমা'ঈ (দ্র.) তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সীরাফী, আখবারুন-নাহ্'বি'য়্যীন (KrenKow), ৫২; (২) যুবায়দী, ত'াবাক'াত, কায়রো ১৯৫৪; (৩) সুয়ূতী, মুয্হির, ২খ., ২৪৮, ২৪৯; (৪) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, ১খ., ৪৮৫; (৫) Brockelmann, S I, ১৬৫।

(২) আল-আখ্ফাশ আল-আওসাত', আবুল হাসান সা'ঈদ ইব্ন মাসআদা, আখফাশ উপাধিধারী বৈয়াকরণদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান, মুজাশি' ইব্ন দারিম-এর তামীম গোত্রের মাওলা, বালখে তাঁহার জন্ম। তিনি মু'তাযিলাপন্থী আবূ শামস-এর, বিশেষত সীবাওয়ায়হ-এর শিষ্য ছিলেন। বয়সে জ্যেষ্ঠতর হইলেও তিনি সীবাওয়ায়হ-এর মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়াছিলেন। আর তিনিই তৎপ্রণীত গ্রন্থ আল-কিতাব-এর শিক্ষা দান করেন এবং ইহা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি ২১০-২২১/৮২৫-৮৩৫ সনের কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর কোনটাই সংরক্ষিত হয় নাই (ফিহরিস্ত, ১খ., ৫২)। আছ-ছা'আলিবী (মৃ. ৪২৭/১০৩৫) তৎপ্রণীত কিতাবু গ'রীবিল-কু'রআন-এর বহুল ব্যবহার করেন এবং আল-বাগদাদীর খিযানা পুস্তকে তৎপ্রণীত কিতাবুল মু'আয়াত হইতে বারংবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে (১খ., ৩৯১; ২খ., ৩০০; ৩খ., ৩৬, ৫২৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, মা'আরিফ (Wust enfeld), ২৭১; (২) Azhari, in Mo, ১৯২০, ১২; (৩) ইবনুল-আনবারী, নুযহা, ১৮৪-৮; (৪) যুবায়দী, ত'াবাক'াত ; (৫) সীরাফী, আখবারুন্-নাহ' বি'য়্যীন, ৪৯-৫১; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, নং ২৫০; (৭) ইয়াকূ'ত, ইরশাদ, ৪খ., ২৪২-৪; (৮) ইয়াফি'ঈ, জানান, ২খ., ৬১; (৯) সুয়ূত'ী, বুগ'য়া, ২৫৮; (১০) ঐ লেখক, মুয্হির, ২খ., ২৫৩, ২৮৭; (১১) Brockelmann, S I, ১৬৫।

(৩) আল-আখ্ফাশ আল-আস্'গ'ার আবুল হাসান আলী ইব্ন সুলায়মান ইব্নিল মুফাদ'দ'াল, আল-মুবার্‌রাদ ও ছ'া'লাব-এর শিষ্য। ইনি মিসরে বাগদাদী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পঠন-পাঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া যশস্বী হন। সেইখানে আহমাদ আন-নাহহাস তাঁহার শিষ্য ছিলেন। স্পেনে তাঁহার রচিত

একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ অধীত হয় এবং ইহার টীকা লিখিত হয় (BAH, ৯খ., ৩১৩-৪ দ্র.)। তিনি ৩১৫/৯২৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S I, ১৬৫; (২) এই সকল ব্যাকরণবিদ সম্পর্কে দ্র. Flugel, Die gramnatischen Schulen der Araber, ৬১ প.।

C. Brockelmann-Ch. Pellat (E.I.[2]) / মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

আখবার (দ্র. তারীখ)

আখবার মাজমূ'আ (اخبار مجموعة) ঃ ইহা অজ্ঞাতনামা রচয়িতার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ঘটনা বিবরণীর শিরোনাম। ইহাতে কর্ডোভার মারওয়ানী শাসক বংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেকার সময়ে 'আরবজাতি কর্তৃক স্পেন দেশ বিজয়ের কাহিনী এবং ঐ শাসক বংশের আমীর তৃতীয় 'আবদুর-রহ'মান আন-নাসি'রের শাসনকাল পর্যন্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই বিবরণী Bibl. Nat.-এর unicum-এর উপর ভিত্তি করিয়া প্যারিসে প্রকাশিত হয় এবং তাহার পরে Lufuente y Alcantara (Madrid 1867) কর্তৃক স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ইব্ন হায়্যানের মুক্'তাবিস শীর্ষক ইতিহাস পুস্তকের অধিকাংশ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উক্ত বিবরণীর তেমন কোন প্রামাণিক গুরুত্ব অবশিষ্ট নাই। ইহার বর্ণনা তেমন সুসমঞ্জস নহে এবং ইহা পরবর্তী কালের রচনা। সম্ভবত ইহা Valencia পুনর্বিজয়ের সময়কালে রচিত। পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তক, বিশেষত ঈসা ইব্ন আহমাদ আর-রাযী রচিত পুস্তকের দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থে উদ্ধৃতি ও অন্য গ্রন্থ হইতে হুবহু গৃহীত বিষয়সমূহের বরাত উল্লেখ না থাকায় Dozy (ইব্ন ইযারী, আল-বায়ানুল মুগ'রিব-এর ভূমিকা, সম্পা. Dozy, Leiden ১৮৪৮-১৮৫১ খৃ., ১০-১২) ও Ribera (দ্র. ইবনুল কুতিয়্যার রচিত ইফতিতাহ'-এর অনুবাদের ভূমিকা, Madrid 1926, ১৩ প.) বিভ্রান্ত হইয়া ইহাকে একটি মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ স্পেনীয় ঐতিহাসিক C.I. Sanchez Albornoz তাঁহার El "Ajbar may mu`a" Cuestiones historiagrcticas que suscita, Buenos Aires 1944 গ্রন্থে বিতর্কিত আলোচনা ও সমস্যামূলক সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন, এইখানে এই কথার উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Brockelmann, S I, 23-52.

E. Levi-Provencal (E. I.[2]) / সায়্যিদ আহমদ আলী

আখবারিয়্যা (اخبارية) ঃ ইছ্'না 'আশারী শী'আ মতবাদে ইহার অর্থ, যাহারা ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য মূলত ইমামগণের হাদীছ অর্থাৎ আখবারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার বিপরীত শব্দ উস্'লিয়্যা (দ্র.), ইহার অর্থ যাঁহারা ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় আইনের মূলনীতিসমূহ (উস্'ল)-এর সদৃশ অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় কিয়াস অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ আন্দাজ-অনুমান অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐতিহ্যবাদী (traditionalist) ও যুক্তিবাদী (rationalist) চিন্তাধারার বিরোধী মনোভাব ২য়/৮ম শতকে ইছ্'না 'আশারী শীআবাদের শুরু হইতেই লক্ষ্য করা যায়। বুওয়ায়হী আমলে তিনজন নেতৃস্থানীয় আলিম আল-মুফীদ (মৃ. ৪১৩/১০২২), আল-মুরতাদা (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪) ও শায়খ আত-তূসী (মৃ. ৪৬০/১০৬৭) কু'ম-এর ঐতিহ্যবাদী চিন্তাধারার বাহকগণের মুকাবিলায় মু'তাযিলী ধর্মতাত্ত্বিক নীতি গ্রহণ করিয়া ও বৈশিষ্ট্যময় ইছ্'না 'আশারী আইন পদ্ধতি (উসূলুল-ফিক্'হ) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তানির্ভর উসূলী মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আখবারিয়্যা ও উসূলিয়্যা যে পরস্পর বিরোধী দল তাহা প্রথম উল্লেখ করেন রায়-এর ইছ'না 'আশারী আলিম আবদুল-জালীল আল-কা'যবীনী। তিনি আনু. ৫৬৫/১১৭০ সনের দিকে গ্রন্থ রচনা করেন, প্রথমোক্ত দলকে তিনি সঙ্কীর্ণ ঐতিহ্যবাদী আক্ষরিক ব্যাখ্যাদাতা এবং শেষোক্ত দলকে ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর অনুসন্ধানকারী বলিয়া চিহ্নিত করেন।

অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী উস্'লী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আখবারী মতবাদ পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবত প্রচ্ছন্ন থাকে, অতঃপর মুল্লা মুহাম্মাদ আমীন ইব্ন মুহাম্মাদ শারীফ আল-আসতারাবাদী (মৃ. ১০৩৩/১৬২৪) তাহার উস্তাদ মীর্যা মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আল-আসতারাবাদী (মৃ. ১০২৮/১৬১৯) কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া তাঁহার কিতাবুল ফাওয়াইদিল মাদানিয়্যা-তে আখ্বারী মত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন এবং ফলে তিনি পরবর্তী আখ্বারী চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত হন। আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৮/৯২৯)-র আমল পর্যন্ত অবিসম্বাদিতভাবে প্রচলিত প্রাথমিক যুগের আখবারী মতবাদকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রস্তাব করেন, বুওয়ায়হী আমলের তিন প্রধান পণ্ডিতের নব্য মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং উস্'লুল ফিক্'হ ও ধর্মতত্ত্বের প্রশ্নে তিনি আল্লামা আল-হিল্লী (মৃ. ৭২৬/১৩২৫), শাহীদুল আওওয়াল মুহাম্মাদ ইব্ন মাক্কী আল-আমিলী (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪) ও শাহীদুছ-ছা'নী যায়নুদ্দীন আল-আমিলীর বরং তীব্র সমালোচনা করেন। উসূলী দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে তিনি যে যে মৌলিক বিষয় দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেন তন্মধ্যে একটি মতবাদ এই, ইমামগণের আখ্বার কুরআনের বাহ্যিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ ও যুক্তি অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা ইমামগণ উহাদের আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যাখ্যাকারী। আখবারের যে বাহ্যিক অর্থকে প্রাথমিক যুগের ইছ্'না 'আশারী সম্প্রদায় সহীহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা রীতিসিদ্ধ নিশ্চয়তা (ইয়াক'ীন 'আদী), উসূলী মুজতাহিদগণ কর্তৃক পোষিত কেবল সম্ভাবনা (জ'ান্ন) নহে, ইছ্'না 'আশারিয়্যাগণের সংগৃহীত চারখানি (ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের) সংকলন গ্রন্থের সকল আখ্বারই সহীহ শ্রেণীর। সুন্নীগণের রীতি অনুসারে আল্লামা আল-হিল্লী হাদীছের রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে সহীহ ও যঈফ বা দুর্বল ব্যতীত যে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেন তাহা অবান্তর। এতদ্ব্যতীত ইজমা' বা সর্বস্বীকৃত মতৈক্য, যাহা মুজতাহিদগণ কর্তৃক অতি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখনই গ্রহণযোগ্য যখন ইমামের অন্তর্ভুক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে এবং সেইজন্য আখ্বার বহির্ভূত কোন উৎস ধর্মীয় আইনের উৎসস্বরূপ স্বীকৃত হয় না। যে ইজ্তিহাদ নিতান্ত জ'ান্ন ও তাক'লীদের দিকে পরিচালিত করে অর্থাৎ মুজতাহিদের মতামত অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেয় তাহা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে ইমামের আখ্বার অনুসরণ করা

অবশ্য কর্তব্য যাহা অনুধাবন করিবার জন্য 'আরবী ভাষাজ্ঞান ও ইমামের ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দাবলীর তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। দুইটি হাদীছের মধ্যকার আপাতবিরোধ যদি ইমামের নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তাওয়াক্'কু'ফ (توقف) বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইতে বিরত থাকা বাধ্যতামূলক।

পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া আখবারী মতবাদ-এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মুহাম্মাদ আমীন আল-আস্তারাবাদীর শিক্ষা সুস্পষ্টরূপে সমর্থন করেন জ্যেষ্ঠ আল-মাজলিসী, মুহাম্মাদ তাকী (মৃ. ১০৭০/১৬৬০) এবং তাহা গ্রহণ করেন মুল্লা মুহ্'সিন ফায়দ' আল-কাশানী (মৃ. আনু. ১০৯১/১৬৮০)। তাহারা সকলেই সূফীবাদ ও দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। আখবারী মতবাদের একজন প্রভাবশালী সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন আল-হু'র্রুল 'আমিলী (দ্র.; মৃ. ১১০৪/১৬৯৩)। তিনি ছিলেন ইমামগণের আখ্বারের এক সুবিশাল সংগ্রহ, তাফসী'ল ওয়াসাইলিশ-শী'আ ইলা আহ্'কামিশ-শারী'আ-র সঙ্কলক আখ্বারী রীতি-পদ্ধতির বিশুদ্ধায়নকারী ও উহার নিষ্ঠাবান অনুসারী। তবে তিনি মুজতাহিদগণের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক দ্বন্দ্ব হইতে বিরত থাকিতেন। তাঁহার সমসাময়িক 'আব্দ 'আলী ইব্ন জুম'আ আল-আরূসী আল-হুওয়ায়যী যিনি কুরআনের টীকা, নূরুছ-ছি'ক'লায়ন-এর রচয়িতা ছিলেন, তিনিও আখ্বারী মতবাদের প্রবল সমর্থক ছিলেন। আল-আসতারাবাদী উসূলী মুজতাহিদগণের বিরুদ্ধে যে বাচনিক আক্রমণ করিয়াছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন হাজ্জ সালিহ আস্-সামাহিজী আল-বাহ্রানী (মৃ. ১১৩৫/১৭২৩) কর্তৃক তাহা পুনরায় আরম্ভ করা হয়; তিনি মুনয়াতুল মুমারিসীন ফী আজ্বিবাতিস্-সুওয়ালাতিশ্-শায়খ ইয়াসীন নামক গ্রন্থে আখ্বারী ও মুজ্তাহিদগণের মধ্যে প্রায় চল্লিশটি বিরোধের বিষয় আলোচনা করেন। অপর বিরূপ আলোচনাকারী ছিলেন মুহাদ্দিছ 'আবদ 'আলী ইব্ন আহ্মাদ আদ্ দিরাযী আল-বাহ্রানী (মৃ. ১১৭৭/১৭৬৩-৪)। তিনি ইহ'য়াউ মা'আলিমিশ্-শী'আ নামক গ্রন্থে এই আলোচনা করেন। আখ্বারী মতের অধিকতর সহনশীল সমর্থকগণের মধ্যে ছিলেন আল-ওয়াফিয়া ফী উস্'লিল ফিক্'হ গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবনুল হাজ্জ মুহাম্মাদ আত্-তুনী আল-বুশ্রাবী (মৃ. ১০৭১/১৬৬৬), সায়্যিদ নি'মাতুল্লাহ আল-জাযাইরী আশ-শুশ্তারী (মৃ. ১১১২/১৭০০) ও ইয়ূসুফ ইব্ন আহ্'মাদ আল-বাহ্রানী (মৃ. ১১৮৬/ ১৭৭৩)। ইনি পূর্বোক্ত 'আবদ 'আলী ইব্ন আহমাদ-এর ভ্রাতা এবং লুলুআতুল বাহ্'রায়ন এবং বৃহৎ ও জনপ্রিয় ফিক'হ গ্রন্থ আল-হ'াদাইকুন নাদিরা-র রচয়িতা। শেষোক্ত জন মূলে বিশুদ্ধ আখ্বারী মতবাদের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দুই বিরোধী মতবাদের মধ্যবর্তী পথ গ্রহণ করেন এবং আল-আস্তারাবাদীকে মুজতাহিদগণের কুৎসা রটনার দ্বারোদ্ঘাটন ও শী'আদেরকে দ্বিধাবিভক্তকরণের দায়ে দোষারোপ করেন।

১২শ/১৮শ শতকের শেষার্ধে উসূলী মতবাদ বলিষ্ঠভাবে পুনর্ব্যক্ত করেন মুহাম্মাদ বাকি'র আল-বিহ্বিহানী (মৃ. ১২০৮/১৭৯৩-৪) তাঁহার আল-ইজ্তিহাদ ওয়াল-আখ্বার ও অন্যন্য গ্রন্থে। তিনি আখ্বারীগণকে কাফির বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধা করেন নাই এবং কারবালাতে তাহাদের আধিপত্য নির্মূল করিতে সক্ষম হন। আখ্বারিয়্যাগণের শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিন-নাবী আন্-নীশাবুরী আল-আখ্বারী, যিনি কিতাবু মুনয়াতিল-মুরতাদ ফী নুফাকিল ইজ্তিহাদ-এ বিরোধাত্মক কটু ভাষা দ্বারা, এমনকি অভিশাপ দিয়াও মুজ্তাহিদগণের মুকাবিলা করেন। তিনি কিছুকাল কা জার শাহ্ ফাতহ্ 'আলী শাহ্-এর সুনজরে ছিলেন, কিন্তু শায়খ জা'ফার কাশিফুল-গি'ত'া (দ্র.) কর্তৃক নিন্দিত হইলে শেষ পর্যন্ত শাহ তাঁহাকে ইরাকে নির্বাসিত করেন, সেইখানে ১২৩৩/১৮১৮ সালে আল-কাজিমায়নে জনতার হাতে নিহত হন। অতঃপর আখ্বারিয়্যাগণের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে স্বল্প সংখ্যক আখ্বারী সম্প্রদায় টিকিয়া আছে বলিয়া জানা যায় তাহা ইরানের খুর্রাম শহর ও আবাদানে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল জালীল আল-ক'যবীনী আর্-রাযী, কিতাবুন-নাক'দ, সম্পা. জালালুদ্দীন উরমাবী মারূফ বিমুহাদ্দিছ, তেহরান ১৩৩১/১৯৫২, পৃ. ২, ২৫৬, ২৯১, ৩০১, ৩০৪, ৪৯২; (২) মুহাম্মাদ আমীন আল-আস্তারাবাদী, আল-ফাওয়াইদুল মাদানিয়্যা, তেহরান ১৩২১/১৯০৪; (৩) মুহাম্মাদ আদ-দিয্ফুলী, ফারূকু'ল-হ'াক'ক যাহা জাফার কাশিফুল-গি'ত'া-র আল-হাক্'কুল মুবীন-এর সহিত একত্রে মুদ্রিত, তেহরান ১৩১৯/১৯০১; (৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল জান্নাত, সম্পা, এ. ইসমাঈলিয়ান, কুমম ১৩৯০-২/১৯৭০-২, ১খ., ১২০-৩৯; (৫) G. Scarcia, Intorno alle contreversie tra Ahbari e Usuli presso gli Imamiti di Persia, in RSO, ৩৩ (১৯৫৮), পৃ. ২১১-৫০; (৬) A. Falaturi, Die Zwolfer-Schia aus der Sicht eines Schiiten : probleme ihrer Untersuchung, in Festschrift Werner Caskel, ed. E. Graf, লাইডেন ১৯৬৮, পৃ. ৮০-৯৫।

W. Madelung (E.I.[2] Suppl.) / হুমায়ুন খান

আখবারুস-সীন ওয়াল-হিন্দ (أخبار الصين والهند) ঃ এই নামে পরিচিত চীন ও ভারতবর্ষের দুইখানি বর্ণনামূলক গ্রন্থ, বিভিন্ন কারণে বই দুইখানি আরবী বিশেষজ্ঞগণ (Arabists)-এর নিকট আকর্ষণীয়।

বিবলিওথেক নাশোনাল (Bibliotheque Nationale)-এর পাণ্ডুলিপি নং ২২৮১-তে অন্যান্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ (১) পত্রক ২ক-২৩খ, শিরোনামবিহীন এবং অজ্ঞাত লেখকের রচিত একটি পাঠ, উহাতে গ্রন্থখানির মূল আলোচ্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশের লেখকের নাম লিখিত রহিয়াছে আবূ যায়দ আস-সীরাফী। (২) পত্রক ২৪ক-৫৬ক, ইহা প্রথমখানির পরিপূরক গ্রন্থ।

১৭১৮ খৃ. Abbe Renaudot প্যারিস হইতে Anciennes relations des Indes et de la Chine, de deux voyageurs mahometans qui y al-lerent dans le neuvieme siecle, traduites d' arabe, avec des remarques sur les principaux endroits de ces relations শিরোনামে প্রথম ও দ্বিতীয়টির একখানি সংস্করণ বাহির করেন। উহা পরে আবার ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়। মূল

পাঠের উৎস সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য প্রদান না করিবার জন্য অভিযোগ আনয়ন করা হয়, Renaudot ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল পাঠ (প্রকৃত পাণ্ডুলিপি নং ২২৮১, উহার সংগে ২২৮২ নং-রূপে যোগ করা হয় অনুবাদকের নিজের তৈরী কপি) পরে বিবলিওথেক রয়াল-এ পাওয়া যায় এবং Langles-এর সদয় সহযোগিতায় মুদ্রিত হয়; ৩৪ বৎসর পরে M. Reinaud ইহার প্রচারের ব্যবস্থা করেন, পাঠের সংগে সঠিক অনুবাদ ও ভূমিকা সংযোজিত হয়, ইহার নাম Relations des voyages faits par les Arabes et les persans dans I' Inde et Chine dans le IX siecle de l'ere chretienne (প্যারিস ১৮৪৫ খৃ., ২ খণ্ড)। ১৯২২ খৃ. G. Ferrand একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করেন, Voyage du marchand arabe Sulayman en Inde et en Chine, redige en 851, suivi de remarques par Abu Zayd Hasan (vers 916) Classiques de I'Orient-এর ৭ম খণ্ডরূপে। অবশেষে ১৯৪৮ খৃ. J. Sauvaget প্যারিস হইতে মূল পাঠ, অনুবাদ ও নং ১-এর বিস্তারিত টীকাসমেত প্রকাশ করেন Ahbar as-Sin wa I-Hind, Relation du la Chine et de I' Inde redigee en 851, এই নামে। Renaudot-এর সংস্করণের প্রতিক্রিয়া ব্যতীতও (দ্র. Sauvaget, পৃ. ১৬) এই বিবরণসমূহের প্রথমটির রচয়িতা অজ্ঞাত থাকা হেতু নানা আলোচনা ও আন্দাজ-অনুমানের সৃষ্টি হইয়াছে। Quatremere (JA, ১৮৩৯ খৃ, পৃ. ২২-৫) আল-মাসঊদী (দ্র.)-কে গ্রন্থটির রচয়িতা বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক মনে করেন; Reinaud পাঠে সুলায়মান আত্-তাজির-এর নামোল্লেখ হইতে (Sauvaget সংস্করণের ১২) মনে করেন, তিনিই ইহার গ্রন্থকার। G. Ferrand এই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থের নামকরণই করেন Voyage du marchand arabe Sulayman; V. Minorsky (Hudud al-alam, নির্ঘণ্ট) ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "Sulayman the Merchant"। এই লেখকগণ সত্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞের সমর্থন দাবি করিতে পারেন। কেননা ইবনুল ফাকীহ (বুলদান, পৃ. ১১; অনু. H. Masse, পৃ. ১৪) এক বর্ণনাতে সুলায়মান আত্-তাজির-এর নাম যে প্রসংগে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত ভিন্ন প্রসংগে তাঁহার কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, H. Yule (দ্র. Cathay and the way thither, লন্ডন ১৮৬৬ খৃ., পৃ. cii-ciii) ও তাঁহার পরে P. Pelliot (Toung-Pao, ২১ খ, [১৯২২ খৃ.] ৪০১-২, ২২ খ [১৯২৩ খৃ.], ১১৬) একটি বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই সুলায়মান অন্যান্য অজ্ঞাতনামা আরও অনেকের মধ্যে একজন তথ্য সরবরাহকারী মাত্র ছিলেন।

সাধারণ শিরোনাম বিষয়ে আবূ যায়দ রচিত "Sequel" (পরিশিষ্ট)-এর শুরুতে লিখিত একটি মন্তব্য হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, যিনি বলেন, তাঁহার স্বরচিত অংশ হইতেছে আল-কিতাবুছ-ছানী মিন্ আখ্বারিস-সীন ওয়াল-হিন্দ। যদিও এই কথাগুলি গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য হওয়াটা অধিক সঙ্গত, তথাপি পরবর্তী কালের লেখকগণ কথাগুলিকে গ্রন্থখানির নাম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আল-বিরূনী যিনি তাঁহার নুবায ফী আখ্বারিস-সীন গ্রন্থে [সম্পা. Krenkow, MMIA, ১৩খ., (১৯৩৫ খৃ.), ৩৮৮] কিতাবু আখ্বারিস-সীন গ্রন্থ হইতে কোন একটি তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন এবং এই মীমাংসা গ্রহণ না করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

অজ্ঞাতনামা লেখকের গ্রন্থখানার নাম আল-কিতাবুল আওওয়াল দিয়াছেন আবূ যায়দ, ইহা রচনার সঠিক তারিখও দিয়াছেন ২৩৭/৮৫১। অপরদিকে কিতাবুছ-ছানীর তারিখ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। কিন্তু এই "Sequel"-এর লেখক সম্বন্ধে আল-মাসঊদীর বদৌলতে আমরা কিছু তথ্য লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে সম্ভবত অনবধানতাবশত ভুল করিয়া তিনি তাঁহার নাম বলিয়াছেন আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আস্-সীরাফী যদিও তিনি নিজেই আবার বলিয়াছেন, তাঁহার ডাকনাম ছিল আল-হাসান। মুরূজ-এর লেখক বলেন (দ্র. ১খ., ৩২১-৩৫১), বুসরাতে আবূ যায়দের সংগে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি ৩০৩/৯১৫-১৬ সালে সেখানে বাস করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তিনি তথ্য লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুত আবূ যায়দ সম্ভবত তাঁহাকে দুইখানি গ্রন্থের মূলপাঠ উপহার দিয়া থাকিবেন, মুরূজে যেইগুলির বহুল ব্যবহার হইয়াছে আর আল-মাস'ঊদী যাহাকে অধিকতর মার্জিত করিতে গিয়া প্রায়শ বিকৃত করিয়াছেন।

পাঠ ১ ও পাঠ ২ সাদৃশ্যবিহীন। উভয়খানিই অপরিচিত দেশে সফরের পরিষ্কার বর্ণনা। প্রথমখানি যদি লেখকের পর্যবেক্ষণের মানের বৈশিষ্ট্যসূচক হয় বা সওদাগরগণেরই পর্যবেক্ষণ যাহা তাঁহারা লেখককে বলিয়া থাকিবেন, তাহা সম্ভবত চীনদেশ সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন বর্ণনা, দ্বিতীয়খানি প্রায় ৭০ বৎসর পরের বর্ণনা, মনে হয় অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য। প্রথম বর্ণনাখানিতে কোন প্রকার ভান বা ছলনা নাই, সাধারণভাবে যথাযথ ও স্বতঃস্ফূর্ত, আর আবূ যায়দের গ্রন্থখানি যাহা অন্যের আদেশে রচিত, উপরন্তু অধিক পরিশ্রমে লিখিত, তাহাতে নাবিকদের কাহিনী আর আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনাই অধিক। ফলে এই ধরনের সাহিত্যে কল্পকাহিনী সংযোজনের যে প্রবণতা আল-জাহি'জ দমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি তাহা পারেন নাই।

আল-মাস'ঊদী ব্যতীত অন্য লেখকগণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বা না করিয়া, আখবারুস-সীন ওয়াল-হিন্দ হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. Sauvaget, পৃ. ২৩-২৯)। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ইহার মাত্র একখানি পাণ্ডুলিপিই অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। যাহা হউক, ইহা অসম্ভব নয়, ইহার অংশ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং ইহা কেবল মৌখিকভাবে সংরক্ষিত ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, অনেক পূর্বেই এই পাণ্ডুলিপিখানির কপি প্রস্তুত করা হয় নাই, যদিও বা এই ধরনের গ্রন্থের পাঠ মূলত শিক্ষিত সমাজের জন্যই প্রস্তুত করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১৯৪৮ খৃ. পূর্বের বরাত Sauvaget-এর গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। আরও দ্র. (১) 1. Krackovskiy, Arabskaya Geograficeskaya Literatura, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ.,

পৃ. ১৪১-২; (২) A. Miquel, La geographie humaine du monde musulman[2], প্যারিস ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ১১৬-২৬ ও নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E. I.[2] Suppl.) / হুমায়ুন খান

আখমীম (اخميم) ঃ কায়রো হইতে ৩১২ মাইল দূরে মিসরের দক্ষিণাঞ্চলে (Upper Egypt) নীল নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি শহর। ইহার নামকরণে কপ্‌টিক্ শব্দ শমিন (Shimn), গ্রীক খেম্‌মীস (Khemmis)-এর প্রভাব প্রতিফলিত এবং বায়যানটাইন গ্রন্থসমূহে স্থানটি প্যানোপলিস (Panopolis) নামে উল্লিখিত। ইহা একটি Pagarchy (Kura=পরগণা)-এর প্রধান শহর ছিল এবং পরবর্তী কালে ফাতিমী খলীফা আল-মুসতান সি'রের সংস্কারের সময় হইতে ইহা একটি প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে শহরটি প্রধান নগর হিসাবে গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে এবং জিরগা (Girga) প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। মধ্যযুগে আখমীম খেজুর ও ইক্ষু চাষে সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। আল-ইয়া'কূ'বী ইহাকে চামড়ার মাদুর প্রস্তুতকেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করেন। ঐ স্থানে একটি শুল্ক আদায়ের অফিস ছিল এবং কর্মচারিগণের কড়াকড়ি ইব্‌ন জুবায়রের (ابن جبير) অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। অদ্যাবধি ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে অনেক খৃস্টান রহিয়াছে। এই শহরে ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষভাগে সূফী যুন-নূন আল-মিস্‌রী (ذو النون المصرى)-এর জন্ম হয়।

সকল আরব লেখক আখ্‌মীমের প্রাচীন মন্দির (যাহার কোন চিহ্ন বর্তমানে নাই) সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন। Hermes Trismegistus-এর সহিত ঐতিহ্যগত সম্পৃক্ততার জন্য ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ফির'আওনদের অধীন মিসরের ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত প্রচলিত কল্পকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই বেশির ভাগ ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে ইব্‌ন জুবায়র প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিবরণ প্রদানে তিনি অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এই মন্দিরটি ধ্বংস করা হয় এবং উহার উপকরণাদির কিছু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করিবার কাজে ব্যবহার করা হয়। ধারণা করা হয়, উহার কিছু উপকরণ পূর্বেই অপহৃত হইয়াছিল।

এই শহরটির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নাই। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মামলূক সর্দারগণের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় শহরটি লুণ্ঠিত হয় এবং ইহার গভর্নর হাসান আখ্‌মীমীকে হত্যা করা হয়। ইতিপূর্বে তিনি ১১১৪-১৬/১৭০২-৪ সালে ইহার প্রধান মসজিদটি সংস্কার করিয়াছিলেন। খোদিত শিলালিপিতে এই বিষয়টির বিবরণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়া'কূ'বী, ৩৩২ (Trans. Wiet, 187) (২) মাক'দিসী, ২০১ ; (৩) ইদ্রীসী (Dozy and de Goaje), 46-7; (৪) ইব্‌ন জুবায়র, ৬০ প., (trans. Gaudefroy Demombynes, 68-78; trans. G. Broadhurst, 53-55); (৫) ইব্‌ন বাত'তূ'তা, ১খ., ১০৩ প.; (৬) ইয়াকূ'ত, ১খ., ১৬৫; (৭) আল-মাক'রীযী, খিতাত (Weit), ৪খ., ১৩৪-৩৮; (৮) Maspero and Wiet, Materiaux, MIFAO, xxxvi, 6-7; (৯) জাবারতী, ১খ., ৪৭, ৯৮; (১০) Wiet, L'Egypte de Murtadi, 103-110.

G. Wiet (E. I.[2]) / মোহাম্মাদ কামরুল হুদা

আল-আখ্‌রাম আল-হাজীমী (الاخرم الهجيمى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা খালীফা ইব্‌ন খায়্যাত' বাগ'আবী ও ইমাম বুখারী (তাঁহার তারীখে) উল্লেখ করিয়াছেন, ইয়াহ্'য়া ইবনুল ইয়ামান আল-'ইজলী হইতে, তিনি আবদুল্লাহ আত্-তায়সী হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল আখ্‌রাম হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যূ'ক'ার-এর যুদ্ধটিই সর্বপ্রথম যুদ্ধ যাহাতে আরবরা পারস্যবাসীদের উপর জয়লাভ করিয়াছিল এবং আমার ওয়াসীলাতেই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইব্‌ন মাকূলা "আল-আখ্‌রাম আল-হাজীমী" ও নিস্‌বা ছাড়া শুধু "আল-আখ্‌রাম"-এর মধ্যে পার্থক্য করেন এবং মনে করেন, তাঁহারা দুইজন পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানীর মতে তাঁহারা একই ব্যক্তি এবং তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছটিও এক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছ'ীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ৫৬; (২) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৫, নং ৫৭।

ড. ছৈয়দ লুৎফুল হক

আল-আখ্‌রাস (الاخرس) ঃ 'আবদুল গ'াফ্‌ফার ইব্‌ন 'আব্‌দিল ওয়াহি'দ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব, ইরাকের আরব কবি, জন্ম ১২২০/১৮০৫-এর কাছাকাছি সময়ে মাওসিলে (ভিন্ন বর্ণনায় ১২২৫ হি.-তে, আল-আ'লাম, সার্‌কীস), মৃ. ১২৯০/১৮৭৪-এ বসরাতে। বাগদাদে বসতি স্থাপনের পর তিনি বাগদাদের ওয়ালী (গভর্নর) দাঊদ পাশার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। দাঊদ পাশা তাঁহাকে ত্রুটিপূর্ণ বাকশক্তির চিকিৎসার জন্য তাঁহার অনুরোধে ভারতে প্রেরণ করেন। এই ত্রুটিপূর্ণ বাকশক্তির জন্যই তিনি আল-আখ্‌রাস (বোবা) নামে অভিহিত হন; কিন্তু তিনি অস্ত্রোপচারে অসম্মত হন। তিনি বাগদাদে অবস্থানের সময় দাঊদ পাশা, 'আবদুল বাকী এবং বাগদাদ ও বসরার খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে স্তুতিমূলক কবিতা লিখিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া মনে হয়। ইরাকে তাঁহার খ্যাতির মূলে ছিল তাঁহার চিরায়ত কাব্যসাহিত্যের বিভিন্ন রীতি অবলম্বনে রচিত অন্যান্য কবিতা, যথা গাযাল, মার্ছি'য়া (বিলাপগীতি) ব্যঙ্গ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনামূলক কবিতা ও আত্মস্তুতি। তিনি কতিপয় মুওয়াশ্‌শাহ'াত ও মদ্যের স্তুতিমূলক কবিতাও লিখিয়াছেন, যেজন্য তাঁহাকে ঊনবিংশ শতকের আবূ নুওয়াস বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। তাঁহার অসমাপ্ত দীওয়ানটি 'আবদুল বাকীর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমাদ ইয্‌যাত পাশা আল-ফারূক'ীর প্রচেষ্টায় সংকলিত হয় এবং উহা কনস্টান্টিনোপলে ১৩০৪/১৮৮৬ সনে আত্-তিরাযুল

আনফাস ফী শি'রিল-আখ্রাস (الطراز الانفس فى شعر الاخرس) নামে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জ. যায়দান, তারাজিম মাশাহিরিশ্-শারক, ৩য় সং, ১৯২২, ১খ., ২৫৭-৬০; (২) L Cheikho, la Litterature arabe au xixe siecle, 2nd ed. 1924-6, ii 9-11; (৩) ম. ম. আল-বাসীর, নাহদাতুল 'ইরাকিল-আদাবিয়্যা ফিল-ক 'রনিত-তাসি' 'আশার, বাগদাদ ১৩৬৫/১৯৪৯, ১১৪-২৯; (৪) H. Peres, La litt. arabe et I' Islam par les textes, ২৮; (৫) Brockelmann, S II, 792 and references quoted.

Ch. Pellat (E.I.[2]) / মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন

আখলাক· (দ্র. 'ইল্মুল আখ্লাক·)

আখ্লাত· (اخلاط) ঃ বা খিলাত· (خلاط), ওয়ান (Wan) হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত শহর ও দুর্গ। (১) প্রাক-মোঙ্গল ; (২) মোঙ্গল ও উছমানী তুর্কী যুগ।

(১) আর্মেনীয় ভাষায় শহরটিকে খলাত (Khlat) বলা হয়, দেশের প্রাচীন অধিবাসী "উরারতীয় খালদ"-গণের নামের সঙ্গে সম্ভবত এই নামটি সম্পর্কিত। মেসোপটেমিয়া (ইরাক) হইতে পূর্ব আর্মেনিয়ায় আক্রমণ পরিচালনাকালে যেই রাস্তা ব্যবহৃত হইত, ইহার সিপান দাগ ও নিমরূদ দাগ্-এর অর্ধপথে ইহা অবস্থিত। আল-বালাযু'রী (পৃ. ২০০) আর্মেনিয়ার তৃতীয় অংশে ইহা অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'আরবদের মতে কালীকালা (Erzerum), আর্জীশ ও বাহুনায়স (অর্থাৎ আপাহুনিক, যেখানে মানাযগিরদ অবস্থিত অথবা আখ্লাত জেলা (Bznunik) ইহার অন্তর্গত (তাঁহারা আর্মেনিয়াকে চারিভাগে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)।

উমার (রা)-এর শাসন আমলে 'ইয়াদ· ইব্ন গ'নম আখ্লাতিদের সঙ্গে সন্ধি করেন (আল-বালাযু'রী, পৃ. ১৭৬, ১৯৯)। চারি শতাব্দী ধরিয়া আখ্লাত পর্যায়ক্রমে গভর্নর, প্রায়-স্বাধীন আর্মেনীয় আমীর ও আরবের কায়স (قيس) গোত্রের স্থানীয় আমীরগণ দ্বারা শাসিত হইয়াছিল (Constontine Prophyrogenitus, ch. 44, ed. andtr. Morovcsik Jenkins, Budapest 1949, 198-205; তু. J. Markwart, Sudarmenien, 501-8 ও M. Canard, H'amdanides i, 478-87)। এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঃ Domesticus John Curcuas কর্তৃক ৩১৬/৯১৮ সালে আখ্লাত আক্রমণ (দ্র. ইবনুল আছীর, ৮খ., ১৪৬), ৩২৮/৯৩৯ সনে সায়ফুদ্ দাওলার আগমন (তারীখ মায়্যাফারিকীন, দ্র. M. Canard, Sayf al-Daula, Algiers-Paris 1934, 76-8; ঐ লেখক, H'amdanides, i, 478-87); ৩৫৩/৯৬৪ সালে নাজা (Nadja) কর্তৃক আখ্লাত অধিকার (মিসকাওয়ায়হ্, ২খ., ২০১) ইত্যাদি।

৩৭৩/৯৮৩-এর দিকে আখলাত· কুরদ বায রাজ্যের অংশ হইয়া যায় (Asolik of Taron, iii, Ch. 14) এবং মানাযগিরদ যুদ্ধ (৪৬৩/১০৭১) পর্যন্ত ইহা মারওয়ানী আমীরগণের অধীন ছিল। ইহার পর আল্পর আর্সলান (দ্র.) স্বয়ং ইহা দখল করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (তারীখ মায়্যাফারিক'ীন, পত্রী 145v)। ৪৯৩/১১০০ সনে ইহা তুর্কী আমীর সুক্মান আল-কুত্বী (سقمان القطبى) কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং শতাধিক বর্ষব্যাপী শাহ আর্মান (দ্র.) নামে পরিচিত বংশীয়দের ইহা রাজধানী ছিল। ৬০৪/১২০৭-এ আয়্যূবী বংশের আল-'আদিলের পুত্র আল-আওহাদ ইহা দখল করেন এবং ৬০৯/১২১২-তে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা আল-আশ্রাফের নিকট ইহা হস্তান্তরিত হয়। অন্তর্বর্তী কালে জর্জিয়ানরা দুইবার আখ্লাত আক্রমণ করিয়াছিল (৬০৫/১২০৮ ও ৬০৭/১২১০)। ৬২৭/১২৩০-এ খাওয়ারিয্ম শাহ জালালুদ্দীন মাংগু বুরনী ছয় মাসব্যাপী অবরোধের পর উহা অধিকার করেন। অনতিকাল পরেই আরযিনজান্ নামক স্থানে রূমের সালজূক' 'আলাউদ্দীন কায়কু'বাদ (১ম)-এর সহযোগিতায় আল-আশরাফ কর্তৃক তিনি পরাজিত হন। ৬৩৩/১২৩৩-এ কায়কুবাদ স্বয়ং আখলাত অবরোধ করেন এবং আয়্যূবী আমীরগণের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা অধিকার করিয়া নেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আখ্লাতের বিশদ বরাতের জন্য দ্র. A. Gabriel, Voyages archeologiques dans la Turquie Orientale, Paris 1940, i, 241-51 (with plates, ii, 85-90); (২) খোদিত ফলকের জন্য দ্র. আবদুর্ রাহীম শারীফ, Ahlat kitabeleri, Istanbul, 1932 (corrections and additions by J. Sauvaget, in Gabriel, op. cit., 346-50, এবং RCEA, nos. 3880-2, 4440, 4682, 4696, 4782-3, 4801-2 4996, 5038, 5116-9; (৩) E. Honigmann, Ostgrenze d. Byzant. Reichs, Brussels 1935, স্থা. ; (৪) V. Minorsky, Studies in Caucasian History, London 1953, index; (৫) Le Strange, 183; (৬) H.F.B. Lynch, Armenia, London 1901, ii, 280-97; (৭) Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenin u. Kurdistan, Leipzig 1913, 58.

V. Minorsky (E.I.[2]) / ম. নুরুল ইসলাম চৌধুরী

(২) মোঙ্গল ও উছমানী তুর্কী যুগ

কোস দাগ (Kose Dagh- كواسه طاغ) যুদ্ধের পর আখ্লাত মোঙ্গলদের দ্বারা অধিকৃত হয় (৬৪২/১২৪৪; দ্র. Tamaschek, in SBAW, 133, no iv, 31 ff.)। তবে আবুল ফিদা (Reiske-Adler iv, 472) দেশীয় আমীরদের কর্তৃত্ব বজায় থাকার কথা দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন (আখ্লাতের উপর একজন জর্জিয়ান রাজকন্যার অধিকার নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, Cyriac of Gandja, 440, cf. B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 330, n. 1)। মোঙ্গলগণ কর্তৃক আখ্লাত, মেসোপটেমিয়ার উপরাংশ ও আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি নিশ্চিতভাবে অধিকৃত হওয়া শুরু হয় তাহাদের বাগদাদ অধিকার (৬৫৬/১২৫৮) এবং তৎসংগে হলাগু খানের (হালাকু খান) সিরিয়ার দিকে অগ্রাভিযানের পর (Spuler, op. cit.,

55)। উহার পর আখ্লাত ঈল্খানগণের (Ilkhans) ও তাহাদের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহের (Djala'irid's, Ak. Koyunlu) অধিকারে থাকে এবং ইহা ঈল্খানদের টাকশাল শহরও হইয়াছিল। ৬৪৪/১২৪৬-এ মারাত্মক ভূমিকম্পে নগরটির বহু অংশ ধ্বংস হইয়া যায়।

'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় লোক-কাহিনীগুলির একটিতে আখ্লাতের উল্লেখ আছে। 'উছমানের পিতা বলিয়া কথিত এরতুগরুল (Ertoghrul) ছিলেন ওগুয (oghuz) গোত্রের লোক এবং এই গোত্রের বিজয় অভিযান এই স্থান হইতে শুরু হয়। কথিত আছে, মোঙ্গলদের চাপের মুখে 'উছমান আখ্লাত হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। আরতুগরুল-কে 'উছমানের পিতা বলিয়া শনাক্ত করিতে নাশরী অস্বীকার করেন (তারীখ, সম্পা. Taeschner, ২১-২২, আনকারা সংস্করণে এই কথাটি নাই)। আওলিয়া চেলেবীর (৪ খ., ১৪) বর্ণনামতে 'উছমানী তুর্কীদের পূর্বপুরুষগণের সমাধি আখ্লাতে অবস্থিত। প্রথম সালীমের সময় এই নগরটি 'উছমানীদের অধিকারে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শাহ্ তাহ্মাস্প্ (Shah Tahmasp) ৯৫৫/১৫৪৮ সালে শহরটি অধিকার করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া দেন। প্রথম সুলায়মান তাঁহার শাসনামলে ইহাকে চূড়ান্তভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া হ্রদের তীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। আওলিয়া চেলেবীর বর্ণনানুসারে ৯৬৩/১৫৫৪-৫-এ ইহার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এই দুর্গের নিকট একটি ক্ষুদ্র নূতন শহর গড়িয়া উঠে। 'উছমানী আমলে আখ্লাত স্থানীয় কুর্দী আমীরদের শাসনাধীনে আসে এবং ১৮৪৭-এ দ্বিতীয় মাহমূদের (Mahmud II) শাসনামলে ইহাকে প্রত্যক্ষ 'উছমানী প্রশাসনের আওতায় আনয়ন করা হয়। কুইনেটের (Cuinet) বিবরণ অনুসারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আখ্লাতের কাদায় (Kada) ২৩,৬৫৯ জন অধিবাসী ছিল (১৬,৬৩৫ মুসলিম, ৬০৯ জর্জিয়ান আর্মেনিয়ান, ২১০ গোঁড়া গ্রীক, ২৩০ ইয়াযীদী)। বর্তমানে ইহা তুর্কী প্রজাতন্ত্রের শাসনাধীনে বিটলিস (Bitlis) প্রদেশ [The wilayet (il)]-এর অন্তর্গত একটি কাদা [Kada ilce]-এর সদর; শহরের জনসংখ্যা (১৯৪৫) ৩,১২৪ ও কাদার ১৩,১০২।

পর্বতের ঢালুতে অবস্থিত মধ্যযুগীয় শহর আসকি আখ্লাত (Eski Akhlat) ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জনবসতিহীন। ইহার পূর্বদিকে হ্রদের তীরে একটি বিরাট 'উছমানী দুর্গ (Kal'e)-সহ একটি নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে (দুর্গের প্রধান ফটকে সুলতান দ্বিতীয় সালীমের একটি শিলালিপি রহিয়াছে (১৫৬৮)। শহরটিতে ১৬শ শতাব্দীর দুইটি মসজিদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে জামে' ইস্কান্দার পাশা নামে পরিচিত মসজিদে ৯৭৮/১৫৬৪ এবং ইহার মিনারে ৯৭৮/১৫৭০ সাল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অপর মসজিদটি "জামে' কাদী মাহমূদ" নামে পরিচিত। ইহার নির্মাণকাল ১০০৬/১৫৯৭। মধ্য ও আধুনিক যুগের শহরগুলির মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিখ্যাত কবরস্থান আছে। এইখানে ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত কালের মনোরমভাবে অলংকৃত মূল্যবান প্রস্তরের বহু স্মৃতিফলক রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৪০১ খৃস্টাব্দের একটি 'ram' প্রস্তর আছে এবং সাল্জূক, মোঙ্গল ও তুর্কী আমলে কবরের উপর নির্মিত ইমারতাদি রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঃ (১) উলু-কুমবেদ (Ulu-Kunbed) (২) শাদী আগা কুমবেদী (Shadi Agha Kunbedi, ১২৭৩ খৃ., এখন বিলুপ্ত) ; (৩) ইতি টুর্বে বুগাতাই আগা (মৃ. ১২৮১ খৃ. ও তাহার পুত্র হাসান তায়মুর (মৃ. ১২৭৯ খৃ.); (৪) বায়েন দীর মসজিদ (৮৮২/১৪৮৩) এবং তুর্বে (৮৯০/১৪৯১-৯২); বাবাজান কর্তৃক নির্মিত একটি ইমারত বিশেষভাবে আকর্ষণীয়; (৫) শায়খ নাজ্মুদ্দীন তুরবাসী (১২২২ খৃ.); (৬) হাসান পাদিশাহ্ তুরবাসী (১২৭৫ খৃ.) ও এর্জেন খাতুন তুরবাসী (১৩৯৬-৭ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, ৪২৩ প.; (২) আওলিয়া চেলেবী, ৪ খ., ১৩৪, ১৪২; (৩) সামী, কামূসুল আ'লাম, ১/৪৬-এ; (৪) Reclus, Nouv. Geogr. univ. ix, 376; (৫) V. Cuinet, La Turquie d' Asie, ii, 564-6.

F. Taeschner (E.I.[2]) / ম. নুরুল ইসলাম চৌধুরী

আখ্শাম (দ্র. সালাত)

আখ্শীকাছ (দ্র. আখস'ীকাছ')

আখ্স'ীকাছ' (خصيكث।) ঃ অথবা আখ্শীকাছ' (خيكث।) (Sogdian, "যুবরাজ-নগর":), ৪র্থ/১০ম শতকে ফারগানার রাজধানী, আমীর (শাসক) ও তাঁহার কর্মকর্তাদের (عمال) নিবাস, সীর দারয়া (jaxartes)-এর উত্তর তীরে কাসান্সে-র মোহনার নিকটে একটি পর্বতের পাদপেশে অবস্থিত। ইব্ন খুররাদায' বিহ্ (মৃ. ২০৮ হি.) ইহাকে মাদীনাতু ফারগানা (ফারগানা শহর) বলিয়া অভিহিত করেন। ইব্ন হ'াওক'াল (Kramers, পৃ. ৫১২)-এর মতে ইহা অনেক খাল ও একটি সেনানিবাসবিশিষ্ট (১ বর্গমাইলের) বড় শহর ছিল। সেইখানে জামে মাসজিদ, শাসনকর্তার প্রাসাদ ও কারাগারও ছিল। তখন নগরটি পাঁচটি ফটকবিশিষ্ট একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার বহির্দেশে ছিল বিস্তীর্ণ শহরতলী ও বাগ-বাগিচা। নগরী ও শহরতলীতে দুইটি পৃথক পৃথক বাজার ও ইহার অদূরে ছিল উর্বর চারণভূমি (আল-ইস্ত'াখ্রী, ৩৩৩; আল-মাক'দিসী, ২৭১; আল-ক'াযবীনী, ২খ., ১৫৬; হ'দূদুল 'আলাম, ৭২, ১১৬)।

১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শহরটি খাওয়ারিযম শাহ ২য় মুহাম্মাদ-এর যুদ্ধ-বিগ্রহের ও পরবর্তী মোঙ্গল আক্রমণের সময় বাহ্যত ধ্বংস হইয়াছিল (শারাফু'দ-দীন 'আলী ইয়ায্দী, জাফার নামাহ, কলিকাতা ১৮৮৫-৮, ১খ., ৪৪১, ২খ., ৬৩৩; এইখানে আখ্স'ীকাছ নামের উল্লেখ রহিয়াছে)। রাজধানী আন্দীজানে স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কালের জন্য, যেমন বাবুরের সময় আখ্স'ী শহরটি পরিচিত ছিল (দেখুন বেভারিজের অনুবাদ, নির্ঘন্ট), ফার্গানার ২য় শহর হিসাবে বিরাজমান ছিল। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতেও বর্তমান রাজধানী নামান্গান শহরটি আখ্সীর কম গুরুত্বপূর্ণ ছোট শহরগুলির (তাওয়াবি') অন্যতম হিসাবে পরিগণিত ছিল (তু. বাহ্'রুল আস্রার, H. Ethe, India Office Cat. no. 575, fol. 108v., আখ্সী ও শাহান্দ পল্লীর নিকটে ধ্বংসাবশেষ (১০০০ পদ পশ্চিম হইতে পূর্বে, ৬০০পদ উত্তর হইতে দক্ষিণে, সির দারয়ার ১৫০ ফুট উঁচুতে)। পুরাতন সেনানিবাস ইস্কি আখ্সী-র সহিত ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে N.

I. Veselovskiy কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত (explored) হইয়াছে (তু. Sredneaziatskiy Vyestnik, Tashkent, July 1896)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Schwarz, Iran, iii, 269 (প্রাসঙ্গিক বরাত, ফারগানা সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই); (২) Le Strange, 477 f., 489; (৩) K. Miller, Mappac Arabicae, Stuttgart 1926-31, iv, 78-82, 86-91.

B. Spuler (E. I.²) / নাজমুস সালেহীন

আখরনার (দ্র. নুজূম)

আখাল্ চিক (দ্র. আখিস্‌খা)

আখাল তেক্‌কে ঃ ১৮৮২ ও ১৮৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ট্রান্স কাসপিয়ার রুশ অঞ্চলের (Oblast') একটি জেলা (uezd) যাহা ১৮৮১ সালে রাশিয়া কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ইহাকে আতেক (Atek) (প্রধান অঞ্চল ঃ আখ্‌কা গ্রাম) ও দুরূন (Durun) (দারূন ঃ প্রধান অঞ্চল বাখারদেন) উপজেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত জেলাটিকে আশ্‌কাবাদ বলা হইত। আখাল নামটি (আধুনিক নাম অনুযায়ী) কোপেত দাগ (Kopet Dagh) ও কুরেন দাগ (Kuren Dagh)-এর উত্তর ঢালে অবস্থিত মরূদ্যানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। Tekke বলিতে এই অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসী Tekke অথবা Teke (তু. Turkmen)-কে বুঝায়। পানিসেচ প্রণালীতে দক্ষ ইরান অধ্যুষিত এই অঞ্চলটির জন্য মধ্যযুগের ইসলামী ভূগোলবিদদের কাছে বিশেষ কোন নাম ছিল না। শাহ্‌রিস্তান-এর নগরদুর্গ (নাসার দিকে তিন ফারসাখ, প্রায় দশ মাইল) এবং বর্তমান কিযিল আর্‌ওয়াত-এর নিকটবর্তী ফারাওয়া (আফ্‌রাওয়া)-র বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত নাসা বা নীসা শহর এককালে এইখানে অবস্থিত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশটি উযবেক শাসনের আওতায় আসে এবং তখন ইহাকে সু বোয়ু (Su Boyu) “পানি পার্শ্ব”-এর পরিবর্তে তাগ বোয়ু (Tagh Boyu) “গিরিপথ” বলা হইত (অর্থাৎ মূল খাওয়ারিয্‌ম)। ঐ সময় নাসা (Nasa) শহরটি সম্ভবত বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা সেচ ব্যবস্থার অভাবে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। সেই সময় দুরূন (দারূন) নামক জায়গাটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। রুশদের বিজয়ের সময় দেশটিতে কোন শহর ছিল না। আশকাবাদ ও কিযিল আর্‌ওয়াত এই দুইটি শহর কেবল রুশদের শাসনামলে স্থাপিত হইয়াছিল। জেলাটি প্রায়ই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (উদাহরণস্বরূপ ১৮৯৩, ১৮৯৫, ১৯২৯, ১৯৪৮ সালে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockhaus-Efron, Entsiklopediceskiy Slovar, St. Petersburg ১৮৯১, ২খ., ৫২৬ প.; ১২খ., Map after ১৬০; (২) Bol' shaya Sovyetskaya Entsiklopediay, ১৯৫০, ৩খ., ৫৬২ (horse-breeding); (৩) আশকাবাদ শীর্ষক নিবন্ধ।

W. Barthold-B. Spuler (E.I.²) / উম্মে সালেমা বেগম

আখিরাত (آخرة) ঃ ইহা আখির শব্দের স্ত্রীলিংগ। ইহার অর্থ সকলের পর, সর্বশেষ। শব্দটি কুরআন মাজীদে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারদের মতে ইহা আসলে الدار الاخرة (পরকাল) অর্থাৎ শেষ আবাস; উহার বিপরীত শব্দ হইতেছে الدنيا (অর্থাৎ নিকটতর বা নিকটতম আবাস বা জীবন অর্থাৎ বর্তমান জগৎ)। আখিরাত শব্দের প্রতিশব্দ معاد মা'আদ। এই বৈপরীত্য دار البقاء (অর্থাৎ চিরস্থায়ী জীবনের আবাস) এবং دار الفناء (অর্থাৎ ধ্বংসশীল আবাস) হইতেও প্রকাশ প্রায়। أ-ج-ل (اجل) ও ع-ج-ل (عجل) ধাতুগুলি হইতেও যথাক্রমে এই অর্থগুলি পাওয়া যায়। আখিরাত দ্বারা পরলোকে সুখ-দুঃখের নিরিখে মানবাত্মার অবস্থাও বুঝায় এবং উহার বিপরীত দুন্‌য়া শব্দের অর্থ হইতেছে ইহজগতে মানুষের ভোগের অংশ, বিশেষভাবে জাগতিক জীবন, আনন্দ প্রভৃতি। অধিকতর পারিভাষিক রংগে রঞ্জিত ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার ভিত্তি এই অর্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত; যথা পুনরুত্থান, মৃতের অবস্থা—তাহা দৈহিক হউক বা বিদেহী হউক। দার্শনিকদের পরিভাষায় যাহারা দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নহে, আখিরা বলিতে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান বুঝায় (দ্র. কিয়ামত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Lexicon, উক্ত নামীয় শব্দ ; (২) তাহাবী, কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাতি ল-ফুনূন, ed. Sprenger, উক্ত নামীয় শব্দ; (৩) আল-গাযালী, ইহ্‌য়া 'উলূমিদ্দীন, ৪০শ অধ্যায় ও স্থা.; (৪) ফাখ্‌রুদ্দীন আর্‌-রাযী, মুহাস্‌সিল, রুক্‌ন ৩, কিসম ২।

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ)

আখিরী চাহার শম্‌বা (آخرى چهار شنبه) ঃ শাম্‌বা, স'াফার মাসের শেষ বুধবার। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মুসলিমগণ এই দিবস পালন করে। আখিরী চাহার শম্‌বা সম্বন্ধে কথিত হয়, নবী কারীম (স) এই দিন তাঁহার পীড়ায় কিছু উপশম বোধ করিয়াছিলেন এবং গোসল করিয়াছিলেন। এই দিনের পর আর তিনি গোসল করেন নাই। কারণ তৎপর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে রাবী'উল আওয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মহানবী (স)-এর পীড়া শুরু হয় স'াফার মাসের বুধবার হইতে। কিন্তু পীড়াকাল ও ইন্তিকালের তারিখ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে বর্ণনাগুলি বিভিন্ন (সীরাতুন-নাবী, ১/২খ., ১৭১-এ ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে)। এই সমস্ত বর্ণনায় ইন্তিকালের তারিখ ১২, ২ ও ১ রাবীউ'ল-আওয়াল বলা হইয়াছে। এই তারিখগুলির মধ্যে ১ রাবী'উল-আওয়ালকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মহানবী (স)-এর ওফাতের এই তারিখটি অধিক গ্রহণীয়। ইহাতে আখিরী চাহার শম্‌বার তারিখ হইবে ২৫ স'াফার (দ্র. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত আখিরী চাহার শম্‌বা ও তদীয় মুদ্রিত প্রবন্ধ, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ বাং, পৃ. ৭৯)। অধিকাংশ বর্ণনানুযায়ী পীড়ার মোট সময় ১৮ স'াফার বুধবার হইতে শুরু করিয়া ১৩ দিন হয় (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৯৯৯)। ইহাতে আছে, পীড়া শুরু হয় সফরের কয়েক রাত্রি বাকী থাকিতে অথবা রাবী'উল আওয়াল মাসেই। পীড়াকালে যতদিন যাতায়াতের শক্তি ছিল, ততদিন তিনি মসজিদে গিয়া নামায পড়াইতেন।

এমনও হইয়াছে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) তাঁহাকে ধরিয়া মসজিদে আনিতেন। হাবীবুস্-সিয়ার, ১/৩খ., পৃ. ৯৭৯ উল্লিখিত হইয়াছে, পীড়াকালে তিনি দুইবার মিম্বরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরা, পৃ. ১০০)।

আখিরী চাহার শম্বা উদ্‌যাপনের কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়া যায় না। এই দিনে লোকেরা গোসল করে, নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং খোশ্‌বু লাগায়। দিল্লীর বাদশাহী কিল্লায় এই উৎসব উপলক্ষে দরবার বসিত। উহাতে শাহ্‌যাদাহ্ ও আমীরগণ শরীক হইতেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. ফারহাংগ-ই আস্'ফিয়া, ২য় সং., ১খ., ১২৬, আখিরী চাহার শম্বা প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত বরাতসমূহ ছাড়া (১) ইব্ন হিশাম, সীরা রাসূলিল্লাহ্, পৃ. ৯৯৯; (২) শিব্‌লী নু'মানী, সীরাতুন্ নাবী, ১/২খ., পৃ. ১৭১ প.; (৩) জা'ফার শারীফ দাকানী, ক'নূন-ই ইসলাম, ইংরেজী অনু. G.A. Herklots, Madras ১৮৬৩ খৃ., সূচী; (৪) ফারহাংগ-ই আস্‌ফিয়া, দিল্লী ১৯১৮ খৃ., ১খ., ১২৬; (৫) J.T. Platt, A Dictionary of Urdu etc., أخرى শব্দ; (৬) E.D. Sell, The Faith of Islam, ১৯০৭, সূচী; (৭) Garcin de Tassy, L' Islamime d'apris le Coran., পৃ. ৩৩৪ প.।

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ)

আখিস্‌খা ঃ মধ্যএশিয়ার জর্জিয়ার Akhal Tsikhe (নূতন দুর্গ)-এ অবস্থিত একটি শহরের ফার্সী ও তুর্কী নাম, Poskhov নদী (Kur নদীর উজানের বাম উপনদী)-র তীরে অবিস্থত, জর্জীয় প্রদেশ Samtskhe (পরবর্তী নাম Sa-atabago)-এর কেন্দ্র, আরব সেনাপতি হ'াবীব ইব্ন মাস্‌লামা কর্তৃক (মু'আবি'য়া (রা)-এর অধীনে) বিজিত স্থানসমূহের মধ্যে ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে (আল-বালাযুরী, ২০৩)।

মোঙ্গলদের অধীনে এখানকার স্থানীয় শাসকগণ (Djakil'e পরিবার ভুক্ত) স্বায়ত্তশাসন ও "আতাবেগ" উপাধি লাভ করেন। ফার্সী ও তুর্কী সূত্রগুলির মাধ্যমে যে কুর্‌কুরা নামটি পাওয়া যায় তাহা এই শাসকগণের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কুয়ারকুয়ারে (Kuarkuare) নামেরও বাহক ছিলেন (Brosset, Histoire de la Georgie, ii)।

১৫৭৯ খৃ. Akhal Tsikhe উছমানী সাম্রাজ্যের দখলে আসে। তাহারা সাফল্যের সঙ্গে এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম, উছমানী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রচলন করেন। ১৬২৫ খৃ. তুর্কী পাশাগণ ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। Akhal Tsikhe এক বিশেষ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং অন্যতম প্রধান ককেশীয় দাস ব্যবসায়ের বাজারে পরিণত হয় (হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৪০৮)। ১৮২৯ খৃ. শহরটি রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রুশ বিপ্লবের পরে ইহা জর্জিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকের একটি অংশে পরিণত হয়।

V. Minorsky (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আখী (أخى) ঃ ১৩শ/১৪শ শতাব্দীতে আনাতোলিয়ায় (তুরস্কের এশীয় অংশের নাম) যুবকদলের সংঘরূপে গঠিত সমিতিসমূহের নেতৃবৃন্দের উপাধি। উহারা প্রধানত কারিগরদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং ফুতুওওয়া (দ্র.)-র নীতি মানিয়া চলিতেন। উপাধিটিকে ইব্ন বাত্তু'তা (২খ., ২৬০) আরবী শব্দ أخى (আমার ভ্রাতা)-র সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন। ধ্বনির অভিন্নতার অধিক কোন কিছুর ভিত্তিতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকিলে ইহা "সম্বোধন" উপাধিরূপে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন আ. সায়্যিদী, তু. খানুম, বেগম প্রভৃতি। তবে ভিন্নার্থবোধক শব্দদ্বয়ের একই ধ্বনিবিশিষ্ট হওয়া একটা আকস্মিক ব্যাপার হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, যদিও আখী উপাধিধারিগণ স্বেচ্ছায় উপাধিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন সময় ফার্সী অনুবাদ বিরাদার শব্দের অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (তু. Taeschner- Schumacher, নাসি'রী, ৩৮)। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি তুর্কী শব্দ (তু. J. Deny, in JA, ১৯২০, ১৮২প.; H. H. Schaeder, in OLZ, ১৯২৮, ১০৪৯, টীকা ১)। উহা আকী (aki) উচ্চারণে বদান্য অর্থে উয়গুর ভাষায় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (A. von Gabain, Altturkische Grammatik, দ্র. শব্দকোষ; Turfantexte, ৬খ., ১. ৪)। শব্দটি একই বানানে ও অর্থে ব্যবহৃত হয় (তু. অধিকন্তু আকীলীক="বাদান্যতা") মধ্যতুর্কী (কাশ্‌গাড়ী) ভাষায়; আল-কাশ্‌গাড়ীকৃত দীওয়ান লুগাতিত তুর্ক-এ (আকী, "আল-জাওয়াদ", ১খ., ৮৪ facs. ed. ৫৭; আকীলীক, ৩খ., ১২৯-facs. ed. ৫২০; C. Brockelmann রচিত Mittelturkischer Wortschatz শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.) এবং আদীব আহমাদ ইব্ন মাহ্'মূদ য়াকনেকীর নীতিশিক্ষামূলক 'আতাবাতুল হাকাইক (عتبة الحقائق) শীর্ষক কবিতার ৯ম পরিচ্ছেদে (সম্প. R. Rahmeti Arat, ইস্তাম্বুল ১৯৫১, পৃ. ৫৮-৬১, নির্ঘন্ট; হিবাতুল হাকাইক (هبة الحقائق, সম্পা. নাজীব আসিম, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪, পৃ. ৫২-৫; তু. J. Deny, in RMM, ১৯২৫, পৃ. ২১৯, টিকা ১); আকী আর, "জনৈক বদান্য ব্যক্তি" ও আকী বোল, "বদান্য হও"; ইহার বিপরীতার্থক শব্দাবলী হইল বাখীল ও বাখীল্লিক অথবা বুখুল, খাসীস ও খাসীস্‌লিকও। শেষোক্ত গ্রন্থে 'আখী' শব্দটি উচ্চারণভেদে আকীরূপে ব্যবহৃত হয়, আর রূম-তুর্কী ভাষায় কেবল এইরূপেই উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীনতম রূম-তুর্কী সাহিত্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহা সম্বোধন করিতে ("হে দানশীল, হে মহান, ওহে বীর") এবং পংক্তির অন্ত্যমিল বজায় রাখিতে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিতাব-ই দেদে কোরকুত (সম্পা. E. Rossi, পত্রী ৬৫, ৩বার; সম্পা. কিলিস্‌লি রিফআত, ১৬; সম্পা. Gokyay, ৯), ইউনুস ইমরে রচিত দুইটি কবিতায় (সম্পা. বুরহান উমীদ, ২খ., ৩৪৪, ৩৬১; সম্পা. 'আবদুল বাকী গোল্‌পিনার্‌লী, ১১৭) এবং অন্যত্র (যথা Enweri [মুক্‌রিমীন খালীল], ৪৩)। ফার্‌সী শব্দ জাওয়াঁমার্দ-এর তাৎপর্য পুরাপুরি গৃহীত হওয়ায় (আখী) শব্দটির সাধারণ অর্থ পরিবর্তিত হইয়া উহা একটি বিশেষ অর্থ অর্থাৎ ফুতুওওয়্যার অধিকারী বীরধর্মশীল (ফার্‌সী ফুতুওওয়াত, তুর্কী ফুতুওবেত) গ্রহণ করিয়াছে। জাওয়াঁমার্দ আস্‌লে আরবী ফাতা, আল-ফাতা (যুবক) শব্দের ফার্‌সী প্রতিশব্দ (তু. H.H. Schaeder, পৃ. স্থা.)।

আখী উপাধিটি সর্বদাই বীরত্ব গুণসম্পন্ন লোকের (সাহিব ফুতূওবেত বা ফুতূওবেত দার) নামের পূর্বে বসে, আর মাঝে মাঝে উহা, এমনকি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর পূর্বেকার লোকজনের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উহা সূফী শায়খ আখী ফারাজ যান্‌জানী (মৃ. ১ রাজাব, ৪৫৭/৮ জুন, ১০৬৫)-র নামে সংযুক্ত হয়। কথিত আছে, কবি নিজামী (জ. ৫৩৫/১১৪১)-র শিক্ষকও উক্ত উপাধি ধারণ করিতেন। যাহা হউক, ৭ম/১৩শ, বিশেষত ৮ম/১৪শ শতাব্দীতেই উপাধিটি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, প্রধানত আনাতোলিয়ায় বহুবার ব্যবহৃত হয়। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর দিকে ক্রমশ ইহার প্রয়োগ বিলুপ্ত হয়।

আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে আনাতোলিয়ায় সাল্‌জূক আধিপত্যের শেষদিকে ও পরবর্তী কালে ফুতূওওয়া বা আখীবাদ সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। নিজস্ব সাহিত্য দ্বারা এইখানে উহা উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়ায় ৬৮৯/১২৯০ সনে নাসিরীর ফারসী ফুতূওয়াত-নামাহ ৮৮৬টি শ্লোকের একখানি মাছনাবী। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালীল আল-বুরগাযীর তুর্কী গদ্যে লিখিত ফুতুওবেত নামাহ সম্ভবত ৮ম/১৪শ শতাব্দী হইতে প্রচলিত। গূল্‌শেহ্‌রী প্রণীত আত্‌তার-এর মানতিকু 'ত্‌ তায়র গ্রন্থের প্রাচীন উছমানী সংস্করণের ফুতূওবেত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, F. Taeschner অধীত [SBPAW, ১৯৩২, ৭৪৪-৬০]। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন গ্রন্থে পরোক্ষ উল্লেখে (ইবন বাত্তুতার ২খ., ২৫৪-৩৫৪, বিশেষত পৃ. ২৬০, আল-আখিয়্যাতুল ফিত্‌য়ান অধ্যায়টিই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত) উৎকীর্ণ লিপি ও দলীলাদি দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে (আরও গ্রন্থাদির একটি তালিকার জন্য যাহাতে বর্তমানে বহু নাম যোগ করা চলে—দ্র. ইসলামিকা, ১৯২৯, ২৯-৪৭)। আশিক পাশা যাদাহ (সং. Giese, ২০১, ২১৩=ইস্তাম্বুল সং, পৃ. ২০৫), আখিয়ান, গাযিয়ান, আব্‌দালান ও বাজিয়ান—এই চারটি দলকে রূম (আনাতোলিয়া)-এর ভ্রমণকারীরূপে (মুসাফিরলীর ভী সায়্যাহলার) উল্লেখ করিয়াছেন (এই বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য দ্র. P. Wittek, Byzantion, ১৯৩৬, পৃ. ৩১০)। বাক্যটির শব্দ যোজনা হইতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত চারিটি দলই বিদেশ হইতে আনাতোলিয়ায় আসিয়াছিল। মোঙ্গল যুগে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অগণিত দরবেশ ও অনুরূপ ব্যক্তি যাহারা প্রাচ্য (খুরাসান ও তুর্কিস্তান) হইতে আনাতোলিয়ায় আসিয়াছিলেন বলিয়া অন্যান্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে, ইহারা তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মোঙ্গল-পূর্ব কালে প্রাচীন ইরান রাজ্যে আখীদের উল্লেখ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আনাতোলিয়ায় আখীদের প্রাচীনতম উল্লেখ (বিশেষত আফলাকী, মানাকিবুল আরিফীন, তু. Cl. Cahan, পরে দ্র.) ইরানের সঙ্গে অতীতের সম্পর্কের জন্যই সম্ভব। পক্ষান্তরে আখীবাদের প্রতিষ্ঠানগত গঠন পদ্ধতির কথা বিবেচনা করিয়া বাগদাদের খলীফার দরবারের ফুতূওয়ার সঙ্গে ইহার সম্পর্ককে উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। ফুতূওয়া সংস্কারক খলীফা আন্-নাসি'র লিদীনিল্লাহ্ (৫৭৫-৬২২/ ১১৮০-১২২৫) ও রূমের সাল্‌জূক সুলতানের মধ্যকার বহুল প্রত্যায়িত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে উহা সম্ভবপর হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রূমের সাল্‌জূক বংশের রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত এবং আনাতোলিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া অনেক রাজ্যে পরিণত হওয়ার সময় আখীরা, সমসাময়িক বা ঈষৎ পরবর্তীকালীন গ্রন্থকারগণের মতে (যথা ইবন বীবী, আকসারায়ী, Paris Anonymous [প্যারী নগরীর অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার] আফ্‌লাকী ছিল সৈন্যদলের নেতা (রুনূদ)। তাঁহারা এই সময় বিস্ময়কর কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন যাহা শতাব্দী কাল পূর্বে বাগদাদে অনুষ্ঠিত আয়্যারূন (দ্র.)-দের ও সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত আহদাছ (দ্র.)-দের ক্রিয়াকর্মকে স্মরণ করাইয়া দেয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইব্‌ন বাত্তূ'তা'র ঐতিহাসিক বিবরণে তৎকালীন আনাতোলিয়ার বিবিধ রাজ্যের একত্র থাকার অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণরূপে আখী আন্দোলনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৩৩ সনের কাছাকাছি সময়ে ইব্‌ন বাত্তূ'তা'র আনাতোলিয়া ভ্রমণকালে সেই দেশের প্রতিটি শহরেই আখীরা তাঁহাকে আতিথেয়তা প্রদর্শন করে। যেই শহরে কোন শাসক বাস করিত না, সেইখানে তাহারা এক ধরনের শাসনক্ষমতা খাটাইত এবং আমীরের পদমর্যাদা ভোগ করিত (আকসারায়, ইব্‌ন বাত্তূ'তা, ২খ., ২৮৬; কায়সারিয়্যা, ২খ., ২৮৮ প.)। কখনও কখনও তাঁহারা বিচারকার্যও চালাইতেন (Konya, ইব্‌ন বাত্তূ'তা ২খ., ২৮১)। যখন সীওয়াস শহরে অবস্থিত আঞ্চলিক মোঙ্গল শাসকের কর্তৃত্ব আন্‌কারা পর্যন্ত পৌঁছে নাই, তখন সেইখানে আখীদলের মর্যাদা অপ্রতিহত ছিল। আনকারার এই সকল আখীর মধ্যে শারাফুদ্দীন সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁহার কবরের স্মৃতিফলকে তিনি নিজেকে "আখী মু'আজ্জ'াম" উপাধিতে আখ্যাত করিয়াছেন (মুবারাক গালিব, আন্‌কারা, ২খ., ১৫ প, নং ২০; ইসলামিকা, ১৯২৯, ৪৪, নং ৩ বি)। নাশরীর (Noshri) মতে (Taeschner, পৃ. ৫২, আন্‌কারা সং, পৃ. ১৯০-২) তাঁহাদের হাত হইতেই ৭৬২/১৩৬০-১ সনে সুলতান ১ম মুরাদ শহরটির শাসনভার গ্রহণ করেন। আখীদেরকে উছমানী বংশের প্রথম সুলতানদের সভাসদরূপেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আখীর কেহ কেহ ক্রুসা জয়ে অংশগ্রহণ করেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ইসলামিকা, ১৯২৯, পৃ. ৩০)। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে Fr. Giese মনে করেন, আখীরাই সেই সেনাদল যাহার সাহায্যে উছমানী শাসকগণ সেই দেশে শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন (ZS, ১৯২৪, পৃ. ২৫৫, ২৫৮)। তিনি উক্ত শাসকগণকে আখীদলের সদস্য বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা আখী আন্দোলন কেবল শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু কারিগররাই উহার সদস্য ছিল। P. Wittek দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিক Giese যে সকল কার্যকলাপকে আখীদের ভূমিকা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তাহা আসলে ধর্মযোদ্ধা গাযীদেরই কৃতিত্ব। ইহারাই ছিলেন আখীদের জঙ্গী পরিপূরক বাহিনী (ZDMG, ১৯২৫, পৃ. ২৮৮, স্থা.)। পক্ষান্তরে ৭৬৭/১৩৬৬ সনে সম্পাদিত সুলতান ১ম মুরাদের এক ওয়াক্'ফিয়া (উৎসর্জন) হইতে ও ৭৬৯/১৩৬৮ সনে প্রণীত হ'াজ্জী বেকতাশ-এর একটি উৎকীর্ণলিপি হইতে মনে হয়, সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে মুরাদ তখন পর্যন্ত প্রভাবশালী আখী সংঘের সদস্য হইয়াছিলেন (দ্র. Fr. Taeschner, War Murad I Grossmeister oder Mitglied des Achibundes, Oriens, ১৯৫৩, পৃ. ২৩-৩১)। তবে ইহার পরে আখীবাদের অগ্রগতি না হইয়া অবনতিই হইয়াছিল। কেননা মনে হয় উছমানী সুলতানগণ

আখীদের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে তাহাদের সহিত আর কোন সম্বন্ধই রাখেন নাই।

আখীদের নিজস্ব সাহিত্যে তাহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে আখী প্রতিষ্ঠান অর্ধ-ধার্মিক দরবেশকল্প সম্প্রদায়রূপেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) য়িগিত (তরুণ সম্প্রদায়, আরবী ফাতা শব্দটির অনুবাদ, আখী সংঘের সাধারণ অবিবাহিত সদস্যদের উপাধি); (২) আখী (কোন ফিত্য়ান সংস্থার সভাপতি ও যাবিয়া বা সভাগৃহের মালিক; কোন কোন শহরে এই শ্রেণীর একাধিক গৃহ ছিল) ও (৩) শায়খ, এই শ্রেণীর সদস্যরা সংঘের কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করিতেন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত উহা দরবেশদের কোন খানকাহ্-র নেতাকে বুঝাইত এবং সদস্যবর্গ নিজেদেরকে তাঁহার ভক্ত বলিয়া মনে করিত। বিভিন্ন সংঘের প্রতি তাহাদের ভক্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। মাওলাবী, বেক্তাশী, খাল্ওয়াতী ও সম্ভবত অন্যান্য শ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে আখীদের সম্পর্ক ছিল। সাধারণ সদস্যরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ কাওলী (বাচনিক)— যখন তাহারা "শুধু বাক্য দ্বারা" সাধারণভাবে আনুগত্য স্বীকার করে কিংবা সায়ফী (অসিধারী সদস্য); সম্ভবত ইহারাই সক্রিয় সদস্য ছিল। ইব্ন বাত্তুতার মতে (২খ., ২৬৪), ছোরা (সিক্কীন) ছিল তাহাদের প্রতীক। তাহারা সাদা পশমী পাগড়ী (ক 'লানস্‌ওয়া) দ্বারা তাহাদের মস্তক আবৃত রাখিত—যাহার প্রান্ত হইতে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ চওড়া ও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি দীর্ঘ একখণ্ড বস্ত্র ঝুলন্ত থাকিত। উল্লেখ্য, উহা কেচে (Kece) বা পরবর্তী যুগের জানিসারী (Janissaries)-দের মস্তকের উষ্ণীষ সদৃশ। ইব্ন বাতৃতার মতে আখী সংস্থার সদস্যবর্গ প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহাদের নেতার গৃহে সমবেত হইয়া তাঁহার হস্তে তাহাদের দৈনন্দিন রোজগার জমা দিত যদ্দ্বারা সভাগৃহের ও দলীয় খানাপিনার সকল ব্যয় বহন করা হইত। অতিথিরা, বিশেষত ভ্রমণকারী পথিকরাও উহাতে নিমন্ত্রিত হইতেন। ভ্রমণকারীদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা আখীদের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইত। ইব্ন বাত্তূতার মতে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ও তাহাদের অনুচরবর্গকে হত্যা করিয়া তাহারা একটি রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করিত। প্রাথমিক যুগের আখীদের প্রমাণিত কাজকর্মের প্রতিধ্বনিরূপে এই বিবরণটিকে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যাহা বিদ্রোহ বা অনুরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য রীতি ও তাহাদের সততার অলংঘ্য নীতি সম্পর্কে আখীবৃন্দ ফুতূওয়া (দ্র. তুর্কী, ফুতূওবেত)-এর সাধারণ রীতিনীতি মানিয়া চলিত। ফুতূওয়ার মত আখীদের মধ্যেও শিক্ষানবিস (তারবিয়া) সদস্যরূপে ভর্তিকালে তাহাদেরকে কোমরবন্দ পরান, মাথার চুল ছাঁটা, এক পেয়ালা লবণাক্ত পানি চতুর্দিকে ঘুরান এবং লম্বা পাজামা পরান অনিবার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। অবশ্য তাহাদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক মর্যাদা সুনির্ধারিত ছিল না। আখী সংঘের কোন কোন মতবাদ ও প্রথা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্ধ আলীভক্তি শী'আদের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে দেখা গেলেও তাহারা যে নিজদেরকে সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিত তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তুর্কী জাতির অন্য সকলের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে হানাফী মতবাদের অনুসারী ছিল। মালিকী মাযহাবভুক্ত ইব্ন বাত্তূতাকে তাঁহার সালাত অনুষ্ঠানে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হওয়ায় সিনোব শহরে রাফিদ'ী অর্থাৎ শী'আ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল। আর সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য তাঁহাকে খরগোশের ভুনা গোশত খাইতে হইয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আখীবাদ সম্বন্ধে তথ্যাদি ক্রমেই বিরল হইয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইয়া গেল। অবশ্য কখনও কখনও আখী শব্দটা নজরে আসে, কিন্তু কেবল ব্যক্তিনামরূপে। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর আমলে মোল্লা আখাওয়ায়ন নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। আখীযাদাহ্ নামক একটি পরিবার যাহার সদস্যবর্গ বিচার বিভাগের বিভিন্ন উচ্চ পদে সমাসীন ছিলেন, তাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়া অঞ্চলে আখী শব্দযোগে গঠিত বিভিন্ন স্থানের নাম বিরল নহে। কিন্তু আখীবাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শুধু তুর্কী সমবায় সংঘসমূহের (তু. সিন্ফ) কোন কোন উপাদানে উহার ঐতিহ্য বজায় থাকে। সেই সকল প্রতিষ্ঠানে (সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্ন সায়্যিদ 'আলাউদ্দীন, Great Futuwwet-name, ১৫২৪ খৃ. অনুযায়ী) নয়টি শ্রেণীবিভাগ ছিল। তন্মধ্যে আখীসংঘ ওরফে খালীফা দল মর্যাদায় সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

চর্ম পাকাকারীদের সমবায় প্রতিষ্ঠানেই আখীদের রীতিনীতি বিশেষভাবে চর্চা করা হইত। আখী এওরান (দ্র.) উহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি ছিলেন এক উপপৌরাণিক ব্যক্তিত্ব। অবশ্য যদি তিনি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইয়াও থাকেন, তবে নিশ্চয়ই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই জীবিত ছিলেন। চর্ম পাকাকারীদের যৌথ সমবায় সংঘের সভাপতির উপাধি ছিল আখী বাবা (দ্র.)। উপরন্তু চর্ম পাকাকারিগণ ইয়াহ্য়া ইব্ন খালীল আল-বুরগাযীকৃত ফুতূওবেত নামাহ্ অধ্যয়ন, সংশোধন ও উহার কপি তৈরি করিতেন।

তুরস্কের বাহিরেও মাঝেমাঝে আখী উপাধিটির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সপক্ষে প্রমাণাদি নিতান্ত অপ্রতুল। পারস্যে ঈলখানদের পতনের পর আযারবায়জান-এ আখীজূক (Akhidjuk) বা ছোট আখী নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক লক্ষণীয়। "খাতাঈ" বা শাহ ইসমাঈল প্রণীত "দীওয়ান" গ্রন্থে আখী শব্দটিকে শিথিল অর্থে কয়েকবার ব্যবহার করা হইয়াছে তাঁহার অনুসারিগণের অন্যতম উপাধিরূপে (V. Minorsky, The Poetry of Shah Ismail I, BSOAS, ১৯৪২, পৃ. ১০৩০ ক; M Fuad Koprulu, Turk Halkedebiyati Ansiklopedisi, নং ১, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫, পৃ. ৩০ ক)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Koprulu-Zade Mehmed Fu'ad, Turk Edebuyyatinde ilk Mutesawwifler, ইস্তাম্বুল ১৯১৮, পৃ. ২৩৭-৪৩; (২) Othman Nuri, Medjelle-i Umur-i Belediyye, i ঃ তারীখ-ই তাশকীলাত-ই বালাদিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৩৩৮/১৯২২, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ Akhi teshkilatinin esnaflik-la munasebeti, পৃ. ৫৩৭-৫৬; (৩) V I. Gordlevskiy, Iz zizmitsekhov v Turtsii. K. Istorii "Akhi", Zapiski Kollegii Vostokovedov,

1926-7, পৃ. ২৩৫-৪৮ (ফরাসী সংক্ষিপ্তসার G. Zajda, in REI, ১৯৩৪, পৃ. ৭৯ প.); (৪) Fr. Taescner, Beitrage zur Geschichte der Achis in Anatolien (14-15 Jhdt.) auf Grund neuer Quellen, Islamica, ১৯২৯, ১-৪৭; (৫) M. Djewdet "ذيل على فصل "الاخية الفتيان التركية" فى كتاب الرحلة لابن بطوطة (L' education et l'organisation aux foyers des gens des metiers en Asie Mineure et Syrie du XIIc siecle jusqu'a notre temps), ইস্তাম্বুল ১৩৫০/১৯৩২; (৬) Afet Inan, Apercugeneral sur l'Histoire economique de l' Empire Ture-Ottoman, ইস্তাম্বুল ১৯৪১, ৬৩-৬; (৭) Fr. Taeschner, Der anatolische Dichter Nasiri (um 1300) und sein Futuvvetname, mit Bietragen von W. Schumacher, Leipzig 1944; (৮) Ilhan Tarus, Ahiler, আন্‌কারা ১৯৪৭ (সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে); (৯) Fr. Taeschner, Spuren fur das Vorkommen des Achitums ausserhalb von Anatolien, Inter. Congr. of Orient-এর সভার কার্যবিবরণী, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ.; (১০) Cl. Cahen, Sur les traces des premiers Akhis, M. F. Koprulu Armagani; (১১) তু. ফুতুওওয়া প্রবন্ধ।

Fr. Taeschner (E.I.[2]) / মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আখী এওরান (اخى اوران) ঃ একজন তুর্কী দরবেশ। দরবেশ হিসেবে তাঁহার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার প্রায় অর্ধেকই লোককাহিনী; তুর্কী চর্ম সংরক্ষণ (tannery) ব্যবসা সংঘের পৃষ্ঠপোষক। একটি তাকিয়া (Tekye)-এর সংগে সংশ্লিষ্ট, কির্‌শহর-এ নির্মিত তাঁহার সমাধিসৌধ জনগণের যিয়ারাতগাহস্বরূপ ছিল। এই সমাধিসৌধ নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত, যাহার শিলালিপিতে ৮৫৪/১৪৫০ ও ৮৮৬/১৪৮১ সালের উৎকীর্ণ লিপি দেখা যায়। শেষোক্ত তারিখের লিপি আলাউদ্দাওলা ইব্‌ন সুলায়মান বেগ-এর নামে; তিনি সম্ভবত যুল্‌-ক'াদ্‌র পরিবারের লোক এবং এই সূত্রে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের ভগ্নীপতি ছিলেন। তাশকোপরু যাদাহ (ইব্‌ন খাল্লিকান, হাশিয়া, পৃ. ১৫; তুর্কী অনু., মাজ্‌দী, পৃ. ৩৩; জার্মান অনু., O. Rescher পৃ. (৯) তাঁহাকে "ওরখান" আমলের শায়খদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। গুলশেহ্‌রী (Gulshehri) কর্তৃক প্রণীত তুর্কী মাছ্‌'নাবী কারামাত-আখী এওরান তাবা ছারাহ্‌-এ আখী এওরানের নামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। দরবেশের মৃত্যুর খুব বেশী দিন পরে এই মাছনাবী রচিত হয় নাই; সম্ভবত গ্রন্থকারের মানতিকুত্‌-তায়র রচনা সমাপ্ত হওয়ার (৭১৭/১৩১৭) পরে ইহা রচিত হয়। কারণ ইহা হইতে মাছ্‌নাবীতে অনেক কিছু ধার করা হইয়াছে। ইহার পর তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় হাজ্জী বেক্‌তাশ প্রণীত বিলায়াত নামাহ্‌ পুস্তকটিতে যাহা রচিত হইয়াছিল দ্বিতীয় মুরাদের রাজত্বকালে (E. Gross, Das Vilayet-name des Haggi Bektasch, Leipzig 1927, p., 82-93)। গূল্‌শেহরী প্রণীত মাছ্‌'নাবীতে আখী এওরানের ব্যক্তিত্বে সামান্য অলৌকিকতার স্পর্শ থাকিলেও ইহা উল্লেখযোগ্য, এখানে চর্ম সংরক্ষকদের বৃত্তির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু বিলায়াত নামাহ-র বর্ণনাতে তাঁহাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত লোককাহিনীর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হইয়াছে দেখা যায় (এখানে চর্ম সংরক্ষকদের সংগে তাঁহার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ আছে)। উল্লেখযোগ্য, শেষোক্ত পুস্তকে আখী এওরানকে হাজ্জী বেক্‌তাশের বন্ধু হিসাবে দেখান হইয়াছে, শিষ্য হিসাবে নহে। আলী আমীরী (OTEM, 1335, 467 প., পাদটীকা) ও M. Djewdet (যায়ল আলা-ফাস্‌'ল আল-আখিয়্যা আল-ফিত্‌য়ান", ইস্তাম্বুল ১৩৫১/১৯৩২, ২৭৯-৮২) এই দুই লেখকের মতে আখী এওরান কর্তৃক সম্পাদিত একটি ওয়াক্‌ফ দলীল বিদ্যমান আছে যাহাতে ৭০৬/১৩০৬-৭ সনের উল্লেখ দেখা যায়। C. H. Tarim কর্তৃক প্রকাশিত Kirsehir Tarihi (কির্‌শহর ১৯৩৮)-তে দলীলের যে কপিটি লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে ৬৭৬/১২৭৭ তারিখের উল্লেখ আছে। এই ওয়াক্‌ফ দলীলে দরবেশের পূর্ণ নাম আশ-শায়খ নাস'িরুদ্দীন (Tarim : Nasr) পীর-ই পীরান আখী এওরান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যে একটি জাল দলীল তাহা সহজেই ধরা পড়ে, যেহেতু হাজ্জী বায়রাম ওয়ালী (মৃ. ৮৩৩/১৪২৮-৯)-এর শিক্ষক শায়খ হ'ামিদ ওয়ালী (৮১৫/১৪১২)-এর নাম উহাতে দেখা যায়। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে দলীলটি সৃষ্টি করা হইয়াছিল কির শহরে অবস্থিত আখী এওরানের সমাধিসৌধ দখলকারিগণের আইনগত অধিকার প্রমাণ করার জন্য। এই সমাধিসৌধের যিয়ারতের গুরুত্ব সম্পর্কে সীদী 'আলী রাঈস সাক্ষ্য দান করিয়াছেন (মির্‌আতুল-মামালিক, ইস্তাম্বুল ১৩১৩, পৃ. ১৬; ইংরেজী অনু., A. Vambery, The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis, London 1899, 105)। উপরিউক্ত পুস্তকের রচয়িতা হিন্দুস্তান হইতে প্রত্যাবর্তন কালে এই সমাধি যিয়ারত করিয়াছিলেন (৯৬৪/১৫৫৬)। কির্ শহর ছাড়া আনাতেলিয়ার অন্য শহরগুলিও দরবেশের মাযার অথবা অন্তত তাঁহার স্মৃতিবাহক কিছুর অধিকারী হওয়ার দাবি করে। সেই সকল শহর হইল ট্রেপিযুন্ত (Trapezunt) [Boz Tepe-তে একটি স্থান—মাকাম], কোনিয়া (Sircali-তে একটি স্থান), নিগদে (Nigde) ও ব্রুসা। যাহা হউক, এইসব দেশের দাবি অল্পবিস্তর বিস্মৃতির তলে তলাইয়া গিয়াছে এবং কির্ শহরের সমাধিসৌধেরই দাবি টিকিয়া আছে।

উপরিউক্ত রচনাবলী ছাড়াও আখী এওরান সম্পর্কিত কল্পকাহিনী পাওয়া যায় (১) কোন কোন গ্রন্থে, যথাঃ 'আলী প্রণীত কুনহুল- আখ্‌বার, ৫খ., পৃ. ৬৪; আওলিয়া চেলেবী প্রণীত সিয়াহাত নামাহ, ১খ., পৃ. ৫৭৪, পাদটীকা; (২) চর্ম সংরক্ষক সংঘগুলির সাহিত্যে যাহা "আখী" ঐতিহ্যকে জারী রাখিয়াছিল (প্রায়শ মানাকিব শিরোনামে যাহা ইয়াহয়া ইব্‌ন খালীল আল-বুর্‌গাযী প্রণীত ফুতূওয়াত নামাহ-র পরিশিষ্টে, তু. আখী); (৩) লোককথায়ও এই কল্পকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ জনশ্রুতি

যাঁহারা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত, যথাঃ M. Rasanen, Turkische Sprachproben aus Mittelanatolien, iii, Helsinki 1936, 99 প., nos. 22, 23 ও 25 এবং W. Ruben (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। এই সকল লেখায় বেশীর ভাগ দরবেশের চর্ম ব্যবসায়ী(বা উদ্যান রক্ষক) হিসাব কার্যাবলীর আলোচনা রহিয়াছে অথবা তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (যথাঃ এওরান বা এওরেন অর্থ সর্প Dragon বা দানব; এই কারণেই Gordlevskiy অনুমান করেন, সম্ভবত সর্প পূজা তখনও প্রচলিত ছিল)। চর্ম ব্যবসায়ী সংঘের সাহিত্যে একটি জনশ্রুতির উল্লেখ আছে এই মর্মে যে, ব্যবসায়ী আখী এওরানের আদি নাম ছিল মাহ্‌মূদ। তিনি ছিলেন নবী কারীম (স)-এর পিতৃব্য 'আব্বাস (রা)-এর পুত্র এবং নবী কারীম (সঃ) তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (মুনীরী বেল্‌গ্রাদী তাঁহার রচনায় [নিস'াবুল ইন্‌তিসাব ওয়া আদাবুল ইকতিসাব, ১৬২০ খৃ.] কাল নির্দেশের মধ্যে অসংগতির নিন্দা করিয়াছেন এবং চর্ম ব্যবসায়ী সংঘের সাহিত্যে শী'আ প্রবণতা পরিস্ফুট বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন)। জিলওয়াতি শায়খ সায়্যিদ মুসতাফা হাশিম (মৃ. ১১৯৭/১৭৮৩) প্রণীত 'আন্‌কা-ই মুশরিক' শীর্ষক পুস্তকটি হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন 'আলী আমীরী (পৃ. ৪৬৪-৬)। ইহাতে সায়্যিদ নি'মাতুল্লাহ আখী এওরান ওয়ালী নামে এই দরবেশ, হাজ্জী বেক্‌তাশ ওয়ালী ও সায়্যিদ আদাব 'আলীর সংগে একত্রে গাযী 'উছমান-এর কটিতে অসিবন্ধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উল্লিখিত হইয়াছেন। তুর্কী চর্ম সংরক্ষকদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহাকে যুক্ত করা হয় একটি দরবেশ সিল্‌সিলার সহিত যাহার আদি পুরুষ ছিলেন সমস্ত চর্ম সংরক্ষকদের পৃষ্ঠপোষক যায়দ হিন্দী। অন্যান্য সিলসিলার আদি পুরুষ ছিলেন মান্‌সূর 'আবিদ অর্থাৎ আল-হাল্লাজ।

কির্‌ শহরে আখী এওরানের সমাধিসৌধ বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক বৎসরগুলিতেও মহান ভূমিকা পালন করিয়াছিল; সমাধির শায়খ (যাঁহার উপাধি ছিল আখী বাবা) কিছুটা ব্যক্তিগতভাবে ও কিছুটা বিভিন্ন শহরে বসবাসরত তাঁহার প্রতিনিধিবৃন্দের মাধ্যমে, আনাতোলিয়ায় ও উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত ইউরোপীয় প্রদেশসমূহে অবস্থিত চর্ম সংরক্ষকদের সংঘগুলি এবং অনুরূপ (জিন্‌, জুতা ইত্যাদি নির্মাণকারী) চর্মকার সংঘগুলির নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ক্রমান্বয়ে তিনি প্রায় সকল তুর্কী ব্যবসায়ী সংঘ সংগঠনের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Gordlevskiy, Dervishi Akhi Evrana i tsekhi v Turtsii, Izvestiya Akademii Nauk SSSR, 1927, 1171-94 (ফরাসী সংক্ষিপ্তসার G. Vajda, in REI, 1934, 81-8; (২) Fr. Taeschner, in Islamica, 1929, 31-4 (with references to earlier bibliography); (৩) ঐ লেখক, Legendenbildung um Achi Evran, den Heiligen von Kirsehir, WI, Sonderbd, Restschrift Fr. Giese, 1941, 61-71, 90 প.; (৪) C. H. Tarim, Kirsehir tarihi uzerinde arastirmalar, i, Kersehr-1938, 114-76; (৫) ঐ লেখক, Tarihte Kirsehri-Gulsehri 1948; (৬) H. B. Kurter, Kitabelerimiz, Vakiflar Dergisi, 1492, 431 প. (the inscrptions in the sepulchral sanctuary ঃ 434 প., nos. 8-14); (৭) W. Ruben, Kersehir'in dikkatimiz ceken san-'at abideleri, iii ঃ Ahi Evran Turbesi., Bell. 1947, 616-38 (German resume in Bell, 1948, 195-9; description of the sepulchral sanctuary and legends about Akhi Ewran); (৮) Fr. Taeschner, Gulschehri's Mesnevi auf Achi Evran, den Heiligen von Kirschehir und Patron der turkischen Zunfte,Wisbaden 1955.

Fr. Taeschner (E.I.[2]) / মোহাম্মদ গোলাম রসূল

আখী জূক (اخی جوق) ঃ ক্ষুদ্র আখী, অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর তাব্‌রীযের জনৈক অজ্ঞাতনামা আমীর। ইনি চোবানী বংশের মালিক আশ্‌রাফের অনুগামী ছিলেন। মালিক আশ্‌রাফ সোনালী বাহিনীর (আলতূন উর্‌দ) খান জানী বেগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। জানী বেগ অধিকৃত এই শহরের শাসনভার তাঁহার পুত্র বার্‌দী বেগ-এর উপর ন্যস্ত করেন। জানী বেগের মৃত্যুতে বারদী বেগ (যাহাকে তাঁহার পিতা বিজিত শহরের গভর্নর হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন) পিতার সিংহাসন নিজ দখলে আনয়নের জন্য তাবরীয ত্যাগ করিলে (৭৫৮/১৩৫৭) আখী জূক কেবল তাবরীযই নয়, একই সংগে সমগ্র আযারবায়জান নিজ কর্তৃত্বে আনয়নে সফল হন এবং বেশ কিছুকাল তাঁহার অধীনে এই এলাকাটি বাগদাদের জালাইরী সুলতান "মহান হাসান" (হ'াসান-ই বুযুর্গ)-এর পুত্র উওয়ায়স-এর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যাহা হউক, ৭৬০/১৩৫৯ সালে উওয়ায়স তাব্‌রীয দখলে সমর্থ হইলে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে আখী জূক'কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসনকালে আখী জূক মিসরের মামলূক সাম্রাজ্যের সহিত পত্রালাপ করেন। (মামলূক সরকার তাঁহাকে সাধারণভাবে "আখী" উপাধির মাধ্যমে সম্বোধন করে (আল-কাল্‌কাশান্‌দী, সুব্‌হু'ল আ'শা, ৮খ., ২৬১; তু. W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten, ১২৮)। তাঁহার সুখ্যাতি আনাতোলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং তথায় প্রাচীন উছমানী কবি আহমাদী তাঁহার প্রখ্যাত ইস্‌কান্দার-নামায় তাঁহার সম্বন্ধে একটি অধ্যায় রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতুস্‌-সাফা, বোম্বাই ১২৫৬ হি., ৫খ., ১৬৯; (২) খাওয়ান্দামীর, হাবীবুস্‌-সিয়ার, তেহ্‌রান ১২৭১ হি., ৩খ., ৮১; (৩) হাফিজ-ই আব্‌রূ, অনু. বায়ানী, প্যারিস, ১৯৩৬ খৃ., ১৫৪; (৪) V. Minorsky, E.I., IV, artt. Tabriz ও Uways; (৫) B. Spuler, Di Mongolen in Iran, ১৩৭; (৬) Fr. Taeschner, Dei Achidschuk von Tebriz,

Festachrift Jan Rypka, Prague 1956; (৭) ঐ লেখক, in Islamica, ১৯২৯, ৩১-৪।

Fr. Taeschner (E.I.2) / আবদুল বাসেত

আখী বাবা (اخى بابا) ঃ সাধারণভাবে আখু বাবা অথবা এখি বাবা নামেও পরিচিত; কিরশহরে অবস্থিত আখী এওরান (দ্র.)-এর তাকিয়ার শায়খের উপাধি। অবশ্য কোন কোন সময় আনাতোলিয়া, রুমেলিয়া ও বস্‌নিয়াতে তুর্কী ব্যবসায়ী সমিতিসমূহে (তু. সিন্‌ফ), বিশেষত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী ও চর্মশিল্পের শ্রমিক (জিন নির্মাতা ও জুতা প্রস্তুতকারক)-গণের সমিতিসমূহে শায়খের প্রতিনিধিগণকে এবং এই সকল ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের প্রধানগণকেও আখী বাবা (অধিকতর সঠিকভাবে আখী বাবা ওয়াকীলি) উপাধিতে ভূষিত করা হইত। আখী বাবা অথবা তাঁহার প্রতিনিধি অথবা স্থানীয় প্রতিনিধির প্রধান কার্য ছিল নূতন শিক্ষানবিসগণকে এই সকল সমিতিতে সরকারীভাবে গ্রহণ করার প্রাক্কালে আনুষ্ঠানিকভাবে এইগুলিতে কোমরবন্ধ প্রদান (কুশাক অথবা পেশ্‌তিমাল কুশাত্মাক) করা; ইহার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা ছিল। ক্রমান্বয়ে আখী বাবাগণ অন্য সমিতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে এবং ঐ সকল সমিতিতেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোমরবন্ধ প্রদানের ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়। এইভাবে তাহারা আনাতোলিয়া ও ইউরোপীয় প্রদেশসমূহ উভয় স্থানেই প্রায় সমস্ত তুর্কী ব্যবসা সমিতিসমূহের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে (তবে 'আরব অধ্যুষিত অঞ্চলে তাহারা সফল হইতে পারে নাই)। ইহার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের জন্য প্রভূত শক্তি অর্জন করে এবং কির্‌শহর তাকিয়া-র জন্য সংগ্রহ করে বিপুল ধনসম্পদ। মাত্র অল্প কয়েকটি সমিতি তাহাদের নিয়ন্ত্রণ এড়াইতে সমর্থ হয়, ইহাদের মধ্যে ছিল আনকারার সমিতিসমূহ। ইহা পূর্বে আখীবাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। আখী বাবার প্রভাব সুদূর ক্রিমিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং সেখানেও সমিতিসমূহের সকল অনুষ্ঠানে চামড়া ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ প্রাধান্য লাভ করে (E. Bulatov, in Ocerki Rossii, সম্পা. V. Passek, মস্কো ১৮৪০, ৩খ, ১৩৯-৫৪; V. Gordlewskiy, Organizatsiya tsekhov v krimskikh Tatar, Trudi etnografo-arkhe-ologiceskovo Muzei, pri l. Moskovskom Gosudarsto. Universitete, ৪খ., মস্কো ১৯২৮, ৫৬-৬৫)।

আখী বাবাগণ নিজেদেরকে আখী এওরানের বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিত। আখী বাবাগণের স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইত স্ব স্ব সমিতির সভ্যগণ দ্বারা। তবে তাহাকে সমিতির সভ্য হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। যে কোন দিক দিয়া বিখ্যাত যে কোন ব্যক্তিকে এই পদে নির্বাচিত করা যাইত। তবে তাহাদের কির্‌শহরের আখী বাবার নিকট হইতে একটি অনুমতি লিপি (ইজাযাতনামাহ্) ও সরকারের নিকট হইতে এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সপক্ষে একটি সনদ (বেরাত) লাভ করিতে হইত। চামড়া ব্যবসায়িগণের আখী বাবা একই সংগে তাঁহার শহরের সমগ্র ব্যবসা সমিতির প্রধান হইতেন। তবে তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাইত।

পাশ্চাত্য অর্থনীতির পদ্ধতিসমূহের অনুপ্রবেশের ফলে তুর্কী ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। কির্‌শহরের আখী বাবা কর্তৃক বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রেরণের রেওয়াজ ক্রমশ বিরল হইয়া উঠে। বসনিয়াতে আখী বাবার শেষ প্রতিনিধি আগমন করে ১৮৮৬-৭ সালে (Hamdija kresevljakovic, Esnafi i Obrti u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, in Zbornik Narodni zivot i obicaje juznik Slavena, Zagreb ১৯৩৫, ১০১-৪৭)। উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য প্রদেশসমূহে এই ব্যবস্থাটি টিকিয়া থাকে এবং ১৯০৮ সালে সকল পুরাতন সমিতির বিলুপ্তির মাধ্যমে ইহার সমাপ্তি ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. "আখী" ও 'আখী এওরান'। আরও দ্র. (১) Fr. Taeschner, Das Zunftwesen in der Turkei, Leipziger Vierteljahrschrift fur Sudosteuropa, ১৯৪১, ১৭২-৮৮; (২) ঐ লেখক, Das bosnische Zunftwesen sur Turkenzeit (১৪৬৩-১৮৭৮), Byzantinische Zeitschrift, ১৯৫১, পৃ. ৫৫১-৯।

Fr. Taeschner (E.I.2) /আবদুল বাসেত

আখী সিরাজুদ্দীন 'উছ্‌মান (اخى سراج الدين عثمان) ঃ দিল্লীর বিখ্যাত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (মৃ. ৭২৫/১৩২৫)-এর খাস মুরীদ। অযোধ্যার বাদায়ূনে তাঁহার জন্ম (বাংলা বিশ্বকোষ, ৪খ., ৪৩৮)। শৈশবকাল হইতেই তিনি হযরত নিজামুদ্দীনের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি প্রথমেই তাঁহাকে মাওলানা ফাখ্‌রুদ্দীন যার্‌রাদী-র নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রেরণ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিঃ বল্‌খম্যানের মতে, বাংলাদেশের গৌড়ে ৭৫৮/১৩৫৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয় (জে. জ. এম. বি., কলিকাতা ১৮৭৩ খৃ., পৃ. ২০০)। কিন্তু মুন্‌শী ইলাহী বাখ্‌শ লিখিত খুরশীদ-ই জাহাননুমার বিবরণী হইতে জানা যায়, তাঁহার মৃত্যু সন ছিল زود گوكان روز عيد الفطر بود। অর্থাৎ "শীঘ্রই বল, ইহা ছিল 'ঈদুল ফিতরের দিন"। আরবী আবজাদ (ابجد) রীতির গণনা পদ্ধতি মতে ইহাতে ৭৪৩ হি. (১৩৪২ খৃ.) হয়। অদ্যাবধিই এই 'ঈদের দিনে তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় সাদুল্লাহপুরে অবস্থিত তাঁহার মাযার প্রাংগণে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের বহু ভক্ত ইহাতে শরীক হয়। অতএব, শেষোক্ত শ্লোকে বর্ণিত দিনটিকেই তাঁহার সঠিক মৃত্যু তারিখ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিখ্যাত উর্দূ গ্রন্থ 'আয়ন জারিয়া-র লেখক আহ্‌মাদুল্লাহ্ লিখিয়াছেন, নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর তিনজন প্রধান খলীফার মধ্যে আখী সিরাজুদ্দীন তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় খলীফা ছিলেন। তাঁহাকে তিনি ভারত উপমহাদেশের আয়না (আইনা-ই হিন্দ) নামে অভিহিত করিতেন। অন্য দুইজন ছিলেন কামালুদ্দীন ও নাস্‌ীরুদ্দীন। নাস্‌ীরুদ্দীনকে বলা হইত চেরাগ-ই দেহ্‌লী বা দিল্লীর চেরাগ। ঐতিহাসিক মিঃ বল্‌খম্যানের বরাত দিয়া মালদহের খান সাহেব 'আবিদ আলী তাঁহার The Memoirs of Guour and Pandua গ্রন্থে তাঁহার বাংলাদেশে আগমনের কারণস্বরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার মাতা বাংগালাদেশের রাজধানী গৌড়ে বসবাস করিতেন বলিয়া তাঁহার মুরশিদের মৃত্যুর পর তিনি গৌড়ে চলিয়া যান (৭২৫/১৩২৫) এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেইখানে তিনি

একটি খানকাহ ও একটি লংগরখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রচারে বহু সংখ্যক বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করে। যদিও জন্মগতভাবে তিনি বাংগালী ছিলেন না, তাঁহাকে বাংগালী বা পাণ্ডুয়াবী বলা হয়। এই দেশে তাঁহার আগমনের কারণস্বরূপ একটি কৌতূহলজনক কাহিনী পেশ করিয়াছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁহার ইসলাম প্রসংগ গ্রন্থে (ঢাকা ১৩৭৭ বাং., পৃ. ১৬১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Abid Ali Khan, The Memoirs of Gour and Pandua, Calcutta 1924; (২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1873; (৩) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসংগ, ঢাকা ১৩৭৭ বাং./১৯৭০ খৃ.; (৪) সূফী আহমাদুল্লাহ, আয়ন জারিয়া (উর্দূ), ঢাকা তা. বি.; (৫) মুহম্মদ আবূ তালিব, উত্তর বংগে সাহিত্য সাধনা, রাজশাহী ১৯৭৫; (৬) গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ঢাকা ১৯৮২; (৭) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা ১৯৭৯।

মুহম্মদ আবূ তালিব

আখূন্দ (اخوند) ঃ (আখূন, আখওয়ান্দ), একটি উপাধি। সাধারণত পণ্ডিত ব্যক্তিদের এই উপাধিতে ভূষিত করা হইয়া থাকে। পূর্ব তুর্কিস্তানে ইহা নামের পরে ইংরেজী "Mister" শব্দের অনুরূপ ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম তুর্কিস্তানে এই উপাধিটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উলামা বা বিদ্বান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাযান জেলায় ইহা দ্বারা প্রধান ইমাম বুঝায়। ফারসী ভাষায় তীমূরীদের সময় হইতে শব্দটির দ্বারা স্কুল মাস্টার ও গৃহ শিক্ষককে বুঝান হইয়া থাকে। সম্ভবত শব্দটি ফারসী খাওয়ান্দ (খাওয়ান্দ, খুন্দ) খুদাওয়ান্দ (خداوند) [দ্র.] শব্দ হইতে গৃহীত।

(E. I.2) / মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার

আখূন্দ দারবীযাহ (اخوند درویزه) ঃ তাংগারহারী, পেশাওয়ারী; পেশাওয়ারের প্রসিদ্ধ ওয়ালী ও 'আলিম, দারবীযাহ্ ইব্ন গাদাঈ ইব্ন সা'দী জীওয়ান ইব্ন জান্নাতীর বংশধর। আখূন্দ দারবীযাহ্ নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, জীওয়ান ইব্ন জান্নাতী কাবুলের পূর্বদিকে অবস্থিত আফগানিস্তানের মুহ্মান্দ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কুন্দুস (কুনদূয)-বাসী তুর্কী ও বাল্খের শাসকদের আত্মীয় ছিলেন। মুহ্মান্দ-এর শাসন-কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিরোধ বাঁধিলে বাল্খের শাসকগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন। ফলে তিনি তাংগারহার-এর জনগণের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার সাত পুত্রের একজনের নাম ছিল মাত্তাহ্ আহ্মাদ (متہ احمد)। মাত্তাহ্ আহ্মাদের পুত্র দারগান (درغان) কোহ্ সাফেদ (كوه سفيد)-এর পাদদেশে অবস্থিত পাপীন অঞ্চলে আবাস গ্রহণ করেন। দারগারেন পুত্র সা'দী ছিলেন শায়খ মাওলা ইউসুফ যাঈ (দ্র.)-র সমসাময়িক। তিনি ৮২০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে ইয়ুসুফ যাঈ গোত্রসমূহের সংগে সুওয়াতে আগমন করেন। এইখানে তিনি শায়খ মাওলার ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদারী লাভ করেন। তাঁহার অংশ মাওলাযাঈ-মানদুযাঈ অঞ্চলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গাদাঈ উক্ত অঞ্চল হইতে ইস্মা'ঈল খায়ল শাসিত বানীর (بنير) অঞ্চলে গমন করেন এবং তথায় চাগ্রযাঈ নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

গাদাঈ পাপীন রাজপরিবারের কারারী বিন্ত নাযূখান ইব্ন মালিক দাওয়ার পায় নামক একজন মহিলাকে বিবাহ করেন যিনি সুলতান তুনসা ও সুলতান বাহ্রামের (দ্র. তারীখ আফগানিস্তান, নিবন্ধ শিরোনাম কুন্নার ও ইউসুফ যাঈ গোত্রসমূহের শাসকগণ) বংশধর ছিলেন। তারীখ-ই পেশাওয়ারের বর্ণনা অনুসারে শায়খ দার্বীযাহ্ উক্ত কারারীর গর্ভে ৯৪০/১৫৩৩ সালের কাছাকাছি সময়ে ইউসুফ যাঈ অঞ্চলের (উত্তর পেশাওয়ার) তাংগারযাঈ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ জন্মভূমিতেই বিদ্যা অর্জন করেন এবং একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যৌবনে তাঁহার শিক্ষকদিগের মধ্যে মুল্লা সান্জার পাপীনী, মুল্লা মিস্'র আহ্'মাদ, মুল্লা মুহ'াম্মাদ যান্গী ও মুল্লা জামালুদ্-দীন হিন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সায়্যিদ 'আলী তির্মিযী (দ্র.)-এর নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কুবরুবীয়া চিশ্তিয়া তারীকায় শামিল হন। তিনি সুওয়াত হইতে আফ্গান রাজ্য তীরাহ পর্যন্ত ধর্ম প্রচার ও জনসাধারণকে সৎপথে আহ্বানের কাজে জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত করেন। এই বিষয়ে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেন। শায়খ দার্বীযাহ্ নিজেই লিখিয়াছেন, তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করিয়া সর্বসাধারণের মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে য়ূসুফ যাঈ গোত্রের জনৈক সম্মানিত ব্যক্তি মালিক দাওলাত মূলীযাঈ দু'আ ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় আপন সহোদরা মার্য়ামকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। ঐ সময়ে দারবীযাহর মাতা কুন্দুস (কুনদূয)-এ ছিলেন। তাঁহার পিতা পূর্বেই তথায় মৃত্যুবরণ। এইজন্যই তাঁহাকে কুন্দূসে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনর্বার ইউসুফ যাঈ অঞ্চলে আগমন করেন। এইখানে তিনি বায়াযীদ পীর রাওশান (দ্র.) মুকাবিলায় বিরোধী প্রচারণার পতাকা উত্তোলন করেন, বরং তিনি পীর রাওশান বায়াযীদের আনুগত্য হইতে জনসাধারণকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় তাঁহার বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। শায়খ দার্বীযাহ্ প্রায়ই বায়াযীদ কিংবা তাহার শিষ্যদের সহিত বিতর্কে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি মিম্বারের উপর হইতে অথবা লোক সমাগমে প্রকাশ্যভাবে তাহাদেরকে কাফির, নাস্তিক ও বিধর্মী বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। তিনি একজন অনলবর্ষী বক্তা, হৃদয়স্পর্শী বাগ্মী, গ্রন্থকার ও কঠোর চরিত্র সমালোচক ছিলেন। তিনি পশ্তু, ফারসী ও 'আরবী ভাষায় বক্তৃতা দান, কবিতা রচনা ও ধর্ম প্রচার করিতেন। আফগানগণ ভক্তিভরে তাঁহ'কে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিত। শায়খ দার্বীযাহ্ এক শত বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিয়া ১০৪৮/১৬৩৮ সালে ইন্তিকাল করেন। পেশাওয়ারের দক্ষিণে 'হাযার খানাহ' গ্রামে অদ্যাবধি তাঁহার মাযার সর্বসাধারণের প্রসিদ্ধ যিয়ারতগাহ।

আখূন্দ দার্বীযাহ্ পশ্তু ভাষায় ছন্দোবদ্ধ গদ্যশৈলী উন্নয়নের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি এক বিশেষ ধারার প্রবর্তক ছিলেন যাহা বায়াযীদের অনুসারীদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়। এই প্রেক্ষাপটে স্বয়ং দারবীযাহ্, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ও তাঁহার বংশধরগণ পশ্তু সাহিত্যের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) মাখযান-ই ইসলামঃ ইহা পশ্‌তু ভাষার ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত, ইহাতে 'আরবী ও ফারসী রচনারও সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এই পুস্তকে আহ্‌লুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত-এর মৌলিক 'আক'ীদার ব্যাখ্যার সহিত বিভিন্ন মুসলিম দলের অবস্থাও বর্ণিত হইয়াছে। তাসাওউফ-এর সমস্যাদি ও পঞ্চ আরকানের হুকুমসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি পীর রাওশান বায়াযীদের অনুসারীদের বিরোধিতা করা হইয়াছে। প্রসংগক্রমে এই গ্রন্থে আফগানদের সম্পর্কিত কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থ আফ্‌গানদের ইতিহাস, বায়াযীদ ও তাঁহার সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যাদির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা ১০০০/১৫৯০ সনের দিকে প্রচলিত পশ্‌তু গদ্য রীতিরও উৎকৃষ্ট নমুনা। এই পুস্তকের শেষাংশে দার্‌বীযাহ্‌ পরিবারের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কিছু পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। যথাঃ কারীমদাদ (অথবা 'আব্‌দুল কারীম) ইব্‌ন দার্‌বীযাহ্‌ (মৃ. ১০৭২/১৬৬১) যিনি নিজেও কতিপয় গ্রন্থের রচয়িতা; মুহ'াম্মাদ হ'ালীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন দার্‌বীযাহ্‌; তাঁহার সহোদর মুল্লা আস্‌গার; 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন দার্‌বীযাহ্‌; নূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন কারীমদাদ; মুস্‌তাফা মুহাম্মাদ ইব্‌ন নূর মুহাম্মাদ; আবদুস সালাম, শের মুহাম্মাদ ও জান মুহাম্মাদ। ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের পক্ষ হইতে মাখ্‌যান-এর শেষে এমন কিছু বক্তব্য যুক্ত করিয়াছেন যাহার মধ্যে দার্‌বীযাহ্‌র রচনারীতির অনুকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু মাখ্‌যান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল আফগানের জন্য রচিত হইয়াছে, সেইহেতু দুই-তিন শতাব্দী কাল অতিবাহিত হইবার পরও উহার হাযার হাযার কপি লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। এইগুলি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। মুদ্রিত কপি ব্যতীত হস্তলিখিত কপিও বিপুল সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হয়।

(২) তায্‌'কিরাতুল আব্‌রার ওয়াল-আশ্‌রার, ২৩৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তক ফারসী ভাষায় রচিত, ১০২১/১৬১২ সালে ইহার রচনা সমাপ্ত হয়। ১৩০৯/১৮৯১ সালে মুফ্‌তী মাহ্‌'মূদের নির্দেশক্রমে পেশাওয়ারের হিন্দু প্রেস হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। পুস্তকের শিরোনাম হইতেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, লেখক তাঁহার বিরোধিগণকে 'অসৎ' (আশ্‌রার) আখ্যা দিয়া ধর্মচ্যুতরূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। অপরদিকে তাঁহার পক্ষের দলকে পুণ্যবান (আব্‌রার) আখ্যা দান করিয়া ধর্মপ্রাণ আল্লাহ্‌ভক্তরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। পীর রাওশান বায়াযীদের শিষ্যমণ্ডলী ও পদাংক অনুসরণকারীরাই প্রথম দল বলিয়া মনে হইতেছে। আখূন্দ দার্‌বীযাহ্‌ ও দিল্লীর মুগল সরকার উভয়েই তাঁহাদের পরম শত্রু মনে করিতেন। পক্ষান্তরে যাহাদের "আব্‌রার" নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহারা সম্ভবত সায়্যিদ 'আলী তিরমিয'ীর শিষ্য ও অনুসারী দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণটাই আশ্‌রার-এর বিশ্বাস ও উক্তিসমূহের নিন্দাবাদ ও আব্‌রার-এর প্রশংসায় ও গুণ-কীর্তনে পরিপূর্ণ। ইহাতে প্রসংগক্রমে আফ্‌গান জাতি সম্পর্কে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত রাওশান বায়াযীদ ও স্বয়ং দার্‌বীযাহ্‌-র পারিবারিক অবস্থার বেশ মূল্যবান বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে আখূন্দ দারবীযাহ্‌ ফিক্‌'হ, তাফ্‌সীর, 'আক'াইদ ও তাসাওউফ-এর প্রাথমিক গ্রন্থসমূহের বরাত দিয়াছেন।

(৩) ইর্‌শাদুত্‌-ত'ালিবীন ঃ ফারসী ভাষায় রচিত এই বিরাট গ্রন্থ বৃহৎ সাইজের ৫৫২ পৃষ্ঠাসম্বলিত, ১২৭৮/১৮৬১ সালে মাত্‌বা' পেশাওয়ার হইতে মুদ্রিত এবং আহ্‌'মাদ বাখ্‌শ তাজির কর্তৃক প্রকাশিত ইহা চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে তাওহীদ, ঈমান, সালাত ও উযূর বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তওবা, কামিল পীরের লক্ষণসমূহ, জ্ঞান (ইল্‌ম) ও যি'ক্‌র সম্পর্কীয় আলোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক পথ (سلوك), প্রশংসনীয় চরিত্র, সবর ও শোকর-এর বিবরণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে নিন্দনীয় স্বভাব, কিয়ামতের লক্ষণসমূহ, কতিপয় (ফিক্‌'হী) মাস্‌আলা ও তি'ব্‌ব (ইউনানী চিকিৎসা)-এর উপকারিতা স্থান পাইয়াছে। এই কিতাব উপরিউক্ত বিষয়সমূহের এক বিরাট সংকলন। ইহাতে পুরাতন যুগের ফিক্‌'হবিদ, তাফ্‌সীরকার, সূফী, ধর্ম প্রচারক, নীতিশাস্ত্রবিদ ও ফাত্‌ওয়াদাতাদের রচিত প্রায় এক শত গ্রন্থের বরাত দেওয়া হইয়াছে।

(৪) শার্‌হ-ই কাসীদা-ই আমালী ঃ ফার্‌সী ভাষায় রচিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সায়্যিদ ফাদ্‌'ল সাম্‌দানীর গ্রন্থাগারে (ক্রমিক নং ৮৫৭) ইসলামিয়া কলেজ পেশাওয়ারে সংরক্ষিত আছে। আখূন্দ দার্‌বীযাহ্‌র গ্রন্থসমূহে সূক্ষ্ম বিচার ও গভীর অনুসন্ধানের পরিচয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আখূন্দ দার্‌বীযাহ্‌, তায্‌'কিরাতুল আব্‌রার ওয়াল-আশ্‌রার, পেশাওয়ার ১৩০৯ হি.; (২) ঐ লেখক, মাখ্‌যান-ই ইসলাম, পশ্‌তু পাণ্ডুলিপি; (৩) ঐ লেখক, ইরশাদুত-তালিবীন, পেশাওয়ার ১৩৭৮ হি.; (৪) আরয়ানা দাইরাতুল মা'আরিফ, ১খ., প্রকাশনা আনজুমান-ই দাইরাতুল-মা'আরিফ, আফ্‌গানিস্তান, কাবুল ১৯৪৩-৪৪ খৃ.; (৫) কি'য়ামুদ্দীন খাদিম, তাত'াওয়ারাত-ই নাছ'র-ই পাশ্‌তু শিরোনামে সালনামাহ-ই কাবুল-এ মুদ্রিত প্রবন্ধ, ১৯৪৩-৪৪ খৃ.; (৬) মুফ্‌তী গুলাম সারওয়ার লাহূরী, খাযীনাতুল আস্‌ফিয়া, ১খ., নাওল কিশোর, ১৯১৪ খৃ.; (৭) আবদুল হ'ায়্যি হাবীবী, মুওয়ার্‌রিখীন-ই গুম্‌নাম-ই আফ্‌গান, কাবুল ১৯৪৬ খৃ.; (৮) রাহ্‌মান আলী, তায্‌কিরা-ই উলামা-ই হিন্দ, লাখনৌ ১২৯২ হি; (৯) আবদুল হায়্যি হাবীবী, আফ্‌গানিস্তান দার 'আস্‌'রই-তায়মূরিয়ান-ই হিন্দ, পাণ্ডুলিপি; (১০) সি'দ্দীক'ল্লাহ, মুখ্‌তাসা'র তারীখ-ই আদাব-ই পশতু, কাবুল ১৯৪৬ খৃ.; (১১) ঐ লেখক, তারীখ-ই আদাব-ই পশ্‌তু, ২খ., কাবুল ১৯৫০ খৃ.; (১২) মীর আহ্‌মাদ শাহ রিদ্‌ওয়ানী, তুহ'ফাতুল আওলিয়া, লাহোর ১৩২১ হি.; (১৩) আবদুল হায়্যি হাবীবী, পুশ্‌তানা শু'আরা, ১খ., কাবুল ১৯৪০ খৃ.; (১৪) সিদ্দীকুল্লাহ, সিহ্‌ খানদান-ই উদাবা-ই পশ্‌তু, কাবুল ১৯৪৬ খৃ.; (১৫) আবদুল হাকীম রুস্‌তাকী, সাকীনাতুল ফুদালা, হিন্দ ১৩৫০ খৃ.; (১৬) নাস্‌রুল্লাহ নাসর, আখূন্দ দার্‌বীযাহ্‌, পেশাওয়ার ১৯৫০ খৃ.; (১৭) গোপাল দাস, তারীখ-ই পেশাওয়ার, লাহোর ১৮৭০ খৃ.; (১৮) আবদুল হায়্যি হাবীবী, তারীখচাহ-ই শি'র-ই পশ্‌তু, কান্দাহার ১৯৩৫ খৃ.; (১৯) মাওলাবী আবদুর-রাহীম পেশাওয়ারী, লুবাবুল মা'আরিফ, আগ্রা ১৯১৮ খৃ.; (২০) মাক্‌তুব আবদুল কারীম ইয়া কারীমদাদ ইব্‌ন দার্‌বীযাহ্‌ তাংগারহারী, পাণ্ডুলিপি ক্রমিক নং ১০০৬, ইসলামিয়া কলেজ, পেশাওয়ার; (২১) ফাকীর মুহাম্মাদ জীলামী, হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, নাওল কিশোর, লাখনৌ ১৩২৪ হি., পৃ. ৪১৭।

হাবীবী আফ্‌গানী (দা. মা. ই.) / মুহাম্মাদ সাদুল্লাহ

আখূন্দ পাঞ্জু (اخوند پنجو) ঃ (৯৪৩-১০৪০/১৫৩৬-১৬৩০) শায়খ 'আবদুল ওয়াহ্হাব আকবারপুরী পেশাওয়ারী, আখূন্দ পাঞ্জু সায়্যিদ গাযী নামে পরিচিত, বাবা নাওসাল্জায় সায়্যিদ হু'সায়নীর পুত্র, পেশাওয়ার-এর উত্তরে অবস্থিত ইউসুফযাঈ এলাকায় ৯৪৩ হি. জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ ও পরহেয্গার ব্যক্তি, যিনি ৯৪৫ হি.-র নিকটবর্তী সময়ে হাযারার পথে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া ইউসুফযাঈ এলাকায় ইয়ার হু'সায়ন নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন এবং ঐ দেশের হাকিম কাজূখান খাদূখীল-এর আশ্রয়ে জীবন যাপন করেন।

ইহার পর তিনি তাঁহার ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র 'আবদুল ওয়াহ্হাবকে সঙ্গে করিয়া ৯৫৮ হি. চুহাগাজার বাগ্রাম নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। আবদুল ওয়াহ্হাব সেইখানেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পিতা ৯৮৯ হি. আটক দুর্গে ইন্তিকাল করেন এবং সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। ৯৯০ হি. ৪৮ বৎসর বয়সে আবদুল ওয়াহ্হাব পেশাওয়ার-এর পূর্বদিকে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত আকবারপুরী নামক স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। ৯৯৩ হি. আকবারপুরীতেই তিনি মীর আবুল ফাতহ্' কান্বাচীর হাতে চিশতিয়া স'াবিরিয়া তারীকায় বায়'আত গ্রহণ করিলেন। উক্ত মীর সাহেব শায়খ জালালুদ্-দীন থানেশ্বরীর মুরীদ ছিলেন। তিনি শারীআত ও তরীকতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং আফ্গান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী একজন আল্লাহর ওয়ালী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। সুতরাং কাবুল ও খায়বার হইতে আটক পর্যন্ত সকলেই তাঁহার মুরীদ ও ভক্ত হইয়া গিয়াছিল। রিদওয়ানীর বর্ণনা (তুহ্ফাতুল আওলিয়া, পৃ. ৩৪) অনুসারে সম্রাট আকবার ও ৯৯৩ হি. আকবারপুরী নামক স্থানে আখূন্দ পাঞ্জুর খিদ্মতে হাযির হইয়া স্বীয় ভক্তি ও আন্তরিকতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুফ্তী গুলাম সারওয়ার-এর বর্ণনা অনুযায়ী আখূন্দ পাঞ্জু শিক্ষা বিস্তার ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় উৎসাহ দানে তৎপর ছিলেন। তিনি পশ্তু ভাষায় কথা বলিতেন, কিন্তু ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তিনি হিন্দী ভাষাতেও কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। তিনি কান্যুদ্-দাকাই'ক' নামক হানাফী ফিক্'হ-এর কিতাবখানা পশ্তুতে পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। আকবারপুরী নামক স্থানে ১০৪০ হিজরীর ২৭ রামাদান, সোমবার প্রভাতে ৯৬ বৎসর বয়সে আখূন্দ পাঞ্জু ইন্তিকাল করেন এবং সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। খাযীনাতুল আস্'ফিয়া-র সংকলক ১০৭৪ হি. তাঁহার মৃত্যু বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রিদওয়ানীর বর্ণনা (১০৪০ হি.) সঠিক বলিয়া মনে হয়। কেননা মৃত ব্যক্তির সমসাময়িক সূত্র হইতে প্রত্যয়ন করিয়া রিদ'ওয়ানী এই তারিখ লিখিয়াছেন।

আখূন্দ পাঞ্জু ইসলামের ৫টি মৌলিক ভিত্তিকে অনুসরণ করার জন্য জনসাধারণকে সব সময় উদ্বুদ্ধ করিতেন। এইজন্যই তিনি পাঞ্জু নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মুরীদগণের ভিড় লাগিয়া থাকিত। তাহারাই জনসমাজে তাঁহার ফায়য ও বরকতের প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহার সম্পর্কে পুস্তকাদিও রচনা করিতেন, যেমন শায়খ 'আবদুর-রাহ'ীম ইব্ন মিয়া আলী ফারসী ভাষায় মানাকি'ব-ই আখূন্দ পাঞ্জু নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উহাকে খাকী আকবারপুরী ১১৯৮ হি. "মানাকি'ব-ই খাকী" নাম দিয়া পদ্যে রূপান্তরিত করেন। অতঃপর ফার্সী পদ্যকে মিয়া পাদ্শাহ (কানদী শায়খান, আকবারপুর অধিবাসী) পশ্তু পদ্যে পরিণত করেন। শায়খ 'আবদুল গাফূর 'আব্বাসী পেশাওয়ারীও আখূন্দের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত তাঁহার মুরীদগণের মধ্যে আখূন্দ চালাক ও আখূন্দ সাবাক নামে দুই ভাই খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন যাঁহারা চাগারযাঈ পাহাড়ী এলাকা, রুদ আবাসীন নদীর তীরে অবস্থিত কাবুল গেরাম-এর অধিবাসী ছিলেন। মূলত তাহারা তুর্কী বংশজ ছিলেন। তাহারা আখূন্দ-এর হাজার হাজার মুরীদ ও মুজাহিদগণের সহিত হাজারা ও বানীর-এর পাহাড়ী এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন এবং জিহাদ করিয়া সেখানকার জনসাধারণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ঐ সময়ে সুল্তান মাহ্মূদ গাদান ও ইয়ারখান গারগাশ্তীও ঐ সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফাতাওয়া গ'ারীবা আখূন্দ চালাক-এর অতি নির্ভরযোগ্য সংকলনের অন্যতম। মাওলানা ইস্মা'ঈল শাহীদ দিহ্লাবী (র) হিন্দ্-যীদাহ নামক স্থানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন ও বাদ্রী নামক স্থানে সরদার ইয়ার মুহাম্মাদ খান-এর হত্যা সম্পর্কে এই গারীবা গ্রন্থ হইতে সমর্থন ও ফাত্ওয়া লাভ করেন। বাহ্'রুল আন্সাব তাঁহার রচিত দ্বিতীয় পুস্তক যাহা আফগান, তুর্কী, সায়্যিদ ও তরীকতপন্থী মাশাইখ-এর বংশতালিকা সম্পর্কে লিখিত। তাঁহার তৃতীয় পুস্তকের নাম গায্বিয়্যা, যাহা বানীর ও হাযারা পাহাড়ী এলাকা হইতে চীলাসাত এলাকা পর্যন্ত এবং গিলগিটবাসী কাফিরগণ ও তাহাদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে লিখিত। এই তিনটি পুস্তকই ফার্সী ভাষায় রচিত। চতুর্থ পুস্তকের নাম "মানাকিব-ই হাদ্রাত আখূন্দ পাঞ্জু। ইহাও একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মীর আহ্মাদ শাহ্, তুহ্ফাতুল আওলিয়া, লাহোর ১৩২১ হি.; (২) নাস্রুল্লাহ খান নাস্র হাদরাত আখূন্দ পাঞ্জু সাহিব (পশ্তু ভাষায়), পেশাওয়ার ১৯৫১ খৃ.; (৩) মুফ্তী গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতুল আস্'ফিয়া, ১ খ., নাওলকিশোর মুদ্রণ, ১৯১৪ খৃ.; (৪) মুল্লা মাস্ত যামান্দ, সুল্কুল গুযাত, কাবুলের পশ্তু একাডেমীর পাণ্ডুলিপি; (৫) সিয়াহুদ্-দীন কাকাখীল, তায্'কিরা-ই শায়খ রাহ্মকার, লাহোর ১৯৫১ খৃ.; (৬) সিদ্দীকুল্লাহ, মুখতাসার তারীখ-ই আদাব-ই পাশ্তু, কাবুল ১৯৪৬ খৃ.।

হাবীবী আফগানী (দা. মা.ই.)/এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

আখূন্দ যাদাহ্ (آخوند زاده) ঃ মীর্যা ফাত্হ আলী (১৮১২-৭৮ খৃ.), তুর্কী কথ্য ভাষায় মৌলিক নাটকের সর্বপ্রথম লেখক। তিনি পারস্যের আযারবাইজান হইতে আগত জনৈক বণিকের সন্তান। তৎকালীন শেকী (Sheki), বর্তমান নূখা (Nukha) নামক স্থানে (Caferoglu অনুসারে) ১৮১১ সালে অথবা (সোভিয়েট বিশ্বকোষ, ১৯৫০ অনুসারে) ১৮১২ সালে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি সাহিত্য ও দর্শনে উত্তম শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি ইসলামী ধর্মবিদের পেশা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শিক্ষা তাঁহাকে উদারপন্থী মতবাদের সংস্পর্শে আনয়ন করে। গানজা (কারাবাগ)-এর জনৈক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আখূন্দ যাদাহ মুসলমানদের জন্য শেকীতে নব প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ান মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা

সমাপন করেন। সম্ভবত আখুন্দ যাদাহ্ তরুণ বয়সে সংস্কারক জামালুদ্দীন আফ্গানী ও মালকুম খানের সংশ্রবে আসিয়া মুসলমানদের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হন। যাহা হউক, আখুন্দ যাদাহ্র পরিবার হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোচারলি (Kocerli) যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করা সহজ নহে। যৌবনে আখুন্দ যাদাহ ফার্সী কবিতার ধাঁচে লিখিতেন। এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে একটি হইল পুশকিন (Pushkin, বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক)-এর মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

তিফ্লীসের সামরিক শাসনকর্তা প্রিন্স ওরোন্টসো (Prince Worontsow, ১৮৪৪-৪৮)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় সেইখানে নাট্যশিল্পের অগ্রগতি হয়। আখুন্দ যাদাহ ঐ সরকারের দপ্তরে প্রাচ্য ভাষার অনুবাদক হিসাবে নিযুক্ত থাকায় তিনি নাট্যকার হিসাবে কাজ করার প্রেরণা লাভ করেন। ১৮৫০ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি আযারী তুর্কী ভাষায় ছয়টি মিলনান্তক নাটক ও একটি ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলির নাম ঃ (১) হিকায়াত-ই মোল্লা ইবরাহীম খালীল-ই কিমিয়াগার, ১৮৫০; (২) হিকায়াত-ই Monsieur Jourdan হাকীম-ই নাবাতাত ও মুস্তালী শাহ জাদুগার-ই মাশ্হুর ১৮৫০; (৩) সার্গুযাশ্ত-ই ওয়াযীর-ই খান-ই সারাব, ১৮৫০; (৪) হিকায়াত-ই খির্স-ই গুল্দুর-বাসান (ডাকাত ধরা ভল্লুকের গল্প), ১৮৫২; (৫) সারগুযাশ্ত-ই মার্দ-ই খাসীস, (কৃপণের কাহিনী), ১৮৫২-৫৩; (৬) হিকায়াত-ই উকালা-ই মুরাফাআ, ১৮৫৫ ও ঐতিহাসিক ব্যঙ্গপূর্ণ বিবরণী আল-দানমিশ কাওয়াকিব (প্রতারিত তারকাপুঞ্জ), ১৮৫৭।

নাটকগুলি ও বিবরণীতে লেখক তৎকালীন ককেসাসে প্রচলিত সামন্ত প্রথা, রাজপথে রাহাজানি, বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন। ট্রান্স-ককেশীয় (আযারী তুর্কী নামটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে তখনও প্রচলিত হয় নাই) মুসলমানদেরকে আধুনিক সভ্যতার আলোকে উত্তরণের লক্ষ্যে তিনি তাঁহার লেখায় পুনঃপুনঃ রাশিয়ান সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহার কতিপয় নাটক রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হইয়া সরকারী পত্রিকা কাবকাস (Kavkas)-এ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তিফ্লীস ও সেন্ট পিটার্সবার্গে মঞ্চস্থ হইয়াছিল। মূল ভাষায় আযারবায়জান স্টেট স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক মঞ্চস্থ হইয়াছিল ১৮৭০ সালের শেষদিকে। নাটক ও কাহিনীগুলির সামগ্রিক আযারী তুর্কী সংস্করণ তিফ্লীসে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৮ সালে আযারবায়জান সোভিয়েট সোসালিস্ট রিপাবলিকের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক লেখকের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। ১৯২০, ২১ ও ২২-এ স্কুলের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ইহার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ফার্সী ভাষায় নাটকগুলি মুহ'াম্মাদ জা'ফার মুন্শী কর্তৃক অনূদিত হয়।

১নং বইখানি Barbier de Meynard কর্তৃক ১৮৮৬ সালে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় (JA, 1886)। ২ নং বইটি ফার্সী হইতে A. Wahrmund কর্তৃক ১৮৮৯ সালে ভিয়েনায় জার্মান ভাষায় অনূদিত হয় এবং L. Bouvat কর্তৃক প্যারিসে ১৯০৬ সালে মূল তুর্কী ভাষা হইতে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। ৩ নং বইখানা ফার্সী হইতে ইংরেজীতে W. H. O. Haggard and G. Le Strange কর্তৃক The Vazir of Lankuran নামে অনূদিত হয়। ৪নং বইখানা ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত হয় Recueil de textes et de traductions-এ Barbier de Meynard কর্তৃক (প্যারিস ১৮৮৯)। ৫নং বইটি A. Bouvat ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত করেন (JA, ১৯০৪)। ৬নং বইখানার অনুবাদ করেন Ailliere ফার্সী হইতে ফরাসী ভাষায় (Deux Comedies Turques-এ প্যারিস ১৮৮৮)। ঐতিহাসিক বিবরণীটি L. Bouvat কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হয় (JA, ১৯০৩)। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে Caucasian Gogol' বা 'Oriental Moliere' উপাধি প্রদান করা হয়। আখুন্দযাদাহ রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তিকা লিখিয়া স্বৈরতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইসলামী ভাবধারা তুর্কী ভাষায় বোধগম্য করা ও তুর্কী ভাষাকে অধিকতর প্রগতিশীল করার মানসে তিনি নিজের উদ্ভাবিত বর্ণানুক্রম সম্পর্কে দুইটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Ķocerli (in Russian Kocarlin-skiy), Azerbaydjan Edibiyyati Materyallari, Baku 1925, i/2, 407ff, আখুন্দযাদাহ-র আত্মজীবনী সম্বলিত; (২) A. Akherdov, Shisu'i deyatelnost' Mirzi Fatali Akhundowi, Baku 1928; (৩) A. Caferoglu, XIX uncu asir buyuk Azeri Reformatour Mirjza Feth Ali Ahunzade in "Festschrift" for Bonelli, Rome 1940, 69-85; (৪) A, Vahap Yurtsever, Mirza Fethali Ahunt Zadenin Hayati ve Eserleri, Ankara 1950; (৫) ঐ লেখক, Azerbaycan Dram Edebiyati, Ankara 1951; (৬) H. W. Brands, Azerbaiganisches Volksleben und modernistische Tendenz in den Schauspielen Mirza Feth-Ali Ahundzades (1812-78), thesis Murburg/L, 1952 (অপ্রকাশিত)।

H. W. Brands (E.I.[2]) / মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার

আখুন্দ সাহেব সুওয়াত (اخوند صاحب سوات) ঃ মিয়াঁ আবদুল গাফূর ইব্ন আবদিল-ওয়াহি'দ যিনি আখুন্দ সাহেব সুওয়াত নামে খ্যাতি লাভ করেন, সমসাময়িক যুগের একজন প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা, মুজাহিদ এবং বর্তমান রিয়াসাত সুওয়াতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুওয়াতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সাফী বংশের এক সাধারণ গ্রাম্য পরিবারে অশিক্ষিত মেষপালক মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। এক বর্ণনা মুতাবিক তাঁহার জন্মকাল ১৭৯৮ খৃ.। Plowdon-এর মতে তাঁহার জন্ম ১৭৯৪ এবং হ'য়াতুল-হু'সনীর গ্রন্থকারের মতে ১১৯৯/১৭৮৪ সালে। বাল্যকালে তিনি সেই গ্রামে ভেড়া, ছাগল ও মহিষ চরাইতেন। আট বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য

খাদাক যাঈ এলাকার অন্তর্গত বড়নগুলা গ্রামে চলিয়া যান। সেখান হইতে তিনি সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত মারদানের গূজার গাড়হী নামক গ্রামে আসিয়া মোল্লা আবদুল হাকীম আখূন্দ যাদাহ-র নিকট কয়েক বৎসর লেখাপড়া করেন। অতঃপর পেশাওয়ার হইতে পাঁচ মাইল পূর্বে মিয়াঁ উমার সাহিব চাম্‌কানীর মাযার সংলগ্ন মাদ্‌রাসায় তিনি তাঁহার লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তিনি নাক্‌শবান্দিয়া তরীকার খিরকা হযরত-জী সাহিব পেশাওয়ারীর নিকট হইতে লাভ করেন এবং মির্‌আতুল আওলিয়া নামক পুস্তকের প্রণেতা ও তূরটীরী মারদান-এর সাহিবযাদা মুহাম্মাদ শু'আয়ব-এর নিকট কাদিরিয়া তরীকায় দীক্ষা লাভ করেন, অতঃপর বীগী দাগাল নামক গ্রামে বার বৎসর কঠোর ধ্যান ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে অতিবাহিত করেন এবং একজন সাধক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন (নাওয়াহ, ১৮২৮ খৃ.)। কিছুকাল পরে আটক নদীর তীরবর্তী হিন্ড নামক স্থানের বিখ্যাত শাসক মালিক খাবী খান তাঁহার মুরীদ হন। ১২৪৩/১৮২৭ সালের কাছাকাছি সময়ে ভারতীয় মুজাহিদগণের একটি কাফেলা সায়্যিদ আহ্‌মাদ ব্রেল্‌ভী ও মাওলাবী ইসমা'ঈল শহীদ-এর নেতৃত্বে বুলান গিরিসংকট, কান্দাহার ও কাবুলের রাস্তায়, পেশাওয়ারের উত্তরে আশান্‌গার নামক স্থানে পৌঁছিয়া পাঞ্জাবে শিখ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। আখূন্দ আবদুল গাফূরও এই জিহাদে তাঁহাদের সহিত শরীক হন এবং তাঁহারই উৎসাহ প্রদানের কারণে তাঁহার কয়েকজন মুরীদ ও সমসাময়িক খান, যেমন হিন্ড-এর খাবী খান, কূটা-র সায়্যিদ আমীর পাচা, যীদাহ-র আশ্‌রাফ খান ও পান্‌জতারের ফাতহ্' খানও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আখূন্দ আবদুল গাফূর পান্‌জতারের বিখ্যাত যুদ্ধে এবং হিন্ড দুর্গ বিজয়ে নিজে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর আখূন্দ সাহিব ধর্মীয় শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভের উদ্দেশে খাটক এলাকার নাম্‌ল নামক স্থানে মোল্লা মুহাম্মাদ রাসূল-এর নিকট অবস্থান করেন এবং তথা হইতে সুওয়াত গমন করেন। সুওয়াত, বুনীর, বাজূড়, দীর ও সীমান্ত প্রদেশের উত্তর অঞ্চলসমূহের হাজার হাজার লোক তাঁহার মুরীদ হয়। ১৮৩৫ খৃ. যখন আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ খান শিখদের ও আপন ভ্রাতা সরদার সুল্‌তান মুহাম্মাদ খান তালাঈর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কাবুল হইতে আগমন করেন, তখন তিনি আখূন্দ সাহিবকেও উক্ত যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান করেন। আখূন্দ সাহিব সুওয়াতের হাজার হাজার গাযী ও মুরীদকে সংগে লইয়া পেশাওয়ার হইতে নয় মাইল পশ্চিমে শায়খান নামক স্থানে আমীর-এর সম্মুখে উপস্থিত হন এবং ১৮৩৫ খৃ. ১১ মে পর্যন্ত মুরীদগণসহ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, ইহার পর সুওয়াত প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুওয়াতের প্রধান শহর সায়দূ নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। ১৮৪৯ খৃ. ইংরেজ সৈন্যরা পেশাওয়ার দখল করিয়া সুওয়াতের উপর আক্রমণ চালায়। এইদিকে আখূন্দ আবদুল গাফূর সুওয়াত, বাজূড় ও বুনীর-এর এক বিরাট জির্গা আহ্‌বান করিয়া ১৮৫০ খৃ. উক্ত এলাকায় ইসলামী শাসন কায়েম করেন এবং সায়্যিদ আহ্‌মাদ শাহীদ ব্রেলভীর অন্যতম সহচর, বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ও কোষাধ্যক্ষ সায়্যিদ আক্‌বার শাহকে সুওয়াত-এর জন্য শারী'আতের ইমাম মনোনীত করেন। তিনি শারী'আতের আইন-কানুন প্রচলন ও বায়তুল-মাল চালু করেন। আখূন্দ আবদুল গাফূর স্বয়ং শায়খুল ইসলাম হইলেন। সায়্যিদ আকবার শাহ ১৮৫৭ খৃ.-র ১১ মে ইন্তিকাল করিলে সুওয়াতে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সায়্যিদ আকবার শাহর পুত্র মুবারক শাহ ১৮৫৭ খৃ. ১৮ জুলাই নারানজী নামক স্থানে ও ১৮৫৮ খৃ. এপ্রিল মাসে পান্‌জতার নামক স্থানে মেজর ওয়াকসন ও মেজর জেনারেল সিডনি কটন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করেন। এই ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlaine) ১৮৬২ খৃ., ২৬ অক্টোবর সাত হাজার সশস্ত্র বাহিনী ও গোলন্দাজ সৈন্যসহ কুতিল আমবীলা নামক স্থানে সুওয়াত-এর মুজাহিদদের উপর আক্রমণ করিলে আখূন্দ সাহিব ও মাওলাবী আবদুল্লাহ মুজাহিদ ইংরেজ সৈন্যগণের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে নয় শত আটজন হতাহত হয় এবং মুজাহিদদের মধ্যে তিন হাজার শাহাদাত লাভ করেন। ইহার পর আখূন্দ সাহিব কতল গড়ের প্রসিদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন, যাহা ১৮৬৩ খৃ., ১৮ নভেম্বর সংঘটিত হয়। আখূন্দ সাহেব ১৫ হাজার মুজাহিদের সহায়তায় ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। কিন্তু বুনীর-এর লোকজন ও মুজাহিদদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে আখূন্দ সাহিব ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং সীদূ শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৬৩ সনের ২৭ ডিসেম্বর)। আখূন্দ সাহিব জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সুওয়াত এলাকাকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে এবং উহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত এলাকায় তাঁহার হাজার হাজার মুরীদ ও অনুসারী ছিল, যাহারা তাঁহাকে তাহাদের মুকুটবিহীন রাজা মনে করিত। সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের আফগান বংশীয় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও খানবর্গ আখূন্দ সাহিবের অনুসারী ও অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পেশকারের নাম ছিল লাতীফ খান। আফগানিস্তানের বাদশাহও তাঁহাকে ও তাঁহার মুরীদগণকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। আখূন্দ সাহিব স্বীয় পুত্রের বিবাহ চিত্রলের রাজবংশের আমানুল মালিক মিহতার-ই চিত্রাল-এর কন্যার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি পবিত্র হজ্জও পালন করেন। তিনি আজীবন বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক মতানৈক্য দূরীকরণ, তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা ও উক্ত এলাকায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৬ সালে জালালাবাদের গভর্নর আহমাদ খান ইস্‌হাকযাঈ আফগানিস্তানের বাদশাহ আমীর শের 'আলী খান কর্তৃক দূত নিযুক্ত হইয়া আখূন্দ সাহিবের নিকট উপনীত হন এবং তাঁহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু আখূন্দ সাহিব ইহাতে সম্মত হন নাই। হান্টারের মতে আখূন্দ সাহিব এইরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, উপজাতিসমূহের উপর তাঁহার বিস্ময়কর প্রভাব ছিল। সায়্যিদ জামালুদ্‌-দীন আফগানী আল-বায়ান পুস্তকের পরিশিষ্টে আখূন্দ সাহিব-এর কঠোর সাধনা, পুত চরিত্র, জিহাদের উৎসাহ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাদরী Hughes তাঁহার বহু কারামাতের উল্লেখ করেন। মূলত আখূন্দ সাহিব ছিলেন আফগানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বীর নেতাদের অন্যতম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মহান মুজাহিদ। তিনি কার্যত সুওয়াতে আফগানদের একটি স্বাধীন জাতীয় ও ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। আখূন্দ সাহিব ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারী ইন্তিকাল করেন। সীদু শরীফে অবস্থিত তাঁহার মাযার অদ্যাপি

জনগণের যিয়ারত স্থল। আখূন্দ সাহিবের রচনাবলীর মধ্যে পশ্‌তু ভাষায় রচিত মুনাজাত নামক মাছ্‌'নাবীটি এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার মুরীদগণের মধ্যে বহু খ্যাতনামা সাধক ও মুজাহিদ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আফ্‌গানিস্তানের জালালাবাদ এলাকার অন্তর্গত হাড্‌ডার প্রসিদ্ধ মুজাহিদ মুল্লা নাজমুদ্দীন (মৃ. ১৩১ হি.), শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব (মৃ. ১৩২২ হি.), যিনি মান্‌কী শরীফ-এর পীর সাহেব নামে প্রসিদ্ধ এবং 'আক'ইদুল মু'মিনীন (পশ্‌তু) নামক গ্রন্থের প্রণেতা নাওশাহ্‌রাহ তাহসীলের মান্‌কী-র শায়খ আবূ বাক্‌র যিনি পাসনী মুল্লা (গায্‌নাবী)-রূপে পরিচিত ছিলেন এবং কাবুলের আখূন্দ সাহিব মুসিহী। তাহারা সকলেই তাঁহাদের পীর ও মুরশিদ-এর ন্যায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।

আখূন্দ সাহিব-এর দুই পুত্র ছিলেন আবদুল হান্নান ও আবদুল খালিক। তাঁহারা উভয়ে ১৮৯৭ খৃ. মালাকান্দ এলাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং কিছুকাল পর তাঁহারা মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল খালিকের পুত্র মিয়াঁ গুল আবদুল ওয়াদূদ ১৯১৭ খৃ. সুওয়াতে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন এবং নিজেকে সুওয়াত-এর শাসনকর্তারূপে ঘোষণা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বুনীর ও চীকীসর এলাকাও সুওয়াতের সহিত যুক্ত করেন। ১৯২৬ খৃ. ভারতের ইংরেজ সরকারও নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁহাকে সুওয়াতের শাসক হিসাবে মানিয়া লয়। ভারত বিভাগের সময় পর্যন্ত তিনি সুওয়াতের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সনে তিনি সুওয়াতকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হওয়ার জন্য ঘোষণা করেন এবং ১৯৪৯ সনে স্বীয় পুত্র শাহযাদাহ আবদুল-হাকক জাহানযীবকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ১৯৪৯ সনে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান সীদূ শরীফ গমন করিয়া সুওয়াতকে একটি স্বায়ত্তশাসিত রিয়াসাত হিসাবে স্বীকৃতির অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন। আবদুল ওয়াদূদ সীদূ শরীফে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র জাহান-যীব সুওয়াতের উন্নয়নকামী একজন জনপ্রিয় শাসক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সায়্যিদ আবদুল গ'ফ্‌ফূর কাসিমী, তারীখ-ই সুওয়াত, পেশাওয়ার ১৩৫৬ হি.; (২) সিদ্দীকুল্লাহ, মুখতাসার তারীখ আদাব-ই পাশ্‌তু, কাবুল ১৯৫৬ খৃ.; (৩) নাস্‌রুল্লাহ নাস্‌র, আখূন্দ সাহিব সুওয়াত, পেশাওয়ার ১৯৫০ খৃ.; (৪) সিদ্দীকুল্লাহ, পুশতানাহ্‌ শু'আরা, ২খ., কাবুল ১৯৪২ খৃ.; (৫) ওয়ালী মুহাম্মাদ সুওয়াতী, মানাকিব আখূন্দ সাহিব সুওয়াত (পাশতু পদ্য); পাণ্ডুলিপি, কাবুলে; (৬) মুহাম্মাদ যারদার খান, সাওয়াত-ই আফগানী, নওলকিশোর ১৮৭৬ খৃ.; (৭) Warburton, Notes on Buner, লন্ডন; (৮) Yabgitus, Frontier Expeditions লন্ডন; (৯) W. Bellow, ইউসুফ যাঈ, কলিকাতা ১৮৯২ খৃ.; (১০) পণ্ডিত বিহারী লাল, Notes on Peshawar, দিল্লী ১৯০২ খৃ.; (১১) Lumsdon, Reprot on Swat, কলিকাতা ১৯০০ খৃ.; (১২) Rev. Hughes, The Akhwand of Swat, লন্ডন ১৮৯৫ খৃ.; (১৩) Central Asia, ১৮৭৩ খৃ.; (১৪) Cap. G. B. Pluden, Personalities of Swat, লন্ডন ১৯০৩ খৃ.; (১৫) সালনামাহ-ই কাবুল, একাদিমী আফগান, কাবুল ১৯৩৯ খৃ.; (১৬) Major Raverty, Notes on Afghanistan, কলিকাতা ১৮৯০ খৃ.; (১৭) H. L. Navi, Campaigns in North West Frontier, লন্ডন ১৮৯৯ খৃ.; (১৮) Cunningham, The Sikha, কলিকাতা ১৯০১ খৃ.; (১৯) James, Peshawar Statement, কলিকাতা ১৮৯৮ খৃ.; (২০) دبشتو نخو اهارو بهار، دار مشئيئر فرنسوى পারিস ১৮৮৮ খৃ.; (২১) মাছ্‌'নাবী গাযিদ্‌-দীন (পাশ্‌তু পাণ্ডুলিপি); (২২) মুহাম্মাদ হায়াত খান, হায়াত আফগানী, লাহোর ১৮৬৭। (২৩) জামালুদ্‌-দীন, তাতিম্মাতুল বায়ান ফী তারীখিল আফ্‌গান, কায়রো ১৯০১ খৃ.; (২৪) মাওলানা মুহ'ম্মাদ ইসমা'ঈল তাওরাবী সার্‌হাদ, সাহিব সুওয়াত, পেশাওয়ার ১৯৫৩ খৃ. ; (২৫) মাওলানা সাফিয়্যুল্লাহ্‌, নাজমুদ্‌-দুরার ফী সিল্‌কিস্‌-সিয়ার, পাণ্ডুলিপি; (২৬) হাজ্জী আহমাদ আলী, বুরহানুল মু'মিনীন আলা 'আক'ইদিল মুদি'ঈীন; পাণ্ডুলিপি।

হাবীবী আফ্‌গানী (দা.মা.ই.) / আবদুল বাসেত

আল-আগ্‌ ওয়াত (الأغواط) ঃ (লাগহুআত—Laghuat), দক্ষিণ আলজেরিয়ার একটি শহর ও মরূদ্যানের নাম, যাহা আলজিয়ার্স নগরী হইতে আড়াই শত মাইল দক্ষিণে ২.৫৫ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৩৩.৪৮ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা দুই হাজার চারি শত ফুট। ১৯১১ খৃ. ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৫৫৯৮, তন্মধ্যে ৫৯৫ জন ছিল ইউরোপীয়। আল-আগ্‌ওয়াত গারদায়া (Ghardaia) এলাকার একটি অংশ এবং একটি মিশ্রিত ও একটি দেশীয় অধিবাসীদের (আলজেরীয়) জেলার (Commune) সদর দপ্তর এখানে অবস্থিত, যাহার আয়তন ৬৬৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৯৮১০।

শহর ও মরূদ্যানটি ওয়াদিল-মিযী (Wed Mzi)-র দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই নদীটি আমূর পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অবশেষে ওয়াদী জেদী (Wed Djedi) নাম ধারণপূর্বক শাত্‌ত মিল্‌গির-এ প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কুসান্‌তীনা প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। ঘরবাড়ীসমূহ দুইটি পাহাড়ের পাদদেশে ধাপে ধাপে নির্মিত হইয়াছে। এই পাহাড়দ্বয় তাস্‌জারীনা পর্বতের শাখা। ইউরোপীয়দের ঘরবাড়ী উত্তর-পশ্চিমে ঢালুতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরবাড়ী উত্তর-পূর্ব ঢালুতে অবস্থিত। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটি পরিখা ও পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দুইটি দুর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মরূদ্যানটি অর্ধবৃত্তের আকারে শহরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিস্তৃত, উত্তর ও পূর্ব অংশ অধিকতর প্রশস্ত। উহাতে খেজুর বাগান ও শাক-সজীর ক্ষেত রহিয়াছে। বাগানের সেচকার্য একটি খাল দ্বারা করা হয়, যাহা ওয়াদী মিযীর উপর বাঁধ দেওয়ার দরুন সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহা ওয়াদিলকাবীর (Lekbier) নামে পরিচিত। খেজুর গাছ সংখ্যায় ত্রিশ হাজার এবং উহাতে সাধারণ জাতীয় খেজুর উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহা দ্বারাই অধিবাসীদের খাদ্যের সংকুলান হয়। আল-আগ্‌ওয়াত দক্ষিণ ওয়াহরান (Oran) ও দক্ষিণ কুসান্‌তীনার মধ্যবর্তী এমন এক স্থানে অবস্থিত যেখান হইতে একটি রাস্তা পশ্চিম দিকে আও্‌লাদ সীদী শায়খ-এর দিকে, অন্য একটি দক্ষিণ দিকে মাযাব ও ওয়ারগালা-এর দিকে এবং অন্য একটি পূর্বদিকে যাবান ও বিস্‌কারার দিকে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থানের জন্য ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

ইতিহাস ঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই ওয়াদী মিযীর তীরে একটি ক্ষুদ্র বসতি ছিল, যাহার বাসিন্দাগণ ফাতিমী কর্তৃত্ব স্বীকার করার পরও আবূ ইয়াযীদ (আন্‌-নুক্‌কারী দ্র.)-এর বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকায়

মাগ্রাওয়া গোত্রের যাযাবর বার্বার সম্প্রদায় বাস করিত। হিলালী আক্রমণের (দ্র. আবূ যায়দ হিলালী ও বানূ হিলাল) কারণে ঐ স্থানে একই গোত্রের অন্যান্য দলেরও আগমন ঘটে। উহাদের মধ্যে কাসেল সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য, যাহাদেরকে যাব (আলজেরিয়ার কুসান্তীনা প্রদেশের দক্ষিণাংশ, দ্র. কামূসুল আ'লাম, ঐ শীর্ষক প্রবন্ধ) হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। তাহারা বেন্বূতা নামক একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। অন্যান্য মুহাজিরগণ যাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 'আরব বংশোদ্ভূত ছিল (দাওয়াবিদা, আওলাদ বূযায়্যান) এবং কিছু সংখ্যক মাযাব হইতে আগত ছিল, অপরাপর মহল্লাসমূহও (বূমিন্দালা, নাজাল সীদী মায়মূন, বাদলা কাস্বা বেন ফুতূহ) পত্তন করে। এই কয়েকটি এলাকাই মিলিতভাবে আল-আগ্ওয়াত নামে অভিহিত হইতে থাকে।

খৃস্টীয় অস্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শহর সম্পর্কে আমাদের সামান্য তথ্যই জানা আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই শহর মরক্কোর সুল্তানকে রাজস্ব প্রদান করিত। ১৬৬৬ খৃ. কুসূর বাদলা ও কাস্বা (বেন) ফুতূহ-এর বসতি পরিত্যক্ত হয়। ১৬৯৮ খৃ. জনৈক মুরাবিত, যিনি মূলে তিলিমসানের অধিবাসী ছিলেন এবং সীদী আল-হাজ্জ 'ঈসা (Isaissa) নামে অভিহিত হইতেন, বেন বূতায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট তিনটি এলাকা ও লারবা-র প্রতিবেশী গোত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নেতৃত্বে আল-আগওয়াতবাসিগণ কাস্রুল আস্ফিয়া-র লোকদেরকে পরাজিত করে, কিন্তু তাহারা মরক্কোর সুল্তান মাওলায় ইসমাঈলকে রাজস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হয়, যিনি ১৭০৮ খৃস্টাব্দে নগর প্রাচীরের নীচে স্বীয় তাঁবু স্থাপন করিয়াছিলেন। সীদী আল-হাজ্জ ঈসার মৃত্যুর (১৭৩৮ খৃ.) পর আল-আগ্ওয়াত-এর ইতিহাস দুইটি দলের মধ্যকার দ্বন্দ্বে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, যাহারা নিজ নিজ কর্তৃত্বের জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। উহাদের নাম ছিল উলাদ সের্গীনা ও হাল্লাফ এবং তাহারা যথাক্রমে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অংশে বসবাস করিত। এই বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে যখন মরূদ্যানটি রক্তে রঞ্জিত হইতেছিল ঠিক তখন তুর্কীগণ ইহার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। তিত্তিরী (Titteri)-র শাসক (=বে) ১৭২৭ খৃস্টাব্দে কুসূরবাসীদের উপর বার্ষিক কর আরোপ করেন। মাযাববাসীদেরকে মরূদ্যান হইতে বহিষ্কার করা হয়, যেখানে তাহারা বাগানের একটি অংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল এবং দক্ষিণের যাযাবরদের সহিত ঐকজোট প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আল-আগ্ওয়াতবাসিগণ লারবা গোত্রের সহযোগিতায় এই ঐকজোটের উপর জয়লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কীগণ দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয় এবং পুনরায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সেখানকার অধিবাসিগণ উহা হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রথম সংঘর্ষে (১৭৮৪ খৃ.) বিলাদুল জাবাল (Medea)-এর শাসক (=বে) নিহত হন, কিন্তু ওয়াহরান-এর বে মুহাম্মাদ আল-কাবীর শহরটি অধিকার করিয়া উলাদ সের্গীনা-র বসতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেন (১৭৮৬ খৃ.)। অতঃপর তাঁহার উত্তরাধিকারী উছমান, হাল্লাফদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন (১৭৮৭ খৃ.)।

পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত এই দল দুইটি শীঘ্রই নিজদেরকে সংগঠিত করে এবং পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, এমনকি হাল্লাফের শাসক আহ্মাদ ইব্ন সালীম আল-আগ্ওয়াত ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন (১৮২৮ খৃ.), কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নাই। উলাদ সের্গীনা ১৮৩৭ খৃ. আমীর আবদুল কাদিরের সাহায্য ও সহায়তায় ক্ষমতায় আসীন হন। আমীর তাহাদের নেতা আল-হাজ্জ আরাবীকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতা টিকাইয়া রাখিতে অসমর্থ হন এবং মাযাবে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আবদুল-বাকীর নিকট যদিও একটি কামান ও সাত শত নিয়মিত সৈন্য ছিল, কিন্তু তিনিও বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। আমীরের নির্দেশ পালনকল্পে তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের আটক করিবার মনস্থ করেন। কিন্তু তাহাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাকে আল-আগ্ওয়াত ত্যাগ করিতে হয় (১৮৩৯ খৃ.)। আল-হাজ্জ আরাবীকে পুনরায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু আহ্মাদ ইব্ন সালীম আয়ন মাহ্দীর জনৈক মুরাবিত তান্জামীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। দ্বিতীয়বার আল-আগ্ওয়াতের কর্তৃত্ব লাভ করিয়া আহমাদ ইব্ন সালীম ফরাসীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা তাঁহাকে ১৮৪৪ খৃ. নিজেদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। এই উপলক্ষে কর্নেল মারী মোন্জ (Marey-Monge)-এর নেতৃত্বাধীন একদল ফরাসী বাহিনী আল-আগ্ওয়াতের দ্বারদেশে উপনীত হয়। ১৮৪৭ খৃ. পুনরায় ফরাসী বাহিনীর আগমন ঘটে, কিন্তু তাহারা সেখানে ১৮৫২ খৃ. পর্যন্ত চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। এই সময় শারীফ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ যিনি প্রথমেই ওয়ারগালায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, হাল্লাফ-এর কিছু লোকের সহায়তায় শহরটি অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে শহর পুনরুদ্ধারের জন্য জেনারেল Pelissier-এর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর যাহাতে জেনারেল Bouscaren ও কমান্ডার Morand নিহত হন (ডিসেম্বর ১৮৫২ খৃ.), আল-আগ্ওয়াত পুনর্দখল করা হয়। অতঃপর এখানে স্বতন্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত করা হয় এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ফরাসীদের সমর অভিযানের জন্য আল-আগ্ওয়াত একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Basset, Les Dictons satiriques attribues a sidi Ahmad ben Yousof, JA, ১৮৯০ খৃ.; (২) E. Daumas, Le Sahara Algerien, প্যারিস ১৮৪৫ খৃ.; (৩) Fromentin, Un ete dans Le Sahara, প্যারিস ১৮৭৪; (৪) Marey-Monge, Expedition de Laghouat, আলজিয়ার্স ১৮৪৪ খৃ.; (৫) মাওলায় আহমাদ, Voyages dans le sud de l' Algerie, অনু. Berbrugger, প্যারিস ১৮৪৬ খৃ.।

G. Yver (দা.মা.ই.) / মু. আবদুল মান্নান

আগ্দাল (أغدال) ঃ (বার্বার), মরক্কো, আল্জিরিয়া ও তিউনিসিয়ার আরবীতে বার্বার ভাষা হইতে গৃহীত একটি শব্দ। শব্দটি বার্বার ভাষায় "একান্তভাবে ভূস্বামীর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত চারণভূমি" অর্থে প্রচলিত;

আরবীতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য মরক্কোতে শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইল, "সুল্‌তানের প্রাসাদ সংলগ্ন উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত চারণভূমি যাহা সুল্‌তানের অশ্ববাহিনী ও পশু পালনের জন্য একান্তভাবে সংরক্ষিত।" ফেয, মেকনেস, রাবাত ও মার্‌রাকুশের মত প্রতিটি রাজকীয় শহরে এইরূপ সংরক্ষিত চারণভূমি রহিয়াছে।

G.S. Colin (E.I.²) / পারসা বেগম

আগ্‌'মাত (أغمات) ঃ দক্ষিণ মরক্কোর একটি ছোট শহর। মার্‌রাকুশ হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে ওয়াদী উরীকা বা ওয়াদী আগ্‌'মাত নামক একটি ছোট স্রোতস্বিনীর কূলে বিশাল আটলাস পর্বতমালা (মধ্যযুগের জাবাল দারান)-এর পাদদেশে অবস্থিত। ভৌগোলিক আবূ 'উবায়দ আল-বাক্‌রীর মতে (৫ম/১১শ শতক) এই নাম দ্বারা দেড় মাইল মসৃণ দূরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জনপথকে বুঝাইত, যথা আগ'মাত আল-ওয়ায়লান (আল-বায়দাক প্রদত্ত বানান, Doc. inedits d'hist. almohode) অথবা আয়লানদের আগ্‌মাত (একটি বারবার উপজাতি ঃ araica Haylana) ও আগ্‌মাত উরীকা বা উরীকাদের আগ্‌মাত। শেষোক্তটি বর্তমানে একটি ছোট মফস্বল শহর, নাম শুধু "উরীকা"। আল-বাক্‌রী ও আল-ইদ্‌রীসী আগ্‌'মাত'কে চতুর্দিকে সুসিঞ্চিত উদ্যানবেষ্টিত ও বেশ কিছু সংখ্যক কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু অধিবাসীর বসতিপূর্ণ এক সমৃদ্ধিশালী শহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মার্‌রাকুশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিশাল আটলাস পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আল-মুরাবিত্‌'ন বিজয় অভিযান কালের প্রথম দিকে এই শহরই ছিল দক্ষিণ মরক্কোর প্রধান নগর কেন্দ্র এবং আন্দালুসীয় চরিতাভিধান অনুসারে একটি অত্যন্ত কর্মচঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন (দ্র.)-এর সিংহাসন আরোহণের ২৫ বৎসর পূর্বে কর্ডোভা, এমনকি আল-কায়রাওয়ান হইতে আগ্‌মাতে বহু 'আলিম ও ফাক'ীহ-র সমাগম হইয়াছিল। জ্ঞানী-গুণিগণ কায়রাওয়ানের গোলযোগহেতু গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উক্ত গোলযোগের ফলে কিছুকাল পূর্বে ইফ্‌রীকিয়্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে আগমাতে একটি ছোট বার্‌বার রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজ্যের শাসক ছিলেন মাগরাওয়া-প্রধান লাক্‌কূত ইব্‌ন ইউসুফ। তিনি ইফ্‌রীকিয়্যা হইতে আগত জনৈক মুহাজিরের অতি খ্যাতনামী কন্যা যায়নাবুন-নাফ্‌য়াবি'য়্যা-কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মহিলা পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে লাম্‌তূনা-প্রধান আবূ বাক্‌র ইব্‌ন উমার (দ্র. আল-মুরাবিত্‌'ন)-এর ও তাঁহার সেনাপতি ও উত্তরাধিকারী ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সংস্কৃতিমনা ও বুদ্ধিমতী এই শাহ্‌যাদী, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, যিনি যাদুবিদ্যার চর্চাও করিতেন, আগ্‌মাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক সাহিত্য সম্মিলনীর আয়োজন করিয়া সাহারা মরুর রুক্ষ লামতূনা সর্দারগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণকেও এক উন্নততর সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত করান। মার্‌রাকুশ শহরটি আল-মুরাবিতদের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে উহাতে আগ্‌মাতের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। ফলে আগ্‌মাতের পতন সূচিত হয়। তবে সেই পতন আরও অনেক পরে সম্পূর্ণ হয়। আল-মুরাবিত্‌ন তাহাদের দ্বারা স্পেনে ক্ষমতাচ্যুত দুইজন শাসকের বন্দীদশার বাসস্থানরূপে আগ্‌মাতকে নির্বাচন করেন। একজন গ্রানাডার যীরী শাসক আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুলুগ্‌গীন এবং অপরজন সেভিলের বিখ্যাত আল-মু'তামিদ। আরও পরে মাহদী ইব্‌ন তুমার্ত বিশাল আটলাস পর্বতমালা জুড়িয়া (ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় অর্থে) "উত্থানের" আগে প্রাচ্য হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আগ্‌মাতেই তাঁহার যাত্রা শেষ করেন। লিও আফ্রিকানাস (Leo Africanus)-এর আমলে এই প্রাচীন বরবার নগরীটি সম্পূর্ণ পতনের পর্যায়ে ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bakri, Descr. de l'Afr, sept., 152/291-92; (২) ইদরীসী, আল-মাগ্‌রিব, পৃ. ৬৫-৭/৭৬-৭; (৩) আল-ইসতিব্‌সার, tr. Fragnan, 177; (৪) ইব্‌ন আবদিল মুন্‌ইম আল-হিম্‌য়ারী, আর-রাওদু'ল-মিতার (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ); (৫) Leo Africanus, Descr. de l'afrique (Schaefer), i, 209, 338; (৬) L. de Marmol, Descr. general de Africa, Granada 1573, ii, 35 ff; (৭) E. Doutte, En tribu, Missions au Maroc, Paris 1914, ch. i; (৮) আল-'আব্বাস ইব্‌ন ইবরাহীম আল-মার্‌রাকুশী, আল-ই'লাম বিমান হ'ল্লা মার্‌রাকুশ ওয়া-আগ্‌'মাত' মিনাল-আলামফেয ১৯৩৬ প., স্থা.; (৯) E. Garcia Gomez তাহার আগমাতে ভ্রমণের এবং আল-মু'তামিদের মাযার যিয়ারতের একটি রোমান্টিক বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন, উহার নাম "El supuesto sepulcro de Mutamid de Sevilla en Aghmat And., 1953, 402-11.

E. Levi-Provencal (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আগ্‌'রী (أغرى) ঃ তুর্কী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত পূর্ব আনাতোলিয়ার একটি প্রদেশ (ইল)। ইহার অধিকাংশ অঞ্চল পূর্বতন বায়াযীদের সানজাক'-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ইহার নামকরণ করা হয় আগ্‌'রী দাগ (দ্র.) হইতে। উহাই বাইবেলোক্ত আরারাত, বিলায়াত কার্‌স ও ইরান ইহার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রচনা করিয়াছে। আয়তন ১২,৬৫৯ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৮৮৯ খৃ. ছিল (সামী অনুযায়ী) ৪৭, ২৩৬; তন্মধ্যে ৮৩৬৭ জন আর্মেনীয় খৃষ্টান আর বাকী সকলেই মুসলমান; ১৮৯১ খৃ. (কুইনেত Cuinet অনুযায়ী) ৫২,৫৪৪, প্রধানত কুর্দী মুসলমান (৪১,৪৭১) আর ১০,৪৮৫ জন আর্মেনীয়; ১৯৪৫ খৃ. ১,৩৩,৫০৪, সকলেই মুসলমান; তন্মধ্যে ৭৮,৯৮৭ জন কুর্দী আর ৫৪,৪৭৩ জন তুর্কী। রাজধানী কারাকোসা (১৯৪৫ খৃ., জনসংখ্যা ৮,৬০৫ পূর্ব নাম ছিল কারা কিলিসা)। ৬টি কাদা (বা ইলচি বিচারকের এলাকা) সমবায়ে গঠিত ঃ কারাকোসা, দিয়াদীল, দগুবায়াযিত (সাবেক বায়াযীদ, একই নামের সান্‌জাকের রাজধানী), এলেসকার্ট (সাবেক আলেশকির্দ বা আলাশগির্দ), পাটনোস (সাবেক আনতাব) ও তুতাক। নামটি বর্তমানে "আগ্‌'রী"-রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, i, 227-39; (২) Sh. Sami Frasheri, কামূসুল আলাম, ২খ., ১২৩৫।

F. Taeschner (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আগ্‌রীত্‌াগ (أغرى طاغ) ঃ বা ইগরী-তাগ, তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের পূর্ব সীমান্তে ৩৯.৪৫ উত্তর দ্রাঘিমাংশে ও ৪৪° ২০ পূর্ব অক্ষরেখায় অবস্থিত জোড়া চূড়াবিশিষ্ট পর্বত (মৃত আগ্নেয়গিরি)। আরাস (Araxes) ও ওয়ান (Wan) [আরারাত মালভূমি] মালভূমি এলাকার উচ্চতম স্থান। আর্মেনীয় ভাষায় ইহা মাসিস বা মাসিক এবং ফারসীতে কূহ-ই নূহ্ নামে পরিচিত। ইউরোপীয়দের নিকট ইহা আরারাত নামে পরিচিত। কারণ নূহ্ (আ)-এর কিশ্‌তী বন্যার পানি কমিয়া যাইবার পরে প্রথমে যে আরারাত পর্বত চূড়া স্পর্শ করিয়াছিল তাহা এই চূড়া বলিয়াই চিহ্নিত হইয়াছে (হিব্রু আরারাত শব্দ দ্বারা আদিতে উরারতু দেশকে বুঝাইত; পরে শব্দটি পর্বত অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে ইরাকে জাযীরা ইব্‌ন 'উমার-এর নিকটস্থ জাবাল জূদীকে আরারাত পর্বত বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল)। বন্যাশেষে নূহ্ (আ)-এর কিশ্‌তী জূদী পর্বতে আসিয়া থামিয়াছিল (১১ ঃ ৪৪)।

পর্বতটির মাঝখানে কোথায়ও কোন শৈলশিরা নাই বলিলেই চলে, সমতল আরাস মালভূমি হইতে সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই মালভূমি ৮০০ মিটার উঁচু এবং পর্বতের উত্তর ও পূর্বদিকে বিস্তৃত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কতকটা উঁচু-নীচু তরঙ্গায়িত, ১৮০০ হইতে ৩০০০ মিটার উচ্চ মালভূমি। সেখান হইতে আরও অন্যান্য মৃত আগ্নেয়গিরিসমূহ উঠিয়াছে এবং সেই স্থানে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি পূর্ব তাওরাস (Taurus) পর্বতমালার মধ্যবর্তী ক্রান্তি রচনা করিয়াছে। আরারাত পর্বতমালা ১০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত এবং ইহার পরিধি ১০০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে। চূড়ার নিকটে পর্বত দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে; উত্তর-পশ্চিমের বড় আরারাত (৫১৭২ মিটার) ও দক্ষিণ-পূর্বে ছোট আরারাত (৩২৯৬ মিটার)। এই দুইটি এক সরু, গোলাকৃতি ও মসৃণ টিলা দ্বারা (২৬৮৭ মি.) সংযুক্ত, তাহা দৈর্ঘ্যে ১৩-১৪ কিলোমিটার এবং আনু. ৮ কিলোমিটার নিচে অবস্থিত। সরদার বুলাক (Sardar Bulak) নামক একটি ঝর্ণার নামানুসারে পরিচিত এই টিলার উপর দিয়া একটি গিরিপথ গিয়াছে। উচ্চতার দিক হইতে আরারাত ইউরোপের অন্য সকল পর্বতশৃঙ্গকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তুলনামূলক উচ্চতার দিক হইতেও (৪৩০০ মিটার) ইহা অন্যান্য মহাদেশের অনেক বড় শৃঙ্গকে হার মানায়। উত্তর দিক হইতে তাকাইলে দেখা যায়, পর্বতটি সমগ্র ভূদৃশ্যের উপরে বিরাজমান থাকিয়া এক সমুন্নত দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বড় আরারাত বা (জাবালুল হারিছ) আকারে কতকটা গোলাকৃতি মোচার (cone) মত। ইহার চূড়া ১৫০-২০০ ফুট পরিধিবিশিষ্ট প্রায় গোলাকৃতির এক ছোট মালভূমি, যাহা খাড়া হইয়া চতুর্দিকে নামিয়া আসিয়াছে। হিমক্ষেত ও হিমবাহ ১০০০ মিটার নিচে পর্যন্ত বিস্তৃত (হিমরেখা ৪০০০ মিটারেরও অধিক উচ্চে অবস্থিত)। বড় আরারাতের উত্তর-পূর্বদিক ভাঙ্গিয়া একটি খাড়া গিরিসংকট (St. James উপত্যকা) সৃষ্টি হইয়াছে। এই গিরিসংকটের সর্বোচ্চ অংশ হইতেছে একটি প্রশস্ত অববাহিকা, যাহার চতুর্দিকে খাড়া শিলার দেওয়াল, আর নিচের অংশে বর্তমান প্রস্তরময় মরুভূমি। পূর্বে এইখানে জনবসতি ছিল (আরগুরি গ্রাম ১৭৩৭ মিটার উচ্চ এবং সেইখানে St. James-এর মঠ)। ছোট আরারাত (জাবালুল হুওয়ায়রিছ) সুন্দর একটি নিখুঁত মোচার আকৃতিবিশিষ্ট।

এই অঞ্চলটি প্রায়ই ভূমিকম্পের শিকার হয়। সাম্প্রতিক কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২০ জুনের ভূমিকম্প ছিল অতি ভয়াবহ। উহার ফলে বিশাল ভূমিধ্বস হয় এবং তাহাতে একটি সমৃদ্ধ জনপদের (প্রাচীন আরগুরি, সুপ্রাচীন আর্মেনীয় আকোরি; তু. Hubschmann, in Indogerm. Forsch., xvi, 364, 395) সকল অধিবাসী (আনু. ১৬০০) তিন কিলোমিটার উপরে অবস্থিত সেন্ট জেমসের ক্ষুদ্র মঠ, সেইখানকার সকল সন্ন্যাসী ও সেন্ট জেমসের পবিত্র কূপ, এই সকলই ধ্বংস হইয়া যায়।

দগ্ধ অঙ্গার ও ধাতুমল প্রস্তরের সরন্ধ্রতা হেতু সমুদয় আরারাত অঞ্চলে পানির অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। উপরে বরফের প্রচুর আবরণ থাকা সত্ত্বেও বড় আরারাতের ঢালু এলাকায় মাত্র দুইটি উল্লেখযোগ্য ঝর্ণা রহিয়াছে (২২৯০ মিটার উঁচুতে সারদার বুলাক ও সেন্ট জেমসের বিখ্যাত কূপ—যাহা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে অপর এক ভিন্ন স্থানে দেখা দিয়াছে)। ছোট আরারাতে কোন ঝর্ণা নাই। ছোট আরারাত চিরতুষারের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে না। পর্বতের পূর্ব ও উত্তর পাদদেশে এবং আরাসের সমভূমিতে অবস্থিত অঞ্চলে কেবল কিছু পানি চুয়াইয়া বাহির হওয়ার ফলে এই এলাকার কোন কোন স্থানে জলাভূমি দৃষ্ট হয়।

পানির অভাবহেতু এলাকাটিতে সামান্য মাত্র উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। কিছু কিছু বার্চ (Birch) বৃক্ষ ব্যতীত আরারাত অন্যান্য পার্শ্ববর্তী পর্বতসমূহের মতই সম্পূর্ণ বনশূন্য। তবে এই চরম অবস্থার জন্য অনেকাংশে মানুষের কার্যকলাপই দায়ী। উদ্ভিদের অভাবের জন্যই বন্য প্রাণীরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেন্ট জেমস উপত্যকার জনপদ ধ্বংস হইবার পর হইতেই আরারাত অঞ্চল অনাবাদী মরুভূমি। কিন্তু মধ্যযুগে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। আল-ইসতাখরী (১৯১) পরিষ্কার উল্লেখ করিয়াছেন, আরারাতে যথেষ্ট বনভূমি ও পশুপক্ষী ছিল। আল-মাক্‌দিসী লিখিয়াছেন, আরারাতের শৈলান্তরীপসমূহে ১০০০-এর অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। আর্মেনীয় ঐতিহাসিক টমাস অফ আর্টসরুনী (Thomas of Artsruni) [খৃ. ১০ম শতক] ও এই এলাকার হরিণ, বন্য শূকর, সিংহ ও বন্য গর্দভের প্রাচুর্যের কথা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন (তু. Thopdeschian, in MSOS, 1904, ii, 150)।

১ম সালীম ও ১ম সুলায়মানের কালে অনুষ্ঠিত পারস্য যুদ্ধের পরে আরারাত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে 'উছমানী সাম্রাজ্যের সর্ব উত্তর সীমানায় প্রতিরোধ স্তম্ভ ছিল—যদিও উভয় পর্বতশৃঙ্গ ও বড় আরারাতের উত্তরের ঢাল ও ছোট আরারাতের পূর্ব ঢাল ছিল পারস্যের বা পারস্যের সামন্ত নাখ্‌চিওয়ান (Nakhcewan)-এর এলাকাভুক্ত। তুর্কমেনচের সন্ধি অনুযায়ী (২-১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৮) পারস্য আরারাতের উত্তরস্থ আরাস সমভূমি (সুরমালু, কুল্‌প ও ইগ্‌দীর জেলাত্রয়) রাশিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। ফলে উত্তরের ঢালু অংশ বড় আরারাতের চূড়া সমেত রাশিয়ার ভাগে পড়ে, আর ছোট আরারাত তুরস্ক, রাশিয়া ও পারস্য এই তিন সাম্রাজ্যের সীমানা প্রস্তররূপে চিহ্নিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত মস্কো চুক্তির ফলে (১৬ মার্চ, ১৯২১) তুরস্ক আরাস সমভূমি লাভ করে এবং তুর্কো-ইরানী চুক্তি (ইতিলাফ নামাহ) দ্বারা ২৩ জানুয়ারী,

১৯৩২ (কার্যকর হয় ৩ নভেম্বর, ১৯৩২) ইরান ছোট আরারাতের পূর্বদিকে ঢালু জমিসমন্বিত একটি ক্ষুদ্র অংশ তুরস্ককে ছাড়িয়া দেয় (তু. MSOS 1934, ii, 116)। ফলে বিশাল পর্বতের সমগ্র এলাকাই বর্তমানে তুরস্কের অংশ (তু. G. Jaschke, Die Nordostgrenze der Turkei und Nachitschewan, WI, 1935, 111-5; idem, Geschichte der rusisch-urkischen Kaukasus- grenze, Archiv des Volkerrechts, 1953, 198-206).

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শ. সামী বে ফ্রাশেরী, ক'মসু'ল-আ'লাম, ১খ., ৭২ (আরারাত), ২৩০ (আগ্রীদাগ), ২খ., ১০১৫ (এগ্রী দাগ); (২) K. Ritter, Erdkunde, X. 77, 273, 343-5, 356-86, 479-514; (৩) E. Reclus, Nouv. geogr. univers., vi, 247-52; (৪) H. Abich, Geolog. Forsch. in den kauka-sischen Landern, Vienna 1882 ff., ii, 451 ff. ও স্থা.; (৫) Ivanoviski, The Ararat (in Russian), Moscow 1897; (৬) Le Strange, 182; (৭) ইয়াকূত, ২খ., ১৮৩, ৭৭৯। আর্মেনিয়া সম্পর্কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থের জন্য দ্র. আর্মেনিয়া প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী; বিশেষভাবে আরারাতের জন্য দ্র. ঃ (৮) Parrot, Reise zum Ararat. Berlin 1834, i, 138 ff.; (৯) F. Dubois de Montpereux, Voyage autour du Caucase etc., en Georgie, Armenie etc., Paris 1839 ff., iii, 358-488; (১০) M. Wagner, Reise nach dem Ararat. Stuttgart 1848, 163-86 ও স্থা.; (১১) H. Abich, Geognost. Reise zum Ararat, Monatsber. der Verhandl. der Gesellschaft f. Erdk., Berlin 1846-7, and in Bullet. de la Societe de Geogr, Paris 1851; (১২) ঐ লেখক, Die Ersteigung des Ararat, St. Petersburg 1849; (১৩) Parmelee, Life among the mounts of Ararat, Boston 1868; (১৪) D. W. Freshfield. Travels in the Central Caucasus and Bashan, London 1869; (১৫) M. V. Thielmann, Streifzuge im Kaukasus, in Persian etc. Leipzig 1875, 152 ff.; (১৬) J. Bryce, Transcaucasia and Ararat, London 1877; (১৭) E. Markoff, Eine Besteigung des grossen Ararat, Ausland, 1889, 244 ff.; (১৮) J. Leclerq, Voyage au mont Ararat, Paris 1892; (১৯) Seid litz, Pastuchow's Besteigung des Ararat, Globus. 1894, 309 ff.; (২০) Rickmer-Richmers, Der Ararat, Zeitschr. des Deutsch-Osterr., Alpenver, 1895; (২১) M. Ebeling. Der Ararat, ibidem, 1899, 144-63 (কতিপয় জীবনী ও মানচিত্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় হাওয়ালার জন্য দ্র. পৃ. ১৬২-৩)।

M. Streck-F. Taeschner (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আগ্রা (آگرہ) ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি শহর। এই নামের একটি বিভাগ ও জেলার সদর দফতর। যমুনা নদীর তীরে ২৭°১' উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭°৫৯' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জনসংখ্যা (১৯৭১) ৫৯৪,৮৫৮, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫.৬ জন মুসলিম। এই শহরটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুগল বাদশাহগণের রাজধানী ছিল। ইহা মুগল স্থাপত্য কীর্তিসমূহের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

ইতিহাস ঃ আগ্রার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের অনেক আগেই যে এই শহরটির পত্তন হইয়াছিল তাহা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে আগ্রার উত্তর-পশ্চিম অংশে হিন্দু আমলের কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট, ১৮৭৪ খৃ., ৪,৯৭)। কবি মাসঊদ ইব্ন সাদ ইব্ন সালমান (মৃ.৫১৫/১১২১ বা ৫২৬/১১৩১) কর্তৃক রচিত গায্নাবী বংশীয় শাহ্যাদাহ্ (সায়ফু'দ্-দাওলা) মাহ্'মূদ ইব্ন ইব্রাহীম-এর প্রশস্তিমূলক একটি কাসীদা এই শহরটি ও শহরের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (দীওয়ান মাস'ঊদ সা'দ সালমান সংশোধন য়াসমী, তেহরান ১৩১৮ শা., পৃ. ২৬২ প., ৩০৭ প.)। এই কাসীদায় (শাহ্যাদাহ্র গায্নী হইতে বসন্তকালে হিন্দুস্তানে সৈন্য চালনা) আগ্রা দুর্গটি (যাহা লৌহ এবং প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, দীওয়ান, ৩০৭) অধিকারের কথা উল্লিখিত আছে, (যাহা সম্ভবত সুল্তান ৩য় মাস্'ঊদ, ৪৯৩-৫০৮/১০৯৯-১১১৫) অথবা সুল্তান ইব্রাহীম ইব্ন মাস্'ঊদ ১ম (৪৫০-৪৯২ হি.)-এর শাসনামলের ঘটনা (দ্র. দীওয়ান মাস্ঊদ)।

এই সময়ে শহরটি রাজপুত রাজা জয়পালের শাসনাধীন ছিল (দীওয়ান)। দিল্লীর সুল্তানের বশ্যতা স্বীকারের পর রাজপুতদের বিয়ানা প্রদেশের সুবাদারের কর্তৃত্বাধীনে এই শহরের শাসন ক্ষমতায় বহাল থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। সুল্তান সিকান্দার লোদী (৮৯৪-৯২৩/১৪৮৯-১৫১৭) কর্তৃক শহরটি পুনর্নির্মিত (৯১১/১৫০৫) হইয়াছিল এবং এই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা অখ্যাতই ছিল (ইলিয়ট, ৫,৯৯)। অতঃপর স্থানটির গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তথায় মুসলিম বিশ্বের নানা স্থান হইতে পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ আগমন করিতে থাকেন। দক্ষিণে গোয়ালিয়র ও মালওয়াগামী পথ, পশ্চিমে রাজপুতানাগামী পথ, উত্তর-পশ্চিমে দিল্লী ও পাঞ্জাবের পথ এবং পূর্বে গঙ্গাবিধৌত সমভূমির সংযোগস্থলে অবস্থিত থাকায় আগ্রা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

৯২৩-৩২/১৫১৭-২৬ সাল পর্যন্ত আগ্রা লোদী বংশের শেষ সুল্তান ইব্রাহীম লোদীর রাজধানী ছিল। ৯২৩/১৫২৬ সালে তাঁহার পরাজয়ের পর ইহা মুগল বাদশাহ বাবুরের রাজধানী হয়। বাবুর এইখানে তাঁহার চারবাগ প্রাসাদ নির্মাণ ব্যতীত কয়েকটি উদ্যান রচনা ও অনেক হ'ম্মাম নির্মাণ করেন। তাঁহার উমারা তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং পুরাতন শহরের অনেকখানি সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয়। ফলে প্রাচীন শহরটি অনেকাংশে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। শের শাহের আমলেও আগ্রায় রাজধানী ছিল। কিন্তু হুমায়ুন, শেরশাহ বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কেহই এইখানে

খুব বেশী সময় অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। আকবারের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে (৯৬৫/১৫৫৮) পুনরায় ইহা শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই বৎসরই আকবার (অতীতে) বাদলগড় নামে পরিচিত নগর দুর্গে বসতি শুরু করেন। তাঁহার উমারাও যমুনা নদীর উভয় তীরে তাঁহাদের বসতি স্থাপন করেন। ৯৭২/১৫৬৫ সালে বাদলগড়ের আদি স্থানেই আগ্রা দুর্গের নির্মাণকাজ আরম্ভ করা হয় এবং ৯৮০/১৫৭২ সালে শেষ হয়। তবে ইহার নির্মাণ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ফতেহপুর সিকরী (দ্র.)-র নির্মাণ শুরু হইয়া যায়। ৯৮২/১৫৭৪ সাল হইতে ৯৯৪/১৫৮৬ সাল পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময় আকবর নূতন শহর ফতেহপুর সিক্রীতে বাস করেন। পরে ১০০৬/১৫৯৮ সাল পর্যন্ত তাঁহার শাসন কেন্দ্র সাধারণত লাহোরেই অবস্থিত ছিল। ঐ বৎসরই আকবার আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। আকবারের শাসনামলে কয়েকজন ইউরোপীয় পরিব্রাজক আগ্রায় আগমন করেন। উদাহরণস্বরূপ ১৫৭৮ খৃ. একজন পর্তুগীজ, ১৫৯০ খৃ. একজন গ্রীক এবং ১৬০৬ খৃ. John Mildenhall নামীয় একজন ইংরেজ পরিব্রাজকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আকবারের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর এই শহরেই সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০১৪/১৬০৫) এবং ১০১৬/১৬০৭ সাল হইতে ১০২২/১৬১৩ সাল পর্যন্ত একটানা তিনি আগ্রাতেই বাস করেন। পরে আরও এক বৎসর তিনি আগ্রাতে থাকেন (১০২৭/১৬১৮)। কিন্তু তাহার পর হইতে ১০৩৭/১৬২৮ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই তিনি লাহোর অথবা কাশ্মীরে অতিবাহিত করেন। জাহাঙ্গীর-এর শাসনামলেও বিদেশী ব্যবসায়ী ও পর্যটক আগ্রায় আসিতে থাকে। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে Capt. Hawkins রাজা প্রথম জেমস-এর পত্র লইয়া জাহাঙ্গীর-এর দরবারে আগমন করেন। ১৬১৩ খৃ. Thomas Keridge ও Robert Shirley আগ্রায় আগমন করেন। ১৬১৪ খৃ. আগ্রায় ইংরেজ কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত Sir Thomas Roe, Finch, Robert Herbert ও Thomas Caryat আগ্রায় আগমন করেন (District Gazetteer, পৃ. ১৫৩ প.)।

পিতার ন্যায় শাহজাহানও আগ্রাতেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পরের বৎসরই তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে রওয়ানা হইতে হয়। ১০৪০/১৬৩১ হইতে ১০৪২/১৬৩৩ সাল পর্যন্ত আবার তিনি আগ্রাতেই বাস করেন। কিন্তু তৎপর স্বল্পকালীন ভ্রমণ ব্যতীত এইখানে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন নাই। অতঃপর অধিকাংশ সময় তিনি দিল্লীতেই থাকিতেন। সেইখানে তিনি নূতন শহর শাহজাহানাবাদ নির্মাণ করেন। সাকসেনা Shahjahan of Delhi গ্রন্থে বর্ণনা করেন, শাহজাহান ২৭ মার্চ, ১৬৪৮ খৃ. আগ্রার পরিবর্তে শাহজাহানাবাদ (দিল্লী)-এ স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবত ১৮ এপ্রিল, ১৬৪৮ সালে ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল (প্রাগুক্ত, ৩১৭ প.)। তখন শাহজাহান আগ্রার নূতন নামকরণ করেন আকবারাবাদ; কিন্তু সেই নামটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। ১০৬৭/১৬৫৭ সালে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকোহ তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যান। পরবর্তী উত্তরাধিকার সংগ্রামে জয়ী হইয়া আওরঙ্গযেব হিন্দুস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০৬৮/১৬৫৮)। শাহজাহান দুর্গে বন্দী হন এবং ১০৭৬/১৬৬৬ সালে বন্দীদশাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। সংবাদ পাইয়া আওরঙ্গযেব আগ্রাতে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুকাল যাবত এইখানেই তাঁহার দরবার বসে। পরে আবার তিনি ১০৭৯/১৬৬৯ হইতে ১০৮১/১৬৭১ সাল পর্যন্ত আগ্রাতে বাস করেন। তবে আওরঙ্গযেব প্রথমদিকে সাধারণত দিল্লীতে বাস করিতেন, পরে দাক্ষিণাত্যে। ১৭শ শতকে যদিও খুব বেশী দিন আগ্রাতে দরবার বসে নাই, তথাপি এই শহরটি সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী বলিয়াই পরিচিত ছিল। ভারত ভ্রমণকারী ইউরোপীয় পর্যটকগণের অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, আয়তনে ইহা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শহর প্যারিস, লন্ডন ও কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে তুলনীয়। আগ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং বস্ত্রশিল্প, স্বর্ণের কারুকাজ, প্রস্তর ও শ্বেত মর্মরের কাজ ও স্ফটিকের জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে দরবার স্থানান্তরিত হইলে সাধারণত শহরটির জনসংখ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইত।

আওরঙ্গযেবের উত্তরাধিকারিগণ প্রধানত দিল্লীতেই বাস করিতেন, যদিও রাজনৈতিকভাবে আগ্রার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাট (দ্র.), মারাঠা ও রোহিলাদের বারংবার আক্রমণ ও লুণ্ঠনে শহরটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠাদের ওলন্দাজ সেনাপতি Col. John Hessing আগ্রার শাসনকর্তা ছিলেন। আগ্রার রোমান ক্যাথলিক গোরস্তানে তাহার সমাধি রহিয়াছে (District Gazetteer, পৃ. ১৬৫)। তাহার পর হইতে ১৮০৩ খৃ. ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত শহরটিতে নামেমাত্র মুগল শাসন বলবৎ ছিল। ১৭৭৪ খৃ. হইতে ১৭৮৫ খৃ. পর্যন্ত সময় ব্যতীত নাজাফ খান (মৃ. ১৭৮২) ও তাঁহার সুবাদারগণ আগ্রার সুবাদার ছিলেন। বাকী সময় আগ্রা জাটদের (১৭৬১-১৭৭০ খৃ. ও ১৭৭৩-৭৪ খৃ.) ও মারাঠাদের (১৭৫৮-৬১ ১৭৭০-৭৩ ও ১৭৮৫-১৮০৩ খৃ.) দখলে ছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৩৩ খৃ. লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। Charles Metcalfe (পরবর্তীতে লর্ড মেটকাফ) লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন। প্রদেশের রাজধানী ছিল আগ্রা। ১৮৫৭ খৃ. লর্ড অকল্যান্ড (Auckland) স্বয়ং আগ্রার শাসনভার গ্রহণ করেন। লর্ড এলেনবরা (Ellenborough)-ও নিজে প্রদেশের দেখাশুনা করিতে থাকেন (District Gazetteer, পৃ. ১৭০)। ১৮৫৭ সালের ৩০ মে পর্যন্ত আগ্রা নিরাপদ ছিল। কিন্তু কিল্লার নিকটে, আশেপাশে ও ছাউনির অনেক স্থান শত্রুরা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল (পণ্ডিত কানাইলাল, তারীখ বাগাওয়াত হিন্দ, ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ২৫৩-০৪ প.)।

ব্যবসাকেন্দ্র ঃ আগ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইত। পুরাতন বাণিজ্য পথ গুজরাট উপসাগর হইতে এলাহাবাদ, পাটলীপুত্র, সাঁচী ও ভরোচ পর্যন্ত গমন করিয়া আগ্রা হইয়া যাইত। ইংরেজ, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা এই পথে চলাচল করিত (Spate, ১৫০)।

স্থাপত্য কীর্তিঃ আগ্রার অখ্যাত ইমারতাদির মধ্যে সিকান্দার লোদীর বারাহ্দারী একটি। ইহা ১৪৯৫ খৃ. নির্মিত হইয়াছিল (District Gazetteer, ইংরেজী, পৃ. ১৪২; E. W. Smith, Akbar's Tomb, এলাহাবাদ ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১)।

বাবুর যমুনা নদীর তীরে "চাহারবাগ" নামে একটি বাগান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৫৩০ খৃ. এই বাগানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (লাতীফ, পৃ. ১২ প.)। এই বাগানটি বর্তমানে আরামবাগ (অপভ্রংশ রামবাগ) নামে পরিচিত।

কিল্লা ঃ আগ্রার বর্তমান কিল্লা যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে লোদী শাসকদের নির্মিত কিল্লা 'বাদলগড়-এর স্থানে আকবার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। মীর-ই বাহ্‌র মুহাম্মাদ কাসিম খানের তত্ত্বাবধানে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮ বৎসরে (৯৭২-৯৮০/১৫৬৪-১৫৭২-৭৩) ইহা নির্মিত হয়। কিল্লার ভিত্তি নদী-সমান্তরালে এবং আকারে ইহা অর্ধ বৃত্তাকার। চতুর্দিকে দুইটি প্রাচীর দ্বারা কিল্লাটি সুরক্ষিত। উভয় প্রাচীরের মাঝে দূরত্ব ৪০ ফুট। গোলা নিক্ষেপের জন্য দেওয়ালে ছিদ্র রহিয়াছে। বহিঃপ্রাচীর উচ্চতায় ৭০ ফুটের কিছু কম, সামনের দিক লাল বেলে পাথরে ঢাকা, পরিধি প্রায় দেড় মাইল। কিল্লার প্রধান তোরণ "দিল্লী দারওয়াযা" সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম। আবুল ফাদ্‌ল-এর মতানুসারে আকবার কিল্লার ভিতরে বাংলা ও গুজরাটের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যরীতির পাঁচ শতেরও বেশী লাল পাথরের ভবন নির্মাণ করেন। সেইগুলির অধিকাংশই শাহজাহান ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং তদস্থলে শ্বেত পাথরের সৌধসমূহ নির্মাণ করেন। যেইগুলি ভাঙ্গা হয় নাই সেইগুলির মধ্যে "আক্‌বারী মহল" ও "বাংগালী মহল" সর্বাপেক্ষা পুরাতন। আকবারের ব্যবহৃত পাথরগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে কাটা পাথরের অবলম্বন (bracket) যাহা চ্যাপ্টা ছাদ (ceiling), পাথরের তীর (beam) ও ছাদের প্রলম্বিত অংশ (eaves)-এর ভার বহন করে। খিলানের ব্যবহার খুবই পরিমিত। জাহাঙ্গীরী মহল-এর স্থাপত্য রীতিও প্রায় অনুরূপ। ইহা দ্বিতল, দৈর্ঘ্য ১৮৮ ফুট ও প্রস্থ ২৬১ ফুট। মনে করা হয়, আকবার ইহা শাহযাদা সালীম (পরবর্তী কালে বাদশাহ জাহাঙ্গীর)-এর জন্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু খুব সম্ভব জাহাঙ্গীর নিজেই তাঁহার হারেমের রাজপুত-রাজকুমারিগণের জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন (Cunningham-এর মতে ইহা ইব্‌রাহীম লোদী কর্তৃক নির্মিত)। শাহজাহান-এর আমলে স্থাপত্য রীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। পর্যাপ্ত পরিমাণে উঁচু মানের মর্মর প্রস্তর প্রাপ্তির ফলে লাল বেলে পাথরের ব্যবহার কমিয়া যায় এবং মর্মর পাথরের ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা আঁকাবাঁকা রেখার সৌকর্য ও সুন্দর পুষ্পিত ছন্দায়িত কারুকার্য সম্ভব হয়। দেওয়ালের অবলম্বনের স্থলে সূক্ষ্মাগ্র পত্র শোভিত সুদৃশ্য খিলানের বেশী প্রচলন হয় এবং খিলানযুক্ত শ্বেত পাথরের খোলা বারান্দা শাহজাহানের সৌধসমূহের স্থাপত্য রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়। কিল্লার ভিতরে শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ সৌধসমূহের মধ্যে রহিয়াছে (ক) খাস মহল ও তৎসংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণের কারুকার্যময় চন্দ্রাতপ (pavilions); (খ) শীশ (কাচ) মহল। ইহা একটি হাম্মাম, ইহার দেওয়ালে ও ছাদে বিভিন্ন আকারের অগণিত দর্পণখণ্ড stucco relief পদ্ধতিতে বসান রহিয়াছে; (গ) মুছাম্মান (octagonal) বুরূজ, ইহা সম্রাজ্ঞী মম্‌তায মহল-এর জন্য নির্মিত হইয়াছিল। এইখানেই শাহজাহান ইন্তিকাল করেন; (ঘ) দীওয়ান-ই খাস বা বিশেষ দরবার; (ঙ) দীওয়ান-ই 'আম বা সাধারণ দরবার গৃহ, ইহাতে ছিল একটি প্রাঙ্গণ, দৈর্ঘ্যে ৫০০ ফুট ও প্রস্থে ৭৩ ফুট, প্রাঙ্গণের সংলগ্ন ২০১ ফুট দীর্ঘ ও ৬৭ ফুট প্রস্থ সুদৃশ্য স্তম্ভযুক্ত একটি দরবার গৃহ ছিল। ইহার এক প্রান্ত ছিল শাহী তখত স্থাপনের জন্য নির্মিত শ্বেত পাথরের কারুকার্যময় খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ, যাহাতে ছিল লাল বেলে পাথরের ও অত্যন্ত শিল্প কুশল শ্বেতপাথরের কারুকার্য; (চ) "মোতী (মুক্তা) মসজিদ", ইহা লাল বেলে পাথরের ভিত্তির উপরে স্থাপিত সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরে নির্মিত আশ্চর্য সুন্দর ভবন। ইহার নির্মাণে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ১০৬৩/১৬৫২ সালে ইহার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মসজিদের সাহ্‌ন (অঙ্গন) অংশ খুবই চিত্তাকর্ষক, মধ্যঅংশে একটি পানির হাওয (حوض) রহিয়াছে।

'আবদুল লাতীফ লিখিয়াছেন; কিল্লার দরজার পার্শ্বে 'মাহ্‌কামার মাস্‌জিদ' নামে আরও একটি বৃহদাকার জামে মসজিদ রহিয়াছে (তাওয়ারীখ আগ্রা, পৃ. ৩১ প.; লাতীফ, পৃ. ৯১)।

কিল্লার অদূরেই রহিয়াছে বাদশাহ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহান আরা বেগম কর্তৃক ১০৫৮/১৬৬৮ সালে নির্মিত জামে মস্‌জিদ। লাল বেলে পাথরের তৈরী এই সুন্দর মসজিদটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট এবং ইহাতে সুন্দর ও সুষম পাঁচটি খিলান রহিয়াছে। মাঝখানের খিলানটি একটি অর্ধগম্বুজাকার যুগ্মতোরণ। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৩০ গজ এবং প্রস্থ ১০০ গজ। মসজিদের সাহ্‌ন অংশটি ৮০ শাহী যিরা (গজ) (তাওয়ারীখ-ই আগ্রা, পৃ. ৩২; লাতীফ, পৃ. ১৮৪)।

আগ্রার পাঁচ মাইল দূরে সিকান্দ্রায় আকবারের সমাধি অবস্থিত। আকবারের নিজের নির্বাচিত স্থানে জাহাঙ্গীর ইহা নির্মাণ করেন। সমাধির উপরের সৌধটি অত্যন্ত সুন্দর এবং সমাধিটি মনোহর উদ্যানের মাঝখানে অবস্থিত। সম্ভবত আকবার নিজেই এই সৌধটির স্থাপত্য রীতি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সৌধটিতে সম্রাটের অন্যান্য স্থাপত্য রীতির নির্ভুল রীতিগত বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সৌধটি দৈর্ঘ্যে ৩৪০ ফুট এবং প্রস্থেও ৩৪০ ফুট। পাঁচটি স্তর ক্রমান্বয়ে ছোট হইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। নিম্নতম তলা তোরণবিশিষ্ট। প্রতি পার্শ্বের মাঝখানে রহিয়াছে স্তম্ভশ্রেণী, যাহার গাত্রে আছে একটি তোরণবিশিষ্ট গভীর কুলুঙ্গি। উপরের দিকের পরবর্তী তিনটি তলা প্রধানত লাল বেলে পাথরে নির্মিত ক্ষুদ্র কক্ষবিশিষ্ট স্তম্ভশ্রেণী। সর্বোচ্চ তল শ্বেত মর্মরের কারুকার্যময় জালি দ্বারা বেষ্টিত। ইহার প্রতি কোণে এক একটি সংকীর্ণ কক্ষ রহিয়াছে।

জাহাঙ্গীরের উযীর মির্যা গিয়াছ বেগ (উপাধি ই'তিমাদুদ্-দাওলা, মৃ. ১৬১২)-এর সমাধি সৌধটি তাহার কন্যা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কর্তৃক নির্মিত। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৬২৮ খৃ.। যমুনা নদীর বাম তীরে একটি সুপরিকল্পিত বাগানের মাঝখানে ইহা অবস্থিত। সৌধটির নীচের তলা ৬৯ ফুট প্রশস্ত সমচতুর্ভুজ। চার কোণে অতি সুন্দর ও সুষম আট কোণবিশিষ্ট চারটি খর্ব মিনার রহিয়াছে। উপরের তল একটি কারুকার্য মণ্ডিত চাঁদোয়া আকারের ছাদ পরিবৃত মহলের সদৃশ, ছাদের চতুর্দিকই নীচের দিকে নমিত ও ঝুলন্ত, উপরে রহিয়াছে দুইটি সোনার চূড়া। আগাগোড়া শ্বেত পাথরের তৈরী, উত্তর ভারতে ইহাই প্রথম বড় সৌধ। কারুকার্যের আশ্চর্য সৌন্দর্য এবং খচিত পাথরের অজস্র নকশার জন্য এই সৌধটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তাজমহল ঃ (তাজ মাহ্‌াল্‌ল) আগ্রায় অবস্থিত পৃথিবীর সুন্দরতম স্মৃতিসৌধ (দ্র. তাজমহল)। বাদশাহ শাহজাহান তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্মিনী

আরজুমান্দ বানূ বেগম [উপাধি মুমতায মহল (মাহ'াল্ল), মৃ. ১৬২০]-এর স্মরণে এই সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। মুমতায মহল তাঁহার সমসাময়িকগণের নিকট তাজমহল নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ই'তিমাদুদ্-দাওলার পুত্র আসাফ খানের কন্যা, ১৬১২ খৃ. ১৯ বৎসর বয়সে শাহজাহানের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। শাহজাহানের চৌদ্দজন সন্তান মুমতাযের গর্ভজাত। ১৬৩১ খৃ. জুন মাসে বুরহানপুরে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কালে মুমতায মহল মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১২ বৎসরে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক Tavernier-এর মতে মূল সৌধ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভবনের নির্মাণ কাজ ২২ বৎসরে সম্পন্ন হয়। এই বাইশ বৎসর যাবত ২০ হাজার শ্রমিক অনবরত নিযুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি ও কারিগরগণকে তাজমহলের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়। যেই ব্যক্তি যেই কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিল, তাহাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাজমহলের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি ছিলেন মাক্রামাত খান ও মীর 'আবদুল কারীম। তাজমহলের নির্মাণে জনৈক ইতালীয় স্থপতি নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, কোন মুগল ইতিহাসে বা সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক (যথা Tavernier, Bernier, Thevenot)-এর ভ্রমণ কাহিনীতে ইহার কোনরূপ সমর্থন পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সকলেরই মতে তাজমহলের নির্মাণশৈলী খাঁটি প্রাচ্য রীতিসম্মত। দিল্লীতে অবস্থিত হুমায়ূনের মাযারসৌধের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দৃষ্টে এবং স্থাপত্যগত ও অলংকরণ রীতির বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যায়, তাজমহলে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

যোধপুরের শ্বেত মর্মর নির্মিত মাযার-সৌধটি ১৮ ফুট উঁচু এবং ৩১৩×৩১৩ ফুট বর্গাকার ভিত্তি (platform)-এর উপর অবস্থিত। সৌধের সম্মুখস্থ খিলান পুষ্প-লতার কারুকার্য শোভিত। এই উঁচু ভিতের প্রতি কোণে একটি করিয়া অতি সুন্দর পরিমিতিসম্পন্ন নলাকার (cylindrical) মিনার রহিয়াছে। মিনারগুলির প্রতিটি ১৩৩ ফুট উঁচু এবং তিন-তিনটি gallery দ্বারা বেষ্টিত। সমাপ্তিস্বরূপ রহিয়াছে একটি গুম্বজ, যাহার নিম্নভাগ খোলা এবং প্রান্ত বাহিরের দিকে প্রলম্বিত। ভিতের মাঝখানে রহিয়াছে সমাধিটি, ১৮৬ ফুট আয়তনের বর্গক্ষেত্র, ইহার কোণগুলি সমান আকারের ৩৩ ফুট ৯ ইঞ্চি পরিমাণে ঢালু। সামনের দিক (facade) ভিত হইতে ৯২ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু। সৌধটির প্রতিটি দিকের সম্মুখভাগ উঁচু খিলানযুক্ত (recessed porch)। প্রতিটি বারান্দার উভয় পার্শ্বে ও ঢালু কোণগুলিতে আবার সমাকৃতি দুই তলবিশিষ্ট খিলান; সেই কুলুঙ্গি ও বারান্দা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রতিটি ঢালু কোণের উপরে একটি করিয়া গুম্বজওয়ালা কক্ষ। কেন্দ্রে আছে একটি মনোরম গোলাকার গুম্বজ যাহা চূড়ার দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া উঠিয়াছে। গুম্বজের চূড়া গিল্টি করা এবং তাহার উপরে একটি অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। কেন্দ্রীয় গুম্বজের ব্যাস ৫৮ ফুট। উহার ছাদ হইতে উপরে আরও ৭৪ ফুট অর্থাৎ মঞ্চ হইতে ১৯১ ফুট, এই গুম্বজের সৌন্দর্য তুলনাহীন। গুম্বজের নিচে কেন্দ্রীয় কক্ষটি ভিতরের দিকে আট কোণাকার, প্রতি কোণ দুই তলবিশিষ্ট আট কোণাকৃতি ছোট প্রকোষ্ঠ দ্বারা মজবুত করা। ইহাদের প্রতি দুইটির মধ্য দিয়া বড় বারান্দা রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কক্ষের মাঝখানে পাশাপাশি মুমতায মহল ও তাঁহার স্বামী শাহজাহানের প্রতীক সমাধি। এই বাঁধানো সমাধির ঠিক বরাবর নীচে মাটিতে তাঁহাদের আসল কবর। উপরের-বাঁধানো সমাধি শ্বেত মর্মর পাথরের এক আশ্চর্য সুন্দর জালির কারুকাজ করা পর্দা দ্বারা বেষ্টিত। বাহিরের দিক কুরআনের আয়াতে অলংকৃত লিপি দ্বারা সুশোভিত। এই দিকের সমগ্র অংশে পাথর কাটিয়া ও পাথর বসাইয়া ছন্দময় কারুকার্য দ্বারা এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-রীতির বিভিন্ন অংশসমূহের মূল্যবান প্রস্তর খণ্ড বসাইয়া ফুল, পাতা ইত্যাদি দ্বারা ঝরোকার জালি তৈরি করা হইয়াছে। সেইগুলির নক্শা, কারুকার্যের চাতুর্য ও রঙ্গের চমৎকারিত্ব তুলনাহীন।

তাজমহল চতুর্দিকে এক অতি মনোরম বাগান দ্বারা বেষ্টিত; বাগানে শ্বেত পাথরের তৈরি লম্বা আকারের চৌবাচ্চাসমূহ রহিয়াছে, যাহাতে সারি সারি ফোয়ারা বসানো, এই ফোয়ারা বাগনের প্রধান ফটক হইতে একেবারে মূল সৌধ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাগানের উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত যমুনা নদীতে যখন তাজমহলের ছায়া পড়ে, তখন তাহা আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। শ্বেত মর্মর প্রস্তরে আলোকের প্রতিফলনের দ্বারা প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে তাজমহলের রং বদলায়। প্রায় সকল দর্শকের মতেই মধ্যযুগের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল সর্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায় পূর্ণিমা রাত্রে।

আগ্রার নিকটবর্তী মথুরাতে একটি তৈল শোধনাগার এবং আগ্রাতে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা স্থাপনের কারণে সেইগুলি হইতে নিঃসৃত গ্যাস আবহাওয়াকে দূষিত করিতেছে। ফলে তাজমহলের অস্তিত্ব, অন্তত ইহার সৌন্দর্য, মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন হইয়াছে। দূষিত আবহাওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই তাজমহলের অমলিন সফেদ সৌন্দর্য অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে স্থাপত্য সুষমার এই অপূর্ব নিদর্শন তাহার মর্যাদা ও আকর্ষণ হারাইবে বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচিত হইতেছে।

আধুনিক আগ্রা বিশ্বের একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্র এবং উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। এইখানে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কলেজ ও একটি মেডিক্যাল কলেজ রহিয়াছে।

[আগ্রার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তির জন্য দ্র. (১) তাওয়ারিখ-ই আগ্রা; (২) সায়্যিদ মুহাম্মাদ লাতীফ, আগ্রা; (৩) Agra, A Gazetteer; (৪) Archaeological Survey of India, Report for the year 1871-72)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাবুর নামাহ, অনু. Beveridge, ২খ.; (২) আক্বার নামাহ, Bib. Ind., বিশেষ করিয়া ২খ., ২৪৬-৭; (৩) 'আলাউদ্ দাওলা কায্বীনী, নাফাইসুল মাআছি'র, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, পত্র, ২৬৬ক-২৬৮খ; (৪) তুযুক-ই জাহান্গীরী, অনু. Rogers ও Beveridge, বিশেষত ১খ., পৃ. ৩-৭, ১৫২; (৫) 'আবদুল হ'মীদ লাহোরী, পাদশাহ নামাহ, Bib. Ind., বিশেষত ১/১খ., ৩৮৪, ৪০২-৩,

১/২খ., ২৩৫-৪১, ২, ৩২২-৩১; (৬) মুহাম্মদ সালিহ, 'আমাল-ই-সালিহ, Bib. Ind., বিশেষত ২খ., ৩৮০-৫; (৭) হ'াদাত-ই তাজ মাহ'াল্ল, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি; (৮) De Laet, The Empire of the Great Mogol, Bombay 1928, 36-44; (৯) Tavernier's Travels in India, সম্পা. V. Ball, 1889, i, 105-12; (১০) Bernier's Travels, London 1881, 184-99; (১১) Indian Travels of Thevenot and Careri, সম্পা. Sen, 1949, 46-57; (১২) S. M. Latif, Agra, Historical Descriptive, 1896; (১৩) Duncan, Keene's Handbook for Visitors to Agra, 1909; (১৪) Imperial Gazetteer of India, 1905; (১৫) Report, Arch. Survey of India., for 1871-72, Calcutta 1874, pp. 93-247 and for 1904-5, 1-3; (১৬) E.B. Havell, A Handbook to Agra and the Taj, 1912; (১৭) J. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, 1910; (১৮) Camb. Hist. of India, vol. iv, chap. xviii; (১৯) Havell, Indian Architecture, 1913; (২০) ঐ লেখক, Ancient and Medieval Architecture of India, 1913; (২১) E. W. Smith, Akbar's Tomb at Sikandara, 1909; (২২) M. Moinuddin Ahmed, The Taj and its Environments, 1924; (২৩) M. Ashraf Husain, An Historical Guide to the Agra fort, 1937; (২৪) Stuart, The Gardens of the Great Mughals, 1913; (২৫) Hosten, Who Planned the Taj?, Jour. As. Soc. Bengal, June 1910; (২৬) V. Smith, History of Fine Arts in India, 183-5; (২৭) Mahdi Hossain, Agra before the Mughals, Jour. U.P. Hist. Soc., xx, pt. ii, 80-7; (২৮) Sarkar, Studies in Mughal India, 1919, 27-32; [(২৯) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., আগ্রা প্রবন্ধ]; (৩০) পণ্ডিত কানাই লাল, তারীখ-ই বাগাওয়াত-ই হিন্দ ১৮৫৭, ১৯১৬, পৃ. ২৫০-৫৯; (৩১) সাদীদুদ্-দীন খান, তাওয়ারীখ আগ্রা, আক্‌বারাবাদ ১৮৪৮, পৃ. ৩১প.; (৩২) ইয়াহ্'য়া ইব্‌ন আহমাদ, তারীখ মুবারাক শাহী, ইলিয়ট, ৪খ.; (৩৩) নি'মাতুল্লাহ, তারীখ খান জাহান লোদী, ইলিয়ট, ৫খ.; (৩৪) খাফী খান, মুন্‌তাখাবুল-লুবাব, ২খ., কলিকাতা ১৮৭৪; (৩৫) খায়রুদ্-দীন, ইব্‌রাত নামাহ্, পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মাজমূ'আ-ই শীরানী; (৩৬) মিস্ মাহ্'মূদা মুশতাক', European Travellers under Akbar and Jahangir, পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লাহোর; (৩৭) O. H K. Spate, India and Pakistan, London 1960; (৩৮) H.R. Nevill, Agra, A Gazetteer, vol. viii, of the District Gazetteer of the United Provinces of Agra and Oudh, এলাহাবাদ ১৯০৫; (৩৯) সাকসীনা, Shahjahan of Delhi, এলাহাবাদ ১৯৫৮ খৃ.।

হাসান (E.I.²)+'আলী 'আব্বাস (দা.মা.ই.) / মাহবুবুর রাহমান ভূঞা

আল-আগ্‌লাব আল-'ইজ্‌লী (الأغلب العجلى) ঃ আল-আগ্‌লাব ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন উবায়দা ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন দুলাফ ইব্‌ন জু'শাম, জাহিলী যুগে জন্মগ্রহণকারী আরব কবি। তিনি ইসলাম কবুল করেন, ও কূফাতে বসতি স্থাপন করেন এবং ৯০ বৎসর বয়সে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া ২১/৬৪২ সালে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি সাহাবী ছিলেন না, যদিও কেহ কেহ তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া মনে করেন। আল-আ'গলাবই প্রথম কাসীদার নমুনায় রাজায ছন্দে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাঁহার স্বল্প সংখ্যক মাত্র কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। সমালোচকগণ, বিশেষ করিয়া ভুয়া নবূওওয়াত দাবিকারিণী মহিলা সাজাহ (দ্র.)-এর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার একটি কবিতার প্রশংসা করেন এবং একটি কিংবদন্তী উদ্ধৃত করেন যাহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তিনি ইসলাম হইতে ধর্মীয় কবিতা রচনার খুব বেশী অনুপ্রেরণা লাভ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জুমাহ'ী, তাবাকাত, কায়রো ২১৮; (২) সিজিস্তানী, মু'আম্‌মারীন (Goldziher, Abhandlungen, ii), no. 107; (৩) আস্‌মা'ঈ, ফুহূ'লা (in ZDMG), ১৯১১, ৪৬৬-৬৭; (৪) জাহি'জ, হায়াওয়ান, ২খ., ২৮০; (৫) ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, ৩৮৯; (৬) আগ'নী, ১৮খ., ১৬৪-৭; (৭) বাগ্‌দাদী, খিযানা, ১খ., ৩৩২-৪; (৮) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবা, নং ২২৫; (৯) আমিদী, মু'তালিফ, ২২; (১০) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশ্‌তিকাক, ২০৮; (১১) O. Rescher, Abriss, i, 144; (১২) Brockelmann, S I, 90; (১৩) Nallino, Scritti, vi, 96-7 (Fr. Trans., 149-51)।

Ch. Pellat (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আগ্‌লাবী (أغلبى) ঃ বা বানুল আগ্‌লাব, মুসলিম রাজবংশ। এই বংশীয়গণ সমগ্র ৩য়/৯ম শতাব্দীব্যাপী আব্বাসী বংশের নামে ইফ্‌রীকি'য়্যা দখলে রাখেন এবং রাজধানী আল-কায়রাওয়ান হইতে উহা শাসন করেন। তিন ভাগে ইহার বিবরণ দেওয়া যায় ঃ (১) সাধারণ বিবরণ, (২) ধর্মীয় জীবন ও (৩) কালানুক্রমিক বিবরণ।

(১) সাধারণ বিবরণ

১৮৪/৮০০ সালে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল আগ্‌লাব, যাব-এর গভর্নর হিসাবে উদ্যম ও দক্ষতার সঙ্গে নিজ প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলে খলীফা হারূনুর-রশীদ নিজের সুবিধাজনক শর্তসাপেক্ষে তাঁহাকে রাজকীয় শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। এতকাল বাগদাদ হইতে ইফ্‌রীকিয়্যাতে যে অর্থ সাহায্য প্রধান করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কোষাগারে বাৎসরিক ৪০,০০০ দীনার প্রদান করিতে ইব্‌রাহীম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। খলীফার সঙ্গে আগ্‌লাবী আমীরের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহাতে আমীর যথেষ্ট স্বাধীনতা, বিশেষত উত্তরাধিকারের বিষয়ে, ভোগ করিতেন। "তিনি ইচ্ছামত কোন পুত্রকে বা ভ্রাতাকে স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিতেন"

(আন্-নুওয়ায়রী) এবং সেই মনোনয়নে বাগদাদ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিত না। তাঁহার পরবর্তী সকল উত্তরাধিকারীই এই রীতি অনুসরণ করেন।

ইফ্‌রীকিয়্যার এই আরব শাসকদের সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ভাল জ্ঞান রহিয়াছে এবং তাহা দ্বারা তাঁহাদের যোগ্যতা ও চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ পরে স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে খলীফাদের দোষগুণও পরিলক্ষিত হয়। যদিও তাঁহাদের অনেকেই ভোগবিলাসী ছিলেন এবং সময় সময় নির্যাতনমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়িতেন, তবুও কেহ কেহ অত্যন্ত সংস্কৃতিবান, উদারচিত্ত, সুবিবেচক ও মানবিক গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই গণপূর্তের উন্নয়ন সাধন করেন। জনগণের প্রদত্ত কর রাজ্যের নানাবিধ কল্যাণে ব্যয় করেন। তাঁহাদের শাসনাধীনে ইফ্‌রীকিয়্যায় এক নবজাগরণের সূচনা হয়। তাঁহাদের মহৎ স্থাপত্যকর্মসমূহ আজও জনদরদী শাসনের পরিচয় বহন করে।

কতিপয় অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহাদের কর্মশক্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল। ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল আগ্‌লাবকে (১৮৪-৯৭/৮০০-১২) বারবার বিদ্রোহের শেষ অভ্যুত্থান দমন করিতে হয়। আগ্‌লাবী এলাকার সীমান্তে দক্ষিণ ইফ্‌রীকিয়্যা, আওরাস ও প্রায় সমগ্র মধ্য-মাগ্‌রিব ছিল খারিজীদের নিয়ন্ত্রণে, রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে ছিল "যাব" প্রদেশ। ছোট কাবিলিয়্যার কুতামা কর্তৃক শী'আ মতবাদের সমর্থনই এই বংশের পতনের কারণ হয়। তবে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সংকট বিদ্যমান ছিল আগ্‌লাবী রাজ্যের কেন্দ্রমূলেই। তিউনিস, এমনকি কায়রাওয়ানও বিরোধের কেন্দ্র ছিল। সর্বাপেক্ষা গোলযোগ সৃষ্টিকারী দল ছিল জুন্‌দ-এর 'আরবগণ—যাহাদের আগ্‌লাবী শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক হইবার কথা ছিল। যেই সমস্ত শহরে তাহাদের ছাউনি ছিল সেই সমস্ত স্থানেই তাহারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করিত, দেশের শাসকশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইত এবং বিভিন্ন অন্যায় দাবি পূরণ করাইয়া লইতে সচেষ্ট থাকিত। ১ম ইব্‌রাহীম দুইবার আরব বিদ্রোহ দমন করেন। হাম্‌দীস ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান আল-কিন্দীর বিদ্রোহ (১৮৬/৮০২) এবং 'ইম্‌রান ইব্‌ন মুখাল্লাদের বিদ্রোহ (১৯৪/৮০৯), এই উভয় ক্ষেত্রেই কায়রাওয়ানীরা জড়িত ছিল। বিপদের কথা পূর্বেই চিন্তা করিয়া আমীর, আল-ক'ায়রাওয়ানের দুই মাইল দক্ষিণে আল-ক'াস্'রুল-ক'াদীম [বা আল-আব্বাসিয়্যা (দ্র.)] নির্মাণ করেন এবং সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন। তিনি বিশ্বস্ত জুন্‌দ ও এতদুদ্দেশে বিশেষভাবে ক্রয় করা ক্রীতদাসদের সমবায়ে গঠিত এক বিশ্বস্ত বাহিনী দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন।

তৃতীয় আগ্‌লাবী আমীর আবূ মুহাম্মাদ যিয়াদাতুল্লাহ (২০১-২৩/৮১৭-৩৮) জুন্‌দদের প্রতি অত্যধিক কঠোরতা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের আমলে আরও বেশী গুরুতর 'আরব বিদ্রোহ হয়। সেই বিদ্রোহের প্ররোচনা দেন মানসূ'র ইব্‌ন নাস্'র আত্-তুন্‌বুযী। তিউনিসের নিকটবর্তী তুনবুয়া নামক দুর্গ হইতে তিনি 'আরব গোত্রপ্রধানদেরকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের সমর্থনও লাভ করেন (২০৯/৮২৪)। কয়েকবার ভাগ্য পরিবর্তনের পরে বিদ্রোহীরা কেবল কাবিস ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইফ্‌রীকিয়্যার উপর আধিপত্য লাভ করে।

জারীদ-এর বারবারদের সাহায্যে যিয়াদাতুল্লাহ পুনর্বার সাফল্য লাভে সক্ষম হন। আত্-তুন্‌বুযী আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়। ইহার পরে সম্মিলিত শক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। যিয়াদাতুল্লাহ্ অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের ক্ষমা করিয়া দেন। কায়রাওয়ানীরা ইহার পরেও আর একবার বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন দান করে।

এই রাজবংশের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের অপর অধ্যায় হইল কায়রাওয়ানীদের শত্রুতামূলক আচরণ এবং তাহাদের প্রতি আগ্‌লাবী শাসকগণের ব্যবহার। সেই বৈরিতার প্রধান উৎস ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় শ্রেণীসমূহ, পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ যাঁহারা দেশের জনগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই 'আলিম, মুহ'াদ্দিছ', ফাকী'হ ও কালামশাস্ত্রবিশারদগণের অধিকাংশই ছিলেন প্রাচ্যবংশোদ্ভূত। তাঁহারা জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করিতেন এবং সকল জনমতের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করিতেন। আড়ম্বরহীন সহজ সরল জীবন যাপনকারী এই ধর্মীয় নেতাগণ আমীরগণের নৈতিক চরিত্রের সমালোচনা করিতেন, নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ হিসেবে তাঁহারা আমীরগণের নীতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেন। দ্বিতীয় আগ্‌লাবী আবুল আব্বাস 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (১৯৭-২০১/৮১২-২) এক অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন যাহা ছিল শারী'আত বিরোধী, যথা উৎপাদিত ফসলের উপর ফসল দ্বারাই উশর প্রদানের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের নগদ কর আরোপ। ইহার ফলে তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় এবং ঘটনার অল্পকাল মাত্র পরেই আমীরের মৃত্যু ঘটিলে তখন সকলে উহাকে আল্লাহ্‌র গযব (غضب) বলিয়া মনে করে। মোটের উপর আগ্‌লাবী শাসকগণ ধর্মানুরাগী শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাদেরকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অনমনীয় মনোভাব শিথিল করিবার জন্য তেমন কোন যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। এই বংশের শাসকগণের বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি ও পূর্ত কর্মসূচীর মধ্যেও (এইগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে) তাঁহাদের ধর্মীয় নীতির প্রভাব পড়িয়াছিল। তাঁহাদের বায়যানটীয় সিসিলী বিজয়ের পশ্চাতেও এই একই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কাজ করিয়াছিল।

আগ্‌লাবী আমীরগণের এই বিজয়, এই বিরাট সামরিক সাফল্য যিয়াদাতুল্লাহ কর্তৃক মানসূ'র আত্-তুন্‌বুযীর বিদ্রোহের ঠিক পরপরই অর্জিত হইলেও, নিঃসন্দেহে 'আরবদের শক্তিকে বাহিরের দিকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশে গৃহীত হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ অভিযানটি ২১১/৮২৭ সনে একটি জিহাদের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছিল ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আসাদ ইব্‌নুল ফুরাত (দ্র.)-এর উপর এবং যে সূসাতে মুজাহিদরা ও তাঁহাদের অনুসারী যোদ্ধারা জাহাজে আরোহণ করিয়াছিল তাহা এক জিহাদী বন্দরের রূপ লাভ করিয়াছিল। ছয় বৎসর পূর্ব হইতেই শহরটিতে একটি রিবাত নির্মাণ করা হয়।

সেই রিবাত অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। উহার ফটকে হুঁশিয়ারি সংকেতের জন্য যে গুম্বজ রহিয়াছে উহার পাদদেশের শিলালিপিতে যিয়াদাতুল্লাহর নাম ও তারিখ ২০৬/৮২১ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই আমীরই আল-কায়রাওয়ান (দ্র.)-এর বড় মসজিদ (দ্র.) পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই অপূর্ব মসজিদটি 'উক্'বা ইব্‌ন নাফি' (আনু. ৬৭০ খৃ.)

প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ৮ম শতকের মধ্যে দুইবার ইহার পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার সাধন করা হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে আগ্‌লাবীগণেরই কীর্তি ছিল। যিয়াদাতুল্লাহ ছাড়াও অপর দুইজন আমীর আবূ ইব্‌রাহীম ও ২য় ইবরাহীমের আমলে মসজিদটির সালাত প্রকোষ্ঠের সম্প্রসারণ করা হয়।

আগ্‌লাবীগণ স্থাপত্য কর্মে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। যিয়াদাতুল্লাহর উত্তরাধিকারী আবূ ইকাল আল-আগ্‌লাবের আমলে (২২৩-৬/৮৩৭-৪০) সূসাতে আবূ ফাত্‌য়াতা নামে পরিচিত ছোট মসজিদটি নির্মিত হয় সেইখানে প্রায় ঐ সময়ে আরও কিছু নূতন স্থাপত্যকীর্তিরও সূচনা হয়। আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইহাকে জামি' মস্‌জিদের মর্যাদা দান করেন (২৩৬/৮৫০) যাহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আবূ ইব্‌রাহীম আহ্‌মাদ কর্তৃক ২৪২-৯/৮৫৬-৬৩ সালে নির্মিত গড়গুলি এখনও সুরক্ষিত আছে। তিনি ইফ্‌রীকিয়্যার স্থাপত্যের ইতিহাসে এই বংশের সকল শাসক অপেক্ষা অধিক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিউনিসের বড় জামি' মস্‌জিদ তিনিই নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। উহাও কায়রাওয়ানের মসজিদের ন্যায় পূর্ববর্তী একটি ক্ষুদ্রতর মসজিদের স্থলে নির্মাণ করা হয়, কারণ উহাতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। এই রাজপুরুষের সৃজনশীল তৎপরতা ও বদান্যতার উত্তম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার সামরিক ও বেসামরিক স্থাপত্য কীর্তিতে। ইব্‌ন খালদূন, যিনি তাঁহার বিবরণী সম্পর্কে খুবই সতর্ক ছিলেন, বলেন, "আবূ ইব্‌রাহীম আহ্‌মাদ আফ্রিকাতে প্রায় ১০,০০০ দুর্গ নির্মাণ করেন, সেইগুলি পাথর ও চুন-সুরকীর তৈরী এবং লৌহ ফটক দ্বারা সুরক্ষিত।" ইহা সত্য, তিনি সমুদ্রের উপকূলভাগে ও পশ্চিম সীমান্ত বরাবর বহু দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহাদের অনেক কয়টিই সম্ভবত বায়যানটীয় যুগের সীমান্ত ঘাঁটি ছিল। তিনি উহাদের সংস্কার সাধন করেন। সূসার দুর্গপ্রাকার (একটি উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী উহার নির্মাণকাল ২৪৫/৮৫৯) হাড্রুমেটুম (Hadrumetum)-এর প্রাচীন দেওয়ালের উপর নির্মিত বলিয়া মনে হয়। অনুরূপভাবে তিউনিসী উপকূল মাহরেস (Mahres)-এর দক্ষিণে অবস্থিত যে বুর্‌জ য়ুঙ্গা (Burj Yunga) আগ্‌লাবী আমলে নির্মিত হয় তাহাও ছিল একটি বায়যানটীয় দুর্গ, মুসলিম স্থপতিগণ সেই পূর্বেকার ভিত্তি ব্যবহার করেন।

এই একই কথা সম্ভবত কয়েকটি পানিসেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এই কথা জোর দিয়া বলা যায়, আগ্‌লাবী শাসকগণ ইহাদের অনেকগুলিই নির্মাণ করিয়াছিলেন অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এলাকায় পানি প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া সেইখানে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য, বিশেষত তিউনিসীয় দুর্গশ্রেণীর দক্ষিণ দিকে। এম. সলিগনাক (M. Solignac) লিখিত এই বিষয়ের উপর একটি সাম্প্রতিক পুস্তকে নির্মাণ রীতি, নির্মাণসামগ্রী বা মাল-মসলার নিরীক্ষা ও কায়রাওয়ানের অন্যান্য পার্শ্ববর্তী জলাধারসমূহের নির্মাণসামগ্রীর যে তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে তাহাতে বিষয়টি সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না।

পূর্ত কর্মসূচী, প্রতিরক্ষা ঘাঁটিসমূহ ও সাধারণভাবে নির্মাণ কাজে আমীরগণ যে স্থানীয় শ্রমিক ও দক্ষ কারিগরদের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল দাসত্বমুক্ত অমুসলিম ও তাহাদের মাওলা (مولى)-গণের উপর; ভবনসমূহের গায়েই তাহাদের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহাদের মুদ্রার গায়েও টাঁকশাল নিয়ন্ত্রণকারী উপরিউক্ত শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের নির্মাণশৈলী ও অলঙ্করণ রীতিতে খৃস্টান আফ্রিকার রীতির কিছুটা প্রভাব থাকিলেও (মেঝে নির্মাণের রোমীয় মোজাইক রীতি তখনও চালু ছিল) আগ্‌লাবী স্থাপত্য রীতিতে প্রাচ্য রীতির প্রভাবই বেশী। সিরিয়া, মিসর ও মেসোপটেমিয়ার প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে এবং তাহাদের সমন্বয়ে এইখানে এক নূতন বিশেষ ধরনের স্থাপত্য গড়িয়া উঠে। সেই রীতির সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিকাশ ঘটিয়াছিল কায়রাওয়ানের জামি' মস্‌জিদের নির্মাণে।

এই রাজবংশের সর্বশেষ সমৃদ্ধি ঘটে আমীর আবূ ইস্‌হাক ইব্‌রাহীম (২য়)-এর শাসনামলে। তিনি আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহাম্ম'াদের (আবুল গারানিক =ابو الغرانق) বা "সারসের পিতা" নামে পরিচিত) পরে ক্ষমতাসীন হন এবং অমিতাচারী ও চপলমতি ছিলেন। ২য় ইব্‌রাহীমের অদ্ভুত চরিত্রে তাঁহার বংশীয় আমীরগণের সাধারণ চরিত্রের ভাল-মন্দের মিশ্রণেরই অতিরঞ্জিত রূপের প্রতিফলন দেখা যায়। একদিকে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক, সর্বদা প্রজাদের মঙ্গল চিন্তায় উদ্‌গ্রীব, আবার একই সঙ্গে তিনি পীড়নামোদী ও অত্যাচারীও ছিলেন। তাঁহার অত্যাচার হইতে এমনকি তাঁহার পরিবারের লোকেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাদি'দ-এর নিকটে অভিযোগ পৌঁছিলে খলীফার হুকুমে তিনি পুত্র আবুল 'আব্বাস 'আবদুল্লাহর অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করেন (২৮৯/৯০২) এবং নৈতিক উন্নতির উদ্দেশে অনুতাপ ও কঠোর সাধনায় বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। স্থলপথে হজ্জযাত্রা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবার ফলে তিনি সিসিলী গমন করেন এবং তাওরমিনা (Taormina) জয় করেন। অতঃপর তিনি ক্যালাব্রিয়া (Calabria) গমন করেন এবং সেইখানেই Cosenza পৌঁছিবার পূর্বে মারা যান (১৯ যুল-ক'া'দা, ২৮৯/১৯ অক্টোবর, ৯০২)।

২য় ইবরাহীমের শাসনামলে ইফ্‌রীকিয়্যাতে শী'আ প্রচারক আবূ 'আবদিল্লাহর আগমন ঘটে এবং তিনিই এই রাজবংশের পতন ঘটান এবং ফাতিমী বংশের আল-মাহ্‌দী উবায়দুল্লাহর বিজয় সুনিশ্চিত করেন। আবূ আবদিল্লাহ কুতামা বার্‌বার্‌গণকে শী'আবাদে দীক্ষিত করেন এবং তাহাদের সমর্থনপুষ্ট হইয়া আগ্‌লাবী রাজ্য জয়ে বহির্গত হন। পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটিগুলি—যেগুলির কোন কোনটি হইতে অদূরদর্শিতাবশত 'আরব সৈন্য তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল—ইব্‌রাহীমের নিষ্ঠুরতার শিকার হয় এবং তাহাদের পক্ষে এই সকল ধর্মান্ধ পার্বত্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। আমীর আবূ মুদার যিয়াদাতুল্লাহ ৩য় এই বিপদ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গৃহীত ব্যবস্থায় সঠিক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার অভাব ছিল এবং তাহা ক্রমঅগ্রসরমান ধ্বংসকে বিলম্বিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি কায়রাওয়ানের দুর্গপ্রাকার পুনর্নির্মাণ করান এবং কুতামার বিরুদ্ধে কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু সকল বাহিনীই পরাজিত হয়। ইহার পরে তিনি যুদ্ধে মহাবিজয়ের এক ঘোষণা প্রচার করিয়া পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। বহু ধনদৌলত সঙ্গে লইয়া তিনি কায়রাওয়ানের

৪½ মাইল দক্ষিণে ২য় ইব্‌রাহীম কর্তৃক স্থাপিত রাজধানী শহর রাক্কাদা ত্যাগ করেন এবং মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেইখান হইতে তিনি রাক্কাতে যান, কিন্তু পরে আবার মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি জেরুসালেমে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্‌দূন, 'ইবার, ৪খ., ১৯৫-২০৭, অনু. Noel Des Vergers, Hist. de l,Afrique sous la dynastie des Aghlabides, Paris 1841; (২) নুওয়ায়রী, সম্পা. M.Gaspar Remiro, অনু. in appendix to Ibn Khaldun, Histoire; (৩) ইব্‌ন ইযারী, বায়ান, ১খ., অনু. E. Fagnan, i, lll-204; (৪) ইবনুল আছ'ীর, আল-কামিল, ৭খ., অনু. E. Fagnan, Annal es du Maghreb et de l'Espagne, Algiers 1898, 157-299; (৫) Bakri, Descr, de l' Afr. Sept., অনু. de Stane. 52-54; (৬) মালিকী, রিয়াদু'ন্‌-নুফূস, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৫৩; (৭) ইয়াদী, মাদারিক, স্থা.; (৮) আবুল আরাব, Classes des savants de l' Ifrikiya, সম্পা. ও অনু. M. Bencheneb, স্থা; (৯) Vonderheyden, La Berberie orientale sous la dynastie de Benou l-Aghlab (800-909), Paris 1927; (১০) Fournel, Les Berbers, Paris 1857-75; (১১) Ch. Diehl and G. Marcais, Le Monde oriental de 395 a 1081 (Histoire generale de G. Glotz), 413-419; (১২) আবদুল ওয়াহ্‌হাব, খুলাসাত তারীখ তিউনিস, তিউনিস ১৩৭২, ৬৪-৭৬; (১৩) M. Solignac, Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des steppes tunisiennes du Vlle au Xle siecle, Algiers 1953; (১৪) G. Marcais, La Berberie musulmane et l' Orient au Moyen Age, 57-101; (১৫) ঐ লেখক, L' archit-ecture musulmane d' Occident, Paris 1954, chap. i.

G. Marcais (E.I.2) / হুমায়ুন খান

(২) ধর্মীয় জীবন

আগ্‌লাবীদের আমলে কায়রাওয়ান ইসলামী ধর্মীয় জীবন যাপন, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য চর্চার এক বিরাট কেন্দ্র ছিল। ইসলামী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের মিলনকেন্দ্ররূপে ইহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। কায়রাওয়ানের ধর্মতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইনের স্থানীয় সাধারণ ব্যাখ্যাকে পরিবর্ধিত করেন নাই। তাঁহারা প্রাচ্যের কোন একটি মাযহাব অনুসারণ করিতেন এবং এই বিষয়ে কখনও কখনও নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন। এই ঔদার্যের সমর্থন শুধু ইব্‌নুল ফুরাতের আসাদিয়্যাতেই নয়, অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়। আগ্‌লাবীদের কায়রাওয়ানে ইরাকী ও মাদানী এই উভয় তরীকার ফিক্‌'হী মতবাদই সমভাবে অনুসৃত হইত। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর শিক্ষা সেইখানে শিকড় গাড়িতে পারে নাই, বিশেষ করিয়া আগ্‌লাবীদের আমলে কায়রাওয়ান মালিকী মাযহাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়, এমনকি এই বিষয়ে মদীনা ও কায়রোকেও ছাড়াইয়া যায়। সেই যুগের ফিক্‌'হশাস্ত্রের যে কয়জন বড় বিশেষজ্ঞের রচনা কমবেশী অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে তাঁহারা হইলেন আসাদ ইব্‌নুল ফুরাত (দ্র., মৃ. ২১৩ হি.), সাহ্‌নূন (দ্র., মৃ. ২৪০ হি.; ইনি মালিকী মাযহাবের বিশাল সংকলন গ্রন্থ আল-মুদাওওয়ানা-র রচয়িতা), ইয়ূসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌'য়া (মৃ. ২৮৮ হি.), আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্‌'য়া ইব্‌ন 'উমার আল-কিনানী (মৃ. ২৮৯ হি.), 'ঈসা ইব্‌ন মিস্‌কীন (মৃ. ২৯৫ হি.) ও আবূ 'উছ্‌'মান সা'ঈদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নুল-হ'াদ্দাদ (মৃ. ৩২০ হি.)। আগ্‌লাবী আমলের উল্লিখিত ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহ অধ্যাবধি কায়রাওয়ানের বড় মসজিদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। গোঁড়াপন্থী ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেও আগ্‌লাবীদের আমলের কায়রাওয়ান বিভিন্ন মতবাদের মিলনক্ষেত্র ও প্রাণবন্ত আলোচনার মঞ্চ ছিল। কখনও কখনও বিভিন্ন মতবাদপন্থী, যথা ন্যায়পন্থী, জাবারিয়্যা, মুর্‌জিআ, মু'তাযিলা ও শেষোক্ত হইলেও সমগুরুত্বপূর্ণ ইবাদিয়্যাগণের (দ্র. সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ) মতভেদ বিবাদ-বিতণ্ডা ও নির্যাতনে পর্যবসিত হইত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আসাদ ইব্‌নুল ফুরাত, সুলায়মান আল-ফাররা-কে আক্রমণ করিয়াছিলেন এই কারণে যে, মু'মিনগণ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন, কথাটি তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। সাহ্‌'নূন কাদী পদ লাভ করিবার পরে তাঁহার পূর্ববর্তী কাদী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিল জাওয়াদকে ধীরে ধীরে প্রহার করিয়া হত্যা করেন। কারণ 'আবদুল্লাহ এমন মত পোষণ করিতেন যে, কুরআন শরীফ সৃজিত (মাখ্‌লূক')। কুরআন সৃজিত কিনা এই প্রশ্নে আগ্‌লাবীগণ বাগ্‌দাদের খলীফাদের মত অনুসরণ করিতেন। প্রাচ্যদেশে মিহ্‌না (ধর্মগত মতভেদের জন্য তদন্ত ও শাস্তি-Inquistion)-এর পরে পরেই ন্যায়পন্থিগণকে মিথ্যা দাবিদার আহ্‌মাদ ইব্‌নুল আগ্‌লাবের নিকট হইতে প্রায় অনুরূপ, যদিও মৃদুতর, নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সাহ্‌'নূন স্বয়ং তখন বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমে মারাত্মক বিপদ হইতে রক্ষা পান। প্রাচ্যের মতই সেইখানে অল্পদিনের মধ্যে ন্যায়পন্থী প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু মু'তাযিলা মতবাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই এবং জনৈক প্রকাশ্যে ঘোষিত মু'তাযিলী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ আস্‌-সাদ্দীনীকে কায়রাওয়ানের কাদী নিযুক্ত করা হয়। উহা ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আহ্‌মাদের শাসনের শেষদিকের এবং এই রাজবংশ বিলুপ্ত হইবার সামান্য পূর্বের ঘটনা। যথার্থ ধর্মীয় জীবনের প্রতিনিধি ছিলেন বহু সংখ্যক ধার্মিক ব্যক্তি ও সূফী-দরবেশ যাঁহারা কোন না কোন ক্ষেত্রে আলিমগণের বিরোধিতা করিলেও তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। আগ্‌লাবীদের আমলে এই উভয় দলই অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। উভয় দলই স্বাধীন মনোভাবের অধিকারী ছিল এবং সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব পোষণ করিত। কাদীগণকে প্রায়শ আঞ্চলিক প্রশাসন ও সামরিক নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হইত। কয়েকটি জীবনী সংগ্রহে—সেইগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীনটি উল্লিখিত কালের প্রায় কাছাকাছি সময়ের—কায়রাওয়ানের ও আগ্‌লাবীদের অধীনস্থ ইফ্‌রীকিয়্যার অন্যান্য শহরের ধর্মীয় ও বুদ্ধিগত জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল আরাব (মৃ. ৩৩৩ হি.), ত'াবাক'াত 'উলামা' ইফ্‌রীকি'য়্যা; (২) ঐ লেখক, তাবাকাত উলামা ইফ্‌রীকিয়্যা, তূনিস; (৩)

আল-খুশানী (মৃ ৩৭১ হি.), তাবাকাত উলামা ইফ্‌রীকিয়্যা (এই তিন সংস্করণেরই সম্পাদক ও অনুবাদক M. Ben Cheneb, প্যারিস-আলজিয়ার্স ১৯১৫, ১৯২০); (৪) আবূ বাক্‌র আল-মালিকী (মৃ. হি. ৪৪৯-এর পরে), রিয়াদু'ন-নুফূস, সম্পা. H. Mu'nis, ১খ., কায়রো ১৯৫১; (৫) ঐ পূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার করিয়াছেন H. R. Idris, in REI, ১৯৫৩, ১০৫ প., ২৭৩ প.; ১৯৩৬, ৪৫ প.; (৬) ইব্‌নুন-নাজী (মৃ. ৮৩৭ হি.), মা'আলিমুল ঈমান, তিউনিস ১৩২০-২৫ হি.।

J. Schacht (E.I.²) / হুমায়ুন খান

(৩) কালানুক্রমিক বিবরণ

এই বংশে নিম্নলিখিত ১১জন শাসক রাজত্ব করেন ঃ

১। ১ম ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল আগলাব ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন 'ইকাল আত্‌-তামীমী (১২ জুমাদাছ'-ছানী, ১৮৪/৯ জুলাই, ৮০০—২১ শাওওয়াল, ১৯৫/৫ জুলাই, ৮১২) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতা আল-আগ্‌লাব, আবূ মুস্‌লিমের জনৈক সাবেক সহচর ছিলেন। তিনি খলীফা আল-মান্‌সূর কর্তৃক ইফ্‌রীকিয়্যাতে প্রেরিত খুরাসানী বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ১৪৮/৭৬৫ সালে তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আশ্'আছে'র স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৫০/৭৬৭ সালে আল-হাসান ইব্‌ন হার্‌ব-এর বিদ্রোহের কালে নিহত হন। ১৭৯/৭৯৫ সালে ইব্‌রাহীম যাব-এর শাসক নিযুক্ত হন এবং শাসক ইব্‌ন মুকাতিলের বিরুদ্ধে উত্থিত একটি বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করার পুরস্কারস্বরূপ খলীফা হারূনুর-রশীদ তাঁহাকে এই প্রদেশের বংশানুক্রমিক শাসন অধিকার প্রদান করেন। পরিশ্রমী, বিজ্ঞ, দূরদর্শী, বিচক্ষণ, একাধারে সাহসী যোদ্ধা ও কুশলী কূটনীতিক ইব্‌রাহীম ইফ্‌রীকিয়্যাতে চমৎকার সুশাসন কায়েম করেন। তিনি অত্যন্ত উদার সংস্কৃতির অধিকারী, ভাল ফাকীহ, উত্তম বাগ্মী ও কবি ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

মৃত্যুর প্রাক্কালে পুত্র আবদুল্লাহকে খারিজী হুওয়ারাদের এক বিদ্রোহ দমনের জন্য ত্রিপোলিতানিয়া প্রেরণ করিলে ১৮৬/৮১১ সালে তিনি তাহারতের রুস্তামী বংশের আবদুল ওয়াহ্‌হাব কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। তখন ইব্‌রাহীম ত্রিপোলীর সমগ্র পশ্চাৎভূমি ছাড়িয়া দিয়া 'আবদুল ওয়াহ্‌হাবের সঙ্গে সন্ধি করেন।

অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ, ২৩৩ প.; (২) কিতাবুল 'উয়ূন, Frag. Hist. arab., ৩০২ প.; (৩) ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, নুজূম, ১খ., ৪৮৮, ৫১১, ৫২৮, ৫৩২; (৪) আবূ যাকারিয়্যা, Chronique, অনু. Masqueray, 121-6; (৫) শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রো, পৃ. ১৫৯-২৪১; for Frankish embassies to Ifrikiya, তু.; (৬) Eginhard, Annales Francorum, an. 801; (৭) Reinaud, Invasion des Sarrazins en France, Paris 1836, 117.

২। আবুল 'আব্বাস 'আবদুল্লাহ্‌ (১ম) ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (স'ফার ১৯৭/অক্টোবর-নভেম্বর ৮১২—৬ যুল-হি'জ্জা, ২০১/২৫ জুন, ৮১৭) অত্যন্ত সুদর্শন ও বদমেযাজী ছিলেন বলিয়া খ্যাত। কুর্‌আনের নির্দেশ বহির্ভূত কর্ম এবং তদুপরি গুরুভার কর ধার্য করিবার অভিযোগে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দোষারোপ করা হয়।

৩। আবূ মুহাম্মাদ যিয়াদাতুল্লাহ্‌ (১ম) ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (২০১/৮১৭—14 রাজাব, ২২৩/১০ জুন, ৮৩৮) এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। আত্‌-তুন্‌বুযীর বিদ্রোহ ব্যতীত তাঁহার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ২১৭/৮২৭ হইতে কায়রাওয়ানের কাদী আসাদ ইব্‌নুল ফুরাত (দ্র.)-এর নেতৃত্বে সিসিলী বিজয়। দুই বৎসর পরে সাবেক বিদ্রোহিগণের প্রতি তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করেন যাহার ফলে ইফ্‌রীকিয়্যাতে সাধারণভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রাওয়ানের বড় মসজিদের সংস্কার সাধন এবং অন্যান্য পূর্তকর্মসূচীও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

৪। আবূ 'ইকাল আল-আগ্‌'লাব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (২২৩/৮৩৮—রাবী' ২য়, ২২৬/ফেব্রুয়ারী ৮৪১) একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সংস্কৃতিবান শাসক ছিলেন। ইফ্‌রীকিয়্যার সুশাসনের প্রতি মনোযোগ দেন এবং সিসিলীর জিহাদে অধিকতর গতি সঞ্চার করেন।

৫। আবূল 'আব্বাস মুহাম্মাদ (১ম) ইব্‌নুল আগ্‌লাব (২২৬/৮৪১-৪২—মুহার্‌রাম ২৪২/১০ মে, ৮৫৬)। ক্ষমতাসীন হইবার ছয় বৎসর পর তিনি তাঁহার ভাই আহ্‌মাদ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। এক বৎসর পর তিনি পুনরায় ভাইকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহাকে প্রাচ্যদেশে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁহার ভাইয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দুইটি বিদ্রোহ ঃ সালিম ইব্‌ন গাল্‌বূনের বিদ্রোহ ২৩৩/৮৪৭-৮ সনে এবং আম্‌র ইব্‌ন সালিম আত্‌-তুজীবীর বিদ্রোহ ২৩৫/৮৫০ সনে। মুহাম্মাদ মালিকী মায্‌হাবের, বিশেষ করিয়া কাদী সাহ্‌নূন (দ্র.) কর্তৃক প্রচারিত মালিকী মতবাদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

৬। আবূ ইব্‌রাহীম আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (২৪২/৮৫৬-১৩ যুল-কা'দা ২৪৯/২৮ ডিসেম্বর, ৮৬৩) পূর্ববর্তী শাসকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল। সেই সময়ে অনেক পূর্তকর্ম সম্পন্ন করা হয়।

৭। যিয়াদাতুল্লাহ (২য়) ইব্‌ন মুহাম্মাদ (২৪৯/৮৬৩—১৯ যুল কা'দা, ২৫০/২৩ ডিসেম্বর, ৮৬৪) পূর্ববর্তী শাসকের ভাই ছিলেন।

৮। আবুল গারানিক মুহাম্মাদ (২য়) ইব্‌ন আহ্‌মাদ (২৫০/৮৬৩—৬ জুমাদা ১ম, ২৬১/১৬ জানুয়ারী, ৮৭৫), আবূ ইব্‌রাহীমের পুত্র। শিকারের প্রতি তাঁহার দুর্বার আকর্ষণ ছিল। তাঁহার আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মালটা বিজয় (২৫৫/৮৬৮)।

৯। আবূ ইস্‌হাক ইব্‌রাহীম (২য়) ইব্‌ন আহ্‌মদ (২৬১/৮৭৫—১৭ যুল কা'দা, ২৮৯/১৮ অক্টোবর, ৯০২) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ ইকালের স্থলে গণসমর্থনে ক্ষমতাসীন হন। ২৬৪/৮৭৮ সালে তিনি নিজের জন্য রাক্‌কাদা (দ্র.) নামে একটি নূতন আবাস নির্মাণ করেন। পরে তিনি উহা ত্যাগ করিয়া তিউনিসে চলিয়া যান। তাঁহার শাসন আমলের প্রধান প্রধান ঘটনা হইল, সাইরাকুস (Syracuse) অধিকার (২৬৪/৮৭৮), আল-'আব্বাস ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূনের দ্বারা ইফ্‌রীকিয়্যা আক্রমণ এবং উহা জাবাল নাফ্‌সার ইবাদরীগণের সহায়তায় প্রতিহত করা (২৬৬-৭/৮৭৯-৮০), যাব-এর বারবার গোত্রীয়দের বিদ্রোহ দমন (২৬৮/৮৮১-২) এবং ইফ্‌রীকিয়্যার উত্তরাংশে অপর একটি বিদ্রোহ দমন (২৮০/৮৯৩)। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ

সিসিলী প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে (২৮৭/৯০০) তিনি পালারমো (Palarmo) ও রেগগিও (Reggio) দখল করেন। ইব্রাহীম সিংহাসন ত্যাগ করিবার পর আবদুল্লাহকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনা হয় (উপরে দেখুন)।

১০। আবুল 'আব্বাস আবদুল্লাহ (২য়) ইব্ন ইব্রাহীম (২৮৯/৯০২—২৯ শা'বান, ২৯০/২৩ জুলাই, ৯০৩)। তিনি শী'ঈ উপদ্রব প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু সম্ভবত স্বীয় পুত্র যিয়াদাতুল্লাহ-র প্ররোচনায় নিহত হন।

১১। আবূ মুদার যিয়াদাতুল্লাহ (৩য়) ইব্ন 'আবদিল্লাহ (২৯০/৯০৩—২৯৬/৯০৯)। পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিহত হইবার পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তেমন সাহসী ছিলেন না। তাহা সত্ত্বেও তিনি জিহাদ ঘোষণা করেন ২৯১/৯০০ সালে, কিন্তু লারিবাসের (Laribus) পতনের পর (১৮ মার্চ, ৯০৯) হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন (দেখুন আবূ 'আবদিল্লাহ আশ-শী'ঈ) এবং তৎক্ষণাৎ দেশ ত্যাগ করেন।

(E.I.2) / হুমায়ুন খান

আগা (آغا) ঃ অথবা আগা (آغا), এই শব্দটি পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষায় সাধারণত "অগ্রজ" কখনও কখনও "ঈনী" অনুজের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইয়াকূ'তী (সাইবেরীয়ার বাশিন্দা এক তুর্কী সম্প্রদায়ের নাম ইয়াকূ'ত, দা. মা. ই.) ভাষায় আগা অর্থ "পিতা" [তু. V. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon Dechifrecs, ৯৪ (আকা)], Koybal-Karaghasi-তে ইহার অর্থ "পিতামহ" ও "পিতৃব্য", Cuwash-এ "অগ্রজা"। মোঙ্গলদের মধ্যে পূর্ব হইতেই এই শব্দটি সম্মানসূচক উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হইত; শাহান্‌শাহী খান্দানের শাহ্যাদীগণকেও আগা বলা হইত (তু. Quatremere, Histoire des Mongols, xxxix-xl)।

'উছ্মানী তুর্কীদের আমলে আগা শব্দটি (প্রচলিত উচ্চারণ "আ'আ" অথবা শুধু "আ") "প্রধান", "মনিব" এবং কখনও কখনও "ভূস্বামী" অর্থে ব্যবহৃত হইত। ইহা পরিবারের প্রধান ভৃত্যের অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং অন্য অনেক শব্দের সহিত যুক্তভাবেও ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন চার্শী আগাসী (বাজার পরিদর্শক), খান আগাসী (সরাইখানার মালিক বা রক্ষক), কোয় আগাসী (গ্রামের মোড়ল) এবং আগা বে অর্থাৎ অগ্রজ (উপরে বর্ণিত), বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। তুর্কী সংস্কার যুগ পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তৎপরবর্তী কালেও সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত অথবা জাতীয় পদে নিয়োজিত নহে এমন পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে এই খিতাবে সম্বোধন করা হইত, বিশেষভাবে "আফিন্দী" (দ্র.) শব্দের মুকাবিলায় এই শ্রেণীর আগাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইল যেনিসের আগাসী (দ্র. য়েনিসেরী) এবং স্থায়ী সেনাবাহিনীর (সামন্ত বাহিনী নহে) অধিকাংশ প্রধান কর্মকর্তা উযেংগী অথবা রিকাব আগালারি, সুলতানের গৃহের "অভ্যন্তর" ও "বাহির"-এর অধিকাংশ কর্মকর্তা; কিন্তু প্রধান উযীরের কাহ্য়াকেও (কেদ্ খুদা) আগা বলা হইত। যদিও তাঁহার কাজের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক ও সচিবের কর্মের অনুরূপ। এই কারণে 'efendi' শব্দটি তাঁহার উপাধির সহিত যুক্ত হইত এবং তাঁহাকে বলা হইত আগা এফেনদিমিয (Efendimiz)। অনুরূপভাবে বাবুস-সা'আদা আগাসী বা কাপি (শ্বেত) আগাসীর ও দারুস-সা'আদা আগাসী বা কিয্‌লার (কৃষ্ণ) আগাসীর নেতৃত্বাধীন রাজপ্রাসাদের খোজাদের, সুলতানের মাতা ও শাহী বংশোদ্ভূত মহিলাদের সেবায় নিয়োজিত খোজাগণকে আগা বলা হইত। এইভাবে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও বিত্তশালীদের দ্বারা নিযুক্ত খোজাগণকে সাধারণত হারেম আগালারী বা খাদিম আগালারী বলা হইত। তথাপি শুধু আগা শব্দটি দ্বারা কখনও কখনও খোজা বুঝান হইত।

১৮২৬ সালে জানিসারীদের উচ্ছেদের পর এবং দ্বিতীয় মাহমূদ কর্তৃক আসাকির-ই মান্সূ'র গঠনের পর কাইম মাকামের পদ পর্যন্ত অশিক্ষিত কর্মচারীদেরকে আগা ও অনুরূপ পদের শিক্ষিত কর্মচারীদের efendi বলিয়া সম্বোধন করা হইত। এই প্রথা 'উছ্মানী তুর্কীদের শাসনামলে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তুর্কী সেনাবাহিনীতে 'য়ূয্‌বাশী' ও 'বিন্‌বাশী,' যথাক্রমে ক্যাপ্টেন ও মেজররূপে আখ্যায়িত সামরিক পদদ্বয়ের মাঝামাঝি কোন আগাসী (এড্‌জুটেন্ট মেজর—বাহিনীর কোন একটি বাহুর নায়ক) নামক একটি পদ ছিল। আগা প্রায়শ আকা এই বানানে লিখিত হয়। ফার্সী ভাষায় ইহা খোজা অর্থসূচক। উদাহরণস্বরূপ প্রথম কাজার সুলতান আগা মুহাম্মাদ শাহের নামে এই ব্যবহার রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Radloff, Versuch eines Worterbuch d. Turko-Tatar. Sprachen, i, 5-6; (২) H. Vambery, Etymologisches Worterbuch d. Turko Tatar. Sprachen, 5; (৩) Pavet de Courteille, Dictionaire Ture-Oriental, 24; (৪) Redhouse, A Turkish and English Lexicon, 1912, 146; (৫) `Ata Tarikh, i, Passim, esp. sections beginning, pp. 7, 30, 72, 138, 157, 182, 205, 209, 257 ও 290; (৬) M. d'Ohsson, Tableaude I Empire Ottoman, vii, cf. index; (৭) Islam Ansiklopedisi, s. v. Aga.

H. Bowen (E.I.2) / পারসা বেগম

আগা (দ্র. আগা)

আগা ওগ্লূ আহ্মাদ (اغا وغلو احمد) ঃ মূলত আহ্মাদ আগায়েফ, পরবর্তী কালে আগা ওগ্লূ আহ্মাদ এবং ১৯৩৪-এর পরে আহ্মাদ আগা ওগ্লূ, একজন তুর্কী লেখক ও সাংবাদিক (১৮৬৯-১৯৩৯)। আযারবায়জান-এর কারাবাগ (দ্র.) অঞ্চলের অন্তর্গত শুশা নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ শহরে ও তিফলিস (Tiblis)-এ শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে প্যারিসে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৪ খৃ. তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে হুসায়ন যাদে আলী, ইসমাঈল গাসপীরালী (গাসপ্রিন্‌সকি, Grasprinski) (দ্র.) আলী মেরদান তপচীবাশী প্রভৃতির মত প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধজীবীদের সহযোগী

হন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেন। ১৯০৮-এ তুরস্কে শাসনতন্ত্র পুনর্বহালের পর তিনি ইসতাম্বুল গমন করেন এবং Committee of Union and Progress (CUP)-এ যোগদান করেন এবং ফরাসী দৈনিক Jeuneture-এর একজন নেতৃস্থানীয় লেখকে পরিণত হন। দিয়াগোকাল্প, ইয়ূসুফ আক্চুরা, মুহাম্মাদ আমীন (Yurdakul-য়ুরদাকুল) প্রভৃতি ব্যক্তিদের সহিত একত্রে তিনি তুর্কীবাদ আন্দোলনের (Turkculuk) একজন অগ্রণী ব্যক্তিতে পরিণত হন। এই আন্দোলনের ১৯১১-এর জুনে জাতীয়তাবাদী সমিতি (Turkish Hearth Turk Objaghi) ও তাহার অংগ-সংগঠন Turk yurdu স্থাপিত হওয়ার ফলে ১৯১২-এর পর তুরস্কের বুদ্ধিজীবিগণের জীবনে প্রভাবশালী ধারায় পরিণত হয়। আগা ওগ্‌লূ ১৯১৩ সালে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে তুরস্কের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার লেখা অব্যাহত রাখেন। পার্লামেন্টের নির্বাচিত ডেপুটি ও CUP-এর কার্যকরী পরিষদের (মারকায-ই 'উমূমী Merkez-i `Umumi) একজন সদস্য, আগা ওগ্‌লূ ১৯১৭ সালে তুরস্কের ককেশাস অভিযানকারী বাহিনীর রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসাবে উহার সঙ্গে যান। ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিতেই তিনি ইংরেজগণ কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং CUP-এর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সদস্যের সহিত মাল্টায় নির্বাসিত হন। ১৯২১-এর জুলাইয়ে মাল্টা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি আংকারায় জাতীয়তাবাদীদের সহিত যোগ দেন এবং মুদ্রণালয়ের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন।

সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদে (Grand National Assembly) নির্বাচিত হইয়া তিনি একই সময়ে আধা সরকারী দৈনিক হাকিমিয়্যাত-ই মিল্লিয়্যাত-এ লিখিতে থাকেন এবং আংকারায় নবপ্রতিষ্ঠিত আইন অনুষদে শিক্ষা দান করেন। ১৯৩০-এর আগস্টে প্রতিষ্ঠিত স্বল্প আয়ুর উদারনৈতিক দলের (Serbest Firka) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং একই বৎসরের নভেম্বরে ইহার বিলুপ্তির পর তিনি রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সনে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইস্তাম্বুলে আইন অনুষদে শিক্ষাদানে রত থাকেন। ১৯৩৯-এর ১৯ মে তিনি ইস্তাম্বুলে ইন্তিকাল করেন।

মূলত তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। তাঁহার রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ হইল (১) Uc' medeniyyet (তিন সভ্যতা), ইস্তাম্বুল ১৯২৭, দ্বিতীয় সংস্করণ রোমান হরফে Uc' medeniyyet ইস্তাম্বুল ১৯৭২; (২) Serbest insanlar. ulkesinde, (স্বাধীন মানুষের দেশে), ইস্তাম্বুল ১৯৩০; (৩) Devlet ve fert (রাষ্ট্র ও ব্যক্তি), তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত; (৪) Serbest Firka hatiralari (উদারনৈতিক দলের স্মৃতিকথা), ইস্তাম্বুল ১৯৪৯। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত আগা ওগলূর অসংখ্য নিবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সামেত আগা ওগ্‌লূ (তাঁহার পুত্র), Babamdan hatiralar, ইস্তাম্বুল ১৯৪০, ইহাতে লেখক তাঁহার পিতার স্মৃতিকথা, আগা ওগ্‌লূর নিজের অসম্পূর্ণ জীবনী ও কয়েকজন লেখকের আগা ওগ্‌লূ সম্পর্কে ধারণা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; (২) ঐ লেখক, Babamin arkadaslari (আমার পিতার বন্ধুগণ), ইস্তাম্বুল ১৯৬৯।

Fahir Iz (E.I.² Suppl.) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আগা খান (آغا خان) ঃ আসল নাম আক'া খান, নিযারী (দ্র.) ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের (নেতৃবৃন্দের জন্য) ব্যবহৃত উপাধি। ইহা মূলত পারস্যের কাজার শাহ্দের দরবারের একটি সম্মানসূচক উপাধি যাহা হাসান আলী শাহ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে তাঁহার পিতা খালীলুল্লাহ নিহত হওয়ার পর তিনি (হাসান আলী) ফাত্হ আলী শাহের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদ শাহের রাজত্বের সময় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে হাসান আলী শাহ ১৮৩৮ সালে কিরমান-এ বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ১৮৪০ সালে সিন্ধুতে পলায়ন করেন এবং সেইখানে সিন্ধু অভিযানে Sir Charles Napier-কে মূল্যবান সহযোগিতা দান করেন। পারস্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বুনপুর (Bunpore) জেলা হইতে তিনি এক ব্যর্থ প্রচেষ্ট চালাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বোম্বাইতে বাস করিতে গমন করেন, কিন্তু পারস্য সরকারের চেষ্টায় তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৮ সালে তিনি বোম্বাইতে ফিরিয়া যান। তখন হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার ও তাঁহার পরবর্তীদের পরিচালিত আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বোম্বাই-ই থাকিয়া যায়। কেবল স্বল্পকালের জন্য কেন্দ্র ছিল বাংগালোর। ইমামের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া খোজা (দ্র.)-দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিণামে একটি মামলায় রূপ পরিগ্রহ করে। এই মামলা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে আগা খানের সপক্ষে প্রদত্ত ১৮৬৬ সালে Sir Joseph Arnould-এর রায়ের মাধ্যমে। (এই মামলা চলাকালে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তর তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। এই সকল তথ্যের মাধ্যমে নিযারী ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়; তু. M. H. B. Freer, The Khojas, the Disciples of the Old Man of the Mountain, Macmillan's Magazine 1876, 431 ff.; St. Guyard, in JA 1877/i, 337 ff.)। হাসান আলী শাহ (মৃত্যু ১৮৮১), অতঃপর তাঁহার পুত্র আলী শাহ (মৃ. ১৮৮৫) ও তাঁহার পর আগা খান His Highness সুলতান মুহাম্মাদ শাহ (জ. ২ নভেম্বর, ১৮৭৭) নেতৃত্ব লাভ করেন। আগা খান ভারত (খোজা সম্প্রদায়সহ), পারস্য, মধ্যএশিয়া, সিরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় নিযারী ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা। তাঁহার নেতৃত্বে নিযারী সম্প্রদায়ের সংগঠন বিপুল উন্নতি লাভ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও তাঁহার সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরেও একজন বিচক্ষণ নেতারূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৫৭ সালের ১১ জুলাই তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী (ওয়ালী 'আহ্দ) প্রিন্স কারীম আগা খান (জ. ১৯৩৬) ১৯৫৭ সালের ১১ জুলাই তারিখে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. N. Hollister, The Shi'a of India, London 1953, 364 ff. আগা খানের স্মৃতিকথা "World

Enough and Time" শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছে, London ১৯৫৮।

H. A. R. Gibb (E. I.[2]) / পারসা বেগম

আগাচ (آغاج) ঃ 'উছমানী তুর্কী ভাষায় ইহার অর্থ "একটি গাছ", "কাঠ", পূর্ব তুরস্কের ভাষায় (যেখানে সচরাচর ইহার রূপ Yighac দেখা যায়) "পুরুষ সদস্য" ও প্যারাসাঙ্গ" (parasang- فرهنك)-ও বুঝায় (তু. আল-কাশগাড়ী, দীওয়ান লুগাতিত্-তুর্ক, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩, ৩খ., ৬; Brockelmann, Mittelturkische Wortschatz, Budapest-Leipzig 1928, 87)। আল- কাশগাড়ী ইহার শুধু Yighac রূপের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু W. Radloff, Versuch eines Worterbuches der Turk-Dialekte, 1893, ১খ., ১৫০, এই শব্দের aghac রূপ ও অন্যান্য রূপও উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—aghatz, aghas ও yaghac এবং শুধু গাছ ও কাঠ বুঝাইতেই নয়, বরং "দূরত্বের একটি পরিমাপ" বুঝাইতেও ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। আল-কাশগাড়ী "প্যারাসাঙ্গ" বলিয়া দূরত্বের যে পরিমাপ উল্লেখ করিয়াছেন (তু. Pavet. de Courteille, Dictionnaire Turc-Oriental, Paris 1870, 554-55) তাহার পরিমাণ হইল, এক ব্যক্তি অন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে দূরত্বে দাঁড়াইলে সে তাহার কথা অন্য দুই ব্যক্তিকে শুনাইতে পারিবে, সেই দূরত্বের তিন গুণের সমান। এইভাবে দূরত্বের পরিমাপ অর্থে, এক আগার, মীর আলী শীর নাওয়াঈর কবিতা অনুসারে ১২০০০ ডবল কিউবিট (কারী) অর্থাৎ ১২০০০ গজের সমান; Pietro della Valle, Voyages, ৩খ., ১৪১ অনুসারে এক স্পেনীয় লীগ অথবা চার ইতালীয় মাইলের সমান; Flandia and Costa, Voyages en Perse, ১খ., ১১১ অনুসারে ৬ কিলোমিটারের সমান এবং Rabloff, পূ. স্থা. অনুসারে, ৬ হইতে ৭ রুশ ভার্সট (Verst)-এর সমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের বরাতের অতিরিক্ত ঃ (১) সুলায়মান আফানদী, লুগাত-ই চাগাতাঈ ওয়া তুর্কী-ই 'উছমানী, ১৫ (অনু. L. Kunos, Budapest 1902, পৃ. ৬, ১০৫); (২) H. Vambery, Cagataische Sprachstudien, পৃ. ৩৫৭।

Cl. Huart-H. Bowen (E.I.[2]) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আগাছুযীমূন (أغاثوذيمون) ঃ নামটির সঠিক প্রতিবর্ণায়ন ইব্ন আবী 'উসায়বিআর 'উয়ূনুল আন্‌বা ১খ., ১৮-তে ও অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। অন্যান্য উচ্চারণ ঃ আগাছাযীমূন ও তদ্রূপ বানান, ইহা ছাড়া আরও গুরুতর বিকৃতিও রহিয়াছে। 'আরবী হইতে ল্যাটিন অনুবাদে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরূপ পাওয়া যায়, যথাঃ "তুরবা ফিলেসোফোরাম" (Turba Philosopharum)-এ আগাডিমান (Agadiman), আডিমন (Adimon), আগমন (Agmon)।

গ্রীসীয়-মিসরীয় দেবতা আগাযোডামন (দ্র. Ganschinietz, in Pauly-Wissowa, iii, Suppl.-Bd.) 'আরবীয় কিংবদন্তীতে প্রাচীন মিসরের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বা নবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। Ps.-Manetho ইতোমধ্যেই আগাথোডিমনকে মিসরের তৃতীয় রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্থানান্তরে তাঁহাকে ২য় হারমিসের পুত্ররূপে ও টাট-এর পিতারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্নুল কিফ্‌তীর (পৃ. ২) মতে আগাথোডিমন ইদ্‌রীস/হেনক (Henoch)/হারমেসের শিক্ষক ছিলেন। ইব্ন আবী উস'য়বি'আ, আল-মুবাশ্‌শির ইব্ন ফাতিকের বরাতে বলেন, তিনি অ্যাসক্লেপিয়াস (Asclepius)-এর শিক্ষক ছিলেন। সাবীঈগণ (দ্র.) তাঁহাকে শীছ ('আ) ইব্ন আদম (আ)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইব্ন ওয়াহ্ শিয়্যার মতে তিনি মাছ ও. সীম খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে পরে আরমিসা/হারমেসও সমর্থন জোগান এবং তাঁহাকে তিনটি প্রাচীন বর্ণমালার আবিষ্কারক বলিয়াও উল্লেখ করেন। ইখ্‌ওয়ানুস্ সাফা (বোম্বাই), ৪খ., পৃ. ২৯৬-তে তাঁহাকে অপর তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকে একটি করিয়া চারটি মতবাদের প্রবর্তন করেন। আগাথোডিমন (Agathodaemon) পীথাগোরীয় (Pythagorean) মতবাদের সৃষ্টি করেন। জাবির ইব্ন হ'য়্যান কয়েক জায়গায় তাঁহাকে সক্রেটিসের সঙ্গে ও মাজরীতী (Ps.-Madjriti) অন্যান্য দার্শনিকের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আগাথোডিমন গূঢ় বিদ্যায় (ocult sciences) পারদর্শী বলিয়া গণ্য হইতেন। জাবির ও মাজরীতীর মতে তিনি এমন এক ঘড়ি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যাহা সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদিকে মুগ্ধ করিয়া গর্ত হইতে লইয়া আসিত। ইব্নুন-নাদীম তাঁহাকে আল্‌কিমিয়া রচয়িতাগণের অন্যতম বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন এবং এই শাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থে তাঁহার উদ্ধৃতিও রহিয়াছে, এমনকি আবূ বাক্‌র আর-রাযীর "সির্‌রুল আস্‌রার"- এও তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে।

অনেক লেখকের মতে বড় দুইটি পিরামিডের একটি হারমেসের ও অপরটি আগাথোডিমনের কবর (তু. হারাম)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Manetho, ed. Waddell, 1940; (২) D. Chwolsohn, Die Ssabier, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৩) ঐ লেখক, Ueber die Ueberreste der altbabylonischen Literatur, 1859; (৪) J. Hammer, Ancient alphabets and hieroglyphic characters, 1806; (৫) A. v. Gutschmid, Die nabataische Landwirtschaft, Kleine schriften, ii, 1890; (৬) P. Kraus, Jabir b. Hayyan, ii, 1942, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৭) Ps.-Madjriti, গায়াতুল হাকীম (Ritter), 327, 406; (৮) শাহ্‌রাস্‌তানী, পৃ. ২৪১; (৯) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৫৩, তু. J. W. Fuck, Ambix, 1951, 92; (১০) J. Ruska, Tabula Smaragdina, 1926, নির্ঘণ্ট দ্র.; (১১) ঐ লেখক, Turba Philosophorum, 1931, নির্ঘণ্ট দ্র.; (১২) ঐ লেখক, Al-Razi's Buch Geheimnis der Geheimnisse, 1937, 21; (১৩) M. Plessner, Hermes Trismegistus and Arabic Science, Studia Islamica, ii, 1954, 45 প.।

M. Plessner (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আগাজ (দ্র. আগাচ)

আগাদির ইগির ঃ আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলে "সূস" সমভূমির সহিত মরোক্কীর "হাই এটল্যাস"-এর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মরোক্কীয় শহর। শহরটি ৮০০ হইতে ৯০০ ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের পাদদেশে এক বিশাল উপসাগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপর একটি কিল্লা রহিয়াছে।। লোকসংখ্যা (১৯৫২ সালের আদমশুমারী অনুসারে) ৩০,১১১; তন্মধ্যে ১৫১৮ জন ইয়াহূদী ও ৬০৬২ জন ইউরোপীয়। ১৯৭১ সনের আদমশুমারী অনুসারে লোকসংখ্যা ১৬,১৯২ (Statesman Year Book, 1983-84)।

যদিও ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে পর্তুগালের Emmanuel I-এর নিকট মাসা (Massa)-র অধিবাসীদের লিখিত একটি পত্রে সেই স্থানে আগাদীর আল-আরবা'আ-র অবস্থিতির উল্লেখ রহিয়াছে, তথাপি পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বে সেইখানে কোন বসতি ছিল কিনা এই সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না (Sources inedites de l' Histoire du Maroc, Portugal, i, 243)। উক্ত পত্র হইতে এই ধারণা পাওয়া যায়, সেইখানে একটি আগাদির (আফ্রিকার বার্‌বার্‌দের কোন সুরক্ষিত স্থান) ছিল যাহার নিকট প্রতি বুধবার একটি ভ্রাম্যমাণ বাজার বসিত। অবশ্য কোনক্রমেই উহা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। Leo Africanus একই বসতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন Gartguessem নামে (Cape Ksima শহরের চারিদিকে বসবাসরত একটি বার্‌বার গোত্রের নামানুসারে এই নামকরণ করা হইয়াছে)।

১৫০৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে Joao Lopes de Sequeira নামক এক পর্তুগীজ আমীর এই স্থানে একটি কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করেন সম্ভবত একটি মৎস্য-শিকারী নৌবহর রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহার রাজার অনুমোদনক্রমে ক্যানারী দ্বীপস্থ স্পেনীয়দের মরক্কোর দক্ষিণ উপকূল সংক্রান্ত সম্ভাব্য দূরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিবার উদ্দেশে। প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঝর্ণার নিকটে। উক্ত পাহাড় হইতে নিকটস্থ পোতাশ্রয়টি নিয়ন্ত্রণ করা যাইত। এখন এই স্থানটির নাম ফুন্টি (Funti), যদিও ঘির (Ghir) অন্তরীপের সহিত উহার আপেক্ষিক নৈকট্যের সুবাদে ইহার সরকারী নাম ছিল Santa Cruz el Cabo de Aguar. ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী পর্তুগালের রাজা এই প্রাসাদটি ক্রয় করেন।

Santa Cruz-এ পর্তুগীজদের অবস্থানের ফলে "সূস" সমভূমির বার্‌বার্ (Berber) গোত্রসমূহের মধ্যে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যে জাযূলিয়্যা দরবেশশ্রেণী প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সূস সমভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রেণীর সদস্যরা বার্‌বার্‌দের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে জিহাদের পক্ষে ব্যবহার করেন। এই জাযূলিয়্যাপন্থীদের কয়েকজন সদস্য সা'দী (বানূ সা'দ) এলাকা হইতে আগত একটি শুরাফা' পরিবার। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে এই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি মুহাম্মাদকে (পরবর্তী কালে যাহাকে আল-ক'াইম বিআম্‌রিল্লাহ উপাধি দেওয়া হয়) জিহাদের নেতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

এই সময় হইতে পর্তুগীজ দুর্গটি সবিরাম ও ক্লান্তিকর সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ ও আক্রমণের সম্মুখীন হয়। সা'দী বংশের ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির সংগে সংগে এই আক্রমণের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সূস-এর সা'দী বংশোদ্ভূত বাদশাহ আল-ক'াইম-এর পুত্র মুহাম্মাদ আশ-শায়খ সান্তাক্রুজের উপরে অবস্থিত পাহাড়টি দখল করেন এবং সেইখানে একটি শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করেন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে অবরোধ শুরু হয় এবং গভর্নর D. Guttere de Monroy ও অবশিষ্ট সৈন্যদের আত্মসমর্পণের ফলে ১২ মার্চ অবরোধ শেষ হয়। এই সব ঘটনার খুব বিস্তৃত ও জীবন্ত একটি বিবরণ পাওয়া যাইবে Chronique de Santa Cruz নামক একখানি গ্রন্থে, যাহার রচয়িতা ছিলেন একজন বন্দী যিনি তারূদান্ত (Tarudant) ও অন্যান্য স্থানে পাঁচ বৎসর বন্দী জীবন যাপন করিবার পর স্বীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

বহু বৎসর পর্যন্ত Santa Cruz আগাদির পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল যে পর্যন্ত না সা'দী সুলতান আবদুল্লাহ আল-গ'ালিব বিল্লাহ (১৫৫৭-৭৪) খৃষ্টান নৌবাহিনীর হাত হইতে এই ঘাঁটি রক্ষা করিবার জন্য আগাদির পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহার পর হইতে আগাদির ছিল ইউরোপীয় বণিকদের নিয়মিত যাতায়াতের স্থান, প্রধানত চিনি বোঝাই করিয়া নেওয়ার উদ্দেশে (বিশেষভাবে দেখুন Sources inedites de l' Histoire du Maroc, Iere serie, France, iii, 361)। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম মোগাদর (Mogador)-এর পত্তন হওয়া পর্যন্ত আগাদির বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে ইহার ভূমিকা অব্যাহত রাখে। তখন হইতে আগাদির পোতাশ্রয়টি খুব কমই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই বসতিটি ক্ষণস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করে যখন জেনারেল Moinier-এর সেনাবাহিনী ফেয অধিকার (১ জুলাই, ১৯১১) করিবার অব্যবহিত পরেই জার্মান দাবি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জার্মান গানবোট "প্যানথার" তথাকার উপকূলে নোঙ্গর করে। প্রটেকটরেট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আগাদির ফরাসী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তখন ইহার জনসংখ্যা ছিল এক হাজারের কম।

তখন হইতে এই শহরটি বিপুল উন্নতি লাভ করে। ইহা সাত লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত মরক্কোর একটি প্রশাসনিক অঞ্চলের প্রধান শহরে পরিণত হইয়াছে। ইহার উন্নতির মূলে রহিয়াছে প্রধানত ইহার কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং খনিজ সম্পদের আহরণ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত আগাদির বন্দরটির আয়তন পরবর্তী কালে বর্ধিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Leo Africanus, Description de l'Afrique (Sehefer), i, 176 (Guarguessem); (২) Chronique de Santa Cruz du Cap de Gue (Agadir), সম্পা. ও অনু. P. de Cenival, Paris 1934; (৩) Marmol, L' Afrique, অনু. Perrot d'Ablancour, Paris 1667, ii, 34-9; (৪) J. Figanier, Historia de Santa Cruz de Cabo de Gue (Agadir), 1505-1541, Lisbon 1945 (তু. Hesp., 1946, 93 ff.); এই গ্রন্থসমূহ

প্রধানত পর্তুগীজ আমল সম্পর্কীয়; (৫) H. de Castries, Une description du Maroc sous le-regne de Moulay Ahmed el-Mansoor (1596), Paris 1909, 110; (৬) Ch. de Foucauld, Reconnaissace an maroc, new edition, Paris 1934, 184-5; (৭) J. Erekmann, Le Maroc moderne, Paris 1885, 50-1 (মানচিত্রসহ map); (৮) Castellanos, Historia de Marruecos, Tangier 1898, 203-17; (৯) Budge Meakin, The Land of the Moors, London 1901, 378-82; (১০) H. Hauser, Histoire diplomatique de I'Europe (1871-1914), Paris 1929, vol. ii, 6th Part, ch. iii : P. Renouvin, La crise d'Agadir; (১১) P. Gruffaz, La port d'Agadir, in Bull,. Ec. et Soc. du Maroc, 1951, 297-301; (১২) G. Guide, Agadir in Les Cahiers d'Outremer, 1952.

R. Le Tourneau (E. I.2) / পারসা বেগম

আগাদীর (اغادير) ঃ বার্বারদের মধ্যে সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের অন্যতম নাম, যেখানে গোত্রের বিভিন্ন পরিবারকে শস্য গুদামজাতকরণের জন্য গৃহ বরাদ্ধ করা হয় এবং যেখানে বিপদের সময় গোত্রের লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহে এই প্রাচীন বারবার আগাদীর প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি টিকিয়া আছে ঃ জাবাল নাফূসা (গাস্র (geloa =কাস্র অথবা temidelt নামে) ; দক্ষিণ তিউনিসিয়া (গুরফা) আওরাস =কালআ (দুর্গ), মরক্কোর রীফ ও বিশেষত বৃহৎ, মধ্য ও এন্টি আটলাস ও সিরওয়া (Shluh শুলুহদের মধ্যে আগাদীর ও মধ্যআটলাসের বারবারদের মধ্যে (igherm) আগাদীর শব্দটি সম্ভবত ফিনিসীয় গাদির=হিব্রু গাদের (Gader) "প্রাচীর" হইতে উৎপন্ন (শব্দটি সূস ভাষায় "দৃঢ় প্রাচীর" অর্থ বহন করে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Montagne, Un Magasin Collectif de I' Anti-Atlas : L'Agadir des Ikounka, Hesp., ১৯২৯; (২) ঐ লেখক, Les Berberes et le Makhzen dans le Sud du Maroc, প্যারিস ১৯৩০, ২৫৩ প.; (৩) ঐ লেখক, Villages et Kasbas Berberes, প্যারিস, ১৯৩০, ৯ প. ; (৪) Dj. Jacques-Meunie, Greniers Collectifs, Hesp., ১৯৪৯, ৯৭ প. ; (৫) ঐ লেখক, Greniers-Citadelles au Maroc, প্যারিস ১৯৫১।

(E. I.2) / মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আল আগানী (দ্র. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী)

আগা বাকের খান (آغا باقر خان) ঃ (দ্র. H. Beveridge, District of Bakarganj..., London 1876, p. 39, foot note), নওয়াব 'আলীবর্দী খানের আমলে (১৭৪০-৫৬) বুযুর্গ উম্মিদপুর পরগনার তিনি একজন অতি খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। বাকের খান ১৭৪১ হইতে ১৭৫৩ খৃ. পর্যন্ত বাকেরগঞ্জের প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশাসক (de facto ruler) ছিলেন। ১৭৫১ খৃ. নওয়াবের পক্ষে তিনি এক বিদ্রোহ দমন করেন এবং বুযুর্গ উম্মিদপুর নামক পরগনা দখল করিয়া নিজের জমিদারীভুক্ত করিয়া লন। পরে পার্শ্ববর্তী সালীমাবাদ পরগনারও অধিকাংশ (সাড়ে এগার আনা) তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সময়ে নওয়াব দরবারে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহাকে চট্টগ্রামের গভর্নর বা নায়েব ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করা হয় (Bangladesh District Gazetteers, Bakerganj)। অবশ্য তিনি ত্রিপুরার বিদ্রোহী জমিদার শাম্‌শীর গাযীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, চট্টগ্রামের প্রশাসক নিযুক্ত হইলেও তিনি ঢাকায় বসিয়া চট্টগ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আগা সাদিক (آغا صادق) তাঁহার পক্ষে চট্টগ্রামে কার্যনির্বাহ করিতেন। সম্ভবত পুরাতন ঢাকার কোথায়ও তাঁহার নিবাস ছিল। ঢাকার আগা সাদিক রোড আজও তাঁহার বাসভূমির স্মৃতি বহন করিতেছে। যতদূর জানা যায়, ১৭৫৩ খৃ. এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। অল্পদিন পর তাঁহার পুত্র আগা সাদিকও আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

অতঃপর উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জমিদারী সরকারে বাজেয়াফত্ হয় (১৭৬০ খৃ.)। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া যায়, এই জমিদারীর সিংহভাগ ঢাকার রাজা রাজবল্লভের হস্তগত হয়। নওয়াব মীর জা'ফরের কল্যাণে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা বিরোধী বিদ্রোহী জমিদারগণ বাকী অংশ লাভ করে।

বাকেরগঞ্জের ইতিহাস লেখক Beveridge-এর বরাত দিয়া জেলা বাকেরগঞ্জের Bakerganj গেজেটিয়ার সংকলক J. A. Jack, I. C. S. (1918)-এর মতে বাকেরগঞ্জ জেলার এই কীর্তিমান পুরুষ ১৭৪৩ হইতে ১৭৫৩ খৃ. পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এই প্রতাপের মূলে শুধু শক্তি-সাহস নহে, অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কূটবুদ্ধিও সক্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, হিন্দু জমিদারদের নিকট হইতে তিনি ছলে-বলে-কৌশলে বুযুর্গ উম্মিমদপুর ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার শৌর্য-বীর্য ও প্রজ্ঞাগুণে সেই সকল জমিদারের শ্রদ্ধা-ভক্তিও তিনি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজবংশের সংগে আরাকান রাজবংশের বিবাদ চলাকালে সহায়তা দানের বদলে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের নিকট হইতে এক হাজার সামরিক নৌযান সাহায্য লাভ করেন যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার রণশক্তিকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আগেই বলা হইয়াছে, আগা বাকের খান বাকেরগঞ্জ বা বাকরগঞ্জ জেলার অধিপতি ছিলেন। এই বাকেরগঞ্জের মূলে ছিল বুযুর্গ উম্মিদপুর পরগনা। পূর্বতন নওয়াব বুযুর্গ উম্মিদ খানের নামে এই পরগনার সৃষ্টি হয়। বুযুর্গ উম্মিদপুর নামটি বাকেরগঞ্জ নাম হইতে প্রাচীনতর (পৃ. গ্র., পৃ. ৮৬)। ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের পতনের সময়ে বুযুর্গ উম্মিদপুর পরগনার সৃষ্টি শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ইহার নামকরণের ব্যাপারে জানা যায়, পূর্বতন নওয়াব বুযুর্গ উম্মিদ খান ছিলেন

প্রথম চট্টগ্রাম বিজয়ী সেনাপতি। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে চট্টগ্রামের প্রথম নায়েব ফৌজদার করা হয় (১৬৬৬-৮৮ খৃ.)। পরে তিনি নওয়াব হন। আলোচ্য বাকের খানও বুযুর্গ উম্মিদপুরের জমিদার হইতে নায়েব ফৌজদার হন (১৭৫০-১৭৫৪)। পরবর্তী কালে বাকেরগঞ্জ বা বাকরগঞ্জ জেলা তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. C. Jack, I. C. S., Bengal District Gazetteers : Bakerganj, Calcutta 1918; (২) Bangladesh Dist. Gazetteers, Bakerganj, Dhaka 1980, repr. Barisal 1470; (৩) Bengal District Gazetteers, Chittagong 1970, p. 87; (৪) সিরাজুদ্দীন আহমেদ, আগা বাকের, খুলনা ১৯৮০ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, বরিশালের ইতিহাস, সাপ্তাহিক দেশবাণী, ঢাকা ১৯৭৭-৭৮ ও বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা, ১৯৭৮-৭৯ (ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

মুহাম্মদ আবূ তালিব

আগা মুহাম্মাদ শাহ (آغا محمد شاه) ঃ পারস্যের কাজার (দ্র.) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১৫৫/১৭৪২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী কাজার গোত্রের নেতা মুহাম্মাদ হাসান খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে নাদির শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র 'আদিল শাহের আদেশে তাঁহাকে খোজা করা হয়। ইহার ফলে পরবর্তী জীবনে তাঁহার চরিত্রে বিকৃতি দেখা দেয়। ১৭৫৮ সালে তাঁহার পিতা নিহত হওয়ার পর তিনি কাজারদের প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার যৌবন অতিবাহিত হয় শীরায-এর কারীম খানের দরবারে। ১৭৭৯ সালে কারীম খানের মৃত্যুতে তিনি আস্তারাবাদ-এ পলায়ন করেন এবং তাঁহার বংশধরদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন। ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যের উত্তর ও মধ্যভাগের অধিকারী হন এবং ঐ বৎসর তিনি তেহরানকে তাঁহার রাজধানীতে পরিণত করেন। কারণ ইহা ছিল কেন্দ্রস্থলে এবং কাজার এলাকার নিকটে অবস্থিত। ১৭৯৪ সালে তিনি কারীম খানের শেষ বংশধর বীর লুত্ফ 'আলী খানকে বন্দী করেন এবং ভয়াবহ অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরবর্তী বৎসর তিনি জর্জিয়াতে পারস্যের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৬ সালে তিনি শাহ উপাধি গ্রহণ ও মুকুট পরিধান করেন। পরবর্তী কালে তিনি নাদির শাহের অন্ধ পৌত্র শাহরুখকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া খুরাসানকে তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন। অত্যাচারের মাধ্যমে তিনি শাহরুখকে তাঁহার পিতামহের সঞ্চিত মনিরত্নের গুপ্তস্থানের কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য করেন। এই অত্যাচারের ফলে হতভাগ্য যুবরাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আগা মুহাম্মাদের উপর নিয়তির প্রতিশোধ খুব শীঘ্রই নামিয়া আসে। ১৭৯৭ সালে তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন। একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সামরিক নেতা হিসাবে তিনি বিপুল দক্ষতার পরিচয় দেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিশোধপরায়ণতা, বীভৎস নিষ্ঠুরতা ও অতৃপ্ত লোভ তাঁহার খ্যাতিকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুর রায্যাক ইব্ন নাজাফ কুলী, মাআছির-ই সুলতানিয়্যা, তাবরীয ১৮২৬ (অনু. Sir Harford Jones Brydges, The Dynasty of the Kajars, London 1833); (২) রিদা কু'লী খান হিদায়াত, রাওদাতুস্ সাফা-ই নাসিরী, ix; (৩) Sir J. Malcolm, History of Persia, ii, 300-302; (৪) R. G. Watson, A History of Persia from the Beginning of the Nineteenth Century to the Year 1858, London 1866, 65-105; (৫) P. M. Sykes, History of Persia, ii, 289-96.

Cl. Huart-L. Lockhart (E.I.[2]) /পারসা বেগম

আল-আগার (الأغر) ঃ আল-গিফারী (রা) একজন সাহাবী। আহমাদ ও নাসাঈ আল-আগার হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আল-আগার বলেন, "আমি নবী কারীম (স)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি সূরা রূম তিলাওয়াত করিয়াছিলেন।" আবূ নু'আয়ম এই আল-আগার ও আল-আগার আল-মুযানীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপরপক্ষে আল-বাগাবীর মতে আল-আগার আল-গিফারী ভিন্ন ব্যক্তি এবং উক্ত হাদীছটি তাঁহার দ্বারা বর্ণিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ৫৬; (২) ইবনুল আছীর-উস্দুল গাবা, ১খ., পৃ. ১০৪।

অ. ফ. ম. আমিনুল হক

আল-আগার ইব্ন ইয়াসার (الأغر بن يسار) ঃ আল-মুযানী (রা) একজন সাহাবী, মুযায়না গোত্রসম্ভূত। তাঁহার বংশ-তালিকা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায় (দ্র. উস্দু'ল-গাবা, ১খ., ১০৪)। তাঁহার বর্ণিত মাত্র তিনটি হাদীছের কথা জানা যায়। মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও আহমাদ তাঁহাদের হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছগুলি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটি ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "হে মানব! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, আমি দিবা-রাত্রে এক শতবার আল্লাহ্র নিকট তওবা করি"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ১খ., ৫৫-৫৬; (২) ইব্নুল আছীর, উসদুল গাবা, ১খ., ১০৪-৫।

আ. ফ. ম. আমিনুল হক

আগা হাশার কাশ্মীরী (آغا حشر كشميرى) ঃ (১৮৭৯-১৯৩৫) সুপরিচিত উর্দূ নাট্যকার। তাঁহার প্রকৃত নাম আগা মুহাম্মাদ শাহ এবং হাশার ছিল তাঁহার তাখাল্লুস্ বা কবিনাম। অন্যদিকে তাঁহার সম্বন্ধবাচক নাম (নিস্বা) তাঁহার পিতার আদি বাসস্থানের ইঙ্গিতবহ। তাঁহার পিতা কাশ্মীর হইতে আগমন করেন এবং বেনারসে একজন ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। আগা হাশার এখানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭ খৃ. বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া বোম্বাই যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। একদিকে তাঁহাকে প্রদত্ত অর্থের অপব্যবহারের জন্য তিনি তাঁহার পিতার ক্রোধের ভয়ে ভীত ছিলেন, অন্যদিকে বোম্বাইয়ে তখন বিকাশমান উর্দূ নাটকের নূতন আংগিকের প্রতি তাঁহার আগ্রহ একটি থিয়েটার কোম্পানীর বেনারস আগমনের ফলে আরও তীব্রতা লাভ করিয়াছিল। বোম্বাইয়ে তিনি বিভিন্ন কোম্পানীর জন্য নাটক রচনার কাজ করেন এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে, যেমন হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজে নাটক রচনার কাজ করেন। এইভাবে তিনি ত্রিশটিরও বেশী

নাটক রচনা করেন, ইহাদের অনেক কয়টি চরম সাফল্য লাভ করে এবং তাঁহাকে পরম খ্যাতি দান করে। এইগুলির মাধ্যমে তিনি বেশ কিছু অর্থও অর্জন করেন, কিন্তু তাহা তিনি অল্প দিনেই অপচয় করিয়া ফেলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পে কাজ করেন। তিনি লাহোরে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

তিনি যখন নাট্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাহার পূর্বেই উর্দূ নাটকের আংগিকের প্রধান ধারাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। আগা হাশার তাহার পেশাগত দক্ষতা ও ভাষার উপর ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা ইহাকে উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে উন্নীত করেন। ১৯৩৯-৪৫-এর দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত নাটকের এই রূপই অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রচলিত থাকে। এই রূপ বা আংগিকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল এইরূপ ঃ কবিতা ও ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ব্যবহার, যাহা প্রায়ই আলংকারিক ও দীর্ঘ আড়ম্বরযুক্ত ভাষায় পূর্ণ এবং মিলনান্তক ও সামাজিক নাটকেই শুধু গদ্যের ব্যবহার সীমিত ছিল, প্রধান আখ্যানের পাশাপাশি উপ-আখ্যানের অগ্রগতি সাধন, যেমন শেক্সপীয়ারের নাটকে ও ঐতিহাসিক অথবা বীরত্বব্যঞ্জক বিষয়বস্তু, যেইগুলির ভিত্তি ইসলামী ও ভারতীয় কাহিনী অথবা শেক্সপীয়ার ও অন্য ইংরেজ নাট্যকারদের নাটকের কাহিনী, তাঁহাদের নাটকের গল্পসমূহ তিনি স্থান ও চরিত্রের পরিবর্তন করত মুক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সামাজিক বিষয়বস্তু লইয়াও তিনি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার নাটকের মঞ্চে দাংগা-হাংগামা ও মৃত্যুর দৃশ্য সাধারণ ব্যাপার, যেমন সোহরাব ও রুস্তম (১৯২৯, লাহোরে প্রকাশিত ১৯৫৯)। তবুও শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডীসমূহের ভিত্তিতে লিখিত নাটকসমূহে হয়তবা মিলনাত্মক সমাপ্তি দেওয়া যাইতে পারিত, যেমন King Lear-এর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত সাফেদ খুন (১৯০৭/ লাহোরে প্রকাশিত ১৯৫৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাথমিক যুগের উর্দূ নাটকের বিবরণের জন্য দেখুন (১) মুহাম্মাদ সাদিক, History of Urdu Literature, London 1964, 393-9; (২) রামবাবু সাক্সেনা, History of Urdu Literature, Allahabad 1927, 346-67; (৩) J. A. Haywood, Urdu drama-origins and early development, in Iran and Islam-in memory of Vladimir Minorsky, ed. C. E. Bosworth, Edinburgh 1971, 293-302.

আগা হাশার ও তাঁহার নাট্যকৌশল সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যাইবে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে ঃ (৪) ওয়াক্কার আজীম, আগা হাশার আওর উনকে ড্রামে, লাহোর ১৯৫৬; (৫) ঐ লেখক, উর্দূ ড্রামা-তারীখ ওয়া তানকীদ, লাহোর ১৯৫৭। তাঁহার মূল নাটকের জন্য, লাহোরের উর্দূ মারকায কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার নাটকসমূহ পাঠের জন্য সুপারিশ করা যাইতেছে। অন্যান্য ও পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহের ভিত্তি হইতেছে শুধু অভিনেতাদের সরবরাহকৃত তথ্য; অনেক কয়টি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অনুমোদন ছাড়াই। এইগুলি আগা হাশারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে অনেকাংশে পৃথক ধরনের। তাঁহার অনেক পাণ্ডুলিপি এখনও রামপুরের নাওয়াবের গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। উর্দূ মারকায কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার নাটকের তালিকায় মূল নিবন্ধে উল্লিখিত দুইখানি ছাড়াও নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ সেক্সপীয়ারের King John-এর ভিত্তিতে লিখিত স'য়দ-ই হাওস (১৯৫৪); Sheridan-এর Pizarro-এর ভিত্তিতে লিখিত আসীর-ই হি'র্স (১৯৫৪); খূবসুরাত বালা (১৯৫৪) ও পাহেলা পিয়ার অথবা বালওয়া মাংগাল (১৯৫৫)।

J. A. Haywood (E.I.[2] Suppl.) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আগাহী (آگهى) ঃ মুহাম্মাদ রিদা মীরাব ইব্‌ন-এর (Er) নিয়ায বেক-এর কবি-নাম। খীবা (Khiva)-এর একজন ইতিহাসবেত্তা, কবি ও অনুবাদক। খাওয়ারিযমের অন্তর্গত খীবা-র নিকটবর্তী, কিয়াত শহরে ১০ যু'লকা'দা, ১২২৪/১৭ ডিসেম্বর, ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি যুয (Yuz)-এর উযবেক গোত্রভুক্ত একটি অভিজাত পরিবারের লোক ছিলেন, যেই পরিবারের সদস্যরা বংশানুক্রমিকভাবে 'মীরাব' ছিলেন (খীবার খান শাসিত রাজ্য 'মীরাব' পদবীধারী চারিজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা থাকিতেন, যাঁহারা খানের পরিষদের সদস্য হইতেন, যাহা ৩৪ জন 'আমালদার লইয়া গঠিত ছিল)। তাঁহার চাচা শীর মুহাম্মাদ 'মীরাব' একজন কবি, অনুবাদক ও ইতিহাসবিদ ছিলেন, যাঁহার কবি নাম ছিল মুনিস (দ্র.)। আগাহী একটি মাদ্রাসাতে, বিশেষ করিয়া তাঁহার চাচার নিকট শিক্ষা লাভ করেন, যাঁহাকে তিনি বারবার তাঁহার উস্তাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১২৪৪/১৮২৯ সালে মুনিসের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার চাচার পদবী ও দায়িত্ব লাভ করেন (আগাহী, রিয়াদু'দ-দাওলা, Msa. of the Leningrad Branch of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the USSR, E-6, f. 334 a)। একজন মীরাব হিসাবে তিনি দেশের সেচ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিতেন (তাঁহার ঐতিহাসিক রচনাবলীতে সেচ সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়)। কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মতই তিনি সচরাচর খীবার খান শাসকদের সামরিক অভিযানসমূহে তাঁহাদের সহগামী হইতেন। ১২৫৫/১৮৩৯ সালে আল্লাহ কু'লী খান তাঁহাকে মুনিস কর্তৃক লিখিত খীবার খান রাজ্যের ইতিহাস 'ফিরদাওসুল-ইক'বাল' সমাপ্ত করিবার নির্দেশ দেন। এই ইতিহাস গ্রন্থটি মুনিসের মৃত্যুর ফলে অসমাপ্ত রহিয়াছিল (দ্র. ফিরদাওসুল-ইক'বাল, Institute of Oriental Studies-এর লেনিনগ্রাদ শাখার পাণ্ডুলিপি C. ৫৭১, f. ৪৪৫ a-b)। আগাহী ১২৪০/১৮২৫ সালে মুহাম্মাদ রাহীম খানের মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিখিয়া এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন এবং আল্লাহ কু'লী খান ও তাঁহার উত্তরসুরিদের পৃথক ইতিহাস রচনার কাজে অগ্রসর হন। এইভাবে তিনি খান রাজ্য খীবার প্রায় সরকারী ইতিহাস লেখকে পরিণত হন (এখান রাজ্যে এই রকম কোন নিয়মিত পদের অস্তিত্ব ছিল না)। ১২৬৮/১৮৫১ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি মীরাবের পদে ইস্তফা দেন (দ্র. তাঁহার জামিউল-ওয়াকি' 'আত-ই সুলতানী, Institute of Oriental Studies-এর লেনিনগ্রাদ শাখার পাণ্ডুলিপি, E.-৬, f. ৪৮৮ a-b) ও রুশদের খীবা দখলের স্বল্পকাল পরে, ১২৯১/১৮৭৪ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত সময়ে সাহিত্য কর্মেই নিয়োজিত থাকেন (দ্র.

মুহাম্মাদ ইয়ুসুফ বেক বায়ানী, শাজারা-ই খাওয়ারিযম শাহী, Institute of Oriental Studies-এর তাশখন্দ শাখার পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৯৫৯৬, পত্রী 8b)।

চাগাতায় ভাষায় তাঁহার সাহিত্য কর্মের পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য। মুনিসের অসমাপ্ত ফিরদাওসুল ইকবালের রচনা কাজ চালাইয়া যাওয়া ছাড়াও তিনি ১২৮৯/১৮৭২ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এক এক করিয়া আরও পাঁচটি ইতহাস গ্রন্থ রচনা করেন ঃ (১) রিয়াদু দ-দাওলা, আল্লাহ-কু'লী খানের সময়ে (১২৪০-৫৮/১৮২৫-৪২) ও রাহীমবুনী খানের রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের (১২৫৯/১৮৪৩-৪৪) ইতিহাস; (২) যুবদাতুত্-তাওয়ারীখ, রাহীম কুলী খান (১২৫৮-৬২/১৮৪৩-৪৬)-এর ইতিহাস; (৩) জামিউল ওয়াকি' 'আত-ই সুলতানী, মুহাম্মাদ আমীন খান (১২৬২-৭১/ ১৮৪৬-৫৫), 'আবদুল্লাহ খান (১২৭১/১৮৫৫) ও কুত্লুগ মুরাদ খান (১২৭১-৭২/ ১৮৫৫-৫৬) এই তিনজন শাসকের ইতিহাস; (৪) গুলশান-ই দাওলাত, সায়্যিদ মুহাম্মাদ খান (১২৭২-৮১/১৮৫৬-৬৪)-এর ইতিহাস ও (৫) শাহিদ-ই ইক'বাল, ২য় সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাহীম খানের রাজত্বকালের প্রথম আট বৎসরের (১২৮১-৯/১৮৬৪-৭২) ইতিহাস। এই রচনাবলীর মধ্যে ফিরদাওসুল ইক'বাল ও রিয়াদু্-দাওলার বৃহত্তর অংশ ছাড়া বাকী সমস্তই সমসাময়িক কালের ঘটনাপঞ্জী। এই ঘটনাপঞ্জী বর্ণানুক্রমিকভবে বিন্যস্ত এবং সেইগুলি প্রধান প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত, যাহাতে সংশ্লিষ্ট খানদের শাসন আমলের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। আগাহীর বিবরণ তাঁহার নিজের পর্যবেক্ষণ, অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী দলীলপত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতীতে মধ্যএশিয়ার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আগাহীর ইতিহাস গ্রন্থাবলী ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনায় ও তথ্যের প্রাচুর্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (Barthold)। তা'বীযুল 'আশিক'ীন নামে তাঁহার তুর্কী দীওয়ান-এ প্রধানত গাযাল, কতক কাসীদা, মাছনাবী, মুখাম্‌মাস প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ফারসী ভাষায়ও তিনি কিছু কবিতা লিখিয়াছেন যাহার অধিকাংশই গাযাল।

আগাহী প্রচুর পরিমাণে অনুবাদ কর্মও করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি মীর খাওয়ান্দ (দ্র.) বিরচিত রাওদ'াতুস্ স'াফা-র মুনিস কর্তৃক আরদ্ধ চাগাতায় ভাষায় অনুবাদকার্য চালাইয়া যান (আগাহী ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ, তৃতীয় খণ্ড এবং সম্ভবত সপ্তম খণ্ড অনুবাদ করেন) এবং পরবর্তী কালে বেশ কিছু ফারসী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, যেমন মুহাম্মাদ মাহ্দী খানকৃত তারীখ জাহান গুশা-ই নাদিরী, একই গ্রন্থকারের দুররা-ই নাদিরী; রিদা-কু'লী খানকৃত রাওদ'াতুস্-স'াফা-ই নাসিরীর তৃতীয় খণ্ড; সাদী-র রচিত গুলিস্তান; জামী রচিত ইয়ুসুফ ওয়া-যুলায়খা; নিজামী রচিত হাফ্ত পায়কার (ইহা একখানি গদ্য অনুবাদ), হিলালী রচিত শাহ ওয়াগাদা; মুহাম্মাদ ওয়ারিছ' লিখিত যুবদাতুল-হিক'ায়াত্ কাবুস-নামাহ্, হুসায়ন কাশিফী রচিত আখলাক'-ই মুহ'সিনী ও মাহ'মূদ গিঝদুওয়ানীর লেখা মিফ্তাহুত-তালিবীন (তু. Storey, i/2, 973)। উল্লিখিত সমুদয় অনুবাদ কর্মসমূহের পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। তাঁহার দীওয়ানের ভূমিকায় তিনি তাঁহার আরও কয়েকটি অনুবাদ কর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অবশ্য এইগুলির পাণ্ডুলিপি এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, যেমন জাফার-নামাহ (বাহ্যত ইহার রচনাকারী শারাফুদ্দীন ইয়াযদী); জামী রচিত সালামান ওয়া আবসাল; জামীর আরও একটি গ্রন্থ বাহারিস্তান; ওয়াসিফী (তাঁহার স্মৃতিকথা) (Storey-Bregel, 1123-26); তায্‌কিরা-ই মুকীম-খানী; তাবাকাত-ই আকবারশাহী; আমীর খুসরাও-এর হাশ্ত বিহিশ্ত এবং এই সমস্ত ছাড়াও দালাইলুল খায়রাত-এর একখানি শার্হ তিনি 'উছমানী তুর্কী ভাষা হইতে অনুবাদ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. V. Bartiol'd Istoriya Kulturnoy zhizni Turkestana (1927), in Socineniya, ii/I, 285-86; (২) P. P. Ivanov, in Materiali po istorii turkmen i Turkmenii, ii, Moscow-Leningrad 1938, 23-27; (৩) K. Munirov, আগাহী (উযবেক ভাষায়), তাসখন্দ ১৯৫৯; (৪) ঐ লেখক, Munis, Agahi wa Bayanining tarikhi athaslari (in Uzbek), Tashkent 1961; (৫) R. Madjidi, Agahi, lirikasi (in Uzbek), Tashkent 1963; (৬) J. Eckmann, in Philologiac turcicae fundamenta, ii, 389-90; (৭) H. F. Hofman, Turkish Literature, section iii, Utrecht 1969, i/2, 48-52 (অতিরিক্ত সূত্রাবলীসহ)। তাঁহার মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে উল্লিখিত সূত্রাবলী ব্যতীত দেখুন ঃ (৮) L. V. Dmitriyeva et alii, Opisaniye tyurkskikh rukopisey Instituta narodov Azii, i, Moscow 1965, 106-18 (Nos. 97,98, 100-102, 105-107, 110); (৯) Sobraniye vostocnikh rukopisey Akademii nauk Uzbekskoy SSR, Tashkent, i, 83-84, vii, 33-37; (১০) ইসতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের Ty 82 পাণ্ডুলিপিতে (সোভিয়েট রাশিয়ার বাহিরে একমাত্র জ্ঞাত পাণ্ডুলিপি) অন্তর্ভুক্ত আছে ফিরদাওসুল-ইক'বাল, রিয়াদু'দ-দাওলা ও যুবদাতুত্-তাওয়ারীখ। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর অংশবিশেষের রুশ অনুবাদ (১১) V. V. Bartol'd (1910), in Socineniva, ii/2, 400-13 (শাহিদ-ই ইকবাল হইতে সংক্ষিপ্ত সার অনুবাদ); (১২) Materiali po istorii karakalpakov, Moscow-Leningrad 1935, 125-43; (১৩) Materiali poistorii turkmeni Turkmenii, ii, Moscow-Leningrad 1938, 384-638; (১৪) দীওয়ান-এর পাণ্ডুলিপি দ্র. Sobraniye vostocnikh rukopisey Akademii nauk Uzbekskoy SSR, vii, 128-9; (১৫) বিবিধ কবিতাবলী ঃ দ্র. ঐ, ২খ., ৩৮৫, ৫খ., ১২৫, ৭খ., নির্ঘণ্ট। লিথো মুদ্রণে দীওয়ান প্রকাশিত হয়। খীবায় ১৩০০/১৮৮২ ও ১৩২৩/১৯০৫ সালে ও আধুনিক সিরিলীক প্রতিলিপিতে (Cyrillic transcription) তাশখন্দে (আংশিক সংস্করণ মাত্র) ১৯৬০ খৃ.; (১৬) তাঁহার ফারসী ইতিহাস গ্রন্থসমূহের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দ্র. Storey-Bregel, 374, 375, 479, 910, 913; (১৭) Sobraniye vostocnikh rukopisey Akademii rauk Uzbekskoy SSR, iii, III, v. 107, vii. 48, 68-69, 217-2.

Yu. Bregel (E.I.[2] Suppl.) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আগুয়েদাল (দ্র. আগদাল)

আগেল (দ্র. উকায়ল)

আগেহী (آگهی) ঃ তুর্কী কবি ও ঐতিহাসিক (মৃ. ৯৮৫/১৫৭৭-৮)। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মানসূ'র, তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র য়েনিজে-ই ওয়ার্দার (Yenidje-yi cardar) গ্রীক মেসিডোনিয়ায় (Giannitsa) জন্ম। মুদাররিস ও কাদী হিসাবে তাঁহার কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার সুযোগ পান। তাঁহার জীবনীকারগণ গ্যালিপলি ও ইস্তাম্বুলে তাঁহার ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার কবিতার সংকলন হিসাবে কোন দীওয়ানের অস্তিত্ব নাই, তথাপি আগেহী যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন কবি ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির ভিত্তি বিশেষভাবে একটি কাসীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কাসীদা তাঁহার প্রিয়পাত্র এক তরুণ নাবিকের উদ্দেশে নিবেদিত। তাঁহার সময়কার তুর্কী নাবিকদের পেশাগত কথ্য ভাষায় ইহা রচিত; ইহাতে সাধারণ নৌচালনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ভাষার শব্দ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া রণতরী সংক্রান্ত শব্দাবলী। তাঁহার সময়কার বেশ কয়েকজন কবি এই কাসীদার অনুকরণ করিয়াছেন। Szigetvrar (দেখুন Babinger, ৬৯)-এর বিরুদ্ধে সুলায়মানের অভিযানের বর্ণনা সম্বলিত "তারীখ-ই গাযাত-ই সিগেটওয়ার" তাঁহার রচিত একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহার কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগেহীর জীবন সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান উৎস হইতেছে 'উছমানী কবিদের সংকলিত সমসাময়িক জীবনী সংগ্রহ [আশিক চেলেবি, কিনালী যাদে হাসান চেলেবি, রিয়াদী, আহ্দী, বায়ানী, কাফ যাদে ফায়দী কর্তৃক রচিত তাযকিরা-ই শু'আরা] ও 'আলীর কুন্হুল আখ্বার-এর জীবনীমূলক অংশসমূহ; এই উৎসগুলির কোনটিই মুদ্রিত হয় নাই ; (২) Agehi in Saabeddin Nuzhet Ergun, Turk sairleri, Istanbul 1936, i, 16-8, উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতিসমূহ; এইখানে আগেহীর কিছু কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছে। নাবিকদের কথ্য ভাষায় রচিত কাসীদাটি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে A. Tietze, xvi, asir Turk siirinde gemici dili, Agehi kasidesi ve tahmisleri, Turkiyat Mecmuasi, 1951.113-121-এর মধ্যে (অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জীসহ)।

A. Tietze (E.I.[2]) /পারসা বেগম

আচায় (আচীহ্) (দ্র. আচেহ্)

আচিন (দ্র. আত্জেহ্)

আচির (দ্র. আশীর)

আচেহ্ (দ্র. আতজেহ্)

আছ্ছাজ আল-'আব্দী (أثج العبدى) ঃ (রা) আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসীর মতে আছ্ছাজ আল-আবদী একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবা, ১খ., পৃ. ২১, নং ৩৬।

মুহা. আনওয়ারুল হক খতিবী

আছ্ছার (দ্র. আছ্র)

'আছ্'র (عثر) ঃ বা 'আছ্'ছ'র (عثر) [দুইটি উচ্চারণই ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় উচ্চারণটি সাধারণত পদ্যে ব্যবহৃত হয়, তু. লিসান, তাজ, মূল ধাতুর অধীনে]। (১) তাবালা (দ্র.)-র নিকটবর্তী পাহাড়, যাহা সিংহের আবাস বলিয়া পরিচিত (মাসাদা), যেমন ইতওয়াদ শারা ইত্যাদি (তু. হামদানী, ৫৪, ১২৭, অনু. Forrer, ২২২ ; কা'ব ইব্ন যুহায়র, বানাত সু'আদ, ৪৬; উরওয়া ইব্নুল ওয়ারদ, ২খ., ৬)। (২) উত্তর-পশ্চিম ইয়ামান-এর একটি জেলা যাহা লোহিত সাগরের উপর জাযান (জিযান) ও হামিদা (আল-হামদানী) অথবা শারজা ও হালী (উমারা)-এর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। প্রধান শহরসমূহ আছ্র (পরে দেখুন), বায়শ, জুরায়ব, হালী, সিররায়ন। উপত্যকাসমূহ ঃ আল-আমান, বায়শ, রীম, ইরাম্রাম, যানীফ, আল-আমুদ। যাবীদে বানূ যিয়াদের গভর্নর সুলায়মান ইব্ন তারফ আছ্র, শার্জা, হালী ও যারাইব (=আল-মিখ্লাফ আস-সুলায়মানী)-কে তাঁহার অধীনে একত্র করিয়া আনু. ৩৫০/৯৬০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আবুল জায়শ-এর কর্তৃত্বমুক্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন এবং ৪৫৩/১০৬১ সালে বানূ তার্ফ-এর বিতাড়ন পর্যন্ত দেশটি যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। ইব্ন তারফ-এর বাণিজ্য হইতে অর্জিত বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ 'উমারা উল্লেখ করিয়াছেন ৫০০,০০০ আছ্রী দীনার (=এক মিছ্'কাল-এর ২/৩, ঠিক মক্কায় মুত'াওওয়াক'-এর মত; আল-মাক'দিসী, ৯৯)। মক্কার সুলায়মানী শারীফগণের ক্ষমতা লাভের পর এখানে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং আনু. ৫৬০/১১৬৫ সালে আয়্যূবী ভাড়াটে সেনাবাহিনী গুয্য কর্তৃক ইয়ামান বিজয় পর্যন্ত তাহা চলিতে থাকে।

(৩) জেলা সদরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। ইহা আল-হাজার (=জাযান) ও বায়দ-এর মধ্যবর্তী স্থলে স'ান্'আ হইতে গমনকারি হজ্জযাত্রী দলের পথে অবস্থিত এবং ১১/৬৩২ সালে ইহা আল-আস্ওয়াদ বিদ্রোহীদের দখলে ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পানির অভাব ও উপসাগরটি পলি দ্বারা রুদ্ধ হওয়ায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম/১২শ ও ১৩শ শতকে শহরটির গৌরব পড়ন্ত অবস্থায় আসিয়াছিল। আল-জানাদী (আনু. ৭০০/১৩০০)-এর সময় ইহা বেশ কিছুকাল পূর্বেই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। তাঁহার মতে (পাণ্ডুলিপি প্যারিস ২১২৭, পত্র ১৫৩ বি, স'ালিহ' আল-'আছ্রীর জীবনচরিতে) 'আছ্র নামটি ইহার বিপরীত দিকের জন্যও ব্যবহৃত হয় যাহাকে সাধারণভাবে ফারাসান (দ্র.) বলা হইয়া থাকে। এই নামটি মানচিত্রে নাই। ইহার অতি নিকটবর্তী যোগাযোগ কেন্দ্র হইল খোর আবূ আস্-সিবা অথবা কাওয (আল-জাআফিরা), জিযান-এর ৩২ কি. মি. উত্তরে।

(৪) 'আদান-মক্কার সামুদ্রিক পথের পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র স্থান যাহা আরা ও সুক্য়া (উমারা, ৮)-এর মধ্যেস্থলে অবস্থিত, পূর্বোক্ত গ্রাম (ইব্নুল মুজাবির ১০০) হইতে তিন ফারসাখ দূরে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাম্দানী, অনু. Forrer, ৪৭/৫২১; (২) ইয়াকূ'ত, ৩খ., ৬১৫; (৩) মাক'দিসী, ৫৩, ৭০, ৮৬; (৪) Kay. Yaman, 7, 11, 141 প., 240 প. ; (৫) ইব্নুল মুজাবির, ৫৪ (বাতন/খাব্ত 'আছ্র), ১০০; (৬) Sprenger, Post-u Reiserouten, 150;

(৭) ঐ লেখক, Die alte Geographie Arabiens, 45-54, 197; (৮) নিস্‌বার শুদ্ধ বানানের জন্য দ্র. ইব্নুল আছীর, লুবাব, ২খ., ১২২ ও যাহাবী, মুশ্‌তাবিহ, ৩৭৭ প.।

O. Lofgren (E.I.2) / আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন

'আছ্‌লীছ' (عثليث) ঃ পূর্বকালে ফিলিস্তীন উপকূলের একটি পোতাশ্রয় যাহা কারমেল (Carmel) ও আত্-তান্তুরা (Dora)-র মধ্যবর্তী শৈলান্তরীপে একটি সরু জিহ্বাকৃতি ভূখণ্ডের উপর একটি ছোট উপসাগরের উত্তরে অবস্থিত এবং ইহার তিন দিক সমুদ্র দ্বারা বিধৌত। আছ্‌লীছ নামটি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসে আছ্‌লীছের উল্লেখ পাওয়া যায় ক্রুসেডের সময়ে। ৫৮৩/১১৮৭ সালে ইহা সালাহুদ-দীন-এর অধিকারে আসে। ফিরিঙ্গীরা ইহাকে Castellum Peregrinorum বলিত। ১২১৮ খৃস্টাব্দে ইহাকে একটি শক্তিশালী Templar-Fortress অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম রক্ষার্থে গঠিত টেম্পলার সংঘের সদস্যগণের দুর্গরূপে পুনর্নির্মাণ করা হইয়াছিল। Districtum-Detroit (Khirbet Dustre)-এর সহযোগে এই দুর্গকে দক্ষিণগামী কার্‌মেল গিরিপথসমূহকে পাহারা দিতে হইত। ৬৯০/১২৯১ সালে ইহা মামলূক সুল্‌তান আল-আশ্‌রাফ খালীল কর্তৃক বিজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আল-'উছ্‌মানী 'আছ্‌লীছকে সাফাদ রাজ্যের সর্ব দক্ষিণ প্রদেশ (ولاية) বলিয়া উল্লেখ করেন (BSOAS, ১৫খ., ১৯৫৩ খ., ৪৮৩)। এখানে হিস্‌নুল আহ্‌মার (حصن الاحمر —লাল কিল্লা) নামে একটি দুর্গ ছিল। ৫৮৩/১১৮৭ সালে আল-মালিকুন্-নাসির ইয়ূসুফ ইব্‌ন আয়্যুব ইহা জয় করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূত , ৩খ., ৬১৬; (২) কাল্‌কাশানদী, মুখ্‌তাসার সুব্‌হুল-আশা, কায়রো, ১খ., ৯০৬, ১,৩০৫; (৩) K. Ritter, Erdkunde, ১৬খ., ৬১২-৬১৯; (৪) G. Rey, Etude sur les monuments de l'architecture militaire des croises en Syrie, 93-105; (৫) E. von Mulinen, Beitrage zur Kenntnis des Karmels, 258-277 (=zeitschr, d. Deutsch. Palastina-vereins, ৩১খ., ১৬৭-১৮৬); (৬) A.S.- Marmardji, Textes Geographiques arabes sur la Palestine, Paris ১৯৫১, ১৩৭; (৭) C. N. Johns-এর Pilgrims' Castle-এ খনন কার্যের রিপোর্টসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য QDAP, ২খ., ১৯৩৩ খৃ., ৪১-১০৪; ৩খ., ১৯৩৪, ১৪৫-১৬৪, ৬খ., ১৯৩৮, ১২১-১৫২; (৮) দা.মা.ই, লাহোর ১৯৭৩, ১২খ., ৯৯৫-৬।

R. Hartmann (E.I.2) / ড. সৈয়দ লুৎফুল হক

আছাছ (اثاث) ঃ (আ.), আসবাবপত্র। আসবাবপত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি আরবী ভাষাতে ঠিক তাহা বুঝাইবার মত শব্দের অভাব রহিয়াছে। "আসবাব", "টেবিল সামগ্রী", "গালিচা", "গৃহস্থালির সামগ্রী" ও "তৈজসপত্র"—এইগুলির ধারণার পারস্পরিক প্রাবরণ (Overlapping) বিবেচনা করিয়া আরবীতে প্রায়শ ভাবার্থবোধক নিকটবর্তী শব্দ ও ব্যাপকতর অর্থবোধক কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় (দুইটি ধারণার সংমিশ্রণ)। উদাহরণস্বরূপ ফার্‌শ (فرش) গালিচা, বিছানাপত্র ও আসবাব, আলা (آلة) হাঁড়ি-পাতিল ও গৃহস্থালির সামগ্রী; আবার ফার্‌শ ও আলা এক সংগেও ব্যবহৃত হইতে পারে; আদাত (ادة) তৈজসপত্র ইত্যাদি। আছাছ-এর শাব্দিক অর্থ মালপত্র; ঘর-সংসারের দ্রব্যাদি ও (বিশেষত আধুনিক আরবীতে) আসবাবপত্র; ফারশ্ ও আছাছ একযোগেও ব্যবহৃত হইতে পারে। মাতা' (متاع) ব্যক্তিগত সম্পদ, গৃহস্থালির দ্রব্যাদি ইত্যাদি। কুরআন মাজীদে (১৬ ঃ ৮০) শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে পশুর লোম হইতে তৈরী গৃহসামগ্রী অর্থে।

মধ্যযুগে মুসলিম গৃহে জীবনযাত্রা তুলনামূলকভাবে মাটির কাছাকাছি নির্বাহ করা হইত। ভোক্তাদেকে খাদ্য পরিবেশন করা হইত পায়াযুক্ত বা পায়াবিহীন এক প্রকার বারকোশে (পাত্রটি অবস্থাবিশেষে ইহার ধারক হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইত). উহাকে মেঝেতে প্রসারিত গালিচার উপরে রাখা হইত। ভোক্তাদের আলাদা আলাদা খানা থাকিত না, নীচু টেবিলের উপর ন্যস্ত বারকোশ হইতে সকলে খাদ্য গ্রহণ করিত, খুওয়ান [خوان], মাইদা [مائدة], ফাছ্‌র [فاثور], মুদাওওয়ারা [مدورة], মুহ্'ওওয়াল [محول], মু'তাস'মাত [معتصمات], সি'মাত [سماط], এই শব্দগুলির অধিকাংশ দ্বারা ছোট গোলাকার টেবিল বুঝাইত। কোন কোনটি দ্বারা, যেমন সিমাত, নীচু আয়তাকার টেবিল বুঝাইত, প্রত্যেকে নিজ নিজ উপযোগী উচ্চতা অনুযায়ী আসনে বসিত। একখানা গদি (বি'সাদা [وسادة] মির্‌ফাক'া [مرفقة], তুক্‌আ [تكئة], মিস্‌ওয়ারা [مصورة], নুমরুক [نمرق] এবং এমনকি মিখাদ্দা [مخدة] যাহা মূলত ছিল বালিশ, একজোড়া গদি একটি অপর একটি গদির উপরে রাখা দুই ভাঁজ করা গদি বা শুধু গালিচা ইত্যাদি। আহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই টেবিল ঘর হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইত।

এইরূপ দৃশ্য যে পাশ্চাত্যের পর্যটকগণকে, এমনকি কোন কোন প্রাচ্য বিশারদকেও বিভ্রান্ত করিত তাহা বোধগম্য। এইজন্য তাহারা মুসলিম গৃহাভ্যন্তরকে "শূন্য" (আসবাবশূন্য), এমনকি "বসবাসের অযোগ্য" ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাহারা এই কথাটি কখনও বিবেচনা করেন নাই, আসবাবপত্রের আকার-আয়তন প্রায়শ নির্ধারিত হয় জীবনযাত্রার পদ্ধতি, উপবেশন রীতি ও রুচি অনুযায়ী। তবে এইরূপ মনে করিলেও ভুল হইবে, মধ্যযুগে আরবদের সমুদয় আসবাবপত্র নীচু আকারের ছিল। কাঠমিস্ত্রী ও অন্য কারুশিল্পীরা ঘরের বাহিরে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য যে টেবিলের আলাদা পায়া (trestles) ও বেঞ্চি নির্মাণ করিত সেইগুলি যথাযোগ্য উচ্চ হইত। তাহারা চেয়ারও তৈরি করিত (দ্র. কুরসী) এবং সেইগুলির পায়া তৈরি করিত কাঠ বা ধাতু দিয়া, আসন তৈরি করিত অনেকটা সিংহাসনের মত করিয়া (দ্র. সারীর বা তাখ্‌ত), কিন্তু আহারের বেলায় এই ধরনের উপবেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত না। মধ্যযুগে প্রচলিত উচ্চ টুল ছিল ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম যাহা দ্বারা উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত (যেমন কোন নৃপতি, পরিবার-প্রধান, কখনও বা একজন সাধারণ লোক)।

উপবিষ্ট ব্যক্তিদের আসনের উচ্চতা তাহাদের শিষ্টতাসম্মত সামাজিক মর্যাদার নির্দেশক ছিল (যেমন সিংহাসন, উচ্চ টুল, ডবল গদি, দ্বিভাঁজকৃত গদি, সাধারণ গদি, গালিচা, মেঝে বা মাটিতে উপবেশন; শেষোক্তটি ছিল অবমাননা, বিনয় বা শোক প্রকাশসূচক)। কি ধরনের ও কি মানের আসবাব ব্যবহার করা হইল তাহা হইতেও একজনের সামাজিক মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যাইত। পায়াযুক্ত খাটের শয্যা বিলাসিতার পরিচায়ক ছিল; উহার নিম্নস্তরে ছিল ফ্রেমবিহীন শয্যাসমূহ, গদিযুক্ত বেঞ্চ (مرتبة), কোমল পালকপূর্ণ উত্তম মানের জাজিম, মাটিতে পাতা সাধারণ তোষক যাহা শয্যারূপে ব্যবহৃত হয়, সাধারণ তোষক, শুইবার মাদুর ও শতরঞ্জী, স্তূপীকৃত জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র (কেবল অতি দরিদ্ররাই মাটিতে ঘুমাইত)। একদিকে রেশমী কাপড় জাতীয় মোলায়েম, উৎকৃষ্ট উপাদানে পূর্ণ ও ওয়াড়ে ঢাকা বালিশ ও গদি এবং অপর দিকে দরিদ্রের জন্য জীর্ণ বস্ত্র বা কেবল একখণ্ড প্রস্তরের বালিশ।

"পাশ্চাত্য ধরনে"র যেই উচ্চ সিংহাসনগুলি উমায়্যা আমলের পটশিল্প (iconography)-তে দেখা যায় সেইগুলি সম্ভবত বায়যানটীয় চিত্রের অনুকরণে অংকিত হইয়াছিল, সেইগুলি হইতে খলীফাদের দরবারের যথার্থ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না (দ্র. V. Strika, in AIUON, ১৪/২খ., (১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ৭২৯-৫৯; কিন্তু তু. O. Grabar, in Studies in memory of Gaston Wiet, জেরুসালেম ১৯৭৭ খৃ., বিশেষত পৃ. ৫৩-৬, যিনি উমায়্যা দরবারের বিকাশমান আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচার পদ্ধতি যথার্থ প্রেক্ষিতে বর্ণনা করিয়াছেন); মধ্যযুগীয় গ্রন্থাদির মূল পাঠে অন্য এক ধরনের সিংহাসন, হেলান দিবার জন্য একটি লম্বা সোফা উমায়্যা, 'আব্বাসী ও আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ, যেমন ইখ্শীদীগণের দরবারে সুপরিচিত ছিল। খলীফা তাঁহার কোন বন্ধুকে একই "সারীর"-এ নিজের পার্শ্বেই বসিবার জন্য আহ্বান করিতে পারিতেন (কাজেই আসনটি বেশ দীর্ঘ হইত)। বিকল্পে তিনি উহাতে শয়ন করিতে পারিতেন। জাজিম-আসন-সিংহাসন-গদি এই ধারণার অধিক্রমণ (overlapping) [উদাহরণস্বরূপ ফারসী হইতে ঃ 'তাখ্ত' দ্বারা ইহার যে কোনটি বুঝাইতে পারে—তক্তা, আসন, সিংহাসন, সোফা, শয্যা, গণনার ফলক (তখ্তী), সিন্দুক বা বাক্স] আনুষ্ঠানিকতার বিবর্তন ও ব্যবহারের পার্থক্যকে বাধা প্রদান করে নাই (আসন বা সিংহাসন সাধারণ কিংবা সমারোহপূর্ণ দর্শন দান বা ব্যক্তিগত দর্শন দান অথবা ভোজ অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য); সিংহাসন ও সংকীর্ণ আসন (উদাহরণস্বরূপ পারস্যে নির্মিত আসনের কথা বলা যায়) এবং দীর্ঘ ও অধিক কারুকার্যময় বৃহৎ সিংহাসনের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা কি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতেও বিরত রাখে নাই। ৩য়/৯ম ও ৪র্থ/১০ম শতকের শেষভাগে সমাজের উচ্চ স্তরে ও মাধ্যবিত্তদের মধ্যে ফ্রেমযুক্ত খাটের ব্যবহার (শয়ন বা নিদ্রার জন্য) কেতাদুরস্ত হইয়া উঠে। কোন কোন প্রাচ্যতত্ত্ববিদের এই ধারণা যে, মধ্যযুগের মুসলিম দেশসমূহে খাট-শয্যার প্রচলন ছিল না, কেবল আংশিকভাবে সত্য, স্প্রিংবিহীন জাজিম সচরাচর ব্যবহৃত হইত। কায়রো Geniza-র দলীলপত্রে তুলনামূলকভাবে স্বল্প ব্যয়ের শয্যারূপে ব্যবহৃত বহু জাজিমের উল্লেখ পাওয়া যায়। যুবতী বধূদিগের যৌতুকের মধ্যে অত্যধিক মূল্যের স্বল্প সংখ্যক ফ্রেমযুক্ত খাটের উল্লেখ রহিয়াছে; আর এই দুই স্তরের মাঝখানে ছিল 'মারতাবা' শয্যা, যাহা ব্যবহারের দিক হইতে আধুনিক কালের ডিভ্যান খাট (Divan-bed)-এর সদৃশ ছিল।

টেবিলের কথাতেই ফিরিয়া আসা যায়, মাইদা, খুওয়ান ও সুফ্রা সমার্থক, এইগুলি দ্বারা প্রাচ্যদেশীয় ছোট "টেবিলকে" বুঝায়। প্রথম দুইটি দ্বারা শক্ত (solid) "টেবিল" (এই দুই-এর মধ্যে মধ্যযুগীয় ভাষাতাত্ত্বিকগণের পার্থক্য নির্ণয় প্রচেষ্টা নিছক বিধিবহির্ভূত), আর তৃতীয়টি দ্বারা (সেই সঙ্গে কখনও কখনও নাত ও মাইদা দ্বারা শুধু কুরআন, উহার তাফসীর ও হাদীছ-এর কোন কোন অংশে) এক ধরনের চামড়ার বস্তু বুঝাইত, যাহা শুধু প্রথম যুগের বেদুঈনগণের [illegible] বাশিন্দাদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। উহা মাটিতে বিছাইয়া বাড়ীতে বা গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হইত (আঞ্চলিক ভাষায় সাধারণ টেবিলকে বলা হয় সুফ্রা আর রেস্তোঁরা বা ক্যাফের পরিবেশককে বলা হয় সুফ্রাজী)। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্যময় দিক যাহা হইতে এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, স্থানীয় বাশিন্দাদের অব্যাহত রীতি (পারস্য, বায়যানটাইন বা প্রাচীন সিরীয় কি মিসরীয় ইত্যাদি হইতে) মধ্যযুগের মুসলমানগণেরই একমাত্র প্রাত্যহিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল কি না, এই অর্থে যে আসবাবপত্র ব্যবহারের মধ্যে ইহার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় অথবা এখানে বেদুঈনগণের ক্ষুদ্রতম অবদানও ছিল কিনা যাহা প্রকাশ পায় পূর্বপুরুষের রীতিনীতির বিস্তারের মাধ্যমে বায়যানটাইনীয় রাজধানীতে ব্যবহৃত উঁচু উঁচু আসবাবের স্থলে নীচু আসবাবের প্রচলন দ্বারা যেগুলি ইরানী সভ্যতাতে ও কোন কোন স্থানীয় আরামী-সিরীয় ও ইরাকী কেন্দ্রে প্রচলিত ছিল, যেই তথ্যটি জানা যায় মধ্যযুগের আভিধানিকগণ ও ভাষ্যকারগণের রচনা হইতে, যেমন তুসতখুওয়ান (طستخوان)ও ফাছূর (فاثور)। যাহা হউক এখনও মধ্যযুগের কাঠের আসবাবপত্রের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই সকল আসবাবের মৃন্ময় অনুকৃতিও রহিয়াছে যে অবলম্বনের (Support) উপরে উহা রাখা হইত, সেগুলিতে কখনও কখনও গর্ত (cavity) দেখিতে পাওয়া যায় (যেন সেগুলিতে জগ [jugs] রাখা যায়, গ্রন্থাদিতে যেরূপ তাক ও রাখনির বর্ণনা পাওয়া যায় হুবহু সেইরূপ; উহাদের কতগুলি অধ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছেঃ মিরফা বা কুরসীযুক্ত সীনিয়্যা যেইগুলি দূরদূরান্তের বিভিন্ন মুসলিম দেশেও দেখা যায়) আঞ্চলিক পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও, চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাহানে জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও রুচির কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় (গৃহস্থালির দ্রব্যাদি, যেমন টেবিল, একদেশ হইতে অন্য দেশে রফতানী করা হইত)।

মধ্যযুগের মুসলিমগণ বিভিন্ন প্রকারের সিন্দুক, কৌটা, বাক্স (صندوق، تخت، قمطرة، مقدمت، سفط)—খুপরি, তাক (رفوف) ইত্যাদি আসবাবপত্র ব্যবহার করিত, কিন্তু আলমারী (Cupboard)-এর ব্যবহার তাহারা করিত না।

মোঙ্গলরা অপেক্ষাকৃত উঁচু চতুর্ভুজ টেবিলের প্রচলন করে, কিন্তু মূল "প্রাচ্যরীতির" জীবন যাপন পদ্ধতি আধুনিক যুগ অবধি রক্ষিত আছে (তুর্কী ও ফার্সী ক্ষুদ্রাকার চিত্র [miniature] হইতে ইহার মোটামুটি সমর্থন পাওয়া যায়), এমনকি ১৯শ ও ২০শ শতকের প্রারম্ভেও পর্যটক, লেখক ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ (উদাহরণস্বরূপ E. Lane মিসরের জন্য, Lortet

সিরিয়ার জন্য, E. Jaussen ফিলিস্তীনের জন্য) অনুরূপ জীবন পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করেন। কোন কোন সামগ্রী (যেমন খাট) যেইগুলি বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বা বিদেশী প্রভাবে নির্মিত, সেইগুলিকে কোন কোন আধা-শহর এলাকায় বর্তমান শতকের প্রারম্ভে frandji বলা হইত। আধুনিক কালে শৌখিন ইউরোপীয় আসবাবপত্রের বহুল প্রচলন ঘটিয়াছে এবং আদি প্রাচ্যের জীবনযাত্রার যে রূপ, রুচি ও আরাম-আয়েশের বিরাট প্রাচুর্য, সেগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ J. Sadan, Le mobilier au Proche-Orient medieval, Leiden 1976 (বিশেষ করিয়া উহার গ্রন্থপ ীর নির্ঘণ্ট, ১৯৫৫-৬৯)।

J. Sadan (E.I[2]) / হুমায়ুন খান

আছ'ার (اثر) ঃ ব.ব. আছ'ার (آثار) শাব্দিক অর্থ "চিহ্ন"; পারিভাষিক অর্থ ঃ (১) হাদীছ (দ্র.); (২) স্মৃতিচিহ্ন, যেমন আল-আছ'ারুশ্-শারীফ (الاثر الشريف) [ব.ব. আল-আছ'ারুশ্-শারীফা =الاثار الشريفة] অর্থাৎ নবী কারীম (স)-এর পবিত্র স্মৃতিচিহ্নসমূহ, যথা তাঁহার দন্ত, কেশ, তৈজসপত্র যাহা তাঁহারই বলিয়া কথিত, বিশেষত তাঁহার পদচিহ্নের ছাপ (দ্র. ক'াদাম)। এই পবিত্র জিনিসগুলি ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. Goldziher, Muh. St., ii, ৩৫৬-৬৮। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নসমূহের বর্ণনা ও ছবির জন্য দ্র. (২) Tahsin OZ, Hirka-i Saadet Dairesi ve Emanet-i Mukaddese, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ.। I. Goldziher (E.I[2])

(৩) আছ'ার পারিভাষিক শব্দ হিসাবে আরও ব্যবহৃত হয় হেতুবাদে, যদিও ইহার ব্যবহার ফি'ল (فعل), ইল্লা (علة) ও সাবাব (سبب) [দ্র.] ও ইহাদের উদ্ভূত শব্দসমূহ (derivatives, مشتقات) হইতে তুলনামূলকভাবে কম। "মুআছ্'ছি'র" অর্থাৎ উচ্চতর কোন সক্রিয় সত্তা বা বস্তু (যথা আল্লাহ তা'আলা) হইতে উদ্ভূত "প্রভাবসমূহ" (তাছীরাত) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিম্নতর সত্তা বা বস্তুসমূহকে প্রভাবিত করে। ইহা উচ্চতর সত্তাসমূহের তুলনায় নিম্নতর সত্তাসমূহে পরোক্ষভাবে কাজ করে। শব্দটির এইরূপ ব্যবহার জ্যোতিষী ও দার্শনিকদের নিকট বহুল প্রচলিত। তাহারা এই শব্দটি পার্থিব জগৎ ও মানবমণ্ডলীর উপর নক্ষত্ররাজির (সেইগুলিকে তাহারা জীবন্ত উচ্চতর সত্তা বলিয়া মনে করেন) প্রভাব প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকন্তু বায়ুমণ্ডলের দৃশ্যমান বস্তু ব্যাপারসমূহকে (যেইগুলি নক্ষত্ররাজি দ্বারা প্রভাবান্বিত) আল-আছারুল উল্‌বিয়্যা (الاثار العلوية) বলা হয়। এই নামে Aristotle-এর Meteorology 'আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। সংবেদী আত্মার বা আবেগ ভাবকে আছার ফিন্-নাফ্স (آثار فى النفس) বলা হইয়াছে, যেহেতু আত্মা বস্তুসমূহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

T.J. De Boer (E.I.[2]) / ড. সৈয়দ লুৎফল হক

আল-আছ'ারু'ল-'উল্‌বি'য়্যা (الاثار العلوية) ঃ "আবহগত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার" এই শিরোনামটি 'আরবগণ Aristotle ও Theophrastus-এর আবহবিদ্যার (Meteorologh) নামকরণ করার জন্য ব্যবহার করিয়াছে।

(১) আল-কিন্দী (الكندى) তাঁহার "রিসালা ফী কামিয়্যাতি কুতুবি আরিস্তুতালিস" (رسالة فى كمية كتب ارسطوطاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفة) গ্রন্থে প্রকৃতিবিদ্যাসমূহ (আত্-ত'াবী'ইয়্যাত (الطبيعيات)-এর সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে বায়ুমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধীয় পুস্তক (কিতাবু আহ্'দাছিল-জাওবি' ওয়াল আরদ' (كتاب احداث الجو والارض) নামক গ্রন্থখানাকে চতুর্থ স্থান দিয়াছেন ; (দ্র. M. Guidi ও R. Walzer, Uno scritto introduttiv allo studio di Aristotele, Studi su al-Kindi, i, Atti Della R. Acad, Dei Lincei, Mem. Della Classe di scienze morali, ৬খ., ৬, ১৯৩৭ খৃ.)। তাবীইয়্যাত-এর অনুরূপ বিভাগ আল-ইয়া'কৃ'বী, ১খ., ১৪৯-এ পাওয়া যায়। তিনি "ফিশ-শারাই' ওয়া হুওয়া কিতাবুল মান্‌তিক ফিল-আছারিল উল্‌বিয়্যা" গ্রন্থখানা উল্লেখ করেন (আরও দ্র. Klamroth, Uber die Auszuge aus Griechischen Schriftstellern bei al-Yaqubi, ZDMG, 41, 1887, 415-42)। "আল-আছ'ারুল-'উল্‌বি'য়্যা" শিরোনামটি ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২৫১ ও ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আ, পৃ. ৫৮-তেও পাওয়া যায়। জাবির (جابر)-এর গ্রন্থ কিতাবুল বাহ্'ছ' (كتاب البحث)-এর আবহবিদ্যা মধ্যস্থ অধ্যায়সমূহের অর্থাৎ পদার্থ বিষয়ক রচনাগুলির অন্তর্ভুক্ত (দ্র. P.Kraus, Jabir b. Hayyan, ১খ., ৩২২ প.; Mem de l' Institut d'Egypte, ৪৫, ১৯৪২ খৃ.)।

Aristotle-এর প্রকৃতি বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী অনুবাদের মাধ্যমে 'আরবী ভাষায় সহজপ্রাপ্য করিয়া তোলার প্রথম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন খলীফা মা'মূনের 'মাওলা' গ্রীক ইয়ূহান্না (ইয়াহ্‌য়া) ইবনুল বিত্‌রীক মালাকী। তাঁহার আবহবিদ্যার গ্রন্থখানির অনুবাদ নিঃসন্দেহে সিরীয় মূল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছিল। এই অনুবাদের দুইখানা পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাদের একখানা সংরক্ষিত আছে ইস্তাম্বুলে (Yeni ১১৭৯) এবং অন্যখানা রোমে (Vat. hebr. ৩৭৮)। ইবনুল বিত্‌রীক-এর রচনার প্রথম তিনখানা গ্রন্থ Cremona-র Gerard কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল (দ্র. Lacombe Aristoteles latinus, ১খ., ৫৬)। তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থখানা রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে রচিত। উহার আরবী-ল্যাটিন তিনখানা তরজমার কথা Fobes উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. Classical philology, ১০খ., ১৯১৫, পৃ. ২৯৭-৩১৪)। এই মূল পাঠগুলির একখানা ms. Cod. Bibl. Nat., lat. 6325, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা ইবনুল বিত্‌রীক-এর রচনা ভিত্তিক অনুবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ফিহ্‌রিস্ত, ২৬৫-তে আবুল খায়র আল-হাসান ইব্‌ন সুওয়ার (জ. ৩৩১/৯৪২)-এর রচনাবলীর একখানি কিতাবুল-আছারিল উল্‌বিয়্যা-র অনুবাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শিরোনামটি প্রকৃতপক্ষে Aristotle-এর আবহবিদ্যাকে বুঝায় কিনা তাহা অনিশ্চিত। ইব্‌ন

সুওয়ার রচিত আবহবিদ্যার অন্য একখানা গ্রন্থের জন্য ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, ১খ., ৩৩-ও দ্রষ্টব্য।

ফিহ্‌রিস্ত, ২৫১-এর অনুসারে Olympiodorus-কৃত Aristotle-এর মূল পাঠের বিরাট ভাষ্যখানা আবূ বিশ্‌র মাত্তা ইব্‌ন ইয়ূনুস (মৃ. ৩২৮/৯৪০) কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল এবং Aphrodisias-এর অধিবাসী Alexander-কৃত ভাষ্যখানা ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আদী (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩) কর্তৃক অনূদিত। এই অনুবাদগুলির কোনটাই আমাদের হস্তগত হয় নাই। আল-ফারাবীর ভাষ্য সম্বন্ধে ইব্‌নুল কিফ্‌তী, ২৭৯ ও ইব্‌ন আবী উসায়বিআ ১খ., ১৩৮ দ্র.। ইব্‌ন সীনার কিতাবুশ-শিফা-তে আবহবিদ্যার ও ভূগোল পঞ্চম ফান্‌ন (فن — বিজ্ঞান)-এ স্থান পাইয়াছে। ইহার জ্যোতিশ্চক্র (halo) ও রংধনু সম্পর্কীয় অংশটি Horten ও Wiedemann কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে (Meteorologische Zeitschr., ৩০খ., ১৯১৩, পৃ. ৫৩৩-৫৪৪)। ইব্‌ন সীনা তাঁহার কিতাবুন-নাজাত (কায়রো সং. ১৯৩৮, ১৫২-৭)-এ কিতাবুশ্-শিফার বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবহবিদ্যা সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর ভাষ্যসমূহের সংক্ষেপিত গ্রন্থের মূল আরবী পাঠ (সং. হায়দরাবাদ ১৩৬৫ হি.) আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

আবহবিদ্যা সম্পর্কে Aristotle-এর ব্যাখ্যাসমূহ, বিশেষত চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত ভাবধারা ইসলামে পদার্থ বিষয়ক ভাবধারার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। হিজ্‌রী তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে মু'তাযিলী কালামশাস্ত্রবিদ আন্-নাজ্জাম (দ্র.) দাহ্‌রিয়্যা দল কর্তৃক ব্যাখ্যাত চারিটি মৌলিক গুণ (قوى غريزية) সম্পর্কিত মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে বিধিবহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, যেহেতু ইহা কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের (ملسة، لمس) উপর নির্ভরশীল। তিনি দুইটি বাষ্পনির্গমন (مائى، ابخار ارضى) সম্পর্কিত মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং সমুদ্রের লবণাক্ততা সম্পর্কিত একটি অভিমতের ব্যাখ্যা করেন; (দ্র. আল-জাহিজ কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁহার খণ্ডলিপিগুলি, কিতাবু'ল-হ'ায়াওয়ান)। জাবির (جابر) -এর চিন্তা পদ্ধতিতে মৌল উপাদান সম্পর্কিত মতবাদ সুস্পষ্টভাবে Aristotle-এর মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত (দ্র. Kraus, পূ. গ্র., পৃ. ১৬৩)। আবহবিদ্যার আরব ঐতিহ্যে ইব্‌নুল বিত্‌রীক হইতে আরম্ভ করিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দ পর্যন্ত, Aristotle কর্তৃক অনিশ্চিতভাবে নির্দেশিত, নিম্নচান্দ্র জগতের উপর গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাবের মতবাদটি (339a 20f.) জ্যোতিষিবিদ্যা অনুসারে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (তু. Alexander, Book of the Treasure)। ইহার মূল আরবী পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন Ruska, Tabula smaragdina, ৮০। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নিম্ন জগৎ ঊর্ধ্ব জগৎকে অনুসরণ করে এবং নিম্নজগতের স্বতন্ত্র বস্তুসমূহ ঊর্ধ্ব জগতের বস্তুসমূহের অধীন। কেননা বায়ুমণ্ডল বস্তুসমূহের বহির্ভাগের ও সকল গ্রহ-উপগ্রহের সংলগ্ন (متصل) বালীনাস (بليناس— Apollonius of Tyana)-এর প্রতি আরোপিত সির্‌রুল খালীকা (سر الخليقة) গ্রন্থে (দ্র. Kraus. পূ. গ্র., ১৪৭,টী ২), গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাবের তত্ত্বটি একটি সৃষ্টির উৎপত্তি তত্ত্বের অধীনে উপস্থাপিত হইয়াছে, এই তত্ত্ব অনুসারে খনিজ দ্রব্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ গ্রহ-উপগ্রহের ক্রমবর্ধিত গতির দরুন হইয়া থাকে। এই ধারণাটি ইব্‌নুল বিত্‌রীককৃত Meteor. i, I-এর সহজতর অনুবাদে বর্তমান "গাগনিক পদার্থসমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর বস্তুসমূহের (যথা উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদির) সৃষ্টি, উৎপাদন, রূপান্তর ও পরিবর্তনসহ ইহাদের গতি গাগনিক প্রভাবসমূহ দ্বারা সংঘটিত হয়।" এই সিদ্ধান্তটি ইখ্‌ওয়ানুস্-সাফা (اخوان الصفا) কর্তৃকও আল-আছারুল-উল্‌বিয়্যা অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (রাসাইল, ২খ., ৫৪ প.)। আলী ইব্‌ন রাব্বান আত্-তাবারী, ফির্‌দাওসুল হিক্‌মা, ২১-এ ইহাকে স্পষ্টভাবে Aristotle-এর সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরও দ্র. ইব্‌ন রুশ্‌দ, আল-আছারুল উলবিয়্যা, ৬।

(২) Theophrastus-এর আবহবিদ্যার যাহার মূল গ্রীক গ্রন্থখানা হারাইয়া গিয়াছে (বিখ্যাত আভিধানিক আবুল হাসান ইব্‌ন বাহ্‌লূল আত্-তীর্‌হানী) এইভাবেই ইহা পঠিত হওয়া উচিৎ, ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, (১খ., ১০৯) কর্তৃক আংশিক অনূদিত হইয়াছিল (দ্র. Bergstrasser, Neue meteorologische Fragmente des Theophrast (Sitzungber. der Heidelb. Akad der. Wiss. Phil.-Hist kl., 1918 : 9)। বার বাহ্‌লূল কর্তৃক অনূদিত সিরীয় মূল পাঠ আমাদের হস্তগত হইয়াছে (দ্র. Drossaart Lulofs, The Syriac translation of The ophrastus's Meteorology Autour d'Aristotle. Recueil d'etudes offert a A. Mansion, Louvain 1955, 433-49)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাত প্রদত্ত হইয়াছে।

B. Lewin (E.I[2]) / ড. সৈয়দ লুৎফুল হক

আছু'র (اثور) ঃ আধুনিক ক'াল্'আত শার্‌কাত ইরাকের দিজলা (তাইগ্রীস) নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি বড় প্রাচীন টিলা, মাওসিল বিলায়াতে, বাগদাদ হইতে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উত্তরে মাওসিলের প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে ৩৫° ৩০' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৪৫°১৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ইহা জাবাল হাম্‌রীন-এর একটি উদ্‌গত অংশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত এবং ইহাকে প্রাচীন আসীরিয়ার অন্যতম রাজধানী শহর আশুর-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। ৩য় সহস্রাব্দ (3rd millennium)-এর মাঝামাঝি সময়ে এই স্থানে পশ্চিম অথবা দক্ষিণ দিক হইতে আগত যাযাবর উপজাতি (বা গোত্রের) লোকেরা বসতি স্থাপন করে এবং খৃ. পূ. ৬১৪ অব্দে বেবিলনীয়দের দ্বারা অধিকৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আসীরিয়ার ধর্মীয়, কখনও কখনও রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসাবে ইহা মর্যাদা পাইত। বেবিলনীয়দের আক্রমণে শহরটি ধ্বংস হইয়া যায় এবং অতঃপর শহর হিসাবে ইহা আর কখনও গড়িয়া উঠে নাই। আশুর শুধু এই স্থানের নামই ছিল না, এখানকার দেবতারও নাম ছিল, আক্কাদীয়, আরামী ও গ্রীসীয় সূত্র হইতে তাহা জানা যায়। তুর্কীরা এই স্থানটিকে বলিত তোপরাক কাল' বা মাটির দুর্গ। 'আরবী নামে এই শার্‌ক'াত' অংশের অর্থ জানা যায় না। ইহা সম্ভবত স্বতন্ত্র স্থান-নাম হিসাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আরব ভূগোলবিদগণ এই নামটি কোথায়ও ব্যবহার করেন নাই ১৮'শ

শতকেই নামটির প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্যের পর্যটকগণ এই নামটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

C. J. Rich মার্চ ১৮২১ খৃ. এই স্থানটি দেখিয়া ইহার বর্ণনা করেন, পরে এখানে অনুসন্ধানকার্য চালান J. Ross (১৮৩৬), W. Ainsworth ও তাঁহার সঙ্গে E. I. Mitford, A. H. Layard ও H. Rassam (১৮৪০) এবং এখানে রাজা ৩য় শালমানেসার (খৃ. পূ. ৮৫৮-৮২৫)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি আবিষ্কৃত হইলে বৃটিশ মিউজিয়ামের পক্ষ হইতে অনুসন্ধানকার্য চালান Layard ও Rassam (১৮৪৭)। ১৮৪৯ খৃ. J. Talbot, J. Oppert, F. Hincks ও H. C. Rawlinson কর্তৃক খননকার্য পরিচালিত হইলে এখানে রাজা ৩য় রিগলাথ পিলেসার (Riglath Pileser)-এর শাসনামলে ইতিহাস সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক ফলক লিপি (Prism) আবিষ্কৃত হয় এবং পরে ১৮৫৩ খৃ. বৃটিশ মিউজিয়ামের পক্ষ হইতে Rawlinson-এর তত্ত্বাবধানে এই ফলক লিপির আরও দুইটি প্রতিলিপি আবিষ্কার করেন Rassam। রাজা ৩য় আদাদ নিরারির (Adad Nirari, খৃ. পূ. ৮১০-৭৮৩) শাসনামলের কয়েকটি ফলক লিপি আবিষ্কার করেন G. Smith ১৮৭৩ খৃ.। স্থানটিতে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে খননকার্য পরিচালিত হয় ১৯০৩-১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। জার্মানী Deutsche Orient Gesellschaft-এর পক্ষ হইতে খননকার্য পরিচালনা করেন প্রথমে R. Koldewy এবং তাঁহার পরে W. Andrae ও অন্যান্য। এই খননের পরেই তুরস্কের খলীফা ২য় আবদুল হামীদ জার্মান সম্রাট কাইজার উইলহেলম (২য়)-কে স্থানটি উপঢৌকন দেন।

উত্তর ও পূর্বদিকে এলাকাটি নদী ও খাড়া উঁচু পাহাড় দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সুরক্ষিত, প্রয়োজন ছিল শুধু একটা প্রাচীরের অবলম্বন। সেনাচেরিব (Sennacherib) (খৃ. পূ. ৭০৪-৬৮১) শিলালিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি দ্রুত নিষ্ক্রমণের জন্য একটি অর্ধগোলাকৃতির দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন। উহার স্থাপত্য ছিল অমার্জিত এবং সেই ধরনের স্থাপত্য সম্ভবত উহাই ছিল সর্বপ্রথম। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এলাকাটির রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল। দক্ষিণের প্রতি নির্ভরশীলতার প্রাথমিক কাল পরে উর-এর তৃতীয় রাজবংশের আমলে (খৃ. পূ. ২১১২-২০০৪) ইহার আলাদা ইতিহাস আরম্ভ হয়। অতি আদি যুগে আশুরে যে জনবসতি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তুরস্কের আনাতোলিয়াতে প্রাচীন কানেশ শহরে (বর্তমান কুলতেপে নামক স্থান) কার্যরত এইরূপ একদল আসিরীয় বণিকের দলীল হইতে; কিন্তু শামশী আদাদ (১ম, খৃ. পূ. ১৮১৩-১৭৮১)-এর প্রাসাদই সর্বপ্রাচীন ও ব্যক্তিগত বসবাসের প্রশস্ত ঘরবাড়ী, মেঝের নীচে পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিবার কুঠরী পাওয়া গিয়াছে উত্তর-পশ্চিমের এলাকায়। এই আমলের ইতিহাসে অধিকাংশ পুনর্গঠন করিতে হয় সরকারী মোহাফেজখানায় সংরক্ষিত শাম্‌শি আদাদের পত্রাবলী হইতে, যেইগুলি পূর্ব সিরিয়ার মারিতে (আধুনিক তেল হারীরী) আবিষ্কৃত হয়। আশুর, এশ্‌নুন্নার (আধুনিক তেল আসমার) নারাম সিন-এর অধীন হইলে শামশি আদাদ উহা নিয়ন্ত্রণ করেন। শুবাত এনলিল (আধুনিক চাগার বাযার)-কে রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করায় আশুরকে তিনি রাজধানী শহর হিসাবে ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সেখানে তিনি নিপ্‌পুরের (আধুনিক নিফ্‌ফার) স্থানীয় দেবতা এন্‌লিলের একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

মেসোপটেমিয়াতে Cassite আধিপত্যের কালে রাজা ৩য় পুযুর আশুর (আনু. খৃ. পূ. ১৪৯০) বেবিলনের ১ম বুরনাবুরিআশ-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করেন এবং আশুরে তিনি ইশ্‌তার মন্দিরের অংশবিশেষ ও দক্ষিণের নগর প্রাচীরের একাংশ নির্মাণ করেন বলিয়া লিপিতে উল্লেখ করেন। এই ধরনের নির্মাণ কার্যের বিষয় অনেক সময়ে মাটির ত্রিকোণাকার ঢেলায় লিপিবদ্ধ হইত এবং নূতন দেওয়ালের ভিতরে সেইগুলি গাঁথিয়া দেওয়া হইত। রাজা ২য় আশুর নাদিন আখে (খৃ. পূ. ১৪০২-১৩৯৩) স্বীয় দেশের অনুকূলে মিসরের সমর্থন লাভ করেন এবং মিসর অধিপতি ফির'আওন-এর নিকট হইতে স্বর্ণ উপহার পান।

আসীরিয়ার রাজাগণের সরকারী তালিকা পাওয়া গিয়াছে এবং সেইগুলি বর্তমানে এই স্থানটির সুপ্রাচীন যুগের ইতিহাসের কাঠামো নির্মাণের অতি প্রয়োজনীয় উৎস। সেইগুলির অনেক কয়েকটিতেই প্রত্যেক রাজার রাজত্বকালের উল্লেখসহ পঞ্চাশটিরও বেশী নাম লিখিত রহিয়াছে। অন্যান্য তালিকাতে আছে সেখানকার মন্দিরগুলির নাম, কিন্তু উল্লিখিত ৩৪টি মন্দিরের মধ্যে কয়েকটিকে মাত্র চিহ্নিত করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল প্রাথমিক কালের দালান-কোঠার স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বেবিলোনিয়ার ইমারতসমূহের অনুরূপ। কিন্তু মন্দিরের পবিত্রতম অংশটিকে উহার কেন্দ্রস্থলে দীর্ঘায়িত করা এবং বেদীটিকে গভীর একটি কুলুঙ্গিতে স্থাপিত করা স্বাতন্ত্র্যসূচক আসীরীয় বৈশিষ্ট্য।

আসীরীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আশুর উবাল্লিত (খৃ. পূ. ১৩৬৫-১৩৩০)। রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি মিতান্নীর তুশ্‌রাত্তার অধীন ছিলেন, কিন্তু খৃ. পূ. ১৩৫০ সালে হিত্তীয় (Hittite) রাজা সুপলিলুলিউমাস (Supplilulíumas)-এর সহায়তায় তিনি উত্তর-পূর্ব মেসোপটেমিয়ার মিতান্নী রাজ্যাংশ অধিকার করিতে সক্ষম হন। আশুর উবাল্লিত ফির'আওন-এর সমমর্যাদায় সাররু রাবু (Sarru rabu) অর্থাৎ মহারাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং বেবিলনীয়গণের নিকট ভীতির কারণস্বরূপ হন। আখ্‌নাতেন-এর নিকটে লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র মিসরের বিখ্যাত তেল আল-আমারনার সরকারী মুহাফিজখানায় রক্ষিত আছে [দ্র. Knudtzon (১৯১৫) সংখ্যা ১৫-১৬]। নিজের দেশকে তিনি বলিতেন মাত আশুর (mat Assur) আশুরের দেশ, আর বেবিলনীয়রা প্রাচীন নাম সুবারতু ব্যবহার করিত সম্ভবত কতকটা হেয় অর্থেই। তাহা সত্ত্বেও আসীরীয় রাজকীয় উৎকীর্ণ লিপিসমূহে বেবিলনীয় আঞ্চলিক উপভাষা আক্কাদীয় ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ বোধ হয় সেই ধরনের ভাষা ঐতিহ্যগতভাবে পরিমার্জিত ছিল। তাঁহার পুত্র এনলিল নিরারি (Enlil Nirari) (খৃ. পূ. ১৩২৯-১৩২০) বেবিলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং আরিক দিন ইলি (খৃ. পূ. ১৩১৯-১৩০৮) পশ্চিমের সেমিটিক গোত্র আখ্‌লামুদেরকে নাকাল করেন। ১ম আদাদ নিরারি (খৃ. পূ. ১৩০৭-১২৭৫) Cassite ও মিতান্নিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মেসোপটেমিয়াকে একটি সাম্রাজ্যে সুসংহত করিতে সক্ষম হন, কিন্তু তাঁহার বিজিত রাজ্য পরবর্তী কালে হিত্তীয়গণের উত্থানের ফলে এবং পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ হেতু ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

১ম শাল্মানেসার (খৃ. পূ. ১২৭৪-১২৪৫) কাল্খুর (আধুনিক বির্স নিমরূদ) উত্তরে একটি নূতন রাজধানী শহর নির্মাণের কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁহার পুত্র ১ম তুকুল্তি নিনুর্তাও (খৃ. পূ. ১২৪৪-১২০৮) ঠিক উত্তর-পূর্বে আরও অনেক নিকটে অপর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তবে তিনি তাহার নাম রাখেন কার তুকুল্তি নিনুর্তা, "তুকুল্তি নিনুর্তার ঘাট" (আধুনিক তুলূল আক্'র)। বেবিলনের মার্দুক দেবতাকে তিনি বন্দী করেন বলিয়া লিখিয়াছেন। মার্দুক বেবিলনীয় পুরাণের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং উহাকে পরবর্তী কালে আসীরীয় সংস্করণের ধর্মগ্রন্থে যুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রকারের একাধিক বিকল্প রাজধানী সত্ত্বেও আশুর সময় সময় রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইত, ইহা মূলত ধর্মীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। খৃ. পূ. ১০ম শতকের মধ্যে ইহার গুরুত্ব লোপ পাইতে থাকে এবং কালখু ও নিনেভে (Nineveh)-র গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী নৃপতিগণ উত্তরের এই স্থানসমূহকেই নিজেদের রাজধানীরূপে নির্বাচন করেন এবং তথা হইতেই রাজ্যশাসন করেন।

এই শহরটি খৃ. পূ. ৬১৪ সালে বেবিলনীয় নৃপতি নাবোপোলাস্সার (Nabopolassar) [খৃ. পূ. ৬২৫-৬০৫] কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উহার দুই বৎসর পূর্বে তিনি নিনেভে ধ্বংস করেন এবং আসীরীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। ইহার পরে সামান্যমাত্র তথ্যাদি পাওয়া যায় যাহা হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। বেবিলনীয়দের সময়ে এখানে সম্ভবত বসতি ছিল খুবই বিরল। কেননা খৃ. পূ. ৫৩৯ সালে প্রতাপান্বিত সাইরাস বেবিলন জয় করিয়া বলিয়াছিলেন 'দিজলার অপর পারে একেবারে আশুর পর্যন্ত যে সকল পবিত্র শহর রহিয়াছে ......, যে সকল পবিত্র ধর্মস্থান দীর্ঘকাল যাবৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে সেইগুলিতে আমি দেবতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং সেখানকার অধিবাসিগণের জন্য স্থায়ী ধর্মস্থান করিয়া দিয়াছি" (পারসিকগণ কর্তৃক বেবিলন বিজয়ের মূল ঐতিহাসিক তথ্য উৎস Cyrus Cylinder হইতে উদ্ধৃত)। এই নামটি আবার পাওয়া যায় Behistun শিলালিপির প্রাচীন পারসিক মূল পাঠে। কিন্তু আর যে একমাত্র উৎকীর্ণ লিপিগত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতেছে স্থানটি হইতে প্রাপ্ত আরামী দলীলপত্রাদি। এইগুলি পার্থীয় আমলের তারিখযুক্ত এবং সুপ্রাচীন আসীরীয় দেবতাগণের নাম যে এই সমাজে খৃ. পূ. ৩য় শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ এইগুলিকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে বলা হইয়া থাকে, এইগুলি খৃ. পূ. ৭ম শতক হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভৌগোলিক নাম হিসাবে আছূ'রা বলিতে হয়ত শুধু শহরটিকেই বুঝায় কিন্তু গ্রীক উৎস হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায়, Atouria বলিতে সমগ্র উত্তরাঞ্চলকেই বুঝাইত। সাসানীয় আমলে স্থানটির গুরুত্ব নিশ্চিতই হ্রাস পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং প্রাচীন সিরীয় ভাষায় আছূ'র বলিতে মধ্যযুগের শেষ নাগাদ পর্যন্ত একটি শাসন বিভাগকে বুঝাইত।

'আরব ভূগোলবেত্তাগণ আছূ'রের উল্লেখ করিয়াছেন (সময় সময় ইহাকে আকূর বলা হয়)। তবে তাঁহারা ইহাকে বর্তমান ক'াল্'আত শার্কাত না বলিয়া মাওসিল-এর পূর্বেকার নাম ও একটি প্রদেশেরও নাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পরবর্তী কালে আল-জাযীরা (দ্র.) নামে পরিচিত হয়। যেই ধ্বংসাবশেষের সহিত এই নাম যুক্ত হইয়াছে উহা আস্-সালামিয়্যার নিকটবর্তী এবং নিমরূদের ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহারা এইরূপও বলিয়াছেন, আছূ'র হইতে আল-জাযীরা নামটি গৃহীত যাহা বস্তুত আয়তনের দিক দিয়া আসীরিয়া অঞ্চলের অনুরূপ। যদিও পরিষ্কারই বুঝা যায়, এইখানে একটি ধ্বংসাবশেষের কথা তখনও জানা ছিল, তথাপি আস-সালামিয়্যার ধ্বংসাবশেষকে ভুলক্রমেই আছূ'র নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নামের অদল-বদলের কারণ উত্তর দিকে আসীরিয়ার দুইটি বিখ্যাত রাজধানী ছিল এবং এইখানেও বাগদাদেরই অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। Pietro della Valle (১৬১৬-১৭ খৃ.) পর্যন্ত মধ্যযুগের পর্যটকগণের ধারণা ছিল, বাগদাদই প্রাচীন বেবিলন। লেয়ার্ড (Layard ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ১৬৫)-এর মতে নিমরূদের ধ্বংসাবশেষের কোণে অবস্থিত পাহাড়টিকে তখনও বলা হইত "তেল আছূ'র"।

বিস্ময়ের বিষয়, ইউরোপীয় পর্যটকগণের বিবরণের পূর্বে শার্কাত নামটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। Rich (১৮২১ খৃ.) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং Layard (১৮৪৯ খৃ.) আরও বিস্তারিতভাবে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন (পৃ. ৩)। তিনি লিখিয়াছেন, "১৮৪৬ খৃ. ১০ এপ্রিল তারিখে আমরা মাওসিল (Mosul) নগরে প্রবেশ করিলাম। সেই শহরে অল্প কয়েক দিন থাকাকালে সেই বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম ইহাই নিনেভে নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়। অশ্বারোহণে আমরা মরুভূমিতেও ভ্রমণ করিলাম এবং কালাহ শের্গাত নামে পরিচিত টিলা নিরীক্ষণ করিলাম। দিজলা ও যাব-এর সঙ্গম হইতে ৫০ মাইল নিম্নে দিজলার তীরে বিরাট ধ্বংসস্তূপটি বিদ্যমান।" তিনি ইহাকে আশুর বলিয়া চিহ্নিত করেন নাই, শুধু এইটুকু বলিয়াছেন, "বিশাল স্তূপের গোড়ায় চতুর্দিকে যে আবর্জনা জমিয়াছিল সেইগুলি অতি যত্নের সংগে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংখ্যক মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও খোদাই করা ইট পাওয়া যায় সেইগুলি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহা সেই লোকদেরই দ্বারা নির্মিত যাহারা শহরটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বর্তমানের নিমরূদ উহারই অবশিষ্ট অংশ" (পৃ. স্থা.)। কিন্তু পরে মাওসিল হইতে নৌকাযোগে বাগদাদ যাইবার সময় তিনি নদীতে নির্মিত একটি প্রাচীন বাঁধকে কেন্দ্র করিয়া রচিত লোককাহিনীতে সেই দুইটি নামের মধ্যকার যোগাযোগের কথা জানিতে পারেন "আরব লোকটি এই বাঁধটির সংগে নিমরূদের সেনাপতি আছূর কর্তৃক নির্মিত শহরের সম্বন্ধের কথা আমাকে বুঝাইয়া বলিল যাহার বিশাল ধ্বংসস্তূপ আমাদের সম্মুখেই ছিল। এই বাঁধটি ছিল শক্তিমান শিকারী সম্রাটের অপর তীরে অবস্থিত প্রাসাদে যাতায়াতের পথ। সেই প্রাসাদের স্থানটি বর্তমানে হাম্মাম আলী টিলা নামে পরিচিত (পৃ. গ্র., ৬)।" এই সকল কিংবদন্তী স্থানীয় গ্রামগুলিতে হয়ত এখনও শ্রুত হয়।

বর্তমানে স্থানটি বৃষ্টিপাত অঞ্চলের কিনারাতে অবস্থিত। কাজেই কৃষিকার্যের জন্য সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়। স্থানীয় লোকেরা প্রায়ই নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্য গ্রামের বাহিরে যাইয়া কাজ করে, তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ও তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে বিশেষ দক্ষ সহকারী হইয়া উঠিয়াছে। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী লোকদের অধিকাংশই

জুবূর গোত্রের লোক। তাহাদের গোত্রপ্রধান শায়খ উপত্যকার আরও উপরের দিকে থাকেন, প্রত্নতত্ত্বের স্থান ৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত শারকাতে একটি অট্টালিকা আছে, উহার মালিক শাম্মারদের শায়খ আজিল আল-ইয়াবির। এলাকাটিতে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৪.৮ জন, ইহা হইতে অঞ্চলটির দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইরাকের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক এলাকার নাম নাহিয়া, শার্‌কাত এইরূপ একটি নাহিয়ার সদর দফতর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এলাকাটির সাধারণ স্থান বিবরণ সংক্রান্ত বর্ণনার জন্য দ্র. (১) Admiralty, Intelligence Division, Geographical Handbook: Iraq and the Persian Gulf, London 1944; (২) R. Dussaud, Topographie Historique de la Syrie antique et medievale, Paris 1927; (৩) G. Tchalenko, Villages antiques de la Syrie du Nord, Paris 1953. প্রত্নতত্ত্বের স্থানটির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ঃ (৪) E. Unger, E. Ebeling and B. Meissner, Reallexicon der Assyriologie, Leipzig 1928, পৃ. ১৭০-৯৬। নির্ভুল ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য আরও আধুনিক গ্রন্থাদি পাঠ করা উচিত। সাধারণভাবে দ্র. (৫) I.E.S. Edwards et lii (eds.), Cambridge Ancient History, Cambridge 1973, ২খ., অধ্যায় ১ (J. R. Kupper লিখিত), অধ্যায় ২ (R.S. Drower লিখিত) ও অধ্যায় ৫ (C.J.Gadd লিখিত); আরও বিশেষভাবে (৬) D.Oates, Studies in the ancient history of Northern Iraq, London 1968. প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সরকারী রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন উল্লিখিত অন্যান্যের সঙ্গে (৭) W. Andrae, Mitteilungen der Deutschen Orient Gesellchaft, xx (1903), R.Koldewy-এর সঙ্গে) xxi, xxii, xxv (1904); xxvi, xxix (1905); xxxi, xxxiii (1906); xxxiii, xxxvi, xxxvii (J.Jordan-এর সঙ্গে) (1908); x, xlii (J.Jordan-এর সঙ্গে) (1909); xliii, xliv (1910); xlv, xlvii (1911); xlviii, xlix (1912, J. Jordan-এর সঙ্গে); li (1913, P.Maresch-এর সঙ্গে); liv (1914, H.Luhrs ও H. Lucke-এর সঙ্গে);lxi (1921; lxiii (1924); lxxi (1932, H.J. Lenzen-এর সঙ্গে); lxxii (1935) ও lxxvi (1938); (৮) Andrae ও অন্যগণ কর্তৃক অনেক প্রবন্ধ Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orientgesellschaft-এর নিম্নলিখিত খণ্ডসমূহে ঃ ১০ (১৯০৯খৃ.); ২৩ (১৯১৩ খৃ.); ২৪ (১৯১৩ খৃ.); ৩৯ (১৯২২ খৃ.); ৫৭ (H.J.Lenzen-এর সঙ্গে ১৯৩৩ খৃ.); ৫৮ (১৯৩৫ খৃ.); ৪৬ (১৯২৪ খৃ.); ৫৩ (১৯৩১ খৃ.)। (৯) সেই সিরিজে পুরাকীর্তির স্থানে আবিষ্কৃত (cuneiform) কিল কাকারে লিখিত পাঠসমূহ নিম্নলিখিত খণ্ডসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ ১৬ (১৯১১ খৃ.) ও ৩৭ (১৯২২ খৃ.) L.Messerschmidt ও O.Schroeder-কৃত; ২৮ ও ২৪ (১৯১৫-২৩ খৃ.) E.Ebeling-কৃত; ৩৫ (১৯২০ খৃ.) Schroeder-কৃত; ৬৪ (১৯৫৪ খৃ.) ও ৬৬ (১৯৫৫ খৃ.) C. Preusser-কৃত; ৬৫ (১৯৫৪ খৃ.) ও ৬৭ (১৯৫৫ খৃ.) A Haller-কৃত; ৬২ (১৯৫৬ খৃ.) F.Wetzel ও অন্যগণ কৃত। (১০) আরামী ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিসমূহ মৃৎপাত্রে (ostraca টালি জাতীয় বস্তুতে প্রথমে M.M.Lidzbarsky কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এই সিরিজ নং ৩৮ (১৯২১ খৃ.) কিন্তু (১১) H. Donner ও W.Rollig-কৃত আধুনিকতর সংস্করণ Kanaanaische und aramaische Inschriften, ২য় সংস্করণ Wiesbaden ১৯৬৯ খৃ., পাঠ ২৩৩ ও ২৩৪-৩৬ এখন ব্যবহার করা উচিত। যে সকল 'আরব ভূগোলবিদ এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন (১২) ইব্‌ন রুসতা, পৃ. ১০৪, অনু. Wiet. পৃ. ১১৫, তিনি আছূর ও মাওসিলকে অভিন্ন স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; (১৩) ইয়াকূত, ১খ., ১১৯, ১৬; ৩৪০, ৫; ১১৮, ১৮। জাযীরা আকূর-এর বিষয়ে দ্র. (১৪) ঐ লেখক, ২খ., ৭২, ১৩; ২৩১, ৯; ইহা ইক্‌লীম আছূর/আকূর, "আশুর-এর এলাকা," (যাহা একমাত্র আল-মুক'াদ্দাসী উল্লেখ করিয়াছেন, ২০, ৩; (আরও দ্র. ২৭, ১০ ও ২৮, ৭)-এর সঙ্গে মিলিয়া যায়। (জাযীরা) আকূর যে জাযীরারই প্রাচীনতর নাম সে বিষয়ে আরও দ্র. (১৩) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, ৮৬।

প্রথম দিককার পর্যটকগণের বিবরণের জন্য দ্র. (১৬) C.J. Rich, Narrative of a residence in Koordistan, লন্ডন ১৮৩৬ খৃ., ২খ., ১৩৭; (১৭) J. Ross, JRGS, ix (1839), 451-3; (১৮) W. Ainsworth, A.H. Layard ও E.L. Mitford-এর সহযোগে, JRGS, xi (1842), 4-8; (১৯) Layard, Nineveh and its remains, লন্ডন ১৮৪৯ খৃ., ২খ., ৪৫-৬৩, ২৪৫, ৫৮১; (২০) ঐ লেখক, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, লন্ডন ১৮৫৩ খৃ.; (২১) V. Place, Ninive et l'Assyrie, প্যারিস ১৮৬৭-৭০; (২১) H. Rassam, Asshur and the Land of Nimrod, নিউ ইয়র্ক ১৮৯৭ খৃ.।

M.E.J. Richardson (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

'আজ (عاج) ঃ গজদন্ত বা হাতির দাঁত।

১। নিকটপ্রাচ্যের সভ্যতাসমূহে অতি প্রারম্ভিক কাল হইতেই গজদন্তের চাহিদা ছিল। এ্যাসীরীয়রা গজদন্তের খোদাই কর্মে অত্যন্ত নিপুণতা অর্জন করিয়াছিল। নিম্‌রূদ ও অন্যান্য স্থানে খননকার্যের মাধ্যমে এমন সেরা শিল্পকর্মসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের নজীর বিরল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গজদন্ত খোদাইয়ের একটি বহুকালব্যাপী ঐতিহ্য বর্তমান ছিল এবং ইহার বিদ্যমান নমুনাসমূহ রোমক রাজত্বের শেষ শতাব্দীগুলিতে প্রতিষ্ঠিত এ্যন্টিয়ক ও আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত কেন্দ্রসমূহের সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়। সিরিয়াতে অবস্থিত কারখানাসমূহে ইসলামের পূর্ববর্তী শতাব্দীতে গজদন্ত সামগ্রী প্রস্তুত হইত, এইরূপ কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না; মিসরে এই ঐতিহ্যটি ইসলামী যুগ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে।

ইসলামী যুগে গজদন্তের সম্ভাব্য প্রধান উৎস ছিল পূর্ব আফ্রিকা। ইহা ছিল মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ গজদন্ত উৎপাদক এলাকা। ভারত হইতে ইউরোপ ও নিকট-প্রাচ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গজদন্ত রপ্তানী হইত এইরূপ সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ ভারতকে তাহার নিজ প্রয়োজনের উপযুক্ত পরিমাণ উৎপাদনে ব্যস্ত থাকিতে হইত (W. Heyd, Histoire du commerce du levant au Moyen-Age. Leipzig 1886, ii, 629-30)। যেইগুলি এখনও সংরক্ষিত আছে, মুসলিমগণের এই জাতীয় সামগ্রীসমূহ গজদন্ত হইতেই নির্মিত বলিয়া মনে হয়। সিন্ধুঘোটকের দন্ত ছোরার বাঁটরূপে ব্যবহৃত হইত (দ্র. R. Ettinghausen, The Unicorn, Washington 1950, 120ff.) এবং মিসর হইতে প্রাপ্ত কিছু হাড়ের খোদাইকার্যেরও উদাহরণ আছে।

গজদন্তের আয়তন ও আকৃতি ইহার ব্যবহারকে সাধারণত তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর আকারের বস্তু নির্মাণে এবং বৃহদাকার অলংকরণ কার্যের অংশরূপে ব্যবহারে সীমিত করে। মুসলিম আমলে সম্পূর্ণভাবে গজদন্ত নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে রহিয়াছে চৌকোণাকৃতি ও বেলুনাকৃতির ক্ষুদ্রকায় পেটিকা, চিরুনী, হাতীর দাঁতের শিঙা অথবা শিকারে ব্যবহৃত শিঙা ও দাবার গুটি অলংকরণে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ছিল গজদন্তের উপরে উচ্চতর প্রণালীতে খোদিতকরণ অথবা উহার উপরিভাগে গিল্টি বা মিনাসহ বা ব্যতীত বিভিন্ন রঙে চিত্রাংকন; কারুকার্য খচিত কাষ্ঠের আসবাবের উপরিঅংশে নানা আকৃতি-বিশিষ্ট হস্তী দন্তের খোদাইকৃত অথবা রঞ্জিত ফলক বা খণ্ডসমূহ আটকান; কঠিন কোন আবরণ দ্বারা আবৃত কাঠের সরঞ্জাম প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন আকৃতিতে কর্তিত গজদন্তের পাতসমূহ যুক্তকরণ; এবং জাফরি জাতীয় সামগ্রীর অলংকরণ এইরূপে, উহাতে বিন্দু বা ফুটকিযুক্ত সমকেন্দ্রিক বৃত্তসমূহ সংলগ্ন থাকিত যাহা কখনও কখনও রঙিন বর্ণে রঞ্জিত হইত। অবশ্য গজদন্তের গোলাকার আকৃতির অলংকরণ ও খোদাই অত্যন্ত দুর্লভ।

২। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে গজদন্ত সামগ্রীর ব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত উমায়্যা ও আব্বাসী আমলের বিভিন্ন স্থানে খননকার্যে কোন প্রকার গজদন্ত নির্মিত বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। পারস্যের সাসানী আমলের বলিয়া অনুমিত গজদন্ত সামগ্রীর সংখ্যা অতি নগণ্য এবং পারস্য ও মেসোপটেমিয়াতে গজদন্ত খোদাইয়ের নমুনার অনুপস্থিতির কারণ সম্ভবত ঐ সকল অঞ্চলে এই ঐতিহ্যের অভাব। কোলন (Cologne)-এর সেন্ট গিরিয়ন (Gereon)-এর রত্নাগারে রক্ষিত মোচার মত ঢাকনিওয়ালা নলাকৃতি বাক্সটির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী সম্ভবত ১৩৬/৭৫৩ সালের দিকে ইয়ামান-এর জনৈক গভর্নরের জন্য এডেনে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ইহার প্রযুক্তি ও পদ্ধতি মিসরীয় শ্রেণীভুক্ত (RCEA, no. 41, ill. in cott, pl, 79a)। মিসরে কিবতী কারিকরগণ একটি পুরাতন ঐতিহ্যকে সজীব রাখিয়াছিল। তাহারা বৃহৎ আয়তাকারের ফলকসমূহ নির্মাণ করিত যাহা হইত কারুকর্ম ও আবরণী অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত। এইগুলি কখনও তাবূত (শবাধার)-এর কাষ্ঠ, কখনও পুস্তকের মলাটরূপে বর্ণিত হইয়াছে, প্রথমোক্তটি অধিকতর সম্ভাব্য। মিসরে প্রাপ্ত কতিপয় নিদর্শনের রীতি হইতে মনে হয় এইগুলি নবম ও দশম শতাব্দীতে কিবতী কারিকরগণের দ্বারা নির্মিত ('আরব যাদুঘর, কায়রোতে রক্ষিত নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে দ্র. যাকী মুহাম্মাদ হাসান, Islamic Art in Egypt, 'আরবী ভাষায় ১খ., কায়রো ১৯৩৫, ফলক ৩৫; Kaiser Friedrich যাদুঘর, বার্লিন, ঐ, ফলক ৩৪ এবং F. Sarre, Islamic Bookbinding, লন্ডন ১৯২৩, ফলক ১ ও চিত্র ১ যাহাকে কুরআন-এর মলাটরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; নিউ ইয়র্ক-এর মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট-এ M.S. Dimand, A Handbook of Muhamedan art^{2}, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৭, চিত্র ৬৯)।

ফুস্তাতের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপে হাঁড় ও গজদন্তের খোদাই করা ফলকসমূহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের খোদাই রীতি দেখিয়া মনে হয়, এইগুলি ফাতিমী আমলের কাষ্ঠ খোদাইয়ের সহিত সম্পর্কিত। এইগুলিতে সামান্য উত্তোলিত কারুকার্য রহিয়াছে, যাহাতে সর্পিল অলংকরণযুক্ত পটভূমিসহ শিকারের পশ্চাতে তাড়না, পৃথকভাবে জন্তু-জানোয়ার ও মনুষ্য মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে। সম্ভবত এইগুলি ক্ষুদ্রাকার পেটিকার কাষ্ঠখণ্ড অথবা বৃহদাকার কাষ্ঠনির্মিত আসবাব স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র খণ্ড যাহা ১১শ-১২শ শতাব্দীর কর্মরূপে চিহ্নিত ('আরব মিউজিয়ামে রক্ষিত নিদর্শন, যাকী মুহাম্মাদ হাসান, কুনূযুল-ফাতিমিয়্যান, কায়রো ১৯৩৭, ফলক ৫৬; ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম-এ, M. Lenghurst, Catalogue of Carvings in Ivory, ১খ., লন্ডন ১৯২৭, ফলক ২৮; মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম-এ, Dimand, পূ. গ্র, চিত্র ৭০। খোদাইকৃত কাষ্ঠশিল্পের জন্য দ্র. E. Pausy, Les bois sculptes jusqu'a l'epoque ayyoubite (Cat. gen du Musee arabe du Caire), কায়রো ১৯৩১। আল-মাক্রীযি (খিতাত, ১খ., ৪১৪) এক প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণে খলীফা আল-মুস্তানসির-এর ধনরত্ন তালিকায় গোলাকার ও আয়তাকার উভয় প্রকার গজদন্ত নির্মিত পেটিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ ভিন্ন বর্তমানে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে অন্য কোন নিদর্শনকেই ফাতিমী মিসরের বলিয়া সনাক্ত করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত শক্তিশালী দাবিদার একটি গ্রুপের প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা হইতেছে ফেলারেন্স-এর বার্গেলো (Bargello) মিউজিয়ামের অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা প্যানেলসমূহ। সম্ভবত বিন্যাসরীতি ও বিষয়বস্তুতে এইগুলি বর্তমানে 'আরব মিউজিয়ামে রক্ষিত কালাউন-এর মারিস্তান হইতে প্রাপ্ত সুবিখ্যাত কাষ্ঠ খোদাইসমূহের সহিত সম্পর্কিত। কারুশিল্পও বিন্যাসে ইহারা ফুস্তাত-এর খণ্ড খণ্ড খোদাইকর্মকে অতি সহজেই উৎকর্ষে অতিক্রম করিয়াছে (Meisterwerke Muhammadanischer Kunst, বার্লিন ১৯১০, ৩খ., ফলক ২৫৩-তে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত)। Louvre-এ ইহার অপর একটি নিদর্শন বর্তমান, দ্র. Migeon Manuel d'Art Musulman, প্যারিস ১৯২৭, চিত্র ১৪৮ (মারিস্তান প্যানেলসমূহের জন্য দ্র. Pauty, পূ. গ্র., ফলকসমূহ,

৪৬-৫৮)। ফাতিমী যুগের বলিয়াও কথিত অপর একগুচ্ছ নিদর্শনের মধ্যে রহিয়াছে গজদন্ত নির্মিত শিঙা বা শিকারী শিঙা ও পেটিকা। ইহাদের গঠনরীতি বৈশিষ্ট্যময় এবং ইহাতে দুই তলে উচ্চ খোদাইসহ পরস্পর সংযুক্ত বৃত্তের অলংকরণ আছে। প্রতিটি বৃত্তের অন্তরে একটি পশু অথবা পাখীর চিত্র রহিয়াছে এবং পেটিকাগুলিতে মানব মূর্তিও খোদিত হইয়াছে। অলংকরণের অনুরূপ ব্যবহার মুসলিম স্পেন এবং একই সঙ্গে ফাতিমী অলংকরণ সংগ্রহে বর্তমান ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে এই ধরনের শিল্পকর্মের প্রচলন ছিল বলিয়া যে ইংগিত রহিয়াছে উহার প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ উক্ত দেশের নর্মান শাসকগণ মুসলিম কারুশিল্পিগণকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাহা ছাড়া এমন কতিপয় হাতীর দাঁতের শিল্প রহিয়াছে যেইগুলি আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্যে প্রস্তুত, কিন্তু সাধারণভাবে প্রাচ্য দেশীয় অলংকরণের অবিকল প্রতিরূপ। যদি শেষোক্ত এই সম্ভারসমূহ প্রকৃতই মিসরে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে অন্ততপক্ষে তাহা সম্ভবত পাশ্চাত্যে রপ্তানী করার লক্ষ্যে নির্মিত (দ্র. O. von Falke, Elfenbeinhorner, ৫১১-৭; তিনি মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম-এর ছয়টি শিঙা ও একটি ভগ্ন টুকরাকে এই শ্রেণীর বলিয়া মনে করেন; আরও চারটি পেটিকা, সাতটি ফলক (V. and A'Museum-এ রক্ষিত) এবং একটি গজদন্ত নির্মিত বাক্স (মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে রক্ষিত)।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, গজদন্তের উপরিভাগে আবরণ প্রদানের পদ্ধতিটি মিসরে অনুসৃত হইত। পালের্মো (Palermo)-এর Cappella Palatina-য় একটি গজদন্ত আবরণ শোভিত কাষ্ঠ নির্মিত পেটিকা মিসরীয় শিল্প বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। কারণ গঠনরীতি ও পদ্ধতির দিক দিয়া ইহা বর্তমানে আরব মিউজিয়ামে রক্ষিত এবং এদ্‌ফুতে প্রাপ্ত গজদন্ত আবৃত একটি কাষ্ঠ প্যানেল-এর ভগ্নাংশের অনুরূপ। ইহার সম্ভাব্য নির্মাণ কাল হইতেছে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যে (দ্র. Monneret de Villard, La Casetta, ফলক ১-৫; এদ্‌ফু প্যানেলটির জন্য ফলক ২৬)।

মুসলিম কারুশিল্পিগণ যখন আবরণী পদ্ধতিটি গ্রহণ করিতে আগ্রহী তখনও কিব্‌তীগণ অধিকতর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন রীতির কাষ্ঠকার্য (intarsia) পদ্ধতিকেই চালু রাখিয়াছিল। এই উভয় পদ্ধতিই দায়রুস্‌-সুর্‌য়ানী (ওয়াদী আন্‌-নাত্‌রূন-এ) মার্‌য়াম-এর গির্জা (Church of the Virgin)-র প্রধান তোরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলির নির্মাণকাল দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে (দ্র. Monneret de Villard, ফলক ২১-২৫)। কিন্তু পরবর্তী কালে আবরণী পদ্ধতিটি অতি বিরল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং প্রধানত ক্ষুদ্রকায় সামগ্রীতে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরদিকে বৃহৎ উপরিতলে কারুকার্যযুক্ত অলংকরণের জন্য আয়্যূবী ও মাম্‌লূক যুগে "ইন্‌টারসিয়া" পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১১৬৮-৯ খৃস্টাব্দে নূরুদ্‌-দীনের আদেশে আলেপ্পোতে একটি সুবিখ্যাত মিম্বার নির্মিত হয়, যাহা পরে জেরুসালেমে মসজিদুল আক্‌সাতে প্রেরিত হয়। ইহা ছিল এই প্রকারের প্রথম কর্ম, যাহাতে অলংকরণহীন অথবা খোদাইকৃত হাঁড় বা গজদন্তের ফলক কাঠের জমিনে খচিত করিয়া বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা, তারকা বা বহুর্ভুজ অঙ্কিত হইয়াছিল। ইন্‌টারসিয়া পদ্ধতির অলংকরণ মাম্‌লূক যুগের বিভিন্ন কুরসী, মিম্বার এবং দিক্কায় দৃষ্ট হয়। কাঠ ও গজদন্তের বৈপরীত্য ব্যবহৃত হইত বিমূর্ত নক্‌শাসমূহকে ফুটাইয়া তুলিতে এবং ঐ প্রভাবটিকে আরও উচ্চকিত করিতে গজদন্ত ফলকসমূহে ব্যবহৃত হইত আরবীয় নকশা (Arabesque) অথবা শৈল্পিক লিপি। মাম্‌লূকগণের পতনের পর পদ্ধতিটি তুর্কীগণ গ্রহণ করে এবং সেখানে ১৭শ শতাব্দীর বিভিন্ন প্রকার ইন্‌টারসিয়া অলংকরণযুক্ত মসজিদ-আসবাবের অতি সুন্দর নির্দশনসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। (আল-আক্‌সার মিম্বরটি চিত্রিত হইয়াছে M. van Berchem, CIA, Syrie du Nord, Jerusalem, ৩খ, নং ২৭৭ [পৃ. ৩৯৩ প., ফলক ২৯-৩০]-এ। মাম্‌লূক নির্দশনসমূহের জন্য দ্র. L. Hautcoeur and G. Wiet, Les Mosquees du Caire, প্যারিস ১৯৩২, ২খ., ফলক ১৭২-৩ ও তুর্কী দির্শনের জন্য দ্র. E. Kuhnel, Meisterwerke der Archaologischen Museen in Istanbul, ৩খ., বার্লিন-লাইপযিগ ১৯৩৮, ফলক ১৯)।

৩। এক শ্রেণীর কতিপয় গজদন্ত সামগ্রী বহুল আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে রঞ্জিত ও মিনাকৃত চিরুনি, পেটিকা ও যাজকীয় দণ্ড। এইসবের অনেক কালক্রমে মধ্যযুগের ইউরোপীয় গির্জাসমূহের কোষাগারে স্থান লাভ করে এবং তথায় পেটিকাসমূহ প্রাচীন বস্তুসমূহের আধার অথবা পবিত্র ধারকরূপে ও চিরুনিসমূহ গির্জায় গণ-প্রার্থনায় ব্যবহৃত হইত। প্রায় সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতার দাবি করিতে পারে এইরূপ একটি গ্রন্থ P. B. Cott-এর Siculo-Arabic Ivories-এ নব্বইটি বিভিন্ন সম্ভার চিত্রিত করা হইয়াছে, যাহাতে রঞ্জিত অলংকরণ এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এই সকল উদাহরণের প্রতিটিই বিশেষ কিছু সাধারণ রীতি ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানে মূল রংয়ের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই এবং এই ক্ষেত্রে Wurz burg-এর প্রখ্যাত পেটিকাটির সুসংরক্ষিত অবস্থাটি বস্তুতপক্ষে একটি ব্যতিক্রম। সাধারণত নকশাসমূহ কাল রংয়ে রূপরেখা অংকিত করিয়া পরে লাল, নীল ও সবুজ রঙের ব্যবহার পূর্ণাঙ্গভাবে রঞ্জিত করা হইত, ইহার সহিত তরল ও পাতার আকারে সোনালী রংয়ের ব্যবহার হইত। বেশ কিছু সংখক নিদর্শনের ঢাকনার কিনারায় হয় কূফী অথবা নাস্‌খ লিপিতে আরবী লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল লিপি হইতেছে মালিকের প্রতি উচ্চারিত আশীর্বাদমূলক বাণী এবং নগণ্য ক্ষেত্রে লিপির মর্মার্থ কোন প্রেম-কাব্যের অংশবিশেষ, যাহা হইতে অনুমিত হয়, এইগুলি মূলত বিবাহ উপলক্ষে গহনা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তু রাখিবার জন্য পেটিকারূপে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া অপর কতিপয় নিদর্শন রহিয়াছে যাহাতে আরবী হরফসমূহকে কেবল অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ব্যবহৃত হরফসমূহ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। দুর্ভাগ্রক্রমে বর্তমানে বিদ্যমান কোন লিপিতে তারিখ কিংবা মালিক বা প্রস্তুতকারকের নাম পাওয়া যায় নাই। সার্বিকভাবে মতৈক্যে উপনীত হওয়া যায়, রঞ্জিত গজদন্তসমূহ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর, তবুও এইগুলির

উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে মতবিরোধ থাকিয়া যায়। যদি এমন কোন উদাহরণের সন্ধান না পাওয়া যায় যাহাতে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লিপি উৎকীর্ণ আছে অথবা যদি সমসাময়িক সূত্রে কোন নির্দেশনা আবিষ্কৃত না হয়, তবে এই প্রশ্নে কোন চূড়ান্ত সমাধানে উপনীত হওয়া অসম্ভব। এইরূপ পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রমাণ হইতেছে গঠনরীতি ও পটচিত্র।

গঠনরীতি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে এই সবের উৎপত্তিস্থল পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিসর, স্পেন ও সিসিলিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সত্য, পারস্যের তথাকথিত মীনাঈ শিল্প যাহা ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৩শ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত তাহার অলংকরণের সহিত চিত্রিত গজদন্তের বাহ্যিক ও আপাতসাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সাদৃশ্যের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইতেছে অলংকরণের হালকা ও কিছুটা বিক্ষিপ্ত বিন্যাস, বিভিন্ন মূর্তির চিত্ররূপ, বিশেষত অশ্বারোহী মূর্তির চিত্র। সিরিয়ার আলংকারিক শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন মটিফের পরিবর্তিত রূপ চিত্রিত গজদন্তে পাওয়া যায়। একটি বৈশিষ্ট্যময় রঞ্জিত গজদন্তের গুচ্ছ বর্তমান, যাহার অলংকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে শৃংখলাকারে নক্ষত্র ও জ্যামিতিক নকশা। ইহা নাস্রীয় আমলের গ্রানাডায় প্রাপ্ত শিল্প কর্মের নকশার সহিত এত বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ যে, নিশ্চিতভাবে বলা চলে, এইগুলি ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে গ্রানাডার কর্মশালায় নির্মিত (Ferrandis, নং ৮৯-১০৩)। Ferrandis অবশিষ্ট শিল্পকর্মগুলির মূল সিসিলীয় বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে এইগুলির মধ্যে তিনটি স্পেনে প্রস্তুত 'নকল' উদাহরণ Cott-এ উল্লিখিত নং ৯, ৬৫ ও Cott-এর তালিকায় অনুল্লিখিত Navarre-এর Fitero-এর স্থানীয় গির্জার একটি পেটিকা, (Ferrandis, নং ২১)। অবশ্য শিল্পকর্মের এই ক্ষুদ্র ও মোটামুটি বিচ্ছিন্ন গ্রুপটি ব্যতীত সর্বাপেক্ষা নিকটতম তুলনীয় নমুনা পাওয়া যায় ফাতিমী মিসরের শিল্পকর্মে। যেমন ফুসতাত হইতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষসমূহ, কাষ্ঠ খোদাই, বিশেষত মারিস্তান ফলকসমূহ ও ফাতিমী চিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পালেরমো-এর ক্যাপ্পেল্লা পালাতিনা-এর ছাদ। অবশ্য Kuhnel (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) মত প্রকাশ করেন, এইগুলি সিরীয় ঐতিহ্য উদ্ভূত (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্পেনীয়)। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে মাদ্রিদ-এর Museo Arqueologico-তে রক্ষিত এবং প্যালেনসির Carrioncle los cenides-এ প্রাপ্ত পেটিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Ferrandis, নং ৯)। ইহা একটি আয়তাকার বাক্স, ইহার সমতল ঢাকনিতে ইনটারসিয়া পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে ইফ্রীকিয়া হইতে শাসন পরিচালনাকারী শেষ ফাতিমী সুলতান আল-মু'ইয্য-এর প্রতি একটি উৎসর্গ। একই সঙ্গে ইহাতে একটি আকর্ষণীয় তথ্য রহিয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, ইহা আল-কায়রাওয়ানের নিকটস্থ ফাতিমী রাজধানী আল-মানসূরিয়্যাতে প্রস্তুত করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার প্রস্তুতকারকের নামটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হইয়াছে, শুধু তাহার উপনাম আল-খুরাসানী অংশটি পড়া যায়। পেটিকাটিকে তাই ৩৪১/৯৫২ ও ৩৬৫/৯৭২ সালের মধ্যবর্তী কালের বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। ইহার পার্শ্বসমূহ সবুজ ও লাল স্ক্রল শিল্পের বর্ডারসহ অলংকৃত করা হইয়াছে। যদিও চিত্রকর্মটি অযত্নে সম্পাদিত এবং ইহার রীতি আলোচ্য শ্রেণীর চিত্রকর্মের সহিত বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, তবুও ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা সম্ভব, গজদন্তের উপর চিত্র অংকনের পদ্ধতি দশম শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশেই মাগ্রিবে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত ইহার প্রসার ঘটে মিসর হইতে।

তথাপি এই তথ্যের উল্লেখ করিতে হয়, এই সকল চিত্রিত গজদন্ত যে শিল্পরীতির ভাব প্রকাশ করে তাহা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিল্পরীতি সম্মত নয়। অলংকরণে আড়ম্বরহীনতা ও প্রায়শ অসাবধানী চিত্রঅংকনযুক্ত এই সকল শিল্পকর্ম আমরা ইসলামী শিল্পকলার অলংকরণে যে সাবধানী উপস্থাপনা এবং নির্ভুল ও সূক্ষ্ম চিত্রণ দেখিতে অভ্যস্ত তাহার সহিত সুস্পষ্টভাবেই বিসদৃশ। বস্তুত আরবী চিত্রলিপিসমূহ না থাকিলে ইসলামী বিশ্বের শিল্পকর্ম তালিকায় এইগুলির অন্তর্ভুক্তিকরণে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইত। এই কারণে ইহা সম্ভাব্য মনে হয়, এইগুলির উৎপত্তিস্থল ছিল এমন কোন এলাকা যাহা ইসলামী বিশ্বের দূর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। কতিপয় পেটিকাতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় চিত্রাদি (যেমন পেটিকার অলংকরণের অনুরূপ রঞ্জিত অলঙ্করণযুক্ত দুইটি যাজকীয় দণ্ড) কেবল ইউরোপীয় দেশসমূহেই পাওয়া যায় তেমন রঞ্জিত গজদন্ত ইহাই নির্দেশ করে, অন্ততপক্ষে পাশ্চাত্য বাজারের জন্যই এইগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছিল (দ্র. খৃষ্টীয় চিত্রের জন্য Cott-এর ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৪, ৮০ নং চিত্রগুলি ও যাজকীয় দণ্ডের জন্য Cott-এর নং ১৪৮, ১৪৯। Instituto de Valencia de Don Juan-এর "গ্রানাডীয়" পেটিকার উৎকীর্ণ লিপির মর্ম হইতেছে, ইহা প্রস্তুত করা হয় প্রভুর রাত্রের আহার্য পবিত্র রুটির আধাররূপে [Cott, নং ১৩৮]। সাধারণভাবে মতৈক্য রহিয়াছে, চিরুনীসমূহ গির্জার গণপ্রার্থনায় ব্যবহৃত হইত)। সম্ভবত রঞ্জিত গজদন্ত প্রস্তুতের কেন্দ্র ছিল একাধিক এবং নিকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ উৎকৃষ্ট মূল শিল্পের অনুকরণমাত্র। কিন্তু প্রমাণ সম্বলিত কোন নিদর্শন প্রাপ্তির পূর্বে এই সমস্যাটির কোন নিশ্চিত সমাধান সম্ভব নয়।

৪। মধ্যযুগীয় মুসলিম গজদন্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিদর্শন হইতেছে মুসলিম স্পেনে খোদিত গজদন্ত এবং এইগুলির মধ্যে এইরূপ কতিপয় মহৎ সৃষ্টি রহিয়াছে যাহা বায়যানটাইন ও পাশ্চাত্য গজদন্তশিল্পের নিকট-প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সৌভাগ্যবশত আমাদের হস্তে বর্ণনাযুক্ত নিদর্শনসমূহের এই পরিমাণ সংগ্রহ বিদ্যমান যাহা দ্বারা এইগুলির এক শতাব্দীর কিছু কম সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব। এই পর্যন্ত আলোচিত গজদন্ত সামগ্রীর অধিকাংশের বিপরীতে এই শ্রেণীর গজদন্ত সামগ্রী রাজকীয় অনুদান ও সহায়তায় প্রস্তুত হয় এবং এইগুলির কিছু পরিমাণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল রাজপুরুষগণের জন্য উপহাররূপে। এই যুগের প্রথমার্ধে ইহার উৎপাদন কেন্দ্র ছিল কর্ডোভায় এবং পরে তাহা মাদীনাতুয্-যাহ্রাতে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ এইসব শিল্প নিদর্শন কর্ডোভার খিলাফাতের অবক্ষয়ী যুগের সৃষ্টি। একেবারে প্রারম্ভিক যুগের স্পেনীয়-আরব গজদন্তসমূহ সম্ভবত কর্ডোভায় প্রস্তুত করা হইত এবং ইহাদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে কেবল লতা দ্বারা অলংকরণ (দ্র. Ferrandis, নং ১-৩)। মাদীনাতুয্-যাহ্রার নূতন কর্মশালার প্রারম্ভিক পর্যায়ের সমস্ত সৃষ্টি বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহার একটির অলংকরণের বিষয় যুগল পাখী ও পশু এবং এইসবের চতুপার্শ্বস্থ পুষ্প-শোভিত সোনালী অংকন, অপর একটিতে

রহিয়াছে যুগল নর্তক ও অন্যান্য বিষয় (দ্র. Ferrandis, নং ৪-৬)। স্পষ্টতই এই দুই শ্রেণীর শিল্পকর্মের শিল্পিগণ কর্ডোভার প্রধান মসজিদের খোদাই করা মার্বেল পাথরের প্যানেল ও মাদীনাতুয্-যাহ্রাতে প্রাপ্ত প্রাচীরের মার্বেল পাথরের আবরণের সহিত পরিচিত ছিল। অপর এক গুচ্ছ শিল্প নিদর্শন মাদীনাতুয্-যাহ্রার কর্মশালায় প্রস্তুত হয় যাহার শিল্পী নিজেকে খালাফ নামে স্বাক্ষরিত করিয়াছেন (Ferrandis, নং ৭-১০)। তাহার শিল্পকর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে নিউ ইয়র্কের স্পেনীয় সমিতির নিকট রক্ষিত একটি বৃত্তাকার বাক্স, তাহার নির্মাণ রীতি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময়; পাখী, পশু বা অন্যান্য মূর্তি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এবং গভীরভাবে খোদাই করা ফুল ও পাতাসমূহকে অত্যন্ত সতেজভাবে ও নিখুঁত খুঁটিনাটিসহ অংকিত করা হইয়াছে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হইতেছে মূর্তি, পশু ও অন্যান্য দৃশ্য সম্বলিত এক গুচ্ছ গজদন্ত শিল্পকর্ম। নিশ্চিতভাবে এইগুলিকে স্পেনীয় আরব-শিল্পের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উদাহরণসমূহের মধ্যে গণ্য করা উচিত। ইহাদের কেবল যে পৃথক শ্রেণীর শিল্পগুণই রহিয়াছে তাহা নয়, একই সঙ্গে এইগুলি তৎকালীন সামাজিক দলীল হিসাবে ইহাতে অংকিত দরবারের দৃশ্য, শিকারের পশ্চাদ্ধাবন ও অন্যান্য চিত্র সুমার্জিত আন্দালুসীয় সভ্যতার একটি বিরল চিত্রও সরবরাহ করে। শ্রেষ্ঠ তিনটি উদাহরণ (Ferrandis, নং ১৩, ১৪, ১৯) হইতেছে Louvre ও ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের দুইটি বেলুনাকৃতি বাক্স ও পামপ্লোনা-র প্রধান গির্জার সম্পত্তি একটি পেটিকা। বাক্সদ্বয়ের প্রথমটি ৩৫৭/৯৬৮ সালের এবং দ্বিতীয় আল-হাকাম-এর ভ্রাতা আল-মুগীরার প্রতি উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয়টি ৩৫৯/৯৭০ সালে নির্মিত এবং যিয়াদ ইব্ন আফ্লাহ্কে উৎসর্গীকৃত। পামপ্লোনার গির্জার পেটিকাটি ৩৯৯/১০০৮ সালে প্রস্তুত আল-মানসূর-এর এক পুত্রের প্রতি নিবেদিত, যাহা কর্ডোভার কর্মশালায় প্রস্তুত সামগ্রীর মধ্যে অধ্যাবধি বিদ্যমান তারিখযুক্ত উদাহরণ। এইগুলির সহিত অপর পাঁচটি কর্মও সংশ্লিষ্ট (Ferrandis, নং ১৫, ১৬, ২০, ২১, ২২)। বিভিন্ন দৃশ্যপটকে লতিবিশিষ্ট বৃত্ত, বহুর্ভুজ অথবা খিলানের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। তরুলতার অলংকরণকে এখানে পশু বা মানব মূর্তির তুলনায় নিম্নতর গুরুত্বে ব্যবহার করা হইয়াছে অর্থাৎ পশু বা মানব মূর্তিসমূহ তুলনামূলকভাবে অনেক বৃহৎ। এই সবের সুসমঞ্জস বিন্যাস প্রাকৃতিক প্রভাব সৃষ্টিতে কোন বাধা হয় নাই। অংকিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে রহিয়াছে গায়ক, সংগীতজ্ঞ ও সহচর ভৃত্যসহ স্বয়ং যুবরাজ, বাজ পাখি হাতে শিকারী অথবা শিকারের সহিত যুদ্ধরত অবস্থায় শিকারী, আর আছে মানুষ বিভিন্ন গ্রাম্য কার্য সম্পাদনে রত, যেমন খেজুর তোলার মত গ্রাম্য দৃশ্য, শিকারের সহিত সংগ্রামরত শিকারী প্রাণী; একটি ক্ষেত্রে মাত্র একটি হাতি অংকিত করা হইয়াছে। পামপ্লোনা-র পেটিকাটি ভিন্ন এই সকল সামগ্রীর কোনটিই স্বাক্ষরিত নয়, প্রথমোক্তটিতে একাধিক শিল্পীর নাম অংকিত রহিয়াছে।

কর্ডোভার খিলাফতের পতন হইলে কারিগরগণ কুয়েন্কা (Cuenca)-তে একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সেইখানে তাহারা টলেডোর শাসক যুন্-নূনীদের আশ্রয় লাভ করে এই কেন্দ্রের বর্তমান বিদ্যমান প্রাচীনতম সম্ভারটি (Ferrandis, নং ২৫) ৪১৭/১০২৬ সালে নির্মিত এবং ইহার নির্মাতা মুহাম্মাদ ইব্ন যায়্যান-এর নামের স্বাক্ষরযুক্ত। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, ৪২৭/১০৩৬ সালে ইস্মাঈল আজ-জাফির কর্তৃক টলেডো রাজ্য বিজয়ের পূর্বেই কর্মশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষ প্রামাণ্য নিদর্শনটি (নং ২৬)-র উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, কুয়েন্কা-র গভর্নর হুসামুদ্-দাওলা ইব্ন ইয়াহ্য়া আল-মা'মূন-এর প্রতি উহা উৎসর্গীকৃত। ইহা ৪৪১/১০৪৯ সালের বলিয়া নির্ণীত। ইহাতেও ইহার নির্মাতা 'আবদুর রহমান ইব্ন যায়্যান-এর স্বাক্ষর রহিয়াছে যাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়, কর্মশালাটি একই পরিবারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কুয়েন্কার গজদন্ত শিল্পসমূহ কর্ডোভীয় গজদন্তসমূহের ন্যায় সজীবতা ও সৃজনশীলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। কর্ডোভীয় মটিফসমূহ বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এইগুলির উপস্থাপনা অত্যন্ত একঘেঁয়ে। পশুচিত্র ও দৃশ্যসমূহকে লতিযুক্ত বৃত্ত বা বহুর্ভুজে আবদ্ধ করা হয় নাই, বরং চিত্রসমূহকে সমান্তরাল অথবা খাড়াভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং একই অলংকরণ অবিকলভাবে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আপাতদৃষ্টিতে উত্তরের খৃস্টান রাজ্যসমূহ গজদন্তশিল্পে অগ্রণী স্থান অধিকার করে, যদিও তাহাদের উৎপাদিত শিল্পে আন্দালুসীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। তথাপি মুসলিম স্পেনে গজদন্ত খোদাইয়ের ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় নাই। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রানাডার নাসরীয় রাজত্বের সময়কালীন অলংকারযুক্ত শিল্পের বিদ্যমান নিদর্শনসমূহে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে ছোরা ও তরবারির হাতল, যাহাতে খোদাই করা গজদন্ত আটকান হইয়াছে। এই গজদন্তে লিপিসহ পুষ্প ও জ্যামিতিক নকশাসমূহ খোদিত হইয়াছে আল্হাম্রার সম্মুখে প্রাচীরের আবরণ ও আস্তরের অনুরূপ (সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর সচিত্র বর্ণনার জন্য দ্র. L. Torres Balbas, Arte Alnohade Arte Nazari Arte Mudeiar, Ars Hispaniae, iv, চিত্র ২৫৬ B, C ও ২৫৭; অপর একটি গজদন্ত আবৃত ধনুক, চিত্র ২৫৫; কার্ডিনাল সিজনেরোজ-এর দণ্ড যাহা নাসরীয় রাজাগণের রাজদণ্ড বলিয়া কথিত, চিত্র ২৪৬; অপর দুইটি তরবারির হাতলের জন্য দ্র. Migeon, পূ. গ্র., চিত্র ১৬১। হাতল ও হাতলের অগ্রভাগের 'কানে' গজদন্ত পাত খচিত "কানযুক্ত" ছোরাসমূহকেও গ্রানাডীয় শিল্পকর্ম বলিয়া গণ্য করা হয় (দ্র. Torres Balbas, পূ. গ্র., চিত্র ২৫৬ ও B)।

৫। গজদন্ত খোদাই ছাড়া কর্ডোভা গজদন্ত আবরণী পদ্ধতিতেও সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং তাহা উমায়্যাগণের পতনের পরও অব্যাহত ছিল। মুসলিম ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ দ্বিতীয় আল-হাকাম-এর নির্দেশে প্রধান মসজিদের জন্য নির্মিত মিম্বারের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন এবং সুখ্যাতি করিয়াছেন। উল্লিখিত উদাহরণটি অথবা কয়েক বৎসর পর দ্বিতীয় হিশাম-এর আদেশে ফেয-এর মসজিদের জন্য নির্মিত মিম্বারটি বর্তমানে আর নাই। তবে প্রাপ্ত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট, এইগুলি গজদন্ত আবৃত কাষ্ঠনির্মিত প্যানেল দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই শ্রেণীর অলংকরণযুক্ত মাগরিবী মিম্বারসমূহের প্রাচীনতম অথচ জমকালো একটি নিদর্শন রক্ষিত আছে মাররাকুশ-এর কুতুবিয়্যায়। ইহাতে উৎকীর্ণ লিপির অনুসারে (দ্র. J. Sauvaget, Hesp. ১৯৪৯, ৩১৩ পৃ.) ইহা কর্ডোভায় নির্মিত হইয়াছিল

এবং ইহা আল-মুরাবিতদের আমলের নিদর্শন। কারিগরি দিক দিয়া মোজাইক হইতে ইহা উদ্ভূত, ইহার অলংকরণে রহিয়াছে বিপরীত রংয়ের কাঠ ও গজদন্ত খণ্ড দ্বারা আবৃত শৃংখলিত ফিতার ন্যায় সজ্জা; ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে খোদিত আরবী নকশার বহুভুজ বৃহৎ পুষ্প ও জ্যামিতিক নকশা ও কানির্সের নীচের অংশে খোদিত লিপি, যাহার হরফসমূহ গজদন্তের পাত দ্বারা গঠিত। এই গজদন্ত কর্মসমূহ হয় স্বাভাবিক রংয়ের অথবা চিত্রিত বিস্তৃত বর্ণনা ও চিত্রসমূহের জন্য দ্র. H. Basset ও H. Terrasse, Hesp., ১৯২৬, ১৬৮-২০৪; (Ferrandis, নং ১৫৯)। অপরাপর মিম্বারসমূহ কারিগরি দিক হইতে নিখুঁত না হইলেও সৃজনশীলতা প্রকাশ করে। প্রাচীনতমটি হইতেছে ১১৪৫ সালে আল-মুরাবিত যুগের শেষ পর্যায়ে নির্মিত ফেয-এর আল-কারাবিয়্যীন-এর মসজিদের মিম্বার। অপরাপর উদাহরণ (দ্র. Basset & Terrasse, ২৪৪-৭০; ১৬০, মার্রাকুশ-এর কাসাবা-র মসজিদের মিম্বার, তাসা মসজিদ-এর মিম্বার ১২৯২-৯৯ ও মাদরাসা বূ ইনানিয়া, ফেয -এর মিম্বার [১৩৫০-৫]। কাসাবা মিম্বারের ১৬শ শতাব্দীতে প্রস্তুত একটি প্রতিরূপ বর্তমানে মার্রাকুশ-এর আল-মাওওয়াসীন মসজিদে রহিয়াছে। স্পেনে আবৃত কর্মের বৃহদাকার সৃষ্টিসমূহের অতি নগণ্য সংখ্যক দৃষ্টান্ত বর্তমানে টিকিয়া আছে; তথাপি আলহামরা প্রাসাদের যাদুঘরে একটি ভোজনপাত্র রাখিবার আলমারির দুইটি অনিন্দ্যসুন্দর দরজা বর্তমানে সংরক্ষিত আছে (Torres Balbas, চিত্র ২৪৪-৫; Ferrandis, নং ১৬৭; অপরাপর দৃষ্টান্তসমূহ, (Torres Balbas, চিত্র ২৪৩; Ferrandis, নং ১৭২, ১৭৪)। গজদন্ত আবৃত মূর্তি চিত্র বা জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকৃত পেটিকাসমূহও সমভাবে উল্লেখযোগ্য (Ferrandis, নং ১৬১-১৬৮-৭১)। এই সকল পেটিকার সব কয়টিই স্পেনে পাওয়া গিয়াছে এবং এইগুলির অলংকরণের সহিত কতিপয় টলেডীয় আস্তর কাজের সাদৃশ্যের কারণে এইগুলিকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ও আন্দালুসিয়ায় উদ্ভূত বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। সর্বশেষে উল্লেখ করা যায়, মাদ্রিদ-এর Museo Historico Militar-এ রক্ষিত বুয়াবদিল-এর কথিত তরবারির হাতলে 'আরবীয় নকশায় অতি সূক্ষ্ম গজদন্ত আবরণীর অলংকরণ রহিয়াছে এবং তাহা গ্রানাডীয় কারিগরের শিল্প নৈপুণ্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে (দ্র. Torres Balbas, চিত্র ২৪০, ও E. Kuhnel, Maurische Kunst, বার্লিন ১৯২৪, প্লেট ১২৪। কার্ডিনাল সিজ্‌নেরোজ-এর দণ্ডটিতেও গজদন্ত আবরণী রহিয়াছে (উপরে দ্রষ্টব্য)।

৬। ইসলামী বিশ্বের গজদন্ত সামগ্রীর এই বর্ণনায় পারস্য দেশের এখন উল্লেখ অতি কদাচিৎ পাওয়া যায়। এইরূপ কোন সামগ্রী পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাকে নিশ্চিতভাবে মোঙ্গল-পূর্ব পারস্যে উদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কিন্তু কেবল এই কারণে এইরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, গজদন্তের উপর কারুকার্য করার শিল্প এই অঞ্চলে অজ্ঞাত ছিল। কারণ সমসাময়িক কালের সাহিত্যে যে সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় তাহা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত সম্ভাবনার ইংগিত দান করে (Monneret de Villard, পূ. গ্র., ২৫, আল-কাযবীনী [Wustenfeld-এর ২য়, ২৭৩] উদ্ধৃতি দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, ইসফাহান জেলার অন্তর্গত তার্ক-এর অধিবাসিগণ আবলুস কাঠ এবং গজদন্তের তৈরি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ। M. de V. মনে করেন, ইহা দ্বারা একটি স্থানীয় আবরণী শিল্পের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে)। আমরা কেবল দুর্ঘটনা ও কালের পরিবর্তনে আপতিত দুর্যোগকেই এই অনুপস্থিতির জন্য দায়ী করিতে পারি। পরবর্তী কালেও আবরণী পদ্ধতি যে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, বর্তমানে লেনিনগ্রাড-এর হার্মিটেজ মিউজিয়ামে রক্ষিত সামারকান্দ-এর গুর-ই মীর হইতে প্রাপ্ত গজদন্তের কাজ সংযুক্ত একজোড়া দরজাতে (Survey of Persian Art, ৬, প্লেট ১৪৭০) যাহা আনু. ৮০০৮/১৪০৫ সালে প্রস্তুত। ইহাদের অলংকরণ সম্পূর্ণভাবে তীমূরীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটি কলমের বাক্স (S. Lane Poole, The Art of the Saracens of Egypt, লন্ডন ১৮৮৬, চিত্র ৭২) এবং অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী কালের কতিপয় ছোরার হাতল (P. Holstein, Contribution a l'etude des armes orientales, প্যারিস ১৯৩১, ২খ., প্লেট ৬১) গজদন্ত খোদাইয়ের একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের ইংগিত দান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Diez. Bemalte Elfenbein-kastchen und Pyxiden der Isl. Kunst, Jahrbuch d. Konigl, Kunstsammlungen, 1910, 321-44; (২) E. Kuhnel, Sizilien und die Isl. Elfenbeinmalerei. Zietschr. f. Bildende Kunst, 1914, 162-70; (৩) O.V. Falke, Elfenbeinhorner, I: Agypten und Italien, Pantheon, 1929, 511-7; (৪) U. Monnert de Villard, La Cassetta incrostata della Cappella Palatina di Palermo, রোম ১৯৩৮; (৫) P.B. Cott, Siculo-Arabic Ivories, প্রিন্সটন ১৯৩৯; (৬) J. Ferrandis, Marfiles arabes de Occidente, মাদ্রিদ ১৯৩৫-৪০।

R. Pinder-Wilson (E.I.[2]) /মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আজওয়াফ (দ্র. তাসরীফ)

আল-'আজ্জাজ (العجاج) ঃ আবুশ্-শা'ছা' আব্দুল্লাহ ইব্ন রুবাঃ তামীম গোত্রীয় আরব কবি, প্রধানত বাসরাতে বসবাস করিতেন, খুব সম্ভব হযরত উছ্মান (রা)-এর খিলাফত কালে (২৩-৩৫/৬৪৪-৫৬) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৭/৭১৫ সালে মারা যান। কূফাবাসী প্রতিদ্বন্দ্বী আবুন্-নাজ্ম আল-ইজ্লী (দ্র.)-এর সঙ্গে তিনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই জানা যায়। আল-'আজ্জাজ-এর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তাঁহার কাব্যে ক্রমাগত ও একমাত্র 'রাজায' ছন্দ, মাত্রা ও খুবই গুরুগম্ভীর শব্দাবলী ব্যবহার করিতেন। এই একই বৈশিষ্ট্য তাঁহার পুত্র রুবা-র কাব্যেও লক্ষণীয় ছিল। ছন্দ প্রকরণের প্রতি নিষ্ঠাবোধ হেতু এবং কবিতাতে অস্বাভাবিক সংখ্যক শ্লোক থাকার কারণে (একটি "উর্জূযা"-তে ২২৯টি) তাঁহার রচনা

খুবই কষ্টসাধ্য হইত। জাহিলী যুগের কাসীদার ঢং-য়ে রচিত তাঁহার "আরাজীয"-এ থাকিত প্রথমে গতানুগতিক "নাসীব" (মাত্র একটি ক্ষেত্রে ইহার বদলে ধর্মীয় বিষয় বর্ণিত হয়), অতঃপর মরুভূমি ও সেখানকার জীবজন্তুর বর্ণনা (উট, ঘোড়া, বন্য গাভী, বন্য ষাঁড়) এবং কবিতার শেষাংশে কোন ব্যক্তির বা স্বয়ং কবির বা তাহার গোত্রের প্রশস্তিসূচক বর্ণনা। আল-'আজ্জাজ কখনও বিদ্রূপাত্মক কবিতা বা শোকগাঁথা রচনা করেন নাই। তিনি বহু বিখ্যাত ব্যক্তির প্রশস্তিও রচনা করেন, যথা ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া, আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান, বিশ্র ইব্ন মারওয়ান, সুলায়মান ইব্ন 'আবদুল মালিক, আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইয়ূসুফ, উমার ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন মা'মার, মুস্'আব ইব্নুয্-যুবায়র। 'আরবী সমালোচকগণ সকলেই আল-আজ্জাজ-এর কাব্যের শব্দ সম্ভারের প্রশংসা করেন। অভিধান প্রণেতাগণ প্রায়শ তাঁহার কবিতা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রাস ব্যবহারের জন্য, অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য শব্দের প্রতি অত্যধিক আসক্তির জন্য তাঁহাকে দোষও দিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-'আজ্জাজ-এর কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন (১) W. Ahlwardt, Sammlungen alter arabischer Dichter, ii; Die Diwane der Regezdichter El`aggag und Ezzafajan, Berlin 1903; (২) R. Geyer, Beitrage zur Kenntnis altarabischer Dichter, 3: al-`Ajjaj und al-Zafayan, in WZKM, 1909, 74-101; (৩) আরাজীযুল-আরাব, কায়রো হি. ১৩১৩, স্থা.; (৪) R. Geyer, Altarabische Diiamben, nos. 1-2; জীবনীমূলক বিবরণী ও কবিতার জন্য দ্র. (৫) জুমাহী, ত'াবাক'াত, কায়রো, ২১৮; (৬) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, ৩৭৪-৬; (৮) ইব্ন হাজার, ইসাবা, নং ৬৩১৬; (৯) Mash., xxiii, 439-48; (১০) O. Rescher, Abriss, i, 219; (১১) Brockelmann, S I, 90; (১২) Nallino, Scritti, vi, নির্ঘণ্ট (ফরাসী অনু. ১৫৩-৫, ১৬০-২)।

Ch. Pellat (E.I.2) /হুমায়ূন খান

আজ্দাবিয়া (اجدابية) ঃ সাইরেনাইকা (Cyrenaica)-এর শহর যাহা বারকা ও সুর্তের মধ্যবর্তী স্থানে, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ত্রিপোলীর উপকূলবর্তী পুরাতন প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত। বর্তমানে আজ্দাবিয়া বেন্গাযী জেলার অন্তর্গত। আম্র ইবনুল আস্ (রা) ২২/৬৪৩ সনে ইহাকে জয় করিয়া জিয্য়া কর আরোপ করেন। পরবর্তী তিন শতকে ইহা একটি সামরিক ঘাঁটি ও বড় বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইহা পাথরময় মরুভূমির দ্বারপ্রান্তে প্রস্তরময় ভূমির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই বোধ হয় ইহার 'আরবী নাম আজ্দাবিয়া যাহার অর্থ "অনুর্বর"। পঞ্চম/একাদশ শতকে এইখানে একটি শহর রক্ষার দুর্গ ও প্রচুর মসজিদ নির্মিত হয়। প্রায় ৩০০/৯১২-৩ সনে ফাতিমী বংশের যুবরাজ উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দীর পুত্র আবুল কাসিম অত্যন্ত সুন্দর অষ্টভুজবিশিষ্ট মিনার নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানকার শিলা পাথরের কূপগুলি ভাল পানির উৎস ছিল। তাহা ছাড়া সেখানে একটি মিঠা পানির প্রস্রবণও ছিল। শহরটি ফলের বাগান (ডুমুর, খুবানী ইত্যাদি) ও কিছু সংখ্যক খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঘরগুলি সাহারার কুসূর-এর অনুরূপ, প্রধানত খিলানযুক্ত ইট (দামূস) দ্বারা নির্মিত। পশ্চাদ্ভূমি হইতে, বিশেষত জাবাল আখ্দার (শ্যামল পর্বত) হইতে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোশ্ত, ফল, মধু, উল প্রভৃতি স্বল্পমূল্যে সরবরাহ হইত। গ্রেট সাইরতিস (Syrtis) উপসাগরের উপকূলে [যাহা পরবর্তী কালে জাওনুল-কিব্রীত (গন্ধকের উপসাগর) নামে পরিচিত] আল-মাহুর নামক (শহর হইতে ছয় মাইল দূরে) একটি ছোট পোতাশ্রয় ছিল, যাহা আজ্দাবিয়া অভিমুখী জাহাজের বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন যুগের ভৌগোলিকদের মতে এই শহর ও জেলাটির অধিবাসীরা প্রধানত লুওয়াতা বারবার শ্রেণীর (যানানা, ওয়াহীলা, মাসূসা, সীওয়া ,তাহ্লালা ইত্যাদির উপবিভাগ) অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক 'আরব দেশীয় লোকেরা, যেমন আয্দ, লাখ্ম, স'াদীফ ইত্যাদি গোত্র বিজয়ের পরে সেইখানে বসতি স্থাপন করে।

পঞ্চম/একাদশ শতকে হিলালী ও সুলামীর আক্রমণের পর হইতেই এই শহরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয় বলিয়া মনে করা হয়। পরিব্রাজকদের মধ্যে যাহারা (আল-আব্দারী, আল-আয়্যাশী, আল-ওয়ার্ছিলানী) আজ্দাবিয়া অতিক্রম করিয়া মাগ্রিব হইতে পূর্বদিকে গমন করিয়াছেন তাঁহারা উল্লেখ করেন, ইহা অনেক দিন পূর্বের একটি বিধ্বস্ত শহর। ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে কোন বৃক্ষলতা ছিল না, শুধু কতিপয় পরিত্যক্ত বসতির ভগ্নাবশেষ দেখা যাইত। তুর্কী আমলের, বিশেষত ইতালী দখলের সময়ে আজ্দাবিয়া একটি ছোট পল্লীতে পরিণত হয়, যাহা বেন্গাযী ও মিস্রাতা-র একটি মান্যিল (যাত্রাবিরতি) হিসাবে ব্যবহার করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়া'কূ'বী, বাগদাদ ১৯১৮, ১০২, অনূদিত G. Wiet, ২০৩; (২) ইব্ন রুস্তা, ৩৪৪; (৩) ইব্ন হ'াওক'াল, ৬৭; (৪) বাক্রী, ৫ (অনু. ১৬); (৫) ইয়াকূত, কায়রো, ১খ., ১২১; (৬) 'আব্দারী, রিহ্'লা (MS), ১ম খণ্ড; (৭) ওয়ার্ছিলানী, আল-জিয়ার্স ১৯০৮, ২১৯ প.।

H. H. Abdul Wahab (E.I.2) / গোলাম রব্বানী

আল-আজ্দাবী (الاجدابي) ঃ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন আহ্'মাদ আল-লুওয়াতী ভাষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের প্রণেতা (তাঁহার প্রণীত অভিধান গ্রন্থ কিফায়াতুল-মুতাহাফ্ফিজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)। আত-তিজানীর নিকট গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত কিফায়া-র কতিপয় অনুলিপি সংরক্ষিত ছিল (আল-আজ্দাবী তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন)। আল-আজ্দাবী ৫ম/১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিপোলীতে বাস করিতেন। তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্মৃতিসৌধ এখনও সেইখানে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকৃ'ত, ১খ., ১৩১; (২) ঐ লেখক, ইরশাদ, ১খ., ৪৭; (৩) সুয়ূত'ী, বুগ্'য়া, ১৭৮; (৪) তিজানী, রিহ্লা, তিউনিস ১৯২৭, ১৮৮ প.; (৫) Brockelmann, I. 375, S I 541.

H. H. Abdul Wahab (E.I.2) /মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন

আজনাদায়ন (اجنادين) ঃ মুসলিম সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তীনের গ্রীক অধিবাসিগণের মধ্যে জুমাদা উলা বা ছানিয়া ১৩/জুলাই-আগস্ট ৬৩৪

সালে যেই স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহারই প্রচলিত নাম আজনাদায়ন। সাহিত্য সূত্রসমূহে এই যুদ্ধের স্থান রাম্‌লা এবং বায়ত জিবরীনের মধ্যস্থলে বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও ভৌগোলিকগণ এই নামের কোন স্থানের কথা সমর্থন করেন না। ভূবৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনা করিয়া Miednikoff মনে করেন, এই যুদ্ধের স্থান ছিল ওয়াদিউস্-সামত ময়দান যাহা আল-জান্নাবা-র দুইটি গ্রাম (গারবিয়্যা ও শারকিয়্যা)-এর সন্নিহিত ৩৪° ৫৭ পূর্ব অক্ষাংশ ও ৩০° ৪২ উত্তর দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আল-জান্নাবা-র দ্বিবচনের রূপ (আল-জান্নাবাতায়ন) হইতে আরবী বহুবচন "আজনাদ" (সেনাবাহিনী)-এর সংমিশ্রণে বর্তমানে প্রচলিত নামটির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রীক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোরাস। প্রাথমিক যুগের কোন কোন 'আরব ঐতিহাসিক জনৈক আরতায়ূন (?) Aratyun=Aretion)-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আরব বাহিনী গঠিত হইয়াছিল ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দানে যুদ্ধরত তিনটি বিভিন্ন সেনাদলের সমবায়ে (দ্র. আবূ বাক্‌র) এবং সাময়িকভাবে একত্রীভূত এই বাহিনী পরিচালনা করেন (খুব সম্ভব) খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালদ (দ্র.), যিনি তিন মাস আগে ফুরাত (ইউফ্রেটিস) হইতে সিরিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। (অপর একটি কম সমর্থিত মত অনুসারে সম্মিলিত বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন 'আমর ইব্‌নুল 'আস্)। এই যুদ্ধে প্রতি পক্ষেরই সৈন্যসংখ্যা সম্ভবত ১০,০০০-এরও (?) কম ছিল। যুদ্ধে গ্রীক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া দামিশ্‌ক-এ পশ্চাদপসরণ করে। ফলে সমগ্র ফিলিস্তীন মুসলমানগণের করতলগত হয়। যুদ্ধ শেষে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী পুনরায় পূর্বের ন্যায় বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু ছয় মাস পরে গ্রীক বাহিনী আবার ফিহ্‌ল-এ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিলে তখন এই তিন বাহিনী পুনরায় সম্মিলিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Caetani, Annali, iii, 13-81 (A.H. 13, 7-66): তথ্যাদির উৎস ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা ; (২) উহার সংক্ষিপ্তসার C.H. Becker, Camb. Med. Hist., ii, 341-2 (=Islamstudien, i, 81-2)।

H.A.R. Gibb (E.I.[2]) /হুমায়ুন খান

আজ্‌ফারী (أظفرى) ঃ মুহাম্মাদ জ'হীরু'দ-দীন মীর্‌যা 'আলী বাখ্‌ত বাহাদুর গুরগানী, মুগল সম্রাট আওরঙ্গযেবের পুত্রপরম্পরা বংশধর ও 'ইফ্‌ফাত আরা বেগমের পৌত্র। আজ'ফারী শাহ আলম ১ম বাহাদুর শাহ্-এর পুত্র। 'ইফ্‌ফাত আরা বেগম মুহাম্মাদ মু'ইয্‌যুদ্-দীন বাদশাহ (জাহান্দারা শাহ)-এর কন্যা। আজ্‌ফারী ১১৭২/১৭৫৮ সনে দিল্লীর লাল কেল্লায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই শিক্ষা লাভ করেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মুগল বংশের অন্যান্য যুবরাজের ন্যায় আজ'ফারীও ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী হইতে একটি ভাতা পাইতেন। ১২০২/১৭৮৯ সনে আজ্‌ফারী দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জয়পুর ও যোধপুর হইয়া তিনি লক্ষ্মৌ উপস্থিত হন, যেথায় অযোধ্যার শাসনকর্তা আস'াফুদ্-দাওলা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি সাত বৎসর যাবৎ সেখানে অবস্থানের পর লক্ষ্মৌ হইতে মাক্‌সূদাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ) গমনের উদ্দেশে পাটনার পথে রওয়ানা হন। অবশেষে ১২১১/১৭৯৭ সনে মাকসুদাবাদে পৌঁছেন। প্রায় দশ বৎসর তথায় অবস্থান করিবার পর তিনি মাদ্রাজ গমন করেন এবং ১২৩৪/১৮১৮ সনে ইন্তিকাল হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন।

আজ্‌ফারী বহুভাষিক ছিলেন। তিনি 'আরবী, ফার্‌সী, তুর্কী ও উর্দূ ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি কিছু ইংরেজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, ছন্দশাস্ত্র ও সংগীতেও তাঁহার সম্যক জ্ঞান ছিল। তবে সমধিক ঝোঁক ছিল কবিতার প্রতি। একটি উর্দূ দীওয়ান (কাব্য সংকলন) ব্যতীত তিনি বেশ কিছু ফার্‌সী ও তুর্কী কবিতার একটি বৃহৎ সংগ্রহ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত কবিতার সংগ্রহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত (memoirs)-এর শেষভাগে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি বিলুপ্ত (দ্র. a Caghatay grammar, Tenkari-Tar-a Turkish-Hindi Compilation)।

রচনাবলী ঃ আজ্‌ফারীর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ওয়াকি'আত-ই আজ্‌'ফারী' বা আজ্‌ফারীর ঘটনাবলী (MSS Beriln 496, Rieu. iii, 1051 b; Madras, i, 450, 451)। ১২১১/১৭৯৭ সনে মুর্শিদাবাদে ইহার রচনা শুরু হয় এবং ১২২১/১৮০৬ সনে মাদ্রাজে সমাপ্ত হয়। দেশ ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা ব্যতীত গুলাম কাদির রোহিলা (দ্র.)-এর স্বল্পকালীন বিদ্রোহ সম্পর্কে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গুলাম কাদির রোহিলা ১২০৩/১৭৮৮ সনে দিল্লী অধিকার করিয়া বাদশাহ সম্রাট ১ম শাহ 'আলামকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এই গ্রন্থের ভৌগোলিক গুরুত্বও যথেষ্ট। কামার হুসায়ন মাহ্‌বী এই গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করেন, যাহা ১৯৩৭ সনে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। গ্রন্থটির শেষাংশে আজ্‌ফারী তাঁহার নিম্নলিখিত রচনাবলীর তালিকা প্রদান করিয়াছেন ঃ (১) লুগ'াত-ই তুর্কী-ই চাগাতাঈ (লক্ষ্মৌ অবস্থানকালে সংকলিত), (২) নুস্‌খা-ই সানিহাত (১২২১ হিজরীতে সমাপ্ত। ইহাতে ১০৯টি ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, অধিকাংশই লেখকের অভিজ্ঞতা সম্বলিত), (৩) মার্‌গূবুল ফুআদ ছন্দোবদ্ধ গদ্যে মীর 'আলী শীরনাওয়াঈ (দ্র.)-র তুর্কী গ্রন্থ মাহ্‌বূবুল কু'লূব-এর ফারসী অনুবাদ (১২০৮/১৭৯৩)। ইহার একটি কপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; বিষয়বস্তুর জন্য দ্র. ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর, আগস্ট ১৯৩৫, পৃ. ৪১-৪৮। মূল গ্রন্থ মাহ্‌বূবুল কু'লূব-এর একটি চমৎকার কপিও উক্ত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (ফিহ্‌রিস্‌ত-ই আযার, পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮১)। (৪) মীযান-ই তুর্কী, লেখকের স্বহস্তে লিখিত কপির জন্য দ্র. পি. পি. শাস্ত্রী ঃ A Descriptive Catalogue of the Islamic MSS in the Govt. Oriental MSS Library, Madras, মাদ্রাজ ১৯০৭ খৃ.; সম্ভবত ইহা সেই পুস্তিকা যাহার উল্লেখ ওয়াকি'আত-ই আজ'ফারী (উর্দূ), পৃ. ১৯৫, সংখ্যা ১-এ করা হইয়াছে, (৫) তাংগরী তার (৬৫০ শ্লোক), 'খালিক বারী'-র পদ্ধতিতে বিন্যস্ত একটি তুর্কী হিন্দী সংকলন, যাহা ভুলক্রমে আমীর খুসরূর প্রতি আরোপিত হইয়াছে, (৬) ফাওয়াইদুল মুব্‌তাদী, আমাদ নামাহ্-র পদ্ধতিতে অর্থাৎ ইহাতে ক্রিয়ার রূপান্তরসমূহ দেখান হইয়াছে, (৭) নিসাব-ই তুর্কী ২৫২টি শ্লোক, (৮) ফাওয়াইদুল আতফাল, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কি'ল্‌'আ-ই মুআল্লা

নামক স্থানে রচিত, (৯) রিসালা-ই কাব্রিয়্যা, মৃত্যুর লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে যাহা বুক্রাত (Hippocrates) কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত একখানি 'আরবী অনুবাদ পুস্তিকার ছন্দোবদ্ধ ফারসী অনুবাদ, হাকীম হাসান রিদ'া খান-এর নির্দেশে অনূদিত , (১০) আরূদ যাদাহ্, পদ্যের নিয়মাবলী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, ১১৯৮ হিজরীতে রচিত, ইহার একটি কপি পা াব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে, (১১) দীওয়ান, উর্দূ গাযাল (প্রাচীন) কি'ল্'আ-ই মু'আল্লা নামক স্থানে সংকলিত এবং বর্তমানে বিলুপ্ত; (১২) দীওয়ান, উর্দূ; মাদ্রাজে সংকলিত, ইহাতে প্রায় ১১২টি গাযাল, ভূমিকা ও পার্শ্বটীকা রহিয়াছে, মুদ্রণ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, (১৩) দীওয়ান, ফারসী, তুর্কী ও রীখ্তাহ্, দিল্লীর কিল্লায় রচিত, (১৪) লুগাত-ই তুর্কী-ই চাগাতাঈ বা ফারহাংগ-ই আজ্'ফারী, লক্ষ্ণৌতে এক বৎসরে রচনা করেন। ইহাতে তুর্কী ভাষা সম্পর্কে সহজ ভাষায় নূতন ব্যাকরণের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সম্ভবত ইহা বর্তমানে বিলুপ্ত (দ্র. রিসালা-ই উরদূ, এপ্রিল ১৯৪০, পৃ. ২১১-২১২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ গাওছ খান, সু'বৃহ্'-ইওয়াতান, মাদ্রাজ ১২৫৮/১৮৪২, ৩৫; (২) Garcin de Tassy, Hist. De la litt. Hindouie et Hindoustanie, প্যারিস ১৮৭০, ১খ., ২৬৫; (৩) Elliot and Dowson, History of India as Told by its Historians, ৮খ., ২৩৪; (৪) A. Sprenger, Oudh Cat. ২০৮; (৫) ফারসী গ্রন্থ তালিকা নং ৪৯৬, বার্লিন; (৬) সাবাহুদ্-দীন আবদুর রাহ'মান, বায্ম-ই তীমূরিয়্যা (উর্দূ), আ'জ'ামগড় ১৯৪৮, পৃ. ৪২৬-২৭; (৭) Storey, পৃ. ৬৪২-৪৩, ১৩২২; (৮) ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর ১১সং., নং ৪ (আগস্ট ১৯৩৫), পৃ. ৪১-৪৮; (৯) ওয়াকি' আত-ই আজ'ফারী, উর্দূ অনু. আবদুস্-সাত্তার, মাদ্রাজ ১৯৩৭ খৃ.; (১০) শ্রী রাম দেহ্লাবী, খাম্খানা-ই জাবীদ, ১খ., ৩৩১; (১১) গুলাম গাওছ খান উরফে আজাম, গুল্যার-ই আ'জ'াম, মাদ্রাজ ১২৭২ হি.; (১২) মুহাম্মাদ কারীম খায়রুদ্দীন হাসান গুলাম দামিন ইব্ন ইফ্তিখারুদ্-দাওলা, সাওয়ানিহাত-ই মুমতায (১২৫২ হি.), সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, হায়দরাবাদ-এর পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩৩২-৩৩৭; (১৩) উর্দূ আন্জুমান-ই তারাক্কী-ই উর্দূ, এপ্রিল ১৯৪০, পৃ. ১৭১-২২১ (মুহাম্মাদ হুসায়ন মাহবী-র নিবন্ধ); (১৪) যুল-ফিকার আলী খান সাফা, মুনাজারা-ই সাফা ও ফায়্যাদী (সালার জাংগ গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য; (১৫) মুনাওওয়ার মুহাম্মাদ বাহাদুর গাওহার, সুখুনওয়ারান-ই বুলান্দ ফিক্র, মাদ্রাজ ১৩৫২/১৯৩৩; (১৬) আজ্ফারী, দীওয়ান-ই আজ্ফারী, উর্দূ পাণ্ডুলিপি নং ১১১২ (সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য)।

এ. এস. বায্মী আনসারী ও
সাখাওয়াত মির্যা (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান

আজমগড় (اعظم گڑھ) ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের জেলা শহর, ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। ২৬°৫' উ. অক্ষাংশ ও ৮৩°১২' পূ. দ্রাঘিমায় তূনস নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি উহার ধ্বংসাত্মক বন্যার জন্য প্রসিদ্ধ। ১০৭৬/১৬৬৫-৬ সালে এক প্রভাবশালী রাজপুত পরিবারের জনৈক সদস্য ১ম আজাম খান কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। এই পরিবারের প্রধান সদস্য অভিমান সিংহ বাদশাহ সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বকালে (১০১৪/১৬০৫— ১০৩৭/১৬২৭) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম রাখা হয় দাওলাত খান। শহরটির লোকসংখ্যা (১৯৫১ খৃ.) ২৬,৬৩২ ও জেলার লোকসংখ্যা ২১,০২,৪২৩। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লইয়া ১ম আজাম খানের উত্তরাধিকারিগণ ও অযোধ্যার নওয়াবের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে ১১৭৫/১৭৬১-৬২ সালে জৌনপুরের যুদ্ধে আজমগড়ের রাজা ও নিজামাবাদ (অযোধ্যা)-এর তহ্সীলদার (আমিল) উভয়েই নিহত হন। অতঃপর গাযীপুরের শাসনকর্তা ফাদ্'ল-ই আলী খান আজমগড় দখল করেন। ১১৭৮/১৭৬৪-৬৫ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাদশাহ শুজা'উ'দ্-দাওলা বৃটিশ কর্তৃক পরাজিত হইলে ২য় আ'জ'াম খান তাঁহার পৈত্রিক জায়গীর পুনরায় লাভ করেন, কিন্তু ১১৮৫/১৭৭১-২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ জায়গীরটি অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ১২১৬/১৮০১-২ সালে সা'আদাত আলী ইহাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সমর্পণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আজমগড়ে ভয়ানক গোলযোগ বিরাজমান ছিল— সিপাহীরা স্থানীয় জেলখানা আক্রমণ করিয়া কয়েদীদেরকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

আজমগড়ের উল্লেখযোগ্য বস্তু হইতেছে মাত্র দুইটি ঃ ১ম আ'জ'াম খান কর্তৃক নির্মিত নদীবন্দর ও দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত মন্দির। তূন্স নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া আজমগড়ে প্রায়ই ধ্বংসাত্মক বন্যা হয় এবং ইহার ফলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৭১, ১৮৯৪, ১৮৯৬, ১৮৯৮ ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের বন্যা বিশেষভাবে ধ্বংসাত্মক ছিল বলিয়া আজমগড়ের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

আজমগড়ে ঘন ঘন হিন্দু-মুসলিম দাংগা হয় বলিয়া ইহার দুর্নাম আছে। আবার মুসলিম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্যও ইহার খ্যাতি কম নহে। বিখ্যাত দারুল্ মুসান্নিফীন (শিব্লী একাডেমী) এইখানেই অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের মাসিক উর্দূ পত্রিকা 'মাআরিফ' এইখান হইতেই প্রকাশিত হয়। ইসলামী গ্রন্থাবলী মুদ্রণের উপযোগী বেশ কয়েকটি উন্নত মানের ছাপাখানা এখানে বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Azamgarh District Gazetteer, ১৯৩৫, ৩৯ প.; (২) Imp. Gazetteer of Ind., ১৯০৮, ৬খ., ১৫৫-৬, ১২৬-৩; (৩) সাবাহুদ্দীন আবদুর রাহমান, A History of A`zamgarh; (৪) সুলায়মান নাদবী, হায়াত-ই শিব্লী, আজমগড় ১৩২৬/১৯৪৩, পৃ. ৫০-৫৫।

ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আজমল খান (اجمل خان) ঃ হাকীম মাসীহুল মুল্ক (খৃ. ১৮৬৩-১৯২৭), হিন্দুস্তানের নামযাদা ইয়ূনানী বা হাকীমী চিকিৎসক। তিনি দিল্লীর এক ঐতিহ্যবাহী হাকীম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুহাম্মাদ খান। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ মধ্যএশিয়ার কাশগড় হইতে বাবুর বাদশাহের সঙ্গে ভারতে আসিয়া দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন (১৫২৬ খৃ.)। মক্তব-মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিয়া তিনি 'আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা করেন এবং তৎপর তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও তিব্ব্ বা ইয়ূনানী চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত

করেন। স্পেনের বিখ্যাত ইব্ন যুহ্র পরিবারের ন্যায় এই পরিবারের পুরুষ পরম্পরায় অনেক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার পিতা ও প্রপিতামহরাও ছিলেন মশহুর হাকীম। তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণ করিয়া আজমল খান একজন কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ চিকিৎসকে পরিণত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল মাজীদ খান প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর তিব্বিয়া মাদ্রাসায় (বর্তমানে কলেজ) তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। অবসর সময়ে তিনি রোগীদের চিকিৎসাও করিতেন। শীঘ্রই দক্ষ হাকীম হিসাবে তাঁহার সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার সুখ্যাতি শ্রবণে রামপুরের তদানীন্তন নওয়াব তাঁহাকে নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। প্রায় এগার বৎসর (১৮৯২-১৯০২) তিনি এই পদে যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। অতঃপর তিনি ইরাক সফর করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক বৎসর তিনি উপরিউক্ত তিব্বিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায়ও চালাইতে থাকেন। ইহাতে তিনি এত নৈপুণ্য ও খ্যাতি লাভ করেন যে, বিদেশ হইতেও তাঁহার নিকট জটিল রোগী আসিত। তিনি দরিদ্র রোগীদেরকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিতেন এবং প্রয়োজন বোধে তাহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র না দিয়া পথ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও উৎসাহ বাক্য বলিয়া রোগীর মনোবল সঞ্চার করত রোগ আরোগ্য করিতেন।

অতঃপর তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে বহির্গত হন (১৯১১)। তিনি বিলাতে সম্রাট ৫ম জর্জের অভিষেকোৎসবেও শরীক হইয়াছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া তিনি রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁহাকে কংগ্রেস মহলে জনপ্রিয় করিয়া তোলে। ১৯১৮ সনে তিনি দিল্লী অধিবেশনে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) তুরস্ক পরাজিত হইলে বিজয়ী মিত্রশক্তি তুর্কী সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা করে। ইহার প্রতিবাদে ভারতে খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি তাহাতে যোগদান করেন। ইংল্যান্ড সেভার্স চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলে আজমল খান মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন (১৯২০)। কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় (১৯২১)। তিনি ঐ বৎসর খেলাফত কনফারেন্সেও সভাপতিত্ব করেন। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণেও তিনি অতি তৎপর ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং আলীগড় এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ ও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২৪ সালে তিনি 'আরবদেশ ও ১৯২৭ সালে আবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামপুর রাজ্যে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন একজন স্বদেশপ্রেমী, উদারচিত্ত, দরিদ্র-দরদী, সদাশয় ও সদালাপী ব্যক্তি। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে ভারতের সেরা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান গৌরবময় হইলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব হইল পাশ্চাত্যের এলোপ্যাথী চিকিৎসার মুকাবিলায় ভারতে মৃতপ্রায় ইয়ূনানী চিকিৎসা পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন। তিনি ইয়ূনানী চিকিৎসাশাস্ত্রে ও ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬।

ড. এম. আবদুল কাদের

'আজ্মাতুল্লাহ খান (عظمت الله خان) ঃ জ. দিল্লীতে, ১ জানুয়ারী, ১৮৮৮; মৃ. মাদ্রাজের মাদান পল্লীতে, জুলাই ১৯২৭, দিল্লীর আলিম সমাজের এক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। শাহ আবদুল-আযীযের খলীফা মাওলাবী রাশীদুদ্-দীন খান-এর পৌত্রী তাঁহার মাতা। তাঁহার পিতা নি'মাতুল্লাহ খান স্যার সায়্যিদ আহমাদ খানের নিকটাত্মীয়। সালার জঙ্গ তাঁহার মাতামহ মাওলাবী মুআয়্যিদুদ্-দীনকে হায়দরাবাদে ডাকিয়া পাঠান এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব নিযুক্ত করেন। তাঁহার পিতার সহিত পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহাকে হায়দরাবাদ গমন করিতে হইয়াছিল। গৃহেই তিনি কুরআন শারীফ ও ফার্সীর প্রাথমিক পুস্তকাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহার মাতার জন্য আজীবন (মাসিক?) এক শত টাকা হারে এবং তাঁহার নিজের জন্য শিক্ষা সমাপ্তি পর্যন্ত ঐ হারে ভাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। পরে নাওয়াব সারওয়ার জঙ্গ তাঁহাকে আজমীরে ডাকিয়া আনেন এবং তথায় তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হায়দরাবাদে তিনি প্রথমে রেসিডেন্সি স্কুলে এবং পরে সরকারী স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি আজমীর কলেজ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) হইতে বি.এ.পাশ করেন। কিন্তু সার্ওয়ারী ও ডক্টর 'আবদুল ওয়াহিদ-এর বর্ণনামতে আলীগড়ে তাঁহার উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং এইখানেই তিনি ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (জাদীদ উর্দূ শাইরী, পৃ. ২৯২; জাদীদ শু'আরা-ই উর্দূ, পৃ. ৪০৯)। কিন্তু ইহা সঠিক মনে হয় না। ইহার পর তিনি হায়দরাবাদ প্রত্যাবর্তন করিয়া পাঁচ/ছয় বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। দিল্লীতে তিনি বিবাহ করেন এবং সেইখানে তিনি হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুকাল এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। অতঃপর নাওয়াব মাস্‌উদ জঙ্গ-এর শাসনামলে তিনি শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন। হায়দরাবাদে শিক্ষার প্রসার ও বিন্যাসে, 'উছ্মানী বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুত্-তারজামা (অনুবাদ সংস্থা) ও দারুত-তাব্' (প্রকাশনা সংস্থা)-এর প্রতিষ্ঠায় তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত হায়দরাবাদের অনেক নামকরা সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস ও দিশারী। মির্যা ফারহাতুল্লাহ বেগ, আম্‌জাদ হায়দরাবাদী ও সায়্যিদ ওয়াযীর হাসান-এর মত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেন। মাদ'মীন-ই ফার্হ'াত নামক গ্রন্থটি তাঁহারই উৎসাহে ও উপদেশে রচিত হইয়াছিল।

তাঁহার শেষ জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া তিনি জুলাই ১৯২৭-এ ইন্তিকাল করেন। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে গভীর ও স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। উর্দূ সাহিত্যের বিবর্তনমূলক কর্মতৎপরতার অধ্যয়ন তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ব্যতীত

সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কাব্য-সাহিত্য ও মীর দার্দ সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধগুলি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মতে কবি হিসাবে মীর দার্দের মর্যাদা অনেক উচ্চে। কারণ তিনি সসীমে অসীমের অনুপ্রবেশ ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি গাযালের স্থলে স্বাধীন ও ধারাবাহিকভাবে কল্পনা ও চিন্তাধারার প্রকাশের জন্য সুকুমার ও নবীন পদ্ধতিসমূহের প্রবর্তনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে উর্দূ কবিতায় তিনি এক নূতন ধারার আবির্ভাব ঘটান যাহা তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা হইতে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। কবিতার এই নবশৈলীর প্রাথমিক চিত্রসমূহ তিনি ইংরেজ কবিদের কাব্যকর্মে ও হিন্দী ছন্দ প্রকরণে লক্ষ্য করেন। তাঁহার মতে ইংরেজ কবিদের ন্যায় উর্দূ কবিদেরও স্বস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী নূতন নূতর ছন্দ সৃষ্টি করা উচিৎ এবং গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হিন্দী কবিতা-কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া উর্দূ ছন্দশাস্ত্র পুনর্গঠিত হওয়া উচিৎ। আরবীর যেই সকল ছন্দ উর্দূ কবিতার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সেইগুলি রাখা যাইতে পারে। উর্দূর নূতন ছন্দশাস্ত্র ইংরেজী ছন্দশাস্ত্রের সেই সকল মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠন করা সমীচীন যেইগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য বন্ধনমুক্তি। বর্তমানে উর্দূ কবিতার গঠন-পদ্ধতি লইয়া যেই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে, তিনিই উহার পথনির্দেশ করিয়াছেন। "প্রকৃতপক্ষে গঠন-পদ্ধতির দিক দিয়া উর্দূ কবিতার বর্তমান যুগ 'আজ্'মাতেরই যুগ (মাস্'উদ হুসায়ন খান)"। মাওলানা হালী-র পরে স্বাভাবিকভাবে আরও কয়েকজন সাহিত্য সমালোচক জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু হালী ও টি. এস. ইলিয়টের ন্যায় একমাত্র 'আজ্'মাতই ছিলেন কার্যকর ও গঠনমূলক সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভাবক। ফলে 'আজ্'মাতই হালীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

'আজ্'মাত নিজস্ব সমালোচনামূলক চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া আধুনিক কাব্যের কতক মূল্যবান নিদর্শনও উপস্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কিছু হইল ইংরেজী কবিতার অনুবাদ এবং কিছু হইল তাঁহার মৌলিক রচনা। অনুবাদে কোথাও কোথাও তিনি নিশ্চয় সফল হইয়াছেন, কিন্তু আল-আহ্মাদ সুরূর-এর ভাষায় এইগুলি ছিল এক ধরনের মানসিক অনুশীলন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মানের কবিতার অনুবাদ সম্ভব নয়। কারণ উহার প্রাণ হইল শব্দসম্ভার যাহাতে কল্পনা ও অনুভূতির এক জগত বিদ্যমান এবং যাহা বিভিন্ন মর্মের ধারকও। এইরূপ কবিতার সফল অনুবাদ অসম্ভব। অপরপক্ষে 'আজ্'মাতের স্বরচিত কবিতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। পরিবেশের ভাল-মন্দের চিত্র, উর্দূ-হিন্দী সংমিশ্রণ, "সহজ-মধুর সুখ-দুঃখ" তাঁহার কবিতার মূল বিষয়বস্তু। 'আজ্'মাতের কবিতার বিশেষ বিষয়বস্তু নারীর অসহায়তা, পরিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক কথাবার্তা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, দেশপ্রেম ও সামাজিক ঘটনাবলী। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গানের একটি নুমনা -

مجھے پیت کا پان کوئی پھل نہ ملا-مرے حسن کے لیے
کیوں مرے وہ ھون پھول جسکا نھل لچین ھے

"প্রেমের আমি পাই নাই কোন সুফল
কেন সে মজিয়াছে আমার সৌন্দর্যে?
আমি এমন ফুল যাহার নাই কোন ফল।"

কবিতায় যেসব বিষয় থাকা 'আজ্'মাতের নিকট প্রয়োজন সেই সবই তাঁহার কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার প্রথম গানটিই তাঁহার কাব্য প্রতিভার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। কবিত্ব সম্পর্কে তাঁহার প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও মর্মার্থের বিবেচনায় তাঁহার কাব্য অঙ্গন খুব বেশি প্রশস্ত নয়, কিন্তু উহার সীমানাসমূহ তাঁহার শৈল্পিক উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত। ফলে তাঁহার গানগুলিতে ভারসাম্য রহিয়াছে এবং সেইগুলির ভাষা ও সুরে কোথাও তিক্ততা নাই।

'আজ্'মাতের বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলিয়া উহা সাহিত্যে খুবই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এইগুলি তাঁহার প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল অংশও বটে। এইগুলি তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিদ্রূপ, কৌতুক ও হাস্যরসের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন এবং এইভাবে উর্দূ সাহিত্যে তিনি এক নূতন ধারার প্রবর্তনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গদ্যে ভারসাম্য ও মাধুর্যের অভাব রহিয়াছে। অবশ্য উহাতে দিল্লীতে প্রচলিত উর্দূ বাগধারায় সুন্দর নিদর্শন কোথাও কোথাও নিশ্চয় পাওয়া যায়।

তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঃ ১। সুরীলে বোল سریلے بول (কবিতা সংগ্রহ), মুদ্রণ আজাম স্টীম প্রেস, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪০, ঐ গ্রন্থ কিছু সংযোজন ও পরিবর্তনসহ, তা. বি.; ২। মাদামীন-ই 'আজ্'মাত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; ৩। মন্ চলে (من چلے), মুদ্রণ, নাকীব প্রেস, বাদায়ূন ১৯২০; ৪। রূহ্'-ই জাপান, স্যার রাস মাসউদ-এর সাফার নামাহ'-ই জাপান-এর অনুবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪৫ হি.; ৫। নাটক; শা'ইর কা ড্রামা (شاعر کا ڈراما) পুস্তকাকারে নহে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাস্'উদ হুসায়ন খান, নায়া 'আরূদ' আওর 'আজ্'মাতুল্লাহ খান (প্রবন্ধ); (২) সুরীলে বোল (سریلے بول), দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ২৭-৪৭; (৩) রিয়াদুদ্-দীন, শু'লাহ-ই মুসুতাজাল (شعلۂ مستجل), প্রবন্ধ, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৫-৬৬; (৪) 'আলী আসাদ, খাও বানাম-ই সায়্যিদ যাকির ই'জায, ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০; (৫) আল-ই আহ্মাদ সুরূর, নায়ে আওর পুরানে চিরাগ' (نئے اور پرانے چراغ), তৃতীয় মুদ্রণ, লক্ষ্ণৌ ১৯৫৫, পৃ. ৩৪৯-৬৩; (৬) তান্ক'ীদী ইশারে, দ্বিতীয় মুদ্রণ, লক্ষ্ণৌ ১৯৪৯, পৃ. ১৯৩; (৭) নাসীরুদ্-দীন হাশিমী, দাকান মে উর্দূ (دکن میں اردو), তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৩৬, পৃ. ৪৪৪।

সায়্যিদ যাকির ই'জায (দা.মা.ই.)/ এ.টি. এম. মুছলেহউদ্দীন

আজ্মাদ ইবন 'উজ্য়ান (اجمد بن عجين) ঃ আল-হাম্দানী, তিনি তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উমার (রা)-এর সময়ে মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় না। মিসরের জীযায় তাঁহার এলাকা প্রসিদ্ধ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। ইবন্ হ'াজার, ইস'াবা, ১খ., ২১, নং ৩৯; (২) ইবনুল আছ'ীর, উস্দুল-গ'াবা, ১খ., ৫২।

মুহাঃ আনওয়ারুল হক খতীবী

'আজমান (عجمان) ঃ বৃটেনের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ 'উমান (Trucial Uman)-এর সাতটি শায়খ শাসিত, বর্তমানে সংযুক্ত

'আরব আমীরাত (الامارات العربية المتحدة) [দ্র. নিম্নে]-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র Sheiktdom। প্রকৃত প্রস্তাবে শায়খ শাসিত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১০০ বর্গমাইল এবং ইহার মধ্যে মাসফূত ও মানামা নামক ভিন্ন রাষ্ট্র শাসিত দুইটি ছোট enclave (অংশ) রহিয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫,০০০। ইহার প্রধান গোত্রগুলি কারাবিসা হামীরাত ও না'ঈম (বা নু'আয়ম)-এর শাখা আল-বু খুরায়বান-এর প্রশাখাসমূহ আল বু যানায়ন, যাহারা বুরায়মী মরূদ্যান ও ইহার নিকটবর্তী এলাকায়ও পরিলক্ষিত হয়। ইহার বর্তমান শাসক (শায়খ) কারাতিসা শাখার রাশীদ ইব্‌ন হু'মায়দ তিনি ১৩৪৭/১৯২৮-৯ সালে ইহার উত্তরাধিকারী।

১৩শ/১৯শ শতাব্দী ব্যাপিয়া 'আজুমান প্রতিবেশী কাসিমী শায়খ রাজ্য সারজা (আশ্-শারিক'া) [দ্র.]-এর আশ্রিত রাষ্ট্রের অধিক কিছু ছিল না। যাহা হউক, ইহা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত শায়খদের (Trucial Sheykhs) ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে এই শতাব্দীতে সম্পাদিত ১২৩৫/১৮২০ সালের General Treaty of Peace (সাধারণ শান্তি চুক্তি) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩০৯/ ১৮৯২ সালের Exclusive Agreements (একচেটিয়া চুক্তিসমূহ) পর্যন্ত বিভিন্ন দলীলে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। শতাব্দীর প্রথম দিকে সা'উদী অনুপ্রবেশের ফলে 'আজমান -এর আল-বুখুরায়বান, অধিকাংশ স্বগোত্রীয় নাঈম গোষ্ঠীর ন্যায় ওয়াহ্‌হাবী রীতিনীতিতে দীক্ষা লাভ করে।

'আজ্‌মান-এর অর্থনীতি সাম্প্রতিক বৎসরগুলি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত মৎস্য শিকার ও স্বকীয় ভোগের জন্য কৃষিকার্যের উপর। বর্তমানে ইহার ব্যয়ভার বহন করা হয় মুখ্যত সম্মিলিত 'আরব আমীরাত-এর অধিকতর সম্পদশালী সদস্যদের, বিশেষত আবু ধাবী (জাবী)-র আর্থিক সাহায্য দ্বারা এবং Occidental Oil Company (পাশ্চাত্য তৈল কোম্পানী) 'আজ্‌মান-এর স্থলভাগে ও জলভাগে তৈল সন্ধানের বিশেষ অধিকারের জন্য প্রদত্ত অর্থ দ্বারা।

J.B. Kelly (E. I.[2] suppl.1-2) /ছেয়দ লুৎফুল হক

আজ্‌মীর (اجمير) ঃ বা আজমের, ভারতের রাজস্থান রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত এই নামের জেলার সদর দফতর, জনসংখ্যা (১৯৮২) ৩,৬৪০০০ (১৯৫১ খৃ. আদম শুমারীতে আজমীরের জনসংখ্যার ২৩% মুসলিম ছিল)। আজমীর সুপ্রসিদ্ধ সূফী দরবেশ হযরত খাওয়াজা মু'ঈনুদ্-দীন হাসান সিজ্‌যী [(চিশতী) [র] (দ্র.)]-এর কর্মক্ষেত্র ও মাযার-এর জন্য সুবিখ্যাত (মৃ. ১২৩৬ খৃ.)। ইহা উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যিয়ারতগাহ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ এই মাযার যিয়ারত করিয়া থাকে। মাযার সৌধটি আরাবল্লী পর্বতমালার তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। মালওয়ার সুল্‌তানগণ ১৪৫৫ খৃ.-এর কাছাকাছি সময়ে শ্বেত মর্মর পাথর দ্বারা ইহা নির্মাণ করেন। এখানকার অন্য ভবনগুলি পরে নির্মিত হয়। মাযার সংলগ্ন দুইটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন বাদশাহ শাহজাহান ও আওরঙ্গযেব। এইখানে আকবার নির্মিত একটি সুরক্ষিত প্রসাদে বর্তমানে বিভিন্ন নিদর্শনাদি রক্ষিত আছে। শহরের উত্তরে আনাসাগর হ্রদের তীরে বাদশাহ জাহাঙ্গীর নির্মিত মনোরম বাগিচা এবং হ্রদের তীরে শাহজাহান নির্মিত একটি সুদৃশ্য বিশ্রামাগার রহিয়াছে (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, "আজমীর" নিবন্ধ)। সম্রাট আকবার প্রতি বৎসর বেগমসহ আগ্রা হইতে আজমীর পদব্রজে গিয়া মাযার যিয়ারাত করিতেন (বাংলা বিশ্বকোষ)। পরবর্তী মুগল বাদশাহগণ সকল সময়ে এই মাযারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সকলেই এই পবিত্র স্থান যিয়ারত করিতেন। গঙ্গা নদীতে হুমায়ূনের প্রাণরক্ষাকারী ভারতবর্ষের একদিনের বাদশাহ ভিশতী নিজামের কবরও দরগাহ প্রাঙ্গণে অবস্থিত। আজমীর রাজপুত রাজা পৃথীরাজ ও মুহাম্মাদ গূরী-র মধ্যে সংঘটিত ভাগ্য নির্ধারণকারী তলাবাড়ী (তিরৌরী)-র যুদ্ধে (১১৯২) নিহত শহীদ মুসলিম সৈনিকগণের কবর নিকটস্থ তারাগড় পাহাড়ে রহিয়াছে (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, "আজমীর" নিবন্ধ)।

উর্‌সের সময় যে বিশাল আকারের তামার ডেগ-এ তাবার্‌রুক রন্ধন করা হয় উহা বাদশাহ আওরঙ্গযেব কর্তৃক নির্মিত।

প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এখানকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভবন হইল "আড়াই দিন কা ঝোপড়া"। পৃথীরাজের সময় উহা একটি পাঠশালা ছিল; পরে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড "আজমীর")। "লীওয়ান" ৪৪৮ ফুট×৪০ ফুট আকারের স্তম্ভশোভিত একটি বড় হলঘর। উহা আট কোণাকৃতি মোট নয়টি কক্ষে বিভক্ত, উপরে সমতল ছাদ ও হলঘরে হিন্দু যুগের পাঁচ সারি স্তম্ভ রহিয়াছে। পরপর সাতটি সূঁচালো খিলানযুক্ত একটি সুউচ্চ (৫৬ ফুট) জাফরিকাটা লীওয়ানের সামনের দৃশ্যকে অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। মাঝখানের খিলানটি অন্যগুলি অপেক্ষা বেশী উঁচু, ইহার উপরে আযানের জন্য দুইটি ছোট মীনার বসানো; উহার ও সমগ্র মসজিদটির স্থাপত্য পদ্ধতি দিল্লীর কুতুব মীনার ও মসজিদের অনুরূপ। সুলতান ইল্‌তুত্‌মিশ (ঈল্‌তুত্‌মিশ) কর্তৃক (সম্ভবত পূর্বেকার ১২০০ খৃ. নির্মাণ আরম্ভ করা একটি মসজিদের স্থলে বা সেই মসজিদটির বর্ধিত অংশরূপে) নির্মিত এই মসজিদে প্রাথমিক যুগের ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য রীতির অতি চমৎকার নিদর্শন রহিয়াছে।

ইতিহাস ঃ রাজপুত রাজা অজয় চৌহান কর্তৃক আনুমানিক ১১০০ খৃ. আজমীর শহর স্থাপিত হয়। মু'ইয্‌যুদ্-দীন মুহাম্মাদ গূরী কর্তৃক ১১৯২ খৃ. ইহা বিজিত হয় এবং ১১৯৫ খৃ. ইহা কুতবুদ-দীন আয়বাক-এর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৩৯৮ খৃ. পরে মেবার-এর রাজপূতগণ কর্তৃক ইহা বিজিত হয়; কিন্তু ১৪৫৫ খৃ. মালওয়ার সুলতানগণ তাহাদেরকে বিতাড়িত করেন এবং ১৫৩১ খৃ. পর্যন্ত স্থানটি নিজেদের অধিকারে রাখেন। অতঃপর মারওয়াড়-এর রাজা মালদেব ইহা অধিকার করেন। আকবার তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই আজমীর দখল করেন এবং ইহাকে এই নামের একটি সুবার সঙ্গে যুক্ত করেন। রাজপুত রাজ্যসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া হেতু এবং মালওয়া ও গুজরাটের মধ্যপথে অবস্থিত হওয়ায় শহরটি অল্প সময়ের মধ্যে গুরুত্ব লাভ করে এবং একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭২১ খৃ.-র পরে রাজপুতগণ পুনরায় শহরটি অধিকার করে। অতঃপর ইহা মারাঠাদের হস্তগত হয়। ১৮১৮ খৃ. মারাঠাগণ ইংরেজগণের নিকট আজমীরের অধিকার ন্যস্ত করে।

বর্তমানে আজমীর রাজস্থান প্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর এবং আজমীর জেলার সদর দফতর। ইহা প্রধান সড়ক ও রেলপথের পার্শ্বে অবস্থিত এবং লবণ, অভ্র, কাপড় ও বিবিধ কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। এইখানে রেলওয়ে কারখানা, তেলের কল, সুতী ও পশমী বস্ত্র বয়ন, জুতা,

সারান ও ঔষধের কারখানা আছে। ১৮৭৫ খৃ. দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের শিক্ষার জন্য এইখানে মেয়ো রাজকুমার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., "আজমীর" নিবন্ধ)।

আজমীর জেলা ঃ ইংরেজগণ ১৮৭৮ সালে আজমীর-মারওয়াড় নামে চীফ কমিশনার শাসিত একটি প্রদেশ গঠন করিয়া সাবেক আজমীর রাজ্যটিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে ভারত সরকার রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন করিলে (১৯৫৬) তখন রাজস্থান নামক নূতন প্রদেশ গঠিত হয় এবং আজমীরকে উহার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আজমীর জিলার আয়তন ৩,২৮৩ বর্গমাইল (৮৫০৪ বর্গকিলোমিটার) জেলার জনসংখ্যা (১৯৮১) ৩৬৪০০০ জন (Statesman Year Book, 1983-84)। ইহা আরাবল্লী পর্বতমালার সংলগ্ন অংশ নিয়া গঠিত, নুনী নদী বিধৌত পার্বত্য এলাকা। জেলাবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ভুট্টা, গম, বাজরা, জোয়ার, যব, পিঁয়াজ ও তুলা। এইখানে অভ্র ও গৃহনির্মাণ উপযোগী পাথরের খনি আছে (Ency. Britta, 15th ed.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Imp. Gazetteer of India, 1908, v; (২) Arch Survey of India, Annual Report, ii. & xxiii; (৩) H.B. Sarda, Ajmer, Indian Autiquary, 1897, 162; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম, ঢাকা; (৫) Statesman Year Book 1983-84.

নূরুল হাসান (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আজর (اجر) ঃ 'আ, পুরস্কার, পারিশ্রমিক, কর বা খাজনা। আক্কাদী (Akkadian) ভাষা হইতে শব্দটির উৎপত্তি এবং সুদূর অতীতের কোন এক সময়ে আরামাইক ভাষার মাধ্যমে ইহা 'আরবী ভাষায় প্রবেশ করে। কুরআন ও পরবর্তী ইসলামী সাহিত্যে শব্দটি ধর্মীয় ও আইনগত পরিভাষায় পরিগণিত হয়।

১। কুরআনের বহু আয়াতে আজর শব্দটি ইহজগতে, বিশেষত আখিরাতে সৎ কর্মের পুরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্তব্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করিবার ব্যাপারে আজরের অংগীকার খুবই কার্যকারী হয়; তবে ইসলামে 'আমল-এর মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, যাহা رضوان الله বা এই জাতীয় বাক্যে প্রকাশিত। কুরআনে আছে (৬ ঃ ১৬০), একটি সৎ কাজের জন্য দশটি আজ্‌র প্রদান করা হইবে, যদিও বর্ণিত আয়াতে আজ্‌র শব্দটির উল্লেখ নাই। অনেক হাদীছে বর্ণিত আছে, খাঁটি নিয়াতে ধর্মীয় কোন আবশ্যিক কাজ সম্পাদন করিলে কাজটি ত্রুটিমুক্ত না হইলেও তাহার জন্য একটি পুরস্কার নির্ধারিত হয়, আর যদি তাহা ত্রুটিমুক্ত হয়, তবে কয়েক বা বহু গুণ পুরস্কার দেওয়া হয়। ইজতিহাদ-এর ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য বা ইজতিহাদ অনুযায়ী বিচার সম্পাদন করিলে বিচারটি ত্রুটিপূর্ণ হইলেও একটি পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করা যায়। আর যদি ইজতিহাদ প্রসূত মত বা বিচারটি ত্রুটিমুক্ত হয় তবে তাহার জন্য দুইটি, এমনকি দশটি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে (দ্র. নাসাঈ, কিতাবু আদাবিল-কুদাত)।

নবী কারীম (স)-এর সময় হইতে মক্কা নগরে আজ্‌র কথাটি আইনগত অর্থে কোন কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিককে বুঝাইত। কুরআনে শব্দটি শুধু পারিশ্রমিক হিসাবে নয়, মাহর (দ্র.) হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়াছে (৪ঃ ২৩, ৫ঃ ৫, ৩৩ঃ ৫০, ৬০ঃ ১০)। এই মাহর দেওয়া হইত শারী'আত মুতাবিক বিবাহিত স্ত্রীকে—সে দাসীই হউক অথবা স্বাধীনা নারীই হউক। সন্তানকে স্তন্য দানের বা প্রতিপালনের জন্য তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যে পারিশ্রমিক পায় (৬৫ ঃ ৫) তাহাকেও আজ্‌র বলা হয়। ফিক্‌হী পরিভাষায় আজ্‌র শব্দটি ইজারা (দ্র.) চুক্তি অনুসারে দেয় খাজনা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে খাজনা অর্থে উজরা শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Quran, 1938, 49; (২) C.C. Torrey, The Commercial-Theological terms in the Koran, Leiden 1892, 23 প.; (৩) A.J. Wensinck, Concordance et indices de la tradition musulmane, s.v. adjr; (৪) Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 1950, 96 প.।

J. Shacht (E.I.[2]) /মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আজরাফি (দ্র. আল-আশরাফ)

'আজ্‌লান (عجلان) ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাওলা (মুক্তদাস ও একজন ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিচার সংক্রান্ত হাদীছ তিনজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার পুত্রও প্রমুখাৎ তাঁহার হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবা, ২খ., ৪৬৫, নং ৫৪৬২; (২) আয্‌-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি, ১খ., ৩৭৫।

মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী

আজ্‌লূন (عجلون) ঃ ট্রান্সজর্দানিয়ার একটি জেলা, ইহার সীমানা ঃ উত্তরে ইয়ারমুক নদী, পূর্বে হামাদ, দক্ষিণে ওয়াদী আয্‌-যারকা ও পশ্চিমে গাওর। ইহা আংশিকভাবে প্রাচীন Gilead ভূভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত; রোমীয় আমলে ডেকাপলিস (Decapolis) শহরগুলির অন্তর্গত ছিল। আজ্‌লূন নামটি প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক ভাষা আরামাইক হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। জেলাটি পার্বত্য ও বনাঞ্চলপ্রধান। প্রথমে ইহার নাম ছিল জাবাল জারাশ, পরে ফাতিমী আমলে দুর্দান্ত প্রকৃতির 'আওফ গোত্রীয়গণ ইহা অধিকার করিলে তাহাদের নাম অনুসারে ইহারও নাম হয় জাবাল 'আওফ। আমীর 'ইযযুদ্‌-দীন উসামা এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আল্‌-মালিকুল 'আদিল ইব্‌ন আয়্যুব-এর নিকট হইতে জায়গীরস্বরূপ এই এলাকা লাভ করিয়া এইখানে কিল্লা নির্মাণ করেন। তখন হইতেই উহা ক'াল'আত আজ্‌লূন নামে পরিচিত। অতঃপর বিভিন্ন আমীর ও রাজপুরুষের মধ্যে হাত বদলের ফলে ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মোঙ্গল আক্রমণের কালে এই কিল্লার বহির্ভাগের দেওয়ালগুলি ধ্বংস হয়, অতঃপর মামলূক আমলে উহা পুনঃনির্মিত হয়। তখন 'আজ্‌লূন দামিশক-এর একটি জেলারূপে পরিগণিত হয়। বর্তমানে 'আজ্‌লূন একটি

'কাদা' (কাদীর এলাকা)-এর নাম (প্রধান স্থান ইর্বিদ [দ্র.], ইহা প্রাচীন কিল্লার নিকটস্থ একটি ছোট শহর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Ch. Clermont-Ganneau, Etudes darch or. ii. 140; (২) G. Schumacher and C. Steuer-nagel, Der Adschlun, Leipzig 1927; (৩) F. M. Abel, Geographie de la Palestine i. Paris 19-33, 15, 67, 276; (৪) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890, 76, 383, 388; (৫) A. S. Marmadji, Textes geographiques arabes sur la Palestine, Paris 1951, 3, 45, 137; (৬) M Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a lepoque des Mamelouks, Paris 1923, 23, 66, 179, 260; (৭) Abu Shama, in Hist. Or. Cr. v index; (৮) Ibn al-Kalanisi (Amedroz), 151, 164, 174; (৯) Abul-Fida, in Hist. or. Cr., i, index; (১০) M. van Berchem, Mndpv, 1903, 51-70 (এই এলাকার শিলালিপিগুলি ও ইব্ন শাদ্দাদ-এর গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের অনু. MS. Leiden 800, 962-97 v); (১১) C. N. J. (ohns), QDAP, i, 1931, 21-33; (২) RCEA, nos. 3746, 3970, 4528.

D. Sourdel (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আজা' (أجا) ও সালমা (سلمى) : মধ্যআরবের পার্বত্য অঞ্চল জাবালা তায়্যি তথা আধুনিক আল-জাবাল-এর দুইটি পর্বতমালা। "পাপের শাস্তি আকৃতির রূপান্তর" এইরূপ একটি প্রাচীন কাহিনী ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট; কাহিনীটি বাস্তবের সহিত সম্পর্কিত এইজন্য, প্রাচীন 'আরবী ও আদি উত্তর 'আরবী আঞ্চলিক ভাষাসমূহে ব্যক্তিনাম হিসাবে আজা ও সালমা-র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইবনুল কালবী রচিত কিতাবুল আস্নাম ও একই গ্রন্থকারের জামহারা-র দুইটি পাঠের একটি অনুযায়ী ফাল্স/ফিল্স/ ফুলুস নামক দেবতাকে আজা' পর্বতের খাড়া উঁচু শিখরসমূহের একটিরূপে পূজা করা হইত। সম্ভবত এই প্রথাটি অতি প্রাচীন কালের; কারণ খৃস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী ও পরে ৫০ হইতে ১৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যে আল-'উলা/দেদান উপত্যকার একটি বিশেষ খাড়া উঁচু পাহাড় (রান)-এর পূজার সমর্থন পাওয়া যায় কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর নামের মাধ্যমে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) W. Caskel, Lihyan und Lihyanisch, Koln and opladen 1954; (২) ইবন হিশাম, ৫৬; (৩) R Klinke-Rsenke-Rsenberger, Das GotZenbuch, কিতাবুল আসনাম, des Ibn al Kabi, লাইপযিগ ১৯৪১, ৬১ প; (৪) J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, ৫১ প.; (৫) ইয়াকূত, ১খ., ১২২ প., ৩খ., ৯১২।

W.Caskel (E.I.²) / মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

'আজা'ইব (عجائب) : 'বিস্ময়সমূহ', বিস্ময়কর বস্তু বা ব্যাপারসমূহ। প্রাথমিক অর্থে ইহা প্রধানত প্রাচীন যুগের বিস্ময়কর বস্তুসমূহকে বুঝায়। ইহার ভিন্ন শব্দটি ও ইহার ভিন্ন রূপ কুরআনে আল্লাহর সৃষ্ট বিস্ময়কর কাণ্ডসমূহকেও বর্ণনা করিতে ব্যবহৃত। এইভাবে 'আজাইব হইতেছে অসাধারণ স্থাপত্য নিদর্শন, প্রকৃতির ত্রিজগত, যথাঃ প্রাণিজগত, উদ্ভিদজগত জড় জগত ও আবহাওয়া, উল্কা ও নক্ষত্র সংক্রান্ত অভাবিত তথ্যসমূহ; এবং এই বিষয়সমূহ নিম্নোক্ত দুই প্রেক্ষিতে পর্যালোচিত হইয়া থাকে, গ্রীক দর্শন ও প্রাচ্য বাইবেলীয় ভাবধারায়।

চিরায়ত প্রাচ্য ঐতিহ্যের উৎসাহী সমর্থক হিসাবে ইসলাম স্বভাবতই অসাধারণ নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আগ্রহী ছিল, কিন্তু ইহার পশ্চাতের চেতনাবোধ ছিল গ্রীক চেতনা হইতে ভিন্নতর। 'আরব গ্রন্থকারগণ কর্তৃক চমকপ্রদরূপে বর্ণিত অত্যাশ্চর্য ভবনসমূহের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার Pharos অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করে। গ্রীক ও ল্যাতিন গ্রন্থকারগণের তুলনায় তাহারা যে সৌধটির অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা ৮ম/১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং মহান আলেকজান্ডারের নির্মিত বলিয়া ভ্রান্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সাধারণভাবে আলেকজান্ডারকে গ্রীক বিজেতা ও প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার অভিন্ন প্রতীক হিসাবে বহু সংখ্যক প্রাচীন ও প্রখ্যাত স্মৃতিসৌধকে তাহার নামের সহিত বিজড়িত করা হয়।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়কর বস্তুসমূহ মোটেই কল্পনা প্রসূত নহে, বরং সূক্ষ্ম ও সঠিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর স্থাপিত। এইরূপ পর্যবেক্ষণের ফল হইতেছে জাহি'জ প্রণীত গ্রন্থ আল-হ'ায়াওয়ান। ইহাতে 'ডারউইনবাদ'-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবূ হামিদ-এর বর্ণনামতে বীবর (Beaver) নামক প্রাণীর নির্মিত বাঁধটি অলৌকিক এবং ইবনুল ফাক'ীহ-এর বর্ণিত আমিদের নিকটস্থ একটি পর্বতে দৃষ্ট বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় ঘটনাবলী বিস্ময়কর।

ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল, 'আজাইব সম্পর্কে এই দুইটি পরস্পর বিরোধী ধারণা ক্রমশ একীভূত হইয়া যায় এবং ইহা হইতে উন্মেষ ঘটে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ধরনের সাহিত্যের যাহা বিশেষভাবে 'আরবী ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থসমূহকে প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাবিক বুযুর্গ ইব্ন শাহরিয়ার [দ্র.] প্রণীত 'আজাইবুল হিন্দ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয়; কারণ গ্রন্থটি এই বিষয়ে খুবই প্রাচীন এবং তৎযুগের তথ্যাবলীর ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য প্রমাণিত দলীলসমৃদ্ধ। গ্রন্থটির উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ তাঁহার বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এইগুলির নয়টি প্রাচ্যে ও অপরটি কম্পাসের অপরাপর বিন্দুর অন্তর্গত (অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে)। প্রাচ্যের নয় অংশের আটটিই ভারত ও চীনের এবং একটি প্রাচ্যের অপরাপর অংশের অন্তর্গত..... উপরিউক্ত গ্রন্থটি পূর্ব আফ্রিকা, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহের নাবিকগণের প্রদত্ত গল্পের সমন্বয়ে সংকলিত। ইহাদের কতিপয় বাস্তব পর্যবেক্ষণ দ্বারা গৃহীত, অপরদিকে কতিপয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর লোকগাথার সমীক্ষা দ্বারাই উহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যদিও অতি দূরবর্তী দেশের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে সাহিত্য রূপ লাভ করে, বিভিন্ন ইসলামী দেশসমূহের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ কেবল ভৌগোলিক প্রশ্নাবলীর পরিশিষ্টে বিশদভাবে উল্লিখিত হয় (উদাহরণস্বরূপ দ্র. আল-মাক'দিসী)। কেবল ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সকল বিক্ষিপ্ত প্রাণীতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ইত্যাদি

বিবরণসমূহ একটি বিশিষ্ট সাহিত্যের রূপরেখা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন আবূ হামিদ আল-গারনাতী [দ্র.] যিনি এই সকল তথ্য তাঁহার তুহ্‌ফাতু'ল-আলবাব গ্রন্থে একত্র করেন। উচ্চাঙ্গ সাহিত্য নামে খ্যাত ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর 'আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হইতেছে পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্যবোধের ভারসাম্য রক্ষা। 'আরবী সাহিত্যের অবক্ষয়ের দরুন এই ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হইলে গ্রন্থকারগণ অধিক মাত্রায় বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করিতে থাকেন। ফলে 'আজাইব ক্রমশ অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে সৃষ্টির গঠনতত্ত্বে ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই যুগের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থকার ছিলেন আল-কাযবীনী [দ্র.], তাঁহার রচনাবলী দুই অংশে বিভক্তঃ 'আজাইবু'ল-মাখলূক'াত (সৃষ্টির বিস্ময়সমূহ) এবং আছারুল বুলদান অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য কীর্তিসমূহ; বহু শতাব্দী পরেও এই বিশেষ সাহিত্য রীতির শ্রেষ্ঠ নমুনা উপরে উল্লিখিত 'আজাইব-এর প্রকারভেদের সাক্ষ্য বহন করে। এই যুগে সৃষ্টি গঠনতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাবলী অধিকতরভাবে ভূগোলশাস্ত্রকে অবহেলা করিতে থাকে। ফলে যাহা রহিয়া গেল তাহা কতিপয় চিত্তাকর্ষক গল্পের সংগ্রহমাত্র। এই যুগের সিন্দবাদ চক্রের গল্পসমূহ এই শ্রেণীর সাহিত্যে সংযোজিত হয়। মূলত এই সকল কাহিনী বুযুর্গ ইব্‌ন শাহ্‌রিয়ার-এর প্রদত্ত বর্ণনার রূপান্তর।

হিজরী প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে 'আজাইব-এর বর্ণনায় পর্যবেক্ষণগণ অথবা তাঁহাদের অনুসরণকারী গ্রন্থকারগণ ভৌগোলিক স্থান সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেন। আদি আরব ভৌগোলিকবৃন্দ ও আবূ হামিদ-এর ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য ছিল। বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং চিত্তাকর্ষক সাহিত্যে জনপ্রিয় আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে তথ্যসমূহের সূক্ষ্মতা ও সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান হারাইয়া যায়। প্রাচীন কালে অজ্ঞাত ও ইসলামী আমলে সংগৃহীত সত্য জ্ঞানের তথ্যসমূহ 'আজাইব-এর বর্ণনায় সার্বিকভাবে পুনঃপুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি চিন্তা ও মননের ইতিহাসে সেই সকল 'আজাইব একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইতেছে, ইহাদের মাধ্যমে আমরা সুস্পষ্ট বাস্তবতা হইতে প্রাচ্য কাহিনী সৃষ্ট কল্পনার জগতে পরিবাহিত হই। জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থকারগণের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন আবূ হামিদ। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ইসলামী সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে 'আরবী ও ফারসী গ্রন্থকারগণের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। আল-কাযবীনী উৎস হিসাবে যে বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মোটেই অবাস্তব নহে। অপরপক্ষে জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্বমূলক রচনাবলীর মাধ্যমেই 'আজাইব গল্পসমূহ বিশ্বসাহিত্যে মুসলিম মনীষার একটি অতি প্রয়োজনীয় অবদান রাখিতে সমর্থ হয়; এই অবদানটি হইতেছে 'আরব্য রজনীর গল্প সংগ্রহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) T A, ১খ., ৩৬৮; (২) Pauly-Wissowa, দ্র. Paradoxographoi; (৩) M. Asin, El faro de Alejandria, And., 1933, 241 প.; (৪) জাহিজ বর্ণিত 'ডারউইনবাদ'-এর জন্য দ্রষ্টব্য E. 'Wiedmann, in SBPMSErlg., 1915, 130; (৫) ইবনুল-ফাকীহ-এর সম্পর্কে দ্র. BGA, ৫খ., ১৩৪ ও G. Jacob, Studien in arabischn Geographen, ১খ., বার্লিন ১৮৯১; (৬) আল-মাক'দিসী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য BGA, ৩খ., ২৪০; অন্যান্য গ্রন্থকার সম্পর্কে দ্র. বুযুর্গ ইবন শাহ্‌রিয়ার, আবূ হামিদ আল-গারনাতী ও আল-কাযবীনী; (৭) C. E. Dubler, El Extremo Oriente visto por los musulmanes anteriores à la invasion de los Mongoles en el siglo xiii (La deformacion del saber geographico yetnologico en los cuentos orientales), Homenaje a Millas-Vallicrosa ১খ., ৪৬৫ প.।

C. E. Dubler (E. I.[2]) /মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আজাদ বিলগ্রামী (দ্র. আযাদ বিলগ্রামী)

আজাদ, মাওলানা আবুল কালাম (দ্র. আযাদ, মাওলানা আবুল কালাম)

আজাদ, মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন (দ্র. আযাদ, মাওলাবী মুহাম্মাদ হুসায়ন)

আজাদ সুবহানী (দ্র. আযাদ সুবহানী)

আজাবুল কবর (দ্র. 'আযাবু'ল-ক'াব্‌র)

'আজাম (عجم) ঃ 'আরবী, সমষ্টিবাচক পদ, ইহার শব্দ প্রকরণ ও শব্দার্থ বিদ্যামূলক ক্রমবিকাশ গ্রীক শব্দ Barbaroi-এর অনুরূপ। যে শব্দমূল হইতে ইহার উৎপত্তি তাহার মৌলিক অর্থের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'আজাম শব্দের অর্থ হইতেছে 'আজাম (عجم) দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তি। 'উজ্‌মা ভাষা ও উচ্চারণের দিক দিয়া কথোপকথনের একটি এলোমেলো অস্পষ্ট পদ্ধতি। সুতরাং 'উজ্‌মা শব্দটি 'আরবী ফাস'াহ'া (فصاحة) শব্দটির বিপরীত এবং 'আজাম হইল অনারব জনগোষ্ঠী (Barbaroi) যাহাদের অসভ্যতার সর্বপ্রধান নিদর্শন অবোধ্য ও অস্পষ্ট কথনভঙ্গি ও পদ্ধতি; সেইজন্য তাহাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীকদের ন্যায় আরবগণও অসভ্য জনগোষ্ঠী বলিতে প্রধানত তাহাদের প্রতিবেশী পারসিকগণকে বুঝাইত এবং ইতোপূর্বে জাহিলী কাব্যে বৈষম্য প্রদর্শনার্থে আল-'আরাবকে আল-'আজাম-এর সহিত তুলনা করা হইত, যদিও শেষোক্ত শব্দের ক্ষেত্রে (عجم) 'আজাম-এর বহুবচন রূপ আ'আজিম (أعاجم)-কে অধিক পসন্দ করা হইত। অনুভূতির উপর শব্দটির কি ধরনের প্রভাব পড়িত তাহা নির্ণীত হইত ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। যদিও বহুলাংশে শব্দটি ইহার মূল অযৌক্তিক 'আরব শ্রেষ্ঠত্বের দাম্ভিকতাপূর্ণ মনোভাবের দরুন ঘৃণার ভাব বহন করিত, তথাপি সময় সময়, এমনকি অতি প্রারম্ভিক কালেও ইহা বিদেশগত বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিত এবং একই সঙ্গে একটি অধিকতর সত্য ও পরিমার্জিত সংস্কৃতির স্বীকৃতি দান করিত। যাহাই হউক না কেন, উমায়্যা 'আমলে 'আরবগণ ইসলামের কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের মাধ্যমে বিজিত 'আজামে ইসলামের প্রচার হইয়াছিল। ফলে 'আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই সময়ে কেবল বিক্ষিপ্তভাবে অনারব অর্থাৎ ইরানীগণের জাতীয় সত্তা ও সংস্কৃতির সমর্থনে বক্তব্য উচ্চারিত হয় উদাহরণস্বরূপ। কবি

ইস্‌মাঈল ইব্‌ন ইয়াসার কর্তৃক (আগানী, ২খ., ৪১১-২)। আব্বাসীগণ ক্ষমতায় আগমন করিলে 'আরবের উপর 'আজাম-এর বিজয় সাধিত হয় এবং পরিস্থিতির পট পরিবর্তন ঘটে। এই বিজয়ের বিরোধিতায় নাস'র ইব্‌ন সায়্যার ইতোপূর্বে বিখ্যাত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন (আদ-দীনাওয়ারী, ৩৬০)। রাজনৈতিক ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করত ইরানীগণ অচিরে তাহাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি উপস্থাপন করে। ইহাই ছিল শু'উবিয়্যা (দ্র.) আন্দোলন। যদিও ইহার বক্তব্য আরবী ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল, তথাপি ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল 'আরবগণের তুলনায় 'আজামের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বিতর্কের উত্তাপ শীতল হইয়া পড়ার পর শব্দদ্বয় প্রাত্যহিক ব্যবহারে শুধু নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য নির্দেশ করণার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। 'আজাম ইহার পর ফুরস (فرس-পারস্য বাসী)-এর সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগের শেষভাগের পরবর্তী কাল হইতে ইরানী মিডিয়া অঞ্চল নির্দেশ করিতে 'ইরাক 'আজমী' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইতে থাকে (প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ইহাকে আল-জিবাল নামে অভিহিত করিয়াছেন)। ইহার বিপরীত মূল ইরাক নির্দেশ করিতে 'ইরাক 'আরাবী' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। শানফারা কর্তৃক রচিত প্রখ্যাত ক'াসীদা লামিয়্যাতুল 'আরাব-এর মুকাবিলায় ইরানী কবি আত-তুগরাঈর (মৃ. ১১২১) অন্ত্যমিলে অনুরূপ একটি কবিতা লামিয়্যাতুল 'আজাম নামে অভিহিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : I. Goldziher, Muhammedanische Studien, ১খ., ১০-১৪৬।

F. Gabrieli (E.I.[2]) / মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

'আজামিয়্যা (عجمية) : আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষা লেখার জন্য 'আরবী বর্ণমালা ব্যবহারের নাম। (E.I.[2]) / মুহাম্মদ আফতাফ হোসেন

আ-আজিমিয়্যা (দ্র. আল-খামিয়া)

'আজামী উগলান (عجمى اوغلان) : (Acemi oglan) একটি তুর্কী পারিভাষিক শব্দ, অর্থ 'বিদেশী তরুণ'; 'উছমানী (Ottoman) কাপী কুলুস (Kapi kulus) [দ্র.] (প্রহরী)-রূপে চাকুরীর জন্য তালিকাভুক্ত খৃস্টান যুবকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৩৬২ খৃস্টাব্দের পেনচিক (কানূন মুতাবিক মূলত যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটককৃত প্রতি পাঁচজন যুবকের মধ্যে একজনকে নির্বাচন দ্বারা এবং পরে সমরভুক্ত (Dewshirme= conscription) আইনের অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করা হইত। তুর্কী ভাষা শিক্ষা ও মুসলিম রীতিনীতি আয়ত্ত করার জন্য তাহাদের পাঁচ হইতে সাত বৎসর, প্রথমে আনাতোলিয়ায় সামন্ত সিপাহী ও অন্যদের হেফাজতে রাখা হইত এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাখা হইত রুমেলিয়ায়। পরে তাহাদের গেল্লিপলি (Gallipoli)-র 'আজামী ওজাক'-এ নিয়োগ করা হইত। ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর তাহাদের সেখানেও বদলি করা হইত। যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীর জন্য মনোনীত করার পর তাহাদের সুলতানের প্রাসাদ অথবা পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর একই বা বিভিন্ন ওজাক-এ কিম্বা এদিরনে (Edirne) ও ইস্তাম্বুলের bostandji (দ্র.) দলে নিয়োগ করা হইত। প্রাসাদ বা সেনাদলসমূহে পদ খালি হইলে চাকুরীতে তাহাদের জ্যেষ্ঠত্ব (Seniority)-র ভিত্তিতে তাহাদের নিয়োগ করা হইত। তাহাদের এই নিয়োগ কাপীয় চিকমা (Kapiya cikma) বলিয়া পরিচিত ছিল। ইস্তাম্বুলের বা এদিরনের গালাতা সারায়ী অথবা ইবরাহীম পাশা সারায়ীতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর 'আজামী উগলানদের সুলতানের গৃহস্থালি কাজে নিয়োগ করা হইত (তখন তাহাদের ic ogians বা ic aghas বলা হইত)। নিম্নতম পদ (koghush অথবা dormitory) হইতে পর্যায়ক্রমে তাহারা উচ্চ পদে (khassoda দ্র.) উন্নীত হইত। এইসব পদ হইতে Beylerbeyis ও Wezirs পদে নিযুক্ত হইত। স্থায়ী অশ্বারোহী বাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দল (Sipahs ও Silahdars) অনুরূপভাবে ic aghas-দের মধ্য হইতে বাছাই করা হইত। অপর চারটি দল (Olufedijis ও Ghuraba) 'আজামী উগলানদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হইত; যাহাদের প্রাসাদে চাকুরীর জন্য মনোনীত করা হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রাসাদের কাজে নিয়োজিত করা হয় নাই।

সপ্তদশ শতকে Dewshirme পর্যায়ক্রমে পরিত্যক্ত হয় এবং পরিণামে 'আজামী উগলান বিলুপ্ত হয়। ১৮২৬ সালে বিলোপ সাধনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র দেহরক্ষী Odjak-এর ন্যায় ইহার সংগঠন রক্ষা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) I.H. Uzuncarsili, Kapukulu Ocaklari, i, 1-141; (২) I.A. দ্র. Acemi oghlan; (৩) আহমাদ জাওয়াদ, তারীখ-ই 'আসকারী-ই 'উছমানী, ১৭৪ (ফারসী অনুবাদ, ১খ., ২৪১); (৪) সায়্যিদ মুস্‌তাফা, নাতাইজুল উকূআত, ১খ., ১৬৬, ১৭৪, ২খ., ১০৯; (৫) Dohsson, Tableau del'Empire Ottomman, vii, 313; (৬) Gibb and Bowen, Islamic Socidty and the West, i/1, নির্ঘণ্ট।

H. Bowen (E.I.[2]) / মুহাম্মাদ আলতাফ হোসেন

আজারবায়জান (দ্র. আযারবায়জান)

'আজারিদা (عجاردة) : একটি খারিজী সম্প্রদায় যাহারা বিশেষভাবে খুরাসানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুল কারীম ইব্‌ন 'আজার্‌রাদ-এর নাম অনুসারে এই নামের উদ্ভব। তিনি নাজাদাত (দ্র.)-এর একটি উপদল 'আতাবিয়্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। 'আবদুল কারীম বালখের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইরাকের গভর্নর খালিদ আল-কাস্‌রী দ্বারা কারারুদ্ধ হন (১০৫-২০/৭২৪-৩৮)। 'আজারিদা বিশ্বাসের কতিপয় মূল বৈশিষ্ট্য হইলঃ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত সন্তানদেরকে (ইব্‌ন হাযমের মতে নিজের সন্তানকেও) মুসলিমরূপে গণ্য না করা (বারা'আত); বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাহাদের সত্য ধর্ম গ্রহণে আহবান জানানো অবশ্য কর্তব্য; হিজরত করা উত্তম কাজ হইলেও ইহা অবশ্য কর্তব্য নহে বলিয়া ঘোষণা করা। শান্তিবাদীদের (আল-কাআদা) সহিত বন্ধুত্ব (আল-বি'লায়া) প্রকাশ; সূরা ইয়ুসুফ ইহার বিষয়বস্তুর অসারতার কারণে আল্লাহর বাণী হইতে পারে না, সুতরাং ইহা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া জ্ঞাপন করা। আল-আশ'আরী আজারিদা-এর নিম্নবর্ণিত শাখাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেনঃ মায়মূনিয়্যা, খালাফিয়্যা,

হামযিয়্যা, গুআরবিয়্যা, সালবিয়্যা, খাযিমিয়্যা (দুইটি উপদলসহ) ও ছাআলিবা (পাঁচটি উপদলসহ)। আশ-শাহরাসতানী আতরাফিয়্যাকে ইহার শাখা বলিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশ উপদল সন্তানদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাব পোষণ করিত অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তাহারা নিরপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত। 'আব্বাসী রাজত্বকালে হামযিয়্যা গোত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। ১৭৯/ ৭৯৫ সালে দক্ষিণ খুরাসানে সংঘটিত মারাত্মক খারিজী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন হামযিয়্যা গোত্রপ্রধান হামযা ইব্‌ন আদরাক। এই বিদ্রোহ ১৯৫/৮১০ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আশ'আরী, মাক'ালাতুল ইসলামিয়্যীন (Ritter), ১খ., ৯৩ পৃ.; (২) আল-বাগদাদী, ফারক, ৭২ প. ; (৩) ইব্‌ন হাযম, ফিস'াল, ৪খ., ১৯১; (৪) শাহরাস্‌তানী, আল্‌-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, ৯৫ প; (৫) মাকরীযী, খিতাত, ২খ., ৩৫৫; (৬) ইবনুল আছীর, ৬খ., ১০১, ১০৩ প.; ১১৪, ১৪৩; (৭) মাসউদী, মুরূজ, ৮খ., ৪২, ১২৭; (৮) L. Vaglieri, Le vicende del lerigismo in Epocaa abbaside, RSO, 1949, 41.

R. Rubinacci (E.I.[2]) / মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন

আজারিস্তান (দ্র. আযারী)

আজাল (أجل) : অর্থ কোন জিনিসের সময়সীমা, নির্ধারিত সময়, উহার সমাপ্তি, মৃত্যু। কুরআন মাজীদে "আজাল" শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা সময়সীমা অর্থে, ২২ঃ ৫ " আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি"; ২৮ঃ২৯ "মূসা যখন তাহার মেয়াদ পূর্ণ করিল"; ২ঃ২৮২ " তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর"; ৪৬ঃ ৩ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবেই ও নির্দিষ্টকালের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি"; ৩৯ঃ৫ "প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত"; ২৩ঃ ৪৩ " কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না"; ৬৩ ঃ১০ " হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও না"; ৬৩ ঃ ১১ "কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা (মৃত্যু) যখন উপস্থিত হইবে, আল্লাহ কখনও তাহাকে অবকাশ দিবেন না"; ৬ঃ২ "অতঃপর এক নির্দিষ্ট কাল নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে যাহা তাঁহার জ্ঞাত"; ৩৫ঃ৪৫ "কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের অবকাশ দিয়া থাকেন"; ৪২ঃ১৪ "এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে ...."; ১১ঃ৩ " তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন"; ১৪ঃ ১০ "এবং নির্দিষ্ট কালের অবকাশ দেন"; ৩৯ঃ৪২ "এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য"; ৪০ঃ৬৭ "আর যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও"; এইরূপ আরও বহু স্থানে।

বহু হাদীছে (আল-বুখারী, ক'াদর ১, মুসলিম, ক'াদর প্রভৃতি) আজাল সম্পর্কে বহু আলোচনা পাওয়া যায়। আজাল-এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুতাযিলাগণও বিশেষ আগ্রহী ছিল। এই ব্যাপারে যেইসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে উদিত হয় (যথা মৃত্যুর সময় ইহা যেইভাবেই ঘটুক না কেন, নির্ধারিত কিনা, আজাল অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব কিনা, মৃত্যুর সময় বদলাইতে পারে কিনা) সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে কালামশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-আশ'আরী, মাক'ালাতুল ইসলামিয়্যীন (Ritter), পৃ. ২৫৬ (অধিক বরাতসমূহসহ), ২৮৫; (২) ঐ লেখক, ইবানা, কায়রো ১৩৪৮ হি., পৃ. ৫৯ প. (হায়দরাবাদ ১৩২১ হি., পৃ. ৭৬, অনু. W.C. Klein, নিউ হ্যাভেন ১৯৪০ খৃ., পৃ. ১১৫-৭; মূল পাঠ হইতে কিছু অংশ বাদ গিয়াছে); (৩) আল-বাগদাদী, উস্‌'লুদ্দীন, ইস্তাম্বুল ১৩৪৬/ ১৯২৮, পৃ. ১৪২-৪; (৪) আল-গাযালী, ইক'তিস'াদ, কুতব ৪, বাব ২, ফাসল ২, মাসআলা ১ ; (৫) আশ্‌-শাহরাস্‌তানী, নিহায়াতুল ইক্‌দাম (সম্প. Guillaume), পৃ. ৪১৬; (৬) আল-ইজী, মাওয়াকি'ফ, কায়রো ১৩২৫ হি, ৮খ., ১৭০; (৭) আত-তাফ্‌তাযানী, শারহু'ল 'আকাইদি'ন নাসাফিয়্যা, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১০৮ প. (অনু. E.E.Elder, নিউ ইয়র্ক ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৯৪ প.) ; (৮) ইব্‌ন আবিল-হ'াদীদ, শারহ নাহজিল বালাগা, উপরন্তু দিলদার আলীতে উদ্ধৃত, 'ইমাদুল ইসলাম ফী ইল্‌মিল কালাম, লক্ষ্ণৌ ১৩১৯ হি., ২খ., ১৪৯-১৫৩; (৯) W.M. Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, লন্ডন ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৬-১৮, ২৯, ৬৬, ১০৮, ১৪৬; (১০) G. Weil, Maimonides uber Die Lebensdaure, Basel 1953 খৃ.।

I. Goldziher and W. Montogomery Watt (E. I.[2]) ও (দা.মা.ই.) ড. আবদুল জলীল

'আজালা (عجلة) : উত্তর-পশ্চিমের সামী (Semitic) ভাষাসমূহ হইতে ধারকৃত 'আরবী শব্দ (হিব্রু 'আগালাহ, ফিনিশীয় 'আগলত, ইয়াহূদী-আরামী 'আগালতা, সিরীয় আগালতা, নূতন সাম্রাজ্যের প্রাচীন মিসরীয় ধারকৃত শব্দ 'আগরত' 'আগালতা, যাহা হইতে কিবৃতী Acotte (দ্র. বরাতসমূহ L. Kochler Lexicon in Veteris Testamenti Libros, লাইডেন। ১৯৫৩, ৬৭৯) গোলাকৃতি অথবা দ্রুততার অর্থজ্ঞাপক শব্দমূল হইতে উদ্‌গত। 'আরবীতে উল্লিখিত ভাষাগুলির ন্যায় শব্দটি দ্বারা চাকাবিশিষ্ট পশু চালিত যানবাহন (রথ, গরু কিংবা ঘোড়ার মালগাড়ি, মালগাড়ি ইত্যাদি) বুঝায়। তবে 'আরবীতে ইহা একটি জাতিবাচক শব্দ। এই কারণেই মুসলিম প্রাচ্যে এইসব যানের ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে এখানে আলোচনা করা হইল। ইসলামের পূর্বে বিভিন্ন প্রকার গাড়ির ব্যবহার (যাহার মধ্যে রহিয়াছে পশ্চিমের সামী দেশসমূহ ও মিসরে আগালাহ ইত্যাদি নামে অভিহিত গাড়িসমূহ) গোটা নিকটপ্রাচ্যে সুপ্রচলিত ছিল (তু. উদাহরণস্বরূপ V. Gordon, Childe, Wheeled Vehicles, in A History of Technology, ১খ., অক্সফোর্ড ১৯৫৪; A.G. Barrois, Manuel d'

archeologie bivlique, ২খ., প্যারিস ১৯৫৩, ৯৮-১০০, ২৩৩; A. salonen, Die Landfahrzeuge des Alten Mesopotamien, হেল্‌সিংকি ১৯৫১; Erman and Ranke, Agypten 2, Tubingen 1923, 584; P. Montet, La vie quotidienne en Egypte, প্যারিস ১৯৪৬, ১৬৯)। পারস্য যুগের (Salonen, 21) পূর্বেই যুদ্ধরথের বিলুপ্তি সত্ত্বেও একই অঞ্চলে গ্রীক ও রোমীয় যুগে গাড়ির ব্যাপক উল্লেখ দেখা যায় (তু. উদাহরণস্বরূপ মিসরের জন্য C. preaux, L' Eeconomic royale des Lagides, Brussels 1939, 214; W.E. Crum. A Coptic Dictionary. Oxford 1939, 26; S. Kraus, Tamudische Archaologie-তে ইয়াহূদী পাঠ, লাইপযিগ ১৯১০-২, ২খ., ৩৩৬-৮ ও G. Dalman, Arbit und sitte in Palastina, ২খ., ১১১-৫, ৩খ., ৫৮ প., ৮৮-৯০, ৬খ., ১৯৩ ইত্যাদি)। প্রাক ইসলামী যুগে উত্তর আফ্রিকাতেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল (R. Capot-Rey, Geographie de la Circulation, প্যারিস ১৯৬৪, পৃ. ৮৭)।

ইসলামী যুগের রচনাবলীতে চাকাওয়ালা গাড়ির চলাচল সম্পর্কে খুব কমই উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে 'আজালা শব্দটির ব্যবহার পাওয়া গেলেও উহা একেবারে বিরল। কোথাও কোন লিখিত পুস্তকাংশে এইসব গাড়ির গঠন কাঠামো ও প্রযুক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না।

ন্যূনকল্পে লেখকগণ শুধু সেইসব প্রাণীর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন যেইগুলি ঐসব গাড়ী টানিবার কাজে ব্যবহৃত হইত। আভিধানিকগণও বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

কালীলা ওয়া দিমনায় (শায়খো সংস্করণ), পৃ. ৫৪, উল্লিখিত দুইটি ষাঁড়-চালিত যে গাড়ির উল্লেখ আছে তাহা মূল সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে। ইতিহাস ও ভূগোলের পুস্তকাদিতে কিছু কিছু গাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মিসর সম্পর্কে এই ধরনের যানবাহন ভারী মালামাল বহনের কাজে সেইখানে ব্যবহৃত হইত বলিয়া জানা যায় (উমায়্যা যুগঃ ইয়াকূ'ত, ১খ., ২৬০। আল-মাস্'উদী (মুরূজ, ৩খ., ২৮ প.) ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে সিরীয় ছ'গ্'র বা সীমান্ত এলাকায় মহিষ চালিত বড় বড় গাড়ীর উল্লেখ করেন। ৭ম/ ১৩শ শতাব্দীঃ ইব্ন সাঈদ আল-মাক্কারী, নাফ্হ'ত তীব, ১খ., ৬৯১; মরক্কো সম্পর্কে ৮ম/১৪শ শতাব্দী আল-জায়নাঈ, যাহ্রাতুল-আস্ (বিল), ২৭, অনু. ৬৯ প.)।

অধিকাংশ বিবরণ এমন সব যানবাহন সম্পর্কে পাওয়া যায় যেইগুলি ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হইত এবং যেইগুলি অনেকটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে বলিয়া মনে হয়। যেমন ২৪২/ ৮৫৬ সনে মক্কা-মদীনার উদ্দেশে বাসরায় একজন হজ্জযাত্রীর একাধিক উষ্ট্রচালিত একটি 'আজালায় আরোহণ (ইব্ন তাগ রীবিরদী, কায়রো, ২খ., ৩০৭); কয়েক বৎসর পর মনুষ্য চালিত একটি 'আজালা, যাহা অসুস্থ আহমাদ ইবন তূলূনকে আনতাকিয়া হইতে মিসরে বহন করিয়া আনিয়াছিল (ইব্ন আবী উসায়বিআ, ২খ., ৮৪); ৩০৭/৯১৯ সনে বিদ্রোহী ইউসুফ ইব্ন আবিস-সাজ-এর প্রকাশ্য অবমাননার জন্য বাগদাদে প্রস্তুত বড় বড় যানবাহন (কিতাবুল উয়ূন, ইবন মিসকাওয়ায়হ, সম্পা. Amedroz, ১খ., ৪৯ টীকা)। খৃস্টানরা তাহাদের উৎসবকালে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিত, যেমন এডেসাতে ক্রুশ উৎসবের প্রাক্কালে (হুসায়ন ইব্ন ইয়া'কূব আল-উমারী, মাসালিক, ১খ., কায়রো ১৯২৪, ২৬৫)। যেইসব প্রাণী এই গাড়িগুলি টানিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় সেইগুলি বিভিন্ন আকারের ঃ বিভিন্ন প্রজাতির অশ্ব, উষ্ট্র, ষাঁড়, খচ্চর, গর্দভ, মহিষ, সম্ভবত হাতীও। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষও গাড়ি টানিবার কাজ করিত।

শব্দটি প্রায়শ বিদেশী গাড়ির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ বায়যানটিয়ামের প্রতিযোগিতার রথসমূহ (ইবন্ রুস্তাহ, ১২০; ইবন খুররাদায্বিহ্, ১১২); আইবেরীয় উপদ্বীপের খৃস্টানদের মালগাড়ি (ইব্ন 'ইয'ারী, ৩খ., ৮৬; আখবারুল 'আস'র, সম্পা. M.J. Muller, Die Utzten Von Granada, মিউনিক ১৮৬৩, ৪৪, অনু. ১৪৭-৮), পরবর্তী কালে তুর্কী আরাবা।

মুসলিম ইরানেও সাহিত্যে গাড়ি (گردون)-এর উল্লেখ খুবই কম পাওয়া যায় (B. Spuler, Iran Fruhislamischer Zeit, Wiesbaden 1952, 428-9, কোন উদাহরণ দেন নাই)। অবশ্য ফিরদাওসী পৌরাণিক কাহিনীর জগতে মহিষ কিংবা ষাঁড়-চালিত গাড়ির প্রচলন করেন (F. Wolff, Glossar zu Firdosis Schahname, বার্লিন ১৯৩৫ দ্র.)। ইস্ফান্দিয়ার কর্তৃক ব্যবহৃত একটি কাষ্ঠ-নির্মিত রথ (শাহ্নামাহ্, সম্পা. Mohl, ৪খ., ৫০০ -২, ৫১০) প্রায়শ গ্রন্থচিত্রে দেখানো হইয়া থাকে (যেমন Survey of Persian Art, ৬খ., ৮৩২ D; La guirlande de I' Iran, প্যারিস ১৯৪৮, ৩০)। গাড়িটির চাকাগুলি দুই অরবিশিষ্ট এবং দুইটি দণ্ডের মধ্যখানে বাঁধা একটি অশ্ব উহাকে টানে। ইরানী গ্রন্থ-চিত্রাদিতে কখনও কখনও অন্যান্য মালগাড়ির ছবিও দেখা যায়। যেমন, অশ্ব-চালিত চারি চাকাবিশিষ্ট একটি মালগাড়ির (তাবরীয হইতে সংগৃহীত ৭ম/ ১৩শ শতাব্দীর শেষ দিককার পাণ্ডুলিপি, E. Blochet, Musulman Painuting, লন্ডন ১৯২৯ খৃ. মুদ্রিত) চিত্রে দুই দণ্ডের মধ্যখানে বাঁধা একটি অশ্ব কর্তৃক চালিত দুই অরের চাকাওয়ালা একটি গাড়ি যাহাতে একটি মসজিদ নির্মাণের সামগ্রী বহন করা হইতেছে (বিহযাদ-এর চিত্র ১৪৬৭ খৃ., E. kuhnel, Miniaturmalerei im islamischen Orient, বার্লিন ১৯২২, pl.51); এক প্রকার yurt (তাঁবু) সম্ভবত অশ্ব-চালিত চাকার গাড়ির উপর আচ্ছাদিত এবং ৭০০/১৩০৪ সনে গাযান খানের মৃতদেহ তাবরীযে লইয়া যাইবার কাজে ব্যবহৃত (৯ম/ ১৫শ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি, ইহার মুদ্রিত অনুলিপি, E. Blochet, les peintures des manuscrits de la Bibl-nat, প্যারিস ১৯১৪-২০, মুদ্রিত চিত্র ১৯, তু. পৃ.২৭২)। অন্যদিকে খৃস্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যএশিয়ায় তুর্ক মোঙ্গলগণ পশু-চালিত গাড়ি (কান্গলী পরে আরাবা আর্বা) প্রচুর ব্যবহার করিয়াছে। অতঃপর বেদুঈনদের অর্থনৈতিক অবনতির ফলে উহাদের ব্যবহার হ্রাস পায়। ইব্ন বাত্তূতা (২খ., ৩৬১) দক্ষিণ রাশিয়ায় ইহাদের ব্যবহারের কথা

উল্লেখ করেন। এই ধরনের গাড়ি-যাহার আরবীকৃত নাম 'আরাবা এমনকি আরাবিয়্যা-মাম্লূক যুগের মিসরে, বিশেষ করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছিল (দ্র. 'আরাবা)। সাধারণ ব্যবহারে গাড়ির একটি জাতিবাচক পরিভাষারূপে এই আরাবা নামটি 'আজালা শব্দের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'আজালা শব্দটি নূতনভাবে বাইসাইকেলের নাম হিসাবে আধুনিক মিসরে ব্যবহার করা হইয়াছে। তুর্কী আমলে আনাতোলিয়ায় বায়যানটাইন মালবাহী গাড়ি (কাগনী)-এর প্রচলন রহিয়া যায়।

গ্রামাঞ্চলে মধ্যযুগীয় অবস্থা আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহাল থাকে। ১৮শ শতাব্দীতে Volney লিখেন, "লক্ষণীয় যে, গোটা সিরিয়ায় কোন মালগাড়ি বা গাড়ি দেখা যায় না। ইহার কারণ সম্ভবত এই, জনসাধারণের আশংকা ছিল পাছে সরকারী লোকেরা এইসব গাড়ি কাড়িয়া লয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়" (Voyage en Egypte et en Syrie, প্যারিস ১৮২৫, ২খ., ২৫৪)। ফিলিস্তীনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কেবল সারকাসী ও বিদেশীদের নিকট গ্রামীণ গাড়ি ছিল (Dalman, Arbeit und Sitte, ২খ., ৯৮ ও চিত্র ৪০-২; A. Ruppin, Syrien als Wirtschaftsgebied, বার্লিন-ভিয়েনা ১৯২০, ৪২৪-৫)। আনাতোলিয়া ব্যতীত সারা নিকটপ্রাচ্যে সামগ্রিকভাবে অবস্থা একই রকম ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মরক্কোর জন্য দেখুনঃ Ch. Rene-Leclerc, Le Maroc Septentrional, আলজিয়ার্স ১৯০৫, ৮৭, ২৫১-২; ঐ লেখক Renseignements coloniaux, 1905, 248; R. La Tourneau, fe avant la protectorat, ক্যাসাব্লাংকা ১৯৪৯, ৪১৫। গাড়ির এই বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাখ্যা হইল রাস্তার দুরবস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা (R.s Brunschvig, la Berberie orientale sous le Hafsides ২খ, ২৩৬; J. Weulersse, Paysans de Syrie of du Proche-orient, প্যারিস ১৯৪৬, ১৩৩-৬; তু. Mez, Renaissance, 461; Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ৩খ., ৯৮)। তবে এই একই দেশসমূহের অবস্থা উহাদের প্রাচীন কালের অবস্থার সহিত কিংবা তুর্কী দেশসমূহের তুলনা করিলে এই ব্যাখ্যা মনঃপূত ও সংগত বলিয়া মনে হয় না। হয়ত বনাঞ্চল ধ্বংস হইবার ফলে কাঠের ক্রমশ স্বল্পতাহেতু গাড়ির ব্যবহার কমিয়া গিয়া থাকিবে। আবার লাঙ্গলের অবনতিকে ইহার সমকক্ষ বিষয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে (দ্র. A.G. Haudricount, L' homre et la charrue যন্ত্রস্থ ও নিবন্ধ "মিহ্রাছ")। তাহা ছাড়া উট ও পালানের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিও অন্যতম কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

এতদসত্ত্বেও শীঘ্রই বা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় গাড়িসমূহ তাহাদের রোমক ভাষাসমূহ (Romance) হইতে উদ্ভূত নামসহ প্রচলিত হইল (ইরানে রুশীয় কালেসকা নামে)। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইগুলি স্থানীয় কলাকৌশল ও রীতিনীতির উপযোগী করিয়া নির্মিত হইত। কেবল শহর এলাকায় সরকারী ও সামরিক কাজকর্ম ও সাধারণ পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত (C. Anet, La Perse en automobile, প্যারিস ১৯০৬, ১২২, ১৮৯, ১৯, ২৫, ২৬ ইত্যাদি) এইসব গাড়ি গ্রামীণ এলাকায় কদাচিৎ প্রবেশ করিত। ১৭শ শতাব্দীতে তিউনিসের মুরাদী শাসক বায় (Bay) একটি কাররুসাহ (ইতালীয় carrozza)-তে ভ্রমণ করিতেন (ইব্ন আবী দীনার, মুনিস, তিউনিস ১২৮৬ হি., ২২৪)। শব্দটি বর্তমানে উত্তর আফ্রিকায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এমনকি বারবারী উপভাষাগুলিতেও ইহা পাওয়া যায় (L. Brunot, Textes arabes de Rabat, ২খ., প্যারিস ১৯৫২, ৭১২)। অনুরূপভাবে কাররীতা (ইতালীয় carretta) শব্দটি আলজিরিয়ায় পশু-চালিত গাড়ি ও মালগাড়ির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Beaussier, Dict. pratique arabe-francais, আলজিয়ার্স ১৯৩১, ৭৯৩)। এই শব্দটি ইতোপূর্বে বহুবচন কারারীতরূপে ১৬শ শতাব্দীর পর্তুগীজ গাড়ির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল (Chronique anonyme de la dynastie sa' dienne, সম্পা. কলিন, পৃ. ৫৯)। মিসরে আরাবিয়্যাত হানতুর "ছেকড়া গাড়ি" (কেব) [হাংগেরীয় হিনটু হইতে তুর্কী হিনটু-এর মাধ্যমে, তু. F. Mikeosich, SBAK. Wien ১৮৮৫, ৫, ১৮৮৯, ৮] এবং 'আরাবিয়্যাত কাররো (ইতালীয় কাররো) শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Nallino, L' Arabo Parlato in Egitto, মিলন ১৯১৩, ২৪১; তু আহমাদ আমীন, কামূসুল-'আদাত ওয়াত-তাকালীদ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩৩৩ ও মুদ্রিত চিত্র ১৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হু'সায়ন যায়্যাত, আল-খিযানাতুশ-শারকিয়্যা, ৩খ., বৈরূত ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৪৯-৫১; (২) V.V. Barthold, o Kolesnom i verkhovom dvizenii v Srednei Azii, Zap Instituta Vestokovedinya Akademii nauk S.S.S. R., 1937 খৃ., পৃ. 5-7; (৩) A. G. Haudricourt, Contribution a la Geographie a I' ethnologie de la voiture, Revue, de Geographic humaine et d' Ethnologie, 1948 খৃ., পৃ. ৫৪-৬৪ (মূল্যবান পদ্ধতিগত নির্দেশাবলী)।

Redirson (E.I.²)/ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আজিয 'আরিফুদ্দীন খান (عاجز عارف الدين خان) ঃ মৃ. ১৭৭৩, কবি-নাম 'আজিয। সম্রাট আওরংগযেবের রাজত্বকালে বলখ হইতে তাঁহার পিতা দাক্ষিণাত্যে আসেন। 'আরিফুদ্দীন নিজামুল মুলকের দরবারে প্রবেশ লাভ করিয়া সেনাদলের বাখশী (বেতন বন্টনকারী) নিযুক্ত হন। সেই সংগে তিনি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার রচিত দীওয়ান-ই 'আজিয ব্যতীত লা'ল ও গাওহার নামক মাছনাবী কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। লা'ল ও গাওহার গ্রন্থখানি পারস্য দেশীয় একটি মনোরম কাহিনীর কাব্যানুবাদ। পাক-ভারতীয় ফার্সী সাহিত্যে 'আজিয কাব্যনামধারী তিনজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কবি সায়্যিদ মুহাম্মাদ 'আজিয, মালিকা-ই মিস্র (মিসর রাণী) নামক মাছনাবী কাব্যের রচয়িতা ছিলেন। তৃতীয় 'আজিয কাব্যনামধারী কবি লাহোরবাসী লাল গংগাবিশন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) T. W. Beale, An Oriental Biographical Dictionary, ed. H.G. Keem, London 1894, pp. 45, 302-3 & 327; (2) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ. ।

আজিজুর রহমান (عزيز الرحمن) ঃ পিতা মৌলবী মুহাম্মদ বশীর উদ্দীন; মাতা সবুরণ নেছা। জ. হাটশ হরিপুর (গ্রাম). জমিদার পরিবারে (উপজেলা ও জেলা কুষ্টিয়া) ১৮ অক্টোবর, ১৯১৪ খৃ., মৃ.১২ সেপ্টম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৭৮ খৃ. মুতাবিক ২৬ ভাদ্র, ১৩৮৫ বাংলা সন (আই. পি. জি. হাসপাতালে গ্যাংগ্রিন রোগে)। নাবালক অবস্থায় পিতার মৃত্যু হওয়ায় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ সরকারী তত্ত্বাবধানে চলিয়া যায় (১৯২৭)। ১৯৩১ খৃ. বিবাহ ও সংসার জীবনে প্রবেশ করায় প্রবেশিকা পরীক্ষা সমাপ্তির পূর্বেই শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৩৫ খৃ. 'মোয়াজ্জিন' নামে তাঁহার প্রথম কবিতা ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদিত দৈনিক তকবীর-এ প্রকাশিত হয়। সমকালীন মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'পরাণ পিয়া'। ছেলেবেলায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনবিদ এস. ওয়াজেদ আলী বি.এ. (ক্যান্টাব), বার-অ্যাট-ল-এর বিশেষ সান্নিধ্যে আসার ফলে আদর্শবাদী কাব্যচর্চার প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং নিয়মিতভাবে লিখিতে শুরু করেন। এস. ওয়াজেদ আলী প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'গুলিস্তা' পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম কবিতার নাম 'এ নব আষাঢ়ে'।

তাঁহার প্রথম জীবন কলিকাতায় কাটে। এই সময়ে কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমাদ-এর সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া পড়েন এবং সেই সূত্রে তিনি ইসলামী গযল, গান ইত্যাদি লিখিতে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৪৪ খৃ. তাঁহার প্রথম ইসলামী গানের একটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। গানের প্রথম কলি—

কারো মনে তুমি দিও না আঘাত
সে আঘাত লাগে কাবার ঘরে।

তাঁহার অনেক গান দি গ্রামোফোন কোম্পানী, কলিকাতা হইতে রেকর্ডকৃত হয়। ১৯৪৫ খৃ. কবি আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত 'কাব্য মালঞ্চে' তাঁহার "শহরের সন্ধ্যা" নামক একটি কবিতা সংকলিত হয়। তিনি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকায় (পরে রেডিও বাংলাদেশ), প্রথমে অনিয়মিতও পরে নিয়মিত কথিকা লেখক হিসাবে যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নানা বিষয়ে কবিতা, আলোচনা, নাটক ইত্যাদি লিখিলেও তিনি প্রধানত গীতিকার হিসাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার গযল-গানের সংখ্যা অনেক। মরমী কবি লালন শাহের তিনি ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কতিপয় গান ছায়াছবিতেও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁহাকে একুশে পদক পুরস্কারে সম্মানিত করেন। কবির অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহাকে নিজ বাটিস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

তিনি অধুনালুপ্ত বিখ্যাত শিশু পত্রিকা আলাপনীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন (১৯৬০)। দৈনিক পয়গাম-এর তিনি সাহিত্য সম্পাদক হিসাবেও বেশ কিছুদিন কাজ করেন (১৯৬৪)। জীবনের সুদীর্ঘ কাল তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ ছুটির দিনে (শিশু নাটিকা) বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত হয় (১৯৬৩); দেশাত্মবোধক গানের সংকলন—এই মাটি, এই মন (১৯৭০), পাঁচ মিশালী গানের সংকলন—উপলক্ষের গান (১৯৭০) ইত্যাদি সমকালীন শিশু, যুবক ও ধর্মানুরাগী পাঠক সমাজে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) কবি আজিজুর রহমান স্মরণিকা (কবি আজিজুর রহমান সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশিত ১৯৮০-৮১); (২) বাংলাদেশের লেখক, বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংকলিত, ঢাকা ১৯৮৪।

আজিজুল হক, কাজী (عزيز الحق قاضى) ঃ খান বাহাদুর [১৮৭২-১৯৩৫] খুলনা জেলার পারগ্রাম কাশ্রাহয়ে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম কাজী জহুরুল হক। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া একজন সাব-ইনসপেকটর অব পুলিশ হিসাবে তিনি তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন (১৮৯২)। ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন। ১৯০১ সালে ইনসপেকটর অব পুলিশ হিসাবে তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং কর্মব্যাপদেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করিবার সুযোগ লাভ করেন। পরে পুলিশ সুপার পদে উন্নীত হইয়া তিনি তৎকালীন বিহার প্রদেশের চাম্পারন জেলার মতিহারীতে বদলি হন। মতিহারীতে কর্মরত অবস্থায় তাঁহার কর্মকাল শেষ হয় এবং তিনি ১৯২৩ সালে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ১২ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষ জীবন তিনি মতিহারীতেই কাটান। মতিহারীতে স্বনির্মিত 'আজিজ মঞ্জিলে' তাঁহার কবর অবস্থিত। কৃতিত্বপূর্ণ কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯১৩ খৃ. 'খান সাহেব' ও ১৯১৬ খৃ. 'খান বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকার তাঁহাকে একখণ্ড নিষ্কর জমি এবং সেই সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। হাত-পায়ের ছাপের সাহায্যে অপরাধী সনাক্তকরণের যে নয়া পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কর্মজীবনে তাহাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করা হয় (১৯২৪)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অপরাধী সনাক্তকরণের উক্ত পদ্ধতি অদ্যাবধি তাঁহার পূর্বতন পুলিশ প্রধান এডওয়ার্ড হেনরী সাহেবের নামে হেনরী সিস্টেম (Henry system)-রূপে পরিচিত। কর্মজীবনের প্রারম্ভে সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মকালে খান বাহাদুর সাহেব উক্ত হেনরী সাহেবের অধীনে বেশ কিছুকাল কর্মরত ছিলেন (১৮৯১-১৮৯৯)। হেনরী সাহেব এই সময়ে হাত-পায়ের ছাপ অবলম্বনে অপরাধী সনাক্তকরণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারত ছিলেন। খান বাহাদুর সাহেবকে উপযুক্ত মনে করিয়া হেনরী সাহেব তাঁহাকেই এই গবেষণা কাজের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। খান বাহাদুর সাহেবও বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং এইভাবে একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হেনরী পদ্ধতিটি গ্রন্থাকারে (মূল বইখানির নাম "Classification and Uses of Finger Prints," London 1900)" প্রকাশকালে খান বাহাদুর আজীজুল হকের নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে পরে ৬ জানুয়ারী, ১৯১২ সনে কলিকাতায় হেনরী সাহেবকে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় হেনরী সাহেব এই আবিষ্কারে জনাব আজীজুল হকের সহযোগিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Sir E.R. Henry, Classification and Uses of Finger prints, London 1900; (২) F. Brewester with an introduction by A. K. Basu (The Eastern Law House, Calcutta) 1936; (৩) Historical Survey on Finger Prints by Sk. Said Bakhsha, The Detectiva (Indipendence Number vol. I, August, p. 105-114].

মুহাম্মদ আবূ তালিব

আজিমুদ্দীন মুনশী (عظيم الدين منشى) ঃ খৃস্টীয় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তাঁহার বিশেষ উল্লেখ নাই। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার খাঁড়ি নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। ১২৬৬ বাং সালে রচিত 'জামালনামা' নামক কাব্যগ্রন্থের শুরুতে তিনি তাঁহার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, মুনশী আজিমুদ্দিন ১২৬৬ বাং/১৮৫৯ খৃস্টাব্দের কিছু কাল পূর্বে বর্ধমান জেলার খাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে তাঁহার স্থায়ী আবাস। তাঁহার পিতার নাম মুনশী গোলাম সরওয়ার; দাদার নাম 'উমর 'আলী এবং নানার নাম জারুল্লাহ কাজী।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম ঃ (১) জামাল নামা, ১২৬৬ বাং/ ১৮৫৯ খৃ.; (২) কি মজার কলের গাড়ী, ১২৭০ বাং/ ১৮৬৩ খৃ.; (৩) কলির বউ ঘর ভাংগানি, ১২৭৫ বাং/ ১৮৬৮ খৃ; (৪) কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে, ১২৭৫ বাং/ ১৮৬৮ খৃ. ইত্যাদি। গ্রন্থগুলি সামাজিক নকশা জাতীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকা। প্রথম 'জামাল নামায়' সমকালীন আরবী ফারসী মিশ্রিত মুসলমানী বাংলায় একটি রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ফারসী ভাষায় রচিত বিখ্যাত ফিরদাওসীর 'শাহনামাহ' কাহিনী হইতে 'জোহাক' রাজার কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তিকা 'কি মজার কলের গাড়ীতে সদ্য প্রচলিত রেলগাড়ী সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা হইয়াছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পুস্তিকাতে যথাক্রমে কলির সুন্দরী বউয়ের ঘর ভাংগানো ও অর্থশালী বৃদ্ধ বরের তরুণী বিবাহ-বিলাসের করুণ সামাজিক পরিণামের কথা স্মরণ করা হইয়াছে। 'ঘর ভাংগানি' গ্রন্থে স্ত্রৈণ তরুণ স্বামী তরুণী স্ত্রীর ফেরেবে পড়িয়া কিভাবে অসহায় বৃদ্ধ মাতা-পিতার দুঃখের কারণ হয়, তাহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বইখানি জনৈক মোহাম্মদ মুনশীর নামেও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মোহাম্মদ মুনশী ও আজিমুদ্দীনকে একই ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু তাহা যে ঠিক নয় তাহার প্রমাণ, মোহাম্মদ মুনশী ভুরশুট কানপুরের বাশিন্দা; তাঁহার পিতার নাম শেখ দারাজতুল্লাহ। মোহাম্মদ মুনশীর ভাষায় যেমন –"কহে মোহাম্মদ মুনশী জনাবে সবার ভুরশুট কানপুরে বসত যাহার"। মুনশী নামদার নামে আর এক লেখকের বেশ কয়েকখানি বই অন্যের নামে প্রচলিত আছে। যেমন 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (১৮৬৮) একাধারে মুনশী গোলাম হোসেন ও মুনশী নামদারের নামে প্রচলিত আছে। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, মুনশী নামদারের নামে প্রচলিত এই বইখানি আসলে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। মুনশী নামদার একজন জাল লেখক। অবশ্য তাহা নাও হইতে পারে । প্রকাশকের ভ্রান্তি বা কারসাজিতেও সেকালে এইরূপ বিভ্রান্তি দেখা যাইত। মুনশী আজিমুদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' গ্রন্থে (১৮৬৮) টাকার জোরে বৃদ্ধ বরের নিত্য-নূতন তরুণী ভার্যা গ্রহণ ও কদর্য যৌন-বিলাসের চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া তৎকালীন সাধারণ মুসলমান সমাজে ক্লেদ-গ্লানিসূচক বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ মুনশী সাহেবের নামে প্রচলিত রহিয়াছে। সম্ভবত এইসব গ্রন্থের লেখক মুনশী আজিমুদ্দীন নহেন, তবে বিষয়বস্তু প্রায় একই জাতীয়। অবশ্য এই ব্যাপারে মুনশী আজিমুদ্দীনকেই পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর রচনার সাহিত্যমূল্য যাহাই হউক, সমকালীন সমাজ-সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে বিচার করিলে ইহার মূল্য নগণ্য নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ আবূ তালিব, বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.; (২) কাজী আব্দুল মান্নান, ডক্টর, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় সং; (৩) ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়; (৪) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭১ বাং/ ১৯৬৪ খৃ.।

মুহাঃ আবূ তালিব

আজীজুল হক, স্যার মুহাম্মাদ (محمد عزيز الحق) ঃ এক বিশিষ্ট ভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক নেতা, নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রামে জন্ম (১৮৯২- ১৯৪৭)। তাঁহার পিতার নাম মুনশী মুহাম্মাদ মুনীরউদ্দীন এবং তাঁহার চাচা বিখ্যাত কবি মোজাম্মেল হক। মোজাম্মেল হক তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'আলেফ লায়লা' পুস্তকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১২৯৩ বাং/ ১৮৮৬ খৃ.)।

আজীজুল হক কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি.এ. (১৯১১) পাশ করেন। পরে বি. এল. (১৯১৪) পাশ করিয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতি শুরু করেন। অতঃপর তিনি সরকারী উকীল হিসাবে নিয়োজিত হন। পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (১৯২৬) ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন (১৯২৮)। পরে তিনি কৃষ্ণনগর পৌর-সভার চেয়ারম্যানও হইয়াছিলেন (১৯৩৪)।

অতঃপর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৪-৩৭) হন। ১৯৩৬ সালে তিনি দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং উহার স্পীকার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন (১৯৩৭-৪২)। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন (১৯৩৮) এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত ১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি. লিট." উপাধি দেয় (১৯৪২) । বাঙালী মুসলমানদের জন্য ইহা ছিল এক দুর্লভ সম্মান। অতঃপর ভারত সরকার তাঁহাকে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাই কমিশনার নিযুক্ত করিয়া পাঠান (১৯৪২-৪৩)।

ইহা ছাড়া ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় বড়লাট-পরিষদের বাণিজ্য-সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি তৃতীয়বার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং সেই সময়ে গণপরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত ফ্লাউড কমিশনের সদস্য, লর্ড লিনলিথগো কমিশনের সদস্য ও

নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি বৃটিশ সরকার হইতে খান বাহাদুর (১৯৩৪), সি. আই. ই. (১৯৩৭), নাইট (১৯৪১) ও কে. সি.আই. ই. (১৯৪৬) উপাধিগুলি লাভ করেন (বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ., ২০৬)। ১৯৪৭ সালে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে এই ক্ষণজন্মা পুরুষের ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার নামে আজীজুল হক কলেজ (১৯৩৯) প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার আজীজুল হক শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি একাধারে খ্যাতনামা রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকও ছিলেন। রাজনীতিক আজীজুল হক সমকালীন মুসলিম বাংলার দুঃখ-দুর্দশা ও অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া যেমন বেদনা বোধ করিয়াছেন, তেমনি তাহা দূরীকরণের জন্যও সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারই এই বেদনা-সমুদ্র-মন্থনজাত সৃষ্টি "দি ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ" (The Man Behind The Plough লাঙ্গলের পিছনের মানুষটি)-ও History and Problems of Muslim Education in Bengal) এই সকল গ্রন্থে তাঁহার জন্মভূমি বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার কর্মজীবনের একটি বড় কীর্তি, তিনি বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কার কার্যে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাহাদের নানা সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য রচনা Education and Retrenchment, Separate Electorate in Bengal, The Sword of the Crescent Moon (ঢাকা ১৯৭৮) ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, স. বাংগালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ কলিকাতা ১৯৭৬; (২) মোজাম্মেল হক ও রওশন আলী, সহি বড় আলেফ লায়লা, রচনা ১২৯৩ বাং/ ১৮৮৬ খৃ.; (৩) এম. আজীজুল হক, The Man Behind The Plough, Kolikata 1939; (৪) The History and problems of Muslim Education in Bengal, অনু. মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ. ১খ., ২০৬, ঢাকা ১৯৭২; (৬) Bangladesh District Gazetteers, Bogra, Dhaka 1979, p. 204-5; (৭) M. Azizul Huque, Life Sketch and Selected Writings, ed. Shahanara Alam and Hurniara Huq, Dhaka 1984, pp. 1-32.

মুহাঃ আবূ তালিব

আজীজুল হাকিম (عـزيـز حـكـيـم) ঃ (১৯০৮-১৯৬২), ঢাকা জেলার রায়পুরা উপজেলার অধীন হাসানাবাদ গ্রামে আজীজুল হাকিমের জন্ম (১৯০৮ খৃ.)। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক ছিলেন। সাংবাদিকতা ও সমাজ সেবাতেও তাঁহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ভোরের সানাই (১৯৩২), মরুসেনা (১৯৩৩), পথহারা (১৯৩৬), ঘরহারা (১৯৩৭), বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর (১৯৫৪), সঞ্চয়ন কাব্যগ্রন্থ, রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম, (১৯৫৫), রুবাইয়াৎ-ই। হাফিজ (১৯৫৬) ইত্যাদি অনুবাদ ইহা ছাড়া ঝড়ের রাতের যাত্রী (১৯৫৯) নামক গল্প গ্রন্থ, আজাজিল নামা (১৯৫৬) নামক ব্যংগ কবিতা সংকলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যুগ-সচেতন কবি ছিলেন। তাঁহার রচনায় ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রভাব ও কতিপয় আধুনিক ছন্দের বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ বিদ্যমান।

তিনি 'সবুজ বাংলা' ও পাক্ষিক 'নওরোজ' নামক পত্রিকা দুইখানি বহুদিন যাবত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশের লেখক পরিচিত, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮০; (২) সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৯৭৬; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ, ১১৮।

মুহাঃ আবূ তালিব

'আজ'ীম (দ্র. আল-আসমাউল হু'সনা)

আল-'আজ'ীমী (العظيمى) ঃ মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আবূ আবদিল্লাহ আত্-তানূখী) ৪৮৩/১০৯০-৫৫৬/ ১১৬১, আলেপ্পো নগরীর জনৈক ঐতিহাসিক। তৎপ্রণীত ৫৩৮/-১১৪৩-৪৪ সন অবধি সময়কালের একখানা পূর্ণ, অথচ নিরস ব্যাপক ইতিহাস, প্রধানত সিরিয়া সম্পর্কিত এখনও প্রচলিত রহিয়াছে (উহার ৪৫৫/১০৬৩ সন পরবর্তী ইতিহাস CL. Cahen, JA, ১৯৩৮,পৃ. ৩৫৩-৪৪৮-এ প্রকাশ করিয়াছেন)। তদুপরি তিনি আলেপ্পো নগরীর এক বৃহৎ ইতিহাস লিখিয়াছেন। তথ্যাদি কামালুদ্দীন ইব্নুল আদীম ও ইব্ন আবী তায়ী (শেষোক্ত ব্যক্তি ৫৫৬/ ১১৬১ সাল পর্যন্ত) প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। যে কারণে আল-আজীমীকৃত গ্রন্থাবলীর সংরক্ষিত অংশ কৌতূহল জাগ্রত করে তাহা উহাদের স্বকীয় ঐতিহাসিক মূল্য নহে, বরং ৫ম/৯ম শতাব্দী হইতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মধ্যকার উত্তর সিরীয় ইতিহাস গ্রন্থাবলীর মধ্যে এইগুলির ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। উহারা এইভাবে আমাদের পরবর্তী শতাব্দীর বৃহৎ গ্রন্থাবলীর ইতিহাস পূর্ণ করিতে বা সমালোচনা করিতে আংশিকভাবে সাহায্য করে। এই সময়ের ইতিহাস প্রণয়নেও আমরা উহাদের উপর নির্ভরশীল। কেননা ঐগুলি আমাদেরকে তথ্যাদির উৎসের কাছাকাছি লইয়া যায়। সিরীয় জনগণের নৈতিকতায় ও সামাজিক পরিবেশে ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুকুরিমিন হালিল (Yinane), XII asir tarihcibri ve muverrihi Azimi, in Ikinci Turk Tarih Kongressi Nesriyati, 1937; (২) CL. Cahen, উল্লিখিত সংস্করণের ভূমিকা ও (৩) La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, 1940, পৃ. ৪২-৩।

CL. Cahen (E.I[2]) /মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

'আজীমুল্লাহ খান, মুহাম্মাদ (عظیم اللّٰه خان محمد) ঃ (মৃ. ১৮৫৯ খৃ.) ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা। ভারতের যুক্তপ্রদেশের কানপুর শহরের এক অতি দরিদ্র পাঠান পরিবারে তাঁহার জন্ম, কিন্তু জন্ম তারিখ অজ্ঞাত (G. Dunbar, A History of India from the Earliest Times to the Present Day, ২খ., ৪৮৩)। ১৮৩৭-৩৮ খৃস্টাব্দে ভারতে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ইহার পূর্বেই তাঁহার পিতা মারা যান। সেই দুর্ভিক্ষের সময় এক খৃস্টান ধর্মযাজক অনাহারে মরণোন্মুখ পিতৃহীন শিশু 'আজীমুল্লাহকে তাঁহার মাতাসহ তাঁহাদের পর্ণকুটির হইতে উঠাইয়া আনিয়া এক স্থানীয় মুসলিম এতীমখানায় পৌঁছাইয়া দেন । সেইখানে তাঁহার মাতা আয়া হিসাবে কাজ করিতে থাকেন (ডি. এন. বি., ১খ., ৯৬)। কিছুদিন পরে নিঃস্ব দরিদ্র বালক 'আজীমুল্লাহ ভৃত্য (খিদমাতগার) হিসাবে কানপুরের এক এংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারে স্থান পান (M. Thompson, The Story of Cawnpoire, পৃ. ৫৮)। তাঁহার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া এই পরিবারের লোকেরা তাঁহাকে এক স্থানীয় সরকারী স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেয়। এই স্কুলে তিনি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া দশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে তিনি একই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। দুই বৎসর শিক্ষকতা করার পর তিনি প্রথমে ব্রিগ-জেনারেল স্টট ও পরে ব্রিগ জেনারেল আশবার্নহাম-এর কেরানী নিযুক্ত হন। অতঃপর সর্বশেষ ২য় পেশওয়া বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসিদ্ধ নেতা নানা সাহেব (১৮২৫ খৃ.?) -এর অনুরোধে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষক ও ইংরেজীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় নানা সাহেব অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে স্বীয় রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করেন।

১৮৫১ সালে সর্বশেষ পেশ্ওয়া বাজীরাও-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেব তাঁহার পদবী, পেনশন ও স্টেটের উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার তাঁহাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী তাঁহাকে ২য় বাজীরাও-এর সঞ্চিত ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়ার অনুমতি দিলেও তাঁহার পদবী ও পেনশন বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৫২ সালে নানা সাহেব 'আজীমুল্লাহ কর্তৃক প্রস্তুত একটি অভিযোগনামা ভারতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন, কিন্তু কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস উহা প্রত্যাখ্যান করে। নানা সাহেব কোম্পানীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য 'আজীমুল্ল'হকে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে ১৮৫৪ (মতান্তরে ১৮৫৩) সালে লন্ডনে প্রেরণ করেন। 'আজীমুল্লাহ নানা সাহেবের পক্ষে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। প্রায় ৫০,০০০ পাউন্ড ব্যয়ে দুই বৎসরের অধিক কালে ইংল্যান্ডে অবস্থান করিয়া অবশেষে হতাশ ও ব্যথিত হৃদয়ে ১৮৫৫ (মতান্তরে ১৮৫৬) সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারত হইতে বৃটিশ সরকারকে অবশ্যই উৎখাত করিতে হইবে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্যারিস ও কনস্টানটিনোপোল গমন করেন এবং সেভ্যাস্টপোলে বৃটিশ সামরিক শিবির ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেন (Russell, My Diary in India, পৃ. ১৬৫-৬৭)। ভারতে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে রাশিয়ানদের সাহায্য লাভের জন্য তিনি গোপনে রাশিয়া সফর করেন। দেশে পৌঁছিয়া তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যের জন্য তুরস্কের সুল্তানের নিকট পত্র লিখেন এবং গোপনে মিসর সফরের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন।

সামরিক অভ্যুত্থানের গোপন প্রস্তুতি হিসাবে 'আজীমুল্লাহ নানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ১৮৫৭ সালের প্রথমাংশে উত্তর ভারতের সামরিক ঘাঁটিগুলি গোপনে পরিদর্শন করেন এবং অভ্যুত্থানে সাহায্য লাভের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। আজীমুল্লাহ্র পরামর্শে নানা সাহেব ভারতের বিভিন্ন যুবরাজের নিকটও গোপনে দূত প্রেরণ করেন এবং প্রয়োজনের সময় সাহায্যের অঙ্গীকার লাভ করিয়া সামরিক অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের ৪ জুন কানপুরে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কতিপয় যুবরাজের ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকার ভুয়া প্রমাণিত হয়। প্রথমত নানা সাহেবের সৈন্যরা বৃটিশ সৈন্যদেরকে নিশ্চিহ্ন করিয়া কানপুর দখল করে, কিন্তু ১৬ জুলাই, ১৮৫৭ তারিখে বৃটিশ জেনারেল Havelock-এর নেতৃত্বে প্রেরিত বৃটিশ বাহিনী নানা সাহেবের কানপুরের নিকটস্থ বিথুর (Bithur) দুর্গের পতন ঘটাইয়া কানপুর পুনরায় দখল করিলে 'আজীমুল্লাহ অদৃশ্য হইয়া যান। ভিন্ন মতে যুদ্ধ অবসানের পর তিনি নানা সাহেবকে লইয়া অন্যান্য নেতাদের সহিত নেপালের ভুতওয়াল (Bhutwal)-এ পালাইয়া যান এবং প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ১৮৫৯ সালের অক্টোবর মাসে সেইখানে ইন্তিকাল করেন।

আজীমুল্লাহ ছিলেন উচ্চ স্তরের সংগঠক, সুদক্ষ নেতা ও খাঁটি স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরপুরুষ। হিন্দু ও মুসলমানগণকে একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে, এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি বৃটিশ সরকারকে উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বীয় অনুরক্ত সহচর নানা সাহেবের প্রতি আনুগত্যের জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

তাঁহার অনেকগুলি চিঠি বিহারে পাওয়া গিয়াছে; এইগুলি The Letters of an Indian Prince নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একটি ডায়রিও রাখিয়া যান, ইহাতে বাজীরাও ও নানা সাহেবের রাজদরবারের জীবন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ধর্ম সম্পর্কে 'আজীমুল্লাহ উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায় একত্রে আহার ও অবাধে মেলামেশা করিবে ইহা তিনি কামনা করিতেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল মুসলিম। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে বৃটিশ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নারীদেরকে এইরূপ অবাধ মেলামেশা হইতে নিবৃত্ত করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম রাসূল মিহর, ১৮৫৭ কে মুজাহিদ, লাহোর ১৯৫৭, পৃ. ৪৩-৬০; (২) ইনতিজামুল্লাহ শিহাবী, মাশাহীর-ই জংগ-ই আযাদী, করাচী ১৯৫৭, খৃ. ১৫৩-৬০, (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাংকলিন বুক

প্রোগ্রামস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ২০৫; (৪) S. Lutfullah, The Man Behind the War of Independence 1857, Karachi 1957; (৫) P.C. Gupta, Nana Sahib and the Rising at Kanpur; (৬) R.C. Majumdar, The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857, Calcutta 1857, 164-65; (৭) S.N. Sen, Eighteen Fifty-Seven, Delhi 1957, 126-29, 138, 145, 150, 368, 406; (৮) Freedom Struggle in U.P., Publications Bureau Information Dept., U. P., vols. I-II; (৯) V.D. Savarkar, The Indian War of Independence 1857, Bombay 1947, 28-29; (১০) J.W. Kaye, A History of the Sepoy War in India : 1857-58, London 1870, i, 109-10, 648-49; (১১) Anand Swarup Misra, Nana Sahib Peshwa; (১২) Earl Roberts, Forty-one Years in India; (১৩) ঐ লেখক, Letters Written during the Indian Mutiny, London 1924, 120; (১৪) W.H. Russell, My Diary in India, vol. I; (১৫) G.W. Forrest, Selections from the Letters, Despatches and Other State Papers, Preserved in the Military Dept. of the Govt. of India; (১৬) D.N.B., ed. S.P. Sen, Calcutta 1972, vols. I, III; (১৭) G.B. Malleson, History of the Indian Mutiny, London 1879, ii, 251-52; (১৮) Lord Roberts, Forty-one Years in India, London 1897, i, 239, 377, 427, 29; (১৯) W.J. Shepherd, A Personal Narrative of the Outbreak and Massacre at Canpore, Lucknow 1879, 14-5; (২০) W. Forbes Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny, London 1893, 185-86; (২১) M.R. Gubbins, An Account of the Mutinies in Oudh, London 1858, 32; (২২) E. I.², i, 822; (২৩) G. Dunber, A History of India from the Earliest Times to the Present Day, London 1943, ii, 483; (২৪) M. Thompson, The Story of Canpore, London 1859, 58; (২৫) G.O.T. Trevelyan, London 1907, 58.

ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

আজুররুমিয়্যা (দ্র. ইব্‌ন 'আজুররূম)

'আজূম (দ্র. 'আয়্যামুল-আজূয)

আটক (Attock) ঃ পাকিস্তানের একটি দুর্গ; সিন্ধুনদের নৌপথ নিয়ন্ত্রণকারী এই দুর্গটি কাবুল নদীর সঙ্গমস্থলের ঠিক নিম্নে ভাটিতে ৩৩°—৫৩´ উ. অক্ষাংশ ও ৭২°—১৫´ পূ. দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সম্রাট আকবার ৯৮৯/১৫৮১ সালে দুর্গটি (আটক-বানারাস নামে) নির্মাণ করেন। তিনি তাঁহার ভাই মীর্‌যা হাকীমের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশে কাবুল হইতে পেশাওয়ার হইয়া আগত প্রধান আক্রমণ পথ রোধকল্পে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। নামটির সমসাময়িক ব্যাখ্যার জন্য দ্র. ফিরিশতা, ১খ., ৫০২ ও আবুল ফাদ'ল, আকবারনামাহ, Bid. Ind., মূল পাঠ, ৩ খ., কলিকাতা ১৮৮১-৮৭ খৃ., ৫৩৩; ইহার সম্ভাব্য ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য দ্র. Cunningham, Arch. Sur. India, 1871, ২খ, ৭।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শেষে আটক বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। তখন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও উত্তর-পশ্চিম রেলপথের জন্য সংযুক্ত সড়ক ও রেলসেতু নির্মিত হইলে (১৩০০/১৮৮৩) উহার সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আকবারনামাহ, মূল পাঠ, Bibl. Ind., Calcutta 1881-87, ৩খ., ৩৫৫; (২) Gazetteer of Rawalpindi District (২য় সংস্করণ), ১৮৯৩-৪ খৃ. লাহোর ১৮৯৫, ২৬০; (৩) Imperial Gazetteer ৬খ., ১৩৮।

P. Hardy (E.I.²) / মু. আবদুল মান্নান

আটকান্দি কুঠি মসজিদ ঃ নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার আটকান্দি গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি মেঘনার একটি শাখা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। নিকটেই একটি নীল কুঠি ছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ। নিকটবর্তী হাসনাবাদ গ্রামের জনৈক মৌলভী আলিম উদ্দিন উনবিংশ শতকের শেষার্ধে মসজিদটি নির্মাণ করেন। কোন শিলালিপি না থাকায় সঠিক নির্মাণ তারিখ অজ্ঞাত। মসজিদটি মোটামুটি মুগল স্থাপত্য কৌশলের অনুকরণে নির্মিত। আয়তন ৩৭-৬´×১৪-৬´, দেওয়ালগুলি ২-১৩´ পুরু।। মসজিদের চার কোণার অষ্টকোণাকার বুরুজগুলি কার্নিশের বেশ উপরে উঠিয়াছে। পূর্ব প্রাচীরে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ এবং উত্তর-দক্ষিণে একটি করিয়া জানালা রহিয়াছে। প্রবেশপথগুলি মসজিদের ভিতর ও বাহির উভয় দিকে কাঠামোগত পার্থক্য রহিয়াছে। প্রধান প্রবেশ পথের ভিতরের দিকে ভূমি হইতে খিলান শীর্ষের উচ্চতা ৬-৩´ এবং প্রস্থ ২-১১´, পার্শ্ববর্তী দুইটির উচ্চতা ৬-২´ এবং প্রস্থ ২-৬´। কিবলা প্রাচীরের মধ্যখানে খিলানাকৃতির কুলঙ্গী (Recess)। মিহরাবটি দুইটি স্তম্ভ সমর্থিত একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। কাঠামোর উপরিভাগ মার্লন (Merlon) নকশায় শোভিত। মিহরাব, কুলঙ্গী, প্রবেশপথ ও উত্তর দক্ষিণের জানালাগুলি এক একটি বড় খাজকাটা খিলানাকৃতির কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। দুইটি তীর্যক খিলান (Lateral arch) দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিন ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বর্গাকৃতির। প্রত্যেক অংশের উপর প্রাচীর ও তীর্যক খিলানের সাহায্যে নির্মিত গোলাকার গম্বুজ দ্বারা মসজিদের ছাদ ঢাকা। মধ্যের গম্বুজটি বড়, পার্শ্ববর্তী দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট। গম্বুজগুলির শীর্ষে পদ্ম নকশা ও কলস চূড়ায় সুশোভিত। আটকান্দি কুঠি মসজিদের বারান্দার ছাদ ছোট পাঁচটি গম্বুজ দ্বারা ঢাকা। বারন্দায় প্রবেশের পাঁচটি সমমাপের খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রহিয়াছে। পথগুলির বাহিরের দিক এক একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত

এবং উপরের অংশ প্যানেল (Panel) নকশায় অলংকৃত। প্রধান প্রবেশ পথের উভয় দিকে ২টি করিয়া এবং অন্যগুলির উভয় পার্শ্বে ১টি করিয়া অষ্টভূজাকৃতির সরু মিনার (pinnacle) দ্বারা শোভিত। মিনারগুলি কার্নিশের বেশ উপরে উঠিয়াছে এবং ইহার শীর্ষদেশ ছোট ছোট কলস চূড়ায় সুশোভিত। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ প্রবেশপথ দুইটিও সম্মুখের অনুরূপ নকশায় নির্মিত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরের বাহিরের দিকের জানালা দুইটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। ইহার উপরে আয়তাকার প্যানেল নকশা এবং দুই পার্শ্বে দুইটি সরু মিনার রহিয়াছে। ইহার দুই পার্শ্বে আয়তাকার ও বর্গাকার প্যানেল নকশা এবং একটি করিয়া সরু মিনার দ্বারা প্রাচীর গাত্র অলংকৃত। মসজিদের পিছনের দিক মিহরাব ও পার্শ্ববর্তী দুই কুলঙ্গীর বিপরীত অংশ প্রাচীর গাত্র হইতে কিছুটা উদগত। মধ্যবর্তী উদগত অংশের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং পার্শ্ববর্তী দুইটির দুই পার্শ্বে একটি করিয়া সরু মিনার দ্বারা শোভিত। ছাদের উপরে গম্বুজের নিম্নভাগ অষ্টকোণা ড্রামের (Drum) মধ্যে নির্মিত এবং ড্রামের উপরিভাগ মার্লন নকশায় অলংকৃত। মসজিদটির বিভিন্ন অংশে সংস্কার করিবার পর বেশ মজবুত অবস্থায় টিকিয়া রহিয়াছে। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে নদীতীরে মুসল্লীদের উযু করিবার সুবিধার্থে বহু ধাপবিশিষ্ট একই বিশাল সিঁড়ি একটি সময়ে নির্মাণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ঢাকা, তাং ৩০-৯-৯৮ খৃ.; (২) ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ঢাকা, ২২ খ., রায়পুরা শিরো.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আট্‌লানটিক (দ্র. আল-বাহরুল মুহীত)

আট্‌লাস (দ্র. আতলাস)

অ্যাটলী : লর্ড ক্লেমেন্ট রিচার্ড, ভাইকাউন্ট প্রেস্টউড (Attlee, Lord Clement Richard, Viscount Prestwood) (১৮৮৩- ১৯৬৭ খৃ.) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী (১৯৪৫-৫১) ও শ্রমিক দলীয় নেতা। তিনি হেইলিবেরী কলেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ইনার টেমপল্ হইতে ১৯০৬-এ তিনি ব্যারিস্টার হন, ১৯০৭ পর্যন্ত আইন ব্যবসায় করেন। বীয়াট্রিস ও সিডনি ওয়েব দম্পতির প্রভাবে তিনি সমাজবাদী হন। ১৯০৭-এ ফে(ই)বিঅ্যান (Faebian) সোসাইটিতে ও পরে শ্রমিক দলে যোগ দেন। রাসকিন কলেজে (১৯১১) ও লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস (১৯১৩-২৩)-এ সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীতে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন এবং ইরাকে আহত হন। স্টেপনির প্রথম শ্রমিক মেয়র (১৯১৯-২০), আলডারম্যান (১৯২০-২৭)। স্টেপনির লাইম হাউস এলাকা হইতে তিনি পার্লামেন্টে শ্রমিক দলীয় সভ্য নির্বাচিত হন (১৯২২)। ১৯২৭-এ সাইমন কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে পাক-ভারত ভ্রমণ করিয়া সেইখানে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রবল সমর্থক হন। তিনি শ্রমিক সরকারে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হন (১৯২২-২৩), কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের কোয়ালিশন সরকার বর্জন করেন। তিনি কমন্স সভায় শ্রমিক দলের উপনেতা (১৯৩১-৩৫) এবং জর্জ ল্যানস্‌বারির পর নেতা (১৯৩৫-৪০) হন। ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন স্যার উইনস্টন চার্চিলের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় তিনি লর্ড প্রিভি সীল (১৯৪০-৪২), ডোমিনিয়ন দফতরের সেক্রেটারি অব স্টেট (১৯৪২-৪৩), ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার (১৯৪২-৪৫) ও লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল (১৯৪৩-৪৫) ছিলেন। জুলাই ১৯৪৫-এ যখন তিনি চার্চিলের সঙ্গে পটসদাম কনফারেন্সে ব্যাপৃত, তখন বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়ী হয়; ফলে তিনি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হন (জুলাই, ১৯৪৫)। তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে বৃটেন শিল্প জাতীয়করণের পথে বহু দূর অগ্রসর হয়, পাক-ভারত স্বাধীনতা লাভ করে (আগস্ট, ১৯৪৭), ফিলিস্তীন-এ ইসরাঈল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, বৃটেনের স্বীকৃতি লাভ করে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। আবার তিনি বিরোধী দলের নেতা হন (১৯৫১-৫৫), আর্ল (Earl) উপাধি লাভ করেন এবং কমন্স সভা ত্যাগ করিয়া লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেন (১৯৫৫)। বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) The Social Worker, (২) The Will and the Way to Socialism; (৩) Labour Party in Perspective (1937), (৪) Labour Party in Perspective and Twelve years Later (১৯৪৯); (৫) As it Happened (autobiography, ১৯৫৪); (৬) Twilight of Empire (১৯৬২) ও (৭) Purpose and Policy (বক্তৃতাবলী) উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১-এ তিনি দিল্লীতে আযাদ মেমোরিয়াল লেক্‌চার দান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., পৃ. ৬৪।

(সংকলিত)

আর্ট (Art) : চিত্রকলা, ললিতকলা, দেশসমূহ, শহরসমূহ, রাজবংশসমূহ (আজ, আরবীয় নকশা (Arabesque), স্থাপত্যবিদ্যা, বিনা, কালী, নাকশ রাসম ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ দেখুন)।

(E.I[2]) /এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

আর্টভিন (Artvin أرتوين) : তুরস্কের দূর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর, ৪১° ডিগ্রি ১০ ফুট উত্তর, ৪১° ডিগ্রি ৫০ ফুট পূর্ব, চোরুখ (Coruh) নদীর তীরে অবস্থিত। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে সান স্টেফ্যানো চুক্তির মাধ্যমে কার্স ও আরদাহানসহ ইহা রাশিয়ার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ১৯২১ খৃস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি আবার জর্জিয়া কর্তৃক ইহা তুরস্কের অধিকারে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে ইহা কাদা-র কেন্দ্র এবং চোরুখ প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে সেখানে শুধু শহরেই ৩৯৮০ জন এবং কাদা-এ ১৬,৯৬৬ জন বাশিন্দা ছিল।

Fr. Taeschner (E.I.[2]) / এ: বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

আটিয়া পরগণা : ঢাকা জেলার সদর মহকুমার উত্তর-পশ্চিম ও টাংগাইল জেলার পূর্ব-দক্ষিণাংশে অবস্থিত বিস্তৃত অঞ্চল "আটিয়া বন" এই পরগণায় অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০ ফুট। বনের আয়তন ৩৩৯ বর্গমাইল। এখানে প্রচুর গজারি কাঠ পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., পৃ. ১২০। (সংকলিত)

আল-'আতক (العتك) ঃ নাজ্দ-এর একটি উপত্যকা। তুওয়ায়ক পাহাড়ের পশ্চিম প্রাচীর যে কয়টি উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, উহাদের সর্ব উত্তরে ইহা অবস্থিত। ইহা একটি প্রকৃত ওয়াদী (উপত্যকা), প্রচুর বৃষ্টি হইলে সেখানে প্রবল বন্যা দেখা দেয়। উপত্যকাটি উত্তরে সুদায়র জেলা এবং দক্ষিণে আল-মাহ্মাল জেলার মধ্যকার সীমা নির্ধারকরূপে বিদ্যমান। ইহার উদ্ভব (فرعه) তুওয়ায়ক পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চলের নিম্নভূমি তথা আল-কাসাব মরূদ্যানের সংলগ্ন এলাকায়। উপত্যকাটির দক্ষিণে রহিয়াছে একটি লবণ আধার (مملحه বা سبخة)। আল-বাকারাত-এ (বাক্রাঃ-র ব. ব.- অর্থ-৩-৫ বৎসরের উষ্ট্রী) পর্বতমালা অতিক্রম করার পর উপত্যকাটি একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া তুওয়ায়ক পাহাড়ের ক্রমশ ঢালু অংশের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। এই সংকীর্ণ পথের ঠিক পূর্ব দিকে, সুদায়রের উচ্চভূমি হইতে উরাত উপত্যকা নামিয়াছে এবং দক্ষিণ দিক হইতে ছাদিক উপত্যকা আল-'আতক-এ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অধিকন্তু সুদায়র-এর মূল উপত্যকা-যেখানে জালাজিল, আল-আওদা ও অন্যান্য মরূদ্যান অবস্থিত এবং 'উশায়রা উপত্যকা উভয়ে একত্রে উত্তর দিক হইতে আসিয়া আল-'আত্ক-এর সহিত মিলিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে আর-হি'সি উপত্যকা (সুবায় উপজাতির ওয়াহ্হাবী ইখ্ওয়ানের একটি বসতি) দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া আল-'আত্ক-এর সহিত মিলিত হইয়াছে। খাশ্ম আবূ রুক্বা-এর দক্ষিণ দিক এবং রুওয়ায়গিব (সুহূল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ইখ্ওয়ানের একটি বসতি)-এর উত্তর দিক অতিক্রম করিয়া আল-আত্ক উপত্যকাটি আল-আরামা পর্বতের ঢালু অংশটিকে বিদীর্ণ করিয়াছে। উপত্যকাটি হ'ফারুল আতক-এর কূপসমূহের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত হইয়াছে এবং আদ্-দাহ্নার মরুভূমির ঠিক পশ্চিমে রাওদ'াতুত্-তান্হাহ-এর শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অবতলটি আশ্-শাওকী ও আত্-তায়রী উপত্যকা হইতে পানি গ্রহণ করে। শেষোক্তটি হ'াফারুল 'আত্ক-এর পশ্চিম দিকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে।

হ'াফারুল 'আত্ক-এ অবস্থিত সুমিষ্ট পানির কূপের (২৫ ডিগ্রি-৫৭ ফুট-০৪ ইঞ্চি উত্তর, ৪৬ ডিগ্রী-৩০ ফুট-২৮ ইঞ্চি পূর্ব) সংখ্যা এক ডজনেরও অধিক। সকল কূপের কিনারা পাথর দ্বারা বাঁধানো। ইহাদের গভীরতা প্রায় ২৩ বা' (=প্রায় ৪০ মিটার)। প্রতিটি কূপের নিজস্ব নাম রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পানি রহিয়াছে আল -গাব্বাশিয়্যা ও সুদারায়। এই কূপগুলি দারবুল কুনহুরী-র পশ্চিম প্রান্তসীমা নির্দেশ করে। একটি বহুল ব্যবহৃত মরুপথ পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত আল-জুবায়ল ('আয়নায়ন) শহর হইতে সমতল মরুভূমির উপর দিয়া প্রসারিত হইয়াছে। এই সকল কূপ হইতে যে কোন পরিব্রাজক সুদায়র অথবা মাহ্মাল উপত্যকায় পৌঁছিতে পারে অথবা নাফ্দুল বালাদীন-এর অনতিদূরে অবস্থিত আল-ওয়াশম জেলায় পৌঁছিতে পারে। জনশ্রুতিতে জানা যায়, বানূ খালিদের গোত্র-প্রধানগণ এখানকার কূপগুলি খনন করিয়াছিলেন। ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আল সাউদ-এর ওয়াহ্হাবী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় পর্যন্ত পূর্ব আরবের শাসক ছিলেন। গ্রীষ্মকালে কয়েক হাজার বেদুঈন হ'াফারুল 'আত্ক-এ সমবেত হইতে পারে। যে নিম্নভূমিতে কূপগুলি অবস্থিত, সেখানে তাহাদের তাঁবুগুলি সারিবদ্ধভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়গুলির পাদদেশ পর্যন্ত খাটান হয়।

আল-আতক উপত্যকাটি সুবায়' ও আস-সুহূল উপজাতির বসতি অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া বিবেচিত। অপরপক্ষে কূপগুলি আল-খুদ্রান উপজাতির অধিকারভুক্ত এবং যাহারা নাবাতা ও আল-'উরায়নাত' গোত্রদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এই উভয় গোত্রই সুবায়' উপজাতির শাখা। এই সকল উপজাতির সদস্যগণ নাজ্দের অধিকাংশ শহরবাসীর ন্যায় উপত্যকার নামটিকে 'আত্তস্ উচ্চারণ করে। কিন্তু নাজদ ও পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য বেদুঈন ইহার নামটিকে 'আতশা (ইহার অর্থ ঝোপবৃক্ষাদি) শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া 'আত্শা বলিয়া থাকে। 'আতক উচ্চারণটি কদাচিৎ শোনা গেলেও হাম্দানী (১খ., ১৪১)-এ বাতনুল আত্ক রূপটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি আল-বাকারাত ও বাতন যী উরাত-এরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন বিশর 'উনওয়ানুল-মাজদ (মক্কা সং, ১খ., ৪৪, ৭২, ১০৮, ২খ., ২৬)-এ আল-'আতক ও হাফারুল 'আত্ক লিখিয়াছেন এবং ইব্ন বুলায়হিদ সাহীহুল আখবার (১খ., ১৩৭)-এ আল-'আত্ককে প্রাচীন আরবী কাব্যে উল্লিখিত আল-ইত্কান অথবা আল-আত্কান নামক স্থানদ্বয়ের একটিরূপে সনাক্ত করিয়াছেন।

George Rentz (E.I.[2]) / মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আত্জেহ ঃ (আত্চিন, আচিন= اچه। আচায়, দা.মা.ই., ২খ., ৬) সুমাত্রা দ্বীপের সর্বাপেক্ষা উত্তর অংশ। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত এই প্রদেশে এক সময় আত্জেহ নামক শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাপানূলী ও বর্তমান কালের সুমাত্রা উতারা প্রদেশরূপে চিহ্নিত সুমাত্রার ওস্টকাস্ট-এর ওলন্দাজ রাজপ্রতিনিধি শাসিত এলাকা দ্বারা ইহার দক্ষিণ সীমানা নির্ধারিত হইত। আরও পূর্ববর্তী কালে আতজেহ প্রদেশ অথবা ন্যূনপক্ষে ইহার রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আরও দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুমাত্রার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের একটা বৃহৎ অংশ আত্জেহ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন ছিল, এমনকি বাটাক অঞ্চলসমূহের পৌত্তলিক (Pagan) গোত্র-প্রধানগণ আত্জেহ-এর রাজন্যবর্গ দ্বারা নিজ নিজ পদে অভিষিক্ত হইত।

বৃহৎ আত্জেহ ঃ আত্জেহ-এর রাজন্যবর্গের সাবেক আবাসস্থল আত্জেহ বন্দর, আত্জেহ নদী ও উত্তর-পশ্চিমে যে জেলা তাহাই প্রথম হইতে মূল আত্জেহ বলিয়া পরিচিত। ওলন্দাজরা ইহাকে বৃহৎ আত্জেহ ও রাজধানীকে কূতা রাজা (অর্থাৎ রাজার দুর্গ) নামে চিহ্নিত করে। কূতা রাজার উত্তর-পূর্বে পূলোওয়ে দ্বীপে অবস্থিত সাবাং বন্দর মাত্র এই শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপকূলবর্তী বারোহ্ অধিবাসীরা অভ্যন্তর ভাগের পার্বত্য অঞ্চলের তুলনামূলক জনসমষ্টি হইতে অনেক দিক দিয়াই পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। রাজপ্রতিনিধিদের বাসভবনের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত প্রথমোক্ত গোত্রের (বারোহদের) রীতিনীতিকে সব সময়ই অধিকতর মার্জিত বলিয়া মনে করা হইত।

গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির মধ্যে ছিল পশ্চিম উপকূলের মিউলাবোহ, (Meulaboh), তাপা তুয়ান (Tuan) ও সিঙকিল (Singkil); উত্তর উপকূলের পিদি (Pidie), পিদির (Pedir)-এর পূর্বকালীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলের সিগলি (Sigli), মিউরিউদু (Meureudu), বিরিউয়েন (Bireuen), পিউসাঙ্গান (Peusangan), লো সুকন (Lho Sukon) ও লো সিউমাবি' (Lho' Seumawe)। শেষোক্ত স্থান ও জামবো (Djambo Aye) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাসে (Pase)-এর বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা ৭৪৬/১৩৪৫ সনে ইব্ন বাত্তূতা (Defremery ও Sanguinetti সম্পাদিত, ৪খ., ২২৮ প.) পরিদর্শন করেন। অন্যান্য জায়গার মধ্যে পূর্ব উপকূলে ইদি (Idi), লাংসা (Langsa) ও কুয়ালা সিমপাঙ (Kuala Simpang) অবস্থিত। পূর্ব ও উত্তরের উপকূল বাষ্পচালিত ট্রাম লাইন দ্বারা কুতা রাজার সহিত যুক্ত। বৃহৎ আত্জেহ-এর জনবসতির এক অংশ সেই স্থানে চলিয়া গিয়াছে। প্রতিবেশী জেলাসমূহ হইতে অনেক মালয় (Malays)-ও এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে।

আত্জেহ-এর অধীন রাজ্যসমূহের জনবসতির একটা অংশ মরিচ চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। পুরুষানুক্রমিক এই ব্যবসা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও ওলন্দাজ শাসনাধীন আত্জেহ একটা বিকাশমান দেশ হিসাবে গড়িয়া উঠে। ১৯৪২ খৃ. ইহার রফতানিযোগ্য উদ্বৃত্ত চাউল ছিল ৪৫,০০০ টন। ইহা ছাড়াও এখান হইতে সুপারি, প্যাচুলী নামক সবুজ লতা, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, রবার ও গবাদি পশু রফতানি হইত। তখন কিছু বৃহৎ সেচ প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তৃত হয়। উপরন্তু পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে পশ্চিমা এস্টেট কোম্পানীগুলি বিপুল পরিমাণ পতিত জমি পরিষ্কার করিয়া রবার, তৈল ও তন্তু উৎপাদক উদ্ভিদ বপনের উপযোগী করিয়া তোলে। রানতো (কুয়ালা সিমপাঙ) ও পিউরিউলা (Peureula)-তে বিপিএম (Bataafse Petroleum Maatschapij) তৈল উত্তোলন করে। অন্যদিকে মিউলাবোহ Meulaboh-তে কাজ করিবার জন্য একটি স্বর্ণ উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধাদি দেওয়া হয়।

গায়ো ও আলাস (Gayo and Alas) দেশসমূহ ঃ আদিম বনভূমি ছাওয়া উচ্চ পর্বতশ্রেণী উপকূলবর্তী এই অঞ্চলকে গায়ো দেশ হইতে পৃথক করিয়াছে। গায়ো অঞ্চল আড়াআড়ি পর্বতশ্রেণী দ্বারা চারটি সমতল মালভূমিতে বিভক্ত হয়। বৃহৎ তাওয়ার (Tawar) হ্রদ ও পিউসাঙ্গান (Peusangan) নদের উৎস সর্বাপেক্ষা উত্তরের সমতলভূমি তথাকথিত 'উরাংলট (হ্রদের জাতি) দ্বারা অধিকৃত। অপরপক্ষে দক্ষিণ দিকের সমতল ভূমি Urang Dorot (মাটির মানুষ) দ্বারা অধিকৃত। পূর্বমুখে প্রবাহিত পিউরিউলা নদীর উৎস লইয়া গঠিত হইয়াছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সমতল মালভূমি সারবোজাদি (Serbodjadi)। পশ্চিম দিকের উপকূলে যে ত্রিপা (Tripa) নদীর স্রোতধারা পতিত হয় তাহার খাতবিশিষ্ট চতুর্থ সমমালভূমির নাম গায়ো লুওস (Gayo Luos অর্থাৎ বিশাল ও বিস্তৃত গায়ো দেশ)। ইহার দক্ষিণে আলাস দেশসমূহ অবস্থিত। আত্জেহ-এর অধিবাসিগণ অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইহার ফলে এই সকল অঞ্চলের জনবসতি প্রথম হইতেই আত্জেহ কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। আত্জেহ- এর রাজন্যবর্গ কর্তৃক গায়ো দেশের বিভিন্ন অংশে (তথাকথিত 'কেজুরুন') চারিজন প্রধান নিযুক্ত হইতেন। ইহারাই গায়ো ও আজেহ্দের মধ্যস্থতাকারী ছিলেন । এই সকল কেজুরুনের দুইজনের প্রভাব ছিল তাওয়ার হ্রদ এলাকায়। তাহাদের সুনির্দিষ্ট উপাধি ছিল রোজো বুকিত ও সিয়াহ উতামা। একজনের প্রভাব ছিল দোরোতদের মধ্যে। সেইখানে তাঁহার উপাধি ছিল রোজোলিঙ্গো। চতুর্থ জনের প্রভাব ছিল গায়ো লুওসে (কেজুরুন পেটিয়ামব্যাঙ)। পূর্বে সার বোজাদি ছিল জনমানব হীন। পরবর্তী কালে ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দলপতিকেও কেজুরুন বলা হইত (কেজুরুন আবুক)। আলাস দেশসমূহে আত্জেহ-এর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করিতেন দুইজন কেজুরুন।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি ছিল তাওয়ার হ্রদের উপরে তাকেঙ্গন (Takengon) এবং গায়ো লুওসের ব্ল্যাং কেজেরেন (Blang Kedjeren)। ৭০,০০০ হেক্টর জমিতে বিস্তৃত ফার বৃক্ষসমৃদ্ধ তাকেঙ্গন উপজেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী রজন ও তার্পিন তৈলের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৪২ খৃ. জাপানি আক্রমণের সময় একটি কাগজের কল স্থাপনের পরিকল্পনা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছিল।

আত্জেহ জাতি সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদির জন্য আমরা সর্বোপরি C. Snouck Hurgronje-এর নিকট ঋণী। তিনি ১৮৯১-১৮৯২ খৃ. প্রথম এই জাতির স্বল্প পরিজ্ঞাত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থাদির উপর গবেষণা করেন (De Atjehers. Batavia 1893-1894; তু. লেখক কর্তৃক নূতন ভূমিকা ও সংযোজনসহ প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদ ঃ The Achenese, Batavia-Leiden 1906; Ambtelijke adviezen I, Hague 1957, 47-438)। পরবর্তী কালে তিনি গায়োদের দেশ ও রীতি সবিস্তার বর্ণনা করেন (Het Gajoland en zijne bewoners, Batavia 1903)। প্রজাতি সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলী J. Kreemer দ্বারা সংগৃহীত ও তাঁহার Atjeh পুস্তকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, Leiden 1922-23; এই বিবরণীতে আলাস অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত।

জনসংখ্যা ও ভাষা ঃ আত্জেহ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অল্পই জ্ঞাত। ভাষাগত দিক হইতে তাহারা মালয়-পলিনেশীয় জাতিসমূহের অন্তর্গত। জনসমষ্টি গঠনে নিয়াস (Nias) ইত্যাদি দ্বীপের দাসসমূহ ও হিন্দুস্তানী ব্যবসায়ীদের মত অন্য বিদেশীরা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আত্জেহ জাতির অনেক উপভাষা রহিয়াছে। প্রতিটি উপভাষার আবার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। সাধারণভাবে বারোহ (Baroh) জেলার বাকরীতির সহিত ইহার সাহিত্যিক ভাষার সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। আত্জেহ-এর সাহিত্যের জন্য দ্র. Snouck Hurgongje, Hurgeonje The Achese, ২খ., ৬৬-১৮৯। গায়েক একটি স্বাধীন ভাষা, অপরদিকে আলাস একটি উত্তর-বাতাক উপভাষা। সমুদ্র বন্দরের অধিবাসীদের একটি অংশ ব্যতীত উনবিংশ শতকে আত্জেহ-তে মালয় ভাষা প্রায় অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু পূর্বে ইহা ছিল রাজভাষা এবং আদিকাল হইতে আত্জেহতে চিঠিপত্র, সরকারী দলীলাদি ও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ মালয়

ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। 'আরবী ও মালয় গ্রন্থসমূহের প্রাচীনতন আচিনিজ রূপান্তরসমূহ সপ্তদশ শতক হইতে পরিলক্ষিত হয়। এখানকার সরকারী ভাষা ইন্দোনেশীয়। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. C. Snouck Hurgronje, Studien over Atjehsche klanken Schriftleer, in TBG, xxxv (1892), 346-442, and Atjehsche Taalstudin, ঐ xtii. (1900), 144-262; K.F.H van Langen, Handleiding Voor de beoefening der Atjehsche Taal, The Hague, 1889; H. Djajadinigrat, Atjehschc- Nederlandsch Woordenbock, Batovia 1933-1934; p. Voorhoeve, Three old Achehnese MSS BSOS 14 (1952), 335-345; G.A.J Hazeu Gajosch-Nederlandsch Woordenboek met neder,-Gajosch register, Batavia 1907।

গোত্র ও পরিবারসমূহ ঃ আত্‌জেহ জনসমষ্টির চারটি গোত্র বিভক্তির কিছু চিহ্ন আজও বিদ্যমান। সেইরূপ একটি গোত্র বা পরিবার Achehnesa Kawon ('আরবী "ক'ওম" বা জাতি হইতে)-এর সদস্যরা নিজদেরকে পিতৃসূত্রে রক্তসম্পর্কিত মনে করে। তাহাদের, বিশেষত রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব ও রক্তপণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সাধারণ অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে। অবশ্য বিভিন্ন কওমের সদস্যগণ সারা দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে। শুধু একত্রে বসবাসকারী জ্ঞাতিরাই নিজেদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে একজন প্রধান মনোনীত করে। গায়ো-রা বিভিন্ন পরিবারে স্বস্ব পরিবার প্রধান (Rodjos) -এর অধীনে বাস করে। যখন কোন ব্যাপারে রোজোদের মধ্যে মতানৈক্য হয় তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার কেজ্জুরুন-এর উপর পড়ে।

গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ আত্‌জেহ্‌তে গ্যামপঙ বা গ্রামের প্রধান কিউতঝি' (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ)। শহরের অংশকেও গ্যামপঙ বলা হয়, (Mal. kampung) প্রয়োজন হইলে কিউতঝি' প্রাজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠের উপদেশ গ্রহণ করেন। সালাতে নেতৃত্ব দানের মত গ্যামপঙের ধর্মীয় বিষয়সমূহ তিউংকু মিউনাসাহ-এর দায়িত্ব। যেসব লোক ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যাঁহারা ধর্মীয় আইনে জ্ঞানী তাঁহারা উভয়েই তিউংকু উপাধিতে ভূষিত। গ্যামপঙ তিউংকু বা তিউংকু মিউনাসাহগনী তেমন বিদ্বান লোক নহেন। তাহাদের পদমর্যাদা অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং Snouck Hurgronje-এর সময়ে অনেক তিউংকু এত অজ্ঞ ছিলেন যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না।

উলীবালাঙ ও সাগীপ্রধান রাজন্যবর্গ ঃ ঐতিহাসিক কাল হইতে আত্‌জেহ অনেকগুলি ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত জেলার প্রধান ব্যক্তিকে বলা হইত উলীবালাঙ (সর্বাধিনায়ক)। তাহারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিতেন । অবশ্য তাহারা সব সময় আত্‌জেহ বন্দরের নৃপতিকে তাহাদের সাধারণ অধিস্বামীর সম্মান দিতেন। সরকারী মালয় দলীলপত্রে তাঁহার উপাধি ছিল সুলতান। কিন্তু আকিনিজগনী তাঁহাকে সাধারণত রাজা বা আমাদের প্রভু নামে ডাকিত। সুলতানগণের ও তাঁহাদের পুরুষ আত্মীয়দের উপাধি ছিল টুয়াঙ্কু। অন্যপক্ষে উলীবালাঙদের পুরুষ সদস্যদের উপাধি ছিল টিউকু।

আকিনিজ রাজন্যবর্গের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তাঁহাদের রাজসভার বিত্ত-বৈভব আত্‌জেহ-রাজধানীর বন্দর শুল্ক ও প্রতিবেশী উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের রাজস্বের উপর নির্ভর করিত। অতীত কালের মালয় ও ইউরোপীয় বর্ণনাসমূহে এই ধনসম্পদের উল্লেখ দেখা যায়। সাহসী আকিনিজ নাবিকেরা ছিল সমুদ্র বন্দরের হর্তাকর্তা। খুব কম লোকেরই তাহাদের বখ্‌রা দিতে অস্বীকার করিবার সাহস ছিল। দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণ রাজন্যবর্গকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করিত, এমনকি আত্‌জেহ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি কালেও (ষোড়শ শতকের অর্ধভাগ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে) সুলতানের কর্তৃত্ব রাজধানীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে আত্‌জেহ রাজন্যবর্গ বৃহৎ আতজেহের উলীবালাঙদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। তাঁহারা তখন আপাতত সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থে তিনটি ফেডারেশন (যুক্ত সংঘ) গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যাহাকে বলা হইত "সাগী" বা পার্শ্ব। ত্রিভুজাকৃতি বৃহৎ আত্‌জেহের এক একটি পার্শ্ব বুঝাইতেই এইরূপ নামকরণ হয়। প্রত্যেক সাগী-র ছিল একজন অধিস্বামী (পাঙলীমা-সাগী)। অবশ্য তাঁহার কর্তৃত্ব সাগীদের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত [এইরূপ ফেডারেশন অবশ্য অধীন রাজ্যসমূহেও দেখা যাইত]। তিনজন সাগীপ্রধান কর্তৃক নির্বাচিত সুলতান তাঁহাদেরকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ প্রদান করিতেন। সাধারণত তিনি হইতেন পূর্ববর্তী শাসকগণের বংশোদ্ভূত। অবশ্য সায়্যিদগণের মত আগন্তুকও মাঝে মাঝে সাল্‌তানাতে নির্বাচিত হইতেন। সময়ের প্রভাবে শাসনকর্তা নির্বাচিত হইতেন। সময়ের প্রভাবে শাসনকর্তা নির্বাচনে অন্যান্য প্রধানও অংশগ্রহণ করেন। এক সময় প্রথানুযায়ী তিনজন সাগী প্রদানসহ বার জন প্রধান এক ধরনের নির্বাচনী পরিষদ গঠন করেন।

বৃহৎ আত্‌জেহ অধীন রাজ্যসমূহের বেশীর ভাগ উলীবালাঙ পরবর্তী কালে সুলতানের নিকট হইতে নিজেদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁহাদেরকে শাসনকর্তার সীলমোহর অঙ্কিত একটি দলীল দেওয়া হয় (তথাকথিত সারাকাতা ; এই সীলমোহরের ভারতীয় উৎপত্তি সম্পর্কে দ্র. G. P. RouffWer, B.T.L,V, Series 7. v, 349-384; G. Snouck Hurgrone, ঐ, Series 7, vi, 52-55)। উলীবালাংদের সকলে অর্থ ব্যয় করিয়া একখানি সারাকাতা বা স্বীকৃতিপত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই "Tjib Sikureueng" [নয় স্তরবিশিষ্ট সীলমোহর] হইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল, Tjab limong [পাঁচ স্তরবিশিষ্ট সীলমোহর যাহা ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে হাত অর্থাৎ স্বার্থরক্ষার সামর্থ্যকে বুঝাইত]। অন্যদিকে গায়ো ও আলাস জাতিসমূহের কেজুরুনগণ তাহাদের পদের প্রতীকস্বরূপ এক ধরনের খঞ্জর লাভ করিত।

মুকীমে বিভক্তি ঃ শাফি'ঈ মায্‌হাব অনুযায়ী জুমু'আর সালাত তখনই বৈধ হয় যখন অন্ততপক্ষে চল্লিশজন মুকীম উপস্থিত থাকে। মুকীম এমন

একজন ব্যক্তি যাহাকে আইনের শর্তানুসারে ঐ স্থানের বাশিন্দা গণ্য করা যায়। অধিকাংশ গ্যামপঙের লোকসংখ্যা নিয়মিতভাবে চল্লিশজন অংশ গ্রহণকারীসহ জুমু'আর সালাত আদায় করিবার মত যথেষ্ট ছিল না। কাজেই কতিপয় গ্যামপঙ্গকে যুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। যতটা সম্ভব উহার কেন্দ্রস্থলে জুমু'আর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইভাবে শুধু আত্জেহ্তেই নহে, অন্যান্য মালয় অঞ্চলেও মুকীম শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বিভাগ বা চক্র। প্রত্যেক উলীবালাঙ এইরূপ কয়েকটি মুকীমের অধিকর্তা ছিলেন। উপরন্তু সাগীত্রয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত মুকীমের সংখ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি বৃহৎ আত্জেহ্-এর দক্ষিণের সাগীকে বলা হইত "বাইশ মুকীমের সাগী," পশ্চিমের সাগীকে "পঁচিশ মুকীমের সাগী", পূর্বেরটিকে "ছাব্বিশ মুকীমের সাগী"। পঁচিশ মুকীমের সাগী, বিশেষ করিয়া বাইশ মুকীমের সাগীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মুকীম সংখ্যা বাড়িলেও এই নামকরণ বজায় থাকে।

মুকীম প্রধানদের উপাধি ছিল ইমাম (Imeum)। এই শব্দ দ্বারা মূলত জুমু'আর সালাতের নেতাকে বুঝান হইত ('আরবী ইমাম)। ক্রমান্বয়ে ইমামগণ উত্তরাধিকার প্রথায় ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানে পরিণত হইলেন। তাঁহারা জুমু'আর সালাতের ইমামতের দায়িত্বভার বিশেষ কর্মচারীর উপর অর্পণ করিলেন।

বিচার ব্যবস্থা ঃ আইন— সাধারণ নিয়মানুসারে প্রধান ব্যক্তিগণ নিজেরাই বিচারকের দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা অলিখিত রীতিনীতি ('আদাত)-এর ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। অবশ্য এমন কিছু লিখিত আইন ছিল প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে যাহা মউকুতা 'আলাম ও অন্যান্য নামকরা শাসনকর্তাগণ জারী করিয়াছিলেন। যে আকিনিজগণ এই সকল আইন শুধু নাম দ্বারাই জানিত, সাধারণভাবে ধারণা করিত, উহা তাহাদের আইনের অবিকল বিবরণ। প্রকৃতপক্ষে উহাতে থাকিত প্রশাসন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আইনের বিধি, আদালতের আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি (উলীবালঙ কর্তৃক শাসনকর্তাকে প্রদর্শনীয় সম্মানসহ) বন্দর শুল্কের বণ্টন ও কতিপয় ধর্মীয় কর্তব্য পালনের অনুশাসন। যখন তাহাদের শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূতকরণের প্রচেষ্টা করেন তখনই এই আইনগুলি প্রবর্তিত হয়, যদিও উহার ফল স্থায়ী হয় নাই (পূর্ণ তথ্যের জন্য দ্র. G. Snouck Hurgronje, The Achenhese, I, 4-16; K.F.H. Van Laugen, De inrichting Van het, Atjiehsche Staaotsbestuur onder het sultanaat, BTLV, Series 5, iii, 381-471; T. Braddell-কৃত Majellis Ache হইতে অনুবাদ, Journal of the Indian Archipelogo, v, 1851, 26-32; এই পুস্তকের G.W.J. Drewes ও P. Voorhowe-কৃত মালয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ আছে)। উপরন্তু সুলতান ও পাঙলিমা এই উভয়েরই নিজস্ব 'কালি' (কাদী) ছিল, কিন্তু এই সকল ধর্মীয় বিচারকগণ শুধু কতগুলি বিশেষ উপলক্ষেই বিচার ব্যবস্থায় অংশ নিতেন, যেমন উত্তরাধিকার বণ্টন, বিশেষ প্রকারের বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বন্ধন ও সাধারণ ধর্মীয় আইন অনুসরণ করা হয় এমন কিছু ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য উপলক্ষে যখন শাসকগণ তাঁহাদের পরামর্শ চাহিতেন। সুলতানের বিচারকের উপাধি ছিল কালি মালিকন আদি=কাদী মালিকুল আদীলা ঃ সময়ের প্রবাহে তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পদের মর্যাদা লোপ পায়। সুলতানের রাজ্যে তিনি কয়েকটি গ্যামপঙের এক অদ্ভুত প্রধানের পদ লাভ করেন। অধিকন্তু অন্যান্য কালিদের পদও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হইয়া যায়। ইহা ছিল খুবই বিরল ঘটনা যে, ওয়ারিছী কালিগণ প্রয়োজনীয় যোগ্যতারও অধিকারী হইতেন।

ধর্ম ঃ প্রাচীন কাল হইতেই আত্জেহ্ ও হিন্দুস্তানের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। আত্জেহ্র ভাষা ও সভ্যতার উপর প্রথমত হিন্দু প্রভাব পড়ে। পরবর্তী কালে আত্জেহ্ উপকূলে ইসলামের আবির্ভাব হয়। সম্ভবত ইহা হিন্দুস্তানী (ভিন্ন মতে 'আরব) ব্যবসায়ীরাই বহন করিয়া লইয়া যান। ১৩৪৫ খৃ.-এ যখন ইব্ন বাত্তূতা পেসে ভ্রমণ করেণ তখন ইসলাম ছিল সেখানে একমাত্র ধর্ম। ঐ দেশের শাসনকর্তা তাঁহার বিধর্মী প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আকিনিজগণ নিষ্ঠাবান মুসলিম। কিন্তু আত্জেহ্ ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য স্থানে প্রচলিত ইসলাম ধর্মে এমন কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা হিন্দুস্তানী উদ্ভবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মরমীবাদের ভাবসম্পন্ন অস্তিত্ব এবং একান্তভাবে শী'আদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়। যেমন আত্জেহতে প্রথম মাসকে সব সময় বলা হইত 'আসান উসেন'। স্পষ্টতই শী'আ সম্প্রদায় অধ্যুষিত দেশসমূহে বিশেষভাবে সম্মানিত শহীদদ্বয় হযরত হাসান (রা) ও হুসায়ন (রা)-এর স্মরণেই ইহার প্রচলন হইয়াছে। হযরত 'আলী (রা)-এর তরবারি যুল-ফিকার-এর প্রতিকৃতি অংকিত একটি অধিকৃত পতাকার এবং ইহার কিনারায় শী'আ বাণী উৎকীর্ণ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, আকিনিজগণ কতকটা শী'আ মতাবলম্বী (তু. A. W. T. Juynboll, Een Atjineeche vlag met Arabische opschriften, TijdschriftVoor Ned-Indie, 1873, ii, 325-340 ; 1875, i, 471-476; M.J. de Goeje, Atjeh, De Nederl. Spectator, ১৮৭৩, ৩৮৮)। সাধারণভাবে আকিনিজগণ অনেক ধর্মীয় কর্তব্যে শৈথিল্য করিত। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ লোকই সালাত সম্পাদনে অবহেলা করিত, অথচ বার্ষিক হজ্জ উদ্যাপনে অভ্যস্ত ছিল। উপরন্তু মালয়, 'আরবী ও আকিনিজ কিতাবসমূহ বিভিন্ন স্থানে আইনজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করা হইত (তু. S, Snouck Hurgronje, Eene verzameling Arab. Mal. en Atjehsche handschriften en gedrukte boeken, Notulen van het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetensch., xxxix (1901) n. vii, also The Achehnese, ii, 1-32)। দূর-দূরান্ত জেলা হইতে আগত ছাত্ররা একটি সাধারণ বাসগৃহ (র‍্যাংক্যাং)-এ থাকিত। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগে আড়ম্বরপূর্ণ রাজদরবারে ভারত, সিরিয়া ও মিসর হইতে বিদেশী 'আলিমদেরকে আত্জেহ্তে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করিবার ঘটনা বিরল ছিল না (প্রখ্যাত ইবন হাজার আল-হায়ছামীর পুত্রও এইরূপ 'উলামার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)।

অনেক আকিনিজ তীর্থযাত্রী মক্কায় গোঁড়া সূফী ভ্রাতৃসংঘের (বিশেষত কাদিরিয়া ও নাকশবান্দিয়া) সদস্য হন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য স্থানের

মত এইসব তরীকা আত্জেহ্তে অধিক গুরুত্ব লাভ করে নাই। ইতোপূর্বে আত্জেহ্তে সর্বেশ্বরবাদী অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন রূপ প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সময় হিন্দুস্তানের সর্বত্র সাধারণভাবে এই মতবাদ ব্যাপ্ত ছিল। প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী এই প্রবণতার ধারকদের মধ্যে আত্জেহ্তে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন শামসুদ-দীন আলসামাত' রাঈ (অর্থাৎ পাসে-র, মৃ. ১৬৩০ (দ্র.) এবং তাহার পূর্ববর্তী হামযা ফানসূরী (দ্র.)। ইহার প্রধান বিরোধিতাকারিগণ ছিলেন রানীরী (দ্র.) ও 'আবদুর রাউফ আস-সিকিলী (দ্র.)। প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের কিছু কিছু রূপ আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। কিন্তু গোঁড়া মতবাদ হইতে পার্থক্যকারী যেসব বৈশিষ্ট্য অজ্ঞতাপ্রসূত, সেইগুলি ইসলামের মূল ধারার সহিত ক্রমবর্ধমান আদান-প্রদানের ফলেই ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে (আরও তথ্যের জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, The Achehnese, ii, 13 প.)। আকিনিজদের মধ্যে জনপ্রিয় সাধু-সন্তদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আজিও বিদ্যমান। তীর্থযাত্রীরা বিখ্যাত সূফীদের সমাধি পরিদর্শন করে এবং মানতের মাধ্যমে তাহাদের অনুগ্রহ ও শাফা'আত কামনা করে। প্রথিতযশা আকিনিজ সূফীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিদেশী। যেমন আরবী তিউংকু আনজং যিনি ১৭৮২ খৃ.-এ ইন্তিকাল করেন এবং তুর্কী বা সিরীয় 'গ্যামপঙ বিটে-র ওয়ালী' যিনি প্রচলিত বর্ণনা অনুসারে ষোড়শ শতকে আত্জেহ্তে আসিয়াছিলেন।

'উলামা' ধর্মীয় জীবনের শীর্ষে অবস্থান করিতেন ('উলামা শব্দটি আকিনিজে একবচনে ব্যবহৃত)। তাঁহারা ছিলেন ধর্মীয় আইন ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। জনসাধারণ তাহাদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত। তাহারা Alem হইতেও বেশি মর্যাদা পাইতেন। Alem যত শিক্ষিতই হউন না কেন, কখনও প্রকৃত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাহাদের ক্ষমতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানী মালেম (Malem) বা লিউবি (Leube)-এর মতই। ইহারা অশিক্ষিত হইয়াও ধর্মীয় আচার-আচরণ বিশ্বস্তভাবে পালনে সক্ষম ছিলেন। সরকারিভাবে নিযুক্ত গ্রামের ধর্মীয় নেতা তিউং কুমিউনাসোহ অপেক্ষাও উলামা অধিক শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। উলীবালাঙগণ যেমন ছিলেন 'আদাত-এর ব্যাখ্যাতা, তেমনি 'উলামা ছিলেন হুকুমের প্রবক্তা ও নির্বাহী। অবশ্য হুকুম অনুযায়ী উলীবালাঙগণ একই সাথে তাহাদের অঞ্চলের ধর্মীয় প্রধানরূপে গণ্য হইতেন। Snouck Hurgronje-এর মতে হুকুম ও 'আদাতের মধ্যে যে সহযোগিতা ছিল আকেহনিজ (Achehnese) সমাজের ভিত্তিস্বরূপ তাহা অবশ্যই নিম্নলিখিত মন্তব্যের আলোকে দেখিতে হইবে ঃ

'আদাতের ভূমিকা গৃহকর্তার মত। অন্যপক্ষে হুকুম তাহার অনুগত দাসী। অবশ্য সুযোগ পাইলেই সে বশ্যতার প্রতিশোধ লইতে চায়; তাহার প্রতিনিধিগণ সর্বদাই এই দাসোচিত অবস্থান হইতে মুক্তি পাইতে উৎসুক (Achehnese, i, 153)।

ইতিহাস ঃ ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রথম মুসলিম রাজ্য আত্জেহ্ প্রদেশেই স্থাপিত হয়। এমন একটি রাজ্যের প্রথম উল্লেখ মার্কোপোলোর বিবরণে দেখা যায়। ১২৯২ খৃ.-এ তিনি যখন আত্জেহ্র উত্তর উপকূল পরিদর্শন করেন তখন ফার্লাক (Ferlec)-এ অর্থাৎ পেরিলাক (Perlak)-এ (Ach. Peureala-য়) একজন মুসলিম রাজা ছিলেন। বাস্মা বা বাস্মান ও সামারা নামক অন্য দুইটি দেশ তখনও ছিল বিধর্মী। পেস ও সমুদ্র (Samudra)-এর সহিত শেষোক্ত স্থানদ্বয়কে চিহ্নিত করা যায় না। সমুদ্র পেস-এর প্রথম মুসলিম রাজা আল-মালিকুস্ সালিহ ১২৯৭ খৃ.-এ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাজেই ইহা অযৌক্তিক যে, ১২৯২ খৃ.-এও সমুদ্রের জনসাধারণ বর্বর মূর্তিপূজক ও নরখাদক পশু ছিল [H.K.J. Cowan, Djawa 19 (1939) 121 প.]। পরবর্তী কালে কয়েক শতাব্দী যাবত পাসাই (Ach. Pase) নামে অভিহিত তৎকালীন সামুদ্রা নামক বন্দর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। শাসকদের বংশগত ইতিহাস হয়ত কোন দিন সমাধিফলক ও মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি, মালয়ী ঘটনাপঞ্জী [E. Dulaurier কর্তৃক R.A. S. Raffles Mal 67-এর একমাত্র পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পাদিত শাজারা ঃ মেলায়ু ও হিকায়াত রাজা-রাজা (Radja) পাসাই : Chroniques Malayes, 1849-এর রোমান লিপি সংস্করণ, সম্পা. J.P. Mead JSBRAS ৬৬ (১৯১৪)], চীনা, 'আরবী (ইব্ন বাতৃতা, পৃ. গ্র.) ও ইউরোপীয় উৎস হইতে সম্ভবত পুনর্বিন্যাস করা হইবে। আজ পর্যন্ত অনেক তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উৎকীর্ণ লিপি এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত (এই বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপের উপর বর্ণনা আছে ঃ Oudheidkundig verslag, 1912 প.; তু. Encyclo- paedie v. Ned. Indie, I, 1917, দ্র. Blang Me)। অনেক সমাধি প্রস্তর গুজরাটের ক্যামবে হইতে আমদানী করা হইয়াছে [J.P. Moquette, TBG ৫৪ (১৯১২), ৫৩৬-৫৪০]; ৭৮১ হিজরীর একটি সমাধিতে 'আরবী ও পুরাতন মালয় লিপি উৎকীর্ণ আছে [W. Stutterheim, Ao 14 (1936), 268-279; তু. G. E. Marrisson, JMBRAS 24 (১৯৫০), pt. i, ১৬২-১৬৫]; ৮২৩ হিজরী তারিখ অংকিত আর একটি প্রস্তর ফলক একজন ভারতীয়ের কবরের উপর রহিয়াছে। ইহাতে সাদীর লেখা একটি ফারসী গাযাল উৎকীর্ণ আছে [H.K.J. Cowan, TBG ৮০ (১৯৪০), ১৫-২১]। এই রাজ্য ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখে। Tome Pires যখন তাঁহার Suma oriental [সম্পা. A. Cortesao, Hakluyt Soc, 2nd ser. 89, 90 (1944)]-এর জন্য মালাক্কাতে তথ্য সংগ্রহ করেন তখনও (১৫১২-১৫) ইহা স্বাধীন ছিল। পর্তুগীজগণ কর্তৃক দখলকৃত মালক্কার অবনতির ফলে এই রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর বিকাশ লাভ করে। এই সমৃদ্ধি বেশী দিন টিকে নাই। পেসের ঐতিহ্যিক শত্রু ছিল পেদির (Ach. Pidie)। যদিও সেই মুহূর্তে রাজা Madaforxa (মুজাফ্ফার শাহ(?) এর মৃত্যু ও রাজ্যটি (আপাতদৃষ্টিতে আত্জেহের সহিত) যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে ধ্বংসোন্মুখ ছিল। এই সময় উদীয়মান শক্তি ছিল আত্জেহ্, পেস নহে। Pires-এর বর্ণনা মতে ইহার শাসনকর্তা ছিলেন জলদস্যুদের রাজা এবং তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন বীরোচিত মানব। তিনি ইতিমধ্যে সংলগ্ন দেশ Lambry (Lamuri, Lambri) এবং আত্জেহ্ ও পেদিরের (Ach. Biheue) মধ্যবর্তী Biar দেশ পদানত করেন; সম্ভবত ইনি ছিলেন সুলতান 'আলী মুগায়াত শাহ্, যিনি Djajadiningrat-এর

তালিকায় প্রথম সুলতান। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সময় অনিশ্চিত। H. Djajadiningrat মালয় ঘটনাপঞ্জী ও ইউরোপীয় উৎসসমূহ হইতে তাহার তালিকা প্রণয়নের পর তাহার পূর্বপুরুষদের কিছু কিছু লোকের সমাধি ফলক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এইসব পূর্বপুরুষের মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ক অনুদ্ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে। সুলতান আলী মুগায়াত শাহ পশ্চিমে দায়া ও পূর্বে পিদি ও পেসে জয় করিয়া আত্জেহ্ সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতারূপে আবির্ভূত হন। সাময়িকভাবে পূর্ববর্তী সুলতানগণের বিবরণ আলোচনা বহির্ভূত রাখিয়া Djajadiningrat কর্তৃক প্রণীত আত্জেহ্ রাজন্যবর্গের তালিকা ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে দেওয়া হইল ঃ

(১) 'আলী মুগায়াত শাহ (?-১৫৩০), (২) সালাহুদ্দীন (১৫৩০-১৫৩৭), (৩) 'আলাউদ্দীন রি'আয়াত শাহ আল-ক'াহ্হার (১৫৩৭-১৫৭১), (৪) 'আলী রি'আয়াত শাহ বা হু'সায়ন (১৫৭১-১৫৭৯), (৫) সুলতান মুদা (এক শিশু, যে ১৫৭৯ খৃ. কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করে), (৬) সুলতান স্ত্রী আলাম (১৫৭৯), (৭) যায়নুল আবিদীন (১৫৭৯), (৮) 'আলাউদ্দীন, পেরাক-এর শাসক বা মানসূর শাহ (১৫৭৯-১৫৮৬), (৯) আলী রিআয়াত শাহ বা রাজা বুয়ুঙ (১৫৮৬-১৫৮৮), (১০) আলাউদ্দীন রিআয়াত শাহ (১৫৮৮-১৬০৪), (১১) 'আলী রিআয়াত শাহ বা সুলতান মুদা (১৬০৪-১৬০৭), (১২) ইস্কান্দার মুদা (মরণোত্তর নাম ঃ মারহূম মাকোতা আলাম) [১৬০৭-১৬৩৬], (১৩) ইস্কান্দার ছানী আলাউদ্দীন মুগায়াত শাহ (১৬৩৬-১৬৪১), (১৪) তাজুল আলাম সাফিয়্যাতুদ্দীন শাহ (১৬৪১-১৬৭৫), (১৫) নূরুল আলাম নাকিয়্যাতুদ্দীন শাহ (১৬৭৫-১৬৭৮), (১৬) ইনায়াত শাহ যাকিয়্যাতুদ্দীন শাহ (১৬৭৮-১৬৮৮), (১৭) কামালাত শাহ (১৬৮৮-১৬৯৯), (১৮) বাদরুল আলাম শারীফ হাশিম জামালুদ্দীন (১৬৯৯-১৭০২), (১৯) পীরকাসা 'আলাম শারীফ লামতুই ইব্ন শারীফ ইবরাহীম (১৭০৩), (২০) জামালুল আলাম বাদরুল মুনীর (১৭০৩-১৭২৬), (২১) জাওহারুল আলাম আলাউদ্দীন (মাত্র কয়েক দিন রাজত্ব করেন), (২২) শামসুল আলাম অথবা ওয়ানদী তিবিং (মাত্র কয়েক দিন রাজত্ব করেন), (২৩) আলাউদ্দীন আহমাদ শাহ বা মহারাজা লেলা মেলায়ু (Lela Melayu) (১৭২৭-১৭৩৫), (২৪) আলাউদ্দীন জোহান শাহ বা পুতজুত অউক (১৭৩৫-১৭৬০), (২৫) মাহ্মূদ শাহ বা তুয়াঙ্কু রাজা (১৭৬০-১৭৮১), (২৬) বাদরুদ্দীন (১৭৬৪-১৭৬৫), (২৭) সুলায়মান শাহ বা রাজা উদাহানা লেলা (Udahana Lela) (১৭৭৩), (২৮) আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ বা তুয়াঙ্কু মুহাম্মাদ (১৭৮১-১৭৯৫), (২৯) আলাউদ্দীন জাওহারুল আলাম শাহ (১৭৯৫-১৮২৪), (৩০) শারীফ সায়ফুল আলাম (১৮১৫-১৮২০), (৩১) মুহাম্মাদ শাহ (১৮২৪-১৮৩৬), (৩২) মান্সূর শাহ (১৮৩৬-১৮৭০), (৩৩) মাহ্মূদ শাহ (১৮৭০-১৮৭৪) ও (৩৪) মুহাম্মাদ দাউদ শাহ (১৮৭৪-১৯০৩)।

আলী মুগায়াত শাহের দুই পুত্র সালাহুদ্দীন, বিশেষত 'আলাউদ্দীন রিআয়াত শাহ আল-কাহ্হার নূতন রাজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। তুর্কী সরকারী দলীল-পত্রাদি হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বিতীয়জন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কনস্টান্টিনোপলে ৯৭৩/১৫৬৩ সনে এক রাষ্ট্রীয় দূত প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়া দেন, উছমানীরা তাহাদেরকে পর্তুগীজগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকজন বিধর্মী শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দূতের আগমন ঘটে Szigetvar অভিযান এবং সুলায়মানের ইন্তিকালের সময়। কাজেই দূতকে কনস্টান্টিনোপলে দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় এবং অতঃপর সুয়েজের নৌসেনাপতি কুরদুগলু খিযির রাঈস-এর অধীন নৌ-অভিযান প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে উনিশটি রণতরী, কামান ও রসদসহ অন্যান্য ধরনের জাহাজ ছিল। কিন্তু এই অভিযানের গন্তব্য পরিবর্তন করিয়া ইয়ামানে এক বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং বিকল্প হিসাবে রসদ ও সামরিক কারিগরসহ দুইটি জাহাজ আত্জেহ্তে প্রেরণ করা হয়। মনে হইতে পারে, তাহারা আত্জেহ্ সুলতানের চাকুরিতে সেইখানে থাকিয়া যায় (দ্র. Saffet, TOEM, ১০খ., ৬০৪-৬১৪; ১১খ., ৬৭৮-৬৮৩; I.H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, ১১খ., ১৯৪৯, ৩৮৮-৩৮৯ ও iii/I, 1951, 31-33)। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে আত্জেহ্ উন্নয়নের উচ্চতম স্তরে ও ইস্কান্দার মুদা-র রাজত্বকালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই রাজাকে তাঁহার মৃত্যুর পর মিউকুতা 'আলাম অর্থাৎ জগতের মকুট (পূ. স্থা., নং ১২) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তাঁহার রাজত্বকালে আকিনিজদের আধিপত্য আরও দক্ষিণে প্রসারিত হয়। পাহাঙ ও মালাক্কার বিরুদ্ধে বিরাট নৌবহরসহ ইস্কান্দারের অভিযানই আকিনিজ মহাকাব্য 'হিকায়াত মালেম দাগাং-এর বিষয়বস্তু (সম্পা. H.K.J. Cowan, The Hague, ১৯৩৭)। ১৬৩৮ খৃ. তাহার উত্তরাধিকারীর (ইস্কান্দার ছ'ানী, Supra n, xiii) রাজত্বকালে এক পতুর্গীজ দূত আসেন। তিনি ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুলতানের সাহায্য লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেন (দ্র. Agostino di S. Teresa, Breve racconto del viaggio.... al regno di Achien Roma ১৬৫২; Ch. Breard, Histoire de Pierre Berthelot, প্যারিস ১৮৮৯)। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আত্জেহ্ চারজন শাহযাদী কর্তৃক শাসিত হয় (১৬৪১-১৬৯৯)। নারী শাসনের এই যুগটি ছিল উলীবালাঙদের জন্য স্বভাবতই অনুকূল সময়। কারণ এই সময় তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্যপক্ষে অনেকেই এইরূপ অবস্থা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন এবং মক্কা হইতে প্রাপ্ত এক ফাতওয়াবলে ঘোষণা করেন, কোন নারী কর্তৃক দেশের শাসনকার্য পরিচালনা আইনসম্মত নহে। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে অনেক কয়টি বংশগত যুদ্ধ শুরু হয়। সিংহাসনের জন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন আত্জেহ্-তে জন্মগ্রহণকারী কয়েকজন সায়্যিদ (অর্থাৎ হযরত হুসায়ন (রা)-এর বংশধর]। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন জামাল (Supra, no. xx)। ১৭২৬ খৃ. তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলে পরবর্তী সুলতানদের বিরুদ্ধে বেশ কিছুকাল যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আহমাদ (Supra, no. xxiii, Bugis বংশের একজন লোক, আকিনিজ রাজন্যবর্গের শেষ বংশের পূর্বপুরুষ) এবং তাঁহার পুত্র জোহান শাহও (Supra, no. xxiv) ছিলেন। জামাল ও জোহান শাহের মধ্যে যুদ্ধ এবং প্রথমজনের মৃত্যুকে বিষয়বস্তু হিসাবে অবলম্বন করিয়া আর একটি আকিনিজ মহাকাব্য "হিকায়াত পতজুত মুহামাত" রচিত হয় (এখন পর্যন্ত

অপ্রকাশিত; তু. Snouck Hurgronje, The Achehnese, ii, 88-100)। এমনকি রাজসভার ঐশ্বর্য ও কর্তৃত্ব বিলুপ্তির পরও সাম্প্রতিক কাল অবধি আকিনিজগণের মধ্যে তাঁহাদের শাসনকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়া আছে, তাঁহাদেরকে তাহারা এক গৌরবময় অতীতের ধারকরূপে সম্মান করে।

Th. W. Juynboll-P. Voorhoeve

আতজেহ যুদ্ধ ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে আকিনিজদের জলদস্যুতা, দাস ব্যবসায় ও প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহে তাহাদের হানাদারি এক বিপদসংকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই দুর্কম বন্ধ করিবার মত অবস্থা ওলন্দাজ সরকারের ছিল না। কারণ তাহারা ১৮২৪ খৃ. ইংল্যান্ডের কাছে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা সুমাত্রায় তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিবে না। কিন্তু পরে ১৮৭১ খৃ. এক নূতন চুক্তির ফলে এই বাধ্যবাধকতা বিদূরিত হয়। ১৮৭৩ খৃ. ওলন্দাজ সৈন্যদের আগমনে আত্‌জেহ্-তে এক যুদ্ধ শুরু হয় (আত্‌জেহ্ যুদ্ধ)। ইহা কয়েকবার বিরতিসহ ১৯১০ খৃ. পূর্ণ শান্তি স্থাপন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে 'উলামা, উলীবালাঙগণ ও সালতানাত এই তিনটি শক্তি এই অপ্রত্যাশিত বিরোধিতাকে উৎসাহিত করিতেছিল। এই তিনটির মধ্যে 'উলামা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সালতানাতের ভূমিকা ছিল দুর্বলতম। শোষোক্ত সত্যটি সহজেই বোঝা যায়। কারণ আমরা দেখিয়াছি, সুলতানের প্রভাব ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। সুলতানের সুরক্ষিত স্থান কুতারজা দখলের ফলে ওলন্দাজ সরকার মনে করিল সাল্‌তানাতের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তখন ওলন্দাজ প্রশাসন তাহার স্থান ও স্বত্ব দখল করিয়া লইল। ইতোমধ্যে সুলতান মাহমূদ শাহের মৃত্যুর পর সুলতান মান্‌সূর শাহের (Super no xxxiii) ছয় বৎসর বয়স্ক পৌত্র মুহাম্মাদ দাউদ সুলতান নির্বাচিত হন। সুলতান পদের দাবিদার এই মুহাম্মাদ দাউদ পিদির কিউমালাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওলন্দাজ সৈন্যদল তাহাকে এক গুপ্ত স্থান হইতে অন্য গুপ্ত স্থানে খুঁজিয়া বেড়ায়। অবশেষে তিনি ১৯০৩ খৃ. আত্মসমর্পণ করেন। ১৯১৭ খৃ. সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তাঁহাকে আত্‌জেহ্ হইতে বহিষ্কার করা হয়। দেশের ক্ষমতাধর (The Achehnese, ১খ., ৮৮) ধর্মনিরপেক্ষ কর্তাস্থানীয় উলীবালাঙগণ ওলন্দাজ কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে তাঁহারা একে একে ওলন্দাজগণ কর্তৃক পর্যুদস্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন তিউকু পাঙলিমা পোলেম মুহাম্মাদ দাউদ। তিনি ছিলেন ২২ মুকীমদের সাগীপ্রধান। সুলতান সরকারের পতনের পর ওলন্দাজগন উলীবালাঙদেরকে নিজ নিজ এখতিয়ারে স্বাধীন শাসনকর্তারূপে স্বীকৃত দেয়। অবশ্য বৃহৎ আত্‌জেহর উলীবালাঙগণ এই স্বীকৃতি পায় নাই। কারণ ঐ অঞ্চল সুলতানের ব্যক্তিগত আয়ত্তাধীন বলিয়া বিবেচনা করা হইত। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উলীবালাঙদেরকে চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজ সরকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইত। Snouck Hurgronje-র পরামর্শ মুতাবিক ১৮৯৮ সাল হইতে তৎপরবর্তী কালে লিখিত চুক্তির ধরনকে বলা হইত Korte verklaring (সংক্ষিপ্ত চুক্তি)। ইহাতে শাসনকর্তাগণ এই মর্মে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাঁহাদের অঞ্চল নেদারল্যান্ড ইন্ডিয়ার অংশ, তাঁহারা বিদেশী কোন শক্তির সহিত রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন না, সমস্ত নিয়ম-কানুন এবং আত্‌জেহর সামরিক ও বেসামরিক গভর্নর কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ মানিয়া চলিবেন।

জনসাধারণের আধ্যাত্মিক নেতা 'উলামা ছিলেন সংগ্রামী উদ্দীপনার প্রকৃত উৎস। এইখানে আমরা শুধু একটি সুপরিচিত পরিবারের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ইহা ছিল তিরো তিউংকু। ইহার সদস্যদের মধ্যে আবার জেহ্ সামান (Tjheh Sama) [মৃ. ১৮৯০ খৃ.] ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পিদি-র গ্যামপঙ তিরো অনুসারে তাঁহাদের নামকরণ করা হয়। ইহা ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। উলামা সারা দেশ জুড়িয়া জিহাদের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের উপর ধার্যকৃত যাকাতই ছিল তাঁহাদের যুদ্ধ তহবিল। দেশীয় প্রধানগণকে অসম্মানজনকভাবে পশ্চাদ্‌ভূমিতে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধটি জিহাদে পরিণত হওয়ার দরুন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং প্রবল উদ্দীপনার সহিত পরিচালিত হয়। এই সময়েই রচিত হয় 'হিকায়াত প্রাং সাবি' (সম্পা. H.T. Damste. BTLV, ৮৪, ১৯২৮, পৃ. ৫৪৫ প.) যাহাতে বিশ্বাসিগণকে জিহাদে আহ্বান করা হয়। ভগু সুলতানের আত্মসমর্পণের পর উলামা' উলীবালাঙগণ গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেন। অবশ্য পাঙলিমা পোলেমও কয়েক মাস পরে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯১১ সালে তিরো তিউংকুদের শেষ ব্যক্তি তিউংকু মাআত নিহত হন।

ওলন্দাজ সরকার যুদ্ধের এই তিন মৌলিক শক্তিকে দীর্ঘকাল পর চিহ্নিত করত তদনুযায়ী নীতি ও কৌশল অবলম্বন করে। Snouck Hurgronje-এর গবেষণাই সর্বপ্রথম সেই রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির দিকনির্দেশ করে যাহার ভিত্তিতে গভর্নর J.B. Van Heutsz(1898-1904), G.C.E van Daalen (1905-1908) & H.N.A. Swart (1908-1918) তাহাদের সামরিক অভিযান পরিচালিত করেন (তু. K.van der Maathe Snouck Hurgronje de Atjeh-Oorlog, দুই খণ্ড, Oostersch Institut, Leiden 1948 এবং তথায় উল্লিখিত গ্রন্থাবলী)। আত্‌জেহর সামরিক ও বেসামরিক এই উভয় দায়িত্বপ্রাপ্ত শেষ গভর্নর ছিলেন Swart।

ওলন্দাজ শাসন ঃ আত্‌জেহ যুদ্ধে সালতানাতের পতন হওয়ার ফলে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সুলতানগণের রাজপ্রতিনিধি উলীবালাঙদের হাতে চলিয়া যায়। যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন 'আদাত (স্থানীয় প্রথাসিদ্ধ আইন) দ্বারা পরিচালিত হইত তাহা নিম্নোক্ত ওলন্দাজ প্রশাসনের সহিত সমন্বিত হয়। উলীবালাঙদের অঞ্চল দেশীয় রাজ্যরূপে গণ্য করা হয় (Zelf besturende landschappen)। স্বল্প মেয়াদী চুক্তি (Korte verk laring) দ্বারা ওলন্দাজ সরকারের সহিতও তাহাদের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। ইহার ব্যতিক্রম ছিল আত্‌জেহ জেলা ও সিঙকেল উপজেলা। এই উভয় স্থানই সরাসরি শাসিত অঞ্চলরূপে গণ্য করা হইত (Rechtstreeks Bestuurd gebied)। তিন সাগী-র অঞ্চল বৃহৎ আত্‌জেহও এই শ্রেণীতে পড়ে। কারণ বিজয়ের পর ভুলক্রমে ইহা ধারণা করা হয়, আত্‌জেহর অন্যান্য অঞ্চলের বিপরীত এই স্থানের প্রধানগণ সুলতানের কর্মকর্তা। সীমান্ত অঞ্চল সিঙকেল ঐতিহাসিক কারণে ঐ

শ্রেণীভুক্ত হয়। এই জেলার একটি অংশ পূর্বেই ওলন্দাজ শাসনাধীনে তাপানুলির রাজপ্রতিনিধির আবাসস্থলের সহিত যুক্ত করা হয়। কাজেই শাসনের স্বরূপ নির্ধারণে রাজকীয় আবাসের অন্যান্য স্থানে বলবৎ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এইখানেও 'আদাত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বিরাজমান প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রাখা হয়, যাহাতে পঙলিমা, সাগী, উলীবালাঙ ইত্যাদি দেশীয় প্রধানগণই রাজকর্মচারী নিযুক্ত হন।

প্রশাসনের অংগীভূত 'আদাত পদ্ধতি সীমাহীন বৈচিত্র্য লইয়া আবির্ভূত হয়। ইহার ফলে এক শত উলীবালাঙ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভিন্ন উপাধিতে পঞ্চাশজন পাঙলীমা, সগী উলীবালাঙ ও স্থানীয় প্রধান শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন। শাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিটি এককের আয়তন গ্রাম হইতে শুরু করিয়া একটি ওলন্দাজ প্রদেশের সমান ছিল। ইহার জনসংখ্যা ছিল কয়েক শত হইতে পঞ্চাশ সহস্রাধিক পর্যন্ত। শাসনকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হইতে বাটাভিয়ার লোক প্রশাসন কলেজে (Bestuurs school) প্রশিক্ষণ পর্যন্ত। এই ইন্দোনেশীয় কাঠামোর উপর ওলন্দাজ প্রশাসন সম্প্রসারিত হয়। ইহার কাজ ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি, শৃংখলা, আইনের শাসন এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা। আত্জেহ সরকার (পরবর্তী কালে Residency) ও অধীন রাজ্যসমূহ গভর্নর (পরবর্তী কালে রেসিডেন্ট) কর্তৃক শাসিত হইত। শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশে এইগুলিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অঞ্চল একজন সহকারী রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসিত হইত। এইসব অঞ্চলের মধ্যে ছিল বৃহৎ আত্জেহ, উত্তর উপকূল, পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূল। এইগুলি আবার একুশটি উপজেলায় ভাগ করা হয় যাহার প্রতিটি একজন Controler (জেলা অফিসার) কর্তৃক শাসিত হইত।

সরকারী নীতি ছিল সর্বদা প্রধানগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রয়াসকে উৎসাহিত করিয়া ইন্দোনেশিয়া প্রশাসনকে পাশ্চাত্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমমানে উন্নীত করা। তদনুসারে পিতৃতান্ত্রিক একনায়ক সুলভ পুরাতন প্রধানগণের স্থানে ধীরে ধীরে প্রগতিশীল তরুণ প্রশাসক আসিতে শুরু করে।

এইভাবে ওলন্দাজ শাসনামলে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার প্রথানুযায়ী উলীবালাঙ গোত্রের অধীনে থাকে। এই গোত্র একদিকে পরস্পরের সহিত নানা প্রকার পূর্ব সম্পর্কযুক্ত পরিবারসমূহের মধ্যে আন্ত-বিবাহের ফলে সংঘবদ্ধ হয় এবং অন্যদিকে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে বিভক্ত হয়। এই গোত্রের নেতৃত্ব শুধু শাসনক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আদাত আইন অনুসারে বিচারের ভারও উলীবালাঙদের হাতে ছিল। অন্যদিকে হুকম অনুযায়ী তাহারা ছিলেন নিজ নিজ অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা। তাহা ছাড়া প্রায়ই তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন। পিদিতে যেখানে মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথার প্রচলন ছিল, বিশেষত সেখানে বিস্তর ভূসম্পত্তি তাহাদের নিজ প্রভাবাধীন ছিল। শেষত সর্বপ্রকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বেলায় তাঁহাদের পুত্রগণ অগ্রাধিকার পাইত বিধায় তাঁহারা কিয়দংশে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত একাধিপত্য বিস্তার করে।

জাপানী যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ তিনজন উলীবালাঙ ছিলেন। তিউকুন্জা 'আরিফ ছিলেন ২৬ মুকীমদের সাগী প্রধান, তিনি Volksraad-এ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আত্জেহ-র প্রতিনিধিত্ব করেন। গ্লুমপাং পেয়ং (Glumpang payong) [পিদি]-এর শাসনকর্তা তিউকু মুহাম্মাদ হাসান পূর্বে কুতারাজার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেইখানে তিনি রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে বিস্তর প্রভাব খাটাইতেন। তিউকু হাজী তঝি, মুহাম্মাদ জোহান আলামসজাহ ছিলেন পিউসাঙ্গান (Bireuen)-এর শাসনকর্তা। উলীবালাঙ দল যখন এইভাবে ক্রমান্বয়ে ওলন্দাজ প্রশাসনের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল তখন 'উলামার মধ্যে ওলন্দাজ বিরোধী ঐতিহ্য বজায় ছিল। শান্তি স্থাপনের পর 'উলামা' আত্জেহ যুদ্ধের সময় অর্জিত গুরুত্ব হারান এবং উলীবালাঙগণ ঐতিহ্যগত শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়া পান। কাজেই যুদ্ধের সময় পরস্পর সহযোগী এই দুই দলের মধ্যে এক প্রকার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আত্জেহর ইতিহাসে ইহা এক পৌনপুনিক ইতিবৃত্ত। ইহার ফলে উলামা' উলীবালাঙগণকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেন।

ওলন্দাজ শাসনামলের ঐতিহ্য অনুযায়ী ধর্মীয় জীবন স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথমত তুয়াংকু রাজা কিউমালা (যাঁহার পিতা ছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ শাহের প্রপৌত্র, Supra xxxi) ধর্মীয় উপদেষ্টারূপে কাজ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এই পদটি আর পূরণ করা হয় নাই। অপরদিকে ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রাদ 'উলামা' (উলামা' পরিষদ) নামক ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত হয়। ইহার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন সুলতানের এই বিদ্বান বংশধর। এই কারণে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ অতঃপর ধর্ম বিষয়ে উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উলীবালাঙদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। কারণ তাহারাই আইনত বিবেচিত হইতেন নিজ নিজ অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা। শেষ পর্যন্ত জাপানী আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে কুতারাজার বড় মসজিদের ইমাম ও পূর্ববর্তী সুলতানের বংশধর তুয়াংকু 'আবদুল 'আযীযকে বেসরকারী ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। 'আলিম বলিতে আত্জেহতে যাহা বুঝায় তিনি ঠিক তাহা ছিলেন না। উপরন্তু 'আলিম (উপরে দ্র.) নামে পরিচিত হইয়াও তিনি তাঁহার বিখ্যাত পূর্বসূরীদের সম্মান ও পদমর্যাদাও পান নাই।

পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষার পরই ধর্মীয় শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষালয় ছাড়াও আত্জেহ্তে তথাকথিত ধর্মীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও ছিল। ঐগুলিতে ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইত। অনেক উলীবালাঙ নিজ নিজ অঞ্চলে এক বা একাধিক ধর্মীয় শিক্ষালয় থাকা অপরিহার্য মনে করিতেন। এইসব শিক্ষালয়ে কার্যরত মিসর, Minangkabau বা আত্জেহ্তেই শিক্ষিত 'উলামার খ্যাতির বদৌলতে উলীবালাঙদের সুনাম বৃদ্ধি পাইত। এই 'আলিমগণ যে কিছুটা পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব পোষণ করিবেন, তাহা পরিবেশের অপরিহার্য অংগ বলিয়া উলীবালাঙগণ মানিয়া লইতেন।

ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জোটের তৃতীয় অংশে সুলতানগণ ও তাঁহাদের অনুসারীদের ভূমিকা পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে 'ভণ্ড' সুলতান বাটাভিয়াতে নির্বাসনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পুত্রকে আতজেহতে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আত্জেহ্তে

বসবাসকারী সুলতানী বংশের অন্য সদস্যদের কোন প্রভাব ছিল না। ব্যতিক্রম ছিলেন তুয়াংকু মাহ্মূদ। তিনি ছিলেন বাটাভিয়ার বেসামরিক প্রশাসনিক কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। আত্জেহ্তে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে সেলিবিসে তিনি কয়েক বৎসর সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। ফিরিবার পর তিনি রেসিডেন্টের অধীনে উচ্চ পদস্থ দেশীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৩১ খৃ.-এ তিনি Volksraad-এর সদস্য হিসাবে তিউকুন্জা' আরিফ-এর স্থলাভিষিক্ত হন। 'ভণ্ড' সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি হন সুলতান পরিবারের অবিসংবাদিত কর্তা। ১৯৩৯ খৃ. কতিপয় আকিনিজ ব্যবসায়ী কর্তৃক আরব্ধ সালতানাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিযান বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে নাই। উলীবালাঙগণ প্রকৃতপক্ষে ইহাকে কোন সমর্থনই দেয় নাই। কারণ ইহা তাহারা নিজেদের মর্যাদার প্রতি হুমকি বলিয়া গণ্য করিয়াছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা আপনা হইতেই অনুকূল হইতে থাকে। প্রতিরোধের শেষ ঘটনা ঘটে ১৯৩৩ খৃ.-এ এবং মোতায়েনরত সৈন্যসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়। কাফির-বিদ্বেষ ও জিহাদের ধারণা, যাহা ছিল ধর্মীয় চেতনার নেতিবাচক প্রকাশ, তাহা এক ধরনের ইতিবাচক স্থানীয় আকিনিজ দেশপ্রেমের জন্ম দেয়। নিজ গৃহে কর্তার স্থান দখলের স্বাভাবিক বাসনার মাধ্যমে ইহা প্রকাশ প্রায়। স্পষ্ট কথায় শাসনকার্যে অধিক হারে স্বদেশী লোকদের অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখা দেয়।

আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধারণা আকিনিজ জাতির মনে তখনও জাগ্রত হয় নাই। জাভায় উন্মেষিত মুহাম্মাদিয়্যা আন্দোলন সম্পর্কে একই কথা খাটে। ইহার লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় জীবনের অগ্রগতি ও বিস্তার ছিল সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায়, তবুও আকিনিজদের ধর্মীয় জীবনে ইহা কোন সাড়া জাগায় নাই। ইহার নেতৃত্বে আকিনিজ থাকা সত্ত্বেও ইহা স্পষ্টত অন-আকিনিজ আন্দোলনরূপে থাকিয়া যায়। অন আকিনিজি উপাদান বা স্থানীয় আকিনিজ সমাজের সংগ্রামী অংশমাত্র ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে ইহার মধ্যে তাহারা রাজনৈতিক ও সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সন্ধান করে। এই নবীন আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের ধ্যান-ধারণা আকিনিজদের অধিকতর রক্ষণশীল ধর্মীয় জীবনের চিন্তা-ভাবনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

মুহাম্মাদিয়া ঃ আধুনিক ধারণার বিকল্পস্বরূপ ১৯৩৯ খৃ.-এ Bireuen-এ পিউসাংগানের শাসনকর্তার প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকতায় PUSA বা পারসাতুয়ান 'উলামা'- উলামা সেলুরাহ, আতজেহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আতজেহর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 'উলামা'-নির্দেশাধীনে ইহা আকিনিজদের বৈশিষ্ট্যমূলক অনমনীয় গোঁড়া ধর্মীয় জীবনের বাহকরূপে কাজ করে। 'উলামাই শুধু ইহার সদস্য ছিলেন না, ইহার লক্ষ্য ও আদর্শের সহিত একাত্ম হইতে পারিলে যে কেহ ইহাতে যোগ দিতে পারিত। ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন কিউ মাংগানের (পিদি) তিউংকু মুহাম্মাদ দাঊদ বিউরিউয়েহ (Beureu'eh)। মনে হয়, এই আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলীয় 'উলামা পরস্পরের সংস্পর্শে আসেন এবং সারা আতজেহ্ জুড়িয়া ইহার শাখা স্থাপিত হয়। ওলন্দাজ বিরোধী বৈশিষ্ট্য ইহাতে যেমন ছিল না, তেমনই কেবল রাজনৈতিক চরিত্র গ্রহণ করাও ইহার লক্ষ্য ছিল না বলা যায়। সরকার ও উলীবালাঙদের প্রতি ইহার মনোভাব সঠিক ছিল এবং অনেক উলীবালাঙ স্থানীয় শাখায় উপদেষ্টা পদ গ্রহণে সম্মত হয়। তুয়াংকু মাহ্মূদকে পৃষ্ঠপোষকের পদ অর্পণ করা হয়। গেমুদা পুসা নামে এক যুব আন্দোলন গঠিত হয়। ইদি-তে ছিল ইহার সদর দফতর। 'আদাত কর্তৃপক্ষের চাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় অধিকতর অগ্রবর্তী ও সংগ্রামী সামাজিক শক্তিসমূহ এই আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশের একটি উপায় এবং ইহার মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। ফলে এই যুব আন্দোলন অতি সত্বর জঙ্গী ও ধ্বংসক চরিত্র গ্রহণ করিতে শুরু করে। কাজেই ওলন্দাজ রাজত্ব ও উলীবালাঙদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুসা 'উলামার হাতে এক নূতন ও কার্যকর অস্ত্রে পরিণত হয়।

ইতোমধ্যেই আমরা সংক্ষেপে এই সময়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় দিকসমূহের আলোচনা করিয়াছি। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতে থাকে। জাপানী আক্রমণের সময় আত্জেহ্তে একটি উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয়, পাশ্চাত্য ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা দানকারী তেরটি বিদ্যালয়, ৩৫৮ টি মাতৃভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ব্যবসা ও হস্তশিল্প কেন্দ্র ছিল। এইগুলি ওলন্দাজ সরকার বা দেশীয় রাজ্যসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাদানকারী কয়েকটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যাহা মুহাম্মাদিয়া ও তামান সিস্ওয়া (Taman Siswa) সংঘদ্বয় কর্তৃক পরিচালিত হইত।

জাপানী দখলকার আমল ঃ ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানী সৈন্যদল কর্তৃক আত্জেহ অধিকৃত হইবার পূর্বে বৃহৎ আত্জেহ এবং ইহার উত্তর ও পশ্চিম উপকূলীয় জেলাসমূহে ওলন্দাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। এই আন্দোলন, বিশেষত দ্বাদশ মুকীমের সাগী ও পশ্চিম উপকূলের Tjalang উপজেলায় জাতীয় অভ্যুত্থানের চরিত্র লাভ করে। জাপানী সৈন্যদের আগমনের পর বিদ্রোহ দ্রুতবেগে বিস্তৃত হয়। আত্জেহ্ যুদ্ধের ন্যায় তখনও 'উলামাই ছিলেন অভ্যুত্থানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুসা ও পেমুদা পুসার প্রধান কর্তা তিউংকু মুহাম্মাদ দাঊদ বিউরিউ'এহ ইহাতে নেতৃত্ব দেন। এই সংগঠনই ছিল সমস্ত আত্জেহ-এর একমাত্র সংগঠন যাহা সারা দেশে জিহাদের আহ্বান প্রচারের যোগ্যতা রাখিত। এই যুদ্ধে উলীবালাঙদের অংশগ্রহণ প্রথম দিকে ছিল একান্তভাবে কিছু অসন্তুষ্ট স্থানীয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বাবিংশতি মুকিমের সাগীদের বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ নেওয়ার কারণ ছিল সাগীপ্রধানের নিকট হইতে 'উলামা'র সমর্থন লাভ। এই সাগীপ্রধান ছিলেন আত্জেহ যুদ্ধের প্রখ্যাত প্রতিরোধ নেতা তিউকু পাংলিমা পোলেম মুহাম্মাদ দাঊদের পুত্র। তিনি যুদ্ধ শুরু হইবার অল্প কিছুকাল পূর্বেই মারা যান। Lageuen-এর তিউকু সাবি ছিলেন দেশীয় শাসকদ্বয়ের একজন যিনি পূর্বে সালতানাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমর্থন করেন। তাঁর এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণের ফলে সেখানকার অভ্যুত্থানের চরিত্রে এমন পরিবর্তন আসে যাহাতে আত্জেহ্ যুদ্ধের তৃতীয় উপাদান সালতানাত শক্তি এই সময় আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠে। এই আন্দোলনে জাপানী পক্ষ হইতে ইন্ধন জোগান হয়। কারণ ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে পেনাং-এর পতনের অব্যবহিত পর

সেখানকার আকিনিজদের মধ্য হইতে একটা পঞ্চম বাহিনী গড়িয়া তোলা হয়। এই বাহিনী তাহার চরদেরকে জাপানী ধ্বংসলীলার শরণার্থী হিসাবে আত্জেহতে প্রেরণ করে। জাপানীদের আগমনের ঠিক পূর্বে ষড়বিংশতি মুকীমদের সাগীপ্রধান তিউকুন্জা আরিফ বিদ্রোহে যোগ দেন। অন্যদিকে পরবর্তী কালে গ্লুমপাঙ পেয়ং-এর তিউকু মুহাম্মাদ হাসান ঘোষণা করেন, তিনি আক্রমণের পূর্বেই জাপানীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

শুরু হইতেই জাপানীরা উলীবাল্যঙ ও 'উলামা'র সহিত ভিন্ন সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। ওলন্দাজগণ এইরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে নাই। প্রথমেই তাহারা 'উলামার পক্ষ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থন লাভ করে। জাপানীরা অবশ্য পুসা কর্তৃক উলীবালাঙদের নিকট হইতে স্থানীয় ক্ষমতা দখলের অনুমতি দেয় নাই। কারণ তাহারা 'আদাত ভিত্তিক সরকারী প্রশাসন-যন্ত্র বিকল করিয়া প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিপত্তি ঘটাইতে চাহে নাই। ইহাতে হয়তো তাহাদের সামরিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িত। তৎপরিবর্তে জাপানীরা 'আদাত ও হুকুম' উভয় রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতি অবলম্বন করে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হয়। ঠিক ওলন্দাজদের মতই জাপানীরাও তাই উভয় দলের মধ্যে ভারসাম্য বিধানের চেষ্টা করে। এই নীতি শীঘ্রই গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ অভ্যুত্থানে উলীবালাঙগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এইভাবে উলীবালাঙদের শাসন বজায় থাকে। সরকারী কাজকর্মে তাহাদের ভূমিকা ও অবস্থান আরও দৃঢ় হয়। ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশীয় গান্কেদের জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া ইহারা উলীবালাঙ পরিবার হইতেই নিযুক্ত হইত। ১৯৪৩ সালে সুমাত্রা হইতে জাপান সফরকারী আত্জেহর প্রতিনিধিত্ব করেন দুইজন উলীবালাঙ। তাহাদের একজন তিউকু মুহাম্মদ হাসান ছিলেন ইহার নেতা। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে সৃষ্ট আত্জেহর উপদেষ্টা পরিষদে তিউকুনজা আরিফ সভাপতি ও তিউকু মুহাম্মাদ হাসান সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। এইবারই পরিষদটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার বেশির ভাগ সদস্য ছিল উলীবালাঙ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু ১৯৪৫ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর আর এমনটি হয় নাই।

তথাপি উলীবালাঙদেরকে অবজ্ঞা করিয়া 'উলামা'র অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে দৃঢ় হইতে থাকে। ১৯৪৩ সালের প্রথমদিকে তুয়াংকু 'আবদুল' আযীয সমগ্র আত্জেহর ধর্মীয় উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক মাস পর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় বিষয়ের পরামর্শ কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন। ইহার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন তিউংকু মুহাম্মাদ দাউদ বিউরিউএহ। সমগ্র আত্জেহ ব্যাপিয়া ইহার শাখা ছিল এবং তিনি অতি সত্বর ইহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এই সংগঠন ও অনুরূপ অন্য সংগঠনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে জাপানী যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে লাগানো।

ধর্মীয় মামলাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৪৪ খৃ.-এ 'শুকিউ হোয়েন নামে একটি 'আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতেও তিউংকু মুহাম্মাদ দাউদ বিউরিউএহ্ ও তাঁহার পুসা আধিপত্য বিস্তার করে। অবশেষে পুসার কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্যকে ধর্মীয় শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। তিউংকু মুহাম্মাদ দাউদ বিউরিউএহ্ ও আরও কয়েকজন 'উলামা' আত্জেহ্র প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

বিচার বিভাগও পুনর্গঠিত হয় এবং ইহাকে উলীবালাঙদের নিয়ন্ত্রণ হইতে প্রায় সর্বাংশে মুক্ত করা হয়, বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে নিযুক্ত সদস্যদের এক বিরাট সংখ্যা ছিল পুসার সমর্থক, প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা ও উলীবালাঙদের শত্রু।

উভয় দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার এই নীতি উলীবালাঙ বা 'উলামা' কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। নিশ্চিতরূপে বলিতে গেলে হুকুম গৃহকর্ত্রী ও 'আদাত তাঁহার অনুগত দাসীর ভূমিকায় আর রহিল না। থাকিলেই 'উলামা' সন্তুষ্ট হইতেন। কাজেই উভয় দলই জাপানী কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করিয়া পরস্পর এক নিষ্ঠুর সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

ইতোমধ্যে জাপানীদের উপর দিন দিন চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশে উৎপাদিত খাদ্য ও রাস্তাঘাট, বিমানক্ষেত্র ও দুর্গ তৈরির জন্য দেশীয় শ্রম-এই দুইয়ের উপরই দখলদার জাপানী সৈন্যরা নির্ভরশীল ছিল। এই চাহিদা মিটাইতে গিয়া জনসাধারণের উপর উলীবালাঙ ও 'উলামা' উভয়ের মাধ্যমে এক অসহনীয় বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। ফলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় উলীবালাঙগণ দখলদার সৈন্যদের সেবায় নিজেদের জনবল সরবরাহ করিতে অস্বীকার করে। অন্যপক্ষে জাপানী চাহিদা মিটান 'উলামার পক্ষেও ক্রমেই কঠিন হইতে থাকে। ১৯৪৩ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে আত্জেহ্ ব্যাপিয়া বিপুল হারে গ্রেফতার শুরু হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কতিপয় উলীবালাঙও ছিলেন।

১৯৪৪ খৃ. আগস্ট মাসে গ্লুমপাং পেয়ং-এর শাসনকর্তাকে গোপন কর্মতৎপরতা ও ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্রের সন্দেহে কতিপয় উলীবালাঙসহ গ্রেফতার করা হয় এবং ইহার অল্প কাল পর তাহাকে হত্যা করা হয়। এই গণগ্রেফতারের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই পিউসাঙান-এর শাসনকর্তা বন্দী ছিলেন। হিকায়াত প্রাঙ্গ সাবি (জিহাদের আহ্বান) গ্রন্থ সঙ্গে রাখা ও উহার পঠন-পাঠন অপরাধ ঘোষিত হইয়াছিল। দুইটি ক্ষেত্রে প্রকাশ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রারম্ভে ১৯৪২ খৃস্টাব্দের দিকে লো' সিউমাউই উপজেলার 'বায়ু'তে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইখানে তিয়াংকু 'আবদুল' জালীল নামক এক 'আলিম যিনি তরুণ হওয়া সত্ত্বেও একটি বৃহৎ ধর্মীয় বিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন, জাপানীদের বিরুদ্ধে তাঁহার কথিত জিহাদ প্রাঙ্গ সাবি ঘোষণা করেন। ফলে এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতে তিনি অনুগামীদলসহ শহীদ হন। ১৯৪৫ খৃ. বিরিউ উপজেলার পান্দ্রা (Pandraih)-এ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইখানে বাধ্যতামূলক সরবরাহের গুরুতর আর্থিক বোঝা ও 'স্বেচ্ছাশ্রমে'র ফলে এক বিস্ফোরণ ঘটে, যাহা বর্বরভাবে দমন করা হয়।

জাপানী আক্রমণের ফলে প্রথমত কাফির বিদ্বেষের নেতিবাচক মানসিকতা পুনর্জাগরিত হয়। কিন্তু জাপানী চাপ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই দেশপ্রেমের ইতিবাচক মানসিকতা গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে আকিনিজদের মধ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের উদগ্র বাসনা জাগিয়া উঠে। জাপানীদের স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকারের ফলে শেষের দিকে এই ইচ্ছা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে ধর্মভিত্তিক ঐক্যে আবদ্ধ করিবার সংকল্পে পরিণত হয়।

ইন্দোনেশিয় স্বাধীনতা ঃ ১৯৪৫ খৃ. আগস্ট মাসে জাপানী আত্মসমর্পণের ফলে আত্জেহতে ওলন্দাজ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, শুধু সাবাং দ্বীপ ওলন্দাজ সৈন্যদের দখলে আসে। এইভাবে 'উলামা' ও উলীবালাঙদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত মুকাবিলার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯৪৫ খৃ. ডিসেম্বরে এক গৃহযুদ্ধ বাঁধে যাহা ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলে। ফলে উলীবালাঙদের ক্ষমতা লোপ পায়। কতিপয় উলীবালাঙ পরিবারের শেষ পুত্রসন্তানটি পর্যন্ত হত্যা করা হয়। উলীবালাঙ পরিবারগুলির শত শত সদস্যকে প্রজাতন্ত্রের শত্রু বলিয়া বন্দী শিবিরে অন্তরীণ রাখা ও তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন ষষ্ঠবিংশ মুকীমদের সাগী প্রধান ও পিউসাংগনের শাসনকর্তা।

উলীবালাঙদের ক্ষমতা লোপকে শুধু 'আদাত ও হুকুম-এর অন্তর্বিরোধরূপে চিহ্নিত করা চলে না। ইহার সহিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও জড়িত ছিল। উলীবালাঙগণ শ্রেণী হিসাবে সমাজে যে স্থান দখল করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে সামাজিক বিপ্লবের একটি হাতিয়াররূপে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উলীবালাঙদের এই ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

গৃহযুদ্ধে পুসা বিজয়ী হইবার অব্যবহিত পরে ইহার নেতা তিউংকু মুহাম্মাদ দাঊদ বিউরিউএহ আত্জেহ্র সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। প্রশাসন, পুলিস ও বিচার বিভাগের যেই সকল পদে পূর্বে উলীবালাঙগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সকল পদ তাঁহার সহযোগিগণ পূরণ করেন। স্বল্প জনসমর্থনপ্রাপ্ত নূতন শাসনকর্তাদের অনভিজ্ঞতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির ফলে ক্রমে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯৪৮ সালে কুতারাজায় এক ব্যর্থ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ওলন্দাজদের সহিত সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত উহার মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল এবং আত্জেহ্তে উহার হস্তক্ষেপের প্রশ্নও উঠে নাই। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সাধারণ সংগ্রামই একমাত্র উপায় হিসাবে বিরাজ করে। আকিনিজদিগের আঞ্চলিক দেশপ্রেম ও ইন্দোনেশিয়ার ঐক্যের ধারণা তখনকার মত একীভূত হইয়া যায়।

১৯৪৯ সালের শেষে হল্যান্ড হইতে সার্বভৌমত্ব ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রে হস্তান্তরিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ গ্রহণে আর কোন বাধা রহিল না। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আত্জেহ্ সুমাত্রা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে তিউংকু মুহাম্মাদ দাঊদ বিউরিউএহ্ গভর্নর পদ হারান। আকিনিজ সমর ইউনিটসমূহে ক্রমশ অন-আকিনিজ সৈন্য নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে পুসা তাহার সামরিক সমর্থন হারাইতে থাকে। ১৯৫১ খৃ. বিপুল সংখ্যক পুসা নেতাকে কমিউনিস্ট নেতা বলিয়া অপরাধী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। এই সময়ে সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে কমিউনিস্টদেরকে পাইকারীভাবে গ্রেফতার করা হইতেছিল। অযোগ্য পুসা নেতাদেরও তখন প্রশাসনিক পদ হইতে অপসারণ করা হয়। কিন্তু এইভাবে আত্জেহ্তে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক খাতে পুনঃপরিচালিত করিবার যে ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। ১৯৫৩ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে তিউংকু মুহাম্মাদ দাঊদ বিউরিউএহ্ ও তাহার অনুসারিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এক রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা ১৯৫৭ খৃ. মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে। তখন তিউংকু ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ১৯৫৬ খৃ. অক্টোবর মাসে আত্জেহকে পুনরায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জীঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ঃ (১) Encyclopaedie van Ned-Indie. i (১৯১৯), আত্জেহ নিবন্ধ; (২) P. J. Veth, Atchin en zijne bectrekkingen tot Nederland (Leiden, 1873); (৩) J. A Kruyt, Atjeh en de Atjehers. Twee jaren blokkade op Sumatra's N.O. Kust, Leiden 1877; (৪) Mededeelingen bet. reffende de Atjehsche onderhoorigheden, BTLV, ser. 7, ix, 138-171; (৫) J.L.J. Kempees, De tocht van overste van Daalen door de Gajo, Alas-en Bataklanden, আর্মস্টারডাম ১৯০৪; (৬) C. Snouck Hurgronje, Een Mekkaansch gezantschap naar Atjeh in 1683, BTLV, ser. 5, iii, 545-54; (৭) W. Voz, Nord-Sumatra II, Die Gajolander, বার্লিন ১৯১২; (৮) P. Voorhoeve, Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra, The Hague 1955, 5-8; (৯) J. Hulshoff Pol, De gouden munten (mas) van Noord-Sumatra in Jaarboek voor munten mas ven penningkunde xvi 1929; (১০) T.J Veltman, Nota over de geschiedenis van het landschap pidie, TITLV 58, 1919, 15-160; (১১) G. L. Ticheln, Een marmeren praalgraf te Koeta Kareueng. Culturrel Indie 2 (1940),-এর প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত টীকাসহ, ২০৫-১১ (De Javabode-এর পূর্বেকার নিবন্ধসমূহ Tichelman, 7/13 শতকের প্রথমার্ধে সমাধির কথা উল্লেখ করেন কিন্তু এই তথ্যের উৎস বিশ্বাসযোগ্য নহে; (১২) P. Voorhoeve, Iskandar Muda, Zoon van 'Ali? BTLV 107, 364/5; (১৩) J. Jongejans, Land en Volk van Atjeh vroeger en nu, 1939; (১৪) A. J Piekaar, Atjeh en de orlog met Japan, 1949; (১৫) S. M. Amin, Sekitar peristiwa berdarah di Atjeh, ১৯৫৬।

A J Pieaar (E. I.²) / পারসা বেগম

'আত্তাব ইবন আসীদ (عتاب بن اسيد)

'আত্তাব ইবন আসীদ (عتاب بن اسيد) ঃ (রা) ইব্ন আবিল 'ঈস ইব্ন উমায়্যা ইব্ন 'আব্দ শাম্স; উমায়্যা বংশোদ্ভূত। তাঁহার উপনাম (كنية) আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ আবদির রহমান। তাঁহার মাতার নাম যায়নাব বিন্ত আমর ইব্ন উমায়্যা। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) তাইফের দিকে হুনায়ন অভিযানে (৮/৬২৯) যাওয়ার কালে 'আত্তাবকে মক্কার ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। ভিন্ন মতে

রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা হইতে মদীনায় যাওয়ার কালে 'আত্তাবকে মক্কার ওয়ালী নিযুক্ত করিয়াছিলেন (ইবন সা'দ, ২খ., ১৪৫)। তিনি ৮ম হিজরীতে হজ্জেরও ইমাম ছিলেন। উক্ত পদে নিযুক্তিকালে 'আত্তাব-এর বয়স ২০ বৎসরের কিছু অধিক ছিল (ইসাবা, ২খ., ৪৫১)। তিনি এই পদে পরবর্তী কালেও বহাল ছিলেন।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) আত্তাবকে মক্কার ওয়ালী নিযুক্ত করায় কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হন। কারণ 'আত্তাব সন্দেহবাদীদের প্রতি ভীষণভাবে কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। পক্ষান্তরে প্রকৃত ঈমানদার ও ইসলামী 'আমল ও অনুশাসনের প্রতি অনুগত লোকদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল। তিনি বলিতেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি জানিতে পারি, কেহ সালাতের জামা'আতে হাজির হওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে, আমি তাহার গর্দান কর্তন করিব। কারণ একমাত্র মুনাফিকই সালাতের জামা'আতে অনুপস্থিত থাকিতে পারে। ফলে মক্কার কোন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিল, 'আত্তাব একজন কট্টর বেদুঈন। ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আমি একজন স্বপ্নদ্রষ্টার অনুরূপ দেখিতে পাইতেছি, 'আত্তাব জান্নাতের দ্বারে উপস্থিত হইয়া উহার কড়া নাড়িল আর তখনই উহা উন্মুক্ত হইয়া গেল। অতঃপর 'আত্তাব জান্নাতে প্রবেশ করিল।"

'আত্তাব 'উকায়লী হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নিস-সাইব আল-কাল্বীর জীবনী গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا। "আর তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি" (১৭ঃ৮০), এই আয়াতের মর্ম 'আত্তাব (রা)-এর উপর পূর্ণরূপে বর্তে অর্থাৎ তিনিই ছিলেন সেই সাহায্যকারী। ফাতিমা (রা)-এর জীবিত থাকাকালে আলী (রা) আবূ জাহল-এর কন্যাকে বিবাহ না করেন ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অভিপ্রায়। ইহা অবগত হওয়া মাত্রই 'আলী তাহাকে বিবাহ করিতে না পারেন, এই উদ্দেশে তিনি তাহাকে দ্রুত বিবাহ করেন। তাঁহার এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার পুত্র 'আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। একদা 'আত্তাব (রা) কা'বার প্রাচীরে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় বলিয়াছিলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি ওয়ালী হিসাবে আমার কাজের বিনিময়ে এক জোড়া কাপড় ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই। কাপড় জোড়াটি আমি আমার আযাদকৃত গোলামকে দান করিয়াছি।"

ওয়াকিদীর বর্ণনামতে যেইদিন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্র (রা) ইন্তিকাল করেন সেই দিনই আত্তাব (রা)-ও ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তাবারানীর বিবরণ অনুযায়ী 'আত্তাব ২১ হিজরীতেও দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) কর্তৃক নিযুক্ত (ওয়ালী) গভর্নর ছিলেন। তাবারীও তাঁহার তারীখে 'উমার (রা)-এর গভর্নরগণের তালিকায় 'আত্তাব-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন্ সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ২খ., ১৪৫; ৩খ., ১৮৭; ৫খ., ৪৪৬; (২) ইবনুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ৩৫৮-৫৯; (৩) ইব্ন হাজার, ইসাবা, বাগদাদ ১৩২৮ হি, ২খ., ৪৫১; সংখ্যা ৫৩৯১; (৪) E.I.2, 751; (৫) মুসআব আয-যুবায়রী, নাসাব কুরায়শ, নির্ঘণ্ট; (৬) নাওয়াবী, তাহযীব, ৪০৫; (৭) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ১২৩; (৮) মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, মুহাব্বার, নির্ঘণ্ট; (৯) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (১০) ইব্ন কুতায়বা, উয়ূনুল আখবার, ১খ., ২৩০, ২খ., ৫৫; (১১) আল-মাসঊদী, ১খ., ৫৪; (১২) বালাযুরী, আনসাব, ৪খ., ১৫০।

আবূ বকর মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ

'আততাব ইবন শুমায়র (عتاب بن شمير) ঃ আবদী (রা) সাহাবী ছিলেন। কোন কোন সীরাতকারের মতে তাঁহার পিতার নাম শুমায়র নহে, নুমায়র। তিনি কূফাতে বসবাস করিতেন। তাঁহার পুত্র মুজাম্মি' তাঁহার নিকট হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইসা'বা ,বাগদাদ ,তা. বি., সংখ্যা ৫৩৯৪ ; (২) আয্-য'াহাবী, তাজরীদ, বৈরূত. তা. বি., ১খ.।

'আত্তাব ইব্ন সালীম আত-তায়মী (عتاب بن سليم التيمى) ঃ একজন সাহাবী; ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় দিবসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দাদার নাম ক'ায়স ইব্ন আসলাম ইব্ন খালিদ ইব্ন মুদলিজ ইব্ন খালিদা ইবন 'আবদ মানাফ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা। তিনি ইয়ামামা-এর যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইবনুল-আছীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ৩৫৯; (২) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৫২, সংখ্যা ৫৩৯২।

আবূ বকর মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ্

আল-'আত্তাবী (العتابى) ঃ আবূ আম্র কুলছূম ইব্ন 'আম্র ইব্ন আয়্যুব পত্রলেখক ও কবি। তৃতীয়/নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইন্তিকাল করেন। জাহিলী যুগের কবি 'আমর ইব্ন কুলছূমের একজন উত্তরসুরি আল-'আততাবী ছিলেন তাগলিব (তু. ইবন হায্ম, ২৮৭) গোত্রের একটি শাখাগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাগলিব গোত্রের বাসস্থান ছিল উত্তর সিরিয়ার কিন্নাসরীনের নিকটবর্তী এলাকায়। তাঁহার জন্ম তারিখ ও বাগদাদে তাঁহার আগমনের তারিখ জানা যায় নাই। ইব্ন তায়ফূর-এর তারীখ বাগদাদ (সম্পা. Kelley, ১০খ., ১৫৭-৮) নামক গ্রন্থে এক ইঙ্গিত অনুসারে তিনি ফার্সী পাণ্ডুলিপি পাঠের উদ্দেশে কিছু কালের জন্য মার্ব ও নীশাপুরে অবস্থান করেন যাহা আহমাদ আমীনও পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনা সত্য হইলে আল-আততাবী 'আরবী ও ইরানী এই উভয় সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। তিনি একটি প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত হইতে প্রতীয়মান হয়, বারমাকী পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। অধিকন্তু তাহাদের পতন ছিল তাঁহার জন্য মারাত্মক। তদুপরি তিনি যানদাক'া (দ্র. যানদাক'া) অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। এইজন্য তিনি হারূনুর রাশীদের শাস্তি হইতে বাঁচিবার উদ্দেশে ইয়ামান হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন (দ্র. ইয়াকূ'ত, বিশেষভাবে মারযুবানী, মু'জাম, ৩৫১)। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার চতুরতা দ্বারা আল-'আত্তাবী পুনরায় খলীফার অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হন। তিনি সেনাপতি তাহির ইব্ন হুসায়ন (দ্র.) ও আল-মামূন-এর নিকটও সম্মানের পাত্র ছিলেন। একটি সূত্র হইতে

প্রতীয়মান হয়, একইভাবে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সেনাপতি মালিক ইব্ন তাওক (মৃ. ২৫৯/৮৭৩)–এর আশ্রয়ে ছিলেন। কথিত আছে, শেষ জীবনে আল-'আত্তাবী শাস্তি ভোগ করিয়াছিলেন। ২২০/ ৮৩৫ সাল তাঁহার মৃত্যু সন বলিয়া ধরা হয় (ইব্ন নাদীম-এর অনুসরণে কুতুবী, ১খ., ১৩৯, কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ, কিন্তু Fluge সং-এ এই স্থানে একটি ফাঁক রহিয়াছে)। একজন বুদ্ধিদীপ্ত ও গৌরবান্বিত সভাসদ হিসাবে আল-'আত্তাবীর খ্যাতি রহিয়াছে। অবশ্য তিনি সর্বদা তত সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। হারূনুর রাশীদের দরবারে প্রতিদ্বন্দ্বী এক কবির পতন ঘটাইবার জন্য আল-'আত্তাবী যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ইহারই সাক্ষ্য বহন করে (দ্র. ইব্ন হা'যম, ২৮৫)।

ইব্ন নাদীমের ফিহরিস্ত, ১২১ ও ৩১৬-১৮ (আল-কুতুবী ও ইয়াকূ'তও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন) -এ আল-'আত্তাবী রচিত ছয়খানা গ্রন্থের তালিকা রহিয়াছে যাহার শিরোনাম হইতে প্রতীয়মান হয়, এইগুলি ছিল ভাষতত্ত্ব ও সাহিত্যের উপর রচিত গ্রন্থ। গদ্য রচয়িতা হিসাবে আল-আত্তাবীর উৎকর্ষ বিচার করিতে হইলে আল-জাহিজ ও ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ্-এর উদ্ধৃতির বিবেচনা করিতে হইবে। আল-'আত্তাবীর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় (ফিহরিসত, ১৬৩-তে ১০০ পত্রের একটি সংগ্রহের উল্লেখ আছে) এবং ইব্ন আবী তায়ফূর (মৃ. ২৮০/৮৯৩) ইহার একটি সংকলন প্রস্তুত করেন (দ্র. ঐ, ১৪৬, শেষাংশ)। বর্তমানে কেবল জাহিজ, ইব্ন কুতায়বা, 'আব্দ রাব্বিহ ও আল-ইস্ফাহানীর উদ্ধৃতি হইতে আমরা সেইগুলি সম্পর্কে জানিতে পারি। এই অংশসমূহ ফারীদ রিফাঈ কর্তৃক এক্ষেত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার রচনাসমূহ সভাকবির রচনার মত। তাঁহার মুক্ত রচনাশৈলী হইতে অনুমিত হয়, তাঁহার এই রচনাসমূহ আবুল আতাহিয়্যা ও আবূ নুওয়াসের রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত। প্রকাশ থাকে, আল-'আত্তাবী তাহাদের গুণমুগ্ধ ছিলেন (দ্র. আগানী, ৪খ., ৩৯)। আর-রাশীদের প্রশংসায় রচিত তাঁহার একটি স্তুতি কবিতা উল্লেখযোগ্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল (আল-জাহিজের উদ্ধৃতি দ্র., ৩খ., ৩৫৩ ও সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত টীকা)। আল-মারযুবানী ব্যতীত এই কবি ইসলামী মধ্যযুগের লোকদের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আল-আত্তাবী নব্য ক্লাসিক্যাল ধারার প্রারম্ভিক যুগের প্রতিনিধি। এই নব্য ক্লাসিক্যাল ধারা উত্তর সিরিয়ায় শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে আবূ তাম্মাম ও বুহতুরী ইহার প্রতিনিধিত্ব করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১২১, ১২৫, শেষাংশ; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১২৯৯ হি, ১খ., ১৩৯; (৩) আগানী, ১২খ., ২-১০; (৪) ইয়াকূ'ত, ইরশাদ, ৪খ., ২১২-৫, কায়রো সং, ১৭খ., ২৬-৩১; (৫) ইব্ন কুতায়বা শি'র, ৫৪৯-৫১ ও 'উয়ূনুল আখবার, নির্ঘণ্ট; (৬) ইব্ন হা'যম, জামহারাতু'ল-আন্‌সাব, সম্পা. Levi Provencal, পৃ. ২৮৫, ২৮৭; (৭) জাহিজ, আল-বায়ান ওয়াত্-তাবয়ীন, সম্পা. হারূন, নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্ন আব্দ রাব্বিহি, 'ইক'দ, সম্পা. আল-উর্‌য়ান, নির্ঘণ্ট; (৯) আল-মারযুবানী, মু'জামু শু'আরা, সম্পা. Krenkow, ৩৫১-২ ও মুওয়াশ্‌শাহ, কায়রো ১৩৪৩ হি., ২৯৩-৫; (১০) আহমাদ আমীন, দুহাল ইসলাম, কায়রো ১৩৫১ হি., ১৮০; (১১) রিফাঈ, 'আস্'রুল-মামূন, কায়রো ১৩৪০/১৯২৮, ৩খ., ২৪৯-৫৪; (১২) Brockelmann, S.I., 120।

R. Blachere (E.I.[2]) / পারসা বেগম

আল-'আত্'তা'র (العطار) ঃ আস-সায়দালানীর মতে প্রাথমিক অর্থে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ী বা ঔষধ বিক্রেতা। যেহেতু অধিকাংশ সুগন্ধি ('ইত'র, ব.ব. 'উতূ'র) ও ভেষজকে (সাধারণত 'আককার ব.ব. আকাকীর) রোগ নিরাময় গুণের অধিকারী মনে করা হয়, সুতরাং 'আত্'তা'র শব্দটি ঔষধপত্রের বিক্রেতা ও সাধারণ চিকিৎসক অর্থেও ব্যবহৃত, তাঁহার কার্যকলাপ একাধারে বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্পর্কিত। তাঁহাকে বিভিন্ন ঔষধ ও সুগন্ধি, ইহাদের ভাল-মন্দ প্রকারভেদ, এমন কি কোন্‌গুলি নকল সেই সম্পর্কেও অবহিত হইতে হয়। তাঁহাকে অবশ্য জানিতে হইবে, কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্রুত পরিবর্তিত অথবা নষ্ট হয়, কোন্‌গুলি হয় না এবং ঐগুলির রক্ষণাবেক্ষণ অথবা পুনর্গঠনের জন্যে কি কি উপায় রহিয়াছে। অবশেষে তাহাকে গুঁড়া ও মসলার মিশ্রণ প্রক্রিয়া জানিতে হইবে" (আদ-দিমাশকী, কিতাবুল ইশারা ইলা মাহাসিনিত তিজারা, তু. Ritter, in Isl., 7, 59)। বর্তমানে এই শব্দটি রঞ্জনকারী ও রঞ্জন দ্রব্য বণিকদেরকে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়, যদিও সুগন্ধি বণিকেরা 'আত্তারদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বিপুল সম্পদের মালিক। মধ্যযুগের মত উদ্ভিজ্জ আরোগ্যমূলক ঔষধ অর্থাৎ বলিতে গেলে উদ্ভিজ্জ ঔষধের অধিকাংশই এখনও শুষ্ক অবস্থায় বিক্রয় করা হয় (অর্থাৎ শিকড় ও ছোট ছোট করিয়া কাটা কাঠ; ঔষধি পাতা ও ফুল গোটা অথবা চূর্ণিত এবং শুষ্ককৃত শুধু ফল অথবা বীজ)। ধারকগুলি (Containers) সাধারণত বাজারের ঔষধ বিক্রেতা কর্তৃক সরবরাহ করা হইত (নাসি'র-ই খুস্‌রাও, সাফারনামাহ্, সম্পা. Ch. Schefer, Pairs 1881, 53)। ঔষধ প্রস্তুতকারিগণ যে সমস্ত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ব্যবহার এবং যে পদ্ধতিতে উপাদান সংগ্রহ করিত তাহা বিশেষভাবে ডিউসকোরাইডিস (Dioscorides) গ্রন্থের ফারসী পাণ্ডুলিপিতে (Topkapi Saray Ahmed III ২১৪৭, পত্র ২০৪-৪৭৫, ৮৬৭/ ১৪৬৩ সনে লিখিত) অতি জীবন্তভাবে চিত্রিত আছে। ঔষধগুলি সাধারণত অমিশ্রিত আকারে দেওয়া হইত (আদবিয়া মুফরাদা Simpicia)। কিন্তু কখনও কখনও 'আততার রোগীদের সম্মুখেই ঔষধগুলি মিশ্রিত করিত (আদ্‌বিয়া মুরাক্‌কাবা Composita) এবং প্রয়োজনবোধে তৎক্ষণাৎ রোগীকে একমাত্রা ঔষধ দেওয়া হইত। ইহার সহিত H. Buchthal-এর ক্ষুদ্র চিত্রের (miniatures) তুলনা করা যাইতে পারে (The Journal of the Walters Art Gallery 5 (1942), 24-33; Bishr, Fares Le Livre de la Theriaque in Art Islamique, vol. ii, Cairo 1953 plates xi and xii)।

বাজারের ঔষধ প্রস্তুতকারীদের পেশাগত জ্ঞান সাধারণত স্বল্প থাকায় এবং অনুপযোগী পরিবেশে দীর্ঘদিন যাবত গুদামজাত করিয়া রাখিবার ফলে ঔষধগুলি অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইত। ঔষধ প্রস্তুতকারিগণ ওজনের প্রতারণার জন্য এবং হাতুড়ে চিকিৎসক হিসাবে কুখ্যাত ছিল। ব্যবসায়ে অসদুপায় অবলম্বন সম্পর্কে যে সমস্ত বিশেষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে

এবং বাজার পরিদর্শক (মুহ'তাসিব)-এর কর্তব্য সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থ রহিয়াছে সেগুলি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। যথা জাওবারীকৃত কিতাবুল মুখতার ফী কাশ্ফিল আস্রার ওয়া হাতকিল আসতার (৭ম শতক হি., তু. E. Wiedermann, Sitzunges-Borichte der Physikaliche-medizinischen Sozitat in Erlanger, 43, 206-32)। এই সমস্ত গ্রন্থ প্রাচ্যে এখনও বহুলভাবে পঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এম. মেয়ারহফের বিবরণ হইতে জানা যায়, কিভাবে ফরাসী সুগন্ধিতে ভেজাল মিশ্রিত ও গোপনে অনুচিতরূপে বাজারজাত করা হইত এবং প্রাচ্য দেশীয় বোতলে আবদ্ধ করত ইউরোপীয়দের কাছে খাঁটি প্রাচ্য দেশীয় সুগন্ধি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট উন্নত মানের ফরাসী দ্রব্য বলিয়া বিক্রয় হইত। G. C Miles-এর Early Arabic Glass Weights and Stamps (Supplement, New York, 1951, সচিত্র) নামক গ্রন্থে 'আত্তারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ওজন, পরিমাপ ও পাত্র সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যায়। পরিমাপক পাত্রের জন্য তু. F. E. Day-র Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, দ্বিতীয় খ., ২৫৯। মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে ঔষধ প্রস্তুতকারিগণ কিভাবে কাজ করিত Der Bazar der Drogen und Wohlgeruche in Kairo, Archiv fur Wirtschafts forschung im Orient (১৯১৮), ১-৪০, ১৮৫-২১৮ নামক গ্রন্থে এম. মেয়ারহফ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন কালের সুপরিচিত ঔষধ প্রস্তুতকারীদের আস্তানা ছিল আল্-ফুস্তাত-এ (E. J. Worman, JQR ৮খ., ১৯০৬ খৃ., ১৬-১৮)। আল-ফুসতাত ৫৬৩/১১৬৮ সনে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল (ইব্ন দুক্মাকের মতে ইহা মাম্লূকদের আমলে পুনর্বার নির্মিত হইয়াছিল)। জেনিযা (Geniza) হইতে প্রাপ্ত দলীলপত্রাদিতেও এই কথা উল্লিখিত আছে। দামিশ্কের সূকুল ইত্রও উল্লেখযোগ্য (H. Sauvaire, JA, নবম সিরিজ, সপ্তম খণ্ড, ১৮৯৬, ৩৮১, ৪০৪)। E. W. Lane-এর An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, ২খ. নামক বইয়ের নবম পাতার উল্টা দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔষধ প্রস্তুতকারীদের দোকানের একটি চমৎকার চিত্র রহিয়াছে। ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র, মূল বিল (আদেয়ক) ও ঔষধের ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় মূল পাঠ্য প্যাপিরাসের উপর লিপিবদ্ধ আছে। এই বিশেষ ব্যবসাটি যে সুদূরপ্রসারী ছিল তাহা ঐ সময়কার কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নামের পরে আল্-আত্তার শব্দটি উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝা যায় এবং এই ব্যবসা তাহাদের একটি অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসাবে পরিগণিত হইত। সুবিখ্যাত উদাহরণ হইতেছে ফারীদুদ্দীন 'আত্'তার।

একই শব্দ (عطر) ভারতবর্ষে সুরাসারমুক্ত সুগন্ধি তৈলের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চন্দন তৈল ফুলের (উদাহরণস্বরূপ গোলাপ) মাধ্যমে চোলাই করিয়া তৈরি হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল রচনায় উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র. (১) A Dietrich, Zum Drogen-handel im islamischen Agypten (Veroffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung. N. F. no-1), Heidelberg 1954; (২) G. Wiet, Les Marchands depices sous les sultans mamlouks (Cahiers d Histoire Egyptienne), Cairo 1955.

A. Dietrich (E.I.2) / পারসা বেগম

'আত'তা'র, ফারীদুদ্দীন মুহ'াম্মাদ (عطار، فريد الدين محمد) ঃ ইবন ইবরাহীম ফারসী ভাষার মরমী কবি। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। দাওলাত শাহ-এর বর্ণনামতে তিনি ৫১৩/১১১৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধারণভাবে ধারণা হয়, তিনি ৬২৭/১২৩০ সনে মোঙ্গলদের দ্বারা নিশাপুরে নিহত হন। ইহার অর্থ তিনি ১১৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, যাহা অসাধারণ। এতদ্ব্যতীত মোঙ্গলগণ নীশাপুর ৬১৭/১২২০ সনে জয় করিয়াছিল। কোন কোন পাণ্ডুলিপি (যথা ইব্রাহীম এফেন্দী, 'আরবী, ফারসী ও উর্দূ উচ্চারণ আফান্দী, পৃ. ৫৭৯) ব্যতীত অন্যান্য সূত্র (যথা সাঈদ নাফীসী, জুস্তজু, পৃ. ৬০৭) ও তাঁহার কবরের শিলালিপি হইতে প্রকাশ পায়, 'আত্তারের মৃত্যু হইয়াছিল ৫৮৬/১১৯০ সনে অর্থাৎ 'মান্তি'কু'ত-ত'ায়র রচনার তিন বৎসর পরে (আত্তারের মাযার তৈরি করাইয়াছিলেন মীর 'আলী শীর নাওয়াঈ)। সাঈদ নাফীসী 'আত্তারের মৃত্যু তারিখ প্রত্যয়ের সহিত ৬২৭/১২৩০ ধরিয়া লইয়াছেন। তাহার এই মত দুইটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রথমত, 'আত্তারের প্রতি ভুলক্রমে আরোপিত পুস্তক 'মিফ্তাহু'ল ফুতূহ' এবং দ্বিতীয়ত জামী-র এই মর্মে বর্ণিত যে, তিনি জালালুদ-দীন রূমীকে স্বীয় 'আস্রার নামাহ' প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি (রূমী) পিতার সহিত ৬১৮/১২২১ সনে বাল্খ হইতে হিজরত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হিজরত সম্ভবত ৬১৬/১২১৯ সনে ঘটিয়াছিল (Islamica সাময়িক পত্রে, Ritter, ১৯৪২ খৃ., ২৬ সংখ্যা, পৃ. ১১-১১৮)। 'আত্তারের নিজের রচনা হইতে তাঁহার জীবনীর কোন নিশ্চিত তারিখ পাওয়া যায় না। "মাজ'হারুল 'আজাইব" নামক যে পুস্তকটিতে এই বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে অধিকাংশ তথ্য পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে উহা 'আত্তারের প্রতি আরোপিত একটি জাল রচনা। ঘটনাক্রমে মীরযা মুহাম্মাদ কাযবীনী ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক রিটার (H. Ritter) উভয়ে উহা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। 'আত্তার ছিলেন একজন ঔষধ প্রস্তুতকারক ও চিকিৎসক। প্রকৃতপক্ষে তিনি সূফী না হইলেও যৌবন কাল হইতে তাঁহাদের সম্পর্কে বহু কাহিনী শুনিতে শুনিতে তিনি তাঁহাদের অত্যন্ত ভক্ত হইয়া পড়েন। ফলে তাঁহার চরিত্র সমুন্নত হয়।

'আত্তারের রচনাবলীর তালিকা প্রণয়নে এক অভাবনীয় বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় অর্থাৎ তাহার প্রতি আরোপিত গ্রন্থগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এইগুলি বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর প্রেক্ষিতে এত অধিক বিভিন্ন যে, একই ব্যক্তির রচনারূপে উহাদের গ্রহণ করা কঠিন। প্রথম শ্রেণীর বড় বড় গ্রন্থ মান্তি'কু'ত্-ত'ায়র, ইলাহী নামাহ্ ও মুসীবাত নামাহ্; দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ, উশ্তুর নামাহ্ ও জাওহারুয-য'াত এবং তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে মাজহারুল আজাইব ও লিসানুল গায়ব। এতদুপরি এক চতুর্থ

শ্রেণীর রচনা আছে; অভ্যন্তরীণ দলীলের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় সেইগুলি 'আত্তারের রচনা নহে। আসরার নামাহ্ ব্যতীত অন্যান্য মহাকাব্য একটি সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ প্রধান কাহিনী সম্বলিত। উহাতে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট প্রাসংগিক গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। উহাতে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনেরও পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়াছে। এই প্রাসংগিক গল্পগুলি অত্যন্ত শৈল্পিক দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বিষয়ের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এই প্রকার গল্পগুলিই এই শ্রেণীর রচনার প্রধান আকর্ষণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় গল্পের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এইগুলিতে বহির্বিশ্ব ও পার্থিব ঘটনাবলী হইতে মনোযোগ অপসৃত হইয়াছে। কতিপয় সীমিত ধারণা, প্রগাঢ় আগ্রহ ও আবেগের সহিত বর্ণিত প্রসংগগুলি হইল ঃ পরিপূর্ণ 'ফানা', এমনকি উহা দৈহিক মৃত্যুর মাধ্যমে হইলেও; ওয়াহ্ দাতুল উজূদ বা সর্বেশ্বরবাদ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন অস্তিত্বই নাই এবং সর্ববস্তুর মূল একই); স্বীয় সত্তার জ্ঞান (মারিফাত-ই য াত) অর্থাৎ সত্তাই সমস্ত কিছুর মূল, সত্তাই আল্লাহ এবং সত্তাই সমস্ত পয়গাম্বরের সহিত একাত্ম, অভিন্ন সত্তাসম্পন্ন। এমন কিছু লোক রহিয়াছে যাহাদেরকে অন্যরা বারংবার আল্লাহ বলিয়া স্বীকার ও সম্বোধন করিয়াছে। কবির বর্ণনা অতি ব্যাপক ও অবিন্যস্ত এবং উহা ক্লান্তিদায়ক পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে কে কথা বলিতেছে এবং কাহাকে সম্বোধন করা হইতেছে তাহাই বুঝা যায় না। শব্দের পুনরাবৃত্তি সীমাহীন ও অসহ্যকর। কোন কোন সময় পরপর শতাধিক রচনা একই শব্দ দিয়া শুরু করা হইয়াছে। সাঈদ নাফীসীর মতে এই প্রকার রচনা 'আত্তারের প্রতি অন্যায়ভাবে আরোপ করা হইয়াছে। নাফীসী এই রচনা তৃতীয় শ্রেণীর (গ্রন্থগুলির) লেখকের প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

তিনি ছিলেন তূস-এর বাসিন্দা এবং বহুকাল তূসে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকাল অবশ্যই নবম/পঞ্চদশ শতাব্দী। তিনি শী'আ ছিলেন। নাফীসীর মতে লেখকের লিখনশৈলীর এইরূপ পরিবর্তন অসম্ভব। যদিও মুহাম্মাদ কায্বীনী ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক (রিটার) উহাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তর্ক করা যাইতে পারে, লিখনশৈলীর পরিবর্তন ও কল্পনার সীমাবদ্ধতা কোন কবির পক্ষে প্রশ্নাতীত অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহাও বলা যায়, শব্দাবলীর অত্যধিক পুনরাবৃত্তির প্রবণতা প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থেও পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলীতে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে এমন কয়েকটি বিষয়ের সন্ধান প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থেও পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলি 'আত্ তারের অকৃত্রিম রচনা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নাও হইতে পারে, যদিও ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। অন্ততপক্ষে জামী-র সময় অর্থাৎ হি. নবম শতাব্দী পর্যন্ত ঐ রচনাগুলি অকৃত্রিম বলিয়া গণ্য করা হইত। কেননা জামী তাঁহার নাফাহ াতুল-উন্স গ্রন্থে যখন বলিয়াছিলেন, (মান্সূর) হাল্লাজ-এর জ্যোতি দেড় শত বৎসর পরে আত্ তারের সত্তায় প্রতিভাত হইয়াছে, তখন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন মনে করা যায়। কারণ সেইগুলির মধ্যেই হাল্লাজের উল্লেখ বারংবার করা হইয়াছে।

অপরপক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলি নিশ্চিতভাবেই জাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মাজ্ হারুল 'আজাইব গ্রন্থে কবি পাঠকদের পরামর্শ দিতেছেন, হাফিজ (মৃ. ৭৯১ হি.) ও আনওয়ার (মৃ. ৮৩৭ হি.) অধ্যয়ন করুন। তাহা ছাড়া জালালুদ্দীন রূমীর আবির্ভাবেরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় (সা'ঈদ নাফীসী, পৃ. ১৪৬ প.) আমার (Ritter) নিকট দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রচনার মধ্যে বিষয়বস্তু ও শৈলীর প্রেক্ষিতে এত অধিক পার্থক্য প্রকট যে, (সাঈদ নাফীসীর মতের বিরোধিতা করিয়া) আমি বলিতে বাধ্য, উভয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলি একই লেখকের নহে। উক্ত গ্রন্থগুলির সম্ভাব্য রচনা তারিখের জন্য (গ্রন্থে প্রদত্ত বরাতের ভিত্তিতে) দেখুন বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ ফিলোলজিকা (Philologica) ২৫, [১৯৩৯ খৃ.] ১৪৪-১৫৬। মাজহারুল 'আজাইব গ্রন্থের বর্ণনামতে ও আত্তার সম্পর্কে (তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ) আমার নিজস্ব প্রবন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা এখন বাতিল করা হইয়াছে। (প্রকাশ থাকে যে, 'মাজহারুল-আজাইব'-এর লেখক ধৃষ্টতার সহিত 'আত্তারের সমস্ত অকৃত্রিম ও প্রসিদ্ধ রচনাকেই নিজস্ব বলিয়া দাবি করিয়াছেন। বলাবাহুল্য এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন)।

এখন রচনাগুলি পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম শ্রেণীঃ (১) দীওয়ানঃ প্রেমের কবিতা ব্যতীত ইহাতে রহিয়াছে এমন ধর্মীয় চিন্তাধারা, যাহা মহাকাব্য (মাছনাবী)-গুলির বিষয়বস্তু। এই দীওয়ান তেহরানে মুদ্রিত হইয়াছে, তবে ইহা সমালোচনা সমৃদ্ধ সংস্করণ নহে। (২) মুখ্তার নামাহ্, রুবাইয়্যাত-এর পূর্ণ সংকলন, বিষয়বস্তু অনুসারে বিন্যস্ত। ইহার সহিত একটি ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা রহিয়াছে, যাহাতে এই গ্রন্থের উৎপত্তি ব্যতীত ইহাও বর্ণিত যে, গ্রন্থটি দীওয়ানেরই অংশ ছিল এবং জাওয়াহির নামাহ্ ও শারহুল কাল্ব নামক দুইটি পুস্তকের বিনষ্ট হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে (Ritter, Philologica X, 152-155)। ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মুদ্রিত, তেহরান ১৩৫৩ হি.। (৩) মান্তিকুত-তায়র (মাকামাতুত্-তুয়ূর) ঃ মুহাম্মাদ বা আহ্মাদ গাযালীর রিসালাতুত্-তায়র পুস্তিকার চটকদার কাব্যিক সম্প্রসারণ। আধ্যাত্মিক সাধনায় মান্যিলসমূহ ঃ ত'লাব (যাচনা), প্রেম, মা'রিফাত (পরিচয়), আকাঙ্ক্ষাহীনতা, তাওহীদ, হায়রাত (বিভ্রম), দৈন্য ও ফানা (বিলুপ্তি) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার জন্য পাখিদের একটি কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে (শীরানী, পৃ.৩৮৬)। পাখীরা হুদ্হুদ্-এর নেতৃত্বে সীমুরগ-এর সন্ধানে বাহির হয় যাহাকে তাহারা নিজেদের বাদশাহ মনোনীত করিয়াছে। পথে তাহাদেরকে সাতটি সংকটময় উপত্যকা (হাফ্ত ওয়াদী) অতিক্রম করিতে হয়। ইহাতে ত্রিশটি ব্যতীত অন্য সমস্ত পাখী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই অংশটিকে একটি পৃথক রচনার রূপ দেওয়া হইয়াছে)। অবশেষে জীবিত ত্রিশটি পাখি উপলব্ধি করে, তাহারা নিজেরাই সীমুরগ (উপাস্য) (সী-ত্রিশ,+মুরগ-পাখী ত্রিশ=পাখী)-------ঃ অবশেষে ফানা (বিলুপ্ত হইয়া আল্লাহরূপী সীমুরগ-এ বিলীন হইয়া সত্তা হারায়।

চিরতরে তাহারা হইল বিলীন, রবি মাঝে ছায়া যথা। পুস্তকটির একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ Garcin de Tassy কর্তৃক প্রকাশিত হয়, Parise 1857; Mantic Uttair ou le langage des oiseaux --- par Farid -Uddin Attar; Traduction Francais and La Poesie Philosophique et religieuse chez les persans d'a pres le Mantic Uttair, on langage

des Oiseasux de Farid-uddin Attar 3rd Edition, Paris 1860 A.C.; Baron E. Hermelin-কৃত অনুবাদের জন্য দ্র. Jan Rypka, in Archiv Orientalni, 4, 1932, A.C. 149-160. পুস্তকটির সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ Cooper and Cooper কর্তৃক বোম্বাইতে ১৩১৩ হি. প্রকাশিত হইয়াছে। 'মান্তিকুত্ তায়র-এর অন্যান্য সংস্করণ ও সাধারণভাবে আত্'তারের রচনা সম্পর্কে দ্র. E. Edwards, A Catalogue of the Persian Printed books in The British Museum, London 1912; A. J. Arberry. A Catalogue of the Library of the India Office, vol. II, Part iv, Persian Books এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য তালিকা। শেমৃঈ ১০০৫/ ১৫৯৬-১৫৯৭ সনে ইহার একটি ভাষ্য তুর্কী ভাষায় লিখিয়াছিলেন (জারুল্লাহ্-এর পাণ্ডুলিপি নং ১৭১৬)। তুর্কী ভাষায় অনুবাদ ও সমালোচনা ইত্যাদির জন্য তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষে বর্তমান লেখকের 'আত্'তার প্রবন্ধ দেখুন।

(৪) মুস'ীবাত নামাহ্ ঃ এক সূফী শিষ্য (সালিক)-কে তাহার সহায়তা ও নৈরাশ্যের পর্যায়ে মুর্শিদ পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন একের পর এক পৌরাণিক জগত ও নিখিল বিশ্বের সমস্ত সত্তার সহিত সাক্ষাত করেন ঃ ফেরেশ্তা, 'আরশ (Throne), লাওহ' মাহ্'ফূজ' (সংরক্ষিত ফলক), কলম, জান্নাত ও জাহান্নাম, সূর্য, চন্দ্র চারটি মৌল উপাদান (عناصر اربعة) ঃ আব(পানি), আতিশ (অগ্নি), খাক (মাটি), বাদ (বায়ু), পর্বত, সমুদ্র; প্রাকৃতিক তিন জগত ঃ জড় উদ্ভিদ প্রাণী, ইবলীস, আত্মাসমূহ (আর্ওয়াহ) আম্বিয়া,; পঞ্চেন্দ্রিয় ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, (সুখের) কল্পনা, মন, হৃদয় ও আত্মা (সত্তা)। অবশেষে আত্মার সমুদ্রে অর্থাৎ স্বীয় সত্তার মধ্যেই আল্লাহর সন্ধান পায়। সম্ভবত এই কাব্যটি 'হ'াদীছু শ-শাফা'আ (বুখারী, ৪খ., ৪৮২) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রচিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ ও তেহরানে ১২৯৮ হি. মুদ্রিত।

(৫) ইলাহী নামাহ্ ঃ এক বাদশাহ তাঁহার ছয় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের মধ্যে কোন্ জিনিসটি তাহারা পাইতে চায়? তাহারা পর্যায়ক্রমে পরীরাজের কন্যা, জাম্শীদের (ঐন্দ্রজালিক) পেয়ালা (জাম), আব-ই হ'ায়াত, সুলায়মানের আংটি ও অমৃতসুধা কামনা করে। তাহাদের পিতা পার্থিব বাসনা পরিহার করত উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে তাহাদেরকে অনুপ্রাণিত করিতে প্রয়াস পান (রিটার সম্পাদিত সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ও লাইপযিগ ১৯৪০ খৃ., Biblotheca Islamica, ১২খ., একটি তুর্কী তরজমা সম্পর্কে দেখুন লেখকের 'আত্'তার প্রবন্ধ, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ)।

(৬) আস্রার নামাহ্ ঃ এই গ্রন্থে কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী নাই, বরং বারংবার সূফীদের প্রিয় এই ধারণারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যে, যেই মানবাত্মা অনাদি কাল (আযল) হইতে বিদ্যমান ছিল তাহাকে এই স্থূল পৃথিবীতে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কথিত আছে, এই গ্রন্থের একটি অনুলিপি 'আত্'তার তরুণ জালালুদ্দীন রূমীকে প্রদান করিয়াছেন। তেহরানে মুদ্রিত ১২৯৮/১৮৮০-৮১। ৩নং হইতে ৬নং গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যান্য মন্তব্য ও তথ্যের জন্য তু. H. Ritter, Das Meer der seele, Mensch, Gott. und Welt in den Geschichten des Fariduddin 'Attar (Leiden 1955)। শীরানী (পৃ. ৪০২) 'আত্'তারের প্রতি আরোপিত দুইটি আস্রার নামাহ্-র উল্লেখ করিয়াছেনঃ একটি হাযাজ ছন্দের ষষ্ঠপদী এবং অপরটি রামাল ছন্দের ষষ্ঠপদী।

(৭) খুস্রাও নামাহ্ ঃ প্রেম, ভালবাসা ও ভাগ্য পরীক্ষার এক কাহিনী। ইহাতে বর্ণিত আছে, তুর্কী সম্রাটের পুত্র খুস্রাও ও খুযিস্তানের রাজকুমারী গুলরুখের পরস্পরকে ভালবাসার দরুন উভয়কে, বিশেষত একনিষ্ঠ প্রেমিকা গুলরুখকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। রাজকুমারীর বহু পাণিপ্রার্থী তাঁহাকে বিশেষ বিব্রত করিয়াছিল। কাহিনীর সংক্ষিপ্তসারের জন্য দ্র. Philologika X, Islamica XXV, 160-173। ১২৯৫/১৮৭৮ সনে লক্ষ্ণৌ-এ প্রকাশিত।

(৮) পান্দ নামাহ্ ঃ ইহা আদব-কায়দা সম্পর্কীয় একটি জনপ্রিয় পুস্তিকা। একমাত্র তুরস্কেই কমপক্ষে ইহার আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (হি. ১২৫১, ১২৫৩, ১২৫৭, ১২৬০, ১২৬৭, ১২৯১)। অন্যান্য সংস্করণের জন্য দ্র. সা'ঈদ নাফীসী, পৃ. ১০৯-১১০ প. ও উপরে ১২৫২, উল্লিখিত তালিকাসমূহ। অনেক ভাষায় ইহার তরজমা হইয়াছে (তু. Geiger-Kuhn. Grundriss der Iranischen Philologie, ii, 603; সা'ঈদ নাফীসী, পৃ. ১০৮-১১০)। ১৮০৯ খৃ. J. H. Hindley ইহা লন্ডনে প্রকাশ করেন; তৎপর de Sacy ফরাসী তরজমাসহ ১৮১৯ খৃ. প্যারিস হইতে। Baron Erik Hermelin-কৃত সুইডিশ ভাষায় অনুবাদের জন্য দ্র. Jan Rypka in archiv Orientalni, iv, 1932, 148 প.; তুর্কী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন Emri (মৃ. ৯৮৮/১৫৮০)৯৬৪/১৫৫৭ সনে)। তুরস্কে ফারসী পাঠসহ বহুবার মুদ্রিত হয় (হি. ১২২৯, ১২৬৬, ১২৮০, ১২৮২)। তুর্কী ভাষ্যসমূহঃ শেমৃঈ (মৃ. ১০০৯/১৬০০-১), সা'আদাত নামাহ্; শু'উরী (মৃ. ১১০৫/১৬৯৩-৪) ভাষ্যকারের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি (১০৮৩ হি.) ইস্তাম্বুলের দারুল্-মাছ্নাবী, ১৮৫ নং; 'আব্দী পাশা (মৃ.১১১৩/১৭০১-২), মুফীদ, বুরসালী ইসমাঈল হাক্কী (মৃ. ১১৩৭/১৭২৪-২৫) অত্যন্ত বিষদ ভাষ্য, ইস্তাম্বুল ১২৫০ হি., মুহাম্মাদ মুরাদ (মৃ. ১২৬৪/১৮৪৯), মাহাদার, ইস্তাম্বুল ১২৫২, ১২৬০ হি.।

(৯) তায্কিরাতুল আওলিয়া ঃ মুসলিম সূফীগণের জীবনী ও বাণীসম্বলিত একটি বিরাট গ্রন্থ। ইহার শেষ জীবনীটি (মানসূর) হাল্লাজ সম্পর্কে। 'আত্'তারের দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলীতে হাল্লাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে বিশটিরও অধিক অন্যান্য জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। এই সমস্ত জীবনী এবং কাব্যেও মূল উৎস হইতে প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে তিনি ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছেন ও স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে উহার যথেষ্ট পরিবর্তনও সাধন করিয়াছেন। তুর্কী ভাষায় এই সম্পর্কে যে বহু সংখ্যক তরজমা ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার জন্য দ্র. তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, 'আত্'তার নিবন্ধ; সাঈদ নাফীসী, 'তানক'ীদ শি'রিল 'আজাম, পৃ. ১১০-১২। আর. এ. নিকলসন, সম্পাদিত, The Tadhkiratul-Awliya of Shaykh Faridud-Din Attar, লন্ডন ও লাইডেন ১৯০৫-১৯০৭ খৃ.,

Persian Historical Texts সংখ্যা ৩ ও ৫-এর মূল পাঠ সর্বক্ষেত্রে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য নহে। অন্যান্য সংস্করণের বিবরণ সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১১২ এবং উপরে উল্লিখিত তালিকাসমূহে বিদ্যমান।

(১০) বুলবুল নামাহ্ ঃ পাখি জাতি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট বুলবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, সে পুষ্পরাজির সামনে যে গান করে তাহাতে তাহারা উদ্বিগ্ন। বুলবুলকে কৈফিয়ত দিবার জন্য তলব করা হয়। অবশেষে হযরত সুলায়মান হুকুম দেন, বুলবুলের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না। সাঈদ নাফীসীর মতে ভুলক্রমে গ্রন্থটি 'আত্তারের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে (পৃ. ১০৬ পৃ.)। তেহরানে প্রকাশিত, ১৩১২ হি.।

(১১) মি'রাজ নামাহ্ ঃ সম্ভবত ইহা অন্য কোন কাব্যের স্তুতি (না'ত) অংশের উদ্ধৃতি। রিটার বলেন, উহার একক পাণ্ডুলিপি যাহা তিনি দেখিয়াছেন, মাত্র দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

(১২) জুমজুমা নামাহ্ ঃ একটি ক্ষুদ্র কাহিনী। 'আত্‌ত'ারের কোন কাব্য হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। হযরত 'ঈসা (আ) মরুমাঠে একটি করোটিকে জীবন দান করেন। সেই মৃত ব্যক্তি তাঁহার সময়ের এক বড় বাদশাহ ছিলেন। তিনি তখন হযরত 'ঈসা (আ)-কে কবর ও জাহান্নাম-এর শাস্তির বিশদ বিবরণ দেন। তৎপর তিনি সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার মৃত্যুনিদ্রায় শায়িত হন। এই পুস্তিকাটির তুর্কী সংস্করণসমূহের জন্য দেখুন তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, 'আত্‌ত'ার' প্রবন্ধ।

'আত্‌ত'ারের উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিঃ

(১৩) উশতুর (শুতর) নামাহ্ ঃ এই গ্রন্থের প্রথমাংশের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন তুর্কী পুতুল নাচ প্রদর্শক, যাহাকে আল্লাহ্র রহস্যময় প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার মঞ্চের উপর রহিয়াছে সাতটি পর্দা এবং তাহার সাতজন সহকারী। সে তাহার স্বনির্মিত পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পর্দাগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। সে স্বীয় সহকারীদেরকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে। কিন্তু নিজে তথা হইতে সরিয়া পড়ে যাহাতে তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হয়। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে তাহার এইসব কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরস্বরূপ সে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে পর্দাগুলির সম্মুখে প্রেরণ করে। তথায় বিস্ময়কর এক ঘটনাপরম্পরা তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। উহার অর্থ একমাত্র আধ্যাত্মিক পদ্ধতিতেই বোধগম্য হইতে পারে। কোন পরিষ্কার তথ্য প্রদান না করিয়াই এক মুর্শিদ তাহাকে সম্মুখের দিকে পাঠাইতে থাকে। সপ্তম পর্দার নিকট পৌঁছিলে তাহাকে হুকুম দেওয়া হয়, যে কোন কবর হইতে একটি লিপি বাহির করিয়া আনা হউক যাহা এক টুকরা রেশমী কাপড়ে সবুজ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই লিপিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তা, সরল পথ, সৃষ্টি ও হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কতিপয় বিষয় উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিবার একমাত্র পন্থা হিসাবে বারংবার ঘোষণা করা হয়। এই সম্পর্কে এক উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ (মান্‌সূর) হাল্লাজের নাম উল্লেখ করা হয়। এক পর্দা হইতে অপর পর্দা পর্যন্ত নিষ্ফল গমনাগমন শিষ্য-সাধককে সেই যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যাহা মুসীবাত নামাহ্-তে উল্লিখিত শিষ্যকে 'সম্ভাবনার বিশ্বে' সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় অংশের প্রায় সম্পূর্ণটাই হাল্লাজের আলোচনায় পূর্ণ। ফাঁসিকাষ্ঠে চড়িয়া তিনি জুনায়দ, শায়খ কাবীর, আবূ 'আব্‌দিল্লাহ (ইব্‌নুল খাফীফ), বায়াযীদ ও শিবলীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন এবং বলেন ঃ

আমি প্রভু, আমিই প্রভু, আমিই তিনি
বীতরাগ আমি, কুফরী, ঈমান ও আশা হইতে

তিনি সর্বেশ্বরবাদ শিক্ষা দেন। বিরাট দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও উশ্‌তুর নামাহ্ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মনোজ্ঞ। ইহা আরও গভীরভাবে অধ্যয়নের দাবিদার। ইহা 'রামাল' ছন্দে রচিত।

(১৪) জাওহারু'য্ (জাওয়াহিরুয)-য'াত ঃ এই কাব্যটি 'উশতুর নামাহ-র পরে রচিত। কারণ ইহাতে উশ্‌তুর নামাহ্ ও মুসীবাত নামাহ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থেও হাল্লাজকে 'ফানা ফীল্লাহ' (আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়া) ও আনাল-হ'াক'ক্-এর মূর্ত চিত্ররূপে বারংবার উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অন্যান্য উপাখ্যানের সহিত ইহার একটি কাহিনীতে দেখা যায়, হযরত 'আলী (রা) একটি হাওযের মধ্যে আল্লাহ্র (মারিফাত-এর) গোপন রহস্য চুপি চুপি বলিতেছেন (কুল্লিয়াত-ই ফারীদুদ্দীন 'আত্‌ত'ার, জাওয়াহিরুয-য'াত, লক্ষ্ণৌ ১৮৭২ খৃ., ১খ., ১৩৩)। এই গোপন রহস্যগুলি পরে এক বংশদণ্ড ফাঁস করিয়া দেয়, যাহা উক্ত হাওযে উদ্‌গত হইয়াছিল এবং উহা কাটিয়া বংশীতে পরিণত করা হইয়াছিল। মাওলানা রূমীর মাছনাবীর প্রথম আঠার শ্লোকের সহিত ইহার সম্পর্ক স্পষ্ট। আমার (রিটার) অনুমান, এই কাহিনীই নিজামীর মাধ্যমে পরিবেশিত মিদাস (Midas)-এর 'গর্দভ-কর্ণের কাহিনী' যাহা দ্বারা মাওলানা রূমী প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সাঈদ নাফীসী (পৃ. ১১৪)-র মতে গ্রন্থটি পরবর্তী কালের একটি জাল রচনা এবং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত (H. Ritter, Das Prooemium des Mathnawi-i-Mawlawi, in ZDMG, পৃ. ৯৩, ১৬৯-১৯৬; শীরানী, পৃ. ৪৭১-৫০৫)। এই কাব্যে সেই তরুণের কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত যে স্বীয় পিতার সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। সে নিজেকে আল্লাহ্ মনে করিয়াছিল। নিজের সত্তাকে আল্লাহ্র সত্তায় পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশে সে সমুদ্রে (in Z DMG, পৃ. ৯৩, ১৬৯-১৯৬; শীরানী পৃ. ৪৭১-৫০৫) ঝাঁপাইয়া পড়ে। একজন সহযাত্রীও সেই তরুণকে আল্লাহ্ মনে করিয়াছিল। এক ব্যক্তি দ্বারা অপর কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌রূপে স্বীকৃতি দান বিষয়টি 'আত্‌ত'ারের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায় (দ্র. কুল্লিয়াত, লক্ষ্ণৌ ১৮৭২ খৃ., পৃ. ৫২ প.)। গ্রন্থটি তেহরানে ১৩১৫/১৯৩৫ সনে প্রকাশিত এবং লক্ষ্ণৌতে প্রকাশিত কুল্লিয়াত-এর অন্তর্ভুক্ত।

(১৫) হায়লাজ নামাহ্ ঃ উশতুর নামাহ্-র দ্বিতীয়াংশের একটি অক্ষম অনুকরণ, হাযাজ ছন্দে, লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত, তেহরান ১২৫৩ হি., লক্ষ্ণৌতে মুদ্রিত কুল্লিয়াত-এ 'মায়ালাজ' (শীরানীর কথায় হায়লাজ নামাহ্) নামে অন্তর্ভুক্ত। এই কাব্য সম্বন্ধে দ্র. শীরানী, পৃ. ৪৭১ প.।

(১৬) মান্‌সূর নামাহ ঃ ইহা রামাল ছন্দে একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী। ইহার প্রারম্ভ 'বূদ মান্‌সূর আয় 'আজাব শূরীদা হাল' এই চরণ দ্বারা (অর্থাৎ মান্‌সূর

ছিল বিভ্রান্ত অবস্থায়, কী আশ্চর্য!)। ইহাতে হাল্লাজের শাহাদাত বরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে (শীরানী, পৃ. ৪১৯)।

(১৭) বে-সার নামাহ্ ঃ একটি ক্ষুদ্র কাব্য যাহার কেন্দ্রীয় ভাব 'নিজেকে আল্লাহ্ ঘোষণা করা' (মান্ খুদায়াম মান খুদায়াম, মান খুদা) এবং আত্মাহুতি দান করিয়া 'ফানা'র মর্যাদা অর্জন করা। ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যান্য কাব্য হইতে উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু উশ্তুর নামাহ্-র দ্বিতীয়াংশের সহিত সম্পর্কিত, লিথো পদ্ধতিতে তেহরানে মুদ্রিত, ১৩১৯ হি. এবং লক্ষ্ণৌতে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে।

রচনাবলীর তৃতীয় শ্রেণী (এই কাব্যগুলি নিঃসন্দেহে অন্য কাহারও রচনা) ঃ

(১৮) মাজ্হারুল আজাইব ঃ হযরত আলী (রা)-এর সম্মানসূচক উপাধি। এই গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহার স্তুতি ও স্তব গান। ইহাতে তাঁহাকে 'মারদ-ই ইলাহী' (আল্লাহ্র মানব), আল্লাহ্র রহস্যসমূহের ধারক, সমগ্র সৃষ্টির বাদশাহ ও আম্বিয়া (আ) ও ফেরেশতাদিগের (আ) নেতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে তাঁহার সম্পর্কে কিংবদন্তী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা 'আত্ তারের রচনাগুলিকে নিজের রচনা বলিয়া দাবি করেন এবং স্বীয় জীবনী ইহাতে বিশদভাবে লিখিয়াছেন। উহাতে নাজমুদ্দীন কুবরার সহিত সাক্ষাতের উল্লেখও রহিয়াছে; লিথো পদ্ধতিতে তেহরানে মুদ্রিত, ১৩২৩ হি. (সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১২৬ প.; শীরানী, পৃ. ৪৩০-৪৭১)।

(১৯) লিসানুল গা'য়বঃ একই কবির অন্য একটি গ্রন্থ, শীঈ মতবাদের প্রেক্ষিতে লিখিত। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে হযরত আবু বাকর (রা) ও হযরত 'উছমান (রা)-কে অস্বীকার করা হয় (দ্র. সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১২২ প.)। উভয় গ্রন্থ সাহিত্য হিসাবে নিকৃষ্ট মানের।

চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাবলী ঃ অভ্যন্তরীণ দলীল দ্বারা অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত, এইগুলি 'আত্ তারের রচনা নহে, বরং ভুলক্রমে তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে।

(২০) খায়্যাত নামাহ্ ঃ ইহার বিষয়বস্তু ও সূচীর জন্য দেখুন, E. Berthels, Fariduddin Attar's Khayyat-Nama, in Bull, de I.Ac. des Sc. de L'URSS, Clase des Humanites, ১৯২৯, পৃ. ২০১-২১৪। হাজ্জী খালীফা এই পুস্তকটি খায়্যাত কাশানী নামক এক ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিয়াছেন। Berthels ইহাকে আসল বলিয়া মনে করেন (দ্র. শীরানী, পৃ. ৪২৭)।

(২১) ওয়াস্লাত নামাহঃ রচয়িতা বাহ্লূল নামক এক কবি (দ্র. সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১৩১-১৩২)।

(২২) কানযুল আসরার (কানযুল-বাহ্র তারজামাতুল-আহ'দীছ) সংকলিত ৬৯৯/১২৯৯-১৩০০, Philologika x, পৃ. ১৫৭ (দ্র. সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১২০; শীরানী, তান্ক'ীদ শি'রিল-'আজাম, পৃ. ৪১৮)। ইহার কবির নাম তুরবাতী এবং রচনাকাল ৭৯৯ হি. বলিয়াছেন।

(২৩) মিফ্তাহু'ল ফুতূহ ঃ রচনাকাল ৬৮৮/১২৮৯-১২৯০। অন্যান্য পাণ্ডুলিপি অনুসারে ৫৮৭/১১৯১-১১৯২। লেখক যান্জান-এর কোন এক ব্যক্তি, Philologika X, পৃ. ১৫৭ (দ্র. সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১২৭-১২৮; শীরানী, পৃ. ৪০৭)।

(২৪) ওয়াসি'য়্যাত নামাহ্ ঃ রচনাকাল ৮৫০/১৪৪৬-১৪৪৭/- Philologika X, পৃ. ১৫৮ (কপূরতলার পাণ্ডুলিপি মতে তারিখ ৮৫২ হি., তানক'ীদ শি'রিল 'আজাম, পৃ. ৪৩০।)

(২৫) কানযুল হ'কা'ইক'-নেকগাযী নামক এক শাহযাদার স্তুতি সম্বলিত। নামটি সম্ভবত অপভ্রংশ (দ্র. সাঈদ নাফীসী, পৃ. ১২১; Ritter, Philologika X, পৃ. ১৫৮)। এই কাব্য সম্বন্ধে দ্র. শীরানী, পৃ. ৪০৪ প.। অন্য কপি হইতে মনে হয়, এই কাব্যটি পাহ্লাওয়ান মাহমূদ খাওয়ারিয্মীর রচনা। ভুলক্রমে আরোপিত আরও চারটি রচনা সম্পর্কে দ্র. ঐ, পৃ. ১৫৪।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দেখুন ঃ (১) হাফিজ মাহমূদ শীরানী, তান্ক'ীদ শিরিল 'আজাম, দিল্লী ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৩৫৩-৫০৫; (২) মীর্যা মুহাম্মাদ ক'াযবীনী, সম্পা. E.G. Brown, তায্কিরাতুল আওলিয়া; (৩) H. Ritter, Philologika X, Isl. 25, 1939A.c, 124-173; (৪) ঐ লেখক, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ। (তিনটি প্রবন্ধেই) মাজহারুল আজাইবকে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং জীবনীমূলক তথ্যের উৎসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; (৫) সাঈদ নাফীসী, জুস্তজু দার আহ'ওয়াল ওয়া আছার ফারীদুদ্দীন 'আত্তার নীশাপুরী, তেহরান ১৩২০; (৬) কুল্লিয়াত 'আত্ তার, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কপি, ৮৭৫ হি. লিখিত। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের ইতিহাস ও পাণ্ডুলিপি তালিকা দেখা যাইতে পারে।

H. Ritter (E.I.[2]) (দা. মা. ই.) / আবদুল হক ফরীদি

আল-আত্ তার, হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদ (العطار، حسن بن محمد) ঃ মিসরীয় 'আলিম, যাহার পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান মাগরিব (মরক্কো), কায়রোতে ১১৮০/ ১৭৬৬ সালের পরে তাঁহার জন্ম। তিনি আল-আয্হার-এ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কতিপয় এমন 'আলিমের অন্যতম যাহারা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Bonaparte) কর্তৃক মিসর দখলকৃত হওয়ার পরে ফরাসী পণ্ডিতদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন শিক্ষাদীক্ষায় সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া ও তুরস্কে অনেক বৎসর অতিবাহিত করেন। মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মুহাম্মাদ আলী পাশা কর্তৃক ১২৪৪/১৮২৮ সালে স্থাপিত সরকারি সাময়িক পত্রিকা (আল-ওয়াক'া'ইল মিসরিয়্যা)-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১২৪৫/১৮৩০ সালে তিনি মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক শায়খুল আয্হার হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত হন। তাঁহার কর্মসূচীর সহিত মুহাম্মাদ 'আলী সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া মনে করা হইত। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ১২৫০/১৮৩৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। সম্ভবত তিনি রিফা'আ রাফি' আত-তাহ্তাবী (দ্র.)-র শিক্ষক হিসাবে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিঠি ও রচনা লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে পুস্তিকা (ইন্শাউল 'আত্তার) বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বারংবার কায়রো ও ভারতে মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতুল জাদীদা, ৪খ., ৩৮-৪০, (২) ফিলিপ তাররাযী, তারীখুস-স'াহ'াফাতু 'আরাবিয়্যা, ১খ.,

বৈরূত ১৯১৩, ১২৮-৩০; (৩) Brockelmann, II, 473; S II, 720; (৪) E.W Lane, Modern Egyptins, ৯ম আধ্যায়; (৫) G. Heyworth Dunne, Hist. of Education in Modern Egypt, লন্ডন ১৯৪০, ১৫৪, ২৬৫, ৩৯৭; (৬) সুলায়মান রাশাদ, কান্‌যুল জাওহার ফী তারীখিল আযহার, কায়রো ১৩২০, পৃ. ১৩৮-৪১।

H. A. R. Gibb. (E.I.2) / ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

'আত·ফ (عطف) ঃ অর্থ সংযোগ, সম্পর্ক; আরবী ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ, যাহা পূর্ববর্তী শব্দ বা বাক্যের সহিত সংযোগ সাধন বুঝায়। দুই প্রকারের 'আত·ফ হইতে পারে। যথা 'আত্·ফুন-নাসাক' বা সঠিক 'আত·ফ ও 'আত্·ফু'ল-বায়ান।

১। সাধারণ সমন্বয়কারী সংযোগ ('আত্·ফুন-নাসাক) বলিতে 'আত্ফের দশটি হরফের যে কোনটি দ্বারা পূর্ববর্তী শব্দ বা বাক্যের সহিত কোন শব্দের বা বাক্যের সংযোগ সাধন বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ قام زيد وعمرو 'যায়দ ও আমর দাঁড়াইয়াছিল'। শব্দ সংযোজনের ক্ষেত্রে এই হরফসমূহ (আল-'আওয়াতি·ফ বা হু·রূফুল-'আত্·ফ)-এর শক্তির মাত্রা অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়। যথা ওয়া (و) সাধারণ সমন্বয়মূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (লিল-জাম') ব্যবহৃত হয়; ফা (ف) ছু·মমা (ثم) ও হ·াত্তা (حتى) ক্রমনিয়ন্ত্রণ ও অধীনতার সম্পর্ক (লিত্-তারতীব) প্রকাশ করে; আও (أو), ইম্মা (أما) অথবা আম্ (أم) দুইটি উল্লিখিত শব্দের যে কোন একটিকে ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করা (লি-তা'লীকিল্-হু·কম বিআহ·াদিল-মায্·কুরায়ন) বুঝায় এবং লা (لا), বাল (بل) অথবা লাকিন্ (لكن) পূর্বোক্ত শব্দ হইতে বিপরীত সম্পর্ক (লিল-খিলাফ) প্রকাশ করে। 'আত·ফ শব্দ (মুফ্রাদ 'আলা মুফ্রাদ) ও বাক্য (জুমলা 'আলা জুমলা) উভয়ই সংযুক্ত হইতে পারে। ইব্ন ইয়া'ঈশ-এর মতে নাসাক হইল কূফার ও 'আত্ফ বসরার পারিভাষিক শব্দ।

২। বর্ণনামূলক সংযোগ ('আত্·ফুল-বায়ান) এমন শব্দ বা শব্দসমষ্টি যাহা পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ হয় না কিংবা বাদাল (بدل) হয় না; তবে উহার বর্ণনা দান করে মুদিহ· লিমাত্·বূ'ইহি। যথা (جاء اخوك زيد) তোমার ভাই যায়দ আসিয়াছে। অথবা আক্·সামা বিল্লাহ আবূ হ·াফস· 'উমার (اقسم بالله ابو حفص عمر) হাফ্সের পিতা উমার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়াছে। এই পরিপেক্ষিতে 'আত্·ফুল বায়ান ওয়া হুওয়া (وهو)—এর অর্থ প্রকাশ করে, যেমন পূর্ববর্তী উদাহরণটিতে جاء اخوك زيد অর্থাৎ جاء اخوك وهو زيد।

উভয় প্রকার 'আত্'ফেই দ্বিতীয় শব্দটিকে আল-মাতূ·ফ (المعطوف) ও পূর্ববর্তী শব্দটিকে আল-মা'তূ·ফ 'আলায়হি (المعطوف عليه) বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. 'আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহ, বিশেষত যামাখশারী, মুফাস্সাল, পৃ. ৫০, ৫১, ১৪০, ১৪২; (২) Dict .of Techn ,Terms 1007-10।

G.Weil (E.I.2) / মু. আবদুল মান্নান

আত্·ফিয়াশ (اطفياش) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সালিহ, উপাধি কুত·বুল-আইম্মা, একজন ইবাদী আলিম এবং মযাব (Mzab)-এর বেনী ইস্গুয়েন (আরবী রূপ ঃ বানূ ইয়াসজান)-এর একজন গ্রন্থকার। তিনি ১৩২২/ ১৯১৪ সালে ৯৪ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি এক আলিম খান্দানের বংশধর ছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যাপক সাহিত্য সাধনা দ্বারা (যাহার সঠিক নিরূপণ Brockelmann কর্তৃক তাঁহার পরিশিষ্ট, ২খ., ৮৯৩-এর উল্লিখিত কয়েকখানা গ্রন্থ দ্বারা সম্ভব নয়) প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম আফ্রিকা (আল-মাগ্‌রিব)-এর ইবাদী ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় নবজীবন দান করেন। এই নব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ইবাদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ও সামাজিক জীবনে অধিক পরিমাণে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুপ্রবেশ করিতে লাগিল। মযাব-এর নারীদের দৃষ্টিতে ইহার প্রত্যক্ষ ফলাফলের একটি আলেখ্য A. M. Goichon (REI,1930, 231 প.) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচ্য দেশসমূহে তাঁহার স্বধর্মীয় অধিবাসীদের সহিত শায়খ আত·ফিয়াশ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এখানকার আর একজন বড় ইবাদী 'আলিম 'আবদুল্লাহ ইব্ন হু·মায়্যিদ আস-সালিমী (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ., ৮২৩) তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। স্বীয় ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়া তিনি ইবাদীদেরকে সাধারণ মুসলমানদের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানের আসনে সমাসীন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে সুলতান দ্বিতীয় 'আবদুল হামীদ (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার যোগাযোগ হয়। বর্তমানে মযাবের বিশিষ্ট ইবাদী আলিমগণ তাঁহারই শিষ্য। তাঁহার গ্রন্থাগার হস্তলিখিত, মুদ্রিত ও লিথোকৃত ইবাদী ও অন্যান্য গ্রন্থরাজির এক অদ্বিতীয় সংগ্রহ, বর্তমানে বেনী ইস্গুয়েন-এ একটি ওয়াক্ফকৃত প্রতিষ্ঠান। এই গ্রন্থাগারে তাঁহার হস্তলিখিত অনেক গ্রন্থও রহিয়াছে।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থ হইল কুরআন মাজীদ-এর তাফসীর ঃ (১) হিম্‌য়ানুয-যাদ ইলা দারিল-মা'আদ, ১৪ খণ্ডে, জাঞ্জিবার ১৩৫০ হি.; (২) তায়সীরুত-তাফসীর, ৬ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৩২৬ হি.। হাদীছ ঃ (৩) ওয়াফাউদ দামানা, ৩ খণ্ডে, কায়রো ১৩০৬-১৩২৬ হি.। ফিক্·হ ঃ (৪) শারহুন-নীল (আবদুল আযীয ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুস্আবী, মৃ. ১২২৩/১৮০৮ প্রণীত কিতাবু'ন-নীল-এর ভাষ্য; (Brockelmann) পরিশিষ্ট, ২খ., ৮৯২), কায়রো ১৩০৫-১৩৪৩ হি.; (৫) শামিলুল আস্·ল ওয়াল-ফার্', ২ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৮ হি.; (৬) শাব্‌হ দা'আইম ইব্নিন-নাজার; এই গ্রন্থকারের জন্য দ্র. Brockelmann, ২খ., ৫৩৮), ২ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৩২৬ হি; (৭) তাফক·ইহুল-গামির, আলজিয়ার্স ১৩১৯ হি.। 'আক·াইদ ঃ (৮) শারহ রিসালাতিত-তাওহ·ীদ (আবূ হাফস 'উমার ইব্ন জামী-র প্রণীত 'আকীদা-এর ভাষ্য; (Brockelmann), পরিশিষ্ট, ২খ., ৩৫৭), আলজিয়ার্স ১৩২৬ হি.; (৯) আয-যাহাবুল খালিস, কায়রো ১৩৪৩ হি.। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের উপরও তাঁহার কয়েকখানা গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কিছু কবিতা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর কয়েকটি প্রবন্ধও পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আবূ ইস্হাক] ইব্রাহীম আত্ফিয়াশ (গ্রন্থকারের ভ্রাতুষ্পুত্র), আদ-দিআয়া ইলা সাবীলিল মুমিনীন, কায়রো ১৩৪২/ ১৯২৩, ১০০-৯; (২) J. Schacht, Bibliotheques at

manuscrits ababites, R. Afr., ১০০তম খণ্ড, ১৯৫৬ খৃ., ৩৭৩ প.।

J. Schacht (E.I.2) / সৈয়দ লুৎফুল হক

আত্‌ফীহ (اطفيح) ঃ মধ্যমিসরের একটি শহর। আত্‌ফীহ ط-এর পরিবর্তে ت দ্বারাও লেখা যায়। ইহা একটি ছোট শহর, জনসংখ্যা মাত্র ৪,৩০০ এবং ফায়্যুম (فيوم) শহরের অক্ষাংশে নীল নদের পূর্ব তীরে ইহা অবস্থিত। শহরটির নাম প্রাচীন মিসরের ভাষায় ছিল তেপ-য়েহ (Tep-yeh) বা পের হাথোর নেব্‌ত তেপ-য়েহ (Hathor nebt Tep-Yeh) অর্থাৎ 'তেপ-য়েহ -এর সভ্রান্ত মহিলা হাথোর-এর নিবাস।' কিব্‌তীরা এই নাম পরিবর্তন করিয়া ইহার নামকরণ করে পেতপেহ (Petpeh) এবং পরবর্তীকালে 'আরবরা নামকরণ করে আত্‌ফীহ, গ্রীকরা হাথোর (Hathor) ও এ্যাফ্রোডিটকে (Aphrodite) একই দেবী মনে করিয়া শহরটির নাম রাখে এ্যাফোডিটোপোলিস (Aphroditoplis), সংক্ষেপে এ্যাফ্রোডিটো (Aphrodito)। খৃষ্টীয় যুগ পর্যন্ত শহরটির গুরুত্ব বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। কেননা এই শহরে বিশটিরও বেশী গির্জা ছিল; তন্মধ্যে দশটি ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন "নমস" যাহা পরবর্তী কালে কূরা আত্‌ফিহ (كورة اطفيح) নামে খ্যাত ছিল, নীল নদের পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া আশ্‌-শারকিয়্যা (الشرقية) নামেও অভিহিত হইত। ফাতিমী যুগের শেষভাগে যখন মিসর কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হয়, তখন আত্‌ফীহ্‌ শহরের নামানুসারে সম্পূর্ণ প্রদেশটির নাম আত্‌ফীহিয়া (اطفيحية) রাখা হয়। ১২৫০/ ১৮৩৪-৫ সালে আত্‌ফীহ এলাকাটি পুনরায় জীযা (جيزة) প্রদেশের সহিত একীভূত হয়। ফলে ইহা জীযার একটি জেলায় (مركز) পরিগণিত হয়। আত্‌ফীহ সম্বন্ধে তথ্য খুবই অপর্যাপ্ত। ইহা সন্দেহাতীত, মামলূকদের সময়ে শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বহু যুগ পরে খেদীবদের আমলে সরকার পুনরায় এই এলাকার কিছুটা উন্নতি সাধনে সক্রিয় হয়। ফলে বেদুঈন ও মামলূকদের ক্রমাগত আক্রমণের সমাপ্তি ঘটিলে নূতন নূতন খাল খনন করা হইতে লাগিল কিংবা পুরাতনগুলি সংস্কার করা হইল। আজকাল আত্‌ফীহ-এর গুরুত্ব একটি স্থানীয় বন্দরের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সামান্য পরিমাণেই হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাল্‌কাশান্দী, দাওউস্‌ সুব্‌হিল-মুস্‌ফির, অনু. Wustenfeld, 93,104; (২) মাক্‌রীযী, খিতাত, ১খ., ৭৩; (৩) আলী মু. বারাক, আল-খিতাতুল-জাদীদা, ৮খ., ৭৭; (৪) ইব্‌ন দুক্‌মাক, ৪খ., ১৩৩; (৫) ইয়াকূত, ১খ., ৩১১; (৬) আবূ সালিহ, ৫৬ক প.; (৭) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ, পৃ. ৮১; (৮) Amelineau, Geographie de I, Egypte a I'epoque Copte, পৃ. ৩২৬; (৯) Boinet, Dictionnaire geographique del'Egypte, পৃ. ৮৬; (১০) Baedeker, Egypte; (১১) মাক্‌রীযী, খিতাত, সম্পা. IFAO, 1 part, 312; (১২) J. Maspero and G. Wiet, Materiaux pour servir a la geographie de l'Egypte, পৃ. ২১।

C.H. Becker (E.I.2) / সৈয়দ লুৎফুল হক

আত্‌বারা (اتبرة) ঃ নীল নদের একটি উপনদী, প্রাচীন আমলে আসতাবোরাস্‌ (Astaboras) নামে পরিচিত ছিল। আবিসিনিয়ার গোন্‌ডার-এর অনতিদূরে ইহার উৎপত্তি এবং গাললাবাত (কাল্‌লাবাত)-এর নিকট সূদানে প্রবেশ করিয়া সালাম ও সেতীত-এর সহিত যুক্ত হইয়াছে। মূল নীল নদের সহিত ইহা খার্তুমের ২০০ মাইল উত্তরে মিলিত হইয়াছে। বন্যার সময় (মে মাসের শেষভাগ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষভাগ পর্যন্ত) নদীটি প্রচুর পরিমাণে পলিবাহী পানি নীলনদে সরবরাহ করে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় ইহা শুকাইয়া কতকগুলি পানির ডোবায় পরিণত হয়।

নদীর মোহনার সন্নিকটবর্তী আত্‌বারা শহরটি সূদান রেলপথের সদর দফতর (পৌর এলাকার জনসংখ্যা ৩৬,১৪৩) এবং লোহিত সাগর লাইন-এর জংশনরূপে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ৮ জুন নদীর মোহনা হইতে কিছু দূর উজানে নাখায়লা নামক স্থানে সংঘটিত আত্‌বারার যুদ্ধে স্যার হার্বার্ট (Herbert) (পরে লর্ড) কিচ্‌নার (Kitchener) -এর নেতৃত্বে ইঙ্গ-মিসরীয় সেনাবাহিনী দারবীশ আমীর মাহমূদ আহমাদের নেতৃত্বাধীন ১২,০০০ পদাতিক ও ৪,০০০ অশ্বারোহীর এক 'মাহদী' বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Sudan Almanac (খারতূম, বার্ষিক); (২) H. E. Hurst, The Nile, লন্ডন ১৯৫২; (৩) A. B. Theobald The Mahdiya. লন্ডন ১৯৫১।

S. Hillelson (E.I.2) /মু. আবদুল মান্নান

আত্‌রাবুলুস (দ্র. তারাবুলুস)

আত্‌রেক (اترك) ঃ খুরাসানের উত্তরে অবস্থিত একটি নদী। কোপেত দাগ-এর গুলিস্তান নামীয় পর্বতমালার হাযার মাসজিদ পর্বত ইহার উৎস। কোচান (Kocan)-এর উত্তর-পূর্বে, ৩৭°১০ উত্তর, প্রায় ৫৯° পূর্ব, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৭৫ ফুট উচ্চে ইহা অবস্থিত। আত্‌রেক নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২০ মাইল (মুস্‌তাওফী, ১২০ ফারসাখ্‌)। ইহা প্রধানত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর-দক্ষিণ দিকে হাসান কুলী উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার প্রশস্ততা প্রায় ৩২ ফুট এবং গভীরতা ২-৩ ফুট। ইহার উচ্চ এলাকায় উর্বর কোচান ও বুজ্‌নুর্‌দ (মধ্যযুগের উস্‌তুওয়া)-এর অঞ্চলগুলি অবস্থিত যেইখানে কুর্দগণ আনুমানিক ১৬০০ খৃ. হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ডানদিক হইতে (চাত্‌ বা চাত্‌লী পল্লীর পার্শ্ব দিয়া) সীম্‌বার (Zumbar)-এর সহিত ইহার সংযোগস্থল হইতে আত্‌রেক নদীটি ১৮৮২ খৃ. হইতে রাশিয়া (বা তুর্কমান SSR) ও ইরানের সীমানা বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। খারাকীর নিম্নদেশে প্রবাহিত আত্‌রেক নদীটি কিছু সংখ্যক তুর্কমানের একটি বসতি এলাকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে যাহা প্রায় বসতিশূন্য। কিন্তু এখনও সেখানে মধ্যযুগের সেচ ব্যবস্থার অনেক নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে এবং গুদরীর নিকট রাশিয়ান (সোভিয়েত) এলাকার বাঁধের সাহায্যে একটি উত্তরমুখী খাল নির্মাণ করা হইয়াছে। মুস্‌তাওফী এই নদীর বর্ণনায় বলিয়াছেন, ইহা পার হওয়া কদাচিৎ সম্ভব। চতুর্থ/দশম শতাব্দীর ভূগোলবিদদের রচনায় এই আত্‌রেক নামটি দৃষ্ট হয় না (আল-মুক'াদ্দাসী, পৃ. ৩৫৪, ৩৬৭), অথচ তাঁহারা সাধারণভাবে

ঐ এলাকার বহু নদী সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছেন। হাম্‌দুল্লাহ মুস্‌তাওফী প্রথম এই নামের উল্লেখ করেন (২১১, অনু. ২০৫) এবং প্রচলিত শব্দতত্ত্বে পরে তুর্ক-এর বহুবচনরূপে (আত্‌রাক) ব্যাখ্যা করা হয়। মধ্যযুগে গুর্‌গান জেলাটি (জুর্‌জান, Hyrcania) আত্‌রেক নদী দ্বারা দক্ষিণ দিকে এবং দাহিস্তান (দ্র.) জেলাটি উত্তর দিকে সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. E. Yate, Khurasan and Sistan, Edinburgh-London 1900; (২) Le Strange, 377; (৩) Brockhaus-Efron, Entsiklopediceskiy Slovar[1], ২খ., ৪৩৮; (৪) Bol'shaya Sovetskaya Entisklopediya[2], ৩খ., ৪৭৩ প.।

W. Barthold [B. Spuler] (E.I.[2])/শিরিন আখতার

আত্‌লাস (اطلس) ঃ উত্তর আফ্রিকার (মরক্কো, আলজিরিয়া ও (তিউনিসিয়া) পর্বতশ্রেণীর সাধারণ নাম। আত্‌লাস উক্ত এলাকাকে সাহারার বৈচিত্র্যহীন মরুময় উচ্চ স্থানের তুলনায় স্বাতন্ত্র ও বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে। আত্‌লাস নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে গ্রীকরা এই নাম ব্যবহার করিত। প্রাচীন গ্রন্থকার, বিশেষত স্ট্রাবো (Strabo)-এর (পুস্তক ১৭) রচনায় বিস্তারিত তেমন কিছু পাওয়া যায় না। আরব ভৌগোলিকগণ হইতেও সঠিক তথ্য জানা যায় না। তাঁহারা স্ট্রাবো-র মত অনেক সময় আদরারন-দেরেন (Adrarn-Deren) নামে এই পর্বতশ্রেণীর নামকরণ করিয়াছেন। এই নামটি প্রকৃতপক্ষে মরক্কোর উচ্চ আতলাস ঔ আলজিরীয় সাহারার আত্‌লাসের জন্য নির্দিষ্ট (আল-বাক্‌রী, অনু. de slane, ২য় সং, ২৮১, ২৯৫)। কতিপয় গ্রন্থকার (আল-বাকরী, ৩০৩-৪; আল-ইদ্‌রীসী, আল-মাগরিব, ৭৩-৪; ইব্‌ন খাল্‌দূন, Hist. des Berberes, অনু. de Slane, ১খ., ১৫৮) উহাকে ভুলক্রমে নেফ্‌সা ও মিসর পর্যন্ত, এমনকি ইহার পরও সম্প্রসারিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর দিকের পর্বতশ্রেণী অর্থাৎ রিফ (Rif) এবং তেল (Tell) আত্‌লাস সম্বন্ধে Strabo (পুস্তক ১৭) ও রিফ্‌ সম্বন্ধে আল-বাক্‌রী (পৃ. ২১৪) অবহিত ছিলেন। ইব্‌ন খাল্‌দূনের মতে (১খ., ১২৮) দেরেন পর্বতশ্রেণী একটি বেষ্টনীর মত, যাহা আল-মাগরিবুল-আক্‌সা-কে আস্‌ফী হইতে তাযা পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং উহাতে মধ্য-আত্‌লাসও অন্তর্ভুক্ত। Leo Africanus (Description de l'Afrique, অনু. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬, পৃ. ৪ ৪৯-৫০) অধিকতর সঠিকভাবে উত্তর প্রান্তের পর্বতশ্রেণীকে আত্‌লাস হইতে পৃথক করেন এবং শেষোক্ত পর্বতশ্রেণীকে মিসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। Marmol (Africa, ১খ., ৫) দক্ষিণ এলাকায় অবস্থিত 'La Sierra menor' ও La Sierra de Athalante Mayor'-এর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন, যাহা এখন হইতে ছোট আত্‌লাস ও বড় আত্‌লাস নামে উল্লেখ করা হইবে। সর্বোপরি ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ ও ভৌগোলিকগণ বিগত অর্ধ শতাব্দীতে ইহাদের বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন।

আত্‌লাস পর্বতশ্রেণী গঠন প্রকৃতিতে ভাঁজ ভাঁজ আকৃতির। ইহা ইউরোপের তৃতীয় যুগের স্তর (Tertiary) সংক্রান্ত পর্বতশ্রেণীর সহিত যুক্ত। ইউরোপীয় পর্বতশ্রেণীর মতই এইগুলি প্লায়োসিন (Pliocene) ও চতুর্থ যুগের স্তর (Quarter rary) সংক্রান্ত ভূমি পর্যায় দ্বারা নূতনভাবে উন্নীত হইয়াছে, যাহা এই পর্বতশ্রেণীকে অনেকটা ভূমধ্যসাগরীয় ও মরুময় সাহারা অঞ্চলের উপর উচ্চতা দান করিয়াছে। 'সাহারা' আকস্মিকভাবে সৃষ্ট, (স্তরচ্যুতি, বক্রতা ও আকস্মিকতার ফলে সরল রেখায় ভূ-স্তর সৃষ্টি দ্বারা) যাহা দক্ষিণ আত্‌লাসের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শুরু হইয়া আগাদির হইতে গাবেস পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দক্ষিণ তিউনিসিয়ার দাহার ও নেফ্‌সা আত্‌লাসের অংশ নহে। কেননা মরক্কোর বিপরীত আত্‌লাস সম্পর্কে বলা যায়, জাবাল সাগ্‌রো উহার বর্ধিতাংশ, ইহা একটি স্বতন্ত্র পর্বত উন্নীত সাহারা অঞ্চলের পার্শ্বস্থ উচ্চ প্রান্ত মাত্র। ইহা একটি অপ্রতিসম বৃহৎ পর্বতস্তূপ যাহার উচ্চতা জাবাল আখনীতে ২৫৩১ মিটারে পৌঁছিয়াছে। এই পর্বত পুঞ্জীভূত প্রাচীন শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত। ইহা সূস ও দাদেস-এর নিম্নভূমির দিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া গিয়াছে (সির্‌ওয়া নামক ৩৩০৪ মিটার উচ্চ আগ্নেয়গিরির লাভা ও শিলা গঠিত বৃহৎ পর্বত, সূস ও দাদেস-কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে)। ইহা আরও নিম্ন দিকে ঢালু হইয়া (দ্র. দার'আ) তাফিলালেত নামক সমতল ভূমির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে 'বানি' পাহাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ইহাকে ছেদ করিয়াছে।

আত্‌লাস অঞ্চলের প্রথম ভাগ অত্যন্ত বিস্তৃত, ভাঁজ করা স্বাভাবিক উচ্চতাসম্পন্ন ও নিম্নতম উচ্চতাসম্পন্ন পাহাড় ও সমতল ভূমির সমষ্টি। আত্‌লাস একটি বৃহৎ মৌলিক পর্বতশ্রেণী যাহার দৈর্ঘ্য ৭৫০ কিলোমিটার। ইহা ৪,০০০ মিটার বা আরও অধিক উচ্চতায় বিস্তৃত (যেমন তুবকাল-এ ৪১৬৪ মিটার এবং মগূন-এ ৪০৭০ মিটার)। ইহার এই বিস্তৃতির জন্য চতুর্থ পর্যায়ের এই পর্বতশ্রেণীতে বরফের নিদর্শন দেখা যায়। তবে ইহার উপর সব সময় বরফ থাকে না। পশ্চিম এলাকায় সূস্‌ ও মাররাকেশের হাওজ-এর মধ্যে এই পর্বতশ্রেণীর অধিক উচ্চতাসম্পন্ন চূড়া থাকা সত্ত্বেও ইহা অনেক সময় পর্বতপৃষ্ঠে ও গভীর তির্যক উপত্যকাসমূহে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অঞ্চল অতিক্রম করা যায় কেবল উচ্চ সংকীর্ণ পার্বত্য পথ এবং 'সূস' (Tiz in-Test) ও উচ্চ 'দ্র' (Tiz in-Tishka)-এর ঐতিহাসিক পথ দিয়া। মধ্য ও পূর্ব অংশে প্রাথমিক পর্যায়ে ইহার মাটি অধিক চুনাযুক্ত (Jurassic and liassic) ও সংকীর্ণ শিলাস্তরচ্যুত বক্র স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত প্রস্তরময় ময়দানে পরিণত হইয়াছে। 'আয়্যাশী পাহাড়ের পরে (৩৭৫১ মিটার) এই পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ক্রমান্বয়ে কমিয়া পূর্ব মরক্কোর দক্ষিণ অংশে যাইয়া শেষ হইয়াছে। দাদেস, গেরিস, যিয্‌ (ফেজ হইতে তাফিলালত পর্যন্ত পথ) গুইর প্রভৃতি বৃহৎ উপত্যকার আকারে পরস্পরকে অতিক্রম করত ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আলজিরীয় সাহারা আত্‌লাস পর্যন্ত আত্‌লাসের উচ্চতা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহার বৃহৎ পাহাড়সমূহ অর্থাৎ কসূর, জাবাল 'আমূর, আওলেদ নায়ল ও যাব্‌-এর পাহাড়সমূহ দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ক্রমাগত নিম্নগামী হইয়া চলিয়া গিয়াছে (আইস্‌সা পাহাড়ের ২২৩৬ মিটার এবং পরে ১০০০ মিটারের কম)। এই পাহাড়সমূহ স্তরবিশিষ্ট পাহাড় শ্রেণীর অবশিষ্টাংশ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই পাহাড়সমূহকে সমতল ত্রিকোণাকার মাঠ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই পার্বত্য এলাকা সাহারা হইতে অধিক উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও যাযাবরগণ ইহা সহজেই অতিক্রম করিতে পারে। বিস্‌করা

নামক নিম্নভূমির পরে উচ্চ আওরেস (আওরাস) পর্বত সাহারা অঞ্চলে আত্‌লাসের এক স্বতন্ত্র বৃহৎ পর্বত তথা আলজিরিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত (চেলিয়ায় ইহার উচ্চতা ২৩২৯ মিটার)। এই পর্বতশ্রেণীর প্রধান অংশ অত্যন্ত প্রশস্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। ইহা আব্দী, আল-আবিওদ (el-Abiod) ও আল-আরাব নামক ওয়াদীসমূহের দ্বারা বিভক্ত, যেইগুলি বিশাল বন্ধুর এলাকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্ন অঞ্চল দক্ষিণ আওরেসের নিম্নভূমির দিকে চলিয়া গিয়াছে। আওরেসের উচ্চভূমির পূর্ব দিকে অবস্থিত নেমেমচা (Nememcha)-র পর্বতশ্রেণী এই নিম্নভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। উত্তর প্রান্তে এই পর্বতশ্রেণী পৃথক পৃথক পাহাড়ের শ্রেণীতে বিন্যস্ত, যেইগুলি প্রশস্ত গম্বুজ আকৃতির পাহাড়গুলির অবশিষ্টাংশ। তিউনিসিয়ায় সাহারার আত্‌লাস হইতে নির্গত এই পর্বতশ্রেণী একমাত্র উত্তর-পশ্চিম এলাকা ছাড়া প্রায় সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে। এই গম্বুজ আকৃতির পর্বতশ্রেণীর চূড়াসমূহ গঠন প্রকৃতিতে কোথাও সংকীর্ণ, আবার কোথাও প্রশস্ত। এই গঠন প্রকৃতি তেবেস্‌সা (Tebessa)-র পর্বতশ্রেণীতে ও তিউনিসিয়ায় দোরসাল (Dorsal) পর্বতশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। চুনা পাথরযুক্ত শিলাখণ্ডের এই পর্বতশ্রেণীর আকৃতি ধনুকের ন্যায় (চাম্বি পাহাড়ের উপর ইহার উচ্চতা ১১৫৪ মিটার) এবং কোন কোন স্থানে ইহা তির্যক ভগ্ন উপত্যকা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত সহজসাধ্য। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পূর্ব দিকে একটি একক পর্বতশ্রেণী, যাহা শৈলশ্রেণীর (জাবাল যাগওয়ান, ১২৯৮ মিটার) সহিত যুক্ত এবং দোরসাল পর্বতশ্রেণীর উত্তরে তিউনিস উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কেন্দ্রস্থল হইতে উত্তরদিকে উচ্চ তেল্ল (High Tell) ও মেজের্‌দা (Medjerda) খুব মযবুত স্তরবিশিষ্ট পার্বত্য অঞ্চল। তথাপি সেখানে মোটামুটি উচ্চতাসম্পন্ন পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর প্রশস্ত নিম্নভূমি, বিশেষত মেজের্‌দা পর্বতের মধ্যভাগের গভীর গর্ত এবং উক্ত উপত্যকা হইতে নির্গত মেলিগ (Mellegue), তেসা (Tessa) ও সিলিয়ানা (Siliana) ওয়াদীসমূহ দ্বারা বিভক্ত। দক্ষিণাঞ্চলে চুনা পাথর অথবা বেলে পাথরযুক্ত পর্বতশ্রেণী প্রশস্ত সমতল ভূমিতে দাঁড়াইয়া আছে। এই পার্বত্য অঞ্চল কতক প্রস্তরময় এবং কতক পলিমাটি দ্বারা আবৃত। পূর্ব-পশ্চিমের গাফ্‌সার সমান্তরাল এলাকায় এই পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ ও উত্তরদিকে বক্র হইয়া পূর্ব তিউনিসিয়ার সমতল প্রান্তসীমা দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

উচ্চ আত্‌লাস ও আলজিরীয় সাহারা আত্‌লাসের উত্তর প্রান্তের নিম্ন এলাকা অত্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে দুই স্থানে মধ্য আত্‌লাস ও হোদ্‌নার পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়াছে। কেন্দ্রীয় উচ্চ আতলাসের পর্বতশ্রেণী যেমন সংকীর্ণ ও বক্র স্তরবিশিষ্ট এবং কেন্দ্রের দিকে সম্প্রসারিত প্রশস্ত নিম্নভূমি সম্বলিত, তেমনই মধ্য আত্‌লাসের পর্বতশ্রেণীর শিলাখণ্ড ও গঠন প্রকৃতি (Ben nacer পাহাড়, ৩৩৫৪ মিটার)। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে ইহা ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হইয়া মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর নিম্ন ভঙ্গিল পার্বত্য অংশ যাহা উচ্চ অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন, সেই অংশ মোচাকার আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে আবৃত। মধ্য আত্‌লাসের এই পর্বতশ্রেণীর উপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে উম্মুর-রাবী, সেবো (Sebou) মোলোয়া (Moulouya) প্রভৃতি মরক্কোর প্রধান নদীসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য আত্‌লাস মরক্কোর প্রাথমিক পর্যায়ের বিস্তৃত শক্ত ভূখণ্ড মেসেতা (Meseta)-কে (মধ্য মালভূমি রেহামা ও জেবিলেত-এর পর্বতসমূহ পাললিক ফস্‌ফরাসের মালভূমি, তাদলা, বাহিরা ও মাররাকেশ-এর হাওজ-এর পাললিক মৃত্তিকা অঞ্চল) ওরান (Oran)-মরক্কো সীমান্ত সন্নিহিত পর্বতশ্রেণী হইতে পৃথক করিয়াছে; ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিকৃষ্ট শিলাখণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত। মরক্কোতে মোলোয়া-র পূর্বদিকে রোকাম অঞ্চল দেবদো (Debdou) ও জেরাদা (Djerada) মালভূমি দ্বারা সম্প্রসারিত। অনুরূপভাবে উক্ত অঞ্চল ওরানের তেল্ল আত্‌লাসের তরঙ্গায়িত ভগ্ন মালভূমি দ্বারা ও তেলেম্‌সেন (Tlemcen), মেকার্‌রা (makarra), সাইদা (Saida), ফ্রেন্ড (Frenda) প্রভৃতি পর্বত দ্বারা সম্প্রসারিত। সাহারা আত্‌লাসের উত্তরে আলজিরীয়-মরোক্কীয় উচ্চ সমতল ভূমির পশ্চিম অংশের উচ্চতা ১২০০ মিটার এবং মধ্য আলজিরিয়ায় ৮০০ মিটার। উভয় এলাকার ভূমির গঠন একই ধরনের অর্থাৎ স্তরবিশিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত যাহার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জমাট বাঁধা প্রাচীন পর্যাপ্ত পাললিক মৃত্তিকার নিম্নে বিলীয়মান (Chott gharbi, Chott Chergui ও Zahrez-এর নিম্নভূমি)। ইহার একমাত্র উচ্চ এলাকা (Oned Touil) সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আরও পূর্বদিকে হোদ্‌নার সংকীর্ণ পর্বতশ্রেণী ও বেলেয্‌মা-র প্রকাণ্ড পর্বতস্তূপ, হোদ্‌না পর্বতের অত্যন্ত নিম্ন অঞ্চলকে (৪০০ মিটার) আলজিরিয়ার পূর্ব অংশের উচ্চ সমভূমি ও কনস্টানটাইন (Constantine) অঞ্চলের উচ্চ সমভূমি (৮০০ হইতে ১০৫০ মিটার) হইতে পৃথক করিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বিতীয় পর্যায়ের চুনা পাথর অথবা শিলাময় পর্বতশ্রেণীটি স্থানে স্থানে বিরতি করত কনস্টানটাইনের উচ্চ সমভূমি অতিক্রম করিয়া ইহার সবিরাম বিস্তৃতি অব্যাহত রাখিয়াছে যাহার ফলে এই পর্বতশ্রেণী শত শত মিটার উচ্চতায় উন্নীত হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তের তথাকথিত সেবাখ অঞ্চল রুমেল, সে বাউফ ও মেস্‌কিয়ানা নদী দিয়া প্রবাহিত পানি হইতে রক্ষা পায়। পূর্ব তিউনিসিয়ার সমতল ভূমির পানি অসম্পূর্ণভাবে বক্র পৃষ্ঠবিশিষ্ট সাহেল এলাকার পশ্চাৎ দিয়া প্রবাহিত হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল এবং রিফ ও তেল্ল আত্‌লাস পর্বতশ্রেণীর পার্শ্ব ঘেঁসিয়া দ্বিতীয় একটি পর্বতশ্রেণী গঠিত হইয়াছে যাহা তাঞ্জিয়ার্স হইতে বিযের্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণীর গঠন অত্যন্ত যৌগিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের পর্বতশ্রেণীর শক্ত ও নরম পাললিক শিলাস্তূপসমূহ স্থানে স্থানে বৃহদাকারের স্তরবিশিষ্ট। সমুদ্র তীরবর্তী বলয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের বিস্ফোরিত লাভা গঠিত পর্বতস্তূপগুলি পাললিক শিলাস্তূপসমূহকে দক্ষিণ দিকে ঠেলিয়া দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহা এখনও সিউটা (Ceuta) ও কাবালিয়া (Kabylia)-র দক্ষিণ অংশে বর্তমান। এই সমস্ত বৃহৎ পর্বতস্তূপ দক্ষিণ দিকের জেবালা (Djebala) বোক্‌কোয়া (Bokkoya, মরক্কো) প্রভৃতি চুনা পাথরের উচ্চ খাঁজযুক্ত শৈলশ্রেণীতে এবং জুর্‌জুরা (Djurdjura) ও নুমিদিয়া পর্বতশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। বাকী অংশ নরম এঁটেল মাটির বৃহৎ স্তূপ এবং বেলে পাথর ও স্বচ্ছ শিলা দ্বারা

গঠিত। ইহা সাধারণত চাদরের মত ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত এবং মরক্কোতে ইহা সরাসরি দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই যৌগিক গঠনের পর্বতগুলি তির্যক গিরিসঙ্কট ও লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরীয় প্রবল জলস্রোতে ক্ষয়িত উপত্যকা দ্বারা কর্তিত হইয়াছে। রিফ পর্বতশ্রেণী সিউটা হইতে মেলিল্লা পর্যন্ত চন্দ্রাকার পর্বতের সৃষ্টি করিয়াছে (Tidighin পাহাড়ের উপর ২৪৫০ মিটার) যাহা দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন পাহাড় দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের এই পার্বত্য এলাকা রিফ এবং সন্নিহিত এলাকার উপর দিয়া প্রবাহিত ওয়েরগা (Ouergha) ও সেবো (Sebou) নদীর উপনদী দ্বারা কর্তিত হইয়াছে। মেলিল্লা উপদ্বীপ হইতে ত্রারা (Trara) পর্বত পর্যন্ত বৃহৎ স্তরের পার্বত্য অঞ্চল ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া নিম্ন মোলোয়া-র বনি স্নেসেন (Beni Snassen) পর্বতশ্রেণী ও ওরান-এর তেল্ল মালভূমিকে অনুসরণ করিয়াছে। অতঃপর ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া একটি দীর্ঘ নিম্নভূমির উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া ওরান-এর সেব্খা হইতে মধ্য কেলিফ (Chelif)-এর পার্শ্বদেশ পর্যন্ত অতিক্রম কয়িয়াছে। উক্ত দিকে ওরান-এর সাহেল পাহাড়সমূহ যাহা দাহরা এবং মিলিয়ানার পর্বতশ্রেণী দ্বারা শুরু অনুসৃত হইয়াছে (Zaccar, ১৫৭৯ মিটার) ও দক্ষিণ দিকে Tessala, Ouled Ali ও Beni Chourgrane পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণীর প্রান্তভাগে Sidi Bel Abbes এবং Mascara এলাকার অভ্যন্তরীণ সমভূমি বিদ্যমান। এই পর্বতসমূহ পূর্বদিকে Ouarsenis-এর বৃহৎ পবর্তকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে (১৯৮৫ মিটার), যাহা উচ্চ সমতল ভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বত। সমতল ভূমি হইতেও নিম্নভূমি মিডিয়া (Medea)-র পূর্বদিক বরাবর পুনরায় লম্বালম্বিভাবে শুরু হইয়াছে এবং সোম্মাম (Soummam) নদীর উপকূলের পার্শ্ববর্তী উপত্যকা অতিক্রম করত Bougie (al Bidjaya) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইহার উত্তর পার্শ্বে সংলগ্ন মিতিজা আত্‌লাস (Mitidja Atlas) যাহা মিতিজার নরম পাললিক ভূমি এবং আলজিরিয়ার সাহেল পাহাড়সমূহ অপেক্ষা অধিক উচ্চতাপ্রাপ্ত। ইহার পরে শেষ প্রান্তে জুরজুরা কাবিলিয়া ও সর্বোচ্চ প্রান্তসীমায় Lalla Khasidja দণ্ডায়মান (চূড়া ২৩০৮ মিটার); দক্ষিণ দিকে তিতেরী (Titeri) পর্বত ও বিবান (Biban)-এর দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী। বোগী (Bougie)-র পূর্বদিকে Babor পর্বত (২০০৪ মিটাব) এবং নুমিদিয়া পর্বতশ্রেণী পূর্ব কাবিলিয়ার সঙ্গে যুক্ত এবং নুমিদিয়া পর্বত ফারজিওয়া (Ferdjioua) ও কনস্টানটাইনের স্বল্প উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অধিক উচ্চতায় দণ্ডায়মান। পূর্ব কাবিলিয়ার স্ফটিক ভূখণ্ড (Crystallaine terrains)-এর কিছু অংশ মাটির স্তূপ ও বেলে পাথর দ্বারা আবৃত। সেই স্থানে কর্ক (Cork) বনাঞ্চল অবস্থিত। বেলে পাথর গঠিত এই সমস্ত পর্বতশ্রেণীর মত Bone-এর উপকূলীয় সমভূমি ও তিউনিসিয়ার Khronmiria & Mogod অঞ্চলও বেলে পাথর দ্বারা গঠিত।

আতলাস উত্তর আফ্রিকাকে একটি উচ্চ, অনুর্বর পার্বত্য এলাকায় পরিণত করিয়াছে। ভূমির এই উচ্চতা ও ভূমধ্যসাগরের নৈকট্য সাহারা অঞ্চলের আবহাওয়াকে বৈচিত্র্যময় ও চরমভাবাপন্ন করিয়াছে। তেল্ল এলাকা, উচ্চ সমভূমি উঞ্চলের শুষ্ক তৃণাবৃত (Steppe) এলাকা ও সাহারার Piedmont-এর মরুময় এলাকা বৃহৎ পর্বতসমূহ ভৌগোলিক পরিবেশের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে, যাহা মাগরিবের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য মরক্কো, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া শীর্ষক নিবন্ধসমূহ দেখুন।

J. Despois (E.I.[2]) / সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আত্‌সিয্ ইব্‌ন উভাক (عاتسز بن اوق) ঃ (আবাক নহে) আত্‌সিয ইব্‌ন উওয়াক) তুর্কোমান সম্প্রদায়ের একজন সর্দার ছিলেন সম্ভবত ঈওয়াঈ গোত্রের ও খাওয়ারিযম- এ সালজূক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে, যিনি ১০৭০ খৃ. আল্‌প-আরসালানের এক জামাতা এরিস্‌গেনের (?) বায়যান্টীয় ভূমিতে পলায়নের সময় তাঁহার অনুসরণ করিয়া এশিয়া মাইনরে গমন করেন। কিন্তু তিনি খৃস্টান সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং ফাতিমী সরকার তাঁহাকে মিসরে আসিয়া কিছু সংখ্যক ফিলিস্তিনী বেদুঈনকে পদানত করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সাড়া দেন (১০৭১ খৃ.)। যদি কেহ সালজূকদের কঠোর ফাতিমী বিরোধী মনোভাবের কথা স্মরণে রাখেন তবে প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার নিকট ইহা বেশ ভালভাবেই প্রতীয়মান হইবে যে, সংক্ষিপ্ত ঐতিহ্যগত বর্ণনায় আত্‌সিযকে ফাতিমীদের একজন সেনাপতি হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহা কতখানি অসত্য। যাহা হউক, তাঁহাকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হইতেছে না- এই অজুহাতে আত্‌সিয নিজের স্বার্থেই জেরুসালেম, ফিলিস্তীন ও দক্ষিণ সিরিয়া দখল করেন। অতঃপর তিনি আল্‌প-আরসলানের উত্তরাধিকারী মালিক শাহের সহিত একটি সমঝোতায় উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। কায়রো সরকার বৃথাই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রথমে 'আককায় (আক্‌রায়) নিযুক্ত তাঁহারই সহকারী ও পরে কুত্‌লুমুশের বংশধর সালজূকদের সাহায্য লাভ করেন, যাঁহারা তখন এশিয়া মাইনরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১০৭৫ খৃ. আতসিয তাহাদের পরাজিত করেন, পরবর্তী বৎসর দামিশ্‌ক জয় করেন এবং ১০৭৭ খৃ. খোদ মিসর আক্রমণ করেন। যাহা হউক, তথায় তিনি পরাজিত হন। অতঃপর ফিলিস্তীনে মিসর সমর্থকদের এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হইলে ১০৭৮ খৃ. উহা তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দমন করেন। মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া ভূখণ্ডেই তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে আসিলে তিনি নিজেকে তাহা প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ মনে করিয়া মালিক শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু মালিক শাহ তাঁহার সহোদর তুতুশকে জায়গীরস্বরূপ সিরিয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আত্‌সিয হয়ত আশা করিয়াছিলেন, তিনি নিজের অধিকারে সামন্ত হিসাবে একটি ভূখণ্ড রাখিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু দুই নেতার মধ্যে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হইলে তুতুশ ১০৭৯ খৃ. বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

সালজূক সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে একটি তুর্কোমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সফল প্রচেষ্টা হিসাবে আত্‌সিযের এই উদ্যম গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, ইহা সাল্‌জূক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। স্বভাবত তুর্কোমানরা চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলে ও অন্যত্র ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী দ্বারা নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। কিন্তু দেশ জয় করিবার পর তিনি

(আত্‌সিয) কৃষির পুনর্বাসনে মনোযোগ দেন। অন্যদিকে শহরবাসীরা অভিযোগ করে, তিনি তাহাদের প্রতি কোন আগ্রহই প্রদর্শন করিতেছেন না। উল্লিখিত ঘটনাবলী তাঁহার ধর্মীয় উদাসীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। অভিজাত শহরবাসীর সালজূকপন্থী ও ফাতিমীপন্থী উভয় দলই তাঁহার যে বিরোধিতা করিয়াছিল, খৃস্টানদের, বিশেষত Monophysite-দের সহিত তাহার স্পষ্ট সুসম্পর্কের আংশিক ব্যাখ্যা উহাতে পাওয়া যায়। যাহাই বলা হউক না কেন, উহাদেরকে ১০৭৮ খৃ. জেরুসালেম হত্যাকাণ্ডের সময় অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং জেরুসালেমের খৃস্টানদের নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া দ্বারা তিনি ইউরোপে ক্রুসেডের প্রচারণায় সহায়তা করিয়াছেন, এই অভিযোগ সঠিক নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Claude Cahen, La premiere penetration turque en Asie-Mineure Byzantion xviii, 1946-48; (২) Mukrimin Halil Yinanc, Turkiye tarihi, i, 2nd ed. 1944; (৩) Faruk sumer, Yiva oguz boyuna dair, Turkiyat Mecmuasi, ix, 1951; (৪) Cl. Cahen, En quoi la conquete turque appellait-elle la Croisade(?) Bulletin de la Faculte, des Lettres de Strabourg, xxix-2, 1950; (৫) E. Cerulli, Gli Etiopi, Palestina, i. Rome 1943. এই গ্রন্থসমূহে, বিশেষত প্রথমটিতে উৎসসমূহের নির্দেশ রহিয়াছে। তবে সিব্‌ত ইবনুল-জাওযীকৃত মিরআতুয-যামান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

Cl. Cahen (E.I.[2]) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আত্‌সিয ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আনুশ্‌তিগিন (اتسز بن محمد بن انوشگن) ঃ খাওয়ারিযম শাহ (দ্র.) (৫২১-২/১১২৭-৮ হইতে ৫৫১/১১৫৬) (জ. ১০৯৮ খৃ. দিকে) সাল্‌জূক সুলতান সান্‌জারের (৫২১-১১২৭ বা ৫২২/১১২৮) সামন্তরূপে তাহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার সারা জীবনের বাসনা ছিল এই সুলতানের অধীনতা হইতে স্বাধীন হওয়া, নব প্রতিষ্ঠিত কারা খিতায়দের শক্তির সমক্ষেও নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং উত্তরের যেই সকল এলাকা পূর্ব শতাব্দীগুলিতে খাওয়ারিয্‌ম রাজ্যের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে যুক্ত ছিল, রাজ্য প্রসারের জন্য সেইগুলি স্বীয় অধিকারে আনয়ন করা। বস্তুত তিনি মিন্‌কিশলাক (Min Kishlak) (রাশিয়ান ঃ Mangyshak) উপদ্বীপের সঙ্গে কাস্‌পিয়ান ও আরাল সাগরের মধ্যবর্তী এলাকাগুলি যোগ করিয়া (জুওয়ায়নীর মতে ইহার কিয়দংশ তাহার পিতার জীবদ্দশায় অধিকৃত হইয়াছিল) জাক্সারতেস (Jaxartes) [ওত্‌রার-এর দক্ষিণে] পর্যন্ত দেশটিকে তাঁহার অধীনে আনিতে সক্ষম হন এবং জানাইদ-কে তাহার কেন্দ্রস্থল করেন। ৫৩৬/১১৪১ সাল হইতে কর হিসাবে বাৎসরিক ৩০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রার সামগ্রী ও অর্থের বিনিময়ে শেষোক্ত এলাকাটি কারা খিতায়দের নিকট হইতে অধিকার করেন। সানজারের বিরুদ্ধে আতসিযের প্রথম বিদ্রোহের পর প্রাথমিক দ্বিধা কাটাইয়া সানজার ১০ রাবী'উল আওয়াল/৫৩৩-১৫ নভেম্বর, ১১৩৮ সালে হাযারাস্‌পে রক্তক্ষয়ী বিজয়ের মাধ্যমে আত্‌সিযকে বিতাড়ন করিতে সক্ষম হন (আত্‌সিযের পুত্রকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হয়)। সান্‌জার তাঁহার ভাগিনা সুলায়মান ইব্‌ন মুহাম্মাদকে (জুওয়ায়নীর মতে) খাওয়ারিয্‌ম শাহরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরের বৎসরই স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে আত্‌সিয পুনরায় সান্‌জারকে বিতাড়িত ও বুখারা অধিকার করিতে সক্ষম হন। আত্‌সিয এইবার সান্‌জারের অধীনতা স্বীকার করাই সুবিধাজনক মনে করিলেন (শাওওয়ালের মাঝামাঝি ৫৩৫/মে শেষ ১১৪১)। কিন্তু (কারা খিতায়দের নিকট) কাতওয়ানের প্রান্তর (Steppe)-এ সান্‌জারের পরাজয়ের পর (৫ সাফার, ৫৩৬/৯/সেপ্টেম্বর, ১১৪১) আত্‌সিয পুনরায় বিদ্রোহ করেন এবং মার্‌ব (১৭ রাবীউছছানী ৪৩৬/১৯ নভেম্বর, ১১৪১) ও নীশাপুর (শাওওয়াল /মে ১১৪২) অধিকার করেন। ৫৩৮/১১৪৩-৪ সালের দিকে সান্‌জার এক অভিযানে আত্‌সিযকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে আবার বাধ্য করেন। সান্‌জারের দূতকে খুন করিয়া তৃতীয়বার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও সান্‌জার হাযারাসপ দখল করিয়া (জানুয়ারি ১১৪৮) গুর্‌গাঞ্জ অবরোধ করার পর আত্‌সিযকে তাঁহার নিজ পদে অধিষ্ঠিত রাখেন, যদিও এক সাক্ষাৎকারে (মুহাররাম ৫৪৩/জুন ১১৪৮) আত্‌সিয বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করেন নাই। শেষ পর্যন্ত, এমনকি ওগুযদের হাতে সান্‌জার বন্দী হওয়ার (৫৪৮/১১৫৩) পরেও আত্‌সিয তাঁহার অনুগত ছিলেন এবং স্বকীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যত আমলের দুর্গ (বর্তমান Cardjuy) ও অন্যান্য দুর্গ লাভ করিবার অঙ্গীকার সান্‌জারের নিকট হইতে আদায় করেন। বাদীদসা হইতে সান্‌জারের পলায়নের পর আত্‌সিয তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান এবং নাসা-তে তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন (৫৫১/১১৫৬) কিন্তু স্বল্পকাল পরেই আত্রেক নদীর তীরে খাবু শান-এ ইন্তিকাল করেন (৯ জুমাদা-২, ৫৫১/৩০ জুলাই, ১১৫৬)। নিজের অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও তিনি সালজূক ও কারা খিতায়দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া খাওয়ারিয্‌মী রাজ্যের ক্ষমতা রক্ষা করেন (শেষ পর্যন্ত ইহাদের উভয়কেই কর দিতে হইয়াছিল) এবং উত্তর দিকে তাঁহার এলাকা বৃদ্ধি করিয়া একটি বৃহৎ শক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন যাহা মোঙ্গলদের আক্রমণ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জুওয়ায়নী, ২খ, ৩-১৪ এবং তাঁহার অনুসরণে মীর খাওয়ান্দ, (Histoire des Sultans du Kharezm, সম্পা. C. Defremery, প্যারিস ১৮৪২, পৃ. ৫-১১; (২) ইবনুল আছীর, ১০খ., ১৮৩, ৪৭৬ ও ১১ খ., ৪৪-৬৩, ১১৮প., ১৩৮ (উভয়টির বরাত আবুল হাসান বায়হাকীর লুপ্ত গ্রন্থ মাশারিবুত তাজারিব; (৩) রাওয়ানদী, রাহাতুস-সুদূর, পৃ. ১৬৯, ১৭৪, ৩৭০; (৪) বুন্দারী, যুব্‌দাতুন-নুস্‌রা (Houtsma), পৃ. ২৮১; (৫) W. Barthold, Turkestan, রুশ সংস্করণ, ১খ., ২৬-২৭ (আত্‌সিয ও সান্‌জারের মধ্যকার বিবাদ সম্পর্কিত সরকারী দলিলাদি); (৬) ইয়াকূত, ৪খ., ৭০; (৭) W. Barthold, Turkestan, ইংরেজি সংস্করণ, ৩৩, ৩২৩-৩১; (৮) ঐ লেখক, 12 Vorlesungen zur Gesch. der Turken Mittelasiens, Berlin 1935, 122 প; (৯) S.P. Tolstow, Auf den Spuren der alt-choresmischen Kultur, Berlin 1953, 295 প. (মানচিত্রসহ, ২৯৭); (১০)

Mehmet Altay Koymen, Der Oghusen-Einfall und seine Bedeutung im Rahmen der Geschichte des grossen Seldschukenreiches, Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi, ৫খ., ১৯৪৭-৮, ৬২১-৬০ (Turkish, 563-620)।

W. Barthold, B. Spuler (E.I.2) / শিরিন আখতার

আতহার আলী (اطهر على) ঃ মুহাম্মদ, আলহাজ্জ, হাফিজ, মাওলানা, বাংলাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম, সূফী ও সমাজ সংস্কারক। আনুমানিক বাংলা ১৩০১/খৃ. ১৮৯৪ সনে সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাং ১৩৮৩/খৃ. ১৯৭৬ সনে ময়মনসিংহে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেইখানকার জামেআ ইসলামিয়া প্রাঙ্গণে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। দীনী শিক্ষা লাভের প্রবল স্পৃহা তাঁহার মধ্যে বাল্যবয়স হইতেই পরিলক্ষিত হয়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উত্তর ভারতের মুরাদাবাদ গমন করেন। তথা হইতে রামপুর ও পরে প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল-উলুম দেওবন্দ (দ্র.) হইতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত হাদীছ ও তাফসীরশাস্ত্রে উচ্চ সনদ লাভ করেন। সেইখানে তিনি 'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও 'আল্লামা শাব্বীর আহমাদ 'উছমানী (দ্র.)-র মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী বিষয়াদির বিশেষজ্ঞগণের সাহচর্য লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর দীর্ঘদিন সিলেট ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। অতি প্রখর স্মরণশক্তিবলে অধ্যাপনার কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাত্র তিন মাস সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফ্জ করিয়াছিলেন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাবী (দ্র.)-র তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তিনি তাসাওউফের তালীম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট খলীফাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সেই যুগে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পূর্বস্থ ভাটি ও হাওর অঞ্চল শিক্ষাদীক্ষায়, বিশেষত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাদপদ ছিল। কিশোরগঞ্জ মহকুমার কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির আমন্ত্রণে ও তাঁহার মুরশিদ মাওলানা থানাবীর অনুমতিক্রমে তিনি কিশোরগঞ্জে চলিয়া আসেন এবং সেখানে শিক্ষা দান ও সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কিশোরগঞ্জ শহরে একটি সুবৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় এই মসজিদটি রক্ষাকল্পে কয়েক জন মুসলিম শহীদ হন। এই কারণে এই মসজিদটি আজও 'শহীদী মসজিদ' নামে পরিচিত। প্রতিদিন ফজরের পরে ইহাতে তিনি ধারাবাহিকভাবে কুরআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করিতেন। কিছুদিন পর তিনি সেই মসজিদ সংলগ্ন স্থানে জামেআ ইমদাদিয়া নামে উচ্চ মানের একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। সম্ভবত বাংলাদেশে দেওবন্দী নিসাব অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জামেআর পাঠ্যসূচীতেই বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেকারত্ব তাঁহাকে খুবই পীড়া দিত। তাহাদেরকে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশে তিনি জামেআ ইমদাদিয়ার পাঠ্যক্রমে সেলাই, বয়ন, টাইপ রাইটিং; টেলিগ্রাফী ইত্যাদি কারিগরী ও অর্থকরী শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে প্রবল বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাব সংগ্রহ করিয়া জামেআ ইমদাদিয়ার গ্রন্থাগারকে তিনি আকর্ষণীয় গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের পরিধি ছিল খুবই সংকীর্ণ। এই অভাব পূরণের উদ্দেশে তিনি "গবেষণা ও প্রচার দফতর" নামে আলাদা একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ হইতে "আল-মুনাদী" নামে বাংলায় একটি ইসলামী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় এবং কয়েকটি গবেষণামূলক পুস্তক রচিত হয়। তাঁহার উৎসাহে আরও বহু ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। বাংলাদেশের প্রায় তিন সহস্র কওমী (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত) মাদ্রাসাকে একই কেন্দ্রের আওতাভুক্ত করিয়া উহাদের পাঠ্যক্রম, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির মান উন্নয়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টা তিনিই চালাইয়া গিয়াছিলেন। মূলত তাঁহারই প্রচেষ্টার ধারা অনুসারে ১৯৭৮ সনে 'বিফাকুল মাদারিসিল কাওমিয়া আল-আরাবিয়া' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাজনীতিকেও তিনি এড়াইয়া চলেন নাই। তিনি ইহাকে 'ইবাদতের ন্যায় মনে করিতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হইতে শুরু করিয়া তাঁহার ইসলামী দৃষ্টিভংগীর সামঞ্জস্যবিশিষ্ট প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জমীয়তে উলামায়ে ইসলাম পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে ইহার অধীনে তাঁহারই নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের সময় 'যুক্তফ্রন্ট' নামক সংগঠনের একটি শক্তিশালী অঙ্গদল হিসাবে নেজামে ইসলাম দল সক্রিয় থাকে। ঐ সময় তিনি তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এক সময় এই দলের নেতা চৌধুরী মুহাম্মাদ 'আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৬ সনে সংবিধান প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপক পরিষদে তাহা গৃহীত হওয়ার পিছনে মাওলানার অবদান অনস্বীকার্য।

উক্ত সংবিধানে যে কতগুলি মৌলিক ইসলামী ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাঁহার পিছনে মাওলানার যথেষ্ট অবদান ছিল।

তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী, সময়নিষ্ঠ ও সকল কাজে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাহ্র পাবন্দ ছিলেন। সফরে বা গৃহে সকল অবস্থাতেই তিনি সকল দায়িত্ব পালন করিয়াও যিকর, সালাত, তিলাওয়াত ইত্যাদি রূহানী উন্নতিমূলক নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসরণ করিতেন। মাওলানার পুত্র জামেআর বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা আজহার আলী আন্ওয়ার-এর নিকট পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাসাওউফ সংক্রান্ত পত্রসমূহ তাঁহার মেধা ও জ্ঞানের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁহাকে প্রায় তিন বৎসর বিনা বিচারে অন্তরীণ থাকিতে হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অত্যধিক পরিশ্রম ও দীর্ঘ কারাভোগের দরুন তাঁহার স্বাস্থ্য

ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেন। জীবনের শেষ ভাগ তিনি ময়মনসিংহ শহরের 'জামেআ ইসলামিয়া' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার পিছনে ব্যয় করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধকারের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

আতা, (ATA) ঃ তুর্কী শব্দ, অর্থ "পিতা" এবং 'পূর্বপুরুষ' (তু. আতা সোযু কথাটির ব্যবহার, 'প্রবাদ') ওগুযদের মধ্যে আতা শব্দটি অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিদের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করা হইত। এই শব্দটির উদ্ভূত অর্থ ঃ "জ্ঞানী", এমনকি "পূতচরিত্র" ও "সম্মানিত"।

(E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

'আতা (عطاء) ঃ "দান", ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের বৃত্তি অর্থে এবং পরবর্তী সময়ে সৈন্যদের বেতন অর্থে শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হইত। মুসলিম বিশ্বের বেতন ব্যবস্থার ইতিহাস বর্ণনা এখানে সম্ভব নহে, বর্তমান প্রবন্ধে ইহার মোটামুটিভাবে একটি সাধারণ বিবরণ দানের চেষ্টা করা হইবে।

'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) প্রবর্তিত বৃত্তি সংস্থা হইতে ইহার ঐতিহ্যগত সূচনা। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ সকল যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের অংশ ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন না। সদ্যগঠিত খিলাফাতের ধনভাণ্ডারে প্রচুর কর সরবরাহের ফলে এক সুনিয়ন্ত্রিত অনুদান ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হয়। ইহাকে মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণ প্রথম দীওয়ান সংগঠনের কারণস্বরূপ ও ফায়-এর ব্যবহার সম্পর্কে পরবর্তী কালে তাঁহাদের উদ্ভাবিত নীতিমালার কাঠামো হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বিভিন্ন বিবরণ একটি অপরটির সহিত সঙ্গতিহীন। কারণ উহাদের প্রতিটিতে পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত একই ইচ্ছা প্রতিফলিত আর তাহা হইল ঃ 'উমার (রা)-এর সিদ্ধান্তকে নজীর হিসাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা যাহা প্রকৃতপক্ষে পূর্বে বিদ্যমান ছিল না।

অবশ্য প্রধান রূপরেখা স্পষ্ট, আর তাহা হইল ঃ ধর্মযুদ্ধের কারণে নিজেদের বাড়ী-ঘর হইতে বিতাড়িত সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যা (প্রাথমিক যুগের মুহাজির, আনসার ও পরবর্তী কালের যুদ্ধরত ব্যক্তিগণ) মহিলা, শিশু, ক্রীতদাস ও মুক্তদাসগণ (ইহারা সংখ্যায় অধিক ছিল না এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদেশী নহে)-এর মধ্যে মহানবী (স)-এর সহিত আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার ক্রমানুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় বৃত্তি বিতরণ করা হইত, কিন্তু বেদুঈন ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী যাহারা 'আরব ও অন্যান্য স্থানে ইসলামের সামরিক বিস্তারের ফলে তেমন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তাহারা এই বৃত্তি প্রাপকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বৃত্তির পরিমাণ ২০০ হইতে ১২০০০ দিরহাম পর্যন্ত ছিল। তবে পুরুষদের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বার্ষিক ৫০০ হইতে ১০০০ দিরহাম লাভ করিত। বৃত্তি লাভের যোগ্য প্রার্থীদের নাম তালিকাভুক্তকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসের জন্য একটি পৃথক দফতরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে প্রথম দীওয়ান গঠিত হয় এবং বৃত্তি প্রাপকদেরকে একজন 'আরীফ (দ্র.)-এর কর্তৃত্বাধীনে ইরাফা নামক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। Caetani এই সকল প্রশ্নের সহিত সম্পর্কিত সকল উদ্ধৃতি তাঁহার Annali, ৪খ., ৩৬৮-৪১৭-এ ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসঙ্গে বর্তমানে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিও সংযোজন করা যাইতে পারে ঃ (১) আবূ 'উবায়দ ইবন সাললামকৃত 'কিতাবুল আমওয়াল', ২২৩-৭১; (২) S. Trion প্রণীত Notes on the Muslim System of Pension, in BSOAS, ১৯৫৪ খৃ., ১৭০-২-এ উল্লিখিত সূত্রসমূহ। উহাতে পরবর্তী এক শত বৎসরের বৃত্তি দান ব্যবস্থার বর্ণনাও রহিয়াছে।

'উমারের খিলাফতকালে অবস্থাধীনে উদ্ভাবিত এই ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে অপরিবর্তিত থাকিতে পারে নাই। যথা (১) বংশের শাখা বিস্তার, (২) বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ, (৩) রাজ্য জয়ে মন্থর গতি ও যুদ্ধ হইতে প্রাপ্ত সুবিধাদি হ্রাস, (৪) উমায়্যা আমলে (ও পরবর্তী কালে আব্বাসী আমলে) সামরিক নীতিতে ক্রমবর্ধমান জটিলতা, সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান পেশাদারী ও প্রগতিশীল "অনারবায়ন"-এর ফলে অনেক পরীক্ষামূলক ও অনিয়মিত পদ্ধতি অবলম্বন, একদিকে মহানবী (স)-এর বংশধরদের ('আলাবী ও আব্বাসী শাখার) জন্য নির্দিষ্ট কর্ম ব্যতীত সম্মানজনক সংরক্ষিত বেসামরিক বৃত্তি (আমরা অবশ্য এখানে কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি না; দ্র. রিয্ক্') এবং অপরদিকে সেনাবাহিনীর বেতন সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে, দীওয়ান-এ তালিকাভুক্ত ও নিয়মিত বেতনভুক পেশাদার সৈনিক শ্রেণী ও দীওয়ানে তালিকাভুক্ত নহে এবং কেবল সক্রিয় অবস্থায় স্বল্প পরিমাণ ভাতা লাভকারী সাময়িক স্বেচ্ছাসেবী শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করা হইত। অপরদিকে উমায়্যাদের আমলে 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীযের স্বল্পকালীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও (দ্র. Wellhausen, Arabische Rich, 186-7) মাওয়ালীদেরকে যাহারা সে সময় সংখ্যায় ছিল বেশী এবং বেশীর ভাগ ছিল ইরানী, প্রকৃতপক্ষে বেতনের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়। 'আব্বাসীদের আমলে খুরাসানীগণ ও পরবর্তী কালে তুর্কী, দায়লামী প্রমুখ পেশাজীবী হিসাবে প্রায় একমাত্র গোষ্ঠী ছিল যাহারা ভাতা পাইত এবং পরিশেষে আরবগণ অন্তত পূর্বাঞ্চলে, ৩য়/৯ম শতাব্দীতে রেজিষ্ট্রার হইতে নিয়মানুগভাবে অপসারিত হয়। প্রাথমিক যুগে মূলত প্রাদেশিক ভিত্তিতে অথবা সিরিয়া ও স্পেনে, জুন্দ্ (দ্র.) নামে অভিহিত সামরিক জেলার ভিত্তিতে আদায়কৃত স্থানীয় কর হইতে এই অবসর ভাতা প্রদান করা হইত। কিন্তু 'আব্বাসী আমলে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এই সকল অর্থের অধিকাংশই ট্রেজারী [বায়তুল মাল (দ্র.) হইতে প্রদান করা হইত অথবা উহার সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইত।

যদিও বেতনের পরিমাণ বেশ ওঠানামা করিত বলিয়া মনে হয়, তবুও অনুমিত হয়, 'আব্বাসী শাসনের দ্বিতীয় শতাব্দীতে একজন পদাতিক সৈন্যের বার্ষিক বেতন ছিল ১০০০ দিরহাম বা ৭০ দীনার, যাহা বাগদাদের একজন মজুরের মজুরির তিন গুণ ছিল এবং একজন অশ্বারোহীর বেতন একজন পদাতিক সৈন্যের বেতনের দ্বিগুণ ছিল। সেনানায়কগণ ও বিশেষ কর্তব্যরত বাহিনী স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশী বেতন পাইত। কু'দামা ব্যবস্থাটির কার্যকারিতা, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্য, নামের তালিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিভিন্ন সময়ে যেইভাবে বিভিন্ন পরিমাণে নানা রকমের

দেয় পরিশোধ করা হইত তৎসম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন (W. Hoenerbach, Zur Heeresverwaltung der Abbasiden, in Isl., 1949)। কিন্তু কুদামার সময়ের পূর্ব হইতেই নিয়মিত বেতন ছাড়াও বিশেষ উপলক্ষে, বিশেষত সিংহাসনরোহণ উপলক্ষে ভাতা দেওয়া হইত এবং ইহা অনুমিত হয়, সকল সময়ই মূল বেতন ছাড়াও খাদ্যদ্রব্য ও সাজসজ্জার সামগ্রী বিতরণ করা হইত। অস্ত্র ক্রয় সকল সময় সরকারী অর্থেই করা হইত। সুতরাং সেনাবাহিনী সর্বদা ব্যয়বহুল ছিল। সামরিক কৌশল অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিলে, ভারী অশ্বারোহী বাহিনী ও অবরোধ অভিযান বৃহত্তর ভূমিকা পালন করিতে থাকিলে সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সরকারকে উহার সক্রিয় বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস করিতে নিবৃত্ত রাখে এবং তাহারা সরকারের জন্য অপরিহার্য ইহা মনে করিয়া সৈন্যবাহিনী তাহাদের দাবি বৃদ্ধি করিত। ফলে নিয়মিত বেতন প্রদান ট্রেজারীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিত। বকেয়া বেতন প্রদানের বিনিময়ে বেতন বৃদ্ধি দ্বারাই সেনাবাহিনীর অসন্তোষ দূর করা হইত এবং এইভাবে এক অশুভ আবর্তচক্রের সৃষ্টি হইত।

৪র্থ/ ১০ম শতাব্দী হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসার ফলে নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে তাহাদের নির্দিষ্ট এলাকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হইত। এই কারণে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ এক এক এলাকা হইতে যে পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করিত উহা তাহাদের প্রাপ্য বেতনের সমান হইত (দ্র. ইক্‌'তা')।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ; (২) আরও তু. 'জায়শ' প্রবন্ধ; (৩) 'উছমানী সেনাবাহিনীর বেতন সম্পর্কে দ্র. 'উলূফা প্রবন্ধ।

Cl. Cahan (E.I.[2]) / মু. আবদুল মান্নান

'আত'া ইব্‌ন আবী রাবাহ্ (عطاء بن ابى رباح) ঃ (র) মক্কার একজন বিখ্যাত প্রাচীন ফকীহ। তাঁহার পিতামাতা নুবিয়া-র বাশিন্দা ছিলেন। 'আত'া' ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কায় লালিত-পালিত হন। তিনি আবূ মায়সারা ইব্‌ন আবী খুছায়ম আল-ফিহরী পরিবারের মাওলা (মিত্র) ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন (৮৮ বৎসর; কাহারও মতে ১০০ বৎসর) এবং ১১৪/৭৩২ অথবা ১১৫/৭৩৩ সালে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। 'আত'া' মক্কার একমাত্র ফকীহ্ যিনি আমাদের নিকট নামসর্বস্ব নহেন। তাঁহার প্রতি আরোপিত মতবাদের বিশ্লেষণ করিলে আমরা পরবর্তী অলীক (موضوع) সংযোজন পৃথক করিয়া নির্ভরযোগ্য সারমর্ম উদ্ধার করিতে সক্ষম হই। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ রীতি অনুযায়ী তিনি বিধিবদ্ধ কিয়াস ও ইসতিহ্‌সান প্রয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব মতামত (রায়) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেন না। অতএব, তিনি রায় মানিতেন না, পরবর্তী কালের এইরূপ বক্তব্য সঠিক নহে। খোদ রাসূলুল্লাহ (স) হইতে শ্রুত হাদীছ ও সাহাবীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাদীছকে 'আত'া' আইনগত যুক্তি হিসাবে কত দূর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তিনি উহা ব্যবহার করিয়া থাকিলে সম্ভবত 'মুরসাল' (দ্র.) হাদীছ ব্যবহার করিয়াছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামী আইনের দ্রুত বিকাশের ফলে 'আত'ার কোন কোন স্বাতন্ত্র্যসূচক মতামত তাঁহার জীবনের শেষের দিকে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত এই কারণে তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন নবীন ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ হইতে বিরত থাকে এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীছগুলি দুর্বল (ضعيف) বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিরূপ মন্তব্যে তাঁহার যে ক্ষতি হয় তাহা এইভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদূরিত হয় যে, পরবর্তী কালে যখন হাদীছ সম্বন্ধে মুহাদ্দিছগণের মনোভাবের পরিবর্তন হয় তখন 'আত'া' সম্বন্ধে বলা হইতে থাকে, সাহাবীদের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং এইরূপ সাহাবীর সংখ্যাও অনেক। তাহা সত্ত্বেও কতিপয় মুসলিম সমালোচক বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, উম্মু সালামা (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর নিকট হইতে 'আত'া' হাদীছ শ্রবণ করেন নাই এবং 'আইশা (রা)-এর সহিত তাঁহার সরাসরি সাক্ষাতের ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞগণ আইন সম্বন্ধীয় মাসাইল-এর প্রতি অধিকতর যত্নবান হইতে লাগিলেন। 'আত'া-র প্রামাণ্য মতবাদে ইহার সমর্থন মিলে। হাজ্জের অনুষ্ঠানমালা মক্কার 'আলিমগণের একটি প্রিয় বিষয় ছিল, এই ধারণা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন নাই।

'আত'া-র জীবদ্দশাতেই তাঁহার খ্যাতি মক্কার বাহিরে দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। আবূ হানীফা (র) বলেন, তিনি 'আত'ার দারস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতেন। ইহাই ফিক্‌হশাস্ত্রের পারিভাষিক শিক্ষা সম্পর্কিত সম্ভবত সর্বপ্রথম প্রামাণ্য দলীল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৫খ., ৩৪৪ প. ; (২) আবূ হাতিম আর-রাযী, কিতাবুল-জারহ্' ওয়া'ত-তা'দীল, ৪খ., হায়দরাবাদ ১৩৬০ হি. ৩৩০ প.; (৩) আবূ নুআয়ম, হি'লয়াতুল-আওলিয়া , কায়রো ১৯৩৩, ৩খ., ৩১০ প. ; (৪) আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী, ত'াবাক'াতুল ফুক'াহা, বাগদাদ ১৩৫৬ হি., ৪৪ প.; (৫) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া কায়রো ১৩৫১-৮ হি., ৯খ., ৩০৬ প. ; (৬) ইব্‌ন হ'াজার আল-আস্‌কালানী, তাহ্‌যী'বুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৭খ., ১৯৯ প.; (৭) J.Schacht, The Origins of Muhammadan Juris-prudence, Oxford 1953, 250 প.।

J. Schacht (E.I.[2]) / মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আত'া' ইব্‌ন আহমাদ (عطاء بن أحمد) ঃ জন্ম ১৩৬২ খৃ. পারস্যের জ্যোতির্বিদ ও আরবী লেখক, পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মাদ 'আত'া' ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাজা গাযী আস্-সামারকান্দী। ইউয়ান রাজবংশের মোঙ্গল রাজপুত্র (চীনা নাম চেন-হি-উ-সিং)-এর জন্য চান্দ্র-তালিকা সংযুক্ত জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মূল পাণ্ডুলিপিখানা প্যারিসে (Bibliotheque Nationale) সংরক্ষিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোয কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১২২।

(সংকলিত)

'আতা বে (عطا بے) ঃ ত'ায়্যার যাদা 'আতাউল্লাহ্ আহমাদ 'আতা বে নামে পরিচিত, 'উছমানী আমলের একজন তুর্কী ঐতিহাসিক। তিনি সুলতানী প্রাসাদের একজন কর্মচারীর পুত্র এবং ১২২৫/ ১৮১০ সনে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলতানী প্রাসাদেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৯৩/১৮৭৬ সনে তিনি মক্কার হারাম এলাকার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইয়া হিজায গমন করেন। ১২৯৪/১৮৭৭ অথবা ১২৯৭/১৮৮০ সনে তিনি মদীনা মুনাওওয়ারা মৃত্যুবরণ করেন। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ তারীখ-ই 'আতা' (ইস্তাম্বুল ১২৯১-৯৩/১৮৭৪-৭৬) তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এই পুস্তকের জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ, গ্রন্থকার ঊনবিংশ শতাব্দীর সুলতানী অন্তঃপুরের ব্যবস্থাপনা রীতিনীতি, ব্যক্তিবর্গ ও নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 'মিল্লাত' গ্রন্থাগারে তাঁহার দীওয়ানের একটি স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Babinger, ৩৬৬-৭; (২) সিজিল্ল-ই উছমানী, ৩খ., ৪৮১, ৪৮২; (৩) Othmanli Muellifleri, ৩খ., ১০৮।

(Ed. E.I.[2]) / আবদুল হক ফরিদী

'আতা বে, মুহাম্মাদ (محمد عطا بے) ঃ (১৮৫৬-১৯১৯ খৃ.) একজন 'উছমানী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সরকারী কর্মকর্তা। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর তিনি অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন এবং এক সপ্তাহের জন্য অর্থমন্ত্রী হন। মেফ্খারী ও 'আতা' ছদ্মনামে তিনি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে অনেক নিবন্ধ প্রকাশ করেন এবং ইক্তিতাফ নামে তিনি একটি সাহিত্য সংকলনও প্রণয়ন করেন যাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়। হ্যাম্মারের 'উছমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাসের তুর্কী অনুবাদ তাঁহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জে. জে. হেলার্টের ফরাসী অনুবাদের ভিত্তিতে তাঁহার এই অনুবাদ ১৩২৯/১৯১১ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হইতে শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটি পনর খণ্ডে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেবল দশ খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৭/১৯১৮ সালে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Babinger, 400-1; (2) Othmanli Muellifleri, ৩খ., ১১০-১।

Ed., (E.I.[2]) / আব্দুল মান্নান

'আতা' মালিক জুওয়ায়নী (দ্র. আল-জুওয়ায়নী)

'আতা'ঈ, 'আতা' উল্লাহ (عطائی، عطاء الله) ঃ ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন পীর 'আলী ইব্ন নাসূহ', যিনি নাওঈ/যাদাহ, 'আতাঈ নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একজন প্রখ্যাত তুর্কী কবি। তাশকোপ্রুযাদাহ তুর্কী 'উলামা' (علماء) ও সূফী-দরবেশদের জীবন বৃত্তান্তের যে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তিনি উহা সমাপ্ত করেন (মুহি'ব্বী, খুলাস'া, ৪খ., ২৬৩, ভুলবশত তাঁহার নাম মুহাম্মাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। তিনি শাওওয়াল ৯৯১/১৫৮৩ সালে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানে তাঁহার পিতা (যিনি নাওঈ কবিনাম গ্রহণ করিয়া একজন বিশিষ্ট কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন এবং তিনি ৯৯৮ হি. হইতে ১০০৩ হি. পর্যন্ত তৃতীয় মুরাদ-এর হতভাগ্য পুত্রদের গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন) সেই সময় জা'ফার আগা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার মাতা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নিশান্জী মুহাম্মাদ পাশার কন্যা (সিজিল্ল-ই'উছ'মানী, ৪খ., ১৩১)। তিনি কাফযাদাহ্ ফায়দুল্লাহ্ আফান্দী (কবিতা সংকলক ফায়দী-র পিতা) এবং আখী-যাদাহ 'আবদুল হালীম আফান্দীর নিকট পড়াশুনা করিয়া ইস্তাম্বুলে জানবাযিয়্যা মাদ্রাসার অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন (সাফার ১০১৪/১৬০৫)। তবে শীঘ্রই তাঁহাকে উক্ত পেশা পরিত্যাগ করিয়া বিচার বিভাগে যোগদান করিতে হয় এবং ১০১৭ হি. শাব এলাকায় লোফ্জার কাদী নিযুক্ত হন।

তিনি রুমিলি নামক স্থানে এই ধরনের বহু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (শায়খী এই সকল পদ সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থে অনেক বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন)। তাঁহার সর্বশেষ পদ ছিল উস্কুবে, উহা হইতে তাঁহাকে ১০৪৪/১৬৩৫ সালে বরখাস্ত করা হয়। পরে তিনি ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে ১ জুমাদাল 'উলা, ১০৪৫-এ ইনতিকাল করেন ('উশশাকী যাদাহ্, পত্র ২৬ খ.; হ'াজ্জী খলীফা, ১খ., ৭২৪; ঐ, ফায্লাকা, ২খ., ১৬৮; ভুলবশত মৃত্যু তারিখ ১০৪৪ সাল বলিয়া উল্লেখ করেন। বৈশিষ্ট্যগতভাবে অনির্ভরযোগ্য রিদা-র মতে মৃত্যু তারিখ ১০৪৬ হি.) এবং তাঁহাকে শায়খ ওয়াফা' মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁহার পিতার কবরের পাশেই দাফন করা হয়। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনিও ছিলেন বিশিষ্ট 'উলামা'র অন্যতম (ফাযলাকা, পূ. স্থা.)।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ হইল—হ'াদাইকুল' হাকাইক ফী তাকমীলাতিশ-শাক'াইক' (রাবীউছ ছানী ১০৪৪-এ সমাপ্ত এবং ইস্তাম্বুলে ১২৬৮ সালে মুদ্রিত)। উহাতে তিনি তাঁহার সময়কাল পর্যন্ত সকল তুর্কী 'উলামা' ও দরবেশদের জীবন-কাহিনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বে তাশকোপ্রূযাদাহ তদীয় 'আরবী গ্রন্থ আশ-শাক'াইকু'ন-নু'মানিয়াতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (Brockelmann, ii, 425)। শেষোক্ত পুস্তকখানার ন্যায় প্রথমোক্ত পুস্তকখানায়ও মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত এইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। যিনি যেই শাসকের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাঁহার জীবন-চরিত সেই শাসকের আমলেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ রাজত্বকাল হইল ৪র্থ মুরাদ-এর। অবশ্য বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থখানা তুর্কী ভাষায় রচিত। উহার বিবরণসমূহ ইতোমধ্যে আরও অধিক সঠিক ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রায়শই উহাতে 'আতাঈর নিজস্ব মন্তব্যসমূহের উল্লেখ করত তাঁহার স্মৃতিচারণ করা হইয়াছে। ঠিক শাকাইক গ্রন্থের অনুবাদে মাজদী (Madjdi) যে রীতি বা ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ইহাতেও সেই একই ধারার অনুকরণ করা হইয়াছে। সাম্প্রতিক বংশধরদের নিকট এই ধারা বা রীতি মার্জিত ও রুচিকর বলিয়া বোধ না হইলেও তাঁহার সমসাময়িক লেখককুল ও বংশধরগণ উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল গ্রন্থখানার একমাত্র বৈশিষ্ট্য যাহা উহাকে একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যানপঞ্জীরূপে পরিগণিত হওয়ার অপবাদ হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। যদিও মুহাম্মাদ ফুআদ কোপরুলু নামক জনৈক আধুনিক পণ্ডিত 'আতাঈ

রচিত মাছনাবী গ্রন্থসমূহ পাঠোপযোগী বলিয়া গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তথাপি তাহার কাব্যগ্রন্থসমূহের সেই অতীত জনপ্রিয়তা আর নাই (তু. Gibb, Ottoman Poetry, ৩খ., ২৩২)। উনবিংশ শতাব্দীর 'উছমানী সমালোচকদের জন্য তাঁহার শেষোক্ত রচনাসমূহ অর্থাৎ মাছনাবীসমূহ তাঁহার রচিত 'খামসা' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার পঞ্চম অংশ হিলয়াতুল আফকার নামে অভিহিত। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার এই গ্রন্থখানা হারাইয়া গিয়াছে কিংবা বিদ্যমান নাই বলিয়া সর্বত্র একটা ধারণা ছিল। তাঁহার জন্য চারিখানা মাছনাবী গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য ও তাঁহার দীওয়ান যাহা এখনও অপ্রকাশিত। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দ্র. Hammer-Purgstall, Gesch. Osman. Dichtkunst, ৩খ., ২৪৪-২৮৩। ইহা উল্লেখ্য, নাফহ'াতু'ল-আযহার নামক পুস্তকখানা সম্পাদনার তারিখ সংক্রান্ত তথ্য এখানে ১০২০ হি. বলিয়া পরিবেশিত হইয়াছে, অথচ A. S. Levend উহা ১০৩৪ হি. বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আর একটি গ্রন্থ যাহা তাঁহার প্রণীত বলিয়া গণ্য, তাহা একটি আইন সংক্রান্ত পুস্তক আল-ক'াওলুল হ'াসান ফী জাওয়াবিল-ক'াওলি লিমান। মনে হয়, ইহা তাঁহার সমসাময়িক মুল্লাজীক আহমাদ নামক লেখকের একটি অসম্পূর্ণ পুস্তকের জওয়াব (তু. হাদাইক ৬৬৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Babinger (171) ও Brockelmann (11, 427) কর্তৃক উল্লিখিত পুস্তকাবলী ছাড়াও Behcet Gonul কর্তৃক বর্ণিত কতিপয় গ্রন্থের নামও এখানে সংযোজন করা যাইতে পারে, যথাঃ (১) Istanbul Kutuphanelerinde al-Shakai'k al-Numaniyya Tercume ve Zeyilleri, Turkiyat Mecmuasi, vii-vii, cuz 2 (1945), 161; (২) শায়খী, ওয়াকাইউল ফুদালা (Sulaymaniyye, Beshir Aga, 479) পত্র ৩a; (৩) রিয়াদী, রিয়াদুশ-শু'আরা (Nuruosmaniye, পত্র ১১৬b) (৪) 'উশশাকী যাদাহ-র য'ায়ল-ই শাক'াইক' গ্রন্থটি মুরাদ মোল্লার পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল, nr, ১৪৩২,পত্র ২৬a; (৫) Sadeddin Nuzhet Ergun, Turk Sairleri, ২খ., ৫৪১-৫০। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থখানাই তাঁহার কাব্য সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করে। উহাতে শায়খী, রিয়াদী ও রিদা প্রদত্ত বর্ণনাসমূহেরও উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া উহাতে মুহাম্মাদ ফুআদ কোপরুলুর মতামতসমূহও লিপিবদ্ধ আছে; (৬) খামসা সম্বন্ধে তু. Agah Sirri Levend, Ataynin Hilye-tul-Efkar'i, (আনকারা ১৯৪৮); তবে এই গ্রন্থের লেখক আতাঈর মৃত্যু সন ১০৪৬ হি. বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

J. Walsh (E.I.²) /এ. এইচ. এম. ফারুক

আতাউল্লাহ ইফিনদী (দ্র. শানীযাদেহ)

আতাউর রহমান খান (عطاء الرحمن خان) ঃ (১৯০৭-১৯৯১ খৃ.) আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধান মন্ত্রী। আতাউর রহমান খান ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার পঙ্কোজ স্কুল হইতে প্রবেশিকা (১৯২৪ খৃ.), জগন্নাথ কলেজ হইতে এফ.এ. (১৯২৭ খৃ.) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে বি.এ. (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৩০ খৃ.)। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এল. ডিগ্রী (১৯৩৬ খৃ.) অর্জন করিয়া ঢাকা জেলা জজকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন (১৯৩৭ খৃ.)। আতাউর রহমান খান ১৯৪২ খৃ. মুন্সেফ পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। দুই বৎসর এই পদে চাকুরী করিয়া তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন। প্রজা সমিতিতে যোগদানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে এবং এক সময় তিনি ঢাকা জেলা প্রজা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং জেলা কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৯ খৃ. মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া সংগঠিত বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৫৬ খৃ. হইতে ১৯৬৪ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই দলের সহসভাপতি ছিলেন। আতাউর রহমান খান ১৯৫২ খৃ. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসাবে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৪ খৃ. নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠিত যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের শরীক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তিনি পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের এ.কে. ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় তিনি বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৫ খৃ. তিনি পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আতাউর রহমান একই সাথে প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা (১৯৫৫-৫৬ খৃ.) এবং গণপরিষদের বিরোধী দলীয় উপনেতা ছিলেন। ১৯৫৬ খৃ. আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রীসভায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। যুক্তফ্রন্টের শরীক দলের মধ্যে কোন্দলের কারণে এই মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৫৮ খৃ. এপ্রিল মাসে পুনরায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং এই সরকার দুই মাস কাল স্থায়ী হয়। ১৯৫৮ খৃ. আগস্ট মাসে তিনি তৃতীয়বার পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ খৃ. সামরিক আইন জারী হইবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬২ খৃ. এইচ.এম. সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা হিসাবে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৬৯ খৃ. তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবি সমিতির সভাপতি এবং ১৯৭০ খৃ. বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খৃ. তিনি জাতীয় লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৭০ খৃ. অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার দল পরিশেষে অংশগ্রহণে বিরত থাকে। ১৯৭১ খৃ. তিনি পাকবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং পাঁচ মাস কারাভোগের পর মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৩ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাতীয় লীগের প্রার্থী হিসাবে ধামরাই আসন হইতে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫ খৃ. আওয়ামী লীগ কর্তৃক সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করিয়া একটিমাত্র দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা

হইলে তিনি তাহাতে যোগ দেন। বাকশাল বিলুপ্তির পর তিনি তাঁহার জাতীয় লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৯৭৮ খৃ. গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের অংশ হিসাবে আতাউর রহমান খান আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করেন। ১৯৭৯ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে ধামরাই আসন হইতে জাতীয় লীগের প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮২ খৃ. দেশে সামরিক আইন জারী হইলে কিছু দিন তিনি ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এক সময় তিনি এইচ.এম. এরশাদ সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। ১৯৮৪ খৃ. মার্চ মাসে তিনি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৫ খৃ. জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন।

১৯৫২ খৃ. বেইজিং (পিকিং)-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের উপনেতা হিসাবে যোগদান করেন। তাহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রহিয়াছে ওকালতির দুই বছর (১৯৬৩ খৃ.) স্বৈরাচারের দশ বছর (১৯৬৯ খৃ.), প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস (১৯৮৭ খৃ.) ও অবরুদ্ধ নয় মাস (১৯৯০ খৃ.)। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করিলে ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৭২ খৃ. ,১খ., পৃ. ১২২; (২) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১ম সং, ১খ., পৃ. ১৪৭; (৩) দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, তাং ০৭-১২-২০০৩ খৃ.; (৪) দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, তাং ০৭-১২-২০০৩ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভুঞা

'আত'াউল্লাহ শাহ বুখারী (عطاء الله شاه بخارى) ঃ মুসলিম সমাজ সংস্কারক ও ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা। ১৮৯১ খৃ. বিহারের রাজধানী পাটনাতে জন্ম। তাঁহার পিতা যিয়াউদ-দীন সায়্যিদ আহমাদ ইন্দারোবীর কন্যা সায়্যিদা ফাতি'মা ইন্দারোবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 'আত'াউল্লাহর শৈশবে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। শিশু 'আত'াউল্লাহ প্রধানত তাঁহার নানা-নানীর দ্বারাই প্রতিপালিত হন। 'আত'াউল্লাহ শাহ-এর পূর্বপুরুষগণ বুখারা হইতে প্রথমে কাশ্মীরে আগমন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা পাটনাতে আসেন এবং পাটনা হইতে পাকিস্তানের গুজরাটে গিয়া বসবাস করেন। তাঁহাদের পরিবার ছিল মধ্যবিত্ত। তাঁহার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। 'আত'াউল্লাহ শাহ বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার চারটি সন্তান ছিল।

'আত'াউল্লাহ শাহ কখনও কোন আধুনিক স্কুল বা কলেজে পড়েন নাই। তাঁহার নানা-নানী উভয়েই ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। বাড়িতেই তিনি ঐতিহ্যগত শিক্ষা লাভ করেন। নানীর নিকটে তিনি 'আরবী ও ফার্সী এবং নানার নিকট উর্দূ শিখেন। নানা-নানীর মৃত্যুর পর তিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরে গমন করেন এবং মাওলানা নূর আহমাদ, মাওলানা গুলাম মুযাফী কাসিম এবং মুফতী মুহাম্মাদ হুসায়ন প্রমুখ উসতাদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শাহ 'আজীম আবাদীর দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট উর্দূ কবিতার রীতি পদ্ধতি শিখিয়াছিলেন। তিনি কখনও বিদেশ ভ্রমণ করেন নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ব্যাপকভাবে সফর করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আযাদ, ডাঃ আনসারী, মাওলানা শেওকত আলী ও আহরার নেতাগণের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

আতাউল্লাহ শাহ অমৃতসরের একটি ছোট মসজিদে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত সেখানে তিনি কুরআন শিক্ষা দান করেন। ১৯২১ খৃ. তিনি জাতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা শেওকত 'আলী পাঞ্জাব খেলাফত কমিটি বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে 'আতাউল্লাহ শাহ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-এর সহায়তায় মাজলিস-ই আহরার ইসলাম হিন্দ পার্টি গঠন করেন এবং নিজে উহার প্রথম সভাপতি হন। সেদগঞ্জ গুরুদ্বার মামলার ঘটনায় তাঁহার সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য এবং বিদ্বেষমূলক রঙ্গিলা রসূল গ্রন্থের প্রকাশক রাজপালকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিয়া 'আত'াউল্লাহ শাহকে এক বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয় (১৯২৭)। ১৯৩০ খৃ. তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিলে আগস্ট মাসে বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর হইতে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ছয় মাসের জেল দেওয়া হয়। মুক্তি লাভের পরেই তিনি কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। পুনরায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং দুই বৎসরের জেল দেওয়া হয়। ১৯৩২ খৃ. তিনি মুক্তি লাভ করেন। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মীর্যা গুলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা বক্তৃতা করিবার অপরাধে বৃটিশ সরকার পুনরায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার ঠিক পূর্বে 'আতাউল্লাহ শাহ পাঞ্জাববাসীকে বৃটিশ সৈন্যদের যোগদান না করিবার জন্য আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ফলে ১৯৩৯ খৃ. পাঞ্জাব সরকার তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া পুনরায় ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে। দেশ ভাগ হইবার পরে তিনি পাকিস্তানে গমন করেন এবং মুলতানে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানে ১৯৬৭ খৃ. ২১ আগস্ট তারিখে ৭১ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারকরূপে 'আতাউল্লাহ শাহ-এর জীবনব্যাপী ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বা তাহা প্রধানত পাঞ্জাবের মুসলিম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম পীর-ফকীরগণ যে সকল কুসংস্কারমূলক ধর্মবিশ্বাস প্রচার করিয়া থাকে তিনি সে সকল বিদূরিত করিবার এবং মুসলমানগণের মধ্যে বিরাজিত অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আহ্বান জানান। তিনি গ্রামের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী হিন্দু কুশীদজীবী (সাহুকার)-দের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুসলমানগণকে ব্যবসায়ের প্রতি দীর্ঘকালের অনীহা ত্যাগ করিবার ও অধিক সংখ্যায় ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইবার আহ্বান জানান। বিধবা বিবাহ ও নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা প্রদানের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার করা ছিল 'আতাউল্লাহ শাহ-এর আর এক সাফল্য। আহরার পার্টির সভাপতিরূপে তিনি অনেক স্কুল স্থাপন করেন। সেইগুলিতে ছাত্র- ছাত্রিগণকে কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান

করা হইত। তিনি বরাবর পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, উহাই ইসলামের পতনের প্রধান কারণ। নিজের সন্তানগণকে তিনি ইংরেজি স্কুলে পড়িতে দেন নাই। তিনি নিজে ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তিনি হিন্দুগণের ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় কাদিয়ানী বা আহমাদীগণের ধর্মবিশ্বাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৫ খৃ. তিনি আহমাদী বিরোধী অভিযানও পরিচালনা করিয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি কুরআনের একান্ত অনুসারী ও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি আন্তরিকতা, সততা, সংকল্প, সৎ সাহস ও ত্যাগের প্রতীক ছিলেন। দারিদ্র্যের অভিমানকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন এবং জীবনে কোনদিন কাহারও অনুগ্রহ গ্রহণ করেন নাই। সততা ও উদ্দেশ্যের অকৃত্রিমতার জন্যই তিনি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে পরিচিতি লাভ করেন। উপমহাদেশের খ্যাতনামা বহু 'আলিম তাঁহাকে আমীর-ই শারী'আত বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার মুরীদ হন।

'আত'াউল্লাহ শাহ-এর জাতীয়তাবাদী আদর্শ ছিল অহিংস এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষেরই জাতীয়তাবাদী নেতা, তাই মুসলিম লীগের পাকিস্তান ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদেশী শাসক শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র ও সংযুক্ত ভারতবর্ষকেই স্বাধীন করিবার উদ্দেশে তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস পার্টির একজন সক্রিয় সদস্যরূপে ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিনিধিরূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং সর্বত্র সকল ভারতীয়ের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনের কথা জোর দিয়া প্রচার করেন। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিবেচনা করিয়া বলিতেই হয়, 'আত'াউল্লাহ শাহ রাজনীতিবিদ যতটা ছিলেন তাহার চেয়ে বড় ছিলেন ধর্মীয় নেতা। সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁহার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বীয় সমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধন। তিনি মুসলমানগণের জন্য বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থার দাবি করিতেন। জাতীয় আন্দোলনে 'আত'াউল্লাহ শাহ বুখারীর একমাত্র অবদান হইতেছে অহিংস ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও প্রচার। তাঁহার সকল সহানুভূতি ছিল মুসলিমগণের প্রতি, কিন্তু সে সময়কার প্রয়োজন অনুযায়ী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্য চেষ্টায় নিরত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আযীযুর-রাহ'মান লুধিয়ানবী, রাঈসু'ল-আহ'রার (মাওলানা হাবীবুর রহমান-এর জীবনী), (উর্দূ), দিল্লী ১৯৬১ খৃ; (২) সারোশ কাশ্মীরী, 'আত'াউল্লাহ শাহ বুখারী (উর্দূ), লাহোর ১৯৫৪ খৃ.; (৩) নাকূ'শ, ব্যক্তিত্ব সংখ্যা, লাহোর ১৯৫৬ খৃ., সম্পা. মুহাম্মাদ তুফায়ল; (৪) নাকূ'শ, আত্মজীবনী সংখ্যা, লাহোর ১৯৬৪ খৃ., সম্পা. মুহাম্মাদ তুফায়ল; (৫) চৌধুরী খালীকুযযামান, Pathway to Pakistan, লাহোর ১৯৬২ খৃ.; (৬) ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক দফতরের কার্যবিবরণী (১৯৩০-১৯৩৬ খৃ.); (৭) Times of India, ১৯৪০-১৯৪৬ সালের সংখ্যাসমূহ; (৮) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২ (প্রবন্ধ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী)। D. Awasthi, Dictionary of the National Biography of India, Calcutta (1972) / হুমায়ুন খান

'আতাচ, নূরুল্লাহ (عاتچ نور الله) ঃ আধুনিক তুর্কীতে নূরুল্লাহ আতাচ (১৮৯৮-১৯৫৭), বিখ্যাত তুর্কী প্রবন্ধকার, সাহিত্য সমালোচক, দুই যুগ ধরিয়া (১৯৩৫-৫৫) সমসাময়িক তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকীকরণের পথপ্রদর্শক। ইস্তাম্বুলে জন্ম, সরকারী চাকুরিয়া ও লেখক মুহাম্মাদ 'আতার (১৮৫৬-১৯১৯) পুত্র। জে. ফন হ্যামার প্রণীত 'উছমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাসের (Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35)-এর (ফরাসী অনুবাদ হইতে) অনুবাদক হিসাবে সমধিক পরিচিত। ১৯৩৪ খৃ. পারিবারিক নাম প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত আতাচ তাঁহার লেখাসমূহে নূরুল্লাহ 'আতা' বলিয়া দস্তখত করেন এবং তখন আতাকে আতাচে পরিবর্তন করেন। পরে নূরুল্লাহ সম্পূর্ণরূপে বাদ দেন। তাঁহার বিভিন্ন কলমী নামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নামটি হইল কাভাফ্ওগলু (Kavafoglu)। আতাচের শিক্ষা গ্রহণ ছিল অনিয়মিত। তিনি বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করেন (চার বৎসর গালাতাসরায় স্কুলে এবং পরে সাহিত্য অনুষদে) এবং কোথাও শিক্ষা সমাপ্ত করেন নাই। যদিও তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কিছুকাল সুইজারল্যান্ডে অতিবাহিত করেন, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ জ্ঞান, তাঁহার অন্য গুণাবলীর মত, প্রধানত স্বঅর্জিত। আতাচ শিক্ষক ও অনুবাদক হিসাবে এবং বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে অনবরত প্রবন্ধাদি লিখিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি ইস্তাম্বুল, আনকারা ও প্রদেশসমূহের বিভিন্ন স্কুলে ফরাসী সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী দফতরে অনুবাদকের কাজ করিতেন। তিনি ১৯৫৭ খৃ. -এর ১৭ মে ইন্তিকাল করেন।

আতাচ বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকা দারগাহতে কবিতা, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও নাট্য-সমালোচনা দ্বারা ১৯২১ খৃ. তাঁহার সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। এই পত্রিকার লেখক ছিলেন সেই যুগের সকল প্রধান লেখক ও অনেক উদীয়মান প্রতিভা। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে নাটকে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রধানত দৈনিক আকশাম-এ নাট্য সমালোচনা লিখিতেন (দ্র. Metin And, Atac tiyatroda, ইস্তাম্বুল ১৯১৩)। পরে তিনি সাহিত্য সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-পটের দৈনন্দিন অগ্রগতি বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়া অবিরত প্রায় ৬০টিরও বেশি দৈনিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিকীতে, বিশেষ করিয়া আকশাম, হাকিমিয়েত-ই-মিল্লিয়া, মিল্লিয়েত, ভারলিক, য়েনি আদাম, তান, সোন পোস্তা, হাবের, তেরকুমি, উলকু, তুর্কদিলি, জুমহুরিয়াত, পাযার. পোস্তাফি, দুনয়া এবং সর্বোপরি ঘন ঘন উলুস-এ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিতেন (দ্র. কোনুর আরতপ, আতাচ বিবলিওগ্রাফিয়াসি, আতাচ, সম্পা. তুর্কী ভাষা কাউন্সিল, আনকারা ১৯৬২ খৃ.)। আতাচ তুর্কী সাহিত্যের একটি অতি অবহেলিত দিক, প্রবন্ধের উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে একটি স্বাধীন সত্তায় রূপ দেন।

তিনি ছিলেন ইহার একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ এবং তাঁহার অনেক অনুসারী ছিল। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও সাধারণ সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী, বিশেষ বিশেষ লেখক প্রভৃতি সম্বন্ধে একান্ত নিজস্ব, স্বাভাবিক, সংক্ষিপ্ত ও নিরলংকার পদ্ধতিতে হাজার হাজার প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৪০ খৃ.-এর দশকের প্রথম দিকে তিনি ভাষা সংস্কার আন্দোলন সমর্থন করেন এবং সাহিত্য মহলে ইহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে প্রবল সমর্থন ও সক্রিয় সহায়তা প্রদান করেন। ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না, তিনি নবজাত সমকালীন তুর্কীদের সেরা উস্তাদ ছিলেন এবং অনেক তরুণ লেখক তাঁহার সাহিত্য-রীতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। এই গদ্য ১৯৩০ খৃ. পূর্বলব্ধপ্রতিষ্ঠ গদ্য-লেখক, যেমন R. Kh. Karay, Reshad Nuri Guntekin ও অন্যদের গদ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যদিও সাহিত্য সমালোচক হিসাবে আতাচের প্রভাব বিতর্কিত; কারণ তিনি স্বীয় প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে সমালোচনার ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা সর্বস্বীকৃত, সমালোচক হিসাবে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা অনেক তরুণ প্রতিভাকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে (যথা Orhan Veli Kanik, F.H. Daglarca প্রভৃতি)। অস্থির, অধীর, স্বভাবগত আক্রমণপ্রবণ, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ও 'পদ্ধতিগতভাবে সন্দিহান' আতাচ ধর্মান্ধতা, অসহিষ্ণুতা, ভাবাবেগ, কাব্যিক কৃত্রিমতা, অপ্রচলিত ও গতানুগতিক চিন্তাধারা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালান। ভাষা সংস্কারে তিনি ছিলেন একজন সচেতন চরমপন্থী এবং বিশ্বাস করিতেন, মাত্র কিছু সংখ্যক চরমপন্থীর আত্মত্যাগ উগ্র রক্ষণশীলদের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির প্রতিকার করিতে পারে। আতাচ পঞ্চদশ শতাব্দীর গদ্যগ্রন্থগুলি, বিশেষ করিয়া মারজুমেক আহমাদ কর্তৃক নিষ্পন্ন কায়কাউসের কাবূস নামার (দ্র. কায়কাউস ইব্ন ইসকান্দার) বিখ্যাত অনুবাদ অধ্যয়ন করেন এবং এইগুলিকে একটি নূতন রীতির আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করেন। তিনি সাফল্যের সহিত এক নূতন ধরনের শব্দ বিন্যাস পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যাহাতে শব্দের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস ছিল বিপরীতধর্মী (Devrik tumce), যাহা কথ্য তুর্কীতে স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত এবং যাহা লেখ্য তুর্কী ভাষার শব্দবিন্যাস পদ্ধতি 'অপ্রচলিত' হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক তুর্কী গ্রন্থবলীতে প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। আতাচ বহু সংখ্যক নূতন শব্দ উদ্ভাবন করেন, সেইগুলির কিছু কিছু এখনও বিদ্যমান থাকিয়া ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (আতাচের নূতন শব্দের একটি তালিকার জন্য দ্র. আতাচের অভিধান, সম্পা. তুর্কী ভাষা কাউন্সিল, আনকারা ১৯৬৩ খৃ.)। আতাচ কয়েক হাযার রচনা ও প্রবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। এইগুলির কিছু কিছু (প্রধানত তাঁহা কর্তৃক ১৯৪০ খৃ.-এর পূর্বে লিখিত) দশ খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ Gunlerin getirdigi (1946), Karalama deffteri (1952), Sozden soze (1952), Ararken (1954), Diyelim (1954), Soz arasinda (1957), Okuruma mektuplar (1958), Gunce (1960), Prospero ile Caliban (1961), Soylesiler দুই খণ্ডে (১৯৬৪)। ১৯৫৩-৭ সাল পর্যন্ত আতাচের রোজনামচা ১৯৭২ খৃ. আনকারাতে প্রকাশিত হয়।

আতাচ তুর্কী ভাষায় অবিকল অনুবাদের নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন ও রাশিয়ার (ফরাসী ভাষার মাধ্যমে) লেখকদের পঞ্চাশটিরও অধিক সাহিত্য গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া সরাসরি ফরাসী ভাষা হইতে তাঁহার অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ Stendhal-এর Le rouge et le noir-এর অনুবাদ। ইহা তুর্কী ভাষায় Kirmizi ve siyah (1941) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ Kizil ile kara (1946) নামে অনূদিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাহির আলাংগু, আতচা সায়গী, আনকারা ১৯৫৯ খৃ.; (২) কোনূর আরতপ, ভারলিক কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার সমুদয় গ্রন্থের ভূমিকা ঃ গুনলারিন গোতরদিগী-কারালামা দেফতেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৬৭ খৃ., ৫-৬৯; (৩) আসীম বেযিরচি, নূরুল্লাহ আতাচ, এলেশতিরি আনলায়িশীভে য়াযীলারী, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ.; (৪) মুহাম্মাদ সালিহ ওগলু, আতাচলা গেলেন, সম্পা. তুর্কী ভাষা কাউন্সিল, অনুমূনুন ১০, ঈল দোনূমূন্দে আতাচ'-ই আনীশ, আনকারা ১৯৬৮ খৃ.।

Fahir Iz (E.I.[2] Suppl. 1-2) / মুঃ আলী আসগর খান

আতাতুর্ক, মুসতাফা কামাল (اتا ترك مصطفى كمال) ঃ তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম রাষ্ট্রপতি। জন্ম সালোনিকায় ১৮৮১ খৃ., মৃত্যু ইস্তাম্বুলে ১০ নভেম্বর, ১৯৩৮ খৃ.। তাঁহার আসল নাম মুসতাফা, পিতার নাম 'আলী রিদা আফান্দী এবং মাতার নাম যুবায়দা খানম। তাঁহার পিতামহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ফলে 'আলী রিদা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন (লর্ড কিন্‌রস, আতাতুর্ক, পৃ. ৪)। ১৮৭৬ খৃ. তিনি আওকাফ ও শুল্ক বিভাগে কেরানীর চাকুরী করিতেন। পরে চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় শুরু করেন। মুসতাফার শৈশবেই তাঁহার পিতা মারা যান। ফলে মাতা যুবায়দা খানমকেই তাহার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। মুসতাফার প্রাথমিক শিক্ষা মহল্লার মাদরাসায় শুরু হয়। কিছু দিন পরে তিনি "শামসী আফান্দী মাকতাবে" ভর্তি হন। নূতন প্রণালীতে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য সালোনিকায় উহাই ছিল প্রথম বিদ্যালয়। স্বীয় শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়া মুসতাফা কামাল বলিয়াছেন "আমার শৈশবের একটি বিষয় এখনও মনে আছে, উহা আমার স্কুল যাওয়ার প্রশ্ন। এই বিষয়ে আমার মাতা ও পিতার মধ্যে প্রবল মতভেদ ছিল। মাতা চাহিয়াছিলেন, আমাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহল্লার মাদ্রাসায় ভর্তি করা হউক। কিন্তু আমার পিতা, যিনি শুল্ক বিভাগে চাকুরী করিতেন, চাহিয়াছিলেন, আমাকে শাম্‌সী আফান্দীর মাকতাবে পাঠাইতে যাহাতে আমি আধুনিক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। তিনি সুকৌশলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। প্রথমে আমাকে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতা সহকারে মহল্লার মাদ্রাসায় পাঠান হয়। ইহাতে আমার মাতা বিশেষ আনন্দিত হন। কিছুকাল পরে আমাকে শামসী আফান্দীর প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। অল্পদিন পরেই আমার পিতা মারা যান। তখন আমি ও আমার মাতা গ্রামে মামার বাড়ীতে বাস করিতে যাই। সেই স্থানে আমি গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠি। আমাকে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিতে দেওয়া হয়। আমাকে মামার জমিজমার তদারকি করিতে হয়। একটি

শিমের ক্ষেতের মধ্যে আমার ভগ্নির (পরে মাদাম মাকবূলা আতাদান) সহিত একটি কুটিরে বসিয়া কিরূপে কাক তাড়াইয়া সময় কাটাইতাম তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারি না। কৃষি খামারের অন্যান্য কাজেও আমাকে সাহায্য করিতে হইত। কিছুদিন এইভাবে সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু অচিরেই আমার মাতা আমার শিক্ষা বন্ধ হওয়ায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। অবশেষে স্থির হয়, আমি সালোনিকায় গমন করত আমার খালার বাড়ীতে থাকিব এবং তথায় স্কুলে পড়িব। আমাকে সালোনিকার সরকারী হাই স্কুল (মুলকী ইদাদিসী)-এ ভর্তি করা হয়। এই স্কুলে কায়মাক হাফিজ নামক শিক্ষক ছিলেন। একদিন তাহার ক্লাসে একটি ছেলের সহিত আমার প্রবল কলহ হয়। কায়মাক হাফিজ আমাকে ধরিয়া এমন নির্দয় প্রহার করেন যে, আমার সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হইয়া যায়। আমার নানী আমার স্কুলে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া নেন।

"আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ছিলেন বেনবাশী (মেজর) কাদরী বে। তাঁহার পুত্র আহমাদ বে এক সামরিক মাধ্যমিক স্কুলে পড়িত এবং উহার জাঁকাল ইয়ুনিফর্ম (উর্দী) পরিধান করিত। যখনই তাহাকে দেখিতাম আমার মনে ঐরূপ ইয়ুনিফর্ম পরিবার সাধ জাগিত। ইহা ব্যতীত পথেঘাটে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে দেখিতাম। আমি জানিতাম, তাহাদের মর্যাদা পাইতে হইলে আমাকে সর্বপ্রথম এক সামরিক প্রস্তুতি বিদ্যালয়ে ('আস্কারী রুশদিয়া) যাইতে হইবে। ঘটনাক্রমে আমার মাতা তখন সালোনিকায় আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি সামরিক স্কুলে ভর্তি হইতে চাই। সৈনিক জীবনের প্রতি তাঁহার ভীষণ ভীতি ছিল। তিনি আমাকে বাধা দিতে থাকেন। যখন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা হইতেছিল, আমি মাতার অগোচরে গোপনে সামরিক স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা দেই। আমার মাতার পক্ষে বাস্তবতা উপেক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না" (১৮৯৩, আতাতুর্ক, য়ুনেস্কোর তুর্কী জাতীয় কমিশন, আনকারা ১৯৬৩, পৃ.৭-৮)।

এই স্কুলে মুস্তাফা গণিতশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। অনুশীলনের মাধ্যমে তাহার জ্ঞান এতটা বৃদ্ধি পায় যে, উপরের শ্রেণীর অংকসমূহ তিনি অনায়াসে কষিতে পারিতেন। এই স্কুলে মুসতাফা নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি একদিন বলিলেন, দুই মুস্তাফার নামের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকা উচিত। আজ হইতে তোমার নাম হইল মুস্তাফা কামাল। ফলে তরুণ মুসতাফার নাম মুস্তাফা কামাল হইয়া গেল। কামাল শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা বা দক্ষতা। শিক্ষক হয়ত অজ্ঞাতসারেই কামালের পরিপূর্ণ সুদক্ষ জীবনের ইংগিত দিলেন।

সালোনিকার সামরিক প্রস্তুতি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া মুসতাফা কামাল ১৮৯৫ খৃ. মুনাস্তিরস্থ সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। এইখানেই গণিত তাঁহার খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু তিনি ফরাসী ভাষায় দুর্বল ছিলেন। প্রথম দীর্ঘ ছুটিতে গৃহে গমন করত এক প্রাইভেট ফরাসী ক্লাসে ভর্তি হন এবং তিন মাসে তাহার ফরাসী ভাষার জ্ঞান বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মুনাস্তিরে তাহার এক সহপাঠী তাহাকে কাব্য ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত করেন এবং উহা উপভোগ করিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু মুসতাফা কামালের এক শিক্ষক তাহাকে সাবধান করিয়া দেন, কাব্য ও সাহিত্য চর্চা সামরিক জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। ইহা ভবিষ্যতে তাহার সামরিক জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। যাহা হউক, মুসতাফা কামাল কথায় ও লেখায় মনোজ্ঞ ভাষা ব্যবহারে বিশেষ মনোযোগী হন। এই অভ্যাসটি তাহার জীবনে সাফল্য আনয়ন করিতে বিশেষ সহায়ক হয় (Turkish National Comission, আতাতুর্ক, আনকারা ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৮-৯)।

মুনাস্তির সামরিক স্কুলের শিক্ষা সমাপনান্তে মুসতাফা কামাল ইস্তাম্বুলে গমন করেন এবং ১৩ মার্চ, ১৮৯৯ খৃ. সামরিক একাডেমীর পদাতিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্থানেও গণিতের প্রতি তাহার আগ্রহ বজায় থাকে। কিন্তু তিনি যৌবনসুলভ স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়েন এবং একাডেমীর পাঠে অমনোযোগী থাকিতেই এক বৎসর যেন সহসা শেষ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি সামরিক পাঠ ও প্রশিক্ষণে অধিকতর মনোযোগী হন। কাব্য ও সাহিত্য চর্চার বিরুদ্ধে শিক্ষকের নির্দেশ মনে থাকিলেও তিনি বক্তৃতায় ও রচনায় সুন্দর ভাষার বরাবরই গুণগ্রাহী থাকেন। অবসর সময়ে তিনি বন্ধুদের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করিতেন এবং সকলে মিলিয়া বাগ্মিতার অনুশীলন করিতেন (পূ. গ্র.)।

সুলতান দ্বিতীয় 'আবদুল হ'ামীদ-এর শাসন এই সময়ে হইয়া উঠিয়াছিল নির্যাতনমূলক ও অত্যন্ত দুর্বল। মুস্তাফা কামাল ও তাহার বন্ধুগণ এই সময় হইতে দেশের কল্যাণ কামনায় চিন্তিত হইয়া পড়েন। নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা কবি নামিক কামাল-এর কবিতা গোপনে আবৃত্তি করিতেন। সামরিক একাডেমীর পাঠ সমাপন করিয়া ১৯০২ খৃ. মুসতাফা কামাল জেনারেল স্টাফ কলেজে যোগদান করেন এবং লেখাপড়ায় গভীর মনোযোগ দেন। এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। বন্ধুগণের সহযোগিতায় তিনি একটি হস্তলিখিত পত্রিকা বাহির করিয়া ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিতে থাকেন। উহাতে মুসতাফা কামালকেই অধিকাংশ নিবন্ধ লিখিতে হইত। কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া অচিরেই পত্রিকাটি বন্ধ করিয়া দেন (পূ. গ্র., পৃ. ১০)। কলেজের জনৈক শিক্ষক নূরী বে' কামালের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। একদিন গেরিলাদের সম্পর্কে এই শিক্ষক মন্তব্য করেন, 'ইহাদেরকে দমন করা যেমন কঠিন, সংগঠন করাও তেমনি কঠিন।' ইহাতে মুসতাফা কামাল এই বিষয়টি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে শুরু করেন। তিনি শিক্ষকের অনুমতি লইয়া এই বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে তুরস্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে তাহার বাস্তব নির্দেশিকা প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যান। এই অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তাহার সামরিক প্রতিভা ও বিচক্ষণতার বাস্তব পরিচয় দেন (পূ. গ্র., পৃ. ১০)।

জানুয়ারী ১৯০৫ সনে তিনি সামরিক একাডেমী ও স্টাফ কলেজ উভয়ের শিক্ষা কৃতিত্বের সহিত সমাপন করত ক্যাপটেন ও তৎসহ সামরিক পদমর্যাদা উভয় সম্মান অর্জন করেন। কিছুকাল পরে তাহাকে দামিশকে পঞ্চম বাহিনীতে প্রেরণ করা হয় এবং প্রশিক্ষণের জন্য ত্রিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর সহিত সংযুক্ত করা হয় (পূ. গ্র., পৃ. ১১)। অচিরেই তিনি পেশাদারী সামরিক জীবনের প্রতি মনোযোগী হন এবং বিভিন্ন সামরিক পদে উন্নীত হনঃ ১৯০৭ খৃ. সেকেন্ড লেফটেনান্ট হইতে লেফটেনান্ট, ১৯০৯ খৃ. এডজুট্যান্ট মেজর, ১৯১১ খৃ. মেজর, ১৯১৪ খৃ. লেফটেনান্ট কর্নেল, ১৯১৬ খৃ. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, ১৯১৯ খৃ. ৯ম বাহিনীর ইনসপেক্টর,

১৯২১ সনের ৫ আগস্ট কমান্ডার-ইন-চীফ, একই বৎসর ১৯ সেপ্টেম্বর মহান জাতীয় মাজলিস তাহাকে মার্শাল-এর পদমর্যাদা ও গাযী উপাধি প্রদান করে (পূ. গ্র., পৃ. ২২৭-২৩০; দা. মা.ই., আতাতুর্ক নিবন্ধ)।

ইস্তাম্বুলের মিলিটারি স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি গোপনে বিরুদ্ধ দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ আরম্ভ করেন। ১৯০৮ খৃ. চীফ অব স্টাফরূপে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি নব্য তুর্কী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১২৩)।

বিভিন্ন সামরিক কাজে, যথাঃ লিবিয়ায় (১৯১১-১২), ২য় বলকান যুদ্ধে (১৯১৩) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। দার্দানালেস, আর্মেনীয় যুদ্ধক্ষেত্র ও ফিলিস্তীনে অসাধারণ রণ-কৌশলের পরিচয় দিয়া তিনি পাশা খিতাব লাভ করেন।

জার্মানীতে সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর তিনি ফিলিস্তীনে সপ্তম বাহিনীর অধিনায়কত্ব পুনগ্রহণ করেন। মুদরোস (Mudros) যুদ্ধ বিরতির সময় (৩০ অক্টোবর, ১৯১৮) তিনি এই বাহিনীর সহিত আলেপ্পোর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত পশ্চাদ্পসরণ করিয়াছিলেন (ইং. ই. বিশ্বকোষ, পৃ. স্থা)। যুদ্ধ বিরতির শর্তসমূহ মোটেই মুসতাফা কামালের মনঃপূত ছিল না। প্রকাশ থাকে, প্রথম মহাযুদ্ধের সংকটময় চার বৎসরের সংগ্রামে মুসতাফা কামালই ছিলেন একমাত্র তুর্কী সমরনেতা যিনি কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন নাই (লর্ড কিন্‌রস, আতাতুর্ক, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ১২৯)।

মুদরোস যুদ্ধ বিরতির শর্তানুসারে সমগ্র 'আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, কুর্দিস্তান ও ফিলিস্তীন তুর্কীদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। কনস্টান্টিনোপল, পূর্ব থ্রেস ও এশিয়া মাইনরের কিয়দংশ মাত্র তাহাদের দখলে রহিল। তুরস্কের সমস্ত বন্দর, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন মিত্রশক্তির কর্তৃত্বাধীন আসিল। তাহারা বাকু ও বাতুম দখলে রাখার এবং আর্মেনিয়ার ছয়টি বেলায়েত ও যে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করার অনুমতি পাইল...(এম, আবদুল কাদের, কামাল পাশা, কলিকাতা, তা. বি., পৃ. ১)।

যুদ্ধ বিরতি শর্তের প্রশ্নে সুলতান ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদ-এর সহিত তাহার মতভেদ সৃষ্টি হয়। মুসতাফা কামালকে ইস্তাম্বুলে ডাকিয়া লইয়া তাহার দেশপ্রেম কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহাকে এরযুরুম (Erzurum)-এর উত্তরাঞ্চলের বাহিনীর পরিদর্শক (ইন্‌সপেক্টর) নিযুক্ত করা হয় (৩০ এপ্রিল, ১৯১৯)। ১৯ মে তিনি সামসুন-এ অবতরণ করেন। মিত্রশক্তির ষড়যন্ত্রের হুমকির প্রেক্ষিতে তিনি তুরস্কের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সংকল্প হন। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার অনুগত সৈন্যদের উপর নির্ভর করেন (ইং. ই. বিশ্বকোষ, পৃ. স্থা.)।

২২ জুন (১৯১৯) মুসতাফা কামাল আমাসিয়া হইতে একটি সার্কুলার প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি সুলতান ও প্রধান মন্ত্রী দামাদ ফারীদ পাশার সরকারের নিন্দা করেন এবং জাতীয় শক্তিসমূহকে সিভাস-এ একত্র হইয়া একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে আহ্বান জানান (ইং. ই. বি., ২ সং, ১খ., ৭৩৪ ও ইয়ুনেস্কো, আতাতুর্ক, পৃ. ৪৯)।

তুরস্কের নিরংকুশ স্বাধীনতা ও তুর্কী জাতির ঐক্যের দাবিতে তিনি ২৩ জুলাই এরযুরুম-এ ও ৪ সেপ্টেম্বর সিভাস-এ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করেন। বেশ কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতার সমর্থন লাভ করিয়া তিনি ২৩ এপ্রিল, ১৯২০ আনকারায় মহান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। জাতীয় পরিষদ তাহাকে পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করে। ফলে ইস্তাম্বুল সরকার ও মিত্রশক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে তাহার সংগ্রাম আরম্ভ হয়, বিশেষভাবে গ্রীকদের বিরুদ্ধে তাহার সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিজয়ের ফলে মহান জাতীয় পরিষদ তাহাকে গাযী উপাধিতে ভূষিত করে (ইং. ই. বি., পৃ. স্থা.)।

সুলতান তাহার কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং তাহাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি সুলতানের আদেশ অমান্য করায় তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়। তুরস্কের অরাজক অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে তিনি তুরস্কে সুলতানের শাসনের অবসান ঘোষণা করেন (১ নভেম্বর, ১৯২২ খৃ.)। সুলতান অবস্থা বেগতিক দেখিয়া দেশ ত্যাগ করেন। ১৯২৩ খৃ. লুসান সম্মেলনে মিত্রশক্তির সহিত সম্মানজনক শর্তে তিনি শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন (বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ঢাকা ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১২৩)। উহাতে তুরস্কের পূর্ণ স্বাধীনতা ও জাতীয় সীমান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় মহান জাতীয় পরিষদ তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। পরিষদ বিভিন্ন পর্যায়ে মুসতাফা কামালকে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত বারংবার তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিতে থাকে। ইসমাত ইনুনো প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং আনকারা তুরস্কের রাজধানী নির্দিষ্ট হয়। ৩ মার্চ, ১৯২৪ খৃ. খেলাফত রহিত করা হয় (ইং. ই. বি., পৃ. স্থা)।

খেলাফত রহিত করার পূর্বে আগা খান ও সায়্যিদ আমীর 'আলী প্রধান মন্ত্রী 'ইসমাত পাশার নিকট মুসলিম বিশ্বের জন্য উহার গুরুত্ব অনুধাবন করিবার নিমিত্ত একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। ফল হইল বিপরীত। পরে ভারতীয় ও মিসরীয় মুসলিমগণের পক্ষ হইতে মুসতাফা কামালকে খলীফার পদ গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া ঐতিহ্যময় খেলাফত প্রতিষ্ঠানটি সংরক্ষণের আর একটি বিফল প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল (লর্ড কিন্‌রস, আতাতুর্ক, লন্ডন ১৯৬৫, পৃ. ৩৮৫-৮৬, টীকা)।

তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রথম বৎসরগুলি প্রধানত মুসতাফা কামালের তিনটি দৃঢ় সংকল্প দ্বারা পরিচালিত হয়ঃ ১। তুরস্ককে একটি উন্নত আধুনিক দেশে পরিণত করা; ২। উহাকে বিদেশী আর্থিক নাগপাশ হইতে মুক্ত করা এবং ৩। উহাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা। একটি অনুগত রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভর করত তিনি দেশে এমন একটি সংবিধান প্রবর্তন করেন, যাহার ফলে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কুক্ষিগত হইয়া পড়ে (৩০ এপ্রিল, ১৯২৪)। রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করিবার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে ছিল শারী'আত কোর্ট, কুরআন শিক্ষালয় ও দরবেশদের খানকাহ্ বন্ধ করা, ফেয টুপি পরা নিষিদ্ধ করা ও সংবিধানের যে ধারায় ইসলামকে রাষ্ট্রের ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা রহিত করা ইত্যাদি। এইসব কারণে কোথাও কোথাও স্থানীয় প্রতিরোধ (কুর্দিস্তান ও ইযমীর অঞ্চল) এবং কোন কোন রাজনৈতিক দলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু উহা দ্রুত দমন করা হয়। তুর্কীকরণ ও আধুনিকীকরণের কাজ এক সঙ্গেই চলিতে থাকে, বিদেশী কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ, কৃষি ও শিল্পকে উৎসাহ দান, জাতীয় ব্যাংক স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ সাধন, বর্ণমালা সংস্কার,

নারী জাতিকে ভোটের ক্ষমতা দান ও সুইস ও ইউরোপীয় আদর্শে নূতন দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে।

জাতীয় পরিষদের সভাপতি, People's Party-এর সভাপতি, রাষ্ট্রপতি ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি একে একে দেশ পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লওয়ায় তাহার সিদ্ধান্ত বা অভিপ্রায় অতি দ্রুত আইনে পরিণত হইয়া যাইত এবং People's Party-এর শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে অবিলম্বে ইহা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারিত ও জারী করা হইত। কাহারও মন্তব্য প্রকাশ বা বিরোধিতা করিবার অবকাশ মিলিত না। তিনি কোন প্রকার মতভেদ সহ্য করিতেন না। ছলে-বলে-কৌশলে নিজের সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতেন।

১৯৩৪ খৃ. নভেম্বরে আইন পাস হয়, প্রত্যেক তুর্কী পরিবারকে একটি পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় পরিষদ মুসতাফা কামালকে 'আতাতুর্ক' পারিবারিক নাম অর্পণ করে।

পররাষ্ট্র নীতিতে কামাল ছিলেন শান্তিকামী ও আপোসমূলক। তবে দেশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের জন্যও তিনি বৈদেশিক অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, যাহাতে ঐ পথে বিদেশস্থ প্রভাব দেশকে পঙ্গু না করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ও বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে তিনি মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বলকান আঁতাত ও সাদাবাদ চুক্তি দ্বারা তিনি দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন (ইং. ই. বি., ২য় সং, লাইডেন ১৯৭১, ১খ., পৃ. ৭৩৪)।

১০ নভেম্বর, ১৯৩৮ খৃ. মুসতাফা কামাল আতাতুর্ক ইস্তাম্বুলে পরলোকগমন করেন। ২১ নভেম্বর আনকারার ইথনোগ্রাফিক মিউযিয়ামে তাহার কফিন অস্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করা হয়। ১৯৫৩ খৃ. ১০ নভেম্বর নবনির্মিত সমাধিসৌধে তাহার কফিন স্থায়ীভাবে দাফন করা হয় (টাকশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো, আতাতুর্ক, পৃ. ২৩২)।

মুসতাফা কামালের জীবনে দুইটি আপাত বিরোধী শক্তি সক্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার প্রবল স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, সামরিক দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অফুরন্ত সাংগঠনিক কর্মশক্তি ও অদম্য পাশ্চাত্য-প্রীতি তাহাকে 'ইউরোপের রুগ্ন লোকটি' নামে অবজ্ঞাত তুর্কী জাতিকে এবং তুরস্ককে একটি নিরঙ্কুশ, সার্বভৌম, আধুনিক, উন্নত জাতি ও রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সক্ষম করিয়াছিল, যেথায় গণতন্ত্রের যবনিকার অন্তরালে তিনি একনায়ক সুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি তাহার সহনশীলতার অভাব তাহার ভাবমূর্তিকে মুসলিম বিশ্বে ম্লান করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) (নির্বাচিত) টাকশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো, আতার্তুক, আনকারা ১৯৬৩; এই গ্রন্থে একটি বিশদ গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে; (২) টার্কিশ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৯, আতাতুর্ক প্রবন্ধ (১ নম্বরে উল্লিখিত গ্রন্থটি ইহার ইংরেজী অনুবাদ); (৩) Lord Kinross, Ataturk London 1965; (৪) Ataturk, Kemal, A Speech, delivered at Angora, 15-20 Oct., 1927, English Translation (Leipzig 1929): (৫) Davison, Roderic H., Turkish Diplomacy from Mudros to Lausanne (in the Diplomats, 1919-39), Princeton 1953; (৬) Edib Halide, Memoirs, London 1926; (৭) Ellison Grace, An English Woman in Angora, London 1924; (৮) Howard Harry N., Partition of Turkey, Oklahoma 1931: (৯) Inonu, Ismet, Negotiation and National Interest, Perspective on Peace, 1910-60, New York 1960; (১০) Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, London 1961; (১১) Orga, Irfan and Margarete, Ataturk, London 1962; (১২) Toynbee, Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey, London 1922, 11; (১৩) Waugh, Sir Telford, Turkey, Yesterday, Today and Tomorrow, London 1930; (১৪) Yalman, Ahmed Emin, Turkey in the World War, Yale 1930; (১৫) Burhan Cahit, Gazi Mustafa Kemal, Istanbul 1930; (১৬) Ziya Sakir, Ataturkun hayati, Istanbul 1938; (১৭) Yakub Kara Osmanglu, Ataturk, Istanbul 1946; (১৮) H.E. Wortham, Mustafa Kemal of Turkey, New York and Boston 1930; (১৯) H. Armstrong, The Grey wolf, Mustafa Kemal, An intimate study of a dictator, London 1932; (২০) H. Melzig, Kemal Ataturk, Frankfurt A. M. 1937; (২১) এম. আবদুল কাদের, কামাল পাশা, কলিকাতা তা. বি.; (২২) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ঢাকা ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১২৩; (২৩) উরদু ইসলামী বিশ্বকোষ (দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা), লাহোর ১৯৮০/১৪০০, ১খ., ৯৬১-৯৮৬।

আবদুল হক ফরিদী

আতাবাক (اتابك) ঃ (আতাবেগ) ইহা সালজূক ও উহাদের উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উপাধি। ইহা একটি তুর্কী পরিভাষা এবং সর্বপ্রথম সালজূক শাসনামলে মুসলিম ইতিহাসে প্রচলিত হয়। সুতরাং ইহা অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত, কেন্দ্রীয় এশিয়ার তুর্কী সমাজে অতীতে ইহার কোন নজীর ছিল কিনা। এই পর্যন্ত শব্দটির ব্যবহারের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই। ওরখুন সভ্যতায় বাহ্যত আতা (পিতা) নামে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি এক তরুণ যুবরাজের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তবে ঘটনাটি একটি সম্পর্ক স্থির করার জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপ বিষয়াদি যাহা অন্যান্য সভ্যতায় বিদ্যমান উহাদের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সত্য (উদাহরণস্বরূপ দ্র. হারূনুর-রাশীদ ও ইয়াহ্'য়া আল-বারমাকী সম্পর্ক); অধিকন্তু কারাখানী রাজত্বকালেও এইরূপ কোন পদের উল্লেখ নাই।

সুতরাং এই শব্দটিও গুয কিংবা সালজূক বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, এমনকি সালজূকদের অধীনে উপাধিটির যাহা পরবর্তী কালে সামরিক প্রধানদের খেতাব হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করে, প্রথম সুনির্দিষ্ট

ইঙ্গিত পাওয়া যায় একজন ইরানী বেসামরিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহারের মধ্যে ঃ মালিক শাহ ক্ষমতা গ্রহণের সময় অতি তরুণ ছিলেন। তিনি তাঁহার উযীর নিজামুল-মুল্ক-এর খেতাবের সংগে আতাবেগ যোগ করেন। ইহা এই ইঙ্গিত বহন করে, তিনি স্বীয় কর্তৃত্বের ভার তাঁহার (নিজামুল-মূলক) উপর অর্পণ করিয়াছিলেন যেন তিনি তাঁহার পিতা (ইবনুল আছীর, সম্পা. Tornberg, ১০খ., ৫৪; RCEA, vii, no. 2734-2709)।

ইহা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে মালিক শাহ-এর মৃত্যর পর হইতে এশিয়া মাইনর-এর সালজূকসহ, সালজূক রাজবংশের সকল শাখার এই উপাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহার একটি বিশেষ ক্রমবিবর্তন রহিয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ প্রতীতি হয় এই শাসকগোষ্ঠীর উৎপত্তিকাল হইতে ইহার অস্তিত্ব ছিল। এই অবস্থায় আখবারুদ-দাওলাতিস-সালজূকিয়্যা (সম্পা. মুহাম্মাদ নাজিম, ২৮-২৯)-র সাক্ষ্য যাহা পূর্বে নজীরস্বরূপ উল্লিখিত হয় নাই—তরুণ আলপ আরসলান-এর সহিত তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় একজন তুর্কী আতাবেগ জনৈক কুতুবুদ্দীন কুল্সারী (কিযিল সারি)-র আবির্ভাব তাহা অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি নাই। তবে একজন অতুর্কী উযীর নিজামুল-মুলককে এই সম্মান প্রদান করা অধিকন্তু তাঁহার কর্তৃত্বের সকল বৈশিষ্ট্যসহ একটা ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়, তবে ইহাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রমবর্ধমান প্রভাবেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহাই হউক না কেন, মালিক শাহর মৃত্যুর পর হইতে আতাবেগদের আবির্ভাব ক্রমেই অধিকতর নিয়মিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সময়ে তাঁহাদের ভূমিকা ব্যাপকতা লাভ করে, যেহেতু যুবরাজ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং সিংহাসনের দাবিদারের মধ্যে বিবাদ ছিল। অতঃপর সালজূক শাসনামলের পতনকালে কেবল তুর্কী সামরিক প্রধানগণ তাহাদের অধিকতর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই উপাধি লাভ করিতেন। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মালিক শাহ-এর পুত্র বার্কয়ারুক তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় জান্দার গুমুশতাকিনকে এক উপদেশদাতা (মুরাব্বী) ও আতাবেগ হিসাবে পান ('ইমাদুদ্দীন আল-ইস্ফাহানী, বুন্দারী কর্তৃক সংক্ষিপ্তকরণ, সম্পা. Houtsman, ৮৩; তু. আর্-রাওয়ান্দী, রাহাতুস-সুদূর সম্পা. মুহাম্মাদ কায্বীনী, ১৪০)। বারকয়ারুক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সানজার ও মুহাম্মাদকে যখন স্বতন্ত্র জায়গীর প্রদান করেন তখন তিনি তাহাদের জন্য আতাবেগ নিয়োগ করেন এবং তাহার মৃত্যুশয্যায় তাহার বালক পুত্র মালিক শাহের জন্যও একজন আতাবেগ নিয়োজিত করেন। একই সময়ে মালিক শাহ-এর ভ্রাতা তুতুশ, যাহার সিরিয়াতে জায়গীর ছিল এবং যিনি দুর্ভাগ্যবশত বারক্য়ারুক-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক পুত্র রুদ্ওয়ান ও দুকাক-এর জন্য আমরা একজন করিয়া আতাবেগ দেখিতে পাই। তখন হইতে প্রত্যেক সালজূক যুবরাজের একজন আতাবেগ ছিল, বিশেষত তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাহাকে জায়গীর মঞ্জুর করা হইলে। অন্য কথায় বলা যায়, পুত্র সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদের আতাবেগের সংখ্যাও তদনুযায়ী হইত। যেহেতু ইহারা দাসবংশীয় সামরিক প্রধানদের মধ্য হইতে গৃহীত হইত, ইহাদের কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট অন্য ক্রীতদাস কিংবা মুক্ত ক্রীতদাসদের কর্তব্যের ন্যায় স্বীয় প্রভুর পরিবারের স্বার্থের প্রতি নজর রাখা যে পরিবারের তিনি নিজেও অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু আতাবেগ তাহার শিষ্যের মাতা বিধবা হইলে তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় মর্যাদা পিতার ন্যায় অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত করিতেন (উদাহরণস্বরূপ দামিশকে তুগতাকিন কর্তৃক উল্লিখিত দুকাক-এর মাতাকে)। কর্তৃত্ব বলিতে গেলে তাহারা যুবরাজের অনির্ধারিত ক্ষমতার অংশীদার হইয়া উঠিতেন। অতএব অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় তাহাদের ক্ষমতা নির্ধারিত ছিল না। যাহা হউক, তাহাকে অপর আতাবেগ দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করা যাইত এবং যুবরাজ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আতাবেগের কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবে লোপ পাইত। তখন কেবল পরামর্শদাতা হিসাবেই তাহার প্রভাব থাকিয়া যাইত। যুবরাজ তাহার পরামর্শ শুনিতেন। আতাবেগ ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রকাশ করিলে যুবরাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইত (উদাহরণস্বরূপ রুদ্ওয়ান ও দুকাক) অথবা এমনকি তাহাকে হত্যাও করা হইত (যেমন বার্কয়ারুক-এর ভ্রাতা মুহাম্মাদ কর্তৃক কুত্লুগতাকিন-এর হত্যা)।

অন্তত ইহা ছিল প্রাথমিক অবস্থা। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সত্বর যুবরাজকে অবজ্ঞা করিয়া আতাবেগ স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করেন। আতাবেগ পদবী ইহার ধারণকারীকে উচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করে। ফলে ইহা চিরস্থায়ী করিতে তাহারা প্রলুব্ধ হন। কিন্তু মালিক শাহ্র উত্তরাধিকারীদের দ্বিতীয় বংশধরের সময় হইতে আতাবেগ ও যুবরাজদের ভূমিকা পূর্বাবস্থার বিপরীত হইয়া যায়। প্রারম্ভ এইভাবে হইয়াছিল, সুলতান ইচ্ছাপূর্বক কিংবা চাপের ফলে শক্তিশালী এক আমীরকে গভর্নর নিযুক্ত করিতেন এবং তাহার আনুষ্ঠানিক অধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশে সুলতান একজন সালজূক বালক যুবরাজকে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতেন এবং তিনি তাহার আতাবেগ হইতেন। কিছুদিনের জন্য তরুণ যুবরাজ আবরণের কাজ করিতেন যাহার অন্তরালে আতাবেগ স্বীয় আকাঙ্ক্ষা গোপন রাখিতেন। ইহা সেই বিবাদের কারণ, যাহার ফলে সুলতান মাসঊদ ও তাহার অপরাপর আত্মীয়গণের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এইরূপে তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার আতাবেগ কর্তৃক প্ররোচিত হইতেন। তদ্রূপ ফারস, আযারবায়জান এবং কোন এক সময় মাওসিল প্রত্যেকটির একজন আতাবেগ ও সালতানাত (রাজত্ব)-এর দাবিদার ছিলেন। কির্মানের ক্ষুদ্র সালজূক রাজবংশের ক্ষেত্রেও এক অনুরূপ বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল (মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, Histoire des Seldjukides du Kirman, সম্পা. Houtsma, 35-132, স্থা. ও নির্ঘণ্ট, বিশেষত কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন বুযকুশ-এর রাজত্বকালে)।

আতাবেগ পদটি বংশগত করার প্রচেষ্টায় কৃতকার্যতার পর আরও এক নূতন ধাপে উত্তরণ ঘটিল, যখন তাহার এই পদটির সহিত একত্রে গভর্নরের পদটির অধিকারও বংশগত করা হয়। আসলে ইহা ছিল তাহার জন্য পুরস্কারস্বরূপ। এই কার্য ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর আযারবায়জান-এর আতাবেগ-পরিবার কর্তৃক সাধিত হয় যাহারা সুলতান আরসলানের আতাবেগ ইলদিগিয-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। পরিশেষে পরবর্তী শতাব্দীর প্রারম্ভে দুকাক-এর উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থায় দামিশকে ইন্তিকাল যাহা সালজূক কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল—আতাবেগ তুগতাকিনকে স্বীয় নামে একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম করিয়াছিল। অন্যত্র সকল শক্তিশালী আতাবেগ তাহাদের সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন

সুলতানগণকে অবদমিত করিয়া অনুরূপ পর্যায়ে উপনীত হন। মাওসিল-এ আতাবেগ যাঙ্গীর মৃত্যুর পর ৫৩৯/১১৪৪ সালে তাহার উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক অনুরূপ কার্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে ইলদেগিয-এর উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক খলীফার সাহায্যে শেষ পারস্য সালজূকদের বিরুদ্ধে একই কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহারা খাওয়ারাযম শাহকে মধ্যইরানে ডাকিয়া আনেন (৫৮৮/১১৯২)। অধিকন্তু সুলতানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আযারবায়জান ও মাওসিল-এর শাসকগণ আতাবেগ বলিয়া অভিহিত হইতেন। অতঃপর এই শব্দটি কার্যত সম্পূর্ণরূপে 'ভূখণ্ড-অধিকারী শাসক' অর্থ বুঝাইত। এইরূপ ইহা মনে হয়, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারস-এ সালগুরীগণ কর্তৃক এই উপাধিটি গৃহীত হইয়াছিল যাহারা ছিলেন প্রকৃত আতাবেগ-এর পরাভূতকারী এবং অন্য কোন সুলতান তখন তাহাদের অভিভাবক হিসাবে ছিলেন না। আতাবেগ বংশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হইল মাওসিল-এর বংশটি। তাহাদের প্রজা ও ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর কর্তৃক তাহাদের সম্পর্কে এতখানি ইতিহাস (তারীখুদ-দাওলাতিল-আতাবাকিয়্যা বিল-মাওসি'ল) রচনাই ইহার কারণ। আরও ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে লুরিস্তান-এ নূতন এক কৃত্রিম আতাবেগ বংশের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল (হা'মদুল্লাহ মুসকতওফী কা'যবীনী, তারীখ-ই গুযীদাহ্)

আতাবেগ খেতাব তখনও সালজূক, বিশেষত খাওয়ারিযম শাহের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। খাওয়ারিযম শাহগণ এই খেতাবধারিগণকে, বিশেষ করিয়া তরুণ যুবরাজদের গৃহশিক্ষকগণকে অধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করিতে দিতেন না (জুওয়ায়নী, ২খ., ২২, ৩৩, ৩৯, ২০৯)। পরবর্তী কালে যে সকল রাষ্ট্রের উৎপত্তি মোঙ্গল বিজয়ের ফলে হইয়াছে, আতাবেগ উপাধি সেইগুলিতে আকস্মিকভাবে কদাচিৎ যুবরাজদের অনির্দিষ্ট গৃহশিক্ষকের জন্য কিংবা অতীত কাল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্মানসূচক উপাধিগুলির একটি হিসাবে ব্যবহৃত হইত (দ্র. তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, M. F. Koprulu, Atabeg প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ)। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল খৃস্টান অধ্যুষিত জর্জিয়ায় সামরিক ও সামন্ত নেতাদের প্রতি আরোপিত এই খেতাবটির প্রসার—যেইভাবে অপরাপর বিষয়সমূহ নিকটবর্তী আযারবায়জান রাজ্য হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। এই রাজ্যদ্বয় কখনও কখনও যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং কখনও কখনও তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইত (J. Karst. Le, Code Georgien du roi Vakhtang. Commentaire, ১খ., ২২১ প.; M. F. Brosset, Histoire de Georgie, ১/২খ., স্থা.; Allen, A History of The Georgian People, 1932, Chap. xxiii)।

এশিয়া মাইনরের সালজূকদের মধ্যে প্রথম কীলীজ আরসলান-এর রাজত্বকালের প্রারম্ভ হইতে 'আতাবেগ' খেতাব স্বীকৃতি লাভ করে। খুমারতাশ আস-সুলায়মানী (তাহার পিতা সুলায়মান ইব্ন কুতলুমুশ-এর মুক্তদাস) তাহার প্রথম আতাবেগ ছিলেন (ইবনুল-আযরাক, ইবনুল কালানিসী প্রণীত দামিশ্কের ইতিহাসে Amedroz-এর একটি টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৭)। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে সালজূকদের প্রধান শাখার আতাবেগগণের অস্তিত্বের উল্লেখ রহিয়াছে (RCEA, no. 3376-3377) এবং তৎপর ৭ম/১৩শ শতাব্দীতেও সুলতানের ক্ষমতা তাহাদের প্রভাব বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে। ধ্বংসলীলার ফলে সালজূক রাজ্য মোঙ্গল আশ্রিত রাজ্যে পরিণতি লাভ করে। কেবল তাহার পরে এই উপাধি তাহারাই ধারণ করিতেন সরকারের উপর যাহাদের চূড়ান্ত প্রভাব ছিল, যেমন জালালুদ্দীন কারাতায়। যাহা হউক, এশিয়া মাইনরে ঘটনার বিবর্তনের ফলে ব্যক্তি নহে, বরং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দলের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, যাহারা অবস্থানুযায়ী পরস্পর কখনও মিত্র, আবার কখনও শত্রু হইতেন। ইহা নিশ্চিত সে, ইহাদের মধ্যে আতাবেগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই এলাকায় আতাবেগের অস্তিত্ব ঈলখানী শাসনকালে পরিলক্ষিত হয় না এবং উছমানী শাসকদের নিকট এই উপাধি অপরিচিত ছিল।

যাহা হউক, আতাবেগ খেতাবটি তবুও মামলূক রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। আয়্যূবীগণ তাহাদের রাজত্বকালে ইরাকে পরিচিত করিয়া তোলেন। সম্ভবত ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল সেই ক্ষণজীবী অভিভাবকত্বে, যাহা আল-আফদাল ৫৯৫/১১৯৮ সালে তাঁহার তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র মিসরের আল-'আযীযের (পুত্র)-এর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা যুবরাজের অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালে ইয়ামান ও আলেপ্পোতে স্থায়ী ও আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হইত (ইবনুল আদীম, তারীখ হালাব, স্থা.)। এই পদ্ধতিতে ইহা মামলূকদের রাজত্বে অনুপ্রবেশ করে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'ইযযুদ্দীন আয়বাক এই খেতাব ধারণ করিতেন, তিনি যুবরাজের শিক্ষক হিসাবে নয়; বরং আস্-সালিহ আয়্যূব-এর বিধবা পত্নী ও প্রসিদ্ধ উত্তরাধিকারী শাজারাতুদ্-দুর্‌র-এর স্বামী ও প্রতিনিধিরূপে। কখনও এই খেতাবের সহিত বিশেষ ক্ষমতা থাকিত, আবার কখনও ইহা ক্ষমতা বিবর্জিত হইত, এইভাবে এই রাজবংশ শেষ পর্যন্ত টিকিয়াছিল। আল-মাক্রীযীর (সুলূক, অনু. Quatremere, i/1, 2) মন্তব্য সঠিক হইলে আয়বাক সেনাবাহিনীর আতাবেগ খেতাব বহন করিতেন, কিন্তু কোন সমসাময়িক লেখক তাহার প্রতি এই উপাধি আরোপ করেন নাই, বরং সেই যুগে প্রচলিত আতাবাকুল 'আসাকির (দ্র.) উপাধিটি আল-মাক্রীযীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। বস্তুত ইহা সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃত্বের সহিত সংযুক্ত ছিল, যদিও সার্‌কাসীদের আমলে নাইব-এর পদবী বিলুপ্ত হওয়ার বাহ্যত ইহা এই বর্ধিত অর্থ লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বিষয়টি সম্বন্ধে একমাত্র সাধারণ গবেষণা প্রবন্ধ M. F. Koprulu লিখিত উল্লিখিত প্রবন্ধটি যাহাতে বিস্তারিত প্রসঙ্গ ও অধিকতর তথ্য পাওয়া যায় ; (২) উৎস ও অন্যান্য বিষয়বস্তুর জন্য নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতগুলি ব্যতীত দ্র. "মামলূক" ও "সালজূক" নিবন্ধদ্বয় । (৩) সালজূকগণ ও তাহাদের ইরানী ও ইরাকী উত্তরাধিকারিগণ সম্পর্কে যে তথ্য এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলি গৃহীত হইয়াছে প্রধানত ইবনুল আছীর ইমাদুদ্দীন আল-ইস্ফাহানী ও রাওয়ান্দী হইতে। আরও দ্র. : (৪) Sanaullah, The Decline and Fall of the Seldjukid Empire, 1938 : (৫) M. A. Koymen, Buyuk Selcuklu Imparatorugu Tarihi, ii, Ankara 1954; (৬) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devleti Teskilatina Medhal, Istanbul 1951, 50-1; (৭) এশিয়া মাইনরের জন্য দ্র. প্রধানত ইব্ন বীবী ও আক্সারায়-এর বিবরণ, স্থা.; (৮) মামলূকগণ সম্বন্ধে আতাবাকুল আসাকির প্রবন্ধ দ্র.।

Cl. Cahen (E.I.[2]) / মাহবুবুর রহমান

আতাবাকুল 'আসাকির (اتابك العساكر) ঃ রাজপ্রতিনিধি (Viceroy=নাইবুস সাল্‌তানা)-এর পদের বিলুপ্তির পর মাম্‌লূক সেনাবাহিনীর আতাবাকুল 'আসাকির (প্রধান সেনাপতি) সাল্‌তনাতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আমীর-এ পরিণত হন। তাঁহার পদবী হইতে তাঁহার কর্তব্যের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তদপেক্ষা তাঁহার কর্তব্য অনেক বেশী ছিল, যেহেতু কার্যত তিনি সর্ববিষয় ও কর্মে সুলতানের প্রতিনিধি ছিলেন। প্রায়শই মুদাববিরুল মামালিক বা মুদাব্বিরুল মামালিকিল ইস্‌লামিয়া পদবীটি তাঁহার নামের সহিত সংযুক্ত করা হইত বিশেষ করিয়া সারকাসিয়ান [Circassian], যুগে তিনি সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হইতেন (দ্র. D. Ayalon, Studies on the Structure of the Mamluk Army, BSOAS, ১৯৫৪, পৃ. ৫৮-৫৯ ও পৃ. ৫৯, টীকা ৬-এ প্রদত্ত বরাতসমূহ)।

D. Ayalon (E.I.[2]) / ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

'আতাবাত (عتبات) ঃ ('আ., প্রবেশস্থল, চৌকাঠের নিম্নাংশ), পূর্ণতর রূপ আতাবাত-ই 'আলিয়া অথবা আতাবাত-ই মুকাদ্দাসা (মহৎ প্রবেশস্থল বা পবিত্র প্রবেশস্থল)। ইরাকের পবিত্র নগরীসমূহ নাজাফ, কারবালা, কাজিমায়ন ও সামার্‌রা (দ্র.) যাহা ছয়জন শী'আ ইমামের সমাধি এবং আরও কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় পর্যায়ের মাযার যিয়ারতগাহ্ লইয়া গঠিত।

নাফাজ কূফা হইতে দশ কিলোমিটার পশ্চিমে 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব [(রা) (মৃ. ৪১/৬৬১)]-এর সমাধি ভূমিরূপে কথিত। অপর একটি সমাধি আলী (রা)-এর প্রতি উৎসর্গীত উত্তর আফগানিস্তানের মাযার-ই শরীফে অবস্থিত (দ্র. খাওয়াজা সায়ফুদ্দীন খুজান্দী, কার্‌ওয়ান-ই বাল্‌খ, মাযার-ই শরীফ, তা. বি., ১৮ প.)। কথিত আছে, উমায়্যা আমলব্যাপী তাঁহার কবর গোপন রাখা হইয়াছিল এবং সর্বপ্রথম তৃতীয়/নবম শতাব্দীর শেষদিকে মাওসিলের হাম্‌দানী শাসক আবুল হায়জা কর্তৃক উহা গম্বুজ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল। সুলতান আদুদুদ্-দাওলা বুওয়ায়হী ৩৬৯/৯৭১-৮০ সালে এই আদি স্মৃতিসৌধটির মেরামত ও সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন (ইব্‌নুল আছীর, ৮খ., ৫১৮ প.)।

বাগদাদের এক শত কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কারবালা যেখানে হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা) ৬১/৬৮০ সনে শাহাদাত বরণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ইহা অতি শীঘ্র শী'আদের একটি তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। শী'আ জনশ্রুতি অনুসারে প্রথম তীর্থযাত্রী ছিলেন জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) যিনি হুসায়ন এর শাহাদাত বরণের ৪০ দিন পর সেই স্থানটি যিয়ারত করিয়াছিলেন। আব্বাসী খলীফা আল-মাহদীর মাতা উম্ম মূসা সেই তীর্থস্থান (মাশ্‌হাদুল হাইররূপে পরিচিত) উদ্যান সরোবরের দরগাহ-এর জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন (তাবারী, ৩খ, ৭৫২)। কিন্তু শী'আদের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াককিল ২৩৬/৮৫০ সনে ইহা ধ্বংস করিয়াছিলেন (তাবারী, ৩খ, ১৪০৭)। ৩৩৬/৯৭৭ সনে ইব্‌ন হাওকালের কারবালা পরিভ্রমণের পূর্বেই দৃশ্যত তীর্থস্থানটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (সম্পা. J. H. Kramers, ১খ., ১৬৬) এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষদিকে আদুদুদ-দওলা ইহাকে নাজাফের ন্যায় সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন।

বুওয়ায়াহী আমল হইতে শুরু করিয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আতাবাতদ্বয় নাজাফ ও কারবালা একই ভাগ্যের অধিকারী হয়। ইরাকের পরপর কয়েকজন শাসক ও বিজয়ীর যিয়ারত ও পৃষ্ঠপোষকতা উভয় আতাবাতই লাভ করে। এইভাবেই মালিক শাহ্ সালজূক ৪৭৯/১০৮৬-৭ সনে নাজাফ ও কারবালা উভয় স্থান যিয়ারত করেন এবং উভয় মাযারে নজরানা পেশ করেন (ইব্‌নুল-আছীর, ১০খ., ১০৩)। এই তীর্থস্থান দুইটি মোঙ্গল আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া ঈলখানী শাসন আমলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিবুদ-দীওয়ান 'আলাউদ-দীন জুওয়ায়নী যিয়ারতকারীদের বাসের জন্য ৬৬৬/১২৬৭ সালে নাজাফে একটি মেহমানখানা স্থাপন করেন এবং তিনি শহরটিকে ফুরাত নদীর সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য একটি খাল খনন আরম্ভ করেন (আব্বাস আল-আয্‌যাবী, তারীখুল-ইরাক বায়না ইহতিলালায়ন, বাগদাদ ১৩৫৪/১৯৩৫, ১খ., ২৬৩, ৩১০)। ৭০৩/১৩০৩ সালে গাযান খান উভয় মাযার যিয়ারত করেন এবং নাজাফে বসবাসকারী সায়্যিদগণের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করেন (দারুস-সিয়াদা) একই সময় তিনি যিয়ারতকারীদের জন্য আর একটি আবাস নির্মাণ এবং জুওয়ায়নী নির্মিত খালটিরও উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি কারবালায়ও অনুরূপ সাহায্য দান করেন (রশীদুদ্দীন ফাদ্‌লুল্লাহ, তারীখ-ই মুবারক-ই গাযানী, সম্পা. K. John, London ১৯৪০, পৃ. ১৯১, ২০৩, ২০৮)। ৮০৩/১৪০০ সনে বাগদাদ দখল করিবার পর তীমূর নাফাজ ও কারবালায় যিয়ারতের উদ্দেশে গমন করেন এবং মাযারদ্বয়ে সওগাত পেশ করেন (আল্-আয্‌যাবী, পূ. গ্র., ২খ., ২৪০)।

দশম/ষোড়শ শতাব্দীতে ইরাক সাফাবী ও তুর্কীদের মধ্যে একটি বিরোধের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিটি পক্ষই নিজ শাসন আমলে নাফাজ ও কারবালার তীর্থস্থানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও উহাদেরকে সম্পত্তি দান করিত। শাহ্ ইস্‌মাঈল সাফাবী ৯১৪/১৫০৮ সনে এই তীর্থস্থান দুইটি যিয়ারত করিয়া উহাতে প্রচুর উপহার পেশ করেন এবং ঈলখানী আমলের খালটিরও সংস্কার সাধন করেন (আল্-আয্‌যাবী, পূ. গ্র. ৩খ., ৩১৬, ৩৪১)। সুলতান সুলায়মান কানূনী ৯৪১/১৫৩৪ সালে ইরাক জয়ের পর অনুরূপভাবে নাজাফ ও কারবালা যিয়ারত করিতে গমন করেন এবং কারবালায় একটি নূতন সেচখাল খনন করান, যাহাকে তাঁহার নামানুসারে আন্-নাহ্‌রুস্-সুলায়মানী বলা হয় (আল-আয্‌যাবী, পূ. গ্র., ৪খ., ২৯, ৩৬-৭)। ১ম শাহ্ আব্বাস ১০৩২/১৬২৩ সালে ইরাক ও আতাবাতকে সাফাবী নিয়ন্ত্রণাধীনে পুনঃআনয়ন করেন। ১০৪৮/১৬৩৮ সনে ৪র্থ মুরাদ সাফাবী নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটান এবং তিনি নাজাফ ও কারবালা উভয় মাযারকে অধিকতর সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের পথে পরিচালিত করেন। পুনরায় ১১৫৬-৯/১৭৪৩-৬ সনে নাদির শাহ্ নাজাফ ও কারবালাসহ ইরাকে এক অংশ তুর্কী শাসন হইতে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করেন। নাদির শাহ্ সম্বন্ধে বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। যথা তিনি কারবালার মাযারের গুম্বজটিকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন এবং মাযারের কোষাগার লুণ্ঠন করেন। এইবারই শেষবারের মত ইরাকের তুর্কী শাসন ইরান হইতে হুমকির সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী নাজাফ ও কারবালা উভয় স্থানে ইরানী রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বহাল ছিল। বর্তমান যুগে ঐ

মাযারসমূহের বহুলাংশে ইরানী চেহারার প্রধান কারণও ইহাই। প্রথম কাজার সম্রাট আগা মুহাম্মাদ খান কারবালার গুম্বজটিকে পুনরায় স্বর্ণমণ্ডিত করাইয়াছিলেন এবং নাজাফের মাযারটিকে স্বর্ণবেষ্টনী দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন (H. Algar, Religion and State in Iran, ১৭৮৫-১৯০৬ ; The Role of the Ulama in the Qajar Period, Berkeley and Los Angeles ১৯৬৯, পৃ. ৪২)। তাঁহার অনুকরণে ফাত্হ আলী শাহ্ কারবালার মিনারগুলিকে স্বর্ণমণ্ডিত করাইয়াছিলেন এবং স্বর্ণইষ্টক দ্বারা মাযারটির গুম্বজ পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১২১৬/১৮০১ সনে ওয়াহ্হাবীদের অতর্কিত আক্রমণে কারবালার যে ক্ষতি হইয়াছিল মুহাম্মদ শাহ উহা পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১২৮৭/১৮৭০ সনে নাসীরুদ্দীন শাহ স্বয়ং আতাবাত পরিদর্শন করিয়া নাজাফ, কারবালা ও কাজিমায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Algar, পূ গ্র., ৪৮, ১০৪, ১৬৭)। ভারতের বিভিন্ন শী'আ রাজ্যের শাসকগণ, বিশেষ করিয়া অযোধ্যার নওয়াব আতাবাতে উপঢৌকন ও অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করিয়াছিলেন (J. N. Hollister, The Shia of India, লন্ডন ১৯৫৩, পৃ. ১০৭, ১১২, ১৬২-৩)।

আতাবাতের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী কাজিমায়ন (কাজিমিয়্যা-ও বলা হয়) পূর্বে তাইগ্রীস (دجلة) নদীর ডান তীরে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র শহর ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা বস্তুত বাগদাদের একটি উপশহর ও সপ্তম ও নবম ইমাম মূসা আল-কাজিম (মৃ. ১৮৬/৮০২) ও মুহাম্মাদ আত্-তাকী (অথবা আল্-জাওয়াদ) [মৃ. ২১৯/৮৩৪]-এর সমাধিভূমি। ইহা উত্তরে সামাররা ও দক্ষিণে নাজাফ ও কারবালার মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ার দরুন 'আতাবাতের মধ্যে ভৌগোলিক দিক দিয়া কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছিল এবং এখানে সর্বদা তীর্থযাত্রীদের নিয়মিত আগমন ঘটিত। ইহা মোঙ্গল আক্রমণের আঘাত হইতে সম্পূর্ণ বাঁচিতে পারে নাই এবং ইহা ৬৫৬/১২৫৮ সনে মোঙ্গলদের বাগদাদ জয়ের সময় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু নাজাফ ও কারবালা ইহার ব্যতিক্রম ছিল। কাজিমায়নে বিদ্যমান অধিকাংশ সৌধ শাহ ইস্মাঈলের সময় নির্মিত হইয়াছিল, ইনি সপ্তম ইমামের বংশধর হইবার দাবির প্রেক্ষিতে কাজিমায়নের পৃষ্ঠপোষতায় অত্যন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে আরব্ধ কাজগুলি সুল্তান সুলায়মান কর্তৃক ৯৪১/১৫৩৪ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন কাজার সুল্তান উহা পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কাজিমায়নের প্রধান প্রাঙ্গণটি (সাহ্ন) কাজার নৃপতি ফার্হাদ মীরযা ১২৯৮/১৮৮০ সনে নির্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কাজিমায়নে সমাহিত রহিয়াছেন দুইজন প্রাচীন শী'আ 'আলিম শারীফ আর্-রাদী (মৃ. ৪০৬/১০১৫), শারীফ আল্-মুরতাদা (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪), মূসা আল্-কাজিম-এর দুই পুত্র ইস্মাঈল ও ইব্রাহীম, ৪র্থ ইমামের পুত্র তাহির ইব্ন যায়নিল আবিদীন, খাদীজা বিন্তুল হাসান ও ফাতিমা বিন্তুল হুসায়ন (L. Massignon, Les saints musulmans enterris a Bagdad in Opera, xŒJ, Y. Moubarac বৈরূত, ৩খ., ১০০-১)।

আতাবাতের চতুর্থ মাযার সামার্রাতে দশম ও একাদশ ইমাম আলী আন-নাকী (মৃ. ২৫৪/৮৬৮) ও হাসান আল-'আস্কারী (মৃ. ২৬০/৮৭৩)-এর সমাধিদ্বয় ও এমন একটি গুহা-চৌবাচ্চা (সার্দাব)-ও রহিয়াছে যেখানে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহ্দী ২৬০/৮৭৩ সনে অন্তর্হিত (গায়ব) হইয়াছিলেন। ঐখানেই তিনি (শী'আদের বিশ্বাসমতে) সময়ের শেষ প্রান্তে পুনঃপ্রকাশের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইবেন।

শী'আ ইসলামী জীবনে প্রায় দ্বিতীয় কিবলার কাজ করে বলিয়া আতাবাতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি ইহাদের স্থান অন্য সকল মাযারের উপরে। ইরান, ভারতীয় উপমহাদেশ ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত অসংখ্য শী'আ এইগুলি যিয়ারত করিয়া থাকে। 'আতাবাতে যিয়ারতকালে প্রধানত নির্দিষ্ট দু'আ (যিয়ারতনামাহ্) পাঠ করিয়া পবিত্র মাযারগুলি তাওয়াফ করা এবং সশ্রদ্ধভাবে মাযারের স্বর্ণবেষ্টনীর ঝাঁঝারি চুম্বন করা হয়। কেহ কেহ হয়ত ইমামদের মধ্যস্থতা (শাফাআত)-ও কামনা করে অথবা তাঁহাদের নামে মানত (নয্র)-ও করিয়া থাকে (এসব কাজই গর্হিত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত)। কার্বালা শুধু ইমাম হুসায়নের সমাধিভূমি নহে, এইখানে তাঁহার সৎ ভাই 'আব্বাস ও তাঁহার পুত্র আলী আক্বারের মাযারও অবস্থিত। যিয়ারতকারিগণ ইহা বারবার যিয়ারত করিয়া থাকে এবং প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাদের নামের শুরুতে কারবালাঈ উপাধিটি ব্যবহারের অধিকারী হয়। কারবালার মাটি হুসায়নের রক্তে সিক্ত হওয়ার দরুন ইহাকে বিশেষ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা হয়। সাধারণত এই মাটি হইতে প্রস্তুত চাকতি (মুহ্র)-এর উপর শী'আগণ সিজ্দার সময় ললাট স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা পানিতে গুলিয়া এক প্রকার পানীয় (আব-ই তুর্বাত) তৈরি করা হয় এবং উহাকে অলৌকিক ও আরোগ্য ক্ষমতাসম্পন্ন পানীয় বলিয়া ধারণা করা হয়। পীড়িত, মুমূর্ষু ও আসন্নপ্রসবা মহিলাদেরকে ইহা পান করান হয় এবং মৃত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠে মৃদুভাবে ছিটাইয়া দেওয়া হয় (H. Masse Croyances et coutumes persanes, Paris ১৯৩৮, ১খ., ৩৮, ৯৬; B. A. Donaldson, the wild rue, লন্ডন ১৯৩৮, পৃ. ২০৫)।

হুসায়ন (রা)-এর মাযারের চতুর্দিকস্থ বেষ্টনীর উপর যে ধূলি জমিয়া থাকে, তাহার প্রতিও অত্যধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে এবং ইহার আরোগ্য ক্ষমতার জন্য ইহাকে যত্ন সহকারে সংগ্রহ করা হয় (Donaldson, পৃ. গ্র., ৬৭)। ভারতে কখনও কখনও ইহা সমাধির আস্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয় (Hollister, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৫)। আতাবাতে দাফন অত্যধিক কাম্য বিবেচনা করা হয়। এই ব্যাপারে কারবালাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইরান ও ভারত হইতে প্রায়ই আতাবাতে দাফন করার জন্য মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, বিশেষত নাজাফ ও কারবালায়, যেথায় বিশাল গোরস্থানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া অনেক ধার্মিক শী'আ শেষ জীবন ইমামদের প্রতিবেশী হিসাবে কাটাইবার জন্য সেখানে বসবাস করিতেও চলিয়া গিয়াছে।

আতাবাত শী'ঈ ধর্মতত্ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জীবনেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। শী'আ অধ্যুষিত প্রতি অঞ্চল হইতে আগত বিদ্বজ্জন ও শিক্ষার্থী সমাবেশে সেখানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। নাজাফকে সাধারণত দারুল-ইলম বলা হয়, যাহা বর্তমান শী'আ বিশ্বের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফগানদের ইস্ফাহান

লুণ্ঠনের পর অনেক ইরানী শী'আ শাসক ও শিক্ষাবিদ আতাবাতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই স্থানে সর্বোপরি কারবালাতেই শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে শী'আ ফিক্‌হশাস্ত্রের দীর্ঘকালের আখ্‌বারী ও উসূলী দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়াছিল উসূলী মতবাদের পক্ষে। যদিও কাজার আমলে ইরানে ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থলগুলি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল, তবুও আতাবাতের আকর্ষণ অব্যাহত ছিল। অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি ইরানে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কিছুকাল সেখানে বাস ও অধ্যাপনা অথবা অধ্যয়ন করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইরানী আলিমদের একটি বিশিষ্ট অংশ যখন কাজার রাজতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া সাংবিধানিক আন্দোলনকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন আতাবাত, বিশেষত নাজাফ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের একটি প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়, নাজাফ ছিল রাষ্ট্রশক্তির নাগালের বাহিরে। এই প্রসংগে নাজাফবাসী তিনজন শী'আ সাংবিধানিক মুজ্‌তাহিদ আবদুল্লাহ মাযানদারানী, মুহাম্মাদ কাজিম খুরাসানী ও মীর্‌যা হু'সায়ন খালীলী তিহ্‌রানীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (দ্র. আবদুল হাদী হাইরি, Shism and Constitutionalism in Iran: a study of the role played by the clerical residents of Iraq in Iranian politics, leiden ১৯৭৭)। ১৯৬৩ খৃ. নাজাফে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নির্বাসনের পরে সাম্প্রতিক কালে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে (mutatis mutandis) নাফাজ অনুরূপ ভূমিকা পালন করিয়াছে। আতাবাতে বসবাসকারী শী'আ উলামা ইরাকের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ তাহারা দেশের উপর বৃটিশ কর্তৃত্ব স্থাপনে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রত্যেক্ষ ভূমিকা পালন করিয়াছে ('আবদুল্লাহ ফাহ্‌দ আন্‌-নাফীসী, দাওরু 'শ্‌-শী'আ ফী তাতাওউরি'ল 'ইরাকিস্‌-সিয়াসী'ল-হাদীছ, বৈরূত ১৯৭৩, পৃ. ৮০)।

পরিশেষে এই বাস্তব ব্যাপারটি উল্লেখ করা যাইতে পারে, আতাবাত কেবল ইছ্‌না আশারী শী'আদেরই নহে, ইস্‌মাঈলী মতবাদের বিভিন্ন শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যও মনোযোগ আকর্ষণ করার যোগ্য বিষয়। যদিও তাহারা কৃচিৎ হজ্জ করিয়া থাকে, তবুও শী'আগণ প্রায়ই নাজাফ ও কারবালায় তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে (Hollister, পূ. গ্র., ২৮৯, ৩৯১) এবং সম্ভবত মোঙ্গলোত্তর যুগের কিছু নিযারী ইমাম নাজাফে সমাধিস্থ হইয়াছেন (W. Ivanow, Tombs of Some Persian Ismaili Imams, in JBBRAS, ১৪খ. (১৯৩৮), ৪৯-৫২)। যেই বেকতাশীদেরকে বিভিন্ন কারণে এক গুপ্ত শী'ঈ দল বিবেচনা করা হয় তাহারাও নাজাফ, কার্‌বালা ও কাজিমায়নে তাহাদের খান্‌কাহ (Tekkes) সংরক্ষণ করিত (আল-আযযাবী, পূ. গ্র., ৪খ., ১৫২-৩; Murat Sertoglu Bektasilik, ইস্তাম্বুল ১৯৬৯ খৃ., ৩১৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের অতিরিক্তি ঃ (১) A. Noldeke, Das Heiligtum al-Husains zu kerbela, বার্লিন ১৯০৯; (২) E. Herzfeld, Archaologische Riese im Euphrat-und Tigrisgebiet, বার্লিন ১৯১৯ খৃ., ২খ., ১০২ প., ১৪৫ প.; (৩) Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate, ৫৬, ৭৬-৯; (৪) D. M. Donaldson, The Shiite religion, London ১৯৩৩ (বহু সংখ্যক বরাত); (৫) ইমাদুদ্দীন হুসায়নী ইস্‌ফাহানী, তারীখ-ই জুগরাফিয়া-ই কারবালা-ই মু'আল্লা, তেহ্‌রান ১৩২৬/১৯৪৭ খৃ;(৬) জা'ফার আশ্‌-শায়খ্‌ বাকির আল-মাহ্‌বুবা, মাদিয়ুন-নাজাফ ওয়া-হাদিরুহা, নাজাফ ১৯৫৫-৭, ৩খ.; (৭) আবদুল-জাওয়াদ আল-কিলীদ্দার আলতামা, তারীখুল কারবালা ওয়া হাইরুল' হুসায়ন আলায়হিস্‌-সালাম, নাজাফ ১৩৮৭/১৯৬৭ ; (৮) জাফার আল্‌-খালীলী, মাওসূ'আতুল 'আতাবাত, বাগদাদ ১৩৮২-৯২/১৯৬৯-৭২, ১খ., কারবালা, ২খ. ও ৩খ., নাজাফ, ৪খ., সামার্‌রা।

H. Algar (E.I.Supl.1-2) / এ. বি. এম. আবদুর রব

'আতাবা (عتابة) ঃ আধুনিক আরবীর চার লাইনের কবিতা যাহা সাধারণত সিরিয়া, ফিলিস্তীন মেসোপটেমিয়া ও ইরাকে প্রচলিত, ইহার প্রথম তিন লাইনে শুধু ছন্দের মিলই থাকে না, বরং সাধারণত একই অন্ত্যমিল শব্দ ভিন্ন অর্থে (তাজ্‌নীস তাম্‌ম্‌) পুন ব্যবহৃত হয়। শেষ লাইনটি আতাবা ("প্রেমিকের ভর্ৎসনা) শব্দরূপের সহিত উচ্চারিত হয় এবং উহার শব্দ বা শব্দাংশের প্রায় কোন অর্থ থাকে না। উহার ছন্দ এক প্রকারের ওয়াফির (وافر)। ইহাকে প্রচলিত এক বিশেষ ধরনের এইরূপ কবিতা আবূযিয়্যা (দুঃখী লোক) বা লামী নামে অভিহিত এবং ইয়্যা (iyya=eyya)-র সঙ্গে উহা শেষ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Sachau, Arabische Volkslieder aus Mesopotamien, Ab. Pr. Ak. W, ১৮৮৯, ১৭ প.; (২) G.H. Dalman, Palastinischer Diwan, Leipzig ১৯০১ খৃ., স্থা.; (৩) B. Meissner, Neuarabische Gedichte aus dem Iraq, ii, MSOS As., ১৯০৩, ৬৫-৭৫, ৯৬-১২৮, iii, MSOS A., ১৯০৪, ২৬৮-৯; (৪) P. Kahle, Zur Herkunft der Ataba-Lieder, ZDPV, ১৯১১, ২৪২-৪; (৫) H. Ritter, Mesopotamische Studien, ii. Vierzig arabische Volkslieder, Isl., ১৯২০ খৃ., ১২০-৩৩; (৬) W. Eilers, Arabische Lieder aus dem Irak, in ZS, ১৯৩৫, ২৩৪-৫৫; (৭) ঐ লেখক, Zwolf irakische Vierzeiler, Leipzig ১৯৪২ খৃ.।

H. Ritter (E.I.2) / মু. আব্দুল মান্নান

আতাকো (দ্র. আতাবাক)

আতাবেগুল-আসাকির (দ্র. আতাবাকুল-আসাকির)।

'আতামা (عتمة) ঃ 'আ., আভিধানিক অর্থে শাফাক' (সূর্যাস্তের পর আকাশের লালিমা) দূরীভূত হইবার পর রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশ। এই সংজ্ঞাটি স'লাতুল-'ইশা-র সঠিক সময় নির্ভুলভাবে নিরূপণ করে এবং সেইজন্য স'লাতুল 'ইশাকে অনেক সময় স'লাতুল আতামা'ও বলা হয়। বেশ কিছু সংখ্যক হাদীছেও এই নাম উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ধর্মবিদগণ এই নামটি প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ পবিত্র কুরআনে স'লাতু'ল ইশাকে সুস্পষ্টরূপে স'লাতু'ল-ইশা (২৪ ঃ ৫৮) নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। সালাত সম্পর্কে আতামার ব্যবহারকে বেদুঈন স্বভাবসুলভ বলিয়া

উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ বেদুঈনগণ উক্ত সময়ে তাহাদের উষ্ট্রের দুগ্ধ দোহন করিত এবং এই দুগ্ধ দোহনকেই 'আতামা বলিত। মুসলিমগণকে এমন নাম ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে যাহা স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Wensinck, Handbook, দ্র. 'আতামা, 'ইশা'।

M. Plessner (E.I.2) / মু. আবদুল মান্নান

আতায় (اتای) ঃ ফালিহ রিফ্‌কী, তুর্কী লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ (১৮৯৪-১৯৭১)। ইস্তাম্বুলে তাঁহার জন্ম। তিনি ছিলেন গোঁড়া মতাবলম্বী হাদীছবেত্তা ও গোল্ডেন হর্নের তীরবর্তী জিবালিস্থ এক মসজিদের ইমাম খালীল হিলমীর পুত্র। তিনি মারজান হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। এখানেই তঁহার শিক্ষক কবি জালাল সাহির তাঁহার প্রাথমিক কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন ফ্যাকাল্টি অব লেটার্সে। 'প্রগতিশীল সরকারী চাকুরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে নামিক কামাল হইতে তাওফীক ফিক্‌রেত পর্যন্ত সমস্ত লেখকের উন্নত মানের সাহিত্য গ্রন্থাদি দিয়া সাহায্য করেন। ফালিহ রিফ্‌কী ১৯০২ খৃ. হুসায়ন যাহিদ (দ্র.)-এর তানীন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তানীন পত্রিকাটি ছিল ঐক্য ও প্রগতি কমিটি (Cap)-এর মুখপত্র। এখানে তিনি সপ্তাহে একবার তাঁহার 'ইস্তাম্বুল মেকতুবলারী' (ইস্তাম্বুল পত্রাবলী) লিখিতেন। বলকান যুদ্ধের সময় এই একই পত্রিকায় তাঁহার এইসব চিঠিপত্র ও পরবর্তী প্রবন্ধগুলি ছিল আবেগ, দেশপ্রেম ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বিরোধী ভাবধারায় পরিপূর্ণ। তুর্কী সুলতানের বিচার বিভাগে স্বল্পকালীন চাকুরীর পর তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত'াল্'আত পাশার ব্যক্তিগত সচিবালয়ে নিয়োগ লাভ করেন। ত'াল্'আত পাশার বুখারেস্ট ভ্রমণে তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং সেখান হইতে তিনি তাঁহার প্রথম ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রেরণ করেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখার রীতিতে তিনি পরবর্তী কালে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন পাক্ষিক পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া শেহবালে প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে তাঁহাকে রিজার্ভ অফিসার হিসাবে ডাকিয়া আনা হয়। তিনি সিরিয়াতে চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জামাল পাশার অ্যাড্‌জুটেন্ট ও ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। যখন জামাল পাশা নৌ-মন্ত্রী হিসাবে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যান তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার সচিবালয়ের উপ-পরিচালক নিয়োগ করেন এবং একই সঙ্গে তিনি জাতীয় ক্যাডেট অফিসারদের (N. O. C.) স্কুলের ইনস্ট্রাক্টর পদেও বহাল ছিলেন। যুদ্ধশেষে যখন ঐক্য ও প্রগতি সংস্থার (Cap) নেতারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন তখন ফালিহ রিফকী তাঁহার তিন বন্ধুসহ দৈনিক আকশাম পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সকল সাংবাদিক ইস্তাম্বুল সরকারকে সমর্থন দিত তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি আনাতোলিয়াতে (১৯১৮-২২) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোঁড়া সমর্থক হিসাবে পরিচিত হন। মুস্‌তাফা কামাল অন্যান্য বিখ্যাত সাংবাদিকদের সহিত তাঁহাকে ইয্‌মিরে আগমনের আমন্ত্রণ জানাইলে ১৯২২ খৃ.-এর শরৎকালে মুস্‌তাফা কামাল পাশার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে তিনি সদ্যমুক্ত (৯ সেপ্টেম্বর) ইয্‌মির রওয়ানা হন। মুস্‌তাফা কামাল তাঁহাদেরকে বলেন, "প্রকৃত যুদ্ধ এখন আরম্ভ হইতেছে" এবং তাঁহাদেরকে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের তাগিদ দেন। বোলু (Bolu) হইতে ১৯২৩ খৃ. সদস্য নির্বাচিত হইয়া ফালিহ রিফকী মুস্‌তাফা কামাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধা-সরকারী দৈনিক হাকিমিয়্যাত-ই মিল্লিয়া (পরবর্তীতে উলুস নামে ইহার নামকরণ হয়) পত্রিকার প্রধান লেখক হন। ১৯৫০ খৃ. ১৪ মে-র সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টির পরাজয় পর্যন্ত তিনি ২৭ বৎসর পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুলে গমন করেন এবং স্বীয় দৈনিক পত্রিকা 'দুন্‌য়া' প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'জুমহূরিয়াতে' একটি সাপ্তাহিক কলাম (Column) লিখিতেন। ২০ মার্চ, ১৯৭১ খৃ. ইস্তাম্বুলে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দুন্‌য়া পত্রিকাটি প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন।

মূলত সাংবাদিক ও সর্বদা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল আতায়-এর সাহিত্য-প্রতিভা ছিল সাধারণ সাংবাদিকদের প্রতিভা অপেক্ষা অনেক বেশী। তিনি প্রবন্ধ, সংক্ষিপ্ত বিবরণী, ভ্রমণ কাহিনী ও আত্মজীবনী রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন গতানুগতিকতা বিরোধী ও নিবেদিতপ্রাণ কামালবাদী। লেখক হিসাবে তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন রিপাবলিকান আমলের অর্জিত সংস্কার রক্ষা ও সমর্থনে নিয়োজিত করেন। আধুনিক প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ককে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তিনি অবিরাম আপোষহীন সংগ্রাম করেন। তিনি কি লিখিয়াছেন তাহা বড় কথা নয়, তিনি যে শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে, পশ্চাদপসরণ নয়।

আধুনিক তুর্কী গদ্যের একজন প্রধান লেখক ছিলেন তিনি। R. Kh. Karay ও উমার সায়ফুদ্-দীন-এর মত তিনিও সাধারণ তুর্কীদের কথ্য তুর্কী ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং পূর্বেকার লেখকদের সমুদয় কৃত্রিমতা সাবধানতার সহিত পরিহার করিয়া সংক্ষিপ্ত, অথচ নিখুঁত বর্ণাঢ্য ও নিজস্ব রীতিতে লিখিতেন। ১৯৩০-এর দশকে সরকার কর্তৃক পুনর্জীবিত ভাষা সংস্কার আন্দোলনের প্রতি জীবনের শেষ দিকে আতায়-এর কিছু সন্দেহ থাকিলেও তিনি ভাষা সংস্কার আন্দোলনের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৯৪০-এর দশক ও ১৯৫০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জনগণের ভাষা ও সাহিত্যের গুরু হিসাবে বিবেচিত নূরুল্লাহ আতাচের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যে সংস্কারকৃত ভাষা প্রবর্তিত করেন তাহা তরুণ লেখকদের আদর্শ ছিল। সম্ভবত এই আকর্ষণীয় রীতির জন্য তাঁহার পাঠকগণ তাঁহার কতিপয় লেখনীতে গভীরতার অভাব প্রায় অনুভব করে না। এইসব লেখনীতে বেশী কৃত্রিমতার আশ্রয় না লইয়া অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তিনি ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ, বিবৃতি ও বর্ণনা দিয়াছেন। আতায় ৩০টিরও অধিক গ্রন্থের লেখক ছিলেন কিন্তু তাঁহার রচনা ও প্রবন্ধের যে বৃহৎ স্তূপ সংবাদপত্র ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাবধি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহারা প্রধান গ্রন্থাবলী আতেশ ভে গুনেশ (১৯১৮) ও জাইতিনদাগী (১৯৩২), জাইতিনদাগী (১৯৭০) নামে দুইটি পুস্তক এক খণ্ডে প্রকাশিত, উছ্‌মানী সাম্রাজ্যের পতনের শক্তিশালী বর্ণনা সম্বলিত ফিলিস্তীন ও সিরিয়াতে প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁহার ধারণাসমূহ দেনিযাশীরি (১৯৩১), ইয়েনী রুশিয়া (১৯৩১), তাইমিশ কিয়িলারী (১৯৩৪), তুনা কিয়িলারী (১৯৩৪), হিন্দ (১৯৪৪) এই গ্রন্থগুলি যথাক্রমে ব্রাজিল, সোভিয়েত রাশিয়া, ইংল্যান্ড, বলকান উপদ্বীপ ও ভারত সম্বন্ধে

আকর্ষণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত-গেজারেক গৌরদুক লারিম (১৯৭০), ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ চানকায়া (দুই খণ্ডে ১৯৬১, সংশোধিত একখণ্ড সংস্করণ ১৯৬৯), আতাতুর্ক ও তাঁহার কার্যাবলীর উপর আতায়-এর অনেক গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। ইহাতে আতাতুর্কের বলিষ্ঠ জীবন-বৃত্তান্ত ও তাহার সময়ের অনেক চিত্তাকর্ষক চরিত্র বিশ্লেষণ আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক জায়গায় প্রচুর পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং ইনোনু বিরোধী অংশসমূহ ইকে কারা ওসমান ওগলু রাজনৈতিক আত্মজীবনী (Politikada 45 yil 1968) হইতে ধার করা হইয়াছে। মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম ফ্রন্টের প্রাক্তন অধিনায়ককে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে এই গ্রন্থে ইহাদেরকে উপস্থাপিত করেন। উভয় লেখক তাঁহাদের জীবনের শেষদিকে ইনোনুর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। বাশভেরেন ইনকিলাপচি (১৯৫৪), বিতর্কিত লেখক ও বিপ্লবী 'আলী সু'আভীর (১৮৩৯-৭৮) উপর একটি বিবরণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাকি মুহা আদিব ওগ্‌লু, ফালিহ রিফকী আতায়, কনোশুয়োর, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫; (২) বে নাজাতিগিল, এদেবিয়াতিমিন্দা ইসিমলার সুজলুন্ড, ইস্তাম্বুল ১৯৭৫ দ্র.; (৩) তাহির আলাংল্ড, ১০০ উনলু তুর্ক এস্বারি, ২খ., ইস্তাম্বুল, ১৯৭৪, ১১২৪-৩১।

Fahir Iz, (E.I.[2] Suppl) / মু. আলী আসগর খান

আতার (اتر) ঃ মৌরিতানিয়ার একটি শহর, আদরার সার্কেলের প্রধান স্থান, সেন্ট-লুই হইতে তিনদোফ অভিমুখী পথে এবং পোর্ট-ইতিন্ হইতে প্রায় ৪২০ কিলোমিটার পূর্বে ২৩০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। কসা-এর লোকসংখ্যা ৪৫০০, তাহাদের অনেকেই মুরাবিতের স্মাকি উপজাতিভুক্ত। স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে আতার ১৬শ বা ১৭শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সিঙ্গেতি (শন্‌কীতী)-র ইদাউ 'আলী প্রতি বৎসর মক্কাগামী হজ্জযাত্রীদল সংগঠিত করিতেন, যাঁহারা স্মাকিদের একজন প্রখ্যাত সদস্যকে ইমামরূপে নিযুক্ত করিতেন। কিছু দিন পরে তাহারা এই প্রথা ভঙ্গ করিয়া জনৈক গেল্লাবীকে এই ইমামাত দান করে। ইহাতে রোষাক্রান্ত হইয়া স্মাকিদের একটি দল শহর ত্যাগ করে এবং আযুগুই-এর এক বিখ্যাত জনবসতি এলাকায় গমন করে। এলাকাটি বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে ইহার প্রাচুর্যের কারণে পর্তুগীজগণ এখানে ১৫শ শতাব্দীতে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করিয়াছিল। পূর্বোক্ত রোষের এই বহিঃপ্রকাশের ফলেই আতার-এর জন্ম হয়।

যদিও সিঙ্গেতি আদ্‌রার-এর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় রাজধানীরূপে টিকিয়া আছে, কিন্তু আতার বর্তমানে একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বিরাট সংখ্যক বেদুঈন এই স্থানে বাজারের সুবিধা পাইয়া থাকে এবং মরক্কোর শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্যের ইহা দক্ষিণাঞ্চলীয় নির্গমন পথ। এইখানেই পশু পালনকারিগণ তাহাদের উট ও মেষ বিক্রয়ার্থে ও চা, চিনি, নীল, তৈল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য আগমন করে। এই স্থানের বিখ্যাত খেজুর বাগানের কারণেও তাহাদের আগমন ঘটে। তাহারা গেতনা নামে পরিচিত এক প্রকার খেজুর পরিষ্কার প্রক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, যাহার ফলে খেজুর আহরণের সময় তাহারা প্রচুর সম্পদ লাভ করে।

২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন Coppolani ও তাঁহার উত্তরসুরি Colonel Montane Capdebse সেনেগালে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করেন, তখন তাঁহারা শীঘ্রই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হন, যতক্ষণ আদ্‌রার-এর পার্বত্য অঞ্চল সশস্ত্র বিদ্রোহীদের উৎকৃষ্ট আশ্রয় দান করিতে থাকিবে, ততক্ষণ মৌরিতানিয়ায় শান্তি স্থাপন সম্ভব হইবে না।

আদরারের রাজধানী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ এই আতারকেই Colonel Gourand ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাহার সৈন্যবাহিনীর লক্ষ্যস্থলরূপে মনোনীত করেন।

হামাদান গিরিপথে আমীরের যোদ্ধাদেরকে ও শায়খ মালআয়নায়নের তালিবগণকে পরাজিত করিয়া তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারী কসারে প্রবেশ করেন এবং স্মাকি নেতা সিদি আওলদ সিদিবাবা-র আনুগত্য লাভ করেন।

সেনেগাল ও মরক্কোর সহিত সড়ক ও আকাশ পথে সংযুক্ত আতার-এর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব তখন হইতে অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Gourand, Mauritanie Adrar, প্যারিস ১৯৪৫ ; (২) Psichari, Les Voiz qui Crient dans le desert (সম্পূর্ণ গ্রন্থ, ২খ.), প্যারিস ১৯৪৮ ; (৩) Cdt. Modat, Portugais, Arabes et Francais dans l'Adrar mauritanien, in Bull., du comite d'Eludesbeitoriques et Acientifiqus d' A. O. F. ১৯২২, ৫৫০ ; (৪) R. M. M. ১৯, ১৯১২, ২৬০ ; (৫) Eludes Mauritaniemes (IFAN no. 5) Ahmed Lamine eeh chinguetti,

S. D. Ottonloyewski (E.I.[2]) / মু. আবদুল মান্নান

আতালিক ঃ আতাবেগ (আতাবাক) উপাধির মত একই মৌলিক অর্থসহ মোঙ্গল-পরবর্তী যুগে মধ্যএশিয়াতে প্রচলিত তুর্কী উপাধি।

জুচি (Golden Horde) ও ইহার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারী জাতিতে, যেমন কাযান ও ক্রিমিয়ার খান শাসিত অঞ্চলে এবং শিবান (Ak Orda) জাতিতে ও মোঙ্গলিস্তানের চাগাতায় রাষ্ট্রে, আতালিক প্রথমত কোন যুবরাজের অভিভাবক ও শিক্ষক এবং পদাধিকারে যুবরাজের সম্পত্তির (Apanage) প্রশাসক রাজার খান বা সুলতান নিজেরও একজন আতালিক থাকিতেন যিনি হইতেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি প্রায়ই প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিতেন। তুর্কী গোত্রীয় অভিজাতদের মধ্য হইতে প্রবীণ বেগরাই (আমীরগণ) আতালিক মনোনীত হইতেন। ইহা প্রতীয়মান হয়, যাযাবর তুর্কীদের প্রথানুসারে শাসকদের সর্বদাই এক একজন আতালিক থাকিত। এই প্রথা শাসকের আচরণের উপর গোত্রীয় অভিজাতদের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। তৈমূরী ও শায়বানী উৎসসমূহে প্রায়ই আতালিক শব্দটির পরিবর্তে ও একই অর্থে 'আতাকা' বা 'আতাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (সম্ভবত আতা-আকা বা আতাবেগ-আকা, আতালীক আকা-র সংক্ষেপিত রূপ। সেইখানে 'আকা অর্থ 'বড় ভাই' যাহা আবার পূর্ব তুর্কীতে সাধারণ নাম ও উপাধির সহিত যুক্ত হইয়া ভদ্র সম্ভোধনের একটি প্রচলিত রূপ)। আতাকা (আতালিক) পদটি প্রায়ই

একজন (কুকাল তাশ, 'পালিত ভাই') কুকাল ও (আমিলদাস)-কে দেওয়া হইত। এই সকল ব্যক্তি ক্ষমতাসীন বংশের রাজপুত্রদের সহিত একত্র লালিত-পালিত হইত, যাহার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক (কুকালতাশী) সৃষ্টি হইত (দ্র. তাওয়ারীখ-ই গুযীদা-ই নুসরাতনামা, সম্পা. এ. এম. আকরামভ, তাসখন্দ ১৯৬৭, অবিকল প্রতিরূপ ২৭০ ছত্র, ৪২৫০-৪ ও ২৭২); শায়বানী নামা হইতে বিনা'ই কর্তৃক রুশ অনুবাদ Materiali po istorii kazakhskikh khanstv xv--xviii Vekov-তে, আলমা আতা ১৯৬৯, ৯৮, ১০০ ; V. V. Velyaminov--Zernov, Issledovaniye O Kasimovskikh tsarakh i tsarevi cakh, pt. 2, St. Petersburg ১৮৬৪, ৪৩৮; V. V. Bartol'd, So cineniya, ii/2, 212; G. Doerfer, Turkische und mongolische Elements in Neupersischen, ii, 9 (No 419), 481 (No. 343), iv, 402-3 অন্যান্য বরাতসহ।

মধ্যএশিয়ার উযবেক শাসিত অঞ্চলে আতালিক উপাধির অর্থ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়। বুখারাতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত "মহান আতালিক" (আতালিক-ই বুযুর্গ) ছিলেন প্রবীণ আমীর ও প্রধান মন্ত্রী (সেইজন্য তাঁহার উপাধি ছিল উম্দাতুল উমারা ও বিযারাত পানাহ)। আস্তারখানী যুগে ঐতিহাসিক উৎসসমূহে তাঁহাকে প্রশাসনের দ্বিতীয় ব্যক্তি দীওয়ান-বেগীর সহিত প্রায়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি একই সময়ে প্রাদেশিক গভর্নরও হইতে পারিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমরকন্দের হাকিম ও ইমারত নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ আতালিক Yalangtush Biy একজন অর্ধ-স্বাধীন শাসক ছিলেন। তিনি ব্যতীত খানের উত্তরাধিকারী বাল্খ-এ বসবাসকারী আরও একজন আতালিক ছিলেন নিজস্ব অঞ্চলে একই কর্তব্যে নিয়োজিত। আরও একজন আতালিক ছিলেন উবায়দুল্লাহ খানের রাজত্বকালে (১১১৪-২৩/১৭০২-১১)। খোশবাগী (দ্র.) বুখারাতে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন নীচ জাতের একজন কর্মচারী। সম্ভবত ইহা ছিল উযবেক আভিজাত্যের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য খানের একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু ইহাতেও আতালিকের প্রাধান্য হ্রাস পায় নাই। ইতোপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বলখের আতালিক এই প্রদেশের স্বাধীন শাসক হন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাংগিত (Mangit দ্র.) গোত্রের 'মুহাম্মাদ রাহীম আতালিক' আখতারখানীদের শেষ খানকে হত্যা করিয়া বুখারায় একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ রাহীম ১১৭০/১৭৫৬ সালে খান ঘোষিত হন। তাঁহার চাচা উত্তরাধিকারী দানীয়াল বে (১১৭২-৯৯/১৭৫৮-৮৫) চেঙ্গিজ বংশের সাক্ষী গোপাল খানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া আতালিক থাকিতে পসন্দ করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মুরাদ এই সকল খানকে অপসারিত করেন এবং নিজেকে আমীর ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ইহা বুখারার মাংগিত শাসকদের অবিসম্বাদিত উপাধিতে পরিণত হয়। ১২১২/১৭৯৮ সালে শাহ মুরাদের নির্দেশে সংকলিত প্রশাসনিক নির্দেশিকা মাজম'উল-আরকামে আতালিকের পদটি প্রবীণ আমীরের পদরূপে বিবৃত হইয়াছে। তিনি সমরকন্দ হইতে কারাকুল পর্যন্ত বিস্তৃত যারাফশান উপত্যকায় সেচকার্যের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং একই সময়ে রূদ-ই শহর নামক বুখারার প্রধান খালের 'মীরাব' ও বুখারার রাবাদীর দারোগা (দ্র.) ছিলেন ডে Facsimile in Pis`menniye Panyatniki Vostoka, 1968, Moscow 1970, 50-51, ct; AA. Semenov, in Sovetkoye Vosto Kovedeniye, V, (1948, 144-7)। কিন্তু ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আতালিক পদটি সম্পূর্ণরূপে সম্মানসূচক পদে পরিণত হয়। বুখারার উহা ছিল ১৫টি ক্রমোচ্চ পদের সর্বোচ্চ এবং অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইত। ১৮২০ খৃ. আমীরের শ্বশুর হিসার-এর অর্ধ স্বাধীন শাসক এই পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন (দ্র. G. Meyendorff , Voyage d' Orenburg a Boukhara, fait en 1820, Paris 1826, 259 ; Of V.L. Vyatkin ,in Izvestiya Sredneaziatskogo Otdela Russkogo Geografieskogo Obsheestva, XViii [1928], 20, ; খৃ. ১৮৪০ সনে Shahrisabz-এর শাসক, আমীরের শ্বশুরও একজন আতালিক ছিলেন (N. Khanikov, Opisaniye Bukharaskogo Khanstva, St. Petersburg 1843, 185); শেষ দুই আমীরের আমলে কেবল হিসারের শাসককে (যাহার কোশ বেগী উপাধিও ছিল) আতালিক উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

খীবা-খান শাসিত রাজ্যে, আতালিক মূলত খান ও শাহযাদা সুলতানদের অভিভাবক ও উপদেষ্টাও ছিলেন এবং (আতালিক) তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তি শাসন করিতেন। আবুল গাযী তাঁহার শাজারা-ই তুর্ক গ্রন্থে (Ed. Desmaisons, text, 252, tr. 269) আতালিক সম্বন্ধে বলেন (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে), তিনি ছিলেন তাঁহার সুলতানের "মুখ, জিহ্বা ও ইচ্ছা" (aghizi, tili wa ikhtiyari)। সপ্তদশ শতাব্দীর রুশ উৎসসমূহ খীবার আতালিকদের সহিত রাশিয়ার বয়ারস (Boyars)-দের তুলনা করে (দ্র. Materiali Po istorii Uzbekskoy Tabzikskoy i, Turkmenskoy SSR, Moscow-Leningrad 4931, 266)। মুনিসের মতে (Firdaws al-ikbal, M. S. of the leningrad Brach of the Institute of Oriental Studies, C-571, f. 65b), আবুল গাযী খান রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিয়া চারিটি আতালিকর পদ সৃষ্টি করেন, তাঁহারা খানের ৩৪ আমলদার বিশিষ্ট পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁহাদেরকে "মহান আতালিক" বলিয়া অভিহিত করা হইত (Ulugh Atalik, of. ibid, ff. 112 a, 118b)। তাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিতেন চারিটি গোত্রীয় দলের (Tupa) যাহাতে সমুদয় খাওয়ারিযমী উযবেকগণ বিভক্ত ছিল : উইঘুর ও নাইম্যান, (Uiygur & Nayman), কুনগ্রাত ও কিয়াত (Kungrat & Kiyat), মাংগিত ও নুকুয (Mangit & Nukuz), কানসিল ও কীপচাক (Kangit & Kipcak)। "মহান আতালিক"দের একজন ছিলেন খানের আতালিক (দ্র. ঐ., পৃ. 69b, 10'b)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খানের আতালিক খীবাতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ১৭৪০ হইতে অন্য একজন সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি, ইনাক তাঁহাকে

কিছুটা পশ্চাতে ঠেলিয়া দেয় (নিম্নে দ্র.)। ইহা সুস্পষ্ট নহে, আবুল গাযীর আমলে মুনিস কর্তৃক উল্লিখিত মাত্র চারিজন আতালিক বর্তমান ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন। ১৭৪০ খৃ.-এ নাদির শাহের শিবির হইতে খীবার পদস্থ কর্মচারিগণ দ্বারা খীবার অধিবাসিদের নিকট প্রেরিত একটি চিঠি ১১ জন আতালিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় (দ্র. Gesgraficeskiye izvestiya, 1850, 546-7)। বাহ্যত উনবিংশ শতাব্দীর মত ঐ সময়েই আতালিক উপাধিটি উয্‌বেক গোত্র-প্রধানদেরকেও দেওয়া হইত। এইরূপ আতালিক তাঁহার গোত্রের প্রবীণ বে হইতেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল সাধারণত বংশানুক্রমিক, অবশ্য খানের অনুমোদন সাপেক্ষে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই উপাধি সম্পূর্ণ সম্মানসূচক মর্যাদা হিসাবেও কতিপয় তুর্কী গোত্রীয় প্রধানদের প্রদান করা হইয়াছিল (See Yu. Bregel,' in Problemi Vostokovedeniya, 1960, No. I, 171; F. idem, Khorezmskiye turkmeni V. Xix Veke, Moscow 1961, 129)। ১৮৫৯ খৃ. এই উপাধি কারাকালপাক গোত্রের প্রধানদের জন্যও প্রচলিত করা হয় (See Yu. Bregel, Dokumenti arkhiva Khivinskikh Khanov Po istorii i Etnografii Karakalpakov, Moscow 1957, 58)। "মহান আতালিক"দের সংখ্যা ১৮৭৩ খৃ.-এর পূর্বে চার হইতে আটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (দ্র. A. L. Kuhns, Papers in the Archives of the Leningrad Branch of the Institute of Oriental Studies File, 1/13, 105-6)। তাহারা অন্যান্য গোত্রপ্রধান হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন এবং উমারা-ই আজামের মধ্যে গণ্য হইতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে খানের আতালিক সর্বদাই খানের কুনগ্রাত (Kungrat দ্র.) গোত্রভুক্ত এবং প্রধানত খানের আত্মীয়ের মধ্য হইতে নিয়োজিত হইতেন। তিনি খান রাজ্যের প্রবীণ আমীর হিসাবে বিবেচিত হইতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও তিনি খানের উপদেষ্টা হিসাবে কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু পরবর্তীতে এই পদের গুরুত্ব লোপ পায়।

খোকান্দ খান শাসিত অঞ্চলে আতালিকদের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ফারগানার শাসক ও এই খান শাসিত রাজ্য মিংগ (Ming) বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহরুখ বে (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) বুখারার খানের নিকট হইতে আতালিক উপাধিপ্রাপ্ত হন (দ্র. V. P. Nalivkin, Histoire du Khanat de Khokand, Paris 1889, 68)। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্তারাও (তাশখন্দ ও খোযানদ-এর ন্যায়) কখনও কখনও এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা শুধু উযবেক গোত্রেরই ছিলেন না। ১৮৫০ দশক ও ১৮৬০ দশকের প্রথম দিকে তাশখন্দের শাসনকর্তা কানা'আত শাহ আতালিক একজন তাজিক গোত্রের লোক। আপাতত মনে হয়, খান শাসিত খোকান্দ অঞ্চলে এবং একই সময়ে বুখারাতে আতালিকের পদটি সরকারী পদ অপেক্ষা সম্মানসূচক পদবী হিসাবে বিবেচিত হইত।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চাগতায়দের অধীন পূর্ব তুর্কীস্তানে আতালিক উপাধিটির মূল অর্থ বজায় ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের (ক্ষমতাসীন বংশের শাহযাদাগণ) খানের উত্তরাধিকারী এবং খান নিজে আতালিক ছিলেন, তাঁহারা সর্বদাই হইতেন প্রবীণ তুর্কী বেগ। খানের আতালিক একই সময়ে ইয়ারকান্দের গভর্নর (হাকিম) ছিলেন এবং যুবরাজের আতালিক ছিলেন আকসু অথবা খোতানের গভর্নর (দ্র. Shah Mahmud Gurs Ta'rikh, ed, by. O.F.Akimushkin, Moscow 1976, text 30, 52, 64 et Passim)। পূর্ব তুর্কীস্তানের শেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক ইয়া'কূ'ব বেক (দ্র.) আতালিক গাযী হিসাবে নিজের পরিচয় দিতেন, সম্ভবত খোকান্দ হইতে কাশগড়ে বুযুর্গ খাওয়াজার উপদেষ্টা ও অভিভাবক হিসাবে প্রেরিত হইবার সময় তিনি আতালিক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র. V. V. Bartol'd, Socineniya, ii/2, 390, 394; (২) A.A. Semenov, in Materials, Po istorii tadzikov i Uzbekov Sredney Azii, ii, Stalinabad 1954, 61; (৩) H. Howorth, The history of the Mongols, ii, 869-7c; (৪) G. Doerfer, Turkische Und mongolische Elemente in Neupersischen, ii, 69-71 (No. 490); (৫) M. F. Kaprulu, IA, art, Ata, at the end.

Yu. Bregel (E.I.[2]) / মু. আলী আসগর খান

আতালীক (اتاليق/ اتليق) : আতাবেগ-এর সমার্থক শব্দ, ইহার ব্যবহার কেবল তুর্কীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ককেশাস, তুর্কিস্তান ও ভারতের তীমূরী ও তুর্কী শাসকদের মধ্যেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ১৯শ শতাব্দীতে বুখারা ও খিবার আমীরগণও এই উপাধি ধারণ করিতেন এবং কাশগারের আমীর ইয়া'কূ'ব বে আতালিক গাযী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : IA-তে, R.F.Koprulu কর্তৃক পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ রচিত প্রবন্ধ দ্র.।

R. Mantran (E.I.[2]) /মু. আব্দুল মান্নান

আতাহিয়্যা (দ্র. আবুল 'আতাহিয়্যা)

'আতিকা (عاتكة) : মক্কাবাসী মহিলা আদিয়্যি ইব্‌ন কা'ব বংশের 'হালীফ', যায়দ ইব্‌ন আমর-এর কন্যা এবং সা'দ ইব্‌ন যায়দ-এর ভগিনী। তিনি প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে আবূ বাক্‌র (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্‌র সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (আত্-তাবারী, ১খ., ২০৭৭ অনুযায়ী ১২/৬৩৩ সালে), যাঁহার ঔরসে ইয়াদ নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে (ইব্‌ন সা'দ, ৩/১খ., ১৯০)। হযরত উমার (রা)-এর শাহাদাতের পর তিনি আল-যুবায়র ইবনুল আওওয়ামকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই স্বামীর ইন্তিকালের পর তিনি অনেক শোকগাঁথার মাধ্যমে বিলাপ করেন (ইব্‌ন সা'দ, ৩/১খ., ৭৯ ইত্যাদি)। এই সুন্দরী মহিলা ও তাঁহার মৃত স্বামিগণের দুঃখের কাহিনী

শীঘ্রই কৃত্রিম প্রেম কাব্য ও শোক সঙ্গীতে বর্ণাঢ্য কল্পনাপূর্ণ রম্যোপন্যাসে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ৮খ., ১৯৩-৫ ; (২) ২/২খ., ৯৭ ; (৩) ইব্‌ন কুতায়বা 'উয়ূনুল আখবার, ৪খ., ১১৪ ; (৪) হামাসা (Freytag), পৃ. ৪৯৩ ; (৫) আগানী, ১৬খ., ১৩৩-৫ ; (৬) 'আয়নী, ২খ., ২৭৮ ; (৭) খিযানাতুল্ আদাব, ৪খ., ৩৫১ ইত্যাদি।

J. W. Fuck (E.I.[2]) / মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আতিয়্যা ইব্‌ন 'উরওয়া (عطية بن عروة) ঃ আস-সা'দী সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, মতান্তরে জুশাম ইব্‌ন সা'দ গোত্রে তাঁহার জন্ম, সন অজ্ঞাত। কাহারও মতে তাঁহার পিতার নাম আম্‌র, কাহারও মতে সা'দ, আবার কাহারও মতে কায়স। ইব্‌ন হিব্বান দৃঢ় মত পোষণ করিয়াছেন, 'আতিয়্যার পিতা 'উরওয়া ও পিতামহ সা'দ, পিতামহের নামের সাথে সম্পৃক্ত করিয়া আতিয়্যাকে আস-সা'দী বলা হয় (তাহযীব)।

ইব্‌নুল মাদীনীর মতে, হাওয়াযিন গোত্রের কয়েদীদের সম্বন্ধে যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিল আতিয়্যার পিতামহ সা'দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। 'আতিয়্যার পিতা 'উরওয়াও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির ছিলেন এবং তাঁহার সাথে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। 'আতিয়্যা তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র গোত্রের কতিপয় লোকের সঙ্গে আমিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গমন করি। আমি ছিলাম তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাঁহারা আমাকে কাফেলায় রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করেন এবং নবী (স) তাহাদের অভাব পূরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ কি বাকী আছে? তাঁহারা বলিলেন, একজন কিশোর কাফেলায় রহিয়াছে। তখন তিনি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। তাঁহারা আমাকে তাঁহার দরবারে লইয়া যান। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, "দাতার হস্ত উচ্চে এবং গ্রহীতার হস্ত নিম্নে।"

আতিয়্যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু হাদীছ রিওয়ায়েত করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে তাহার পুত্র মুহাম্মাদ, পৌত্র 'উরওয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও রাবী'আ ইব্‌ন ইয়াযীদ আদ-দামিশকী, ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবীল মুহাজীর, আতিয়্যা ইব্‌ন কায়স প্রমুখ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে পৌত্র 'উরওয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "রাগ শয়তান হইতে এবং শয়তান অগ্নি হইতে সৃষ্ট। অগ্নি পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেহ রাগান্বিত হয়, সে যেন উযু করে যাহাতে রাগ স্তিমিত হয়"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উসদুল্ গাবা, ৩খ., ৪১১; (২) ইসাবা, ৪৮৪; (৩) তাহযীবুত্-তাহযীব (দাইরাতুল মা'আরিফ প্রেস, হায়দরাবাদ, ভারত ১৩২৬ হি.), ৭খ., ২২৭।

রফিক আহমদ

আতিয়্যা ইব্‌ন বুস্‌র (عطية بن بسر) মাযিন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু সন অজ্ঞাত। দারাকুতনী ও ইব্‌ন হিব্বান তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবদুস্-সামাদ ইব্‌ন সা'ঈদ তাঁহাকে সেই সমস্ত সাহাবীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, যাহারা হিম্‌সে বসবাস করিয়াছিলেন। আতিয়্যাঃ, পিতা বুস্‌র, ভ্রাতা আবদুল্লাহ ও তাহার মাতা কতিপয় আত্মীয়-স্বজনসহ হিম্‌সে বসবাস করিতেন।

আতিয়্যা ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ উভয়ে তাঁহাদের পিতা বুস্‌রের নিকট হইতে নবী কারীম (স)-এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজা, সালীম ইব্‌ন আমিরের মাধ্যমে আতিয়্যাঃ ইব্‌ন বুস্‌র ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌রের সূত্রে একটি মাত্র হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি হইল ঃ আতিয়্যাঃ ইব্‌ন বুস্‌র ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর আমরা তাঁহাকে পনির ও খেজুর পরিবেশন করিলাম ....ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, ইস াবাঃ, ২খ., ৪৮৪ (২) ইব্‌নু'ল, আছীর, 'উস্‌দু'ল-গ াবা, ৩খ., ৪১১।

রফিক আহমদ

আতীল অথবা ইতীল (اتيل او اتيل) ঃ কোন কোন সময় আতিল (ইতিল) হাযারান বা খাযারান আতিল বলা হয়। খাযার-এর রাজধানী মধ্যযুগের গোড়ার দিকে নিম্ন ভল্গা নদী বা বাল্‌টিক সাগরের তীরে একটি জোড়া শহরকে আতিল, ইতিল (দ্র.) বলা হইত। ইহার প্রকৃত অবস্থান অজ্ঞাত। আল-মাস্'উদীর মতে (মুরূজ, ২খ., ৭), সুলায়মান (সালমান) ইব্‌ন রাবী'আ আল-বাহিলীর শাসনামলে অর্থাৎ প্রায় ৩০/৬৫০ সালে ককেশাসের নিকটে সামান্দার হইতে রাজধানী আতিলে স্থানান্তর করা হয়, যদিও অন্যত্র (তান্‌বীহ, ৬২) তিনি বলেন, ককেশাস অঞ্চলের বালাঞ্জর ছিল মূল খাযারের রাজধানী। ইহার পূর্বেই এই তারিখে বালাঞ্জর হইতে ২০০ ফারসাঙ্গ (৬০৮ মাইল) দূরে আল-বায়দার উল্লেখ আরবী উৎসসমূহে পাওয়া যায় (আত্-তাবারী, ১খ., ২৬৬৮), যদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, ইহা পরবর্তী কালের রাজধানী। ইব্‌ন রুস্তা (১৩৯) ভল্গার তীরে অবস্থিত জোড়া শহরকে স্পষ্টত প্রাচীনতর খাযার নামে বর্ণনা করিয়াছেন। আল-ইস্তাখরী (পৃ. ২২০)-র মতে শহরটির পশ্চিমাংশ যাহা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কয়েক মাইলব্যাপী ও প্রাচীর বেষ্টিত বিক্ষিপ্ত পশমী তাঁবুর ও কিছু সংখ্যক মাটির ঘরের একটি শহর ছিল। প্রকৃত খাযারগণ অর্থাৎ ইয়াহূদী মতাবলম্বী শাসকগোষ্ঠী, সেনাবাহিনী ও ইষ্টক নির্মিত রাজকীয় দুর্গ এই তীরেই অবস্থিত ছিল। অধিকাংশ মুসলমান, সংখ্যায় আনুমানিক ১০,০০০ পূর্ব তীরে বসবাস করিত। ইহা শহরের বাণিজ্যিক এলাকা ছিল। উহার বাজার, হাম্মাম, মসজিদ ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খৃস্টানও ছিল এবং পৌত্তলিক সাকালিবা ও রুশদের একটি কলোনীও ছিল (মুরূজ, ২খ., ৯, ১২)। প্রকৃতপক্ষে জোড়া শহরের পশ্চিম তীরের নাম খাযারান এবং পূর্ব তীরের নাম আতিল হওয়াই সঠিক মনে হয় (ইব্‌ন হ াওক াল, ৩৮৯, টীকা)। ইহার আধুনিক প্রতিরূপ আসত্রাখান-এর অনুরূপ।

ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমদানী কেন্দ্র। উত্তরাঞ্চলের উৎপাদিত দ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়া পশু-লোম খাযার রাজধানী হইয়া পার হইত এবং এই ব্যাপারে পশ্চিমে কিয়েভীয় (Kievan) রুশিয়া ও পূর্বে খাওয়ারিয্‌ম-এর সহিত যোগাযোগ করা হইত। দাস ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। ১০ম শতাব্দীর ষাটের দশকে রুশগণ খাযার রাজধানী ধ্বংস করে (ইবন হাওকাল, ১৫, ৩৯২; Russian Chronicle, anno ৯৬৫) এবং ইহার সমৃদ্ধি আর কখনও পুনরুদ্ধার হয় নাই, যদিও রুশগণ সেখানে হইতে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করিয়াছিল এবং ইহা পুনঃনির্মাণ করার চেষ্টাও করা হইয়াছিল (ইব্‌ন হাওকাল, ৩৯৮ ; আল-মাক্‌দিসী, ৩৬১)। খাযার রাজ্য ইহার পর কিছু দিন কোনমতে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল ; কিন্তু খাযারান আতিলের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হু'দূদুল-'আলাম, ৪৫২ প. ; (২) D.M. Dunlop, History of the Jewish Khazars, ৯১ টীকা, ১০৬, ২১৭ টীকা।

D. M. Dunlop (E. I.[2]) / মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আতিশ, খাজা হ'ায়দার 'আলী (آتش حيدر على) ঃ (মৃ. ১২৬৩/১৮৪৭). উর্দু ভাষায় এই কবি-আবুল-লায়ছ সিদ্দিকী-র মতে সম্ভবত ১১৯১/১৭৭৮ সালের কাছাকাছি সময়ে ফায়যাবাদে (ফায়দাবাদ দ্র.) জন্মগ্রহণ করেন (নিম্নে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। কথিত আছে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী এবং সেখান হইতে তাঁহারা দিল্লী আগমন করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা 'আলী বাখ্‌শ ফায়যাবাদে বসতি স্থাপন করেন এবং কবির যৌবনকালে ইন্তিকাল করেন। আতিশের বিদ্যা শিক্ষা ব্যাহত হয়; কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন দ্বারা তাহা পূরণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অমিতাচারী ও বিলাসী ছিলেন এবং একটি তরবারি সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু কবিতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা সকলের দৃষ্টিগোচর হইলে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রেরণ করা হয়। তথায় প্রখ্যাত কবি শায়খ গুলাম হামাদানী মুস্'হ'াফী তাঁহাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং খুব শীঘ্রই তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শায়খ ইমাম বাখ্‌শ নাসিখ-এর সহিত একজন প্রধান গযল (গাযাল) কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। লক্ষ্ণৌ-এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যদিও এইরূপ কাব্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আতিশের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, সব সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত হয় নাই, এমনকি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুর পর তিনি স্বয়ং কাব্য রচনা বন্ধ করিয়া দেন।

আধুনিক সমালোচকগণের মতে উভয়ের মধ্যে আতিশ তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার অভিমতে উর্দু গাযাল শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ, রচনাশৈলীতে অলংকারপূর্ণ এবং ইহাতে ব্যবহৃত উপমা, রূপক ও অন্যান্য অলংকার প্রায়শই কষ্ট-কল্পিত ও অতিরঞ্জিত। গাযালের ভাবসমূহ ছিল প্রধানত গতানুগতিক। উদাহরণস্বরূপ ফারসী গযলের অনুকরণে প্রিয়জনের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, যথা কেশগুচ্ছ (যুলফ) ও মুখমণ্ডল (রুখসার) সম্পর্কে প্রধানত মনোযোগ দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, আতিশ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা অদ্ভুত খেয়ালী ব্যক্তি এবং তাঁহার কবিতায় ইহার আংশিক প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। অযোধ্যার নওয়াবের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অবসর ভাতা গ্রহণ করিলেও তিনি কাহারও অনুগ্রহ লাভের জন্য কাব্য রচনা করিতেন না। ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভগ্ন কুটিরে দরবেশের ন্যায় বসবাস করিতেন। তিনি দরিদ্র লোকের প্রতি ছিলেন বিনয়ী ; কিন্তু ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি উদ্ধত। তাঁহার কাব্য রচনাতে তিনি বিশেষ কোন নব রীতির প্রবর্তক ছিলেন না, তবে একই সঙ্গে তিনি যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত কাব্যরীতির অন্ধ অনুকরণও করেন নাই। ফলে তিনি গযলের গঠন ও রীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন না করিলেও সমসাময়িক ও পূর্বসূরিগণের তুলনায় তাঁহার রচনাবলীতে প্রায়শ স্বল্প কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্ণৌর শিক্ষিত জনসাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় যাহা ব্যবহার করিত তাঁহার কাছাকাছি অধিকতর স্বাভাবিক ভাষা তিনি তাঁহার রচনায় ব্যবহার করেন। সম্ভবত বিদ্যালয়গত শিক্ষার অভাব তাঁহার এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহাকে আরবী শব্দের ভুল বানান ও সাহিত্যসুলভ নহে এমন বাক্যাংশ ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। প্রথমোক্তটি সম্ভবত ইচ্ছাকৃত ছন্দ প্রকরণের প্রয়োজনে অথবা উর্দুতে এই শব্দাবলীর প্রকৃত উচ্চারণ প্রকাশের জন্য। সংক্ষেপে বলা চলে, তাঁহার রচনাবলীতে প্রায়শ আমরা স্বতঃস্ফূর্ততা, এমনকি আন্তরিকতার ছাপ পাই এবং তাঁহার সাহিত্যিক ভাষা কালক্রমে একটি আদর্শ রীতিতে পরিণত হয়। তাঁহার কাব্য ৮০০০ শ্লোকের প্রায় সবই বাস্তবে গযলরূপে রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আতিশের কাব্য প্রথমত দুইটি দীওয়ান-এ প্রকাশিত হয়—প্রথমটি ১৮৪৫ সালে লক্ষ্ণৌতে কবির তত্ত্বাবধানে এবং দ্বিতীয়টি, যাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অধিকাংশ বিধৃত আছে, কবির মৃত্যুর পর ১২৬৮/১৮৫১ সালে তাঁহার ছাত্র মীর দোস্ত আলী খালীল কর্তৃক একই শহরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সংকলিত কাব্যসমূহের অনেক সংস্করণ এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কুল্লিয়াত, কানপুর ১৮৭১ ও ১৮৮৪, কুল্লিয়াত-ই আতিশ, জাহীর আহমাদ সিদ্দীকী রচিত একটি প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকাসহ, এলাহাবাদ ১৯৭২; (২) উক্ত কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালচনাসমূহ মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ-এর আব-ই হ'ায়াত পুস্তকে পাওয়া যাইবে, লাহোর ১৯৫০, ৩৭৯-৯৩; (৩) আবুল-লায়ছ সিদ্দীকী, লাখনাও কা দাবিস্‌তান-ই শা'ইরী, লাহোর ১৯৫৫, ৫২৫-৪১; (৪) মুহাম্মাদ সাদিক, History of Urdu Literature, লন্ডন ১৯৬৪, ১৩৮ ; (৫) রামবাবু সাক্‌সেনা, History of Urdu Literatur, এলাহাবাদ ১৯২৭, ১১১-১৩ ; (৬) শায়খ গুলাম হামাদানী মুস্'হ'াফী, রিয়াদুল ফুস'হ'া-তে আরও তথ্য পাওয়া যায়, দিল্লী ১৯৩৪, ৪-৯; (৭) কারীমুদ্‌-দীন ও ফাল্লোন, তায্‌কিরা-ই শু'আরা-ই হিন্দ, দিল্লী ১৮৩৮, ৩৫৪ ; (৮) সাফীর বিলগিরামী, জালওয়া-ই খিদির, দুই খণ্ড, আরা বিহার ১৮৮২, ২খ., ১০৬ প. ; (৯) খাওজা আবদু'র-রাউফ 'ইশরাত লাখনাবী, আব-ই বাকা, লক্ষ্ণৌ ১৯১৮, ১১-১৯, ১৭০-৭; (১০) Memoirs of Delhi and Faizabad, ইংরেজী অনু. ফায়দ. বাখ্‌শ, তা'রীখ-ই ফারাহ' বাখ্‌শ,

এলাহাবাদ ১৮৮৯, ২৬৬-৩০২; (১১) ই'জায হু'সায়ন, কালাম-ই আতিশ, এলাহাবাদ ১৯৫৫; (১২) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লক্ষ্ণৌর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি সাধারণ চিত্রের জন্য দ্র. আবদুল হালীম শারার, অনু. E. S. Harcourt and Fakhir Husain, Lucknow: the last phase of an oriental culture, লন্ডন ১৯৭৫। আরও গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত বিষয়াবলীর নিমিত্ত দ্র. খালীলুর-রাহমান আজামী ও মুরতাদা' হু'সায়ন ফাদি'ল, প্রবন্ধ আতিশ, লাহোর ১৯৬২, ১খ., ১০-১৪ ; (১৩) দা.মা.ই., পা'ব ১৯৬৪ খৃ., ১খ., ১০ ; (১৪) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরাজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., ১২৪)।

J. A. Haywood (E.I.² Suppl.) / আবদুল বাসেত

আতিশখানা মস্‌জিদ ঃ বা খান মুহাম্মদ মৃধার মস্‌জিদ, ঢাকা শহরে লালবাগ কিল্লার অনতিদূরে অবস্থিত। ১৭০৬ খৃ. কাযী ইবাদুল্লাহর আদেশে কারিগর খান মুহাম্মাদ মৃধা কর্তৃক নির্মিত। ইহা আয়তাকার, তিন গুম্বজবিশিষ্ট, মুগল রীতিতে নির্মিত; আয়তন ৪৮´ × ২৪; বড় গুম্বজটি মধ্যস্থলে অবস্থিত। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে গুম্বজগুলির দুই সংযোগস্থলের নিম্নে দুইটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান দ্বারা মসজিদটি তিন ভাগে বিভক্ত ; প্রতি ভাগের পশ্চিম প্রান্তে একটি করিয়া কারুকার্যময় মেহরাব। মসজিদের পার্শ্বে একটি হুজরা (কামরা) আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., ১২৪ ; (২) Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca, The City of Mosques, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৪৩।

(সংকলিত)

'আতীক' ইব্‌ন ক'ায়স (عتيق بن قيس) ঃ (রা) সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাবির (রা)-এর পিতা তাঁহার মাতার নাম যায়নাব বিন্‌ত সায়ফিয়্যি। তিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র জাবির একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন শাহীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ-এর বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, ৩খ., ৩৭০ ; (২) ইব্‌ন সা'দ আত্‌-ত'াবাক'াত, ৩খ., ৬২৪; (৩) ইব্‌ন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ., ৪৫৮, নং ৫৪২৯ ; (৪) আয্‌-যাহাবী, তাজ্‌রীদ ১খ., ৩৭৩, নং ১৯৮৫।

সিদ্দিকুল্লাহ

আতীনা (اتينة) ঃ গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। প্রাক্‌-ইস্‌লামী যুগের এথেন্সের ইতিহাস এখানে বর্ণনা করা হইবে না। মুসলমানদের সহিত
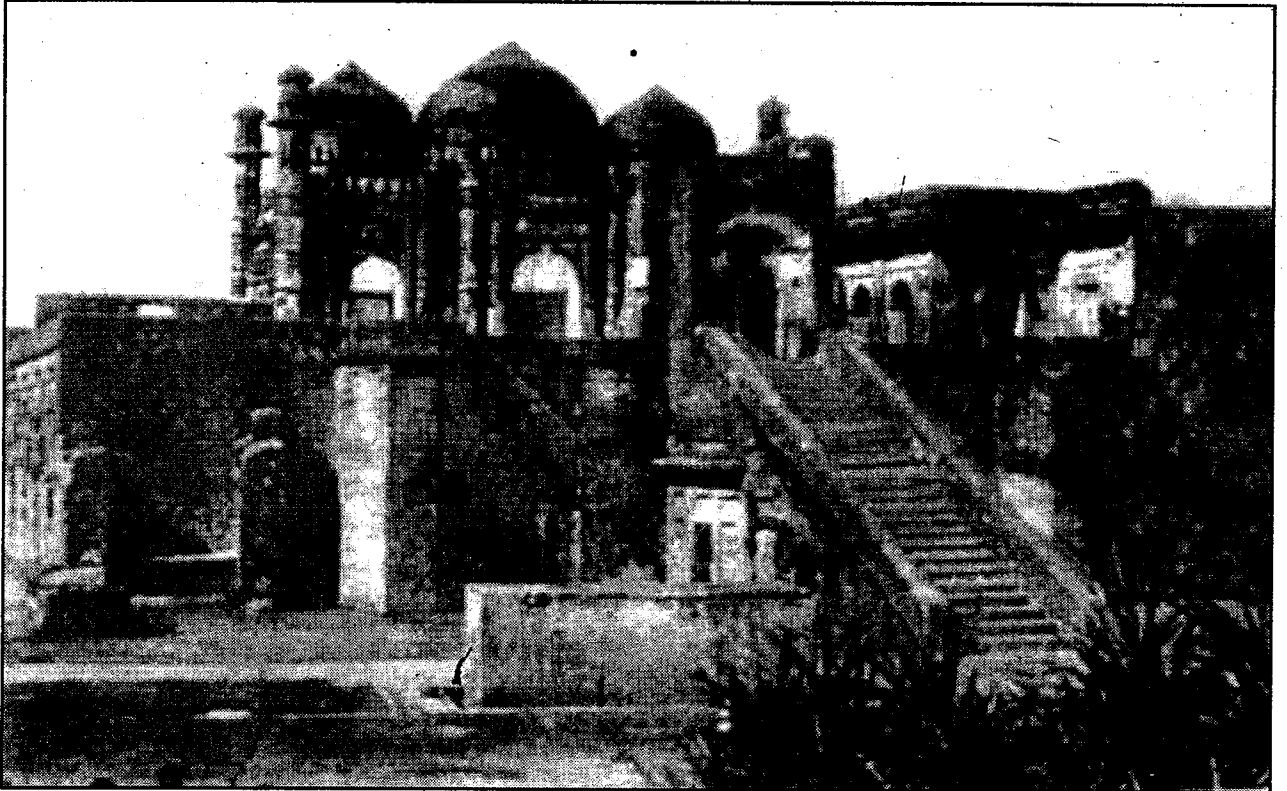
আতিশখানা (খান মুহাম্মাদ মৃধার) মসজিদ (১৭০৬ খৃ.)। পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে।

স্বীকৃতভাবে শত্রুতামূলক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ২৮৩/৮৯৬ সালে স্থাপিত হয় যখন 'আরবগণ অল্প সময়ের জন্য শহরটি দখল করিয়াছিল (তু. D. G. Kambouroglous-এর গ্রীক ভাষায় রচিত এই সম্পর্কিত গ্রন্থ, এথেন্স ১৯৩৪)। এথেন্স কতিপয় আরবীয় ধ্বংসাবশেষ ও অলংকরণ পদ্ধতির উপর আরবীয় প্রভাব এই ঘটনার সহিত সম্পর্কিত মনে করা হয় (তু. G. Soteriou, Arabic remains in Athens in Byzantine Times, in Praktika (Proceedings) of the Academy of Athens, iv (Athens 1929) reproduced by D. G. Kambouroglous, 1. c. 160; তু. আরও Byzant.-Neugriech. Jahrbucher, xi, (বার্লিন ও এথেন্স, ২৩৩-৬৯)। সমস্ত ব্যাপারটি এখনও পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় (তু. K. M. Setton, On the Raids of the Moslems in the Aegaean in the ninth and tenth centuries and their alleged occupation of Athens, in American Journal of Archacology, vol. LVIII (১৯৫৪), ৩১১-১৯)। প্রথম জাস্টিনিয়ান-এর রাজত্বকালের অল্প পরে এথেন্স প্রাদেশিক শহরে পরিণত হয় ; বড় বড় ইমারত ব্যতীত উহার প্রাচীন কৃষ্টিগত গুরুত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। গ্রীসের পাশ্চাত্য শাসন আমলে এথেন্স একজন ডিউকের রাজধানী হইয়াছিল (১২০৫ খৃ.) যাহা পরপর বার্‌গান্ডীয়গণ ও কাটালীয়গণ (Burgundians and Catalans) অধিকার করিয়াছিলেন। কাটালীয়গণ ১৩১১ খৃ. ইহা অধিকার করিয়া আরাগন রাজার সার্বভৌমত্বের অধীনে আনে (তু. Kenneth M. Setton, Catalan Domination of Athens, ১৩১১-১৩৮৮; ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্, ১৯৪৮, ২৬১-৩০১ পৃষ্ঠায় চমৎকার গ্রন্থপঞ্জীসহ)। ১৩৮৮ খৃ. হইতে ১৪৫৮ খৃ. পর্যন্ত এক্সিয়ালজুলি (Acciajuoli)-র ফ্লোরেনটাইন পরিবার এথেন্স শাসন করে। ১৩৯৭ খৃ. প্রথম সুলতান বায়াযীদ কর্তৃক অস্থায়ীভাবে ইহা অধিকৃত হয়। (এই তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে, তু. Neshri, Ruhi ও সা'দু'দ-দীন, সুলাক-যাহাদ, হা'জ্জী খলীফা ও মুনাজ্জিম বাশী)। নিঃসন্দেহে ইহা ছিল শহরটির অস্থায়ী দখল, সম্ভবত আক্রমণাত্মক অভিযান ছাড়া আর কিছু নহে। গ্রীক উৎসসমূহে ঘটনাটির সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই (তু. সাদুদ-দীন, তাজুত-তাওয়ারীখ, ১খ., ১৪৯ প. এবং ZDMG, ১৫খ. (১৮৬১), ৩৪৪; সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে দ্র. J. H. Mordtmann, Die erste Eroberung von Athen durch die Turken zu Ende des 14. Jahrhunderts, in: Byz-Neugriech. Jahrbucher, iv, ৩৪৬-৩৫০)। দ্বিতীয় মুহাম্মাদের সময় "জ্ঞানীদের শহর" এথেন্স (মাদীনাতুল-হু'কামা) চূড়ান্তভাবে তুর্কী শাসনের অধীনে আসে, যখন বিজেতা ব্যক্তিগতভাবে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে জয়োল্লাস সহকারে প্রবেশ করেন এবং প্রায় ৩৩০ বৎসরের তুর্কী শাসনের সূচনা করেন। এই ঘটনা ও ইহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্পর্কে দ্র. F. Babinger, Mehmed der Eroberer und seine Zeit, মিউনিক ১৯৫৩, ১৭০ প.; (ইতালীয় সংস্করণ Maometto II il Conquistatore ed il suo tempo, তিউরিন ১৯৫৬, ২৪৬)। পরবর্তী শতকসমূহে এথেন্সের গুরুত্ব অত্যন্ত হ্রাস পায়; যেমন পাশ্চাত্য পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় (তু. বিশেষভাবে Comte de Laborde, Athenes aux xve, xvie et xviie siecles, প্যারিস ১৮৫৪, দুই খণ্ড)। ১৬৮৭ খৃ. শরৎকালে ফ্রান্সিসকো মোরোসিনি (Francesco Morosini) পরবর্তী কালে Doge নামক একজন ভিনিশীয় নৌবাহিনী প্রধান কর্তৃক ইহা অবরুদ্ধ হয় এবং এই ঘটনায় পারথিননের বিরাট অংশ বোমা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (২৬ সেপ্টেম্বর)। কারণ বোমাটি গোলাবারুদের ভাণ্ডারে আঘাত হানিয়াছিল। ভিনিশীয় সামরিক উপদেষ্টা Provueditore Daniele Dolfin কর্তৃক শহরের দুইটি মসজিদ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের উপাসনালয়ে পরিণত করা হয় (শেষোক্তটির কারণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জার্মান সৈনিকের উপস্থিতি)। অল্প কিছুদিন পর ১৬৮৮ খৃ. ৯ এপ্রিল দখলদার বাহিনী এথেন্স পরিত্যাগ করে (মহামারীতে দখলদারদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল) এবং তুর্কী বাহিনী পুনরায় প্রবেশ করে। ১৭৭৭ খৃ. অধিকাংশ পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের উপর শহরের দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। ১৭শ শতাব্দীতে ও তৎপরবর্তী কালে এথেন্সের প্রাচীন গ্রীক কীর্তি সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ঐ সময় হইতে ঐ কীর্তিগুলির বিস্তারিত বর্ণনা বিশেষ করিয়া ফরাসী ভাষায় পাওয়া যায় (যেমন J. Spon (১৬৭৮) ও G. Wheler (১৬৮২); তু. Sh. H. Weber, Voyages and Travels in Greece, The East And adjacent Regions made Previous to the Year 1801, প্রিন্সটন ১৯৫৩ খৃ.]। কি শোচনীয় অবস্থায় এথেন্স পতিত হইয়াছিল এই বিবরণগুলিতে পরিষ্কাররূপে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে এই ধ্বংস বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮২২ খৃ. গ্রীক বাহিনী কর্তৃক এথেন্স বিজিত হয়, কিন্তু ১৮২৬ খৃস্টাব্দের মধ্যেই পুনরায় তুর্কী সেনাদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হয় (আক্রোপোলিস ১৮২৭ খৃ.)। কেবল লন্ডন সম্মেলনের পরই (১৮৩০ খৃ.) এথেন্সকে গ্রীস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৩৪ সালের শেষের দিকে এথেন্স গ্রীসের রাজধানী হয় এবং শীঘ্রই একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে উন্নীত হয়। দ্রুত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির ফলে জনসংখ্যাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ খৃ. এথেন্সের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষ (Pears Cyclopaedia 1984-85)। এখানে ১৮৩৩ খৃ. একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কাটালীয় ও ফ্লোরেনটাইন শাসনামলে এথেন্সের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যায় কেনেথ, এম. সেটনের (Kenneth M. Setton) Catalan Domination of Athens, ১৩১১-১৩৮৮ (১৯৪৮)-এর দ্বাদশ অধ্যায়ের ২৬১ পৃ. হইতে; (২) তুর্কী শাসন সম্পর্কে Th. N. Philadel pheus-এর গ্রীক ভাষায় প্রণীত এথেন্স সংক্রান্ত গ্রন্থ, এথেন্স ১৯০২ খৃ., ২ খণ্ড; (৩) ১৭ শতাব্দীতে এথেন্সের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় Ewliya Celebi, সিয়াহাতানামাহ্, viii, ইস্তাম্বুল ১৯২৮, ২৪৯-৬৭ ; (৪) J. v. Hammer, Rumeli und Bosna, ভিয়েনা ১৮১২ খৃ., ১০৯-১০

(হাজী খলীফা কর্তৃক উল্লিখিত) ; (৫) Wm. Miller, The Latins in the Levant, লন্ডন ১৯০৮, ৩৩৫ প. (মধ্যযুগ ও আধুনিক কাল) ; (৬) Ferd, Gregorovius, Die Geschiehte der Stadt Athen im Mittelalter, Stuttgart ১৮৮৯ খৃ., দুই খণ্ড; (৭) G.C. Miles, The Arab Mosque in Athens in Hesperia, Journal of the American School of Classical Studies at Athens, XXV (এথেন্স ১৯৫৬), ৩২৯-৪৪ (৪৯ টি প্লেটসহ)।

Franz Babinger (E.I.2) / মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আতীয়া জামে মস্জিদ (عطية جامع مسجد) ঃ টাংগাইল জেলায়; পীর আলী শাহান্‌শাহ বাবা কাশ্মীরী (মৃ. ১৫০৭ খৃ.)-র দরগাহে বায়যীদ খান পন্নীর পুত্র সায়্যিদ খান পন্নী কর্তৃক ১৬০৯ খৃ. নির্মিত। ইহা ৬৯ × ৪০ আয়তাকার প্রাচীর ৭ ১/২ পুরু, প্রধান প্রকোষ্ঠ বর্গাকৃত ও এক গুম্বজবিশিষ্ট, সম্মুখে তিন গুম্বজবিশিষ্ট বারান্দা, চারি কোণে বিশাল অষ্টভুজ মিনার। পূর্বদিকে তিনটি ছোট দরওয়াজা, একটি হইতে অন্যটি বহু প্যানেল দ্বারা বিভক্ত। দরওয়াজার উর্ধ্বের সম্পূর্ণ প্রাচীর আয়তাকার প্যানেল দ্বারা বিভক্ত। ঝনঝনিয়া মস্‌জিদ ও কদম রাসূল দালানের সহিত সাদৃশ্য আছে। ইহাতে মুগল ও প্রাক-মুগল শিল্পের সমন্বয় দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, নওরাজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১২৪।

(সংকলিত)

'আতীরা (عتيرة) ঃ ব. ব. আতাইর عتائر জাহিলী যুগে আরবগণ যেই বকরী বা ভেড়া পৌত্তলিক দেবদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিত তাহা নির্দেশ করে (ব্যাপক অর্থে ইহার উৎসর্গকরণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়)। কোন প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তাহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে (বিশেষ করিয়া পশুপাল বৃদ্ধি সম্পর্কে) অথবা পশুর সংখ্যা ১০০টি হইলে (ফারাআ শব্দটি) এইরূপ করা হইত। যেই প্রতিমার সম্মুখে পশুটি উৎসর্গ করা হইত তাহার মস্তক উক্ত বলির রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করা হইত। এই উৎসর্গ (যাহাকে রাজাবিয়্যাও বলা হইত ; যে কারণে বাক্যাংশ রাজ্জাবা 'আতীরাতান) রাজাব মাসে (অর্থাৎ বসন্তকালে) সংঘটিত হইত এবং অন্যদিকে নীতিগতভাবে প্রথম শাবককে এই উৎসর্গে ব্যবহার করা হইত। মহানবী (স) এই ধরনের উৎসর্গ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন [লা ফারাআতা (প্রথম শাবকের উৎসর্গ) ওয়ালা আতীরাতা]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানুল 'আরাব, দ্র. আতীরা ,রাজ্জাবিয়্যা; (২) Wellhausen, Reste, ১১৮; (৩) J. Chelhod, Lasacrifice Chez Les Arabes, প্যারিস ১৯৫৩, ১৫১ এবং

'আতীয়া জামে মসজিদ (১৬৭৯ খৃ.)। মুসলিম মনুমেন্টস অব বাংলাদেশ শীর্ষক গ্রন্থের সৌজন্যে।

উল্লেখকৃতসূত্রসমূহ; (৪) তু. Jaussen, Moab, ৩৫৭; আরও দ্র. (৫) জাহিজ, হ'য়াওয়ান, ১খ., ১৮, ৫খ., ৫১০।

Ch. Pellat (E.I.2) /মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আতেইবা (দ্র. 'উতায়বা)

আতেক (اتك) ঃ সোভিয়েট তুর্কমেনিস্তানের একটি জেলা, খুরাসানের সীমান্ত পর্বতমালা (কোপেত দাগ)-এর উত্তর পার্শ্বের ঢালে ও আধুনিক রেলওয়ে স্টেশন জাওর্স্ (Gjaurs) ও দুশাক্ (Dushak)-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আসলে নামটি তুর্কী; ইতেক অর্থ (পর্বতশ্রেণীর) "প্রান্তদেশ" এবং তাহা এই জেলার ফারসী নাম 'দামান কূহ' যাহার অর্থ পর্বতের পাদদেশ। কিন্তু ইরানীরা সর্বদা ইহাকে আতাকরূপে লিখিয়া থাকে। মধ্যযুগে আতেকের জন্য কোন বিশেষ নামের প্রচলন দেখা যায় না। আবীওয়ারদ (দ্র.) শহরের একটি জেলারূপে ইহা খুরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে ইহা খাওয়ারিয্ম-এর খানদের এবং পরে তুর্কোমানদের অধিকারে আসে। রুশদের আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যের সহিত ইহার সীমান্ত কখনও স্পষ্টরূপে চিহ্নিত ছিল না। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে সীমান্ত চিহ্নিতকরণের পূর্বে আবীওয়ারদসহ আতেকের একটি অংশ কালাত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহা পারস্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

W. Barthold (E.I.2) /মু. আবদুল মান্নান

আত্মা (দ্র. নাফস)।

আত্রাই ঃ নদী, হিমালয়ের পাদদেশে শিলিগুড়ি হইতে (৬ মাইল উ. পূ.) উৎপত্তি, দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও রাজশাহী জেলার আত্রাই গ্রাম হইয়া চলন বিল অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত এবং পাবনা জেলার বেড়া হইতে ৬ মা. দ. পূ. যমুনায় পতিত হইয়াছে। উর্ধ্বাংশ করতোয়া নামে এবং নিম্নাংশ বড়াল নামেও পরিচিত। আনু. ২৪০ মা. লম্বা। ইহার প্রধান উপনদী দুইটি ঃ একটি করতোয়া (বেড়ার ৩ মা. উ. প.-এ মুখ) ও অপর একটি যমুনা (নওগাঁ-এর ১১ মা. দ.-এ মুখ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ.।

(সংকলিত)

'আদ (عاد) ঃ পবিত্র কুরআনে বারবার উল্লিখিত এক প্রাচীন গোত্র। তাহাদের সম্পর্কিত ইতিহাস কেবল বিক্ষিপ্তাকারে ও ইঙ্গিতে কিছু জানা যায়। তাহারা এক মহাপরাক্রমশালী জাতি ছিল এবং হযরত নূহ' (আ)-এর সময়ের অব্যবহিত পরেই তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। কুরআন মাজীদে ইহাদেরকে নূহ' জাতির প্রতিনিধিরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। অতঃপর এই মহান জাতি নিজেদের বিপুল সমৃদ্ধির কারণে অবাধ্য হইয়া উঠে (৭ ঃ ৬৯; ৪১ ঃ ১৫)। 'আদ জাতির মযবুত ইমারতসমূহের উল্লেখ কুরআনের ২৬ ঃ ১২৮ ও পরবর্তী আয়াতসমূহে রহিয়াছে। ৮৯ ঃ ৬ ও ৭ আয়াতে আদাকে "ইরামা যাতিল ইমাদ" (ارم ذات العماد) "স্তম্ভের অধিকারী ইরাম" (গোত্র) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ইরাম' হযরত নূহ (আ)-এর বংশের একটি গোত্রের নাম। বায়দ'াবী ও অনান্য ভাষ্যকারের মতে হযরত নূহ (আ) হইতে 'আদ গোত্রের বংশতালিকা এইরূপ ঃ নূহ, সাম (Shem), ইরাম, আওস, 'আদ। সুতরাং পূর্বপুরুষের নাম অনুযায়ী এই জাতির নাম হইয়াছে 'আদ ইরাম। কুরআনের ৪৬ ঃ ২১ আয়াত অনুযায়ী 'আদগণ আহ'কাফ (দ্র.) অর্থাৎ বালির টীলায় বসবাস করিত। 'আদদের নিকট তাহাদের ভাই হযরত হূদ (আ) (দ্র.) নবীরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু তাহারা তাঁহার সহিত একইরূপ অসদাচরণ করে যেরূপ পরবর্তী কালে মক্কাবাসিগণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত করিয়াছিল। এই অপরাধের জন্য হযরত হূদ (আ) ও কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র 'আদ জাতি এক ভীষণ ঝড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (৭ ঃ ৬৫; ৪১ ঃ ১৬; ৫৪ ঃ ১৯; ৬৯ ঃ ৬)। সর্বশেষে কুরআনে ১১ ঃ ৩২ আয়াতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রহিয়াছে তাহারা যাহার কবলে পড়িয়াছিল। এই সকল ইঙ্গিতের ভিত্তিতে পরবর্তী কালে নবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী রচিত হয় (এইজন্য দ্র. হূদ, ইরামা য'াতি'ল-'ইমাদ ও লুকমান শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ)।

আরবদের মধ্যে 'আদ জাতি সম্পর্কে যে কাহিনী মশহুর উহার ভিত্তি কুরআন মাজীদ, কুরআনের ভাষ্য সম্পর্কিত বিবরণ ও হাদীছ। প্রাচীন আরব কবিগণ 'আদ নামে এক প্রাচীন জাতি সম্পর্কে জানিতেন যাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে (তারাফা, ১খ., ৮; আল-মুফাদ্দ'ালিয়াত, ৮খ., ৪০; ইব্ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ., ৪৬৮; যুহায়র, ২০, ১২ ও লুকমান শীর্ষক প্রবন্ধ)। এই কারণেই মিন্ 'আহদি 'আদ (من عهد عاد—আদদের আমল হইতে) কথাটির প্রচলন হইয়াছে, হামাসা, সম্পা. Freytag, ১খ., ১৯৫, ৩৪১)। বানূ হুযায়ল কবিগণের দীওয়ান (দীওয়ানুল হুয'ায়লিয়্যীন), ৮০, ৬-এ 'আদ রাজাদের কথা ও আন-নাবিগা ২৫, ৪-এ আদদের জ্ঞান-গরিমার বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। যুহায়র, মু'আল্লাক'া, ৩২ নং শ্লোক-এ আহমার আদ-এর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বানূ হুযায়ল কবিগণের দীওয়ান, পৃ. ৩১-এ আহমার আদ-এর যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বিবেচনাযোগ্য, কারণ মুসলিমদের বর্ণনাতে (কুদার) আল-আহমারকে ছ'ামূদ (দ্র.) জাতির একজন লোক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

আরব ঐতিহাসিকদের মতে 'আদ জাতি সেই সকল 'আরব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের পৃথিবীর বুক হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়টি গোত্র ছিল, যাহারা ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ-এর বংশধর ছিল। এই গোত্রগুলির নাম 'আদ, ছামূদ, তাসম, জাদীস, জুরহাম, উমায়ম, 'আবীল, ওয়াবার ও 'ইমলীক'। ঐতিহাসিকগণ প্রথম 'আদ ও দ্বিতীয় 'আদ এই দুইভাগে 'আদ-এর ভাগ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'আদ জাতির ব্যাপারে 'আরবদের প্রদত্ত বংশতালিকাকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। আধুনিক গবেষণার ফলে ইহাও সঠিক প্রমাণিত হয় নাই, 'উমান ও হাদরামাওতের মধ্যবর্তী স্থানে আদ সভ্যতার বিকাশ ঘটিতে পারে নাই, যেহেতু এলাকাটি ছিল বসবাসের অযোগ্য এক বিরাট মরুঅঞ্চল। আরব পণ্ডিতগণ ও আধুনিক কালে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ইরামকে আরামরূপে সনাক্ত করার যে প্রবণতা দেখাইয়াছেন তাহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে লথ (Loth) 'আদকে বিখ্যাত ও সুপরিচিত ইয়াদ গোত্ররূপে সনাক্ত করিয়াছেন। অপরদিকে স্প্রেংগার

(Sprenger) আল-আওদ (Oadites)-এর মধ্যে আদদের সন্ধান লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহারা টলেমী (Ptolemy)-এর বর্ণনানুযায়ী উত্তর-পশ্চিম 'আরবে বসবাস করিত। ইহা হইতে হিসমার ইরাম কূপের কথা মনে পড়িয়া যায় (আল-হামদানী, সিফা, পৃ. ১২৬; A. Sprenger, Die alte Geogr. Arabiens, অধ্যায় ২০৭; A. Musil, Arabia Petraea, ২খ., ২ ভাগ, পৃ. ১২৮)। 'আকাবা' হইতে পূর্বদিকে আনুমানিক পঁচিশ মাইল দূরবর্তী রাম্ম পাহাড়ে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি নাবাতী উপাসনালয় খননের সময় যে নাবাতী উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, উহাতে সেই স্থানের নাম ইরম বলিয়া উল্লেখ আছে। Savignac দৃশ্যত গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দ্বারা উহাকে (কুরআনের) ইরাম বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন (দ্র. H. W. Glidden, BASOR, সংখ্যা ৭৩, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ১৩ প.)। রাম্মকেও আল-হাম্‌দানীর ইরাম ও টলেমীর আরামাউয়া (Aramaua) বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্-তাবারী, ১খ., ২৩১ প.; (২) আল-হাম্‌দানী, সিফাতু জাযীরাতিল আরাব, পৃ. ৮০; (৩) A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, ১খ., ৫০৫-৫১৮; (৪) ঐ লেখক, Die alte Geogr. Arabiens, ১৯৯; (৫) Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, ১খ., ২৫৯; (৬) E . Blochet, Le Culte d' Aphrodite-Anahita chez les arabes, du paganisme, ১৯০২, পৃ. ২৭ প.; (৭) O. Loth, in ZDMG, ১৮৮১ খৃ., পৃ. ৬২২ প.; (৮) J. Wellhausen, GGA, ১৯০২, পৃ. ৫৯৬ ঐ লেখক, ওয়াকিদী শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ২৪; (৯) J. Horovitz, Koranische Untersuschungen, বার্লিন-লিপজিগ, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১২৫ প.; (১০) জাওয়াদ 'আলী, তারীখুল 'আরাব ক'বলাল ইসলাম, বাগদাদ ১৯৫১ খৃ., পৃ. ২৩০-২৩৭; (১১) 'আদী অর্থ 'ইফরীত, এইজন্য দ্র. যথাঃ আল-আগানী, ২খ., ১৮২; ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবুশ-শি'র, ২১৭; আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, সম্পা. Wright, পৃ ২৯৭, শব্দকোষ; (১২) আদীব লাহূদ, হাদারাতুল আরাব।

সংযোজন ঃ জার্মান প্রাচ্যবিদ Wellhausen-এর মতে আদ একটি পৌরাণিক জাতি যাহার উল্লেখ বাইবেলেও নাই এবং ব্যাবিলনে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও নাই। এই জাতির আবাসস্থল আম্মান ও হাদরামাওতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ধরা হয়, যাহা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। বিগত শতাব্দীর নূতন আবিষ্কারাদির ফলে Wellhausen-এর এই অভিমত সঠিক প্রমাণিত হয় নাই। বর্তমানে 'আদ জাতি ইতিহাসের গহ্বর হইতে ক্রমেই দৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

১। James Montgomery তাহার পুস্তক Arabia and Bible-এ উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীন কালে আরবে অপেক্ষাকৃত বেশী পানি পাওয়া যাইত। উপত্যকাগুলিতে আরও অধিক সবুজের সমারোহ ছিল। যে বালির টিলাময় এলাকায় বর্তমানে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেখানে মনুষ্য বসতির নিদর্শনাদি মিলিতেছে, যাহা অতীতে কোন জাতির অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। 'আদ সেই আমলের জাতি।

২। R. P. Doughty তাহার পুস্তক The Sea Land of Ancient Arabia-তে উল্লেখ করিয়াছেন, 'আরব সবুজ আমল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এইখানে কয়েকটি সভ্যতাই মাটির নীচে চাপা পড়িয়া আছে। অ্যাসিরীয় লিপিতে মরুময় 'আরবের একটি জাতি 'আদু-উম্মাতু (উম্মাতু 'আদ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে (পৃ. ৭১)। গ্রন্থকার এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারেন নাই, উহার অর্থই হইতেছে 'আদ।

৩। আধুনিক কালে আরবের পূর্বাঞ্চল ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যে অনুসন্ধান চালাইয়াছিল উহার ফলাফল Geoffrey Bibby তাহার পুস্তক Looking for dilmun (লন্ডন ১৯৭৪)-এ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, পৃথিবীর প্রাচীনতম সুমেরীয় সভ্যতার কেন্দ্র ইরাকে নহে, বরং আরবে ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে 'আরবে অধিক পরিমাণে পানি পাওয়া যাইত। তখন ঝিল, বিল ইত্যাদি বর্তমান ছিল যাহা এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এইসবের আশেপাশে সর্বদা মানুষ্য বসতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে ।

৪। পণ্ডিতগণ আরবের দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নহেন। সীমিত অনুসন্ধান হইতে জানা যায়, আরবের দক্ষিণাঅঞ্চল বিভিন্ন জাতির আবাসভূমি ছিল। Bria Doe-এর পুস্তক Southern Arabia, ১৯৭১ খৃ.-তে ভগ্নাবশেষ, প্রতিমা, প্রাচীন শিলালিপি ও উহার ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা হইতে প্রতীয়মান হয়, দক্ষিণ আরবে প্রাচীন জাতিসমূহের বসবাস ছিল।

৫। ফিলিপ হিট্টি লিখিয়াছেন, "আরবদেশ বরফ যুগের কল্যাণে কখনও মনুষ্য বসতির অনুপযোগী ছিল না। বর্তমানে উহার শুষ্ক গভীর উপত্যকাসমূহ সাক্ষ্য দান করিতেছে, বৃষ্টির পানি এককালে উহার মধ্য দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত আর উহা সুশোভিত করার ব্যাপারে কতই না শক্তিশালী"। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "হাদরামাওতের ভূ-পৃষ্ঠে গভীর উপত্যকাসমূহ পরিদৃষ্ট হয় এবং সেইখানে ভূ-গর্ভে পানির কোন অভাব নাই।" আদ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "আদ জাতি সম্পর্কে অনুমান এই যে, তাহারা প্রাচীন হাদরামাওতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল" (History of the Arabs গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ, পৃ. ২৪, ৩০, ৫২)।

৬। সুমেরীয় শিলালিপিতে ঃ আদা=আমাদের প্রভু; আদা = রাজপুত্র; আদা=রাজা শব্দের পুনরুক্তি রহিয়াছে। সুমেরীয় বিশেষজ্ঞ নূহা ক্রিমার লিখিয়াছেন, "আদা একটি প্রহেলিকা। ইতঃপূর্বে কিছু সংশোধন করিয়া উহার অর্থ করা হইত পিতা। এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে ভুল। যে পর্যন্ত এই প্রহেলিকার সঠিক অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, ইহার কোন অর্থ না করাই শ্রেয়" (Journal of the American Oriental Society, ৮৮খ., সংখ্যা ১, পৃ. ১০৯, পাদটীকা ৮)।

বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) হইতে এই প্রহেলিকার সমাধান পাওয়া যায়। আদিপুস্তকে 'আরবের তাঁবুবাসীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ রহিয়াছে ঃ 'আদা (Adah)-র গর্ভ হইতে যাবল (Jabal) জন্মিল। সে তাঁবুবাসী ও পশু পালকদের আদি পুরুষ ছিল (আদিপুস্তক ৪ ঃ ২০, অনুবাদ, সোসাইটি অব সেন্ট পল, রোম ১৯৫৮ খৃ.)। ইহা হইতে আদের সহিত আরবের বিলুপ্ত প্রাচীন জাতিগুলির বংশগত সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

৭। আক্কাদী সভ্যতা 'আরব হইতে উৎপন্ন হইয়া ইরাকে বিস্তার লাভ করে। "আক্কাদ"কে ছিল তাহা বিবেচনার বিষয়। "আক্কাদ" (اكاد) আসলে "আখা 'আদ" (اخا عاد) অর্থাৎ 'আদ-ভ্রাতৃত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত লোক। সম্ভবত আক্কাদ দ্বিতীয় 'আদের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল।

৮। কুরআন মাজীদে উক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ আরবের যে অঞ্চলে 'আদ জাতির বাস ছিল, সেখানে উপত্যকা, শস্যক্ষেত ও পানি বর্তমান ছিল (২৬.ঃ ১৩৪; ৪৬ ঃ ২৪)। এক ভীষণ ঝড়ে সব কিছু বালির নীচে চাপা পড়িয়া যায়। এই জাতি সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুরকাণ্ডের ন্যায় কর্তিত হইয়া মাটির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে (৬৯ ঃ ৬, ৭)। এই ইঙ্গিতসমূহ প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য ভিত্তিস্বরূপ বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

F. Buhl (E.I.2) / সংযোজনী ঃ আবদুল কাদির (দা. মা. ই.)/ মু. আবদুল মান্নান

'আদাত (عادة) ঃ শব্দ হইতে উৎপন্ন। (সময় সময় আঞ্চলিক পরিবর্তনসহ) শব্দটি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম জাতিগুলির ভাষায় সাধারণত দেশাচার ও রীতিনীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন সমাজ বা ব্যক্তি যাহাতে অভ্যস্ত তাহাই তাহাদের 'আদাত এমনকি জীব-জন্তুরও নিজস্ব 'আদত আছে। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা যেইরূপ ক্ষুদ্র সমাজে জীবন যাপন করে, তাহাতে প্রত্যেকেই চিরন্তন বা চিরন্তন বলিয়া বিবেচিত রীতিনীতি পালন করিয়া চলিলে সামাজিক ঐক্য সম্ভব হয়। সমাজ বা ব্যক্তির মনে সংশয় জাগে যদি আদতকে উপেক্ষা করা হয়। ইহাতে অদৃষ্টপূর্ব ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের অনুপ্রবেশের পর হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষত বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানাদি ইসলামে দীক্ষিত সম্প্রদায়গুলির 'আদতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; সাধারণ আইনের কার্যবিধিও ইসলাম সম্মত বিধান দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র ও সমাজে যেই 'আদতগুলি নাগরিকদের আইনগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাহাদের সহিত কোন বিচার্য বিষয়ের সংশ্রব আছে, সেই 'আদতগুলিকে পরিভাষাগতভাবে 'আদত আইন' বলা হয়। Snouck Hurgronje সর্বপ্রথম ইহার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেন। যেই সকল এলাকায় ইন্দোনেশীয় আইন বলবৎ আছে সেই সকল এলাকায় আদত 'আইন কথাটির ব্যবহার প্রসারিত। মূল ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালাকা, ফরমোযা ও মাদাগাস্কারেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম জাতিগুলি তাহাদের 'আদাতের ইসলামী অংশ ও দেশজ অংশের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে প্রায়ই ওয়াকিফহাল। প্রথমোক্তগুলিকে হুকুম সরত (হুকম শারী'আত) ও শেষোক্তগুলিকে 'আদাত নামে অভিহিত করিয়া ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শন করা হয়। মতবাদ হিসাবে হুকম সরতকে বাধ্যতামূলক স্বীকার করা হইলেও কার্যত উহার যতটুকু প্রথাগত আইনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কেবল তাহাই প্রতিপালিত হয়। উনবিংশ শতকে আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সহিত বর্ধিত যোগাযোগের ফলে ইসলামী শারী'আত ইন্দোনেশিয়ায় অধিকতর সুপরিজ্ঞাত হইলে সেখানে কয়েকটি অঞ্চলে বিশুদ্ধ শার'ঈ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের উদ্দেশে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী 'আদাতপন্থী দলগুলি তাহাদের প্রাচীন প্রথা আকড়াইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলের মিনাংকাবাউ-এর কথা বলা যাইতে পারে। তথাকার মাতৃকেন্দ্রিক রীতিনীতিগুলি ইসলামী পারিবারিক আইনের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন। এই বিরোধের ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ধর্মোন্মত্ততার আকস্মিক আবির্ভাব ও কলহ-বিবাদ ঘটিয়াছে। সমাজে পরস্পর বিরোধী অবস্থার প্রভাবে অনেক সময় 'আদত আইনেরও পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাও ইহার প্রয়োগকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

'আদত আইন আবিষ্কার ও সংগ্রহ করা সহজ নহে। দেশীয় শাসকদের ফরমানই হইল উহা সংগ্রহের লিপিবদ্ধ উৎস। এইরূপ কিছু সংখ্যাক ফরমানই পাওয়া যায়। 'আদাত আইনের বর্ণনামূলক গ্রন্থগুলিতে 'আদাত শব্দকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি, উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রণালীসহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণে 'আদাত আইনের সংগ্রহের ব্যাপারে এই জাতীয় গ্রন্থের মূল্য কম। প্রচলিত তথাকথিত আইনগ্রন্থগুলি পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী বাস্তবে আইনগ্রন্থ নহে। আইনের অধিকর্তাগণ শাসকদের প্রভাবে এই সকল পুস্তকে নিজেদের রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহার সহিত প্রায়শ 'আদাত আইনের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত বিচার বুদ্ধিকে তাঁহারা এই সকল পুস্তকে আইনানুগ অভিমতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। এই কারণে 'আদাত আইনের অনুসন্ধানে এই আইনগ্রন্থগুলি বিশেষ সহায়ক নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক কর্মচারী সরকারী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে 'আদাত আইনের প্রতি কিছুটা অনুরাগ প্রদর্শন করেন। ইহার পর Snouck Hurgronje তাঁহার De Atjehers (1892-93) নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রথাগত (Customary) আইনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। পরে Van Vollenhoven's Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়; তাহাতেই সর্বপ্রথম 'আদাত আইনকে পূর্ণাঙ্গ আইন পদ্ধতিরূপে বিবেচনা করা হয়। এই পুস্তকটি শুধু ওলন্দাজ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান ও অ-মুসলমান জাতিগুলির 'আদাত আইনের আলোচনায় সীমিত। বস্তুত ভূতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রাচীনতর লেখায় ও সরকারী স্মারকলিপি ও দলীল-পত্রাদিতে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পুঞ্জীভূত ছিল, প্রয়োজন ছিল তথ্য উদ্ধারের জন্য শ্রমসাধ্য খনন কাজের জন্য শ্রম স্বীকার। অবশেষে Van Vollenhoven-এর অনুপ্রেরণায় ১৯১০ হইতে ১৯৪৩ খৃ. পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ৪২ খণ্ড Adatrechtbundels প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থ সিরিজের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি ঃ (১) প্রাচীনতর বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সহজলভ্য করা এবং (২) ইহার সহিত নবলব্ধ তথ্যের সংযোজন করা। প্রচুর মালমসলা এই গ্রন্থ সিরিজে বিধৃত হইয়াছে বটে, তবে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে 'আদাত আইন সংগ্রহের ব্যাপারে এখনও আমরা এই অঞ্চলের সমাজ জীবন ও ইহার শাসন প্রণালী পর্যবেক্ষণের উপর প্রধানত নির্ভরশীল।

'আদাত আইনের উৎস অনুসন্ধানের নৃতত্ত্বকে উপেক্ষা করা চলে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত ঃ যেমন শারী'আত মুতাবিক বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরও প্রায়ই একটি অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। শারী'আতে এই বিবাহের বৈধতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইলেও দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ঐ অনুষ্ঠানটি বাদ দিলে উহা সামাজিকতার চাপে প্রায় অবৈধ হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে 'আদাত আইন নৃতত্ত্বের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু যদি কোন আচরণের জন্য কাহাকেও জনসমক্ষে দণ্ড দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে, ঐ আচরণটি আত্মিক ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে এই অবস্থায় 'আদাত আইনের প্রয়োগ ঘটিল, না নৃতাত্ত্বিক অনুশাসন কার্যকরী হইল-এই প্রশ্নে বিতর্ক উপস্থিত হইবে। ইহাদের পার্থক্য সহজবোধ্য নহে।

ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র 'আদাত আইনের ইসলামী বিধানের সংমিশ্রণ সমানভাবে ঘটে নাই। দেশীয় কর নির্ধারণ পদ্ধতির সহিত সংঘর্ষে যাকাত ইচ্ছাকৃত দানের অধিক মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। পারিবারিক আইন সাধারণত শারী'আতের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইয়াছে। মৃতের দাফন-কাফনও শারী'আত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ওয়াক্ফ-এর মত যে সকল প্রতিষ্ঠান ইসলামের সহিত আগমন করিয়াছে সেইগুলির আইনগত প্রকৃতি সাধারণত অক্ষুণ্ন রহিয়াছে; কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিতে পারে। অবশিষ্ট বিষয়াদিতে শারী'আত-শাসিত অঞ্চলে প্রাক-ইসলামী রীতি সম্পূর্ণ বিতাড়িত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

১৮শ শতাব্দীতে আইনের গ্রন্থায়ন (Codification) আরম্ভ হয়। গ্রন্থায়নের গুরুত্ব পরবর্তীতেও সমভাবে অনুভূত হইয়াছিল। কারণ এই দেশবাসীকে তাহাদের প্রথাগত আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবার সুবিধা দেওয়ার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু 'আদাত আইনের সন্ধান ও সনাক্তকরণ দুঃসাধ্য হওয়ায় গ্রন্থায়নের কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে ঔপনিবেশিক সরকার একটি বিচার বিভাগীয় এলাকায় প্রচলিত 'আদাত আইনের মৌল নীতিগুলিকে সুনিশ্চিতভাবে স্থির করার চেষ্টা করে। ওলন্দাজ ভাষায় এইরূপ এলাকাকে বলে rechtsgauw যেখানে একই 'আদাত আইন প্রচলিত। পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার শাসিত স্বতন্ত্র 'আদাত আইনের ক্ষেত্ররূপে প্রায় কুড়িটি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়। এইরূপ বিভাগসমূহ প্রচলিত 'আদাতের বিশেষ বিবরণ দেশীয় আইনজ্ঞদের দ্বারা লিপিবদ্ধ অবস্থায় বর্তমান আছে।

অধুনা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে 'আদাত আইনের প্রতি তেমন অনুরাগ দেখা যায় না, বরং উহার অধ্যয়নে অনীহা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ তাহারা যে সকল আধুনিক আইন-কানুন প্রবর্তনে ইচ্ছুক সেইগুলির সহিত উহার বহু স্থলে সঙ্গতি নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Snouck Hurgronje, The Achenese, Leiden 1906; (২) C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Neder'andsch-Indie, 3 vol., Leiden 1918-1932; (৩) do, De On Tdekking van Het Adatrecht, Leiden 1928; (৪) Adatrechtbundel, xliv, The Hague 1910-43 (continued; vol-xxi and xxi contain contributions to the Adat Law of the Philippines); (৫) Pandecten van het Adatrecht, vols. i-x, Amsterdam Bandoeng 1914-36 (these are divided according to the subjects of Adat Law); (৬) Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien Amsterdam 1934; (৭) B. ter Haar, Beginselen, en Stelsel van het Adatrecht, 1939 (English translation by A. A. Schiller and E. A. Hoebel ; Adat Law); (৮) J. Prins, Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesie, The Hague 1948.

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ)

সংযোজন

'আদাত (عادة) ঃ ইহাকে শরী'আর ভাষায় উরফ (عرف) বা তা'আমুল (تعامل) -ও বলে। উরফ অর্থ 'প্রচলিত রীতি বা প্রথা', 'আদাহ অর্থ 'অভ্যাস' এবং তা'আমুল অর্থ '(অভ্যাসগত) কাজ'। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবত কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়াকালে আরব সমাজে যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত অনেক প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহা সরাসরি নিষিদ্ধ করেন নাই। খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে বহু অমুসলিম এলাকা মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণ ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কোন প্রথা যদি ইসলামী শরী'আর পরিপন্থী না হইত তবে তদনুযায়ী আচরণ করিতে জনগণকে বাধা দেওয়া হইত না। এই প্রসঙ্গে 'তা'বীরে নাখল' সম্পর্কিত হাদীছ স্মরণীয়।

কয়েক ব্যক্তি বা কয়েক শ্রেণীর মানুষ বা কয়েক মহল্লার মানুষ যে আচরণ করে আইনের দৃষ্টিতে তাহা প্রথা নহে। একটি গ্রামের বা একটি শহরের আচরণও প্রথা হইতে পারে না। মাঝে মাঝে মানুষ যাহা করে তাহাও প্রথা নহে। সমগ্র দেশে অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্বজন স্বীকৃতভাবে যে অভ্যাস প্রচলিত থাকে তাহাকে প্রথা গণ্য করা যায়। কত কাল প্রচলিত থাকিলে কোন আচরণকে প্রথা বলা যায় তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। স্মরণকালের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব হয় এবং সেই সময় হইতে অব্যাহতভাবে মুসলমানগণ উহা অনুসরণ করিতে থাকিলে উহাকে প্রথার মর্যাদা দেওয়া যায়। রদ্দুল মুহ্তারের গ্রন্থকারের মতেঃ 'যাহা সর্বদা আচরণ করা হয় তাহাই প্রথা'।

কোন আচরণ রাসূলুল্লাহ (স) বা তাঁহার সাহাবীগণের যুগ হইতে প্রচলিত হইলেই তাহা প্রথার মর্যাদা পাইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতাও নাই। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার স্পীরিটের পরিপন্থী না হইলে প্রথা ভিত্তিক আইন সকলে মানিতে বাধ্য। অবশ্য ইজমার মধ্যে মুজতাহিদ ফকীহ্গণের গবেষণার অবদান বিদ্যমান আছে, যাহা প্রথার মধ্যে নাই। তাই প্রথার তুলনায় ইজমা'র মর্যাদার অনেক বেশি। তবে কিয়াস ভিত্তিক আইনের তুলনায় প্রথা ভিত্তিক আইনের উচ্চতর মর্যাদা স্বীকৃত। ইসলামী আইনের গবেষকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইসলামী আইনের

বিকাশে প্রথার অবদান অতি বৃহৎ। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈনের আমলে যেসব প্রথা সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইত সেইগুলি আইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। হানাফী আইন তত্ত্ববিদগণ (উসূলিয়্যূন) প্রথাকে আইনের একটি উৎস মনে করেন। কুরআনের যেসব আয়াত ও যেসব সুন্নাহ দ্বারা ইজমা'কে প্রামাণ্য গণ্য করা হয়, প্রথাকেও ঐগুলির ভিত্তিতে প্রামাণ্য বলা হয়। হিদায়ার গ্রন্থকারের মতে, স্পষ্ট আয়াত বা সুন্নাহ্র অনুপস্থিতিতে প্রথাকে ইজমা'র সমস্থানীয় মনে করা হয় (আরও দ্র. শিরো. 'উরফ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উসূলে ফিক্হ-এর গ্রন্থাবলীতে 'উরফ শিরো. দ্র.। অধিকন্তু আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাতে 'উরফ শিরোনামাধীনে বিস্তারিত দ্র.।

মুহাম্মদ মূসা

আদ্'দাদ (اضداد) ঃ 'আরবী দি'দ্দ [ضد] শব্দের ব.ব., "যে শব্দটির দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ আছে", আরবী ভাষাবিজ্ঞানীবৃন্দ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে যে সকল শব্দের এমন দুইটি অর্থ আছে যাহার একটি অপরটির বিপরীত ভাব প্রকাশ করে ; যেমন –বা'আ' (باع) ক্রিয়াপদটি দ্বারা 'বিক্রয় ও ক্রয়' (ইশ্তারা) উভয় অর্থই বুঝানো যাইতে পারে, এমনকি দি'দ্দ শব্দটিও একই শব্দগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা লা দি'দ্দা লাহু–এই বাক্যে 'বিপরীত' ভাব প্রকাশিত না হইয়া 'সমকক্ষ' বুঝাইতেছে। ভাষা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আদ্'দাদ নানা অর্থ জ্ঞাপক শব্দাবলীর (আল্-মুশ্তারিক দ্র.) একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে ব্যতিক্রম এই, আল্-মুশ্তারিক দুইটি শব্দ একই ধ্বনিবিশিষ্ট হইলেও দুইটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে (معنيان مختلفان), অথচ আদ্'দাদ শ্রেণীভুক্ত শব্দের দুইটি অর্থ সরাসরি বিপরীত ভাব প্রকাশক। আরবগণ তাহাদের ভাষার অন্যান্য ক্ষেত্রে যে উদ্যম ও প্রজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছেন এই আভিধানিক সমস্যার প্রতিও অনুরূপ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য হয় সাধারন গ্রন্থাবলীতে বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন (দ্র. আস্-সুয়ূতী, আল্-মুয্হির, বূলাক, ১খ., ১৮৬-৯৩ প.; ইব্ন সীদা, আল্-মুখাস্'স'াস্, ১৩খ., ২৫৮-৬৬) অথবা স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র পুস্তিকাগুলি সম্পর্কে প্রথমবারের মত বিশদ বিবরণ দিয়াছেন M. Th. Redslob তাঁহার গ্রন্থে Die arabischen Worter mit entgegengesetzter Bedeutung, Gottingen ১৮৭৩, পৃ. ৭–৯ (তাঁহার এই তালিকা হইতে অবশ্য আল-জাহিজ-এর নামটি বাদ দিতে হইবে)। এই সকল গ্রন্থের কয়েকটির অস্তিত্ব বিভিন্ন উদ্ধৃতি হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। নিম্নোক্ত গ্রন্থকারদের কিতাবুল আদ্'দাদ সংরক্ষিত ও আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে ঃ (১) কুত্রুব (মৃ. ২০৬/৮২১), সম্পা. H. Kofler, Islamica, ১৯৩২; (২) আল্-আস্মাঈ (মৃ. ২১৬/৮৩১), সম্পা. A. Haffner, Drei arabische Quellenwerke uber die Addad, বৈরূত ১৯১৩, পৃ. ৪৫-৬১; (৩) আবূ 'উবায়দ (মৃ. ২২৩/৮৩৭), দ্র. Brockelmann, S I, ১৬৭ ; (৪) আবূ হাতিম আস্-সিজিস্তানী (মৃ. আনু. ২৫০/৮৬৪) সম্পা. Haffner, ঐ ৭১-১৫৭; (৫) ইবনুস-সিক্কীত (মৃ. ২৪৩/৮৫৭), সম্পা. Haffner, ঐ ১৬৩-২০৯; (৬) আবূ বাক্র ইবনুল আনবারী (মৃ. ৩২৭/৯৩৯), সম্পা. M. Th. Houtsma, লাইডেন ১৮৮১ এবং কায়রো ১৩২৫ হি.; (৭) আবুত-তায়্যিব আল্-হালাবী (মৃ. ৩৮১/৯৯১), দ্র. Brockelmann, S I. ১৯০; (৮) আস্-সাগানী (মৃ. ৬৫০/১২৫২), সম্পা. Haffner, ঐ, ২২১-৪৮।

এই ধরনের আদ্'দাদ অন্য কোনও সেমিটিক ভাষায় না থাকিলেও আরবীতে প্রচুর রহিয়াছে এমন একটা অভিমত বহুদিন যাবত পোষণ করা হইতেছে। উক্ত ধারণা বর্তমানে অচল। আদ্'দাদের তালিকায় ভুলক্রমে যে শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত এবং আদৌ অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সকল শব্দ তালিকা হইতে বাদ দিলে 'আরবী ভাষায় অল্পই আদ্'দাদ অবশিষ্ট থাকিবে। এইজন্য আল-মুবাররাদ (পাণ্ডু. লাইডেন ৪৩৭, পৃ. ১৮০) এবং ইব্ন দুরুস্তাওয়ায়হ্ (আস্-সুয়ূতী কর্তৃক আল্-মুয্হির, ১খ., ১৯১ প. উদ্ধৃত) 'আরবীতে আদ্'দাদ-এর অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। ইব্নুল আন্বারী তাঁহার গ্রন্থে এই ধরনের চারি শতাধিক আদ্'দাদ-এর সংখ্যা গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কিতাবটি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও 'আন্কারা '(انكر) 'ওয়ালা' (ولا) প্রভৃতি শব্দ উহাতে স্থান লাভ করে নাই। Redslob পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন, উহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। কেননা উহার প্রণেতারা আদ্'দাদ-এর ধারণাটিকে হয় তাহাদের খেয়ালী কল্পনায় অত্যধিক প্রসারিত করিয়াছেন অথবা যদৃচ্ছা কৃত্রিম বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটাইয়াছেন এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ (১) প্রথমত ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উহাতে যে সকল শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রায় সবকয়টির শুধু একটিমাত্র অর্থই 'আরবরা জানিত আর সেই অর্থেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত, ক্বচিৎ অন্য অর্থে ইহার ব্যবহার হইত অথবা কোন বিতর্কিত উদ্ধৃতিতে ইহা দৃষ্ট হইত। এইরূপ না হইলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক ভুল বুঝাবুঝির উদ্ভব হইত। উপরন্তু ইব্নুল আন্বারী তাঁহার ভূমিকায় (পৃ. ১) কোনও দ্ব্যর্থক শব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। (২) শব্দগুলিকে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সম্পূর্ণ ভুল, বরং বাক্যের মধ্যে পদসমূহের অবস্থানও বিবেচনা করা উচিত। বাক্য গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতির দরুন কোন শব্দের যদি পরস্পর বিরোধী দুইটি অর্থ বা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় কেবল সেই ক্ষেত্রেই ঐ শব্দগুলিকে আদ্দাদ-এর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হইবে (ইব্নুল আন্বারী, পৃ. স্থা., ১৬৭-৮)। (৩) ان–من–ان–او–ما–هل প্রভৃতি অব্যয়গুলিকে আদ্'দাদ-এর তালিকা হইতে বাদ দেওয়াই সঙ্গত। ان শব্দের অর্থ 'যদি' হইতে পারে, আবার 'না'ও হইতে পারে অর্থাৎ কোন কিছুর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি উভয়ই বুঝাতেই পারে-এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগে ان-কে আদ্'দাদের অন্তর্ভুক্ত করা খুবই দুর্বল যুক্তি। يكون বা كان ক্রিয়ারূপ একাধিক কাল নির্দেশ করে অথবা ইস্হাক, আয়্যূব, ইয়া'কূব প্রভৃতি নামবাচক বিশেষ্য শব্দগুলির আনুষঙ্গিক অর্থও থাকিতে পারে—এই সকল ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহাদের আদ্'দাদের অন্তর্ভুক্ত করা অনুরূপ গুরুত্বহীন যুক্তি। (৪) শুধু বাক্য গঠনের বিশেষ রীতিতে পদের মুখ্যার্থের [= ব্যুৎপত্তিগত বা আভিধানিক] বিপরীত স্বতন্ত্র অর্থও থাকিতে পারে, এমন শব্দের সংখ্যা প্রচুর। যেমন كاس পিয়ালা ও তন্মধ্যস্থ পদার্থ, نحن=আমরা, আমি প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ব্যতীত خائف–واثق প্রভৃতি যে সকল اسم فاعل কর্তৃবাচক পদরূপে ব্যবহৃত

হয় এবং امين প্রভৃতি فعيل-এর ওজনের যে সকল কর্তৃবাচ্যরূপ রহিয়াছে। অমিশ্র مجرد অথবা মিশ্র مزيد ধাতুজাত ইস্‌ম হইতে নিষ্পন্ন কর্তৃবাচক বিশেষ্য পদসমূহ ; এবং যে সমস্ত ক্রিয়া পদ অমিশ্ররূপে (مجرد) সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ জ্ঞাপন করে (যেমন زال) প্রভৃতি। কিন্তু এইগুলির কোনটিই প্রকৃত আদ্‌'দাদ-এর নমুনা নহে। (৫) যে সকল শব্দ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ প্রকাশের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় [اهتزاء। কিংবা تحكما], যেমন নির্বোধকে ডাকিতে ঃ يا عاقل (ওহে বুদ্ধিমান!) কিংবা রুগ্ন ব্যক্তিকে আদর করিতে يا سليم (ওহে স্বাস্থ্যবান) এই উভয় ক্ষেত্রেই শব্দের আলংকারিক প্রয়োগ বক্তার অভিরুচির উপর নির্ভর করে। (৬) যে সকল ব্যাকরণ تلعة শব্দটিকে 'পানির নল' ও পাহাড় অর্থে ব্যবহার করিয়া উহাকে আদ্‌'দাদ তালিকাভুক্ত করেন, তাহারা শুধু খামখেয়ালীর পরিচয় দিয়াছেন। পানি নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, অথচ পাহাড় নিচু হইতে উপরদিকে ক্রমেই উচু হইয়া থাকে—ইহাই তাহাদের যুক্তি। ইবনুল আন্‌বারী যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলটির ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত কোন না কোন যুক্তি প্রযোজ্য। সুতরাং আদ্‌'দাদরূপে উহাদের বিবেচিত হওয়া সমীচীন নহে। এই অবস্থায় আদ্‌'দাদ শব্দ সংখ্যার পরিমাণ সামান্যই থাকে। অবশ্য আরব পণ্ডিতগণ এই সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দানের প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে একটি মাত্রই বিবেচনারযোগ্য। কেননা এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা সেই মূলে পৌছিয়া যাই যেখান হইতে শব্দটির দুইটি অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে (ইবনুল আনবারী, পৃ. স্থা. ৫; আল-মুযহির, ১খ., ১৯৩)। অন্যান্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শুধু ব্যবহারিক অর্থসমূহ বিবেচনা করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে হয় সমস্ত আদ্‌'দাদ সেই সকল অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে যেগুলি ক্রিয়ামূলগুলির পরস্পর হইতে গৃহীত (ইবনুল আন্‌বারী, পৃ. স্থা., ৭; আল-মুযহির, ১খ., ১৯৪) অথবা তাহারা এই সকল পরস্পর বিরোধী অর্থসমূহের সমন্বয় সাধনের অশোভন প্রয়াস পাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ (بعض) শব্দটিকে আরবগণ এই যুক্তিতে সম্পূর্ণ বস্তু অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, সমগ্র বস্তুটি তো অন্য কিছুর অংশমাত্র (ইবনুল-আন্‌বারী, পৃ. ৬)।

C. Abel তাহার Uber den Gegensinn der Urworte, লাইপজিগ ১৮৮৪ (তাহার Sprachwissenschaftlichen Abhandlungen, লাইপজিগ ১৮৮৫-এ পুনর্মুদ্রিত) বইটিতে একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে শুরু করিয়া সমগ্র আদ্‌'দাদের (enantiosemia) ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মতে আদিম মানুষ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিত সেগুলি কতকগুলি দ্ব্যর্থহীন ধারণার প্রকাশ ছিল না, বরং উহারা দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরণ দিত। যেমন 'বলবান' শব্দটির ধারণাটিকে বুঝিতে হইলে কেবল 'দুর্বল' শব্দটির ধারণার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষার ধ্বনি সংক্রান্ত পরিবর্তনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধারণার বৈপরিত্যের দুই দিকের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। Abel- এর মতবাদ ভাষাবিদ্‌গণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই, তবে মনঃসমীক্ষকগণ উহাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন।

R. Gordis তৎপ্রণীত Words of Mutually Opposed Meaning, Am. j. Semit. lang, ১৯৩৮, ২৭০-৮০ পৃষ্ঠায় একটি ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যাহা সকল আদ্‌'দাদ-এর ক্ষেত্রেই সঠিক বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। আধুনিক নৃবিদ্যাগত মতবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি আদ্‌'দাদের ধারাবাহিকতাকে আদিম যুগের বৈধ ও অবৈধ ধারণার সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, মোটামুটিভাবে মানবজাতির কথাবার্তায় যে বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহা মানবজাতির প্রাথমিক চিন্তাধারারই স্মৃতিবাহক।

এই ধরনের মতবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাষাবিদদের প্রচলিত মত এই, বিপরীতার্থক শব্দকে কোন একক নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রতি শব্দের একটি নির্ধারিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিটি দি'দ্দ-এর বেলাতে শব্দের একটি অর্থ মুখ্য এবং অন্যটি গৌণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

ভাষাবিদ্যার কাজ হইবে অর্থের বিবর্তন [ক্রমিক পরিবর্তন] খুঁজিয়া বাহির করা—যদিও সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, প্রতিটি দি'দ্দ-এর সপক্ষে সকল তথ্য প্রমাণ করা সম্ভবপর হইবে না। বস্তুত ইতোমধ্যে আরবী ভাষাবিজ্ঞানীরা এই মতবাদটিকে নীতিগতভাবে মানিয়া লইয়াছেন ঃ (الاصل للمعنى واحد) মূলত একটি শব্দের একটি অর্থ। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যার সমাধানে তাঁহারা নগণ্য ভূমিকা পালন করিয়াছেন। ইহার অন্যতম কারণ, তাঁহারা আদ্‌'দাদ-এর ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে না দেখিয়া কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনা করিয়াছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত যেইসহ শব্দের দুইটি বিপরীত অর্থ আছে তাহাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করাকে 'আরবগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। এই ব্যাপারে তাঁহারা অনেক সময় কেবল শব্দের বাহ্যিক আকৃতি বা গঠনরীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা مودى শব্দটিকে আদ্‌'দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যাহার অর্থ হইল (১) নশ্বর, মূল و-د-ى এবং (২) শক্তিশালী, সুদৃঢ় মূল أ-د-ى।

F. Giese তাহার Untersuchungen uber die Addad auf Grund von Stellen aus Altarabischen Dichtern, বার্লিন ১৮৯৪ গ্রন্থে প্রাচীন 'আরবী যেই সকল আদ্‌'দাদের সন্ধান পাইয়াছেন সেইগুলিকে শব্দার্থ বিজ্ঞানমতে শ্রেণীবিন্যাস করিয়া কিভাবে উহারা বিপরীতার্থক শব্দে পরিণত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাঃ (১) রূপকালঙ্কার অথবা লক্ষণালঙ্কার শব্দঃ (Metonym—مجاز مرسل) যখন শব্দের একটি অর্থকে উহার অপর একটি অর্থের কারণসম্ভূত অথবা উহার সাময়িক পরিণতিরূপে ব্যাখ্যা করিতে হয়। যেমন [তু. বাংলা ভাষায় ঃ শব্দের অভিধেয় অর্থ দ্বারা মুখ্যার্থের উপলব্ধিতে বাধা জন্মিলে যে শক্তিবলে অভিধেয় অর্থের সহিত সমন্বয়বিশিষ্ট প্রকৃত বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণাশক্তি]। ناء=একটি বোঝাকে কষ্টে উত্তোলন করা, উহা বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া, ناهل=যে ব্যক্তি পানির দিকে যায়, পিপাসার্ত ব্যক্তি; পিপাসা তৃপ্ত করিয়া যে ব্যক্তি পানি হইতে প্রত্যাবর্তন করে। (২) বিভিন্ন রকমের ধারণাগুলিকে বিন্যাস করা; যেমন بين বিচ্ছেদ

ও মিলন (এই অর্থে যে কোন একজনকে দল হইতে বিচ্ছিন্ন করা অথবা অন্য আর একজনের সহিত একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করা) অথবা جلل=আবর্তিত হওয়া, অতএব ভারী; উহার অপর অর্থ দ্রুত ঘুরিয়া সরিয়া যাওয়া—অতএব তুচ্ছ বা হাল্‌কা বস্তু। (৩) অপকৃষ্ট বা মার্জিত করিয়া ধারণাটির সঙ্কোচন; যেমন—رم রাম্মা—"মজ্জাসদৃশ হওয়া," সবল ও মজ্জাহীন হওয়া, দুর্বল। (৪) Emotion and odour (আবেগ ও গন্ধজ্ঞাপক) শব্দ দুইটির মূল নিরপেক্ষ মুখ্যার্থ "উত্তেজিত" হওয়াকে তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে- ইহা ভাল কিংবা মন্দ যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক না কেন। এইভাবে راع অর্থ "ভীত হওয়া" ও "খুশী হওয়া"; طرت অর্থ "বিষণ্ন হওয়া" ও "আনন্দিত হওয়া"; رجا خاف অর্থ "আশা করা" ও "ভয় করা" بنة – ذفر শব্দদ্বয়ের অর্থ "সুগন্ধ" ও "দুর্গন্ধ"। যে সকল ক্রিয়াপদ জ্ঞাত হওয়া ও জ্ঞাত না হওয়া উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন خال–حسب–ظي ; (৫) কতকগুলি শব্দ মূলত একটি অর্থজ্ঞাপক ছিল; কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে উহা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে باع ও شرى। "বিক্রয় করা" ও "ক্রয় করা" অর্থে ; মূলত উভয় শব্দেরই অর্থ ছিল "বিনিময় করা"। (৬) নামবাচক শব্দ, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় ও চতুর্থ আকারে (باب باب افعال ও تفعيل) মূল অর্থ "কোনও বিশেষ লক্ষ্যে কার্য শুরু করা"। সুতরাং উহারা ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন— فرع অর্থ "ভাষা", "ডুবা" (তু. হিব্রু—শীরীশ, সিক্‌কীল)। এতদ্ব্যতীত যুগ্ম শব্দ গঠনে অব্যয় পদের প্রয়োগ 'আরবী ভাষায় না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থবোধক ভাবের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিয়াছে (তু. আস্-সুয়ূতী, ১৮৯- قبل=ولى। অর্থ "নিজেকে কাহারও অভিমুখী করা" এবং ادبر= কাহারও দিক হইতে নিজেকে ফিরাইয়া আনা سمع= অর্থ 'শোনা' ও 'সাড়া দেওয়া' (উত্তর দেওয়া অর্থে)। ইহা ভিন্ন 'আরবী ভাষায় voices ambiguae (অনিশ্চিত ধ্বনির) অথবা Communis generis (একই মূল হইতে নির্গত এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি দ্ব্যর্থবোধক, যেমন ام= যাহার মূল অর্থ "লক্ষ্য" নগণ্য বা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু; مأتم অর্থাৎ "নারীগণের সমাবেশস্থল"—আনন্দময় বা বিষাদময় যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে হউক না কেন। زوج "স্বামী" অথবা "স্ত্রী" অর্থে। পরিশেষে ভাষার আঞ্চলিক রূপের পরিপ্রেক্ষিতে 'আদ্'দাদ' 'আরবী ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ। আরব ভাষাবিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তামীম গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় شدفة শব্দটির অর্থ 'অন্ধকার', অথচ কায়স গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় উহা "আলো"। হিময়ারী গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় وثب শব্দটির অর্থ 'বসা' (হিব্রু য়াশাভ), অথচ আরবীতে শব্দটির সাধারণ অর্থ "লাফাইয়া উঠা"। এতদ্ব্যতীত قرع=سميد প্রভৃতি শব্দও তদ্রূপ (তু. C. Landberg, Za langue Arabe et ses dialectes. লাইডেন ১৯০৫, ৬৪ প.)।

আদদাদের এইরূপ অভিব্যক্তি সকল সেমিটিক ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। E. Landue, Die gegensinnigen Worter im Alt-und Neuhebraischen, 1896; বার্লিন হইতে প্রকাশিত প্রবন্ধটি 'আরবী ভাষায় আদ্'দাদ বুঝিবার পক্ষেও সহায়ক। Th. Noldeke তাঁহার worter mit Gegensinn (Addad); Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft গ্রন্থে (স্ট্রাসবুর্গ ১৯১০, পৃ. ৬৭-১০৮) বিষয়টি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উহাতে 'আরবীর সাহিত্যিক ভাষার ১৭৭টা আদ্'দাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উহাদের ব্যুৎপত্তিগত ও অর্থগত (অনুরূপ অর্থের পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়া) ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'আরবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা হিব্রু, আরামাইক ও আবিসিনীয় ভাষার সদৃশ ক্রিয়ামূলগুলি বিবেচনা করেন। Noldeke বহু সংখ্যক পরিবর্তনকে কয়েকটি শব্দার্থ বিদ্যাগত শ্রেণীতে ভাগ করিলেও বিশেষ বিবেচনার পর তিনি ইহা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি বা প্রণালী প্রণয়নে বিরত থাকেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান অপেক্ষা শব্দার্থবিদ্যার সুনির্দিষ্ট সাধারণ নিয়ম-কানুন স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে না। অধিকন্তু মানুষের বাচনভঙ্গির বিচিত্র বাস্তবতা উহাকে বিধিবদ্ধ করার সকল প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে।

পূর্ববর্তী যুক্তি দ্বারা পরোক্ষভাবে এই কথা বলা হইয়াছে, আদ্'দাদের ব্যবহার দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি সকল ভাষাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। Kleinere Aufsatze, ৭খ., পৃ. ৩৬৭-তে গ্রন্থকার Jacob Grimm বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। K. Nyrop-কৃত Das Leben der Worter গ্রন্থ (R. Vogt অনূদিত) ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। Vorlesungen uber Syntax, Basel 1928, ২খ., পৃ. ২৩৫-এর এক অনুচ্ছেদে গ্রন্থকার J. Wackernagel যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন (যাহা অন্যথায় উপেক্ষিত হইতে পারিত) তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল।

G. Weil (E.I.[2]) / মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আদন (দ্র. জাননা)

'আদনান (عدنان) ঃ 'আরবদের যে বংশ তালিকা ৮০০ খৃস্টাব্দের দিকে ইবনুল কাল্‌বীর রচনায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে তদনুসারে 'আদনান উত্তরাঞ্চলীয় 'আরবদের পূর্বপুরুষ। উত্তর-পশ্চিম 'আরবের নাবাতী (نبطى) শিলালিপিসমূহের দুইটি স্থানে এই নামটির উল্লেখ রহিয়াছে ('আব্‌দ-'আদনূন, 'আদনুন; Jaussen et Savignac Mission Archeologiqueen Arabie, প্যারিস ১৯০৯-১৪, সংখ্যা ৩৮, ৩২৮)। ছামূদীয় শিলালিপিতেও এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় (Lankester Harding/Littmann, some Thamudic Inscriptions, Leiden 1952)। ধূপ-ধুনার বাণিজ্যপথে এই নামটি দক্ষিণ 'আরবে গিয়া পৌঁছে (Corpus Inscriptionum Semit., ৪খ., সংখ্যা ৮০৮)। আল-জুমাহী রচিত তাবাকাত গ্রন্থে (Hell), পৃ. ৫, অনুরূপ উল্লেখ রহিয়াছে (অধিকন্তু তু. ইবন 'আবদিল বার্‌র, আল-আন্‌বা', 'আলা ক'াবাইলি'র-রুওয়াত, কায়রো ১৩৫০ হি., পৃ. ৪৮)। জাহিলী যুগের কবিতায় এই নামটির কোন উল্লেখ নাই (লাবীদ, ক'াসীদা ৪১, পংক্তি প্রক্ষিপ্ত)। ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহিত্যেও ইহার

উল্লেখ বিরল। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, বংশতালিকায় এই নামটি যেখানে স্থান পাইয়াছে, ইহার কারণ উমায়্যা শাসনামলের নিযার ও রাবী'আ গোত্রের ন্যায় গোত্রীয় কলহ, বরং এই নামটি জাহিলী যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, যদিও ইহা বেদুঈন ঐতিহ্য হইতে উদ্ভূত নহে। বংশতালিকার অন্য প্রাথমিক উপাদানগুলির ন্যায় ইহাও মক্কার প্রচলিত ঐতিহ্য হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে তুরস্কে জাতীয় চেতনাবোধের পুনরুজ্জীবনের প্রেক্ষিতে এই 'আদ্‌নান নামটি প্রচলিত হয়। মূলত 'উছমানী জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম যুগে 'তুর্কী যুব আন্দোলন' আরব ঐতিহ্য সম্বলিত 'উছমানী জাতীয়তাবাদের প্রতীক হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) W. Caskel, Die Bedeutung der Beduinen fur die Geschichte der Araber (Arbeitsgemeinschaft fur Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften, Heft 4) Koln and Opladen 1953, 11 প.; (২) CIH, 808; (৩) E.I. দ্র. Nizar; (৪) Jaussen et Savignac, Mission archeologique en Arabie, 1, 2, প্যারিস ১৯০৯, ১৯১৪, সংখ্যা ৩৮, পৃ. ৩২৮; (৫) Lankester Harding /Littmann, Some Thamudic Inscription, Leiden 1952; (৬) G. Strenziok, Die Genealogic der Nordaraber Nach Ibn al-Kalbi, Thesis, Kolon 1953, তু. Nizar.

W. Caskel (E.I.²) / এ. এন. এম. মাহবুবর রহমান ভূঞা

'আদ্‌নান আল-'আয়ন্‌যারবী (عدنان العين زربى) : ১২শ' শতকের প্রথমার্ধের মুসলিম চিকিৎসাবিদ ও জ্যোতিষী। পূর্ণ নাম আবূ নাস্‌র 'আদ্‌নান ইব্‌ন নাদ্‌র আল-'আয়নযারবী। বহুকাল বাগদাদ ও কায়রোর শাহী দরবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তিনি কিতাবুল-কাফী ফী 'ইল্‌মিত-তিব্ব নামে চিকিৎসা গ্রন্থ ও কিতাবু ফী মা ইয়াহ্‌তাজুত ত'বীব মিন 'ইলমিল ফালাক' নামে চিকিৎসায় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ, ১খ., পৃ. ১২৫।

(সংকলিত)

আল-আদ্‌ফুবী (الأدفوى) : ১২৮৬-১৩৪৭ হি., মিসরীয় ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। পূর্ণ নাম আবুল ফাদ্‌ল জা'ফার ইব্‌ন সালাব আল-আদফুবী আশ্‌শাফি'ঈ। তিনি কিতাবুত তালী আস-সা'ঈদ আল-জামি' লি আসমাইন-নুজাবাই'স, সাঈদ নামে উত্তর মিসরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনচরিত; আল্‌-বাদ্‌রুস সাফির ওয়া তুহ্‌ফাতুল মুসাফির নামে ১৩শ শতকের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনচরিত, সংগীতের বৈধতা ও অন্যান্য বিষয়ে পুস্তক প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., ১২৬ প.।

(সংকলিত)

আদ্‌ফূও (এদফূ=ادفو) : নীলনদের পশ্চিমে উত্তর মিসরের প্রাদেশিক রাজধানী, গ্রীক শাসনের প্রাচীন (Appollinopolis Magna)। বর্তমান 'আরবী নামটি উহার কপটিক (কিবতী) নাম Atbo-এর রূপান্তর। মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে উহা আস্‌ওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা মরুযাত্রীদলের কায়রো হইতে দক্ষিণাভিমুখী সড়ক পথে অবস্থিত। কিন্তু মধ্যযুগীয় পর্যটকগণের মধ্যে একমাত্র ইবন বাত্‌তূতা বর্ণনা করেন, Armant-এর দক্ষিণ দিকে ইহার দূরত্ব একদিন ও এক রাত্রির পথ। আদ্‌-দিমাশ্‌কী কেবল আদ্‌ফূ মন্দিরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তবে কোন বিবরণ দেন নাই। কেননা তখন উহা নিশ্চয়ই বালুকার নিচে চাপা পড়িয়া থাকিবে। বস্তুত ১৭৩০ খৃ. Granger উহার যে উল্লেখ করিয়াছেন উহাই সর্বপ্রথম কোনও ইউরোপীয় লেখকের পরোক্ষ উল্লেখ। তিনি সেখানে এমন একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন যাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগ মাটি ও জঞ্জাল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। উহার একটি বিশদ বিবরণের জন্য Vivant Denon-এর বর্ণনা দেখা যাইতে পারে। মন্দিরটি তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ৭০০/১৩০০ সনে কতিপয় রাজমিস্ত্রী উহাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি স্ত্রীলোকের প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কার করে। সিংহাসনটিতে প্রাচীন মিসরীয় বর্ণমালার (Hieroglyphic) একটি শিলালিপি ছিল।

আদ্‌ফূ জেলা অত্যন্ত উর্বর ছিল বলিয়া মনে হয়, বিশেষত তাল জাতীয় বৃক্ষ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। তথাকার খর্জুর পিষিয়া পিঠা, প্রস্তুত করা হইত। মামলূক রাজবংশের শাসনামলে ২৪৭৬২ ফাদ্দান (একর) এলাকাবিশিষ্ট জেলাটির বাৎসরিক রাজস্ব ১৭ হাযার দীনার ধার্য ছিল। গ্রন্থকার আল আদ্‌ফুবী আদ্‌ফূ এলাকার বাশিন্দাদের সৎ গুণাবলী বর্ণনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি তাহাদের দানশীল, বিচক্ষণ, সরল ও অতিথিপরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। স্মরণীয় কোন ঐতিহাসিক ঘটনা শহরটিতে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাক্‌রীযী, খিত'ত', Mifao, ৪৯খ., ১২৫ (গ্রন্থপঞ্জীসহ), (২) ইয়াকূ'ত, ১খ., ১৬৮-৯; (৩) ইব্‌ন দুকমাক, ৫খ., ২৯; (৪) Egypte de Murtadi, (পুনঃসম্পা.) Wiet, ভূমিকা, ১১৩-৪; (৫) Carre, Voyageurs francais en Egypte, ১খ., ৬৫, ৮৯, ১৩৪।

G. Wiet (E. I.²) / মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আদবি'য়া (ادوية) : 'দাওয়া'-এর ব. ব., মানবদেহ গঠনে সহায়ক এমন যে কোন বস্তু, প্রতিষেধক বা বিষরূপে প্রযোজ্য যে কোন ঔষধ। ইউনানী (গ্রীক) ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মুসলিম ভেষজবিদগণ সহজ বা অমিশ্র ঔষধ (আদ্‌বি'য়া মুফ্‌রাদা) ও মিশ্র ঔষধ (আদবি'য়া মুরাক্কাবা)-এর মধ্যে পার্থক্য করিতেন (শেষোক্তটির জন্য 'আক্‌রাবাযীন' দ্র.)। মূল উদ্ভব অনুযায়ী আদবিয়া নিম্নরূপভাবে বিভক্ত ছিল : ঔষধিজাত (নাবাতিয়া), প্রাণীজ (হ'ায়ওয়ানিয়া) ও খনিজ (মা'দিনিয়া)।

ঔষধ-বিজ্ঞানে ইউনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হইলেও মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ অভিজ্ঞতার আলোকে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। প্রস্তুত ঔষধের নামকরণ রীতিতে পারস্য দেশীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। বহু ক্ষেত্রে ঔষধি লতাগুল্ম ও দাওয়া-এর অদ্যাবধি প্রচলিত ফারসী নাম, (দ্র. যথা Ahmed Issa Bey,

Dictionnaire des noms des Plantes, Cairo 1930) সম্ভবত জুনদীসাপুর (Djundisabur)-এর বিখ্যাত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে, তথায় গ্রীক বিজ্ঞানের বিকাশ লাভ ঘটিয়াছিল। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ১৪৮/৭৬৫ সালে মুসলমানগণের উপরে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে যখন খলীফা আল-মানসূর তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসার জন্য জুনদীসাপুর-এর প্রধান চিকিৎসক বুখতিয়াশু' পরিবারের জুরজীসকে ডাকিয়া পাঠান। গ্রীসীয় ঔষধ প্রস্তুত জ্ঞান ডিওসকরাইড্স (Dioscorides), জালীনূস (Gallen), অরিবাসিয়াস (Oribasius) ও ইজিনা (Aegina)-এর অধিবাসী পল (Paul)-এর মৌলিক চিকিৎসা বিষয়ক রচনাবলীর সিরীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। ডিওসকরাইড্স-এর মেটিরিয়া মেডিকা (ভেষজবিদ্যা)-এর 'আরবী অনুবাদ (مخزن الادوية)-এর ইতিহাসের জন্য দিয়ূসকুরিদীস (Diyuskuridis) নিবন্ধ দ্র.। ডিওসকুরিডীয় ধারণা বিশ্ববিখ্যাত ইরানী বৈজ্ঞানিক আল-বীরূনী তাঁহার নিম্নে উল্লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে (الصيدنة في الطب) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইল, তত্ত্বগতভাবে প্রতিটি লতাগুল্মেরই কিছু না কিছু ঔষধী গুণ রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে বাস্তবে মানুষের জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক। তাঁহার সেই ধারণা হেতুই ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতাগণ এমন সকল গাছ-গাছড়ার বিবরণও প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যেইগুলির একমাত্র উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গুরুত্বই ছিল না। উল্লিখিত গ্রন্থকারগণ এই সকল উদ্ভিদের বর্ণনা প্রধানত আবূ হানীফা আদ্-দীনাওয়ারী হইতে গ্রহণ করেন। এই কারণেই চিকিৎসা বিষয়ক মুসলিম ঐতিহ্য মেটিরিয়া মেডিকা বা 'আল-আদ্‌বি'য়াতু'ল-মুফরাদা ইত্যাদি ও উদ্ভিদবিদ্যা, 'নাবাত' (দ্র.) এই সকলের মধ্যে কোন পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণীত হয় নাই।

হু'নায়ন ইবন ইসহাক রচিত গ্রন্থপঞ্জী 'রিসালা' (Uber die syrischen und arabischen Galen-ubersetzungen' (Bergstrasser), no. 53) অনুসারে গ্যালেনের সহজ (অমিশ্র) ঔষধ গ্রন্থ (Book of Simple Drugs)-এর প্রথম পাঁচ 'মাক'লাত' প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক আরমাইক ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন ইউসূফ আল-খুরী। অনুবাদ খুব সন্তোষজনক ছিল না। পরে উহা আবার অনুবাদ করেন আর-রুহ'ার আয়্যুব (Job of Edessa) আনুমানিক ৭৬৫-৮৩৫ খৃষ্টীয় সালে এবং সর্বশেষে স্বয়ং হুনায়ন কর্তৃক উহা সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত হয়। তিনি মূল পাঠের একটি 'আরবী অনুবাদও প্রকাশ করেন। সারজীস (Sarjis of Rish'ayna, মৃ. ৫৩৬ খৃ.)-কৃত সিরীয় ভাষায় অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড [মূল পাঠের একখানি পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে (বর্তমান নাম বৃটিশ লাইব্রেরী) রক্ষিত আছে, নং ১০০৪] হুনায়ন সংশোধন করেন এবং উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়শ কর্তৃক আরবীতে রূপান্তরিত হয়। মিশ্র ঔষধ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (The Book of Compound Drugs) প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন সারজীস ও হুনায়ন এবং অতঃপর 'আরবীতে অনুবাদ করেন হুনায়ন (Hunayn; পূ. গ্র., no. 79)।

অরিব্যসিয়াস Oribasius)-এর 'Synopsis' ও "Ad Eunapium" হুনায়ন কর্তৃক (আরবীতে?) অনূদিত হয়। তিনি 'ঈসা ইব্ন ইয়াহয়া-এর সমবায়ে প্রাচীন সিরীয় ভাষায় "Collectiones"-এর প্রথম পুস্তিকার (Tract) অনুবাদ করেন (আল-কুন্নাশুল কাবীর, ইব্ন আবী উসায়বি'আ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, ১খ., ১০?)। এই সকল অনুবাদ বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালের লেখকগণের গ্রন্থাবলীতে ইহাদের বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

ইজিনার (Aegina) পল রচিত Pragmation গ্রন্থখানি মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। তাঁহারা হুনায়নকৃত উহার সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি (সংক্ষিপ্ত) অনুবাদ ব্যবহার করিতেন (আল-কুন্নাশ ফিত-তিবব, ফিহ্‌রিস্ত, ২৯৩; কুন্নাশু'স-সুরায়্যা, ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ., ১০৩)। খণ্ড খণ্ড অংশ ছাড়া 'আরবীতে উহার কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না, কিন্তু পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণের রচনায় উহার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

Bar Hebraeus-এর মতে (The Chronography, অনু. E.A.W. Budge, Oxford 1932, 57) ধর্মযাজক আহরান (Ahrun) গ্রীক ভাষায় তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ক Pandect (আইন সংগ্রহ) রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। মাসারজিস (মাসারজাওয়ায়হ) উহার 'আরবী অনুবাদ করেন। ধর্মযাযক আহরান (Ahrun al-kass)-এর 'কুন্নাশ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক লেখকগণের গ্রন্থে প্রায়শ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত হিসাবে বিশেষ খ্যাত ছিলেন (জাহিজ, আল-হায়াওয়ান, কায়রো ১৩৫৬, ১খ., ২৫০)। আরবীতে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক মাসারজিস্ (মাসারজাওয়ায়হ) [দ্র. Steinschneider, in ZDMG. 1899, 428-34]। আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, একখানির বিষয়বস্তু খাদ্য এবং অপরখানির ঔষধি (আল-'আকাকীর)। আহরান-এর অনূদিত গ্রন্থের সঙ্গে তিনি দুইটি 'মাক'লাত' সংযোজন করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত দুইটি গ্রন্থ ও এই দুই মাক'লাত সম্ভবত অভিন্ন (তু. ইবনুল কিফ্‌তী, ৮০)।

হুনায়নের পরবর্তী কালে মুসলিম দুনিয়ার প্রাচ্যের দেশসমূহে ঔষধ বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ সাধিত হয়। ইবনুন নাদীম, ইব্ন আবী উসায়বি'আ এবং ইবনুল কিফ্‌তীর গ্রন্থপঞ্জীমূলক রচনায় ঔষধশাস্ত্র বিষয়ক প্রায় এক শত 'আরবী লেখকের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গ্রন্থাগারসমূহে তাঁহাদের প্রায় ত্রিশজনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, সেইগুলির মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকখানিই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন। গ্যালেন ও অন্যান্য লেখকের গ্রীক পুস্তকগুলির ইতিহাসের জন্য এই সকল 'আরবী গ্রন্থ নিশ্চয়ই অতি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কালক্রমে গ্রীকদের নিকট অজ্ঞাত বহু শত মূল ঔষধির নাম 'আরব ও পারস্যের মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করেন (এই ধরনের ঔষধের একটি প্রাথমিক তালিকার জন্য দ্র. L. Leclerc, Histoire de la medicine arabe, Paris 1876, ii, 232-33)। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রচলিত গাছ-গাছড়া ও ঔষধের 'আরবী, ইরানী ও ভারতীয় নামের যে বিপুল আমদানী ঘটে তাহার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় অবধারিতভাবেই বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী কালে এই সকলের যথার্থ গুরুত্ব নির্ধারণ এবং ভিন্ন ভাষায় সমার্থক শব্দাবলী সংযোজনের জন্য অনেক পুস্তক লিখিত হয়। বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য বাগদাদে কৃত ডিওস্‌করাইড্‌স-এর অনুবাদ দ্বারা চিকিৎসকগণের প্রয়োজন মিটে নাই; অন্তত যতদিন পর্যন্ত ইউনানী নামসমূহের অধিকাংশই কেবল আরবী হরফে অনুলিখিত হইত। খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আন্দালুসীয় পণ্ডিতগণ মূল পুস্তকে সমার্থক 'আরবী শব্দাবলীর ব্যবহার প্রবর্তন করেন। প্রায় এই সময়ে প্রাচীন সিরীয় ভাষায় রচিত 'কুন্নাশ'-এর লেখক ইয়ুহান্না ইব্‌ন সারাবিয়ুন (Serapion Ibn Abi Usaybi'a, i, 109) উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সকল ঔষধের ইউনানী ও প্রাচীন সিরীয় ভাষার নামসমূহের 'আরবী সমার্থক নাম সংযোজন করেন (পাণ্ডুলিপি তুরস্কের আয়া সোফিয়াতে রক্ষিত, ৩৭১৬; P. Guigues, Les noms arabes dans Serapion, J.A, 1905-6)। ফার্সী ভাষায় রচিত অন্যতম প্রাচীন গদ্য রচনা হইল আবূ মান্‌সূর মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আলী আল হারাবী-এর 'আল-আবনিয়াতুল হাকাইকিল আদ্‌বিয়া। ইহাতে ৫৮৪টি বিভিন্ন ধরনের মূল ঔষধির 'আরবী, ফার্সী, প্রাচীন আঞ্চলিক সিরীয় ও ইউনানী নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে বিবরণসহ সন্নিবেশিত রহিয়াছে (সম্পা. F.R. Seligmann. Vienna 1859; জার্মান অনু. A.C. Achundow, Dorpat 1873)।

ঔষধি ও চিকিৎসা বিষয়ক সমার্থক 'আরবী পরিভাষা ও শব্দাবলীর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ অবশ্যই আল-বীরূনী (৩৬১/৪৪০/৯৭২-১০৪৮)-র 'আস্ সায়দানা ফিত্-তিব্ব' (M. Meyerhof, Das Vorwort Zur Drogenkunde des Beruni, Quellen und Studien zur Gesch der Naturwiss, und der Med., iii, Berlin 1933; ঐ লেখক, BIE 1940, 133 প., 157 প.)। ফার্সীতে দুইখানি পাণ্ডুলিপি ব্যতীত ব্রুসাতে রক্ষিত এই গ্রন্থখানির একটি মাত্র ছিন্ন পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে গ্রন্থকারের খসড়া আকারে রচিত। বোধ হয় ইহা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা এবং তিনি উহা সমাপ্ত করেন নাই। অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহাতে ৭২০টি নিবন্ধ রহিয়াছে, সেইগুলি 'আরবী বর্ণমালার সাধারণ ক্রম অনুযায়ী সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ ঔষধ। সেইগুলির নাম সম্বন্ধে গ্রীসীয়, সিরীয়, ভারতীয়, ফার্সী ও অন্যান্য ইরানী ভাষায় প্রচুর মন্তব্য লিখিত। গাছ-গাছড়ার নামের অর্থের ভাষাতাত্ত্বিক মন্তব্য, 'আরবী কবিতাতে সেইগুলির সমার্থক শব্দ, ঔষধের মান ও উৎপত্তি বিষয়ক এবং ঔষধের বিকল্প (আব্‌দাল) বিষয়ের বিভিন্ন চিকিৎসাগ্রন্থ ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে (যাহাদের অনেকই আমাদের জানা নাই)। এই গ্রন্থখানি অবশ্যই আরও অধীত হওয়ার উপযোগী।

প্রাচ্যে চিকিৎসা বিষয়ক যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং যেইগুলিতে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ের উপর অধ্যায় রহিয়াছে, সেইগুলির মধ্যে এখানে শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আলী ইব্‌ন রাব্বান আত্-তাবারী রচিত 'ফিরদাওসুল হি'কমা' রচনাকাল ২৩৫/৮৫০ (সম্পা. M. Z. Siddiqi, Berlin 1928), ইহাতে হুনায়ন ও তাঁহার শিষ্যগণের অনুবাদের উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ইহার বিশেষ আকর্ষণীয় দিক হইল ভারতীয় ঔষধ সম্বন্ধেও পরিচিতি প্রদান (তু. A. Siggel, in Abh. ber Akad, der Wiss. und Lit. Berlin 1950)। আবূ বাক্‌র আর-রাযী (২৫০-৩১৩)/৮৬৪-৯২৫)-এর রচিত বৃহৎ চিকিৎসা বিশ্বকোষ (আল-হাবী) অগণিত ঔষধের নামে পূর্ণ। ইব্‌ন সীনা-এর বিশাল আকারের 'আল-ক'ানূন ফিত-তি'ব্ব' (বূলাক ১২৯৪ হি.)-এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আট শত প্রকার ঔষধের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যায়নুদ্‌দীন ইসমাঈল আল-জুরজানী কর্তৃক ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে রচিত চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'যাখীরা'-ই খাওয়ারিয্‌ম শাহী (অদ্যাবধি অপ্রকাশিত)—এর ১০ম খণ্ডে একটি বিশেষ অধ্যায় রহিয়াছে, যেখানে ঔষধের নাম ও তাহাদের ব্যবহারবিধি আলোচিত হইয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রেই ডিওস্‌করাইড্‌স আবূ হানীফা আদ্-দীনাওয়ারী প্রমুখের বর্ণনা গাছ-গাছড়া চিনিবার জন্য যথেষ্ট নহে। কাজেই বিশেষ শব্দাবলী ও পরিভাষার অভাব, যে অভাবটি মুসলিম ও সকল প্রাচীন বিজ্ঞানেই সমভাবে দেখা যায়, উহা পূর্ণ করিবার একটি মূল্যবান পদ্ধতি ছিল লতা বা গুল্মাদির চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখা। প্রাচীন কালে এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন করেন ১ম উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডবিশারদ ক্রাটিউআস (Crateuas, খৃ. পূ. ১ম শতাব্দী) এবং ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত বিভিন্ন সমার্থক নাম ও চিত্রাদি ডিওস্‌করাইড্‌স-এর সংশোধিত সংস্করণে স্থান লাভ করে, যাহার প্রতিনিধিত্বশীল হইল খৃস্টীয় ৫১২ সালে রচিত Juliana Anicia codex (উহাতে পরবর্তী লেখকগণ 'আরবী সমার্থক নাম সংযোজন করেন)। বায়যানটীয় সম্রাট কর্তৃক ৯৪৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থখানি কর্ডোভাতে ৩য় 'আবদুর রাহ্‌মানের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরিত হইলে তখন স্পেনে নূতন করিয়া গ্রন্থখানির সফল ও ব্যাপক অধ্যয়নের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। [ডিওসকরাইডস-এর সচিত্র পাণ্ডুলিপির জন্য 'দিয়ুসকুরিদীস' (Diyoskuridis) নিবন্ধ দ্র.]। ইব্‌ন আবী উসায়বিআ (২খ., ২১৬-৯) হইতে আমরা অবগত হই যে, তাঁহার উস্তাদ রাশীদুদ্দীন আল-মানসূর ইবনুস-সূরী (মৃ. ৬৩৯/১২৪১) একখানি (উদ্ভিজ্জ) ঔষধি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন যাহার চিত্রগুলি জীবন্ত গাছ-গাছড়া দেখিয়া অঙ্কন করা হইয়াছিল। ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ-এর উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক অধ্যায়ের জন্য B. Fares, Un Herbier arabe illustre du xiv. siecle. Archeologica Orientalia in Memoriam E. Herzfeld. 1952. 84 প. দ্র.।

আইবেরীয় উপদ্বীপের মুসলিমগণ এমন একটি দেশের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিল, যাহা সুপ্রাচীন কাল হইতে ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় লতাগুল্ম ও খনিজ সম্পদের জন্য সুবিখ্যাত ছিল। প্রথমে স্পেনের চিকিৎসা বিষয়ক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল প্রাচ্য হইতে পাওয়া এবং পাশ্চাত্যের ছাত্রগণ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তখন বাগদাদে গমন করিত। ডিওস্‌করাইড্‌স-এর একখানি সংশোধিত সংস্করণ স্পেনে ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অমিশ্র ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদানের কোন অভাব ছিল না (দ্র. M. Meyerhof, Esquisse

d'histoire de la Pharmacologic et botanique chez les Musulmans d'Espagne, and 1935, 1-41}। স্পেনে বনজ ঔষধ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন 'আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক ইব্ন হায়ছাম ও সুলায়মান ইব্ন হাসসান, যিনি ইব্ন জুল্জুল নামে পরিচিত ছিলেন। তাহারা উভয়েই ডিওস্‌করাইড্‌স-এর মূল পাঠের উপরে গবেষণা কাজে নিয়োজিত সন্ন্যাসী নিকোলাস ও অন্যান্য চিকিৎসাবিদ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে যোগদান করেন। ডিওস্‌করাইড্‌স উল্লেখ করেন নাই এমন সব ঔষধ সম্বন্ধে ইব্ন জুল্‌জুল একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ড Hyde ৩৪, পত্র ১৯৭-২০১)। আবুল কাসিম আয্-যাহরাবী (মৃ. আনু. ৪০০/১০০৯) রচিত বিখ্যাত চিকিৎসা বিশ্বকোষ "আত্-তাস্'রীফ"-এর ২৭তম খণ্ডে অমিশ্র ঔষধ, তাহাদের সমার্থক নাম ও বিকল্প ব্যবস্থা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। আবূ বাক্র হামিদ ইবন সামাজুন-এর জীবনী সম্বন্ধে খুব অল্পই জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে তিনি 'হাজিব' আল-মানসূর (মৃ. ৩৯২/১০০২)-এর আমলের একজন অতি বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত Book of Sayings of Ancient and Modern Physicians and Philisophers about the Simple Drugs" সম্প্রতি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে (তু. P. Kahle lbn Samagun and sein Dragenbuch Documenta islamica inedita, Berlin 1952, 25 প.)।

স্পেন দেশে রচিত ঔষধ ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক সবচেয়ে তথ্যবহুল পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেন আল-গাফিকী, সম্ভবত ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। প্রথম খণ্ড দুইটি সচিত্র পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে (দ্র. M. Meyerhof, in BIE, 1941, 13 প; সমগ্র রচনা ত্রিপোলীতনিয়াতে পাওয়া গিয়াছে) ইহার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন খৃস্টান আবুল ফারাজ ইবনুল 'ইব্‌রী, যিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন Barhebraeus নামে (সম্পা. M. Meyerhof and G.P. Sabhy, Cairo 1932-8, অসম্পূর্ণ)। ইব্ন সামাজুন ও আল-গাফিকী যে রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যেভাবে উপাদান বিন্যস্ত করিয়াছিলেন আল-ইদরীসী (মৃ. ৫৬০/১১৬৬)-ও তাহাই করেন। তাঁহার অমিশ্র ওষধ সংক্রান্ত Book Simple Drugs (গ্রন্থখানির প্রথম অর্ধাংশের পাণ্ডুলিপি ফাতিহ সংগ্রহ ৩৬১০, ইস্তাম্বুল)-এ তিনি বিভিন্ন ভাষায় বিপুল সংখ্যক সমার্থক নাম প্রদান করিয়াছেন (দ্র. M. Meyerhof, in Archiv. Fur Gesch. der Math, der Naturwiss und der Technik, 1930, 45 প., 225 প.; ঐ লেখক, BIE, 1941, 89 প.)। ইব্ন রুশ্দ-এর ঔষধশাস্ত্র বিষয়ক অধ্যায়ের জন্য দ্র. 'আল-কুল্লিয়্যাত ৪র্থ-এর এ. আল-বুস্তানীকৃত ফটো প্রতিলিপি, তাঞ্জিয়ার ১৯৩৯ খৃ.।

বিশাল আকারের বিশ্বকোষ আল-জামে' লিমুফ্‌রাদাতিল-আদবিয়া ওয়াল-আগযিয়া (আরবী পাঠের নিকৃষ্ট সংস্করণ বূলাক ১২৯১; ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন L. Leclerc, Notices et Extraits dte la Bibliotheque Nationale xxiii, xxv, xxvi, xxx, 1877-93) গ্রন্থে ইব্নুল বায়তার (মৃ. ৬৪৬/ ১২৪৮) তাঁহার আমলে প্রাপ্ত সকল তথ্য সন্নিবেশিত করেন, তিনি ডিওসকরাড্‌স হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার উস্তাদ আবুল আব্বাস আন-নাবাতী পর্যন্ত তাঁহার পূর্ববর্তী ১৫০ জন লেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন, উস্তাদের রচিত "রিহ্‌লা" বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক সফর গ্রন্থ হইতে প্রায়শ উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ গ্রন্থ সম্বন্ধে ইব্নুল-বায়তার অবশ্যই পরোক্ষ সূত্র হইতে অবগত হইয়া থাকিবেন, বিশেষত আল-গাফিকী। ২৩২৪টি নিবন্ধযুক্ত জামে' গ্রন্থে প্রায় ১৪০০ ধরনের ঔষধ ও উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৪০০টি গ্রীকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। পাশ্চাত্যে রচিত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে ঔষধ ও উহাদের ব্যবহার বিধি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের সঙ্গে আরও বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থের নাম সংযোজন করা যাইতে পারে, সেইগুলিতে সমার্থক শব্দাবলীর তালিকা দেওয়া আছে এবং যাহাতে অমিশ্র ও অন্যান্য ঔষধের বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে খ্যাতনামা ইয়াহূদী ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও চিকিৎসক মূসা ইব্ন মায়মূন (Maingonieds, 1135-1204)-এর রচিত শারহ্ আসমাইল উককার, সম্পা. M. Meyerhof, Cairo 1940 ও জনৈক অজ্ঞাত লেখকের রচিত তুহ্‌ফাতুল আহবাব, সম্পা. H.P.J. Renaud ও G.S. Colin, রাবাত ১৯৪৩; ইহাতে বিশেষভাবে মরক্কোতে প্রচলিত ঔষধের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সম্ভবত ১৮শ শতাব্দীতে রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Meyerhof, in the introduction to Maimonides, শারহ্ আসমাইল উক্‌কার ; (২) ঔষধের একটি তালিকার জন্য M. Steinschneider, Heilmittelnamen der Araber, WZKM, xi (২০৪৩ ধরনের ঔষধ)।

B. Lewin (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আদমদীঘি ঃ বগুড়া জেলার একটি থানা। জেলা সদর হইতে ৩৭ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ৬টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা, ১১২টি মৌজা, ১৭৯টি গ্রাম। আয়তন ১৬৮.৮৪ বর্গকিলোমিটার (৬৫.১৯ ব.মা.)। ভৌগোলিক অবস্থান ২৪°৪৩ হইতে ২৪°৫২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৮ হইতে ৮৯°১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ দ্বারা চিহ্নিত। এই থানার উত্তরে আক্কেলপুর, দুপচাঁচিয়া, পূর্বে দুপচাঁচিয়া, কাহালু ও নন্দীগ্রাম থানা, দক্ষিণে নন্দীগ্রাম, রাণী নগর ও পশ্চিমে নওগাঁ সদর থানা। ১৯৯১ খৃ. আদমশুমারী অনুসারে মোট জনসংখ্যা ১,৭০,৩২৬, পুরুষ ৮৭.৯৪৩, মহিলা ৮২,৩৮৩। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০০৯ জন। ১৯৮১ খৃ. হিসাব অনুযায়ী থানাটিতে মোট মুসলমান ১,১৭,৮৬৭, হিন্দু ১৪,৫৪০, বৌদ্ধ ০৩, খৃস্টান ৪১, অন্যান্য ২৩৯। মোট মসজিদ ২২৪টি, মন্দির ১৫টি। ইউনিয়নগুলি ঃ (১) ছাতিয়ান গ্রাম, (২) আদমদীঘি, (৩) সান্তাহার, (৪) নসরৎপুর (৫) কুন্দগ্রাম ও (৬) চাঁপাপুর। এই থানার একমাত্র পৌরসভাটির নাম সান্তাহার।

নামকরণ ঃ যখন বাংলার শাসনকর্তা বল্লাল সেনের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বাবা আদম নামে একজন দরবেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর সঙ্গে লইয়া সান্তাহার হইতে পাঁচ
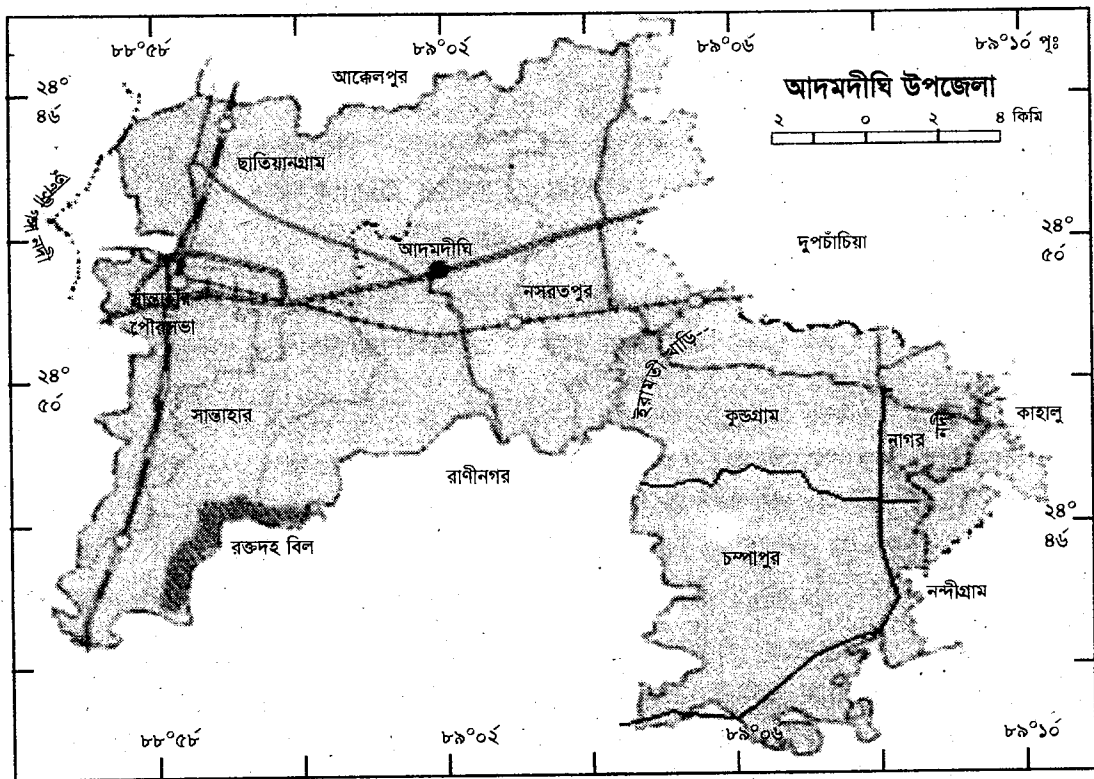
(বাংলাপিডিয়ার সৌজন্যে)
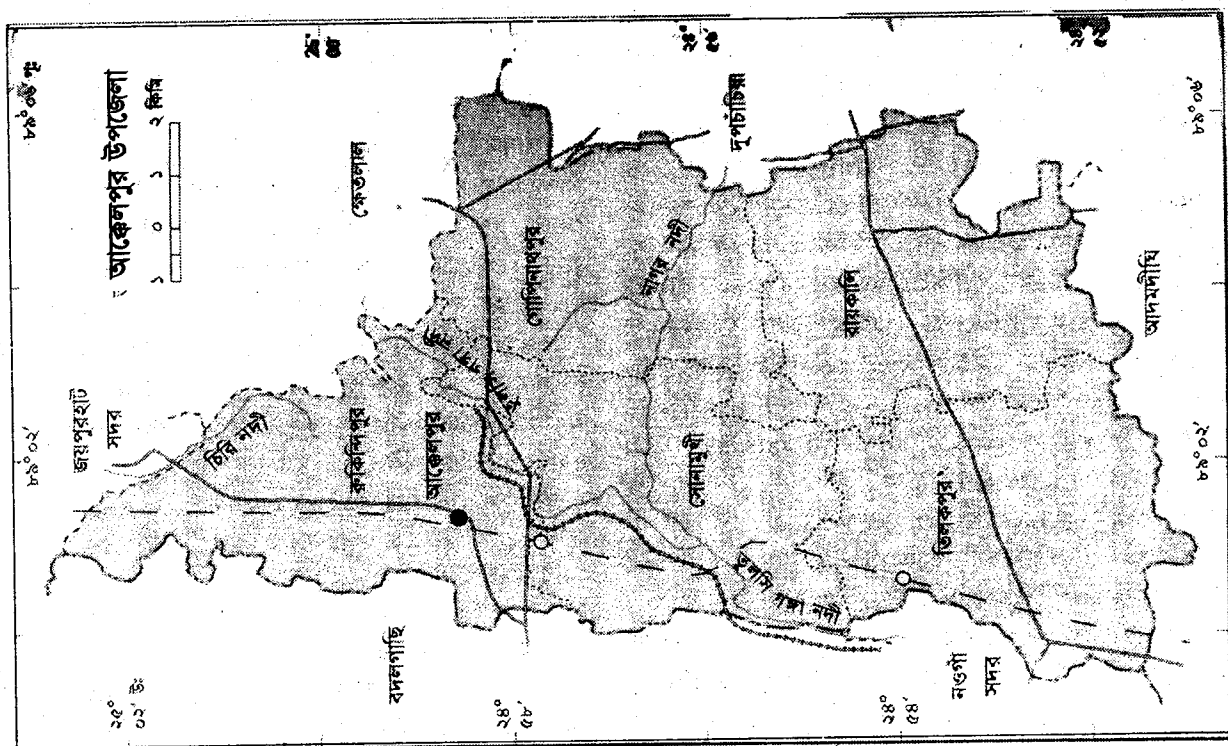
(বাংলাপিডিয়ার সৌজন্যে)

কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে গিয়া খানকাহ্ স্থাপন করেন। তিনি ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে প্রথম প্রথম পানির অভাবে কষ্ট পান। অবশেষে এই কষ্ট নিবারণের জন্য ঐ স্থানে একটি সুন্দর ও বৃহদাকারের পুষ্করিণী খনন করার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয় আদমদীঘি (গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃ. ৫৪)।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো কৃষিভিত্তিক। ১৯৯১ খৃস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী এই থানায় কৃষকের সংখ্যা ১৩,৯৬৯। মোট জমির পরিমাণ ৪১,৭২১ একর, আবাদী ৩১০০০ এবং পতিত ১০,০০০ একর, এক ফসলী ৮,০০০ একর, দুই ফসলী ১৯,০০০ একর, তিন ফসলী ৪০০০ একর। উৎপন্ন দ্রব্য ধান, আলু ও গম। এতদ্ব্যতীত তিল, সরিয়া ও ডালও প্রচুর উৎপন্ন হয়। এইখানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এই থানার ১৭টি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র রহিয়াছে। এখানকার তাঁতশিল্পও উল্লেখযোগ্য। থানার ১৫টি গ্রামে তাঁতী পরিবার রহিয়াছে ৪৫৯টি।

যোগাযোগ ঃ মোট রাস্তা ১৯৩ কিলোমিটার, পাকা ৫৩ কি., আধা পাকা ৮কি. ও কাঁচা রাস্তা ১৩২ কি., মোট রেলপথ ২৮ কি., তাহার মধ্যে ১৮ কি.মি. ব্রডগেজ ও ১০ কি. মি. মিটার গেজ। থানায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়া 'নাগর' নদী এবং পশ্চিম সীমান্ত দিয়া তুলসীগঙ্গা নদী প্রবাহিত। কিছু খাল-বিলও রহিয়াছে, যেগুলি দিয়া বৎসরের প্রায় আট মাস নৌকাযোগে লোকজনের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন করা হয়।

শিক্ষার হার গড়ে ৩৪.৪%; তন্মধ্যে পুরুষের ৪২.২% ও স্ত্রীলোকের ২৬.০%। প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৪টি, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২১টি, মাদরাসা ১০টি ও কলেজ ৪টি।

পীর-আওলিয়া ও সংস্কারক ঃ আদমদীঘিতে অনেক পীর-আওলিয়া ও সংস্কারকের শুভাগমন ও জন্ম হইয়াছিল। যেমন নিমাই পীর : ৪৩৯ হিজরীর শেষ ভাগে সুলতান বলখী মাহীসওয়ার নামে যে সাধক পুরুষ মহাস্থানে আগমন করেন নিমাই পীর তাঁহার শাগরিদ ছিলেন (বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃ. ৫৬-৫৭)। তাঁহার প্রকৃত নাম মীর সৈয়দ রুকনুদ্দীন।

বাবা আদম ঃ নির্যাতিত মুসলিম জনতার মুক্তির লক্ষ্যে ও ইসলাম প্রচারার্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাবা আদম এই থানায় আগমন করেন। তিনি শাহজালাল (র), শাহ আরেফীন (র), শাহ তুর্কান, শাহী বন্দেগী, শাহ রায়হান ও আরও কয়েকজনকে (সূফীকে) সঙ্গে লইয়া সান্তাহার হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান আদমদীঘিতে আস্তানা পাতেন (উত্তর বাংলার আউলিয়া প্রসঙ্গে, পৃ. ২০-২১)। তিনি স্থলপথে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া উত্তরবঙ্গে আসেন (বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব, পৃ. ১৯২)। ইসলাম প্রচারের কারণে তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজকর্মচারী ও সৈন্যদলের দ্বারা উৎপীড়িত হন। আদম দীঘিতেই তাঁহার দরগাহ অবস্থিত (ঐ)।

তুর্কান শাহ ঃ তুর্কান শাহ (র) বাবা আদমের সঙ্গী ছিলেন। প্রথমে তিনি আদমদীঘিতে আস্তানা পাতেন। বল্লাল রাজার বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি শহীদ হন। তাঁহার সম্পর্কে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখিয়াছেন, "তুর্কান শহীদ হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হন। যুদ্ধক্ষেত্রের যেই স্থানে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূমি স্পর্শ করে, সেই স্থানটি 'শির মোকাম' এবং যেইখানে তাঁহার শিরশূন্য দেহ পতিত হয় উহা 'ধড় মোকাম' নামে অভিহিত হয়। তুর্কান শহীদের দরগাহের সৌধগুলিতে অশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।" করতোয়া নদীর উপকূলে শেরপুরে তাঁহার কবরগাহ বিদ্যমান।

বন্দেগী শাহ ঃ হযরত বাবা আদম (র) যে কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর লইয়া বল্লাল সেনের সৈনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হইয়া জয়ী হন, হযরত শাহ বন্দেগী (র) তাঁহাদের অন্যতম। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গাজী হইয়াছিলেন এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বগুড়ার শেরপুরে তাঁহার মাযার রহিয়াছে (বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃ. ৫৫)।

দেওয়ান গাজী রহমান ঃ বাবা আদমের অন্যতম সহচর দেওয়ান গাজী রহমান। তিনি বাবা আদমের সঙ্গে আদমদীঘিতে পদার্পণ করার পর তাঁহার নির্দেশেই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের নিকটে শাহপুরে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে খানকাহ স্থাপন করেন। তিনি 'গাবরু' সাহেব বলিয়াও পরিচিত ছিলেন, স্থানীয় ভাষায় যাহার অর্থ চিরকুমার (বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃ. ৫৮-৫৯)।

আরও যে সকল পীর-আওলিয়া সংস্কারক আদমদীঘি ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার ও সংস্কার কার্যের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শাহ আরেফীন রায়হান, গাজী পীর টুনটুনী শাহ ও মোজাফফর হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal, vol. viii, compiled by C.J.O. Donnell Trubner & Co., London 1876, Bangladesh Sectt.—Library Accession no 954. 92 Hus.: (২) Dr. Ashraf Siddiqui (ed.), District Gazetteer, Rajshahi, 1976, pp. 37-38; (৩) ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৪) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৯৪ খৃ.; (৫) দেওয়ান মু. ইবরাহীম তর্কবাগীশ, উত্তর বাংলার আউলিয়া প্রসঙ্গ, ২য় সং. ১৩৯৮ হি., সিদ্দিকীয় পাবলিকেশন্স, বগুড়া; (৬) কাজী মোহাম্মদ, বগুড়ার ইতিকাহিনী, ১৯৫৭ খৃ.; (৭) হায়দার আলী চৌধুরী, পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, ই.ফা.বা, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৮) খোন্দকার আবদুর রশীদ ফকীর বিদ্রোহ, ঢাকা; (৯) কুমার সৌরিন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, ময়মনসিংহে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; (১০) মোঃ সোলাইমান আলী, ভূগোল সমাজ পরিচিতি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, নওগাঁ ১৯৮৬; (১১) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ.; (১২) মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রত্নময় উত্তর টাঙ্গাইল, ১১শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ- চৈত্র ১৩৮৪; (১৩) আবু রেজা মোঃ গোলাম মোর্তুজা, আদমদীঘি থানার কৃত্রিম মৎস্য প্রজনন প্রকল্পগুলির অবস্থান, ক্রমবিকাশ, বিস্তার ও ধরন, ১৯৯৬ খৃ.।

খোন্দকার আবদুর রশীদ

আদাম খান (ادم خان) ঃ সম্রাট আকবারের সেনাপতি, ধাত্রীমাতা মাহম আনগার পুত্র। সম্রাটের অভিভাবক বৈরাম খানের পতনের ষড়যন্ত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মালব অভিযানে (১৫৬১) অধিনায়কত্ব

করেন। পরে মালবের ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতা প্রদর্শন করায় অপসারিত হন। আকবার কর্তৃক মন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত শামসুদ্দীন আতাকাকে হত্যা করায় সম্রাটের নির্দেশে দুর্গ-প্রাকার হইতে নিক্ষেপ করিয়া আদাম খানকে হত্যা করা হয়। তাঁহার শোকে মাতা মাহম আনগা ৪০ দিন পর মারা যান।

আদাম খানের সমাধি, দিল্লীতে সম্রাট আকবারের আমলে, ১৫৬২ খৃ. পাঠান-মুগল স্থাপত্যরীতির যুগ-সন্ধিকালে নির্মিত। সমাধিটি লোদী স্থাপত্যের উৎকর্ষের নিদর্শন। অষ্টভুজ, খিলান শ্রেণীতে সম্মুখভাগ তৈরী। কেন্দ্রীয় কক্ষের উপর অনুচ্চ গুম্বজ, ড্রামের উপর অবস্থিত; ১৬টি অর্ধ বৃত্তাকার খিলানের দ্বারা ড্রামটি নির্মিত, দোতলা বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ১২৬।

(সংকলিত)

আদমিরাল (দ্র. কাপূদান) আদ্‌রামিত(দ্র. ইর্দরিমিত)

আদ্‌রার (ادرار) ঃ বার্বার ভাষার একটি ভৌগোলিক শব্দ, অর্থ পর্বতসমূহ' শব্দটি দ্বারা সাহারার কয়েকটি অঞ্চলকে বুঝানো হইয়া থাকে।

১। আদ্‌রার, তাওয়াত (Towat, Touat)-এর রাজধানী এবং তিম্মি গোত্রীয়গণের প্রধান "কাসার" (قصر), কালম্ব-বেচার (Colomb-Bechar) হইতে ৬৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

আদরার-এর কেন্দ্র বর্তমান স্থানে স্থাপিত হয় ফরাসী বিজয়ের সময় (৩০ জুলাই, ১৯০০)। তাহার পর হইতে শহরটি প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে। ১৯৫১ খৃস্টাব্দে আদ্‌রার-এর জনসংখ্যা ছিল ১,৭৯৫।

কাসার জীবনে কৃষিকাজের ভূমিকা অতি গৌণ। কারুশিল্প (দোক্কানী নামক পশমী ও সূতি দেওয়ালের পরদা' তৈরি করা) পতনের মুখে। এইখানে সব সময়ই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভূমিকা সর্বপ্রধান। কিন্তু এই স্থান হইতে সুদান-এর সঙ্গে (খেজুর, তামাক) এবং আলজিরিয়ার মরূদ্যানসমূহের সঙ্গে (চামড়া, মাখন, ভেড়া) যে উষ্ট্র কাফেলার বাণিজ্য ছিল তাহাও মোটরযানের প্রতিযোগিতায় বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Cne. Flye Sainte Marie, Le cemmerce et l'agriculture au Tuat, Bul. Soc. Geg. Arch. Oran, 1904; (২) Watin, Origine des populations du Touat, Bul. Soc, Geog. Alger, 1905; (৩) A. G. P. Martin, Les oasis sahariennes (Gourara, Touat, Tidikelt), Pairs 1908; (৪) P. Devots, Le Touat, etude geographique et medicale, Archives Inst. Pasteur Algérie, 1947।

(২) **ইফোগাস-এর আদ্‌রার** (Adrar of Ifoghas). দক্ষিণ সাহারা (সুদান) -এর একটি প্রাচীন সূপ পর্বত (Massif), 21° ও 18° উত্তর দ্রাঘিমাংশের এবং ৩০ ও ৩ পূব অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহা আহাগগার পর্বতমালার বর্ধিতাংশ এবং উক্ত পর্বতের ন্যায়ই ইহাও প্রাক-ক্যাম্ব্রীয় যুগের স্ফটিক জাতীয় (Crystalline) প্রস্তর দ্বারা গঠিত, কিন্তু এইখানে সাম্প্রতিক কালের কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

গিনি উপসাগর হইতে প্রতি বৎসর ইফোগাস-এর আদ্‌রার-এ মৌসুমী বৃষ্টিপাত ঘটে (Kidal, 123 mm) এবং তাহার ফলে উৎপাদিত উদ্ভিদ উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের উৎপাদনের প্রায় সমপরিমাণ, অন্তত উপত্যকা এলাকাসমূহে। কিন্তু মাটির জলাভেদ্যতার দরুন পানি প্রাপ্তির স্থান বিরল।

এই সূপ পর্বতে তুয়ারেগ (Tuareg) গোত্রীয় লোকেরা বাস করে। তাহাদের মধ্যে ইফোগাসের সুখ্যাত কিদাল গোত্রীয়গণ সাধারণত "আমোনোকাল" (Amenokal=স্বাধীন নেতা) হইয়া থাকে। ইফোগাস নামটি বৃহত্তর অর্থে আদরার এবং উহার সীমান্তে বসবাসকারী সকল গোত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। ১৯৪৯ সালে কিদাল মহকুমার জনসংখ্যা ছিল ১৪,৫৭৪, উহাদের সকলেই যাযাবর ও উহাদের পেশা ছিল উট, গরু ও ভেড়া পালন। তাহারা পার্বত্য এলাকাতেই অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, কিন্তু পালিত ভেড়া বিক্রয় করিবার জন্য তানেযরুফ্‌ত (Tanezruft) অতিক্রম করিয়া তিদিকেল্‌ত (Tidikelt) ও তুয়াত (Tuwat)-এও গমন করিয়া থাকে। প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র কিদাল (জনসংখ্যা ৬৮৩); উহার অদূরেই আল্-সুক (এস সৌক, তাদমেক্কেত)-এর সুপ্রাচীন সোনঘাই শহরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাওকাল, Description de l'Afrique (transl. de Slane, JA. 1842); (২) বাক্‌রী, Description de l'Afrique septentrionale (transl. de Slane. Algiers, 1913); (৩) E.F Gautier, A travers le Sahara Francais (La Geo, xv, i, 1907); (৪) Lt, Cortier, D'une rive a l'autre du Sahara, Paris 1908; (৫) R. Chudeau, sahara soudanais Paris 1909; (৬) R. Mauny, Encyclopaedie Maritime et coloniale. Afrique occidentale Francaise. Protohistoire et Histore, ancienne paris 1949 vol i.; (৭) R. Capot-Rey, sur quelques formes de relief de l'Adrar des Ifoghas, Trav. I. R. S. vol, vii, 1951; (৮) H.Lhote, Sur l'emplacement de la ville de Tademekka, ancienne capitale des Berderes soudanais, Notes Afr. no. 51, July 1951।

৩। মৌরিতানিয়া (Maurétania)-এর আদ্‌রার, ইফোগাসের আদ্‌রার হইতে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য ইহাকে আদ্‌রার তমার (Tmar)-ও বলা হয়। দক্ষিণ সাহারার কয়েকটি মালভূমি, ১৯° ও ২৩° উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ১০° ও ১৩° ৩´ পশ্চিম অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত, ১,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট। মালভূমি পলিজ স্তর কঙ্কর শিলাস্তর ও চুনা পাথর দ্বারা গঠিত এবং বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত ঢালু ভূমি দ্বারা সীমিত, সেইগুলির পরেই শিলা-স্তরযুক্ত গর্তসমূহ এবং তাহার পরেই উপত্যকা (ওয়াদি) অথবা (সেবখাসমূহ) লবণাক্ত কোমল মাটির সীমাচিহ্ন। প্রধান ঢালু ভূমিটিকে বলা হয় দ্হার (Dhar), উহার উচ্চতা ৮৩০ মিটার।

স্বল্প বৃষ্টিপাত (আতার-এ ৮১ মিলিমিটার, চিঙুইতিতে ৫২) ও স্থায়ী নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবহেতু এইখানে শুধু শুষ্ক নিষ্পাদপ উদ্ভিজ্জ ও কাঁটাযুক্ত তৃণগুল্মাদি জন্মায়; ফলে আদ্‌রার মরুভূমিরই অংশবিশেষ। কিন্তু তবুও আবহাওয়া, জলীয় অবস্থার বিশ্লেষণ ও উদ্ভিজ্জের ধরন অনুযায়ী ইহা সাহারার অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর। গ্রীষ্ম মওসুমে গিনি উপসাগরের জলীয় কণাযুক্ত হাওয়া সমগ্র আদ্‌রার-এর উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং জুলাই-আগস্ট মাসে ঘূর্ণিঝড় হয়; তখন উপত্যকা জলমগ্ন হয় এবং "গ্রাইর" (Grair) বলিয়া পরিচিত চতুর্দিকে আবদ্ধ ঢালু এলাকা পানিতে ভরিয়া যায়।

আদরার-এর সর্বপ্রথম অধিবাসী ছিল 'বাফুরগণ'। তাহাদের সম্বন্ধে এই অতি সামান্য তথ্যমাত্র অবগত হওয়া যায়। ১৬শ শতক পর্যন্ত পর্তুগীজের নিকট আদরার বাফুর পর্বতমালা নামে পরিচিত ছিল। খৃস্টীয় ১০ম শতক হইতে লামতুনাগণ (দ্র.) আদ্‌রার-এ অনুপ্রবেশ করে এবং তাহাদের প্রধান আবূ বাক্‌র 'উমার শিনকীত' (দ্র.) (আধুনিক চিংগুইতি- Chinguiti) অধিকার করেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘানা (Ghana) দখল করেন, যদিও এই বিজয় খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তিন শতাব্দী পরে (বানূ) মাকিল (দ্র.) ১ম মারীনীগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আবূ বাক্‌র-এর পথ পুনঃঅনুসরণ করেন এবং বারবার গোত্রসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৫শ শতাব্দীতে মুরাবিত আন্দোলনও পশ্চিম সাহারার এই অঞ্চলসমূহের 'আরবীকরণে সহায়ক হইয়াছিল। এই আমলে মৌরিতানীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ স্তরবিশিষ্ট দলীয় পদ্ধতির শাসন সংগঠনের উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থার সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল যোদ্ধাগণ (বানূ হাসান), যাহারা 'আরব বিজেতাগণের বংশধর ছিল, তাহার পরে মুরাবিতগণ (যাওয়ায়া) ও কর-প্রদানকারী গোত্র যেনাগা), শেষোক্ত শ্রেণীদ্বয় ছিল বার্‌বার এবং সর্বশেষে হারাতীন, ক্রীতদাস ও কর্মকারগণ বাফুর, নিগ্রো বা মিশ্র বংশীয়গণ। এই সামাজিক সংগঠন ফরাসী অনুপ্রবেশকাল পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। ১৯০৯ সালে জেনারেল গোরো (Gauraud)-এর বাহিনী আদ্‌রার অধিকার করে। ১৯৩২ সালে আদ্‌রার-এর 'আমীর বিদ্রোহ করেন যাহা দমন করত দুই বৎসর শান্তি স্থাপনে অতিবাহিত হয়। অধিবাসিগণের জীবিকার প্রধান উপায় পশু পালন। যোদ্ধাগণ, মুরাবিতগণ ও কর প্রদানকারী গোত্রসমূহ বহু সংখ্যক উট ও ভেড়ার পালের মালিক। সেইগুলি শীত মওসুমে 'আরগ' (Ergs) এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে এবং গ্রীষ্মের আগমনে পুনরায় সেইগুলিকে কূপের চারদিকে একত্র করা হয় অথবা সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থানসমূহে চরানো হয়। কৃষি দুই ধরনের ঃ প্লাবনের পরে পরে 'গ্রারাস' (Graras)-এ সরগাম ও তরমুজ উৎপাদন এবং পানি সেচ দ্বারা বাগিচাসমূহে খেজুর গাছের তলায় জোয়ার, ভুট্টা ও যব উৎপাদন। জুলাই মাসে সংগৃহীত খেজুর (Gatno) দ্বারা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা পরিচালিত হয়। কয়েকটি ছোট ছোট মরূদ্যানও রহিয়াছে। যথাঃ আযুগুই, (Azougui), কসার তরচানে (Ksar Torchan), তৌঙ্গাদ (Toungad), ঔযেফ্‌ত (Oujeft) ইত্যাদি। শিন্‌কীত Changuiti) এক সময়ে ধর্মীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল, উহার দীপ্তি সুদূর সেনেগাল (Senegal) পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হইত; কিন্তু এখন উহা অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র এক শহর মাত্র। বর্তমানে সকল প্রাণচাঞ্চল্য জেলার রাজধানী বা সদর দফতর আতার (Atar)-এ কেন্দ্রীভূত, উহা সেন্ট লুই ও আগাদীর-এর মধ্যস্থ মোটর পথের পার্শ্বে অবস্থিত। ("মৌরিতা-নিয়া" নিবন্ধ ও দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Th. Monod, L'Adrar mauritanien, esquisse geoligique, Dakar 1952; (২) idem, cotribution a l'etude du peuplement de la Mauritanie, Notes botaniques sur I'Adrar, institut francais de I'Afrique Noire, April 1952; (৩) F. de la Chapelle, Esquisse d'unc histoire du sahara occidental, Rabat 1930; (৪) P. Marty, Les tribus de la Haute Mauritanie, Bulletin du comite de I'Afrique francaise, Renseignements coloniaux, 1915; (৫) Col. Modat, Les Populations primitives de l'Adrar mauritanien, Bulletin du comite des etudes historiques et Scientifiques de l'A. O. F.,1919; (৬) Idem, Portugais, Arabes et Francais dans l'Adrar Mauritanien, ibid, 1922; (৭) Cne. Huguet. Les population primitives de l'Adrar mauritanien, Bull. du com. de l'Afr, fr., Rens. col 1927.

R. Capot-Rey (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আদ্‌রিয়ানোপল (দ্র. ইদির্‌নে)।

'আদল (عدل) ঃ শব্দটি 'আর্‌বী ভাষায় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে ব্যবহৃত হইলেও অর্থের দিক দিয়া উভয়টি এক নহে। বিশেষ্য পদে 'আদল অর্থ ন্যায়বিচার এবং বিশেষণে ইহার অর্থ সরল, ন্যায়বান ও সুষম। সুতরাং শব্দটি জীব বা বস্তু উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও আইনশাস্ত্রের পরিভাষায় শব্দটি উভয়রূপে সমভাবে প্রচলিত। মু'তাযিলা মতবাদ অনুসারে 'আদল' অর্থ আল্লাহর ন্যায়বিচার, যাহা উহার পাঁচটি মৌলনীতির একটি (দ্র. মু'তাযিলা)। কাদীর অবশ্যই উচিত, তিনি কুরআন-এ উল্লিখিত 'আদ্‌ল (অথবা قسط ৪ ঃ ৫৮, ৫ ঃ ৪২) সহকারে রায় প্রদান করিবেন। যিনি 'আদ্‌ল গুণের অধিকারী, তিনি 'আদিল।

বিশেষণরূপে 'আদ্‌ল শব্দটি একটি বিশেষ আইনগত (فقهي) ধারণা প্রকাশ করে এবং ইহার প্রয়োগ বহুবিধ। তবে শব্দটির ব্যাখ্যায় কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যেমন মালিকী আইনবিশারদ ইব্‌ন রুশ্‌দ বলিয়াছেন, অধিকন্তু এই পারিভাষিক শব্দটির যে সমস্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, সেইগুলি যেমন ব্যাপক তেমনি অস্পষ্ট। মাওয়ার্‌দীর সংজ্ঞায় 'আদ্‌ল ('আদালা) দ্বারা পরম চারিত্রিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষ বুঝায়। ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর মতে ইহার তাৎপর্য হইল, কোন গুরু পাপে (كبائر) লিপ্ত না হওয়া এবং লঘু পাপ (صغائر) হইতে বিরত থাকা। অন্য একজন গ্রন্থকার এই ধারণা বিবৃত করিয়াছেন, এই গুণটি একান্ত ব্যতিক্রমরূপে শুধু ওয়ালীগণের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, 'আদালা কথাটি এমন একটা অবস্থার ইঙ্গিত দেয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই নৈতিক ও ধর্মীয় বিধানসমূহ মানিয়া চলে। এই মতবাদটি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'উছ্মানী শাসনামলের শেষ পর্যায়ে গৃহীত মুসলিম আইন-বিধিতে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহা এইরূপঃ 'আদ্ল ('আদিল) ঐ ব্যক্তি যাহার সৎ বৃত্তিগুলি অসৎ বৃত্তিগুলির উপর প্রবল (মাজাল্লা, ধারা ১৭০৫)। সংক্ষেপে 'আদ্ল-এর অনুবাদ এইভাবে করা হয়, 'আদ্ল ('আদিল) ঐ ব্যক্তি, যিনি স্বভাবতই ইসলাম নির্দেশিত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। চারিত্রিক এই গুণটি মানুষের স্বভাবজাত, না প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানুষকে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কের বিষয়। 'আদিল-এর বিপরীত শব্দ ফাসিক।

এই বিশেষণটি বিশেষ্য পদে ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা সুনীতিবান ব্যক্তি বুঝানো হইয়া থাকে (বহুবচনে 'উদূল)। 'আদালা শব্দটি আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট। লোকআইনশাস্ত্রে 'আদালা শারী'আত মুতাবিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি প্রধান শর্ত। আবার ব্যক্তিগত আইনে (Private Law) ও প্রমাণতত্ত্বে 'আদ্লের ধারণা পরিপূর্ণভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং পদ্ধতিগত অনেক নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি করিয়াছে। সাক্ষী অবশ্যই 'আদেল (ন্যায়নিষ্ঠ) হইবে এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সময় তাহা যাহাই থাকুক না কেন, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তাহার নিষ্ঠার প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। বিতর্কমূলক প্রশ্ন হইল, সাক্ষীর ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত না হইলে বিনা প্রমাণে তাহাকে ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে কিনা অথবা প্রতিপক্ষের আপত্তি না থাকিলেও সাক্ষীর ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ তলব করিতে হইবে কিনা। যথা সময়ে তাহার ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ তলব করাই নীতিগতভাবে এবং কার্যক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করিয়াছে। ফলে সাক্ষীর সত্যনিষ্ঠা যাচাইয়ের জন্য মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহাকে তায্কিয়া বা তা'দীল বলা হয়।

ইসলামী ফিক্হের বিকাশের শেষ পর্যায়ে এই পদ্ধতি দুই ধারায় প্রযুক্ত হয়ঃ (১) বিচারক গোপনে সাক্ষী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন সীলমোহরযুক্ত খামে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাকে বলা হয় 'আত্-তায্কিয়াতুস-সির্রিয়্যা' (গুপ্ত প্রত্যায়ন)। কোন কোন ক্ষেত্রে গোপনে লিখিত মন্তব্য প্রত্যয়নের জন্য প্রকাশ্য আদালতে উক্ত ব্যক্তিগণকে উপস্থিত হইতে হয়। ইহাকে বলা হয় 'আত্-তায্কিয়াতুল 'আলানিয়্যা (প্রকাশ্য প্রত্যয়ন)। এইরূপে সাক্ষীর ন্যায়নিষ্ঠার প্রত্যয়নকে তা'দীল ও তাহার ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে (জারহ্') বা জেরা বলা হয়।

যাহা হউক, এইরূপ তায্কিয়া শুধু বিশেষ মামলার আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক হিসাবেই অবলম্বন করা হয় না, বরং স্বাধীনভাবে ব্যক্তিবিশেষের ন্যায়নিষ্ঠা প্রমাণের পদ্ধতি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। লিপিবদ্ধ বিবরণ গ্রহণের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইবার দরুন উহার উপর আস্থা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে সাক্ষ্যকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য করিবার জন্য প্রামাণিক সাক্ষ্যপত্র গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু এই পন্থাও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইল না; কারণ সাক্ষ্যপত্রের সত্যায়নকারিগণ নিজেরা 'আদ্ল কিনা এই প্রশ্ন সর্বদাই উঠিতে পারে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রারম্ভিক 'তায্কিয়া' প্রথা অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ কাদী প্রথমেই কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীরূপে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিতেন। ফলে তাহারা নীতিগতভাবে এমন সাক্ষী হিসাবে গণ্য হইতেন যাহাদের বিরুদ্ধে 'আদালাত বা ন্যায়নিষ্ঠার অভাব জাতীয় অভিযোগ আনয়ন করা যাইত না। এই সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে "কাতিব 'আদল বা কাতিব 'উমূমী" (Notary Public) নিযুক্ত করা হয় বা দলীয় প্রমাণকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়, পরিভাষায় তাহাদের 'উদুল বলা হয়। তাঁহাদেরই কাছে লিখিত দলীল-দস্তাবেজ সত্যায়নের জন্য রুজু করা হয়। এই সকল ব্যক্তিকে অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কাজেও নিয়োগ করা হইত। যথা ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী হিসাবে পদ্ধতিগত দলীলপত্র এবং বিচারকের রায় তাস্দীক দেওয়ানী প্রশাসনের নানাবিধ কার্য সম্পাদন, তায্কিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নাদির উত্তর দান এবং যে পদে 'আদালাত গুণ অপরিহার্য তাহার জন্য যোগ্য লোকের নাম প্রস্তাব করা ইত্যাদি (তু. শাহিদ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন ফারহূন, তাব্সি'রাতুল-হু'ককাম. কায়রো ১৩০২/১৮৮৪, ১খ., ১৭৩, ২০৪ প.; (২) Dictionary of Technical Terms, সম্পা. A. Sprenger, 1015 প.; (৩) Juynboll, Handleiding, 67; (৪) Santillana, Istituzioni, ১খ., ১০৯; (৫) Tyan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, Paris 1938, t.i., ch. iv, Sect v: (৬) ঐ লেখক, Le notariat.... dans la pratique du droit musulman, বৈরূত ১৯৪৫ খৃ.।

মুদ্রা সংক্রান্ত আলোচনায় 'আদল শব্দটির একটি বিশেষ ব্যবহার রহিয়াছে। মুদ্রার উপর উৎকীর্ণ 'আদল কথা (সংক্ষেপে উৎকীর্ণ ع)-এর অর্থ মুদ্রাটি পূর্ণ খাঁটি ওজনের এবং বাজারে প্রচলিত (adli)।

E. Tyan (E.I.[2]) /এ. এন. এম. মাহবুবর রহমান ভূঞা

'আদ্লী (عدلى) ঃ দ্বিতীয় মাহ্মূদ, দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ও দ্বিতীয় বায়াযীদ-এর ছদ্মনাম। Gibb (History of the Ottoman Poetry, ২খ., ৩২ প.)-এর মতানুসারে শেষোক্ত জনের ছদ্মনাম 'আদ্নী, কিন্তু উপসালা (Upsala) পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার 'আদ্লী নামের উল্লেখ রহিয়াছে। Gibb (২খ., ২৫প.) মনে করেন, 'আদ্নী-র দীওয়ান, (ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হি.) মাহ্মুদ পাশা কর্তৃক রচিত।

(E.I.[2]) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আদ্হা (দ্র. ঈদুল আদ'হা)।

আদহাম খালীল (দ্র. ইলদিম, খালীল আদহাম)।

আদ্হামিয়্যা (ادهميه) ঃ বিখ্যাত সূফী ইবরাহীম ইব্ন আদ্হাম (দ্র.)-এর অনুসারীদের সামষ্টিক নাম। তাঁহাদের সম্পর্কে পরবর্তী কালের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তাঁহারা একটি দরবেশী সিলসিলা কায়েম করিয়াছিলেন।

দা. মা. ই./আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আদাহ্ (ادا বা اطه) ঃ তুর্কী শব্দ, অর্থ দ্বীপ অথবা উপদ্বীপ। ভৌগোলিক মানচিত্রে ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণত আদাহ্ কিল্আ [(দ্র.) Adakle] আদাহ্ কু'ঈ, আদাহ্ উওয়া (Owa), আদাহ্ পাযার (Pazar), আদাহ্লার দীনীযী (Denizi) [বাহ্'রুল-জাযীরা, দ্বীপের সাগর=মাজ্মা 'উল জাযাইর, দ্বীপপুঞ্জ]।

দা. মা. ই./ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আদাক'াল্'আ (ادا قلعة) ঃ ইহা রুমানিয়ার অন্তর্গত দানিউব নদীর একটি দ্বীপ। ৮০০×২০০ মিটার আয়তনের এই দ্বীপটি লৌহ দরজা (Irongate) হইতে ৪ কিলোমিটার উজানে এবং অর্সোভ (Orsova) হইতে অর্ধ কিলোমিটার ভাটিতে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীরা তুর্কী। এই অঞ্চলের নদীটির সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ 'উছমানী তুর্কীরা ১৫শ শতকে দখল করে। কিন্তু দ্বীপটির কথা সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয় ১৬৯১ খৃ. যখন উযীর দুরসুন মুহাম্মাদ পাশা 'ইরশোওয়া (অর্সোভা) প্রণালী'র এই ছোট দ্বীপটি যাহা তখন ৪০০ জন সৈন্য কর্তৃক দখলকৃত ছুর এবং শান্স্ আদাসি অর্থাৎ 'পরিখাবেষ্টিত দ্বীপ' নামে অভিহিত হয়, জার্মান Schanz হইতে দখল করিয়া লন। (Silihdar Findiklili Mehmed Agha, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৯২৮, ২খ., ৫৪০)। ১৭১৬ খৃ. প্রথম সুদৃঢ় দুর্গ তৈরি করেন লৌহ দরজার মুহাফিজ চেরকেস মুহাম্মাদ পাশা (মুহাম্মদ রাশীদ, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১১৫৩ হি., ২খ., ১৫৩)। অস্ট্রীয়দের দখলের পর ইহা ১৭৩৮ খৃ. 'সারদার-ই আকরাম' উপাধিতে ভূষিত 'আলী পাশা কর্তৃক পুনর্বিজিত হয় এবং এই ঘটনা উপলক্ষেই প্রথমবারের মত ইহা আদাকাল্আসি নামে পরিচিত হয় (তু. মুহাম্মাদ সুব্হী, তারীখ-ই ওয়াকাই, ইস্তাম্বুল ১১৯৮ হি., ১৩১, ১৩৪)। ইহা ভিদিনের ওয়ালীর নিকট হইতে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। ১৭৮৮ খৃ. Laudon-এর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সাদ্র আজাম কোজা ইয়ূসুফ পাশার অভিযানের সময়েই, যখন বানাত এলাকায় উছমানী বাহিনীর শেষবারের মত আগমন ঘটে, আদাক'াল্'আ দ্বীপের চারিদিকে সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধের সময় এই দ্বীপ একটি নৌঘাঁটির ভূমিকা পালন করে। ইয়ূসুফ পাশা অর্সোভা ও তেক্ইয়ে (Tekey-Tekija)-এর মধ্যে বিরাট সেতু নির্মাণ করেন এবং 'বৃহৎ দ্বীপের দুর্গটি' (আদা-ই কাবীর কাল্আসি)-র শক্তি বৃদ্ধি করেন। (একজন অজ্ঞাতনামা লেখক এই অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহার 'সাফার নামা-ই সার্দার-ই আকরাম ইয়ূসুফ পাশা' গ্রন্থে, পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় কিতাপসারায়ী, T. Y. ৩২৫৪; অন্য একটি পাণ্ডুলিপি এই নিবন্ধকারের নিকটে রহিয়াছে)। সার্বীয়দের বিদ্রোহের সময় এই দ্বীপ সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে পরিণত হয়। আদাকাল্আতেই ১৮০৯ খৃ. মুহাফিজ রাজাব আগা বেলগ্রেডে আত্মসমর্পণকারী 'দায়ী'র প্রাণদণ্ড দেন (আহ্মাদ জাওদাত, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি., ৯খ., ১২৬, ১২৮)। কিছু দিন পরে রাজাব আগা নিজেই বলকানের আয়ানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিদ্রোহ করেন, কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার ভ্রাতাগণ আদাম, বাকির ও সালিহ যাঁহারা ফাতহ ইসলাম দুর্গ (Kladovo) অধিকার করিয়াছিলেন—এই দ্বীপে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। 'আলী তাপাদালেন্লি-র পুত্র ওয়ালী পাশা, যাঁহাকে সার্বীয়গণকে শান্ত করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল, এই ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করেন, যাহার ফলে তাঁহারা দ্বীপটি সমর্পণ করেন। ১৮৬৭ খৃ. তুর্কী সৈন্যদল সার্বিয়া পরিত্যাগ করিলে রাজধানীর সহিত আদাকাল্'আর সরাসরি যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। বার্লিন কংগ্রেস (১৮৭৮) এই দ্বীপের কথা ভুলিয়া যায়। সুতরাং ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধীনে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসাবে থাকিয়া যায় এবং একজন 'নাহি-ই মূদুর' কর্তৃক শাসিত হইতে থাকে। ইহার অধিবাসীরা তুর্কী পার্লামেন্টে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিত। ট্রায়ানোন চুক্তি (Treaty of Trianon) 1920 দ্বারা ইহাকে বানাতসহ রুমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু তুরস্ক কেবল Lausanne চুক্তি (১৯২৩) সম্পাদনের দ্বারাই এই অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করিয়া লয়।

বর্তমানে ৬৪০ জন তুর্কী এই দ্বীপের অধিবাসী। মুসলিম বাসিন্দাদের জন্য এখানে বিদ্যালয় আছে। ভূগর্ভস্থ কক্ষ ও পানির চৌবাচ্চাসহ লাল ইট ও পাথরে নির্মিত এই দুর্গটি উল্লেখযোগ্য, আরও উল্লেখযোগ্য তৃতীয় সালীম কর্তৃক নির্মিত মসজিদ যাহার সহিত আছে মিস্কীন বাবা নামক একজন ওয়ালীর মাযার। তিনি ১৮শ শতাব্দীতে তুর্কিস্তানে আগমন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আলী আহমাদ, Insula Adakaleh, তুর্নু-সেভেরিন ১৯৩৮; (২) I Kunos, Turkische Volksmarchen aus Adakale, Leipzig-New York 1907 (Turkish transl, after the Hungarian ed. by Neomi Seren. Istanbul 1946; the Hungarian, ed. Budapest 1906); (৩) ঐ লেখক, Ungarische Revue, 1908, 88-100, 423-33; (৪) Hammer-Purgstall[2], iv, 346 ff.; (৫) N. Iorga, Gesch. Osm, Reiches, iv, 230, 244, 342, 438; v, 77. 83; (৬) Dionisie Eclesiarhul, Chronografu1 Tarii Romanesti dela 1769 pana la 1815, in Papiu larianu: Tesauru de monumente istorice pentru Romania, Bukarest 1863. ii, 178.

Aurel Deceli (E.I.[2]) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আদা পাযারী (ادا پازارى) ঃ ইহা তুরস্কের কোজা-এলি প্রদেশের অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু শহর। সাকারয়া নদীর নিম্ন গতিপথে আকোওয়া নামে পরিচিত উর্বর সমতল এলাকায় ৪০ ডিগ্রি ৪৭ উত্তরে ও ৩০ ডিগ্রি ২৩ ফুট পূর্বে ইহা অবস্থিত। পূর্বকালে ইহা এই নদীর দুই শাখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল (তাহা হইতেই ইহার পূর্ব নাম ছিল আদা দ্বীপ), কিন্তু এখন সাকারয়া ও চারখ সু নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। ওরখানের নেতৃত্বে তুর্কীরা ইহা অধিকার করে এবং তাহারই প্রতিষ্ঠিত একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মত ইহার কথা উল্লিখিত হয় (T. Gokbilgin, XV, ve XVI asirlarda Edirne ve Pasa livasi, Istanbul 1952, 161)। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে একজন নাইবের কর্মস্থল হিসাবে আধুনিক আদাপাযারী নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। V. Cuinet-এর মতে, ১৮৫২-৫৩ সালে ইহাকে একটি শহরের মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং ১৮৯০-এর দিকে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৪,৫০০ (V. Cuniet, La Turquie d'Asie, iv, Paris 1899, 372 ff.)। ১৯৫০-এর আদমশুমারীর সময়ে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬,২১০-এ দাঁড়ায়। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য বিশেষভাবে তামাক, শাক-সব্জি ও ফলমূলের ইহা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এইখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ইসলামী স্মৃতিচিহ্ন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ch. Texier, Descr. de L'Asie Mineure, i, Paris 1839, 52 ff.; (২) J.B. Tavernier, The Six Voyages, London 1677-78, i, 3; (৩) আবূ বাকর ফায়দী, খালাসাই আহ্ওয়ালুল বুল্দান..., ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, Fotokopiler 28, 312 f; (৪) এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতী, ১১০০-১২০০, Ist. 1931, 189; (৫) Talia Balcioglu, Adapazari, Ist. 1952; (৬) Talat Tarkan, Adapazari ilcesi, Ist., n.d.; (৭) Serif kayabogazi, Izmit-Sapanca- Adapazari vadisi, Ist. 1929; (৮) Turk (Inonu) Ansiklopedisi, s.v.

R. Anhegger (E.I.[2]) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আদা' (اداء) ঃ ('আ) শাব্দিক অর্থ পরিশোধ বা সুসম্পাদন। ফিক্হশাস্ত্রে ব্যবহৃত ইহা একটি বিশেষার্থক শব্দ। ইহা দ্বারা আইনানুমোদিত সময়ের মধ্যে কোন ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করা বুঝায়। ইহার বিপরীতার্থক শব্দ 'কাদা' (قضاء) যাহা দ্বারা ধর্মীয় কর্তব্য বিলম্বে (যতটুকু বিলম্বে অনুমোদিত) সম্পাদন করা বুঝায়। আদা-কে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, সুসম্পাদিত আদা (আল-আদাউল কামিল) এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পাদিত আদা' (আল-আদাউন-নাকি'স)। কুরআন তিলাওয়াতের (আবৃত্তির) ক্ষেত্রে আদা' দ্বারা সচরাচর প্রচলিত রীতিতে হরফগুলির যথার্থ উচ্চারণ বুঝায় যাহা কি'রাআ (দ্র.)-এর সমার্থক।

(E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

'আদা (দ্র. 'আদত আইন)।

আদাগে (দ্র. মাছাল)।

আদাত (দ্র. নাহব)।

'আদাদ (দ্র. হিসাব)।

'আদান (عدن) ঃ (১) দক্ষিণ ইয়ামান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ও বন্দর (এডেনে) ইহা আরবের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ। 'আদান [তু. আক্কাদীয় ভাষায় 'ইদনিউ (edniu); অর্থ 'অর্ধ মরু অঞ্চল'; Steppe]-এর অধিকতর শুদ্ধ নাম আদান আবয়ান (عدن ابين) 'আদান লা'আ (عدن لاعة) ও আল-'আদান (العدن)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ইহা উফনুন আত-তাগলিবীর এক কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ইয়াকূত, ৩খ., ৬২ ২প.; Kay, পৃ. ২৩২; AM, ২খ., ১৭, ২৮৪) অথবা সুদৃঢ় সামরিক অবস্থানহেতু ছাগর 'আদান (ثغرعدن)। ইহা বালীনূস (Pliny)-এর Athene, Philostorgius-এর Athene Perilus-এর Eudauion Arabia, টলেমী (Ptolemy)-এর Arabia emporion (তু. Pauly-Wissowa, পরিশিষ্ট, ৩খ., ৬) এবং সম্ভবত ইহাই তাওরাত-এর 'আদান (E.z., xxvii 23) এই স্থানের অন্যান্য নামের জন্য দ্র. আল-মাকদিসী, ৩০, IM, 110 (Lofgren, Arab. Texte, ১খ., ২৯)।

'আদান উপদ্বীপ প্রকৃতপক্ষে শামশান (মামুলী উচ্চারণ শাম্শাম নামক এক প্রাচীন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, প্রাচীন কালে ইহাকে আল-'উরর অর্থাৎ পর্বত (عرعدن) বলা হইত। ইহার উচ্চতা ১৭৭৫ ফুট (প্রায় ৫৫০ মিটার), ইহার পূর্ব দিক সীরা দ্বীপের বিপরীত পর্বতমালার মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থান। এই স্থানে শহরের অধিকাংশ অধিবাসীর বসতি। কিছু বসতি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আদান কোন এককালে দ্বীপ ছিল। ইহার নিম্ন ও সঙ্কীর্ণ যোজক পূর্ণ জোয়ারের সময় এখনও প্রায় নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। আল-মাকসির (المكسر) নামক একটি সেতু নির্মাণের ফলে এই অসুবিধার অবসান ঘটে। ইরানীরা ইহা নির্মাণ করে (তু. 'খোর মাকসার' যাহা যোজকের পশ্চিমে অবস্থিত)। এখানে বৃহৎ আগ্নেয়গিরি ব্যতীত ক্ষুদ্রাকারের কয়েকটি পাহাড়ও আছে। যেমন জাবাল সীরা, হুক্কাত মারশাক (যাহার মধ্যে একটি আলোকস্তম্ভ আছে) ও জাবাল হ'াদীদ (যোজকের পশ্চিমে)। পুরাতন বন্দর, শহরের অবস্থান হিসাবে, পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু (আয়য়াব) হইতে ইহাকে রক্ষা করার জন্য একটি পাথরের বাঁধ (শাসনা) নির্মাণ করা হয়। আজকাল 'আদানের গুরুত্ব ইহার অতীব সমৃদ্ধ বন্দরের উপর নির্ভরশীল যাহা 'আদান উপদ্বীপ ও 'আদান আস'গ'ার উপদ্বীপের মধ্যবর্তী প্রশস্ত ও অতীব সংরক্ষিত একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানে মুযালকাম (Sugarloaf Peak) ও ইহ্'সান (Ass's Ears) পর্বত অবস্থিত। বন্দর তাওয়ায়ি (তাওয়াহী) নামে আধুনিক বন্দরটি উত্তর-পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রসার লাভ করিয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Red Sea and Aden Pilot, পৃ. ১৩৫)। সাবাঈ কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যস্বরূপ পানির বাঁধ ও চৌবাচ্চা নির্মাণের চিহ্নসমূহ 'আদান ভূখণ্ডে এখনও বিদ্যমান। প্রায় পঞ্চাশটি চৌবাচ্চার ধ্বংসাবশেষ উপদ্বীপে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইবনুল মুজাবির-এর বর্ণনানুসারে এইগুলি সীরাফ হইতে আগত ইরানীরা নির্মাণ করে। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে Salt ও ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে Haines (যিনি পরবর্তী সময়ে 'আদান জয় করেন) এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, এইগুলির অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। কিন্তু ১৮৩৯ সালের পর হইতে এইগুলি অমনোযোগ ও অযত্নের শিকার হয় এবং আগ্নেয়গিরির মুখের অভ্যন্তরে স্থিত চৌবাচ্চাগুলির সংস্কার কার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অট্টালিকাদির প্রস্তরগুলি লোকেরা অপহরণ করিতে থাকে। এখানে তেরটি জলাশয় বিদ্যমান। এইগুলি প্রায় বিশ লক্ষ লিটার পানি ধারণ করিতে পারে। কিন্তু সামান্য ও অনিয়মিত বৃষ্টির ফলে চৌবাচ্চাগুলি কদাচিৎ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। পর্বতের মুখাভ্যন্তরে ও উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে অনেক কূপ আছে (তু. ইব্নুল মুজাবির, ১৩১ প.), কিন্তু এইগুলি পানীয় জলের অভাব মিটাইতে সক্ষম নহে। কেননা এইগুলির পানি অধিক মাত্রায় লবণাক্ত। মধ্যযুগে আল-হায়ক (সম্ভবত আল-হিসওয়া) 'আদনের পানীয় জলের ঘাট ছিল (আল-হামদানী, ৫৩)। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার লাহ্জ-এর সুলতান -এর নিকট হইতে শায়খ 'উছ্মান নামক গ্রাম হইতে একটি পানির পাকা প্রণালী নির্মাণের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী কালে সেখানে বাষ্পকে তরল আকারে পরিণত করিবার যন্ত্র (Condensers) স্থাপন করা হয়।

পুরাকালের কাহিনীতে 'আদানের ভিত্তি শাদ্দাদ ইব্ন 'আদ (দ্র.)-এর সহিত সম্পৃক্ত করা হয়। এই সর্ম্পকে বলা হইয়া থাকে, তিনি এখানকার প্রসিদ্ধ পার্বত্য সুড়ঙ্গটিকে পর্বতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খনন করার জন্য এবং স্থানটিকে কারাগার হিসাবে ব্যবহার করেন। অনুরূপ একটি কাহিনী (ইয়ামানের) তুব্বা'দের (তাবাবিয়া) ও মিসরের ফির্'আওনদের সম্পর্কেও প্রচলিত আছে। ইহা হইতে আল-হাব্স বা হাব্স ফির্আওন নামের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন কাহিনীমতে (দৃষ্টান্তস্বরূপ আত্-তাবারী, ১খ., ১৪৪) কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীল (দ্র.)-কে হত্যা করত স্বীয় ভগ্নিসহ ভারত হইতে পলায়ন করিয়া আদানে আগমন করে। এইখানে জাবাল সীরায় ইব্লীসের সহিত তাহার সাক্ষাত ঘটে। ইব্লীস তাহাকে বাঁশী বাজাইবার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয়। আজকাল বৃহৎ গিরিপথের প্রবেশদ্বারে তাহার কবর পরিদৃষ্ট হয়। পরিত্যক্ত কূপ (দ্র. ২২, ৪৪) ও 'ইরামা যা'তিল-'ইমাদ' (দ্র. ৮৯ঃ৬) –এর অবস্থান 'আদান অথবা নিকটবর্তী কোন এক স্থানে বলিয়া কথিত আছে। ইব্নুল মুজাবির-এর বর্ণানুযায়ী হনুমান-বাঁদর সদৃশ হিন্দু দেবতা, যাহার মন্দির 'আদানে অবস্থিত, দৈত্য রাবণ কর্তৃক রামচন্দ্রের অপহৃত স্ত্রীকে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ দিয়া সীরা হইতে উজ্জয়িনীতে পৌঁছাইয়া দেয়।

আল-হাম্দানী-এর বর্ণানুসারে (পৃ. ৫৩, ১২৪) 'আদানের আরবরা তিন দলে বিভক্তঃ মারব, হুমাহিম (জামাজিম, ইব্নুল মুজাবির) ও মাল্লাহ (তু. ইয়াকূত, ৩খ., ৬২২; BGA, ৩খ., ও ১০২ ও ৪খ., ২০৬)। হিন্দু সোমালীয়দের বিরাট সংখ্যা সমুদ্র পথে অবিরত দেশত্যাগের প্রমাণ বহন করে। ইব্নুল মুজাবির (পৃ. ১১৭ প.)-এ মাদাগাস্কার (কুমার) হইতে মোগাদিশু ও কিলওয়াহর পথ দিয়া ইরানীদের শীরায ও কায়স (কীশ) হইতে দেশত্যাগের বিশদ বিবরণ আছে। দ্র. Ferrand, Le Kouen-Louen etc. (JA1919, Goitein in BSOAS 1954 খৃ. পৃ. ২৪৭ পৃ., ঐ লেখক, Speculum, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৮১ প.), আদানের ইয়াহূদীদের বেশ বিরাট একটি দলকে (এই সম্পর্কে দ্র. Encyclopeadia Judaica, নিবন্ধ 'আদান) সাম্প্রতিক কালে ইসরাঈলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

'আদানের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। আমরা Periplus হইতে জানিতে পারি (৫০ খৃ.-এর কাছাকাছি), তদানীন্তন কালে KAICAP (সম্ভবত ইহা ভুল, CAP-এর স্থলে Ilisharah yahdib, তু. Wissmann Hofner Beitrage, ৪খ., ৮৮) শহরটির ধ্বংস সাধন করেন। কিন্তু সম্রাট Constantine-এর সময় ইহার রোমীয় বড় বাজার (Emporium Romanum) অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করে। বিশপ থিওফিলাস (Theofilus) আনু. ৩৪২ খৃ. সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করান। পরবর্তী কালে লোহিত সাগর উপকূলীয় বন্দরদ্বয় আহওয়াব্ ও গুলাফিকা-র দরুন আদান ইহার অন্যান্য গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। ইরানীরা (৫৭৫ খৃ. পর হইতে) ইয়ামান-এর কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করে। তাহার চৌবাচ্চা, গোসলখানা ও চামড়া পাকা করিবার কারখানা নির্মাণ করে। বাযানের পরবর্তী শেষ সাসানী শাসনকর্তা রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। হযরত 'আলী (রা) ১০/৬৩১ সালে 'আদানে গমন করেন এবং ইহার মিম্বার হইতে জনসমাবেশে ভাষণ দেন। বানূ যিয়াদ (২০৪-৪২৯/৮১৯-১০৩৭)-এর উযীর হুসায়ন ইব্ন সালামা হযরত 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয নির্মিত মস্জিদ-এর সংস্কার সাধন করত ইহার পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনেন। মিসরের ফাতিমী বংশের প্রচারক 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আস্-সুলায়হী ৪৫৪/১০৬২ সালে 'আদান জয় করেন এবং ৪৬১/১০৫৯ সালে পুত্র আল-মুকাররাম-এর বিবাহে পুত্রবধূ হুররা সায়্যিদাকে উপঢৌকনস্বরূপ ইহা (আদান) প্রদান করেন। বানূ মান যাঁহারা বানূ যিয়াদের পর ৪১০/১০১৯ সাল হইতে 'আদান দখল করেন, ৪৭৬/১০৮৩ সালে ইহার শাসনকর্তা ছিলেন পরবর্তী কালে বিদ্রোহ করিলে তাহাদের পদচ্যুত করা হয় এবং কারাম (মুকাররম) ইব্ন ইয়াম-এর হামদানী বংশোদ্ভূত দুই ভ্রাতাকে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তাঁহারাই ছিলেন বানূ যুরায়আ (দ্র.) বংশের প্রতিষ্ঠাতা, এক ভ্রাতা 'আব্বাস তাহার দুর্গে অবস্থান গ্রহণপূর্বক যোজক-দ্বার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপর ভ্রাতা মাসঊদ খাদ্'রা' দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্বক সামুদ্রিক বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করেন। অতঃপর শহরটি মুহাম্মাদ ইব্ন সাবা (৫৩৪-৫৪৮/১১৩৯-১১৫৩) ও তদীয় পুত্র 'ইমরান (৫৬০/১১৬৫)-এর নেতৃত্বে একত্র হইয়া যায়। সেই সময়ে ইহার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ এক লক্ষ দীনার ছিল বলিয়া কথিত আছে। ৫৬৯/১১৭৩ সালে সুলতান সালাহুদ্দীন-এর ভ্রাতা তুরান শাহ বেতনভোগী তুর্কী সৈন্যদের (গুয) সহায়তায় 'আদান জয় করেন। আয়্যুবী (৬২৫/১২২৮), রাসূলী (৮৫৮/১৪৫৪) ও তাহিরী (৯২৩/১৫১৭)-দের শাসনকাল 'আদানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল। আয়্যুবী শাসকরা এক নূতন কর ধার্য করেন যাহা শাওয়ানী (যুদ্ধ জাহাজ) -এর সাহায্যে আদায় করা হইত।

ভারত গমনের সামুদ্রিক পথের আবিষ্কার ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় 'আদানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতির সূচনা করে। পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি আল-বুকারক (Albuquerque) বিশখানা রণতরীসহ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্টার (Easter)-এর সন্ধ্যায় এই শহর আক্রমণ করে, কিন্তু ইহা জয় করিতে ব্যর্থ হয়। ১৫৩৮ খৃ. ভারত যাইবার পথে তুর্কী নৌবহর প্রতিরোধকারীদের পরাভূত করে। ফলে প্রায় এক শত বৎসর যাবত ইয়ামান তুর্কীদের আধিপত্যে ছিল। ১৫৬৮ খৃ. 'আদান সান'আর যায়দী ইমামদের করতলগত হয় এবং ১৬৩০ খৃ. তুর্কীরা সম্পূর্ণরূপে আদান পরিত্যাগ করে। ১৭৩৫ খৃ. 'আদান লাহজ-এর 'আবদালী সুলতানের অধিকারে আসে। এই বংশের এক উত্তরাধিকারী মুহসিনকে ক্যাপ্টেন হেন্স (Haines)-এর নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজদের কর্তৃত্বে শহরটিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়। বৃটিশ জাহাজ লুণ্ঠিত হইবার পর ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য এই অভিযান প্রেরিত হয়। তাহারা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী আক্রমণ চালায় এবং 'আদান ছিনাইয়া লয়। ১২৭৬ খৃ. মার্কোপোলো (Marcopolo) এই সুন্দর শহরটি পরিভ্রমণ করেন। তখন শহরটির জনবসতি ছিল আশি হাজার এবং মসজিদের সংখ্যা ছিল তিন শত ষাট, অথচ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকারের সময় ইহা ছিল মাত্র ছয় শত অধিবাসী অধ্যুষিত একটি জরাজীর্ণ গ্রাম– যাহার অধিবাসীরা পর্ণ কুটিরে বসবাস করিত। ইহার পর হইতে 'আদান দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ

করিতে থাকে, বিশেষ করিয়া ১৮৬৯ খৃ. সুয়েজ খাল চালু হইবার পর হইতে এই 'আরবী জিব্রাল্টার দ্রুত উন্নয়নশীল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইমারতসমূহ ঃ বানূ যুরায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তার খাতিরে একটি নগর প্রাকার নির্মাণ করে। ইহার পর হইতে প্রস্তরনির্মিত ঘরবাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তুরান শাহের প্রস্থানের পর তাঁহার প্রতিনিধি উছমান আয্-যান্জীলী (যানজাবীলী) বৃহদাকারের আর একটি প্রাকার নির্মাণ করেন। ইহাতে ছিল ছয়টি ফটক ও একটি শুল্ক ঘর। তুগতাকীন ইব্ন আয়্যুব, তদীয় পুত্র ইসমাঈল, রাসূলী বংশীয় 'আলী আল-মুজাহিদ, তাহিরী বংশীয় আবদুল ওয়াহহাব প্রমুখের অক্ষয় ইমারতগুলির স্মৃতি এখনও বিদ্যমান (AM, পৃ. ১০ প.)। সেই মনোরম গোসলখানাগুলি যাহার নিম্নাংশ মর্মর ও জ্যাস্পার (Jasper) প্রস্তরে নির্মিত এবং ছাদগুলি গুম্বজবিশিষ্ট, যেইগুলি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে Merrecle (Playfair, from La Roque) দর্শন করিয়াছিলেন, সেইগুলি এখন আর অবশিষ্ট নাই। 'আদানের মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মসজিদ হইল নগরের হেফাজতকারী ওয়ালী আবূ বাক্র আল-আয়দারূস-এর মসজিদ। রাবী'উছ-ছানীর ১৫ তারিখে ইহার যিয়ারত ('উরস) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্যান্য মসজিদের বর্ণনা হান্টার (পৃ. ১৭৫ প.) প্রদান করিয়াছেন এবং AM. গ্রন্থেও রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. M. Hunter, An Account of British Settlement of Aden, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ.; (২) F. Apelt, Aden Eine Kolonial Geographische u, kolonialpolitische Studie, পরীক্ষার থিসিস, লাইপজিগ ১৯২৯ খৃ.; (৩) আল-হামদানী, স্থা. (অনু. Forrer, পৃ. ৪১); (৪) ইয়াকূত, ৩খ., ৬২১; (৫) আল-মাক্দিসী, পৃ. ৩০ ও স্থা.; (৬) আল-ইদ্রীসী, (অনু. Jaubert, ১খ., ৫১); (৭) আল্-কায্বীনী (সম্পা. Wustenfeld), ২খ., ৬৭; (৮) আবুল-ফিদা, তাকব'ীম, অনু. ২/১ খ., ১২৬; (৯) ইব্ন বাত্‌তূতা, ২খ., ১৭৭-১৭৯; (১০) ইব্নুল মুজাবি'র (Lofgren), ১খ., ১০৬-১৪৮ (=IM); (১১) আবূ মাখ্রামা, তারীখ ছাগ্‌র 'আদান (-AM) O. Lofgren, Arabische Texte Zur, Kenntnisder Stadt Aden m Mittelater গ্রন্থে, আপসালা ১৯৩৬-১৯৫০; (১২) আহমাদ ফাদ্ল ইব্ন মুহসিন আল-আবদালী, হাদিয়্যাতুয-যামান ফী আখ্বারি মুলূকি লাহাজ ওয়া 'আদান, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২; (১৩) R.L. Playfair, History of Arabia Felix, বোম্বাই ১৮৫৯ খৃ.; (১৪) H.C. Kay, Yaman, its early mediaeval history, লন্ডন ১৮৯২ খৃ.; (১৫) H. Von Maltzan, Reisenach Sudarabien, 1873 খৃ.; (১৬) H. F. Jacob, Kings of Arabia, লন্ডন ১৯২৩ খৃ.; (১৭) H. Ingrams, Arabia and the Isles লন্ডন ১৯৪২ খৃ.; (১৮) A. Grohmann, Suderabien als, Wirtschalt gebiet, Wienna-Brunn 1922-1933 খৃ.; (১৯) H. V. Wissmann ও M. Hofner, Beitrage zur histor Geographie des Vorislam, sudarabien, Wiesbaden 1953, মানচিত্র 'আদান Protectorate, ১৯৩০ খৃ. (Geogr. Section. Gnp. staff, সংখ্যা ৩৮৯২; স্কেল ঃ ১ ঃ ২৫৩-৪৪০)।

(২) বৃটিশ এলাকা (১৯৩৭ খৃ. হইতে রাজকীয় উপনিবেশ) দক্ষিণ-পূর্ব 'আরবে 'আদান শহর, উপদ্বীপ ও যোজক, শায়খ উছ্মানশহর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ ছোট 'আদান উপদ্বীপ; আয়তন ঃ আনুমানিক আশি বর্গমাইল, জনসংখ্যাঃ প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার।

(৩) বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য পশ্চিম অর্ধাংশে ও পূর্ব অর্ধাংশে বিভক্ত। ইহাদের কেন্দ্র ছিল 'আদান ও মুকাল্লা। (ক) পশ্চিম 'আদান আশ্রিত রাজ্য (প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গমাইল) ঃ নয়টি জেলা (Cantons) সমন্বয়ে গঠিত, যথা (পশ্চিম হইতে পূর্ব) সুবায়হী, আমিরী (রাজধানীঃ দালি), 'আলাবী, হাওশাবী (রাজধানী মুসায়মির, আবদালী (রাজধানী লাহাজ), আকরাবী, উচ্চ ও নিম্ন ইয়াফিঈ, ফাদ্লী (রাজধানী শুকরা), উচ্চ ও নিম্ন 'আওলাকী (রাজধানী আহওয়ার), আওযালী এবং বায়হানী জেলাগুলি ব্যতীত ইহাদের প্রতিটি সম্বন্ধে নিবন্ধ দেখুন। (খ) 'আদান আশ্রিত রাজ্য (সত্তর হইতে আশি হাজার বর্গমাইল), হ'াদ'রামাওত-এর রাজ্যসমূহ (কু'আয়তী ও কাছীরী) [দ্র. হাদরামাওত], বালহাফ ও বিরআলী-র ওয়াহিদী রাজ্যসমূহ, সুলতান শাসিত রাজ্যসমূহ 'আরকা' হাওরা (দ্র.), শায়খ শাসিত রাজ্যসমূহ এবং কিশন (দ্র.) ও সুকুতরা (দ্র.)-এর মাহ্রী সালতানাত সমন্বয়ে গঠিত। জনসংখ্যা প্রায় ষাট হাজার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ D. Ingrams, A Servey of Social and Economic Conditions in the Aden Protectorate, আসমারা ১৯৪৯ খৃ.।

O. LOFGREN (দা. মা. ই., E.I.[2]) / মু. মকবুলুর রহমান

আদানা (اذنـة ;ادنـة ;اذانـة) ঃ আযানা, আদানা, আদানা, পরবর্তী কালে আতানা (أطنـة)। (১) আনাতোলিয়ার [এশীয় তুরস্ক] দক্ষিণ অঞ্চলের একটি নগর, (২) উছমানী বিলায়াত ওয়ালী শাসিত প্রদেশ।

(১) Seyhan (প্রাচীন নাম Sarue) নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে সমতলভূমি Cllicia Cukurowa)-এর উত্তরাংশে ৩৭° উ. অক্ষরেখা ৩৫°১৮ পূর্ব. দ্রাঘিমায় আদানা অবস্থিত। উছমানী শাসনামলে ইহা আদানা প্রদেশের রাজধানী ছিল। ১৯৩৫ সন হইতে ইহা Seyhan প্রদেশের রাজধানী [নীচে(২) দ্র.], সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র; জনসংখ্যা (১৯৫০) ১,১৭,৭৯৯ (১৯৮০ সনে ৫,৭৪,৫১৫, Statesman Yearbook 1983-84)।

ইতিহাস ঃ Taurus গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত। নগরটির ভৌগোলিক অবস্থানই উহার বিবর্তনশীল ভাগ্য পরিবর্তনের প্রধান কারণ। Taurus নদী সীমানা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রসারমান আনাতোলিয়া রাজ্য ও উহার পার্শ্ববর্তী উত্তরাভিমুখে বিস্তারমান সিরীয় রাজ্য—এই দুই রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমানায় আদানা অবস্থিত। সিরীয় সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্যে বা দুর্বলতার সুযোগে সেখানে সময়ে সময়ে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের (Rubenids, Ramadanids প্রভৃতি) উদ্ভব ঘটে। 'আরব অধিকারভুক্ত হওয়ার পূর্বে যখন আনাতোলিয়া ও সিরিয়া একই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তখন ও পরবর্তী কালে উছমানী সুলতানগণের শাসনামলেই শুধু নগরীটি নিরাপদ ছিল। আদান একটি প্রাচীন জনপদ। যতদূর মনে হয়, লিডিয়ান রাজবংশের শাসনামলে উহার সমৃদ্ধি ঘটে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইলে রোম সম্রাট পম্পে উহা পুনর্নির্মাণ করেন। পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে ইহা Tarsus-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত (তু. Pauly-Wissowa, ১খ., ৮৪৪)।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি 'আরবগণ কর্তৃক আদানা অধিকৃত হইলেও বায়যানটাইনদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ঘন ঘন ইহার শাসক পরিবর্তিত হয়। অনবরত সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে শহরটি জনশূন্য হইয়া পড়িলে খলীফা হারূনুর-রাশীদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ উহা পুনর্নির্মাণ করেন। ফলে সিরীয় অভিযানের জন্য সেখানে এক দুর্গশ্রেণী (ছুগূরুশ-শাম) গড়িয়া উঠে। ৮৭৫ সনে উহা সাময়িকভাবে প্রথম Basil কর্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু ৯৪৪-৪৬ সনে আবার বায়যানটাইদের দখলে চলিয়া যায়। ৯৬৪ সনে অবরোধ করিয়া 'আরবরা পুনরায় উহা অধিকার করে। বায়যানটীয়গণ ১০২৫ সনে পুনরায় Cilicia অধিকার করিলেও উহা স্থায়ীভাবে দখল করিতে পারে নাই। (১০৭১ সনে) বিজয়ী সাল্জূকগণও গোড়ার দিকে প্রদেশটির উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয় (তু. J. Laurent, Byzance et les Turcs .... Jusqu'en 1981, Paris 1813, II)।

যাহা হউক, ১০৮২ সনে আদানা আবার বায়যানটীয়ের দখলে আসিলে ১০৮৩ সনে সম্রাট সুলায়মান ইব্ন কু'তলুমীশ উহা দখল করেন (J.B. Chabot, Chronique de Michel Le Syrien, Paris 1905, 179)। ১০৯৭ সনে ক্রুসেডারগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলে নগরীটি প্রথমে Antioch সামন্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু ১১০৪ সনে প্রথম Alexis উহাকে পৃথক করেন এবং পুনরায় উহা বায়যানটীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১১৩২ সনে শহরটি ক্ষুদ্র আর্মেনিয়ার অধিপতি Leon-এর দখলে এবং ১১৩৭ সনে আবার বায়যানটীয় অধিকারে চলিয়া যায়। ১১৩৮ সনে উহা রূম সাল্জূক মাস্‌ঊদ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১১৫১ সাল বা উহার কিছু পূর্বে ক্ষুদ্র আর্মেনীয় সমান্তরাজ রাজ্যভুক্ত, ১১৫৮ সনে বায়যানটীয় এবং অবশেষে ১১৭২-৭৩ সনে আর্মেনীয় শাসক Rubenid Mlech শহরটিকে তাঁহার শাসিত অঞ্চলভুক্ত করিয়া লন। বারংবার মুসলিম আক্রমণ সত্ত্বেও বহু বৎসর যাবৎ উহা তাঁহার শাসনাধীনে থাকে। ১২৬৬ সনে Antioch-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর Baybars আদানায় উপস্থিত হন। ১২৭৫ ও ১৩০৪ সনে মাম্‌লূকগণ নগরীটি লুণ্ঠন করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। ১৩৫৫ সনে তাহারা আবার উহা আক্রমণ করে। যাহা হউক, ইহার পর (উত্তরাধিকার সূত্রে ১৩৪১-৪৪ খৃ. Guy de Lusignan-এর শাসনকাল ভিন্ন) উহা বরাবর আর্মেনীয় অধিকারে থাকে। ১৩৫৯ সনে মাম্‌লূকরা আদানা অধিকার করিলে উহা একটি নিয়াবা-র রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৩৭৮ সনে Yuregiroghlu Ramadan নামক জনৈক তুর্কী নগরটির শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মামলূক রাজবংশের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং এইভাবে (দুই রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে) রামাদান ওগ্‌লু (দ্র.) নামক একটি ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Buffer-State)-এর গোড়াপত্তন করেন। তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ শাসনকার্যে কখনও মামলূকদের পক্ষীয় কখনও বা বিপক্ষীয় নীতি অনুসরণ করিতেন। তাহারা এইভাবে আদানা এলাকার শান্তি তুলনামূলকভাবে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ১৪৬৭ সনে যুল-কাদিরীয় শাহ্‌সুওয়ার-এর আক্রমণে শহরটির শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ১৪৮৫-৮৯ সনে আদানাকে মামলূক বংশের কবল হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উছ্‌মানী শাসকগণ এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। তবে ১ম সালীম ১৫১৬ সনে মিসর অভিযানকালে ইহা দখল করেন এবং রামাদান ওগ্‌লু রাজবংশের অধীনে উছমানী সাম্রাজ্যের সামন্তরূপে রাখিয়া যান। ১৬০৬ সনে ইহা সাময়িকভাবে বিদ্রোহী জানবুলাত ওগ্‌লুর কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। ১৬০৮ সনে তুর্কী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তার (ওয়ালী) অধীনে ইহাকে একটি প্রদেশ Eyalet -এর মর্যাদা দান করা হয়। ১৮৩২ সনের তুর্কী-মিসরীয় যুদ্ধে আদানা সেনাপতি ইব্‌রাহীম পাশার মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। কুতাহয়া সন্ধির শর্তানুযায়ী নগরটিকে মিসরের মুহাম্মাদ আলী কর্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয় (১৮৩৩ সনের ৬ এপ্রিল)। কিন্তু ১৮৪০ সনের ৬ জুলাই তারিখের লন্ডন কনভেনশন (চুক্তি) মতে উহাকে পুনরায় (কনস্টান্টিনোপলের কেন্দ্রীয়) তুর্কী সরকারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তখন ইহাকে হালাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু ১৮৬৭ সনে আবার উহা নবগঠিত প্রদেশ আদানার রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী বাহিনী নগরটি অধিকার করে—কিন্তু আনকারার তুর্কী-ফরাসী সন্ধি (১৯২১ সনের ২০ অক্টোবর) অনুসারে ১৯২২ সনে উহা তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

বাণিজ্য ঃ পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও 'আর ও আনাতোলীয় রাজপথের সন্নিকটে কৌশলগত অবস্থানের দরুন (তু. Fr. Taeschner, Anat. Wegenetz, Leipzig 1934, নির্ঘণ্ট) এবং উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উর্বরতার কারণে আদানার পক্ষে বারংবার পূর্ব মর্যাদা ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও রামাদান ওগ্‌লুর শাসনামলের পূর্বে নগরটি তারসূস অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। আল-ইস্‌তাখ্‌রী ও ইব্‌ন হাওকাল-এর মতে আটটি প্রবেশপথবিশিষ্ট একটি প্রাচীর ও নদীর অপর তীরে একটি দুর্গের (১৮৩৬ সনে উহার সর্বশেষ অবশিষ্টাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়) জন্য ১০ম শতাব্দীতে আদানা সামরিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। আল্-ইদ্‌রীসীর বর্ণনা (১১৫০ খৃ.) অনুযায়ী আদানা ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র। W.von Ollenburg (১২১১ খৃ.) -এর কথায় শহরটি ছিল জনবহুল, তবে সমৃদ্ধ নহে। তুলার জন্য বিখ্যাত এই শহরটিতে বাণিজ্যিক লেনদেনে ভেনিসের বণিকগণ বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিলেন (Heyd, Hist. du Commerce, নির্ঘণ্ট, তু. Laurent, II)। আবুল্ ফিদা শহরটিকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বর্ণনা করেন। B. de la Brouquiere (১৪৩৭ খৃ.)-এর মতে ইহা ছিল একটি কর্মব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। 'উছমানী

সার্বভৌমত্বের অধীনে রামাদান ওগ্লু বংশের শাসনকালে উহার যে উন্নতি সাধিত হয়, পর্যটকগণের বিবরণীতে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে [তু. বাদ্রুদ্দীন আল-গায্যী (১৫৩০ খৃ.) পাণ্ডু. Koprulu ১৩৯০; কু‘তু‘বুদ্দীন আল-মাক্কী (১৫৫৭ খৃ.) Tarih Semineri Dergisi, ১/২, পৃ; Belon, Les Observations, etc. Antewerp 1533)। মুহাম্মাদ আশিক; Menazir al Awalim (পাণ্ডু. নুরু উছমানিয়্যা ৩০৩২, ২১৫) ও হাজ্জী খলীফা জিহাননুমা (ইস্তাম্বুল ১১৪৫, পৃ. ৬০১] আরব ভৌগোলিকগণের উপর নির্ভর করেন এবং কোন অতিরিক্ত নূতন তথ্য দেন নাই। অজ্ঞাত লেখকের আল-মানাযিল ওয়াত-তারীক ইলা বায়তিল্লাহিল-আতীক (المنازل و الطريق الى بيت الله العتيق) পাণ্ডু. likilap Kitabhanesi, M. C. K. boy, 113, fol. 8v) কিতাবে ইহার বিপণী কেন্দ্রের ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির উৎকর্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে Ewliya Celebi লিখিত সিয়াহাত নামাহ্ (سياحت نامه) ইস্তাম্বুল ১৯৩৫, ৩খ., ৩৭, ৯খ., ৩৩৩ প.) অনুযায়ী আদানা নগরীতে মৃত্তিকা নির্মিত ৮৭০০ খানা গৃহ ছিল (গ্রন্থাকারের অভ্যাসমত সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত হইতে পারে)। ‘উছমানী সাম্রাজ্যের সাধারণ অবনতির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শহরটির ক্রমাবনতি ঘটিতেছিল। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নগরীর প্রবেশদ্বারের বাহিরেই নিরাপত্তার অভাব। তদ্সত্ত্বেও নগরীতে তুলার ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Kayseri হইতে আগত বণিকদের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল [তু. P. Lucas 1766); C.Niebuhr (1766 খৃ. ভ্রমণ) Reisebeschreibung, Hamburg 1837 ও Ritter কর্তৃক উদ্ধৃত অপরাপর লেখকগণ]।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও Tarsus অপেক্ষা আদানা অধিক জনবহুল নগরী ছিল (দ্র. J.M. Kinneir, Voyage dans l'Asie Mineure, প্যারিস ১৮১৮), অথচ দুই দশক পরে ১৮৩৬ সনে ইহা Tarsus অপেক্ষা ক্ষুদ্র শহর বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. J. Rusegger, Reise in Griechenland... und sudostl. Kleinasien, Stuttgart 1841, 524 প.) বৃটিশ বাণিজ্য-দূত Neale-এর একটি বিবরণে মন্তব্য করা হইয়াছে, এই সময়ে যৎসামান্য বাণিজ্যই প্রচলিত ছিল (দ্র. Ritter, Bibl.)। মিসরীয় আধিপত্য কালে তুলা উৎপাদন পুনঃপ্রবর্তনের যে প্রচেষ্টাটি চলে তাহা বিশেষ সফল হয় নাই; তৎসম্পর্কে দ্র. W.F. Ainsworth, A Personal Narrative. ১খ., লন্ডন ১৮৮০। V. Langlois, voyage dans la cilicie (প্যারিস ১৮৬১ খৃ.) গ্রন্থ তৈল কারখানাগুলির একটি যৌথ সংস্থার বিবরণ দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নগরীটির সমৃদ্ধি আরম্ভ হয় ইউরোপে ক্রমবর্ধমান তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রচেষ্টার, বিশেষত ওয়ালী খালীল পাশার প্রচেষ্টার মাধ্যমে (যথা Mersin-গামী সড়ক)। Life in Turkey (লন্ডন ১৮৭৯ খৃ., পৃ. ৪৮) গ্রন্থের প্রণেতা J. Davies-এর মতে এই সকল প্রচেষ্টার ফলে জমির চাষাবাদ উন্নত হয়, শহর আরও পরিচ্ছন্ন ও কর্মব্যস্ত হইয়া উঠে এবং জনসংখ্যা বিশ হইতে পঁয়ত্রিশ হাযারের মধ্যে উঠানামা করিতে থাকে (গ্রীষ্মে অধিবাসীদের একাংশের পর্বতে গমন এবং ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের জন্যই জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইত)। V. Quint, ২খ., ৩৫ প.-এর বর্ণনায় উহাতে স্থায়ী বাসিন্দা ৩০ হাযার (১৩ হাযার মুসলিম, ১২৫৭৫ আর্মেনীয় খৃস্টান) এবং ১২ হইতে ১৫ হাযার ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের বাস ছিল। ১৮৭০ সনে উহাতে একজন মেয়র নিয়োগ করত পৌর প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৮৬ সনে Mersin পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করিয়া এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালে Taurus গিরিসুড়ঙ্গ নির্মাণ করিয়া উহার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়। আর্মেনীয় ও গ্রীকরা শহরটি দখল করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্ব লাভ করে। পরে তাহারা দলবদ্ধভাবে দেশত্যাগ করায় এক সংকটের সৃষ্টি হয়। তুর্কী প্রজাতন্ত্রের অধীনে নগরীর দ্রুত উন্নয়ন হইতে থাকে (জনসংখ্যা ১৯২৭ সনে ৭২,৫৭৭, ১৯৫০ সনে ১,১৭,৭৯৯ ও ১৯৮০ খৃ. ৫,৭৪,৫১৫- Statesman Year Book, 1983-84)। ১৯৩৫ খৃ. হইতে আদানা Seyhan প্রদেশের রাজধানী।

অধিবাসী ঃ প্রাচীন কাল হইতে খৃস্ট ধর্ম প্রচলিত থাকায় আদানা একটি বিশপ এলাকা ছিল। নগরীতে আর্মেনীয় রুবেনী সরকারের সময় হইতে গ্রীক অপেক্ষা আর্মেনীয় বাসিন্দার সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আর্মেনীয় গির্জা অধিকতর প্রভাবশালী হইয়া উঠে। ইহার খৃস্টান জনসংখ্যা মুসলিমদের আক্রমণ ও মামলূক বিজয়ের পর এবং ‘উছমানী শাসনামলে ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে (দ্র. পর্যটকদের বিবরণী ও Ritter ও আলীশান প্রদত্ত তথ্যাদি)। উনবিংশ শতাব্দীতে খৃস্টান অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ১৯২২ সনে তুর্কী বিজয়ের ফলে তাহারা সকলেই বিতাড়িত হয়। আদানার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত বড় একটা জানা যায় না (তু. A. Galante লিখিত Histoire des Juifs d'Anatolie, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯, ২খ., পৃ. ৩০৪)। অষ্টম শতাব্দী হইতে ‘আরবরা সেনাবাহিনীর সাহায্যে Cilicia এলাকায় অনুপ্রবেশ করে, কিন্তু তুর্কী যাযাবরগণ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করিলে ‘আরবদের পক্ষে আদানা শহরে টিকিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া পড়ে। P. Belon (১৫৪৮)-এর বর্ণনামতে আদানা ছিল ‘আরবী ও তুর্কী ভাষাভাষীদের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। তৎপর আদানার জনবসতি হইতে ‘আরবরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে আদানা সাময়িকভাবে মিসরীয়দের দখলে থাকিলেও এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

সংস্কৃতি ঃ আদানা বর্তমানে বা অতীতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করে নাই। শহরে জাফার পাশার মাদ্রাসা ভবনে ১৯২৪ সনে স্থাপিত একটি আর্কষণীয় যাদুঘর রহিয়াছে। রামাদান ওগ্লু বংশের শাসকরাই নগরীর প্রধান স্মৃতিস্তম্ভ ও সৌধ নির্মাণ করেন। যথা স্মৃতি ফটকসহ (১৫৫৩ সনে উৎকীর্ণ), Eski বা Yagh Djami'i (প্রাচীন জামে‘ মসজিদ) এবং চত্বরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে মাদরাসা ভবন ও গুম্বজবিশিষ্ট সূক্ষ্ম ভাস্কর্যে অলংকৃত ঈওয়ান (ايوان)। ১৫০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত হইলেও মসজিদটির সঠিক নির্মাণ তারিখ অজ্ঞাত। রামাদান

ওগ্‌লু খালীল (১৫০৭-৪১ সন) কতৃর্ক Ulu Djami নির্মাণ ও ৯৪৮/১৫৪১ সনে তাঁহার পৌত্র মুসতাফা কর্তৃক উহার সম্প্রসারণ কার্য সম্পন্ন হয় (নির্মাণ সম্পর্কিত লোককাহিনীর জন্য তু. Baki T. Arik, Adana Fethinin Destani, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩, ৪৭ প.)। মস্‌জিদ, মাদ্‌রাসা। Turbe (কবরস্থান) ও Ders-khane (পাঠগৃহ) ভবনগুলি সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্বদিকের বহির্ফটকের সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। গৃহতলের নক্‌শা বিভিন্ন খুঁটিনাটি ও মিনারের রঙ্গিন কারুকার্যে সিরীয় স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত গুম্বজের পাদদেশে ড্রাগন ব্যয়বহুল কারুকার্যমণ্ডিত মিহরাব ও উছমানী ছাঁচের অতি উৎকৃষ্ট মানের টালি ইত্যাদি উপকরণগুলির মনোজ্ঞ সমাবেশ ঘটান হইয়াছে। রামদান ওগ্‌লু খালীল, পীরী ও মুসতাফা তাঁহাদের আমলের টালি ব্যবহার করিয়া কবরস্থান ও উহার অন্তর্ভুক্ত সমাধিগুলি অলংকৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত বংশের বহু অট্টালিকার মধ্যে নিম্নোক্তগুলির কোনটি সম্পূর্ণ আর কোনটি বা আংশিকভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তথাকথিত ওয়াকীফ সেরায়ী রাজাপ্রসাদে ১৪৯৫ সন হইতে তাঁহারা বংশপরম্পরায় বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। সালামীক দায়রেসী প্রাসাদের হালনাম তুয্‌খানী, চারশি হাম্মামী (Carshi Hammami), বেদেস্তান (পর্যটকগণ কর্তৃক বারংবার উল্লিখিত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুনর্নির্মিত) ও ১৪০৯-১০ সনে নির্মিত আগ্‌জা মসজিদ (খোদিত নক্‌শী দরজাবিশিষ্ট নগরীর প্রাচীনতম মস্‌জিদ) উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিষয়টি সম্পর্কে কোন বিশেষ পুস্তিকা পাওয়া যায় না। নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত নিম্নোক্ত গ্রন্থাদিতে বিক্ষিপ্ত বরাত রহিয়াছেঃ (১) IA and Turk (প্রাক্তন Inonu) Ansiklopedisi; (২) R. A. Chesney, The Expedition for The Survey etc., ১খ., লন্ডন ১৮৫০; (৩) Ebu Bekr Fewdi, Khulasa-yi Ahwal al-Buldan fi Memalik-i Dewlet-i Al-i othman (Ist Univ. Kutub-hanesi, Fotokopiler no. 28, p. 90; (৪) V. Cuinet, La Turuie d'Asie, ২খ., ৩-৪০; (৫) Ch. Texier, Asie Mineure, 731; (৬) E. Reclus, Nouv. Geogr. univ, ৯খ., ৬৫৬; (৭) Sami Bey Frasherí, কামূসুল-আলাম, ১খ., ২৯০ প.; (৮) W. M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, ৪খ., লন্ডন ১৮৯০; (৯) Le Strange, 131; (১০) E. Reirmeyer, Die Stadtegrundungen der Araber, লিপযিগ ১৯১২; (১১) M. Canard, Histore de la Dynastie des H'amdanides, আলজিয়ার্স ১৯৫১; (১২) E.Honigmann, Die ostgrenze des Byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, ব্রাসেল্‌স ১৯৩৫; (১৩) I.H. Uzucarsili, Anadolu Beylikeri, আন্‌কারা ১৯৩৭; (১৪) Mehmed Nuzhet, Ramazanogullari, TOEM, ১খ., ১৬৭ প.; (১৫) Hammar-Purgstall, ১০খ., নির্ঘণ্ট; (১৬) L. Alishan, Sissouan ou I'Asmino Cilicie. ভেনিস ১৮৭৯; (১৭) C. Ritter, Vergleichende Erdkundee des Habin sell andes Kleinasn, বার্লিন ১৮৫৯; (১৮) উ. লে.-কৃত Sulname-yi-Wilayet-i-Adana, ৯নং ১৩০৮ ও ১০নং ১৩১২; (১৯) Naci Akverdi, Adana Cumhuriytten evvel ve sonra, Ankara; (২০) M. Oppenheim, Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, লিপযিগ ১৯১৩; (২১) K. Otto-Dorn, Islamische Denkmaler Kilikiens, Jahrb, f. Keinasiatische, forsch 1952, 118 প.। R. Anhogger.

(২) যে প্রদেশটি সমগ্র সিনিসীয় সমতলভূমি ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল উহার পূর্বতন নাম ছিল Cukurowa, হাল নাম Seyhan, রাজধানীর নামও Seyhan। প্রাচীন উছমানী সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত আদানা প্রদেশ [দ্র. হাজ্জী খলীফা, জাহাননুমা ৬০১] মূল আদানা ব্যতীত। সীস ও তারসূস নামক দুইটি সান্‌জাক (বিভাগ) লইয়া গঠিত ছিল। ১৮৬৭ সন হইতে আদানা প্রদেশ আদানা Icel (Silifke), Khozan সীম ও Djebeli-Bereket (Yarput) নামক সানজাকসমূহ লইয়া গঠিত, ১৭,২৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫,০৯,৬০০ (১৯৫০) সংখ্যক অধিবাসী অধ্যুষিত বর্তমান Seyhan প্রদেশ (Genel nufus Sayimi, আন্‌কারা ১৯৫০), মোটামুটি পূর্বতন আদানা সান্‌জাক (বিভাগ)-এর অনুরূপ। নিম্নোক্ত কাদাগুলি (কাদা যে প্রশাসনিক জেলার শাসনকর্তা কাদী) উহার অন্তর্ভুক্তঃ Adana, Bagce, Ceyhan, Dortyol, Feke, Kadirli, Karaisali, Kozan, Osmaniye, Saimbeyli। তুলা চাষই Cukurowa প্রদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পেশা, অধুনা উহাই একমাত্র পেশা বলিয়া মনে হয়।

Fr. Taesthner. (E.I.[2]) / মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আদাব (ادب) ঃ আ., এই শব্দের ইতিহাস, 'ইল্‌ম (علم) ও দীন (دين) শব্দদ্বয়ের ইতিহাসের সমান্তরাল, এমনকি ইহা হইতেও প্রকৃষ্টতরভাবে, প্রাক-ইসলামী যুগের সূচনা হইতে আমাদের সময় পর্যন্ত আরব সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শব্দের প্রাচীনতম অর্থে ইহাকে 'সুন্নাহ'র প্রতিশব্দ হিসাবে গণ্য করা যায় এই অর্থসহ যে, "সুন্নাহ' দ্বারা পূর্বপুরুষাগত ও আদর্শ হিসাবে বিবেচিত অন্যান্য ব্যক্তি হইতে গৃহীত 'অভ্যাস, আচরণের ঐতিহ্যগত নিয়ম-প্রথাকে বুঝায়" (যেমন, ধর্মীয় অর্থে মুসলমানদের জন্য মহানবী (স)-এর সুন্নাহ)। Vollers ও Nallino এই শব্দের যেই ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন তাহার সহিত এই প্রাচীন অর্থের মিল আছে ঃ উভয়েই এই মত ব্যক্ত করেন, ইহার বহুবচন 'আদাব' (آداب) গঠিত হইয়াছে দাব্ (دأب) প্রথা, অভ্যাস) শব্দ হইতে এবং পরে এই বহুবচন হইতে এক বচনের রূপ 'আদাব' গৃহীত হইয়াছে। (দেশীয় অভিধান-লেখকেরা ইহাকে ء-د-ب ধাতুর সহিত সম্পর্কিত করেন, যাহার অর্থ 'চমৎকার জিনিস' অথবা 'প্রস্তুতি উৎসব')। যেভাবেই হউক, ইহার প্রাচীন অর্থ তাহাই যাহা উপরে প্রদত্ত

হইয়াছে ঃ ইহা দ্বারা একটি অভ্যাস বা রীতি, আচরণের একটি ব্যবহারিক নিয়মকে বুঝায়। ইহা একদিকে প্রশংসনীয় হওয়া এবং অন্যদিকে কাহারও পূর্বপুরুষগণ হইতে গৃহীত হওয়া, এই উভয় অর্থই বহন করে।

এই প্রাথমিক অর্থের বিবর্তন, একদিক দিয়া ইহার নৈতিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্যকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেঃ আদাব শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'আত্মার উত্তম গুণ, উত্তম লালন-পালন, সভ্য, মার্জিত আচরণ ও সৌজন্য' এই অর্থের অনুসরণে, এই শব্দ দ্বারা, বেদুঈনদের ইসলাম গ্রহণ (তু. Wensinck, Handbook, s. v. adab)-এর ফলে ও হিজরী প্রথম দুই শতাব্দীতে বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসায় তাহাদের নীতিজ্ঞান ও আচার-প্রথা পরিমার্জিত হওয়াকেও বুঝানো হয়। এইভাবে 'আব্বাসী শাসনামলের প্রথমদিকে আদাব ইহার এই অর্থে ল্যাটিন urbanitas শব্দের সমকক্ষ ছিল, যাহার অর্থ ভদ্রতা, সৌজন্য, বেদুঈনদের সংস্কৃতিহীনতার বিপরীতে শহরের শিষ্টাচার [এই অর্থে, অভিধানসমূহ 'আদাব' শব্দ ব্যাখ্যার জন্য 'জারূফ' (ظرف) শব্দ ব্যবহার করে, যাহার অর্থ ভদ্রতা, সৌন্দর্য]। মুসলিম সভ্যতার সমগ্র মধ্যযুগে এই শব্দটি ইহার এই নৈতিক ও সামাজিক অর্থই বহন করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আদাব আহার্য গ্রহণের, পান করার, পোশাক পরিধানের শিষ্টাচার (তু. ত'া'আম, শারাব, লিবাস); আদাব অন্তরঙ্গ, আনন্দদায়ক সঙ্গীর শিষ্টাচার (তু. কুশাজিম প্রণীত 'আদাবুন-নাদীম' ও নিবন্ধ 'নাদীম')। অন্যদিকে আদাব অর্থ বিতর্ক বা বাদানুবাদের শিষ্টাচার ঃ তু. আদাবুল-বাহ্'ছ' শীর্ষক কতিপয় পুস্তিকা ও বাহছ নিবন্ধ; অধ্যয়নের শিষ্টাচার (তু. আদ্‌াবুদ-দার্‌স, আদাবুল 'আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম বিষয়ে গ্রন্থসমূহ ও তাদ্‌রীস)।

যাহা হউক, হিজরতের প্রথম শতক হইতে আদাব ইহার নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ছাড়াও একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অর্থ গ্রহণ করে, যাহা প্রথমদিকে ইহার পূর্ব অর্থের সহিত যুক্ত থাকিলেও পরে ক্রমান্বয়ে তাহা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এখন 'আদাব শব্দের অর্থ দাঁড়াইল—একজন মানুষকে ভদ্র ও সভ্য করে এমন জ্ঞানসমষ্টি, বৈষয়িক সংস্কৃতি, (যাহা 'ইলম জ্ঞান, বিশেষত ধর্মীয় জ্ঞান, কুরআন, হাদীছ ও ফিক্‌হ হইতে পৃথক) যাহার ভিত্তি হইতেছে প্রথমত কবিতা, বাগ্মিতার কৌশল, প্রাচীন আরবদের ঐতিহাসিক ও গোত্রীয় বর্ণনাসমূহ এবং ইহা ছাড়াও অলংকারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান সংকলনবিদ্যা ও ছন্দ বিজ্ঞান। ফলে 'আদাব শব্দের এই মানবতাবাদী ধারণা প্রথম অবস্থায় ছিল সম্পূর্ণ জাতীয়। উমায়্যা যুগে 'খাঁটি আদীব' এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে, আয়্যামুল আরাব সম্পর্কে এবং আরব সংস্কৃতির কাব্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে জ্ঞানে চরমোৎকর্ষ লাভ করিতেন। কিন্তু বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে 'আদাব' শব্দের পরিসর প্রসারিত হয় অথবা আরব Humanitas কোন সীমাবদ্ধতার বিশেষণ ছাড়াই শুধু Humanitas-এ রূপান্তরিত হয়। এখন অনারবী (ভারতীয়, ইরানী, প্রাচীন গ্রীক) সাহিত্য (অর্থাৎ নীতি বাক্য সংক্রান্ত ও পরিভাষা সংক্রান্ত সাহিত্য)-এর সেই সকল শাখাও ইহার আওতাভুক্ত হয়, যাহার সহিত আরব মুসলিম সভ্যতা 'আব্বাসী যুগের প্রথম হইতেই পরিচিত হয়। সুতরাং ৩য়/৯ম শতকে একজন আদীব (যাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আল-জাহিজ) বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইত, যিনি শুধু আরবী কাব্য সাহিত্য, প্রবাদবাক্য ও জনশ্রুতি, জাহিলিয়্যা যুগের এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রায় অব্যবহিত পূর্ব সময়ের আরবদের কুলজী শাস্ত্র ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্পর্কেই জ্ঞানচর্চা করিতেন না; বরং তাঁহার আগ্রহ ও জ্ঞানচর্চাকে আরও প্রসারিত করিয়া পারস্য সভ্যতা ও তাহার মহাকাব্য, নীতিশাস্ত্র ও কাহিনীমূলক সাহিত্য, ভারতীয় সভ্যতা ও তাহার রূপকথা, গ্রীক সভ্যতা ও তাহার প্রায়োগিক দর্শন, বিশেষভাবে তাহার নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি প্রভৃতিও তাহার অধ্যয়নের আওতায় আনিতেন। এইভাবেই ৩য়/৯ম শতকে বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক জ্ঞানমণ্ডিত মহৎ সাহিত্য 'আদাব-এর সৃষ্টি হয়, যাহা নিছক পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ছিল না, যদিও অনেক সময় বিজ্ঞানের বিষয়াবলী লইয়াও ইহা আলোচনা করিয়াছে, বরং সর্বোপরি ইহার বিষয়বস্তু ছিল মানুষ, তাহার গুণাবলী ও তাহার আবেগ-অনুভূতি, তাহার বসবাস করার পরিবেশ এবং তাঁহার সৃষ্ট বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। আল-জাহিজ ও তাঁহার অনুসারিগণ (আবূ হায়্যান আত্‌-তাওহীদী, আত্‌-তানূখী প্রমূখ) এই বিশাল পরিসরে পদচারণা করেন এবং পূর্ববর্তী শতাব্দীর মুসলিম সমাজ 'আদাব-এর এই ব্যাপকতর ধারণার প্রকৃত স্রষ্টা হিসাবে বর্ণিত ইরানী মনীষী ইব্‌নুল মুকাফ্‌ফা তাঁহার বিদেশী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রচনাবলীর অনুবাদ (খুদায় নামাক ও কালীলা ওয়া দিমনা) এবং তাহার নৈতিকতামূলক ও উপদেশমূলক মৌলিক পুস্তিকাসমূহের মাধ্যমে (আল-আদাবুল কাবীর ও আস-সাগীর, পরবর্তীটির নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ যে ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে প্রসারিত করেন। 'আদাব' সংজ্ঞায় পরিচিত সাহিত্য উন্নত 'আব্বাসী সংস্কৃতির প্রধান মেরুদণ্ড।

অন্যদিকে মানবতা অথবা সংস্কৃতি হিসাবে 'আদাব'-এর এই ধারণার ব্যাপকতা ও জটিলতা 'আব্বাসী যুগ হইতেই সংকীর্ণতর অর্থে সংকুচিত হয়। উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী একজন মানুষের নিকট হইতে প্রত্যাশিত 'প্রয়োজনীয় সাধারণ সংস্কৃতি'র অর্থ ত্যাগ করিয়া 'আদাব' কোন নির্দিষ্ট পদ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। এইভাবে যখন কেহ বলিতেন, 'আদাবুল-কাতিব', তখন ইহা দ্বারা সেই শিক্ষা-সংস্কৃতি বুঝাইত, যাহা সচিব পদের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হইত (ইবন কুতায়বার এই শিরোনামের একটি পুস্তিকা আছে, তু. আরও কাতিব) কিংবা বলিতেন, মন্ত্রীদের 'আদাব' বা 'আদাব-এর অর্থ হইত উক্ত পদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি [কাযী-আদাব'-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি (কাযী)-র 'আদাব'-এর জন্য তু. কাযী]। অন্যদিকে খিলাফাতের স্বর্ণযুগে ইহা যে ব্যাপক তাৎপর্য বহন করিত তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া আদাবের এই ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অধিকতর সংকীর্ণ অর্থে, বিশেষত সুকুমার সাহিত্য, কবিতা, শিল্প-সৌকর্য সম্বলিত পদ্য, ছন্দক গদ্য ও কাহিনীমূলক রচনার আলংকারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আল-হারীরী তাঁহার ভাষাগত দক্ষতা, নিয়ম-নীতির প্রতি নিষ্ঠা ও ভাষার সৌন্দর্যপ্রীতিসহ এই প্রকার 'আদাব-এ একজন পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ক্রমে আদাব মানবিক সাহিত্য (Humanitas)-এর বৃহত্তর পরিধি ছাড়িয়া কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যে পরিণত হয় এবং 'আরবীর শব্দগত ও অর্থগত পতনের দীর্ঘ যুগ ধরিয়া আধুনিক রেনেসাঁ যুগ পর্যন্ত তাহাই বর্তমান

থাকে। বর্তমান যুগে আদাব ও ইহার বহুবচন আাদাবও একেবারে সুনির্দিষ্ট অর্থেই 'সাহিত্যে'র প্রতিশব্দ, যেমন তারীখুল আদাবিল 'আরাবিয়্যা বলিতে বুঝায়—আরবী সাহিত্যের ইতিহাস; 'কুল্লিয়্যাতু'ল-আদাব' হইতেছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বিন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলা অনুষদ। কিন্তু এই বিশেষ পারিভাষিক নামকরণের সীমার বাহিরেও লেখক (উদাহরণস্বরূপ তাহা হুসায়ন)-এর মধ্যে এই শব্দের সচেতন ব্যবহার দ্বারা ইহাকে তাহার পূর্বেকার নমনীয়তা ও প্রসারতা ফিরাইয়া দিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Nallino, Scritti, vi, 2-17; (২) ইহা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার শিষ্টাচার সম্পর্কিত বইয়ের জন্য তু. Brockelmann, ৩খ., পরিশিষ্ট, দ্র. আদাব; আাদাব; (৩) হাজ্জী খালীফা, দ্র. আদাব ও আাদাব।

F. Gabrieli (E.I. 2) /মোঃ মনিরুল ইসলাম

আল-'আদাবী, মুহ'াম্মাদ হ'াসানায়ন মাখলূক (العدوى، محمد حسنين مخلوق) ঃ আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আলিম ও প্রশাসক, এক সময়ে তান্তায় অবস্থিত আহ্মাদী মসজিদের শায়খ। মিসরের আসয়ূত প্রদেশের মান্ফালুত-এর নিকটবর্তী বানী 'আদী গ্রামে ৫ রামাদান, ১২৭৭/১৮ মার্চ, ১৮৬১ সনে তাঁহার জন্ম।

১৩০৫/১৮৮৭ সালে আল-আয্হার (দ্র.)-এ শিক্ষা শেষ করার পর তাঁহাকে আলিম (দ্র. 'উলামা') ডিগ্রী দেওয়া হয়। সেই প্রতিষ্ঠানে তিনি স্বল্পকাল যাবত শিক্ষকতা করেন; অতঃপর তিনি আল-আয্হার গ্রন্থাগারের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁহার উদ্যমে গ্রন্থাগারটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়। আল-আয্হারের সংস্কার সাধনের যে গুরুদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনধারাকে সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ করিয়া তোলে। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উচ্চ প্রশাসনিক পদে (মুদীরুল আয্হার, মুফাত্তিশুল আওওয়াল ও ওয়াকীলুল আয্হার পদগুলি উল্লেখযোগ্য) অধিষ্ঠিত এবং তান্তার আহ্মাদী মসজিদের শায়খ থাকাকালে তিনি সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও নেতৃত্ব দানে সমর্থ হন (তু. আহমাদ শাফীক; মুয'াককিরাতী ফী নিস্ফ কারন, কায়রো ১৯৩৬, ২খ., ২য় অধ্যায়, ১৩৭ প., ১৪০, ১৮২, ২৩৩)। মিসরের সুলতান হুসায়ন কামিল-এর সহিত ১৯১৫ খৃ. তাঁহার মতবিরোধের ফলে তিনি (দ্র. 'আবদুল মুতাআল আস্-সাঈদী, তারীখুল ইস্লাহ ফিল-আয্হার ওয়া সাফাহাত মিনাল-জিহাদ ফিল ইসলাহ, কায়রো তা.বি., পৃ. ১৪২ প.)।

১৯১৫ খৃ. হইতে তিনি প্রধানত ব্যক্তিগত শিক্ষকতায় ও বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রায় ৪০খানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাদের অনেক কয়টিই আইন সংক্রান্ত ও তাসাওউফ বিষয়ক (দ্র.)। তিনি খালওয়াতিয়্যা (দ্র.)-এর শারকাবিয়্যা শাখার একজন সক্রিয় সদস্য ও ইহার প্রতিষ্ঠাতা আহ্মাদ ইব্ন আশ্-শারকাবী আল-খালিফী (১৮৩৪-৯৮)-এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি মুহাররাম ১৩৫৫ / এপ্রিল, ১৯৩৬-এ ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রদত্ত বরাতসমূহ ছাড়াও জীবনী গ্রন্থাবলী দ্র. (১) ইলয়াস যাখ্খুরা, মিরআতুল 'আসর ফী তারীখি ওয়া রুসূমি আকাবিরি রিজালি মিস্র, কায়রো ১৮৯৭, ২খ., ৪৫৫; (২) খায়রুদ্দীন আয্-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, কায়রো ১৯৫৪-৯, ৬খ., ৩২৬; (৩) মুহাম্মাদ 'আবদুহ আল্-হিজাযী, মিন আলামিস্-সা'ঈদ ফি'ল-ক'ারনির-রাবি' 'আশ্র আল-হিজ্রী, কায়রো ১৯৬৯, পৃ. ৯৩-১১২; (৪) যাকী মুহাম্মাদ মুজাহিদ, আল-আলামিশ্ শারকিয়্যা ফিল মিআতির রাবিআ 'আশারা আল-হিজ্‌রিয়্যা, কায়রো ১৯৫০, ২খ., ১৬০-এ অতিরিক্ত বরাতসমূহ এবং আল-'আদাবীর গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা পাওয়া যায়। ইহার সদৃশ একটি তালিকা আল-আদাবীর বেশ কয়েকটি গ্রন্থের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। উপরোল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও দ্র. আত্-তাক্'রীরু'ল-আওওয়াল লি-মাশ্য়াখাতিল-জামি'ইল আহ্মাদী 'আন্সানা ১৩১৬ দিরাসিয়্যা, কায়রো ১৩২৭/১৯০৯, যাহা তিনি তানতার আহমাদী মসজিদের শায়খ থাকাকালে লিখিয়াছিলেন। আহমাদী মসজিদের সংস্কার ও উন্নতি বিধানে তাঁহার কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য দ্র. যিক্রা তাশ্রীফ সামূল জানাবিল আলাল খুদায়বিল মুআজজাম 'আব্বাস হিল্মি'ছ-ছানী লিল-জামি ওয়াল মাহাদিল আহমাদী, সানার ১৩৩২, কায়রো ১৩৩২/১৯১৩-১৪, পৃ. ২৯ প.।

F. De Jong (E.I.2 Suppl.) / ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

আদম বান্নৌড়ী (آدم بنورى) ঃ শায়খ, ইনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-এর প্রধান খলীফাদের অন্যতম। তাঁহার জন্মস্থান ছিল কসবা মুদ, কিন্তু বান্নৌড়ে বসবাস করিতেন। এই স্থান সরহিন্দ হইতে বার ক্রোশ দূরে। 'রাওদ'াতুল কায়্যুমিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি মাতৃকুলের দিক দিয়া সায়্যিদ ও পিতৃকুলের দিক দিয়া পাঠান ছিলেন। কিন্তু হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলাবী (র) লিখিয়াছেন, মুল্লা 'আবদুল হাকীম সিয়ালকোটী ও বাদশাহ শাহজাহানের মন্ত্রী সা'দুল্লাহ খাঁ শায়খ আদামের সহিত সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোন্ বংশের? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি সায়্যিদ; কিন্তু যেহেতু আমার মাতামহ আফগান ছিলেন, এইজন্য সাধারণের নিকট আমি আফগানী বলিয়াই খ্যাত হইয়াছি'। ইনি শুরুতে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে কুরআন মাজীদ হিফ্জ করেন এবং অন্যান্য জাহিরী ইল্‌ম মৌখিক শিক্ষা করেন। তিনি বাদশাহী সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন, পরে কোন কারণে চাকুরী ছাড়িয়া দেন। তরীকতের শিক্ষা প্রথমে সুলতান হাজ্জী খিদ্র রাওগানীর নিকট লাভ করেন। ইহার পর হাজ্জী খিদরের ইঙ্গিতেই তিনি হযরত মুজাদ্দিদ সরহিন্দী (র)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকটই তরীকত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শায়খ আদাম 'নিকাত আল-আসরার' গ্রন্থে বলিয়াছেন, হযরত মুজাদ্দিদ (র) আজমীরে আমাকে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা দান করেন এবং সরহিন্দে খিলাফত প্রদান করেন।

সুন্নাতের অনুসরণে শায়খ আদাম ছিলেন অদ্বিতীয়। শারী'আত ও তারীকাতে দৃঢ়তার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার জনৈক লাহোরী বন্ধু তাঁহাকে লাহোর আসিবার জন্য আহ্বান জানান। সেই সময় বাদশাহ শাহজাহান লাহোরেই ছিলেন। তিনি পাঁচ হাজার পাঠান সমভিব্যাহারে লাহোর পৌঁছিলেন। সেখানে বহু লোক তাঁহার মুরীদ হইল। প্রত্যহ আফগানিস্তান হইতে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। বহু সংখ্যক

সাক্ষাতপ্রার্থীর আগমনের ফলে বাজারে ও পথে চলাফেরা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বাদশাহ তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। এই উদ্দেশে তিনি "মালিকুল উলামা" মুল্লা 'আবদুল হাকীম সিয়ালকোটী ও তাঁহার উযীর সা'দুল্লাহ খাঁকে প্রেরণ করেন। শায়খ (র) তাঁহাদের তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। তাঁহারা বাহিরেই বসিয়া থাকিলেন। যখন তিনি খাস কামরা হইতে বাহির হইলেন, তখনও ইঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাদশাহ্র নিকট গিয়া মুল্লা 'আবদুল হাকীম কোন অভিযোগ করিলেন না বটে, কিন্তু উযীর তাঁহার বিরুদ্ধে খুবই অভিযোগ করেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুজাদ্দিদ আলফে ছানীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, সেইজন্য শায়খ (র)-কে কোন শাস্তি দিলেন না, শুধু আদেশ করিলেন, শায়খ যেন হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। প্রথম হইতেই তিনি হজ্জের নিয়াত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বাদশাহ্র আদেশ পাইয়া হজ্জযাত্রা করিলেন। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া বলেন, তিনি সুরাট পৌছিলে সেখানকার শাসনকর্তার নিকট বাদশাহ্র আদেশ আসিল, শায়খ আদামকে শ্রীঘ্রই ফেরত পাঠাইবে; কেননা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এই দরবেশের এই দেশ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার কারণে আমার রাজত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। শাসনকর্তা তখন স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া লিখিলেন, আপনার আদেশ পৌছিবার পূর্বেই তিনি রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। এই ঘটনার আল্পকাল পরেই বাদশাহ বন্দী হইলেন।

শায়খ আদাম হজ্জ সমাধা করিয়া মদীনা মুনাওওয়ারায় যান। সেখানে তিনি ১৩ শাবান, ১০৫৩ হি. / ২৫ ডিসেম্বর, ১৬৪৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কবর হযরত উছমান গানী (রা)-এর কবরের নিকট অবস্থিত।

হযরত খাজা মুহাম্মাদ মা'সূ'ম যখন হজ্জে গিয়াছিলেন তখন হযরত শায়খ আদাম ইন্তিকাল করেন। যখন হযরত খাজা জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হইতেন তখন হযরত শায়খ আদমের কবরের নিকট অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং ফাতিহা পড়িতেন।

তিনি সহস্র সহস্র আল্লাহান্বেষীকে আল্লাহ্প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খানকাহে প্রত্যহ এক হাজারেরও অধিক তরীকতপ্রার্থী উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা লঙ্গরখানা হইতে দুই বেলা খানা পাইতেন। তাঁহার এক শতজন খলীফা ও এক লক্ষ মুরীদ ছিল। তাঁহার কয়েকজন বিখ্যাত খলীফার নাম ঃ (১) সায়্যিদ 'আলামুল্লাহ রায়-বেরেলবী। ইনি অত্যন্ত ধার্মিক ও সুন্নাতে নাবাবীর পাবন্দ ছিলেন। হযরত সায়্যিদ আহমাদ বেরেলবী (র) তাঁহারই বংশধর।

(২) হাফিজ সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবারাবাদীঃ ইনি শাহ 'আবদুর- রাহীম ফারূকী দেহলাবীর পীর ছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলাবীর আধ্যাত্মিক সংযোগ তাঁহার পিতার মাধ্যমে ইঁহারই সহিত ছিল।

(৩) শায়খ মুহাম্মাদ সুলতান বালয়াবী।

(৪) শায়খ সা'দী লাহোরী।

(৫) হাফিজ সা'দুল্লাহ ওয়াযীরাবাদী।

(৬) শায়খ 'উছমান শাহজাহানপুরী।

(৭) খাওয়াজা মুহাম্মাদ আমীন। ইনি বিশ বৎসর কাল শায়খ আদামের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি এককানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) -এর খলীফাবৃন্দ ও সন্তানদের অবস্থা, বিশেষ করিয়া স্বীয় পীর হযরত শায়খ আদামের অবস্থা ও জীবনী খুব বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। মূলত এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্যই ছিল শায়খ আদামের জীবনী রচনা।

রচনাবলী ঃ হযরত শায়খ আদাম রচিত গ্রন্থাবলী ও পুস্তিকাসমূহের মধ্যে (১) খুলাস'াতুল-মা'আরিফ, ২খণ্ড, ফারসী ভাষায়। (২) নিকাতুল-আস্‌রার (এই গ্রন্থের দুইখানি পাণ্ডুলিপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে), এই দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইখানি গ্রন্থ উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানপূর্ণ। নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি তাঁহার রচিতঃ (১) উদ্রুহ' আল-মায'াহিব,

(২) নাতাইজুল-হ'ারামায়ন। তাঁহার বাণী ও পত্রাবলী সংগ্রহ; পাণ্ডুলিপি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তায'কিরাতুল 'আবিদীন, দিল্লী, ২খ., পৃ. ১২৪ ; (২) মুফতী গোলাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আসাফিয়া, ৫৯৪; (৩) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলাবী, আল-ইন্তিবাহ, আহমদী প্রেস, দিল্লী, পৃ. ৪। (৪) মুহাম্মাদ ইহ্‌সান, রাওদ'াতুল কায়্যূমিয়া (অনুবাদ); (৫) আনফাসুল- আরিফীন, মুজতাবাঈ, দিল্লি ১৩৩৫ হি., ১৩, ১৪ প.; (৬) হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই, নুযহাতুল-খাওয়াতির; (৭) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদ্‌বী, সীরাত-ই-সায়্যিদ আহমাদ শাহীদ; (৮) মুহাম্মাদ হাসান নাক্'শবান্দী হালাত মাশাইখ-ই নাক্‌শ বান্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া মুরাদাবাদ ১৩২২ হি.; (৯) মীর্যা মুহাম্মাদ আখতার দেহলাবী, তাযকিরা আওলিয়া-ই হিন্দ, দিল্লী ১৯২৮-হি., ৩, ১০৩ ও ১০৪; (১০) C. A. Storey, Persian Literature, ১/২ খ., ইশারিয়া।

নাসীম আহমাদ সায়দী আরূহী [দা. মা. ই.]

'আদ্ম (عَدَم) ঃ এরিস্টোটলের দর্শনের একটি পরিভাষা (Praivatio)-এর অনুবাদ, যাহার অর্থ 'অস্তিত্বের অবিদ্যমানতা'। এই শব্দটির একটা সংজ্ঞা পাওয়া যায় এরিস্টোটলের Meaphysics, ৫খ., ২২-এ এবং তাঁহার দর্শনের আরব অনুসারিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হয়। মোটকথা, এরিস্টোটলের দর্শনে এই শব্দের দুইটি অর্থকে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিতে হইবেঃ (১) পরম অস্তিত্বহীনতা বা পরম অবিদ্যমানতা অর্থাৎ পরম শূন্যতা, (২) আপেক্ষিক অস্তিত্বহীনতা, যথা (ক) বস্তুর মধ্যে একটি গুণের অনুপস্থিতি, (খ) বস্তুর খাঁটি প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা। এরিস্টোটলের মতে যেহেতু একটি গুণের অনুপস্থিতি প্রচ্ছন্নভাবে ইহার বিপরীত গুণকে ধারণ করে, কাজেই প্রচ্ছন্নরূপে নিশ্চিতই ইহার একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আছে। এরিস্টোটলীয়-দর্শনের অস্তিত্ববান হওয়ার এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীনতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরম হওয়া বলিয়া কিছু নাই, সকল হওয়াই কোন আপেক্ষিক অনস্তিত্ব অথবা প্রচ্ছন্নতার বাস্তব রূপায়ণ। যাহা হউক, এরিস্টোট্‌ল-এর মতে, এমনকি পরম অবিদ্যমানতা বা শূন্যতারও মনে হয় কিছু একটা অস্তিত্ব আছে। কারণ

তাঁহার মতানুসারে কোন কিছু হওয়ার দ্বারাই ইহা অস্তিত্ববান। কিন্তু বৈরাগ্যবাদী (Stoics) দার্শনিকরাই অনস্তিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় সমস্যাটি লইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের আলোচনার প্রতিধ্বনি ও তাহাদের পরিভাষা ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যেও দেখা যায়, বিশেষভাবে মু'তাযিলীগণ মনে করিতেন, অনস্তিত্বের অবস্থাও একটি "জিনিস" (শায়), একটি সত্তা (যাত) ও যথার্থ কোন কিছু (ছাবিত)। তাঁহাদের মতে বিশ্বের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আল্লাহ, তিনি যেই সকল জিনিস বা সত্তা সৃষ্টি করিতে যাইতেন তাহা জানিতেন এবং তিনি যেই সকল জিনিস বা সত্তা সম্পর্কে জানিতেন সেইগুলির অবশ্যই বাস্তবতা ছিল, যেহেতু তিনি সেইগুলি সম্পর্কে জানিতেন। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি সেই সমস্ত জিনিস বা সত্তাকে অস্তিত্বের আপতন প্রদান করিয়াছেন। দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনা মুতাযিলীদের মত অস্তিত্বকে একটা আপতন বলিয়া মনে করিতেন, অন্যদিকে ইব্ন রুশ্দ ও আশ্আরীগণ অস্তিত্বকে মূল উপাদান বলিয়া মনে করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুতাযিলীগণ 'আদম সম্পর্কে যে মতবাদের সমর্থন করিতেন তাহা তাহাদের সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, যেমন ইব্ন হায্ম, ফিসাল, ৫খ., ৪৫; (২) এই সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায় ঃ শাহ্রাস্তানী, নিহায়াতুল-ইক্দাম (Guillaume), পৃ. ১৫০ প.; (৩) এই বিষয়ের উপর একটি সাধারণ আলোচনার জন্য দ্র. S. van den Bergh, ইব্ন রুশ্দের তাহাফুতুত-তাহাফুত-এর অনুবাদ, ১ম ও ২য় অধ্যায় ; (৪) আরও দ্র. S. Pines, Beitrage zur Islamischen Atomenlehre, 116 f.

S. Van Den Bergh (E.I.2) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

আদম (آدم) ঃ (আ) মানবজাতির জনক (আবুল বাশার), উপাধি স'াফিয়্যুল্লাহ- আল্লাহ্র মানোনীত (মাস্জূদুল-মালাইকা) যাঁহাকে ফিরিশ্তাগণ সিজ্দা করিয়াছেন। (খালীফাতুল্লাহ্ ফিল-আর্দ') দুনিয়ায় আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও প্রথম নবী। آدم শব্দটী ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে ভাষাবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দটি আরবী না অনারবী, এই সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইব্ন দুরায়দ آدم শব্দটির দুই ধরনের ব্যুৎপত্তির বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (১) آدم শব্দটি أدمة শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ গৌর বর্ণ; (২) آدم শব্দটির অর্থ শুভ্র, যথা ظبى آدم অথবা جمل ادم অর্থাৎ এমন হরিণ বা উষ্ট্র যাহার পেট শুভ্র বর্ণের। আবূ মান্সূর আল-জাওয়ালীকীর মতে সকল আম্বিয়া (আ)-এর নাম অনারবী, তবে আদাম (আ), স'ালিহ' (আ), শু'আয়ব (আ) ও মুহাম্মাদ (স.)-এর নাম ইহার ব্যতিক্রম। জাওহারীও آدم শব্দটিকে 'আরবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহাকে أفعل শব্দরূপের তুল্য বলিয়া মনে করেন। কোন কোন ব্যাকরণবিদ آدم শব্দটি آديم (উপরিভাগ অথবা চর্ম যথা اديم الارض। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ) শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ আদাম (আ)-কে ভূপৃষ্ঠ হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কেহ কেহ আবার آدم শব্দটিকে آدم (আদ্ম) অথবা أدمة শব্দ হইতে গৃহীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার অর্থ সমন্বিত ও সংমিশ্রিত। এই অর্থ দ্বারা আদাম (আ) -এর মধ্যে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বুঝায়। কেননা মাটি ও পানির মিশ্রণে তাঁহার খামির প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার آدم শব্দটিকে أدمة শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ অনুসরণযোগ্য। কিন্তু যামাখশারী آدم শব্দটিকে 'আরবী বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। آدم শব্দটির বহুবচন اوادم এবং ইহার تصغير (ক্ষুদ্রত্ববোধক রূপ) أويدم দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, শব্দটি অন-আরবী, অন্যথায় উভয় রূপেই همزه অপরিবর্তিত থাকিত।

হিব্রু ভাষায় آدم শব্দের অর্থ মানবজাতি, ফিনিশীয় ও সাবাই ভাষায়ও শব্দটির একই রূপ। ইংরেজী সাহিত্য, অন্যান্য ভাষায় آدم, آدم وحواء শব্দ ইন্জীল ও তাওরাতের মাধ্যমে প্রচলিত হইয়াছে। বাইবেলের আদি পুস্তকে উল্লিখিত আছে, আদম (আ) তাঁহার স্ত্রীর নাম حواء এইজন্য রাখিয়াছিলেন, তিনি জীবকুলের মাতা (আরও দ্র. Heb Eng. Lex., হাওওয়া নিবন্ধ)। آدم ও أدمحوا-এর অর্থ কোন বিষয়ের জন্মদাতা, গোত্র বা জাতির বড় নেতা ও আদি পুরুষ। যেমন 'দাক্ষিণাত্যের ওয়ালী উর্দূ কবিদের বাবা আদাম ছিলেন।' আরও তু. W. D. Whithney, Language and the Study of Languages, London 1884, পৃ. ৩৯৬। পবিত্র কুর্আনের পাঁচটি স্থানে آدم শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে। আদম সৃষ্টি ও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ঘটনা বর্ণনায় সূরা তাহা (২০ ঃ ১১৪) যাহা মাক্কায় অবতীর্ণ, প্রথমদিকের সূরাগুলির অন্যতম উল্লেখ রহিয়াছে। অন্যান্য উল্লিখিত স্থানসমূহ, যথা ১৫ ঃ ২৬ প., ৩৮ ঃ ৭১-৮৫, ১৭ ঃ ৬৩ প., ১৮ঃ ৮০, ৭ ঃ ৯-২৫, ২ ঃ ২৮-৩৬।

আদম (আ)-এর পূর্বে জিন্ন ও ফেরেশ্তাদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কালো কাদামাটি দ্বারা আদম (আ)-এর দৈহিক কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, উহাতে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তনের যোগ্যতা নিহিত ছিল। শুষ্ক হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাতে প্রাণ দান করেন (তু. নাওয়াবী, তাহযীব, ১খ., ৯৬)। আদম (আ)-এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁহার ও তাঁহার বংশধর দ্বারা বিশ্বে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করানো। সুতরাং আল্লাহ যখন ফেরেশ্তাদের ডাকিয়া বলিলেন, আমি পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি (অর্থাৎ "خليفة فى العالم" মুহাম্মাদ আব্দুহু, ১খ., ২৬১) সৃষ্টি করিতেছি, তখন তাঁহারা (জানার জন্য) আরয করে, আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে এবং রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি (অর্থাৎ আমরা আপনাকে সকল প্রকার দোষত্রুটি হইতে পবিত্র ও মুক্ত মনে করি। আপনি ছাড়া কেহই দোষমুক্ত নহে। অতএব সৃষ্ট এই নূতন খলীফাও দোষমুক্ত হইবে না এবং তাহাদের মধ্যে অবশ্যই এমন ব্যক্তিও থাকিবে, যাহারা রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত থাকিবে। কোন কোন আলিমের ধারণা, ফেরেশ্তাগণ পৃথিবীতে জিনদের খুনখারাবী লক্ষ্য করিয়া ধারণা করে, এইসব সৃষ্টি আদম সন্তানেরাও খুনখারাবি ও বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিবে)।

অতএব আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বিশ্বের বিভিন্ন জিনিসের নাম শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের বিভিন্ন জিনিসের অবস্থা ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা নিজেদের অপারগতা স্বীকার করেন।

কিন্তু আদম (আ)-কে প্রশ্ন করিলে তিনি ফেরেশ্‌তাদের সব বিষয় বলিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি কি বলি নাই, আমি আসমান-যমীনের সকল গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত? এই সময় ফেরেশ্‌তাদের দলে অগ্নি হইতে সৃষ্ট ইবলীসও অন্তর্ভুক্ত ছিল (বাহ্যত জিন্ন ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত ছিল, মুহাম্মাদ 'আবদুহু, ১খ., ২৬৫)। নির্দেশ দেওয়া হয়, "আদাম (আ)-কে সিজ্‌দা কর (এখানে সিজ্‌দা দ্বারা ইবাদতের সিজদাকে বুঝানো হয় নাই; সিজ্‌দার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নত হওয়া, আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা; মুহাম্মাদ 'আবদুহু, ১খ., ২৬৫)। সকলেই নির্দেশ পালন করে, কিন্তু ইব্‌লীস নির্দেশ অমান্য করে। সে দেখিল, আল্লাহ্ আদম (আ)-কে সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছেন। অতএব তাহার মনে ঈর্ষা জাগ্রত হয়। সে বলিল, আমি অগ্নির তৈরী এবং আদম মাটির তৈরী। আমি মাটির সৃষ্টির সামনে কি করিয়া অবনত হইব? (অগ্নির উপর মৃত্তিকার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের জন্যে দ্র. নাওয়াবী, ১খ., ১৬; ইব্‌নুল-কায়্যিম, বাদাইউল-ফাওয়াইদ, ৪খ., ১৩৯-১৪১)। আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে তাহার এই অহংকারের জন্য জান্নাত হইতে বাহির হইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন এবং তখন হইতে ইব্‌লীস আদম (আ) ও তাঁহার বংশধরদের শত্রুতে পরিণত হয়। ইব্‌লীস কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করে এবং বলে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দাদেরকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া বিভ্রান্ত করিতে থাকিব। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সেই অবকাশ দিলেন।

আদম (আ) ও হাওওয়া জান্নাতে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদেরকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট যাইতে বারণ করা হয়। কিন্তু ইব্‌লীস তাঁহাদের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক করিয়া তাঁহাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং তাঁহারা ইব্‌লীসের ধোঁকায় পতিত হন। যখন তাঁহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন তখন তাঁহাদের মনে নগ্নতার অনুভূতি জাগ্রত হয়। তাঁহারা জান্নাতের বৃক্ষের পত্র দ্বারা স্বীয় লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেন। অতএব আল্লাহ্ তাঁহাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ আবার আদম (আ) -এর উপর অনুগ্রহভাজন হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহাদের মনে কয়েকটি (তওবার) বাক্য উদ্রেক করেন এবং তাঁহাদের তওবা কবুল করেন। তখন হইতেই আদম (আ) নবী হন। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, তাঁহার শরীর হইতে সঙ্গে সঙ্গে নূরানী পোশাক খুলিয়া যায়। সায়্যিদ আহমাদ খান আদম (আ) সম্পর্কে এই ঘটনাটি রূপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সাওয়াত (سوأة) অর্থাৎ নগ্নতাকে পাপের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং লিবাস (لباس)-এর অর্থ করিয়াছেন তাক্‌ওয়া (تقوى)। মুফতী আবদুহু-র মতে, আদম অর্থ মানবজাতি, জান্নাত অর্থ আরাম ও শান্তির আনন্দঘন একটি পরিবেশ, নিষিদ্ধ বৃক্ষ দ্বারা পাপ ইত্যাদিকে বুঝানো হইয়াছে (দ্র. ১খ., ২৮১ প.)। অবশ্য ইহাদের এই সকল মত কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত বিধায় সাধারণ মুসলিম সমাজে উহা সমাদৃত হয় নাই।

আল-মাওয়াকি'ফ ওয়াল-মাক'াসি'দ গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে, জান্নাতে আদম (আ) প্রথম অবস্থায় নবী ছিলেন না। তথায় তাঁহার কোন উম্মতও ছিল না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, আদম (আ) জান্নাতেও নবী ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী ছিলেন তাঁহার প্রথম উম্মত (তু. আত্-তাফতাযানী, শারহু'ল 'আক'াইদি'ন- নাসাফিয়্যা, টীকাসহ আল্লামা খায়লী ও পার্শ্বে ইসাম-এর ভাষ্য, কায়রো ১৩৩৫ হি., পৃ. ১৩৪, টীকা, আরও দ্র. মুহাম্মাদ আবদুহু, ১খ., ২৮০)।

আদম ও ইব্‌লীস সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত ঘটনায় آدم শব্দের পরিবর্তে (বাশার) بشر এবং الإنسان। শব্দদ্বয়েরও ব্যবহার হইয়াছে, যথা ১৫ ঃ ২৬ আদমের সৃষ্টির শুরু সম্বন্ধে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলির উল্লেখ করা যায়ঃ ৯৬ঃ ২, ৮৬ঃ ৫, ৯৫ঃ ৪, ৫৫ঃ১৪, ৭৭ঃ২০, ৭৫ঃ৩৪, ৭৬ঃ২, ২১ঃ৩৭, ৩০ঃ২০, ৩ঃ৫৮, ২২ঃ৫, ৭ঃ১৮৯। এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, (আল্লাহ্) তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়......। (কোন কোন মুফাস্‌সির এই আয়াতের نفس واحدة দ্বারা আদাম (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী ও অন্যান্য অনেক মুফাস্‌সির ইহার দ্বারা সাধারণ মানুষকে বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মনে করেন)।

আদাম (আ) জান্নাত হইতে বাহির হইয়া কোন দেশে অবতরণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে কুর্‌আন ও সহীহ হাদীছে কোন উল্লেখ নাই। সাধারণ বর্ণনামতে আদম (আ) সান্দ্বীপ (শ্রীলংকা) ও হাওওয়া জিদ্দায় আপতিত হইয়াছিলেন এবং আরবের 'আরাফাতে আবার উভয়ের সাক্ষাত ঘটে। জান্নাতে আল্লাহ্ আদমের সম্মুখে পায়গাম্বরগণসহ মানবজাতির সমস্ত লোকের প্রতিকৃতিকে একই সঙ্গে প্রদর্শন করেন। আদম (আ) যে দ্বীপে অবতরণ করিয়াছিলেন, ঐ দ্বীপে একটি পর্বত আছে। পর্তুগীজরা উহার নাম দেয় পিকে Pica de Adam বা আদমের পর্বত। উপাখ্যান অনুযায়ী সেইখানে একটি পাথরে আদামের ৭০ ফুট দীর্ঘ পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাবারী, ১খ., ১২২ ও ইব্‌নুল আছীর, ১খ., ২৯-এর মতে আল্লাহ্ আদমকে কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে হজ্জের আচার-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। ইয়াহূদী উপাখ্যান অনুযায়ী তাঁহাকে আগুনের ব্যবহার, কৃষিকাজ ও কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় (হামযা আল্-ইস্‌ফাহানী, ৮৪বার্লিন ১৩৪০, ৫৭, তাবারী, ১খ., ১২৩, ১২৬ প.; ছ'া'লাবী [কিসাস], ২৩-২৫)। ছ'া'লাবর বর্ণনামতে তিনি স্বাভাবিক জীবনের প্রয়োজনে দির্‌হাম ও দীনার মুদ্রার ব্যবহার করিতেন। পূর্বে ধারণা এই ছিল, আদম (আ) আরামী ভাষায় কথা (Sanhedrina 38b; Barhbraeus, Chron, Syr, 5); হালাবী আস্-সীরাতুল্ হালাবিয়্যা কায়রো, ১৩২৯, ১খ., ২০) বলেন, আদম (আ) জান্নাতে 'আরবী ভাষায় কথা বলিতেন, কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর তিনি সিরীয় ভাষায় কথা বলিতেন।

আদমের প্রথম সন্তান কাবীল, তৎপর হাবীল (দ্র.)। কুর্‌আনে তাহাদের উল্লেখ রহিয়াছে (৫ ঃ ৩০)। প্রতিবার তাঁহাদের যমজ সন্তানের জন্ম হইত, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। আদম (আ) প্রত্যেক পুত্রের সংগে তাহার যমজ ভগ্নীর বিবাহ দিতেন। ছ'া'লাবীর মতে আদম (আ)-এর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল ৪০,০০০।

ইয়াহূদী সাল অনুসারে ৬ নীসান শুক্রবার আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। একই দিনে তিনি জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হন এবং একই দিনে তাঁহার মৃত্যু হয় (তাবারী, ১খ., ১৫৫ প.; মাস্‌উদী, ১খ., ৬০, ৬৯; ইয়া'কূ'বী, ১খ., ৪)। তিনি আবূ কুবায়স পাহাড়ের পাদদেশে রত্ন গুহায় (মাগরাতুল-কুনূয) সমাহিত হন (ইয়া'কূ'বী, ed. Houtsma, ১খ., ৫)। অন্যান্য লেখকের মতে তাঁহার শবদেহ প্লাবনের পর Melchizedek কর্তৃক জেরুসালেমে নীত হয়।

তাফসীর গ্রন্থাবলী ও নবীদের কাহিনী বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে আদম (আ)-এর ব্যাপারে যেইসব বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহার বেশীর ভাগ অংশই ইয়াহূদী সূত্র হইতে গৃহীত। এই সমস্ত বর্ণনা ও ইসলামী বর্ণনার মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ইহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Encyclopaedia of Islam, ২খ., সংস্করণ, নিবন্ধ Adam.

বাইবেলের আদিপুস্তকে প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে আদম (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কিত কাহিনীর কয়েকটি বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে। বিস্তারিত জানার জন্য উহা দেখা যায়। আদিপুস্তকে (২ ঃ ৯) জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষটিকে ভাল মন্দের জ্ঞান-বৃক্ষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাইবেলের ইয়োব (৩১ ঃ ৩৩) পুস্তকেও আদম (আ)-এর সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআন, স্থা. ও তাফসীর, বিশেষত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীঃ (ক) ইব্‌ন জারীর আত্‌-তাবারী, তাফসীর, কায়রো; (খ) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আজীম, কায়রো ১৯৩৭, ১খ., ৬৯-৮২; (গ) ফাখ্‌রুদ্দীন আর্‌-রাযী, মাফাতীহুল-গা'য়ব, কায়রো ১৩০৮ হি, ১খ., ২৬১ প.; ৪খ., ৩৪১ প.; (ঘ) যামাখ্‌শারী, আল-কাশ্‌শাফ, কায়রো, ১খ., ১৫.; (ঙ) মুহাম্মাদ আব্‌দুহু, তাফসীরুল-মানার, কায়রো ১৩৪৬, ১খ., ২৫১-২৮৬; (চ) সায়্যিদ আহমাদ খান, তাফ্‌সীর আহ্‌মাদিয়্যা, আলীগড় ১৮৮২-৯৫; (ছ) আবুল কালাম আহমাদ (আযাদ),তরজুমানুল কুরআন, লাহোর, ২,৩, প.; (২) বুখারী, আল-জামিউস্‌-সাহীহ (বিশেষত কিতাবুল আম্বিয়া) ; (৩) মালিক, আল্‌-মুওয়াত্তা (বিশেষত কিতাব ৪৬ঃ আন-নাহয়ু 'আনিল কা'ওল বিল-কাদ্‌র); (৪) ইব্‌ন সাদ তাবাকাত, লাইডেন ১৯০৫, ১/১ খ., ১২-১৬; (৫) Wensink, Handbook of Mohammadan Tradition, ১৯২৭, আদম নিবন্ধ; (৬) ইবন দুরায়দ, আল- ইশ্‌তিকাক, পৃ. ৪৪; (৭) আবূ মানসূ'র আল্‌-জাওয়ালীকী, আল্‌-মু'আর্‌রাব (সম্পা. Sachou), Leipzig ১৮৬৭; (৮) আল্‌-জাওহারী, আস্‌-সিহাহ্‌ (সম্পা. আহমাদ 'আবদুল-গাফূর আত্তার), কায়রো; (৯) রাগিব আল্‌-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত; (১০) ইব্‌ন ফারিস, মু'জামু মাকাঈসিল লুগা, কায়রো ১৩৬৬ হি., ১খ., ৭১-৭২; (১১) আন্‌-নাওয়াবী, তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত, কায়রো ১খ., ৯৫-৯৭; (১২) আল-কিসাঈ, কিসাসুল্‌-আম্বিয়া, লাইডেন ১৯২২-১৯২৩, ১খ., ২৩-৭৩; (১৩) আবূ ইসহাক আছ্‌-ছা'লাবী, কিসাসু'ল-আম্বিয়া (আল- আরাইস), কায়রো ১৩০১ হি., ১৯ প. ও ৩৭; (১৪) আশ্‌-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবুল-মিলাল ওয়ান্‌-নিহাল, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ., ৪৩০; (১৫) আল-বাগাদাদী, কিতাবুল ফারক, কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ১৮০, ৩২৩; (১৬) মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, হা'য়াতুল-কু'লূব, লক্ষৌ ১২৯৫ হি., পৃ. ৪১ প., (১৭) ইব্‌নুল আছীর আল্‌-জাযারী, আন-নিহায়াতু ফী গাঁরীবিল হাদীছ, কায়রো ১৩২২ হি., ১খ., ২৫-২৬; (১৮) বাইবেল (আরবী), সম্পা. Willam Walts, লন্ডন ১৮৬০ খৃ.; (১৯) Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৫৯ খৃ., ১খ., ৮৪-৮৭; (২০) Jewish Encyclopaedia, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯০১ খৃ. প. ১খ., ১৭৩ প.; (২১) সায়্যিদ আহ্‌মাদ খানঃ তাব্‌য়ীনু'ল কালাম তায়্‌সীরুত্‌-তাওরাতি ওয়াল-ইন্‌জীলি আলা মিল্লাতিল-ইসলাম, ২খ., ৯৮-১৩৩; (২২) হাকীম শামসুল্লাহ্‌ কাদিরী, কামূসুল-আ'লাম, হায়দরাবাদ, দক্ষিণাত্য ১৯৩৫ খৃ, ১খ., ক-১০-১২; (২৩) মাখ্‌যান-ই-উলুম ওয়া ফুনূন (ইদারা-ই আদাবিয়্যাত-ই উর্দূ), হায়দরাবাদ ১৯৫১ খৃ, পৃ. ৬১-৬২; (২৪) Encyclopaedia of islam, লাইডেন, ২য় সংস্করণ; (২৫) আন্‌-নাসাফী, আকাঈদ (শার্‌হ লিত্‌' তাফ্‌তাযানী ও খায়ালী-র টীকা), কায়রো ১৩৩৫ হি, পৃ. ১৩৪; (২৬) মীর গুলাম 'আলী, শামামাতুল-আন্‌বার সুব্‌হা'তু'ল-মার্‌জান।

'আবদুল মাজেদ দার্‌য়াবাদী, এম. এন. ইহ্‌সান ইলাহী, রানা
(দা. মা. ই.)/মাহবুবুর রহমান

আদামাওয়া (ادموه) ঃ নামটি ১৮০৯ খৃস্টাব্দের ফুলানী (Fulani) জিহাদের স্থানীয় নেতার নামানুসারে উদ্ভূত (নিম্নের পঞ্চম অনুচ্ছেদ দ্র.) যাহা দ্বারা পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চাদ্‌ভূমির একটি অঞ্চলকে অভিহিত করা হয়। নিম্নবর্ণিত অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়ঃ

(ক) ইহা দ্বারা এমন একটি এলাকা বুঝানো হয়, ভৌগোলিক সংজ্ঞায় সুস্পষ্টভাবে যাহার কোন সঠিক সীমা নির্ধারিত করা হয় নাই; কিন্তু এই জিহাদের বিজিত অঞ্চল ও এই বিজয়ের ফলে ঐ অঞ্চলের ফুলানী প্রভাবান্বিত এলাকা যাহা উত্তরে মারুআ হইতে দক্ষিণ নাগাউনদের (Ngaundere)-এর সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত এবং পূর্বে রাই বুবা (Rei Buba) হইতে য়োলা (Yola)-এর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; প্রায় ১১° ডিগ্রী হইতে ৬° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে এবং ১২° ডিগ্রী হইতে ১৪° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকার এই অঞ্চল ইউরোপীয়দের দখলে আসার ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ঘন বসতিপূর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চল নাইজেরিয়া বৃটিশ শাসনাধীন হয়। পূর্বাংশ জার্মান অধিকৃত ক্যামেরুনের অংগীভূত হয়। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের পর ইহা "লীগ অব্‌ নেশান্স"-এর সনদবলে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের দ্বারা শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়।

(খ) এই শব্দ দ্বারা এমন একটি প্রদেশকে বুঝায় যাহার আয়তন ১৯৩১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ২,৮১,৭৭৮ বর্গমাইল, ১৯২৭ সাল পর্যন্ত উহা উত্তর নাইজেরিয়ার য়োলা (Yola) প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। লীগ অব্‌ নেশন্সের সনদবলে বৃটিশ শাসিত পূর্বতন জার্মান ক্যামেরুন এলাকাসহ মূল এ্যাঙ্গলো-জার্মান আন্তর্জাতিক সীমানার পশ্চিম অঞ্চল লইয়া এই প্রদেশ গঠিত। বেনু (Benue) নদীর উত্তর তীরের ক্ষুদ্র এলাকা এবং দক্ষিণ তীরের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এলাকা লইয়া প্রদেশ গঠিত। ইহার দক্ষিণ-

পশ্চিমে অবস্থিত মুরি (Muri) আমীরাত ও কিছু উপজাতীয় এলাকাও আদামাওয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই উপজাতীয় এলাকা পুরাতন আদামাওয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই এলাকা নাইজেরিয়ার বোর্নু (Bornu) প্রদেশের দক্ষিণে এবং বাউচি (Bauchi) প্রদেশের পূর্বে অবস্থিত।

২। **ভৌগোলিক অবস্থান** ঃ আদামাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হইতেছে ইহার মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত নাইজার নদীর প্রধান উপনদী বেনু নদী। এই নদী সারা বৎসর বৃহৎ সালতি নৌকা ও বজরা চলাচলযোগ্য নাব্য এবং ভরা বর্ষা মওসুমে (আগস্ট হইতে অক্টোবর) ষ্টীমার চলাচলযোগ্য নাব্য একটি আন্তর্জাতিক জনপথ। মান্দারা পর্বতমালা, ইহা বেনু নদীর উত্তরে অবস্থিত এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, উচ্চতা ৩০০০ ফুটের অধিক; একটি বিশাল বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি পবর্তস্তূপ যাহার পশ্চিম প্রান্ত ৫০০০ ফুটের অধিক উচ্চ ও বেনু নদীর দক্ষিণে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বক্রাকারে অবস্থিত।

৩। **পরিবহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য** ঃ পরিবহণের জন্য বেনু নদীই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রধান কাফেলা পথ ও আধুনিক মোটর চলাচলের সড়ক এই অঞ্চলের অভ্যন্তর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। আদি যুগে ক্রীতদাস ও গজদন্ত ছিল ইহার প্রধান রপ্তানি পণ্য। আধুনিক কালে চীনা বাদম ও চামড়া উহার স্থান দখল করিয়াছে। ইহা ছাড়া তুলা, গদ, তিলসহ অন্যান্য বহু দ্রব্যও রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানী পণ্যের মধ্যে রহিয়াছে শিল্পজাত দ্রব্যাদি, বিশেষভাবে তুলাজাত দ্রব্যাদি।

৪। **অর্থনীতি** ঃ অঞ্চলটি শিল্পায়িত নয় এবং এখানে কোন বড় শহরও নাই; জীবন নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণের ব্যাপারে ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহার জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী ও পশুপালক। এখানে প্রধান সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে বহু সংখ্যক গবাদি, মেষ ও ছাগল পাল।

৫। (ক) **জনগোষ্ঠী** ঃ এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ হইতেছে যাযাবর শ্রেণীর ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ফুলানী সম্প্রদায় (ফুলবে প্রবন্ধ দ্র.) এবং বহু পৌত্তলিক উপজাতি। পূর্বোল্লিখিত ১ম অনুচ্ছেদের 'ক' অংশে বর্ণিত অনির্ধারিত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের সঠিক সংখ্যা প্রদান সম্ভব নয়। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে নাইজেরিয়ার আদামাওয়া প্রদেশের [অনুচ্ছেদ ১(খ)] যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ ফুলানী ১,৫০,৯৩৬; হাউসা (Hausa) ২১,৫৬০; কামুরী (Kamuri) ১০,৪৯৫; অন্যান্য উপজাতি ৪,৬৭,১৩৮। এই সকল জাতি ও অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিসহ মোট জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল ১০২৪,৭৫৫। তৎকালে প্রধান পৌত্তলিক গোত্রগুলির জনসংখ্যা ছিল ঃ বাচামা (Bachama) ১৯,৭০৩, চাম্বা (Chamba) ৫১,২২৪, হোনা (Hona) ৬,৬০৪; বাতা (Bata) ২৩,০০৩; হিজি (Hiji) ৬,২৮৪, কিল্বা (Kilba) ২২,৭৯৯; লালা (Lala) ৯,৭৩৩; লংগুদা (Longuda) ১১, ৮০৯; ম্যামবিল্লা (Mambilla) ১৯,৩৪৮, মুমুয়ে (Mumuye) ৭৯,২৭২, ভেরে (Vere) ১০,৮৬৬; উর্কুন (Wurkun) ২৩,৪৭২; মর্ঘি (Marghi) ১,৫১,২২৩। (বর্তমান প্রাদেশিক সীমাবহির্ভূত কিন্তু প্রাচীন আদামাওয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী বার্বার জাতির লোক সংখ্যাও তারকাচিহ্নিত অংকভুক্ত)।

(খ) **ভাষা** ঃ ফুলানি (Fulbe-এর অন্তর্গত Fuffulde দ্র.) হইতেছে এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা এবং ইহা এই অঞ্চলের সাধারণ ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। বহু পৌত্তলিক গোত্রের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও তাহারা এখন এই ভাষা ব্যবহার করিতেছে। এই গোত্রীয় ভাষাগুলি আবার অল্প বিস্তর পরস্পর সংযুক্ত (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'বুরা' ও 'মর্ঘী' ভাষা পরোক্ষভাবে 'কিল্বা' ভাষার সমজাতীয়)। হাউসা ভাষা শহরের বাহিরে খুব একটা ব্যবহৃত হয় না এবং শহরেই কেবল ব্যবসায়ী ক্রিয়াকর্মে উহা বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় যথাক্রমে কেবল প্রদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা বলিয়া থাকে।

ইতিহাস ঃ ফুলানী জিহাদ পূর্ব কালের ইতিহাসের জন্য আমাদের নিকট কেবল লোকপরম্পরায় প্রচারিত স্থানীয় কাহিনী আছে। বেনু নদীর উত্তর তীরবর্তী অধিকাংশ প্রধান উপজাতিরা স্থানীয় অধিবাসী বলিয়া দাবি করে না, তাহাদের উপাখ্যানাদি হইতে জানা যায়, তাহারা উত্তর অথবা পূর্বাঞ্চল হইতে আগমনকারী অধিবাসীদের অন্তর্গত। ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুমিত হয়, সাহারার আরও উত্তরে ক্রমবর্ধমান শুষ্কতার কারণে পূর্বকালে এই অঞ্চলটি ছিল
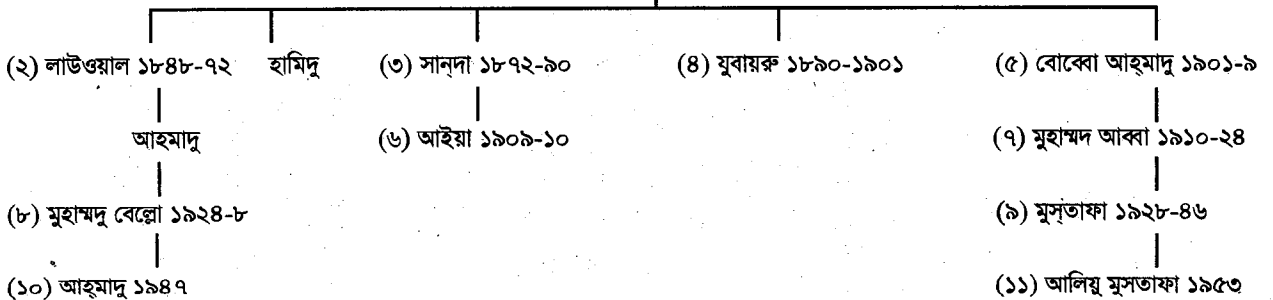
উপজাতীয় গোত্রসমূহের সাধারণ লক্ষ্য এবং উহার ফলেই কোন প্রকার জীবন বাঁচাইবার স্পৃহায় দক্ষিণাঞ্চলের মাছি (tsetse) উপদ্রুত উপকূলভাগে তাহাদের এই অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। ফুলানীরা সম্ভবত জিহাদের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই আদামাওয়া প্রদেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। স্থানীয় পৌত্তলিকদের প্রচলিত লোককাহিনী অনুযায়ী ঃ

১। মূল ফুলানী অভিবাসনকারীদের একটি শাখা (উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল পরিক্রমণ করিয়া পরে সেনে-গাম্বিয়ার দিক হইতে পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চাদ্ভূমিতে প্রবেশ করে) পশ্চিমাভিমুখী কাফেলা পথে বিল্মা (Bilma) ও মুর্যুক (Murzuk) হইয়া মধ্যসাহারা অতিক্রম করিয়া বোর্নু (Bornu)-তে প্রবেশ করে এবং ঐ স্থান হইতে আদামাওয়াতে প্রবেশ করে এবং (২) এই ফুলানীরা পথিমধ্যে তাহাদের গবাদি পশু পাল হারাইয়া রিক্ত অবস্থায় স্থানীয় পৌত্তলিকদের নিকট হইতে তাহাদের গবাদি পশু সংগ্রহ করে।

জিহাদের সময় হইতে আমরা সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমি প্রাপ্ত হই। ১৮০৪ সালের নিকটবর্তী সময়ের উস্মানুবি ফোদুয়ে (উছ্মান ইব্ন ফুদী দ্র.) সোকোতো এলাকায় জিহাদ আরম্ভ করিলে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে এবং জনৈক বিশিষ্ট মোদিব্বো (মুআল্লিম, ফুলানী প্রতিশব্দে) আদামা তাঁহার সহিত যোগদান করেন। বেনু নদীর ঠিক দক্ষিণে ও ভেরে (Vere) পর্বতের পূর্বদিকে ফারো উপনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত গুরিনের নিকট এই মোদিব্বো আদামা জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে বোর্নুতে এক বিশিষ্ট মোদিব্বো কিয়ারির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বেনু অঞ্চলের ওয়েলটুন্ডে (Weltunde) নামক এক গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮০৬ সালে মোদিব্বো আদামাকে উস্মানু একটি পতাকা ও কিছু সংখ্যক সৈনিক (যোদ্ধা) প্রদান পূর্বক তাঁহাকে নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় ঐ জিহাদ আরম্ভ করিতে নির্দেশ দান করেন। ১৮০৯ সালে মোদিব্বো আদামা গুরিন হইতে জিহাদ আরম্ভ করেন। তিনি এইরূপে বিজয় লাভ ও স্থানীয় পৌত্তলিক উপজাতি হইতে দাস সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণভাবে বলা যায়, কেবল যে অঞ্চলে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের জন্য ফুলানী অশ্বারোহী দল গমন করিতে পারে নাই সেইখানেই পৌত্তলিকরা রক্ষা পাইয়াছিল, ইহা ব্যতীত ফুলানী অশ্বরোহিগণ সর্বত্রই সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই সকল এলাকার মধ্যে বেনু নদীর উত্তরে কিল্বা, মারঘী, হিজি এবং উহার দক্ষিণে ম্যামবিল্লা, চাম্বা-সহ বহু বর্বর উপজাতি ইউরোপীয়দের দখলের পূর্বকাল পর্যন্ত কার্যত স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল।

১৮৩৮ সালে মোদিব্বো আদামা তাঁহার প্রধান কার্যালয় গুরিন (বর্তমানে ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও পুরাতন স্মৃতির জন্য ইহা শ্রদ্ধেয়) হইতে নিকটবর্তী রিবাদু (Ribadu)-তে এবং ১৮৩৯ সালে সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত জোবোলিও (Joboliwo)-তে স্থানান্তরিত করেন। অবশেষে ১৮৪১ সালে তিনি আরও পশ্চিমে য়োলা নগরের পত্তন করেন (ফুলানী ভাষায় এই নামের অর্থ জলাভূমিতে উচ্চ স্থান) এবং তথায় তিনি ১৮৪৮ সালে ইন্তিকাল করেন। এই সকল স্থল বেনু নদীর ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই স্থানে নগর পত্তনের উদ্দেশ্য ছিল ঐ নদীর সংযোগ স্থলের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। মোদিব্বো আদামা কর্তৃক স্থাপিত বংশের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিজিত অঞ্চলসমূহে ফুলানী প্রশাসন কেবল রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানসমূহ ব্যতীত অন্যত্র সুসংগঠিত ছিল না। ইহাদের প্রশাসনিক পদ্ধতি ছিল জায়গীরদারি ও সামন্ত প্রকৃতির। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সরদারগণ 'লামিডো' (Lamido-র) ফুলানী ভাষায় আমীর-এর প্রতিশব্দ, বহুবচনে Lamibe প্রতি অনুগত থাকিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল জায়গীরদারগণ (ফুলানী Lamdo, ব. ব. Lambe) রাজধানী হইতে তাহাদের জায়গীরের আনুপাতিক দূরত্ব অনুসারে নামেমাত্র অধীন ছিল, বরং প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বাধীন ছিল।

এই প্রবণতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় এই অঞ্চলের উত্তরে ও পূর্বে অবস্থিত যথাক্রমে মাদাগালি ও রাই বুবা (Madagali and Rei Buba)-তে। ১৮২৩-২৪ সালে বোর্নুতে ক্লাপ্পারটন Clapperton-এর অবস্থানকালে এই অঞ্চলের জন্য আদামাওয়া নামের ব্যবহার হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মোদিব্বোর জীবদ্দশাতেই এই অঞ্চলটি আদামাওয়া নামে পরিচিতি লাভ করে।

৭। ধর্ম ঃ ফুলানীদের ধর্ম হইতেছে ইসলাম। বহু বার্বার্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণের পথে। তথাপি প্রকৃতিপূজারী (Animist)-এর সংখ্যা এখনও প্রচুর। বর্তমানে এই অঞ্চলে খৃস্টান মিশনারীরা প্রচার কার্য পরিচালনা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইতেছে বেনু নদীর উত্তরে বুরা-মরঘীর উপজাতীয় এলাকায় আমেরিকার Church of Brethren (ভ্রাতৃ সংঘের গির্জা) এবং য়োলার পশ্চিমে নদী সন্নিকটস্থ বাকামা Bachama অঞ্চলে উপজাতীর মধ্যে ডেনমার্কের সুদান ইউনাইটেড। ১৯৩১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আদামাওয়া প্রদেশের সর্বমোট জনসংখ্যা ১০,২৪৭৫৫ জনের মধ্যে ৬,৭৪,৫১৬ জন মুসলমান, ৩,৪৮,৭৯১ জন প্রকৃতিপূজারী এবং ১৪২৫ জন প্রোটেস্টান্ট খৃস্টান। ইহা সুনিশ্চিত যে, আগামী আদমশুমারীতে প্রকৃতিপূজারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, মুসলমানগণের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি এবং খৃস্টানদের সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাইবে।

৮। বিবিধ ঃ যে সকল আবিষ্কারক ও পর্যটকের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পর্যটক ছিলেন ড. বার্থ (Barth)। তিনি ১৮৫১ সালে ঐ স্থান ভ্রমণ করেন। ফরাসী পর্যটক Lieut Mizon ঐ এলাকায় পর্যটন করেন ১৮৯১-৩ সালে। ১৯০১ সালের ২ সেপ্টেম্বর বৃটিশ সেনাবাহিনী কর্তৃক য়োলায় সামরিক আধিপত্য স্থাপনের পূর্বে বেনু নদীতে চলাচলকারী প্রাচীন আমলের জাহাজের সাহায্যে নাইজার কোম্পানী এই অঞ্চলে বহু বৎসর যাবৎ ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকে। এই সময় য়োলা শহর আধুনিক রাইফেল ও দুইটি কামানে সজ্জিত রাবেহ (Rabeh)-এর পলাতক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে (দ্র. বোর্নু) বিশেষ তেজস্বিতার সহিত রক্ষিত হইতেছিল। লেফটেন্যান্ট মিযোন তাঁহার সন্ধির

শর্তের খেলাফ করিয়া ঐ অস্ত্রগুলি তৎকালীন লামিডোকে উপহার দিয়াছিলেন। জার্মান সেনাবাহিনী ১৯০২ সালের মার্চ মাসে গারুয়া (Garua) দখল করে এবং ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে একটি কমিশন কর্তৃক এ্যাংগলো-জার্মান আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এই এলাকা একটি বৃহদাকারের সমরাংগনে পরিণত হয় এবং চরম যানবাহন সমস্যা দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রমণ প্রতিআক্রমণের পর জার্মান ক্যামেরুন একটি এ্যাংগলো-ফরাসী বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাহারা ১০-০৬-১৫ তারিখে গারুয়া এবং ২৮-০৬-১৫ তারিখে নাগাউনদের (Ngaundere) দখল করে। জার্মানদের পার্বত্য দুর্গ মোরা (Mora) ১৮-০২-১৬ তারিখে আত্মসমর্পণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) S. J. Hogben, The Muhammadan Emirates of Northern Nigeria, Oxford 1930 (পরিশিষ্টের ৪, ৫, ৭, অধ্যায়, পৃ. ২০০১ -এ প্রাসংগিক উৎস হিসাবে যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে উহাতে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এখানে পুনরুল্লেখ করা হইল না); (২) E.W. Bovill, Caravans of the old Sahara, Oxford 1933; (৩) Brooke, Census of Nigeria 1931, vol. ii, London 1933; (৪) C. E. J. Whitting, The ..Literature.... of Nigeria, JRAS, 1943; (৫) Infakul maisuri (Whitting), London 1951; (৬) ১৯০০ খৃ. হইতে নাইজেরীয় সরকারের প্রকাশনাসমূহ।

C.E.J. Whitting (E.I.2) / শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

আল-'আদ'য়ম (আদেম) (العضيم) ঃ টাইগ্রিস বা দিজ্‌লা (দ্র.) নদীর পূর্বদিকের উপনদী। জাবাল হাম্‌রীন (পর্বত)-এর সমান্তরালে উহার পূর্বদিকে একটি পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। তথা হইতে যে সকল স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি হইয়াছে, উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকগামী উহাদের স্রোতধারা সঙ্কীর্ণ গিরিখাত গভীরভাবে বিদীর্ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যে স্থানে একত্রে মিলিত হইয়াছে, সেই তরঙ্গিনী সঙ্গমই উপনদীটির উৎপত্তিস্থল। এই নদীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল (১) কিরকূক এলাকার নদী, যেমন খাসা (Khasa Kaza, Kissa-Cay)-চায় (ক্ষুদ্র নদী) কোন কোন মানচিত্রে ইহা কারাসু (কারা, তুর্কী-কাল সু, তুর্কী-ঝরনা, স্রোত) কিরকূক-এর উত্তরে অবস্থিত কতিপয় উৎসমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (২) ইহার কিছু দূর অগ্রে তউক অঞ্চলের নদীটির নাম তাউক নদী (দাকুকা দ্র.) অর্থাৎ তাউক সূ (চায়), এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী। এই নদীটি তাউক-এর দক্ষিণ-পশ্চিম খাসা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। (৩) আক নদী যাহার অপর নাম তূখ খুরমাতলি। শেষোক্ত নদীটি Sedjirme-dagh, [dagh, তুর্কী পর্বত] হইতে উৎপন্ন হইয়া তুয-খুরমাতলির নিম্নভাগ দিয়া তাউক নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর সঙ্গম স্থল হইতে নদীটির পরবর্তী অংশ আল-আদায়ম বা শাত্তুল-আদায়ম নামে অভিহিত। জাবাল হামরীন-এর মধ্য দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ব্যাবিলনীয় সমভূমির ভিতর দিয়া দক্ষিণাভিমুখী চলিতে চলিতে যেখানে ইহা টাইগ্রিস নদীতে পতিত হইয়াছে। সে স্থানটি ৩৪° অক্ষাংশ ও ৪৪°২০´ পূ. দ্রাঘিমায় অবস্থিত। কিরকূক-এর নিম্নদিকে তাযা খুরমাতলির দক্ষিণ হইতে আকসূ নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত উত্তর দিকে এবং উত্তর ও মধ্যভাগের সম্মিলিত উৎস নদীগুলি বহু দূর বিস্তৃত জলাভূমির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যখন তুষার গলিয়া যায় তখন জাবাল হামরীন (পর্বতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এক বিশুষ্ক নদীগর্ভের মধ্য দিয়া 'আদায়ম নদীটি নারিন (Narin) নদীর সঙ্গে মিলিত হয় (কোন কোন মানচিত্রে ইহা নারিত (Narit) প্রবাহিনী নামে অভিহিত)। উহা দিয়ালা নদীর একটি উপনদী। স্থানীয় অধিবাসীরা এতদ্‌ঞ্চলে, এমনকি জাবাল হামরীনের দক্ষিণ-পশ্চিমেও দরকারবোধে সাধারণত বিশুষ্ক নাহ্‌র রায়ান-কে কাজে লাগাইয়া উক্তরূপ (নৌপথে) যাতায়াত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। শেষোক্ত পানিস্রোতটি দিয়ালা নদীর একটি উপনদীর সঙ্গে সংযুক্ত। বর্তমানে উক্ত ক্ষুদ্র নদীটির স্রোত আর দিয়ালা পর্যন্ত যায় না বলিয়া উহার খাতটি কেবল সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। পানিসেচ বাঁধের ধ্বংসাবশেষের বিবরণ সর্বপ্রথম J. Ross লিপিবদ্ধ করেন। Journ. Roy. Geogr Soe, 1840, পৃ. ১২১, তৎপর J.F. Iones, Bombay Records, Mamoir 43, 1857, পৃ. ১২৩ এবং E. Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra, হামবুর্গ ১৯৪৮, পৃ. ৭৬। নাহ্‌র রাযান খালটি খোলা হইলে তাহার প্রবাহ দিয়ালা নদীতে পড়ে। তখন 'আদ'য়ম নদীর মোহনার অংশ প্রায় সম্পূর্ণই শুষ্ক হইয়া যায়। নদীটির এই অংশে গ্রীষ্ম মৌসুমে অতি অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ হইয়া থাকে। পর্যটকগণের বিবরণমতে নদীটির স্রোতের নিম্নাংশ বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস প্রায়ই শুষ্ক থাকে।

'আদ'য়ম নামটি মারাসি'দুল্‌-ইত্‌তি'লা' গ্রন্থে (৮ম/১৪শ শতাব্দী) পৃ. ৩৭৯, সর্বপ্রথম আল্‌-আজীম বা আল্‌-উজায়্যিম নামে উল্লেখ পাওয়া যায় ; তু, মুসতাওফী-(আনু. ১৩৪০ খৃ.)-এর নাহ্‌রুল আজাম। কীলফাকার শিলালিপিতে উল্লিখিত (Turnat) ও প্রাচীন লেখকগণের উল্লিখিত Tornadotus (Tornas)-কে আদায় নদীরূপে সনাক্ত করিবার জন্য দ্র. F. Hommet, Grundriss der Geogr. und Gesch. des alten Orients, মিউনিক ১৯০৪, ৫ খ., ২৯৩ প. Pauly Wissowa, Tornadotus। কালীককার শিলালিপিতে উল্লিখিত রাদানু (নাহ্‌র রাযান) যাহা এক সময় আদায়ম নদীর নিম্নাংশ বুঝাইয়া থাকিবে দ্র. Streek, Z.A. 1900, 275 &, Hommel, 293 p. Herodotus উল্লিখিত Gyndes নদীটিকেও আমরা আদায়মরূপে সনাক্ত করিতে পারি কিনা তাহা সন্দেহজনক; তু. Billerbeck, 92 প. দ্র. Pauly-Wissowa, Gyndes নিবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ritter, Erdkunde, ৯খ., ৫২২ প., ৫৩৭ প.; (২) A. Billerbeek, Mitteilungen d, Vorderas, Ges., ১৮৯৮ খৃ., ৬৫ প., ৮৩; (৩) G. Hoffmann, Auszuge aus Syr. Akten Persischen Martyrer, 1880, 253, 275।

M. Streek (E.I.2) /মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আদার বা আযার (দ্র. তারীখ)

আদাররাক (أدراق) ঃ বারবার্ 'চিকিৎসক'দের একটি পরিবারের নাম যাহার পূর্বপুরুষ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (মৃ. ১০৭০/ ১৬৫৮-৬০) সূস ত্যাগ করিয়া ফেয (ফস)-এ বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। চিকিৎসাকার্যে তিনি নিশ্চয়ই নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ পূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ফলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ করেন। ইব্ন শাকরূন (দ্র.) ছিলেন জনৈক আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আদার্‌রাক-এর শিষ্য; সম্ভবত এই আহ্মাদ ছিলেন উপরোল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র; কিন্তু পরিবারের সর্বাপেক্ষা পরিচিত সদস্য ছিলেন এই আহমাদের পুত্র আবূ মুহাম্মাদ আবদুল-ওয়াহ্হাব ইব্ন আহ্মাদ (জ. আনু. ১০৭৭/১৬৬৬; মৃ. ২৮ সাফার, ১১৫৯/২২ মার্চ, ১৭৪৬), যিনি মাওলায় ইস্মাঈল (১০৮২-১১৩৯/ ১৬৭২-১৭২৭)-এর সহযোগী ছিলেন। আবদুল ওয়াহ্হাব ঐতিহ্যগত শিক্ষাও লাভ করেন এবং পদ্য রচয়িতা হিসাবে কিছু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বস্তুত নৈতিক-দার্শনিক শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা ও মেক্‌নেস-এ সমাহিত দরবেশদের প্রশংসায় রচিত একটি কাসীদা (মানজূমা ফী মাদহি' সালিহী মিক্‌নাসাতুয-যায়তূন) ব্যতীত তাঁহার জীবনীকারগণ প্রধানত ঔষধের সহিত সম্পর্কিত তাঁহার কয়েকটি পুস্তকের উল্লেখ করেন। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) সর্বপ্রথম আল-আন্তাকীর নুয্‌হা-র একটি ভাষ্য ও দুইটি উরজুযা (রাজায্ ছন্দে রচিত কবিতা)। ইহাদের একটি ইব্ন সীনা-র উরজুয়ার পরিপূরক ও অপরটি বসন্তরোগ বিষয়ে রচিত (এইগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়); (২) অতঃপর পুদিনা (নানা)-র সূক্ষ্ম গুণাবলী সম্পর্কে রচিত. ৩১ শ্লোকের একটি কাসীদা যাহা পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (রাবাত ডি ১৫৮ ও ডি ১১৩১); ইহার আংশিক অনু. Renand, Medicine, 104-05 & Lakhdar, ১৮৯-এ বিদ্যমান); (৩) সর্বশেষে উপদংশ-রোগ (হাব্বুল ইফ্‌রান্‌জ) সম্পর্কে রচিত ১৭৯ শ্লোকের একটি উরজুযা যাহা বহুলাংশে আল-আন্তাকী-র নুয্‌হা ও ইব্ন শাক্‌রূন কর্তৃক ভারতীয় লতাবিশেষ (Sarsa-parilla) সম্পর্কে (কিল-উশ্‌বাল-হিন্দিয়্যা) লিখিত পুস্তিকার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ইহার মূল পাঠ ও Renaud ও Colin-এর অনু. Mal franc (আরবী মূল পাঠ ২৫-৩২; অনু ৮১-৯৪)-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্য একজন আদাররাক ও (যাঁহাকে আহমাদ বলা হয়) সীদী মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (১১৭১-১২০৪/১৭৫৭-৯০)-এর চিকিৎসক হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন যায়দান, ইত্‌হাফ আলামিন্-নাস, রাবাত ১৩৪৭-৫২/ ১৯২৯-৩৩, ৫খ., ৪০০-০৭; (২) কাদিরী, নাশ্‌রুল-মাছানী, (লিথো.) ফেয্ ১৩১০, ১খ., ২২৬, ২খ., ২৫১; (৩) কাত্তানী, সালওয়াতুল-আনফাস, ফেয ১৩১৬/ ১৮৯৮, ২খ., ৩৪; (৪) আকান্‌সূস, আল-জায়শুল আরাম্‌রাম, (লিথো.) ফেয ১৩৩৬/১৯১৮, পৃ. ৯৪ প.; (৫) Levi-proovencal, Chorfa, পৃ. ৩১০-১১; (৬) H.P.J. Renaud, Medecine et Medecins marocains, in AIEO Alger, ৩খ. (১৯৩৭), ৯৯-১০৬; (৭) ঐ লেখক ও G. S. Colin, Documents marocains pour servir a l'histoire du mal franc, "প্যারিস ১৯৩৫, পৃ. ৩১-৫ ; (৮) M. lakhdar, La vie litteraire au Maroc, রাবাত ১৯৭১, পৃ. ১৮৭-৯০ এবং উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী।

Ed. (E.I.[2] Suppl.) / ডঃ মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

আদাল (أدال) ঃ পূর্ব আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম যাহা মুসলমান ও আবিসিনিয়ার খৃষ্টানদের মধ্যকার যুদ্ধগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। 'আল-মাক্‌রীযী (আল্-ইলাম বিআখ্‌বারি মান্ বিআরদিল- হাবাশাতি মিন মুলূকিল-ইসলাম, কায়রো ১৮৯৫, পৃ. ৫) দক্ষিণ ও পূর্ব আবিসিনিয়ার নিম্নলিখিত সাতটি ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এইগুলিকে মামালিক্ বিলাদ যায়লা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ঃ আওফাত (সচরাচর রূপ ঈফাত), দাওয়ারো, আরবানী (আরাবায়নয়া, আরাবাব্‌নী), হাদীয়া, শার্‌খা, বালী ও দারা। আবিসিনীয় ইতিহাস হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রের কথাও জানা যায়, যেইগুলি উপরোল্লিখিত রাষ্ট্রগুলিরই অনুরূপ এবং আদাল উহাদের অন্যতম।—আদাল (আদাল) ঐ রাষ্ট্রগুলির পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ও বর্তমানে 'Cote Fraucaise de Somalis' নামে পরিচিত। অধিবাসীরা আংশিকভাবে সোমালী, আংশিকভাবে আফার (দ্র. দাল্‌কালী)। আবিসিনীয় নৃপতি আমদা সেয়োন (১৩১৪-৪৪) ও মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধসমূহের প্রসঙ্গে উহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। আমদা সেয়োনের যায়লা অভিযানকালে (১৩৩২) আদালের রাজা তাঁহাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে গিয়া নিহত হন। আরবী গ্রন্থসমূহে আদাল-শাসকদের উপাধি আমীর এবং পরবর্তী কালে ইমাম বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ইথিওপীয় ইতিহাসে তাঁহাদের উপাধি নেগুস 'রাজা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। পঞ্চদশ শতকে আদাল ছিল ঈফাতের (দ্র. আওফাত) অংশ; পঞ্চদশ শতকে আদালের আমীর ঈফাতে শাসন করিতেন এবং তাঁহার রাজধানী ছিল হারারের পূর্বে অবস্থিত দাকারে। রাজা যারআ ইয়াকূব (১৪৩৪-৬৮) ও বায়েদা মারয়াম (১৪৬৮-৭৮)-এর আমলে আবিসিনিয়া ও আদালের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে উহাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ইহার ফলাফল ছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ। আদাল প্রায়ই উহার আরও পশ্চিমের এলাকাগুলির মুসলমানদের জন্য আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হইত। আবিসিনীয়রা প্রায়ই আদাল পর্যন্ত উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। মুসলিম লেখকগণ (আল-মাক্‌রীযী ও 'আরাব ফাকী 'হ-ফুতূহুল-হাবাশা) আদালের উল্লেখ করেন নাই, অবশ্য যদি 'আদালু'ল-উমারা দ্বারা উহাকে বুঝানো না হইয়া থাকে (আল-মাক্‌রীযী, পৃ. স্থা. ২) তাহারা কেবল ঐ অঞ্চলে যায়লা' সালতানাতের উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু আদালের রাজা মুহাম্মাদ ইব্ন আরবী বদলায় (Perruchon, Chroniques do Zar'a Ya'eqob et de Ba'eda Maryam, 131) যায়লা'-এর সুলতানদের বংশেরই ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সা'দুদ-দীনের পৌত্র, যাঁহার নামে এই বংশ ও এলাকা পরিচিত (বার্‌র সাদুদ-দীন)। সা'দুদ-দীন ১৩৮৬ খৃ. হইতে ১৪১৫ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেন, আবিসিনিয়ার রাজা য়েশাক' (১৪১৪-২৯)-এর সঙ্গে যুদ্ধে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। 'আদাল' ও 'যায়লা' সাম্রাজ্য' প্রায় সমার্থক এবং উহাদের ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (তু.

যায়লা')। ষোড়শ শতাব্দীর অবস্থা সম্পর্কে আহমাদ গ্রানও দ্র.। এইসব দেশের পরবর্তী ইতিহাসে মুসলিম সোমালী ও 'আফার-এর সঙ্গে যুদ্ধ অপেক্ষা গাল্লাদের সঙ্গে উহাদের যুদ্ধই বেশি গুরুত্ব লাভ করে। গাল্লারা ১৫৪০ সাল হইতে আবিসিনিয়ার মুসলমান ও খৃস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। ইহার পরও ইতিহাসে আদালের কয়েকবার উল্লেখ পাওয়া যায়, এমনকি উনিশ শতকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর আবিসিনিয়ার উপকূলীয় ভূখণ্ড দখলের পূর্বে শোয়া-র রাজা সাহ্‌লা সেলাসী 'আদাল-রাজ' উপাধি ধারণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Cerulli, Documenti Arabi per la Storia dell'Etiopia, Mem. Lin., 1931, fasc. ii; (২) ঐ লেখক, L'Etiopia del secolo XV in nuovi document i storici, Rivista Africa Italiana, 1933, 80-98; (৩) ঐ লেখক, Studi Etiopici, I : La lingua e la storia di Harar, Rome 1939, 15-6; (৪) ঐ লেখক, Il Sultanato dello Scioa nel Secolo XIII secondo un nuovo documento storico, Rassegna di Studi Etiopici, 1941, 28-9; (৫) J. S. Trimingham, Islam in Ethiopia, London 1952.

E. Littmann (E.I.[2]) / এ মতীন খান

আদালত খান, মুন্‌শী (عدالت خان، منشى) ঃ 'আদালাত খান, মুনশী ১৮৩৪-১৮৮৪, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাষাবিদ শিক্ষক। পিতা মুনশী জুলফিকার (যুল-ফিকার) উক্ত কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। আদালত খান কলিকাতা মাদরাসা ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬২ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে হায়ার টেক্সট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দীর্ঘকাল তিনি বোর্ড অব এগযামিনার্স-এর অফিসে মুনশীর দায়িত্ব পালন করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজই পরবর্তী কালে বোর্ড অব এগযামিনার্স নামে আখ্যায়িত হয়। আদালত খান ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও সেনা বিভাগীয় লোকদের প্রাচ্যদেশীয় ভাষা শিক্ষা দান করিতেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, ফারসী, উর্দূ, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইংরেজীতে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ও বৃটিশ মিউজিয়ামে এখনও তাঁহার রচিত বেশ কয়েকটি বইয়ের কপি সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইংল্যান্ডেও তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল। ১৮৬৪ খৃ. তাঁহার প্রথম গ্রন্থ (ইক্'দ-ই মানজূম-এর ইং. অনু.) প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি, তুলসী দাসের রামায়ণ, প্রেম সাগর, বাগ ও বাহার, ইক্দ-ই গুল, গুলিস্তাঁ প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি ইংরেজী অনুবাদ করেন। আদালত খানের স্বলিখিত বইগুলির মধ্যে হিন্দুস্তানী, ফারসী ও বাংলা ভাষার এক হাজার শব্দের একটি শব্দকোষ এবং হায়ার স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার জন্য আবগারী কর সম্পর্কিত একটি বই ছিল। আদালত খান তৎকালীন সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১, ১২৯।

(সংকলিত)

আদালয়া (দ্র. আন্তালয়া)।

আদালা (দ্র. 'আদ্‌ল')।

'আদাস (عدس) ঃ (আরবী, বালাস ও বুল্‌সুন-এরও ব্যবহার আছে) অর্থ মসুর বা মসুরীর ডাল। ইহার চাষের জন্য শুষ্ক আবহাওয়া ও কোমল বালুকাময় যমীন উপযোগী। প্রাচ্যদেশে ইহার চাষ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। মিসরবাসীদের ইহা প্রিয় খাদ্য। ইব্‌নুল আওওয়াম ঘোষণা করেন, ইসলামী খিলাফাতে পশ্চিম দেশগুলিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইব্‌ন বাত্‌তূতা সাধারণ মসুর ব্যতীত তিক্ত মসুর, নাব্‌তী মসুর ও জলজ মসুরের উল্লেখ করেন। ইহার প্রলেপ প্রদাহের উপশম করত শান্তি দান করে। ইহা মাত্রাতিরিক্ত আহার করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে এবং পাণ্ডুরোগ, অবসাদ, চর্মরোগ, ক্ষত ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আল-কুরআন, ২ ঃ ৬১-এ ইহার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল 'আওওয়াম, কিতাবু'ল-ফালাহ', ২খ., ২৫, ৬৯ প.; (২) ইব্‌নুল-বায়তার, আল-জামি, কায়রো ১২৯১ হি., ৩খ., ১১৭ প.; (৩) আবূ মান্‌সূর মূফিক, কিতাবু'ল আবনিয়া, সং, সেলিগম্যান (Seligmann), ২খ., ৪৯; (৪) A. V. Kremer, Aegypten ১৮৬৩ খৃ., ১খ., ২০৩; (৫) R. Hartmann, Reiso des Fr. Barnime, পৃ. ২১৯ (নূবিয়া)।

Hell (E. I.[2]) / আবদুল হক ফরিদী

আদিগে (দ্র. চারকিস)।

আল-'আদি'দ-লিদীনিল্লাহ (العاضد لدين الله) ঃ মিসরের একাদশ ও সর্বশেষ ফাতিমী খলীফা। তাহার প্রকৃত নাম আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন য়ূসুফ এবং সম্পর্কের দিক হইতে তিনি ছিলেন খলীফা আল-হাফিজ-এর পৌত্র। খালীফা আল-ফাইয-এর সিংহাসনারোহণের দিনেই তাঁহার পিতা উযীর 'আব্বাস ইব্‌ন আবি'ল-ফুতূহ কর্তৃক নিহত হন। আল-ফাইয ছিলেন আল-'আদি'দ-এর চাচাত ভাই। তিনি ছিলেন রুগ্ন। সাড়ে এগার বৎসর বয়ক্রমকালেই তিনি পরলোক গমন করিলে আল-'আদি'দ তাহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। তিনি ১৭ রাজাব, ৫৫৫/২৩ জুলাই, ১১৬০ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরাক্রমশালী মন্ত্রী আসসালিহ তালাই (দ্র.)-এর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হন, যিনি খলীফার বয়প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁহার পক্ষে ছয় বৎসরেরও অধিক কাল যাবত মিসর শাসন করিতেছিলেন। আল-'আদি'দ প্রকৃতপক্ষে ২০ মুহাররাম, ৫৪৬/৯ মে, ১১৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং এই শিশু খলীফার শাসনামলকে তাঁহার নিজের সক্রিয় শাসনামল বলা যায় না। এই ব্যাপারে 'আরব লেখকদের মধ্যেও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয় এবং তাহারা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যর্থ বিদ্রোহের জন্য খলীফাকে দায়ি করিয়াছেন। তবে বলা যায়, তদানীন্তন শোচনীয় ঘটনা প্রবাহের আবর্তে তিনি অসহায় দর্শক মাত্র ছিলেন এবং পরিণামে তিনি নিজেই উহার শিকার হইয়াছিলেন। স্পষ্টতই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সংগোপনে উচ্চাভিলাষী মহলের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকার কথা আমাদের জানা নাই বলিলেই চলে। তবে তাহারা যে প্রভাবশালী ছিল ইহার ইঙ্গিত বিদ্যমান। উক্ত মহলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবণতা কালক্রমে পরিদৃষ্ট হইয়া

উঠে। তাহারা বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত থাকিত এবং তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিংবা নিজকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। ফাতিমী বংশের শাসনামলের যবনিকাপাত সত্যই করুণ।

তরুণ খলীফাকে সহজেই হাত করার উদ্দেশে ও তাঁহার আনুগত্যের প্রত্যাশায় তালাই নিজ কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি (তালাই) সদাসর্বদা যে পরিণতির ভয়ে ভীত ছিলেন, উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি ১৯ রামদান, ৫৫৬/১১ সেপ্টেম্বর, ১১৬১ সাল গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। সম্ভবত এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খলীফা অবগত ছিলেন, কিন্তু তালাই-এর হত্যায় খলীফা শত্রুমুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি মৃত তালাই-এর পুত্র রুযযীক (দ্র.)-কে মন্ত্রিত্বে আসীন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রুযযীক তাহার বিশেষ ক্ষমতার একটিও ত্যাগ করিতে রাযী না হওয়ায় খলীফা নিজেকে রুযযীকের হাত হইতে মুক্ত করার জন্য দক্ষিণ মিসরের জনৈক শাসনকর্তা শাওয়ার (দ্র.)-কে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশে তাঁহার সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। শাওয়ার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ৯ রাবী-১, ৫৫৮/ফেব্রুয়ারি ১১৬৩ সালে কায়রো দখল ও ক্ষমতা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। খলীফা শীঘ্রই অনুভব করিতে পারিলেন, তিনি একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। কারণ নূতন মন্ত্রীও তাঁহার পূর্বসূরীর মতই তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেছিল। শাওয়ার অতি শীঘ্রই দিরগাম (দ্র.) নামক তাহার একজন কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন এবং দিরগাম নিজেই রামাদান ৫৫৮/ আগস্ট ১১৬৩ সালে মন্ত্রী হইয়া বসেন। সমসাময়িক লেখক 'উমারা মন্তব্য করিয়াছিলেন, ঐ সময় যিনিই তাঁহার ভাইয়ের আস্থা অর্জন করিয়াছেন তিনিই তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। তাঁহার করুণ উক্তির যথেষ্ট যুক্তি ছিল। ইহার পরেই ঘটে সেই মর্মন্তুদ ঘটনা যাহা এই বংশের পতন ডাকিয়া আনে। শাওয়ার পালাইয়া যাইতে সক্ষম হন এবং আলেপপোর যাঙ্গী নৃপতি নূরু'দ-দীন-এর রাজদরবারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মিসরে সুন্নী মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ও ইসলামী ঐক্যের অভিলাষী নৃপতি শাওয়ারের সাহায্যে আগাইয়া আসিতে দ্বিধা করেন নাই। এই যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব দেন শীরকূহ (দ্র.) নামক 'একজন নির্ভীক বীর সেনাপতি'। তিনি আয়্যূবী বংশের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা সালাহুদ-দীনকেও এই অভিযানে সঙ্গী করিয়াছিলেন। দিরগাম পরাজিত ও নিহত হন এবং শাওয়ার রামাদান ৫৫৯/ আগস্ট ১১৬৪ সালে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

শীরকূহকে লইয়া অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু একথাও সত্য, ঐ সব অসুবিধা সৃষ্টির জন্য তাহাকে দায়ি করা যায় না। শাওয়ার শী'আদের বিরুদ্ধে সুন্নীদের সাহায্য প্রার্থনা করেন, অথচ এক সময় তিনি শী'আদেরই মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা আরও জঘন্য রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি মিসর হইতে শীরকূহ বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য ১ম এমালরিক (Amalric I)-কে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান। ইহার স্বল্পস্থায়ী ফলাফল সকলেরই জানা। শীরকূহ শর্তাধীনে বিলবেতে আত্মসমর্পণ করেন এবং সিরিয়ায় ফিরিয়া আসেন। ফ্রাঙ্করা অল্পদিনের জন্য কায়রো দখল করে এবং ইহা প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইয়া শাওয়ার ফুসতাতে আগুন ধরাইয়া দেন। ভীত-সন্ত্রস্ত উযীর ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্যদিকে তখনও পর্যন্ত ক্ষমতাশূন্য খলীফা নিজেই নূরুদ-দীন-এর কাছে সাহায্যের আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং এইভাবেই তাঁহার আসন্ন পতনের পথ আরও প্রশস্ত করেন।

ইহা ছিল শীরকূহর তৃতীয় ও চূড়ান্ত অভিযান। এই অভিযানে শাওয়ার পরাজিত হন এবং ১৭ রাবী-১, ১৫৬৪/১৮ জানুয়ারি, ১১৬৯ সালে নিহত হন। শীরকূহ পুনরায় মন্ত্রিত্ব দখল করেন, কিন্তু তাহা মাত্র দুই মাসের জন্য, কারণ ২১ জুমাদা'ছ-ছানী /২৩ মার্চ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ভাতিজা সালাহুদ-দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

সালাহুদ-দীন সাহসিকতার সহিত অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করেন, এমনকি তিনি খোদ রাজধানীর রাজপথেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার এই সাহসিকতার জন্যই ফাতিমী, সূদানী ও আরমেনীয় বাহিনীর শেষ সৈন্যটিও বিতাড়িত হয়। অবশেষে এক শুভ দিনে উদাসীন পরিবেশে কায়রোয় বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফার নাম ঘোষণা করা হয়। পারস্য বংশোদ্ভূত আল-খাবুশানী নামক একজন ধর্মতত্ত্ববিদ এই কাজ সম্পন্ন করেন। ইহার তিন বৎসর পরেই তাঁহার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সালাহুদ-দীন তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। সম্ভবত খলীফা 'আদি'দ কখনই তাঁহার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে পারেন নাই। 'আব্বাসী খিলাফাতের ঘোষণার অল্প কয়েক দিন পরেই ১০ মুহাররাম, ৫৬৭/১৩ সেপ্টেম্বর, ১১৭৯ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখনও তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর হয় নাই।

অতএব, 'আদি'দ কোনক্রমেই তাঁহার বেশ কয়েকজন পূর্বসূরী পর্যায়ের খলীফা ছিলেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন, শাওয়ারের নেতৃত্বে একদল ফ্রাঙ্ক দূতকে তিনি দরবারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কগণকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরস্থিত 'বিভিন্ন প্রাণী, পাখি ও মনুষ্য আকৃতি সম্বলিত' রেশম ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরি বিরাট পর্দা দ্বারা বিভক্ত বিশাল হলঘরে নেওয়া হইয়াছিল। এই পর্দা ঝুলানোর পূর্বে শাওয়ার তিনবার সিজদা করিয়াছিলেন এবং তৃতীয়বারে অত্যন্ত ভক্তি-বিনয়াবনতভাবে। হঠাৎ এই সুবিশাল পর্দা উত্তোলিত হইলে স্বয়ং খলীফাকে মূল্যবান পাথর খচিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা গেল। তাঁহার মুখমণ্ডল ছিল আবৃত এবং তাঁহার ডান হাতের দস্তানা অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উন্মোচন করা হয়। ফ্রাঙ্ক রাজদূতগণকে অবহিত করা হয়, খলীফা বয়সে তরুণ, সবেমাত্র তাঁহার দাঁড়ি গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার গায়ের রং কাল এবং অবয়ব স্থূলকায়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ৩৩৮; (২) মাকরীযী, খিতাত, বূলাক, ১খ., ৩৫৭; (৩) ইব্ন তাগরীবিরদী, নুজূম, কায়রো, ৫খ, ৩৩৪ প.; (৪) H. Derenbourg, Oumara du yemen; (৫) Schlumberger, Campagnes du roi Amaury ger; (৬) G. Wiet, Inscr, du mausolee de Shafi'i, BIE, ১৫ খ., ১৬৯-১৭১; (৭) ঐ, Precisde Phistoire d'Egypte,

২খ., ১৯৬-১৯৮; (৮) ঐ, Hist. de la nation egyptienne, ৪খ., ২৮৯-৩০২।

C. Wiet (E.I.[2]) / শেখ আবদুল গাফফার

আদিভার (عبد الحق عدنان) ঃ আবদুল হাকক আদ্নান আধুনিক তুর্কী গ্রন্থকার, পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ (খৃ. ১৮৮২-১৯৫৫)। ইস্তাম্বুলের বিশিষ্ট 'উলামা পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা আহমাদ বাহাঈ যখন গ্যালিপলি (Gallipoli)-র কাদী ছিলেন তখন 'আদনান আদিভার তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। তিনি হামীদী পুলিশ কর্তৃক হয়রানির সম্মুখীন হন। ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি ইউরোপে পলায়ন করেন এবং প্যারিস ও যুরীখে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি বার্লিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বার্লিনে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদে সহকারীরূপে নিয়োজিত হন। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তুর্কী সংবিধান পুনর্বহাল হইলে তিনি তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেন, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদের ডীন (Dean) পদে বরিত হন (১৯০৯-১১)। শক্তিশালী ঐক্য ও প্রগতি সংঘ (Committee of Union and Progress) সংক্ষেপে Cup-এর বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে তিনি রেড ক্রিসেন্ট (Red Crescent— হিলাল আহ্‌মার) ও স্বাস্থ্য বিভাগের পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি বিশিষ্ট লেখিকা খালিদা এদীব (আদীব) [দ্র.]-কে উকীলের মধ্যস্থতায় ১৯১৭ সালে বিবাহ করেন। আর্মিস্টিস-উত্তর (Post-armisticc) উছমানী আইন সভার সভ্য (Deputy) নির্বাচিত হওয়ার পর ড. 'আদ্নান (১৯৪০ সালে পারিবারিক নাম 'আদিভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন)। বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিশ্চিত গ্রেফতারি ও নির্বাসন দণ্ড এড়াইবার মানসে গোপনে সস্ত্রীক ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন এবং আঙ্কারার জাতীয়তাবাদী সরকারে যোগদান করিয়া স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও তৎকালীন আইন সভার ডেপুটি স্পীকার হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন। পরে তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী কতিপয় জেনারেল ও প্রাক্তন Cup সদস্যদের সহিত মিলিত হইয়া 'প্রগতিশীল প্রজাতান্ত্রিক দল' (Progressive Republican Party) গঠন করেন (তুর্কী ভাষায় Terakki perver Djumhuriyyet Firkasi দ্র.)। ইহা ছিল মুস্তাফা কামাল পাশার বিরোধী প্রধান দল (১৯২৪)। ১৯২৬-এর গ্রীষ্মকালে মুসতাফা কামাল পাশাকে হত্যার ইউনিয়নপন্থীদের একটি গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া পড়িলে কতিপয় ব্যক্তি গ্রেফতার হন। ড. 'আদনান কয়েক মাস ইউরোপে অবস্থানের সময় অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিচার হয়, যদিও তিনি বেকসুর খালাস পান। তিনি ও তাঁহার পত্নী ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। তাঁহারা ইংল্যান্ড ও পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সে বসবাস করিতে থাকেন। প্যারিসে তিনি Ecole de Langues Orientales Vivantes বিভাগে jean Deny-এর সহিত প্রভাষক হিসাবে কাজ করেন (১৯২৯-৩৯)।

তুরস্কের সংস্কারপরায়ণ শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৮-৪৬) হাসান আলী য়ুজেল (Hasan Ali Yujel) ইসলামী বিশ্বকোষের তুর্কী সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তিনি 'আদনান আদিভারকে ইহার প্রধান সম্পাদক নিয়োগ করেন (১৯৪০)। তিনি ইসলাম এনসাইক্লোপেডিসি (Islam Ansiklopedisi)-এর সচিবালয় সংগঠন করেন এবং তুর্কী আইন সভার একজন নির্দলীয় সদস্য (১৯৫০-৫৪ খৃ.) হিসাবে সাফল্যজনকভাবে এই প্রকল্পটি প্রবর্তন ও পরিচালনা করেন। ১৯৫৫ খৃ.-এর ১ জুলাই ইস্তাম্বুলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তুরস্কে বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকটি 'আদনান আদিভার-এর প্রধান সাহিত্যকর্ম বলিয়া স্বীকৃত। ফ্রান্সে নির্বাসন অবস্থায় তিনি আলোচ্য গ্রন্থটি (La science chez les Turcs ottomans, Paris 1939) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি Osmanli Turklerinde ilim (Istanbul 1943) নামকরণ করিয়া উহার সংশোধন ও পরিবর্ধন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি আলোচ্য বিষয়ে প্রথমবারের মত ব্যাপক তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত করেন। ফস্ট (Faust, tahlil Tecrubesi, ইস্তাম্বুল ১৯৩১) ও ইতিহাসে বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা (Tarih boyunca ilim ve din, two vols. Istanbul 1944), এই দুইটি গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার অবশিষ্ট সাহিত্যকর্ম ছিল সাধারণ সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধাদি যাহা তিনি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধাদির মধ্যে কতিপয় নিম্নলিখিত নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়ঃ Bilgi Cumhuriyeti haberleri (1945), Dur, dusun (1950) ও Hakikat pesindeki emeklemeler (1954).

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Yeni ufuklar, বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫৫; (২) Halide Edib Adivar, Doktor Adbulhak. Adnan Adivar, Istanbul 1956; (৩) Tahir Alangu, 100 Unlu Turk buyugu, ii. Istanbul 1974, 1259-65.

Fahir Iz (E.I.[2] Suppl.) / আ. ফ. ম. আমীনুল হক

'আদিয়্যি ইব্ন আবিয্ যাগ্বা (عدى ابن ابى الزغباء)ঃ (রা), প্রকৃত নাম সিনান ইব্ন সুবায়া ইব্ন ছালাবা ইব্ন রাবীআ আল-জুহানী। জুহায়না গোত্র বাবু'ন-নাজ্জার-এর মিত্র গোত্র। তিনি বছর ও পরবর্তী জিহাদসমূহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূল কারীম (স) বছরের যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁহাকে বাস্বাস ইব্ন 'আমরের সঙ্গে আবূ সুফয়ানের কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে উপনীত হন। 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল বার্র-আল ইসতী'আব, নাদা প্রকাশনালয়, মিসর তা.বি., ৩খ., ১০৫৯-৭০; (২) ইবনুল আছীর, উসদুল গা'বা, তেহরান ১২৮৬ হি., পৃ. ৩৯৪; (৩) ইব্ন হাজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৬৯।

ড. মুজিবর রহমান

'আদিয়্যি ইব্ন 'আমীরা (عدى بن عميرة) ঃ ইব্ন ফারওয়া ইব্ন যুরারা আল-কিন্দী (রা) একজন সাহাবী। তাঁহার উপনাম ছিল আবূ যুরারা, মতান্তরে আবূ ওয়াফ্রা। তিনি আল-জাযীরায় বসবাস করিতেন এবং সেইখানেই ইন্তিকাল করেন। ভিন্নমতে তিনি ৪০ হিজরীতে কূফায় ইন্তিকাল করেন। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহ বিদ্যমান। ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন, 'আদিয়্যির ইসলাম গ্রহণের কারণ তিনি নিজেই এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "আমাদের দেশে ইব্ন শাহলা' নামে এক ইয়াহূদী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "আমি আল্লাহর কিতাবে পাইয়াছি, জান্নাতুল ফিরদাওস-এর অধিবাসী এমন একটি দল হইবে যাহারা তাহাদের চেহারাসমূহের উপর তাহাদের প্রচুর উপাসনা চিহ্ন বহন করিবে।"

'আদিয়্যি বলেন, 'আল্লাহর শপথ ! অচিরেই আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেয়ে, হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তখন ইব্ন শাহলা-এর কথা আমার মনে পড়িল। সুতরাং আমি উক্ত নবীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতঃপর দেখিলাম তিনি ও তাঁহার সহচরগণ সকলে তাঁহাদের চেহারার উপর সিজদা করিতেছেন। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ১২৮৬ হি., ৩খ., ৩৯৬; (২) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১৬৫, নং ৬৭৭৫; (৩) ইব্ন 'আবদিল বার্র, আল-ইস্তী'আব, উক্ত ইসাবার হাশিয়ায়, পৃ. ১৪৩।

ড. মুজিবুর রহমান

'আদিয়্যি ইব্ন শারাহ্ীল (عدى بن شراحيل) ঃ (রা), সাহাবী ছিলেন এবং বানূ 'আমের ইব্ন যুহল ইব্ন ছালাবা গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি রাবাযা নামক স্থানে বাস করিতেন। অতঃপর রাসূল কারীম (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া নিজের ও গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেন। রাসূল কারীম (স)-এর নিকট নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে লিখিতভাবে তাহা দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতীআব মিসর, তা. বি; (২) ইবনুল আছীর, উসদুল, গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি, ৩৯৫; (৩) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি. ২খ., ৪৭০।

ড. মুজিবর রহমান

'আদিয়্যি ইব্নুর রাবী' (عدى بن الربيع) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা আবুল 'আস ইবনুর রাবী'-এর ভ্রাতা। সিয়ার গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে, রাসূল কারীম (স)-এর কন্যা যায়নাবকে যখন তিনি মদীনায় পৌঁছাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনই হাব্বার ইব্নুল আসওয়াদ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলে তিনি তাহাকে (হাব্বারকে) শরাঘাতে হত্যা করেন এবং 'আদিয়্যি বলেন (কবিতায়) ঃ

"আমি হাববার ও তাহার গোত্রের ইতর জনগণের ব্যাপারে আশ্চর্য হইয়া যাই, কেননা তাহারা আমার নিকট হইতে মুহাম্মাদ (স)-এর কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে চায়। আর আমি যখন হিন্দী (ভারতীয়) তরবারিসহ তাহাদের সহিত মিলিত হই তখন আমি তাহাদের দুর্বল প্রকৃতির লোকদেরকে ভয় করি না।"

'আদিয়্যিকে ঐ সকল কবি সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে যাঁহারা কবিতায় রাসূল কারীম (স)-এর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, রেনেসাঁ প্রকাশালয়, মিসর, ৩খ., ১০৬০-১০৬১; (২) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., পৃ. ৩৯৪-৬; (৩) ইব্ন হাজার, আল-ইস'াবা, মুস্তাফা মুহাম্মাদ প্রকাশনালয়, মিসর ১৯৩৯ খৃ., ২খ., ৪৭০, ৪৭১।

ড. মজিবুর রহমান

আল-'আদিয়াত (العديت) ঃ কুরআন মাজীদের ১০০ সংখ্যক সূরা, ১ রুকূ' ও ১১ আয়াত সম্বলিত, মক্কায় আনাস (রা) ও কাতাদা (রা)-এর মতে মদীনায়] অবতীর্ণ। এই সূরার প্রথম আয়াতেই 'আদিয়াত শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। 'আদিয়াত (এক বচন عادية) শব্দের অর্থ 'যাহা বেগে ধাবমান'।

এই সূরার সূচনাতে মুজাহিদের বাহন শত্রু ব্যূহের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বের (বা উষ্ট্রের) শপথ রহিয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে, মানুষ তাহার প্রভু আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং ধন-সম্পদের আসক্তি তাহার অত্যধিক। আরও বলা হইয়াছে, কিয়ামতের দিন কবরে যাহা আছে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবে, অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশিত হইবে, আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক অবহিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দা. মা. ই.; (২) খাযিন; (৩) লিসান; (৪) ইতকান; (৫) Y. A. P. 1173.

মোঃ ফেরদাউস খান

আদিয়ামান (آديامان) ঃ পূর্বে হিসন মানসূর বা হিসন-ই মানসূর (আধুনিক তুর্কী বানান Husnumansur)। Cuinet-এর মতে ইহাকে কোকূন (Kokun)-ও বলা হইয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়ার একটি ক্ষুদ্র শহর। ইহা মালাতিয়ার সানজাক, বর্তমানে মালাতিয়া প্রদেশ (বিলায়েত)-এ অবস্থিত এবং একই নামীয় কাদার রাজধানী (পূর্বে ইহা মামূরাতুল 'আযীয বিলায়েতের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। ৩৭-৪৫ উত্তর অক্ষাংশে ও ৩৮-১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ইহার অবস্থান। অতীতে লোকসংখ্যার বর্ণনায় গরমিল পরিলক্ষিত হয়। Encyclopaedia of Islam (প্রথম সংস্করণ)-এর বর্ণনা অনুসারে লোকসংখ্যা ১০,০০০, অধিকাংশই আর্মেনীয়। সামীর বর্ণনা অনুসারে লোক সংখ্যা ২৫,০০০, ইহাদের মধ্যে ১১৫৫ জন খৃষ্টান। 'আলী জাওয়াদের এক বর্ণনায় ১১৫০, অপর বর্ণনায় ২৫০০ জনের অধিক। ইহার অর্ধাধিক কুর্দী। কুইনে (Cuinet)-এর বর্ণনানুসারে ২০০০ (সমগ্র হিসন-ই মানসূর কাদায় ৪২,১৩৪)। ১৯৪৫ সালে লোকসংখ্যা ছিল ১০,১৯২।

উমায়্যা আমীর মানসূর ইবন জাওয়ানার নামানুসারে হিসন মানসূর নামকরণ করা হইয়াছে। খলীফা মানসূর 'আব্বাসীর আদেশে ১৪১/৭৫৮ সালে তিনি নিহত হন। পরবর্তী সময়ে হারূনুর রাশীদ ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া স্থানটিতে একটি সেনা চৌকির ব্যবস্থা করেন। এইভাবে হিসন মানসূর বা আদিয়ামান নিকটবর্তী প্রাচীন শহর পেরী (Perre)-র স্থান দখল করিয়া লয়। নালা ও প্রস্তর-নির্মিত কবরাদি দ্বারা পেরীর অবস্থান এখনও

চিহ্নিত করা রহিয়াছে। পরবর্তী সময়ে হিসন মানসূরের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ইহা অর্তুকীয়দের অধিকারভুক্ত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ, ১৯২; (২) ইয়াকূত, ২ খৃ., ২৭৮; (৩) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, ৬০১; (৪) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাতনামা, ৩ খৃ., ১৬৯; (৫) সামী, কামূসুল 'আলাম, ৩খ., ১৯৬২; (৬) আলী জাওয়াদ, তারীখ ওয়া জুগরাফিয়া নুগাতী, ৬ খ., ৩৩১; (৭) C. Ritter, Erdkunde, 10, 885; (৮) Humann and puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, 139 পৃ.; (৯) Le Strange, 123; (১০) ঐ লেখক, Palestine Under the Muslims, 454.

F. Taeschner (E. I.[2]) / মাহবুবুর রহমান ভূইয়া

আদিল (দ্র. 'আদল)

আল-'আদিল (العادل) ঃ দুইজন আয়্যূবী সুলতানের উপাধি ঃ (১) আল-মালিকুল 'আদিল আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যুব (الملك العادل ابوبكر محمد بن ايوب) সুলতান সালাহুদ-দীন (দ্র.)-এর ভ্রাতা, সহকারী ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। সায়ফুদ্দীন (ধর্মের তরবারি) ছিল তাঁহার সম্মানসূচক উপাধি। ক্রুসেডারগণ তাঁহাকে বলিত সাফাদীন (Saphadin)। তিনি মুহাররাম ৫৪০ / জুন-জুলাই ১১৪৫ সালে, মতান্তরে ৫৩৮/১১৪৩-৪৪ সালে দামিশ্ক কিংবা বা'লাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই হিসাবে তাঁহার যশস্বী ভ্রাতা অপেক্ষা ছয় কিংবা আট বৎসরের ছোট ছিলেন।

শীরকুহ-এর তৃতীয় ও শেষ অভিযানের সময় ৫৬৪/ ১১৬৯ সালে আল-'আদিলও সালাহুদ্দীনের সঙ্গে মিসরে ছিলেন। তাঁহার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরী হয় মিসরে। ৫৬৯/১১৭৪ সালে সুলতান নূরুদ্দীন-এর মৃত্যুর পর সালাহুদ্দীনকে প্রায়ই সিরিয়ায় থাকিতে হইত বলিয়া তাঁহাকে ভ্রাতার দায়িত্ব পালন করিতে হইত। এই পদেই আল-'আদিল নিজকে একজন দক্ষ ও অনুগত প্রশাসক হিসাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন। সালাহুদ্দীনের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার বাহিনীর জন্য রসদ ও সামরিক শক্তি সরবরাহ করা ব্যতীত তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই হিসাবে তিনি মিসরের প্রকৃত সুলতান ছিলেন ('ইমাদুদ্দীন, আল-বারকুশ-শামী, ৫খ., পত্র ১১৭৭)। ৫৭৯/ ১১৮৩ সালে আলেপ্পো দখলের পর সালাহুদ্দীন প্রথম আলেপ্পোর দায়িত্ব তাঁহার পুত্র আজ-জাহির গাযীর উপর অর্পণ করেন, কিন্তু কয়েক মাস পর আল-'আদিল-এর অনুরোধেই সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্বসহ আলেপ্পোর দায়িত্ব তাঁহার নিকট হস্তান্তর করেন (Diploma in 'Imad al-Din, ঐ ১২৪-৬, তারিখ শাবান ৫৭৯) ও তাঁহার ভাগিনেয় তাকী-য়ুদ্দীন 'উমার-কে আল-আফ্দাল (দ্র.)-এর প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। যদিও আজ-জাহির আনুগত্যের সহিত পিতার এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লন, তথাপি এই ব্যাপারে তাঁহার হতাশাই খুব সম্ভব পরবর্তী কালে আল-'আদিলের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্যের ইন্ধন যোগাইয়াছে। যাহা হউক, তিন বৎসর পর ৫৮২/১১৮৬ সালে পুনরায় আল-'আদিল-এর সুপারিশেই আজ-জাহির আলেপপোতে পুনর্নিয়োজিত হন এবং আল-'আদিল সালাহুদ্দীনের পুত্র আল-আযীয 'উছমান-এর প্রতিনিধি হিসাবে পুনরায় মিসরের প্রশাসক নিয়োজিত হন। এই পদে আসীন থাকাকালেই তিনি ৫৮৩-৪/১১৮৭-৮৮ সালের অভিযানসমূহ, আসন্ন ক্রুসেড-যুদ্ধ, দক্ষিণ ফিলিস্তীন ও কারাক বিজয়ে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সালাহুদ্দীন কর্তৃক আক্কা অবরোধ (৫৮৫-৮৭/১১৮৯-৯১) পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা গৃহীত হইলে তাঁহাকে যুদ্ধজাহাজ, সৈন্য ও রসদসামগ্রী সরবরাহ করেন। পরবর্তী ফিলিস্তীন অভিযানসমূহে Richard Cocur-de-Lion-এর সঙ্গে আপোস আলোচনায়ও তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রিচার্ডের সহিত এমনই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন যে, রিচার্ডের ভগ্নী জোয়ান (Joan)-কে তাঁহার বিবাহ করা এবং তাঁহাদের যৌথভাবে ফিলিস্তীন শাসন করা উচিত বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছিল। পরের বৎসর (৫৮৮/১১৯২) তাকীয়ুদ্দীন-এর অননুমোদিত জাযীরা ও দিয়ার বাক্র অভিযানের ফলে উদ্ভূত বিশৃংখলার প্রেক্ষিতে এই দুইটি প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আল-'আদিলকে বদলি করা হয় (একই সাথে কারাক ও বাল্কার দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে)। এই পুনপুন নিয়োগ ও বদলির পশ্চাতে সালাহুদ্দীনের কোন পরিকল্পনাও থাকিতে পারে। ভ্রাতাদের মধ্যে যাহার প্রতি আস্থা ছিল, যাহার সকল্প পরামর্শই তিনি গভীর আস্থার সহিত গ্রহণ করিতেন, তিনি ছিলেন আল-'আদিল। সুতরাং ইহাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, আল-'আদিলকে তখনই সেই প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, যখনই সুলতান সালাহুদ্দীন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনে তাঁহার উপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে সালাহুদ্দীনের মৃত্যুর পর (৫৮৯/১১৯৩) আল-'আদিল-এর প্রথম কর্তব্যই ছিল মাওসিলের আতাবেগ 'ইয্যুদদীন কর্তৃক জাযীরা পুনর্দখলের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করিয়া দেওয়া। 'আদিল নিজ প্রদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করার পর সালাহুদ্দীনের পুত্রদ্বয় মিসরের শাসনকর্তা আল-আযীয ও দামিশ্ক-এর শাসনকর্তা আল-আফ্দাল-এর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আগাইয়া আসেন। যদিও প্রথম হইতেই তিনি আল-আফ্দাল-এর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, কিন্তু আল-আফ্দাল-এর অযোগ্যতা ধীরে ধীরে এতই প্রকট হইয়া উঠিল যে, শেষ পর্যন্ত তিনি আল-'আযীয-এর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আল-আফ্দালকে বিতাড়িত করিয়া তিনি নিজেই আল-'আযীযের প্রতিনিধিরূপে দামিশ্ক-এর শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে তুলিয়া লন (৫৯২/১১৯৬)। একইভাবে তিনি ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত ক্রুসেডারদের মুকাবিলা করেন। আল-'আযীয-এর ইন্তিকাল (৫৯৫/১১৯৮)-এর ফলে মিসরীয় সেনাবাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে; একদল আল-আফ্দাল ও অন্যদল আল-'আদিলকে সমর্থন করিতে থাকে। আল-'আদিল দামিশ্কে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁহার পুত্র আল-কামিল-এর নেতৃত্বে মেসোপটেমীয় বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া আল-আফ্দালকে মিসর অবধি ধাওয়া করত পরাজিত এবং নিজেকে মিসর ও সিরিয়ার সুলতান ঘোষণা করেন (৫৯৬/১২০০)। আল-'আদিল-এর এই দাবি আজ-জাহির অস্বীকার করিয়া পুনরায় দামিশক অবরোধ করেন, কিন্তু

আল-'আদিল তাঁহাকে তাঁহার বাহিনী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করেন এবং আলেপ্পো পর্যন্ত তাঁহার পিছু ধাওয়া করেন। অবশেষে সেখানে আজ-জাহির তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া নিজেকে বিপদমুক্ত করেন (৫৯৮/১২০২)। ৬০৪/১২০৭ সালে খলীফা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। অতঃপর তিনি নিজ এলাকাসমূহ পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন ঃ আল-কামিল মিসরের, আল-মু'আজ্জাম দামিশক-এর, আল-আওহাদ ও আল-আশ্রাফ যথাক্রমে জাযীরা ও দিয়ার বাক্র-এর শাসনক্ষমতা লাভ করেন। আল-'আদিল স্বয়ং যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যতদূর জানা যায়, আল-'আদিলের সমুদয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল ইউরোপ হইতে নূতনভাবে ক্রুসেডারদের আক্রমণের আশংকার মুখে সালাহুদ্দীনের সাম্রাজ্যকে সুসংহত রাখা এবং একই সঙ্গে আয়্যূবী বংশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। অবশ্য প্রধান প্রদেশসমূহের শাসনভার তাঁহার পুত্রদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না, তাঁহারা ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য শাসক। সালাহুদ্দীনের পুত্রদের মধ্যে যিনি শাসনকার্যে কিছু দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেলেন তাঁহাকে তিনি আলেপ্পোর শাসন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাঁহার শিশুপুত্রের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানও করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি হিম্স হামাহ-তে আয়্যূবী বংশের অন্য শাখায় শাসনাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা প্রজাদের বস্তুগত ও চারিত্রিক কল্যাণ সাধনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ধর্ম ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শান্তি-শৃংখলা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীনের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি দ্বিবিধ উদ্দেশে ইতালীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন ঃ তাঁহার নিজস্ব সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং নূতন ক্রুসেড আক্রমণে সাহায্য প্রদানে তাহাদের নিরুৎসাহিত করা। স্থানীয় ক্রুসেডারদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সামরিক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁহার শাসনামলে তিনি শান্তি নিশ্চিত করিয়াছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ভবিষ্যৎ বিপদের বিরুদ্ধে যাহা ৬১৪/১২১৭ সালের পঞ্চম ক্রুসেডের অভিযানে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল, তাহার জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষা শক্তিও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রতিরক্ষার উদ্দেশে সেনাবাহিনীর বৃহদাংশকে মিসরে নিয়োজিত রাখিয়া তিনি মুআজ্জামকে জেরুসালেম ও দামিশ্কের প্রবেশপথ রক্ষায় সাহায্য করিবার উদ্দেশে সিরিয়ায় গমন করেন এবং দামিয়েত্তা প্রতিরক্ষার জন্য আরও সৈন্য প্রেরণ করিবার ব্যাপারে কর্মব্যস্ত থাকাকালীন অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দামিশ্কের অদূরবর্তী 'আলিকী নামক স্থানে ৭ জুমাদাউলা, ১.৬১৫/ ৩১ আগস্ট, ১২১৮ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু শামা, কিতাবুর-রাওদ'াতায়ন, কায়রো ১২৮৭, স্থা; (২) য'ায়লুর-রাওদ'াতায়ন, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭, ১১১-৩; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৬৬৫ ; (৪) সিব্ত ইবনুল জাওযী, মিরআতুয-যামান (Facs, Jewett), ৩৯০ ; (৫) ইব্ন তাগ্রীবির্দী, নুজূম, ৬খ., স্থা.; (৬) মাক্রীযী, সুলুক, ১খ., ৫৮-১৯৪ কায়রো ১৯৩৪, (৭) কামালুদ্দীন ইবনুল আদীম, Histoire d'Alep (অনু. Blochet, প্যারিস ১৯০০), ৮২-১৫৮; (৮) G. Weit, L 'Egypte Arabe, প্যারিস ১৯৩৭, ৩১৮- ৩৪৭; (৯) দ্র. তৃতীয় ক্রুসেডের সাধারণ ইতিহাস ও সালাহুদ্দীন প্রবন্ধদ্বয়।

H.A.R. Gibb (E.I.2) / শেখ আবদুল গাফফার

আল-'আদিল ইবনুস-সালার (العادل بن السلار ابو الحسن على) ঃ আবুল হাসান আলী ফাতিমী উযীর। তিনি ছিলেন একজন আর্তুকী রাজকর্মচারীর পুত্র, যিনি ৪৯১/১০৯৮ খৃষ্টাব্দে মিসরীয় বাহিনী কর্তৃক জেরুসালেম দখলের পর ফাতিমী সরকারের চাকুরী গ্রহণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসিত অবস্থায় তিনি একজন মরহুম যীরী নৃপতির বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

ফাতিমী খলীফা আজ-জাফিরের শাসনামলের প্রারম্ভে আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর হিসাবে তিনি সর্বপ্রথম ইতিহাসে পরিচিত হন। আমরা অবগত আছি, তিনি সসৈন্যে কায়রো উপস্থিত হন এবং ৭ শা'বান, ৫৪৪/১০ ডিসেম্বর, ১১৪৯ তাঁহার পূর্বসূরী বৃদ্ধ উযীর ইব্ন মাসাল-এর পরিত্যক্ত প্রাসাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইব্ন মাসাল পরে ১৯ শাওয়াল, ৫৪৪/১৯ ফেব্রুয়ারী, ১১৫০ সালে দক্ষিণ মিসরে নিহত হন। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলীফা আজ-জাফির তাঁহাকে আল-মালিকুল-'আদিল উপাধিতে ভূষিত করিয়া উযীর হিসাবে অভিষিক্ত করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, তিনি (আজ-জাফির) তাঁহার উযীরের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের উস্কানি দিতে প্রয়াস চালাইয়াছিলেন, কিন্তু উযীর এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়া প্রাসাদের বালক ভৃত্যদলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র (আব্বাস ইব্ন আবিল-ফুতূহ)-এর আক্রোশে পতিত হইয়াছিলেন, যিনি তদীয় পুত্র নাস্র-এর উপর ইবনুস-সালারকে হত্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই ঘাতকের হাতেই ইবনুস-সালার ৬ মুহাররাম, ৫৪৮/৩ এপ্রিল, ১১৫৩ সালে ইন্তিকাল করেন। নাসর নিজ হাতে এই কার্য সমাধা করে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কবুতরের মাধ্যমে এই সংবাদ পিতাকে অবহিত করে। আব্বাস সেই সময় আসকালান বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালারের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি উযীরের পদ গ্রহণের জন্য দ্রুত কায়রো উপনীত হন।

ইবনু'স-সালার-এর রাজনৈতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে, তিনিই ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের অভিন্ন লক্ষ্যে আলেপ্পোর শাসনকর্তা নূরুদ্দীন-এর সঙ্গে আঁতাত গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁহার এই উদ্যোগ ছিল অবাঞ্ছিত। কারণ নূরুদ-দীন-এর নিজেরই দামেশক সম্পর্কে ভিন্নতর পরিকল্পনা ছিল। এই স্থানটি ক্রুসেডাররা কয়েক বৎসর পূর্বেই অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। আস-সালার তাঁহার সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ৫৪৬/ ১১৫১ সালে জাফফা, সিডন, বৈরূত ও ত্রিপোলী বন্দরে মিসরীয় নৌবহর প্রেরণ করিয়া ঐসব বন্দরের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেন। এই অভিযানের অন্য উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণও বটে, কারণ ইহার আগের বৎসরই তাহারা ফারামা লুণ্ঠন করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন মুয়াস্‌সার, ৮৯-৯২; (২) ইব্ন তাগরীবিরদী, নুজূম, কায়রো, ৫খ., ২৮৮-২৯৯; (৩) উসামা, অনু. Derenbourg, নির্ঘণ্ট; (৫) G. Wiet, Precis de I'Histoire d'Egypte, ২খ., ১৯৩-১৯৪ ; (৪) ঐ লেখক, Hist. de la nation Egyptienne, ৪খ, ২৭৮-২৮৪।

G. Weit (E.I.[2]) / শেখ আবদুল গাফফার

'আদিল শাহ্ সূর, (عادل شاه شور)ঃ মুহাম্মাদ, মৃ. ১৫৫৬; আসল নাম মুবারিয খান, সম্রাট শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পরে বাদশাহ (১৫৫৪)। তাঁহার চাচাতো ভাই ও ভগ্নীপতি সুলতান ইসলাম শাহ (জালাল খান) সিংহাসনে আরোহণ করিতে মুবারিয বায়ানার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে ইসলাম শাহ্‌কে বন্দীর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া মেওয়াতে খাবাস খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। অতঃপর ইসলাম শাহের অকাল মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার নাবালক পুত্র ফীরূযের হত্যার পর মুবারিয মুহাম্মাদ 'আদিল শাহ সূর নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৫৪ খৃ.) এবং চুনারে আবাসিক রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য ছিলেন বলিয়া রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হিন্দু প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি হিমুর হস্তে প্রদান করেন। ফলে রাজ্যের আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হিমু সাফল্যের সহিত এই সকল বিদ্রোহ দমন করিলেও পরে পানিপথের ২য় যুদ্ধে মুগল সেনাপতি বায়রাম খানের নিকট পরাজিত হন। বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'আদিল শাহ্ নিহত হন। য়াদগারের মতে তাঁহার রাজ্য আগ্রা, মালব ও জৌনপুরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তানসেন তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ ১খ., পৃ. ১৩০।

(সংকলিত)

'আদিল শাহী (عادل شاهى)ঃ মুসলিম শাসনামলে বিজাপুরের একটি রাজবংশের উপাধি। ভারতের দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মানী রাজ্যের স্থলে যে কয়টি খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিজাপুর ছিল ইহাদের অন্যতম। স্বাধীন বিজাপুরের ইতিহাস ৮৯৫/ ১৪৮৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৯৭/১৬৮৬ সালে বিজিত হইয়া মুগল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। রাজবংশটির প্রতিষ্ঠাতা য়ূসুফ 'আদিল খান ছিলেন বিখ্যাত বাহ্‌মানী মন্ত্রী মাহ্‌মূদ গাওয়ানেন চাকুরীতে নিয়োজিত একজন ক্রীতদাস। তিনি বাহ্‌মানী রাজ্যের অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক পদে উন্নীত হন এবং পরে দাওলতাবাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বাহমানী রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রে য়ূসুফ 'আদিল সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তার মতে ৮৯৫/ ১৪৮৯ সনে তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ করান। রাজবংশটির মুসলিম ইতিহাসবেত্তারা য়ূসুফ 'আদিল খানকে শাহী বংশের লোক বলিয়া দাবি করেন। তাঁহাদের দৃঢ় মত, তিনি ছিলেন 'উছমানী তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সাওয়া সওদাগর খাজা ইমদাদুদ্দীনের হাতে সঁপিয়া দিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পরবর্তী উছমানী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের কবল হইতে রক্ষা করেন এবং সওদাগর তাঁহার শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। পরিশেষে ভারতে আসিয়া মাহ্‌মূদ গাওয়ানের অধীনে একটি চাকুরী লাভের সুযোগ পান। আদিল শাহী রাজবংশের প্রতি পক্ষপাতবিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণের সমর্থনে নিরপেক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে পারস্য দেশীয় ছিলেন ইহা সাধারণ্যে স্বীকৃত। য়ূসুফ 'আদিল শাহ শী'আ মতবাদের প্রবর্তন করেন। এই ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় নরপতি। তাঁহার রাজত্বকাল (৮৯৫/১৪৮৯-৯১৬/১৫১০) দক্ষিণাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম রাজন্যবর্গ ও বিজয়নগরের হিন্দু নরপতিগণের সংগে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ-বিগ্রহেই প্রায় কাটিয়া যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পর্তুগীজরা ভারত উপকূলের অদূরে আবির্ভূত হয়। য়ূসুফ 'আদিল শাহের উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকাল নিম্নরূপঃ

ইসমাঈল ইব্ন য়ূসুফ—৯১৬/১৫১০—৯৪১/১৫৩৪, মাল্লু ইব্ন ইসমাঈল—৯৪১/১৫৩৪— ৯৪১/১৫৩৫, ইব্‌রাহীম (১ম) ইব্ন ইসমাঈল—৯৪১/১৫৩৫—৯৬৫/১৫৫৭, আলী (১ম) ইব্ন ইব্‌রাহীম ৯৬৫/১৫৫৭—৯৮৭/১৫৭৯, ইব্‌রাহীম (২য়) ইব্ন তাহ্‌মাস্‌প ইব্ন ইব্‌রাহীম—৯৮৭/ ১৫৭৯ —১০৩৫/১৬২৬, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্‌রাহীম —১০৩৫/ ১৬২৬—১০৬৬/ ১৬৫৬, 'আলী (২য়) ইব্ন মুহাম্মাদ–১০৬৬/১৬৫৬— ১০৮৩/ ১৬৭২, সিকান্দার ইব্ন 'আলী—১০৮৩/ ১৬৭২—১০৯৭/১৬৮৬।

১১শ/ ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর দিক হইতে মুগল আক্রমণের আশংকা প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিজাপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস দাক্ষিণাত্যের প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলি বীদার, আহ্‌মাদ নগর, গোলকুণ্ডা ও হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস। ৯৭২/ ১৫৬৪ সালে অবশ্য মুসলিম রাজ্য চতুষ্টয় বিজয় নগরের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া তালিকটে বিজয় নগর বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। ইহার রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ইব্‌রাহীমের রাজত্বকালে বিজাপুর শক্তি-সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করে। তবে আমীরদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ হইতে ইহা কখনও বিমুক্ত ছিল না।

শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত বিজাপুর মুগলদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে মুগল আক্রমণে আহ্‌মাদনগর রাজ্যটি দ্বিখণ্ডিত হইতে থাকিলে বিজাপুর রাজ্য উহার কোন কোন অংশ দখল করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। বিজাপুরের সহিত মুগল রাজশক্তির সংঘর্ষ বাঁধে। ১০৪৬/১৩৩৬ সালে মুগলরা বিজাপুর আক্রমণ করে এবং বিজাপুরকে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে। এই চুক্তি অনুযায়ী বিজাপুর মুগলদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। পরবর্তী বিশ বৎসর রাজ্যটিতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজিত ছিল। ১০৬৮/১৬৫৬ সালে মুহাম্মাদ 'আদিল শাহের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় 'আলী আদিল শাহ্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বাদশাহ শাহ্‌জাহান আওরঙ্গযেবকে ঐ রাজ্য আক্রমণ করিবার আদেশ দেন। কিন্তু শাহজাহানের অসুখের সংবাদে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়। বিজাপুর মুগল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু উহাকে মারাঠা নায়ক শিবাজীর তরফ হইতে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। ১০৬৯-৭০/১৬৫৯ সালে শিবাজীর এক অতর্কিত আক্রমণে সেনাপতি আফদাল খান নিহত হন এবং তাঁহার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। এই

ঘটনার পর হইতে বিজাপুর রাজ্যটি মারাঠাদের লুটতরাজ হইতে কদাচিৎ মুক্ত ছিল। নাবালক সিকান্দার 'আদিল শাহের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে মুগল ও মারাঠাগণ রাজ্যটিকে ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া উহার বিভিন্ন অংশ দখল করিয়া লইতে থাকে। অবশেষে ১০৯৭/১৬৮৬ সালে বৎসরাধিক কাল ব্যাপী এক অবরোধের পর আওরঙ্গযেব ইহার রাজধানী অধিকার করিয়া নেন এবং অবশিষ্ট রাজ্যাংশগুলিও মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১১১১/১৭০০ সালে সিকান্দার বন্দীদশায় ইন্তিকাল করেন।

'আদিল শাহী রাজন্যবর্গ ছিলেন মহান স্থাপয়িতা। তাঁহাদের রাজধানী বিজাপুরে তাঁহারা ভারতের ইসলামী স্থাপত্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ বহু সুরম্য 'ইমারত নির্মাণ করেন। তাঁহারা শিক্ষা ও সাহিত্যের মহান পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) C. A. Storey, Persian Literature, ২খ., ২৭২ প.; (২) Henry Cousens, Bijapur and its Architectural Remains, Archaeological survey of India, Vol. 37, বোম্বাই ১৯১৬, পৃ. ১-১৮; (৩) Cambridge History of India, iii (আফগান ও তুর্কী), Chs. xvi and xvii, iv (The Moghul Period), Ch. ix; Cambridge 1928 and 1937; (৪) Sir Jadunath Sarkar, History of Aurangzib, কলিকতা ১৯১২-২৪, vol. iv, Chs.-xxxviii-xlv; (৫) মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দু শাহ (ফিরিশ্‌তা), গুলশান-ই ইব্‌রাহীমী (তারীখ-ই ফিরিশ্‌তা), সম্পা. Briggs, বোম্বাই ১৮৩১ খৃ., পৃ. ১-১৯৭।

P. Hardy (E. I.²) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আদিলা খাতূন (عادلة خاتون) : আহ্‌মাদ পাশার কন্যা ও বাগদাদের 'উছ্‌মানী গভর্নর সুলায়মান পাশা মিয়ূরাকিন (আবূ লায়লা)-এর স্ত্রী। স্বামীর জীবদ্দশায় তিনি প্রদেশের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতেন। তিনি স্বয়ং দরবারে আসন গ্রহণ করিয়া একজন খোজার মাধ্যমে জনগণের দরখাস্তসমূহ শ্রবণ করিতেন। তিনি স্বীয় নামে একটি মসজিদ ও একটি সরাইখানা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যুর (১১৭৫/১৭৬১) পর ক্ষমতা তাঁহার হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইলে তিনি সুলায়মানের স্থলাভিষিক্ত আলী পাশার বিরুদ্ধে প্রথম জানিসারী বাহিনী এবং পরে প্রধান প্রধান পাঁচজন মামলূককে উস্কাইয়া দেন। এইভাবে তিনি দেবর 'উমার পাশাকে আলী পাশার স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করাইতে সক্ষম হন (১৭৬৪)। কখন ও কোথায় তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) C. Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien, ফরাসী অনু. ২খ., ২১৫; ২৫৮ প.; (২) Cl. Huart, Histoire de Bagdad dans les Temps Modernes, 153; (৩) S.H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, অক্সফোর্ড ১৯২৫, পৃ. ১৬৫, ১৬৯, ১৭৩-৪, ১৭৯।

Cl. Huart (E.I.²) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আদিস আবাবা (أديس ابابا) : (ঈথিওপীয় উচ্চারণ= আদ্দিস আব্যাবা), একটি নগর (জনসংখ্যা প্রায় ৫,০০,০০০), ঈথিওপিয়ার রাজধানী। দ্বিতীয় মেনেলিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৭) ও রাজধানীতে পরিণত (১৮৮৯)। ১৯৩৬-৪১ সাল পর্যন্ত ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী। মধ্য ঈথিপিওয়ার পাহাড়ী মালভূমির উপর অবস্থিত এই নগর একটি বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র; এখান হইতে কফি, তামাক, খাদ্যশস্য ও পশুচর্ম রফতানী হয়। পূর্বে এখানে বহু চালাঘর দৃষ্ট হইত। ১৯৫৮ খৃ. নগরটি জাতিসংঘের একটি কমিশনের অধিষ্ঠান স্থল এবং তৎফলে স্থাপত্য নিদর্শনসূচক ভবনাদি নির্মিত হয়। নগরে বহু রাজপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঈথিওপিয়ার একমাত্র রেলপথের এক প্রান্ত এইখানে এবং অপর প্রান্ত সোমালীল্যান্ডের জিবুতী শহরে। উল্লেখযোগ্য অট্টালিকাদি : সম্রাটের প্রাসাদ, পার্লামেন্ট ভবন, কপটিক ক্যাথিড্রাল। এইখানে একটি কলেজও আছে। ইতালীয়গণ ১৮৯৬-এ আদাওয়ার যুদ্ধে ২য় মেনেলিকের নিকট পরাজিত হইলে আদিস আবাবায় ঈথিওপিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৩৬-এ ইতালীয়গণ আদিস আবাবা দখল করিয়া ইহাকে ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী করে। ১৯৪১-এ উহারা ঈথিওপিয়া হইতে বিতাড়িত হইলে সমগ্র দেশের সংগে আদিস আবাবাও মুক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৩০।

(সংকলিত)

'আদী ইব্‌ন আর্‌ত'াত (عدى بن ارطات) : আল-ফাযারী, আবূ ওয়াছিলা উমায়্যা আমলের একজন প্রশাসক, যিনি ৯৯-১০১/৭১৮-৭২০ সাল পর্যন্ত বস্‌রা হইতে ইরাক শাসন করিতেন। 'উমার ইব্‌ন 'আবদিল আযীয কর্তৃক ইয়াযীদ ইব্‌নুল মুহাল্লাব-এর স্থলে তিনি এই পদে নিয়োজিত হন এবং আল-মুহাল্লাবের সকল পুত্রকে গ্রেফতার করিবার আদেশপ্রাপ্ত হন। তিনি আল-মুফাদ্দাল, হাবীব, মারওয়ান ও ইয়াযীদকে গ্রেফতার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ইয়াযীদ পলায়ন করত প্রতিআক্রমণ করেন। 'আদী তখন বস্‌রার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং বিদ্রোহীদের প্রবেশ রোধকল্পে নগরীর চারিপার্শ্বে পরিখা খনন করেন। কিন্তু তাঁহার এই পদক্ষেপসমূহ মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই। ইয়াযীদ সহজেই বস্‌রা দখল করিতে সক্ষম হন এবং 'আদীর গ্রেফতারের আদেশ দেন। ১০২/৮২০-২১ সালে মু'আবি'য়া ইব্‌ন ইয়াযীদ কর্তৃক ওয়াসিত নামক স্থানে 'আদী নিহত হন। সর্বপ্রথম তাঁহার নামানুসারে বস্‌রায় খাবার পানির সন্তোষজনক সরবরাহের লক্ষ্যে খননকৃত খালটির নাম রাখা হয় "নাহ্‌র 'আদী"। দ্বিতীয় ১০০/৭১৯ সনে যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে উহাকে বলা হয় "ত'া'উন 'আদী"।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) জারীর, দীওয়ান, ২৪১; (২) নাক'াইদ, নির্ঘণ্ট; (৩) জাহিজ, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্‌ন কুতায়বা, মাআরিফ, নির্ঘণ্ট; (৫) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৬) বালাযুরী, ফুতূহ, ৭৭, ৩৪৯, ৩৫৯, ৩৬৯-৭০; (৭) ইবনুল কাল্‌বী-Caskel, তালিকা ১৩০ ও ২খ., ১৩৮; (৮) ইয়াকূ'বী, তারীখ, ২খ., ৩৬২, ৩৭০, ৩৭৩; (৯) ঐ লেখক, বুলদান, অনু. Wiet, 94.124; (১০) মুবার্‌রাদ, কামিল, নির্ঘণ্ট; (১১) মাস্'উদী, মুরূজ,

৫খ., ৪৫৩-৪, ৪৫৭=২২০৬, ২২০৯; (১২) ঐ লেখক, তান্বীহ, নির্ঘন্ট; (১৩) খাতীব বাগদাদী, তারীখ, ১২খ., ৩০৬; (১৪) ইব্নুল আছীর, ৫খ., ৩১, ৪২, ৫৩, ৬৪; (১৫) ইয়াকূ'ত, ১খ., ৬৪৩, ৪খ., ৮৪১; (১৬) ইব্ন আবিল-হাদীদ, শারহ', ১খ., ৩০৩; (১৭) Caetani, Chronographia, 1205, 1239, 1244, 1248, 1260; (১৮) এস. আল-আলী, Sumer, ৭খ. (১৯৫২), ৭৮; (১৯) Pellat, Milieu, নির্ঘন্ট; (২০) যিরিক্লী, ৬খ., ৮।

Ed. (E.I.[2] suppl.) / মোঃ শহীদুল্লাহ

আদী ইব্ন মুসাফির আল-হাক্কারী (عدى بن مسافر الهكارى) ঃ শায়খ 'আদী একজন সূফী নেতা। তিনি ছিলেন একজন কুরায়শ গোত্রীয় 'আরব। বা'লাবাক্কের নিকটবর্তী বায়ত ফার-এর এক উমায়্যা পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার সহিত আকীল আল-মান্বিজী, হাম্মাদ আদ-দাব্বাসে, 'আবদুল কাহির আস্-সুহ্রাওয়ারর্দী, আবদুল কাদির আল-জীলী, আবুল ওয়াফা আল-হুলওয়ানী ও আবূ মুহাম্মাদ আশ্-শান্বাকী-এর পরিচয় ছিল। তিনি বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং মরু অঞ্চলে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর আপাতদৃষ্টিতে ৫০৫/১১১১-এর পূর্বে মাওসিল-এর নিকটবর্তী লায়লাশ (লালেশ)-এ স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি একটি খানকাহ নির্মাণ করিয়া 'আদাবিয়্যা নামক সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করেন। তাঁহার নিয়মাবলী এতই কঠোর ছিল যে, বহু সূফী নেতা তাহা অনুসরণে ব্যর্থ হন। কথিত আছে, তিনিই সর্বপ্রথম নব দীক্ষিতদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার 'আকীদা ছিল সুন্নী মতের এবং অসাধারণত্বহীন। তিনি মুতাযিলা ও সর্বপ্রকার মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সূফী হিসাবে তিনি ছিলেন আল-গাযযালীর অনুরূপ। ইব্ন তায়মিয়্যা তাঁহাকে সুন্নার অনুসারী একজন ধার্মিক, সত্য-বিশ্বাসী হিসাবে আশ্-শাফি'ঈ-র সমকক্ষ এবং সূফী হিসাবে 'আবদু'ল-কাদির আল-জীলি-র সমপর্যায়ের বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে তিনি চরম ভাবাবেশ (وجد) লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যে যে আতিশয্য ছিল তাহা তাঁহার উত্তরসুরিদের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি ৫৫৭/১১৬২-এর দুই বৎসর পরে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত কাব্য ও উদ্ধৃতিসমূহ যে কোন সূফীর হইতে পারে। Layard কর্তৃক উদ্ধৃত কবিতাটি নিশ্চিতভাবেই তাঁহার রচিত বলা যায় না। রামীশো নামক জনৈক সন্ন্যাসীর কথিত একটি খৃষ্টীয় কিংবদন্তীর মতে তিনি ছিলেন একজন কুর্দ; তাঁহার পিতা ছিলেন একটি মঠের মেষপালক এবং তিনি স্বয়ং কালক্রমে উক্ত মঠের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মঠাধ্যক্ষ ও কিছু সন্ন্যাসীর অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি মঠটি দখল করেন। তিন বৎসর পর ৬৯৯/১২২১ সালে তাঁহাকে মারাগায় ডাকিয়া পাঠান হয় এবং তথায় তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়; কিন্তু ৬৬২/১২৮৩-তে উক্ত মঠটি বংশধরদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

শায়খ 'আদীর কোন সন্তান না থাকায় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন তাঁহার ভ্রাতা সাখর-এর সন্তানগণ। মতান্তরে 'আলী তাঁহার এক ভৃত্যের পুত্র হাসান আল-বাওওয়াকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বংশধররাই নেতৃত্ব লাভ করেন। ইঁহারা অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং কন্যাদের পিতা-মাতা সগর্বে কন্যাদেরকে ইঁহাদের নিকট পাঠাইতেন। এই সম্প্রদায়টি প্রধানত কুর্দীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যদিও কায়রোর কারাফাতে ইহাদের একটি খানকাহ ছিল। এই তারীকার সদস্যগণ 'আদীর (অর্থাৎ তাহার সমাধির প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিত এবং আখিরাতের জীবনে তাহাকেই তাহাদের রক্ষাকর্তারূপে বিবেচনা করিত। এই প্রকার আনুগত্য অন্য কোন সম্প্রদায়ে বিরাজমান ছিল না। এইরূপ আতিশয্যময় ব্যবহার ও রীতি হঠাৎ করিয়া উদ্ভূত হয় নাই এবং অনেক পরে তাহারা মুসলিম উপাসনা ত্যাগ করিয়া এই বিশ্বাস গ্রহণ করে, আদী তাহাদের রুযীদাতা এবং তিনি খোদার সহিত রুটি-পেঁয়াজ ভক্ষণ করিতেছেন। সম্প্রদায়টির একজন প্রধান হাসান ইব্ন আদী জনৈক ধর্মপ্রচারকের ওয়াজ শ্রবণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন এবং কুর্দিগণ উক্ত বাক্পটু প্রচারককে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। সম্প্রদায়টি অত্যধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিলে তাহাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং উক্ত হাসানকে মাওসিলের বাদ্রুদ্দীন লুলু ৬৪৪/১২৪৬-এ মৃত্যুদণ্ড দান করেন। কিন্তু কুর্দিগণ এই বিশ্বাসে অনড় থাকে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই এবং ছয় বৎসর পর লুলু শায়খ 'আদী-র সমাধি খনন করিয়া তাঁহার অস্থিসমূহ অগ্নিদগ্ধ করেন। ৬৫৫/১২৫৭-তে শারাফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আদী ও অপর একজন কুর্দী আহমাদ ইব্ন বিলাস মালাতিয়ার 'ইয্যুদ্দীন কায়খুসরাও-এর সাহায্যার্থে আমন্ত্রিত হন। অপর একজন বংশধর তাঁহার মোঙ্গল বংশীয় স্ত্রীসমেত ৬৭৫/ ১২৭৬ সালে মিসরে পলায়ন করেন। অপর একজন সিরিয়াতে পলায়ন করেন এবং ৬৮০/১২৮১ সালে সেখানে নিহত হন। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পরিবারের একজন বায়ত ফার-এ রাজকীয়ভাবে বসবাস করিতেন। আমীরান নামীয় অপর একজন সিরীয় সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে মিয্যাতে অবসর গ্রহণ করেন। সেখানে কুর্দিগণ তাহাকে শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে উপহারাদি প্রদান করিতে থাকে। তাহারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করিলে আমীরান কারারুদ্ধ হন (তাহার নিজ ইচ্ছাতে, আদ-দুরারুল-কামিনা, ১খ., ৪১৪)। ইহার পর সব কিছু শান্ত হইয়া আসে, যদিও কুর্দিগণ তাহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা মিনারের সম্মুখে অবনত হওয়ার নূতন রেওয়াজ প্রবর্তন করে। একজন আইনজীবী গোঁড়া মতাবলম্বীদের উত্তেজিত করিয়া ৮১৭/১৪১৪ সালে শায়খ-এর সমাধিটি ধ্বংস করেন এবং সুহবাতিয়্যা নামে পরিচিত তাঁহার অবশিষ্ট অনুচরদের সম্মুখে শায়খ-এর অস্থি অগ্নিদগ্ধ করেন। পরে সমাধিটি পুনঃনির্মিত হয়। ঐতিহাসিক চরিত্র শায়খ 'আদী ও ইয়াযীদীগণের ধর্ম বিশ্বাসে তাঁহার ভূমিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য "য়াযীদী"।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্নুল-আছীর, ১১খ., ১৯০ (৫৫৭ হি.); (২) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৪২৬; (৩) আশ্-শাতান্নাওফী, বাহ্জাতুল আনসার, ১৫০ ; (৪) ইব্ন তায়মিয়্যা, মাজমূ'আতুর রাসাইল, ১৯০৫, ১খ., ২৭৩; (৫) কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ., ১৫৮; (৬) ইব্ন কাছীর, ১২খ., ২৪৩; (৭) মাকরীযী, খিতাত, ২খ.., ৪৩৫; (৮) ঐ লেখক, আস্-সুলূক, ৮১৭ হি.; (৯) তাদিফী, ক'লাইদুল জাওয়াহির, ১৩০৩, ১০৭ ; (১০) হাজ্জী খলীফা, ৪খ., ২৪৩; (১১) ইয়াকূ'ত, ৪খ, ৩৭৪; (১২) ইব্নুল 'ইমাদ, শায'রাতুয্য'াহাব, ৪খ., ১৭৯, ৫খ., ২২৯; (১৩) Bar Hebraeus,

Syriac Chronicle (Bedjan), 498 (= Eccl. chron, ১খ., ৭২৬), Arabic Chronicle, 466; (১৪) F. Nau, in ROC, 1914, 105; 1915, 142; (১৫) W. Ahlwardt Vereichnis, নির্ঘণ্ট; (১৬) A.H. Layard, Nineveh and its remains, ১খ., ২৯৩ প.; (১৭) ঐ লেখক, Discoveries in the ruins of Ninevch and Babylon, ৭৯ প.; (১৮) G.P. Badger, Nestorians and their rituals, ১খ., ১১৩ প.; (১৯) R. Frank, Scheich adi (Turk, Bibl, ১৪) বার্লিন ১৯১১; (২০) Th. Menzel, in H. Grothe, Meine Vorderasiensex pedition, লিপজিগ ১৯১১, ১খ., ১০৯ প.; (২১) A. Taymur, (আল-ইয়াযীদিয়্যা ওয়া-মান্শা নিহ্লাতিহিম, কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮; (২২) আবদুর্ রায্যাক, আবাদাতুশ শায়তান, Sidon 1931; (২৩) M. Guidi, in RSO, 1932, 408 প.; (২৪) Lescot, Enquete sur les Yezides, বৈরূত ১৯৩৮; (২৫) আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ৫খ., ১১; (২৬) আব্বাস আল-আযযাবী, তারীখুল-ইরাক, ৩খ., ৩৬ প. (২৭) দা.মা.ই, ১৩খ., ১৫-১৭।

A. S. Triton (E. I.²)/ আবদুল বাসেত

'আদী ইব্ন যায়দ (عدى بن زيد) ঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের হীরার খৃষ্টান আরব কবি। তাঁহার জীবনের কিছু অংশ Ctesiphon (আল-মাদাইন)-এ অবস্থিত সাসানী রাজদরবারে অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি খুসরাও পারভেযের 'আরব বিষয়ক সচিব ছিলেন। তিনি হীরায় লাখ্মী রাজদরবারে তৃতীয় নু'মানের একজন পারিষদ ও উপদেষ্টা হিসাবে জীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁহাকে (তৃতীয় নু'মান)সিংহাসনারোহণের ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে নু'মান তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং অবশেষে (৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকে) তাঁহাকে কারাগারে হত্যা করেন। জাহিলী যুগের 'আরব ইতিহাসে ও কাব্যে 'আদী এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। নাবিগা আয-যুব্য়ানী ও আল-আ'শার সঙ্গে তিনি মার্জিত রুচিসম্পন্ন দরবারী কবি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, যাহারা তৎকালীন মরু-কৃষ্টির তুলনায় উচ্চস্তরের কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ফলে 'আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ তাঁহার অ-নাজদী ভাষার কারণে তাঁহাকে জাহিলী যুগের কাব্যের মূল স্রোতধারার ব্যতিক্রমী কবি হিসাবে গণ্য করেন, যদিও তিনি যেসব বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং যে রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা ইসলামী যুগের 'আরবী কাব্যের বিকাশের ক্ষেত্রে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

'আদীর কাব্য সংকলন (দীওয়ান) অবলুপ্ত হইয়া যাওয়ার কারণে তাঁহার কাব্যকর্মের কিছু বিক্ষিপ্ত অংশমাত্র আমাদের নিকট জ্ঞাত। L. CHEIKHO কর্তৃক অসম্পূর্ণ অবয়বে ও সমালোচনা বিবর্জিত পদ্ধতিতে সংগৃহীত শু'আরাউন-নাস্'রানিয়্যা, ৪৩৯-৭৪, যাহার সাথে আল-জাহিজ -এর কিতাবুল হ'ায়াওয়ান (৪খ., ৬৫-৬), আল-মাক'দিসী-র আল-বাদ' ওয়া'ত-তারীখ (১খ., ১৫১), ইব্ন কুতায়বার আশ-শি'র (১১২-৩) ও বুহ'তুরীর হ'ামাসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উদ্ধৃতিসমূহ সংযুক্ত করা যাইতে পারে। অত্র কবিতাসমূহের মধ্যে যেইগুলি বাইবেলের উপাখ্যান (সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানবের প্রথম পাপ) বিষয়ক বর্ণনা সেইগুলি ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসের জন্য মূল্যবান। ইহার সঙ্গে অন্যান্য প্রমাণ সহযোগে এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, তিনি খৃষ্টান (ইবাদী) ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল একদিকে সুরার প্রশংসা, অপরদিকে ছিল মানুষের আবেগ ও প্রয়াসের অবক্ষয় যাহাকে কালের নিষ্ঠুর প্রবাহ ব্যর্থ করিয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রেণীর সামান্য কিছু বিক্ষিপ্ত, অথচ গুরুত্বপূর্ণ কবিতার নমুনা সংরক্ষিত হইয়াছে। আমরা জানি সেইগুলি ওয়ালীদ ইব্ন যায়দ এবং পরে আবূ নুওয়াস কর্তৃক সমাদৃত ও অনুকৃত হইয়াছে। সম্ভবত কবির নিজস্ব দুর্ভাগ্য দ্বারা প্রভাবিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার বহু বিক্ষিপ্তাংশ আমাদের নিকট বিদ্যমান, যেইগুলি শুধু ধর্মীয় ও বৈরাগ্য উদ্দীপনার জন্যই হৃদয়গ্রাহী নহে, বরং উহাতে প্রাচ্য (আরব্য পারস্য) ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বলিয়া উহাতে মানুষের অহংকার ও দুর্বলতাও বিবৃত হইয়াছে। প্রথম নু'মান ও খাওয়ারনাক প্রাসাদ সম্পর্কে রচিত তাঁহার কবিতাংশ এই শ্রেণীর কাব্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ (আগানী ১৩৮-৯, ২য় সংস্করণ, ২ ও অন্যত্র)। হাতরা সম্পর্কে অপর একটি কবিতাংশও তাঁহার রচনা (আল-বুহ'তুরী, আল-হ'ামাসা [CHEIKHO], সম্পা. পৃ. ১৯৮)। ইব্ন কুতায়বা দ্বারা উদ্ধৃত (পৃ. ১১২-১৩) জাযীমাতুল-আবরাশ ও আয-যাব্বা' সম্পর্কে রচিত কবিতাংশ উহার অপর উদাহরণ। শেষোক্ত কাব্যটি একটি দীর্ঘ গাঁথার অনুরূপ। অনধিক চারি শত লাইনের এই নমুনাগুলিতে আমরা একজন ধীশক্তিসম্পন্ন শিল্পীর পরিচয় পাই যিনি প্রাচীন শামী দুঃখবাদকে 'আরবী কাব্যে রূপ দান করিতে প্রয়াসী ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীবনের উত্তম বস্তুসমূহের সমাদর করিতে চেষ্টা করেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, ১১১-১৭; (২) আগানী-², ২য়, সং, ৯৭-১৫৪; (৩) J. Horovitz, `Adi ibn Zaid, The poet of al-Hira, IC, 1930, 31-69; (৪) F. Gabrieli, `Adi ibn Zaid, il poeta di al-Hira, Rend, Lin, 1948, 81-96; (৫) Th. Noldeke, Gesch. d. Perser u. Aaber z. zeit der Sassaniden, 312 প.; (৬) G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira, Berlin 1899, 199 প.।

F. Gabrieli (E. I.²) /আ.জ.ম. সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

'আদী ইব্ন হাতিম (عدى حاتم) ঃ (রা) ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন সা'দ আত-তাঈ, আবূ ত'রীফ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবী এবং পরবর্তীতে হযরত আলী (রা)-র অনুসারী। তাঁহার পিতা বিখ্যাত কবি ও দাতা হাতিম তাঈ (দ্র.)-র ন্যায় তিনিও ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার পিতার নিকট হইতে গোত্রের কর্তৃত্বভার লাভ করেন। এই কর্তৃত্ব হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তিনি ৯ অথবা ১০/৬৩০-১ সালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঈ ও আসাদ গোত্রের কর সংগ্রহ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তিকালের পরও তিনি ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন এবং রিদ্দা (ধর্মত্যাগ)-এর সংকট কালে

তাঁহার গোত্রের লোকদেরকে ধর্মত্যাগ হইতে বিরত রাখেন। পরবর্তী কালে তিনি ইরাক বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত 'উছমান (রা)-এর নিকট হইতে পরবর্তী কালের বাগদাদ-এর অদূরবর্তী নাহ্‌র 'ঈসা-র তীরবর্তী আর-রাওহ'া' গ্রাম অনুদান হিসাব প্রাপ্ত হন (তু. Le Strange, Lands, Index)। তবে 'উছমান (রা)-এর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল নির্লিপ্ত; আত্-তাবারী (১খ., ৩১৬৪)-এর বর্ণনামতে অনুমিত হয়, 'উছমান (রা)-এর ঘাতকদের সহিত তাঁহার কিছু যোগসাজশ ছিল। হযরত আলী (রা)-এর অধীনে "উষ্ট্রের যুদ্ধে" (৩৬/৬৫৬) অংশগ্রহণ করিয়া তিনি একটি চক্ষু হারান। সিফ্‌ফীন-এর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত আপোস-মীমাংসার আলোচনায় আমীর মু'আবিয়া (রা)-র নিকট প্রেরিত হযরত আলীর প্রতিনিধি দলের তিনি সদস্য ছিলেন এবং পরে নিশানবরদার হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার তিন পুত্র নিহত হন। ইহার পরবর্তী সময়ে তিনি কূফা শহরে বসবাস করেন এবং তথায় তিনি তাঁহার আলীপন্থী ভাবধারা বির্সজন দেন নাই। একই সঙ্গে তিনি ইরাকের শক্তিমান শাসক যিয়াদ ইব্‌ন আবীহি-এর আত্যাচার হইতে তাঁহার গোত্রীয় লোকদের সক্রিয় নিরাপত্তা দান করেন। ৬৮/৬৮৭-৮৮ সালে তিনি ইনতিকাল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৯৮৪ প., ৯৬৫; (২) তাবারী, index; (৩) বালাযুরী, ফুতূহ, ২৭৪; (৪) ঐ আন্‌সাব (= O. Pinto and G.levi della Vida, Il Califfo Muawiya I, Index); (৫) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, ১৩৬; (৬) ঐ, শি'র, Index; (৭) আবূ হাতিম আস্-সিজিস্‌তানী, কিতাবুল্-মু'আম্মারীন, (Gloldziher, Adhandlungen, 2, index); (৮) নাওয়াবী, তাহ্‌যীব, ৪১৫-১৭; (৯) ইবনুল আছীর, উস্‌দুল-গাবা ৩খ., ৩৯২ প.; (১০) ইব্‌ন হাজার, ইস'াবা, নং ৫৭৫; (১১) ইয়াকূ'ত, দ্র. জুসিয়া; (১২) Wustenfeld, Gen. Tabellen, index.

A.Schaade (E.I.²) / আবদুল বাসেত

'আদী ইবনুর-রিকা' (عدى بن الرقاع) : আবূ দুআদ আদী ইব্‌ন ইযায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আদী ইবনুর রিকা আল-আমিলী, সিরিয়ার আরব কবি। দামিশ্‌কে উমায়্যা বংশের, বিশেষত ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল-মালিক (৮৬-৯৬/৭০৫-১৫)-এর স্তুতি-কবি। খলীফার উপস্থিতিতে তিনি কবি জারীর-এর সহিত এক কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি আর-রাঈ-র আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন। 'আদী বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার কাসীদা নাসীর-এর মাধুর্যের জন্য (বিশেষভাবে দ্র. আল্-মুবাররাদ, আল্-কামিল, ৮৫, উম্মুল কাসিম প্রসঙ্গে) এবং কাব্য রচনায় সতর্কতার জন্য। পূর্বেই তাঁহার কাব্য স্পেনে পরিচিত ছিল (BAH, ৯খ., ৩৯৭)। খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদিল্-মালিকের রাজত্বকালে (৯৬-৯৯/১১৫-১৭) তিনি নিশ্চিতভাবে জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জুমাহী, তাবাকাত (Hell), ১৪৪-৫; (২) জাহিজ, হ'ায়াওয়ান,² ৩ : ৬৪, ৪খ., ৩৩৬, ৫খ., ৪৪১; (৩) ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, ৩৯১-৪; (৪) আগানী, ৮খ., ১৭৯-৮৩; (৫) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশ্‌তিকাক ২২৫; (৬) মারযুবানী, মু'জাম, ২৫৩; (৭) মায়মানী, আত্-তারাইফু'ল-আদবিয়্যা ৮১-৮৭ (তিনটি কবিতা); (৮) আমিদী, মুতালিফ, ১১৬; (৯) Brockelmann, SI, 96; (১০) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ৪খ., ২৪৬-৫০; (১১) Nallino, Scritti, 6, 161-2 (ফরাসী অনুবাদ, ২৪৮)।

Ch. Pellat (E.I.²) / আবদুল বাসেত

আদীনা বেগ খান (آدينه بيگ خان) : খৃ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং গভর্নর পদ পর্যন্ত উন্নীত হন। লাহোরের কেন্দ্রীয় যাদুঘরে তাঁহার একখানা হস্তাঙ্কিত চিত্র রক্ষিত আছে। সমসাময়িক ইতিহাস তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধে নীরব। তাঁহার জীবনী সম্বলিত প্রাচীনতম পুস্তিকা আহ'ওয়াল-ই দীনা বেগ খান (احوال دى نه بيگ خان) (ফিহ্‌রিস্ত-ই মাখ্‌তূতাত ইহার রিভিউ, ৩খ., ১০৪৪)। অজ্ঞাতনামা লেখকের এই পুস্তিকা আদীনা বেগের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পর সংকলিত হয়। যদিও এই পুস্তিকার অধিকাংশ ঘটনা ও সন-তারিখ ভ্রমাত্মক, তবুও তাঁহার বাল্যকালের তথ্য সম্পর্কে ইহাই একমাত্র সূত্র। আহ'ওয়াল-ই দীনা বেগ খান গ্রন্থের লেখকের বর্ণনামতে আদীনা বেগ খান ছিলেন আরাঈন (ارائين) জাতের লোক। ইমাদুস-সাআদা (عماد السعادة) গ্রন্থের রচয়িতা তাঁহাকে তুরানী মুগল বংশের লোক হিসাবে চিহ্নিত করেন (পৃ. ৬৯)। তাঁহার পিতার নাম চান্নু। জন্মস্থান লাহোর সংলগ্ন মৌজাপুর পট্টি (শরকপুর)।

ছোটবেলায় তিনি মুগলদের ঘরে লালিত-পালিত হন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় জালালাবাদ, খানপুর ও বাজ্‌ওয়াড় নামক স্থানে (জালালাবাদ ও খানপুর হুশিয়ারপুর হইতে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং বাজওয়াড় হুশিয়ারপুর হইতে দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত)। আদীনা বেগ খান অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন (দ্র. ইমাদুস -সাআদা, '৬৯ বর্ণনানুযায়ী مفردے بود كم بغل تهى دست অর্থাৎ তিনি ছিলেন সহায়-সম্বলহীন রিক্তহস্ত"। তিনি কিছুকাল সৈনিক জীবন যাপন করেন, তারপর সুলতানপুরের সন্নিকট 'কংগ' নামে পরিচিত নুহিয়ান অঞ্চলের জীবওয়াল এলাকার তহ্‌সীলদার নিযুক্ত হন। প্রথমে একজন ধনাঢ্য সওদাগরের যামিনে 'কংগ' অঞ্চলের পাঁচ-ছয়টি গ্রাম এবং পরবর্তী বৎসর সমস্ত অঞ্চলের ইজারাদারি গ্রহণ করেন। তৎপর নাওওয়াব খান বাহাদুর (যাকারিয়া খান) তাঁহাকে সুলতানপুরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। নাদির শাহের আক্রমণের সময় তিনি সুলতানপুরে এই পদে ছিলেন। তখন পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন খান বাহাদুর যাকারিয়া খান।

নাদির শাহের আক্রমণের পর (১১৫০-১১৫১ হি.) পাঞ্জাবে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। নাদির ২৬ শাওয়াল, ১১৫১/২৬ ডিসেম্বর, ১৭৩৯ সনে লাহোর হইতে রওয়ানা হইলেন (লাকহার্ট, Nadir Shah, ১৩১ প.)। শিখগণ বল প্রয়োগ শুরু করিলে তাহাদের দমন করিবার নিমিত্ত যাকারিয়া খান আদীনা বেগকে জলন্ধর দোআব অঞ্চলের নাজিম নিযুক্ত করেন (Gupta, আদীনা বেগ খান, ৫ প.)। তিনি শিখদের দমন না করিয়া তাহাদের উৎসাহিত করত চালাকির সহিত নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত যাকারিয়া খানের চাপে শিখদের নিজের অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হন। লাহোরের শাসনকর্তা যাকারিয়া খানকে রাজস্ব প্রদান না করায় আদীনা বেগ খানকে গ্রেফতার ও শাস্তিও প্রদান করা হয় (গুপ্ত, ৬ প.)। যাকারিয়া খানের শাসনামলে তিনি সরকারী কর্মচারী হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর শাস্তিযোগ্য হওয়ায় তাহাকে প্রহার ও চাবুকাঘাতে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয় যে, শরীরে আঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয় (ইমাদুস-সাআদাত, ৬৯প.)। এক বৎসর পর মুক্তিলাভ করিলে তিনি শাহনাওয়ায খানের অধীনে নাইব নাজিম নিযুক্ত হন। এইবার তিনি রাজস্ব আদায়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন। নাওয়াব যাকারিয়া খান ২১ জুলাই, ১৭৪৫ ইন্তিকাল করেন (মাআছিরুল-উমারা, ২খ., ১০৭)। তাঁহার দুই পুত্র ইয়াহয়া খান ও শাহনাওয়ায খানের মধ্যে গভর্নরের পদ লইয়া বিরোধ সৃষ্টি হয়। আদীনা বেগ উভয়ের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখেন। শাহনাওয়ায খান কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লাহোর দখল করেন (২১ মার্চ) এবং কুড়ামিলকে নিজের খাযাঞ্চী ও আদীনা বেগকে জলন্ধর দোআবের শাসক নিয়োগ করেন। ঐ সময় নাদির শাহ পরলোকগমন করেন (১৯জুন, ১৭৪৭ খৃ., লকহার্ট, ২৬১)। আহ্মাদ শাহ আবদালী কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাহ্নাওয়ায খান কেন্দ্রীয় সরকারের ভয়ে আদীনা বেগের পরামর্শক্রমে আবদালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে পাঞ্জাব আগমনের আহ্বান জানান। অন্যদিকে আদীনা বেগ খান কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই সংবাদ প্রেরণ করেন। আহমাদ শাহ আবদালী পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলে শাহনাওয়ায খান নিজের কর্মসূচীর পরিবর্তন করেন। আবদালীর সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহনাওয়াযকে দিল্লী পলায়ন করিতে হয়। আবদালী সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বাদশাহের সৈন্যদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। উযীর কামারুদ্দীন খান সরহিন্দ হইতে দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মানুপুর নামক স্থানে গুলীর আঘাতে নিহত হন। মু'ঈনুল-মুল্ক অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হন। আদীনা বেগ খান মু'ঈনুল-মুল্ক-এর সঙ্গ দান করিয়া দুই দুইবার আহত হন (গুপ্ত, ১৫ প. আহ্'ওয়াল-ই-দীনা বেগ খান-এর বরাতে, তায্কিরা-ই-আনন্দরাম মুখ্লিস ও গোলাম মুহয়িদ্দীন রচিত জাফরনামা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কপি সংখ্যা ৭৫০)। মু'ঈনুল-মুল্ক 'উরফে মীর মান্নু পাঞ্জাবের গভর্নর ও কুড়ামিল দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু আদীনা বেগ খান পূর্বের মত জলন্ধর দো'আব অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ রহিলেন। শিখেরা দোআব অঞ্চলে পুনর্বার লুটতরাজ শুরু করিলে মু'ঈনুল-মুল্ক তাহা দমন করেন। ঐ সময় আদীনা বেগ অপেক্ষা কুড়ামিল অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। সেই সময় আবদালী তৃতীয় বারের মত পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া লাহোর অবরোধ করেন (ডিসেম্বর ১৭৫১ খৃ.)। কারহাতুন-নাজিরীন-এ বর্ণিত আছে, আদীনা বেগ খান এমন ফন্দি আঁটিয়াছিলেন যাহার ফলে কুড়ামিল মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মু'ঈনুল মুল্ককে অস্ত্র সমর্পণ করিতে হয় (৬ মার্চ, ১৭৫২ খৃ.) [ইলিয়ট ও জাদ, ৮১৬৭]। তৎপর তিনি আহমাদ শাহ আবদালীর পক্ষ হইতে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত হন (গুপ্ত, ২০ প.)। মু'ঈনুল-মুল্ক ও আদীনা বেগ উভয়েই শিখদের নিধনে ব্যাপৃত থাকেন। মু'ঈনুল-মুল্ক ৩ নভেম্বর, ১৭৫৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

ইহার পর মুরাদ বেগম (মুগলানী বেগম)-এর রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং দেশে বিশৃঙ্খলা বিস্তার লাভ করে। সুতরাং আদীনা বেগ স্বাধীনভাবে স্বীয় অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তিনি রাজ্য বিস্তার করিতে শুরু করেন এবং সরহিন্দ ও নিজের অঞ্চল নিজের আয়ত্তে আনেন (১১ মার্চ, ১৭৫৫)। দিল্লীর শাসনকর্তা তাঁহাকে 'জাফর জাংগ' অর্থাৎ যুদ্ধ বিজয়ী উপাধিতে ভূষিত করেন। 'কংগ' অঞ্চলের শাসনকর্তাও তাঁহার তাবেদারী স্বীকার করেন (গুপ্ত, ২৫ প.)। এতদঞ্চলে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া আদীনা বেগ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে মুগলানী বেগম সমস্ত ক্ষমতা খাজা 'আবদুল্লাহকে প্রদান করিয়াছিলেন। লাহোর অধিকার করিয়া আদীনা বেগ খান সাদিক বেগ খানকে সেখানকার নায়েব নিযুক্ত করিয়া নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মুগলানী বেগম আহমাদ শাহ আবদালীর সহযোগিতায় দ্বিতীয়বারের মত লাহোর দখল করেন (ডিসেম্বর ১৭৫৫ খৃ.)। খাজা 'আবদুল্লাহ পুনরায় মুগলানী বেগমের নায়েব নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি মুগলানী বেগমকে ক্ষমতাচ্যুত করিলেন। মুগলানী বেগম দিল্লীর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তৎকালীন দিল্লির প্রধান মন্ত্রী 'ইমাদুল-মুল্ক শিকারের ছলে শাহযাদা আলী গাওহারকে সংগে লইয়া লাহোর দিকে অগ্রসর হন। এই সুযোগে আদীনা বেগও প্রধান মন্ত্রীর সহিত যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী মুগলানী গ্রেফতার করেন এবং লাহোরের ও মুলতানের শাসনভার আদীনা বেগের উপর ন্যস্ত করেন (গুপ্ত, ২৮ প.)। মুগলানী বেগমের সাহায্যকল্পে আহ্মাদ শাহ আবদালী আসিলে আদীনা বেগকে শাওয়ালিক-এর পার্বত্য অঞ্চলে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আফগানীরা তাঁহাকে উলন্ধর দোআব অঞ্চলের শাসনভার প্রদান করে। আবদালীর পর তায়মুর শাহের শাসনামল শুরু হয়। তখন পাঞ্জাবের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় আদীনা বেগ নিজ অঞ্চলের উপর দখলদার থাকিয়া আফগানদের পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য শক্তিশালী সহায়ক খুঁজিতেছিলেন। সেই সময় মারাঠাগণ উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে আদীনা বেগ তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন (গুপ্ত, ৩৫ প.)। মারাঠাগণ পাঞ্জাবের দিকে ধাবিত হইলে আফগানগণ পলাইতে বাধ্য হয় (শাহ আলমনামা, ৩৪প.)। রঘুনাথ রাও মারাঠী আদীনা বেগের সহযোগিতায় এই বিজয় লাভ করেন। মারাঠাগণ আদীনা বেগের নিকট হইতে নিজেদের দাবি আদায় করিয়া তাঁহাকে নাওয়াব উপাধি প্রদান করে এবং বাৎসরিক ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পাঞ্জাবের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিল্লিতে চলিয়া যায় (গুপ্ত, ৩৯ প.)। আদীনা বেগ নিজ জামাতা খাজা মিরযা খানকে লাহোরে তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করেন এবং স্বীয় অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন (গুপ্ত, Studies in Later Mughal History, ৯৮ প.; সরকার, Fall of the Mughal Empire, ২খ., ৫৫)। তাঁহার শাসনামল মাত্র পাঁচ মাস স্থায়ী হয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতার প্রমাণ দেন। যখন পাঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা দুরূহ ব্যাপার ছিল, ঠিক এমনি এক

সময়ে আদীনা বেগের কলা-কৌশল, শক্তি ও সাহস, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ফলে দোআব অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এক মহাকৃতিত্বের পরিচায়ক। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসে এবং তাঁহার স্থাপিত শহর আদীনা নগরের প্রতিটি ইট পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু আদীনা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন, অথচ তাঁহার জীবদ্দশাতেই দিল্লীর কতিপয় অঞ্চলের পতন ঘটে। স্যার যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন, আদীনা বেগ তাঁহার জামাতা খাজা মিরযা খানকে লাহোরে নিজেই নায়েব নিযুক্ত করেন (সরকার, Fall of the Mughal Empire, ২খ., ৫৪ প.) এবং সিয়ারুল মুতাআখখিরীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আদীনা বেগ বিধবা স্ত্রী ও একজন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। তাঁহারা আহমাদ শাহ আবদালীর আক্রমণের ভয়ে দিল্লী চলিয়া গিয়াছিলেন (গুপ্ত, Studies in Later Mughal History of the Punjab, ১০৮ প., সিয়রুল মুতাআখখিরীন-এর বরাতে)।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন, আদীনা বেগ খান 'কুলাঞ্জ' (قولنج পেটের শূল) রোগে আক্রান্ত হইয়া ১২ মুহাররাম, ১১৭২/১৫ সেপ্টম্বর, ১৭৫৮ বাটালীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ওসিয়াত মতই তাঁহার লাশ খানপুর লইয়া গিয়া দাফন করা হয় (প্রা., ১০২ প., বরাতঃ মিসকীন, সরকার ২খ., ৫৫, ১৩ অক্টোবর, ১৭৫৮ খৃ. মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু পূর্বোক্ত ১২ মুহাররামই অধিক নির্ভরযোগ্য)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) গুলাম আলী খান, শাহ আলামনামা, কলিকতা ১৯১৪ খৃ.; (২) ঐ লেখক, ইমাদুস-সাআদাত, নাওল কিশোর প্রেস, ১৮৯৮ খৃ. ৬৯-৭০ প.; (৩) গুলাম হুসায়ন, সিরারুল-মুতাআখখিরীন, নাওল কিশোর প্রেস ১৮৬৬ খৃ., ৩খ., ৮৯৭, ৯০৮ প.; (৪) সামসামুদ-দাওলা শাহ্‌নাওয়ায, মা'আছিরুল-উমারা, কলিকতা ১৮৯০ খৃ, এবং ১৮৯১ খৃ. ২খ., ৩৫৬; ৩খ., ৮৯০;(৫) আবদুল-কারীম, বায়ান ওয়াকি', পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারের কপি, আযাদ সংগ্রহ; (৬) আনন্দরাম মুখলিস, তাযকিরা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কপি ; (৭)) আহওয়াল-ই আদীনা বেগ খান, পাণ্ডুলিপি, বৃটিশ লাইব্রেরী, ফটোকপি। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নং ১৭; (৮) Elliot and Diwson, History of India, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ., ৮খ., ১৬৭, ১৬৮; (৯) Proceedings of the Idara-i Ma'arif-i Islamia, লাহোর ১৯৩৮খৃ., পৃ. ২৫৩-২৭৮; (১০) J.D. Pearson, Index Islamicun, ১৯০৬-১৯৫৫, কেমব্রীজ ১৯৫৮, পৃ. ৬৫২; (১১) Islamic Culture, ১৩ খ., (১৯৩৯ খৃ.), ৩২৩-৩৩৮, ডা. হরিরাম গুপ্তের প্রবন্ধ, শিরোনাম Adina beg, the last Mughal Viceroy of the Punjab, Journal of the Punjab University Historical Society, 6,23-77; পৃথক পুস্তিকা আকারে ১-৫৫ উৎস তালিকা ৪৯-৫৫ পৃ., বর্তমান নিবন্ধে 'গুপ্ত' বলিতে এই পুস্তিকাই বুঝায়); সামান্য সহসংযোজনে ঐ নিবন্ধ Dr. Hare Ram Gupta-এর Studies in Later Mughal history of the Punjab, লাহোর ১৯৪৪ খৃ., ৫৬-১০৮; (১২) Syed Muhammad Latif, Lahore, Its History, Architectural Remains and Antiquities, দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর ১৯৫৬-১৯৫৭ খৃ., ৭৫ প.; (১৩) ঐ, History of the Punjab, কলিকাতা ১৮৯১ খৃ, নির্ঘণ্ট; (১৪) J. N. Sarker, Fall of the Mughal Empire, খণ্ড ১, (১৭৩৯-১৭৫৪খৃ.) কলিকতা ১৯৪৯ খৃ, ২৪২ প., খ. ২, (১৭৫৪-১৭৭১খৃ.) কলিকাতা ১৯৫০ খৃ, ৪৫-৫৮ প.; (১৫) J.D. Cunningham, History of the Sikhs, ২য় সং, লন্ডন ১৮৫৩ খৃ., ৯২ প.; (১৬) Storey, Persian Literature, 2/3, ৬৬৪-৬৬৫।

ওয়াহীদ কুরায়শী (দা. মা. ই.)/ সাইয়েদুল ইসলাম

আদীনা মস্‌জিদ (ادينه مسجد) ঃ ভারতের মালদহ জেলার হযরত পাণ্ডুয়ায় (দ্র.) সিকান্দার শাহ কর্তৃক ১৩৭৫ খৃ. নির্মিত। এই মসজিদের নাম ফারসী শব্দ আদীনা হইতে গৃহীত। শব্দটির অর্থ জুমুআর দিন অর্থাৎ শুক্রবার। মসজিদটি প্রথম হইতেই জামে মসজিদরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে সংযোজিত প্রকোষ্ঠে আনুমানিক ১৩৮৯ খৃ. নির্মিত সিকান্দার শাহের সমাধি, বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। আদীনা মসজিদ দামিশ্‌কের ওয়ালীদ কর্তৃক স্থাপিত মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। ইহার আয়তন ৫০৭´×২৮৫´ (দাসকৃত মসজিদের ৫৩০´× ৩২৩´), উচ্চতা ৬০´ ফুট, মধ্যভাগে ৪০০´×১৫০´ মুক্ত প্রাংগণ। মোট ২৬০টি স্তম্ভে পশ্চিম দিকের কোঠা ৫টি ও অন্যান্য কোঠা ৩টি যাতায়াত পথ দ্বারা বিভক্ত। প্রাচীর ইটের তৈরী। উপরে পাথরের আস্তরণ, মধ্যপ্রাংগণের চারিধারে ৮৮ টি অর্ধবৃত্ত অর্ধ শীর্ষক দ্বারপথ, ছাদের উপর ৩৬০ টি গুম্বজ। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মাত্র তিনটি মুক্ত সড়ক মসজিদের প্রবেশ পথ। পশ্চিম প্রাচীরের প্রতিটি সড়ক প্রান্তে মিহরাব। কিন্তু কেন্দ্রীয় মিহরাব একটি বর্ধিত কোঠার মধ্যে। ইহার পার্শ্বে মঞ্চাকৃতি মিম্বর, দক্ষিণ দিকে অপর একটি মিহরাব। ইহার উত্তরে ১৫ টি গুম্বজে আবৃত স্থানে অনেকটা দোতলার মত নির্মিত একটি মঞ্চ। ইহা 'বাদশাহের তখ্‌ত' নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা মহিলাদের গ্যালারী। কেন্দ্রীয় মিম্বরের অর্ধবৃত্ত হংস তোরণের অনুকরণে নির্মিত। ইহাতে ২০টি সারিবদ্ধ কুলংগীতে শিকল দিয়া ঝুলানো একটি করিয়া প্রদীপ। সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াছুদ্দীন আ'জাম শাহের সমাধিতে অনুরূপ প্রদীপ আছে। মিহরাব টেরাকোটা দ্বারা অলংকৃত। আদীনা মসজিদের বিশালতাই ইহার সৌন্দর্য। এই উপমহাদেশে ইহা দ্বিতীয় বৃহত্তম, লাহোরের শাহী মসজিদের পরেই ইহার স্থান। প্রাঙ্গণ পর্যন্ত সমস্ত অর্ধবৃত্তের সারিতে ক্লাসিক্যাল গাম্ভীর্য লক্ষিত হয়। ইহার নির্মাণ-শৈলীও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা হইতে স্থাপত্য শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০; (২) ড. এস. এম. হাসান, The Adina Masjid at Hazrat Pandua, ২য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

(সংকলিত)
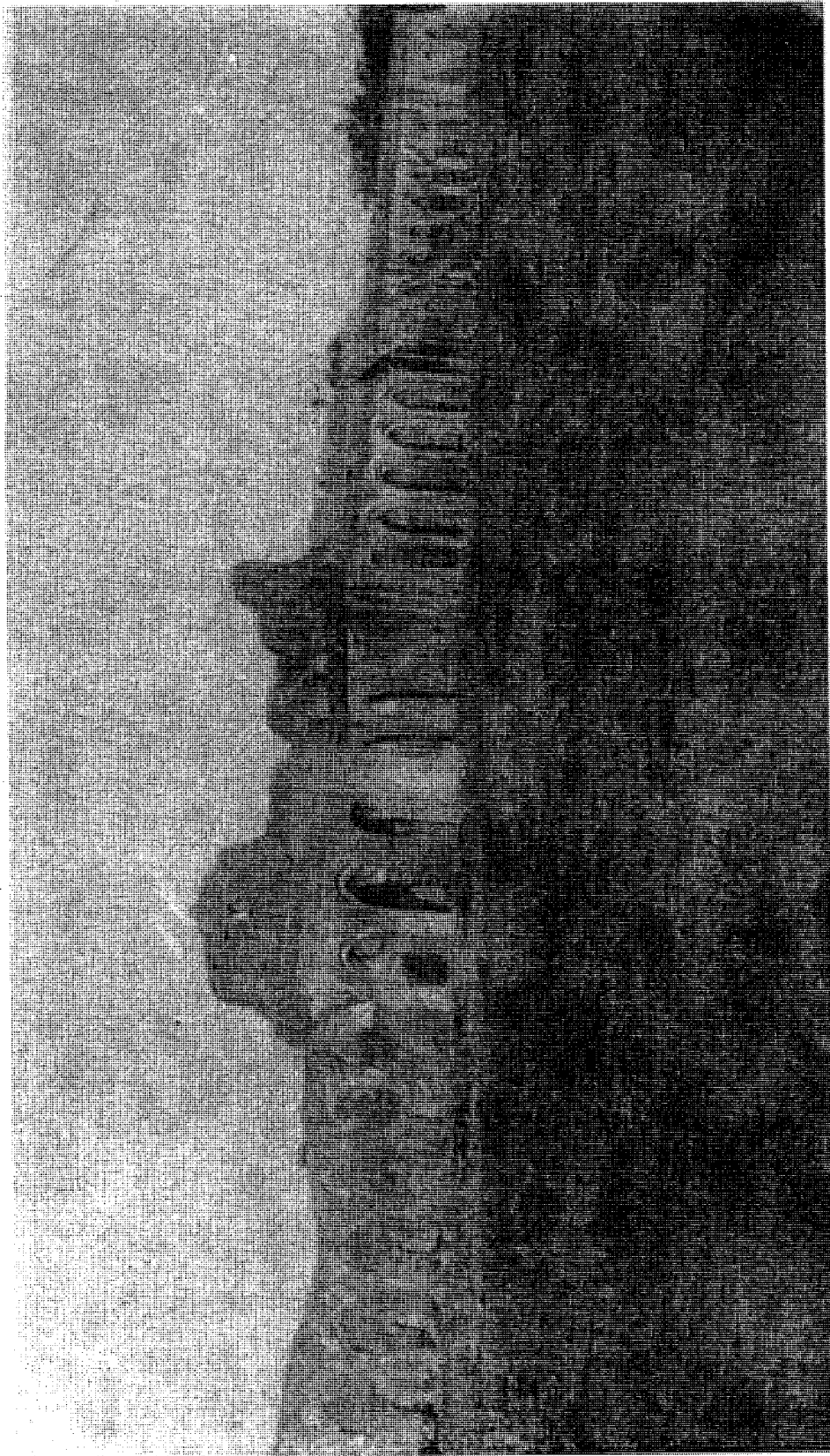
আদিনা মসজিদের সম্মুখ প্রাঙ্গন (১৩৭৪-৭৫ খৃ.)। *Gaud And Hazrat Pandua* শীর্ষক গ্রন্থের সৌজন্যে।
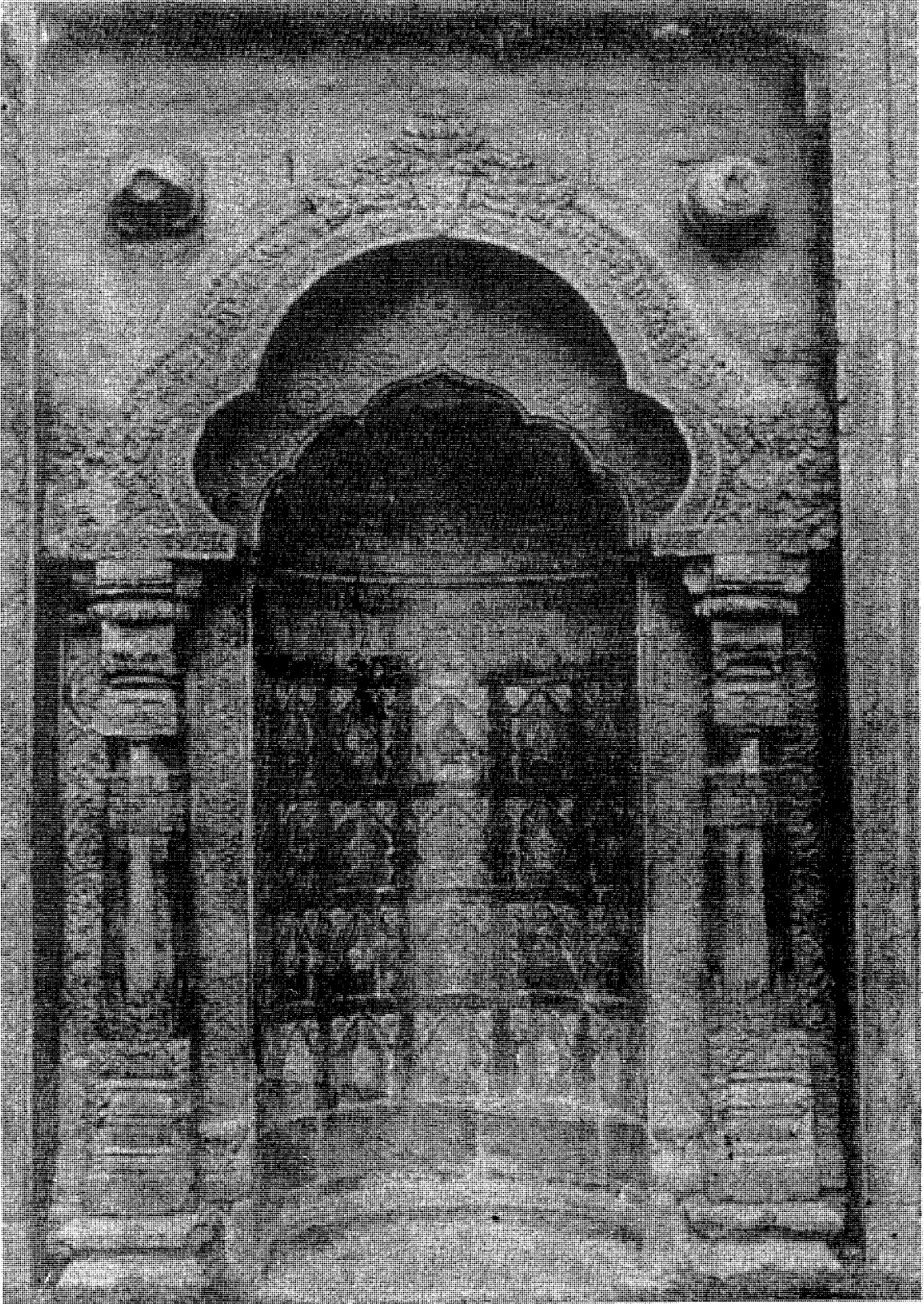
আদিনা মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
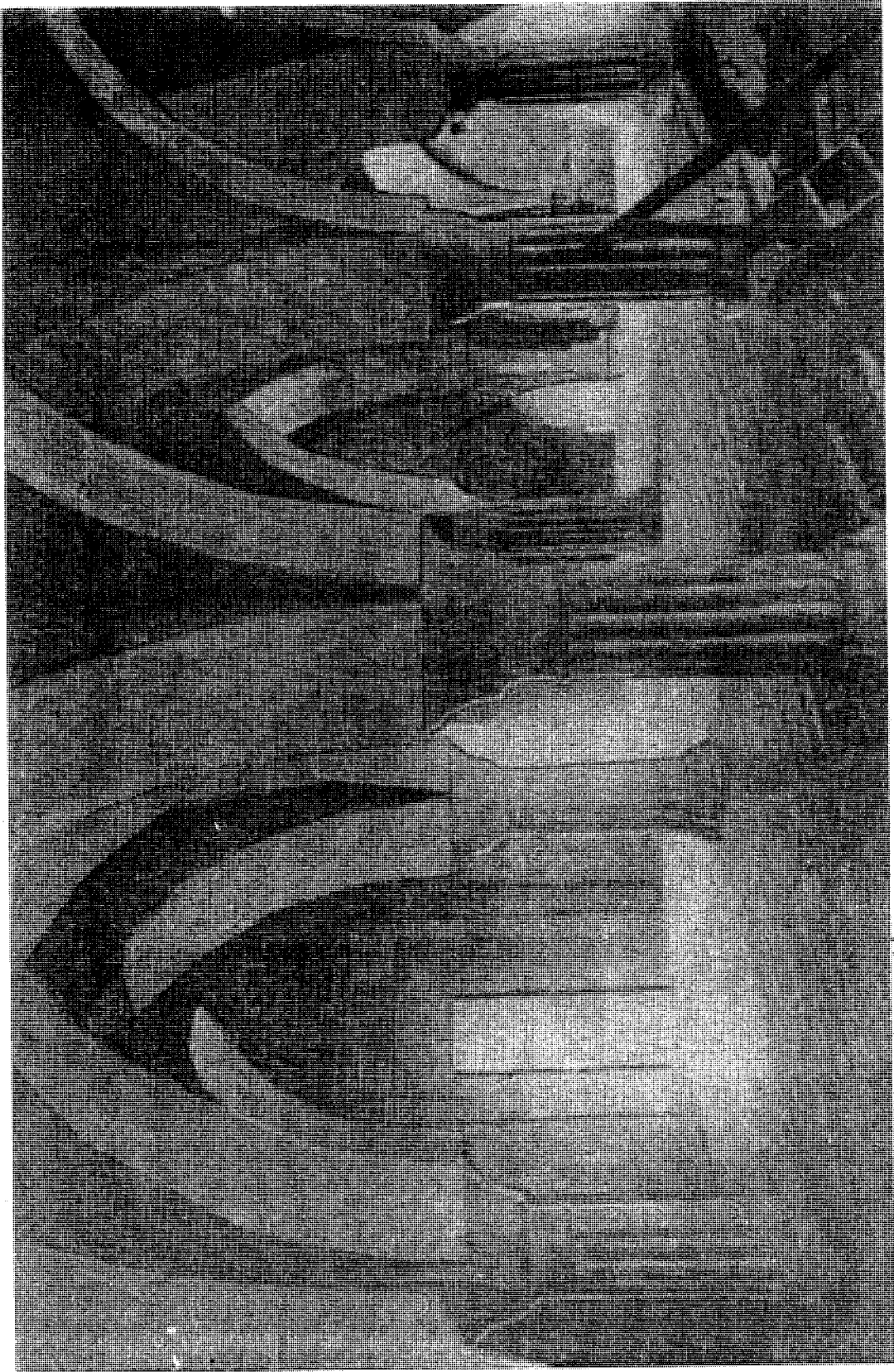
আদিনা মসজিদ, মহিলাদের নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত গ্যালারী (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
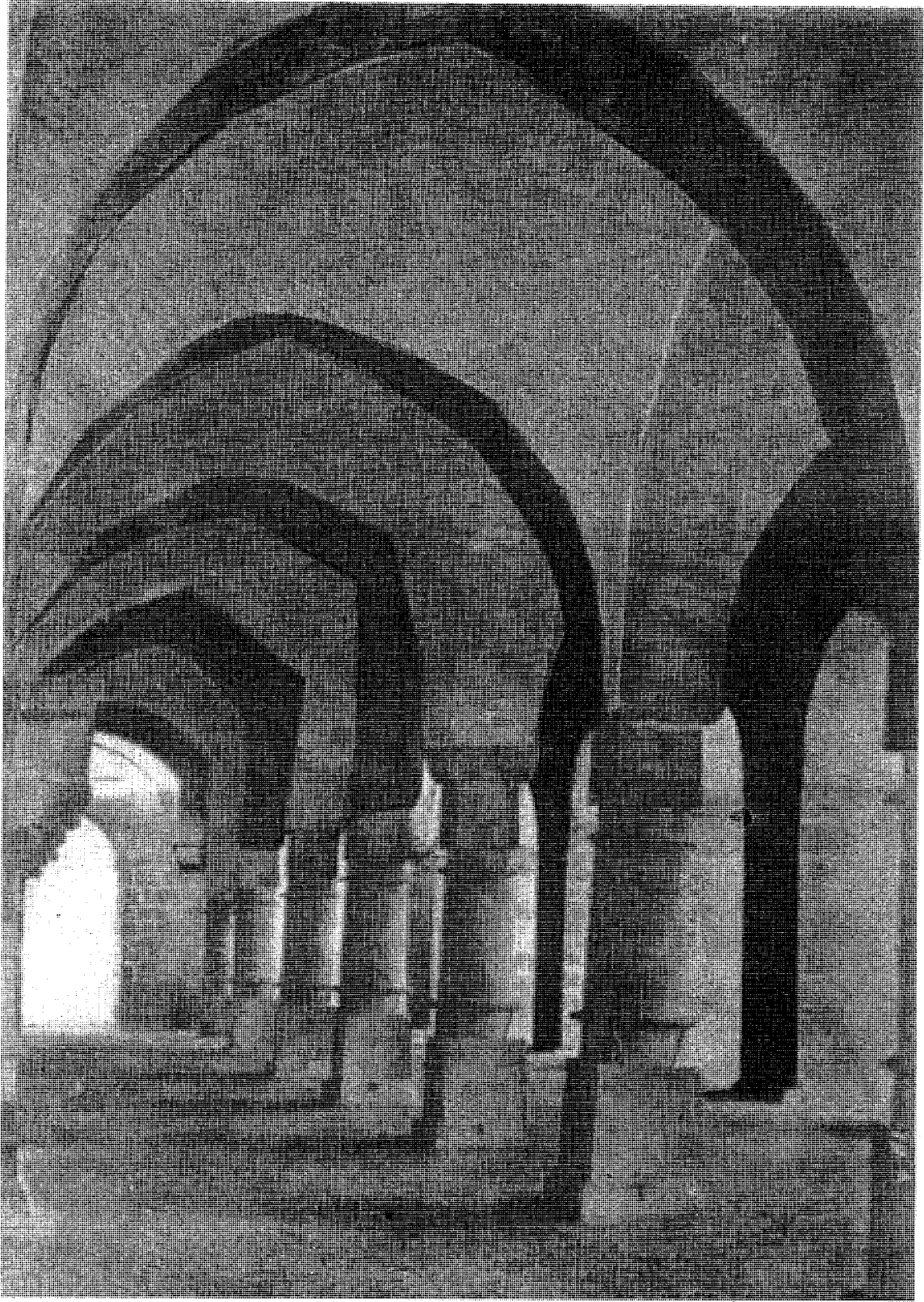
আদিনা মসজিদ, উত্তর দিকের অংশ এবং মহিলাদের জন্য নির্দ্ধারিত গ্যালারী (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
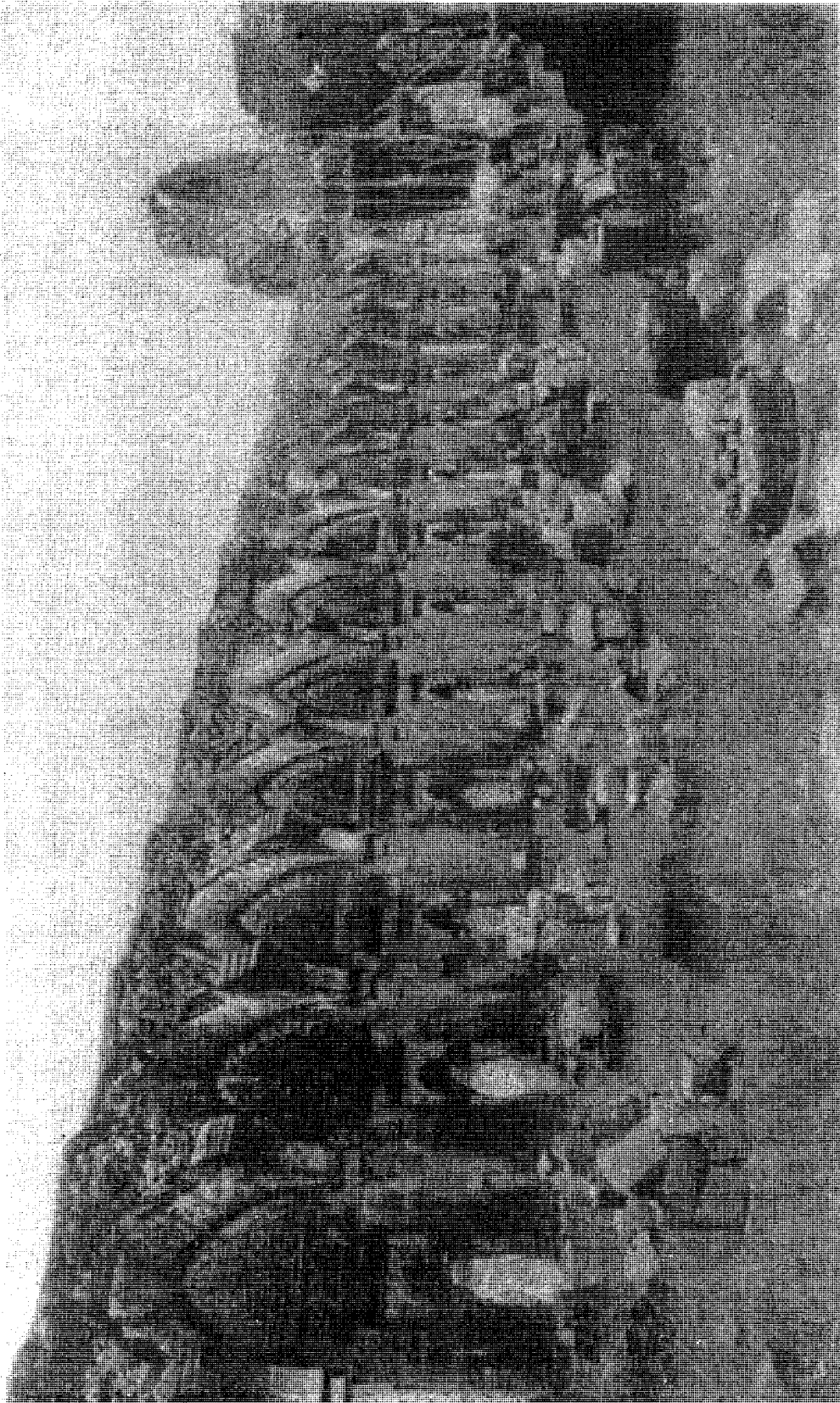
আদিনা মসজিদ, দক্ষিণ দিকের অংশ (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
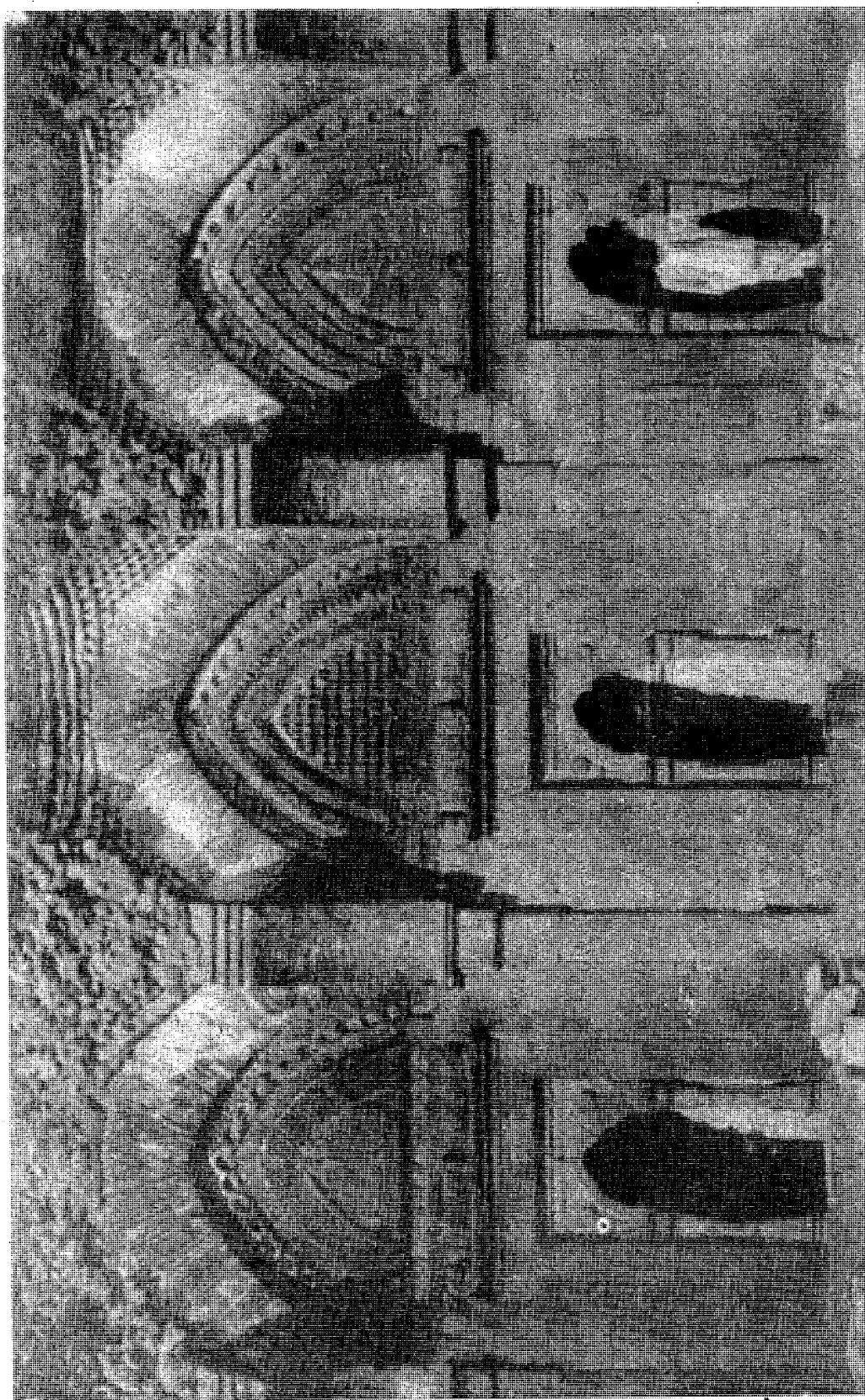
আদিনা মসজিদ, দক্ষিণাংশ, বিস্তারিতভাবে মিহরাবগুলি দেখানো হইয়াছে (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
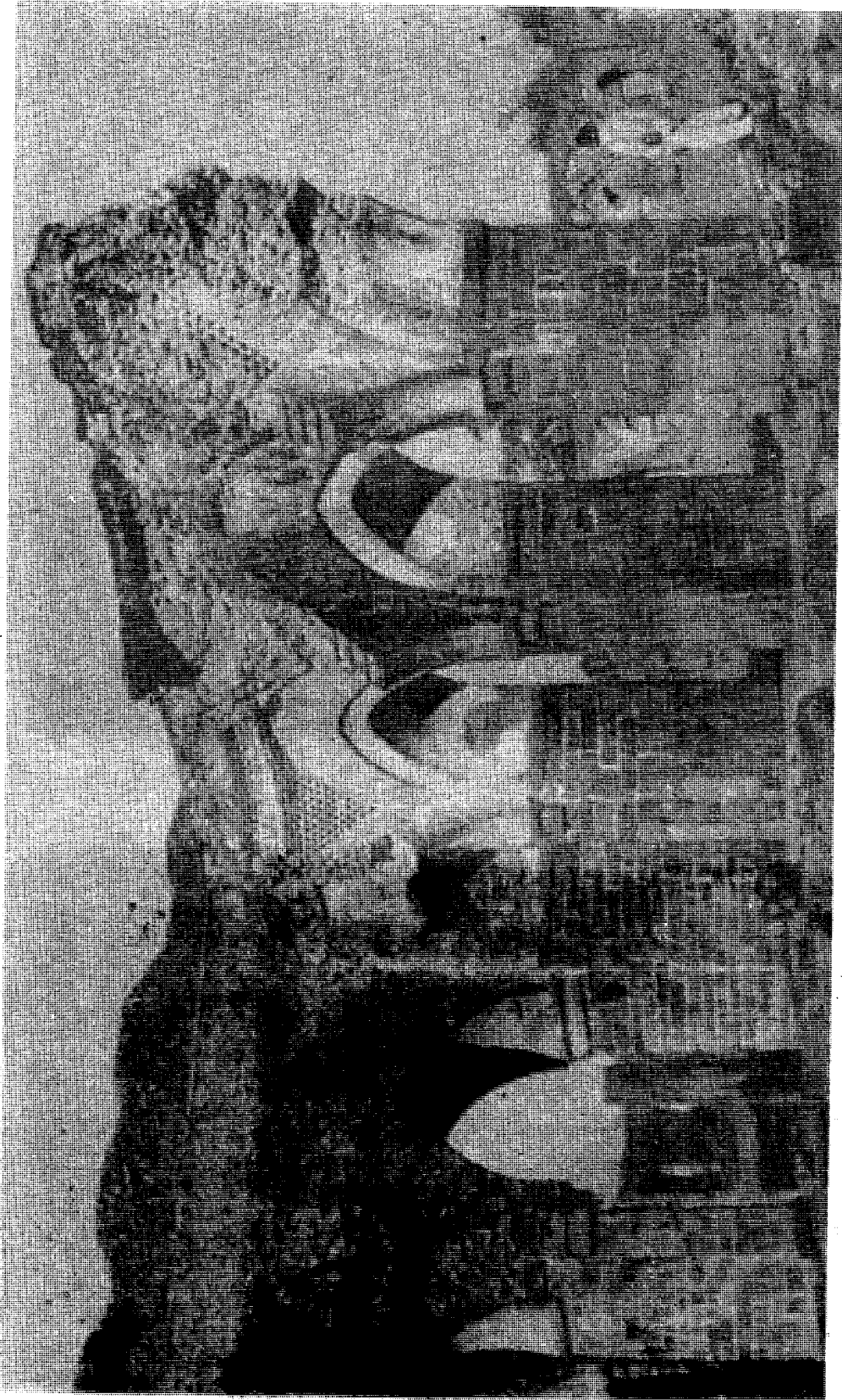
আদিনা মসজিদ, দক্ষিণাংশ (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
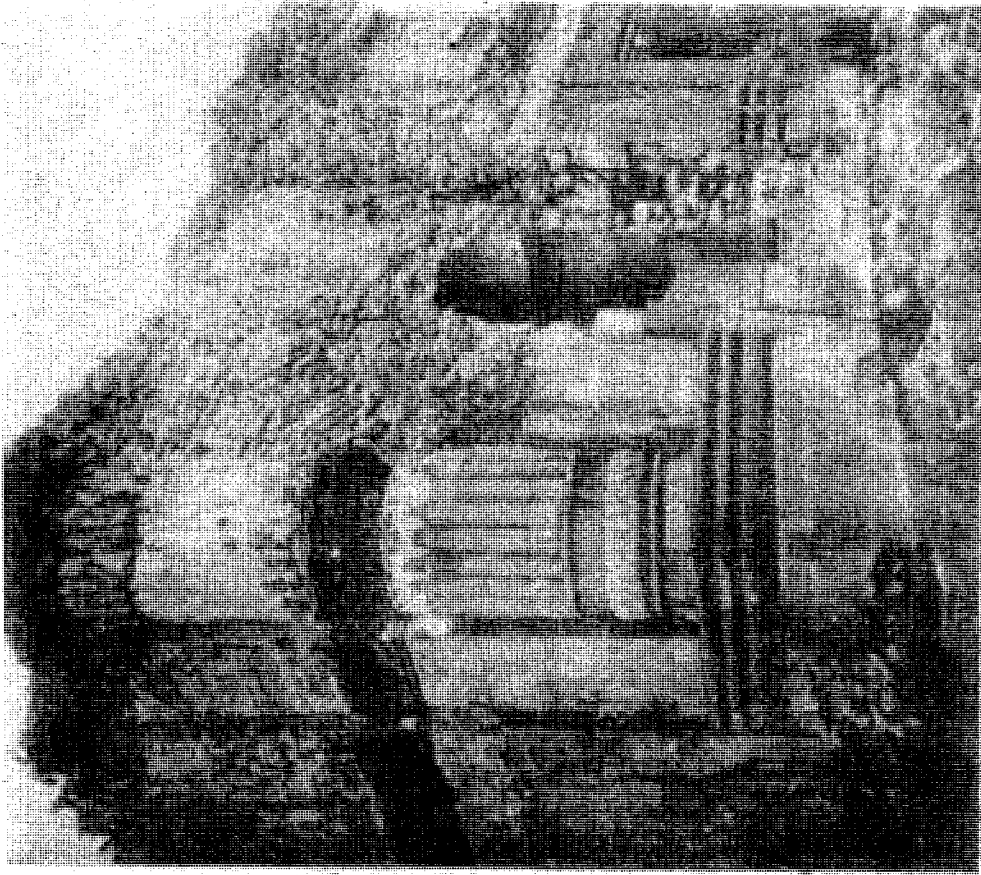
আদিনা মসজিদ, কর্ণার টাওয়ার (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
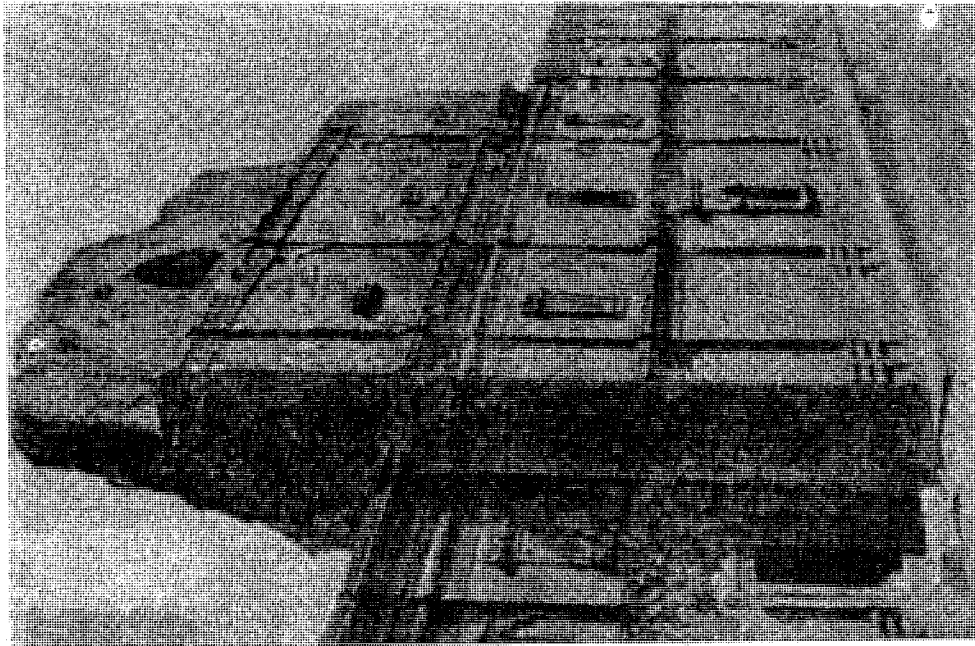
আদিনা মসজিদ, মিহরাব দেয়াল (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।

আদিনা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর লিপি (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।
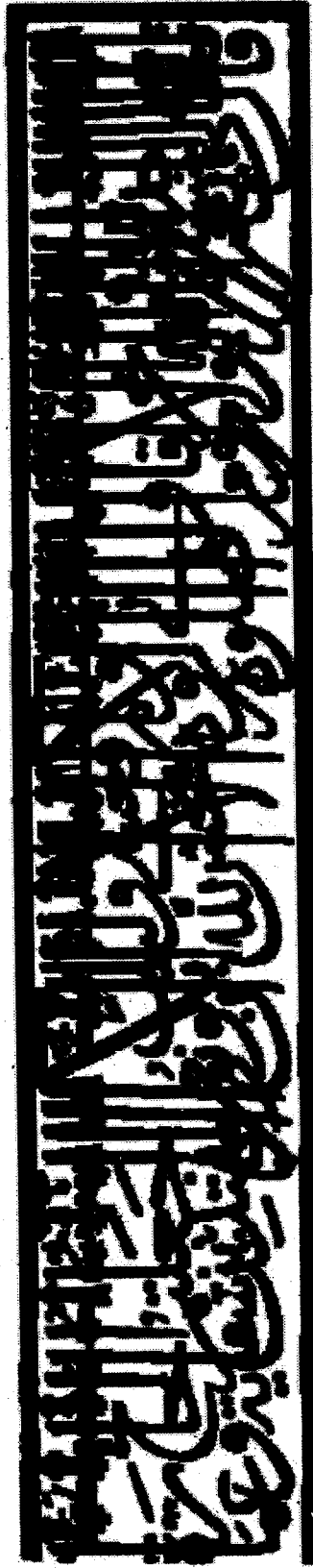
আদিনা মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরস্থিত শিলালিপি (পূর্বোক্ত গ্রন্থের সৌজন্যে)।

আদীব উওয়ায়স আহ্‌মাদ সাহারানপুরী (ادیب اویس احمد سہارن پوری) ঃ নাম উওয়ায়স আহমাদ, কবি-নাম আদীব (সাহিত্যক) বিশিষ্ট উর্দূ সাহিত্যিক, জ. ঝাঁসী (ভারত), পূর্বপুরুষদের বাসস্থান সাহারানপুর। তিনি বি. এ. অনার্স পরীক্ষা পাশ করেন (১৯৩৪); উর্দূতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন (১৯৩৫)। কিছুকাল লাখনৌতে প্রকাশিত সারপাঞ্চ ফিল্ম এডিশন নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দূ বিভাগে গবেষণামূলক কাজ করেন। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন (১৯৩৭)। শিক্ষা শেষে কানপুর মুসলিম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯৩৮)। প্রকাশিত রচনাঃ উর্দূ কা পহ্‌লা নাবিস্‌নিগার, উর্দূ কা পহ্‌লা শাইর, মাহ-ই আরাব, বীবী কে ফারাইদ, একট্রস কী আপবীতী (অভিনেতাদের আত্মকথা) ইত্যাদি। বাস্তবতা ও ব্যাপকতা তাঁহার সমালোচনার বৈশিষ্ট্য। নাট্য রচনায় তাঁহার বাচনভংগী হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার সামাজিক ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধসমূহে গাম্ভীর্য ও হাস্যরসের সুসমঞ্জস মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গল্পের ভাষা প্রাঞ্জল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., পৃ. ১৩১।

(সংকলিত)

আদীব পেশাওয়ারী (ادیب پیشاوری) ঃ সায়্যিদ আহ্‌মাদ ছিলেন একজন পারস্য কবি। আনু. ১৮৪৪ খৃ. তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশাওয়ার নামক স্থানে এক যাযাবর সয়্যিদ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক দিক হইতে শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দী তরীকাপন্থী বলিয়া দাবি করেন। তিনি যখন সবেমাত্র বালক সেই সময় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পিতা ও পরিবারের অধিকাংশ পুরুষ আত্মীয়স্বজন নিহত হন। তিনি নিজেও কাবুলে পলায়ন করেন। গায্‌নী, হারাত ও তুরবাত-ই শায়খ জাম-এ কয়েক বৎসর কাটাইবার পর তিনি মাশ্‌হাদ নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই কয়েকজন স্বনামধন্য 'আলিমের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। সাব্‌যাওয়ার-এ প্রসিদ্ধ মুল্লা হাদী সাব্‌যাওয়ারীর নিকট তিনি দুই বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাশ্‌হাদে তিনি আদীব-ই হিন্দী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃ. তিনি মাশহাদ হইতে তেহরান গমন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। তেহরানে তিনি নাসিরুদ্দীন শাহ কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৯৩০ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ৪২০০ টি ফারসী ও ৩৭০ টি আরবী শ্লোকবিশিষ্ট একখানি দীওয়ান, মুতাক'আরিব ছন্দে রচিত একটি মাছনাবী কাব্য, জর্মানীর কাইযারকে উৎসর্গীকৃত, ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত রচনা কায়সার নামাহ্ (অপ্রকাশিত), দুইটি দার্শনিক বিষয়ক প্রবন্ধ, তারীখ-ই বায়হাকী-র ভাষ্য ও ইব্‌ন সীনা (Avicenna) রচিত কিতাবুর-ইশারাত-এর অসম্পূর্ণ ফার্‌সী অনুবাদ। তাঁহার দীওয়ান আলী আবদুল রামূলী কর্তৃক ১৯৩৩ সালে তেহরানে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষ্যসম্বলিত তারীখ-ই বায়হাকী-র একটি সংস্করণ ১৮৮৯ খৃ. তেহরানে এবং ভাষ্যটি সাঈদ নাফীসী-র সংশোধনসহ তিন খণ্ডে ১৯৪০-৫৩ সালে তেহরানে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার মাতৃভাষা পাশতু হইলেও আদীব পেশাওয়ারী ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হিসাবে পরিগণিত। ব্যাপক অধ্যয়ন ও প্রখর স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি তাঁহার ধারণাসমূহকে সুললিত সাহিত্য শৈলীতে পরিবেশন করিতে পারিতেন। জনগণের কর্মকাণ্ডে কখনও সক্রিয় অংশগ্রহণ না করিলেও এবং সারা জীবন আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকিলেও তাঁহার কাব্যে দেখা যায়, পৃথিবীর ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধ, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন ও বিশ্বযুদ্ধের মত বিষয়সমূহের উপর তিনি তাঁহার রচনায় স্বাধীনভাবে মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রাথমিক জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক স্থায়ী ঘৃণাবোধের জন্ম দেয়। নিঃসন্দেহে এই ঘৃণাবোধই কাইযারকে সমর্থন দানে তাঁহাকে আংশিকভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আন্তরিকভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী ও সত্যিকার দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের উপর কখনও নির্ভরশীল ছিলেন না এবং তাঁহাদের উদ্দেশে কোন স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় না। নবযুগের কবিগণ যাঁহারা প্রাচীন Classical কবিতা-রীতি পরিত্যাগ করিয়া জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রণীরূপে বিবেচিত।

গ্রন্থপঞ্জীঃ জীবন-চরিতমূলক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে (১) মুহাম্মাদ ইস্‌হাক, সুখানওয়ারান-ই ঈরান দার 'আস্'র-ই হাদিরম, কলিকাতা ১৯৬৩, ১খ., ১-৮; (২) রাশীদ য়াসিমী, আদাবিয়্যাত-ই-মু'আসি'র, তেহরান ১৯৩৭, পৃ. ১০-১৩; (৩) মুহাম্মাদ ইসহাক, Modern Persian Poetry, কলিকাতা ১৮৪৩, স্থা. ; (৪) সায়্যিদ মুহাম্মাদ বাকী বুর্‌কাঈ, সুখান্‌ওয়ারান-ই নামী-ই মু'আসি'র, তেহরান ১৯৫০, ১খ., ১-২; (৫) J. Rypka, Iranische Literaturgeschichte, Leipzig 1959, 356-7; (৬) ঐ লেখক, History of Iranian Literature, Dordrecht 1968, 374-5; (৭) বোযোর্গ আলাবী, Geschichte und Entwicklung der Modernen Persischen Literatur, বার্লিন ১৯৬৪, ৩৪-৫।

L. P. Elwell Sutton (E. I. [2]) / মোঃ শহীদুল্লাহ

আদীব স'াবির (ادیب صابر) ঃ নাম স'াবির। পিতার নাম ইসমাঈল। রাশীদুদ-দীন ওয়াতওয়াত (লুবাবুল আলবাব, ৮৬) তাঁহার উপাধি শিহাবুদ-দীন উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তিরমিয-এর অধিবাসী ছিলেন (লুবাব, ২খ., ১১৭) এবং মূলত বুখারা তাঁহার দেশ ছিল (দাওলাত শাহ)। সেখানকার জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সায়্যিদ মাজদুদদীন আবুল কাসিম 'আলী ইব্‌ন জা'ফার আল-মুসাবীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতাই এই আমীরের প্রশংসায় রচিত ইনতিখাব-ই দাওয়াবীন-ই শু'আরা-ই মুতাক'াদ্দিমীন, কিতাব খানা-ই হামীদিয়্যা, ভূপাল, পত্র ৪৯৫ খ, দীওয়ান-ই আদীব সাবির, কামা লাইব্রেরী, বোম্বাই (R vii 48)।

এতদ্ব্যতীত কবি আরও কয়েকজনের স্তুতি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন আবুল-হাসান তাহির (ইব্‌ন ফাক'ীহ-ই আজাল্লি

আবুল-কাসিম আবদিল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন ইসহাক) যিনি নিজামুল-মুল্ক তূসীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন (তারীখ-ই বায়হাক, পৃ. ৭৪) এবং নীশাপুরে বাস করিয়াছিলেন। (তারীখ-ই বায়হাক, পৃ. ২১০) তাঁহার আর একজন প্রশংসার পাত্র হইলেন মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন যিনি কবির বর্ণনানুযায়ী বাল্খ হইতে রাশিয়া পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলাউদ-দীন সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্ন হায়দার-এর প্রশংসায়ও তাঁহার দীওয়ানে একটি কবিতা আছে (দীওয়ান -ই সাবির, কামা লাইব্রেরী, বোম্বাই)।

সাবিরকে সানজারের তরফ হইতে আত্সিয খারিযম শাহ (৫৫১/১১৫৬ খৃ.)-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী অবহিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি সেইখানে গিয়া আত্সাযের প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করেন।

আদীব সাবির সেই সময় পর্যন্ত খারিযমে ছিলেন যখন আত্সিয সানজারকে হত্যা করার জন্যই দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাবির এক বৃদ্ধা দ্বারা মারব-এ সংবাদটি পাঠাইয়া দিলেন। সানজার সেই দুই ব্যক্তিকে অনুসন্ধান চালাইয়া একটি মদের দোকানে পাওয়া গেলে সেইখানে হত্যা করান। এই ব্যাপার অবগত হইয়া আত্সিয সাবিরকে আমু দারয়া-তে ফেলিয়া দেন (জুওয়ায়নী, পৃ.৭)। সাবিরের জলমগ্ন হওয়ার তারিখ ৫৪২ হিজরীর জুমাদাল উখরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দাওলাত শাহ (পৃ. ৫৭) ৫৪৬/ ১১৫২ সাল উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাই সঠিক। কেননা আমরা সাবিরকে ৫৪৩ বা ৫৪৪ হি. আবুল হাসান তাহিরের প্রশংসায় কবিতা রচনা করিতে দেখিয়াছি এবং রূহানী গাযনাবী সুলতান বাহরাম শাহ গাযনাবীর মন্ত্রী নাজীবুদ-দীন হুসায়ন ইব্ন হাসানের মন্ত্রিত্বকালে সাওগানদ (শপথ) নামাহ ৫৪৪ হিজরীর পর লিখিয়াছিলেন। কারণ কমপক্ষে সেই পর্যন্ত নাজীবুদ-দীন হুসায়নের পিতা আবূ আলী-হাসান ইব্ন আহমাদই মন্ত্রী ছিলেন, উহাতে আদীব সাবিরকে জীবিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন [তারীখ বাহরাম শাহ (ইংরেজী অনু.), গুলাম মুসতাফা খান, লাহোর ১৯৫৫ খৃ. ৯৩-৯৫]।

সাবির ওয়াতওয়াত সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করিয়াছেন (ইনতিখাব, ভূপাল পত্র ৪৯৯ ক), কিন্তু ওয়াতওয়াত তাঁহার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়াছেন (দ্র. লুবাবুল আলবাব, ১খ., ৮৩ ও ৮৬)। ব্যঙ্গ ও প্রশংসাসূচক কবিতার রচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও আদীব সাবিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের প্রতি আর্কষণ এবং পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্তি (ডা. রিফা যাদাহ শাফাক, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৩২১ হি. সৌর.)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (ক) পাণ্ডুলিপি ঃ (১) দীওয়ান-ই আদীব সাবির, জামি'আ-ই উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, পাণ্ডুলিপি, ৮৭৮; (২) দীওয়ানা-ই আদীব সাবির, কামা লাইব্রেরী, বোম্বাই; (৩) দীওয়ান-ই আদীব সাবির, মাক্তাবা-ই আসাফিয়্যা, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, পাণ্ডুলিপি ৯৩৬; (৪) ইনতিখাব-ই দাওয়াবীন-ই শু'আরা-ই মুতাক'াদ্দিমীন, ৩, হামীদিয়্যা লাইব্রেরী, ভূপাল; (৫) আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ কুলাঈ ইসফাহানী, মুনিসুল-আহরার, হাবীবগঞ্জ। (খ) মুদ্রিত গ্রন্থাদি ঃ (৬) আওফী, লুবাবুল-আলবাব, লাইডেন ১৯০৩ খৃ.; (৭) জুওয়ায়নী, তারীখ জাহান গুশায়, সম্পা. সায়্যিদ জালালুদ্দীন তিহরানী, তেহরান ১৩৫১ হি; (৮) গুলাম মুসতাফা, তারীখ-ই বাহরাম শাহ গাযনাবী (ইংরেজী) লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (৯) দাওলাত শাহ, তাযকিরা-ই দাওলাত শাহ, ১৯২৪ খৃ.; (১০) বায়হাকী, তারীখ-ই বায়হাক, সম্পা. আহমাদ বাহমানয়ার, তেহরান ১৩১৭ হি. সৌর; (১১) রিদাযাদাহ শাফাক, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৩২১ হি. সৌর।

গুলাম মুসতাফা খান (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ ইউনুস

'আদু'দুদ-দাওলা (عضد الدولة) ঃ আবূ শুজা' ফান্না খুসরাও, পিতা রুক্নুদ দাওলা ও বুওয়ায়হী বংশীয় (দ্র.) 'আমীরুল উমারা ৫ যু'ল-ক'া'দা ৩২৪/২৪ সেপ্টেম্বর, ৯৩৬ সালে ইসফাহানে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৩৮/৯৪৪ সালে তাঁহার অপুত্রক চাচা 'ইমাদু'দ দাওলার মৃত্যুর পরে তদীয় ইচ্ছানুযায়ী ফান্না খুসরাও মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ফারস্-এর শাসকরূপে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ৩৫১/৯৬২ সালে খলীফা আল-মু'তী-এর নিকট হইতে তিনি আদুদুদ-দাওলা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অপর চাচা মু'ইযুদ-দাওলার মৃত্যুর পরে (৩৫৬/৯৬৭) তিনি 'উমান-এরও অধিকার লাভ করেন। উহার পরের বৎসর তিনি কিরমান জয় করিলে খলীফা তাঁহাকে সেই রাজ্যের শাসকরূপে স্বীকৃতি দান করেন এবং সীস্তান-এর শাসকও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। ৩৬১/৯৭১-২ সালে কিরমান-এর সাবেক শাসকের এক ভাই কর্তৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা তিনি ব্যর্থ করিয়া দেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিরমান-এর বালুচ ও বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণকারী অন্য গোত্রপতিগণকে পরাস্ত করিয়া সেই প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

এভাবে সমগ্র দক্ষিণ পারস্য নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া আদুদুদ্-দাওলা অতঃপর তাঁহার চাচাতো ভাই বাখ্তিয়ারকে ইরাকের শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করেন। বাখ্তিয়ার-এর ভ্রান্তির কারণে তাঁহার তুর্কী সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং তখন ৩৬৩/৯৭৩-৪ সালে আদুদুদ্-দাওলা বুওয়ায়হী বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী বাখ্তিয়ার-এর পিতার নিকট হইতে রায়স্থ রুকনুদ্-দাওলার বাহিনীর একটি অংশের সমবায়ে গঠিত সেনাবাহিনী লইয়া বাখ্তিয়ার-এর 'সাহায্যার্থে' অগ্রসর হইবার অনুমতি আদায় করেন। কিন্তু অতঃপর ইচ্ছা করিয়াই তিনি সেই যুদ্ধযাত্রা বিলম্বিত করেন, যতদিন পর্যন্ত না বাখ্তিয়ার পরাজয়ের প্রায় সম্মুখীন হন। অতঃপর আদুদুদ-দাওলা অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহী তুর্কীদের আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করেন এবং জুমাদাল-উলা, ৩৬৪/জানুয়ারী ৯৭৫ সালে বাগদাদে প্রবেশ করেন। দুই মাস পরে তিনি ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বাখ্তিয়ারকে শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তবে আদুদুদ-দাওলাকে ইরাক গ্রাস করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে দমন করিয়া রাখিতে হয়। বাখ্তিয়ার-এর প্রতি এহেন আচরণে মারাত্মকভাবে মর্মাহত হইয়া তাঁহার পিতা পীড়িত হইয়া পড়েন এবং পরবর্তী বৎসর প্রাণত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী অনুগত পুত্রের ন্যায় তিনি বাখ্তিয়ারকে পুনরায় শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া শীরাযে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পিতার উত্তরাধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার বয়োকনিষ্ঠ দুই ভাই ফাখরুদ-দাওলা ও মুআয়্যিদুদ্-দাওলা তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় রুকনুদ্-দাওলার মৃত্যুর পরে আদুদুদ-দাওলা পারস্য হইতে কোন প্রকার বাধার বিষয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হন এবং দ্বিতীয়বার ইরাকে অভিযান পরিচালনা

করিতে সক্ষম হন। বাখ্‌তিয়ার এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আহ্‌ওয়ায-এ আদুদুদ-দাওলার সম্মুখীন হন কিন্তু যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন (যু'ল-কা'দা ৩৬৬/জুলাই ৯৭৭)। পরাজয়ের তিন মাস পরে তিনি আদুদুদ্-দাওলার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন, কিন্তু সিরিয়াতে গিয়া বসবাস করিবার মানসে সেখানে যাইবার পথে হামদানী বংশীয় আবূ তাগলিব কর্তৃক পুনরায় আদুদুদ্-দাওলার মুকাবিলা করার জন্য অনুপ্রাণিত হন। ১২ শাওয়াল ৩৬৭/২৪ মে, ৯৭৮ তারিখে সংঘটিত সামাররা (কাসরুল, জুসাস-এর যুদ্ধে আদুদুদ্-দাওলা তাঁহাদের মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া দেন। বাখ্‌তিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইলে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। আর আবূ তাগলিব পরবর্তী বার মাস কাল যাবত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমাগত পশ্চাদ্ধাবিত অবস্থায় স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া কাটাইতে থাকেন। অবশেষে সিরিয়াতে যাইয়া তিনি ফাতিমীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর 'আদুদ্দ-দাওলা যখন যু'ল-কা'দা ৩৬৮/ জুন ৯৭৯ সালে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি শুধু ইরাকেরই নহে, বরং দিয়ার রাবী'আ, দিয়ার বাক্‌র ও জাযীরার অধিকাংশ ভূভাগের অধিকারী হন।

আদুদুদ্-দাওলার দ্বিতীয় অভিযানের আশঙ্ক করিয়া বাখ্‌তিয়ার কেবল আবূ তাগলিব-এর সাহায্যেই নহে, নিম্নাঞ্চলের (আল-বাতীহা) শাসক 'ইমরান ইব্‌ন শাহীন, কুর্দী সর্দারসহ হাসান ওয়ায়্‌হ আল-বারযিকানী, আদুদুদ্- দাওলার ভাই ফাখরুদ-দাওলা ও যিয়ারী গোত্রের কাবূস ইব্‌ন উশম্‌গীর-এরও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই কারণে ৩৬৯/৯৭৯ সালে আবূ-তাগলিবের মুকাবিলা শেষে আদুদুদ্ দাওলা ইহাদের প্রত্যেকেরই আনুগত্য লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি 'ইমরান-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-হাসান-এর বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণ করিলে হাসান পরবর্তী বৎসর হইতে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। ইতিমধ্যে হাসান ওয়ায়হ-এর মৃত্যু ঘটায় তিনি তাঁহার পুত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি ফাখরুদ-দাওলাকে ভর্ৎসনাসূচক একখানি পত্র প্রেরণ করিলে ফাখরুদ্-দাওলা উহার তীব্র জবাব প্রদান করেন। তখন তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশে 'আদুদুদ-দাওলা স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে জিবাল-এ যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফাখরুদ্-দাওলার এত বেশী সমর্থক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় যে, তিনি বাধ্য হইয়া কাযবীন-এ পলায়ন করেন। সেখানে যাইয়া তিনি কাবূস-এর সঙ্গে চুক্তি করেন। তাঁহারা উভয়ে সামানী সহায়তায় পুনরায় 'আদুদুদ্-দাওলাকে প্রতিহত করিবেন। অতঃপর তাঁহারা সাহায্যের জন্য নীশাপুরে গমন করেন। এই অভিযানে রওয়ানা হইবার পথে আদুদুদ্-দাওলা মৃগী রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িলে হাসানওয়ায়হী দুর্গসমূহ পদানত করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। ফাখরুদ দাওলার তুলনায় অপর ভাই মুআয়্যিদুদ্ দাওলাকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি প্রথমে তাঁহাকে হামাযান ও নিহাওয়ান্দ-এর শাসনভার প্রদান করেন এবং অতঃপর ৩৭১/৯৮১ সালে কাবূসকে আনুগত্যের পত্র লিখিয়া তদুত্তরে বিরোধিতামূলক মনোভাবের পরিচয় পাইলে তখন কাবূস-এর স্থলে মুআয়্যিদুদ্-দাওলাকে তাবারিস্তান ও জুরজান-এর গভর্নর নিযুক্তির বিষয়ে খলীফার নিকট হইতে ফরমান আনয়ন করেন। মুআয়্যিদুদ-দাওলা এই উভয় প্রদেশ হইতে কাবূসকে বিতাড়িত করেন। কাবূস ও ফাখরুদ্- দাওলা উভয়েই সামানী সহায়তা লাভ করা সত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত আদুদুদ-দাওলা ও তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন নাই।

রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরকালে আদুদুদ্ দাওলা বায়যানটাইন ও ফাতিমী এই উভয় শক্তির সহিত আপোস-মীমাংসার আলোচনায় রত থাকেন। ৩৬৯/৯৮০ সালে বিদ্রোহী সেনাপতি (Bardas Sclerus) দিয়ার বাক্‌র-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আদুদুদ্-দাওলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কন্‌স্টান্টিনোপল হইতে বাগদাদে প্রেরণ করা হইলে তাঁহার জবাবে কাদী আবূ-বাক্‌র আল-বাকি'ল্লানীর মাধ্যমে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া 'আদুদুদ- দাওলা বিদ্রোহী সেনাপতিকে শুধু যে সাহায্য প্রদানে অস্বীকার করেন তাহাই নহে, বরং নিজ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহাকে কতিপয় আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দী করিয়া রাখেন। ঐ একই বৎসর মিসরের ফাতিমী খলীফা আল-'আযীয-এর নিকট হইতেও অনুরূপ দূত রাজধানীতে আসেন। খলীফা এইরূপ একটি গুজব শুনিয়া বিব্রত বোধ করেন, আদুদুদ্-দাওলা মিসর অভিযানের পরিকল্পনা করিয়াছেন। পূর্বে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা তাঁহার থাকিলেও ফাখরুদ-দাওলা ও কাবূস-এর বিরোধিতার মুকাবিলায় ব্যস্ত থাকা হেতু তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রকাশ্যে স্বীয় সদিচ্ছা ব্যক্ত করিলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত অভিযানের ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল এবং কায়রোতেও সদাসতর্ক অবস্থা বিরাজিত ছিল।

আদুদুদ্-দাওলা ৪৮ বৎসর বয়সে ৮ শাওওয়াল, ৩৭২/২৬ মার্চ, ৯৮৩ তারিখে বাগদাদে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শুধু তাঁহার বংশের অপরাপর শাসক কর্তৃক শাসিত সমগ্র ভূভাগকে একত্রীভূত করিয়া একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই করেন নাই, বরং উপরিউক্ত বিজয়সমূহ দ্বারা সেই রাজ্যের সীমানা বহু দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। যথার্থই তাঁহাকে বুওয়ায়হী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আমীর'-রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে এবং তৎকর্তৃক ইরাক বিজয়ের পরে তাঁহার ক্ষমতা গৌরবের শীর্ষে উন্নীত হয়। অতঃপর তিনি খালীয়া আত-তাই (যিনি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন) -এর নিকট হইতে নানা প্রকার সুবিধা আদায় করিয়া লন, যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী অন্য কোন শাসক করিতে সক্ষম হন নাই। যেমন দ্বিতীয় নাক'ার 'তাজুল-মিল্লা' দ্বারা সম্বোধন, রাজধানীতে খুত্‌বা পাঠের কালে খলীফার নামের সঙ্গে তাঁহার নামও পাঠের রেওয়াজ এবং প্রতি ওয়াক্ত সালাতের সময়ে তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে নহবত বাদন। এই সকল সম্মানই তাঁহার যথার্থ প্রাপ্য ছিল।

আদুদুদ-ওয়ালা জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার পিতার উযীর আবুল ফাদ্‌ল ইবনুল-আমীদ-এর নিকট হইতে রাজ্য শাসন বিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অঞ্চলে সুদীর্ঘ কাল যাবত অজ্ঞাত এইরূপ কতিপয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক আদেশ প্রথমে ফারস-এ ও পরে বিজিত অন্যান্য প্রদেশে তিনি জারী করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ পূর্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফার্‌স্-এর কূর নদীতে 'বান্দ-ই আমীর' নামে আড়াআড়িভাবে একটি বাঁধ বা পানিসেচ প্রকল্প নির্মাণ এবং

শীরায ও বাগদাদে তাঁহার নিজের নামে পরিচিত একটি আদুদী হাসপাতাল নির্মাণ। বাস্তবিকই তিনি বাগদাদ-এর হৃত সমৃদ্ধি ও গৌরবের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি নাজ্ফস্থিত হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর মাযার-এর উপর একটি নূতন সৌধ নির্মাণ করেন এবং সেইখানেই তঁহার নিজের সমাধিও অবস্থিত (তাঁহার নির্মিত অন্যান্য সৌধ ইত্যাদির বিষয়ের জন্য ইবনুল-বাল্খী ও আল-মাক্‌দিসীর 'ফার্স নামাহ'-এর নির্দেশিকা বিশেষভাবে দ্র.)। শীরাযস্থ তাঁহার কুতুবখানার বিবরণের জন্য আল-মাক্‌দিসী, ৪৪৯ ও ইয়াকূত-এর 'ইরশাদ' ৫খ., ৪৪৬, এই উভয়ই দ্র.। আদুদুদ্-দাওলা বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী ও কবিগণের (আল=মুতানাব্বীসহ) একজন উদার পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার কিছু কিছু কবিতা আছ-ছা'আলিবী কর্তৃক 'ইয়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র'-এ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র, প্রাত্যহিক জীবন ও রাজ্য শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আর্-রূযরাওয়ারী (৩খ., ৩৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্, তাজারিবুল-উম্মা আবূ শুজা' আর-রূযরাওয়ারী কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ (মূল ও অনু. 'The Eclipse of the Abbasid Caliphate' by Amedroz and Margoliouth-এর অন্তর্ভুক্ত), নির্ঘন্ট; (২) মাক্‌দিসী ও ইব্‌ন হাওকাল, নির্ঘন্টসমূহ; (৩) উত্‌বী, আল-ইয়ামীনী, ১খ., ১০৫-৩০ (ইবরাহীম ইব্‌ন হিলাল আস-সাবী-এর 'তাজী' হইতে উদ্ধৃত); (৪) ফারসনামাহ, সূচী; (৫) ইবনুল আছীর, সূচী; (৬) ইবনুল কালানীসী, যায়ল তারীখ দিমাশ্‌ক (Amedroz), সূচী; (৭) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৫৪৩ (অনু. de Slane, ii, 481); (৮) ইয়াকূত, ইরশাদ, ১,২,৪, নির্ঘন্টসমূহ বুওয়ায়হীগণ শীর্ষক নিবন্ধও দ্র.।

H. Bowen (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

'আদু দু'দ্-দীন (عضد الدين) ঃ আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুসলিমা (দ্র.) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং খালীফা আল-মুসতান্‌জিদ-এর অধীনে 'উস্তাদ দার' (গৃহস্থালির ব্যবস্থাপক) পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি আল্-মুসতান্‌জিদকে তাঁহার গোসলখানায় হত্যা করাইয়া আল্-মুস্‌তাদী-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন (৫৬৬/১১৭০)। আল-মুস্‌তাদী তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার স্বল্পকাল পরেই আবার পুনর্বহাল করেন। আদুদুদ্-দীন ৫৭৩/১১৭৮ সালে হজ্জ করিবার মানসে মক্কা শরীফের উদ্দেশে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে ইসমাঈলীগণ কর্তৃক নিহত হন। ইবনুত্-তাআবীযী (দ্র.) প্রমুখ কয়েকজন কবি তাঁহাদের কবিতায় 'আদুদুদ্-দীনকে মহিমান্বিত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, ১১, ২১৯; (২) ফাখ্‌রী (Ahlwardt), পৃ. 367।

(E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

'আদু দু'দ্-দীন আল-ঈজী (দ্র. আল-ঈজী)

আদুলতেরী (দ্র.) যিনা)

আদেন (দ্র.'আদন)

আল-আন্‘আম (الأنعام) ঃ কুর্‌আন মাজীদের ৬ষ্ঠ সূরা, হিজরতের বৎসরখানিক পূর্বে মক্কায় একই সংগে সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হইয়াছিল। ইহাতে বিশটি রুকূ' ও ১৬৫ টি আয়াত রহিয়াছে।

গৃহপালিত ও বৈধভাবে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত পশুকে কুরআন মাজীদে আন্‘আম (যথাঃ উট, গরু, ছাগ-মেষ, এক বচনে نعم) নামে অভিহিত করা হয়। শির্‌ক ও কুসংস্কারের বশে 'আরব পৌত্তলিকগণ ইহাতে ও حرث অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যে আল্লাহ ও কল্পিত দেব-দেবীদের বরাদ্দ স্থির করিত। আল্লাহ্‌র বরাদ্দ অনেক সময় দেব-দেবীদের অংশে গিয়া পড়িত, কিন্তু ইহার বিপরীত কখনও ঘটিত না (১৩৭)। তাহারাই স্থির করিয়াছিল, কোন্ জন্তুর গোশ্‌ত কাহার জন্য হালাল এবং কাহার জন্য হারাম, কোন্ কোন্ জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ, কোন জন্তু বলিদানের সময় আল্লাহ্‌র নাম আদৌ উচ্চারিত হইবে না, কোন জন্তুর গর্ভস্থ বৎস তাহাদের ধারণায় পুরুষদের জন্য বৈধ, স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, কিন্তু মৃত বৎস তাহাদের মতে সকলের জন্যই বৈধ ছিল (১৩৯-১৪০)। আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করিয়া তাহারা এই সকল শির্‌ক ও কুসংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিল। প্রসংগক্রমে শিশু-হত্যা প্রথার উল্লেখও এই আয়াতে রহিয়াছে। এই সমস্ত শির্‌ক ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদপূর্বক তাওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে আন্‌আম-কে ও প্রসংগক্রমে "হারছ-কে কেন্দ্র করিয়া আয়াত এই সূরার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাই 'আন্‌আম নামের সার্থকতা।

পূর্ববর্তী যে কয়টি আয়াতে (১১৯-১২১) পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছে, কেবল আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ করা হালাল জীবের গোশ্‌তই মুসলিমের জন্য বৈধ; সুতরাং মৃত পশুর গোশ্‌তও হারাম। এই প্রসংগে আল্লাহ (ثمنية ازواج) (১৪৩-১৪৪) অর্থাৎ ছাগ, মেষ, উট, গরু— এই চারিটির পুং ও স্ত্রীসহ আট প্রকার পশুর উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, আল্লাহ কি পুং জাতীয় পশু হারাম করিয়াছেন, না স্ত্রী জাতীয়, না উহাদের গর্ভস্থ শাবক হারাম করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ নিজেই বলেন, কাফিররা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করিয়া মানুষকে পথভ্রষ্ট করিবার উপায় স্থির করিয়াছে (১৪৪)। প্রসংগক্রমে পুনর্ব্যক্ত হইয়াছে মূলত কি কি জিনিস হারাম অর্থাৎ মৃত প্রাণী, বহমান রক্ত (دم مسفوح), শূকরের মাংস ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তু (১৪৫)। বিদ্রোহের শাস্তিরূপে আল্লাহ ইয়াহূদীদের জন্য হারাম করিয়াছিলেন নখরযুক্ত সমস্ত প্রাণী, গরু ও ছাগলের চর্বি –তবে উহাদের পৃষ্ঠদেশ, অন্ত্র ও অস্থি সংলগ্ন চর্বি ছিল হালাল (১৪৬)।

গ্রহ-নক্ষত্র উপাসকদের মতবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য এই সূরাতে যেই অভিনবভাবে ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রসংগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাও এই সূরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক রাত্রে একটি তারকাকে লক্ষ্য করিয়া ইব্‌রাহীম (আ) তর্কচ্ছলে বলিলেন ঃ هذا ربى । এই আমার প্রতিপালক। কিন্তু তারকাটি অদৃশ্য হইলে তিনি বলিলেন ঃ لا احب الافلين। আমি অপসৃয়মানদের ভালবাসি না অর্থাৎ আমার প্রতিপালকরূপে স্বীকৃতি দিতে পারি না। অতঃপর তিনি উদীয়মান চন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন ঃ ইহাই আমার প্রতিপালক, কিন্তু চন্দ্র অস্তমিত হইলে বলিলেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ না দেখাইলে আমি পথভ্রষ্টদের মধ্যে

শামিল হইব। অবশেষে তিনি যখন উদীয়মান সূর্যকে অবলোকন করিলেন তখন বলিলেন ঃ هذا ربى هذا اكبر অর্থাৎ ইহাই আমার প্রতিপালক, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সূর্যও যখন অস্তগমন করিল তখন ইব্রাহীম (আ) ঘোষণা করিলেনঃ আমি আসমান ও যমীনের সৃজনকারীর প্রতি একনিষ্ঠভাবে (حنيفا) মুখ ফিরাইলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি (৬ ঃ ৭৯)।

এই প্রসংগে মূর্তি উপাসক পিতা আযার (৭৪) -এর সহিত মূর্তি পূজার অসারতা সম্পর্কে ইব্রাহীম (আ)-এর তর্কের কথা পুনর্ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্বাপর কয়েকটি আয়াতে কওমের সমক্ষে, তাওহীদের পক্ষে এবং শিরকের বিপক্ষে ইব্রাহীমের জোরালো যুক্তিতর্কের বর্ণনা রহিয়াছে; অবশেষে তাওহীদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ইব্রাহীম (আ)-এর অনুসারী, তৎ-পূর্ববর্তী নূহ (আ)-সহ সতেরজন নবী-রাসূলের নামোল্লেখ করা হইয়াছে (৮৪-৮৬)। অতঃপর তাঁহাদের ঊর্ধ্বতন, অধঃস্তন পুরুষ ও ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে ইরশাদ হইয়াছে, তাহারাও ছিল আমার মনোনীত, আমি তাহাদের সৎ পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম (৮৫ ঃ ৮৭), তাহাদের কিতাব , হিক্মাত ও নুবুওয়াত প্রদান করিয়াছিলাম (৮৯), কিন্তু তাহারা যখন কুফরীতে নিমজ্জিত হইল তখন وكلنا بها قوما ليسوا بها بكفرين —আমরা (আল্লাহ্) ইহার হিকমাত ও নুবুওয়াত তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিলাম এমন সম্প্রদায়ের উপর যাহারা কুফ্র-এর পথ ধরিল না (৮৯) অর্থাৎ নুবুওয়াত ইব্রাহীমের বংশের এক শাখা বানূ ইসরাঈল-এর হস্ত হইতে (তাহাদের পাপের দরুন) বানূ ইসমা'ঈল শাখায় হস্তান্তরিত হইল।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নুবুওয়াতের অভূতপূর্ব সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী এই সূরায় হিজরতের পূর্বেই ধ্বনিত হইয়াছে। এই সূরায় আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়াছেন, মুশরিক ও কিতাবধারিগণ ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মাদ (স)-কে মিথ্যুক মনে করে না (لايكذبونك), বরং জালিমগণ আল্লাহ্র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে (৩৩)। অন্যান্য সূরাতে, যেমন এই সূরাতেও আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে সান্ত্বনা বাণী শুনাইয়া বিজয় আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ لامبدل لكلمات الله —(৩৪) আল্লাহ্র কালিমাত-এর কোন পরিবর্তনকারী নাই, সুতরাং ইসলামের জয় অবশ্যম্ভাবী। অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড (اية) দেখাইবার ক্রমাগত দাবিতে রাসূলুল্লাহ (স) -এর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ মৃদু তিরস্কারের সুরে বলিয়াছেন, যদি তুমি পার তবে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ (نفقا فى الارض) অথবা আকাশে কোন সোপানের (اسُلَّمًا فِى السَّمَاء) সাহায্যে অলৌকিক কিছু আনিয়া কাফিরগণকে দেখাও। অ-মুসলিমগণের দাবির জবাবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে বলিয়াছেন, বল, আমি তোমাদের ইহা বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আমি তোমাদের ইহাও বলি না, আমি ফেরেশতা আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় আমি তাহারই অনুসরণ করি--------" (৫০)।

সহায়-সম্বলহীন নবদীক্ষিত মুসলিমগণকে বিতাড়নের জন্য অভিজাতগণের দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, "যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাহাদের তুমি বিতাড়িত করিও না----- (৫২), বরং তাহারা তোমার নিকট আসিলে বলিও سلام عليكم। দয়া করা তোমাদের প্রতিপালক তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন----- (৫৪)।

এই সূরার একটি প্রধান শিক্ষা অংশীবাদীদের দেবদেবী সম্বন্ধে কথাবার্তায় শালীনতা অবলম্বনের আদেশ। ইরশাদ হইয়াছে, "আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যাহাদের তাহারা ডাকে তাহাদের তোমরা গালি দিও না; কেননা সীমালঙ্ঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত তাহারা আল্লাহ্কে গালি দিবে----- (১০৮)। ইহাতে শুধু তিক্ততাই বাড়িবে, লাভ কিছু হইবে না।

সূরার শেষের দিকে (১৫১-১৫২) দুইটি দীর্ঘ আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। যথাঃ আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, দারিদ্র্যের অজুহাতে সন্তান হত্যা বর্জন, প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার অশ্লীলতা বর্জন, যথার্থ কারণ ব্যতীত কাহাকেও হত্যা না করা, বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীমের সম্পদ হইতে দূরে থাকা, মাপে-ওজনে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা, স্বজনের বিরুদ্ধে হইলেও ন্যায় কথা বলা, সর্বোপরি আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলা হইয়াছে, যাহারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়া বহু দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়, তাহাদের ব্যাপার কেবল আল্লাহ্রই এখ্তিয়ারভুক্ত".... (১৫৯)। উপসংহারে আল্লাহ তাঁহার রাসূলের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন কয়েকটি ঘোষণা বাণী, যথাঃ "বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ".... (১৬১)। "বল, আমার সালাত, আমার ইবাদাত (কুরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ সমস্তই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশে".... (১৬২), "প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকার্যের জন্য দায়ী, কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না".... (১৬৪) ইত্যাদি। সর্বশেষ আয়াতে পুনর্বার বলিয়াছেন, "তিনিই তোমাদের দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তোমাদের দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন...." (১৬৬)।

পূর্ববর্তী সূরাতে যেমন হুবহু একই প্রকাশভংগীতে বা কোন কোন স্থানে শব্দের সামান্য পরিবর্তন সহকারে বর্ণিত হইয়াছে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের অবাধ্যতা, দুনিয়াতে তাহাদের শোচনীয় পরিণতি, কিয়ামতে আল্লাহ্র দরবারে তাহাদের লাঞ্ছনা, কাফিরদের নানা আপত্তি-অজুহাতের জবাবস্বরূপ আল্লাহ্র অপূর্ব ক্ষমতা ও সৃষ্টি কৌশলের বর্ণনা, উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল ও গগনে উড্ডয়নরত যত প্রাণী-তাহারাও তোমাদেরই মত এক একটি উম্মত, কোনটি আল্লাহ্র কিতাব হইতে বাদ পড়ে নাই (৩৮), অর্থাৎ অদৃশ্যের কুঞ্জী (চাবি) তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, জলে-স্থলে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না, নড়ে না, মৃত্তিকা গহ্বরের অন্ধকারে যে বীজ উপ্ত হয়, তাহাও তাঁহার জ্ঞানবহির্ভূত নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাফ্সীর গ্রন্থাবলীতে সংশ্লিষ্ট সূরার আলোচনা দ্র.।

আহমদ হোসাইন

আন্ওয়া' (انواء) ঃ প্রাচীন 'আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি হিসাব পদ্ধতি। একবচন নাও, মূল ن-و-ء —অর্থঃ কষ্টের সহিত উঠা, ঝোঁকা,

কষ্টের সহিত বোঝা বহন করা (দ্র. কুরআন, ২৮ঃ ৭৬); নাও'-এর অর্থ একটি নক্ষত্রের বা নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তগমন এবং উহার বিপরীতে অন্য একটি নক্ষত্রের উদয়। রাগিব এই অর্থের সম্প্রসারণক্রমে, ইহা সময়ের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থে প্রযোজ্য এবং শেষ মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের ভাষায় ইহার অর্থ 'মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান' (দ্র. Dozy, suppl.; Beaussier, H, Webr, Arab, Worlerbuch)। 'আরবদের ধারণায় বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে নক্ষত্রের ভূমিকা রহিয়াছে, সেইজন্যই এইরূপ কিছু অর্থের উদ্ভব হইয়াছে। বহুবচনে, আনওয়া'র অর্থঃ নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধ্যায় অস্তগমন ও প্রত্যূষে উদয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত। বহু সংখ্যক গ্রন্থের নামেও ইহার ব্যবহার দেখা যায় যাহা অবশ্য উহার নিজস্ব একটি ভিন্ন শ্রেণী গঠন করে।

আরবগণ বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ, গ্রীষ্ম ও শীতের আগমনকে নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় ও অস্তের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। এই জাহিলী বিশ্বাস সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেনঃ বংশ সম্পর্কে নিন্দাবাদ, মৃতের জন্য উচ্চ স্বরে বিলাপ ও আনওয়া'— এই তিনটি জাহিলী ক্রিয়াকর্ম। অতঃপর তিনি বলেনঃ অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে, যে উহা বিশ্বাস করিল, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করিল না, বরং সে নক্ষত্রে বিশ্বাস করিল (দা. মা. ই., ৩খ., পৃ.৪৭৮)।

১। **আন্‌ওয়া'-র পদ্ধতি** ঃ সময়ের হিসাবের জন্য প্রাচীন 'আরবদের একটি প্রাচীন পদ্ধতি জানা ছিল এবং তাহা সম্ভবত 'প্লি এ্যাড়সের বর্ষপঞ্জী' (Calender of the Pleiades) দ্বারা প্রভাবিত ছিল (তু. J. Henninger Sternkunde, ১১৪ ও উদ্ধৃত সূত্রসমূহ)। উহা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে ঃ (ক) একদিকে একদল নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তগমনে একটি সময় আরম্ভ হয় যাহার নাম নাও', কিন্তু উহার মধ্যে সঠিক নাও-এর সময়কাল ১-৭ দিন। আনওয়া' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বেদুঈনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিত। (খ) অপরদিকে একই দলের নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জের ছয় মাস অন্তর অন্তর উদয়ের ফলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়কালের সম্ভবত ২৮-এর সৌর বৎসর সূচিত হইত। যে সকল প্রবাদ-প্রবচন এখন পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে উহা দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রাচীন 'আরবে ইহাই ছিল বর্ষপঞ্জীর ভিত্তি।

ইসলামের পূর্বে কোন এক সময়ে (দ্র. কুরআন ১০ঃ ৫; ৩৬ঃ ৩৯) আরবগণ চন্দ্রের ২৮ টি অবস্থান (মানযিলা ব.ব. মানাযিল [দ্র.]) নির্ণয় করিতে শিখিয়াছিল। এই জ্ঞান তাহারা সম্ভবত ভারতীয়দের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। এই অবস্থানগুলির তালিকা ও তাহাদের নিজস্ব আনওয়া'-র তালিকা অভিন্ন ভাবিয়া তাহারা দুইটি ভাবধারাকে একত্র করিবার প্রয়াস পায় এবং নিজেদের আনওয়া'-র সমন্বয় সাধন করিয়া মানাযিলের সহিত উহাকে সদৃশ করিয়া তোলে এবং সৌর রাশিচক্রকে আনুমানিক ১২০ ৫০-এর ২৮ টি সমান ভাগে বিভক্ত করে। সুতরাং ২৮ টি মানযিলের সহিত চিহ্নিত ২৮টি আন্‌ওয়া' (মানাযিল, নিবন্ধের তালিকা দ্র.) ১৪ জোড়ায় বিভক্ত ২৮টি নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা নির্ণীত হয় (একটি অস্তগমনের সঙ্গে অপরটি উদয় হয়) এবং এইরূপে ১৩ দিনের ২৭টি ও ১৪ দিনের একটি সময়কালের সূচনা হয়। এই সংশোধনসমূহ, যাহার তারিখ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নহে, নিশ্চিতভাবেই ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক পদ্ধতি হইতে অন্য পদ্ধতিতে অতিক্রমণ জ্যোতির্বিদ্যা উন্নয়নের সহায়ক হয়। প্রাচীন পদ্ধতির প্রচলন অবশ্য এখনও রহিয়া গিয়াছে। একদিকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হিসাবে বেদুঈন গোত্রগুলির মধ্যে (তু. উদাহরণস্বরূপ, নূওয়া, ব.ব. নাওয়াবী, দক্ষিণ তিউনিসিয়ার মারাযীগ গোত্রের মধ্যে প্রচলিত, G. Boris Documents Linguistiqur----, প্যারিস ১৯৫১, ২০৮-১১) এবং অপরদিকে ঐতিহ্যগতভাবে ও আনওয়া'-র অবস্থানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এই সম্পর্কিত বিশিষ্ট গ্রন্থসমূহে, যাহার ফলে কোন কোন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পদ্ধতি চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে (দ্র. Westermmarck, Ritual and Belief in Morocco, লন্ডন ১৯২৬, ২খ., ১৭৭ ও Wit and Windom in Morocco, লন্ডন ১৯৩০, ৩১৩-১৭)।

২। **আরবী সাহিত্যে আনওয়া'** ঃ যেইরূপ আশা করা গিয়াছিল অভিধান রচয়িতাগণই সর্বপ্রথম আনওয়া' বিষয়ে বেদুঈন ভাবধারা অভিধান সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ সন্নিবেশিত করেন, যাহার মধ্যে আমরা কেবল 'কিতাবুল আন্‌ওয়া' শীর্ষক গ্রন্থগুলিকেই বিবেচনায় রাখিব। কিতাবুল আয্‌মিনাও একই শ্রেণীভুক্ত; অন্যগুলিকে এই আলোচনার বাহিরে রাখিব। নিম্নে কিতাবুল আন্‌ওয়া' শীর্ষক গ্রন্থসমূহের প্রণেতারূপে উল্লিখিত প্রধান লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল যাঁহাদের কোন গ্রন্থই এই পর্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইব্‌ন কুনাসা (মৃ. ২০৭/৮২২); মু'আর্‌রিজ (মৃ. ১৯৫/৮১০-১১); আন্‌-নাদ্‌র ইব্‌ন শুমায়ল (মৃ. আনু. ২৪৫/৮৫৯); আলআস্‌মা'ঈ (মৃ. ২১৩/৮২৮); ইবনুল আরবী (মৃ. ২৩৩. ৮৪৬); আশ্‌-শায়বানী (মৃ. প্রায় ২৪৫/৮৫৯); আল-মুবার্‌রাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮)। অপরদিকে ইব্‌ন কুতায়বার (মৃ. আনু. ২৭৬/৮৮৯) কিতাবুল আনওয়া' আমাদের নিকট রহিয়াছে যাহা সম্প্রতি (১৯৫৭) হায়দরাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে। আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারীর (মৃ. ২৮২/ ৮৯৫-এর পর) পুস্তকের অংশবিশেষ মুদ্রিত হইয়াছে। আল-আখফাশ আল-আস্‌'গ'ার (মৃ. ৩১৫/৯২৭); আয-যাজ্জাজ (মৃ.৩১০/৯২২); ইব্‌ন দুরায়্‌দ (মৃ. ৩২১/৯৩৩); কাদী ওয়াকী' (মৃ. ৩৩০/৯৪১) ও অন্যগণের রচিত গ্রন্থ বর্তমানে বিলুপ্ত। মূলত এই গ্রন্থগুলি আন্‌ওয়া পদ্ধতির ব্যাখ্যা, অবস্থানসমূহের তালিকা (অর্থাৎ সংশোধিত আন্‌ওয়া'), আন্‌ওয়ার অবস্থান নিরূপণকারী নক্ষত্রসমূহের উদয় ও অস্তগমনের তারিখ, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাতের প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে। ব্যাখ্যার সহিত প্রবচন ও কবিতার সাধারণত টীকা সহকারে উল্লেখ রহিয়াছে।

৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে জ্যোতির্বিদগণ আন্‌ওয়া-র প্রতি কৌতূহলী হইয়া উঠেন। আল-হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন নাওবাখ্‌ত, আবূ মা'শার আল-বাল্‌খী (মৃ. ২৭২/৮৮৫-৬), ছাবিত ইবন কুররা (মৃ. ২৮৯/৯০২) ও ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ্‌ (মৃ. ৩০০/৯১২-৩) কিতাবুল-আন্‌ওয়া' রচনা করেন। আল-বীরূনী (মৃ. ৪৪০/১০৪৮) তাঁহার আছার নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেন এবং সিনান ইব্‌ন কুররা (মৃ. ৩৩১/৯৪৩) রচিত

কিতাবুল আন্‌ওয়া-র অংশবিশেষ (২৪৩-৭৫) উহাতে তুলিয়া ধরেন। উল্লেখ্য, শেষোক্ত গ্রন্থখানি একটি বর্ষপঞ্জী বিশেষ।

বিজিত রাজ্যসমূহে প্রাপ্ত বর্ষপঞ্জী অনুসারে 'আরব গ্রন্থকারগণও যে বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করিবেন এইরূপ আশা করাই স্বাভাবিক এবং আমাদের নিকট যদিও সিনানের 'ইরাক' সম্পর্কিত বর্ষপঞ্জী বিদ্যমান রহিয়াছে, তবুও ইহা সম্ভব যে, মিসরীয় গ্রন্থকারগণ আরও পূর্বে উহা রচনা করিয়া থাকিবেন, যেরূপ ইবনুল-মাম্মাতী ও আল-মাকরীযীর কতিপয় অধ্যায় ও স্পেনে প্রস্তুত বর্ষপঞ্জীতে উল্লিখিত কপ্‌টিক্‌ মাসের নাম হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত দেশটির জন্য Dozy কর্তৃক প্রকাশিত Calendrier de Cordove de l'annee, 961 (লাইডেন ১৮৭৩) নামে একটি বর্ষপঞ্জী আমাদের নিকট রহিয়াছে এবং এখনও উহার নাম কিতাবুল-আন্‌ওয়া-ই রহিয়া গিয়াছে, যেরূপ মাররাকুশের গণিতজ্ঞ ইব্‌নুল বান্না (মৃ. ৭২১/১৩২১)-র গ্রন্থ যাহা H. P. J. Renaud প্রকাশ করিয়াছেন (প্যারিস ১৯৪৮)। বর্তমানে বিলুপ্ত অন্যান্য কিতাবু'ল-আন্‌ওয়া আল-গারবাল (মৃ. ৪০৩/১০১২-৩) ও আল-খাতীব আল-'উমারী আল-কুরতুবী (মৃ. ৬০২/১২০৫-৬) কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। এই পঞ্জীগুলি সৌর ও প্রত্যেক দিনের নীচে লেখক আন্‌ওয়া, দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য, কৃষিকার্যের করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া Calendrier de Cordove-তে খৃস্টান ধর্মোৎসব সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও রহিয়াছে। আধুনিক জনপ্রিয় পঞ্জীসমূহ (রা'দিয়্যা তাক'বীম ইত্যাদি) কিতাবুল-আন্‌ওয়াই সর্বশেষ সংস্করণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাত্‌তানী, Opus Astronomicum, সম্পা. ও অনু. C. A. Nallino, Milan 1903 খৃ, নির্ঘণ্ট; (২) ফারগানী, কিতাব ফিল-হ'রকাতিস-সামাবিয়্যা ওয়া জাওয়ামি' 'ইন-নুজূম, সম্পা. ও অনু. J. Golius (Elementa Astronomica), আমস্‌টারডাম ১৬৬৯; (৩) 'আবদুর-রাহমান আস্‌-সূফী, কিতাবুস্‌-সুওয়ারিস-সামাইয়্যা, হায়দরাবাদ; (৪) ইব্‌ন সীদা আল-মুখাস্‌সাস, ৯খ., ৯প.; (৫) আল-বীরূনী, Chronologie Orient, Volkr, সম্পা. C. E. Sachau, Leipzig 1878; (৬) ইব্‌ন মাজিদ, কিতাবুল ফাওয়াইদ ফী উস্‌ 'লি 'ইলমিল-বাহ্‌'র ওয়াল-কাওয়াইদ, সম্পা. G. Ferrand, প্যারিস ১৯২১-২৩; (৭) আল-কায্‌বীনী, আজাইবুল-মাখলূকাত, সম্পা. Wustenfeld; (৮) হাজ্জী খলীফা, সম্পা. Flugel, ৫খ., ৫৩-৪; (৯) লিসানুল-আরাব, নাও (দ্র.); (১০) আল-মার্‌যূকী, কিতাবুল আযমিনা ওয়াল-আমকিনা, হায়দরবাদ ১৩৩২ হি.; (১১) Reinaud, introdution generale a la geographie des Orientaux (Geographie, ১খ.), প্যারিস ১৮৪৮, ১৮৩ প.; (১২) G. Ferrand Introduction a l'Astronomie nautique arabe, প্যারিস ১৯২৮; (১৩) Motylinsky, Les Mansions lunaires des Arabes, আলজিয়ার্স ১৮৯৯; (১৪) J. Henninger, Uber Sternkunde und Sternkult in nord und Zentralarabien in Zeitschrift fur Ethologie 1954, 482-117; (১৫) Ch. Pellat, Dictons Rimes anwa et mansions lunaires chez les Arabes, in Arabica, 1955, ১খ., ১৭-৪১।

CH. Pellat (E.I.[2]) / মু. আবদুল মান্নান

আন্‌ওয়ার-ই সুহায়লী (انور سهیلی) ঃ কাশিফী (দ্র.) কর্তৃক অনূদিত কালীলা ওয়া দিম্‌না নামক গ্রন্থের ফার্সী ভাষ্যের শিরোনাম।

আন্‌ওয়ার পাশা (انور پاشا) ঃ তুরস্কের প্রসিদ্ধ নেতা, রাজনীতিবিদ, আনজুমান-ই ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্‌কী-এর বিশেষ উপদেষ্টা, তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তিনি সমমনা বন্ধুবান্ধবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সাহসী উৎসাহী সংগঠনের মাধ্যমে তুরস্কের নাযুক মুহূর্তে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সংকটের মুকাবিলা করিয়াছিলেন।

আন্‌ওয়ারের পিতার নাম আহমাদ-বে এবং মাতার নাম আইশা। তাঁহারা মালাসতারের অধিবাসী ছিলেন (বর্তমান Betols বাটোল, প্রাক্তন মেসিডোনিয়া, এখন দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়া)। আন্‌ওয়ার ১৮৮১ সালের ২২ নভেম্বর ইস্তাম্বুলের 'দীওয়ানে য়েলো' নামক মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তথায় একটি সাধারণ সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে আন্‌ওয়ার ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। বাল্যকালেই তাঁহার পিতা সম্ভবত বদলি হওয়ার কারণে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। তথায় তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইস্তাম্বুলে সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপন ছাড়াও জেনারেল স্টাফের উচ্চতর কোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯০২ সালের ২ ডিসেম্বর চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন (প্রথম স্থান অধিকার করেন আনওয়ারের অন্তরঙ্গ ও আজীবন বন্ধু ইসমা'ঈল হাককী পাশা, ১৮৭৯-১৯১৬)। এই সময় তুরস্কের সাতটি বৃহৎ সৈন্যদল ছিল। আন্‌ওয়ার তৃতীয় সৈন্যদলের জেনারেল স্টাফে ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন। এই সময় উক্ত সৈন্যদলের অবস্থান ছিল মেসিডোনিয়ায়। এই সময় মেসিডোনিয়ায় ব্যাপাক গুপ্ত হত্যাকাণ্ড দেখা দেয়। বহুকাল রাজ্যগুলি এই সকল গুপ্ত হত্যাকারীদের ইন্ধন যোগাইতেছিল। পরবর্তী তিন বৎসর আন্‌ওয়ার এই সকল হত্যাকারীদের দমনে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯০৬ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন। তাঁহাকে তৃতীয় সৈন্যদলের সদর দফতর মানাস্‌তিরে প্রেরণ করা হয়। সম্ভবত এখানেই তিনি "আনজুমান-ই ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্‌কী'-র সদস্য হন। সাধারণ বর্ণনামতে তাঁহার ক্রমিক নম্বর ছিল বারো।

যে আন্‌জুমানটি পরবর্তী কালে "ইত্তিহাদ ওয়া তারাককী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল উহার জন্ম হইয়াছিল ১৮৮৯ সালে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং সকল প্রশাসনিক অঞ্চলকে নূতন আইনের আওতায় আনা। কিন্তু এই আন্দোলনটি সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করে নাই বা কোন ফলপ্রসূ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নাই। সামরিক অফিসারগণ আনজুমানের প্রসারত্ময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করিলেও ইহাতে বলিষ্ঠ কর্মস্পৃহার সৃষ্টি হয় নাই। আনজুমানকে সক্রিয়করণে কেহই আনওয়ারের

সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই (দ্র. আঞ্জুমান-ই ইত্তিহ'াদ ওয়া তারাক্'কী)। আনওয়ারই প্রথম ব্যক্তি, যিনি শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সুলতানকে বাধ্যকরণের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন মেসিডোনিয়ায় সামরিক বাহিনীতে দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছিল, তাহা সুলতানের কর্ণগোচর হইল। এই সকল আন্দোলন দমনের সাধারণ কৌশল ছিল, সক্রিয় কর্মীদের পদোন্নতি দান করিয়া কেন্দ্রে ডাকিয়া আনা। তথায় তাহাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হইত। আবার প্রয়োজনবোধে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইত অথবা তাহাদের নিষ্ক্রিয় করার অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা হইত। আন্ওয়ারের সামনেও পদোন্নতির অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি পদোন্নতি গ্রহণ না করিয়া তদীয় অবস্থানে থাকিয়া আন্দোলনের কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ৮ জুন, ১৯০৮ সালে কেন্দ্রস্থল হইতে বাহিরে গমন করেন এবং মেসিডোনিয়ার পাহাড়ে চলিয়া যান। ৪ জুলাই, ১৯০৮ সালে আহমাদ নিয়াযী-বে-ও আগাইয়া আসেন এবং রেস্না (বর্তমান রেমান, দক্ষিণ যুগোশ্লোভিয়া)-এর পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। ইহার পর আয়্যুব সাবরীও তাঁহার অনুসরণ করেন। ফলে একটি বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুলতান এই বিশৃংখলা দূর করার জন্য শামীম পাশাকে প্রেরণ করেন। ৭ জুলাই, ১৯০৮ সালে তিনি সারা দিন মানাস্তির বাজারে গুলী বর্ষণ করেন। আবার তৃতীয় বাহিনীর বিভিন্ন সৈন্যদল একের পর এক শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে জোর দাবি জানাইতে থাকে। ফলে ২৪ জুলাই, ১৯০৮ সালে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ ১৮৬৭ সনের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করিতে বাধ্য হন। আন্ওয়ারের সাহসিকতা ও দৃঢ়তার ফলে তুর্কীদের মধ্যে নব যুগের সূচনা হয়। তিনিই ছিলেন এই নাটকের মূল নায়ক। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বৎসর।

শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হইলেও অল্পকালের মধ্যেই সুলতান গোপন তৎপরতা শুরু করেন। ফলে শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিরোধিগণ ইস্তাম্বুলে এমন বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন যে, ফলস্বরূপ শাসনতন্ত্র আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া যায়। মেসিডোনিয়ার তৃতীয় বাহিনী মাহমূদ শাওকাত পাশার নেতৃত্বে আবার শাসনতন্ত্র সংরক্ষণের সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করে। এই বাহিনী ইস্তাম্বুলে উপনীত হয়। ২৮ এপ্রিল, ১৯০৯ সালে সুলতান আবদুল মাজীদের পদচ্যুতির ঘোষণা দেওয়া হয়। তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ রাশাদ খান পঞ্চম মুহাম্মাদ উপাধি ধারণ করিয়া সুলতান মনোনীত হন। এই পদক্ষেপেরও মূল নায়ক ছিলেন আন্ওয়ার।

তুর্কী জাগরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টায় বিফল হইয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বহির্দেশীয় বিবাদ সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। প্রথমে তাহারা ইতালীকে প্রাচ্য ত্রিপোলী (বর্তমান লিবিয়া)-এর উপর আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করে। ইহার পর বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত করে। উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে তুর্কীগণ কোনরূপ সংস্কার কর্মের অবকাশ না পায়। যাহা হউক, আন্ওয়ার ও তাঁহার সহযোগিগণ অভ্যন্তরীণ জটিলতা কাটাইয়া সংস্কারকর্ম শুরু করিতে না করিতেই তাঁহাদের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়।

আন্ওয়ার মেসিডোনিয়ায় অবস্থানকালে জার্মানদের সামরিক বিন্যাস ও কৌশল অবলম্বনে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে তাঁহাকে বার্লিনস্থ তুর্কী কূটনৈতিক অফিসে সামরিক এ্যাটাচী নিয়োগ করা হয়। এই দায়িত্বে থাকাকালে তিনি জার্মান সামরিক বাহিনী সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালী অতর্কিতে প্রাচ্য ত্রিপোলী (বর্তমান লিবিয়া) আক্রমণ করিলে আন্ওয়ার এ্যাটাচী পদে ইস্তফা দেন এবং স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে আক্রান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় সেই অঞ্চলে সরাসরি সৈন্য প্রেরণ করা যাইত না; কেননা পথিমধ্যে মিসর অবস্থিত ছিল। মিসর এই সময় তুরস্কের একটি প্রদেশ হইলেও ইহা বৃটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ইহার উপর দিয়া সৈন্যবাহিনী গমন করা নিষিদ্ধ ছিল।

আন্ওয়ার ও তাঁহার কয়েকজন নিষ্ঠাবান সহযোগী (তাঁহাদের মধ্যে মুসতাফা কামাল ও ইসমাত ইনোনুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) ছদ্মবেশে ত্রিপোলী পৌঁছেন। সেখানে স্থানীয় আরবদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া যুবকদের দ্রুত সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর উপর ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করেন। অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র তাঁহারা ইতালীয় সৈন্যবাহিনী হইতে ছিনাইয়া হস্তগত করিয়াছিলেন। তাহাদের ত্রিপোলীর উপকূল হইতে সামান্য অগ্রসর হওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এই সময় তুর্কীদের সাহায্য, সহোযোগিতা ও সহমর্মিতায় ইসলামী বিশ্বে নবজীবনের সূচনা হইয়াছিল, এমনকি ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও সহমর্মিতার এক নবজাগরণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইতালী ত্রিপোলীতে বিপদগ্রস্ত ও অস্থির হইয়া বলকান রাজ্যসমূহের সংগে চুক্তি সম্পাদন করত ১৯১২ সালে তুরস্ক আক্রমণ করে। ফলে আন্ওয়ার ও তাঁহার সহোযোগিগণকে ত্রিপোলী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা হয়। ইউরাপীয় দেশগুলি ত্রিপোলীতে যেমন ইতালীর পৃষ্ঠাপোষক ছিল, তেমনি বলকান রাজ্যগুলিরও পৃষ্ঠপোষকতা করিল। তুর্কীগণ পরপর পরাজিত হইতে থাকে। মেসিডোনিয়া ও থ্রেস হস্তচ্যুত হয়। দীর্ঘ অবরোধের পর আদ্রিয়ানোপল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইস্তাম্বুলের নিরাপত্তা আশংকাজনক হইয়া পড়ে। এই সময় তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কামিল পাশা। কার্যত তাঁহাকে বৃটেনের ক্রীড়নক বলিয়া গণ্য করা হইত। তাঁহার দ্বারা যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করিয়া সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে লন্ডনে একটি কন্ফারেন্সের আয়োজন করা হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, মেসিডোনিয়া ও থ্রেসের বৃহৎ অঞ্চল, অধিকন্তু আদ্রিয়ানোপল ও ক্রীট দ্বীপে তুরস্কের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকিবে না। কামিল পাশা স্বীয় মন্ত্রীসভাকে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনে প্রলুব্ধ করেন। ১৯১৩ সালের ৩০ জানুয়ারী মন্ত্রীসভা এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমনি মুহূর্তে আন্ওয়ার পাশা জীবনের ঝুঁকি লইয়া মন্ত্রীসভার সেই বৈঠকে উপস্থিত হন। তাঁহার হাতে পাঁচ শতের অধিক সামরিক অফিসারের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি কাগজ ছিল। তাঁহাদের দাবি ছিল, হয় যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হউক অথবা মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক। সমর সচিব নাজিম পাশা আন্ওয়ারকে বাধা দেওয়ার জন্য আগাইয়া আসেন। আন্ওয়ারের প্রতি গুলী চালান হয়।

ইহাতে আনওয়ার বাঁচিয়া গেলেও তাঁহার একজন সঙ্গী নিহত হন। আন্ওয়ারের সঙ্গীরাও গুলী চালায়। ইহাতে নাজিম পাশা নিহত হন। আনওয়ার বৈঠকে উপস্থিত হইয়া সামরিক অফিসারদের দাবিগুলি পেশ করেন। অল্পকালের মধ্যেই মাহমূদ শাওকাত পাশার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। লন্ডনে সন্ধির যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল উহা পরিত্যাগ করা হয় এবং আবার নূতনভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। এখন খোদ বলকানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। তুর্কীগণ থ্রেসের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলসহ আদ্রিয়ানোপল পুনরুদ্ধার করে। তুর্কী সৈন্যবাহিনী স্বয়ং আন্ওয়ারের নেতৃত্বে বিজয়ীর বেশে তথায় প্রবেশ করে (২২ জুলাই, ১৯১৩)।

মাহমূদ শাওকাত পাশা মন্ত্রীভবন হইতে বাহির হওয়ার সময় তুর্কী নবজাগরণ বিরোধী একটি দলের আক্রমণে নিহত হন (৪ জানুয়ারী, ১৯১৪)। সাঈদ হালীম পাশা নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ইহাতে আন্ওয়ারকে সমর সচিব নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহাকে পাশা উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সমর সচিব নিযুক্ত হওয়ার পরপরই আনওয়ার পাশা ব্যাপকভাবে সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন শুরু করেন। প্রধান অফিসারদের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দান করেন। কর্মী যুবকদের বাছাই করিয়া বাহিনীতে ভর্তি করেন। উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সঠিক যোগ্যতা প্রমাণের পরীক্ষাস্বরূপ একটি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। ইহাতে সৈন্যগণ শীঘ্রই উচ্চ পদে উন্নীত হইতে সক্ষম হন। উহার প্রমাণ, বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কের সীমা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছোট ছোট বলকান রাজ্যসমূহের মুকাবিলায় পরাজিত হইতে থাকে। আনওয়ারের প্রস্তুতকৃত সৈন্যবাহিনী চারি বৎসর বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি স্থানেই তাহাদের কৃতিত্ব ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কারের প্রাথমিক যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আন্ওয়ার ও তাঁহার সহযোগিগণ সানন্দে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। তিনি দীর্ঘদিন লক্ষ্য করিতেছিলেন, ইউরোপীয় দেশগুলি একে অপরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কখনও আফ্রিকার কোন নূতন অঞ্চলকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত; কখনও বা তুরস্কের কোন অঞ্চল বা দ্বীপসমূহকে স্বীয় শাসনভুক্ত করিয়া লইত। বলকানের বিভিন্ন রাজ্যগুলি বসনিয়া ও হারযেগভিনা, আবার মেসিডোনিয়া, থ্রেসের বৃহৎ অঞ্চল আলবেনিয়া, ক্রীট, ত্রিপোলী, ডেডিকানীয, রোডস, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চল এইভাবে ছিনাইয়া নেয়। পরিশেষে বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়াকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্য উহাকে ইস্তাম্বুল দিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার সরকারের পতনের পর বলশেভিকগণ এই গোপন চুক্তিটি ফাঁস করিয়া দিলে বিষয়টি বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তুর্কীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিলে কোন অবস্থায়ই নিরাপদে ও সসম্মানে বসবাস করার অবস্থা তাহাদের ছিল না। তাহাদের সামনে একটি মাত্র পথই খোলা ছিল, হয় তাহারা সসম্মানে বসবাসের জন্য মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে অথবা চুপ করিয়া অপমানের জীবন যাপন করিবে। যাহা হউক, প্রথমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর সংগে একটি প্রতিরোধ চুক্তি সম্পাদন করা হয় (২রা আগস্ট, ১৯১৪)। সাঈদ হালীম পাশা, আন্ওয়ার পাশা এবং বিশিষ্ট কয়েকজন সহকর্মী ব্যতীত কেহই এই ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। তুরস্ক সরকার দুইটি যুদ্ধ জাহাজ ক্রয়ের জন্য বৃটেনের কাছে ফরমায়েশ দিয়াছিল এবং ইহার মূল্যও পরিশোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বৃটেন জাহাজ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায়। ইহার পর তুরস্ক সরকার জার্মানীর নিকট হইতে জাহাজ ক্রয় করে (জাহাজ দুইটির জার্মান নাম ছিল Goeben & Breslau) ; তুর্কীগণ জাহাজগুলির উক্ত নাম বহাল রাখে। এই জাহাজগুলি কৃষ্ণ সাগরে রুশ নৌবহর ও বন্দরগুলির ধ্বংসসাধন করে। ইহার ফলে ১৯১৪ সালে অক্টোবর মাসে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী বাহিনীর কৃতিত্বের ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাহারা ককেশিয়া নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে। ইহাতে ইংরেজদের বিতাড়নের উদ্দেশে তাহারা দুইবার সুয়েজ খাল আক্রমণ করে। শারীফ হুসায়নের কারণে এই অভিযানে তাহারা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তুর্কী বাহিনী 'আদান (এডেন) আক্রমণ করে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ফাখরুদ্-দীন পাশার নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী মদীনা শরীফ হেফাজত করিতে থাকে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয় গ্যালীপলী নামক স্থানে। তুর্কী বাহিনী মুসতাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীকে পরাজিত করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য করে। আন্ওয়ার পাশা সুলায়মান 'আসকারীর নেতৃত্বে তাশকীলাত মাখ্সূসা নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি লিবিয়া, মেসিডোনিয়া, ককেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। ইহাকে ইংরেজদেরকে তীব্র সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

সাঈদ হালীম পাশার মৃত্যুর পর তাল'আত পাশাকে মন্ত্রী পরিষদের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ওয়াহীদু'দ-দীন ষষ্ঠ 'মুহাম্মাদ' উপাধি ধারণ করিয়া সুলতানরূপে অভিষিক্ত হন। যুদ্ধের অবস্থা নাযুক রূপ ধারণ করিলে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ সম্পর্কিত আলোচনা সহজতর করার উদ্দেশে তাল'আত পাশার মন্ত্রীসভা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ৪ নভেম্বর তাল'আত, আন্ওয়ার, জামাল, ড. নাজিম ও আঞ্জুমান-ই ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কীর অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যবর্গ আন্ওয়ারের পার্শ্বচর (Oide-de-camp) কাজিমের গৃহে জমায়েত হন। এই গৃহটি বসফোরাসের তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা একটি জার্মান জাহাজে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণসাগরের রুশ সমুদ্র বন্দরে অবতরণ করেন। এই সময় এই বন্দরটি জার্মানীর অধীনে ছিল। আন্ওয়ার তথায় অবস্থান করেন। কেননা তিনি ককেশিয়া যাওয়ার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অপরাপর সবাই ডিসেম্বর মাসে বার্লিনে উপনীত হন। কিছুদিন পর আন্ওয়ার বার্লিনে চলিয়া যান। ইস্তাম্বুল মিত্র বাহিনীর অধীন হইয়া পড়ে। সুলতান তাহাদের প্রভাবাধীন ছিলেন। তথায় একটি সামরিক আদালত স্থাপন করা হয়। এই 'আদালত ৫ জুলাই, ১৯১৯ সালে আন্ওয়ার, তাল'আত, জামাল ও ড. নাজিমের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করে।

দেশত্যাগের পর আন্ওয়ার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার এই সময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিস্তারিত ও সঠিক খতিয়ান আমাদের সামনে

বর্তমান নাই। কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণের সন্ধান পাওয়া যায়। যথাঃ আন্‌ওয়ার ও জামাল পাশা কয়েকবার রাশিয়া ও মধ্যএশিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। এই সময় আনাতোলিয়ায় এক জাতীয় বিপ্লব শুরু হইয়াছিল এবং উক্ত বিপ্লবের প্রতি আন্‌ওয়ারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁহার সমস্ত কর্মদক্ষতা উক্ত আন্দোলনের সমর্থনে প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু তিনি ইহাও চাহিতেন না, সরাসরি আন্দোলনের জন্য দায়িত্বশীল তাঁহাদের কাহারও মর্যাদার কোনরূপ বিরোধের সৃষ্টি হউক। এই সময় তিনি দুইটি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। একটির নাম ছিল 'ইসলাম ওয়া ইসতিকলাল জামহুরিয়াত লেরী ইত্তিহাদী। ইহাকে একটি ইসলামী জাতীয় বৈপ্লবিক সংগঠনরূপে মনে করা যয়। অপরটির নাম ছিল 'খাল্‌ক শুরালার ফেরকাসী'। ইহা ছিল প্রথমোক্ত সংগঠনটির একটি শাখা। বলশেভিকগণ বাক নামক স্থানে প্রাচ্য জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দের একটি কনফারেন্সের আয়োজন করিয়াছিল (১ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০)। আন্‌ওয়ারও লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মারয়াকুশের প্রতিনিধিরূপে উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করেন। মুসতাফা কামালের পক্ষ হইতেও একটি প্রতিনিধি দল ইব্‌রাহীম তালি-এর নেতৃত্বে উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য আন্‌ওয়ার কখনও বার্লিনে, কখনও রাশিয়ায় আসা-যাওয়া করিতে থাকেন। একবার তাঁহার উড়োজাহাজটি যান্ত্রিক গোলাযোগের কারণে লিথুনিয়া অবতরণে বাধ্য হয়। সেখানে তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ বন্দী রাখা হয়। অতঃপর বার্লিনের বন্ধু-বান্ধবদের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আনাতোলিয়ায় মুস্‌তাফা কামালের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা সংগ্রামে বলশেভিকগণ পূর্ণ সহযোগিতা দান করিবে। তাই তিনি নিজ নেতৃত্বে তুর্কী যুদ্ধবন্দী ও ককেশিয়ার মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত দুই ডিভিশন সৈন্যসহ আনতোলিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তার উদ্দেশে তথায় গমনের জন্য রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন (অক্‌টোবর ১৯২০)। মুজাহাহিদগণ আনাতোলিয়ার জন্য বার্লিন হইতে অস্ত্র ক্রয়েরও চেষ্টা করেন। বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, আন্‌ওয়ারের আনাতোলিয়ায় গমন এবং তথাকার স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অংশগ্রহণকে মুসতাফা কামাল পসন্দ করিতেন না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, আন্‌ওয়ার প্রোপাগান্ডার মাল-মশলাসহ 'খাল্‌ক শুরালার ফেরকাসী'-এর পক্ষ হইতে মেজর নাঈম জাবীদকে আনাতোলিয়ায় প্রেরণ করিলে কৃষ্ণসাগরের সমুদ্র বন্দরে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। মুসতাফা কামালের কূটনৈতিক প্রতিনিধি 'আলী ফুওয়াদ রাশিয়া গমন করিলে আন্‌ওয়ার তাঁহার সংগে সাক্ষাত করেন (২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১)। আলী ফুওয়াদ আনওয়ারকে আনাতোলিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। ইহার পরিপেক্ষিতে আন্‌ওয়ার মুস্‌তাফা কামালকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। ইহাতে তিনি তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণে বিস্ময় প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি কেবল বাহির হইতে জাতীয় সংগ্রামে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা করিবেন (১৬ জুলাই, ১৯২১)।

আন্‌ওয়ার পাশার ব্যাপারে সংশয়ের বিষয়টি ভিত্তিহীন হওয়ারও আশংকা রহিয়াছে। সম্ভবত ইহাও হইতে পারে, তাঁহার সম্পর্কে মুসতাফা কামালের কাছে এমন সব সংবাদ পৌছিত যাহাতে তাঁহার সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ ছিল। যাঁহারা অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, তাঁহারা কোন নূতন কিছুর আবির্ভাবে মূল আন্দোলনে ইহার কতদূর প্রভাব পড়িবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কোন কোন সময় স্বভাবগত পার্থক্যও দুইজন মহৎ ব্যক্তির একত্রে অংশগ্রহণের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

উপরিউক্ত পত্র প্রেরণের কিছুদিন পর আন্‌ওয়ার জানিতে পারেন, গ্রীক সৈন্যবাহিনী দ্রুত আঙ্কারার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহা শ্রবণ করা মাত্রই তিনি মস্কো হইতে বাতুম পৌছেন। ইহা ছিল কৃষ্ণসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত আনাতোলিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি সমুদ্র বন্দর। সেখানে ৫ সেপ্টেম্বর "আনজুমান-ই ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্‌কী"-এর সদস্যদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আঙ্কারা হইতে উক্ত বৈঠক আন্‌জুমান-ই ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্‌কী-এর সদস্যদের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পরিহার করার আবেদন জানায়। এই সময় সাকারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক সৈন্যবাহিনী (৩ সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২১) শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং ইযমীর-এ পলাইয়া যায়। অনেক গ্রীক সৈন্য নিহত হয় এবং সমুদ্রে অনেকের সলিল সমাধি রচিত হয়। স্বল্প সংখ্যক সৈন্য জাহাজে উঠিয়া আত্মরক্ষা করে। মুসতাফা কামালের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় হয়। এই সময় অন্য কাহারও হস্তক্ষেপের সরাসরি প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক, আনওয়ার বাতুম হইতে তিফলিস, বাকু, আশকাবাদ ও মার্‌ব-এর রাস্তা দিয়া বুখারা চলিয়া যান (অক্‌টোবর ১৯২১)। এ সময় কয়েকজন প্রবীণ সহযোগী তাঁহার সংগে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হাজ্জী সামীর উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি "তাশকীলাত-ই মাখ্‌সূসা"-এর একজন দায়িত্বশীল সদস্য ছিলেন।

সাধারণ বর্ণনামতে আন্‌ওয়ার বলশেভিকদের মনে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তিনি বিভিন্ন মুসলিম গোত্রকে সংঘবদ্ধ করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্ত উহাই হইয়া থাকিবে। তাহা সত্ত্বেও তুর্কিস্তানকে বহিশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার তাঁহার প্রচেষ্টার কোন উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় না। সেই সময় তুর্কিস্তান বলশেভিকদের অধিকারভুক্ত হয় নাই। যাহা হইক, তিনি বিভিন্ন উযবেক গোত্রকে একত্র করিয়া বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কৌশল অবলম্বন করা কোনরূপ অন্যায় কাজ নয়। তাহা সত্ত্বেও আন্‌ওয়ারের স্বভাব ছিল এইসব মারপ্যাঁচের অনেক উর্ধ্বে। এই সময় উযবেকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। স্বাধীনচেতা লোকদের একটি সংগঠন ছিল; ইহার নেতৃত্ব ছিল 'উছমান খাজার হাতে। তাঁহারা বলশেভিকদের সাহায্যে বুখারার আমীরকে কাবুলে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করে এবং তাহারা গণতন্ত্রের সমর্থক ছিল। অপর দল উপজাতীয়দের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তাহাদের বাসমাজী বলা হইত। তাহারা গণতন্ত্রের সমর্থক ও বলশেভিকদের বিরোধী ছিল এবং তাহারা বিতাড়িত আমীরের সহযোগিতা করিতেছিল। 'উছমান খাজা আন্‌ওয়ারকে স্বাগত জানান। আন্‌ওয়ার আহমাদ যাকী ওয়ালিদী তুগানের সংগে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। আহমাদ যাকী বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন।

আন্ওয়ার ৮ নভেম্বর ত্রিশজন সহযোগী সমেত শিকারীর ছদ্মবেশে বাহির হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাসমাজীদের সংগে একত্র হইয়া শীঘ্রই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ ছিল, বিলম্ব হইলে বলশেভিকদের অবস্থান সুদৃঢ় হইয়া পড়িবে। তিনি শীরাবাদ হইতে পূর্বদিকে গমন করিতে থাকেন এবং আফগান সীমান্ত বরাবর গমন করেন। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিও তাঁহার দলে শামিল হয়। তিনি কাওয়াগুনতেপা-এর পার্শ্বে দাওশানবেহ (বর্তমান স্ট্যালিনবাদ)-এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বাসমাজী নেতা ইবরাহীমের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু বুখারার আমীরের কোন সক্রিয় সহযোগী ছিল না। ইব্রাহীম স্বাধীনচেতা তুর্কীদেরকে যেমন ঘৃণা করিতেন, তেমনি স্বাধীনচেতা বুখারাবাসীদেরকেও ঘৃণা করিতেন। অতএব, তিনি আন্ওয়ারকে গ্রেফতার করেন এবং প্রায় ছয় সপ্তাহ নজরবন্দী রাখেন (১ ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল হইতে ১৫ জানুয়ারী ১৯২২)। অবশেষে সুলতানের নেতৃত্বে বাসমাজীগণ আন্ওয়ারকে মুক্তি দেয়। ইহার পর আন্ওয়ার আবার দুই শত সৈন্যসমেত দাওশান্বেহ আক্রমণ করেন। ফলে সেখান হইতে রুশ সৈন্যবাহিনী বিতাড়িত হয় (১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২)।

১৯ ফেব্রুয়ারী পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবনের সময় আন্ওয়ারের বাহুতে আঘাত লাগে। দাওশান্বেহ্-এ সফল অভিযানের পর সশস্ত্র বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট জমায়েত হয়। বহু কর্মী অধিক সাহায্য লাভের জন্য আফগানিস্তান গমন করেন। আবার কাফরানের যুদ্ধে আন্ওয়ার আন্দোলন হইতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন (২৮ জুন)। যে গতিতে জনসাধারণ তাঁহার পার্শ্বে জমায়েত হইয়াছিল সেই গতিতে আবার বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে আন্ওয়ার বাসমাজীদের নেতা দানিশ্মান্দ বেগের সংগে মিলিত হইতে বাধ্য হন। দাওশানবেহ -এর দক্ষিণ-পশ্চিমে বানজায়য়ান নামক স্থানে এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

৪ আগস্ট, ১৯২২ সালে আন্ওয়ার চাক্ন নামক স্থানে রুশ বাহিনীর উপর একটি পাল্টা আক্রমণ চালান। রুশ সৈন্যসংখ্যা আন্ওয়ারের সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল। আন্ওয়ার নিজে সৈন্য পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধেই জুমু'আর দিন তিনি শহীদ হন (সম্ভবত ১৩৪০ হি. সালের ৭ যুলহিজ্জা)। দানিশ্মান্দ বেগও আন্ওয়ারকে বাঁচাইতে যাইয়া শহীদ হন। ৫ আগস্ট চাক্ন-এ তাহাদেরকে দাফন করা হয়। আন্ওয়ারের বয়স হইয়াছিল চল্লিশ বৎসর আট মাস তের দিন। তিনি তাঁহার জীবনের একটি মুহূর্তেও দেশ ও জাতির চিন্তা ব্যতিরেকে অন্য কোন চিন্তায় নিমগ্ন হন নাই।

আন্ওয়ার ছিলেন মাঝারি ধরনের লম্বা হালকা-পাতলা গড়নের। চোখের আকৃতি খুবই সুন্দর ও উজ্জ্বল। স্বভাবসুলভ বীরত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। কর্মস্পৃহা ও সক্রিয়তার তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল নমুনা। তিনি ছিলেন একান্ত নম্র, ভদ্র, সহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী। তাঁহার সাংগঠনিক ক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় লিবিয়ায়। সেখানে তিনি একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় স্থানীয় আরবদেরকে ইতালীর বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধকারী শক্তিতে সংগঠিত করিয়াছিলেন। অল্প কালের মধ্যে তিনি তুর্কী সামরিক বিভাগের রূপ পাল্টাইয়া দেন যাহাতে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। তাঁহার প্রতি জনসাধারণের অপরিমেয় ভালবাসা ছিল। তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেমের সাক্ষ্য দিত। তাঁহার প্রথমিক কালের বন্ধু গাযী রঊফ বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন শিষ্টতা ও আভিজাত্যের এক উজ্জ্বল নমুনা।

৫ মার্চ, ১৯১৪ সালে সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ ও ষষ্ঠ মুহাম্মাদের ভগ্নিকন্যা আমিনা নাজিয়া সুলতানের সংগে আন্ওয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। কনিষ্ঠা কন্যার নাম ছিল তুরকান। হাওয়ায়দা মিয়াতা পাকের সংগে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ডেনমার্কে তুরস্কের কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। আন্ওয়ারের পুত্রের নাম ছিল আলী আন্ওয়ার। তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। বিবাহের চারি বৎসর পর ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে আন্ওয়ার দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। ইহার পর দ্বিতীয়বার তাঁহার পক্ষে স্ত্রী-কন্যাদের সংগে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নাই। শেষদিকে তিনি মধ্যএশিয়া হইতে নাজিয়া সুলতানকে দরদমাখা একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। আন্ওয়ারের শাহাদাতের প্রায় চৌদ্দ মাস পর তাঁহার ভ্রাতা কামিল কুলীগুলের সঙ্গে নাজিয়া সুলতানের পুনরায় বিবাহ হয়।

আন্ওয়ার কয়েকটি ভাষা জানিতেন। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল তুর্কী। সামরিক স্কুলে ফারসী ভাষা অপরিহার্য ছিল। ইহার পর তিনি প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। পশ্চিম ত্রিপোলীতে (লিবিয়া) 'আরবদের সামনে তিনি অনর্গল আরবী বলিতেন। রাশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি রুশ ভাষায় কথাবার্তা রপ্ত করেন।

তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে আন্ওয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিলেন। জামাল পাশা তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই সময় সিরিয়ার গভর্নর। একদিন হঠাৎ আন্ওয়ার মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় হিজায রেলওয়ে চালু ছিল। আন্ওয়ার ও জামাল পাশা একটি স্পেশাল ট্রেনে মদীনা পৌঁছেন। স্টেশনে গাড়ীর ব্যবস্থা থাকিলেও আন্ওয়ার গাড়ীতে উঠিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলন, " আমি গোলামরূপে এখানে আসিয়াছি"। স্টেশন হইতে তিনি পায়ে হাঁটিয়া মসজিদে নববীতে যান। সেইখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাওদা শরীফ যিয়ারত করেন। তিনি স্থানীয় আলিমদের সভায়ও যোগদান করেন। অতঃপর তিনি মদীনা হইতে ফিরিয়া আসেন। মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী 'আসীর-ই মালটা' ও নাকশে-হায়াত নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার সম্বন্ধে এইসব ঘটনার কিছু বিবরণ দিয়াছেন। ১৯৩৪ সালের পর আন্ওয়ারের বংশধরগণ 'কুলীগুল' বংশীয় উপাধি ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় নিম্নে তাঁহাদের বর্ণনা দেওয়া হইলঃ

নূরী কুলীগুল, (১৮৯০-১৯৪৯) আহমাদ বে (পরে পাশা) ও আইশার দ্বিতীয় সন্তান এবং আন্ওয়ার পাশার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯১৪ সালে তিনি মেজর ছিলেন। ১৯১৫ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপোলীর (লিবিয়া) স্থানীয় আরবদের সংগঠিত করিয়া ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং উপকূল অঞ্চল হইতে ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার গতিরোধ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি ককেশাসের গুপ্তঘাতক দলকে সংযত করিতেছিলেন। ইস্তাম্বুল সরকার তাঁহাকে ফিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি রোমে অবস্থান করেন। ১৯২০ সালে তিনি দাগিস্তানে উপনীত হন। তথায় তিনি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অভিযান ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকেন। ইহার পর ইস্তাম্বুল ফিরিয়া গিয়া শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ শালজা-র অস্ত্র তৈরীর কারখানায় যে বিস্ফোরণ ঘটে ইহাতে তিনি নিহত হন। জানা যায়, তাঁহাকে এই কারখানাই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

কামিল কুলীগুল, আন্ওয়ারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৯৬২ সালে ইন্তিকাল করেন। ১৯২৩ সালের ৩০ অক্টোবর তিনি আন্ওয়ারের স্ত্রী নাজিয়া সুলতানাকে বিবাহ করেন।

মাদীহা কুলীগুল, আন্ওয়ারের কনিষ্ঠা ভগ্নী, জন্ম ১৮৮৯ সালে; ১৯১৯ সালে কর্নেল (পরে জেনারেল) কাজিমের সংগে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি আন্ওয়ারের পার্শ্বচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৬১ সালে তাঁহাকে এসেম্বলীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। পরে তাঁহাকে প্রজাতন্ত্রের সিনেটের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। মাদীহা ১৯৬৩ সালে ইন্তিকাল করেন।

খালীল পাশা (১৮৮১-১৯৫৭) আন্ওয়ারের পিতৃব্য (তাঁহার পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)। তিনি আন্ওয়ারের সমবয়স্ক ছিলেন। সামরিক একডেমীতে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ লইয়া ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন। পশ্চিম ত্রিপোলী (লিবিয়া) ও বলকান যুদ্ধ ছাড়াও বিশ্বযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৬ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হন। ইহার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত হইয়া ষষ্ঠ সৈন্যদলের কমান্ডার নিযুক্ত হন। এই সৈন্যদলটি ইরাকে যুদ্ধরত ছিল। খালীল পাশা সেখানে অনেক গৌরবজনক বিজয় লাভ করেন। ইরাকে তিনি তের হাজার বৃটিশ সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করেন। এই বাহিনী জেনারেল রাওতাশেও-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। ১৯১৮ সালের জুন মাসে তাঁহাকে ককেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি বাকু অধিকার করেন। পরে ঘটনাক্রমে বাতুমে তাঁহাকে নজরবন্দী রাখা হয়; কিন্তু তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং ইস্তাম্বুল পৌঁছেন। আরমেনীয়দের উপর নিষ্ঠুরতার অভিযোগে তাঁহাকে আবার বন্দী হইতে হয়। কিন্তু তিনি সেখান হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং আনাতোলিয়া গমন করেন। মুসতাফা কামাল তাঁহাকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য লাভের উদ্দেশে মস্কো প্রেরণ করেন। তথায় তিনি চাচ্‌রান (বৈদেশিক মন্ত্রী) ও কারা খানের সংগে মিলিত হন। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও এক লক্ষ তুর্কী পাউন্ড সাহায্যসহ ফিরিয়া আসেন। ১৯২০ সালের শীতকালে তিনি আবার মস্কো গমন করেন। সেখানে আনওয়ারের সহিত যুক্ত হইয়া খালক শুরালার ফিরকাসী-এর সমর্থনে কাজ আরম্ভ করার জন্য তারাবযুন পৌঁছেন। কিন্তু মুসতাফা কামালের সরকার তাঁহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করে। স্বাধীন তুর্কীদের সফলতা লাভের পর খালীল পাশা ইস্তাম্বুল গমন করেন। সুলতান ওয়াহীদুদ্দীনের সরকার মিত্রবাহিনীর প্রভাবে তাঁহাকে সামরিক বাহিনী হইতে বরখাস্ত করে (১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০)। ১৯২৩ সালে এই আদেশটি রহিত হয়। কিন্তু খালীল পাশা আর কোন রাজনৈতিক বা সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন নাই।

১৯৩৪ সালের আইনের অনুসরণে তিনি 'কূত' বংশীয় নাম ধারণ করেন। তাঁহার এই নামটি কূতুল 'ইমারা (ইরাক)-এ তাঁহার গৌরব আর বিজয়ের স্মারক ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দিয়া শাকির (Soku) Yokin tarihin ue buyuk adams; Talat, Enwar, Camal, দ্বিতীয় সং, ইস্তাম্বুল ১৯৪৪, একটি সর্বজন সমাদৃত বিবরণ, কিন্তু সকল বিষয় সঠিক নয়; (২) Kurt Okay, Enwer Pasha, der grosse Freund Deutschlands, বার্লিন ১৯৩৫, ইহাতে প্রকৃত ঘটনা ও কাহিনী উভয়ই বর্তমান। আন্ওয়ারের স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যঃ (৩) আখবার-ই ওয়াতান, ইস্তাম্বুল, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫২ ও ২১ জানুয়ারী, ১৯৫৩। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আন্ওয়ারের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের জন্য দ্র. (৪) A. D. Alderson, Structure of the Ottoman Dynasty, অক্সফোর্ড ১৯৫৬; (৫) Tevfik Biyiklioglu, Trakya da Milli Mucadele, আঙ্কারা ১৯৫৫-৫৬, বিশেষত ১খ., ৮৮ প.; (৬) Resneli ahmad Niyazi, Khatirat-i Niyazi, ইস্তাম্বুল ১৩২৬ হি.; ইংরেজী সারসংক্ষেপ E. F. Night, The Awakening of Turkey; ওয়ালিয়্যু-দ্দীন বে কৃত 'আরবী অনু., ইনশাল্লাহকৃত উর্দূ অনু., তুর্কী কী বেদারী; (৭) E.E. Ramsaur, The Young Turks, প্রিন্সটন ১৯৫৭; (৮) Ali Fuad Turkgeldi, Gorup Isittiklerim, দ্বিতীয় সংস্করণ, আঙ্কারা ১৯৫১। জার্মানদের সংগে ঐক্য ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দ্র. (৯) Ibnulemin Mahmud Kemal Inal, Osmanli Devinde son sadriazamlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪০-৫৩, বিশেষত পৃ. ১৮৯৬ প.; (১০) Harp Kabinelerinin isticvabi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ (পার্লামেন্টারী পর্যালোচনা বোর্ডের সামনে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশেষ পরিষদের সদস্যদের সাক্ষ্য দান); (১১) Carl Muhlmann, Deutschland und die Turkei, 1913-1914, বার্লিন ১৯২৯। ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত তাঁহার সামরিক নেতৃত্বের জন্য দ্র. (১২) W. E. D. Allen & Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge 1953; (১৩) আহমাদ জালাল পাশা, Memoirs of a Turkish Statesman, London 1922; (১৪) M. Larcher, La guerre dans la guerre mindiale, প্যারিস ১৯২৬; (১৫) Carl Muhlmann, Das deutsch-turkische Waffenbundnis im Weltkrieg, Leipzig 1940; (১৬) Joseph Pomiankowski, Der Zusammenbruch des ottoManischen Reiches, Leipzig 1928। নির্বাসিত অবস্থায় আনওয়ার, খালীল ও নূরীর ক্রিয়াকর্মের বিবরণের জন্য দ্র. (১৭) Samet Agaoglu Babamin arkadaslari, ইস্তাম্বুল ১৯৫৯, পৃ. ৩০-৪৩; (১৮) Abdullah Receed Baynuh, Turkistan Milli hareket leri, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫; (১৯)

Tevfik Biyiklioglu, Ataturk Anadoluda, আঙ্কারা ১৯৫৯, পৃ. ৩৫, ৬৮ প.; (২০) Wipert von Blucher, Deutscland Weg nach Rapallo, Wiesbaden 1951, পৃ. ১৩২-৩৫; (২১) Olaf Caroe, Soviet Empire, লন্ডন ১৯৫৩, পৃ. ১১৪-১৩০; (২২) Joseph Castagne, Les Basmat Chis (1917-1924), প্যারিস ১৯২৮; (২৩) Ali Fuat Cebesoy, Maskova, hatiralari, ইস্তাম্বুল ১৯৫৫, বিশেষত পৃ. ১২৮-১৩৭, ১৫৭-১৮৮, ২২০-২৩৯, ৩১৩-৩২৭; (২৪) Baymirza Hayit, Turkestan im xx Jahrhundert, Darmstadt 1956; (২৫) Gotthard Jaschke, in WI. ১৯২৯, ১০খ., ১৪৬ ও নূতন ধারা, ১৯৫৭, পৃ, ৪৪-৫২ ও ৬খ., (১৯৬১), পৃ. ১৮৫-২২২ ও ৮খ., (১৯৬২), পৃ. ৩৫-৪৩; (২৬) Sami Sabit Karaman, Trabzon ve kars hatiralari Milli mucadele ve Enver Pasa, ইযমীদ ১৯৪৯; (২৭) Friedrich von Rabenau, Aus seinem Leben, Sceckt (1918-1936), Leipzig 1940, পৃ. ৯৫, ৩৫৬ প.; (২৮) D. A. Rustow, World Politics, 11(1959), 513-552; (২৯) Otto- Ernt Schuddekopf, Karl Radek in Berlin, Archov fur Sozialgeschichte, Z (1962), 87-166 (Radak-এর বার্লিনে লিখিত ডায়রির জার্মান অনু. November শিরোনাম এই গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত (যাহা সর্বপ্রথম Krasnayanov নামক ম্যাগাজিনে অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২৬ সালে মুদ্রিত হয়), বিশেষত পৃ. ৯৭ (এখানে আন্ওয়ারের বার্লিন হইতে মস্কো যাওয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে) ও পৃ. ১৫২; (৩০) আহমাদ যাকী ওয়ালিদী তুগান, Bugunku Turkili (Turkistan) ve yokin mazisi, ইস্তাম্বুল ১৯৪৭, পৃ. ৪৩৪-৪৫৩; (৩১) ১৯২০ সালের ১৬ জুলাই মুসতাফা কামালের নামে লিখিত আন্ওয়ারের চিঠির অনুলিপি তুর্কী বিপ্লবের ইতিহাস বিভাগ (Turk Inkilap Tarihi Enstitusu)-এ সংরক্ষিত আছে।

এই সকল গ্রন্থপঞ্জীতে সেই সমস্ত বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে যাহা জেনারেল কাজিম উরবে (আঙ্কারা ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী, ১৯৪৩) এবং বে 'আলী আনওয়ারের (ইস্তাম্বুল ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় তাঁহাদের মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে (তাহা ছাড়া Bey Faik Resit Unat আঙ্কারা-এর প্রেরিত বিবরণ); (৩২) ওয়াজাহাত হুসায়ন আন্ওয়ার পাশা, লাহোর ১৯২১; (৩৩) D. A. Rustow লিখিত আন্ওয়ার পাশা শীর্ষক নিবন্ধ, Encyclopaedia of Islam, Leiden, দ্বিতীয় সংস্করণ; (৩৪) আল-হিলাল (ম্যাগাজিন), কলিকাতা, প্রথম খণ্ড (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১২) ও দ্বিতীয় খণ্ড (জানুয়ারী-জুন ১৯১৩); (৩৫) হুসায়ন আহ্মাদ মাদানী, নাকশ হায়াত, দ্বিতীয় খণ্ড, দিল্লী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত, দিল্লী ১৯৫৪; (৩৬) হুসায়ন আহমাদ মাদানী, আসীর-ই মালটা।

গোলাম রাসূল মিহ্র (দা. মা. ই.)/এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আন্ওয়ারী (انورى) ঃ আওহাদুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ইসহাক-এর (৫৬৪/১১৬৮)-এর কবিনাম (تخلص)। তিনি সালজূক শাসনামলে, বিশেষত সানজারের শাসনামলের মহান ফারসী কবিদের মধ্যে গণ্য। কোথাও কোথাও তাঁহার নাম মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদরূপে লিপিবদ্ধ আছে (লুবাবুল-আলবাব, সম্পা. Browne, ২খ., ১২৫ প.)। কিন্তু সমসাময়িক মুহাম্মাদ আজ্-জুহায়রী আস্-সামারকান্দী আন্ওয়ারীর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আলী লিখিয়াছেন (দ্র. সিনদাবাদ নামাহ্ যাহা ৫৫৬/১১৬১ সালের কিছুকাল পরে লিখিত, সম্পা. আহমাদ আতিশ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৮, ভূমিকা ও পৃষ্ঠা ১১, ১৩, ১৪, ১৭ ইত্যাদি অধিকন্তু আগ্রাদুস্-সিয়াসা; ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি, কুতুবখানা-ই আয়াসোফিয়া, ইস্তাম্বুল, সংখ্যা ২৮৪৪, পত্রক ৬৪৬ ব)। আনওয়ারী একটি কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পিতামহের নাম ছিল ইসহাক। কয়েক বৎসর পূর্বে ইরানে দীওয়ান-ই কাতরান-এর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার সংকলন আলী ইব্ন ইস্হাক আবীওয়ারদী একজন কবি ছিলেন। সকলেরই ধারণা, উক্ত দীওয়ানের সংকলন প্রসিদ্ধ কবি আন্ওয়ারী [দ্র. মাহ্দী বায়ানী, দীওয়ান-ই কাত্রন তাবরীযী, আনওয়ারী আবীওয়ারদী লিখিত, ইয়াগমা (সাময়িকী), ৩য় খণ্ড, সংখ্যা ১১, তেহরান ১৩২৯ হি. শা., পৃ. ৪৭৪-৪৯৫; দীওয়ান-ই কাতরান তাবরীযী, সম্পা. মুহাম্মাদ নাখচুওয়ানী, তাবরীয ১৩৩৩ হি, শা.]। কিন্তু লক্ষণীয়, উক্ত দীওয়ানে কবির নামের উল্লেখ নাই। যদি আন্ওয়ারীর নাম সম্পর্কে উপরিউক্ত বক্তব্য সঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই দীওয়ানের সংকলক আন্ওয়ারী নহেন, তাঁহার পিতা। অধিকাংশ গ্রন্থে লিখিত আছে, আন্ওয়ারী প্রথমদিকে খাওয়ারী কবিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে 'আন্ওয়ারী' কবিনাম গ্রহণ করেন। আন্ওয়ারীর জন্মস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন বিবৃতি রহিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থানের প্রসঙ্গে আবীওয়ারদ, খাওয়ারান, বাদানা ও মাহ্না-র উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু দাওলাত শাহ লিখিয়াছেন, আন্ওয়ারী মূলত আবীওয়ারদ প্রদেশের বাদানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এই গ্রামটি মাহ্নার পার্শ্বে অবস্থিত। এখানকার মরু অঞ্চলকে দাশ্ত-ই খাওয়ারান বলা হয়। তায্কিরাতুশ-শু'আরা (সম্পা. E. G. Browne, লাইডেন ১৯০০ খৃ., পৃ. ৮৪) গ্রন্থের উক্ত বর্ণনা দ্বারা আন্ওয়ারীর জন্মস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। খাওয়ারান নামের অনুসরণে তিনি সম্ভবত প্রথমদিকে খাওয়ারী কবিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আনওয়ারীর বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। দীওয়ানের একটি পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত বিররণ হইতে জানা যায় (দ্র. হ'দাইকে'র পরিশিষ্ট, ফিহ্রিস্ত-ই কুতুবখানা-ই সিপাহসালার, তেহরান ১৩১৮-২১ হি. শা, ৫৬৫), আনওয়ারীর পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তিনি প্রভূত ধন-সম্পদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। আন্ওয়ারী এই ধন-সম্পদ ভোগবিলাসে নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই বিবরণটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কেননা তাহা হইলে শেষদিকে আন্ওয়ারীর ব্যাপক জ্ঞান লাভের বিষয়টি ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা প্রতিষ্ঠিত যে, বাল্যকাল হইতে আন্ওয়ারী জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছেন। বলা হইয়া থাকে, আনওয়ারী তূসের মাদ্রাসা-ই মান্সূরিয়্যায় অধ্যয়ন

করিয়াছেন (Browne, Lit. Hist., ২খ., ৩৬৬)। আন্‌ওয়ারী যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, স্বীয় কাব্যে উহার বর্ণনা দিয়াছেন। আহ্‌কাম, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, কালামশাস্ত্র ইত্যাদি (দ্র. কুল্লিয়াত, পৃ. ৭০৪ প.)। তিনি লিখিয়াছেন, জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। অতঃপর তিনি যাহা বলিতেন, প্রত্যেকেই তাহা বিশ্বাস করিত। অপর একটি কবিতায় (কুল্লিয়াত, পৃ. ২৩৬) উল্লেখ করেন, তিনি উচ্চাংগ সুর ও ইরাকী সুরে গযল গাহিতেন। ইহা দ্বারা জানা যায়, তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

জীবনীকারগণ লেখেন, আন্‌ওয়ারীর বিদ্যালয় ত্যাগ করার কারণ ছিল ঃ একদিন সুলতান সান্‌জার তূস-এ আগমন করেন। এই সময় আন্‌ওয়ারী মাদ্‌রাসায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি খুবই জাঁকজমকের সংগে গমন করিতেছেন। আন্‌ওয়ারী প্রশ্ন করেন। তিনি কে ? বলা হয়, তিনি সুলতানের দরবারী কবিদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন কবি আমীর মু'ইয্‌যী (JA, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৫)। আন্‌ওয়ারী যখন দেখিতে পান, জ্ঞানার্জন দ্বারা যে মর্যাদা লাভ করা যায়, কবিতা রচনা দ্বারাও তাহা সম্ভব, অতএব সেই দিনই তিনি কবিতা রচনাকে স্বীয় পেশা হিসাবে অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই রাত্রেই তিনি একটি কাসীদা রচনা করিয়া পরদিন সুলতানের দরবারে পেশ করেন। সুলতান সানজার আন্‌ওয়ারীর কাব্য-প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভাতা নির্ধারণ করেন এবং আনওয়ারী দরবারী কবিদের মধ্যে পরিগণিত হন। উক্ত বর্ণনার সহিত সংশ্লিষ্ট কাসীদাটি 'কুল্লিয়াত-ই আন্‌ওয়ারী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ১২৪ প.)। বর্ণনা-রীতির বিচারে কবিতাটি এতই বলিষ্ঠ যে, ইহা কবির প্রথম রচিত কবিতা বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কবিতাটি দ্বারা বুঝা যায়, আন্‌ওয়ারী যখন এই কবিতা রচনা ও সুলতানের দরবারে পেশ করিয়াছিলেন, ইহার দশ বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি 'নাদীমান-ই মাজলিস' ও 'মুকীমান-ই আসতান'-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহ পোষণ করিতেছিলেন (দ্র. দীওয়ান আন্‌ওয়ারী, সম্পা. সাঈদ নাফীসী, পৃ. ৯৪, পংক্তি ১ ও ২)। এইজন্য ধারণা করা হয়, যদিও এই কাসীদা তাঁহার রচিত সর্বপ্রথম কাসীদা ছিল না, কিন্তু সুলতানের প্রশংসায় রচিত কাসীদা হিসাবে ইহাই ছিল প্রথম।

সুলতান সান্‌জারের সংগে আন্‌ওয়ারীর গভীর সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক ভিত্তিহীন ও অলীক কাহিনী বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার কবিতায় এই তথ্য মাত্র পাওয়া যায়, তিনি কখনও কখনও সুলতানের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। একটি কবিতায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ৫৩৬/১১৪১-৪২ সালে তিনি সুলতানের একটি মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাল্‌খ হইতে সামারকান্‌দ আগমন করেন (কুল্লিয়াত, পৃ. ৩৫৭-৩৬২)। ৫৪২/১১৪৭-৪৮ সালে হাযার-আস্‌প বিজয়ের সময় তিনি সুলতানের সংগে ছিলেন (দ্র. 'হ'াদাইকুস্‌-সিহ্‌'র', সম্পা. ইক্‌বাল, তেহরান ১৩০৮ হি., শা, ভূমিকা, পৃ. ৮)। তাহা ছাড়া সব সময় সুলতানের সংগে মজলিসে উপস্থিত থাকাও আন্‌ওয়ারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুলতান সান্‌জারের প্রশংসায় রচিত আন্‌ওয়ারীর অন্যান্য কবিতারও তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। কেননা ফারসী সাহিত্যের অন্যান্য কবিদের ন্যায় আন্‌ওয়ারী সম্পর্কেও খুব কমই জানা যায়। এইজন্য তাঁহার দীওয়ানে উল্লিখিত বিষয়সমূহকে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা উচিত। কুল্লিয়াত-এ দশ হাযার কবিতা সন্নিবেশিত রহিয়াছে (দা. মা. ই., ৩খ., ৪৯৪)। কবি আনওয়ারী জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করিতেন এবং এইজন্য গর্ববোধও করিতেন। ইহা দ্বারা তিনি যেমন সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি তাঁহার পতনও ইহাতে সূচিত হইয়াছিল। ২৯ জুমাদা ২য় (দ্র. ইব্‌নুল আছীর, সম্পা. Torn berg, ১১খ., ৩৪৮) ৫৮১/১১৮৫ সনে সাতটি গ্রহের অপূর্ব সম্মেলনের দরুন পৃথিবীতে ভীষণ বিপর্যয় ঘটিবার, এমন কি দালান-কোঠা ও পাহাড়-পর্বত ধ্বসিয়া পড়িবার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে কিছুই সংঘটিত হইল না বলিয়া তাঁহাকে হাস্য'স্পদ হইতে হইয়াছিল (তাযকিরাতুশ শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, পৃ. ৮৫)। ভীত হইয়া আন্‌ওয়ারী খুরাসান হইতে বাল্‌খ চলিয়া যান।

বাল্‌খে ঘটনাক্রমে তিনি জনগণের রোষে পতিত হন। খারনামাহ্‌ (গর্দভ বিবরণ) নামক একটি কাব্য তাঁহারই রচনা বলিয়া খ্যাত হয়, অথচ ইহা ছিল সূযানীর লেখা (E. G. Browne, Lit. Hist., ii, p. 382)। ইহাতে বলা হইয়াছিল, বাল্‌খে গর্দভ ও লম্পট ব্যতীত একটিও বোধশক্তিসম্পন্ন লোক নাই। এই কাব্যের রচয়িতা সন্দেহে বাল্‌খের জনসাধারণ তাঁহাকে স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধান করাইয়া শহরময় প্রদক্ষিণ করায়। বিচারক সায়্যিদ আবূ তালিব হামীদুদ্দীন, মুফতী সাফিয়্যুদ্দীন 'উমার প্রমুখ ব্যক্তির হস্তক্ষেপের দরুন আনওয়ারী অধিকতর লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পান। E.G. Browne-এর মতে অন্তত ইউরোপীয় পাঠকদের বিচারে আশকহা-ই খুরাসান আন্‌ওয়ারীর সর্বপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব্য। ইহার একটি ইংরেজী পদ্য অনুবাদ Tears of Khurasan, অনুবাদক Capt. William Kirkpatrick (Asiatic Miscellany, Calcutta 1785, vol, 1, pp. 286-310), আর একটি অনুবাদ E. H. Palmer-কৃত Song of the Reed নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (E. G. Browne, পূ. গ্র, পৃ. ৩৮৪)।

আন্‌ওয়ারী কয়েক বৎসর পরে সম্ভবত ৫৮৫/ ১১৮৯ কিংবা ৫৮৭/ ১১৯১ সনে ইন্তিকাল করেন, সমাহিত হন বাল্‌খে (দাওলাতশাহ) কিংবা তাবরীযে, কবিদের কবরস্থানে, কবি খাকানী ও জাহীর ফারয়াবী (তু. মুসতাওফী, নুয্‌হাতুল-কু'লূব, পৃ. ৭৮)-এর পার্শ্বে। বাল্‌খ সম্পর্কীয় বিবরণটি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। আন্‌ওয়ারীর কাব্য প্রতিভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুরাসানে গুজ উপজাতীয়দের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে লিখিত শোকগাথা اشکهائے خراسان ইহার একটি প্রমাণ। তাঁহার শ্লেষ ও উপহাসমূলক কবিতার স্বাদও ছিল তীব্র। তিনি আত্মসমালোচনা করিতেন না কারণ তিনি মনে করিতেন, জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি পারদর্শী এবং তর্কশাস্ত্র, সংগীত, ধর্মতত্ত্ব, গণিত ইত্যাদি সকল শাস্ত্রে তিনি তাঁহার সমকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। অনুমিত হয়, সানজার-এর পরবর্তী পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহার নিজ ধারণা অপেক্ষা কম সমাদর করেন, তিনি অন্তত তাঁহাদের পারিতোষিককে অপর্যাপ্ত মনে করিতেন এই কারণে অথবা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঈর্ষা তাঁহাকে প্রশংসামূলক কবিতা ও গযল রচনা পরিত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, যদিও তাঁহার জীবনের কোন্‌ সময়ে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন তাহা নির্ধারণ করা মুশকিল। শ্লেষাত্মক কবিতা তাঁহার অনেক শত্রু

সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আর্থিক অবনতি তাঁহাকে ক্রমাগত অদৃষ্টের খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে অনুযোগের প্রবৃত্তি দান করিয়াছিল। রচনাশৈলীতে ও ভাষায় তিনি অস্পষ্ট, যদ্দরুন দাওলাত শাহ ঘোষণা করেন, তাঁহার রচনা উপলব্ধি করিবার জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন। এই অস্পষ্টতা ও সাহিত্যিক রুচির পরিবর্তন সম্ভবত আধুনিক কালে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ আওফী, লুবাবুল-আল্‌বাব (সম্পা. E. G. Browne, Persian Historical Texts, ২য়), ২খ., ১২৫ প.; ১খ., ৩৪৩ প. (মীরযা মুহাম্মাদকৃত টীকা); (২) দাওলাত শাহ, তায্‌কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. Browne, পৃ. ৮৩ প., ৯০, ১১০, ১২৫; (৩) আযার, আতাশকাদাহ, বোম্বাই ১২৯৯ হি., পৃ. ৮৫ প.; (৪) রিদাকুলী খান হিদায়াত, মাজ্‌মা'উল ফুস'াহা, তেহরান ১২৭০ হি., ১খ., ১৫৬ প.; (৫) হামদুল্লাহ মুসতাওফী কায্‌বীনী, তারীখ গুযীদাহ্, সম্পা. Browne, GMS, ১৪/১খ., ৪৭৪, ৪৮৮, ৮১৩ প.; (৬) খাওয়ান্‌দআমীর, হ'াবীবুসসিয়ার, বোম্বাই ১২৭৩ হি., ৪/২খ., ১০৩ প.; (৭) জামী, বাহারিস্তান, ইস্তাম্বুল, পৃ. ৭৯; (৮) Ch. Rieve, Catalogue of the Persian Mss. in the British Museum, পৃ. ৫৫৪; (৯) Blochet, Catalogue des Mss Persans de li Bibliotheque Nationale, ৩খ., ৩৮ প.; (১০) আবদুল মুক্‌তাদির, Catalogue of the Arabic and Persian Mss in the Orient Public Library of Bankipore, কলিকাতা ১৯০৮, ১খ., ৩৩ প.; (১১) হ'াদাইক' (পরিশিষ্ট), ফিহ্‌রিস্ত কিতাবখানা-ই মাদ্‌রাসা-ই আলী সিপাহ্‌সালার, তেহরান ১৩১৮ হি./২খ., ৫৬৪ প.; (১২) আন্‌ওয়ারী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা V. Zhukovskiy কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে Ali Awhad al-Din Anwari, Materyli dlyabiografii ikrakteristiki, St. Petursburg 1883; W. Petsch কৃত জার্মান ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্তসারের জন্য দ্র. Literatur Blatt fur Orientalische Philologie, Leipsyg ১৮৮৪-৮৫, ২খ.; (১৩) M. Ferte, Notice sur le Poeteperson Envieri, JA, ক্রমিক ৯, ৫খ., ২৩৫; (১৪) Ethe, Grundriss der Lranische Philologie, ২খ., ২৬১ প.; (১৫) E. G. Browne, A Literary History of Persia, ২খ., ৩৬৫-৯১ (Zhukovskiy-এর গ্রন্থের উপর ইহার ভিত্তি); (১৬) মীর্‌যা মুহাম্মাদ কায্‌বীনী, বীস্‌ত মাক'ালা, তেহরান ১৩১৩ হি. শা, ২খ., ২৮৩ (আন্‌ওয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কে); (১৭) ঐ লেখক, আন্‌ওয়ারী ও সুলতান আলাউদ্‌-দীন গোরী (দার ইয়াদগার, তেহরান ১৩২৩ হি. শা, প্রথম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৭৩ প.; (১৮) শিব্‌লী নু'মানী, শি'রু'ল-'আজাম (গীলানীকৃত ফারসী অনুবাদ, তারীখ-ই শি'র ও আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৩১৬ হি, ১খ., ১৯৪-২১৫); (১৯) মাহমূদ শীরানী, তানক'ীদ শি'রু'ল-'আজাম; (২০) দীওয়ান আনওয়ারী, সম্পা. সাঈদ নাফীসী; (২১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয্‌-যুহায়রী আস্‌-সামারকানদী, সিন্দাবাদ নামাহ।

আহমাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আন্‌ওয়ারী (انورى) ঃ হাজ্জী সা'দুল্লাহ আফেন্দী (১৭৩৩-১৭৯৪) একজন উছমানী ঐতিহাসিক। Trebizond-এ তাঁহার জন্ম এবং সেখানেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। যৌবনকালে তিনি ইস্তাম্বুল গমন করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি তুর্কী রাজদরবারে খাজা (দীওয়ানের অধ্যক্ষ) পদে নিযুক্তি লাভ করেন।

১১৮২/১৭৬৯ সালে আন্‌ওয়ারী সরকারী ঐতিহাসিকের পদ লাভ করেন। তিনি চারিবার স্বল্পকালীন বিরতিসহ ক্রমাগত তিনজন সুলতান তৃতীয় মুসতাফা, প্রথম 'আবদুল হামীদ ও তৃতীয় সালীমের শাসনামলে সরকারী ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেন। ইহা ছাড়া তিনি অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন।

১১৮৪/১৭৭১ সাল হইতে তিনি একের পর এক তেশ্‌রীফাত্‌জী (Teshrifatji), জেবেজিলার কাতিবী (Dhebejilar Katibi), মাওকুফাত্‌জী (Mewkufatdji), বুয়ুক তেযকিরেজি (Buyuk Tedhkiredji)-এর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং চারিবার তিনি আনাদোলু মুহাসেবেজিসি (Anadolu Muhasebedjisi) নিযুক্ত হন। তাহা ছাড়া চারিবার ওয়াসিফের স্থলে তিনি অথবা তাঁহার স্থলে ওয়াসিফ সরকারী ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁহার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের নাম 'তারীখ-ই আন্‌ওয়ারী'। তিন খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নাই; প্রথম খণ্ডে সেই সকল সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, যাহা ১১৮২/১৭৬৯ সালে রাশিয়ার সংগে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, উহার সহিত সম্পর্কিত ছিল। ইহার ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ইহাতে জটিল রচনাশৈলী পরিহার করিয়াছেন, গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা যাহাতে বাদ না যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং শব্দ-বাহুল্য বর্জিত সহজ সরল ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছেন (পাণ্ডুলিপি, ইসতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা T. Y. 2437, পত্রক ২ক)। ওয়াসিফ উক্ত খণ্ডের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবর্তন করেন এবং উহাকে স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বলিয়া দাবি করেন। আন্‌ওয়ারীর গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ১১৬৭/১৭৫৪ সাল হইতে ১১৯৭/১৭৮৩ সালের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে যাহা হইতে জাওদাত পাশা বেশ কিছু তথ্য লাভ করিয়াছেন।

আনওয়ারী কবিতাও রচনা করেন; কিন্তু সেইগুলি তেমন আকর্ষণীয় হয় নাই। তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই লিখিতে পারিতেন। তিনি হজ্জ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন (জামালুদ্দীন, আইনা-ই জুরাফা, ইসতাম্বুল ১৩৪৪ হি., পৃ. ৫৭। লেখকের স্বীয় পাণ্ডুলিপি ইসতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে, সংখ্যা T. Y. 372; ফাতীন, তায্‌কিরা ২০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইসতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্‌কিলাব ও তোপকাপুসারায় গ্রন্থগারগুলিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহ ব্যতীত আন্‌ওয়ারীর প্রধান প্রধান পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. (১) Istanbul Kutuphaneleri Tarih-Cografya Yazmalari Kataloglari, ইসতাম্বুল ১৯৪৪ খৃ., ২খ., ১৪৩-৪৬; (২) Babinger, 320; (৩) মুহাম্মাদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই উছমানী, ইসতাম্বুল ১৩০৮ হি., ১খ., ৪৪০; (৪)

মুহাম্মাদ তাহির, Othmanli Muellifleri, ইসতাম্বুল ১৩৪২ হি., ৩খ., ২২; (৫) সা'দুদ-দীন নুযহাত এরগুন, তুরক্ শাইর লারী, ৩খ., ১৩০৩ হি.; (৬) Nail Tuman, Katalog, ইসতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত লেখকের পাণ্ডুলিপি, ২৭১; (৭) Encyclopaedia of Islam-এর প্রথম সংস্করণে উক্ত শিরোনামের প্রবন্ধ ও উহার গ্রন্থপঞ্জী।

Abdulkadir Karahan (E. I.2) /এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আন্‌কা' (عنقاء) ঃ [প্রায়শ বিশেষণরূপে কিংবা ইদাফার (সম্বন্ধযুক্ত) কারণে ইহার সহিত মুগরিব (مغرب) শব্দ সংযোজন করা হয়], ফীনিক্স (Phoenix)-এর ন্যায় একটি রূপথয়ার পক্ষীবিশেষ, যাহার আবাসও গ্রীকগণ আরবের মরুভূমিতে নির্ণয় করিয়াছেন। এই জীবে আরবদের বিশ্বাস দীর্ঘদিনের; তাহারা আসহাবুর রাস্স (দ্র.)-এর সহিত ইহার সম্পর্ক স্থাপন করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় (আল-মাসউদী, মুরূজ, ৪খ., ১৯ পৃ.)। হাদীছটির বর্ণনা মতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি 'আনকা' প্রথমে সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পরে এক অভিশপ্ত জীবে পরিণত হয়; "মধ্যবর্তী সময়ে"র (ফাত্‌রা) একজন নবী খালিদ ইব্‌ন সিনান অথবা হান্‌জালা ইব্‌ন সাফওয়ান এই শ্রেণীর পাখীর ব্যাপক ধ্বংসলীলার পরিসমাপ্তি ঘটান ইসলাম পরবর্তী কালে। 'আনকা' নিশ্চিতভাবেই ইরানী পৌরাণিক কাহিনীর সীমুরগ ও সম্ভবত ভারতীয় পাখী, বিষ্ণুর বাহন, গরুড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং শী'আ সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী গুমায়তিয়্যা (দ্র. আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী, ইব্‌ন হাযমের হাশিয়া, ২খ., ৩) ইহাকে আত্মগোপনকারী ইমামের অন্যতম বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন লেখক এই পাখীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করিয়াছেন, যদিও তাঁহারা স্বীকার করেন, পাখীটি বর্তমানে বিলুপ্ত। আবার কেহ কেহ দাবি করেন, ফাতিমীগণ তাঁহাদের চিড়িয়াখানায় ইহার নমুনা সংরক্ষণ করিয়াছিল। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা একটি সারস জাতীয় পাখী।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান, ৭খ., ১০২ প. ও পরিশিষ্ট; (২) ঐ লেখক, তারবী (Pellat), পরিশিষ্ট; (৩) ছাআলিবী, ছিমার, ৩৫৬-৭; (৪) রাসাইল ইখওয়ানিস্‌-সাফা, ২খ., ১৯০-১; (৫) মায়দানী, আমছাল, কায়রো ১৩৫২ হি., ১খ., ২১০; (৬) কায্‌বীনী (Wustenfeld), ১খ., ৪১৯-২০; (৭) দামীরী দ্র.।

Ch. Pellat (E.I.2) / মু. আব্দুল মান্নান

'আন্‌কাবূত (عنكبوت) ঃ আ., অর্থ মাকড়সা, কুরআনের ২৯তম সূরার নামকরণ করা হইয়াছে 'আন্‌কাবুত। ঐ সূরার ৪১ আয়াতে 'আনুকাবৃত শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আয়াতটির অনুবাদ ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম"।

মাকড়সা সম্পর্কে প্রাচীন মুসলিম পণ্ডিতগণ পর্যবেক্ষণলব্ধ বহু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। আল-কায্‌বীনী ও আদ্-দামীরী কয়েক প্রকার মাকড়সার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক বিষাক্ত মাকড়সা হইল 'আর-রুতায়লা' বা আর-রুছায়লা। আদ-দামীরী আরও এক প্রকার লাল বর্ণের মাঠ মাকড়সার বর্ণনা দিয়াছেন। ইহাদের শরীর সুন্দর চুলে আবৃত থাকে, মাথায় চারটি থাবা আছে যাহা দ্বারা ইহারা আঁচড় দিয়া থাকে; মাটি খুঁড়িয়া ইহারা মাটির নিচে বাসা তৈরী করে এবং রাত্রিবেলায় শিকার করিয়া খাদ্য আহরণ করে। বুননকারী মাকড়সাগুলি যে জাল তৈরী করে উহা অংকের নিয়মের সহিত সঙ্গতিশীল। কোন কোন লেখকের মতে পুরুষ মাকড়সা সূতা কাটে এবং স্ত্রী মাকড়সা জাল বুনে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, একমাত্র স্ত্রী মাকড়সাই জাল তৈরী করিতে পারে। উপাদান হিসাবে ইহারা লালা ব্যবহার করে। জাল বুনন শেষ হইলে মাকড়সা এক কোণায় বসিয়া জালে মশা-মাছি ঢুকার অপেক্ষায় থাকে এবং ঢুকিবামাত্র উহার উপর লাফাইয়া পড়ে। অন্যরা সুতার সহিত ঝুলিয়া থাকে, কেহ বা মেঝেতে স্থিরভাবে বসিয়া থাকে এবং লাফ দিয়া তাহাদের শিকার ধরে; অতঃপর ইহাকে তাহাদের জালে জড়াইয়া অসহায় করিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া যায় এবং উহার রক্ত চুষিয়া লয়। আল-জাহিজের মতে সকল জীবের মধ্যে মাকড়সার বাচ্চা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। কারণ উহারা কোনরূপ শিক্ষা ছাড়াই সুতা কাটিতে পারে। মাকড়সা ডিম পাড়ে, ডিম হইতে ছোট ছোট কীট বাহির হইয়া আসে এবং তিনদিন পর উহারা মাকড়সায় রূপান্তরিত হয়; যৌনক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলে। পুরুষ মাকড়সা কিরূপে স্ত্রী মাকড়সার সমীপবর্তী হয়, দামীরী উহার বর্ণনা দিয়েছেন। মাকড়সার জাল ক্ষত হইতে রক্ত বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। রূপা ঘষার কাজেও উহা ব্যবহৃত হয়। মাকড়সার গুঁড়া শ্লৈষ্মিক জ্বর ইত্যাদির ভাল ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। হাদীছের বর্ণনামতে হিজরতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাকর (রা) এক গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন তাহাদের অনুসন্ধানকারী শত্রুরা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা তখন ভাবিল, কিছুক্ষণ পূর্বে কেহই এই গুহায় প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেখান হইতে তাহারা ফিরিয়া যায়। এই ঘটনা ও অনুরূপ আরও ঘটনা এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মাকড়সা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উহার জাল তৈরী করিয়া থাকে। আরও দ্রষ্টব্য 'আসতুরলাব' শীর্ষক প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হ'ায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (২) কাযবীনী, সম্পা. Wustenfeld, ১খ., ৪৩৯; (৩) দামীরী, কায়রো ১২৯৮ হি., ৬খ., ১৩২ প.।

J. Ruska (E. I.2) / মু. আবদুল মান্নান

আল-আনকাবূত (العنكبوت) ঃ ব. ব. 'আনাকিব, (عناكب) নাযিলের ধারাবাহিক অর্থ মাকড়সা। কুরআন মাজীদের ২৯তম সূরা এব ক্রমিক নং-৮৫, যাহা সূরা আর-রূম-এর পরে এবং সূরা আল-মুতাফফিফীন-এর পূর্বে নাযিল হয় (আল-কাশশাফ, ৩খ., ৪৩৮; লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনীত তানযীল, ১খ., ৮; আল-ইতকান, ১খ., ১০)। সূরার ৪১ নং আয়াতে উদাহরণস্বরূপ 'আনকাবূত' (মাকড়সা)-এর উল্লেখ থাকায় উক্ত শব্দ দ্বারাই সূরাটির নামকরণ করা হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইবনুয যুবায়র (রা)-র বর্ণনামতে ইহা মক্কায় নাযিল হয়। হাসান বসরী, জাবির ইব্‌ন যায়দ ও ইকরিমা সূত্রেও ইহা

বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য কাতাদা এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-র অপর মতে সূরাটি মদীনায় নাযিল হইয়াছে। ইয়াহ্য়া ইব্ন সালামের মতে প্রথম এগারটি আয়াত মাদানী এবং অবশিষ্ট মাক্কী (রূহুল মা'আনী, ২০খ., ১৩২; আল-বাহ্রুল মুহীত, ৭খ., ১৩৮)। অবশ্য সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় ইহা হাবশায় হিজরতের কিছু কাল পূর্বে নাযিল হইয়াছে। এসব অভিমত কোন হাদীছের ভিত্তিতে নয়, বরং সূরার বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অনুমান করা হইয়াছে।

মক্কায় সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরা কোনটি সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে আল-আনকাবূত, কারও মতে আল-মুমিনূন এবং কারও মতে আল-মুতাফ্ফিফীন সর্বশেষ মাক্কী সূরা (লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনিত তানযীল, ১খ., ৮)।

আল্লামা আলূসী বলেন, সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী সূরাটি ৬৯ আয়াত সম্বলিত (রূহুল মা'আনী, ২০খ., ১৩২)। ইমাম 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাযিন আল-বাগদাদীর বক্তব্যমতে সূরাটি ৯৮০ শব্দ এবং ৪১৬৫ হরফ বিশিষ্ট (লুবাবুত তাবীল, ৩খ., ৪৪৪)।

সূরাটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নীশাপূরীর আসবাবুন নুযূল, পৃ. ১৯৫; আল-বাহ্রুল মুহীত, ৭খ., ১৩৯ প.; পূর্বোক্ত সূরার সহিত ইহার সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র সম্পর্কে রূহুল মা'আনী, ২০খ., ১৩২; তাফসীর আল-মারাগী, ২০খ., ১০৯; বাহ্রুল মুহীত, ৭খ., ১৩৯; সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্পর্কে আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুরআন আল-কারীম, ১৪খ., ৮৭; তাসাওউফ ও মা'রিফাত সংক্রান্ত আলোচনার জন্য তাফসীর ইবনুল 'আরাবী, ২খ., ৬২; বর্ণনাভঙ্গির অতুলনীয় ভাষাশৈলী ও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে দ্র. ফী জিলালিল কুরআন, ২০খ., ১০১; এবং এই সূরার সহিত সংশ্লিষ্ট ফিক্হী বিধান তথা আইন সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দ্র. ইবনুল 'আরাবীর আহ্কামুল কুরআন, পৃ. ১৪৭২; আল-জাসসাস, আহ্কামুল কুরআন, ৩খ., ৩৪৯ এবং আশ-শাওকানী, আহ্কামুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট সূরার অধীন।

সূরার শুরুতে ঈমানদারগণকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, সত্য-ন্যায়ের পথের পথিকদের পরীক্ষাস্বরূপ তাহাদের উপর বিপদ-আপদ আসা ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়া অবধারিত। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতা সহকারে আল্লাহ্র পথে দৃঢ়পদে জিহাদকারীগণ সর্বাবস্থায় জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। অতঃপর হযরত নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), লূত (আ) প্রমুখ নবী-রাসূলগণের সহিত সংশ্লিষ্ট কতক ঘটনার উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে যে, তাঁহারাও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্যাতিত হইয়াছেন, তারপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব পরীক্ষার কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা মুসলমানরাও আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। সাথে সাথে মক্কার মুশরিক (পৌত্তলিক) ও আহলে কিতাবগণের টাল-বাহানা ও ওজর-আপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট সত্যের যে দাওয়াত পৌঁছানো হইয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে অচিরেই নির্মম পরিণতির শিকার হইবে, অতীতের সত্য প্রত্যাখ্যানকারী জাতিগুলির ধ্বংসাবশেষ তো তাহাদের সামনেই রহিয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ এবং দীন ইসলামের সত্যতা তুলিয়া ধরিয়া ঈমানদারগণকে বলা হইয়াছে, দীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য হিজরত অপরিহার্য হইয়া পড়িলে তাহারা যেন পশ্চাদপদ না হয়। কেননা জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্রই কর্তৃত্বাধীন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) বায়দাবী, তাফসীর, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (৩) আল-খাযিন, লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনী আত-তানযীল, কায়রো তা.বি.; (৪) সায়্যিদ কুতুব শহীদ, ফী জিলালিল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (৫) আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৬) আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, কায়রো, তা.বি.; (৭) কাযী আবূ বাক্র মুহ্য়িদ-দীন ইবনুল 'আরাবী, আহ্কামুল কুরআন, কায়রো ১৩৩৫ হি.; (৮) তাফসীর ইবনুল 'আরাবী, কায়রো ১৩১৭ হি.; (৯) আবূ হায়্যান আল-গারনাতী, আল-বাহ্রুল মুহীত, রিয়াদ তা. বি.; (১০) সিদ্দীক হাসান খান, ফাতহুল বায়ান, কায়রো তা.বি.; (১১) আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (১২) আবুল হাসান নীশাপুরী, আসবাবুন-নুযূল, ১৯৬৬ খৃ.; (১৩) কাযী আবূ বাক্র আল-জাসসাস, আহ্কামুল কুরআন, কায়রো ১৩৩৫ হি.; (১৪) তানতাবী জাওহারী, আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুরআন আল-কারীম, কায়রো ১৩৪৮ হি.; (১৫) মাজদুদ্দীন আল-ফীরূযাবাদী, বাসাইর যাবিত-তাম্ঈয, ১খ., ৩৫৯-৩৬৪; (১৬) জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, তাফসীরুল কাসিমী; (১৭) উর্দূ ভাষায় রচিত পুরাতন ও নূতন তাফসীরসমূহও দ্র.।

জহুর আহ্মাদ আজহার (দা.মা.ই.) / মুহাম্মদ মূসা

আন্কারা (انقرة) ঃ গ্রীক ও ল্যাটিনে আনকিরা, আধুনিক গ্রীকে আংগোরা; আরব ভৌগোলিকগণের নিকট আনকিরা; আনকুরিয়া ও কা'ল'আতু'স-সালাসিল অর্থাৎ শৃংখলের দুর্গ নামেও পরিচিত; তুর্কী আমলে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত নামের মধ্যে এনগুরিয়ে, এন্গুরি, এনগুরু রূপসমূহ যাহা সময়ে সময়ে মুদ্রায় অঙ্কিত ছিল। ইহা মধ্যআনাতোলিয়ার গালাতিয়া (Galatia) জেলায় অবস্থিত একটি শহর এবং তুর্কী প্রজাতন্ত্রের (ও একই সঙ্গে একটি প্রদেশের) রাজধানী। অবস্থান ৩৮° ৫৫' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩২° ৫৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৮৩৫ (রেলওয়ে স্টেশন ৮৫১) মিটার উচ্চে অবস্থিত। ইহার অবস্থান মধ্যআনাতোলিয়ার শুষ্ক তৃণাবৃত ভূমির উত্তর সীমানার নিকটে, যাহা তিনটি ক্ষুদ্র নদী, বেন্ত দেরেমি বা হাতিপ সূয়ূ, ইঞ্জেসু (ইনজেসু) ও চুবুক' সুয়ূ-এর সংগমস্থল; এই মিলিত নদীতে অতঃপর আনকারা (প্রাক্তন এনগুরু) সূয়ূ (অথবা চায়ী) নামে সাকারয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই শহরটি একটি পর্বতের পাদদেশে ও ঢালুতে অবস্থিত যাহা উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত। এই শহরটি উত্তরাভিমুখে ক্রমে উচ্চ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার শীর্ষে একটি বিশালকায় দুর্গ শোভা পাইতেছে। এই শৃংগটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৭৮ মিটার ও পার্শ্ববর্তী হাতিপ দেরেসি উপত্যকা হইতে ১২০ মিটার উচ্চ। অপর পার্শ্বে অবস্থিত দ্বিতীয় একটি পাহাড় যাহা হীযীরলীক (খীদীরলীক) নামে পরিচিত। হায়দার পাশা (ইস্তাম্বুল) শহর হইতে আনকারার দূরত্ব রেলপথে ৫৭৮ কি. মি. এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূল হইতে ইহার নিকটতম দূরত্ব প্রায় ১৮৫ কি. মি.।

ইতিহাস ঃ আন্‌কারা সম্ভবত সব সময়েই আনাতোলিয়ার মধ্য দিয়া সকল দিকে অতিক্রমকারী সকল কাফেলার মিলন কেন্দ্র ছিল এবং স্বভাবতই ইহার ফলে তাহা একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রেও পরিণত হয়। আনাতোলিয়ার প্রাচীন নগরসমূহের অন্যতম এবং ইহার উৎপত্তি সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক সময়ে। ইহার মূল অবস্থান ছিল দুর্গ পাহাড় এবং ইহা মালভূমিতে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে বিস্তৃত হইয়া ঢাল বাহিয়া অবশেষে ইহা পশ্চিম পার্শ্বদেশের সমভূমি পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। দুর্গ সমষ্টির মূল পরিকল্পনা অতি প্রাচীন কালের। বায়যানটাইন আমলে ইহা তাহার বর্তমান রূপ লাভ করে; সালজূক আমলে ইহাকে কয়েকবার সম্প্রসারিত করা হয়। ইহার প্রাচীরের গাত্রে প্রাচীন কালের অসংখ্য নির্দশনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দুর্গটিকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ 'বহির্দুর্গ' (দীশকাল'এ) হিসার কাপীসীর মাধ্যমে ইহাতে পৌঁছানো সম্ভব, যাহার প্রাচীর দুর্গটিকে দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে সুরক্ষিত করিয়াছে; 'অন্তঃদুর্গ' (ইচ্‌কালএ) সামগ্রিকভাবে একটি সমচতুষ্কোণ এবং উত্তর অংশে পাহাড়ের শীর্ষে প্রধান দুর্গ কেন্দ্র আককাল-এ (শ্বেত দুর্গ)।

বিগত কয়েক বৎসরে প্রাপ্ত অতীত কালের বিভিন্ন নিদর্শন হইতে এইরূপ ধারণা করা সম্ভব, শহরটি অতি প্রাচীন। এই এলাকার অধিবাসিগণ তাহাদের আবাসভূমির যে নামকরণ করিয়াছিল, তাহাই ঐতিহাসিক সময়কালে সামান্য রদবদলের মাধ্যমে বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে। ইহা ছাড়া ইহাও সত্য, অন্যান্য প্রাচীন শহরের ন্যায় আন্‌কারার নামকরণের সহিত কতিপয় উপাখ্যান জড়িত ছিল যাহা ইহার নামকরণের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের পক্ষে বাধাস্বরূপ।

এই উপাখ্যানগুলির মধ্যে রহিয়াছেঃ ফ্রিজিয়ার নৃপতি Gordius-এর পুত্র Midas এমন এক স্থানে উক্ত শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন, যেখানে একটি জাহাজের নোংগরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক Pausanias-এর মতে উক্ত নোংগর তাহার কাল (খৃস্টীয় ২য় শতক) পর্যন্ত জুপিটার (Jupiter)-এর এক মন্দিরে সংরক্ষিত ছিল (১/৪খ., ৩৪)।

দ্বিতীয়ত, শহরটির নাম নোংগরের সহিত জড়িত করিবার উদ্দেশে বায়যান্টাইন এটিয়েন (Étienne) কারয়ালী ঐতিহাসিক অ্যাপপলোনিয়াস (Appollonius)-এর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যখন গলরা (Gauls) এশিয়ায় প্রবেশ করে (আনু. খৃ. পূ. ৩য় শতক) তখন একদিকে ইরানী ও তাহাদের মিত্রবাহিনীর এবং অন্যদিকে মিসরীয়গণের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। মিসরীয় জাহাজসমূহের যে সমস্ত নোংগর তাহাদের হস্তগত হয় তাহা তাহারা গনীমতরূপে লইয়া আসে এবং তাহাদের উপাসনালয়ে রাখিয়া দেয়। শহরটির নামকরণও এই ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে হয়। রোমক শাসনামলেও জাহাজের নোংগর আন্‌কারা শহরের নিজস্ব চিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত হইত এবং এই চিহ্ন সেই যুগের বেশ কিছু সীলমোহর ও পদকেও খোদিত আছে। ইহার বিপরীতে কতিপয় ইসলামী তুর্কী দলীলে শহরের নাম 'আনগুরু' ফারসী শব্দ 'আনগুর' হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বরং ইহাও বলা হইয়া থাকে, নামটি 'শৃঙ্খলের দুর্গ' হইতে উদ্ভূত। কতিপয় ইউরোপীয় লেখকের মতে নামটি গ্রীক শব্দ aghuriddha (কাঁচা আংগুর), anguri (শসা) এবং Kicpert-এর মতে আরমান শব্দ ankur (বন্ধুর ভূমি) হইতে উদ্ভূত। পেরো (Perrot)-এর মতে শহরটির এই নাম এবং সংস্কৃত শব্দ আন্‌কাস-এর মধ্যে, যাহা ফ্রিকিয়া ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া সঙ্গত মনে করা হয় এবং যাহার অর্থ 'তির্যক' বা 'গড়বড়', অধিকতর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই শেষোক্ত শব্দটি গ্রীক শব্দ aykoz-এর সহিত একত্রে 'প্রস্তরময় উপত্যকা' ও 'সংকীর্ণ গিরিপথ' অর্থবোধক হইতে পারে। সুতরাং অনুমান করা যায়, শহরের নাম দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ উপত্যকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিষয়ে গবেষণা হইত, আন্‌কারা ও হিত্তিগণ (যাহারা খৃস্টপূর্ব বিংশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আনাতোলিয়ার বিস্তৃত অংশ শাসন করিত)-এর শহর Ankuwa-র মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি? তবে নিম্নে এই সম্পর্কে গবেষণার যে সমস্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা অসম্ভব মনে হয়, বর্তমান শহরটি হিত্তি শহরের ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে। ইতিহাসে এই শহরের যতগুলি নামের সন্ধান পাওয়া যায় (Ankyre, Ankyra, আংগুরিয়াহ, আংগুরু, আংগারাহ, আংগাওরাহ এবং বর্তমানে সকলের নিকট প্রচলিত নাম আন্‌কারা) সবগুলিই পরস্পরের সহিত প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আনকারার নামকরণের কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহা সুস্পষ্ট যে, আনদুলুর রাজপথগুলির উপর ইহার সাধারণ অবস্থা ও ইহার স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থান-এই দুইটিই এইখানে একটি শহর গড়িয়া উঠার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আন্‌কারা প্রথমদিকে নিশ্চয়ই ইহার স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী এলাকার জাতিসমূহকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং এইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল।

আনকারা ঃ শহরের চতুর্দিকের পরিস্থিতি ও সম্পদ এমন ছিল যেমন অভ্যন্তরীণ আনাতোলিয়ার অন্যান্য শহরের ভিত্তি স্থাপনকালে সাধারণত বিদ্যমান থাকিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রশস্ত সমভূমির প্রান্তে শহরগুলি নির্মিত হইত, যাহা চতুর্দিক দিয়া পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত এবং সেইখানে পানি সহজে সংগ্রহ করা যাইত।

আনকারায় বিশেষভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় শিল্পকলা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইতে ইহাই ধারণা হয়, ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অবস্থানগতভাবে ইহা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সুবিধাসম্পন্ন উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত, যাহা ১০০০-১২০০ মিটার উচ্চ। পার্শ্বদেশে গভীর ঢালসহ এখানে কয়েক শত মিটার উচ্চ পাহাড় বর্তমান। পাহাড়সমূহের মধ্যে সমতল ভূমি বিদ্যমান। শৃঙ্গের উপর অবস্থিত দুর্গ বহুদূর পর্যন্ত শত্রুর উপর নজর রাখিতে সহায়ক ছিল। এই সকল কারণে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ-শহরে পরিণত হয়। ধারণা করা হয়, ফিরীকীদের শহর ও গিলাতীগণের মযবুত দুর্গসমূহের একটি এখানে অবস্থিত ছিল। ইহার পরবর্তী কালে গ্রীক-রোমান শহরের দুর্গ এখানে নির্মিত হয়। সালজূক ও 'উছমানী আমলেও ইহা শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। অতীত যুগের যে সমস্ত নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমিত হয়, আনকারার সমস্ত শহরটিই দুর্গ ছিল। আন্‌কারার প্রাচীন বিখ্যাত সেনা ছাউনিসমূহ সমূলে

ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহার শেষ চিহ্ন হিসাবে পাহাড়ী টিলার প্রশস্ত মাঠের উচ্চ অবস্থানে লাল, সুরমা রংয়ের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাহা এক ভীতিপূর্ণ বৃহৎ দুর্গের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

আনকারার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রাচীন কাল হইতেই জীবন যাপনের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করে। শহরটি এমন কতগুলি রাজপথের সন্নিকটে ছিল যাহা সমগ্র আনাতোলিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। ফলে প্রথম হইতেই ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে গড়িয়া উঠে। এই সকল বর্ণনা হইতে এই তথ্য প্রতিভাত হয়, আনকারা একদিকে তৎকালীন শাসকবর্গের শক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত ছিল, অপরদিকে আনকারার সীমানার সন্নিকটে অথবা তথায় হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কার্য ছিল।

ইতিহাসের ক্রমপর্যায়ে আনকারা এমন একটি শহররূপে আত্মপ্রকাশ করে, যাহার অধিবাসীবৃন্দ শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন অতিবাহিত করিত। ইহার উপাসনালয়সমূহ সুসজ্জিত ছিল এবং প্রধান রাজপথগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র দ্বারা শোভিত ছিল। আবার কখনও আনকারা শক্তিশালী ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বারংবার আক্রমণের সম্মুখীন হইয়া শত্রুর হাতে পদানত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ সময়কালের স্রোতে মাঝে মাঝে বাধার সম্মুখীন হইলেও শহরটির উন্নতির বর্ণনা নিম্নরূপঃ প্রথম পর্যায়ে এক শতাব্দী পর্যন্ত শহরটি সাধারণভাবে পাহাড়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে তাহা ঐ পাহাড়ের ঢালের দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে এবং সমভূমি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। শেষ পর্যায়ে আনকারার নয়া বসতবাড়ীসমূহ সমভূমির অব্যবহিত সম্মুখের পর্বতের ঢাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

অতীত ইতিহাস সম্পর্কিত ঘটনাবলী ঃ আনকারার নিকটবর্তী এলাকায় কয়েকবার পুরাতন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগের মানুষের বিভিন্ন চিহ্নের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সর্বপ্রথম ১৯১০ সালে R. Campbell Thompson আওয়াগীল নামক স্থানে এবং তৎপর ১৯৩১ সালে K. Bittel গ্যাসের কারখানার নিকটে চকমকি পাথর নির্মিত (mousterien) অস্ত্রোপচারের হাতিয়ারের সন্ধান লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে 'আযীয কানসূহ চাওবূক' উপত্যকায় আনুমানিক মধ্যপ্রাচীন প্রস্তর যুগের শিল্পকলার সন্ধান লাভ করেন (দ্র. انقره جوارنيك برى هستور باشنده يكى بولوشلر دوسرى ترك تاريخى كانگريس ١٩٣٧ ع)। ইহার পর আরও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। Leuchs শহরের পশ্চিমে উরমান-এর কৃষি খামারের নিকট একটি হাত-বেলচা পান, যাহা প্রাচীন প্রস্তর যুগের বলিয়া মনে করা হয়। অপরপক্ষে ১৯৩৩ খৃ. আনকারার উত্তরে আখলাত লিবল-এর মধ্যে হামিদ যুবায়র তাম্রযুগের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি প্রাচীন চিহ্নযুক্ত স্থানে খনন কাজ চালান। বর্তমানে প্রাপ্ত খননকার্যের বিবরণী হইতে সন্ধান পাওয়া যায় যে, আনকারায় মানুষের বসবাস অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছিল।

হীত্তী যুগ ঃ প্রাচীন আনাতোলিয়ার ইতিহাসে হীত্তীগণ যে সকল কারুকার্যময় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল অতি সাম্প্রতিক কালেই সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হইতে শুরু করিয়াছে। প্রাথমিক যুগে আনকারার নিকটবর্তী স্থানে তাহাদের সহিত সম্পর্কিত কতিপয় নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় (ইহাদের মধ্য রহিয়াছে কালাবা নামক একটি গ্রামের একটি কূপে G. Perrot-এর আবিষ্কৃত একটি বাঘের মূর্তি]। ১৯০৫ সালে বোগূয কোঈ (হিত্তুশাশ) নামক স্থানে (আনকারা হইতে ১৬০ কি. মি. পূর্ব দিকে) H. Winckler ও T. Makridi সুপরিকল্পিতভাবে খননকার্য পরিচালনা করেন এবং তাহাদের এই খননের ফলে হীত্তী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বোগূয কোঈ-এ প্রাপ্ত নির্দশনসমূহ হইতে উদ্ধারকৃত ফলকে যে সমস্ত শহরের নাম পাওয়া যায়, তাহার সহিত আনাতোলিয়ার কতিপয় শহরের বর্তমান নামের পার্থক্য অতি সামান্য। ইহাদের মধ্যে আনকুল্লাহ ও আনকুওয়াহ-এর নামও শামিল রহিয়াছে। ধারণা করা হয়, এই আনকুওয়াহ নামক স্থানটি যাহার উল্লেখ বারবার করা হইয়াছে এবং যাহা হীত্তী সাম্রাজ্যের কোন জেলার সদর ছিল, তাহা হিত্তুশাশ হইতে পদব্রজে তিন দিনের দূরত্বে ছিল। 'বাদশাহ প্রথম রাত্রে ইমরুল্লাহ শহরে অবস্থান করেন, দ্বিতীয় রাত্রে Hobigassa নামক স্থানে এবং তৃতীয় দিনে আনকুওয়াহ পৌঁছেন (পাঠ পৃ. ২৬২৬)। এখানেই বাদশাহর স্থায়ী আবাস ছিল। ঐতিহাসিক E. Cavaignac-স্বীকার করেন, আনকারা শহরের প্রাচীন নাম আনকিরাহ এই আনকুওয়াহ হইতে নির্গত (Revue hittite et asianique, 1930, ১খ., ১০১)। একই সঙ্গে হীত্তী শহর হাবাব, মিতিলাস ও মারাস-এর নামগুলি বর্তমান শহর হালাব, মালাতিয়া ও মারআশ-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া ধারণা করা হইলে আনকারার নাম আনকুওয়াহ হইতে উদ্ভূত বলাও সংগত। উপরের বর্ণনানুসারে ইহাও ধারণা করা যায়, যেভাবে বর্তমান আনকারায় আনকুওয়াহ-এর আবাদ হওয়া সম্ভব, ঠিক সেইভাবে ইহাও সম্ভব, আনকারার অন্য স্থানেও আবাদ হইতে পারে; যেমন য়েশীল ইরমাক-এর অন্তর্গত তাস-এ। E. Farrer প্রথমোক্ত মতামত পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন না, কিন্তু উহাকে অসম্ভবও মনে করেন না। চূড়ান্ত কথা হইতেছে, এই বিষয়ে এখনও কোন শেষ সমাধান হয় নাই। ফলে আনকারা শব্দের নিগূঢ় রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। অপরদিকে যদিও আনকারার উপরের বর্ণিত নিদর্শন ও অন্যান্য যত নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা হীত্তী যুগের বলিয়া প্রমাণিত, তথাপি ইহা সম্ভব, সেই হীত্তী দুর্গ তখন যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল তথায় বর্তমান দুর্গটি অবস্থিত। বোগূয কোঈ 'আউর কিলআ (আনকারা হইতে ষাট কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত) ইত্যাদির দালান-কোঠাসমূহের ন্যায় অতি বিশাল আকারের প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছিল, যাহা মসৃণ ও বড় বড় পাথরের ভিত্তির উপর কাঁচা ইটের তৈরী। কেননা এই সুনির্দিষ্ট স্থানটিতে পরবর্তী কালে আরও বহু দালান-কোঠা তৈরী হইতে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই দুর্গটির নির্মাণ কাজ মযবুতীর সঙ্গেই সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

ফুরীকিয়া ও গাল্লু রোমক যুগ ঃ ইহা বর্তমানে সর্বজনবিদিত, হীত্তী শাসনের অবসানের পর (খৃ. পূ. ৮ম শতক) উক্ত স্থানে মধ্যবর্তী ও উত্তর সিকারিয়ার আশেপাশে ফুরীকি আবাস গড়িয়া উঠে। তাহারা প্রধানত কৃষিকার্য এবং মেষ ও ছাগল চরাইয়া দিন যাপন করিত। বেশীর ভাগ শহর

খোলা প্রান্তরে নিজেদের তৈরী অনুচ্চ টিলাসমূহের উপর গড়িয়া উঠে। Gordion-এর প্রান্তে এই সকল পাহাড়ের মধ্যে তাহাদের কতিপয়ের রাজধানীর নাম খোদাই করা ছিল (Koerte, পৃ. ১৯০০); আন্‌কারার নিকটস্থ যে পাহাড়শ্রেণী তাহাদের সহিত সম্পর্কিত, সেইগুলি এখনও বিদ্যমান এবং সেইগুলিতে খোদাই করা ছিল (Makridi, ১৯২৫ খৃ., হামিদ যুবায়র ১৯৩৩ খৃ.)। ফুরীকিগণের আমলে আন্‌কারা সম্ভবত এমন স্থানে নির্মিত হয় যেখানে কোন এক সময়ে হীত্তীগণের প্রাচীন দুর্গ ছিল। খৃ. পূ. সপ্তম শতাব্দীতে যে সকল স্থানে ফুরীকিগণের বসবাস ছিল সেইগুলি কয়েকটি Lydia-এর শাসনকর্তার অধীনে চলিয়া যায়। ইহার মধ্যে একবার এই এলাকায় পশ্চিম দিক হইতে আগত কাম্মারু গোত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর খৃ. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এলাকাটি ইরানীদের অধীনে যায়। খৃ. পূ. ৩৩৪ সনে যখন সিকান্দার পূর্ব এলাকা জয়ের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন তিনি Gordion হইতে এখানে আগমন করেন এবং এখানে তিনি পাফলা গুনিয়ারাদের দূতদের সহিত সাক্ষাৎ প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যদিও এই শহর অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত সেলুসীয়ানদের অংশে ছিল, তথাপি আন্‌কারার প্রকৃত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল 'গিলাতী' শাসকগণ। ইহারা খৃ. পূ. তৃতীয় শতকের প্রথম চতুর্থাংশে বলকান হইতে আগমন করে এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে। ফুরীকী ও তাহাদের শহরসমূহে অনেক গ্রীক স্থপতি বাস করিতেন। ফলে ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকভাবেই Gallo-Greek স্থাপত্য রীতি এখানে প্রচলিত হয়।

গিলাতীগণের তিনটি পৃথক ও বিশাল জনসংগঠন ছিল এবং তন্মধ্যে আন্‌কারা Tectosag-গণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। গিলাতীগণ তাহাদের শাসনকেন্দ্রের মযবুত শহরসমূহকে (যাহার অগ্রভাগ সরাসরি ঢাল পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল) পাহাড়ের উপর প্রস্তরময় মাঠের মধ্যে নির্মাণ করে এবং এই সকল শহরকে তাহারা বড় বড় অমসৃণ পাথরের সাহায্যে ডিম্বাকৃতির বৃত্তাকার প্রাচীর (oppidum) দ্বারা বেষ্টন করিয়া তোলে। প্রাচীন আন্‌কারার দুর্গে এই নমুনা বিদ্যমান ছিল এবং অবশেষে সেই স্থানে রোমকগণের দুর্গ ও প্রাচীর নির্মিত হয়।

রোমক গালু ঃ খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে কানসাল মানীলোস-এর নেতৃত্বে গ্রীকগণের বিরুদ্ধে (যাহারা তাহাদের শত্রুদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল) যুদ্ধ করিতে উক্ত স্থানে উপনীত হইয়া আন্‌কারায় প্রবেশ করে (খৃ. পূ. ১৮৯), কিন্তু তাহাদের শত্রুগণ সন্ধি করায় তাহারা উক্ত দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট করে নাই। ইহার কিছুকাল পরে (১৮৬ খৃ. পূ.) যখন এইখানে বের্‌গামার বাদশাহগণ জয়ী হইলেন তখন এই সকল ব্যক্তি জোরপূর্বক রোমক আধিপত্য হইতে বাহির হইয়া আসে। কিছুকাল পর্যন্ত আন্‌কারা পোনটুস (Pontus) রাজ্য মিত্‌রিদার (Mitridat)-এর কর্তৃত্বাধীনে আসে কিন্তু (খৃ. পূ. ৮৮ হইতে ৮৪ সালের মধ্যে) রোমক নেতা পোমপী আনকারার সন্নিকটে তাঁহাদের পরাস্ত করেন এবং তিনি গিলাতিয়ার শাসনভার Dejotar-এর হস্তে অর্পণ করেন, যিনি পরে নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর রাজত্বের অধিকারী হন তাঁহার সচিব Amintas। তাহার মৃত্যুর পর আন্‌কারাকে সমগ্র গিলাতীয়াসহ রোমক সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হয় এবং লীকূনিয়াসহ সমগ্র অঞ্চলকে একজন সেনানায়কের শাসনাধীন করা হয়। সন্ধির মাধ্যমে রোমকগণের আন্‌কারা প্রবেশের ফলাফল ছিল—এই তাহাদের চক্রান্ত গিলাতীয় সময় হইতে বিদ্যামান ছিল। সন্ধির শর্তের মধ্যে ছিল গিলাতীগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিবে এবং সাগর (ভূমধ্যসাগর)-এর উপকূল এলাকায় বিদ্যমান সংস্কৃতি পালন করিবে। জনৈক ইউরোপীয়ের মতে, তাহারা নিজেদের সকল দলীলপত্র গ্রীক অথবা রোমান হরফে লিখিত। গিলাতী বাদশাহদের জাঁকজমকপূর্ণ শহরে কৃষি ও জীবজন্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বড় বড় বাজার ছিল এবং এই কারণে তাহারা রাজকীয় হালে দিন যাপন করিত। রোমক সম্রাটগণও অধিকাংশ সময় এই শহরের প্রতি দয়ালু ছিলেন। রোমক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শহরটিকে অন্য রোমক শহরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ইমারতে সুসজ্জিত করা হয়। সম্রাট অগাস্টাস-এর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয় সেবাস্ত (Sebast)। এই সময় নির্মিত ইমারতসমূহের মধ্যে রহিয়াছে প্রাচীনতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং অগাস্টাস-এর নাম সম্বলিত একটি মন্দির। ইহার প্রাচীরগাত্রে সন্ধান পাওয়া যায়, প্রাচীন শিলালিপিসমূহের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ The monumentum Aneyranum. ইহা হইতেছে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত সম্রাট অগাস্টাস-এর প্রদত্ত তাঁহার রাজত্ব সম্পর্কিত বিবরণী ও আদেশাবলী। খৃস্টান আমলে ইহাকে একটি গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। মুসলিম যুগে ইহা ছিল একজন দরবেশ সাধক হাজ্জী বায়রাম ওয়ালীর সাধনার স্থান। তাঁহার মাকবারা ও মসজিদ বর্তমানে মন্দিরটির ধ্বংসস্তুপের পার্শ্বে বিদ্যমান। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সম্রাট জুলিয়ান (অথবা জেভিয়ান?)-এর নির্মিত একটি স্তম্ভ (বিলকীস মিনারেসি)। সাম্প্রতিককালে উত্তরাভিমুখী সড়কে (চানকীরী-এর পথে) একটি বৃহৎ রোমক স্নানাগারের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সম্রাট নীরো এইখানে একটি বৃহৎ নগর ও Carcalla-এর প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তাহার নামকরণ করেন Antonianai. রোমক রাজত্ব কালে এখানে বহু উপাসনালয়, একটি Hippodrome (ঘোড়- দৌড়ের মাঠ), স্নানাগার ও সম্রাটদের অবস্থানের জন্য বিশেষ প্রাসাদ নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়ে আন্‌কারায় তিনটি রোমক সৈন্যঘাঁটি ছিল। ফলে ইহা সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তবে শহরের এক লক্ষ অধিবাসী কিভাবে জীবন যাপন করিত সে সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। শহরের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর অংশে প্রচুর রোমক গির্জা ও অন্যান্য ইমারত গড়িয়া উঠে। গিলাতী আমল হইতে সেখান হইতে প্রান্তরের দিকে শহরটির বিস্তার লাভের প্রবণতা দৃষ্ট হয়। সম্ভবত রোমকগণের এই নূতন বসতির পার্শ্বস্থ বিনত দারাহ নদী একটি প্রাকৃতিক লেকের ন্যায় উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। রোমক বসতির চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, অভ্যন্তরীণ দুর্গ ও সেই প্রাচীরসমূহের এখন আর অস্তিত্ব নাই। বিভিন্ন চক্রান্ত ও আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই সকল স্থানে নূতন নূতন দালান-কোঠা নির্মিত হয়। ঐ স্থানে অথবা তাহার সামান্য দূরে প্রাচীরসমূহ পুনঃস্থাপন করা হয় এবং তাহা বায়যানটাইন ও সালজূক আমলে নির্মাণ করা হয়। রোমক আমলে আনকারা ছিল আনাতোলিয়ার উন্নত ও শীর্ষস্থানীয় আদর্শ নগরীর অন্যতম। বিভিন্ন ইউরোপীয় পরিব্রাজক, যাহারা আন্‌কারার

পথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা সমৃদ্ধির অবশিষ্ট নিদর্শন সম্বন্ধে নিবিষ্টভাবে গবেষণা করেন। Ch. Texier ১৮৩৪ সালে এই স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো বিভিন্ন ইমারতের বর্তমানে অবশিষ্ট ভগ্নাবশেষসমূহের জাঁকজমক রোমক সাম্রাজ্যের ইমারতসমূহ হইতে কোন অংশে কম নয়। এই সকল ইমারতের ইউরোপীয় কলাকৌশল ও কারুশিল্প যাহা পরবর্তী কালে আক্রমণকারীদের হাতে বিনষ্ট হয়, যে সূক্ষ্ম ও মহামূল্যবান সম্পদ দ্বারা সজ্জিত ছিল তাহা রোমক সাম্রাজ্যে উপাসনা গৃহেও দেখা যায় না। আন্‌কারা শহরের বিভিন্ন স্মৃতিফলকে যে সব প্রথা ও বিজয়োৎসবের কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা দ্বারা জানিতে পারা যায়, একটি শক্তিশালী শাসনের অধীনে থাকার ফলে শহরটি বিভিন্ন সময়ে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। শহরবাসিগণ সুখে-শান্তিতে দিন নির্বাহ করিত, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রোমক শাসনামলে শহরটিতে মাঝে মাঝে, বিশেষত কৃতু ও ইরানী হামলার আংশকা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হইত। তথায় অবস্থিত একটানা শ্রেণীবদ্ধ সুদৃঢ় দুর্গসমূহ সম্ভবত এই আক্রমণের আশংকায় নির্মিত হইয়াছিল।

৫১ খৃ. সেন্ট পল আন্‌কারা সফর করেন এবং সেখানে একটি প্রাচীন খৃস্টীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাদের প্রতি তিনি তাহার Epistle to the Gaiatians নামক ধর্মতাত্ত্বিক অভিভাষণ দান করেন। খৃস্ট ধর্ম এই শহরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে।

মধ্যযুগে আন্‌কারা ঃ এই সময়ে আন্‌কারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরুপদ্রবভাবে কাল কাটাইয়াছে বলিয়া ধারণা করা সঠিক নহে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় সাত শত বৎসরের বেশি সময়কাল (৩৩৪-১০৭৩ খৃ.) ইহার ভাগ্য পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সহিত জড়িত ছিল। এই শাসনের চরমোন্নতির যুগে শহরটি নূতন নূতন প্রাসাদ-অট্টালিকায় সুসজ্জিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিল। অপরপক্ষে ইহা আনাতোলিয়ার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় খৃস্টান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইহার আয়তন আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় এবং উহার দুর্গ প্রাচীরগুলি বিভিন্ন যুগে পুনঃপুনঃ নির্মিত হইতে থাকে, বিশেষত ৭ম শতাব্দী হইতে আরব আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশে ইহা বারবার নির্মিত হইতে থাকে।

আন্‌কারা সম্পর্কে 'আরবগণের পরিচিতি ও জ্ঞান অতি প্রাচীন। ইয়া'কূত তাহার মু'জাম (সম্পা. Wustenfeld, ১খ., ৩৯০) গ্রন্থের আন্‌কারা সম্পর্কিত অধ্যায়ে জাহিলিয়্যা যুগের 'আরব কবি ইমরুউল কায়স-এর বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ 'আরবের জনৈক শাসক হুজ্‌র-এর পুত্র ছিলেন, সিংহাসন লাভের আশায় তিনি সম্রাট (Justinian)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশে কনস্টান্টিনোপল গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে (সম্ভবত ৫৪০ খৃ.) তাহাকে আন্‌কারায় বিষ প্রয়োগ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে কবিতায় তিনি আন্‌কারা সম্পর্কে তাহার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। তায়মূর পাহাড়ে অবস্থিত কবর অনেকে যাহা তায়মূরের কবর বলিয়া ধারণা করে, স্বয়ং ইমরুউল কায়েসের কবর বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে (দ্র. ইমরুউল কায়স)।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে বৃহৎ আক্রমণ ঘটে ইরানের দিক হইতে। ইরানীগণ আন্‌কারা অধিকার করে এবং প্রথমে শাপূর ও পরে ২য় খুসরাও পারবীয (খুসরু পারভেষ) আন্‌কারা ধ্বংস করেন (৬২০ খৃ.)। কিন্তু ৬২৭ খৃ. নিনেভা-এর নিকট হিরাক্লিয়াস (Heraclius) খুসরাও পারবীযকে পরাজিত করিলে তিনি এই স্থান হইতে পশ্চাৎপসরণ করেন। ইহার পর Bukellarion প্রদেশের রাজধানী আন্‌কারা বারবার 'আরব আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬৪৬ খৃ. আরবগণ 'আম্মুরিয়া (Amorium)-এ উপস্থিত হন এবং ৬৫৪ খৃ. তাহারা আন্‌কারা জয় করেন, কিন্তু তাহারা সেখানে অবস্থান করেন নাই। ৭০৮ খৃ. ও উহার দশ বৎসর পর পুনরায় আরবদের আক্রমণ শুরু হয়। ৩য় কায়সার (Leon) শহরের প্রাচীরসমূহ সংস্কার করেন। ৭৯৯ খৃ. (মতান্তরে ৮০৬ খৃ.) 'আব্বাসী খলীফা হারূনুর রাশীদ-এর সেনাবাহিনী আন্‌কারা শহর নূতনভাবে পুনরায় অধিকার করে। পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র খলীফা আল-মু'তাসিম ৮৩৮ খৃ. পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। 'আরব কবি হুসায়ন ইবন দাহহাক-এর রচনায় ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ঐ সময়ে এই শহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় (আম্মুরিয়া বিজয়ের বর্ণনায় দ্র. ইয়া'কূত, মু'জামুল বুলদান, আন্‌কারা শিরোনাম)। বায়যানটাইন দলীলে এই ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ৮৫৯ খৃ. তৃতীয় মিখাইল দুর্গ প্রাচীর পুনরায় সংস্কার করেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই ৮৭১ খৃ. শহরটি Thephrike (diwrigi)-এর প্যালিসীয়দের (Paulicians) দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল সন্দেহজনক এবং কখনও ইহাদের আরবগণের পক্ষে আবার কখনও বিপক্ষে দৃষ্ট হইত। কুদামা (৮৮০ খৃ.) আল-বায়ালিকা নামে ইহাদের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কিছু কালের জন্য ইহারা (P. Wittek-এর মতে) শহরটি ক্রাইসোশিয়ার (Chrysocheir) রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয়। আরমেনীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী Cameiyan একটি গ্রন্থের বর্ণনা দান করিয়াছেন যাহার বক্তব্য অনুযায়ী Chrysocheir মুসলমান ছিলেন। কথিত আছে, ইহার পরে শহরটি প্রায় দুই শতাব্দী যাবত শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন অতিবাহিত করে। কেবল ৯৩১ খৃ. সমসাময়িক কালের ইসলামী মুজাহিদগণের কেন্দ্র তারসূস হইতে 'আরবগণ এই শহরের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু ৯৫৬ খৃ. দ্বিতীয় নেকূফুরাস ফোকাস তারসূস শহরটিকে বায়যানটাইন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া নেন। ফলে ভবিষ্যত আক্রমণসমূহের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বদিকে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে আন্‌কারা দূর-দূরান্ত সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত একটি পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার এলাকায় পরিণত হয়। ঐ সময়ে বায়যানটীয়গণ কর্তৃক আনাতোলিয়ায় গৃহীত অঞ্চল বন্টন সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ফলে ইহা বুকেল্লারিয়ন তীমা প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়।

সাল্‌জুক সুলতান আল্‌প আর্‌সালান মালাযগির্দ-এর নিকটে এক যুদ্ধে সম্রাট চতুর্থ রোমানুস-এর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। ফলে সমগ্র আনাতোলিয়ায় তুর্কী আক্রমণ পরিচালনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ইহার সঠিক সন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ১০৭৩ সালেও শহরটি বায়যানটাইন দখলে ছিল। ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায়, মালাযগির্দ-এর পরাজয়ের পরও তুর্কীগণ দুই বৎসর যাবত আন্‌কারার আশেপাশে আক্রমণ পরিচালনা করিতেছিল এবং তাহারা উহার বেশ নিকটে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছিল

(Gerphanion, Melange d' archeologie anatolienne, পৃ. ২১৫)। কিছুকাল পরই শহরটি তুর্কীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। শহরটি সর্বপ্রথম কোন্ তুর্কী সেনাপতির অধিকারে আসে সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। তবে তিনি স্বয়ং কোন সাল্‌জূক শাসক অথবা তাহার কোন সেনাপতি অথবা কোন স্বাধীন গোত্রপতি হইতে পারেন। সার্বিকভাবে আন্‌কারা ও আনাতোলিয়ার ইতিহাসের এই পর্বটি অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে বলা যায়।

প্রথম ক্রুসেডের সময় ১১০১ সালে ক্রুসেডারদের সেনানায়ক Raymond de Toulouse পুনরায় বায়যানটাইন সম্রাটের পক্ষে শহরটি অধিকার করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী প্রায় দুই শত তুর্কী সৈন্যকে হত্যা করে। ফলে শহরটি পুনরায় বায়যানটাইন শাসনাধীনে চলিয়া যায়। ১১০২ খৃ. Counte de Nevres-এর অধীনস্থ ক্রুসেড সৈন্যবাহিনী এই স্থান ত্যাগ করিলে শহরটি পুনরায় তুর্কী অধিকারে চলিয়া যায়। প্রথমে সাল্‌জূকগণ ইহার কর্তৃত্ব লাভ করে। ইহার পর ১১২৭ সালে শহরটি সাল্‌জূকগণের নিকট হইতে দানিশ্‌মান্‌দী শাসক আমীর গাযীর দখলে আসে। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ গাযীর মৃত্যুর পর (প্রায় ১১৪৩ খৃ.) আনকারা সাল্‌জূক শাসনাধীনে চলিয়া যায়। কিন্তু অল্পকাল পরেই যখন সুলতান ২য় কীলীজ আর্‌সালান আনকারার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন, তখন রূম-সাল্‌জূক সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইয়া তাঁহার ১১ জন পুত্রের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং আন্‌কারা তাহার পুত্র মুহ্‌য়িদ্দীন মাস্‌'উদ-এর অংশে পড়ে। তবে ১২০৪ সালে তাঁহার ভ্রাতা তুকাদ-এর শাসক রুক্‌নুদ্দীন সুলায়মান শাহ আন্‌কারার দখল গ্রহণ করিয়া রূম-সাল্‌জূক সাম্রাজ্যকে পুনঃঐক্যবদ্ধ করেন। সর্বপ্রাচীন রূম সাল্‌জূক শিল্পকর্ম হইতেছে বাদশাহ মাস্‌'উদ-এর সময়কালীন (৫৯৪/১১৯৭-১১৯৮) একটি কাষ্ঠ-নির্মিত মিম্বার, যাহা আন্‌কারা দুর্গের অন্তর্গত তথাকথিত 'আলাউদ্-দীন মসজিদে অবস্থিত। ১২১০ খৃ. সুলতান প্রথম কায়খসরুর মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরে তাঁহার পুত্র 'আলাউদ্-দীন কায়কোবাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান প্রথম 'ইয্‌যুদ-দীন কায়কাউস-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আন্‌কারাঃ দুর্গ অধিকার করেন। এক বৎসর প্রতিরোধ করিবার পরে অন্য ভ্রাতার নিকট তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং তাঁহাকে মালাতিয়ায় বন্দী করিয়া রাখা হয়। ১২১৯ সালে ভ্রাতা কায়কাউস-এর মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আলাউদ্-দীন কায়কোবাদের শাসনামল (১২১৯-৩৭ সাল) সাল্‌জূক সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল যুগ। তৎকালে আন্‌কারার গভর্নর ছিলেন কিযিল বে। এই সময়ে আন্‌কারা হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে এক ঘণ্টার ভ্রমণের দূরত্বে নির্মিত হয় চুবুক সুয়ু নদীর উপরস্থিত শ্বেত সেতু (আককোপরু, ৬১৯/১২২২)। এই সেতু আন্‌কারাকে Beyapazar ও পশ্চিমের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। কীরশেহির ও কায়সেরির পথে কোপরুকোয়ের (আন্‌কারা হইতে দক্ষিণ-পূর্বে) নিকট কীযীল ইর্‌মাক নদীর উপরস্থিত অতি সুন্দর সেতুটি এই একই সময়ের কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। ইহাতে কোন শিলালিপি নাই, ইহার নামকরণ সম্ভবত আমীর সায়ফুদ্-দীন আয়না চাশ্‌নেগীর-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইব্‌ন বীবী বারংবার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, উদাহরণস্বরূপ প্রথম কায়কাউস-এর নিকট আন্‌কারা হস্তান্তর সম্পর্কিত অংশ দ্রষ্টব্য (ইবন বীবী, সম্পা. Houtsma, নির্ঘণ্ট)।

দুর্গ প্রাসাদের অভিমুখী ফটকের বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত সুবৃহৎ আকারের তথাকথিত আরসালান খান মসজিদটি (এই মসজিদটিকে দুর্গ প্রাসাদের বাহিরে অবস্থিত শহরের অবশিষ্ট এলাকার জন্য প্রধান জামে মসজিদরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে) সাল্‌জূক আমলের শেষদিকে নির্মিত বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। মসজিদটি কাঠের স্তম্ভ ও উন্মুক্ত কড়িকাঠের দ্বারা নির্মিত। ইহার সৌন্দর্যমণ্ডিত কাঠের মিম্বারটি ৬৮৯/১২৯০ সালে আখী গোত্রের দুই ভ্রাতা দান করেন। ইহাতে কারুকার্য মণ্ডিত একটি সুন্দর মিহরাবও রহিয়াছে। কিযিল বে জামে-ও প্রায় একই সময়ের নিদর্শন। ইহার মিম্বারে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি অনুযায়ী ইহা জনৈক আমীর ইয়া'কূব ইব্‌ন 'আলী শীর ৬৯৯/১২৯৯-১৩০০ সালে দান করেন। তিনি ছিলেন সম্ভবত তুর্কমান গেরমিয়ান ওগলু বংশের সদস্য।

ইহার পর সাম্রাজ্য অতি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গিয়াছুদ-দীন কায়খসরু মোঙ্গল সৈনিকগণের আক্রমণের তীব্রতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য কিছু সময় আনকারা দুর্গে কতকটা বন্দী জীবন কাটান এবং ১২৪৩ খৃ. সাম্রাজ্যের এক অংশ মোঙ্গলগণের অধিকারে চলিয়া যায়। ১২৪৯-৫০ খৃ. ২য় কায়কাউস আন্‌কারার প্রাচীরসমূহ পুনরায় মেরামত করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আনাতোলিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর সাল্‌জূক অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। সুলতানগণ বাহ্যিকভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিলেও মূল ক্ষমতা এই সময়ে কেন্দ্রীভূত ছিল অন্যান্যদের মধ্যে আখী ভ্রাতৃসংঘ (দ্র.) ও গেরমিয়ানী ইয়া'কূব-এর হাতে। বহু শাসকের প্রভাবপূর্ণ এই বিশৃঙ্খলাময় অবস্থার অবসান ঘটে যখন ১৩০৮ খৃ. আনাতোলিয়া ঈল্‌খানী শাসনের অধীনে আসে।

সাল্‌জূক শাসকগণ আনকারার সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই কারণে তাঁহারা আনকারার প্রতিরক্ষা প্রাচীর সুসংরক্ষণে সব সময়ে সচেষ্ট থাকিতেন। ইহার বিপরীতে আন্‌কারাতে আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরভাগের অন্যান্য শহর, যথা কুনিয়া, সীওয়া, কায়সারী ইত্যাদির ন্যায় সালজূকদের নির্মিত 'আবাদাত খানাহ্ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। P. Wittek 'আলাউদ্-দীন কায়কোবাদের শাসনামলে নির্মিত শুধু দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি মসজিদের বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা হইতে এই ধারণা করার সংগত কারণ রহিয়াছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে আনকারায় ইসলামী জীবনধারার বিশেষ প্রচলন হয় নাই। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শাসনামলেও সুলতানগণ নিজেরা মসজিদ, মাদরাসা অথবা কোন মাযহাবী অথবা ছ'ক'ফাতী (সাংস্কৃতিক) ইমারত নির্মাণ করেন নাই, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রপ্রধানগণের তত্ত্বাবধানে ইহা নির্মিত হয়। যেহেতু আন্‌কারা বিভিন্ন শাসক কর্তৃক বিভিন্ন যুগে আক্রান্ত ও বিজিত হইতে থাকে এবং ইহাকে অন্যতম সীমান্ত শহর বলিয়াও মনে করা হইত, সেহেতু ইহা সহজেই অনুমিত হয়, তৎকালীন শাসকগণের নিকট ইহার এত অধিক সামরিক গুরুত্ব কেন ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রূম-সাল্‌জূক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে আন্‌কারা ইরানের মোঙ্গল বংশীয় ঈলখানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭০৩/১৩০৪ হইতে ৭৪২/১৩৪২ সালের মধ্যে আনকারায় এমন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়, যাহার উপর ঈলখানী শাসকগণের নাম 'আরবী ও উইগূর

(اويغور) ভাষায় মুদ্রিত আছে। ইহা ব্যতীত প্রাচীর তোরণে ৭২৯/১৩৩০ সালে ঈলখানী আবূ সাঈদ-এর একটি ফারসী উৎকীর্ণ লিপিতে জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহের নীতির বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে (তু. W. Hinz, Bell., ১৯৪৯ খৃ.,৭৪৫ প.)। এই অঞ্চলে ঈলখানী শাসন ক্রমশ পশ্চিমদিকে আন্‌কারা ছাড়াইয়া সিওরীহিসার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৩২৮ খৃ. ঈলখানী গভর্নর হাসান জালায়িরী ইরান যাত্রার পথে আনাতোলিয়া ত্যাগ করিলে তাহারা স্থলে 'আলাউদ্দীন এর্‌তেনাহকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি এই সময়ে সীওয়াস-এ অবস্থান করিতেন। ১৩৩৫ খৃ. আবূ সাঈদ খানের মৃত্যুর পর এরতেনাহ ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং ঈলখানী সাম্রাজ্যের পতনের পর আনকারাঃ এরতেনাহ্ ও তাঁহার উত্তরাধিকারগণের কর্তৃত্বে আসে। ইহারা ১৩৪১ খৃ. সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। তবে এইরূপ ধারণা করা সংগত, ঈলখানী ও এরতেনীয়গণ আনকারার উপর কেবল সামরিক অধিকার ও কর আদায়ের ক্ষমতাই বজায় রাখিতেন; নগরীর প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল ধনী বণিক সম্প্রদায় ও কারিগরগণের হাতে এবং তাঁহারা আখী সংগঠনের মাধ্যমে প্রভূত প্রভাব অর্জনে সক্ষম হন। আখীগণের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন শারাফুদ্দীন (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)। তিনি আনকারার প্রধান মসজিদ, আরসালান খান মসজিদে প্রচুর অর্থ দান করেন এবং এই মসজিদের পার্শ্বে একটি কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার কাষ্ঠ নির্মিত শবাধারে (বর্তমানে আন্‌কারা নৃতাত্ত্বিক যাদুঘরে রক্ষিত) উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁহাকে আখী মু'আজ্জামরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন আরব ভৌগোলিকগণ শহরটির নাম আন্‌কারা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পূর্বে বর্ণিত Ayyuoa-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ মোঙ্গল আমলের সূচনা পর্বে ইয়াকূত ও ইব্‌নুল-আছীর-এর লেখনীতে আনকারার সাথে সাথে আংগোরিয়াহ নামও দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইহার তুর্কী রূপ এংগূরু। সাল্‌জূক স্মৃতিফলক ও আনকারায় প্রস্তুত মুদ্রাসমূহে সব সময় ইহার উল্লেখ আন্‌কারারূপে পাওয়া যায়, কিন্তু ঈলখানী ফলক ও মুদ্রাসমূহে প্রচলিত নামটি হইতেছে আংগূরিয়াহ্। শেষোক্ত রূপটির সন্ধান পাওয়া যায় ইব্‌ন বীবী (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ) ও আবুল-ফিদা (মৃ. ১৩৩০ খৃ.)-এর গ্রন্থে এবং 'আযীয আস্‌তারআবাদীর চতুর্দশ শতকের শেষভাগে লিখিত বেযম ও রেযম নামক রচনায়। ইহার বিপরীত হামদুল্লাহ আল-মুসতাওফী (নুযহাতুল কুলূব, ১৩৪০ খৃ.)-এর গ্রন্থে এংগুরী অথবা আংগুরার পাশাপাশি আন্‌কারার উল্লেখ সমভাবে পাওয়া যায়। সমসাময়িক 'উছমানী যুগের দলীলপত্র (আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ্ ও জাহান্নুমা) এক জায়গায় আনকারা ও এংগুরু এই দুইটি রূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহ্যত প্রথম নামটি প্রচলিত দলীলে অধিকতর ব্যবহৃত হইত। সাধারণ জনগণ অবশ্য এংগুরু রূপটি বেশী ব্যবহার করিত। প্রাচীন শহরের জন্য আন্‌কীরা (Ancyra) ব্যতীত অন্যান্য রূপসমূহ যথেষ্টভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, ক্রুসেডের বিবরণ প্রদানকারিগণের মধ্যে Albertus Aqunsis শহরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন Ancras। নিকটবর্তী যুগে Tournefort ব্যবহার করিয়াছেন Angori ও Angora রূপদ্বয়। শেষোক্ত রূপটি (আংগোরা) আধুনিক ইউরোপীয় পত্র পত্রিকায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে এংগুর রূপটি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে এবং তদস্থলে আনুষ্ঠানিকভাবে শহরটির নাম আন্‌কারা নির্ধারিত হইয়াছে। মধ্যযুগের আরব দলীলপত্রে কোন কোন সময় আন্‌কারাকে যাতুস্-সালাসিল অথবা শুধু সালাসিলরূপে বর্ণনা করা হয়। সম্ভবত ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী দ্বারা শহরটি পরিবেষ্টিত হওয়ার পরিবর্তে একাধিক নগর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও উহার দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। শুকুরুল্লাহ (প্রকাশিত The seif, Mog, ২খ., ১৮৮), কারাহ্‌মানী মুহাম্মাদ পাশা (তারীখ আল 'উছমান, অনু. মুকরিমীন খালীল, TTEM, ১৪খ., ৯১), Haniwaldanus (Louenklau, Muslim Hist, ১৫৯৫ খৃ, পৃ. ১৩১), আলী (কুন্‌হুল আখবার, ৫খ., ৬৬) এবং সর্বশেষে আওলিয়া চেলেবী (সিয়াহাত নামাহ্, প্রকাশিত আহ্‌মাদ জাওদাত, ২খ., ৪২৭) -র গ্রন্থাদিতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

উছমানী যুগ ঃ প্রথমবারের মত আন্‌কারা উছমানী অধিকারে আসে ১৩৫৪ সালে, যখন ওরখান-এর পুত্র সুলায়মান ইহা অধিকার করেন। কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে উছমানী ইতিবৃত্তে কোন প্রকার উল্লেখ নাই। তাই মনে হয়, ঘটনাটি যদি ঘটিয়া থাকে তবে তাহা ছিল একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা মাত্র। প্রথম মুরাদ-এর শাসনামলের পূর্বে আন্‌কারা উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় নাই (৭৬২/১৩৬১ সাল)। একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী (Neshri, সম্পা. Taeschner, ১খ., ৫২, ২খ., ৮০ [৫৭]) এই সময় আনকারা শহরটি ছিল আখীগণের নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁহারা শহরটিকে মুরাদ বেগের হস্তে সমর্পণ করে। এই শহরে মুরাদ বেগের শাসনকালের (৭৬৩/১৩৬১-২) অন্যতম প্রমাণ হইতেছে দুর্গ প্রাঙ্গণের 'আলাউদ্দীন মসজিদের একটি শিলালিপি। উছমানী আমলের প্রারম্ভ পর্যায়ে ধনশালী আখী পরিবারসমূহ আনকারায় তাহাদের পূর্বতন প্রভাবের কিয়দংশ বজায় রাখিতে সমর্থ হয়, ইহার ইংগিত পাওয়া যায় তাহাদের নির্মিত মসজিদসমূহের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি হইতে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, ৭৯৪/১৩৯১ সালে জনৈক আখী ইয়াকূব ও ৮১৬/১৪৩৩ সালে জনৈক আখী এওরান, পরবর্তী কালে ইহাদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আনাতোলিয়া যখন তৈমূরের আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন আনকারার প্রশাসক ছিলেন ইয়াকূব বে। এই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া প্রথমে বায়াযীদ আন্‌কারা অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৯ যিলহাজ্জ, ৮০৪/১৪০২-এর ২০ জুলাই আন্‌কারার উত্তরে চুবুকওয়াসী নামক স্থানে যে সংঘর্ষ হয় তাহা ইতিহাসে আন্‌কারার যুদ্ধরূপে পরিচিত। সাহায্যকারী সেনাদলের বিশ্বাসঘাতকতা, পানির অভাব ও শত্রু সৈন্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বায়াযীদ পরাজিত ও তাঁহার দুই পুত্র মূসা ও মুস্‌তাফাসহ তৈমূরের হাতে বন্দী হন। পরবর্তী কালে তৈমূর এই এলাকা পরিত্যাগ করিলে বায়াযীদের পুত্রগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং আনকারা মুহাম্মাদ চেলেবির এলাকাভুক্ত হয়। ১৪০৪ সালে ঈসা চেলেবী উহা অবরোধ করেন এবং ১৪০৬ সালে কিছু কালের জন্য সুলায়মান চেলেবির সেনাবাহিনী উহা দখল করিয়া লয়। সুলতান দ্বিতীয় বায়াযীদ ও জেম সুলতানের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি

হইলে আন্‌কারার প্রশাসক ১৪৮২ সালে জেমের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বায়াযীদ আনকারা দখল করেন এবং জেম নিহত ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র বায়াযীদের হাতে বন্দী হন। প্রথম আহ্‌মাদের শাসনামলে আনকারা একটি বিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নগরীর অধিবাসী জনৈক দস্যু দলপতি কালান্দার ওগলু। এই বিদ্রোহ ক্রমশ সমগ্র আনাতোলিয়ায় ছাড়াইয়া পড়ে (১৬০৭) এবং শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী কুয়ুজু মুরাদ পাশা ১৬০৮ সালে ইহার বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন।

উছমানী আনকারায় সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব ছিলেন বায়রামিয়্যা নামক দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হাজ্জী বায়রাম ওয়ালী [দ্র.] (৭৫৩/১৩৫২ হইতে ৮৩৩/১৪২৯-৩০)। তাঁহার মাযার ও তৎসংলগ্ন মসজিদটি (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত এবং অভ্যন্তরভাগে সমতল কাষ্ঠ নির্মিত ছাদ ও বাহিরে টালির নির্মিত বহিঃছাদ আবৃত একটি আকর্ষণীয় ভবন) অগাস্টাস-এর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অতি নিকটে অবস্থিত।

আনকারার উছমানী আমলের কতিপয় ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের মসজিদ রহিয়াছে। ইহাদের কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, যথাঃ উলটা 'T' (⊥) আকৃতির নকশায় এবং একটি প্রাচীনতর উছমানী মসজিদের অনুকরণে নির্মিত ইমারাত জামে' (জনৈক ক্যারাজা বেগ কর্তৃক ৮৩১/১৪২৭-২৮ সালে নির্মিত; সম্ভবত এই ব্যক্তি ৮৪৮/১৪৪৫ সালে ভার্না্র যুদ্ধে নিহত হন) এবং জেনাবী আহমাদ পাশার মসজিদ যাহা য়েনী বা কুরশুন্‌লু জামে নামেও পরিচিত। ইহার নির্মাতা উছমানী আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি সিনান (৯৭৩/১৫৬৫-৬৬ সাল)। ইহা একটি গুম্বজ শোভিত এবং পার্শ্বে ইহার প্রতিষ্ঠাতার কবর অবস্থিত (মৃ. ৯৬৯/১৫৬১-৬২)। মসজিদ ও মাযার সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দ্র. হিকমেত তুর্‌হান দাগলীওগলু ও আ. সাইম উলগেন, Vakiflar Dergisi, ২খ., ১৯৪২, ২১৩-২২; E. Egli, Sinan, Der. Baumeister osmanischer Glanzzeit), স্টুটগার্ট (১৯৫৪, পৃ. ৮৬-৮)। উছমানী আমলের অপরাপর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সৌধের অন্যতম খান (কুর্‌শুন্‌লু খান, ১১৫৯-১৭৪৬ সালের ওয়াকফিয়্যে, দ্র. A. Galanti, ১খ., ১৩৩) ও ইহার পার্শ্বস্থ বেদিস্থান যাহা দুর্গ পাহাড়ের শিখর পথের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে ইহাদের পুনঃসংস্কার করিয়া প্রাচীন কীর্তির সংগ্রহশালা যাদুঘরে পরিণত করা হইয়াছে।

উছমানী আমলে আন্‌কারা ছিল আনাদোলু এয়ালেত-এর একটি সান্‌জাক (লিওয়া)-এর রাজধানী। গুরুত্বে ইহা একই সংগে এয়ালেতটিরও রাজধানী ছিল; কিন্তু পরে এই ভূমিকা পালনের জন্য নির্ধারিত করা হয় কুতাহিয়াকে। তানজীমাত আমলে (৭ জুমাদাছ-ছানী, ১২৮১/৭ নভেম্বর, ১৮৬৪ সালের আইন) অভ্যন্তরীণ সরকারের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় আনকারা একটি বিলায়েত-এর রাজধানীতে পরিণত হয়। ইহার অন্তর্গত সানজাকসমূহ হইতেছে আন্‌কারা যুযগাদ, কীরশেহির ও কায়সেরী। আনকারা সানজাক নিম্নোক্ত কাদাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ছিল ঃ আন্‌কারা আয়াশ, বালা, যির, বেয়পাযার, জীবুকাবাদ, হায়মানা, সিফরিহিসার, মিহালীচজীক, নালীহান, য়াবানাবাদ।

১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত আন্‌কারা পুরাতন হিসার (প্রাচীর)-এর পার্শ্বে, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে প্রান্তরের দিকে বিস্তার লাভ করে, বিশেষভাবে দক্ষিণ দিকে ইহা রোমক-বায়যানটাইন শহরের সীমা অতিক্রম করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শহরের রূপ ধারণ করে। ৯২৯/১৫২২ সালের আদমশুমারীর বর্ণনা অনুযায়ী ১৬শ শতাব্দীর প্রথম চতুর্ভাগের শেষাংশের দিকে আন্‌কারা শহরে দুই সহস্রের অধিক মুসলিম, প্রায় এক শত বিশ খৃস্টান ও আনুমানিক ত্রিশটি ইয়াহূদী পরিবার ছিল। ইহাদের মধ্যে এক শত আশিটির অবস্থান ছিল দুর্গের অভ্যন্তরে কিন্তু এই গণনায় মহিলা ও শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই; ফলে প্রকৃত জনসংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না; তবে আনুমানিকভাবে ইহার সংখ্যা ছিল দশ হইতে বারো হাজার। ঐ বর্ণনা অনুযায়ী খাস আন্‌কারা শহরের ট্যাক্স হইতে সুলতানের ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ অষ্টাশি হাজার ছেশট্টি আক্‌চা। ইহার এক-তৃতীয়াংশ ছিল শহরে মাদক দ্রব্য তৈরী ও বিক্রয় কর হইতে প্রাপ্ত; এক-চতুর্থাংশ ছিল বাজারের ও ওজনের খাজনা. আনুমানিক এই পরিমাণই ছিল ছাপার মোহর লাগানোর ফী বাবদ। অবশিষ্ট পরিমাণ (৫২,৩৩৩ আকচা) আনকারার রঙ্গের দোকানগুলি হইতে, ৪৫,০০০ আক্‌চা স্বর্ণকারের দোকান ও শহরের অভ্যন্তরভাগের শস্যক্ষেত ও গমের বাজারের ট্যাক্স হইতে আদায় হইত। লিওয়ার শাসনকর্তার নিজস্ব ব্যয় এক লাখ নব্বই হাজার আকচা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই ব্যয়ের অধিকাংশ বাজার পরিদর্শক, পুলিস বিভাগ, বায়তুল-মাল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ। বাকী অংশ গানীমাতের মাল, বাগ-বাগিচা ও চারণভূমির আয় হইতে সংগৃহীত হইত। ১০৫৮/১৬৪৮ সালে আওলিয়া চেলেবী আন্‌কারায় আগমন করেন। তিনি শহরের সরকারী রেজিস্টার পরিদর্শন ও পরীক্ষা করেন। তাঁহার বর্ণনায় শহরটি তখন দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল এবং মীর. লিওয়ার আয় ২,৬৩,৪০০ আকচা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। শহরের অভ্যন্তরীণ প্রাচীর ছিল সাদা পাথরে নির্মিত এবং একটি প্রাচীর হইতে অপরটি উচ্চ, এইরূপে চারটি ধাপ ছিল। ইহার চার হাজার কদম বেষ্টনীর মধ্যে বাগ-বাগিচা ছাড়া আনুমানিক ছয় শত ঘর ছিল। শহরতলীর চতুর্দিকে বহিরাগত হামলার ভয়ে উচ্চ প্রাচীর নির্মিত হয়। এইখানে ছিল আনুমানিক সত্তরটি বাগানসহ বিশাল অট্টালিকা এবং ছয় হাজারের অধিক সাধারণ বাসগৃহ, যেই গৃহগুলি চুন বা সিমেন্টের প্রলেপহীন আনকারার প্রসিদ্ধ কাঁচা ইটের নির্মিত, তবে এই সকল অত্যন্ত শক্ত ছিল। বাজার ও বাসস্থান (ছাদ নির্মিত বাজার) ছিল শহরের উচ্চ অংশে। জাহাননুমার বর্ণনামতে আন্‌কারার অধিকাংশ বাশিন্দা ছিল তুর্কমান। আওলিয়া চেলেবীর মতে বাশিন্দাগণের মধ্যে রোমকগণ সংখ্যায় কম এবং ইয়াহূদী ও আরমনীয়গণ তুলনামূলকভাবে ছিল অধিক। আন্‌কারার নিকটবর্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ মাঠে-ময়দানে উৎকৃষ্ট মানের শাকসবজি ও ফল উৎপাদিত হইত। চারণভূমিতে উৎকৃষ্ট জাতের (ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া) পালিত হইত এবং যেসব কাঁচামাল সহজলভ্য ছিল উহা হইতে প্রস্তুত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল (চামড়া, বুনন শিল্প, লবণাক্ত গোশত, মদ ও শুষ্ক ফল)। এতদ্ব্যতীত আন্‌কারা নামীয় এক বিশেষ জাতের ছাগল দুনিয়াময় যাহার খ্যাতি ছিল– প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। আংগোরা ছাগলের উজ্জ্বল শ্বেত

বর্ণের রেশম-কোমল লোম (Mohair, তুর্কী তিফ্‌তিক) ছিল একটি অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী। স্থানীয় লেখকদের বর্ণনামতে ইহা ছিল দুধের ন্যায় সাদা, রেশমের ন্যায় কোমল ও হীরকের ন্যায় দ্যুতিমান। প্রচুর সংখ্যায় ইহাদের পালন করা হইত। আন্‌কারার অভ্যন্তরে ও সংলগ্ন এলাকায় ইহার পশম কর্তন করিয়া ইহা হইতে উৎপন্ন সুতার সাহায্যে বস্ত্র প্রস্তুত করা হইত। এই সকল বস্ত্র সূফ ও শালী নামে পরিচিত ছিল। আন্‌কারার অধিবাসিগণের জীবিকা উপার্জনের ইহাই ছিল অন্যতম প্রধান উপায়। উৎকৃষ্ট উৎপাদিত বস্ত্রসমূহ শাহী মহলে ও অন্যান্য বস্ত্র ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে ইস্তাম্বুল ও ইয্‌মিরে পাঠান হইত। শাহী মহলে, মিসর ও ইউরোপে এই বস্ত্র অত্যন্ত সমাদৃত হইত। আন্‌কারার এই বস্ত্র ইউরোপের বাজারসমূহে Camelot & Cimatile নামে পরিচিত ছিল। আওলিয়া চেলেবির বর্ণনামতে ইউরোপীয়গণ যে সকল আংগোরা ছাগল ইউরোপে আমদানী করিত, তাহা স্বল্পকাল পরেই সাধারণ শ্রেণীর ছাগলে রূপান্তরিত হইত এবং তাহাতে লোম হইতে আনকারায় প্রস্তুত সূফের ন্যায় উৎকৃষ্ট বয়ন সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে তাহাদের ধারণা, আংগোরা ছাগলের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া কেবল আন্‌কারার চতুষ্পার্শ্বেই বিদ্যমান ছিল। এই খ্যাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৮১২ খৃ. আন্‌কারার বস্ত্র প্রস্তুতের আনুমানিক এক হাজার কারখানা চালু ছিল। এই সকল কারখানায় দশ হাজার তাঁতী কর্মরত ছিল। স্থানীয় লেখকের একটি রচনা অনুযায়ী আন্‌কারায় এক বৎসরে এক হাজার কির্‌শ (পিয়াস্‌টার) মূল্যের চোগা ও উন্নত মানের সূফ প্রস্তুত হইত। রঙের কারখানাসমূহে 'শালী'-তে রঙ করা হইত এবং উল্‌ দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের জায়নামাযও প্রস্তুত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন Pournefort আন্‌কারা আগমন করেন, তখন আন্‌কারায় বহু ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিক বর্তমান ছিলেন। ঐ সময়ে পশম ও পশমী বস্ত্র রফতানীর পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আন্‌কারার এই পশমী শিল্পের চরম বিপর্যয় ঘটে। একদিকে পশমী বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পায়, অন্যদিকে ইহার বৈদেশিক বাণিজ্যেও ভাটা পড়ে। কাশ্মীর ও ইরানে প্রস্তুত বস্ত্রের মুকাবিলায় ইহা টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হয় না। ইহা ছাড়া ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে আনকারার কলকারখানার সংখ্যা দারুণভাবে কমিয়া যায়। বহু সমাদৃত আনকারার স্থানীয় রংশিল্প জেহরা (Rhamus tinctoris) ইউরোপীয় সহজলভ্য খনিজ জাতীয় রং ও উন্নত শিল্পকলা কৌশলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। উৎপাদিত পশম এখন আর কাপড় প্রস্তুতের কার্যে ব্যবহৃত না হইয়া বাহিরে রফতানী হইতে থাকে। Tschischatscheft, Ainswarth & Mordtmann-এর হিসাব অনুযায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্‌কারার উৎপাদিত ও বিদেশে রফতানীকৃত পশমের আনুমানিক পরিমাণ ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ উক্‌কাহ (১-২.৮ পা.)। ইংরেজগণ কিছু পরিমাণ আংগোরা ছাগল দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পালনের মাধ্যমে ইহাদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পালন করে। এই শতাব্দীর শেষ দিকে এই সব ছাগলের পশম আন্তর্জাতিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। কিছুকাল পরে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত সফলতার সহিত ইহার প্রচলন করা হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আন্‌কারার পশমের মূল্য বিশেষভাবে কমিয়া যায় এবং অবহেলার কারণে আন্‌কারায় পালিত ছাগলের সংখ্যা অত্যন্ত মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্‌কারা ও ইহার আশেপাশে মাত্র দুইটি বস্ত্র কারখানার অস্তিত্ব বজায় থাকে। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়, আন্‌কারা যাহার অর্থনৈতিক তৎপরতা একমাত্র পশম শিল্প ও উহার বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল—কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে উহার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ? Poujoulat-এর প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে আনকারা ছিল সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শহর। কিন্তু Perrot-এর মতে ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর ছিল। Jexier-এর মতে সকল বিপদ ও আশংকার মধ্যেও আনকারা আনাতোলিয়ার অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর ছিল। দালানকোঠা নির্মাণের প্রয়োজনীয় পাথর সুলভ থাকা সত্ত্বেও ইহার গৃহসমূহ কাঁচা ইটের নির্মিত ছিল। ফলে এই সকল গৃহের স্থায়িত্ব ছিল না, তদুপরি বহিরাংশে উপযুক্ত প্রলেপ অথবা অলংকরণ না থাকায় আনকারার বাহ্যিক চেহারা হইতে শহরটির দরিদ্র অবস্থার ধারণা সৃষ্টি হইত। তুলনামূলকভাবে নূতন শহরগুলিতে এই দৃশ্য দেখা যাইত না। অবশ্য মনোরম ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আনকারার অবস্থান, উহার জমির উর্বরতা ও বিপুল পরিমাণে মেষ পালনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উহার ঘনবসতির কারণ।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শহরটির আকার ও জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণসমূহ পরস্পর বিরোধী। Tournefart-এর মতে ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৫,০০০ এবং তন্মধ্যে তুর্কীদের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। উক্ত শতাব্দীর শেষাংশে লিখিত একটি ভূগোল পুস্তকে আন্‌কারাকে একটি বৃহৎ শহররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, ইহাতে ১৮ হাজার গৃহ ছিল। Ch. Texier-এর বর্ণনায় শহরের বাসিন্দাদের এক-তৃতীয়াংশে ছিল খৃস্টান (যাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আর্মানী ও রোমক) এবং ১৮৩০ সালে সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ২৮ হাজার। তাঁহার বর্ণনামতে আন্‌কারার সীমানা এত বিস্তৃত ছিল যে, ইহাতে আরও অনেক অধিবাসীর স্থান সংকুলান হইতে পারিত। A. D. Mordtmann ১৮৫৯ খৃ. শহরটির গৃহসমূহের যে সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন (সর্বমোট ১২ হাজার, তন্মধ্যে ৮২২০ তুর্কী, ২৬০০ আর্মেনীয়, ৮০০ রোমক ও ৮০টি ইয়াহূদী) তাহা যদি নির্ভুল হয়, তবে জনসংখ্যা নিঃসন্দেহে ইহা হইতে অনেক বেশী হইবে। ১৮৬০ খৃ. সালে Perrot মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ৪৫ হাজার পর্যন্ত অনুমান করিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনুমানসমূহ তুলনামূলকভাবে কম। Humann-এর মতানুসারে ১৮৮২ সালে আনকারায় ৪ হাজার তুর্কী ও ১৭ হাজার আর্মেনীয় বাসগৃহে ৩২০০০ লোক বসবাস করিত। ১৮৯০ সালে Naumann-এর বর্ণনা অনুসারে ইহার সংখ্যা ২৫০০০-৩০০০০। Cuinet-এর মতে এই সংখ্যা ২৭৮৫৫। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হয়, উহাতে অধিবাসীর সংখ্যার কোন সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। তবে উহাতে বলা হইয়াছে, শহরে ৬৫০০ গৃহ, আনুমানিক ২২০০ দোকান এবং ৪৪টি ছোট-বড় মসজিদ ছিল। বিদেশী দলীল অনুযায়ী শহরের এক-তৃতীয়াংশ ও স্থানীয় তথ্য

অনুযায়ী এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা খৃস্টান। খৃস্টান অধিবাসিগণ পশ্চিম অংশের ঢালু পাহাড়ী মহল্লায় বসবাস করিত এবং শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করিত। ইহাদের মধ্যে কাহারও ইস্তাম্বুলে বড় বড় বাণিজ্য ছিল। আন্‌কারার মার্নীগণের একটি মঠ পশ্চিম মধ্য-আনাতোলিয়ার আর্মেনীয় মঠসমূহের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইত। আনাতোলিয়ায় বহু স্থানের ন্যায় আন্‌কারায়ও খৃস্টানগণ তুর্কী ভাষায় কথাবার্তা বলিত। Cl. Huart-এর বর্ণনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আন্‌কারার জনৈক ধর্মযাজক রোমান বর্ণমালায় তুর্কী ভাষায় কতিপয় মাযহাবী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (Trois ouvrages en-Turc d'Angora, JA, ১৯০০ খৃ., ১৫খ., ৯ম সংখ্যা, ৪৫৯ প.)।

তুর্কী রাজধানী হিসাবে আনকারা ঃ বলকান যুদ্ধের পর ঈলী প্রদেশ তুর্কীদের হস্তচ্যুত হয় এবং নূতন সীমান্ত ইস্তাম্বুলের মাত্র ২০০ কি. মি. পর্যন্ত আগাইয়া আসে এবং ঐ সময়েই আশংকা প্রকাশ করা হইতে থাকে, এই বন্দর-শহরটি বিদেশী আক্রমণের মুকাবিলা করিতে হয়ত পারিবে না, তাই এইরূপ চিন্তা-ভাবনা করা হয়, উছমানী রাজধানী মধ্য-আনাতোলিয়ার এমন স্থান স্থানান্তরিত করা হউক, যাহা বহির্দেশীয় হামলার আশংকা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। তুর্কী সেনাবাহিনীতে বহুদিন যাবত চাকুরীরত Von der Goltz পাশা কর্তৃক এই ধরনের একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু ইস্তাম্বুলের মুকাবিলায় আনাতোলিয়ার অন্য সব শহর নিষ্প্রভ হওয়ার এবং তুর্কী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উহার প্রতি আকর্ষণ থাকার ফলে এই বিষয়ের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ১৯১৫ খৃ. বসন্তকালে ইংরেজ ও ফরাসী যুদ্ধ জাহাজসমূহ চুনাক দুর্গের গিরিপথে জবরদস্তি চলাচলের পথ তৈরী করিয়া লয়। অতঃপর যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের আশংকা ছিল, ততদিন পর্যন্ত আনাতোলিয়ার কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইবে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা চলিতে থাকিল। এই প্রসঙ্গে কুতাহিয়া ও কুনিয়ার কথা বিবেচনা করা হইলেও আন্‌কারার কথা কাহারও মনে আসে নাই। কারণ উক্ত শহরসমূহের তুলনায় আন্‌কারা তেমন গুরুত্বের অধিকারী ছিল না, এমনকি ১৯২০ খৃ. ইস্তাম্বুল শহর বিজয়ী দখলদারগণের অধিকারে চলিয়া গেলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি স্থান নির্বাচনের নিমিত্ত প্রচেষ্টা শুরু হইলে কতিপয় ব্যক্তি এই লক্ষ্যে সীওয়াসের দাবি ব্যক্ত করেন। অপরাপর মতাবলম্বিগণ এসকীশহর, কুতাহিয়া ও কুনিয়ার জন্য সুপারিশ করেন। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের সম্মেলনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আনকারাকে ভবিষ্যত তুরস্কের রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত করা হয়। এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে উপরিউক্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক যুক্তি বিদ্যমান ছিল।

আনাতোলিয়ার ইতিহাসের প্রাথমিক ও মধ্যযুগে শহর পত্তনে এবং উহার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, যে সকল স্থান শহরের কেন্দ্রস্থল বলিয়া নির্ধারিত হইতেছিল, সাধারণভাবে উহাদের অবস্থান ছিল প্রশস্ত ভূখণ্ড। ঐ ভূখণ্ডের একদিকে বসবাসের জন্য প্রায় অযোগ্য আনাতোলিয়া শুষ্ক তৃণহীণ ভূমি, অপরদিকে চলাচলের অনুপযোগী ও সর্বদা বহিরাক্রমণের আশংকাপূর্ণ সীমান্তবর্তী অসমতল অঞ্চল ছিল। অন্যদিকে এইসব ভূখণ্ডের মধ্যে সীমান্তবর্তী বনাঞ্চল ও মধ্যভাগের তৃণাঞ্চল বসবাস ও চলাচলের অধিক উপযোগী ছিল। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রধান প্রধান সড়ক এই সব স্থানে মিলিত হইয়া একটানা গোলাকার বৃত্তের রূপ ধারণ করিত। শুষ্ক তৃণহীন ভূমির পার্শ্বে গড়িয়া উঠা এই প্রকার আনাতোলীয় শহরসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান শহর ছিল এস্‌কীশহর, আনকারা, কায়সারী, নগ্‌দেহ, কারাহ্‌মান, কুনিয়া, আফয়ুন (কারাহিসারী) ও কুতাহিয়া। এই সকল বসতি পূর্বদিকে সীওয়াস হইতে মালাতিয়া, দিয়ার বাক্‌র ও এরযরূম, উত্তরদিকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল, পশ্চিমে এস্‌কীশহর ও আফয়ুন হইতে মর্মর সাগর ও ঈজীনের উপকণ্ঠে ও দক্ষিণে কায়লুকীয়া কাপূসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পরস্পর সড়ক দ্বারা যুক্ত ছিল। H. Louis-এর বর্ণনামতে "আনাতোলিয়ার সড়ক ব্যবস্থা চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহকে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়াছিল"। প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র এই স্থানে অবস্থিত ছিল। সংযুক্ত হিত্তী শাসনামলে শাসনকেন্দ্র হাতোশাশ (বুগায কুই) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল এবং কৃষ্ণ সাগর অভিমুখে প্রসারিত সড়ক এই স্থান হইতে পৃথক হইত। ফিরীকিয়া ও গালাতিয়ার যুগে আন্‌কারা, Gordion ও আমুরিয়া রাজ্যের কেন্দ্ররূপে গণ্য হইত। সালজূক যুগে রাজধানী ছিল কুনিয়া। মধ্য আনাতোলিয়ার সড়কসমূহের উল্লিখিত বৃত্তগুলির যেইদিক হইতে শত্রুর আক্রমণাশংকা প্রবল ছিল আন্‌কারার অবস্থান ছিল সেইদিক হইতে বেশ কিছু পূর্বে এক নিরাপদ স্থানে, তথাপি ইহা পশ্চিম প্রান্ত ও ইস্তাম্বুলের সহিত রেলপথে সংযুক্ত ছিল। যখন ইহাকে শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করা হয়, তখন আনকারা ছিল সকল প্রকার নাগরিক সুবিধাদি হইতে বঞ্চিত এবং ম্যালেরিয়া আক্রান্ত একটি অতি সাধারণ শহর। মধ্যম আকৃতির একটি শহরের প্রয়োজনীয় পানি এখানে পাওয়া যাইত না এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা ছিল সম্পূর্ণভাবে গাছপালাশূন্য। এখানকার ঘূর্ণিঝড় খুবই মারাত্মক ছিল।

মুসতাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিপ্লবিগণ আন্‌কারা আগমন করেন। ১৬ মার্চ, ১৯২০ সালে ইস্তাম্বুল তাহাদের দখলে আসে। ১৯২০ সালের ১৯ মার্চের এক ফরমানে সম্পূর্ণ তুর্কী রাজ্যকে আনকারায় অনুষ্ঠিত অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তের আওতাভুক্ত করা হয়। ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল আনকারায় উক্ত পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এইভাবে আন্‌কারা তুর্কী সরকারের গণপ্রতিনিধিদের প্রধান জাতীয় পরিষদের (The Grand National Assembly) কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে জাতীয় আন্দোলনের সকল পর্যায়ে আন্‌কারা সকল তৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২৩ সালের ১৩ অক্টোবর এক আইনের মাধ্যমে আনকারাকে তুরস্কের প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে ঘোষণা করা হয়। ইহার দুই সপ্তাহ পরে এই শহরে তুর্কী জামহুরিয়ার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

অতঃপর নয়া তুরস্কের কেন্দ্র হিসাবে আনকারার নির্বাচন চূড়ান্ত হওয়ার পর শহরটির উন্নয়নের জন্য প্রবল প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই কাজ প্রথমদিকে প্রায় অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে অগ্রগতি অর্জিত হয় এবং আন্‌কারার বসতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রারম্ভে এমন কোন পরিকল্পিত নীতিমালা ছিল না, যাহার মাধ্যমে এই ক্রমবর্ধমান বসতির সমস্যাসমূহ

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইত। ফলে প্রথমদিকে উন্নয়নের গতি ছিল বিশৃংখলাপূর্ণ, তথাপি পুরাতন শহর এলাকার শূন্য স্থানসমূহে দ্রুত দালান-কোঠা গড়িয়া উঠিতে থাকে। নূতন এলাকায় নয়া বসতি অঞ্চল ও আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। চতুষ্পার্শ্বস্থ জলাভূমি নিষ্কাশনের মাধ্যমে শহর হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হয়। চতুর্দিকে নূতন নূতন সরকারী ইমারতসমূহ গড়িয়া উঠে। রাস্তাঘাট উন্নয়নের কার্য দ্রুত গতিতে আরম্ভ হয়। ১৯২৮ খৃ. সুপরিকল্পিতভাবে নূতন শহর এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং পুরাতন আন্‌করার স্বকীয়তা বজায় রাখিয়া উহাকে নূতন শহরের অংগীভূত করা হয়। নূতন অন্‌কারার সম্মুখভাগে গড়িয়া উঠে মজ্‌লিসে মিল্লীর সুরম্য ভবন, সরকারী দপ্তর, বাগিচা ও সাংস্কৃতিক এলাকা। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ এই অঞ্চলে অবস্থিত। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শহরের কারিগরি ও বাণিজ্যিক অঞ্চল তৈরী করা হয়। শহরের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ শোভিত বৃহৎ সড়কসমূহ তৈরী করা হয় এবং প্রধান সড়কগুলির মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাস্তাসমূহ তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার সহিত রেল ও বাস চলাচলের ব্যবস্থাও করা হয়। অপর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তাহাদের সম্মুখে ছিল। তাহা হইতেছে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই শহরের ব্যবহার্য পানীয়, সেচ, কৃষিকার্য, শিল্প ও গৃহে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করা। রোমকগণ অতি প্রাচীন কালে মাগাবাহ (আল্‌মা অথবা ইদ্‌রীস) পাহাড় হইতে শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য যে সকল নহর নির্মাণ করে, তাহা সালজূক ও 'উছমানী আমলেও ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু বহুকাল পরে উহা বিনষ্ট ও অকেজো হইয়া পড়ে। ১৮৫৯ খৃ. শুষ্ক মৌসুমে এই শহরে আগমনকারী A. D. Mordtmann-এর বর্ণনামতে শহরটি ধীরে ধীরে পানিবিহীন হইতে থাকে। শহরের ভিতর মাত্র নগণ্য সংখ্যক পানির কূপ অবশিষ্ট থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮৯০ খৃ. আবিদীন পাশার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় আল্‌মাতাগ-এর পাহাড়সমূহের পাদদেশ হইতে নির্গত কয়েকটি প্রাকৃতিক ঝরনা হইতে যানবাহনের সাহায্যে আন্‌কারা শহর পর্যন্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই সকল অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা একটি দ্রুত বর্ধিষ্ণু শহরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আন্‌কারার ১২ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত চুবুক উপত্যকায় একটি বড় বাঁধ নির্মাণ করা হউক। ১৯২৯ ও ১৯৩৬ খৃ. নির্মিত এই বাঁধটি ২ শত মিটার লম্বা এবং ২৫০ মিটার উচ্চ। ইহার পশ্চাতে ৭ কি. মি. বিস্তৃত একটি প্রান্তরে ১৩৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি সঞ্চিত থাকে এবং ইহা দুই লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত কোন শহরের জন্য যথেষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বাঁধের ফলে আন্‌কারার চতুষ্পার্শ্বে পানি প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং আন্‌কারার আশেপাশের পাহাড়ী ঢাল, মরুময় অঞ্চল, রাস্তার পার্শ্ব ও পর্বতসমূহে প্রচুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়। উহার ফলে শহরের বাহ্যিক চেহারায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে আন্‌কারা আনাতোলিয়ার উত্তর অংশে অবস্থিত হইলেও ইহার প্রাকৃতিক অবস্থান শুষ্ক বন ও তৃণাঞ্চলের মধ্যভাগে বিদ্যমান। ১৯২৬ খৃ. হইতে নিয়মিতভাবে আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হইতে আবহাওয়া বুলেটিন পরিবেশিত হইতে থাকে। উক্ত তথ্য অনুসারে শেষ আট বৎসরে আন্‌কারা শহরের বার্ষিক গড় উষ্ণতা ১২ সেন্টিগ্রেড। সর্বাপেক্ষা উষ্ণ মওসুমে (জানুয়ারী) ১.৮ সেন্টিগেড এবং সর্বপেক্ষা উষ্ণ মওসুমে (জুলাই, আগস্ট) ২৩.৫ সেন্টিগ্রেড ছিল। এই সময়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ও কম উষ্ণতা পরিমাপ করা হইলে তাহা হয় যথাক্রমে ৩৭.৫ ও ২৪.২ সেন্টিগ্রেড।

১৩ বৎসরের পর্যবেক্ষণের ফলাফল অনুযায়ী বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৩৩০ মি.মি. (এই সময়ের সর্বাধিক ও স্বল্পতম বৃষ্টির পমিমাণ ৫০১ ও ২২০ মি. মি. ছিল)। কিছু পরিমাণে তুষারপাতসহ প্রধানত বর্ষা মওসুম হয় শীতে এবং বসন্তের প্রারম্ভে। যদিও সাধারণভাবে কোন মওসুমই একেবারে বৃষ্টিশূন্য নয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালের শেষভাগে ইহার পরিমাণ নামেমাত্র দাঁড়ায়।

আনকারার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহা শহরের ক্রমোন্নতির প্রতি নির্দেশ করে। এক সময়ের ৩০ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই শহরে ১৯২৬ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী ৫৭,৮০০ বাসিন্দা ছিল। ১৯২৭ খৃ. শহরের সীমানার মধ্যে বসবাসকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার ৫শত ৫৩ জন এবং ১৯৩৫ খৃ. আদমশুমারীতে তাহা ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭২০ জনে পৌঁছায়। ১৯৪০ খৃ. গণনা অনুযায়ী চূড়ান্ত জনসংখ্যা ছিল ১,২৭,২৫২ জন। এই সংখ্যা ১৯২৭ সালের জনসংখ্যার তুলনায় ১১১ শতাংশ এবং ১৯৩৫ সালের গণনার তুলনায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে আনকারা ইস্তাম্বুল ও ইযমীরের পরে তুরস্কের তৃতীয় বৃহত্তম শহরে পরিণত হয়। রাজধানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ইস্তাম্বুল ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে সরকারী কর্মচারী, কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণী এই শহরে বিরাট সংখ্যায় আগমন করিতে থাকে। বর্তমানে আনকারায় পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশী (১৯৪০ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী পুরুষের সংখ্যা ৯০,৯৫৩ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৬৬,২৭৯ জন ছিল)। কিন্তু এই পার্থক্য ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ১৯২৭ খৃ. আন্‌কারায় প্রতি ১০০০ পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ছিল ৫১১ কিন্তু ১৯৩৫ খৃ. এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪০ এবং ১৯৪০ খৃ. ৭৪০ -স্ত্রী।

১৯৩৫ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী আন্‌কারার ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭২০ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৯ হাজার আন্‌কারার মূল বাশিন্দা, ১০ হাজার আন্‌কারার অন্যান্য এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ৭০ হাজার তুরস্কের অন্যান্য প্রদেশের ছিল। ইহাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশের ভাষা ছিল তুর্কী। ১৯৪০ খৃ. মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ১,৫২,৭০০ অর্থাৎ ৯৭ শতাংশের বেশী এবং অমুসলিম ৪,৫০০ অর্থাৎ ৩ শতাংশের কম। শিক্ষিতের হার ছিল ১৯২৭ খৃ. পুরুষদের মধ্যে ৪৩.৯৫ শতাংশ ও মহিলাদের মধ্যে ২৮.৭৫ শতাংশ। ১৯৪০ খৃ. এই হার দাঁড়ায় ৬৮% ও ৪৯%।

শহরের বর্তমান এলাকার (১৬,৪০০ হেকটর) মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি হেক্টরে নয়জন। এই পরিমাণ বর্তমান ইস্তাম্বুলের জনসংখ্যার গড় ঘনত্বের তুলনায় কম। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, আনকারার অধিবাসিগণ একটি প্রশস্ত এলাকায় বসবাস করিতেছে। কারণ এই এলাকার কোন কোন অংশে (যেমন পুরাতন শহর এলাকা) প্রতি হেক্টরে ১৭৫ হইতে ২০০ অধিবাসী বসবাস করে।

নূতন নূতন ভবন নির্মাণের সাথে সাথে বর্তমান আনকারার চেহারা পরিবর্তিত হইতেছে এবং উহার অধিবাসীদের পেশা ও ঘন বসতির কারণে তাহারা বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত হইয়াছে।

(ক) প্রাচীন আনকারার পরিচয় তৎকালীন শহর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও শহরের আবাদী চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, পুরাতন আন্‌কারার অংশেই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি এবং আনকারার মোট জনসংখ্যার তিন-পঞ্চ মাংশ এই অঞ্চলে বসবাস করে। জনসংখ্যার ঘনত্ব এখানে হেক্টর প্রতি দুই শতেরও অধিক। প্রাচীন আনকারা এমন দুইটি অংশে বিভক্ত যাহা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনে সম্পূর্ণ বিপরীত। অংশ দুইটি হইতেছে হিসারবান্দ পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশ (দুর্গের অভ্যন্তরে) এবং ঐ পাহাড়ের মধ্যস্থ ঢালু স্থান হইতে প্রান্তরের দিকে বিস্তৃত মহল্লা। আন্‌কারা-দুর্গ দুইটি দুর্গ দ্বারা নির্মিত ঃ পাহাড়ের উচ্চতম অংশে অবস্থিত অভ্যন্তরীণ-দুর্গ এবং ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া বহির্দুর্গ। আনুমানিক ২০টি বুরূজ (برج)-এর মধ্যে ১৫টি এবং ইহার মধ্যভাগের প্রাচীর সমষ্টির একটি বিরাট অংশ বর্তমান কাল পর্যন্ত মোটের উপর ভাল অবস্থায় টিকিয়া আছে। ইহার বহির্দিকে দুইটি তোরণ এবং একটি ঘণ্টাঘর ছিল। অভ্যন্তরীণ দুর্গের বিস্তৃতি ছিল পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রায় ৫০ হাজার বর্গমিটার। ইহার প্রাচীরের নিম্ন অংশ মর্মর পাথর ও কাল ব্যাসল্ট-এর কর্তিত পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। ইহার উপরের অংশ বিভিন্ন প্রকারের পাকা ইট দ্বারা তৈরী যাহার উপরের দিক ছিল ক্রমশ প্রশস্ত। ইটের নির্মিত অংশটি স্থানে স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও অভ্যন্তরীণ দুর্গ উহার সম্পূর্ণ জাঁকজমক ও শিল্প সৌকর্যসহ বর্তমানেও টিকিয়া আছে। অভ্যন্তরীণ দুর্গের পরিধি ১১৫০ মিটার এবং প্রাচীরসমূহ ১৪ হইতে ১৬ মিটার উচ্চ, পূর্ব পার্শ্বে তাহা ১০-১২ মিটার উচ্চ। প্রাচীরসমূহের উপর ৪২টি বুরূজ রহিয়াছে এবং সেইগুলির অধিকাংশ পাঁচ কোণবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে দুর্গের পশ্চিম পার্শ্বে সারিবদ্ধ ১৯টি বুরূজ যাহা সারিতে সজ্জিত কতগুলি জাহাজের মত দেখায়, ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বারের দক্ষিণে এবং অভ্যন্তরীণ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পূর্ব কিল্‘আ নামে পরিচিত একটি বুরূজ আছে। উত্তর-পূর্বের কোণে অবস্থিত আক দুর্গ হিসারের সর্বাপেক্ষা উচ্চতম অংশ, যাহার উচ্চতা ৯৭৮ মিটার, খাতীব চায় নামক ঝরনা উহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত যাহা হইতে আক দুর্গ ১১০ মিটার উচ্চ। অভ্যন্তরীণ দুর্গের ন্যায় দুর্গের প্রাচীরসমূহে ও বুরূজ বায়যানটাইন আমলে নির্মিত। পরবর্তী কালে কয়েকবার উহার পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। ইহা ব্যতীত সালজূকি আমলে দ্বিতীয় একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এই প্রাচীর আক দুর্গের এক প্রান্তরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে খাতীব চায় দৃষ্টিগোচর হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আনকারা বারবার আক্রমণের সম্মুখীন হইলে দুর্গগুলির মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশে প্রাচীন রোমক নিদর্শন ধ্বংসোন্মুখ ‘ইবাদাতখানার মর্মর পাথর, স্তম্ভ, ঢাকনা ও মূর্তিসমূহের পাথর, পানি, সরবরাহ ব্যবস্থার পাইপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। প্রান্তরবেষ্টিত এই পাহাড়ের ঢালুতে নূতন আন্‌কারা বিস্তার লাভ করে। উহার শহরতলীতে বহু ঝুপড়ি ও উদ্যান রহিয়াছে।

আনকারার অভ্যন্তরীণ ও বহির্দুর্গের মধ্যভাগের ঢালু প্রশস্ত এলাকায় অভ্যন্তরীণ দুর্গের পার্শ্বস্থ অসমতল ভূমিতে ও আঁকাবাঁকা রাস্তার পার্শ্বে দুই সারি পুরাতন গৃহের মহল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দুর্গের পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তৃত এই মহল্লা ১৯১৭ খৃ. সালের অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বর্তমানে তথায় একটি সবুজ-শ্যামল ময়দান প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রাচীন আন্‌কারার কোন কোন গৃহ ১৮শ শতাব্দীর নির্মিত বলিয়া মনে হয়। তবে বারংবার মেরামতের ফলে এইগুলির বাহ্যিক চেহারা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত গৃহের সংখ্যা অতি নগণ্য। ইহাদের মধ্যে একাধিক কক্ষযুক্ত গৃহ থাকিলেও দৃশ্যমান গৃহসমূহের অধিকাংশই ছিল এক কক্ষবিশিষ্ট। ইহার সহিত আংগিনা, গুদামঘর, ভাঁড়ার ঘর, কোন কোন সময় ঘোড়ার আস্তাবল সংযুক্ত থাকিত। এই সকল গৃহের বারান্দা বাঁশের পর্দা দ্বারা আবৃত থাকিত। ঘরগুলি চুনকাম করা এবং উহার কাঠের অংশ গেরুয়া রংগীন হইত। ছাদের ভিতরের অংশ জ্যামিতিক নকশায় সাজান হইত। জানালাসমূহে শীশার নানা বর্ণের ক্ষুদ্র টুকরা লাগান হইত এবং উহাতে কাঠের পর্দা ঝুলিত। ফলে এই সকল গৃহ গরমের সময় উষ্ণ বায়ু ও ধূলা হইতে এবং শীতের সময় বায়ু হইতে রক্ষা পাইত।

(খ) নূতন শহর ও শহরতলী ঃ যে সময় আন্‌কারা দুর্গের বহিস্থ মহল্লা এবং রাস্তাসমূহ প্রশস্ত করা হইতেছিল এবং বিশাল ভিত্তির উপর নূতন ভবনসমূহ নির্মাণ করা হইতেছিল ও ইহার ফলে আন্‌কারার চেহারার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল, তখন ইহার দক্ষিণে অবস্থিত প্রান্তরে যাহা এতকাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল এবং মাঝে মাঝে ঈন্‌জাহ্‌সূ নদীর পানিতে প্লাবিত হইত, এক নূতন শহরের (য়ানী শহর) ভিত্তি স্থাপন করা হয়। য়ানী শহরের সীমারেখা ছিল সেই বড় সড়ক যাহা আওলাস প্রান্তর ও প্রাচীন আন্‌কারার দক্ষিণ প্রান্তর হইতে শুরু হইয়া প্রাচীন আনকারার দক্ষিণ প্রান্ত স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে যাহার দৈর্ঘ্য ৬ কি. মি. এবং আতাতুর্ক বুলেভার নামে অভিহিত। ইহার সন্নিকটে প্রাচীন আনকারার অতি নিকটে ব্যবসায় কেন্দ্র ও ব্যাংকসমূহ অবস্থিত। ইহার আরও দক্ষিণে ঐ এলাকা যেখানে আন্‌কারা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনসমূহ রহিয়াছে। ইহার সামান্য দূরে প্রধান আবাসিক এলাকাসমূহ অবস্থিত যেখানে রাস্তাগুলি ও ঘরবাড়িসমূহ পরিকল্পিতভাবে নির্মিত এবং মাঝে মাঝে উদ্যান ও পার্ক দ্বারা সজ্জিত। প্রান্তরের প্রান্তভাগে পাহাড়ী ঢালে সরকারী মহল্লা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই বড় সড়কটি আনকারার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া চুনকিয়ার জামহুর রিয়াসাতী কোশাক হইতে আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে যাহা স্থাপত্য সৌন্দর্যের অন্যতম নিদর্শন এবং যাহার দুই পার্শ্বে বৈদেশিক দূতাবাস নির্মিত হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া উত্তর দিক হইতে নূতন শহর চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে। নূতন শহর পুরাতন শহরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পূর্বদিকে জেবাহ্‌জী-র পার্শ্বস্থ বসতি হইতে শহর রেল লাইনের পাশাপাশি প্রসারিত হইতেছে। ১৯৪০ খৃ. সালের আদমশুমারী অনুযায়ী শহর ও জেবাহ্‌জী-র জনসংখ্যা ছিল ৪১ হাজার। আবাসিক এলাকা ও গ্রীষ্মকালীন আবাস পাহাড়ের ঢালুতে নির্মিত হইয়াছে। ইহার বিপরীতে শিল্প এলাকা যেখানে বড় বড় কারখানা আছে যাহা শহরের আরও পশ্চিমে অবস্থিত।

তুর্কী শাসনামলে নূতন রেলপথ নির্মিত হইলে আন্‌কারা যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এইরূপে আন্‌কারা কৃষ্ণ সাগরের উপকূল হইতে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সংযোগ সাধন করিয়াছে এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন (Toros Express) রেল ব্যবস্থা যাহা পশ্চিম ইউরোপকে তুর্কী-ইরাক ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, উহা আন্‌কারা হইয়া অতিক্রম করে।

তুর্কী রাজধানীরূপে আন্‌কারা শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব লাভ করে নাই, বরং বিগত বৎসরসমূহে সংঘটিত উন্নতির কারণে শহরটি কৃষ্টির কেন্দ্রে, নিজস্ব কারিগরি ও ব্যবসায়িক ঐশ্বর্যের কারণে একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

আন্‌কারায় বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মানের সাধারণ বিদ্যালয়, কারিগরি, বাণিজ্যিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ব্যতীত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গাযী ইনস্টিটিউট নামে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রহিয়াছে। তদুপরি সেখানে উলূমে সিয়াসিয়া মক্তব (ক'াদীমে মুলকিয়্যা), আইন অনুষদ, ইতিহাস ও ভূগোল অনুষদ এবং একটি কৃষি ইনস্টিটিউট রহিয়াছে যাহাতে বন, কৃষি ও পশু পালন অনুষদ আছে। সামরিক একাডেমীর একটি স্কুল ও য়াদাক-এর প্রাদেশিক দফতরও রহিয়াছে এবং মেডিক্যাল ফ্যাকালটিও হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাধারণ নাগরিকদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহার পার্শ্বে নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর অবস্থিত। এই যাদুঘরে তুর্কী নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহসমূহ ব্যতীত এক বিশেষ কক্ষে বিভিন্ন তরীকা সম্পর্কিত সামগ্রী এবং আরও কিছু কক্ষে প্রাচীন নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত আছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাহাড়শ্রেণীর একটির শীর্ষে আতাতুর্কের সৌন্দর্যমণ্ডিত সমাধি নির্মাণ করা হইয়াছে। আন্‌কারায় দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটি হইল মধ্যপ্রাচ্য কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থনৈতিক দিক হইতে আন্‌কারা সব সময়েই একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। পশম শিল্প বিলুপ্ত হওয়ার পরও আন্‌কারায় চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তৃত এলাকার কৃষিপণ্য সমাগত হইত এবং এই স্থান হইতে সেইগুলি রফতানী হইত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেই সকল বস্তুর এই এলাকায় অভাব ছিল সেইগুলি বাহির হইতে আমদানী করা হইত। এই শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ উহার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সামগ্রীর চাহিদাও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

নূতন নূতন প্রদেশ গঠিত হওয়ার ফলে ১৯২৪ খৃ.-এর পর আন্‌কারা নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয় এবং আন্‌কারায় উহার সদর দফতর স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই প্রদেশের আয়তন ২৮,৯২৩ বর্গ কি. মি.। ইহার ১২টি জেলা (আন্‌কারা, আয়াশ, বালা, বে পাযারী, চুবুক, হায়মানাহ, কেল্‌আ জাক, কেস্‌কীন, কিযিল জাহামাম, কোচ্ হিসার, নাল্লী খান ও পোলাদ্‌লী)। ১৯৩৫ খৃ. আন্‌কারার সদর জেলায় ১২৬টি এবং সমগ্র প্রদেশে আনুমানিক ১১৪০টি গ্রাম ছিল। এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫,৩৪,০২৫। ১৯৬০ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী আন্‌কারা প্রদেশের জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ এবং আন্‌কারা শহরের ৬,৫০,০০০-এর অধিক। বর্তমানে আন্‌কারা তুরস্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Mamboury, Ankara, Guide touristique; (২) J. Deny and R. Marchand, Petit manuel de la Turque nouvelle, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., ২৯৫-৩১৪ (bibliography by G. Vajda); (৩) A. Galanti, Ankara Tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৫০-১; (৪) IA. s.v. (by B. Darkot); (৫) K. Ritter, Erdkunde, ১৮খ., ৪৭২ প.; (৬) Reclus, Nouvelles geogr. univ., ৯খ., ৩৭৩; (৭) M. Galib, Ankara, ইস্তাম্বুল ১৩৪১/১৯২৩; (৮) Pauly-Wissowa, s. v. Ankyra; (৯) G. de Jerphanion, Melanges d'archeologie anatolienne MFOB, ১৯২৮, ১৪৪ প.; (১০) H. Gregoire, in Byzantion, ৪খ., ৪৩৭-৬১, ৫খ., ৩২৭-৪৬; (১১) W. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, London 1890; (১২) P. Wittek, Zur Geschichte Angoras im Mittelalter, Festschrift fur G. Jacob, ১৯৩২ খৃ., ৩৫৯-৩৫৪; (১৩) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত নামাহ্, ২খ., ৪২৬-৪৩; (১৪) হাজ্জী খলীফা, জাহাননুমা, ৬৩৩; (১৫) The travel books of Busbecq, Tavernier, Lucas, Poujoulat, Texier, Barth, A. D. Mordtmann, Humann-Puchstein (for titles see Anadolu); (১৬) W. Anisworth, in JRGS, ১৮৪০ খৃ., ২৭৫ প., ৩১১ প.; (১৭) W. J. Hamilton, Researches in Asia Minor, London, 1842; (১৮) V. Cuinet, Turquie d'Asie, ১খ., ২৪৭ প.; (১৯) আন্‌কারা প্রদেশের সালনামাহ্; (২০) H. Louis, Turkiye cografiyasinin bazi esaslari, Birinci cografya Kongresi, ১৯৪১ খৃ., ২২৩ প.; (২১) Ankara Sehrinin Jausseley, Jansen ve Brix tarafindan yapilan plan ve projelerine ait izahnameler, Ankara 1929; (২২) Realencycl, d. klass, Altertum, Pauly Wissowa swiss, ১খ., ২২২০-২১; (২৩) Strabon, Geographie, ৪খ, ১৮৭ ও ১২খ., ৫১৭, ৫৬৭; (২৪) V. Schultze, Altchristliche Stadte und Landschaften, ২খ., ৩৯২ প.; (২৫) Dictionnaire d'Histoire et de Geographie ecclesiastiques, A. Baudrillard কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৫৩৮ প.; (২৬) A. G. v. Busbeck, Itinera Constantinopolitum et Amasianum (অনু. ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী; তুর্কী অনু. হুসায়ন যাহিদ য়াল্‌চিন, তুর্ক মাক্‌তাব্‌লারী, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ.; (২৭) J. B. Tavernier, Les six voyoges.....প্যারিস ১৬৮১ খৃ.; (২৮) P. de Tournefort, Relation dlun voyage du

Levant, Amsterdam 1712; (২৯) P. Lucas, Voyage du sieur Paul Lucas fait par l'ordre du Roy, প্যারিস ১৭১২ খৃ.; (৩০) P. de Tchihatcheff, Asie mineure, প্যারিস ১৮৫৩-১৮৬৯ খৃ.; (৩১) B. Poujoulat, Voyage dans l/Asie Mineure, প্যারিস ১৮৬০ খৃ.; (৩২) Ch. Texier (Coll. Univers) Asie Mineure, প্যারিস ১৮৬২ খৃ., ৪৭৯-৪৯২; (৩৩) Ph. le Bas, Asie Mineure (Coll, Univers, প্যারিস ১৮৬৪ খৃ.); (৩৪) H. Barth, Reise von Trapezunt.... nach Scutari, গোথা ১৮৬০ খৃ., পৃ. ৭৮; (৩৫) A.D. Mordtmann, Anatolien Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien ১৮৫০-১৮৫৯, Haunover ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৬৭১ প.; (৩৬) G. Perrot, Souvenir d'un voyage en Asie Mineure, প্যারিস ১৮৬৪ খৃ.; (৩৭) K. Humann and O. Puchstein, Risen in Kleinasien und Nordsyrien, বার্লিন ১৮৯০ খৃ.; (৩৮) E . Naumann,Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrats, Munich and Leipzig 1893. পৃ. ১৩৯-১৫২; (৩৯) J.G.C. Anderson, Exploration in Galatia cis Halym (Journ. of the hist. Soc., ১৮৯৯ খৃ., ১৯খ., ৯৭প.; উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পুরাতন নিদর্শনসমূহ; যথাঃ দরগাহ ও শিলালিপির জন্য দ্র. (৪০) G. Perrot, de la Galatie, প্যারিস ১৮৬২ খৃ., পৃ. ২২৭ প.; (৪১) G. Perrot, E. Guillaume and J. Delbet, La Galatie et la Bithynie, প্যারিস ১৮৬২ খৃ.; (৪২) O. Hirschfeld, Zum Monumentum Ancyranum (Arch. Epigr, Mitt. Viena ১৮৫৫ খৃ); (৪৩) J. Mordtman, Marmora Ancyrana, বার্লিন ১৮৭৪ খৃ.; (৪৪) T. Mommsen, Res Gestaedivi Auqusti, বার্লিন ১৮৮৩ খৃ.; (৪৫) A. Domaszewski, Inschriften aus Kleinasien Ancyr, Arch. Epigr, Mitt, ১৮৮৫ খৃ., ৯খ., ১১৩ প.; ইসলামী তুর্কী দরগাহ ও শিলালিপির জন্য দ্র. (৪৬) মুবারাক গালিব, আন্‌কারাহ্ (ইস্তাম্বুল ১৩৪১/১৯২৮); ভৌগোলিক ঘটনাবলীর জন্য নিম্নোক্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলী দ্র. (৪৭) E. Reclus, Nouvelle Geographie Universelle, ৯খ., ৩৭৩; (৪৮) গাযী মুস্‌তাফা কামাল, নুতক; (৪৯) গেনেল নুফূস সায়িমী (১৯৩৫), নাশারিয়া, ৭৫, ২ (আন্‌কারাহ বিলায়িতী) এবং ১৯৪০ খৃ., আদমশুমারীর প্রাথমিক ফলাফল; (৫০) ইস্‌তাতিস্‌তিক য়ায়লাল্‌গী, ১৯৩৯-১৯৪০ খৃ. সংখ্যা ১৫৯, ১১খ.; (৫১) Turkey Facts and Figures, ইসতাম্বুল ১৯৪৯ খৃ.; (৫২) দা.মা.ই, ৩খ., ৪৫০-৪৭৫।

F. Taeschner (E.I.²) / আবদুল বাসেত

আন্‌জাশা (انجشة) ঃ (রা) একজন সাহাবী, আবিসিনিয়ার কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস, তাঁহার কুন্‌য়াঃ ছিল আবূ মারিয়া। সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিয়া উট চালাইতে তিনি ছিলেন পারদর্শী। বিদায় হজ্জের সময়ে গান গাহিয়া উট চালাইতে থাকিলে উট খুব দ্রুত গতিতে চলিতে আরম্ভ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মহিলা যাত্রীদের [যাঁহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণিগণও ছিলেন] প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটু ধীর গতিতে উট চালনা করিতে নির্দেশ দিয়া বলেন, "হে আন্‌জাশা! رويدك سوقك بالقوارير "ধীরে চল, কাচের জিনিসবাহী উট চালাইতেছ ত"!

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৬৭-৬৮, নং ২৬১; (২) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল-গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা, তা. বি., ১খ., ১২১,; নং ২৬১।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আন্‌জুমান (انجمن) ঃ একটি ফার্‌সী শব্দ, যাহা ফিরদাওসীর (৫ম/১১শ) শাহ্‌নামাহ্ গ্রন্থে সভা, পরিষদ ও সেনাদল অর্থে বহুল ব্যবহৃত। আধুনিক অর্থে ইহাদের দ্বারা ধর্মীয় বা সমাজ সংস্কার বিষয়ক সমিতি বুঝায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইরানে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তনকালে আন্‌জুমান দ্বারা রাজনৈতিক দল বুঝাইত। এই সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে তাব্‌রীযের "আন্‌জুমান-ই মিল্লী" বা জাতীয় সংঘ সর্বাধিক খ্যাতিমান দলগুলির অন্যতম। উহা গঠনতন্ত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ১ রামাদান, ১৩২৪/১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৬-এ গঠিত হয়। অনুরূপ উদার উদ্দেশে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রধান প্রধান প্রাদেশিক রাজধানীতে আন্‌জুমান গঠিত হয় (ইরান দ্র.)। পরবর্তী কালে ইরানীরা ইস্‌তাম্বুল, বোম্বাইতে ও বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দ মাতৃভূমির নানা স্থানে আন্‌জুমান গঠন করে। বর্তমানে নামটি দ্বারা প্রধানত জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের সংঘ বা পেশাদারী সংঘ বুঝাইয়া থাকে। ১৩৫৫/১৯৩৬ সনে ফারহান্‌গিস্‌তান-ই ঈরান (ইরান একাডেমী) স্থাপিত হইবার পূর্বেই আন্‌জুমান-ই আদাবী-ই ঈরান (ইরানী সাহিত্য সমিতি) গঠিত হয়। ১৩৪৬/১৯২৬ সাল হইতে আন্‌জুমান-ই আছার-ই আদাবী-ই মিল্লী (জাতীয় স্মৃতিসৌধ রক্ষা সমিতি) পুরাতন গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করে; তন্মধ্যে ফারসী ভাষায় লিখিত আবূ সীনার গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। আন্‌জুমান শব্দটি আজকাল আঞ্চলিক সমিতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আন্‌জুমান-ই খুরাসানীহা (তেহ্‌রানে বসবাসরত খুরাসানের বাশিন্দাদের সমিতি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) As. Fr. B., মে ১৯০৮, ১৭৫-৭৬; (২) Rmm (National Club of Tabriz), মে ১৯-৭, ১-৯; আগস্ট, ১১৬-১৭; জানুয়ারী ১৯০৮, ৮৫, ১৬১; মার্চ ৫৯৭; মে ১৬৭, সেপ্টেম্বর ৭৪৫; অক্টোবর ২৯১; নভেম্বর ৫৩৪; (৩) Women's Club, আগস্ট ১৯০৫, ১৪৫; মে ১৯০৭, ৩১১, ৩৭৯; নভেম্বর ৫৬৯; (৪) Muslim Associations of India, নভেম্বর ১৯০৬, ৭৭-৭৮ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৭, ৫৭৯; জানুয়ারী ১৯০৮, ১৭২; মার্চ ৬০০।

H. Masse (E.I.²) /মুহম্মদ ইলাহি বখশ

তুরস্কেও এই পরিভাষার প্রচলন আছে; তবে শব্দটির উচ্চারণ Endjumen। ইস্‌তাম্বুল নগরীতে ১২৬৭/১৮৫১ সালে মধ্যপ্রাচ্যে

সর্বপ্রথম সাহিত্যানুশীলন ও বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র বা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম রাখা হয় আন্‌জুমান-ই দানিশ। অতঃপর আহ্‌মাদ জাওদাত পাশা (দ্র.)-র অনুপ্রেরণায় ফরাসী একাডেমীর কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্গঠিত করা হইলে চল্লিশজন তুর্কী সদস্য এবং Hammer, Bianchi ও Redhouse প্রমুখ ইউরোপের প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশারদ আরও কয়েকজন পত্র-সদস্য উহাতে গ্রহণ করা হয়। তুরস্কে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান ও তুর্কী ভাষার উন্নয়ন সাধন উক্ত একাডেমীর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৬১/১৮৪৫ সালে তুর্কী সরকারের 'মাজলিস-ই মা'আরিফ' অর্থাৎ শিক্ষা পরিষদে প্রাগুক্ত প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। অতঃপর ১২৬৭, ২৭ রাজাব/ ১৮৫১, ২৬ মে তারিখের এক সরকারী আদেশ দ্বারা উহা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্কের পুনরুজ্জীবনে এই একাডেমী কি ভূমিকা পালন করিবে তাহা নির্ধারণ করিয়া মুস্‌তাফা রাশীদ পাশা ১৯ রামাদান, ১২৬৭/১৮ জুলাই, ১৮৫১ তারিখ প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। অবশ্য দেশে তখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে উহার লক্ষ্য অর্জন প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয় এবং ১২৭৯/১৮৬২ সালে কতিপয় পুস্তক প্রকাশনার প্রতিশ্রুতি দিয়াই প্রতিষ্ঠানটি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পুস্তকগুলির মধ্যে জাওদাত ও ফুআদ পাশার তুর্কী ভাষার ব্যাকরণ, জাওদাত পাশা কর্তৃক লিখিত ইতিহাসের একাংশ ও তাঁহার তুর্কী ভাষায় অনূদিত ইব্‌ন খাল্‌দূন-এর মুকাদ্দিমা রহিয়াছে। ১৯০৮-এর বিপ্লবের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য অনেক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল খৃ. ১৯১১ সনে প্রতিষ্ঠিত উছ্‌মানী ইতিহাস সমিতি (Tarikh-i Othmani Endjumeni)।

আন্‌জুমান নামটি তুরস্কের বিভিন্ন আইন সভায় বিধিবদ্ধ ও শাসনতান্ত্রিক কমিটি বা সমিতি বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইত। এইরূপ একটি সমিতি ছিল ১২৯৯/১৮৮২ সালে স্থাপিত Endjumeni Teftish we-Muayene এবং অন্য একটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার তদারকীর দায়িত্ব লইয়া ১৩২৮/১৯১০ সালে স্থাপিত মা'আরিফ আন্‌জুমান। ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ক্লাবের নামেও আন্‌জুমান-ই উল্‌ফত তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বলিয়া মনে হয়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে আন্‌জুমান নামটির পরিবর্তে তুর্কী বা পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাহ্‌মূদ জাওয়াদ, Maarif-i Umumiyye Nezareti Tarikhce-i-Teshkilat we Idjraati, Istanbul ১৩৩৮ খৃ., ৪৪ প., ২১৩; (২) Lutfi, Tonzimatdan sonra Turkiyede Maarif Teshkilati, T.O.E.M., ১৬শ বর্ষ, নং ৯৪, পৃ. ৩০২; (৩) Cevdet Pasa, Tezakir, ১-১২ (Cavid Baysun সম্পা.), আনকারা ১৯৫৩ খৃ., ৫খ., ১৩; (৪) Server Iskit, Turkiyede Nesriyat Hareketleri Tarihine bir Bakis, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ., ৪০-৪৬; (৫) Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi, ৬খ., আনকারা ১৯৫৪, ১৭০, ১৭৬-৮; (৬) Ebu l-Ula Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden, Ahmet Cevdet Pasa, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., ৩৭-৪১; (৭) A. Ubicini, Lettres sur la Turquie, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ., Letter 9, Document 15; (৮) Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Trimleri, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., ৫২৯-৩৩।

B. Lewis (E.I.[2]) /মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কতিপয় আন্‌জুমান গঠিত হইয়াছে; যথা ঃ

আন্‌জুমান তারাক্‌'কী-ই উর্দূ ঃ ইহা স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স (মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন) দ্বারা ১৯১৩ খৃ. উহার বিজ্ঞান শাখার অধীনে স্থাপিত উপ-সমিতি। স্যার টমাস আর্নল্ড ও মাওলানা মুহাম্মাদ শিব্‌লী নু'মানী যথাক্রমে এই আন্‌জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। হিন্দীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তৎকালীন ভারতে উর্দূকে জনগণের ভাষা (Lingua Franca)-রূপে প্রাধান্য দেয়াসহ উহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনকল্পে প্রধানত এই সমিতি গঠিত হয়। ইহার উদ্যোগে উর্দূ ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিত ও ইংরেজী ভাষা হইতে অনূদিত হয়। সমিতির সদর দফতর প্রথমে আলীগড়ে ছিল। পরে আওরঙ্গাবাদে (দাক্ষিণাত্য) স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় হইতে মাওলাবী আবদুল্‌-হাক্‌ক (বাবা-ই উর্দূ নামে সুবিদিত) উহার পরম উৎসাহী, যোগ্য ও কর্মঠ সম্পাদক ছিলেন। এই নূতন সদর দফতরে হায়দারাবাদ রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া আন্‌জুমান কেবল উর্দূ ভাষায় কিতাব প্রণয়ন ও সম্পাদনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য অনুবাদেও সক্রিয় প্রমাণিত হইয়াছে। উহা ইংরেজী ভাষা হইতে এবং কিছু সংখ্যক গ্রন্থ ফরাসী, আরবী ও ফার্সী ভাষা হইতেও উর্দূতে অনুবাদ করিতে থাকে। তদুপরি আন্‌জুমান ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অনুবাদ করে। এইভাবে আন্‌জুমান খৃ. ১৯১৮ স্থাপিত উছ্‌মানিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যাদির যোগ্য সম্পূরকরূপে ক্রিয়াশীল থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দূ সকল শিক্ষাদান কার্যক্রমের মাধ্যম হওয়ায় আন্‌জুমান সাধারণ পাঠকের পঠিতব্য পুস্তকাদির পরিবর্তে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদে আত্মনিয়োগ করে। ইহা উরদূ নামে একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও সাইন্স (Science) নামে অপর একখানি পত্রিকা পরিচালনা করে। এতদ্ব্যতীত উর্‌দূ বর্ণের ও উর্‌দূ ভাষায় মুদ্রণের উন্নয়ন প্রচেষ্টা আন্‌জুমান অব্যাহত রাখিয়াছে। তবে বিজ্ঞান, দর্শন ও বিভিন্ন পেশা সংশ্লিষ্ট পারিভাষিক শব্দাবলীর যে অনুবাদ তালিকা আন্‌জুমান প্রস্তুত করিয়াছে এবং ইংরেজী Concise Oxford অভিধানের অনুকরণে রচিত উর্‌দূ-ইংরেজী ও ইংরেজী-উর্‌দূ যে অভিধানদ্বয় প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছে পথিকৃৎরূপে তাহাই উহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। খৃ. ১৯৩৬ আন্‌জুমানের সদর দফতর আওরঙ্গাবাদ হইতে দিল্লীতে এবং খৃ. ১৯৪৮ তথা হইতে করাচীতে স্থানান্তরিত হয়। সেইখানে একটি উর্‌দূ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে আধুনিক বিজ্ঞানসহ সকল শিক্ষাদান কার্য উর্‌দূ ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং উহা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত। তারাক্কী-ই উর্‌দূ-র তিনটি সক্রিয় শাখা কলিকাতা, ঢাকা ও সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) **লাহোরের আন্জুমানে হিমায়াতে ইস্লাম ঃ** মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ও তাহাদের সামাজিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে খৃ. ১৮৮৪ স্যার সৈয়দ আহ্মাদের অনুপ্রেরণায় ইহা স্থাপিত হয়। কাযী খলীফা হামীদুদ্দীন উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইহার উদ্যোগে খৃ. ১৯১২ লাহোরে ইসলামিয়া কলেজ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অপর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়— যাহাতে আলীগড় পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলক- ভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষাসহ পাশ্চাত্য শিক্ষা দান করা হয়। উক্ত আন্জুমান, উহার কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাহাদের নেতৃবৃন্দ পাঞ্জাবের মুসলিম জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বালক-বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা করা ছাড়াও উক্ত আন্জুমান একটি মহিলা কলেজ, একটি শিল্প বিদ্যালয়, একটি তিব্বিয়া কলেজ ও চিকিৎসালয় যেখানে আধুনিক ঔষধপত্রের ব্যবহার বর্জিত হয় নাই এবং একটি ইয়াতীমখানা ইত্যাদি পরিচালনা করে। ইশা'আত-ই ইসলাম কলেজ নামে উহার একটি ধর্ম প্রচারমূলক বিদ্যালয়ও রহিয়াছে। উহা "হি'মায়াতে ইসলাম" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও কয়েকটি সুলিখিত পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করে। উহার নিজস্ব একটি ছাপাখানাও রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আন্জুমানে তারাক্কী-ই উর্দূ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (১) A. Bausani, Oriente Moderno, খৃ. ১৯৫৫, ৩৩১-৪৩, ৫৩৬-৪৮; (২) রামবাবূ সাকসেনা (অনু. উর্দূ মুহাম্মাদ 'আসকারী, নওলকিশোর, লক্ষ্ণৌ ১৯২৯ খৃ., ৩৯২-৯৪। ২য় আন্জুমান সম্পর্কে দ্র. ড. জামালুদ্দীন Pakistan, Heyworth-Dunne, কায়রো খৃ., ১৯৫২, ৩৮।

F. Rahman (E.I.[2]) /মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আন্জুমান খুদ্দাম-ই কা'বা (انجمن خدام كعبة) ঃ স্বাধীনতা-পূর্বকালে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের মুসলিমদের একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্থা ১৩৩২/১৯১৪-এর প্রথমাংশে ইহা স্থাপিত হইয়া প্রায় ছয় বৎসরকাল স্থায়ী থাকে। দরিদ্র মুসলিমদেরকে হজ্জ সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়াও প্যান-ইসলামী আন্দোলনের উন্নতি সাধনে ইহা অনেক সহায়ক হইয়াছিল।

মূলত উপমহাদেশের বহিস্থ মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই আন্জুমানটি স্থাপিত হয় ঃ সেপ্টেম্বর ১৯১১ সালে ইতালী ত্রিপোলির তিনটি শহর দখল ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; অক্টোবর ১৯১২ সালে বলকান লীগ কর্তৃক তুরস্কের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ ১৯১৩ খৃ. শেষ হয়। খৃস্টান শক্তিবর্গের এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে ও বলকান যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের উপর তাহাদের নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী শ্রবণে উপমহাদেশের মুসলিমগণ তাহাদের নিজেদের ও অন্যান্য দেশের মুসলিমদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত শংকিত হইয়া পড়ে। জানুয়ারী ১৯১৩ শায়খ মুশীর হুসায়ন কিদ্ওয়াঈ ও লক্ষ্ণৌর পীর মাওলানা আবদুল বারী (দ্র.) 'হ'ারামায়ন শারীফায়ন"(মক্কা ও মদীনার হারাম শরীফদ্বয়)-কে শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত আনজুমান খুদ্দাম-ই কা'বা নামে একটি সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা তৈরি করেন ঃ দশ কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনী গঠন ছাড়াও জাহাজ ইত্যাদি ক্রয় করা হইবে ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ রক্ষার্থে। স্কীমটি কলিকাতার "আল-হিলাল" পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য ইহার সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (দ্র.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ইহা প্রকাশ করিলেন না এই কারণে যে, তিনি নিজেই অনুরূপ উদ্দেশে একটি গোপন সোসাইটি গঠনের স্কীম তৈরি করিয়াছিলেন। ৩১, মার্চ ১৯১৩ মাওলানা শাওকাত আলী (দ্র.)-র এক বক্তৃতায় সর্বপ্রথম জনসাধারণের নিকট আবদুল বারীর স্কীমটি ঘোষণা করা হয়। ইহা ও মাওলানা আযাদের স্কীম উভয়ই ১৯১৩-এর ৯, ২৩ ও ৩০ তারিখে আল-হিলালে প্রকাশিত হয়। স্কীম দুইটি অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হইল। মে ১৯১৩ আবদুল-বারীর স্কীমটি সংশোধন করা হয়। ১৯১৪ খৃ. প্রথমদিকে আলী ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক লক্ষ্ণৌতে আবদুল-বারীর বাসভবনে আয়োজিত এক সভায় ইহার সর্বশেষ সংশোধন সম্পন্ন করা হয়। ইহাতে আন্জুমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিহাদের স্থলে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (Singh, Freedom Movement in Delhi, পৃ. ২২১-২৪; Robinson, Separatism Among Indian Muslims, পৃ. ২০৮-১২)।

ফিরিঙ্গী মহল (দ্র.)-এর পীর মাওলানা আবদুল বারী আন্জুমানের খাদিমুল-খুদ্দাম, শায়খ মুশীর হুসায়ন কিদ্ওয়াঈ ও মাওলানা শাওকাত আলী ইহার যুগ্ম সচিব ও লক্ষ্ণৌর হাকীম আবদুল-ওয়ালী, ব্যারিস্টার ড. নাজীরুদ্দীন হুসায়ন ও কমরেড-এর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (দ্র.), "মুস্তামিদীন খাদিমি'ল-খুদ্দাম" নিযুক্ত হন (Freedom, পৃ. ২২৪)।

আন্জুমানের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইল আলিমদের ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য মুসলিম রাজনীতিকগণ (Young Party)-এর সমন্বয়ে। এই কমিটির সদস্য ছিলেন 'আবদুল বারী (লক্ষ্ণৌ), হাকীম আবদুল ওয়ালী (লক্ষ্ণৌ), মুহাম্মাদ আলী (দিল্লী), মুহাম্মাদ গুলাম মুহইদ্দীন (কানপুর), মৌলভী গুলাম মুহাম্মাদ (হুশিয়ারপুর), নওওয়াব ওয়াকারুল-মুলক (আমরুহা), ড. নাজীরুদ্দীন হাসান (লক্ষ্ণৌ), মাওলানা শাহ আহমাদ আশরাফ (Kacawca), মাওলানা আবদুল মাজীদ কাদিরী (বাদাউন), মাওলানা মিয়া খাজা আহমাদ (রামপুর), ডা. এম. এ. আনসারী [দ্র.] (দিল্লী), নওয়াব বাশীরুদ্দীন আহমাদ (হায়দরাবাদ), কাযী ওয়াহীদুদ্দীন (বারাবানকী), মুশীর হুসায়ন কিদ্ওয়াঈ (লক্ষ্ণৌ) ও শাওকাত আলী (রামপুর) [Separatism]।

আন্জুমানের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করা হয় দিল্লীতে। প্রতিটি প্রদেশে ও ইহার জেলাসমূহে আন্জুমানের শাখা খুলিবার ও শাখা-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

আন্জুমানের দুই প্রকারের সদস্য থাকিবেন ঃ (১) "খুদ্দাম-ই কা'বা" যাঁহারা চাঁদা দিবেন, আন্জুমানের নীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন এবং (২) "শায়দাঈয়ান-ই কা'বা" যাহারা কা'বার খিদমতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন এবং আন্জুমানের ইউনিফরম পরিধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবেন; দরিদ্র হইলে তাহাদের ও তাঁহাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ভার আন্জুমান বহন করিবে (Separatism, পৃ. ২০৮-২০৯; তু. Freedom, পৃ. ২২৪)।

আন্জুমানের সদস্যদের ও মুসলিম জনসাধারণের চাঁদার টাকার অর্ধাংশ হ'ারামায়ন-এর তত্ত্বাবধায়ক মুসলিম রাষ্ট্রকে দেওয়া হইবে, এক-চতুর্থাংশ আন্জুমানের প্রশাসনিক কাজে, ইয়াতীমখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত সোসাইটিগুলির কল্যাণে ব্যয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ হজ্জ ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে (Separatism, পৃ. ২০৮-২০৯; তু. Freedom, পৃ. ২২৪)। আন্জুমানের লক্ষ্য (মক্কা ও মদীনা রক্ষা করা) অর্জনের জন্য তিনটি শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা হইবে ঃ (ক) সাধারণ মুসলিমদের নিকট আন্জুমান ইহার লক্ষ্য ও আদর্শসমূহ প্রচার করিবে, তাহাদের ইহাতে যোগদানের আহ্বান জানাইবে এবং হারামায়ন শারীফায়ন-এর অকপট খিদ্মত করিতে তাহাদেরকে অনুপ্রেরণা দিবে। (খ) আন্জুমান হ'ারামায়ন শারীফায়ন-এর প্রতিবেশীদের মধ্যে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাইবে, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহাদের মধ্যে একতা ও যোগাযোগ বর্ধিত করিবে এবং হ'ারামায়ন শারীফায়ন-এর রক্ষকের প্রতি আনুগত্য ও সাহায্য দানে তাহাদেরকে সম্মত করাইবে। (গ) আন্জুমান অমুসলমান ও হ'ারামায়ন শারীফায়ন-এর মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি সাধন ও তাহাদের সহিত পারস্পরিক যোগাযোগের উপায়সমূহ সহজ ও বর্ধিত করিবে (দাস্তুরুল-'আমাল, দিল্লী ১৯১৪; তু. Freedom, পৃ. ২২৫)।

আন্জুমানের সাময়িকীর (দিল্লী হইতে প্রকাশিত) ১ম প্রকাশে 'আবদুল বারী আন্জুমানের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন এবং ইহা অর্জনের উপায়সমূহ উল্লেখ করেন (Freedom, পৃ. ২২৫)। আন্জুমানের কয়েকজন প্রচারকও নিযুক্ত করা হয়, যাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাগ্মী 'আল্লামা আযাদ সুব্হানী (দ্র.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য (Separatism, পৃ. ২১৪-১৫)।

প্রথম ১৮ মাসে আন্জুমানের সদস্য সংখ্যা ২৩ হইতে ৩৪১৩-তে বর্ধিত হয়; আরও এক বৎসর পর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়িতে থাকে। ১৩৩২/১৯১৪-এর মধ্যেই আন্জুমান পরবর্তী কালে স্থাপিত যে কোন ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংস্থা হইতে দ্রুততর গতিতে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম মহিলাগণও (যথা আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা ও ডাঃ আনসারীর স্ত্রী) ইহাতে যোগদান করেন (Separatism, পৃ. ২১০)।

আন্জুমানের কেন্দ্র ফিরিঙ্গী মহলে ছিল বলিয়া এই মহলের সকল সহযোগীদের ইহার সম্পৃক্ত হওয়া স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত আন্জুমানের প্রতি আকৃষ্ট হন, দেওবান্দ (দ্র.) ও বেরেলী দলদ্বয়ের নেতৃস্থানীয় 'উলামা ব্যতীত, সর্বশ্রেণীর আলিমগণ ঃ (১) স্থানীয় প্রভাবশালী উলামা; (২) বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের আলিমগণ; (৩) সারা ভারতের (কলকাতা, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, সিন্ধু, বিহার ইত্যাদি) 'আলিমগণ। 'আলিমদের সদস্য হওয়ার অর্থ শুধু সদস্যদের তালিকাভুক্ত হওয়া নয়, বরং তাঁহাদের অনেকেই স্থানীয় শাখাগুলির পরিচালক বা কমিটির সদস্য ছিলেন এবং আবদুল-বারী ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। সদস্য হওয়ার অর্থ ইহাও নয়, সকলে আন্জুমানের আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি মানিয়া চলিতেন। দুইটি কারণে দেওবান্দ ও বেরেলীর 'উলামা আন্জুমানের বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া দেন ঃ (১) ফিরিঙ্গী মহলের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহাদের বিরোধ বিদ্যমান ছিল; (২) যে কোন দল ও সম্প্রদায়ের আলিমগণ আন্জুমানের সদস্য হইতে পারিতেন বলিয়া দেওবান্দীদের মতে এই সংস্থাটি ইসলামের সহায়ক তো নয়, বরং ক্ষতিকরও বটে (Separatism, পৃ. ২৭৯-৮০)।

'আলিমদের তুলনায় আন্জুমানের সহিত সম্পৃক্ত নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণ ও মুসলিম যুবকদের সংখ্যা ছিল বেশী। এই দুই শ্রেণীর সদস্যদের সঠিক ধর্মীয় অনুভূতিই ছিল আন্জুমানের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ। আর্থিক সুবিধা লাভ তাহাদের উৎসাহ বর্ধনে কিঞ্চিৎ সহায়ক হইয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শায়দাঈগণ বেতন পাইতেন। দরিদ্র শায়দাঈগণের নিজেদের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যয়ভারও আন্জুমান বহন করিত। আন্জুমানের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই সচ্ছল। সদস্যগণ ছাড়াও মুসলিম জনসাধারণ, এমনকি গরীব মুসলমানগণও কম্‌রেড পত্রিকার চাঁদা দেওয়ার বারংবার অনুরোধে সাড়া দেয়। ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে তুরস্কের জিহাদ, প্যান-ইসলামী আন্দোলনের উন্নতি সাধন ও সর্বোপরি "ইসলাম বিপদাপন্ন" ডাক এমনকি গরীবদেরকেও চাঁদা দিতে উদ্বুদ্ধ করে (Separatism, পৃ. ১৮৫, ২১৪-১৫)।

আন্জুমানের দ্রুত সদস্য বৃদ্ধির ও বিপুল অর্থ সংগ্রহের সহিত ইহার কার্যকলাপের পূর্ণ সংগতি ছিল না। ইহা বৃটিশ সরকারের স্বীকৃতি লাভে অসমর্থ হয়; সরকার ইহাকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং ইহার বিলুপ্তি কামনা করে; এমনকি আবদুল-বারীর একখানা সামান্য সুপারিশপত্র দেওয়ার অনুরোধও সরকার প্রত্যাখ্যান করে। হ'ারামায়ন শারীফায়ন-এর তৎকালীন রক্ষক তুরস্কের নিকট কোন অর্থ পাঠান হয় নাই। ইয়াতীমদেরকেও কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই। মুসলিমদের জন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় নাই। কেবল হজ্জের ব্যাপারে আন্জুমানের লক্ষ্য কিছু পরিমাণে অর্জিত হইয়াছিল। হজ্জের পথের অবস্থারও খবরাদি দেওয়া হইত। শাওকাত 'আলী আন্জুমানের ইউনিফরম পরিধান করিয়া হাজ্জীদের খিদমত করিতেন। তুরস্কের সাহায্যে একটি পূর্ণাংগ জাহাজ কোম্পানী স্থাপন করিয়া তিনি হাজ্জীদের পরিবহণে ইউরোপীয়ানদের একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট করিতে সমর্থ হন (Separatism, পৃ. ১১০-১১)।

আন্জুমানে ধীরে ধীরে দুর্নীতি ঢুকিয়া পড়ে। ইহার নীতিমালার ৮ম অনুচ্ছেদ মুতাবিক শায়দাঈগণ আন্জুমানের ব্যয়ে জীবিকা নির্বাহ করিত, কিন্তু তাহারা এই অনুচ্ছেদটির অপব্যবহার করিয়া বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতে থাকে বলিয়া অভিযোগ উঠে। ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ আন্জুমানের দিল্লীর শাখা কমিটির ম্যানেজার হাফিজ আবদুর-রাহীম কেন্দ্রীয় কমিটির আর্থিক দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন করিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ধমক দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির আবদুল মাজীদ আসিয়া জেলা কমিটির আবদুর রহীমের সহিত কলহ ও মারামারিতে লিপ্ত হন। উলামা ও ধার্মিক ব্যক্তিগণের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে হজ্জের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আন্জুমানের প্রয়োজন আর তেমন রহিল না। আবদুর রহীমের যুদ্ধকালের জন্য দিল্লীর অফিস বন্ধ ঘোষণা করেন। অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদের দরুন আন্জুমানের কাজ অনেকাংশে ব্যাহত হয় (Separatism, পৃ. ১৮৭, ২১১)।

জুন ১৯১৫ সালে আলী ভ্রাতৃদ্বয় বন্দী হওয়ায় আন্জুমানের কাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংস্থাটির জন্ম হইতেই শাওকাত 'আলী ইহার সচিব ছাড়াও একজন প্রভাবশালী সদস্য ও সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। তাঁহার অপসারণের ফলে আন্জুমানের কার্যাবলী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কেন্দ্রীয় কমিটির আবদুল মাজীদ কর্তৃক ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। মার্চ ১৯১৬ সালে আন্জুমানের প্রধান কেন্দ্র দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ-এ স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় মাওলানা আবদুল-বারীর এক কর্মচারী বই-পুস্তক ও দলীল-পত্রাদি বুঝিয়া লয় (Freedom, পৃ. ২৩০)।

১৩৩৬/জানুয়ারী ১৯১৮ মাওলানা আবদুল বারী আন্জুমানকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তখন ইহার হেড কোয়ার্টার ছিল লক্ষ্ণৌতে, তাঁহার অধীনে ইহার লক্ষ্য ছিল মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করা (নাঈ রাওশ্নী, এলাহাবাদ, ১১ জানুয়ারী, ১৯১৮; হাম্দাম, লক্ষ্ণৌ, ২৭ জানুয়ারী ১৯১৮)। তিনি সতর্কতার সহিত ঘোষণা করিলেন, শাওকাত 'আলীকে (মুক্তির পর) আন্জুমানের সহিত জড়িত হইতে দেওয়া হইবে না। ইহা সত্ত্বেও আনজুমানের দুর্নামের কারণে কেহ ইহার সহিত আর সম্পর্ক রাখিতে চাহিল না (হাম্দাম, লক্ষ্ণৌ, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮)।

আন্জুমানের সুফল ঃ (১) হাজ্জীদের অবস্থার উন্নতি; (২) আন্জুমানের শিপিং কোম্পানীতে মুসলিম যুবকদের কর্মসংস্থান; (৩) বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ভুক্ত 'আলিমগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, যাহার ফলে পরবর্তী কালে খিলাফাত আন্দোলন (দ্র.) জন্মলাভ করে; (৪) 'উলামা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য মুসলিম রাজনীতিক দল (Young Party)-এর মধ্যকার বিরাজমান ব্যবধান দূরীভূত হওয়া। আন্জুমানের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া উলামা ও নব্য মুসলিম রাজনীতিকগণ একত্রে কাজ করিয়াছেন বলিয়া এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এ যাবৎ যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুটা দূরীভূত হইয়া যায়। আবার তাহাদের মাধ্যমেই মুসলিম জনসাধারণের সহিত আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য মুসলিম রাজনীতিকগণের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইয়া উঠে (Separatism, পৃ. ২৭৯, ২৮১ প.)। ইহাও পরবর্তী কালে খিলাফাত আন্দোলনের সহায়ক হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims : The Politics of the United Provinces, Muslims 1860-1923, কেম্ব্রিজ (ইংল্যান্ড), ১৯৭৪ খৃ.; (২) Sangat Singh, Freedom Movement in Delhi, দিল্লী ১৯৭২ খৃ.; (৩) Gail Minault, The Khilafat Movement, দিল্লী ১৯৮২ খৃ.; (৪) Syed Sharifuddin Pirzada, Foundations of Pakistan, All-India Muslim League Documents, ১খ., ঢাকা তা. বি.; (৫) মাওলাবী 'ইনায়াতুল্লাহ, রিসালা-ই হ'াসরাতিল আফাক বা ওয়াফাত মাজ্মূ'আতিল-আখ্লাক, লক্ষ্ণৌ তা. বি, পৃ. ১৬-১৭; (৬) আন্জুমান খুদ্দাম-ই-কা'বা কা দাস্তূরুল আমল, দিল্লী ১৯১৪ খৃ.; (৭) নাঈ রাওশ্নী, এলাহাবাদ, ১১ জানুয়ারী ১৯১৮; (৮) হাম্দাম, লক্ষ্ণৌ ২৭ জানুয়ারী, ১৯১৮ খৃ.।

ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আন্জুমান মফিদুল ইসলাম (انجمن مفيد الاسلام)ঃ ১৯০৫ খৃ. কলিকাতায় স্থাপিত। প্রধান উদ্দেশ্য "শিক্ষা ও কৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিমগণের সামাজিক সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করা।" তৎকালীন বহু নিঃস্বার্থ, জাতির খিদমতে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় শাখা স্থাপনের পূর্বে কলিকাতায় আঞ্জুমানের সভাপতিদের মধ্যে বাংলাদেশের সুপরিচিত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ বাহাদুর (১৯১০-১১), নওয়াব সায়্যিদ নওয়াব আলী চৌধুরী (দুইবার ঃ ১৯১২, ১৯১৪-৩০), জনাব এ. কে. ফজলুল হক (চারবারঃ ১৯১৩, ১৯৩৫, ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৪১-৪৫)। প্রথমদিকে আন্জুমানের অফিস ছিল বিভিন্ন স্থানে ভাড়া করা বাড়ীতে। ১৯১৬ সনে আন্জুমান উহার বর্তমান স্থান ৩১ নং আইস ফ্যাক্টরী লেন-এ স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে উহা মুফীদুল ইসলাম লেন নামে পরিচিত। প্রধানত মরহুম নওয়াব সায়্যিদ নওয়াব 'আলী চৌধুরীর প্রচেষ্টায় আন্জুমান অংগনাদিসহ উহার অফিস গৃহের মালিক হইতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য কলিকাতা আঞ্জুমানের সুনাম দেশে বিদেশে সুবিদিত ছিল। মুসলমানদের লা-ওয়ারিছ লাশ শারী'আত মুতাবিক দাফন করা আঞ্জুমানের একটি কর্তব্য ছিল এবং এখনও আছে। কলিকাতায় আন্জুমান অনাহূতভাবে বিদেশ হইতেও প্রশংসা ও আর্থিক সাহায্য পাইত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সাম্প্রদায়িক দাংগায়, বিশেষত বিভাগ-পূর্ব কলিকাতায় কুখ্যাত মুসলিম নিধনযজ্ঞের সময় আঞ্জুমানের অমূল্য খিদমতের কথা তখনকার দিনে যাহারা কলিকাতায় ছিলেন বা সেই স্থানের ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাহারা কখনও ভুলিতে পারিবেন না (আন্জুমান মফিদুল ইসলামের রিপোর্ট, ঢাকা ১৯৭৬-৭৭, পৃ. ৪. স্থা.)।

ঢাকায় আন্জুমান মুফীদুল ইসলাম ঃ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা হইতে ঢাকায় আগত কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা আন্জুমান মুফীদুল ইসলাম-এর সহিত পরিচিত এবং উহার কর্মতৎপরতার সহিত জড়িত ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজন ঢাকায় উহার একটি শাখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কলিকাতার আন্জুমান কর্তৃপক্ষ সাগ্রহে প্রস্তাবটি সমর্থন ও প্রাথমিক ব্যয় বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। সংস্থার সুষ্ঠু সংগঠনের জন্য কলিকাতার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা (জনাব এস. এম. সালাহুদ্দীন সাহেব)-কে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। জনাব এ. এম. সালীমুল্লাহ ফাহ্মী প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী কর্মী ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে ঢাকায় আঞ্জুমানের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুত্রাপুর লোহার পুলের পূর্ব পাড়ে এস. কে. দাস রোড (গেণ্ডারিয়া)-য় উহার অফিস স্থাপিত হয়। বর্তমানে উহার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর স্থাপিত অফিস সিদ্ধেশ্বরী রোডে (কাকরাইল মোড়ে) অবস্থিত।

প্রথমিকভাবে কলিকাতার আন্জুমান কর্তৃক মনোনীত একটি বিশেষ কমিটির হাতে ইহার কার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হয় যাহা খৃ. ১৯৪৯ সনের শেষ পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধ লেখক সভাপতি মনোনীত হইয়াছিল, পরে আর একবার ১৯৫৮, সেপ্টেম্বর হইতে জুন ১৯৬৭ পর্যন্ত নির্বাচিত সভাপতি ছিল। ঢাকা আঞ্জুমানের প্রথম নির্বাচিত

সভাপতি ছিলেন তৎকালীন স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯৫০-১৯৫৫)। ১৯৫০ সনের প্রথম হইতেই ঢাকার আন্জুমান স্বতন্ত্র সংস্থারূপে পরিচালিত হইতেছে। তবে তখন কলিকাতা হইতে আগত এবং কলিকাতা আঞ্জুমানের অনুমোদন লইয়া উহার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে এই সংস্থার সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসাবে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম সভাপতির পরে প্রায় সমস্ত সভাপতিই ছিলেন হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের জজ। শেষ-জজ সভাপতি ছিলেন জাস্টিস এ. এফ. এম. আহসানউদ্দীন চৌধুরী (সুপ্রীম কোর্ট) যিনি পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মনোনীত হইয়াছিলেন।

ঢাকায় আন্জুমান মুফীদুল ইসলাম ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিতে এবং ইহার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের পরিধি সম্প্রসারিত হইতে থাকে। তবে অন্যান্য সংস্থার মত আন্জুমানকেও ঈর্ষাকাতর লোকের চক্রান্তের শিকার হইতে হয়। সুখের বিষয়, সরকারী তদন্ত আঞ্জুমানের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখে।

আঞ্জুমানের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বাধ্য হইয়া ১৯৫২ হইতে ১৯৬৭ পর্যন্ত ঢাকার বাহিরে থাকিতে হয়। তখন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব হিদায়াতুল্লাহ্ অবৈতনিক প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ চালাইয়া যান। এই সময় কেবল দাফন বিভাগই প্রধানত কর্মতৎপর ছিল। ১৯৬৭ সনের ফেব্রুয়ারী প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফিরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে উহার সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম পুনরায় শুরু করেন (পূ. রিপোর্ট, পৃ. ১০)। বর্তমানে নিম্নলিখিত কাজ চলিতেছে ঃ

১। বিনা মূল্যে লা-ওয়ারিশ লাশ দাফন।

২। ফজলুল হক দাতব্য সমিতি ঃ দুঃস্থ ও অসহায়দের প্রধানত সাময়িক সাহায্য দান।

৩। দারুস্ সালাম ঃ দুঃস্থ, অনাথ শিশু ও নারীদের আশ্রয় গৃহ পরিচালন।

৪। ফজলুল হক মহিলা কলেজ (গেণ্ডারিয়া) পরিচালন।

৫। জামীলুর্ রাহ্মান ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল স্থাপন।

৬। মুফীদুল ইসলাম লাইবেরী ও হাবীব ফকীর পাঠাগার পরিচালন।

৭। মাতৃকল্যাণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র।

৮। বুনন, সেলাই ও নক্শা করা প্রশিক্ষণ দান।

৯। বিনা মূল্যে সার্বক্ষণিক এম্বুলেন্স সার্ভিস।

আন্জুমান ইতিমধ্যে কতিপয় শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যথাঃ দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা, নাটোর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুরে শাখা স্থাপনের প্রস্তুতি চলিতেছে।

সেবামূলক শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনে আন্জুমানকে পুরস্কৃত করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইংরেজী ভাষায় ঢাকায় মুদ্রিত আন্জুমান মুফীদুল ইসলামের কার্যবিবরণী ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮; (২) ঐ, ১৯৭৬-৭৭; (৩) ঐ, ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯।

আ. ফ. মু. আবদুল হক ফরিদী

আন্জুমান মুআয়্যিদিল ইসলাম (انجمن مؤيد الاسلام)ঃ অবিভক্ত ভারতে ফিরিঙ্গী মহলের 'আলিমগণ লক্ষ্ণৌতে আন্জুমানে ইসলাহ নামে একটি স্বল্পকাল স্থায়ী ক্ষুদ্র সংস্কার সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর, সেই বৎসরই তাঁহারা লক্ষ্ণৌতে ব্যাপক কর্মসূচী লইয়া অপর একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন এবং ইহার নামকরণ করেন আন্জুমান মু'আয়্যিদিল ইসলাম (Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England 1974, p. 276)। এই সংগঠনটি প্রায় এক যুগ স্থায়ী ছিল।

তদানীন্তন ভারতে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ও রাজনীতি ভারতের প্রধান প্রধান উলামা সম্প্রদায়ের নজরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি হুমকিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল ভারত শী'আ কন্ফারেন্স (স্থা. ১৯০৭ খৃ.) ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম সমিতি, যথা আন্জুমান-ই ইস্লাহ আনসার (স্থা. ১৯১০ খৃ.) গঠিত হয়। একই কারণে লক্ষ্ণৌতে আন্জুমান মুআয়্যিদিল ইসলাম সংগঠনটিও প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আন্জুমানের সংবিধান ছিল নিম্নরূপ ঃ আন্জুমানের উদ্দেশ্য তিনটিঃ (১) বৃটিশ সরকারের আইনের আওতার ভিতরে থাকিয়া ভারতের মুসলিম সমাজের সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা; (২) শারী'আতের বিধিনিষেধের আলোকে সকল পার্থিব বিষয়ে উন্নতি লাভের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য করা; ও (৩) ভারতের মুসলিম সমাজে শারী'আতের বিধি নিষেধ প্রচার করা এবং ইহার প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করা। আন্জুমানের সদস্য পদের বার্ষিক চাঁদা হইবে মাত্র তিন টাকা। সদস্য হইবার অধিকার শুধু ফিরিঙ্গী মহল ও ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কেবল সদস্যগণই নূতন সদস্য পদের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। সদস্যগণ এমন কোন কাজ করিবেন না যাহা ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বিতর্কের কারণ হইতে পারে বা যাহার ফলে সংস্থার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহারা ধর্মীয় সীমার বাহিরে স্বাধীন চিন্তা হইতেও বিরত থাকিবেন। শারী'আতের আলোকে মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সংস্কার সাধন ও শারীআত বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের সংশোধন করার চেষ্টা করা প্রত্যেক সদস্য তাঁহার অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে আন্জুমানের শাখা স্থাপন করা যাইবে। সদস্যগণ প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবেন। ইহা লক্ষ্ণৌ ছাড়া ভারতের অন্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই সভা সাধারণ সভার বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারিবে, যাহা সদস্য বহির্ভূত মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ পীর মাওলানা আবদুল-বারী ও সালামাতুল্লাহ যথাক্রমে আন্জুমানের সভাপতি ও সচিব থাকিবেন। ঐ, পৃ. ২৭৬-৭৭: Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi 1982, p. 34)।

ভারতের বিভিন্ন শহরে আন্‌জুমানের অফিস স্থাপন করার ব্যবস্থা সংবিধানে থাকিলেও কার্যত লক্ষ্ণৌ ছাড়া অন্য কোন শহরে ইহার কোন অফিস খোলা হয় নাই (ঐ, পৃ. ৩৪)। অবশ্য লাহোর, বিহার ও অন্যান্য স্থানের 'আলিমগণের সহিত আন্‌জুমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু যুক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান উলামা সম্প্রদায় (দেওবান্দী 'উলামা) সর্বদা ফিরিঙ্গী মহলের বিরুদ্ধবাদী ছিল বলিয়া আন্‌জুমানেরও বিপক্ষে ছিল (Robinson, Separatism, p. 285)। লক্ষ্ণৌ হইতেই আন্‌জুমানের সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালান হইত।

তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আন্‌জুমান প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাহিরের মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণেও ইহার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতের নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণ আন্‌জুমানের সহিত একযোগে কাজ করেন। ১৯১২ খৃ. হইতে ইঁহারা বৃটিশ সরকারকে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় বাধ্য করার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারা আন্‌জুমানকে সেই উপায় হিসাবে গ্রহণ করিলেন। 'আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলী ও মাওলানা শাওকাত আলী) কর্তৃক লাল হিলাল (Red Crescent) তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে আন্‌জুমানের সভাপতি ও সদস্যগণ উদ্যমের সহিত অংশগ্রহণ করেন (Minault, Khilafat, p. 34; Robinson, Separatism, p. 281)। ইহা ছাড়া আন্‌জুমান বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিল যেন তুরস্কের উপর চাপ দেওয়া হইতে সরকার বিরত থাকে। মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য আন্‌জুমান-ই খুদ্দাম-ই কাবা নামক সংস্থার কাজেও আন্‌জুমান অংশগ্রহণ করে। আন্‌জুমানের সভাপতি এই আন্‌জুমানের খাদিমুল-খুদ্দাম নিযুক্ত হন। নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণও আন্‌জুমানের কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে আন্‌জুমান ও আন্‌জুমানের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণ এবং ফিরিঙ্গী মহলের 'উলামা ও তাঁহাদের সহচরগণ একযোগে মুসলিম স্বার্থের জন্য কাজ করিয়া যান (Robinson, Separatism, p. 281 f.)।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিহারের শাহাবাদ জেলায় যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় অসংখ্য মুসলমান শহীদ হইয়াছিল ইহার প্রতিবাদে আন্‌জুমানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্‌জুমানের সভাপতি দাঙ্গার সংবাদে অতিশয় মর্মাহত হন। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিলে বহু মুসলমান জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এই চরম পন্থা ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর ৩০ অক্টোবর তিনি লক্ষ্ণৌতে আন্‌জুমানের সভা আহ্বান করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট 'আলিমদেরকে সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সভায় ভারত সচিব মন্টেগু-র নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নেতৃস্থানীয় নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণ, শী'আ মুজতাহিদগণ ও দেওবান্দের 'উলামা' ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের উলামা এই সভায় যোগদান করেন। ভারত সচিবের সমীপে পেশ করার জন্য অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্রের একটি খসড়া আন্‌জুমানের সদস্যগণ প্রণয়ন করেন। খসড়াটি ছিল সম্পূর্ণ আপোষহীন ও হিন্দুদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন (Indian Daily Telegraph, Lucknow, 6. November 1917)। খসড়াটি নব্য রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আলীগড় ও বিহার হইতে আগত নব্য মুসলিম রাজনৈতিক নেতাগণ আবেদনপত্রের খসড়া হইতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ও আপোষহীন অংশগুলি বাদ দেওয়ার জন্য ভীষণ চাপ প্রয়োগ করিলে আন্‌জুমানের সদস্যগণ ইহাতে সম্মত হন। ফলে খসড়া আবেদনপত্রের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং ইহা হিন্দুদের উপর আক্রমণাত্মক না হইয়া বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যকলাপ শারী'আত বিরোধী এই মনোভাব প্রকাশের রূপ লাভ করিল। ফলে আন্‌জুমানের চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না (Robnson, Separatism, pp. 284 ff.)।

আন্‌জুমানের সভাপতি সংকটময় মুহূর্তে বলিতেন, "প্রথমে আমরা মুসলমান ও পরে ভারতীয়।" এই উক্তি হইতে আন্‌জুমানের অদম্য ইসলামী মনোভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এইরূপ মনোভাব লইয়াই সদস্যগণ আন্‌জুমানের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তী কালে খিলাফাত আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিলে আন্‌জুমান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম সমিতি খিলাফাত আন্দোলনের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Franci Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England 1978; (২) Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi 1982; (৩) Indian daily Telegraph, Lucknow, 6, November 1917; (৪) ড. আবদুল বারী, A Histoty of Freedom Movement, Karachi 1959; (৫) সায়্যিদ শারীফুদ্দীন পীরযাদাহ, Foundatins of Pakistan, All-India Muslim League Documents, vol. I, Dhaka, n. d.

ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আন্‌তাকিয়া (انطاكية) : Antiocheia-এর 'আরবী রূপান্তর। ইহা উত্তর সিরিয়ার অরোন্তেস (Orontes= عاصى) নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল হইতে ইহার দূরত্ব ১৪ মাইল। খৃ. পূ. ৩০০ অব্দে প্রথম সেলিউকাস (Seleucus) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং খৃ. পূ. ৬৪ অব্দে পম্পী কর্তৃক অধিকৃত এই শহর এশিয়ার বৃহত্তম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোমক নগরীতে পরিণত হয়। এখানে স্থাপিত হয় রোমক সাম্রাজ্যের এশীয় প্রদেশসমূহের রাজধানী। সাসানী সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর হইতে ইহার ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে এবং ইহার ফলে দিজলা-ফুরাত অববাহিকার উপর নগরীটির রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়া যায় এবং বারংবার ইহা পারস্যবাসীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। প্রথমবারের মত ইহা ২৫৮ ও ২৬০ খৃ. প্রথম শাপূর কর্তৃক অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়। তিনি এখানকার বহু অধিবাসীকে সুসিয়ানা (তু. আত্-তাবারী, ১খ., ৮২৭)-র জুন্দীশাপূর (দ্র.)-এ অপসারণ করেন। ২৬৬ হইতে ২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা পাল্‌মীরা (Palmyra/ تدمر)-র রাণী যেনোবিয়া-র

শাসনাধীন থাকে। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম খুসরাও (আনূশীরওয়ান) কর্তৃক আক্রমণ ও ধ্বংস সাধন এবং সেই সঙ্গে ইহার অধিবাসীদের পারস্য সাম্রাজ্যে নির্বাসনের পূর্ব পর্যন্ত অনবরত অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ও সর্বনাশা ভূমিকম্পে (এই এলাকায় ভূমিকম্প প্রায়শ সংঘটিত হয়) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহার উন্নতি সাধন অব্যাহত ছিল (তু. Th Noldeke, Ges. d. Perser u. Araber zur Zeit der Sasaniden, লাইপযিগ ১৮৭৯ খৃ., পৃ. ১৬৫, ২৩৯; M. Streck, Babyulonien nach d. Arab. Geographen, ১৯০১ খৃ., ২খ., ২৬৬ প.)। জাস্টিনিয়ান কর্তৃক অত্যন্ত অল্প পরিসর কিন্তু মযবুতভাবে সুরক্ষিত পরিসীমার (যাহা সমগ্র মধ্যযুগে বিদ্যমান ছিল) মধ্যে উহা পুনর্নির্মিত হয়। পুনরায় পারস্য সৈন্যবাহিনী এখানে ৬০২ ও ৬১১ খৃ. লুটতরাজ করে এবং ১৬/৬৩৭-৩৮ সালে ইহা আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

খিলাফাত আমলের প্রথমদিকে কদাচিৎ আন্তাকিয়া-র উল্লেখ দেখা যায়। তখন ইহা ছিল আল-'আওয়াসি'ম (দ্র.) নামে অভিহিত সীমান্তে সামরিক সংগঠনের সদর দফতর এবং দৃশ্যত মনে হয়, ইহা বরাবরই বুদ্ধিজীবী মহলের একটি প্রাণকেন্দ্র হিসাবে তৎপর ছিল। ২৬৫/৮৭৮ সালে আহমাদ ইব্ন তূলূন (দ্র.) কর্তৃক ইহা উত্তর সিরিয়ার অবশিষ্ট অংশের সহিত সংযোজিত হয় এবং ২৮৫/৮৯৮ সাল পর্যন্ত উহা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের দখলে থাকে। ৩৩৩/৯৪৪ সালে হাম্‌দানী সায়ফুদ্-দাওলা (দ্র.) কর্তৃক উহা অধিকৃত হয়। ৩৫৮/৯৬৯ সালে বায়যানটাইন সেনাধ্যক্ষ মাইকেল বার্টযেস (Michael Burtzes) কর্তৃক পুনরাধিকৃত হইয়া ৪৭৭/১০৮৪ সাল পর্যন্ত বায়যানটাইন রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত হয়। অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সাল্‌জূক বংশীয় সুলায়মান ইব্ন কুত্‌লুমিশ (দ্র.)-এর নিকট ইহার পতন হয়। এদিকে মাওসিল ও আলেপ্পোর 'উকায়লী শাসনকর্তা মুসলিম ইব্ন কুরায়শ (দ্র.) নগরটির উপর সুলায়মান ইব্ন কুত্‌লুমিশ-এর অধিকার লইয়া বিবাদের সূত্রপাত করেন। সুলায়মান সাফার ৭৭৮/জুন ১০৮৫ সালে আন্তাকিয়ার অদূরে সংঘটিত এক যুদ্ধে মুসলিম ইব্ন কুরায়শকে পরাভূত করেন। পরের বৎসর তিনিও তুতুশ নামক তাঁহার এক জ্ঞাতি কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে সাল্‌জূক সুলতান মালিক শাহ হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তুর্কী আমীর য়াগীসিয়ানকে আন্তাকিয়া নগরীটি জায়গীর হিসাবে দেন। এই শাসনকর্তার নিকট হইতে জুমাদাছ্-ছানী ৪৯১/২ জুন, ১০৯৮ সালে খৃস্টান ক্রুসেডারগণ এই নগরী হস্তগত করে। অতঃপর মাওসিল-এর শাসনকর্তা কার্‌বুগা কর্তৃক নগরীর অবরোধ তাহারা ব্যর্থ করিয়া দেয়। ইহা তখন হইতে ৪ রামাদান, ৬৬৬/১৯ মে, ১২৬৮ সালে মামলূক সুলতান বায়বার্স বুন্দুকদারী (দ্র.) কর্তৃক পুনর্দখল ও ধ্বংস সাধনের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের অধীনে থাকে। ঐ সময় এখানে নরমান (Norman) রাজবংশ শাসন করিত। তাহারা বোহেমন্ড (Bohemond)-এর বংশধর ছিল এবং তাহাদের ক্ষমতায় থাকা না থাকা খৃস্টান ক্রুসেডারদের উত্থান-পতনের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তাহাদের রাজধানী ৫৮৪/১১৮৮ সালে সুলতান সালাহুদ্দীন (দ্র.) কর্তৃক স্বল্পকালের জন্য মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত আর তেমন কোন মারাত্মক ঘটনার সম্মুখীন হয় নাই।

ইহার পর আন্তাকিয়া প্রথমে মামলূক নিয়াবা এবং পরে আলেপ্পোর 'উছমানী পাশালীক-এর অধীনে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী সৈন্যবাহিনী ইহা দখল করে এবং সিরিয়ার ফরাসী ম্যানডেট (Mandate)-ভুক্ত অঞ্চলের সহিত যুক্ত করা হয়। যখন ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে ইস্‌কান্দ্রুনা (Alexandretta, পরবর্তী কালে হাতায় প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত)-এর শাসন বিভাগ (সান্‌জাক)-এর জন্য একটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার রাজধানী হিসাবে আন্তাকিয়াকে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু ফরাসী সরকার উক্ত সান্‌জাক-কে ২৩ জুন, ১৯৩৯-এ তুর্ক প্রজাতন্ত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করে (দ্র. M. Khadduri, The Alexandretta Dispute, American Journal of International Law, ১৯৪৫ খৃ., ৪০৬-৪২৬)।

বায়যানটাইন আমলের মধ্যযুগীয় স্মৃতি নিদর্শনগুলি আন্তাকিয়ায় এখন খুব কমই বিদ্যমান আছে। কেননা ১৮৭২ খৃস্টাব্দে এই নগরী এক ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের শিকার হয়; তখন ইহার অধিবাসিগণ দেওয়ালগুলির উপর স্ব স্ব বাড়ী-ঘর পুনর্নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। সিলপিয়াস (Silpius) পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত হাবীব আন্-নাজ্জার (দ্র.)-এর একটি দরগাহ ব্যতীত এখানে মুসলমানদের কীর্তিরাজির তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এখন আর নাই। মুসলিম কিংবদন্তীতে এই দরগাহকে জনৈক মর্দে মুমিনের মাযার বলা হইয়া থাকে, যাঁহার উল্লেখ ইঙ্গিতে কুরআন মাজীদে আছে বলিয়া তাফসীরকারগণ মনে করেন (৩৬ ঃ ১২ প.)। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে আন্তাকিয়া কাদার জনসংখ্যা ছিল ৯৯,৩৪৭ (৩৬,৫০০ তুর্কমান, ৩২,৬০২ আলাবী, ২১,৯২৬ আরব, ৮,৩১৯ আর্মেনীয়)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বায়যানটাইন আমলের উপর অনেক রচনা রহিয়াছে। দ্র. (১) Pauly-Wissowa, Antiocheia শব্দ; (২) Antiochon the Orontes, ১-৪ খ., প্রিন্সটন ১৯৩৪-১৯৪০; এই শহরের গির্জা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর; (৩) R. Devresse, Le Patriarchat d'Antioche...jusqu'd la conquete arabe, প্যারিস ১৯৪৫। ইসলামী আমলের জন্য (ক) ভূগোল ঃ আরব ভৌগোলিকদের তথ্যাদি; (৪) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, লণ্ডন ১৮৯০; (৫) ইয়াহ্‌য়া ইব্ন সাঈদ আল-আন্তাকী, নাজ্‌মুল জাওহার Corpus scr. chr. or., ser. ২, ২খ., ৭খ., (১৯০৬-১০) এবং যায়ল, Patr. or., ১৮খ., ৫ এবং ২৩খ., ৩ (১৯২৪, ১৯৩১); (৬) A. von Kremer, Denkschriften d. Wiener Akad. d. Wissensch- aften, ১৮৫২; (৭) মাসউদী, মুরূজ, ২খ., ২১৬ প., ২৮২ প.; ৩খ, ৪০৬-১০; ৪খ., ৫৫, ৯১; ৮খ, ৬৮-৭০; (৮) লেখক অজ্ঞাত, আরবী রচনা (cod. vat. arab., ২৮৬), সম্পা. ও অনু. I. Guidi in Rendiconti...Lincei, রোম ১৮৯৭ (D. S. Margoliouth কর্তৃক সংশোধিত, JRAS, ১৮৯৮, ১৫৭-৫৯); এই গ্রন্থ হাজ্জী খলীফা, জাহাননুমা, ইস্তাম্বুল ১১৪৫ হি., পৃ. ৫৯৫-এ ব্যবহার করিয়াছেন। আরও দেখুন ঃ (৯) R. Dussaud, Topographie hist.

de la Syrie antique et medievale, প্যারিস ১৯২৭, নির্ঘণ্ট; (খ) ইতিহাস ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত নিবন্ধসমূহের বরাত; (১০) A. A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, ed. fr. by H. Gregoire etc., i-iii, Brussels, 1935; (১১) E. S. Bonchier, A short history of Antioch, অক্সফোর্ড ১৯২১; (১২) Cl. Cahen, Le Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, প্যারিস ১৯৪০; (১৩) Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks, প্যারিস ১৯২৩। (গ) ভ্রমণকাহিনী ঃ (১৪) R. Pococke, A Description of the East & c., লণ্ডন ১৭৪৩-৪৫, ২খ., ১৮৮-৯৩; (১৫) C. Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien, Amsterdem 1774, ৩খ., ১৫-১৮; (১৬) J. Russegger, Reisen in Europa, Asien, u. Afrika, স্টুটগার্ট ১৯৪১, ১খ., ৩৬৩-৭৩; (১৭) T. Chesney, Expedition....to the rivers Euphrates and Tigris, লণ্ডন ১৮৫০, ১খ., ৪২৫ প.; (১৮) H. Petermann, Reisen im Orient, লাইপযিগ ১৮৬৭, ২খ., ৩৩৬ প.; (১৯) E. Sachau, Reise in Syrien u. Mesopotamien, লাইপযিগ ১৮৮৩, ৪৬২ প.। আরও দেখুনঃ (২০) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, প্যারিস ১৮৯২, ২খ., ১৯৩-৭; (২১) P. Jacquot Antioche, Centre de Tourisme, বৈরূত ১৯৩১, ২খ.; (২২) J. Weulersse, Antioche, Essai de geographie urbaine, B.E.O., ১৯৩৪, ২৭-৭৯।

M. Streck-H. A. R. Gibb (E.I.[2]) /হাসান আবদুল কাইয়ূম

আল-আন্‌ত'াকী (الأنطاكى) ঃ আবুল ফারাজ ইয়াহ্‌'য়া ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌'য়া, একজন আরব চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক। তিনি ছিলেন একজন মেলকী (Melkite) খৃষ্টান। আলেকজান্দ্রিয়ার সাঈদ ইব্‌ন বিত্‌রীক (Eutychius ঃ ম. ২৬৩ হি.) তাঁহার নিকটাত্মীয় ছিলেন। তিনি সম্ভবত ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রথম ৩৫-৪০ বৎসর মিসরে অতিবাহিত করেন। খলীফা আল-হাকেম ৪০৪/১০১৩-১০১৪ সালে খৃষ্টানদের মিসর ত্যাগের অনুমতি দিলে ইয়াহ্‌'য়া ইব্‌ন সাঈদ ৪০৫/১০১৪-১৫ সালে মিসর ত্যাগ করিয়া বায়যান্টীয় শহর আনতাকিয়া (এন্টিয়ক)-এ বসতি স্থাপন করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেইখানেই ছিলেন। ৪৫৫/১০৬৩ সালে তিনি সেইখানে ইব্‌ন বাতলান-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। আল-আনতাকী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি ৪৫৮/১০৬৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ইয়াহ্‌য়া প্রধানত একজন ঐতিহাসিক ও সাঈদ ইব্‌ন বিত্‌রীক প্রণীত তাওয়ারীখ (ইতিহাস গ্রন্থ)-এর একটি পরিশিষ্টের রচয়িতা হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। ৩২৬/৯৩৮ সাল হইতে পরিশিষ্টটির বর্ণনা শুরু হইয়াছে। ৩৯৭/১০০৬-৭ সালে তিনি ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরে ৪০৫/১০১৪-১৫ সালের কিছু পূর্বে নূতন ঐতিহাসিক বরাতের ভিত্তিতে তিনি ইহার সংশোধন করেন। আন্‌তাকিয়ায় তিনি অনেক নূতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি আবার তাঁহার গ্রন্থটি সংশোধন করেন এবং সমসাময়িক ঘটনা সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থটিকে ক্রমে ক্রমে সমাপ্ত করেন। এই উদ্দেশে তথ্য সংগ্রহের কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের যেই সকল পাণ্ডুলিপি এখন পাওয়া যায়, উহার কোনটিতেই ৪২৫/১০৩৪ সালের পরের ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। যদিও ইহা সম্ভব, তাঁহার ইতিহাসে উক্ত সালের ইতিবৃত্তও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি ইহাতে ৪৫৫/১০৬৩ সাল, এমনকি ৪৫৮/১০৬৫ সাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইয়াহ্‌'য়া ইব্‌ন সাঈদ বর্ষানুক্রমে ঘটনা বর্ণনা করিতেন না, বরং তিনি তাঁহার গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে খলীফাদের শাসনামল (প্রথমে আব্বাসী, পরে ফাতিমী) এবং দেশের ভিত্তিতে বিন্যাস করেন। তিনি মিসর, সিরিয়া ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি বিশেষ ও বাগদাদের প্রতি পরিমিত আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রাথমিক ফাতিমীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উত্তর আফ্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তিনি তাঁহার (ইতিহাস) গ্রন্থটি রচনায় কেবল মুসলিম উৎসসমূহের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, বরং গ্রীক ও স্থানীয় খৃষ্টানদের গ্রন্থাদি হইতেও উহার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহার সহিত তিনি আন্‌তাকিয়ায় পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থটি সন-তারিখের উল্লেখে পরিপূর্ণ। প্রায় ক্ষেত্রেই হিজরী ও সেলেওসীয় (Seleucid) তারিখ দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবত পরবর্তী তারিখটি মূল উৎস হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং তিনি নিজেই ইহাকে হিজরী তারিখের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থটি ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বর্ণনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সমভাবে ফাতিমী মিসর এবং স্বাভাবিকভাবেই খৃষ্টীয় সমাজ জীবন ও খৃষ্ট ধর্মীয় বিষয়াদির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টির মীমাংসা করা দুঃসাধ্য, তাঁহার মূল উৎস কি ছিল এবং তাঁহার ইতিহাস ও সেইকালে লিখিত আরব ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ লেখক সম্পর্কিত বরাত ঃ M. Canard, A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, ২খ., La dynastie macadonienne, ২য় ভাগ, Extraites des sources arabes, Brussels 1950-এর ফরাসী সংস্করণের টীকায় পাওয়া যায় এবং উক্ত টীকায় V. Rosen-এর মৌলিক গ্রন্থ The Emperor Basil the Bulgar-Slayer, Extracts from the Chronicle of Yahya of Antioch (রুশ ভাষায়) St. Petersburg ১৮৮৩-এর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার সংক্ষিপ্তসার A. Vasiliev, Byzance et les Arabes ১৯০২, ২খ., ৫৯-এর রুশ সংস্করণে উল্লিখিত রহিয়াছে। কেবল পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ L. Cheikho, B. Carra de Vaux ও H. Zayyat, CSCO Script. ar., তৃতীয় সিরিজ, পত্রক-৭, প্যারিস ১৯০৯; সম্পা. ও অনু. Vasiliev (Petrologia Orientalis (১৮খ., ১৯২৪ ও ২৩খ., ১৯৩২) ৪০৪ হি. সমাপ্ত হয়; অধিকন্তু দ্র. G. Grof, Gesch. der cristl. arab. Litteratur, ২খ., ৪৯-৫১।

M. Canard (E.I.[2]) / মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল্-আনত াকী (الأنطاكى) ঃ দাউদ ইব্ন 'উমার আদ্'-দ'রীর ৯৫০/১৫৪৩ সালে এন্টিওক (আন্তাকিয়া) শহরে জন্মগ্রহণকারী আরব চিকিৎসক. সীদী হাবীব আল-জাজ্জার নামক ক'রয়া (গ্রাম)-এর রাঈস্-এর পুত্র, অন্ধ কিন্তু দীর্ঘ পথ ভ্রমণকারী, যাহার ফলে তাঁহার এশিয়া মাইনরেও আগমন হইয়াছিল। সেখানে তিনি একজন ইরানী চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে, যিনি তাঁহাকে দীর্ঘদিনের এক ব্যাধি হইতে আরোগ্য দান করিয়াছিলেন, গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার এই গ্রীক ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎসগুলিকে মূল গ্রন্থসমূহ হইতে অধ্যয়ন করা। পরবর্তী কালে তিনি দামিশ্ক ও কায়রোতে বসবাস করেন, তথা হইতে মক্কা শরীফ আগমন করেন এবং এক বৎসরেরও কম সময় অবস্থানের পর সেখানেই ১০০৮/১৫৯৯ সালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার প্রধান রচনাকর্ম একটি বৃহৎ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসাগ্রন্থ যাহাতে তিনি ইবনুল বায়তারকে অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থটির নাম تذكرة اولى الالباب والجامع للعجب العجاب কায়রো ১৩০৯/১৮৯০-১ (গ্রন্থটির পার্শ্বটীকায় রহিয়াছে তাঁহার একজন শিষ্যের য'ায়ল (সম্পূরক গ্রন্থ) এবং রোগ চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ (النزهة المبهجة فى تشحيذ الاذهان وتعديل الامزجة (দ্র. Leclerc. Notices et Extraits, ২৩খ., ১৩)। হাসান আবদুল্-সালাল-এর সাম্প্রতিক রচনা। যেহেতু তখন ভালবাসার কলাকৌশল চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি পরিশিষ্টরূপে বিবেচিত হইত তাই তিনিও মুহাম্মাদ আস্-সার্‌রাজ (মৃ. ৫০০/১১০৬) রচিত প্রেম সম্পর্কিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটির নাম ((تزيين الاسواق بتفصيل (ترتيب) اشواق العشاق, বূলাক ১২৮১/১৮৬৪, ১২৯১/১৯৭৪, কায়রো ১২৭৯/১৮৬২, ১৩০২/১৮৮৪, ১৩০৫/১৮৮৭, ১৩০৮/১৮৯০; দ্র. Kosegarten, Chrestom, arab., 22; A. V. Kremer, Ideen, ৪০৮; Goldziher, SBAK, Wien, Phil-Hist, Kl.,৭৮ ঃ ৫১৩ প., নং ৭। কয়েকটি ক্ষুদ্র পুস্তক ছাড়াও তিনি দার্শনিকদের প্রস্তর সম্পর্কে একটি পুস্তক লিখিয়াছেন, নাম রিসালা ফি'ত্'ত'াইর্ ওয়া'ল্-'উক'াব (de Slane, Cat. D. mss. de la Bibl, Nat.,নং ২৬২৫, ৮) এবং অপর একটি, চিকিৎসাতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কিত, নাম আন্‌মুযাজ ফী 'ইল্‌মিল-ফালাক (ঐ নং ২৩৫৭, ৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহিব্বী, খুলাস'াতুল-আছ'ার, ২খ., ১৪০-১৪৯; (২) Leclerq, Histoire de la medecine arabe, ২খ., ৩০৪; (৩) Wustenfeld, Geschichte der arab. Aerzte and Naturforscher, নং ২৭৫; (৪) Brockelmann, II, ৩৬৪; S II 491; (৫) হাসান আবদুস্-সালাম, য'াখীরাতুল 'আত্'ত'ার আও তায্'কিরাত দাউদ ফী-দ'াওইল-'ইল্‌মিল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭।

C. Brockelmann-[J. Vernet] (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

(সীরাত) 'আন্‌তার (سيرة عنتر) ঃ আরবী সাহিত্যের একটি অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী। ইহা যথার্থই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। পাঁচ শত বৎসরব্যাপী আরব ইতিহাসের এক প্রকার সারসংকলন ও প্রাচীনতর আরব ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। জনৈকা ক্রীতদাসীর পুত্র 'আন্‌তার কিভাবে আব্‌স গোত্রে প্রতিপালিত হয় এবং সে কিভাবে এই গোত্রকে মহাসংকট হইতে উদ্ধার করে সেই কাহিনী কিতাবুল-আগানী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা প্রাচীন ঐতিহ্যগাথার বিপুল জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করে। সীরাত 'আন্‌তার যে কোন অজ্ঞাতসারে উদ্ভূত পৌরাণিক কাহিনীসমূহকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এক সাহসী উদ্যোগ লইয়া নিঃসঙ্গ বীর 'আন্‌তারকে সমগ্র আরবের প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এই কল্পকাহিনীতে পাঁচ শতাব্দী কালের আরবদের ও ইসলামের উত্থান-পতনের আলেখ্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে স্থান পাইয়াছে প্রাচীন আরবদের গোত্রীয় কোন্দল, আরবে ইথিওপীয় শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আরবদের, বিশেষ করিয়া ইরাকের পারস্যের কর্তৃত্বাধীন হওয়া, পারস্যে উদীয়মান ইসলামের বিজয়, ৭ম শতাব্দীতে আরবে ইয়াহূদীদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান, বিশেষ করিয়া সিরিয়ায় খৃস্টানদের উপর আরব বিজয়, বায়যানটাইনদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের; পরবর্তী কালের মুসলিম প্রাচ্যের ধারাবাহিক যুদ্ধ এবং উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে ইসলামের বিজয়াভিযান। ইহাতে ক্রুসেড যুদ্ধের কিছু ঘটনারও উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অসংখ্য কাহিনী ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে। সাবলীল ছন্দময় গদ্য ভংগীতে লেখা এই উপাখ্যানের মাঝে মধ্যেই সন্নিবেশিত হইয়াছে প্রায় ১০,০০০ শ্লোক। ১২৮৬ হি. হইতে প্রাচ্যে প্রকাশিত সংস্করণসমূহে এই কাহিনীকে ৩২টি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার কোন খণ্ডেই হাযার এক রজনীর খণ্ডের মত কোন গল্পের উপসংহার টানিয়া সমাপ্ত করা হয় নাই।

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়া এই উপাখ্যানটি প্রাচীন কাল হইতে বানূ আব্‌সের উপর বাদশাহ্ যুহায়র-এর শাসনকাল পর্যন্ত যুগ পাঠকদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। আব্‌সী বীর শাদ্দাদ এক অভিযানে নিগ্রো ক্রীতদাসী যাবীবা-কে বন্দী করেন (১৮শ খণ্ডের পরে জানা যায়, সে ছিল একজন উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তির কন্যা, যাহাকে সূদান হইতে অপহরণ করা হইয়াছিল)। তাহারই গর্ভজাত সন্তান 'আন্‌তার। শিশু অবস্থায়ই 'আন্‌তার তাহার পরিধানের অত্যন্ত শক্ত কাপড়ের বন্ধনী ছিঁড়িয়া ফেলে, দুই বৎসর বয়সে তাঁবু ছিঁড়িয়া ফেলে, চার বৎসর বয়সে একটি বড় কুকুর, নয় বৎসর বয়সে একটি নেকড়ে বাঘ এবং কিশোর মেষ পালক হিসাবে একটি সিংহ হত্যা করে। এই বালক শীঘ্রই তাহার নিপীড়িত গোত্রকে উদ্ধারের লক্ষ্যে আগাইয়া আসে যেই কারণে তাহার পিতা তাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় এবং সে এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। এক সময় 'আন্‌তার তাহার পিতৃব্য কন্যা আব্‌লাকে বিবাহ করিতে চাহেন এবং এক বিপদের সময়ে তাঁহার চাচা আব্‌লাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার প্রতিশ্রুতিও দেন, কিন্তু বিপদ কাটাইয়া উঠার পর 'আন্‌তারের প্রতি বিবাহ-পূর্ব শর্ত হিসাবে অতি বিপজ্জনক কতগুলি শর্ত আরোপ করেন। আন্‌তার সব শর্তই পূরণ করেন। কিন্তু ইহার পরও ১০টি বিস্ময়কর অভিযান সম্পন্ন করার পরেই কেবল আবলাকে বিবাহ করিবার অনুমতি তাহাকে দেওয়া হয়। তাহার অভিযানের পরিধি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিজের বংশে আন্‌তারকে প্রথমেই জয় করিতে হয় পিতার বিরোধকে, ইহার পর জয়

করিতে হয় আবলার আত্মীয়-স্বজনদের শত্রুতাকে, প্রতিহত করিতে হয় কবি 'উরওয়া ইব্‌নুল ওয়ারদসহ তাহার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের এবং অবসান করিতে হয় বানূ য়িযাদ, বানূ রাবী' ও বানূ উমারা-র সহিত বংশগত দ্বন্দ্বের। 'আব্‌স ও ফাযারা গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘ বিবাদে আন্‌তার আব্‌স গোত্রের ত্রাণকর্তা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার নিজ গোত্রের বাহিরেও তিনি অনেক শক্তিশালী বীরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়াছেন, আবার তাহাদের সহিত বন্ধুত্বও করিয়াছেন। ইহারা ছিলেন দুরায়দ ইব্‌নুস-সিম্মা, মু'আম্মার, হানি ইব্‌ন মাস্‌উদ (যূ-কার-এ পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী), 'আম্‌র ইব্‌ন মা'দিকারিব, 'আমির ইব্‌নুত-তুফায়ল, 'আম্‌র ইব্‌ন উদ্দ (বানূ হারামের বীর যোদ্ধা), আরব শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রাবী'আ ইব্‌ন মুক'াদ্দাম প্রমুখ বীর যোদ্ধা। এক প্রতিযোগিতায় মু'আল্লাক'া কবিদের পরাজিত করিয়া মক্কার হারামে তিনি তাঁহার মু'আল্লাক'া ঝুলাইয়া দেন। অন্যান্য বহু প্রতিযোগিতায় তিনি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর বিজয়ী হন এবং ইম্‌রুউল-কায়স কর্তৃক প্রণীত আরবী ভাষার সমার্থবোধক শব্দাবলীর প্রতিযোগিতায় সফল হন। মক্কা হইতে তিনি খায়বার গমন করেন এবং সেইখানে ইয়াহূদীদের শহর ধ্বংস করিয়া দেন। আরব ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল আন্‌তারের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী; কাহিনীতে ইহার সমর্থনে যুক্তির অভাব নাই। আব্‌লার পিতা বিবাহের পণ হিসাবে আসাফীর জাতীয় কতগুলি উট দাবি করে যাহা হীরার রাজা মুন্‌যিরই কেবল প্রতিপালন করিতেন। এই উদ্দেশে আন্‌তার ইরাক গমন করেন। গ্রীক বীর বাদ্‌রামূত-এর সহিত মল্লযুদ্ধ করিবার জন্য সেখান হইতে পারস্যে তাহাকে আহ্বান করা হয়! পরবর্তী কালে আমরা তাহাকে ইরাকের রাজন্যবর্গের সাহচর্যে দেখিতে পাই। তাহারা হইলেন মুন্‌যির, নু'মান, আস্‌ওয়াদ, আম্‌র ইব্‌ন হিন্দ, ইল্‌য়াস ইব্‌ন কাবীসা ও তাহাদের মন্ত্রীবর্গ। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আম্‌র ইব্‌ন বুকায়লা। শাহ্ খুস্‌রাও আনূশির্‌ওয়ান শাহ্ খুদাওয়ান্দ (সাসানী ইতিহাসে এই নামের কোন শাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না), শাহ্ কাওয়ায (সম্ভবত কাওয়ায), শিরোয়া প্রভৃতি ব্যক্তির সহিতও তাহার নিকট সম্পর্ক ছিল। কখনও ছিলেন তাহাদের ঘোরতর শত্রু, কখনও বা গ্রহণযোগ্য মিত্র। এক সময় সিরিয়ার রাজপুত্র আন্‌তারের জনৈক বন্ধুর প্রস্তাবিত পত্নীর প্রণয়াসক্ত হইলে আন্‌তার সিরিয়া গমন করেন এবং রাজা হারিছ আল-ওয়াহ্‌হাবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন। রাজা তাহার বন্ধুতে পরিণত হন এবং হারিছ-এর মৃত্যুর পরে রাজকন্যা হালীমার অনুরোধে আন্‌তার অপ্রাপ্তবয়স্ক নবীন রাজা আমর ইব্‌ন হারিছের অভিভাবকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রকারান্তরে এইভাবে তিনি সিরিয়ার শাসক হইয়া গেলেন। এইখানে আন্‌তার ফ্রাংকদের সংস্পর্শে আসেন। কখনও তাহাদের শত্রুরূপে, কখনও বা পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে তাহাদের মিত্ররূপে কাজ করেন। সিরিয়া তখন বায়যান্টাইন শাসনাধীনে। এখানকার খৃষ্টানদের জন্য আন্‌তার যে কাজ করেন তাহার জন্য তাহাকে কন্সটান্টিনোপলে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় এবং তথায় তাহাকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ফ্রাংকদের রাজা লায়লামান (Laylaman) ইহাতে আপত্তি করেন এবং সম্রাটের কাছে দাবি জানান, আন্‌তারকে তাহার হাতে সমর্পণ করা হউক। আন্‌তার তখন সম্রাটের পুত্র হেরাক্লিয়াসকে সঙ্গে লইয়া ফ্রাংকদের জনপদে বায়যান্টাইন বাহিনীর অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন। তাহাদের সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন; ইহার পরে স্পেনে পৌঁছান, রাজা সান্টিয়াগোকে পরাজিত করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাহার প্রদেশসমূহের মধ্য দিয়া মরক্কো হইতে মিসর পর্যন্ত অগ্রসর হন। বায়যান্টিয়দের পক্ষে এইসব বিজয় অভিযান শেষ করিয়া কনস্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতীকস্বরূপ তাহার অশ্বারোহী বীরের এক প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। তাহার প্রতিকৃতির দুই পার্শ্বে স্থাপিত হয় তাহার অন্য দুই ভাইয়ের প্রতিকৃতি যাহারা বায়যান্টিয়ানে তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে আনতার রোমে আসেন। রোমের রাজা বাল্‌কাম ইব্‌ন মার্‌কাস, বোহেমন্দ কর্তৃক অত্যন্ত কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন, আনতার বোহেমন্দকে হত্যা করিয়া রোম মুক্ত করেন। সূদানীদের বিরুদ্ধে এক পাল্টা অভিযান চালাইয়া আন্‌তার আফ্রিকার গভীরে একটির পর একটি রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নাজাশীদের ভূখণ্ডে পৌঁছেন। এইখানে নাজাশীদের মধ্যে তিনি তাহার মাতা যাবীবার পিতামহকে আবিষ্কার করেন। ইহার চেয়েও অধিকতর চমকপ্রদ ছিল তাহার হিন্দ-সিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান, বায়দা নামক স্থানে খৃষ্টান রাজা লায়লামানের বিরুদ্ধে অভিযান এবং দৈত্যের দেশে অভিযান। আন্‌তারের মৃত্যু ঘটিয়াছিল বিয্‌র ইব্‌ন জাবির-এর হাতে, যাহাকে আসাদ আর্‌-রাহীস বলা হইত। আন্‌তার তাহাকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই মহত্বে বিয্‌র অপমানিত বোধ করে এবং মাঝে মধ্যেই তাহার উপর আক্রমণ চালায়। পরিশেষে আন্‌তার তাহাকে অন্ধ করিয়া দেন। অন্ধ হইলেও বিয্‌র পাখী ও হরিণের শব্দ শুনিয়া তীর-ধনুক দ্বারা উহা শিকার করিতে শিক্ষা করে। তাহার একটি বিষাক্ত তীরে আন্‌তার আহত হন। তবে আন্‌তারের পূর্বেই বিয্‌র মৃত্যুবরণ করে এই ভুল ধারণা লইয়া যে, আন্‌তারের প্রতি তাহার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। আন্‌তার মৃত্যুর সময়, এমনকি তাহার আবজার নামক অশ্বের পৃষ্ঠে মৃত অবস্থায়ও তাহার লোকদের নিকট হইতে শত্রু বিতাড়িত করিয়াছিলেন। আন্‌তার আব্‌লা-র সহিত বিবাহে ছিলেন নিঃসন্তান; তবে আন্‌তারের কতিপয় গোপন বিবাহ ও প্রেম সম্পর্কের ফলে তাহার কয়েকটি সন্তানের জন্ম হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল দুইটি খৃষ্টান ও ক্রুসেডারগণ; গাদান্‌ফার, সিংহ-প্রাণ (Coeur-de- Lion) আন্‌তার ও রোমের রাজার ভগিনীর পুত্র। আন্‌তার তাঁহাকে রোমে বিবাহ করিয়াছিলেন, কনস্টান্টিনোপলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং ফিরিঙ্গী রাজকন্যার গর্ভজাত আন্‌তারের পুত্র জুফ্‌রান (অর্থাৎ Geoffroi, Godfrey)। আন্‌তারের সন্তানেরা বীর পিতার হত্যার প্রতিশোধ লয় এবং তাহার জন্য শোক প্রকাশ করে। গাদান্‌ফার ও জুফ্‌রান অতঃপর ইউরোপ প্রত্যাবর্তন করে। 'আব্‌স গোত্র তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

বিশ্লেষণ ঃ জীবন কাহিনী রচনায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান উপদান বিদ্যমান ঃ (১) আরবের পৌত্তলিকতা; (২) ইস্‌লাম; (৩) পারস্যের ইতিহাস ও মহাকাব্য; (৪) ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ।

১। আরবের পৌত্তলিকতা হইতে আসিয়াছে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এবং নাইটসুলভ বেদুঈন উদ্দীপনা, কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্র যাহাদের কিছু কিছু ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, দুইটি নিকট সম্পর্কীয় গোত্র 'আব্স ও ফাযারা-র মধ্যে চরম শত্রুতা, দাহিস ও গাব্রার মধ্যে প্রতিযোগিতা, আখ্বারুল-আরাবের সর্বশ্রেষ্ঠ বিক্রমশালী, যেমন রাজা যুহায়র-এর সহিত তুমাদির-এর বিবাহ, যুহায়র-এর মৃত্যু, মালিক ইব্ন যুহায়র-এর মৃত্যু, হারিছ ও লুবনা, জায়দা ও খালিদ, হাতিম তাঈর কাহিনী, রাবী'আ ইব্ন মুক'দ্দাম-এর অসাধারণ চরিত্র ইত্যাদি।

২। ইসলাম ধর্ম হইতে লওয়া হইয়াছে সীরাতের ভূমিকা যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে ইব্রাহীম (আ)-এর দীর্ঘ কাহিনী, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও আলী (রা)-র পুনঃপুনঃ বর্ণিত কাহিনী এবং সীরাতের উপসংহারে ইসলামের উত্তরণের জন্য যে প্রচেষ্টা লওয়া হইয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি। এই গ্রন্থেই আন্তারকে ইসলামের জন্য পথ তৈরির পথিকৃৎ হিসাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আরব, পারস্য, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্য দিয়া আনতারের বিজয় অভিযান ইসলামের বিজয় অভিযানের অনুরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সীরাতের কিছু কিছু বিবরণে শী'আ রূপ পরিলক্ষিত হয়।

৩। নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ দ্বারা পারস্য প্রভাব প্রকাশ পায়ঃ পারস্য দেশীয় ইতিহাস ও পার্সী মহাকাব্য সম্বন্ধে জ্ঞান, স্থানে স্থানে ফার্সী ভাষার ব্যবহার, রাজত্ব লাভ আল্লাহ্র মহান নিয়ামত-এই ধারণা, পারস্য দেশের ধারায় রাজদরবার ও রাজ্যোৎসব (সিংহাসন, রাজমুকুট, রাজকীয় গালিচা), রাজকীয় শিকারী জীবজন্তুর (বাজ পাখী, চিতা ইত্যাদি) বর্ণনা, কবুতর দ্বারা চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদানের বর্ণনা, পারস্যের রাজকর্মকর্তাদের পদ ও মর্যাদা (উযীর মুবাদান্ মুবাদ, মার্যপান পাহ্লাওয়ান, শাহের চোখ-কান) ইত্যাদি অনেক কিছুর বর্ণনা।

৪। খৃস্ট ধর্ম ও ক্রুসেড-সাসানী আমলের সিরিয়ার ও বায়যান্টিয়ামের খৃস্টান এবং ফ্রাংকদের সম্পর্কও এই জীবন কাহিনীর বর্ণনায় রহিয়াছে। ফ্রাংকদের ক্রুসেডার হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে (এই কাহিনীতে, এমন কি তাহাদের বুকে ক্রস পরিধানেরও উল্লেখ রহিয়াছে) যাহারা Shiloe ও জেরুসালেমের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। জুফ্রান (Godfrey) দামিশক অবরোধ করে এবং আন্তাকিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। ইহাতে রহিয়াছে ক্রুস, খৃস্টান ধর্মযাজক ও ভিক্ষুদের পোশাক ও কোমরবন্ধ (সীরাতের বর্ণনানুযায়ী যাহা ক্রুসের পরেই খৃস্টানদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক), বিশপের লাঠি, ঘণ্টা, ধূপ, পবিত্র পানি, মৃতদের জন্য প্রার্থনা, মরণোন্মুখ মানুষকে তৈল মর্দন, গির্জার ভাবগম্ভীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যীশুর জন্মদিন, Palm-Sunday ইত্যাদির বর্ণনা। ফ্রাংকদের মধ্যে ধর্মযাজকই যে গির্জার ও রাষ্ট্রের প্রধান, চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ অবৈধ— এই সব ধারণা এই কাহিনীতে স্থান পাইয়াছে। তাহারা ধর্ম সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারকরণের প্রথা সম্পর্কেও অবহিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাতে স্পেনের তীর্থস্থানের ও তীর্থ উদ্যাপনের দিনের কথাও বর্ণনা করা হইয়াছে। খৃস্টানরা শপথ করে যীশু, মেরী, বাইবেল, ব্যাপটিস্ট জন (Mari Hanna al-Mamadan, Yukhna), লূক (Luke), টমাস (Mar Toma) ও সাইমনের নামে। সম্রাট রাজীম (Radjim) রাজত্ব করেন বায়যন্টিয়ামে এবং তাঁহার পুত্রের নাম হেরাক্লিয়াস; বালকাম ইব্ন মারকাস ছিলেন রোমের নৃপতি। উত্তর আফ্রিকার খৃস্টান শাসকদের নামসমূহ শেষ হয় 's' অক্ষরে, যেমনটি দেখা যায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাতেও। যেমন মার্তস (Martos), কারদুস (Kardus), হারমেস (Hermes), ইব্নুল-উরনূস (Ibnul-Urnus), কিন্দারিয়াস ইব্ন কিরমাস (Kindaryas ibn Kirmas), সিন্দারিস (Sindaris) ও থিওডোরোস (Theodoros)। স্পেনের নৃপতিকে বলা হইত সান্টিয়াগো (Santiago); ফ্রাংকদের রাজা ও যুবরাজদের নামের মধ্যে কেবল বোহেমন্দ (Bohemund)-এর নামই নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তাহার ভ্রাতৃবর্গের নাম মুবার্ত, সুবার্ত, কুবার্ত, সমুদ্রের রাজপুত্র শূবার্ত (Shubert of the Sea) প্রভৃতি হইতে প্রাচীন ফ্রান্সে ব্যক্তিগত সাধারণ নামের শেষ অংশ কেমন ছিল তাহা বুঝা যায়। ফ্রাংক রাজকন্যার গর্ভে 'আনতারের পুত্র সন্তানের নাম ছিল জুফরান যাহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে Godfrey of Bouillon-এর প্রাচীন ফরাসী নাম Jofroi, Jefroi, Goffroi। 'আন্তারের রম্য কাহিনীতে ইউরোপ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই; তবে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, গ্রন্থকার ইউরোপের বাহিরে তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহা ঘটিয়াছিল ক্রুসেডের সময়। আন্তার বোহেমন্দকে হত্যার করিয়াছিলেন। 'আন্তারের পুত্র গডফ্রে ক্রুসেডার হিসাবে এশিয়ায় আসিলে সেখানে তাহার পিতৃত্ব সম্পর্কে জানিতে পারেন এবং তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন, এমনকি আর্মেনিয়ার পিটারের সেনাবাহিনীতে ভিক্ষুকরাজ তাফুর-এর নামও এই জীবন-কাহিনীতে সংরক্ষিত হইয়াছে। দ'াফূর হইল বলপূর্বক দখলকারীর নাম, তিনি শিশু রাজপুত্র আম্রকে সিরিয়ার সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করেন কিন্তু নিজে আন্তার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। সীরাত আন্তার গ্রন্থে খৃস্ট ধর্মের প্রতি বুদ্ধিমত্তাযুক্ত সহানুভূতির ও ইহার সহনশীলতার যে চিত্র দেখা যায়, তাহা মধ্যযুগের খৃস্টানগণ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলাম ধর্মের চিত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত। খৃস্টান কাব্যে মুসলমানদেরকে এ্যাপোলো, কাহু, গোমেলিন, জুপিটার, মারগট, মালকুড্যান্ট, তের্ভাগান্ট ইত্যাদি মূর্তি পূজা করে বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। 'আন্তার উপাখ্যানে ক্রুসেডকে সহানুভূতি ও প্রশংসা ব্যতীত উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা সত্য, যাহারা পবিত্র ভূমিতে লুটতরাজ করিবার ও শাস্তি এড়াইবার উদ্দেশে গিয়াছিল কেবল সেই সব ক্রুসেডারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে ফ্রাংকরা পিতা, ঈশ্বর পুত্র ও ধর্ম প্রসারের জন্য যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া দেখান হইয়াছে।

লোকগীতি ও সমমানের সাহিত্যকর্ম ঃ সীরাত 'আনতারে কমই লোকগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়; তবে ইহাতে উহার যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান; ডাইনীদের চমৎকার রান্নাঘরের বর্ণনা আছে, আছে রূপকথার অশুভ লক্ষণ, জীবন প্রতীক প্রভৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য বর্ণনামূলক কবিতার বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এই মহাকাব্য, বীরের

শক্তি ও অঙ্গবৃদ্ধি, তাহার অভিযান, তাহার দ্বারা সিংহবধ, মু'আম্মারুন (দীর্ঘ জীবনের কাহিনী আনতার ও শাহনামায় একই প্রকার), স্বপ্ন, অলীক দর্শন, আমাজন, পিতা-পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ, গুডরুন (Gudrun)-এর ধারণামতে কনের বিশ্বস্ততার পরীক্ষা, বোকা লোকের প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয় কাব্যিক উপাদান হিসাবে স্থান পাইয়াছে। বাহির হইতে খুব সামান্য কিছুই লওয়া হইয়াছে ঃ নু'মানের শুভ ও অশুভ দিন, খুসরাও-এর ন্যায়বিচারের ঘণ্টা (সম্রাট চার্লস ও সাপের কাহিনী প্রসঙ্গ), ঈগল বাহিত বাক্সে স্বর্গ ভ্রমণ, কিছু কিছু আফ্রিকান ঐতিহ্য (সম্ভবত আফ্রিকার ভূগোল সম্বন্ধীয় রচনা হইতে লওয়া)। ইউরোপীয় লোককাহিনীর সহিতও কিছু সংযোগ দেখা যায়। শার্লাম্যান (Charlemagne)-এর সিউডো টারপিনে (in Pseudo-Turpin) বিস্ময়কর নির্দশনের সঙ্গে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম সময়ের রম্য কাহিনীর বেশ মিল আছে বলিয়া ধারণা করা হয়। তবে সিউডো টারপিন (Pseudo-Turpin) নিঃসন্দেহে প্রাচীন কোন উৎস হইতে গৃহীত। ফরাসী ও জার্মান কাব্যে ধাতুর তৈরী কিছু কৃত্রিম পাখীর বর্ণনা আছে যাহা ঘণ্টা ও পাইপের সাহায্যে বিভিন্ন সুরে গান করে। ঠিক এমন ধরনের পাখীর বর্ণনা সীরাত আন্‌তারেও পাওয়া যায়। এখানে আমরা কনস্টান্টিনোপলের ক্রাইসোট্রিকলিনিয়াম (Chrysotriklinium)-এর ঐতিহাসিক চমৎকারিত্বের বিবরণ পাই ঠিক যেমনটি মিলে সাসানীদের টেসিফন (Ctesiphon)-এ ও তাতার খানদের রাজধানীতে। কিছু কিছু মিল বেশ চমক লাগাইবার মতই। হারিছ আজ্-জালিম তাহার তরবারি যুল-হিয়াত একটি প্রস্তর খণ্ডে বারবার আঘাত করেন যাহাতে উহা শত্রুর হাতে না পড়ে। প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু তরবারি অক্ষত রহিয়াছে; ঠিক যেমনটি হইয়াছিল রোলান্ডের ডুরান্ডাল (Roland's Durandal)-এ। খুসরাওকে হত্যা করিয়া নিজে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী আন্‌তারের পুত্র গাদবানকে আন্‌তার বিধাতার ইচ্ছায় রাজা হইবার বিষয়ে উপদেশ দিলেন, যেমনটি দিয়াছিলেন জিরার্ড দ্য ভিয়ান (Girard de Viane) তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আইমেরী (Aimeri)-কে যিনি শার্লাম্যান (Charlemagne)-কে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। আন্‌তারের মৃত্যুর পর তাঁহার অশ্ব আবজার মরুভূমিতে পলাইয়া যায় যাহাতে তাহাকে আর কোন প্রভুর সেবা করিতে না হয়, যেমনভাবে রেঁনো দ্য মনতাউবা (Renaud de Montauban)-এর বাইয়ার্ত (Baiart) পলাইয়া গিয়াছিল আর্দেননেস (Ardennes)-এর জঙ্গলে। অতীব উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় রোল্যান্ড (Roland) ও অলিভার (Oliver)-এর দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং আনতার ও রাবী'আ ইব্‌ন মুক'াদ্দাম-এর দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে। একজন যোদ্ধার তরবারি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইলে তাহার মহৎ প্রতিপক্ষ তাহাকে আরেকখানা তরবারি আগাইয়া দিল। যুদ্ধে লিপ্ত এই প্রতিপক্ষরা শেষে আপোষ করে এবং শ্যালক-ভগ্নিপতি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এইরূপ বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, নাইটদের সহিত তাহাদের তলোয়ার, অশ্ব, প্রভু ও প্রতিপক্ষের সম্পর্কের বর্ণনা লইয়াই এই ধরনের কাব্যের বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

সীরাত আন্‌তারের বীরগাথা ঃ শৌর্যবীর্যের উপাখ্যান হিসাবে জীবন কাহিনীটি যথার্থই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। জাহিলী যুগে আরবদের মধ্যে পুরুষোচিত গুণের আদর্শ ছিল মরুওওয়া (مروة) (পৌরুষ), ফুতুওওয়া (فتوة-বীরত্ব), ইহার পাশাপাশি সীরাত আন্‌তারে দেখা যায় ফুরূসিয়া (فروسية), ফারাসা (فراسه) ও তাফারুরাসা (تفرس)। নাইটকে বলা হয় ফারিস (فارس)। 'আনতারকে বলা হয় 'নাইটদের পিতা 'আবুল-ফাওয়ারিস (ابو الفوارس), কখনও বা বলা হয় আবুল ফুরসান (ابو الفرسان), আলাল-ফুরসান (على الفرسان), 'ফারিসুল ফুরসান (فارس الفرسان), আফরাস (افرس), অশ্বারোহী সকলেই। নাইট হয় না। একজন নাইটের গুণাবলী হইল সাহস, বিশ্বস্ততা, সত্যপ্রিয়তা, বিধবা, অনাথ ও দরিদ্রদের নিরাপত্তা বিধান (আনতার ইহাদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করিতেন), মহত্ত্ব, নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ (আনতার তাহার বীরত্বপূর্ণ জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নারীদেরকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; তিনি আবলার নামে আবলার চোখের নামে শপথ নিতেন এবং আবলার নামেই বিজয়ী হইতেন), উদারতা, বিশেষ করিয়া কবিদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ইত্যাদি। নাইটগণও কবি ছিলেন, বিশেষ করিয়া হিজাযের কবিগণ। সীরাত 'আন্‌তার-এ এই ধরনের শত শত কবির বর্ণনা পাওয়া যায়। নাইটদের রীতিনীতি, গুণাবলী চর্চা ও প্রতিষ্ঠা লাভের বর্ণনাও সীরাতে পাওয়া যায়। টেসিফন (Ctesiphon)-এর সাহারিজা (صهارجة)-র পাশাপাশি ভৃত্য ও অভিজাত ভূস্বামীদেরও দেখা যায়; আনতার নিজেই কয়েক শত অভিজাত ভূস্বামীকে প্রশিক্ষণ দান করিয়াছিলেন। হিজায, হীরা, টেসিফোন-এ অনুষ্ঠিত কতিপয় ব্যাপক টুর্নামেন্টের বর্ণনাও সীরাতে রহিয়াছে। সর্বাধিক জাঁকালো টুর্নামেন্ট হইয়াছিল বায়যান্টিয়ামে যেখানে আনতারের বর্শা ৪৭৬ বার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করিয়াছিল। এইসব প্রতিযোগিতার সহিত ইউরোপে অনুষ্ঠিত অনেক টুর্নামেন্টের বৈশিষ্ট্যের অনেক মিল ছিল, যেমন ভোঁতা অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ খেলা, বেষ্টিত জায়গার মধ্যে চাষ করা, অনুষ্ঠানকে মনোরম করিয়া সাজানো এবং তথায় মহিলা ও বালিকাদের উপস্থিতি। এই সকল বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। একদিকে ডেলেসলুজ (Delecluze)-এর মনে আনতারের মধ্যে ইউরোপীয় নাইটের আদর্শ রহিয়াছে এবং সীরাত আন্‌তারকে তাহারা (নাইটসুলভ গুণাবলীর) উৎস বলিয়া মনে করিতেন। অন্যদিকে রেনোঁ (Reinaud)-এর মতে ইউরোপীয় ভাবধারা, রীতিনীতি ইত্যাদি সীরাত-এ অনুকরণ করা হইয়াছে (J.A, 1833, i, 102-105)। এখান হইতেই কেহ কেহ সীরাত আনতারের মূল উৎস খুঁজিয়া পান। মূল সীরাত আনতারেই মাঝে মধ্যে ইহার মূল উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, খলীফা হারূনুর-রাশীদের সময় তাঁহার রাজদরবারে আল-আস্‌মা'ঈ এই সীরাত রচনা করেন। আস্‌মাঈ ৬৭০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার ৪০০ বৎসর জাহিলিয়্যা যুগে কাটিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'আনতার ও তাহার সমসাময়িকদের সহিত পরিচিত ছিলেন। ৪৭৩/১০৮০ সালে তিনি তাঁহার রচনা সমাপ্ত করেন। আনতার হামযা, আবূ তালিব, হাতিম তাঈ, ইমরুউল-কায়স, হানী ইব্‌ন মাসউদ, মক্কার হাযিম, 'উবায়দা, আমূর ইব্‌ন উদ্দ, দুরায়দ ইব্‌নুস্-সিম্মা, আমের, ইব্‌নুত-তুফায়ল প্রমুখ ব্যক্তিদের নিকট হইতে তিনি ঐতিহ্যমূলক কাহিনী সংগ্রহ করেন। প্রকৃত অর্থে এই উপাখ্যানের মূল উৎস সম্পর্কেও আমরা রীতিমত অন্য একখানি উপাখ্যানের

সন্ধান পাই। বারবার উল্লিখিত রাবী (راوى), নাকি'ল (ناقل), মুসান্নিফ (مصنف), সাহিবুল ইবারাত (صاحب العبارة), আস্‌মাঈ ও অন্য গ্রন্থকারগণের সীরাত 'আনতার রচনায় এইরূপ গুরুত্ব রহিয়াছে যেইরূপ ফির্‌দাওসীর শাহনামায় দিহকান পাহ্‌লাবী গ্রন্থ ও প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের অবদান অথবা সেন্ট ডেনিসের ফরাসী মহাকাব্যে। ঘটনাপঞ্জীর দুইটির রূপে (version)-হিজাযের জন্য একটি ও ইরাকের জন্য একটি সীরাত আনতার রচনার কথাটি একটি নিছক কল্পকাহিনী। হিজাযের সংস্করণ আবিষ্কারের উদ্দেশ্য হইল এই বিশ্বাসকে জোরাল করা, আসমাঈ আনতার ও হিজাযে তাহার সঙ্গীদের নিকট হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা এই উপাখ্যান রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। হিজায এই রম্য কাহিনীর 'মূল উৎস স্থল' উক্তিটি কল্পনাপ্রসূত। অন্যদিকে ইহাও সম্ভব, সীরাত 'আনতার রচনায় ইরাকেরও উল্লেখযোগ্য অবদান থাকিবে। সীরাত 'আন্‌তারের প্রকৃত তারিখ সম্পর্কে নিম্ন সূত্রগুলি পাওয়া যায়ঃ (১) জনৈক মুসলমান ও খৃষ্টান সন্ন্যাসীর মধ্যে এক ধর্মীয় আলোচনায় (Das Religionsgesprach von Jerusalem um 800 A.D. aus dem Arabischen udersetzt von K. Vollers, Ztschr. f. Kirchengeschichte xxix, 49) সন্ন্যাসী 'আনতারের অপূর্ব কার্যের কথা উল্লেখ করেন। (২) দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জনৈক ইয়াহূদী সামাওআল ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আল-মাগরিবী তাহার জীবন-বৃত্তান্তের বর্ণনা দেন এবং বলেন, তিনি তাহার কিশোর জীবনে আনতারের গল্পের মত দীর্ঘ গল্পগুলি (MGWJ, 1898, xlii, 127, 418) পসন্দ করিতেন। (৩) গ্রন্থখানিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, বোহেমন্দ জুফরান (Godfrey of Bouillon) সম্ভবত ভিক্ষু রাজা তাফুর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব প্রথম ক্রুসেডের পরবর্তী সময়ের দিকেই ইংগিত করে অর্থাৎ এই সময়টা ছিল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রথম দিক। উল্লিখিত ধর্মীয় কথোপকথনের তথ্য হইতে বুঝা যায়, আনতারের ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হইয়াছিল ৮ম শতকে। সামাওআল ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়ার তথ্যানুযায়ী আনতার সম্বন্ধে একখানি উল্লেখযোগ্য বৃহৎ গ্রন্থ ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিল এবং যদি বোহেমন্দ ও জুফরান-এর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়া থাকে, তবে ইহা দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকেই প্রণীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রশংসাকারিগণ (مداحون) ইহাতে প্রচুর অবদান রাখিতে পারিতেন, বিশেষ করিয়া ইহার ইসলামীকরণে ইবরাহীম (আ)-এর মিদরাশ-এর উল্লেখ সামঞ্জস্যহীন সংযোজন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) ও আলী (রা)-এর কাহিনী যে কোন সময়ের সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারিত। ভাষাগত সম্ভাবনার দিক হইতে মূল 'আনতারকে পুনর্বিন্যাস করা যাইতে পারে। ইহার ৩১তম খণ্ডে মৃত্যুশয্যায় 'আনতার তাহার বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরব, ইরাক, পারস্য ও সিরিয়ায় তাহার বিজয়াভিযানের কথা গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি বায়যান্টিয়াম অথবা স্পেন, ফেজ, তিউনিস অথবা বারকা, মিসর, হিন্দ-সিন্ধ অথবা ইথিওপিয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই। মূল 'আন্‌তারের উদ্ভব হইয়াছিল হয়ত বা ইরাকে (পারস্য প্রভাবের অধীনে অথবা ফারসী মহাকাব্যের অনুকরণের আগ্রহে)। এই অন্তিম গাথায় কোন শিশুর উল্লেখ নাই। কেবল আনতারের একটি প্রেমকাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব মূল 'আনতার-কে 'আনতার ও আবলা বলাই সমীচীন। বংশানুক্রমিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ের মহাকাব্যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার রাজকীয় পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ছিল সূদানে এবং রাজকীয় বংশোদ্ভূতদের বাসস্থান ছিল আরব, বায়যান্টিয়াম, রোম ও ফ্রাংকদের দেশে। 'আনতার-কাহিনীতে ক্রুসেডের প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। ক্রুসেডাররা ফ্রাংকদের দেশ হইতে বায়যান্টিয়াম হইয়া সিরিয়ায় আসিয়াছিল, কিন্তু আনতার এক রকম উল্টা ক্রুসেডে সিরিয়া হইতে বায়যান্টিয়ামের মধ্য দিয়া ফ্রাংকদের দেশে পৌছেন এবং বিজয় লাভ করেন। এই বিজয় যদিও তখন পর্যন্ত ইসলামের বিজয় নহে, তথাপি ইহা ছিল ইউরোপীয় খৃষ্ট ধর্মের উপর আরবীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির বিজয়। উপন্যাসের সম্পূর্ণ ভৌগোলিক এলাকা ও ঐতিহাসিক পরিধি জুড়িয়া রহিয়াছে 'আনতারের অভিযান কাহিনী।

আনতার উপাখ্যানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের Bibliotheque Universelle des Romans-এ (JA, 1834, xiii, 256)। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সহিত ইহার প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন Hammer-Purgstall এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Dunlop-Liebrecht (Geschichte der Prosadichtungen, xiii-xvi) ইহার পরিচয় ঘটান তুলনামূলক সাহিত্যের সহিত। পাণ্ডিত্যের বিষয় হিসাবে সীরাত 'আনতার অধ্যয়ন শুরু করেন Goldziher (প্রধানত তাহার হাংগেরী ভাষার রচনায়)। ফ্রান্সে সীরাত 'আনতার দীর্ঘদিন যাবৎ একটি জনপ্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল। Journal Asiatique-এ এই বিষয়টি প্রায়ই আলোচিত হইয়াছে এবং ইহার অংশবিশেষ অনুবাদও করা হইয়াছে। Lamartine 'আনতারের ভূয়সী প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত (Voyages en Orient : Vie des grands hommes I. Premieres Meditations Poetiques, Premiere Preface)। Taine 'আনতারকে স্থান দিয়াছেন মহাকাব্যের মহান বীর Siegfried, Roland. The Cid, Rustam, Odysseus এবং Achilles-এর পাশেই (Philosophie de l'Art, ii, 297)। এইসব প্রশংসা ইহার প্রাপ্য। সীরাত 'আনতার আমাদের সমক্ষে একটি আকর্ষণীয় যুগের চিরপরিবর্তনশীল এক উজ্জ্বল চিত্র তুলিয়া ধরে অপরিমিত কল্পনা শক্তির মাধ্যমে। বর্ণনাভঙ্গীতে এমন কুশলী দক্ষতা যাহা ৩২টি খণ্ডে কোথাও একটু ম্লান হয় নাই। ইহার কাব্যিক ধারায়ও রহিয়াছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সীরাত 'আন্‌তার-এর পাণ্ডুলিপি, সংস্করণ ও অনুবাদ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ (১) V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes, etc., iii; (২) Louqmane et les fabulistes. Barlaam 'Antar et les Romans de chevalerie, Luttich Leipzig 1898, 113-126; (৩) তু. আরও I. Goldziher. Der arabische Held `Antar in der geographischen Nomenclatur (Globus, 1893, lxiv., no. 4, 65-67); (৪) ঐ, Ein orientalischer

(১৩) G Huart, Epigraphie arabe d asie Mineure (Revue Semitique, খৃ. ১৯০৫), পৃ. ১৬১। প্রাচীনকাল সম্পর্কে গ্রন্থাবলী ঃ (১৪) Lanckronsky, Stadte Pamphyliens und pisidie, (Vienna, খৃ. ১৮৯০), পৃ. ১৭-৩২। আন্তালিয়াহ্ সম্পর্কে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ও প্রাসাদসমূহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোটে A. Gabriel লিখেন—আন্তালিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত গবেষণা ও সমীক্ষা করা হয় নাই এবং প্রাচীন যুগ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলী Lanckronsky-র উপরোল্লিখিত গ্রন্থ (ফরাসী অনুবাদ ঃ Vielles de Pamphylie et de Piside, Paris, খৃ. ১৮৯০, ব্যতীত আন্তালিয়া-র খৃস্টীয় যুগ সম্পর্কিত প্রাসাদসমূহের তথ্যের জন্য দ্র. (১৫) Hans Ritt, Kleinasiatische Denkmaler, (Leipzig, খৃ. ১৯০৫, পৃ. ৩২-৪৬)। ইসলামী শাসনামলের প্রাসাদসমূহ সম্পর্কে R. M. Riefstahl প্রস্তুত ক্ষুদ্রচিত্রের জন্য দেখুন ঃ (১৬) Turkish architecture in South-Western, Anatolia, Cambridge, খৃ. ১৯৩১, পৃ. ৪১-৫৩ (P.Wittek, সংগৃহীত শিলালিপি ঐ গ্রন্থের পৃ. ৭৮-৯০)। আন্তালিয়া-র ইতিহাস সম্পর্কে দেখুন : (১৭) হাক্কী, আন্দবীলিক্লিরী, পৃ. ১৫-১৮; আন্তালিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রঃ (১৮) আত্-তাবারী, মিসর ১৩২৬ হি., ২খ., ৬০; (১৯) ইব্নুল-আছীর, আল্-কামিল (বূলাক মুদ্রিত হি. ১২৯০), ১২খ., ১০৫; (২০) ইবন বীবী, মুখতাসার সালজূক নামাহ্ (Houtsma প্রকাশিত, Leiden খৃ. ১৯০২, পৃ. ৩৩ প., ৯৭, ১০৩ প., ১১২ প., ১২৩, ১২৭ প., ১৪২., ১৪৭, ১৫৩, ১৮২, ১৯৯, ২১২, ২৭৩., ২৮৪, ২৮৭ প., ২৯৬; (২১) Chalandon, Les Commenes, Paris খৃ. ১৯০০, ১খ., ১৯৭-২৩৪ ও ২খ. (Paris খৃ. ১৯১২) , ৩৮, ৪৮, ১১৩, ১৮১ প., ১৯৮; (২২) de Mas Latri, Hist. de' 1lle de Chypre, Paris খৃ. ১৮৬১, ১খ., ১৭৪; ২খ., ১৩ প., ৩৬৫ প.; (২৩) মুহাম্মাদ 'আরিফ, আহমাদ তাওহীদ ও 'আলী, আন্তালিয়া বিভক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ (TTEM ও TOEM-এ); (২৪) সুলায়মান ফিক্রী, আন্তালিয়া লাওয়াসী তারীখী, ইস্তাবুল হি. ১৩৩৯-১৩৪০; (২৫) গিনিল নুরফুস সায়িমী [সাধারণ আদমশুমারী] খৃ. ১৯৩৫, ৬খ., ৭৫।

Besim Darkot (দা.মা.ই.) / যোবায়ের আহমদ

আনতিওক (দ্র. আনতাকিয়া)

আনতুনফারাহ (দ্র. ফারাহ আনতুন)

আন্তেমুরূ (انتمرو) ঃ দক্ষিণ-পূর্ব মাদাগাসকারের উপজাতি, ৮৫,০০০ স্থায়ী কৃষিজীবী সমন্বয়ে গঠিত এই উপজাতি দক্ষিণে মাতাতানা হইতে উত্তরে নামুরানা পর্যন্ত নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করে এবং মৎস্য শিকার করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে। তাহাদের মধ্যে কতিপয় গোত্রের ২৫,০০০ সদস্য এমাকা (Emaka) হইতে আসিয়াছে বলিয়া দাবি করে এবং ঐ এলাকাকে তাহারা মক্কা শরীফের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। তাহাদের লিখিত প্রাচীন বিবরণ অনুযায়ী কিছু সংখ্যক সিলামু 'মুসলমান' কাফিরি পৌত্তলিকদের সঙ্গে কোমোরেস ও উত্তর-পূর্ব মাদাগাস্কার অতিক্রম করিয়া ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে তাহাদের বর্তমান ভূখণ্ডের নিকট বসতি স্থাপন করে। তাহারা সেখানে মূলগতভাবে অভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর লোক দেখিতে পায় এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া যায়।

এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামে দীক্ষিত কয়েকটি দলের আগমনে একটি ইন্দোনেশীয় সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ঐ দলগুলি সম্ভবত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে আগমন করিয়াছিল, যেখানে পারস্য উপসাগর হইতে আগত লোকদের বংশধরদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। ইসলামে দীক্ষিত এই লোকগুলির মর্যাদা এইরূপ ছিল যে, ইন্দোরেশীয় রাজবংশ ও কতিপয় গোত্রের লোকেরা নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দান করিত।

বহিরাগতদের পরপর দুইটি দলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব ঃ প্রথম দলের লোকেরা ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিয়া দেওয়ার বিষয়টি প্রবর্তন করে এবং অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের আগত লোকেরা আরবী বর্ণমালায় লিখন পদ্ধতি ও কাগজশিল্পের প্রবর্তন করে। তদুপরি ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ (যথা আঙ্গুর, দাড়িম্ব,শন ও কহরোবা বৃক্ষ), দাবাখেলা, সালাত, সাওম কতিপয় আরবী শব্দ এবং সর্বোপরি একটি বর্ষপ ীর প্রবর্তন করে।

১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে আনতেমুরূর যাদুকরদের খ্যাতি ও প্রভাব সমগ্র মাদাগাস্কারে ছড়াইয়া পড়ে। অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন এই উপজাতি লিখন পদ্ধতিকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করিয়া বরং নিজেদের যাদু ধর্মীয় রহস্য সংরক্ষণের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। যাদুবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার সঙ্কোচন ঘটিতে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বর্ষপঞ্জী মুসলিম চান্দ্র বর্ষপঞ্জীর স্থান দখল করিয়া লয়। সালাত যাহার অর্থ কেহ বুঝিত না, যাদুর নিয়ম-নীতিতে পরিণত হয়। এই অধঃপতন আনতেমুরূর উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত ১২,০০০ আন্তামবাওক বা আন্তাম্বাহ্ওয়াকা উপজাতিদের মধ্যে বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।

১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তেমুরু রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কিছু লোক সাময়িকভাবে মাদাগাস্কারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যায়। সেখানে তাহারা কোর মোরিয়ান মুসলমানদের সহিত একত্রে বসবাস করে। ইহার ফলে ১৯১৩ খৃস্টাব্দ হইতে, বিশেষত ১৯২৬ ও ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তালাওত্রা শ্রেণীর গোত্রগুলির প্রায় ২,০০০ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকদের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের জোয়ার আসে।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের পর কফি চাষের উন্নয়নে নূতন সম্পদ সৃষ্টির ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোকদের প্রস্থান বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃত মুসলমানদের সহিত (পুনরায়) সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। ফলে খৃস্টান ও প্রাচীনপন্থী যাদুকরদের বিরোধিতার মুখে ইসলামী পুনর্জাগরণের গতি শ্লথ হইয়া পড়ে। পাকিস্তানী খোজাগণের ইসলামে দীক্ষা দানের কয়েকবারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উহাতে আর গতি সঞ্চারিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) Flacourt, Histoire de la grande ile de Madagascar, প্যারিস ১৬৬১, Grandidier সংগ্রহ,

Collection des ouvrages anciens concernant Madagascar, প্যারিস ১৯১৩-এ পুনঃপ্রকাশিত; (২) G. Ferrand, Les musulmans a Madagascar et aux Iles Comores ১ও ২, প্যারিস-আলজিয়ার্স ১৮৯১-৯৩; (৩) F. F. Gautier, Madagascar, প্যারিস ১৯০২; (৪) G. Ferrand, La legende de Raminia, JA, ১৯০২; (৫) ঐ লেখক, Un texte arabico-malgache du xvi siecle, Recueil de lEcole sup. des lettes, আলজিয়ার্স ১৯০৫; (৬) ঐ লেখক, Un chapitre dastrologie arabico- malagche, JA. ১৯০৫; (৭) ঐ লেখক, Un texte arabico -ma-lgache ancien, আলজিয়ার্স ১৯০৫; (৮) ঐ লেখক, Textes magi-ques malgache, Revue del'Histoire des religions, ১৯০৭; (৯) E. F. Gautier ও Froidevaux, Un manuscrit arabico- malgache sur les compagnes de La Case dans l'Imoro de 1659 a 1663, প্যারিস ১৯০৭; (১০) G.Ferrand, Un vocadulaire malgache arade, Memoirs de la societe de liuguistipue, ১৯০৮-৯; (১১) A. and G. Grandidier, Ethnographie de Madagascar, ১খ., প্যারিস ১৯০৬; ৩খ., প্যারিস ১৯১৭; (১২) G. Ferrand Les voyages des Javanis a Madagasca, JA 1910; (১৩) G. Mondain, L'histoire des tribus de l'lmore au xvii siecle d'apres un manuscrit historique arabicomalgache, প্যারিস-আলজিয়ার্স ১৯১০; (১৪) Ardant du Picq, Le samantsy, jeu d'echee des Tanala de it I'Ikongo Bull de l'Acad malgache, ১৯১২; (১৫) G. H. Julien, Pages arabico-malgaches, Annales de l'Acad, des sciences coloniales, ৩খ., প্যারিস ১৯২৯, ৬খ., প্যারিস ১৯৩৩; (১৬) Perrier de la Bathie, Les plantes introduites a Madagascar, Toulouse ১৯৩৩; (১৭) J. P. Rombaka, tantaran-drazana antaimoro- anteony (in Malagazi), Antananarivo ১৯৩৩; (১৮) H. Berthier, Notes et impressions sur les moeurs et coutumes du peuple malgache, Antananarivo ১৯৩৩; (১৯) F. Kasanga, Tantaran'ny Antemoro Anakara teto Imerina (in Malagazi) Antananarivo ১৯৫৬।

J. Faublee (E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

আনদ্খূয়ে (اندخوئى) ঃ ইয়াকূত, ১খ., ৩৭২-এ আনদাখূয় অথবা আদ্দাখূদ বা আন্-নাখূদ নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অংশে মাযার-ই শারীফ প্রদেশের একটি শহর। আমূ দরিয়ার (অক্সাস নদীর) ৫০ কিলোমিটার উত্তরের তৃণাবৃত জলাভূমিতে শহরটি অবস্থিত। শহরটির লোকসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। বৎসরের বার মাস নাব্য আনদ্খূয়ে নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। এই শহরটি কাবুল, মাযার-ই শারীফ হিরাতগামী মোটরযান চলাচলের উপযোগী রাস্তার সহিত সংযুক্ত। অধুনা কারাকূল অর্থাৎ মেষচর্ম বাণিজ্যের একটা প্রধান কেন্দ্ররূপে ইহা বিখ্যাত। নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য একটি মাত্র প্রাচীন ইমারত শহরটিতে আছে যাহা গম্বুজবিশিষ্ট এবং বাবা ওয়ালী সাহিবের মাযার। তিনি তথাকার একজন ওয়ালিয়্যুল্লাহ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব নাম হয়ত বা বাবা শুক্রুল্লাহ আবদাল ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, ৪২৬, হাওয়ালাসহ; (২) M. N. Kuhi, আরমাগান-ই মায়মানা, মায়মানা ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৪৩-৪৪, ৫৪।

D. N. Wilber (E. I.2) /মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আন্দারাব (اندراب) ঃ "পানির অভ্যন্তরে"; ভূখণ্ডের সাদৃশ্যের দরুন ইরানের একাধিক স্থানের এই ধরনের নাম রহিয়াছে। (১) আন্দারাব নদী ও কাসান উপনদী দ্বারা প্লাবিত আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের একটি জিলা (আল-ইসতাখ্রী, ২৭৯, আন্দারাবা)। ইহার বর্তমান কেন্দ্র হইতেছে বানূ (Banu), দ্র. বুরহান কুস্খাকী, কাত্তাগান ওয়া-বাদাখশান, রুশ অনুবাদ, তাশকেন্ত (Tashkent) ১৯২৬, ২৮-৩৪; খাওয়াক গিরিপথ উহাকে পাঞ্জহীর (পাঞ্জশীর)-এর রৌপ্য খনিসমূহের সাথে সংযুক্ত করিয়াছে। বিভিন্ন রাজবংশ, বিশেষ করিয়া স্থানীয় আবূ দাউদীদের দ্বারা আন্দারাবের টাকশাল ব্যবহৃত হইত (মুদ্রা ঃ ২৬৪-৩১০/ ৮৭৭-৯২২), দ্র. R. Vasmer,Wien. Num,Zeit., ১৯২৪, ৪৮-৬৩। আন্দারাবের শাসনকর্তাগণ শাহ্রসালার উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, দ্র. হু'দূদুল-'আলাম, ১০৯, ৩৪১; Le Strange, ৪২৭।

(২) আন্দরাবা, মার্‌ব–এর নিকটবর্তী একটি শহর, সেখানে সুল্তান সানজার নির্মিত একটি দুর্গ ছিল, দ্র. Barthold, Istoriya Orosheniye Turkestana, ১৯১৪, ৬৩।

(৩) বার্‌দা'আ (بردعة) হইতে এক দিনের দূরত্বে আবস্থিত আর্‌রান-এর একটি জায়গা, আল-ইস্তাখরী, ১৮২, Terter-এর দক্ষিণে প্রবাহিত খাসেন (Khacen) নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। লামবারান সম্ভবত ইহার বর্তমান নাম।

(৪) নুযহাতুল-কুলূব, ২২৩, অনুসারে আরদাবীল নদীর তীরবর্তী একটি স্থান। নদীটির বর্তমান নাম বালীখলী-সু; ইহা সওয়ালান পাহাড়ের উপরে প্রবাহিত হইয়া আহার নদীর সংগমস্থলে মিলিত হইয়াছে।

V. Miorsky (E.I.2)/ উম্মে সালমা বেগম

আনদারুন (দ্র. ইনদি রুন)।

আল-আনদালুস (الاندلس) ঃ আল-আনদুলুস নামেও পরিচিত, দ্র. ইয়াকূত, ১খ., ৩৭৫, ভৌগোলিক পরিভাষায় জাযীরাতুল আনদালুস। আইবেরীয় (Iberian) উপদ্বীপ অর্থাৎ আধুনিক স্পেন ও পর্তুগাল মুসলিম জাহানে মধ্যযুগের অবসান কাল পর্যন্ত উক্ত নামে পরিচিত ছিল।

(১) আল-আনদালুস নামের শাব্দিক তাৎপর্য; (২) ভৌগোলিক জরীপ;(৩) ইহার ঐতিহাসিক রূপরেখা; (৪) আনদালুসের জনসংখ্যা; (৫)

Ritterroman, Pester Lloyd, Mai 18, 1918; (৫) B. Heller, Der arabische 'Antarroman, Ungarische Rundschau, v. 83-107; (৬) ঐ, Az arab Antarregeny, Budapest 1918; (৭) ঐ, Der arabische 'Antarroman, ein Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte, Hanover 1925 (আরও দ্র. শিরো. 'আনতারা)।

B. Heller (E.I.[2]) / এ. এইচ. এম. রফিক

আন্‌তারতুস (দ্র. তারতুস)

'আন্‌তারা (عنترة) ঃ "সাহসী" (দ্র. লিসানুল আরাব, ৬খ., ২৮৩; এখানে নীল মক্ষিকা অর্থও দেওয়া হইয়াছে)। শব্দটি সম্ভবত 'ع-ت-ر' মূল হইতে উৎপন্ন যাহা হিংস্রতার ভাব প্রকাশ করে। জাহিলী যুগের একাধিক যোদ্ধা-কবি এই নাম ধারণ করিয়াছি (দ্র. আমিদী, ১৫১-২)।

খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর যোদ্ধা-কবি আন্‌তারা ইব্‌ন শাদ্‌দাদ্ মধ্যআরবের 'আব্‌স্ গোত্রের লোক ছিলেন (দ্র. গাতাফান)। কিতাবুল-আগানীতে আবুল ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, ৪র্থ/১০ম শতাব্দী নাগাদ দায়িত্বশীল লোকেরা, যে জনপ্রিয় অতিরঞ্জিত কাহিনী 'আন্‌তারাকে গল্পের নায়কে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহা আগ্রাহ্য করিবার প্রতি প্রবণতা দেখাইয়াছেন। এই লোকটির বাস্তব তথ্যভিত্তিক জীবনী নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। আরব পিতা ও কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া 'আন্‌তারা তাহার যৌবনকালে দাসত্ব বন্ধনে একজন মেষপালক হিসাবে জীবন যাপন করেন; 'আব্‌স্ ও তাহাদের আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে তিনি শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করেন দাহিস ও আল-গাবরা যুদ্ধে, বিশেষত 'আব্‌স্ ও যু'ব্‌য়ান গোত্রদ্বয় এবং পরে তামীম গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধে তিনি নিজেকে সবিশেষ খ্যাতিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় (দ্র. Cheikho, ৮৫০ প. এবং দীওয়ান, নং ১৩ প.-এর পার্শ্বে প্রদত্ত টীকা; আরও দ্র. দীওয়ান, নং ১২ ও ২৬ যাহা অন্য কবিগণের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর)। আনতারা সম্ভবত এইরূপ বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বানূ তায়্যির বিরুদ্ধে এক হামলায় পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন (তাঁহার মৃত্যুর বিভিন্ন বর্ণনার জন্য দ্র. আগানী)। নিছক এই কাহিনী পরে 'আব্‌স্ গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও খারিজী সাম্যের প্রভাবে রূপকথায় পরিণত হইল। আনতারা প্রমাণ করিয়াছে, জাহিলী যুগে একজন সংকর জাতীয় লোক খাঁটি আরব রক্তের অধিকারীর মর্যাদা লাভ করিতে পারিত। তাহার কবিতার সৌন্দর্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। যথাঃ নায়কের সাহসিকতাপূর্ণ সাফল্য, স্বীয় চাচাতো বোন আবলার প্রতি আসক্তি, তাহার (আবলার) অবজ্ঞা জয় করিবার ব্যর্থ চেষ্টা এবং হৃদয়হীন এই সুন্দরীর জন্য যোগ্য হওয়া। এই সকল ঘটনার পরিণতিতে তাহার বিখ্যাত মহাকাব্য সীরাত 'আন্‌তার (দ্র.) রচিত হয়। যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে, কবিতা ও কবিতাংশ জীবনী সংক্রান্ত লোককাহিনীর অন্তঃস্তর গঠন করিয়া থাকে। ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই কাব্য গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ বসরার পণ্ডিতগণ শুরু করেন, তন্মধ্যে আল-আস্‌মাঈ (দ্র.) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। স্পেনীয় আল-আলামুশ্-শানতামারী (মৃ. ৪৭৬/১০৮৩)-র এক ভাষ্য গ্রন্থে ২৭টি কবিতা ও কবিতাংশ রহিয়াছে; উহাদের অন্যতম মীম (অন্ত্যবর্ণ)-এর কাসীদা মু'আল্লাকাত কাব্য সঙ্কলনেও স্থান লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত ও আনতারার বলিয়া কথিত অসংখ্য কবিতাংশ, যাহার অনেক কয়টিই বেশ দীর্ঘ সঠিক সূত্রের উল্লেখ ব্যতীত Cheikho (৮১৬-৮২) সংগ্রহ করিয়াছেন। মোটের উপর এই শেষোক্ত গ্রন্থটি অনিপুণভাবে সম্পাদিত অন্যের অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য Cheikho প্রদত্ত কবিতাংশ ঃ ৮১২, ৮২০, ৮২৯, ৮৫৫। পণ্ডিতগণ অথবা নকলকারীরা প্রায়শই আব্‌লার নাম সম্বলিত যে কোন কবিতাকেই আনতারার নামে চালাইতে চাহেন (দ্র. Cheikho, ৮৫৩, ৮৪৮-৯, যেখানে একজন কবি 'আব্‌লাকে সম্বোধন করিয়া পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছে)। 'আনতারার নামে প্রচারিত অনেক বিষয়ই সন্দেহপূর্ণ (দ্র. Cheikho, ৮৫৩ ও আগানী ৩খ., ৩২৫। মু'আল্লাক'া যাহা ইহার দৈর্ঘ্যের জন্য সন্দেহপূর্ণ, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী লইয়া রচিত। মোটকথা আন্‌তারার নামে প্রচারিত কবিতা ও কবিতাংশ যাহাতে বাহ্যত জালিয়াতের হাত লাগে নাই, সাধারণত খুবই সংক্ষিপ্ত। 'নাসীব বা পূর্বরাগযুক্ত কবিতা খুবই বিরল (দ্র. দীওয়ান, সম্পা. Ahlwardt, নং ১৩, ২১; Cheikho, ৮১৭, বা অন্ত্যবর্ণের কবিতা)। একটি শোকগাঁথা (দীওয়ান নং ২৪) ও দীওয়ান নং ১১-এর ন্যায় তীব্র নিন্দাপূর্ণ ভাষার কতক কবিতাংশ ব্যতীত অধিকাংশ কবিতাই সাহসিকতা, শৌর্যবীর্য ও আব্‌লার প্রতি তাহার প্রেম নিবেদনের দাবি প্রকাশ করে। যে সকল কবিতায় অনিপুণভাবে জাল না হইবার কিছুমাত্র আশংকা বিদ্যমান তাহা সহজ ও সরল ভাষা ও রচনাশৈলীর জন্য বিখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সাল্লাম, তাবাকাতুশ-শু'আরা', সম্পা. শা'ইর, ১২৮; (২) ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, সম্পা. De Goeje, ১৩০-৪; (৩) আগানী, ৮খ., ২৩৭-৪৬ (Cheikho, কর্তৃক পুনরায় গৃহীত, শু'আরাউন-নাস্‌রানিয়্যা, বৈরূত ১৮৯০, ১খ., ৭৯৪-৮৯২, যিনি দীওয়ান, সম্পা. Ahlwardt ও অসংখ্য কাব্যাংশ সংশোধিত আকারে পুনর্লিখন করিয়াছেন); (৪) Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, প্যারিস ১৮৪৭, ২খ., ৪৪১ প., ৫১৪-২১; (৫) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহি, 'ইক্‌দ, সম্পা. উর্‌য়ান, নির্ঘণ্ট; (৬) আমিদী, মু'তালিফ, ১৫১, Noldeke Funf Mu'allaqat, ২খ., ১-৪৯; (৭) Thorbecke, Antarah, Leipzig ১৮৬৭ খৃ., Derenbourg কর্তৃক অনুসৃত, Le Poete anteislamique Antar, in Opuscules d'un Arabisant, প্যারিস ১৯০৫, ৩-৯; (৮) Ahlwardt, Bemerkungen uber die Achtheit der alten arab, Gedichte, Greifswald

১৮৭২, ৫০-৭; (৯) Nallino, La Litterature arabe, অনু., Pellat, প্যারিস ১৯৫০, ৪৪-৫; (১০) ইসকান্দার আগা, মুনয়াতুন-নাফ্সী ফী আশ্আরি 'আনতারাঃ আল-আব্সী, বৈরুত ১৮৬৪। দীওয়ানটি Ahlwardt, সম্পাদনা করিয়াছেন, The Divans of the six ancient Arabic Poets, লন্ডন ১৯৭০ খৃ., ৩৩, ৫২, সংযোজন, ১৭৮ প.; অন্যান্য সংস্করণ, কায়রো ১৩১৫ হি., ও বৈরুত ১৮৮৮, ১৯০১, এইজন্য দ্র. Brockelmann, S I, ৪৫ [আরও দ্র. শিরো. (সীরাত) 'আনতার]।

R. Blachere (E.I.2) /মু. আবদুল মান্নান

'আন্তারা (عنترة) ঃ (রা) মদীনাবাসী একজন আনসারী সাহাবী। তাঁহার জন্মতারিখ ও বংশপরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে তিনি সুলায়ম ইব্ন আম্র ইব্ন হাদীদা নামক জনৈক আনসারীর মাওলা ছিলেন। ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন, তিনি বানূ তামীম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা-এর মিত্র (হ'ালীফ) ছিলেন। তিনি কখন ও কোন্ সালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। তবে তিনি বদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁহার হন্তা ছিল নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া আদ্-দীলী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্-সাহাবা, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ৩খ., ৪০; (২) আয্-যাহাবী, তাজরীদু আস্মাইস্-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৪২৭; (৩) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ৩খ., ৫৮২; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., ৩২৩।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আন্তারী (عنترى) ঃ (আ) আনতার [দ্র.] হইতে উৎপন্ন বিশেষ্য, মিসরে ইহা নিম্নরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকেঃ (১)/সীরাত 'আন্তার বর্ণনাকারী; (২) কাফ্তানের নীচে পরিধেয় একটি ক্ষুদ্র পোশাক। শেষোক্ত অর্থে আসলে গ্রীক ভাষা হইতে আগত তুর্কী শব্দ Entari ব্যবহৃত হইত, কিন্তু জনসাধারণের ব্যবহারে উহা আনতারী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Dozy, Suppl., ২খ., ১৮০ এবং উদ্ধৃত তথ্যসমূহ।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2) /মু. আবদুল মান্নান

আন্তালিয়া (انطالية) ঃ (আদালিয়া) আনাতোলিয়ার দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে ঐ নামেরই উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণায় একটি শহর। উহার নাম প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আতালিয়া (Attalia, Attaleia, Peutinger-এর মানচিত্রে আতালিয়া Atalia), আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহে Adalia এবং অধিকাংশ তুর্কী গ্রন্থে Adalya'রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। Bergama-এর শাসক দ্বিতীয় আত্তালূস (Attalos II) [খৃ. পূ. ১৩৮-১৫৯]-এর নাম হইতে গৃহীত, যাহাকে ঐ শহরের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। কাতিব চেলেবী রচিত জাহাননুমা (পৃ. ৬৩৮) গ্রন্থে উহার আরবী বানান উহ্তুলুস (اوهطلس) লিখিত আছে। সম্ভবত এই শহর প্রতিষ্ঠার পূর্বেও এইখানে জনবসতি ছিল (Hirachfeld-এর মতে এখানে Karyos নামে একটি প্রাচীন বসতি ছিল। কিন্তু Lanckoronski এই মতের প্রতি কোন গুরুত্ব দেন না)।

আন্তালিয়া এলাকায় এমন কিছু আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল যাহার ফলে এখানে প্রাচীন যুগে একটি বন্দর গড়িয়া তোলা সহজসাধ্য হইয়া থাকিবে। প্রথমত ইহার অবস্থান এমন একটি উপসাগরের প্রান্তসীমায় ছিল যাহা স্থলভাগের অভ্যন্তরে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে ভূমধ্যসাগর হইতে আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য ইহা অতি উপযোগী ছিল। দক্ষিণ আনাতোলিয়ার পর্বতমালা যাহা সাধারণত তীরের অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে, তাহা এখানে সোজা দেশের অভ্যন্তরভাগের দিকে অগ্রসর হইয়া আছে। এইভাবে ঐগুলির মধ্যবর্তী স্থানে উপসাগরের প্রান্তসীমায় একটি প্রশস্ত শ্যামলভূমির উদ্ভব হইয়াছে। এই বিশাল শ্যামলভূমি বহু দূর পর্যন্ত পর্বতমালার ভিতরে ভিতরে বিস্তৃত হইয়া আছে। সমুদ্রতট হইতে নিম্নভূমি পর্যন্ত এবং তথা হইতে Phrygia অর্থাৎ আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরভাগের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত একটি প্রাকৃতিক রাস্তা ধরিয়া পৌঁছা তুলনামূলকভাবে সহজ। সাধারণভাবে আন্তালিয়া-র অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয়, এইখানে বিভিন্ন ধরনের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। যথা সমুদ্রতীরে বিশ হইতে ত্রিশ মিটার উচ্চ পাহাড়-পর্বত রহিয়াছে, সেইগুলিকে সহজেই প্রাচীরাবদ্ধ করা যায়। ইহা ঐ পাহাড়গুলির মধ্যস্থলে একটি প্রাকৃতিক বন্দর, যেখানে প্রাচীন কালের বা মধ্যযুগের বড় ধরনের নৌ-বহর নোঙ্গর করিতে পারে এবং যাহা সর্বপ্রকার ঘূর্ণিঝড় ও বালিস্তূপে আটকাইবার বিপদ হইতে মুক্ত ও নিরাপদ। সেখানে সামুদ্রিক বাঁধসমূহ (Breakwaters) নির্মাণের ফলে উহা একটি সংরক্ষিত সমুদ্র বন্দরে পরিণত হয়। ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে এই ধরনের মনোরম দৃশ্য বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং আত্তালূস (Attalos) নির্মিত এই শহরটি অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করত অন্যান্য শহরের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু কিছুকাল পরেই Attalos-এর বংশধরদের এলাকাসমূহকে রোমক সরকার তাহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। ফলে এই শহর (পার্শ্ববর্তী সকল সামুদ্রিক এলাকার ন্যায়) জলদস্যুদের করায়ত্ত হয়। খৃ. পূ. ৭৯ সালে রোমকদের একজন প্রধান শাসক P. Servilius (যিনি Isaurekus নামে পরিচিত) ঐ জলদস্যুদের উৎখাত করেন এবং তখন হইতেই এইখানে কার্যত রোমক শাসনের সূচনা হয়। নগর প্রাচীরের সম্প্রসারণ করিয়া উহাকে আরও দৃঢ় করা হয়। বায়যানটাইন যুগে আন্তালিয়া-র গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহা ভূমধ্যসাগরের একটি কর্মব্যস্ত বাণিজ্য বন্দরে পরিণত হয়। এই কারণেই মুসলিমদের দেশ জয়ের প্রাথমিক যুগে উহা বারংবার তাহাদের নৌ-আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং ২৪৬/৮৬০ সালে খলীফা আল্-মুতাওয়াক্কিল-এর তুর্কী নৌ-সেনাপতি ফাদ্ল ইব্ন কারিন সমুদ্র পথে আক্রমণ করত উহা জয় করেন। অতঃপর একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন তুর্কীরা সমগ্র আনাতোলিয়া জয় করে তখন আন্তালিয়া শহরটিও তাহাদের অধিকারে আসে। কিন্তু খৃ. ১১০৩ সালে সম্রাট Alexis Komnene-এর সৈন্যরা পুনরায় উহা অধিকার করিয়া লয়।

কিছুদিন পর তুর্কীরা উহা পুনরায় জয় করে। ১১২০ সালে সম্রাট John Komnene আবার তুর্কীদের নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লইলেন। খৃ. ১১৮১ সালে সুলতান দ্বিতীয় কালীজ আর্‌সালান শহরটি অবরোধ করেন কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই। লাতিন্‌দের কন্সটানটিনোপল জয় করার ও বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের বিভক্তির পর আন্‌তালিয়া Aldobrandin নামক একজন ইউরোপীয়ের অধিকারে চলিয়া যায়। ৬০৩/১২০৭ সালে সুল্‌তান গিয়াছুদ্দীন ১ম কায়খুসরূ উহা অবরোধ করেন। যদিও সাইপ্রাসের শাসনকর্তা Gautier de Montbeliard ফিরিঙ্গীদের একটি দল লইয়া সাহায্যার্থে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতান আন্‌তালিয়া অধিকার করিয়া নেন (উক্ত জয়লাভের পর হইতেই সাল্‌জূক জাতি ও ভেনিসবাসীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ শুরু হয় এবং ভেনিস্‌বাসীকে কিছু কিছু বাণিজ্য সুবিধা প্রাদান করা হয়)। কিন্তু Gautier যিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন এবং পরে যাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়, খৃ. ১২১৫ সালে পুনরায় সাইপ্রাস হইতে আসিয়া আন্‌তালিয়া অধিকার ও তুর্কীদেরকে হত্যা করেন। আনাতোলিয়ার সুলতান ইযযুদ-দীন প্রথম কায়কাউস দ্বিতীয়বার উক্ত শহর অধিকার করেন এবং Gautier-সহ সকল ইউরোপীয়কে হত্যা করেন। তুর্কীরা নগর প্রাচীর মেরামত করে এবং সমুদ্র বন্দরের প্রাচীন পোতাশ্রয় ও জেটিগুলি নূতন করিয়া নির্মাণ করেন এবং জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানাও স্থাপন করেন।

আন্‌তালিয়া, আনাতোলিয়ার সালজূকদের ঐ সকল নৌ-বহরের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যাহা ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন ছিল। এখানকার তুর্কী শাসকবর্গের উপাধি "মালিকুস্‌-সাওয়াহি'ল" (সমুদ্রতীরের রাজা) বা আমীরু'স্‌-সাওয়াহি'ল (সমুদ্রতীরের আমীর) ছিল। তুর্কীরা তাহাদেরকে 'সাহি'ল-বে' নামে আখ্যায়িত করিত। বায়যানটীয়গণ এই শব্দটি Salbeg (সাল্‌বেগ) রূপে ব্যবহার করিত।

কিছুকাল পর্যন্ত আন্‌তালিয়া সাল্‌জূক শাসকবর্গের শীতকালীন বাসস্থান ছিল। সাল্‌জূক শাসনের অবসানের পর এই এলাকা হামীদ উগল্‌ বংশের অধিকারে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইলয়াস বে-র পুত্র দুন্দার বে যিনি জলাভূমি এলাকায় একটি রাজ্য কায়েম করিয়াছিলেন, আনতালিয়া দখল করিয়া উহার শাসনভার স্বীয় ভ্রাতা ইয়ূনুস বে-র হস্তে অর্পণ করেন। দুন্দার নিজে ঈল্‌খানীদের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। যেই সময় আনাতোলিয়া তাঁহাদের অধিকারে ছিল উহার শাসন ক্ষমতাও তাঁহারা পরিচালনা করিতেন। খৃ. ১৩২৪ সালে তাঁহাকে আনাতোলিয়ার ঈল্‌খানী শাসক দিমির্‌তাশ-এর আদেশে আন্‌তালিয়ায় হত্যা করা হয়। ইহার তিন বৎসর পর অর্থাৎ খৃ. ১৩২৭ সালে তাঁহার পুত্র ইস্‌হাক বে মিসরেরর খুস্‌রু বংশীয় শাসকদের অধীনতা স্বীকার করত স্বীয় পৈত্রিক এলাকার অধিকার লাভ করেন। ঐদিকে আনতালিয়ায় দুন্দারের ভাই ইয়ূনুস বে-র পুত্রগণ শাসন ক্ষমতা আয়ত্ত করে। কোন কোন ঐতিহাসিক হামীদ উগুল্‌লারী গোত্রের উক্ত দ্বিতীয় শাখাকে তেকাহ উগুল্‌লারী নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে সালজূকরা আন্‌তালিয়া জয় করিবার পর তথায় "তেকাহ্‌" তুর্কীদিগের বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুত ঐখান হইতেই হামীদ উগুল্‌লারী-র আবির্ভাব ঘটে। মোটকথা, আন্‌তালিয়ায় যাহাদের আধিপত্য ছিল তাঁহারা হামীদ উগুল্‌লারীরই একটি শাখা ছিল। খৃ. ১৩৬১ সালে সাইপ্রাসের বাদশাহ্‌ Pierre আন্‌তালিয়া অধিকার করেন। ফলে হামীদ উগূল্‌লারী বাধ্য হইয়া উত্তর দিকে পশ্চাদপ্‌সরণ করেন। কিন্তু খৃ. ১৩৭৩ সালে য়ূনুস বে-র পৌত্র মুহাম্মাদ বে ইব্‌ন মাহ্‌মূদ বে পুনরায় ঐ শহর দখল করেন। শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র 'উছ্‌মান বে-র যুগে আন্‌তালিয়া তুর্কী আল-ই 'উছ্‌মান-এর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। আন্‌কারা যুদ্ধের (খৃ. ১৪০২) পর যদিও 'উছ্‌মান বে Karaman অধিপতিদের নিকট সাহায্য চাহিয়া পুনরায় শহরটি করায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা চালান। তার আন্‌তালিয়াস্থ উছমানী গভর্নর হাম্‌যা বে তাঁহাকে পরাস্ত করত হত্যা করেন (খৃ. ১৪২২-১৪২৩)। উছমানী যুগে এই শহর তেকাহ সানজাক-এর রাজধানী ছিল (যদিও তেকাহ্‌-র পাশা সময় সময় আল-মালীতেও অবস্থান করিতেন)। আওলিয়া চালাবী যিনি ১০৮২/ ১৬৭১-১৬৭২ সালে ঐ শহরে গমন করিয়াছিলেন এবং আন্‌তালিয়ার অবস্থা বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন,তাঁহার বর্ণনামতে এই শহরের পার্শ্বে একটি প্রাচীর ছিল যাহা দৈর্ঘ্যে ৪,৪০০ ফুট এবং তাহাতে ৮০টি বুরূজ নির্মিত ছিল। এই প্রাচীরাবদ্ধ নগরে কমপক্ষে তিন সহস্র প্রাচীন ঘর-বাড়ি ছিল যেগুলির ছাদ ছিল খাপরার। ঘর-বাড়িগুলি ছিল চারিটি মহল্লায় বিভক্ত যাহাতে সংকীর্ণ গলি ছিল। শহরটি তিন দিক হইতে নানা ধরনের বাগান পরিবেষ্টিত ছিল। বড় বাজার ছিল নগর প্রাচীরের বাহিরে। পোতাশ্রয় যাহার ভিতর এলাকায় দুইটি বুরূজ নির্মিত ছিল, তাহা কমপক্ষে দুই শত জাহাজের জন্য পরিপূর্ণ ও সুরক্ষিত নিরাপদ আশ্রয় ছিল। শহরটিতে এগারটি বড় বড় মস্‌জিদ (তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ মস্‌জিদটি ছিল কুওয়ায়জী মুরাদ পাশা নির্মিত মস্‌জিদ), সাতটি বড় বড় মাদ্‌রাসা, বহু খানকাহ, সরাইখানা ও হাম্মাম (স্নানাগার) ছিল। আন্‌তালিয়ায় বিভিন্ন যুগের কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শন ছিল, যেমন যে সকল নগর-প্রাচীর বন্দরের পার্শ্বে শহরের প্রাচীন কেন্দ্রস্থলকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং উহাকে ভিতরের দিকে নিম্ন এলাকায় বিভক্ত করে, তাহা মূলত প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ যদিও মধ্য ও বর্তমান যুগে ইহাকে কয়েকবার মেরামত, দৃঢ় ও নবায়ন করা হয়। তুর্কীরা নিজেরাও আন্‌তালিয়ার দৃঢ়করণের উদ্দেশে উহাকে সংযোজন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। বহু বিধ্বস্ত অট্টালিকার উপকরণ পরবর্তী নির্মাণকার্যে ব্যবহার করা হয়। সাল্‌জূক শাসনকালে আনাতোলিয়া-র যে অপরিসীম গুরুত্ব ছিল তাহা ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ পরবর্তী যুগে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। "উলু (বৃহৎ) মস্‌জিদ এখন পরিত্যক্ত। কারাহ্‌তায় মস্‌জিদের শুধু একটি দ্বার, যাহা অত্যন্ত উন্নত মানের কারুকার্য মণ্ডিত এবং একটি মিহ্‌রাব অবশিষ্ট আছে। এয়ুলী মস্‌জিদ যাহা ৭৭৪/১৩৭৩ সালে নির্মিত তাহার একটি ইষ্টক নির্মিত মনোরম মিনার অবশিষ্ট রহিয়াছে। সাল্‌জূক যুগের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে রহিয়াছে একটি লঙ্গরখানা, একটি ভগ্ন খানকাহ ও অসংখ্য কবর। উছমানী যুগের মস্‌জিদসমূহ (যেমন কুওয়ায়জী মুরাদ 'জামে ও মুহাম্মাদ পাশা জামে')-ও উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান আন্‌তালিয়া সমুদ্রতীর হইতে সোজা উচ্চ কংকরময় মধ্যবর্তী একটি সমতল ময়দানে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে তাহা অবলোকন করিলে সারি সারি লাল টালির ছাদবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ঘর-বাড়ী, উহাদের চতুষ্পার্শ্বের

শস্য-শ্যামল উদ্যান ও পশ্চাদপটে অবস্থিত পাহাড়ের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। তীরবর্তী কংকরময় ভূমিগুলির উপর হইতে সমুদ্রে পতিত জলপ্রপাত এই দৃশ্যকে আরও সজীব করিয়া তোলে। ঐ সকল জলপ্রপাতের পানি Katarraktes নদী হইতে প্রবাহিত হয়, যাহা উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড় হইতে নির্গত। উহা আন্তালিয়ার মাঠে চুনের স্তরে বারংবার অদৃশ্য হইয়া পুনরায় ভূমির উপর দৃশ্যমান হয় এবং শহরের নিকটস্থ বিভিন্ন নদ-নদীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই অসংখ্য নদী-নালা শহরের আবহাওয়ায় ও সাগরের আবহাওয়ায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। এই ময়দানটি তিন দিক হইতে পহাড় দ্বারা বেষ্টিত। তাই গ্রীষ্মকালে তথায় অধিক গরম পড়ে (জুলাই মাসে গড় তাপমাত্রা হয় ২৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)। দ্বিপ্রহরে তাপ ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত পৌছায়। সমুদ্র হইতে যখন বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, শুধু তখন তাপ কমিয়া যায়। বাতাসে আর্দ্রতার আধিক্য থাকায় গরম অসহ্য হইয়া পড়ে, তজ্জন্য বাশিন্দাগণের এক বিরাট অংশ গ্রীষ্মকাল কাটাইবার জন্য পাহাড়ী চারণভূমিসমূহে ও আশেপাশের বাগানগুলিতে চলিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে তথায় বৃষ্টিপাতও হয় না। পরন্ত শীতকালে এখানকার আবহাওয়া অনুকূল ও মনোরম (জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)। শীতকালে কুয়াশা বিরল এবং তুষারপাত খুবই কম। অধিক বৃষ্টিপাতের মৌসুম (সারা বৎসরে এক মিটার হইতে অধিক) হেমন্তকালের শুরু হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত।

এই জাতীয় আবহাওয়ার কারণে ঐ এলাকায় স্বাভাবিক তাপের গ্রীষ্মমণ্ডলের বহু মৌসুমী ফসল উৎপাদন করা যায়। আন্তালিয়ার আশেপাশে নানা প্রকারের শস্য ও শাক-সব্জী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের ফল, বিশেষত লেবু, কমলা, এমনকি কলাও উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি এখানে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে, যেখানে গ্রীষ্মকালীন নানা প্রকার ফসল উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা করা হইতেছে। আশা করা যায়, যতই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে, ততই এই অঞ্চল দ্রুত ফল ও সব্জী উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। এখন পর্যন্ত বহির্বিশ্বের সহিত আন্তালিয়ার যোগাযোগ সমুদ্রপথেই বিদ্যমান। আজকাল বড় বড় জাহাজ পুরাতন বন্দরের বাহিরে সহজেই নোঙ্গর করিতে পারে। ইস্তাম্বুলের সঙ্গে মেইল স্টীমারের যাতায়াত নিয়মিত জারী আছে। বৈদেশিক জহাজগুলি দ্বারা আন্তালিয়ার যোগাযোগ বেশীর ভাগ ইটালী, মিসর ও সিরিয়ার সমুদ্রবন্দরের সহিত স্থাপিত। এই স্থান হইতে ফল, জ্বালানি ও গৃহ নির্মাণের কাঠ, শাক-সব্জী, খাদ্যশস্য, অশোধিত ধাতু ইত্যাদি রফ্তানী করা হয়। অপরদিকে বিগত দিনগুলিতে স্থলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ফলে ইয্মীর ও মির্সীন-এর ন্যায় আন্তালিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ ভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, অথচ এই বিস্তীর্ণ অনুন্নত এলাকার সহিত উহার বাণিজ্যিক তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারিত। আফয়ুন-আনতালিয়া রেলওয়ে নির্মিত হইলে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং আনতালিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যবসার একটি অংশ আনতালিয়ার বন্দরের দিকে আকর্ষিত হইবে। আন্তালিয়া ও বুরদুর-এর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিকারী একটি উন্নত মানের সড়ক বিদ্যমান আছে, যাহা আন্কারা ও ইস্তাম্বুলের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের সহায়ক।

নিয়মিত আদমশুমারী না হওয়া পর্যন্ত অতীতে আন্তালিয়ার জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় নাই। প্রায় সাত বৎসর পূর্বে Ch. Texier-এর অনুমান ছিল, ঐ শহরের জনসংখ্যা পনর ও আঠারো হাযারের মধ্যে সীমিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই শহরের জনসংখ্যা তেরো হইতে পঁচিশ হাযারের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাযার। তন্মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ছিল মুসলমান ও এক-চতুর্থাংশ Orthodox Church-এর অনুসারী। যখন শেষোক্ত খৃষ্টানদেরকে লোক বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে গ্রীসে প্রেরণ করা হয়, তখন সমস্ত আন্তালিয়া তুর্ক (মুসলিম) শহরে পরিণত হয় এবং আজও সেইভাবে বিদ্যমান। খৃ. ১৯২৭ সালে ইহার জনসংখ্যা ছিল ১৭,৩৫৬। অতঃপর খৃ. ১৯৩৫ সালে তাহা ২২,৯৯৩-এ দাঁড়ায়। তন্মধ্যে অমুসলিম যাহাদের মাতৃভাষা তুর্কী নহে, তাহাদের মোট সংখ্যা এক শতও ছিল না। খৃ. ১৯৪০ সালে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫,০৭৫ ও খৃ., ১৯৬০ সালে ৪,১৬,১৩০ পর্যন্ত পৌঁছে।

আন্তালিয়া কাদা-র (যাহা প্রথমে কূনিযা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত তেকাহ্ সানজাক-এর অধীনে এলাকার সদর দফতর ছিল) আয়তন ১৯,৪৭৯ বর্গ কিলোমিটার এবং ইহার জনসংখ্যা ২,৪২,৬০৯। বিগত শতাব্দীগুলিতে ইহার অসংখ্য বৃক্ষাদি ধ্বংস করা সত্ত্বেও আন্তালিয়ার বনাঞ্চল প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বড় এলাকা বলিয়া পরিগণিত। পার্বত্য এলাকার (তাখ্তাহ্ জী) কাঠুরিয়া যাহারা কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এবং যাযাবরের মত বাস করে—গ্রীষ্মকালে তাহারা গবাদি পশু লইয়া উষ্ণ অঞ্চলের চারণভূমিতে চলিয়া যায়। কৃষিপণ্য ও বনসম্পদ ব্যতীত রাজ্যের ভূগর্ভে বহু সম্পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ক্রোম (Chrome) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (যাহা এই পর্যন্ত আংশিকভাবে কাজে লাগান হইয়াছে)। উপরিউক্ত কারণে আন্তালিয়া প্রদেশটি তুরস্কের এমন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেইখানে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ আনতালিয়া সম্পর্কে বিশেষ তথ্যাবলী সম্বলিত প্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ (১) কাতিব চেলেবী, জাহাননুমা, পৃ. ৬৩৮; (২) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ্, ১খ., ২৮৫-২৯০। আরও দেখুন ঃ (৩) ইব্ন বাত্তূতা, সিয়াহাত নামাহ্, ১খ.; (৪) Strebon, Geographie, ১৪খ., ৬৬৭। ইহা ব্যতীত বিগত শতাব্দীর ভ্রমণ ও ভূগোলশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে আনতালিয়ার কিছু চিত্র পাওয়া যায়, দেখুন ঃ (৫) C. Texier, Asia Mineure, পৃ. ৭০৫ প.; (৬) T. Spraitt ও E. Forbes, Traveles in Lycia, ১খ., ২১১; (৭) K. Ritter, Erdkunde, ১৯খ., ৬২৪ প., ৬৪০ প. ; (৮) E. Reclus, Nouvelle Geographie Universelle, ৯খ., ৬৫; (৯) W. Ruge, Beitrage zur Geographie von Kleinasian (Petermanns Mitteilungen, খৃ. ১৮০২); (১০) V. Cuinet, La Turpuite d Asiae, ১খ., ৮৫৩-৮৬৩; ইহা ব্যতীত সম্প্রতি রচিত গ্রন্থাবলীর জন্য দেখুনঃ (১১) Banse, Die Turkei., পৃ. ১৬০; (১২) M. Gemal, Anadolu, পৃ. ৬৭ প. ;

উন্নয়ন; (৬) আনদালুসের ইতিহাসের জরীপ; পরিশিষ্ট ঃ উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত আনদালুস; (৭) আল-আনদালুসে ইসলাম; (৮) আনদালুসী সাহিত্য ও কৃষ্টি; (৯) আনদালুসী শিল্পকলা; (১০) স্পেনীয় আরবী।

(১) আল-আনদালুস নামের শাব্দিক তাৎপর্য

আন্দালুস নাম ভান্দাল (আল-আন্দালীশ অথবা ভানদালিশ)-দের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করা হয়। সম্ভবত ভান্দালগণ উত্তর আফিকা অভিযানের পূর্বে আইবেরীয় উপদ্বীপ অতিক্রমকালে বেটিকা (Baetica)-র ভান্দালিসিয়া (Vandalicia) নামকরণ করে। আনদালুস শব্দে বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনার্থে আল্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য অনেকেই 'আল' বাদ দিয়া শুধু আনদালুস ব্যবহার করিয়াছেন (আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ., ৩৫, তালিকা; আরও দ্র. মুহাম্মাদ ইনায়াতুল্লাহ, আনদালুস কা তারীখি জুগরাফিয়া)। আল-আন্দালুস নামটি ৯৮/৭১৬ সনের একটি দ্বিভাষিক (আরবী ও লাতিন) দীনারে অংকিত দেখা যায়। উহাতে আল-আনদালুস নামের লাতিন রূপ Spania ব্যবহৃত হইয়াছে। সে কালের স্পেনীয় লাতিন ঐতিহাসিকগণ আইবেরীয় উপদ্বীপকে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ মুসলিম স্পেন ও খৃস্টান স্পেনকে চিহ্নিত করিতে যাইয়া শুধু স্পানিয়া অথবা ইহার জুড়ি Hispania ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যদিকে আরব লেখকগণ যখনই আল-আনদালুস শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা দ্বারা কেবল মুসলিম স্পেন বুঝাইয়াছেন, সেই স্পেনের আয়তন যতটুকুই থাকুক না কেন। খৃস্টানদের পুনর্বিজয়ের ফলে এই আয়তন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে (স্পেনীয় সমার্থক শব্দ Reconquista-এর অর্থবোধক শব্দ হিসাবে পুনর্দখল শব্দটি এই নিবন্ধে ব্যবহৃত হইবে), এমনকি এই উপদ্বীপে ইসলামী শক্তি-শাসিত অঞ্চলের আয়তন সংকুচিত হইয়া যখন গ্রানাডার বানূ-নাস্র শাসকদের ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে পর্যবসিত হয়, তখনও উহা বুঝাইবার জন্য আল-আনদালুস শব্দ ব্যবহৃত হইত। অন্যদিকে ইহার কিছুদিন পূর্বে হইতেই মুসলিম পণ্ডিতগণের লিখিত ইতিহাসে আরবী ধাঁচের নাম পরিলক্ষিত হয় ইশবানিয়া (Hispania, Espana) এবং পরবর্তী কালে খৃস্টানদের পুনর্বিজয়ের ফলে গঠিত রাজ্যসমূহের লিয়ন (Leon), কাশতাল্ল বা কাশতীলা (Catilla, Castile), বুরতুকাল (Portugal), আরাগূন (Aragon), নাবাররা (Naavarra)। রোমকগণ ইশবানিয়ার নামকরণ করে হিস্পানিয়া। ইহার পূর্বে ইহা আসপারী (Hesperie) নামে অভিহিত হইত যাহার অর্থ পশ্চিমা দেশসমূহ (বিলাদুল-গারব বা আল-মাগরিব)। কিন্তু আল-মাককারী এই নামকরণের কারণ বর্ণনায় বলিয়াছেন, একদা এই অঞ্চলের এক সম্রাটের নাম ছিল আশবান ইবন তায়তুশ; তাঁহার নামানুসারে রোমকগণ উহার নামকরণ করে আশবানিয়া। আর এক বর্ণনায় জানা যায়, উক্ত সম্রাটের প্রকৃত নাম ছিল ইসবাহান, যাহা রোমকদের নিকট ইশবান-এ পরিণত হয়। ইশবীলিয়ার নির্মাণও এই সম্রাটের প্রতি আরোপিত হয়। আরও উল্লেখ রহিয়াছে, পূর্বে ইশবীলিয়া ছিল একটি ক্ষুদ্র জনপদ। পরবর্তী কালে সমগ্র দেশ এই ইশবীলিয়া নামে পরিচিত হয় (নাফহু'ত-তীব)।

কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া ইবন কুযমান-এর বর্ণনায় আল-আন্দালুস-এর নাম আল-আন্দালুসরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আল-আন্দালুস হইতে জাতিগত পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ আনদালুসী ও সমষ্টির পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ আহ্লুল- আনদালুস শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমান কালেও উপকূলবর্তী ভূখণ্ডের ভৌগোলিক এলাকা (উপকূলবর্তী ভূখণ্ড ও উচ্চ ভূমিসমূহ) পূর্ব হইতে পশ্চিমে, আধুনিক আলমেরিয়া (Almeria) প্রদেশ হইতে ওলিবা (Huelva) পর্যন্ত অর্থাৎ আন্দালুসিয়া (স্পেন, Andulucia)-এর প্রাকৃতিক ভূখণ্ড চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আন্দালুস নাম প্রয়োগ করা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহার অধিবাসিগণকে Andaluces (এ. ব. Andaluz) বলা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. mus, i, 71-3; (২) ঐ লেখক, Esp. mus. Xe siecle, 5-6; (৩) Ch. Courtois, Les Vandales et l' Afrique, Paris 1955, 56, 57 and note 1; (৪) ইয়াকূত, ১খ., ৩৭৫; (৫) আল-মাক্কারী, নাফ্হুত-তীব; (৬) আল-ইদরীসী, নুযহাতুল-মুশতাক; (৭) আবুল-ফিদা, তাকবীমু'ল-বুলদান।

(২) ভৌগোলিক জরীপ

(১) প্রাকৃতির অবস্থানঃ ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আইবেরীয় (Iberian) উপদ্বীপ অনেকটা পঞ্চভুজ (Pentagonal) আকৃতি বিশিষ্ট এক বৃহৎ শৈলান্তরীপ (Promontory) গঠন করিয়াছে। ইহা পিরেনীজ পর্বতমালা (জিবালুল-বারানিস) দ্বারা ইউরোপ মহাদেশের সংগে সংযুক্ত এবং অবশিষ্ট অঞ্চল আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর দ্বারা বিধৌত। ইহা ৪৩° ২৭' ২৫" ও ৩৫° ৫৯' ৩০" উত্তর এবং ৯° ৩০' ও ৩° ১৯' পূর্বের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ২,২৯,০০০ বর্গমাইল। সমগ্র ভূখণ্ডের পঞ্চমাংশের কিঞ্চিত কম এলাকা জুড়িয়া রহিয়াছে আধুনিক পর্তুগাল (আধুনিক স্পেনের আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গমাইল)।

এই উপদ্বীপ ভূমধ্যসাগর অববাহিকার পশ্চিম প্রান্তে আটলান্টিক উপকূলবর্তী অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থিত থাকায় ইহার বহু ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পিরেনীজ পর্বতের প্রতিবন্ধক ইহাকে ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। কেবল সংকীর্ণ জিবরালটার প্রণালী দ্বারা ইহা আফ্রিকা মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত তারীফা ও সিবতা (Ceuta) সেতুমুখ (bridgehead) দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভৌগোলিক গঠন প্রকৃতির কারণে ইহা একটি দ্বীপের বৈশিষ্ট্য (insular character) অর্জন করিয়াছে, যাহার ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া আইবেরীয় উপদ্বীপ ট্রান্স-পিরেনীয় (Trans-Pyrenean) পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। অপর পক্ষে আদিকাল হইতে প্রাচ্য প্রভাবের অনুপ্রবেশের জন্য ইহার প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় প্রবেশ পথকে উন্মুক্ত রাখিয়াছে।

স্পেনীয় উপদ্বীপ ইউরোপে একটি সর্বাপেক্ষা অসমতল ভূখণ্ড। ইহার গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে প্রতীয়মান হয়, মূলত একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় মালভূমি লইয়া ইহা গঠিত, যাহার অন্তত অর্ধেক ভূমি তথা মিসিটা (Meseta)-র গড় উচ্চতা ১,৯৬৫ ফুট এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে দুই Castiles ঃ প্রাচীন (Castilla la Vieja) ও নব (Castilla la

Nueva) এবং ইস্তারামাদুরা (Estramadura)। মিসিতাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে পর্বতের খাড়া ঢাল। উত্তরে কান্তাব্রীয় (Cantabrian) পর্বতমালা; উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে আইবেরীয় পর্বতমালা, দক্ষিণে সিয়েররা মোরেনা (Sierra Morena)-র পরম্পরাগত স্তরসমূহ (Subbaetic পর্বতশ্রেণী)। পশ্চিমে গ্যালিশিয়া (Galicia) ও পর্তুগালের উচ্চ মালভূমি। এই মালভূমির পার্শ্বদেশে তিনটি গভীর নিম্ন অঞ্চল রহিয়াছে; যথা এব্রো (Ebro), ওয়াদিল-কাবীর (Gualdaquiver) ও নিম্ন তাগুস (Lower Tagus) নদীসমূহের অঞ্চল। দক্ষিণে পিনিবাইটিক সিস্টেম (Penibaetic System)-এর ভূমিকম্পের ফলে এক পর্বতপুঞ্জের (Mountain mass) সৃষ্টি হয়। যাহা উচ্চ আন্দালুসিয়ার বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে এবং এক অবিন্যস্ত পর্বতশ্রেণী রূপে (স্পেনিশ sierra saw; আ. আশ-শাররাত)ঃ বিরাজ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বতের নাম জাবালুছ-ছালজ (Sierra Nevada) এবং উহার সর্বোচ্চ শিখরের নাম মাওলাঈ হাসান (Cerro Mulhacen); ইহার উচ্চতা ১১,৪২০ ফুট। আন্দালুসের স্বনামধন্য শায়খ আবুল-হাসানের নামে ইহার নামকরণ করা হয়। তাঁহার পুত্র আবূ আবদিল্লাহ আন্দালুসের আহমার গোত্রের সর্বশেষ শায়খ ছিলেন।

পর্বতসমূহের জটিল গঠন প্রকৃতির ফলে উপদ্বীপের ভূমির গড় উচ্চতা ২,১৬০ ফুটের কম নহে। এইরূপ হওয়ার কারণে ১,৬৪৫ ফুটের নিম্ন ভূমির গড় পরিমাণ মাত্র ৪০%। এই কারণে দেশের বৃহত্তর অংশে ভূমি কর্ষণযোগ্য করিয়া তোলা ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বৃষ্টিপাতের হার অপর্যাপ্ত; উপরন্তু নদীসমূহ যে পানি সরবরাহ করে তাহাও অপ্রতুল, ফলে ভূমি অনুর্বর।

(২) আবহাওয়া

যে সমস্ত উচ্চ ও অনতিউচ্চ অঞ্চল আটলান্টিক অথবা ভূমধ্যসাগরের তীব্রতা হ্রাসক প্রভাব হইতে বঞ্চিত, তাহাদের তাপমাত্রায় অত্যধিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই উপদ্বীপের আবহাওয়া শুষ্ক ও সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ। এইখানে শীতকালে তীব্র শীত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম। উপকূল সংলগ্ন এলাকায়, বিশেষ করিয়া আন্দালুসের নিম্নভূমি ও সমুদ্র তীরবর্তী উন্মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে শুষ্ক স্পেন ও আর্দ্র স্পেনের মধ্যে তারতম্য করা বিশেষ প্রয়োজন। পিরেনীজের পশ্চিম দাড়া (Prong) হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্ক (Basque) অঞ্চল, ক্যান্টাব্রীয় (Cantabrian) উপকূল ও আধুনিক পর্তুগাল-এর প্রায় সমগ্র অঞ্চল আর্দ্র স্পেনের অর্ন্তভুক্ত। উপদ্বীপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া রহিয়াছে শুষ্ক স্পেন। মূলত এখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত, এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বোচ্চ ২৩ ইঞ্চি এবং সর্বনিম্ন ১৫ ইঞ্চি যে কারণে প্রায়শ বৃষ্টিপাত দ্বারা ভূমির কোন উপকার সাধিত হয় না। যাহা কিছু বৃষ্টি হয় তাহাও আবার বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, বিশেষ করিয়া লেভান্ত (Levant, বালেনসিয়া ও মুসিয়া এলাকা)-এ। ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা নাই, সেই সব অঞ্চলে ভূমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকায় উহা কোন কাজে আসে না।

উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ও সাধারণত আটলান্টিক মাহসাগরের সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আর্দ্রতা ও মেঘের উপস্থিতির দরুন অপেক্ষাকৃত মৃদু আবহাওয়া বিরাজ করে। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় কাতালোনিয়া (Catalonia) ও লেভান্ত (Levante) হইতে আন্দালুসী উপকূল পর্যন্ত একইভাবে শীতকাল থাকে মনোরম। এই সময় রৌদ্র-রশ্মি থাকে বিশেষ উজ্জ্বল এবং পরিবেশ নির্মেঘ ও পরিচ্ছন্ন।

(৩) জলভাগের বিবরণ (Hydrography)ঃ দেশের প্রাকৃতিক গঠন ও আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্তিকা জলাভেদ্য হওয়ার ফলে উপদ্বীপটিতে পানির অভাব প্রকট। নদীগুলি হইতেও নিয়মিত পানি পাওয়া দুষ্কর। কারণ প্রায় সব সময় নদীগুলি শুষ্ক থাকে, বিশেষ করিয়া জুলাই-আগস্ট মাসের উষ্ণতম সময়ে যখন বাষ্পীভবন থাকে প্রচণ্ডতম। এই নদীগুলির বৈশিষ্ট্য উত্তর আফ্রিকার ওয়াদী (উপত্যকা)-গুলির ন্যায়। হয় এইগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকে, নতুবা আকস্মিক জলস্ফীতি ঐগুলিকে প্রচণ্ড স্রোতে প্লাবিত করে। ইহার ফলে নদীগুলিতে ভাঙা-গড়ার চিরন্তন রূপ প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

উত্তর ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত নদীগুলি সাধারণত ছোট ছোট স্বল্প দৈর্ঘ্য উপকূলবর্তী নদী (coastal rivers)। ইহাদের প্রধান নদী মিনো (পর্তুগীজ Minho মিন্‌হো) যাহা পর্তুগালে উত্তর সীমান্ত নির্দেশ করে এবং আটলান্টিক সাগরে পতিত হয়। মেসেতা (Meseta)-র অপর তিনটি নদীও আটলান্টিক অভিমুখে প্রবাহিত। ইহাদের পানি সরবরাহ অত্যন্ত অনিয়মিত। পানি নিষ্কাশক নদীত্রয় হইতেছে ঃ (১) ডিউরো (Duero, পর্তুগীজ ভাষায় Douro), তাগস (স্পেনীয় ভাষায় Tajo, পর্তুগীজ ভাষায় Tejo) ও গুয়াদিয়ানা (Guadiana) যাহার মোহনা স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে দক্ষিণ সীমান্ত।

উপদ্বীপে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী ওয়াদি'ল-কাবীর (গুয়াদাল কুইভার =Guadalquivir)। ইহা মেসেতার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কোন পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া বেশ কয়েকটি উপনদীর পানি দ্বারা স্ফীত হয়। ইহাদের মধ্যে জেনিল (Genil) সর্বপ্রধান। জেনিল Sierra Nevada পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালে উক্ত পর্বতস্তূপের বিগলিত বরফ হইতে উহার পানি আসে। এই উপদ্বীপে গুয়াদাল কুইভারই একমাত্র নদী যাহার নিম্নাংশ (শেষ ৭৫ মাইল) নাব্য। তীব্র স্রোতের প্রকৃতিসম্পন্ন কতিপয় ওয়াদী, লেভানটাইন (Levantine) উপকূল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এইগুলি মেসেতা (Meseta)-র প্রান্তসীমা হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহার অনিশ্চিত পানি সরবরাহ সেচকার্যের জন্য বাঁধের সাহায্যে সঞ্চয় করা হয়। এই ওয়াদীর মধ্যে প্রধান শাকুরা (Segura) ও জুকার (Jucar) যাহাদেরকে বর্তমান কালে ভালেনসিয়া (Valencia)-র আবাদি অঞ্চলের (huerta) উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হইতেছে।

এবরো (Ebro) নদীর উৎপত্তি বাস্ক (Basque) অঞ্চল। ইহাতে পানি আসে পিরেনীজ পর্বতমালার দক্ষিণের ঢালু এলাকা (Aragon ও সেগরা Segra) হইতে। দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার সময় ইহার নদীমাত্রা (gradient) মৃদু হইবার ফলে নিম্ন অংশে আসিয়া ইহার পানির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ইহার গতিপথ ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবাহিত হইতে

থাকে এবং বৃহৎ পাললিক বদ্বীপ (delta) অতিক্রম করিয়া ইহা অবশেষে সাগরে পতিত হয়।

(৪) সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ উপদ্বীপটির ভূগর্ভস্থ মাটি, সীসা, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ম্যান্‌গানীজ (Manganese), মার্বেল পাথর ইত্যাদি নানা ধরনের ধাতব পদার্থে বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়াও প্রাকৃতিক লবণ, যবক্ষার বা শোরা, ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), সিলিকেট (Silicate) ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে এখানে মওজুদ রহিয়াছে। শুষ্ক স্পেন ও আর্দ্র স্পেনের উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শুষ্ক স্পেনে সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত সম্পর্কিত তিন প্রকারের উদ্ভিদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ বনাঞ্চলে (পর্ণহীন মোচী বৃক্ষ, বিভিন্ন প্রকারের পাইন ও চিরসবুজ ওক বা কর্ক বৃক্ষ), পর্বতমালার পাদদেশে (স্পেনীয় ভাষায় montebaj) ও বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে (ক্ষুদ্র ঝোপ, স্পারতো বা কাগজ নির্মাণের ঘাস)। অন্যদিকে আর্দ্র স্পেনে বনরাজি ও প্রাকৃতিক চারণভূমি বিদ্যমান থাকায় সারা বৎসর এখানকার পল্লী এলাকাতে সবুজের সমারোহ বিরাজ করে।

প্রাকৃতিক এই বৈচিত্র্যের কারণে স্পেন একটি চরম বৈপরীত্যের দেশ। আর এই কারণেই একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ শোনা যায়, স্পেন দেশে কোনরূপ পথের কষ্ট ছাড়াই যে কেহ চিরসবুজ ও মনোরম উপত্যকা হইতে রৌদ্র-ঝাঁঝালো ও তপ্ত বাতাসপূর্ণ স্তেপ (Steppe) এলাকায় পৌঁছিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ভৌগোলিক ম্যানুয়েলসমূহ, বিশেষ করিয়া (২) M. Sorre, La Peninsule iberique, vol. vii of the Geographic universelle by Vidal de Lablache and Gallois.

৩। আল-আন্‌দালুসের ঐতিহাসিক ভূগোলের রূপরেখা

(১) আল-আন্‌দালুসের বর্ণনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'আরব ভূগোলবিদগণের রচনাবলীর যাহা আমরা পাইয়াছি, তদ্দ্বারাই মধ্যযুগের আল-আন্‌দালুস সম্পর্কে আমরা প্রধান তথ্যসমূহ, যথা উহার অবস্থা, অগ্রগতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছি। প্রথমত BGA-তে De Goeje কর্তৃক রাস্তা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী (মাসালিক) প্রকাশিত হইলেও তাহাতে স্পেনের বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। ঐ সমস্ত মাসালিকের প্রাচীনতম লেখক ইব্‌ন খুররাদায্‌বিহ, আল-ইয়া'কূবী, ইব্‌নুল-ফাকীহ ও ইব্‌ন রুস্‌তা। ঐসব গ্রন্থে স্পেন সম্পর্কে এত সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে যদ্দ্বারা মনে হয়, ৪র্থ/১০ম শতাব্দী পর্যন্ত আল-আন্‌দালুস ইসলামী দুনিয়ার একটি প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও ঐ সম্পর্কে প্রাচ্য দুনিয়ার জ্ঞান ছিল খুবই নগণ্য। কর্ডোভায় মারওয়ানী খিলাফাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আন্‌দালুস সম্পর্কে ভৌগোলিক তথ্যাদি সুবিন্যস্ত হয়, অবশ্য তখনও বিস্তারিত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। আল-ইস্‌তাখ্‌রী (মৃ. ৩২২/৯৩৪) আল-আন্‌দালুসের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা কৃষি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত এবং তাহাতে উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ চৌদ্দটি ভ্রমণপথের বিবরণ রহিয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌ন হাওকাল স্পেন ভ্রমণের সুযোগে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বহু তথ্য সংগ্রহ করত লিপিবদ্ধ করেন। ফাতিমীপন্থী এই লেখক আন্‌দালুসের যে চিত্র উপস্থাপিত করেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট। ইহা সত্ত্বেও কর্ডোভা রাজ্য সম্পর্কে তাহার যে বিবরণ আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে উহাই সর্বপ্রথম যুক্তিগ্রাহ্য, সুসংগত ও পরিপূর্ণ। একইভাবে (দশম শতাব্দীর শেষ পর্বে) ফিলিস্তীনের আল-মুকাদ্দাসী প্রদত্ত বিবরণও মনোযোগের দাবিদার। যদিও তিনি স্বয়ং এই উপদ্বীপে ভ্রমণ করেন নাই, তথাপি তিনি সম্ভবত প্রামাণ্য সূত্রের সাহায্যে আন্‌দালুসের সাংস্কৃতিক জীবন, ভাষা, পরিমাপনবিদ্যা, বাণিজ্য ইত্যাদির বিষয়ে মূল্যবান বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

খিলাফাত যুগ ও উহার পরবর্তী শতাব্দীসমূহে আন্‌দালুসের অবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা প্রধানত পাশ্চাত্যে লিখিত হইয়াছে তাহা প্রাচ্য বংশোদ্ভূত কর্ডোভার ঐতিহাসিক আহমাদ আর-রাযী (মৃত্যু ৩৪৪/৯৫৫) লিখিত আন্‌দালুসের অধুনালুপ্ত বিরাট ইতিহাসের মুখপত্রে সন্নিবেশিত বর্ণনার নিকট ঋণী। এই ইতিহাস গ্রন্থ উদ্ধৃতির সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণত স্বীকৃতি ব্যতীতই, বিশেষ করিয়া সংকলক ইয়াকূত কর্তৃক তাঁহার মু'জামুল-বুল্‌দান গ্রন্থে আর-রাযীর বিবরণ আমরা কেবল ১৮৫২ খৃস্টাব্দে P. de Gayangos কর্তৃক প্রকাশিত কাস্‌তিলী (Castilian) ভাষায় অনূদিত গ্রন্থে দেখিতে পাই, যাহা পর্তুগীজ ভাষা হইতে গৃহীত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্তুগালের রাজা দেনিস (King Denis, ১২৭৯-১৩২৫ খৃ.)-এর নির্দেশে সম্পাদিত হয়। বর্তমান নিবন্ধের লেখক উহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তিনি মূল আরবী পাঠ পুনর্বিন্যাস করিবার চেষ্টা করেন (And., ১৯৫৩ খৃ., ৫১-১০৮)।

ইহা দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, আহমাদ আর-রাযীর বিবরণের পরিকল্পনা যদিও সামগ্রিকভাবে একটি রূপরেখা মাত্র, তবুও উহা পরবর্তী অধিকাংশ বর্ণনার কাঠামো হিসাবে কাজ করিয়াছে। এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে আবূ 'উবায়দ আল-বাক্‌রী আল-আন্‌দালুসী (মৃ. ৪৮৭/১০৯৪)-এর বিবরণকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও লুপ্ত। তবুও আর-রাওদুল-মিতার-এর ৭ম/১৪শ শতাব্দীর মাগরিবী সংকলক ইব্‌ন আব্‌দিল মুন'ইম আল-হিময়ারীর সংকলন গ্রন্থ হইতে উহা বহুলাংশে পুনর্গঠিত করা যায়। আল-হিময়ারী অবশ্য আশ-শারীফ আল-ইদরীসীর রচনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই তালিকায় আল-কাযবীনী ও আদ-দিমাশকী তাঁহাদের রচনাবলীতে আনদালুস সম্পর্কে যে সকল বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত আল-মাক্কারী (খৃ. ১৭শ শতাব্দী) উল্লিখিত দীর্ঘ বিবরণও সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরী। তিনি তাঁহার এই সমস্ত বিবরণ স্বপ্রণীত গ্রন্থ নাফহুত-তীব গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ পর্যালোচনার জন্য দ্র. (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., iii, 233-9; (২) BGA-তে বর্ণিত স্পেনের বিবরণসমূহ ঃ ইব্‌ন খুররাদাযবিহ ও ইব্‌ন রুসতা (ফরাসীতে অনু. G. Wiet, কায়রো ১৯৩৭, ২১৭-২২১); (৩) আল-ইসতাখরী, BGA, v, ৩৭-৪৬; (৪) ইব্‌ন হাওকাল, BGA, ii, ৪৭-৯, J. H. Kramers, new ed., Leiden, 1938, i, 108-17; (৫) আল-মুকাদ্দাসী, BGA. iii, ২১৫-৪৮ (ফরাসীতে অনু. Ch. Pellat, আল-জাযাইর ১৯৫০ খৃ.। আনদালুসের ভৌগোলিক সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল রচনাবলীর জন্য দ্র. J. Alemany Bolufer, Le

Geographia de la Peninsula iberica en los escritores arabes, Granada 1921 (extract from the Rev. del Centro de Est. hist. de Grana day su reino), তু. আল-ইদরীসী, নুযহাতুল-মুশতাক (Dozy and de Goeje Description de l' Afrique et de l' Espagne, Leiden 1866, text 165-214; ফরাসী অনু. ১৯৭-২৬৬); (৬) E. Levi-Provencal, La Peninsule iberique au moyen age d'apres le Kilab al-Rawd al-mitar, Leiden 1938।

(২) আন্দালুসের প্রাকৃতিক ভূগোল ঃ মুসলিম ভৌগোলিকদের ঐতিহ্য অনুসারে আর-রাযীর বর্ণনা অনুযায়ী আন্দালুস চতুর্থ ইকলীম (اقليم) (দ্র.)-এর পশ্চিম প্রান্তিক অংশ। এই দেশটি প্রধানত অসংখ্য নদী ও মিঠা পানির প্রস্রবণ দ্বারা বিধৌত। এই বর্ণনা উপস্থাপন করিয়া ভূগোলবিদগণ স্বভাবত স্পেনের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠেন।

আন্দালুস ত্রিভুজ আকৃতির। ইহার প্রতিটি কোণ এমন একটি অঞ্চল বিশেষ যাহা স্পেনীয় উপাখ্যানে পরিচিত। ত্রিভুজের দক্ষিণ-পশ্চিম শীর্ষে কাদিম-এর মন্দির (Sanam Kadis দ্র.) অবস্থিত। দ্বিতীয় কোণটি বেলিয়ারিক (Balearic) দ্বীপপুঞ্জের অক্ষাংশের উপর নারবোন ও বুরদৌ (Narbonne and Bordeaux) (sic)-এর মধ্যস্থলে; তৃতীয় কোণটি উত্তর-পশ্চিমে Corunna-এর নিকট Torre de Hercules-এর সদৃশ। এই ধারণাগুলি আংশিকভাবে হইলেও মাসালিক গ্রন্থাবলীতে (Road Books), ইব্ন হাওকাল ও আল-ইদ্রীসীর রচনায় চিত্রসহ বর্ণিত হইয়াছে। আর-রাযী উপদ্বীপটির গঠন প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ঃ তাঁহার মতে পশ্চিম স্পেন ও পূর্ব স্পেনের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ উভয়ের বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও নদ-নদীর গতি বিভিন্ন। পশ্চিম স্পেনে নদীগুলি আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিমা মৌসুমী বায়ু বৃষ্টি বহিয়া আনে। অপরপক্ষে পূর্ব স্পেনে পুবালী বায়ু প্রবল এবং নদীগুলিও পূর্বদিকে প্রবাহিত। আন্দালুস 'ত্রিভুজ'-এর কতিপয় বিন্দু নির্দেশ করিবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কতকগুলি ভূমি চিহ্নের (Land Mark) উল্লেখ করা হয়; যথাঃ পর্তুগালের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সেন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপ (Cape St. Vincent), 'আরবগণ ইহাকে বলিত কানীসাতুল গুরাব (Church of the crow অর্থাৎ কাকের গির্জা); বিপরীত প্রান্তে ভেনাসের মন্দির (The Temple of Venus), হায়কালুয যাহরা (Port-Vendres)।

ইউরোপ মহাদেশ তথা বৃহৎ ভূখণ্ড (আল-আরদুল কাবীরা) হইতে আন্দালুসে প্রবেশ করিতে হইলে পিরেনীজ পর্বতমালার কোন একটি গিরিপথ (আবওয়াব) অথবা ফটক (বুর্তাত) অতিক্রম করিয়াই কেবল আল-বাশ্‌কুনিশ (Gascons)-দের অথবা আল-ইফরাঞ্জ (Franks)-দের এলাকায় উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে পৌঁছান যায়। এই মহাসাগরটি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন "urronding Sea "Sea of Darkness," (আল-বাহ্‌'রুল'জ-জুলুমাত) সবুজ সাগর (আল-বাহ্‌'রুল-আখ্‌দ'ার) Green Sea, অথবা "Surronding Sea" (আল-বাহ'রু'ল মুহী'ত')। এই বিপদসংকুল সমুদ্রপথে নির্ভীক নাবিকগণ কৃষ্ণকায়দের দেশ (আফ্রিকা), ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ (Canary Islands) ও জাযাইর খালিদাত বা সৌভাগ্য দ্বীপ হইতে গ্রেট বৃটেনের সীমান্ত পর্যন্ত উপকূলীয় বাণিজ্য (coastal trade) পরিচালনা করিত। ভূমধ্যসাগর (The Mediterranean Sea) বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা ঃ বৃহৎ সাগর (আল-বাহরুল কাবীর), মধ্যসাগর (আল-বাহরুল মুতাওয়াসসিত), এমন কি টায়রেনিয়ান সাগর (Tyrrhenian Sea, আরবী ঃ বাহ্‌র তীরান)।

আহমাদ আর-রাযীর মতে স্পেনের কেবল তিনটি পর্বতমালা উপদ্বীপের এক সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্র পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করিয়াছে। ইহার কোনটিকেই কোন নদী অতিক্রম করে নাই। এই পর্বতমালার প্রথমটির নাম Sierra Morena, ইহাকে কর্ডোভা গিরিশ্রেণী (জিবাল কুরতুবা)-ও বলা হইয়া থাকে। ইহা Levante-এর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল হইতে উত্থিত হইয়া আটলান্টিক উপকূলের Algarve-এ শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয়টি নারবোনা (Narbonne) ও গালিসিয়া (Galicia)-এর মধ্যবর্তী Pyrenean পর্বতমালা। তৃতীয়টি টরটোসা (Tortosa) হইতে লিসবন (Lisbon) পর্যন্ত স্পেনকে তীর্যকভাবে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে; আল-ইদরীসীর মতে ইহাই আশ-শাররাত (Al-Sharrat) পর্বতমালা। যাহা হউক, উপরন্তু আল-ইদ্রীসী Sierra Nevada (জাবাল শুলায়র, "Mons Solarius") এবং সুদূর আলজেসিরাস (Algeciras) পর্যন্ত বিস্তৃত জাবাল রায়্যো (মালাগার পর্বত, Serrania of Malaga) পর্বতমালার কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আল-আন্দালুসের প্রধান নদী আল-ওয়াদিল-কাবীর (Guadal-quivir)। ইহা আন-নাহরুল-আজাম (বড় নদী) ও নাহর কুরতুবাঃ (কর্ডোভা নদী) নামেও পরিচিত। কোন কোন সময় আবার ইহার প্রাচীন নাম নাহ্‌র বীতী (Baetis) নামেও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩১০ মাইল। উপদ্বীপের সমৃদ্ধতম বেটিকা (Baetica) এলাকায় এই নদীটি অবস্থিত। ইহা কর্ডোভা ও ইশ্‌বীলিয়া (Seville) এলাকাকে উর্বর করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রধান প্রধান উপনদী জেনিল (Genil or Shanil or Sindjil), ইহা গ্রানাডা, লোজা (Loja) ও Ecija-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত; গুয়াদাজোয (ওয়াদী শুশ); গুয়াদালিমার (আল্‌-ওয়াদিল-আহমার=Guadalimar) (পানির বর্ণ ঈষৎ লাল হওয়ায় এই নাম) ও গুয়াদাবুল্লুন (ওয়াদিল বুল্লুন=Guadalbullon)।

গুয়াদিয়ানা (ওয়াদী আনা=Guadiana) দৈর্ঘ্যে ৩২০ মাইল এবং উহার উৎপত্তিস্থল গুয়াদাল কুইভার-এর উৎস হইতে বেশি দূরে নহে। কিছুদূর পর্যন্ত ইহা মাটির নীচ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালাট্রাভা (Calatrava) এলাকায় ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইয়াছে এবং Ocsonoba -এর নিকটে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

তাগুস নদী (Wadi Tadju) টলেডো পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং ৫৮০ মাইল অতিক্রম করিয়া ইহা লিসবনের নিকটে আটলান্টিকে পতিত হইয়াছে। আরও উত্তরে ৭৮০ মাইল দীর্ঘ ডিউরো
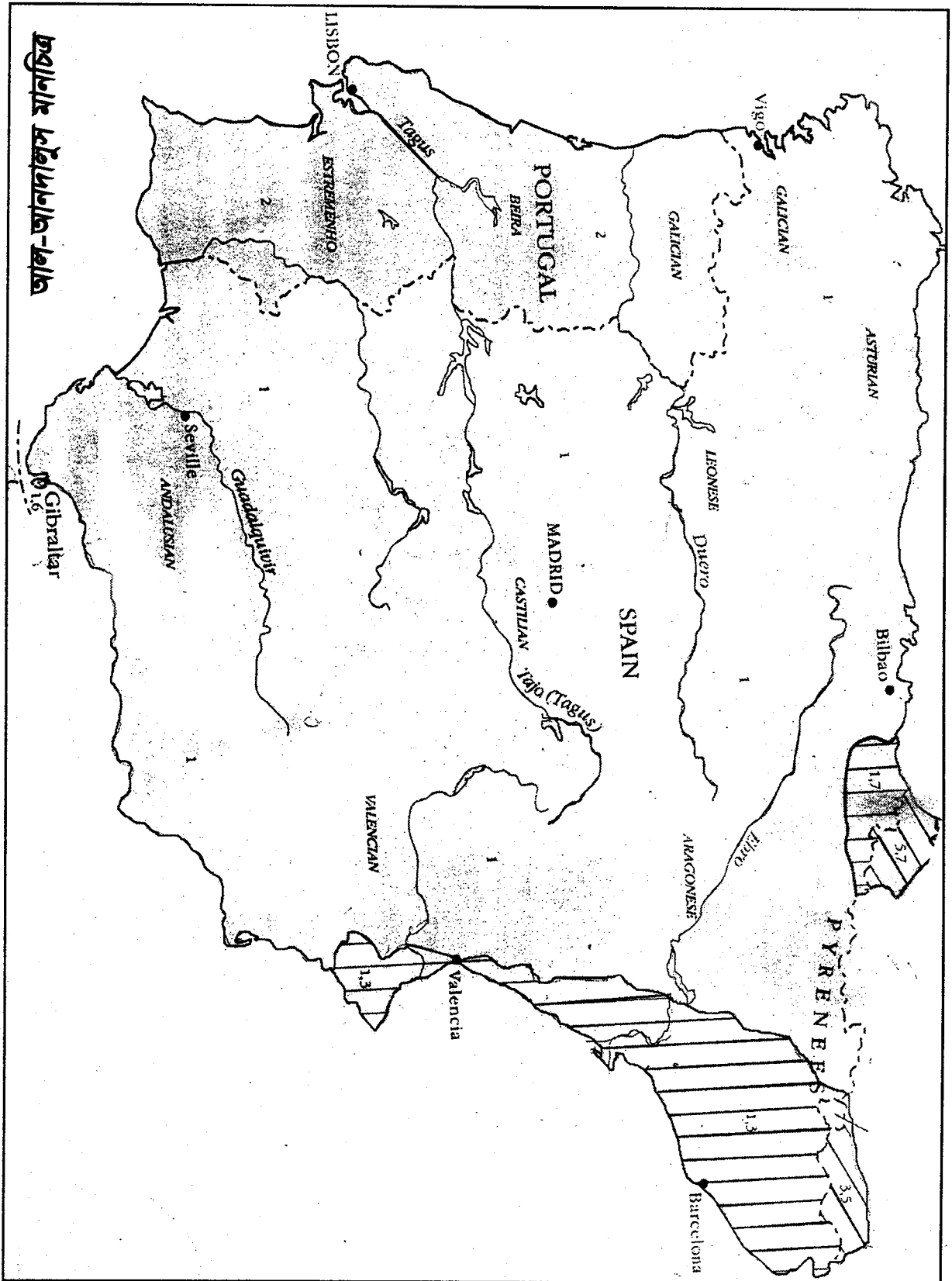
বর্তমান স্পেনের (আল-আনদালুস) মানচিত্র
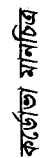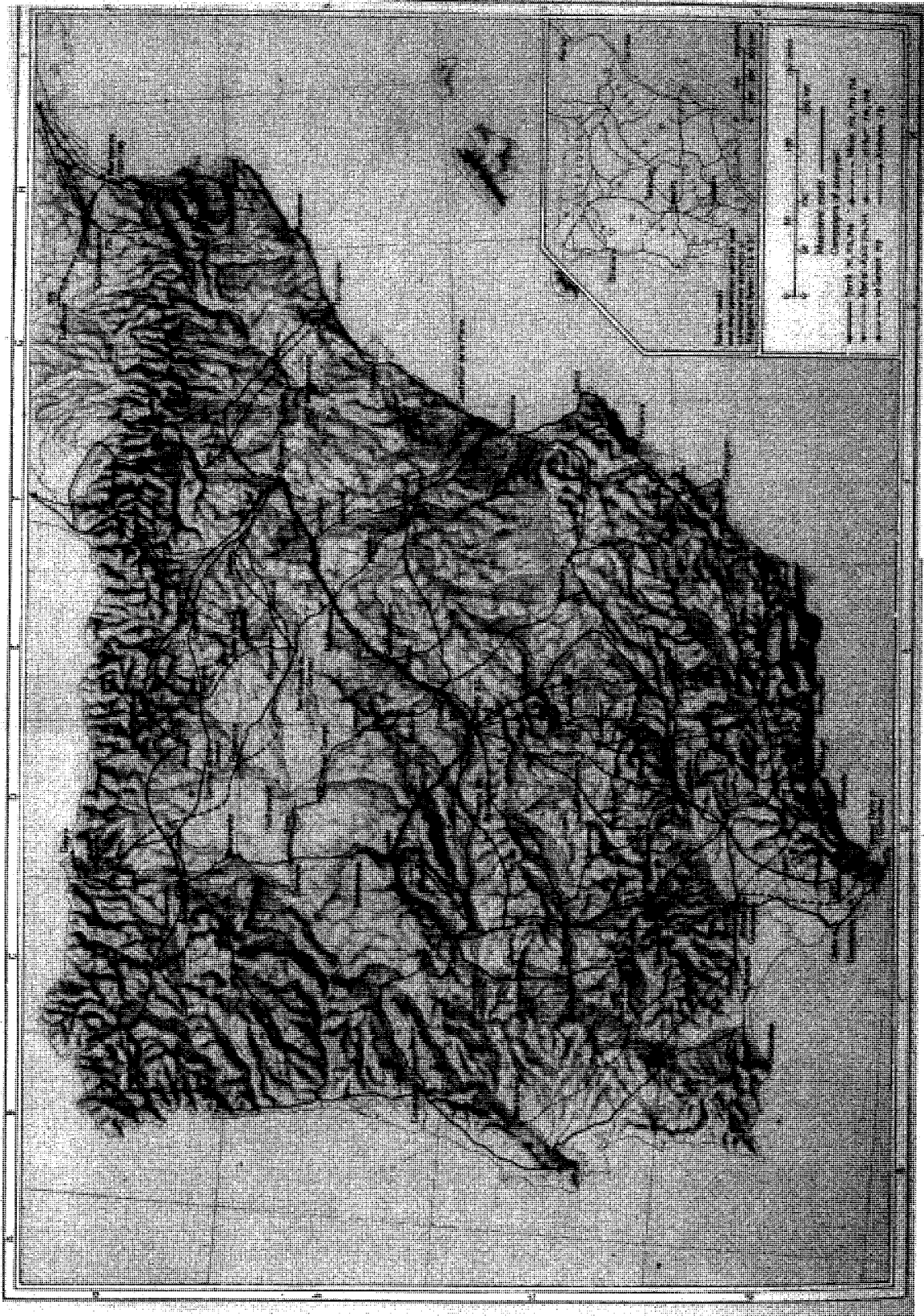
মুসলমানদের আল-আনদালুস (স্পেন) বিজয় (খৃ. ৮ম শতকের প্রথমদিকে)।
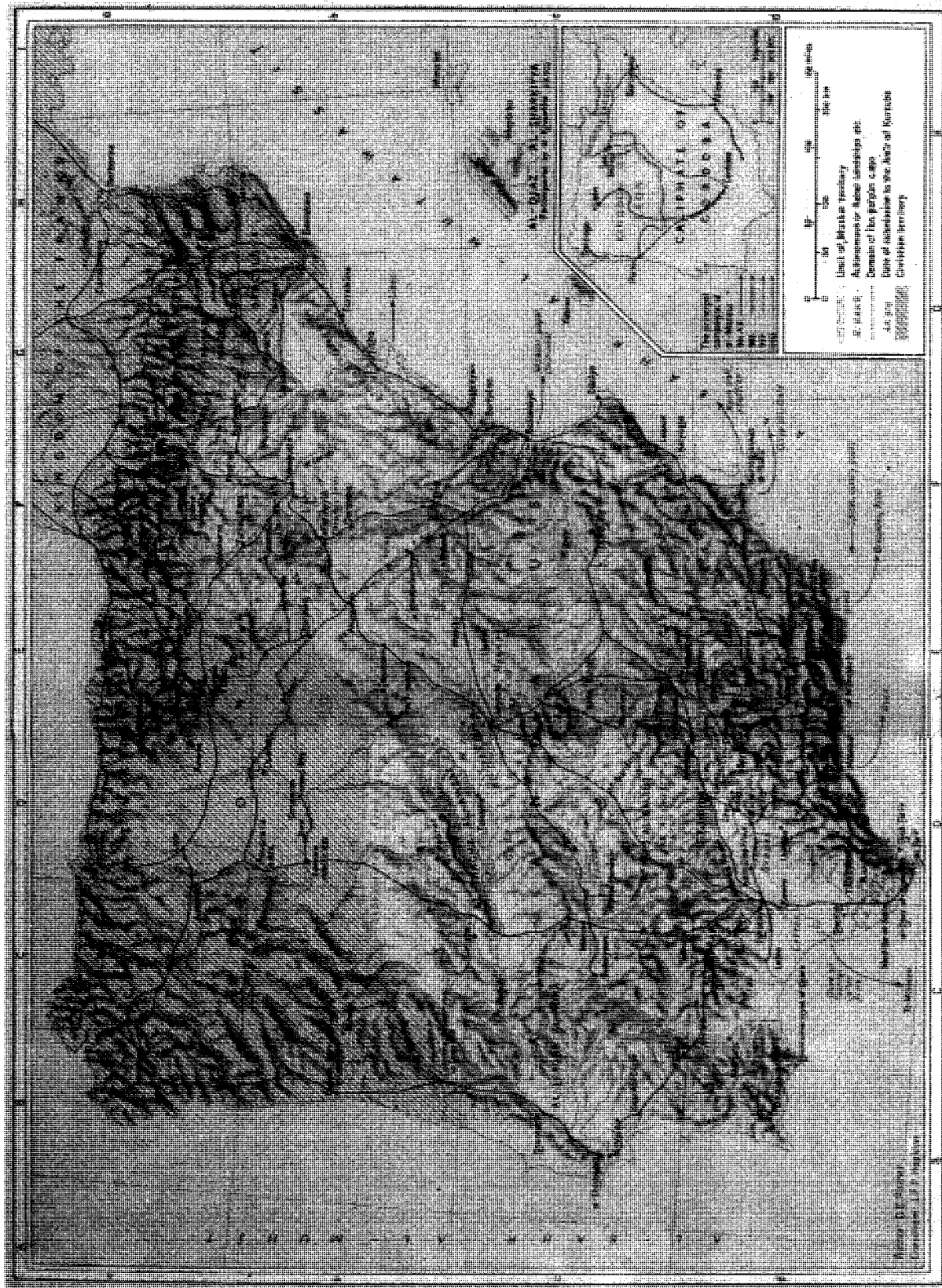
উমায়্যা রাজবংশের অধীনে আল-আনদালুস (আনু. ৮৯০ খৃ.)।
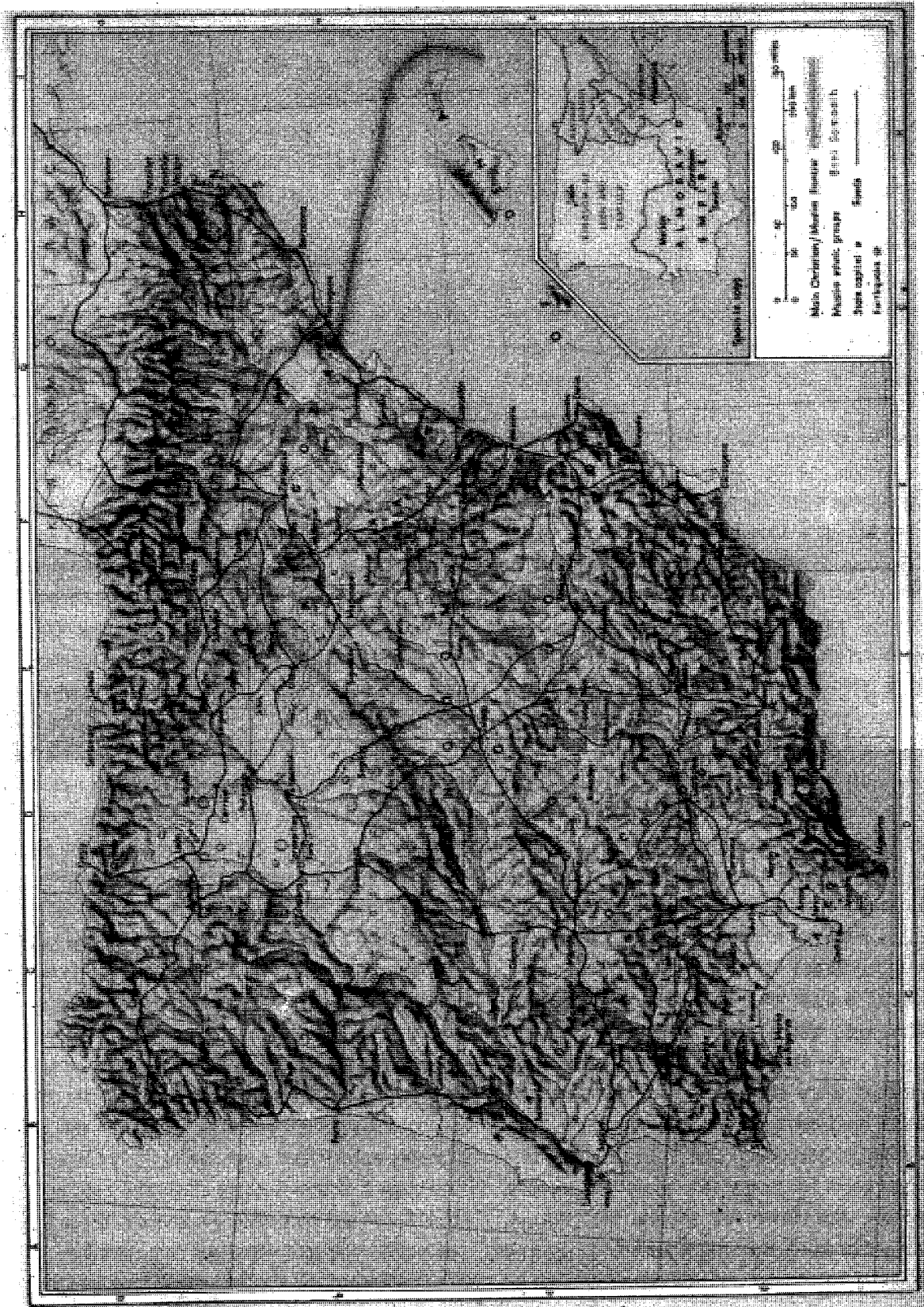
মুলূকুত-তাওয়াইফ-এর শাসনাধীনে আল-আনদালুস (আনু. ১০৩৫ খৃ.)।

(Duero) নদী, যাহাতে কতিপয় উপনদী প্রবাহিত। এই নদী Oporto (বুরতুকাল)-এর নিকটে আটলান্টিকে পতিত হইয়াছে। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর নাম মিনো (Mino বা নাহ্‌র মীনয়ু, পর্তুগীজ মিনহো) ৩০০ মাইল দীর্ঘ। এই নদীটিও গালিসিয়াকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে অতিক্রম করিয়া আটলান্টিকে পতিত হইয়াছে।

যে সকল নদী ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে আহ্‌মাদ আর-রাযী শুধু সেগুরা (শাকূরা=Segura) নদীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার উৎপত্তিস্থল গুয়াদাল কুইভার ও রিওএব্‌রো (ওয়াদী ইবরো=Rio Ebro)-এর উৎস মুখের সন্নিকটে অবস্থিত। রিওএব্‌রো-এর উৎপত্তিস্থল উত্তর ক্যাস্টিলে (Castile) অবস্থিত ফনটীবার (Fontibre)-এ এবং ইহা ২০৪ মাইল অতিক্রম করিয়া তরতূসা (Tortosa)-র সন্নিকটে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। রিওএব্‌রোতে Rio Gallego-সহ কতিপয় উপনদী মিলিত হইয়াছে, উহার উৎস Cerdagne পর্বতে (জিবালুস্ সীরতানিয়্যিন)।

৩। আন্‌দালুসের শহরসমূহের নাম ও অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগ : মুসলিম ইতিহাসের সর্বযুগে আল-আন্‌দালুস উহার নগর কেন্দ্রগুলির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, পক্ষান্তরে জনসংখ্যার দিক দিয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ কোন নগর উত্তর আফ্রিকায় গড়িয়া উঠে নাই। 'আরবদের আক্রমণের পরেও রুমীয় স্পেন (Roman Spain)-এর অধিকাংশ প্রাচীন শহর যে কেবল টিকিয়াই ছিল তাহা নহে, বরং সেইগুলির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। অন্যপক্ষে 'আরব বিজেতাগণ অল্প সংখ্যক নূতন নগর কেন্দ্র স্থাপন করে রণ-কৌশলগত কারণে অথবা ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে ফাতিমীদের আগ্রাসী অভিসন্ধি রোধ করিবার লক্ষ্যে উপকূলীয় সেনা ছাউনি হিসাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুর্‌সিয়া (Murcia) প্রাচীন নগর এল্লো (Ello)-এর স্থলে স্থাপিত হয় এবং আলমারিয়্যা (Almeria) ১০ম শতাব্দীতে একটি অস্ত্রাগার (arsenal) ও নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করিবার পূর্বে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র মাত্র ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন লাতিন স্থানীয় নামগুলি প্রায় অপরিবর্তিতরূপে থাকিয়া যায়, যেমন কুরতুবা / Corduba, হিসপালী (Hispali)/ ইশ্‌বীলীয়া, সারাকুসতা/ Caesaraugusta, Valentia/ বালানসিয়া অথবা কোন কোন স্থানের নাম আবার ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশক (مصغر) রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যথা টলেটম (Toletum), টলেডো (Toledo) হইয়াছে টলেটুলা (Toletula) বা তুলায়তুলা। কোন কোন ঐতিহাসিক স্থানের নাম কৌতুকবহরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, যেমন ওসেলী (Ocili) হইয়াছে মাদীনাতুস-সালিম তথা মেদীনাসেলী (Medinaceli)। ফলে ইহার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সালিম নামক এক কল্পিত ব্যক্তির উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। তবে কেবল বর্ণনামূলক আরবী নামধারী শহরগুলির বেলায় ব্যত্যয় দেখা যায়, যেমন আল্‌জেসিরাস, "সবুজ দ্বীপ" (আল-জাযীরাতুল-খাদরা = الجزيرة الخضراء)। কোন কোন স্থানের নাম আবার মুসলিম বিজয়ের পরে তথায় বসবাসকারী আরব অথবা বার্বার উপজাতিদের নামে নামকরণ করা হয়; যথা পলী (Poley), কর্ডোভার উত্তরে অবস্থিত গাফিক (Ghafik) ও আরাগুন (Aragon)-এ স্থিত মিকনাসা (Mequinenza)। পূর্ব আন্‌দালুস (Levante)-এ স্থিত অনেক স্থানেরই নামে প্রকটতর আরব প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, মান্‌যিল-এর নামে স্থানের নাম রাখা হইয়াছে—মান্‌যিল শব্দের সহিত একটি আরবী নাম যোগ করিয়া, যেমন ভ্যালেনসিয়া (Valencia)-র উপকণ্ঠে অবস্থিত মিসলাতা (মান্‌যিল 'আতা= Mislata) এবং মাসানাসা (মান্‌যিল নাস্‌র =Masanasa)। Valencia অঞ্চলের অনেক জায়গার নাম পূর্বপুরুষের নামের সহিত আরবী Beni-বানী যোগ করত গোত্রের নামের মত করিয়া রাখা হইয়াছে (দ্র. Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ৩খ., ৩২৬-৮)।

যে যুগে আহমাদ আর-রাযী আন্‌দালুসের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন, তৎপূর্বেই মুসলিম স্পেন খৃষ্টান স্পেন হইতে একটি সীমারেখা দ্বারা পৃথক হইয়া গিয়াছে। এই দুই রাজ্যের মধ্যস্থলে ছিল কেবল একটি মালিকহীন ভূখণ্ড (No man's land), আর উহাদের সীমান্ত বরাবর স্থাপিত ছিল তিনটি সীমান্ত চৌকী (ছুগূর), যথা আল-আ'লা, আল-আওসাত, আল-আদ্‌না। খৃস্টানদের পুনর্দখল (Reconquista)-এর প্রথম পর্যায়ের চাপে পড়িয়া উপদ্বীপের অনেক এলাকা বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল, শেষ পর্যায়ে উহারা আন্‌দালুস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যথা পূর্বে হিস্‌পানী চৌকী (Hispanic March), কেন্দ্রস্থলে বাস্‌ক (Basque) এলাকা এবং পশ্চিমে ক্যান্টাবরীয় (Cantabrian) উপকূল। সান্ত য়া'কূব (Santiago do Compostela)-এর বিরুদ্ধে মানসূরুল-আমিরী কর্তৃক বিখ্যাত অভিযান ছিল একটি নিষ্ফল দৃষ্টি আকর্ষণ আক্রমণ মাত্র। তাই খিলাফাত আমলেই স্পেনের একটি বৃহৎ অংশ মুসলমানদের দখলচ্যুত হইয়া যায়। পরবর্তী কালেও তাহারা উহা পুনরুদ্ধারের জন্য তেমন প্রয়াস পান নাই। তাহা সত্ত্বেও আন্‌দালুসের প্রাদেশিক সংগঠন অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়।

৮ম শতাব্দীতে অর্থাৎ মার্‌ওয়ানী খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই দেশের এই সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয়। এই সংগঠনের ভিত্তি ছিল প্রাদেশিক (কূরা) জেলা যাহাতে একটি প্রধান শহর, একজন গভর্নর (ওয়ালী) ও একটি সেনানিবাস (Garrison) ছিল। খিলাফাতের যুগে প্রদেশগুলি (কূরা)-র সংখ্যা কত ছিল তাহা লইয়া ব্যাপক মতভেদ রহিয়াছে। আল-মুক'াদ্দাসী ১৮টি প্রদেশের নামসম্পন্ন একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইয়াকূ'তের তালিকা অনুসারে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ৪১টি; আর-রাযী প্রদত্ত ৩৭টির প্রায় সমান। পরবর্তী সময়ে ইদরীসী দেশটিকে নূতনভাবে বিভক্ত করিয়া উপস্থাপিত করেন। তিনি কূরা-র বদলে ইক'লীম বা বিভাগ (Climes)-এর উল্লেখ করেন যাহার কোন প্রশাসনিক গুরুত্ব নাই। তিনি এমন কতকগুলি নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি প্রমাণের অভাবে বাতিল করাই সমীচীন। আর-রাযী, যিনি রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বের এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন তাঁহার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ও আল-বাক্‌রীর বিস্তারিত বিবরণ অনুসরণে খিলাফাত যুগের প্রাদেশিক সংগঠনের প্রতিটি কূরার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজেই নির্ধারণ করা যায়। প্রতিটি কূরা সাধারণত পরিচিত হইত উহার প্রধান শহরের নামানুসারে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিত। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কূরা ছিল কর্ডোভা। উহার উত্তর সীমান্তে ছিল

ফাহ্সুল-বাল্লুত (Llano de los Pedroches, "ওক"-এর মালভূমি; যাহার প্রধান স্থানের নাম গাফিক (Ghafik), নিঃসন্দেহে আধুনিক বেলালকাযার (Belalcazar, তু. F. Hernandez, in And., ১৯৪৪, ৭১-১০৯)। কর্ডোভা (আল-কান্‌বানিয়্যা, আধুনিক লা কামপিনা)-র নদীজ সমভূমির বিপরীত দিকে গুয়াদাল কুইভার নদীর দক্ষিণে ছিল কাব্‌রা (Kabra) ও Ecija (ইস্‌তিজ্জা) নামক কূরা দুইটি। আরও পশ্চিমে সমৃদ্ধিশালী কারমূনা (Carmona), ইশবীলিয়া (Seville) ও লাবলা (Niebla) জেলাগুলি বিদ্যমান ছিল। উখ্‌শূনুবা (Ocsonoba) কূরার প্রধান শহর ছিল শিলব্‌ (Silves) যাহা গারবুল-আন্‌দালুস (Algarve) অর্থাৎ আটলান্টিক তীরে অবস্থিত আধুনিক পর্তুগালের দক্ষিণ সীমান্তের সহিত অভিন্ন। এই অঞ্চলের উত্তরে বাজা (Badja) অঞ্চল অবস্থিত। আল-আন্‌দালুসের সর্বদক্ষিণাংশ চারিটি কূরায় বিভক্ত ছিল, যথা মাওরূর (Meron), শাধূনা (Sidona), ইহার প্রধান শহরের নাম কালশানা (Calsena); আলজেসিরাস (Algeciras) ও তাকুরুন্না (Tacaronna), ইহার প্রধান শহর রুনদা (Ronda), আরও পূর্বে মালাকা (Malaga)। ইহাকে রায়্যো (Rayyo) বলা হইত। ইহার প্রথম নগরী ছিল উরজুযূনা (Archidona)। ইলবীরা (প্রাচীন নাম Iliberris) কূরার সংলগ্ন এই কূরাটি ছিল আধুনিক গ্রানাডা (Gharnata)-র সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত। ইল্‌বীরা (Elvira), কূরা জায়্যান (Jaen) ও বাজ্জানা (Pechina) কূরাদ্বয়-এর সংলগ্ন ছিল। দ্বিতীয় আল-হাকাম-এর শাসন আমলে ইহার প্রধান শহরকে আলমেরিয়া (Almeria)-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী শারকুল-আন্‌দালুস বা পূর্ব আন্‌দালুস (Levante) এলাকা দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে তিনটি প্রধান প্রধান কূরায় বিভক্ত ছিল, যথাঃ (১) তাদমীর (Theodemir), প্রাচীন কালে Goth জাতির রাজা তাদমীর (Theodemir)। ইহার শাসক ছিলেন এবং ইহার প্রধান শহরের নাম ছিল মুরসিয়া (Murcia); (২) শাতিবা (Jativa) ও বালান্‌সিয়া (Velencia), ইহা এবরো বদ্বীপ (delta of Ebro) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশের অভ্যন্তরে সিয়েররা মোরেনা (Sierra Morena) পর্বতমালা অতিক্রম করত টলেডো অঞ্চলে একটি কূরা গঠিত হয়। এই কূরা পূর্বদিকে শান্তাবারিয়া (Santaver) কূরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার প্রধান শহর ছিল উকলীজ (Ucles, আকলীশ অথবা য়াকলীশ)। সম্ভবত খিলাফাত যুগে বালারক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands) আল-জাযাইরুশ-শারকিয়্যা এক পৃথক প্রাদেশিক অঞ্চল (কূরা) ছিল। আন্‌দালুসের পশ্চিম অর্ধাংশে, সম্প্রতি শান্তি স্থাপিত স্থানগুলির ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। স্থানগুলি মারিদা (Merida), বাতালয়াওস (Badajoz), শান্তারীম (Santarem), আল-উশ্‌বূনা (Lisbon) ও সম্ভবত কুলুমরিয়্যা (Coimbra)।

কূরাগুলির মধ্য হইতে নয়টি খিলাফাত যুগেও বিশেষ অধিকার ভোগ করিত। ইহাদের বলা হইত মুজান্নাদা (Mudjannada)। ১২৫/৭৪২ সালে গভর্নর (ওয়ালী) আবুল খাত্তার আল-কালবী সিরিয়া হইতে সেনাধ্যক্ষ বাল্‌জ ইব্‌ন বিশ্‌র (দ্র.) কর্তৃক আনীত সিরীয় সেনা (জুন্দ)-এর মধ্যে কূরাগুলি জায়গীর হিসাবে দিয়াছিলেন। ঐ কূরাগুলি (১) ইলবীরা (Elvira), দামিশক জুন্দের জায়গীর; (২) রায়্যো (Rayyo) আল-উরদুন জুন্দের জায়গীর; (৩) শিদোনা (Sidona) ফিলিস্তীন জুন্দের জায়গীর; (৪) Niebla ও (৫) ইশ্‌বীলিয়্যা (Seville) হিমস জুন্দের জায়গীর; (৬) জায়্যান (Jaen), কিন্নাসরীন (Kinnasrin) জুন্দের জায়গীর; (৭) বেজা (Beja); (৮) উখশুনুবা ও (৯) মূরসিয়া (Murcia) মিসর জুন্দের জায়গীর।

আহমাদ আর-রাযী উল্লেখ করিয়াছেন আছ-ছুগূরু'ল-আ'লা (Upper Marches)-এর সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলের, যথা তাররাকুনা (Tarragona), ইহা লারিদা (Lerida)-এর সংলগ্ন; বার্বিতানিয়্যা (Boltana), ইহার সুদৃঢ় দুর্গ বারবাশ্‌ত্রো (Barbastro)-সহ ওয়াশ্‌কা (Huesca); তুতীলা (Tudela), দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত তারাসূনা (Tarazona) শহর, ইহার অন্তর্গত আরনূত (Arnedo), কালাহুররা (Calahorra) ও নাজিরা (Najera)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, La Description de l' Espagne" d' Ahmad al-Razi, in And., ১৮খ., ১৯৫৩ খৃ., স্থা.; (২) Hist. Esp. mus., ৩খ., অধ্যায় ৭ (৪) ও অধ্যায় ১৩; (৩) আরও দ্র. বিভিন্ন শহর সম্বন্ধে নিবন্ধসমূহ।

(৪) আল-আন্‌দালুসের জনসংখ্যা ঃ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষের দিকে আন্‌দালুসের ভৌগোলিক সীমারেখা সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু ঐ সময় আন্‌দালুসের জনসংখ্যা যে কত ছিল সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে ভূগোলবিদগণও নীরব। ফলে তখনকার সঠিক জনসংখ্যার হিসাব প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। অনুমান করা হয়, মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে মাগরিবী কূতী (Visigoth) শাসন আমলে আন্‌দালুসের জনসংখ্যা ছিল এক কোটি। এই সংখ্যা যদি সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তবে ইহা মানিতে হইবে যে, ১০ম শতাব্দীতেও আন্‌দালুসের জনসংখ্যা প্রায় অনুরূপ ছিল। কারণ এখানে বাহির হইতে যে সমস্ত মুসলমান আসিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সম্ভবত এখানে পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা নগর ও গঞ্জ এলাকায় জনবসতি অধিক ছিল। অপরপক্ষে ইহাও অনুমিত হয়, উপদ্বীপটির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের নিরিখে বিভিন্ন জনপদ গড়িয়া ওঠে। তাহা ছাড়াও কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে সেই এলাকার উচ্চতা, সাধারণ পরিস্থিতি, আবহাওয়া, জমির উর্বরতা ও পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার সম্ভাবনা ইত্যাদির উপর। বর্তমানে আন্‌দালুসের যে সমস্ত অংশে জনসংখ্যা খুবই কম, কর্ডোভার খিলাফাত কালেও সেইসব এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা কম ছিল এইরূপ অনুমান ভুল হইবে না।

মুসলিম বিজয়ের পরে বিপুল সংখ্যক স্পেনীয় অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়; ফলে আন্‌দালুসের মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নও-মুসলিম ও অন্যান্য জাতির বাশিন্দাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। বহিরাগতদের মধ্যে যাহারা স্থায়ীভাবে আন্‌দালুসে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বার্বারদের গুরুত্ব সর্বাধিক বলিয়া মনে হয়। বার্বারগণ বার্বারী

(Barbary)-র সমগ্র এলাকা হইতে এখানে আসে নাই, বরং আল-আন্দালুসের নিকটস্থ মাগরিব, মরোক্কীয় জাবাল ও রীফ (Rif) অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। জিব্রাল্টার প্রণালীর অপর তীর হইতে আগত এই সমস্ত বার্বার যাহাদের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য কোনরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় নাই, বহিরাগত অভিজাত শ্রেণীর আরবদের চাপের মুখে আন্দালুসের উচ্চ ভূমি এলাকায় যাইয়া বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হয় যাহাতে আরবগণ আন্দালুসের উর্বর ভূমি একচেটিয়াভাবে ভোগদখল করিতে পারে। বিভিন্ন লেখক, বিশেষত ইব্ন হ'যম তাঁহার 'জামহারা' নামক গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা যায়, বার্বার ঔপনিবেশিকগণ উপকূলীয় ভাগের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। যাহারা এখানে বসতি স্থাপনে ব্যর্থ হয় তাহারা মেসিতা (Meseta) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। এখানে সংস্থাপিত হইয়া আন্দালুসের বার্বারগণ অতি দ্রুত আরব ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, এমনকি তাহারা নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আরবী ভাষা ব্যবহার করিতে থাকে। ১০ম শতাব্দীর শেষ নাগাদ অনুপ্রবেশকারীদের বিপুল সমাবেশের দরুন সৈন্যবাহিনীতে মধ্য ও পূর্ব আল-মাগরিব হইতে ন্যায্যভাবেই ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপে বার্বারদেরকে বিপুল সংখ্যায় নিযুক্ত করিতে হয়। ফলে আন্দালুসের উত্তর আফ্রিকাবাসীদের এত বিপুল সমাবেশ ঘটে যে, তাহারাই খিলাফাত কাঠামোর ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। তাহারা জাতিগতভাবে দলবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী শতাব্দীতে আন্দালুসী তাইফার বিরুদ্ধে বার্বার তাইফা প্রতিষ্ঠিত করে।

আন্দালুসে আরব বংশোদ্ভূত লোক কখনও সংখ্যালঘুর সীমা অতিক্রম করে নাই। ইহাদের অধিকাংশই বিজয়ের সময় অথবা পরবর্তী কালে এই দেশে প্রবেশ করে। পরে সিরীয় সৈন্যবাহিনী (জুন্দী) ও স্পেনে মারওয়ানী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে বহিরাগতদের আগমনের ফলে উহাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। মূলত স্পেনে আরবগণ সংখ্যায় ছিল মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু স্থানীয় মহিলাদের সহিত আন্তবিবাহ 'ওয়ালা' প্রথা চালু হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক, সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, নিজদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতে থাকে।

আন্দালুসীয় সমাজে বিদ্যমান বহিরাগতদের মধ্যে তৃতীয় জনগোষ্ঠী ছিল নিগ্রো ও পূর্ব ইউরোপের স্লাভগণ। সংখ্যায় উহারা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম হইলেও উহাদের উল্লেখ প্রয়োজন। যে সমস্ত বণিক বিশেষভাবে দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, তাহাদের দ্বারা স্পেনে আনীত সূদানী নিগ্রো (আবীদ) ভাড়াটিয়া সৈনিকগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভাড়াটে প্রহরীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিগ্রো রমণীদের সহিত আন্তঃবিবাহের দরুন তাহারা স্থানীয় নাগরিকদের সংগে মিশিয়া যায়। নিগ্রো রমণীদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—যাহার একটি কারণ গৃহস্থালির কাজে তাহাদের দক্ষতা। অপরপক্ষে স্লাভগণ (সাকালিবা দ্র.) ছিল ইউরোপ মহাদেশ অর্থাৎ জার্মানী হইতে স্লাভ দেশসমূহ (Slav Countries) পর্যন্ত—এই এলাকা হইতে ধৃত অথবা গ্রীষ্মকালীন (সাইফা) অভিযানে আন্দালুসের সীমান্ত এলাকা হইতে বন্দীকৃত লোকজনের সন্তান-সন্ততি। অবশেষে খিলাফাতের দ্বিতীয় যুগে অনেক সংঘবদ্ধ কর্মতৎপর দলের অভ্যুত্থান হয়, বিশেষত কর্ডোভাতে যাহারা রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ভীষণ প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করিয়া উহার ধ্বংসের কারণ হয়।

বার্বার, আরব ও অন্যান্য বহিরাগত মুসলিমদের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও স্পেনের নও-মুসলিমদের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা বিস্ময়কর যে, এই সমস্ত নও-মুসলিম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরবী রীতিনীতির সহিত সামগ্রিকভাবে একাত্ম হইয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ ইসলামের বিজয়কালীন অথবা বিজয়ের পরে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাহারা ইসলামী যিম্মেগীর মধ্যে সুখী সুন্দর জীবনের সন্ধান লাভ করে। তাহারা আন্দালুসে মুসালিমা অথবা বিশেষভাবে 'মুওয়াল্লাদূন' নামে পরিচিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই ইসলামের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন করে, যাহা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এখানকার শাসকবর্গ এমন বুদ্ধিমত্তার সহিত উহাদের সেবা ব্যবহার করেন, যাহাতে প্রাচীন বুনিয়াদী মুসলিম বহিরাগতদের অভাব অনুভূত না হয়। মুওয়াল্লাদগণের অনেকেই আন্দালুসী সমাজ কাঠামোয় এমন একাত্মভাবে মিলিয়া যায় যে, তাহাদের স্পেনীয় (আইবেরীয় অথবা গথিক) মূল উৎসের স্মৃতিও হারাইয়া ফেলে। অবশ্য নামের ক্ষেত্রে তাহারা প্রায়শ প্রাচীন (Romance) নাম ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে। ইসলামের ছায়াতলে বহু উৎসজাত বাশিন্দাদের সহঅবস্থান ক্রমশ তাহাদেরকে একীভূত করে। অভিন্ন জীবনধারা ও ছন্দ অবলম্বন এবং দৈনন্দিন জীবনে স্পেনীয় আরবী ও রোমান্‌স ভাষাকে একই মর্যাদা দান এই একীকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

আল-আন্দালুসের মুসলিম জনগণ উৎসগতভাবে সংকর হইলেও ক্রমান্বয়ে একটি সমজাতীয় শক্তিতে পরিণত হয়। মুসলিম জাহানের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের ন্যায় তাহারাও ১০ম শতাব্দীতে কতিপয় সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়, যথা : খাস্‌সা ও 'আম্‌মা। অভিজাতগণকে লইয়া গঠিত হয় প্রথম শ্রেণী। অপরপক্ষে ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের সমন্বয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হয়, যাহারা অচিরেই একটি কায়েমী স্বার্থভোগী (বুর্জোয়া) নাগরিক শ্রেণীতে পরিণত হয়, যদিও তাহাদের কোন সনদ বা বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার ছিল না। ইহাদের বিপরীতে ছিল সাধারণ লোক বা 'আম্‌মা যাহারা শহরগুলিতে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এক অবজ্ঞাত মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছিল এবং কর্তৃপক্ষ দ্বারা ভীষণভাবে উত্যক্ত হইত। তখনকার আন্দালুসে প্রচলিত ভূমি আইনের সঠিক তথ্যের অভাবে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয়, তথায় বিত্তহীন একদল দিনমুজুর ছিল যাহারা জমির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিয়া দুঃসহ জীবনযাপন করিত এবং অনেকের পক্ষেই এই দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় ছিল না।

আন্দালুসীয় সমাজে জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল করদাতা (মু'আহিদূন বা চুক্তিবদ্ধ) যাহারা খৃস্টান ও ইয়াহূদী উভয় দলভুক্ত ছিল। খৃস্টানদের সাধারণত মুদারাবা বলা হইত। ইহারা স্পেনের সেই সব অধিবাসী যাহারা মুসলিম বিজয়কালে নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া

বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করে নাই। বড় বড় শহরে, বিশেষত কর্ডোভা, সেভিল (Seville) ও টলেডোতে মুদারাবা সম্প্রদায় মুসলিম কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আশ্রয় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সংগঠিত হয় এবং তাহাদের প্রতিটি দলের জন্য একজন সরদার নিযুক্ত করা হইত, যাহাদের কূমিস (Comes قومس = Protector অথবা Defensor) বলা হইত। তাহাদেরকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত। কূমিস তাহার দলের মধ্যে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নির্বাহ করিতেন এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও পালন করিতেন। তাহাকে সাহায্য করিতেন একজন বিশেষ বিচারক কা'দী'ল-'আজাম অথবা মুহ্তাসিব (Censor)। তিনি মুদারাবাগণের মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করিতেন। একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আল-আন্দালুস ভূখণ্ড পশ্চিমী ভিসিগথ (Visigoth) আমলের ন্যায় তিনটি যাজকীয় (ecclesiastical) অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, যথাঃ টলেডো, লুসিতানিয়া ও Baetica। এই তিনটি বিভাগই ছিল মেট্রোপলিটান অঞ্চলে। প্রতিটি প্রদেশে ছিলেন একজন যাজক এবং প্রতিটি প্রদেশই কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল। আল্-বাক্রীর রচনা হইতে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। তিনি ইহাকে কনস্টানটাইন বিভাগ (Constantine's partition) বলিয়াছেন। খিলাফাত আমলের আন্দালুসে কর্মরত কতিপয় বিশিষ্ট গির্জার উচ্চ পদস্থ ও সম্মানিত যাজকদের নাম আল-বাক্রীর রচনাতে সংরক্ষিত আছে। যে মুদারাবা সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের নিকট পর্যাপ্ত তথ্যাদি রহিয়াছে উহা কর্ডোভার বাসিন্দা যদিও সংখ্যার দিক দিয়া উহা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নহে।

আন্দালুসের শহরগুলিতে বসবাসকারী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও উহাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত তথ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিটি শহরে এই সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা মহল্লা (হারাত অথবা মাদীনাতুল-ইয়াহূদ) ছিল। স্পেনে, বিশেষ করিয়া গ্রানাডার যীরী সাল্তানাতে আবগারী কর্মকর্তা ও খাজাঞ্চী (Treasurer) পদে ইয়াহূদী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইত। এই কার্যে বানুন-নাগ্রাল্লা পরিবারের গুরুত্ব স্বীকৃত হইত। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ বুলুগ্গীন ইব্ন বাদীস ইবন হাবুস্ ইব্ন যীরী-এর হত্যার পর গ্রানাডায় অবাধ হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠনের সুযোগ দান ও ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রানাডার অর্থনীতিতে বিশাল ইয়াহূদী (লুসেনা [আল-য়ুস্সানা] শহরের জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল ইয়াহূদী) সমাজের প্রবল প্রভাব দৃষ্টে ইহার প্রতীতি জন্মে, পুনর্দখলে সর্বস্তরে আন্দালুসের ইয়াহূদীগণ মুসলমান অথবা খৃষ্টানদের চাকুরীতে দেশের পরামর্শদাতা ও রাষ্ট্রদূত হিসাবে সক্রিয় অবদান রাখে এবং তাহারা একদিকে ইউরোপ মহাদেশ ও আন্দালুসের মধ্যে ও অন্যদিকে মুসলিম প্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্যপথসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যাপারে কায়রোর গানিযা (Geniza)-তে প্রাপ্ত দলীলাদি হইতে আরও তথ্যাদি পাওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরিউক্ত তথ্যাদি অতি সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ৩খ., ১৬৩-২৩২; আরও দ্র. (২) ঐ-লেখক, Esp. mus. XE siecle, ১৮-৩৯ ও স্থা.; (৩) F. J. Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, মাদ্রিদ ১৮৯৭-১৯০৩; (৪) F. de Las Cagigas, Les Mozarabes, মাদ্রিদ ১৯৪৭-৪৯; (৫) H. Graetz, Geschichte der Juden, vols. 5-7, লাইপযিগ ১৮৭১-৩; (৬) ঐ লেখক, Les Juifs d,' Espagne, ফরাসী ভাষায় Stenne কর্তৃক অনূদিত, প্যারিস ১৮৭২; (৭) J. Amador de los Rios, Historia social, politica y religiosa de los Judios de Eapana y Portugal, মাদ্রিদ ১৮৭৫।

(৫) **আল-আনদালুসের উন্নয়ন ঃ** কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আন্দালুসের ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছিল এবং উহার উদ্ভিদ ও খনিজ সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত ও আহরিত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে প্রধানত ভূগোলবেত্তাগণই অল্প বিস্তর তথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন যুগের গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা যথেষ্ট কারিগরী সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাদের মধ্যে আত্-তিগ্নারী, ইব্ন ওয়াফিদ, ইব্ন বাস্সাল, ইবন লুয়ুন ও ইব্নুল 'আওওয়াম-এর গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য। কর্ডোভার ৯৬১ খৃষ্টাব্দের পঞ্জিকা (Cordovan Calendar of 961)-এর কথাও এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য যাহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ডোযী (Dozy) কর্তৃক প্রকাশিত। আরও উল্লেখযোগ্য পরবর্তী কালের একটি গ্রন্থ যাহা কর্ডোভার ইতিহাসবেত্তা 'আরীব ইব্ন সা'দ (দ্র.)-এর প্রতি আরোপিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থে চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে ও জমি সংক্রান্ত চুক্তি কিভাবে সম্পাদন করা হইত সেই সম্পর্কেও বস্তুত কোন তথ্যাদি দেওয়া হয় নাই। এই ব্যাপারে আইন ও বিচার সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা অস্পষ্ট ও অনির্ভরযোগ্য।

(১) কৃষি ঃ বর্তমান যুগের ন্যায় সেই যুগেও স্পেনে শুষ্ক ভূমি (স্পেনীয় ভাষায় secano= আরবী বা'ল) ও সেচের ভূমি (স্পেনীয় ভাষায় regadio= আরবী সাকী)-এর মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিদ্যমান ছিল। প্রথমোক্ত ভূমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইত। মৃত্তিকা অত্যন্ত নিম্ন মানের হওয়ায় ও আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় এখানে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে বিভিন্ন সময়ে এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। খাদ্যশস্যের এই ঘাটতি পূরণের জন্য আন্দালুস উত্তর আফ্রিকা হইতে গম আমদানী করিতে বাধ্য হইত। কয়েক প্রকারের আন্দালুসীয় (টলেডো) গমের খ্যাতি ছিল। অশ্বচালিত (তাহুনা) অথবা পানিচালিত (রাহা) কল খাদ্যশস্য ভাংগানোর কাজে ব্যবহৃত হইত।

দেশের বিস্তৃত অঞ্চল, বিশেষ করিয়া আন্দালুসিয়া ও ইক্লীমুশ-শারাফ (Aljarafe) অঞ্চল জলপাই বীথি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং ঐসব অঞ্চলে জলপাই তৈলশিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তৈল নিষ্কাশন প্রক্রিয়া যদিও আদিম ছিল তবুও কোন কোন সময়ে স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈল উৎপাদিত হইত এবং উদ্বৃত্ত তৈল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হইত। অন্যান্য শুষ্ক চাষের ন্যায় ব্যাপকভাবে আঙ্গুরের চাষও করা হইত। কিশমিশ, মনাক্কা রান্নায় ব্যবহৃত হইত।

ফসল আবাদের জন্য যথোপযুক্ত সেচের প্রয়োজন। সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্দালুসিগণ অতি দ্রুত অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য অর্জন করে যদিও তাহাদের ব্যাবহৃত সেচব্যবস্থা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব তাহাদের প্রাপ্য নহে। এই

ব্যবস্থা বিশেষভাবে পূর্ব আন্দালুস এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্যতীত এখনও জারী রহিয়াছে। জালের মত পরস্পরছেদী ছোট ছোট খাল (সাকিয়া, স্পেনীয় ভাষায় acepuia)-এর মাধ্যমে তাহারা সেচকার্যের সরলতম পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিল মুর্সিয়া (Murcia) ও ভ্যালেনসিয়ার (Valencia) উপকূল এলাকায়। এই সেচব্যবস্থায় পানির গতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত স্তরের পার্থক্যের উপর। পিতৃশাসিত পরিবারের প্রচলিত বিধি মুতাবিক পানি স্বত্ব নির্ধারিত হইত যাহা অদ্যাপিও চালু রহিয়াছে। উচ্চতর ভূমি ও গুয়াদিয়ানা (Guadiana), তাগুস (Tagus), এবরো (Edro) প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় পাম্প মেশিনের সাহায্যে সেচকার্য সমাধা করা হইত। পাম্পের প্রকৃতি ও কার্যানুযায়ী উহাদেরকে নাউরা (স্পেনীয় ও ফরাসী noria) অথবা সানীয়া (স্পেনীয় ভাষায় acena) বলা হইত। এই সেচ পদ্ধতি তরিতরকারি ও উদ্ভিদ চাষে ব্যবহৃত হইত। আন্দালুসে উৎপাদিত ফলের প্রশংসায় ভূগোলবেত্তাগণ যেন পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। চেরী (cherry), আপেল, নাশপাতি, বাদাম, আনার ইত্যাদি, সর্বোপরি বিভিন্ন প্রকারের ডুমুর বা আঞ্জীর ফল (Fig) স্পেনে উৎপাদিত হইত। কোন কোন সুরক্ষিত উপকূলীয় ফালিকৃত এলাকায় আধা-গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় ফল, যথা ইক্ষু, কলা ইত্যাদি উৎপাদন করা যাইত। ইলচি (Elche, আলশ দ্র.)-এর পামকুঞ্জ (palm groves) দেশের অন্যতম মনোরম দর্শনীয় স্থল ছিল।

পরিশেষে সুগন্ধি ওষুধী বা মসলা (aromaric herbs) উদ্ভিদ উৎপাদনের পাশাপাশি বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ চাষও এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে করা হইত। সুগন্ধি ওষুধী বা মসলা জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান ছিল যাফরান, মু'আসসাফার (safflower-লেব্রিঃ), জিরা, ধনিয়া, madder (রুবিয়া) ও মেহেদী। অপরদিকে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে শণ তন্তু (Flax) ও কার্পাস তুলা উৎপাদিত হইত। প্রধানত গ্রানাডা ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার মধ্যস্থলে ব্যাপকভাবে রেশম চাষ হইত।

ভূগোলবেত্তারা যোগাযোগ, পরিবহণ, পাহাড় ও কৃষিকার্যে যে সমস্ত পশু ব্যবহৃত হইত অথবা যে সমস্ত পশুর গোশত খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত, উহাদের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নিম্ন গুয়াদালকুইভারের তৃণ এলাকায় অশ্ব লালন-পালন করা হইত এবং ইব্ন হাওকাল-এর আমল পর্যন্ত আনদালুসের খচ্চরের খ্যাতি ছিল। অপর্যাপ্ত চারণভূমি কাজে লাগাইয়া গবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগল সর্বত্র পালন করা হইত। মধু উৎপাদনের জন্য মৌমাছিও পালন করা হইত।

আল-আনদালুসের বন-সম্পদ শহরের কাজে ব্যবহৃত হইত, বিশেষত কাঠ কয়লার জন্য মেসিতা (Meseta)-এর প্রান্তস্থ প্রচুর পাইন বৃক্ষ (pine), কড়িকাঠ ও জাহাজের মাস্তুল নির্মাণের জন্য কাটা হইত। দক্ষিণ-পূর্বে বিশাল স্টেপের (Steppe like) মত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বেঁটে তাল বৃক্ষ (dwarf Palm) ও লম্বা লম্বা ঘাস (esparto) জন্মাইত। উহা ঝুড়ি তৈরী ও গৃহস্থালির অন্যান্য কার্যে ব্যবহার করা হইত।

২। খনিজ সম্পদের ব্যবহার ঃ আনদালুসের ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ থাকায় প্রাচীন কাল হইতেই উহা কাজে লাগাইবার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রয়াস চালান হয় এবং মুসলিম শাসন আমলেও এই প্রয়াস অব্যাহত থাকে। কোন কোন নদীর বালুকা হইতে স্বর্ণ আহরণ করা ছাড়াও কর্ডোভার উত্তরাঞ্চলে রৌপ্য ও লৌহের খনি খনন করা হইয়াছিল এবং আলমা'দান (Almaden) ও হিস্ন আবাল (Ovejo) এলাকায় মাটির নিচে রক্ষিত হিংগুল (cinnabar) উত্তোলন করা হইত। ওলিবা (Huelva) এলাকায় পাইরাইট (Pyrite) খনি হইতে তামা উত্তোলন করা হইত। ফিট্‌কিরি (Alum), হিরাকস (Sulphate of Iron), সীসা, সীসকাঞ্চন (galena) প্রভৃতিও এখানে পাওয়া যাইত। মার্বেল ও দুর্মূল্য প্রস্তরের জন্য মুসলিম. স্পেনের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ছিল। পূর্ববর্তী রোমানদের ন্যায় আন্দালুসীয়গণ উষ্ণ প্রস্রবণ (Thermal Spring)-গুলিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। ঐ সমস্ত প্রস্রবণের অনেক প্রাচীন নাম অদ্যাপি অপরিবর্তিত রহিয়াছে, যেমন আলহামা (আরবী আল্-হাম্মা)। সৈন্ধব লবণ খনি ও কাদিয, আলমেরিয়া ও আল-কানাত (Alicante) উপকূল এলাকায় লবণ শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করে। তন্তুজাল ও দড়াজাল (আরবী মাদ্‌রাবা)-দ্বারা মৎস্য শিকার করা হইত। প্রচুর পরিমাণে সার্ডিন (Sardine) ও টুনা (Tunny) মাছ পাওয়া যাইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই অধ্যায়ের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., iii, ২৩৩-৯৮; আরও দেখুন (২) ঐ লেখক, Esp. Mus., XE siecle, ১৫৭-৯৪; একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তথ্যের জন্য দ্র. (৩) C.E. Dubler, Uber das Wirtschaftsleben auf der iberischen Halbinsel vom XI. zum XIII. Jahrhundert, জেনেভা-জুরীখ ১৯৪৩; (৪) A. Carbonel T.F., La mineriay la metalurgia entre los Musulmanes en Espana, কর্ডোভা ১৯২৯ খৃ.।

(৬) **আল-আন্দালুসের ইতিহাসের সাধারণ জরীপ ঃ** এখানে স্পেন বা আইবেরীয় উপদ্বীপ (Iberian Peninsula)-এ মুসলমানদের সাত শতাব্দীব্যাপী শাসন ইতিহাসের ক্রমবিকাশের কেবল একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়াই সম্ভব। এই রূপরেখা কতিপয় সময়ানুক্রমিক পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া উপস্থাপিত করা হইল যাহা বিস্তারিত বিবরণ ব্যতিরেকেই সংশ্লিষ্ট আমলের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদানে সহায়ক হইবে ঃ (১) আল্-আন্দালুস বিজয়। (২) মারওয়ানী শাসনের পুনঃস্থাপনকাল পর্যন্ত আল্-আন্দালুসের ইতিহাস। (৩) কর্ডোভায় মারওয়ানী সালতানাত। (৪) খিলাফাত ও আমিরী একনায়কত্ব। (৫) মারওয়ানী খিলাফাতের পতন, আল্-আন্দালুস সালতানাতের বিভক্তি। (৬) তাইফা (طائفة) সাল্তানাত আয-যাল্লাকা যুদ্ধ পর্যন্ত। (৭) আল-মুরাবিতগণের (Almoravids) অধীনে স্পেন। (৮) আল্-মুওয়াহ্‌হিদূন (Almohads)-এর অধীনে স্পেন ও পুনর্দখলের (Reconquista) -এর অগ্রগতি। (৯) গ্রানাডার নাসরী রাজ্য ও পুনর্দখলের সমাপন।

(১) আল-আন্দালুস বিজয় ঃ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে 'আরবগণ বিজয়ের যে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করে, তাহার মধ্যে গতি ও ক্ষিপ্রতার

বিচারে আল-আন্দালুস বিজয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বিভিন্ন পর্যায়ে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপে যেইভাবে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইহা অতি স্পষ্ট, এই বিজয়ের পশ্চাতে এক অনুকূল পরিবেশ মুসলমানদের পক্ষে কাজ করিয়াছিল। গথিক শাসন, শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত স্পেনের আমজনসাধারণ তখন অত্যাচারের এই নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য মুসলিমদেরকে সাহায্য করিয়াছিল। এই সময় মুসলিম শাসন উত্তর মরক্কো অঞ্চলে সবেমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইফরীকিয়া ও মাগরিব-এর শাসনকর্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন মূসা ইব্ন নুসায়র (দ্র.)। ফলে আন্দালুস বিজয়ের সামগ্রিক কৃতিত্ব মূসা ইব্ন নুসায়র এবং তাঁহার তরুণ সেনাধ্যক্ষ ও মাওলা তারিক ইব্ন যিয়াদ (দ্র.)-এর প্রাপ্য।

ইহা প্রায় সুনিশ্চিত, মূসা ইব্ন নুসায়র জিব্রালটার প্রণালীর অপর পারে অবস্থিত নূতন ভূখণ্ডে অভিযানের সিদ্ধান্ত দামিশ্কের খালীফার দরবারে পেশ করিবার পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূসা Septem (Ceuta) শহরের গির্জাপ্রধানের নিকট হইতে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস পাইয়া এই অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুসলমানদের হস্তে কার্থেজ (Carthage)-এর পতনের পরও সিউটা বায়যান্টীয় শাসনাধীন থাকিয়া যায়। ইহার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান (Count Julian) সর্বপ্রথম স্পেনের মাটিতে মুসলমানদের অবতরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় স্পেনের জনসাধারণ গথিক অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। গথিক রাজন্যবর্গ কেবল পাদরীদের সুযোগ-সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখিত। পাদরী-পুরোহিতগণ ও জনগণ ইহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এমনকি খৃষ্টানদের অবিরত অত্যাচারে জর্জরিত স্পেনের ইয়াহূদীরাও অধীর আগ্রহে মুসলমানদের শুভাগমন কামনা করিতেছিল। মূসা ইব্ন নুসায়র সর্বাত্মক অভিযানের লক্ষ্যে প্রাথমিক জরীপের জন্য অধীনস্থ বার্বার অধিনায়ক তারীফের নেতৃত্বে একদল সৈন্য স্পেন ভূখণ্ডে প্রেরণ করেন। তারীফ সদলবলে রামাদান ৯১/জুলাই ৭১০ সালে স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত তারীফা দ্বীপ (জাযীরাতু ত'ারীফা)-এ অবতরণ করেন। তারীফের এই সাফল্যের সংবাদ পাইয়া মূসা ইব্ন নুসায়র-এর সহকারী সেনাধ্যক্ষ তারিক ইব্ন যিয়াদ সাত হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক মুজাহিদ বাহিনী লইয়া অতি সফলতার সহিত ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালীটি অতিক্রম করিয়া রাজাব অথবা শা'বান ৯২/এপ্রিল অথবা মে ৭১১ সালে স্পেন ভূখণ্ডে অবতরণ করেন। যে পাহাড়ের পাদদেশে তারিক অবতরণ করিয়াছিলেন উহার নামকরণ করা হয় জাবালুত্-ত'ারিক (Gibralter)।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে ২৮ রামাদান, ৯২/১৯ জুলাই, ৭১১ তারিখ মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী ও গথিক রাজা রডারিক (Roderic, আরবী লাযরীক বা রাযারীক)-এর নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ওয়াদী লাক্কু (Wadi Lago, Rio Barbate=ওয়াদী বাকা) নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে গথিক বাহিনী ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে। হাজার হাজার গথিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিতে যাইয়া নদীবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারান। তারিক আরও অগ্রসর হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন তারিক মুজাহিদ বাহিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া এই ভাষণ দিয়াছিলেন ঃ তোমাদের সম্মুখে শত্রুদল এবং পিছনে বিশাল বারিধি। ফলে গথিক রাজ্যের একটির পর একটি শহরের পতন হইতে থাকে। মুক্তদাস মুগীছ ৯৩ হিজরীর শুরুতে/অকটোবর ৭১১ সালে কর্ডোভা দখল করিলেন এবং বিনা বাধায় টলেডোর পতন হইল। মূসা ইব্ন নুসায়র আনদালুস বিজয়ের সম্পূর্ণ গৌরব তারিক লাভ করিতেছেন দেখিয়া স্পেনের দিকে অগ্রসর হন এবং প্রধানত আরবদের সমন্বয়ে গঠিত আঠারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া রামাদান ৯৩/জুন ৭১২ সালে স্পেন ভূখণ্ডে উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়াই তিনি একে একে ইশবীলিয়া (Sevlle) ও মারিদা (Merida) দখল করেন (শাওয়াল ৯৪/জুন-জুলাই ৭১৩)। টলেডোতে পৌঁছিয়া মূসা ইব্ন নুসায়র তারিকের সহিত মিলিত হইলেন এবং এখান হইতে সারাগোসা (Saragossa) দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ঠিক এই মুহূর্তে মূসা ইব্ন নুসায়র দামিশক হইতে খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আব্দিল-মালিকের নির্দেশ লাভ করিলেন, তিনি যেন কালবিলম্ব না করিয়া তারিকসহ রাজধানী দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে তাঁহারা প্রায় সমগ্র স্পেন জয় করিয়াছিলেন। খলীফার নির্দেশ পাইয়াই তাহারা স্পেন ত্যাগ করিয়া দামিশকের পথে রওয়ানা হইলেন। আর কখনও তাঁহারা স্পেনে ফিরিয়া আসেন নাই।

(২) মারওয়ানী শাসনের পুনঃস্থাপন পর্যন্ত আন্দালুসের ইতিহাস মূসা ইব্ন নুসায়র-এর প্রাচ্যে গমনের ফলে যে পরিস্থিতির সূচনা হইল তাহাতে নব-বিজিত এই অঞ্চলটিতে পরপর বেশ কতিপয় গভর্নর (ওয়ালী) নিযুক্ত হইলেন, যাঁহারা হয় দামিশকের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে অথবা আল-কায়রাওয়ানের নামমাত্র গভর্নর (ওয়ালী)-এর প্রতিনিধি হিসাবে এই অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন। এই সময় স্পেনে নামিয়া আসে ভীষণ অরাজকতা। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ইহার ফলে সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ভীষণ আকার ধারণ করে। এই সময় অবশ্য গাওলিশ (Gaulish) অঞ্চল (বার্সেলোনা, গেরোনা ও নার্বেন) দখল দ্বারা ইসলামী শক্তি সম্প্রসারিত করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিষ্ফল অভিযান পরিচালিত হয়। নুরবুনায়ী (Narbonnaise) ও তুলশীয় (Toulouse)-দের বিরুদ্ধে ১০০/৭১৯ অথবা ১০২/৭২১ সালে এক অভিযান পরিচালিত হয় এবং ৭২৫ খৃষ্টাব্দে রোন (Rhone) উপত্যকার বুরগান্দী (Burgundy) পর্যন্ত আরও অভিযান পরিচালিত হয়। সর্বশেষ বৃহৎ অভিযানে নেতৃত্ব দেন শাসনকর্তা (ওয়ালী) আবদুর-রাহমান আল-গাফিকী এবং যুদ্ধরত অবস্থায় [ভিন্নমতে (দ্র. দা.মা.ই.) ব্যূহ রচনাকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকস্মিকভাবে পতিত হইয়া] তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে রামাদান ১১৪/অকটোবর ৭৩২ সালে বালাতুশ-শুহাদা-তে সংঘটিত এই যুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের ডিউক চার্লস মার্টেল (Charles Martel)-এর হস্তে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে। (মতান্তরে এই সংকট পর্যালোচনা করিয়া নূতন শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিয়োগ সাপেক্ষে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই

যুদ্ধ সাধারণত (পয়োতিয়ার-এর যুদ্ধ= Battle of Poitiers) নামে পরিচিত।

মুহাম্মাদ ইনায়াতুল্লাহ আন্দালুসের ঐতিহাসিক ভূগোল (আনদালুস কা তারীখী জুগরাফিয়া, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯২৭) গ্রন্থে আনদালুসের শাসনকর্তাগণের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছেন তাহা এখানে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা Zambaur. Mannual-de Geneologie de Chronologie, Hanover ১৯২৭ খৃ., পৃ.-৫৩)-এর তালিকার অনুরূপ। আনদালুসের মুসলিম বাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত শাসনকর্তাদের নামের পূর্বে তারকাচিহ্ন প্রদত্ত হইল ঃ

১। তারিক ইব্ন যিয়াদ, শাওওয়াল ৯২/জুলাই ৭১১ হইতে জুমাদাল-উলা ৯৩/মার্চ-এপ্রিল ৭১২ পর্যন্ত; ২। (আবদুর-রাহমান) মূসা ইব্ন নুসায়র, যুল্‌হিজ্জা ৯৫/সেপ্টেম্বর ৭১৪ পর্যন্ত ; ৩। 'আবদুল 'আযীয ইব্ন মূসা ইব্ন নুসায়র, যুল্‌হিজ্জা ৯৭/আগস্ট ৭১৬ পর্যন্ত; ৪। *আয়্যুব ইব্ন হাবীব আল-লাখমী, যুলহিজ্জা ৯৮/জুলাই-আগস্ট ৭১৭ পর্যন্ত; ৫। আল-হুর্‌র ইব্ন আবদির -রাহমান আছ-ছাকাফী, রামাদান ১০০/মার্চ-এপ্রিল ৭১৯ পর্যন্ত; ৬। আল-সাম্‌হ ইব্ন মালিক আল্-খাওলানী, যুলহিজ্জা ১০২/মে ৭২১ পর্যন্ত; ৭। আবদুর-রাহমান ইব্ন আবদিল্লাহ আল-গাফিকী, সফর ১০৩/আগস্ট ৭২১ পর্যন্ত; ৮। 'আন্‌বাসা ইব্ন সুহায়ম আল্-কাল্‌বী, শা'বান ১০৭/ডিসেম্বর ৭২৫-জানুয়ারী ৭২৬ পর্যন্ত; ৯। 'উয্‌রা ইব্ন আবদিল্লাহ আল-ফিহ্‌রী, শাওওয়াল ১০৭/মার্চ ৭২৬ পর্যন্ত; ১০। ইয়াহ্‌য়া ইব্ন সালামা আল-কাল্‌বী, রাবী'উছ-ছানী ১০৮/সেপ্টেম্বর ৭২৬ পর্যন্ত; ১১। *উছমান ইব্ন আবী আবদিহী, শা'বান ১০৯/নভেম্বর ৭২৭ পর্যন্ত; ১২। উছমান ইব্ন আবী নিসআ আল-খাছ'আমী, রাবীউল-আওওয়াল ১১০/জুন-জুলাই ৭২৮ পর্যন্ত; ১৩। হুযায়ফা ইব্‌নুল-আহ্‌ওয়াস আল-কায়সী, মুহাররাম ১১১/এপ্রিল ৭২৯ পর্যন্ত; ১৪। আল-হায়ছাম ইব্ন উবায়দ আল্-কালবী (আল-কিনানী), জুমাদাল-উলা ১১৩/আগস্ট ৭৩১ পর্যন্ত; ১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ (আবদিল-মালিক) আল-আশজা'ঈ, শা'বান ১১৩/অক্টোবর ৭৩১ পর্যন্ত; ১৬। আবদুর্-রাহমান আল্-গাফিকী (দ্বিতীয় বার), রামাদান ১১৪/অক্টোবর ৭৩২ পর্যন্ত; ১৭। আবদুল-মালিক ইব্ন কাতান (ইব্ন নুদায়ল ইব্ন আবদিল্লাহ) আল-ফিহ্‌রী, রামাদান ১১৬/অক্টেবর-নভেম্বর ৭৩৪ পর্যন্ত; ১৮। উক্‌বা ইবনুল-হাজ্জাজ আস-সালূলী (আল-কায়সী), সাফার ১২৩/ডিসেম্বর ৭৪০ পর্যন্ত; ১৯। 'আবদুল-মালিক ইবন কাতান আল-ফিহ্‌রী (দ্বিতীয়বার) যুল-কা'দা ১২৩/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৭৪১ পর্যন্ত; ২০। বাল্‌জ ইবন বিশ্‌র আল-কুশায়রী, শাওয়াল ১২৪/সেপ্টেম্বর ৭৪২ পর্যন্ত; ২১। ছা'লাবা ইবন সালামা আল-'আমিলী' রাজাব ১২৫/মে ৭৩৪ পর্যন্ত; ২২। আবুল-খাত্তার হুসাম ইবন দিরার আল-কাল্‌বী, রাজাব ১২৭/এপ্রিল-মে ৭৪৫ পর্যন্ত; ২৩। ছাওয়াবা ইবন সালামা আল-জুযামী, রাবী'উছ-ছানী ১২৯/ডিসেম্বর ৭৪৬-জানুয়ারী ৭৪৭ পর্যন্ত; [প্রথমদিকে কিছু দিনের জন্য আস-সামীল ইবন হাতিমও প্রশাসনে শরীক ছিলেন]। ২৪। ইয়ূসুফ ইবন 'আবদির-রাহমান আল-ফিহ্‌রী, যুলহিজ্জা ১৩৮/মে ৭৫৬ পর্যন্ত।

ইহার পর আনদালুসে আবদুর-রাহমান আদ-দাখিল-এর হুকূমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১ ও ২-এর জন্য) ঐ গ্রন্থপঞ্জী যাহার বিস্তারিত বিবরণ (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ১খ., ৮, টীকা ২-এ রহিয়াছে। ঐ লেখকের গ্রন্থের ১ হইতে ৮৯ পৃষ্ঠায় শাসনকর্তাদের প্রশাসন ও বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আরও দ্র. (২) Dozy, Recherches, তৃতীয় মুদ্রণ, ১খ., ১ হইতে ৮৩; (৩) E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, মাদ্রীদ ১৮৯২।

(৩) কর্ডোভায় মারওয়ানী আমীরাত (১৩৮-৩০০/৭৫৬-৯১২) ঃ মারওয়ানী বংশের উত্তরাধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে 'আবদুর-রাহমান ইব্ন মু'আবি'য়া (ইব্ন খলীফা হিশাম) আন্‌দালুসে আগমন করেন এবং তাঁহার পরিবারের বহু আশ্রিত ব্যক্তি ও দলীয় লোকজনকে তাঁহার সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ করিতে সক্ষম হন। তিনি এখানকার শাসনকর্তা ইয়ূসুফ ইব্ন আবদির রাহমান আল-ফিহ্‌রীকে কর্ডোভার নিকটে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এইখানেই তিনি ১০ যুলহিজ্জা, ১৩৮/১৫ মে, ৭৫৬-তে নিজেকে আন্‌দালুসের আমীর ঘোষণা করেন। এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবদুর রাহমান আদ-দাখিল শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আল-আন্‌দালুসের আমীরগণের তালিকা (তৃতীয় আবদুর রাহমানের খলীফা খেতাব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত) ঃ ১। আবদুর রাহমান আদ্-দাখিল ইব্ন মু'আবি'য়া ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদিল-মালিক ইব্ন মারওয়ান, জন্ম ১১৩/৭৩১; আন্‌দালুসের আমীর ঃ ১৩৮/৭৫৬ হইতে ১৭২/৭৮৮; ২। (আবুল ওয়ালীদ) হিশাম আল-আওওয়াল ইব্ন আবদির-রাহমান আল-আওওয়াল, জন্ম ১৩৯/৭৫৭; শাসনকাল ১৭২/৭৮৮ হইতে মৃত্যু তারিখ ৩ সাফার, ১৮০/১৭ এপ্রিল, ৭৯৬ পর্যন্ত ৩। (আবুল-মুজাফ্‌ফার আল্-মুর্‌তাদা) আল-হাকাম (প্রথম) ইব্ন হিশাম (প্রথম), জন্ম ১৫৪/৭৭০, শাসনকাল ১৮০/৭৯৬ হইতে ২৫ যুলহিজ্জা, ২০৬/২১ মে, ৮২২ তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত; ৪। আবদুর রাহমান (দ্বিতীয়) ইব্ন আল-হাকাম (প্রথম), জন্ম ১৭৬/৭৯২, শাসনকাল ২০৬/৮২২ হইতে ৩ রাবী'উছ-ছানী, ২৩৮/২২ সেপ্টেম্বর, ৮৫২ তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত; ৫। মুহাম্মাদ (প্রথম) ইব্ন আবদির রাহমান (দ্বিতীয়), জন্ম ২০৭/৮২৩; শাসনকাল ২৩৮/৮৫২ হইতে ২৮ সাফার, ২৭৩/৪ আগস্ট, ৮৮৬ তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত; ৬। আল-মুনযির ইব্ন মুহাম্মাদ (প্রথম), জন্ম ২২৯/৮৪৪; শাসনকাল ২৭৩/৮৮৬ হইতে ১৫ সাফার, ২৭৫/২৯ জুন, ৮৮৮ তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত; ৭। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (প্রথম), পূর্ববর্তী জনের ভ্রাতা, জন্ম ২২৯/৮৪৪, শাসনকাল ২৭৫/৮৮৮ হইতে ১ রাবী'উল আওওয়াল, ৩০০/১৬ অক্টোবর, ৯১২ তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত। দেড় শত বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী আন্‌দালুসের মারওয়ানী শাসন আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ হিশাম (প্রথম)-এর শান্তিপূর্ণ শাসন আমলে মালিকী মায্‌হাবের প্রচলন; প্রায় সমগ্র কালব্যাপী সীমান্ত অঞ্চলে বার্বার, আরব ও মুওয়াল্লাদগণের বিদ্রোহ দমন এবং রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় শাসকদের জিহাদী তৎপরতা। আল-হাকাম (প্রথম)-কে উৎখাত করিবার জন্য বিভিন্ন সময় কয়েকবার

আক্রমণ (বিশেষ করিয়া রাব্‌দ'ার বিদ্রোহ) পরিচালিত হয়, যে কারণে তাঁহাকে বেশ কয়েকবার মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। উপর্যুপরি প্রথম অস্টুরিয়ো-লিয়োনিজ (Austurio Leonese) যুবরাজদের ও স্পেনীয় সীমান্তে ফ্রাঙ্ক (Franks)-দের আক্রমণাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে ক্রমশ খৃস্টানদের পুনর্দখল (Reconquista)-এর পথ সুগম হইয়া যায় [অবশেষে বার্সেলোনা (Barcelona) পুনঃহস্তগত করে]।

দ্বিতীয় আবদুর রাহমান কিছুদিনের জন্য অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃংখলা দমন করেন। তিনি যুগপৎ ফ্রাঙ্ক (Franks), গেসকোন (Gascons) ও এবরো (Ebro) উপত্যকার বান্‌কাসী (দ্র.)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, কর্ডোভায় (৮৫০-৯) মোযারাব (Mozarab) বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইশ্‌বীলিয়া (Seville) উপকূলে যে সমস্ত উর্দুমানীয়ূন বা মাজূস (Norsemen) অবতরণ করিয়া ব্যাপক লুটতরাজ করিতেছিল, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া সমুদ্রে ঠেলিয়া দেন। এই মহান শাসক তাঁহার প্রপিতামহ আবদুর রাহমান আদ-দাখিল কর্তৃক প্রবর্তিত সিরীয় ঐতিহ্যের পরিবর্তে আব্বাসী আদর্শে রাজ্য সংগঠিত করেন।

তাঁহার কর্মধারা তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ (প্রথম)-ও অব্যাহত রাখেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার শাসন আমলের শেষদিকে আবদুর রাহমান ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন আল-জিল্লিকী (দ্র.) নূতন করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ আন্‌দালুস অঞ্চলে উমার ইব্‌ন হাফ্‌সূন (দ্র.)-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এই সমস্ত বিদ্রোহ পরবর্তী শাসকদের আমলেও অব্যাহত থাকে। উপরন্তু আমীর 'আবদুল্লাহর শাসন আমলে ইলভিরা (Elvira) ও ইশ্‌বীলিয়া অঞ্চলে আরব ও মুওয়াল্লাদদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ১খ., ৯১-৩৯৬, তৎসহ সমগ্র সূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী; (২) Dozy, Hist. Mus. Esp., ২য় সং, ২খ., বর্তমানে এই গ্রন্থখানি অপ্রচলিত।

(৪) খিলাফাত ও 'আমেরী একনায়কত্ব ঃ তৃতীয় আবদুর রাহমান আন-নাসির-এর দীর্ঘকালীন সফল রাজত্ব, কর্ডোভায় খিলাফাত-এর পুনরুজ্জীবন, উহার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন আবদুর রাহমান তৃতীয় শীর্ষক নিবন্ধ Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ii, পৃ. ১-১৬৪।

আবদুর-রাহমান আন-নাসির-এর পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী শাসন এই উপদ্বীপে মারওয়ানী আধিপত্যের উচ্চতম শিখরই ছিল না, বরং আল-আন্‌দালুসে সমগ্র মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম যুগ প্রবর্তন করিয়াছিল। ২২ রামাদান, ৩৫০/৪ নভেম্বর, ৯৬১ সনে আবদুর রাহমানের ইন্তিকালের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক তাঁহার পুত্র আল-হাকাম দ্বিতীয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনি ৩ সাফার, ৩৬৬/১ অক্টোবর, ৯৭৬-এ ইন্তিকাল করা পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আল-হাকাম দ্বিতীয়-এর শাসনকালও ছিল সাফল্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী। উত্তর জার্মানী (Saxon)-র মহিলা কবি (Hroswitha)-র ভাষায় বলা যায়, ঐ সময় "কর্ডোভা ছিল বিশ্ব সুন্দরীর অলংকার এবং একই সংগে আল-হাকাম দ্বিতীয় নিজেই ছিলেন একজন জ্ঞান-পিপাসু ও গ্রন্থপ্রেমিক ব্যক্তি। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কর্ডোভা ভাষাতত্ত্বে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেনের খৃস্টানগণ সালিসীর জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইত এবং অনুমিত হয়, তখন খৃস্টানদের পুনর্দখলের (Reconquista) প্রচেষ্টা স্তিমিত হইয়াছিল।

আল-হাকাম (দ্বিতীয়)-এর ইন্তিকালের পর তৎপুত্র হিশাম (দ্বিতীয়) পিতার উত্তরাধিকারী হন। তিনি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেইজন্য রাজকার্য পরিচালনায় তাঁহার যোগ্যতা ছিল না। তিনি খলীফার ঔরসে ও গ্যাসকোন (Gascon) মহিলা উম্ম ওয়ালাদ সুবহ-এর গর্ভে ৩৫৪/৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তিনি জড়াইয়া পড়েন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমের-এর মত উৎসাহী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত হইয়া যায়, যিনি অতি দ্রুত শাসনভার স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া দৃঢ়তার সহিত খিলাফাত-এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ছিলেন শাহী মহলের একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (major-domo)। পরবর্তী কালে তিনি আল-মানসূর (দ্র.) উপাধি গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন আবী আমের-এর উজ্জ্বল জীবনের বিভিন্ন পর্যায় যাহা তাঁহাকে অতি দ্রুত সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। এই মহান প্রতিভাধর রাজনীতিবিদ একাধারে দক্ষ সেনানায়ক ও রণকৌশলী ছিলেন। তিনি উত্তরাঞ্চলের খৃস্টান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে পর পর কতিপয় জিহাদ পরিচালনা করত তাহাদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন, এমনকি ৩৮৭/৯৯৭ সালে গ্যালিসিয়া (Galicia) অভিযানকালে তিনি কমপোসতেলা (Compostela)-র বিখ্যাত সেন্ট জেম্‌স (Santiago) গির্জা দখল করিয়া ধ্বংস করিয়া দেন। উত্তর কাশতালীয়ায় (Castile) তাঁহার সর্বশেষ অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ২৭ রামাদান, ৩৯২/৯ আগস্ট, ১০০২ সালে মাদীনাতুস-সালিম নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে সমগ্র মুসলিম স্পেন অখণ্ড ও একতাবদ্ধ ছিল। তিনি আবদুর রাহমান (তৃতীয়) ও আল-হাকাম (দ্বিতীয়)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পশ্চিম বার্বারীর সমগ্র অঞ্চলে আন্‌দালুসীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আল-মান্‌সূর-এর কর্মকৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি আজীবন খিলাফাতের বাহ্যিক অবয়ব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন এবং নামমাত্র মনিব হিশাম (দ্বিতীয়)-এর বিশেষ অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিশাম (দ্বিতীয়) আল-মান্‌সূর-এর প্রিয় পুত্র আবদুল মালিককে প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক (major-domo)-এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবদুল মালিক (আল-মুজাফফার উপাধি গ্রহণ করত) পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ৩৯৯/১০০৮-এ তাহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সপ্ত বর্ষব্যাপী (Septennate) শাসনের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য আবদুল মালিক ইব্‌ন আবী আমের নিবন্ধ। আবদুল মালিকের ইন্তিকালের পর তাঁহার ভ্রাতা আবদুর রাহমান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তখন হইতেই স্পেনের খিলাফাতে বিশৃংখলা ও অরাজকতার সূচনা হয়, যাহার ফলে অবশেষে উহার পতন ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Hist, Esp. mus., ii, ১-২৯০।

৫। মারওয়ানী খিলাফাতের পতন ও আল-আন্দালুস রাজ্যের বিভক্তিঃ আল-মানসূরের সামরিক নীতির ফলে উত্তর আফ্রিকার বার্বারী বংশোদ্ভূত বেতনভোগী সৈন্যদের একটি বৃহদাংশ মুসলিম স্পেনে সমবেত হয় এবং তাহারা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফার ইন্তিকালের পর কেবল আন্দালূসীয়দের বিরুদ্ধেই নহে, বরং শক্তিশালী সিসিলীবাসীদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের কেন্দ্র গড়িয়া তোলে। আবদুর রাহমান সানখূল (Sanchuelo) খলীফা হিশাম (দ্বিতীয়)-কে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার নিজের নাম ঘোষণা করিতে বাধ্য করিলেন (রাবী'উল-আওওয়াল ৩৯৯/ নভেম্বর ১০০৮)। আবদুর রাহমানের এই উন্মত্ত বাসনা কর্ডোভায় বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয় এবং তাহার বিরুদ্ধে জনতা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। মারওয়ানী খিলাফাতের দাবিদার মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদিল জাব্বার-এর সমর্থকগণ কর্ডোভার উপকণ্ঠে ৩ রাজাব, ৩৯৯/ মার্চ ১০০৯-এ 'আমেরী হাজিবকে হত্যা করে (দ্র. আবদুর রাহমান ইব্ন আবী আমের)। তখন হইতেই কর্ডোভা রাজ্যের পতন যুগের সূচনা হয়। খিলাফাতের দাবিদার ও প্রতিদাবীদার কেহ বা বার্বারদের মদদপুষ্ট হইয়া, আবার কেহ বা বার্বার বিরোধীদের মদদপুষ্ট হইয়া আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত হইয়া পড়ে যাহা অচিরেই খিলাফাতের পতন ডাকিয়া আনে।

কর্ডোভার শেষ খলীফাগণের তালিকা

১। হিশাম (দ্বিতীয়) ইব্ন হাকাম (দ্বিতীয়) আল-মুআয়্যাদ বিল্লাহ (৩৬৬-৩৯৯/৯৭৬-১০০৯); দ্বিতীয়বার (৪০০-৪০৩/ ১০১০-১০১৩); ২। মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়) ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদিল জাব্বার আল-মাহ্দী (৩৯৯/১০০৯); ৩। সুলায়মান ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবদির রহমান (তৃতীয়) আল্-মুস্তা'ঈন বিল্লাহ্ (৩৯৯/১০০৯) দ্বিতীয়বার ৪০৩/১০১৩-৪০৭/১০১৬ পর্যন্ত ৪। আবদুর রাহমান (চতুর্থ) ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল মালিক ইব্ন আবদির রাহমান (তৃতীয়) আল-মুরতাদা বিল্লাহ (৪০৮/১০১৮); ৫। আবদুর রাহমান (পঞ্চম) ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদিল জাব্বার আল-মুসতাজহির বিল্লাহ (৪১৪/১০২৩-২৪); ৬। মুহাম্মাদ (তৃতীয়) ইব্ন আবদির রাহমান ইব্ন উবায়দিল্লাহ ইব্ন আবদির রাহমান (তৃতীয়) আল-মুসতাকফী বিল্লাহ (৪১৪-৪১৬/১০২৪-১০২৫); ৭। হিশাম (তৃতীয়) ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল মালিক ইব্ন আবদির রাহমান (তৃতীয়) আল-মু'তায্ বিল্লাহ্ (৪২০-৪২২/১০২৯-১০৩১)।

হামমূদী খলীফাগণ

১। আলী ইব্ন হামমূদ (আন-নাসির ইদ্রীসী) ৪০৭-৪০৮/ ১০১৬-১০১৮; ২। আল-কাসিম ইব্ন হাম্মূদ (আল-মা'মূন) ৪০৮-৪১৩/ ১০১৮-১০২৩।

আল-আন্দালুসবাসী স্লাভ ও বার্বার উপদলগুলি (তাওয়াইফ) কর্ডোভার খিলাফাতের ধ্বংস পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই সমগ্র অঞ্চলটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া লয়। ইহাদের কতিপয় খণ্ডের অস্তিত্ব ছিল মাত্র কয়েক দিনের। অবশ্য কতিপয় বৃহৎ দল রাজনৈতিকভাবে তাহাদের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করিতে পারিয়াছিল, যেমন ইশবীলিয়া-এর বানূ আব্বাদ, বাতালয়ূস (Badajoz)-এর বানূ আফতাস, গ্রানাডার বানূ যীরী, টলেডোর যুন্নূনিয়া ও সারাগোসার হূদিয়া।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ii, ২৯১-৩৪২ (আরও দ্র. ২৯১ পৃষ্ঠার টীকায় বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জী) ও হাম্মূদী। ৩-৫ শাখার জন্য দ্র. উমায়্যা।

৬। আল-যাল্লাকা যুদ্ধ পর্যন্ত তাইফা রাজ্যসমূহ ঃ একাদশ শতাব্দীতে স্পেনের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খৃষ্টান শক্তিসমূহের স্পেন পুনর্দখলের আপ্রাণ চেষ্টা। উদ্যমশীল ও উচ্চাভিলাষী খৃষ্টান নৃপতিগণের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় ঐক্য পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাহাদের বিরোধিতা আরও উজ্জীবিত হইয়া উঠে। আল-আন্দালুস খিলাফাত-এর বিভক্তির মধ্য দিয়া সৃষ্ট রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ইতিহাস অত্যন্ত করুণ ও আকর্ষণহীন। ঐতিহাসিগণ ইহাকে যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা উত্তরাধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র। স্বার্থের দ্বন্দ্ব, পরস্পর কলহ ও অবিশ্রান্ত সংঘর্ষের মধ্যে এমন কোন যোগসূত্র নির্ণয় সম্ভব নহে, যাহা সর্বদা আমাদের পথ প্রদর্শন করিতে পারে। আন্দালুসীয়গণ বার্বারদের বিরুদ্ধে ও স্লাভগণ উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়, খিলাফাত পুনরুজ্জীবিত করার আর কোন আশা নাই। ছোট ছোট রাজ্য ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ায় খৃষ্টান নৃপতিদের লোভ-লালসা প্রবলতর হইয়া উঠে। তাহারা ঐ সমস্ত রাজ্যের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণে কর আদায় করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া এই নীতি রাজা ৬ষ্ঠ আল্ফনসো (Alfonso VI) অবলম্বন করেন। তিনি বিচক্ষণতার সহিত কৌশলে রক্তপাতহীন ও শান্তিপূর্ণভাবে ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে টলেডো দখল করেন এবং মুলূকুত-তাওয়াইফ-এর কলহ-বিবাদ মীমাংসাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

তখন স্পেনের সংকটময় অবস্থা এমন চরমে উঠে যে, মুলূকুত-তাওয়াইফ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল-মুরাবিতগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। উত্তর আফ্রিকী সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী লইয়া আমীর ইয়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন মুলূকুত-তাওয়াইফকে সাহায্য করিতে স্পেনে উপনীত হইলে ঘটনা প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়। আমীর ইয়ূসুফ ২২ রাজাব, ৪৭৯/২ নভেম্বর, সালে যাল্লাকা (দ্র.) [Sagrajas] নামক স্থানে ৬ষ্ঠ আলফন্সোর সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করেন। বিজয়-উত্তর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অচিরেই ইয়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন আন্দালুসের নৃপতিগণের পারস্পরিক অনৈক্য এবং খৃষ্টান নরপতিদের সহিত তাঁহাদের সমঝোতা অবলোকন করিয়া বিরক্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি উহাদের একটির পর একটিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দেন এবং আন্দালুসের বৃহৎ অংশকে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই সময় হইতেই মুসলিম স্পেন মাগরিব-এর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. A. Prieto y Vives কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণত সঠিক তালিকা ঃ (১) Loss Reyes de Taifas : estudio historico-numismatico de Los Musulmanes espanoles en siglo V de la hegira (XI de J. C.)., মাদ্রিদ ১৯২৬ ; (২) Dozy, Hist. Mus. Esp., ২য় মুদ্রণ, vol.

iii; (৩) A. Gonzales Palencia, Hist. de la Esp. Mus. পৃ. ৫৪-৬৯ ; (৪) আরও দ্র. আব্বাদী, আফতাসী, যুন-নূনী, হুদী, যীরি প্রভৃতি ; (৫) তাওয়াইফ রাজ্যগুলির তালিকার জন্য দ্র. মুলূকুত তাওয়াইফ।

(৭) আল-মুরাবিতগণের অধীনে আল-আন্দালুস ঃ আল-মুরাবিতগণ কর্তৃক মুসলিম স্পেন দখল সম্পন্ন হয় দুইটি ঘটনার মাধ্যমে ঃ (১) ভ্যালেনসিয়ার পুনর্দখল (৪৯৫/১১০২), ভ্যালেনসিয়া ৪৭৮/১০৮৫ সালে সিদ ক্যামপিয়াদোর (Cid Campeador Rodrigo Diaz) কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং (২) ৫০৩/১১১০ সালে আল-মুসতাঈন বিল্লাহ্‌র ইন্তিকালের ফলে হুদী রাজধানী সারাগোসার আত্মসমর্পণ। আন্‌দালুসী সমাজে এই সময় ফকীহ্‌গণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশটিতে কয়েক বৎসর পর্যন্ত উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শান্তিপর্ণ শাসন বিরাজমান থাকে। শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ফলে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং জনগণের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। একমাত্র টলেডো পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা ব্যতীত আল-মুরাবিত সেনাবাহিনী কতিপয় নিরংকুশ বিজয়ের নজীর স্থাপন করে (৫০২/১১০৮ সালে আকলীশ = Ucles)। ৫১২/১১১৮ সালে সারাগোসা আলফনসোর দখলে চলিয়া যায়। আন্‌দালুসের খৃষ্টানদের চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইয়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলী মরক্কোতে স্বয়ং আল-মুওয়াহ্‌হিদূন কর্তৃক হুমকির সম্মুখীন হন। ইহা ছাড়া চতুর্দিক হইতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে যাহা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে ইহা খৃষ্টান শক্তির সফলতাকে ত্বরান্বিত করিয়া দেয়, এমনকি আন্‌দালুসে নূতন কোন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় আসন্ন হইয়া পড়ে (দ্র. আল-মুরাবিতূন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Menendez Pidal, La Espana del Cid, definitive edition, মাদ্রিদ ১৯৪৭; (২) F. Codera, Decadencia y desparicion de los Almoravides en Espana, সারাগোসা ১৮৯৯ খৃ.।

(৮) আল্‌-মুওয়াহ্‌হিদূন-এর শাসনধীনে আল-আন্‌দালুস ও খৃষ্টানদের পুনর্দখল (Reconquista)-এর অগ্রযাত্রা ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর মুলূকুত-তাওয়াইফ (Kingdoms of Taifa)-কে এক নূতন আংগিকে বিন্যাসের জন্য কতিপয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। অবশেষে আল্‌-আন্‌দালুস মরক্কো-এর বানূ মুমিন সরকারের অধীন হইয়া যায়। স্পেন উপদ্বীপের যে অংশ তখনও মুসলিম শাসনাধীন ছিল আল-মুওয়াহ্‌হিদগণ তাহা নানা বিপদ-আপদ সত্ত্বেও প্রায় এক শত বৎসর অধিকারে রাখে। খৃষ্টানগণের পুনর্দখল অভিযানের ফলে প্রতি বৎসর নূতন নূতন অঞ্চল তাহাদের হস্তচ্যুত হইতে থাকে, যেমন কীতলুনিয়া (Catalonia)-তে Ramon Berenguer IV যথাক্রমে তরতুশা (Tortosa) ও লারিদা (Lerida) দখল করেন, কিন্তু পুনর্দখল অভিযানের প্রধান স্থপিত ছিলেন কাশ্‌তালিয়া-এর রাজা ৮ম আলফনসো ১১৫৮-১২১৪ খৃ. যিনি সিলভেস (Silves), ইবোরা (Fvora) ও কুনকা (Cuenca) দখল করিতে সমর্থ হন। আল্‌-মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা আবূ য়ূসুফ ইয়াক্‌ব ৮ শাবান, ৫৯১/১৮ জুলাই, ১১৯৫-এ আল-আরাক (Alarces) যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহা স্থায়ী হয় নাই। পনর বৎসর যাইতে না যাইতেই কাশতালিয়া লীওন (Leon), নাব্‌রা (Navarre), আরাগুন (Aragon) প্রভৃতি অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী সমন্বয়ে গঠিত খৃষ্টান সম্মিলিত শক্তি ১৫ সাফার, ৬০৯/১৭ জুলাই, ১২১২-এ আল-ইকাব (Las Navas de Tolosa) নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীকে পরাভূত করে। ফলে উবেদা (Ubeda) ও বিয়াসা (Baeza) মুসলমানগণের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। সিকি শতাব্দী যাইতে না যাইতেই মুসলমানগণ কর্ডোভাও হারায়। ইহার পরপরই আরাগুন-এর জেকস ১ম (Jacques I) কর্তৃক ভ্যালেনসিয়া (৬৩৬/১২৩৮) এবং ফার্ডিনান্দ তৃতীয় কর্তৃক ইশবীলীয়া অধিকৃত হয় (৬৪৬/১২৪৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. আল-আরাক, আল-ইকাব, ইশ্‌বীলীয়া, বালানসিয়া কুর্‌তুবা, বানূ মুমিন।

(৯) গ্রানাডায় নাস্‌রিয়া রাজ্য ও খৃষ্টানদের পুনর্দখল সমাপন ঃ একটির পর একটি এলাকা হস্তচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও গ্রানাডার সালতানাত আইবেরীয় উপদ্বীপে একমাত্র মুসলিম রাজ্য হিসাবে আরও আড়াই শতাব্দী কাল টিকিয়া থাকে। জাবালুত-তারিক (জিব্রালটার) হইতে আলমেরিয়া পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই রাজ্য অভ্যন্তরে রান্দা (Serrania de Rondo) ও এলবীরা (Sierra d Elvira) পর্বতমালা অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাস্‌রী রাজবংশ (অথবা বানুল-আহ্‌মার)-এর পূর্বপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মুহাম্মাদ আল্‌-গালিব বিল্লাহ ৬৩৫/১২৩৭-৩৮ সালে গ্রানাডা অধিকার করেন এবং আল্‌-হামরা দুর্গকে শাহী মহলে রূপান্তরিত করেন। তিনি কাশ্‌তালিয়ার রাজা ১ম ফারডিনাণ্ড (Ferdinand I) ও পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী দশম আলফনসো (Alfonso X)-কে নিয়মিত কর প্রদানেও সম্মত হন। ইহার পর হইতেই কর্ডোভার বাদশাগণ খৃষ্টানদের সহিত অথবা মরক্কোর মারিনী (marinids)-দের সহিত সম্পন্ন চুক্তিসমূহে একটি বিপজ্জনক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাইতে থাকেন। মারিনীগণ ইতোমধ্যে আন্‌দালুসিয়া ভূখণ্ডে সামরিক অভিযান চালায় এবং উহারা তারীফাসহ কতকগুলি অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। মরক্কোর সহযোগিতার প্রত্যাশা ক্রমশ মিথ্যা প্রমাণিত হইতে থাকে এবং বিক্কা নদী (Rio Salado)-র তীরে ৭৪১/১৩৪০ সালে সুলতান আবুল-হাসান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও সুরম্য অট্টালিকারাজি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমারোহ ও লিসানুদ্‌-দীন ইব্‌ন খাতীব-এর মত বিখ্যাত পণ্ডিতসহ অনেক গুণীজনের সমাবেশের কারণে রাজধানীরূপে গ্রানাডার মর্যাদা অক্ষণ্ণ থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান জগতে ক্যাথলিক (Catholic) নৃপতিদের উদ্ভব ঘটে। আরাগুন-এর ফারডিনাণ্ড (Ferdinand) ও কাশ্‌তালিয়া-এর ইসাবেলা (Isbella)-এই দুইজন চরম মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান নেতা পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে (এমনকি বিবাহসূত্রে) আবদ্ধ হন। তাহারা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে মুসলমানদের উপর আঘাত হানিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে লোজা (Loja) খৃষ্টানদের দখলে চলিয়া যায়। পরবর্তী বৎসরে তাহারা বিলিশ মালাগা (Velez-Malaga), মালাগা ও আলমেরিয়াও দখল করে। ১৪৮৯

খৃষ্টাব্দে বাসতা (Baza) তাহাদের হস্তগত হয়। অবশেষে ২ রাবী'উল-আওয়াল, ৮৯৭/৩ জানুয়ারী, ১৪৯২ সালে ক্যাথলিক নৃপতিদের নিকট গ্রানাডা আত্মসমর্পণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. বানূ নাস্র পুনর্দখল (Reconquista) শেষে মুসলমানদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, তাহারা কি খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল না অন্য পথ ধরিয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য দ্র. Moriscos (E. Levi-provencal)।

পরিশিষ্ট

উত্তর আফ্রিকায় আন্দালুস জাতি ঃ উত্তর আফ্রিকায় আল-আন্দালুস বলিতে বিশেষভাবে একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাহাদের বংশগত উৎস ছিল স্পেনে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে উত্তর আফ্রিকায় আন্দালুসী জনগোষ্ঠী কেবল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই বিশেষভাবে নজরে পড়িত। কিন্তু এইখানে আমাদের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার চরম পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণমাত্র।

হিস্পানী (Hispani) ইসলামের ইতিহাসে মাগরিব অঞ্চলে আল-আন্দালুসীদের হিজরত অনেক সময় অভ্যন্তরীণ সংকটের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্যই ঘটিত। আন্দালুসী বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক স্বার্থও পশ্চিম ও মধ্যমাগ্রিবের উপকূলবর্তী অঞ্চলে হিস্পানী মুসলিমদের আগমনকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিল। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম আন্দালুসীয় মুসলমানদের দুর্ভোগ তাহাদের এক বৃহৎ অংশকে কাস্রুল-কুতামা (আল্-কাস্রুল-কাবীর)-এর দিকে গমন করিতে বাধ্য করে। খৃষ্টানদের স্পেন পুনর্দখল অভিযান মুসলমানদের উত্তর আফ্রিকায় হিজরত করার গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যদিও একমাত্র কারণ নহে। মুসলিম স্পেনের সুদীর্ঘ ভাঙ্গনের যুগে অনিয়মিত হিজরত চলিতে থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কতিপয় সংকটপূর্ণ ঘটনা গ্রানাডার পতন অতি আসন্ন করে। এই সময় হইতে দেশত্যাগের প্রবণতা দেখা দেয়। অবশেষে উহা সাধারণ নির্বাসনের রূপ পরিগ্রহ করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মাগ্রিবী ভূখণ্ডে আন্দালুসী বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা এখানকার এক প্রভাবশালী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ঘটনা প্রবাহ নূতন মোড় নেয় এবং ইহার সূচনার কিছুদিন পর মুরুন (Moriscoes, উত্তর আফ্রিকার আরবগণ)-এর ব্যাপক...... বহিষ্কারের পরিণতি দেখিতে পাই। বহিষ্কৃত হইয়া উহারা যে সব বন্দরে অবতরণ করে সেইখান হইতে উহাদের একটি বিরাট অংশ ফেয (Fes), তিলিমসান (Tilemsen) অভিমুখে চলিয়া যায় ; কিন্তু উহাদের অনেকেই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করে অথবা দুষ্কৃতিকারীদের কবলে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। আবার অনেকেই আলজেরিয়া (Algeria) ও তিউনিসে অবস্থানরত স্বদেশবাসীদের সহিত যাইয়া মিলিত হয়। উছ্মান দাই কর্তৃক প্রদত্ত অনুকূল নীতির ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুহাজির আসিয়া ভীড় জমায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, উপরিউক্ত লোকজন কখন হইতে আন্দালুস ত্যাগ করিয়া আসিতে থাকে এবং মরক্কো, আলজিরিয়া অথবা তিউনিসে আসার পর তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা যদিও এখানে আলোচ্য বিষয় নহে, তবুও প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়, যাহারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু স্পেনেই নহে, বরং তদানীন্তন বিশ্বে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদেরকে কিভাবে আন্দালুসী খৃষ্টানগণ অত্যাচার-অনাচার আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহারা মুসলিমদেরকে খৃষ্টান বানাইবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে অথবা তাহাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। তাহারা তথাকার পাঠাগারগুলি পোড়াইয়া দেয়। তদুপরি দেশত্যাগী উত্তর আফ্রিকাগামীদের জাহাজগুলি পথিমধ্যে আক্রমণ করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বারংবার উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত আনদালুসী তিউনিসে যাইয়া বসবাস শুরু করে তাহাদের অবস্থা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আগত মুহাজিরদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাহারা হাফ্সীদের সাম্রাজ্যে বিশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। একজন সর্বময় প্রধান (শায়খুল আনদালুস)-এর নেতৃত্বে তাহারা একটি সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজরূপে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। বাহ্যত তাহাদের গ্রামীণ সমাজ কতিপয় আইনসংগত অধিকার ভোগ করিতে থাকে এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় তাহারা ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে। অত্যন্ত সফল ও সুসংগঠিত শাশিয়া (মখমল, মিহ্সুতী কাপড় বিশেষ) শিল্পের একচেটিয়া অধিকার তাহাদের হস্তগত হইবার ফলে তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভাব এতই বৃদ্ধি পায় যে, আমীনুশ্-শাওওয়াশ বাণিজ্যের (de jure) সংগত আমীন-এ পরিণত হন। তিনি বাণিজ্যিক আদালতের সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন, সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থা যাহার অধীন ছিল। দুইজন ব্যতীত আন্দালুস শাওওয়াশা হইতেই ইহার সদস্য সংগৃহীত হইত। কৃষিক্ষেত্রে দূরদর্শী উছ্মান দায়-এর প্রেরণায় তাহারা উর্বর উত্তর অঞ্চলকে ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত করে এবং উন্নত ধরনের চাষ ও সেচ পদ্ধতি প্রয়োগ ও বৃক্ষ রোপণ করিয়া উদ্যানজাত ফসল বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কাঁচা রেশম, রেশমী ও জরিদার বস্ত্র উৎপাদন ও ইহাদের ব্যবসা এই নির্বাসিত আন্দালুসীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে আলজিরিয়ার রেশম শিল্প প্রধানত উহাদের করায়ত্ত ছিল। এই শিল্প নগরকে সমৃদ্ধ করিতে তাহারা যথেষ্ট অবদান রাখে। অন্যপক্ষে আল-মাগ্রিব ইহাদের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছিল, সম্ভবত তাহা বহুলাংশে অবলুপ্ত। উদাহরণস্বরূপ মরক্কোতে (বানূ সা'দ সাদীগণ দ্র.) সা'দী বংশ ইহাদের সামরিক দক্ষতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহাদের স্মৃতিচিহ্ন আজও বিদ্যমান। অনেক উত্তর আফ্রিকী আবার নিজদেরকে আন্দালুসী বংশোদ্ভূত হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। তাহাদের বংশগত নাম এই পরিচয়ের বাহক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই বিষয়ে কোন বিস্তারিত গ্রন্থাদি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। নিম্নে বর্ণিত তালিকা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংকলিত। প্রাথমিক যুগের জন্য দ্র. ঃ (১) বাক্রী, Descr. de L' Afrique sept. (de Slane), ৫৫, ৬১-২, ৬৫, ৭০-৭১, ১০৪, ১১২, ইত্যাদি; (২) E. Levi-Provencal, Fondation de Fes, প্যারিস ১১৩৯ খৃ. ; (৩) ঐ লেখক, Hist. Esp. mus., ১খ., ১৬৯-৭০ ইত্যাদি; (৪) R. Le Tourneau, Fes, কাসাব্লান্কা ১৯৪৯, পৃ. ৩৫, ৪৭, ১৩৬, প.।

মরক্কোর জন্য দ্র. (৫) আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল্-আরাবী, মির্আতুল-মাহ'াসিন, lith. ফেয, ১৩৫-৩৬, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬ ইত্যাদি ; (৬) Chronique anonyme sa`dienna (Colin) ৩৮-৩৯, ৪৮, ৫৩ ইত্যাদি ; (৭) ইফরানী, নুযহাতুল-হাদী (Houdas), ৬২, ১১৬, ২৩৭, ২৬৪-৬৫, ২৬৭, ৩০৩ ; (৮) ক'াদিরী, নাশ্রুল -মাছ'ানী, অনু. Graulle ও অন্যান্য, ১খ., ২১৯, ৩২২-২৪, ৩২৮-২৯, ২খ., ৩৯, ইত্যাদি ; (৯) নুব্যাতু'ল-'আস্'র (Bustani and Quiros), Larache ১৯৪০, ৪৭-৪৮/৫৬-৫৭ ইত্যাদি ; (১০) আল্-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ওয়ায্যান আয্-যায়্যাতী, Leo Africanus, Descr. dell Africa, in Ramusio, Navigationi, ভেনিস ১৫৬৩, ৩১, ৩৫, ৪৮ ইত্যাদি ; (১১) মাক্কারী, নাফ্হুত্-ত'ীব, কায়রো ১৯৪৯ ; ৪খ., ১৪৮-৪৯, ৬খ., ২৭৯-৮১ ; (১২) Marmol, Descr. de Africa, গ্রানাডা ১৫৭৩ খৃ., ২খ, ৩৩, ৮৩-৮৫ ইত্যাদি ; (১৩) M. J. Muller, Beitr. z. Gesch. der westl. Araber, ১খ., ৪২-৪৪; (১৪) উমারী, মাসালিকুল-আব্স'ার, অনু. Gaudefroy- Demombynes, ১৪৭, ১৫৪, ২১৪ ; (১৫) আবূ জানদার (Boujendar), তারীখ রিবাতিল-ফাত্হ', রাবাত ১৩৪৫ খৃ., ১৯৪-৯৭, ২০২ প., ইত্যাদি ; (১৬) Sourçes inedites de l'histoire du Maroc, স্থা.; (১৭) Caille, La ville de Rabat, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., ১খ., ২১৩ প. ও স্থা.; (১৮) Michaux-Bellaire, El-Qcar el-Kabir, AM, ১১/২খ., ১৯০৫ খৃ., ২/১১ খ., ১৫৩, ১৭৩-৭৪, ১৭৭-৭৮, ১৮২-৮৩, ১৮৭, ১৯১-৯২ ইত্যাদি ; (১৯) Terrasse Hist du Maroc, নির্ঘণ্ট। আলজিরিয়ার জন্য দ্র. (২০) গুব্রীনী, 'উন্ওয়ানু'দ-দিরায়া, Muhammad ibn Shanb, পৃ. ৭১ ও স্থা. (২১) মারীনী, 'উনওয়ানুল-আখ্বার, অনু. Feraud RAfr., ১৮৬৮ খৃ., ২৫১-৫২, ২৫৪-৫৫, ৩৩৭, ৩৪২-৪৩, ইত্যাদি ; (২২) Leo, পৃ. গ্র. ; (২৩) Marmol, পৃ. গ্র. ; (২৪) Haedo Topograpgia e historia de Argel, স্থা.; (২৫) Salvago, Africa overo Barbaria, (Sacerdoti padova), ১৯৩৭ খৃ., স্থা.; (২৬) Lea, Moriscos of Spain, লণ্ডন ১৯০১ খৃ., ২৭৩-৭৪, ৩২৯-৩১, ৩৫০, ৩৬৪ ও স্থা. ; (২৭) Trumelet, Blida, Algiers ১৮৮৭ খৃ., ১খ., ৫৭২, প., ২খ, ৭৬০, ৭৬৪ ও স্থা.। তিউনিসিয়ার জন্য দ্র. (২৮) ইব্ন খালদূন, Prolegomenes, অনু. de Slane, ২খ., ২৩, ২৯৯, ৩৬২; (২৯) ঐ লেখক, Berberes, ২খ., ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৮২ ও স্থা. ; (৩০) Brunschvig, Berberie orientale sous les Hafsides, নির্ঘণ্ট। সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তী কালের জন্য দ্র. (৩১) G. Marcais, Teatour et sa grande mosquee, Rt, ১৯৪২ খৃ., ১৪৭-৬৯ ও সূত্রাবলী; (৩২) ইব্নুল-খোজা, তারীখু মা'আলিমুত-তাওহীদ, তিউনিস ১৯৩৯, ৮২-৮৩, ১৮৬ ইত্যাদি ; (৩৩) Grandchamp, La France en Tunisie, তিউনিস ১৯২০-৩০ খৃ., ২খ-৪খ., স্থা.; (৩৪) Peiresc, Lettres ineds. communiquees par M. Millin, প্যারিস ১৮১৫ খৃ., স্থা.; (৩৫) ঐ লেখক, Lettres publ. par Th. de Larroque, ৭খ., প্যারিস ১৮৯৮ খৃ., স্থা.; (৩৬) Ximenez Colonia Trinitaria de Tunez (Bauer) Tetuan ১৯৩৪ খৃ., স্থা.; (৩৭) Atger, Corporations Tunisiennes, প্যারিস ১৯০৯ খৃ., স্থা. ; (৩৮) Despois, Tunisie orientale : Sahel et Basse Steppe, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., নির্ঘণ্ট।

(৭) **আল-আন্দালুসে ইসলাম** : খৃ. নবম শতাব্দীর প্রথম হইতেই আল-আন্দালুস মালিকী ও আল্-আওযাঈ মায্হাবের নিষ্ঠাবান অনুসারী ও সনাতনপন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আন্দালুসবাসীদের ফিক্হী ও দীনী কর্মতৎপরতা অমৌলিক বিষয়গুলি সংক্রান্ত পুস্তিকাগুলির পূর্ণত্ব ও বিস্তার সাধন তাকলীদ-এর সহিত সর্বাত্মক সম্পর্কে সীমিত ছিল। ৩য়-৪র্থ/৯ম-১০ম শতাব্দীতে এখানে শাফি'ঈ ও জাহিরী মতের ক্ষণিক বিদ্যুদ্দীপ্তি পরিলক্ষিত হয়। আন্দালুসে জাহিরী মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন কাদী মুনযির ইব্ন সা'ঈদ আল্-বাল্লুতী (মৃ. ৩৫৫/৯৬৬)। তাঁহার পরে প্রখ্যাত 'আলিম স্বয়ং ইব্ন হ'যম (দ্র.) ইহার পতাকা বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একইভাবে এখানে কখনও কখনও মু'তাযিলা মতবাদের অভ্যুদয় ঘটে, যাহা যুহদ বা বৈষয়িক নিস্পৃহার প্রবণতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। যুহদ-এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কর্ডোভার বিখ্যাত দার্শনিক ইব্ন মাসাররা (দ্র. মৃ. ৩১৯/৯৩১)।

আন্দালুসে মালিকী মাযহাবের যে প্রবক্তাগণের নাম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা রচনাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংখ্যাও একেবারে কম নহে। উঁহাদের অধিকাংশের জীবনী Bibliotheca arabico- hispana সিরিজে সংকলিত হইয়াছে। খিলাফাতের পতনের পর ফিক্হশাস্ত্র এখানে পূর্বাপেক্ষাও অধিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং ফাকীহ সম্প্রদায়ের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, বিশেষত আল্-মুরাবিতগণের রাজত্বকালে।

আকীদার দৃষ্টিকোণ হইতে আল্-মুওয়াহ্হিদগণের প্রচার আন্দালুসের উপর অতি স্বল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেষ অবধি এইখানে মালিকী মায্হাবের প্রভাব অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. Levi-Prevencal, Hist. Esp. Mus., ৩খ., ৪৫৩-৮৮ (E. Levi-Provencal)।

(৮) আন্দালুসের সাহিত্য ও সংস্কৃতি : দ্র. 'আরাব প্রবন্ধ।

(৯) আন্দালুসী শিল্পকলা : আইবেরীয় উপদ্বীপ ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রান্ত পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। এই উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই এখানে ভূমধ্যসাগরীয় বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যাহা প্রাচ্য প্রভাব গ্রহণের অনুকূল ও উপযোগী। সারটন (Sarton) বলেন, ধর্ম ও ভাষা একই হওয়ায় জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক মযবুত করিয়াছে। মক্কা শরীফে হজ্জ পালনের মধ্য দিয়া এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

আট শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্য হইতে শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন নিদর্শন আইবেরীয় উপদ্বীপে আসিতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইখানে

শিল্পকলার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়, এমনকি তাহাদের উৎসদেশ হইতেও এখানে উহার উন্নতি হয় ব্যাপকতর। হিস্পানী শিল্পকলায় বায়যান্টীয় আর্টের ইহার সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ, যথা সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মিসর, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সিরিয়ার মত মধ্যযুগের আইবেরীয় শিল্পকলা রোম সাম্রাজ্যের শিল্পকলার ধাঁচে গড়িয়া উঠে। এই দুইটি দেশের শিল্পকর্মে অদ্ভুত মিল দেখিয়া ইহাদের উৎসমূল একই বলিয়া অনুমতি হয়। অবশ্য ইহা দুইটি দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নির্দেশ করে না। কিন্তু যেখানে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাবধি কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্নতি সাধিত হয়, সেখানে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে আইবেরীয় উপদ্বীপ, বিশেষ করিয়া সমগ্র পশ্চিম এলাকা ইহার কৃষ্টি ও সভ্যতার মানের ক্ষেত্রে দারুণ সংকট ও পতনোন্মুখ অবস্থার মুকাবিলা করে। মুসলিম স্পেনে ভিসিগোথিকদের অধীন স্পেনের শিল্পকলার সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। ভিসিগথিকদের একাগ্রতার অভাব ও অবক্ষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় আক্রমণকারীদের দুর্বল প্রতিরোধ হইতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগের বা পরবর্তী কালের মুসলিম যুগের কার্য ও ধ্বংসাবশেষের অভাবে অনেক স্থলে অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়া ফাঁক পূরণ করিতে হয়। আন্দালুসী শিল্পকলা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব লইয়া বিকশিত হয়। ২য়/৮ম ও ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে প্রাচ্যের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া এখানে কতকগুলি অনিন্দ্যসুন্দর প্রাসাদ গড়িয়া উঠে। এই প্রাসাদরাজির তুলনা মুসলিম দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে কর্ডোভার মস্জিদ। সুনিপুণ গাঁথুনি, মূল্যবান অলংকরণ ও মনোমুগ্ধকর বহিরাবরণ—ইহাকে এক অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। মাদীনাতুয্-যাহারা যাহার প্রাসাদরাজির অপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্য ও প্রকৃতি তুলনাহীন। সারাগোসার আল-জা'ফারিয়া প্রাসাদের অনন্য মৌলিকত্ব ও সুশোভন প্রাচুর্য, বর্তমানে যাহার পুনর্নির্মাণকার্য শুধু করা হইয়াছে এবং গিরালদা বা জিরালদা-এর স্মৃতি মিনার মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসৌধ। পরিশেষে গ্রানাডার বিরাট প্রাসাদ আল্-হাম্রা (ক'াস্রু'ল-হ'াম্রা), যাহার সূক্ষ্ম ও অপূর্ব সুষমা বিস্ময়করভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহাতে স্থাপত্য সৌন্দর্য ও পানির বৃক্ষ ও গুল্মলতার শ্যামল সুষমা সংমিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

স্থাপত্য শিল্প—উমায়্যা যুগ ঃ প্রাচীন অট্টালিকা ও ইমারত বিদ্যমান না থাকায় আল্-আন্দালুসে ইসলামী স্থাপত্য রীতি সম্পর্কে অনুশীলন করিতে গেলে বাধ্য হইয়া কর্ডোভা মসজিদের প্রাচীনতম অংশ হইতে শুরু করিতে হয়। প্রথম আবদুর-রাহ্মান কর্তৃক ১৬৮/৭৮৪ হইতে ১৭০/৭৮৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ স্পেন উপদ্বীপে মুসলমানদের অভিযান ও আধিপত্যের ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর পরে এই মসজিদ ভবনটি নির্মিত হয়। এই আমীরের মৃত্যুর সময় মসজিদটির শুধু চূড়ান্ত অলংকরণ বাকী ছিল। তাঁহার পুত্র হিশাম (১৭২-১৮০/৭৮৮-৭৯৬) উহা সম্পূর্ণ করেন।

এই মসজিদের প্রাচীন অংশ ইহার উত্তরপশ্চিম দিক দিয়া অবস্থিত, যাহা অদ্যাবধি সুরক্ষিত রহিয়াছে। মসজিদ ভবনটি আয়তাকার এবং দেয়ালগুলি প্রস্তর নির্মিত। কিব্লামুখী করিয়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বমান ১১টি দালান রহিয়াছে। মধ্যস্থলের দালানটি অন্যগুলির তুলনায় বৃহৎ। দালানগুলি মার্বেল প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ (Column) দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। স্তম্ভের শিরোভাগে চতুর্ভুজ প্রস্তর খণ্ড সংস্থাপিত এবং উহার উপর ভর করিয়া রহিয়াছে আয়তাকার প্রান্তরের পিল্পা (Pier) যাহার বহিরাংশ Corbel ভর করিয়া রহিয়াছে, যাহা এপার ওপার ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং ঊর্ধ্বদেশে যাইয়া পুনরায় একটি থামের সহিত মিশিয়াছে। পিল্পাগুলি লম্বালম্বিভাবে দুই সারি খিলান দ্বারা সংযুক্ত। নিম্নাংশের অশ্বখুর আকৃতির খিলাগুলি ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহার উপর কোন কিছু ভর করিয়া নাই। দ্বিতীয় সারির অর্ধ বৃত্তাকার খিলানগুলি উদ্গত হইয়াছে থামসমূহ হইতে এবং দেয়ালকে ঠেস্ দিয়া রাখিয়াছে।

এই নির্মাণ কৌশলের কারণেই সরু সরু স্তম্ভের উপর এমন একটি বিরাট প্রাসাদ সংস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল—যাহাতে উহার অভ্যন্তরের অধিকাংশ জায়গা কাজে লাগান সম্ভব হয়। এই মসজিদের অভ্যন্তরের যে কোন স্থানে বসিয়াই মুসল্লিগণ ইমাম সাহেবকে অনায়াসেই দর্শন করিতে পারেন। এই স্তম্ভগুলির বিস্তার (প্রস্থ) উহাদের উচ্চতার তুলনায় অধিকতর হওয়ায় উহারা ছাদের ভার বহনে সহায়ক হইয়াছিল এবং বর্ষার পানি নির্গমনের মুহুরীগুলিকে (gutters) স্থূল দেয়ালের অভ্যন্তরে স্থান দেওয়া সম্বব হইয়াছিল।

মধ্যযুগীয় স্থাপত্যশিল্পে কর্ডোভার মসজিদ এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহার নির্মাণে একটির উপর একটি জোড়া খিলান সংস্থাপনে যে কৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা অনিন্দ্যসৌন্দর্য ও অপূর্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন মসজিদে দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য মসজিদে খিলানগুলি সাধারণত খিলান পথকে আলাদা করিয়া কাষ্ঠনির্মিত কড়ি কাঠের উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে যাহা দেখিলে প্রতীয়মান হয়, ঐগুলি অস্থায়ীভাবে নির্মিত হইয়াছিল।

৮ম শতাব্দীর শেষার্ধে কর্ডোভায় এমন একটি নিখুঁত প্রাসাদের নির্মাণ কৌশল দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। কারণ এত উন্নত ধরনের স্থাপত্য প্রকৌশল তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। এই নির্মাণ কৌশলের উৎস সন্ধানের জন্য বহু প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে। চতুষ্কোণ প্রস্তর খণ্ড (ashlar) প্রাচীরে লম্বালম্বিভাবে সংস্থাপন করা কিম্বা তদ্দারা এক প্রাচীরকে অন্য প্রাচীরের সহিত সংযুক্ত করার এই নির্মাণ রীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রোমান স্থাপত্য নিদর্শনে পরিদৃষ্ট হয়। রোমানগণ এই নির্মাণ কৌশল গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। পশ্চিমা গথিক (Visigothic) স্থাপত্যে অশ্বখুরাকৃতি খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। রোমান ও প্রাচ্যের ইসলামী স্থাপত্যশিল্পে যদিও ইহার অনুরূপ নমুনা পরিদৃষ্ট হয়, তবুও স্পেন উপদ্বীপে ইহার ব্যবহার যত বেশী পরিদৃষ্ট হয় তত আর কোথাও হয় না। ধনুক আকৃতি খিলানসমূহে (Voussoirs) পাথর ও ইটের একান্তর ব্যবহার রোমান স্থাপত্য শিল্পেও সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহার প্রভাব বায়যানটাইন স্থাপত্য শিল্পে পড়িয়াছে। প্রথম আবদুর রাহ্মান-এর মসজিদের মৌলিকত্ব, ইমারতের নকশা ও ইহার অসংখ্য সমান্তরাল খিলানসহ সাধারণ বিন্যাসে বিদ্যমান। প্রাচ্যের মসজিদগুলির ন্যায় ইহার কেন্দ্রীয় খিলান পথটি বেশ বড় এবং হয়ত দেয়ালের ঢালু পোস্তাগুলিতেও (buttresses) এবং সম্ভবত

ছাদনালীর পার্শ্বস্থ ও উর্ধ্বে স্থাপিত সারি সারি প্রাচীরের ফোকরগুলিতেও, যাহা উহাদেরকে সুশোভিত করিয়াছে, এই অভিনবত্ব দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় আবদুর-রহমানের শাসন আমলে (২০৬-৩৮/৮২২-৫২) কর্ডোভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মিহরাব ভাঙিয়া ও কিবলার প্রাচীর ভেদ করিয়া খিলান পথগুলি দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করা হয়। এই বর্ধিত অংশ সাবেক অংশের নির্মাণ পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত হইলেও প্রাচীন প্রাসাদ হইতে সংগৃহীত স্তম্ভ শীর্ষ (capitals)-এর অনেকগুলির মধ্যে ১১টিকে এই উদ্দেশে সুনিপুণভাবে কাটিয়া প্রাচীন ধাঁচে গড়া হয়। এইগুলির মধ্যে ৪টি লওয়া হয় মূল মিহরাব হইতে এবং পরবর্তী কালে ঐগুলিকে দ্বিতীয় আল-হাকামের মিহরাবে স্থানান্তরিত করা হয়। দ্বিতীয় আল-হাকামের স্তম্ভশীর্ষগুলি রোমীয় জাঁকালো স্তম্ভ শীর্ষগুলি অপেক্ষা নিম্নমানের ছিল না এবং তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, এই যুগেও সুদক্ষ কারিগর বিদ্যমান ছিল।

মসজিদটির বর্ধিত অংশের কাজ ২১৮/৮৩৩ সালে শুরু করা হয় এবং নব নির্মিত মিহরাবের সামনে প্রথম সালাত আদায় করা হয় ২৩৪/৮৪৮ সালে। কিন্তু ২য় আবদুর-রহমানের মৃত্যুর সময়েও এই সম্প্রসারণের কাজ অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মুহাম্মাদ ইহার নির্মাণ কাজ ২৪১/৮৫৫ সালে সমাপ্ত করেন। এই তারিখ সেন্ট স্টিফেন (St. Stephen)-এর গির্জার দ্বারে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ঢালুকৃত (bevelled) কারুকার্য ও অলংকরণ নিঃসন্দেহে বায়যানটাইন পদ্ধতির।

তৃতীয় আবদুর-রহমান (৩০০-৫০/৯১২-৬১) তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী শাসনকাল স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশে এই মহান মসজিদটিতে ৩৪০/৯৫০ সালে সিরীয় মীনার-এর ধাঁচে একটি বর্গাকৃতি বিশাল মিনার নির্মাণ করেন।

৩২৬/৯৩৬ সালে তৃতীয় আবদুর-রহমান খলীফা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিয়া কর্ডোভার অনধিক পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত সিয়েরা (জাবালুছ-ছালজ=Sierra Nevada)-এর পাদদেশে মাদীনাতুয যাহ্‌রা-এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। এই নির্মাণকার্য ৩৬৫/৯৭৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চলে। এই সময় আন্দালুসীয় খিলাফাতের ঐশ্বর্য ও শক্তি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। রাজকার্য নির্বাহের কেন্দ্রস্থল মাদীনাতুয-যাহ্‌রার দরবারগৃহের ভগ্নাবশেষ হইতে এবং দ্বিতীয় আল-হাকাম-এর নির্দেশে সম্পাদিত কর্ডোভা মসজিদের সম্প্রসারণ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়।

মাদীনাতুয যাহ্‌রার যে সমস্ত অংশ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে প্রস্তর-নির্মিত দালান-কোঠা, বসতবাটি, কার্যালয়, অভ্যর্থনা কক্ষ ইত্যাদি। অভ্যর্থনা কক্ষগুলি প্রাসাদ চত্বরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল, স্তম্ভের উপরে স্থাপিত অশ্ব-খুরাকৃতির খিলান দ্বারা পৃথকীকৃত; ইহাতে কতকগুলি সমান্তরাল খিলান পথও ছিল। প্রাচ্যে সচরাচর ব্যবহৃত বাসিলিকা রীতির (basilica type) অনুকরণে উহা নির্মিত হয়। এই নগরীকে সুসজ্জিত করার জন্য খলীফাদ্বয় নগরীতে কতকগুলি অসাধারণ জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য প্রাসাদ তৈরি করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ভূমধ্যসাগরের অপর উপকূল হইতে ইহার নির্মাণ সামগ্রী ও দক্ষ কারিগর আমদানী করেন। প্রাসাদের বাহিরের ছাদ ও ভিতরের ছাদ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বেশ কয়েকবার মাদীনাতুয-যাহ্‌রা অগ্নিদগ্ধ ও লুটপাটের শিকার হয় এবং তাহার পরে ইহাকে একটি প্রস্তরের খাদ (quarry)-রূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা সত্ত্বেও অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে ইহার অনেক কক্ষের প্রাচীরের মার্বেল প্রস্তরনির্মিত পার্শ্বদেশ, মার্বেল ও অন্যান্য প্রস্তরখণ্ড, উহা হইতে নির্মিত বহু স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ (capitals), পাথর, মার্বেল ও ইটনির্মিত ফুটপাত (pavement)। এই অট্টালিকাসমূহের বাহ্যিক বর্ণাঢ্য অলংকরণের কাজে যেসব দক্ষ কারিগর নিয়োজিত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আগত। তাহারা প্রস্তর ও মার্বেলের কাজে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল এবং তাহাদের কর্ম পদ্ধতিও বিভিন্ন ছিল কিন্তু তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্যে ছিল দ্বিমাত্রিক (two- dimensional) লতাগুল্ম দ্বারা অলংকরণে (যাহাতে কতগুলি সাধারণ জ্যামিতিক নকশাও রহিয়াছে)। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে একটি বিশাল হলঘক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই হলঘর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভিতরের প্রাচীরে অনেক অলংকৃত নকশা দেখা যায়, যাহা ৩৪২-৩৪৫/৯৫৩-৫৭-এর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। এইগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য সম্প্রতি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

আয-যাহ্‌রা নির্মাণে যে সমস্ত কারিগর কাজ করিয়াছিল, পরবর্তী কালে কর্ডোভার বৃহৎ মস্‌জিদের সম্প্রসারণেও তাহারাই অংশগ্রহণ করে। এই কার্য দ্বিতীয় আল-হাকামের উদ্যোগে ৩৫০/৯৬১ সালে হাতে লওয়া হয় এবং প্রধান অংশের কাজ ৩৫৫/৯৬৬ সালে সম্পন্ন হয়। কোন কোন প্রাচ্যবিদ দাবি করেন, ইহার অলংকরণে মোজাইক মিস্ত্রীদের হাত ছিল, যাহাদেরকে বায়যানটাইন সম্রাটের মাধ্যমে আনা হইয়াছিল। এই মসজিদের বর্ধিত অংশে পরস্পরছেদী ধনুকাকৃতি খিলানে প্রাচ্য প্রভাবও লক্ষণীয়, যদিও প্রাচ্য প্রাথমিক যুগের অনুরূপ দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ঝাড়বাতির কুলঙ্গির দেওয়াল উঁচু করা হয়। সম্ভবত এই রীতি ৯ম শতাব্দীর ইফরীকিয়ার মসজিদসমূহ হইতে অনুসৃত হইয়াছে, যদিও শেষোক্ত খিলানগুলি বায়যানটাইন রীতিতে নির্মিত। নক্‌শা অনুযায়ী সমব্যবধানে পরস্পরছেদী খিলানগুলি উন্মুক্ত জাফরীর কাজ করে, যাহা সুদক্ষ উদ্ভাবন ও সুনিপুণ নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে উপরের গম্বুজকে (cupolas) ধারণ করিয়াছে। কোন কোন খিলান সূক্ষ্মাগ্র এবং আব্বাসী রীতিতে নির্মিত। আবার বহু খর্বাকৃতি খিলানও রহিয়াছে। পূর্বোক্ত সূক্ষ্মাগ্র খিলান ও পরস্পরছেদী খিলান-এর সমন্বয় হিসপানো-মুসলিম স্থাপত্য রীতির একটি সমাদৃত বৈশিষ্ট্য যাহা ঐ সময়ে প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং কেবল অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা এমন একটি রীতি ছিল যাহা সমগ্র ইসলামী বিশ্বের স্থাপত্য কলায় অনুসৃত হয়, তবে আল-আন্‌দালুসে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় হাকামের আমলে সম্পন্ন এই বর্ধিত অংশ প্রকৃতপক্ষে আসল মসজিদ সংলগ্ন একটি নূতন মসজিদ। অবিশ্বাস্য রকমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত কারুকার্যের সঙ্গে রহিয়াছে জাঁকজমকপূর্ণ রঙের বাহার। আরব রীতির (arabesques, আত-তাওরীক) উজ্জ্বল সুবিন্যস্ত মোজাইক দ্বারা দেওয়াল ও খিলানগুলি রঞ্জিত ও আচ্ছাদিত। ইহাতে

অধিকাংশ স্থলে কাটা পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার পটভূমি লাল রংয়ে রঞ্জিত এবং ভিন্ন ধরনের নীল রং দ্বারা দেওয়াল-লিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। ইহার স্তম্ভসমূহ ও উহার বেদীতে (pedestal-এ) শিরাবিশিষ্ট মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে।

আয-যাহ্রা-তে তৃতীয় আবদুর-রহমান কর্তৃক নির্মিত দরবারকক্ষের ন্যায় দ্বিতীয় হাকামের মসজিদে স্থাপত্য শিল্পের যাবতীয় কলা-কৌশল ও উপকরণ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করত পূর্ণতার উচ্চতম শিখরে উন্নীত করা হইয়াছে যাহা সমসাময়িক পাশ্চাত্যে অতুলনীয়। এই মসজিদ কর্ডোভা খিলাফাতের ঐশ্বর্য ও গৌরবের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

দ্বিতীয় হিশামের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী আল-মানসূ'র-এর উদ্যোগে এই বিশাল মসজিদকে তৃতীয় ও শেষবারের মত বর্ধিত করা হয়। এই বর্ধিতকরণের কাজ ৩৭৭/৯৮৭ হইতে ৩৮০/৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে। স্তম্ভ ও খিলানগুলি হুবহু সাবেক অংশের মত নির্মাণ করিয়া সমগ্র অট্টালিকার স্থাপত্য ঐক্য সংরক্ষিত হইয়াছে। এই বর্ধিত অংশে কোন নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, সাজসজ্জা ও নির্মাণ কৌশলও নিকৃষ্ট। মাদীনাতুয-যাহ্রার দরওয়াজাগুলিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ কৌশল ও রীতির সংমিশ্রণ উহাদের বিকট ও বৈচিত্র্যহীন করিয়া ফেলিয়াছে।

৫ম/১১শ শতাব্দীতে তাইফাদের আমলে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ হইয়াছিল তাহার নিদর্শন অতি সামান্যই টিকিয়া রহিয়াছে। আরবী গ্রন্থসমূহের বিবরণ অনুসারে এবং অবশিষ্ট নিদর্শনসমূহদৃষ্টে বলা যায়, মসজিদগুলিতে প্রাচীন রীতির ন্যায় স্তম্ভের উপর অশ্বখুরাকৃতি খিলান স্থাপনের মাঁধ্যমে খিলান পথগুলি কিবলা দেওয়ালে সমান্তরালভাবে বিভক্ত করা হয়। ধর্মীয় ভবনাদি অপেক্ষা তাইফা রাজন্যবর্গ প্রাসাদ নির্মাণে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ববর্তী ঐক্যবদ্ধ স্পেনের শাসকবর্গের শক্তি ও ধন-সম্পদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারিলেও অন্ততপক্ষে বাহ্যত পূর্ববর্তীদের জমকালো অট্টালিকার অনুকরণ করিতে তাঁহারা প্রয়াস পান। মাদীনাতুয-যাহ্রার নিরেট প্রস্তরনির্মিত দেওয়ালের স্থানে তাঁহারা কাদা ও ইটের দেওয়াল নির্মাণ করেন। পাথর ও মার্বেলের উপর আরব রীতির (arabesques-তাওয়ারীকা) নক্শার স্থানে গ্রহণ করিয়াছে চুন বালির অলংকরণ এবং মার্বেল স্তম্ভের স্থলে কাঠের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়। যথা মালাগার আল-কাসবা (Alcazaba)-তে ক্ষণস্থায়ী বৈভব ও প্রাচুর্য প্রদর্শন করিয়া অন্তর্নিহিত দৈন্য নানা রংয়ের ছাপের আবরণে লুকাইবার চেষ্টা করা হয়। আড়ম্বর, দৃঢ়তার অভাব ও গৌরবের অনুপস্থিতির প্রতিকার করা হইয়াছে ৫ম/১১শ শতাব্দীর স্থাপত্য শিল্পের কতিপয় মনোরম ও বর্ণাঢ্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা এবং চত্বর ও বারান্দায় প্রবহমান ঝর্ণাধারা মনোরম চারাগাছ সংস্থাপন দ্বারা। নিঃসন্দেহে ইহা প্রাচ্য প্রভাবের ফল যাহা সম্ভবত ইফরীকিয়্যার মাধ্যমে এখানে আগত। এই সকল প্রাসাদের আংশিক দৈন্য ঢাকিতে যে অলংকরণ প্রয়োগ করা হয় তাহা খিলাফাত যুগের শিল্পকলার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার হইলেও মূলত হিস্পানী স্থাপত্য শিল্পের এক চটকদার বিবর্তন। কর্ডোভা ও মাদীনাতুয-যাহ্রার স্থাপত্য শিল্প বিষয়ক উপাদানসমূহকে অন্যান্য নিছক অলংকরণ উপাদানসমূহে রূপান্তর করা হয় যাহার মধ্যে জটিল ও দুরূহ নক্শা ও প্রাচুর্যমণ্ডিত অলংকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তাইফা শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্দশন বহন করে যে প্রাসাদটি তাহা আল-মুক্'তাদির ইব্ন হূদ (৪৪১/১০৪৯-৪৭৪/১০৮১) সারাগোসা (সারা কুস্তা) সন্নিহিত স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী অর্থাৎ আল-আনদালুসে আল-মুরাবিত ও আল-মুওয়াহ্হিদগণের শাসন আমল পাশ্চাত্য শিল্পকলার অন্যতম ফলপ্রসূ কাল, অধিকন্তু এই সময়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা হইতে আগত গঠন প্রকৃতিরও ব্যাপক মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। মুরাবিতগণ ছিল নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিহীন আফ্রিকার বার্বার শাখার। শৈল্পিক রীতির প্রান্তমাত্র তাহারা স্পর্শ করিয়াছিল।

মুসলিম স্পেনের সহিত বারবারীর (Barbary অর্থাৎ প্রাচীন উত্তর আফ্রিকা) রাজনৈতিক সংযোগ এক শতাব্দীর অধিক কালের (৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ-এর প্রথম বৎসরগুলি)। প্রথমে এখানে আল-মুরাবিতগণ এবং পরে আল-মুওয়াহ্দিদগণ শাসন করে। ইহার ফলে আন্দালুসীয় শিল্পকলা জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করিয়া বৃহৎ শহর-কেন্দ্রবিহীন প্রধানত গ্রামীণ সভ্যতাপূর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে (দ্র. আল-মুরাবিতূন)।

মুরাবিত আমলে নির্মিত মসজিদগুলির গঠনপ্রকৃতি সাবেক হিসপানী মসজিদ হইতে ভিন্নতর। সম্ভবত ইরাকী প্রভাবের ফলেই এইরূপ ঘটে। তাঁহারা এযাবত খিলানপথ বিচ্ছিন্নকারী প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভসারির (Columns) পরিবর্তে ইট নির্মিত থাম (Pillar) নির্মাণ করেন। ফলে প্রাসাদসমূহের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাষ্ঠ নির্মিত সংযোজক কড়ি-বর্গার প্রয়োজন লোপ পায়। তবে স্থানের সংকোচন ঘটে এবং দৃষ্টিগোচরতা হ্রাস পায়। প্রস্তুর স্তম্ভনির্মিত ইবাদাতগাহ-এর তুলনায় ইট নির্মিত থামের ইবাদাতগাহ সর্বদা বিকট ও বৈচিত্র্যহীন মনে হয়।

আন্দালুসে আল-মুরাবিতদের নির্মিত কোন মসজিদই রক্ষিত নাই। প্রথম দিকে অলংকরণ বর্জিত তিলিমসান ও আল-জাযাইর-এর বৃহৎ মসজিদগুলি সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত হয়। তখন পর্যন্ত আনদালুসী প্রভাব আফ্রির উপকূলে পৌঁছায় নাই। এই প্রভাব দেখা দেয় 'আলী ইব্ন ইয়ূসুফের (৫০০/১১০৬ হইতে ৫৩৭/১১৪৩) রাজত্বকালে। এই সময়ে তিলিমসানের মসজিদটিকে জমকালো ও প্রাচুর্যপূর্ণ হিস্পানী অলংকরণে সজ্জিত করা হয়। মিহ্রাবের দেওয়াল ও গুম্বজের বহির্ভাগ নিখুঁত ও মনোরম অলংকরণে সজ্জিত করা হয়। টানা হস্তলিপিতে উৎকীর্ণ ইহারই একটি অংশ হইতে জানা যায়, এই অলংকরণ ৫৩০/১১৩৬ সালে সমাপ্ত হয়। আনুমানিক ৫২৯/১১৩৫ সালে আলী ইব্ন ইয়ূসুফ ফেয-এ অবস্থিত আল্-কারাবিয়্যীন জামে 'মসজিদকে সম্প্রসারণ করেন। এই মসজিদে স্পষ্টত কর্ডোভাজাত পরস্পরছেদী খিলান ও ইরান অথবা ইরাক হইতে গৃহীত ঝুলন্ত ঝাড় (stalactite- হিসপানীয় ভাষা mocarabes) দ্বারা গঠিত কক্ষ (vaults) রহিয়াছে যে ঝাড়গুলি কোন কোন স্তম্ভকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই মসজিদের অত্যাশ্চর্য নিখুঁত অংগ সৌষ্ঠব দেখিয়া ইহাই মনে হয়, আমদানীকৃত উপাদান দ্বারা নির্মাণকার্যের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাই প্রথম নহে।

আল-মুরাবিতগণের অলংকরণ রীতির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষার বহন করিতেছে মার্‌রাকুশ-এর কু'ব্বাতুল-বারূদ। ইহা সম্ভবত ৫১৪/১১২০ ও

৫২৬/১১৩০-এর মাঝামাঝি কোন সময়ে নির্মিত হয়। এই ক্ষুদ্র আয়ত আকৃতির ভবনটির কেন্দ্রীয় অংশে একটি বক্রাকৃতি ইষ্টক নির্মিত ছোট গুম্বজ (কু'ব্বা) রহিয়াছে। ইহার ভিতরের দিকে পরস্পরছেদী আটটি খিলান রহিয়াছে। উহা কর্ডোভা মসজিদের মিহরাবের সামনের কুলঙ্গী আচ্ছাদনকারী গুম্বজের গঠন প্রণালীর অনুরূপ। মাররাকুশ-এর মূল খিলানগুলি বিভিন্ন আকৃতির। কোনটার গঠন সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট, কোনটা বাঁকা ও কোনটা সমকোণী আকারের, অন্যান্য তল (Surface)-এর মতই ঐগুলির উৎপত্তি স্থলের মধ্যভাগস্থিত সমতল পৃষ্ঠ সূক্ষ্ম আরব রীতির (Arabesques) আস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত যাহার চতুষ্পার্শ্বে বিশাল গোলচক্র রহিয়াছে। ইহা হিস্পানী শিল্পকলার এক অনন্য ঐশ্বর্য ও অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির স্বাক্ষর। খণ্ডকরণ (fragmentation) ও আলংকারিক আতিশয্যের প্রতি প্রাচীন শিল্পকলা বিরোধী প্রবণতা ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা সময়ে সময়ে স্পেনীয় শিল্পকলার ইতিহাসের ধারায় আবির্ভূত হয়।

পূর্বসূরীদের ন্যায় আল-মুওয়াহ্হিদগণও তেমন কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কাজকর্মে কৃচ্ছ্র (যুহদ) ও সংযম সাধনা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে যাহার ফলে যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও আতিশয্য পরিত্যাজ্য গণ্য হয়। মূল ইসলামের সারল্য ও বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার জন্য তাঁহারা এক বলিষ্ঠ আন্দোলনের সূচনা করেন। অলংকরণ পদ্ধতির উপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপের মাধ্যমে তাঁহারা শৈল্পিক বিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেন। শিল্পে মূল প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়া অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করা হয়। প্রশস্ত ও সরল পশ্চাদ্ভূমির উপর নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রেখা ব্যবহৃত হইতে থাকে (দ্র. আল-মুওয়াহ্'হি'দূন–অধ্যায় শিল্পকলা)। আল-মুওয়াহ্হিদগণ কর্তৃক নির্মিত কোন ইবাদতগাহের নিদর্শন স্পেনে টিকিয়া না থাকায় আমরা বলিতে পারিতেছি না, ঐ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব স্পেনের অট্টালিকার উপর পড়িয়াছিল কিনা। ইশবীলিয়া (Seville)-এর বৃহৎ মসজিদ দেখিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয়, ইহাতে তাঁহারা যে অলংকরণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আল-মাগরিবে সংরক্ষিত প্রাসাদরাজি অপেক্ষা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। সেভিলের এই বৃহৎ মসজিদের নির্মাণ ইয়া'কূ'ব আল-মান্সূ'র (৫৭২/১১৭৬– ৫৯৪/১১৯৮)-এর রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়।

আল-মুওয়াহ্হিদগণ অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহাদের শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রতিফলিত করেন। কর্ডোভার খিলাফাত আমলের ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদরাজি ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিচিহ্নসমূহ দ্বারা তাঁহারা অনুপ্রাণিত হন। তাঁহারা সুষম ও সুপরিকল্পিত বিশাল বিশাল মসজিদ, বলিষ্ঠ সুউচ্চ মীনার ও বিশাল নগর তোরণ নির্মাণ করেন যাহা তাঁহাদের বংশের সম্মানে নির্মিত।

আল-মুরাবিত ও আল-মুওয়াহ্হিদগণের অবশিষ্ট প্রাসাদসমূহে দুই ধরনের আঙিনা (patios) পরিদৃষ্ট হয়, যাহা পরবর্তী কালে গ্রানাডার শিল্পকলায় উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছে। একটি আঙিনায় আড়াআড়িভাবে দুইটি রাস্তা পরস্পরকে কর্তন করার ফলে চারটি বর্গাকৃতি সবুজ ঘাসের উদ্যান রচিত হইয়াছে। ইহার ক্ষুদ্রতর অংশে রহিয়াছে অভিক্ষিপ্ত চত্বর (মুর্সিয়ার ভেগায় অবস্থিত El Castillejo-তে এইরূপ নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)। দ্বিতীয় ধরনের আঙিনায় এক অথবা দুই দিকে চাতাল থাকিত (এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় সেভিলের আল-ক'াস্'র (Alcazar)-এ অবস্থিত ইয়েসো (Yeso)-তে।

আল-আন্দালুসে আল-মুওয়াহ্হিদগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফৌজী দালান-কোঠা নির্মাণে বায়যানটাইন স্থাপত্য রীতি হইতে গৃহীত যে স্থাপত্য কৌশল প্রয়োগ করা হয় তাহা তখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যে অজ্ঞাত ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, বক্রাকার ফটকসমূহ বাদাজোয (Badajoz), সেভিল ও নাইএবলা (Niebla)-র প্রাচীরসমূহে বহুভুজী বুরুজ (Caceres, Badajoz, সেভিল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়) এবং আল-বাররানা অর্থাৎ দেওয়ালের বহির্ভাগের কেল্লা (কাসরাশ, বাদাজোয ও ইস্তিজা Ecija)। স্টাইলাকটাইট (Stalactites-ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার জন্য উৎপন্ন ঝুলন্ত চুনের দণ্ড)-এর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য হইতে আনীত টানা হাতে অঙ্কিত উৎকীর্ণ লিপি (গ্রানাডার মাউরূর [Mauror] ও মুরসীয়ার Castillejo-এর আস্তরণে অলংকরণ দেখা যায়) এবং অট্টালিকার বহির্ভাগ অলংকরণে চক্চকে অথবা বার্নিশ করা সিরামিক (ceramic)-এর ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়। স্পেনে ইহার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত সেভিলে টোররে ডেল্ওরো (Torre del Oro)-তে বিদ্যমান। ইহা নির্মিত হয় ৬১৭/১২২০-২১ সালে।

আল-মুওয়াহ্হিদ সাম্রাজ্যের পতনের পর আন্দালুসে মুসলিম শাসনের শেষ অবস্থান ছিল গ্রানাডার ক্ষুদ্র রাজ্যটি। ইহা ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রানাডার বিশ্বনন্দিত আল-হামরা প্রাসাদ ও সেই শেষ যুগের অন্যান্য অট্টালিকার প্রায় কোনটিই ৮ম/১৪শ শতাব্দীর পূর্বেকার নহে। নাসরী (দ্র. আন-নাস্র, বানূ) অথবা গ্রানাডার শিল্পকলা, এই উপদ্বীপে ইসলামী আমলের সমুজ্জ্বল শেষ পর্ব, যাহা আল-মুওয়াহ্হিদ বংশের আনুষ্ঠানিক শিল্পকলার প্রান্তসীমায় আসিয়া আংশিকভাবে নিজ মর্যাদা সংরক্ষণ করে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিল্পরীতি ও প্রাচ্য হইতে আমদানীকৃত উপাদানের মাধ্যমে এই শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হয়, যদিও ইহা কালের অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তনকে উপেক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। অলংকরণের দিকে ইহা নিবিড় বৈচিত্র্যহীন ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের জাতীয় ঐতিহ্যকে আল-মুওয়াহ্হিদগণ পুনর্জীবিত করে। সংক্ষিপ্ত বিচ্যুতির পরে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আন্দালুসে আল-মুওয়াহ্হিদগণের এই বিচ্যুতি কোন্ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। সাজসজ্জার ক্ষেত্রে মানব প্রতিভা ও শিল্পকলা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনাসমূহ দ্বারা গ্রানাডার কারিগরগণ একটি বিলুপ্তপ্রায় সভ্যতার শেষ দিনগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিল। নিকৃষ্ট ও ভঙ্গুর উপকরণ দিয়াই তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল প্রশস্ত, দৃঢ় ও অনাড়ম্বর ইমারতসমূহ, যেমন কুমারীস (Comares)-এর বুরুজ ও আল-হামরার বাবুল 'আদল বা ন্যায়বিচার তোরণ (Gate of Justice) অথবা মাদীনাতুল-বীরার (Alberea) চত্বরের মত প্রশান্ত, গম্ভীর, সুসমঞ্জস ও অপূর্ব ইমারতসমূহ ও সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরভাগ, যেমন গ্রানাডার রাজপ্রাসাদের দারু'ল-উস্দ বা সিংহপুরী (Lion's Court) হইতে দারাজার (Daraja) প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রাসাদসমূহের সমান্তরাল বিন্যাস। ইহা ছাড়াও তাহারা কতগুলি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল যাহা হিস্পানো আল-মুওয়াহ্হিদী দুর্গগুলি হইতে অধিকতর

গুরুত্বপূর্ণ এবং আজও যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহারা গ্রানাডাকে অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প সৌন্দর্যমণ্ডিত সরকারী ভবনসমূহ, বাসগৃহ ও রাজপ্রাসাদ দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছিল। নগরীকে বেষ্টন করিয়াছিল যে সমস্ত অনাড়ম্বর বাসভবন সুরম্য শাহী মহলগুলি তাহাদের প্রতিটিতেই ছিল উন্মুক্ত অঙ্গন, ফোয়ারা, চৌবাচ্চা, উজ্জ্বল রংয়ের টালিপাতা রাস্তা, আস্তরণের সাজসজ্জা ও দক্ষতার সহিত স্থাপিত কাঠের ছাদ।

গ্রানাডার শিল্পকলাবিশিষ্ট মহিমা ও গরিমা অত্যন্ত ভঙ্গুর হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিকভাবে একমাত্র আল-হামরার শাহী মহলেই সংরক্ষিত রহিয়াছে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত আল-বারশা (Alberca) ও আল-উস্-এর উন্মুক্ত অঙ্গন হইতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের দিকে সজ্জিত থামওয়ালা বারান্দা সম্বলিত তোরণ এবং আল-মুরাবিত যুগে অনুসৃত আড়াআড়ি দুইটি পায়ে চলা পথ রাখিবার রীতিরই উন্নত সংস্করণ। আল-হামরাস্থ মৌচাকের ন্যায় মনোরম ঝাড় (Stalectities) যৌগিক খিলান গঠন করিয়াছে, মিহরাবসমূহের বহিরাবয়ব ঢাকিয়া দিয়াছে এবং স্তম্ভের উপরিভাগ (imports)-এর অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। চাকচিক্যময় (alicatades) রঙীন টালি পাথরের মোজাইকের স্তম্ভের পাদদেশের উপর কক্ষগুলির দেওয়াল এমনভাবে আবৃত হইয়াছে যেন সেইগুলির উপর গালিচা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। উহার আস্তরণের চারিপার্শ্ব লতাপাতার কারুকার্য দ্বারা অলংকৃত, যাহার বড় পাতাগুলি ছোট ছোট পাতায় বিভক্ত হইয়াছে, যাহা আল-মুরাবিত ঐতিহ্য বহন করে। অন্য মসৃণ শিল্পকর্মসমূহ আল- মুওয়াহ্হিদদের সাজসজ্জা রীতির সমন্বয় সাধন করিয়াছে, যাহাতে আঁকাবাঁকা জ্যামিতিক নকশা এবং কূফী ও টানা হস্তলিপির শৈল্পিক আকৃতি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। আল-হামরার অভ্যন্তরে অলংকরণের বিস্ময়কর প্রাচুর্য রহিয়াছে। কিন্তু কক্ষগুলির অন্তস্থ খোদাই কারুকার্যের স্বল্পতা ও সুশৃংখল বিন্যাসের কারণে উহাতে অতি প্রাচুর্যজনিত বিশৃংখলা সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সমস্ত কিছুই দেখিতে সুষম, হালকা ও মনোহর।

যখন এই প্রাসাদ নির্মিত হইতেছিল তখন বেশ কিছু সরকারী ভবন নির্মিত হইয়া গ্রানাডাকে সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করিয়া তোলে। তন্মধ্যে একটি হইল ফুনদুক (সরাইখানা), যাহাকে হিসপানো ভাষায় Alhondiga nueva বলা হইত। ৭৫০/১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে একটি মাদরাসার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। আরও নির্মিত হয় একটি মারিস্তান বা উন্মাদ আশ্রয় (৭৬৭/১৩৬৫-৭৬৮/১৩৬৭)। এই তিনটি অট্টালিকার মধ্যে কেবল প্রথমটিই সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহা বিদেশী পরিকল্পনায় নির্মিত হইলেও উহার গঠন-প্রকৃতি দেশীয় রীতির প্রতিনিধি।

৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্পেনে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগ নামিয়া আসে। তখন গ্রানাডার শিল্পকলা এক অন্তঃসারশূন্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল হইতে নূতন চিন্তাধারার আগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা স্বয়ং বিস্ময়কর, অথচ অভিনবত্বহীন সূক্ষ্ম বিচার-বিতর্কের ফলে কৃত্রিমতার শিকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা প্রাচীন আদর্শের পুনরাবৃত্তি করিতেছিল এবং শিল্পীদের দৃষ্টি অতীত রীতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ইহার পর প্রায় বর্তমান কাল পর্যন্ত কতিপয় শতাব্দী যাবত গ্রানাডার শিল্পকলা নিষ্প্রাণ দেহে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

কারুশিল্প (Industrial Arts) ঃ আল-আন্দালুসে বাণিজ্য প্রধানত ইয়াহূদী ও মিসরীয়দের হাতে ছিল। প্রাচ্যের বহু আলংকারিক ও কারুশিল্পজাত দ্রব্য, যাহাদের কিছু কিছু বহনযোগ্য ছিল, বাণিজ্যের মাধ্যমে আল-আন্দালুসের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বাগদাদ ও বায়যানটাইন-এর প্রভাবে দ্বিতীয় 'আবদুর রহমান ও তাঁহার পুত্র প্রথম হিশাম-এর শাসনামলে বিলাস ব্যসন ও বাহ্যাড়ম্বরের মার্জিত রুচি কর্ডোভায় প্রাধান্য লাভ করে। ইসলামী অঞ্চলসমূহ উপদ্বীপের খৃস্টান রাজ্য ও পিরেনীয় পর্বতমালার উত্তরাঞ্চলের গ্রাহকদের বিপুল চাহিদা পূরণার্থে আন্দালুসে বস্ত্রশিল্প, অলংকার তৈরী, হস্তীদন্ত ও মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য, গৃহসরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটে। এইসব দ্রব্য আমদানীকৃত সামগ্রীর অনুকরণে প্রস্তুত করা হইত। সকল দ্রব্যের কতকগুলি এত নিখুত হইত যে, ভূমধ্যসাগরের অপর পারের দেশগুলি হইতে আমদানীকৃত, না আন্দালুসেই উৎপাদিত তাহা বলা কঠিন ছিল। ফাতিমী পদ্ধতিতে প্রস্তুত বহু তৈজসের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত বলা অসম্ভব ছিল, তাহা মিসরে প্রস্তুত, না স্পেনে প্রস্তুত। এখানকার কিছু কাপড়ের বুনন এত সুন্দর ছিল যে, সেইগুলি 'আব্বাসীদের না আল-আন্দালুসের কারখানায় প্রস্তুত তাহা অতি সতর্ক নিরীক্ষা ব্যতীত বলা যাইত না।

৫ম/১১শ শতাব্দীতেও স্পেনীয় কারখানাগুলির উৎপাদনে মন্দা পড়ে নাই। শুধু পরবর্তী শতাব্দীতে প্রথম দিকের আল-মুওয়াহ্হিদ খলীফাগণ উহার উপর, বিশেষ করিয়া সরকারী কারখানাগুলির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করায় উৎপাদন মন্থর হইয়া গিয়াছিল। অন্যদিকে ক্ষুদ্রতর রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রানাডায় কারুশিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। বিলাসী সভাসদবর্গের চাহিদা পূরণ করিয়াও উৎপাদিত সামগ্রীর রপ্তানী এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিপালনে সাহায্য করিত, যাহারা ক্যাস্টিলের নৃপতিকে দুর্বহ রাজস্ব প্রদানে বাধ্য ছিল।

অন্তত ৪র্থ/১০শ শতাব্দী হইতে আল-আনদালুসে ধর্মীয় আসবাবপত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নিখুত সৌন্দর্যবিশিষ্ট ছিল। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, অত্যন্ত দক্ষ কারিগরগণ স্বীকার করেন কর্ডোভার জামে মসজিদ ও মাররাকুশস্থ কুতুবিয়্যা জামে মসজিদের মিম্বারদ্বয় সেই যুগের শ্রেষ্ঠতম মিম্বার। আল-ইদরীসীর মতে কর্ডোভার প্রধান মসজিদের মিম্বার সারা দুনিয়ায় অতুলনীয়। ইহা দ্বিতীয় আল-হাকামের শাসনকালে নির্মিত হয়। ইহা হস্তীদন্ত ও মূল্যবান কাষ্ঠ দ্বারা মীনা-কার্যের আসবাব নির্মাণ শিল্পের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

৫৩৪/১১৩৯ ও ৫৩৮/১১৪৩ সালের মধ্যে কর্ডোভার কুতুবিয়া মসজিদের মিম্বার নির্মিত হয়। রঙ্গিন কাষ্ঠখণ্ড, হস্তীদন্ত খচিত শিল্পকর্ম (marquetry) ও অতি সূক্ষ্ম জ্যামিতিক অংকন বিজড়িত অলংকরণ দ্বারা ইহা আবৃত। ইহাতে নানা রঙয়ের মূল্যবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড ও কিনারায় সুন্দর সুন্দর হস্তীদন্তের পাত (lamellae) স্থাপিত হইয়াছে; মধ্যকার ফাঁকা স্থানগুলি সূক্ষ্ম খোদাই নকশা দ্বারা পূর্ণ করা হয়।

খিলাফত যুগের শৈল্পিক মহিমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দর্শন হইল হস্তীদন্ত [আজ-عاج (দ্র.)] নির্মিত ক্ষুদ্র কৌটা ও বয়াম যাহার পূর্ববর্তী নমুনা বায়যান্টাইন সংস্কৃতিতে সন্ধান করা যাইতে পারে। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উহা সরকারী কারখানায় নির্মিত হইত। উহার অলংকরণে প্রধানত আরবী রীতি (Arabesques) অনুসৃত হইলেও জীবজন্তু ও মানুষের চিত্রও বিরল ছিল না। ইহাতে যেসব চিত্রের অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ইরাকে প্রচলিত ছিল।

আল-আনদালুসে মৃৎশিল্পের অনন্য উন্নতি সাধিত হয় (তু. খাযাফ)। মাদীনাতুয-যাহরা অথবা মাদীনাতুল-বীরা (Elvira)-র মৃৎশিল্পরূপে পরিচিত যে সমস্ত সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে তাহা খিলাফাত যুগে উৎপাদিত। এই দুই নগরীর ধ্বংসস্তূপে উহাদের বহু নমুনা বিদ্যমান। উহাতে সাদা পটভূমির উপর পিঙ্গল সবুজ (oxide of copper) রংয়ের কারুকার্য অংকিত রহিয়াছে যাহার চারিপাশে আছে গাঢ় বাদামী (manganese) রংয়ের পাড়। এই মৃৎশিল্পের উৎস বায়যানটাইন হইলেও ইহা আনদালুসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া বিকশিত হয়।

সোনালী চীনা মাটির জমকালো বাসনপত্র ইরাক ও ইরান হইতে আসিয়াছিল। ৫ম/১১শ শতাব্দী হইতে আল-আনদালুসে ইহা উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া গেলেও সম্ভবত আরও পূর্বে তথায় ইহার উৎপাদন শুরু হইয়াছিল। এই বিলাসবহুল প্রযুক্তির চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর অংগ সৌষ্ঠবও গঠন সৌন্দর্য অতুলনীয় ছিল, যেমন মালাগা (Malaga)-র অত্যুৎকৃষ্ট ফুলদানি। এই দুর্লভ নমুনা যে যাদুঘরে ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রহিয়াছে সেইগুলির গৌরব বর্ধন করিয়াছে। ইহার কতকগুলিতে রহিয়াছে শুধু সোনালী কারুকার্য, অন্যগুলিতে সোনালী রংয়ের সঙ্গে নীল রংও ব্যবহার করা হইয়াছে। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর সূক্ষ্ম রেখা (euerda seca) দ্বারা পৃথকীকৃত নানা রংয়ের মৃন্ময় পাত্রের টুকরা পাওয়া গিয়াছে যেইগুলি স্পেনে তৈরী বলিয়া মনে হয়; অন্যদিকে কিছু চাকচিক্যহীন খোদাই নকশা সম্বলিত মৃৎপাত্রাদি কেবল ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বাগদাদ হইতে আমদানীকৃত জরী বস্ত্রে প্রস্তুত বিখ্যাত বড় চাঁদোয়া (শামিয়ানা-baldachin)-এর স্পেনে সংরক্ষিত কিছু নমুনা মধ্যযুগের রেশম শিল্পের চরম উন্নতির স্বাক্ষর বহন করে। ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর খৃষ্টান স্পেনের অনেক দলীল-পত্রাদিতে সিরীয় (Sirico) ও বায়যানটীয় (Grecisco) বস্ত্রের উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ যুগে প্রাচ্য হইতে মূল্যবান বস্ত্রসামগ্রী স্পেনে আমদানী করা হইত।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে সেভিল ও কর্ডোভায় এমন কতিপয় কারখানা ছিল যেখানে তিরায অর্থাৎ জরির কাজ করা রেশমী বস্ত্রাদি উৎপাদিত হইত যাহা আনুষ্ঠানিক মূল্যবান পোশাক (robes)-এর জন্য ব্যবহৃত হইত। এইসব বস্ত্র ও উহা দ্বারা প্রস্তুত পোশাকাদি (robes=خلعت) শ্রেষ্ঠতম উপহার সামগ্রীরূপে বিবেচিত হইত। আল-মুরাবিতদের আমলে আল মিরীয়ার তাঁত শিল্প প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ আমলে সাজসজ্জার বায়যানটীয়-সাসানীয় ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল। ইহাতে আব্বাসী রাজধানী বাগদাদের কৌশল ও রীতি অনুকরণের পরস্পর-স্পর্শী বৃত্তের মধ্যে জীবজন্তুর চিত্র অংকিত থাকায় আল-মুওয়াহহিদ শাসকগণ তিরায উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে রেশমী বস্ত্রসামগ্রী হইতে বৃত্তের অন্তর্ধান ঘটে। ইহার পরিবর্তে জ্যামিতিক নকশাদি, সরল বক্ররেখার কারুকার্য, স্রোতধারার নকশা, তারকা আকৃতির বহুভুজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৭ম/১৩শ শতাব্দী হইতে উৎকীর্ণ লিপি ও জ্যামিতিক উপকরণে সমৃদ্ধ বহু সমান্তরাল রেখার সাজসজ্জার রীতি প্রচলিত হয়। গ্রানাডার রেশমী বস্ত্র এই নমুনারই হইত।

খিলাফাত যুগে নির্মিত তৈজসপত্র, যথা প্রদীপ, মোমবাতি দান, বাতির ঝাড়, কান্দীল, জীবজন্তুর আকৃতির তৈরী পানি নিঃস্রাবী নল, হামানদিস্তা, আগরদান ইত্যাদির সহিত ফাতিমী যুগের তৈজসপত্রের সাদৃশ্য থাকার কারণে ইহা বলা কঠিন কোনটা কোথায় উৎপাদিত—আমরা ইতিপূর্বে অবশ্য এই সম্পর্কে ইংগিত করিয়াছি। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর ধাতুর কাজে শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিপূর্ণতা ব্রোঞ্জের কারুকার্য খচিত মীনা করা ফলকে স্পষ্ট, যাহা সেভিল (Seville)-এর বড় মসজিদের চত্বরে স্থিত কাঠের দরওয়াজার পাল্লায় স্থাপিত। উক্ত ফটকের কড়াগুলিও শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন।

যাদুঘর ও সংগ্রহশালায় খিলাফাত যুগের কারুকার্য (উল্টা পিঠে হাতুড়ী ঠুকিয়া উঁচু করা-repoussage)খচিত রৌপ্যের কাকনগুলির নমুনা রক্ষিত আছে। এই কৌশল স্বর্ণ-অলংকারে তেমন দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালির কাজ ও মিহি তার ব্যবহৃত হয়। মূল্যবান প্রস্তর ও কাঁচমণ্ড দ্বারা শূন্য স্থান পূর্ণ করা হয়। এই শিল্প কৌশল গ্রানডার সালতানাতের অবসান পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। এই যুগের বহু তলোয়ার রহিয়াছে, যেমন মাদ্রিদের সামরিক যাদুঘরে রক্ষিত (গ্রানাডার শেষ শাসক) আবূ আবদিল্লাহ (Boabdil)-এর তলোয়ার। ইহা স্বর্ণকারের শিল্প-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার হাতল গিলটি করা রৌপ্য ও হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত। ইহাতে রহিয়াছে সূক্ষ্ম জালির কাজ ও নানা রংয়ের মীনা করা কারুকার্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, ২খ., অক্সফোর্ড ১৯৪০; (২) G. Marcais, Manuel d'art muslman, L'architecture, ১-২খ., প্যারিস ১৯২৬-২৭ খৃ.; (৩) M. Gomez Moreno, El arte arabe espanol hasta los Almohades Arte mozarabe, in Ars Hispaniae, ৩খ., মাদ্রিদ ১৯৫১ ; (৪) H. Terrasse, L'art hispano-mauresque des origines au xiiie siecle, Tours ১৯৩২; (৫) L. Torres-Balbas Arte almohade, Arte nazari, Arte mudejar, in Ars Hispaniae, ৪খ., মাদ্রিদ ১৯৪৯ ও Historia de Espana ৪খ., সম্পা. Menendez pidal. মাদ্রিদ ১৯৫৭।

L. Torres-Balbas (E.I.2) / হাসান আবদুল কাইয়ুম

(১০) স্পেনের মধ্যযুগীয় আরবী ভাষা সম্পর্কে বলা যায়, যাবতীয় সনাতন-পরবর্তী (post-classical) প্রাদেশিক আরবী বাচনসমূহ (dialects)-এর মধ্যে আইবেরীয় উপদ্বীপে চলিত আরবী বাচনই

সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতেই ভাষা বিজ্ঞানী আয-যুবায়দী আল-ইশবীলী আল-আনদালুসের সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় প্রচলিত ভাষাগত ভুলসমূহ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক পুস্তিকা রচনা করেন। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ইব্‌ন কুযমান (দ্র.) ভাষা ও সমাজ বিজ্ঞানগত সম্পর্ক সম্বলিত কিছু যাজাল (দ্র.) রচনা করেন, যাহার অধিকাংশই সংরক্ষিত আছে। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে সূফী আশ-শুশতারীও (দ্র.) কিছু যাজাল করেন যাহার কতিপয় সংগ্রহ আমাদের পরিচিত। প্রাদেশিক বাচন (dialect)-এ যে কবিতাগুলি তাহারা রচনা করিয়াছেন তাহার বিষয়বস্তু পূর্বতন কবিদের রচনার ন্যায় হৃদয়গাহী নহে।

১৩শ শতাব্দীতেই যখন খৃস্টানরা বালানসিয়া (Valencia) পুনর্দখল করে এবং সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রচার কার্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় তখন এক অজ্ঞাতনামা লেখক আরবী-ল্যাটিন ও ল্যাটিন-আরবীতে এক বৃহৎ শব্দকোষ (Vocabulista) সংকলন করেন, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রানাডা রাজ্য পুনর্দখলের পর আলকালার ব্রাদার পেড্‌রো (Br. pedro de Alcala)-রও Arte নামক একখানি গ্রন্থ ও একখানি শব্দকোষ (Vocabulista) সংকলন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ইহাতে আরবী শব্দসমূহ রোমান হরফে লিখিত হইয়াছিল। শেষোক্ত রচনা (শব্দকোষ) বিশেষভাবে মূল্যবান কিন্তু Arte-র গদ্যাংশ ভুলে পরিপূর্ণ।

এই মৌলিক সূত্রসমূহ ব্যতীত বহু গৌণ সূত্রও বিদ্যমান আছেন অর্থাৎ যাজাল-এর স্বল্প পরিচিত লেখকদের রচনা মুওয়াশশাহাত (দ্র.)-এর বিভিন্ন ভাষ্য (খারজাত)। সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলীল-দস্তাবেজ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, হিসাবের ফর্দ ইত্যাদিতে এই যুগের গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। পরিশেষে শব্দকোষ সম্পর্কে বলা যায়, প্রাচীন আরবীতে লিখিত প্রায়োগিক গ্রন্থাবলীর লেখকগণ, যেমন ঐতিহাসিক ভূগোলবিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ প্রমুখ তাঁহাদের রচনাবলীতে আঞ্চলিক ভাষায় বহু সংখ্যক নাম উপস্থাপিত করিয়াছেন। হিসবা (অঙ্ক) সংক্রান্ত রচনাবলীতেও অনুরূপ নাম উপস্থাপিত হইয়াছে। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে স্পেনীয় আরবী আর জীবন্ত ভাষা ছিল না—এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিলুপ্তি সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে হয়। যাহা হউক, যে সমস্ত স্পেনীয় মুসলমান (Moriscos) স্পেন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ১৬১০ খৃস্টাব্দ নাগাদ তিউনিস ও মরক্কো পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা কথাবার্তা শুধু আরবীতে বলিতেন না, বরং স্পেনীয় (Spanish) ভাষায়ও বলিতেন। অতএব, আইবেরীয় উপদ্বীপে আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলার প্রচলন প্রায় আট শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কাল পৃথক পৃথক প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক এককসমূহে দেশের বিভক্তি, এমনকি বিভিন্ন আরব জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য সম্মিলিত হইয়া নানা প্রকার 'আরবী উপভাষাসমূহ সৃষ্টি করিতে পারিত, যেমন ঘটিয়াছিল রোমানস ভাষার কাঠামোতে; কিন্তু তেমন কিছু হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ইহা সত্য, যে সমস্ত প্রমাণ-পত্রাদি আমাদের হস্তগত হইয়াছে উহা কাল ও স্থানের নিরিখে পরস্পর বিরোধী। সে কারণে তুলনামূলক বিচার ব্যাহত হইয়া পড়ে। বড়জোর, দক্ষিণ (সেভিল, কর্ডোভা, গ্রানাডা) পূর্ব ভ্যালেনসিয়া, মুরসিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলসমূহ (Marcher-আরাগুন)-এর উপভাষাসমূহের মধ্যে নিহিত পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। টলেডো সম্পর্কে যে দলীলপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের।

সারকথা, স্পেনীয় আরবীতে উচ্চ পর্যায়ের সাদৃশ্য সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাহারো বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, আমাদের প্রমাণপত্রাদি মাত্র শহুরে কথাবার্তাসমূহের সহিত সম্পর্কিত। সম্ভবত গ্রামীণ বাচনভঙ্গী বিভিন্ন ছিল। কেননা এমন সব লোকের মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল যাহারা শহরের মানুষের মত যত্রতত্র খুব কমই যাতায়াত করিত। যদিও ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে চলিত ভাষা হিসাবে স্পেনীয় আরবীর বিলুপ্তি ঘটে, তবুও এমন কবিতায় ইহার অস্তিত্ব টিকিয়া ছিল যাহা তিউনিস হইতে মরক্কো এলাকার শহরবাসিগণ কর্তৃক আনদালুসীয় সুরে ও গানের কথায় অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) মূল পাঠসমূহ ঃ (১) De Gunzburg, Le Divan d'Ibn Quzman, fasc. 1 (কেবল একটিই প্রকাশিত হইয়াছে) ঃ একক কপির ফটোকপি, বার্লিন ১৮৯৬ ; (২) Nykl, El Cancionero de Aben Quzman, মাদ্রিদ ১৯৩৩ (পূর্ব-বর্ণিত পাঠ রোমান লিপিতে প্রতিবর্ণিত, কতিপয় নির্বাচিত যাজাল-এর অনুবাদসহ, দ্র. review, in Hesp., ১৯৩৩, ১৬৫); (৩) Schiaparelli, Vocabulista in Arabico, Florence ১৮৭১; (৪) Pedro de Alcala, Arte para ligeramente Saber la lengua arauiga-Vocabulista arauigo en letra castellana, গ্রানাডা ১৫০৫ (Hispanic Society of America কর্তৃক প্রকাশিত ফটোকপি, নিউ ইয়র্ক ১৯২৮, Paul de Lagarde, Petri Hispani de Lingua Arabica libri duo, ১ম সংস্করণের আংশিক সংশোধিত পুনঃপ্রকাশ, Gottingen ১৮৮৩); (৫) Martin de Ayala, Doctrina en lengua arauiga y castellana, ভ্যালেনসিয়া ১৫৬৬; (৬) Yafil, মাজমূউল-আগানী ওয়াল-আলহান মিন কালামিল-আন্দালুস, আলজিয়ার্স তা. বি.।

(খ) বিশেষ গবেষণা ঃ (১) M. Alarcon, Carta de Abenaboo en arabe granadino, in Miscelanea de estudios y textos arabes, মাদ্রিদ ১৯১৫ ; (২) M. Asin Palacios, Glosarlo de voces romances, মাদ্রিদ-গ্রানাডা ১৯৪৩; (৩) G. S. Colin, Sur une charte hispanoarabe de 1312, in Islamica, ১৯২৭, ৩খ.; (৪) ঐ লেখক, Les voyelles dedisjonction dans l'arabe de Grenade au xv° siecle, in Memorial Henri Basset P.I.H.E.M., প্যারিস ১৯২৮, পৃ. ২১১ ; (৫) ঐ লেখক, Notes sur l'arabe d' Aragon, in Islamica, ৪খ., পৃ. ১৫৯, ১৯২৮ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Les toris interdentales de l'arabe, hispanique, in Hesp. ১৯৩০, পৃ. ৯১ ; (৭) ঐ

লেখক, Un document nouveau sur l'arabe dialectal d'Occident au XII° siecle, in Hesp., ১৯৩১, পৃ. ১ ; (৮) De Eguilaz, Glosario...., গ্রানাডা ১৮৮৬ (রোমান্স স্পেনীয় ভাষায় অন্তর্ভুক্ত আরবী শব্দসমূহ সম্বলিত); (৯) Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo en los siglos xii y xiii, ৪খ., মাদ্রিদ ১৯২৬-৩০; (১০) Simonet, Glosario..., মাদ্রিদ ১৮৮৮ (স্পেনীয় আরবীতে ব্যবহৃত আইবিরীয় ও ল্যাটিন শব্দাবলী সম্বলিত) ; (১১) A. Steiger, Contribucion a la fonetica dsl hispano arade....., মাদ্রিদ ১৯৩২; তু. C. R. Colin, in Hesp., ১৯৩৩, পৃ. ১৭১; (১২) Neuvonen, La negacion katt en el concionero de Ibn Quzman, in Studia Orientalia, ১৭শ খ., ৯, হেলসিন্কি ১৯৫২ ; (১৩) L. Seco de Lucena, Un nuevo texto en arabe dialectal grenadino, in al-Andalus, ২০খ., ১৯৫৫, পৃ. ১৫৩। [আরও দ্র. (১) ইব্নুল খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখবার গারনাতা ; (২) আল-মাক্কারী, নাফহু’ত্‌তীব ; (৩) আবূ নাস্‌র মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফী তারীখ রিজালিল-আন্দালুস ; (৪) আল-ইদ্রীসী, নুযহাতুল মুশতাক’; (৫) য়াকূত, মু‘জামুল বুলদান ; (৬) আল-মাররাকুশী, কিতাবুল মুজিব।]

G.S. Colin (E.I.2) /হাসান আবদুল কাইয়ুম

সংযোজন

আনদালুসে ইসলামী শাসন

পাপ-পঙ্কিলতা, হিংসা-দ্বেষ, কলহ-বিবাদ, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত এবং অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জরিত আরবজাতি তথা বিশ্বমানবকে ন্যায় ও সত্যের পথ প্রদর্শনের জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব হয়। মহানবী (স) ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬১০ খৃ. হেরা পর্বতের গুহায় আসমানী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সর্বশেষ নবীর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ঐশীবাণীতে ধর্মপ্রচারে আত্ম-নিবেশের প্রেরণা পান। মহানবী (স) মক্কাবাসীদিগকে পুরাতন কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্য, প্রেম ও একত্ববাদের ধর্মে দীক্ষিত হইবার উদাত্ত আহবান জানান। শারীরিক নির্যাতন, সামাজিক বয়কট এবং কুরায়শদের প্রতিরোধের মুখে তিনি ৬২২ খৃ. মদীনায় হিজরত করেন এবং সেইখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র মদীনা প্রজাতন্ত্রই ছিল পরবর্তী কালের বৃহত্তম ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল (P.K. Hitti, History of the Arabs, P. 116)। খুলাফায়ে রাশিদীনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) -এর শাসনামলে (৬৩৪-৪৪ খৃ.) মুসলিম রাষ্ট্র সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায় সূচিত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলিমদের আত্ম-কলহের কারণে দেশ বিজয়ের কার্যক্রম মন্থর হয়। উমায়্যা খলীফা আল-ওয়ালীদের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে গতি সঞ্চারিত হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারের এই পর্যায়ে ইসলামী সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তার লাভ করে।

খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আল-আনদালুস (স্পেন ও পর্তুগাল, মধ্যযুগে মুসলিম শাসনাধীনে উক্ত নামে পরিচিত) বিজয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। উমায়্যা খিলাফতে উত্তর -আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৯৮ খৃ. রাজধানী কার্থেজ হইতে বায়যানটাইনগণ বিতাড়িত হয় এবং তিউনিসে ইসলামের আগমন ঘটে ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই মুসলমানগণ আলজিরিয়ার মধ্য দিয়া মরক্কোতে প্রবেশ করিতে শুরু করে। এই এলাকায় স্থায়ী বসবাসকারী বার্বারগণ মুসলমানদের অগ্রাভিযানে বাধা প্রদান করিলে তিউনিসিয়ার (ইফরীকি’য়্যা) নব নিযুক্ত গর্ভনর মূসা ইবন নুসায়র (৭০৮ খৃ.) তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন। ইফরীকি’য়্যা বা উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমানগণ মূসা এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি তারিক ইব্‌ন যিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন অভিযান করে। ইফরীকি’য়্যা যখন মুসলিম শাসনাধীনে সহিষ্ণুতা ও সুবিচারের আর্শীবাদপুষ্ট হইয়া পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত ছিল তখন আইবেরিয়ান উপদ্বীপ ভিজিগথ শাসনের কঠোর ও কঠিন যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতেছিল (Ameer Ali History of the Saracens, London 1951, p. 106)। ভিজিগথ শাসকগণ তাহাদের পূর্ববর্তী সুয়েভী (Shevi) এবং ভ্যান্ডাল শাসকদের অপেক্ষা নিজদিগকে উত্তম বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হয়। স্পেন প্রায় তিনশত বৎসর (৪০৯-৭১২ খৃ) ভিজিগথ শাসনাধীনে ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তাহার পূর্ববর্তী শাসকদের দুঃশাসন ও অন্যায়-অত্যাচারের কলঙ্ক বিদূরিত করিতে পারে নাই। উপরন্তু তাহাদের দুঃশাসনে জনগণের দুঃখ-কষ্ট আরও বাড়িয়া যায় (Imamuddin, Political History of Muslim Spain, P. 1969, P. 7)। তাহাদের শাসন ছিল ধ্বংস, গণহত্যা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্দয়ভাবে দমন এবং আক্রমণকারী বার্বারদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পরিপূর্ণ (Lauis Bernand; The History of Spain , London 1956, P. 18)। সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, ভিজিগথ রাজতন্ত্র রোমান ইতিহাসের ব্যর্থতার কলঙ্কময় প্রতীক (ঐ, পৃ. ৭)।

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনে অত্যন্ত শোচনীয় সামাজিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। এখানে যোজন ব্যাপী ব্যবধান লইয়া শাসক ও শাসিত নামে দুইটি পৃথক সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। শাসক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজা, আমত্যবর্গ যাজক, সামন্তরাজ ও অভিজাত। অপরদিকে বর্গাদার, ভূমিদাস (সাফ), ক্রীতদাস ও ইয়াহূদীগণ ছিল শাসিত শ্রেণীভুক্ত (ঐ, পৃ. ৭-৮)। সমাজের এই বৈষম্যমূলক শ্রেণী-বিন্যাস ও বিভেদ সমাজদেহ জর্জরিত করে। জুয়া, মদ, শিকার, ঘোড়দৌঁড় এবং ভূরিভোজের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণী যথেচ্ছ জীবন উপভোগ করিত। তাহারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও অলংকারে নিজদিগকে মোহনীয়ভাবে সুসজ্জিত করিয়াও দর্প প্রকাশ করিত। তাহারা বাস করিত সুরম্য ও সুশোভিত প্রাসাদে। কিন্তু যাহারা জীবনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে এই অর্থ, বিত্ত ও দর্প যোগাইত তাহাদের দিকে নজর দেওয়ার সময় তাহাদের ছিল না। প্রজাকুলের কল্যাণের প্রতি তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। প্রজাদের আনুগত্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের উপরই যে তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনীয় রোমান ও

ভিজিগথ অভিজাত সম্প্রদায় সুবিধাভোগী শ্রেণী (Clasas devadas) নামে অভিহিত ছিল। প্রশাসনে ইহাদের বিশেষ প্রভাব ছিল (ঐ, পৃ. ৮)।

স্পেনীয় সমাজ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ভূস্বামীবৃন্দের স্তরটি যাজক ও বর্গাদারদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। অনধিক পঁচিশ একর ভূমির মালিক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমি হস্তান্তরের অধিকার ছিল না। ফসল উৎপাদনের জন্য তাহারা জমি বর্গা দিত। কোন কারণে ফসল উৎপাদিত না হইলে বর্গাদারগণ নিজেদের তহবিল হইতে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করিত। অনেক সময় বর্গাভূমি ছাড়িয়া তাহারা সেনাবাহিনীতে অথবা অন্য পেশায় জীবিকা অন্বেষণ করিত।

স্পেনের সর্বনিম্ন শ্রেণী গঠিত ছিল হতভাগ্য ভূমিদাস (সাফ) ও ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে । ভূমিদাসগণ জমিচাষ করিত এবং কৃষি-শ্রমিক ও সেনাবিভাগের জনবল সরবরাহের কঠিন দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাহাদের উপর (Dozy, Spanish Islam, p. 229)। তাহাদিগকে জমির খাজনা ছাড়াও ব্যক্তিগত কর দিতে হইত এবং সামান্য ত্রুটিতে দৈহিক নির্যাতনও ভোগ করিতে হইত। ভূমির সহিত তাহাদের ভাগ্য একেবারেই বাঁধা ছিল। মনিব জমি বিক্রয় করিয়া দিলে তাহারাও বিক্রয় হইয়া যাইত। ব্যাপকভাবে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত গথিক সমাজে পণ্য সামগ্রীর ন্যায় ক্রীতদাসগণ প্রতিনিয়ত বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইত। ৪০০০ হইতে ৮০০০ ক্রীতদাস এক এক ব্যক্তির অধীনে থাকিত। ভিজিগথ শাসন কালে ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মানবীয় অধিকার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। দূর-দূরান্ত হইতে পানি বহন ও জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ এবং জমি চাষ করিয়া তাহারা জীবনের মূল্য দিত। তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। তাহাদের কেহই কোন বস্তুর মালিক হইতে পারিত না বা কোন বস্তুকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাহারা মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারিত না। যদি পাশাপাশি দুই জমিদারীর ভূমিদাস পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইত তবে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ উভয় মালিকের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইত (History of Saracens, P. 107)। মানবতার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ ও বৈধ জৈবিক চাহিদার প্রতি নির্মম প্রহসন স্পেনের শোষিত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য শ্রেণীর মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাহারা অকথ্য যুলুম সহ্য করিয়া অপেক্ষায় ছিল এক চরম বিপ্লবের জন্য ।

মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত ও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। স্পেনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইয়াহূদীদের প্রভাব ছিল সীমাহীন। কিন্তু স্পেনের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ইয়াহূদীগণ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে কল-কারখানা, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করিয়া দেশত্যাগ করে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদিকে বিত্তবানদের কর হইতে অব্যাহতি দান, অপরদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর সীমাহীন কর ধার্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা ও কৃষি ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা, অর্থের যথেচ্ছ অপচয় ও অপব্যবহার, বৈষম্যমূলক ধন বণ্টন, নির্যাতনমূলক কর নির্ধারণ প্রভৃতি কারণে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে নামিয়া আসে আর্থিক বিপর্যয় ও দুর্ভোগ। শিল্প-কারখানাগুলিতে অতিরিক্ত করারোপের ফলে সারাদেশ অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের কবলে পতিত হয়। ভূমিদাস ও কৃষকেরা নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক করভার সহ্য করিতে না পারিয়া বন-জঙ্গলে পলায়ন করিত এবং অনেক সময় দস্যুদলে যোগদান করিত। ফলে কল-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হইত এবং সেচকার্যের অভাবে জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। ইহার ফলে যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে অচলবস্থা দেখা দেয়।

স্পেনে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা ছিল অনুপস্থিত (Some Aspects of the Socio-Economic And cultural History of Muslim Spain, P. 10)। স্পেনের ধর্মযাজক ও শাসকগণ ছিল খৃস্টান, এই কারণে তাহারা খৃস্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা নিজ ধর্মের সেবায় পরধর্মকে উচ্ছেদ ও উৎখাত করা ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিত। ইয়াহূদীগণ খৃস্টানদের কোপানলে পতিত হয়। তাহাদিগকে খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার বিরামহীন প্রচেষ্টা চলিত। স্পেনের খৃস্টান কর্তৃপক্ষ ইয়াহূদীদিগকে খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার জন্য বারবার আদেশ জারী করে। ৬১২ খৃ. পরবর্তী সময়ে ৯০,০০০ ইয়াহূদীকে জোরপূর্বক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। খৃস্ট ধর্ম গ্রহণে অসম্মত ইয়াহূদীগণকে শারীরিক নির্যাতন করা হইত এবং পুত্র-কন্যাসহ ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইত। অবশ্য নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া একবার ইয়াহূদীগণ বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় (ঐ, পৃ. ১১)। এইরূপে গথিক শাসকগণ একটি মানব সমাজকে মানবীয় অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। ইয়াহূদীগণ স্বাধীন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকে (ঐ, পৃ. ১১)।

স্পেনের রাজনৈতিক আকাশ এই সময় মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে প্রদেশগুলি ছিল প্রায় স্বাধীন। তাহাদের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন ছিল না। তাহারা প্রায়ই উত্তরাধিকারী নির্বাচনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনে গথিক খৃস্টান রাজা রডারিক (বাদেটিকার ডিউক) পূর্ববর্তী রাজা উইতিজাকে হত্যা করিয়া আইবেরিয়ার সিংহাসন দখল করে এবং উইতিজার পুত্র আচিলা (Achila) ও ভ্রাতা অপাসকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করে। এই সময় সিউটার গর্ভনর ও নিহত রাজা উইতিজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান তৎকালীন প্রথানুযায়ী স্বীয় কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার রপ্ত করিবার জন্য রডারিকের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন। ফ্লোরিন্ডা রডারিক কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া বিপথগামিনী হয় (ঐ , পৃ. ১৪)। রডারিকের আচরণে জুলিয়ান গভীরভাবে মর্মাহত হন। জুলিয়ান আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ও আফ্রিকায় বসবাসরত দেশত্যাগীদের অনুরোধে দেশকে বেআইনী দখল মুক্ত করিবার জন্য সংকল্প করেন এবং স্পেনের অবস্থা সম্পর্কে মূসাকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গোপন তথ্য সরবরাহ করেন। অতীতে যেই জুলিয়ান দীর্ঘদিন মুসলিম অধিকার হইতে সিউটাকে রক্ষা করেন, পরবর্তী কালে সেই জুলিয়ানই সিউটাকে শুধু মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরই করেন নাই; উপরন্তু স্পেন অধিকার করিতে তারিক ও মূসাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা সক্রিয়ভাবে দান করেন (ঐ, ১৪-১৫)।

দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জনসাধারণ, দুঃখী ক্রীতদাস, দুর্ভাগা ভূমিদাস এবং

উৎপীড়িত ইয়াহূদীগণ সকলে সমবেতভাবে একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষা করিতেছিল (ঐ, পৃ. ১৫)। অবশেষে সিউটার গর্ভনর জুলিয়ান এবং উত্তর আফ্রিকার স্পেনীয় উদ্বাস্তুদের অনুরোধে মূসা ইব্ন নুস'ায়র স্পেনে অভিযান পরিচালনার জন্য দামিশকের খলীফা আল-ওয়ালীদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণের অনুমতি দান করেন। মূসা তাঁহার মুক্তদাস তারিককে ৭১০ খৃ. জুলাই মাসে চারি শত পদাতিক ও এক শত অশ্বারোহী বার্বার সৈনিকসহ স্পেনের দক্ষিণ উপকূল জরিপ এবং প্রাথমিক পর্যাবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তারিক যেই দ্বীপে অবতরণ করেন তাহা তারীফা নামে পরিচিত। তাহারা চারিটি জাহাজযোগে স্পেনে পৌঁছেন। জরীপশেষে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং অভিযান পরিচালনার অনুকূলে প্রতিবেদন পেশ করেন (ঐ, পৃ. ১৬)। তারিকের এই সাফল্যের সংবাদে মূসা ৮ রাজাব, ৯২/৩০ এপ্রিল, ৭১১ খৃ. ৩০০ আরব ও ৭০০ বার্বার সৈন্যের একটি দল স্পেনে প্রেরণ করেন। পরবর্তী কালে সৈন্যসংখ্যা ১০,৩০০ অথবা ১২,০০০-এ উন্নীত হয়। কাউন্ট জুলিয়ান কর্তৃক প্রেরিত চারিটি জাহাজে তারিক ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেনের পাবর্ত্য অঞ্চলে অবতরণ করেন। স্থানটির নামকরণ হয় জাবালুত ত'ারিক (তারিকের পাহাড়)। পরবর্তী কালে তিনি সেইখানে রাভাত নামক একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পাহাড়টিকে পরবর্তী আক্রমণ পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করিয়া তিনি জিব্রালটার হইতে উপকূল পথে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং কারতেয় ও লাগুন দে জান্দা (Lagun de Janda) অধিকার করেন। স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর থিও ডোমি রডারিককে মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে অবহিত করে (ঐ, পৃ. ১৭)।

মুসলমানদের স্পেনে আগমনের সংবাদে আতঙ্কিত রডারিক অতি দ্রুত এক লক্ষের একটি সম্মিলিত বাহিনী সুসজ্জিত করে। ২৭ রামাদান, ৯২/১৯ মে, ৭১১ সালে ওয়াদী লাক্কোর উপত্যাকায় লাগুন দে জান্দা নদীর উপকূলে মেদিনা সিদোনিয়ার শহর ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারিকের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে গথিক বাহিনী ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে। হাজার হাজার গথ সৈন্য নিহত হয়। রাজা রডারিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে যাইয়া নদীতে নিমজ্জিত হইয়া মারা যায়। এখান হইতেই স্পেনে ইসলামের অগ্রযাত্রার সূচনা হয়। একটি দিনের একটিমাত্র প্রচণ্ড আক্রমণে ইউরোপে মুসলিম আধিপত্যের সোপান প্রোথিত হইল এবং ইউরোপের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজন হইল (R. Dozy, Spanish Islam, London 1913, P. 232)।

এমন অভাবনীয় সাফল্যের কথা তারিক চিন্তাও করিতে পারেন নাই। তিনি মূসা ইবন নুস'ায়রকে সাফল্যের ফলাফল অবহিত করেন। উত্তরে মূসা স্পেন অগ্রাভিযান স্থগিত রাখিতে বলেন। কিন্তু বিচক্ষণ সমরবিদ তারিক ভিজিগথদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ না দিয়া অনতিবিলম্বে পরবর্তী আক্রমণ করিবার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি গনীমতের মাল লইয়া আফ্রিকায় না ফিরিয়া রডারিকের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অবাক করিয়া শহরের পর শহর দখল করেন। তাহারা এলভিরা, আর্কিডোনা, এভিজা, কর্ডোভা দখল করেন এবং বিনা বাঁধায় টলেডোর পতন হয়। ইহা ছাড়া ভ্যালেন্সিয়া ও আলজেসিরার মধ্যবর্তী এলাকা অতি দ্রুত মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়। মূসা ইব্ন নুস'ায়র আনদালুস বিজয়ের সম্পূর্ণ গৌরব তারিক অর্জন করিতেছেন দেখিয়া স্পেনের দিকে অগ্রসর হন এবং আরবদের সমন্বয়ে গঠিত আঠারো হাযার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া রামাদান ৯৩/জুন ৭১২ সালে স্পেনের ভূখণ্ডে উপনীত হন। মূসা প্রথমেই সেদিনা, সিদোনিয়া ও কারমোনা দখল করেন। অতঃপর নিয়েবলা ও বেলা বিজিত হয়। বিজয়ী বেশে মূসা টলেডোর নিকটবর্তী তারাভেরাতে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই তারিকের সহিত মিলিত হন। তাহাদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে সারাগোসা, বার্সিলোনা, আস্তুরিকা, লিওন, আসায়্যা ও লেগিও পদানত হয়। ৭১৪ খৃ. উদ্যমী সেনাপতি মূসা যখন পিরেনীজ পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া ফরাসী সীমান্ত হইতে সমগ্র ইউরোপ বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে রাজধানী দামিশ্ক প্রত্যাবর্তনের জন্য খলীফা আল-ওয়ালীদের জরুরী নির্দেশ লাভ করেন। স্পেন ত্যাগের পূর্বে মূসা সদ্য বিজিত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইভাবে স্পেন উমায়্যা খিলাফাতের একটি প্রদেশে পরিণত হইল এবং ইহার আরবী নাম হইল আল-আনদালুস। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে মধ্যযুগের ইউরোপের সুন্দরতম ও বৃহত্তম প্রদেশগুলির অন্যতম এই উপদ্বীপটি তাঁহারা জয় করেন। কয়েক শতাব্দী এই উপদ্বীপ বিজয়ীদের দখলে ছিল (P.K. Hitti, The History of the Arabs, P. 498)।

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইউরোপের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। বর্বরতা, অজ্ঞতা, আত্মকলহে অতিষ্ঠ, যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসম্বাদে জর্জরিত স্পেনের সাধারণ জনগণ মুসলমানদিগকে তাহাদের ত্রাণকর্তা ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বিবেচনা করিয়া দীর্ঘ দিনের নির্যাতন ও নিগ্রহের যাঁতাকল হইতে হাফ ছাড়িয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মুসলমানগণ স্পেন দখলের পর সেখানকার মানুষের জীবনে নতুন করিয়া আর কোন অসহনীয় অত্যাচার নামিয়া আসে নাই (ঐ, পৃ. ৫১০)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরবদের স্পেন বিজয় একটি আশীর্বাদ হইয়া আসিয়াছিল (Dozy, Spanish Islam, 1913, P. 236)।

স্পেনে মুসলিম শাসন শুরু হইলে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়সহ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর একাধিপত্য খর্ব হয়, ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি হয় এবং বঞ্চিত খৃষ্টানরা ভিজিগথগণ কর্তৃক হরণকৃত অধিকার ফিরিয়া পায় (The History of the Arabs, P. 510)। সেইখানে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের সাম্যের শাশ্বত বাণী প্রচারিত হয় এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকেই ইসলামের সামাজিক সুবিচারে আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপদ্বীপটিতে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খৃষ্টানগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় (ঐ, পৃ. ৫২০)। তবে স্পেনের জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হইতে কখনও বাধ্য করা হয় নাই (T. W. Arnold, The Preaching of Islam, P. 136)।

গথিক শাসনে সর্বাধিক নির্যাতিত ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাসগণ। তাহারা মুসলমানদিগকে সাদরে বরণ করে এবং তাহাদের ভাগ্য

মুসলমানদের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করে। এই সকল নিম্নশ্রেণীর ক্রীতদাসগণই ছিল স্পেনে প্রথম ধর্মান্তরিত মুসলিম (ঐ, পৃ. ১৩২)। অভিজাত খৃস্টানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রকৃতপক্ষে নব ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষিত হইলেও অনেকেই ধর্মান্তরিত হয় সামাজিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা কেবল লোক দেখানোর জন্য ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই, বরং ধর্মের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা লইয়া ধর্মান্তরিত হয়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর স্পেনীয় এই সকল মুসলমান নিজদিগকে তাহাদের নব বিশ্বাসের গর্বিত অনুসারী হিসাবে প্রকাশ করিত এবং তাহারা আরব অভিজাতদের বিলাস-বহুল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান মুসলিম ধর্মবেত্তাগণের সমর্থন লাভ করে (ঐ, পৃ. ১৩২)।

স্পেনের খৃস্টান প্রজাকুলের প্রতি মুসলিম শাসকদের সহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে (ঐ, পৃ. ১৩৬)। খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণকে স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম পালন করার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। যত দিন পর্যন্ত তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করিত ততদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণ তাহাদের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ নীতি অনুসরণ করিতেন না। সুতরাং অমুসলিমদের অবস্থা পূর্ববর্তী সময়ের খৃস্টান শাসকদের অধীনে যেইরূপ ছিল মুসলিম শাসকদের অধীনে তাহা অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় (Sayyed Fayyaz Mahmud, A Short History of Islam, P. 176)। আন্ত-বিবাহ খুবই স্বাভাবিক ছিল। কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করিয়াই মূসার পুত্র আবদুল আযীয রাজা রডারিকের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। অনেক খৃস্টান আরব নাম গ্রহণ করে এবং খতনা প্রথা গ্রহণ করে (ঐ, পৃ. ১৩৬)। উপদ্বীপটিতে মুসলমানদের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এক তথ্যে দেখা যায় যে, খৃস্টানগণ চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় ৭৪৮ খৃ.-এর মধ্যে অর্ধেক গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় (A Political History of Muslim Spain P. 27)। মুসলমানদের আবাসনে স্পেনে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইউরোপে ধর্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়।

আনদালুসিয়ার উমায়্যা আমীরদের শাসনামলে (৭১৪-৭৫৬ খৃ.) আমীরগণ ইসলামী শাসন সম্প্রসারণের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিস্ফল অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহারা পিরেনীজ অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন (History of The Arabs, P. 499)। সেনাপতি ও আমীর আল-হুর এ্যাকুইটেনের ডিউকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে উৎসাহিত হইয়া সামরিক অভিযান শুরু করেন এবং তাঁহার উত্তরসুরি আস্-সাম্হ· ইব্ন মালিক আল-খাওলানী ইহা অব্যাহত রাখেন। সাম্হ· আমীর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরেই সেপ্টিমানিয়ায় খৃস্টানদের বিদ্রোহ দমনের জন্য অগ্রসর হইয়া এ্যাকুইটনের রাজধানী তুলুস অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৭২১ খৃ.-র মে মাসে ইহা অবরোধ করেন। তুলুসের এই প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাম্হ· নিহত হন। আনবাসা-এর শাসনামলে (৭২১-২৫ খৃ.) মুসলিম সৈন্যগন উত্তর দিকে রোণ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আউতুনে উপস্থিত হয়। মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বারগুইন্ডি প্রদেশ অধিকার করে। জামিন ও বন্দীদের প্রতি তাঁহার মহানুভবতা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ ব্যবহার দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলমানদের অবস্থানকে শক্তিশালী করিতে সাহায্য করে (The political History of muslim Spain, পৃ. ৩৫)। হিশাম ইবন উবায়দ কিলাবীর সময় (৭২৯-৭৩০) পিরেনীজের অপর পার্শ্বে অবস্থিত লিওন, মাসোন ও অন্যান্য স্থান মুসলমানদের হস্তগত হয়। সুদক্ষ প্রশাসক ও মাযাব সেনাপতি আবদুর রাহমান আল-গাফিকী (৭৩০-৭৩২ খৃ.) পিরেনীজের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অপর একটি পথে ৭৩২ খৃ. বসন্তকালে এক লক্ষ সৈন্য লইয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। তিনি রোন নদীর তীরে আলেস অধিকার করেন। তাঁহার আগমন সংবাদে ডিউক ইউডেস রাজা চার্লসের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করিয়া এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে। পয়টিয়ার্স (Poitiers) ও তুরসের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যখন ফ্রান্সের পরাজয় অত্যাসন্ন সেই মুহূর্তে গনীমত সংগ্রহের জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। আবদুর রহমান শৃংখলা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। দশম দিবস সন্ধ্যাবেলায় যুদ্ধ পরিচালনা করিবার সময় তিনি নিহত হন। সেনাপতির মৃত্যুতে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে (ঐ, পৃ. ৩৭)। তুরসের যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে চার্লস মার্টেল পরাজিত হইলে সম্পূর্ণ পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিত। সেই দিন যদি আরবরা জয়লাভ করিত তাহা হইলে প্যারিস ও লন্ডনে গীর্জার ধ্বনির পরিবর্তে মসজিদের আযান শুনা যাইত এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন পাঠ করা হইত। আধুনিক যুগের অনেক ঐতিহাসিকের মতে তুরসের যুদ্ধটি ইতিহাসের চূড়ান্ত যুদ্ধগুলির অন্যতম (P.K., Hitti, প্রাগুক্ত, P. 500)।

অধীনস্থ আমীরদের শাসনামলে আনদালুসিয়ায় বসবাসকারী প্রজারা ছিল অমুসলিম, নব-মুসলিম ও মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত। খৃস্টানগণ তাহাদের সম-ধর্মাবলম্বী গথ শাসনামলের অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নিঃসন্দেহে তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। (S.M. Imamuddin, প্রাগুক্ত P. 47) আরব ও বার্বার বিজয়ীরা স্পেনকে তাহাদের নিজের দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলে। তাহারা সেইখানে বসতি স্থাপন করে, নিজস্ব গ্রাম ও শহরে হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা করে। একই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা এক একটি গ্রাম অথবা মহল্লা গড়িয়া উঠে। মুসলমানগণ মসজিদ স্থাপন করে এবং মসজিদের পার্শ্বে মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করে। সাম্হ· ইবন মালিক আল-খাওলানী সারাগোসায় একটি জামে মসজিদ স্থাপন করেন (ঐ, পৃ. ৩৪) এবং তাঁহার দরবারে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের আহবান জানান। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা চালু করেন। তথাপি সেখানকার মুসলিম সমাজ বার্বার ও আরবদের সাংস্কৃতিক ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আনদালুসিয়ার দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত লোকেরা পার্বত্য ও গ্রামীণ এলাকায় তাহাদের পুরাতন জাতীয় চরিত্র ও প্রচলিত সংস্কৃতি বজায়

রাখিলেও শহর অঞ্চলে তাহারা ইহা রক্ষা করিতে পারে নাই (P.K. Hitti, প্রাগুক্ত, P. 510)। খৃস্টান ক্রীতদাস ও ভূমিদাসগণ ইসলামকে মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতার উপায় হিসাবে মনে করিয়া সুবিধা লাভের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অনেকেই প্রচ্ছন্ন খৃস্টান হিসাবে থাকিয়া যায় (S. F. Mahmud, প্রাগুক্ত, P. 176)। নও মুসলিম হিসাবে তাহারা একটি সামাজিক শ্রেণীর জন্ম দেয়। আরবগণ তাহাদিগকে মুওয়াল্লাদুন (এ.ব. মুওয়াল্লাদ, গৃহীত, অনুমোদিত) বলিয়া ডাকিত। স্পেনীয়গণ তাহাদিগকে মূলাদিশ বলিত (Hitti, প্রাগুক্ত, P. 570)। মুওয়াল্লাদদের বেশ কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর হইলেও আরব মুসলমানগণ তাহাদিগকে তাহাদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। বিজয় পরবর্তী প্রথম শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই মুওয়াল্লাদগণ অনেক শহরে বাসিন্দাদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হয় এবং প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারাই প্রথম বিদ্রোহ করে (ঐ, পৃ. ৫১০)। উমায়্যা যুগে মাওয়ালী এবং আব্বাসী যুগে পারসিক সৃষ্ট সমস্যার ন্যায় স্পেনে ইহা ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যা। ইহার সাধারণ কারণগুলির একটি ছিল নও-মুসলিমদের হীনমন্যতাবোধ। আরব অভিজাতদের মর্যাদার প্রতি তাহারা ঈর্ষা পোষণ করিয়া অসন্তোষের বিস্তার ঘটায়। এমনকি তাহারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিত (S. F. Mahmud, প্রাগুক্ত, P. 176)।

আনদালুসিয়ায় উমায়্যা অধীনস্থ আমীরদের শাসনামলে (৭১৪-৭৫৬ খৃ.) অরাজকতা বিরাজমান ছিল। আরব, বার্বার, সিরীয় এবং নওমুসলিমগণ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। বানূ আদনান, বানূ হাশিম, বানূ উমায়্যা, বানূ মাখযূম, বানূ ফিহ্‌র এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলি জীবিকার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আনদালুসে বসতি স্থাপন করিয়া পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। তাহারা সুন্নী আদর্শে বিশ্বাসী মুদারী এবং শী'আ মতে বিশ্বাসী হিময়ারী এই দুই পুরাতন গোষ্ঠীর অধীনে সংগঠিত হয়। কালবী (দক্ষিণ আরব) এবং কায়সী (উত্তর-আরব) গোত্রদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের ফলে আনদালুসিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। বার্বার ও নও মুসলিমগণ আরব শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পুরাতন মনিবের স্থলে নূতন মনিবকে স্বাগতম জানায়। আনদালুসের উমায়্যা মাওয়ালী ও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসগণ ছিল আবদুর রহমানের সমর্থক। সর্বোপরি আবদুর রহমান নিজে ছিলেন একজন সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জানিতেন কিরূপে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হয়।

স্বাধীন উমায়্যা আমীরদের রাজত্ব

যাব নদীর তীরে আব্বাসীদের হস্তে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয় হইলে উমায়্যা খিলাফতের অবসান ঘটে এবং ৭৫০ খৃ. মার্চ মাসে আব্বাসী খিলাফতের সূচনা হয়। আব্বাসীরা উমায়্যাদের সহিত অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করে। উমায়্যাদের অনেককেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। একজন উদ্যমশীল ও বুদ্ধিমান তরুণ উমায়্যা শাহযাদা আবদুর রহমান আব্বাসীদের হত্যাকাণ্ড এড়াইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আনদালুসিয়ায় পলায়নের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করেন। তিনি ইউফ্রেতিসের রাহতে পলায়ন করেন (The Political History of Muslim Spain, প্রাগুক্ত, P. 52)। সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবকটি সেইখান হইতে ফিলিস্তীন হইয়া স্পেন পর্যন্ত পথে পথে আব্বাসী গুপ্তচরদের অগোচরে ভ্রমণ করেন। তাঁহার সাথী ছিল বদর নামক একজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য মুক্তদাস। আবদুর রহমান অবশেষে মরক্কোর পশ্চিম উপকূলের সিউটা বন্দরে পৌঁছেন এবং তাঁহার মাতুল বারবারদের সাহায্য কামনা করেন। তাহারা সিরীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং ঐ সময় সিরীয়গণ স্পেনের কিছু অঞ্চলে ক্ষমতাসীন ছিল। তাহারা অনেক দিন বানূ উমায়্যার অধীনস্থ ছিল এবং এই দুঃসাহসী উমায়্যা শাহযাদার সঙ্গে তাহাদের ভাগ্য জড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহারা আনদালুসিয়ায় আবদুর রহমানের পক্ষে কাজ শুরু করে এবং ইয়ামানীদেরকে তাহাদের পক্ষে আনিতে সক্ষম হয়। সমস্ত কিছু প্রস্তুত হইলে তাহারা উমায়্যা শাহযাদাকে আনদালুসিয়ায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ জানায়। ভাগ্যান্বেষী আবদুর রহমান সেইখানে গমন করেন এবং সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। একটির পর একটি শহর তাহার সেনাদলের হস্তে পতিত হয় এবং তিনি আনদালুসিয়ার আব্বাসী শাসনকর্তা ইয়ূসুফ আল-ফিহ্‌রীকে কর্ডোভার নিকট এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং রাজধানী কর্ডোভা অধিকার করেন। ৭৫৬ খৃ. আবদুর রহমান আন্দালুসিয়ার অধিপতি হন। তিনি আন্দালুসিয়ার স্বাধীন উমায়্যা আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ৯২৯ খৃ. তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক খিলাফত ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত বলবত ছিল।

প্রথম আবদুর রহমান ৩২ বৎসর (৭৫৬-৭৮৮ খৃ.) আনদালুসিয়া শাসন করেন। একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি আরব, বার্বার, ইয়ামানী, সিরীয় ও ফিহ্‌রীদের বৈরীতার মুকাবিলা করিয়া শান্তি স্থাপন করেন এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দূর করার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেন। এই উদ্যোগে সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও তিনি তাহাদের মধ্যে একটি ঐক্যানুভূতি ও ঐক্যের দৃঢ়তা উজ্জীবিত করেন। তিনি আনদালুসিয়ায় এমন একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন যাহা কয়েক পুরুষ পর্যন্ত টিকিয়াছিল। তিনি আমীর উপাধি গ্রহণ করেন এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক অশান্তি দূরীভূত করিতে বিরামহীনভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকেন। তাহার আকাঙ্ক্ষিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি নানা বাঁধার সম্মুখীন হন। তিনি ৭৬১ খৃ. আনদালুসিয়ায় আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের নিয়োজিত শাসক 'আলা ইব্‌ন মুগীছকে পরাজিত করিয়া হত্যা করেন। তিনি তাহার ছিন্ন মস্তক আব্বাসী খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। খলীফা মানসূর তাঁহাকে কুরায়শের বাজপাখী বলিয়া অভিহিত করেন (S. M. Mahmud, প্রাগুক্ত, P. 61)। তিনি আনদালুসিয়ায় ফ্রাঙ্গের সম্রাট শার্লিমানের গতিরোধ করেন এবং তাহার অভিযান ব্যর্থ করেন। তিনি রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। আবদুর রহমান অনেক জনকল্যাণমূলক ও সংস্কারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রথম আবদুর রহমান একজন দরদী ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি রাজধানীতে পানি সরবরাহের জন্য খাল খনন করেন এবং অনেক চমৎকার ফুল ও ফলের বাগান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন। কর্ডোভাতে একটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম ও সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় কর্ডোভার জামে মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত

কয়েকটি গীর্জা পুনঃনির্মাণের অনুমতি দান করেন। তাঁহার সময়ে নির্মিত কর্ডোভা মসজিদের কাঠের সিলিং একটি উত্তম নিদর্শন। মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদরাসা নির্মিত হয় তাঁহার সময়ে যাহা পরবর্তী কালে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার দরবারের বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত কবি আবূ আল-মুতাহাশশা, আইনবিদ শায়খ আবূ মূসা হ'ওয়ারী, ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রবিদ শায়খ গাযী ইব্ন ক'য়স যিনি আবদুর রহমানের শাসনামলে মালিক ইব্ন আনাসের (৭১৫-৯২ খৃ.) আল মুওয়াত্তা' আনদালুসিয়ায় আনয়ন করেন। ঈসা ইব্ন দীনার ইয়াহ্'য়া ইব্ন ইয়াহ্'য়া এবং সাঈদ ইব্ন হাসান তাঁহার দরবারের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। আনদালুসিয়ায় মুসলিম সভ্যতার বিকাশে তাঁহার অবদান ছিল প্রশংসনীয়।

আবদুর রাহমান মৃত্যুর পূর্বে তদীয় পুত্র হিশামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। হিশাম মাত্র আট বৎসর (৭৮৮-৭৯৬ খৃ.) স্পেন শাসন করেন। তিনি ভাইদের বিদ্রোহসহ একাধিক বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সফল অভিযান প্রেরণ করেন। ধর্মভীরু শাসক হিশাম পিতার ন্যায় ফুক'াহার (ইসলামী আইন বিশারদ) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে উমায়্যা শাসক দ্বিতীয় উমার ইব্ন আবদুল আযীযের সঙ্গে তুলনা করা যায় (S.F.Mahmud, প্রাগুক্ত, P. 73)। তিনি চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ইমাম মালিক ইব্ন আনাসের ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। আলী (রা)-র সমর্থক মুহাম্মাদ আবদুল্লাহর প্রতি সমর্থনের কারণে আব্বাসী খলীফা মানসূ'র তাঁহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন। মদীনাতে অবস্থানরত ইমাম মালিকের নিকট ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়া আনদালুসিয়ায় তাহা প্রচার করিবার জন্য হিশাম ছাত্রদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন। আনদালুসিয়ায় ইমামের শিষ্যদের মধ্যে ইয়াহ্'য়া ইবন ইয়াহ্'য়া ও ঈসা ইবন দীনারের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম হিশাম তাঁহার সাম্রাজ্যে মালিকী মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। রাষ্ট্রীয় কার্যে মালিকী মতবাদ অনুসরণ করা হইত। পূর্বে আনদালুসিয়ায় আল-আওযা'ঈ সুন্নী মাযহাবের মতবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন। হিশাম বিচারক ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অগ্রাধিকার প্রদান করিতেন ইমাম মালিকের শিষ্যদের। শাবাতূন নামে অধিক পরিচিত আবূ আবদিল্লাহ্ জায়্যাদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন জায়্যাদ আল-লাখমী (মৃ. ২০৪/৮১৯) এবং বারবার ফিক্'হ্বিদ ইয়াহ্'য়া ইব্ন ইয়াহ্'য়া আল-লায়ছী মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইমাম মালিকের মতবাদকে তাহাদের লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করেন। মুসলিম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য সর্বপ্রথম গ্রন্থ কিতাব আল-মুওয়াত্তা প্রণয়ন করেন ইমাম মালিক (র)। এই গ্রন্থের অনুলিপি স্পেনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মালিকী মতবাদে বিশ্বাসী ধর্মবেত্তাগণ শুধু উচ্চ রাজপদেই আসীন ছিলেন না, তাহারা আমীরকে সামান্যতম ইসলামী আদর্শ বিরোধী আচরণের জন্য দারুণ ভর্ৎসনা করিতেন। ফলে আমীরকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। ক্ষমতালোভী এবং বৈষয়িক যশ ও খ্যাতির প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হইয়া খলীফা হিশাম ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। তাহাদের আচরণ হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায় যে, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের ছদ্মবেশে রাজনীতি করা। তিনি খৃস্টানদের প্রতি অসহিষ্ণু না হইলেও ধর্মবেত্তাদের প্রভাবের কারণে খৃস্টানদিগকে দূরে রাখিতেন। তাঁহার সময়ে স্বাভাবিক সহনশীলতা প্রদর্শন করিলে হয়তো পূর্ববর্তী শাসকদের আমলের ন্যায় খৃস্টানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত (ঐ, পৃ. ৭৫)।

আনদালুসিয়ায় মালিকী মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন এবং পরবর্তী কালে আনদালুসিয়ার বিদ্যালয়সমূহে মালিকী মতবাদ অনুসারে আইন শিক্ষাদানের জন্য তাহা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খলীফা হিশাম নব প্রতিষ্ঠিত আনদালুসিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের খৃস্টান শক্তির ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন।

৭৯৬ খৃ. হিশামের মৃত্যুর পর পুত্র ১ম হাকাম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। হাকাম ছিলেন বুদ্ধিমান, চতুর ও মদাসক্ত। মদাসক্তির কারণে ধর্মীয় নেতাদের সহিত তাঁহার মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। হিশামের রাজত্বকালে এই ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। প্রশাসনের উপর তাঁহাদের প্রভাব ছিল অসামান্য। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট ধর্মবেত্তা ইয়াহ্'য়া ইব্ন ইয়াহ্'য়া এবং ঈসা ইব্ন দীনার। ফকীহগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহাদের প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল আমীরের মদ্যপ চরিত্র এবং দেহরক্ষী হিসাবে নিগ্রোদের নিয়োগ। তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হয়। ফাক'ীহ্দের আন্দোলনে সমর্থন দেন নবদীক্ষিত মুসলমানগণ (মুওয়াল্লাদূন) ও অভিজাতবর্গ (ঐ, পৃ. ৮০)। ৭০৫ খৃ. একদিন উত্তেজিত জনতা রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় আমীরকে পাথর ছুড়িয়া আক্রমণ করে এবং ধর্মবেত্তাগণ ইহার সমর্থন জানায়। পরবর্তীতে আল-হাকামকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে এই চক্রীদলের ৭২ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যা করা হয় (History of the Arabs, P. 512)। একের পর এক অভ্যুত্থান ঘটে এবং ৮১৪ খৃ. ইয়াহ্'য়া ইব্ন ইয়াহ্'য়া নামক একজন বারবার ফাক'ীহ্র নেতৃত্বে একটি গুরুতর বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা আল-হাকামকে তাঁহার রাজপ্রাসাদে বন্দী করে। তাঁহার অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্রোহীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে। শহরতলির জনসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। শত শত ব্যক্তিকে হত্যা এবং হাজার হাজার ব্যক্তিকে আনদালুসিয়া ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ঐ, পৃ. ৫১২)।

আল-হাকামের রাজত্বকালে প্রথম অষ্টুরিয়ো লিওজি (Austurio-Leonese) যুবরাজদের এবং আনদালুসিয়ার সীমান্তে ফ্রাঙ্ক (Frank)-দের আক্রমণাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে ক্রমশ খৃস্টানদের পুনর্দখল Reconquesta-এর পথে সুগম হয়। অবশেষে বার্সেলোনা (Barcelona) পুন হস্তগত হয়। আল-হাকাম ২০৬/৮২২ সালে ইনতিকাল করেন।

অতঃপর হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রাহমান (৮২২-৮৫২ খৃ.) আমীর হিসাবে সিংহাসনে উপবেশন করেন। পিতার তুলনায় আবদুর রহমান ছিলেন একজন সহনশীল শাসক ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। কথিত আছে, আবদুর রাহমান তাঁহার রাজত্বকালে ধর্মবেত্তা আবূ মুহাম্মাদ ইয়াহ্'য়া ইব্ন

ইয়াহ্‌ইয়া, গায়ক জিরাব, খোজা ক্রীতদাস নাসর ও সুলতানা তারুব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

তাঁহার শাসনামলে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। আনদালুসিয়া এই সময় সমসাময়িক ফ্রান্স ও ইটালী অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। তাহারা আরবদের রীতিনীতি গ্রহণ করে, আরবী ভাষা বলিতে এবং আরবদের ন্যায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। এই সকল খৃস্টানদের জন্য বাইবেলকে আরবীতে অনুবাদ করিতে হয়। ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও যাজকগণ আশংকাগ্রস্ত হয় এবং ইহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। এই সকল যাজকের কিছু সংখ্যকের ক্রোধ এত বেশী ছিল যে, তাহাদের একজন ধর্মান্ধতায় উন্মত্ত হইয়া প্রকাশ্যে মহানবী (স)-এর প্রতি গালি বর্ষণ এবং ইসলামকে অভিশাপ দেয়। পারফেকটাস নামক উক্ত যাজককে শাস্তি দেওয়া হয়। তাহার মৃত্যুকে খৃস্টানগণ শহীদের মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করে, এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য অন্যকেও অনুপ্রাণিত করে এবং শীঘ্রই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আত্মত্যাগ একটি খেপামীতে পর্যবসিত হয়। A Short History of Islam, P. 178-179)।

দ্বিতীয় 'আবদু'র রাহমান কিছু দিনের জন্য অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃংখলা দমন করেন। তিনি যুগপৎ ফ্রাঙ্ক, গেসকোনস এবং এবরো (Ebro) উপত্যকার বানূ ক'ায়সীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, কর্ডোভায় মুজারাব (Mozarab) বিদ্রোহ দমন করেন এবং সেভিল উপকূলে যেই সমস্ত মাজূস (Norsemen) অবতরণ করিয়া ব্যাপক লুটতরাজ করিতেছিল তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া সমুদ্রের দিকে বিতাড়িত করেন। এই মহান শাসক তাঁহার প্রপিতামহ আবদুর রহমান আদ-দাখিল কর্তৃক প্রবর্তিত সিরীয় ঐতিহ্যের পরিবর্তে আব্বাসী আদর্শে রাজ্য সংগঠিত করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩১৯)। তাহার সময়ে তিনি ৮২৯ খৃ. সেভিলের এবং ৮৩৩খৃ. জীনের জামে মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। দ্বিতীয় আবদুর রহমান জামে মসজিদের সম্প্রসারণ করেন এবং তিনি ২৩৮/৮৬২ সালে ইন্তিকাল করেন।

প্রথম মুহাম্মাদ (৮৫২-৮৮৬খৃ.) দ্বিতীয় আবদুর রহমানের উত্তরাধিকারী হিসাবে আনদালুসের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার কর্মধারা অব্যাহত রাখেন। তিনি পিতার ন্যায় ততটা সহনশীল, উদ্যমী ও যোগ্যতা-সম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার শাসনামলের শেষদিকে আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইব্ন ইউনুস আল-জিল্লিকী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এই সময় দক্ষিণ আনদালুসে উমার ইব্ন হাফসূনের নেতৃত্বে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এই সমস্ত বিদ্রোহ পরবর্তী শাসকদের আমলেও অব্যাহত থাকে। উমার ইব্ন হাফসূন মুজারাব ও নওমুসলিমদের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি মুজারাব ও নওমুসলিমদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমীর প্রথম মুহাম্মাদ আল-মুনযি'র ও আবদুল্লাহ এবং খালীফা তৃতীয় আবদুর রাহমানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কাল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখেন।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মী। তিনি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। প্রথম মুহাম্মাদ রাষ্ট্র পরিচালনায় কর্ডোভা মসজিদের কাযীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী আমীর প্রাচ্য চিন্তাবিদ ও হাদীছবেত্তা বাকী ইব্ন মাখলাদকে (মৃ. ২৭৬/৮৮৯) অনুপ্রাণিত করেন। আনদালুসের শী'আ মতাবলম্বীদের মধ্যে বাকী ছিলেন সুপরিচিত। বিখ্যাত ধর্মীয় তত্ত্ববিশারদ ইব্ন আবী শায়বার মতবাদের উপর তিনি বক্তৃতা করেন। মালিকীদের এবং হাদীছের সমর্থক আনদালুসিয়ায় অন্যান্য ধর্মীয় আইনের প্রবক্তাদের তিনি সমালোচনা করেন (ঐ, পৃ. ১২১)। আইন বিজ্ঞানের ব্যাপারে বাকী হাদীছের অন্তর্নিহিত আদর্শের অনুসরণে মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের সমর্থক ছিলেন। এই মতের সমর্থন করিয়া তিনি কর্ডোভায় তাঁহার ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেন। মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থক বিখ্যাত আল-জাহি'জে'র (মৃ. ৮৬৯ খৃ.) গ্রন্থাবলী তাঁহার সময়ে উছমান ইব্ন আল-মুছ'ান্না ও ফারাজ ইব্ন সাল্লামা আনদালুসিয়ায় আনয়ন করেন (ঐ,পৃ. ১২২)। আল-জাহি'জ রচিত-কিতাবুল-হ'ায়্যান নামক গ্রন্থে জীবতত্ত্বের তুলনায় ধর্মতত্ত্ব লোককাহিনী ও দার্শনিক মতবাদ বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চিন্তাবিদগণ কর্ডোভায় ভিড় জমান এবং মুক্ত-চিন্তার চর্চায় উৎসাহ বোধ করেন। মালিকী মতবাদের উপর একখানি সম্পূরক গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথম মুহাম্মাদের শাসন আমলে প্রাচ্যের একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আনদালুসিয়ায় আগমন করেন এবং সেইখানে একটি চিকিৎসক পরিবারের সূচনা করেন।

২৭৩/৮৮৬ সালে প্রথম মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র প্রথম মুনযি'র কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁবার শাসনামলেও তাঁহার পিতার রাজত্বকালের বিদ্রোহ-বিশৃংখলা অব্যাহত থাকে। তিনি বিদ্রোহী উমার ইব্ন হাফসূনকে দমন করিতে ব্যর্থ হন। তদীয় ভ্রাতা আবদুল্লাহর প্ররোচনায় তাঁহার চিকিৎসক বিষ প্রয়োগে ৮৮৮খৃ. তাঁহাকে হত্যা করে।

আল-মুনযি'রের কোন-পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আনদালুসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে অনেক গোলযোগ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুওয়াল্লাদ এবং মোযারাবগণ (আরবীকৃত খৃস্টান) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উমার ইব্ন হাফসূনের বিদ্রোহ ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্রোহের কারণে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাহারা কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নিজ অঞ্চলে স্বাধীন হয়। তাঁহার সময়ে এলভিরায় স্পেনীয়দের এবং সেভিলে আরবদের অভ্যুত্থান ঘটে। ৩০০/৯১২ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আনদালুসিয়ায় স্বাধীন আমীরদের শাসনের অবসান হয়। এই সময় আনদালুসিয়ায় বহু জাতির সংমিশ্রণে আনদালুসিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। গোত্রীয়, জাতিগত ও ধর্মীয় বিরোধের কুফল থাকা সত্ত্বেও ইহার একটি ভালো ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বহু যুগের কূপমণ্ডুকতা হইতে মুসলমানগণ স্পেনীয়দিগকে মুক্ত করে। তাহারা এক বুদ্ধিমান, দৃঢ়চেতা, সাহসী ও কর্মঠ জাতিতে পরিণত হয় এবং একমাত্র কর্ডোভার শাসকের নেতৃত্বে তাহাদের হারানো ক্ষমতা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় (ঐ, পৃ. ১৩৩)।

আনদালুসিয়ায় উমায়্যা খিলাফতের যুগ (৩১৭-৪২২/৯২৯-১০৩১)

আনদালুসিয়ার এইরূপ সংকটময় মুহূর্তে সেখানে ইসলামের জন্য একজন রক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেবল অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকগণ

তারিক ও প্রথম আবদুর রহমানের গঠিত সাম্রাজ্যকেই হুমকির সম্মুখীন করে নাই, স্যামুয়েলের (উমার) ন্যায় বিদ্রোহীগণও বাহির হইতে ইহার উপর আঘাত হানিতেছিল। প্রথম আবদুর রহমানের পরিবার হইতে এই রক্ষকের উদ্ভব ঘটে। তিনি হইলেন এই বংশের অষ্টম শাসক তৃতীয় আবদুর রহমান। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আনদালুসিয়ায় আরবদের বিশাল রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া কর্ডোভা কেন্দ্রিক একটি নগর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তেইশ বৎসরের এই তরুণ শাসক অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি দৃঢ় সংকল্প, সাহসী, শঙ্কাহীন ও দয়ালু ছিলেন। তিনি পূর্ণ উদ্দীপনায় তাঁহার উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া শহরের পর শহর, জিলার পর জিলা এবং প্রদেশের পর প্রদেশ তিনি পুনর্দখল করেন। ৯১৭ খৃ.-এর মধ্যে তিনি সমগ্র আনদালুসিয়া জয় করিয়া তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

আমীর ও খলীফা হিসাবে তৃতীয় আবদুর রহমানের দীর্ঘ ৫০ বৎসরের (৯১২-৯৬১খৃ.) রাজত্বকাল আনদালুসিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। তিনি সকল সামরিক অভিযানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিদ্রোহী উমার ইব্ন হাফসূনকে কঠোর হস্তে দমন, সেভিল ও কারমোনা দখল ও তুদমিরে শান্তি স্থাপন করেন। ইসলাম ধর্মের একজন রক্ষক হিসাবে আবদুর রহমান আক্রমণকারী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আরাগন, নাভারে, ক্যাস্টাইল ও লিওনের পাবর্ত্য অঞ্চলের আগ্রাসী ও দুর্ধর্ষ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভিযান চালাইয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করেন।

মিসরের ফাতিমীদের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষে তাঁহার রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শী'ঈ ফাতিমীগণ ইসলামী জগতে তাহাদের নিজেদের ব্যতিরেকে অন্য কাহারও শাসন করার অধিকার নাই বলিয়া মনে করে। তাহারা আনদালুসিয়ায় উমায়্যাদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার জন্য সেখানে নিজেদের গোপন কর্মী-সমর্থক পাঠাইত। খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমান ফাতিমীদিগকে তাঁহার শক্তির গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন। তিনি মরক্কো ও আলজিরিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফাতিমীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি ফাতিমী এলাকায় ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে ৭০টি জাহাজের একটি বিরাট নৌবাহিনী প্রেরণ করেন (S.F. Mahmud, The Short History of Islam, P. 180)।

তৃতীয় আবদুর রহমান ৯২৯ খৃ. আন-নাসি'র (বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে খলীফা এবং ধর্মের রক্ষক হিসাবে ঘোষণা করেন। যাঁহার শাসনাধীনে পবিত্র মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুক'াদ্দাস থাকিবে তিনিই হইবেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা-মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত থাকিলেও একজন খলীফার মধ্যে যেই সমস্ত গুণের প্রত্যাশা করা হইত তৃতীয় আবদুর রাহমান সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন (S.M. Imamuddin, The Political History of Muslim Spain, P. 153)।

তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বে আনদালুসিয়ায় কৃষি শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান সাহিত্য চর্চা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি রাজকোষের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি বৎসর শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে ব্যয় করিতেন। আনদালুসিয়ায় মুসলিম সভ্যতা বিকাশে তাঁহার বিরাট অবদান চিরস্মরণীয়। আবদুর রহমান তাঁহার স্ত্রী আয্-যাহরার স্মরণে যাহরা প্রাসাদটি নির্মাণ করেন (ঐ, পৃ. ১৬৫)।

তাঁহার অধীনে আরব অভিজাততন্ত্রের অবসান এবং একটি নূতন ও উন্নতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। সামরিক নেতৃবৃন্দকে জায়গীর বা ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়। খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা হয়। এই সময় আনদালুসিয়ায় মুসলিম মনীষার এতই বিকাশ ঘটে যে, পাশ্চাত্যে দীন ইসলাম স্বর্ণযুগে উত্তীর্ণ হয় (S.F. Mahmud, P. 183)।

৯৬১ খৃ. তৃতীয় আবদুর রহমানের ইনতিকালের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আল-হ'াকাম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি একজন জ্ঞানী ও ন্যায়বিচারক শাসক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার শাসনাধীনে দেশটি আবদুর রহমানের বিজয়ের ফল ভোগ করে। এই যুগের শান্তি ও প্রাচুর্য শিক্ষা বিস্তারকে উৎসাহিত করে এবং তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়টি তাঁহার পৃষ্ঠ পোষকতায় শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। (S.F. Mahmud, P. 183)। সফল শাসক দ্বিতীয় আল-হ'াকাম ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু ও গ্রন্থপ্রেমিক ব্যক্তি। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কর্ডোভা ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেনের খৃস্টানগণ সাহায্যের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইত এবং অনুমিত হয় যে, তখন খৃস্টানদের পুনর্দখলের প্রচেষ্টা স্তিমিত হইয়া যায়।

আল-হ'াকামের ইনতিকালের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হিশাম আল-মুআয়্যাদ পিতার উত্তরাধিকারী হন। হিশাম সিংহাসনারোহণ কালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় রাজকার্য পরিচালনায় তাঁহার যোগ্যতা ছিল না— এই কারণে তাঁহার মাতা উত্তর স্পেনীয় বংশোদ্ভূত উম্মে সুঁবহ' নামের একজন মহিলা তাঁহার রাজ- প্রতিভূ হন। তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়েন এবং ইহাতে ব্যর্থ হন (S.F. Mahmud, P. 184)। আল-হ'াকামের সভাসদগণের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমের নামে একজন প্রতিভাবান তরুণ ছিলেন, যিনি তাঁহার সাহসিকতা , যোগ্যতা ও অধ্যবসায়গুণে প্রধান উপদেষ্টার পদমর্যাদায় হ'াজিব নামে অভিহিত হন। পরবর্তী কালে তিনি আল-মানসূ'র উপাধি গ্রহণ করেন। ইব্ন আবূ 'আমের উজ্জ্বল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হন। তিনি অতি দ্রুত দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত খিলাফতের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। এই মহান প্রতিভাধর রাজনীতিবিদ একাধারে দক্ষ সেনানায়ক ও রণকুশলী ছিলেন। প্রথমে তিনি আল-মাগ'রিবের দিকে দৃষ্টি দেন এবং ঐ অঞ্চলের সমস্ত অংশই তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আনেন। অতঃপর আনদালুসিয়ার মুসলমানদের চিরশত্রু উত্তর স্পেনের খৃস্টান রাজ্যসমূহ সিওন, ক্যাস্টাইল ও নাভারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কেননা মুসলিম এলাকায় হামলা, সীমান্ত এলাকা ও মুসলিম শহরগুলিতে লুটপাট করা ছিল তাহাদের নৈমিত্তিক পেশা। হ'াজিব আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ৯৮১ খৃ. যামোরা অধিকার করেন,

৯৮৫ খৃ. উত্তর পূর্বে বার্সেলোনা শহর ধ্বংস করেন এবং ৯৮৮ খৃ. দুর্ভেদ্য দুর্গ নগর লিওন অধিকার ও ধুলিসাৎ করেন। ৯৯৭ খৃ. গ্যালিসিয়া অভিযানকালে তিনি কমপোসতেলা (Compostele)-এর বিখ্যাত সেন্ট জেমস Santiago গির্জা দখল করিয়া ধ্বংস করেন (S.F. Mahmud, P. 185)।

তিনি (হ'াজিব) ১০০২খৃ. যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্তিকাল করেন। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া তিনি আশা পোষণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুকালে সমগ্র মুসলিম স্পেন অখণ্ড ও একতাবদ্ধ ছিল। তিনি তৃতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় আল-হ'াকামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পশ্চিম বার্বারীর সমগ্র অঞ্চলে আনদালুসীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার কর্মকৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি আজীবন খিলাফাতের বাহ্যিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং নামমাত্র খলীফা দ্বিতীয় হিশামের বিশেষ অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৩২০)।

হ'াজিব আল-মানসূ'র ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আনদালুসিয়ার একজন যোগ্য প্রশাসক ও গতিশীল শাসনকর্তা ছিলেন। আন্দালুসিয়ার খৃস্টানগণ তাঁহার মৃত্যুর দিনকে মুক্তির দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করে (S.F. Mahmud, P. 185)। আনদালুসিয়ায় আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসাবে কাজ করেন। তিনি যেই পন্থায় ক্ষমতায় আসেন ইহা সমর্থনযোগ্য ছিল না, কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি ইহা সততা ও সফলতার সহিত ব্যবহার করেন (S.M. Imamuddin পূ. গ্র., P. 200)।

দ্বিতীয় হিশাম আল-মানসূ'রের প্রিয় পুত্র আবদুল মালিককে প্রাসাদের তত্ত্বধায়কের (Major Demo) দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবদুল মালিক আল-মুজ'াফফার উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি রহস্যজনকভাবে ইন্তিকাল করেন এবং ভ্রাতা আবদুর রহমান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তখন হইতে আনদালুসিয়ায় খিলাফাতে বিশৃংখলা ও অরাজকতার সূচনা হয়। দীর্ঘকাল ব্যাপী যোগাযোগ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারের আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় আবদুর রহমানের গঠিত এবং পরে হ'াজিব আল-মানসূ'রের পুনর্গঠিত খলীফার দেহরক্ষী বাহিনী পরবর্তী কালের আব্বাসীদের তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনীর অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করে। তাহারা তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খলীফা নিয়োগ ও পদচ্যুত করিত। পরিণামে খলীফার ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার পতন ঘটে (S.F. Mahmud, P. 185)।

আবদুল মালিক (মুজ'াফফার)-এর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা আবদুর রহমান শানজুল জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন এবং তাঁহার হ'াজিবের পদ গ্রহণ দুর্বল খলীফা দ্বিতীয় হিশাম অনুমোদন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর মদাসক্তি ও ইসলামের পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান বিরোধী কার্যকলাপে আনদালুসিয়ার ইতিহাসে অরাজকতা, বিশৃংখলা ও ধ্বংসের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। উমায়্যা খিলাফাতের ভাবী উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহাকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য তিনি দ্বিতীয় হিশামকে বাধ্য করেন (S.M. Imamuddin; P. 202-203)।

আবদুর রহমানের এই উন্মত্ত বাসনা কর্ডোভায় বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জনতা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। উমায়্যা খিলাফাতের দাবিদার মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল জাববার-এর সমর্থকগণ কর্ডোভার উপকণ্ঠে রাজাব- ৩৯১/মার্চ ১০০৯ সালে আমেরী হ'াজিব আবদুর রহমান ইব্ন আবূ আমির (দ্র.) কে হত্যা করে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩২০)। তিনি সম্মানসূচক মাহদী উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস খলীফা ছিলেন। অতঃপর তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন উমায়্যা যুবরাজ সুলায়মান ইব্ন আল-হ'াকাম। ইহার পর চতুর্থ আবদুর রহমান (১০১৮-১৩ খৃ.), পঞ্চম আবদুর রহমান (১০২৩খৃ.), তৃতীয় মুহাম্মাদ (১০২৩-২৫খৃ.) ও সর্বশেষে তৃতীয় হিশাম (১০২৭-৩১খৃ.) উমায়্যা সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সময় কতিপয় খলীফা একাধিকবার সিংহাসনে বসেন এবং ১০২৫ খৃ. হইতে ১০২৭ খৃ. পর্যন্ত কোন খলীফাই পদাসীন ছিলেন না।

যাহা হউক, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এত বেশী দলীয় কোন্দল, গুপ্ত চক্রান্ত, হীন ধাপপাবাজি ও দুষ্কৃতির আবির্ভাবে উমায়্যা শাসনের শোচনীয় পতন হয়। আনদালুসিয়ায় উমায়্যা শাসনের পতন ছিল খুবই মর্মান্তিক। ৭৫৬খৃ হইতে ১০৩১ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭৫ বৎসর উমায়্যা বংশের রাজত্ব ইউরোপ ভূ খণ্ডে সমৃদ্ধি, গৌরব ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়।

আনদালুসিয়ায় ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উমায়্যা শাসকদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হ'াজিবের হস্ত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যায়। প্রদেশগুলি কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শুরু করে। রাজনৈতিক গুরুত্ব কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। দৃশ্যপট হইতে আরব রাজতন্ত্র অপসারিত হয়। দেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগ লইয়া আরব, বার্বার ও স্লাভ নেতাগণ তাহাদের নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। উম্যায়া সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার পর সাময়িকভাবে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ক্ষুদ্র রাজ্যকে মুলূকুত-তাওয়াইফ বলিয়া অভিহিত করা হইত (S.M. Imamuddin, P. 228)। উমায়্যা খিলাফাতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আনদালুসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পঁড়ে। ইহাদের কতিপয় খণ্ডের অস্তিত্ব ছিল মাত্র কয়েক দিনের। অবশ্য কতিপয় বৃহৎ দল রাজনৈতিকভাবে তাহাদের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শাসকদের মধ্যে কর্ডোভার বানূ জাওহার, মালাগা ও আলজেসিরাসের বানূ হাম্মুদ, সারাগোসার বানূ হূদ এবং সেভিলের বানূ আব্বাস ছিল আরব। গ্রানাডার বানূ জিরি ও টলেডোর বানূ যু'ন্নুন ছিল বার্বার এবং দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের ও বেলিয়ারিক দীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র শাসকগণ, যেমন আলজিরিয়ার খায়রান, মুরসিয়ার জুহায়র, দেনিয়ার মুজাহিদ ও অন্যান্য শাসকগণ ছিল স্লাভ।

এই সকল ক্ষুদ্র শাসক সর্বদা একে অপরের সহিত স্বার্থের দ্বন্দ্ব, পরস্পর কলহ এবং অবিরাম সংঘর্ষের লিপ্ত থাকিত, এমনকি প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করিবার জন্য খৃস্টানদিগকেও সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইফ্রিকিয়ার দুই শক্তিমান বার্বার শাসক মুরাবিত্'ন ও মুওয়াহহিদূনের কবলে পতিত হইয়া তাহারা আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। দেশের উত্তরাঞ্চলে একের

পর এক খৃস্টান শক্তির উদ্ভব হয় (ঐ, পৃ. ২২৮)। উদ্যমশীল ও উচ্চাভিলাষী খৃস্টান নৃপতিদের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টীয় ঐক্য পুনস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাহাদের বিরোধিতা আরও উজ্জীবিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির দুর্বলতার সুযোগে খৃস্টান নৃপতিদের লোভ-লালসা প্রবলতর হইয়া উঠে। তাহারা ঐ সমস্ত রাজ্যগুলির নিকট হইতে বিপুল পরিমাণে কর আদায় করিতে থাকে। এই নীতি রাজা ৬ষ্ঠ আলফনসো অনুসরণ করেন। তিনি সুকৌশলে ১০৮৫ খৃ. টলেডো দখল করেন এবং মুলূকত-তাওয়াইফ-এর বিবাদ মীমাংসাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., ৩২১)।

আনদালুসিয়ার সংকটময় বিশেষ অবস্থায় মুলূকুত-তাওয়াইফ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উত্তর আফ্রিকায় আল-মুরাবিতদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। উত্তর আফ্রিকার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী লইয়া আমীর ইয়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন মুলূকুত-তাওয়াইফকে সাহায্য করিতে আনদালুসিয়ায় আগমন করিলে ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। আমীর ইয়ূসুফ ২২ রাজাব, ৪৭৯/২ নভেম্বর, ১০৮৬ সালে যাল্লাক' (দ্র.) নামক স্থানে ৬ষ্ঠ আলফোনসোর সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৩২৯)। ৬ষ্ঠ আলফনসো মাত্র তিন শত সৈন লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয় (S.M. Imamuddin, P. 260)। ইয়ূসুফের আনদালুসিয়া ত্যাগের অব্যহিত পর খৃস্টানগণ মুসলিমদের সহিত পুনরায় সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয় এবং মুসলামগণ পরাস্ত হয়। এই পরাজয়ে মালিকী ফাক'ীহদের আহবানে ইয়ূসুফ ১০৯০ খৃ. বসন্তকালে পুনরায় আলজেসিরাসে পদার্পণ করেন (ঐ, পৃ. ২৬১)। ইয়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন আনদালুসের নৃপতিদের পারস্পরিক অনৈক্য এবং খৃস্টান নরপতিদের সহিত তাহাদের সমঝোতা দেখিয়া বিরক্ত হন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে একের পর এক সিংহাসনচ্যুত করেন এবং আনদালুসের বৃহৎ অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। তখন হইতে আনদালুসিয়া আল- মাগরিবের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩২১)

আল-মুরাবিতগণের অধীনে আল-আনদালুস

দুইটি ঘটনার মাধ্যমে আল-মুরাবিতগণ আনদালুসিয়া দখল করেনঃ (১) ভ্যালেন্সিয়ার পুনর্দখল (৪৯৫/১১০খৃ.)ঃ ভ্যালেন্সিয়া, ইতিপূর্বে ৪৭৮/১৮৫ খৃ. সিদী (সায়্যিদ) ক্যামপিয়াদোর (Cid Campeador Rodrigo Diaz) কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং (২) ৫০৩/১১১০ খৃ. বানূ হূদ নেতা আল-মুসতাঈন বিল্লাহর ইনতিকালের ফলে হূদী রাজধানী মারাওগাওয়ার আত্মসমর্পণ। আন্দালুসিয়ার সমাজে ফক'ীহগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশটিতে কয়েক বৎসর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ শাসন বিরাজমান ছিল। শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ফলে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং জনগণের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। একমাত্র টলেডো পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা ব্যতীত আল-মুরাবিত সেনাবাহিনী কতিপয় নিরংকুশ বিজয়ের নজীর স্থাপন করে (৫০২/১১০৮খৃ. ইউক্লিস =Ucles)। ৫১২/১১১৮ খৃ. আলফনসো সারাগোসা অধিকার করে। আন্দালুসিয়ায় খৃস্টানদের চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইয়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলী মরক্কোতে স্বয়ং আল-মুওয়াহহিদূন কর্তৃক হুমকির সম্মুখীন হন। ইহা ছাড়া চারিদিকে বিদ্রোহের অপ্রতিরোধ্য আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা খৃস্টান শক্তির সাফল্যের পথ পরিষ্কার করে। এমনকি আনদালুসে নূতন কোন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাও আসন্ন হইয়া পড়ে।

আল -মুওয়াহ'হি'দূন-এর শাসনাধীনে আল- আনদালুস এবং খৃস্টানদের শক্তিবর্গ কর্তৃক তাহা পুর্নদখলের অগ্রযাত্রা

আল মুরাবিতদের পতনের পর আনদালুসিয়ায় মুওয়াহহিদূনদের আগমন ঘটে। ১১৪৫ খৃ. তিলিমসেনের (Tlemcen) যুদ্ধে মুরাবিতদের পরাস্ত করিয়া মুওয়াহহিদগণ ক্ষমতা দখল করেন। নানাবিধ বিপদ-আপদ সত্ত্বেও উপদ্বীপটি প্রায় এক শত বৎসর (১১৪৬-১২৪৮খৃ.) তাহাদের অধীনে থাকে। খৃস্টানদের অব্যাহত পুনর্দখল অভিযানের ফলে প্রতি বৎসর নূতন নূতন অঞ্চল তাহাদের হস্তচ্যুত হইতে থাকে। ক্যাটালোনিতে (Catalonia) Romon Berhegner IV তরতূশা (Tortosa) ও লারিদা (Lerida) দখল করে। কিন্তু আনদালুসিয়ায় পুনর্দখল অভিযানের প্রধান স্থপতি ছিলেন ক্যাষ্টিলের (Castile) রাজা ৮ম আলফোনসো (১১৫৮-১২১৪ খৃ.)। তিনি সিলভেস (silves) ইভোরা (Evora) ও কূনকা (cuenca) দখল করেন। আল-মুওয়াহহিদ খলীফা আবূ ইয়ূসুফ ইয়া'কূব্ ৮ শা'বান, ৫৯১/১৮ জুলাই, ১১৯৫ সালে আলারকোসে (আল-আরাক)-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও এই বিজয় স্থায়ী হয় নাই। পনের বৎসরের মধ্যেই ক্যাষ্টাইল, লিওন (Leon), ন্যাভারে (Navarre) ও আরাগন (Aragon) প্রভৃতি অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী সমন্বয়ে গঠিত খৃস্টান সম্মিলিত শক্তি ১৫ স'ফার, ৬০১/১৭ জুলাই, ১২১২ সালে আল- ইক'াব (Las Navas de Tolosa) নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীকে পরাভূত করে। ফলে উবেদা (Ubeda) ও বায়েজা (Baega) মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার কিছু দিনের মধ্যেই মুসলমানগণ কর্ডোভা হারায়। ইহার পরপরই প্রথম জেকস (Jaeques) কর্তৃক ভ্যালেনসিয়া (৬৩৬/১২৩৮) এবং ফার্ডিন্যান্ড তৃতীয় কর্তৃক সেভিল অধিকৃত হয় (৬৪৬/১২৪৮খৃ.)।

গ্রানাডায় নাসরিয়া রাজ্য ঃ খৃস্টানদের পুনর্দখল

আনদালুসিয়ায় একটির পর একটি অঞ্চল মুসলমানদের হস্তচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র গ্রানাডাই মুসলিম রাজ্য হিসাবে প্রায় আড়াই শতাব্দী কাল টিকিয়া থাকে। জাবালুত তারিক (জিব্রাল্টার) হইতে আলমেরিয়া পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই রাজ্য অভ্যন্তরে রান্দা (Sorrania de Ronda) ও এলভিরা (Sierra de Elvira) পর্বতমালা অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাসরী রাজবংশের পূর্বপুরুষ এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মুহাম্মাদ আল-গালিব বিল্লাহ ৬৩৫ হি. ১২৩৭-৩৮খৃ. গ্রানাডা অধিকার করেন এবং আল-হামরা দুর্গটিকে শাহী মহলে রূপান্তরিত করেন। তিনি ক্যাষ্টাইলের রাজা ১ম ফার্ডিন্যান্ড ও পরে তাহার উত্তরাধিকারী ১০ম আল-ফনসোকে নিয়মিত কর প্রদানে সম্মত হন। ইহার পর হইতেই কর্ডোভার শাসকগণ খৃস্টানদের সহিত অথবা মরক্কোর মারিনী (Marinids)-দের সহিত সম্পাদিত চুক্তিসমূহের একটি বিপজ্জনক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাইতে থাকেন। মারিনীগণ ইতিমধ্যে আনদালুসিয়া ভূখণ্ডে

সামরিক অভিযান চালায় এবং তাহারা তারীফা-আল, জাযীরা (আলজেসিরাস)-সহ কতগুলি অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয় (S.M Imamuddin, P. 288)। মরক্কোর সহযোগিতার প্রত্যাশা ফলপ্রসূ হয় নাই। আরাগন, পর্তুগাল ও ক্যাস্টিলের সুশৃংখল সেনাবাহিনীর সহিত ১৩৪০ খৃ. ৩০ অক্টোবর মালাদো নদীর মোহনায় মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। প্রথম ইয়ূসুফ ও আবুল হাসান সমুদ্র পথে তাহাদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধে আহত একাদশ আল ফনসো মৃত্যুমুখে পতিত হন। খৃস্টানগণ নারী, শিশু নির্বিশেষে মুসলিমদিগকে হত্যা করে। আলাদোর যুদ্ধের পর আফ্রিকার শাসকগণ চিরদিনের জন্য স্পেন অভিযানের ইচ্ছা ত্যাগ করে। গ্রানাডার শাসকগণ পরবর্তী সময়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনা নীতি গ্রহণ করে (ঐ, পৃ. ২৯১)। এতদসত্ত্বেও সুরম্য অট্টালিকারাজি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমারোহ এবং লিসানুদ্দীন ইব্ন খাতীব- এর মত বিখ্যাত পণ্ডিতসহ অনেক গুণীজনের সমাবেশের কারণে রাজধানী গ্রানাডার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে খৃস্টান জগতে ক্যাথলিক (Catholic) নৃপতিদের উদ্ভব ঘটে। আরাগনের ফার্ডিন্যান্ড এবং ক্যাষ্টাইলের ইসাবেলা (Isabella) দুইজন চরম মুসলিম বিদ্বেষী খৃস্টান নেতা পরস্পর মৈত্রী ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আনদালুসিয়া হইতে মুসলমানদিগকে উৎখাতের জন্য তাহারা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে এবং মরিয়া হইয়া উঠে। ১৪৮৬ খৃ. লোয খৃস্টানদের অধিকারভুক্ত হয়। পরবর্তী বৎসর তাহারা ভিলেয মালাগা ও আলমেরিয়াও দখল করে। ১৪৮৯ খৃ. বাযা তাহাদের হস্তগত হয়। অবশেষে ২ রাবী'উল-আওয়াল, ৮৯৭/৩ জানুয়ারী, ১৪৯২ খৃ. খৃস্টান ক্যাথলিক শাসকদের নিকট গ্রানাডা আত্মসমর্পণ করে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাঃ আবু তাহের

আনদালুসে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা

মধ্যযুগে ইউরোপের জ্ঞানসাধনার ইতিহাসে আনদালুসিয়া গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা কালের মধ্যবর্তী সময় আরবীভাষী জনগণই পৃথিবীর সর্বত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকার প্রধান বাহক ছিলেন (Philip K. Hitti, History of The Arabs, London 1968, p. 557)। তাহাদের মাধ্যমেই প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান পুনর্জীবন লাভ করে এবং উহার চর্চা শুরু হয় । ইহার ফলেই পশ্চিম ইউরোপে রেনেঁসার আগমন সম্ভব হয় (ঐ, পৃ. ৫৫৭)।

আনদালুসে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশের প্রাককালে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপের সার্বিক অবস্থা অতীব করুণ ছিল। ইউরোপের লোকেরা তখন বর্বর জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল। তমসাছন্ন ইউরোপে সেই সময় শাসন ব্যবস্থা সুশৃংখল ছিল না, এমনকি জ্ঞান অন্বেষণে রত লোকদিগকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইত। প্রাচীন গ্রীক নৃপতিদের স্থাপিত পাঠাগারগুলি ভস্মীভূত ও বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও জ্ঞানের নির্মল জ্যোতি ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল (মুজাফফর আলী, বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের দান, ঢাকা ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩)।

অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের আনদালুসিয়া বিজয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। আইবেরীয় উপদ্বীপের জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বিপ্লব সমগ্র ইউরোপে সৃষ্টি করে অভিনব জাগরণ। যুগ-যুগান্তরের ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে নতুন সমাজ। শোষণ, বঞ্চনা ও জুলুমের অবসান ঘটে। জনগণ পায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার। অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জিত স্পেনে আরবদের নজিরবিহীন বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য এক উন্নত যুগের সূচনা করে (S.M. Imamuddin, Some Aspect of the Socio-Economic And Cultural History of Muslim Spain 711- 1482 AD, Leiden, E.J. Brill 1965, p. 134)। আনদালুসে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যেইরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল ইউরোপের অন্য কোথাও তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। শিক্ষার্থীগণ ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড হইতে দলে দলে আনদালুসিয়ার শহরগুলিতে বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত আগমন করিত। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী আনদালুসিয়া শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চা এবং সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই ইউরোপের অন্য কোন দেশ মূরদের জ্ঞানপিপাসার চারণভূমির সমতুল্য হইতে পারে নাই (Lanepoole, Moors in Spain, London 1912, p. 230)।

আনদালুসিয়ায় বসতি স্থাপনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ দেশটিতে প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্গঠন করেন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। আনদালুসিয়ায় উমায়্যা আমীরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আবদুর-রহমান দেশগঠনের পাশাপাশি রাজধানী শহর কার্ডোভাকে মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য সরকারী সৌধরাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেন (S.M. Imamuddin, p. 183)। সুশিক্ষিত এই শাসকের সাহিত্য চর্চা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বিশ্বের জন্য বিস্ময়কর ছিল।

নবম শতাব্দী ব্যাপী কর্ডোভার আমীরগণ দেশটিতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তের গোলযোগ সত্ত্বেও দ্বিতীয় 'আবদুর রহমান তাঁহার শাসনের তিরিশ বৎসর (৮২২-৮৫২ খৃ.) স্পেনের সাংস্কৃতিক উন্নতিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন এবং ইহাকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সভ্য দেশগুলির একটিতে পরিণত করেন। গ্রীক রাজদূতগণ কার্ডোভার সৌন্দর্য ও সম্পদ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। গুয়াডালকুইভার নদীর উভয় তীরে মাইলের পর মাইল সুদৃশ্য সারিবদ্ধ সৌধরাজি ও উদ্যানসমূহ দ্বারা সজ্জিত ছিল। তাঁহার রাজদরবারে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যিরয়াব (মৃ. আনু. ৮৪৫ খৃ.)-এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি পোশাকাদি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেন। এই সময়ে আব্বাসী অনুকরণে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও রীতিনীতির প্রবর্তন করা হয় । তিনি দেশটিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেন।

দশম শতাব্দীতে আনদালুসিয়ায় একটি নূতন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুগের সূত্রপাত হয়। তৃতীয় 'আবদুর রহমান হিস্পানীয়-আরব সভ্যতার

আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেন এবং ধ্বংসের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করেন। তাঁহার ও দ্বিতীয় হ'াকামের রাজত্বকাল এবং প্রধান মন্ত্রী মানসূ'রের শাসনামল স্পেনে মুসলিম শাসনের চরম বিকাশের যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। খৃস্টান ও মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিতে আনদালুসিয়া পরবর্তী কালে কখনও এইরূপ দীপ্তিময় সংস্কৃতি অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই (ঐ, পৃ. ১৮৩)। রাজধানী কার্ডোভাকে দশম শতাব্দীর একজন জার্মান কবি Hroswitha বিশ্বের অলংকাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ১৮৪)। তৃতীয় আবদুর রাহমানের রাজত্বকালে কৃষি, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের উন্নয়নে এক নূতন মাত্রা যোগ হয়। সভ্য দুনিয়ার বিভিন্ন রাজ্য হইতে রাজদূতগণ কর্ডোভায় আগমন করিতেন এবং দূরবর্তী দেশসমূহের পণ্ডিতগণ আনদালুসিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে সমবেত হইতেন। কর্ডোভার রাজদূত Recemund জার্মানির মহামতি অটোর (Otto) দরবারে ঐতিহাসিক Liudprand-কে Antapodosis-এর ইতিহাস রচনার ব্যাপারে পরামর্শ দেন। খ্যাতিমান পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিখ্যাত ফাতিমী ভৌগোলিক ইব্ন হ'াওক'াল কর্ডোভায় আগমন করেন এবং স্পেনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন (ঐ, পৃ. ১৮৪)।

শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় হ'াকামের রাজত্বকাল ছিল স্পেনের স্বর্ণযুগ। কর্ডোভা শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং ইহা ইউরোপের অন্ধকার যুগে আলোক সংকেত হিসাবে দণ্ডায়মান ছিল। দ্বিতীয় হ'াকামের শাসনামলে তাঁহার পিতা কর্তৃক কর্ডোভা জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় কায়রোর আল-আযহার ও বাগদাদের নিজামিয়্যা-এর সমতুল্য ছিল। সকল বড় বড় শহরেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরে বিদ্যালয় ছিল। আকর্ষণীয় বেতন ও পর্যাপ্ত অনুদান বহির্দেশের অধ্যাপকদের আকৃষ্ট করিত এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটিত। মূল্যবান গ্রন্থাদি ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিসহ একটি বিশাল গ্রন্থাগার কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটেই প্রতিষ্ঠিত ছিল (ঐ, পৃ. ১৮৪)। দ্বিতীয় হ'াকামের সময়ে আনদালুসিয়ায় সংস্কৃতির সাধারণ মান এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, প্রায় প্রত্যেকেই পড়িতে ও লিখিতে পারিত। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী মানসূ'র শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সাহিত্যের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে আনদালুসিয়ার সাহিত্য ও শিল্পকলা সংক্রান্ত তৎপরতায় প্রাদেশিক রাজধানীগুলি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে আরম্ভ করে। টলেডো, বাদাজোয, ভ্যালেন্সিয়া, দেনিয়া, আলমেরিয়া, গ্রানাডা ও সেভিলের মুসলিম শাসকদের দরবার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের মিলনকেন্দ্র ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনে ছোট ছোট রাজ্যগুলিও স্পেনের উমায়্যা শাসকদের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল না। শাসকগণ শিল্পকলা ও স্থাপত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেভিলে নির্মিত জিরাল্ডা (Giralda) স্তম্ভটি একটি মানমন্দির ছিল। গ্রানাডার আলহ'মরা এবং সেভিলের আল-কাযারের সৌন্দর্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদগুলির নির্মাণ ও সজ্জিতকরণে মুসলিম রাজমিস্ত্রি ও স্থপতিগণ তাহাদের অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে উৎসাহ প্রদানের কমতি ছিল না। ইব্নুল খাত'ীব, ইব্ন তু'ফায়ল, ইব্ন যুবায়র, ইব্ন যুহর, ইব্ন বাজজা ও ইব্ন রুশ্দের ন্যায় ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ স্পেনে মুসলিম শাসনের শেষের দিনগুলিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন এবং গ্রীক ও হিন্দুদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা প্রাপ্ত হন তাহার সঙ্গে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার যুক্ত করিয়া পরবর্তী বংশধরদের নিকট হস্তান্তর করেন (Bertrand Louis, The History of Span, p. 73)।

আনদালুসিয়া, সিসিলিও সিরিয়া এই প্রধান তিন দেশের মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতা ইউরোপে প্রবেশ করে। আনদালুসীয় শিক্ষক ও ব্যবসায়ীবৃন্দ, সিসিলি এবং আফ্রিকার মুসলিমগণ ও ক্রুসেডারগণ এই সভ্যতার প্রধান বাহক ছিলেন (S. M. Imamuddin, p. 186)। আনদালুসিয়ায় মুসলমানদের সাধিত বস্তুভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী ছিল। খৃস্টানরা দেশটি পুনর্দখল করিয়া সেখান হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিলেও মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইউরোপীয় জীবনধারার প্রত্যেক দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করা অব্যাহত রাখে। আনদালুসিয়ার মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসাবে মোযারাবগণ (মুসতা'রিব) ইউরোপে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের হস্তান্তর ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবী ভাষার মাধুর্য ও উপযোগিতা তাহাদের নিকট এতই আবেদন সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তাহারা এক সময়ে তাহাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষা না করিয়া উৎসাহের সঙ্গে আরবী ভাষা শিক্ষা করিত। মোযারাবগণ আরবী ভাষায় রচিত কবিতা, গল্প, মুসলিম দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিত। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া তাহারা আরবী গ্রন্থের বিশাল গ্রন্থাগার নির্মাণ করিত (ঐ, পৃ. ১৮৭)। লিওন, ক্যাস্টাইল, নাভারে (Navarre) এবং খৃস্টান স্পেনের অপরাপর স্থানে আরবী ভাষা সচরাচর কথিত হইত। স্পেনে মুসলিম বিজয়ের পর তৃতীয় বংশধারা হইতে আনদালুসীয় মুসলিম ও খৃস্টানদের রোমান্স (Romanec) নামে অভিহিত এক অভিন্ন ভাষা ছিল। এই ভাষাটি নিম্ন পর্যায়ের ল্যাটিন হইতে উদ্ভূত কিন্তু সাধারণভাবে আরবী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মোযারাবগণ এই ভাষায় কথা বলিত এবং বিচারালয় ও রাজপ্রাসাদে ইহা সকলের বোধগম্য ছিল (তু. Arnold, Legacy of Islam, পৃ. ৮)। রোমান্স ভাষা বিপুল আকারে আরবী পরিভাষা মূল আকারে অথবা ল্যাটিনে রূপান্তরিত আকারে গ্রহণ করিয়াছে। পরবর্তী কালে মরিস্কোগণ ইহা আরবী বর্ণমালায় লিখিয়াছেন। অনেক আরব রোমান্স ভাষা বুঝিতে পারিত। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তাহারা ল্যাটিন মুর (Latine) নামে অভিহিত হইত (Cambridge Medieval History, vol, p. 438)।

আনদালুসিয়ায় খৃস্টান ও মুসলমানগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধ তাহাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই। সেইখানে খৃস্টানরা প্রত্যেকটি মুসলিম রাজ্য পুনর্দখল করিলে তাহারা মূল্যবান গ্রন্থাদি লাভ করে। দ্বিতীয় আবদুর রাহ্মান কর্ডোভায় একটি আরবী অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সেইখানে গ্রীক ভাষায় রচিত বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয় (S. M. Imamuddin, p. 188)। তাঁহার নীতি তৃতীয় আবদুর রাহমান, দ্বিতীয় আল-হ'াকাম ও দ্বিতীয়

আল-হিশাম অনুসরণ করেন। আরবী ভাষার গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ এবং আরবী-ল্যাটিন ভাষা বিস্তারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০ম আলফন্সো ১২৫৪ খৃ. সেভিলে আরবী-ল্যাটিন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং টলেডোতেও অনুরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলির মধ্যে টলেডোর অনুবাদ কেন্দ্রটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। আরবীয় পণ্ডিতদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পাশ্চাত্য সম্প্রচারের ক্ষেত্র টলেডো মূল ভূমিকা পালন করে (P. K. Hitti, History of the Arabs, P. 588)। বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শন শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ আরবী হইতে ল্যাটিন ও রোমান্সে অনূদিত হয় এবং কিছু মৌলিক গ্রন্থও রচিত হয়। আনদালুসিয়ার গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রীক মৌলিক গ্রন্থের যত অনুবাদ কর্ম ছিল তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে ছিল ইহাদের ভাষ্য সংক্রান্ত গ্রন্থ। ইহা খৃস্টানরা হস্তগত হয়। বাট্রান্ড মন্তব্য করেন, "ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্যের খৃস্টানগণ মুসলমানদের নিকট অবশ্যই ঋণী। কারণ তাহাদের অনুবাদ কর্ম অভিযোজন এবং এই সকল ভাষ্যের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষার্থিগণ গ্রীকো-ল্যাটিন প্রাচীন যুগের দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিকদের সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছে (তু. The History of Spain, p. 78)।

খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে আরবদের মেধার শ্রেষ্ঠত্ব ইউরোপে স্বীকৃতি লাভ করে (ঐ, পৃ. ১৯০)। ইউরোপের আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম প্রচারক ছিলেন Gerbert (Pope Sylvester ii, মৃ. ১০০৩ খৃ.)। তিনি আরবী জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র এবং রোমান সংখ্যা নির্দেশক জটিল চিহ্নের পরিবর্তে আরবী সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন প্রবর্তন করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে টলেডো ইউরোপের নিকট আরবী সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান হস্তান্তরের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয় (রেমন্ড, মৃ. ১১৮৭ বা ১১৬৪ খৃ.)। সেইখানে সমগ্র ইউরোপ হইতে সমবেত পণ্ডিতদের মধ্যে ক্রিমোনার গেরার্ড (Gerard, মৃ. ১১৮৭ খৃ.), সেভিলের যোহন (Avendeath), বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মাইকেল স্কট এবং চেষ্টারের রবার্ট-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের বিশাল সংখ্যক আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। টলেডোর হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক সত্তরখানারও অধিক আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আয-যাহ্‌রাবীর আত-তাসরীফের শল্য চিকিৎসা বিষয়ক অংশ, আর-রাযীর কিতাবুল-মানসূবী এবং ইব্‌ন সীনার ক'নূন, বানূ মূসার গ্রন্থাবলী খাওয়ারিযমীর উপর আল-বীরূনীর ভাষ্য, জাবির ইব্‌ন আফ্‌লাহ' ও যারকালীর সারনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল (Sarton, Introduction to the History of Scienec, p. 321)। রেমন্ডের আনুকূল্যাধীনে সেভিলের যোহন (John) ইব্‌ন সীনা, কুস্‌তা ইব্‌ন লূকা ও আল-ফারগানীর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেন। গুনডিমালডি কিতাবুন নাফ্‌স (Anima), ইব্‌ন সীনার কিতাবু'শ-শিফা (Sulficentia), ইব্‌ন রুশদের ভাষ্য, আল-কুল্লিয়াত (Colliget)-এর অনুবাদ করেন। টলেডোতে অন্যান্য অনুবাদকও ছিলেন। এইভাবে স্পেনীয় আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। ইহা লোরাইন, জার্মানি, মধ্য ইউরোপে ও ইংল্যান্ডে ছড়াইয়া পড়ে (Bernard Louis, England and Arabic Learning, পৃ. ২-৬)।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ আনদালুসিয়ার আমীর ও শাসকদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে। সমৃদ্ধশালী আরবী ভাষা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একটি সার্বজনীন ভাষা। আরবী কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষাই নহে, ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও ভাষা। আরবী ভাষায় কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে। মহানবী (স)-এর হাদীছের ভাষাও আরবী। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা কাল হইতেই এই ভাষা প্রাধান্য পায় এবং প্রশাসনকে আরবীয়করণ করা হয়। উমায়্যা আমলে খলীফা আবদুল মালিক এই ভাষার উৎকর্ষতা বিধানে যের, যবর, পেশ ও নুক্‌তার প্রচলন করেন। ভাষাবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনায়ও আনদালুসিয়া পশ্চাদপদ ছিল না। ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক আবূ 'আলী আল-কালী (৯০১-৯৬৭ খৃ.)। তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্ম আর্মেনিয়ায় এবং বাগদাদে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি 'আমালী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন (History of the Arab, p. 557)। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হ'াসান আয-যুবায়দী (৯২৮-৮৯ খৃ.)। তিনি খলীফা হিশামের গৃহ শিক্ষক এবং পরবর্তী কালে সেভিলের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও কাযী নিযুক্ত হন। আয-যুবায়দী তাঁহার সময়কাল পর্যন্ত সকল আরব ব্যাকরণবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। ভাষাতত্ত্ববিদ আস-সুয়ূতী, আয-যুবায়দীর গ্রন্থাবলী ব্যবহার করিয়া মুযহির (Muzhir) রচনা করেন। এইখানে উল্লেখ্য যে, হিব্রু ব্যাকরণ মূলত আরবী ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আনদালুসে রচিত হয় এবং প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত হিব্রু ব্যাকরণ প্রণেতা যায়যূজ জুডা বেন ডেভিড (আরবী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্‌'য়া ইব্‌ন দাঊদ) কর্ডোভায় বসবাস করিতেন (ঐ, পৃ. ৫৫৭)।

কর্ডোভার বাসিন্দা এবং খলীফা তৃতীয় 'আবদুর-রাহমানের সভাকবি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্‌বিহী (৮৬০-৯৪০ খৃ.) ছিলেন মূল সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা। তিনি মূল্যবান সাহিত্য সংকলন আল-'ইক্‌'দুল ফারীদ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। আনদালুসিয়ার সর্বাধিক বড় পণ্ডিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তানায়ক ছিলেন 'আলী ইব্‌ন হ'াযম (৯১৪-১০৬৪ খৃ.)। তিনি অধিক সংখ্যক গ্রন্থের লেখক এবং দুই বা তিনজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বানের অন্যতম ছিলেন। ইব্‌ন খাল্লিকান ও ইব্‌ন কি'ফ্‌ত'ীর মতে, ইব্‌ন হ'াযম ইতিহাস, ধর্মবিজ্ঞান, হাদীছ, তর্কশাস্ত্র, কবিতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ৪০০ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত ত'াওক্‌'ল-হ'ামামা (কপোতের মালা) নামক কাব্য গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল নিষ্কাম প্রেম। তাঁহার অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আল-ফাস'ল ফিল-মিলাল ওয়াল-আহ্‌ওয়া ওয়ান-নিহ'াল। গ্রন্থটি তাঁহাকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রথম গবেষক পণ্ডিত।

মূরদের শাসনামলে শুধু কর্ডোভাতেই নহে, রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হইত। আব্বাদী, মুরাবিত ও মুওয়াহহিদদের সময়ে সেভিল, টলেডো ও গ্রানাডায় পূর্ববর্তী যুগের মত সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটে (ঐ, পৃ. ৫৫৮)। আরবী ভাষা,

ব্যাকরণ ও সাহিত্যের উপাদানগুলির সম্প্রসারণের ফলে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে উপকথা, গল্প ও নীতি কাহিনীমূলক সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করে। এইগুলির ভিত্তি আবার অনেকাংশে ছিল ইন্দো-পারসিক। ক্যাষ্টাইলিয়নের আলফন্সোর শাসনামলে (১২৫২-৮৫ খৃ.) কালীলাহ্ ওয়া দিমনার চিত্তাকর্ষক উপকথাগুলি স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরে একজন য়াহূদী ইহা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে। 'মাক'মা' ছন্দোময় গদ্যে রচিত গ্রন্থ। ইহাতে শব্দবিজ্ঞানের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক অলংকার রহিয়াছে। ইহার প্রভাব ইউরোপীয় সাহিত্যকে ইহার চিরাচরিত সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করে (S. M. Imamuddin, p. 191)। আনদালুসীয় সাহিত্যের ভাব ঐশ্বর্যের মূলে আছে আরবী সাহিত্যের আদর্শ। ডন কুইকজোটের মডেলটি আরবী সাহিত্য হইতে গৃহীত।

কবিতা ঃ প্রাচীন আরবে কাব্যপ্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। আরবেরা মন-মানসিকতার দিক হইতে বাস্তব্যতার প্রতি আকৃষ্ট ছিল বলিয়া মু'আল্লাক'ার মত গীতি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মধ্যে কবিতা অতীব জনপ্রিয় ছিল। একদা যুদ্ধ-বিগ্রহ, মরুভূমির উষ্ট্র এবং প্রণয়মূলক ঘটনা লইয়া আরবী কবিতা রচিত হইত (ঐ, পৃ. ১৪২)। মুসলিম শাসনামলেও কাব্যচর্চা অব্যাহত থাকে এবং ইহাতে উৎকর্ষতা লাভ করে। স্পেনে প্রথম উমায়্যা শাসনকর্তা একজন কবি ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী শাসকগণও কাব্যচর্চা করিতেন এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেভিল সর্বাধিক সংখ্যক কবির জন্য গর্ব করিত। তবে কবিতার মশাল অনেক আগে কর্ডোভায় প্রজ্জলিত হয় এবং গ্রানাডা যতদিন মুসলিম শক্তির অধীনে ছিল, ততদিন সেইখানে এই মশাল জ্বলিতে থাকে (P. K. Hitti, p. 559)।

কর্ডোভা, গ্রানাডা ও সেভিলের রাজদরবারের কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। আল-গ'াযাল (মৃ. ৮৬৪ খৃ.) পদবীধারী ইয়াহ্'য়া ইব্নুল-হ'াকাম দ্বিতীয় আবদুর-রাহমানের রাজদরবারের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক এবং ব্যঙ্গাত্মক ধরনের কবিতা রচনা করিতেন। ইব্ন 'আবদ রাব্বিহী (৮৬০-৯৪০ খৃ.) দ্বিতীয় 'আবদুর-রাহমানের সভাকবি ছিলেন। তিনি আরবদের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। দ্বিতীয় হ'াকামের রাজদরবারের একজন সনামধন্য কবি আহমাদ ইব্ন ফারাজ, আল-হাইক শিরোনামে একটি কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা দ্বিতীয় হ'াকামকে উৎসর্গ করা হয়। দ্বিতীয় হিশামের শিক্ষক আয-যুবায়দী (৯১৮-৯৮৯ খৃ.) এবং বাগদাদের সাঈদ আল-মানসূরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা উভয়ই কবিতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন (S. M. Imamuddin, p. 143)। আনদালুসিয়ার প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী, ইব্ন হাযম, ইব্নুল খাতীব ও আবুল-ওয়ালীদ আহমদ ইব্ন যায়দূন (১০১৩-১০৭১ খৃ.)। শেষোক্তজন প্রেমের কবিতা লিখিতে পছন্দ করিতেন এবং খলীফা আল-মুসতাকফীর রূপসী কন্যা ওয়াল্লাদার উদ্দেশ্যে রচিত প্রেমগাঁথার জন্য কারাবরণ করেন। আনদালুসিয়ার আরবী কবিতার অন্যতম গুণাবলী হইল গতানুগতিক ছন্দের পরিবর্তে একটি আধুনিক রোমান্টিকতা দ্বারা কাব্যকে সুষমামণ্ডিত করা। এই ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় মুওয়াশ্শাহ্'। একাদশ শতাব্দীতে আনদালুসে মুওয়াশ্শাহ্' ও যাজাল-এর উদ্ভব হয়। এইগুলি সাধারণত গীতি কাব্যে ব্যবহৃত হইত।

চারণ কবিদের মধ্যে গ্রাম্য রূপকথা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই ধরনের একজন বিখ্যাত চারণ কবি ছিলেন আবূ বাক্র ইব্ন কুযমান (মৃ. ১১৬০ খৃ.)। তিনি প্রায় ১৫০টি যাজাল কবিতা রচনা করেন। প্রভাসাল কবি পাইটিয়ার্সের (Poitiers) উইলিয়াম ইব্ন কুযমানের ব্যবহৃত ছন্দে কবিতা রচনা করেন (ঐ. পৃ. ১৯২)। আবুল-'আব্বাস আত-তুতীলী লোকসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। যাজাল বা গীতিকাব্য পরবর্তী কালে ইউরোপীয় কাব্যে প্রভাব বিস্তার করে। আরবীভাষী আনদালুসীয় কবিতা ইউরোপের নূতন কাব্য সাহিত্যের উত্থানে ব্যাপক অবদান রাখিয়াছে (ঐ, পৃ. ১৯২)। ইউরোপে এমন এক সময় আসে যখন কবিতা প্রত্যেক ব্যক্তির বাচন মাধ্যম ছিল (S. Lanepole, Moors, P. 147)। আরব ও ল্যাটিন সংস্কৃতি আনদালুসিয়ায় একটি কাব্যিক কৌশলের জন্ম দেয়। আনদালুসিয়ার কবিতা আরবদের নিকট হইতে মার্জিত ধরন রপ্ত করে (S. M. Imamudin, p. 144)।

শিক্ষা ঃ মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা-দীক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। কুরআন শারীফে জ্ঞান চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইসলামের প্রথম যুগেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে মসজিদই ছিল শিক্ষা গ্রহণের মূল কেন্দ্র। শিক্ষাদানকে মহান ধর্মীয় কাজ বলিয়া মনে করা হইত। অন্যান্য মুসলিম দেশের মত স্পেনেও কুরআন এবং আরবী ব্যাকরণ ও কবিতা রপ্ত করার উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় (P. K. Hitti, p. 562)। ইসলামী শিক্ষা মূলত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি সাধারণত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দিতেন। অনেক মুসলিম তাহাদের বাড়ীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। স্পেনের আমীর ও খলীফাগণও শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী ছিলেন (S. M. Imamuddin, p. 135)। সমসাময়িক ইউরোপের তুলনায় আনদালুসীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার অধিক ছিল। খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বিদ্যা শিক্ষায় আনদালুসিয়া অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল (ঐ, পৃ. ১৩৬)। সেইখানে নারীরাও লেখাপড়া করিত।

আনদালুসিয়ায় উচ্চতর শিক্ষার প্রধান পাঠক্রম বা বুনিয়াদ ছিল কুরআনের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা, হাদীছ, ফিক্হ, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, অভিধান রচনারীতি এবং আরবী ব্যাকরণ। প্রধান শহরগুলিতেই উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা, গ্রানাডা, ভালেন্সিয়া এবং আলমেরিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। দলে দলে শিক্ষার্থিগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগমন করিত। তৃতীয় 'আবদুর-রাহমান কর্ডোভার বড় মসজিদ সন্নিহিত স্থানে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র ও আইনের বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছিল বিশ্বব্যাপী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করিতেন। একমাত্র ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞানেই চারি হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত বলিয়া জানা যায়। এখানকার সনদের বদৌলতে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ চাকুরী পাওয়া যাইত (ঐ, পৃ. ৫৬৩)। সপ্তম নাসিরীয়

খলীফা ইয়ূসুফ আবুল-হ'জ্জাজ (১৩৩৩-৫৪ খৃ.) চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, দর্শন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল (ঐ, পৃ. ৫৬৩)। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সাধারণ বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। শিক্ষকগণ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকবৃন্দ সমাজের অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইতেন (S.M. Imamuddin, p. 137)। গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল। ইহাতে লেখা ছিল, "মাত্র চারিটি বস্তুর উপর পৃথিবী নির্ভরশীলঃ জ্ঞানীর জ্ঞান, মহান বিচারকের বিচার, সৎলোকের প্রার্থনা ও সাহসী লোকের বীরত্ব" (P. K. Hitii, History of the Arabs, p. 563)।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে গ্রন্থের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক ও জরুরী হয়। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে ক্রমাগতই গ্রন্থের প্রচলন ব্যাপক হয়। আরবী ভাষা ও রীতিনীতিতে অতি আগ্রহী মোযারাবগণ আরবী গ্রন্থগুলি তাহাদের নিজেদের রোমান্স ভাষায় এবং তাহাদের নিজস্ব গ্রন্থগুলি আরবীতে অনুবাদ করে। কেবল অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থ আরবীতেই অনূদিত হয় নাই, বরং ফারসী, হিব্রু ও গ্রীক মূল উৎসগুলিও মূল গ্রন্থ রচনায় ব্যবহার করা হইতে। আমীর ও খলীফাগণ, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় 'আবদুর-রাহমান এবং দ্বিতীয় হ'াকাম গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হন। তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ নূতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য প্রাচ্যে গমন করেন। দ্বিতীয় আবদুর রাহমানের প্রতিনিধি 'আব্বাস ইব্ন নাসি'হ' বিজ্ঞান বিষয়ক ফার্সী ও গ্রীক রচনাবলীর আরবী অনুবাদ ক্রয়ের জন্য মেসোপটেমিয়ার গ্রন্থ বিপণীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজেন। প্রাচ্যের ন্যায় আনদালুসিয়াতেও বই সংগ্রহের আগ্রহ সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এমনকি ক্রীতদাস ও মহিলাগণও গ্রন্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না (ঐ, পৃ. ১৪০)।

শিক্ষিত, অধ্যাপক, শিক্ষার্থী, নকলনবীশ ও গ্রন্থ বিক্রেতাগণ দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কার্ডোভা আসিতেন। কার্ডোভা পাশ্চাত্যের একটি শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে গ্রন্থ বিপণীগুলি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল (ঐ, পৃ. ১৪০)। গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য কর্ডোভা বাজার এত বেশী খ্যাতি অর্জন করে যে, ক্রেতা-বিক্রেতাগণ স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সেইখানে আগমন করিতেন। ইব্ন রুশ্দ বলেন, সেভিলের একজন শিক্ষিত লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার বই-পুস্তক বিক্রয়ের জন্য কর্ডোভায় আনয়ন করা হইত এবং কর্ডোভার একজন সঙ্গীতজ্ঞের মৃত্যু হইলে তাঁহার বাদ্যযন্ত্রগুলি বিক্রয়ের জন্য সেভিলে প্রেরণ করা হইত (ঐ, পৃ. ১৪০)। গ্রন্থবিপণীগুলিতে পুস্তক ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি ইহার কপিও তৈরী করা হইত। জনৈক ঐতিহাসিক ইবনু'ল-ফায়্যাদ বলেন, কর্ডোভার পূর্বাঞ্চলে ১৭০ জন মহিলা কুফিক পদ্ধতিতে কুরআন কপি করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন (ঐ, পৃ. ১৪০)।

কাগজ ঃ গ্রন্থ রচনার অন্যতম উপাদান কাগজ। মুসলিম আনদালুসিয়াতে কাগজ উৎপন্ন হইত। স্থানীয়ভাবে কাগজ উৎপাদিত না হইলে আনদালুসিয়ায় এইরূপ পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থের সমাবেশ ঘটান সম্ভব হইত না। ইহা ছিল ইউরোপে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর অবদান (P. K. Hitti, History of the Arabs, 564)। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ও কাগজের ব্যবহার না হইলে ইউরোপে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই মাত্রায় অগ্রগতি সম্ভব হইত না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, মুরগণ কাগজের প্রচলন না করিলে ইউরোপে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটিত না, এমনকি রেনেসাঁর উদ্ভব হইত কিনা ইহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্যাপিরাসের পরিবর্তে অধিকতর সস্তা লিনেন (Linen) এবং তুলোট কাগজ প্রবর্তন এবং তাবা নামক এক প্রকারের ব্লক ছাপার কাগজ প্রবর্তন শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। ইয়াকূ'ত মনে করেন, যাতিবা (Jativa) কাগজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি এখনও ইংরেজী রীম (ream) শব্দের মধ্যে নিহত আছে। এই শব্দটি মূলত 'রিয্মা:' (Rizmah) বা বাণ্ডিল হইতে উদ্ভব হইয়াছে। আনদালুসীয় ভাষায় শব্দটি হইয়াছে 'রেয্মা' (resma)। ফ্রান্স প্রথম কাগজ কলের জন্য আনদালুসিয়ার নিকট ঋণী। এই সকল দেশ হইতে কাগজ ইউরোপের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে (ঐ, পৃ. ৫৬৪)।

গ্রন্থাগার ঃ শিক্ষা সম্প্রচার ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। মূর সভ্যতার অসামান্য অবদান ছিল অসংখ্য গ্রন্থ সম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহ। গ্রন্থাগারের জন্য কর্ডোভা এক উজ্জ্বল স্থান দখল করিয়া আছে। প্রাদেশিক শাসক এবং স্বাধীন রাজ্যের সুলতানগণ আনদালুসিয়ার বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, ফলে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত গ্রন্থাগার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপাঠাগারও স্থাপিত ছিল। অধিকাংশ পাঠাগারই সরকার পরিচালিত ছিল। প্রত্যেক নগরীতেই পাঠাগার ছিল। সমগ্র আনদালুসিয়ায় ৭০টি বৃহদাকার গ্রন্থাগার ছিল বলিয়া জানা যায়। আনদালুসিয়ায় মুসলিম শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ার সময় দ্বিতীয় ফিলিপ্স (১৫৫৬-৯৮ খৃ.) ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলিম গ্রন্থাগার হইতে দুই হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, ইহা পরবর্তী কালে মাদ্রিদের Escorial গ্রন্থাগারের ভিত্তি রচনা করে। ইতিপূর্বে মাদ্রিদে কোন লাইব্রেরী ছিল না (ঐ, পৃ. ৫৬-৫৬৫)।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আনদালুসিয়ায় ঐতিহ্যমণ্ডিত হইয়া গড়িয়া উঠে। গ্রন্থাগারিকগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইত। এই পদটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল। রাজধানীর গ্রন্থাগারগুলি রাজপরিবারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পুস্তকের তালিকা থাকিত এবং এই তালিকায় পুস্তক প্রণেতা, তাঁহার পিতার নাম, তাঁহার জন্ম তারিখ, বিষয়বস্তু ও পুস্তক রচনার সময়কাল লিখিত থাকিত। পুস্তকের বাঁধাই ছিল অতি চমৎকার ও মজবুত। বাঁধাই-এর জন্য চামড়ার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কোন কোন মহামূল্যবান পুস্তক সোনা-রুপায় প্রলেপে অলংকৃত করা হইত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ ও পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল।

আনদালুসিয়ার প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় কর্ডোভায়। দ্বিতীয় 'আবদুর রাহমান তাঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভেই ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। তৃতীয় 'আবদুর রাহমান ইহা সম্প্রসারণ করেন (S.M Imamuddin, Some Aspects of the Socio-Economic And Cultural History of Muslim Spain, 1965, P. 140)। মুহাম্মাদ ও দ্বিতীয় হ'াকামও পৃথক পৃথকভাবে গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন এবং দ্বিতীয় হ'াকাম ৬,০০,০০০ গ্রন্থের এক বিশাল সংগ্রহ সমাহার গড়িয়া তোলেন। তাঁহার রাজকীয় গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থগারিকের নাম ছিল তালিদ। জানা যায়, হ'াজিব আল-মানসূ'রের নির্দেশে রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। টলেডোর সা'ঈদ এই ধ্বংসের ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়াছেন। বার্‌বারগণ খিলাফতের পতনকালে এই রাজকীয় গ্রন্থাগারের চূড়ান্ত ধ্বংস সংঘটিত করে। ইহা ছিল শিক্ষা জগতের জন্য চরম বিপর্যয় (ঐ, পৃ. ১৪১)। খিলাফতের পতন ঘটিলে প্রাদেশিক শহরগুলি সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুলূকু'ত-তাওয়াইফ-এর মধ্যে সেভিলের আববাদীগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাদের রাজধানীতে একটি বিশাল গ্রন্থবিপনী ছিল। আলমেরিয়ার শাসক যুহায়র-এর উযীর আবূ-জা'ফার ইব্‌ন 'আব্‌বাসের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ৪,০০,০০০ এর অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। টলেডোর বানূ যূন-নূন এবং সারাগোসার বানূ হুদদের রাজধানীতে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারে গ্রানাডাও পিছাইয়া ছিল না। বানূ যুবায়দী ইব্‌ন ফুরক'ান অ্যাবেন লোপ (Aben Lope) প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি সেখানে ছিল।

ইতিহাস চর্চা ঃ ইতিহাস চর্চায় আনদালুসিয়ার মুসলিমগণ অসামান্য অবদান রাখিয়াছেন। ভূগোল-ইতিহাস-জ্ঞানের এই দুইটি শাখা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটি অপরটির পরিপূরক। রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-স্থাপত্য, ধর্ম-দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং বিশ্ব ইতিহাস রচনায় আনদালুসিয়ার মুসলিম লেখকগণ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। শতাধিক ঐতিহাসিক আনদালুসিয়ার ইতিহাসে অবদান রাখিয়াছেন। সেইখানকার মুসলিমদের ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তৃত ও বৃহদাকার। বর্তমান স্পেনে টিকিয়া থাকা আরবদের স্থাপত্য কীর্তি ও আরব সংস্কৃতির অংশবিশেষ যাহা ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত, ইহা আরব ঐতিহাসিকদেরই বিবরণের ফসল। স্পেনীয় ঐতিহাসিকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিবরণ পরবর্তী বিরুদ্ধবাদী লেখকগণও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ঐতিহাসিক রচনাবলী উপাখ্যান ও কল্পকাহিনী নির্ভর। তবে এইগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নহে। দুর্ভাগ্য যে, এই সকল রচনার অধিকাংশই বর্তমানে পাওয়া যায় না (ঐ, পৃ. ১৪৬)।

আনদালুসিয়ার ঐতিহাসিকদের মধ্যে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণকারী আবূ বাক্‌র ইবন 'উমার, যিনি ইবনুল কূ'তিয়্যা নামে পরিচিত, তিনি গথিক শাসক উইটিজার-এর একজন বংশধর ছিলেন। আনদালুসিয়ায় মুসলিম বিজয় ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর তাঁহার রচিত 'তারীখ ইফতিতাহ' আল-আনদালুস' অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য (ঐ, পৃ. ১৪৬)। খ্যাতনামা আধুনিক ঐতিহাসিক অধ্যাপক পি.কে. হিট্টি তাঁহার 'হিষ্ট্রি অবদি অ্যারাবস' রচনায় ইব্‌নুল-কূ'তিয়্যা-এর উপরিউক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (History of the Arabs, p. 565)। কর্ডোভার আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবূ মারওয়ান হ'ায়্যান ইব্‌ন খানাফ (৯৮৮-১০৭৬ খৃ.) বা ইব্‌ন হ'ায়্যান কমপক্ষে পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'আল-মাতীন' শীর্ষক জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থটি ষাট খণ্ডে রচিত। তাঁহার আল-মুক'তাবিস ফী তা'রীখি'ল-আনদালুস' বর্তমানেও টিকিয়া আছে (ঐ, পৃ. ৫৬৫)। মুওয়াহহিদ যুগের উপর ১২২৪ খৃ. ইতিহাস রচনা করেন আনদালুসিয়ায় বসবাসকারী মরক্কোবাসী ঐতিহাসিক 'আবদুল ওয়াহি'দ আল-মাররাকুশী (ঐ, পৃ. ৫৬৫)।

তৃতীয় 'আবদুর রাহমানের সচিব গ'ারীব ইবন সা'ঈদ তাবারীর গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করেন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস রচনা করেন। বানূ যু'ন-নূন-এর অধীনে টলেডোর কাযী 'আবুল ক'াসিম সা'ঈদ ইবন আহ'মাদ (১০২৯-৭০ খৃ.) আরব ও অন-আরব মুসলিম জ্ঞানীজনদের উপর একটি জীবন-বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ ত'াবাকাতু'ল-উমাম এবং জার্মি'উল-আখবার আল-উমাবী নামক বিভিন্ন জাতির একটি সাধারণ ইতিহাস লিখেন। অপর একজন ঐতিহাসিক ইবন সা'ঈদ আল-মাগ'রিবী (১২১৪-১২৮৬ খৃ.) আনদালুসিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস 'আল-মাগরিব' রচনা করেন (ঐ, পৃ. ১৪৬)। আনদালুসিয়ার বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে আল-ওয়ালীদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-ফারাদী জীবন-বৃত্তান্ত রচনায় বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি কর্ডোভায় গবেষণা ও শিক্ষকতা করেন। তাঁহার অসংখ্য রচনার মধ্যে 'তা'রীখ 'উলামা আল-আন্‌দালুস' একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ (History of the Arabs, p. 566)।

আল-ফারাদীর মূল্যবান গ্রন্থটি পরবর্তী কালে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন আবুল্‌-ক'াসিম খালাফ ইব্‌ন 'আবদুল-মালিক ওরফে ইব্‌ন বাসকুওয়াল। তিনি ১১৩৯ খৃ.ঃ আস্‌'-সি'লাহ' ফী তা'রীখ আইম্মাতিল-আন্‌দালুস রচনা করেন। তিনি ৫০টি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে কৃতিত্বের দাবিদার। বিশ্বকোষ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন আদ-দাব্‌বী। তাঁহার গ্রন্থের নাম "বুগ'য়াতুল-মুল্‌তামিস ফী তা'রীখ রিজাল' আল-আনদালুস"। হু'নায়ন ইব্‌ন 'আসি'ম খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি আল-মানসূ'র ইব্‌ন আবী 'আমিরের জীবনী কিতাবু'ল-মাআছি'রি আল-'আমিরিয়াহ রচনা করেন।

মুসলিম পাশ্চাত্যের দুইজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌নুল খাতীব ও ইব্‌ন খালদূন নাসরীয় যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (S.M. Imamuddin, P. 147)। লিসানু'দ-দীন ইব্‌নুল-খাত'ীব (১৩১৩-৭৪ খৃ.) সিরিয়া হইতে স্পেনে আসেন। তিনি সর্বমোট ষাটটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এইগুলির অধিকাংশই ইতিহাস, কবিতা, ভূগোল, চিকিৎসা, দর্শন এবং সুকুমার সাহিত্য বিষয়ক। তাঁহার গ্রানাডার ইতিহাস 'আল-ইহ'াত'া ফী তারীখ গ'ারনাত'া' দুই খণ্ডে লিখিত। ইহার আংশিক স্পেনিস ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি বহুমুখী প্রতিভাধর আবদুর রাহমান ইব্‌ন খাল্‌দূন (১৩২২-১৪০৬ খৃ.) জ্ঞানচর্চা ও

গবেষণা, মননশীলতা ও একনিষ্ঠ সাধনার জন্য জগৎ বিখ্যাত। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাব 'আল-ইবার' রচনা করেন। এই গ্রন্থে মূল বিষয়বস্তু হইল আরব, পারসিক এবং বার্বারদের সম্পর্কিত ইতিহাস ও দৃষ্টান্তসমূহ। গ্রন্থটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ মুক'দ্দামা (মুখবন্ধ)। দ্বিতীয় অংশ আরব ও পার্শ্ববর্তী জাতিদের ইতিহাস, তৃতীয় অংশ বারবার ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজবংশসমূহের ইতিহাস (ঐ, পৃ. ৫৬৮)। ইব্ন খালদূনের খ্যাতি মুক'দ্দামায় নিহিত (ঐ, পৃ. ৫৬৮) এবং মুক'দ্দামা আরবী সাহিত্যে একটি অনন্য স্থান দখল করিয়াছে। এই কালজয়ী গ্রন্থে ইতিহাসের বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ ও তথ্যনির্ভর আলোচনা এবং ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁহার মূল্যবান ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হইয়াছে।

দর্শন ঃ দর্শন শাস্ত্রে আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা, মননশীলতা ও মৌলিক জ্ঞানের যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অনুকরণীয়। আনদালুসিয়ায় সাধারণত দর্শন শাস্ত্র জনপ্রিয় ছিল না। দার্শনিকগণ একনিষ্ঠ ধর্মবেত্তাদের ভয়ে ভীত ছিলেন। দর্শনের প্রতি আগ্রহী সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা গোপনে ইহার চর্চা করিত এবং প্রাচ্যে গমন করিয়া আরবী ভাষায় লিখিত দর্শনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত। প্রকৃত অর্থে মুসলিম বিশ্বে দর্শনের সূত্রপাত হয় আব্বাসী খিলাফাত কালে। আরবী দর্শন মূলত আল-কুরআন ও হাদীছ শরীফ ভিত্তিক হইলেও পরবর্তী পর্যায়ে গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় বেদান্ত দ্বারা মুসলিম দর্শন প্রভাবান্বিত হয়। পরবর্তী কালে আনদালুসিয়ায় আরবগণ বুদ্ধিভিত্তিক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি আগ্রহী হয়। গ্রীক দর্শন মুসলিম দার্শনিকগণ ল্যাটিন ইউরোপে সম্প্রচার করে। পরবর্তী যুগের ধর্মতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার উপর ইহার প্রভাবের কথা বিচার করিলে তাহাদের অবধানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করিতে হয় (History of the Arabs, p. 580)।

ইব্ন মাসাররা (মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (৮৮৩-৯৩১ খৃ.) ছিলেন কর্ডোভার প্রথম প্রভাব বিস্তারকারী দার্শনিক। তিনি পিতার ন্যায় মু'তাযিলা দর্শনের প্রবক্তা এবং মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গোপনে তাঁহার সর্বেশ্বরবাদের দার্শনিক ধারণা প্রচার করিতেন। নাস্তিক্যবাদের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইয়া নির্বাসিত হন (S.M Imamuddin, P. 148)। কর্ডোভার বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন ইব্ন হ'াযম (৯৯৪-১০৬৪ খৃ.)। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ধর্মমত বিরোধী বিশ্বাসের সমালোচনার ইতহাস (আল-ফাস'ল ফি মিলাল ওয়ান-আহওয়া ওয়ান-নিহ'াল) পাঁচ খণ্ডে Miguel Asin Palacious (১৯২৭-১৯৩২) স্পেনীয় ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন। ইব্ন হ'াযম সেভিলে বসবাস করিতেন। সেইখানে তাঁহার গ্রন্থাবলী শাসক আল-মু'তামিদ পোড়াইয়া দেন। প্রাথমিক স্পেনীয় আরব দার্শনিকদের মধ্যে মালাগাবাসী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ভুক্ত মলমন ইব্ন গ্যাবীরোল শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পাশ্চাত্যে নিও প্লাটোনিজমের মহান শিক্ষক হিসাবে ইব্ন গ্যাবীরোলকে ইয়াহূদী প্লেটো বলা হয় (The History of the Arabs, p. 580)। তাঁহার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ক্লাসিক্যাল দর্শন মুসলিম দর্শনে অনুপ্রবেশ করে। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "য়ানবু' আল-হ'ায়াত"।

আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ'য়া ইব্ন বাজ্জা (১০৮৫-১১৩৮ খৃ.) একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং এরিস্টোটলের সূত্রের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদবীরুল-মুতাওয়াহ্হি'দ। অনেক আরব ঐতিহাসিকের মতে তিনি প্রাচ্যের ইব্ন সীনা ও আল-গাযালীকে অতিক্রম করেন। তিনি তাহার শিষ্য ইব্ন সীনার পথ প্রস্তুত করেন (S.M Imamuddin, P. 149)। তাঁহার মতে পরম শক্তি বা আল্লাহ্র সত্তার (Active Intellect) সহিত মিলনের মধ্য দিয়া মানুষের আত্মা বিশুদ্ধতা অর্জন করে এবং ইহা শিক্ষা দেওয়াই দর্শনের উদ্দেশ্য। মুসলিম জীবনী লেখকগণ ইব্ন বাজজাকে একজন নাস্তিক বলিয়া মনে করেন (History of the Arabs, p. 581)।

খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী আনদালুসিয়ায় দর্শন শাস্ত্রের অগ্রগতির পূর্ণ যুগ। এই যুগের নিও প্লাটোনিক দার্শনিক আবূ বাকর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন তু'ফায়ল ছিলেন ইব্ন বাজজার শিষ্য। তাঁহার প্রখ্যাত দর্শন গ্রন্থের নাম হ'ায়্য ইব্ন ইয়াক'জ'ান। বাহিরের কোন শক্তির প্রভাব ছাড়া একজন মানুষ তাহার স্বীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী দ্বারা উচ্চপদ অর্জন করিতে পারে এবং ধীরে ধীরে সৃষ্টিকর্তার (Supreme Being) উপর তাঁহার নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়া এই গ্রন্থে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁহার এই গ্রন্থ ১৬৭১ খৃ. এডওয়ার্ড পোকক (Edword Pococke) ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সেখান হইতে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া ওলন্দাজ (১৬৭২ খৃ.), রুশ (১৯২০ খৃ.) ও স্পেনীয় (১৯৩৪ খৃ.) ভাষায় ইহা অনূদিত হয়। অনেকের মতে ইব্ন তু'ফায়লের রচনা রবিনসন ক্রুশোর (Robinson Crusoe) কাহিনীকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তিনি ইব্ন সিনা ও আল-ফারাবীর নিকট ঋণী (ঐ, পৃ. ২৮১-২৮২)।

পাশ্চাত্যে Averroes নামে পরিচিত আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন রুশ্দ (১১২৬-১১৯৬ খৃ.) একজন সুবিখ্যাত মনীষী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তিনি মরক্কোতে জন্মগ্রহণ ও ইনতিকাল করেন। মরক্কোর গোঁড়া মুসলিমগণ তাঁহাকে একজন যিন্দীক বলিয়া অপবাদ দেন এবং ১১৯৪ খৃ. আবূ য়ূসুফের পুত্র আল-মানসূ'র তাঁহাকে নির্বাসিত করেন (ঐ, পৃ. ১৪৯)। পাশ্চাত্যে তাঁহার অসামান্য প্রভাব হইতে ধারণা করা হয় যে, হিস্পানো-আরব জ্যোর্তিবিদ, চিকিৎসাবিদ ও এরিস্টোটলীয় প্রবক্তা ইব্ন রুশ্দ অন্যতম শ্রেষ্ট মুসলিম দার্শনিক (History of the Arabs, p. 582)। তিনি আল-কুল্লিয়াত ফিত-তি'ব্ব নামক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। দর্শন বিষয়ক তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ রচনা তাহাফুত। তাহাফুত নামে পরিচিত গ্রন্থটি ইমাম আল-গ'যালীর তাহাফুতু'ল-ফালাসিফা (দার্শনিকদের মতবাদ খণ্ডন) গ্রন্থের প্রত্যুত্তর। এই গ্রন্থের কারণেই ইব্ন রুশ্দ মুসলিম বিশ্বে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের নিকটে এরিস্টোটল যেমন ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক, ইব্ন রুশ্দ তেমনি ছিলেন তাঁহার প্রকৃত ভাষ্যকার হিসাবে খ্যাত। মধ্যযুগের ইউরোপের খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতদের মনে ইব্ন রুশ্দ যেইরূপ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন আর কোন গ্রন্থকারই করিতে পারেন নাই। ইব্ন রুশ্দের গ্রন্থ প্রথমে আনদালুসিয়ায় মুসলমান, পরে তালমুদী এবং সর্বশেষে খৃস্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু তৎসত্ত্বে ও খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ

হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চিন্তাজগতে ইব্ন রুশদের মতবাদই প্রবল থাকে। তাঁহার সম্পর্কে যত নিন্দা ও ভুল ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন তবুও আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইব্ন রুশদের প্রবর্তিত চিন্তাধারাই ইউরোপীয় চিন্তাজগতে জীবন্ত শক্তিরূপে টিকাইয়া রাখিয়াছে (ঐ, পৃ. ৫৮৪)।

ইব্ন রুশদের পর খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম স্থানের দাবিদার হইলেন তাঁহার সমসাময়িক কার্ডোভার মনীষী ইব্ন মায়মূন। আরবদের অগ্রগতির যুগে তিনিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ইয়াহূদী চিকিৎসক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার প্রধান দার্শনিক গ্রন্থের নাম দালালাতু হাইরীন (বিভ্রান্তদের পথপ্রদর্শক)। এই গ্রন্থে তিনি ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্রের সহিত মুসলিম এরিস্টোটলবাদ অথবা ব্যাপক অর্থে বিশ্বাসের সহিত যুক্তির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। এই দিক হইতে অন্তত তিনি বাইবেলের মৌলবাদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাহসী সমর্থক ছিলেন। ইহাতে তিনি গোঁড়া শাস্ত্রবিদদের রোষে পতিত হন। তাহারা তাঁহার গ্রন্থের নাম দেন দ'লালাহ (গোমরাহ্করণ)। আধুনিক সমালোচকেরা তাঁহার প্রভাবের পরিচয় বহুজনের মধ্যে দেখিতে পান, যেমন ডমিনিকান (Dominicans), ডান স্কোটাস (Dans Scotus), স্পিনোজা (Spinoga), এমনকি ক্যান্ট (Kent)।

খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলামী সূফীজগতে আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী মুহ্'য়িদ্দীন ইব্নুল 'আরবী (১২৬৫-১১৪০ খৃ.) সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি স্পেনের মুর্সিদা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে যুগের মরমীবাদীদের প্রধান বলা হয় (ঐ, পৃ. ৫৮৫)। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেভাবে উল্লেখ্য হি'কমাতু'ল-ইশরাক', আল-ফুতূহ'াতুল-মাক্কিয়্যা, ফুসূসু'ল হি'কাম, আল-ইসরা ইলা মাক'ামিল আস্রা। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে ইব্ন আরাবী মহানবী (স)-এর মি'রাজ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দান্তের (Dante) মহাকাব্যের সহিত ইহার সামঞ্জস্যের আভাস পাওয়া যায় (ঐ, পৃ. ৫৮৬)। ইব্ন আরাবীর মতবাদ মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলিয়াছিল। একমাত্র মাওলানা রূমী ছাড়া ইসলামের অন্য কোন মরমীবাদী সৃষ্টিশীলতা কিংবা নিগূঢ়তার দিক দিয়া ইব্নুল আরাবীকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই (E.J. Brown, Literary History of Persia, P. 205)। তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা মরমী কবি-দার্শনিকদের দেশ পারস্যে সর্বেশ্বরবাদী (Pantheism) সূফীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নাই বরং ইব্ন আরবী বৈরাগ্যবাদ হইতে ইসলামী দর্শনকে মরমী সূফীবাদে রূপান্তরিত করেন (আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, ঢাকা ১৯৯১, পৃ.২১২)। ইব্ন আরাবী যে দার্শনিক মতবাদের প্রচলন করেন তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী মরমীবাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি যে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাহা সাধারণত ইশরাক'ী বা Illuministic বলা হয় (History of the Arabs, p. 586)। নিওপ্লাটোনিজম এবং সর্বেশ্বরবাদী (Pantheisn) মতবাদের প্রেরণায় তিনি যে ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন তাহার মূলমন্ত্র সৃষ্টিকর্তা হইতেছে আল্লাহ্ এবং অশরীরী আত্মা (Spirit), আলোকচ্ছটা বা Illumination। এই আলোকচ্ছটা বস্তু জগতের সমস্ত কিছুতে বিকিরণ হয়। তাহার দার্শনিক চিন্তাভাবনা এবং মতবাদের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাঁহার মতবাদ পারস্য ও তুর্কী সূফী সাধক ও দার্শনিকদের প্রভাবন্বিত করে (ঐ, পৃ. ৫৮৭)। বিখ্যাত মাছ'নাবী রচয়িতা জালালুদ্দীন রূমী বিশেষভাবে ইব্ন 'আরাবী দ্বারা প্রভাবন্বিত ছিলেন। দান সস্কটাম, রজার বেকন এবং রেমণ্ড লালের ন্যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন।

ভূগোল ঃ আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ ভূগোল শাস্ত্র ও ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর হিসপানো-আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সুপরিচিত ছিলেন আল-বাকরী। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যে মুসলিম ভৌগোলিকদের পথিকৃত। বহু খণ্ডে লিখিত তাঁহার প্রখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ "আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক (সড়ক ও রাজ্য সমূহের ইতিবৃত্ত) তাঁহার খ্যাতির মূল উৎস। গ্রন্থটি আংশিক পাওয়া গিয়াছে।

'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীসী খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ভৌগোলিক ও মানচিত্র কর। ১১০০ খৃ. তিনি সিউটায় রাজকীয় স্পেনীয়-আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্পেনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজাবের রাজদরবারের প্রধান অলংকার বলিয়া অভিহিত হন (History of the Arabs, p. 569)। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'নুযহাতুল মুশতাক' ফী ইফতিরাকি'ল-আফাক'। ইহা টলেমী ও আল-মাস'ঊদীর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত এবং ইহাতে পর্যটকদের বর্ণনা হইতে সংগৃহীত তথ্যাবলী সংযোজিত হয়। এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় রজারের জন্য রূপার একটি গোলক মানচিত্র এবং নভোমণ্ডল তৈরী করেন (ঐ, পৃ. ৫৬৯)।

ভূগোল শাস্ত্র ছাড়াও আনদালুসীয় মুসলমানগণ পর্যটন বৃত্তান্ত লিখিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিস্পানো-আরব পর্যটকদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন আবুল-হুসায়ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন যুবায়র। তিনি ১১৮৩ খৃ. হইতে ১১৮৫ খৃ. পর্যন্ত গ্রানাডা হইতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে মিসর, ইরাক, সিরিয়া ও সিসিলি ভ্রমণ করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঃ প্রাকৃতিক রহস্যের অনুসন্ধানের পথে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ধারণ, এইগুলির পরস্পরের সম্পর্ক ও পৃথিবীর সঙ্গে এইগুলির সম্পর্ক নির্ণয়ে আনদালুসীয় মুসলমানদের অপরিসীম কৃতিত্ব ছিল। সেখানকার মুসলমানগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁহারা কালদিয়, ব্যবিলনীয় ও প্রাচীন মিসরের লোকদের মত প্রার্থনাগারের একাংশ জ্যোতির্বিদ্যার জন্য বরাদ্দ রাখিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি মসজিদের উপরেই স্থাপন করিত এবং মসজিদ সংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্যোতির্বিদগণ তাহাদের গণনা-কাল সম্পূর্ণ করিতেন। হজ্জ পালন যেমন মুসলমানদের ভূগোল চর্চায় উৎসাহ দেয়, অনুরূপভাবে কিব্লা নির্ধারণ ও পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায়ের জন্য জ্যোতির্বিদ্যা চর্চারও প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই মুসলিম স্পেনে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় এবং কর্ডোভা, সেভিল ও টলেডোর

শাসনকর্তাগণ জ্ঞানের এই শাখাকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখিতে থাকেন (ঐ, পৃ. ৫৭০)। মুসলমানগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানকে 'ইলম তানাজিম' নামে অভিহিত করিতেন। ইহাতে ফলিত জ্যোতিষ এবং গণিত জ্যোতিষ অন্তর্ভুক্ত ছিল (মুজাফ্ফার আলী, বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের দান, ঢাকা ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৯৫-৯৬)। বাগদাদের জ্যোতির্বিদ আবূ মা'শারের প্রভাবে আনদালুসিয়ার অধিকাংশ গ্রহ-বিজ্ঞানীই ধারণা করিতেন যে, জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী মানুষের প্রধান ঘটনাবলীর উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সক্রিয়।

হিস্পানো-আরব উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদদের মধ্যে কর্ডোভার আল-মাজরিতী, টলেডোর আয-যারকালী এবং সেভিলের ইব্ন আফলাহ ছিলেন প্রধান। আনদালুসিয়ার প্রাথমিক মুসলিম বিজ্ঞানী আবুল কাসিম মাসলামা আল-মাজরিতী একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি আল-খাওয়ারিয্মীর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সারণির (যীজ) সংরক্ষণ ও সংশোধন করেন। ইহাই একজন মুসলমানের প্রথম উদ্ভাবিত সারণী। তিনি পূর্ববর্তী পারস্যের য়ায্দাগির্দ-এর যুগ হইতে ব্যবহৃত যীজকে ইসলামী যুগের উপযোগী করিয়া তোলেন। পূর্বে পৃথিবীর গোলকের যে মধ্যরেখা বা মধ্যাহ্ন (meridian) নিরূপণ করা হইত তাহার পরিবর্তে কর্ডোভা ভিত্তিক মধ্যাহ্ন নির্ধারণ করিয়া আল-মাজরিতী অশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ১১২৬ খৃ. বাথ (Bath)-এর এডিলার্ড (Adelard) আল-খাওয়ারিয্মীর প্রণীত সারণী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। চৌদ্দ বৎসর পরে অপর একটি সারণী (যীজ) আল-বাত্তানী কর্তৃক ৯০০ খৃ. প্রণীত হয় এবং ইহা টিভোলী (Tivoli)-র প্লেটো কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী আল-মাজরিতী গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য নেতা (ইমাম) হিসাবে বিবেচিত হন (ঐ, পৃ. ৫৭১)।

আয্-যারকালী আনদালুসিয়ার অপর একজন প্রখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী। তিনি এবং আবূ ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্য়া টলেডো সারণি নামে পরিচিত জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান রাখেন (ঐ, পৃ. ৫৭১)। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণে আয-যারকালী স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনিই প্রথম ভূ-মধ্যসাগরের সঠিক দৈর্ঘ্য ৪২ ডিগ্রীতে নিরূপণ করেন। তিনি সাফীহা নামক একটি উন্নত ধরনের আস্তরলেব (Astrolable) উদ্ভাবন করেন। ইহা দ্বারাই প্রথম তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের ভিত্তিতে সূর্যের দূরতম সৌর বিন্দু (solar apoge) নির্ধারণ করেন। কোপারনিকাস (Copernicus) তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থে আল-বাত্তানী ও আয-যারকালীর উল্লেখ করেন (ঐ, পৃ. ৫৭২)।

মুসলিম শাসিত আনদালুসিয়ায় আয-যারকালীর পরেই জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ স্থান দখল করিয়াছেন জাবির ইব্ন আফ্লাহ'। তাঁহার রচিত 'কিতাবুল হায়'আ' গ্রন্থটি ক্রীমোনার জেরার্ড অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে তিনি টলেমীর গ্রন্থগুলির সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন এবং সঠিকভাবে নিরূপণ করেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্ররাজির, যেমন-বুধ ও শুক্র গ্রহের কোন দৃশ্যমান অক্ষ রেখা (visible pasallaxes) নাই। ইহাতে তিনি একটি ত্রিকোণমিতির অধ্যায়ও সংযোজন করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ৫৭২)।

আনদালুসিয়ার জ্যোতির্বিদদের মধ্যে সর্বশেষ স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ ছিলেন নূরুদ্দ-দীন আবূ ইসহাক আল-বিত্রূজী। তিনি তাঁহার 'কিতাব আল-হায়'আ' গ্রন্থে নভোমণ্ডলের নক্ষত্ররাজির আপেক্ষিক অবস্থান (configuration of the heavenly bodies) সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। আল-বিত্রূজীকে জ্যোতির্বিদ্যার নূতন দিকপাল বলিয়া মনে করা হইলেও মূলত তাঁহার সূত্রাবলী টলেমীর মতবাদের বিরোধী ছিল (ঐ, পৃ. ৫৭২)।

গণিতশাস্ত্র ঃ আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় গণিত শাস্ত্রেরও সমধিক উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন। বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য তাহারাই সর্বপ্রথম নির্ভুলরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন। সৌর কলঙ্কের আবিষ্কার, সৌর কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা, সূর্যের মন্দোচ্চতা, ক্রান্তি বৃত্তের বক্রতার ক্রমিক হ্রাস, ক্রান্তিগমনের পরিমাণ ইত্যাদি সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা তাঁহারা গণিত শাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

গণিত শাস্ত্র ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নহে। গণিত শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। আরবী হইতে যে সকল গণিত-ঘটিত শব্দ ধার করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিতান্তই কৌতূহলোদ্দীপক একটি শব্দ সাইফার (Cipher) বা জিরো (zero) 'শূন্য'। আরবগণ শূন্য অবিষ্কার করেন নাই বটে, কিন্তু তাহারা আরব সংখ্যার সঙ্গে শূন্য ইউরোপে প্রেরণ করেন এবং ইউরোপীয়দের ইহার ব্যবহার শিক্ষা দেন। ইহার ফলে জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে গণিতের ব্যবহার সম্ভব হয় (ঐ, পৃ. ৫৭৩)। কারণ সংখ্যাতত্ত্বে শূন্য ব্যতিরেকে গণনা একেবারেই অসম্ভব। এই কথা স্মরণ রাখিয়া আরব গণিতজ্ঞগণ প্রাচীন বিরক্তিকর রোমীয় সংখ্যাতত্ত্বের স্থলে শূন্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে। এই শূন্য 'হিন্দি' নামে পরিচিত ছিল এবং ইহা হইতেই শূন্যের ভারতীয় উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় (ঐ, পৃ. ৫৭৩)।

আল-খাওয়ারিয্মীর গণিত বিষয়ক গ্রন্থ বাথ (Bath)-এর এবেলার্ড (Abelard) ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। মূল আরবী গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হইলেও খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এড্লার্ডের গ্রন্থ De numero indico সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল (ঐ, পৃ. ৫৭৩)। আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 'হুরুফুল-গু'বার' (বালির অক্ষর) নামে এক ধরনের গণনাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন যাহা মূলত এক ধরনের Abacus বালুর সাহায্যে লেখা হইত। অধিকাংশ পণ্ডিত (হিন্দু) শূন্যের মত 'গুবার'-কে ভারতীয় উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন (ঐ, পৃ. ৫৭৪)। শূন্যের ন্যায় দশমিক মানও (decimal notation) মুহাম্মাদ ইব্ন মূসার আবিষ্কার, তিনিই সংখ্যার স্থানীয় মান (value of position) নির্দেশ করেন। বর্গীয় সমীকরণের সাধারণ নিয়মও তাঁহারাই আবিষ্কার করেন (Draper, পৃ. ৪৭)।

হিন্দু সংখ্যাতত্ত্ব অপেক্ষা আরবী গুবারের উপর ভিত্তি করিয়া ইউরোপের আধুনিক সংখাতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়। ইউরোপের গণিতজ্ঞগণ খৃস্টীয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রোমীয় সংখ্যাতত্ত্ব Abacus ব্যবহার করিতেন। উল্লেখ্য যে, আনদালুসিয়া হইতে সর্বপ্রথম ইতালিতে গুবার প্রচলিত হয়। ১২০২ খৃ. পিসার লিওনার্ডে ফিবোনাসী (Leonardo Fibonacei) যিনি একজন প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীর

নিকট গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন, উত্তর আফ্রিকা সফর করেন এবং মুসলিম সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থটি ইউরোপে আরবী সংখ্যাতত্ত্ব প্রচলনে সহায়তা করে। ইহা ছিল আরবী সংখ্যাতত্ত্ব প্রচলনের মাইলফলক। ইহার ফলে ইউরোপে গণিত শাস্ত্রের সূচনা হয় (ঐ, পৃ. ৫৭৪)।

বীজগণিত ও জ্যামিতিতেও আরবদের অসামান্য অবদান ছিল। আল-খাওয়ারিযমীর "হিসাবুল-জাবর ওয়াল-মুক'াবালা" ল্যাটিনে অনূদিত হইলে ইউরোপে বীজ গণিতের প্রচলন হয়। ইউরোপে ইহা Algorism নামে পরিচিত। শুধু বীজ গণিতই নহে, আরবরা জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির উদ্ভাবন করেন। (ঐ, পৃ. ৫৭৩)। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে আরবী গণিত শাস্ত্রের অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। বীজগণিতের পরিভাষা 'সুর্দ' (swrd) যাহা খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ল্যাটিনে ব্যবহৃত হয় তাহা আরবী শব্দ "জাযর আসাম্ম" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিকোণমিতিতে 'sine' শব্দটিও যাহা ল্যাটিনে seine হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আরবী 'জায়ব' (pocket) পকেট হইতে অনূদিত হইয়াছে। ইংরেজ গণিতজ্ঞ চেষ্টারের (chester) রবার্ট (Robert) খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার ত্রিকোণমিতিতে আরবী শব্দ 'জায়ব'-এর বিপরীতে Sinus শব্দটি ব্যবহার করেন (ঐ, পৃ. ৫৭৩)।

উদ্ভিদবিদ্যা ঃ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ উদ্ভিদবিদ্যায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ ও ফলিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের মুসলিমগণ তাঁহাদের গবেষণার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কৃষিকার্য সম্বন্ধে তাহাদের অগাধ-জ্ঞান ছিল এবং উদ্ভিদের উপর গবেষণা করিয়া নানা প্রকার তথ্য আবিষ্কার করেন। বৃক্ষলতাকে তাঁহারা বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেন। যেমন কিছু উদ্ভিদ কলম (cutting) হইতে জন্মে, কিছু বীজ হইতে জন্মে এবং কিছু আপনা আপনি জন্মে। চারাগুলিকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে তাঁহারাই প্রথম বিভক্ত করেন (ঐ, পৃ. ৫৭৪)। অনেক খলীফা এবং শাসক, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় 'আবদুর-রাহমান এবং তৃতীয় 'আবদুর-রাহমান বৃক্ষ সংগ্রহের জন্য প্রাচ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন (S.M. Imamuddin, p. 154)।

আনদালুসিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞানী কর্ডোভাবাসী আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-গ'াফিক'ী (১১৬৫ খৃ.) গবেষণার জন্য আনদালুসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ও আফ্রিকা হইতে উদ্ভিদ ও চারা সংগ্রহ করেন। তিনি প্রতিটি চারার আরবী, ল্যাটিন ও বারবার নাম দেন। তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আদবিয়া আল-মুফ্‌রাদা' তাঁহার সমসাময়িক প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনুল বায়তার কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। ইয়াহ্'য়া ইব্ন মুহ'ম্মাদ আল-'আওয়াম রচিত গ্রন্থ 'আল-ফিলাহ'া' তৎকালীন সময়ের সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়। ইহা মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা (History of the Arabs, p. 575)। এই গ্রন্থে কমপক্ষে ৫৮৪টি বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের এবং ৫০ প্রকারের ফলের বর্ণনা আছে। তাহা ছাড়া কলম তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতি, বৃক্ষ ও চারার বিভিন্ন রোগ, চারার বিভিন্ন উপাদান এবং রোগ নিবারণের ঔষধাদির বিবরণও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আনদালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আল-বায়তার সমগ্র স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার পার্বত্য ও বনাঞ্চলে ভেষজ বিজ্ঞানী হিসাবে অসংখ্য নমুনা সংগ্রহ করেন। তাঁহার রচিত দুইটি প্রখ্যাত গ্রন্থ আল-মুগ'নী 'ফিল-আদ্‌বিয়া আল-মুফ্‌রাদা' একটি মেটিরিয়া মেডিকা এবং অপরটি 'আল-জামে' ফিল-আদবিয়া আল-মুফরাদা'। ইহাতে প্রাণীজ, উদ্ভিদ, খনিজ বস্তুর রোগ নির্ণয় ও ইহার ঔষধ সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা আছে।

ভূ-বিদ্যা ঃ আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ ভূ-বিদ্যা অধ্যয়ন ও চর্চা করিতেন। আনদালুসিয়ার বিজ্ঞানীগণও খনিজের গঠন ও ইহার শ্রেণীবিন্যাস, বিভিন্ন যুগে পাহাড়-পর্বতের স্তর বিন্যাস এবং ভূত্বকের হ্রাস সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়া মানব জাতির প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন এবং এইগুলি ইউরোপে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল (S. M. Imamuddin, p. 157)।

রসায়নশাস্ত্র ঃ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি ও অগ্রগতিতে আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান বিশ্বনন্দিত। আরবী 'আল-কীমিয়া' হইতে আল-কেমি (alchemy) এবং আধুনিক Chemistry বা রসায়নের উদ্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান হিসাবে রসায়নশাস্ত্র নিঃসন্দেহে মুসলিমদের সৃষ্টি (E. Gibbon, Rise and Fall of the Roman Empire, vol. vi, p. 37) এবং আধুনিক রসায়ন স্পষ্টতই ছিল মুসলিমদের আবিষ্কার এবং এই বিষয়ে তাহাদের কীর্তি ছিল এক অনন্য আকর্ষণের ব্যাপার (আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ বাংলা বাজার, ঢাকা ২০০১ খৃ., পৃ. ৭৮)। মুসলমানগণ রসায়নের অগ্রগতিতে প্রভূত বৈজ্ঞানিক অবদান রাখিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা গ্রীকদের জ্ঞানচর্চাকে কাজে লাগাইয়া ইহার উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন (Some Aspects of the Socio-Economic And Caltural History of Muslim Spain, p. 161)। আরব আল-কেমির জনক ছিলেন জাবির ইব্ন হ'ায়্যান (geber) এবং আর-রাযীর পরই তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে হয় (History of the Arabs, p. 380)। তাঁহার মিসরীয় ও গ্রীক অগ্রদূতদের ন্যায় তিনি টিন, সিসা, লৌহ, তামা ইত্যাদি ধাতু স্বর্ণে রূপান্তরিত করার ধারণাকে কার্যকরী করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আল-জাবির সেভিলেও বসবাস করিতেন (Some Aspects of Socio-Economic History of Muslim Spain, P. 161)। তিনি সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক ও নাইট্রো মিউরিয়াটিক এসিড এবং রসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন (ঐ, পৃ. ১৬১)। আব্বাস ইব্ন ফিরনাস (মৃ. ৮৮৮ খৃ.) কাঁচ তৈরি করেন। তিনি তাঁহার গবেষণাগারে মেঘের গর্জনে বিদ্যুৎ চমকানো বিষয়টি অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের চেষ্টা করেন (ঐ, পৃ. ১৬১)।

আনদালুসিয়ার মুসলিম রসায়নবিদগণ জানিতেন যে, উত্তাপ দিয়া চূর্ণ করিলে ধাতুর ওজন না কমিয়া বাড়িয়া যায়। তাহারা বিশ্লেষণ (analysis), পৃথককরণ (separation), খনিজ মিশ্রিত ধাতু গলান প্রক্রিয়া (smelting of ores), গুপ্ত পরীক্ষা হইতে মিশ্র ধাতু নির্মাণ (compositons of alloys), কাঁচ গলান (fusing of

glass), স্বচ্ছকরণ (crystaligatian), বাষ্পীভূত করা (evaporation), পরিষ্করণ (suflimation), পরিশ্রাবণ (distillation), ছাঁকন (filtration), ক্ষার (alkali) প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষে অবদান রাখিয়াছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ববর্তী চিকিৎসকদিগকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। মধ্যযুগীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর স্পেনিশ মুসলিমদের প্রভাব ছিল খুবই গভীর। তাহাদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ঋণী (ঐ, পৃ. ১৬২)। আনদালুসিয়ার প্রায় আরব চিকিৎসকই বুদ্ধিবৃত্তি ও পেশাগত দিক হইতে প্রকৃত চিকিৎসক ছিলেন (History of the Arabs, p. 576)।

প্রথম মুহাম্মাদের সময় (৮৫২-৮৮৬ খৃ.) আনদালুসিয়ায় বসতি স্থাপনকারী প্রাচ্যের খ্যাতনামা চিকিৎসক য়ূনুস আল-হার্‌রানীর দুই প্রপৌত্র আহমাদ ও 'উমার বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তৃতীয় আবদুর-রাহমানের সময় অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসক ছিলেন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইসহাক। দ্বিতীয় হিশামের চিকিৎসক ছিলেন আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন জুলজুল। তিনি ৯৮২ খৃ. কার্ডোভায় Dioscorides-এর আরবী অনুবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আনদালুসিয়ায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন আবু'ল-কাসিম খালফা ইব্‌ন 'আববাস আয-যাহ্‌রাবী (১০৩০ খৃ.)। তিনি ল্যাটিনে Abulcasis নামে সুপরিচিত। তাঁহার খ্যাতির মূল উৎস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুপরিচিত গ্রন্থ 'আত-তাসরীফ লিমান আজাম আল-তা'আলীফ'। গ্রন্থটি ৩০টি অংশে লিখিত। শল্যচিকিৎসা বিষয়ের অংশ তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ যে, এই গ্রন্থের একটি কপি বাঙ্কিপূর (পাটনা) লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (Some Aspects of Socio-Economic And Cultural History of Muslim Spain, p. 163)। গ্রন্থটিতে ক্ষত বন্ধ করা (cauterization of wounds), নালীতে পাথর ভাঙ্গার প্রক্রিয়া (crushing of stone inside the bladder) এবং প্রাণীকুলের ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of visisection and dissection) প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হইয়াছে। ইহার শল্যচিকিৎসা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদগুলি ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শৈল্যবিদ্যার ম্যানুয়েল হিসাবে পরিগণিত হইত (Hitti, History of the Arabs, p. 577)। পক্ষান্তরে গ্রন্থটি মধ্যযুগে শল্যচিকিৎসার প্রধান মৌলিক গ্রন্থ এবং ইউরোপীয় শল্যচিকিৎসকদের গাইড হিসাবে বিবেচিত হয় (S. M. Imamuddin, p. 163)।

আনদালুসিয়ার বানূ যুহর পরিবার চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। পরিবারটি প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া আনদালুসিয়ায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেবা দান করে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন যুহর ছিলেন এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র আবূ মারওয়ান 'আবদুল-মালিক ইব্‌ন যুহর (Avenzoar, মৃ. আনু. ১০৯১-৪-১১৬২ খৃ.) একজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক এবং আর-রাযীর পরেই তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন (The History of the Arabs, p. 577)। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি প্রথম পাকস্থলীর ক্যানসারের বর্ণনা দিয়াছেন এবং সায়াটিকা (sciatica) চিকিৎসায় বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন (Some Aspects of Socio-Economic And Cultural History of Muslim Spain, p. 163)। আবূ যুহর রচিত ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণটি হইল "আত-তায়সীর ফি'ল-মুদাওয়াহ ওয়াত-তাদ্‌বীর"। ইব্‌ন রুশদ তাঁহার কুল্লিয়াতে ইব্‌ন যুহরকে গ্যালেনের পরে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে উল্লেখ করেন (History of the Arabs, p. 577)।

আবূ যুহরের পরিবার ছয়টি বংশ-পরম্পরায় প্রত্যক্ষভাবে আনদালুসিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ৫৭৮)। আবূ মারওয়ানের পুত্র আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ (১১৯৮-৯ খৃ.) তাঁহার চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই পরিবারের অপর একজন ইব্‌ন যুহর বাগদাদ, কায়রাওয়ান এবং কায়রোতে চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা করেন। 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌নুল মুজাফ্‌ফার আল-বাহিলী অপর একজন হিস্পানো-আরব চিকিৎসক প্রাচ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চা করেন।

প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইব্‌ন রুশ্‌দ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ১৬টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম-কানুন সম্বলিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কুল্লিয়াত ফি'ত-তিব্ব' ১২৫৫ খৃ. ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রানাডায় বসবাসকারী বিখ্যাত চিকিৎসক ইব্‌নু'ল-খাতীব (১৩১৩-১৩৭৪ খৃ.) প্লেগের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। অপর একজন প্লেগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন খাতিমা (মৃ. ১৩৬৯ খৃ.)। তাঁহার গ্রন্থটি প্লেগের উপর মৌলিক গ্রন্থে পরিণত হয়। আনদালুসিয়ার অন্যান্য চিকিৎসকগণও জ্বর, পঙ্গুত্ব, চোখের পীড়া, শিশুরোগ, হার্নিয়া, টিউমার প্রভৃতি রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন (S. M. Imamuddin, p. 164)। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাব-স্রোতের গতি এত বেশী তীব্র হয় যে, খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্রোত দ্বারা সমগ্র ইউরোপ প্লাবিত হয়।

সঙ্গীত ঃ সঙ্গীতে আনদালুসিয়ার মুসলমানদের অবদান ছিল অপরিসীম। সেইখানে সঙ্গীত চর্চায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রথম 'আবদুর-রাহমানের আফযা নামক একজন প্রিয় গায়িকা ছিল- সে 'উদ বাজাইত। গিনায় (সঙ্গীত) সে ছিল অনন্য। প্রথম হিশামের রাজত্বকালেও সঙ্গীতের চর্চা হয়। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী প্রথম হাকাম সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজসভার গায়কদের মধ্যে ছিলেন আল-আব্বাস আন-নাসাঈ, আল-মানসূর, 'আলূন এবং যারকূন। তাঁহার রাজত্বকালে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যিরয়াব (৭৮৯-৮৫৭ খৃ.) নামে পরিচিত আবূ হাসান আলী ইব্‌ন নাফে' বাগদাদ হইতে আগমন করেন। তিনি বাগদাদের সঙ্গীতজ্ঞ ইস্‌হাক ইব্‌ন মাওসিলীর শিষ্য ছিলেন। তিনি আনদালুসিয়ায় সঙ্গীত কলার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি কর্ডোভার দ্বিতীয় 'আবদুর-রাহমানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ যালযালের প্রবর্তিত বাদ্যযন্ত্র বীণায় চারি তারের স্থলে পাঁচটি তারের সংযোজন করিয়া একটি নূতন বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যিরয়াব কাঠের চুসীর (যাহার সাহায্যে তারে ঝঙ্কার

সৃষ্টি করা যায়) পরিবর্তে ঈগল পাখীর নখ ব্যবহার করিতেন। ইহা ছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তার সিংহ শাবকের অন্ত্র দিয়া তৈরীর পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা যির্‌য়াব উদ্ভাবিত বাদ্যযন্ত্রের সুরে মোলায়েম আবেশ ও গভীরতা সৃষ্টি হয়। আল-মাক্কারী তাঁহার শিষ্যদের শিক্ষাদানের কৌশল সম্পর্কে বিবরণ দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত চর্চার পূর্বে কোমরে শক্ত করিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া দিতেন যাহাতে তাহারা সুরেলা সঙ্গীত গাইতে পারে। ইহা ছাড়া মুখে তিন ইঞ্চি চওড়া কাঠের খণ্ড প্রবেশ করাইয়া তাহাদের চোয়াল প্রশস্ত করাইয়া সজোরে চিৎকার করিতে বলিতেন। এই পদ্ধতিটি "ইয়া হ'জ্জাম" বা 'আহ' নামে পরিচিত ছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় অনেক প্রথিতযশা সুরের সাধক ও সঙ্গীতজ্ঞের সৃষ্টি হয় (S. M. Imamuddin, p. 179)।

যির্‌য়াবের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তাঁহার ছয় পুত্র এবং দুই কন্যা পিতার গুণের অধিকারী ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ফাদ্'ল, মুসাবিহ্, মুতাআওওয়াল্লাদাহ সঙ্গীতে সুনাম অর্জন করেন। সেভিল, টলেডো, ভ্যালেন্সিয়া ও গ্রানাডায় সঙ্গীত চর্চার নিকেতন স্থাপিত হয় (ঐ, পৃ. ১৭০)। আবুল ক'াসিম 'আব্বাস ইব্ন ফির্‌নাস (মৃ. ৮৮৮ খৃ.) যির্‌য়াবের পরে আনদালুসিয়ায় প্রাচ্য সঙ্গীত প্রচলন করেন (ঐ, পৃ. ১৭৯)।

টলেডোর বানূ যু'ন-নূন সঙ্গীত চর্চার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ও উদার ছিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ আবুল হুসায়ন ইব্ন জা'ফার আল-ওয়াক্শী এবং খ্যাতিমান দার্শনিক ইব্ন বাজজা (মৃ. ১১৩৮ খৃ.) সঙ্গীত চর্চা করিতেন। আবদুল-ওয়াহ্হাব আল-হুসায়ন ইব্ন জা'ফার আল-হ'াজিব বিভিন্ন স্বরগ্রামে (দিল, যায়দান, মায়মূন ও মায়া) 'উদ বাজাইতেন এবং চমৎকার সুর লহরী রচনা করিতেন। তাঁহার পরিবারের সকল সদস্যই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। গ্রানাডার আবুল হুসায়ন আলী ইব্ন হামারা সুর রচনায় এবং একটি বিশেষ ধরনের বীণার উদ্ভাবনের খ্যাতি অর্জন করেন।

আনদালুসিয়ায় সঙ্গীত চর্চা শুধুমাত্র রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ মানুষের মধ্যেও জনপ্রিয় ছিল। ১০১৫ খৃ. মালাগার জনগণ 'উদ, তুনবির, সিযমার এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া কথিত হয়। আনদালুসিয়ায় সাধারণ কিতাবাহ (গিটার) ব্যবহার করা হইত (ঐ, পৃ. ১৮১)। আরব সঙ্গীত আনদালুসীয় উপদ্বীপে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মুসলিম সঙ্গীত বিশারদগণ ক্যাস্টাইল ও আরাগণের রাজাদের দরবারেও সমাদৃত হন।

আনদালুসিয়ার আরবগণ ইউরোপে দুইটি বাদ্যযন্ত্র প্রচলন করে; একটি আল-উদ বা বীণা এবং অপরটি রাবাব বা বেহালা (violin)। 'রাবাব' নিঃসন্দেহে আধুনিক ইউরোপে ব্যবহৃত violin-এর পূর্বসূরী। ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের অধিকাংশই মুরদের উদ্ভব, যেমন 'আনাফিল অথবা আনাফিল যাহা পাশ্চাত্যে শিঙ্গা (trampet) নামে পরিচিত। অন্যান্য উদ্ভাবিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খঞ্জনী (tambowrine) গীটার (আরবী কিতারাহ), শিঙ্গা (horn= আরবী আল-বূক'), তাবলা (আরবী আত'-ত'াবল) হইতে উৎপত্তি হইয়াছে।

স্থাপত্য শিল্প ঃ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাশাপাশি আনদালুসিয়ায় চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্পেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্থাপত্য শিল্পে মুসলমানদের অবদান সুবিদিত। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে মুসলিম শিল্পকলার গৌরব মণ্ডিত ধ্বংসাবশেষ আজিও আধুনিক বিশ্বের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। উমায়্যা শাসকদের নির্মিত কর্ডোভার বিখ্যাত জামে' মসজিদ ও যাহ্‌রা রাজপ্রাসাদ; সারাগোসায় বানূ হুদদের আল-জা'ফারিয়্যা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ; সেভিলে মুওয়াহ্হিদীনের জিরালডা এবং আলকাযার প্রাসাদের প্রাচীনতম অংশ এবং গ্রানাডায় নাসিরীদের আল-হ'ামরা প্রাসাদ প্রভৃতি আনদালুসিয়ার মুসলিম স্থাপত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃষ্টানগণ আনদালুসিয়ায় মুসলিম শাসনের অবসানের পূর্বে এবং পরে সেইখানে মুসলিম স্থাপত্যগুলি রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। ইহার ফলে অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও স্পেনে মুসলিম শাসনের আট শত বৎসরের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উন্মেষ, বিস্তার ও বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যের সর্বোত্তম নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়। তাঁহারা বার্‌বারদের নিকট হইতে সামান্য কিছুই গ্রহণ করিয়া স্থাপত্যের মৌখিক রীতিসমূহ উদ্ভাবিত করেন। আরবদের প্রচলিত স্থাপত্য রীতিসমূহ রোমীয় ও স্পেনীশ পদ্ধতিসমূহ হইতে ব্যাপক স্বতন্ত্র ছিল। কর্ডোভায় নির্মিত রাজপ্রাসাদ ও ইমারতাদি অনেকাংশে বাগদাদের স্মৃতিসৌধমালাকে হার মানায় (S.M. Imamuddin, p. 166)।

আনদালুসিয়ার কর্ডোভা (কুরতবা বলিয়া অভিহিত) নগরী, সিয়েরা মোরেনা নামক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে সমতল ভূমির উপর গুয়াদাল কুইভার নদীর দক্ষিণ তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা এক ধরনের অর্ধ-বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চের মত (Sayed Amir Ali, Short History of the Saracens, p. 515)। প্রাথমিক বিষয়ের পর আরবগণ বিভিন্ন দেশে মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে শহর গড়িয়া তুলিত। কার্ডোভা বিজয়ের পরও সম্ভবত একই পন্থায় আরবগণ কর্ডোভা নির্মাণ করেন (আবুল বাশার মোশারফ হোসেন, আরব স্থাপত্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১৯৮৫ পৃ. ২৬৫)। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষের দিকে প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া কার্ডোভা রাস্তাঘাট, মসজিদ, নবনির্মিত প্রাসাদাদি লইয়া গড়িয়া উঠে এবং তৃতীয় 'আবদুর-রাহমান (৯১২-২৯, ৯২৯-৬১ খৃ.), দ্বিতীয় হাকাম (৯৬-৯৭৬ খৃ.) এবং আল-হ'াজিব আল-মানসূ'রের (৯৭৭-১০০২ খৃ.) সময় কর্ডোভা, কনস্টান্টিনোপল ও বাগদাদের পাশাপাশি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলায় সর্বোন্নত নগরীর মর্যাদা লাভ করে (History of the Arabs, p. 526)।

কর্ডোভা শহর নির্মাণে উমায়্যা, 'আব্বাসী ও স্থানীয় স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় (আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, আরব স্থাপত্য, পৃ. ২৬৬)।

কর্ডোভা মসজিদ আনদালুসিয়ায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগের একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইমারত। ৭৮৬ খৃ. ১ম 'আবদুর-রাহমান ইহার নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ৭৯৩ খৃ. তাঁহার পুত্র ১ম হ'াকাম ইহা সমাপ্ত করেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বিশেষ করিয়া ২য় 'আবদুর-রাহ'মান ও ৩য় 'আবদুর-রাহ'মান, ২য় হ'াকাম ও ২য় হিশাম ইহা সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। মসজিদটি ছয় শত কুড়ি ফুট দৈর্ঘ্যে এবং চারি শত চল্লিশ ফুট প্রস্থে। মূল মসজিদের প্রশস্ততা ছিল প্রায় তিন শত ফুট। মসজিদটি একজন স্লাভ প্রকৌশলী আবূ জা'ফার আস-সাকলাবীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় (S.M. Imamuddin, P. 167)।
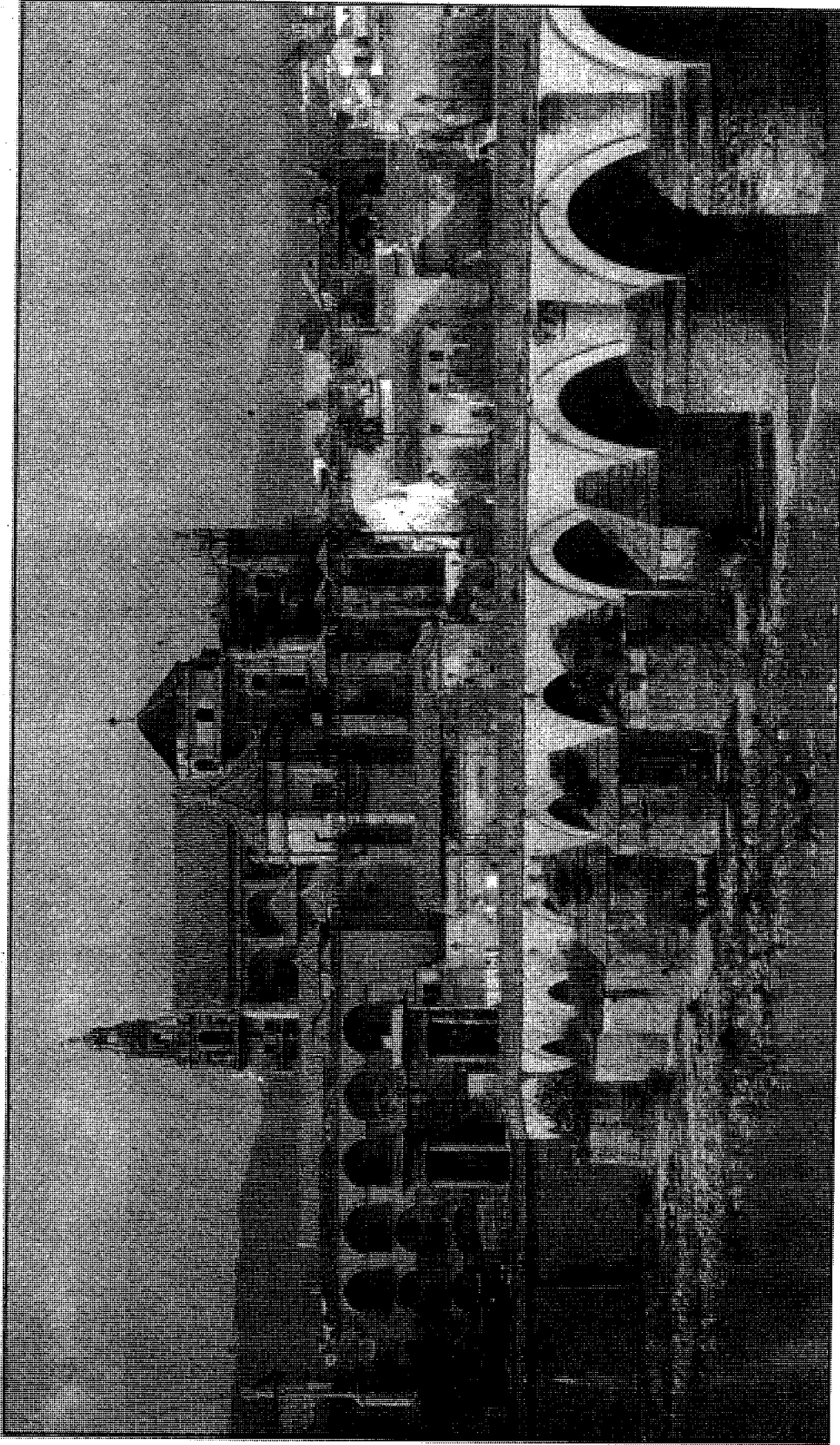
গুয়াদাল কুইভার নদীর তীরে মুসলিম স্থাপত্য কীর্তি কর্ডোভা জামে' মসজিদ (ইসলাম আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
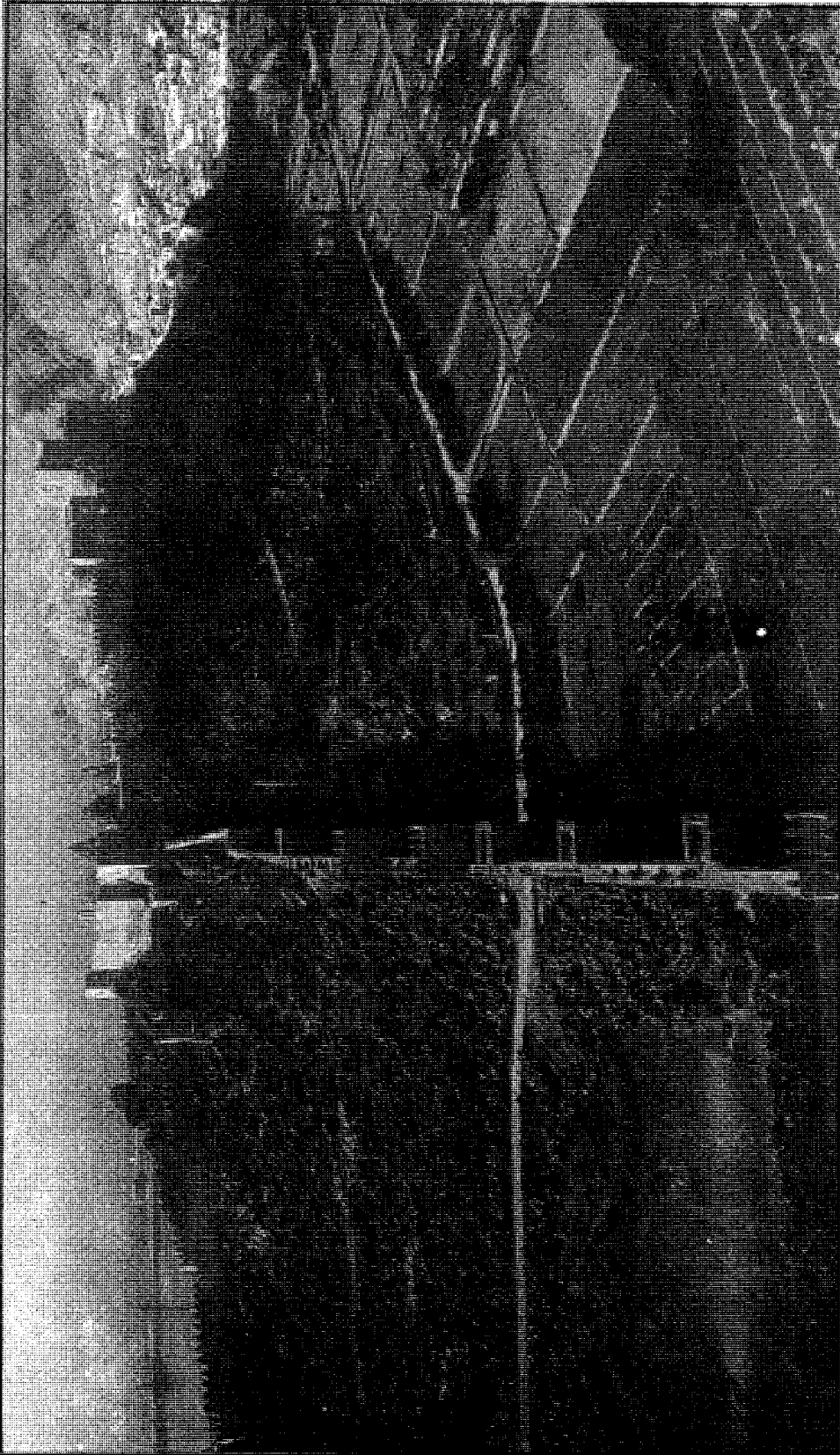
পর্বতশ্রেণী বেষ্টিত আল-কাযাবা (সমুদ্র দর্পণ) সামুদ্রিক বন্দর ও দুর্গপ্রাসাদ (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
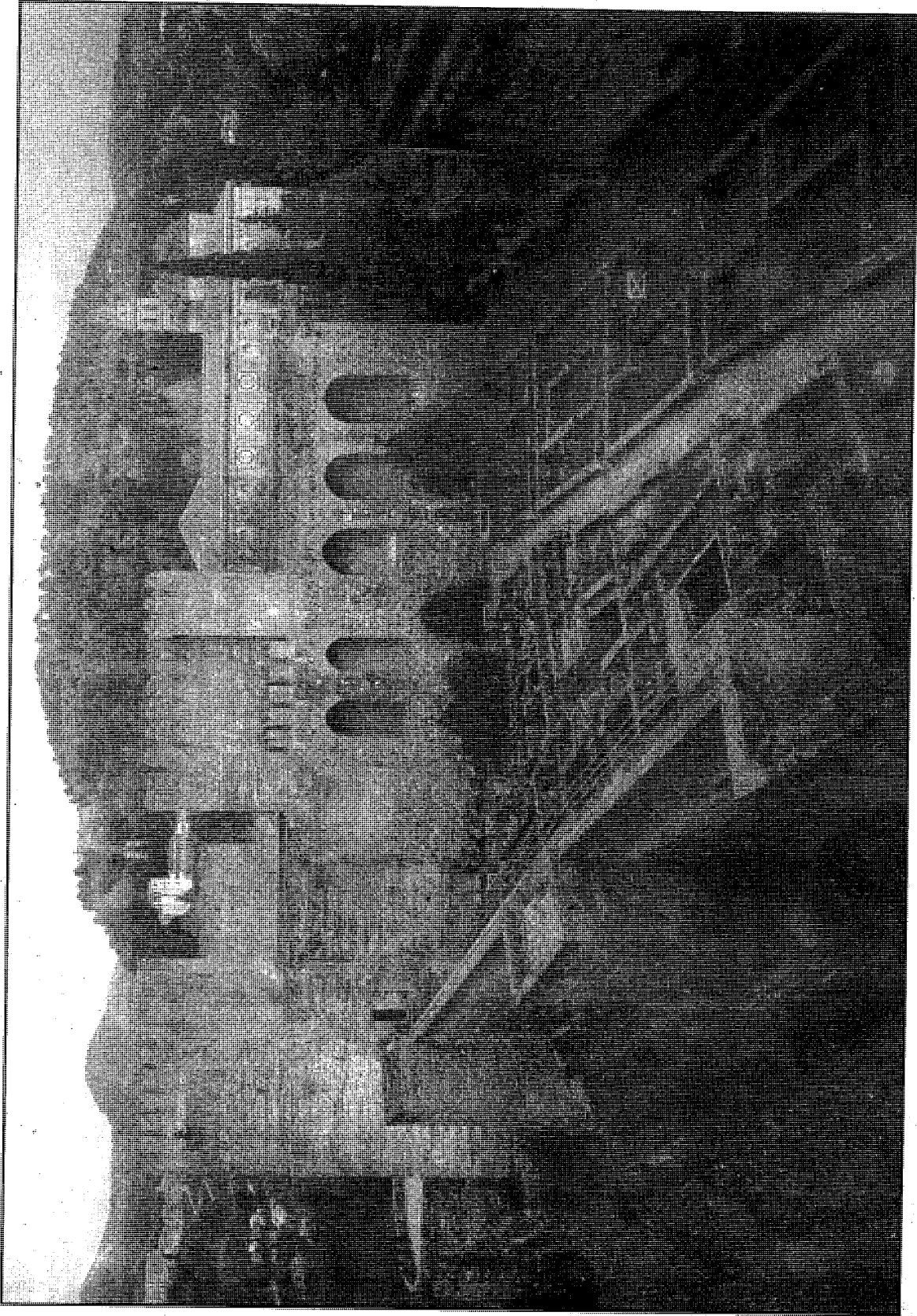
টররে তি লা ভিলে পর্বতমালার চূড়া হইতে আল-কাযাবা দুর্গের ভেতরের দৃশ্য (ইসলাম আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
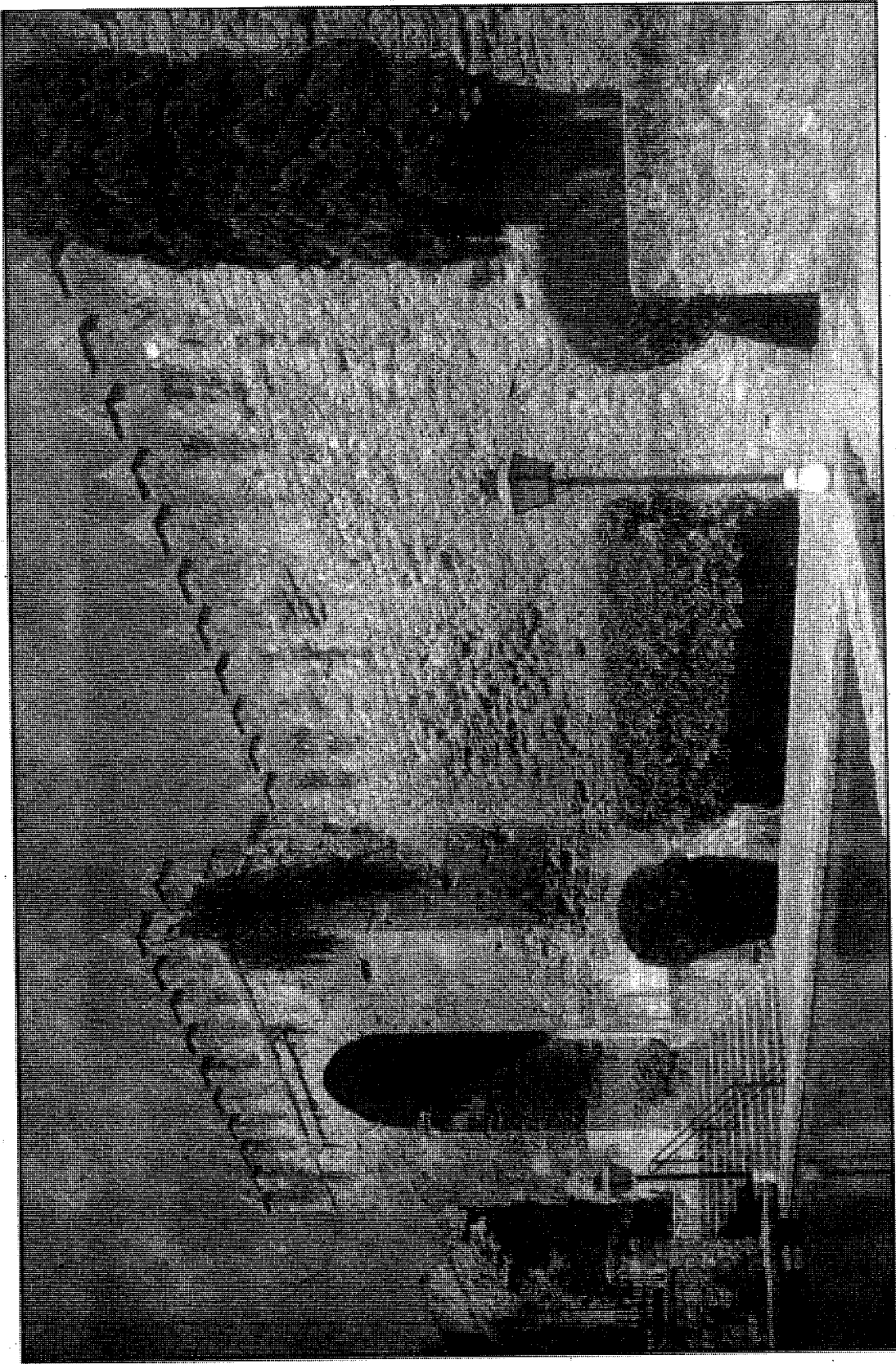
কর্ডোভা শহর রক্ষাপ্রাচীর (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
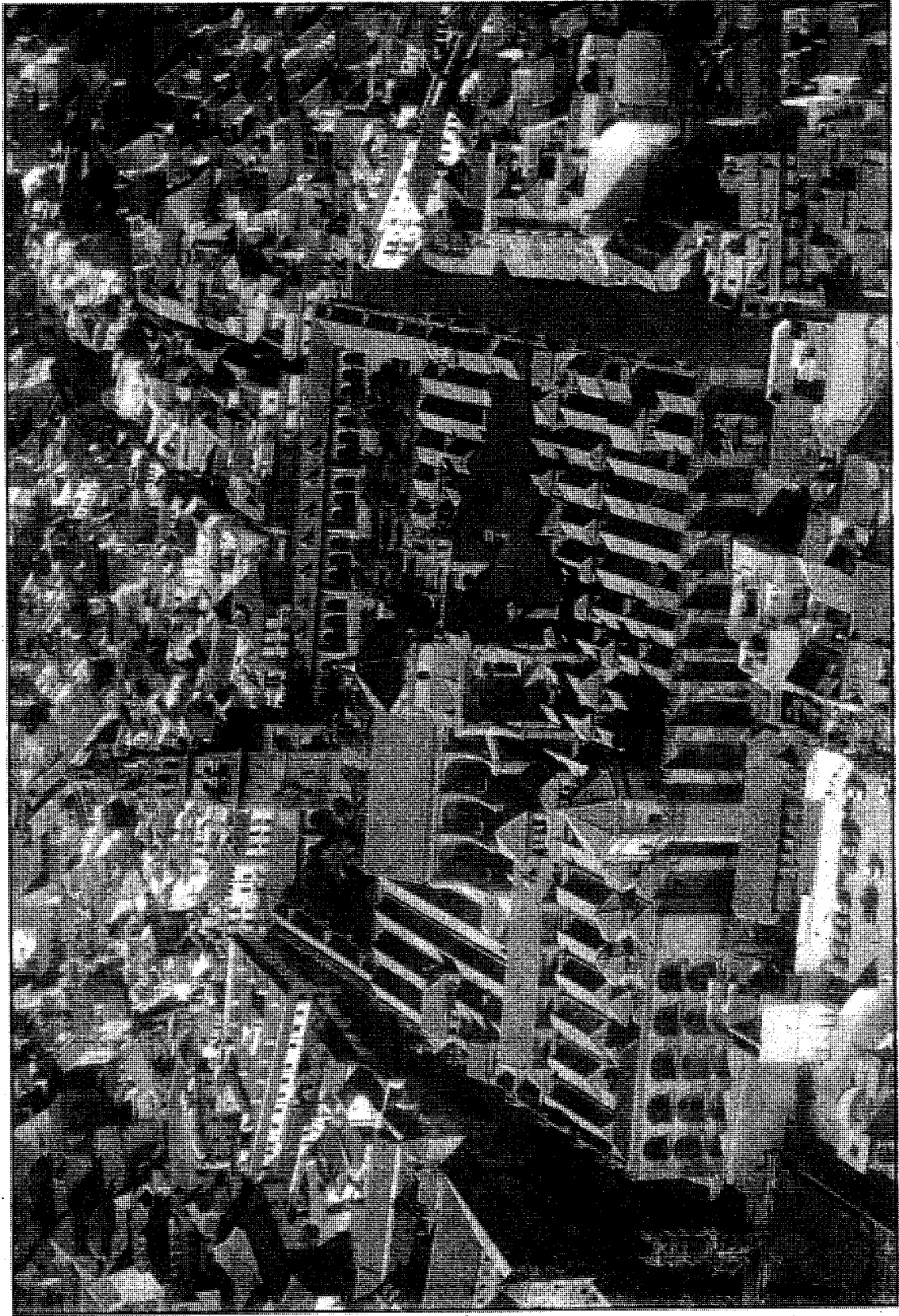
কর্ডোভা জামে' মসজিদ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার দৃশ্যসহ (৭৮৫-৯৮৮) (ইসলাম আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
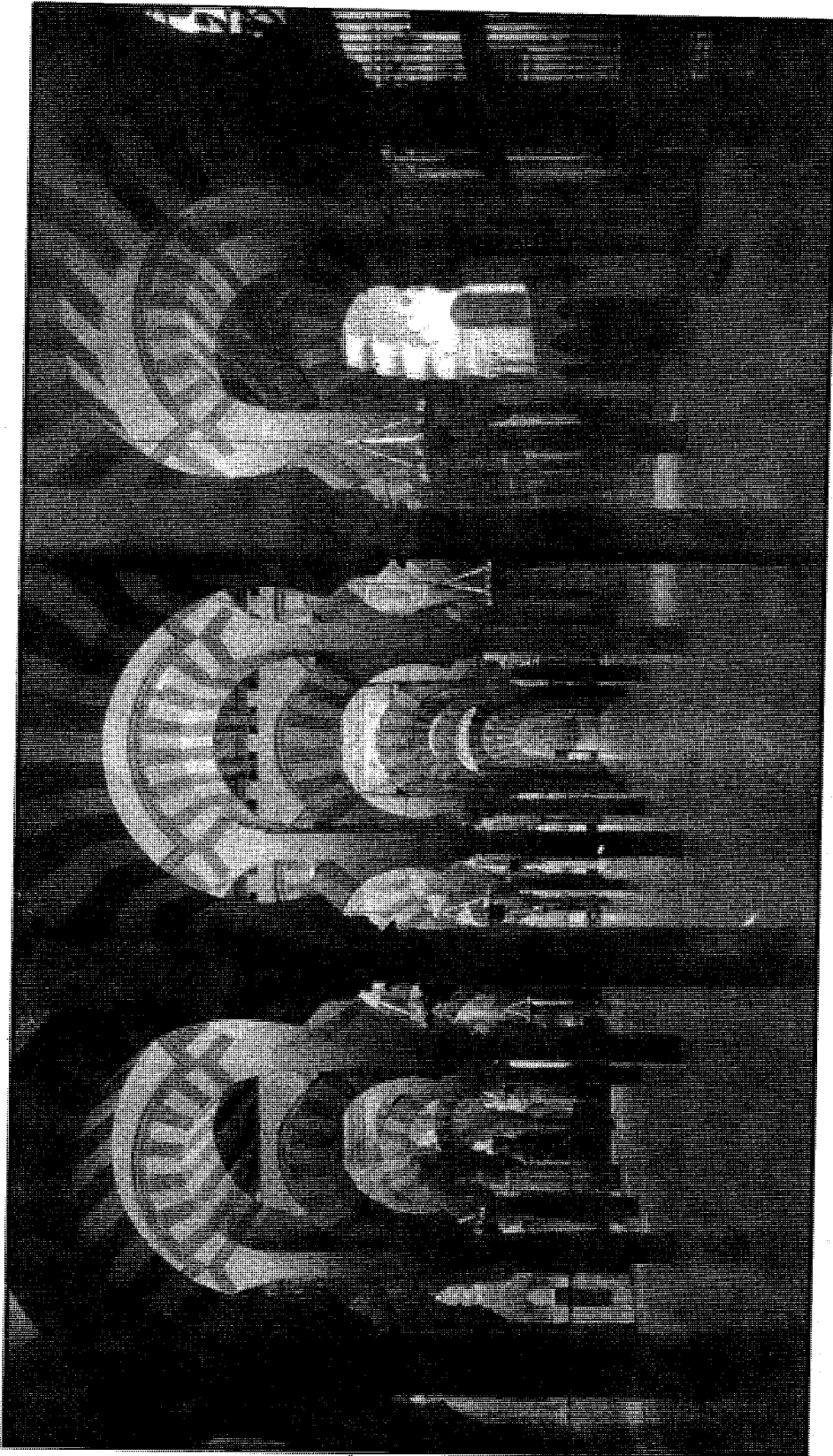
কর্ডোভা জামে' মসজিদের ভিতরের দৃশ্য, ২য় হাকাম (৯৬২-৯০৬ খৃ.)-এর সময় সম্প্রসারিত (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
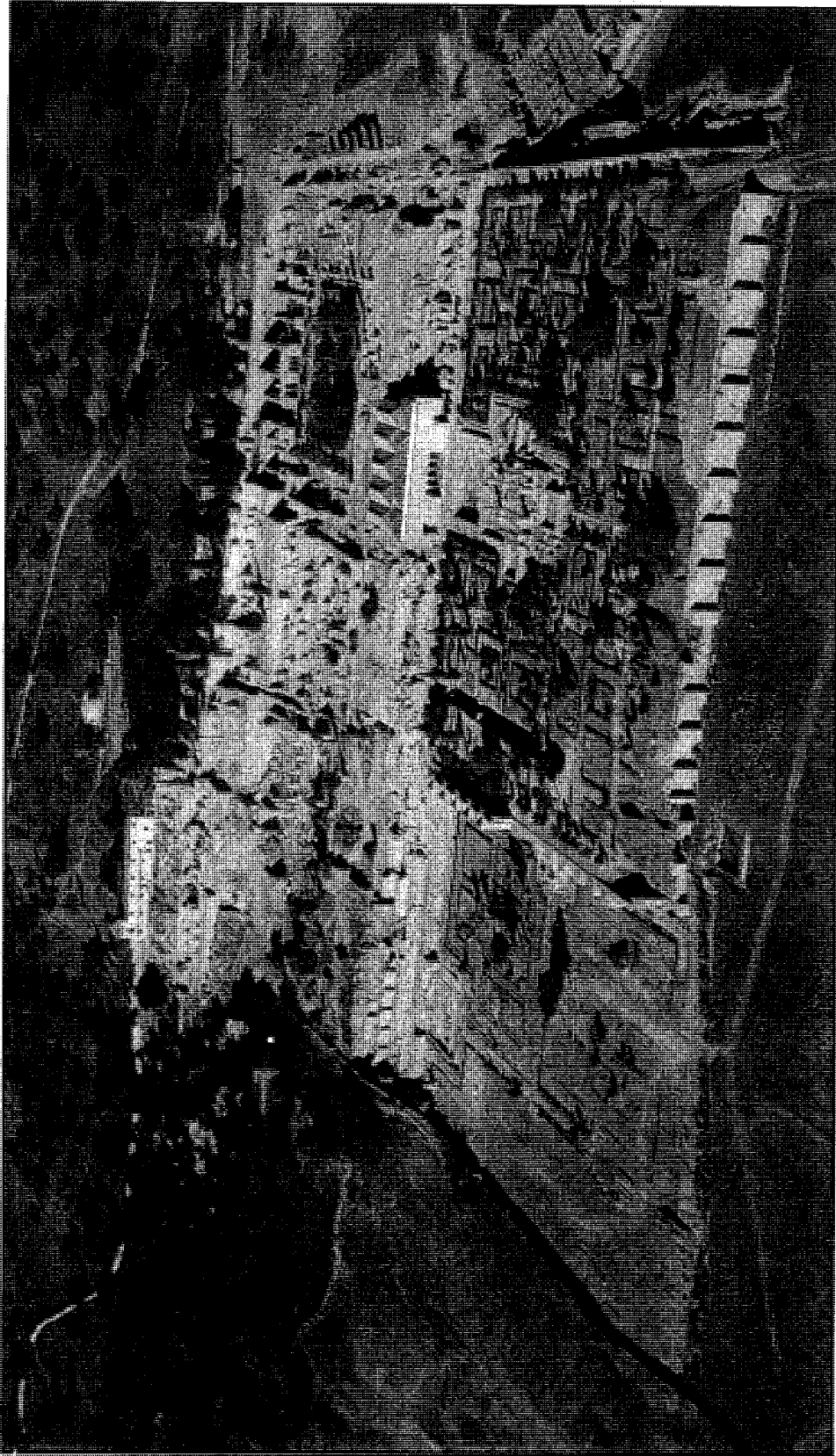
কর্ডোভার অনতিদূরে মদীনা আয-যাহ্রা, ৯৩৬-১০১০ খৃ. (ইসলাম আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।

মালাগার আল-কাযাবা দুর্গশ্রেণী, ১১শ শতাব্দী (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার গ্রন্থের সৌজন্যে)।
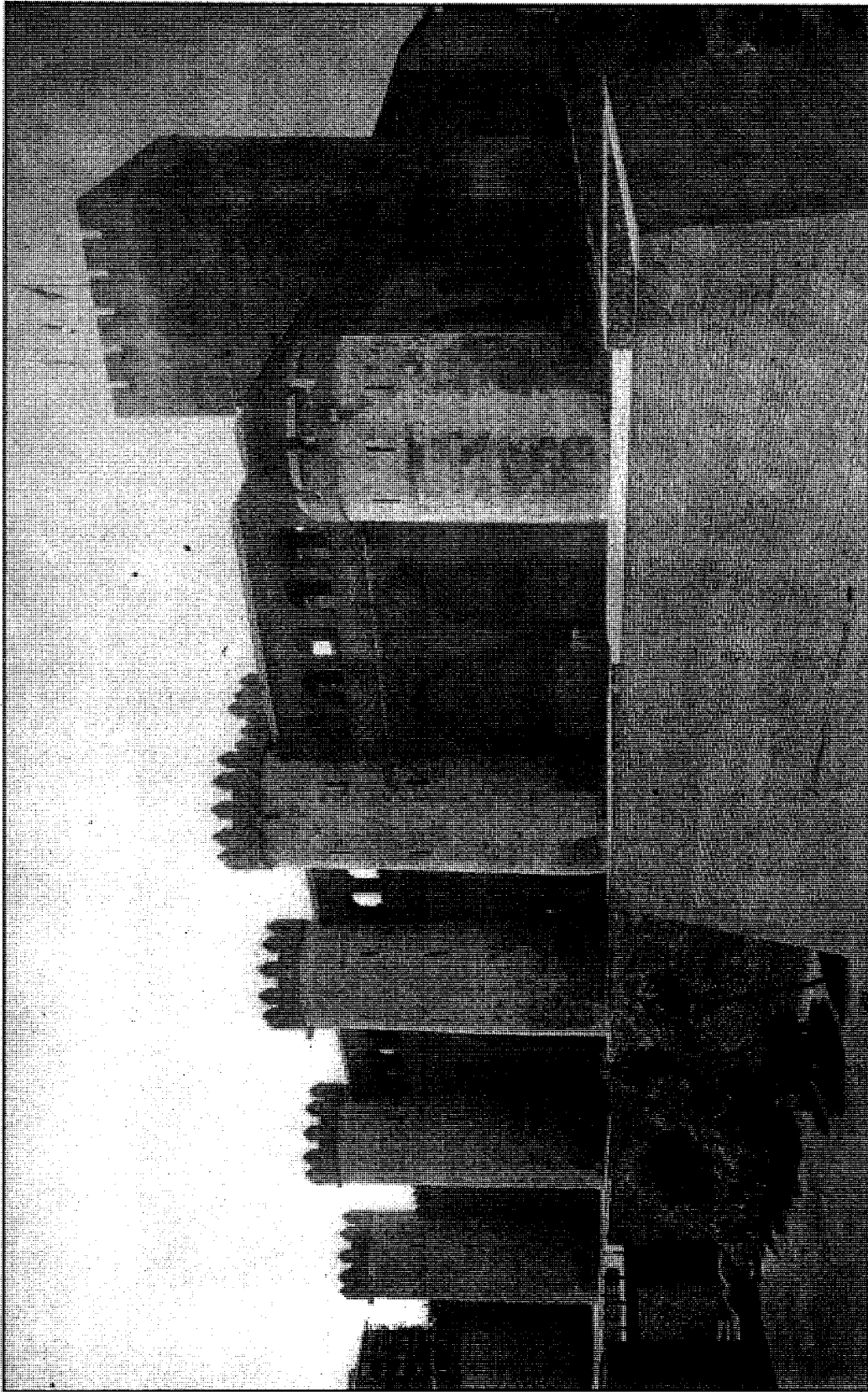
আল-জা'ফারিয়্যা রাজপ্রাসাদ, ১১শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার-এর সৌজন্যে)।
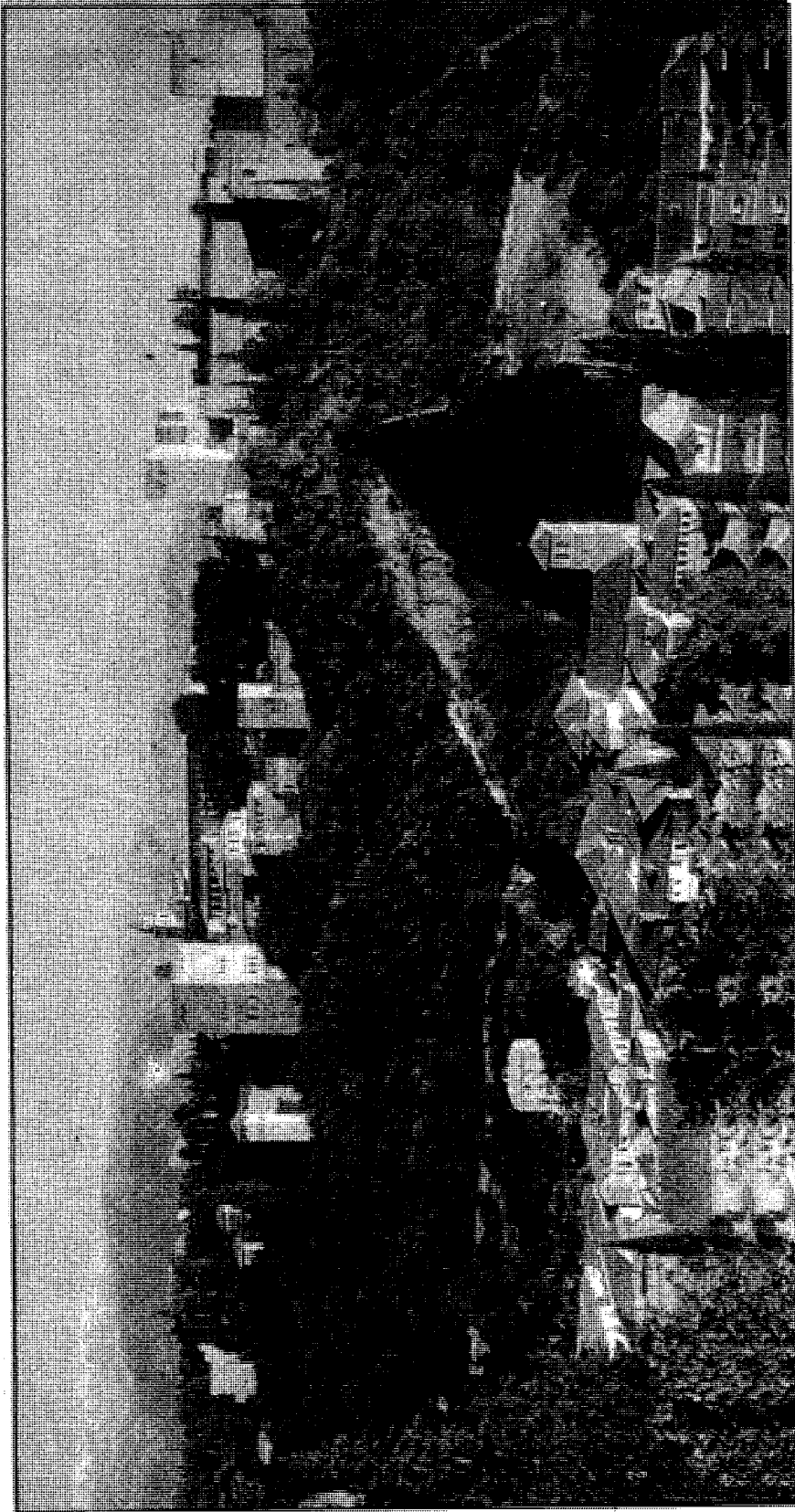
আল-বায়াসিন পর্বতমালার চূড়া হইতে আল-হামরা রাজপ্রাসাদের দৃশ্য (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার-এর সৌজন্যে)।

মসজিদটির বর্হিভাগ ছিল সাদামাটা কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ জাকজমকপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। মসজিদটিতে রোমক স্তম্ভশ্রেণী, আফ্রিকীয় স্তম্ভশীর্ষ, সিরীয় খিলান, বায়যানটাইন মোজাইক ও পারসিক সজ্জিত প্রাচীরের চমৎকারিত্বপূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে। এইভাবে এই মসজিদে বহু যুগের ও বহু জাতির কল্পনার বস্তু, প্রকৌশল ও অলংকরণসমূহ অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহা ধর্মবেত্তা ও শিল্পীদের মধ্যে সমান উদ্দীপনা সৃষ্টি করে (ঐ, পৃ. ১৬৭-১৬৮)। কর্ডোভা মসজিদের নিখুঁত নির্মাণ কৌশল ছিল বিস্ময়কর। এত উন্নত ধরনের স্থাপত্য প্রকৌশল তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। এই অভিনব নির্মাণ কৌশলের উৎস সন্ধানের জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে। চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড (ashlar) প্রাচীরে লম্বালম্বিভাবে সংস্থাপন করা কিংবা ইহা দ্বারা এক প্রাচীরকে অন্য প্রাচীরের সহিত সংযুক্ত করার এই নির্মাণ রীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রোমান স্থাপত্য নিদর্শনে দৃষ্ট হয়। রোমানগণ এই নির্মাণ কৌশল গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। ভিজিগথিক (Visiogothic) স্থাপত্যে অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। রোমান ও প্রাচ্যের ইসলামী স্থাপত্য শিল্পে ইহার নমুনা দৃষ্ট হইলেও স্পেন উপদ্বীপে ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। ধনুক আকৃতি খিলানে পাথর ও ইটের ব্যবহার রোমান স্থাপত্য শিল্পেও সচরাচর দেখা যায় এবং ইহার প্রভাব বায়যানটাইন স্থাপত্য শিল্পে পড়িয়াছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩২৫)।

কর্ডোভা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে শিয়েরা নেভাদার (Siera Nevada) নিচু ঢালে জাবালুল উরুস উপত্যকায় মাদীনাতু'য-যাহরা অবস্থিত। খলীফা তৃতীয় আবদুর-রাহমানের প্রিয়তমা পত্নী আয-যাহরার স্মৃতিতে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। একটি রাজপ্রসাদ, একটি হারাম, একটি প্রাচীর বেষ্টিত প্রাসাদ এবং কয়েকটি ভবন ও চত্বর সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রীষ্ম আবাসটি চল্লিশ হেক্টরেরও অধিক (প্রায় ১০০ একর) পরিমাণবিশিষ্ট একটি এলাকার উপর অবস্থিত ছিল (S.M. Imamuddin, P. 168)। বর্তমানে স্থানটি জলপাই, ওক ও পাইপ বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্থানটির সৌন্দর্য জলবায়ু ও রক্ষণের সহজতা লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবত তৃতীয় আবদুর-রাহমান ইহাকে রাজধানী নির্মাণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। ৯৩৬ খৃ. মাদীনাতুয-যাহরা-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। শহরটির নির্মাণকার্য প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চলে। তন্মধ্যে আবদুর রহমানের খিলাফতের পঁচিশ বৎসর এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় হাকামের সময় পনের বৎসর অতিবাহিত হয় (আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, আরব স্থাপত্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ. পৃ. ২৭৭)।

আনদালুসিয়ার ঐতিহাসিক প্রাসাদসমূহের মধ্যে সেভিলের আলকাযার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আব্বাদী শাসক আল-মু'তামিদই (১০৬৮-৯১ খৃ.) ইহার প্রথম নির্মাতা (ঐ, পৃ. ২৯১)। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আল-মুওয়াহ্হিদ শাসক আবূ ইয়া'কূব ইয়ূসুফ টলেডোর স্থপতি জালুবিকে সেভিলের উদ্যানে অবস্থিত তাঁহার নিজের জন্য আল-কাযার প্রাসাদটি পুনর্নির্মাণের আদেশ দান করেন। বহু খৃস্টান শাসক কর্তৃক প্রাসাদটির পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজপ্রাসাদটি ইহার প্রাচুর্যপূর্ণ ও শোভন অলংকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য। রাজদূতদের হলঘর (Sala de Embajadore) এবং কুমারীদের অঙ্গন (Patio de la's Doncelas) প্রসাদটির সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময় অংশ (S.M. Imamuddin, P. 168-169)।

আনদালুসিয়ার বিখ্যাত ইমারতসমূহের মধ্যে জিরালডা অন্যতম এবং সেভিলের সর্বাধিক আকর্ষণীয় স্থাপত্য নির্দশন। মূলত সেভিল জামে' মসজিদের মিনার হিসাবে ১১৮৪ খৃ. ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১১৯৮ খৃ. ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। খৃস্টান পুনর্বিজয়ের পর মসজিদটি তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং মিনারটিকে রাখিয়া দেয়। এক সময় মিনারটি দ্বারা জ্যোতির্বিদদের একটি মানমন্দিরের প্রয়োজন সাধিত হইত (ঐ, পৃ. ১৬৯)।

স্পেনীয় মুসলিম শিল্পশৈলীর উজ্জ্বলতম নির্দশন আল-হ'আমরা নামীয় প্রাসাদ (History of the Arabs, P. 595)। এই প্রাসাদ প্রথম নাসিরীয় শাসক প্রথম মুহাম্মাদ (১২৩২-১২৭২ খৃ.)-এর শাসনামলে গ্রানাডায় নির্মিত হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ইহার সম্প্রসারণ করেন ও অলংকৃত করেন। ইয়ূসুফ ১ম (১৩১৩-১৩৩৪ খৃ.) প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত এবং ব্যাপকভাবে ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আল-হ'আমরা প্রাসাদের সৌন্দর্য অতুলনীয়। সারিকা পাহাড়ের উপর ইহার অবস্থান। নিকটবর্তী দারো উপত্যকা, সমভূমি এবং সিয়েরা নেডাদার দৃশ্য এবং এতদ্বঞ্চলের চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি আল-হ'আমরার যে পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অন্যান্য মুসলিম স্থাপত্যে বিরল। আল-হ'আমরার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ইহার একটি উল্লেখযোগ্য দিক (ঐ, পৃ. ২৯১২৮)। এক কথায় আল-হ'আমরা মুসলিম মাগরিবী স্থাপত্যের চরম বিকাশ।

স্থাপত্য ক্ষেত্রে আনদালুসিয়ায় নির্মাণ উপাদানের অপরিমিত সরবরাহ থাকায় আরব স্থপতিগণ তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাইয়া একটি বিশেষ স্থাপত্য শৈলীর ধারা চালু করিতে সক্ষম হন। আনদালুসিয়ায় আবরগণ তাহাদের অট্টালিকাসমূহের জাঁকজমকপূর্ণ রূপরেখা, নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং ব্যাপক অলংকরণে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের অট্টালিকা নির্মাণে উন্নত মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করায় তাহাদের নির্মিত অট্টালিকাদি এখন পর্যন্ত টিকিয়া আছে।

উপযোগিতা ও অলংকরণের জন্য আরব স্থপতিগণ আনদালুসিয়ায় 'আজিমেয' বা সরু স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত জোড়া জানালা উদ্ভাবিত করেন। ইহা দামিশকে ওয়ালীদের মসজিদে দৃষ্ট হয়। দেওয়াল চিত্র শিল্পে (মিউরাল) আরবগণ অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। আরবদের দেওয়াল অলংকরণের স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য ছিল চুন-বালির মিশ্রিত প্রলেপকর্মে। অট্টালিকাসমূহের বহির্ভাগ সাধারণত বৈচিত্রহীন হইত কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অগণিত সংখ্যক নকশায় ব্যাপকভাবে বৈচিত্রময় করা হইত। বিখ্যাত আরব রাজপ্রাসাদ আলহামরা মুসলিম স্থাপত্য শিল্প, শিল্পকলা ও মেধার অপূর্ব নিদর্শন। আলহামরায় ব্যবহৃত মোজাইক মানবিক দক্ষতার দ্বারা সম্পন্ন যে কোন সুদৃশ্য কাজের মধ্যে নিশ্চিতরূপে অতুলনীয় ছিল (S. M. Imamuddin, P. 171)।

নকশা অঙ্কণে আরবগণ বায়যানটীয়গণকে অতিক্রম করে। তাহাদের ইমারতের স্থাপত্য কৌশলগত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অশ্বক্ষুরাকৃতি, কৌণিক ও খাঁজকাটা খিলানের ব্যবহার এবং বর্গাকার ভিত্তির স্থাপিত গম্বুজ। আরব স্থপতিগণ দৃঢ় ও সুদৃশ্য খিলান নির্মাণে নিঃসন্দেহে সকলকে অতিক্রম করেন (ঐ, পৃ. ১৭১)।

স্থাপত্য শিল্প সংক্রান্ত অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আরবী তুগরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মুসলমানগণ অলংকরণের প্রয়োজনে অতুলনীয় দক্ষতার সহিত ভৌগোলিক চিত্রের খণ্ডাংশ এবং উদ্ভিদ জগতের সৌন্দর্যমণ্ডিত পত্ররাজির ব্যবহার করিয়াছে। প্রাচীরকে ভূমি হইতে উদগত নক্শা দ্বারা অলংকৃত করা হয়। লাল ও নীল পটভূমিকে অলঙ্করণের এই পদ্ধতিটি কখনও পুষ্প সংক্রান্ত এবং কখনও জ্যামিতিক চিত্র সংক্রান্ত হইত।

আনদালুসিয়ায় চিত্রশিল্পের প্রতিও গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। আমীর-উমরাহদের প্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহ চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত করা হইত। মানবদেহের ভাস্কর্যের পরিবর্তে আরবগণ লতাপাতার অলংকরণ ব্যবহার করিত। ইহা সৌধসমূহে প্রীতিকর বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য যুক্ত করিত। আরবদেশীয় অলঙ্করণের প্রাথমিক রীতিসমূহ বায়যানটীয় রীতির সঙ্গে ব্যাপক সাদৃশ্য সম্পন্ন। শীঘ্রই বর্গকার কুফিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সেইগুলির স্থান অধিকার করে। মুসলিম ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে লতাপাতার অলংকরণে পশু ও ফল, পাখি ও ফুল সংযুক্ত করে। কিন্তু ধর্মীয় অট্টালিকাসমূহে কখনও জীবন্ত প্রাণীর ছবি ব্যবহৃত হয় নাই। অলংকৃত লিপি, মসজিদ, সমাধিসৌধ এবং প্রাসাদে ইহা প্রায়শ ব্যবহৃত হইত, সেইখানে কুরআনের পূর্ণ অধ্যায়সমূহ গম্বুজ, মিনার, দরজা ও খিলানের পার্শ্বদেশে খোদিত ও খচিত হইত। এইগুলি এইভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় একাগ্রতার সাক্ষ্য বহন করে (ঐ, পৃ. ১৭৩)।

আনদালুসিয়ার মুসলমানগণ দালানকোঠা ও মসজিদের সৌন্দর্য বর্দ্ধনের জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্য অথবা হস্তিদণ্ড ও মূল্যবান প্রস্তর খচিত কাষ্ঠ নির্মিত দৃষ্টিনন্দন দরজা ও জানালা, বাক্স ও অন্যান্য আসবাবপত্র প্রস্তুত করিত। তাহাদের কাঠের কাজের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির একটি ছিল কর্ডোভা মসজিদের অভ্যন্তরীণ ছাদ। ইহা তাহাদের সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের একটি জীবন্ত উদাহরণ। ধাতুর উপর খোদাই করা নক্শা অথবা সোনা-রূপার কাজে আনদালুসিয় মূর কারিগরদের দক্ষতা ঐ সময়ে অতুলনীয় ছিল। ছুরি, কাঁটা চামচ এবং তলোয়ারের মত পেটা লৌহের কাজ নির্মাণে টলেডো ও সেভিলের কারিগরদের বিশেষ সুনাম ছিল। গুণগত মানের বিচারে টলেডোর নির্মিত তলোয়ারের স্থান ছিল দামিশকের তলোয়ারের অব্যবহিত পরেই (History of the Arabs, P. 591)।

মহাকাশ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে জ্যোতির্যন্ত্রের উদ্ভাবক ছিল প্রাচীন গ্রীস। কিন্তু এইগুলি উন্নত ও আধুনিক করিয়া খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ইউরোপে চালু করার কৃতিত্ব ছিল মুসলমানদের। নামাযের সময় এবং মক্কা শরীফের অবস্থান নির্ধারণ করিতে এই যন্ত্রের ব্যবহার হইত। নাবিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকটও ইহা অপরিহার্য ছিল (ঐ, পৃ. ৫৯১)।

মধ্যযুগে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে আনদালুসীয় আরবদের অসামান্য অবদান ছিল। রেশমী ও অন্যান্য কাপড় বুনন এবং বাণিজ্যে তাহাদের অবস্থান ছিল সকলের উর্ধ্বে। কর্ডোভা ছিল যন্ত্রশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। কথিত হয় যে, আল-জেরিয়াতেই চারি হাজার আট শত তাঁত ছিল। আল-মাওসিল হইতে মূল্যবান মসলিন ইতালিতে রফতানী করা হইত। সেইখানে মসলিনকে 'মুসোলিনা' বলা হইত। বাগদাদ হইতে রফতানী করা মূল্যবান রেশমী কাপড়ের ইতালীয় নাম ছিল 'বালডাককো (Baldacco) আর রেশমের তৈরী এক বিশেষ ধরনের চাঁদোয়াকে বলা হইত 'বালডাচিন' (baldachin)। ইউরোপের অনেক গির্জার পবিত্র বেদীর উপর এই চাঁদোয়া টাঙানো হইত। পরবর্তী কালে গ্রানাডা হইতে রেশমী কাপড় ইউরোপে রপ্তানী করা হইত। ফুল, লতাপাতা বা জ্যামিতিক নক্শা করা এবং উজ্জ্বল বর্ণের রঞ্জিত প্রাচ্যের এই রেশমী কাপড়ের চাহিদা ছিল মূলত ইউরোপের অভিজাত মহলে। মুসলিম দেশ হইতে রেশমী কাপড়ের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপের ব্যবসায়ীরা এই শিল্পকে লাভজনক মনে করিয়া ফ্রান্স ও ইতালিতে বিভিন্ন স্থানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করে। তাহারা এই সকল কলকারখানা প্রতিষ্ঠালগ্নে মুসলিম কারিগরদিগকে নিয়োগ করে (History of the Arabs, P. 592)। খৃস্টীয় চতুর্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বস্ত্রশিল্পে ইসলামী প্রভাবের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। স্থাপত্য, ধাতু, কাঁচ, মৃৎশিল্প এবং ললিতকলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলিম প্রভাব ছিল। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই ইউরোপের তাঁত শিল্পীরা ইসলামী নক্শার অনুকরণ করিতে শুরু করে। নির্মাণ যুগে সিসিলির শিল্প ও স্থাপত্যে ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্ট। মুদেজার শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতা কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প ও বস্ত্রশিল্পে বিদ্যমান ছিল। বর্তমানেও স্পেনের ছুতাররা তাহাদের কাজকর্মের সময় যেই সকল ভাষা ব্যবহার করে ইহার অধিকাংশই আরবী (ঐ, পৃ. ৫৯২-৫৯৩)।

প্রাচীন কাল হইতেই মৃৎপাত্র নির্মাণে মুসলিম শিল্পীগণের সুনাম ছিল। ইউরোপে মুসলমানদের এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভ্যালেন্সিয়ায়। পয়টিয়ার্সে মৃৎশিল্পের কারখানা গড়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়। খৃস্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে হল্যান্ডেও মুসলিমদের অনুকরণে মৃৎশিল্প গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। স্পেন হইতে ইতালিতে এই শিল্পের প্রসার ঘটে। পরবর্তী কালেও স্পেনে নির্মিত মৃৎপাত্র, নকল আরবীয় অন্তর্লেখ এবং গির্জায় ব্যবহৃত বহু জিনিসের কারুকার্যে মুসলিম শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। মৃৎশিল্পে মুসলমানদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তন্মধ্যে মোজাইক, বিশেষ করিয়া টালি ও নীলাভ মসৃণ মাটির বা চীনা মাটির পাত্র ইত্যাদি স্পেন ও পর্তুগালে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অদ্যাবধি ইহার চাহিদা লক্ষণীয়। আরব শিল্পীদের হস্তেই প্রথম বর্ণিল টালি নির্মিত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ, টালির মূল আরবী নাম 'আজলেজো' বর্তমানেও প্রচলিত আছে। বর্তমান যুগেও সংগ্রহকারীগণ মনে করেন যে, মুদেজারের মৃৎশিল্পের তুলনা একমাত্র চীনা মৃৎশিল্পের সঙ্গে হইতে পারে। খৃস্টীয় ১১শ শতাব্দীর তৃতীয়ার্দ্ধে টলেডো ও কর্ডোভায় অতি সাধারণ মৃৎপাত্র নির্মিত হইত। অতঃপর কালাতায়ূদ (কাতসআত আয়্যুব), মালাগা ও ভ্যালেন্সিয়ার ম্যানিসেসে এই শিল্পের প্রসার ঘটে (History of the Arabs, P. 592)।

গহনা তৈয়ারী শিল্পে আনদালুসিয়ার আরবগণ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে কর্ডোভায় একদল শিল্পী আংশিক অথবা সম্পূর্ণ হাতির দাঁতের অপূর্ব সুন্দর কয়েকটি বাক্স তৈয়ারী করিয়াছিল। ইহার উপর হস্ত অংকিত অথবা খোদাইকৃত অসামান্য কারুকার্য থাকিত। এইগুলি গহনা, সুগন্ধি অথবা মিষ্টি রাখার জন্য ব্যবহার করা হইত। নক্শার মধ্যে নাচ, গান বা শিকারের দৃশ্য ছিল। নক্শার ছাঁচে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে

পশু-পাখির ছবি ব্যবহার করা হইত। এই সকল বাক্সগাত্রে উৎকীর্ণ লেখা হইতে জানা যায়, অধিকাংশ সময় এইগুলি উপহার হিসাবে দেওয়া হইত। এই কর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল ৯৬৪ খৃ. এর তৈয়ারী একটি বেলুনাকার বাক্স। ইহার ঢাকনায় খোদাইকৃত লেখা হইতে জানা যায়, খলীফা দ্বিতীয় আল-হ'াকাম ইহা তাঁহার স্ত্রীকে উপহার হিসাবে দেন। বাক্সের গাত্রে ময়ূর ও অন্যান্য পাখি ছাড়াও ছোট ছোট খেজুর গাছ খোদাই করা ছিল (ঐ, পৃ. ৫৯৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতসমূহ নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাঃ আবু তাহের

আনদালুসিয়ায় (স্পেনে) মুসলমানদের পতনের কারণ

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত আইবেরীয় উপদ্বীপে মুসলমান অভিযান ছিল আরবদের সর্বশেষ, অত্যন্ত নাটকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান (Hitti, History of the Arabs, Macmillan, London, p.493)। ইহাতে মূসা ইবন নুসায়র এবং তাঁহার অধীনস্ত সেনাপতি তারিক ইবন যিয়াদ অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেন। তাহাদের নেতৃত্বে আন্দালুসিয়ায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। মুসলমানগণ ৭১১ খৃ. হইতে ১৪৯২ খৃ. পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আনদালুসিয়া শাসন করেন। এইগুলি ছিল অধীনস্ত আমীর হিসাবে পরিচিত গভর্নরদের শাসন (৭১১-৭৫৬ খৃ.), স্বাধীন উমায়্যা আমীরদের শাসন (৭৫৬-৯২৯ খৃ.), উমায়্যা খিলাফতের যুগ (৯১৯-১০৩১ খৃ), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের (মুলুকুত-তাওয়াইফ) শাসকদের যুগ (১০১০-১০৯১ খৃ.), উত্তর আফ্রিকার শাসকবৃন্দের যুগ (১০৯১-১১৪৬ খৃ.) এবং গ্রানাডার বনূ নাসর বংশের (১২৩২-১৪৯৬ খৃ.) শাসকদের শাসনামল। আন্দালুসিয়ার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র কোন ভূইফোঁড় রাষ্ট্র ছিল না। সেইখানে মুসলমানগণ প্রায় আট শত বৎসর রাজত্ব করেন। ১৪৯২ খৃ. তাহাদের ঘটনাবহুল, বিচিত্র ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। আন্দালুসিয়ায় মুসলিম আধিপত্য তত দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল যত দিন দক্ষ প্রশাসন যন্ত্র, শক্তিশালী ও অনুগত পুলিশ ও সেনাবাহিনী, যোগ্য শাসক দ্বারা তাহা পরিচালিত ছিল (Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain, Leiden E.J. Brill, 1965, p. 321)। অবশেষে স্পেনে মুসলমানদের অব্যাহত পতন ও সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের শাসনাবসানের মূলে ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে কতিপয় সহজাত দুর্বলতা (ঐ, পৃ. ৩২১)।

আন্দালুসে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের মূলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিভেদ, অনৈক্য ও বিশৃংখলাই সর্বাধিক দায়ী। আন্দালুসিয়ায় আগমনের প্রাককালেই মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ উপস্থিত ছিল। আরব (হি'ম্য়ারী, ইয়ামানী), ক'ায়সী ও কালবী, সিরীয় (মুদ'ারী), বারবার, সানহাজা ও যানাতা, নবদীক্ষিত মুসলমান, খৃষ্টান ও ইয়াহূদী প্রভৃতি জাতীয় ও ধর্মের অনুসারিগণ সেইখানে বসবাস করিতে শুরু করে। আরব ও বারবারগণ তাহাদের পূর্বপুরুষদের গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা স্পেনের মাটিতেও লালন করিয়া চলে। তাহাদের প্রধান শত্রু খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাহারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধে লিপ্ত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বাধীন পরিশ্রান্ত খৃষ্টান সেনাবাহিনী তুরসের যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু গোত্রীয় কোন্দলে লিপ্ত মুসলিম সেনাবাহিনী আবদুর রহমান আল-গ'াফিক'ীর স্থলে একজন নূতন সেনাপতি নির্বাচন করিয়া খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য আঘাত হানিতে ব্যর্থ হয়। এই গোত্রীয় বোধ বা জাতীয় চেতনার অভাবের ফলেই আলহামদিনা ও জাম্মাছার যুদ্ধের ন্যায় কতিপয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মুসলমানদিগকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হয়। হ'াজিব আল-মানসূ'র মুদ'ারীয় ছিলেন এবং এই কারণে তিনি ইয়ামানীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। অধীনস্ত আমীরদের ৪৫ বৎসরের (৭১১-৭৫৬ খৃ.) শাসনামলে ২৪জন ওয়ালী স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহারা দামিশকের খলীফা, উত্তর আফ্রিকার ওয়ালী অথবা প্রভাবশালী উমারা ও অভিজাতদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন বা নিয়োগ লাভ করিতেন। এইরূপ দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের কারণে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল গোলযোগপূর্ণ। উক্ত সময় শাসকদের রদবদল ও রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত ও বিশৃংখলাপূর্ণ করার ক্ষেত্রে দেশীয় বিবদমান দুইটি গোত্র হি'ম্য়ারী ও মুদ'ারীদের প্রভাব ও ভূমিকা ছিল মুখ্য (A Political History of Spain , Najmah sons, 1. Maneshwar 1st Lane, Dhaka 1968, p. 32)। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকজন শাসক স্পেন শাসন করেন।

আন্দালুসিয়ায় উমায়্যা শাসনকালে গৃহযুদ্ধ, গোত্রীয় ও উপদলীয় কোন্দল এবং দেশী-বিদেশীর দ্বন্দ্ব দেশকে অস্থিতিশীল করিয়া তোলে। একমাত্র শক্তিশালী শাসকই তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিতেন। উমায়্যা খিলাফতের পতনের পর্যায়ে অনেক প্রাদেশিক গভর্নর এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রদেশগুলি কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উমায়্যা খিলাফতের ধ্বংসস্তূপের উপর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বারবার, পূর্বাঞ্চলের শ্লাভ, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের আরব, উত্তরাঞ্চলের নও মুসলমান খৃষ্টানগণ নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। বারবার সেনাদের সাহায্যে মানসূ'র স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলেন।

উমায়্যাদের পতনের পর ক্ষণস্থায়ী বহু রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসক সামাজিক বিদ্বেষ ও উপজাতীয় কোন্দলের শিকার হন। সেভিলের মু'তামিদও টলেডোর মা'মূন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মালাগার ইয়াহ্'য়া আন্দালুসীয় আরব নেতাদের বিরুদ্ধে বারবারদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া কর্ডোভা ও সেভিলের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলেন। কিন্তু তাহাদেরই ঐক্য প্রচেষ্টা স্থায়ী হয় নাই। বারবার সর্দারগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সেভিলের ইসমা'ঈল কর্তৃক ইয়াহ্'য়া পরাজিত ও নিহত হন। ইসমাঈলও পরবর্তী কালে আলমেরিয়ার স্লাভ নেতা যুহায়র কর্তৃক নিহত হন। গ্রানাডার বাদিস ও জুহায়রের মধ্যে চরম শত্রুতা ছিল। বার্বারদের একমাত্র নেতা জিরি শাসক বাদিস আরবদের নেতা মু'তামিদের মুকাবিলা করেন। বানূ হাম্মূদগণ ঐক্যবদ্ধ ছিল না, মালাগা ও আলজেসিরাসে তাহাদের দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজধানী গড়িয়া উঠে।

কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক গৃহযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই; তাহারা বরং মুসলমান স্পেনের ধ্বংস ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে খৃস্টানদিগকে আহবান জানায় (ঐ, পৃ. ৩২৩)।

টলেডোর বানূ যুন-নূনদের শ্রেষ্ঠ শাসক মা'মূন আবদুল মালিক ইব্ন জাওহারের কবল হইতে কর্ডোভা উদ্ধার করিতে ব্যর্থ হইয়া ক্যাস্টিল ও লিওনের খৃস্টানদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ৬ষ্ঠ আলফনসোকে তাহার রাজ-প্রাসাদে আমন্ত্রণ জনান। মুসলিম স্পেনের শেষ পর্বে খৃস্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বিখ্যাত নাসরী রাজবংশ অন্যান্য মুসলিম রাজবংশের ধ্বংসস্তুপের উপর গড়িয়া উঠে। পূর্ববর্তীদের ন্যায় খৃস্টানদের দ্বারাই এই রাজবংশেরও পতন ঘটে (ঐ, পৃ. ৩২৩)।

দেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ন্যায্য অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত, আরব শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বৈরী ভাবাপন্ন বারবারগণ তাহাদের মূল আবাসভূমির সহিত সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিত। উত্তর আফ্রিকার বারবারদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দিলে আন্দালুসিয়ায় বসবাসকারী আরবদের বিরুদ্ধেও তাহারা বিদ্রোহ করিত। আন্দালুসিয়ার মুসলিম প্রশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই তাহারা ইহা করিত। ইহাতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। বার্বারগণ স্পেনে আরব শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার ইন্ধন যোগায়। স্পেনে আরব শাসনের অবসানের পর তাহারা ইহাকে নিজেদের প্রশাসনভুক্ত করে। স্পেনে উমায়্যা সামরিক শক্তি হ্রাস পাইবার পর মুরাবিতূন (১০৯১-১১৪৭ খৃ.) ও মুওয়াহহিদূন (১১৪৭-১২২৮ খৃ.) স্পেনে আগমন করে। তাহারা মরক্কো হইতে স্পেন শাসন করিত। ফলে তাহারা কার্যকরীভাবে সেখানে তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে অনেক বার্বার তাহাদের আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। দেশত্যাগ করিয়া নও মুসলমানদের কোথাও যাইবার স্থান ছিল না এবং আরবদের দেশত্যাগের চিন্তাও ছিল না। আরব ও বার্বারদের উপদলীয় কোন্দলের সুযোগ লইয়া বিদেশী শক্তিগুলি স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, চরিত্রবান শাসক, কর্তব্যনিষ্ঠ সরকারী কর্মচারী ও সুশৃংখল সেনাবাহিনীর উপর মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। উমায়্যা সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অপদার্থ শাসকদের আগমনে প্রশাসন যন্ত্রের অবনতি ঘটে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অপারগতা, এমনকি পুলিশ বিভাগের লোকের ও তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে ব্যর্থ হয়।

আত্মকেন্দ্রিক ও দেশপ্রেম বর্জিত মুসলিম অভিজাত শ্রেণী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অনৈক্যের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। এমনকি তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অবস্থা মারাত্মক খারাপ অবস্থায় নিপতিত হয় এবং দ্বিতীয় হাকাম ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্বকালে ইহা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। আরব অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহাত্মক প্রকৃতি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান বহু সংখ্যক স্লাভ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন এবং হ'াজিব আল-মানসূ'র বারবারদিগকে ব্যাপকাকারে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন। সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে ইহা শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথম হাকামের রাজত্বকাল হইতেই ক্রীতদাস ও খোজাগণ রাজপ্রাসাদে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে শুরু করে এবং খিলাফত আমলেই স্লাভগণ প্রকৃত দল গঠন করিয়া প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহারা সরকারী উচ্চপদ ও উপঢৌকনের মাধ্যমে প্রশাসন যন্ত্র কুক্ষিগত ও কলুষিত করে। এমনকি রাজার সিংহাসনারোহণ ও অপসারণ তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। আবদুর রহমানের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য গঠনের সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং তাঁহার আমলে কৃত্রিম জাতীয় ঐক্য অদূর ভবিষ্যতে বিনষ্ট হইয়া যায়।

স্পেনের প্রশাসনের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকগণ কঠোর প্রকৃতির আরব, সিরীয় ও বাররারদের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু অধিক সংখ্যক বিদেশী, স্লাভ ও নিগ্রো সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করায় সেনাবাহিনী অনির্ভরযোগ্য হইয়া উঠে। এই সকল বিদেশী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ না হইয়া একমাত্র অর্থের লোভে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত। তাহারা কদাচিত বিদ্রোহ দমনে আগ্রহ প্রকাশ করিত এবং নিয়োগকর্তার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত। বিদেশী বেতনভুক্ত সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় হাকামের সেনাবাহিনী আফ্রিকার বা রবারদের তুলনায় খুবই নিম্ন মানের ছিল। দেশের উত্তরাঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে আবূ আমের মুহাম্মাদ পরিচালিত রাজকীয় বাহিনীর উপর যে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয় ইহাতে রাজকীয় বাহিনী আরও অধিক দুর্বল হইয়া পড়ে (ঐ, পৃ. ৩২৪)।

দ্বিতীয় আল-হাকাম ও আবূ আমের মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারিগণ তেমন প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশ পরিচালনা করিতে সক্ষম ছিলেন না। দ্বিতীয় হিশামের শাসনামল হইতে প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন শুরু হয়। সিংহাসনারোহণ কালে তিনি ছিলেন নাবালক। এই সুযোগে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়া রাজ্যের প্রশাসন ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করেন। ইহা অবনতি ও অধঃপতনের পথকে সুগম করে। শৈথিল্য সৃষ্টিকারী পরিবেশ, খাদ্য দ্রব্যের সহজলভ্যতা, আন্দালুসীয়দের সহিত অসবর্ণ বিবাহ, বিলাসিতার প্রশ্রয় দান, আমোদ-প্রমোদ ও অপরাপর আনুষংগিক কারণেই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের অধঃপতন সূচিত হয়। অধিকন্তু যুবরাজগণ ওয়ালী বা সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর কেহই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই ভোগ-বিলাসপূর্ণ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেন এবং হেরেমের আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করিতেন। পরবর্তী কালে ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ও উমায়্যা যুবরাজদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ভালো ছিল না। ফলে ক্ষুদ্র যুবরাজগণ রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন (ঐ, পৃ. ৩২৫)।

এই সকল যুবরাজ তাহাদের পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্যকে হারাইয়া ফেলিয়া ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হইয়া অধঃপতিত জীবন যাপন করেন। সমসাময়িক কালের আন্দালুসিয়ার প্রশাসক সেভিলের আবূ আমর আব্বাস আল-মু'তাদিদের হেরেমে ৮০০ বাছাই করা সুন্দরী ক্রীতদাসী ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী মু'তামিদ ছিলেন গানবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি অতিরিক্ত আকৃষ্ট। উযীর ইব্ন আম্মার ও রানী রুমায়কিয়া তাঁহার সীমাহীন

লোভ-লালসা চরিতার্থে উৎসাহ দান করেন। মু'তামিদের ন্যায় গ্রানাডার বিখ্যাত আল-কাজারের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামুয়েল নামক জনৈক ইয়াহূদীর হস্তে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজে ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। আলমেরিয়ার উযীর ইব্‌ন 'আব্বাসও মদ্যপান ও লাম্পট্যের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার হেরেমে ৫০০ গায়িকা ও নর্তকী ছিল। এই ধরনের উচ্চাভিলাসী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। গানবাদ্য ও আনন্দ উৎসব উপভোগ এবং লাম্পট্য ও মদ্যপানের প্রশ্রয়দানের ফলে রাজা ও প্রজা উভয়ই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়ে (ঐ, পৃ. ৩২৫-২৬)।

ভ্যালেন্সীয়গণ সিদের (Cid) নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিলে তিনি রূঢ় ভাষায় বলেন, কোন জরুরী কাজ থাকিলে তোমরা আমার নিকট আসিও। আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করিব। তোমাদের রাজার মত তোমাদিগকে আমার দর্শন হইতে বঞ্চিত করিব না। কারণ আমি তোমাদের রাজার মত নারী ও মদের ভিতরে নিজেকে বিলীন করিয়া দেই নাই (Bertrand, The History of Spain, P. 62)।

মুসলিম শাসকদের অধঃপতন যুগের ইহা একটি প্রকৃত চিত্র। আন্দালুসিয়ার পরিবেশের প্রভাবে মুসলমানগণ তাহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং চরিত্রের যাযার বৈশিষ্ট্য ও সাহস হারাইয়া ফেলে এবং ভোগবিলাসিতা, মদ্যপান, গায়ক ও নর্তকী পরিবৃত্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কতিপয় অভিজাত শ্রেণীর পরিবর্তে ভোগবিলাস ও অসৎ জীবন যাপনের জন্য স্পেন দেশীয় খৃস্টান সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকগণ সাধারণ মুসলমানদিগকে সমালোচনা করেন (A Political History of Muslim Spain, 969, P. 326)।

খলীফা ও আমীরদের লাগামহীন খেয়ালখুশি বাধা দেয়ার মত কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের বাধাদানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তৃতীয় আবদুর রহমানেরও একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদের পরামর্শ কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন। শাসকদের স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দেওয়ার মত কোন শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকিলে হয়তো দুর্বল শাসকদের সময় দেশের অভ্যন্তরে যে সীমাহীন অশান্তি ও বিশৃংখলা বিরাজ করিত তাহা দমন করা সম্ভব হইত।

উত্তরাধিকার আইনের কড়াকড়ি না থাকায় রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্মান হ্রাস পায়। মৃত শাসকের পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকট আত্মীয়গণের প্রত্যেকেই নিজেকে সিংহাসনের যোগ্য প্রার্থী বলিয়া দাবি করিত এবং শক্তি পরীক্ষা ব্যতীত এই দাবি তাহারা পরিত্যাগ করিত না। ইহার অর্থ দেশে বিশৃংখলা এবং রাজকীয় শক্তির মর্যাদাহানি। নূতন শাসক নির্বাচনে কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রথা অথবা নির্ধারিত উত্তরাধিকার আইন থাকিলে রাষ্ট্রের কল্যাণে অহেতুক রক্তপাত ও গোলযোগ পরিহার করা যাইত।

দূরবর্তী প্রদেশসমূহ শাসনের জন্য সরকারের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। সীমাহীন সম্পদের অধিকারী উচ্চাভিলাষী গভর্ণরগণ প্রায়ই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। শাসকগণ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ওয়ালীগণকে (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং প্রদেশগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করিয়া নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাভুক্ত করিতে ব্যর্থ হন (ঐ, পৃ. ৩২৭)।

দূরবর্তী অঞ্চলের প্রতি সরকারের ক্রমাগত অবহেলার কারণে কখনও কখনও জনগণ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিত। দুর্বল শাসকদের আমলে দূরবর্তী অঞ্চল ও পল্লীর নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙখলার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গৃহীত হইত না। ইহাতে গ্রাম্য টাউটগণ প্রশ্রয় পাইত এবং জনগণের সহিত সরকারের সম্পর্ক শুধু খাজনা আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। ফলে রাজধানীতে কোন পরিবর্তন সূচিত হইলেও গ্রামবাসীদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। তাহাদের সম্পর্ক কেবল ভূমির মালিকদের সঙ্গেই থাকিত, শাসকের সঙ্গে নহে। খলীফা অথবা মন্ত্রীর হত্যা কিম্বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে জনগণ কোন প্রতিবাদ জানাইত না।

আন্দালুসীয় সরকারের সামরিক বৈশিষ্ট্য অভিন্ন থাকে। বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে ব্যবধান দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে কখনও জাতীয় সরকার গঠিত হয় নাই। ফলে দেশের সর্বত্র প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিত এবং বিদ্রোহিগণ অবশ্যই কোন কোন সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিত। প্রথম আবদুর রহমানের রাজত্বকাল হইতে স্পেনের স্থানীয় জনগণকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইত। সর্বোপরি আরব ও বারবারদের পুরাতন উপজাতীয় শত্রুতা, দেশী-বিদেশী বিরোধ প্রথম হাকামের ও আবদুল্লাহর রাজত্বকালে, এমনকি হ'াজিব আল-মানসূ'রের পরেও সাংঘাতিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে (ঐ, পৃ. ৩২৭-২৮)।

খৃস্টানদের সহিত যুদ্ধ এবং মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহবিবাদের কারণে আবদুল মালিক আল-মুজ'াফ্‌ফারের (মৃ. ১০০৭ খৃ.) মৃত্যুর পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। দুর্গসমূহের মেরামত ও সেনাবাহিনীর বেতনের টাকা পর্যন্ত সরকারী তহবিলে ছিল না। সরকারী কর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকগণ তাহাদের কৃষিকাজ পরিত্যাগ করিয়া নানবিধ জীবিকা গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দস্যুবৃত্তিও গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তির কারণে আমদানী-রফতানী শুল্ক ও টোল বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজ্যের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আর তাহা হইল জনগণের অর্থে নিজ নিজ রাজ্যভাণ্ডার স্ফীত করা। রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিল্পজাত বস্তুর রফতানির উপর বর্ধিত কর আরোপিত হয়। ইহাতে জীবিকার ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে সহায়ক ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। দেশের তথাকথিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অঢেল সাহায্য এবং ক্যাস্টিলীয় ও ল্যাভারীয়দের কর দেওয়ার ফলে রাজকোষ শূণ্য হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, টলেডোর মামূনের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী য়াহ্'য়া আল-ক'াদির দুর্বল ও অযোগ্য শাসক হওয়ায় খৃস্টানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তাঁহার প্রভুকে অধিক কর দেওয়ার জন্য তাঁহার গরীব প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব বেশী রাজস্ব আদায় করিতেন। অসন্তুষ্ট জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করে এবং বাদাজোযের শাসক আল-মুতাওয়াককিলকে ক্ষমতা গ্রহণের আহবান জানায়। অসহায় আল-ক'াদির ৬ষ্ঠ আল-ফন্সোর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১০৮৫ খৃ. তিনি নিজে টলেডো অধিকার করেন

এবং আল-কাদির তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ভ্যালেন্সিয়াতে অতিবাহিত করেন। ৪র্থ হেনরীকে বাৎসরিক ১২০০০ দীনার কর প্রদানে সম্মত হইয়া গ্রানাডার সা'দ ইব্ন আলী শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবুল হাসান আলী (১৪৬৫-৮২ খৃ.) এই মোটা করদানে ব্যর্থ হইবার ফলে খৃষ্টানগণ নূতন করিয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করে। খৃষ্টান যুবরাজগণ মুসলমান রাজ্য অধিকার করিয়া ইহার শাসকদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত অথবা উৎখাত না করিয়া তাহাদের রাজ্যগুলিকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করিবার দীর্ঘস্থায়ী নীতি গ্রহণ করে (Bertrand, The History of Spain, p. 148)।

পুরানো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্পেনের ন্যায় একটি বৃহৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ঐক্য বিধানে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্পেনে পরিপূর্ণ ঐক্য বিধানের পরিবেশ অনুপস্থিত ছিল এবং এই প্রেক্ষিতে কতিপয় মুসলমান শাসক জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা দূর করার অবিরত চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। উপরন্তু স্পেনের প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে আকা-বাঁকা পথে সেনাবাহিনী দ্রুত গমনাগমন করিতে পারিত না। ফলে দুর্বল শাসকদের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না (S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain, p. 329)।

মুসলমানগণ ফ্রান্সে তাহাদের উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী করিতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে স্পেনের অভ্যন্তরে ফ্রান্সের উপনিবেশ থাকিয়া যায়। ফলে মুসলিম স্পেন দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। মুসলমানগণ তাহাদের শক্তি সুসংহত করিতে স্পেনের অভ্যন্তরে ফ্রান্সের সিটমহলসমূহের ধ্বংস সাধন এবং ফ্রান্সে নিজেদের উপনিবেশ টিকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে পারিত। তাহাদের অধিকৃত এলাকা রক্ষার জন্য ফ্রান্সে মুসলমানদের সেনানিবাস নির্মাণ করা উচিত ছিল। ইহার ফলে ইউরোপে আর অগ্রসর হইতে না পারিলেও স্পেনে নিজেদের দখলকৃত এলাকা তাহারা নিজ অধিকারে রাখিতে পারিত। মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে ফ্রান্সে দক্ষিণ-পূর্বে অরক্ষিত নারবোনে (Norbonne) তাহাদের একটি মাত্র ঘাটি ছিল। ঘাটিটি তেমন শক্তিশালী ছিল না; এমনকি ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর বিরুদ্ধে নারবোন হইতে তেমন কোন সাহায্যের আশা করা যাইত না। তাহারা সর্বদা কর্ডোভার নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিত। কিন্তু দূরত্ব, সড়ক পথের অসুবিধা এবং নৌশক্তির দুর্বলতার কারণে অতি দ্রুত সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। তুষারাবৃত পিরেনীজ পর্বতের মধ্য দিয়া কয়েকটি মাত্র গিরিপথ ছিল। ইহাও বৎসরে প্রায় ছয় মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকিত। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যগুলির নিয়মিত সাহায্যের উপর নির্ভর করার কারণে তাহারা কর্ডোভায় রাজধানী স্থাপন করেন, কিন্তু সমগ্র দেশের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব বলবৎ রাখিবার জন্য রাজধানী হিসাবে টলেডো অথবা মেদিনাসেলীই ছিল অধিক উপযুক্ত। এখান হইতে দেশের সর্বত্র অতি দ্রুত ও অতি সহজে সেনা প্রেরণ করা যাইত, যাহা কর্ডোভা হইতে সম্ভব ছিল না, অবশ্য কর্ডোভা হইতে উত্তর আফ্রিকায় যাতায়াত সহজ ছিল।

আবহাওয়া এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দক্ষিণে বসবাসকারী মুসলমান ও উত্তরে বসবাসকারী খৃষ্টানগণের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীতে ডুরোর (Douro) পরিত্যক্ত মেসেতা অঞ্চলটি সীমানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই সীমারেখা বরাবর দুর্গের প্রাচীর নির্মিত হয়। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এইগুলি উত্তরের খৃষ্টানগণ কর্তৃক অধিকৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১০৮৫ খৃ টলেডোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দালুসিয়া উত্তরাঞ্চলের অগ্রসরমান খৃষ্টান সৈনিকদের সহজ আক্রমণের শিকারে পরিণত হয় (ঐ, পৃ. ৩৩০)

বিভিন্ন ধর্মে ও মতে বিশ্বাসী আন্দালুসিয়ার জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং তাহাদের সমর্থন লাভ করা মুসলমান শাসকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মুসলমান শাসকগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, জনগণের সমর্থন ব্যতীত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা কল্পনা করা যায় না। তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁহার প্রজাবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সফলকাম হইলেও ইহা দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং মুসলমান শাসকগণ বিদেশী সৈনিকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। যখন রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন অতীব তীব্র হয় তখন কোন দিক হইতেই ইহার আগমন ঘটে নাই (ঐ, পৃ. ৩৩০-৩৩১)।

একাদশ শতাব্দীতে উমায়্যা খিলাফতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দালুসিয়ায় খৃষ্টান পুনর্বিজয়ের (Reconquesta) সূত্রপাত হয় (P.K. Hitti, History of the Arabs, P. 551)। অবশ্য আন্দালুসীয় ঐতিহাসিকগণ ৭১৮ খৃ. কোভাডোঙ্গা (Covadonga)-এর যুদ্ধকে এই পুনর্বিজয়ের প্রকৃত সূচনা বলিয়া মনে করেন (ঐ, পৃ. ২১৭)। এই যুদ্ধে জনৈক অষ্টারিয়ান পিলায়ও (Pelayo) মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করে এবং রডারিকের স্থলাভিষিক্ত নেতা নির্বাচিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানগণ যদি উত্তরের পাবর্ত্য অঞ্চলের খৃষ্টান শক্তির শেষ আশ্রয়স্থলটি ধ্বংস করিত তবে পরবর্তী কালে আন্দালুসিয়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হইত (P.K. Hitti, History of The Arabs, P. 551)।

মুসলমানগণ যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হয় সেই সময় খৃষ্টান অভিজাত সম্প্রদায় এবং প্রাদ্রীগণ তাহাদের উপর চরম আঘাত হানিবার সুযোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বের শেষদিকে তাঁহার সহনশীলতা, দয়া ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্মোন্মত্ত খৃষ্টানগণ মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ফলে কিছু সংখ্যক ধর্মোন্মত্ত খৃষ্টানকে বন্দী ও হত্যা করা হয়। প্রথম মুহাম্মাদ কঠোর হস্তে তাহাদের বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু উগ্রপন্থী খৃষ্টানদের কোন মানসিক পরিবর্তন হয় নাই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের ঘৃণা ও শত্রুতা পূর্বের মতই বহাল থাকে। এই সমস্ত উগ্রপন্থী খৃষ্টান ইব্ন হাফসূনের সহিত যোগদান করে। ইব্ন হাফসূন ঘোষণা করেন অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ ও আরবদের গোলামী হইতে স্থানীয় জনগণকে তিনি মুক্তি দিতে আগ্রহী। কর্ডোভার সিংহাসনে শক্তিশালী শাসকবৃন্দ অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাহারা শাসকের অনুগত ছিল এবং মাথা নত করিয়া থাকিত। টলেডোর খৃষ্টানগণ কখনও কখনও মুসলমান শাসন অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করে (History of Muslim Spain, P. 331)। মুসলমানদের অদূরদর্শী নীতি অনুসরণের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খৃষ্টান

শহরের কেন্দ্রস্থলে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। তাহারা খৃস্টান যুবরাজদিগকে আক্রমণ ও উচ্চাকাক্ষী সর্দারদিগকে বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইতে আমন্ত্রণ জানায়। তাহারা মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন এবং চূড়ান্তভাবে মুসলমানদিগকে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বজাতিদের সহিত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, স্পেনের মুসলমানদের দুর্বলতা না থাকিলে খৃস্টানগণ একত্র হইবার সুযোগ পাইত না। খিলাফতের পতনকালে আন্তবিবাহ এবং পারিবারিক অন্যান্য নীতির মাধ্যমে খৃস্টানগণ সাম্রাজ্যকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ করে। খিলাফতের পতনের মাত্র ছয় বৎসর পরই ক্যাস্টিলের প্রথম ফার্ডিনান্ড লিওন ও ক্যাষ্টাইল রাজ্য একত্র করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বার্সিলোনা আরাগন রাজ্যের সহিত একত্র হয়। এইরূপে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১০৮৫ খৃ. ৪র্থ আলফন্সো টলেডো অধিকার করিয়া ইহাকে আন্দালুসিয়ার অবশিষ্টাংশে আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে এবং যাল্লাকার যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ঐ যুদ্ধের ফলে খৃস্টানগণ পরাজিত হয় এবং স্পেন উত্তর আফ্রিকার আল-মুরাবিত ও আল-মুওয়াহহিদ-এর হস্তগত হয়। গৃহযুদ্ধের কারণে খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাগনের প্রথম জেমস এবং ক্যাস্টিলের দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ডের সম্মিলিত বাহিনী জয়লাভের পর মুসলমান সাম্রাজ্য গ্রাস করিতে শুরু করে। ১২২৩ খৃ. আল-মুওয়াহ্হিদ খলীফার মৃত্যুর পর আন্দালুসিয়ার রিকনকোয়েস্টা প্রতিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১২৩০ খৃ. নবম আলফন্সোর মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে ক্যাষ্টিলের সহিত যোগদান করে। তৃতীয় ফার্ডিনান্ড বিশেষভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করেন। ১২৩১ খৃ. হইতে তিনি বহু অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে ১২৩৬ খৃ. আন্দালুসিয়ার প্রাণকেন্দ্র কর্ডোভা এবং ১২৪৮ খৃ. সেভিল অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্দালুসিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল খৃস্টানদের অধিকারভুক্ত হয়। অবশিষ্ট গ্রানাডা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় উপনীত হয় (ঐ, পৃ. ২২৬-২২৭)।

১৪৬১ খৃ. আরাগনের ফার্ডিনান্ড ও ক্যাস্টিলের রাজকুমারী ইসাবেলার বিবাহ এই দুইটি রাজ্যকে চিরকালীন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। এই ঐক্যের মধ্য দিয়াই স্পেনে মুসলমান শাসনের পতন ত্বরান্বিত হয় (P.K. Hitti, P. 551)। মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে উৎখাত এবং মুসলিম সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করাই ছিল উভয়ের সংকল্প। ১৪৮২ খৃ. খৃস্টানগণ সুযোগ বুঝিয়া আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে। তাহারা আল-হামাহ, গ্রানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশদ্বার অধিকার করে (ঐ, পৃ. ৫৫৩)। তাহারা এই নগরীতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী শিশু ও মহিলারাও খৃস্টানদের শানিত কৃপাণ হইতে রেহাই পায় নাই। অসহায় বালক, শিশু ও নারীর রক্তে পবিত্র মসজিদ রঞ্জিত করিয়া ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা পরম তুষ্টিলাভ করে। সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের সুদৃশ্য, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধিশালী আল-হামরা ধর্মান্ধ খৃস্টানদের বর্বরোচিত হামলায় সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হয়। আল-হামরার পতন গ্রানাডার ধ্বংসের পূর্ব সংকেত ছিল। (S.M. Imamuddin, P. 297)। আবুল হাসান পরপর দুইবার আলহামাহ দুর্গ পুনর্দখলের প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হন। চরম দুর্দিনে রাজপরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে খৃস্টানগণ একের পর এক দুর্গ ও শহর দখল করে এবং গ্রানাডা গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে। আবুল হাসানের দুই স্ত্রী ছিলেনঃ একজন তাঁহার পিতৃব্য কন্যা আইশা, অন্যজন এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্পেনীয় মহিলা ইসাবেলা দ্য সালিমা (যাহরা)। তাঁহার এই দুই স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ধারণ লইয়া নিজ নিজ পুত্রের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করিতে তাহারা উভয়ে ব্যস্ত ছিলেন। জাতীয় মহাসংকটের বিষয়টি তাহাদের নিকট নগণ্য ছিল। আবুল হাসানের পুত্র মুহাম্মাদ আবূ আবদুল্লাহ (বোয়াবদিল) রাজধানীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া পিতার মহত কার্যকে পণ্ড করিয়া দেন এবং নিজেদের পতনকে ত্বরান্বিত করেন। মুহাম্মাদ আবূ আবদুল্লাহ সৈনিকদের সমর্থনে ১৪৮২ খৃ. আল-হামরা দখল করেন এবং নিজেকে গ্রানাডার শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। ঐ বৎসরই আবূ আবদুল্লাহ ক্যাষ্টিলীয় খৃস্টান শহর লুছেনা (Lucena) আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন। এই সুযোগে আবুল হাসান গ্রানাডার শূন্য সিংহাসন পুনরায় দখল করেন। কিন্তু পরে তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা মুহাম্মাদ আল-যাগালের (দ্বাদশ মুহম্মাদ ১৪৮৩-৮৭ খৃ.) পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। ফার্ডিনান্ড -ইসাবেলা বন্দী বোয়াবদিলকে গ্রানাডা ধ্বংসের এক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে (P.K. Hitti, P. 553)। তাহারা বোয়াবদিলকে একটি সেনাদলসহ তাঁহার পিতৃব্য আল-যাগালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। আবূ আবদুল্লাহ খৃস্টানদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহৃত হন (S.M. Imamuddin, P. 297)। আল-যাগাল সম্মিলিতভাবে ক্যাষ্টিলীয়দের বাধা প্রদানের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ আবদুল্লাহ ইহাতে সম্মত হন নাই। উপরন্তু গ্রানাডা রাজ্যের পতন ঘটানোর জন্য আবূ আবদুল্লাহ ক্যাষ্টিলীয় ও আরাগনীয়দের সাহায্য করেন। আবূ আবদুল্লাহ তাঁহার পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গ্রানাডায় পুনর্বাসিত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দেশপ্রেমিক আফ্রিকার বানূ-সাররাজকে সমূলে ধ্বংস করেন। গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্যাষ্টিলীয়গণ আলোরা, কাসর বনিলা, রোন্ডা ও অন্যান্য শহরগুলি পরপর অধিকার করে। ১৪৮৬ খৃ. লোজা (Loja) এবং পরবর্তী বৎসর আলমেরিয়া ও মালাগা পদানত হয়। শহরসমূহের অধিবাসীদের অত্যাচার করা হইবে না এই শর্তে শহরগুলি আত্মসমর্পণ করে। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে অথবা নগর হইতে তাড়াইয়া দেয় (ঐ, পৃ. ২৯৯; P.K. Hitti, P. 553-54)। এইরূপ পরিবেশে হতাশাগ্রস্ত আল-যাগাল নিজেদের মধ্যে কোন্দলরত আফ্রিকার মুসলমান শাসকদের নিকট শেষবারের মত আবেদন জানাইয়াও ব্যর্থ হন। অবশেষে আল-যাগাল ১৪৮৭ খৃ. আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মরক্কোর তিলিমসানে গমন করেন এবং অতি কষ্টে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন (ঐ, পৃ. ৫৫৪; S.M. Imamuddin, প্রাগুক্ত, P.299)। ভণ্ড ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা জনগণকে ঘরবাড়ী হইতে বহিষ্কার করিয়া ধনসম্পদ আত্মসাত করে।

দেশপ্রেমিক আল-যাগালের স্পেন ত্যাগের পর বিধ্বস্ত গ্রানাডা ও ইহার সন্নিহিত কিছু স্থান ব্যতীত মুসলমানগণের নিকট আর অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। অতঃপর ১৪৯০ খৃ. আবূ আবদুল্লাহর (বোয়াবদিল)-এর পৃষ্ঠপোষক ও মিত্র ফার্ডিনান্ড গ্রানাডা তাহাদের হাতে ন্যস্ত করার জন্য নির্দেশ দেয়। বোয়াবদিল ইহাতে অস্বীকৃতি জানাইলে চল্লিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ১৪৯১ খৃ. বসন্তকালে গ্রানাডা ও গ্রানাডার শস্য-শ্যামল ভূমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। প্রধান সেনাপতি মূসা ইব্ন গাযানের নেতৃত্বে মুসলমান অশ্বারোহী বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া প্রথমদিকে বহু সংখ্যক অবরোধকারীকে হত্যা করে (ঐ, পৃ. ২৯৯)। ফার্ডিনান্ড অবরুদ্ধ নগরীতে সকল সববরাহ বন্ধ করে এবং নগরবাসীকে চরম দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। ভেগা (Vega)-এর ধ্বংসলীলা অবলোকন করিয়া এবং মুসলমান দেশগুলি হইতে সাহায্যের সম্ভাবনা না দেখিয়া ২ রাবীউল আওয়াল, ৮৯৭/২ জুন, ১৪৯২ সালে ৫৫টি শর্ত সাপেক্ষে বোয়াবদিল আত্মসমর্পণ করেন। শর্তগুলি (১) আবূ আবদুল্লাহ (বোয়াবদিল), তাঁহার অফিসার ও নাগরিকবৃন্দ ফার্ডিনান্ড ইসাবেলার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন; (২) আবূ আবদুল্লাহ আল-বুশারাতে (আলপুজারা) একটি জায়গীর পাইবেন; (৩) মুসলমানগণ তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবে; (৪) তাহাদের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাষা ও পোশাক বহাল থাকিবে; (৫) মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যকার বিরোধ উভয় পক্ষের লোকদের লইয়া গঠিত সম্মিলিত ট্রাইবুনাল মীমাংসা করিবে; (৬) মুসলমানগণ মুসলিম শাসকদের আমলে যে সমস্ত কর প্রদান করিত তাহাই প্রদান করিবে; (৭) সমস্ত মুসলমান বন্দী মুক্তি পাইবে; (৮) স্বর্ণ ও হাতিয়ার ইত্যাদি বহনযোগ্য মালামাল লইয়া মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে স্পেন ত্যাগ করিতে পারিবে। ইহা করিলে তিন বৎসর সময়সীমার মধ্যে তাহারা স্পেনে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। তিন বৎসর পর ফিরিয়া আসিলে তাহাদের সম্পদের এক-দশমাংশ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; (৯) নও মুসলমানদিগকে তাহাদের পূর্ব ধর্মে ধমান্তরিত করা হইবে না এবং খৃস্ট ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী মুসলমানদিগকে তাহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তা করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত একজন মুসলমান ও একজন খৃস্টান বিচারকের সম্মুখে ঘোষণা করিতে হইবে; (১০) মুসলমান ব্যবসায়ীদিগকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ দিতে হইবে এবং খৃস্টানদের ন্যায় শুল্ক প্রদান করিয়া মুসলমানগণও দেশের ভিতরে ও বাহিরে ব্যবসা করিতে পারিবে; (১১) চুক্তির শর্তসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য দায়িত্বশীল ওয়ালী ও পরিচালক নিয়োগ করিতে হইবে (ঐ, পৃ. ৩০০)।

খৃস্টানদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সেনাপতি মূসা খুব সচেতন ছিলেন। তিনি এই আপত্তিকর দাসত্বমূলক ও শর্ত সাপেক্ষ আত্মসমর্পণের চুক্তির বিরোধিতা করেন। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার অঙ্গীকারে তাহার বিশ্বাস ছিল না। মুসলমানদের পক্ষ হইতে কোন প্রকার সমর্থন না পাইয়া তিনি চিরদিনের জন্য নগরের এলভিরা তোরণ দিয়া বাহিরে চলিয়া যান। অবশেষে ১৪৯২ খৃ. ২ জানুয়ারী খৃস্টানগণ গ্রানাডায় প্রবেশ করে। এইভাবে আন্দালুসিয়ার ৭৮০ বৎসরের মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে। (ঐ, পৃ. ৩০১)। বোয়াবদিল গ্রানাডা ত্যাগ করেন। দেশত্যাগের আগে পার্বত্য ভূমিতে দাঁড়াইয়া তিনি যেই বিষাদময় বিদায় অভ্যর্থনা জানান তাহা বর্তমানেও মুরদের সর্বশেষ দীর্ঘশ্বাস (P.K. Hitti, P. 555)। বোয়াবদিল পুকসরাসে আশ্রয় গ্রহণ এবং পরে ফেযে নির্বাসিত হন এবং সেইখানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অতি দুঃখ-কষ্টে দিনযাপন করেন (Imamuddin, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১, P.K. Hitti: P. 555)।

গ্রানাডার পতনের পর খৃস্টানগণ মুসলমান নিধনযজ্ঞে মাতিয়া উঠে। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা আত্মসমর্পণের শর্তগুলি মানিয়া চলে নাই। ১৪৯৯ খৃ. ফার্ডিনান্ড কার্ডিনাল জিমেনেজের দা সিস্নেরস (Casdinel ximenez de Cisneros) পরিচালনায় মুসলমানদের বলপূর্বক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। ফার্ডিনাণ্ড ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থগুলি পোড়াইয়া সেইগুলির প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করে। গ্রানাডা আরবী পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর উৎসবকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সকল পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া বাহির করার জন্য সে গুপ্ত বিভাগ খোলে। গ্রানাডা দখলের পর যেই সমস্ত মুসলমান সেখানে থাকিয়া গেল তাহাদিগকে মরিস্কো বলা হইত। মরিস্কোগণ নির্যাতনের শিকার হন। অধিকাংশ মরিস্কোই ছিল স্পেনীয় বংশধর। তাহাদিগকে বলা হইল, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল খৃস্টান। সুতরাং তাহাদিগকে খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হইতে বাধ্য করা হয়। মুদেজারগণ মরিস্কোদের সহিত দলবদ্ধ হইল এবং অনেকেই ভয়ে খৃস্ট ধর্মে বিশ্বাসী বলিয়া ভান করিলেও গোপনে ইসলাম ধর্ম পালন করিত। অনেকে প্রকাশ্যে খৃস্টান নাম ব্যবহার করিলেও গোপনে আরবী নাম ব্যবহার করিত এবং গোপনে মুসলিম বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান মানিয়া চলিত (ঐ, পৃ. ৫৫৫-৫৬)। ১৫০১ খৃ. লিওন ও ক্যাষ্টিলের সকল মুসলমানকে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের রাজকীয় আদেশ প্রদান করা হয়। ১৫২৬ খৃ. আরাগনের মুসলমানদের প্রতি অনুরূপ আদেশ জারী করা হয়। ১৫৫৬ খৃ. দ্বিতীয় ফিলিপ একটি আইন চালু করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের ভাষা, ধর্ম, প্রতিষ্ঠান ও জীবন যাপনের পদ্ধতি বাতিলের আদেশ দেয়। এমনকি মুসলমানদের স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত স্পেনীয় স্নানাগারগুলিও ধ্বংস করার জন্য আদেশ দেয়। ১৬০৯ খৃ. তৃতীয় ফিলিপ মুসলমানদের বহিষ্কারের আদেশ স্বাক্ষর করে এবং স্পেনের মাটি হইতে সকল মুসলমানকে জোরপূর্বক নির্বাসিত করা হয় (ঐ, পৃ. ৫৫৬)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমানকে নির্বাসিত বা হত্যা করা হয় (ঐ, পৃ. ৫৫৬)। মুরগণ স্পেন হইতে নির্বাসিত হইল। কিছু দিনের জন্য খৃস্টান স্পেন ধার করা আলোকে চন্দ্রের কিরণ বিকিরণ করিল। অতঃপর চন্দ্র রাহুগ্রস্থ হইল এবং সেই অন্ধকারে স্পেন চিরদিনের মত নিমজ্জিত হয় (ঐ, পৃ. ৫৫৬)।

অভ্যন্তরীণ অসুবিধাসমূহ সত্ত্বেও মুসলমানগণ যদি তাহাদের দলীয় ও গোত্রীয় কলহ-বিদ্বেষকে দূরীভূত করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত তাহা হইলে আন্দালুসিয়ায় তাহাদের শাসন অটুট রাখিতে সক্ষম হইত। তাহাদের ব্যক্তিগত বিরোধ ও দলীয় স্বার্থের সংঘাত স্পেনে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে সর্বদাই লক্ষণীয়। তাহাদের শত্রুদের উগ্রতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ তাহাদের পতনের মূল কারণ। মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনের জন্য প্রধানত তাহারা নিজেরাই দায়ী ছিল। কিন্তু দেশ হইতে তাহাদের উৎখাতে খৃস্টানদের ধর্মোন্মত্ততাই মূল কারণ।

শাসক অথবা শাসিতরূপে আন্দালুসিয়ায় মুসলমানদের বসবাস করিবার অধিকার অবশ্যই ছিল। কারণ খৃষ্টানদের ন্যায় তাহাদের পূর্বপুরুষগণও সেখানে যুগ যুগ ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছিল এবং দেশের উন্নয়নে তাহাদের বিরাট অবদান ছিল। তাহারা স্পেনেরই সন্তান এবং নাগরিক হিসাবে স্পেনীয় খৃষ্টানদের মতই সমান অধিকার তাহাদের প্রাপ্য ছিল। একমাত্র খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে পূর্বপুরুষের ভিটামাটি হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত ও উৎখাত করা হয় (Imamuddin, P. 331-332)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাঃ আবু তাহের

স্পেনে মুসলমানদের পতনের সর্বপ্রধান কারণ হইল, মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর ইসলামের ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের অভাব। তাহারা দেশ জয় করিয়াছেন সত্য কিন্তু তথাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ফলে সেখানে মুসলমানগণ পূর্বাপর সংখ্যালঘুই থাকিয়া যায়। আবার যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদেরও সুষ্ঠ পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে ইসলামের মূল স্পিরিটে তাহারা কখনও উজ্জীবিত হইতে পারে নাই। উপরন্তু তথাকার আরব অভিজাতবর্গের নিকট হইতেও স্থানীয় নও-মুসলিমগণ কখনও মানবিক সহানুভূতি ও সামাজিক সম-মর্যাদা লাভ করে নাই। তাহাদের প্রতি আরবদের অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে তাহারা হীনমন্যতাবোধ করিত। ফলে মানবতাবাদী ইসলাম তাহাদের অন্তরে স্থান করিয়া নিতে পারে নাই। স্পেনের মুসলিম শাসনের প্রকৃতি ছিল অনেকটা ভারতে মুসলিম শাসনের অনুরূপ। অর্থাৎ মুসলমানগণ দীর্ঘকাল ভারত শাসন করিলেও এখানকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পৌত্তলিকই থাকিয়া যায়।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণের মতে মুসলমানদের পূর্ণ উত্থান ও কর্তৃত্বের সময়েও স্পেনে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ত্রিশ হইতে বত্রিশ-এর উর্ধে উঠে নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক তো উক্ত হার শতকরা সতের ভাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার কিছু সংখ্যক ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া নয়, বরং খৃষ্টান স্বজাতির নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদুপরি মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বার্বার যাহারা হিজরত করিয়া সেখানে গিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসকগণ স্পেনে সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কালাম শাস্ত্র ইত্যাদির চর্চার প্রতিই নজর দেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার বা নিজদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। ফলে মুসলমানগণ সংখ্যায় বরাবর নগণ্যই থাকিয়া যায়। খৃষ্টান শক্তি এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। তাহারা ভিতরে ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন স্থানে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাকে। তাহাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে মুসলিম শাসকগণ টিকিতে পারে নাই। অপরদিকে ঈমানী শক্তি দুর্বল হওয়ায় তাহাদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে মুসলিম শাসকগণ পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়েন। এই নিষ্ঠার অভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য হইতেও তাহারা বঞ্চিত হন। ইহার ফলেই স্পেন হইতে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জাতিরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) T.W. Arnold, The Preaching of Islam, Low price Publications, 2nd edition, Delhi 2001, P. 131-144; (২) ড. মুহসিন উছমানী, তাবলীগে ইসলাম, ইউনিভার্সাল পিস ফাউন্ডেশন, নয়া দিল্লী, তা.বি., পৃ. ৪ প.; (৩) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, তুহ্ফায়ে মাশরিক, বাংলা অনু. প্রাচ্যের উপহার, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ১ম সং., ঢাকা ১৪১১/২০০৩ পৃ. ২৫৯-৬৩।

ড. আবদুল জলীল

আনদিজান (اندجان) ঃ ফারগানার একটি শহর। সীর দার্‌য়ার উজানে বামতীরে ৪০-৪৩° উ. অক্ষাংশ ৭২-২৫ পূ. দ্রাঘিমায় অবস্থিত। উহা ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আন্দুকান বা আন্দুগান নামে পরিচিত ছিল। শহরটি কারলুকদের ও পরে কারাখানী শাসকদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ১১শ শতকে উহা সালজুকদের শাসনাধীন ছিল (ইয়াকূত, কায়রো সংস্করণ, ১খ., ৩৪৭)। ১২শ শতকে উহা ফারগানা রাজ্যের কেন্দ্র হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে (তু. Zap. Imp. Russk. geogr. obva. ২৯, ৭২)। বাহ্যত শহরটি হানাদার মোঙ্গলদের হস্তে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৩শ শতকের শেষভাগে চাগ্‌তাই খান বংশীয় কায়দু ও দুওয়ার শাসনকালে (হামদুল্লাহ মুসতাওফী, পৃ. ২৪৬) উহাকে পুনর্নির্মাণ করিতে হয়। তখন হইতে এই স্থানে প্রধানত তুর্কীরাই বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পৃথক পৃথক গোত্র শহরটির বিভিন্ন অংশে দৃশ্যত বসতি স্থাপন করিয়াছে (ইস্কান্দার ছদ্মনামে Barthold, Vorlesungen, পৃ. ২২১)। অতঃপর সমগ্র ফারগানা রাজ্যে তাহাদের (তুর্কীদের) ভাষাই আদর্শ হিসাবে গড়িয়া উঠে (দ্র. বাবুর নামাহ, কাযান ১৮৫৭, পৃ. ৩)। আলী শীর নাওয়াঈ এই ভাষা ব্যবহার করিতেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া আন্দিজান নগর ফারগানা রাজ্যের রাজধানী ও কাশ্‌গারের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহা খুকান্দ (দ্র.)-এর খান বংশীয় শাসকদের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং কৃষিজাত পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে উহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

রুশগণ খান শাসিত অঞ্চলটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জয় করিয়া উহার নাম তাহাদের উচ্চারণ অনুযায়ী আন্দিযান রাখে। তৎকালে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩০,৬২০। তাহারা প্রধানত কৃষিকার্য ও উদ্যান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তখন হইতে উক্ত জেলার পেট্রোল ও লৌহখনিতে উৎপাদন আরম্ভ হয়। মারজিলান জেলার মিন টেপে হইতে ঈশান (দ্র.) মাদালীর নেতৃত্বে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ ও ১৮ মে তারিখে ধর্মভিত্তিক এক অভ্যুত্থান ঘটে। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ উহাকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেক রক্তপাতের পর উক্ত অভ্যুত্থান দমন করা হয় (তু. Revolyustsiya v Sredney Azii, ১খ., তাশকান্দ ১৯২৮, যাহাতে Sang-zada\K 30-letiyu Andizanskogo vosstaniya 1898 g; E. G.

Fedorov, Ocerki natsional' noosvoboditel' nogo dvizeniya v Sredney Azii, তাশ্‌কান্দ ১৯২৫; K. Ramzin, Revolyuciya v Sredney Azii v obrazakhi kartinakh, মস্কো ১৯২৮ খৃ.। ১৯০০ খৃস্টাব্দে নগরটির লোকসংখ্যা ছিল ৪৯,৬৮২। তন্মধ্যে ১৯০২ খৃ. এক ভূমিকম্পে ৪,৫০০ লোক প্রাণ হারায় (F. N. Cernysev প্রমুখ ঐতিহাসিক লিখিত Andizanskoe zemletryasenie ১৯০২ g., সেন্ট পিটার্সবার্গ [বর্তমানে লেনিনগ্রাড] ১৯১৪ খৃ.)। Basmaci অভ্যুত্থানটি ১৯১৬ খৃ. দমিত হইলে পরে ১৯২৪ খৃ. হইতে আন্‌দিজান সোভিয়েত উযবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৯৩৯ খৃ. উহার লোকসংখ্যা রুশীয় বাসিন্দাসহ ৮৩,৭০০-এ উন্নীত হয়। বিগত ১৯৪১ সনের ৬ মার্চ হইতে বর্তমানে নগরটি একটি স্বতন্ত্র জেলার সদর। জেলাটির আয়তন ৩৮০০ বর্গ কি. মি.। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলা উৎপাদন কেন্দ্র। ১৯৩৭-৩৮ সন হইতে সেইখানে পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে (তু. W. Leimbach, Die Sowjetunion, স্টুটগার্ট ১৯৫০, পৃ. ৩৪০, মানচিত্র সমেত)। শহরটিতে বর্তমানে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, একটি কৃষি কলেজ, মহিলা প্রশিক্ষণ কলেজ, একটি উযবেক নাট্যশালা ও একটি আঞ্চলিক যাদুঘর ইত্যাদি রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bolsaja Sovetskaya Enciklopediya, ২খ,, মস্কো ১৯২৬, পৃ. ২৭৯ ; (২) প্রাগুক্ত, ২খ., মানচিত্র ও চিত্রসহ, ১৯৫০ খৃ., ৪২৩-২৬ ; (৩) Zap. Imp. Russk. Geogr. Ob-va, উনবিংশ খ., পৃ. ৪১-৭৮, ৪৫৩ প., ৪৯৬-৫০২ ; (৪) W. Barthold, Zwolf Vorlesungen uber die Geschichte der Turken Mittelasiens, বার্লিন ১৯৩৫ খৃ., বিশেষত ১৪১, ১৯২, ২২১ (তু. নির্ঘন্ট) ; (৫) A. Zeki Velidi Togan, Turk ili tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., নির্ঘন্ট; (৬) L. Kostenko, Turkestanskiy Kray. সেন্টপিটার্সবার্গ ১৮৮০ খৃ.।

B. Spuler (E.I.[2]) /মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আন্‌দী (اندى) ঃ আন্দী গোত্রসমূহ বলিতে আটটি ছোট ছোট আইবেরীয়-ককেসীয় মুসলিম গোত্রকে বুঝায়। সংখ্যায় তাহারা প্রায় ৫০,০০০। তাহারা বংশের দিক দিয়া আওয়ার (Awar, দ্র.)-দের স্বগোত্রীয় কিন্তু ভাষাগত দিক দিয়া তাহাদের হইতে ভিন্ন। তাহারা সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র দাগিস্তান-এর পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আনদী-র কোয়সু (Koysu) নদীর অববাহিকায় বাস করে।

এই গোত্রসমূহে রহিয়াছে ঃ (১) প্রকৃত আনদী সংখ্যায় ১৯৩৩ সনে ৮,৯৮৬; ১৯৫৪ সনে প্রায় ১০,০০০; (২) আখওয়াখ (অথবা Acwado), ১৯৩৩ সনে ৪,৬১০; (৩) বাগুলাল (অথবা Kvavada), ১৯৩৩ সনে ৩,৬৩৭; (৪) বোতলিখ (Botlikh), ১৯৩৩ সনে ১,৮৬৪; (৫) গোদোবেরী (Godoberi), ১৯৪৬ সনে ১,৫০০; (৬) চামালাল (Camalal), ১৯৩৩ সনে ৫,১০১; ১৯৫৪ সনে প্রায় ৭,০০০; (৭) কারাতা (অথবা Kirdi-Kalal), ১৯৩৯ সনে ৬,২৩৫; (৮) তিনদী (অথবা Tindal, Ideri), ১৯৩৩ সনে ৪,৭৭৭।

আনদী গোত্রসমূহ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে আওয়ারদের মাধ্যেমে ইসলাম গ্রহণ করে। আওয়ারদের ন্যায় তাহারাও শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী সুন্নী ছিল। প্রতিটি আনদী গোত্রের নিজস্ব ভাষা রহিয়াছে। এইসব ভাষা আইবেরীয়-ককেসীয় ভাষার দাগিস্তান শাখার আওয়ার- আনদো-দিদো (Awar-Ando-Dido) ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত। আনদী গোত্রদের ভাষাসমূহ প্রতিবেশী গোত্রের ও আওয়ারদের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল নিম্নোক্ত গোত্রসমূহই তাহাদের পরস্পরের ভাষা বুঝিতে সক্ষমঃ কারাতা-আখওয়াখ, বাগুলাল-তিনদী ও গোদোবেরী-বোতলিখ। আনদী গোত্রসমূহের কোন ভাষা লেখ্যরূপ গ্রহণ করে নাই। আনদী গোত্র শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা হিসাবে আওয়ার ভাষা এবং কখনও কখনও রুশ ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। দুই ভাষার ব্যবহার (আওয়ার স্থানীয় ভাষা) তাহাদের মধ্যে সাধারণত প্রচলিত ছিল। ১৯১৮ সনের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বেও আনদী গোত্রের মধ্যে একটি প্রাগ-সামন্ততন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আওয়ার খানদের বোতলিখ ও আখওয়াখ জয় করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহারা কখনও একটি নিজস্ব রাষ্ট্র (Principalty) গঠন করে নাই কিংবা অন্য কোন বড় রাষ্ট্রের অধীন হয় নাই। তাহারা সরদারের নেতৃত্বে এক একটি গোত্র বা স্বাধীন সমাজ গঠন করিয়াছিল এবং এইসব সমাজ ও গোত্রের সমন্বয়ে কখনও একটি মৈত্রী সংঘও গঠিত হইত। প্রতিটি গোত্র Uzden (মুক্তচাষী)-এর একটি পরিষদ (জামা'আ) দ্বারা পরিচালিত হইত। অন্যান্য দাগিস্তানী জনগণের তুলনায় এই গোত্রের মহিলাগণ অধিকতর স্বাধীন ছিল। ১৯১৮ সনের আনদীর অর্থনীতি Cecnya-এর সহিত সংযুক্ত ছিল, আনদীদের উপর যাহাদের প্রাশসনিক কর্তৃত্ব ছিল। অনুরূপ মধ্য-ককেসিয়ার সঙ্গেও তাহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল (দ্র. CECEN)। বর্তমান, বিশেষ করিয়া ১৯৪৫ সনে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কর্তৃক Ceceno Ingushen-এর দমনের পর হইতে তাহারা আওয়ারের প্রতি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহাদের সহিত দিদো (দ্র.) ও Arci (দ্র.)-কে লইয়া একটি আওয়ার জাতি (Awar nation) গঠন করে। আনদী গোত্রসমূহের অর্থনীতি বর্তমানেও প্রাচীন পদ্ধতির। তাহাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পশু পালন। এই কারণে মওসুমের পরিবর্তনে তাহাদেরকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইত। তাহারা উচ্চ খাঁজকাটা ঢালু (terrace) ভূমিতে চাষাবাদ করিত এবং তাহাদের মধ্যে একদল দক্ষ কারিগরও ছিল। দাগিস্তানের পার্বত্য এলাকায় বোতলিখের আউল (Aul) একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Narody Daghestana, Ac. of Sc., Moscow 1955; (২) Z. A. Nikol'skaya, Istoriceskie Predposilki natsional'noy konslidatsii Awartsev, Sovetskaya Etnografiya 1953, 113-24; (৩) Bolshaya Sovetkaya Entsiklopediya, 2nd edition-II Andiisti and

Ando-Didoiskie Yaziki; (৪) B. Grande Spisok narodnostey S. S. S. R., Revolutsiya i Natsional' nosti 1936, 74-85; (৫) E. M. Shilling, Daghestanskaya Ekspeditsiya, 1946 goda, Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografii, Moscow 1948, iv, 31-40; (৬) A. A. Bokarev, Kratkie sevedeniya o yazikakh Daghestana, Makhac-Kala 1949; (৭) ঐ লেখক, Ocerk grammatiki camalinskogo yazika, Moscow 1949; (৮) A. Dirr, Kratkiy gramaticeskiy ocerk andiyskogo yazika Sbornik Mater yalov dlya oisaniya mestrostcy i Plemen kavkaza, xxxv. Tiflis 1904; (৯) ঐ লেখক, Matieryal dlya izuceniya yazikov i norecii andodidoskoy gruppi, Sbornik Materyalov dlya opisanya mestnostey i Plemen Kavkaza, Tiflis 1909. fasc. 40. আওয়ার, দাগিস্তান ও দিদো শীর্ষক নিবন্ধসমূহের গ্রন্থপঞ্জীও দ্রষ্টব্য ; (১০) দা. মা. ই. ৩খ., ৩৬৩-৬৪ ।

H. Carrere D' Encausse (E.I.²) / উম্মে সালমা বেগম

আন্না (দ্র. সিক্কা)

আল-'আননাবা (العنابة) ঃ আলজিয়ার্স শহরের পূর্বে আলজেরীয় উপকূলে অবস্থিত বর্তমান বোনে (Bone) শহর। এই শহর কখন হইতে আল-আননাবা অথবা লিও আফ্রিকানাস (Leo Africanus)-এর মতে বিলাদুল-উননাব; (কুল ফলের শহর) এই নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা জানা যায় না। এই নামে উক্ত শহরে উৎপাদিত কুল ফলের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। আদি আরব ভৌগোলিকগণ ইহাকে ইহার প্রাচীন নাম হিপপোনা হইতে নিষ্পন্ন 'বুনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ইহার দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষ্য। শহরটি পর্যায়ক্রমে ফিনিশীয় বসতি, পুনিক শহর, নুসিদিয়ান রাজাদের অধীন রাজ্য ও হিপপো রিজিয়াস নামে একটি রোমীয় শহরে পরিণত হইয়াছিল। ইহা খৃষ্টীয় আমলে যখন সেন্ট অগাস্টিন সেখানে বিশপ ছিলেন (খৃ. ৩১৫-৪৩০) তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। শহরটি ভ্যাণ্ডালগণ কর্তৃক অধিকৃত হয় (খৃ. ৪৩০) এবং পরবর্তী কালে বায়যান্টাইনগণ কর্তৃক পুনর্বিজিত হয়। অবশেষে ৭ম শতকের শেষ অথবা ৮ম শতকের প্রথমদিকে ইহা মুসলিম অধিকারে আসে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৌর কেন্দ্রটি বিভিন্ন স্থান দখল করিয়া আছে। ভূগোলবিদ আল-বাকরী এই সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তথ্য দিয়াছেন। তিনি তিনটি অবস্থানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন ঃ একটি উচ্চ স্থানে অবস্থিত এই শহরটি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ অগাসটিনের কারণে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। খুব সম্ভব সেই স্থানেই ব্যাসিলিকাটি আজও বিরাজমান। ইহার পাদদেশে সম্প্রসারিত রহিয়াছে 'সিবাস শহর' যাহাকে যীরী রাজকুমারের নাম অনুসারে মাদীনাতুয-যাবী-ও বলা হয়। কারণ তিনি ইহা তাহার ভাগ হিসাবে পাইয়াছিলেন। পুরাতন শহরের এই অবস্থানটি যাহা খনন কার্যের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হওয়ার পথে আছে এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধিশালী প্রথম মুসলিম শহরের এই অবস্থানটি সামুদ্রিক বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুরূপে উন্মুক্ত হওয়ায় অবশ্যই পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং সিবোজ (Seybouse)-এর পলির নীচে ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে মাদীনাতুয-যাবী হইতে তিন মাইল দূরে নূতন বোনে বুনা আল-হাদীছা আরও অধিক নিরাপদ স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ৪৫০/১০৫৮ সনের পরে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। ইহাই বর্তমান মুসলিম বসতি যাহা উচ্চে অবস্থিত। যেখান হইতে বন্দর ও ইউরোপীয় শহরটি দৃষ্টিগোচর হইত। ৪২৫/১০৩৩ সন হইতে এখানে একটি বিরাটকায় মসজিদ বিরাজমান আছে, যাহার কতিপয় বৈশিষ্ট্য আল-কায়রাওয়ান ও তিউনিসের প্রধান মসজিদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং পরবর্তী কালে ইহা সাধক সীদী আবূ মারওয়ানের (মৃ. ৫০৫/১১১১) নামে পরিচয় লাভ করে।

আল-বিজায়ার মত 'বোনে' জল-দস্যুবৃত্তির ঘাঁটি ছিল এবং এই কারণেই পিসা ও জেনোয়াবাসীদের দ্বারা উহা আক্রান্ত হইয়াছিল (খৃ. ১০৩৪)। সিসিলির দ্বিতীয় রজার ইহা ১১৫৩ খৃ. অধিকার করত তথায় একজন হাম্মাদী রাজকুমারকে অধিষ্ঠিত করেন। ১১৬০ খৃ. আল-মুওয়াহহিদগণ ইহা দখল করে। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা হাফসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু প্রায়শ তিউনিস-এর অজ্ঞাতে আল-বিজায়া অথবা কনস্টান্টাইন হইতে এই স্থানের গর্ভনর নিয়োগ করা হইত। ১৫৩৩ খৃ. ইহা আলজিয়ার্সের শাসনকর্তা খায়রুদ-দীনের নিকট আবেদন জানাইলে উহা একটি তুর্কী গ্যারিসন কর্তৃক অধিকৃত হয়। গ্যারিসনটি ১৮৩০ সন পর্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাওকাল, de Slane-এর ফরাসী অনুবাদ, JA, 1842, I, 182; (২) আল-বাক্রী, Description de l' Afrique septentrionale, text (1911) 54, de Slane-এর ফরাসী অনুবাদ (1913), 116-17; (৩) আল্-ইদ্রীসী, Description de 1' Espagne, সম্পা. ও ফরাসী অনু. Dozy and de Goeje, text, 116-17; trans. 136; (৪) Leo Africanus, ed. Ramusio (Venice 1837) 117. Temporal-এর ফরাসী অনু., সম্পা. Schefer. III, 107; (৫) Feraud, Documents pour servir a 1 ;histoire de Bone, R. Afr, 1873; (৬) G. Marcais, La mosquee de Sidi bou Merouan, in Melanges william Marcais 225-236.

G. Marcais (E.I.²) / আবদুর রহমান মামুন

আন্নাবিদ্স (দ্র. বানূ আন্নায)

আন্নিয়্যা (انية) ঃ আন (أن) বা আন্না (أن) সংযোগমূলক অব্যয় (যে) হইতে গঠিত একটি গুণবাচক বিশেষ্য; ইহার তাৎপর্য হইল

'প্রতিটি বস্তুই ইহার নিজস্ব সত্তা' (thatness)। আন্না (أن) অব্যয়টি কখনও কখনও বস্তুবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং আল-আন্না (الأن)-এর অর্থ আল-আন্নিয়্যা (الأنية)-র অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম দার্শনিকগণ যে অর্থে আন্নিয়্যা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অর্থ হইতেছে অস্তিত্বশীলতা (existentia) অর্থাৎ ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ইহার মূলের (essentia) বিপরীতে বাস্তবে ব্যক্তির অস্তিত্ব, ইহার 'স্বরূপ' মাহিয়্যা (ماهية), ল্যাটিন অনুবাদে quidditas। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আল-গাযালী যখন মাকাসিদুল-ফালাসিফাতে আল্লাহর অস্তিত্ব (وجود) ও সত্তা (ذات) একীভূত মুসলিম দার্শনিকদের এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি আন্নিয়্যা মাহিয়্যা শব্দগুলি ব্যবহার করেন। আল-আন্নিয়্যা শব্দটি অস্তিত্বহীন সত্তার জন্যও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ এরিস্টোটলের Metaphysics ix 10. 1051 b 23-এ সত্য ও মিথ্যার অস্তিত্বহীন সত্তাকে আন্নিয়্যা দ্বারা বুঝান হইয়াছে এবং ইব্ন রুশদ এই অনুচ্ছেদের উপর তাঁহার মন্তব্যে শব্দটিকে মাহিয়্যা (ماهية) শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, আন্নিয়্যা, উজূদ ও হুবিয়্যা শব্দগুলি পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কোন কোন ইরানী সূফী 'আন্নিয়্যা' শব্দটি আনা (أنا-আমি) শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করেন এবং এই ধারণা কিছু সংখ্যক আধুনিক ইউরোপীয় সুধী ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। অন্য কোন কারণে না হইলেও ব্যাকরণগত কারণে এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে আনা সর্বনাম হইতে উদ্ভূত শব্দ হইল ঃ 'আনা নিয়া' (انانيون/انانية) ও 'আনাঈ' (انائيون-انائى) এবং পরবর্তী আরব দার্শনিকগণ ইহার ব্যবহার করিয়াছেন; উদাহরণস্বরূপ শীরাযী (সপ্তদশ শতাব্দী)।

আমাদের নিকট আরবী দার্শনিক শব্দগুলির কোন সন্তোষজনক অভিধান নাই। Bouyges কর্তৃক সম্পাদিত ইবন রুশদের ব্যাখ্যাসহ এরিস্টোটলের Metephysics-এর টীকা সম্বলিত সূচীতে যে উদাহরণসমূহ রহিয়াছে সেইগুলির অধ্যয়ন লাভজনক। আন্নিয়্যা শব্দটি ইব্ন সীনা কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও আল-গাযালীর 'তাহাফুত' অথবা ইব্ন রুশদের 'তাহাফুতুত-তাহাফুত' গ্রন্থদ্বয়ে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায় না (দ্র. দা. মা. ই., ৩ খ., ৪৭৫)।

S. Van Den Bergh (E.I.²) / পারসা বেগম

আনফা (انفا) ঃ ক্যাসাব্লাংকার প্রাচীন নাম (আরবী নাম আদ-দারুল-বায়দা, আঞ্চলিক ভাষায় দারুল বেদা)। পর্তুগীজ ইতিবৃত্তে ইহা আনাফে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। E. Laoust (REI, 1939)-এর মতে শব্দটি বার্বার ভাষার আফা শব্দের পরিবর্তিত রূপ যাহার অর্থ শৃঙ্গ, ছোট পাহাড়। ইহাতে অনুমিত হয়, বর্তমানে যেখানে পাহাড়ের উপর আবাসিক এলাকা সেখানেই আন্ফার পূর্ব অবস্থানস্থল ছিল এবং সেইটি উচ্চ আন্ফা নামে অভিহিত। Marmol-এর মতে কার্থেজবাসীরা শহরটির পত্তন করেন, আর Leo-এর মতে রোমকরা। কিন্তু ইহাদের সমর্থনে লিখিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আয-যায়্যানী বলেন, যানাতা আমীরগণই ১ম/৭ম শতাব্দীর শেষদিকে শহরটির গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু তিনি ইহার কোন সূত্র উল্লেখ করেন নাই। আল-ইদরীসী উল্লেখ করেন, বন্দরটি প্রচুর খাদ্যশস্য রফতানীর কেন্দ্র ছিল। বারাগ্ওয়াতা (তু. বার্বার কাবীলাগুলির চুক্তি) ঘটনার ব্যাপারে শহরটির ভূমিকা কি ছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মারিনী শাসনামলে বন্দরটি সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এখানে একজন গর্ভনর ও একজন কাদী ছিলেন। আবুল হাসান তথায় একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। অতঃপর বংশটির পতন হইলে শহরটিতে অরাজকতা দেখা দেয় এবং উহা কার্যত স্বাধীন হইয়া জলস্যুদদের সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। পর্তুগীজ রাজশক্তি জলদস্যুদের কার্যকলাপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করিলে ১৪৬৮ কিংবা ১৪৬৯ খৃ. সম্রাট পঞ্চম আলফনসোর রাজত্বকালে ২য় যুবরাজ ডি. ফারনান্দো আন্ফা অধিকার করেন। শহরটির বাশিন্দাগণ দেশত্যাগ করে। পর্তুগীজরা শহরটি ধ্বংস করিয়া দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করত প্রস্থান করে। বিভিন্ন লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করিয়া শহরটি পুনরাধিকার করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উহা নিজেদের দখলে রাখে। ইহা একটি রূপকথা মাত্র। সম্ভবত পর্তুগীজরা ১৫১৫ খৃ. যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাহাই এই কাহিনীর মূল সূত্র। সেই পরিকল্পনায় পর্তুগীজরা আল-মামুরা দুর্গের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে আন্ফায় আর একটি দুর্গ নির্মাণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিল। কিন্তু আল-মামুরায় তাহাদের ব্যর্থতার দরুন আন্ফা সম্পর্কিত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুলতান সীদী মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আন্ফা পরিত্যক্ত ও ধ্বংসস্তূপরূপে থাকে। সুলতান কর্তৃক পুনর্নির্মিত হইলে শহরটির আদ-দারুল-বায়দা' (দ্র.) নামকরণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদরিসী, Descr. de l' Afr. et de l'-Esp., Dozy. ও de Goeje. সম্পা. ও ফরাসী অনু. ১৮৬৬ খৃ., ৮৪; (২) Marnol, L' Afrique, Perrot d' Ablancourt. ফরাসী অনু., ১৬৬৭ খৃ., ১৪০; (৩) Leo Africanus, Descr. de l' Afrique. সম্পা. Scheffer. ১৮৯৭ খৃ., ৯-১৩; (৪) Une description Geographique du' Maroc d' Az-Zyany, Coufourier, কর্তৃক ফরাসী অনু., AM, ১৯০৬ খৃ., ৪৫২; (৫) E. Levi-Provencal, Ua nouveau texte d' histoire merinide, le Musnad d' Ibn Marzuk, Hesp. ১৯২৫, ৬৯; (৬) David Lopes, Histoire de Portugal, সম্পা. Damiao Peres, ১৯৩২, ৫৩৬-৩৭; (৭) Robert Ricard, Sovrces inedites de l' Histoire du Maroc, ১ম সিরিজ, Dynastie sa'dienne, পর্তুগাল ১৯৩৩ খৃ., ১৫-১৬।

A. Adam (E.I.²) / মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আল-আন্ফাল (الأنفال) ঃ কুরআন মাজীদের অষ্টম সূরার নাম। এই সূরা বদর যুদ্ধের পর ২য় হিজরীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল (ইতক ান; তাফসীরুল-মানার)। ইহাতে ১০টি রুকূ' ও বিসমিল্লাহ বাদে ৭৫টি আয়াত আছে। আন্ফালের অর্থ শত্রুদের ঐ সম্পদ (গনীমত) যাহা নিয়মিত যুদ্ধে

হস্তগত হয় এবং ফিদয়ার অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন অভিধান বিশেষজ্ঞের মতে নাফল ও গনীমত একই বস্তুর দুইটি নাম। পার্থক্য শুধু এই, যুদ্ধে বিজয়ের পর শত্রুকে পর্যুদস্ত করার ফলে যাহা পাওয়া যায় উহাকে গনীমত বলে এবং যাহা শুধু আল্লাহর নিছক দয়ায় প্রাপ্ত এবং যাহা প্রয়াসলব্ধ নহে তাহাকে নাফল বলে (মুফরাদাত, আনফাল)। কাহারও কাহারও মতে উভয়ের মধ্যে 'উমূম খুসূ'স' (সাধারণ ও বিশেষ)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ গনীমত শব্দটির ক্ষেত্র ব্যাপকতর এবং নাফল শব্দটির ক্ষেত্র কম ব্যাপক। গনীমত ঐ সকল সম্পদকে বলা হয় যাহা শত্রুদের নিকট হইতে হস্তগত হয়, উহা অর্জনে কোন প্রকারের কষ্ট হউক বা না হউক—যুদ্ধ জয়ের পূর্বে বা পরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে হস্তগত হইলেও। পক্ষান্তরে নাফল দ্বারা এক বিশেষ প্রাপ্তি বুঝায় যাহা গনীমত বণ্টনের পূর্বে পাওয়া যায়। আবার কাহারও কাহারও মতে নাফল ঐ সম্পদকে বলা হয় যাহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে হস্তগত হয়। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সম্পদ গনীমতের মাল বণ্টনের পরে বণ্টন করা হয়, উহাকে নাফল বলে (মুফরাদাত)। ফায় (فى) ও নাফল-এর মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরে শত্রুপক্ষ বিনা যুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করিলে সেই অবস্থায় লব্ধ সম্পদকে ফায় বলা হয়, কিন্তু নাফল-এর জন্য ইহা আবশ্যক নহে। আন্‌ফাল নাফ্‌লের বহুবচন যাহার অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর উহাকে নাফিলাও বলা হইয়া থাকে। এই অর্থেই অতিরিক্ত সালাতকে নাফল বলা হয়। আন-নাওফাল শব্দের অর্থ প্রচুর দান (দ্র. মুফরাদাত ও লিসানুল আরাব, শিরো. নাফল)।

এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় বদর-এর যুদ্ধ (রামদান হি. ২, ইবন হিশাম ২খ., ২৬৬ মুদ্রণ আবদুল-হামীদ) এবং উহার সহিত সম্পর্কিত ঘটনাবলী যাহাতে গনীমতের মাল মুসলিমদের হস্তগত হইয়াছিল এবং কিছু সংখ্যক শত্রুকে বন্দীও করা হইয়াছিল। এইজন্য সূরার প্রথম আয়াতে আনফালের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আনফাল আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)-এর জন্য নির্দিষ্ট (قل الانفال لله والرسول) অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ এই সম্পদ জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হইবে; যে মাল যাহার হস্তগত হইবে সে-ই উহার মালিক হইবে না। ইসলামী যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পদ আহরণ ও গনীমত লুণ্ঠন নহে। এইজন্যই কুরআন মাজীদে আনফালের উল্লেখের সাথে সাথে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও ঈমানের তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে (فاتقوا لله .... اولئك هم المؤمنون حقا -৮ ঃ ১,৪), বরং সামাজিক কল্যাণ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য ও সৎ কার্য সম্পাদনের তাকিদ দেওয়া হইয়াছে। আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্ত সালাত প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়, অহংকার পরিত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি ভয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে বলা যায়, সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর জন্য যুদ্ধ ছিল পবিত্র কর্তব্য এবং বড় বড় বিজয়ের পরেও তাঁহারা শত্রুদেরকে পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা কখনও অকারণে রক্তক্ষয় করিতেন না।

অতঃপর সূরার মূল বিষয়ে বদর যুদ্ধের ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুদের শক্তি ধ্বংস করা যাহাতে সত্যের আহ্বানকে নিস্তব্ধ করিবার এবং মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করিবার তাহাদের অপচেষ্টা পর্যুদস্ত হয় এবং ইসলামের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন থাকে।

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিত—প্রথমত রাসূলে আকরাম (স) স্বেচ্ছায় অথবা কোন লোকের কথায় যুদ্ধাভিযান করেন নাই, বরং আল্লাহর নির্দেশেই তাঁহাকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (كما اخرجك ربك من بيتك بالحق - ৮ ঃ ৫) আর তাঁহার এই অভিযান ন্যায়ভিত্তিক ছিল অর্থাৎ এই পদক্ষেপ ছিল তাঁহার অবশ্য কর্তব্য এবং উহা অবস্থা ও সময়ের প্রেক্ষিতে অপরিহার্যও হইয়া পড়িয়াছিল (দ্র. মুফরাদাত حق-এর অর্থ)। এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি নাযুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কতিপয় সাহাবী আবূ সুফ্‌য়ানের কাফেলার পরিবর্তে মক্কাবাসীদের অভিযানের সম্মুখীন প্রত্যক্ষ মৃত্যুর নামান্তর বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। অপর সাহাবীগণ সানন্দে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালনের জন্য মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সংকল্প করিলেন। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বদ্‌র-এর যুদ্ধকে জিহাদ বলিয়া আখ্যায়িত করা এবং উহাতে অংশগ্রহণকারীদেরকে মুজাহিদীন বলা হইয়াছে (৪ঃ ৯৫)। বাস্তব অবস্থা এই ছিল যে, মুহাজিরগণ ছিলেন সহায়সম্বলহীন, আনসার তখনও অনভিজ্ঞ, ইয়াহূদীগণ বিরোধী, মুনাফিকদিগের প্রবঞ্চনা ছিল ক্রমবর্দ্ধমান এবং আশেপাশের আরব গোত্রসমূহ মক্কার কুরায়শদের ভয়ে ভীত এবং ধর্মের দিক দিয়া তাহাদের বন্ধু। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইবার পর আল্লাহর নির্দেশ আসিলঃ قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم (২২ ঃ ৩৯) এবং أذن للذين يقا تلون بانهم ظلموا (২ ঃ ১৯০)। ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে, মুসলিমগণ অত্যাচারিত ছিলেন এবং আগ্রাসনকারীদের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য যুদ্ধের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ মদীনা হইতে যাত্রা করিবার পূর্বেই কাফিরদের এক বিরাট বাহিনী আবূ জাহ্‌লের নেতৃত্বে মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছিল। আর ইহার সংবাদ মহানবী (স)-এর নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছিল (আহমাদ ইবন হাম্বাল, মুসনাদ, ১খ., ১১৭)। ঠিক ঐ সময় আবূ সুফ্‌য়ানের নেতৃত্বে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া হইতে মক্কায় ফিরিতেছিল, এই সংবাদও মুসলিমগণ পাইয়াছিলেন (মুসলিম, বাব বদর-এর যুদ্ধ)। উল্লিখিত তথ্যাদি হইতে প্রমাণিত হয়, মহানবী (স) মূলত আবূ জাহ্‌লের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধের জন্যই বাহির হইয়াছিলেন, আবূ সুফ্‌য়ানের কাফেলা লুণ্ঠনের জন্য নহে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত ঘটনাবলীর আলোকে ইহাই স্পষ্ট হয়। অতএব রাসূলে আকরাম (স) যখন সাহাবীদের সম্মুখে সমস্ত বিষয়টি বর্ণনা করিলেন তখন মুজাহিরগণের মধ্যে মিক্‌দাদ ইব্‌ন আম্‌র বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যেই দিকে অগ্রসর হইতে নির্দেশ করিতেছেন সেইদিকেই চলুন, আমরা আপনার সংগে আছি। আমরা বনী ইস্‌রাঈল-এর মত কখনো বলিব না, "সুতরাং তুমি (মূসা) ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং (আমালিকার সহিত) যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া রহিলাম" (৫ ঃ ২৪)। আমরা আপনার সহিত মরণপণ যুদ্ধ করিব এবং কোন অবস্থায় আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি অবিকৃত থাকে (আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী;

ইবনুল-আছীর, তরীখ, ২খ., ৫৬ প.)। অতঃপর আনসার-এর মধ্যে আওস গোত্রপতি হযরত সাদ ইব্‌ন মুআয (রা) বলিলেন, হে রাসূল! আপনি যাহা সংকল্প করিয়াছেন তাহা করুন। যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, যদি আপনি কোন সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইয়া তাহাতে নামিয়া পড়েন আমরাও সেইখানে ঝাঁপাইয়া পড়িব এবং এই কাজে আমাদের কেহই পশ্চাৎপদ হইবে না.... (মুসলিম, কিতাবুল মাগাযী; ইব্‌ন হিশাম, ২খ., ২৫৪, মুদ্রণ আবদুল্লাহ হামীদ)। উপরে উল্লিখিত বাক্যাবলী দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, রাসূলে আকরাম (স) ও সাহাবা (রা) আবূ সুফ্‌য়ানের কাফেলা লুট করিবার জন্য নহে, বরং মদীনার দিকে ধাবমান আবূ জাহলের সুসজ্জিত সৈন্যদের মুকাবিলা করার উদ্দেশেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য ছিল আমর ইব্‌ন হাদরামীর হত্যার প্রতিশোধ লওয়া (ইবনুল-আছীর, তারীখ, ২খ., ৫৪, মিসর ১৩০১ হি.) এবং এই অজুহাতে মুসলমানদেরকে চিরতরে বিলীন করা। সুতরাং যখন আবূ জাহলকে বলা হইল, আবূ সুফ্‌য়ানের কাফেলা নিরাপদে মক্কার দিকে চলিয়া গিয়াছে তখনও সে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে (প্রাগুক্ত)। বদর মদীনার নিকটবর্তী এবং মক্কা হইতে দূরে অবস্থিত, অথচ মক্কার কাফির সম্প্রদায়ই অগ্রে বদর প্রান্তরে উপনীত হইয়াছিল (ইবন হিশাম)। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, মুসলিমগণই প্রথমে বদর প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিলেন। তাহা হইলেও ইহা প্রমাণিত, মক্কা হইতে কুরায়শদের যাত্রার সংবাদ অবগত হওয়ার পরই মহানবী (স) মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

(إذ تستغيثون ربكم ... ৮ ঃ ৯)-এ বর্ণিত হইয়াছে, মুসলিমগণ কখনও নিজ শক্তিতে গর্বিত হয় না, বরং আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থী হইলে ফেরেশতাগণ তাঁহাদেরকে সাহায্য করেন যেন শত্রু হীনবল হয় এবং মুসলিমগণ প্রশান্তি লাভ করিতে পারে (বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আরও দেখুন বদর, আল-আততার, বুলূগুল আরাব, মুদ্রণ আবিয়্যা (লেবানন) ১৩১৯ হি., পৃ. ৪৩পৃ.)।

বদর যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়গুলি বর্ণনার পর ২য় রুকূ'তে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণিত এবং প্রকৃত যুদ্ধের একটি চিত্র অংকিত হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, মুসলিমগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, মানুষের কর্ম ও চিন্তায় আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর। এইজন্যই নিজেদের মনোভাবের প্রতি মুসলিমদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিৎ। অতঃপর যুদ্ধের পরিণামের উপর আলোকপাত করিয়া বলা হইয়াছে, যদিও এই যুদ্ধের ফলাফলে কাফির সম্প্রদায়ের মূল শক্তি বিনষ্ট হইবে, তবুও তাহারা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকিবে এবং বর্তমানের তুলনায় অধিক সৈন্য-সামন্ত লইয়া আক্রমণ করিবে। কিন্তু তাহাদের এই সংখ্যাধিক্য ও যুদ্ধ প্রস্তুতি কোন কাজে আসিবে না, আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের জন্যই। অপরদিকে কাফিরদের হঠকারিতার মনোভাব তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিবে। প্রকৃত জীবন ও বিজয়ের রহস্য রাসূল (স)-এর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সূরার চতুর্থ রুকূ'তে ও পরবর্তী অংশে কাফিরদের ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতা ও পরিণামে তাহাদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, বদর যুদ্ধের পরে তাহারা আরও কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং সৈন্যদের সমরাস্ত্রে সজ্জিত করিতে তাহাদের অনেক অর্থ ব্যয় হইবে, কিন্তু পরিণামে তাহারা পরাজিত হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, মুসলিমগণই পবিত্র কা'বার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। বদর যুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায় একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা পূরণার্থেই যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়াছিলেন, যদিও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার শক্তি ও সাহস তাহাদের ছিল না। বদর যুদ্ধকে ফুরকান বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অদম্য মনোভাব রক্ষার ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কাফিরদের অঙ্গীকার ভংগেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। অষ্টম রুকূ'তে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শান্তিকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সংগে সংগে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, শত্রুদের সংখ্যাধিক্যে ভয়ের কোন কারণ নাই। নবম রুকূ'তে দাসত্ব সমস্যা সমাধানের উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাক্ষাৎ যুদ্ধে জয়ী হওয়া ব্যতীত কাহাকেও বন্দী করা যায় না, ইহা এই সূরার নির্দেশ। ইহাতে অসহযোগের নীতিও বর্ণিত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে, সারা বিশ্বের মুসলিমদের পক্ষে পরস্পর সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা (আল-বারাআত) পরস্পরের পরিপূরক।

দা.মা.ই./ মু. আনসার উদ্দীন

আন্‌বাদুক্‌লীস (انبادقليس) ঃ Anbaduklis শব্দটি Empedocles-এর নামের আরবী রূপ (প্রায়শ আবীদুক্‌লীস ইত্যাদি অপভ্রংশরূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে কতক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য Aristotle-এর গ্রন্থাবলী Ps-Plutarch ইত্যাদির ঐশী বন্দনা লিপি (doxography) ও ইত্যাকার সূত্রে মুসলিমদের নিকট পৌঁছে (উদাহরণস্বরূপ ১খ., ৩, তু. সম্পা. বাদাবী আরও উদ্ধৃত আবূ সুলায়মান আল-মানতিকী সিওয়ানু'ল হি'কমা-র ভূমিকায় ; আল মাক্‌দিসী, আল বাদ, ১খ., ১৩৯, ২খ., ৭৫)। ইসলামী দর্শনে প্রকৃত Empedocles কোন ভূমিকা পালন করেন না ; অপরপক্ষে পরবর্তী নব্য-প্ল্যাটোনিক চক্র তাঁহার ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করিয়াছিল এবং যে সমস্ত রচনায় নব্য প্ল্যাটোনিক কল্পনাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা তাঁহার মুখে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেইগুলিকে আরবীতে অনুবাদ করা হয়। এই সাহিত্যের মূল প্রতিনিধি হইতেছে The Book of the Five Substances; ইহার আরবী অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার অংশবিশেষ আরবী হইতে হিব্রুতে অনূদিত উদ্ধৃতির আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে (দ্র. D. Kaufmann, Studien uber Salomon b. Gabirol Budapest 1899, I পৃ.)। অনুমিত হয়, মাজরীতীকৃত গায়াতুল হাকীম, পৃ. ২৮৫, ২৮৯ ও ২৯৩-৪-এর উদ্ধৃতিসমূহ কোন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত উৎস হইতে গৃহীত হইয়াছে (২৮৯ সম্পা., Kaufmann, ১৩)। নানা প্রকার নব্য-প্ল্যাটোনিক ধ্যান-ধারণা Ammonius-এ Empedocles-এর প্রতি আরোপিত হইয়াছে, আরাউল ফালাসিফা (আয়াসোফিয়া পাণ্ডুলিপি ২৪৫০ দ্র. পত্রিকাসমূহ 109 v পৃ. 130 r) যাহাতে নব্য-প্ল্যাটোনিক মতবাদগুলিকে কিছু সংখ্যক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থটি, যাহার উদ্ধৃতি পাওয়া যায় আল-বীরূনীর India-তে, ৪১-৪২ অনূদিত ৮৫

(Empedocles হইতে গৃহীত অনুচ্ছেদ আয়াসোফিয়া পাণ্ডুলিপি পত্রক ১৩০ r); প্রাচীন দার্শনিকদের সম্পর্কে শাহরাস্তানী যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার প্রধান সূত্র এবং Empedocles সম্পর্কীয় বিবরণেও প্রধান উৎস (আল মিলাল, পৃ. ২৩০)। যাহা হউক, অধিকন্তু অন্য কোন সূত্র হইতে শাহরাস্তানী Empedocles-এর আর একখানা গ্রন্থের (text) অনুলিপি প্রদান করিয়াছেন (২৬২, I. ১-২৬৩ I, ১৮)। আশ-শাহরাযুরী তাঁহার রচিত রাওদাতুল-আফরাহ (যদিও এই রচনায় তিনি প্রধানত শাহরাস্তানী ও ইবনুল কিফতীকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন)-তে কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ যোগ করিয়াছেন (Asin Palacios- এর উদ্ধৃতি)। সাঈদ আল-আনদালুসীর মতে ইব্ন মাসাররা Empedocles-এর গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত ছিলেন Ps- Empedoclean মতবাদের নিকট ইব্ন মাসরারা-র ঋণ সম্পর্কে যাহা কথিত হয়, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্র. ইব্ন মাসাররা।

জীবনীমূলক সাহিত্যে Empedocles মহান পাঁচজন দার্শনিকের মধ্যে প্রথম দার্শনিক হিসাবে চিহ্নিত। এই পাঁচজন দার্শনিক হইতেছেন ইমডোক্লিস, পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটল। তাঁহাকে দাউদ (Dabid) [আ]-এর সমসাময়িক এবং তাঁহার দার্শনিক মতবাদ লুক্‌মান-এর দর্শন হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করা হয়; দ্র. আল-আমিরী আল-আব্াদ আলাল-আমাদ—যাহা সিওয়ানুল-হিকমার ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে ; সাঈদ আল-আনদালুসী, তাবাকাতুল-উমাম, ২১ (ইনি আল-আমিরীকে অথবা কোন সাধারণ উৎসের অনুসরণ করিয়াছেন) ; ইবনুল-কিফতী, ১৫-৬ ও ইব্নু আবী উসায়বিআ, ১খ., ৩৬-৭ (উভয়েই সাঈদ-কে অনুসরণ করিয়াছেন) ; আশ-শাহরাস্তানী, তিনি সিওয়ান-এর সাহায্য গ্রহণকারী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Steinschneider, Die arabischen ubersetzungen aus dem Griechisechen Philosophie, 4; (২) ঐ লেখক, Die hebraischen ubersetzungen. নির্ঘণ্ট; (৩) P. Kraus, Jabir ibn Hayyan, ii, নির্ঘণ্ট; (৪) M. Asin Palacios, Ibn Masarra y su escuela chs iv-v (-Obras escogidas, i, 53 প.); (৫) Ps-Empedoclean রচনা সম্পর্কে S. M. Stern একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

S. M. Stern (E. I.[2]) / পারসা বেগম

'আনবার (عنبر) ঃ ইংরেজীতে ইহাকে Ambergris বলা হয়। ইহা কস্তুরীর ন্যায় মিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত একটি দ্রব্য ; ইহা সহজে দ্রবণীয় এবং উজ্জ্বল শিখা সহকারে জ্বলে; প্রাচ্যে ইহা অতি মূল্যবান সুগন্ধি ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের সমুদ্রে বা সমুদ্রতীরে বড় বড় খণ্ডে ইহাকে ভাসিতে দেখা যায় (আপেক্ষিক ঘনত্ব ০.৭৮-০.৯৩); আমবারগ্রিস সম্ভবত স্পার্ম তিমির পিত্তথলি হইতে একটি অস্বাস্থ্যকর নিঃসরণ যাহা উহার অন্ত্রে পাওয়া যায়। কাযবীনীর মতে ইহা পারদ, গন্ধক, অ্যাসফাল্ট, খনিজ আলকাতরা ও নাপথার সমগোত্রীয় তৈল-খনিজ দ্রব্য। ইহার মূল উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন ও বিচিত্র মতবাদের সহিত তিনি আরও বলেন, ইহা একটি প্রাণীর দেহ হইতে নিঃসৃত হয় এবং লোনা পানির মাছের শরীরে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে সমুদ্র হইতে যে ইহার উৎপত্তি সে সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই, বিশেষ করিয়া যানজ সমুদ্র (আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর ভারত মহাসাগরের অংশ) ইহাকে কোন কোন সময় তীরভূমিতে বড় পিণ্ডের আকারে ভাসাইয়া লইয়া আসে। ইহার আয়তন প্রায় (মানুষের মাথার মত, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পিণ্ডের ওজন ১০০০ মিছ্‌কাল =৪-৫ কিলোগ্রাম)। তিনি আরও বলেন, ইহা মস্তিষ্ক অনুভূতি শক্তি ও হৃৎপিণ্ডকে অদ্ভুতভাবে শক্তিশালী করে ; ইহা মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ইহার সূক্ষ্ম উষ্ণ প্রভাবের জন্য ইহা বৃদ্ধ লোকের জন্য খুবই উপকারী। ইব্নুল-বায়তার ঔষধ হিসাবে আম্‌বারগ্রিসের প্রভাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। আন্-নুওয়ায়রীর বিশ্বকোষে ইহার উৎস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বিবরণ, ইহার বিভিন্ন বাণিজ্যিক বৈচিত্র্য ও ব্যবহার-বিধি পাওয়া যায়। আন্-নুওয়ায়রী, আহ্‌মাদ ইব্ন আবী ইয়াকূব (অর্থাৎ (আল-ইয়াকূবী) ও আল-হুসায়ন ইবন্ ইয়ায়াদ আস্-সীরাফী (আবূ যায়দ আল-হাসান আস-সীরাফী, আখ্‌বারুস্‌সীন ওয়াল-হিন্দ-এর পরিপূরক লেখক)-এর অনুসরণ করিয়াছেন। এই দুইটি সূত্রই তাঁহার গোচরে আসে চিকিৎসক মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্‌মাদ আত-তামীমী রচিত জায়বু (বা তি 'ব্বু)ল-'আরূস ওয়া রায়হ'ানুন্-নুফূস-এর মাধ্যমে (GAL, I, ২৩৭)। বিভিন্ন ধরনের আম্‌বারগ্রিসের মধ্যে দুই প্রকার আম্‌বারগ্রিস সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক উল্লেখ রহিয়াছে, 'মৎস্য আম্‌বারগ্রিস' ও 'চঞ্চু আম্‌বারগ্রিস'; প্রথমোক্তটিকে 'গ্রাস করা আম্‌বারগ্রিস' (আল-মাব্‌লু) বলা হয়। কথিত আছে, ইহা বাল বা আন্‌বার নামক বিরাটকায় মৎস্যের উদর হইতে পাওয়া যায়। এই মৎস্যটি সমুদ্রে ভাসমান আম্‌বারগ্রিস গ্রাস করে এবং পরিণামে মরিয়া যায়। মৎস্য দেহটি তীরভূমিতে ভাসিয়া আসে এবং ফাটিয়া গিয়া ভিতরের আম্‌বারগ্রিস বাহির হইয়া আসে। চঞ্চু আম্‌বারগ্রিসে (আল-মানাকিরী) একটি পাখীর নখর ও চঞ্চু থাকে; এই পাখী পিণ্ডাকার আম্‌বারগ্রিস-এর উপর অবতরণ করিয়া আর উড়িয়া যাইতে পারে না; ফলে সেইখানেই মরিয়া যায়। এই উপকথাটি স্পষ্টত এই বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে উদ্ভূত যে, আম্‌বারগ্রিস-এর মধ্যে প্রায়শই সামুদ্রিক মৎস্যের কঠিন চঞ্চু পাওয়া যায়। এই সামুদ্রিক মাছ তিমি মাছের খাদ্য (Dr. Swediaur কর্তৃক উল্লিখিত)। আদ্-দিমাশ্‌কী বাণিজ্যিক মূল্যের ভিত্তিতে আম্‌বারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূবী, বুলদান, ৭খ., ৩৬৬ প.; (২) মাস্'ঊদী, মুরূজ, ১খ., ৩৩৩ প.; (৩) আল্-মুক'াদ্দাসী, ১০১ (অনু. E. Wiedemann, SB. Phys. Med. soz. Erlangen, ৪৪খ., ২৫৩ প.); (৪) ইদ্‌রীসী, অনু. Jaubert, ১খ., ৬৪; (৫) ইবনুল বায়তার, ১২৯১, III, ১৩৪ প. (Leclere অনু. Nortices et Extraits, ২৫, ৪৬৯প.); (৬) কাযবীনী (Wustenf.), ১খ., ২৪৫; (৭) দামীরী, হ'ায়াতুল হ'ায়াওয়ান, বূলাক ১২৮৪, ২খ., ১৮৬; (৮) দিমাশ্‌কী, আল-ইশারা ইলা মাহাসিনিত্-তিজারা ১৩১৮, ১৯ (অনু. E. Wiedemann, ঐ, খণ্ড ৪৫, ৩৮ প.); (৯) নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল্-আরাব, ১২খ., ১৯৩৭, ১৬-২২ (অনু. E. Wedemann, ঐ, ৪৮খ., ১৬প.); (১০) G. Ferrand, Voyage du marchand arabe Sulayman ইত্যাদি, ১৯২২, ১৩২-৩; (১১) 'বাল' সম্বন্ধে তু. কায্‌বীনী, ১খ., ১৩১; (১২) দামীরী, ১খ., ১৪১।

J. Ruska-M. Plessner (E.I.[2]) /পারসা বেগম

আল-আন্‌বার (الانبار) ঃ ফুরাত নদীর বাম তীরে অবস্থিত শহর; 8৩° 8৩ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৩৩° ২২.৫ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। আরব ভূগোলবিদগণ বাগদাদ হইতে আল-আন্‌বারের দূরত্ব মেইল পথে (Mail route) ১২ ফার্‌সাখ (ইয়াকূত ঃ ১০ ফারসাখ) বলিয়া উল্লেখ করেন (তু. Streck, Babylonien, ১খ., ৮); মুসিলের পরিমাপকৃত (পৃ. ২8৮), দূরত্বে ইহা ৬২ কিলোমিটার=৩৮ মাইল।

আল্-আন্‌বার সাওয়াদ (ইরাকের গ্রামাঞ্চল)-এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মরুভূমির নিকট আবাদযোগ্য সমভূমিতে অবস্থিত। ইহা ফুরাত হইতে দিজ্‌লা (নাহ্‌র 'ঈসা) পর্যন্ত প্রথম নাবা খালের নিকট অবস্থিত। ইহা ফুরাতের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পারাপার স্থান নিয়ন্ত্রণ করে (তু. মুসিল, ২৬৭-৯, ৩০৭; Le Strange, JRAS, ১৮৯৫, পৃ. ৬৬)। শহরটি প্রাক-সাসানী যুগের। মারিখ (Maricq) ইহাকে MSYK বা মাস্‌কিন (Maskin) বলিয়া চিহ্নিত করেন, কিন্তু আরব লেখকগণ (আল-বালাযু'রী, ২8৯-৫০; ইব্‌ন খুররাদাযবিহ ,৭; কুদামা, ২৩৫) দুইটির মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। আল-আন্‌বার ব্যাবিলনীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিনা (Hilqrecht, Exploration in Bible lands, Philadelphia ১৯০৩, ২৯৮) তাহা নিশ্চিতকরণের জন্য খননকার্য প্রয়োজন, যদিও পুরাতন একটি খালের মুখ ও প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ (Tell Aswad, অনু. ৩০০০ খৃ. পূ.) সমভূমির দক্ষিণ দিকে দেখা যায়।

পশ্চিম ফটক (রোমান সাম্রাজ্যের দিক) হইতে রাজধানী পর্যন্ত ও সাওয়াদে সেচ ব্যবস্থার কেন্দ্রভূমি হিসাবে আল-আন্‌বারের কৌশলগত গুরুত্ব ১ম শাপূরকে (২8১-৭২ খৃ.) এই শহর পুনর্নির্মাণ করিতে এবং ইহাকে একটি ডবল লাইন দুর্গবেষ্টিত সৈন্যাবাস শহরে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত করে। তিনি ২8৩ খৃ. চতুর্থ গর্ডিয়ানের উপর তাঁহার বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ইহার নামকরণ করেন 'ফীরূয শাপূর' (বিজয়ী শাপূর) Herzfeld, Samarra ১২; Maricq, 8৭; তু. al-Makdisi, আল-বাদ, ৯8; হাম্‌যা, 8৯; আদ্‌-দীনাওয়ারী, ৫১)। অন্য লেখকগণ এই নামকরণকে ভুলক্রমে দ্বিতীয় শাপূরের প্রতি আরোপ করিয়াছেন (আত্‌-ত'াবারী, ১খ., ৮৩৯; ইয়াকূ'ত, ১খ., ৩৬৭; ২খ., ৯১৯; হ'াম্‌দুল্লাহ্‌ মুস্‌তাওফী, ৩৭)। Ammianus Marcellinus-এর ইহার সরকারী নাম হইতেছে পিরিসাবোরা (Pirisabora)। আরবগণ আল্‌-আলী (Le Strange, Lands, ৫৬-৬৬; Streck, ১খ., ১৬, ১৯) প্রদেশ (আস্‌তান)-এর আশেপাশের জেলা (তাস্‌সূজ)-এর জন্য ফীরূয শাপুর নামটি অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। আন্‌বার (ফার্‌সী ভাষায় যাহার অর্থ 'সংরক্ষণাগার' বা 'শস্যাগার') নামটি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং প্রথমে কেবল দুর্গের সংরক্ষণাগার বা খাদ্যশস্য ভাণ্ডার বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত (Maricq, ১১৫-৬; তু. আল্‌-বালাযু'রী, ২৯৬; ইয়াকূ'ত, ১খ., ৩৬৮, ৭8৯)।

শহরটি ছিল বিস্তৃত এবং ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও জনবহুল (Ammianus. xxiv,2)। ইহা ছিল ইয়াকূ'বী (Jacobean) ও নেস্তরী (Nestorian) বিশপদের আবাসস্থল (তু. I. Guidi, in ZDMG, xliii, 8১৩)। আবার ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইয়াহূদী কেন্দ্রও ছিল (মুসিল, ৩৫৬; Maricq., ১১8; Newman, Jews in Babylonia, ১8)। ইহার সৈন্যবাহিনী ছিল পারস্য দেশীয়; অপরপক্ষে ইহার বাশিন্দাদের মধ্যে আরবও ছিল (আত্‌-ত'াবারী, ৭8৯, ২০৯৫)। পারস্যের বিরুদ্ধে সম্রাট জুলিয়ানের অভিযানের সময় দুর্গটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১২ হিজরী/৬৩8 খৃস্টাব্দে আল্‌-আন্‌বার খালিদ (রা) কর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি পারসিক সৈন্যব্যূহকে বহিষ্কৃত করেন এবং অধিবাসীদের সহিত একটি সন্ধি করেন (আল-বালাযু'রী, ২8৫; আত্‌'-ত'াবারী, ১খ., ২০৫৯; মুসিল, ২৯৫, ৩০৮-৯)। ইরাকের তৃতীয় মস্‌জিদটি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্ক'াস (রা) কর্তৃক আল-আন্‌বারে নির্মিত হইয়াছিল (আল-বালাযু'রী, ২৮৯-৯০)। ইরাকে একটি সেনানিবাস (দার হিজরা) স্থাপনের জন্য উমার (রা)-এর আদেশ পাইয়া সা'দ (রা) প্রথমে আল-আন্‌বারের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু শহরটিতে জ্বর ও মাছির উপদ্রবের (আদ্‌-দীনাওয়ারী, ১৩১; আত্‌-তাবারী, ১খ., ২৩৬০) জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। আল্‌-হ'াজ্জাজ আন্‌বার খালটি পরিষ্কার করেন (আল-বালাযু'রী, ২৭8-৫, ৩৩৩)।

১৩8/৭৫২ সালে আবুল-'আব্‌বাস আল্‌-আন্‌বারে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং শহর হইতে অর্ধ ফার্‌সাখ (প্রায় ২.৫ কিলোমিটার) উজানে তাঁহার খুরাসানী সৈন্যবাহিনীর জন্য কেন্দ্রস্থলে এক বিরাট প্রাসাদসহ একটি নগরী নির্মাণ করেন (আল-বালাযু'রী, ২৮৭; আদ্‌-দীনাওয়ারী, ২৭৩; আত্‌-ত'াবারী, ৩খ., ৮০)। তিনি সেখানে সারা যান এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয় (আল-ইয়া'কূ'বী, ১খ., 8৩8; আল্‌-বালাযু'রী, ২৮৩; তু. আল্‌-মাক'দিসী, আল-বাদ্‌, 8খ., ৯৭)। বাগদাদের পত্তনের পূর্বে আল্‌-মান্‌সূর এই শহরে বাস করিতেন (১8৫/৭৬২)। আর্‌-রাশীদ আল-আন্‌বারে দুইবার অবস্থান করেন (১৮০-৭৯৯ ও ১৮৭/৮০৩)। ইহার অধিবাসীদের একাংশ খুরাসানীদের বংশধর ছিল (আদদীনাওয়ারী, ৩৮; আল্‌-ইয়াকূবী, ১খ., ৫১০; আত্‌-তাবারী, ৩খ., ৬৭৮)। খারাজের পরিমাণ বিচারে আল-আন্‌বার ৩য়/৯ম শতকের প্রাথমিক দশকগুলিতেও একটি উন্নত শহর ছিল (ইব্‌ন খুররাদায্‌বিহ, ৮খ., 8২; কু'দামা, ২৩৭)।

খিলাফাত দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্‌-আন্‌বার বেদুঈনদের লুট-তরাজের কবলে পতিত হয়। বেদুঈনগণ শহরটি ২৬৯ হি. ও জেলাটি ২৮৬ হি. আক্রমণ করে (আত্‌-তাবারী, ৩খ., ২০8৮, ২১৮৯)। ৩১৫/৯২৭ সালে কারমাতী আবূ তাহির কর্তৃক ইহার দখল ও ধ্বংসের ফলে ইহার পতন ত্বরান্বিত হয় (আল-মাস'ঊদী, তানবীহ, ৩৮২)। ৩১৯/৯২৯ সনে বেদুঈনগণ ইহার প্রচুর ক্ষতিসাধন করে (আরীব, ১৫৮)। আল্‌-ইস্‌তাখ্‌রী (পৃ. ৭৩) শহরটিকে সমৃদ্ধ জনবহুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যেখানে আবুল আব্বাসের ইমারাতগুলির ধ্বংসাবশেষ তখন দেখা যাইত। ইব্‌ন হ'াওক'াল (পৃ. ২২৭) বলেন, আল-আনবার ক্রমশ অবনতির দিকে যাইতেছিল এবং আল-মাক'দিসী (পৃ. ১২৩) বলেন, অধিবাসীর সংখ্যা ছিল অকিঞ্চিৎকর। অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিকার্যে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু যেহেতু শহরটি নৌপথ ও স্থলপথ এই উভয় পথেই সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল (তু. য়াকূবী, অনু. Wiet, ২৫০; ইব্‌ন হাওকাল, ১৬৬; Le Strange, in JRAS, ১৮৯৫, ১8, ৭১; ইব্‌ন

খুররাদায্‌বিহ, ১৫৪), ইহার কিছু বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল এবং এই শহরে কতিপয় নৌযান নির্মাতা ছিল। ইব্‌নুস্‌-সাঈর একটি কাহিনী (৫৯৭/১২০০, পৃ, ১৯-২০) হইতে জানা যায়, শহরটি চারিটি অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অংশের দায়িত্বে একজন শায়খ ছিলেন। ১২৬২ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল অধিনায়ক কেরবোকা আল্‌-আন্‌বার লুণ্ঠন করে এবং বহু অধিবাসীকে হত্যা করে [আল্‌-মাক্‌রীযী, সূলূক Quatremere ১/৫ খ., ১৭১-৩]। মোঙ্গলদের অধীনে আল্‌-আন্‌বার একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল। জুওয়ায়নী আল-আন্‌বারের নিকট হইতে নাজাফ পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন। ৮ম/১৪ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আল-আন্‌বারকে জেলার কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয় (আল্‌-আয্‌যাবী, ইরাক, ১খ., ২০৪, ৩৩৭, ৫৪৮)। ইহা কাঁচা ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল (যাহার ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ উত্তর দিকে পরিলক্ষিত হয়)।

আল-আন্‌বারের ধ্বংসাবশেষ আল-ফাল্লাজার ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত (তু. মুসিল, ২৯৬; Herzfeld, সামার্‌রা, ১৩)। এইগুলি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৬ কিলোমিটার পরিমিত অসমান আকৃতির পরিধি বেষ্টিত, ধ্বংসাবশেষের নাম আন্‌বারই রহিয়াছে (তু. মুসিল, ১৭৪; Obermeyer, ২১৯; Ward, Hebraica, ২খ., Chicago ১৮৮৫, ৮৩ প.)।

পার্‌থিয়ান কাঁচা ইটের তৈরী সুরক্ষিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ উত্তর-পূর্ব কোণে দেখা যায়। উহার মসজিদটি পূর্বের মসজিদ হইতে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন ইসলামী স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। ইহা আয়তাকার, তিন দিকে এক সারি করিয়া স্তম্ভ এবং কিব্‌লার দিকে ৫ সারি স্তম্ভ রহিয়াছে।

ফুরাত নদী শহরটির ধ্বংসাবশেষের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত। সুতরাং নাহরুল-কারমা বা আস্‌-সাক্‌লাবিয়্যা (কোন মতেই ইহার প্রাথমিক গতিপথে) নাহ্‌র 'ঈসা হইতে পারে না (দ্র. Herzfeld, ১৩; Le Strange, JRAS, 1895, 70)। যেহেতু নাহ্‌র 'ঈসা আব্বাসী শাসনামলে খনন করা হইয়াছিল এবং আল-আন্‌বারের এক ফারসাখ ভাটি দিয়া প্রবাহিত করা হইয়াছিল। সম্ভবত এই নাহ্‌রুস্‌-সাক্‌লাবিয়্যা প্রাক-ইসলামী যুগের নাহ্‌রুর-রুফায়ল হিসাবে চিহ্নিত এবং আংশিকভাবে প্রাচীন খালের খাতে প্রবাহিত (তু. Musil, ২৬৮; Maricq. ১১৬; সুহ্‌রাব, ১২৩; ইরাকী জরীপ পরিদপ্তরের মানচিত্র, ১৯৩৪, ১; ৫০,০০০)। এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, এই খালটি ইসলামী যুগেই ইহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Chesney, The expedition for the survey of the river Euphrates and Tigris, London ১৮৫০, ২খ., ৪৩৮; (২) Bewsher, JGS, ১৮৬৭, ১৭৪; (৩) K. Ritter, Erdkunde, ১০খ., ১৪৫ প., ১৪৭প.; (৪) G. Hoffmann, Auszuge aus syrisch. Arten pers. Martyrer, Leipzig ১৮৮০ খৃ., ৮৩, ৮৮ প.; (৫) Th. Noldeke, Gesch. d. Perser und Araber, ৫৭; (৬) Pauly-Wissowa, ১খ., ১৯৮০-৯৫, ২০খ., ১৯৫০; (৭) Le Strange, ২৫, ৬৫; (৮) A. Musil, The Middle Euphrates, New York, ১৯২৭; (৯) A. Maricq and E. Honigmann, Recherches sur les Res Gestae divi Saporis, Brussels ১৯৫৩ খৃ., ১১৬-৭।

A. A. Duri- M. Streck (E.I.2) /পারসা বেগম

আন্‌বার বনূ (দ্র. তামীম)।

আল-আন্‌বারী (الانبارى) : আবূ মুহাম্মাদ আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (মৃ. ৩০৪/৯১৬ অথবা ৩০৫/৯১৭), একজন মুহাদ্দিছ ও ভাষাবিশারদ ছিলেন। তিনি মুফাদ্দালিয়্যাত (আল-মুফাদ্দাল আদ্‌-দাব্বীর কবিতা সংগ্রহ)-এর একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন, যাহা তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। Charles Lyall সম্পাদিত : The Mufaddaliyat ...according to the recension and with the commentary of Abu Muhammad Al-Quasim b. Muhammed Al-Anbari, Oxford 1918-21.

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-ফিহ্‌রিস্ত, ৭৫; (২) যুবায়দী, ত'াবাক'াত, ১৪৪; (৩) আল-খাত'ীব্‌ আল-বাগ্‌দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১২খ., ৪৪০-১; (৪) ইয়াকূত, ইর্‌শাদ, ৬খ., ১৯৬-৮; (৫) ইব্‌নু'ল-কি'ফ্‌তী, ইন্‌বাহুর-রুওয়াত, ৩খ., ২৮; (৬) A. Haffner, WZKM, ১৩খ., ৩৪৪ প.; (৭) F. Kern, in MSOS, ১১/২খ., ২৬২ প.; (৮) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ৩৭; (৯) দা.মা.ই., ৩খ., ২৭৮।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2) /মনোয়ারা বেগম

আল-আন্‌বারী, আবুল বারাকাত (الانبارى، ابو البركات) : আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন আবী সা'ঈদ কামাদ-দীন

(সঠিক নাম ইব্‌নুল-আন্‌বারী), আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ, জন্ম রাবী'উছ-ছানী ৫১৩/জুলাই ১১১৯। আল্‌-জাওয়ালীকী ও ইব্‌নুশ-শাজারীর অধীনে বাগদাদের নিজামিয়্যাতে ভাষাতত্ত্বের উপর শিক্ষা লাভ করেন এবং একই মাদ্‌রাসায় ঐ বিষয়ের অধ্যাপক নিয়োজিত হন। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি জনজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে গবেষণাকর্ম ও ধর্মীয় সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৯ শা'বান, ৫৭৭/১৯ ডিসেম্বর. ১১৮১ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি নুযহাতুল-আলিব্বা ফী ত'াবাক'াতিল-উদাবা (lith., কায়রো ১২৯৪ হি.) শীর্ষক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন; ইহার বিষয়বস্তু প্রাচীন কাল হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস।

তাঁহার রচিত সহজ ব্যাকরণ আস্‌রারুল-'আরাবিয়্যা C.F. Seybold কর্তৃক সম্পাদিত হয় (Leiden ১৮৮৬ খৃ.); আল-ইন্‌সাফ ফী মাসাইলি খিলাফ বায়নান-নাহ্‌বি'য়্যীন আল-বাস্‌'রিয়্যীন ওয়াল-কূফিয়্যীন শীর্ষক বইখানা সম্পাদনা করেন C. Weil, Leiden ১৯১৩ খৃ.। এই বইটিতে বস্‌রা ও কূফার দলীয় মতবাদগুলির মধ্যে পার্থক্যের বিশদ বিশ্লেষণ রহিয়াছে। তাঁহার রচিত অন্যান্য রচনার পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 'আয্‌-যাহূর' নামক তাঁহার রচিত একটি অভিধানের নাম আবদুল কাদির আল-বাগদাদী কর্তৃক খিযানাতুল-আদাব (২খ., ৩৫২)-এ উল্লিখিত

হইয়াছে। আল-ওয়াক্ফ ওয়াল-ইব্‌তিদা নামক গ্রন্থটির বরাত দিয়াছেন আস্-সুয়ূতী তাঁহার শারহ' শাওয়াহিদিল-মুগ্‌নী'তে, পৃ. ১৫৮।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-কি'ফ্‌তী, ইন্‌বাহুর-রুওয়াত, ২খ., ১৬৯-৭১; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৪৬৯; (৩) কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ., ২৬২; (৪) সুব্‌কী, ত'াবাক'াত, ৪খ., ২৪৮; (৫) Brockelmann, ১খ., ৩৩৪, SI, 37.

C. Brockelmann (E.I.²) /পারসা বেগম

আল-আন্‌বারী (الانبارى) ঃ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌নুল কাসিম (সঠিকভাবে ইব্‌নুল আন্‌বারী) হাদীছবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ; আবূ মুহাম্মাদের পুত্র (তু. আল-আন্‌বারী, আবূ মুহাম্মাদ)। জন্ম ১১ রাজাব, ২৭১/৩ জানুয়ারী, ৮৮৫, মৃত্যু যুল-হিজ্জা ৩২৮/অক্টোবর ৯৪০। তিনি ছিলেন তাঁহার পিতার ও ছা'লাবের শিষ্য। তাঁহার জীবদ্দশায় একই মসজিদে বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিস্ময়কর স্মরণশক্তি ও সংযমের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি এখনও বিদ্যমানঃ আল-আদ্'দ'াদ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden ১৮৮১; আয্-যাহির, আল-ঈদাহ' ফিল-আক্‌ফ ওয়াল-ইব্‌তিদা ও কুরআনের সেই সমস্ত অনুচ্ছেদের উপর রচনা যেখানে হা-এর পরিবর্তে তা লিখিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবত আল-হাআত ফী কিতাবিল্লাহ-এর একটি উদ্ধৃতি; মুখ্‌তাস'ার ফী যি'ক্‌রিল-আলিফাত; আল-মুযাক্কার ওয়াল-মুআন্নাছ', মুআল্লাকাতের উপর তাঁহার ভাষ্যের (পাণ্ডুলিপির জন্য Brockelmann, SI, ৩৫ দ্র.) নিম্নোক্ত অংশগুলি O. Rescher কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; (তারাফা, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১১; RSO, iv-v-এ আনতারা MO-তে, যুহায়র ১৯১৩, ১৩৭-৯৫); ইব্‌নুল-আছীর নিহায়ার মুখবন্ধে তাঁহার সূত্র হিসাবে আল-আন্‌বারীর গারীবুল-হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ৭৫; (২) যুবায়দী, ত'াবাক'াত, ১১১-২; (৩) আয্‌হারী, MO, ১৯২০, ২৭; (৪) আল-খাতীব আল-বাগ্‌দাদী, তারীখ বাগ্‌দাদ, ৩খ, ১৮১-৬; (৫) আন্‌বারী, নুয্‌হা, ৩৩০-৪২; (৬) ইয়াকূত, ইর্‌শাদ, ৭খ, ৭৩-৭; (৭) ইব্‌নুল কি'ফ্‌তী, ইন্‌বাহুর-রুওয়াত, ৩খ, ২০১-৮; (৮) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৬৫৩; (৯) G. Flugel, Die Gramm. Schulen der Araber, ১৬৮-৭২; (১০) Brockelmann, ১খ, ১২২, S I, ১৮২।

C. Brockelmann (E.I.²) / পারসা বেগম

আল্-আনবীক (الانبيق) ঃ মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষায় Alembic পাতন যন্ত্রের সেই অংশের নাম যাহাকে ইংরেজীতে "head" বা "cap" বলা হয় অর্থাৎ মাথা বা টুপি। শব্দটি গ্রীক ambeks হইতে গৃহীত। খৃ. ১০ম শতকে Dioscorides-এর অনুবাদে, মাফাতীহু'ল 'উলূম-এ ও আর্-রাযী-র রচনাবলীতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। 'গোলাপ জল পাতনের অন্যতম যন্ত্ররূপে' আন্‌বীকে'র উল্লেখ প্রায়শ পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণ পাতন যন্ত্র তিন অংশে বিভক্তঃ 'আলাবু' (cucurbit, قرعة), 'মাথা' বা 'টুপি' (head or cap, الانبيق) ও ধারণ পাত্র (receiver, قابلة)। আধুনিক পাতনযন্ত্রে টুপি ও আলাবু এক সঙ্গেই তৈরি করা থাকে। আরবী পাণ্ডুলিপিতে পাতনযন্ত্রের ছবি দেখা যাইতে পারে আদ্-দিমাশ্‌কীর আজাইবুল-বার্‌র ওয়াল-বাহ্'র (Cosmography, মুদ্রণ মেহরেন) গ্রন্থে, পৃ. ১৯৪ প.। সচরাচর কারআ বা আলাবু-র উপরে আন্‌বীক বা মাথা বসান থাকে, যদিও এই গ্রন্থের চিত্রে উহা সামনে বসান রহিয়াছে দেখা যায়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মাথার আকার দেখা যায় একটি রুক্তমোক্ষক কাঁচ (cupping-glass) পাত্রের ন্যায়। মাফাতীহ গ্রন্থেও (সম্পা. van Vloten, পৃ. ২৫৭) সেইরূপ চিত্রই বিদ্যমান। ইব্‌নুল-'আওওয়াম (অনু. Clement Mullet, ২খ., ৩৪৪) গোলাপজল তৈরীর বা পাতন পদ্ধতির বিবরণ যেইখানে দিয়াছেন সেইখানে আন্‌বীকে'র বর্ণনাও দিয়াছেন। কিন্তু সেই বর্ণনাতে সব সময়ে সম্পূর্ণ মাথাটিকে ঐ নাম দ্বারা বুঝান হয় নাই, কখনও শুধু মাথার সঙ্গে যুক্ত পিপার নলকে বুঝান হইয়াছে (অবশ্য পাণ্ডুলিপির পাঠ যদি বিকৃত না হইয়া থাকে)। আন্‌বীককে কার্‌আর রাস বা মাথাও বলা হইয়া থাকে।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতির বিভিন্ন তালিকাতে আন্‌বীকে'র উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাফাতীহুল-'উলূম, আর-রাযীর কিতাবুল আস্‌রার উল্লেখযোগ্য। সেইগুলিতে ইহার বিভিন্ন রকমের নাম গণনা ও ইহাদের বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন কার্‌শূনীতে লিখিত একটি পাঠেও উল্লেখ পাওয়া যায়, Berthelot কর্তৃক সেইখানি প্রকাশিত হইয়াছে; উহার সঙ্গে আর্-রাযীর বর্ণনার ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে।

বিশেষ ধরনের আন্‌বীকে'র মধ্যে রহিয়াছে মুখবন্ধ আন্‌বীক', ইহাতে কোন অতিরিক্ত নল থাকে না। ফলে উহা বন্ধই থাকে, চক্ষুযুক্ত আন্‌বীক ও অন্যান্য বিভিন্ন আকারের আন্‌বীক'। ইব্‌নুল-'আওওয়াম-এর বর্ণনায় দেখা যায়, সংযোজিত অংশকে যানাব (Cl. Mullet এই উচ্চারণ পসন্দ করেন) বা ভিন্ন পাঠ অনুযায়ী যাবাবও বলা হয়। Dozy উচ্চারণের এই রূপটি রাখার পক্ষপাতী। কারণ তিনি অতিরিক্ত নলের সঙ্গে বাষ্প ঘনীভূতকরণের জন্য একটি প্যাঁচযুক্ত নলও একসঙ্গে সংযোজিত দেখাইয়াছেন (কিন্তু শেষোক্তটির কোন চিত্র পাওয়া যায় না)।

আরব রসায়নবিদগণ প্রধানত গ্রীক রসায়নবিদগণের উপর নির্ভর করিতেন বলিয়া অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত চিত্রাবলীর উপরে নির্ভর করা যাইতে পারে। Geber কর্তৃক অনূদিত বলিয়া পরিচিত ল্যাটিন গ্রন্থাবলীতে কিছু কিছু চিত্র রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Wiedemann, ZDMG, ৩২ম সংখ্যা, পৃ. ৫৭৫; (২) ঐ লেখক, Diergart, Beitr. aus d. Geschd, Chemie, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ২৩৪ (৩) M. Berthelot, La Chimie au moyen age. ii, lxiv, 66, 105 ff.; (৪) J. Ruska, Al-Razi's Buch der Geheimnisse (১৯৩৭ খৃ.), নির্ঘণ্ট দ্র.; (৫) A. Siggel, Arab,-deutsches Worterbuch der Stoffe, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৯৫।

E. Wiedomann [M. Plessner] (E.I.²) /হুমায়ুন খান

আন্‌যারূত (انزروت) ঃ গ্রীক sarhoholla (Sarcocolla) এক ধরনের কাঁটা গুল্মজাত আঠালো পদার্থ, কোন্ কাঁটা গাছ তাহা বর্তমানে সঠিকভাবে জানা যায় না। সুপ্রাচীন কাল হইতে এই আঠা মানুষের

নিকট পরিচিত এবং ওষধিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার সমার্থক শব্দ, যথা আন্‌যারূত, আন্‌যারূত, কুহ্‌'ল ফারিসী, কুহ্‌'ল কির্‌মানী; ফারসী ভাষায় ঃ আন্‌যারূত বা আন্‌জারূত তাশ্‌ম্‌ (চাশ্‌ম্‌), কান্‌জুবা, কান্‌জুযা, কান্‌জুদাক, বাযাহ্‌র-ই চাশ্‌ম (কাজেই যাহ্‌র জাশ্‌ম-এর বদলে ব্যবহৃত হয়, আন্‌তাকী তা'য্‌কিরা, নিম্নে গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। এই ঔষধ সম্পর্কে প্রচুর লিখিত হইয়াছে। পূর্বে Thymelaeaceae-এর অন্তর্ভুক্ত Penaca প্রজাতিটিকে মূল উদ্ভিদ বলিয়া মনে করা হইত, নাম দেওয়া হইয়াছিল Penaea mucronata L. অথবা P. Sarcocolla L. বা P. squamosa L. কিন্তু ১৮৭৯ খৃ. W. Dymock প্রমাণ করিতে সক্ষম হন, অন্তত Persian Sarcocolla-টি তাহার নামকরণে পরিচিত Astragalus Sarcocolla Dym, (Leguminosae) হইতে উৎপন্ন পদার্থ। সুপ্রাচীন কাল হইতে অতি পরিচিত এই ঔষধ বর্তমানে ইউরোপের ঔষধ ভাণ্ডার হইতে অপসৃত হইয়াছে, কিন্তু Meyerhof-এর মতে প্রাচ্য দেশসমূহে এখনও ইহা সুপরিচিত, বিশেষ করিয়া কায়রোর ঔষধের বাজারে।

Dioscorides-এর মতে এই হলুদ বর্ণের তিক্ত আঠা ব্যবহারে সর্বোপরি ক্ষতস্থানে নূতন গোশ্‌ত জন্মায়। আল-কিন্‌দী যে কয়েক ধরনের ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় উপাদানের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন (আক্‌'রাবাযীন, নিম্নে গ্রন্থপঞ্জী দ্র.), তন্মধ্যে একটি ছিল কুষ্ঠ রোগের ঔষধ। সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন ইব্‌নুল-বায়তার। তাঁহার বিবরণের ভিত্তি ছিল গ্রীক ও আরবী উৎস গ্রন্থসমূহ এবং সেই সংগে তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ। এই আঠা পচা ঘায়ের পুঁজযুক্ত গোশত শুষে নেয়, স্ফোটক পাকাইয়া ফেলিতে সহায়তা করে, রস টানিয়া নেয়, হলুদ রঙের ফোঁড়া শুকাইয়া আনে, ইহা চক্ষুর জ্বালাপোড়া প্রশমিত করে, চক্ষুর দুই পাতা লাগিয়া গেলে তাহা আল্‌গা করিয়া দেয় এবং চক্ষু হইতে অতিরিক্ত পানি পড়া বন্ধ করে। এই আঠা খাইলে তাহা তীব্র জোলাপের কাজ করে, কিন্তু আবার মাথার চুল পড়িয়া যায়। সর্বোৎকৃষ্ট যে আন্‌যারূত তাহা সাদা বীচির গুড়ার সঙ্গে আখরোটের তৈল মিশাইয়া তৈরি করা হয়। বিভিন্ন পরিমাণে ইহা অন্য ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়াও ব্যবহার করা যায় (sagapenum, myrobalanum, aloes, bdellium ইত্যাদি)। মিশ্রিত না করিয়া শুধু এই আঠা খাইলে ফল মারাত্মক হইতে পারে। কাজেই ইহার পরিমাণ সোয়া দুই দিরহাম ওযনের বেশী হওয়া উচিত নহে। তবে ইব্‌নুল-বায়তার বলিয়াছেন, তিনি মিসরে দেখিয়াছেন, মহিলারা দৈহিক স্থূলতা বৃদ্ধির আশায় গোসলের পর হলুদ রঙের তরমুজের মণ্ডের সঙ্গে চার আউন্স পরিমাণ পর্যন্ত আন্‌যারূত খাইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dioscorides, Materia Medica, সম্পা. M. Wellmann, বার্লিন ১৯০৬ খৃ, ২খ., ১০২ (=lib., ৩খ., ৮৫); (২) La Materia Medica de Dioscorides, ২খ. (ইস্‌তাফান ইব্‌ন বাসিল-এর আরবী অনু.), সম্পা. C. E. Dubler ও E. Teres, তেতুয়ান ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৮০ প.; (৩) The Medical Formulary or Aqrabadhin of Al-Kindi, অনু. M. Levey, Madison ও অন্যান্য, ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২৩৬ (নং ২৫); (৪) আল-বীরূনী, কিতাবুস-সায়দালা, সম্পা. মুহাম্মাদ সাঈদ, করাচী ১৯৭৩ খৃ., আরবী, ৭০ প, ইংরাজী ৪৫ প.; (৫) গাফিকী আল-জামি' ফিল-আদবিয়্যাতিল-মুফ্‌রাদা, পাণ্ডুলিপি রাবাত, Bibl. Gen., K 155 I, পত্রসমূহ ২৬ খ-২৭ ক; (৬) The abridged version of The Book of Simple Drugs" of ..al-Ghafiqi by..Barhebraeus, সম্পা. ও অনু. M. Meyerhof and G.P. Sobhy, কায়রো ১৯৩২ খৃ., নং ৩৭; (৭) সুওয়ায়দী, কিতাবুস-সিমাত ফী আস্‌মাইন-নাবাত, পাণ্ডুলিপি প্যারিস, আরবী ৩০০৪, পত্র ১৫ খ., ১৩৭; (৮) ইব্‌ন বিক্‌লারিশ, কিতাবুল-মুস্‌তাঈনী, পাণ্ডুলিপি নেপল্‌স, Bibl. Naz. iii, F65, পত্র ১৪ খ.; (৯) ইব্‌নুল-জায্‌যার, আল-ই'তিমাদ, পাণ্ডুলিপি আয়াসোফিয়া ৩৫৬৪, পত্র ১৩ বি.; (১০) যাহ্‌রাবী, তাস্‌'রীফ, পাণ্ডুলিপি বাসীর আগা ৫০২, পত্র ৫০০ক, ৭; (১১) Maimonides, শারহ্‌ আস্‌মাইল-উক্কার, Un Glossaire de matiere medicale-সম্পা. M.. Meyerhof, নং 8; (১২) ইব্‌নুল-বায়তার, আল-জামি', বূলাক ১২৯১ হি., ১খ., ৬৩ প., অনু. L. Leclerc, Notices et extraits...xxiii 1.I, প্যারিস ১৮৭৭ খৃ., নং ১৭১; (১৩) গাস্‌সানী, আল-মু'তামাদ ফিল-আদ্‌বিয়্যাতিল-মুফ্‌রাদা সম্পা. মুহাম্মাদ আস্‌-সাককা, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১০; (১৪) Die Pharmakologischen Grundsatze des Abu Mansur...Harawi, অনু. A. Achundow, Halle 1893, নং ৩৪; (১৫) তুহ্‌ফাতুল-আহ্‌বাব, সম্পা. H. P. J. Renaud and G. S. Colin, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., নং ৩৫; (১৬) রাযী, আল-হা'বী, ২০খ., হায়দরাবাদ ১৩৮৭/১৯৬৭ নং ৪৪; (১৭) ইব্‌ন সীনা, কানূন, ১খ., বূলাক, ২৪৮; (১৮) ইব্‌ন হুবাল, আল-মুখ্‌তারাত ফিত-তি'ব্ব, হায়দরাবাদ ১৩৬২, ২খ., ২৩প.; (১৯) দাউদ আল-আন্‌তাকী, তায্‌কিরাতু উলিল-আল্‌বাব, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ১খ., ৬০; (২০) নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-আরাব, ১১খ, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৩১৫; (২১) El Libro Agrega de Seropiom, সম্পা. G. Ineichen, ২খ., ভেনিস ১৯৬৬; (২২) H. G. Kircher, Die "Einfachen Heilmittel" aus dem "Handbuch der Chirurgie" des Ibn al-Quff; Bonn 1967, নং ২১; (২৩) W. Schmucker, Die pflanzliche und mineralische Materia medica in Firdaus al-Hikma des Ali ibn Sahl Rabban at-Tabari, Bonn 1969, নং ৭৯।

A. Dletrich (E.I.2) / হুমায়ুন খান

আল্‌-আন্‌সার (الأنصار) ঃ সাহায্যকারী, মক্কা হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের পর মদীনার যে সকল মুসলমান তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান ও সাহায্য করেন, তাঁহাদের উপাধি। মদীনার আওস ও খায্‌রাজ গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহকর্মী ও সাহায্যকারীরূপে পরিগণিত হন। আওস ও খায্‌রাজ উভয়ই হারিছা ইব্‌ন ছালাবা ইব্‌ন আম্‌র মুযায়কিয়া আল-আযদী আল-কাহ্‌তানীর বংশধর ছিলেন। তাঁহাদের মাতা ছিলেন কায়লা বিন্‌তুল-আর্‌কাম। এইজন্য আওস

ও খায্রাজ্ গোত্রকে বানূ কায়লাও বলা হইয়া থাকে। (ফুতূহুল বুল্দান, ২৩; জাম্হারাতু আন্সাবিল আরাব, ৪৮১)। তাঁহাদের আগমনের পূর্বের মদীনায় ইয়াহূদীদের বসবাস ছিল আরিম-এর প্লাবনে মাআরিব-এর বাঁধ ফাটিয়া গেলে আয্দ গোত্রের লোকেরা ইয়ামান হইতে হিজ্রত করে। তন্মধ্যে আওস ও খায্রাজ গোত্রের লোকেরা মদীনায় বসতি স্থাপন করে (ফুতূহুল বুল্দান, ২৩); আওস মদীনার দক্ষিণাংশে এবং খায্রাজ মদীনার মধ্য অঞ্চলে। আওস গোত্রের সম্পর্ক ছিল বানূ কুরায়জা ও বানূ নাযীর-এর সঙ্গে এবং খায্রাজ গোত্রের ছিল বানূ কায়নুকা'-এর সঙ্গে। নিম্নোক্ত পরিবার ও উপগোত্রগুলি আওস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ (১) বানূ 'আওফ ইব্ন মালিক ইব্নিল-আওস, তাহারা কুবার অধিবাসী ছিল; (২) বানূ আম্র ইব্ন মালিক ইবনিল-আওস, তাহারা আন্-নাবীত নামে খ্যাত। তাহাদের মধ্যে বনূ আশ্হাল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; (৩) বানূ মুর্রা ইবন মালিক ইব্নিল-আওস, তাহাদেরকে আল-জাদিরা বলা হয়; বানূ ওয়াইল গোত্র প্রমুখ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪) বানূ জুশাম ইব্ন মালিক ইব্নিল-আওস বানূ ওয়াকিফ তাহাদের অন্তর্ভুক্ত (জাম্হারা, ৪৭০)। খায্রাজের উপগোত্র ও বংশধরদের মধ্যে নিম্নোক্ত শাখাগুলি অন্তর্ভুক্তঃ (১) বানূ আওফ ইব্নুল খায্রাজ; বানূ সালিম প্রমুখ শাখাগুলি তাহাদের বংশধর (২) বানূ আম্র ইব্নুল খায্রাজ। তাহাদের বংশধরদের মধ্যে বানূ নাজ্জার অধিকতর প্রসিদ্ধ, (৩) বানূ জু'শাম ইব্নুল খায্রাজ, বানূ যুরায়ক প্রমুখ তাহাদের বংশধর; (৪) বানূল-হারিছ ইব্নুল খায্রাজ, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে বানূ খুদ্রা অধিকতর খ্যাত ছিল, (৫) বানূ কা'ব ইব্নুল খাযরাজ, সাঈদা প্রমুখ তাহাদের বংশধর (জাম্হারা, পৃ. ৪৭১-৪৭২)। আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই বিশটি উপগোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. জাম্হারাতু আন্সাবিল-'আরাব, পৃ. ৩৩২-৩৬৬)। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই গোত্রগুলি ইয়াহূদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য ও কৃষি কাজকর্ম তাহাদের অধীন ছিল। পরবর্তী কালে বাহিরের সাহায্যে আওস ও খায্রাজ গোত্রগুলি ইয়াহূদীদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তাহারা অপর একটি বিপদের সম্মুখীন হয়। গোত্র দুইটির মধ্যে কলহ-বিবাদ শুরু হয়। কিন্তু সংখ্যক ইয়াহূদী গোত্র আওস গোত্রের এবং কিছু সংখ্যক খাযরাজ গোত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. তারীখ ইব্ন খাল্দূন)। তাহাদের মধ্যকার যুদ্ধগুলির মধ্যে য়াওমুদ্-দারুক, য়াওমুর্-রাবী ও য়াওমুলবুআছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বানূ কায়লা গৃহযুদ্ধ ও বিবাদ-বিসম্বাদে ভীত হইয়া শান্তি, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। অধিকন্তু ইয়াহূদীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কোন কিতাবধারী নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রত্যাশী ছিল। তাহারা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে ইহাও শুনিয়াছিল, একজন নবী আবির্ভূত হইবেন। তাহাদের আশা ছিল, অন্যদের আগেই তাহারা সেই নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইয়াহূদীদের ন্যায় আহ্লে কিতাবে পরিগণিত হইবে। তাহা ছাড়া সেই নবীর মাধ্যমে বিবদমান এই গোত্র দুইটির মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি ফিরিয়া আসিবে এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। নবুওয়াতের নবম বর্ষে খায্রাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান আনিলে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার একটি অংশ পূর্ণ হয়।

মুস্'আব ইব্ন উমায়র (রা) ও আস্'আদ ইব্ন যুরারা (রা)-এর প্রচেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছিতে থাকে। মুস'আব কুরআন শিক্ষা দিতেন, ইসলামের বাণী প্রচার করিতেন এবং আস্'আদ সালাতে ইমামতি করিতেন। মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে উপনীত হইলে তাঁহারা জুমু'আর সালাত শুরু করেন (যাদুল-মা'আদ, আ'লামুন্-নুবালা, ১খ., ২১৮)। সা'দ ইব্ন উবাদা ও উসায়দ ইব্নুল-হুদায়র-এর ইসলাম গ্রহণের পর 'আম্র ইব্ন ছাবিত ইব্ন ওয়াক্শ আল-উসায়রিম ব্যতীত বানূ আবদিল-আশ্হালের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আম্র ইব্ন ছাবিত উহুদের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। জনসাধারণের সন্দেহ নিরসনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ একটি সিজদা না করিয়াও আম্র জান্নাতে প্রবেশ করিল (জাম্হারা, আন্সাবুল আশ্রাফ)। মদীনার উচ্চাংশে বসবাসকারী কয়েকটি শাখাগোত্র যথাঃ বানূ খাত্মা, বনূ ওয়াইল, বনূ ওয়াকিফ ও বানূ উমায়্যা ইব্ন যায়দ খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের বিলম্বের কারণ ছিল তাঁহাদের সর্দার আবূ ক'ায়স সায়ফী ইব্ন আস্লাত তাঁহাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করিতেছিল (ইব্ন খালদূন)। তাঁহাদের মধ্যে কেবল বানুস্-সাল্ম স্বীয় মিত্র গোত্র বানূ আম্র ইব্ন আওফ-এর সাহায্যে তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (জামহারাতু আন্-সাবিল-আরাব, পৃ. ৩৪৫)।

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে মদীনার তিয়াত্তরজন আন্সারী মুসলমান হজ্জ পালনকালে আকাবা নামক স্থানে আয়্যামে তাশ্রীক'-এর মধ্যবর্তী রাত্রের এক-তৃতীয়াংশের পর চুপে চুপে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহায্য করার মর্মে তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। উক্ত দলে দুইজন আন্সারী মহিলাও ছিলেন (জাওয়ামি 'উস্-সীরা, পৃ. ৭৫; ইব্ন খালদূন, ১খ., ৩০৮)। একজন ছিলেন বানূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের উম্ম উমারা নাসীবা বিন্ত কা'ব ইব্ন 'আমর (রা) এবং অপরজন ছিলেন বানূ সালিমা গোত্রের উম্ম মানী আস্মা বিন্ত আম্র ইব্ন আদী (রা) (আত-তায়ালিসী, ২খ., ৯৩; যাদুল্-মাআদ ২খ., ৫১)। প্রথমোক্ত মহিলা ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী যোদ্ধা ও মর্যাদাশীলা। তিনি উহুদ, হুদায়বিয়্যা, হুনায়ন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি স্বামী ও দুই পুত্রসহ অংশগ্রহণ করেন। তিনি মশক বহন করিয়া আহত মুজাহিদকে পানি পান করাইতেন এবং যখমে ঔষধ ও পট্টি লাগাইতেন। বাস্তব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াও তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিতেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি বারটি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি ঢাল লইয়া স্বামী ও দুই পুত্রের সহযোগিতায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে থাকেন। বার জনকে তিনি আহত করেন এবং পুত্রের সহযোগিতায় কয়েকজনকে নিহত করেন। শত্রুদলের এক অশ্বারোহী রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ধাবিত হইলে উম্ম উমারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ও তাহার ঘোড়াটিকে মাটিতে ফেলিয়া দেন। অবশেষে ইব্ন কামীআ তাঁহার স্কন্ধে তলোয়ারের এত গভীর আঘাত করে যে, পূর্ণ এক বৎসর ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করেন ঃ 'হে আল্লাহ! উম্ম 'উমারা যেন জান্নাতে আমার সাহচর্য

লাভ করে'। তিনি ইহাও বলেন, উহুদের যুদ্ধে উম্ম উমারার স্থান অমুক অমুক ব্যক্তির ঊর্ধ্বে। উম্ম উমারা দুই পুত্রসহ ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা-পুত্রের চেষ্টা ছিল, তাঁহারা মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করিবেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় উম্ম উমারার একটি হাত কাটিয়া যায়। এক পুত্র হাবীব (কাহারও মতে খুবায়ব) ইব্‌ন যায়দ ইবন আসিম মুসয়লামার হস্তে শহীদ হন, কিন্তু অপর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ আল-মাযিনী মুসায়লামাকে হত্যা করেন (আলামুন্-নুবালা, ২খ., ২০০-২০৪; আন্‌সাবুল-আশ্‌রাফ, ১খ., ৩২৫)। বানূ সালিমা-র নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হারাম (রা) সেই আকাবার রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বায়'আতে শরীক হন। আকাবার দ্বিতীয় বায়আতে আনসারগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের ন্যায় হেফাজত করিবেন। ইহাও সিদ্ধান্ত হয়, রাসূলুল্লাহ (স) আন্‌সারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াছরিবে (মদীনা) হিজরত করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্য আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে আন্‌সারগণ এই চুক্তি সম্পাদন করেন; কিন্তু তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই (ইব্‌ন খালদূন)। আল্-বারা' ইব্‌ন মা'রূর আন্‌সারী (রা) স্বীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন। ইহার পর আবু হায়ছাম ইব্‌নুত্-তায়্যিহান (রা) ও আব্বাস ইব্‌ন উবাদা (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর অন্যান্য আনসার বায়'আত গ্রহণ করেন (জাওয়ামিউস্-সীরা, পৃ. ৭৪)।

রসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের মধ্য হইতে বারজন প্রতিনিধি (نقيب) নিযুক্ত করেন, নয়জন খায্‌রাজ ও তিনজন আওস গোত্র হইতে (আন্‌সাব, ১খ., ২৫৩)। (১) আবু উমামা আস্‌আদ ইব্‌ন যুরারা আন-নাজজার আল-খাযরাজী আনসারের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নাজ্জার গোত্রের নেতা। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে 'আস্‌'আদুল-খায়র' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার ইমামতিতে মদীনায় সর্বপ্রথম জুমুআর সালাত শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের নয় মাস পর মস্‌জিদে নববী মেরামতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুলবাকী' (بقيع)-তে দাফনকৃত তিনি প্রথম আন্‌সারী। তাঁহার মৃত্যুর পর বানূ নাজ্জার রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আরয করেন, "আমাদের নাকীব এখন মৃত, অতএব আপনি আমাদের নাকীব নিযুক্ত করুন।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "এখন আমিই তোমাদের নাকীব।" রাসূলুল্লাহ (স) আস'আদ (রা)-এর তিন কন্যাকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া আসেন। তাঁহার হাতে স্বর্ণ অথবা মুক্তার কোন অলংকার আসিলে তিনি এই কন্যাদেরকেও সেইসব অলংকার পরিধান করাইতেন (ইব্‌ন সা'দ, ৩/২খ., ১৩৮; উস্‌দুল-গ'াবা, ১খ., ৭১; আল-ইস'াবা, ১খ., ৩২)।

(২) সাদ ইব্‌নুর-রাবী আল-খায্‌রাজী আল-বাদ্‌রী, আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আওফের ইসলামী ভাই (মুওয়াখাতী), উহুদের যুদ্ধে সত্তরটি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শাহাদাত বরণ করেন। তিনি তাঁহার শেষ ওসিয়াতে নিজ গোত্রের নিকট বলিয়া পাঠান, "তোমাদের একজনের বর্তমানেও কাফিরা যদি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পর্যন্ত উপনীত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা কি জবাব দিবে' (সিয়ার আ'লামিন্-নুবালা, ১খ., ২৩০ প.)।

(৩) রাফি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌নিল-আজ্‌লান আয্-যুরাকী (রা) বদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই, উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

(৪) আল্-বারা' ইব্‌ন মা'রূর আল-খায্‌রাজী (রা) বানূ সালিমার নেতা, প্রথম আকাবার বায়'আতের প্রথম ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের এক মাস পূর্বে সাফার মাসে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় গমনের পর তিনি তাঁহার কবর যিয়ারত করেন। তিনি প্রথম হইতে কা'বা শারীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করেনঃ এক ভাগ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য, এক ভাগ আল্লাহ্‌র জন্য এবং অন্য ভাগ নিজের সন্তানদের জন্য নির্ধারিত করেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের অংশ বারা'-র উত্তরাধিকারিগণকে প্রদান করেন (সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ১খ., ৯৩ প.)।

(৫) আবূ জাবির আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হারাম আস্-সুলামী আল-বাদ্‌রী (রা) উহুদের যুদ্ধের প্রথম শহীদ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আবূ জাবির শাহাদাতে এত বেশী তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যেন পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি আবার শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করিবেন।

(৬) সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা আস্-সা'ঈদী আল-বাদরী (রা) খায্‌রাজ গোত্রের একজন সম্মানিত নেতা, রাসূলুল্লাহ (স) ও আস্‌হাব সুফ্‌ফার আতিথ্য দানকারী, হাওরানে ১৬ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন (সিয়ার আ'লামিন্-নুবালা, ১খ., ১৯৬)।

(৭) আল-মুন্‌যি'র ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন খুনায়স আস্-সাইদী আল-খায্‌রাজী আল-বাদ্‌রী (রা)-কে ৪র্থ হিজ্‌রীতে বি'র মা'উনায় প্রেরিত প্রতিনিধি দলের আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং শত্রুদের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন (আন্‌সাবুল-আশরাফ, ১খ., ২৫০; জাম্‌হারা, পৃ. ৩৬৬)।

(৮) 'উবাদা ইব্‌নুস্-স'ামিত আল্-বাদ্‌রী (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন-এর বিশিষ্ট আলিম, পাঁচজন আনসারের অন্যতম, হিম্‌স ও ফিলিস্তীনে কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত হন। বাহাত্তর বৎসর বয়সে ৩৪ হি. রামলা (ফিলিস্তীন) নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন (আন্‌সাব, সিয়ারু আলামিন্-নুবালা, খ.১-২)।

(৯) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহ'া আল্-বাদ্‌রী (রা), প্রসিদ্ধ খায্‌রাজ নেতা, লেখক (كاتب) ও কবি, ৮ম হিজরী মুতা-র যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হন (সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১খ., ১৬৬ প.)।

(১০) উসায়দ ইব্‌নুল-হ'দ'ায়র আল-আওসী আল-আশ্‌হালী (রা) চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান নেতা। তিনি হযরত মুস্'আব ইব্‌ন উমায়রের হাতে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন; তিনি অত্যন্ত সুকণ্ঠ কারী ছিলেন। তিনি হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতকালে ২০ হি. ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে জান্নাতু'ল-বাকী'তে দাফন করা হয় (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১খ., ২৪৬ প.)।

(১১) সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা আল্-আওসী আল্-বাদ্‌রী (রা), তাঁহার পিতা খায়ছামাও ইসলাম গ্রহণ করেন। বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পিতার ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া শাহাদাত বরণ করিবেন। পুত্রের বক্তব্য, বিষয়টি জান্নাত

লাভের ব্যাপার না হইলে তিনি পিতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতেন। পরিশেষে লটারী করা হয়। লটারীতে পুত্রের নাম উঠে। তিনি বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার পিতা খায়ছামা (রা) উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন (সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১খ., ১৯৩)।

(১২) আবুল হায়ছাম মালিক ইবনুত-ত্যায়্যিহান আল্-আওসী আল-বাদ্রী, (রা) আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়'আতে শরীক ছিলেন। হযরত উমার ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে ২০ হি. ইন্তিকাল করেন। আয্-যাহাবী প্রমুখের মতে সিফ্ফীনের যুদ্ধে তাঁহার শাহাদাত সম্পর্কিত বর্ণনাটি সঠিক নহে (সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১খ., ১৩৮ প.)।

ইসলাম আওস ও খায়রাজ গোত্রের দীর্ঘ দিনের বিবাদ ও শত্রুতার নিরসন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ইয়াহূদীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করে। আনসার ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। নিজেদের নজীরবিহীন কুরবানী ও সাহায্য দ্বারা ইসলামের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁহাদের বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। বদ্রের যুদ্ধে দুই শত ত্রিশজনের অধিক আন্সার শরীক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক শত সত্তরজন খায্রাজ গোত্রের এবং বাকী আন্সার আওস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট সত্তরটি উটের মধ্যে সা'দ ইব্ন উবাদা আল-খায্রাজী একাই ২০টি উট দান করিয়াছিলেন (আল্-ইসতিব্সার ফী নাসাবিল-আন্সার, আল্-আন্সার ওয়াল-ইসলাম-এর বরাতে, পৃ. ৯৯)। বদ্রের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী চৌদ্দজনের আটজনই ছিলেন আন্সার (জাওয়ামিউস্-সীরা, পৃ. ১৪৬)।

উহুদের যুদ্ধে মুহাজিরদের সঙ্গে বহু সংখ্যক আন্সারও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সত্তরজন শহীদের মধ্যে ছেষট্টিজন ছিলেন আন্সার। কাহারও কাহারও শরীরে সত্তরটি আঘাত লাগিয়াছিল। ইব্ন হিশাম, জাওয়ামি'উস্-সীরা, আন্সাবু'ল-আশ্রাফ, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা' ইত্যাদি গ্রন্থে শহীদগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বির মা'উনা-র শহীদদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন আন্সার। আন্সারী মহিলা 'আফরা' বিন্ত ছা'লাবা আন্-নাজ্জারিয়্যার সাত পুত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে বদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছয়জন বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন এবং মাত্র এক পুত্র 'আওফ-এর মাধ্যমে তাঁহার বংশ টিকিয়া থাকে (আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৯৯ প.)।

আন্সারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ আল-খায্রাজী (রা) আযানের শব্দ স্বপ্নে শ্রবণ করার সম্মান লাভ করেন (জাম্হারা, পৃ. ৩৬১)। রাসূলুল্লাহ (স) আন্সারের উদারতা ও দানশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন (কিতাবুল-বুখালা, ২খ., ১০৬)। হযরত উবায়্যি ইব্ন কা'ব আন্সারী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম কাতিব (লেখক) হওয়ার সম্মান লাভ করেন (আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., ৫৩১)। কা'ব ইব্ন আশ্রাফ ইয়াহূদী ও অন্যান্য দুষ্ট প্রকৃতির শত্রুদের হত্যার গৌরবও আন্সারগণই লাভ করিয়াছিলেন (আনসাব, ১খ., ৩৭৪; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১খ., ১৬৬)। হ'ানজ'ালা ইব্ন আবী 'আমির (রা) উহুদের শহীদ গ'াসীলুল-মালাইকা উপাধি লাভ করেন। হযরত 'আসি'ম ইব্ন ছ'াবিত ইব্ন আবিল আক্লাহ্ (রা) [রাজী]-এর শহীদ), হামিয়্যুদ দাব্র (ইব্ন খাল্দুন), আল-মুন্যি'র ইব্ন 'আম্র ইব্ন খুনায়স (রা) (বি'র মা'উনার শহীদ) আল্-মুনিক লিয়ামূত (জাম্হারা), হযরত খুযায়মা ইব্ন্ ছ'াবিত ইব্নিল-ফাকিহ্ যুশ্শাহাদাতায়ন (আন্সাব, ১ম, ৫০৯) উপাধি প্রাপ্ত হন। হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর শাহাদাতে আল্লাহর আরশ্ প্রকম্পিত হইয়াছিল (মিশকাত, বাব মানাকি'ব সা'দ ইব্ন মুআয)।

আনসারের মধ্যে কেবল আওস ইব্ন খাওয়ালিয়্যি ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাফনে তাঁহার কবরে নামার সম্মান লাভ করেন (জাম্হারা, পৃ. ৩৫৫)। হযরত আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (রা)-এর মনোনয়নের সময় তিনি আন্সারকে উযারারূপে উল্লেখ করিয়াছেন (আন্সাব, ১খ., ৫৮২)। আন্সারের মধ্যে হযরত উসায়দ ইব্নুল-হুদায়র (রা) বা বাশীর ইব্ন সা'দ সর্বপ্রথম হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করেন (প্রাগুক্ত)। হযরত সাহ্ল ইব্ন মালিক আন্সারী (রা) মদীনায় সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন (জাম্হারা, পৃ. ৩৬৬)। আনসারগণ মুহাজিরগণকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাগ-বাগিচার ফলের অংশীদার করেন। উখুওওয়াতের (ভ্রাতৃত্বের) ভিত্তিতে মুহাজিরগণ আন্সারের উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কুরআন ইহা বিলুপ্ত করে (আল্-বুখারী, কিতাবুল-কাফালা)। মুহাজিরগণও কঠোর পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতেন এবং আনসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল কিছু পরে প্রত্যর্পণ করেন (আল্-বুখারী, কিতাবুল-হিবা)। এক সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইহাও চিন্তা ছিল, তিনি আন্সারকে বাহ্রায়নের জায়গীর প্রদান করিবেন (আল্-বুখারী, কিতাবুল-জিয্য়া)।

বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়, আনসারের মধ্যে অনেক বড় বড় মুহ'াদ্দিছ, ফকী'হ, রাবী, কবি, ক'াদী, ক্বারী ও মুফ্তী জন্মলাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবিদের মধ্যে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা), হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) ও হযরত কাব ইব্ন মালিকের (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি আন্সার পরিবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলামী দেশসমূহে বসতি স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ইব্ন হ'াযম জাম্হারা আনসাবিল-আরাব গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্সারের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান। ইশবীলিয়ায় শূশু'ল-আন্সার নামে একটি বসতি ছিল। লিসানুল-আরাব গ্রন্থের প্রণেতা ইব্ন মান্জূরও একজন আন্সার বংশোদ্ভূত ছিলেন। বিভিন্ন কবিও আন্সারের কর্মকাণ্ডের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কা'ব ইব্ন যুহায়র আন্সারের প্রশস্তিতে একটি কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন (Brockelmann, তারীফ আব্দিল-হালীম আন্-নাজ্জার, ১খ., ১৫৭)।

আন্সারের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এরও গভীর মহব্বত ছিল। তিনি তাঁহাদের অবদান, ত্যাগ ও কুরবানী যথার্থ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আন্সার প্রীতিকে তিনি ঈমানের অংগ বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই আন্সারের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতে পারে না। আন্সারের প্রতি বিদ্বেষকে তিনি মুনাফিকের প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) আন্সার ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের দোয়া করেন (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল-আন্সার; আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী, ২খ., ১৩৬-১৩৮)।

ইসলাম-পূর্ব যুগে ইয়াছরিববাসীদের অভ্যাস ছিল, হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহারা সম্মুখদরজার পরিবর্তে পেছন পথে গৃহে প্রবেশ করিতেন। ইহা বাতিল করিয়া কুর্‌আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি (২ ঃ ১৮৯) অবতীর্ণ হয় (মুসলিম, কিতাবুত্-তাফ্‌সীর) ঃ "পশ্চাৎ দিক দিয়া তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই, কিন্তু পুণ্য আছে কেহ তাক্'ওয়া অবলম্বন করিলে। সুতরাং তোমরা দ্বারসমূহ দিয়া গৃহে প্রবেশ কর"।

আন্‌সারকে সময় সময় অধিকতর স্পষ্টভাবে আন্‌স'আরু'ন-নাবী বা নবীর সাহায্যকারী বলা হইয়া থাকে। কুর্‌আনে 'ঈসা (আ) প্রসঙ্গে তাঁহার শিষ্যগণ সম্পর্কে আন্‌স'আরুল্লাহ (৩ ঃ ৫২, ৬১ ঃ ১৪) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈমানদারগণের উচিত আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হওয়া এই ধারণা আল্লাহ কুর্‌আনে কয়েকবারই প্রকাশ করিয়াছেন। 'তাহারা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্য মুসলিমগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে' বলিয়া কুর্‌আনে বিশেষ মর্যাদার সহিত মুহাজিরগণের সঙ্গে আন্‌সারেরও উল্লেখ করা হইয়াছে (৯ ঃ ১০০)। এতদ্ভিন্ন ৯ম সূরার ১১৭ আয়াতই কুর্‌আনের একমাত্র বাক্যাংশ যেখানে শব্দটি সরাসরি মদীনার মুসলমানদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুর্‌আন ২ঃ১৮৯; ৮ঃ৭২, ৭৪ ; ৯ ঃ ১০০, ১১৭; ৫৯ ঃ ৯; ৬১; ১৪; (২) আবূ দাঊদ আত্-তায়ালিসী, আল্-মুসনাদ (তাব্‌বীব, মিন্‌হাতুল-মাবূদ ফী তার্‌তীব মুসনাদিত্-তায়ালিসী আবী দাঊদ, সংকলন আহমাদ আবদুর রহমান আল-বান্না আস্-সা'আতী), ২খ, ১৯, ১৩৬-১৩৮, মিসর ১৩৭২ হি.; (৩) আল্-বুখারী, কিতাবুল-ঈমান, কিতাব মানাকিবিল আন্‌সার, কিতাবুল-উমরা, কিতাবুল-হারছ ওয়াল-মুযারাআ, কিতাবুল-হিবা, কিতাবুল-জিযয়া, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল-গাস্‌ব, কিতাবুল-কাফালা; (৪) মুস্‌লিম, কিতাবুত-তাফ্‌সীর (আয়াত ২ঃ ১৮৯); (৫) ইব্‌ন সা'দ, আত্-ত'াবাক'াত, ১/১খ., ১৪৫ প.; ১/২ খ., ১প., ৩/২ খ., ২১, নির্ঘণ্টও দ্র.); (৬) ইব্‌ন হাবীব, আল-মুহ'াব্বার, পৃ. ২৬৮, নির্ঘণ্ট দ্র., হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৬১ হি.; (৭) ইব্‌ন হ'াযম, জাম্‌হারাতু আনসাবিল আরাব (সম্পা. আবদুস সালাম হারূন), পৃ. ৩৩২-৩৬৬, ৪৭০-৪৭২, ৪৮১, মিসর ১৯৬২ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, জাওয়ামি'উস্-সীরা (সম্পা. ইহ্‌সান আব্বাস), পৃ. ৭৫, ৭৬, (নির্ঘণ্টও দ্র.), মিসর ১৯৫৬ খৃ.; (৯) ইব্‌ন দুরায়দ, কিতাবুল ইশ্‌তিক'াক, পৃ. ২৬০; (১০) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, ২খ., ৪৫ প.; (১১) ঐ লেখক, উস্‌দুল গ'াবা, কায়রো ১২৮৬ হি.; (১২) ইব্‌ন 'আসাকির, তারীখ দামিশ্‌ক, ৩খ., ৫১প.; (১৩) ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণ্যত্য; (১৪) ইব্‌ন খালদূন, তারীখ (ড. শায়খ 'ইনায়াতুল্লাহকৃত প্রথম খণ্ডের উর্দূ অনুবাদ), ১৮০-২০১, ৩০৫-৩১১, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (১৫) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা; (১৬) ইব্‌ন সায়্যিদিন-নাস, 'উয়ূনুল আছার, ১খ., ১৫৫ প., কায়রো ১৩৫৬ হি.; (১৭) ইব্‌নুল জাওযী, তালকীহ' ফুহূমি আহ্‌লিল্ আছার পৃ. ২১৩ প.; (১৮) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., ১৪৫ প., কায়রো ১৩৫৮ হি.; (১৯) ইব্‌নুল ক'ায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, ২খ., ৫০প., মিসর ১৩৪৭/১৯২৮; (২০) ইব্‌ন মান্‌জূ'র, লিসানুল আরাব (দ্র. নাস্‌র, আওস, খায্‌রাজ শব্দত্রয়), (২১) আবুল ফিদা, তারীখ, ১খ., ১০৭; (২২) আল্-বালাযু'রী, আন্‌সাবুল আশরাফ (সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ), ১খ., ২৩৮ প. (দ্র. নির্ঘণ্ট), মিসর ১৯৫৯ খৃ.; (২৩) ঐ লেখক, ফুতূহু'ল বুলদান, পৃ. ৯-২৩, কায়রো ১৩১৯ হি.; (২৪) আল-ইস্‌ফাহানী, আল-আগানী (নির্ঘণ্ট); (২৫) আল-জাহি'জ, কিতাবুল বুখালা, ২খ., ১০৬, কায়রো ১৯৪০ খৃ.; (২৬) আল্-হাল্লাবী, ইন্‌সানুল্ 'উয়ূন (আস্-সীরাতুল-হালাবিয়্যা), ২খ., ১৪ প.; (২৭) আদ্-দিয়ার বাক্‌রী, তারীখুল খামীস, ১খ., ৩১৬ প.; (২৮) আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা (সম্পা. সালাহুদ্-দীন আল-মুনাজ্জিদ), ৩খ., নির্ঘণ্ট, কায়রো; (২৯) ঐ লেখক, তারীখুল্-ইস্‌লাম, ১খ., ১৭১ প; ২খ., ৩৩ প; কায়রো ১৩৬৭ হি.; (৩০) আস্-সাম্‌হূদী, ওয়াফাউল্-ওয়াফা বি-আখ্‌বারি দারিল্-মুস্‌তাফা (সম্পা. Wustenfeld, ১৮৬০ খৃ.); (৩১) আস্-সুহায়লী, রাওদুল্ উনুফ, ১খ., ১৩ প., কায়রো ১৩৩২ হি.; (৩২) সু'বৃহি আস্-স'ালিহ্, আন্-নাজমুল ইসলামিয়্যা (নির্ঘণ্ট), বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫; (৩৩) আত্-তাবারী, তারীখ, ২খ., ২৩৪ (আরও দ্র. নির্ঘণ্ট); (৩৪) আবদুদ্-দাইম আল্-বাকারী, আল্-আন্‌সার ওয়াল ইস্‌লাম, কায়রো ১৩৬৪/১৯৫৪; (৩৫) উমার রিদ'া কাহ্'হ'ালা, মু'জামু ক'াবাইলিল্ আরাব, প্রথম খণ্ড (দ্র. আওস ও খায্‌রাজ শব্দদ্বয়), দামিশ্‌ক ১৯৪৯ খৃ.; (৩৬) আল্-ক'াসত'াল্লানী, আল্‌মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়্যা,১খ., ৭৬ প.; (৩৭) আল্-ক'ালক'াশান্দী, সু'বৃহুল-আ'শা, ১খ., ৩১৯, মিসর ১৩৪০ হি.; (৩৮) ঐ লেখক, নিহায়াতুল-আরাব ফী মা'রিফাতিল-আনসার (সম্পা. ইবরাহীম আল-আবয়ারী), কায়রো ১৯৫৯ খৃ.; (৩৯) আল-মাক'রীযী, ইম্‌তাউল-আসমা, ৩২ প.; (৪০) আন্-নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল আরাব, ২খ., ৩১৬, মিসর ১৩৪২ হি.; (৪১) আল-হাম্‌দানী, সি'ফাতু জাযীরাতিল 'আরাব, পৃ. ২১১; (৪২) ইব্‌ন সাল্লাম আল্-জুমাহী, ত'াবাক'াতুশ-শু'আরা; (৪৩) আমীন দুওয়ায়দার, সুওয়ারুম মিন হায়াতির-রাসূল, পৃ. ২১৮-২৩১, ২৫০-২৫৫, ৩৬১, মিসর ১৯৫৮ খৃ.।

আবদুল কায়্যুম (দা. মা. ই.) / মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আন্‌সার বাহিনী ঃ বাংলাদেশ আন্‌সার বাহিনী; বাংলাদেশে আনসার নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী রহিয়াছে। ইহা দেশরক্ষার দ্বিতীয় ব্যূহ হিসাবে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আমলে মদীনার আনসার যে ধর্মানুরাগ, দেশাত্মবোধ ও সমাজসেবার অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় ১৯৪৮ খৃ. (একটি অর্ডিন্যান্স বলে) এই বাহিনী গঠিত হয়। বর্তমানে এই বাহিনীর লোকবল আনুমানিক তিন লক্ষ। তাঁহারা সকলেই অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই বাহিনীর প্রধান কর্তব্য হইতেছে ঃ

(১) শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশের উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কর্মে অংশগ্রহণ করা।

(২) দেশে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনমত পুলিস ও সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করা।

(৩) জাতীয় জরুরী অবস্থায় সংকট মুকাবিলার কাজে সামরিক বাহিনীর সাহায্য করা।

(স.ই.বি., ১খ.)

'আন্সারা (عنصارة) ঃ একটি পর্বের নাম। ইবনুল হাজ্জ (তাজুল-মুলূক, কায়রো ১৩১২ হি.) শব্দটি মূল আরবী ধাতু ع-ص-ر হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশের বেশী কাল ধরিয়া একদিকে Dozy এবং অন্যদিকে Eguilaz y Yancas শব্দটিকে হিব্রু আসারা (আসরেছ = عصرث) শব্দজাত বলিয়া ধারণা প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, উহার অর্থ 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, বিশেষ করিয়া পেন্‌টিকস্ট (Pentecost) অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত জনসমাবেশ।' কিবতীদের (copts) মধ্যে এখনও ইহা পেনটিকস্ট পর্বের নাম (দ্র. Lane, Modern Egyptians, ২খ., ৩৬৫)। স্পেনে আলহানযারো, আলহানযারা বা আলহানসারা নামে বিদ্যমান শব্দটি খৃষ্টান ও মুসলিমগণ কর্তৃক সাধুজনের ভোজ উৎসবের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (তু. Dozy and Engelmann, Glossaire, পৃ. ১৩৫-৭; Eguilaz y Yancas, Glosario, পৃ. ১৮৭-৮)। আল-মাগ্‌রিবে আন্‌সারা (জেলাভেদে উচ্চারণ আন্‌সুরা, আন্‌সুলা; আন্‌সারা, আনসেরেছ) দ্বারা উত্তর অয়নান্ত (summer solstice)-এর উৎসব বুঝায়। জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে ইহার তারিখ হয় ২৪ জুন, আর গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে তারিখ হয় ৫ ও ৬ জুলাই এবং মরক্কোর সর্বত্র আলজিরিয়ার অধিকাংশ এলাকায় ইহা পালিত হয়, কিন্তু মনে হয় তিউনিসিয়াতে ইহার প্রচলন নাই। এই জনপ্রিয় উৎসবের মন্ত্রতন্ত্রের পদ্ধতির কারণে ইহার যাদুকরী ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই (ক) অগ্নি অনুষ্ঠান যে হয় তাহা সম্ভবত অয়নানকালে সূর্যকে অধিকতর শক্তি দানের কামনায়; একটি বৃহদাকার পাত্রে গাছ-গাছড়া, মৌচাক বা কুটির যে পোড়ান হয় তাহা হইতে সৃষ্ট ধূম্রকে মনে করা হয় সকল পাপ স্খালনকারী ও উর্বরতাদায়ক; (খ) পানি অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিক গোসল, পানি ছিটাইয়া দেওয়া, অগ্নিপাত্রের ছাইয়ের সংগে পানি মিশান, যাহা দ্বারা নূতন সৌর আবর্তনকালের শুরুতে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সংগে সুফলদায়ক জলীয় বাষ্প মিশ্রিত হইবার কামনা করা হয়। মাগ্‌রিবের আনসারা অনুষ্ঠানাদির সংগে মধ্যপ্রাচ্যের নওরোয (দ্র.) অনুষ্ঠানাদির মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসংগত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dozy and Engelmann, Glossaire de mots espagnols derives de l'arabe, পৃ. ১৩৫-৭, মাগরিবে প্রথম আগত ইউরোপীয় পর্যটকগণের প্রদত্ত তথ্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত; (২) Eguilaz y Yancas, Glosario de palabras espanolas de origen oriental, পৃ. ১৮৭-৮, স্পেনের তথ্য উৎসসমূহের অসংখ্য উল্লেখসহ; (৩) Destaing, Fetes et coutumes saisonnieres chez les Beni Snous, R. Afr., ১৯০৭ খৃ.; প্রধান প্রধান আরব লেখক যাঁহারা আনসারা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (যথা মাকরীযী, ইব্‌নুল-হ'াজ্জ, সূসী, মাজাবী, ওয়ারযীযী, বূনী) তাঁহাদের রচনার উদ্ধৃতিসমেত; (৪) Westermarck, Midsummer customs in Morocco, in Folklore, ১৯০৫ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Ritual and belief in Morocco, ২খ., ১৮২-২০৭; (৬) E. Doutte, Marrakech, পৃ. ৩৭৭-৮২; (৭) ঐ লেখক, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, পৃ. ৫০৫ প.; (৮) W. Marcais, Textes arabes de Tanger, পৃ. ১৫২ প. ও ৩৯২; (৯) A. Bel, Feux et rites du solstice d'ete en Berberie, Melanges Gaudefroy-Demombynes, কায়রো ১৯৩৫-৪৫ খৃ., পৃ. ৪৮-৮৩; (১০) G. S. Colin, Chrestomathie marocaine, পৃ. ২০৫; (১১) E. Laoust, Noms et ceremonies des feux de joie chez les Berberes du Haut et de l'anti-Atlas, Hesperis ১৯২১ খৃ.।

Ph. Marcais (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আল্-আনস'ারী আল্-হারাবী (الانصارى الهروى) ঃ আবূ ইসমা'ঈল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন মান্‌সূ'র ইব্‌ন মাত্‌ত আল-আন্‌স'রী আল্-হারাবী আল্-হ'াম্বালী ২ শা'বান, ৩৯৬/৪ মে, ১০০৫ সালে হারাত-এর কুহান্‌দিয দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। একজন বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা হিসাবে তিনি শৈশবেই আবূ মানসূ'র আল-আয্‌দী, আবুল ফাদ্'ল আল-জারূদী ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আম্মার-এর শিষ্যত্ব লাভ করেন যাঁহারা তাঁহাকে হ'াদীছ ও তাফ্‌সীর শিক্ষা দেন। প্রথমদিকে শাফি'ঈ শিক্ষকদের নিকট পড়াশুনা করায় তিনি শাফি'ঈ মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অচিরেই তিনি হ'াম্বালী মতবাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ৪১৭/১০২৬ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে আল-আস'াম্ম-এর শিষ্যদের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং পরে তূস ও বিসত'াম গমন করেন। ৪২৩/১০৩১ সালে তিনি হজ্জ পালন করেন। আবূ মুহাম্মাদ আল্-খাল্লাল-এর পাঠচক্রে যোগদানের জন্য পথিমধ্যে বাগদাদে তিনি যাত্রাবিরতি করেন। বাগদাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আবুল হাসান আল্-খিরক'ানীর সংস্পর্শে আসেন, যিনি তাঁহার (আল্-আনসারীর) আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। অবশ্য তাঁহার পিতা আবূ মানসূর-এর অনুপ্রেরণাতেই তিনি আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা করেন। তাঁহার পিতা বাল্‌খ-এর শারীফ আল্-আকীলীর মুরীদ ছিলেন। পরিশেষে তিনি হারাত নগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানে তিনি ধর্মতত্ত্ববিদদের সহিত তর্কবিতর্ক ও শিষ্যদের শিক্ষাদান কাজে সময় ব্যয় করেন। তর্কযুদ্ধের ফলে তাঁহাকে পাঁচবার মৃত্যুভীতির সম্মুখীন হইতে এবং তিনবার নির্বাসন ভোগ করিতে হয়।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার জন্মস্থানে তিনি 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত হন এবং ২২ যুল-হিজ্জা, ৪৮১/৮ মার্চ, ১০৮৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার জীবনীকারগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার কতিপয় গুণ তথা তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার জ্ঞানের প্রসার, কুরআন, সুন্না ও ইমাম ইব্‌ন হ'াম্বাল-এর মতবাদের প্রতি তাঁহার অদম্য আগ্রহও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল গুণের কারণে তিনি তাঁহার শত্রুগণ কর্তৃক গোঁড়া ধর্মান্ধ ও নরত্বারোপবাদে (Anthropomorphism) বিশ্বাসী বলিয়া অভিযুক্ত হন।

স্বীয় রচনাবলীতে তাঁহার সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তাসাওউফের ক্ষেত্রে সাজা' (سجع) রীতি বা কাব্যে রচিত তাঁহার 'মুনাজাত' ও অন্যান্য রচনায় তিনি অন্তরের আকুল আবেগ ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত রচনা বর্তমানে ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 'মানাযিলুস-সাইরীন' (منازل السائرين) নামক তাঁহার মূল্যবান আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক রচনা, সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মৌলিকত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক দিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয় (তাঁহার এই গ্রন্থখানার অগণিত ভাষ্যকার ইহাকে সূফীবাদের ইতিহাসে উচ্চাসনে স্থান দিয়াছেন)। তাঁহার ত'াবাক'াতুস সূ'ফিয়া (طبقات الصوفية) নামক গ্রন্থখানি, আস-সুলামীর রচনা ও জামীর নাফাহ'াত (نفحات) নামক রচনার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারীর ভূমিকা পালন করিয়াছে। ইহা একাধারে যেমন একখানি জীবনী সংক্রান্ত দলীল, অপরদিকে ইহা হারাত নগরীতে ৫ম/১১শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত কথ্য ভাষাসমূহের বাস্তব নিদর্শন। সর্বশেষে যাম্মুল-কালাম ওয়া আহলিহ (ذم الكلم واهله) নামক তাঁহার গ্রন্থখানা যুক্তিনির্ভর ধর্মতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের প্রধান উৎস।

তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ আবুল-ওয়াকত 'আবদুল-আওওয়াল আস্-সিজযী, মুতামিনুস- সাজী এবং সর্বোপরি ইয়ূসুফ আল্-হামাযানী, যিনি ছিলেন তাঁহার ভাবশিষ্য।

গ্রন্থপঞ্জী (১) Storey, ১খ., ৯২৪-৬; (২) Brockelmann, ১খ., ৪৩৩, SI, ৭৭৪; (৩) H. Ritter, in Isl., ১৯৩৫, ৮৯-১০০ (তাঁহার অদ্যাপি বর্তমান গ্রন্থাবলী, বিশেষত উহাদের পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত); (৪) ইব্‌ন আবী ইয়া'লা, ত'াবাকাতুল হ'ানাবিলা, দামিশ্‌ক ১৩৫০ হি., ৪০০; (৫) ইব্‌ন রাজাব আল-বাগদাদী, ত'াবাকাতুল-হ'ানাবিলা (Laoust), নং ২৭; (৬) জামী, নাফাহাতুল-উনস (Lees), ৩১৬; (৭) যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, MS. Brit. Mus. Or. ৫০, P. ২৭৫২৪, ১৭৬ b; (৮) ঐ লেখক, তায'কিরাতুল হুফফাজ, হায়দরাবাদ, ৩৭৫; (৯) সুব্‌কী, ত'াবাক'াতুশ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো, ৩খ., ১১৭; (১০) 'মুসাজ্জা'আত' সম্পর্কে দ্র. Browne, ২খ., ২৬৪; (১১) 'মুনাজাত', সম্পা. Kaviani, বার্লিন ১৯২৪; (১২) ইলাহী-নামাহ, সম্পা. ও অনু. BIFAO, 47; (১৩) তাবাকাত গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে দ্র. Ivanow, in JRAS, ১৯২৩, ১-৩৪, ৩৩৭-৮২; (১৪) 'মানাযিল' সম্পর্কে দ্র. (ক) ইব্‌ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যার, মাদারিজুস-সালিকীন, কায়রো ১৯৫৬; (খ) আনসারিয়্যাত সংগ্রহ, IFAO; (গ) MIDEO-এর কতিপয় প্রবন্ধ, কায়রো ও (ঘ) K. Sad Maydan, in Mel. Islam., IFAO, ১৯৫৪।

S. De Beaurecueil (E.I.[2]) এ.কে.এম. ফারুক

আন্‌সারী, ডাঃ মুখতার আহমাদ (انصارى الدكتور مختار احمد) ঃ ডাক্তার এম. এ. আনসারী নামে পরিচিত, (১৮৮০-১৯৩৬ খৃ.), খেলাফত আন্দোলন ও উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক। জন্ম ভারতের উত্তর প্রদেশের গাযীপুর জেলার ইউসুফপুরের এক সুন্নী পরিবারে ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃ.। পিতার নাম হ'াজ্জী আবদুর-রাহ'মান ও মাতার নাম ইলাহান বীবী (Elahan Bibi, মৃ. এপ্রিল ১৯২১)। পূর্বপুরুষেরা সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলাক-এর শাসনামলে (১৩২৫-১৩৫১ খৃ.) ভারতবর্ষে আগমন করিয়া রাজকীয় সেনাবাহিনীতে ও রাজদরবারে উচ্চ পদ লাভ করেন। পরে তাঁহারা ইউসুফপুরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ক্ষুদ্র জমিদার পরিবার হিসাবে ক্রমশ উন্নত হইয়া উঠিলেও পরে আনসারীর জন্মের সময় ইহার কিছু আর্থিক অবনতি ঘটে। দেওবান্দ (দ্র.)-এর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য। আন্‌সারীর এক ভ্রাতা আবদুল-ওয়াহ্‌হাব রাশীদ আহ'মাদ গাঙ্গুহী (র)-এর শিষ্য ছিলেন এবং অপর ভ্রাতা আবদুর-রাযযাক ছিলেন শায়খুল-হিন্দ মাহ'মূদ হাসান (র)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরামর্শদাতা; ইনি 'রেশমী রুমাল কার্যক্রমের সহিত জড়িত ছিলেন (Robinson, Separatism Among Indian Muslims, পৃ. ২৮০, ২৯২ প., ৩৩৬; Sen, D. N. B., পৃ. ৬৫)।

আন্‌সারী নিজ বাড়ীতে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। গাযীপুরের ভিকটোরিয়া হাই স্কুল হইতে ১৮৯৬ খৃ. তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা (D. N. B., পৃ. ৬৫; তু. Separatism, পৃ. ৩৬৭) ও এলাহাবাদের এম. সি. কলেজ হইতে ১৮৯৮ খৃ. এফ. এ. পরীক্ষা পাস করেন। অতঃপর তিনি হায়দরাবাদের নিজামের কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৮৯৯ খৃ. তাঁহার চাচাত বোন শামসুন-নিসা বেগম (মৃ. ডিসেম্বর ১৯৩৮)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বিবাহের পূর্বে গৃহে অধ্যয়ন করিয়া হ'াদীছ, ফিক্‌হ ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান লাভ ও কুরআন শারীফ মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই (ঐ, পৃ. ৬৬)।

১৯০০ খৃ. মাদ্রাজ মেডিকাল কলেজ হইতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রী প্রাপ্তির পরই ১৯০১ সালে আনসারী চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিজাম এস্টেট স্কলারশিপে ইংল্যান্ড গমন করেন। ১৯০৩ খৃ. এল. আর. সি. পি. (L. R. C. P.) ও এম. আর. সি. এস. (M.R.C.S.) পাস করিয়া ১৯০৫ সালে তিনি এম. ডি. (M. D.) ও এম. এস. (M. S.)-এর যোগ্যতা পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। ফলে তিনিই হইলেন একমাত্র ভারতীয় চিকিৎসক যিনি লন্ডনের লক (Lock) হাসপাতালের 'রেজিস্ট্রার' হইবার গৌরব লাভ করেন (Separatism. পৃ. ৩৬৭)। পরে তিনি লন্ডনের চারিং ক্রস (Charing Cross) হাসপাতালের 'হাউজ সার্জন' নিযুক্ত হন এবং ইংল্যান্ডের রাজার Honorary Surgeon Dr. Boyd-এর অধীনে কাজ করার সুযোগ পান। শল্যচিকিৎসায় তাঁহার বিশিষ্ট কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ উক্ত হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডের নাম রাখা হয় 'আনসারী ওয়ার্ড' (ঐ, পৃ. ৬৬)।

ইংল্যান্ডে দশ বৎসর (১৯০১-১৯১০ খৃ.) অবস্থানকালে তিনি 'ইন্ডিয়ান মেডিকাল এসোসিয়েশন'-এর প্রথমে সচিব ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই সময় কতিপয় ভারতীয় নেতা প্রায়ই লন্ডন গমন করিতেন। তাঁহাদের সহিত আনসারীর সাক্ষাৎ হইত। ফলে ভারতের জাতীয় সমস্যাবলীর সহিত তিনি পরিচিত হন, কিন্তু তখনও তিনি রাজনীতি আরম্ভ করেন নাই। লন্ডনেই মতিলাল নেহরু, হাকীম আজমাল খান (দ্র.) ও জাওহার লাল

নেহরুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় যাহা মৃত্যু পর্যন্ত অটুট থাকে।

১৯১০ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনসারী হায়দারাবাদ ও ইউসুফপুর শহরে স্বল্পকাল অবস্থান করেন। অতঃপর লাহোর মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি দিল্লীতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১২ খৃ. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী তাঁহার 'কমরেড' পত্রিকাসহ দিল্লীতে আসার পরেই আনসারী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ আরম্ভ করেন (Separatism, পৃ. ৩৬৭)। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বলকান যুদ্ধরত তুর্কী সৈন্যদের সাহায্যে প্রেরিত 'আনসারী মেডিকাল মিশন'-এর তিনি নেতৃত্ব দান করেন। ভারতীয় মুসলিম নেতাগণ [যথা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (দ্র.), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (দ্র.) ও হাকীম আজমাল খান (দ্র.)] মুসলমানদের স্বার্থে এই মিশনটির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ভারতের তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ইহাতে পূর্ণ সমর্থন দান করে (Separatism, পৃ. ২০৭)।

১৯১৫ সালে আন্‌সারী আলীগড়ের ট্রাস্টী নিযুক্ত হন। একই বৎসর তিনি 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ও 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন'-এর সদস্য পদ লাভ করেন (Separatism, পৃ. ৩৬৭)।

তৎকালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক দিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর অতি নিকটবর্তী ছিল বলিয়া একই ব্যক্তি একই সময়ে উভয় সংস্থার সদস্য হইতে পারিতেন। আনসারী উভয় সংগঠনের সদস্য ছিলেন এবং ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই বৎসর ১ জানুয়ারী নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে 'কংগ্রেস-লীগ সংস্কার কমিটি' গঠিত হয়। আনসারী ইহার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন (Pirzada, Foundations of Pakistan, পৃ. ৩৫৬)। তাঁহারই উদ্যোগে ১৯১৭ সালে দিল্লীতে 'Home Rule League' গঠিত হয় এবং তিনি ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন (Singh, Freedom Movement in Delhi, পৃ. ২৪৩-৪৪)। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসাবে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কুরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া খেলাফতের পক্ষে ও উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রতি শর্তহীন সমর্থন জানান। বৃটিশ সরকার ইহাকে 'আইনের আওতা বহির্ভূত' ঘোষণা করে (Disorders Enquiry Committee Evidence, ১খ.; Freedom পৃ. ২৫৪ প., ২৬৪; Foundations, পৃ. ৪৭৩-৭৪, ৪৯৭)। খেলাফত সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করার জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট 'আলিমগণকে এই অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান জানান (Separatism, পৃ. ২৬০ প., ২৮৭)। অনেক আলিম তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন। পূর্বে 'অসহযোগ' আন্দোলনের বিরোধী হইলেও সেপ্টেম্বর ১৯২০-এর পর হইতে আনসারী এই আন্দোলনের পক্ষে কার্যকর সমর্থন দিতে থাকেন। সেই বৎসর তিনি মুসলিম লীগের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

মুসলিম লীগের ন্যায় কংগ্রেসেও আনসারীর স্থান ছিল অনেক উচ্চে। প্রায় সারা জীবনই তিনি কংগ্রেসের পরিচালনা কমিটির (Working Committee) সদস্য ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি দিল্লীতে 'প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি' গঠন করেন। ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩১-৩২ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সচিব ছিলেন। ১৯২৭ খৃ. তিনি সি. আর. দাস হইতে ইহার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত সালে তিনি সংগ্রেসের Civil Disobedience Enquiry Committee-রও সদস্য হন। একই বৎসর তিনি কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার দিল্লীস্থ বাসভবন 'দারুস-সালাম' কার্যত সংগ্রেস ভবনের মত ব্যবহৃত হইত। দিল্লী আসিলেই গান্ধীজী তথায় অবস্থান করিতেন, (Freedom পৃ. ২৭১, ২৭৩; D.N.B., পৃ. ৬৬; Separatism, পৃ. ৩৬৭; Nehru, An Ltobiography, পৃ. ১০৭ প.)।

১৯২২ খৃ. গয়ায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্স'-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। খেলাফত-এর পক্ষে তিনি কুরআন-হাদীছ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া সুযোগমত জোরাল বক্তৃতা দিতেন। 'মুসলিম জাতীয় দল'-এর নেতৃস্থানীয় সদস্য ও 'নব্য রাজনীতিবিদ দল' (Young Party)-এর 'প্যান ইসলামিস্ট' নেতাদের ১ম শ্রেণীভুক্ত হিসাবে তিনি ভারত হইতে বৃটিশ সরকার উৎখাতের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন (Freedom, পৃ. ২৭১; Foundations, পৃ. ৫৩৬, ৫৭২; Separatism, পৃ. ৩৩৬, ২৮৫-৮৭, ৩৪০, ২৪০, ২৯২ প., ৩৫০)। ১৯২০ খৃ. হইতে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকীম আজমাল খানসহ তিনি ছিলেন মুসলিম দলসমূহ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মাধ্যম। তাঁহার এই রাজনৈতিক মধ্যস্থতার ভূমিকা তাঁহাকে ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দিকে 'কংগ্রেস হাই কমান্ড-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে উন্নীত করে (Separatism, পৃ. ৩৪১, ৩৪৩, ৩৬৭)।

'অসহযোগ' আন্দোলনের সময় আনসারী উচ্চ শিক্ষার জন্য স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীর জামি'আ মিল্লিয়্যা ইসলামিয়্যা (২৯ অক্টোবর, ১৯২০) ও বেনারসের কাশী বিদ্যাপীঠ (Kashi Vidyapith) স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটির ১ম চ্যান্সেলর (১৯২০-১৯২৭ খৃ.) হাকীম আজমাল খানের মৃত্যুর পর আনসারী ১৯২৮ সালে ইহার চ্যান্সেলর (আমীর-ই জামি'আ) নির্বাচিত হন এবং আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (D.N.B., পৃ. ৬৭)।

আনসারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী দিল্লীর মহিলাদের কল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই ধার্মিক ও রক্ষণশীলা মহিলা বোরকা পরিধান করিয়া দিল্লীর দরয়াগঞ্জের পর্দা গার্ডেন (Parda Garden)-এর মহিলা ক্লাবের সভায় নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন। এই ক্লাবের তিনি কিছুকাল সচিব ও সভাপতি ছিলেন (D.N.B., পৃ. ৬৭)।

বিভিন্ন রাজনৈতিক, শিক্ষা সম্পর্কীয় ও সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আনসারী তাঁহার পেশাগত কর্তব্যে অবহেলা করিতেন না। রোগীদের

কেবল নিয়মিতভাবে চিকিৎসা করাই নয়, বরং চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বশেষ আবিষ্কারসমূহের সহিতও তিনি নিজকে অবহিত রাখেন। ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে বিদেশী সাময়িকীতে লেখা, কংগ্রেসের সাধারণ সচিব হিসাবে ইহার বার্ষিক রিপোর্ট ও সভাপতির ভাষণ প্রস্তুত করা ছাড়াও তিনি The Regeneration of Man (Thacker Spink & Co., 1935) শীর্ষক একটি চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লিখন ও বাচনভঙ্গী ছিল সহজ ও প্রত্যক্ষ। অপ্রয়োজনীয় সূচনা ও শব্দ ব্যবহার হইতে বিরত থাকিয়া তিনি সর্বদা সরাসরি মূল বিষয়বস্তুর আলোচনা আরম্ভ করিতেন। তিনি একজন শিল্পানুরাগী ছিলেন।

শেষ বয়সে আনসারী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। কিছুকাল রোগ ভোগের পর ১০ মে, ১৯৩৬ খৃ. Mussoorie হইতে রামপুরের নওয়াবকে পেশাগতভাবে দেখিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনের মধ্যে ভোরে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামি'আ মিল্লিয়্যা ইসলামিয়ার পার্শ্বে দাফন করা হয় (D. N. B., পৃ. ৬৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge University Press, Cambridge (England) 1973; (২) Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), Foundations of Pakistan, All-India Muslim League Documents: 1906-1947, ১খ., ঢাকা তা. বি.; (৩) Sangat Singh, Freedom Movement in Delhi (1858-1919), New Delhi 1972; (৪) D. G. Tendulkar, Life of Mahatma Ghandhi, ৪খ.; (৫) Pattabhi Sitaramayya, The History of the Congress, ১খ.; (৬) Harijan, May 16, 1936; (৭) Congress Presidential Addresses, San & Co. Publ., Madras; (৮) Indian National Congress, 34th Annual Session, 1919-20, Prodgs, volume; (৯) S.P. Sen (ed.) Dictionary of National Biography (D. N. B.), ১খ., কলিকাতা ১৯৭২; (১০) Gail Minault, The Khilafat Movement, দিল্লী ১৯৮২; (১১) Comrade, Delhi 26 October, 1912; (১২) J. Nehru, An Autobiography, লন্ডন ১৯৩৬; (১৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৩৮।

ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আনস'ারী, শায়খ মুরতাদ'া (انصاری، شیخ مرتضی) : পাশ্চাত্য জগতে অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও একজন শী'আ মুজতাহিদ হিসাবে বিবেচিত এবং শী'আ জগতে তাঁহার ব্যাপক স্বীকৃত ধর্মীয় নেতৃত্বকে এখন পর্যন্ত কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি ১২১৪/১৭৯৯ সালে ইরানের দক্ষিণে দিযফুলের এক প্রসিদ্ধ, অথচ দরিদ্র পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বংশের দিক হইতে তিনি মহানবী (স)-এর সাহাবী জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আনসারী (রা) মৃ.-এর সহিত সম্পর্কিত। কুরআন তিলাওয়াত ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিষয়গুলি শিক্ষা করিবার পর আনসারী ১২৩২/১৮১৬ সালে তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ আমীন-এর সহিত ইরাকের মাযার নগরীগুলি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, তাঁহার চাচা শায়খ হুসায়ন আনসারীর অধীনে লেখাপড়া করেন। কারবালাতে অবস্থানকালে তিনি তৎকালীন শী'আ নেতা সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুজাহিদ (মৃ. ১২৪২/১৮২৬)-এর শিক্ষাচক্রে যোগদান করেন। তিনি আনসারীকে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরূপে দেখিতে পান এবং তাঁহাকে কারবালাতে রাখিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার পিতাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ইহার পর আনসারী মুজাহিদের অধীনে আনুমানিক ১২৩৬/১৮২০ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এই সময় তৎকালীন পারস্য-উছমানী বিরোধের ফলে বাগদাদের উছমানী শাসনকর্তা দাঊদ পাশার আরোপিত কড়াকড়ির কারণে আনসারী অন্যান্য শত শত ইরানীর সহিত কারবালা হইতে পলায়ন করেন (S.H. Longrigg, Four centuries of modern Iraq, Oxford 1925, 242-9: Sir Percy Sykes, A History of Persia, ii, repr. London1963, 316ff.)। অতঃপর আনসারী দিযফুলে ফিরিয়া আসেন।

আনুমানিক ১২৩৭/১৮২১ সালে আনসারী আবার কারবালা গমন করেন এবং বিখ্যাত মুজতাহিদ মুল্লা মুহাম্মাদ শারীফুল 'উলামা (মৃ. ১২৪৫/১৮২৯)-এর শিক্ষাচক্রে যোগদান করেন। আনুমানিক ১২৩৮/১৮২৯ সালে তিনি নাজাফ রওয়ানা হন এবং শায়খ মূসা কাশিফুল-গি'ত'া (মৃ. ১২৪১/১৮২৫)-র শিষ্যত্বে অধ্যয়ন চালাইয়া যাইতে থাকেন। এক বৎসর বা অনুরূপ সময়ের পর তিনি আবার নিজ শহর দিযফুলে ফিরিয়া আসেন। বিভিন্ন ইরানী শহরে ধর্মীয় শিক্ষাচক্রে যোগদানের উদ্দেশে ১২৪০/১৮২৪ সালে মাশহাদের দিকে রওয়ানা হইয়া আনসারী বুরূজিরদ-এ শায়খ আসাদুল্লাহ বুরূজিরদী (মৃ. আনু. ১২৭১/১৮৪৫) (আবদুল-আযীয, সাহিবুল-জাওয়াহির, দাইরাতুল-মা'আরিফিল-ইসলামিয়্যা, ঈরান ওয়া হামায়ি মাআরিফ-ই শীআয়ি ইমামিয়্যায়ি ইছনা আশারিয়্যা, ২খ., তা. বি., ১৫৫, 'আসাদুল্লাহ' শিরোনামে) এবং ইসফাহানে সায়্যিদ মুহাম্মাদ বাকির শাফতী (মৃ. ১২৭০/১৮৫৩)-এর শিক্ষাচক্রে যোগদান করেন [মুহাম্মাদ রিদ'া আর-রাদাবী আল-খাওয়ানসারী কর্তৃক লিখিত আনসারীর জীবনী, কিতাবুল-মাতাজির (আল-মাকাসিব) তেহরান ১৯০৮, ১; কিন্তু কোন শিক্ষাচক্রেই তিনি এক মাসের অধিক ছিলেন না। আনসারী কাশানে মুল্লা আহমাদ নারাকীর (মৃ. ১২৪৫/১৮২৯) সংগে সাক্ষাতের পর সেইখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ তিনি নারাকীর শিক্ষাচক্রকে শিক্ষা লাভের জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূল দেখিতে পান। নারাকীও আনসারীকে (তখন তাঁহার বয়স আনু. ৩০ বৎসর) অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন দেখিয়া মন্তব্য করেন, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতায় কখনও আনসারীর ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুজতাহিদের সাক্ষাৎ পান নাই (মুরতাদ'া আল-আনস'ারী, যিনদিগানী ওয়া শাখসি'য়্যাত-ই শায়খ-ই আনস'ারী কু'দদিসা সিররুহু, আহওয়ায [তথা লিখিত] ১৯৬০, ৬৯।

১২৪৪/১৮২৮ সালে আনসারী মাশহাদের উদ্দেশে কাশান ত্যাগ করেন এবং কয়েক মাস সেইখানে অবস্থানের পর তেহরানে গমন করেন।

১২৪৬/১৮৩০ সনে তিনি দিযফুলে ফিরিয়া আসেন। সেই শহরে অন্যান্য বিশিষ্ট উলামার উপস্থিতি সত্ত্বেও ধর্মবিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি বিপুল স্বীকৃতি লাভ করেন। কথিত আছে, আনসারী কিছুদিন পর হঠাৎ গোপনে দিযফুল ত্যাগ করেন। কারণ ধর্মীয় আইনের বিচারক হিসাবে একটি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে একতরফা রায় দেওয়ার জন্য তাঁহার উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর তিনি আনু. ১২৪৯/১৮৩৩ সনে নাজাফ-এ আগমন করেন এবং সেইখানে শায়খ 'আলী কাশিফুল-গি'ত'ার (মৃ. ১২৫৪/১৮৩৮) শিক্ষাচক্রে, অন্য সূত্রমতে শায়খ মুহ'াম্মাদ হ'াসান স'াহি'বুল-জাওয়াহির (মৃ. ১২৬৬/১৮৪৯)-এর শিক্ষাচক্রে যোগ দেন, কিন্তু প্রতিটি চক্রে মাত্র কয়েক মাসের জন্য। শীঘ্রই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজস্ব শিক্ষাচক্র গড়িয়া তোলেন।

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সকল শী'আ সম্প্রদায়ের চার কোটি লোকের বিপুল স্বীকৃতি পাওয়ার পর ১২৬৬/১৮৪৯ সনে বিশিষ্ট ধর্মীয় আলিম হিসাবে আনসারীর জীবন এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করে যাহার ফলে তাঁহার মাধ্যমে মারজা'-ই তাক'লীদ (দ্র.) প্রতিষ্ঠানটি উহার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করে। আনসারীর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মুহাম্মাদ হাসান ই'তিমাদুস-সালতানা লিখিয়াছেন ঃ 'ইরানের ১২ ইমামে বিশ্বাসী শী'আ জনগণ, ভারতবর্ষ, রাশিয়া ও কতিপয় উছমানী প্রদেশে, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তানের বিভিন্ন শহরে এবং অন্যত্র যে বহু সংখ্যক শী'আ সম্প্রদায় বসবাস করে তাহারা তাহাদের আওকাফ-এর আয়, খয়রাতি কর, তাহাদের বাৎসরিক সঞ্চয়ের এক-পঞ্চমাংশ....... এবং এই ধরনের অন্যান্য অর্থ আনসারীর নিকট প্রেরণ করিত যাহার পরিমাণ বৎসরে ২,০০,০০০ তুমান (আনু. বার্ষিক ৩০,০০০ ডলার)-এর সমান হইত' (আল-মাআছি'র ওয়াল-আছার, তেহরান ১৮৮৮, পৃ. ১৩৬-৭)।

বিপুল আয় ও অভূতপূর্ব নেতৃত্ব সত্ত্বেও আনসারী, অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণমতে, আপন পরিবারবর্গকে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন হইতে বঞ্চিত করেন এবং তাঁহার নিজের চেহারা হইতেও বুঝা যাইত, তিনি কঠোর কৃচ্ছ্র জীবন যাপন করেন (তু. অন্যান্যের মধ্যে মুহাম্মাদ হিরযুদ্দীন, মা'আরিফুর-রিজাল, ২খ., নাজাফ ১৯৬৪, পৃ. ৩৯৯-৪০৪)। পক্ষান্তরে তিনি এই অর্থ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে, ধর্মীয় শিক্ষালয়ের ছাত্রগণকে এবং কখনও কখনও যে সকল মুসলিম মাশহাদে ইমাম রিদ'ার সমাধি যিয়ারতে যাওয়ার পথে তুর্কীদের হাতে বন্দী হইয়াছিল তাহাদেরকে দান করিতেন। আনসারী যখন ১২৮১/১৮৬৪ সনে ইন্তিকাল করেন তখন তাঁহার সম্পদ ও জিনিসপত্রের মূল্য ছিল মাত্র ১৭ তুমান (তিন ডলারেরও কম), সমপরিমাণ অর্থ তাঁহার ঋণ ছিল। ফলে তাঁহার অনুসারীদের একজন তাঁহার কাফন-দাফনের খরচ বহন করেন।

অবশ্য আনসারীর ধর্মনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি আলিম হিসাবে তাঁহার যোগ্যতা তাঁহার এইরূপ স্বীকৃতির কারণ। তবে তাঁহার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য কারণও সহায়ক ছিল। তৎকালীন মহান মারজা'-ই তাক'লীদ স'াহি'বুল-জাওয়াহির তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আনসারীকে শী'আদের একমাত্র আইনসংগত 'মারজা'-ই তাক'লীদ' বলিয়া ঘোষণা করেন। এই স্বীকৃতি, অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্ম-বিশেষজ্ঞ, যেমন শায়খ মুহাম্মাদ হুসায়ন স'াহি'বুল-ফুসূ'ল (মৃ. ১২৬১/১৮৪৫)-এর আশু মৃত্যুর ফলে অবিসম্বাদিত হয়। তদুপরি এই ঘটনাপ্রবাহের পূর্ব হইতেই ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে ইসফাহানের গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। সাফাবী বংশের পতনের পর হইতে এই গতিধারার সূত্রপাত হইয়াছিল। শাফ্তী ও ইবরাহীম কারবাসীর (মৃ. ১২৬২/১৮৪৫) মত ইসফাহানের ধর্মবিশেষজ্ঞদের মৃত্যুতে ইহা আরও ত্বরান্বিত হয়। ফলে নাজাফ তখন হইতে শী'আদের অভূতপূর্ব মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকে এবং সর্বাধিক দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় আনসারীর ব্যক্তিত্বের উপর।

আনসারী শুধু শী'আ নেতৃত্বের ইতিহাসেই নবযুগের সৃষ্টি করেন নাই, তিনি শী'আ আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ছিলেন এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি আইনের মূলনীতির (اصول) ক্ষেত্রে এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ আইনে শী'আ 'উলামা' সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালের সমস্যা 'দূষণীয় নয় নীতি' (কা'ইদা লা দ'ারার- قاعده لاضرر)-এর তিনি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়াছিলেন তাহা সাধারণভাবে ইজতিহাদ প্রয়োগ, বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সমস্যার সমাধানে এক স্পষ্টতর পন্থার উদ্ভাবন করে। সংশ্লিষ্ট যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি মারজা'-ই তাক'লীদ হইবার যোগ্য, এই নীতির উপর আনসারীর পদ্ধতিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তিনি বলেন, 'আক'ল (যুক্তি) ও 'উরফ (সামাজিক প্রথা ও সাধারণ রীতিনীতি)-কে নূতন আইন প্রবর্তনের মানদণ্ড ও ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইস্তিস্'হ'াব, বারাআ ও জ'ান্ন রীতির মত উসূল সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক অভিমত প্রদানে সক্ষম বিশেষজ্ঞ হিসাবেও তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয়। এইগুলির প্রতিটি আনসারী স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন (উক্ত শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার জন্য তু. জাফার সাজ্জাদী, ফারহান্গ-ই উলূম-ই নাকলী ওয়া আদাবী, তেহরান ১৯৬৫, পৃ. ৫১-৩, ১৩৬, ৩৫৯)।

শী'আ ধর্মীয় মহলে আনসারীর চিন্তারীতি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই স্পষ্টত প্রবল হইয়া উঠে এবং অধিকাংশ শী'আ আলিম কর্তৃক তাঁহার মতবাদ আলোচিত ও গৃহীত হয়। আনসারীর ভ্রাতার এক বংশধর ১৪৪ জন মুজতাহিদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যাঁহারা আনসারীর বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষ্য লিখেন (আনসারী, যিনদিগানী, পৃ. ৩৫৪-৮৭)। পরবর্তী কালের 'আলিম সম্প্রদায়ের উপর আনসারীর প্রভাব, শী'আ ধর্মবিশেষজ্ঞগণ সম্পর্কে সংকলিত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ক অভিধানসমূহেও পাওয়া যাইতে পারে (তু. গ্রন্থপঞ্জী)। আনসারীর চিন্তাধারার প্রভাব আরও দেখিতে পাওয়া যায় বিভিন্ন শী'আ সম্প্রদায়ের জন্য রচিত আইনে। কারণ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সহিত যাঁহারা জড়িত ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আনসারীর শিষ্য কিংবা পরোক্ষভাবে তাঁহার চিন্তাধারার প্রভাবাধীন ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে শী'আ আইনের উপর মূলত প্রতিষ্ঠিত পারস্যের দেওয়ানী আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং যিনি "রুশ ভাষায় ইসলামী আইনের অনুবাদ করেন এবং যে আইনে আদালতে ককেসাসের মুসলমানদের বিচার করা হইতেছিল" তিনি ছিলেন আনসারীর একজন শিষ্য, মীরযা কাজিম বে (মাহ্দী খান মুম্তাহিনুদ-দাওলা, শাকাকী, খাতিরাত, তেহরান ১৯৭৪, পৃ. ১১০)।

বহু শিক্ষার্থী আনসারীর শিক্ষাচক্রে যোগদান করেন, তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব যুগের শ্রেষ্ঠ 'মারজা'-ই তাক্‌লীদ' হইয়া উঠিয়াছিলেন। যেমন হুসায়ন কুহকামারী (মৃ. ১২৯১/১৮৭৪), মুহাম্মাদ ঈরওয়ানী (মৃ. ১৩০৬/১৮৮৮), হাবীবুল্লাহ রাশ্‌তী (মৃ. ১৩১২/১৮৯৪), মুহাম্মাদ হাসান শীরাযী (মৃ. ১৩১২/১৮৯৪) ও মুহাম্মাদ কাজিম খুরাসানী (মৃ. ১৩২৯/১৯১১)। সায়্যিদ জামালুদ্দীন আসাদাবাদী 'আফগানী'ও আনসারীর একজন শিষ্য ছিলেন, এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় (আস'গ'ার মাহ্‌দাবী ও ঈরাজ আফ্‌শার, মাজ্‌মূ'আ-য়ি আস্‌নাদ ওয়া মাদারিক-ই চাপনাশুদা দার বারায়ি সায়্যিদ জামালুদ্দীন মাশ্‌হুর বিআফগানী, তেহরান ১৯৬৩, পৃ. ২০)। আরও জানা যায়, ১২৭০/১৮৫৪ সনে নজাফ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্বে আফগানী চার বৎসর আনসারীর শিষ্যচক্রে অধ্যয়ন করেন (মীরযা লুত'ফুল্লাহ খান আসাদাবাদী, শারহ'-ই হ'াল ওয়া আছার-ই সায়্যিদ জামালুদ্দীন আসাদাবাদী মা'রূফ বি আফগানী, বার্লিন ১৯২৬, পৃ. ২১-২)। কিন্তু এই সকল বিবরণ বিতর্কিত। ইজ্‌তিহাদের সার্টিফিকেট প্রদানে খুবই সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও আনসারী তৎকালে মাত্র ১৬ বৎসর বয়স্ক আফগানীকে এইরূপ একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে (খান মালিক সাসানী, সিয়াসাতগারান-ই দাওরা-ই কাজার, ১খ., তেহরান ১৯৫৯, পৃ. ১৮৬)। শায়খ মুরতাদা জামালুদ্দীনকে একটি ইজাযা (উচ্চতর শিক্ষা দানের অনুমতিপত্র) প্রদান করিয়াছেন" বলিয়া Nikki R. Keddie লুতফুল্লাহ খান-এর যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাও সঠিক হয় নাই (Sayyid Jamal al-Din "al-Afghani" a political biography, Berkeley and Los Angeles 1972, 15-16)Ç বরং লুত'ফুল্লাহ বলেন, আফ্‌গানীর পিতাকে আনসারী একটি সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন (আসাদাবাদী, পৃ. গ্র., ১৫, ২১ ও আবদুন-নাঈম মুহাম্মাদ হাসানায়ন কর্তৃক আসাদাবাদীর গ্রন্থের আরবী অনুবাদ, বৈরূত ১৯৭৩, ৬৪; আরও দ্র. আবদুল হাদি হায়রি, আনদীশাহায়ি সায়্যিদ জামালুদ্দীন আসাদাবাদী দার পীরামুন-ই ইনহিতাত-ই মুসালমানান ওয়া ইনকিলাব-ই মাশরূতিয়্যাত-ই ঈরান, in Vahid, নম্বর ২২৫-৯ (১৯৭৮), পৃ. ৪৭-৫২, ৫৭-৬১ ইত্যাদি।

একটি চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও আনসারী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এক বিবরণমতে তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা ৩০-এর অধিক (আনসারী, যিনদিগানী, ১৩১-৪)। এইগুলির মধ্যে আনসারীর প্রকাশিত গ্রন্থ হিসাবে খান বাবা মুশার-এর মুআল্লিফীন-ই কুতুব-ই চাপীয়ি ফারসী ওয়া আরাবী, ৬খ., তেহরান ১৯৬৫, নং ১২৬-৩৫-তে ২৪টি তালিকাভুক্ত। ইহাদের অনেক গ্রন্থই ভারত, ইরাক ও ইরানে ১২৬৭/১৮৫০ খৃ.-এর পর হইতে বহুবার প্রকাশিত হয়, বিশেষত তাঁহার দুইটি গ্রন্থ জ্ঞানী ও গবেষকগণ দ্বারা বহুল ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং শী'আ আলিম সম্প্রদায় উভয় গ্রন্থকে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন ঃ উসূ'ল সম্বন্ধে ফারাইদু'ল-উসূ'ল (আর-রাসাইল) ও ফিক্'হ সম্বন্ধে আল-মাকাসিব। উভয় গ্রন্থ প্রথমে তেহরানে প্রকাশিত হয়, প্রথমটি ১২৬৮/১৮৫১ সনে এবং দ্বিতীয়টি ১২৮০/১৮৬৩ সনে। উভয় গ্রন্থই সকল শী'আ মহলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ইরাকের শী'আ আলিম সম্প্রদায় জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে যে সকল সাহায্যকারী আর্থিক সংস্থার সহিত জড়িত ছিলেন 'অযোধ্যা ওয়াক্'ফ' তন্মধ্যে অন্যতম। তেহরানস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কথায় ইহা ছিল একটি 'শক্তিশালী উপায় যাহা পারস্যের ধর্মীয় প্রধানগণ ও আমার নিজের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া দিত এবং...... পারস্যের নেতৃস্থানীয় 'আলিম সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করিয়া দিত' (Sir Arthur Hardinge, A Diplomatist in the East, London 1928, পৃ. ৩২৩-৪)। অবশ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অযোধ্যা ওয়াক'ফ-এর মাধ্যমে আনসারীকে প্রভাবিত করিতে সফল হয় নাই (সায়্যিদ মুহ'সিন আমীন, আয়ানুশ-শী'আ, বৈরূত ১৯৬০, পৃ. ৪৩-৬)। কেবল অল্প কিছু দিনই তিনি উক্ত ওয়াক'ফের অর্থ গ্রহণ করেন এবং পরে আর গ্রহণ করেন নাই (মাহ'মূদ, তারীখ-ই রাওয়াবিত'-ই সিয়াসী-ই ঈরান ওয়া ইনগিলীস, ৬খ., তেহরান ১৯৫৩, ১৭৪৩)।

রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আনসারী ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। তাঁহার অনুসারীরা, পারস্যবাসী হউক বা না হউক, তিনি রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংগ্রামে তাহাদের স্বার্থে প্রভাব প্রয়োগ করিতে রাজী ছিলেন না। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে তিনি বিশ্বাস করিতেন, আলিম সম্প্রদায় কেবল ধর্মেরই তত্ত্বাবধায়ক নহেন, তাঁহারা বিচার ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্যও নিঃসন্দেহে দায়ী (Hairi, Shiism and constitutionalism in Iran : a study of the role played by the Persian residents of Iraq in Iranian politics, Leiden 1977, p. 60)। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে আনসারীর আগ্রহের অভাব সমকালীন প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণের সমালোচনার বস্তু ছিল। উদাহরণস্বরূপ ফাতহ' আলী আখুন্দ যাদাহ বলেন, ইরান কেন পতন দশায় আছে এবং ইরানীরা কেন অবমাননার শিকার তাহা উপলব্ধি করিবার মত পর্যাপ্ত দূরদৃষ্টি আল্লাহ আনসারীকে দেন নাই (আলিফবায়ি জাদীদ ওয়া মাক্‌তূবাত, বাকু ১৯৬৩, পৃ. ১২১)। আকাখান কির্‌মানী (উপরে দ্র.) বিশ্বাস করিতেন, জনগণের অজ্ঞতা ও হতবুদ্ধিতায় আনসারী অবদান রাখিয়াছিলেন (ফেরীদূন আদামিয়্যাত, আনদীশাহায়ি মীরযা আকা খান কিরমানী, তেহরান ১৯৬৭, পৃ. ৬৬)।

অপরপক্ষে রাজনীতি হইতে তাঁহার দূরে অবস্থান রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আন্তরিকভাবে সমাদৃত হয়। মনে হয় তাহারা ইহাকে তাঁহার তাপস জীবনের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করিতেন। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ইরাকের গভর্নর তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ফারূক' (সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী) মনে করিতেন এবং বলা হয়, বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করিয়াছিলেন, আনসারী হয় নিজেই যীশু খৃস্ট অথবা পৃথিবীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিনিধি (হাসান খান শায়খ জাবিরী আনসারী, তারীখ-ই ইসফাহান ওয়া রায়্যি ওয়া হামায়ি জাহান, তেহরান ১৯৪৩ খৃ., প্রচ্ছদ-মোড়কের ভিতরে)। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত ধর্মীয় মতবাদের প্রেক্ষিতে কিছু লোক বলিতে শুরু করে, আনসারী দ্বাদশ ইমাম (মাহদী)-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। বাবী সাহিত্যেও আনসারীকে...... "তাঁহার পরমত সহিষ্ণুতা, প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচারবোধ, ধার্মিকতা ও মহৎ চরিত্রের জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে'। বাহাউল্লাহ নামে অভিহিত বাহাঈ নেতা মীর্‌যা

হুসায়ন আলী নূরী আনসারীকে চরম সংসারত্যাগী পণ্ডিতের মধ্যে গণ্য করেন। আব্বাস আফান্দী (আবদুল বাহা)-ও আনসারীকে 'খ্যাতনামা ও বিদগ্ধ মনীষী, মহৎ ও সম্মানিত আলিম, সত্যানুসন্ধানকারীদের সীলমোহর' হিসাবে উল্লেখ করেন (Shoghi Effendi, God passes by Wilmette, Illinois 1944, 143)। বাবী বিশ্বাস ও রীতিনীতির নিন্দায় অন্যান্য শী'আ আলিমের সংগে যোগ দেন নাই বলিয়া আনসারী এইভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন। আনুমানিক ১৮৬৩ সালে বাহাউল্লাহ ও তাঁহার অনুসারীদের ইরাক হইতে বহিষ্কার নির্ধারণার্থে কাজি'মায়ন-এ শী'আ 'উলামা' কর্তৃক আহূত সভায় তিনি যোগদান করেন নাই (মুহাম্মাদ খান যা'ঈমুদ দাওলা, মিফ্তাহ বাবিল-আব্ওয়াব, কায়রো ১৯০৩, পৃ. ৩৪৭)। বাবী বিবরণমতে তিনি সভায় যোগদান করেন; কিন্তু যখন তাঁহাকে আলিমগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করা হইল তখন তিনি এই বলিয়া সভা ত্যাগ করেন, তিনি এই নূতন ধর্মমতের সহিত পরিচিত নহেন (E.G. Browne সম্পা. ও অনু. A Travellers Narrative written to illustrate the episode of the Bab, Cambridge ১৮৯১, ২খ., ৮৬-৭)।

শুরুতে বাবী মতবাদ শী'আ মতবাদের মধ্যে একটি শাখা সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও পরিণামে ইহা ভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে যাহার আলোচনায় ছিল আনসারীর অনীহা। এই কারণে মনে হয়, এই ক্ষেত্রে আনসারীর মতামতের অভাব আসলে রাজনৈতিক ও সরকারী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর প্রতি তাঁহার অনাগ্রহ ও সর্তক মনোভাবেরই ফল।

আনসারী রাজনীতি হইতে যত দূরেই থাকুন না কেন, তিনি তাঁহার শিষ্যদেরকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে পারেন। তদুপরি ইরানের শী'আ আলিম সম্প্রদায়ের জন্য আনসারী এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী মর্যাদা অর্জন করিয়াছিলেন। ফলে আলিমগণ ইহারও সদ্ব্যবহার করেন। মীরযা হাসান শীরাযী Tobacco Concession-এর বিরুদ্ধে এক ফাতওয়া জারী করেন (তু. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ফীরূয কাজি'ম যাদাহ, Russia and Britain in Persia, ১৮৬৪-১৯১৪, New Haven ১৯৬৮, পৃ. ২৪১ প.) এবং খুরাসানী ১৯০৬-১১ সালের পারস্য বিপ্লব সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও তৎকালীন পারস্য শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে সাহায্য করেন (আবদুল হাদী হাইরি, Why did the Ulama participate in the Persian Constitutional Revolution of 1905-1909? WI, xvii (1976), ১২৭-৫৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের মধ্যে উল্লিখিত সূত্রসমূহ ব্যতীত (১) মুহাম্মাদ আলী মুদাররিস, রায়হানাতুল-আদাব, ১খ., তাবরীয ১৯৬৭; (২) আব্বাস কু'ম্মী, হাদিয়্যাতুল আহ্বাব, নাজাফ ১৯২৯; (৩) ঐ লেখক, ফাওয়াইদুর-রাদাবিয়্যা ফী আহ্'ওয়ালি উলামাইল-মায'হাবিল জা'ফারিয়্যা, তেহরান ১৯৪৭; (৪) ঐ লেখক, আল-কুনা ওয়াল আলকাব, ৩ খণ্ডে, নাজাফ ১৯৫৬; (৫) আলী মাহফূজ, সিরর বাকাইন নাজাফ ওয়া খুলুদিল উলামা, মাজাল্লাতুন-নাজাফ, নং ১০ (১৯৫৭), ৬ প.; (৬) হামিদ আলগার, Religion and State in Iran 1785-1905, Berkeley and Los Angeles 1969; (৭) মুহাম্মাদ বাকি'র খাওয়ানসারী, রাওদা'তুল-জান্নাত, তেহরান ১৮৮৯; (৮) মীরযা হুসায়ন নূরী, মুসতাদরাকুল-ওয়াসাইল, ৩খ., তেহরান ১৯৪৯; (৯) আলী আল-ওয়ার্দী, লামাহাতু ইজ্তিমা'ইয়্যা মিন তারীখিল 'ইরাকি'ল-হ'াদীছ, ১-৪খ., বাগদাদ ১৯৬৯-৭৪; (১০) গুলাম হুসায়ন মুসাহিব, সম্পা. দাইরা আল-মাআরিফ-ই ফারসী, ১খ., তেহরান ১৯৬৬; (১১) আবদুল হুসায়ন আমীনী, শুহাদাউল-ফাদীলা, নাজাফ ১৯৩৬; (১২) মুহসিন আল-মুমিন, আন-নাজাফুল-আশরাফ ঃ উলামাউদ্দীনিল-আলাম ওয়া-বায়ান আনহুম, মাজাল্লাতুর-রাবিতা আল-আরাবিয়্যা, নম্বর ১৯৩ (১৯৩৮), ২৮প.; (১৩) মুরতাদা মুদাররিসী, তারীখ-ই রাওয়াবিত-ই ঈরান ওয়া ইরাক, তেহরান ১৯৭২; (১৪) মুহাম্মাদ তুনুকাবুনী, কিসাসুল-উলামা, তেহরান ১৮৮৬; (১৫) হাবীবুল্লাহ শারীফ কাশানী, লুব্বুল-আলবাব ফী আল্-কাবিল-আতয়াব, তেহরান ১৯৫৮; (১৬) শায়খ জাফার মাহ'বূবা, মাদীউন-নাজাফ ওয়া হাদিরুহা, ১খ., নাজাফ ১৯৫৮; (১৭) মুহাম্মাদ হুসায়ন নাসিরুশ-শারীআ, তারীখ-ই কুম্ম, কুম ১৯৭১; (১৮) মুহাম্মাদ আলী তামীমী, মাশহাদুল-ইমাম, ২খ., নাজাফ ১৯৫৪; (১৯) আগা বুযুর্গ তিহরানী, মুসাফফাল-মাকাল ফী মুসাননিফি ইলমির-রিজাল, তেহরান ১৯৫৯; (২০) ঐ লেখক, আয-যারীআ ইলা তাস'নীফি'শ-শীআ, ১-২০ খ., ১৯৩৬-৭৪; (২১) ঐ, তাবাকাত আলামিশ-শী'আ, ১-২ খ., নাজাফ ১৯৫৪-৬২; (২২) মুহাম্মাদ মাহদী আল্-আশফা, মুরূরু কারনিন আলা ওয়াফাতিশ- শায়খিল-আনসারী, মাজাল্লাতুন-নাজাফ, ৪খ., নম্বর ৮ (১৯৬১), ২৯ প.; (২৩) মুহাম্মাদ হাশিম খুরাসানী, মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, তেহরান তা. বি.; (২৪) মুল্লা আলী ওয়াইজ খীয়াবানী, কিতাব-ই উলামা-ই মু'আসিরীন, তাবরীয ১৯৪৬; (২৫) নাসরুল্লাহ তুরাব দিযফূলী, লামা'আতুল বায়ান, তা. বি.; (২৬) হাবীবুল্লাহ রাশ্তী, বাদাইল আফ্কার, তেহরান? ১৮৯৫; (২৭) আলী আকবার নিহাওয়ান্দী, আখলাক'-ই রাবীঈ বুনয়ান-ই রাফী', তেহরান ১৯২৬; (২৮) ইয়াহয়া দাওলাতাবাদী, তারীখ-ই মু'আসি'র ইয়া হ'য়াত-ই ইয়াহ'য়া, ১খ., তেহরান ১৯৫৭; (২৯) মুহাম্মাদ মাহ্দী আল-কাজিমী, আহ্'সানু'ল-ওয়াদী'আ, ১-২ খ., নাজাফ ১৯৬৮; (৩০) হোমা পাকদামান, জামালুদ্দীন আসাদআবাদি দিত আফগানি, প্যারিস ১৯৬৯; (৩১) আব্বাস আলী কায়ওয়ান কায্বীনী, কায়ওয়ান-নামাহ, তেহরান ১৯২৯; (৩২) মুহাম্মাদ তাহা নাজাফী, ইতক'ানুল-মাক'াল ফী আহ'ওয়ালির-রিজাল, নাজাফ ১৯২১; (৩৩) আব্দুল্লাহ মামাকানী, তান্ক'ীহু'ল-মাক'াল ফী আহ'ওয়ালির-রিজাল, নাজাফ ১৯৩৩; (৩৪) জাফার খালীলী, মাওসূআতুল-আতাবাতিল-মুকাদ্দাসা, ৪খ., বাগদাদ ১৯৬৫-৬; (৩৫) আবদুর-রাহীম মুহাম্মাদ আলী, আল্-মুস'লিহু'ল-মুজাহিদ আশ-শায়খ মুহাম্মাদ কাজি'ম আল-খুরাসানী, নাজাফ ১৯৭২; (৩৬) নাজী ওয়াদাআ, লামাহ'াত মিন তারীখিন-নাজাফ, ১খ., নাজাফ ১৯৭৩; (৩৭) মুহাম্মাদ মুঈন, ফারহানগ-ই আলাম, ৫খ., তেহরান ১৯৬৬, শিরোনাম 'আনসারী'; (৩৮) মুরতাদা আল্-ইয়াসীন, উসলুবুদ-দিরাসাতিদ-দীনিয়্যা ফী মাদরাসাতিন নাজাফ, মাজাল্লাতুন-নাজাফ,

১খ., নং ৩ (১৯৫৬), ২প.; (৩৯) আবদুল্লাহ আল্-মুদাররিস আস-সাদিকী আল-ইসফাহানী, লুলুউস-স'াদাফ ফী তারীখিন-নাজাফ, ইসফাহান ১৯৫৯; (৪০) আব্বাস ইক'বাল, হু'জ্জাতুল-ইসলাম হ'াজ্জ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বাকি'র শাফ্তী, ইয়াদগার, ৫খ., নং ১০ (১৯৪৯), ২৮-৪৩; (৪১) মীরযা হুসায়ন হামাদানী, তারীখ-ই জাদীদ, সম্পা. E.G. Browne, Cambridge 1893; (৪২) ইসমা'ঈল রাঈন, হুকূক বিগীরান-ই ইনগিলিস দার ঈরান, তেহরান ১৯৬৯; (৪৩) খান মালিক সাসানী, দাস্ত-ই পিনহান-ই সিয়াসাত-ই ইনগিলীস দার ঈরান, তেহরান ১৯৫০; (৪৪) মুহাম্মাদ আলী মুহাম্মাদ রিদ'া তাবাসী, যিকরা শায়খিনা আল্-আনসারী বা'দ ক'ারনিন, নাজাফ ১৯৬১ (?); (৪৫) প্রবন্ধ আনসারী, শায়খ মুরতাদা, লুগাত নামাহয়ি দিহখুদা, নং ৮৬, ১৯৬৩, পৃ. ৪০৮; (৪৬) দিয়াউদ্দীন আদ্-দাখীলী, তারীখুল-হ'ায়াতিল ইসলামিয়্যা ফী জামিইন-নাজাফিল আশ্‌রাফ, মাজাল্লাতুর-রিসালা, ৬খ. (১৯৩৮), পৃ. ১৫০৯-১১, ১৫৫৫-৮।

আবদুল হাদী হাইরি (E.I.[2] Suppl.) / মুখলেসুর রহমান

আনা (দ্র. সিক্কা)।

'আনা (عانة) ঃ মধ্যযুগে ব্যবহৃত শব্দ আনাত ও তুরস্কের সরকারী দলীলপত্রে আনা, ফুরাত নদীর দক্ষিণ তীরে (৪১° ৫৮ ডিগ্রী পূর্ব, ৩৪° ২৮ ডিগ্রী উত্তর), দায়রুয-যূর হইতে ২৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ও হীত (Hit) হইতে ১৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক ইরাকের একটি শহর। শতাব্দীকাল পূর্বের চেষ্টা সত্ত্বেও শহরটির পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত নদীটি বাষ্পীয় পোতের জন্য নাব্য নহে। কেবল 'শাখতুর' (কাঠের ভেলা) স্রোতধারার সহিত ভাটির দিকে চলিবার জন্য নদীটি ব্যবহৃত হয়। মধ্য ইরাক হইতে উত্তর সিরিয়ায় যাইবার কারাভান পথটি আনা শহরের উপর দিয়া যাওয়ার ফলে পূর্বে শহরটির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কিন্তু পরে আন্ত-মরুভূমি মোটরযান প্রচলিত হওয়ায় এই পথটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। শহরটির পশ্চিমে রহিয়াছে আনিযা উপজাতির বসতিপূর্ণ সিরীয় মরুভূমি এবং পূর্বে রহিয়াছে জাযীরার শাম্মার-জারবা গোত্রের আদিবাসীদের অঞ্চল। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করে স্থায়ীভাবে মেষ পালন ও কৃষিকর্মে রত দুলায়ম গোত্র। ইরাক সরকারের অধীন এই শহরটি দুলায়মের (সদর দপ্তর, রামাদী) লিওয়ার কাদার সদর দপ্তর এবং কাইম, জুব্বা ও হাদীছার নাহিয়া (প্রান্তসমূহ) ইহার অন্তর্ভুক্ত। শহরবাসীরা প্রায় সকলেই সুন্নী আরব (তবে ১৩৬৯-৭০/১৯৪৯-৫০ পর্যন্ত ক্ষুদ্র একটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ও সেখানে বাস করিত)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা নদীর অপর তীরস্থ রাওয়াবাসীদের সহিত তিক্ত বৈরিতা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। ১৩৪০/১৯২১ সনে এই শত্রুতার অবসান ঘটে।

নদী ও পশ্চিম দিকে ছোট ছোট টিলার মধ্যবর্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত এই শহরটি দৈর্ঘ্যে ৭ মাইল ও প্রস্থে অত্যন্ত সংকীর্ণ। জলচক্রের সাহায্যে সেচের মাধ্যমে আবাদকৃত ঘন খেজুর বাগানের মধ্যে শহরের দালানগুলি অবস্থিত। নদী মধ্যস্থ দ্বীপসমূহেও চাষাবাদ ও বসতি রহিয়াছে। শহরটি স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য গণ্য করা হয়।

আনা শহরের মহিলারা সৌন্দর্যের জন্য ও সূতার কাপড়, উলের মাদুর ও জামা বুননের জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানকার পুরুষেরা স্থান সংকুলানের অভাবে বহু সংখ্যায় বিদেশ গমনে বাধ্য হয়। তবে তাহারা ফুরাত নদীতে নৌচালক হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। আগেকার দিনে বাগদাদ শহরে পানি বহনকারী হিসাবে এককভাবে তাহাদেরকেই নিয়োগ করা হইত। এইখানে শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে সেখানে ৮টি বিদ্যালয় ছিল।

বর্তমান আনা দূর অতীতের অপসৃত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কীলকাকার বর্ণমালায় উৎকীর্ণ লিপিতে বর্তমানে এই শহরের নাম আনাত অথবা খানাত' লিখিত আছে। গ্রীক Anatho (দ্র. Pauly-Wissowa, ১খ., ২০৬৯, Suppl. ১খ., ৭৭; M. Streck, ZA., ১৯, ২৫; ঐ লেখক, Klio, ৬খ., ১৯৭; ZDMG, ৬১, ৭০১) শব্দের সহিত এই নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। চাষাবাদ, বাণিজ্য ও কখনও কখনও সামরিক সদর দপ্তরের কেন্দ্র আনা শহর। নদীর চড়াসমূহ ও শহরের পশ্চিমে উচ্চভূমি আশ্রয়ের স্থান হিসাবে বিভিন্ন সময় সংরক্ষিত রাখা হইত।

আব্বাসী আমলে আনা ছিল জাযীরা প্রদেশের অন্তর্গত এবং আল-ইরাক সীমান্তবর্তী একটি নগর। পরিব্রাজকদের নিকট আনা খর্জুর ও ফলোদ্যান এবং মদ্য তৈরীর স্থান হিসাবে খ্যাত ছিল। প্রাচীন কবিরা এখানকার প্রস্তুত মদের প্রশংসা করিয়াছেন (তু. S. Fraenkal, Die aramaischen Fremdworter im Arabischen, ১৫৭; G. Jacob, Altarab, Beduinenleben, ৯৮, ২৪৮)। খলীফা আল্-ক'াইম ৪৫০/১০৫৮ সালে তৎকালীন ইরাকের দায়লামী শাসকের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৮ম/১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা আদিবাসী শাসকদের সদর দপ্তর হিসাবে ছিল। তাহাদের স্থলে ১৭৫০ খৃ. তুর্কীদের দ্বারা শিথিল প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৫০ খৃ. তুর্কী প্রশাসনের এই ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়। শেষোক্ত প্রশাসনের আমলে এই শহর বাগদাদ প্রদেশে (বিলায়াত) অন্তর্গত একটি জেলারের (কাদা) সদর দপ্তর ছিল। ১৩৩৭/১৯১৮ সালে শহরটি বৃটিশরা দখল করে এবং ১৩৪০/১৯২১ সালে ইরাক রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে ইহা পরিগণিত হয় এবং বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, ১০৬ (আরব ভূগোলবেত্তাদের উল্লেখপূর্বক); (২) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, Paris ১৮৯৪, ৩খ., ১৪৫; (৩) K. Ritter, Erdkunde, ১০খ., ১৪১, ১৪৩ প., ১১খ., ৭১৭-২৬; (৪) E. Reclus, Nouv. geogr. un., ৯খ., ৪৫০; (৫) M. Hartmann, ZDPV, ২৩খ., ২, ১২২; (৬) S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford ১৯২৫; (৭) আবদুর রায্যাক আল্-হাসানী, আল-ইরাক, কাদীমান ওয়া হাদীছান, Sidon ১৯৪৮, পৃ. ২৩৯ প.।

S. H. Longrigg (E.I.[2]) / শাহাবুদ্দীন খান

'আনাক' (عناق) ঃ আদাম (আ)-এর কন্যা, শীছ (আ)-এর যমজ ভগ্নী, কাইন বা ক'াবীল-এর স্ত্রী এবং উজ (দ্র.)-এর মাতার নাম। 'আনাক' নামটি আরবগণ কর্তৃক প্রদত্ত [দ্র. জাহি'জ, তারবী (Pellat) নির্ঘণ্ট]। প্রাণীবিদ্যার সংজ্ঞায় 'আনাক' কৃষ্ণ কর্ণবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুদ্র বিড়াল

জাতীয় প্রাণীকে বুঝায়, যাহা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে অধিক সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয় (তুর্কী ভাষায় কারা কুলাক শব্দের অর্থ কালো কান ও ফারসী ভাষায় উহার প্রতিশব্দ সিয়াহগুশ)। প্রবাদ আছে, এই বিশেষ ধরনের জন্তুটি সিংহের অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিয়া চীৎকার দ্বারা সিংহের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। জ্যোতিষশাস্ত্রে 'আনাকু'ল বানাত প্রকাণ্ড ভল্লুকের প্রতীক চিহ্ন (m) ও 'আনাকু'ল-আর্দ' উত্তরভাদ্র পদ (Androedac)-এর প্রতীক চিহ্ন (y) বহন করে (দ্র. A Benhamouda Les Noms arabes des etoiles, in AIEO, Algiers, ix, 1951, 84, 97)।

সম্পাদকমণ্ডলী (E.I.2)/এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

আনাতোলিয়া (দ্র. আনাদোলু)।

আনাতূ'লী হি'সারী (آناطولى حصارى) : বস্ফোরাস প্রণালীর সংকীর্ণতম স্থানে অবস্থিত একটি দুর্গ (ইহা গুযেল্জী হিসার, ইয়েনিজী, ইয়েনী অথবা আক্চা হিসার নামে পরিচিত)। ইস্তাম্বুল ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে এই দুর্গটি ৭৯৭/১৩৯৫ সনে প্রথম বায়াযীদ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল (দ্র. Ashik Pasha-Zade, ed. Giese, Leipzig 1928, 61, 121, 131; Neshri, ed. Taeschner, i, Leipzig 1951, 90; বিহিশ্তী, তারীখ; সুলাক যাদাহ, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯৮, পৃ. ৬৪; সা'দু-দদীন, তাজুত তাওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯৭ হি, ১খ., ১৪৮; মুনাজ্জিমবাশী, সাহাইফুল আখবার, ইস্তাম্বুল ১২৮৫ হি., ৩১০)। সম্ভবত ৮৫৬/১৪৫২ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ কর্তৃক রূমেলী হিসারী নির্মাণকালে উক্ত দুর্গের কিছু উন্নতি সাধিত হয়। এই কারণে ভুলক্রমে আনাতূলী হিসারী দুর্গের নির্মাণের কৃতিত্ব দ্বিতীয় মুহাম্মাদের উপর আরোপিত হয় (দ্র. কাতিব চালাবী, সিয়াহাত নামাহ, ১খ., ৬৬৪)। ভার্না যুদ্ধের পূর্বে প্রথম মুরাদের সেনাবাহিনীর আনাতেলিয়া হইতে ইউরোপীয় সমুদ্র উপকূলের দিকে যাত্রাপথে এই আনাতূলী হিসারী দুর্গ সৈন্যদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল (তু. Neshri, পৃ. স্থা., সা'দুদ্দীন ৩৭৯; মুনাজ্জিম বাশী, ৩৫৮; লুত্ফী পাশা, তাওয়ারীখ-ই আল-ই উছ'মান, ইস্তাম্বল ১৩৪১, '১১৭)। ইস্তাম্বুল বিজয়ের পরই দুর্গটির সামরিক গুরুত্ব লোপ পায়। কিন্তু পরবর্তী কালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের ফলে বসফোরাস প্রণালীর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় চতুর্থ মুরাদ কোযাকদের (Cossacks) আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশে রূমেলী কাওয়াগী (كـواغى روم ايلى) ও আনাদুলু কাওয়াগী (اناطولى كواغى)-তে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। আওলিয়া চালাবী এই দুর্গের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন (দ্র. সিয়াহ'াত নামাহ, পৃ. স্থা.)। বহু কালের অব্যবস্থা ও অবহেলার পর ১৯২৮ খৃস্টাব্দে সুনিপুণভাবে ইহার পুনর্নির্মাণ সাধিত হয়। আনাতূলী হিসারী নামে পরিচিত উপজেলায় (আওলিয়া চালাবী কর্তৃক বর্ণিত) প্রায় পাঁচ হাযার লোকের (কানলিজা চবুকলুর অধিবাসীসহ) বাস ছিল। ইউরোপের মিষ্ট পানিরূপে পরিচিত ক্ষুদ্র নদীদ্বয় গুকসু ও কুচুকসু পূর্বে ইস্তাম্বুল হইতে আগত যাত্রীদের প্রমোদ ভ্রমণের আকর্ষণীয় স্থানরূপে গণ্য হইত। তুর্কী সাহিত্যেও প্রায়শই ইহার আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে উক্ত দুর্গ ও কানলিজার মধ্যবর্তী স্থানে আমুজা যাদা হুসায়ন পাশা কর্তৃক ১৬৯৫ খৃস্টাব্দের দিকে নির্মিত maison de plaisanec নামে প্রমোদ ভবনের কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়াও উক্ত স্থানে উছমানী সাম্রাজ্যের প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মিত কিছু বেসামরিক স্থাপত্য নিদর্শন অবশিষ্ট আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) S. Toy, The Castles on the Bosphorus, Oxford 1930, 225 ff.; (২) H. Hogg, Turken Burgen am Bosphorus und Hellespont, Dresden 1932, 9 ff.; (৩) A. Gabriel, Chateaux Tures du Bosphore, Paris 1943, 9 ff.; (৪) IA, s/ v.

R. Anhegger (E.I.2) /এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

আনাতোমী (দ্র. তাশ্রীহ')।

আনাদোলু (اناﺩﻭﻟﻮ) : আনাতোলিয়া, এশিয়া মাইনর।

(১) নাম।
(২) প্রাকৃতিক ভূগোল।
(৩) তুর্কী আনাতোলিয়ার ঐতিহাসিক ভূগোল।
(ক) তুর্কীদের আনাতোলিয়া বিজয়, প্রথম পর্যায় ও রূমের সালজূকদের অবস্থা।
(খ) আনাতোলিয়া বিজয়, দ্বিতীয় পর্যায় ও উছমানী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত।
(গ) আনাতোলিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ।
(৪) জনসংখ্যা।
(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থা।
(৬) অর্থনীতি।

১। নাম

আনাদোলু (আরবী বানান اناطولى, অর্থাৎ গ্রীক Anatole-বায়যানটীয় উচ্চারণ), আনাতোলিয়া, এশিয়া মাইনর, পার্বত্য উপদ্বীপ উহার পাদদেশীয় ভূভাগ সমেত এশিয়া মহাদেশ যেখান হইতে ইউরোপমুখী (বলকান উপদ্বীপ) বিস্তৃত হইয়াছে সেখান হইতেই ইহার শুরু-সুপ্রাইহার শুরু—সুপ্রাচীন কাল হইতে এশিয়া মাইনর নামে সুপরিচিত—৩৬° ও ৪২° উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬° ও ৩৫° পূর্বে দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। বলকান উপদ্বীপ সমবায়ে ইহা তাহার সমগ্র ঐতিহাসিক কাল ব্যাপিয়া পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যইউরোপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে আরব ঐতিহাসিকগণ ও উছমানী সাম্রাজ্যের আমল পর্যন্ত তুর্কীগণ এই দেশটিকে বলিত বিলাদুর-রূম (রোমকদের দেশ =country of the Rhomaeans)।

গ্রীক Anatole (সূর্যোদয়) নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে বায়যানটীয়গণ একটি ভৌগোলিক শব্দ হিসাবে। কারণ প্রাচ্য (Orient) বা (Levant) কথাটি দ্বারা তাহারা কন্সটান্টিনোপলের পূর্বদিকে অবস্থিত সকল ভূভাগকেই বুঝাইত, বিশেষ করিয়া এশিয়া মাইনর ও মিসরকে বুঝাইত। প্রাচ্য-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট Diocletion ও কন্সটানটাইন প্রশাসন পুনর্গঠনের পরে এই দেশটিকে Per Orientem নামক একটি অঞ্চলরূপে সাম্রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ অংশ হিসাবে গঠন করিয়াছিলেন

বলিয়া মনে হয়। পাঁচটি dioces (বিশপের এলাকা) লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল, যথা ঈজিপ্টাস, ওরিয়ন্স, পন্টাস, এশিয়ানা ও থ্রেসিয়া অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য, থ্রেস, মিসর ও লিবিয়া।

এই প্রশাসনিক বিভাগকে পুনরায় কয়েকটি Theme (প্রশাসনিক ক্ষুদ্রতর অঞ্চল)-এ বিভক্ত করিলে তখন প্রশাসনিক পরিভাষা Anatalaxs নামটি তখন হইতে আমোরিয়াম (Amoriam) ও আইকোনিয়াম (Iconium)-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী Theme (প্রশাসনিক অঞ্চল) অর্থে ব্যবহৃত হইত। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক এলাকাকে বলা হইতে থাকে আল-নাতোলুস বা অনুরূপ কোন কিছু যাহাকে ইব্ন খুররাদাযবিহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন আল-মাশ্রিক' বা প্রাচ্যদেশ বলিয়া (পৃ. ১০৭, অনু. ৭৯); কুদামা ব্যাখ্যা করিয়াছেন আল-নাতোলীক (অর্থাৎ আল-মাশ্রিকী, 'পূর্বদেশীয়') বলিয়া (সম্পা. de Goeje, পৃ. ২৫৮, অনু. পৃ. ১৯৮); (দ্র. H. Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Themen Verfassung, লাইপযিগ ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ৮৩; F. W. Brooks, Arabic List of Byzantine Themes, Journal of Hellenic Studies, ১৯০১ খৃ., পৃ. ৬৭-৭৭)।

তুর্কী বিজয়ের পর হইতে পুনরায় প্রশাসনিক অঞ্চল Theme-এর যে নাম Anatolikon ছিল, তাহা বিলুপ্ত হয়। সাধারণ ভৌগোলিক নাম আনাতোলী আবার ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং তুর্কীগণের মুখে মুখে তাহা আনাদোলু রূপ লাভ করে। প্রথমদিকে ইহা দ্বারা শুধু পশ্চিম আনাতোলিয়াকে বুঝাইত। এই নামের যে বৃহত্তর উছমানী প্রদেশ (এয়ালেত বা বিলায়েত) ছিল— তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল সাবেক পশ্চিম আনাতোলীয় তুর্কী ক্ষুদ্র রাজ্যাংশসমূহ (পরবর্তী প্রবন্ধ দ্র.)। একটি প্রদেশের নাম হিসাবে আনাদোলু কথাটি 'তানজীমাত'কালীন রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের সময়ে (১৯শ শতকের মধ্যভাগে) বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন হইতে 'আনাতোলিয়া' কথাটি ভৌগোলিকভাবে ব্যবহৃত হইয়া সমগ্র উপদ্বীপটিকে বুঝাইতে থাকে (মোটামুটিভাবে ত্রেবিযনদ =Trabzon এরযিনজান-বিরেজিক আলেকজান্দ্রেত্তা রেখা পর্যন্ত ভূভাগ) যাহা বর্তমান তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করিয়াছে। বর্তমানে তুর্কী ভাষায় সমগ্র আনাদোলু বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল আধুনিক তুরস্কের সমগ্র এশিয়া মহাদেশীয় অংশ এবং সেই সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে উত্তর মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত অংশসমূহ। যথা আল-জাযীরা (দিয়ার বাকর), কুর্দিস্তান (ভান ও বিৎলিস) ও আরমেনিয়া (কারস)-এর অন্তর্গত অংশসমূহ। বর্তমান প্রবন্ধে এই অর্থেই আনাদোলুকে গ্রহণ করা হইয়াছে (ঈজিয়ান= এগাহ সাগরে অবস্থিত দ্বীপসমূহ বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয় নাই)। ১৯৫০ খৃ. তুরস্কের সমগ্র এলাকার আয়তন বলা হয় ৭,৬৭,১১৯ বর্গকিলোমিটার এবং আনাতোলিয়ার আয়তন ৭,৪৩,৬৩৪ বর্গকিলোমিটার। তন্মধ্যে থ্রেসের আয়তন ২৩,৪৮৫ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৫০ খৃ. সমগ্র তুরস্ক দেশের লোকসংখ্যা ছিল ২০৯,৩৪,৬৭০; তন্মধ্যে ১৬,২৬,২২৯ জন বাস করিত তুরস্কের ইউরোপীয় অংশে এবং ১,৯৩,০৮,৪৪১ জন বাস করিত আনাতোলিয়াতে।

[তুর্কী শাসন-পূর্ববর্তী আনাতোলিয়ার জন্য দ্র. রূম প্রবন্ধ]

F. Taeschner (E.I.²) / হুমায়ুন খান

২। প্রাকৃতিক ভূগোল

দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ ঃ আনাতোলিয়া প্রশস্ত মালভূমি দ্বারা গঠিত, উত্তরে ও দক্ষিণে সুদীর্ঘ ও সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। কেন্দ্রস্থ মালভূমির অন্তর্ভুক্ত হইতেছে মধ্য আনাতোলিয়া। এই বেষ্টনীর উত্তরাংশকে যথার্থই যৌথভাবে নাম দেওয়া যায় উত্তর আনাতোলিয়া সীমান্তবর্তী পর্বতমালা। দক্ষিণের অংশ গঠন করিয়াছে তোরোস (Taurus) পর্বতমালা। মধ্য আনাতোলিয়া পূর্ব ও পশ্চিমেও পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, সেইখানে উত্তর ও দক্ষিণের পর্বতমালাও একসঙ্গে মিশিয়াছে। ফলে একদিকে রহিয়াছে পশ্চিম আনাতোলিয়ার পর্বতমালা, তাহার পরে বিস্তৃত ঈজিয়ান সাগরের তটরেখা। পূর্বে ফোরাতের উজান অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী এবং যেন আনাতোলিয়ার বহিস্থ চৌকিকেন্দ্রস্বরূপ রহিয়াছে আরারাত পর্বতের উচ্চ মালভূমি।

ভৌগোলিক অবস্থা হইতে যেইরূপ আশা করা যায়, তেমনই আনাতোলিয়ার তটরেখাস্থ উষ্ণতা, শীতকালে উষ্ণতা মৃদু, জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণ সাগর উপকূলে উষ্ণতা গড়ে ৫° ডিগ্রী সেলসিয়াসের কিছু বেশি, ক্রমশ বাড়িয়া দক্ষিণ উপকূলে উষ্ণতা গড়ে ৮° ডিগ্রী সেলসিয়াসের কিছু বেশি। দেশের বৃহত্তর অংশ নিম্ন আবহাওয়া চাপের নিয়মিত এলাকার মধ্যে অবস্থিত। সেই চাপ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং সারা বৎসরব্যাপী পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের আবহাওয়াকে প্রবাহিত করে। ফলে শীতকালে আনাতোলিয়াতে বায়ুর আর্দ্রতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাসমূহে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয়। উত্তরাঞ্চলে জুলাই-আগস্ট মাসে গড় তাপমাত্রা হয় ২২° ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং দক্ষিণে ২৭° ডিগ্রী সেলসিয়াস। গ্রীষ্মকালে উত্তর দিক হইতে ভূমধ্যসাগরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং তখন পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে শুষ্কতা বিরাজ করে, আবার সমুদ্র হইতে আসে বলিয়া উত্তর উপকূল অঞ্চলে গ্রীষ্মকালেও বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে যে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ তাহা প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সচরাচর দৃষ্ট চিরহরিৎ ধরনের। অনেক স্থানেই এই বনাঞ্চলকে কৃষি জমিতে পরিণত করা হইয়াছে, আর বাদবাকী অংশ ক্রমে গুল্মে পরিপূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন চারণভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। উত্তরের তটরেখা বরাবর অধিক সবুজ ও সমৃদ্ধ বৃক্ষলতা দেখা যায়। উহা গ্রীষ্মকালে অধিক আর্দ্র বলিয়া যেইসব উদ্ভিদের অধিক পানি প্রয়োজন সেইগুলির বনভূমি, ঝোপ ও কৃষিজ জমিরূপে গড়িয়া উঠে।

সীমান্তবর্তী পর্বতসমূহে স্বভাবতই শীতকালে বেশি ঠাণ্ডা পড়ে, স্থানে স্থানে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত কম গরম পড়ে এবং বায়ুতে আর্দ্রতা উপকূলবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। পর্বতের পার্শ্বদেশসমূহ স্বভাবতই বনাঞ্চলে পূর্ণ। পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলীয় বহিঃসীমা ধরিয়া এই বনভূমি প্রধানত 'শুষ্ক অরণ্য', সেখানে বিশেষ করিয়া ওক ও মোচাকৃতি (Coniferous) ধরনের বৃক্ষ জন্মায়। পরিকল্পিতভাবে কৃষিজমি ও চারণভূমি সৃষ্টি করিবার কালে এই ধরনের বহু গাছ কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। উত্তরের পর্বতশ্রেণী তটরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে বনভূমি 'আর্দ্র' ধরনের, এখানকার উচ্চ এলাকাসমূহে বীচ ও পাইন গাছের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প হ্রাস পাইবার কারণে,

এমনকি উত্তর আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরীণ পর্বতমালাতেও 'আর্দ্র অরণ্যে'র স্থানে 'শুষ্ক অরণ্য' সৃষ্টি হইতেছে। 'আর্দ্র অরণ্যে'র ক্ষয়পূরণ ক্ষমতা অত্যধিক বিধায় মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে ধ্বংসের আশংকা কম থাকে।

মধ্য আনাতোলীয় মালভূমি সীমান্তবর্তী পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত থাকার কারণে শীতকালে খুবই ঠাণ্ডা থাকে। জানুয়ারী মাসে গড় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে, আবার গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম থাকে, জুলাই-আগস্ট মাসে তাপমাত্রা ২৪° সেলসিয়াসে পৌঁছায়। উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে ও তথাকার পর্বতসমূহের তুলনায় এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশ কম হওয়ায় এই অঞ্চল তৃণভূমিপূর্ণ। কোন কোন মানচিত্রে ভুল তথ্য দেওয়া থাকিলেও মধ্য আনাতোলিয়াতে প্রকৃতপক্ষে কোন মরুভূমি নাই, এমনকি অতি শুষ্ক অঞ্চলসমূহেও কোন রকম কৃত্রিম পানিসেচের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া বেশ সাফল্যের সহিত গম ও যবের চাষ করা যায়।

আনাতোলিয়া ও মেসোপটেমিয়া যেখানে মিলিত হইয়াছে সেই পূর্বাঞ্চলীয় তোরোস (Taurus)-এর দক্ষিণ প্রান্তেও তৃণভূমি রহিয়াছে। সমুদ্র হইতে খুব বেশি উচ্চে অবস্থিত না হইলেও সেইগুলি সমুদ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, যাহার ফলে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অপেক্ষা এখানে শীতকাল মৃদু ও কম আর্দ্র আর গ্রীষ্মকাল খুবই গরম ও শুষ্ক।

উত্তর আনাতোলীয় সীমান্তের পর্বতমালা ঃ উত্তর আনাতোলীয় সীমান্তের পর্বতমালা (ইউরোপে অনেকেই ইহাকে পন্টিক পর্বতমালা বলিয়া থাকে) তুলনামূলকভাবে সোজা সমান্তরাল পর্বত দ্বারা গঠিত। উচ্চতা ১২০০ মিটার হইতে ১৫০০ মিটারের মধ্যে, যাহার কতক শৃঙ্গ কোথাও ২০০০ মিটার অতিক্রম করিয়াছে। এইগুলি মোটামুটি প্রশস্ত এবং কোন কোনটির ক্ষুদ্র মালভূমিও রহিয়াছে। পূর্বদিকে তথাকথিত যিগানা পর্বতমালাতে (ট্রাবযনের দক্ষিণস্থ যিগানা গিরিপথের নামানুসারে এই নামকরণ) বহু দূর পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ মিটার উচ্চ একটানা দীর্ঘ পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এখানে পর্বতের গড়ন আলপস-এর অনুরূপ। পর্বতগুলি প্রধানত শ্লেট পাথর, বেলে পাথর, চুনা পাথর, আগ্নেয়শিলা ও স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা গঠিত। পশ্চিম দিকে মর্মর সাগরের দক্ষিণস্থ পর্বতের গঠনে বলকান উপদ্বীপের অন্তঃস্থ দিনারিক পর্বতমালার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পূর্বদিকে দক্ষিণ ককেসীয় পর্বতমালা উত্তর ইরানীর পর্বতমালার সঙ্গে একত্রে মিলিত হইয়াছে।

উত্তর আনাতোলীয় পর্বতমালার প্রাকৃতিকভাবে গড়িয়া উঠা অরণ্যময় মালভূমিতে, বিশেষ করিয়া উহার মধ্যভাগে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চে অবস্থিত বনভূমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি হইতেছে শস্য উৎপাদন এবং ভেড়া ও বকরী পালন (পূর্বদিকে গবাদি পশুও পালন করা হয়)। পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী দীর্ঘ প্রশস্ত উপত্যকাসমূহ যেইখানে দারুণ গ্রীষ্ম, পানি থাকা হেতু চাষবাস করা সম্ভব হইয়াছে, সেই সকল স্থানেই জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে প্রাচীন বিথাইনিয়া (Bithynia)-র পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বোলু-গারাদি-চারকাশ-ইলগায তোসা অববাহিকা, সাফরানবোলু-কাসতামোযু-বোয়াবাত অববাহিকা অঞ্চল, প্রাচীন পাফ্লাগোনিয়ার কেন্দ্রভূমি, প্রাচীন পনটাস অঞ্চল, আমাসিয়া, যিলে ও তোকাতের চতুষ্পার্শ্ববর্তী উজান ইয়াশিল ঈরমাক (আইরিস Iris)-এর অববাহিকাসমূহ এবং পূর্বদিকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটায় দীর্ঘ কেলকিট-চরুহ নিম্ন উপত্যকা।

উত্তর উপকূলে পর্বতমালা কৃষ্ণসাগর হইতে খাড়াভাবে উপরে উঠিয়াছে। এইখানে কয়েকটি উপসাগরও রহিয়াছে। উপকূলীয় ভূমি খুবই সরু এবং স্থানে স্থানে উপত্যকাসমূহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া পূর্বদিকে জনবসতি অত্যন্ত ঘন এবং গিরেসুন (Gerasus), তারাবযুস (Trapezus, ত্রেবিযোনদ, আধুনিক ত্রাবযোন) ও রিযে (দ্র.)-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভুট্টা, সীম, বিশেষ করিয়া এক জাতীয় বাদাম (hazelnut) উৎপাদিত হয়। একমাত্র বৃহত্তর সমভূমি হইতেছে ইয়াশিল ঈরমাক ও কীযীল ঈরমাক (দ্র.) [হ্যালিস] নদীর মোহনার কাছাকাছি বদ্বীপ অঞ্চল, কিন্তু এইগুলি অংশত জলা জায়গা। অধিকতর উর্বর জমিতে অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মায়। কোজা ইলী উপদ্বীপ, থ্রেস উপদ্বীপ সমতল ও নিম্ন সাকারিয়া (Sangarius) অঞ্চলে অবস্থিত আদাপাযারী সমভূমি অত্যন্ত উর্বর।

বসফরাস ব্যতীত আর মাত্র একটিই পোতাশ্রয় আছে যাহা কৃষ্ণসাগরের উত্তর-পশ্চিমা ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে সুরক্ষিত, তাহা হইতেছে সিনোব (Sinob)। পশ্চাদভূমি খুবই ভাল না হইবার কারণে ইহার গুরুত্ব বর্তমানে খুবই কম। সামসুন (Amisus)-এর মধ্য আনাতোলিয়ার সহিত চমৎকার রেল ও সড়ক এই উভয় পথেই যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কয়লা খনি ও শিল্প অঞ্চলসমূহের যোঙ্গুলদাক ও আরেগলি (Heraclea Pontica)-এর বর্তমানে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করা হইতেছে। এক সময় যিগানা পর্বতমালাতে অবস্থিত রৌপ্য, সীসা ও তামার খনিগুলির কিছু গুরুত্ব ছিল [গুমুশ খান (দ্র.) বরচকার সন্নিহিত মুরগুল ও অন্যান্য]।

ভূমি অবনয়নের ফলে যে আনাতোলিয়া ও বলকান উপদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে ঈজিয়ান সাগরের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মর্মর অঞ্চলের উত্তর আনাতোলীয় পর্বতমালাকেও প্রভাবিত করিয়াছে। ফলে মর্মর সাগরের চতুর্দিকে পার্বত্য জেলা ও সমতল অঞ্চল রহিয়াছে (মর্মর সাগরের অববাহিকা কোন কোন স্থানে বেশ গভীর)। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিরাজিত। বুরসা (Brusa)-এর নিকটে গুটি পোকার চাষ হয়, রেশম উৎপাদিত হয় এবং তেকির দাগ (Rodosto)-এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে মদ্য প্রস্তুত হয়। অসাধারণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বায়যানটিয়াম কন্স্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল (দ্র.) গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া উহার সেই গুরুত্ব রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আনাতোলিয়া ও বলকান উপদ্বীপের মধ্যবর্তী সংযোগস্থলের উপরে অবস্থিত এই শহরটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল স্বভাবতই সেই সময়কালে যখন শহরটি উভয় এলাকা জোড়া বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক রাজধানী ছিল। এমনকি বর্তমান সময়েও ইহা বিশ্বের কাছে তুরস্কের দ্বার এবং দেশের প্রধান আমদানী বন্দর। এখানকার প্রণালী অবশ্যই দুই মহাদেশ বা দুইটি সংস্কৃতির সীমারেখা নহে। সেই ধরনের সীমান্তরেখা বরং পূর্ব থ্রেসের অতি জনবিরল তৃণভূমি ও হীদার গুল্ম অঞ্চলে পাওয়া যাইতে পারে।

তোরোস =Taurus (Toros) **পর্বতমালা** ঃ সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ আনাতোলিয়ার তোরোস পর্বতমালা উত্তর আনাতোলিয়ার সীমান্তবর্তী পর্বতশ্রেণী অপেক্ষা বেশ উচ্চ। পর্বতশ্রেণী এখানে সুদীর্ঘ রেখায় বিস্তৃত এবং ইহার বিরাটকায় তরঙ্গ সদৃশ শীর্ষদেশ স্থানে স্থানে ২,০০০ মিটার পর্যন্ত এবং কোথাও কোথাও ৩,০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ। ভান-ওয়ান (Van) হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তুষারাচ্ছন্ন জিলো দাগ পর্বতের কোন কোন চূড়া ৪,১৭৬ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন। এই সকল পর্বতে চুনা পাথরই বেশি। পর্বতশ্রেণীসমূহ কখনও কখনও খুব বেশি ধনুকাকৃতির, ফলে ইহার বিভিন্ন অংশ স্পষ্টভাবে পৃথক। আনতালিয়া (Adalia, Attalia) উপসাগরের পশ্চিমে পশ্চিম তোরোসের বিশাল চুনা পাথরের পর্বতমালা—এইগুলির মধ্যে সর্বোচ্চগুলিকে কখনও কখনও Lycian Taurus বলা হইয়া থাকে—বহির্মুখী হইয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে সাগরের দিকে এবং রোডস, ক্রীট ও বলকান উপদ্বীপের দিনারিক পর্বতমালার বহিঃপ্রান্তের দিকে প্রসারিত। আনতালিয়া উপসাগর ও আদানা সমভূমির মাঝখানে কেন্দ্রীয় তোরোসের বিশাল বক্র অংশ প্রসারিত। ইহারই সুপরিচিত পূর্ব শাখাকেই কখনও কখনও বলা হইয়া থাকে Cilician Taurus। তোরোস পর্বতমালা দুইটি সমান্তরাল রেখায় প্রসারিত হইয়া আলেকজান্দ্রেত্তা উপসাগরের পূর্ব পর্যন্ত গিয়াছে। একটি বাহিরের পর্বতরেখা আমানুস পর্বতমালা (Amanus Mountains) হইতে ভান হ্রদের দক্ষিণস্থ পর্বতরেখার সঙ্গে মিশিয়াছে, পরে মালাতিয়ার দক্ষিণস্থ এবং মুরাদ নদীর দক্ষিণস্থ পর্বতমালার সঙ্গে গিয়া এক হইয়াছে। ভিতরের দিকের একটি পর্বতরেখা—যাহার পশ্চিমের অংশকে কখনও কখনও একেবারে অযৌক্তিকভাবে বলা হয় Anti-Taurus—আদানার উত্তরে উচ্চ সায়হান অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী হইতে উরমিয়া এলাকা পর্যন্ত গিয়াছে এবং অতঃপর ফোরাতের উজানাঞ্চল (কারা সু)-এর সঙ্গে এবং আরাস (Araxes)-এর উজানাঞ্চলের দক্ষিণস্থ পর্বতমালার সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। এই দুইয়ের মধ্যে কয়েকটি অববাহিকা রহিয়াছে—আলবিস্তানের অববাহিকা, মালাতিয়া- ইলাযিগের অববাহিকা (Elaziz, Kharput), চাপাকচুরের অববাহিকা, মুশের ও ভানের অববাহিকা। এই সমগ্র পর্বতমালাকেই যথার্থভাবে বলা হয় পূর্ব তোরোস (Eastern Taurus)। (পূর্বেকার গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন রকমের নামকরণ দেখা যায় ঃ Anti-Taurus ব্যতীতও পর্বতমালার বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন নাম প্রচলিত ছিল, যেমন আর্মেনীয় তোরোস, কুর্দী তোরোস, যদিও এ সকল নামের যথার্থ ব্যবহার নির্ধারিত হয় নাই)। উপরোল্লিখিত নিম্ন সমভূমিসমূহ ভিতরস্থ তোরোস শৈলশ্রেণীকে বহিঃস্থ তোরোস শৈলশ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কাজেই সামগ্রিকভাবে দেখিলে পূর্ব তোরোস পর্বতশ্রেণী (এই দুই পর্বতশ্রেণী সমেত) একটি উত্তরাভিমুখী অর্ধবৃত্ত রচনা করিয়াছে এবং ইহার দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণ ইরান সীমান্ত পর্বতমালার সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিম তোরোসের এবং মধ্য তোরোসের পশ্চিমাংশের দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে বেশ কিছু সংখ্যক দীর্ঘ বিস্তৃত অববাহিকা রহিয়াছে। সেইগুলির কয়েকটিতে হ্রদ আছে। প্রাচীন অঞ্চল পিসিডিয়া ও ইসাওরিয়ার হ্রদ বিখ্যাত। এই অববাহিকাগুলিই লোকবসতির প্রধান কেন্দ্র। কোন কোন স্থানে মূল্যবান বিশেষ সংস্কৃতি রহিয়াছে, যেমন ইসপার্টা (দ্র.) ও বুরদুর (দ্র.)-এর নিকটে। চুনা পাথরের পর্বত অঞ্চলে পানির অভাবহেতু জনবসতি কম। সাবেক 'শুষ্ক অরণ্য' অঞ্চল বর্তমানে ব্যাপকভাবে নিম্নমানের পশুচারণ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এইগুলিতে ছাগল ও ভেড়া চরানো হয়। মধ্য তোরোস অঞ্চলে জনবসতি অল্প কয়েকটি সরু উপত্যকাতে সীমাবদ্ধ; ইহা একটি বিস্তীর্ণ পর্বতশিলাময় অঞ্চল। এখানেও অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানসমূহ গ্রীষ্মকালে প্রধানত ভেড়া ও ছাগলের চারণভূমি (ইয়ায়লা) রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব তোরোস অধিকতর প্রশস্ত, এখানকার নিম্ন-সমভূমিতে যথেষ্ট জনবসতি থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমানে এইগুলিতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই বাস করে। পূর্ব তোরোসের দক্ষিণাংশের পাদদেশ অঞ্চলে বৃষ্টির পানিতে যতটুকু সম্ভব—পর্বত হইতে যতদূর যাওয়া যায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ততই কমিতে থাকে—ততটুকু বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদ এবং এতকাল পর্যন্ত পূর্ব তোরোসের পাদদেশে অবস্থিত দক্ষিণ দিকের পাহাড়সমূহের জনবিরল অঞ্চলে জনবসতি বৃদ্ধিও সম্ভব। এই বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদ ও জনবসতি বৃদ্ধি করা যায় প্রাচীন কেন্দ্রগুলির নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে, যথা দিয়ারবাকীর [দিয়ার বাকর (দ্র.), দিয়ারবেকির, আমিদ], উরফা (দ্র.) আর-রুহা-Edessa, গাযী-আনতেপ (দ্র.), হ'লাব (দ্র.) (আলেপ্পো), কিন্তু তার দক্ষিণে আর বেশি দূর নহে। এই পূর্বাঞ্চলীয় পর্বতের পাদদেশীয় সর্বাপেক্ষা উর্বরা অঞ্চল হইতেছে পশ্চিমে আনতাকিয়া (দ্র.) (Antioch)-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী হাতাই (দ্র.) যেখানে নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরের অবস্থানহেতু কমলা ও লেবু জাতীয় অন্যান্য ফল জন্মান সম্ভব হয়।

সামগ্রিকভাবে তোরোসের উপকূলীয় সরু ভূভাগে শুধু সরু, দীর্ঘ পলি জমি আর কিছু ছোট পাহাড় জনবসতির উপযোগী। এই স্বল্প পরিমাণ স্থানেই ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ অংশত লেবু জাতীয় ফলসমূহের বৃক্ষ জন্মান সম্ভব। তবে এখানে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ খুব বেশি। সাধারণভাবে আমরা দেখিতে পাই, চুনা পাথরের পর্বত (যাহাতে আর্দ্রতা নাই) সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাতেই থাকে। সত্যিকারের কৃষির উপযোগী একমাত্র এলাকা হইতেছে আদানা (দ্র.) সমভূমি—তারসূস (দ্র.) ইহার অন্তর্গত—যাহা হইতেছে সুপ্রাচীন কালের সিলিসীয় সমভূমি এবং যাহা সায়হূন নদী [দ্র.] (Saros) ও জায়হূন নদী (দ্র.) (Pyramos)-এর পলি দ্বারা গঠিত। সাম্প্রতিক বৎসরসমূহে এই অঞ্চলে তুলা উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনতালিয়ার (দ্র.) নরম চুনা পাথরময় যে সমভূমি যেইখানে সমুদ্র খাড়া, উচ্চতা ৩০ মিটার, উহা কৃষির জন্য বেশি সুবিধাজনক নহে।

আনাতোলিয়ার দক্ষিণ উপকূল—যতদূর পর্যন্ত উহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে—উহার কোনখানে বড় জাহাজের জন্য নিরাপদ ভিড়িবার স্থান নাই। ইসকান্দারূন [দ্র.] (আলেকজান্দ্রেত্তা) ও মারসীনের কিছুটা গুরুত্ব রহিয়াছে আদানা সমভূমি ও হাতাইয়ের পোতাশ্রয় হিসাবে এবং পূর্বাঞ্চলীয় তোরোসের আকরিক ক্রোমিয়াম বিদেশে চালান দিবার পোতাশ্রয় হিসাবে। পশ্চিমে তোরোসের জন্য পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র পোতাশ্রয় ফাতিহিয়্যা বরং এই ভূমিকাটি বেশি পালন করে।

ঈজীয় আনাতোলিয়া (এগাহ অঞ্চল) ঃ দুই সীমান্তবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যকার এই অঞ্চলের ভূমিরূপের মধ্যে বৈচিত্র্য কম। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যময়

স্থান রহিয়াছে। পশ্চিমে এগীয় আনাতোলিয়া, আধুনিক তুর্কী ভাষায় ইহাকে বলা হয় 'এগাহ অঞ্চল', উত্তরে দক্ষিণ মর্মর পর্বত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তোরোস পর্বতের মধ্যে অবস্থিত, মোটামুটিভাবে এই অঞ্চলটিই ছিল প্রাচীন গ্রীকদের আয়োনীয় (Ionian) উপনিবেশ। এখানে বাকীর চে (Caicus), গেদিয (Hermus), বৃহৎ মেন্দারেস ও ক্ষুদ্র মেন্দারেস (Kayster, Maeander)— এইসব প্রশস্ত উপত্যকা উপদ্বীপের ২০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে, যেইখানে ১,০০০ মিটার হইতে ২,০০০ মিটার উচ্চ, পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রসারিত পর্বতশৃঙ্গসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে স্বচ্ছ পাথরের (Philipson এইগুলিকে বলিয়াছেন Lydian-Carian প্রস্তর) স্তর রহিয়াছে। এই সকল উপত্যকার কারণে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেশের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে। এই অঞ্চলে জনবসতি অত্যন্ত ঘন। এখানে তামাক, জলপাই, ডুমুর ও আঙুর (প্রধানত শুকাইয়া কিশমিশ করা হয়) উৎপাদিত হয়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে তূলা উৎপাদন কিছুটা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

উপকূল ভূমি সমকোণীভাবে পর্বতশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেইখানে অনেক উপসাগর, খাড়ি ও প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় রহিয়াছে। বড় নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি বহন করিয়া আনে এবং এইভাবে উপসাগরগুলি ক্রমেই ভরাট হইয়া আসিতেছে। Ephesus ও Miletus সুদূর অতীত কালে দুইটি পোতাশ্রয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে এইগুলি কয়েক কিলোমিটার দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। প্রায় সর্বাপেক্ষা সুন্দর পোতাশ্রয় ইয্মির (স্মার্না) যে পলি মাটি দ্বারা ভরাট হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা গেদিস চে নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে। ইয্মির উপরিউক্ত সকল উপত্যকার সঙ্গে রেল দ্বারা যুক্ত। ফলে ইহা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র এবং তুরস্কের কৃষিজ সম্পদ রফতানীর প্রধান বন্দর। এই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানীয় কেন্দ্র হইতেছে বেরগামা (দ্র.) (Pergamum), মানিসা [দ্র.] [(Magnesia), তিরে (দ্র.), আয়দীন (দ্র.), গুযেল হিসার] ও দেনিয্লি (দ্র.)।

পশ্চিম আনাতোলীয় শৈলশিরা ঃ পূর্বদিকে এগীয় আনাতোলিয়া উপত্যকা যেইখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একদিকে তোরোস পর্বতমালার পুনঃপ্রবেশিত কোণ এবং অপর দিকে মর্মর সাগরের দক্ষিণ সীমান্তরেখার মাঝখানে আফ্য়ূন কারা হিসার-কুতাহ্য়া উশাক অঞ্চলে এক বিশাল চড়াই রহিয়াছে। ইহা হইয়াছে এক বিশাল মালভূমি দ্বারা যাহার উচ্চতা ১,২০০ মিটার হইতে ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত। এইগুলির উপরে বিশালাকারের পর্বতশ্রেণী উঠিয়াছে, সেইগুলির উচ্চতা প্রায়শই ২,০০০ মিটারের অধিক। উত্তর-পূর্বদিকে ও উচ্চ সাকারিয়্যার (Sangarius) চড়াইয়ের দিকে পর্বতশ্রেণী ক্রমেই ১,১০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢালু হইয়া গিয়াছে। এই বিশাল উচ্চতার নামই পশ্চিম আনাতোলীয় শৈলশিরা। মালভূমির অধিকাংশ অঞ্চল প্রধানত তৃতীয় স্তরের কাদামাটি ও বালুকা দ্বারা গঠিত। এইগুলি এক সময়ে উত্থিত হইয়াছিল এবং পরে উপত্যকাসমূহ দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে যাহা আমরা বর্তমানে দেখিতে পাই। এইগুলি সবই তৃণভূমি। শুধু উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলেই স্বাভাবিক বৃক্ষাদি জন্মায়; কিন্তু অধিকাংশ বনভূমিই কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

এই অঞ্চলে যে স্বল্প সংখ্যক লোক বাস করে তাহাদের প্রধান উপজীবিকা হইতেছে শস্য উৎপাদন ও ছাগল-ভেড়া পালন। এই মালভূমির অভ্যন্তরে কয়েকটি সড়ক ও রেলপথ গিয়াছে এবং অন্য দিকে আফয়ূন কারা হিসারের [দ্র.] (Afyon kara hisar) নিকটে গিয়া বিভক্ত হইয়া পশ্চিম তোরোসের অববাহিকাসমূহ এগীয় অঞ্চলের নিম্নভূমি ও মর্মর সাগর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

মধ্য আনাতোলিয়া ঃ মধ্য আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরস্থ মালভূমি বিস্তৃত সমতল অঞ্চলসমূহ লইয়া গঠিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইগুলির উচ্চতা ৮০০ মিটার হইতে ১,২০০ মিটার পর্যন্ত। কুনিয়া (Iconium) অববাহিকাসমূহের চতুর্দিক স্থলভাগ বেষ্টিত হওয়ায় তলানি পড়িয়াছে, যাহা জমিয়া সাম্প্রতিক এইগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন তুয গুলু (লবণ হ্রদ) নামক বিশাল লবণের জমান সমতল স্তর। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০ মিটার উচ্চে অবিস্তৃত এবং কিছু কিছু মানচিত্রে অনেক সময় ভুলবশত ইহাকে তুষ চুলু (লবণের মরুভূমি) বলিয়া দেখান হয়। উচ্চ সাকারয়া ও কীযীল ঈরমাকেরও কোন কোন স্থানে এই রকম জমান সমতল স্তর সেইখানে রহিয়াছে। ভূনিম্নে তৃতীয় পর্যায়ের সঞ্চিত শিলার বিস্তৃত মালভূমি ও ভাঁজযুক্ত মাটির স্তরের উপরে প্রশস্ত সমভূমিও রহিয়াছে।

মধ্য আনাতোলিয়াতে বেশ উচ্চ পর্বতসমূহ রহিয়াছে। সেইগুলি চতুষ্পার্শ্ববর্তী মালভূমি হইতে ৫০০ হইতে ১,৫০০ মিটার উঁচু। সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট কয়েকটি বিশাল আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে, এইগুলি বর্তমানে জীবন্ত নহে, যেমন এরজিয়াস দাগ [দ্র.] (৩,৯১৬ মিটার), কায়সারির নিকটস্থ সুপ্রাচীন কালের পরিচিত আগ্নেয়গিরি আরগেআস (Argaeus) ও নিগদের নিকটবর্তী হাসান দাগ আগ্নেয়গিরি (৩,২৫৮ মিটার)।

জনসাধারণের জীবন ধারণের জন্য এই পর্বতসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। শুষ্ক মধ্য আনাতোলিয়াতে উচ্চ পর্বত বেষ্টিত হওয়ায় যেইগুলি নিম্ন এলাকা সেইগুলি সর্বাধিক শুষ্ক, অপরদিকে উচ্চ পর্বতগুলিতে মেঘ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিপাত হয়। অতএব জনবসতির জন্য সবচেয়ে অনুকূল অঞ্চল হইল, একদিকে উচ্চতম মালভূমিসমূহ, যেমন উদাহরণস্বরূপ কীযীল ঈরমাকের বাঁকের সন্নিহিত এলাকাসমূহ, সুপ্রাচীন কালের Cappadocia এলাকা এবং অপরদিকে পর্বত বেষ্টনীর পাদদেশ এলাকাসমূহ যেইখানে বেগবতী স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ শহর যতগুলি আছে উহাদের অধিকাংশই উল্লিখিত এই দুই এলাকার শেষোক্ত এলাকাতে অবস্থিত। যেমন আনকারা [দ্র.] (Ancyra, Angora) এসকি শেহির [দ্র.], কুনিয়া [দ্র.] (Iconium), নিগদে (দ্র.), Caesarea ও সিবাস [দ্র.] (Sebastia)। এইগুলিরই ভূমি এইরূপ বা অতীতে এইরূপ ছিল যে, সহজেই সেইখানে পানি সেচন সম্ভব। তৃণভূমিতে জনবসতি খুবই কম। সেইখানে জীবিকার ভিত্তি হইল গম ও যব উৎপাদন এবং ভেড়া ও আঙ্গোরা ছাগল পালন, যদিও আধুনিক যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রচলনের ফলে সাম্প্রতিক কালে চাষাবাদের এলাকাসমূহ বাড়িয়াছে এবং ইহাদের উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। তবে কৃষি উন্নয়ন সবচেয়ে কম হইয়াছে, বিশেষ করিয়া তুয গুলু ও কুনিয়ার শুষ্ক অববাহিকায়, সুপ্রাচীন কালের Lycaonia এলাকায় ও 'Artemisian steppe'-এর অধিকাংশ অঞ্চলে।

পর্বতসংকুল সীমান্ত এলাকা অপেক্ষা মধ্যবর্তী মালভূমি অঞ্চলে চলাচল অপেক্ষাকৃত সহজ। এই কারণে এই মালভূমি যাহা সব সময়েই আনাতোলিয়ার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা রাজধানী আনকারাতে স্থানান্তরের পর হইতে এবং তুরস্কের সড়ক ও রেল যোগাযোগ অধিকতর সম্প্রসারিত হওয়ায় পূর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে।

ফোরাতের উজান অঞ্চল ও আরারাত উচ্চভূমি ঃ ভৌগোলিকভাবে আনাতোলিয়ার পূর্ব সীমান্ত হইতেছে ফোরাতের উজান (Upper Euphrates) এলাকায়, যেইখানে উত্তর আনাতোলীয় সীমান্তবর্তী পর্বতমালা ও পূর্বাঞ্চলীয় তোরোস এই দুইয়ের মধ্যখানে নূতন পর্বতসমূহের সৃষ্টি হওয়ায় ইহারা একসঙ্গে মিশিয়াছে বিশাল এই পার্বত্য অঞ্চলে, যেইখানে অধিকাংশ শৃঙ্গই ২,৫০০ মিটার অতিক্রম করিয়াছে (কখনও ৩,০০০ মিটারও ছাড়াইয়া গিয়াছে)। শুধু উপত্যকাগুলিতে, বিশেষ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উপত্যকাগুলিতে অল্প সংখ্যক লোক বাস করে। এই উপত্যকাগুলির মধ্য দিয়াই আনাতোলিয়া হইতে আযারবায়জান ও ইরানের রাস্তা গিয়াছে। এরযিন্‌জান (দ্র.) ও এরযুরুম (দ্র.) (Erzerum) শহর দুইটি প্রহরীর ন্যায় রাস্তাগুলির পার্শ্বে অবস্থিত।

একদিকে পূর্বদিককার তোরোস ও অন্যদিকে উত্তর আনাতোলীয় সীমান্তবর্তী পর্বতমালা এরযুরুমের মধ্যরেখার পূর্বে পুনরায় বিভক্ত হইয়াছে এবং একটি উচ্চভূমি গঠন করিয়াছে, যাহা ১,৫০০ মিটার হইতে ১,৭০০ মিটার উচ্চতায়, এমনকি মধ্য আনাতোলিয়ার অববাহিকা (basin) অপেক্ষাও উচ্চতর অববাহিকা গঠন করিয়াছে। ভাঁজযুক্ত ভিত্তির উপরে বেশ কিছু পরিমাণ আগ্নেয় শিলা সাম্প্রতিক কালে সঞ্চিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে বিশাল আগ্নেয়গিরিসমূহ (বর্তমানে সুপ্ত), যথাঃ আরারাত (আগরিতাগ দ্র.) (৫,১৭২ মিটার), আলাগোয দাগ (৪,০৯৪ মিটার), সুবহানদাগ (৪,৪৩৪ মিটার) পার্বত্যাঞ্চল হইতে উর্ধ্বে উঠিয়াছে এবং স্থানে স্থানে, যেমন ভান হ্রদের নিকটে অববাহিকাসমূহের বাঁধরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই বন্ধুর পার্বত্যাঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে, ইহা প্রধানত চারণভূমিরূপেই ব্যবহৃত হয়, আর শুধু তুলনামূলকভাবে ছোট অববাহিকাসমূহেই কৃষিকাজ ও বসবাসের উপযোগী আবহাওয়া বিরাজ করে। এই অঞ্চল সাধারণভাবে আর্মেনিয়া নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের ফল হিসাবে গত একপুরুষ যাবত যাহারা এখানে বাস করে তাহারা তুর্কী অথবা কুর্দী ভাষায় কথা বলে। কাজেই তুরস্কের এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে (যাহা প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক আনাতোলিয়ার সীমানার বাহিরে অবস্থিত) আরারাত পার্বত্যাঞ্চল নামে অভিহিত করাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এই নামটি নিরপেক্ষ হইলেও ভৌগোলিক দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সর্বাধুনিক কালের সাধারণ ভৌগোলিক জরীপসমূহ ঃ (১) E. Banse, Die Turkie, eine moderne Geographie[2], ব্রনসউইগ ১৯১৬ খৃ., ইহাতে বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্বেকার রচনাবলীর বিস্তারিত তালিকা রহিয়াছে; (২) R. Blanchard, Asie occidentale, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (৩) U. Frey, Turkei und Zypern (Handbuch der geograph. Wissenschaft, vol. Vorder und Sudasien), পট্‌সডাম ১৯৩৭ খৃ.; (৪) H. Louis, Anatolien Geography, Zeitschr, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৩৫৩-৭৬; (৫) হামীদ সাদী সালান, ইকতিসাদী তুর্কীয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯-৪০ খৃ.; (৬) ফাইক সাব্‌রী দুরান, তুর্কীয়াজোগরাফিয়াসী, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ.; (৭) R. Steinmetz, Anatolie, Tijdschr, Nederl Aardr, Genootsch, ১৯৪১ খৃ.; (৮) H. Louis, Turiye Cografyasinin ana hatlari, I, Turk Cogr. Kongresi Raporlar, Muzakereler, Kararlar, আনকারা ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৭১-২২৮; (৯) বেসিম দারকত, তুর্কী জোগ্রাফিয়াসী, ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ.; (১০) H. Wenzel, Die Turkei, ein landeskundlicher Uberblick, Zeitschr. f. Erdkunde, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৪০৮-২৩; (১১) Statistics : Kucuk Istatistik Yilligi, Statistical abstract. Istatistik Genel Mudurlugu, শেষ সংস্করণ ১৯৫১ খৃ., ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্রসমূহ; (১২) R. Kiepert, Karte von Kleinasien, ২৫ পাতা, ১ ঃ ৪,০০,০০০, বার্লিন ১৯০২-৬ খৃ.; (১৩) A. Philippson, Topographische Karte des westlichen Kleinasien, ৬ পাতা, ১ ঃ ৩,০০,০০০, গোথা ১৯১০-৩ খৃ.; (১৪) ফাইক সাব্‌রী দুরান বুয়ুক আটলাস, ১ম সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৭ খৃ., অতঃপর আরও সাম্প্রতিক সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, এইগুলিতে তুরস্কের একটি চমৎকার মানচিত্র রহিয়াছে, স্কেল ১ ঃ ৪.৫ Mill. ও ১ ঃ ২ Mill.; (১৫) তুর্কীয়্যা, ১ ঃ ৮,০০,০০০ হারতা জেনেল দিরেকতোরলুগু, আনকারা ১৯৩৩ খৃ. হইতে ৮ পাতা, ইস্তাম্বুল, আনকারা, সিভাস, এরযুরূম, ইয্‌মির, কুনিয়া, মালাতিয়া, মুসুল; (১৬) তুর্কীয়্যা জিওলিক হারতাসী, ১ ঃ ৮,০০,০০০ মাদেন তেতকিক ভেআরামা ইন্সটিটুসু, আন্‌কারা ১৯৪২ খৃ., উপরিউক্ত মানচিত্রের সহজ ভৌগোলিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া অঙ্কিত ৮ পাতা মানচিত্র (প্রতিটি পাতার ‘বিস্তারিত ব্যাখ্যা সমেত’ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে); (১৭) তুর্কীয়্যা টেকটনিক হারতাসী, ১ ঃ ৮,০০,০০০, মাদেন তেতকিক ভে আরামা ইন্সটিটুসু, নেকডেট ইজীরান ও ই. লান, আন্‌কারা ১৯৪৫ খৃ.।

H. Louis/হুমায়ুন খান

৩। তুর্কী আনাতোলিয়ার ঐতিহাসিক ভূগোল

(ক) তুর্কীগণ কর্তৃক আনাতোলিয়া বিজয়, প্রথম পর্যায় ও রূমের সালজূকদের অবস্থা ঃ মুসলিম আরবগণের বিজয় আনাতোলিয়ার প্রধান অংশের বহির্ভূত ছিল। বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল ঃ উত্তর-পূর্বে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া—এই দুইটি খৃস্টান রাজ্য; এইগুলির দক্ষিণে কালীকালা (পূর্ব নাম Theodosiopolis, পরে নাম হয় আরযান আররূম, এরযুরূম Erzurum) এবং কখনও কামাখ ছিল খলীফাগণের সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সীমান্ত ঘাঁটি; অতঃপর তোরোস পর্বতমালা, ‘গিরিপথসমূহের দেশ’ (বিলাদুদ-দুরূব), একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমান্ত ছিল। বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই আক্রমণ করিলেও আরবরা

বায়যান্টাইন আনাতোলিয়া (আনু. ৮ম-১১শ খৃ. শতক)

আনাতোলিয়া ১১১৬-১২০৪ খৃ. বায়যান্টাইন সামরিক অভিযান এবং তুর্কীদের প্রবেশ
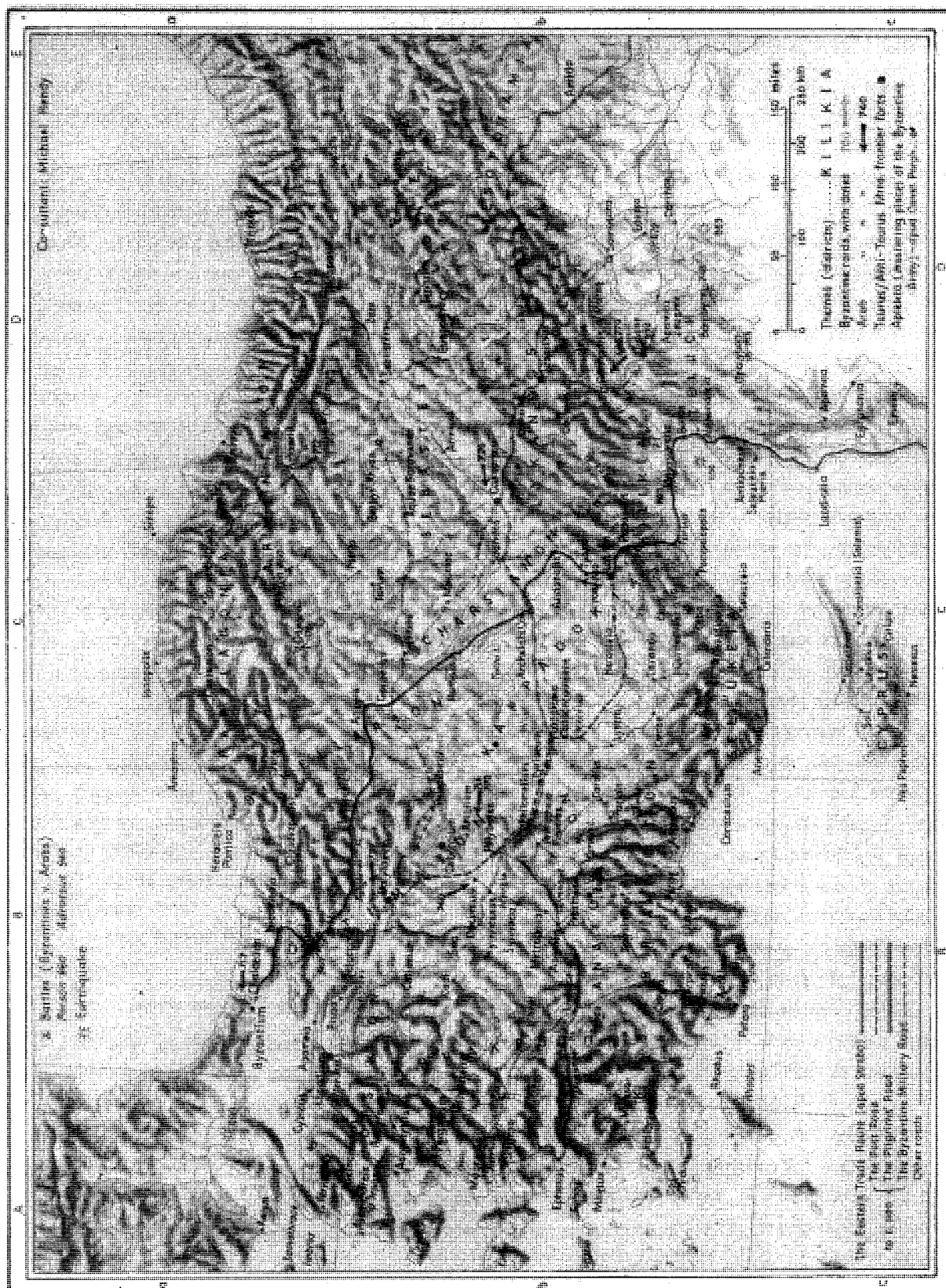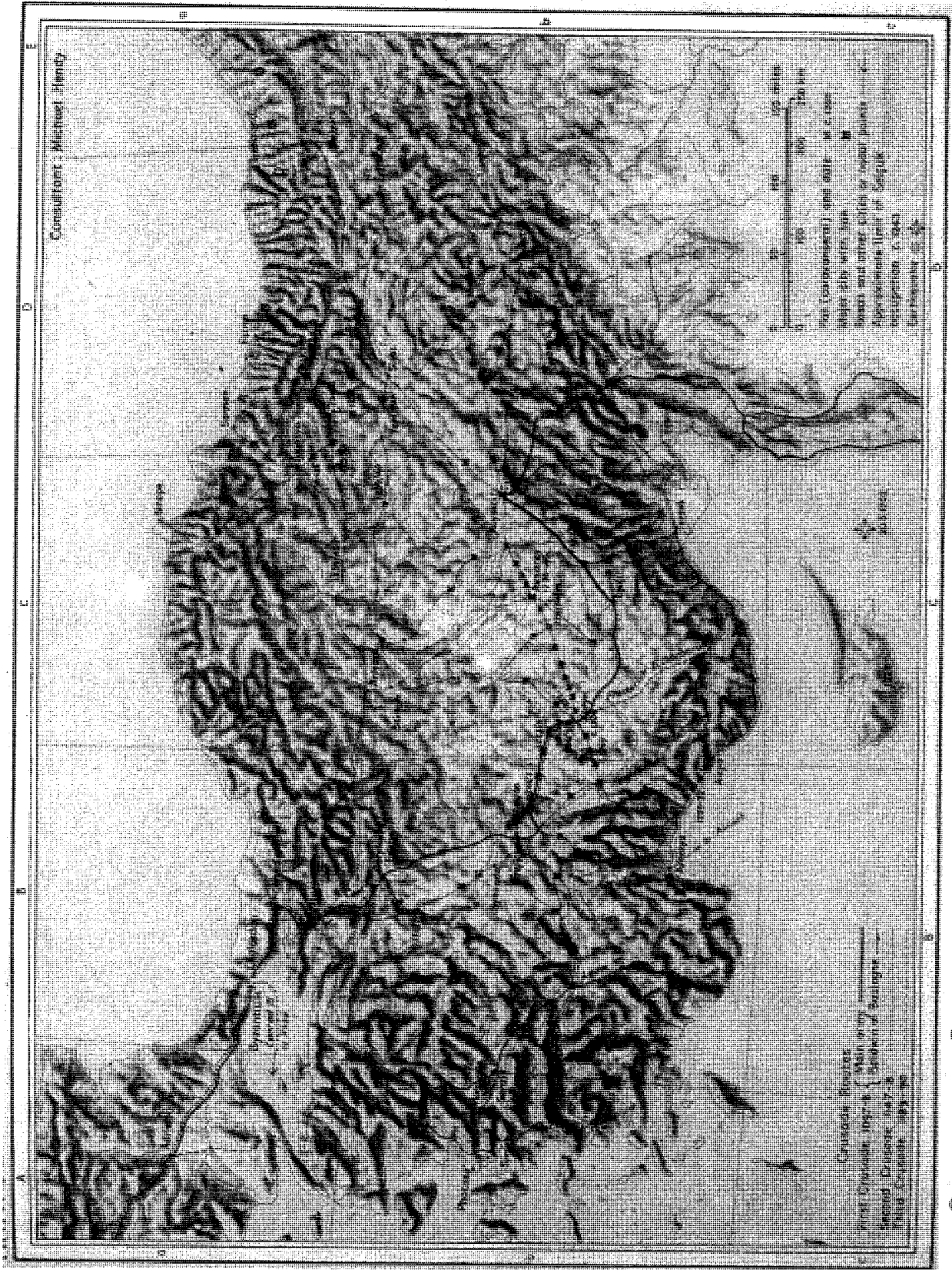
আনাতোলিয়া (আনু. ১৩শ শতাব্দী) সালজূক ও ক্রুসেড অধিগমন সড়ক

আনাতোলিয়া (আনু. ১৩০০ খৃ.) উছমানী বিজয়াভিযান ১৩৬২ খৃ. নাগাদ)।

উছমানী বিজয় অভিযান ১৩৬২-১৪০৫ খৃ. । রুমেলিয়া ও আনাতোলিয়া প্রথম বিজয় ।

কখনও দেশটি দখল করে নাই। এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর সিরিয়া ও উজান মেসোপটেমিয়ার সর্বশেষ অংশসমূহ এবং এইগুলি ছিল 'দেশরক্ষাকারী দুর্গসমূহের সামরিক অঞ্চল' (জুনদুল-'আওয়াসি'ম বা সংক্ষেপে আল-'আওয়াসি'ম) (দ্র.); মানবিজ বা আনতাকিয়া (Antioch) ছিল এই অঞ্চলের রাজধানী আর 'সিরীয় সীমান্তে'র অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত দুর্গসমূহ (ছুগূ'রুশ-শাম), যাহাদের কেন্দ্র ছিল তারসূস এবং মেসোপটেমীয় সীমান্তের দুর্গসমূহ (ছুগূ'রুল-জাযীরা), যাহাদের কেন্দ্র ছিল মালাতিয়াতে (Melitene)। এইগুলি রাজ্যের বহিঃসীমা রচনা করিত। বায়যানটীয়দের ও আরবদের মধ্যকার যুদ্ধে বারবার ক্ষমতা বদলের ফলে এই সীমান্তবর্তী এলাকসমূহ খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেইগুলি আরবদেরই হাতে থাকে। বিখ্যাত সম্রাট নিসেফোরাস ২য় ফোকাস (৯৬৩-৬৯ খৃ.), জন চিমিসকেজ (৯৬৯-৭৬ খৃ.) ও ২য় বাসিল (৯৭৬-১০২৫) কর্তৃক বিজিত না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলগুলি বায়যানটীয় ক্ষমতাধীনে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। এই তিনজনের মধ্যে শেষোক্তজনের মৃত্যুকালে আমাদের আজিকার পরিচিত সমগ্র তুরস্ক-একমাত্র আমিদা (দিয়ার বাক্‌র) ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাদে-বায়যানটীয় সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল (তু. E. Honigmann, Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, Brussels ১৯৩৫ খৃ.)। অতঃপর বায়যানটীয়ামে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অধিনায়কগণ ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই সকল কারণে, বিশেষ করিয়া শেষোক্তগণ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সীমান্তরর্তী এলাকাসমূহ দুর্বল হইয়া পড়ে।

সালজূক বংশীয় তুর্কীগণের বিজয়কালে বায়যানটীয় সীমান্ত অঞ্চল এইরূপ দুর্বল অবস্থায় ছিল; তখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জয় করিবার পরে তাহারা তুর্কী বাহিনীকে সীমান্ত এলাকায় জিহাদের জন্য প্রেরণ করে। বাস্তবিক তাহারা বায়যানটীয় আনাতোলিয়ার কয়েকটি স্থানেই অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয় (৪৫৬/১০৬৪)। বায়যানটীয়—আর্মেনীয় সীমান্ত এলাকাতে আনী বিজিত হয়, তখন সিলিসিয়া ধ্বংস হয় এবং কায়সারিয়্যার (Caesarea) পতন ঘটে। বেসামরিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমর্থনপুষ্ট প্রাচ্য রোম সম্রাট ১০ম কন্সট্যানটাইন ডুকাস-এর মৃত্যুর পরে (মে ১০৬৭ খৃ.) পরিস্থিতি মুকাবিলা করিবার জন্য সামরিক বাহিনীর পদস্থ অধিনায়কগণের অন্যতম সদস্য ৪র্থ রোমানুস ডায়োজিনিসকে যুদ্ধক্ষেত্রেই সিংহাসনে আরোহণ করান হয় (১ জানুয়ারী, ১০৬৮)। তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি কয়েকটি প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেন। ফলে সালজূক সুলতান আল্‌প আরস্‌লান স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিতে বাধ্য হন। ৪৬৩/১৯ আগস্ট, ১০৭১ সালে ভান হ্রদের নিকটে অবস্থিত মানজিকার্ট (Malazgird)-এর যুদ্ধে আল্‌প আরস্‌লান মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা বহু গুণ বেশি শক্তিশালী বায়যানটীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। রোমীয় সম্রাটের পরাজয়ের কারণ ছিল তাঁহার ভাড়াটিয়া সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং সম্রাটের বিরোধী দলের বিশ্বাসঘাতকতা। বায়যানটীয় সম্রাট যুদ্ধে বন্দী হন; কিন্তু সুলতান আল্‌প আরস্‌লান সহজ শর্তাবলীর অধীনে চুক্তি সম্পাদনের পর তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। এই পরাজয়ের ফলে কন্সটান্টিনোপলে এক বিদ্রোহ হয় এবং সেইখানে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হয়। ৪র্থ রোমানুসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার চক্ষু বিনষ্ট করা হয়, অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১০৭২ খৃ., গ্রীষ্মকাল)।

সম্রাট রোমানুসের পতনের পর তাহার ও সুলতান আল্‌প আরসালান-এর মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি বাতিল হইয়া যায় এবং তুর্কীগণ তখন নূতন করিয়া বায়যানটিয়ামের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। এইবারের যুদ্ধে নিয়মিত সালজূক সৈন্যরা অংশগ্রহণ করে নাই, বরং ব্যক্তিগতভাবে নেতাগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেন মালিক দানিশমান্দ (দ্র.) আহমাদ গাযী। তিনি উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়াতে আক্রমণ পরিচালনা করেন। দলে দলে তুর্কী যোদ্ধাগণ গ্রাম্য অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বায়যানটীয় শাসন ব্যবস্থা অচল করিয়া দেয়। অবশেষে আল্‌প আরসলান-এর উত্তরাধিকারী মালিক শাহ (৪৬৫/১০৭২ হইতে) সালজূক বংশীয় সুলায়মান ইব্‌ন কুতলুমিশকে একটি তুর্কী অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে বায়যানটীয়ামের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে আনাতোলিয়া জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। বায়যানটীয়ামে সিংহাসন লইয়া বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ার ফলে তাঁহার পক্ষে পরিস্থিতি খুবই সুবিধাজনক হয়। সম্রাট ৭ম মাইকেল ডুকাস ও তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের পরে (১০৭৮ খৃ.) ৩য় নিসেফোরাস বোটানিয়াটেস, সুলায়মানের সহায়তায় ক্ষমতা লাভ করেন। বিনিময়ে তাহারা তুর্কীদের দ্বারা বিজিত অঞ্চলসমূহে সুলায়মানের আধিপত্য স্বীকার করিয়া নেন এবং তৎকালীন বিজিত দুইটি শহর, সায়যিকাস (Cyzicus) ও নিসিয়া (Nicaea) তাঁহাকে প্রদান করেন (১০৮১ খৃ.)। সুলায়মান নিসিয়াতে (তুর্কী ঈয়্‌নিক Iznik) তাঁহার সদর দফতর স্থাপন করেন। প্রাচ্য রোম সম্রাট ১ম আলেক্সিয়াস কমনেনাস (১০৮১ খৃ. হইতে রাজত্ব শুরু করেন) সুলায়মানকে নামমাত্র বায়যানটীয় আনুগত্যের বিনিময়ে অধিকৃত অঞ্চলে তাঁহার তুর্কী বাহিনী মোতায়েন রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন। বস্তুত সমগ্র আনাতোলিয়াতেই সুলায়মান-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তাঁহার সৈন্যগণ সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। সত্যিকার অর্থে তিনি বায়যানটীয় শাসন অগ্রাহ্য করিয়া আনাতোলিয়াতে স্বীয় শাসনই কায়েম করেন।

আনাতোলিয়াতে সাফল্য অর্জনের পর রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি এন্টিওক (আনতাকিয়া) অধিকারেও সাফল্য লাভ করেন, যাহা তখন পর্যন্ত বায়যানটীয় অধিকার ছিল। কিন্তু সসৈন্যে আলেপ্পো অভিমুখে অগ্রসর হইলে সালজূক আমীরগণের, বিশেষ করিয়া সুলতান মালিকশাহের ভাই তুতুশ-এর নিকট হইতে তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। যুদ্ধে সুলায়মান পরাজিত ও নিহত হন (১০৮৬ খৃ.)।

ইতোমধ্যে আযারবায়জানে জিহাদে রত তুর্কী সৈন্যদলসমূহ আর্মেনিয়ায় বাগরাতীদের খৃস্টান রাজ্য অধিকার করিয়া লয় (৪৭৩/১০৮০)। অতঃপর বাগরাতীয় রাজা রুবেন তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সমেত সিলিসিয়াতে 'ছোট আর্মেনিয়া' নামে এক নূতন রাষ্ট্রের পত্তন করেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণের শাসনাধীন এই রাজ্য ১৪শ শতক (১৩৭৫ খৃ.) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই বংশ তাহারই নামানুসারে রুবেনী বংশ (Rubenids) নামে পরিচিত হয় (দ্র. সীস)।

সুলায়মানের মৃত্যুর পর আনাতোলিয়াতে কিছুকাল পর্যন্ত অরাজক অবস্থা বিরাজিত থাকে। অনান্য তুর্কী নেতা তাঁহাদের সৈন্যদল সমেত আসিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বসেন। উপরোল্লিখিত মালিক দানিশমানদ আহ্‌মাদ গাযী উত্তর-পূর্বে রাজ্য স্থাপন করেন, সদর দফতর করেন সেবাসতিয়াতে (Sivas)। আমীর মেঙ্গুজেক (দ্র.) গাযী

তেফরীকা (Divrigi) ও আরযিনজান অধিকার করেন। আর পশ্চিম দিকে স্মার্নাতে জনৈক আমীর—বায়যানটীয়গণ তাঁহাকে বলিত যাকাস (Tzachas), স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান মালিক শাহের মৃত্যুর পরেই কেবল (১০৯২ খৃ.) তাঁহার উত্তরাধিকারী সুলতান বারকিয়ারুক পরলোকগত সুলায়মান-এর পুত্র কীলীজ আরসলানকে আনাতোলিয়াতে গমনের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া তুর্কী রাজপুরুষগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা দুরূহ বোধ করেন। যাকাস সমুদ্রপথে কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করিতে আসিলে তাঁহাকে বায়যানটীয় সহায়তায় প্রতিহত করা হয়।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হইলে প্রথমদিকে বায়যানটীয়গণ ও ক্রুসেডীয়গণের সম্মিলিত বাহিনী নিকিয়ার নিকটে কীলীজ আরসলান ও মালিক দানিশমন্দ (বা তাঁহার পুত্র গাযী গুমুশতেগীন) নেতৃত্বে পরিচালিত তুর্কী বাহিনীকে পরাজিত করেন। নিসিয়াতে তুর্কী সদর দফতর প্রথমে অবরুদ্ধ ও পরে অধিকৃত হয় (২০ জুন, ১০৯৭ খৃ.)। ১ জুলাই, ১০৯৭ খৃ. বর্তমান এস্‌কিশেহির (Eskishehir)-এর নিকটবর্তী ডরিলিয়ামের সন্নিকটে খৃস্টান ক্রুসেড বাহিনী জয়লাভ করিলে পশ্চিম আনাতোলিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যায় এবং বাদবাকী তুর্কী অঞ্চলে ক্রুসেড বাহিনীর জন্য পথ খুলিয়া যায়। তাহারা এন্টিওকে পৌঁছায়। দীর্ঘ অবরোধের পরে তাহারা উহাও দখল করে (৩ জুন, ১০৯৮)। এখানে বায়যানটীয়ামের আধিপত্যাধীনে প্রথম ক্রুসেডীয় রাষ্ট্র এন্টিওকের ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বৎসর মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত এডেসা জেলা (বর্তমান নাম উরফা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রুসেডীয়গণের এই কয়েকটি সাফল্যের পরে তুর্কী বাহিনীকে পশ্চিম আনাতোলিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে এবং এই এলাকাটিকে পুনরায় বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত করিতে সম্রাট আলেক্সিয়াসকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি সীমান্ত এলাকাকেও অধিকতর শক্তিশালী করেন। সীমান্তরেখা ছিল আনাতোলিয়ার একেবারে মধ্যভাগ দিয়া এবং তখনও তুর্কীদের অধিকারভুক্ত এলাকার বিরোধের মুখে। এই ব্যবস্থার ফলে সাময়িকভাবে তুর্কী অভিযান প্রতিহত হয়।

এই বিপর্যয়ের পরে এক শত বৎসরের বেশী কালের জন্য তুর্কী বিজয় শুধু মধ্য আনাতোলিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকে। সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল (মোটামুটিভাবে ডরিলিয়াম হইতে), কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলভূমি বায়যানটীয় অধিকারে থাকে। সিলিসিয়া ছোট আর্মেনিয়া রাজ্যে পরিণত হয় এবং এন্টিওক ও এডেসা উপরে উল্লিখিত খৃস্টান ক্রুসেড রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। আমিদ (দিয়ার বাক্‌র) আরতুকী বংশ (দ্র.)-এর আতাবেগদের শাসনকেন্দ্র। পরবর্তীতে (১১৪৪ খৃ.) মসুল (মাওসিল)-এর আতাবেগ যাঙ্গী কর্তৃক এডেসা বিজিত হয়। আরও পরে (১২৬৮ খৃ.) মামলূক সুলতান বায়বার্‌স কর্তৃক এন্টিওক বিজিত হয়। কীলীজ আরসলান তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত দেশের মধ্যভাগ মালিক দানিশমান্দ বা তাঁহার পুত্র এবং মেঙ্গুজেক-এর সঙ্গে ভাগ করিয়া নিতে বাধ্য হন। প্রথমোক্তজন মধ্য আনাতোলিয়ার তৃণভূমি নিজ অধিকারে রাখেন, তাঁহার রাজধানী হয় কুনিয়া (সুপ্রাচীন কালের আইকোনিয়াম); শেষোক্তজন পর্বতময় উত্তর-পূর্ব অংশ এবং সেই সঙ্গে সিভাস ও এরযিনজান লাভ করেন। কোন কোন স্থানের অধিকার লইয়া তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়, বিশেষ করিয়া মেলিটিন (Malatya) লইয়া। শেষ পর্যন্ত কীলীজ আরস্‌লান তাহা নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সক্ষম হন (১১০৪ বা ১১০৬ খৃ.)। তবে কীলীজ আরস্‌লান আরও পূর্বে মেসোপটেমিয়াতে (মসুল) রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। খাবুর নদীর তীরে সংঘটিত যুদ্ধে সম্মিলিত সালজূক বাহিনীর নিকট তিনি পরাস্ত হন এবং পশ্চাদ্‌পসরণকালে মারা যান (শাওওয়াল ৫০০/৩ জুন, ১১০৭)। এই সময়কালের ঘটনাবলীর জন্য আরও দ্র. Cl. Cahen, La premiere penetration turque en Asie Mineure, Byzantion, ১৯৪৬, পৃ., ৫-৬৭।

অতএব আমরা দেখিতে পাই, রূম সালজূক রাষ্ট্র (দ্র. সালজূক) বা ক্রুসেড যোদ্ধাদের ভাষায় আইকোনিয়াম সালতানাত ছিল আনাতোলিয়ার সর্বাপেক্ষা অনুর্বর বা দরিদ্র অংশে সীমাবদ্ধ। রূম সালজূকগণ সুলতান ১ম মাস'উদের আমলে এই অঞ্চলটির অধিকার রক্ষা করেন এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডের কালে ডরিলিয়ামের (Dorylaeum) নিকটে সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধে (২৬ অক্টোবর, ১১৪৭ খৃ.) খৃস্টান বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া তাহাদেরকে তুর্কী এলাকার বদলে বায়যানটীয় এলাকার উপর দিয়া পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য করেন। ২য় কীলীজ আরস্‌লান সাফল্যের সংগে দানিশমান্দী রাষ্ট্র স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলে (১১৪৭ খৃ.) রূম সালজূক রাষ্ট্রের পরিসীমা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। রাজ্যের এই অংশটি একই সঙ্গে বায়যানটীয় সম্রাট ১ম ম্যানুয়েল কোমেনুস (Manuel Comnenus) দাবি করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিরিও সেফালন-এর নিকটে ফ্রিজীয় গিরিপথের যুদ্ধে (চারদাকের গিরিপথ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১১৭৬ খৃ.) কীলীজ আরস্‌লান বায়যানটীয় বাহিনীকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলেন এবং সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। প্রবীণ সুলতান ২য় কীলীজ আরস্‌লান স্বীয় রাজ্য পুত্রগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে তখন যে ভ্রাতৃকলহ দেখা দেয় তাহাতে তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। এই অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগেই জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা তুর্কী আনাতোলিয়ার ভিতর দিয়া সসৈন্য অগ্রসর হইবার সুযোগ পান, এমনকি উহার রাজধানী কুনিয়া দখল করিতে সক্ষম হন (১৮ মে, ১১৯০)। কিন্তু তাঁহার এই বিজয় কোন স্থায়ী সুফল বহন করিতে পারে নাই, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, বিজয়ের স্বল্পকাল পরেই সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা সালেফ নদীতে (সুপ্রাচীন কালের Calycadnus নদী, আধুনিক নাম গোকসু নদী) ডুবিয়া মারা যান (১০ জুন, ১১৯০)।

তথাকথিত চতুর্থ ক্রুসেডের খৃস্টান যোদ্ধাগণ ১২০৪ খৃ. কন্সটান্টিনোপল জয় করে এবং ভেনিসের ডোজ এনরিকো ডানডোলোর অনুপ্রেরণায় সেইখানে একটি ল্যাটিন সাম্রাজ্য স্থাপন করে। বায়যানটীয়গণ থিওডোর লাসকারিস-এর নেতৃত্বে পশ্চিম আনাতোলিয়াতে একটি গ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য গঠন করে, উহার রাজধানী স্থাপন করে নিসিয়াতে এবং কমনেনী রাজবংশের দুই ভাই— ডেভিড ও অ্যালেক্সিস, জর্জিয়ার রাণী থামার-এর সহায়তায় ত্রেবিযন্দে তথাকথিত 'বৃহত্তর কমনেনী' (Great Comneni) রাজ্য গঠন করেন। রূম সালজূক সুলতান গিয়াছুদ্দীন ১ম কায়খুসরাও যিনি ছিলেন সুলতান ২য় কীলীজ আরস্‌লান-এর কনিষ্ঠ পুত্র, আত্তালিয়া (Adaliya, Antaliya) জয় করিতে সক্ষম হন। ফলে ভূমধ্যসাগরে তিনি স্বীয় রাজ্যের প্রবেশপথ লাভ করেন (১২০৭ খৃ.)। তিনি পশ্চিম আনাতোলিয়াতে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১২১০ খৃ. থিওডোর লাসকারিস হোনাসের নিকট তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন এবং তিনি সম্ভবত স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গেই সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন। থিওডোর লাসকারিস ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের নিসীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে এমন মযবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক রিয়াছিলেন যে, তুর্কীদের

পক্ষে সামরিকভাবে সেই এলাকাতে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। ১২১৪ খৃ. কায়খুসরাও-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'ইযযুদ্-দীন ১ম কায়কাউস ত্রেবিযন্দের সম্রাটকে সিনোপ (Sinob) ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন এবং এইভাবে রূম সালজূক রাজ্যও কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশাধিকার লাভ করে। এই বিস্তার দ্বারা বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সুগম হয়, ইতালীর বাণিজ্যকারী প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যর সমৃদ্ধি দেখা দেয় এবং দেশে কল্পনাতীত ধন-সম্পদের সমাগম হয়। কায়কাউসের উত্তরাধিকারী ও ভাই 'আলাউদ-দীন কায়কু'বাদ, যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রূম সালজূক সুলতান, তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমান্ত ভূমধ্যসাগরের দিকে বিস্তৃত করেন এবং গালোনোরোস দুর্গ অধিকার করেন। ইহাকে তিনি বেশ বড় একটি বন্দর নগরীতে পরিণত করেন, নগরীর নামকরণ করেন 'আলাইয়্যা (বর্তমান নাম আলায়া বা আলান্য়া)। সেইখানে তিনি নিজের শীতকালীন আবাস প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পূর্বদিকে মেসোপটেমিয়ার উজানে তিনি ও আরতুকীদের নিকট হইতে আমিদ হিস্‌ন কায়ফার রাজ্যাংশ লাভ করেন এবং আরতুকীদেরকে স্বীয় আধিপত্য মানিয়া লইতে বাধ্য করেন। ৬২৫/১২২৮ সনে তিনি এরযিনজানের মেঙ্গুজেক অঞ্চল স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন এবং পূর্বদিকেও তিনি আরও অন্যান্য অঞ্চল দখল করেন (এরযেরূম ১২৩০ খৃ., আখলাত ১২৩১ খৃ., খারপুত ১২৩৪ খৃ.)। তাঁহার শাসনামলে রূম সালজূক সংস্কৃতি ও ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াছু'দ-দীন ২য় কায়খুসরাও (সিংহাসনে আরোহণ ৬৩৪/১২৩৭) আমিদকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সক্ষম হন এবং সেই সময়ে রূম সালজূক রাজ্যের যে পূর্ব সীমান্ত ছিল তাহাই মোটামুটিভাবে বর্তমান তুরস্কেরও সীমানা।

২। আনাতোলিয়া বিজয়, দ্বিতীয় পর্যায় ও উছমানী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত।

১৩শ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত দুইটি ঘটনা পরিস্থিতির পরিবর্তন করে। উহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল মধ্যপ্রাচ্যে মোঙ্গল অভিযান, যাহার গুরুতর প্রভাব আনাতোলিয়াতেও পড়ে। যদিও রূম সালজূক সৈন্যবাহিনী বায়জুনয়োন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মোঙ্গলদের নিকটে পূর্ব আনাতোলিয়ার কোসি দাগের সন্নিকটে পরাজিত হয় (৬ মুহ'াররাম, ৬৪১/জুন ১২৪৩), তথাপি প্রকৃতপক্ষে কোন রূম সালজূক রাজ্যাংশ বিজিত হয় নাই, কিন্তু মোঙ্গল বাহিনী একেবারে কায়সারিয়্যা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং যথেচ্ছ লুণ্ঠন চালাইতে থাকে। রাজ্যটি ক্রমেই অধিকতর মোঙ্গলদের সামন্ত রাজ্যের ন্যায় হইয়া পড়ে, প্রথমে পূর্ব ইউরোপ বিজেতা মোঙ্গল বাতুর, অতঃপর পারস্যের মোঙ্গল শাসক ঈলখানদের। এই মোঙ্গলদের সহিত দলে দলে নূতন তুর্কোমানরা আনাতোলিয়াতে প্রবেশ করিতে থাকে। কোন কোন দল আসে মোঙ্গলদের অনুসারী হইয়া, আবার কোন কোন দল আসে তাহাদের দ্বারা নিজেদের বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া। তাহারা ইতোমধ্যে আনাতোলিয়াতে বসবাসকারী কতকটা যাযাবর ধরনের তুর্কোমান অধিবাসিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাৎক্ষণিক গুরুত্ব বহনকারী যে দলটি আগমন করে সেইটির নেতৃত্ব করেন কারামান (দ্র.) ইব্‌ন নুরা সূফী (নাম হইতে মনে হয় যেন কোন দরবেশ পরিবারের সন্তান)। তিনি তোরোস পর্বতমালার পাদদেশে আরমানিকের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (প্রাচীন জার্মানিকোপোলিস), লাইকাওনিয়া ও সিলিসিয়ার সীমান্তে একটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করেন। ১২৭৭ খৃ. কারামান-এর পুত্র মুহাম্মাদ বেগ রূম সালজূক রাজ্যের উপর আধিপত্য অর্জনের চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি জনৈক জিম্‌রী নামক দাবিদারের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সেই আশ্রয়প্রার্থীর সমর্থনে কুনিয়া জয় করেন। কিন্তু একটি মোঙ্গল প্রতি-আক্রমণের ফলে শহরটি পুনর্বিজিত হইলে তখন মুহাম্মাদ বেগ তাঁহার তুর্কোমান বাহিনী সমেত পর্বতে পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য হন। জিমরী উত্তর-পশ্চিম দিকে পলায়ন করেন, কিন্তু সালজূক সৈন্যদলের হাতে তিনি সাকারিয়া নদীর তীরে পরাজিত হন (মুহ'াররাম ৬৭৬/জুন ১২৭৭)। প্রথমে তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং পরে শিরশ্ছেদ করা হয়।

অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সম্রাট ৭ম মাইকেল প্যালিওলোগাস-এর অধীনে বায়যানটীয়গণ কর্তৃক কন্সটান্টিনোপল পুর্নবিজয় ও বায়যানটীয় সাম্রাজ্য পুনর্গঠন। সাম্রাজ্যের শক্তি অবশ্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। প্যালিওলোগাস বংশীয় সম্রাটগণ ক্রমেই বেশী বলকান উপদ্বীপের বিষয়ে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন এবং ল্যাটিনদের লোলুপত্য তাঁহাদেরকে ঠেকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বাদবাকী শক্তি যাহা ছিল তাহা ব্যয়িত হইতেছিল এই সকল বিষয়ে। সম্রাটগণ আনাতোলিয়ার ঘটনাক্রমের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না এবং সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষামূলক যে ব্যবস্থা লাসকারীগণ চালু করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও ক্রমাগত দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই কারণে তুর্কোমান অশ্বারোহী দল, যাহারা জিহাদের জন্য আনাতোলিয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, তাহারা সহজেই পশ্চিম অংশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের অধিকতর উর্বরতা ইতোমধ্যে তাহাদেরকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এইভাবে পুরাতন অধিবাসিগণ ক্রমেই তাহাদের আনাতোলীয় এলাকা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় এবং তুর্কীগণ, বিশেষ করিয়া উন্মুক্ত অঞ্চলে তেমন কোন বাধারই সম্মুখীন হয় নাই। আনুমানিক ১৩০০ খৃ. মধ্যে পশ্চিম আনাতোলিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল তুর্কীদের অধিকারে চলিয়া আসে এবং এমন জেলার সংখ্যা কমই ছিল যেইখানে অতুর্কী অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক তুর্কী ছিল না। শেষ পর্যন্ত তুর্কী এলাকাতে বিচ্ছিন্ন বায়যানটীয় কর্তৃত্বাধীন কয়েকটি মাত্র দুর্গ—যেমন বিথিনিয়াতে প্রুসা, নিসিয়া ও নিকোমিডিয়া, লীডিয়াতে সারডিস, ফিলাডেলফিয়া ও ম্যাগনেশিয়া এবং কিছু সংখ্যক বন্দর (যেমন ঈজীয় সাগরের উপকূলে স্মার্না, ফোসিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে হেরাক্লিয়া) মাত্র থাকিয়া যায়।

তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদল, প্রতিটি অপরটি হইতে আলাদাভাবে তাহাদের নেতাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হইত। নেতাগণ বিজিত এলাকাতে আমীরাত বা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিত। সেই সকল রাজ্যের প্রাথমিক কালের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানিতে পারি, যদিও অনুমিত হয়, এইরূপ অর্ধ যাযাবর রাষ্ট্র বেশ কয়েকটিই ছিল এবং উহাদের মধ্যে কয়েকটির অস্তিত্ব ছিল স্বল্পকালীন মাত্র। আনুমানিক ১৩০০ খৃ. মধ্যে অল্প সংখ্যক রাজ্যের

উদ্ভব ঘটে। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যেইটির নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য সেইটি ছিল ফ্রিজিয়াতে জারমিয়ান, উহার রাজধানী ছিল কুতাহয়া (প্রাচীন Cotyaeum)। আল-উমারীর মতে পশ্চিম আনাতোলিয়ার তুর্কী আমীরগণ জারমিয়ানকে কখনও কখনও খাজনা দিতেন এবং ইব্ন বাত্তূতার মতে ইহারা তাহাদেরকে ভয় করিতেন। কখনও কখনও তাহারা মধ্য আনাতোলিয়াতেও প্রভাব বিস্তার করিত। ১৩০০ খৃ. সুদূর আনকারা পর্যন্ত তাহাদের শক্তি বিস্তৃত হইয়াছিল (একটি শিলালিপি অনুসারে)। ঘটনাক্রমে মূলত তাহারা তুর্কোমান ছিল না বলিয়াই মনে হয়, তাহারা সম্ভবত ছিল ইয়াযীদী কুর্দী (তু. Cahen, Notes sur l'histoire des Turcomans d'Asie Mineure au xiii, siecle JA-তে, ১৯৫১ খৃ., ৩৩৫-৫৪; জারমিয়ানদের উদ্ভব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দ্র. পৃ. ৩৪৯ প.)। জারমিয়ানদের চতুষ্পার্শ্বে বহু সংখ্যক রাজ্য গড়িয়া উঠে এবং এইগুলির প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে কেহ কেহ জারিমিয়ান হইতেই আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই সময়কার পশ্চিম আনাতোলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ছিল পাফ্লাগোনিয়ার জানদার। ইহার রাজধানী ছিল কাসতামনি (Castra Comneni, বর্তমান কাসতামেনু), আর বন্দর নগরী সিনোব (Sinop, Sinope) ও উহার অংশ ছিল। উহার পশ্চিমে, উত্তর ফ্রিজিয়াতে (এসকিশেহির-ডরীলিয়াম) ছিল উছমানী রাজ্য, উহার কেন্দ্র ছিল সোগুদ। সেইখানে কয়েকটি দুর্গ জয় করিবার পরে এই রাজ্য দ্রুত মর্মর সাগরের কিনার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আরও পশ্চিমে মাইসিয়াতে ছিল কারাসী। উহার অংশ ছিল বালিকেসরি (Palaeocastro) ও বারগামা (Pergamum) যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল মর্মর সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা একেবারে হেলেসপন্ট (দার্দানেলিস) পর্যন্ত। ইহার পরে ঈজীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের উত্তর লীডিয়াতে ছিল সারুখান, তাহার সঙ্গে ছিল Magnesia (বর্তমানে মানিসা); দক্ষিণ লীডিয়াতে আয়দীন (দ্র.) এবং টায়ারের সঙ্গে স্মার্নার পশ্চাদ্ভূমি ও কারিয়াতে মেনতেশে এবং তৎসহ মিলাস (Mylasa) ও মুগলা। সর্বশেষ আরও দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়াতে ছিল টেককে (Tekke) [দ্র.] ও লাইসিয়া, প্যামফাইলিয়া ও আদালিয়া (Antalya) এবং পিসিডিয়াতে হামীদ [দ্র.] ও ইসবার্টা।

প্রায় একই সময়ে রূম সালজূক রাষ্ট্র লোপ পায়। অতীতে বেশ কিছুকাল যাবতই শাসনকর্তা হিসাবে সুলতানের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের স্থলে সিভাসে অবস্থানকারী মোঙ্গল গভর্নরদের ক্ষমতা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বশেষ ক্ষমতাহীন নামমাত্র সুলতান 'আলাউদ্-দীন ৩য় কায়কু'বাদ-এর মৃত্যুর (৭০৭/১৩০৭ বা ৭০৮/১৩০৮) পরে এই সাম্রাজ্য পারস্যের মোঙ্গল ঈলখানী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিগণিত হইয়া যায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়া কারামানগণ তোরোস পর্বতের পাদদেশ হইতে তাহাদের রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তাহারা লারানডা শহরটি (বর্তমান নাম কারামান) জয় করিতে সক্ষম হয় এবং সেইখানে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে। তবে তাহারা কুনিয়া দখল করিতে গিয়া ব্যর্থ হয়, ইহা অধিকার করিয়াছিলেন ঈলখানী গভর্নর চোপান ও তাঁহার পুত্র তিমুরতাশ। শেষোক্তজন পশ্চিমাভিমুখে বিজয় অভিযান পরিচালনা করিয়া বাস্তবিকই ঈলখানী রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন। সেই অঞ্চলে তিনি ছোট ছোট তুর্কী রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেই শতাব্দীর বিশ দশকে ঈলখানী সাম্রাজ্যের গোলযোগ আনাতোলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে (তিমুরতাশ ৭২৮/১৩২৮ সনে মিসরে পলায়ন করেন)। বিজিত অঞ্চলগুলি হাতছাড়া হইয়া যায় এবং কারামানগণ কুনিয়া দখল করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু রাজধানী তাঁহারা লারানডাতেই রাখেন। ১৪শ শতক কালের মধ্যে কারামানগণ তাহাদের শাসন পশ্চিমাভিমুখে দক্ষিণ আনাতোলিয়াতে বিস্তৃত করে। এইখানে তাহারা পশ্চিম আনাতোলিয়াতে ক্রমবর্ধমান তুর্কী রাষ্ট্রসমূহের সংস্পর্শে আসে।

ঈলখানী সাম্রাজ্য ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হইতে থাকিলে মোঙ্গল গভর্নরগণ একে একে নিজেদেরকে রূমের স্বাধীন আমীর (বা সুলতান) বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন এবং মিসরের মামলূক সুলতানগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৩৭৫ খৃ. শেষোক্ত শক্তি ক্ষুদ্র আর্মেনিয়া রাজ্যের অবসান ঘটে এবং রামাদান নামক একটি তুর্কোমান রাজবংশ স্বল্পকাল পরেই সিলিসীয় অঞ্চলে একটি নূতন রাষ্ট্র স্থাপন করে। এই রাজ্যের রাজধানী হয় আদানাতে এবং ইহা মিসরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। অপর একটি তুর্কোমান পরিবার দুলগাদির [আরবীকৃত নাম যু'ল-ক'াদার (দ্র.)] পূর্ব তোরোস অঞ্চলে, আলবিস্তান সমেত, রাজ্য স্থাপন করে। ইহাও মিসরের আধিপত্য মানিয়া নেয়।

পশ্চিমে গাযী উছমান কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য ও তাঁহার বংশধর উছ'মানীগণের রাজ্য অবশিষ্ট বায়যানটীয় অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। উত্তর ফ্রিজিয়া এবং একেবারে মর্মর সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ উছমানী রাজ্যভুক্ত হইয়া যাইবার পরে প্রুসা (ব্রুসা, বুর্সা, ৬ এপ্রিল, ১৩২৬), নিসিয়া (ইযনিক, ২ মার্চ, ১৩৩১) ও নিকোমিডিয়া (ইযনিকোমিড, বর্তমান নাম ইযমিত, ১৩৩৭ খৃ.) একে একে উছমান-এর পুত্র ওরখান কর্তৃক বিজিত হয়। তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয় ব্রুসাতে। প্রতিবেশী রাজ্য কারাসীর উত্তরাধিকার উদ্ভূত বিবাদকে স্বীয় সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পরিণত করিয়া নিয়া ওরখান পরে সেই রাজ্য দখল করিয়া নেন (৭৩৬/১৩৩৬)। এইভাবে মর্মর সাগরের সমগ্র দক্ষিণ উপকূল উছমানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দার্দানেলিসে তাহাদের প্রবেশ উন্মুক্ত হয়, আনাতোলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি প্রায় শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহজেই সম্ভব হয়। একই সময়ে বলকান উপদ্বীপ বিজয়ও সম্পন্ন করেন সুলতান ১ম মুরাদ। সিংহাসনে আরোহণের (৭৬১/১৩৬০) অল্পকাল পরেই তিনি আন্কারা জয় করেন। উহা প্রথমে নামমাত্র মোঙ্গল গভর্নরের শাসনাধীনে ছিল, পরে তাহাদের উত্তরাধিকারী রূমের (Sivas) আমীরগণের অধীনে ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা শাসিত হইতেছিল আখী (দ্র.) ঐক্যজোট গঠনকারী সংঘসমূহের প্রধানগণ দ্বারা এবং বাস্তবে উহা স্বাধীনই ছিল। কিছুকাল পরে তিনি হামীদ রাজ্য অধিকার করেন (৭৮৩/১৩৮১)। ফলে উছমানী রাজ্য পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অনেক বৃদ্ধি পায়। মুরাদ-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ১ম বায়াযীদ সিংহাসনে আরোহণের (৭৯২/১৩৮১) অল্পকাল পরেই সকল আনাতোলীয় তুর্কোমান রাজ্য দখল করিয়া নেন, কারামান ও মোঙ্গল গভর্নরগণের রাজ্যও তন্মধ্যে ছিল। কিন্তু ইহার ফলে তীমূর (দ্র.) তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন

এবং আনকারার নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে ১ম বায়াযীদ পরাজিত হন (১৯ যুলহিজ্জা, ৮০৪/২০ জুলাই, ১৪০২)। তীমূর সিংহাসনচ্যুত আনাতোলীয় শাসকগণকে পুনরায় ক্ষমতা দান করেন এবং তখন মূল উছমানী রাজ্য ব্যতীত আনাতোলিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মাত্র মূল মোঙ্গল রাজ্য উছমানীগণের অধিকার থাকে। সেই অবস্থা হইতে সুলতান ১ম মুহাম্মাদ আবার সাম্রাজ্য একত্রীভূত করেন এবং ২য় মুরাদ-এর আমলে পশ্চিম আনাতোলিয়ার রাজ্যসমূহ একে একে উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অতঃপর উছমানীগণের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন কারামান। মুরাদ-এর পুত্র ২য় মুহাম্মাদ (বা বিজয়ী মুহাম্মাদ) উছমানী রাজ্য সমগ্র আনাতোলিয়াব্যাপী বিস্তৃত করেন, তৎপূর্বে তিনি অতি সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্টান্টিনোপল জয় করিয়া (২৯ মে, ১৪৫৩) উহাকে সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক কেন্দ্ররূপে গঠন করেন। ১৪৬১ খৃ. তিনি ত্রেবিযন্দ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান; ১৪৬৭ খৃ. কারামান রাজ্য অধিকার করেন এবং এই উভয়কেই উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আক কোয়ুনলু বংশের তুর্কোমান শাসক উযুন হাসান মুহাম্মাদ-এর নিকট হইতে এই দুইটি বিজিত রাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলে আরযিনজানের নিকটে তিরজানের যুদ্ধে মুহাম্মাদ তাঁহাকে পরাস্ত করেন (৮৭৮/১৪৭৩)। আনাতোলিয়ার পূর্বদিকে উছমানী শাসন সম্পূর্ণ হয় যখন মুহাম্মাদ-এর পৌত্র ১ম সালীম (৯২১১/৫১৫) দুলগাদির রাজ্যটি স্বীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন, দিয়ার বাক্র জয় করেন, রামাদানওগুল্লারী রাজ্যের (সিলিসিয়াতে) শাসককে কর দিতে বাধ্য করেন এবং সুন্নী কুর্দী সরদারগণেরও আনুগত্য লাভ করেন। উত্তর-পূর্বে কাকেসীয় পাদদেশ অঞ্চলে উছমানী সুলতানগণের ও তাঁহাদের সেনাপতিগণের পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের কারণে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই আক্রমণগুলি সাধারণভাবে উত্তর-পূর্ব দিকে পরিচালিত হয় (সুলায়মান, ৯৪০/১৫৩৪, ৯৫৫-৫৬/১৫৪৮-৪৯, সের-'আসকার মুসতাফা পাশা, ৯৮৬/১৫৭৮, জর্জিয়ার বিরুদ্ধে এবং ৪র্থ মুরাদ, ১০৪৫/১৬৩৪, এরিভানের বিরুদ্ধে)। তখন হইতে সমগ্র আনাতোলিয়া নিরংকুশভাবে উছমানী অধিকারে থাকে এবং বর্তমানে তাহা তুর্কী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে একমাত্র পরিবর্তনটি হইয়াছে তাহা হইল কারস, আরদাহান ও বাতুম জেলাগুলি (সানজাক) ১৩ জুলাই, ১৮৭৮-এর বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়াকে হস্তান্তর, যাহার ফলে সান স্ট্রিফানোর শান্তিচুক্তি (৩ মার্চ, ১৮৭৮) নিশ্চিত হয়। কিন্তু পুনরায় ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তি দ্বারা (৩ মার্চ, ১৯১৮) তুরস্ক সেই অঞ্চলগুলি ফিরিয়া পায়। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া কর্তৃক মস্কো-চুক্তির (১৬ মার্চ, ১৯২১) বলে (বাতুম শহর ও বর্তমানে আজারিস্তান নামে পরিচিত একটি ক্ষুদ্র পশ্চাদ্ভূমি ব্যতীত) এবং তখন পর্যন্ত নামমাত্র স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক অঙ্গরাষ্ট্র জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান কর্তৃক কারস চুক্তির বলে (১৩ অক্টোবর, ১৯২১) [তু G. Jaschke, Geschichte der russischturkischen Kaukasusgrenze, Archiv des Volkerrechts, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১৯৮-২০৬) ইহা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। ২৩ জুন, ১৯৩৯ সালে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কো-তুর্কী চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়া ইসকানদারানের সানজাক তুরস্ককে ছাড়িয়া দেয় এবং তখন উহা (৬৩তম) হাতাই বিলায়েত নামে তুরস্ক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩। আনাতোলিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ

প্রাথমিক উছমানী ব্যবস্থা উছমানী সাম্রাজ্যে এত দ্রুত বিস্তার লাভ করে যে, শাসন কার্যের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম দিকে এইগুলি ছিল শুধু সামন্ত অশ্বারোহী বাহিনী 'পতাকাসমূহের আওতাধীন জেলা [সানজাক (দ্র.)] বা লিওয়া, যেইগুলি ছিল 'পতাকা'র জেলা অধিনায়ক (সানজাক বেগী বা মীর লিওয়া)-এর অধীন। দ্বিতীয় উছমানী সুলতান ওরখান-এর আমলে এই রকম চারটি জেলা ছিলঃ (১) সুলতান উয়ুগি যাহার অন্তর্গত ছিল উছমানিয়াদের মূল ভূমি এসকিশেহির ও সোগুদ-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল; (২) খোলাওয়ান্দকার (এলি) শাসকের (দেশ) যাহা স্বয়ং সুলতান শাসন করিতেন এবং তৎসহ ছিল ব্রুসা ও ইযনিক; (৩) কোজা এলি জায়গীর অঞ্চল, যাহার শাসন ক্ষমতা ওরখান তাঁহার সেনাপতি আকচি কোজাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা ছিল বিথাইনীয় উপদ্বীপ এবং তৎসহ ঈযমিদ সম্বলিত; (৪) কারাসী-এলি [দ্র.], সাবেক কারাসী ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তৎসহ বালিকাসরি ও বারগামা। সুলতান ১ম মুরাদ-এর আমলে বলকান উপদ্বীপ বিজয় ও আনাতোলিয়ারও অন্যান্য অংশ বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্য আরও প্রসারিত হয়। তখন প্রণালীর উভয় পার্শ্বের উছমানী অঞ্চলসমূহ লইয়া একটি করিয়া প্রদেশ (ইয়ালেত, পরে নাম হয় বিলায়েত) গঠন করা হয়। প্রতিটি প্রদেশে শাসনের জন্য একজন পাশা নিযুক্ত করা হয়, তাহার উপাধি হয় বেগলারবেগী, পরে পরিবর্তন করা হয় ওয়ালী। অতএব আমরা দেখিতে পাই, উছমানী সাম্রাজ্য প্রথমে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, উহাদের নাম ছিল আনাতোলিয়া (আনাতোলী, পরে উচ্চারণ হয় আনাদোলু) ও রুমেলিয়া (রূম-এলি)। আবার প্রতিটি প্রদেশ সামন্ত বাহিনীর বিভিন্ন জেলা (সানজাক বা লিওয়া)-তে বিভক্ত ছিল। আনাতোলিয়ার তুর্কী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যখন উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় তখন সেইগুলিকে এইরূপ সানজাকে পরিণত করা হয়, কিন্তু পূর্বেকার নামই সংরক্ষিত হয়। সাম্রাজ্যের যে ক্রমিক বিস্তার ও বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা এই রাজনৈতিক বিভাগগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়। পরে সুলতান ১ম বায়াযীদ-এর, বিশেষ করিয়া দিগ্বিজয়ী ২য় মুহাম্মাদ ও ১ম সালীম-এর আমলে উছমানী শক্তি যখন পূর্বমুখী অধিকার বিস্তার লাভ করে তখন নূতন অধিকৃত অঞ্চলগুলি আর আনাদোলুর কোন ইয়ালেতের সানজাকে পরিণত হইল না, বরং নিজস্ব গুরুত্বের কারণে এক একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করিল। এই প্রদেশ ও সানজাকে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও সাম্রাজ্যে আবার বিচার বিভাগীয় কতকগুলি আলাদা ভাগেও (কাদা) বিভক্ত ছিল, তাহাদের প্রতিটির জন্য একজন করিয়া কাদী নিযুক্ত ছিলেন। তদুপরি আবার কতগুলি রাজ্য (কূহুমাত) ছিল যেইগুলি স্থানীয় শাসকগণ বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করিতেন। তাঁহারা উছমানী বংশের সুলতানগণের সরাসরি সামন্ত শাসক ছিলেন। এই সমগ্র শাসন ব্যবস্থাই সুলতান ১ম সুলায়মান কা'নূনীর আইন দ্বারা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তদনুযায়ী (তু. কাতিব চেলেবি, জিহান-নুমার মুদ্রিত সংস্করণ; এতদ্ব্যতীত তু. J. V. Hammer, Des

osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung ii, ২৪৯ প. ও P. A. v. Tischendorf, Das Lehnswesen in den muslimischen Staaten, লাইপযিগ ১৮৭২ খৃ., পৃ. ৬২ প.) আনাতোলিয়াতে নিম্নলিখিত ইয়ালেতসমূহ ছিল : (১) আদানা (৬০১, আলেপ্পোর সানজাকরূপেও উল্লিখিত); (২) আনাদোলু (৬৩০; ইহার জন্য আরও তু. বর্তমান আনাদোলু প্রবন্ধের পরবর্তী প্রবন্ধাংশ); (৩) চিল্‌দীরের অংশবিশেষ (৪০৮, পরবর্তী কালে ট্রান্সককেসিয়ার আখিস্‌কা); (৪) দিয়ার বাক্‌র (৪৩৬); (৫) আরযান-ই রূম (এরযেরূম, ৪২২); (৬) কারামান (কূ'নিয়া, ৬১৪); (৭) কারস (৪০৭); (৮) যুল-কাদ্‌রিয়া (মার'আশ, ৫৯৮); (৯) রাক্‌কা (উরফা, ৪৪৩); (১০) সীওয়াস (ইহাকে শুধু রূমও বলা হয়, ৬২২); (১১) তিরাবযন (তারাবযন, ৪২৯); (১২) ওয়ান (৪১১); (১৩) হালাব (আলেপ্পো) ইয়ালত হইতে আনতাকিয়া সানজাক (৫১৫, আধুনিক হাতাই), বীরে (বিরেজিক, ৫৯৭) ও কিলিস (৫৯৮); (১৪) পশ্চিম আনাতোলীয় সানজাক বীগা (৬৬৭), কারাসী (৬৬১) ও সুগলা (ঈযমির, ৬৬৭) ঈচেল (সেলিকা) ও আলায়া তৎসহ দক্ষিণ উপকূলের কুব্রুস (সাইপ্রাস) দ্বীপ যেগুলি কাপুদান পাশার অধীনে ছিল (উল্লিখিত প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা প্রবন্ধ দ্র.)।

১৯শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মূলত রাষ্ট্রের এই বিভাগই স্থায়ী ছিল, যদিও কখনও কখনও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্থানীয় পাশাগণ নিজ নিজ প্রদেশের এলাকার বাহিরে হস্ত প্রসারণের সুযোগ গ্রহণ করিতেন। এই ধরনের কোন গভর্নর যদি স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করিয়া স্বীয় প্রদেশে বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেন তখন তাহাকে বলা হইত দেবের বেগী [দ্র.] 'উপত্যকার প্রধান'। সেক্ষেত্রে তাহারা আর বেসামরিক কর্মকর্তা থাকিতেন না, বরং তুর্কী সুলতানেরই স্থানীয় প্রতিনিধি হইয়া যাইতেন এবং—খুব একটা ইচ্ছাকৃতভাবে না হইলেও— সেইরূপ স্বীকৃতি লাভ করিতেন। তখন তিনি সুলতানের বাহিনীর জন্য নির্ধারিত সংখ্যক সেনাবাহিনীও তৈরী রাখিতেন। যেহেতু স্ব স্ব এলাকা সমৃদ্ধিশালী হইবার ব্যাপারে তাহাদের স্বার্থ থাকিত সেই কারণেই তাঁহাদের শাসন সাধারণত সুশাসনই হইত। অপরদিকে যাঁহারা প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত হইয়া আসিতেন তাহারা ঘন ঘন বদলি হইয়া যাইতেন বিধায় সব সময়ই চেষ্টা করিতেন, কত তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ হস্তগত করা যায়, বিশেষ করিয়া ১৮শ শতকে আনাতোলিয়াতে এইরূপ কয়েকটি করদ অঙ্গরাজ্যের উদ্ভব হয়, যেমন ঈজীয় অঞ্চলে কারা উছমান ও মধ্যকীযীল ঈরমাকে (হালীস) চাপান (বা চাপার)।

তানজীমাত : সুলতান ২য় মাহমূদ-এর প্রশাসন সংক্রান্ত সংস্কারের ফলে 'দেরে বে'গণের করদ-রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হয়। পরবর্তী অন্যান্য সংস্কার বা তানজীমাতের কালে ৭ জুমাদা, ১২১৮/ ৮ নভেম্বর, ১৮৬৪ তারিখের আইন দ্বারা সাম্রাজ্যকে ইউরোপীয় ধারায় নূতন করিয়া বিভক্ত করা হয়। এইবারে সৃষ্টি করা হয় প্রদেশ (বিলায়াত), প্রশাসনিক এলাকা (সানজাক) ও জেলা (কাদা)। অনেক পুরাতন সান্‌জাককে, বিশেষ করিয়া আনাদোলুর ইয়ালেতগুলিকে— পরবর্তী কালে (১৮৭৫ খৃ.) এরযেরুমের ইয়ালেতগুলিকেও—বিলায়াতের মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্‌জাকে বিভক্ত করা হয়। ছোট ছোট কয়েকটি ইয়ালেতকে সান্‌জাকরূপেই কোন একটি বিলায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু রদবদলের পরে নিম্নলিখিত বিলায়াতসমূহ লইয়া আনাতোলিয়া গঠিত হয় (Cuinet-এর মতানুযায়ী La Turquie d' Asie, প্যারিস ১৮৯০)ঃ (১) আদানা; (২) আনকারা; (৩) আয়দীন (স্মার্না, ইয্‌মির); (৪) বিত্‌লীস; (৫) দিয়ার বাক্‌র; (৬) এর্‌যেরূম; (৭) হালাব (আলেপ্পো) বিলায়াতের মার্'আশ ও উর্‌ফা সান্‌জাক ও তৎসহ কয়েকটি কাদা; (৮) ইস্তাম্বুল বিলায়াতের কয়েকটি কাদা ও নাহি'য়া; (৯) কাস্‌তামুনী; (১০) খুদাওয়ান্‌দিগার (ব্রুসা); (১১) কুনিয়া; (১২) মামুরাতুল-আযীয (খার্‌পুত, ১৮৮০ হইতে); (১৩) সীওয়াস; (১৪) তিরাবিযোন; (১৫) ওয়ান ও দুইটি স্বতন্ত্র সান্‌জাক; (১৬) বীগা; (১৭) ইয্‌মীদ (ইহাদের প্রতিটি সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্র.) এই বিভাগ—কিছুটা পরিবর্তনসহ—১ম মহাযুদ্ধের পরেও স্থায়ী ছিল।

তুর্কী প্রজাতন্ত্রের আমলে বিলায়াতগুলি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সান্‌জাকগুলিকে বিলায়াতে উন্নীত করা হয়। পরে ভাষা সংস্কার করা হইলে তখন এইগুলিকে বলা হয় ঈল। উহাদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হয়। ২০ অক্টোবর, ১৯৩৫-এ বিলায়াতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৭, ১৯৩৫ খৃ. শেষে আরও নূতন পাঁচটি বিলায়াত সৃষ্টি করা হয় (এইগুলি করা হয় পার্শ্ববর্তী বিলায়াতসমূহের জেলা বা কাদা হইতে, কাদারও আবার নূতন নাম হয় ইলচে=ক্ষুদ্র রাজ্যে)। ১৯৩৯ খৃ. হাতায় ৬৩তম বিলায়াতরূপে যুক্ত হয় (সিরিয়ার ফরাসী অছি কর্তৃক তুরস্ককে প্রদত্ত, উপরে দ্র.)। (১ জানুয়ারী, ১৯৪০ খৃ. জেলার সংখ্যা ছিল ৬৩, সেইগুলি ও সেইগুলির অন্তর্গত জেলাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন G. Jaschke, Turkei, বার্লিন ১৯৪১ খৃ., পৃ. ২২-৪)। ১৯৫৩ খৃ. উসাকে ৬৪তম বিলায়াতরূপে যুক্ত হয়। ৪ জানুয়ারী, ১৯৫৪-এ তুর্কী রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকা ৬৪টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল (তন্মধ্যে মাত্র ৪টি ছিল তুরস্কের ইউরোপীয় অংশে আর বাকী ৬০টি আনাতোলিয়াতে) এবং সেই প্রদেশগুলি মোট ৫২৩ জেলাতে বিভক্ত ছিল। আনাতোলিয়ার প্রদেশগুলির মধ্যে চানাককিল'আ-র স্বল্প কিছু অংশ ইউরোপীয় ভূভাগে অবস্থিত; অপর দিকে ইস্তাম্বুল প্রদেশ প্রধানত ইউরোপীয় এলাকাতেই।

ভৌগোলিকভাবে প্রদেশগুলি নিম্নলিখিত ৮টি অঞ্চলে (বোল্‌জেহ্) বিভক্ত (নামগুলির আধুনিক উচ্চারণ দেওয়া হইল)ঃ (১) কৃষ্ণ সাগর উপকূলের প্রদেশসমূহ ঃ ত্রাবযোন, ওরদু, রিসেহ, যোঙ্গুলদাক, গিরেসুন, সামসুন, সিনোর, কাস্‌তামোনু, বোলু, চোরুহ; (২) মর্মর সাগর উপকূল ও ঈজীয় সাগর উপকূলের প্রদেশসমূহ ঃ ইস্তাম্বুল প্রদেশের এশীয় অংশ (উস্‌কুদার, কাদিকোয, বেকোয, আদালার, কারতাল, সিলে ও ইয়ালোভা জেলা) এবং চানাককিল'আ (চানাককিল'আ, আইভাচিক, বাগা, বায়রামীচ, বোযজাদা, এযীনেহ, লাপসেকি ও ইয়াকীজা জেলা) এবং ইযমীর, কোকাইলি (ইয্‌মিট), আয়দীন, বালিকেসির, বুরসা, মানিসা ও মুগবা প্রদেশসমূহ। (৩) ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে হাতায় (ইসকেন্দেরুন), সেইহান (আদানা), আইচেল (সিলিফকে) ও আন্‌তালিয়া প্রদেশ; (৪) ইউরোপীয়

তুরস্ক; ইউরোপীয় প্রদেশসমূহ, ইস্তাম্বুল (বেয়ুগলু, বেসিকতাস, সারীয়ার, ফাতিহ, ইয়ুপ, আমিনোনু, বাকীরকোয়, চাতাল্‌কা ও সিলিভরি জেলাসমূহ, চানাককিলআ (ইসিয়াবাত, গেলিবোলু ও ইমরোয জেলাসমূহ) এবং কীর্কলারেলি, তাকিরদাগ ও এদিরনে প্রদেশসমূহ; (৫) পশ্চিম আনাতোলিয়া দেনিয্‌লি, বিলেসিক, কৃতাহিয়্যা, আফিয়েন-কারাহিসার, ইসপার্টা, বুরদুর, এসকিশেহির—এবং ১৯৫৩ খৃ. হইতে—উসাক প্রদেশসমূহ; (৬) মধ্য আনাতোলিয়া, তোকাট, চোরুম, আমাসিয়া, কায়সারী, মালাতিয়া, আন্‌কারা, চান্‌কীরী, য়োযগাট, সিভাস, মারাস, নিগ্‌দে, কীরশেহির ও কুনিয়া প্রদেশসমূহ; (৭) দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়া ঃ গাযীআন্‌তেপ, মার্‌দিন ও উর্‌ফা প্রদেশসমূহ; (৮) পূর্ব আনাতোলিয়াঃ কার্‌স, এলাযিগ, দিয়ারবেকীর, গুমুসানে, এরযেরুম, এরযিন্‌চান, সিইরত, বিত্‌লিস, তুনসেলি, আগরী মুস, বিনগোল, ওয়ান ও হাকারি প্রদেশসমূহ।

৪। জনসংখ্যা

তুর্কী ও অ-তুর্কী ঃ তুর্কী কর্তৃক আনাতোলিয়া বিজয়ের পূর্বে দেশটি গ্রীকপন্থী হইয়া পড়িয়াছিল। আনাতোলিয়ার আদি বাশিন্দাগণের গ্রীকায়ন সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাদেরকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে (ইহা শুরু হয় গ্রীক ও রোমীয় শাসনামলে)। বর্তমানে সেই পুরাতন অধিবাসিগণ (যেমন লাযেগণ, The Lazes) শুধু পার্বত্য অঞ্চলে কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে—বিশেষ করিয়া ককেসাস পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চলে। এই অঞ্চলগুলিতেই প্রাচীন ধর্মমতাবলম্বিগণ—যেমন পলেসীয়গণ (Paulicians)— স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে বসবাস করিতেছে। তুর্কীদের আগমনকালে আনাতোলিয়া সামগ্রিকভাবে ছিল গ্রীক ভাষাভাষী অঞ্চল এবং প্রধানত বায়যানটীয় গির্জার অনুসারী গোঁড়া খৃষ্টান। পূর্বাঞ্চলের আরমানীগণ ছিল মোনোফিসাইট (Monophysites—যাহারা মনে করেন, যীশু খৃষ্টের মধ্যে মানবসত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তা একীভূত হইয়া গিয়াছে) এবং গ্রীকগণের হইতে ভিন্ন গির্জার অনুসারী, ইহারা গ্রীক ভাবধারায় প্রভাবিত হয় নাই। পেশাগত ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে সম্ভবত এই আরমানীগণ প্রাক তুর্কী যুগেই পশ্চিম দিকে একেবারে রাজধানী এলাকা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তুর্কীগণ এক মধ্যএশীয় জাতি। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আনাতোলিয়ায় আগমন করে। প্রথম দিকে গ্রীকদের তুলনায় তাহারা হয়তো সংখ্যালঘু ছিল, কিন্তু তুর্কী অধিকৃত অঞ্চলসমূহে এই সংখ্যালঘুগণ যেহেতু শাসক শ্রেণীর ছিল সেইহেতু ইহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িতে সক্ষম হয়। ইহার কারণ ছিল সম্ভবত, পুরাতন অধিবাসিগণের মধ্যে অনেক লোকই নিজেদের ধর্মীয় কেন্দ্র কন্সটান্টিনোপলের সঙ্গে সংস্পর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং এই বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলে তাহারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তুর্কীদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। প্রথম দিকে উহাদের এই ধর্মান্তর ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া ছিল খুবই মন্থর। যাহা হউক, ১২৭২ খৃ. মার্কোপোলো যখন আনাতোলিয়া ভ্রমণ করেন তখন অধিবাসিগণ তুর্কীদের সহিত একীভূত হইয়া যায় নাই বলিয়া মনে হয় (দ্র. E. Oberhummer, Die Turken und das Osmanische Reich, লাইপযিগ-বার্লিন ১৯১৭ খৃ., পৃ. ৪২)। অপরদিকে কন্সটান্টিনোপলের গির্জার দলীলাদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া খৃ. ১৪শ শতাব্দীতে যখন অধিক সংখ্যক তুর্কী আনাতোলিয়া প্রবেশ করে তখন সনাতন খৃষ্ট ধর্ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে দেশটির গ্রীক বৈশিষ্ট্যও হারাইয়া যায়। ইহা দুই কারণেই হইয়া থাকিতে পারে; এক দিকে তুর্কী অধিকৃত অঞ্চল হইতে লোক আগমনের ফলে বা অপরদিকে পুরাতন অধিবাসিগণ তুর্কীদের সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ফলে। প্রসঙ্গক্রমে দুই ধরনের অঞ্চলের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বুঝিতে হইবে; একদিকে ছিল দীর্ঘদিন যাবত গ্রীক ঐতিহ্যে লালিত অধিবাসিগণ, যেমন পশ্চিম আনাতোলীয় উপকূলীয় অঞ্চল, যেখানে লোকেরা অনেক কাল পর্যন্ত গ্রীক সংস্কৃতি ও খৃষ্ট ধর্ম আঁকড়াইয়া ছিল। দীর্ঘকাল যাবত গ্রীক শাসনাধীনে থাকা অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল; যেমন ত্রেবিযন্দ) ও অপর দিকে মধ্য আনাতোলীয় অঞ্চল যেখানে অধিবাসিগণ শুধু বাহ্যত গ্রীক সংস্কৃতি ভাবাপন্ন ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল (বিশেষ করিয়া উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়াতে যেখানে পারসিক মোঙ্গলগণ অর্থাৎ ঈলখানীগণ যাহারা মাত্র গাযানের আমল হইতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং কিছুকাল পর্যন্ত এই নব দীক্ষিতগণ নূতন উদ্দীপনায় শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিল)। আনাতোলিয়ার খৃষ্টানদের প্রতি মারাত্মক আঘাত হানেন তীমূর; তাঁহার বিজিত অন্যান্য স্থানের মত এখানেও তিনি খৃষ্টানগণের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পরে তিনি যখন রাজনৈতিক কারণে উছমানী রাষ্ট্রের মধ্যে গ্রীসীয় গোঁড়া ধর্মমতকে নিরাপত্তা দান করেন তখন খৃষ্টানদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সুলতান এই ধর্মমতকেও সুন্নী ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে খৃষ্টান সম্প্রদায়, আনাতোলিয়ার গ্রীকগণ (দ্র. রূম) ও আরমানীগণ (দ্র. আরমান) তাহাদের ধর্মীয় কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যে অসুবিধায় ছিল তাহা দূর হয় এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করার অধিকার লাভ করে, সেই অধিকার তাহারা এখন পর্যন্ত ভোগ করিতেছে। তখন যে মিল্লাত (দ্র.) নীতি অনুসৃত হয় উহার ফলে উছমানী সাম্রাজ্যে বসবাসকারী অ-মুসলিমগণ পর্যাপ্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকে। এই নীতি উক্ত সম্প্রদায়গুলিকে অধিকতর সংকুচিত হইবার আশংকা হইতে রক্ষা করে। এইভাবে সাম্রাজ্যের বিকাশকালে এমন একটি জীবন যাপন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে যাহাতে মুসলিম, অমুসলিম সকলেই সমভাবে নিজেদের অধিকার ভোগ করিতে পারিত। ১৮শ ও ১৯শ শতকে আনাতোলীয় গ্রীকবাদের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং ১৯শ শতকে আরমানীগণকে মিল্লাত-ই সাদিকা বা 'বিশ্বস্ত জাতি' (অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত) বলিয়া উল্লেখ করা হইত। সামগ্রিকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় এলাকাগুলি ছিল অভিন্ন, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মধ্য আনাতোলিয়া (কুনিয়াতে ও কায়সারীতে), সেখানে গ্রীকরা তুর্কী ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল (অংশত গ্রীসীয় বর্ণমালাতে) পারিবারিক ও সামাজিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমরূপে, আর আরমানীরা তুর্কী ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল (অংশত আরমানী বর্ণমালাতে) প্রধানত শুধু সামাজিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমরূপে, বাড়িতে তাহারা নিজেদের ধর্মীয় ভাষা আরমানীতেই কথা বলিত।

তুর্কী অধিবাসিগণ ব্যতীত—শহরবাসীই হউক বা গ্রামের কৃষকই হউক—আনাতোলিয়াতে রহিয়াছে বা ছিল যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর অধিবাসী ও স্থানান্তর গমনকারী ছাগল-মেষ পালকের দল। ইহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর লোক ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ঃ তুর্কী, কুর্দী ও ককেসীয়। তুর্কীদের বেলাতে [তথাকথিত ইয়ুরুকগণ বা তুর্কোমানগণ (দ্র.)] বলা যায়, তাহাদের আদি উৎস বিতর্কের বিষয়; তাহারা তুর্কোমানও হইতে পারে যাহারা এখনও যাযাবর জীবনযাত্রার রীতি পরিত্যাগ করে নাই বা এমনও হইতে পারে, তাহারা আদিতে ছিল বিভিন্ন উৎসজাত, ক্রমে তুর্কীকৃত হইয়া গিয়াছে। ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে তাহাদের অধিকাংশই 'আলাবী শী'আ। কুর্দীগণের প্রায় সকলেই সুন্নী মুসলমান। ইহারা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে বাস করে। পরিশেষে ককেসীয়গণের (দ্র. চারকেস) অধিকাংশই ককেসাস পার্বত্য অঞ্চল হইতে আগত। ককেসীয় অঞ্চলে যখন রুশীয় খৃস্টান শাসন বিস্তার লাভ করিতেছিল তখন ইহারা সেই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের ব্যতীত সমগ্র তুরস্ক ব্যাপিয়া প্রায়শ দেখা পাওয়া যায় মুসলিম মুহাজিরগণের, যাহারা বলকান দেশসমূহের খৃস্টান সরকারের অধীনে বসবাস করা অপেক্ষা তুরস্কের স্বধর্মাবলম্বী মুসলমানগণের সঙ্গে বসবাসের জন্য এখানে চলিয়া আসিয়াছে। কেননা তুরস্ক হইতেছে দারুল ইসলাম। এই মুহাজিরগণ যাযাবর নহে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শহর বা গ্রাম এলাকায় তাহাদের কেন্দ্রীভূত দেখা যায়, নিজ নিজ দেশ ছাড়িয়া সেখানে আসিয়াই তাহারা নূতন আবাস গড়িয়াছে।

তুরস্কের মুসলিম ও অমুসলিমগণের মধ্যে সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে সৌহার্দপূর্ণ ছিল, কিন্তু ১৯শ শতকে পাশ্চাত্য শক্তি তুরস্কের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে তখন এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তুচুক-কায়নারজা চুক্তির বলে (১৭৪৪ খৃ.) রাশিয়া তুরস্কের গোঁড়া খৃস্টানদের উপরে আশ্রয়দাতার অধিকার দাবি করে। ফলে তাহাদের মধ্যে তুর্কী বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়। পশ্চিমে ইউরোপ হইতে আগত জাতীয়তাবাদের ধারণা তুরস্কের খৃস্টান অধিবাসিগণের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ফলে তুর্কী প্রতিক্রিয়া এই হয়, প্রথমে তাহারা খৃস্টান অধিবাসীদেরকে অপসন্দ করিতে থাকে, পরে সেই অপসন্দ ঘৃণায় পরিণত হয়। এই ঘৃণাবোধ আরমানীগণই সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করে। কারণ রাশিয়ার নিকট-প্রতিবেশী বলিয়া বিশেষ করিয়া তাহারা রাশিয়ার পক্ষে কাজ করিতেছে—এইরূপ সন্দেহভাজন হয়। বার্লিন চুক্তিতে স্বীকৃত (১৮৭৮ খৃ.) সংস্কারসমূহ বাস্তবায়িত করিবার কালে ১৮৯৪-৯৬ খৃ. কুর্দীদের সঙ্গে রক্তাক্ত বিরোধ দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে রুশ-ককেসীয় বাহিনী কর্তৃক ওয়ান অঞ্চলে অভিযান পরিচালিত হইলে—তুর্কী মতানুসারে—আরমানী অধিবাসিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে, সমগ্র আরমানীদেরকে বলপূর্বক মেসোপটেমিয়াতে অপসারিত করা হয়, সেই সময় তাহাদের মধ্যে বহু লোক মারা যায়। বাদবাকী সবাই আবার যুদ্ধের পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ লাভ করে। গ্রীকদের সঙ্গে একটি বড় যুদ্ধ হইয়াছিল ১৯১৯ খৃ. যখন ইংরেজ বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হইয়া তাহারা স্মার্না দখল করে এবং ১৯২১ খৃ. সাকারিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কীগণ গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করে, উহারা তখন আনাতোলিয়া হইতে পশ্চাদপসারণ করে এবং সেই সময়ে গ্রীক অধিবাসিগণের অধিকাংশও সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করে। অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহাদের সঙ্গে গ্রীসের মুসলমানদের বিনিময় করা হয় (পশ্চিম থ্রেসে বসবাসকারী তুর্কীগণ ও ইস্তাম্বুলে বসবাসকারী গ্রীকগণ বাদে)। এই কর্মপন্থার ফলে আনাতোলিয়া ৯০% তুর্কীপ্রধান এবং ১৯% মুসলিম প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়। সিরীয় সীমান্তে বসবাসকারী আরব অধিবাসিগণ ব্যতীত আর যে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট অ-তুর্কী মুসলিম বসবাসকারী এলাকা রহিয়াছে সেগুলিতেও ক্রমবর্ধমান তুর্কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সামরিক চাকুরীর মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তুর্কীকরণের ও কুর্দীদের উপর স্কুল-কলেজগুলির প্রভাবের ফলে এবং সর্বোপরি কুর্দীদের নিজস্ব কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তেমন নাই বলিয়া তাহাদের তুর্কীকরণ সম্ভব হইবে আশা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে তাহা কতদূর সফল হইয়াছে বলা মুশকিল।

১৯শ শতকের শেষ ঃ সামনে যে জনসংখ্যার তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহাতে গত শতকের শেষ দশকে ধর্ম অনুসারে আনাতোলিয়ার জনসংখ্যা দেখানো হইয়াছে, তথাগুলি V. Cuniet-এর গ্রন্থ হইতে গৃহীত (গ্রন্থপী দ্র.) এবং তাঁহার তথ্য-উৎস ছিল রাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির সালনামাহ। সে সময়ে তুরস্কে রাষ্ট্রীয় কোন আদমশুমারী হয় নাই বিধায় উক্ত জনসংখ্যাগুলি প্রধানত অনুমান ভিত্তিক এবং বাস্তবের সাথে সম্পর্ক সামান্যই। তদুপরি আরও কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি আসিয়াছে। কারণ যে সকল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেগুলিও সকল বিলায়াতে একরূপ ছিল না। কোন কোন বিলায়াতের আমরা বিস্তারিত তথ্য পাই (ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষ ও মহিলার আলাদা তথ্যও পাওয়া গিয়াছে), অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধু তথ্যের সারসংক্ষেপ পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কোন কোন বিলায়াতে শী'আ ও ইয়াযীদীগণের জনসংখ্যা আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ ইহা নহে যে, অন্যান্য বিলায়াতে এই দুই দলের আদৌ কোন জনসংখ্যা নাই। তবে এই পরিসংখ্যান হইতে আনাতোলিয়াতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জনসংখ্যার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইতে পারে ঃ

সংকেতসমূহ ঃ

বি-বিলায়াত সা=সানজাক কা=কাদা

না=নাহিয়্যা স্বা. সা-স্বাধীন সানজাক

অ-ইসলামী ধর্মসমূহের সংখ্যা যোগ করিলে ধর্ম অনুসারে মোট জনসংখ্যা Cuinet-এর সময়ে এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় (সঠিক সংখ্যা ও শতকরা হিসাব) ঃ

মুসলিম	৯৬,৭৬,৭১৪ ঃ ৭৮.৯%
অমুসলিম	২৫,৭৭,৭৪৫ ঃ ২১.১%
মোট	১,২২,৫৪,৪৫৯ ঃ ১০০%

অমুসলিমগণের মধ্যে ২৪,১০,২৭২ ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃস্টান।

এই পরিসংখ্যানগুলিতে কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যেগুলি ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া পর্যালোচনাযোগ্য বলিয়া মনে হয় 'কপ্‌টিক'দের সংখ্যাধিক্য (২,৮৬৭)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই হইতেছে প্রকৃত কপটিক (যেমন খৃস্টান মিসরীয়গণ); কিব্‌তী

(কপটিক, copts) বলিতে তুর্কীরা সাধারণত অমুসলিম জিপসীদেরকে বুঝায়। অতএব এই 'কিবতীদেরকেও' জিপসীদের জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ করিতে হইবে (২,৮৬৭+৩৭,৭৫২=৪০,৬১৯)। 'বিদেশী' কলামের অন্তর্ভুক্ত শুধু প্রকৃত 'বিদেশী'রাই (আজনাবী) নহে, বরং স্থানান্তরিত উছমানী নাগরিকগণও (য়াবানজিত) রহিয়াছে যাহাদের বাড়ী সেই আলোচ্য বিলায়াতে নহে। শুধু এরযেরুম বিলায়াতের ক্ষেত্রেই এই দুইটি বিভাগ আলাদা করিয়া দেখানো হইয়াছে (১,২২০ জন আজনাবী+৪,৯৮৬ য়াবানজিত= ৬,২০৬)। সেখানকার যে আনুপাতিক গড় (১ : ৪) তাহা অন্যান্য বিলায়াতের জন্যও সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

জাতি বিষয়ে পরিসংখ্যানে পরিষ্কারই দেখা যায়, আরমানীগণ (গ্রেগরীয়, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট আরমানীগণ একত্রে ১১,৪২,৭৭৫) কয়েকটি পূর্বাঞ্চলীয় বিলায়াতে বসবাসরত ছিল (এরযেরুম, বিতলীস ও সিভাস, অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় ওয়ান, মামুরাতুল-আযীয, দিয়ার বাকর ও আদানা)। যদিও সেখানে জনসংখ্যার মুসলিম অংশের (তুর্কী ও কুর্দীগণ) আরমানীদের তুলনায়ও সংখ্যালঘু ছিল)। মুসলিম বলিয়া দেখানো জনসংখ্যার জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে ধারণা লাভ করা বরং আরও বেশী কঠিন। কারণ পরিসংখ্যানে শুধু সর্বমোট জনসংখ্যা দেওয়া আছে। শুধু কয়েকটি পূর্বাঞ্চলীয় বিলায়াতের জন্যই সুন্নী মুসলিমগণের জাতিগত তথ্য এভাবে দেওয়া হইয়াছে :

মুসলিম গোত্রীয়গণের মধ্যে কখনও কখনও আলাদাভাবে দেখানো গোত্রীয়গণ (সাধারণত শী'আগণ) কোন জাতির অন্তর্গত তাহা সম্পর্কে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে (উহাদের সর্বমোট সংখ্যা ৫,৩৩,৬৭৭)। ওয়ান ও বিত্লীসে তাহাদেরকে বলা হইয়াছে ইয়াযীদী (৫,৪০০+৩,৮৬৩ = ৯,২৬৩) এবং দিয়ার বাক্রের ক্ষেত্রে বলা হয়, বিভিন্ন গোত্রীয় যে ৬,০০০ সদস্য তাহাদের মধ্যে ইয়াযীদীগণও অন্তর্ভুক্ত। আমরা ধরিয়া লইতে পারি, সামগ্রিকভাবে ইহারা ছিল কুর্দী। অন্যদের বিষয়ে অধিকাংশই ছিল সম্ভবত তুর্কী শী'আ, 'আরব এলাকাতে সম্ভবত নুসায়রী আরবগণও।

	তুর্কী	কুর্দী	আরব	ককেসীয়	মোট
বি. আদানা	৯৩,২০০	৩৯,৬০০	১২,০০০	১৩,২০০	১,৫৮,০০০
বি. দিয়ার বাক্র	৩,১০,৬৪৪	—	৮,০০০	১০,০০০	৩,২৮,০০০
বি. হালাবের আনাতোলীয় জেলাসমূহ	১,৭৭,০৪৮	১,১৯,৫৮৮	১,২৩,৫৩৬	৪,৫০০	৪,২২,৩৬৬
বি. মা'মুরাতুল-'আযীয	২,৬৭,৬১৬	৫৪,৬৫০	-----	-----	২২,৩৭২
বি. ওয়ান	৩০,৫০০	২,১০,০০০	-----	৫০০	২,৪১,০০০
	৮,৭৯,০০৮	৪,২৪,১৩৮	১,৪৩,৫৩৬	২৭,৫০০	

তুলনায় তাহারা সংখ্যালঘুই ছিল। গ্রীসীয়দের বিষয়ে গোঁড়া খৃস্টানদের সঙ্গে (১০,৪২,৬১২—২৫,৮৯০ সিরীয় খৃস্টান=১০,১৬,৭২২ গ্রীসীয় খৃস্টান) সংযুক্ত গ্রীসীয় ক্যাথলিক বা uniate (১৬,৮১১), যাহাদেরকে এই পরিসংখ্যানে ক্যাথলিকভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা দেখা যায় ১০,৩৩,৫৩৩। তাহাদের বাস ছিল ইস্তাম্বুল বিলায়াতের জেলাগুলিতে এবং খুদাওয়ানদিগার, আয়দীন (ইযমির) ও ত্রেবযোন বিলায়াতসমূহে, অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় সিভাস, কুনিয়া ও আদানা বিলায়াতসমূহে। সর্বত্রই মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় ইহারা সংখ্যালঘু ছিল (সিভাস ও আদানাতে শী'আ ও ইয়াযীদী এবং সেই সঙ্গে 'আরব, তুর্কী ও ককেসীয় অধিবাসিগণের সংখ্যা বাদ দিলে সুন্নী তুর্কীদের সংখ্যা থাকে ৮৫,৩৭,৮৬৩, তাহার মধ্যেও থাকিয়া যায় কিছু কিছু শী'আ, অ-তুর্কী সুন্নী, Lazes এবং বর্তমানে খৃস্টান শাসনাধীন সাবেক উছমানী প্রদেশসমূহ হইতে আগত মুহাজির। আরবদের সংখ্যার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর যথেষ্ট সংখ্যক খৃস্টান অধিবাসীকেও ধরিতে হইবে। যথা :

	সিরীয় খৃস্টান	সিরীয় সংযুক্ত খৃস্টান	ক্যালডীয় সংযুক্ত খৃস্টান	সংযুক্ত ম্যারোনীয় খৃস্টান	মোট
বি. আদানা	২০,৯০০	----	----	৪,৫৩৯	২৫,৪৩৯
বি. দিয়ার বাক্র	৪,৯৯০	-----	-----	-----	৪,৯৯০
বি. বিত্লীস	-----		২,৬০০	-----	২,৬০০
বি. হালাবের আনাতোলীয় জিলাসমূহ	-----	১৩,৬৮৭	৯,৮৬৫	-----	২৩,৫৫২
বি. ওয়ান	-----	-----	৬,০০২	-----	৬,০০২
মোট	২৫,৮৯০	১৩,৬৮৭	১৮,৪৬৭	৪,৫৩৯	৬২,৫৮৩

	মুসলিম *শী'আ ও ইয়াযীদী	গ্রীসীয় ও সিরীয় খৃষ্টান	আরমানী গ্রেগরীয়	আরমানী ক্যাথলিক	আরমানী প্রোটেস্টান্ট	অন্যান্য ক্যাথলিক [সংযুক্তবাদী (Uniato) ও ল্যাটিন]	অ-সংযুক্তবাদী জ্যাকবীয় ক্যালডীয় ও নেস্তোরীয়	ইয়াহূদী	কপটিক	জিপসী	অন্যান্য (বিদেশী)	মোট
কা. আদানা (ইস্তাম্বুল)	২,৯৯০	৫,০১০	১,৩০০	৩০০	–	৯০৩	–	–	–	–	–	১০,৫০৩
বি. আদানা	১,৫৮,০০০ * ৫৬,০০০	৬৭,১০০	৬৯,৩০০	১১,৫৫০	১৬,৬০০	৪,৫৩৯	–	–	–	১৬,০৫০,	৪,৪০০	৪,০৩,৫৩৯
বি. আংকারা	৭,৬৮,১১৯	৩৪,০০৯	৮৩,০৬৩	৮,৭৮৪	২,৪৫১	–	–	৪৭৮	–	৯৯৭	–	৮,৯২,৯০১
কা. আন্তাকিয়া (হালাব)	৪৬,০০০	১,০০০	২,০৮৪	২,৫০০	–	৬,৫০০	৪,৫০০	২৬৬	–	–	–	৬২,৮৫০
বি. আয়দীন (ইয্মীর)	১০,৯৩,৩৩৪	২,০৮,২৮৩	১৪,১০৩	৭৩৭	২৬৫	১,১৭৭	–	২২,৫১৬	–	–	৫৬,০৬২	১৩,৯৬,৪৭৭
কা আয়নতাব (হালাব)	৬৫,০৮৫	৪,০০০	২,০৪৬	২,০০০	–	৬,৫০০	৫,৯০৬	৮৫৭	–	–	৫৯৪	৮৬,৯৮৮
কা বেকোয (ইস্তাম্বুল)	৫,৪৪৪	২,১৫০	১,৯০০	–	–	–	–	–	–	–	–	৯,৪৯৪
স্বা. সা. বীগা	১,০৬,৫৮৩	১৭,৫৮৫	১,৬৩৬	–	৬০	৯২	–	২,৯৮৮	–	–	৪৯৪	১,২৯,৪৩৮
বি. বিত্লীস	২,৫৪,০০০ * ৩৮৬৩	২১০	১,২৫,৬০০	৩,৮৪০	১,৯৫০	২,৬০০	৬,১৯০	–	৩৭২	–	–	৩,৯৮,৬২৫
বি. দিয়ার বাক্র	৩,২৮,৬৪৪ * ৬,০০০	১৪,২৪০	৫৭,৮৯০	১০,১৭০	১১,০৬৯	২০৬	৬৩,৯৭৪	১,২৬৯	–	৩,০০০	–	৪,৯১,৪৬২
বি. এরযেরুম	৫,০০,৭৮২	৩,৭২৫	১,২০,২৭৩	১২,০২২	২,৬৭২	–	–	৬	১৬	–	৬,২০৬	৬,৪৫,৭০২
কা খাব্যা (ইস্তাম্বুল)	১৪,০০০	৫,১০০	–	–	–	–	–	–	–	–	১৫০	১৯,২৫০
বি. খুদাওয়ান্দিগার (ব্রুসা)	১২,৯৬,৫৯৩	২,৩০,৯১১	৮৫,৩৫৪	৩,০৩৩	৬০৪	–	–	৩,২২৫	–	–	৭,৩১৯	১৬,২৬,৮৩৯
কা ইসকান্দারুন (হালাব)	১২,৫০০	১,০০০	১,১৪২	১,৫০০	–	৪,১৪৬	৩,০০০	৪২	–	–	–	২৩,৩৩০
স্বা. সা ইয্মিদ	১,২৯,৭১৫	৪০,৭৯৫	৪৬,৩০৮	৩৯০	১,৯৩৭	–	–	২,৫০০	–	১,১১৫	–	২,২২,৭৬০
না. কাদিকয় (ইস্তাম্বুল)	৯,৩৭৪	৮,১৩৭	১০,৪৮০	২০০	১০০	–	–	৪৫০	–	২৯০	৩,১৮০	৩২,২১১
না. কানলীজা (ইস্তাম্বুল)	১৬,৭৯৬	৩,৩৮৭	৪,০৮০	–	–	–	–	১২০	–	–	৮০০	২৫,১৮৩
কা. কারতাল (ইস্তাম্বুল)	১০,৮৭০	৫,০০০	২,২০০	১৮০	–	–	–	–	–	–	৫০	১৮,৩০০
বি. কাসতামনি	৯,৯২,৬৭৯	২১,৫০৭	২,৬১৭	৩০	–	–	–	–	২,০৭৯	–	–	১০,১৮,৯১২
কা. কিলিস (হালাব)	৭৩,৫২০	১,০০০	১,৫৪৭	১,৩০০	–	২,৭৭৪	৩,০০০	৭৪৭	–	–	–	৮৩,৮৮৮
বি. কূনিয়া	৯,৮৯,২০০	৭৩,০০০	৯,৭০০	–	–	–	–	৬০০	৪০০	১৫,০০০	১০০	১০,৮৮,০০০
বি. মামুরাতুল আযীম (খারপূত)	৩,২২,৩৬৬ *১,৮২,৫৮০	৬৫০	৬১,৯৮৩	১,৬৭৫	৬,০৬০	–	–	–	–	–	–	৫,৭৫,৩১৪
সা. মারআন (হালাব)	১,৩৪,৪৩৮	৫,৫০৫	১,৮৫০	২,৪৬৩	৭,৮০৬	১৮,৫০৫	৮,৯১৮	৩৬৮	–	–	–	১,৭৯,৮৫৩
বি. সিবাস	৫,৫৯,৬৮০ * ২,৭৯,৮৩৪	৭৬,০৬৮	১,২৯,৫২৩	১০,৪৭৭	৩০,৪৩৩	–	–	–	–	–	–	১০,৮৬,০১৫
কা. শিলে (ইস্তাম্বুল)	১৫,৭৫০	৩,২০০	৮০০	–	–	–	–	–	–	–	–	১৯,৭৫০
বি. তিরাব্যোন	৮,০৬,৭০০	১,৯৩,০০০	৪৪,১০০	২,৩০০	৮০০	৪০০	–	৪০০	–	–	–	১০,৪৭,৭০০
সা. উরফা (হালাব)	১,২২,৬৬৫	৫,০৬০	২,০০০	২,৪৩৭	২,০০০	২,৭৩৮	৬,২১৮	৩৬৭	–	–	–	১,৪৩,৪৮৫
না. উসকুডার (ইস্তাম্বুল)	৭১,২১০	১২,১৮০	১৫,৮০০	২৫০	২৫০	–	–	৫,১০০	–	৭০০	২০০	১,০৫,৬৯০
বি. ওয়ান	২,৪১,০০০ * ৫,৪০০	–	৭৯,০০০	৭০৮	২৯০	৬,০০২	৯২,০০০	৫,০০০	–	৬০০	–	৪,৩০,০০০
মোট	৯৬,৭৬,৭১৪ (৯১,৪৩,০৩৭+ *৫,৩৩,৬৭৭)	১০,৪২,৬১২	৯,৭৭,৬৭৯	১৯,৭৪৯	৮৫,৩৪৭	৫৬,১৭৯	১,৬৮,৭০৬	৩৭,২৯১	২,৮৬৭	৪৭,৭৫২	৭৯,৫৫৫	১,২২,৫৪,৪৫৯

অ-সংযুক্ত জ্যাকোবীয়, ক্যালডীয় ও নেসটোরীয়গণের সংখ্যা যোগ করিলে বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃস্টান আরবের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৩১,২৮৯-এ। তবে ইহাদের মধ্যে কিছু ক্যালডীয়, নেসটোরীয় ও সংযুক্ত ক্যালডীয়কে কুর্দীদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই পরিসংখ্যানগুলি হইতে ধরিয়া নেওয়া যায় যে, ২,৬৭৫ জন ক্যাথলিককে সংযুক্ত খৃস্টান গির্জা অনুসারিগণের মধ্যে ধরা হয় নাই, উহারা ছিল প্রধানত ল্যাটিন অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশীয় (ধর্ম প্রচারক ইত্যাদি) যাহারা উছমানী সাম্রাজ্যের নাগরিক হইতে পারে, নাও হইতে পারে; 'বিদেশী' (আজনাবী) শিরোনামের অধীনে তাহাদের ধরা হয় নাই।

	সুন্নী	শী'আ	ইয়াযীদী	খৃস্টান	ইয়াহূদী	অজ্ঞাত পরিচয় এবং বিদেশী	মোট
তুর্কী	৮৫.৪৭,৮৬৩	৪,৬২,৪১৪?	—	—	—	—	৯০,১০,২২৭
কুর্দী	৪,২৪,১৩৮	?	৯,২৬৩?	?	—	—	৪,৩৩,৪০১
আরব	১,৪৩,৫৩৬	৬২,০০০?	—	২,৩১,২৮৯?	—	—	৪,৩৬,৮২৫
ককেশীয়	২৭,৫০০	—	—	—	—	—	২৭,৫০০
গ্রীসীয় (গ্রীক)	—	—	—	১০,৩৩,৫৩৩	—	—	১০,৩৩,৫৩৩
আর্মেনীয়	—	—	—	১১,৪২,৭৭৫	—	—	১১,৪২,৭৭৫
ইয়াহূদী	—	—	—	—	৪৭,২৯৯	—	৪৭,২৯৯
জিপসী	—	—	—	—	—	৪০,৬১৯	৪০,৬১৯
অজ্ঞাত পরিচয় ও বিদেশী	—	—	—	২,৬৭৫	—	৭৯,৫৫৫	৮২,২৩০
মোট	৯১,৪৩,০৩৭	৫,২৪,৪১৪	৯,২৬৩	২৪,১০,২৭২	৪৭,২৯৯	১,২০,১৭৪	১,২২,৫৪,৪৫৯

অতএব Cuinet-এর সময়ে আমরা আনাতোলিয়ার অধিবাসিগণের নিম্নরূপ জাতিগত গঠন পাই ঃ তুর্কী প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি সরকারী আদমশুমারীর তথ্য আমাদের নিকট রহিয়াছে, যেমন ১৯২৭ খৃ., ১৯৩৫ খৃ., ১৯৪০ খৃ., ১৯৪৫ খৃ. ও ১৯৫০ খৃ.-এর আদমশুমারী, কিন্তু শেষোক্ত সালের শুমারীকে মুওয়াক্কাত বা 'চূড়ান্ত নহে'-রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ সংখ্যা পাওয়া যাইবে বিভিন্ন ইলের (বিলায়াত) রাজধানী শীর্ষক প্রবন্ধে, উপরে ৩ অধ্যায়ের শেষ প্যারাতে সেইগুলি দেখান হইয়াছে।

১৯৪৫ খৃ. সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ১,৮৭,৯০,১৭৪ ও ১৯৫০ খৃ. ২,০৯,৩৪,৬৭০; ১৯৪৫ খৃ. ইউরোপীয় তুরস্ক ও আনাতোলিয়াতে যথাক্রমে ১৪,৯৬,৬১২ ও ১,৭২,৯৩,৫৬২; ১৯৫০ খৃ. ইউরোপীয় তুরস্ক ও আনাতোলিয়াতে যথাক্রমে ১৫,৯৮,২৫৫ ও ১,৯৩,৩৬,৪১৫।

১৯৫০ খৃ. আদমশুমারীর কয়েকটি শহরের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়। ৫টি শহরের জনসংখ্যা ১,০০,০০০-এর উপরে; ইস্তাম্বুল ১০,০০,০২২, আন্কারা ২,৮৬,৭৮১, ইয্মির ২,৩০,৫০৮, আদান ১,১৭,৭৯৯, ও বুরসা ১,০০,০০৭। নিম্নলিখিত ৬টি শহরের জনসংখ্যা ৫০,০০০ ও ১,০০,০০০-এর মাঝে এসকিশেহির (Eskisehir) ৮৮,৪৫৯, গাযীআনতেপ ৭২,৭৪৩, কায়সারী ৬৫,৪৮৯, কূনিয়া ৬৪,৫০৯, এরযুরুম ৫৪,৩৬০, সিবাস ৫২,২৬৯।

১৯৪৫ খৃ. ও ১৯৫০ খৃ. শহর এলাকা ও গ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যা কত ছিল তাহাও দেখান হইয়াছে। সংখ্যাগুলি পরবর্তী কলামে সংখ্যাচিত্রের নীচে দেখান হইল ঃ

	১৯৪৫ খৃ.	১৯৫০ খৃ.
শহর	৪৬,৮৭,১০২ ঃ ২৫˙০৬%	৫২,৬৭,৬৯৫ ঃ ২৫.১৬%
গ্রাম	১,৪১,০৩,০৭২ ঃ ৭৪˙৯৪%	১,৫৬,৬৬,৯৭৫ ঃ ৭৪.৮৪%
	১,৮৭,৯০,১৭৪ ঃ ১০০%	২,০৯,৩৪,৬৭০ ঃ ১০০%

সমগ্র তুরস্কের আয়তন ৭,৬৭,১১৯ বর্গ কিলোমিটার। অতএব দেখা যায়, দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১৯৪৫ খৃ. প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৪˙৪৯ জন ও ১৯৫০ খৃ. ২৭ জন। সরকারীভাবে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা হার (সমগ্র দেশের ও প্রতিটি বিলায়াতের জন্য) পাওয়া যায় শুধু ১৯৩৫ সালের। তদনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ২৩˙৫% বাস করিত শহরাঞ্চলে, আর ৭৬˙৫% বাস করিত গ্রাম অঞ্চলে। এই সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ১৯৩০ খৃ. আইন অনুযায়ী দেশের যেইখানে একটি পৌর স্বায়ত্তশাসিত সরকার রহিয়াছে (বিলাদিয়া তেস্কিলাতি) উহাকেই একটি শহর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেইখানেই ২,০০০-এর বেশী লোক বাস করে সেই স্থানকে ও সকল কাদা দফতরকে (এই ন্যূনতম জনসংখ্যা থাকুক বা না থাকুক) শহর হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। কোন কোন কাদা দফতর এলাকার লোকসংখ্যা, এমনকি ৫০০-এরও কম রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের মানে বিচার করিতে গেলে এই হার গ্রাম অঞ্চলের প্রতিই গণ্য হইবে।

H. Louis, Die Bevolkerungskarte der Turkei, (বার্লিন ১৯৪০ খৃ.) গ্রন্থটি ১৯৩৫ খৃ. তুরস্কের আদমশুমারীর প্রকাশনার

উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছেন। মানচিত্রে দেখা যায়, আনাতোলিয়ার সবচেয়ে জনবহুল তিনটি এলাকা হইতেছে এইগুলিঃ (১)পশ্চিম আনাতোলীয় উপকূলভূমি, সেই সঙ্গে নদী-উপত্যকাসমূহ যেইগুলি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, বিশেষ করিয়া মায়েনদার উপত্যকা (বুয়ূক মেন্দারেস চে); (২) কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা; (৩) সিলিসিয়া, হাতায়-এর নূতন সানজাক এবং ফুরাত নদীর দিককার সমভূমি যাহা ভৌগোলিকভাবে উত্তর সিরিয়ার অংশ; ইহার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মধ্য আনাতোলিয়া, উহার শুষ্ক তৃণভূমি ও উত্তর-পূর্বের পর্বত অঞ্চল, সেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম। জনবসতির ঘনত্বের তারতম্য হয় দেশটির প্রকৃতিগত কারণে, তাহা সম্ভবত মধ্যযুগ হইতে সেই একইরূপ রহিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও একইরূপ থাকিবে বলিয়া ধারণা করা যায়। ধর্মীয় বা ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগ অনুসারে জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া যায় ১৯৪৫ খৃ. (২১ Ekim 1945 Genel Nufus Sayimi, Recensement general de La population du 21 Octobre 1945, Turkiye Nufusu, population de la Turquie, vol. 65.আনকারা ১৯৫০ খৃ.)। এই তথ্য অনুযায়ী ভাষাগতভাবে তুরস্ককে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়ঃ

তুর্কী ভাষাভাষী জনসংখ্যা	১,৬৫,৯৮,০৩৭ ঃ	৮৮.৩৪%
অ-তুর্কী ভাষাভাষী জনসংখ্যা	২১,৯২,০০৬ ঃ	১১.৬৬%
অজ্ঞাত	১৩১ ঃ	
মোট	১,৮৭,৯০,১৭৪ ঃ	১০০%

ধর্ম অনুযায়ী লোকসংখ্যা ঃ

ইসলাম	১,৮৪,৯৭,৮০১ ঃ	৯৮.৪৫%
অ-ইসলামী	২,৯২,১৫২ ঃ	১.৫৫%
অজ্ঞাত	২২১ ঃ	
মোট	১,৮৭,৯০,১৭৪ ঃ	১০০%

অমুসলিমগণের মধ্যে রহিয়াছে ঃ

খৃস্টান	২,০২,০৪৪ ঃ	৬৯.১৬%
ইয়াহূদী	৭৬,৯৬৫ ঃ	২৬.৩৪%
ধর্মহীন	৫৬১ ঃ	০.১৯%
অন্যান্য	১২,৫৮২ ঃ	৪.৩১%
মোট	২,৯২,১৫২ ঃ	১০০%

এই মোটমুটি পরিসংখ্যানকে Cuinet প্রদত্ত শতাব্দীর শেষের জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে পরিষ্কারই বুঝা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধকালে ও যুদ্ধের ঠিক পরে জনসংখ্যার কী বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত উভয় শ্রেণীর বিভাগসমূহ হইতে আরও অধিক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাইবে।

জনসংখ্যাকে ভাষাভিত্তিক বিভাগ করিবার ফলে প্রতি বিভাগের যে মোট সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিলায়াতের প্রদত্ত জনসংখ্যা বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী উদ্ঘাটিত হয় (এখানেও আবার সংখ্যাগুলি সমসংখ্যায় হাজার বা লক্ষের ঘরে দেখানো হইয়াছে)। কুর্দী ভাষাভাষী লোকেরা একত্রে বাস করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বিলায়াতগুলিতে এবং নিম্নলিখিত বিলায়াতগুলিতে উহারা সংখ্যাগুরু ঃ আগরী (৮০,০০০), বিনগুল (৪২,০০০), বিত্লীস (৪৩,০০০), দিয়ার বাক্র (১,৮০,০০০), হাকারি (৩০,০০০), মারদিন (১,৫৫,০০০), মুস (৫৩,০০০), সিইর্ত (১,০০,০০০), ওয়ান (৭৮,০০০)। তুনসেলি (৪৮,০০০) ও উর্ফাতে (১,০৩,০০০), উহারা তুর্কীদের চেয়ে সামান্য সংখ্যাগুরু (তুর্কী যথাক্রমে ৪৩,০০০ ও ১,০৩,০০০), আর এলাযিগ (৮২,০০০), কারস (৬৬,০০০) ও মালাতিয়্যাতে (১,৪১,০০০)। ইহারা বড় সংখ্যালঘু। কুর্দী ভাষাভাষীদের তুলনায় আরবী ভাষাভাষীরা সর্বত্রই সংখ্যায় কম; মারদিনে ইহাদের সংখ্যা ৬০,০০০, আর কুর্দী ভাষাভাষী ১,৫৫,০০০, সেখানে তুর্কীর সংখ্যা মাত্র ১৫,০০০; উরফাতে ৪০,০০০, কুর্দী ১,২৩,০০০, আর্তুকী ১,০৫,০০০; হাতায়-এ আরবী ভাষাভাষীর সংখ্যা সর্বাধিক, ১,০০,০০০, এখানে তুর্কীর সংখ্যা ১,৫০,০০০। সবচেয়ে কম সংখ্যক তুর্কী বাস করে মারদিন (আনু. ১৫,০০০), সিইর্ত (আনু. ১৫,০০০) ও হাকারি (৪,০০০) বিলায়াতগুলিতে। য়ুনানী বা গ্রীসীয়, আরমানী ও ইয়াহূদীরা (আনুমানিক ১০,০০০ জুডাই স্পেনীয় ভাষাভাষী সমেত) প্রায় সকলেই বাস করে ইস্তাম্বুল শহরে। আনুমানিক ৭,০০০ গ্রীক বাস করে চানাক্কালিতে এবং আনুমানিক ১২,০০০ ইয়াহূদী বাস করে ইয্মীরে। অন্যত্র ইহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অন্যান্য বিভিন্ন জাতির ছোট ছোট দল, যেমন ককেশীয়গণ (ইহাদের অধিকাংশই কায়সারী বিলায়াতে বাস করে), লাযগণ, জর্জীয়গণ (এই উভয় জাতিই, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ সাগরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে বাস করে)। এই সকল প্রদেশে তুর্কীদের তুলনায় ইহারা খুবই নগণ্য সংখ্যায় বাস করে।

ধর্ম অনুযায়ী যে ভাগ করা হইয়াছে তাহা আরও তথ্যবহুল। সর্বোপরি লক্ষণীয়, যে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠী বা দলের মাতৃভাষা তুর্কী তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুরস্কে ইসলাম ধর্মের মধ্যে শী'আ-সুন্নী ভেদাভেদ করা হয় না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় মতাবলম্বীর মধ্যে রহিয়াছে-স্বল্প কয়েকজন অপরিচিত ধর্মীয় মতাবলম্বী বিদেশী ব্যতীত—প্রধানত কুর্দীগণ (সম্ভবত উগ্রপন্থী শী'আ বা ইয়াযীদী) যাহারা হয়ত নিজেদেরকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করে না বা সুন্নী ও মধ্যপন্থী শী'আগণও উহাদেরকে আদৌ মুসলিম বলিয়া জ্ঞান করে না। যাহাদের মাতৃভাষা জর্জীয় তাহারা লায, প্রকৃত জর্জীয় নহে, প্রকৃত জর্জীয়রা খৃস্টান। অন্যান্য ভাষার নিম্নে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট যে তুলনামূলকভাবে বেশী দেখানো হইয়াছে তাহা দ্বারা অবশ্যই বিদেশীদেরকে বুঝানো হইয়াছে। অন্যান্য ভাষার নিম্নে যে ইয়াহূদীদের দেখান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১০,৮৬৬ জন জুডাইস্পেনীয় ভাষাভাষীও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। Cuinet প্রদত্ত পরিসংখ্যানে জিপসীদের সংখ্যা দেখান হইয়াছিল ৪০,০০; নূতন পরিসংখ্যানে উহারা সম্পূর্ণই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। উহারা যেহেতু যাহাদের মধ্যে বাস করে তাহাদের ভাষাতেই

কথা বলে, ধর্মও তাহাদের মত একই, কাজেই ধরিয়া লওয়া যায়, পরিসংখ্যানের অন্তর্গত বিভিন্ন দলের সঙ্গে উহারা অচিহ্নিতভাবে মিশিয়া আছে।

যাহা হউক, তুরস্কের সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী (১৯৭৬ খৃ.) সমগ্র তুরস্কের আয়তন দেখান হইয়াছে ২,৯৬,১৮৫ বর্গমাইল। তন্মধ্যে আনাদোলুর আয়তন ২,৮৭,১৭৯ বর্গমাইল; জনসংখ্যা সমগ্র তুরস্কের ৪,০২,০০,০০০ ও আনাদোলুর ৩,৬০,০০,০০০।

৫। যোগাযোগ ব্যবস্থা

মধ্যভাগে শুষ্ক তৃণাবৃত ভূমি আর স্বল্প সংখ্যক ব্যবহারোপযোগী বন্দর ও পোতাশ্রয় থাকা হেতু আনাদোলুতে পরিবহন চলাচল খুবই কম। ইস্তাম্বুল হইতে প্রাচ্য অভিমুখে গমনকারী দীর্ঘ সমুদ্র পথের জাহাজসমূহ আনাদোলুতে খুব কমই আসে; স্থলপথের বন্ধুর রাস্তার পরিবর্তে অধিকাংশই সহজতর নৌপথে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী ত্রাবযোনে যাইয়া থামে বা মধ্যযুগে জেয়হান নামে পরিচিত নদীর মোহনাতে অবস্থিত আয়াস (Ayas)-এ যায় বা উছমানীদের অধীনে ইসাস উপসাগরের পায়াস (Payas)-এ যায় এবং আধুনিক কালে ইসকান্দারুনে (Alexandretta) যায়। যুগ যুগ ধরিয়া এই সকল বন্দর হইতে প্রধান কাফেলাপথ এশিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন স্থানে গিয়াছে। আনাতোলিয়ার ভিতরে যে যোগাযোগ ও চলাচল তাহা ছিল প্রধানত স্থানীয় গুরুত্বের বিষয়। সব যুগে সব সময়ই দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্তে গমনের সড়ক যোগাযোগ ছিল। সেইগুলি সবই সাধারণত ইস্তাম্বুল হইতে শুরুও ইস্তাম্বুল যাইয়া শেষ হইত (ইস্তাম্বুল যখন রাজনৈতিকভাবে আর আনাতোলিয়ার রাজধানী ছিল না, এমনকি তখনও উহা অবিসম্বাদিতভাবে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করিত)।

তুর্কী আমলের উল্লিখিত সড়কগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) সামরিক সড়ক; (২) কাফেলা চলাচলের পথ এবং (৩) ডাক যোগাযোগের পথসমূহ। এই তিন ধরনের রাস্তাই দেশের ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী নির্মিত ও বিস্তৃত এবং অভ্যন্তরীণ দুস্তর শুষ্ক তৃণাবৃত ভূমি অতিক্রম করিয়া সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সীমান্ত পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সড়কগুলি তৃণাবৃত ভূমির প্রান্ত ধরিয়া গিয়াছে, যেখানে পশু চারণ করা সম্ভব এবং যেখানে শহরগুলিও অবস্থিত। এই পথগুলি মোটমুটিভাবে একই অভিমুখে গিয়াছে- যদিও উহাদের একটির সঙ্গে অপরটি মিশিয়া যায় নাই।

প্রধান সামরিক সড়ক (যে সড়ক দিয়া ১৬শ ও ১৭শ শতকে সুলতান-এর সৈন্যবাহিনী পারস্য ও ককেসিয়াতে যুদ্ধাভিযানে যাইত) মধ্য আনাতোলীয় তৃণাবৃত ভূমির দক্ষিণ দিয়া একটি বড় অর্ধ-বৃত্তাকারে উস্‌কুদার হইতে ইয্‌মীদ, এস্‌কিশেহির, আক্‌শেহির হইয়া কূনিয়া এবং সেখান হইতে ইরেগ্‌লি, নিগ্‌দে, কায়সারি হইয়া সিবাস, অতঃপর এরযিন্‌জান ও এরযুরুম হইয়া প্রাচ্য অভিমুখে গিয়াছে। সুলতান ১ম সালীম যখন সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তিনিও প্রথমে কায়সারিতে যান এবং সেখান হইতে তাওরূস কাহ্‌কারায় (Anti Taurus)-এর মধ্য দিয়া এলবিস্তান ও মার'আশে যান। ইরেগ্‌লি হইতে সিলিসীয় প্রবেশদ্বার (গুলেক বোগাযী) অতিক্রম করিয়া আদান পর্যন্ত যে পথ এবং অতঃপর সিরিয়া যাইবার যে পথ উহা সাধারণত এড়াইয়া যাওয়া হইত, বিশেষ করিয়া কষ্টকর যানবাহনের জন্য আরও বিশেষ করিয়া গুলেক বোগাযী সহজেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া থাকে বলিয়া। উদাহরণস্বরূপ ১৬৩৮ খৃ. ৪র্থ মুরাদ বাগদাদ অবরোধের জন্য প্রয়োজনীয় গোলন্দাজ বাহিনী সমুদ্র পথে একেবারে পায়াস পর্যন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে সেখান হইতে স্থলপথে মহিষের পিঠে করিয়া সমরাস্ত্র বহন করিয়াছিলেন। উত্তরের কাফেলা চলাচলের পথটি (নিম্নে উহার উল্লেখ করা হইবে) শুধু ছোট ছোট সৈন্যদল পাঠাইবার জন্য ব্যবহার করা হইত। সুলতানের রাজকীয় বাহিনীর বিবরণীতে প্রায়শ প্রধান সামরিক সড়কের উপরে ছাউনি স্থাপন করিবার কথা উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু এইগুলি প্রায়শ সড়ক পথের উপরে জনবসতি হইতে বেশ দূরে স্থাপন করা হইত।

কারাভান সড়কসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি উস্‌কুদারের উপর দিয়া কোনাকুনি গিয়া গাবযে (Gebze) হইয়া দীল হইতে ইযমীর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর ইয্‌মীদ উপসাগর অতিক্রম করিয়া এস্‌কি শেহিরের মধ্য দিয়া কূনিয়া, ইরেগ্‌লি পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সামরিক সড়কের পাশাপাশি চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর গুলেক বোগাযীর মধ্য দিয়া আদান পর্যন্ত গিয়াছে, সেখান হইতে সিরিয়া বা মেসোপটেমিয়াতে গিয়াছে। আনৃতাকিয়া হইতে সিরিয়া পর্যন্ত যে সড়কটি গিয়াছে সেই পথেই হাজ্জযাত্রিগণ (দামিশ্‌ক হইয়া) ইসলামের পবিত্রতম স্থানদ্বয় মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফেও গমন করিতেন বলিয়া সড়কটিকে প্রায়শ হজ্জের রাস্তা বলা হইয়া থাকে। উত্তর দিকেও একটি কারাভান সড়ক গিয়াছে, সেইটিরও কিছুটা গুরুত্ব রহিয়াছে; সেই সড়কটি উসকুদার হইতে ইয্‌মীদ, বোলী (Boli) ও তাওসিয়া (Tosya) হইয়া আমাসিয়া পর্যন্ত গিয়াছে (বা আমাসিয়াকে এক পাশে রাখিয়া নিক্‌সার হইয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে এরযিনজান ও এরযেরুমে গিয়াছে, সেখান হইতে আরও পূর্বে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার বিকল্প একটি পথও রহিয়াছে, আমাসিয়া হইতে তোকাত, সিবাস ও মালাতিয়া হইয়া দিয়ার বাক্‌র এবং সেখান হইতে মাওসিল ও বাগদাদ পর্যন্ত; উস্‌কুদারের পর হইতে এই সড়কটিকে বলা হয় বাগদাদ য়োলু। ইহার একটি পুরাতন বিকল্প পথ ছিল—১৫৫৫ খৃ. বুসবেক সেই সড়কটি ব্যবহার করিয়াছিলেন—উহা কোণাকুণিভাবে এস্‌কি শেহির পর্যন্ত গিয়াছে। অতঃপর আন্‌কারা হইয়া আমাসিয়া গিয়া শেষ হইয়াছে। সর্বশেষ উত্তর-দক্ষিণ সড়ক, উহা মধ্য আনাতোলিয়ার তৃণাবৃত ভূমি ঘুরিয়া পূর্ব অভিমুখে গিয়াছে এই সড়কটিরও কিছুটা গুরুত্ব রহিয়াছে। সালজূক আমলে এই পথটি রাজধানী কূনিয়াতে গিয়া দুই মুখে বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে তৃণাবৃত ভূমি অতিক্রম করিয়া মনোরম সুলতান খান ও আক্‌সারায় পার হইয়া কায়সারিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে সিবাস পর্যন্ত গিয়া উহা উত্তরমুখী পথের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, একই সঙ্গে আবার পূর্বাভিমুখী (এরযিন্‌জান ও এরযুরুম) পথসমূহের সঙ্গেও একত্র হইয়াছিল। কারামান ও উছমানী আমলে এই পথ তোরোস, লারান্দা (কারামান) বা উলুকীশ্‌লা পর্বতের পাদদেশস্থ স্থানসমূহ হইতে নিগ্‌দে হইয়া কায়সারি পর্যন্ত গিয়াছিল। পশ্চিম আনাতোলিয়াতে শুধু ইযমীর হইতে বহির্গত পথসমূহেরই কিছুটা

স্থানীয় গুরুত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় এবং সেইগুলির উল্লেখ কমই পাওয়া যায়।

ডাক যোগাযোগের পথসমূহ ঃ কারাভান সড়কের ন্যায় ডাক চলাচলের পথসমূহও তিনটি বাহুতে বিভক্ত ছিল (ইহার তুর্কী প্রতিশব্দ কোল বাহু (arms) শব্দটি প্রশাসনিক ভাষায় একটি বিশেষ শব্দরূপেও ব্যবহৃত হয়। এইজন্য দ্র. (১) Redhouse, A. Turkish and Enghlish Lexicon, ১৯৪২ খৃ.; (২) H. W. Duda, Balkanturkische Studien, ভিয়েনা ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৯৮, টীকা ৮]। জাহাননুমা গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ১৭শ শতকে এই বাহুগুলির মধ্যবর্তীটি কোণাকুণি যাওয়া পথের সম্পূর্ণ অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল, সেই সঙ্গে দামিশ্‌ক পর্যন্ত বিস্তৃত উহার শাখাপথও ছিল। দক্ষিণের বাহুটি তাহার সকল শাখাপথসহ পশ্চিম আনাতোলিয়া জুড়িয়া ছিল। আর বাম দিকের বাহু ছিল উত্তরের কারাভান পথ, উহার বর্ধিতাংশ সুদূর বাগদাদ পর্যন্ত গিয়াছিল। ১৯ শতকে ডাক-সড়কের বিবরণী অনুযায়ী কোণাকুণি বিস্তৃতি পথটি আনাতোলীয় সড়কসমূহসহ দক্ষিণের বাহু গঠন করিয়াছে, উত্তরের কারাভান পথ কেন্দ্রীয় বাহু গঠন করিয়াছে, আর বাম বাহুটি তোকাতের আগে কেন্দ্রীয় বাহু হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, সেখান হইতে উহা পূর্বাঞ্চলীয় সড়কজালের সঙ্গে মিশিয়া এর যে রুম পর্যন্ত গিয়াছে [১৯শ শতকের পূর্বেই আনাতোলিয়ার সড়ক নির্মাণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দ্র. (১) F. Taeschner, Das Anatolische Wegenetz nach Osmanischner, Quellen, লাইপযিগ ১৯২৪ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im wandel der Zeiten, Petermanns Geographische Mitteilungen, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ২০২-৬]।

এই যোগাযোগ ও চলাচলের পথগুলির প্রতি সড়ক (roads) কথাটি সীমিত অর্থে মাত্র ব্যবহার করা যায়। কেননা সেইসব সড়ক কোন শক্ত ভিত্তির উপরে নির্মাণ করা হয় নাই। তবে রোমকগণ কর্তৃক নির্মিত অংশগুলি ছিল ইহার ব্যতিক্রম; বাদবাকী সব পথই বহুল ব্যবহৃত চলা-পথ। সেইগুলির স্থানে স্থানে জনহিতৈষী ব্যক্তিগণ দ্বারা পর্যটক ও পথচারিগণের সুবিধার্থে সরাইখানা (Caravanserai), কূপ ও সেতু নির্মিত হইয়াছিল।

১৯শ শতক ও ২০শ শতকে রেল সড়ক সম্প্রসারণের ফলে পূর্বেকার এই তিনমুখী চলাচল ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য রেলপথও মোটামুটিভাবে পুরানো পথ ধরিয়াই নির্মিত হইয়াছে—অন্তত কোণাকুণি সড়কগুলির ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।

রেলপথ নির্মাণ দ্বারা স্বভাবতই সড়ক নির্মাণকে বন্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই, তানজীমাত আমল (সংস্কার যুগ) হইতে (কতকাংশে) সড়ক নির্মাণকেও উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। সড়ক নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের উদ্ভাবিত উপায় হইতেছে স্বেচ্ছাশ্রম ও পথকর, "য়োল পারাসি" (দ্র. G. Young, Corps de Droit Ottoman, IV, অক্সফোর্ড ১৯০৬ খৃ., ২৪৫ প., 'Routcs et Prestations)।

আনাতোলিয়াতে রেলপথ নির্মাণের ইতিহাস আরম্ভ হয় ১৮৫৬ খৃ. একটি বৃটিশ কোম্পানীর স্মার্না (ইযমীর) হইতে আয়দীন পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রদত্ত চুক্তির তারিখ হইতে। ১০ বৎসর পরে সেই রেলপথে গাড়ী চলাচল করিতে শুরু করে। উছমানী সাম্রাজ্যের শেষ কয়েক বৎসর আনাতোলিয়াতে নিম্নলিখিত রেলপথগুলি নির্মিত হয়ঃ (১) বৃটিশ কোম্পানীঃ স্মার্না—ইযমীর—আয়দীন ১৮৬৬ খৃ.-দিনার ১৮৮৯ খৃ. (সেখান হইতে শাখাপথসমূহ ওডেমিস, টায়ার, সোক, দেনিয্‌লি ও চিব্‌রিল)-আগিরদির ১৯১২ খৃ.; (২) ফ্রাংকা-বেলজীয় কোম্পানী (১৮৯৩ খৃ. পর্যন্ত ব্রিটিশ)ঃ স্মার্না (ইযমীর)-মানিসা-কাসাবা ১৮৬৬ খৃ., আলাশেহির ১৮৭৩ খৃ.; (?) আফয়ুন কারা হিসার ১৮৯৭ খৃ.; মানিসা-সোমা ১৮৯০ খৃ., বালিকাসির—বানূ দীরমা ১৯১২ খৃ.; (৩) সরু গেজ রেলওয়ে মুদানিয়্যা-ব্রুসা (বুর্‌সা) ১৮৭৫ খৃ. ইহা ১৮৯২ খৃ. একটি ফ্রাংকো-বেলজীয় কোম্পানী কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয় (বর্তমানে আর ব্যবহৃত হয় না); (৪) জার্মান কোম্পানী (১৮৮৮ খৃ. হইতে) আনাতোলিয়া রেলওয়ে হায়দার পাশা-ইযমীদ ১৮৭৩ খৃ. (আদাপ্‌যার পর্যন্ত একটি শাখালাইন নির্মাণ সমেত) —এস্‌কি শেহির- আংকারা ১৮৯২ খৃ.; এসকি শেহির-আফয়ুন কারা হিসার (আলায়ুন্ত হইতে কুতাহিয়া পর্যন্ত একটি শাখা লাইন সমেত)—কুনিয়া ১৮৯৬ খৃ.; বাগদাদ রেলওয়ে; কুনিয়া—বুলগুর্‌লু ১৯০৪ খৃ.; তোপ্রাক্কালে— ইসকান্দারুন ১৯১৩ খৃ.; বুলগুর্‌লু—আদানা—তোপ্রাক্কালে— আলেপ্পো (হালাব)- নুসায়বিন ১৯১৮ খৃ. (মারদীন পর্যন্ত একটি শাখা লাইন সমেত); (৫) বৃটিশ কোম্পানী ঃ মারসিন—আদানা ১৮৮৬ খৃ. (১৯০৬ খৃ. বাগদাদ রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ)।

এইভাবে দেখা যাইতেছে, সামান্য অংশের ব্যতিক্রম ছাড়া যেখানে আদানা ও ব্রুসাকে উহাদের বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে—সমগ্র রেল ব্যবস্থা একদিকে ছিল স্মার্নাভিত্তিক (ইযমীর) রেলপথসমূহ যেইগুলি পশ্চিম আনাতোলিয়ার উর্বর কৃষিজ উৎপাদনের জেলাগুলিকে সংযুক্ত করিয়াছিল; অপর দিকে ছিল একটি কোণাকুণি রেখা। সেখানকার একটি শাখা আন্‌কারাতে গিয়াছে যাহা দ্বারা রাজধানীর সঙ্গে দূরবর্তী আরব প্রদেশসমূহের (মেসোপটেমিয়া, ইরাক ও সিরিয়া) সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী এলাকায় ও উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়াতে রেল ব্যবস্থা সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনা রুশ বিরোধিতার মুখে পরিত্যক্ত হইয়া যায়।

তুর্কী প্রজাতন্ত্রের আমলে ১৯২০ খৃ. দেশের সকল রেল ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা হয় ('তুর্কী জুমহুরিয়াতি ডেভলেট ডেমিরিওল্লারী') এবং পরে রেল লাইন সম্প্রসারিত করিয়া আন্‌কারাকে সমগ্র ব্যবসার কেন্দ্র করা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই রেল সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়, সরু (narrow) গেজ রেলপথ দ্বারা আন্‌কারা—ইর্‌মাক—য়াহ্‌সীহান (১৯২৫ খৃ.)-য়ারকোয় সংযুক্ত করিয়া কায়সারীর দিকেও বর্ধিত করা হয় (১৯৫২ খৃ.)। সেই অংশটুকু পরে ব্রডগেজ লাইনে রূপান্তরিত করা হয়।

বর্তমানে এই লাইনগুলি চালু রহিয়াছে ঃ (১) আন্‌কারা—কায়সারি (১৯২৭ খৃ.)—সিভাস (১৯৩০ খৃ.)—ইর্‌যিন্‌কান (১৯৩৮ খৃ.)—এরযুরুম (১৯৩৯ খৃ.)—হোরাসান (১৯৫০ খৃ.)—সারিকামীস পর্যন্ত

নির্মাণাধীন রহিয়াছে। এখানে ইহা ব্রডগেজ লাইনের সংগে সংযুক্ত হইয়াছে, উহা ১৮৯৬ খৃ. রুশগণ নির্মাণ করিয়াছিল। গুমরু (আলেকজান্দ্রোপোল, বর্তমান নাম লেনিনাকান) হইতে কার্‌স হইয়া সারীকামীস পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে সেখান হইতে এরযুরুম হইয়া মামাহাতুন পর্যন্ত সরু গেজে লাইনটি নির্মাণ করা হয়। (২) ঈলিসা (আদরামিত উপসাগরের কূলে)—আদরামিত—পালামুতলুক (সরু গেজ ১৯২৪ খৃ. হইতে অব্যবহৃত পড়িয়া আছে); (৩) ফেভ্যিপাসা (আদানা-আলেপ্পো লাইনে)-মালাতিয়া (১৯৩১ খৃ.), দিয়ারবাক্‌র (দিয়ারবাকীর) ১৯৩৫ খৃ. (এলাযীগ পর্যন্ত শাখা লাইন সমেত),—কুরতালান ১৯৪৪ খৃ.; (৪) সামসুন—চারসাম্বা (সরু গেজ) ১৯২৬ খৃ. (বর্তমানে আর ব্যবহৃত হয় না); সামসূন—আমাসিয়া-সিবাস ১৯৩২ খৃ. (৫) কুতাহিয়া-বালিকাসির ১৯৩২ খৃ.; (৬) কায়সরী-উলুকীসলা (আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়—(বোগাযকুপতু—কারদেযেদিগি) ১৯৩৩ খৃ. (তখন হইতে সিরিয়া ও ইরাকে সরাসরি ট্রেন চলাচল—তোরোস এক্সপ্রেস—এখন কূনিয়্যার উপর দিয়া না গিয়া আন্‌কারা হইয়া যায়); (৭) ঈরমাক—ফিল্‌য়াওস ১৯৩৫ খৃ. যুংগুল্‌দাক ১৯৩৭ খৃ.-কোয্‌লূ ১৯৪৩ খৃ., এরেগ্‌লির পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং নির্মাণাধীন; (৮) আফ্‌য়ূন কারাহিসার—কারাকুয়ু (দিনারের নিকটে) বালাদিয (এগিরদীরের নিকটে)-ইস্‌পারটা ১৯৩৬ খৃ.; (৯) চেতীনকায়া (সিবাস—এর্‌যিন্‌জান-এর অভিমুখে)—মালাতিয়া ১৯৩৭ খৃ.; (১০) এলাযীগ—গেঞ্চ ১৯৪৭ খৃ.—মুস নির্মাণাধীন—তাওয়ান (ওয়ান হ্রদের কিনারে) পরিকল্পনা করা হইয়াছে; (১১) কুপরুআগ্‌রী (ফেড্‌যীপাসার নিকটে)—মার'আশ ১৯৪৮ খৃ.; (১২) নারলী (ফেড্‌যীপাসার নিকটে)-গাযিআন্‌তে ১৯৫৩ খৃ.-কারকামূশ, পূর্ব নাম জায়াবুলূস (ফুরাত নদীর তীরে, আলেপ্পো—নুসায়বীন শাখায়) নির্মাণাধীন [তু. G. Jaschke, Geschichte und Bedeutung der turkischen Eisenbahner, Zeitschrift fur Politik, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৫৫৯-৫৬৬; বিশেষ করিয়া বাগদাদ রেলপথ সম্বন্ধে তু. (১) H. Bode, Der Kampf um die Baghdadbahn 1903-1914, ব্রেসলে ১৯৪১ খৃ.; (২) R. Huber, Die Bahgdadbahn, বার্লিন ১৯৪৩ খৃ.]।

মোটর যানবাহন বেশী ব্যবহারের কারণে রেলগাড়ির ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। ফলে স্থানীয় রেলপথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (মুদানিয়াহ্‌—ব্রুসা, ঈলীজা—এদ্‌রেমী—পালা—মূতলু)। তুরস্কের সমগ্র রেল ব্যবস্থাই এখন অচল হইয়া পড়ার অবস্থা হইয়াছে। ফলে সড়ক নির্মাণের উপরে নূতন করিয়া গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (তু. মুকবিল গোকডোগান, Strassenbau und Verkehrspolitik in der Turkei, স্টুটগার্ট ১৯৩৮ খৃ.)। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে তুরস্কের সড়কগুলির নির্মাণ কাজ বহু পরিমাণে বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই সম্প্রসারণ কাজ অংশত করা হইয়াছে আমেরিকার সহায়তায় এবং বর্তমানে বহু সংখ্যক বাস লাইন নির্মিত হইয়াছে (তু. R. W. Kerwin, The Turkish Roads Programme, The Middle East Journal, ১৯৫০ খৃ.)।

আনাতোলিয়ার নদীগুলি নৌ-চালনার উপযোগী নহে বলিয়া সত্যিকার অর্থে এখানে কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা নাই। ব্যতিক্রম শুধু বড় বড় নদী যেইগুলির মোহনার উপরে কিছু দূর পর্যন্ত জাহাজ চলে, তাহা ছাড়া চামড়া ফুলাইয়া তদ্দ্বারা ভেলা তৈরি করিয়া দিজলা (Tigris) নদীপথে চালান হয় (কালীক [Kelek] দ্র.)। কোনরকম কৃত্রিম নৌপথও নাই। সাবান্‌জা হ্রদকে খাল দ্বারা একদিকে সাকারিয়্যার সঙ্গে এবং অপরদিকে ইয্‌মীদ উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার প্রকল্প দুইবার বিবেচনা করা হয় (৯৯৯/১৫৯০-৯১ ও ১০৬৪/১৬৫৩)। কিন্তু কোনবারেই তাহা সেই বিবেচনার পর্যায়ে অতিক্রম করিতে পারে নাই (দ্র. সাবান্‌জা)।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের পরিবেশও খুব অনুকূল নহে। উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় অল্পই রহিয়াছে। আর পশ্চিম উপকূলে যে অনেক উপসাগর রহিয়াছে সেইগুলি কমই কাজে লাগে। কারণ নদীর মোহনাগুলি সবই নদীবাহিত পলি দ্বারা ভরাট হইয়া গিয়াছে (তু. উপরে. ২ প্রাকৃতিক ভূগোল, এগ্‌লাহ সাগরের উপকূলবর্তী আনাতুলী)। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর স্মার্না (ইযমীর দ্র.) ব্যতীত পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি গুরুত্বহীন বন্দর রহিয়াছে। যেমন ফোচা [দ্র.] (Phocaea; প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে ইহাকে স্মার্না বন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচনা করা হইত, কারণ ইহা সমুদ্রের অনেকখানি বাহিরে অবস্থিত ছিল। বোদরুম (Halicarnassus) ও ফেত্‌হিয়্যা (মাকরি) যেইগুলি কেবল উপকূলবর্তী জাহাজ চলাচলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সাম্প্রতিক কালেই বহির্বাণিজ্যের বন্দর হিসাবে স্মার্নার কিছুটা গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদিও মধ্যযুগে ফোচারও অনুরূপ গুরুত্ব ছিল। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে আনাতোলিয়ার মধ্যভাগ হইতে নদী-উপত্যকা দিয়া গমন করা যায় কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলের অল্প কয়েকটি বন্দর এমন যেইগুলিতে পৌঁছান কঠিন। উত্তর উপকূলে সিনোব (Sinope) [দ্র.] বন্দর (পার্বত্য পশ্চাদ্‌ভূমি থাকা (হেতু ইহা প্রায় দুর্গম) ও সামসুন (Amisos) [দ্র.] বন্দর কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করিয়া বিপরীত দিকে অবস্থিত ক্রিমিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য। সাম্‌সূন বন্দরটি কীযীল ঈর্‌মাক (Halys) নদী ও য়েশিল ঈরমাক (ইরিস) নদীর মোহনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া বর্তমানে সিনোব অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, এই গুরুত্ব বিশেষ করিয়া ১৯শ শতকে বেশী বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ উপকূলে আন্‌তালিয়া বন্দর [দ্র.] (Adalya, প্রাচীন কালে নাম ছিল Attaleia; ক্রুসেড যুদ্ধের কালে Satalia নামে খ্যাত) ও আলান্‌য়া [দ্র.] (আলাইয়্যা, বাইযান্টীয় আমলে নাম Galonoros, মধ্যযুগের ইউরোপীয় বণিকদের নিকট Cardelar নামে খ্যাত) মধ্যযুগ হইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে মেরসীনা বন্দরও [বর্তমান নাম মোরসীন (দ্র.)] ১৮৩২ খৃ. নির্মাণের পর হইতে গুরুত্ব লাভ করিয়া আসিতেছে। দুই মহাদেশের মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীসাধারণের অবতরণের স্থানগুলি ছিল প্রকৃতপক্ষে আনাতোলীয় উপদ্বীপের সংলগ্ন প্রান্তিক স্থানগুলি (base), যথা কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ত্রেবযোন [দ্র.] (Trebizond) ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত ওয়ান বন্দর [মধ্যযুগের আয়াস (দ্র.)] ক্রুসেড যুদ্ধের কালে Laiazzo ও উছমানী আমলে পায়াস নামে খ্যাত

বর্তমান নাম ইস্কান্দারুন বা আলেকজান্দ্রেট্টা; কারাভানসমূহ ত্রেবযোন হইতে আযারবায়জান ও পারস্যে যাইত এবং উপরিউক্ত ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরসমূহ হইতে উত্তর সিরিয়া (আলেপ্পো), মেসোপটেমিয়া (মাওসিল) ও ইরাকে (বাগদাদ) গমন করিত।

৬। অর্থনীতি

আনাতোলিয়া সব সময়ই কৃষিনির্ভর দেশ ছিল এবং মোটামুটিভাবে যথেষ্ট প্রাথমিক শিল্পায়ন সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কৃষিনির্ভরই রহিয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যস্থলে যেখানে দেশটি পশুচারণ ছাড়াও অন্যভাবে ব্যবহার উপযোগী, সেইখানে প্রধান শস্য গম, যব ইত্যাদি, আর উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ও নদীতীরবর্তী অঞ্চলে যেইখানে চাকাযুক্ত কল দ্বারা বাগানে পানি সেচ করা সম্ভব সেইসব অঞ্চলে ফলমূল ও শাকসব্জী উৎপাদিত হয়। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী জেলাগুলির ফলমূল উৎপাদনই প্রধান বৈশিষ্ট্য (আমাসিয়ার আপেল সারা দেশে বিখ্যাত এবং কেরাসূস বা বর্তমান নাম গিরেসুন সম্ভবত চেরি ফুল উৎপাদনের আদিভূমি), বহু অঞ্চলে এক জাতীয় বাদাম (hazelnuts) উৎপাদিত হয়। এজিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় (ভূমধ্যসাগরীয় কৃষিপ্রধান অঞ্চল) ডুমুর, জলপাই, তরমুজ (সাধারণ তরমুজ, খরবুজা ও কাভুন নামক মিষ্ট আর এক জাতের তরমুজ), তুঁত গাছ ও আঙ্গুর উৎপাদিত হয়। কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে (বিশেষ করিয়া সাবানজার নিকটে, পূর্বে যাহা 'কাঠ সমুদ্র', আগাচ দেনিযি নামে পরিচিত ছিল) এত প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ উৎপাদিত হইত যে, স্থানীয় গৃহ নির্মাণের কাঠ, লাকড়ি ও কাঠ কয়লার প্রয়োজন মিটাইয়াও আংশিকভাবে রাজধানীর প্রয়োজন মিটাইতে উহা সক্ষম ছিল, রাজধানীর বাদবাকী কাঠ আসিত ইউরোপীয় তুরস্ক এলাকা হইতে।

দেশের মধ্যস্থলের তৃণভূমি পশু পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এখানে বিভিন্ন জাতের ছাগল ও ভেড়া পালিত হয়, তন্মধ্যে রহিয়াছে বিখ্যাত আন্গোরা ছাগল। ইহাদের পশমের (তিফতিক, mohair) কদর বিশ্বজোড়া। আনাতোলিয়ার ঘোড়া মধ্যযুগ হইতেই সুবিখ্যাত। ফ্রাইজিয়ার আযীযিয়্যা অশ্ব পালনের প্রতিষ্ঠান উছমানী অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য অশ্ব সরবরাহ করিত। গুটিপোকার চাষ উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ার একচেটিয়া অধিকার। সেই অঞ্চলে প্রচুর তুঁতগাছের চাষ হয়। রেশম উৎপাদন ও রেশমী বস্ত্র বয়নের কেন্দ্র ব্রুসাতে অবস্থিত।

ত্রেবযোন ও এরযুরুমের মধ্যবর্তী গুমুশ-খানির ও আমাসিয়ার নিকটবর্তী গুমুশ হাজ্জির রূপার খনির উল্লেখ সর্বপ্রাচীন হিসাবে করিতেই হয়; এখানেই রূপার টাকা তৈরির টাঁকশালও অবস্থিত ছিল। তাম্র পাওয়া যাইত কুরে-তে (ইনা-বোলু ও কাসতামনুর মাঝখানে) এবং এরগানী মাদেনে (দিয়ার বাক্রের নিকটে)। এস্কিশেহিরের নিকটেই অবস্থিত পৃথিবীতে একমাত্র এলাকা যেখানে মীরশাম (meerschaum) নামক সাগরের ফেনা বলিয়া কথিত এক ধরনের অতি মিহি সাদা কাদামাটি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ধূমপানের পাইপ তৈরী হয়। ১৯শ শতকে পাইপ (লুলে) ও অনুরূপ বস্তু তৈরির জন্য ইহার বিরাট চাহিদা ছিল, কিন্তু বর্তমানে মীরশামের চল কমিয়া যাওয়াতে উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে।

চারু ও কারুশিল্প দ্রব্যাদির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল, বিশেষ করিয়া চীনা মাটির দ্রব্যাদির যথেষ্ট সমাদর ছিল; উহা সালজূক আমলেই পারস্য হইতে আনিয়া প্রচলন করা হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া কূনিয়ার দালান-কোঠাসমূহে রুম-সালজূক চীনা মাটির দ্রব্যাদির নির্মিত অতি সুদৃশ্য নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। সুলতান ১ম সালীম যখন তাঁহার পারস্য অভিযানকালে (১৫১৪ খৃ.) তাবরীয হইতে কারুশিল্পিগণকে পুনরায় তুরস্কে আনিয়া ইস্তাম্বুল ও ইযনীকে তাহাদের বসতি স্থাপন করেন, তখন হইতে উছমানী চীনা মাটির দ্রব্যাদির স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে ইয্নীক ছিল চিরায়ত উছমানী মৃৎশিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র, সেইগুলিতে প্রধান রঙ ব্যবহার করা হইত নীল ও সবুজ। এই দুইয়ের মধ্যে অতি উজ্জ্বল 'বোলুস-লাল' রঙ দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইত। ইয্নীকে নির্মিত টালি দ্বারা ইস্তাম্বুলের মসজিদসমূহ ও তুরবাসমূহকে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে, তোপকাপী সারায়ে নামক স্থানেও উহা ব্যবহার করা হইয়াছে। তৈজষপত্রের মধ্যে মৃৎশিল্পজাত বাসন (ব্যবসায়িগণের নিকট 'রোড্স প্লেট' Rhodes plates নামে পরিচিত) অতি সুপরিচিত এবং সর্বাধিক রফতানী হইয়া থাকে। পরবর্তী আমলে (সুলতান ৩য় আহমাদ-এর আমলে) ইস্তাম্বুলের তাক্ফুর সারায়তে ও কুতাহিয়াতে মৃৎশিল্প কারখানা স্থাপিত হয় (ইয্নীক এবং অন্যান্য স্থানে যে উজ্জ্বল কারুকার্যময় তুর্কী মৃৎশিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় সে বিষয়ে পাঠের জন্য দ্র. K. Otto-Dorn, Das Islamische Iznik, বার্লিন ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১০৯ ও R. Anheggerসঙ্কলিত তথ্য-গ্রন্থাদির তালিকা, ঐ, পৃ. ১৬৫ প., আরও তু. খাযাফ প্রবন্ধ)।

মৃৎশিল্প দ্রব্য ব্যতীত বয়নশিল্পজাত বস্ত্রাদিও আনাতোলিয়ার উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া গাচিলার উল্লেখ করিতে হয়। তুর্কীরা প্রাচ্য হইতে এই শিল্প নৈপুণ্য লইয়া আসে এবং উন্নয়ন সাধন করে। প্রধান কেন্দ্র ছিল 'উশাক', কুলা ও গরদেয। এই সকল কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে গালিচা তৈরী করা হইত অংশত পারস্যের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে এবং অংশত আরও জনপ্রিয় রীতিতে। ইউরোপে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত যেই গালিচা সেইগুলি ১৯শ শতকে তৈরী দীর্ঘ পশমী সুতা দিয়া ঢিলা করিয়া বোনা এবং স্মার্না গালিচা নামে পরিচিত। এইরূপ নাম হইয়াছে স্মার্না বন্দর হইতে রফতানীকৃত বলিয়া। প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি সবই তৈরী 'উশাক' অঞ্চলে। আনাতোলিয়ার রেশমশিল্পও এক সময়ে সুবিখ্যাত ছিল। এই শিল্পের কেন্দ্র ছিল ব্রুসাতে। রেশমী বস্ত্র উৎপাদনের মধ্যে, বিশেষ করিয়া প্রোকেডের মধ্যে সোনার ও রূপার সুতার বুনুনি ছিল অত্যন্ত উচ্চ স্তরের শিল্পমানের। এইগুলি প্রধানত সুলতানের প্রাসাদ ও সমাজের ধনী ও অভিজাত শ্রেণীসমূহের জন্য তৈরী করা হইত [তুর্কী বয়নশিল্প সামগ্রী বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) তাহসিন ওয, তুর্ক কুমাস' বে কাদিফেলেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬-৫১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Turkish Textiles and Velvets, আন্কারা ১৯৫০ খৃ.]। সর্বশেষে মোটা সতরঞ্জি ও মাদুর (কিলিম) নির্মাণের কথা বলিতে হয়। তুরস্কে তৈরী এইসব মোটা মাদুর জাতীয় বস্ত্র দ্বারা মসজিদের মেঝে ঢাকা হয় (আরও দ্র. বিসাত, নাসীদ্জী প্রবন্ধদ্বয়)।

শহরের ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্যবসা করিতেন। এই সংগঠনগুলি [আসনাফ, এ. ব. সিন্ফ (দ্র.)] Guild হইতে 'ভ্রাতৃত্ববন্ধনের' ন্যায় ছিল; কতকটা দরবেশগণের তারীকার ন্যায়। এইগুলি

ঐতিহ্য অনুসারে চলিত এবং সেই ঐতিহ্যের মান ও দৃঢ় সংহতি সচেতনভাবে রক্ষা করা হইত। কাহারও ব্যবসায়ে কোন দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা ঘটিলে সেই সদস্যকে অন্যেরা ভ্রাতৃসুলভ সাহায্য-সহানুভূতি দ্বারা রক্ষা করিত। সেই সময়ে স্ব স্ব ভ্রাতৃপ্রতিষ্ঠানের প্রতি যেই আনুগত্য ও ঐক্যবোধের প্রকাশ ঘটিত সেই ক্ষমতার কাছে কখনও কখনও এমনকি সরকারকে পর্যন্ত নতি স্বীকার করিতে হইত। এই ব্যবসায়ী ভ্রাতৃপ্রতিষ্ঠানগুলির তদারক করিতেন বাজার পরিদর্শক (মুহ্ তাসিব), তিনি ছিলেন কাদীর অধীন। এই সংস্থা পরিচালিত হইত শারী'আ মুতাবিক [তুর্কী ব্যবসায়ী ভ্রাতৃপ্রতিষ্ঠান বা গিল্ড বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) উছমান নূরী, মাজাল্লা-ই উমুর-ই বালাদিয়া, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯২২ খৃ., অধ্যায় আস্নাফ, পৃ. ৪৭৯-৭৬৮; (২) Tacschner, Die Zunfte in der Turkei, Leipziger Vierteljahrsschrift fur Sudosteuropa, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৭২-৮৮; এবং সিনফ প্রবন্ধ সাধারণভাবে উছমানী আমলের প্রাথমিক দিককার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. আফেত ইনান, Apercu general sur l'Histoire economique de l'Empire Turc-Ottoman, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ.]।

১৯শ শতকে যখন তানজীমাত বা রাষ্ট্রীয় সংস্কার করা হয় তখন পশ্চিম ইউরোপীয় ধারায় বাণিজ্যিক সংস্কারও সাধন করা হয়। তখন প্রাচীন গিল্ড বা ভ্রাতৃপ্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং পাশ্চাত্য আইনের বিধিবিধানও (অংশত ইউরোপীয় বাণিজ্য আইন বিধি হইতে গৃহীত) প্রয়োগ করা হইতে থাকে। অবশেষে এই গিল্ড বা সওদাগারী ভ্রাতৃসমাজগুলি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় ২৬ ফেব্রুয়ারী ,১৯১০ খৃ.। গেডিক [Gedik] বিলুপ্ত হয় ১ মার্চ, ১৯১৩ খৃ.। উহাদের স্থলে আধুনিক সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ খৃ.। সেইগুলিকে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত করিয়া গঠন করা হয়। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়, উদাহরণস্বরূপ কুনিয়ার সমভূমি অঞ্চলে বাগদাদ রেলওয়ে (১৯০৭-১৯১৩ খৃ.) কর্তৃক পানিসেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত করিয়া নূতন নূতন কৃষি ব্যবস্থা (যেমন সিলিসীয় সমভূমিতে তুলাচাষ প্রবর্তন) চালু করা হয়।

আনাতোলিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপীয় দেশসমূহের ধারায় আনিবার যেই চেষ্টা করা হয় সেই চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয় তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর হইতে [সেইজন্য দ্র. (অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে) (১) Orhan Conker ও Emile Witmeur, Redressement economique et industrialisation de la Nouvelle Turquie, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; (২) আহমাদ ওগুয, Die Wirtschaftslenkung in der Turkei, বার্লিন ১৯৪০ খৃ.; (৩) শওকাত রাশীদ, Die turkische Landwirtschaft als Grundlage der turk. Volkswirtschaft, বার্লিন-লাইপযিগ ১৯৩২ খৃ.; (৪) M. Thornburg, G. Spry, G. Soule, Turkey, An Economical Appraisal, নিউইয়র্ক ১৯৪৯ খৃ.; (৫) The Economy of Turkey, An Analysis and Recommendations of a Development Program, বাল্টিমোর ১৯৫১ খৃ.]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইদরীসী, কিতাব রুজার বা নুযহাতুল-মুশ্তাক (K. Miller, Mappae Arabicae, ৪খ., স্টুটগার্ট ১৯২৭ খৃ., প্লেট নং ৩৫, ৪৫, ৫৫; (২) Edrisii Geographia Arabice, রোম ১৫৯২, পত্র ১১৩ আর-১১৪ভি, ১৩৯ আর-১৪২আর, ১৫৩ ভি-১৫৪ভি; (৩) P. Amedee Jaubert, Geographie d'Edrisi, প্যারিস ১৮৩৬-৪০ খৃ., ২খ., ১২৯, ৩০৫, ৩১৯); (৪) ইয়াকূত, মু'জামুল-বুল্দান ও আল-কায্বীনী, আছারুল-বিলাদ. দ্র. আর্-রূম; (৫) আবুল-ফিদা, তাক্ বীমুল-বুল্দান=Geographie d' Aboulfeda, সম্পা. Reinaud ও de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.; (৬) Reinaud কৃত ফরাসী অনু., প্যারিস ১৮৪৮ খৃ., St. Guyard কর্তৃক অনুবাদ ক্রমশ কৃত, প্যারিস ১৮৮৩; (৭) ইব্‌ন বাতূতা (আরবী পাঠ, তৎসহ ফরাসী অনু., Voyages d'Ibn Batoutah, Defremery ও Saguinetti কর্তৃক অনূদিত, ২খ., প্যারিস ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ২৫৪-৩৫৪; (৮) ফরাসী অনু. ও টীকা, Defremery-কৃত Nouvelles Annales des Voyages-এ, ডিসেম্বর ১৮৫০-এপ্রিল ১৮৫১ খৃ.; (৯) ইংরাজী অনু., H. A. R. Gibb-কৃত Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa 1325-1354, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১২৩-৬৬; (১০) আল-উমারী, মাসালিকুল-আবসার=F. Taeschner, Al-'umari's Bericht uber Anatolien, লাইপযিগ ১৯২৯ খৃ.; Quatremere-কৃত অসম্পূর্ণ অনু., Notices et Extraits-এ, ১৩খ., প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., পৃ. ১৫১-৩৮৩; (১১) হাম্‌দুল্লাহ মুসতাওফী, নুয্‌হাতুল-কু'লূব, (The geographical Part of Nuzhat alqulub সম্পা., G. Le Strange, লাইডেন-লণ্ডন ১৯১৫ খৃ., ইংরাজী অনু. ১৯১৯ খৃ.; (১২) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, কেম্ব্রিজ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ১২৭-৫৮; (১৩) F. Taeschner, Ein altosmanischer Bericht uber das Vorosmanische Konstantinopel. Annali Ist. Univ., Or., Napoli-তে, N. S. I., রোম ১৯৪০ খৃ., পৃ. ১৮১-৯; (১৪) মুহাম্মাদ আশিক-এর মানাজি'রুল-আওয়ালিম (১০০৬/১৫৯৮) গ্রন্থটির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধরনের ভূগোল সাহিত্যের সমাপ্তি ঘটে। ভূগোল অংশে তিনি প্রাচীন লেখক, যথা আল-ইদরীসী, আবুল ফিদা ও অন্যদের রচনার তুর্কী অনুবাদ দ্বারা শুরু করিয়াছেন। অতঃপর যেই সকল স্থানে তিনি নিজে সফর করিয়াছেন সেইগুলির বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণগুলি গ্রন্থের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, এইগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি স্বতন্ত্র সংস্করণের উপযোগী, বিশেষ করিয়া এই কারণে, এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী গ্রন্থগুলি রচিত হয়।

উছমানী লেখকগণের রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে যেইগুলি অদ্যাবধি টিকিয়া আছে সেইগুলি উপরিউক্ত যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা তথ্যবহুল; (১৫) পীরী রাঈস, কিতাব-ই বাহরিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ., ৭৪৬ প., হইতে শুরু করিয়া facsimile সংস্করণ; (১৬) কাতিব চেলেবি (অপর নাম হ'াজ্জী খলীফা), জিহাননুমা, ইহার দুইটি সঠিক সংস্করণ

রহিয়াছে (দ্র. Taeschner, Zur Geschichte des Djihannuma, MSOS, ১৯২৬ খৃ., ২খ., ৯৯-১১১; (১৭) ঐ লেখক, Das Hauptwerk der geograpischen Literatur der Osmanen, Katib Celebis Gihannuma, Imago Mundi1935. পৃ. ৪৪-৭)। প্রথমোক্তটি শুধু অসমাপ্ত খণ্ডাংশরূপে টিকিয়া আছে, পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে ভিয়েনাতে রক্ষিত Mxt. ৩৮৯ (ক্যাটালগ Flugel, ২খ., নং ১২৮২) হইতেছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডু.। কেননা এইখানিই সম্ভবত সেই বিখ্যাত পণ্ডিতের স্বহস্তে লিখিত মূল কপি; (১৮) আবূ বাক্‌র ইব্‌ন বাহরাম আদ্-দিমাশ্‌কী (মৃ. ১১০২/১৬৯১) কাতিব চেলেবির অসম্পূর্ণ কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং আনাতোলিয়ার একখানি বর্ণনামূলক বিবরণ রচনা করেন। উহার একখানি পাণ্ডু. লন্ডনে রহিয়াছে (বৃটিশ লাইব্রেরী নং ওরিয়েন্টাল ১০৩৮); (১৯) ইব্‌রাহীম মুতাফার্‌রিকা জিহাননুমা ছাপান (১০ মুহার্‌রাম, ১১৪৫/২৩ জুলাই, ১৭২৩); ইহার একখানি ত্রুটিযুক্ত ল্যাটিন অনুবাদ করেন Matth. Norberg, Gihan Numa, Geographia Orientalis, ২খণ্ডে, Lund 1818, ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন Armain, Description de l'Asie Mineure, Louis Vivien de Saint Martin-এ Histoire des decouvertes geographiques, ৩খ., প্যারিস ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ৬৩৭)। এইখানিতে তিনি কাতিব চেলেবির অসম্পূর্ণ অংশটি আবূ বাক্‌র-এর গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ করেন (পৃ. ৪২২ প., Norberg, ১খ., ৬১৮)। এই গ্রন্থখানি ছিল তুর্কী মুদ্রণের প্রাথমিক পর্যায়ের এবং ইহা এশিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ সম্বলিত। তবে আনাতোলিয়ার মধ্যে Norberg, (১খ., ৫৮৯প.) শুধু ওয়ান ইয়ালাতের অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে কাতিব চেলেবির লেখা, বাদবাকী সবই, যথা কারস (সংযোজিত পৃ. ৪০৭), এরযেরুম (পৃ. ৪২২), ত্রেব্‌যোন (পৃ. ৪৯২), দিয়ারবাক্‌র (পৃ. ৪৩৬); এখানে হইতে Norberg-এর অনুবাদ শুরু, ২খ.) সিলিসিয়া (আইচেল পৃ. ৬১০), কারামান (পৃ. ৬১৪), সিবাস (পৃ. ৬২২) ও আনাদোলূ (পৃ.৬৩১), এই ইয়ালাতসমূহের বিবরণ আবূ বাক্‌রের লেখা।

উছমানী আমলের আনাতোলিয়া সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিবরণ পাওয়া যায় পর্যটকগণের বর্ণনা হইতে, তুর্কী ও আরবী উভয় ভাষায়; (২০) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত নামাহ্, ৪খ., অতি দুর্বল সম্পাদনা, ইস্তাম্বুল হি. ১৩১৪-১৬, ৭খ., ও ৮খ., কিঞ্চিৎ ভাল, ১৯২৮ খৃ., ৯খ., ও ১০খ., (ল্যাটিন হরফে) ১৯৩৫ খৃ. ও ১৯৩৮ খৃ.; (২১) প্রথম দুই খণ্ড বিনষ্ট পাণ্ডুলিপি হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন Joseph von Hammer, Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa, লন্ডন ১৮৩৪ খৃ., ১৮৪৬ খৃ. ও ১৮৫০ খৃ.। ইহাতে শুধু মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির যে অংশে আনাতোলিয়ার বর্ণনা রহিয়াছে (২খ.-৫খ.) সেইটুকু একত্রে অনুবাদ করিয়াছেন Taeschner, Das Anatolische Wegenetz nach osmanischen Quellen, ১খ., লাইপযিগ ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৩৭-৩৯, ৪৪। তদুপরি যাত্রিগণের ভ্রমণ নির্দেশিকার বইও রহিয়াছে, যেমন (২২) মুহাম্মাদ আদীব-এর লিখিত গ্রন্থ ১১৯৩/১৭৭৯ (ইস্তাম্বুল মুদ্রিত ১২৩২/১৮১৭, ফরাসীতে অনু. Bianchi, Itineraire de Constantinople a la Macque, প্যারিস ১৮২৫ খৃ., এইখানিতে ভুলক্রমে রচনাকাল দেখান হইয়াছে ১০৯৩/১৬৮২, তু. Taeschner, Wegenetz, ১খ., ৮২)।

উপরিউক্ত প্রাচ্য দেশীয় পর্যটকগণের বিবরণাদির পরিপূরক হিসাবে ইউরোপীয় পর্যটকগণের ভ্রমণ কাহিনী ও বিবরণাদি গণ্য করা যায় (প্রাচীন বিবরণগুলি তালিকাভুক্ত করিয়াছেন : (২৩) L. Vivien de Saint-Martin, তাহার Histoire des decouvertes Geographiques অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; (২৪) Selcuk Trak, Turkiyeye ait cografi eserler genel bibliografyasi, ১খ., আন্‌কারা ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৩০-৯।

তুরস্কের দলীলপত্র সংরক্ষণাগার হইতে বিপুল তথ্যসম্পদ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু সেইগুলি অবলম্বনে গবেষণা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে; (২৫) (উমার লুত্ফী বারকান, Turkiyede Imperatorluk devirlerinin Nufus ve arazi tahrirleri ve Hakana Mahsus defterler, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ., ও XV ve XVI inci asirlarda Osmanli Imperatorlugunda Xrat ekonominin Hukuki ve mali esaslari, Kanunlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.)।

আর রহিয়াছে (২৬) সরকারী বর্ষপঞ্জী বা হ্যান্ডবুকসমূহ (দাওলাত-ই আলিয়্যা-ই উছমানিয়্যা সাল-নামেসি), এইগুলি ১২৬৩/১৮৪৭ সাল হইতে ১৩৩৪ মালিয়্যা/১৯১৮ পর্যন্ত ৬৮ বৎসরের পাওয়া যায় এবং উছমানী সাম্রাজ্যের শেষ আমলের তথ্য উৎসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিলায়াতের সাল নামাহ ব্যবহার করা যাইতে পারে (সেই সময়কার সাম্রাজ্যের ও প্রদেশসমূহের সালনামাহ্ এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য তথ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া); (২৭) V. Cuinet রচনা করিয়াছেন La Turquie d'Asie, প্যারিস ১/২, ১৮৯২ খৃ. ৩/৪, ১৮৯৪ খৃ.)। তুর্কী প্রজাতন্ত্রের আমলে অনুরূপ একটি সিরিজ প্রকাশনা শুরু হইয়াছিলঃ (২৮) Turkiye Djumhuriyeti Dewlet Sal-namesi, কিন্তু এই পর্যন্ত উহার মাত্র ৫খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (১খ., ১৯২৬ খৃ., ২খ., ১৯২৭ খৃ., ৩খ., ১৯২৮ খৃ., ৪খ., ১৯২৯ খৃ., ৫খ., ১৯৩০ খৃ.)। কিন্তু পূর্বেকার উছমানী আমলের সালনামাতে যেইরূপ তথ্য ও উপকরণাদি থাকিত এইগুলিতে আর তাহা পাওয়া যায় না।

অবশেষে বিভিন্ন স্থানের নামের তালিকা একেবারে আধুনিক আমলের তথ্য-উৎসরূপে কাজে আসিতে পারে, যেমন (২৯) Son teskilat-i mulkiyede Koylerimizin adlari, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ.; (৩০) Idare Taksimati, ১৯৪২ খৃ., ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ.; (৩১) Turkiye' de Meskun Yerler Kilavuzu, ২খণ্ডে, আন্‌কারা ১৯৪৬ খৃ. ও ১৯৫০ খৃ.। ইহা হইতে বর্তমান তুরস্ক ও আনাতোলিয়ার জনসংখ্যার পরিক্রম লওয়া হইয়াছে; (৩২) Encyclopedia Americana, 1985, ed. Grolier Inc., Connecticut., U.S.A.; art, Turkey.
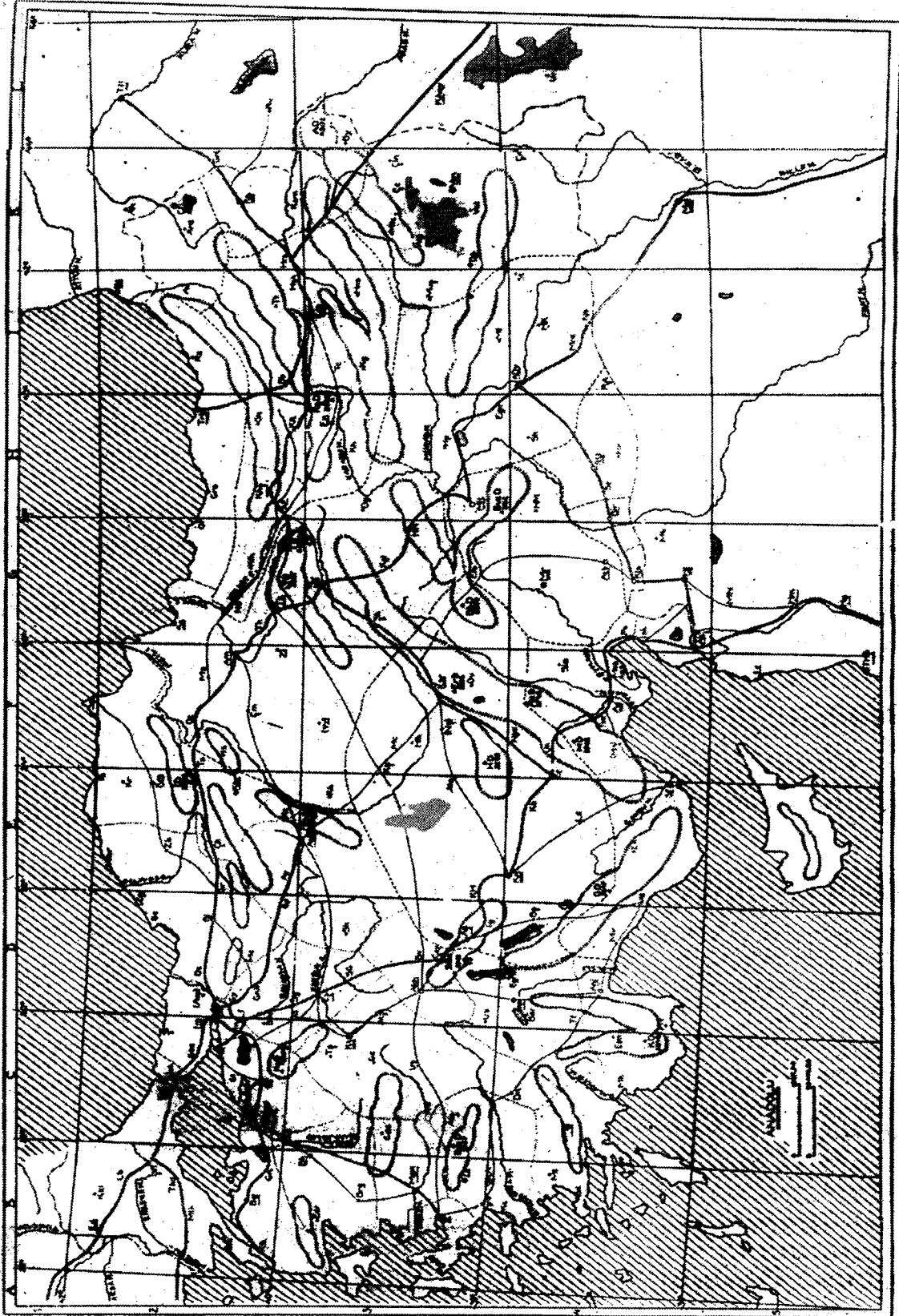
আনাদোলূ ঃ মানচিত্র

১৭শ শতকের আনাতোলিয়ার মানচিত্রের নির্দেশিকা

এই মানচিত্রখানির ভিত্তি হইতেছে H. Louis কর্তৃক ১৯৩৮ খৃ. কৃত Bevolkerungskarte der Turkei, ১ ঃ ৪০,০০,০০০। নামগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে প্রধানত কাতিব চেলেবির জিহাননুমা হইতে, সেই কারণেই ইহাতে ১৭শ শতকের তুরস্কের যে অবস্থা ছিল তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। মানচিত্রখানিতে ইয়ালাতগুলির মোটামুটি সীমানা (বর্তমান তুরস্কের সীমার মধ্যে) ভাঙা লাল রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইয়ালাতের অন্তর্গত লিওয়া বা সান্জাকের সীমানা দেখান হইয়াছে লাল ফোঁটাযুক্ত রেখা দ্বারা। কাতিব চেলেবি, আওলিয়া চেলেবি ও অন্যগণ কর্তৃক নির্দেশিত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ অর্থাৎ প্রধান প্রধান যোগাযোগের পথকে পাশাপাশি দুইটি লাল রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে; অন্যান্য সড়ককে দেখান হইয়াছে একটিমাত্র লাল রেখা দ্বারা। শহরগুলির নাম (লাল রঙ দ্বারা) ও পর্বতশৃঙ্গসমূহের নাম (কাল রঙে, উচ্চতা মিটারে দেখান হইয়াছে) সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে এবং নিম্নের তালিকাটি হইতে উক্ত সংক্ষেপিত রূপ ও উহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; প্রথমে জিহাননুমা ও ১৭শ শতকের অন্যান্য তথ্য উৎস অনুযায়ী নামগুলি লেখা হইয়াছে, অতঃপর বন্ধনীতে সুপ্রাচীনকালের বা বায়যান্টীয় নাম (যদি জ্ঞাত থাকিয়া থাকে), বর্তমান নাম (যদি প্রাচীন নাম হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে), প্রশাসনিক জেলা (শহরগুলি বাদে, এইগুলি পরবর্তী কালে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে এবং সেই কারণে প্রাচীন তথ্য-উৎসে উহাদের নাম দেখা যায় না; মানচিত্রে এইগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইয়াছে) এবং সর্বশেষ মানচিত্র যে ক্ষেত্রসমূহে বিভক্ত সেইগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইয়ালাতসমূহের রাজধানীর নাম ছোট আকারে ক্যাপিটাল অক্ষরে (small capitals) দেখান হইয়াছে, লিওয়াসমূহের রাজধানী দেখান হইয়াছে বাঁকা অক্ষরে। সাধারণ সংক্ষেপিত রূপসমূহ অর্থাৎ ব্যবহৃত শব্দসমূহের সঙ্কেত-অক্ষর ঃ B.=বুয়ুক; C.= চে, চাই; D.=দাগ, দাগী; E.=ইয়ালাত; G.= গোল, গোলু; I.=ইরমাক; L=লিওয়া; N=নাহির, নাহরি। বস্তুনিষ্ঠ করিবার জন্য ভাষান্তরের বেলায় আধুনিক তুর্কী উচ্চারণকে ভিত্তি করা হইয়াছে, সাবেক উচ্চারণও দেখান হইয়াছে ঃ

AD = আগরী দাগী (আরারাত ঃ (L 3)
Ad = আদানা (ইয়ালাত আদানা ঃ E 4)
Adc = আদিলসিভাষ (E. Van ঃ K 3)
(Adp) = আদাপাযার (D 2)
A Dy = আমিদ/দিয়ারবাক্র (দিয়ারবাকীর; E. দিয়ারবাক্র ঃ L 4)
A E = আকসেহির, (Enderes ঃ লিওয়া কারা হিসার-ই-সারকি ঃ H 2)
Ah = আহিস্কা (K 2)
Ahl = আহ্লাত (ইয়ালাত ওয়ান ঃ K 3)
Ak = আনতাকিয়া (Antiocheia; লিওয়া আনতাকিয়া ঃ G 4)
Akh = আফয়োন কারা হিসারী (লিওয়া কারা হিসার-ই-সাহিব; D 3)
Aks = আকসারাই (ইয়ালাত কারামান ঃ E 3)
Al = আলায়া (আলাঈয়া, আলানিয়া, Kalonoros; লিওয়া ইচেল ঃ E 4)
Ala D = আলা দাগ (F 4)
Als = আলাসহর (Philadelphia, লিওয়া আয়দীন ঃ C 3)
Am = আমাসিয়া (Amaseia; ইয়ালাত সিভাস ঃ F 2)
Amr = আমাসরা (Amastris; লিওয়া বোলু ঃ E 2)
Ank = আনকারা (Ankyra, Angora; লিওয়া আন্কারা ঃ E 3)
Anl = আনতালিয়া (Attaleia, আদালিয়া ঃ লিওয়া টাক্কা Tekke ঃ D 4)
Ard = আরদাহান (ইয়ালাত কীলদীর; K 2)
As = আয়াস (ইয়ালাত আদানা ঃ F 4)
As = আকসহর, আকসেহির (Philomelion; ইয়ালাত কারামান ঃ D 3)
Atb = আয়নতাব (Gaziantep; ইয়ালত মারআস ঃ G 4)
Ats = আলতীনতাস (লিওয়া জারমিয়ান ঃ D 3)
Av = আর্টভিন বা আরতবিন (ইয়ালাত চীলদীর ঃ 1 2)
Ay = আয়াস (লিওয়া আনকারা ঃ E 2)
Ays = আয়াসোলুক (Ephesos, Hagios, Theologos, সেলচুক; লিওয়া আয়দীন ঃ B 4)
Bb = বায়বুর্ত (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ 1 2)
Bb D = বিনবোগা দাগী (G 3)
Bd = বোডরুম, বোদরুম, (Halikarnassos; লিওয়া মানতাসা, মেনতেসে ঃ B 4)
Bdr = বুরদুর (লিওয়া হামিদ ঃ D 4)
Be = বন্দ আগলি, বেনদেরেগ্লি (Heraclea Pontica, Eregli, সানজাক বোলু ঃ D 2)
Bg = বিগা (লিওয়া বিগা ঃ B 2)
Bir = বিরে (Birecik ঃ লিওয়া বিরে ঃ H 4)
Bk = বালিকেসরি (Balikesir; লিওয়া কারাসী ঃ B 3)
Bl = বোলু (লিওয়া বোলু ঃ D 2)
Blk = বিলেসিক, বিলাসিক (লিওয়া সুলতান উয়ুগি ঃ C 2)
Boz D = বোয দাগী (Tmolos ঃ C 3)
Bp = বেপাযার (লিওয়া আনকারা ঃ D 2)
Br = বুরসা (Prusa, Brussa; লিওয়া হুদাবন্দিগার; C 2)
Brg = বার্গামা, বেরগামা (Pergamon; লিওয়া কারাসী ঃ B 3)
Bs = বিতলিস (ইয়ালাত ওয়ান ঃ K 3)
Bs = বেসহর, বেসেহির (ইয়ালাত কারামান ঃ D 4)
Bt = বাতুম; (I 2)
Buz D = বুয দাগী (H 3)
Bv = বোলভাদীন (লিওয়া কারাহিসার-ই-সাহিব ঃ D 3)
By = বায়াযীদ (Dogu Bayazit; ইয়ালাত কারস ঃ L 3)
Cav = চেব (লিওয়া কারাহিসার-ই-সাহিব ঃ D 3)

Ck = চারকাস, চেরকেস (লিওয়া কানকীরী ঃ E 2)
CL = চিলদীর (ইয়ালাত চিলদীর ঃ K 2)
Cln = চালদীরান (ইয়ালাত ওয়ান ঃ K 3)
Cm = চোরুম (ইয়ালাত সিভাস ঃ F 2)
Cmk = চোলেমারিক (ইয়ালাত ওয়ান ঃ K 4)
Crl = চোরলু (Tzurullo ঃ B 2)
Dg = দিবরিগি (Tephrike; ইয়ালাত সিভাস ঃ H 3)
Dn = দেনিযলি (লিওয়া জারমিয়ান ঃ C 4)
Dv = দেবিলি-কারাহিসার (Develi; ইয়ালাত কারামান ঃ F 3)
Dz = ডোযচে, দুযচে (লিওয়া বোলু ঃ D 2)
Ec = এরচিস বা ইরচিস (ইয়ালাত ওয়ান ঃ K 3)
Ed = এদীরনে (Adrianopolis ঃ B 3)
Edr = এদরামিত বা এড্রামিট (লিওয়া কারাসী ঃ B 3)
Egn = এরগানি, আরগানি (ইয়ালাত দিয়ারবাকর ঃ H 3)
Egr = আগিরদির (লিওয়া হামিদ ঃ D 4)
Ek = আরমানাক, আরমেনিক (লিওয়া ইচেলী ঃ E 4)
Elb = এলবিস্তান (ইয়ালাত মারআস ঃ G 4)
El D = এলমালী দাগী ঃ (E 3)
Elm = এলমালী (লিওয়া টাক্কা বা টেককে ঃ C 4)
Em = এরযেরুম (এরযান আর-রুম, Erzurum ঃ ইয়ালাত এরযেরুম ঃ I 3)
En = আরযিনকান (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ H 3)
Er = আরাগলি, এরাগলি (Herakleia; ইয়ালাত কারামান ঃ F 4)
Er D = আরসিয়াস দাগী; (Argaios ঃ F 3)
Es = আসকিসহর বা এসকিসাহির (লিওয়া সুলতান উযুগি ঃ D 3)
Fc = ফোচা (Phokaia; লিওয়া সারুহান ঃ B 3)
Fn = ফিনিকি বা ফিনিকে (লিওয়া টাক্কা বা টেককে ঃ D 4)
Gbz = গেগ্‌বুযা বা গেগ্‌বুযে (Dakibyza, Gebze ঃ লিওয়া কোকায়েলি ঃ C 2)
GD = গায়িক দাগী (E 4)
Gds = গরদেয (লিওয়া সারুহান ঃ C 3)
Gh = গুমশানি বা গুমুশানে (Gumusane; ইয়ালাত এরযেরুম ঃ H 2)
Gh A = গুযেলহিসার-আয়দীন (আয়দীন; লিওয়া আয়দীন ঃ B 4)
Gk = গুলেক কালেসি (ইয়ালাত আদানা ঃ F 2)
Gl = গেমলিক (লিওয়া হুদাবান্দিগার ঃ C 2
Glb = গালিবোলু বা গেলিবোলু (Gallipoli, Kalliopolis : B 2)
Gn = গোনেন (লিওয়া বিগা ঃ B 2)
Gnk = গোয়নুক (লিওয়া সুলতান উযুগি ঃ D 2)
Gr = গারাদা বা গেরেদে (লিওয়া বোলু ঃ E 2)
Grs = গিরেসুন (Kerasus; ইয়ালাত ত্রাবযোন ঃ H 2)
Gru = গুমরু (Alexandropol, Leninakan ঃ K 2)
Gy = গেইবি বা গেইবে (লিওয়া সুলতান উযুগি ঃ D 2)
Gz = গাদিয বা গেদিয (লিওয়া জারমিয়ান ঃ C 3)
HB = হাসি বেকতাস (ইয়ালাত কারামান ঃ F 3)
HD = হাসান দাগী (F 3)
HH = হকিম হানী (ইয়ালাত সিভাস ঃ F 3)
HK = হিসন কিফ (হিসন কায়ফা, হাসানকায়ফ; ইয়ালাত দিয়ারবাকর ঃ I 4)
HK = হারসেক (লিওয়া হুদাবান্দিগার ঃ C 2)
HL = হালাব (আলেপ্পো ঃ G 4)
HM = হিসন-ই মানসূর (হুসনু মন্‌সুর, Adiyaman, ইয়ালাত মারাআস ঃ H 4)
HM = হামা (G 4)
Hns = হীনীস (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ I 3)
Hoy = হোয় (L 5)
Hp = হারপুত (Hartbirt, Elazig; ইয়ালাত দিয়ারবাকর ঃ H 3)
Hr = হাররান (Karrhai; ইয়ালাত রাক্কা ঃ H 4)
Hrs = হোরাসান (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ K 2)
Hs = হিম্‌স (এমেসা, হোমস ঃ G 5)
Hsk = হাসানকালি (Pasinler; ইয়ালাত এরযেরুম ঃ I 2)
Ib = ইনেবোলু (লিওয়া কাসতামোনু ঃ E 2)
ID = ইলগায দাগী (E 2)
Ig = ইলগুন (ইয়ালাত কারামান ঃ D 3)
Im = ইযনিকোমিদ (Nikomedeia, ইযমিত; লিওয়া Kocaeli ঃ C 2)
In = ইযনীক (Nikaia; লিওয়া Kocaeli ঃ C 2)
Io = ইনোনু (লিওয়া সুলতান উযুগি ঃ D 3)
Ir = ইযমির (স্মার্না; লিওয়া সুগলা ঃ B 3)
Is = ইসকেলিব (ইয়ালাত সিভাস ঃ F 2)
Isk = ইসকান্দারুন (Alexandreia, Alexandretta; লিওয়া আনতাকিয়া ঃ G 4)
Isp = ইসপার্টা (লিওয়া হামিদ ঃ D 4)
Ka = কুস আদাসী (Scala nuova; লিওয়া আয়দীন ঃ B 4)
Kb = কারাবুনার (Karapinar; ইয়ালাত কারামান ঃ E 4)
Kc = কালেসিক (লিওয়া কানকীরী ঃ E 2)
KD = কোহ দাগী (C 4)
Kg = কীগী (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ I 3)
Kgl = কানগাল (ইয়ালাত সিভাস ঃ G 3)
KH = কাদীন হানী (ইয়ালাত কারামান ঃ E 3)
Kh = কেমাহ (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ H 3)
Khs = কারাহিসার ই-সারকি ঃ (Sabin Karahisar; লিওয়া কারাহিসার ই-সারকি ঃ H 2)

Kk = কেসকিন (ইয়ালাত সিভাস ঃ E 3)
Kkl = কিরককিলিযি (Kirklareli : B 2)
Kkr = কানকীরী (চানকীরী; লিওয়া কানগীরী ঃ E 2)
Kl = কুলা (লিওয়া জারমিয়ান ঃ C 3)
Klh = কোয়লুহিসার (লিওয়া কারাহিসার-ই-সারকি ঃ G 2)
Kls = কিলিস (লিওয়া কিলিস ঃ G 4)
Klt = কালকিত বা কেল্‌কিট (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ H 2)
Km = কাস্‌তামোনু (লিওয়া কাস্‌তামোনু ঃ E 2)
Kmt = কিরমাস্‌তি (লিওয়া হুদাবান্দিগার ঃ C 2)
KN = কুনিয়া (Ikonion; ইয়ালাত কারামান ঃ E 4)
Kr = কুরে (লিওয়া কাসতামোনু ঃ E 2)
KS = কালএ-ই-সুলতানিয়া (চানক কালেসি; লিওয়া বিগা ঃ B 2)
Ks = কার্‌স (ইয়ালাত কার্‌স ঃ K 2)
Ksr = কায়সারিয়া (কায়সেরিয়া, কায়সারি, ইয়ালাত কারামান ঃ F 3)
Kst = কোস্‌তান্‌তিনিয়া (Konstentinopolis, ইস্তাম্বুল ঃ C 2)
Ks = কীরসহর বা কীরসেহির (ইয়ালাত কারামান ঃ F 3)
Ks D = কাসিস দাগী (উলুদাগ, Olympus of Bithynia : C 2)
Ks D = কাসিস দাগী (H 3)
Kt = কুতাহিয়া (Kotyaion; ইয়ালাত আনাদোলু, লিওয়া জারমিয়ান ঃ C 3)
541.0 = কাগীয্‌মান (ইয়ালাত কার্‌স ঃ K 2)
Lb = লুলেবুরগায (B 2)
Ld = লারান্‌দা (কারামান; ইয়ালাত কারামান ঃ E 4)
Lf = লেফকা লেফকে (Leukai, ওস্‌মানেলি, লিওয়া সুলতান উয়ুগি ঃ C 2)
Lt = লাতাকিয়া (Laodikeia ঃ G 5)
Mb = মেম্‌বিচ (G 4)
Mc = মুকুর (ইয়ালাত কারমান ঃ F 3)
Md = মাদ্‌দাসিয দাগী, মেদেদসিথ দাগী ঃ f 4)
Md = মুদুর্‌নু (লিওয়া বোলু ঃ D 4)
Mdn = মুদানিয়া (লিওয়া হুদাবান্দিগার ঃ C 2)
Mf = মেয়াফারিকীন (Silvan; ইয়ালাত দিয়ারবাকর ঃ I 3)
Mg = মুগ্‌লা (লিওয়া মানতাসা বা মেনতেসে ঃ C 4)
Mgn = মাগ্‌নিসা (Magnesia, Manisa; লিওয়া সারুহন ঃ B 2)
Mhc = মিহালিচ (Karacabey; লিওয়া হুদাবান্দিগার ঃ C 2)
Mk = মাক্‌রি (Fethiye; লিওয়া মানতাসা ঃ C 4)
Ml = মিলাস (লিওয়া মানতাসা ঃ B 4)
Mlk = মালকারা (B 2)
Mlt = মালাতিয়া (Melitene; ইয়ালিত মার'আস ঃ H 3)

MN = মা'আররাতুন-নুমান (G 5)
MR = মারআস (মারাস; ইয়ালাত মার'আস ঃ G 4)
Mrd = মারদিন (ইয়ালাত দিয়ারবাক্‌র ঃ I 4)
(Ms) = মার্‌সিন (F 4)
MsL = মোসুল (K 4)
Mss = মিসিস (Mopsuestia; ইয়ালাত আদানা ঃ (F 4)
Mus = মুস্‌ (ইয়ালাত ওয়ান ঃ I 3)
Mv = মানাব্‌গাত (লিওয়া ইচেল ঃ D 4)
Mz = মারযিফুন (ইয়ালাত সিভাস ঃ F 2)
Nb = নুসায়বীন (Nisibis; ইয়ালাত দিয়ারযাকর ঃ I 4)
Ngd = নিগদে (ইয়ালাত কারামান ঃ (F 4)
Ns = নিকসার (Neokaisareia; লিওয়া কারাহিসার ই-সারকি ঃ G 2)
Nv = নব্‌সহর বা নেবসেহির (F 3)
Oc = ওস্‌মান্‌সিক (ইয়ালাত সিভাস ঃ F 2)
Or = ওরদু (ইয়ালাত ত্রাবযোন ঃ G 2)
Ps = পায়াস (Baiai; ইয়ালাত আদানা ঃ G 4)
Ra = রা'সুল-আয়ন (ইয়ালাত রাক্কা ঃ I 4)
RU = রোহা/উর্‌ফা (এডেসা; ইয়ালাত রাক্কা ঃ H 4)
Rv = রেবান বা রেভান (এরিভান ঃ L 2)
Rz = রিযে (ইয়ালাত ত্রাবযোন ঃ I 2)
Sb = সাবাংকা (Sapanca ঃ লিওয়া Kocaeli; D 2)
Sc = সুরুচ (ইয়ালাত রাক্কা ঃ H 4)
SD = সুলতান দাগী (D 3)
Sf = সেলেফ্‌কা (Seleukeia; Silifke; লিওয়া ইচেল ঃ E 4)
SG = সায়দি গাযী (Nakoleia; লিওয়া সুলতান উয়ুগি ঃ D 3)
Sg = সোগোত (লিওয়া সুলতান ঃ উয়ুগি D 3)
Sh = সিব্‌রিহিসার (লিওয়া আন্‌কারা ঃ D 3)
Sis = সিস (ইয়ালাত আদানা ঃ F 4)
Sk = সিবারেক (ইয়ালাত দিয়ার বাক্‌র ঃ H 4)
Sp = সিনোপ (লিওয়া কাসতামোনু ঃ F 1)
Ss = সাম্‌সুন (Amisos; ইয়ালাত সিভাস ঃ G 2)
Ssl = সুসীগীরলীগী (Susurluk; লিওয়া কারাসী ঃ C 3)
St = সিইরত (siirt; ইয়ালাত; লিওয়া কাবাসী ঃ C 3)
Sv = সিভাস (Sebasteia; ইয়ালাত সিভাস ঃ G 3)
Sk = সারকীস্‌লা (ইয়াল্যাত সিভাস ঃ F 3)
Sl = সিলে (লিওয়া Kocaeli : C 2)
Tc = তারকাম বা টার্‌কান (মামাহাতুন; ইয়ালাত এরয়েরুম ঃ I 3)
TD = তাকেলি দাগী (G 2)
Td = তাদমুর (Palmyra : H 5)
Tf = তাফেনি (লিওয়া হামিদ ঃ D 4)

TrL = তিফ্‌লিস (L 2)
Th = তুর্‌হাল (ইয়ালাত সিভাস ঃ G 2)
Tk = তোকাট (ইয়ালাত সিভাস ঃ G 2)
Tkd = তাকির্‌দাগ বা তেকির্‌দাগ (Rhaidestos, Rodosto : B 2)
Tr = টায়ার (লিওয়া আয়দীন ঃ B 3)
Trs = ত্রাবযোন (Trapezus; ইয়ালাত ত্রাবযোন ঃ H 2)
Trb = তারাবুলুস-ই-সাম (Tripolis : G 5)
Ts = তোস্যা (লিওয়া কানকীরী ঃ F 2)
Tss = তারসুস (Tarsos; ইয়ালাত আদানা ঃ F 4)
Ts = তাব্‌সানলী (লিওয়া জারমিয়ান ঃ C 3)
Tt = তোর্‌তুম (ইয়ালাত এরযেরুম ঃ I 2)
Tv = তাতভান (ইয়ালাত ওয়ান ঃ K 3)
Ub = উলুবুর্‌লু (লিওয়া হামিদ ঃ D 3)
Uk = উলুকীসলা (ইয়ালাত কারামান ঃ (F 4)
Ur = উরমিয়্যা (L 4)
Us = উসাক (লিওয়া জারমিয়ান ঃ C 3)
Usk = উসকোদার (Skutari : C 2)
Vst = বোস্তান বা ভোস্তান (ইয়ালাত ওয়ান : K 3)
YD = য়ীলদীয দাগী (G 2)
Ys = য়ানিসহর বা য়ানিসাহির (লিওয়া হুদাবান্দিগার ঃ C)
Yv = ইয়ালেভাচ (লিওয়া হামিদ ঃ D 3)
(Yz) = য়োয্‌গাট (F 3)
Zb = যাফ্‌রানবোলু (লিওয়া কাসতামোনু ঃ E 2)
Zg = যঙ্গোলদাক (L 2)
Zl = যিলা বা যিলে (ইয়ালাত সিভাস ঃ F 2)
Zr = যারা (ইয়ালাত সিভাস ঃ G 3)

F. Taeschner (E. I.[2]) / হুমায়ুন খান

আনাদোলু (انادولو) ঃ (২), ১৫শ ও ১৮শ শতক কালের মধ্যে এই নাম দ্বারা তুরস্কের একটি ইয়ালাতকে (প্রদেশ) বুঝাইত, সেই প্রদেশটি বর্তমান আনাতোলিয়ার পশ্চিম অর্ধাংশ (পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্র.) এবং প্রধানত পশ্চিম আনাতোলিয়ার তুর্কী রাজ্যসমূহ লইয়া গঠিত ছিল। প্রথম দিকে রাজধানী ছিল আনকারা, বেগলারবেগ (গভর্নর)-এর দফতরও ছিল সেইখানে, পরে উহা কুতাহিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। আনাদোলু ইয়ালাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নলিখিত লিওয়া বা সান্‌জাক বা সামরিক জিলাগুলি, যেইগুলি অংশত স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল (কাতিব চেলেবি তাঁহার জিহাননুমাতে যে ক্রম অনুসারে সানজাকগুলি দেখাইয়াছেন এখানেও সেইভাবেই দেওয়া হইল) ঃ (১) জারমিয়ান, রাজধানী বা সদর দফতর কুতাহিয়া; (২) সারুখান, রাজধানী মাগনিসা (বর্তমান নাম মানিসা); (৩) আয়দীন, রাজধানী টায়ার; (৪) মানতাসা বা মেনতেসে, রাজধানী মুগলা; (৫) টাক্কা বা টেককে, রাজধানী আন্‌তালিয়া; (৬) হামীদ, রাজধানী ইসবার্টা; (৭) কারাহিসার-ই সাহিব, রাজধানীর একই নাম (পরে রাজধানী আফয়ুন কারা হিসার); (৮) সুলতান উয়ূগি (অনেক সময় ইহার বিকৃত উচ্চারণ করা হয় সুলতান উনি), রাজধানী আসকি শহর বা এসকিশেহির, (৯) আনকারা, রাজধানী একই নামীয় (ইহাকে এনগুরিও বলা হয়); (১০) কানকীরী, রাজধানী একই নামীয় (বর্তমান নাম চানকীরী); (১১) কাস্‌তামোনি, রাজধানী একই নামীয় (বর্তমান নাম উচ্চারণ কাস্‌তামোনু); (১২) বোলী, রাজধানী একই নামীয় (বর্তমানে বোলু); (১৩) খুদাওয়ান্‌দিগার, রাজধানী ব্রুসা (বুরসা); (১৪) কোজাএলি, রাজধানী ইয্‌নিকোমীদ পরে ইযমিদ, ইয্‌মিত। এতদ্ব্যতীত কাপুদান পাশার অধীন নিম্নলিখিত সানজাকগুলি ছিলঃ (১) কারাসী, রাজধানী বালিকাসরি; (২) বীগা, রাজধানী একই নামীয় এবং ক'ল'এ-ই সুলতানিয়্যা (বা চানাক ক'ল'এসি); (৩) সুগ্‌লা, রাজধানী ইয্‌মির। (উল্লিখিত জিলাগুলির প্রতিটির জন্য সেই নামের প্রবন্ধ দ্র.)।

তুরস্কের এশিয়া অংশে যখন আনাদোলু ব্যতীত অন্যান্য ইয়ালাত গঠন করা হয়, তখন সাম্রাজ্যের সমগ্র এশীয় অর্ধাংশের প্রতি আনাদোলু কথাটি লঘুভাবে প্রয়োগ করা হয়। যেমন সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশের সর্বোচ্চ বিচারপতি রুমেলিয়ার 'সামরিক বিচারপতি' (কাদী 'আস্‌কার, উচ্চারণ করা হইত কাযাস্‌কার) থাকা সত্ত্বেও এশীয় অংশের জন্য অনুরূপ আর একটি পদ ছিল। শেষোক্ত পদাধিকারী যিনি হইতেন তাঁহাকে পাদিশাহ-এর এশিয়াতে সামরিক অভিযানগুলিতে যাইবার সময়ে সঙ্গে যাইতে হইত। রুমেলিয়াতে নিযুক্ত 'হিসাবরক্ষক' (দফতরদার) অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আনাতোলিয়ার জন্য অনুরূপ একটি পদ ছিল, যদিও প্রথমোক্ত পদের তুলনায় শেষোক্তটি ছিল নিতান্তই নামমাত্র ধরনের।

৭ জুমাদা, ১২৮১/৫ নভেম্বর, ১৮৬৪ তারিখের বিলায়াত বিষয়ক আইনবলে বিশাল আনাদোলু ইয়ালাতকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং খুদাওয়ান্দিগার, আয়দীন, আনকারা ও কাসতামোনী সানজাকগুলিকে বিলায়েতের মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং বাদবাকী সানজাকগুলিকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাতিব চেলেবি, জিহাননুমা, ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২ খৃ., ৬৩০ প.; আরও বরাতের জন্য পূর্ববর্তী প্রবন্ধ আনাদোলু দ্র.।

F. Taeschner (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আনানিয়্যা (عانانية) ঃ আনান ইব্‌ন দাঊদ (আনু. ৭৬০ খৃ.)-এর বিশ্বস্ত অনুসারীদের সংগঠিত একটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তবে ভুলক্রমে তাঁহাকে কারাইট (Karaite) মতাদর্শে পুষ্প ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যে সমস্ত ধর্মীয় সংগঠন অষ্টম-নবম শতাব্দীতে রাব্বানী বা পুরোহিততন্ত্রী ইয়াহূদীবাদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাঁহার অনুসারী সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। ইহা প্রতীয়মান হয়, মুসলিম বিদ্বানগণ আনান ও তাঁহার সম্প্রদায় সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য কারাইট, বিশেষ করিয়া কিরকিসানী উৎস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা তাঁহার পরিবেশিত তথ্যাবলীর একটি ক্ষুদ্র অংশই ব্যবহার করিয়াছেন। 'আল-বাদউ ওয়া'ত-তারীখ' গ্রন্থের রচয়িতা আনানকে এক ধরনের মু'তাযিলা হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি ঐশী একত্ববাদ ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী এবং নরত্বারোপবাদ (Anthropomorphism) প্রত্যাখ্যান করেন। ইব্‌ন হ'যম বর্ণিত আনানিয়্যা সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে

কারাইট সম্প্রদায়। আল-বীরূনী বর্ষপঞ্জী সম্পর্কে তাহাদের অভিনব মতবাদ অনুধাবন করিতে আগ্রহী ছিলেন। আশ-শাহরাসতানী সংক্ষেপে তাহাদের বর্ষপঞ্জী ও খাদ্যদ্রব্যের উপর আরোপিত নিষেধের উল্লেখ করা ছাড়াও 'ঈসা (আ) সম্পর্কে তাহাদের অনুকূল মনোভাবের উপর মন্তব্য করিয়াছেন। পরবর্তী মুসলিম উৎসসমূহ উক্ত বিষয়ের উপর কোন নূতন তথ্য যুক্ত করে নাই। কোন মুসলিম গ্রন্থকার খলীফা মানসূরের কারাগারে আনান ও ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-এর মধ্যে কথিত সাক্ষাতকারের কথা উল্লেখ করেন নাই। কারাইট ও হ'নাফী সম্প্রদায় কি'য়াস (দ্র.)-কে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচনা করা সত্ত্বেও ইহা বলা সমীচীন হইবে না যে, হ'নাফী মতবাদ কারাইট মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ ইয়া'কূ'ব আল-কিরকিসানী, আল-আনওয়ার ওয়াল মারাকি'ব, সম্পা. L. Nemoy, New York 1939-45, নির্ঘণ্ট, দ্র. Anan and Ananites; (২) Le Livre de la Creation et de l'Histoire, সম্পা. ও অনু. Cl. Huart, iv, Paris 1907, পাঠ ৩৪-৬, অনু. ৩২-৫; (৩) ইব্ন হ'াযম, ফিস'াল, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ., ৯৯ (১৩৪৭, ৮২); (৪) আল-বীরূনী, আছ'ার, The Chronology of Ancient Nations, সম্পা. ও অনু. E. Sachau, পাঠ ৫৮-৯, তু. ২৮৪, অনু., ৬৮-৯, তু. ২৭৮; (৫) আশ-শাহরাস্তানী, মিলাল, সম্পা. Cureton, ১৬৭-৬৮; সম্পা. M. Badran, ৫০৩-৫। কারাইবাদের উৎপত্তি ও আনান সম্পর্কিত সমস্যাদির উপর সাম্প্রতিক কালের বক্তব্য Leon Nemoy-এর প্রবন্ধসমূহে স্থান পাইয়াছে ঃ (৬) Anan ben David. A re-appraisal of the historical data, Semitic Studies in Memory of Immanuel Low, Budapest 1947, 239-48; (৭) ঐ লেখক, Yivo-Bleter, 1949, 95-112; (৮) JQR, 1950, 307-15; প্রয়োজনীয় প্রাচীনতর গ্রন্থপঞ্জী সেই প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

G. Vajda (E.I.[2]) /এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

আনাপা (Anapa) ঃ কুবান মোহনার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪০ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী বুগুর নদীর তীরে অবস্থিত একটি অবলুপ্ত দুর্গ। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে সুলতান ১ম 'আবদুল-হ'ামীদের আদেশে ফরাসী প্রকৌশলিগণ কর্তৃক দুর্গটি নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৮৭ ও ১৭৯০ খৃস্টাব্দে উহার উপর রুশ আক্রমণ বিফল হইলেও ১৭৯১ খৃস্টাব্দে জেনারেল গুদোভিচ (Gudovich) কর্তৃক উহা বিধ্বস্ত হয়। ইয়াসী (Yassy) চুক্তি (১৭৯১ খৃ.) অনুসারে উহা তুরস্ককে ফেরত দেওয়া হয়। ১৮০৮ খৃস্টাব্দে রুশগণ উহা দখল করে, কিন্তু ১৮১২ খৃস্টাব্দে পুনরায় উহা তুরস্ককে ছাড়িয়া দেয়। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে এ্যাডমিরাল গ্রীগ (Greig) ও প্রিন্স মেনশিকভ (Menshikov) উক্ত দুর্গ অবরোধ করেন; ১৮২৯ খৃস্টাব্দের আদ্রিয়ানোপল চুক্তি অনুসারে (ধারা নম্বর ৪) রুশকে উহার কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। ১৮৪৬ সালে আনাপাতে একটি শহর নির্মিত হয়। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় রুশগণ কর্তৃক উহা বিধ্বস্ত হয়; ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে তাহারা উহা পুনরাধিকার করে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে আনাপার অধিবাসিগণ তেমরুকে স্থানান্তরিত হয়। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আনাপা শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য সমুদ্র সৈকত ও বিশ্রাম স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ খৃস্টাব্দে শত্রুপক্ষের আক্রমণে উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু পুনর্নির্মাণের ফলে বর্তমানে উহা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Novistsky, Anapa, Zap. Kavk. Otd. Imp. Geogr. Obs., 1853, ii, 14-43; (২) P.P. Semenov. Geogr. Slovar Ross. imperii, i, 96; (৩) রুশ ও সোভিয়েত বিশ্বকোষসমূহ।

V. Minorsky (E.I.[2]) / এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

আনামা (عنمة) ঃ (রা) একজন সাহাবী, জুহায়না গোত্রভুক্ত বলিয়া তাঁহাকে জুহানী বলা হইয়া থাকে। ভিন্নমতে তিনি মুযায়না গোত্রভুক্ত, এইজন্য তাঁহাকে মুযানীও বলা হয়। ত'াবারানী রাফে' ইব্‌ন খালিদ-এর সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৪০, নং ৬০৮২।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আনামূর (أنامور) ঃ আনাতোলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে উহার ৩৬.৬ উত্তর অক্ষ রেখা ও ৩২.১৫ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার উপর অবস্থিত একটি ছোট শহর ও পোতাশ্রয়। ১৯৪৫ সনের হিসাব মুতাবিক ২,৭৩৪ লোকসংখ্যার এই ছোট শহরটি ইচেল প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলার (কাদা) সদর দফতর (১৯৪৫ সালে উক্ত জেলার লোকসংখ্যা ছিল ২৩,৭২৫)। আনাতোলিয়ার সর্বদক্ষিণ প্রান্তের আনামূর বুরনু অন্তরীপ হইতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট নদীর মোহনায় সমতলভূমিতে শহরটি অবস্থিত। মধ্যযুগে নাবিকদের দিকনির্দেশক পুস্তকে ইহাকে স্টালিমুরী (Stallimuri), স্টালেমুরা (Stalemura) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। উপকূলীয় অঞ্চলের নিম্নভূমিতে ও আনামূর বুরনুর ঢালু প্রান্তরে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং প্রাথমিক কালের খৃস্টান শহর আনেমূরিয়াম (Anemurium) বা আনেমোরিয়াম (Anemo- rium)-এর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া আছে। সাগর তীরের সন্নিকটে আনামূর সমতল ভূমির পূর্ব প্রান্তে মামূরিয়্যা ক'ালা'আসি নামে একটি সুরক্ষিত মধ্যযুগীয় দুর্গ অবস্থিত। 'উছমানী শাসকগণ কর্তৃক উহা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ৮৭৪/১৪৬৯-৭০ সনে একটি শিলালিপিতে এই তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, ২খ., ৮১ প.; (২) W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von kleinasien im Mittelalter, Vienna ১৮৯১ খৃ., পৃ. ৫৯।

F. Taeschner (E.I.[2]) / এ .কে. এম. ইয়াকুব আলী

'আনাযা (عنزة) ঃ একটি অতি প্রাচীন কিন্তু অদ্যাপি বিদ্যমান আরব গোত্র। প্রাচীন বংশতালিকা পদ্ধতি 'আনাযা ইব্ন রাবী'আ (Wustenfeld, Tab. A 6) সম্প্রতি একইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে যেমন হইয়াছে অন্যান্য গোত্রের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর হিজাযে বানূ-'আতিয়্যা, বাকর ও তাগ'লিব-এর পূর্বপুরুষ ওয়াইল তাহাদের গোত্রীয় পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য। অতি সাম্প্রতিক বংশতালিকায় কুরায়শ-এর স্থান ওয়াইল-এর অগ্রে। রাবী'আ গোত্রসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত হউক বা না হউক, (বংশ তালিকাসমূহের নিহিতার্থ অনুসারে) তাহারা তাহাদের বাসভূমি ইয়ামামাতে প্রতিবেশীমূলক ও অন্যান্য বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত ছিল। 'আনাযা গোত্র ওয়াদী নিসাহ-এর দক্ষিণে অবস্থিত তুওয়ায়কে বসবাস করিতেছিল। সেখানে হাদ্দার নাম স্থানে তাহাদের অবশিষ্ট এক ক্ষুদ্র বংশ বানূ ইয়যান অদ্যাপি বসবাস করিতেছে। আল-আফলাজে তাহাদের যে সকল বংশধর বাস করিত তাহারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাইফ-এর দক্ষিণে 'আনাযা গ্রামসমূহ ১২০০ খৃষ্টাব্দের দিকে মহামারীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কুওয়ায়ত ও বাহরায়নের শাসকগোষ্ঠী বানূ উতবা/উতূবও হাদ্দার হইতে আগত।

বাক্র গোত্রের কিছু সংখ্যক দেশত্যাগী লোকদের সহিত 'আনাযা গোত্র ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং তাহাদের ন্যায় সেখানে বসবাস করিতে থাকে। বসরার দক্ষিণ অংশে বসবাসকারী কায়স ইবন ছা'লাবার মিত্র হিসাবে তাহারা পূর্ব-আরবীয় বিদ্রোহে (রিদ্দা) অংশগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা ও পূর্ব স্থানে থাকিয়া যাওয়া 'আনাযাগণ কখন ও কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তাহা জানা যায় না। কথিত আছে, তাহারা পূর্বে সু'আয়র/সা'ঈর দেবতার ও রাবী'আ গোত্রের সহিত মুহ'র্‌রিক দেবতার উপাসনা করিত। মুহ'র্‌রিক-এর মূর্তি ছিল হীরার দক্ষিণস্থ সালমানে (ইয়াকূ'ত, বুল্‌দান, ৩খ., ১২১)।

কিছু সংখ্যক 'আনাযা কূফায় বসতি স্থাপন করে। অন্যেরা শায়বান (বাক্র)-এর একটি দলের সহিত মাওসি'ল অঞ্চলে চলিয়া যায়। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত সেখানে তাহাদের বসতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান কালের 'আনাযার পূর্বপুরুষগণ দ্বাদশ শতাব্দীতে খায়বারের হ'ার্‌রাতে বাস করিতেছিল বলিয়া জানা যায়। তাহারা কখন এইখানে আসিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। তাহারা সম্ভবত তুওয়ায়ক হইতে অথবা 'আয়নুত-তাম্‌র ও আল্‌-আম্বার-এর মধ্যবর্তী এলাকা হইতে এখানে আসিয়াছিল (ইব্‌ন খাল্‌দূন-এর Hist. des berberes, ১খ., ১৪ হইতে ইব্‌ন সা'ঈদ-এর উদ্ধৃতি)। এই নূতন দেশত্যাগ নিশ্চিতভাবে পূর্ব আরবীয় কারমাতী আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিল যাহা বেদুঈন আরবের চেহারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে তাহারা পূর্বে আল-কাসীম পর্যন্ত এবং উত্তরে আল-উলার পূর্বদিক জাফ্‌র 'আনাযা (ওয়াকি'সা?) পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তী কালে তাহারা সেই মরূদ্যানটি ও মাদাঈন সালিহ দখল করে। বর্তমানে যে গোত্রীয় বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সেই ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে সনাক্ত করা যায়। জেলাস গোত্র (রুওয়ালা) সামিরা হইতে হানাকিয়া হইয়া মদীনা হইতে হ'ার্‌রা (খায়বার)-এর দক্ষিণে, আসবা'আ গোত্র ওয়াদীর-রুমা-তে আল-কাসীম পর্যন্ত, 'আমারাত গোত্র শাম্মার পর্বতে এবং পূর্ব 'আরবে বিচরণ করে। ফাদ'আন গোত্র সম্ভবত হ'ার্‌রা-র উত্তরে চলিয়া যায়, সেখানে বর্তমানে ওয়াল্‌দ সুলায়মান গোত্র রহিয়াছে, তাহারা ফাদ'আন গোত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ওয়াল্‌দ 'আলী গোত্রের বাস খায়বারের পশ্চিমে ছিল এবং তাহাদের নিকট-আত্মীয় আল-আহ্‌সানা গোত্রও খুব সম্ভব সেইখানেই বাস করিত।

'আনাযা গোত্রের নূতন অভিবাসন ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শুরু হয়। ইহার প্রাথমিক পর্যায় এক শতাব্দী কাল অপেক্ষা বেশী সময় যাবৎ স্থায়ী ছিল। সিরিয়াতে জেলাস (রুওয়ালা) গোত্রের আগমনের সহিত ইহা শেষ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মা'আন-এ এবং ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ফুরাতের অববাহিকায় তাহাদের অবস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। এই অভিবাসন ইহার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। কারণ সিরীয় মরুভূমির উত্তরে অবস্থিত মাওয়ালীর আমীরদের ক্ষমতা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে হ্রাস পাইতেছিল এবং গাযিয়্যা গোত্র কারবালার পশ্চাদ্‌ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ফোরাত এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতে অভিবাসনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে এবং ইহা হইয়াছিল ওয়াহ্‌হাবীদের জন্য। 'আনাযাদের কতক তাহাদের পক্ষে ছিল ('আমারাত) এবং তাহাদের কর আদায়কারীদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 'আনাযাদের ইতিহাসে তুর্কী কর্তৃপক্ষের সহিত এবং হাইলের শাম্মার আমীরদের রাশীদ পরিবারের সহিত তাহাদের সম্পর্কই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুওয়ালা ও শা'লান নামক তাহাদের উত্তরাধিকারী শায়খগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (জোফ্‌ মরূদ্যান ১৯০৯ হইতে ১৯২২ খৃ. পর্যন্ত শা'লানের অধিকারে ছিল)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাগদাদের পতনের পর 'আমারাত ইংরেজদের সহিত যোগ দেয় (১১ মার্চ, ১৯১৭)। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রুওয়ালা মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দেয় নাই। তাহাদের শায়খ আন-নূরী ইব্‌ন শা'লান বৃটিশ ও 'আরব সৈন্যবাহিনীসহ ১৯১৮ সালের অক্টোবরে দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন। যুদ্ধোত্তর সংকটের কালে 'আনাযাগণ প্রায়ই পক্ষ পরিবর্তন করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে 'আনাযা গোত্র সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্সজর্ডান ও সৌদী 'আরবের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ফাদ্'আন, আস্‌বা'আ ও রুওয়ালা গোত্রগুলিকে সিরীয় বলিয়া গণ্য করা হয়, 'আমারাত গোত্রকে (কেবল নাজদে স্থায়ীভাবে বসবাসকারিগণ ব্যতীত) ইরাকী নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়, যদিও অভিবাসনকালে তাহারা মাঝে মাঝে এই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

'আনাযার মধ্যে সর্বদাই দুইটি পরস্পর বিরোধী দল ছিলঃ দানা মুসলিম গোত্র (আহ্‌সানা, ওয়ালদ 'আলী, জেলাস/ রুওয়ালা) ও বিশর (ফাদ্'আন, আস্‌বাআ ও আমারাত)। এই পুরাতন শত্রুতার অগ্নিশিখা যাহা মধ্যে মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইত, তাহা শেষবারের মত নির্বাপিত হয় ১৯২৯ সালে ফরাসীগণ কর্তৃক শাম্মার, বিশেষত উত্তর দিকে 'আনাযাদের অগ্রসর হওয়ার সময় হইতে এবং সাফা ও হাওরান-এর অধিবাসিগণ, বিশেষত দ্রুযগণ, 'আনাযাদের বংশানুক্রমিক শত্রু। এই কারণেই সকল দ্রুয বিদ্রোহের সময় 'আনাযা গোত্র সরকারের পক্ষে থাকিত।

'আনাযার আধুনিক চারণভূমিসমূহ নিম্নরূপ ঃ ফাদ'আন গ্রীষ্মকালে আলেপ্পো ও হামা-র পূর্ব অঞ্চল, বিশেষ করিয়া ফুরাত নদীর পূর্বদিকে; শীতকালে সিরিয়ার মরুভূমি (আল-বিশরী, আল-কাআরা ও সময় সময় আর- রওদা পর্যন্ত, আসবা'আ গ্রীষ্মকালে হামাত এবং পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে শীতকালে সিরিয়া-ইরাকের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সিরিয়ার মরুভূমিতে। আমারাত গ্রীষ্মকালে জাযীরা, খাবূর-এর দক্ষিণ-পূর্ব সিরীয় মরুভূমি (আল-উদ্য়ান)। আহ্‌সান-গ্রীষ্মকালে হিম্‌স্-এর পূর্বদিক; শীতকালে সিরিয়া-ইরাক সীমান্তের নিকটবর্তী সিরিয়ার মরুভূমি। ওয়ালদ আলী-গ্রীষ্মকালে দামিশ্‌কের উত্তর-পূর্ব দিক ও হাওরান সমভূমি; শীতকালে সিরীয় মরুভূমির কেন্দ্রীয় অঞ্চল জোফ ও তায়মা পর্যন্ত উহাদের যে অংশ আরবে রহিয়া গিয়াছিল। ফুকারা ও ওয়ালদ আলীর (উভয়েই দানা মুসলিম), তাহাদের তাঁবু থাকিত আল-উওয়ায়রিদ-এর হ'ররা ও খায়বারের হ'ররা-এর মধ্যখানে; ওয়ালদ সুলায়মান (বিশ্‌র) খায়বারের হার্‌রা ও নুফূদের দক্ষিণ সীমান্তের বেদা নাছীল পর্যন্ত (হাইলের দক্ষিণ-পশ্চিমে) স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অভিপ্রায়ান করিত। এইখানে বিংশ শতাব্দীর ২০ দশকের দিকে ইখ্‌ওয়ানের একটি "হু'জরা বসতি" পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর আনাযাগণ উট পালক। আহ্‌সানা ও ওয়াল্‌দ আলীর প্রধান পেশা হইতেছে মেষ পালন (১৯০০ খৃ. হইতে)। ১৯২০ সাল হইতে ফাদ'আন ও রুওয়ালা গোত্র ক্রমবর্ধমান হারে এই পেশা গ্রহণ করে। আহ্‌সানা ওয়াল্‌দ আলী ও সাম্প্রতিক কালে আস্‌বা'আ গোত্র কিছু কালের জন্য চাষাবাদ করিত। পূর্ববর্তী যুগে খায়বারের ফসলের কিছু অংশের উপর 'আনাযাদের অধিকার ছিল। উছমানী আমলে সুর্‌রা-র উপর 'আনাযাদের অধিকার ছিল। সুর্‌রা হইল ঐ এলাকায় হজ্জযাত্রীদের কাফেলা রক্ষা করিবার জন্য দেয় শুল্ক। ইহা না দেওয়া হইলে অথবা আংশিকভাবে দেওয়া হইলে হাজ্জীদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া তাহারা নিজেদের পাওনা আদায় করিয়া লইত (দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৭০০, ১৭০৩, ১৭৫৭ খৃ.)। আয়ের আর একটি উৎস ছিল কাফেলা হইতে আদায়কৃত তোলা এবং স্থায়ী বাশিন্দাদের নিকট হইতে সংগৃহীত খুওওয়াঃ (নিরাপত্তা শুল্ক)। অধিকতর সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহ, যাহাদের মধ্য হইতে শায়খ নিযুক্ত হইতেন, তাহাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূসম্পত্তি থাকিত। এইগুলির কতক অংশ সুলতান আবদুল হামীদের দান। জাযীরাতে ইহার কিছু অংশে চাষাবাদ করা হয়; এই চাষাবাদ মার্কিন পদ্ধতি অনুসরণে শহরবাসীদের সহিত অংশীদারী ভিত্তিতে করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Max Freiherr von Oppenheinmi, E. Braunlich ও W. Caskel-এর সহযোগিতায়, Die Beduinen, i, Leipzig ১৯৩৯, ৬২-১৩০, ৩০৫, (মাওয়ালী); (২) ঐ লেখক, ২খ., Leipzig ১৯৪৩, ৩৪২-৫১; (৩) ঐ লেখক, ৩খ., (W. Caskel কর্তৃক সংকলিত ও সম্পা.), Wiesbaden ১৯৫২, ৩৫১, ৪১২ (গাযিয়্যা), পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ; (৪) A. Musil, The Leanners and customs of the Rwala Bedouins, New York ১৯২৫; (৫) আহমাদ, ওয়াস্‌ফী যাকারিয়্যা,.আশাইরুশ্‌ শাম, দামিশ্‌ক ১৯৪৫-৪৭; (৬) আব্বাস আয্‌-যাবী, তারীখুল-ইরাক বায়না ইহ্‌তিলালায়ন, বাগদাদ ১৯৩৫-৪৯, নির্ঘন্ট, দ্র. আনাযা; (৭) Ashkenazi, The Anazah Tribes, South-Western Journal of Anthropology, New Mexico ১৯৪৮, ২২২-৩৯ [আরও দ্র. রুওয়ালা]।

E. Graf (E.I.[2]) /পারসা বেগম

'আনাযা (عنزة) ঃ ইহা একটি নীতিদীর্ঘ বর্শা অথবা যষ্ঠি (লিসান, ৭খ., ২৫১), সাধারণত হার্‌বা (حربة) শব্দের সমার্থক। মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'আনাযা প্রথম ব্যবহৃত হয় ২/৬২৪ সনে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স) যখন ঈদুল-ফিত্‌র-এর সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহ (মুসাল্লা-দ্র.)-এর দিকে যাইতেছিলেন,তখন তাঁহার অগ্রে চলিয়াছিলেন বিলাল (রা) যাঁহার হাতে ছিল একটি বর্শা [কথিত আছে, এই বর্শাটি যুবায়র (রা) তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং যুবায়র (রা) ইহা নাজাশীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। জামা'আতের সময় বর্শাটির অগ্রভাগ মাটিতে হযরত (স)-এর তথা ইমামের সম্মুখভাগে পুঁতিয়া দেয়া হইয়াছিল এবং ইহা সুতরা (দ্র.)-এর কাজ করিয়াছিল। ঈদুল-আদ্‌হাতেও একই রূপ একটি বর্শা বা যষ্ঠি ইমামের সামনে পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে এই বর্শা বা যষ্ঠি বহন করিবার রীতি প্রাথমিক যুগের খলীফাদের দ্বারা পালিত হয় এবং প্রসার লাভ করে। জুমু'আর দিন মিম্বারে উঠিবার সময় হাতে যষ্ঠি ধারণ করা বা যষ্ঠি (কাদীব), তরবারি বা ধনুকের উপর ভর দিয়া মিম্বারে উঠা তখনকার ইমামদের রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। এই সকলই 'আনাযার প্রতীকস্বরূপ। 'আনাযা মূলগতভাবে কর্তৃত্বের প্রতীক (তু. মার্‌দুকের বর্শা)। প্রাচীন আরবদের মধ্যে যষ্ঠি ও মিম্বার ছিল বিচারক ও বাগ্মীর বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত।

আল্‌-মাগ্‌'রিব-এ শব্দটি স্থাপত্য শিল্পের একটি শব্দ হিসাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে; সেখানে ইহা মসজিদের অংগনে সালাতে রত ব্যক্তিদেরের জন্য নির্মিত বাহিরের মিহ্‌'রাব-এর অর্থ প্রকাশ করে। [দ্র. কিরতাস (Tornberg), ৩০, ৩১, ৩২, ৩৭, (উৎকীর্ণ লিপি ৫২৪ হি.; তু. RCIA নং ৩০৩১); E. Pauty, in Hesp., ১৯২৩, ৫১৫-৬।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, ১খ, ১০৭, ১৩৫-৬, ২৪১; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৩/১খ., ১৬৭; (৩) সাম্‌হূদী, বূলাক ১২৮৫ হি., ১৮৭= অনু. Wustenfeld, ১২৭-৮; (৪) Wensinck, Handbook, দ্র. Sutra; (৫) ঐ লেখক, Mohammed en de Joden te Medina, ১৪১ প.; (৬) Juynboll, Handbuch, ৮৪, ৮৭-৮; (৭) Schwarzlose, Waffen der alten Araber, Leipzig 1886, ২১২ প.; (৮) G. C. Miles, Mihrab and 'anazah, Archaeologica orientalia in memoriam Ernst Herzfeld, N. Y. 1952, ১৫৬-৭১ (early iconographical representation, Fullreferences)।

G. C. Miles (E.I.[2]) /পারসা বেগম

আনাস ইব্‌ন আওস (انس بن اوس) ঃ ইব্‌ন আওস (রা) ইব্‌ন আতীক একজন সাহাবী, আওস গোত্রভুক্ত আনসার। বদ্‌র যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন; খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ-এর

নিক্ষেপিত তীরের আঘাতে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, 'খন্দক' যুদ্ধে যে ছয় ব্যক্তি শহীদ হন, আনাস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আতীক ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, ১খ., ১২২-২৩; (২) ইব্‌ন হাজার আল-আস্‌কালানী, আল-ইসাবা ফী তাম্‌য়ীযিস্‌-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৬৮ নং ২৬৪।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আনাস ইব্‌ন 'আব্বাস (انس بن عباس) ঃ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন 'আমির (রা) তিনি বনূ সুলায়ম গোত্রের নেতা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি স্বীয় গোত্রের সাত শত লোকের বিরাট দলসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খালীফা উমার (রা)-এর শাসনামলে তিনি কাদিসিয়্যা ও ইয়ার্‌মূক-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দামিশ্‌ক বিজয়ে তাঁহার অবদান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, ১খ., (২) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল-গাবা, ১খ., ১২৪।

মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

আনাস ইব্‌ন আরক'াম (انس بن ارقم) ঃ (রা) ইব্‌ন যায়দ আনসারী খাযরাজী একজন সাহাবী; হিজরী তৃতীয় সালে উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাঁহার শহীদ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, আল-আয্‌হার, কায়রো, তা. বি., ৩০, ৫৯; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা ফী মা'রিফাতিস্‌-সাহাবা, ১খ., ১২১; (৩) ইব্‌ন হাজার আল্‌-আসকালানী, আল্‌-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্‌-সাহাবা, মিসর ১৩২৮হি., ১খ., ৬৮, নং ২৬২।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আনাস ইব্‌ন ক'ায়স (انس بن قيس) ঃ (রা) ইবনিল মুন্‌তাফিক আল-উকায়লী, তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁহার গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের সহিত মহানবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবা; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা।

মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

আনাস ইব্‌ন জু'হায়র (انس بن ظهير) ঃ (রা) উসায়দ ইব্‌ন জু'হায়র-এর ভ্রাতা; তিনি ও তাঁহার পিতা জুহায়র উভয়ই সাহাবী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছ'াবিত তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য মহানবীর খিদমতে হাযির হন। তিনি তাঁহাকে অল্প বয়স্ক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন। পরে যখন জানা গেল, তিনি তীর চালনায় পারদর্শী তখন মহানবী (স) তাঁহাকে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, ১খ., ৭০; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, ১খ., ১৪০।

সৈয়দ লুৎফল হক

আনাস ইব্‌ন দ'াবী' (أنس بن ضبيع) ঃ (রা) অথবা দ'াব' ইব্‌ন 'আমের আল-হারিছী। তিনি ছিলেন উবায়দ আস্‌-সাহ্‌হাম ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন দাব'-এর পিতৃব্য। আবূ আমর ও আবূ মূসা-র মতে তিনি উহুদ-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ১২৪; (২) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৭০, নং ২৬৯; (৩) ইব্‌ন আব্‌দিলবারর, আল-ইস্‌তীআব উক্ত ইসাবার প্রান্তদেশে, পৃ.৭৩; (৪) আয'-য'াহাবী, তাজ্‌রীদ আস্‌মাইস্‌-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩০, নং ২৬৪।

সৈয়দ লুৎফুল হক

আনাস ইব্‌ন ফুদ'ালা ইব্‌ন 'আদী (انس بن فضالة بن عدى) ঃ আল্‌-আন্‌সারী আজ-জাফারী (রা), একজন আন্‌সা'রী সাহাবী। তাঁহার পিতা ফুদালাও সাহাবী ছিলেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ ও পৌত্র ইয়ুনুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ উভয়ই তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত আছে, তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ-এর জন্মের দুই সপ্তাহ পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের এলাকায় গমন করেন। তখন নবজাত শিশুর নাম মহানবী (স)-এর নামে নামকরণ করার জন্য নির্দেশ দেন, কিন্তু তাঁহার ডাকনাম (কুন্‌য়া) ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। মহানবী (স) শিশুর মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। ফলে বৃদ্ধাবস্থায় চুল-দাড়ি পাকিয়া যাওয়ার পরও যে যে স্থানে মহানবী (স)-এর হাত স্পর্শ করিয়াছিল সেসব স্থানের চুল আদৌ সাদা হয় নাই। উহুদ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে শত্রুপক্ষ কুরায়শ দলের উহুদ পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করার খবর যখন মহানবী (স)-এর নিকট পৌঁছিয়াছিল তখন মহানবী (স) তাঁহাকে তাঁহার এক ভাইসহ গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে শত্রু সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ গোপনে অবস্থান করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করিয়া মহানবী (স)-এর নিকট পৌঁছান। অতঃপর তিনি উহুদের যুদ্ধে নিজে যোগদান করিয়া শহীদ হন। যুদ্ধশেষে শিশু-পুত্র মুহাম্মাদকে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত করা হইলে তিনি পিতৃহারা ইয়াতীম বাচ্চাটিকে একটি খেজুরের বাগান দান করেন এবং উহার বিক্রি ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা।

মোঃ ইয়াকুব শরীফ

আনাস ইব্‌ন মালিক (انس بن مالك) ঃ আল্‌-কা'বী আল-কু'শায়রী (রা) একজন সাহাবী। আবূ উমায়্যা, আবূ উমায়মা, আবার আবূ উমামা—তাঁহার এই তিন উপনামের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বসরায় বসবাস করিতেন। তিনি নিম্নের হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূল কারীম (স)-এর অশ্বারোহী দল আমাদের আক্রমণ করে এবং আমাদের সম্পদ

লইয়া যায়। তখন আমি রাসূল কারীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বসিয়া পড় এবং আমার সহিত আহার কর।" আমি আরয করিলাম, "আমি রোযা রাখিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাসূল কারীম (স) বলিলেন, "তুমি বসিয়া পড়; আমি তোমাকে স'লাত ও স'াওম সম্পর্কে কিছু কথা বলিব। আল্লাহ্ তা'আলা প্রবাসী, স্তন্য দানকারিণী ও অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকদের হইতে কতক স'লাত ও স'াওম রহিত করিয়া দিয়াছেন"। আনাস বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাসূল কারীম (স) সালাত ও সাওম উভয়েরই অথবা একটির কথা বলিয়াছিলেন (তাহা আমার স্মরণ নাই)। তিনি আরও দুঃখ করিয়া বলেন, "আমার জন্য ইহা বড় পরিতাপের বিষয়, আমি রাসূল কারীম (স)-এর সহিত পানাহার করি নাই"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ১খ., ১৭৮; (২) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৭২, সংখ্যা ২৭৮; (৩) শায়খ ওয়ালিয়্যুদ-দীন আল-খাতীব, আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল (আসাহহুল-মাতাবি, করাচী), পৃ. ৪৬৫।

এ.আর.এম. আলী হায়দার

আনাস ইব্ন মুআয (انس بن معاذ) ঃ (রা) ইব্ন কায়স ইব্ন উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন 'আম্র ইব্ন মালিক ইব্নুন-নাজ্জার আল-খায্রাজী আল-আন্সারী, মদীনার অধিবাসী একজন সাহাবী। তাঁহার নাম সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কাহারও মতে তাঁহার নাম আনাস, কাহারও মতে উনায়স।

তিনি হযরত রাসূল কারীম (স)-এর সহিত বদ্র, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিন্নমতে তিনি কেবল বদ্র যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বি'র মা'উনাতে শহীদ হন, ভিন্নমতে উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ১খ., ১৩১; (২) ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী, আল-ইস'াবা, ১খ., ৭৪, সংখ্যা ২৮২।

এ. আর. এম. আলী হায়দার

আনাস ইব্ন মুদ্রিক (انس بن مدرك) ঃ ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আম্র ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আওফ আল-খাছ'আমী আল-আক্লূবী (রা) একজন সাবাহী। তাঁহার উপনাম (কুন্য়া) আবূ সুফ্য়ান। তিনি কবি ছিলেন এবং জাহিলী যুগে তাঁহার নিজ গোত্র খাছ'আমের নেতা হিসাবে বরিত হইতেন। আনাস ইব্ন মুদ্রিক জাহিলী যুগে খ্যাতনামা ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে বসরাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে বসরা হইতে দুই ফারসাখ দূরে দাফন করা হয়। কুতন ইব্ন মুদ্রিক আল-কিলাবী তাঁহার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। ১৫৪ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ১খ., ১২৯; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ৭৩।

এ. আর. এম. আলী হায়দার

আনাস ইব্ন যানীম (أنس بن زنيم) ঃ আল-কিনানী (রা); আবদান আল-মারওয়াযী ও ইব্ন শাহীন তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আম্র ইব্ন সালিম আল-খুযাঈ ৪০ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হন এবং কুরায়শ গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূল কারীম (স)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের বক্তব্য শেষ হইলে উপস্থিত লোকেরা বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস ইব্ন যানীম আদ্-দীলী আপনার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছে। ইহা শ্রবণ করত রাসূল কারীম (স) আনাস-এর রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করিলেন। যখন সে এই সম্বন্ধে অবগত হইল তখন মক্কা বিজয় দিবসে নবী কারীম (স)-এর খিদমতে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাঁহার প্রশংসায় একটি কবিতা পাঠ করিল যাহার একটি শ্লোক হইল ঃ

فاعلم رسول الله أنك مدركى – وأن وعيدا منك
كالاخذ باليد

"জানিয়া রাখুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে নিশ্চয়ই পাকড়াও করিতে পারিবেন এবং আপনার ভীতি প্রদর্শন হস্ত দ্বারা পাকড়াওয়ের সমতুল্য"।

এই সময় নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া আদ্-দীলী আনাসকে ক্ষমা করার জন্য নবী কারীম (স)-এর নিকট সুপারিশ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করার সর্বোপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি। আমাদের মধ্যে কে এমন ব্যক্তি আছে যে আপনাকে কষ্ট দেয় নাই এবং আপনার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে নাই? জাহিলী যুগে আমরা জানিতাম না, আমরা কি কি জিনিস গ্রহণ করিব আর কি কি জিনিস বর্জন করিব যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদেরকে আপনার দ্বারা হিদায়াত করিলেন এবং ধ্বংসের হাত হইতে মুক্তি দান করিলেন।' নবী কারীম (স) বলিলেন, "আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।" তখন আনাস (রা) বলিলেন, "আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গকৃত হউক।" রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচিত তাঁহার কবিতার নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিল ঃ

فما حملت من ناقة فوق رحلها–أبرو أو فى ذمة من
محمد

"অতএব, কোনো উষ্ট্রী ইহার হাওদার উপর মুহ'াম্মাদ অপেক্ষা কোন অধিকতর ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব পালনকারীকে বহন করে নাই"।

দিবিল ইব্ন আলী ত'াবাক'াতুশ-শু'আরা গ্রন্থে মন্তব্য করেন, এই শ্লোকটি আরবদের রচিত শ্লোকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য।

আনাস ইব্ন যানীম ও ইরাকের গভর্নর 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ সম্পর্কে অনেক ঘটনা আছে যাহা আবুল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী বর্ণনা করিয়াছেন হ'ারিছ'া ইব্ন বাদ্র-এর জীবনী প্রসঙ্গে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হইল, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ-এর অভ্যাস ছিল এক কবিকে অন্য এক কবির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া। অতএব তিনি একদিন হ'ারিছ'া-কে আদেশ করিলেন আনাস ইব্ন যানীম-কে ব্যঙ্গ করার জন্য। তখন তিনি আনাসের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিলেন, যাহার একটি শ্লোক হইল ঃ

وخبرت عن أنس أنه قليل الامانة خوانها.

"আনাস সম্বন্ধে আমার নিকট খবর আসিয়াছে, সে একজন অবিশ্বস্ত লোক, যাহার উপর নির্ভর করা যায় না"।

তদুত্তরে আনাস একটি কবিতা রচনা করিলেন, যাহার প্রথম শ্লোকটি হইল ঃ

أتتنى رسالة مستنكر – فكان جوابى غفرانها.

"য়জনৈক অজ্ঞ লোকের চিঠি আমার হস্তগত হইয়াছে এবং আমার পক্ষ হইতে উত্তর হইলঃ চিঠিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছ'ীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ১২৪; (২) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮হি., ১খ., ৬৮-৯, নং ২৬৭; (৩) আয্-য'াহাবী, তাজ্রীদ আস্মাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., ৩০, নং ২৬২।

ড. ছৈয়দ লুৎফুল হক

আনাস ইবনুল-হ'ারিছ' (انس بن الحارث) ঃ (রা) ইব্ন নাবীহ একজন সাহাবী। ইব্ন মান্দার মতে তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। আশ্'আছ' তাঁহার পিতা মুহায়খ হইতে তাঁহার হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আনাস ইবনুল-হ'ারিছ' হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আনাস) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "আমার এই দৌহিত্র হু'সায়ন ইরাকের কারবালা নামক স্থানে নিহত হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সেইখানে তাহার কাছে উপস্থিত থাকিবে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে তাহাকে সাহায্য করা"। আনাস (রা) কারবালা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সেইখানে হুসায়ন (রা)-এর সহিত শাহাদাত বরণ করেন।

কাহারও কাহারও মতে তিনি সাহাবী ছিলেন না, বরং তাবি'ঈ ছিলেন এবং তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ' মুরসাল-এর পর্যায়ভুক্ত। এই মত সঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কেননা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি", এই ধরনের উক্তি একমাত্র সাহাবীগণই করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত বাগ'াবী, ইবনুস-সাকান, ইব্ন শাহীন, দাগূলী, বাওয়ার্দী, ইব্ন মান্দা প্রমুখ তাঁহাকে সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবা, তা. বি. ১খ., ১২৩; (২) ইব্ন হ'াজার আল্-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাম্য়ীযিস সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৬৮, নং ২৬৬।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

'আনিয়ারা (عنيرة) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তিনি বদর-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহুদ-এর যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাম্য়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৪০, নং ৬০৭৮।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আনী (آنى) ঃ প্রাচীন আর্মেনীয় রাজধানী, আরপা-চায় (আর্মেনীয়দের নিকট আখুরয়ান নামে অভিহিত) নদীর ডান তীরে অবস্থিত আরাক্‌সাস নদীর সঙ্গমস্থল হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইরানী দেবী আনাহিতা (গ্রীক আনাঈটিস)-এর মন্দিরের নামানুসারে এই নগরীর নামকরণ হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। স্থানটিতে খৃষ্টপূর্ব আমলে লোকবসতি ছিল। কারণ শহরটির অতি নিকটবর্তী স্থানে পৌত্তলিক আমলের কবর পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মত প্রাচীন যুগের দুর্গ হিসাবে আনী-র উল্লেখ পাওয়া যায়। শাল্‌কোত্‌যাদ্‌যর (Tsalkotzadzor) গিরিখাত যাহার মধ্য দিয়া আলাজা পাহাড় হইতে একটি স্রোতধারা আরপাচায়ের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, উহার এবং ঐ নদীটির খাড়া তীরের মাঝখানে নগরীর অবস্থান নগরীটি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আনী-তে কামসারাকান রাজপরিবারের (আশরাকীগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত) একটি দুর্গ ছিল এবং চুন-সুরকীর আস্তর ব্যতীত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ঠিক পাহাড়ের উপর নির্মিত এই অট্টালিকাটির ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অট্টালিকার প্রাচীনতম অংশটি একটি ছোট গির্জা ছিল বলিয়া মনে হয়, যাহা সম্ভবত ৭ম শতাব্দী-দুর্গের পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত হইয়া থাকিবে এবং পরবর্তীতে কামসারাকামগণ বাড়ীর মধ্যকার উপাসনালয় হিসাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকিবে।

৮ম শতাব্দী হইতে আর্মেনিয়ার অবশিষ্ট এলাকার ন্যায় আনী জেলাও খলীফাগণের সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই সময়ে বাগ্‌রাতী বংশ ক্রমে তাঁহাদের অধিকৃত এলাকা সুসংহত করিতে ও খলীফাগণের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয়। ৮৮৭ খৃ. 'আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার রাজাধিরাজ' (امير الامراء) বাগরাতী আশোত-কে তাঁহার দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ বাদশাহরূপে ঘোষণা করেন এবং খালাফিও এই মর্যাদার স্বীকৃতি দান করেন। এই প্রথম বাদশাহ্-র পুত্র সম্বাতকে (আরবী লেখকগণ কর্তৃক সান্‌বাত্ ইব্‌ন আশূত নামে অভিহিত) আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবিস-সাজ ৯১৪ সালে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে এবং ইব্‌ন হ'াওক'াল (পৃ. ২৫২) এই কাজকে 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও বিদ্রোহ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, এমনকি সম্বাতের আমলে দক্ষিণে মেসোপটেমিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিল (আরবী দাবীল) হইতে বারযাআ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা বাগরাতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কথিত আছে (আল-জাযীরা, আল-ইস্তাখরীর মতে, ১৮৮, ১৯৪)। নিহত বাদশাহ পুত্রের 'লৌহ মানব' আশোত অংশত বায়যান্টাইন সাহায্যে স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। আর্মেনিয়ার শাসক হিসাবে তিনি পারস্য ভাষায় শাহানশাহ্ (রাজাধিরাজ) উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্বে তাঁহার পূর্বসূরী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শাপুহ্-র পুত্র আশোতকে য়ূসুফের স্থলাভিষিক্ত সাবুক এই উপাধি প্রদান করেন।

৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগরাতী বংশীয় আশোত মসাকের (মাংসখাদক) কামসারকানের নিকট হইতে আনী জেলাটি ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু কেবল ৩য় আশোতের আমলে (৯৬১-৭৭) আনী রাজকীয় রাজধানীতে পরিণত হয়। বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীরটি ২য় সমবাত (৯৭৭-৮৯) নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত একটি প্রাচীনতর দেওয়ালের স্থান ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের খনন কার্যের ফলে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই দুইটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এলাকার তুলনা করিলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে প্রাচীরের মধ্যবর্তী তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ স্থান নগর জীবনের জন্য অপ্রতুল হইয়া পড়ে। বাগরাতীগণ আরপা-চায় নদীর উপর একাধিক পুল নির্মাণ করে। ফলে ত্রেবিযন্দ্ ও পারস্যের মধ্যকার বাণিজ্য পথ দ্বিলের পরিবর্তে আনী হইয়া

চালু হয় এবং দূরত্ব হ্রাস পায়। বাগরাতীগণ ও তাহাদের রাজধানী প্রথম গাগি-এর আমলে (৯৯০-১০২০) উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে। ৯৯৩ খৃস্টাব্দ হইতে আনী আর্মেনিয়ার ক্যাথলিকোসের (Catholicos) বাসস্থান ছিল। অসংখ্য শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয়, গাগিক পারস্য ভাষায় শাহানশাহ উপাধি ধারণ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন এবং উহার আর্মেনীয় রূপও (আরক্ আয়িত্‌য্ আরক্‌আই) পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াবাসীদের রাজা উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। ১০০১ খৃস্টাব্দে গাগিক কর্তৃক নির্মিত একটি গির্জার ধ্বংসাবশেষ ১৯০৫ ও ১৯০৬ খৃস্টাব্দে খনন করা হয়। সেখানে রাজার একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির হাতে গির্জাটির একটি আকৃতি ও মাথায় মুসলমানদের পাগড়ী রহিয়াছে। একই পাগড়ী তাহার পূর্ববর্তী ২য় সমবাতের খোদাই করা মূর্তিতেও পাওয়া গিয়াছে যাহা হালবাতের মঠে সংরক্ষিত আছে।

গাগিকের উত্তরাধিকারিগণের আমলে রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে এবং ১০৪৪ খৃস্টাব্দে ইহা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। কিন্তু বায়যান্টাইন গভর্নরগণ (কাতাপান্‌স) আনী নগরীর উন্নয়নে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করেন। একটি আর্মেনীয় শিলালিপি অনুসারে কাপাতান আরোন আলাজা পাহাড় হইতে নগরীতে পানি সরবরাহের জন্য এক সুবিশাল পানি প্রণালী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সুলতান আলপ আরসালান গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান। তিনি ১০৬৪ খৃস্টাব্দে আনী নগরী জয় ও ধ্বংস করেন। ইব্‌নুল আছীরের মতে (১০খ.; ২৭) শহরটিতে তখন ৫০০ গির্জা বর্তমান ছিল। সম্রাট রোমানোস ডিওজিনিস (Romanos Diogenes)-এর পরাজয় বরণের এক বৎসর পর সুলতান ১০৭২ খৃ., বানূ শাদ্দাদ (দ্র.)-এর মুসলিম রাজবংশের নিকট আনী বিক্রয় করিয়া দেন এবং ১২শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত (মধ্যে মধ্যে সাময়িক বিরতি ব্যতীত) শহরটি ঐ পরিবারের একটি শাখার বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ সময় শহরটিতে দুইটি মসজিদ বর্তমান ছিল। তন্মধ্যে একটি ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিধ্বস্ত হয় এবং অপরটি অক্ষত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ১৯০৭ খৃস্টাব্দ হইতে তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির যাদুঘররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে একই আমলের খৃস্টানদের কিছু দালান-কোঠাও বিদ্যমান আছে। শাদ্দাদ বংশীয় শাসকগণ অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন, এমনকি খৃস্টান প্রজাদের প্রতিও তাঁহাদের উপকারের হস্ত সম্প্রসারিত ছিল। আর বাগরাতীগণের সহিত বৈবাহিক সূত্র স্থাপিত হওয়ার দরুন খৃস্টান জনসাধারণ তাঁহাদেরকে স্থানীয় ও আইনসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিত। তাঁহাদের শাসনামলে নগরীর প্রাচীরসমূহের সংস্কার সাধন করিয়া কয়েকটি উচ্চ মিনার দ্বারা উহা সুশোভিত করা হয়।

আনী প্রথমবারের মত ১২২৪ খৃ. ২য় ডেভিডের অধীনে জর্জীয়দের পদানত হয়। এইভাবে ২য় ডেভিড জর্জীয় রাজাদের ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করেন। শহরটি আর্মেনীয় পরিবার যাক্‌আরীগণকে (জর্জীয় ভাষায় : Mkhargrdzclilongimani) জায়গীরস্বরূপ দেওয়া হয়। তাহারা নগরীর প্রাচীর আরপা-চায় (Arpa-cay) নদীর খাড়া তীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। প্রাচীন আর্মেনীয় বিবরণে এই তথ্যটি উপেক্ষিত হইয়াছে। আর্মেনীয় একটি বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে যে, জর্জীয় শাসকগণ (তাহাদের পূর্ববর্তী গ্রীকগণের ন্যায়) গ্রীক অর্থডক্স মতবাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন, যাহা ঐ সময়কার স্থাপত্যশিল্পে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সময়ে মুসলমানদের প্রতি কোনরূপ ধর্মীয় নির্যাতন ছিল না যেমন হইত না শাদ্দাদীগণের আমলে খৃস্টানদের প্রতি। জনৈক সমসাময়িক মুসলিম মনীষী যাহার টীকা ইব্‌ন হা'ওক'লে (পৃ. ২৪২) বিদ্যমান, এই ব্যাপারে একমত, জর্জীয় রাজা সকল অনিষ্ট হইতে ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন এবং একজন মুসলমান ও জর্জীয়র মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যের কারণ নাই। খুব সম্ভব ত্রেবিযোন্দ্ (Trebizond) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে (১২০৪ খৃ.) আনী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল (দ্র. A. Manandian, o torgovle i gorodakh Armenu[2] Erevan ১৯৫৪ খৃ., ii ২৭৮)।

খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ জালালুদ-দীন ১২২৬ খৃ. আনী অবরোধ করিয়া ব্যর্থ হন এবং ১২২৯ খৃ. এই নগরী মোঙ্গল বাহিনী অধিকার করে। কিন্তু এই বিজয়ের পরও শহরটি কিছুকালের জন্য যাক'আরীগণের অধিকারে থাকিয়া যায়। প্রধান ফটকে স্থাপিত একটি শিলালিপি হইতে প্রতীয়মান হয়, পরবর্তী কোন এক সময় আনী পারস্যের মোঙ্গল শাসকগণের ব্যক্তিগত এলাকা (খাস্‌স্-ঈন্‌জু)-রূপে বিবেচিত হইত। কিন্তু উহা কখনও উহার পূর্বেকার গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন বিবরণ অনুসারে ১৩১৯ খৃ. এক ভূমিকম্পে আনী চূড়ান্তরূপে বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু ইহার পরবর্তী তারিখের শিলালিপি ও মুদ্রা উভয়ই পাওয়া গিয়াছে। আনীতে ঈলখান সুলায়মানের (১৩৩৯-১৩৪৪খৃ.) প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের তাম্র মুদ্রা তুর্কীদের নিকট 'বানর মুদ্রা' (মায়মুন সিককেসি) নামে অভিহিত। মুদ্রাগুলিতে কেশবিশিষ্ট একটি মানবমূর্তি রহিয়াছে। আনীর নামসম্বলিত মুদ্রা ১৪শ শতাব্দীতে জালাইর বংশীয় শাসকগণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমনকি ১৫শ শতাব্দীতেও কারা কোয়ুনলু উহা প্রস্তুত করেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে টাঁকশাল শহরের বাহিরে অবস্থিত ছিল এবং সম্ভবত উহা মাগাযাবারদ্ দুর্গের ভিতরে ছিল (আনী হইতে ২ মাইলের কম দূরে)। খননকার্য হইতে প্রতীয়মান হয়, প্রাসাদ ও গির্জাসমূহের ধ্বংসের পর অত্যন্ত অসভ্য প্রকৃতির দরিদ্র লোকেরা ধ্বংসস্তূপের উপর তাহাদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল। কার পোর্‌টার (Ker Porter)-এর ভ্রমণকালে (নভেম্বর ১৮১৭ খৃ.) এই সকল বাড়ীঘর, উহাদের পৃথক প্রকোষ্ঠগুলি ও পরবর্তী কালে নির্মিত ১২-১৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তাসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে আনীর নাম কেবল ধ্বংসস্তূপের নিকট অবস্থিত একটি মুসলমান বসতির দরুন সংরক্ষিত রহিয়াছে। ১৮৭৭-৮ খৃস্টাব্দের যুদ্ধের পর আনী রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু ১৯২১ খৃস্টাব্দের যুদ্ধ দ্বারা উহা আবার তুরস্কের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। বর্তমানে ইহা কার্‌স বিলায়েতের আরপাচায় কাদা (জেলা)-র অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার অধিবাসী আনু. ৩৫০ জন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আনীর ঐতিহাসিক বিবরণ প্রধানত আর্মেনীয় উৎসসমূহে পাওয়া যায়, বিশেষত (১) Stephan Asolik-এর লেখায় যিনি রাজা ১ম Gagik-এর একজন সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় ইহার বিবরণ নিতান্তই বিরল এবং ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর আরব ভৌগোলিকগণ শহরটির কোন উল্লেখই করেন নাই; (২) ইয়াকূ'ত (১খ.,

৭০) আনী সম্পর্কে একটি লাইন মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন; (৩) হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী (নুযহাত, পৃ. ৯৩) কেবল উল্লেখ করিয়াছেন, জেলাটি শীতল আবহাওয়া সম্পন্ন এবং সেখানে প্রচুর শস্য ও সামান্য ফল উৎপন্ন হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর আনী সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যসম্বলিত একমাত্র ইসলামী উৎস হইল ঃ (৪) আল-ফারিকী'র তারীখ মায়্যাফারিকী'ন, বৃ. মিউ. Or. ৫৮০৩ ও Or. ৬৩১০; আরও দ্রষ্টব্য (৫) স্থানীয় পণ্ডিত বুরহানুদ্দীন আনাবী রচিত নীতিমূলক ঘটনাপঞ্জী (আনীসুল কু'লব ফারসী ভাষায় ৬০৮/১২১১ সালে লিখিত, F. Koprulu উহা Bell-এ ১৯৪৩, ৩৭৯-৫২১-এ বর্ণনা করিয়াছেন)। আরও তু. (৬) ইব্নুল আছীর, ১০খ., ২৬ (তথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে); দ্র. (৭) Minorsky, Studies in Caucasian History 1953, পৃ. ৭৯-১০৬। (৮) Gemelli-Carren ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ সর্বপ্রথম পরিদর্শন করেন (Collection de tous bs voyages faits autour du monde,২খ., প্যারিস ১৭৮৮ খৃ., পৃ. ৯৪) ও (৯) কার পোর্টার (Ker Porter) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেন (Travels, ১খ., লন্ডন ১৮২১, পৃ. ১৭২-৫)। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১০) টেক্সিয়ার (Texier) শহরটির নকশা অঙ্কন করেন (Voyages en Armenic, প্যারিস ১৮৪২, Atlas, Plate no. 14) ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে (১১) আবিচ (Abich) (তু. M. Brosset, Rapports Sur un voyage dans la Georgie et dans l'Armenie, St. Petersburg 1851. Atlas Plate no. 23 ও Brosset, Les Ruines d'Ani, St Petersburg 1860, Atlas, plate no, 30)। খৃষ্টান নিদর্শনসমূহ ঃ (১২) Muravyev বর্ণনা করিয়াছেন Gruziya i Armeniya, St. Petersburg ১৮৪৮; মুসলিম শিলালিপির জন্য দ্র. (১৩) Khanykov (১৮৪৮ খৃ., তু. Melanges Asiatiques,১খ., ৭০ প. ও M. Brosset, Rapports etc., 3-e rapport, ১২১-৫; (১৪) কাস্ট্নার (Kastner) কর্তৃক সংগৃহীত এ্যালবামে (১৮৫০ খৃ.) ৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের ছবি ও ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী আরবী, ফারসী ও জর্জীয় শিলালিপির সংগ্রহ রহিয়াছে (cp. Brosset, Les ruines d'Ani, পৃ. ১০-৬৩)। আর্মেনীয় লেখকগণের মধ্যে Nerses Sarkisyan ও Sarkis Djalalyantz আর্মেনীয় শিলালিপি সংগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্য নগরীর ইতিহাসের উপর লিখিত। (১৫) আলিশানের ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যবহৃত হয় (ভেনিস ১৮৫৫, আর্মেনীয় ভাষায় cp. Brosset, Melanges Asiatiques, ৪খ., ৩৯২-৪১২), যাহা বর্তমানে অপ্রচলিত।

রুশ খননকার্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় এবং ১৯০৪-১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর এন. ওয়াই. মার (Prof. N.Y. Marr) উহা সুসংবদ্ধভাবে চালাইয়া যান; ইহার ফলাফলঃ (১৬) রাশিয়ার সাময়িকীগুলিতে অসংখ্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয় এবং (১৭) একটি বিশেষ সিরিজে (Aniyskaya Seriya) Mar J. Orbeli, Barthold প্রমুখের রচনাবলী ও পরিচয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। আরও বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. (১৮) N. Marr, Ani Kniznaya istoriya goroda i Raskopki, মস্কো ১৯৩৪ খৃ., এবং (১৯) T"oros Toramanian-কৃত স্থাপত্য সংক্রান্ত রচনাবলী (আর্মেনীয় ভাষায়), Erevan ১৯৪২-৪; (২০) V and I. Kratchkovsky, Iz arabskoy epigrafiki v Ani, N. Y. Marr-কে প্রদত্ত স্মারক গ্রন্থে, মস্কো ১৯৩৫, পৃ. ৬৭১-৯৩।

W. Barthold-[V. Minorsky] (E.I.2) /মু. আবদুল মান্নান

আনীস, মীর বাবর আলী (انیس میر بابر علی) ঃ (১২১৭-৯১/১৮০২-৭৪) উর্দূ কবি, ফায়যাবাদ (দ্র.)-এ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যাহার পাঁচ পুরুষ ছিল কবি। তাঁহার পিতা খালিকসহ তাঁহাদের কয়েকজন ভারতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মার্‌ছি'য়া (শোকগাথা) রচনা করেন, যাহা অযোধ্যার শী'আ নওয়াবদের রাজধানী লক্ষ্ণৌ-তে কবিতা আবৃত্তির সাধারণ আসরসমূহে সমাদৃত হয়। এই জাতীয় কবিতা অর্থাৎ মার্‌ছি'য়া কারবালাতে আল-হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-র শাহাদাত বরণ (৬১/৬৮০)-কে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইত এবং সম্ভবত ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। যৌবনে আনীস লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং কবিতা রচনায়, বিশেষ করিয়া মার্‌ছি'য়া রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন এই জাতীয় কবিতা রচনার প্রধান পথপ্রদর্শক। লক্ষ্ণৌতে ও জীবনের শেষভাগে তিনি অন্য যেইসব ভারতীয় শহরে মাঝে মাঝে গমন করেন সেইসব জায়গায় হাজার হাজার লোক তাঁহার আবৃত্তির আসরে উপস্থিত হইত। কোন কোন সমালোচক তাঁহার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বীর দাবিকে তাঁহার চেয়ে বড় মনে করিতেন, কিন্তু এই অভিমত এখন আর গ্রহণযোগ্য নহে। আনীস যেই সময় কবিতা লিখিতে শুরু করেন তখন ভারতীয় মার্‌ছি'য়া কাব্যের প্রধান দিকগুলি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও সেইগুলির আভাস-ইঙ্গিত ইতোপূর্বেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং আনীস ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এতদিন যাহা ছিল চতুষ্পদী এখন তাহা প্রায় সম্পূর্ণ ষষ্ঠ পদী (মুসাদ্দাস) রূপ লাভ করে। আবেগ ও ভক্তিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত শোকগাথা হিসাবে আরম্ভ হইয়া ইহা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত শতাধিক শ্লোকে দীর্ঘায়িত হয়। কারবালা-তে আল-হু'সায়ন (রা) ও তাঁহার অনুসারীদের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর সহিত আনীস প্রকৃতির বিবরণ, যেমন স্থলভাগের দৃশ্য, মরুভূমি ও ঝড়-তুফান, সমর্থকদের চরিত্র অংকন, অশ্ব, তলোয়ার, সামরিক পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সীমিত ভাসা ভাসা বিষয়বস্তুর দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ যুক্ত করেন যাহার ফলে ইহা সার্বজনীনতা লাভ করে। ভাষাতে সব রকমের অলঙ্কার (বালাগ'াত) প্রয়োগ সত্ত্বেও তাঁহার কবিতায় আছে একটি স্বাভাবিক সরলতা ও সততা। তৎকালে প্রচলিত উর্দূ গ'াযাল (দ্র.)-এর সহিত এখানেই ইহার প্রধান পার্থক্য। ফলে ইহা হালী ও আযাদের মত কবি ও দূরদর্শী সমালোচকদের অনুমোদন লাভ করে এবং উর্দূ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে। ইহা আনীসের শিল্প-নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক যে, তিনি আগ্রহ সহকারে ২,৫০,০০০ শ্লোক রচনা করেন। কিন্তু ইহা কিছুটা বিস্ময়ের বিষয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর পর তাঁহার কাব্যরীতির ব্যাপক চর্চা বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আনীস ও তাঁহার মারছি'য়া কাব্যের সমালোচনামূলক বিবরণ পাওয়া যাইতে পারেঃ (১) মুহাম্মাদ সাদিক, History of Urdu Literature, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৫৫-৬৩; (২) আবুল লায়ছ সিদ্দীকী, লাখনাউ কা দাবিসতান-ই শা'ইরী, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., ইহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মারছি'য়া কবিদেরও উদাহরণ আছে; (৩) রাম বাবু সাকসেনা, History of Urdu Literature, এলাহাবাদ ১৯২৭ খৃ., ইহার 'শোকগাথা ও শোকগাথা লেখক" সম্বন্ধে একটি সাধারণ অধ্যায়ে (পৃ. ১২৩ প.) আনীসের পরিবারের তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবিদের উল্লেখ সম্বলিত একটি বংশতালিকা (পৃ. ১৩৬) রহিয়াছে।

আনীস সম্বন্ধে সমালোচনামূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) আমীর আহমাদ, ইয়াদগার-ই আনীস, লক্ষ্ণৌ ১১২৪ হি.; (২) জা'ফার আলী খান, আনীস কী মারছি'য়া নিগারী, লক্ষ্ণৌ ১৯৫১ খৃ.; (৩) শিব্‌লী নু'মানী, মুওয়াযানা-ই আনীস ওয়া দাবীর, ইহাতে আনীসের পক্ষে অত্যধিক গুরুত্ব থাকিলেও ইহা এখন পর্যন্ত এই দুই কবি সম্বন্ধে উচ্চ মানের তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থ। আনীসের কবিতাসমূহের বহু সংখ্যক সংস্করণ আছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। বিস্তারিত সংস্করণগুলির অন্যতম মারাছী-ই আনীস, সম্পা. নাইব হু'সায়ন নাক্‌'বী আমরোতা, ৪ খণ্ডে, করাচী ১৯৫৯ খৃ.। নওয়াব হায়দার জাঙ্গের তিন খণ্ড সংস্করণটি, বাদায়ূন ১৯৩৫ খৃ., একটি স্বল্প বিস্তারিত সংস্করণ, কিন্তু ইহাতে নিজামুদ্দীন হু'সায়ন নিজামী বাদায়ূনীর একটি মুখবন্ধ আছে।

J.A. Haywood (E.I.²) /মুখলেছুর রহমান

আনূশারওয়ান (انوشروان) ঃ ১ম খুসরাও-এর উপাধির আরবী রূপ (আত্-তাবারী, ১খ., ৮৬২) [দ্র. কিস্‌রা], পাহ্‌লাবীতে আনোশাগ্-রুওয়ান; পাযান্দ্-এ আনোশ-রুআন অর্থাৎ 'অমর আত্মার অধিকারী,' অতঃপর পারসীতে নূশীরাওয়ান (নূশীরওয়ান্), যাহা সাধারণত নূশীন-রাওয়ান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ 'মিষ্টি আত্মার অধিকারী' (বুরহান-ই ক'াতি')। ইসলামে একাধিক ব্যক্তি এই নাম ধারণ করেন (Zambaur চারজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন)। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মানূচিহ্‌র-এর ঔরসজাত ও মাহ্‌মূদ গায্‌নাবীর জনৈকা কন্যার গর্ভজাত এক পুত্র, যিনি ৪২০/১০২৯ সাল হইতে ৪৩৪/১০৪২ সাল পর্যন্ত জুর্‌জানের আমীর ছিলেন (ইব্‌নুল আছীর, ৯খ., ২৬২) ও আনূশারওয়ান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কাশানী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides, ৮ম অধ্যায়; (২) Zambaur, নির্ঘণ্ট দ্র.।

H. Masse (E.I.²) /মু. আব্দুল মান্নান

আনূশিরওয়ান ইব্‌ন খালিদ (انوشروان بن خالد) ঃ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কাশানী, শারাফু'দ্-দীন আবূ নাস্‌র সালজূক সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহ্‌র কোষাধ্যক্ষ ও আরিদুল-জায়শ ছিলেন। শামসুল-মুল্‌ক ইব্‌ন নিজামুল-মুল্‌ক আরিদুল জায়শ হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলে তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মালিক শাহ্‌র রাজত্বকালে স্বল্প মেয়াদের জন্য কারাবরণ করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মাহ্‌মূদ তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করেন (৫২১/১১২৭- ৫২২/১১২৮)। ৫২৬/১১৩২ সাল হইতে ৫২৮/১১৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি খলীফা আল-মুস্‌তারশিদের উযীর ছিলেন। ৫২৯/১১৩৪ সালে তিনি মাসঊদ ইব্‌ন মুহাম্মাদের উযীর নিযুক্ত হন এবং ৫৩০/১১৩৫-৬ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ইব্‌নুল আছীর-এর মতে তিনি বাগদাদে ৫৩৩/১১৩৮-৯ সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু হিন্দু শাহ্ ইব্‌ন সান্‌জার-এর তাজারিবুস্-সালাফ অনুসারে ৫৩২/১১৩৭-৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ফুতূর যামানিস-সু'দূর ওয়া সু'দূর যামানিল-ফুতূর নামে সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে ফারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; পরে উহা 'ইমাদুদ্দীন [দ্র.] কর্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হয় যাহা আল-বুন্দারী কর্তৃক সংক্ষেপিত করা হয় এবং Houtsma কর্তৃক Recueil de textes relat. a l'hist., des Seldjoucides, ii নামে প্রকাশিত হয়। হ'াজ্‌জী খালীফা নাফ্‌ছ'াতুল-মাস্‌'দূর নামে তাঁহার অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা এবং উপরে উল্লিখিত ফুতূর যামানিস্-সুদূর সম্ভবত একই গ্রন্থ (দ্র. মীরযা মুহাম্মাদ ক'াযবীনী, মাক'ালা-ই তারীখী ওয়া ইন্‌তিকাদী, তেহরান ১৩০৮ সৌর হি.)। সমসাময়িক কালের বিভিন্ন কবি আনূশিরওয়ানের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনিই আল-হ'ারীরীকে তাঁহার মাক'ামাসমূহ প্রণয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Recueil de textes relat. a l'hist. das Seldjoucides, ii; (২) ইব্‌নুল আছীর, ১০খ., ১১খ.; (৩) সিব্‌ত ইব্‌নুল জাওযী, মির্‌আতুয্-যামান ফী তারীখিল-আয়ান, শেষ খণ্ড (৪৯৫-৬৫৪ হি.), সম্পা. Jowett, শিকাগো ১৯০৭, হায়দরাবাদ (দা.) ১৯৫১-৫২ খৃ.; (৪) হিন্দু শাহ্ ইব্‌ন সান্‌জার, তাজারিবুস্-সালাফ।

A.K.S. Lambton (E.I.²) /মু. আবদুল মান্নান

আপামিয়া (দ্র. আফামিয়া)।

আপোল্লোনিয়াস (দ্র. বালীনূস)।

আফ্‌'আ (افعى) ঃ শব্দ দ্বারা সচরাচর বিষধর সাপকে বুঝানো হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা অনুরূপ অন্যান্য সাপও বুঝায় (Noldeke, in Wiedemann, 271)। আরবী প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে যে বর্ণনা পাওয়া যায় (ফোঁটা বা দাগযুক্ত, চওড়া মাথাযুক্ত, সরু গলাযুক্ত, খাট লেজযুক্ত, কখনো বা দুই শিংওয়ালা ইত্যাদি) তাহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সাপের সঙ্গে যথাযথভাবে মিলিয়া যায় (echis carinatus, echis coloratus, aspis cerastes cerates)। অধিকাংশ উৎস গ্রন্থমতে আফ্‌আ দ্বারা শুধু স্ত্রী জাতীয় বিষধর সাপকে বুঝায়। আর পুরুষটিকে বলা হয় উফ্'উওয়ান (افعوان)। অবশ্য প্রথমোক্ত শব্দটি দ্বারা সব সময়ই সাধারণভাবে সকল বিষধরকে বুঝাইয়া থাকে। ইহার সমার্থক হিব্রু ও ইথিওপীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ হইতে ধারণা করা যায়, শব্দটি সেমিটিক ভাষাসমূহের প্রাচীনতম কোন শাখা হইতে উদ্ভূত।

আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কবিতা, প্রবাদ ও হাদীছ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের একেবারে সেইসব রচনা পর্যন্ত যেইগুলিতে প্রাণিবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত বস্তুগুলি পদ্ধতিগতভাবে আলোচিত হইয়াছে; এইগুলিতে প্রায়শ আফ্‌'আ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কবিতায় ইহাকে খুনের

বদলা গ্রহণেচ্ছু মারাত্মক শত্রুর প্রতীকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার মারাত্মক অনিষ্টকারিতা একটি প্রবাদের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, "আফ'আ যাহাকে কামড়াইয়াছে সে দড়ি দেখিলেও ভয় পায়" (من لدغه الافعى خاف من الحبل)। আল-জাহিজ আফ'আ সম্বন্ধে প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিয়াছেন। আফ্‌আর বেশ বাজার মূল্য ছিল, ইহা হইতে theriac (তিরয়াক—ترياق) উৎপাদন করা হইত। কিছু সংখ্যক লোক আফ্'আ-র ব্যবসা করিয়া, প্রধানত সিজিস্তান হইতে আফ্'আ আমদানী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। আল-জাহিজ-এর আমলে একবার ত্রিশটি আফ্'আ দুই দীনারে বিক্রি হইয়াছিল। কোন কোন বেদুঈন গোত্রের লোকেরা আফ্'আর গোশত খাইয়া থাকে এবং অনেক কবি তাহাদের কবিতায় এই বিষয়টিকে বিদ্রূপাত্মকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

আফ্'আ সম্বন্ধে প্রচলিত বহু তথ্যই কল্পকাহিনীমাত্র, যেমন ইহার আয়ু হাজার বছর; ইহা অন্ধ হইয়া গেলে আবার 'রাযিয়ানাজ' (fennel plant) গাছের গায়ে চক্ষু ঘষিয়া পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে ইত্যাদি। সঠিক তথ্য হইতেছে, সাপ জাতির অন্যান্য অধিকাংশ সদস্যের তুলনায় আফ'আ অধিক পরিণত বাচ্চা প্রসব করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ হায়্যান আত্-তাওহীদী, আল-ইমতা, ১খ., ১৬০, ১৭৪, ১৯২; (২) দামীরী, হ'ায়াতুল-হ'ায়াওয়ান দ্র. (অনু. জায়াকার, ১খ., ৫৬-৮; (৩) জাহিজ, আল-হ'ায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্নুল আছীর, নিহায়া, ১খ., ৪৪; (৫) ইব্নুল বায়তার আল-জামে', বূলাক ১২৯১ হি., ১খ., ৪৬-৮; (৬) ইব্ন কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার, কায়রো ১৯২৫-৩০; ২খ., ৭৯, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৪ (transl. Kopf, 54, 72, 74, 75, 77, 80); (৮) আল-কায্‌বীনী (Wustenfeld), ১খ., ৪২৮-২৯; (৯) ইব্ন সীদা, আল-মুখাস্'সাস', ৮খ., ১০৭-৮; (১০) A. Malouf, Arabic Zool. Dict., Cairo 1932, index; (১১) আন্-নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-আরাব, ১০খ., ১৩৩; (১২) E. Wiedemann, Beitr. z. Gesch. d. Naturwiss., liii, 249-50L.

Kopf (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আল-আফ্‌ওয়া আল-আওদী (الافوة الاودى) ঃ আবূ রাবী'আ স'ালা'আত ইব্ন আম্‌র প্রাক-ইসলামী যুগের আরব কবি, মায্‌হিজ গোত্রের আওদ শাখার প্রধান, খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়কার। বর্তমানে প্রাপ্ত তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার গোত্র ও গোত্রপ্রধানের যোদ্ধাসুলভ গুণাবলীর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। অপরদিকে তাঁহার নীতিবাক্য সংক্রান্ত কবিতাসমূহ তাঁহাকে জাহিলী যুগের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত করে। আল-জাহিজ অবশ্য (আল-হায়াওয়ান, ৬খ., ২৮০) তাঁহার নামে প্রচারিত কবিতাসমূহের প্রমাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তিনি এই ব্যাপারে যে সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সঙ্গত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আফ্‌ওয়া আল-আওদীর দীওয়ান, আত-তারাইফুল আদাবিয়্যা নামক গ্রন্থে প্রকাশিত, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; (২) L. Cheikho, শুআরাউন-নাস্‌রানিয়্যা, পৃ. ৭০-৪; (৩) আল-কালী কর্তৃক স্পেনে তাঁহার দীওয়ান প্রবর্তিত হয়, তিনি ইহা ইব্ন দুরায়দের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন (BAH, ৯খ, ৩৬৯); (৪) শ্লোক ও জীবনীমূলক টীকার জন্য দ্র. জাহিজ, হ'ায়াওয়ান, পরিশিষ্ট, ঐ লেখক, বায়ান (সানদূবী), ১খ., ১৭১; (৫) ইব্ন কু'তায়বা, শির, ১১০-১; (৬) ঐ লেখক, উয়ূনুল-আখবার, ৩খ., ১১৩; (৭) আল-ক'ালী, আমালী, ১খ., ১২৫; (৮) আগানী, ১১খ., ৪১-২; (৯) Barbier de Meynard, Surnoms, ৪৫ (JA, ১৯০৭, সংখ্যার মুদ্রিতাংশ); (১০) Brockelmann, S I, ৫৭; (১১) Nallino, Scritti, ৬খ., ২৯ (ফরাসী অনুবাদ, ৪৮)।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আফ্‌গান (افغان) ঃ (১) জাতি; (২) পশতু (পাশ্‌তু) ভাষা; (৩) পশতু (পাশ্‌তু) সাহিত্য।

(১) জাতি ও বংশগতভাবে বিভিন্ন আফগান উপজাতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। বি.এস. গুহের মতানুসারে (Census of India, ১৯৩১, ১, ৩ ক, পৃ. ১১) বাজৌরের পাঠান ও চিত্রলের কালাশদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ সম্ভবত তাহারা অনেকাংশে চালচলনে আফ্‌গান দার্দ। অপরপক্ষে বালুচিস্তানের প্রশস্ত শিরবিশিষ্ট পাঠানগণের তাহাদের বালূচ প্রতিবেশীদের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। পেশাওয়ার ও ডেরাজাতের সমতলভূমিতে কিছু ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে এবং কোন কোন উপজাতির মধ্যে তুর্কী মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আফগানগণ ভূমধ্যসাগরীয় মানবগোষ্ঠী dolichocephalie-এর ইরানী-আফগান শাখার সহিত সম্পর্কযুক্ত। Coon-এর মতানুসারে (Races of Europe, পৃ. ৪১৯) আফগানদের মস্তিষ্কের খুলির সূচী ৭২-৭৫ এবং গড় উচ্চতা ১৭০ সে. মি. (পাকিস্তান সীমান্তের পাঠানদের ক্ষেত্রে) ও ১৬৩ সে. মি. (আফগানিস্তানের আফগানদের ক্ষেত্রে)। তাহাদের নাক খাড়া ও প্রায় ক্ষেত্রেই উন্নত যাহা তথাকথিত সামীয় (সেমিটিক) বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বালূচ, কাশ্মীরী প্রভৃতিদের মধ্যেও অনুরূপ নাক দেখিতে পাওয়া যায়। আফগানদের চুল সাধারণত কালো, তবে একই সঙ্গে কিছু সংখ্যক আফগানের ঈষৎ স্বর্ণাভ চুলও দেখা যায়, যাহাতে এই ক্ষেত্রে নরডিক সংমিশ্রণ প্রতিফলিত হয়। তাহাদের দাড়ি অত্যন্ত ঘন (Coon, পৃ. ৪২০)।

কোন কোন সময় আফগান ও পাঠানদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয় এবং আফগান নাম দুর্‌রানী ও তৎসংশ্লিষ্ট উপজাতিদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা সম্ভবত কেবল নামের পার্থক্য, ইরানী নাম আফ্‌গান (যাহার মূলোৎপত্তি অজ্ঞাত) স্বভাবতই প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলীয় উপজাতিসমূহের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর পাঠান, যাহা স্থানীয় নামের ভারতীয় রূপ, পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতিদের প্রতি প্রযোজ্য।

যে দেশীয় নাম সকল উপজাতি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা হইল পাশ্‌তূন বা পশ্‌তুন (উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ভাষায় পাখতুন), বহুবচন পায়েশ্‌তানে। Lassen ও তাঁহার পরবর্তী কতিপয় লেখক পাশতূন শব্দের তুলনা হেরোডোটাসের পাক্‌তাবীস-এর সহিত করিয়াছেন এবং আফরীদীদের নাম আপারোতাইরূপে সনাক্ত করিয়াছেন। এই শেষোক্ত সনাক্তকরণ সম্ভবত সঠিক, যদিও তাহা নিশ্চিত নহে। কিন্তু প্রথমটিকে ধ্বনি

ও অন্যান্য কারণবশত অবশ্যই নাকচ করিতে হয় (শেষাংশ 'উন' 'আনা' হইতে উৎপন্ন এবং প্রাচীন কালের যে ধ্বনি গঠনের ফলে পাশ্তুতে 'শত' [পরবর্তী কালের ভাষায় 'খত']-এর সৃষ্টি হইয়াছে)। পশতুর 'শত' প্রাচীন কালের 'রস' হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব (দ্র. Morgenstierne, "Pashto" "Pathan" etc., AO, ১৯৪০, ১৩৮ প.) এবং সম্ভবত এই নামের প্রাচীন রূপ ছিল পারস্ওয়ানা (Parswana) যাহা পারসু (Parsu) হইতে উৎপন্ন ; তু. আশুরী-বাবেলী ও পারসু [আ] (Parsua) অর্থাৎ ফারসী। কিন্তু ইহাতে এই কথা বুঝায় না, আলোচ্য দুইটি ইরানী উপজাতির মধ্যে কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল (আরও তু. পুশ্‌ত, পুখত, ওয়াযীরী অঞ্চলে আফগান উপজাতিসমূহের কল্পিত আবাসভূমির নাম)। আফ্‌গান ভাষার দেশীয় নাম পাশ্‌তূ (পাখ্‌তূ)-এর সম্পর্ক সম্ভবত একটি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পারসাওয়া (Parsawa) [অর্থাৎ বিজয়ী ভাষা]-র সহিত রহিয়াছে।

লোগারের ওর্‌মুরদের নিকট আফগানগণ কাশ নামে অভিহিত এবং কানিগুরামের ওর্‌মুরদের নিকট ওয়াযীরীগণ কেসী (বহুবচন) নামে অভিহিত। এই শব্দের মূল অজ্ঞাত, তবে কোয়েটার নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী একটি আফগান উপজাতির নাম 'কাসী' (Masson, Travels, ১খ., ৩৩০) এবং সুলায়মান পর্বতমালার পাশতূ নাম (দা) 'কাসে গার"-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত।

পাশ্‌তূ শব্দটি আফগানদের বিশেষ সামাজিক বিধি 'পাশ্‌তুন্‌ওয়ালী' ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আফগানদের বিশেষ সামাজিক বিধির প্রধান স্তম্ভগুলি (আরকান) নিম্নরূপ ঃ (১) নানাওয়াতায় (আশ্রয় লাভের অধিকার); (২) বাদাল (বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ); (৩) মেল্‌মাস্‌-তুয়া (অতিথিপরায়ণতা)। ঝগড়ার যে সকল কারণ বাদাল-এর কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহা 'স্বর্ণ, নারী ও ভূমি' (যান্‌, যার, যামীন) বলিয়া কথিত। অধিকাংশ উপজাতির সংগঠন গণতান্ত্রিক এবং বংশগত খান সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শাখা ও বংশীয় প্রধানগণের সহিত পরামর্শক্রমে মীমাংসা করা হয় এবং উপজাতীয় বা গ্রাম পরিষদ (জির্‌গাহ্‌) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অনেক উপজাতির স্বাধীনতা, যেমন আফগানিস্তানে তেমনই পাকিস্তানে, অবিরামভাবে খর্ব করা হইতেছে। আফগান কিংবা আফ্‌গান প্রতিবেশিগণ বেশীর ভাগ উপজাতিদের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাহাদের আশ্রয়ে বসবাস করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ভূমি পুনর্বন্টনের প্রাচীন প্রথা বর্তমানে অধিকাংশ স্থানে বিলীন হইতে চলিয়াছে। রাজনৈতিকভাবে অনৈক্য পীড়িত ও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আফগান উপজাতিদের মধ্যে ভাষা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের মিলনের ভিত্তিতে এক প্রকার ঐক্যের অনুভূতি ক্রিয়াশীল ছিল। অপরদিকে প্রতিটি উপজাতি শাখা, গোত্র ও বংশে বিভক্ত। এইরূপ শাখার নাম প্রায়শ 'খেল' শব্দযোগে অথবা অন্তে 'যাঈ' (Zay) প্রত্যয়যুক্ত হইয়া গঠিত হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আবার 'যাঈ' সমগ্র উপজাতিকেই বুঝায়।

আফগানের উল্লেখ সর্বপ্রথম ভারতীয় জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির (৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) তাহার গ্রন্থ বৃহৎ সংহিতায় (আভাগানারূপে) করিয়াছেন। কিছুকাল পর সম্ভবত তাহাদের উল্লেখ হিউয়েন-সাং (Hiuen-Tsang)-এর জীবনীতে পাওয়া যায়, যেখানে অ-পো-কিন (A-p'o-kien) [অভাগান?] নামে একটি উপজাতির উল্লেখ রহিয়াছে যাহারা সুলায়মান পর্বতমালার উত্তরাংশে বসবাস করিত (দ্র. A. Foucher, Le vieille route de l'Inde de Bactres a Taxila, প্যারিস ১৯৪৭, ২খ., ২৩৫, ২৫২ টীকা ১৭)। মুসলিম লেখকদের সর্বপ্রথম যে গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইল হু'দূদুল-'আলাম (৩৭২/৯৮২); অতঃপর আল-'উত্‌বী, তারীখ ইয়ামীনী গ্রন্থে এবং আল-বীরূনীও তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। নামটি ১৬শ শতাব্দীর পূর্বের কোন লেখায় পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু 'শত'-এর 'ঠ'-এ রূপান্তর হইতে প্রমাণিত হয়, এই নামটি ভারতীয় আর্য ভাষায় অনেক পূর্বেই প্রবেশ করিয়া থাকিবে। আল-'উতবীর মতানুসারে (কায়রো ১২৮৬, ২খ., ৮৪) গয্‌নীর সুলতান মাহ্‌মূদ ভারতীয়, খালাজ, আফ্‌গান ও গায্‌নাবীদের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী লইয়া তুখারিস্তান আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সময় তিনি আফগানদেরকে আক্রমণ করিয়া শাস্তি প্রদান করেন এবং বায়হাক'ী—যিনি অল্প কিছুকাল পরে লিখিয়াছেন—এই ঘটনার সমর্থন করেন। আল-বীরূনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন আফগান উপজাতির উল্লেখ করিয়াছেন (India, অনু. Sachau, ১খ., ১, ২০৮, তু. ১৯৯)। ইহা হইতে মনে হয়, সুলায়মান পর্বতমালা আফগানদের সর্বপ্রথম জ্ঞাত আবাসভূমি ছিল। পশ্চিমে তাহাদের বসতি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা অনিশ্চিত, তবে প্রাথমিক কালের কোনও লেখকই গয্‌নীর পশ্চিমে কোন আফগান বসতির কথা উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ মনে করিবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই যে, গূরের অধিবাসিগণ প্রথমে পাশ্‌তূভাষী ছিল (তু. Dames-এর নিবন্ধ, E.I.[1])। আমরা যদি পেটা খাযানার বিবরণ [নীচে (৩) দ্রষ্টব্য] বিশ্বাস করি, তবে শানাস্‌বের পৌত্র রূপকথার আমীর কারোর (৮ম শতাব্দী) একজন পাশতূ কবি ছিলেন, কিন্তু ইহা বিভিন্ন কারণে প্রায় অসম্ভব। পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তের আফগান উপজাতি দুর্‌রানীদের (আবদালীদের) [দ্র.] উৎপত্তি ও প্রাথমিক ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। —গালযাঈ (দ্র.)-দের ব্যাপারে ইহা সম্ভব মনে হয়, তাহাদের নাম তুর্কী উপজাতীয় নাম খাল্‌জীর জনপ্রিয় শব্দরূপ খালাজ (চোরের পুত্র) হইতে উৎপন্ন, যাহাদের আবাস-ভূমি আল-ইস্‌ত'াখ্‌রী হিল্‌মান্দ তীরের মধ্যবর্তী স্থানে বলিয়াছেন এবং হু'দূদুল-'আলামের লেখক বলিয়াছেন যে, উহা গয্‌নী এলাকায় অবস্থিত (দ্র. খালাজ)। কিন্তু স্বয়ং গালযাঈগণ অংশত ও সম্ভবত প্রধানত আফগান বংশোদ্ভূত হইতে পারে। যাহা হউক, আফগানগণ গায্‌নাবী আমলে কোনরূপ রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। M. Longworth Dames (E.I.[1]) কিছু প্রাথমিক সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা পরে বিবৃত হইবে এবং পি. হাড়ি উহার সহিত আরও কিছু

সংযোজন করিয়াছেন। ৪৩১/১০৩৯-৪০ সালে মাসউদ স্বীয় পুত্র ঈযাদায়রকে গায্নীর নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহী আফগানদেরকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন (গার্দীযী, সম্পা. এম. নাজিম, ১০৯)। ৫১২/১১১৮-৯ সালে আর্সলান শাহ্ আরব, আজাম, আফ্গান ও খালাজদের সমন্বয়ে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। আলফীর বর্ণনা অনুসারে ৫৪৭/১১৫২-৩ সালে বাহ্রাম শাহ আফগান ও খালাজদের এক সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করেন। গূরী শক্তির উত্থান হইলে একই অবস্থা বিরাজ করিতে থাকে। ফিরিশ্তার মতে (বোম্বাই ১৮৩১, পৃ. ১০০ প.) ৫৮৮/১১৯২ সালে মু'ইয্যুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন সাম যে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন তাহা তুর্কী, তাজীক ও আফগানদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল এবং তাঁহার ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পিথোরায় (পৃথ্বীরাজ) রাজপুত ও আফগান অশ্বারোহী বাহিনীর সমাবেশ ঘটাইয়াছিল। মুসলিম ও হিন্দুদের এই মহাসমরে আফগানদেরকে উভয় পক্ষেই যুদ্ধ করিতে দেখা যায়, যাহা সম্ভবত ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করে, তাহারা তখনও ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হয় নাই, যদিও এই মর্মে বানোয়াট বর্ণনা (রিওয়ায়াত মাওদূ'আ) আছে, তাহারা খালিদ ইব্নুল-ওয়ালীদ (রা)-এর সময়েই ইসলামে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। ফিরিশ্তা তাঁহার এই উক্তি কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট নহে। মিন্হাজ-ই সিরাজ ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ দানকালে এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই, বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে, এই লেখক গায্নাবী ও গূরী বাদশাহদের সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের কোথাও আফগানদের কথা উল্লেখ করেন নাই। তাহাদের সম্পর্কে তিনি প্রথম ও একবার মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার যুগের ৬৫৮/১২৬০ সালে দিল্লীর সুলতান নাসি'রুদ্দীনের রাজত্বকালে। তিনি সেখানে বলেন (অনু. Raverty, পৃ. ৮৫২), উলুগ খান রাজপুতানার মেওয়াতের পার্বত্য উপজাতিগুলিকে দমন করিবার জন্য ৩০০০ সাহসী আফগান নিয়োগ করিয়াছিলেন। জুওয়ায়নীর মতে (১খ., ১৪২) ৬১৯ হি. মারব (Marw) লুণ্ঠনকারী মোঙ্গল বাহিনীর একাংশ খালাজ, গায্নাবী ও আফগান সমন্বয়ে গঠিত ছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দী কাল যাবৎ আমরা ভারতের ইতিহাসে আফগানদের উল্লেখ কদাচিৎ দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, বারানী তারীখ-ই ফীরূযশাহী (পৃ. ৫৭)-তে বলেন, বাল্বান ৬৬৪/১২৬৫ সালে গোপালপুরের আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আফগানদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। দস্যু দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত অপর তিনটি শহরেও দুর্গ নির্মাণ করিয়া আফ়গানদেরকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমীর খুস্রাও তাঁহার এক মাছ্'নাবী'তে এইরূপ দুর্গবাসী আফগানদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের সাজপোশাক ও কথাবার্তা সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দান করিয়াছেন (দীওয়ান তুহ্'ফাতুস্-সিগ'ার; দ্র. মুহাম্মাদ ওয়াহীদ মীরযা, Life and work of Amir Khusrau, ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৫১ প.)। বারানীর মতে (পৃ. ৪২৮) মুহাম্মাদ ইব্ন তুগ্লাকের রাজত্বকালে একদল আফগান মুলতান মাল্হ (মুল্তানী ভাষায় এই নামের অর্থ 'মুলতান রক্ষক' এবং ইহা সম্ভবত কোন আফগানের আসল নাম নহে)-এর নেতৃত্বে মুলতানে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। সিরহিন্দী (তারীখ-ই মুবারাকশাহী, কলিকাতা ১৯৩১ খৃ., পৃ. ১৬০) বলেন, এই বিদ্রোহ ৭৪৪/১৩৪৩ সালে সংঘটিত হইয়াছিল। আবার মাখ আফগান ছিলেন দেওগীরে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী বিদেশী আমীরদের অন্যতম। ৭৭৮/১৩৭৬-৭ সালে মালিক বীর আফগানকে বিহারের জমিদারী প্রদান করা হয় (তারীখ-ই মুবারাকশাহী, পৃ. ১৩৩)। তীমূর তাহাদেরকে তখনও পার্বত্য দস্যুরূপে দেখিতে পান এবং মাল্ফূজ'াত-ই তীমূরী, জা'ফার নামাহ্ ও মাত্'লা'উস্-সা'দায়ন গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, তিনি সুলায়মান পর্বতমালায় বসবাসকারী আওগানী (বা আগানী)-র দেশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। এইভাবে তাহারা এক হিংস্র পার্বত্য তস্করের জাতিতে পর্যবসিত হয়; ব্যতিক্রম ছিল শুধু কতিপয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। অবশেষে তাহাদেরই এক দুঃসাহসী নায়ক ভারতে ক্ষমতায় আরোহণ করিয়া তাহাদেরকে বিখ্যাত করিয়া তোলেন। ইনি হইলেন গালযাঈ শাখাভুক্ত লোদী বংশের দাওলাত খান লোদী। তিনি সাম্রাজ্যের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। বাহ্লূল লোদী ৮৫৫/১৪৫০ সালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন (দ্র. লোদী)। বাবুর (দ্র.) ৯৩২/১৫২৫ সালে এই রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটান; কিন্তু শের শাহ সূর অল্প দিনের জন্য (৯৪৪-৬৩/১৫৩৭-৪৫) আফগানদেরকে ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত করেন (দ্র. সূর)। ইহার ফলে বহু সংখ্যক গালযাঈ ও অন্যান্য পাঠান ভারতে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে আওরঙ্গযেব (দ্র.) বিভিন্ন উপজাতীয় পাঠানকে রোহিলখণ্ডে [দ্র.] (বেরীলী বিভাগ ইত্যাদি) জায়গীর দান করেন (আরও দ্র. রামপুর)। উল্লেখযোগ্য, রোহিল খণ্ড নাম পাশ্তূ শব্দ 'রোহীলা' হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ 'পর্বতবাসী' ও 'পাঠান'। ১৮৮৬ সালে Darmesteter-এর ভ্রমণকালেও রামপুরের নওয়াবের দরবারে কিছু কিছু পাঠান ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে ভারতের আফগান বসতি স্থাপনকারিগণ এখানকার অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া যায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানগণই কেবল ইহার ব্যতিক্রম।

ভারতে আফগানদের আগমন মধ্যযুগের শেষভাগে তাহাদের মহাসম্প্রসারণেরই একটি অংশ ছিল। তাহাদের এই সম্প্রসারণের পরিমাপ এইরূপ বিশাল ছিল যে, Dames (E.I.[1])-এর মতে আফগানগণ গূরী বংশের রাজত্বকাল পর্যন্তও সীমাবদ্ধ এলাকায় বসবাসকারী একটি গুরুত্বহীন পার্বত্য উপজাতি ছিল মাত্র বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। সুলায়মান খেল গালযাঈগণ লোহানীদেরকে গায্নীর পার্বত্য এলাকা হইতে বিতাড়িত করে এবং ১৫শ শতাব্দীতে বিতানীগণকে গোমাল গিরিপথের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে ঠেলিয়া দেয়। ইহার এক কিংবা দুই শতাব্দী পূর্বে খাটক (দ্র.) ও বাঙ্গাশগণ তাহাদের কোহাটের বর্তমান আবাসভূমির দিকে আগমন শুরু করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন বিবরণ অনুসারে য়ূসুফযাঈ ও তাহাদের মিত্র উপজাতিসমূহ ১২শ শতাব্দীতে কাবুলের উদ্দেশে তারনাক ও আরগাসান ত্যাগ করিয়াছিল। পরে ১৪শ শতাব্দীতে তাহারা কাবুল হইতে বিতাড়িত হইয়া পেশাওয়ারের সমতলভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেইখান হইতে সম্ভবত পূর্ববর্তী সময়ে আগমনকারী আফগানদের প্রতিনিধিত্বকারী

দিলাযাকদেরকে পিছনে হটাইয়া দেয় এবং নিজেরা পেশাওয়ারের উত্তরে পার্বত্য উপত্যকাসমূহে প্রবেশ করে (তু. য়ূসুফযাঈ)। তাহাদের পর ১৫শ শতাব্দীর প্রথমদিকে গোরিয়া খেলদের (মাহমান্দ প্রভৃতির) আগমন ঘটে। কিছু কিছু উপজাতি সিন্দুনদ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবে পৌছে।

মুগল শক্তির অধীন হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য সীমান্তের আফগান উপজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রথম প্রয়াস ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে যোদ্ধা কবি খুশ্‌হ'াল খান খাটক আরম্ভ করেন। কিন্তু আফগানদের প্রথম জাতীয় রাষ্ট্র গালযাঈ প্রধান মীর ওয়ায়সের নেতৃত্বে এবং আরও স্থায়ীভাবে আহ্‌মাদ শাহ দুর্‌রানীর কর্তৃত্বাধীনে ১৮শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় (দ্র. আফগানিস্তান, ইতিহাস অংশ)।

আফগান উপজাতীয় ঐতিহ্যের মৌল রূপরেখা আবুলফাদ্‌ল আকবারনামায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুলায়মান মাকূর তায্‌কিরাতু'ল আওলিয়াতে (১৩শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া কথিত) ও পো খাযানায় [এই সম্পর্কে নীচে (৩) দ্র.] সামান্য ভিন্নতর বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। উপজাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের প্রধান উৎস হইল নি'মাতুল্লাহ্‌র মাখ্‌যান-ই আফগানী (১৬১৩ খৃ. সমাপ্ত)। উহাতে প্রদত্ত বংশতালিকা, যাহা হ'য়াত-ই আফগানীর ন্যায় পরবর্তী গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ঐতিহাসিক উৎস হিসাবে নির্ভরযোগ্য নহে। তবে উহা ১৭শ শতাব্দীতে আফগানদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসমূহের সাক্ষ্য হিসাবে মূল্যবান। এই কাহিনী অনুসারে অধিকাংশ আফগান উপজাতির একক পূর্বপুরুষ ছিলেন ক'য়স 'আব্দুর্‌-রাশীদ যিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যিনি ছিলেন বাদশাহ তালূত (Saul)-এর পৌত্র আফগানার বংশধর।

ক'য়সের তিন পুত্র ছিল ঃ সার্‌বান, বাতান (বিতান) ও গুর্‌গুশ্‌ত। সারবানের ছিল দুই পুত্র ঃ শার্‌খ্‌বুন ও খার্‌শ্‌বুন। তাহাদের পরবর্তী শাখা বিস্তার নিম্নরূপে দেখানো যাইতে পারে ঃ

বিতান

ইসমা'ঈল (নিঃসন্তান) | ওয়ারস্‌পন | ওয়ারস্‌পন | মাতো (শাহ হুসায়ন গূরীর সহিত বিবাহিতা)

বিতান উপজাতি

মাতী উপজাতি

ইসমা'ঈল (নিঃসন্তান) | লোদী | সারওয়ানী (বর্তমানে বিলুপ্ত)

সূর | লোহানী (দাওলাত খেল, মিয়ান খেল, নিয়াযী, মারওয়াত, খাসোর ও তাতোর উপজাতিসমূহের পূর্বপুরুষ)।

গুর্‌গুশ্‌ত

দানায় | বাবায় | মানদ

কাকাড় (কাকাড় উপজাতি) (কোন কোন বিবরণ অনুসারে সিন্ধুর উপরিভাগের দাদুন উপজাতি কাকাড়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত) | নাগার উপজাতি | পানী | দাওয়ায়

পানী উপজাতি ঃ ইহারা-সিবির পানী, মূসা খেল, ইসোত, যমারায় (বা মযারায়) দেহ্‌পাল প্রভৃতি সমন্বয়ে গঠিত

যোবের মান্দু খেল উপজাতি
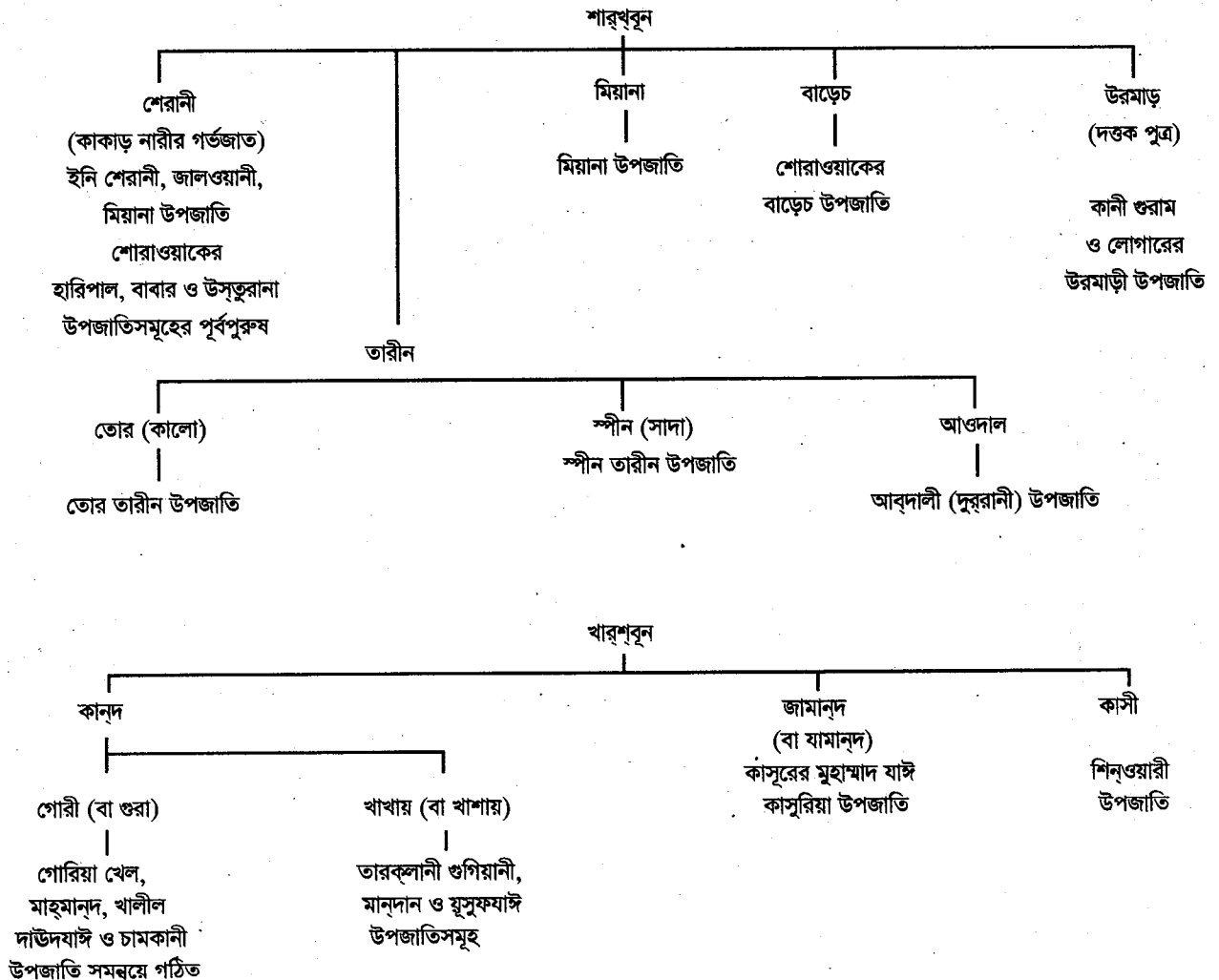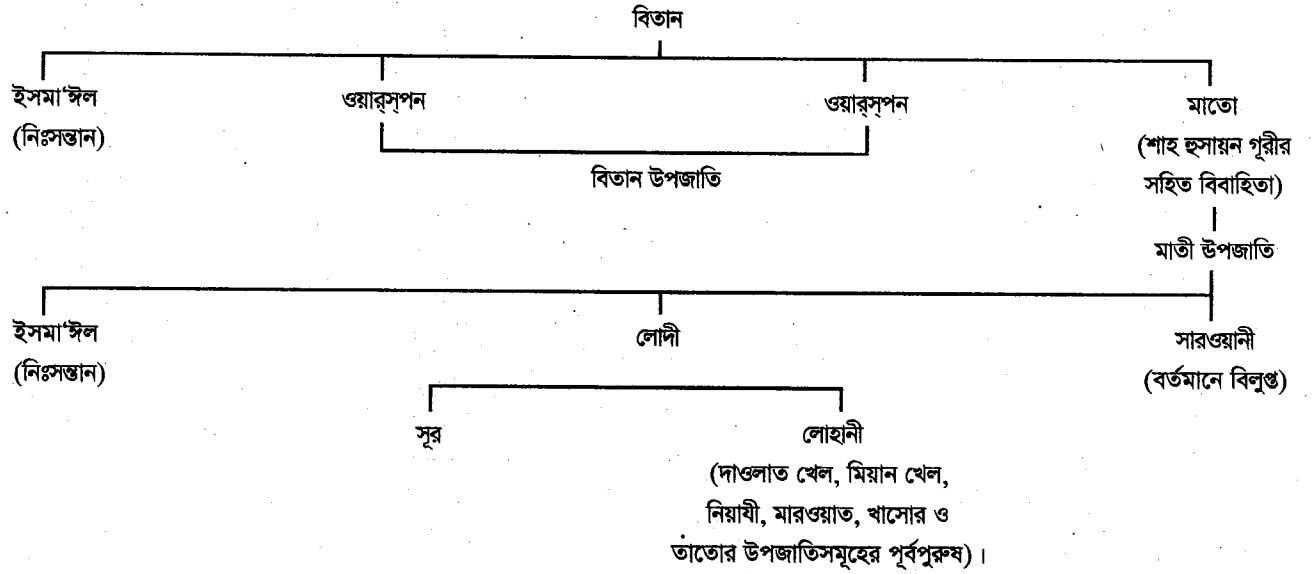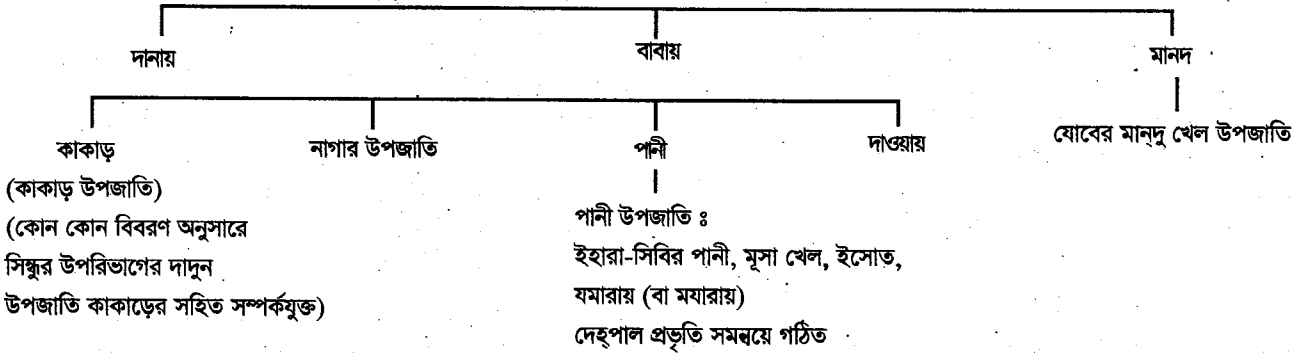
অবশিষ্ট উপজাতিসমূহের অধিকাংশই কারড়ান (বা কাড়লান)-এর বংশধর বলিয়া কথিত, যাহার বংশপরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে।
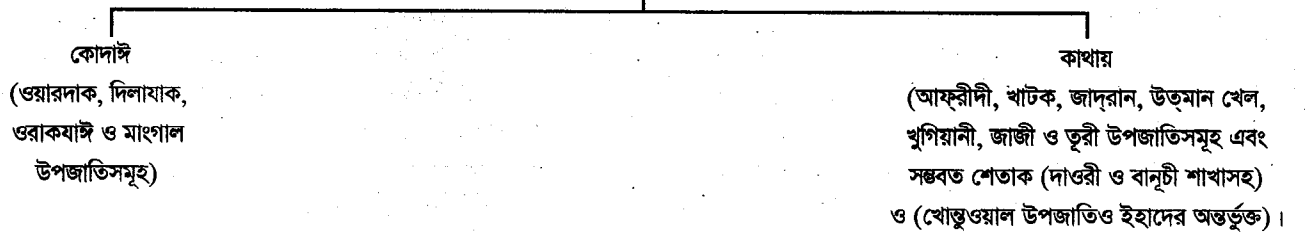
কোন কোন বিবরণ অনুসারে বাংগাশ (বাংগাখ) ও ওয়াযীরীগণ কাথায়-এর বংশধর; আবার অন্য বিবরণমতে ওয়াযীরী ও দাওর উপজাতিদ্বয় এই সকল বংশের কোনটির সহিতই সম্পৃক্ত নহে।

কোন কোন গোত্র সায়্যিদ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করে। ইহাদেরকে শেরানী, কাকাড়, কারড়ানী, দাওয়ায়, তারীন, মিয়ানা ও বিতানী উপজাতির মধ্যে দেখা যায়। গান্দাপুর ও উস্‌তারানা উপজাতিরাও অনুরূপ দাবি করিয়া থাকে, ইহারা মূলত শেরানীরই শাখা উপজাতি। বাংগাশরা কুরায়শ বংশের দাবিদার।

মাখ্‌যান-ই আফ্‌গানীতে উপরিউক্ত সকল উপজাতিকেই আফ্‌গানরূপে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে; তবে বাংগাশ, ওয়াযীরী ও কাথায় শাখাভুক্ত কারড়ানীগণ (আফ্রীদী প্রভৃতি) ইহার ব্যতিক্রম মনে হয়। লেখক কারড়ানীদের ব্যাপারে জ্ঞাত নহেন।

ইহা লক্ষণীয়, পাশতূ যে সকল আঞ্চলিক ভাষায় দীর্ঘস্বর পরিবর্তিত হইয়া যায় (যথা আ হইতে উ ইত্যাদি, নিম্নের (২) অংশ দ্রষ্টব্য) ঐগুলি কারড়ানী কিংবা ওয়াযীরী শ্রেণীর সহিত সম্পৃক্ত। অত্যন্ত জটিল উপজাতীয় রীতিনীতি বুঝিবার জন্য এখানে ইয়ূসুফযাঈদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাদের পাঁচটি শাখা উপজাতির অন্যতম আকোযাঈগণ রানীযাঈ ও অপর কয়েকটি প্রশাখায় বিভক্ত । রানীযাঈদের পাঁচটি গোত্রের একটি আবার গায়বী খেল ও অপর তিনটি গোত্রে বিভক্ত এবং গায়বীদের দুইট গোত্রের একটি নূর মুহাম্মদ খেল আবার গারীব খেল ও দাওড়া খেলে বিভক্ত। ইহাও লক্ষণীয়, খটকদের অন্যতম পিতৃপুরুষ তোরমান ও ভারতের হূন রাজা ও শাহী রাজপরিবারের সদস্য তোরমানা সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। ইহার অর্থ এই, রূপকথার আফ্গান ও এই রাজপুরুষদের মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং ইহা দ্বারা এইটুকুই বুঝায়, স্থানীয় কাহিনীসমূহে ঐ নামটি আজও টিকিয়া আছে।

আফগান উপজাতিসমূহের ভৌগোলিক অবস্থানঃ সাব্যাওয়ার ও যামীনদাওয়ার হইতে কান্দাহার ও চমনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত এলাকার নদীর নিম্ন উপত্যকাসমূহে দুররানীদের (দ্র.) বসবাস। পোপালযাঈ (রাজকীয় গোত্র সাদোযাঈসহ) ও বারাক্যাঈগণ ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। দুররানীদের পরেই গাল্যাঈগণ (দ্র.) অত্যন্ত শক্তিশালী উপজাতি এবং ইহারা দীর্ঘকাল যাবত তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কালাত-ই গিলযাঈ ও জালালাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ইহাদের বসতি। প্রথমে হোতাকগণ ইহাদের নেতৃস্থানীয় শাখা ছিল। বর্তমানে ইহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হইতেছে সুলায়মান খেল। পোবিন্দা নামে খ্যাত সেই সকল যাযাবর শ্রেণীর লোক যাহারা শরৎকালে গোমাল ও তোচী গিরিপথ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুর তীরে আসিয়া উপনীত হয় এবং বসন্তকালে আফ্গানিস্তানে ফিরিয়া যায়, তাহারা এই সুলায়মান খেল শাখারই লোক। খারোটিদের সম্পর্ক রহিয়াছে গাল্যাঈদের সহিত। বেলুচিস্তানের পিশিন ও যোব জেলায় কাকাড় ও তারীন উপজাতি বাস করে। সিবির পানীগণ তাহাদের প্রতিবেশী। যোবের উত্তর-পশ্চিমে তাখ্ত-ই সুলায়মানের চারিপার্শ্বে শেরানীদের দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়াযীরীগণ [দ্র.] (যাহারা দারবেশ খেল ও মাহমূদ এই দুই শাখায় বিভক্ত) গোমাল ও কুররাম নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য এলাকায় সীমান্তের উভয় পার্শ্বে বসবাস করে। পূর্বদিকে পর্বতের পাদদেশে রহিয়াছে বিতানী ও লোহানীগণ এবং কুররাম নদীর নিম্নভাগের দক্ষিণে সমতলভূমিতে রহিয়াছে মারওয়াত উপজাতির বসতি। তোচী উপত্যকায় দাওরী ও বানূচীগণ বসবাসরত। খটকদের বাস কোহাটের সমতলভূমিতে এবং তাহা আটক পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কুরড়াম নদীর উপরিভাগের উপত্যকায় বাস করে বাংগাশ, শী'আ তুরী ও অন্য উপজাতীয়রা এবং সীমান্তের আফ্গান পার্শ্বে রহিয়াছে জাজীগণ স্বীয় প্রতিবেশী মোঙ্গল ও খোস্তওয়ালসহ। বাংগাশের উত্তরে ওয়াকযাঈ (কতিপয় শি'আ গোত্র সহকারে)-দের বাস এবং তিরাহ খায়বার ও কোহাট গিরিপথে সীমান্তের উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে আফ্রীদীগণ (দ্র.)। আর তাহাদের উত্তরে হইল শিনওয়ারীদের নিবাস। কাবুল নদীর উত্তরে আফ্গানিস্তানও পেশাওয়ার জেলার এক বিরাট অংশ মাহমান্দের অধিকারভুক্ত আর তাহাদের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে পেশাওয়ারের খালীলদের। মাহ্মান্দদের পূর্বে, পেশাওয়ার অঞ্চলে এবং উত্তরে পাহাড়ী এলাকায় (বুনের, সোয়াত, দীর প্রভৃতি) য়ূসুফযাঈ [দ্র.] ও উহাদের মিত্র উপজাতি (মান্দান) প্রভৃতির বাস। তাহারা সেখানে দার্দীয় অধিবাসীদেরকে পিছনে হটাইয়া দিতেছে এবং নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতেছে। তথাকথিত সোয়াতীগণ শঙ্কর জাতি, য়ূসুফযাঈগণ ইহাদেরকে সিন্ধুর অপর তীরে হাযারা জেলায় বিতাড়িত করিয়া দেয়। কুনাড় উপত্যকায় ও উত্তর-পূর্ব আফ্গানিস্তানের অন্যান্য স্থানে সাফীগণ রহিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে পাশতূভাষী আফ্গানগণ হিন্দুকুশের উত্তরে বিভিন্ন স্থানে ও হিরাত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে অথবা তাহাদের বসতি স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ হায়াত Bellew ও Raverty-এর গ্রন্থাবলী দ্র., যাহার উদ্ধৃতি 'আফগানিস্তান' প্রবন্ধের ২য় অংশে প্রদত্ত হইয়াছে; (২) Elphinstone-এর গ্রন্থ, যাহা আফ্গানিস্তান প্রবন্ধের ১ম অংশে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; (৩) H.A. Rose, A Glossary of Tribes and Castrs of the Punjab and the N. W. Frontier province, লাহোর ১৯১১-৯, বিশেষভাবে পাঠান শীর্ষক আলোচনা দ্র.; (৪) H. C. Willy, From the Black Mountain to Waziristan, লণ্ডন ১৯১২ (সীমান্তের পাঠান উপজাতি সম্পর্কে)।

(২) পাশ্তূ ভাষা

দক্ষিণ-পূর্ব আফ্গানিস্তানের জালালাবাদের উত্তরাঞ্চল হইতে কান্দাহার পর্যন্ত এবং তথা হইতে পশ্চিমে সাব্যাওয়ার পর্যন্ত অঞ্চলের লোকে পাশ্তূ ভাষায় কথা বলে (কাবুল এলাকা প্রধানত ফার্সী ভাষাভাষী, গায্নীও তদনুরূপ)। উত্তর ও পশ্চিম আফ্গানিস্তানের নূতন বসতি স্থাপনকারিগণও পাশ্তূ বলে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাশিন্দাগণের মধ্যে দীর ও সোয়াত হইতে দক্ষিণ অভিমুখী অঞ্চলে পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে এবং বেলুচিস্তানের দক্ষিণে কোয়েটা পর্যন্ত এলাকায় পাশ্তূ ভাষা প্রচলিত। এখানকার পাশ্তূভাষীর সর্বমোট সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ।

পাশ্তূ মূলত ও গঠন প্রণালী অনুযায়ী একটি ইরানী ভাষা, যদিও ইহা ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে প্রচুর উপাদান গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে সকল সাধারণ ইরানী ধ্বনি-রূপান্তর বিদ্যমান। পূর্ব ইরানী ভাষাসমূহের সহিত ইহার মিল লক্ষণীয়। আদিতে ইহা সম্ভবত একটি 'শক" ভাষা ছিল, যাহার প্রচলন হইয়াছিল উত্তর দিক হইতে। তবে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সম্পর্ক নিরূপণ করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন ধ্বনি রূপান্তর ইরানী ভাষা হইতে আগত অধিকাংশ শব্দের রূপ আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে যেরূপ পরবর্তী পৃষ্ঠার কতকগুলি পাশ্তূ শব্দ ও উহাদের মূল ফার্সী প্রতিশব্দের মধ্যকার তুলনা হইতে প্রতিভাত হইবে। যথাঃ

পাশ্তু শব্দ	বাংলা অর্থ	মূল ফার্সী প্রতিশব্দ
-	-	-
দ্রে	৩	সিহ্
সালোর	৪	চাহার
শাপাগ	৬	শশ

ওঅ	৭	হাফ্ত
আটঅ	৮	হাশ্ত
নাস	১০	দাহ
(ও) শল	২০	বীসত
মোর	মাতা	মাদার
লুর	কন্যা	দুখ্তার
গওয়াগ	কান	গোশ
যড়এ	অন্তঃকরণ	দিল
সোড়	ঠাণ্ডা	সর্দ
উস্ত্র	উট	উশ্তুর
য়গ	ভল্লুক	খিরস
গড়ন	ভুট্টা	আরযান
পক্ষত-অম	আমি জিজ্ঞাসা করি	পুরস-আম

উল্লেখ্য যে, উচ্চারণকালে অপেক্ষাকৃত জোর প্রদান একটি প্রাসঙ্গিক উপাদন হিসাবে অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং ছন্দ উহার উপরই স্থাপিত, পরিমাণের উপর নহে।

ধ্বনির রূপান্তর ও অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণের ফলে পাশ্‌তু ভাষায় ফারসী ভাষা বহির্ভূত অনেক ধ্বনির আমদানী ঘটিয়াছে।

বায়াযীদ আন্‌সারী ও তাঁহার উত্তরসুরিগণ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির বর্ণমালার প্রবর্তন করিয়াছেন। অন্যান্য উচ্চারণগত পার্থক্য ও বিভিন্ন চিহ্ন প্রবর্তনের বিষয়াদি প্রধানত অভিধানসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

পাশ্‌তু ভাষার শব্দ প্রকরণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ (১) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যকার পার্থক্য; (২) বিভিন্ন প্রকারের শব্দরূপ, বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে শব্দরূপের পরিবর্তন; (৩) নামপুরুষের একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্যহীনতা এবং (৪) সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালের জন্য তথাকথিত কর্মবাচ্য বাক্য গঠন (যথাঃ 'যতা ওয়াহম'-আমি তোমাকে আঘাত করি; কিন্তু 'যতা ওয়াহলম'— তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছিলে)।

(৩) পাশ্‌তু সাহিত্য

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত পাশ্‌তু ভাষায় ১৭শ শতাব্দীর পূর্বেকার কোন সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু Almanach de Kabul, ১৯৪০-১ (দা কাবুল সালনামাহ্) গ্রন্থে 'আবদুল-হ'ায়্যি হ'াবীবী সুলায়মান মাক্‌-র তায্‌কিরাত-ই 'আওলিয়া' পুস্তকের অংশবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতা সম্বলিত উক্ত অংশবিশেষের রচনাকাল ১১শ শতাব্দী বলিয়া কথিত। ১৯৪৪ সালে তিনি মুহাম্মাদ হোতাকের পটা খাযানা গ্রন্থ কাবুলে প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে দাবি করা হয়, উহা কান্দাহারে বসিয়া লিখিত (১৭২৯ খৃ. সমাপ্ত) এবং ৮ম শতাব্দী হইতে সংকলকের সময়কাল পর্যন্ত সময়ের পাশ্‌তু কবিদের একটি কবিতা সঙ্কলন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অনেক গুরুতর ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উহাদের পাণ্ডুলিপি ভাষাতাত্ত্বিক নিরীক্ষার জন্য প্রাপ্তব্য না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদের নির্ভুলতার প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে মীমাংসা করা যায় না, এমনকি খাযানার বিশুদ্ধতা মানিয়া লইলেও মুহাম্মাদ হোতাক প্রাচীনতম কবিতাসমূহের যে তারিখ প্রদান করিয়াছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়। Raverty-র মতে শায়খ মারী ১৪১৭ খৃ., য়ুসুফযাঈদের একখানা ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না [দ্র. য়ুসুফযাঈ]। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তি বায়াযীদ আন্‌সারী (মৃ. ১৫৮৫ খৃ.)-র খায়রুল বায়ান সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বিদ্যমান আছে এবং উহা নিরীক্ষা করা হইয়াছে। ১৭শ শতাব্দীর প্রাথমিক কাল হইতে আমাদের নিকট উক্ত লেখকের গোঁড়া বিরোধী আখুন্দ দারওয়াযার (দ্র. রাওশানিয়্যা) তীব্র নিন্দায় পরিপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি (মাখ্‌যান-ই আফ্‌গানী) ও মাখ্‌যান-ই ইসলাম রহিয়াছে। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ফার্সী পদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইউরোপীয় মান অনুসারে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও আধুনিক আফ্‌গানিস্তানের জাতীয় কবি হইলেন খোশহ'াল খান [দ্র.] (১০২২-১১০৬/১৬১৩-৯৪), যিনি খটক উপজাতি-প্রধান, দেশপ্রেমিক, যোদ্ধা ও বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ততায়, প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তায় ও স্বাধীন চেতনার প্রকাশে অত্যন্ত সুন্দর। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেও অনেক কবি ছিলেন এবং তাহার পৌত্র আফ্‌দ'াল খান তারীখ-ই মুরাস্‌'স'া' নামে আফ্‌গানদের একখানা ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীনতম সাধক ছিলেন মীর্যা। তিনি বায়াযীদ আন্‌সারীর পরিবারের লোক ছিলেন; কিন্তু অত্যধিক জনপ্রিয় ছিলেন 'আবদুর-রাহ'মান ও 'আবদুল-হ'ামীদ (উভয়ই আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর)। দুর্‌রানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ শাহও একজন কবি ছিলেন। এতদ্ব্যতীয় ফার্সী সাহিত্যের অসংখ্য অনুবাদ এবং ইরানী ও আফগান লোককাহিনীর কাব্যান্তর করিয়াছেন। আদম খান, দুর খানাযাঈ প্রমুখ Darmesteter কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত লোকগীতি, লোকগাঁথা ইত্যাদি বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক। সম্প্রতি কাবুলের আফ্‌গান একাডেমী লোকগীতির একটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছে, যাহাতে প্রধানত তথাকথিত লান্‌দাঈ বা মিস্‌রা এক বিশেষ পরিমাপের দুই চরণবিশিষ্ট গীতি-কবিতা স্থান লাভ করিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি অত্যধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। আফ্‌গানিস্তানে আজকাল আধুনিক পাশ্‌তু কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকাশ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পাশ্‌তু একাডেমী অন্যান্য সাহিত্য কর্মও প্রকাশ করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (২য় ও ৩য় অংশের জন্য) : (১) W. Geigr Sprache der Afghanen, in Grundriss der Iran, Philologie, ১/২ (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (২) G. A. Grierson, Linguistic Survey of India, ১০খ. (বিশদ গ্রন্থপঞ্জীসহ, ১৪-৬); (৩) H. G. Raverty. Grammar, লন্ডন ১৮৬৭; (৪) ঐ লেখক, Dictionary, লন্ডন ১৮৬৭; (৫) ঐ লেখক, গুলশান-ই রোহ (নির্ধারিত উদ্ধৃতাংশ), লন্ডন ১৮৬০; (৬) ঐ লেখক, Selections from the Poctry of the Afghans, লন্ডন ১৮৬৪; (৭) H. W. Dellew, Grammar, লন্ডন ১৮৬৭; (৮) ঐ লেখক, Dictionary, লন্ডন ১৮৬৭; (৯) Trumpp, Grammar, লন্ডন-টুবিনগেন ১৮৬৩; (১০) J. Darmesteter, Chants Populaires des Afghans. প্যারিস ১৮৮৮-৯০; (১১) T. P.

Hughes,কালীদ-ই আফগানী, পেশাওয়ার ১৮৭২; অনু. Plowden, লাহোর ১৮৭৫; (১২) J. G. Lorimer, Grammar and Voc. of Waziri Pashto, কলিকাতা ১৯০২; (১৩) D. L. R. Lorimer, Syntax of Colloquial Pashtu, অক্সফোর্ড ১৯১৫; (১৪) Malyon, Some Current Pashtu Folk stories, কলিকাতা ১৯০২; (১৫) Gilbestson, The Pakhto Idiom. A. Dictionary, লন্ডন ১৯২৩; (১৬) Cox, Notes on Pushtu Grammar, লন্ডন ১৯১১; (১৭) G. Morgnastierne, Etymological Voc of Pashto, ওসলো ১৯২৭; (১৮) ঐ লেখক, Archaisms and Innovations in pashto Morphology, Norsk Tidskrift for Sprogwidenskap, ১২; (১৯) ঐ লেখক, The Wanetsi Dialect, ঐ, ৪খ.; (২০) W. Lentz, Sammlungen zur afghanischen Literatur-und Zeitgeschichte, ZDMG, ১৯৩৭, ৭১১ প.; (২১) ঐ লেখক, Die Pasto Bewegung, ZDMG, ১৯৪১, ১১৭ প.; (২২) H. Penzl, on the Cases of the Afghan Noun, Word, ৬খ.; (২৩) ঐ লেখক, Afghan Descriptions of the Afghan Verb, JAOS, ১৯৫১; (২৪) ঐ লেখক, Die Substantive nach Afgh.Grammatikern, ZDMG, ১৯৫২, গ্রন্থপঞ্জীসহ; (২৫) মুহাম্মাদ আজাম ইয়াযী, Las Zera Paxto Lughatuna, কাবুল ১৯৪১; (২৬) মুহাম্মাদ গুল মাহমান্দ, Paxto Sind, কাবুল ১৯৩৭; (২৭) Da Paxto Kili, কাবুল ১৯৩৯-৪০, Paxto Tolana কর্তৃক প্রকাশিত; (২৮) পাখ্তু কামূস, কাবুল ১৯৫২-৪ খৃ.।

G. Morgenstierne (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আফগানিস্তান (افغانستان) ঃ (১) ভূগোল; (২) জাতিগত বিভাগ; (৩) ভাষা; (৪) ধর্ম; (৫) ইতিহাস।

(১) **ভূগোল** ঃ যে দেশটি আজ আফগানিস্তান নামে পরিচিত এই নামে ইহার পরিচিতি ঘটিয়াছে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে [১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে] অর্থাৎ যখন হইতে আফগান জাতির রাষ্ট্রীয় আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্বে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক পৃথক নাম থাকিলেও সমগ্র দেশটির কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক একক ছিল না এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বংশগতভাবে কিম্বা ভাষাগতভাবে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধও ছিল না। পূর্বে আফগানিস্তান শব্দের সরল অর্থ ছিল আফগানদের আবাসভূমি। তখন ইহা একটি সীমিত অঞ্চল ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত উহার অনেকগুলিই তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অবশ্য পূর্বে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন কিছু বড় বড় অঞ্চল বর্তমানে হয় স্বাধীন হইয়া গিয়াছে অথবা পাকিস্তানের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। বারাকযাঈ বাদশাহদের (সাবেক আমীর) অধীনে গঠিত আধুনিক আফগানিস্তান উত্তরে ২৯০° ৩০ ও ৩৮°-এর মধ্যে এবং পূর্বে ৬১° ও ৭৫°-এর মধ্যে (ওয়াখানের লম্বা ফালিকে বাদ দিলে ৭১° ৩০ পূর্বে) বিসম আকৃতির পরিসীমাভুক্ত একটি অঞ্চল।

ভূ-গঠন প্রকৃতি ঃ ইরানের বৃহৎ মালভূমির উত্তর-পূর্ব অংশের সমন্বয়ে এই দেশটি গঠিত। ইহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে উত্তর দিকে মধ্যএশিয়ার নিম্নভূমি অঞ্চল, পূর্বে সিন্ধুর সমভূমি অঞ্চল এবং পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ; আর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হইতে হইতে মালভূমির মধ্যাঞ্চল জুড়িয়া বিরাজমান নিম্ন ভূ-ভাগে যাইয়া লীন হইয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে ইহা বেলুচিস্তানের পর্বতমালার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। উচ্চভূমির উত্তরাংশের প্রতিবন্ধক পর্বতমালা পামীর হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। বান্দ-ই তুর্কিস্তান ইহার বহিস্থ শৈল শিরা (ridge), যাহার পরেই আমূ দরিয়া (Oxus) পর্যন্ত বিস্তৃত বালু আর মিহি মাটির সমভূমি। পূর্ব দিকে সহসা সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া ইহার অধোগতি ঘটিয়াছে। তাই দেখা যায়, তুর্কিস্তানের মসৃণ মাটিময় সমভূমি বাদ দিলে সমগ্র দেশটিই মালভূমির অন্তর্ভুক্ত। এই মালভূমির ভূতাত্ত্বিক গঠন মূলত বেলে পাথর ও চুনা পাথর দ্বারা তৃতীয় যুগের (Tertiary Period) শেষ পর্যায়ে হইয়াছে। অতীতে মালভূমির উত্তর-পূর্বাংশ বিরাট মহাসাগরের অংশবিশেষ ছিল, যাহা কাস্পিয়ান অববাহিকা অঞ্চলকে পাকিস্তানের সমভূমি অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল। ভূমি গঠনের যে প্রক্রিয়ায় ইহার উত্থান তাহা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। Holdich-এর ধারণা, নদীগুলিতে মাটি ক্ষয়করণ তৎপরতা অত্যন্ত মন্থর হওয়ায় উহা উর্ধ্বমুখী গতিধারার সহিত সমান তালে চলিতে পারে না। ফলে নদীগুলিতে অসাধারণ গভীর খাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

পর্বতমালার বিবরণঃ আফগানিস্তানের উত্তরের পর্বতমালার গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে এবং উপরিউক্ত মালভূমির উত্তর প্রান্ত গঠন করিয়াছে। এই পর্বতমালা উত্তরে অবস্থিত তুর্কিস্তানের জেলাগুলিকে (প্রাচীন ব্যাকুটিয়া–Bactria) দক্ষিণে অবস্থিত কাবুল, হেরাত ও কান্দাহার-এর (প্রাচীন আরিয়ানা-Ariana ও আরাকোসিয়া-Arachosia) প্রদেশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই প্রধান পর্বতমালা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন পূর্বদিকে ইহার নাম হিন্দুকুশ (দ্র.), যেখানে ইহা পামীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; আরও পশ্চিমে ইহার নাম কুহ্-ই বাবা; হিরাতের সন্নিকটে ইহা কুহ-ই সাফীদ ও সিয়াহ বুবুক নামে অভিহিত। শেষোক্ত পর্বতটি সাধারণত পারোপামিসাস (Paropamisus) নামে পরিচিত যদিও আসল Paropamisus (অথবা টলেমী বর্ণিত পারোপানিসাস Paropanisus)-এ হিন্দুকুশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত এলাকার বৃহৎ অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে শৈলশ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্‌গত অসংখ্য পাহাড় যাহা পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে অথবা অধিক সচরাচর উত্তর-পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণী ও ইহার অন্তস্থ উপত্যকাসমূহ লইয়া হিরাত ও কান্দাহার প্রদেশের বৃহৎ অংশ গঠিত। উপরন্তু কাবুল ও কুরাম নদীর উপত্যকা এবং কাবুল ও নুরিস্তান প্রদেশ পূর্ব হিন্দুকুশের দক্ষিণে অবস্থিত অবিন্যস্ত বিশাল পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃংগ হইতেছে কুহ্-ই বাবার শাহ ফুলাদী (১৬,৮৭০ ফুট/ ৫১৫৮ মিটার) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে দীর্ঘ পর্বত শাখা চলিয়া গিয়াছে উহার সর্বোচ্চ শৃংগের পরিমাপ প্রায় ১১০০০ ফুট/৩৩৫৩ মিটার। যে সমস্ত শৈলশিরা

(ridges) হিলমন্দ, তারনাক আরগান্দাব ও আরগাসান উপত্যকাসমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে উহারাও এই পর্বতমালার বহিঃস্থ শাখা এবং উহার সন্ধান দক্ষিণ-পূর্বে বেলুচিস্তানের অভ্যন্তরেও পাওয়া যাইতে পারে।

সুলায়মান (দ্র.) পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃংগ তাখ্‌ত-ই সুলায়মান, উচ্চতা ১১,২০০ ফুট/ ৩১৪৫ মিটার যাহা অবশেষে সিন্ধু উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া শেষ হইয়াছে এবং মালভূমির পূর্ব প্রান্তে ইহা অবস্থিত। ইহা আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় সীমানার বহির্ভূত। মালভূমির এই পূর্ব প্রান্তের আরও উত্তরে কুরাম ও গুমাল নদীর মধ্যভাগে যে পাহাড় বর্তমান রহিয়াছে উহা আরও অবিন্যস্ত। উহার শৃংগসমূহের উচ্চতা ১১০০০ ফুট/৩৩৫৩ মিটার-এরও বেশী।

উপরন্তু আরও উত্তরে কুরাম ও কাবুল নদীর উপত্যকার মধ্যভাগে সাফীদ কূহ্ অবস্থিত। ইহা হিন্দুকুশ ও কুহ্-ই বাবার পরই আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতমালা (সর্বোচ্চ শৃংগ ত্রিকারাম ১৫,৬০০ ফুট/৪৫৪৩ মিটার)।

নদ-নদী ঃ হিন্দুকুশ হইতে উত্তর দিকে দেশটির ভূপৃষ্ঠ আমু দরিয়ার উপত্যকাভিমুখে দ্রুত নামিয়া গিয়াছে। উপরন্তু দক্ষিণ দিকে উপত্যকাসমূহ ক্রমে ক্রমে সীস্তানের নিম্নভূমির দিকে ঢালু হইয়া নীচু হইয়া গিয়াছে। হিলমন্দ হামূন (হিলমন্দ হ্রদ) ও উহার শাখা গুদ-ই যিরাহ ইহাতে অবস্থিত। সিন্ধু নদের ধারাসমূহ ব্যতীত হিন্দুকুশের দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত নদী এই নিম্নভূমিতে পড়িয়াছে। অতএব, স্বভাবতই নদ-নদীগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ যথা ঃ (১) সিন্ধু শ্রেণী; (২) হিলমান্দ শ্রেণী ও (৩) আমু দরিয়া শ্রেণী।

কাবুল (দ্র.) নদ ও ইহার উপনদীগুলি সিন্ধু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উপনদীগুলির মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নদী। তাগাও ও কুনার হিন্দুকুশ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত এবং লুগার নদী গুল কুহ হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। এই শ্রেণীর দক্ষিণের নদী কুমার পাওয়ার (Paywar) পাহাড় হইতে উৎসারিত। উহার উপনদীর নাম তোচী, যাহার ভাটি অংশ গাম্বীলা নামে পরিচিত। এই নদী পর্বতমালার পদদেশে অবস্থিত পাকিস্তানের ভূখণ্ডে আসিয়া কুরাম নদীর সহিত মিলিয়াছে। আরও দক্ষিণে কুন্দার ও যোব নদীর সংগমে গঠিত গুমাল নদী ওয়াযীরিস্তান পর্বতশ্রেণীকে তাখত-ই সুলায়মান হইতে আলাদা করিয়াছে। এই নদীগুলি ছোট হইলেও ইহাদের বিস্তৃত এলাকার পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা রহিয়াছে, এমনকি উহারা হিন্দুস্তান ও মালভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত গিরিমালা দিয়া সামরিক ও বাণিজ্যিক যাতায়াতের সুগম রাস্তা করিয়া দিয়াছে। অন্যান্য ছোট নদী, যেমন ওয়াহুআ (Wahua), লুনী, কাহা ও নারী আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া ঐ একই কাজ সমাধা করিতেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই নদীসমূহের অধিকাংশই পর্বতমালা দ্বারা গঠিত প্রাকৃতিক উপত্যকা বাহিয়া প্রবাহিত হয় না, বরং উহারা সুলায়মান পর্বতমালার রেলে পাথর ও চুনাপাথরময় শৈলশিরা বাহিয়া তীর্যকভাবে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় বা হিলমান্দ শ্রেণী হিলমান্দ নদী, ইহার উপনদীসমূহ ও অন্যান্য নদী লইয়া গঠিত। উহারা দক্ষিণ-পশ্চিমে সীস্তানের নিম্নভূমি অভিমুখে প্রবাহিত। হিলমান্দ (দ্র.) বা হিরমান্দ (আবেস্তায় বর্ণিত হায়তুমান্ত Haetumant; প্রাচীন লেখকদের বর্ণনায় ইতাইমানদ্রুস-Etaymandrus) ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহা কাবুলের উপকণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া সংকীর্ণ পর্বত উপত্যকাগুলির মধ্য দিয়া যামীন দাওয়ারের অপেক্ষাকৃত মুক্ত এলাকা বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে ইহা আরগান্দাব হোরাহ্ওয়েতি (Horawaiti) আরাশোতিস (Arachotis)-এর বাম তীরে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত নদীটি আবার উচ্চ আরগানদাব, তারনাক ও আরগাসান (অথবা আরগাসতান =Arghastan)-এর সংগমে গঠিত হইয়াছে। এই নদীগুলি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখী প্রায় সমান্তরাল উপত্যকাগুলির পানি নিষ্কাশন করে। এই একই গতিধারার অন্য একটি সদস্য গযনী হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা হিলমান্দ শ্রেণীর সহিত কখনও মিলিত হয় না, বরং ইহা আবিস্তাদাহ লবণ হ্রদে পতিত হয়। হিলমান্দের পশ্চিমে অবস্থিত অন্যান্য নদী ঐ একই সাধারণ নিয়মে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং উহা হামুনে যাইয়া পতিত হয়। এই নদীগুলির নাম খাশ রূদ, ফারাহ রূদ ও হারুত রূদ।

হামূন (দ্র.) নদীর অববাহিকা কালেভদ্রে, বিশেষ করিয়া প্রবল বন্যা মৌসুমে দক্ষিণ দিকে অতিশয় স্ফীত হয়। এই সময় কূহ্-ই খাজা পর্বত-দুর্গ দ্বীপে পরিণত হইয়া যায়। অতঃপর ইহা শীলাগ নামীয় নালা দিয়া গুদ-ই যিরাহ নামে পরিচিত নিম্নতর খাদে আসিয়া পতিত হয়। সীস্তানবিভক্তকারী আধুনিক সীমান্তরেখা অনুসারে হামূনের একটি অংশ আফগানিস্তানের ভাগে এবং অপরাংশ ইরানের ভাগে পড়িয়াছে। হামূন সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ১৫৮০ ফুট/ ৪৮১ মিটার উচ্চে অবস্থিত এবং গুদ-ই যিরাহ উহার চাইতে নিম্নে অবস্থিত। হামূনের পানি গড়পড়তা দশ বৎসর অন্তর একবার প্লাবিত হইয়া গুদ্-ই যিরাহ্-তে পতিত হয়। ইহার পানি ঈষৎ লবণাক্ত হইলেও পানোপযোগী। মাঝেমধ্যে প্লাবন হইবার কারণেই ইহার পানিতে লবণাক্ততা কম। যদিও নদীগুলির পানি নির্গমনের কোন পথ নাই এবং উহা নিম্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি লইয়া যায়, তথাপি সীস্তানের ভূমির উচ্চতা পূর্বের চাইতে বৃদ্ধি পায় নাই। সম্ভবত ইহার কারণ, বৎসরের বেশীর ভাগ সময় এই এলাকায় উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং উহা সমতল ভূমির হাল্কা মাটির স্তর উড়াইয়া লইয়া যায়।

তৃতীয় অর্থাৎ আমু দরিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আমু দরিয়া ও ইহার দক্ষিণ উপনদীসমূহ, এমনকি মুরগাব (দ্র.) ও হারী রূদও উত্তরদিকে সমভূমি এলাকায় প্রবাহিত হয়; কিন্তু উহা কখনও দরিয়ায় পৌঁছায় না। হারী রূদ (দ্র.) ব্যতীত এই সব নদীই বৃহৎ পার্বত্য প্রতিবন্ধকের উত্তর দিক হইতে নির্গত হইয়াছে। হারী রূদ কূহ্-ই বাবার দক্ষিণ দিক হইতে নির্গত হইয়া কূহ্-ই সাফীদ ও কূহ্-ই সিয়াহ এবং মধ্যখানে অবস্থিত এক সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে হেরাত সমভূমি এলাকায় প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে উহা উত্তর দিকে বাঁক লইয়াছে এবং একটি পার্বত্য খাদ অতিক্রম করিয়া যুল-ফিকার-এর অনতিদূরে রুশ তুর্কিস্তানের সমভূমি এলাকায় আসিয়া বিলীন হইয়াছে।

সাধারণ গঠন ঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম অভিমুখে পর্বতমালার উচ্চতা সাধারণত কম হইতে থাকায় অত্র এলাকায় যাতায়াতের অসুবিধা দূরীভূত হয়। এই কারণেই বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রয়োজনে হেরাত হইতে

কান্দাহার যাতায়াতের সুগম পথ হিসাবে যুগ যুগ ধরিয়া সাব্যাওয়ার, ফারাহ ও গিরিশ্কের ঘূর্ণিত পথই অবলম্বন করা হইত। পক্ষান্তরে কান্দাহার হইতে কাবুল ও গযনী যাইতে তারনাক উপত্যকার সোজা পথ ব্যবহৃত হয়। যেখানে পারোপামিসাস (Paropamisus) পর্বতের উচ্চতা কমিতে কমিতে যৎসামান্য অবশিষ্ট থাকায় সেই পথ দিয়া হেরাত হইতে তুর্কিস্তান প্রদেশে গমনাগমন খুবই সহজ, আবার ঐ একই দেশে কাবুল হইতে হিন্দুকুশের মধ্য দিয়া খাওয়াক, বামিয়ান ও অন্যান্য দুর্গম গিরিপথ ধরিয়া সরাসরি যাওয়া যায়।

তাই হেরাত, কান্দাহার ও কাবুল— এই তিনটি শহর প্রাকৃতিক অবস্থানগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের প্রতিটিই উর্বর উপত্যকায় অবস্থিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইহাদের প্রতিটিরই পরস্পরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে। আবার প্রতিটিই ভারত, ইরান, মধ্যএশিয়া ও অন্যান্য দেশ অভিমুখী গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম। সুতরাং আফগানিস্তানের স্বাধীন সত্তা টিকাইয়া রাখিতে ইহার শাসকদের এই তিনটি কেন্দ্র দখলে রাখা অপরিহার্য। এই তিনটি শহর যদি পৃথক পৃথক শাসন কর্তৃত্বের অধীন হয় তাহা হইলে দেশের সংহতি থাকিবে না। এই রাজনৈতিক কারণেই কাবুলের সহিত গযনী ও জালালাবাদ, কান্দাহারের সহিত প্রাচীন রাজধানী বুশ্তা গিরিশ্ক্ ও হেরাতের সহিত সাবযাওয়ারকে যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। হেরাত হইতে কান্দাহারগামী সুগম সড়কের উপর সীস্তান অবস্থিত বিধায় সর্বদা ইহা একটি বিতর্কিত ভূখণ্ড।

সর্বদিক দিয়া কাবুল এক শক্তিশালী অবস্থানে অবস্থিত এবং ফলে অন্য অঞ্চলগুলির চাইতে সাধারণত অধিকতর স্বাধীন। পক্ষান্তরে পশ্চিম ও উত্তরদিক হইতে হেরাত আক্রান্ত হইবার আশংকা প্রচুর এবং কখনও কোন বহিঃশত্রু হেরাত দখল করিয়া বসিলে সঙ্গে সঙ্গে কান্দাহারকেও হুমকির সম্মুখীন হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত হেরাতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমা হামলা হইতে কান্দাহারও মুক্ত থাকে। কাবুলের মত অত শক্তিশালী না হইলেও পাক-ভারত সীমান্ত বরাবর ইহার অবস্থান সুদৃঢ়।

হামুন (নদী) সংলগ্ন সীস্তান অঞ্চল উর্বর ও সেচোপযোগী। এই অঞ্চলটি পূর্ব দিক হইতে কান্দাহারগামী ও পশ্চিম দিক হইতে হেরাতগামী সড়কের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম-এমন অবস্থানে থাকায় ইহা আফগানিস্তানের শাসকগণের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলিয়া বিবেচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে উহা ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে বিভক্ত।

আবহাওয়া ঃ সমগ্র দেশের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। একদিকে গ্রীষ্মকালে সীস্তান, গর্মসীর ও আমুদরিয়া উপত্যকা এলাকায় প্রচণ্ড উত্তাপ, অন্যদিকে অত্যন্ত উন্মুক্ত অঞ্চলে তীব্র শীত, যেইখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবল তুষার ঝড় বিরল নহে। এই ধরনের শৈত্যে নিপতিত হইয়া সেনাবাহিনীকে যে ভীষণ দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছে তাহার নজীর ইতিহাসে সুবিদিত। হেরাত অঞ্চল হইতে যাহারা পর্বতমালার মধ্য দিয়া সম্রাট বাবুরের কাবুল অভিযান উহার একটি নজীর। অনেকেই মনে করেন, সম্রাট শাহজাহানের হিন্দুস্তানী সেনাদল এখানে আসিয়া মৃত্যুবরণ করায় এই পর্বতের নাম হইয়াছে হিন্দুকুশ (শাব্দিক অর্থ হিন্দু হন্তা)। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আব্দুর রাহমানের সেনাদল ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাদগীস-এ বৃটিশ বাউন্ডারী কমিশন (British Boundary Commission)-এর দুর্ভোগ দুইটি সাম্প্রতিক নজীর। প্রাত্যহিক তাপমাত্রার ব্যবধান প্রচণ্ড। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য ১৭° হইতে ৩০° ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে। বসন্ত ও শরৎ কালে উচ্চ উপত্যকাসমূহের আবহাওয়া পরিমিত ও সুখকর যাহা নানা ধরনের ফলমূল উৎপাদনে সহায়ক, যথা আঙুর, তরমুজ, খরমুজ, পীচ ফল, কুল, খুবানী, আখরোট ও পেস্তা বাদাম। কাবুল এলাকার বর্ণনায় সম্রাট বাবুর যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন আধুনিক কালের পর্যটকগণও উহাকে অত্যুক্তি বলিয়া মনে করেন না। হিন্দুকুশের অধিক উচ্চ অংশে যেখানে কাফির (Kafir) গোত্র বাস করে উহাতে সত্যিকারের আলপাইন (Alpine) আবহাওয়া বিরাজমান, হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়া সদৃশ। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এখানকার উদ্ভিদসমূহ ইরানী মালভূমির ও ভারতবর্ষের সমভূমির উদ্ভিদসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাগানে বর্ধিত উদ্ভিদ বাদে সমতল ভূমিতে অতি অল্প বৃক্ষলতাই দেখা যায়, যেমন ফলের গাছ, প্লেইন (Plane) বৃক্ষ ও পপলার (Poplar) বৃক্ষ। পক্ষান্তরে উচ্চ পর্বতমালায় বিবিধ প্রকারের পাইন বৃক্ষ ও চিরসবুজ এক বৃক্ষ ছাড়াও বন্য দ্রাক্ষালতা, আইভি (Ivy) লতা ও গোলাপ কুঞ্জ দেখা যায়। নিম্ন ও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পাহাড়গুলিতে বন্য পেস্তা বাদাম (Pistacia Khinjuk), বন্য জলপাই (Olea europca), জুনিপার (Juniper), জুনিপার বৃক্ষ (Juniper cxcelsa) রিওদান-reodan (Tecoma undulata) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃক্ষরাজি দেখা যায়। দেশের অনেক অংশেই আনুগ্যা বা হিং (Ferula assafotida) প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং নানা ধরনের বন্যফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বসন্তকালে নানা ধরনের বন্য ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে। উহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য আইরিস (Iris), লালা (Tulip), গুলনার (Poppy) ইত্যাদি।

রাজনৈতিক বিভাগ ঃ প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে দেশটি বিভক্ত হইয়াছে।

কাবুল ঃ কাবুল লুগার ও তাগাও নদীগুলির উজান অংশ ও গযনীর চতুর্দিকস্থ উর্বর উচ্চ উপত্যকাসমূহ এবং জালালাবাদের নিকট কাবুল উপত্যকার নিম্নাংশ কাবুল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। অতীতে এই অঞ্চলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল গযনী (দ্র.)। কিন্তু বিগত ৪০০ বৎসরের কাবুল (দ্র.) ইহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। মুগল বাদশাহ্দের আমলে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্র হিসাবে কাবুল স্বীকৃতি লাভ করে এবং দুররানী বাদশাহগণের আমলে কান্দাহারের পরিবর্তে রাজধানী হিসাবে গৃহীত হয়। ইহার সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী পেশাওয়ার সিন্ধুনদের সন্নিকটবর্তী নিম্নভূমি এলাকার উপজাতিদের স্বাভাবিক কেন্দ্র। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শিখগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়া অবধি ইহা আফগানিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা বৃটিশ ভারতের অংশ ছিল।

কান্দাহার ঃ প্রাচীন যামীনদাওয়ার প্রদেশ, হিলমান্দ, তারনাক ও দুররানীদের প্রধান আবাসভূমি আরগাসান-এর নিম্ন উপত্যকাসমূহ লইয়া কান্দাহার গঠিত। আরগানদাব নদীর তীরে অবস্থিত আধুনিক কান্দাহার

(দ্র.) শহর চতুর্দশ শতাব্দী হইতে প্রদেশের রাজধানী এবং ইহা প্রাচীনতর শহর গিরিশ্‌ক (দ্র.) ও বুশ্‌ত (দ্র.)-এর স্থান দখল করিয়া লইয়াছে।

সীস্তান ঃ (সীস্‌তান) সীস্তান [দ্র. সিজিস্তান] হামুন-এর চুতর্দিকে অবস্থিত উষ্ণ, উর্বর ও সেচকৃত একটি অঞ্চল। কিন্তু ইহার একটি বৃহৎ অংশ ইরানের অন্তর্ভুক্ত। এইখানে কোন বড় শহর নাই।

হেরাত ঃ (হারাত) হেরাত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলি হইতেছে হারিরূদের উর্বর উপত্যকা এবং হাযারা পর্বতমালা ও ইরান সীমান্তের মধ্যস্থানে অবস্থিত উন্মুক্ত ভূখণ্ড। এতদ্ব্যতীত হাযারা (দ্র.) ও চাহার আয়মাক (দ্র.) উপজাতি অধ্যুষিত এই পর্বতমালার একটি উল্লেখযোগ্য অংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার রাজধানী হেরাত শহর প্রাচ্যের ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী। ইহার প্রাচীন গৌরবের পতন ঘটিলেও আজও ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিবেচিত হয়। স্থায়ী শান্তি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবেশ প্রাপ্ত হইলে শহরটির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সাবযাওয়ার (দ্র.) অপর একটি সমৃদ্ধিশালী শহর।

হাযারিস্তান ঃ যে পার্বত্য জনপদে হাযারা ও চাহার আয়মাক উপজাতিদের আবাসভূমি উহা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে উত্তরে কুহ-ই বাবা, পশ্চিমে হেরাতের উন্মুক্ত ভূখণ্ড, পূর্ব ও দক্ষিণে হিলমান্দ উপত্যকা। প্রাচীন কালে এই ভূখণ্ডটি গূর (দ্র.) নামে পরিচিত ছিল। গূর নগরীর ধ্বংসাবশেষ সম্ভবত ফীরূয কুহ-এর পুরাতন রাজধানী স্থান। এইখানে গূরী সুলতানগণ দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। বর্তমানে কোন গুরুত্বপূর্ণ শহর নাই।

তুর্কিস্তান ঃ কূহ-ই বাবার উত্তর দিক দিয়া আমুরিয়া পর্যন্ত যে এলাকা চলিয়া গিয়াছে উহাই তুর্কিস্তান নামে পরিচিত। ইহার পুরাতন শহর বাল্‌খ (দ্র.) সাবেক গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং বর্তমানে প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ মাযার-ই শারীফ (দ্র.), তাশ্‌কুরগান ও মায়মানা (দ্র.)।

বাদাখ্‌শান ঃ হিন্দুকুশের উত্তরেও তুর্কিস্তানের পূর্বে আমু দরিয়ার বাম তীরে যে এলাকা অবস্থিত উহাই বাদাখশান (দ্র.) নামে পরিচিত। কুনদুয ও ইহার উপনদীগুলি দ্বারা ইহা সিঞ্চিত।

ওয়াখান ঃ আরও পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হইয়া যে দীর্ঘ উপত্যকা পামীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে উহাকেই ওয়াখান (দ্র.) বলে।

নূরিস্তান ঃ হিন্দুকুশ পর্বতমালার একটি অংশ। কাবুল উপত্যকার দক্ষিণে ও কুনার-এর পূর্বে ইহা অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা কাফির। পূর্বে ইহা কাফিরিস্তান (দ্র.) নামে পরিচিত ছিল। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে আবদুর রাহ্‌মান খান কর্তৃক ইহা বিজিত হইবার পর ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া নূরিস্তান করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) এম. আক্‌রাম, Bibliographie analytique de l'Afghanistan, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (২) M. Elphinstone, Caubul, লন্ডন ১৮৩৯-৪২ খৃ.; (৩) J.P. Ferrier. Carauan Jowrnerys লণ্ডন ১৮৫৭ খৃ.; (৪) A Burnes. Cabool. লণ্ডন ১৮৪২ খৃ.; (৫) N. Khanikon Bokhara, ইংরেজী অনু. v. Bode, লণ্ডন ১৮৪৫ খৃ.; (৬) H. W. Bellew, Afghanistan and the Afghans, লন্ডন ১৮৩৯ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, From the Indus to the Tigris, লন্ডন ১৮৭৫ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, Political Mission to Afghanistan, লন্ডন ১৮৬২ খৃ.; (৯) T. H. Holdich, The Indian Borderland, লন্ডন ১৯০১ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, Geographical Results at the Afghan Campaign Proc. of the R Geogr. Soc. 1879; (১১) Evan Smith, in F. J. Goldsmid, Eastern Persia, লন্ডন ১৮৭৬, ১খ, ২২৩, ৪২৮; (১২) C. Masson, Travels in Balochistan, Afghanistan, etc., লন্ডন ১৮৪৪ খৃ.; (১৩) G. T. Vigne, Ghazni, Kabul and Afganistan, লন্ডন ১৮৪০ খৃ.; (১৪) মোহনলাল, Travels in Punjab, Afghanistan, লন্ডন ১৮৭৬ খৃ.; (১৫) C. E. Yate, Northern Afghanistan, লন্ডন ১৮৮ খৃ.; (১৬) G. S. Thorburn, Bannu, লন্ডন ১৮৭৬ খৃ.; (১৭) Oliver, Across the Border, Pathan and Baloch, লন্ডন ১৮৯০ খৃ.; (১৮) A. H. Mac-Mahon, Southern Border-land of Afghanistan, Geogr, Journal, লন্ডন ১৮৯৭ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, Survey and Exploration in Seistan,ঐ Journal, ১৯০৬ খৃ.; (২০) P. Molesworth Sykes, Fourth Journey in Persia, ঐ Journal, ১৯০২ খৃ.; (২১) A. and P. Griesbach, Field Notes. Geol. Survey of India, xix ১, ১৪; (২২) A. Hamilton, Afghanistan, লন্ডন ১৯০৬ খৃ.; (২৩) F. A. G. Martin, Under the absolute Amir, লন্ডন ১৯০৭ খৃ.; (২৪) O. V. Nieder mayer, Afghanistan, Leipzig 1934; (২৫) E. Trinkler, Afghanistan, eine landeskundliche Studie, Gotha ১৯২৮; (২৬) ঐ লেখক, Quer durch Afghanistan, nach Indien, বার্লিন ১৯২৫ খৃ.; (২৭) R. Furon, L' Iran, Perse et l'Afghanistan, ২য় মুদ্রণ, প্যারিস ১৯৫১; (২৮) E. Dollot, L' Afghanistan, প্যারিস ১৯৩৭; (২৯) ইকবাল আলী শাহ্‌, Modern Afghanistan, লন্ডন ১৯৩৮ খৃ.; (৩০) V. Cervinka, Afghanistan, Structure economique et Social, commerce eXterieur, Lausanne ১৯৫০; (৩১) আল-বালাযু'রী, ফুতূহ', কায়রো ১৯০১; (৩২) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ, আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, লাইডেন হি. ১৩০৬ হি.; (৩৩) ইব্‌নুল-আছ'ীর, আল-কামিল, মিসর ১২৯০ হি.; (৩৪) আল-ইয়াকূবী, কিতাবুল-বুলদান, লাইডেন ১৮৯২; (৩৫) আল-মাসঊদী, মুরূজ, প্যারিস ১৮৬১।

M. Longworth Dames

জাতিগত বিভাগ

আফগানিস্তানের জনগোষ্ঠী কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) আফগান; (২) তাজীক ও অন্যান্য ইরানী, (৩) তুর্কী-মংগোলীয়; (৪) হিন্দুকুশ-ইন্দো-আর্য (কাফিরসহ)। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে এক আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ পর্যন্ত দাঁড়ায়। উহার মধ্যে ৫৩% আফগান, ৩৬% তাজীক, ৬% উযবেক, ৩% হাযারা ও ২% অন্যান্য। তবে এই হিসাবকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কোন

'অমিশ্রিত জাতি'-র সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রতিটি ভাষাভিত্তিক সম্প্রদায় বিভিন্ন বংশীয় জাতি সমন্বয়ে গঠিত। ফার্সী ও পাশ্‌তু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পরিগ্রহণের ফলে অতীতে তাহাদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকিলেও এখন তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গোত্রগুলির উৎস সম্পর্কে তত্ত্বগত অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহা দ্বারা তাহাদের গোত্রীয় বিভাগ সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় এমন নৃতাত্ত্বিক তথ্যও অপ্রতুল। সেই কারণে আমাদেরকে তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করিতে যাইয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

১। আফ্‌গানদের সম্পর্কে জানিবার জন্য 'আফ্‌গান' শীর্ষক পৃথক নিবন্ধ দ্র.।

২। আফগানিস্তানের ফার্‌সী ভাষাভাষী অধিবাসীদের সাধারণ নাম তাজীক (তু. তাজীক)। ইহাদেরকে পারসিওয়ানও বলা হয়। পূর্ব ও দক্ষিণে দিহ্‌গান (Dihgan) ও দিহ্‌ওয়ারস (Dihwars)-ও বলা হয়। তাহারা গ্রামে বাস করে, তবে শহরের অধিকাংশ বাশিন্দা ফারসীতে কথা বলে। কতিপয় প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়া তাজীকদের কোন গোত্রীয় সংগঠন নাই। গ্রামগুলিতে তাহারা শান্তিপ্রিয় প্রজা। হেরাত ও সীস্তানে তাহারা পারস্যের ইরানীদের প্রত্যক্ষ বংশধর। পক্ষান্তরে উত্তর আফগানিস্তানে (মায়মানাহ হইতে বাদাখ্‌শান পর্যন্ত) তাহারা সোভিয়েত রাশিয়ার তাজীকদের সহিত সম্পৃক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্‌গানিস্তানে তাহারা গযনীর চতুষ্পার্শ্বে ও কাবুল এলাকা (কূহ্‌-ই দামান, পাঞ্জশীর ইত্যাদি)-র উর্বরতম কৃষি অঞ্চলের অধিবাসী। উৎপত্তিগত দিক দিয়া তাহারা অত্যন্ত মিশ্র জাতি। কিন্তু বাদাখশান ও উত্তর আফ্‌গানিস্তান-এর পাহাড়ী তাজীকগণ সাধারণত আলপাইন শ্রেণীর। হিন্দুকুশের দক্ষিণে বহু তাজীক সম্ভবত ইরান-আফ্‌গান গোত্রভুক্ত। বাদাখশান-এর কোন কোন পাহাড়ী তাজীকরা অদ্যাবধি তাহাদের প্রাচীন ইরানী ভাষা ব্যবহার করে। কাবুলের উত্তরে পায়চী ও লোগার উপত্যকার ওরমুরগণের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। কিন্তু যিলবাশগণ নাদির শাহ কর্তৃক কাবুল ও হেরাতে পুনর্বাসিত ইরানী তুর্কীদের বংশোদ্ভূত।

৩। তুর্কী ও মংগোলীয় উপজাতিসমূহ ঃ তুর্কী উপজাতি উত্তর আফ্‌গানিস্তানের সমভূমি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাশিন্দা, এমনকি জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান অংশ। ইহাদের অধিকাংশই উযবেক (Uzbeks) [দ্র.]। উহারা গ্রাম ও শহরগুলিতে বসবাস করে। জারিং (Jarring)-এর আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ইহাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। ইহাদের পশ্চিমে অবস্থিত আন্দখূয় ও বালা মুর্‌গাব-এর মধ্যখানে আমরা তুর্কোমান (দ্র.) যাযাবরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা অধিকাংশই ইরসারীয় (Ersaris) [আনুমানিক সংখ্যা দুই লক্ষ]। আফগান পামীর অঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ কিরগিয (দ্র.) যাযাবর আছে। অবশ্য অন্যান্য আরও তুর্কী উপজাতি আফগানিস্তানে দেখা যায়। কাবুলের উত্তরে কুহিস্তান ও কূহ্‌-ই দামান এলাকায় বসবাসরত তুর্কীরা সম্ভবত সকলেই এখন তাহাদের জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়াছে।

গযনী হইতে হেরাত ও বামিয়ানের উত্তর হইতে মধ্য হিলমান্দ পর্যন্ত মংগোল উপজাতি অথবা মিশ্র তুর্কী-মংগোল বংশোদ্ভূতদের দ্বারা অধ্যুষিত। ইরানেও ইহাদের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্বাংশে হাযারা (দ্র.) অথবা বার্‌বারীদের বাস। ইহারা কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত, যথা দে-কুন্দী, দে-যেংগী, জাগুরী ইত্যাদি। হাযারাগণ গ্রামে বাস করে। পুরাকালে ইহাদের অত্যন্ত প্রতাপশালী সরদারগণ বিলাসবহুল প্রাসাদে বাস করিত। তাহারা শী'আ ছিল এবং আমীর আব্‌দুর রাহ্‌মান-এর আমল পর্যন্ত তাহারা অর্ধ-স্বাধীন ছিল। তাহাদেরকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার উদ্দেশে যখন আফগান আমীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তখন তাহাদের অনেকেই কোয়েটা ও আফগানিস্তানের বাহিরে অন্যান্য স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। হাযারাদের অধিকাংশ কাবুল ও অন্যান্য শহরে শ্রমিকের কাজ করে। নিঃসন্দেহে তাহাদের মংগোলীয় আকৃতি রহিয়াছে, কিন্তু অধিক চেপ্টা চেহারাবিশিষ্ট উযবেকগণ হইতে সাধারণভাবে তাহাদের পার্থক্য চিহ্নিত করা যায়। আরও পশ্চিমে হারি রূদের উভয় পার্শ্বে অর্ধ-যাযাবর সুন্নী মতাবলম্বী চাহার আয়মাক [দ্র.] (চার উপজাতি)-দের দেখা যায়। চাহার আয়মাক নামটি আপাতত অনেকটা শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে সাধারণত তায়মনী (হারি রূদের দক্ষিণ), ফীরূযকূহী (উক্ত নদীর উত্তরে), জামশীদী (কুশ্‌ক), তীমুরী (পারস্যের হেরাতের পশ্চিমে) ও হাযারী (ক'াল্‌'আ-ই নাও) গোত্রগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই হাযারীরা পূর্বদিকের হাযারীদের হইতে পৃথক। প্রায়শ হাযারীদেরকে চিন্‌গীয খান-এর সিপাহীদের বংশধর বলিয়া গণ্য করা হয়, কিন্তু চিনগীয খান ও তাহার স্থলবর্তিগণ যে সমস্ত এলাকা ধ্বংস করিয়াছিল, খুব সম্ভব ঐ সমস্ত এলাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুর্কী বাশিন্দাগণ ধীরে ধীরে আসিয়া দখল করে (দ্র. Bacon, পৃ. গ্র.)।

৪. ইন্দো-আর্য ও কাফিরগণঃ আফ্‌গানিস্তানের ইন্দো-আর্য 'দার্‌দী' উপজাতিদের মধ্যে কাবুলের কূহিস্তান, লাগমান ও নিম্ন কুনার উপত্যকা অঞ্চলের পাশাঈ (স্থানীয়ভাবে দিহ্‌গানও বলা হয়) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উহারা কাপিসা ও নাগারাহারা-র প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদের অবশিষ্টাংশ। কুনার অঞ্চলে এমন কিছু ছোট ছোট সম্প্রদায় রহিয়াছে যাহারা মূলত ইন্দো-আর্য ছিল। নূরিস্তান (কাফিরিস্তান) এমন কিছু সংখ্যক উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত যাহাদেরকে ভাষাগতভাবে প্রকৃত ইন্দো-আর্যগণ (তু. কাফিরিস্তান) হইতে পৃথক করা যায়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবদুর্‌ রহ্‌মান ইহাদিগকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত এবং ইসলামে দীক্ষিত করেন। দার্‌দী উপজাতিদের কিছু সদস্য অল্পকাল পূর্ব পর্যন্তও বিধর্মী (Pagan) ছিল। এখন কাফিরদিগকে নূরিস্তানী অথবা জাদীদী অর্থাৎ 'নও মুসলিম' বলা হয়। অতীতে ভারতীয়দের মত তাহারাও ছিল মুশরিক। বিভিন্ন গোত্র পৃথক পৃথক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করিত। তাহারা বহু প্রাচীন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সংরক্ষণ করিয়াছে। কেহ কেহ ইহাদেরকে গ্রীক বংশোদ্ভূত হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাহাদের প্রতিবেশিগণ তাহাদেরকে সিয়াহ্‌পূশ 'কৃষ্ণ বস্ত্রধারী' (ফাতী ও কাম) ও সাফীদপূশ 'শ্বেত বস্ত্রধারী' (ওয়ায়েগালী, আশকুন ও প্রাসূন অথবা পারূনী) এই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। নৃতাত্ত্বিকভাবে কাফিরগণের মধ্যে প্রাচ্যের দিনারী (Dinaric) ও নোরদি (Nordic)-দের মিশ্রণ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র লম্বা ধরনের করোটীবিশিষ্ট জাতির লোকও আছে, যাহাদের হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত সম্বন্ধ আছে। কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে গৌরদেহ ও স্বর্ণ কেশবিশিষ্ট লোকের অনুপাত যথেষ্ট অধিক।

আফগানিস্তানে কিছু সংখ্যক জাট (দ্র. জাঠ), যাযাবর (gipsies) ও কুনার উপত্যকায় কিছু সংখ্যক গুজার (দ্র.) আছে। কাবুল ও অন্যান্য শহরে হিন্দুরা বণিক ও মহাজন হিসাবে এবং কাবুলের উত্তরে কূহ-ই দামানে উদ্যানপালক হিসাবে বসবাস করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. W. Bellew, Races of Afghanistan, কলিকাতা ১৮৮০ খৃ. ;(২) H. G. Raverty, Notes on Afghanistan, লন্ডন ১৮৮০ খৃ. ; (৩) মুহাম্মাদ হায়াত, হ'ায়াত-ই আফগানী (উর্দু, ইংরেজী অনুবাদ ঃ Afghanistan), লাহোর ১৮৭৬; (৪) J. Biddulph, Tribes of the Hindoo-Koosh, কলিকাতা ১৮৮০; (৫) B. S. Guha, Racial Affinities of the People of India, in Census of India, ১৯৩১, vol. i, part iii A, pp. x প., সিমলা ১৯৩৫; (৬) G. S. Rodertson, Kafirs of the Hidndu-Kush, লন্ডন ১৮৯৬ ; (৭) Herrllich, Beitrage zur Rassen und stammeskunde der Hindukusch-Kafiren, in Deutche im Hindukusch, বার্লিন ১৯৩৭ ; (৮) Markowski, Die Materielle Kultur des Kadulgebietes, Leipzig ১৯৩২ ; (৯) Andreev, po etnologiya Afganistana, তাশখন্দ ১৯৩২ ; (১০) G. Harring, On the distribution of Turkish tribes in Afghanistan, Lund-Leipzig ১৯৩৯ ; (১১) Bacon, Inquiry into the History of the Hazara Mongols, S. W. Journal of Anthropology, 1951, 230 প.।

৩. ভাষা

কাবুল অঞ্চলে ১১টি কথ্য ভাষা রহিয়াছে বলিয়া সম্রাট বাবুর উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশে উহার সংখ্যা আরও অনেক বেশী। অধিকাংশ বাশিন্দা হয় পাশতু নতুবা ফারসী ভাষার কথা বলে। আর এই দুইটি ভাষাই ইরানী ভাষা। পাশতুর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আফগান।

অন্যান্য ইরানী ভাষা ঃ আফগানিস্তানে যে সমস্ত ফারসী উপভাষা (তু. আরও বিবরণ, ইরান, ভাষা অনুচ্ছেদ) প্রচলিত আছে তাহার অধিকাংশই প্রাচ্য পদ্ধতির। ইহাতে (یای مجهول، واو مجهول) [ও এবং এ ধ্বনি] এবং (یای معروف، واو معروف) (উ এবং ঈ ধ্বনি)- এর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। হারাত অঞ্চলে এই ধ্বনিগুলি আবার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে উচ্চারিত হয়। অবশ্য হাযারাদের কথ্য ভাষায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে। বালুচ ভাষা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কেবল দক্ষিণ মরুভূমি এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। কাবুলের দক্ষিণে লুগার উপত্যকা হইতে উরমুড়ী ভাষা যদিও অবলুপ্তির পথে, তবুও ওয়াযীরিস্তান-এর কানিগুরাম অঞ্চলে এই ভাষা আজও কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। পারাচী অন্য আর একটি স্থানীয় ইরানী ভাষা; উহা কাবুলের উত্তরে কয়েকটি গ্রামে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুকুশের উত্তরে বাদাখশান-এর পাহাড়ী এলাকায় তথাকথিত পামির বা গাল্চা (দ্র.) বর্তমানে টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সম্ভবত ইহার অবলুপ্তি আসন্ন এবং ক্রমান্বয়ে ইহার জায়গায় তাজীকী ফারসী স্থান করিয়া লইতেছে। এইরূপ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্তঃ মুনজান-এ মুনজী ভাষা, ইহার একটি শাখা ঈদগা (Yidgha) নামে চিত্রলে ব্যবহৃত হয়। ওয়াখানা-এ অতি প্রাচীন ভাষা ওয়াখী, (গিলগিট ও চিত্রলে অনুপ্রবেশ করিয়াছে), সাংলেচী, যেবাকী ও ইশ্‌কাশমী প্রভৃতি ভাষার প্রচলন রহিয়াছে আমুদরিয়ার বাঁকে ও উচ্চ ওয়ারদোজ উপত্যকা এলাকায়; শুগনী ও রোশানী ভাষা ইশ্‌কাশম-এর উত্তরে আমুদরিয়ার উপত্যকায়।

ইন্দো-আর্য ও কাফিরী ভাষাঃ হিন্দুদের কথিত ভাষা লাহদা বাদ দিলে আমরা উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানে অবস্থিত নূরিস্তান-এর প্রান্তে বেশ কিছু ইন্দো-আর্য ভাষা ও উপভাষা ব্যবহৃত দেখিতে পাই। উহারা ইন্দো-আর্য ভাষায় তথাকথিত দারদিক শাখার অন্তর্ভুক্ত; পাশাঈ উহাদের মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উহার কয়েকটি বিভিন্ন কথ্যরূপ রহিয়াছে এবং জনপ্রিয় কাব্যে সমৃদ্ধ। চিত্রল সীমান্তের নিকটে কুনার উপত্যকায় গাওয়ারবাটি (Gawar-Bati) ভাষার প্রচলন রহিয়াছে। কাফির ভাষাগুলির (কাতী, ওয়াইগালী, আশকুন ও প্রসুন) কিছুটা পৃথক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অবশ্য উহারা ইন্দো-আর্য ভাষা হইতে প্রাক-বৈদিক যুগেই পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু ভাষাগুলি বর্তমানে বিশুদ্ধ ইন্দো-আর্য উপাদানে অতিশয় ভারাক্রান্ত।

ইন্দো-আর্য ব্যতীত অন্যান্য ভাষা ঃ উত্তর আফগানিস্তানে উযবেক, তুর্কমান ও কীর্‌গীযরা তুর্কী উপভাষায় কথা বলে। অধিকাংশ হাযারা এখন তাহাদের প্রাচীন ভাষা ত্যাগ করিয়াছে। সম্ভবত চাহার আয়মাকদের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এফ. ম্যাকেনযী (F. Makenzie)-র একটি ব্যক্তিগত পত্রানুসারে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বিহ্সূদ-এর হাযারা ও মায়মানার উত্তরে বসবাসকারী মোংগল (Moghols)-দের মধ্যে ব্যবহৃত মংগোলীয় মূল হইতে উৎপন্ন এমন সমস্ত শব্দের কয়েকটি তালিকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, মাযার-ই শারীফ-এর পশ্চিম যাযাবররা এখনও আরবী ভাষায় কথা বলে। তাজীকিস্তানের আরবদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য (দ্র. 'আরাব)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাধারণ ঃ Linguistic Survey of India, vol. x (Eranian), viii/ii (Dardic Languages); (২) G. Morgenstierne, Report on a Linguistic Mission to Afghanistan, Oslo ১৯২৬; (৩) Rep. on a Linguistic Mission to N. W. India, Oslo ১৯৩২ খৃ.; Persian : (৪) D.L.R. Lorimer, Phonology of Bakhtiari, Badakhshani, etc., London ১৯২২ খৃ.; (৫) G. Morgenstierne Persian Texts from Afghanistan, AO, vi; Ormuri and Paraci; (৬) G. A. Grierson, The Ormuri or Bargista Language, Calcutta ১৯১৮; (৭) ঐ লেখক, Ormuri (LSI, x); (৮) G. Margenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages, i, Oslo ১৯২৯ (Parachi and Ormuri); (৯) ঐ লেখক, Supplementary Notes on Ormuri, N (orsk) T (idskrift for) S (progwidenskap), v;

Pamir Dialects; (১০) W. Geiger, Pamir-Dialekte (Grundr. d. iran Philol. i/2 গ্রন্থপঞ্জীসহ); (১১) G.A. Grierson. Linguistic Survey of India, vol x (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (১২) G. Morgenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages, ii, Oslo ১৯৩৮; (১৩) ঐ লেখক, Notes on Shughni, NTS, i; (১৪) R. Gauthiot, Quelques observations sur le mindjani (MSL, (১৯১৫); (১৫) W. Lentz, Materialien Sur Lenntnis der Schugni-Gruppe, Gottingen ১৯৩৩; (১৬) H. Skold, Materialien zu den iranischen Pamirsprachen, Lund ১৯৩৬; (১৭) I.I. Zarubin, Kharakteristike mundzhanskogo yazika, Leningrad ১৯২৭; (১৮) Klimcitskiy, Vakhanskie teksti, Moscow- Leningrad 1936; Dardic and Kafir Languages;. (১৯) G. A. Grierson, Kinguistic Survey of India, vol. viii, ii (পুরাতন রচনাবলীর গ্রন্থপঞ্জীসহ); (২০) G. Morgenstierne, Pashai Texts (Indo-Iranian Frontier Languages, iii/2, Oslo ১৯৪৪); (২১) ঐ লেখক, The Language of the Ashkun Kafirs (NTS, ii); (২২) ঐ লেখক, The Language of the Prasun Kafirs (NTS, xv); (২৩) ঐ লেখক, Notes on Gawar Bati, Oslo ১৯৫০, ও অন্যান্য প্রকাশনা। Turkish and Mongol; (২৪) G. Jarring, Uzbek Texts from Afghan Turkestan, Lund ১৯৩৮; (২৫) Ramstedt, Mogholica, JSFO, ২৩; (২৬) Leech, Vocabulary of the Mongal Aimaks (Vocabularies of Some Languages, etc., বোম্বে ১৮৩৮)।

৪. ধর্ম

অন্ধকারাচ্ছন্ন (কাফির) জীবন হইতে যখন আফগানিস্তানের মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয় ঠিক তখন হইতে আফগানিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠী মুসলিম, বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সুন্নী মতাবলম্বী। হাযারা, কিযিলবাশ; সীস্তান ও হারাত-এ কায়্যানী ও সীমান্ত এলাকার কিছু সংখ্যক পাঠান উপজাতি (তুরী, তিরাহ্-এর সায়্যিদ ব্যতীত ওরাকযাঈ ও বাংগাশ-এর কিছু গোত্র) এবং কিছু কূহিস্তানী ও বাদাখ্শী (বিশেষত গালচা) শী'আ মতাবলম্বী। ইহাদের মধ্যে বাদখ্শান-এর অধিবাসিগণ (শুগনান, ওয়াখান ইত্যাদি) ও লাগমান ও নিকটবর্তী উপত্যকাগুলিতে বসবাসকারী অনেক পাশাঈ ইসমাঈলী শাখাভুক্ত। বাদাখ্শীরা নিজদেরকে মুল্লাঈ বলিয়া অভিহিত করে এবং পাশাঈরা আলী-ইলাহী নামে পরিচিত (তু. Ivanow, Guide to Ism. Lit, পৃ. ৯)। শী'আ পাঠানদের মধ্যে এখনও ধর্মদ্রোহী নেতা বায়াযীদ আনসারীর গুপ্ত অনুসারী রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় [তু. রাওশানিয়্যা]।

আফগানিস্তানে সত্যিকার ইসলাম এখন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে ইসলামী আইন (শারী'আত) স্বীকৃত। হিন্দু ও শী'আদের সহ্য করা হইলেও দেশের অভ্যন্তরে আহমাদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। খৃস্টান মিশনগুলিও নিষিদ্ধ। স্থানীয় পীর-দরবেশ ও তাঁহাদের দরগাহগুলিকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়। সীমান্ত এলাকায় পাঠান উপজাতিগুলির মধ্যে মুল্লাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। স্থানীয় রাজনীতি ও জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদানে তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

G. Morgenstirne (E.I.[2])।

৫. ইতিহাস

প্রাক-ইসলামী যুগ ঃ যে এলাকা বর্তমানে আফগানিস্তান নামে পরিচিত উহা খৃ. পূ. দ্বিতীয় ও প্রথম সহস্রাব্দে আর্যদের দেশান্তরে গমনকালে ইরানী উপজাতিসমূহ কর্তৃক দখলকৃত হয়। সাইরাস (Cyrus) ইহাকে আকামেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আলেকজান্ডারের বিজয়ের পর (তু. উদাহরণস্বরূপ W.W. Tarn, Alexander the great, কেম্ব্রীজ ১৯৪৮) এই এলাকা গ্রীক-ব্যাকট্রীয় ও পারসীয়দের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে (তু. ঐ লেখক, The Greeks in Bactria and India, কেম্ব্রীজ ১৯৫২)। খৃ. পূ. প্রথম শতাব্দীতে য়ুএহ্-চি (Yuehchi) জাতির কুশান গোত্রের নেতৃত্বে ইরানী উপজাতিদের এখানে নূতন করিয়া সমাগম ঘটিতে থাকে। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুজুলা কাদফাইসেস (Kujula Kadphises) ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কানিক্শ-এর অধীনে কুশান রাজত্ব উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করে (তু. Cambridge History of India, i, ১৯৩৫; R. Ghrishman, Begram, Recherches archeologiques et historiques sur les Kouchans, কায়রো ১৯৪৫)। অবশেষে সাসানী বংশের ২য় শাপুর-এর হস্তে আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে উহাদের পতন ঘটে। ৩৫০ খৃস্টাব্দের অল্প কিছুদিন পর কাশগারিয়ায় বসবাসরত য়ুএহ্-চি উপজাতিগুলি তুর্কী-মোংগল উপজাতির চাপের মুখে পড়ে। ফলে উহারা ব্যাকট্রিয়াতে গিয়া উপস্থিত হয়। উহাদের সাহায্য করিবার জন্য চিউনী নামে বিভিন্ন উৎসের একটি সম্মিলিত দল আগাইয়া আসে (দ্র. R. Ghirshman, Les Chionites Hephtalites, কায়রো ১৯৪৮, ৬৯ প.)। রোমের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও শাপুর হানাদারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে উহাদের সহিত তিনি এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে উহারা তাহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে এই শর্তে উহাদেরকে ব্যাকট্রিয়া ও ইহার সন্নিহিত এলাকায় বসতি স্থাপনের অনুমতি দান করেন।

য়ুএহ্-চি অথবা 'ক্ষুদ্রতর কুশান'-এর রাজা কিদারা (Kidara) অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার বিজয়সীমা হিন্দুকুশের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার করেন এবং পারোপামিসাদ (Paropamisad) [কাবুল ও গযনী] ও গান্ধারী [সোয়াত ও পেশাওয়ার]-কে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য, এই সম্প্রসারণের কালে চীউনীয়দের যাবুল নামক একটি উপজাতি গযনী এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী কালে যখন কিদারা নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন তখন শাহ্পুরের সহিত নূতন

করিয়া তাঁহার সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। চিউনী গোত্র শাহপুরের পক্ষ অবলম্বন করে। কিদারা তাঁহার রাজ্য হারান এবং সম্ভবত জীবনও। রাজবংশের নামানুসারে হেফতালীয় নামে পরিচিত চিউনীদের দখলে ব্যাকট্রিয়া চলিয়া যায়। প্রায় ৪০০ খৃস্টাব্দে হিন্দুকুশের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চল চিউনী হেফতালীদের দখলে ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতমালা উহাদেরকে দুইটি শাখায় বিভক্ত করে, কিন্তু উহার দক্ষিণ শাখা অর্থাৎ যাবুল উপজাতি উত্তর শাখার আধিপত্য স্বীকার করিত এবং উভয় শাখাই ইরানের সাসানী বাদশাহর আধিপত্য স্বীকার করিত। ইরানের শাহী বংশ যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন উহারা ইরানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু খৃস্টীয় ৫ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইরানীরা রোমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ততা এবং বর্বর গোত্রের মুকাবিলায় ককেসাস গিরিপথের প্রতিরক্ষা—এই উভয় কারণে তাহারা যে অসুবিধায় পড়িয়াছিল উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া হেফতালীয়রা ইরানীদের কর্তৃত্ব ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাহরাম গোর পুনরায় উহাদের করায়ত্ত করেন। অপরদিকে ভারতবর্ষের মাটিতে উহাদের অগ্রাভিযানের প্রয়াসকে গুপ্ত রাজন্যবর্গ স্তব্ধ করিয়া দেয়।

খৃস্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিল ইরানী ও হেফতালীয়দের পারস্পরিক সম্পর্কের এক সঙ্কট মুহূর্ত। ৪৮৪ খৃস্টাব্দে ফীরূযের রাজত্বকালে হেফতালীয়রা ইরানীদের উপর একটি বিজয় লাভ করে যাহার ফলে ইরানের অধীনে হওয়ার পরিবর্তে তাহারা ইরানের প্রায় প্রভু হইয়া উঠে। ফলত ইহার পর অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল সাসানীরা উহাদেরকে কর প্রদান করিতে থাকে। অবশেষে আনুমানিক ৫৬০ খৃস্টাব্দের পশ্চিমা তুর্কী বলিয়া অভিহিত এক নূতন জাতি মধ্যএশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। উহাদের সহিত ১ম খসরুর ঐকজোট স্থাপিত হয়। ফলে হেফতালীয়দের কেন্দ্রীয় শক্তির অবসান ঘটে (সাসানীদের সহিত উহাদের সম্পর্ক বিষয়ে তু. A. Christensen, L' Iran sous les Saesanides, ১৯৪৪)।

যাবুল বা দক্ষিণ চিউনীদের রাজত্ব আপন গতিতে চলিতে থাকে। খৃ. ৫ম শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দুকুশের দক্ষিণে এক নূতন রাজবংশ রাজত্ব করে। তোরামানা (Toramana) ও মিহিরাকুলা (Mihiracula) (আনুমানিক খৃ. ৫১৫-৫৪৪) নামক এই বংশের দুইজন রাজা ভারতবর্ষের বিশাল এলাকা জয় করে। মিহিরাকুলা (মিহিরগুল) সূর্য দেবতা মিহিরের উপাসনা করিত। তাঁহার রাজত্বকাল অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনের এক করুণ ইতিহাস। অত্যাচার ও অবিচার অবিরাম গতিতে চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের একটি জাতীয় জোট তাহাকে পর্যুদস্ত করে। দক্ষিণের চিউনীদের অন্তর্ধান উত্তর অঞ্চলে হেফতালীয়দের আধিপত্য ধ্বংস হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়।

এই দুইটি রাজত্বের ধ্বংস হইবার পর উহাদের এলাকাগুলি ছোট ছোট রাজার হাতে থাকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাসানীদের, আবার কেহ কেহ তুর্কীদের অধীনতা স্বীকার করে। আনুমানিক খৃ. ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (Hiuen-Tsang)-এর ভ্রমণ কাহিনীতে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। একটি ঐতিহাসিক উৎস হিসাবে এই গ্রন্থেই প্রথম আফগান জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনায় আফগানিস্তান-এর নাম আ-প' ও-কিন (A-p'-o-kien) রহিয়াছে এবং ইহার অবস্থান সুলায়মান পর্বতমালার উত্তর অংশে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. A. Foucher, La vielle route de l' Inde de Bactres a Taxila, ii, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., ২৩৫, ২৫২, টীকা ১৭)।

হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণের কিছুদিন পর চীন দেশীয় তাঙ (Tang) বংশ পশ্চিমা তুর্কীদের ধ্বংস করে এবং তাহাদের রাজত্ব পামীরের পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করে। হিন্দুকুশের উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত ষোলটি রাজ্য এক শতাব্দীকাল (৬৫৯-৭৫১) পর্যন্ত চীন সম্রাটগণের কর্তৃত্ব নামেমাত্র স্বীকার করে। আরব বিজেতাগণ অত্যন্ত দ্রুত ইরানকে পদানত করিলেও তাহাদেরকে আফগানিস্তানের এই অঞ্চলে সর্বশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। অবশেষে খৃ. ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুকুশের দক্ষিণ অঞ্চলে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন হয়। আধুনিক আফগানিস্তানের জাতিগত বিশ্লেষণের ধারায় হেফতালীয়দের পরিচয় পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাদাখ্শান এলাকায় হায়তাল নামক একটি প্রধান গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। চিউনীহেফতালী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিবার জন্য হায়তাল, যাবুলিস্তান ও যুন শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন। প্রাথমিক ইতিহাসের পটভূমির জন্য তু. আরও W. M. MC-Govern, The early Empires of Central Asia, ১৯৩৯ খৃ.।

R. Ghirshman (E.I.[2])।

(২) ইসলামী যুগ ঃ আফগান জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।

মংগোল যুগ ঃ যে অঞ্চলগুলি লইয়া আধুনিক আফগানিস্তান গঠিত হইয়াছে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সহস্র বৎসর উহা বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিবেশী প্রদেশগুলির সাধারণ উত্থান-পতনে ও সুখ-দুঃখে একে অপরের দোসর ছিল এবং উহারা কখনও একটি পৃথক অস্তিত্বে পরিণত হয় নাই। মীর ওয়ায়েস, বিশেষ করিয়া আহমাদ শাহ দুররানীর আমলের পূর্বে আফগানরা তাহাদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করে নাই। আফগানদের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য যাহা জানা যায় তাহার সারসংক্ষেপ আফগান নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

এখানে দেশটির ইতিহাস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল (আরও জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ, যেমন খুরাসান, সিজিস্তান, কাবুলিস্তান, যাবুলিস্তান, যামিন দাওয়ার, তুখারিস্তান ও যে সমস্ত রাজবংশ বিভিন্ন সময় এই জনপদ শাসন করিয়াছে এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেমন ঃ বালখ, গাযনী, হারাত, কাবুল ইত্যাদি নিবন্ধ দেখুন)।

ইসলামের বিজয় অভিযানকালে সাসানীদের অধীনে প্রদেশগুলি দ্রুত পদানত হইতে থাকে। বিজয় অভিযানের একটি তরঙ্গ সিজিস্তানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে। কিন্তু সাফ্ফারী রাজবংশের (দ্র.) উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এই কেন্দ্র হইতে কাবুলকে বশীভূত করার জন্য যে সমস্ত আক্রমণ পরিচালিত করা হয় তাহার একটিও কোন স্থায়ী ফলাফল স্থাপন করিতে পারে নাই। ইতোপূর্বে যে সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ইসলামের অধীনস্ত হয় সেই প্রদেশগুলির তুলনায় কাবুল ইসলামীকরণের দীর্ঘতর সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এখানে ইসলামের বুনিয়াদ কেবল গাযনাবীদের

শাসনামলে স্থাপিত হয়। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আল্‌পতাকীন (দ্র.) গযনীর সাবেক শাসক লাবীক (Lawik)-এর নিকট হইতে গযনী হস্তগত করেন। তিনি যাবুলিস্তান জয় করেন এবং একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পুত্র ইসহাক উহার উত্তরাধিকার লাভ করেন। অতঃপর বালকাতাকীন নামক তাঁহার এক ক্রীতদাস, তাঁহার পরে সবুকতাকীন নামে আর এক ক্রীতদাস যিনি গাযনাবী (দ্র.) বংশের প্রতিষ্ঠাতা, স্থলাভিষিক্ত হন। এই বংশের রাজধানী ছিল গযনী। এই শহর হইতেই পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ গাযনাবী শাসক সুলতান মাহমূদ (দ্র.) পশ্চিমে পারস্যে ও পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। আফগান নামটি প্রথম ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে গযনী বংশ কোনক্রমেই জাতিগতভাবে আফগান ছিল না। সম্ভবত তাঁহার সৈন্যবাহিনী প্রধানত তুর্কীদের দ্বারা গঠিত ছিল। আল-উত্‌বীর মতে কারাখানী শাসকদের বিরুদ্ধে যখন সুলতান মাহমূদ বাল্‌খ আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সেনাবাহিনী ভারতীয়, খালাজী (দ্র.), আফগান ও গাযনাবী সমন্বয়ে গঠিত ছিল। গাযনাবী শব্দ দ্বারা নিঃসন্দেহে গযনী প্রদেশের ইরানীদের নির্দেশ করা হইয়াছে ('তাজীক' দ্র.)। ৪১৪/১০২৩ সনে মাহমূদ সুলায়মান কূহ-এর আফগানদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের দেশকে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন।

মাহমূদ জীবনের শেষভাগে এক বৃহৎ এলাকার উপর রাজত্ব করেন যাহা পশ্চিমে খুরাসান, জিবাল-এর অংশবিশেষ ও তাবারিস্তান এবং পূর্বে সমগ্র পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার প্রভাব উত্তরে আমু দরিয়া ছাড়াইয়া আরও দূরে পৌঁছায়। বর্তমান আফগানিস্তানের সমগ্র অঞ্চলই ছিল উহার কেন্দ্রভূমি। এই মহান দিগ্বিজয়ী বীরের ব্যক্তিত্ব সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং যে ভূখণ্ডে তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করেন। এই রাজবংশের ইতিহাস আরও জানিবার জন্য দেখুন গাযনাবী প্রবন্ধ। বাহ্‌রাম শাহ (৫১১-৫২/১১১৮-৫৭) সালজূকদের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। ইহার পর গূরী সরদারগণ প্রবলতর হইয়া উঠেন। দীর্ঘ দিন সংগ্রাম চালাইয়া তাঁহারা গাযনাবীদেরকে বিতাড়িত করেন। গূরী (দ্র.) রাজবংশ সম্ভবত 'তাজীক' বংশোদ্ভূত। গুয ও খাওয়ারিযম শাহ কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমণের ফলে এই রাজবংশের ভাগ্য প্রতিহত হয়। স্বদেশে তাহাদের শক্তির পতন ঘটিলেও ভারতবর্ষে তাহারা সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, যাহা পরবর্তী কালে তুর্কী দাসগণ দখল করিয়া লয়। খাওয়ারিযম শাহ-এর শেষ বংশধর সুলতান জালালুদ্দীন মানকুবিরনী প্রবল প্রতিরোধের পরে চেনগীয খানী মংগোলদের হাতে আফগানিস্তানকে অর্পণ করিতে বাধ্য হন।

মংগোল, কার্ত (Karts)গণ ঃ হারাত ও সীস্তান বিজিত হয় চেনগীয খানের পুত্র তুলুই (Tuluy) কর্তৃক এবং গযনী অধিকার করেন উগুদায় (Uguday)। উগুদায় গূর অঞ্চলেও প্রবেশ করেন এবং এখানে তিনি যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য সৈন্য ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি ফীরূয কূহ ও গারজিস্তান জয় করেন এবং গারমশির ও সীস্তান-এর সমভূমি অঞ্চল দখল করেন। গূরী বংশীয় শেষ সুলতানগণকে উৎখাত করা হয় এবং ফীরূয কূহকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। তুলাক (Tulak) ও অন্য পর্বত-দুর্গগুলি প্রতিরোধের চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। গারজিস্তানের আমীর মুহাম্মাদ গূর এই প্রতিরোধকারীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। মাতৃকুলের দিক দিয়া তিনি গূরী সুলতানদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁহাকে ৬২০/১২২৩ সালে আশ্‌য়ার দুর্গে হত্যা করা হয়। কার্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁহারই বংশধর। আফগানিস্তানের বৃহত্তর অংশ তখন মংগোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বাঞ্চলে সায়ফুদ্দীন হ'াসান কারলুগ নামক এক তুর্কী সরদার কিছু দিনের জন্য বামিয়ান, গযনী ও গূর দখল করিয়াছিলেন এবং তিনি সম্ভবত জালালুদ্দীন মানকুবিরনীর মিত্র ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ৬২২/১২২৫ সালে রাজ্য শাসন করেন। ঐ বৎসর তিনি খলীফা আজ-জাহির-এর নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। ৬৩৬/১২৩৮ সালে তিনি উগুদায় (Uguday)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে এক মংগোল শিহনা (Shihna-তত্ত্বাবধায়ক)-এর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। যাহা হউক, তাঁহাকে কুরাম উপত্যকার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে নির্বাসিত করা হয়। সিন্ধুতে তিনি ও তাঁহার পুত্র নাসিরুদ্দীন আরও বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। গযনী ও কুরাম পরবর্তী সময়ে মংগোলদের ভারতবর্ষে অতর্কিত হামলা করিবার ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এই সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা আফগানদের নাম শুনিতে পাই না। সম্ভবত তাহারা তখন পর্যন্ত উত্তর দিকে কুরাম উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে নাই। উগুদায়-এর মৃত্যুর পর মংগোল সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায় এবং আফগানিস্তান পারস্যের ঈলখানদের ভাগে পড়ে।

তাঁহাদের সার্বভৌমত্বের অধীন কার্ত নামীয় একটি তাজীক বংশ ক্ষমতায় আসে এবং প্রায় দুই শত বৎসর দেশের বৃহত্তর অংশ শাসন করে। তীমূরই কার্ত বংশের অবসান ঘটান এবং গূর ও হারাত-এ তাজীক বংশীয় শেষ ব্যক্তি যিনি ঐ দেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফগানদের উত্থান পর্যন্ত স্থানীয় কোন বংশ আফগানিস্তানে রাজত্ব করিতে সক্ষম হয় নাই।

তীমূর, তীমূরীয় ঃ তীমূরের আক্রমণকালে সীস্তান ভয়ানক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, কাবুল ও কান্দাহার (বর্তমানে অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে পরিগণিত) অতি দ্রুত বিজিত হয় এবং সমগ্র দেশই তীমূরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ৮০০/১৩৯৭ সনে তীমূর তাঁহার পৌত্র পীর মুহাম্মাদকে কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিয়া পূর্বাঞ্চল অভিযানে মনোনিবেশ করেন। একই সময়ে তাঁহার পুত্র শাহরুখ হারাত রাজধানীসহ খুরাসান রাজ্যের জায়গীর লাভ করেন। পীর মুহাম্মাদ সুলায়মান কূহ-এর আফগানদের আক্রমণ করেন এবং পরে ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হন। মুলতানে তিনি অবরোধের সম্মুখীন হন। সংবাদ পাইয়া তীমূর নিজেই আনদারাব হইতে হিন্দুকুশ পাড়ি দিয়া সম্মুখ পানে অগ্রসর হন; অতঃপর সিয়াহপুশ ও কাতোর কাফিরদের আক্রমণ করিবার জন্য লাগমান হইতে গতি পরিবর্তন করেন। এই অভিযানের পর তিনি বিদ্রোহী আফগানদের আক্রমণ করেন এবং পরে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁহাকে টোচির রাস্তা ব্যবহার করিতে হয়, যাহা গালযাঈ ও ওয়াযীরীদের এলাকার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সৈন্যদলে তাজীকরা ছিল। কিন্তু কোন আফগান ছিল কি না জানা যায় না।

তীমূরের ইন্তিকালের সময় (৮০৭/১৪০৫) পীর মুহাম্মাদ কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন; তথাপি খালীল (খালীল ইব্‌ন মীরান শাহ ইব্‌ন তীমূর) সাম্রাজ্যের সিংহাসন দখল করিয়া বসেন (তীমূরের বংশধরদের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য তু. তীমূর প্রবন্ধ)। ফলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় পীর মুহাম্মাদের হত্যার পরে উহার সমাপ্তি ঘটে। ইহার কিছুদিন পর খালীল সিংহাসনচ্যুত হন এবং শাহরুখ সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। প্রায় ৪০ বৎসর স্থায়ী তাঁহার শাসনামলে শান্তি বিরাজ করে এবং অতীতের ক্ষয়ক্ষতি হইতে দেশ উদ্ধার লাভ করে। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন যথাক্রমে উলুগ বেগ, আবদুল লাতীফ, আবদুল্লাহ ও বাবুর মীর্যা। ইহাদের প্রত্যেকের শাসনামল ছিল সংক্ষিপ্ত। ৮৬১/১৪৫৬ সালে আবূ সাঈদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু খুরাসান ও আফগানিস্তানের দখল লইয়া তাঁহার হুসায়ন বায়কারার সহিত বিবাদ বাঁধে। হুসায়ন বায়কারা ৮৭০/১৪৬৫ সালে পরাজিত হন। কিন্তু আবূ সাঈদ দুই বৎসর পর ইন্তিকাল করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুলতান আহমাদ মোটেই খুরাসান দখল করিতে পারেন নাই। হুসায়ন বায়কারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানরূপে রাজধানী হারাত হইতে খুরাসান, সীস্তান, গূর ও যামীন-দাওয়ার শাসন করেন। শাহরুখ ও হুসায়ন বায়কারা-এর দীর্ঘ শাসনামলে হারাত কাব্য, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে সুখ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। হুসায়ন বায়কারা-এর রাজত্বকালের শেষভাগে উত্তরাঞ্চল শায়বানী ও তাঁহার উযবেকদের ক্রমবর্ধমান শক্তি তাঁহার শাসনের প্রতি বিপদ সৃষ্টি করে। উপরন্তু আফগানিস্তানের অন্যান্য অংশে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয় যদিও ইহাদের শাসক স্বদেশী ছিল না। বাবুর (দ্র.) কাবুলে নিজের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিলেন। তখন পর্যন্তও কাবুল তীমূর বংশীয় শাসকদের অধীনে ছিল, যাহারা মোটামুটি স্বাধীন ছিল। আরগুন পুত্র মুকীম সবেমাত্র ইহা দখলে আনিয়াছেন আর ঠিক এই সময়ে বাবুর এই নগরীতে পদার্পণ করিয়া ইহা অধিকারে আনেন (৯১০/১৫০৫)। নাদির শাহ্-এর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত কাবুল দুই শত বৎসরেরও অধিক কাল ভারত সম্রাট বাবুর (দ্র. মুগল) ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের শাসনাধীন ছিল।

বাবুর, আরগুন, উযবেক শাহ্ ইসমাঈল ঃ আরগুন (দ্র.) রাজবংশের উত্থান খুরাসান রাজ্যের জন্য ছিল অধিকতর বিপজ্জনক। ইহার প্রতিষ্ঠাতা যুননূন বেগ আরগুন ছিলেন ঈলখান বংশীয়। তিনি গূর ও সীস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। হাযারা ও নীকূদারী উপজাতিদের পরাভূত করিয়া তিনি যাবুলিস্তান ও গারমসীর অঞ্চলও হস্তগত করেন। কান্দাহারে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজ পুত্র শাহ বেগের সহায়তায় তিনি দক্ষিণ দিকে বোলান গিরিপথ ও সিওয়াস্তান (Siwastan) পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। গূর, যামীনদাওয়ার ও কানদাহারবাসীদের সম্ভবত তাজীক ও আফগানদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ৯০৪/১৪৯৮-৯ সালে তিনি হারাতও আক্রমণ করেন। উপরে উল্লিখিত তাঁহার পুত্র মুকীম অল্প সময়ের জন্য কাবুল দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু শায়বানীর আক্রমণ যুননূন বেগের জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। উযবেকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই তিনি নিহত হন এবং ৯১৩/১৫০৭ সনে শায়বানী হারাত দখল করেন।

যুননূন-এর পুত্রগণ শাহ্ বেগ ও মুকীম এখন বাবুর ও শায়বানী-এর মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। বাবুর কিছুটা স্বত্বের ভিত্তিতে তীমূরী সাম্রাজ্যের দাবি করেন। বাবুর কান্দাহারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, অপরপক্ষে আরগুন শাহযাদাগণ তাঁহার পুরাতন শত্রু শায়বানীর পক্ষাবলম্বন করেন। বাবুর তাহাদেরকে পরাজিত করিয়া কানদাহার জয় করেন। তিনি তাঁহার পুত্র নাসির মীর্যাকে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নাসির মীর্যা শায়বানী কর্তৃক আক্রান্ত হন। উযবেকদের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাবুর সুলতান হুসায়নের সহিত পরামর্শ করিতে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি সুলতান হুসায়নের মৃত্যু সংবাদ পান। তিনি সুলতানের পুত্রদের সহিত মুরগাব অভিযানে শরীক হইয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি হারাতে গমন করেন এবং শীত মৌসুমে পার্বত্য পথে কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন। এই সফরে তাঁহাকে সৈন্য-সামন্তসহ দারুন কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ৯১২/১৫০৭ সালের প্রারম্ভে তিনি কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন যেই সময় তাহার আত্মীয়গণ এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তিনি তাহা দমন করেন, অতঃপর গ্রীষ্ম মৌসুমে কান্দাহার অভিযানে গমন করেন। জুমাদাল-উলা ৯১৩/ সেপ্টেম্বর ১৫০৭ সালে কাবুলে ফিরিয়া তিনি ভারতবর্ষ অভিযানের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। তখনই কান্দাহারের পতন ঘটিবার ও শায়বানী আরগুনদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। খবরটি এমন এক মুহূর্তে আসে যখন তিনি জাগদালাক ও নান গাড়হার-এর আফগান উপজাতিদের দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই উপজাতিরা কিছুদিন পূর্বে কাবুল উপত্যকা এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কাবুলকেও অধিকারে রাখা তাঁহার জন্য দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল। কারণ সেখানে বিদ্রোহ ও গোলযোগের অগ্নি তাঁহার ক্ষমতার প্রতি হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শায়বানী এখন খুরাসানের অধিকারী ও কান্দাহারের অধিপতি, কিন্তু তাঁহার শক্তি হ্রাস পাইতেছিল। গূরের পার্বত্য অঞ্চলে এক অভিযানে তাঁহার সৈন্যবাহিনী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দিকে অন্য এক যোদ্ধা সুলতান, পারস্যে সাফাবী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ ইসমাঈল পশ্চিম অঞ্চল হইতে তাঁহাকে হুমকি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ৯১৬/১৫১০ সালে ইসমাঈল খুরাসান আক্রমণ করিলেন এবং শায়বানী মারব-এর সন্নিকটে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইসমাঈল হারাত দখল করেন এবং নির্যাতনের মাধ্যমে সেখানে শী'আ মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই সময় বাবুর ইসমাঈল-এর সহিত মৈত্রী চুক্তি করেন এবং তাহার ভ্রাতা নাসির মীর্যার হস্তে কাবুল রাজ্যের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া তিনি মধ্যএশিয়ায় উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত তাঁহার পূর্বপুরুষদের রাজত্ব কিছু দিনের জন্য পুনরুদ্ধার করেন। তবে সাফাবী সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপনের ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারান এমনকি উযবেকরা বিক্ষোভ পরিদর্শন করিতে থাকে। অবশেষে ৯১৮/১৫১২ সালে বুখারার সন্নিকটে অবস্থিত গাযদাওয়ান নামক স্থানে তিনি চরমভাবে পরাজিত হন এবং কোনমতে জীবন লইয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে আসিয়া তিনি ভীষণ গোলযোগ ও অসন্তোষ দেখিতে পাইলেন। নিজস্ব মুগল বাহিনী ও আফগান উপজাতীয়দের মধ্যে বিরাজিত

বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। য়ূসুফযাঈ গোত্র পার্বত্য এলাকা হইতে পেশাওয়ার উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া তাহাদের পূর্ববর্তী দিলাযাদেকে বাজওয়ার ও সোয়াত-এর পর্বতমালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বাবুর তাহাদেকে প্রবলভাবে দমন করেন এবং বহু হত্যাকাণ্ডের পর তিনি বাজওয়ার হস্তগত করেন। হাযারাদের মধ্যে উত্থিত বিদ্রোহও তাঁহাকে দমন করিতে হয়। অতঃপর তিনি কান্দাহারের দিকে মনোনিবেশ করেন যেখানে শাহ্ বেগ আরগুন তখনও রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি শাহ ইসমাঈলের সহিত আপোস করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তাঁহাকে হারাতে কয়েদ করা হয়, কিন্তু তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তখন হইতে তিনি সিন্ধু এলাকায় নিজের জন্য একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ৯১৭/১৫১১ সালে কতিপয় বালুচ উপজাতির সহযোগিতায় তিনি সিন্ধু আক্রমণ করেন। বাবুর কান্দাহার অধিকার করিবার জন্য দুইবার প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে ৯২৮/১৫২২ সালে সফলকাম হন। তখন শাহ্ বেগ তাঁহার সদর দফতর গ্রীষ্মকালে শাল (কোয়েটা)-এ শীতকালে সীবাতে স্থানান্তর করেন এবং সিন্ধুতে তাঁহার পরিকল্পনাসমূহ অব্যাহত রাখেন। সমগ্র কান্দাহার প্রদেশ বাবুরের অধিকারে থাকে। বাবুর এখন ভাগ্য যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন এবং বারংবার অভিযান চালাইয়া ভারতবর্ষের লোদী-আফগানদের রাজত্বের অবসান ঘটান। তিনি কাবুলকে ভারতের সমভূমি এলাকার চাইতে বেশী ভালবাসিতেন। গযনীতে তাঁহাকে দাফন করা হয় এবং তাঁহার মাযার একটি স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত অবস্থায় সেখানে বিদ্যমান।

মুগল ও সাফাবী সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাল ঃ ভারতবর্ষ ও পারস্য এই দুইটি সাম্রাজ্যের মধ্যে আফগানিস্তান বিভক্ত থাকায় উহাদের প্রভাবে সেইখানে অধিকতর স্থিতিশীল অবস্থার সূচনা হয়। হারাত ও সীস্তান ইরানের ভাগে থাকিয়া যায়, যদিও উযবেক হানাদারদের উৎপাত সেখানে বেশ কিছুকাল চলিতে থাকে। কাবুল মুগল সাম্রাজ্যের ভাগে পড়ে। অপর পক্ষে কান্দাহার কখনও মুগল শাসনাধীনে, আবার কখনও ইরানী শাসনাধীনে চলিয়া যায়। মুগল শক্তি ক্রমশ হিন্দুকুশের দক্ষিণে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। হিন্দুকুশের উত্তরে বাবুর কর্তৃক নিযুক্ত বাদাখশান-এর গভর্নর সুলায়মান মীর্যা প্রায় স্বাধীন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল শায়বানীদের অধীনে থাকিয়া যায়। ইসমাঈল ৯৩০/১৫২৪ সালে ও বাবুর ৯৩৭/১৫৩০ সালে ইন্তিকাল করেন। বাবুরের পুত্র হুমায়ুন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা কামরান, হিন্দাল ও আসকারী বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। কাবুল ও কান্দাহারকে পাঞ্জাবের সহিত যুক্ত করিয়া কামরান-এর অধীনে দেওয়া হয়। অপরপক্ষে ইরানে ইসমাঈলের উত্তরাধিকারী তাহ্মাস্প স্বীয় ভ্রাতা সাম মীর্যাকে হারাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সাফাবীগণ পূর্বে কান্দাহারকে তাহাদের অধিকৃত খুরাসানের সামন্ত রাজ্য মনে করিত। তাহারা মুগল সম্রাটগণ দ্বারা ইহার দখলকে জবরদখল মনে করিত। ৯৪১/১৫৩৫ সালে সাম মীর্যা অতর্কিতে কান্দাহার আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে সফলতার সহিত প্রতিহত করা হয়। আট মাস পর কামরান আসিয়া পৌঁছান এবং উহাকে অবরোধমুক্ত করেন। সাম-এর অনুপস্থিতিতে উবায়দুল্লাহ্র নেতৃত্বে উযবেকেরা খুরাসান আক্রমণ করে এবং দুর্দশাগ্রস্ত হারাত শহর পুনরায় পরাজিত ও লুণ্ঠিত হয়। তাহমাস্প ইহা পুনরুদ্ধার করেন এবং সামকে বরখাস্ত করেন। তিনি নিজেই কান্দাহার আক্রমণ করিয়া জয় করেন, কিন্তু কামরান তাহা পুনরায় করায়ত্ত করেন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে শের শাহ্-এর নেতৃত্বে সূর আফগানদের এক অভ্যুত্থানের ফলে হুমায়ন সিংহাসনচ্যুত হন। ৯৫০/১৫৪৩ সালে তিনি সিন্ধু হইতে কান্দাহার-এর দক্ষিণস্থ মরুভূমির মধ্য দিয়া সীস্তান ও পারস্যে উপনীত হন। সেইখানে শাহ তাহমাস্প তাঁহাকে মেহমানরূপে স্বাগত জানান। এই সময় কামরান বাদাখ্শান হইতে কান্দাহার পর্যন্ত সমগ্র এলাকা শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কাবুলে। ৯৫১/১৫৪৪ সালে হুমায়ন সাফাবী দরবার হইতে সাহায্য লাভ করিয়া হারাত-এর পথে হিলমান্দ নদীর তীরে পৌঁছেন এবং কামরান-এর অধীনে বুস্ত-এর শাসনকর্তা শাহ'আলী ও মীর খালীজকে বন্দী করেন। ৯৫২/১৫৪৫ সালে তিনি ইরানী সৈন্যদের সহযোগিতায় কান্দাহার অবরোধ করেন যাহা তাহার ভ্রাতা আসকারী কামরানের পক্ষে দখল করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ছয় মাস প্রতিরোধের পর হুমায়ুন উহা জয় করেন। তাহমাস্প-এর সহিত চুক্তির শর্তানুসারে তিনি ইরানীদেরকে শহরটি ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ইহা তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বাধ্য হইয়া পুনরায় তিনি ইরানীদের দখল হইতে কান্দাহার ছিনাইয়া লন এবং ইহাকে নিজ সাম্রাজ্যের প্রদেশ হিসাবে গণ্য করেন, যাহাতে তাহমাস্প ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। অল্প কিছুদিন পর হুমায়ুন কাবুল দখল করেন এবং তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র আকবারের সহিত মিলিত হন। পরবর্তী কয়েক বৎসর ভ্রাতৃযুদ্ধ চলিতে থাকে, যাহার ফলাফল ছিল ভিন্ন রকম। কামরান দুই দুইবার কাবুল দখল করেন কিন্তু তাহা দীর্ঘদিনের জন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কিছুদিন মাহমান্দ ও খালীল নামক আফগান উপজাতিদের সহিত অতিবাহিত করেন এবং তাহাদেরকে কাবুল উপত্যকায় লুণ্ঠন করিতে উস্কানি দেন। অবশেষে ৯৬১/১৫৫৩ সালে তিনি হুমায়ুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে চক্ষু উৎপাটিত করিয়া অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হুমায়ুন এখন কাবুল ও কান্দাহার রাজ্যের অধিপতি হইয়া ভারতবর্ষ পুনরুদ্ধারের জন্য বিপুল শক্তি অর্জন করেন। এইভাবে তিনি সূর রাজাদের উপর জয়লাভ করেন। ১ রামাদান, ৯৬২/২০ জুলাই, ১৫৫৫ সালে তিনি পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১৪ রাবীউল আওয়াল, ৯৬৩/২৬-২৭ জানুয়ারী, ১৫৫৬ সালে এক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া তিনি দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার তরুণ পুত্র জালালুদ্দীন আকবার ২ রাবী'উছ-ছানী শুক্রবার ৯৬৩/১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬ সালে কালানুর (পাঞ্জাব) নামক স্থানে সাম্রাজ্য অধিকারের ঘোষণা দেন। বাদশাহ আকবার ভারতের সমগ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধারে যখন ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে তাহমাস্প কান্দাহার দখল করিয়া বসেন (৯৬৫/১৫৫৮) এবং ৩৮ বৎসর কাল কান্দাহার ইরানীদের শাসনাধীন থাকে। ১০০৩/১৫৯৪ সালে শাহযাদা মুজাফফার হুসায়ন ইহা আকবারের নিকট প্রত্যর্পণ করেন এবং শাহ বেগ কাবুলী কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

আকবারের রাজত্বকালে আফগানিস্তানে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার বিবরণ ঃ আকবারের সিংহাসনে আরোহণের খবর

পাইয়া সুলায়মান মীর্যা হুমায়ুনের পুত্র মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যাকে কাবুলে অবরোধ করেন, কিন্তু আকবারের সৈন্যদল কাবুলে উপস্থিত হইলে সুলায়মান বাদাখ্শানে ফিরিয়া যান (৯৬৩/১৫৫৬)। ৯৭১/১৫৬৩ সালে আবুল মা'আলী তিরমিযী আকবারের দরবার হইতে পলায়ন করিয়া কাবুলে যান এবং শাহযাদা মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যার মাতা ও অন্যান্য কতিপয় অমাত্যকে হত্যা করেন। শাহযাদা সুলায়মান মীর্যার সাহায্য চাহিয়া পাঠান। সুলায়মান মীর্যা গুরবান্দ সেতুর উপর আবুল মাআলীকে হত্যা করিয়া কাবুল দখল করেন (৭ রামদান, ৯৭১/১৯ এপ্রিল, ১৫৬৪)। অতঃপর শাসন ক্ষমতা শাহযাদার উপর অর্পণ করিয়া তিনি বাদাখশানে ফিরিয়া যান। আকবারের দরবার হইতে সাহায্য পাওয়ায় মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যার কাবুল হইতে সিন্ধু নদ এবং কান্দাহার হইতে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল এলাকার শাসনকর্তা হইবার সৌভাগ্য হয় এবং সুলায়মান মীর্যার প্রভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিছু দিন পর মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যা লাহোর আক্রমণ করেন, কিন্তু আকবার তাহাদের পেশাওয়ারের দিকে হটাইয়া দেন (৯৭৪/১৫৬৬)। কিছুদিন পর সুলায়মান মীর্যা ভারতবর্ষের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হন (৯৮৩/১৫৭৫)। ৯৮৭/১৫৭৯ সালে তিনি মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যার সহায়তায় বাদাখ্শান হামলা করিলে শাহরুখ তাহার সহিত সন্ধি করেন এবং তালকান হইতে হিন্দুকুশ পর্যন্ত এলাকা সুলায়মানকে প্রদান করিয়া তিনি নিজে বাদাখ্শান লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন (৯৮৮/১৫৮০)। মুহাররাম ৯৮৯/ফেব্রুয়ারী ১৫৮২ সালে আকবার আর একবার মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কাবুলে আসিয়া পৌঁছান, কিন্তু সাফার ৯৮৯ সালে তিনি পুনরায় কাবুল ও যাবুলিস্তান মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যার নিকট সমর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। এদিকে সুলায়মান মীর্যা ও শাহরুখ-এর মধ্যে বিরাজিত বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বালখ-এর শাসনকর্তা আবদুল্লাহ খান উযবেক উভয়কেই কাবুলের দিকে বিতাড়িত করেন। শাহযাদা মুহাম্মাদ হাকীম মীর্যা ইন্তিকাল করিলে (১৩ শাবান, ৯৯৩/৯ আগস্ট, ১৫৯৫) সম্রাট আকবার মানসিংহের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাদলকে কাবুল রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন এবং যায়ন খান কোকাহকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইভাবে কাবুল একটি স্বতন্ত্র অংশ হিসাবে আকবারের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় (৯৯৫/১৫৮৬)। অতঃপর আকবারের সৈন্যবাহিনী সোয়াত ও বাজওয়ার অঞ্চলে যুদ্ধবাজ পাশতুন উপজাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হি. ৯৯৭ সালে আকবার কাসিম খান কাবুলীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রুশানী জালালুদ্দীন ইব্ন বায়াযীদ-এর সঙ্গে শাহী ফৌজের যে যুদ্ধ হয় উহাতে শাহী ফৌজের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং আকবারের অন্যতম 'নবরত্ন' বীরবল নিহত হন (৯৯৪/১৫৮৬)। এইভাবে গযনীর শাসন ক্ষমতা রুশানীদের হস্তগত হয়। ৩ জুমাদাল আখিরা, ১০১৪/১৬ অক্টোবর, ১৬০৫ সালে সম্রাট আকবার ইন্তিকাল করেন এবং তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হারাত-এর সাফাবী শাসক হুসায়ন খান শামলূ কান্দাহার হামলা করিলে শাহ বেগ উহার প্রবল প্রতিরোধ করেন এবং ইরানী সৈন্যদল নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। জাহাঙ্গীর কান্দাহার, সিন্ধু ও মুলতানের শাসন ক্ষমতা গাযী খানকে প্রদান করেন। ১০১৫/১৬০৬ সালে কাবুল সফরকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ বেগকে আফগানিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, কিন্তু ১০২০/১৬১১ সালে যখন আহাদ্দাদ রুশানী কাবুল হামলা করেন তখন কালীজ খানকে কাবুল শাসন করার জন্য প্রেরণ করা হয়। ১০৩১/১৬২১ সালে শাহ্ আব্বাস সাফাবী পুনরায় কান্দাহার জয় করেন। ইহার পর জাহাঙ্গীর-এর পক্ষে এখানে সৈন্য প্রেরণ সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

২৮ সাফার, ১০৩৭/৮ নভেম্বর, ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীর ইন্তিকাল করেন এবং শাহজাহান ভারতবর্ষের সিংহাসন লাভ করেন। তীরাহ, পেশাওয়ার, কাবুল, গযনী, বাংগাশ প্রভৃতি এলাকায় শাহজাহা-এর সিংহাসনে আরোহণের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাল্খ-এর শাসনকর্তা নাযার মুহাম্মাদ খান উত্তর আফগানিস্তান জয় করিয়া কাবুল অবরোধ করেন। তিন মাসকাল যুদ্ধ চলিতে থাকে। অতঃপর সম্রাটের সৈন্যবাহিনী কাবুল আসিয়া উহাদেরকে পরাভূত করে (১০৩৮/১৬২৮)। এই বৎসর আফগান উপজাতিরা সংঘবদ্ধ হইয়া বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং পেশাওয়ার অবরোধ করে, কিন্তু কাবুলের শাসনকর্তা সাঈদ খান উহাদেরকে বিতাড়িত করেন। সম্রাট আকবারের রাজত্বকালের শেষদিকে পাশীন (বেলুচিস্তান)-এ হাসান খান তারীন নামক জনৈক নেতার পুত্র শের খান তারীন সাফাবী ও মুগল সাম্রাজ্যের মাঝখানে এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ১০৪১/১৬৩১ সালে সীবিস্তান জয় করিবার মনস্থ করেন, কিন্তু কানদাহার-এর সাফাবী শাসনকর্তা আলী মার্দান খান তাঁহাকে পরাজিত করেন, ১০৪৭/১৬৩৭ সালে শাহজাহান কান্দাহার আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। আলী মার্দান খান কান্দাহার শহর শহজাহান-এর নিকট অর্পণ করিয়া দেন। এক অবরোধের পর গিরিশিক হস্তগত হয় এবং যামীনদাওয়ার-এর উপর তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৪৯ হি. শাহজাহান কাবুল ভ্রমণ করেন। এখানে তখন য়ূসুফযাঈগণ গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছিল। উহা দমন করিবার পর হিন্দুকুশ হইতে কান্দাহার পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সম্রাট ১০৫৫ হি. সনে আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চলও আক্রমণ করেন এবং বাদাখশান হইতে বালখ পর্যন্ত ভূখণ্ড পদানত করিয়া রাজ্যের সীমা আমু দরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত করেন। ১০৫৮/১৬৪৮ সালে ইরান-এর মাত্র ষোল বৎসর বয়স্ক তরুণ বাদশাহ ২য় আব্বাস এক সামরিক অভিযান চালাইয়া কান্দাহার দখল করিয়া লন এবং তাহা আর কখনও মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। শাহজাহান-এর সৈন্যদল বারংবার ইহা পুনর্দখলের চেষ্টা চালাইয়াও ব্যর্থ হয়। আওরঙ্গযেব ও দারাশুকোহ এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাহযাদা কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান চালাইয়া উভয়েই ব্যর্থ হন (হি. ১০৫৯, হি. ১০৬১, হি. ১০৬২)। ফলে শাহজাহান-এর দখলে কেবল কাবুল ও গযনী এলাকা থাকে। মুগল ও সাফাবী সাম্রাজ্যদ্বয় যখন ভাগাভাগি করিয়া আফগানিস্তান শাসন করিতেন তখনকার ইতিহাসে কান্দাহারের উত্থান-পতন ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। আফগান উপজাতিগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনবল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এই সময় আবদালী ও গালযাঈগণ পার্বত্য আবাস পরিত্যাগ করিয়া কানদাহার ও যামীনদাওয়ার-এর অত্যন্ত উর্বর সমভূমি, তারনাক ও আরগানদাব-এর উর্বর উপত্যকা এলাকায়

চলিয়া আসে। যেই তাজীক গোত্রগুলি মোংগলদের আক্রমণের প্রচণ্ডতার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং যাহাদের গূরের পর্বত দুর্গগুলি একদল অর্ধ মোংগল অধিবাসীদের দ্বারা (তু. হাযারা) অধিকৃত সেই তাজীক গোত্রগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় আফগান জাতি আর একবার প্রাধান্য লাভের সুযোগ পায়। তাহাদের পূর্বদিকে পর্বতমালা বহিঃশত্রু দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে আক্রান্ত না হওয়ায় তাহাদের গিরিবর্তের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবার স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু তাহাদের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার নির্গম পথের প্রয়োজনে পূর্বদিকে ভারতবর্ষের সমতল ভূমি অঞ্চলে তাহারা ছড়াইয়া পড়ে এবং মেষপালক উপজাতিগুলিও পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করে। পার্বত্য উপজাতিসমূহ সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিয়া কার্যত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। কাবুলের মুগল শাসন তাহাদেরকে নামমাত্র শাসন করিলেও ইহার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা উন্মুক্ত উপত্যকাসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৯৯৪/১৫৮৬ সালে সোয়াত ও বাজাওয়ার-এর য়ূসুফযাঈদের হস্তে আকবারের সেনাবাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সেনাধ্যক্ষ রাজা বীরবল নিহত হইয়াছিলেন। পার্বত্য অধিবাসীদেরকে রাজা মানসিংহ পরবর্তী সময়ে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে কখন বশ্যতায় আনিতে পারেন নাই। প্রায়শ তাহারা সমভূমি এলাকায় হানা দিয়া লুটতরাজ করিত এবং কখনও কখনও রাজবংশীয় কলহ-বিবাদে পক্ষ অবলম্বন করিত। যেমন য়ূসুফযাঈরা আওরাঙ্গযেবের বিরুদ্ধে শাহযাদা শুজা'-র পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে প্রথম শাহ আলাম আওরাঙ্গযেবের অধীনে কাবুল-এর শাসনকর্তা ছিলেন (১১১৪/ ১৭০২)। তখন পুরদিল খান নামক তাঁহার এক আফগান সেনাপতি সৈন্যদল লইয়া খোস্ত হইতে কাবুল গমনের প্রচেষ্টা চালাইবার কালে তাঁহার সমস্ত সৈন্যসহ নিহত হন এবং কাবুল ও পেশাওয়ারের সড়ক পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য শাহ আলাম উপজাতিগুলিকে উৎকোচ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আবদালীগণ, গালযাঈগণ ও নাদির শাহ ঃ ভারতবর্ষ ও ইরানে বারবার সরকার পরিবর্তনের ফলে কান্দাহার প্রদেশে গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং ইরান ও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গোত্রগুলি পরস্পরকে উস্কানি দিতে সমর্থ হয়। কান্দাহার উপকণ্ঠে বসবাসরত আবদালী (দ্র.)-রা শাহ আব্বাস-এর নিকট হইতে এই উপায়ে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হয়। প্রধান হিসাবে সাদু (Sadu) স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁহার বংশধররা সাদুযাঈ নামে এক শাসক পরিবারে পরিণত হয়। এই গোত্রের একটি অংশকে অসদাচরণের অভিযোগে হারাতে অপসারিত করা হয়। ফলে কান্দাহার-এর উপকণ্ঠে গালযাঈ (দ্র.) উপজাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে এবং শাহ আলম ১ম-এর সিংহাসন আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কান্দাহার প্রদেশের গালযাঈগণ পারস্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। গুরগীন খান নামক জনৈক জর্জিয়ান প্রধানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী কান্দাহার-এ প্রেরিত হয়। গালযাঈ প্রধান মীর ওয়ায়েসকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দীশালায় অবস্থানকালে তিনি ইরানের বাদশাহ্ শাহ হুসায়নের সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হন এবং নিজ গোত্রের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর গুরগীন খানকে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করা হয়। মীর ওয়ায়েস কান্দাহার অধিকার করেন এবং তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ভ্রাতা আবদুল আযীয পারস্যের প্রতি অনুগত হওয়ার কিছুটা প্রবণতা দেখাইয়াছিলেন। ওয়ায়েসের পুত্র মাহমূদ তাহাকে হত্যা করেন এবং নিজেকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন (তাহাদের পারস্য বিজয়ের বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. গালযাঈ প্রবন্ধ।)

সেই সময়ে হারাত প্রদেশের আবদালী গোত্রের একটি শাখা কার্যত উক্ত প্রদেশের মালিকে পরিণত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে সাফী কুলী খানের নেতৃত্বে প্রেরিত একটি প্রবল বাহিনীকে পরাজিত করে এবং নিজদেরকে নাদির শাহের সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখে, এমনকি গালযাঈ পারস্য জয় করার পরেও তাহাদের নিকট হইতে ফারাহ অধিকার করিয়া লয়। গালযাঈ নেতা মাহমূদ যখন পারস্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন আবদালীগণ খুরাসানে ছড়াইয়া পড়ে এবং মাশ্‌হাদ অবরোধ করে। গালযাঈ বংশ পারস্যের ন্যায় একটি দেশ শাসন করার যোগ্য ছিল না এবং প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনকে প্রতিহত করার মত তাহাদের যথেষ্ট শক্তিও ছিল না, এমনকি কান্দাহার প্রদেশের সমর্থনও তাহারা হারায় যখন আশরাফ তাহার চাচাত ভাই মাহমূদের স্থলাভিষিক্ত হন। মাহমূদের চাচাত ভাই কান্দাহার রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে যখন নাদির (দ্র.) একটি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন আশ্‌রাফের শাসন দ্রুত পর্যুদস্ত হয় এবং অতি অল্প সংখ্যক গালযাঈ প্রাণ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয়। বেলুচিস্তানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার কালে আশ্‌রাফ নিহত হন (১১৪২/১৭২৯)। নাদির এখন তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র মাশহাদ-অধিকারী মালিক মাহমূদ খানের অধীনে আবদালীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন ১১৪২/১৭২৯)। নাদির ইহাদেরকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করিয়া ইহাদের বহু সৈন্য বন্দী করেন। তাহা সত্ত্বেও নাদির যোদ্ধা হিসাবে ইহাদের মূল্য অনুধাবন করিয়া ইহাদেরকে কান্দাহারের নিকটে ইহাদের পূর্ব গৃহে পুনর্বাসন করিয়া ইহাদের সমর্থন অর্জন করেন। সেখান হইতে সুযোগমত তিনি গালযাঈদেরকে অপসারিত করেন এবং ইহাদেরকে হারাত প্রদেশে নির্বাসিত করেন। কিন্তু তাহাদের অতি অল্পই সেইখানে বাসস্থান গ্রহণ করে এবং বর্তমানে সেইখানে তাহারা কেহই নাই। নাদির শাহ যখন নিজে পারস্যের রাজা হন তখন তিনি কান্দাহার অবরোধ করেন যাহা এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে প্রতিহত করিয়া অবশেষে ১১৫০/১৭৩৮ সালে পরাজিত হয়। এইরূপে গালযাঈ শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে আফগান উপজাতিদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া আবদালীদের ক্ষেত্রে তিনি একটি আপোসমূলক নীতি অবলম্বন করেন এবং উহাদের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে নাদির-এর সেনাদলে ভর্তি করা হয়। বহু গালযাঈ ভারতবর্ষের মুগল রাজত্বের অধীনে কাবুল প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ব্যাপারে নাদির শাহের প্রতিবাদের কোন উত্তর ভারত হইতে না পাওয়ায় তিনি কাবুল আক্রমণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ ইহার পতন ঘটে (১১৫১/১৭৩৮)। আর তখন হইতে ইহা চূড়ান্তভাবে মুগল রাজত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

মানচিত্র আফগানিস্তান
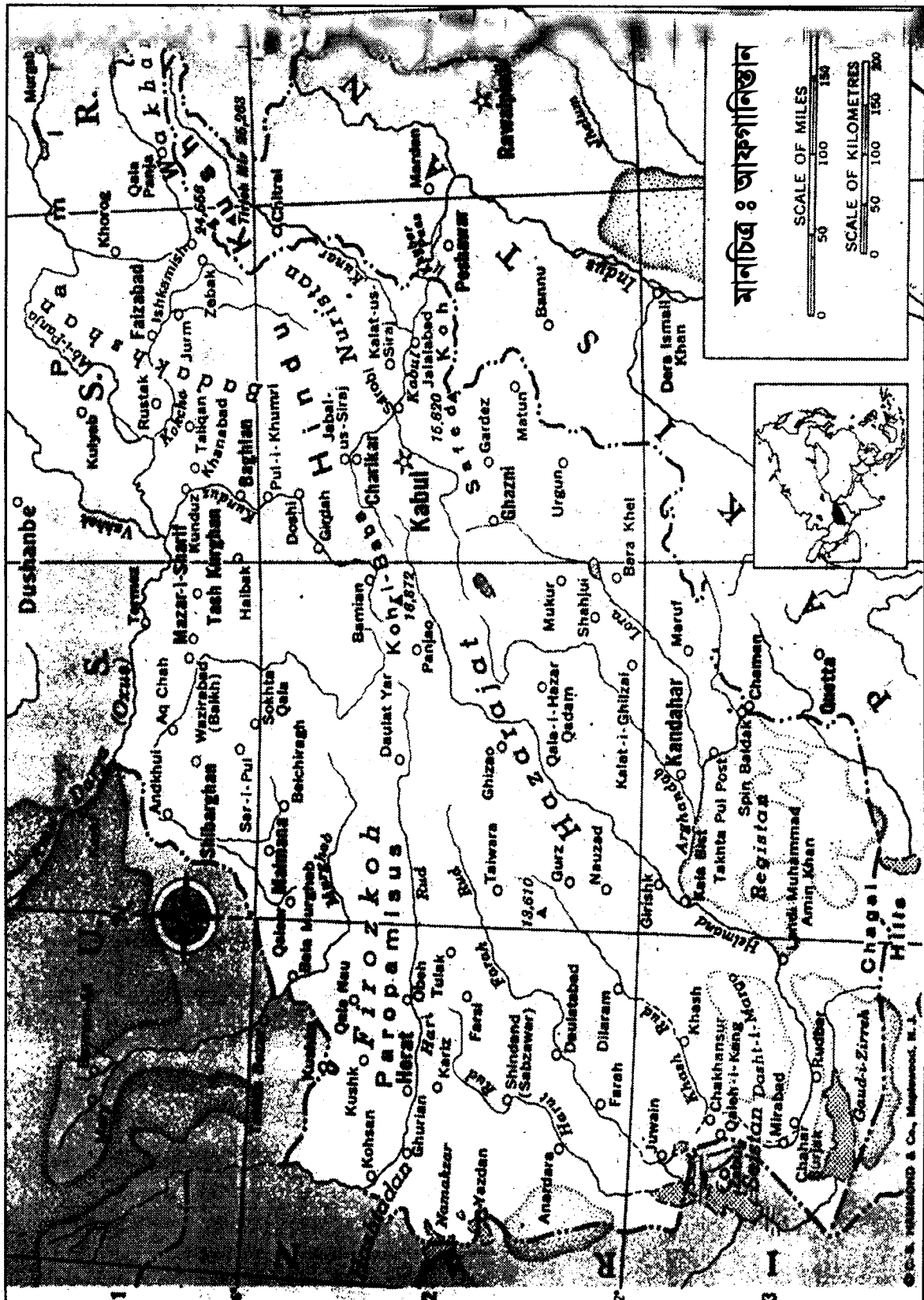
কাবুলে সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ্-এর উৎকীর্ণ সর্বশেষ তারিখ দেখা যায় ১১৩৮/১৭২৫। নাদির শাহ আপাতত কাবুল-এর টাঁকশাল ব্যবহার করেন নাই, বরং তিনি কান্দাহার বিজয়ের বৎসর ১১৫০/১৭৩৭ সালে কান্দাহারে মুদ্রা প্রস্তুত করান। তাঁহার অন্যান্য মুদ্রা প্রস্তুত হয় নাদিরাবাদে (এই শহর কান্দাহার অবরোধের সময় কান্দাহারের বাহিরে তিনি নির্মাণ করেন)। ইহা অবরোধের সময়-কাল নির্ণয় করিয়া দেয়। সমগ্র আফগানিস্তান নাদির শাহের অধিকারে আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে হামলা পরিচালনার জন্য ইহাকে ভিত্তিরূপে ব্যবহার করার তিনি সুযোগ পান। মুহাম্মাদ শাহ্-এর উপর তাঁহার এই বিজয়ের ফলে পেশাওয়ার, ডেরাজাত ও সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত মুগল সাম্রাজ্যের সমগ্র এলাকা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কাবুলে তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিন্ধুর কালহোরা বা আব্বাসী শাসকগণ তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লন। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রথমে আটোকে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন (১১৫২/১৭৪০)। অতঃপর তিনি গোলযোগ সৃষ্টিকারী য়ূসুফযাঈদের দমন করিয়া কাবুলে চলিয়া যান। পরে তিনি কুড়াম উপত্যকা ও বাংগাশ-এর রাস্তা ধরিয়া ডেরাজাতের মধ্য দিয়া সিন্ধুতে অবতরণ করেন। তথা হইতে বেলান হইয়া কান্দাহারে, পরে হারাতে গমন করে। জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইরানী সৈন্যদের চাইতে আফগান সৈন্যদের উপর তিনি অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। কারণ তিনি সুন্নী মতাবলম্বী হওয়ায় ইরানীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক শিথিল হইয়া পড়ে। আবদালীদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের তরুণ সর্দার আহমাদ খানকে সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, নাদির শাহ্ স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাঁহার পর আহমাদ বাদশাহ হইবে। নাদির শাহ ইরানী ও কিযিলবাশদের হস্তে নিহত হন। তখন আহমাদ শাহ আবদালীদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এক ধনভাণ্ডার বহনকারী কাফেলাকে অধিকার করিয়া কান্দাহার চলিয়া যান। কান্দাহারে তিনি নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন।

(M.Longworth Dames)

(৩) আফগান জাতীয় রাষ্ট্রঃ (ক) সাদোযাঈ বংশে হি. (১১৬০-১২৫০) কান্দাহারে আহমাদ শাহ নির্জেকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং সিন্ধুনদ পর্যন্ত নাদির শাহ-এর সাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে অধিকার করেন। হারাতও অচিরেই তাঁহার দখলে আসে। পারস্য রাজ্যের সাধারণ ভগ্নদশায় আহমাদ শাহ নাদির শাহের পৌত্র শাহরুখ-এর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। শাহরুখকে তাঁহার দুশমনেরা অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আহমাদ শাহ শাহরুখের জন্য খুরাসানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যও সংরক্ষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশটি আহমাদ শাহ ও তাঁহার পুত্র তীমূর শাহ-এর রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। মাশ্হাদ-এ তাঁহাদের উভয়েরই নামে কোন কোন সময়ে মুদ্রা জারি করা হয়। তীমূর শাহ-এর মৃত্যুর পর আগা মুহাম্মাদ কাজার কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শাহরুখ নামেমাত্র সেই প্রদেশ শাসন করেন। হারাত দুর্‌রানী সালতানাতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য হয় এবং খুরাসান-এর প্রাচীন রাজ্য ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে বিভক্ত থাকে। আহমাদ শাহ কান্দাহারকে রাজধানী ঘোষণা করত উহার নাম রাখেন আহমাদ শাহী। তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মুদ্রায় উক্ত নামই অঙ্কিত হইতে থাকে। তিনি দুর্‌রে দুর্‌রান উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিজ গোত্র অর্থাৎ আবদালী দুর্‌রানী (দ্র.) নামে পরিচিত হন। বহুদিন হইতেই তাঁহার পরিবারকে সম্মানের চোখে দেখা হইত। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মোদ্দীপনা উহার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম করে। তিনি বিভিন্ন গোত্রের সহিত নম্র ব্যবহার করিতেন। আয়ের পন্থা হিসাবে রাজস্বের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি বিদেশীদের সংগে যুদ্ধ করার উপর অধিক নির্ভর করিতেন। তাঁহাকে লইয়া দুর্‌রানীরা গর্ব করিত এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিত, অথচ এই গোত্রটিকে শাসন করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই কারণে তাঁহার পুত্র তীমূর শাহ কাবুলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এখানকার জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল তাজীক। ভারত বিজয় দ্বারা আহ্মাদ শাহ শুধু নাদির শাহ-এর সমকক্ষই হন নাই, বরং তাঁহার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা অর্জন করিয়াছেন। তিনি নিজের রাজ্যসীমা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া বহু দূর প্রসারিত করেন। কাশ্মীর, লাহোর প্রদেশ ও মুলতান তর্থাৎ পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ তিনি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন এবং ভাওয়ালপুর-এর দাউদ পুত্রদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

আহমাদ বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ অভিযানে আগমন করেন। একাধিকবার তিনি দিল্লী অধিকার করেন। ১১৭৪/১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদের পরাজিত করেন। ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু তিনি পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশকে স্বরাজ্যভুক্ত করেন নাই। শিখদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ছিল নিরবচ্ছিন্ন। অবশেষে পাঞ্জাব প্রদেশটি তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। নাদির শাহের করদ রাজ্য কালাতের খান বারাহূঈ (ব্রোহী) নাসির খানও ১১৭২/১৭৫৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আহমাদ শাহ্ কালাত অবরোধ করেন, কিন্তু উহা জয় করিতে ব্যর্থ হন। ভারতে চলিয়া যাইতে হয় বলিয়া তিনি কালাতের খান-এর নামমাত্র আনুগত্যেই সন্তুষ্ট হন। নাসির খান খুরাসানের যুদ্ধে আহমাদ শাহকে সমর্থন দেন। ১১৮২/১৭৬৮ সালে আহমাদ শাহ-এর (ইরানের) কারীম খান যান্দ-এর উপর বিজয়ে নাসির খান-এর এক বিরাট অবদান ছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্ধ আফশারী শাহযাদা কারীম খান-এর পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাঁহাকে মাশহাদে আশ্রয় দেন। আহমাদ শাহ মাশহাদের চতুর্দিক অবরুদ্ধ করিয়া উহার পতন ঘটান।

আহমাদ শাহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানিবার জন্য দেখুন আহমাদ শাহ দুর্‌রানী প্রবন্ধ। তিনি কান্দাহারের উপকণ্ঠে অবস্থিত পাহাড়ী এলাকার মুরগাব নামক স্থানে ১১৮২/১৭৬৮ সালে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের জন্য আয়তনে বিশাল কিন্তু অরক্ষিত এক সাম্রাজ্য রাখিয়া যান।

আহমাদ শাহ একজন আলিম, পাশতূ ভাষার কবি, দীনদার ও বীরপুরুষ ছিলেন। প্রজাদের নিকট তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে পরিচিত হন এবং তিনি অপর রাজ্যের মুসলমানদের সহিত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি আফগানিস্তানের এত বিরাট উপকার করিয়াছিলেন যে, সেখানকার জনগণ তাঁহাকে 'বাবা' খিতাবে ভূষিত করে। তিনি আফগানিস্তান রাজ্যে স্বরাষ্ট্র, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উযীর নিয়োগ করেন। কান্দাহারের তাশকারগান শহর ব্যতীত আরও কয়েকটি শহরের তিনি পত্তন করেন। ১১৬৬/১৭৫২ সালে কাবুলের সামরিক কেল্লা তিনি নির্মাণ করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে প্রায় ১ লক্ষ সৈনিক ছিল এবং তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব আয় ছিল তিন কোটি দশ লক্ষ রুপিয়া।

তীমূর শাহ তাঁহার পিতার আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি লাহোর ও মুলতান-এর নিজাম ছিলেন। একাধিক মুদ্রায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আহমাদ শাহ-এর ইন্তিকালের সময় তিনি হারাতে ছিলেন। এই সময় তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মানকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করান হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে বন্দী ও হত্যা করার পরেই কান্দাহার অধিকার করেন, অচিরেই তিনি কাবুলে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং নির্বিঘ্নে বিশ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসন আমল বাহ্যত গোলযোগহীন ও শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের শক্তি ও স্থিতিশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাহিরের প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অনিশ্চিত ছিল। শিখরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া ১১৯৬/১৭৮১ সালে মূলতান অধিকার করে। অবশ্য তীমূর শাহ সেই বৎসরই উহা পুনরুদ্ধার করেন। সিন্ধুদেশে সামন্ত শাসক কালহোরাদেকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থলে তালবুর নামে অভিহিত গোত্রের বালুচ আমীরগণ অধিষ্ঠিত হন। তাঁহারা ১১৯৭/১৭৮২ হইতে ১২০১/১৭৮৬ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সহিত তীমূর শাহ-এর সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন, যদিও নামেমাত্র তাঁহারা তীমূর শাহ-এর আনুগত্য স্বীকার করিত। বুখারার মানগত আমীর মা'সূ'ম তুর্কিস্তান সীমান্ত, বিশেষ করিয়া মারব সীমান্ত লংঘন করিতে থাকেন। তীমূর শাহ তাহাদেরকে আক্রমণ করায় তাঁহারাও নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু বিজিত এলাকার উপর কর্তৃত্ব অটুট রাখেন। কাশ্মীরেও বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাহা দমন করেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে দুররানী বংশোদ্ভূত বারাকযাঈ গোত্রের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তীমূর শাহ (৭ শাওওয়াল, ১২০৭/১৮ মে, ১৭৯৩ সালে) ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পুত্র যামান শাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১২১৫/১৮০০ সালে স্বীয় ভ্রাতা মাহমূদ শাহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাজত্ব করেন, যদিও তাঁহার স্বল্পকালীন শাসন আমলে তিনি এত অধিক অপরাধ ও নির্বুদ্ধিতামূলক কার্য করিয়াছিলেন, যাহা দুররানী রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বীয় ভ্রাতা মাহমূদ ও শুজা'উল-মুলক-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খুরাসান-এর কাজারদের হুমকি, উত্তরে শাহ মুরাদ মানগিত-এর আস্ফালন, দক্ষিণে কালাত-এর খান ও সিন্ধুর আমীরগণের অবাধ্যতা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁহার রাজত্ব দুর্বল হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আহমাদ শাহ-এর বিজয়গুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নির্বোধের মত আক্রমণ করা হইতে এবং ইসলামের রক্ষক সাজিয়া শিখ ও মারাঠাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজের শক্তি অপচয় করা হইতে তিনি বিরত হন নাই। এইসব কারণে সেই সময় উত্তর ভারতে দ্রুত ক্ষমতা বিস্তারকারী ইংরেজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। বৃদ্ধ অন্ধ শাহরুখকে হত্যা করিয়া আগা মুহাম্মাদ কাজার মাশহাদ অধিকার করিয়া লইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া তিনি হাসান আবদাল-এর পরিচালিত প্রথম অভিযান (১২০৯/১৭৯৫) সংক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হন। পারস্য রাজার একটি দূতাবাস কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হন। কিন্তু মাহমূদ হারাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হন। এই বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। এই সময় তিনি লাহোরে উপনীত হন এবং রনজিত সিং-এর নেতৃত্বে শিখদের মৌখিক আনুগত্য গ্রহণ করেন। খুরাসানে কাজারদের সীমান্ত লঙ্ঘন তাঁহাকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করে। এই সময় মাহমূদ হারাত হইতে কান্দাহার পরিক্রমণ করিয়া বিক্ষুব্ধ জনগণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন বারাকযাঈ গোত্রের শক্তিশালী নেতা সারফারায খান উপাধিতে পরিচিত পাইন্দা খান যিনি উযীর ওয়াফাদার খানের শাসন কর্তৃত্বের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। ষড়যন্ত্রটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় এবং পাইন্দা খান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার পুত্র ফাতহ খান খুরাসানে মাহমূদের আশ্রয়ে পলায়ন করেন এবং মাহমূদকে পরাজিত করেন। এখানে তিনি দুররানী গোত্রের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। কারণ যামান শাহ দুররানীদের নিকট অপ্রিয় ছিলেন (যামান শাহ-এর মাতা ছিলেন য়ূসুফযাঈ গোত্রের, পক্ষান্তরে মাহমূদ-এর মাতা ছিলেন পোপালযাঈ দুররানী গোত্রীয়)। ইহার পরিণাম ফলপ্রসূ হয়। যখন মাহমূদ কান্দাহার দখল করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন যামান শাহ ভারতবর্ষে আর একবার অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাহমূদ কাবুলের উদ্দেশে অগ্রসর হইলে যামান শাহ পলায়ন করেন, কিন্তু তিনি সত্বর ধৃত হন এবং তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয় (১২১৫/১৮০০)। এইদিকে কাবুলে মাহমূদের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে শুজা'উল-মুলক পেশাওয়ারে নিজেকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন। মাহমূদের বিরুদ্ধে গালযাঈ বিদ্রোহ তাঁহাকে সাহায্য করে। ১২১৮/১৮০৩ সালে মাহমূদকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহার অন্ধ সহোদর ভ্রাতা যামান শাহকে মুক্ত করা হয়। কিছু দিনের জন্য ফাতহ খানের সমর্থনপুষ্ট মাহমূদ-এর পুত্র কামরান কান্দাহার অধিকার করিয়া রাখেন। কিন্তু ফাতহ খান স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কামরানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তবে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি যামান শাহের পুত্র কায়সার শাহকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারূপে দাঁড় করান। পরবর্তী কয়েক বৎসর অবিরাম ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ফাতহ খান বারংবার দল পাল্টাইতে থাকেন। কখনও তিনি মাহমূদ ও কামরানের সমর্থনে আসেন। আবার কখনও কায়সারের দলে যান। অন্য দিকে শুজা'উল-মুলক সিন্ধু ও কাশ্মীর অভিযানে গিয়া তাঁহার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলেন। অবশেষে ফাতহ খান যিনি তখন মাহমূদের সমর্থক ছিলেন নিমলা নামক স্থানে শুজা'উল-মূলককে পরাজিত করেন (১২২৪/১৮০৯)। শুজা'উল-মুলক ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। মাহমূদের রাজত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। ফাতহ খানের শক্তি ইতোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠে এবং মাহমূদ সম্পূর্ণভাবে ফাতহ খানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। তাঁহার (ফাতহ খান) ভ্রাতা দোস্ত মুহাম্মাদ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। আর এক ভ্রাতা মুহাম্মাদ আ'জামকে কাশ্মীরের এবং অন্য এক ভ্রাতা কুহানদিলকে কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অপর এক শাহযাদার নেতৃত্বে হারাত স্বাধীন হইয়া গেলে ফাতহ খান ও দোস্ত মুহাম্মাদ খান ১২৩২/১৮১৬ সালে উহা পুনরায় জয় করেন। দোস্ত

মুহাম্মাদ শাসনকর্তা পদে উন্নীত হন। কামরানের হারেমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভগ্নীকে অপমানিত করায় দোস্ত মুহাম্মাদ কামরানের রোষানলে পতিত হন। দোস্ত মুহাম্মাদ কাশ্মীরে পলায়ন করেন। ফাতহ খানকে অন্ধ করিয়া কামরান প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন এবং মাহমূদ-এর অনুমতিক্রমে ফাতহ খানকে হত্যা করা হয়। অবিশ্বস্ত ও নীতিজ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও আফগানরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। সেই কারণে তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মুহাম্মাদের জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া ১২৩৫/১৮১৮ সালে কাবুল উপকণ্ঠে মাহমূদকে পরাজিত করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। ফলে কাবুল মাহমূদ-এর হস্তচ্যুত হয় এবং তিনি আর কখনও উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। ১২৪৫/১৮২৯ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হারাত দখলে রাখেন। কামরানও ১২৫৮/১৮৪২ সালে নিহত হইবার পূর্ব পর্যন্ত হারাতে শাসন করেন।

(M. Longworth Dames)

বারাকযাঈ (বা মুহাম্মাদ যাঈ) বংশ ঃ মুহাম্মাদ যাঈ কান্দাহারের দুররানী বারাকযাঈ-র এক ক্ষুদ্র উপশাখা। আবদালী গোত্রসমূহের প্রধান মালিক সাদ্-এর সমসাময়িক জনৈক মুহাম্মাদ-এর নামানুসারে গোত্রটির নামকরণ হয়। আনুমানিক ১০০০/১৫৯১ সালে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র গোত্রটির সহিত কান্দাহারের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আরগাসান নামক স্থানে বাস করিতেন। কান্দাহার-এর বারাকযাঈ উপজাতিগুলির মধ্যে তাঁহার বংশধররা সরদার উপাধি গ্রহণ করেন এবং হা'জ্জী জামালুদ্দীন খান ইব্ন হা'জ্জী ইউসুফ ইব্ন যারো ইব্ন মুহাম্মাদ-এর কারণে খ্যাতি লাভ করেন, যিনি আহমাদ শাহ-এর অধীনে কাজ করিতেন এবং ১১৮৪/১৭৭০-৭১ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পুত্র পাইন্দা খান তীমূর শাহ-এর সপক্ষে বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট অবদান রাখেন। কিন্তু শাহ যামান-এর বিরুদ্ধে মাহমূদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে কান্দাহারে তাঁহাকে ১২১৪/১৮০০ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি কয়েকটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। মাহমূদ-এর কাবুল অধিকার করিবার পরে (১২১৫/১৮০০) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফাতহ খান শাহ দোস্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া উযীর পদে অভিষিক্ত হন। মুহাম্মাদ যাঈদের শক্তি বৃদ্ধির সংগে সংগে তাহারা উচ্চাভিলাষী হইয়া উঠে। ফলে শাসক সাদুযাঈ পরিবারের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। আফগানিস্তান কলহ-বিবাদ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অবশেষে ১২৩৪/১৮১৮-১৯ সালে ফাতহ খান-এর হত্যার পরে তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মুহাম্মাদ মাহমূদকে কাবুল হইতে বহিষ্কৃত করেন।

ইতিমধ্যে বারাকযাঈ সরদারদের কব্জায় প্রায় সমগ্র দেশ আসিয়া যায়। প্রথম দিকে তাহারা সাদুযাঈ পরিবারের পুতুলসম রাজাদের নামে রাজ্য শাসন করিতে থাকে। এই সব সুলতানের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন আয়্যুব ও সুলতান আলী (যিনি তাঁহার মুদ্রায় ব্যবহারের জন্য সুলতান মাহমূদ নাম গ্রহণ করেন)। ১২৫৪/১৮৩৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত দোস্ত মুহাম্মাদ কাবুলের আমীর উপাধি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি কিম্বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী হাবীবুল্লাহর পূর্বে শাহ বা সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শাসন আমলের প্রথম দিকে সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলি দ্রুত হস্তচ্যুত হইতে থাকে। শিখরা ১২৩৩/১৮১৮ সালে মুলতান, ১২৩৫/১৮১৯ সালে কাশ্মীর ও ডেরাগাযী খান ও ১২৩৬/১৮২১ সালে ডেরা ইসমাঈল খান অধিকার করিয়া লয়। দোস্ত মুহাম্মাদ-এর ভ্রাতা সরদার সুলতান মাহমূদের নেতৃত্বে পেশাওয়ারে দীর্ঘদিন তাহাদেরকে প্রতিরোধ করিতে থাকে। অতঃপর ১২৫০/১৮৩৪ সালে ইহারও পতন ঘটে। শিকারপুর দখল করিয়া সিন্ধুর আমীরগণ আফগান শাসনের শেষ চিহ্নও অবলুপ্ত করে এবং হিন্দুকুশের উত্তরে অবস্থিত বালখও আফগানদের হাতছাড়া হয়। দোস্ত মুহাম্মাদ তাই আয়তনে ছোট, অথচ ঘনবিন্যস্ত এক আফগান রাজ্যের শাসক হইলেন। সাদুযাঈ সুলতানদের নিকট প্রান্তিক প্রদেশগুলি দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা হস্তচ্যুত হইবার ফলে তিনি তাঁহার শক্তিকে দৃঢ় করিতে সমর্থ হইলেন। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে দ্বিধাহীন থাকিলেও একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল এবং তিনি আফগানদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাদের অনিবার্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার অগ্রগতির পথে ভীষণ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। তিনি যখন কাবুলে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন তখন কান্দাহার তাঁহার ভ্রাতা কুহানদিল খানের দখলে ছিল। ১২৫০/১৮৩৪ সালে শুজা'উল মুলক সাদুযাঈ কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। স্বীয় উযীর ইয়ার মুহাম্মাদ কর্তৃক কামরান নিহত হইলে (১২৫৮/১৮৪২) ইরানীরা হারাত দখল করে। দোস্ত মুহাম্মাদ খান ১২৮০/১৮৬৩ সালে মৃত্যুর মাত্র অল্প কিছু দিন পূর্বে ইহা পুনরুদ্ধার করেন।

শুজা'উল মুলক কান্দাহারে ব্যর্থ হইয়া বৃটিশদের সাহায্য লাভের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-তদবীর করিতে থাকেন। তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে উহা অর্জনে তিনি সক্ষম হন। আলেকজান্ডার বার্নেস দোস্ত মুহাম্মাদ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকার শুজা'উল-মূলক-এর দাবি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হন। এই সময় ইরানীরা হারাত অবরোধ করিয়া বসে (১২৫৩/১৮৩৭)। ধারণা করা হইত, তাহাদের এই আক্রমণের নেতৃত্ব রুশগণ দিয়াছিল এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছিলেন একজন ইংরেজ কর্মকর্তা। ফলে ঘটনা প্রবাহ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। ইন্দো-ভারতীয় একদল সৈন্য সিন্ধু ও বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়া কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হয় (১২৫৪-এর শেষ/ফেব্রুয়ারী ১৮৩৯) এবং নগরী দখল করিয়া তাহারা কাবুল আক্রমণ করে। দোস্ত মুহাম্মাদ বুখারা পলায়ন করেন। শুজা'উল-মুলককে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় (১ জুমাদাছ-ছানিয়া, ১২৫৫/১৭ আগস্ট, ১৮৩৯)। দোস্ত মুহাম্মাদ উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি অভিযানে ব্যর্থ হইয়া পরবর্তী বৎসর বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়।

শুজা'উল-মূলক-এর শাসনকাল ছিল গোলযোগে পরিপূর্ণ। ১৮৪১ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কাবুল ত্যাগ করে এবং তাহাদের পশ্চাদপসরণের সময় অধিকাংশ সৈন্যকে খুরদ কাবুল গিরিপথে প্রায় নির্মূল করা হয়। দোস্ত মুহাম্মাদ-এর পুত্র মুহাম্মাদ আকবার এই অভিযানগুলি পরিচালনা করেন। জালালাবাদ ও কান্দাহার তখনও বৃটিশের দখলে থাকে

এবং ১২৫৮/১৮৪২ সালের শরৎকালে তাহারা কাবুল পুনরায় অধিকার করে। ইহার অল্প কিছুদিন পূর্বে শুজা'উল-মুল্ক আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্র ফাত্‌হ জাংগকে পোপালযাঈরা বাদশাহ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে, কিন্তু বারাকযাঈরা ইহার বিরোধিতা করে। অল্প কিছুদিন পর বৃটিশ আফগানিস্তান ত্যাগ করে। কাবুলে অবস্থান করা আদৌ নিরাপদ নয় জানিয়া ফাতহ জাংগ তাহাদের সহিত কাবুল ত্যাগ করেন। তখনও জীবিত কিন্তু অন্ধ ও বৃদ্ধ যামান শাহকে সঙ্গে লইয়া আফগানিস্তানে একটি সুদৃঢ় সরকার গঠন করিবার মত যোগ্যতা একমাত্র দোস্ত মুহাম্মাদেরই ছিল। তাই তাঁহাকে পুনরায় আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতাগণকে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে পুনর্বহাল করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে গোলযোগ অব্যাহত থাকায় গোত্রীয় সংহতি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে, এমনকি উযীর পদে আসীন থাকিয়াও তাঁহার পুত্র আকবার খান মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পিতার সহিত সদ্‌ভাব রক্ষা করেন নাই। আকবার খান ১২৬৬/১৮৪৯-৫০ সালে ইন্তিকাল করেন। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে শিখদের সহিত যুদ্ধের সময় ব্যতীত দোস্ত মুহাম্মাদ বৃটিশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী যুদ্ধে তিনি উহাদেরকে সমর্থন দেন নাই। তিনি তাঁহার দেশকে শক্তিশালী দেশ হিসাবে গঠন করিবার কাজে ব্যাপৃত থাকেন এবং হি. ১২৬৭ হইতে ১২৭২ পর্যন্ত (খৃ. ১৮৫০-৫৫) সালে তিনি বালখ, খুল্‌ম, কুন্দুয ও বাদখ্‌শান পুনঃঅধিকার করেন। ১২৮০/১৮৬৩ সালে তিনি হারাত হইতে ইরানীদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন এবং হারাত উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই তিনি সেইখানে ইন্তিকাল করেন। সুস্পষ্ট কিছু দোষ-ত্রুটি থাকিলেও মোটামুটি তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন (আরও দ্র. দোস্ত মুহাম্মাদ খান)।

তিনি তাঁহার পঞ্চম পুত্র শের 'আলী খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। শের 'আলী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আ'জ'াম ও মুহাম্মাদ আফদ'াল এবং শেষোক্তের দক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত পুত্র আবদুর রাহমান-এর সহিত গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন (এই গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিবার জন্য দেখুন আবদুর রাহমান খান)। শের 'আলী ১২৮৩/১৮৬৬ সালে পরাজিত হন। প্রথমে কাবুল ও পরে কান্দাহার তাঁহার দখলচ্যুত হয়। ১২৮৫/১৮৬৮ সাল পর্যন্ত আফদ'াল ও আ'জ'াম পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও হারাত দখল করিতে পারেন নাই। পরবর্তী বৎসর শের 'আলীর পুত্র মুহাম্মাদ ইয়া'কূ'ব হারাত হইতে এক অভিযানে অগ্রসর হইয়া পিতার সপক্ষে কাবুল ও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। সমগ্র আফগানিস্তান শের 'আলীর অধীনে আসিয়া যায়। ভারতবর্ষের সরকার তাঁহাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি ১২৮৬/১৮৬৯ সালে আম্বালা নামক স্থানে ভাইসরয় মেয়ো (Lord Mayo)-এর সহিত সাক্ষাত করেন, কিন্তু ভাইসরয়-এর নিকট হইতে অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য ও সমর্থনের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই সময় তিনি তাঁহার উচ্চাভিলাষী পুত্র ইয়া'কূবকে বন্দী করেন। ভাইসরয় তাঁহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিলে তিনি ক্ষুব্ধ হন। সীস্তান সীমান্ত লইয়া ইরানের সহিত বিদ্যমান বিরোধ বৃটিশ কর্মকর্তাদের আপোস প্রস্তাব তিনি মানিয়া লন। কিন্তু সালিশ মুতাবিক যখন একটি বিশাল উর্বর অঞ্চল ইরানের ভাগে পড়ে তখন তিনি আরও বেশী ক্ষুব্ধ হন। অবশেষে রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যোগাযোগ রক্ষা করিতে থাকেন এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদূত গ্রহণে অসম্মতি প্রদান করেন। এই সমস্ত কারণে ১৮৭৮-৮০ সালে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী কাবুল অধিকার করে, শের 'আলী মাযার-ই শারীফ-এ পলায়ন করেন এবং সেখানে ১২৯৬/১৮৭৯ সালে ইন্তিকাল করেন (দ্র. শের 'আলী)। ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে লর্ড রবার্টস (Lord Roberts) পায়ওয়ার (Paywar) গিরিপথে পরাজিত করেন।

মুহাম্মাদ ইয়াকূ'ব জেল হইতে মুক্ত হইয়া (আট বৎসর পর) পিতার পলায়নে সৃষ্ট শূন্য আসনে নিজেকে আমীর হিসাবে ঘোষণা করিয়া অধিষ্ঠিত হন (রাবী'উল-আওওয়াল ১২৯৬/ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৮৭৯) এবং গান্দামাক নামক স্থানে বৃটিশ অগ্রগামী সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হন। এখানে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় (৪ জুমাদাছ-ছানী/২৬ মে)। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে বোলান গিরিপথ ও কুরাম উপত্যকা সন্নিহিত একটি অঞ্চল বৃটিশ ভারতের নিকট আর্পিত হয় এবং কাবুলে বৃটিশ মিশন স্থাপনে তাঁহাকে সম্মত হইতে হয়। ইহার কয়েক মাস পর এক অভ্যুত্থানে স্যার লুইস কাভাগনারী (Sir Louis Cavagnari)-র নেতৃত্বে গঠিত ব্রিটিশ মিশনের সদস্যগণ নিহত হন। ইহার ফলে পুনরায় যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে। রবার্টস (Roberts) পুনরায় কাবুল অধিকার করেন, কিন্তু মুহাম্মাদ জান ও মুল্লা মুশক-ই আলাম-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি উপজাতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা কাবুলে অবরুদ্ধ হন। এই অবরোধ বিফল হইলে ইয়া'কূ'ব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তাঁহাকে ভারতবর্ষে সরাইয়া দেওয়া হয়। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব আবদুর রাহমান-এর উপর অর্পিত হয়। কান্দাহারকে আলাদা রাজ্য হিসাবে সংগঠিত করা হয়। কান্দাহার-এ অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ স্টুয়ার্ট (Stewart)-এর নেতৃত্বে দেশত্যাগ করার প্রস্তুতি হিসাবে কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু গালযাঈদের এলাকা অতিক্রম করিবার সময় উক্ত সেনাবাহিনী আহমাদ খায়ল নামক স্থানে বিশাল গালযাঈ মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ভীষণ এক সংঘর্ষ মুকাবিলা করিবার পর হানাদারদেরকে পর্যুদস্ত করা হয়। আবদুর রাহমান-এর বাদশাহ হিসাবে ঘোষণার প্রায় সংগে সংগে শের 'আলীর অন্যতম পুত্র আয়্যুব, যিনি হারাতে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেছিলেন, কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মেওয়ান্দা নামক স্থানে ইন্দো-ভারতীয় একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরাজিত করিয়া তিনি কান্দাহার অবরোধ করেন। রবার্টস (Roberts) অতি দ্রুত কাবুল হইতে আসিয়া আয়্যুবকে পরাজিত করেন। ইহার পর বৃটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয় এবং কান্দাহারসহ সমগ্র দেশ আবদুর রাহমান-এর নিকট হস্তান্তর করা হয় (১২৯৭/১৮৮০)। অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বাহ্যিক সমস্যাদি থাকা সত্ত্বেও আবদুর রাহমান খান দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি সংরক্ষণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৫ জুমাদাছ-ছানী, ১৩১৯/৯ অক্টোবর, ১৯০১) তদীয় পুত্র হাবীবুল্লাহ অবিসম্বাদিত কর্তৃত্বের অধিকারী হন।

হাবীবুল্লাহ্‌র সিংহাসন আরোহণের কিছু দিন পর রুশ-বৃটিশ চুক্তি সম্পাদিত হইবার ফলে এই দুই শক্তির যে কোন একটি দ্বারা পুনঃঅধিকৃত

হওয়ার অথবা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার আশংকা দূরীভূত হয়। ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকারের সহিত তাঁহার পিতা যে চুক্তি করিয়াছিলেন ১৩২৩/১৯০৫ সালে তিনি তাহা অনুমোদন করেন। বৃটিশ ভারতকে আফগানিস্তানে বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের বিনিময়ে বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা (১,৬০,০০০ পাউন্ড) ভর্তুকী গ্রহণে সম্মত হন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি সামগ্রিকভাবে বিরাজ করে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে আফগানিস্তান নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। হাবীবুল্লাহ খান ১৮ জুমাদাল-আওওয়াল, ১৩৩৭/২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ লাগমান-এ অবস্থিত কালাইগূশ-এ স্বকীয় শিবিরে গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা নাসরুল্লাহ খান জালালাবাদ-এ নিজকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ৩য় পুত্র আমানুল্লাহ খান তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া নিজে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। নাসরুল্লাহ খান জল খানায় ইন্তিকাল করেন। আমানুল্লাহ খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই বৃটিশ ভারতের সহিত তাঁহার বৈরিতা শুরু হয় কিন্তু মাত্র এক মাস পরেই তিনি বৃটিশ ভারতের নিকট যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ করেন। রাওয়ালপিন্ডির (১১ যু'ল-কা'দা, ১৩৩৭/৮ আগস্ট, ১৯১৯) চুক্তি অনুসারে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের সহিত নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু উত্তর সীমান্তে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তেজনা অব্যাহত থাকে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে Loe Djirga (লয়া জিরগা)-তে একটি শাসনতন্ত্র জারী করা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রশাসনিক বিধি গৃহীত এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নারী জাতির শিক্ষার ফরমান জারী হয়। মুল্লা আবদুল কারীম-এর নেতৃত্বে খোস্ত নামক স্থানে নারী উচ্চশিক্ষা বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইলে দ্বিতীয় লয়া জিরগা (জুলাই ১৯২৪) তাহা বাতিল ঘোষণা করে এবং বাধ্যতামূলক ভর্তি বিধির সংশোধন করে। ইহার ফলে বিদ্রোহ স্তিমিত হইয়া যায়। বাদশাহ আমানুল্লাহ (বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষ হইয়া ইউরোপ, সোভিয়েট রাশিয়া ও তুরস্ক সফরশেষে (ডিসেম্বর ১৯২৭-জুলাই ১৯২৮) দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য তৃতীয় লয়া জিরগা তলব করেন। ওদিকে একটির পর একটি উপজাতির উত্থান সংঘটিত হইতে থাকে। বাচ্চা-ই সাকাও নামক এক তাজীক দস্যু কূহ-ই দামান হইতে অগ্রসর হইয়া কাবুল অধিকার করিয়া বসে (জানুয়ারী ১৯২৯)। পরবর্তী কালে বাচ্চা-ই সাকাও হাবীবুল্লাহ খান উপাধি গ্রহণ করে। এইদিকে আমানুল্লাহ কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া কান্দাহার-এ গমন করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার কাবুল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হাবীবুল্লাহ খান (বাচ্চা-ই সাকাও)-এর গালযাঈ অনুসারিগণ ব্যর্থ করিয়া দেয় (এপ্রিল-মে ১৯২৯)। ইতোমধ্যে আবদুর রাহীম নামক অন্য এক তাজীক হারাত অধিকার করিয়া লন।

নাদির খান (ইব্ন মুহাম্মাদ ইয়ূসুফ খান ইব্ন ইয়াহ্'য়া খান ইব্ন সুলতান মুহাম্মাদ খান, দোস্ত মুহাম্মাদ-এর ভ্রাতা)-এর নেতৃত্বে পাইন্দা খান-এর জ্ঞাতি বংশোদ্ভূত মুহাম্মাদ যাঈগণ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে আগাইয়া আসে। প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ নাদির খান স্বেচ্ছায় নির্বাসিত ছিলেন। একাধিক ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর তিনি গোপনে ওয়াযীর ও মাহসুদদের এক সেনাদলকে সংঘবদ্ধ করেন। এই সেনাবাহিনী নাদির খান-এর ভ্রাতা শাহ ওয়ালী খান-এর নেতৃত্বে কাবুল অধিকার করে। এখানে তিনি ১২ জুমাদাল-আওওয়াল, ১৩৪৮/১৬ অক্টোবর, ১৯২৯ সালে নিজেকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং নাদির শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। হাবীবুল্লাহ আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দেশের সুখ-শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে আরও দুই বৎসর সময় লাগে। আমানুল্লাহ্র সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিহিংসার আগুন স্তিমিতভাবে জ্বলিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে লোগার-এর চারখাঈ পরিবার বেশি সক্রিয় হইয়া উঠে। এই পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফলে এক দীর্ঘ মেয়াদী বিবাদের আগুন প্রজ্বলিত হয়। পরিণামে দিলকুশা প্রাসাদে ২০ রাজাব, ১৩৫২/৮ নভেম্বর, ১৯৩৩ সালে নাদির শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মাদ জাহীরকে নাদির শাহ-এর ভ্রাতাগণ তৎক্ষণাৎ নাদির শাহ-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা দেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরদার মুহাম্মাদ হাশিম খান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতে উদ্ভূত বিভিন্ন উপজাতির বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং সামরিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তান জাতিপুঞ্জের (League of Nations) সদস্য তালিকাভুক্ত হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের সহিত সাদাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহা কঠোর নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা করে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এক চুক্তির মাধ্যমে উত্তর সীমান্ত বিরোধ মীমাংসিত হয়। ইরানের সহিত হিলমান্দ নদী লইয়া বিরোধ মার্কিন (আমেরিকার) মধ্যস্থতায় মীমাংসিত হয়। এই বৎসরই একটি নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়। সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনচেতা উপজাতিগুলি লইয়া বিদ্যমান সমস্যাদি (দেখুন আফ্রীদী ও মাহমান্দ) শতাব্দী কালব্যাপী আফগানিস্তান ও বৃটিশ ভারতের মধ্যকার সম্পর্কে ফাটলের সৃষ্টি করে। উহারা দুই মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যেও ফাটলের সৃষ্টি করা অব্যাহত রাখে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের প্রথম অংশে বর্ণিত বরাতগুলির অতিরিক্ত (১) J. P. Ferrier, History of the Afghans, London ১৮৫৮; (২) C. B. Malleson, History of Afghanistan, লাহোর ১৮৭৮, লন্ডন ১৮৮০; (৩) G. P. Tate, The Kingdom of Afghanistan, a historical sketch, বোম্বাই-কলিকাতা ১৯১১; (৪) P. Sykes, A History of Afghanistan, লন্ডন ১৯৪০ খৃ. (সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী); (৫) W. K. Fraser, Tytler-Afghanistan, A Study of Political Developments, লন্ডন ১৯৫৩; (৬) A. A. Kuhzad, Tarikh-i Afghanistan, কাবুল ১৯৪৬; (৭) K. Ishtiya, Afghanistan dar Qarn-i Nuzdahum, কাবুল ১৯৫০; (৮) C. C. Davies, The Problem of the North-West
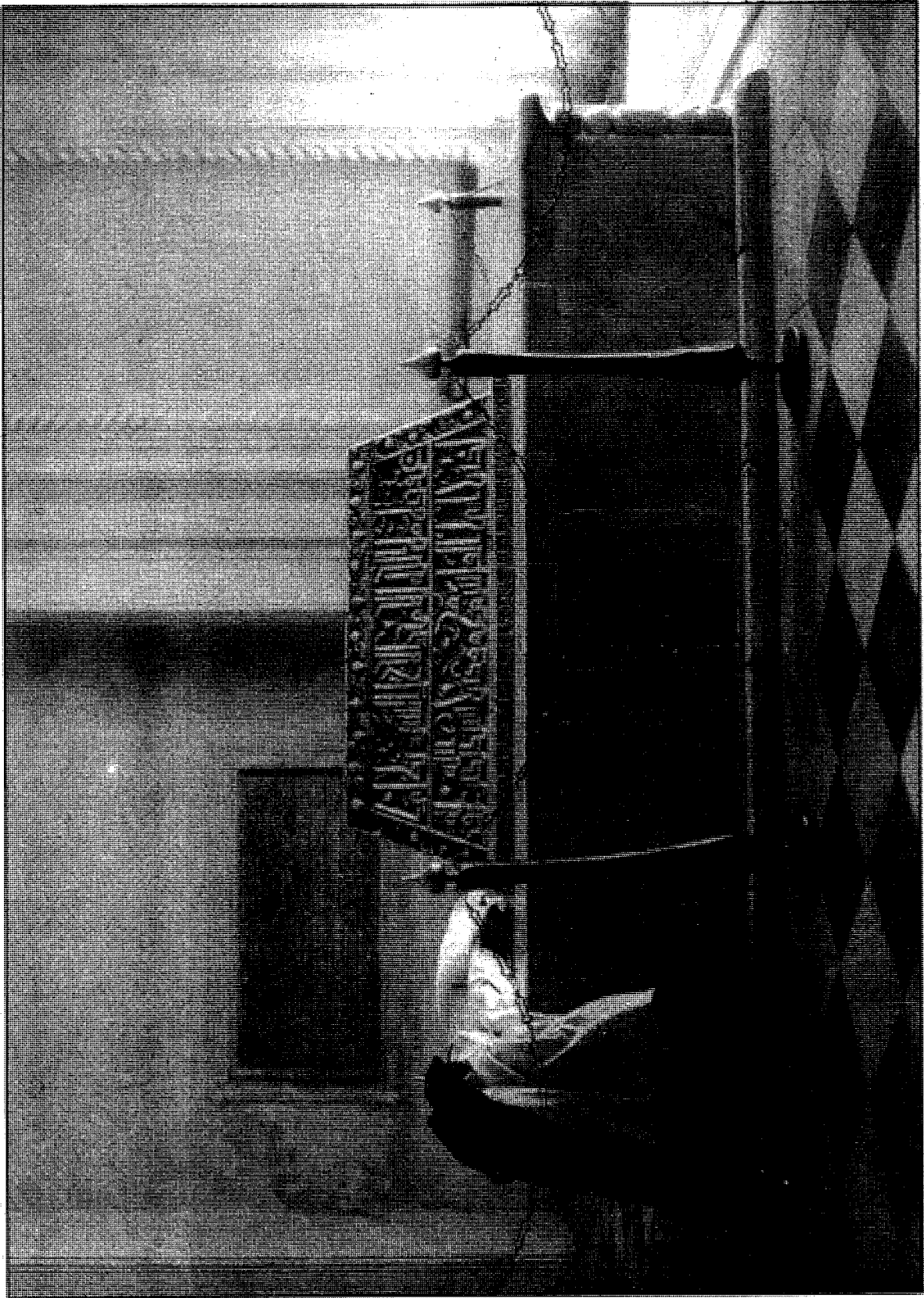
গযনীর সুলতান মাহমূদের মাযার (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার-এর সৌজন্যে)।
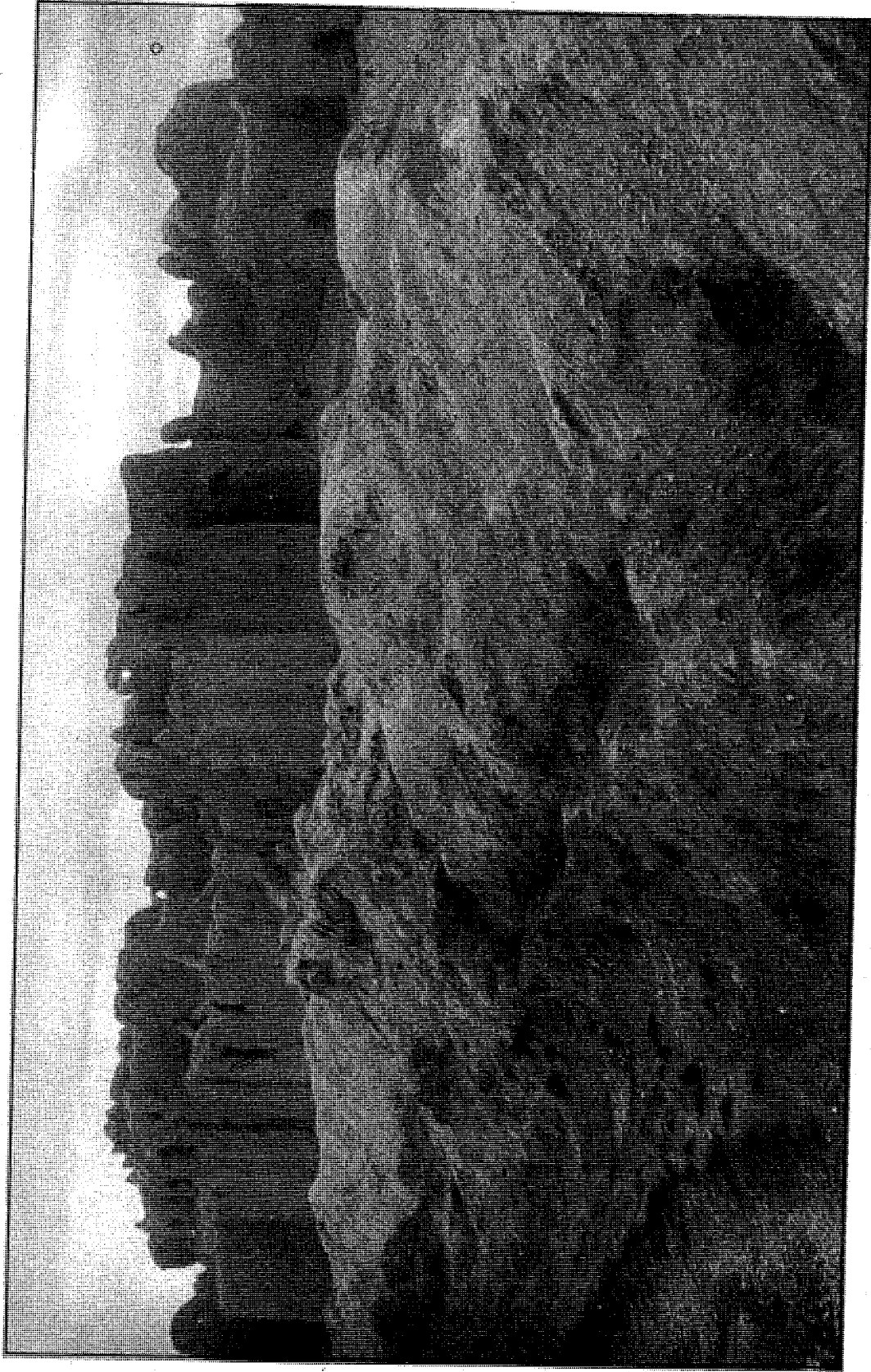
গাযনাবী সুলতানদের শীতকালীন রাজধানী হিলামান্দ-এ লশকর-ই বাযার আল-'আসকার (সেনানিবাস)-এর ভগ্নাবশেষ, ১১শ শতক (ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার-এর সৌজন্যে)।

পূর্ণ সূরা মারয়াম এবং গূরী সুলতান গিয়াছুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ (১১৬৩-১২০৩ খৃ.)-এর নামাঙ্কিত ১১শ-১২শ শতকের একটি মিনার *(ইসলাম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার-এর সৌজন্যে)।*

Frontier, ১৮৯০-১৯০৮, কেম্ব্রিজ ১৯৩২; (৯) W. Hubberton, Anglo-Russian Relations Concerning Afghnistan: 1837-1907, লণ্ডন ১৯৩৭; (১০) Cambridge History of India, v. অধ্যায় ২৮; (১১) Drand, Causes of the First Afghan War, লণ্ডন ১৮৭৯; (১২) J. W. Kaye, History of Afghan War, লণ্ডন ১৮৭৪; (১৩) The Second Afghan War, 1878-1880, Abridged Official Account, লণ্ডন ১৮৮১; (১৪) The Third Afghan War, ১৯১৯, Official Accont, কালিকাতা ১৯২৬; (১৫) White King, History and Coinage of the Barkzais, Numismatic Chronicle, ১৮৯৬। আরও দেখুন আহমাদ শাহ দুররানী, দোস্ত মুহাম্মাদ খান, আবদুর রাহমান খান, শের আলী, পানজদিহ শীর্ষক প্রবন্ধ গুচ্ছের গ্রন্থপঞ্জী।

M. Longworth Dames-H.A.R. Gibb (E.I.[2])/
হাসান আব্দুল কাইয়ূম

সংযোজন

মুহাম্মাদ জাহীর শাহের শাসনামল (১৯৩৩-৭৩ খৃ.) ছিল আফগানিস্তানের দীর্ঘতম রাজত্বকাল। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি তাঁহার পিতার নীতি অনুসরণ করেন। দেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় ছিল এবং আফগানিস্তান সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় (Nancy Hatch Deprec, An Historical Guide to Afghanistan, Afghan Tourist Organization, Kabul 1971, p. 61)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও আফগানিস্তান নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পদ্ধতি নিশ্চিতরূপে একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। বাদশাহর আদেশে ১৯৬৩ খৃ. মার্চ মাসে নিযুক্ত একটি সংবিধান সংক্রান্ত কমিটি আফগানিস্তানের জন্য একটি নূতন উদারনৈতিক সংবিধান রচনা করে। ইহা ১৯৬৪ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে একটি লয়া জিরগা (মহান জাতীয় কাউন্সিল) অনুমোদন করে। ১ অক্টোবর বাদশাহ স্বাক্ষরদান করিলে ইহা আইনে পরিণত হয়। দেশে সার্বজনীন অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আফগানিস্তান একটি কঠোর ইতিবাচক ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে (ঐ, পৃ. ৬২)। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি স্বাধীন পাঠান রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৮৯৩ সালের বৃটিশ সীমানা বিভাজন রেখা লইয়া মতবিরোধ দেখা দেয়। বিতর্কিত এলাকাটি 'ডুরান্ড লাইন'-এর ভিত্তিতে মূলত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমানায় স্বাধীন উপজাতীয় এলাকা লইয়া গঠিত ছিল (Encyclopaedia Britannica, vol.1, p. 244)। ইহা পরবর্তীতে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, পশ্তুন বা পাখ্তুনিস্তান সমস্যা খৃ. ১৯৪৭ সালের পরেই শুরু হয়। বাদশাহ জাহীর শাহের চাচাদের তদারকিতে প্রথম বিশ বৎসর অত্যন্ত সার্থক পদক্ষেপের কারণে কাবুল কোন বিপদে জড়াইয়া পড়ে নাই। এই দুই দশকে আফগানিস্তানের আর্থিক অবকাঠামোগত উন্নতি বহির্বিশ্বের সাহায্য ছাড়াই অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহারেই সম্ভব হইয়াছিল।

উন্নত রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগের উন্নত পদ্ধতি গঠন এবং খনি, শিল্প, শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়ন সাধনের জন্য ১৯৫৬ খৃ. একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়। ১৯৬১ খৃ. পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। এই বিশাল উন্নয়নকাজে অর্থ যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আফগান সরকার কিছু সংখ্যক বিদেশী সরকারের সঙ্গে বিশেষভাবে USSR এবং USA-এর সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ ও আর্থিক সহায়তার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। আফগানিস্তানের আধুনিকীকরণকে আগাইয়া লইতে সাহায্য করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক নির্মাণ সংস্থাকে দেশে আহবান করা হয় এবং সমাজ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণকে স্বাগত জানান হয়। ১৯৪৬ খৃ. মে মাসে প্রতিষ্ঠিত কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতে অনেক শিক্ষার্থী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ হইতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে (ঐ, পৃ. ৬২)।

পরিবহন ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি সাধিত হয়। অনেক প্রশস্ত পাকা মহাসড়ক নির্মিত হয়। সোভিয়েত প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে ১৯৬৪ খৃ. হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্য দিয়া আমুদরিয়ার উপরে সালাং সুড়ঙ্গ এবং বেশ কয়েকটি পুল নির্মিত হয়। এই সকল উন্নতির ফলেই সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলির সহিত আফগানিস্তানের নৈকট্য বাড়িতে থাকে। বিমান পথে প্রাদেশিক শহরগুলির সহিত কাবুলের এবং বিশ্বের অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয় (ঐ, পৃ. ৬৩)।

তাঁহার দীর্ঘ শাসনামলে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে তাঁহার তিন চাচা মুহাম্মাদ হাশিম খান, শাহ মাহ্‌মূদ ও শাহ ওয়ালী খানের হাতে। পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাশিম খান (১৯৩৩-১৯৪৬ খৃ.) এবং শাহ মাহ্‌মূদ (১৯৪৬-১৯৫৩ খৃ.) ক্রমবেশী একই নীতি অনুসরণ করেন। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বজায় রাখিয়া তাঁহারা সতর্কভাবে জার্মানী, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাহায্য গ্রহণ করে (Tahir Amin, Afghanistan Crisis, Institute of policy studies, Islamabad. Pakistan 1982, p. 30-31)।

এই সময় আফগানিস্তান সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাহীর শাহ, গোত্রাধিপতি এবং ধর্মীয় নেতাদের সহিত ক্ষমতা বিভাজিত হয়। বাদশাহর পরিবার, সেনা কর্মকর্তা, উচ্চ মধ্যবিত্ত সিভিল সার্ভেন্ট এবং ব্যবসায়ীরাও ছিলেন ক্ষমতার অংশীদার। এই সময় রাশিয়াপন্থী কিছু কিছু গ্রুপ গড়িয়া উঠে। তাহারা সবাই কম্যুনিষ্ট না হইলেও সংস্কারপন্থী ছিল। তাহারা জাহীর শাহের নিকটআত্মীয় (ফার্স্ট কাজিন ও ব্রাদার ইন-ল) লে. জেনারেল মুহাম্মাদ দাউদ খানের সাহায্যে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মাহ্‌মূদ খানকে অপসারণ করে। সর্দার দাউদ ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধান মন্ত্রী হন। তবে বাদশাহ জাহীর শাহকে তিনি অপসারণ করেন নাই। কারণ তাঁহার মন্ত্রণাদাতাদের বিবেচনায় বাদশাহ জাহীরের মত সজ্জন ও জনপ্রিয় শাসককে বিদায় করার সময় তখনও আসে নাই।

সরদার দাউদ (১৯৫৩-১৯৬৩ খৃ.)-এর শাসনামলে ব্যাপক আকারে দ্রুত আধুনিকীকরণের একটি উদ্যোগ গৃহীত হয়। তিনি জাতীয় সেনাবাহিনী

ও আমলাতন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং অধিকতর কেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী শাসনামলের তুলনায় নজিরবিহীন মাত্রায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেন। আমানুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি সতর্ক পন্থায় (মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর) ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা প্রবর্তন করিতে শুরু করেন। তিনি ইসলামের মৌলিক বিধান পর্দাপ্রথার বিলোপ সাধন করেন এবং বিরোধিতাকারী 'উলামাকে গ্রেফতার করেন। বিশ্বের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতার ফলে তিনি বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং ইহা আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যয় করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এই কারণে বিশ বৎসর পরে আফগানিস্তানে একটি দুর্দমনীয় বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা হয় (ঐ, পৃ. ৩১)।

১৯৬২ খৃ. আফগান সরকার দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করে। কৃষি ও শিল্পে বিপুল অর্থ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইরান ও আফগান বাণিজ্য সহযোগিতায় নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয়। দাউদ সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। সোভিয়েত সহযোগিতার নীতি আমেরিকা ও পাশ্চাত্য মহলে নানাভাবে সমালোচিত হইতে থাকে। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিবর্গ দাউদের সোভিয়েত-ঘেঁষা নীতির তীব্র সমালোচনা করিতে শুরু করেন। পাশাপাশি পশ্চিমা শক্তিগুলির দ্বারা আফগানিস্তানসহ ভারতীয় উপমহাদেশে সোভিয়েত অধিপত্য বিস্তারের এই কৌশল তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। ফলে ঘরে ও বাহিরের চাপের মুখে বাদশাহ জাহীর ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে দাউদকে দায়িত্ব হইতে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, দাউদ তাঁহার আত্মীয়তার সুযোগে জাহীর শাহের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টায় রত ছিলেন বলিয়াই জাহীর শাহ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

দাউদের অপসারণের পর বাদশাহ জাহীর শাহ ১০ বৎসর দেশ শাসন করেন। এই সময় তিনি রাজপরিবার ও অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের সমর্থন লাভ করেন। তাঁহার শাসনামলের এই দশককে আফগানিস্তানের সাংবিধানিক যুগ (১৯৬৪-১৯৭৩) বলা হয়। এই সময় পাঁচজন প্রধান মন্ত্রী দেশটি শাসন করেন। ডঃ য়ূসুফ মাইওয়ান্দওয়াল ইতেমাদী, ডঃ যাহির এবং মূসা শাকির। এ সময়ে দুইটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, একটি ১৯৬৫ এবং অন্যটি ১৯৬৯ খৃ.।

তাঁহাদের শাসনামলে মধ্যপন্থী ও গতিশীল নীতি অনুসরণ করা হয়। এই যুগে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উন্নয়ন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবর্তন, স্বাধীন মতাদর্শমূলক আন্দোলনের অভ্যুদয়, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, গতানুগতিক জীবনধারা, সংস্কৃতি চর্চার ধরন পরিবর্তিত হইয়া আফগানিস্তানে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে (ঐ, পৃ. ৩১-৩২)। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে লয়া জিরগা কর্তৃক প্রণীত নূতন সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ (১) আফগানিস্তানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; বাদশাহর হস্তে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা সংরক্ষণ; (২) রাজপরিবারের সদস্যবর্গের আইনসভা, সরকার বা সুপ্রিম কোর্টে কোন পদাধিকারী না হওয়া; (৩) আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ; (৪) নাগরিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির স্বাধীনতা, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার প্রদান। এই সময় হইতে পশতু এবং দারি ভাষাকে আফগানিস্তানের সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে ঘোষণা করা হয় বটে কিন্তু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

এই যুগে সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬২-৬৭ খৃ.) আফগানিস্তানকে আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসরমান করে। কুশকা, হেরাত ও কান্দাহার ৬৮০ কি. মি. দীর্ঘ যোগাযোগ পথ নির্মাণ (১৯৬৫ খৃ.), হিন্দুকুশ পর্বতমালা ভেদ করিয়া ৪৭০ কি. মি. দীর্ঘ কাবুল ও পের্টিশের খান পর্যন্ত রাজপথ (১৯৬৬ খৃ.), এক লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নাখ্‌লু পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১৯৬৭ খৃ.), জালালাবাদ সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (১৯৬৫ খৃ.), আফগানিস্তান ও সোভিয়েত মধ্যএশিয়া পর্যন্ত [illegible] দীর্ঘ গ্যাস পাইপ লাইন প্রতিষ্ঠা (১৯৬৮ খৃ.), কাবুল পলিটেকনিক [illegible] স্থাপন (১৯৬৮ খৃ.) প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যাবলী আফগানিস্তানের শিল্পায়ন ও অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

এই দশকে আফগানিস্তানে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি। তাহাদের দাবিসমূহ শুধুমাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত ছিল না। এইগুলি মূলত ছিল রাজনৈতিক। তাহারা ছিল অধিকাংশই রুশ সমর্থক বামপন্থী। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে সংঘবদ্ধ হয় ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র সংগঠনগুলি। এই সময় রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হয় এবং প্রথম আফগানিস্তানে বৈধ রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা গঠন করার উদ্যোগ শুরু হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বাদশাহ জাহীর শাহের সুস্পষ্ট আপত্তি ছিল। ১৯৬০ খৃ.-এর দশকের শেষভাগ সমগ্র বিশ্বের বামপন্থী চিন্তাধারা প্রসারের যুগ। ১৯৬৫ খৃ. মার্কসবাদী বামপন্থীরা পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান (Pdpa) প্রতিষ্ঠা করে। নূর মুহাম্মাদ তারাকি ইহার সাধারণ সম্পাদক এবং বাবরাক কারমাল, কিস্তমন্দ প্রমুখ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই নবগঠিত বামপন্থী দলের মুখপত্র ছিল খাল্‌ক। Pdpa ইহার কর্মসূচীতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক জাতীয় জোট গঠনের কথা ঘোষণা করে। খালকে নূর মুহাম্মাদ তারাকি আর পারচামে বাবরাক কারমাল নিজেদের অবস্থান সংগঠিত করে এবং আফগান সেনাবাহিনীতে সমমনা অফিসারদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। বাবরাক কারমালের পারচামের প্রথম পদক্ষেপ ছিল আফগানিস্তান হইতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, অন্যদিকে নূর মুহাম্মাদ তারাকির লক্ষ্য ছিল সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। কাবুলে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ইহাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

মস্কোপন্থীদের বিরুদ্ধে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র সংগঠনগুলি সোস্যালিস্ট ও রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে নামে। এই সকল ইসলামপন্থী আন্দোলনে কাবুলের বাহিরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ধারায় পরিচালিত মাদরাসার ছাত্ররা যোগ দেয়। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন ফ্যাকালটির ডীন

প্রফেসর বুরহানুদ্দীন রব্বানী। ইসলামপন্থী ছাত্র গুলবুদ্দীন হি‘কমাত য়ার, দীন মুহাম্মাদ, আহমাদ শাহ মাসঊদ, কাযী আমীন ও আরও অনেকে (Holy War Unholy Victory Cust Lohbek, p. 28)। বামপন্থী তারাকীর সহিত বাবরাক কারমালের আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছিল। কারমাল রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেন। পক্ষান্তরে তারাকি সেনাবাহিনীতে কেজিবি (KGB) দ্বারা চিহ্নিত সোভিয়েতপন্থী অফিসারদেরকে রাজতন্ত্র-উৎখাতের ষড়যন্ত্রে উৎসাহিত করেন (বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.), আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথাঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা, পালক পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃ. ১০৩)।

এইরূপ পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশব্যাপী মার্কসপন্থী ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করে। অপরদিকে পরপর দুই বৎসর খরার ফলে ১৯৭২ খৃ. দুর্ভিক্ষ, ত্রাণসামগ্রীর অপচয় ও আত্মসাৎ, চোরাচালান ইত্যাদি কারণে সরকারের প্রতি জনগণ আস্থা হারাইয়া ফেলে। ১৯৭৩ খৃ. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নির্বাচন হইতে পারে নাই। ইহার পূর্বেই বামপন্থী খাল্‌ক ও পারচাম প্রভাবিত এক সময়ের বরখাস্তকৃত প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মাদ দাঊদ এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। তিনি ১৯৭৩ খৃ. বাদশাহ জাহীর শাহের অবর্তমানে সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করিয়া জাহীর শাহকে উৎখাত করেন। এইভাবে ১৯৪৭ খৃ. আহমাদ শাহ আবদালী প্রতিষ্ঠিত আফগান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। মুহাম্মাদ দাঊদ আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

বাদশাহ জাহীর শাহ ৪০ বৎসর রাজত্বের পর সিংহাসন ছাড়িয়া বাদশাহ আমানুল্লাহর ন্যায় ইতালী চলিয়া যান। বৃদ্ধ বাদশাহ তাঁহার বেগম হু‘মায়রা ও ছয়টি সন্তান লইয়া রোম নগরীর উত্তর উপকণ্ঠে চারি শয্যার কক্ষের একটি ছোট ভিলায় বাস করিতেন। তিনি বাগানের কাজ করিতেন আর বই-পুস্তক পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। দেশ ও জাতির সুখশান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা ছাড়া তাঁহার আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। প্রিয় জন্মভূমিতে বিদেশী সামরিক আগ্রাসন, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। সিংহাসন ফিরিয়া পাওয়া নহে, দেশের স্বাধীনতা ও শান্তি ফিরিয়া আসুক এই ছিল তাঁহার প্রার্থনা। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের পতনের পর পশ্‌তুন নেতা হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ গ্রহণ করিলে প্রাক্তন বাদশাহ জাহীর শাহ ২০০২ সালের ১৭ এপ্রিল আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন।

পশ্চিমা সাংবাদিকগণ দাঊদের অভ্যুত্থানকে কম্যুনিষ্ট সমর্থিত বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি যখন প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত তাহার সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বামপন্থী কারমালের পারচাম গ্রুপ তাহাকে সমর্থন দেয় এবং কারমালের পিতা দাঊদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বামপন্থীরা এই অভ্যুত্থানে কিছু ভূমিকা পালন করে। ইহাতে দাঊদ খুশী হইয়া ১৬০ জন পারচাম কর্মীকে প্রাদেশিক প্রশাসনে নিয়োগ করেন।

দাঊদের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আফগানিস্তানে তিনটি ভিন্ন বলয়ের জন্ম হয়। এইগুলি হইল দাঊদ সমর্থিত মাওপন্থী বামদল, ইসলামপন্থী দল এবং পি.ডি.পি.এ.। মস্কোপন্থীরা দাঊদের ক্ষমতা দখলে অতি উৎসাহিত হয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। অন্যদিকে ইসলামপন্থী দলগুলি ক্রমেই অসন্তুষ্ট হইয়া গ্রামে-গঞ্জে সোস্যালিষ্ট কম্যুনিষ্ট বিরোধী প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। ইসলামপন্থীদের সহিত ক্রমেই আফগানিস্তানের অতি পরিচিত ইসলামী চিন্তাবিদগণও যোগ দিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুর রাসূল সায়্যাফ, সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী, মৌলবী ইউনুস খালিস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বাধিক নিষ্ঠাবান ইসলামী সংগঠনের সহিত জড়িত ছিলেন হি‘কমাত য়ার। একজন নেতৃস্থানীয় মাওপন্থী নিহত হইলে হত্যার অপরাধে হি‘ক্‌মাত য়ারকে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ফলে বেশ কিছু সময়ের জন্য কাবুলে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের অগ্রগতি স্থিমিত হয়। তবে অন্যান্য শহরগুলিতে ধর্মীয় সংগঠনগুলি সরাসরি দাঊদের বিরুদ্ধে কাজ করিতে থাকে। ইতোমধ্যে হি‘কমাত য়ার কারামুক্ত হইলে ইসলামী আন্দোলন আবার গতি লাভ করে। এক পর্যায়ে আফগান সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করা হইলে রাশিয়ার কে.জি. বি. (K.G.B.) এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করিয়া দেয়। এই বিফল অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের দায়ে দাঊদ কাবুল এবং আশেপাশের সকল ইসলামপন্থীদের গ্রেফতার করার ঘোষণা দিলে বেশীরভাগ সদস্যই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আত্মগোপন করে এবং অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণ করে। সেইখানে তাহারা গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি লইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ছিলেন গুলবুদ্দীন হি‘ক্‌মাত য়ার এবং আহমাদ শাহ মাসঊদ প্রমুখ (ঐ, পৃ. ১০৪-১০৫)। অতঃপর দাঊদ আফগান বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের মুকাবিলা করেন।

১৯৭৪ খৃ. দাঊদ তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে প্রদান প্রধান পদে নিয়োগ করেন এবং বামপন্থীদের অপসারণ শুরু করেন। ১৯৭৫ খৃ. দাঊদ জাতীয় বিপ্লবী পার্টি নামে তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং এই দল সকল রাজনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে লয়া জিরগায় দাঊদের শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সংবিধানের ৪০ নং ধারা সংশোধনের মাধ্যমে আফগানিস্তানে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন সরকার যে কোন ধরনের বিরোধিতা দমন করা শুরু করে। তাহার শাসনামলে শত শত লোককে গ্রেফতার এবং পাঁচজনকে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মুহাম্মাদ দাঊদ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ক্ষমতায় আসার ৩ বৎসর পর তিনি ৭ দফা উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইহাতে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিপুল বিদেশী সাহায্যের বিধান রাখা হয়। দাঊদ দেশীয় রাজনীতিতে বামপন্থা পরিহার নীতি গ্রহণ এবং সোভিয়েত সামরিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতা হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ খৃ. তিনি ভারতের সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লইয়া আলোচনা শুরু করেন এবং ইরানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেন। এই সময় ইরানের তৈলের রাজস্ব চারি গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইরানের শাহ প্রতিবেশী দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তারের বিষয় চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং এই নীতির আওতায় আফগানিস্তানকে ১ কোটি মার্কিন ডলার মঞ্জুরি হিসাবে প্রদান করেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে শাহ এই মঞ্জুরি প্রদান করেন। দাউদ শুধু রক্ষণশীল ইরানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন নাই, সাউদী আরব, ইরাক ও কুয়েতের মত তেলসমৃদ্ধ ইসলামী দেশগুলির কাছেও তিনি সাহায্য লাভের জন্য হাত বাড়ান।

তাঁহার সময় পাকিস্তানের সহিত পাখ্তুনিস্তান সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টার অগ্রগতি হয়। এই সম্পর্ক উন্নয়নে ইরান ও মার্কিন উদ্যোগ সফল হয়। ১৯৭৭ খৃ. নাগাদ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণের সফর বিনিময় হয় এবং ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট দাউদের ইসলামাবাদ সফরকালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যাহা হউক দাউদের সহিত আফগান কম্যুনিষ্ট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তিনি দক্ষিণপন্থী ইসলামী শক্তিগুলিকে সংহত করেন। ইহাতে বামপন্থী দলগুলি ঐক্য গঠনের চেষ্টা করে। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে Pdpa-এর দুইটি গোষ্ঠী খাল্‌ক ও পারচাম ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। Pdpa কাবুলসহ সমগ্র দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাইতে শুরু করে। ১৯৭৭ খৃ. আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল খুবই শোচনীয়। মাথাপিছু জাতীয় আয় বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় অত্যন্ত নিম্ন অবস্থানে ছিল। উপরন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা, সন্ত্রাস, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, দুর্বৃত্তায়ণ, দুর্নীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারীর ঘটনা দাউদ সরকারকে বিব্রত করিয়া তোলে। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে দেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী আলী আহমাদ খুররাম কাবুলের মধ্যস্থলে আততায়ীর হাতে নিহত হন। ক্রমাগত দাউদ সরকারের অভ্যন্তরেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উপরাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ হাসান শারক্‌কে অপসারিত করিয়া জাপানের রাষ্ট্রদূতের পদে নিয়োগ করা হয়। পশতুনগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে তৎপর হয় (এ. কে. এম. মহিউদ্দীন, আফগান রণাঙ্গনে, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৮)।

১৯৭৮ সালের ১৭ এপ্রিল পিডিপির একজন নেতা মীর আকবার খায়বার কাবুলে নিহত হইলে রাজনৈতিক সংকট জটিল ও তীব্রতর হয়। নয় মাসের ব্যবধানে ইহা ছিল তৃতীয় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ১৯ এপ্রিল তাঁহার জানাযায় ব্যাপক লোকসমাবেশ ঘটে। তাঁহার শোকমিছিল অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ এবং মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দাউদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহবান জানানো হয়। বামপন্থীদের এইরূপ শক্তি প্রদর্শনে নূর মুহাম্মাদ তারাকি, বাবরাক কারমাল, নূর আহমাদ নূর, আনোহিতা রতেবজাদ প্রমুখ অসংখ্য পিডিপি-এর নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৮ খৃ. ২৭ এপ্রিল সামরিক বাহিনীর একাংশের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয় এবং কার্যত প্রায় বিনা বাধায় দাউদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুৎ করা হয়। অতঃপর একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী কাউন্সিলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়। এই অভ্যুত্থানে দাউদ ও তাঁহার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হয় (দেবাশিষ চক্রবর্তী ও অন্যান্য, আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৬৪)।

সোভিয়েত মদদপুষ্ট এই অভ্যুত্থানের পর খাল্‌ক নেতা নূর মুহাম্মাদ তারাকিকে বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ১৯৯৭ খৃ. ২৮ মার্চে হাফীযুল্লাহ আমীনকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী করা হয়। অতঃপর ২১ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। 'পারচাম' নেতা বাবরাক কারমাল এই মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ও উপ-প্রধান মন্ত্রী হন। মন্ত্রীদের মধ্যে ১১ জন খাল্‌ক এবং ১০জন পারচাম গ্রুপের (আঁল্-মাহমুদ ও আফজাল চৌধুরী সম্পা., আফগানিস্তান আমার ভালোবাসা, নভেম্বর ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৩৬)। অভ্যুত্থানের অনতিবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, ভারত, মঙ্গোলিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, কিউবা ও পোল্যান্ড আফগানিস্তানের সরকারকে সমর্থন জানায়। এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশই তারাকি সরকারকে স্বীকৃতি জানায়।

নূর মুহাম্মাদ তারাকি পারচাম সমর্থক সন্দেহে মেজর জেনারেল আবদুল কাদির, আর্মি-চীফ অব ষ্টাফ লেঃ জেনারেল শাহপুর আহমাদ যাই, ডঃ মীর আলী আকবার, লেঃ কর্নেল মুহাম্মাদ রাফী, সুলতান আলী কিশ্‌তমান্দ প্রমুখ উচ্চ পদস্থদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য অভিযুক্ত ও গ্রেফতার করেন। বাবরাকসহ ইহাদের সবাই বিপ্লবী পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত হন। তারাকি পরপর অনেকগুলি ডিক্রী জারি করেন। ৮নং ডিক্রী (ভূমি মস্কোর সংক্রান্ত) জারির পরই ১৯৭৯ সালের ২৮ মার্চ খালকের অন্যতম নেতা ও উপ-প্রধান মন্ত্রী হাফীযুল্লাহ আমীন তারাকিকে অপসারণ করিয়া নিজে প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্বে ১৮ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা ঘোষণা করেন। ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে তারাকিকে হত্যা করা হয়। এইদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হাফীযুল্লাহ আমীনকে তাহাদের বিশ্বস্ত লোক মনে করিত না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আমীনের সমর্থনের কোন কমতি না থাকিলেও ১৯৭৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর সাহায্যে হাফীযুল্লাহ আমীনকে অপসারিত করিয়া বাবরাক কারমালকে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়া ক্ষমতায় বসান হয়। অতঃপর হাফীযুল্লাহ আমীনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইহা ছিল সোভিয়েতপন্থী শিবিরের অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিপ্রকাশ। এই রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের সময় কাবুলে অবস্থিত বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা ছিল (ঐ, পৃ. ৩৭)।

এই অভ্যুত্থানে রাশিয়া আফগানিস্তানে অভিযান চালায়। তাহারা পূর্বেই সোভিয়েত-আফগানিস্তান সীমান্ত বরাবর দুইটি সেনাদল মোতায়েন করিয়াছিল। এমনকি আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পূর্বেই বিমানক্ষেত্রসমূহের নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করিয়াছিল। একজন সোভিয়েত লেঃ জেনারেল ভিক্টর পাপুতিন (Victor Paputin) আমীনকে বাবরাক কারমালের অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করে এবং শেষ মুহূর্তের আলোচনা চলাকালে আমীনের সৈন্যদের হাতে উক্ত জেনারেল নিহত হন। সোভিয়েতগণ বিশাল NA-12 পরিবহন বিমান কাবুলে অবতরণ করায় এবং জোরপূর্বক শহরটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। একই সময়ে দুইটি যান্ত্রিক রাইফেল ডিভিশন, একটি স্থল আক্রমণের জন্য দাউদের সময়ে সোভিয়েত-আফগান সীমান্তে সোভিয়েত নির্মিত রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হয়। এক ডিভিশন পশ্চিম দিকের কুশ্‌কা, হিরাত, কারাহ ও কান্দাহার এবং অন্যটি পূর্বদিকের

মাযার-ই শারীফ, কাবুল ও গারদেজ হইয়া অগ্রসর হয়। ইহা ছাড়াও চারিটি কমব্যাট ডিভিশন সংরক্ষিত রাখা হইয়াছিল। আক্রমণের প্রথম সপ্তাহের শেষেরদিকে সোভিয়েত সৈন্যরা প্রধান প্রধান শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে ৮৫,০০০ সোভিয়েত সৈন্য ১,৭৫০টি ট্যাঙ্ক, ২,২০০টি কামান, ৪০০ বিমানসহ আফগানিস্তান দখল করে (Tahir Amin, Afghanistan crisis, Islamabad, Pakistan 1982, P. 79)। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এইরূপ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পশ্চিমা দেশসমূহ, জোটনিরপেক্ষ জাতি এবং আঞ্চলিক দেশসমূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে এই আক্রমণের প্রতিবাদ জানায় (ঐ, পৃ. ৮০)।

সোভিয়েত কৃপা ও আস্থা হারাইয়া সর্দার দাঊদ, নূর মুহাম্মাদ তারাকি, হাফীযুল্লাহ আমীন ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। এইসব ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড ও ক্ষমতার রশি টানাটানির বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের শহরে-নগরে, গঞ্জে গ্রামে বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। বাবরাক কারমালের সময় হইতে আফগানিস্তানে সমাজ কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক আদলে ঢালিয়া সাজানো শুরু হয়। বিদ্রোহ করে আফগানিস্তানের রাজনীতির সর্বাধিক প্রভাবশালী অংশ বিভিন্ন গোত্রপতিরা। রক্ষণশীল আফগান সমাজের এই প্রতিনিধিরা কম্যুনিষ্ট শাসনে প্রথাগত আফগান সংস্কৃতি, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অবহেলা এবং নূতন সংস্কৃতি জোরপূর্বক চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা প্রত্যক্ষ করে। ইহার ফলে বিভিন্ন গোত্র কম্যুনিষ্ট সরকারের উপর হইতে তাহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। স্বাধীনতাপ্রেমিক ধর্মপ্রবণ দক্ষিণপন্থী আফগান জনগণ সোভিয়েত আধিপত্যবাদ ও তাহাদের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করে (আল মাহমুদ সম্পা., আফগানিস্তান আমার ভালোবাসা, পৃ. ৩৭)।

আফগানিস্তানে পুতুল সরকারকে টিকাইয়া রাখিতে ১৯৭৯ খৃ. সোভিয়েত রাশিয়া সেইখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। আফগান মুজাহিদদের প্রচণ্ড আক্রমণ ও বিশ্ব শান্তিকামী মানুষের নিন্দা ও প্রতিবাদের মুখে ১৯৮৯ খৃ. এক দশকের দখলদারিত্বের অবসান ঘটাইয়া সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়ে। ঐ বৎসরের ১৫ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তান হইতে ১,১৫,০০০ রুশ সৈনিকের শেষ দলটি প্রত্যাহার করা হয়।

প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক কারণে আফগানিস্তানের অধিবাসিগণ হইল স্বাধীনচেতা। "শির দেগা, নাহি দেখা আমামা" কথাটি আফগান জনগণ সম্পর্কে পুরাপুরি প্রযোজ্য। আফগান জনগণ রুশ হস্তক্ষেপকে কোনভাবে মানিয়া লইতে পারে নাই। রুশ আগ্রাসন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাহারা সাংগঠনিক প্রয়াস শুরু করে। একটি সুসংগঠিত শক্তি দাঁড় করাইতে আফগান জনগণ ইসলাম প্রদত্ত সংগঠন সম্পর্কিত সহজাত শিক্ষাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে। তাহারা শক্তিশালী মুজাহিদ বাহিনী গড়িয়া তোলে। মুজাহিদদের সাংগঠনিক কাঠামো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনসমূহের পক্ষ হইতে গঠিত হয়। সোভিয়েত বাহিনী বিতাড়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি অভিন্ন মতৈক্যের সৃষ্টি হয়। তাহারা আমরণ জিহাদ করার সংকল্প ও শপথ গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন তাহাদের সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করে। পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য তাহারা 'Islamic Alliance for the Liberation of Afghanistan নামক একটি ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হন। এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসাবে ছয়টি রাজনৈতিক সংগঠনের নাম এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সকল শক্তিশালী মুজাদিহীন গ্রুপ সোভিয়েত প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এইগুলি হইলে ঃ (১) প্রকৌশলী গুল্‌বুদ্দীন হি‘কমত ইয়ারের নেতৃত্বাধীন হিযবে ইসলামী বা ইসলামী দল; (২) অধ্যাপক বুর্‌হানুদ্দীন রাব্বানী পরিচালিত জামা'আত-ই ইসলামী; (৩) ইউনুস খালিস পরিচালিত হিযবে ইসলামী; (৪) এন. এম. মুহাম্মাদ পরিচালিত হ‘ারকাতুল-ইসলামী; (৫) অধ্যাপক আহমাদ জিলানী পরিচালিত মিল্লি ইসলামী মাহ‘য-ই আফগানিস্তান এবং অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী পরিচালিত যাব্‌হা নিজাত-ই মিল্লী-ই আফগানিস্তান। ইহা ছাড়াও উপজাতীয় আঞ্চলিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে অনেকগুলি ছোট ছোট সংগঠন ছিল। ইহাদের মধ্যে মাওলানা মুআয্যিনের নেতৃত্বাধীন হ‘ারাকাত-ই ইন্‌কি‘লাব-ই ইসলামী, মাওলানা মুহাম্মাদ মীরের নেতৃত্বাধীন জিন্‌হাত-ই মিল্লী এবং মধ্য আফগানিস্তানে শিয়াহাযারী পূর্ব অঞ্চলে নুরিস্থানী, ইখ্‌ওয়ানুল-মুস্‌লিমীন ও জামইয়্যাতে ইসলামী উল্লেখযোগ্য (ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭)।

সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐকমত্য পোষণকারী সংগঠনসমূহ ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাসে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ইত্তিহাদ-ই ইসলামী নেতা আব্‌দুর-রাসূল সায়্যাফ ইবন ফাকীর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে ৫০ সদস্যের মাজলিস-ই শূরা গঠন করে। মাজলিস-ই শূরার নেতৃত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবে আবদুর-রাসূল সায়্যাফ ইব্‌ন ফাকীর মুহাম্মাদের উপর ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্বও বর্তায়।

ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পর আফগান মুজাহিদ বাহিনীর সামরিক কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো ও অভিযান পরিচালনা পদ্ধতি সুসংহত হইয়া উঠে। মুজাহিদগণ একেকটি এলাকায় তাহাদের অভিযান পরিচালনা সীমিত রাখেন। এই আঞ্চলিক বিভক্তি কোন ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়া চিহ্নিত হয় না বরং যে এলাকায় যে নেতার সমর্থন বেশী সেই এলাকায় তাহার নেতৃত্বেই অভিযান পরিচালিত হয়। যেই এলাকায় যেই দল কাজ করিত সেই এলাকায় ঘর-বাড়ির দেওয়ালে বা চায়ের দোকানে ঐ দলের নেতার ছবি টাংগানো থাকিত (ঢাকা ডাইজেষ্ট, বিশেষ সংবাদ সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০)। ঐক্যফ্রন্ট নেতা আফগানিস্তানে অবস্থানরত তাঁহার অধীনস্থ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য ও মাজলিস-ই শূরার পরামর্শ অনুযায়ী সীমান্ত এলাকায় বসিয়া কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণ করিতেন। সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের সদর দফতর ছিল। এইখান হইতেই তাহারা সাধারণত দুইটি কাজ করিত ঃ একটি রাজনৈতিক, অন্যটি সামরিক। রাজনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশ্বজনমত গঠন, তহবিল সংগ্রহ, মুজাহিদ বাহিনীতে লোক নিয়োগ ও বাহির হইতে আগত সাংবাদিকদের সফরের ব্যবস্থা করা। রুশ প্রতিরোধে কমবেশী ১৫টি মুজাহিদীন গ্রুপ অংশগ্রহণ করে। ইহাতে পেশাওয়ার ভিত্তিক মুজাহিদীনই বেশী প্রাধান্য পায়। তাহাদের সহিত পাকিস্তান ও আমেরিকার সখ্যতা বেশী ছিল। সামরিক কাজের মধ্যে ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ দান, অস্ত্র সংগ্রহ, সরবরাহ ও

বিতরণ এবং মুজাহিদ বাহিনীর অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা (আফগানিস্তান আমার ভালবাসা, পৃ. ১১২)।

মুজাহিদীনের যুদ্ধের কোন সুনির্দিষ্ট ধরন ছিল না। হাযার হাযার কমান্ডো মুজাহিদীন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সুযোগ পাইলেই রুশ সৈনিকদের আক্রমণ করিত। ট্যাংক আটক করার জন্য সাঁজোয়া যান বিধ্বংসী অস্ত্রহীন আফগানরা সকল অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিত। তাহারা দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ হানিত। (এক) কম্যুনিষ্ট সৈন্য হত্যা করা এবং (দুই) সমরোপকরণ হস্তগত করা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদগণ রণাঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অস্ত্র, রসদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত (ঐ, ১১২)।

মুজাহিদ তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রুশবাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাবেদারগণ তাহাদের গুণগ্রাহীদেরকে উচ্চ পর্যায়ের ট্রেনিং-এর জন্য মস্কোতে পাঠাইত। তাহারা তাহাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার করে। মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের মুখে তাবেদার বাহিনী ও রুশ বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হয়। তাহাছাড়া দেশ-বিদেশে কর্মরত দায়িত্বশীল কূটনীতিবিদ, বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং সাধারণ সৈনিকগণ স্বপক্ষত্যাগে মাতিয়া উঠে। তাহারা মুজাহিদ বাহিনীর ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানাইয়া দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে অংশ নেয় (সাপ্তাহিক বিপ্লব, ১৩ অক্টোবর, ১৯৮২, ১ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা)।

আফগানিস্তানে অবৈধ সোভিয়েত হামলার মর্মান্তিক পরিণতিতে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলিতে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। ইহা ছিল একটি পর্বত প্রমাণ মানবিক সমস্যা। রুশ ও মুজাহিদ বাহিনীর সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাহারা ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সীমান্তের অপর পাড়ের শিবিরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে আফগান জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই দেশত্যাগী হয়। আশ্রয়দানকারী দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একমাত্র পাকিস্তানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল প্রায় ৩০ লক্ষ আফগান নাগরিক। পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর প্রায় ৩০০টি উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়। এত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর জন্য পাকিস্তান সরকার পৃথক প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। কেবল প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য বৎসরে এক কোটি ডলার এবং উদ্বাস্তুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য প্রতিদিন ব্যয় হইত এক কোটি টাকা। ইহার সিংহভাগই পাকিস্তান সরকার বহন করিত। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশন এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (W.F.P.) এই ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতা দেয়। ইরান সরকারও উদ্বাস্তুদের হিজরতকারীর মর্যাদা দিয়া আশ্রয় দেয়। তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং থাকা-খাওয়ার ব্যয় ইরান সরকারকে একাই বহন করিতে হয়। তুরস্ক সরকারও আফগান উদ্বাস্তু সমস্যা নিরসনে সহযোগিতা প্রদান করে (আফগানস্তান আমার ভালোবাসা, পৃ. ১১৫-১১৭)।

উদ্বাস্তুরা নিঃস্ব অবস্থায় প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও পূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করিত না। সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে প্রাপ্ত আফগানিস্তানের তাবেদার সরকারের বিমান বাহিনীর আধুনিক বিমানগুলি অহরহ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে হামলা চালাইত। পাকিস্তান ও ইরানের সীমান্ত এলাকার ৫০-৬০ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিমানগুলি বহু সংখ্যক নিরীহ গ্রামবাসীর প্রাণহানি ঘটায়। তাহারা নাপাম বোমা নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করে সীমান্তবর্তী বহু গ্রাম। রাইফেল ও দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতেও অবিরাম গোলা বর্ষণ করা হয় (ঐ, পৃ. ১১৫-১১৭)।

রুশগণ তাহাদের দখলদারিত্বের ১০ বৎসরের মধ্যে আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। মুজাহিদ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে বাধ্য হইয়া ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সালে গরভাচেভ রুশ সেনাবাহিনী ধাপে ধাপে প্রত্যাহারের ১০ মাসের কর্মসূচির ঘোষণা দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা তৈরী হয়। ইহাতে সিব্‌গাতুল্লাহ মুজাদ্দিদীকে রাষ্ট্রপতি এবং আব্‌দুর-রাসূল সায়্যাফকে তিন বৎসরের জন্য প্রধান মন্ত্রী করা হয়। এই সরকারের সাধারণত নির্বাসিত সরকার হিসাবে পেশাওয়ার হইতেই মুজাহিদের সকল কর্মকাণ্ড এবং আফগানিস্তানকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করার কথাও ছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ২৮ সদস্যের মধ্যে ১৪ সদস্য নির্বাসিত মুজাহিদীন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে, ৭জন আফগান শরণার্থীর মধ্য হইতে আর ৭জন কাবুলে অবস্থানরত ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসাবে পরিচিতদের মধ্য হইতে (পি.ডি.পি. ভুক্ত নয়) লইয়া সরকার গঠন করার প্রস্তাব পাস করা হয়। অন্য এক সিদ্ধান্তে সিব্‌গাতুল্লাহ মুজাদ্দিদীর ৩ বৎসরের মেয়াদ পূর্তির পর অধ্যাপক বুরহানুদ্দীন রাব্বানীকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়, যদি ৩৩দিনে আফগানিস্তনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়।

এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হইলেও ঐ বৎসরই এই সরকারের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই এপ্রিল মাসে এই সংক্রান্ত জেনেভাচুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী যাইন নূরানী এবং কাবুল সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন নাজীবুল্লাহর পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল ওয়াকিল। এ চুক্তিতে উপস্থিত হইয়া স্বাক্ষর দান করেন মার্কিন সেক্রেটারী অব স্টেট জর্জ সুলজ্ আর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভারনাৎসে। চুক্তিতে নির্দ্ধারণ করা হয় যে, ৫মে, ১৯৮৮ হইতে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯-এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান হইতে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করিবে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেও পাকিস্তান নাজীবুল্লাহ সরকারকে স্বীকার করিত না।

হি'কমত য়ারের হিযব-ই ইসলামীর সমর্থকগণ সরাসরি জেনেভা চুক্তি নাকচ করিয়া পেশাওয়ারে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে এই চুক্তির ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এই জেনেভা চুক্তিতে আরও বলা হইয়াছিল যে, সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের পর কাবুলে নাজীবুল্লাহ সরকার একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে। এই সরকারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকিবে জাতিসংঘের হাতে। এই সরকারই পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। আফগানিস্তানের বিবদমান কোন পক্ষকেই দুই পরাশক্তির কোন পক্ষই সামরিক উপকরণ সরবরাহ করিবে না। কার্যত জেনেভাচুক্তি কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়। কোন পক্ষই জেনেভা চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই বরং প্রতিটি পক্ষই

সুবিধামত এই চুক্তিকে ব্যবহার করিয়াছে (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব), আফগানিস্তান অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের সংকট-১, দৈনিক সংবাদ, ২ ডিসেম্বর, ২০০১)।

ইতিমধ্যে মুজাদ্দিদী আফগানদের জন্য সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করেন এবং ইসলামিক আফগান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইসলামী কন্‌ফারেন্সসহ সমগ্র বিশ্বকে অনুরোধ জানান, কিন্তু তেমন সাড়া পান নাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (সিনিয়র) আপাতত স্বীকৃতি দানে অপেক্ষার নীতি গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই অরগানাইজেশন ইসলামিক কন্‌ফারেন্স (OIC)-এ যোগদানের জন্য নির্বাসিত আফগান অন্তর্বর্তী সরকারকে আহবান জানাইলে উক্ত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুলবুদ্দীন হি'কমত য়ার ইহাতে যোগদান করেন। ইহার পরপরই মুজাদ্দিদী সরকারকে সৌদি আরব, সুদান এবং বাহরাইন স্বীকৃতি দেয়। কাবুলে নাজীবুল্লাহ্ সরকার এইসব স্বীকৃতিকে নীতি বিবর্জিত কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড বলিয়া ধিককার দেন।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের পর মস্কো-সমর্থক নাজীবুল্লাহ্ সরকারকে মুজাহিদীনের চাপের মুখে পড়িতে হয়। সেনা প্রত্যাহার শুরু হইলেই বড় বড় শহরগুলি মুজাহিদীনের দখলে আসে। এইসব দখলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে নিজেদের মধ্যে সহিংস কোন্দল। বুরহানুদ্দীন রাব্বানীর জামা'আত-ই ইসলামী এবং হি'কমত য়ারের কট্টরপন্থী হি'যব-ই ইসলামীর মধ্যে এই কোন্দল প্রকট আকারে দেখা দেয়। ৯ জুলাই, ১৯৮৯ সালে থাককার প্রদেশে এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে রাব্বানী সমর্থিত ৭জন মুজাহিদীন কমান্ডার এবং ২৩ জন মুজাহিদীনের মৃত্যু হয়। ইহাতে হি'কমত য়ারের সংশ্লিষ্টতার খবরে অনেক স্থানেই এই দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ২০ আগষ্ট, ১৯৮৯ সালের শূরায় হি'কমত য়ার অনুপস্থিত থাকিয়া এক বক্তব্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে জনসমর্থন যাচাইয়ের জন্য আফগান মুক্তাঞ্চল এবং শরণার্থী শিবিরগুলিতে নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেন। তবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। মুজাহিদীন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দল চলিতেই থাকে। ২৯ আগষ্ট, ১৯৮৯ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হি'কমত য়ার অন্তবর্তীকালীন সরকারের সহিত তাঁহার সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

৬-৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ আন্তর্জাতিক তদারকিতে আফগানিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট নাজীবুল্লাহকে ক্ষমতায় রাখার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। নাজীবুল্লাহ ১৯৯০ সালের ২৯ মে আফগানিস্তানকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। মুজাহিদদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নাজীবুল্লাহ সরকারের সহিত সকল ধরনের আপোস কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে। খৃ. ১৯৯০ সালেই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান ও ইরান হইতে আফগান শরণার্থীদের আফগানিস্তানে প্রত্যর্পণ শুরু হয়। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল পরেজ্যদ কুয়েলার ২১ মে, ১৯৯১ সালে আফগানিস্তানে লড়াইরত দলসমূহকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতি আহবান জানান। সেই সাথে সংঘর্ষ বন্ধ করিয়া একটি স্বাধীন ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের জন্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিরও আহ্বান জানান হয়। ১৯৯২ সনের জানুয়ারী হইতে যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদীনকে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন কাবুলকে সকল প্রকার সহযোগিতা বন্ধ করিয়া দেয়। পাকিস্তানও জাতিসংঘের শান্তিচুক্তির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এবং সকল সহযোগিতার সমাপ্তি টানে।

১৯৯২ সালের ১৮ মার্চ নব-গঠিত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ইয়েলৎসিনের চাপে নাজীবুল্লাহ একটি নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজি হয়। অতঃপর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বুট্রোস ঘালি এপ্রিল মাসে ঘোষণা দেন যে, জাতিসংগের তত্ত্বাবধানে ১৫ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল নাজীবুল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিবে এবং ইহার জন্য তিনি ৪৫ দিনের একটি যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করেন। কিন্তু নাজীবুল্লাহ্ এবং বিবদমান সকল গোষ্ঠীই ইহা গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই। ইতিমধ্যে হঠাৎ করিয়া ১৫ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ড. নাজীবুল্লাহ-পদত্যাগ করেন এবং জনরোষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে কাবুলে অবস্থিত জাতিসংঘের কমপাউন্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাজীবুল্লাহ বিদায় লইলে হি'যব-ই ওয়াত'ান পার্টির আব্দুর-রাহমান হাতেম রাষ্ট্রপতি নিয়োজিত হন। কিন্তু তিনি কাবুলে অরাজকতা এবং দাঙ্গা প্রশমিত করিতে সফল হন নাই। নাজীবুল্লাহর আকস্মিক পদত্যাগ জাতিসংঘের পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত করে। এইরূপ চরম অবস্থার মধ্যে শেষ প্রচেষ্টার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ দূত মিঃ বেনন সেভন কাবুলে আগমন করেন। তখন কাবুলের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে (ব্রিগেডিয়ার জে এম সাখাওয়াত হোসেন (অব), আফগানিস্তান, অতিতের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সংকট-১, সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ২০০১)।

আফগানিস্তানে বিবদমান গোষ্ঠীগুলি কাবুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। পদত্যাগী প্রেসিডেন্ট নাজীবুল্লাহর মিলিশিয়া কমান্ডার মাযার-ই শরিফ হইতে তাঁহার দলবল লইয়া কাবুলের বাগরাম বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। তখন উত্তরের আহমাদ শাহ মাসঊদ তাঁহার তাজিক বাহিনী লইয়া কাবুলের সন্নিকটে আগমন করে। ১৭ এপ্রিল পশতুন মুজাহিদগণ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর গরদেভ দখল করিয়া কাবুলের দোড়-গোড়ায় পৌঁছায়। অপরদিকে ইরান সমর্থিত হি'যব-ই ওয়াহ'দাত পার্টির নেতা ইসমাঈল খান হিরাতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কাবুলে তাঁহার মিলিশিয়াদের প্রবেশ করান। এপ্রিল মাসের মধ্যেই কাবুলে তখন চারিটি গোষ্ঠী নিজ নিজ ক্ষমতায়নের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রস্তুত হয়।

শহরের বাহিরে বাগরামে অবস্থিত উজবেক যুদ্ধংদেহী নেতা আব্দুররশীদ দোস্তাম আহমাদ শাহ মাসঊদের সহিত এক অলিখিত সমঝোতা করিয়া কাবুলে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নামে প্রবেশ করিলে দক্ষিণের হি'কমত য়ারের কিছু মুজাহিদীন কাবুলে প্রবেশ করে। ইহাতে সংঘর্ষ শুরু হয়। অপরদিকে পেশাওয়ারে অবস্থানরত অন্তবর্তীকালীন সরকার কাবুলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে গুলবুদ্দীন হি'কমত য়ার ইহার বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে দোস্তাম ও মাসঊদ বাহিনী টিভি ও বেতারকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দারুল-আমান প্যালেসসহ কাবুলের বৃহদাংশ দখল করে। অতঃপর ২৭ এপ্রিল মুজাদ্দিদী সদলবলে কাবুলে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং আহমদ শাহ মাসঊদকে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদে বহাল করে। অতি দ্রুত পাকিস্তান সরকার কাবুল সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট (CIS) কাবুলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। মুজাদ্দিদী রাষ্ট্রপতি হইয়া আফগানিস্তানের সকল গোত্রকে একত্র হইয়া একটি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করিতে এবং হি'কমত য়ারকে বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে যোগদানের আহবান জানান। কিন্তু হি'কমত য়ার তাঁহার বাহিনী লইয়া কাবুলের দক্ষিণের পাহাড় হইতে কাবুলের উপর অবিরত কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতে থাকে (চিন্তা ৯-১০ সংখ্যা, ২০০১)।

মুজাদ্দিদী, হি'কমত য়ার ও আহমদ শাহ মাসউদের মধ্যে অসহিষ্ণু, রেষারেষি অব্যাহত থাকে। এই সুযোগে আহমাদ শাহ মাসউদ কাবুলে সর্বাধিক শক্তি অর্জন করিয়া এককভাবে ক্ষমতাবান হইয়া উঠে। অন্য দিকে 'আবদুর-রশীদ দোস্তাম মাযার-ই শরিফে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক প্রকার স্বাধীনভাবে প্রশাসন চালায়। অতঃপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুজাদ্দিদী বুরহানুদ্দীন রাব্বানীর হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করেন। মাসউদ ও রাব্বানী ঐ সময় সংখ্যালঘিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র প্রশাসনের একচ্ছত্র দখলদারিত্বে পরিণত হয়। ইহারই প্রেক্ষিতে পশতুন আর তাজিক উজবেকদের মধ্যে ভয়াবহ হানাহানি শুরু হয়। ইহাতে যোগদান করে কাবুলে অবস্থানরত ইরান সমর্থিত শী'আ গোষ্ঠী হি'যব-ই ওয়াহ'দাত। এই তিন বাহিনীকে মোকাবিলা করেন হি'কমত য়ার। খৃ. ১৯৯২ সালের শেষের দিকে কাবুলের অভ্যন্তরে সন্ধ্যা নামিলেই শুরু হইত ত্রিমুখী হামলা আর প্রতি-হামলা। কাবুল এক ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। গৃহযুদ্ধ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চলে (ঐ)। এক পরিসংখ্যানে গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়। ১৯৯২-৯৪ সালে গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে শুধুমাত্র রাজধানী কাবুলেই বেসামরিক ৫০ হাজার লোক নিহত হয়; আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে (চিন্তা, বছর ১০, সংখ্যা ৯-১০, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪২)। ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বুরহানুদ্দীন রাব্বানীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রধান মন্ত্রী গুলবুদ্দীন হি'কমত য়ার একটি সামরিক অভিযান চালান। ইহাতে ক্ষমতাসীন আফগান সরকার দুই দলে বিভক্ত হইলে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। আফগানিস্তানে এইরূপ অস্থিতিশীল পরিবেশে ১৯৯২ খৃ. সালে গৃযযুদ্ধ যখন বিরাজমান তখন কান্দাহার প্রদেশে উত্থান ঘটে তালিবান নামে এক নূতন গোষ্ঠীর। খৃ. ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে তালিবান কর্তৃক কাবুল দখলের মধ্য দিয়া আপাতদৃষ্টিতে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়।

আফগান রাজনীতিতে তালিবান

আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালিবানদের উত্থান আকস্মিক। তাহাদের উত্থানের মূলে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখল, গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা, সন্ত্রাস এবং মুজাহিদ নেতাদের নৈতিক অবনতি ইত্যাদি বলিয়া অনেকে মনে করিলেও ইহার প্রধান কারণ ছিল আদর্শ ভিত্তিক ইসলামপন্থী একটি স্থিতিশীল সরকারের অনুসন্ধান (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব), আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা, পার্লক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৭৫)। আফগানিস্তান হইতে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পর সেইখানে ভয়াবহ জাতিগত দাঙ্গা দেখা দিলে হাজার হাজার মানুষ দেশত্যাগ করিয়া পাকিস্তান ও ইরানের সীমান্তের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। মানবিক বিপর্যয়ের শিকার আফগান তরুণরা ধর্মীয় শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আফগানিস্তানের সীমান্ত সন্নিহিত পাকিস্তান সীমান্তে বেসরকারী অর্থায়নে গড়িয়া ওঠা শত শত মাদরাসায় তাহারা লেখাপড়া করিত। ধর্মভীরু এই সকল ছাত্র-শিক্ষকই দলে দলে তালিবান বাহিনীতে যোগদান করে। ইহা শিক্ষার্থীদের একটি আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়। ইহা প্রথম শুরু হয় খৃ. ১৯৯২ সালে আফগানিস্তানের দক্ষিণের প্রদেশ কান্দাহারে। সেখানে মোল্লা মুহাম্মদ 'উমার নামক একজন যুবক প্রবহমান অ-ইসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার মধ্য দিয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। মোল্লা মুহাম্মদ উমার প্রাক্তন মুজাহিদ, যিনি দেশের অরাজকতার বিরুদ্ধে মাত্র ১৬ জন সঙ্গী লইয়া সর্বপ্রথম সমরে আবির্ভূত হন। এই সময় নৈতিক অবক্ষয়িত প্রাক্তন মুজাহিদরা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের পথ বাছিয়া লয়। এই সকল তথাকথিত মুজাহিদগণ মহাসড়কে চাঁদাবাজি, রাহাজানি ও ডাকাতির পথ বাছিয়া লইলে মোল্লা মুহাম্মদ 'উমারের মত অনেক যুবকই ইহা প্রতিহত করিবার জন্য সশস্ত্র বিরোধিতায় নিঃস্বার্থে নামিয়া আসেন। ক্রমেই মোল্লা 'উমারের সহিত তাহার এলাকা কান্দাহারের 'সিঙ্গেসারের' প্রায় সকল যুবকই যোগ দেয়। ফলে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারা সকলেই বয়সে তরুণ এবং মাদরাসার ছাত্র (ঐ, পৃ. ১৭৬)। এক কথায় বলা চলে, মোল্লা 'উমারকে কেন্দ্র করিয়া তালিবানদের সকলেই গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী-স্বার্থে দলাদলিতে বীতশ্রদ্ধ এবং একদা আদর্শবান কিন্তু বর্তমানে অপরাধপ্রবণ মুজাহিদদের সম্পর্কে মোহমুক্ত এক নূতন প্রজন্ম (দেবাশিস চক্রবর্তী ও অন্যান্য সম্পা., আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৮২)।

মাদরাসার পূর্ণ সময়ের ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার্থী বা 'তালিব', যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের 'তালিবান'(তালিব অর্থ ছাত্র-তালিবান বহুবচন) নামটি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের বাহিনী বা তালিবান নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানে নিঃস্বার্থ শান্তিকামী, মুজাহিদদের নোংরা যুদ্ধ-রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক জীবন হইতে মুক্ত সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া সূচিত হয়। দুর্গত আফগানদের মত, ক্ষমতালোভী অন্যান্য হিংস্র যুদ্ধবাজ, দস্যুগোষ্ঠীগুলি হইতে তাহারা মৌলিকভাবে পৃথক, নির্লোভ এবং সর্বত্যাগী এক ধর্মীয় শক্তি। শারী'আতের আইন জারি করা এবং আফগানিস্তানের সংহতি রক্ষা, ইসলামী চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তালিবানদের উদ্দেশ্য (ঐ, পৃ. ৮২)।

দুই-একটি ঘটনার মাধ্যমে তালিবানগণ পরিচিতি লাভ করে। তাহাদের অভ্যুদয়কালে কয়েকজন যুদ্ধবাজ কমান্ডার দুইজন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করিয়া তাহাদের শ্লীলতাহানি ঘটায়। মেয়ে দুইটির মা বাবা একটি মাদরাসার শিক্ষকের নিকট সাহায্য কামনা করিলে শিক্ষক তাহার ৫৩ জন ছাত্র সমেত কেবল ১৬টি বন্দুক জোগাড় করিয়া ঐ কমান্ডারের ঘাঁটি আক্রমণ করে। তাহারা মেয়ে দুইটিকে উদ্ধার করিয়া কমান্ডারকে ফাঁসিতে ঝুলায়। ইহাতে অনেক শিক্ষার্থী তালিবান আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহবোধ করে। তাহারা স্থানীয় দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ ও

যুদ্ধবাজ নেতাদের ফাঁসি দিয়া আফগানদের মধ্যে সুনাম অর্জন করে। ১৯৯৩ খৃ. সালের দিকে একজন আফগান যুদ্ধবাজ নেতা পাকিস্তানের ৩০টি ট্রাকের একটি সামরিক কনভয় আটক করিলে তালিবানগণ ইহা উদ্ধার করিয়া দেয় এবং এই যুদ্ধবাজ নেতাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়। এই ঘটনার পর হইতে তালিবানগণ আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে (চিন্তা, সংখ্যা ৯-১০, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৪)।

প্রথমদিকে মৌলভী ইউনুস খালিসের হি'যব-ই ইসলামী তালিবানদের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিলেও তাহাদের সাহায্যার্থে হি'কমত য়ার-বিরোধী অনেকেই আগাইয়া আসে, যাহাদের মধ্যে মুজাহিদ কামান্ডার হাজী বশীর এবং 'আবদুল গাফফার আখুন্দযাদা প্রমুখও ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে মোল্লা মুহাম্মাদ উমার আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেই নিজের শক্তির উৎস খুঁজিতে থাকেন এবং কিছু কিছু প্রাক্তন মুজাহিদ কমান্ডারের সাহায্য লইয়া কান্দাহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেন। মোল্লা 'উমার কাবুলের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বুরহানুদ্দীন রাব্বানীর সহিত যোগাযোগ করিয়া কান্দাহারের পরিস্থিতি অবহিত করেন। রাব্বানী হি'কমত য়ারের বিরুদ্ধে তালিবানের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও রাব্বানীর সাহায্য কখনও তালিবানরা পায় নাই।

তালিবান অবশেষে পাকিস্তানের মওলানা ফযলুর রাহমান, মওলানা সামী'উল হক এবং প্রাক্তন জেনারেল হামীদগুলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। উক্ত সময়ে বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে আফগান শরণার্থীদের জন্য স্থাপিত এবং পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মাদরাসাগুলিতে প্রচুর আফগান ছাত্র ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষারত ছিল। এই মাদরাসাগুলি পাকিস্তানের ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল, বিশেষ করিয়া সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান ভিত্তিক জে. ইউ. আই (JUI)-এর প্রভাবে পরিচালিত হইত। এই দলের নেতা ছিলেন মওলানা ফযলুর রাহমান। তিনি স্বয়ং পাখ্তুন ছিলেন। ধর্মমন্ত্রী ফযলুর রহমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল (অব) নাসিরুল্লাহ্ বাবর এই দলকে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত করিতে তাহাদিগকে সহযোগিতা দিতে আগ্রহী হন (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব), আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০২, পৃ. ১৭৬)।

এই সময় পাকিস্তানে পি.পি.পি (PPP) সরকার ছিল ক্ষমতায়। পাক সরকার দেশের অর্থনৈতিক মন্দা কাটাইয়া নূতন বাজার সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাহারা মধ্য এশিয়ার প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি, বিশেষ করিয়া উয্বেকিস্তান হইয়া অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত বাণিজ্যপথ খোলার চিন্তাভাবনা করিতেছিলেন। এইজন্য প্রয়োজন ছিল আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া একটি স্থলপথকে উন্মুক্ত করা। সংক্ষিপ্ততম পথটি ছিল পেশাওয়ার কাবুল হইয়া হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া মাযার-ই শারীফ স্পর্শ করিয়া উযবেকিস্তানের তিরমিয ও তাসখন্দে উপনীত হওয়া। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং গৃহযুদ্ধে আফগানিস্তানের এই স্থলপথটি যুদ্ধবাজ দস্যু দলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাহা ছাড়া সোভিয়েত বাহিনী পিছু হটিবার পরও কাবুলে মস্কোপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদের পক্ষে এই সরকারের নিকট হইতে এই ধরনের সুবিধা আদায় করা সম্ভব ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতে পাক-সরকার তালিবানের সামরিক অগ্রগতিতে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেয়। (আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব, পৃ. ৮৪)। এমনকি পাকিস্তানের S.S.G. হইত প্রশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে গেরিলা যুদ্ধের যাবতীয় রণকৌশল শিখান হয় (আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা, পৃ. ১৭৮)।

ক্রমেই তালিবানের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা একটি দুর্দমনীয় বাহিনীতে পরিণত হয়। তাহারা আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহর দখল করিতে থাকে। তালিবান এক পর্যায়ে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া হি'কমত য়ারের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। সাতজন সৈন্য নিহত হয়, অনেকে আহত হয় (আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব, পৃ. ৮৫)। তাহারা স্পিন বালদাকের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল এবং পাশা নামক স্থানের একটি বৃহৎ অস্ত্রভাণ্ডার অধিকার করে। তালিবান ১৮ হাযার কালাশনিকভ্, ৫০টির অধিক দূরপাল্লার কামান, বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ এবং কয়েক শত জিপ গাড়ি দখল করে (ঐ, পৃ. ৮৬) এবং এই সাফল্যে আফগানিস্তানে তাহাদের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্তুন জনগণও সমর্থন দেয়। অতঃপর ১৯৯৪ খৃ. তাহারা কান্দাহার দখল করে। তালিবান বাহিনী এইখানে কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক, আর্মাড কার, বিপুল অস্ত্রসম্ভার এবং কান্দাহার বিমানবন্দর হইতে ৬টি মিগ-২১ ফাইটার ও ৬টি ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার হস্তগত করে (ঐ, পৃ. ৮৫)। ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ তালিবান বাহিনী হি'কমত য়ারের সদর দফতর চারাখিয়া দখল করে। হি'কমত য়ার তাঁহার বাহিনীসহ জালালাবাদে পালাইয়া যান। তালিবান বাহিনী কাবুলগামী সমস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া খাদ্যবাহী যানগুলি দীর্ঘদিন পর কাবুলে প্রবেশ করিতে দেয়। এতদিন এই পথগুলি হি'কমত য়ারের বাহিনী বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কাবুলের ভীতসন্ত্রস্ত অধিবাসীদের কাছে তালিবান বাহিনী পরিত্রাণকর্তা বলিয়া মনে হইতে থাকে (ঐ, পৃ. ৮৭)। অভ্যুদয়ের পর মাত্র দুই বৎসরের মাথায় তালিবান কাবুল হইতে রাব্বানীর সরকারকে বিতাড়িত এবং আহ্মাদ শাহ্ মাসউদের বাহিনীকে পরাজিত করিয়া ১৯৯৬ খৃ. ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানী কাবুল দখল করে। তালিবান কাবুল দখল করিয়া রুশপন্থী সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট ড. নাজীবুল্লাহ্ এবং তাঁহার এক ভাইকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া হত্যা করে। ১৯৯৬ খৃ.-র মধ্যেই তালিবান মালাং গিরিপথের দক্ষিণ ও উত্তরে মাযার-ই শারীফসহ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ স্থান নিয়ন্ত্রণ করে (আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা, পৃ. ১৭৮)। উত্তর পাঞ্জশীর উপত্যকাসহ প্রায় ১০ ভাগ রাব্বানী সমর্থিত আহমাদ শাহ্ মাস্উদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে থাকে। তাঁহার সহিত জাতিগত উযবেক জেনারেল আবদুর রাশীদ দুস্তামের তালিবান বিরোধী বাহিনী ও শী'আ গোষ্ঠী হি'যব-ই ওয়াহ্'দাতের সঙ্গে একটি জোট গঠন করে। ইহা 'নর্দার্ন এলায়েন্স' বা 'উত্তরাঞ্চলীয় জোট' নামে পরিচিত।

আফগানিস্তানে আকস্মিকভাবে তালিবানের অভ্যুদয় এবং দুই বৎসরের মধ্যে দুস্তাম, মাসউদ ও হি'ক্মত্ য়ারের মত যুদ্ধবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের বিজয়লাভ ছিল বিস্ময়কর। তাহাদের উত্থান ছিল কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। আফগানিস্তানে সোভিয়েত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যর্থ ও হতাশ বেশ কয়েকজন মুজাহিদ কমান্ডার তালিবানের সাহায্যে প্রথমত আগাইয়া আসেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন জালালুদ্দীন হা'ক্কা'নী এবং

নাজীবুল্লাহ্‌র এক সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শাহ্‌নাওয়ায তানাই প্রমুখ। তাহা ছাড়া দোস্তামের বাহিনীর এক অংশ তালিবানের সহিত যোগ দেয়। পাকিস্তানের সহায়তায় তাহাদিগকে ট্যাংক ও যুদ্ধ বিমান চালনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৯৪ খৃ. মাত্র ১০০ জন সদস্য লইয়া তালিবান বাহিনী অভিযান শুরু করিলেও পরবর্তীতে তালিবানের প্রায় ৫০ হাযারের এক বিশাল বাহিনী গড়িয়া তোলে। তাহাদিগকে সহায়তা দান করে মধ্যপ্রাচ্যের স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধার দল। সাত বৎসরের মাথায় তালিবান একটি দৃঢ়চিত্ত বাহিনীতে পরিণত হয়, যাহা বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িতে সক্ষম হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ১৭৯)।

তালিবানের উত্থান-পর্বে সাধারণ আফগানরা ভয়ঙ্কর নৈরাশ্য ও আত্মঘাতী হিংস্র গৃহযুদ্ধ হইতে মুক্তি পাইতে উদ্দীপ্ত হয়। সমষ্টিগত রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রশাসন পরিচালনা ছিল আফগানিস্তানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। দেশ পরিচালনায় ঐ আফগান ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রচার করিয়াই কান্দাহারে প্রথম তালিবান শূরা বা 'পরামর্শ পরিষদের' প্রবর্তন করে। শূরা সংগঠনের ধরনটা ছিল পাশ্‌তুন্ উপজাতিদের জির্‌গা বা পরিষদের মত বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রধান, উপজাতি সর্দারদের লইয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি প্রশ্নে মতবিনিময় মঞ্চ। এমনকি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা লইয়া রাতভর আলোচনা চলিত। মুল্লা, কমান্ডার, সাধারণ যোদ্ধা সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিত। বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন মুল্লা মুহাম্মদ উমার (আফগানিস্তান ও সমসাময়িক বিশ্ব, পৃ. ৮৯)।

উলামা লইয়া একটি সামরিক ধর্মপরিষদ গঠিত ছিল। তাহারা রণনীতি এবং রণকৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কার্যত তাঁহাদের সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা কিংবা শিক্ষা ছিল না। সামরিক নীতি প্রণয়ন, সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় সেনানায়কদের নিয়োগ এবং সামরিক খাতে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য অর্থ বরাদ্দ, এই সকল অধিকার নিরঙ্কুশভাবে মুল্লা উমারের শর্তহীন এখতিয়ারের মধ্যে ছিল। তালিবান সৈনিকদের বেতন দেওয়া হইত না। ছুটিতে বাড়ি ফেরার সময় সেনাধ্যক্ষ তাহাদের এককালীন অর্থ দিত। এই বাহিনীতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাক্তন সেনাবাহিনীর যোদ্ধারা নিয়মিত বেতন পাইতেন (ঐ, পৃ. ৯০)।

কান্দাহারে ইসলামী সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান বিচারপতি ছিলেন মৌলভী মুহাম্মদ পাসানাই। বিচার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের প্রচলন করা হয়। সর্বোচ্চ আদালতই সমগ্র দেশের বিভিন্ন ইসলামী বিচারক কাযী ও সহকারী কাযীদের নিয়োগ করিত। বৎসরে এক অথবা দুইবার কান্দাহারে পুরাতন মামলা বা অভিযোগগুলি পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে শারী'আ আইনের বিধান নির্দিষ্ট করার জন্য কাযীদের ডাকা হইত। কাবুলেও সুপ্রিম কোর্ট চালু ছিল। ইহার ক্ষমতা কান্দাহার সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় ছিল না।

তালিবান কঠোর ইসলামী বিধান মুতাবিক মহিলাদের পর্দা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। নারী শিক্ষায় সীমাবদ্ধতা আনয়ন এবং চাকুরী ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ বন্ধ করিলে প্রায় ৪০,০০০-১,৫০,০০০ মহিলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (Afghanistan and the Taliban, edited by William Maby, Penguin Book, 1st pub. 2001, New Delhi, p. 155)। পুরুষের দাড়ি কামানো নিষেধ এবং মাথায় পাগড়ি পরা বাধ্যতামূলক ঘোষিত হয়। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর বা ভিসিপি প্রদর্শন, রেডিওতে গানবাজনা প্রচারও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আইন অমান্যকারীকে কারাবাস, প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত বা মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় শাস্তি দেওয়া হইত। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী চুরি করিলে হাতের কব্জি কর্তন করা, ডাকাতি, খুন-খারাবি বা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করিলে প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ বা ফাঁসি দেওয়ার বিধানে সকলে সর্বদাই তটস্থ থাকিত।

তালিবান শাসনে কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি এবং প্রতিমূর্তি নিষিদ্ধ ছিল। এই কারণে তাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর প্রতিকৃতি ধ্বংস করে। তাহারা ২০০১ সালের ১ মার্চ বামিয়ান প্রদেশের প্রাচীনকালের বুদ্ধমূর্তির ধ্বংস সাধন করে। তালিবান দেশে অপরাধ নির্মূল এবং আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবিদার। মুল্লা মুহাম্মদ উমার একজন খাটি মুসলিম। তিনি দেশে প্রকৃত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যাহারা ধর্মীয় অনুশাসন বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে একজন সংগঠক হিসাবে স্বধর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং অনৈতিক নাস্তিকদের বিতাড়িত করিয়া আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম করেন।

তালিবান সরকার অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে বারবার আবেদন জানাইতে থাকে। তালিবান আফগানিস্তানের ৯০ ভাগের বেশী এলাকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইলেও কেবল পাকিস্তান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ছাড়া জাতিসংঘের কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা অন্য কোন দেশ কূটনৈতিকভাবে তাহাদিগকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। ফলে তালিবান সরকারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধুহীন অবস্থায় পাঁচ বৎসর শাসনামল অতিবাহিত করিতে হয়।

তালিবান শাসনামলে জাতিসংঘ আফগানিস্তানের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দেয়। ইহাতে কোন শুভ ফলাফল সূচিত হয় নাই। ১৯৯৯ সালের ১৪ নভেম্বর বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞাসহ জাতিসংঘের অবরোধ কার্যকর হয়। ইহার প্রতিবাদে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত জাতিসংঘ দফতরগুলিতে আক্রমণ চালান হয়। তবে ২০০০ সালের ৩ নভেম্বর তালিবান জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় সম্মতি প্রদান করে। তবে ২০ নভেম্বর তাহারা রোমে অবস্থানরত আফগানিস্তানের নির্বাসিত সাবেক বাদশাহ্ জাহীর শাহের একটি শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। ২৯ নভেম্বর, ২০০০ আফগানিস্তানের উপর জাতিসংঘ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা কড়াকড়িভাবে আরোপিত হয়। অস্ত্র আমদানি, বিদেশে তালিবানের অফিস স্থাপন ও তালিবান কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে। ২০ ডিসেম্বর, আফগানিস্তানে আবার জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করে। ২০০১ খৃ. ১৪ ফেব্রুয়ারী তালিবান সরকার কাবুলে জাতিসংঘ অফিসগুলি বন্ধ করিয়া দেয়। জাতিসংঘ আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ঘোষণা দেয়।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে তিনটি যাত্রিবাহী বিমানের আত্মঘাতী হামলায় নিউইর্য়ক ও ওয়াশিংটনে ৩ হাযারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়। এই হামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি ধনকুবের ও তালিবানের রাষ্ট্রীয় অতিথি উসামা বিন লাদেন এবং তাঁহার আল-কায়দা নেটওয়ার্ককে প্রধান সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করে। উসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করিতে রাযি না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১ প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ক্রুসেডের ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর সৌদি আরব ২৫ সেপ্টেম্বর কাবুলের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ২৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তালিবানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় তালিবান তাহাদের প্রধান মিত্র পাকিস্তানের সমর্থন হারায়। পাকিস্তান নিজের ঘর রক্ষাকল্পে বাধ্য হইয়া মার্কিন বাহিনীকে তাহার জল, স্থল ও আকাশ সীমা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। ৭ অক্টোবর মার্কিন জোটের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক হামলা চালায়। পাকিস্তান ও উযবেকিস্তানের বিমানঘাঁটি ও আরব সাগরের মার্কিন রণতরী হইতে বিমান হামলা চালায়। তালিবান ও লাদেনের জানবায বাহিনী পুরাতন কিছু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এক মাসেরও অধিক সময় মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট জোটকে মুকাবিলা করে। ৯ নভেম্বর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা মাযার-ই শারীফ দখল করে এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। ১৩ নভেম্বর সকালে উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালিবান সৈন্যদের কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়াই কাবুলে প্রবেশ করিলে আফগানিস্তানে তালিবানের পাঁচ বৎসরের শাসনামলের অবসান ঘটে।

তালিবান-পরবর্তী সরকার গঠনের জন্য জার্মানীর বনে জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০১ সালের নভেম্বরে আফগানিস্তানের দল ও গ্রুপগুলির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ নয় দিন আলোচনার পর ৫ ডিসেম্বর তালিবান-পরবর্তী আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌছায়। অতঃপর ২২ ডিসেম্বরে ২ জন মহিলাসহ ২৯ সদস্যের মন্ত্রীসভার সরকার প্রধান হন পাখ্তুন্ নেতা হামিদ কারজাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের কলেবরে উল্লেখিত বরাত ছাড়াও (১) G.P. Tade, The Kingdom of Afghaniston, D.K. Publishing house, Delhi 1973; (২) Arnold Pletcher, Afghanistan Highwoy of Conquest, Cornell University Pres, New York 1966; (৩) Ludwig W. Adamce, Afghanistan, 1900-1923, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1967; (৪) Lieut-General G.N. Molesworth, Afghanistan 1919, Asia publishing house, Bomby 1962; (৫) Nancy Hatch Duprce, An Historical Guide to Afghanistan, Afghan Tourist organization, Kabul 1971; (৬) Tahir Amin, Afghanistan Crisis, Institute of policy Studies, Islamabad, Pakistan 1982; (৭) K.P. Saksena, Afghanistan Conflict and the United Nations; (৮) Afghasitan in crisis, edited by K.P. Misra; (৯) Sayed Shabbir Hussain, Afghanistan under Soviet Occupation, World Affairs Publications, Islamabad, April 1980; (১০) Donald N. Wilber, Afghanistan its People, its society, its cultures; (১১) S.H. Imamuddin, A Modern History of the Middle East and north Africa, vols. I & II, Najma sons, Dhaka 1970; (১২) Afghanistan and the Taliban, edited by William Maley, Penguin Books, 1st pub. 2001, New Delhi; (১৩) দেবাশিষ চক্রবর্তী ও অন্যান্য সম্পা., আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ ২০০১, কলকাতা; (১৪) এ. কে. এম. মহিউদ্দীন, আফগান রণাঙ্গনে, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৮; (১৫) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০২; (১৬) এ. জেড. এম. শামসুল আলম, আফগানিস্তান ও তালিবান, ঢাকা ২০০১; (১৭) মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ, ওসামা বিন লাদেন, তালেবান ও আমেরিকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০২; (১৮) চিন্ত, বছর ১০, সংখ্যা ৯-১০, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০১; (১৯) সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, খ. ১৫, নং ২৫, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১; (২০) যুগান্তর, শুক্রবার, ১৬ নভেম্বর, ২০০১; (২১) ঐ, ১৪ নভেম্বর; (২২) ঐ, ১ ডিসেম্বর, ২০০১; (২৩) দৈনিক সংবাদ, ২ ডিসেম্বর, ২০০১; (২৪) দৈনিক সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ২০০১।

মুহাঃ আবু তাহের

আল-আফগানী (দ্র. জামালুদ্দীন)

আফজাল আলী (افضل على)ঃ কবি, জন্ম আনুমানিক খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার মিলুয়া গ্রামে। তাঁহার পিতা ভংগু ফকির একজন দরবেশ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। শাহ রুস্তম ছিলেন কবির পীর। স্থানীয় লোকদের ধারণা তিনি একজন অতি প্রাচীন কবি। আফজাল আলীর কাব্যে উল্লিখিত 'ছৈয়দ পেরোজ শাহ'কে পণ্ডিতরা সুলতান নুসরাত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ বলিয়া মনে করেন। ইহা কবির সময়কাল নির্ণয়ের একটি সূত্র। কবির 'নসীহৎ নামা' কাব্যগ্রন্থ কুরআন ও হাদীছের ধর্মোপদেশে পূর্ণ। ইহাতে কবির গুরু শাহ রুস্তম তাঁহার শিষ্য আফজাল আলীর মুখে ধর্মোপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিত্বের চাইতে ধর্মোপদেশের প্রতিই এই কাব্যের লক্ষ্য বেশি। সেই যুগে বাংলায় ইসলাম ধর্মের উপদেশ সংবলিত রচনা খুব বেশি ছিল না বলিয়া ইহার একটি বিশেষ মূল্য আছে। ইহা ছাড়া সরল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে লেখা কয়েকটি পদে তাঁহার কবি প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৪৭।

(সংকলিত)

আফতাব আহমদ খান (افتاب احمد خان) ঃ সাহিবযাদা (১৮৬৭-১৯২৮) আইনবিদ, সমাজকর্মী ও শিক্ষাব্রতী, কাঞ্চনপুরার রাঈস নাওয়াব গুলাম আহমদ খান কালামীর পুত্র, আলীগড়ে শিক্ষা পান। বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। আলীগড় কলেজ ও মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯১৭ খৃ. পর্যন্ত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। আলীগড়ে অন্ধদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তিনি সুবক্তা ছিলেন, বিশেষত তাঁহার শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতাগুলি খুবই তথ্যপূর্ণ হইত। স্যার সায়্যিদ আহমাদের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ বাংলা বিশ্বকোষ ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৪৭।

সংকলিত

আফ্তাস (افطس) ঃ (রা) সিরিয়াবাসী একজন সাহাবী। আবূ 'উমার ইবন আবী 'আসি'ম, ইবন মান্দা ও তাবারানী তাঁহাকে সাহাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আফ্তাস (রা)- এর সহিত ইবরাহীম ইবন আবী আবলা-এর সাক্ষাত লাভ ঘটিয়াছিল। ইবন মান্দা, ইবন আবী 'আসি'ম ও তা'বারানী বাকি'য়্যা-এর সূত্রে ইবরাহীম ইবন আবী আবলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আফতাস নামক রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবীর সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছিল। উক্ত সাহাবীর পরিধানে তখন রেশমী কাপড় ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল–আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা ফী মা'রিফাতিস–সাহাবা। (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাম্য়ীযিস সাহাবা, মিসর, ১ম সং, ১৩২৮ হি., ১খ., ৫৭।

মুহাম্মদ আবদুল খালেক

আফতাসী (বানুল আফ্তাস) (بنو الافطس) ঃ ৫ম/১১শ শতাব্দীর ক্ষুদ্র স্পেনীয় মুসলিম রাজবংশ; ইহা আল-আন্দালুসের তাওয়াইফ রাজাদের আমলে আইবেরীয় উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করে এবং বাদাজো (বাতালায়াওস) ছিল ইহার রাজধানী।

কর্ডোভার খিলাফাতের অবসানে গুয়াদিয়ানা (ওয়াদী আনা) নদীর মধ্য উপত্যকা ও আধুনিক পর্তুগালের মধ্যভাগসহ আল-আন্দালুসের দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চল (الثغر الادنى) দ্বিতীয় আল-হাকামের এক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস সাবূর-এর অধিকারে আসে। তিনি তৎকালীন মুসলিম স্পেনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে হ'াজিব উপাধি গ্রহণ করেন। সাবূরের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ ফলক সংরক্ষণ করা হইয়াছে এবং তিনি ১০ শা'বান, ৪১৩/৮ নভেম্বর, ১০২২ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি কর্ডোভার উত্তরে ফাহসুল বাল্লূতে প্রতিষ্ঠিত বারবার জাতির মিকনাসা দলভুক্ত ইবনুল-আফতাস উপনামে অভিহিত আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা নামক এক শিক্ষিত ব্যক্তিকে তাঁহার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। দুই পুত্রকে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাখিয়া সাবূর যখন ইন্তিকাল করেন, তখন ইবনুল-আফতাস অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করিতে ইতস্তত করেন নাই এবং তিনি বাদাজোযের আফতাসী বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশ কখনও কখনও বানূ মাসলামা নামেও অভিহিত হয়। আবদুল্লাহ সম্মানসূচক আল-মানসূ'র উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সমাধি স্তম্ভের সংরক্ষিত ফলক অনুসারে ১৯ জুমাদাছ ছানিয়া, ৪৩৭/৩০ ডিসেম্বর, ১০৪৫ সালে বাদাজোযে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রাজত্বকালের খুব অল্প বিবরণই জানা যায়। মনে হয় প্রথমদিকে ইহা ছিল রাজ্যের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সফল রাজত্বকাল। কিন্তু শীঘ্রই সেভিলে (Saville) তাঁহার প্রতিবেশী মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ-এর (তু. আববাদী বংশ) সহিত তাঁহার খারাপ সম্পর্কের কারণে শেষের দিকে ইহা গোলযোগপূর্ণ হইয়া উঠে, এমনকি ইব্ন আব্বাদ তাহাকে বেজা (বাজা)-এ গ্রেফতার করেন এবং কিছুকাল তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

আল-মুজ'াফফার উপাধিতে সমধিক পরিচিত আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-রুচির প্রশংসায় ঐতিহাসিকগণ একমত এবং তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি সমকালীন কবিদের খুব কমই মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহারা আল-মুতানাববী ও আল-মা'আররী-র কবিতার সমতুল্য, এমনকি কাছাকাছি কোন কিছুই রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি আল-মুজ'াফফরী নামে অন্যূন পঞ্চাশ খণ্ডের একটি বৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে গণ্য। তবে ইহা নিঃসন্দেহে একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটির অত্যল্প উদ্ধৃতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়, এমনকি স্পেনেও ইহার ব্যাপক প্রচলন হয় নাই।

বিশ বৎসর স্থায়ী আল-মুজ'াফ্ফারের রাজত্বকাল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ এবং সেভিলের শাসক আল-মু'তাদিদ-এর বিরুদ্ধে একটানা, অথচ নিষ্ফল সংগ্রামে ইহা প্রায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত ছিল। বিরোধের মীমাংসার্থে কর্ডোভার শাসক জাওওয়ার-এর (তু. জাহওয়ারী বংশ) প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় অবিরাম এই বিরোধ বাদাজোয রাজ্যেকে খুবই দুর্বল করিয়া দেয় এবং কাস্তিল (Castile) ও লিওন (Leon)-এর রাজা প্রথম ফার্দিনান্দাকে এই রাজ্য আক্রমণে ও ইহার উপর করারোপ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে ৪৪৯/১০৫৭ সালে আফতাসী রাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত দুর্গ ভিযিউ (Vizeu) ও লামিগো (Lmego) খৃষ্টান নরপতির হস্তগত হয় এবং তিনি ৪৫৬/১০৬৩ সালে কোইমব্রা (Coimbra- কুলুমরিয়্যা-Qulumriyy) শহর, দৌরো (Douro- দুইরো-Duero) ও মনদিগো (Mondgo) নদীর মধ্যবর্তী সমুদয় অঞ্চল অধিকারের মাধ্যমে খৃষ্টানদের স্পেন পুনর্বিজয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেন।

মুজ'াফফার তাঁহার রাজ্যের এই মারাত্মক বিখণ্ডিকরণের পর অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইয়াহ্'য়া আল-মানসূ'র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইয়াহ'য়া তাহার ভ্রাতা ইভোরা (য়াবুরা)-এর গভর্নর উমারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন এবং শীঘ্রই দৃশ্যপট হইতে অন্তর্হিত হন। উমার আল-মুতাওয়াক্কিল উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার যুগের সকল ক্ষুদ্র রাজার ন্যায় খৃষ্টান নরপতি ষষ্ঠ আলফনসোর ক্রমবর্ধমান দাবির শিকারে পরিণত হন। আলফনসো ৪৭১/১০৭৯ সালে তাঁহার নিকট হইতে কুরিয়া (Cori বা Kuriya) দুর্গ হস্তগত করেন, এমনকি ষষ্ঠ আলফনসো কর্তৃক টলেডো অধিকারের পূর্বে সম্ভবত তিনিই প্রথম স্পেনে আল-মুরাবিত'দের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার সকল

প্রতিবেশীর মতই খৃষ্টান নরপতির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হন এবং তাহার (খৃষ্টান নরপতির) কর প্রদানের দাবি মানিতে বাধ্য হন। টলেডোর অধিবাসীদের নিজেদেরই দেয়া প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ৪৭২/১০৮০ সালে টলেডো রাজ্য পুনরায় তাঁহার নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, যদিও তিনি দশ মাস যুননূনদের রাজধানীতে অবস্থান করেন। ১২ রাজাব, ৪৭৯/২৩ অক্টোবর, ১০৮৬ সালে স্বীয় রাজ্যে সংঘটিত আল-যাললাক'া (দ্র.)-এর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং যে ষড়যন্ত্রের ফলে আল-মুরাবিত'গণ শেষ পর্যন্ত আল-আনদালুসের সকল ক্ষুদ্র রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে ও তাঁহাদের রাজ্য দখল করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার হাত ছিল। 'উমার আল-মুতাওয়াক্কিল নিজেকে বিপদাপন্ন মনে করিয়া ষষ্ঠ আলফনসোর শরণাপন্ন হন এবং সানতারিম (শানতারীন), লিসবন (আল-উশবূনা) ও সিনত্রা (শিনতারা) তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বিনিময়ে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই সব কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ৪৮৭/১০৯৫ সালের শেষের দিকে করভারে জর্জরিত বাদাজোযের অধিবাসীদের পরোক্ষ সম্মতিতে আল-মুরাবিত' সেনাপতি সীর ইব্ন আবী বাক্র বাদাজোয অধিকার করেন। আল-মুতাওয়াককিল ও তাহার দুই পুত্র আল-ফাদ'ল ও সা'দ বন্দী হন এবং সেভিলে প্রেরিত হন, কিন্তু সেভিলে পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহাদেরকে হত্যা করা হয়। আল-মুতাওয়াককিলের অন্য পুত্র মানস্'র পলায়ন করেন, কিছু কালের জন্য তিনি আধুনিক কাসিরিস (Caceres) প্রদেশের মনতানছেয (Montanchez) দুর্গে নিজেকে সুরক্ষিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীয় অনুসারীদেরসহ ষষ্ঠ আলফনসোর রাজ্যে প্রস্থান করেন এবং খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ক্ষুদ্র রাজাদের মুলূকুত-ত'াওয়াইফ আমলের সমুদয় ঘটনাপঞ্জী, বিশেষ করিয়া ইব্ন হ'ায়্যানের লিখিত ঘটনাপঞ্জী, যাহা ইব্ন বাসসামের 'য'াখীরাতে' উদ্ধৃত; (২) ইব্ন ইযারী, বায়ান, ৩খ., সূচীপত্র; (৩) ইবনুল খাতীব, আমালু'ল-'আলাম (Levi-Provencal), ২১১-৫; (৪) আবদুল্লাহ ইব্ন বুলুগগীন (দ্র.)-এর আত্মজীবনীতে (Momoirs) আল-মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকাল সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তাহা সর্বাপেক্ষা বিশদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য; (৫) Hoogvliet, Specimen elitt. Orent......ie regia Aphtasidarud fmilia, Leiden 1839 is antiquate; (৬) R. Dozy, Hist. Mus. Esp.2 iii, নির্ঘণ্ট; (৭) A. Prietoy Vives, 1 Los reyes de taifas, Madrid 1926 295-8; (৮) R. Menendez Pidal, La Espana del cid, Madrid 1947; (৯) E. Le-Prevencal, Inscriptions arabes d'Espagne, 53-5; (১০) ঐ লেখক, Islam d'Occident, 125-6; (১১) ঐ লেখক, Hist. Esp. mus,(in preparation).

E. Levi Provencal (E.I.2)/মুখলেসুর রহমান

আল-আফ্দ'াল (الأفضل) ঃ আবূ 'আলী আহমাদ (কুতায়ফাত (كتيفات) উপাধি, আল-আফদ'াল (দ্র.) ইব্ন বাদরুল-জামালীর পুত্র। খলীফা আল-'আমিরের মৃত্যুর (১২ যুল-ক'াদা, ৫২৪/১৭ অক্টোবর, ১১৩০) পর তাঁহার দুই প্রিয়পাত্র হাযার মারদ ও বারগাশ ক্ষমতা দখল করেন এবং তাঁহারা আল-'আমিরের চাচাতো ভাই আবদুল মাজীদকে অস্থায়ী শাসকরূপে মনোনীত করেন। চারদিন পর সেনাবাহিনী কুতায়ফাতকে (যিনি আল-আফদ'াল উপাধি ধারণ করেন) উযীর পদে অধিষ্ঠিত করে। কিছুদিন পর উযীর ফাতিমী বংশকে ক্ষমতাচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সাম্রাজ্য ইছনা 'আশারী শীআদের ভাবী ইমামের সার্বভৌমত্বের অধীনে স্থাপন করেন। আবদুল-মাজীদ শাসন ক্ষমতা হইতে অপসারিত ও কারারুদ্ধ হন এবং কুতায়ফাত একনায়করূপে দেশ শাসন করেন। আমাদের নিকট ইমাম মুহাম্মাদ আবুল ক'াসিম আল-মুনতাজি'র লি-আমরিল্লাহ' নাম খচিত হি. ৫২৫ সালের মুদ্রা রহিয়াছে; 'আল-ইমাম আল-মাহদী আল-ক'াইম বি-আমরিল্লাহ হু'জ্জাতুল্লাহ 'আলাল-'আলামীন' লিপিখোদিত হি. ৫২৬ সালের অপর মুদ্রাসমূহ উযীর আল-আফদ'াল আবূ 'আলী আহমাদ, তাঁহার প্রতিনিধি (নাইব) ও স্থলাভিষিক্ত (খলীফা)-এর প্রতি অধিকতর প্রাধান্য দান করে। ইহাতে যদিও মিসরের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ইসমাঈলী মতবাদের বিলুপ্তি বুঝা যায়, কিন্তু তবুও কুতায়ফাত ইহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নাই, বরং ইহার প্রতি কিছু নমনীয় ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁহার নিযুক্ত ক'াদীগণের মধ্যে হ'ানাফী, শাফি'ঈ ও ইমামী ক'াদী ব্যতীত একজন ইসমাঈলী ক'াদীও স্থান লাভ করিতেন। ইসমাঈলীগণ স্বভাবতই একটি অপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্তরে নিজেদের অবনতিকে মানিয়া লইতে পারে নাই। কুতায়ফাত নগরীর বাহিরে অশ্বারোহণে ভ্রমণকালে নিহত হন এবং আবদুল মাজীদ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন (১৬ মুহ'াররাম, ৫২৬/৮ ডিসেম্বর, ১১৩১)। ঘটনাটির স্মরণে ফাতিমী বংশের সমাপ্তি কাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর অনুষ্ঠানাদি পালন করা হইত (মাক'রীযী, খিতাত, ১খ., ৩৫৭, ৪৯০)। আবদুল মাজীদ প্রথমে সাময়িক শাসকরূপে শাসনকাজ পরিচালনা করেন, কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই তিনি আল-হ'াফিজ' লি-দীনিল্লাহ উপাধি ধারণ করিয়া খলীফা পদে আসীন হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল মুয়াস্‌সার (Masse), ৭৪-৫; (২) রুহী (পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ড ৮৬৫), প্রবন্ধ 'আল-হাফিজ'; (৩) ইবনুল আছ'ীর, s. a. ৫২৪, ৫২৬; (৪) ইব্ন তাগরীবিরদী (Popper), ২খ., ৩২৮-৯, ৩খ, ১প. (সং. কায়রো, ৫খ., ২৩৭-৪০); (৪) G. Wiet, Materiaus Pour un Corpus Insc. Arab, ii (MIFAO, lii, 1930), ৮৫ প.; (৫) S. M. Stern, The Succession to the Fatimid Imam al-Amir, Oriens ১৯৫১ খৃ., পৃ. ১৯৩ প. (মুদ্রা সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণসহ)।

S. M. Stern (E.I.2) / মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

আল-আফদ'াল ইব্ন বাদরুল-জামালী (الأفضل بن بدر الجمالى) ঃ আবুল-ক'াসিম শানান শাহ, ফাতিমী উযীর; উযীর উপাধি দ্বারা ইতিহাসে সাধারণভাবে পরিচিত। ৪৫৮/১০৬৬ সালের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৪৮২/১০৮৯ সালের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি তাঁহার পিতার সহিত ওয়ারতী কার্যে সম্পৃক্ত ছিলেন। বদরের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ খলীফা আল-মুসতানসি'র

সেনাবাহিনীর চাপের মুখে আল-আফদ'লকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং তিনি নিজে কয়েক মাস পরেই ইন্তিকাল করেন।

খলীফা আল-মুসতা'লীর সিংহাসনারোহণ— উহার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফলে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয়। আল-মুসতানসি'রের জীবদ্দশাতেই তাঁহার উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দিয়াছিল এবং পারস্য হইতে আগত ইসমাঈলী ধর্মপ্রচারক হ'াসান ইবনু-সাব্বাহ খলীফার অন্যতম পুত্র নিযারের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উযীর পদে অধিষ্ঠিত আল-আফদ'াল আল-মুসতানসিরের কনিষ্ঠতর পুত্র আহমাদকে আল-মুসতা'লী উপাধিতে ভূষিত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করান। বঞ্চিত উত্তরাধিকারী নিযার সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশে আলেকজান্দ্রিয়া পলায়ন করিলে সেখানে ধৃত ও ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী হন। কেহ কেহ অবশ্য বিশ্বাস করেন, পালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তিনি হ'াসান ইবনুস-স'াব্বাহ' (দ্র.)-এর নিকট ইমামরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই হ'াসানই আস্‌সাসীনদের (الحشاشون) এক দোর্দণ্ড সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষোক্ত দলের মুদ্রায় কিছু কালের জন্য নিযারের নাম অঙ্কিত থাকে এবং মিসরে তাহাদের অনুগামিগণ নিযারী নামে পরিচিতি লাভ করে। আল-আফদ'াল এইরূপ পরিণতির কথা ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার আচরণের পশ্চাতে ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ যাহার ফলে তিনি এমন এক যুবককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাইতে উদ্বুদ্ধ হন যে সকল সময় তাঁহাকে মানিয়া চলিবে।

বাদরুল-জামালী, যিনি মিসরকে বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমগ্র দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম করিয়াছিলেন এবং আল-আফদ'াল অতঃপর তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করেন এবং খলীফা আল-মুসতা'লীকে, যিনি সিংহাসনারোহণের সময়-প্রায় বিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন, তাঁহার প্রাসাদের মধ্যে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। আল-মুসতা'লী প্রায় আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন (৪৮৭/১০৯৪—৪৯৫/১১০১) এবং কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নিযারীগণ তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকিতে পারে। অতঃপর আল-আফদ'াল আল-মুসতা'লীর পাঁচ বৎসর বয়স্ক এক পুত্রকে আল-আমির বি-আহকামিল্লাহ উপাধি দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করান এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রী বিনা বাধায় শাসনকার্য চালাইতে থাকেন। কিন্তু খলীফার বয়স বৃদ্ধি পাইলে উযীরের অভিভাবকত্বে তিনি অস্থির হইয়া উঠেন এবং অবশেষে অ্যাস্যাসীনদের সহায়তায় ৫১৫/১১২১ সালে আল-আফদ'াল হইতে মুক্তিলাভে সক্ষম হন। আল-আফদ'াল সাতাইশ বৎসর যাবত প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর এই সময় লক্ষণীয়ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ইহার বিপরীত পরবর্তী বৎসরগুলিতে নজীরবিহীন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

আল-আফদ'ালের একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার কারণে ক্রুসেডারদের ফিলিস্তীন আক্রমণের সময় মিসরীয় অবহেলার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে যথার্থভাবে চাপানো যায়। ফাতিমী সরকারকে আংশিকভাবে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে যদি মিসর সীমান্তের বাহিরের জনগণের নিকট উহার অপ্রিয় হওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়। তবে কতকগুলি কার্য ফাতিমীদের কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, যথাঃ কতিপয় দুর্গ পুনরুদ্ধার করা হয় (অন্তত ৪৯১/১০৯৮ সালে সিডন বন্দরের জন্য আমাদের নিকট শিলালিপির নির্দশন রহিয়াছে)। পূর্ববর্তী বৎসর ফাতিমী বাহিনী বিদ্রোহী গভর্নরের কবল হইতে টায়ার পুনরুদ্ধার করে ; পরিশেষে জেরুসালেম ৪৯১/১০৯৮ সালে আরতুকী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে, যাহারা সেখানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, জোরপূর্বক দখল করা হয়। মিসরীয়দের নিকট ইহা অজ্ঞাত ছিল না, জেরুসালেম ছিল ক্রুসেডারদের মূল উদ্দেশ্য এবং ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, তাহারা ইহা ফিরিঙ্গীদের নিকট হস্তান্তরের জন্য দখল করিয়াছিল। মিসর হইতে দূত আসলে ৪৯০/১০৯৭ সালে ক্রুসেডার শিবিরে, যাহা এন্টিওক-এর নিকটে ছিল, আগমন করিয়াছিল এবং বিনিময়ে শেষোক্তজন সম্ভবত চুক্তির জন্য আলোচনার উদ্দেশে কায়রোতে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উত্তর সিরিয়া সুন্নী মতাবলম্বী নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। ফাতিমীদের তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপের ইচ্ছা ছিল না এবং সালজূকগণও তাহাদের হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করিতে পারিত না। যথাযথ প্রমাণাদির অভাবে আমরা শুধু অনুমানিভিত্তিক তথ্য পরিবেশনেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি।

এতদ্‌সত্ত্বেও মিসরীয় সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অন্তত শক্তিমত্তার অভাব কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। তাহারা জেরুসালেম রক্ষার্থে আগাইয়া আসে নাই। ইহার পতন গভীরভাবে অনুভব করা হয় এবং আল-আফদ'াল একদল সৈন্যসহ আসক'ালানের উত্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে অবশ্য তিনি তাহাদেরকে নিশ্চল অবস্থায় রাখেন। তিনি সমুদ্রযোগে নূতন সৈন্য আগমনের এবং ফিলিস্তীন হইতে তাঁহার সৈন্য সমাগমের অপেক্ষায় থাকেন। ফিরিঙ্গীরা প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করে এবং মিসরীয় বাহিনীকে নির্বিচারে হত্যা করে। আল-আফদ'াল আসক'ালানের আশ্রয়ে পলায়ন করেন এবং দ্রুত কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন। ৪৯৪/১১০১ সালে ফিলিস্তীন ফিরিঙ্গীদের দখলে চলিয়া যায়। ফলে উহার অধিবাসিগণ মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তী বৎসরগুলিতে আল-আফদ'াল ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করিতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্সকালান সীমান্তের বাহিরে খুব কম অভিযানই পরিচালিত করেন এবং উহাতে লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই। সিরিয়ার প্রধান বন্দরসমূহ এই সময় ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিদের অধিকারে ছিল, তাহারা তখনকার স্বার্থ অনুযায়ী কখনও সুন্নী আবার কখনও শী'ঈ রং ধারণ করিত। আল-আফদ'ালের এক পুত্রের পরিচালিত অতি গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযান রামলা অধিকারে সাফল্য অর্জন করে। ৪৯৭/১১০৩ সালে আক্‌কা (Acre)-এর পতন ঘটে, সমর্থনের অভাবে উহার ফাতিমী সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেন। ত্রিপোলীর আধা-স্বাধীন নৃপতির দুর্দমনীয় প্রতিরোধে উৎসাহিত হইয়া আল-আফদ'াল নৌবাহিনীর একটি দল প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহা অতি বিলম্বে পৌঁছে। ৫১২/১১১৮ সালে ফিরিঙ্গীদের হুমকি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় ; তখন ফারামা শহরটি আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। ঘটনাটি এই কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে, জেরুসালেমের রাজা প্রথম বলডুইন যে নিজে অভিযানটি পরিচালনা করিয়াছিলেন, আকস্মিকভাবে তখন মারা যান। এই দুঃসময়ে মুসলিম নৃপতিগণ পারস্পরিক সন্দেহে নিমজ্জিত থাকে, কিন্তু আল-আফদ'াল দামিশকের বূরীপূদের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানাইয়া উহা লাভ করিয়াছিলেন।

স্পষ্টতই খলীফা আল-আমির ও তাঁহার উযীর যে বিলাসিতায় নিমজ্জিত ছিলেন ইহাতে তাঁহাদের সম্পর্কে অতি খারাপ ধারণাই জন্মে। যত বেশী শহর ফিরিঙ্গীদের অধীনে চলিয়া যাইত ততই তাঁহাদের জাঁকজমক ও আনন্দ-উৎসব বৃদ্ধি পাইত বলিয়া অনুমিত হয়। ঔদাসীন্যের জন্য মিসরীয় সরকারের উপর যে দায়িত্বই বর্তাক না কেন, তাহা সবেমাত্র শিশু খলীফার উপর বর্তানো যায় না, ইহা তাঁহার ভীষণভাবে অমনোযোগী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রীর উপরই বর্তায় মাত্র। বদ্‌র কর্তৃক নির্মিত অট্টালিকাসমূহ যাহার মধ্যে এখানে কেবল কায়রোর বিস্ময়কর সদর দরজা ও প্রাচীর উল্লেখযোগ্য এবং তৎপুত্র আল-আফদ'আলের নির্মিত অট্টালিকাসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বৈসাদৃশ্য বিরাজমান। শেষোক্ত জন কেবল তাঁহার নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন এবং ফুসতাত ও কায়রোতে একের পর এক আনন্দ চত্বর নির্মাণ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর খলীফা আল-'আমির মন্ত্রীর সম্পত্তি নিজ দখলে আনয়ন করেন। মূল্যবান সামগ্রী, অলঙ্কার ও রেশমী বস্ত্রসমূহ স্থানান্তর করিতে অন্যূন দুই মাস সময় লাগে। সুনামের ক্ষেত্রে অবশ্য ঐতিহাসিকগণ আল-আফদ'আলের অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেন, যাহাতে রাষ্ট্রের রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আল-আফদ'আলের কুতায়ফাত উপাধিধারী পুত্রের জন্য পূর্ববর্তী আল-আফদ'আল প্রবন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-মুয়াসসার (Masse), ৩০-৪৩, ৫৬-৬০ ; (২) ইবনুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৩) ইবনুস-সায়রাফী, আল-ইশারা ইলা মান নালাল-বি'যারা, কায়রো ১৯২৪, ৫৭-৬১; (৪) ইবনুল-ক'আলানিসী, য'য়ল তারীখ দিমাশক (Amedroz), ১২৮-২০৪, স্থা. ; (৫) ইবন তাগরীবিরদী (Popper), ২খ. (সং কায়রো, ৫খ., ১৪২-২২২); (৬) ইবন খাল্লিকান, নং ২৮৫; (৭) মাক'রীযী, খিতাত, ১খ., ৩৫৬ প., ৪২৩, ২খ., ২৯০; (৮) S. Lane-Poole, History of Mediaeval Egypt, 161 প.; (৯) G. Wiet, Histoire de la Nation egyptienne, ৪খ., ২৫৫-৬৭ ; (১০) ঐ লেখক, Materiaux pour un Corpus Insc. Arab, ii (MIFAO lii) (ইহাতে পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে) ; (১১) History of the Crusades, i, Philadelphia ১৯৫৫ খৃ., ৯৫-৯৭।

G. Wiet (E.I.²)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আল-আফদ'আল ইবন স'আলাহ'দ-দীন (الافضل بن صلاح الدين) ঃ পূর্ণ নাম আল-মালিকুল-আফদাল আবুল-হাসান আলী নূরুদ্দীন (الملك الافضل ابو الحسن على نور الدين) সালাহুদ্দীন (দ্র.)-এর জেষ্ঠ্য পুত্র, জন্ম ৫৬৫/১১৬৯-৭০ সনে, মৃত্যু সুমায়সাতে ৬২২/১২২৫ সনে। সালাহুদ-দীনের মৃত্যুর পর তিনি দামিশকের শাসক ও আয়্যূবী পরিবারের প্রধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন, কিন্তু নিজ অক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তিনি ক্রমান্বয়ে দামিশক, মিসর ও তাঁহার সকল সিরীয় জায়গীর হারান এবং পরিশেষে রূমের সালজূক সুলতানের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হন (আয়্যুবিয়্যা দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন খাল্লিকান, নং ৪৫৯ ; (২) আবূ শামা, য'য়লুর-রাওদ'তায়ন, ১৪৫; (৩) ইবন তাগরীবীরদী, নুজূম, ৬খ., নির্ঘণ্ট; (৪) মাক'রীযী, সুলূক, ১খ., নির্ঘণ্ট।

H. A. R. Gibb (E.I.²)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আফদাল খান (افضل خان) ঃ বিজাপুর সুলতানের অন্যতম সেনাপতি ও বিচক্ষণ যোদ্ধা। মারাঠা প্রধান শিবাজীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আনয়নের জন্য সুলতান কর্তৃক প্রেরিত হন (১৬৫৯)। এক পক্ষকালের মধ্যে তিনি সাতারা হইতে ২০ মাইল দূরে ওয়াই-এ পৌছিলে শিবাজী বেগতিক বুঝিয়া প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। আফদাল খান মারাঠা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণজী ভাস্করের মাধ্যেমে সন্ধি আলোচনার জন্য বৈঠকের প্রস্তাব করেন। শিবাজী বৈঠকে সম্মত হয়। আফদাল খান তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে শিবাজী কর্তৃক 'বাঘনখ' নামক অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। ঐতিহাসিক খাফী খান ও ডাফ শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ২খ., ১৪৮।

(সংকলিত)

আফদ'আল খান খাটক (افضل خان خٹك) ঃ মৃ. ১১৮৩ হি., পাশতূ কবি ও লেখক। আশরাফ খান হিজরী-র পুত্র ও খুশ্‌হাল খান খাটকের পৌত্র। পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় গোত্রের প্রধান হন। পাশতূ ভাষার উত্তম কবি বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তাঁহার গদ্য রচনাবলী পাশতূ সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুরাগীদের নিকট তাঁহার কবিতাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ তারীখ-ই মুরাস্‌সা তাঁহার রচিত। এই প্রবন্ধে তিনি খাটক উপজাতির ইতিহাস ও কৃতিত্বের আলোচনা করিয়াছেন। পাশতূ গদ্য সাহিত্যে তাঁহার মূল্যবান অবদানসমূহের মধ্যে কালীলাহ ওয়া দিম্‌নাহ-এর পাশতূ অনুবাদ ইলম খান-ই দানিশ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৭২, ১খ., ১৪৮।

(সংকলিত)

আফদ'আল রাসূলী (দ্র. রাসূলিয়্যা)।

আফদাল হাক্ক চৌধুরী (افضل حق چودهرى) ঃ (১৮৯২-১৯৪২) পাকিস্তানের রাজনীতিক ও লেখক। হুশিয়ারপুর জেলার অধিবাসী। এফ. এ. পর্যন্ত শিক্ষালাভ করার পর তিনি পুলিশ বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিয়া সাব-ইনসপেকটর পদে নিযুক্ত হন। ১৯২০ খৃ. অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সরকার কর্তৃক তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা ইত্যাদি লিপিবদ্ধকরণের জন্য আদিষ্ট হন। কয়েকটি সভার বক্তৃতা তাঁহার মনে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনে শরীক হন। তিনি কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাজলিস-ই-আহ'রার-এর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইহার সর্বময় কর্তা ছিলেন। একাধিকবার তিনি কারাবরণ করেন। পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের দুইবার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মর্যাদার চোখে দেখিতেন। তিনি

একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে 'দুন্য়া মেয় দুযাখ' (দুনিয়াতে দোযখ) ও তারীখ-ই আহ্'রার, উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনায় জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার প্রয়াসের পরিচয় বর্তমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৪৮।

(সংকলিত)

আফদ'ালুদ-দীন তুরকা (افضل الدين تركه) ঃ খাওয়াজা আফদ'াল-ই স'াদর হিসাবে অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন তীমূর বংশীয় শাহরূখ মীর্যা (দ্র.)-র রাজত্বকালের প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ ইসফাহান-এর একটি মূলত তুর্কোফোন পরিবারের সদস্য। এই কারণেই তাঁহার পদবী হইয়াছে তুরকা। ৮৪৫/১৪৪১ সালে শাহরূখ তাঁহার পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন বায়সুনকুর-কে ইরাক-ই 'আজাম (আল-জিবাল)-এর এক অংশের শাসক নিযুক্ত করার সময় আফদালুদ-দীন তুরকা ছিলেন এই যুবক শাসকের পণ্ডিত সভাসদগণের অন্যতম। কিন্তু পরে মুহাম্মাদের বিদ্রোহের ফলে শাহরূখ যখন ইসফাহান আগমন করে, তখন আফদালুদ-দীন অন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত মুহাম্মাদের সহচরবর্গ হিসাবে বন্দী হন এবং কোন অনুসন্ধান ছাড়াই শাহরূখের প্রদত্ত আদেশে নিহত হন (রামাদ'ান ৮৫০/নভেম্বর ১৪৪৬)।

আফদালুদ-দীন শাহরাস্তানীর কিতাবুল মিলাল ওয়ান্-নিহ'াল-এর আংশিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদে তিনি মূল লেখকের বিপরীতভাবে, শুধু প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতবাদগুলি প্রকাশে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং এই মতবাদগুলি খণ্ডন করিতেও প্রয়াস পান। মূলত এই অনুবাদটি ৮৪৩/১৪৩৯ সালে মীর্যা শাহরূখের জন্য করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে মুহাম্মাদ বায়সুনকুর ইরাক-ই 'আজাম-এ আগমন করিলে গ্রন্থখানির একটি নূতন সংস্করণ তাঁহার প্রতি উৎসর্গ করা হয়।

তুরকা পরিবারের অন্যান্য প্রসিদ্ধ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমরা অন্য এক আফদ'ালুদ-দীন তুরকা (মৃ. ৯৯১/১৫৮৩)-কে জানি, যিনি ছিলেন খাওয়াজা আফদ'ালুদ-দীন-এর পৌত্র ও সাফাবী যুগের বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি কাযবীন-এ সাফাবী শাহ তাহমাসপ-এর অধীনে কিছুকাল কাদী ও মুদাররিস (শিক্ষক)-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাওলাতশাহ, তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. Browne, পৃ. ৩৩৯; (২) আহ'মাদ ইবন হু'সায়ন আল-কাতিব, তারীখ-ই জাদীদ-ই যায়দ, সম্পা. আই. আফশার, তেহরান ১৯৬৬, পৃ. ২৪১-৪২ ; (৩) আবূ বাকর তিহরানী, কিতাব-ই দিয়ারবাকরিয়্যা, সম্পা. Necati Luga ও Faruk Sumer, আনকারা ১৯৬২, পৃ. ২৮৫-৮৮; (৪) 'আবদুর-রায্যাক' সামারকান্দী, মাত'লা'-ই সা'দায়ন, ২খ., ১৯৪৬, পৃ. ৮৬২-৬৩ ; (৫) হ'াসান-ই রূমলূ, আহসানুত-তাওয়ারীখ, তেহরান ১৯৭০, পৃ. ২৬০ ; (৬) মুদাররিস-ই খিয়াবানী, রায়হ'ানাতুল-আদাব; তিহরান ১৩২৬/১৯৪৭, ১খ., ৪১২-১৩ ; (৭) জালালী-য়ি-নাঈনী, সম্পা. তারজুমায়িল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, তেহরান ১৩৩৫/১৯৫৬, পৃ. ৩৪-৫৭, তু. ইসকান্দার বেগ মুনশী, আলামা আরা-ই আব্বাসী, নির্ঘণ্ট।

A.H. Zarrinkoob (E.I.Suppl.)/ ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আফফান ইবনুল-বুজায়র (عفان بن البجير) ঃ আস-সুলামী (রা), ভিন্নমতে তাঁহার নাম 'আফফান ইবন ইত'র আস-সুলামী (দ্র. ইস'াবা, ১৪৮৬)। সারাবুতনীর মতে তাঁহার পিতার নাম 'ইত্'র ও পিতামহের নাম বুজায়র। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁহারা হিমসে গমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিকট হইতে জুবায়র ইবন নুফায়র, খালিদ ইবন মা'দান ও মিসের আরও কিছু ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইস'াবা, ১খ., ৪৮৬ ; (২) ইবনুল-আছ'ীর, উসদুল গা'াবা, ৩খ., ৪১৩।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া

'আফফান ইবন হ'াবীব (عفان بن حبيب) ঃ (রা) একজন সাহাবী। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁহারা নীশাপুরে গমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কথিত আছে, তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দাউদ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইস'াবা, ১খ., ৪৮৬ ; (২) ইবনুল আছ'ীর, উসদুল-গা'াবা ৩খ., ৪১৩, ৪১৪।

এ. বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া

আফয়ূন (افيون) ঃ আফিম, গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ শাক-সব্জির রস। ইহা হইতেছে oppyx-এর অর্পক্ক শুষ্ক বীজকোষের শুষ্ককৃত মত্ততাদায়ক রস (ল্যাটিনে Popaver somniferum, আরবীতে খাশখাশ), যাহার প্রস্তুত প্রণালী প্রাচীন কালের লেখকগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যথা Dioscorides, ৪খ., ৬৪। [প্রাচীনকালের আফিমের জন্য দ্র.- Pauly-Wissowa, (দ্র.) Mohn.] ইসলামী আমলে ইহার ব্যবহার ছিল চিকিৎসার প্রয়োজনে এবং চৈতন্য বিলোপকারী ঔষধ হিসাবে। উচ্চ মিসরে বহুকাল ধরিয়া আফিম গাছের চাষ হইত। কূহীন আল-আততার, ১২৮ অনুসারে তাহার সময়ে (৭ম/১৩শ শতাব্দী) সর্বোত্তম আফিম তৈরি হইত আসয়ুতের দক্ষিণে আবূ তীজ নামক স্থানে। ১৯শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত আফিম গাছের চাষ ও আফিম প্রস্তুতের যথেষ্ট উন্নতি হয় (দ্র. Lane, Modern Egyptians, ১খ., ১১৮, ২খ., ৩৫)। এশিয়া মাইনরে বায়যানটাইন আমলে আফিম গাছের চাষ হইত বলিয়া মনে হয় না। দৃশ্যত ক্রুসেডের পরেই ইহা প্রসার লাভ করে এবং তুর্কী শাসন আমলে গাছটিকে, বিশেষ করিয়া কারা হিসারের আশপাশের আবহাওয়াতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয় যাহার ফলে উক্ত স্থান আফয়ূন কারা হিসার (দ্র.) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরটি আফিম চাষের ও উহা রফতানীর কেন্দ্র ছিল (দ্র. O. Blau, Etwas uber das Opium, ZDMG ১৮৬৯, ২৮০)। পারস্য ও তুরস্কে আফিমকে প্রায়শ তিরয়াক' বা রোগ প্রতিষেধকরূপে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় আব্বাস যখন মদ্যপান নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগে সচেষ্ট হন তখন আফিমের ব্যবহার এইরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তিনি অবশেষে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করিতে এবং আফিম ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন (১৬২১ ;

P. della Valle, ২খ., ১০৮)। য়াযদ ও ইসফাহান হইতে ভারত ও তুরস্কে আফিম রপ্তানী করা হইত (দ্র. Chardin, Voyages, Amsterdam ১৭৩৫, ৩খ., ১৪-৫, ৯২ প. ২খ., ৫৮-৬৭ ; J. E. Polak, Persien, Leipzig ১৮৬৫, ২খ., ২৪৮-৫৫ ; E. G. browne কর্তৃক আফিম সেবনের সুস্পষ্ট বর্ণনা, A year amongst the Capersians, নির্ঘণ্ট)। ভারতেও আফিম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেখানে খোসা ফুটাইয়া কাথ বাহিরকরণকে Post নামে অভিহিত করা হইত (দ্র. J Charpentier, post (a) BSAS, ১৯৩৫-৭, ১০১ প., বিশেষ করিয়া মুগল আমলের জন্য)। B. Laufer, T'oung pao. ১৯১৬, ৪৬২ (আরও দ্র. O. Franke, Gaschichte d. Chines, Reiches, ২খ., ৫৫১, ৩খ., ৪২৮) অনুসারে আফিম প্রস্তুতের জ্ঞান চীনে (মধ্যযুগের) ভারত হইতে আমদানী হয়, মুসলমানদের নিকট হইতে নহে (ইহা নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের অভিমতের পরিপন্থী, যথা J. Edkins, The Poppy in China, ৫; E. Bretschneider, in A. de Candolle, Origin of Cultivated Plants, 400 ; Yule and Burnes Hobson-Jobson, ৬৪১ ; Giles, Glossary of Reference, ২০০, ইহারা আফিমের চীনা নাম আরবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন)। অসাধু ব্যবসায়িগণ কর্তৃক আফিমে বিভিন্ন প্রকার রজন প্রভৃতির মিশ্রণ দ্বারা ভেজাল প্রদান সম্পর্কে দ্র. E. Wiedmann, in SBPMS Erl., ৪৬খ., ১৯১৪, ১৭৬-২০৬।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবূ মানসূর আল-মুওয়াফ্ফাক', আবনিয়া (Seligmann), ১খ., ৩৬ ; (২) ইবনুল-'আওয়াম, ফিলাহা, অনুবাদ Clement-Mullet, ২খ./১, ১২৮ প.; (৩) ইবনুল-বায়তার, জামি', ১খ., ৪৫, অনু. Leclerc, নং ১১৬ ও ২১২০ ; (৪) ক'যবীনী (Wustenfeld), ১খ., ২৮২; (৫) তুহ্'ফাতুল-আহ্'বাব (Renaud-Colin), ৪০ ; (৬) I. Loew, Die Flora der Juden., ২খ., ৩৬৪-৭০ ; (৭) M. Meyerhof, Un glossaire de matiere medicinale comp. par Maimonide, নং ৩৫ (আরও দ্র. নং ৪০১) ; (৮) Millaut, L'opium et le hachich, La Geographic, ১৯১২, ১৩৯ প.।

C.E. Dubler (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

আফয়ূন কারা হিসার (افيون قرة حصار) ঃ অধিকতর শুদ্ধ রূপ আফয়ূন কারা হিসারী (আফিমের কৃষ্ণ দুর্গ), বর্তমানে শুধু আফয়ূন, পূর্বনাম কারা হিসার-ই-সাহিব (নেশরী, সং আনাকারা, ৬৪; সং বার্লিন, ২১-Leunclavius, Hist. Musulm, Frankfurt ১৫৯১ col ১৪০ ঃ সাহিবুন কারা হিসার [দ্র.], Principis Maurocastrum; Saibcarascar in Caterino Zeno, Commentarii del Viaggio in Persia, Venice ১৫৫৮, ১৪b) পশ্চিম আনাতোলিয়ার একটি শহর, ৩৮°৫০´ উ., ৩০°৩০´ পূ. সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০৭ মিটার উপরে আকারচায় নদীর তীরে, যে নদী প্রবাহিত হইয়া প্রথমে ইবার গুল (Eber Goul)-এ এবং তারপর আকশেহির গৌল (Akshehir Golu)-এ পতিত হইয়াছে, একটি নির্জন ও খাড়া মোচাকৃতি পাহাড়ের পাদদেশে। উহা চতুষ্পার্শ্বস্থ শহরের সমতল ভূমি হইতে ২০০ মিটার উচু। কারা হিসার-ই সাহিব শহরটি আনাদোলু প্রদেশের এক সানজাকের রাজধানী ছিল (হ'াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, ৬৪১)। ১২৮১/১৮৬৪ হইতে বিলায়াত খুদাওয়ানদিগার (خداوندكار) [ব্রুসা]-এর এক সানজাকের রাজধানী। আধুনিক তুরস্কে আফয়ূন কারা হিসার একই নামের বিলায়াতের রাজধানী এবং উক্ত বিলায়াত আফয়ূন কারা হিসার বোলওয়াদিন, দিনার ইমিরদাগ ('আযীযিয়্যা), সানদীকলী ও শুহুত কাদাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৪৫ সালে শহরটির লোকসংখ্যা ছিল ২৯,০৩০ (১৯৫০ ঃ ২৯,৮২৬), কাদার লোকসংখ্যা ছিল ১,৩৬,৬৬৭ এবং বিলায়াতের ৩৩৫,৬০৯ (১৯৫০ ঃ ৩,৭২,৬০০) জন। বিলায়াতটির আয়তন ১৩,৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার, পূর্বে কেবল লোকমুখে কিন্তু বর্তমানে সরকারীভাবে ব্যবহৃত আফয়ূন কারা হিসার নামটি (Tavernier, Les six voyages, i, 120 has: Aphiom Carassar ; Ch. Texier, Asie Mineure, Paris 1834; Aphioum) জেলায় প্রচুর আফিম উৎপাদন হইতে আসিয়াছে। Belon তাহার Les obeservations de Pluisieurs singularitez et choses memorables, প্যারিস ১৫৫৫, ১৮৩ a, পুস্তকে ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন (তু. O Blau, in ZDMG, ১৮৬৯, ২৮০)।

কারা হিসার-ই সাহিবরূপে আক্রোইনোসের বায়যান্টাইন দুর্গকে সনাক্ত করা হইয়াছে, উহার সন্নিকটে ৭৪০ খৃস্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় লিও (Leo) আরবদেরকে পরাজিত করেন এবং রূপকথার নায়ক সায়্যিদ বাততাল ও তাহার সৈন্যবাহিনী মৃত্যুমুখে পতিত হন [Theophanes Chronogr (de Boor), ১খ., ৩৯০, ৪১১] এবং সেখানে সম্রাট প্রথম আলেকজিয়াস কমনেনাস (Alexius I Commenus) ১১১৬ খৃস্টাব্দে সালজূক সুলতান মালিক শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন [Anna Comnena Alexias (B. Leib, Paris ১৯৩৪-৪৫, ৩খ., ২০৯)]। দৃশ্যত ইহা বায়যান্টাইনদের নিকট হইতে তুর্কীগণ ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অধিকার করেন, কিন্তু উহার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আলতিগোয কোপরুসু (Altigoz koprusu) শিলালিপি (RCEA, নং ৩৬৫৮) হইতে প্রতীয়মান হয়, শহরটি ৬০৬/১২০৯ সালে তুর্কীদের ছিল। এই কারা হিসারেই বিখ্যাত সালজূক উযীর সাহিব আতা ফাখরুদ-দীন 'আলী ইবন আল-হু'সায়ন (মৃ. ৬৮৭/১২৮৮-৯) তাহার ধন-সম্পদসহ কারামানিয়ানদের আক্রমণের পূর্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, শহরটি তাঁহার নাম অনুসারে কারা হিসার সাহিব নামে খ্যাত হয়। তাঁহার পুত্রগণ তাজুদ্-দীন হু'সায়ন ও নুস'রাতুদ্-দীন ১২৭১ খৃস্টাব্দে কারা হিসারের সমগ্র ভূখণ্ড কুতাহয়া, সানদীকলী, গুরগুরুম ও আকশেহির এবং পরবর্তী কালে লাদীক (আধুনিক ডনিযলি-র নিকট লাইবাসের তীরবর্তী লাওডিসা) ও খোনাস (প্রাচীন চোনাই, আধুনিক হোনায) সহকারে জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন; দ্রষ্টব্য আকসারায়ী (ওসমান তুরান) ৭৪, ইবন বীবী (Houtsma), ৩০৮ (সাহিবের পুত্রদের সম্পর্কে আরও উল্লেখিত

পৃ. ৩২৩, ৩২৭, ৩৩৪; কারা হিসার দেবেল দ্বারা আমাদের কারা হিসারকেই বুঝান হইয়াছে)। জিমরীর গোলযোগের সময় (১২৭৭ খৃ.) তুর্কমান আলী বেগের নিকট লাদীক ও খোনাসের পতন ঘটে। তিনি অবশ্য সুলতানের এক সফল অভিযানে পরাজিত এবং কারা হিসারের নিকট নিহত হন (ইবন বীবী, ৩৩৩)। সাহিব আতার পরবর্তী বংশধরকে জারমিয়ানদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় এবং পরিশেষে নিজেদের রাজ্য তাহাদের নিকট হারান। [ইবন ফাদ্‌লুল্লাহ আল-উমারী মাসালিকুল-আবসার (Taeschner) এক স্থানে বর্ণনা করেন (পৃ. ৩১) যে, কারাসার ইবন তোরগুদের দখলে ছিল ; অপর এক স্থানে বলেন (পৃ. ৩৬ ও ৩৭), কারাসারী জারমিয়ানদের সার্বভৌমত্বাধীন ইবনুস-সায়িবের দখলে ছিল—ইবনুস-সায়িব দ্বারা নিঃসন্দেহে সাহিবের বংশধরকেই বুঝান হইয়াছে; আরও দ্রষ্টব্য আহমাদ তাওহীদ TOEM-এর ১ম সিরিজ, ২খ., ৫৬৩ প.]। ইহার পর কারা হিসার জারমিয়ান (দ্র.) রাজ্যের উত্থান-পতনের অংশীদার হয়, যাহা শীঘ্রই উছমানী তুর্কীদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় এবং ১ম বায়াযীদের সময় প্রকৃতপক্ষেই ইহা কিছু দিনের জন্য ৭৯২/১৩৯০ হইতে তীমূরের সময় ৮০৫/১৪০২ সালে উহার পুনরুদ্ধার পর্যন্ত উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জারমিয়ানের সুলায়মান শাহ-এর পুত্র খিদ্‌র পাশা (মৃ. ৭৫০/১৩৪৯) ও এই রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্য কারা হিসারের মাওলাবী উপনিবেশসমূহের প্রধান (চেলেবি)-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য গালিব দেদে, তায্‌কিরা-ই শু'আরা'-ই মাওলাবিয়্যা; পাণ্ডুলিপি ভিয়েনা, নং ১২৫৭, পত্র ৫৪r, ৯০t, 'আলী আনওয়ার, সেমাখানা-ই আদাব, ইস্তাম্বুল ১৩০৯, ৪৮ প., ১০২)। তীমূরের এশিয়া মাইনর অভিযানকালে আন্‌কারা যুদ্ধের পর (১৪০১ খৃ.) কারা হিসারও বিজয়ীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় (শারাফুদ্-দীন 'আলী য়াযদী, যাফারনামাহ্, কলিকাতা ১৮৮৭-৮, ২খ., ৪৪৬, ৪৫৭, ৪৮৮, ৪৯২-Histoire de Timur-Bec, অনু. Petis de la Croix, Delft ১৭২৩, ৪খ., ২১, ৩১, ৬০, ৬৮; Dukas, Hist., Bonn, ৭৭)।

৮২৩/১৪২৮-৯ সালে জারমিয়ান-ওগলু রাজ্য নিশ্চিতরূপে 'উছমানী তুর্কীদের অধিকারে আসে এবং কারা হিসার উহার ভূখণ্ডসহ ইয়ালাত আনাদোলুর একটি লিওয়া (সান্‌জাক)-তে পরিণত হয় (দ্র. জিহাননুমা, ৬৪১)। যত দিন কারামান রাজ্যটি স্বাধীন ছিল ততদিন পর্যন্ত কারামান সীমান্তের একটি দুর্গ হিসাবে ইহা সামরিক গুরুত্বের অধিকারী ছিল। উযুন হাসানের সহিত যুদ্ধের প্রারম্ভে (৮৭৭/১৪৭২-৩) শাহযাদা মুসতাফা কারা হিসারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পারসিকদের মিত্র কারামান ওগলুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য ইহাকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করেন ['আশিক পাশা যাদে, তারীখ (Giese), ১৬৯; সা'দুদ্-দীন, তাজুত-তাওয়ারীখ, ১খ., ৫৩৪; Caterino Zeno, loc. cit. এবং ৮৯৫/১৪৮৯-৯০ সালে ইহা কারামান আক্রমণকারী মিসরীয়দের বিরুদ্ধে পরিচালিত হেরসেক-যাদে আহমাদ পাশার অভিযানের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হয় (সা'দুদ্-দীন, ২খ, ৬৫)। ১৭শ শতাব্দীতে প্রতিদ্বন্দ্বী পাশাদের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম উপলক্ষে প্রায়শ কারা হিসারের নাম উল্লিখিত হয় (১০১১/১৬০২ সালে জেলালীর বিদ্রোহ; ১০৪১/১৬৩১ সালে বাবা উমারের বিদ্রোহ ; ১০৬৯/১৬৫৮ সালে আবাযা হাসান পাশার বিদ্রোহ)। ১৮৩৩ সালে মুহাম্মাদ আলী পাশার পুত্র ইবরাহীম পাশা শহরটি সাময়িকভাবে দখল করেন। ১৯২১-৩ সালে গ্রীস–তুরস্ক যুদ্ধের সময় গ্রীকগণ ইহা দুইবার দখল করে (২৮ মার্চ–৭ এপ্রিল, ১৯২১ ও ১৩ জুলাই, ১৯২১–২৭ আগস্ট, ১৯২২)। যুদ্ধে শহরটির প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়, কিন্তু তুর্কী প্রজাতন্ত্রের আমলে বিরাট পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হয়।

প্রাচীন কালের বিরল নির্দশনসমূহের অনেকাংশই পার্শ্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান (যথা সিডীলার (Prymnessus), ইসচে কারা হিসার (Docimium) ও চিফুত কাসাবাসী (Synnada) হইতে শহরটিতে সম্ভবত স্থানান্তরিত হইয়াছে। শহরটির বৈশিষ্ট্য, খাড়া মোচাকৃতির পর্বত পরবর্তী বায়যান্টাইন দুর্গাদিসহ যাহা জারমিয়ান ওগলু কর্তৃক পুনঃস্থাপিত হইয়াছে (আওলিয়া চেলেবি কর্তৃক বর্ণিত সিয়াহাত-নামে, ৯খ., ২৯-৩৪); নিবুহরের সময় (১৭৬৬ খৃ.) পর্যন্তও বেক বারান কালএসি (যে দুর্গ বেগকে আশ্রয় দান করে) নাম ধারণ করিয়াছিল। এখানে কখনও যথারীতি বসতি স্থাপিত হয় নাই এবং বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত, কিন্তু সময় সময় উহা রাজনৈতিক বন্দীদের অন্তরীণাবদ্ধ রাখার জন্য ব্যবহৃত হইত (আশিক পাশা-যাদে, তারীখ, সং ইস্তাম্বুল, ২৪৩ প., Giese সম্পাদিত নহে) এবং ১৮০২ সালে ইহাকে মিসর হইতে আগত ফরাসী যুদ্ধবন্দীদের কারাবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়। সালজূক ও জারমিয়ান-ওগলূ আমলের অন্য নিদর্শনসমূহ, যথা সাহিবলের তুরবেসি খোজা বেগের উলু জামি ও সুলতান দীওয়ানীর সমাধিসৌধ ও উছমানী তুর্কী নিদর্শনসমূহ, যথা আহমাদ গেদিক পাশার মসজিদ ও উহার সংলগ্নীসমূহ (মাদ্‌রাসাটি বর্তমানে যাদুঘররূপে ব্যবহৃত হইতেছে ; একরেম হাককি আয়বিরদি, ফাতিহ দেউরি মিমারিসি, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩, ২৫২-৫৮), এখনও বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানের অপেক্ষায় রহিয়াছে। উপরে উল্লিখিত আলতিগোয কোপরুসু-এর শিলালিপি ব্যতীতও শহরটিতে প্রাপ্ত অন্য শিলালিপিসমূহ RCEA, নং ৪১৩২, ৪৩২৯, ৪৫৪০ ও ৪৬৬৭-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিলায়াত খুদাওয়ানদিগারের ১৩০২ সালের সালনামে, ৪৬৬ প. ; (২) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, ৪খ., ২২৪ প.; (৩) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, ৬৪১ প.; (৪) Tavernier, Les six voyager, প্যারিস ১৬৭৭, ১খ, ৮৭ প.; (৫) Pococke, Description of the East, লন্ডন ১৭৪৫, ২খ./২, ৮২; (৬) U. Niebuhr, Reiseabeschrcibung, ৩খ., ১৩১-৪ (নকশা ও চিত্রসহ) ; (৭) W. G. Browne (১৮০২) ও "R. Walpole-এর অন্তর্গত Travels in various countries of the East, লন্ডন ১৮২০, ১১৬ প.; (৮) Leon de Laborde, Voyage de l'Asia Mincure, প্যারিস ১৮৩৮, ৬৪ প. (সুন্দর দৃশ্যসহ) ; (৯) W. Hamilton, Rescarcher in Asia Minor, লন্ডন ১৮৪২, ১খ., ৪৬২, ৪৭০ ; (১০) V. Vincke, F.L. Fischer ও v. Moltke, Planatles von Kleinasien, বার্লিন ১৮৪৬, পৃ. ৫৪ নং ৪; (১১) Mitt. des Deutschen Arch. Instituts in Athen, ১৮৮২, ১৩৯ প. ; (১২) G. Radet,

Rapport sur une Mission scientifique en Asie Mineure, Nour, Arehives des Mission scientifique, ১৮৯৫, ৪২৫ প.; (১৩) E. Naumaan, Globus, ৭খ., নং ১৯ (চিত্র) ; (১৪) Korte, Anatolische Skizzen, বার্লিন ১৮৯৬, ৮১ প.; (১৫) Oberhummer ও Zimmerer, Durch Syrien und Kleinasien, বার্লিন ১৮৯৯; ৩৯০ প.; (১৬) Besim Darkot, IA, ৭খ., ২৭৭-৮০ ; (১৭) Edib Ali Baki, Afyonda eski zamanlarda Yasayis, in Taspinar dergisi, Afyon ; (১৮) M. Ferid ও M. Mesut Sahip Ata ile ogullari, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ.।

J.H.Mordtmann-FR. (E.I.[2])/মুহাঃ আবদুল মান্নান

আফ্রাগ (افراغ) ঃ (আল-মানসূরা) ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মারীনী রাজগোষ্ঠীর একটি সেনাছাউনি (সেইখান হইতেই ইহার নামকরণ)। এই প্রাচীন মরক্কোর (বর্তমানে স্পেনীয়) সামুদ্রিক বন্দরটি যে উপদ্বীপে অবস্থিত উক্ত উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চ মালভূমি হইতে সিউটা (Ceuta)-র উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল। এই স্থানটি বর্তমানে বিকশিত একটি আধুনিক শহরতলিতে অবস্থিত। উত্তর-পূর্বে ইহার পশ্চিম পার্শ্বের দেশগুলির রেখা সিউটা-পান্টা ব্লাংকা উপকূলীয় সড়ক (carretera de la playa Benitez)-এর অনতিদূরে আসিয়া থামিয়াছে। সেনা-শহরটির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে উত্তর-পূর্ব দিক পর্যন্ত অসমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুজ আকৃতির স্থানটুকু ক্যারেটেরা ডি টোরান্‌স দ্বারা লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত। প্রাচীরের পশ্চিম পার্শ্বের অর্ধ-কিলোমিটারের বেশি অংশের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। এই অর্ধ-কিলোমিটারের মধ্যে ফাসের ফটক নামে তৎকালীন তিনটি ফটকের একটি ফটক ও উহার বুরুজগুলিও বিদ্যমান আছে। ফটকগুলির নির্মাণ কৌশলে আন্দালুসীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আফ্রাগে'র অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল সিউটার উপর। এই সিউটা ১২৫০ খৃ. হইতে অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব লাভ করে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রপ্তানী ও আমদানীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই অর্থনীতির সমৃদ্ধি সাধারণত নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী যুদ্ধজাহাজ কর্তৃক বিপক্ষীয় যুদ্ধজাহাজ লুটতরাজের উপর। সিউটা সামরিক দিক দিয়া স্পেনে ইসলামের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। সিউটার ছিল জাহাজ, সামুদ্রিক বন্দর ও জলে-স্থলে যুদ্ধ পরিচালনায় সুসজ্জিত সমুদ্রচারী জনগোষ্ঠী। আবহাওয়া ভাল থাকিলে ইহার সামুদ্রিক জাহাজগুলি সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতি সহজে আলজেসিরাসে পৌছাইতে পারিত। ইহার দুর্গসমূহ ছিল ভয়ংকর এবং স্থল পথে প্রবেশের পথগুলিও ছিল অভেদ্য। সিউটা যেহেতু মূল ভূখণ্ড হইতে পরিচালিত আক্রমণ ও অবরোধে বাধাদানে সক্ষম ছিল, সেইহেতু ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া লাভজনক মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এমন কি আযাফীদের অধীনে থাকাকালীন কোন কোন সময় ইহা মারীনী নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দালের কারণে ৭২৮/১৩২৭-২৮ সালে সিউটার উপর আযাফী নিয়ন্ত্রণ চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হইয়া গেলে মারীনী সুলতান আবূ সা'ঈদ তথায় স্থায়ীভাবে তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন উহাদের মধ্যে একটি ছিল সিউটার শহরতলী বহির্ভাগের প্রাচীরটি ধ্বংস করা। কারণ এই প্রাচীর ছিল পশ্চিম দিক হইতে সিউটা প্রবেশের সবচাইতে দুর্ভেদ্য বাধা। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল নিশ্চিতভাবে এক কালের বহু অবরোধ শিবিরে পরিণত সিউটাকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব দান করা। মারীনী বংশীয় সুলতানদের এক পূর্বপুরুষ কর্তৃক তৈরী তিলিমসেনের বাহিরে একটি প্রতিষ্ঠানের মতই এই শহরটিরও নাম দেওয়া হয় মানসূরা। সুলতান আবূ সা'ঈদ তথায় একটি রাজপ্রাসাদ, তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত তৈরির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তবে প্রাচীরটির বেশীর ভাগ ও ইমারতগুলি আবুল-হাসানের (৯৩১-৫২/ ১৫৩১-৫১) কীর্তি বলিয়া মনে হয়। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে আফ্রাগ'কে সিউটার শহরতলী মনে করা হইত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানের অনেকখানিই বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B. Pavon Maldonado, Arte hispanomusulman en Ceuta y Tetuan in Cuadernos de la Alhambra, ৬খ. (১৯৭০), ৭২-৬ ; (২) J.D. Latham, the Strategic position and defence of euta in the later Muslim period, Orientalia. Hispanic, সম্পা. J.M. Barral, ১/১খ., লাইডেন ১৯৭৪, পৃ. ৪৫৪ ও স্থা. (অধিকন্তু Islamic Quarterly, ১৫খ., (১৯৭১), পৃ. ১৯৫-৭ ও স্থা ; (৩) আল-আনসারী, ইখতিস'রুল-আখবার, সম্পা. E. Levi-provencal এই শিরোনামসহ Description musulmane au xve siecle Hesperis, ১২খ. (১৯৩১), পৃ. ১৪৫-৭৬, সম্পা. ইবন তাবীত, Tetuan (১৯৫৯), সম্পা. A. Ben Mansour, বারাত ১৯৬৯, স্থা.; (৪) স্পেনীয় ভাষায় অনু. J. Vallve Bermejo, Al-Andalus, ২৭খ. (১৯৬২), পৃ. ৩৯৮-৪৪২।

আফ্রাগ (افراگ) ঃ (বার্বার্ ভাষায় বেষ্টিত এলাকা), মরক্কোতে আল-মুওয়াহ'হি'দূন-এর আমল হইতে এই শব্দটি কাপড়ের পর্দা দ্বারা বেষ্টনকে বুঝায়, যাহা শিবিরের অন্যান্য অংশ হইতে সুলতানের তাঁবু ও কক্ষসমূহকে পৃথক করে। ইহার ফারসী প্রতিশব্দ সারাচাহ্ (سراچه) অথবা সারাপারদাহ (سراپرده)।

(E.I.[2]) /মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন।

আফ্রানী (দ্র. আল-কারফানী)

আফ্রাসিয়াব (افراسیاب) ঃ বসরার গভর্নরদের এক বংশ (আল-আফ্রাসিয়াব)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন এক অজ্ঞাত বংশোদ্ভূত সরকারী কর্মচারী। আনু. ১০২১/১৬১২ সালে তিনি স্থানীয় পাশা হইতে বসরার শাসনাধিকার ক্রয় করেন। ১০৩৪/১৬২৪-২৫ সালে পারস্যবাহিনী বসরা আক্রমণ করিলে তাঁহার পুত্র 'আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। 'আলীর

প্রতিরোধের সামনে তাহারা টিকিতে পারিল না। ১০৩৮/১৬২৯ সালে পারস্যবাহিনী দ্বিতীয়বার বসরা অধিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু এইবারও তাহারা অকৃতকার্য হয়। তুরস্ক ও পারস্য সরকার বাগদাদ দখলের চেষ্টা করার সময় 'আলী পাশা কাহারও পক্ষ সমর্থন না করিয়া স্বীয় প্রদেশ বসরা স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র হু'সায়ন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত (আনু. ১০৬২/১৬৫২) হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইহাতে বাগদাদ-এর মুরতাদা' পাশা ১০৬৪/১৬৫৪ সালে হুসায়নকে পদচ্যুত করিয়া তদস্থলে আলীর ভ্রাতা 'আহমাদকে অধিষ্ঠিত করার সুযোগ পান। মুরতাদা' কর্তৃক আহমাদ নিহত হইলে পরবর্তী কালে স্থানীয় লোকেরা ও উপজাতিগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং হু'সায়ন পাশা পুনরায় তাঁহার পদে বহাল হন। হু'সায়ন আল-হাসায় স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করিলে ১০৭৬/১৬৬৫ সালে বাগদাদের পাশা ইবরাহীম (তাবীল) তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ণাংগ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। দীর্ঘকাল কুর্না অবরুদ্ধ থাকার পর হু'সায়ন মসনদ ত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্র আফ্রাসিয়াবকে নিজ পদে অধিষ্ঠিত করেন কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি (regent) হিসাবে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। পরে কারা মুসতাফা (ফিরারী) পাশার নেতৃত্বে বাগদাদ হইতে দ্বিতীয় সামরিক অভিযান হু'সায়নকে বিতাড়িত করিয়া ১০৭৮/১৬৬৮ সালে সার্বভৌম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুরতাদা' নাজ্মী যাদা, গুলশান-ই খুলাফা', ইস্তাম্বুল ১৭৩০ খৃ.; (২) ফাতহু'ল্লাহ আল-কা'বী, যাদুল মুসাফির, বাগদাদ ১৯২৪ খৃ.; (৩) মুহাম্মাদ আগা খাওয়াজা যাদা, তারীখুল-সিলিহ'দার, ১খ., বাগদাদ ১৯২৮ খৃ; (৪) সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ১খ., ১০৮ ; ২খ., ১৯৫ ; ৩খ., ৫১৩; ৪খ., ৪০০ ; (৫) J.B. Tavernier, Les Six Voyages, প্যারিস ১৬৭৬, ইং অনু. লন্ডন ১৬৭৮ ; (৬) S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, অক্সফোর্ড ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৯৯-১১৭ ; (৭) আব্বাস আল-আজজাবী, তারীখুল-ইরাক বায়না ইহ'তিলালায়ন, ৫খ., বাগদাদ ১৯৫৩, পৃ. ২১-১০১।

H.A.R. Gibb (E.I.²)/ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আফ্রাসিয়াব (افراسياب) ঃ ইরানী রূপকথার তুরানী রাজা, আভেস্তাতে বর্ণিত আছে, ফ্রাঙ্গরাস্য়ান তুরী ছিলেন কাবী হাওস্রাবা (কায় খুসরাও)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি কাবী হাওস্রাবা-র পিতা সিয়াবর্শন (সিয়াউশ)-কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। তিনি হবর্ন বা আর্য গৌরব অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধে কাবী হাওস্রাবা দ্বারা নিহত হন। সম্ভবত তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তুরী গোত্রসমূহের দলপতি ছিলেন [ইহারা বোধ হয় ইরানী বংশের (তু. তূরান নিবন্ধ)]। নামটির পাহলাবী রূপ ফ্রাসিয়াব। ধর্মীয় সাহিত্য (বুন্দহিশ্ন ইত্যাদি) তাঁহার সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার যে বংশ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে উহার বর্ণনামতে তাঁহার আদি পূর্বপুরুষ ছিলেন ফ্রেদূন (ফারীদূন দ্র.)-এর পুত্র তূচ (তুর, তূরানীদের পূর্বপুরুষ)। কথিত আছে, তাহার প্রথম আক্রমণের সূচনা হয় মানুশচিহ্‌রের রাজত্বকালে। তিনি মানুশচিহ্‌রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইরান দখল করেন। কিছুকাল পরে উযাও (যাও বা যাব) ইরানকে তাহার কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করেন। ফ্রাসিয়াব 'গৌরব' পুনর্দখলের চেষ্টা করেন এবং ইহার জন্য সমস্ত সপ্ত কেশওয়ারে তল্লাশী চালান। তাঁহার আবাসস্থল (য়াশতদের ভূগর্ভস্থ দুর্গ, যেখানে ফ্রাঙ্গরাস্য়ান 'লৌহ বেষ্টিত' হইয়া বাস করিতেন) সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে কায় খুসরাও-এর হাতে ফ্রাসিয়াব নিহত হন। 'য়াশত'দের পরবর্তী যুগে কিংবদন্তীর বিকাশে ফ্রাসিয়াব তুরানীদের সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন—শুধু কায়ানীদের বিরুদ্ধেই নহে, বরং তাহাদের পূর্ববর্তী পীশ্দাদীদের বিরুদ্ধেও। এই দৃষ্টিতে তিনি মানুশ্চিহ্‌র ও উযাও-এর সমসাময়িক হইয়া উঠেন। তবে তাঁহার মৃত্যুর ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে কায় খুসরাও-এর সংগে সম্পর্কিত রহিয়াছে।

মুসলিম গ্রন্থকারগণ জাতীয় ঐতিহ্যের তথ্য প্রাচীন পুস্তকাদি, বিশেষত খোওয়াদায়-নামাক (خوداى نامك) হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আফ্রাসিয়াব মানুশচিহ্‌র-এর সংগে তাবারিস্তানে যুদ্ধ করেন। অতঃপর বাল্খের নদীকে উভয় রাজ্যের সীমানা স্থির করত তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। কায়কাউস সিয়াউশকে একদল সৈন্যসহ আফ্রাসিয়াবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে তিনি এক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু কায়কাউস তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সিয়াউশ আফ্রাসিয়াবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আফ্রাসিয়াব তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া কন্যা বিস্ফফারীযকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন (আত-তাবারী; ফিরদাওসী ঃ ফারিংগীস)। কিন্তু কিছুদিন পর হিংসার বশবর্তী হইয়া আফ্রাসিয়াব সিয়াউশকে হত্যা করেন। বিসফাফারীয তাঁহার গর্ভে কায় খুসরাওকে ধারণ করিতেছিলেন। তিনি রক্ষা পান এবং বিখ্যাত পাহলোয়ান গিও (বায়্য, ওয়াওও) তাঁহাকে পুনরায় ইরানে লইয়া যান। পরে রুস্তামও তূস শহরে সিয়াউশ হত্যার প্রতিশোধে গিও তুরান দেশটি ধ্বংস করেন। কায় খুসরাও-এর রাজত্বকাল আফ্রাসিয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হয় (বিস্তারিত বিবরণ আত-তাবারীতে, ১খ., ৬০৫ পৃ.; তু. নির্ঘণ্টও ; আছ-ছা'আলিবী, Histoire des rois de la Perse (Zotenberg), ২২২ প. ; ফিরদাওসী, শাহনামাহ (Vullers), ২খ., ৭৬৪, ৩খ., ১৪৪৪)। সর্বশেষ যুদ্ধের পর আফ্রাসিয়াব তুর্কিস্তানে পলায়ন করেন এবং আযারবায়জান-এ আত্মগোপন করেন। কিন্তু তিনি ধরা পড়িয়া যান। কায় খুস্রাও নিজ হাতে তাহাকে হত্যা করেন।

যেহেতু তুরানীদেরকে তুর্কী (দ্র. তূরান) বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে, সেইহেতু আফ্রাসিয়াবকে তুর্কী গণ্য করা হয়, শাহনামায় এই বিষয়টি প্রবলভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। ফলে তুর্কী বংশগুলি কখনও কখনও আফ্রাসিয়াবকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। এইজন্যই কারাখানীদেরকে (দ্র.) আফ্রাসিয়াব বংশের বলা হয় এবং সালজূকগণ তাঁহার বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন (তু. W. Barthold, Hist. des Turcs d' Asie Centrale, 70, 84)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Christensen, Les Kayanides. Copenheagen 1932, নির্ঘণ্ট দ্র. ফ্রাংরাসয়ান ও ফ্রাসিয়াব (আরও ইসলামী গ্রন্থকারদের বরাতসহ) ; (২) F. Wolff. Glosser zu Firdosis Schahname, বার্লিন ১৯৩৫ খৃ., দ্র. আরও Pishdadids Kayanids.

S. M. Stern (E.I.²)/ আশরাফুল আলম খান

আফ্রাসিয়াবিয়া (افراسيابية) ঃ মাযান্দারানের একটি ছোট রাজবংশ। Rabino ইহাকে চুলাব বা চালাব কিয়াস-এর নামে অভিহিত করিয়াছেন (আমূলের আটটি বুলুকের মধ্যে একটির নামানুসারে) এবং Sachau ইহার নাম কিয়া জালাবী উল্লেখ করিয়াছেন। আফ্রাসিয়াব ইব্ন কিয়া হাসানের নামানুসারে এই বংশের নামকরণ করা হয়, যিনি স্বীয় ভগ্নীপতি ফাখরুদ-দাওলা হ'াসান বাওয়ান্দ-এর অধীন একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আফ্রাসিয়াব স্বীয় ভগ্নীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই ভগ্নীর পূর্ব-স্বামীর পক্ষের এক যুবতী কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া ফাখরুদ-দাওলার নামে এই অভিযোগ করেন, তিনি উক্ত কন্যাকে উপপত্নীরূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমূলের আলিমদের নিকট হইতে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের ফাতওয়া লাভ করেন এবং একই সময়ে বাওয়ান্দ প্রতাপশালী কিয়া-ই জালালী পরিবারের স্বীয় উযীর জালালুদ-দীন আহমাদ ইব্ন জালাল-কে হত্যা করেন। ইহাতে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ অসন্তুষ্ট ও ভীত হইয়া পড়েন। বিপদগ্রস্ত হইবার আশংকায় বাওয়ান্দ চুলাবের কিয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য হন। ইঁহারা ছিলেন কিয়া-ই-জালালীর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দুই পরিবারের পারস্পরিক সন্ধির ফলে কিয়া আফ্রাসিয়াবের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ঘটে। পরিশেষে ২৭ মুহার্‌রাম, ৭৫০/এপ্রিল ১৩৪৯ সালে আফ্রাসিয়াবের দুই পুত্র আলী ও মুহাম্মাদ (Justi-এর মতে শুধু মুহাম্মাদ) বাওয়ান্দকে গোসলখানায় হত্যা করে। ফাখ্‌রুদ-দাওলার মৃত্যুর ফলে বাওয়ান্দ পরিবারের সাত শত পঞ্চাশ বৎসরের শাসনামলের অবসান হয় (৪৫-৭৫০/৬৬৫-১৩৪৯) এবং আফ্রাসিয়াব আমূল (ও সারী ?; JA, ১৯৪৩-৪৫ পৃ. ২৩৭)-এর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাক্তন মনিবের অধিকাংশ কর্মচারী তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করায় তিনি সাধারণের ধর্মানুরাগের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন এবং দারবীশ নেতা কাওওয়ামুদ দীনের মুরীদ হন। তিনি মীর বুযুর্গ নামে খ্যাত ছিলেন। আফ্রাসিয়াব আশা করিয়াছিলেন, ইহাতে এই দারবীশের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল আমূলের অধিবাসিগণ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু দশ বৎসর শাসনের পর আফ্রাসিয়াব ৭৬০/১৩৫৯ সালে জালালাক্‌মারপারচিনের যুদ্ধে সেই দারবীশগণ দ্বারা পরাজিত হন এবং স্বীয় তিন পুত্রসহ নিহত হন।

মীর-ই বুযুর্গ নিজেকে আমূলের শাসনকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে মার'আশী (দ্র.) সায়্যিদদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় (৭৬০-৯৮৯/১৩৫৯-১৫৮১)। এই বৎসর আফ্রাসিয়াব গোত্রের জনৈক সদস্য কিয়া ফাখ্‌রুদ-দীন জালাবী মীর বুযুর্গের পুত্র আবদুল্লাহকে হত্যা করে। এই অপরাধে তাঁহাকে তাঁহার চারি পুত্রসহ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সর্বশেষ বাওয়ানদ-এর অপর ভগ্নিপতি কিয়া গুশ্‌তাস্‌প (Wishtas)-ও তাঁহার সাত সন্তানসহ নিহত হন।

আফ্রাসিয়াবের অষ্টম পুত্র ইস্‌কান্দার শায়খীর নেতৃত্বে চুলাবের কিয়াবৃন্দের পুনরুত্থান ঘটে। তিনি পূর্বে হারাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন দুঃসাহসিক জীবন যাপনের পর তীমূরের অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৭৯৫/১৩৯২-৩ সালে তীমূর মাযানদারান আক্রমণ করেন। আমূলের নিকটবর্তী মাহানা-সার-এর দুর্গ অধিকার করত আমূল ও সারী অধিকার করেন এবং মার'আশী সায়্যিদদেরকে বিতাড়িত করিয়া ইস্‌কান্‌দারকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আক্রমণকারীদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করায় ইস্‌কান্দারের জনপ্রিয়তা খুবই কম ছিল। অধিকন্তু তিনি সারীতে মীর-ই বুযুর্গের স্মৃতিস্তম্ভকে ধ্বংস করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার জনপ্রিয়তা আরও হ্রাস পায়। ৮০২/১৪০০-১ সালে ইস্‌কান্দার ইরাক, আযারবায়জান, আনাতোলিয়া ও সিরিয়া অভিযানকালে তীমূরের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর অনুমতি লইয়া আমূলে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ৮০৫/১৪০৩-৪ সালে তীমূর ইস্‌কান্দারের পশ্চাদ্ধাবনে মাযান্দারানে প্রবেশ করেন। ইস্‌কান্দার স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তানসহ জঙ্গলে পালাইয়া যান এবং তাহাদের কান্নার শব্দে ধরা পড়িবার ভয়ে মাতাসহ দুইটি শিশুসন্তানকে হত্যা করেন। অবশেষে শীরুদ দূ-হাযার নামক স্থানে তিনি নিজে নিহত হন। তীমূরের কর্মকর্তাগণ তাঁহার মস্তক কর্তন করিয়া তাঁহার পুত্র হুসায়ন কিয়া-র নিকট প্রেরণ করেন। হুসায়ন কিয়া ফীরূয কূহ দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া আক্রমণ প্রতিহত করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত দুর্গ তৎক্ষণাৎ তীমূরের সৈন্যবাহিনীর নিকট অর্পণ করেন। ইস্‌কান্দারের অপর পুত্র আলী কিয়া তীমূরের সৈন্যবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হইয়াছিলেন। তীমূর উভয় ভ্রাতাকে ক্ষমা করেন এবং হুসায়ন কিয়া ফীরূযকুহে শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র লুহ্‌রাস্‌প ইব্‌ন হুসায়ন ইবন ইস্‌কান্দার ৮৮০/১৪৭৯-৮০ সালে তালাকান শাসন করেন। অন্যদিকে আমীর হুসায়ন (হাসান ?; তু. Sachau) ইবন আলী ইব্‌ন লুহ্‌রাসপ রুসতামদারের একাংশ, ফীরূযকূহ, দামাওয়ান্দ ও হারীরূদ পার্বত্য অঞ্চল শাসন করেন। ৯০৯/১৫০৩ সালে শাহ প্রথম ইসমাঈল গুল্‌খান্‌দান ও ফীরূযকূহের দুর্গদ্বয় অধিকার করিবার পর উস্তা-র দুর্গ অবরোধ করেন। এইখানে আমীর হুসায়ন কিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়া কিছু পরেই আয়ওয়ান-ই-রাসূল ওয়াদ-এ আত্মহত্যা করেন। ঐ বংশের শেষ সদস্য আমীর সুহ্‌রাব চুলাব, সাওজ বূলাক-এ আরদাহিন দুর্গের রক্ষক ছিলেন। শাহ্ তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Zambaur, পৃ. ১৮৮; (২) E. Sachau, Verzeichniss muh. Dynastien, পৃ. ৭; (৩) F. Justi, Iranisches Namenbuch, পৃ. ১০৩; (৪) W. Barthhold, Istorikogeograf obzor Irana. পৃ. ১৫৫-১৬১; (৫) H. L. Rabino, Dynasties alaouides du Mazandaran, JA, ১৯২৭, পৃ. ২৫৩-২৭৭; (৬) ঐ লেখক, Dynasties de Mazandaran, JA, ১৯৩৬, পৃ. ৩৭৭-৪৭৯; (৭) ঐ লেখক, L'histoire du Mazandaran, JA, ১৯৪৩-১৯৪৫, পৃ. ২১৮, ২২১, ২৩৬, ২৩৭; (৮) ঐ লেখক, Mazandaran and Astrabad, ১৯২৮, পৃ. ৪০, ১৪২।

B. Nikitine (E.I.[2])/মাহবুবুর রাহমান ভূঞা

আফ্রীত (দ্র. ইফরীত)

আফ্রীদী (افريدى) ঃ পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রায় ৫০,০০০ যুদ্ধক্ষম জনসমষ্টিসহ একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী পাঠান উপজাতির নাম। আফ্রীদী অধ্যুষিত এলাকা সাফীদ কুহের পূর্বদিকের পর্বতমালা হইতে শুরু হইয়া তিরাহের উত্তর অর্ধাংশ ও খায়বার গিরিপথের (দ্র.) ভিতর দিয়া

পেশাওয়ার জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বদিকে তাহারা পাকিস্তানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন জেলাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। উত্তর দিক মেহমুন্দদের অঞ্চল, পশ্চিম দিক শিন্ওয়ারীদের অঞ্চল ও দক্ষিণ দিক ওরাক্‌যায় ও বাংগাশ উপজাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহারা আটটি উপজাতিতে বিভক্ত ঃ খায়বার গিরিপথ ও ইহার আশেপাশে কুকী খেল, মালিকদীন খেল, কাম্বার খেল, কামারই, যাক্কা খেল ও সিপাহ উপজাতি রহিয়াছে। এই ছয়টি উপজাতিকে সাধারণত খায়বার আফ্রীদী বলা হয়। আকা খেল আফ্রীদীদের খায়বারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহারা বারা নদীর দক্ষিণে অবস্থান করে। আদাম খেল আফ্রীদীগণ কোহাট ও পেশাওয়ার জেলার মধ্যবর্তী পাহাড়গুলিতে বাস করে।

আফ্রীদী উপজাতির (যে নামে আফ্রীদীরা নিজেদেরকে অভিহিত করিয়া থাকে) উৎপত্তি জাতিবিজ্ঞানীদের হতবুদ্ধি করিয়াছে। H.W.Bellew (JRAS. ১৮৮৭, পৃ. ৫০৪) তাহাদেরকে Herodotus-এর Aparutai বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। G. A. Grierson (Lingustic Survey of India, ১০খ., ৫) ও A Stein (JRAS, ১৯২৫, পৃ. ৪০৪)-ও ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু Achaemenian উৎকীর্ণ লিপিতে এই নামটির সাক্ষাত পাওয়া যায় না এবং বর্তমানে আফ্রীদীরা যে স্থানে বাস করে, Herodotus Aparuta-এর কথা বলিতে গিয়া সে স্থানের কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। H. G. Raverty (Notes on Afganistan, ১৮৮৮, পৃ. ৯৪) সম্ভবত কল্পিত বংশতালিকার উপর নির্ভর করিয়া আফ্রীদীগণকে কারলান নামক কথিত একজন পূর্বপুরুষের বংশসম্ভূত পাঠান বা আফগান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ হায়াত খান প্রণীত হায়াত-ই আফগানীতে (ইংরেজী অনু. আফগানিস্তান, লাহোর ১৮৭৪, পৃ. ২০১) আফ্রীদী শব্দটিকে আফরীদাহ্ (আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবন) শব্দ হইতে গৃহীত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আধুনিক কালের একটি বানোয়াট ব্যাখ্যা Grierson (JRAS, ১৯২৫, পৃ. ৪০৫=৪১৬)-এর ধারণা অনুযায়ী আধুনিক কালের তিরাহ কোন কালে একটি সম্প্রদায়ের আবাসভূমি ছিল, যাহাদের ভাষাকে আজিও তীরাহী বলা হইয়া থাকে। হিন্দুকুশের দারদী ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। অতএব মনে হয়, আফ্রীদীগণ যদিও পাশ্‌তূ ভাষায় কথা বলে, তথাপি তাহাদের কথার মধ্যে ঐ লোকদের গোষ্ঠীগত উপাদান বহুলাংশে না হইলেও অনেকাংশে বর্তমান রহিয়াছে, যাহা পাশ্‌তূভাষী আক্রমণকারীদের পূর্বেই তীরাহ-এ বিদ্যমান ছিল। পাশ্‌তূভাষী আফগানগণ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ্ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ক্রমশ পাহাড়ের বেষ্টনীগুলিতে ও সিন্ধুনদের পশ্চিমে পলিমাটিবিশিষ্ট সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইতে থাকে।

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংযোগকারী খায়বার গিরিপথে আড়াআড়িভাবে তাহাদের অবস্থানের ফলে মুগল সম্রাটগণের পক্ষে কাবুল প্রদেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট আকবারের শাসনামলে রাওশানিয়্যা (দ্র). গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বায়াযীদ ও তদীয় পুত্র জালালুদ্দীনের উস্কানিতে আফ্রীদীগণ খায়বার গিরিপথ দিয়া অতিক্রমকারী মুগল বাহিনী ও যাত্রীদলকে আক্রমণ করিত। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবারের সৈন্যদল তাহাদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে এবং পর বৎসর তাহারা কিছু ভাতার বিনিময়ে গিরিপথটি চলাচলের জন্য খোলা রাখিতে অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই অঙ্গীকার ছিল খুবই সাময়িক। কেননা জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গযেবের শাসনামলেও তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বহু আফ্রীদীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানে এখনও তাহাদের বংশধরদের দেখিতে পাওয়া যায়। আহমাদ শাহ দুররানী কর্তৃক আফগান রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর আফ্রীদীগণ নামমাত্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। সৈন্য তালিকায় তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। তালিকা অনুসারে উক্ত গোত্রে ১৯,০০০ যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ছিল।

১৮৩৯-৪২ সালে ইংরেজদের আফগানিস্তান আক্রমণের সময় আফ্রীদীদের সঙ্গে তাহাদের প্রথম যুদ্ধ হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সংযুক্তিকরণ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠনের সময় পর্যন্ত এই দুর্দান্ত আফ্রীদীদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে আটটি অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রথম অভিযানটি প্রেরিত হইয়াছিল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কোহাট গিরিপথের আফ্রীদীদের বিরুদ্ধে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আদাম খেল আফ্রীদীদের একটি গোত্র জাওয়াকী আফ্রীদীদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল তাহারা সাফীদ কূহের ঢালু অঞ্চল হইতে পেশাওয়ারের সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত এলাকায় বসবাস করিত। অতএব তাহারা তাহাদের এলাকার মধ্য দিয়া অতিক্রমকারী প্রতিবেশীদেরকে উচ্চ হারে কর প্রদানে বাধ্য করিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের সময় যাক্কা খেলদের সঙ্গে প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয় (Aitchison, ১১খ., ৯২-৯৬)। ১৮৭৮-৮০ সালের দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর ছিল। ঐ সময় খায়বার ও সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলের শান্তি অস্বাভাবিকরূপে ব্যাহত হইয়াছিল। যাক্কা খেল আফ্রীদীগণ খায়বারের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করিলে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের এলাকায় ঢুকিয়া তাহাদের শস্যাদির ক্ষতিসাধন করিতে এবং তাহাদের দুর্গ ও গ্রামগুলি ধ্বংস করিতে বাধ্য হয়। ১৮৮১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী খায়বারের আফ্রীদীগণ লান্ডি কোটাল Landi Kotal-এর লোয়ারগি (Loargi)-র শিনওয়ারীদের সংগে মিলিত হইয়া খায়বার গিরিপথের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতির বিনিময়ে অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সংগে কোন সম্পর্ক না রাখার অঙ্গীকার করে। এই চুক্তিতে খায়বার গিরিপথ রক্ষার জন্য জাযাইলচী (উপজাতীয় নূতন ভর্তিকৃত) সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং ভারত সরকার তাহাদের ভাতা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে (Aitchison, ১১খ, ৯৭-৯)। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক সীমান্ত বিদ্রোহের সময় আফ্রীদীগণ সর্বশেষে ইহাতে যোগদান করে এবং ১৮৯৭-৯৮ সালে তিরাহ্‌তে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরই সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। এই অভিযানের সমাপ্তির পর তাহাদেরকে ভাতা দানের পূর্ববতী প্রথা, যাহা সতের বৎসর (১৮৮১-৯৭) পর্যন্ত খুবই সফল প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহা আবার চালু করা হয়। একই সময়ে খায়বারের রাইফেলস্ বাহিনীকে বৃটিশ অফিসারের অধীনে পুনর্গঠিত করা হয় এবং পেশাওয়ারে স্থাপিত একটি ভ্রাম্যমাণ সৈন্যদল তাহাদেরকে সমর্থন করার জন্য মোতায়েন করা হয়। এই চুক্তি অনুসারে বৃটিশ পক্ষে খায়বার রক্ষীবাহিনী খায়বারের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ইহা দ্বারা বৃটিশ ও আফ্রীদীদের মধ্যকার সম্পর্ক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় (Parliamentary Papers ১৯০৮, ৭৪খ., সংখ্যা ৪২১০, পৃ. ১৪-৫)।

১৯০৪ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বহু আফ্রীদী কাবুল পরিভ্রমণ করে। ইহার পরপরই বৃটিশ এলাকাসমূহের মধ্যে কতিপয় ছোটখাট লুটতরাজ সংঘটিত হয়, ইহাদের সংগে যাক্কা খেল আফ্রীদীগণ প্রধানত জড়িত ছিল। অন্যান্য আফ্রীদী উপজাতি, এমনকি ওরাকযাঈ প্রমুখ হাযারনাও-এর মত আফগান দস্যুদলগুলি তাহাদেরকে সাহায্য করে। খৃস্টীয় ১৯০৫ সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সশস্ত্র আফ্রীদী দলসমূহ বৃটিশ সীমান্তে লুটতরাজ করে। ১৯০৮ সালের ২৮ জানুয়ারী রাত্রিতে প্রায় আশিজন আফ্রীদীর একটি সৈন্যদল পেশাওয়ার নগরী আক্রমণ করিলে বৃটিশ সরকারের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই বৎসর মেজর জেনারেল Sir James Willcocks-এর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী ত্বরিৎ গতিতে যাক্কা খেলদেরকে বিতাড়িত করে। ১৯১৪ সালের নভেম্বরের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণের ফলে সীমান্ত অঞ্চলে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আফ্রীদীগণের মনোভাব সীমান্ত অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ ছিল। কেননা অপরাপর গোত্রও আফ্রীদীগণের অনুসরণের প্রয়াসী হইত। সৌভাগ্যক্রমে পেশাওয়ার সীমান্ত তথা সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলের শান্তির জন্য তিরাহ্‌তে তুর্কী জেনারেলদের প্রচারণা অর্থাভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার তাহাদের ভাতা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আফ্রীদী বিদ্রোহের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।

১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ হয়। ইহা ছিল সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলের বিদ্রোহের পূর্বাভাস এবং যাহাতে আশংকা ছিল লর্ড কার্জনের মিলিশিয়া প্রকল্পের ব্যর্থতার। ১৯২১ খৃস্টাব্দের মধ্যে আফ্রীদী গোত্রসমূহ পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। 'খায়বার রাইফেলস' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের স্থান অধিকার করে খাস্‌সাদার বাহিনী অর্থাৎ উপজাতীয় নূতন ভর্তি করা সেনাবাহিনী। তাহারা ভারত সরকারের বেতনভোগী ছিল, অস্ত্র ও গোলাবারুদ তাহাদের নিজেদের সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু আকা খেল-এর মুল্লা সায়্যিদ আকবারের উস্কানিতে আবার বিপদের আশংকা দেখা দেয়, আফ্রীদীগণ আবার লুটতরাজ শুরু করিবে। কেননা তিনি বৃটিশ শর্তাবলী গ্রহণকারী সকল গোত্রকে নিন্দা করিতে থাকেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে খায়বার রেলওয়ে নির্মাণে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আফ্রীদী উপজাতীয় জির্গার ক্ষতিপূরণস্বরূপ নূতন ভাতা মঞ্জুর করা হইলে তাহার কার্যকলাপ বন্ধ হয় (Secret Border Report, ১৯২১-২, পৃ. ১)। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যাক্কা খেল আফ্রীদীগণ তাহাদের অতীত অপকর্মের জন্য মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হয়। পরবর্তী বৎসর কোহাট দস্যুদের লুণ্ঠনের ফলে আফ্রীদী অঞ্চলের শান্তি দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। এই দস্যুদলের সদস্যগণ আফগান ভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। তথায় আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা দুষ্কর্মের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করায় ভারতের ভাইসরয়ের পক্ষ হইতে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানান হয়। জামরূদ হইতে লানদিখানা পর্যন্ত খায়বার রেলওয়ে স্থাপিত হইলেও শান্তি স্থাপিত হয় নাই। এই রেলপথ নির্মাণ কার্য উপজাতীয়দের আয়ের উৎস ছিল, কিন্তু ইহা সম্পন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহাদের ভাতা কমিয়া গেল। ১৯২৭ খৃস্টাব্দ হইতে তিরাহ্‌তে শী'আ ও সুন্নীদের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয়। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইহা অব্যাহত ছিল। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে আফ্রীদীগণের উপর ভারতীয় কংগ্রেসে আন্দোলনকারীদের প্রভাব পড়ে। ফলে আফ্রীদী লশ্‌কর (উপজাতীয় সৈন্যদল) পেশাওয়ার জেলায় প্রবেশ করে এবং ঐ বৎসর জুন ও আগস্ট মাসে পেশাওয়ার আক্রমণ করে। আগস্টের শেষভাগে লুণ্ঠনকারী দলসমূহ ঐ জেলা হইতে বহিষ্কৃত হয়। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার আফ্রীদী গোত্রসমূহের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, এমনকি ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে আইন বহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত যেসব আফ্রীদী দল পাকিস্তানে লুণ্ঠন কার্য করিত তাহাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পাকিস্তান কর্তৃক আফগান সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C.U. Aitchison, Treaties, Engagements and Sanads, ১৯০৯, ১১খ; (২) C. C. Davies, The Problem of the North-West Frontier, Cambridge ১৯৩২ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, British Relations with The Afridis of the Khyber and Tireh, Army Quarterly, ১৯৩২ খৃ.; (৪) Frontier and Overseas Expeditions from India, ii and Supplement A, ১৯০৮ খৃ; (৫) H. D. Hutchinson, The Campaign in Tirah, London ১৮৯৮ খৃ.; (৬) Th. Holdich, The Indian Borderland, London ১৯০১, অধ্যায় ১৫-১৬; (৭) North-West Frontier Province Administration Reports (বৎসরে বৎসরে প্রকাশিত); (৮) W. H. Paget and A. H. Meson, Record of Expeditions against the N. W. F. Tribes since the Annexation of the Punjab ১৮৮৮; (৯) Parliamentary Papers, ১৯০৮ খৃ. ৭৪ খ., সংখ্যা ৪২০১; (১০) R. Warburton, Eighteen years in the Khyber ১৮৭৯-৯৮, ১৯০১ খৃ.।

C. Collin Davies (E.I.2)/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আফরীদুন (দ্র. ফারীদুন)

'আফরীন (عفرين) ঃ অরোন্টেস (আল-আসী) নদীর ডান দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনদী। ইহা আন্‌তাকিয়া (Antioch) হ্রদের নিকট নাহ্‌র য়াগরা (মুরাদ পাশা)-র সহিত এবং আম্‌কের নিকট নাহরুল-আসওয়াদ (কারাসু)-এর সহিত মিলিত হইয়া অরোন্টেস নদীতে পতিত হইয়াছে। জাবাল সিমান ও কুরদ-দাগের মধ্যে অবিস্থত ইহার প্রশস্ত মধ্যউপত্যকা, মধ্যযুগে জূমা জিলা নামে পরিচিত ছিল। উহার ভিতর দিয়া একটি রাস্তা অতিক্রম করিবার ফলে তৎকালে এই উপত্যকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাস্তাটি আন্‌তাকিয়াকে ফুরাত নদীর উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলির সহিত এবং Cilicia ও এশিয়া মাইনর হইতে আলেপ্পো ও মধ্যসিরিয়াগামী রাস্তাগুলির সহিত যুক্ত করিত। এই জাতীয় একটি রাস্তা বাগরাস গিরিপথের নিকট আমানুস অতিক্রম করার পর এবং আন্‌তাকিয়া হ্রদের উপকূল ঘেষিয়া চলার পর আধুনিক বেলেন (Bellane-ক্রুসেডারদের ভাষায় Ford of the Baleine)-এর নিকট আফরীন উপনদীর (পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়ার উপযোগী) সরু অংশ অতিক্রম

করিয়াছে। মুসলিম যুগের প্রথম শতাব্দীতে তীযীন, আর্তাহ, ইম্‌ম প্রভৃতি ছোট ছোট দুর্গ দ্বারা ইহার দক্ষিণ দিক এবং ক্রুসেডের সময় হইতে অরোন্টেস নদীর নিকটে অবস্থিত হারিম দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। উত্তরাংশের অন্যান্য রাস্তা আযায-এর ফাঁকা জায়গার নিকট কুরদ-দাগ অতিক্রম করার পর কীবার নদীর (বর্তমান 'আফরীন) পুলের নিকট অথবা কিছু উপরে উক্ত এলাকার রাজধানী কূরিস (Cyrrhus)-এর নিম্নাংশের নিকট 'আফরীন উপনদীকে অতিক্রম করিয়াছে। নূতন রাজধানীগুলির মধ্যে 'আফরীন উপনদীর মূল অববাহিকার বাহিরে অবস্থিত আযায ও রাওয়ানদান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আফরীন উপনদীর উৎসের নিকট ইহাদের (রাজধানীগুলির) ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। মুসলিম ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে 'আফরীন উপনদীর এই উপত্যকা সামরিক জেলা 'আওয়াসি'ম-এর পশ্চিমাংশের সহিত প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হইত। ইহা সাময়িকভাবে ৪র্থ-৫ম/১০ম-১১শ শতাব্দীতে বায়যান্টাইনদের ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ক্রুসেডারদের দখলে আসে। বর্তমানে ইহা তুরস্ক ও সিরিয়ার রাজনৈতিক ও জাতীয় সীমানার পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উত্তর সিরিয়ার ভূগোলের উপর মধ্যযুগের প্রধান গ্রন্থ হইতেছে ইব্‌ন শাদ্দাদ রচিত আল-আ'লাকু'ল-খাতি'রা ফী যি'ক্‌রিল-উমারাইশ্‌-শাম ওয়াল-জাযীরা, আংশিক সম্পাদনায়, Lcdit, মাশ, ১৯৩৫; পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনায় D. Sourdel; আধুনিক বর্ণনা ঃ (২) R. Dussaud topographie histortique de la syrie, প্যারিস ১৯২৭; (৩) E. Hoingmann, Die ostzrenge des hyzantinischen Reiches, Brussels 1935; (৪) Cl. Cahen, La syrie de Nord a l'e/poque des Croisa des, প্যারিস ১৯৪০; (৫) M. Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanies, ১খ, আলজিয়ার্স ১৯৫১; উছমানী ও আধুনিক যুগের জন্য দ্র. (৬) Guide Bleu; Syrie-palestine; প্রাকৃতিক ভূগোলের জন্য দ্র. (৭) S. Mazloum, L''Afrin, etude hydrologique, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ.।

Cl. Cahen (E.I.[2])/মমতাজ উদ্দীন

আফলাকী, শামসুদ-দীন আহ্‌মাদ (افلاكى، شمس الدين) ঃ মাওলাবি'য়্যা (দ্র.) দরবেশদের জীবনীকার ও জালালুদ্‌-দীন রূমীর পৌত্র জালালুদ্‌-দীন আল-'আরিফ-এর শিষ্য। জালালুদ্‌-দীন আল-'আরিফ-এর অনুরোধে তিনি মানাকি'বুল-'আরিফীন রচনা করেন। ইহাতে আছে জালালুদ্দীন রূমী, তাঁহার পিতা ও তাঁহার অনুসারিগণ ও সহযোগীদের জীবনী। ৭১৮/১৩১৮-১৯ সালে ইহার রচনা আরম্ভ হয় ও ৭৫৪/১৩৫৩-৫৪ সালে সমাপ্ত হয়। ইহার সংস্করণ ঃ আগ্রা ১৮৯৭; ফরাসী ভাষায় অনুবাদ Cl. Huart, Les Saints des derviches tourneurs, প্যারিস ১৯১৮-২২; কতিপয় উদ্ধৃত অংশের ইংরেজী অনুবাদ- 7. W. Redhouse, The Mesnevi, Book the first, লন্ডন ১৮৮১, পৃ. ১-১৩৫। ইংরেজী একটি সংশোধিত সংস্করণ আবদুল ওয়াহ্‌হাব আল-হামাদানী (৯৪৬/১৫৪০-৪১) কর্তৃক রচিত হইয়াছে; এই সংস্করণে অতিরিক্ত তারিখ ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানির একটি তুর্কী অনুবাদও আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storey, ১খ., ৯৩৭ প.; (২) Cl. Huart, in JA., ১৯২২, পৃ. ৩০৮ প.; (৩) M. F. Koprulu, in bell., ১৯৪৩, পৃ. ৩৮৩, ৪২২-২৩, ৪২৫; (৪) H. Ritter, in Isb., ১৯৪২, পৃ. ১২৯ প.।

F. Meier (E.I.[2])/ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আল-আফ্‌লাজ (الأفلاج) ঃ আফ্‌লাজ আদ-দাওয়াসীর, দক্ষিণ নাজ্‌দ-এর একটি অঞ্চল। ইহা তুওয়ায়ক গিরিশ্রেণীর ঢালে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। মোটামুটিভাবে ইহার উত্তরে ওয়াদী বির্‌ক, পূর্বে আল-বায়াদ সমভূমি, দক্ষিণে ওয়াদী আল-মাকরান এবং পশ্চিমে আদ্‌-দাহী বালুকাময় মরুভূমি অবস্থিত। ইহা একটি ঘন বসতিপূর্ণ মরূদ্যান। লায়লা ইহার বর্তমান রাজধানী (৪৬° ৪৪´ ৩৫´´ পূ, ২২° ১৬´ ৪৫´´ উ.)।

উক্ত অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে। ঝরনাধারার প্রবাহপুষ্ট এইসব জলাশয় 'উয়ূনুস্‌-সায়হ' (عيون السيح) নামে পরিচিত। সেইখানে নদীনালাসমূহেরও ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এককালে এইসব নদীনালা দ্বারা বিধৌত এই অঞ্চল একটি উন্নত ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রাকার এই জলাধারগুলি 'আরব উপদ্বীপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আয়তনে এই জলাশয়গুলি এত ছোট যে, উহাদের সবচেয়ে বড়টির দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটারেরও কম। ফালাজ (বহুবচনে আফ্‌লাজ) শব্দ হইতেই এই অঞ্চলের নামকরণ করা হইয়াছে। অতীতেও ইহাকে আল-ফালাজ নামে অভিহিত করা হইত। উমানে এই শব্দটি দ্বারা এখনও ভূগর্ভস্থ পাকা নালাসমূহ বুঝানো হইয়া থাকে। এই নালাসমূহের উপরিভাগে স্থানে স্থানে মুখ রাখা হইয়াছে, যাহাতে প্রয়োজনে নালাসমূহ পরিষ্কার করা যায়। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, আল-আফলাজ-এ একই জাতীয় কৃত্রিম নালাসমূহকে বর্তমানে সাকী (যাহার উচ্চারণ সাজী, বহুবচন সাওয়াজী) নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত ফারসী ভাষা হইতে এই শব্দটি গৃহীত হইয়াছে। সামহান, বারাবির ও আল-ওয়াজ্জাজ নামক অযত্নে রক্ষিত এই তিনটি কৃত্রিম নালা ছাড়াও সেইখানে আরও ছোট তিনটি নালা প্রবহমান রহিয়াছে। এইগুলি সবই আস্‌-সায়হ' মরূদ্যানে পানি সরবরাহ করিতেছে।

আল-আফলাজের সবচেয়ে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত গ্রামের নাম উসায়লিলা। লায়লায় তিনটি বসতি অঞ্চল রহিয়াছেঃ গ'াসীবা যাহা আমীরের বর্তমান রাজধানী; আল-মুবার্‌রায—আমীরের প্রাক্তন রাজধানী; ও আল-জুফায়দিরিয়্যা। আরও দূরে দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে আল-'আমার (দাওয়াসির-এর অংশবিশেষ, আল-আম্মার নহে), আস্‌-সায়হ' আল-খারফা ও আর-রাওদা নামে কয়েকটি মরূদ্যান। মরূদ্যানগুলির মধ্যে আস্‌সায়হ হইল সর্বাপেক্ষা কৃষিপ্রধান। ক্ষুদ্রাকার জলাশয়গুলির অবস্থান হইতেছে আস্‌-সায়হ-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে। তাহার দক্ষিণে রহিয়াছে আরও কতিপয় ছোট ছোট মরূদ্যান, যথা সুওয়ায়দান, আর-রুকায়কিয়্যা, আল-গ'ওত'া ও মারওয়ান। সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মরূদ্যানগুলির অন্যতম হইতেছে আল-বাদী। ইহা ওয়াদী হাশরাজ-এর অন্তর্গত আল-হাদ্দার হইতে শুরু হইয়াছে। আর অপরটি হইতেছে আশ্‌-শুত্‌বা এবং ইহা আল-মাকরান-এর উঁচু এলাকায় অবস্থিত। তুওয়ায়ক-এর পার্বত্যাঞ্চলে আস্‌-সিতারা (আল-হামদানী ইহাকে আস-সিদারা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন), হুরাদা ও

আল-গায়ল নামক প্রাচীন স্থানসমূহ রহিয়াছে। তুওয়ায়ক-এর পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ের খাড়া অংশের পাদদেশে অবস্থিত স্থানগুলির নাম হইতেছে আল-হ'মার (আল-আহ্'মার) [উত্তরে] ও আল-হাদ্দার (দক্ষিণে)।

প্রাথমিক ইসলামী যুগে আল-আফ্লাজ-এ বসবাসকারী প্রধান গোত্রের নাম ছিল জা'দা। তাহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন কুশায়র ও আল-হাশীর-এর একজন সহোদর। তাঁহারা সকলেই ছিলেন কা'ব-এর পুত্র। কা'ব ছিলেন উত্তর আরবের অধিবাসী 'আমির ইব্ন সা'সা'আর বংশধর। ৯/৬৩০-১ সনে জা'দা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় একজন দূত প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত অঞ্চলে তাহাদের অবস্থানের স্বীকৃতি দেন (Caetani Annali, ২খ., ১, ২৯৭)।

১২৬/৭৪৩-৪ সনে জা'দা ও তাঁহাদের মিত্র বানূ 'আমির গোত্রের লোকেরা আল-ফালাজের প্রথম যুদ্ধে বানূ হানীফাঃ গোত্রের একজন গভর্নরকে, যিনি তাহাদের উভয় গোত্রের শাসকরূপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, হত্যা করে। বানূ হানীফাঃ গোত্র আল-ফালাজ-এর দ্বিতীয় যুদ্ধে বানূ 'আমির গোত্রকে পরাজিত করে এবং হি. ১২৬ সনে আন্-নিশাশ-এর যুদ্ধে তাহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে (Caetani, Chronographia ৫খ, ১৬০১)।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পর তিন শতাব্দী পর্যন্ত আল-আফ লাজ-এ জা'দা গোত্রই ছিল সর্বপ্রধান। কুশায়র ও আল-হাশীর গোত্রদ্বয়ের মর্যাদা ছিল ইহার পরে (আল-হামদানী, ১খ., ১৫৯)। জা'দা-র প্রধান কেন্দ্র ছিল সূকু'ল-ফালাজ। এই শহরটির তোরণ লৌহ নির্মিত ছিল এবং উহা প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। আর এই প্রাচীরগুলি ছিল ত্রিশ হাত চওড়া। ইহার পরিব্যাপ্তি এত ব্যাপক ছিল যে, উহার অভ্যন্তরে ২৬০টি সুপেয় পানির কুয়া বর্তমান ছিল বলিয়া কথিত ছিল। ইহা তাস্ম ও জাদীস্-এর যুগের প্রাসাদ বলিয়া খ্যাত। ইহাকে সম্ভবত আস-সায়হ-এর ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত কুসায়ারাত 'আদ-এর ধ্বংসাবশেষের সহিত শনাক্ত করা যায়। কুশায়র দখল করিয়াছিলেন আল-হায়সামিয়্যা নগরী। উহার দেওয়ালগুলি এত প্রশস্ত ছিল যে, ঐগুলির উপর দিয়া ৪টি ঘোড়া একত্রে পাশাপাশি দৌড়াইতে পারিত। আল-হাশীর-এর অধীনে শহরগুলির অন্যতম ছিল আল-হাদ্দার। তবে এই গোত্রের বহু সংখ্যক লোকই ইতিপূর্বে ইয়ামানে চলিয়া গিয়াছিল।

৪৪৩/১০৫১ সালে নাসি'র-ই খুস্রাও আল-আফলাজ অঞ্চলকে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পান। কারণ ইহার অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও গোলযোগ এত চরম আকার ধারণ করিয়াছিল যে, তখন লোকদেরকে সদা ঢাল-তরবারি দ্বারা সজ্জিত হইয়া হইয়া থাকিতে হইত, এমনকি সালাত আদায় করার অবস্থায়ও। এই যুগে জুমায়লা গোত্র সেখানে প্রধান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, জুমায়লা ছিল আনাযা গোত্রেরই শাখা। আল-কুওয়ায়ত ও আল-বাহরায়নের বর্তমান শাসক আল-সাবাহ'ও আল-খালীফা পরিবারদ্বয় জুমায়লা গোত্রেরই বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করা হয়। তাহারা দুই শতাব্দীরও কিছু পূর্বে দক্ষিণাঞ্চলের দাওয়াসির (দ্র.)-বাসীদের চাপে পড়িয়া আল-হাদ্দার শহর হইতে হিজরত করিয়া এইখানে আগমন করে। পরবর্তী কালে দাওয়াসির জুমায়লা গোত্রকে সরাইয়া দিয়া সমগ্র অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

১১৯৯/১৭৮৫ সালে আল-আফ্লাজ-এর অধিবাসীরা তাহাদের স্ববংশীয় ওয়াদী আদ-দাওয়াসির-এর লোকদের অনুসরণে ওয়াহ্হাবী মতবাদ অবলম্বন করে এবং তখন হইতে তাহারা এই মতবাদের উপর অবিচল থাকে, যদিও এই অঞ্চল আধুনিক ইতিহাসে খুব সামান্য ভূমিকাই পালন করিয়াছে। ১৩২৮/১৯১০ সালে 'আবদুল-'আযীয আল-সা'উদ আল-ফারা গোত্রের হাযাযিনা বিদ্রোহী নেতাদের লায়লা শহরে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। পরে তিনি ইহাদেরকে হত্যা করেন। অঞ্চলটি বর্তমানে একজন আমীরের শাসনাধীনে রাহিয়াছে। তিনি সৌদী আরবের রিয়াদস্থ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত।

দাওয়াসীরের অধিবাসীরা ছাড়াও সুবায়া', সুহূল ও ফুদূল গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আল-আফলাজে বস্বাস করে। জুমায়লা বংশীয় লোকদের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও আল-হাদ্দারে পাওয়া যায়। আস-সায়হ'-এর অধিবাসীদের মধ্যে আশরাফ গোত্রই প্রধান। শহরগুলিতে নিগ্রো বংশের লোক প্রায়ই দেখা যায়। বানূ খাদীর (দ্র.) গোত্রের বহু লোকও সেইখানে বসবাস করে। তাহারা প্রধানত কৃষিকাজেই নিয়োজিত (كدار ব.ব. كوادير)।

আল-আফ্লাজ-এর খেজুর সুপ্রসিদ্ধ। আল-হামদানী এবং ফিলবী উভয়ে সেইখানকার সুফরী জাতীয় খেজুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আল-হামদানী সুফরী খেজুরকে সায়্যিদুত-তুমূর (سيد التمور) বা শ্রেষ্ঠ খেজুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও সেখানকার বর্তমান অধিবাসীরা সিরী নামক খেজুরকেই সেরা (سيد) বলিয়া মনে করিয়া থাকে। নাসি'র আল-আফ্লাজ-এর খেজুরকে বস্রার খেজুর অপেক্ষা উত্তম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হামদানী, নির্ঘণ্ট, দ্র. আল-ফালাজ; (২) নাসি'র-ই খুসরাও, সাফারনামাহ (Schefer), পৃ. ৮০-১, অনুবাদ ২২০-২; (৩) J. G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, কলিকাতা ১৯০৮-১৫; (৪) H. St. J.B. Philby, The Heart of Arabia; (৫) ঐ লেখক, Two Notes from Central Arabia (আল-আফলাজ-এর মানচিত্রসহ), G. J. ১৯৪৯, পৃ. ৮৬-৯৩; (৬) ইব্ন বুলায়হিদ, স'াহীহু'ল-আখ্বার।

G. Rentz ও W.E. Mulligan (E.I.²)/এ.কে.এম. ফারুক

আফ্লাতূ'ন (দ্র. প্লেটো)।

আফ্লাহ' (افلح) ঃ (রা), তিনি একজন সাহাবী, আবুল কুয়ায়সের পুত্র ছিলেন। কিন্তু ভিন্নমতে তাঁহার নিজের উপনামই ছিল আবুল কুয়ায়স। আবার কাহারও মতে আবুল-কুয়ায়স ছিল তাঁহার ভাইয়ের উপনাম। ইব্নুল-আছীর শেষোক্ত অভিমতটিকে সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন মান্দার মতে তিনি বানূ সুলায়ম গোত্রীয়। পক্ষান্তরে আবূ 'উমার বলেন, তিনি ছিলেন আশ'আরী গোত্রভুক্ত। তিনি 'আইশা (রা)-এর দুগ্ধ-পিতৃব্য ছিলেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে।

'উরওয়া ইব্নুয যুবায়র 'আইশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধ-পিতৃব্য আফ্লাহ' (রা) পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার অনুমতি চাহিলেন, তিনি অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিলে 'আইশা (রা) আফ্লাহ' (রা)-এর সহিত স্বীয় আচরণ সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি আফ্লাহ'কে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার অনুমতি দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আছীর, উস্দুল-গা'বা ফী মা'রিফাতিস-সা'হা'বা; (২) ইব্ন হাজার আল-আসক'ালানী, আল-ইসাবা ফী তাম্য়ীযিস সাহাবা (১ম সং. মিসর ১৩২৮ হি.), ১খ., ৫৭; (৩) আল-বুখারী, আস-সাহীহ (তাফসীর অধ্যায়, সূরা আল-আহযাব), আসাহহুল-মাতাবি, করাচী, ২য় সং, ১৯৬১, ২খ., ৭০৭; (৪) মুসলিম, আস-সাহিহ (আর-রাদা অধ্যায়) আসাহ্হুল মাতাবি, ২য় সং, করাচী, ১৯৫৬, ১খ., ৪৬৬-৬৭।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আফ্লাহ' (افلح) ঃ (রা) একজন সাহাবী। উম্মু সালাম (রা) তাঁহাকে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। উম্মু সালামা (রা)-এর হাদীছে এই সাহাবীর উল্লেখ রহিয়াছে। উম্ম সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার আফ্লাহ' নামক একজন দাসকে দেখিতে পাইলেন, সে সিজদা করার সময় ফুঁ দিতেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমার মুখমণ্ডলে ধূলি লাগিতে দাও। আবূ নু'আয়ম-এর মতে পূর্বোক্ত ও বর্তমান আলোচ্য আফ্লাহ' একই ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আফ্লাহ' রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্ত দাস। তাঁহাকে উম্মু সালামা (রা)-এর মুক্ত দাস বলিয়াও অভিহিত করা হইত। ইব্ন মানদা উপরিউক্ত দুই আফ্লাহ'-এর মধ্যে পার্থক্য করিয়া বলিতে চাহেন, তাঁহারা দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রথমজন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি মনে করি, আফ্লাহ' ঐ ব্যক্তি যাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, তোমার মুখমণ্ডলে ধূলি লাগিতে দাও। দ্বিতীয় জন সম্পর্কে উম্মু সালামা (রা) অবিকল উপরিউক্ত হাদীছ পেশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি নহেন, বরং একই ব্যক্তি। আবূ 'উমার কেবল প্রথম আফ্লাহ' (রা)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ 'ঈসা তিরমিযী সূত্রপরম্পরায় উম্ম সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উম্মু সালামা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আফ্লাহ' নামক দাসকে দেখিতে পাইলেন, সে সিজদা করার সময় ফুঁ দিতেছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে আফ্লাহ'! তোমার মুখমণ্ডলে ধূলি লাগিতে দাও। রাসূলুল্লাহ (স) যে সাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া 'তোমার মুখমণ্ডলে ধূলি লাগুক" এই উক্তি করিয়াছিলেন, আবূ ঈসা তিরমিযী সেই আফ্লাহ' নামক সাহাবীকেই উম্মু সালামা (রা)-এর মুক্ত দাস বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইব্ন মান্দার উপরিউক্ত মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গা'াবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা ফী তাম্য়ীযিস-সাহাবা (১ম সং, মিসর ১৩২৮, হি.), ১খ., ৫৮।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আফ্লীমূন (افليمون) ঃ ফুলায়মূন, ইফ্লীমূন, গ্রীক অলংকারশাস্ত্রবিদ ও কুতার্কিক Antonius Polemon (আনু. ৮৮-১৪৪ খৃ.)। তাঁহার বাসস্থান ছিল লাওদিসিয়া পশ্চিম তুরস্কের বর্তমান দেনিয্‌লী (দ্র.)-এর কাছে। তিনি তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ স্মার্নায় কাটান। তিনি "চেহারা ও আকৃতি দ্বারা চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা" (Physiognomy) বিষয়ে একটি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বইটির আরবী অনুবাদ সংরক্ষিত আছে। এই তরজমায় একটি গ্রীক উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদকের পরিচয় অজ্ঞাত। পুস্তকটির (কিতাবু আফ্লীমূন ফিল-ফিরাসা) বিষয়বস্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিত্তিক, দেহতত্ত্ব নহে, বরং চরিত্র নির্দেশক দৈহিক বৈশিষ্ট্য (দ্র. ফিরাসা)। ইহা মনে করা হইত যে, "চরিত্রজ্ঞাপক" (Physio- gnomy) কোন ব্যক্তির দৈহিক অবয়বের তাৎপর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে তাহার চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভে (আল-ইস্তিদলাল বিল-খুলূকি'জ্-জ'াহির আলাল-খুলকি'ল, বাতিন) সাহায্য করিতে পারে। পুস্তকটি ৭০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মানুষের চক্ষুর বৈশিষ্ট্যসমূহ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাণীসমূহের ঐ সব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হইয়াছে যাহার সঙ্গে Analogy বা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। এই দুই অধ্যায় পুস্তকের প্রায় অর্ধেক জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহার পরবর্তী অধ্যায় সমুদয়ে (৩-৩০) দেহের বিভিন্ন অঙ্গের আলোচনা, ৩১-৩৫-তে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির, ৩৬-৪০ অধ্যায়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের রঙ, ৪১-৪৮-এ দেহের বিভিন্ন অংশে লোমের উদ্ভব, ৪৯-৫০ অধ্যায়ে অঙ্গ চালনা, ৫১-৬৬ অধ্যায়ে কতিপয় প্রকট চারিত্রিক নমুনা এবং ৬৭-৭০ অধ্যায়ে মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য অন্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। পুস্তকটির বহু গ্রীক উদাহরণ হইতে অনুমান করা যায়, উহা নির্ভরযোগ্য অর্থাৎ নকল নয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ উহাতে উল্লেখ রহিয়াছে Odeipus (সম্পা. Hoffmann, ১১১, ৭), Cyrene (পূ. গ্র., ১১৯, ১৪), Lydia ও Phyrgia (পূ. গ্র., ১৩৯, ১৩), মিসর, ম্যাসিডোনিয়া, ফিনিশিয়া, সাইলিশিয়া, সিথিয়া (Scyitha)-এর (পূ. গ্র., ২৩৭, ১৪-২৩৯, ২)। রোম সম্রাট Hadrian-এর চক্ষুদ্বয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (পূ. গ্র., ১৪৯, ৪)। লেখক এই সম্রাটের খুবই প্রিয় ছিলেন। পৃ. ১৬১, ৮ প.-এর নামহীন ও বিদ্বেষপূর্ণ বর্ণনায় লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বী Favorinus-এর প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সম্রাটের প্রাণনাশের প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত আছে পৃ. ১৬১, ৮প-এ।

লেখক তাঁহার পদ্ধতির কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নাই। তিনি Ps. Aristotle-এর Physiognomicon হইতে উপাদান গ্রহণ করত তাঁহার পুস্তকে ব্যবহার করেন। সমসাময়িক ব্যক্তিদের সম্পর্কিত কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করিয়া ও বিষয়বস্তুর একঘেঁয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা পরিহার করিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন (Stegemann, ১৩৪৫-৭)। আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫/৮৬৮, দ্র.) তাঁহার পুস্তক হ'ায়াওয়ান-এ (সম্পা. এ. এম. হারুন, কায়রো ১৯৩৮, ৩খ., ১৪৬, ২৬৯-৭৫, ২৮৪) আফলীমূনের নাম উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে বনকপোতের Physiognomy (ফিরাসাতুল-হ'ামাম)-এর উপর বহু উদ্ধৃতি দেন। এইসব উদ্ধৃতির কোনটিই অবশ্য বর্তমানে বিদ্যমান আরবী

Physiognomicon-এ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইব্নুন্-নাদীম [মৃ. ৩৭৭/৯৮৭ (দ্র.)] আফলীমূনের বই ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না করিয়া ফিরাসাতুল হামাম নামে একটি বইয়ের উল্লেখ করেন (ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. Flugel, ৩১৪)। ইব্ন হায্‌ম ও [(৪১৩, ১০২২ (দ্র.)] তাঁহার "ত'াওকু'ল হ'ামামা' (সম্পা. D. K. Petrof, Leiden ১৯১৪, ৩০) বইয়ে আফলীমূনের উল্লেখ করেন। ইব্ন হ'ায্‌মের উদ্ধৃতি আফলীমূনের এক দুর্বল প্রতিধ্বনিমাত্র, সম্পা. Hoffmann, ১৬৯, ১-৪। Aristotle-এর টীকায় বর্ণিত Polemon ও Hippocrates সম্পর্কিত একটি কাহিনী (একটি অমার্জনীয় কাল-বিরোধ সির্‌রুল-আসরার, তু. সম্পা. Foerster, ২খ., ১৮৭-৯০) ইব্নুল -কি'ফত'ী (মৃ. ৬৪৬/১২৪৮ দ্র.)-এর তারীখুল হুকামা' (সম্পা. Lippert, Leipzig ১৯০৩, পৃ. ৯১, ছত্র ১২ পৃ. ৯২ ছত্র ২) ও ইব্ন আবী উস'ায়বি'আ (মৃ. ৬৬৮/১২৭০, দ্র.)-এর উয়ূনুল 'আন্‌বা (সম্পা. (Muller, Konigsberg ১৮৮৪, ১খ., ২৭-৮)-তে পাওয়া যায়।

আফলীমূনের পুস্তক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং উহার অনেক সারসংক্ষেপ প্রণীত হইয়াছে। এম. আর. আত-তাব্বাখ, আলেপ্পো ১৯২৯-এর সংস্করণটি উহার একটি আরবী সংক্ষিপ্ত রূপ। গ্রীস প্রভাবিত বিশ্বের কয়েকটি জাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (সম্পা. Hoffman, ২৩৭-৯, সম্পা. আত-তাব্বাখ, ৪৬) ইসলামী বিশ্বের জাতিসমূহে আরোপ করা হইয়াছে। আরেকটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতেছে পাণ্ডুলিপি Gotha, ৮৫ [৩ (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)]। উহাতে গ্রীকদের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ নাই; কিন্তু উহা আলেপ্পো সংস্করণ অপেক্ষা ইসলামী রুচির তেমন অনুরূপ নয়। আফলীমূনের নামে লিখিত বইগুলির এখন পর্যন্ত কোন মূল্যায়ন করা হয় নাই। আফলীমূনের বই সম্ভবত আদ-দিমাশ্‌কী [মৃ. ৭২৭/১৩২৭ (দ্র.)] কিতাবুস-সিয়াসা ফী 'ইল্‌মিল ফিরাসা (তু. Brocklmann, S. II, 161) ও ইব্নুল আক্‌ফানী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮, দ্র.)-র আসাসুর-রিয়াসা ফী 'ইল্‌মিল ফিরাসা (MS Paris, BN. Arab. 2762)-এর অন্যতম প্রধান উৎস ছিল দরবারী জীবন, মানব সম্পর্ক ও দাস ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ফিরাসা একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান। পূর্বেও ইহারা ছিল এবং বর্তমানেও আছে। ফিরাসা সম্পর্কে পরবর্তী কালে প্রণীত পুস্তকসমূহের উপর আফলীমূনের পুস্তকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব সঠিকভাবে নিরূপণ করা এখন সহজসাধ্য নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আফ্‌লীমূন সম্পর্কে সাধারণভাবে দ্র. Pauly-Wissowa, xxi/2, cols, 1320-57, নিবন্ধ Polemon (রচিত W. Stegemann) ও F. Sezgin, GAs, iii, 352—3; (২) আরবী ফিরাসা ঐতিহ্যে Polemon-এর অবস্থা সম্পর্কে দ্র. T. Fahd, La divination arabe, Strasbourg 1966, 384-6 ও Y. Mourad, La physiognomie arabe..... Paris 1939, 44-6 এবং সেখানে বর্ণিত রচনাদি। Polemon-এর গ্রন্থ সম্পাদিত হয় G. Hoffmann কর্তৃক R. Foerster-এ; Scriptores physiognomonici Graeci et Latini, Leipzig 1893, i, 93-294 (=MS Leiden or. 198 (1). Polemon-এর একমাত্র সংরক্ষিত গ্রীক উদ্ধৃতি ঐ সংকলনেই দেওয়া হইয়াছে, i, পৃ. LXXVI. ঐ গ্রন্থেই একটি Ps-Polemonic রচনার উল্লেখও উহাতে রহিয়াছে; ii, 147-60 (=MS Gotha Arab, 85 (31). Polemon-এর নামে আরোপিত অন্যান্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন ফাহ্‌দ, পূ. গ্র., ৩৮৪-৬; Ullmann, Medizin, 96; Forester, Script. phys., i, p. LXXXVII (হ'াজ্জী খলীফা, সম্পা. Flugel, vii, 297, ও (?) MS Nuruosmaniye, Defter no. 2388 হইতে অভিন্ন); এম. আর. আত্-তাব্বাখের সংস্করণ ভূমিকা পৃ. ২। Acliani variae Historiae Libr XIIII, Rome 1545, পৃ. 79-91-এ Polemon-এর প্রতি আরোপিত Greek Physihgnomicon প্রামাণিক নহে বলিয়া R. Foerster দেখাইয়াছেন তাঁহার পুস্তক De Polemonis Physiono-monicis dissertatio-এ, Kiel 1886, 10 প.।

J.J. Witkam (E.I.[2] Suppl.)/আবদুল মতিন খান

আফশার (افشار) ঃ অথবা আওশার, ওগুয (গুয্ দ্র.) গোত্র, আল্-কাশ্‌গারী কর্তৃক প্রথম উল্লিখিত (দীওয়ান লুগ'াতিত-তুর্‌ক, ১খ., ৫৬, তু. রাশীদুদ্দীন, জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ (Berezine), ১খ., ৩২)। তাঁহার মতে আওশার ছিলেন ওগুয খানের তৃতীয় পুত্র য়িলদিয খান-এর পৌত্র (এই কারণেই য়াযিজী-ওগুলু নামকরণ হইয়াছে, সালজূকনামাহ্, পাণ্ডু., আবদুল গাযী, শাজারা-ই তুরকী (Desmaisons), ২৭; ঐ লেখক, শাজারা-ই তারাকিমা, ইস্তাম্বুল ১৯৩৭, ৪২)। অন্য ওগুয গোত্রসমূহের সহিত তাহারা পশ্চিম দিকে হিজরত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শুমলা নামে পরিচিত আয়দোগ্ ইব্ন কুশদোগান নামক একজন আফশার গোত্রীয় প্রধান, খূযিসতান অঞ্চলে সালজূকদের সামন্ত হিসাবে শাসন করিতেছিলেন (আল-বুন্‌দারী (Houtsma), ২৩০, ২৮৭; আর-রাওয়ানদী, রাহ'াতুস'-সুদূর, ২৬০; ইব্নুল-আছীর, নির্ঘণ্ট, দ্র. শুমলা; ওয়াস্‌সাফ-এর বোম্বাই সং, ২খ., ১৪৯ মতে আফশারের পূর্ণ নাম ইয়া'কূ'ব ইব্ন আরসলান আল-আফশারী; হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী-র তারীখ-ই গুযীদা, ১খ., ৫৪৭-এ নামকরণ হইয়াছে হু"সামুদ-দীন শুহ্‌লী। এই কারণেই বিদ্‌লীসী, শারাফনামা (Velyaminov-Zarnov), ১খ., ৩৩-এ একই ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং ইহার অন্যতম কারণ গ্রন্থের মূল পাঠগত একটি ভুল। শুমলার শাসনকাল ছিল ৫৪৩-৭০/১১৪৮-৭৮ সাল। ইহার পরে তাঁহার পুত্র গারসু (বা 'ইয্‌যু)-দদাওলা (আর-রাওয়ানদী, ৩৭৭) শাসন করেন। ৫৯০/১১৯৪ সালে গারসু'দ্-দাওলার মৃত্যুর পর এই বংশের শাসনের অবসান হয়। এই আদি শতাব্দীগুলিতে আফশার গোত্র সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা যায় নাই। ইহার অন্যতম কারণ, লেখকগণ সাধারণত কোন বিশেষ গোত্রের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে তুর্কী বংশোদ্ভূতদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কথা সুবিদিত যে, প্রচলিত নিয়মানুসারে একজন গোত্রীয় প্রধানকে ইক'তা' (তিয়ূল) হিসাবে একটি বিশেষ জেলা বরাদ্দ করা হইত যাহার সহিত তাঁহার গোত্রের অন্যরাও বাস করিত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এই

অধিকার ভোগ করিত। আফশার গোত্রের ক্ষেত্রেও অবশ্য এই প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল। আক কোয়ূনলু-এর শাসনামলের ইতিহাসে আফশার প্রধানদের উল্লেখ রহিয়াছে (যথা মানসূর বেগ আওশার, ৮৭৭/১৪৭২-৩; হাসান রূমলু, আহ্‌সানুত্-তাওয়ারীখ, পাণ্ডুলিপিতে আক কোয়ূনলু সংক্রান্ত অধ্যায়; দাওওয়ানী, আরদ্ নামাহ্, MTM, ৫খ., ২৯৮, ইংরেজী অনু. BSOAS, 1940-42, 156, 174; মানসূর বেগ, শীরায জেলা, ৯০৪/১৪৯৮-৯, ৯০৬/১৫০১-২; ঐ লেখক, সম্পা. Seddon, Baroda 1931, 21প., 69; পীরী বেগ, শীরায, ৯০৪/১৪৯৮-৯, পূ. গ্র., ২৪)। সাফাবী বংশের প্রতিষ্ঠায় আফশার গোত্র অংশগ্রহণ করিয়াছিল (তু. কিযিল বাশ, প্রথম ইসমাঈল)। সাফাবী ইতিহাসে প্রায়ই আফশার গোত্রীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, (যথা আহ্‌সানুত-তাওয়ারীখ, ২৩৬, ৩৩২, ৩৩৯, ৩৪৫, ৪৩৮; ইসকান্দার মুনশী, তারীখ-ই 'আলাম-আরা-ই 'আব্বাসী, ১খ., ১৫৫, ১৮৫, ১৯০, ৩০৯, প. ৪০০; ৩খ., ৪৬৩, তায্‌কিরাতুল-মুলূক (Minorsky), ১৬।

সাফাবীদের শাসনামলে আফশার গোত্রসমূহকে বিভিন্ন জেলায় দেখা যাইত এবং তাহাদের প্রধান নেতা প্রাদেশিক গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। কূহ গীলু জিলায় আফশার খানেরা শাসন পরিচালনা করিতেন। এই অঞ্চলের উপজাতীয়রা ছিল প্রধানত গুনদূলূ (Gunduzlu) ও আরাশ্‌লূ গোত্রের (দ্র. তারীখ-ই 'আলামআরা-ই 'আব্বাসী, ১৯৯, ৩৪০-৪, ৩৫৮ ও LUR)। ১০০৫/১৫৯৬-৭ সালের বিদ্রোহের পর তাঁহাদের শাসনের অবসান হয়। শাস্তি হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত অধিকাংশ গোত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং মাত্র অল্প সংখ্যকই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত টিকিয়াছিল।

খূযিস্‌তান অঞ্চলে গূনদূযলূ ও আরাশ্‌লূ গোত্রীয় প্রধানগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দিয্‌ফুল ও শুশতার অঞ্চলে মাহদী কু'লী সুলতান ও হ'ায়দার সুলতান-এর মত আফশার শাসকদের উল্লেখ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাওয়া যায়। গভর্নর মাহ্‌দী কু'লী ৯৪৬/১৫৩৯-৪০ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আফ্‌শার হ'ায়দার কু'লীকে তাহার শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয় (আহ্‌সানুত-তাওয়ারীখ, ২৯৪ প.; শুশ্‌তারের আফ্‌শার গভর্নরদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. শিরো. শুশ্‌তার বি)। নাদির শাহের পর পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রসমূহের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে এতদ্‌অঞ্চলের আফ্‌শারগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। C. A. de Bode (Travels in Luristan and Arabistan, London 1945)-এর মতানুসারে কিছু সংখ্যক আফশার দোরুক (Doruk) হইতে কানগাওয়ার, আসাদাবাদ ও উরুমিয়া অঞ্চলে অপসারিত হয় এবং একটি ক্ষুদ্রতর অংশ শুশতার ও দিয্‌ফুল-এ বসতি স্থাপন করে।

আফশার গভর্নরগণ কাযারূন (দ্র.) অঞ্চলে প্রথম 'আব্বাসের সময় হইতে ১২৫০/১৮৩৪-৫ পর্যন্ত প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর শাসন করেন। অন্য কয়েকটি অঞ্চলেও আফশার গোত্রের শাসকদেরকে দেখা যায়, যেমন ইনাললু (Inallu), য়াযদ, কিরমান শাহ, মোসুল (Mosul) ও রুমিয়্যায়; আল্‌পলু কোস আহ্‌মাদলু ও কিরক্‌লু খুরাসানে (আবী ওয়ার্‌দ ফারাহ, ইস্‌ফীযার)।

উরমিয়া অঞ্চলের সন্নিকটে প্রথম 'আব্বাস-এর সময়ে আফশারদের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। Nikitine কর্তৃক অনূদিত কিংবদন্তীর বর্ণনা অনুসারে তাহারা তীমূর-এর সহিত ৮০২/১৪০০ সালে এইখানে আগমন করে, এই বর্ণনা ভিত্তিহীন। ইনানলূ (ইনাল্‌লূ?) গোত্রের প্রধান প্রথম 'আব্বাস-এর প্রখ্যাত সমরনেতা ক'াসিম খান তাঁহার গোত্রের সহিত ১০৩২/১৬২২-৩ সালের কিছু পরে উরমিয়া, সাইন কালআ ও সুলদুয অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন (তারীখ-ই আলামআরা-ই আব্বাসী, ৭৬৩)। তাঁহার পুত্র কালব-ই 'আলী খান ১০৩৭/১৬২৭-২৮ সালে গভর্নর ছিলেন এবং তাঁহার পর অন্যান্য আফশার গোত্রীয় ব্যক্তি গভর্নর হন। খুদাদাদ বেগ কাসিমলূ (সম্ভবত ক'াসিম খান-এর নাম হইতে উদ্ভূত) ১১১৯/১৭০৭ সালে বেগলের বেগ উপাধি গ্রহণ করেন (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. B. Nikitine, Les Avsar d'urumiyeh, JA, 1929, 71 ff. ও Urumiya, আরও তু. সাইন কাল্'আ)।

যদিও প্রথম 'আব্বাস তাঁহার সাধারণ নীতি অনুসারে গোত্রীয় প্রবণতা খর্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি সাধারণভাবে আফশারগণ উছমানী ও উযবেকদের বিরুদ্ধে সাফাবীদের যুদ্ধসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। নাদির শাহের শাসনামলে আফশার আমীরগণ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি নিজে আবী ওয়ার্‌দ জেলার কির্‌কলূ শাখার অন্তর্গত ছিলেন। নাদির শাহ্-এর মৃত্যুর পর গোলযোগপূর্ণ সময়ে আফশার গোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। আফশারগণ কাজার সৈন্যবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে তাহাদেরকে ব্যবহার করা হয়।

Joannin-এর মতে (quoted by Langles, in Voyages du Chevalier Chardin en Perse, Paris 1811, x, 243) ১৯শ শতকের প্রথম দিকে আফশারদের সংখ্যা ছিল ৮৮,০০০ (Ritter কর্তৃক পুনরুল্লিখিত , Asien, viii, ৪০০-৫ ইত্যাদি), সম্ভবত ইহা তাঁবুর সংখ্যা (এলাকা অনুসারে জনসংখ্যার বিস্তারিত হিসাবও তথায় দেওয়া আছে)। একই সময়ের জন্য দ্র. P. A. Jaubert, Voyages en Armenie et en Perse, 225; যায়নুল-'আবিদীন শিরওয়ানী, বুসতানুস-সিয়াহা, ১০৬ (সম্ভবত সংখ্যাগুলি অতিরঞ্জিত)। আরও আধুনিক সময়ের জন্য দ্র. মাসঊদ কায়হান, জুগ্‌রাফিয়া-ই মুফাস্‌সাল-ই ঈরান, তেহ্‌রান ১৩১০-১, ২খ., ৮৫ (ফারস-এ ইনানলু, ঈলাত-ই খাম্‌সা-এর অংশবিশেষ), ১০৬ প., ১১২, ৩৬৩ (আরদাবীল, মিশকিন, যারানদ্, বিশেষত সাওয়া ও ক'ায্‌বীন-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইনানলু ও আফশার (আরও তু. শাহ সেওয়ান ও খাম্‌সা); ৯০ (কূহ্‌গীলূতে আকাজেরী-র অংশ হিসাবে আফশার গোত্র; আরও তু. ফারসনামা-ই নাসিরী, ২খ., ২৭০), ৯২ (শুশতার ও দিয্‌ফুল-এর নিকট গূনদুযলূ সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত); ৯২, ২৫৩ (কিরমান-এ আফশার), আরও তু. ৭৫ ও ৩৭১ (তাহাদের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক পরিভাষা), মেহ্‌মেদ হাসান বাহারলু, আযারবায়জান, বাকূ ১৯২১, ৭৩, আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র আফশার, পূর্ববর্তী কালের জন্য তু. Ewliya Celebi, সিয়াহাতনামাহ্, ২খ., ২৫৯, ৮৫৯; ৪খ., ২৮৪, ৩৩৭); G. Tarring, On the

distribution of Turk tribes in Afghanistan, Lund 1939, 61 (কিছু সংখ্যক আফশারকে প্রথম 'আব্বাস এবং অন্যদের নাদির শাহ আনদখুয়েতে বসবাসের ব্যবস্থা করেন)। আফশার বংশোদ্ভূত লোকেরা যেমন অন্য গোত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছিল, যেমন উপরে উল্লিখিত, তেমনি (যেমন তাহাদের নাম হইতে প্রতীয়মান) আফশার গোত্রের অনেকের উৎপত্তি মূলত অন্য গোত্র হইতে, উরমিয়া অঞ্চলের শামলূ ও জালাইর গোত্রদ্বয় সম্ভবত (Nikitine কর্তৃক উল্লিখিত) এই নামের বৃহৎ গোত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তেকেলু ও ইমিরলূ সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য (O. Mann, Das Mujmit et-Tarikh-i-ba'd Nadirije, 31)।

মামলূক শাসনামলে সিরিয়ায়, বিশেত আলেপ্পোর আশেপাশে যে সকল তুর্কী বাস করিত তাহাদের মধ্যেও আফশারদেরকে দেখিতে পাওয়া যায় (তু. যথা আল-কালকাশানদী, সুবহুল-আ'শা; ইব্ন তাগরীবিরদী (Popper), ৬খ., ২২৫, ৩৬৪, ৩৮৬, ৫৫৭)। মনে হয় তাহারা কারামান ওগলু (দ্র.) রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল (দ্র. Cl. Cahen, in Byzantion, 1939, 133)। উছমানী শাসনামলেও আফশার গোত্রের বিভিন্ন শাখার উল্লেখ দেখা যায় (কালআত জাবার-এর নিকটে রাজাব ওগলূ হ'াজ্জী খলীফা, জিহাননুমা, ৫৯৩; দলীলপত্রে রাজাবলু আওশারি, A. Refik, Anadoluda turk asiretleri, ইসতাম্বুল ১৯৩০, ১৪৫, ১৬৫-৭৬, ১৮৬, ২০৯, ২৩৯; কারাআওশার, কারা গূনদূযলু আওশারী, বাহরিলি আওশারী, ঐ, ১০২, ১০৬)। দ্বিতীয় য়েনী (Yeni) নামেও যৌথভাবে পরিচিত এই সকল গোত্র শীতকাল সিরিয়ায় ও গ্রীষ্মকাল যামানতির নিকটে আনাতোলিয়ায় অতিবাহিত করিত। ইহাদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করাইতে সরকার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল (ইস্পারতা-র নিকটবর্তী আওশার গ্রামসমূহ, জিহাননুমা, ৬৪০ আনাতোলিয়ার নিকট আওশার নামে পরিচিত আরও কতিপয় গ্রাম)। উনবিংশ শতাব্দীতে দারবীশ পাশা Cukur Owa এলাকায় আফশারদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পর তাহাদেরকে Goksun ও কায়সারী অঞ্চলের নিকটে ও অন্যান্য স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপনে বাধ্য করেন (TTEM, lxxxviii, 348 ও এই সিরিজের সাধারণ নির্ঘণ্ট)। Cukur Owa মার'আশ (তু. Besim Atalay, মার'আশ তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৩৪০ হি., ৭০ প.), আনাতোলিয়ার Icel ও কায়সারী ও সিরিয়ার আর-রাক্কা অঞ্চলের নিকটে এখনও কিছু সংখ্যক যাযাবর জনগোষ্ঠী দেখা যায় (আলী রিযা য়ালমান, Cenupta turkmen oymaklari, Adana 1939, ii, 105 প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) IA দ্র. Avsar by M. F. Koprulu; (২) আহমাদ আকা তাব্রীযী, In Ayanda, iv and v, and part ii, viii, তেহরান ১৯২৬-৮; (৩) ঐ লেখক, তারীখ-ই পানসাদ সালা-ই খূযিস্তান, তেহরান ১৩১২ হি.; (৪) F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, নির্ঘণ্ট; (৫) V. Minorsky, Ainallu/Inallu, Rocznik Orientalistyczny, 1951-2, I ff.

M. Fuad Koprulu (E.I.[2])/মু. তাহির হুসাইন

আফশীন (افشين) ঃ জাহিলী যুগে উশরূসানা-র স্থানীয় রাজাদের উপাধি। সমরকন্দ ও খুজান্দ-এর মধ্যবর্তী পার্বত্য জেলার নাম উশরূসানা। যারাফশান নদীর উজানাঞ্চলও ইহার অন্তর্ভুক্ত (Barthold, Turkestan[2], পৃ. ১৬৫-৯)। ১৭৮/৭৯৪-৫ সালে আল-ফাদ'ল ইব্ন ইয়াহ'য়া আল-বারমাকীর নেতৃত্বে পরিচালিত এক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই প্রদেশটি খুরাসান-এর 'আরব গভর্নরদের অধীনে আসে। কিন্তু একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এবং ২০৭/৮২২ সালে আহ'মাদ ইব্ন আবী খালিদ-এর নেতৃত্বে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযানের পরেই ইহার তৎকালীন শাসক আফশীন কাউস ইসলাম গ্রহণ করেন। কাউস-এর পুত্র খায়যার (আরবী গ্রন্থে সাধারণত হায়দার) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে আফশীন নামে সর্বজনবিদিত। মা'মূন-এর খিলাফাতকালে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যখন খলীফার ভ্রাতা ও মিসরের নামমাত্র শাসক আবূ ইস্হ'াক আল-মু'তাসি'ম-এর অফিসার হিসাবে তাঁহার উপর বার্কা (Cyrenaica)-র শাসনভার ন্যস্ত করা হয় এবং ২১৬/৮৩১ সালে তিনি বলিষ্ঠভাবে বদ্বীপ এলাকার কিব্তী ও আরবদের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার অপর একটি কৃতিত্ব হইতেছে তিনি বদ্বীপ এলাকা ও ইহার পশ্চিম দিকের মরুভূমির আবূবদেরকে সৈনিক হিসাবে নিয়োগ করিয়া মু'তাসি'ম-এর মাগ'রিবা নামে সৈন্যদল গঠন করিয়া দিয়াছিলেন।

আল-মু'তাসি'ম-এর খিলাফাতকালে (২১৮-২৭/৮৩৩-৪১) আফশীনের প্রধান বীরোচিত কার্য ছিল তাঁহার একটানা অভিযান, যাহা তিনি ২২০-২২২/৮৩৫-৩৭ সালে আযারবায়জানে বাবাক (দ্র.) কর্তৃক পরিচালিত খুররামী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবিরাম চালাইয়া যান। তাঁহার কৃতকার্যতার পুরস্কারস্বরূপ খলীফা তাঁহাকে একটি মুকুট, দুইটি মণিখচিত তরবারি এবং আরমেনিয়া ও আযারবায়জান ছাড়াও সিন্ধুর শাসনক্ষমতা প্রদান করেন। স্বয়ং আল-মু'তাসি'ম কর্তৃক ২২৩/৮৩৮ সালে পরিচালিত বিখ্যাত আমোরিয়াম অভিযানেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী কালে ট্রান্সঅক্সিয়ানার বিশিষ্ট শাসনকর্তা হিসাবে তিনি মা ওয়ারাউন-নাহর-এর উপর ভূঁইফোড় তাহিরীগণের কর্তৃত্বে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'াহির-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া গোপনে তাবারিস্তানের ইস্পাহ্বায আল-মাযিয়ার (মুহাম্মাদ ইব্ন কারিন)-এর বিদ্রোহে উৎসাহ দান করেন। ফলে ইস্পাহ্বায-এর পরাজয়ের সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ আনীত হয়। একটি প্রসিদ্ধ বিচারের পর শা'বান ২২৬/ মে-জুন ৮৪১-এ তাঁহাকে সামাররায় তাঁহার নির্মিত জেলে কারারুদ্ধ করা হয়; সেখানে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন।

মধ্যএশিয়ার অন্য যুবরাজগণও 'আফশীন' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইয়াকূ'বীর (২খ., ৩৪৪) মতে সমরকন্দের যুবরাজ গুরাক কু'তায়বা ইব্ন মুসলিম-এর সহিত সন্ধিতে নিজকে সুগদ-এর ইখ্শীয' সমরকন্দের আফশীন নামে অভিহিত করেন তু. B. Spuler, Iran in fruh-Islamischer Zeit, পৃ. ৩৫৭, টীকা ১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ., ১১০৫, ১১৭১-১৩১৮ স্থা., অনু. Zotenberg, ৪খ., ৫২৫-৪৫; অনু. E. Marin, The Reign of al-Mu'tasim, New Haven ১৯৫১; (২) বালাযু'রী, ৪৩০ প.; (৩) কিন্দী, ১৮৯-৯৩; (৪) বায়হাক' (Morley), ১৯৯ প.; (৫) ইয়া'কূ'বী তারীখ, ২খ., ৫৭৭-৮৪ (সং. নাজাফ ১৩৫৮ হি., ৩খ., ১৯৯-২০); (৬) ইয়া'কূ'বী, বুলদান, ২৫৯, ২৬২-২৯৩; (৭) আবূ তাম্মাম, দীওয়ান, ১০৭, ২৬২ প.; (৮) Barthold, Turkestan², ২১০-১; (৯) Browne, ১খ, ৩৩০ প.; (১০) E. Herzfeld, Gesch, der Stad Samarra, বার্লিন ১৯৪৮, ১০১, ১৩৮-৫২।

W. Barthold-H.A.R. Gibb (E.I.²)/
ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আফ্স (عفص) ঃ আরব গ্রন্থকারগণের মতে ইহা দ্বারা ওক অথবা সদৃশ বৃক্ষের ফল ও স্বয়ং বৃক্ষ বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিভিন্ন প্রকার কীট-পতঙ্গের দংশনের ফলে বিশেষ কতিপয় বৃক্ষ ও চারাগাছে সৃষ্ট এক প্রকার ক্ষত বা অর্বুদবিশেষ। সম্ভবত আরবী শব্দটি বিশেষভাবে ওক বৃক্ষের ক্ষতকে বলা হইত। ধারণা করা হইত, ওক বৃক্ষের অর্বুদ ও বীজ একসঙ্গে অথবা পরপর উৎপাদিত হইত।

মধ্যযুগের আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রে এই ক্ষত আফ্স, প্রধানত চর্মরোগের ঔষধ ও অন্ত্রের সংকোচকরূপে ব্যবহার করা হইত। আরও বলা হইত, ইহা মাড়িকে শক্তিশালী ও দাঁতকে পোকা হইতে রক্ষা করে। প্রধানত ইহার চূর্ণ বাহ্যিকভাবে অথবা ইহাকে সিরকা বা সুরাসারে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োগ করা হইত। চুলের খিযাব ও লিখিবার কালি প্রস্তুতিতে প্রধান উপাদানরূপে ইহার ব্যবহার আছে। আল-কালকাশান্দী কালি প্রস্তুতির ব্যাপারে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাউদ আল-আন্তাকী, তাযকিরা, কায়রো ১৯৩৫, ১খ., ২২৮; (২) ইব্নুল-'আওওয়াম, ফিলাহ'া (অনু. Clement-Mullet), ii/b, ২৬৫; (৩) ইব্নুল-বায়তার, জামি', বূলাক ১২৯১ হি., ৩খ., ১২৭-৮; (৪) কালকাশান্দী, সুব্হ' 'ল-আ'শা, ২খ., ৪৬৪-৬; (৫) কাযবীনী, (Wustenfeld), ১খ., ২৫৯; (৬) I. Low, Aram. Pflanzennamen, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৭) ঐ লেখক, Die Flora der Juden, ১খ., ৬৩১-৪১; (৮) ইব্ন মায়মূন আল-কুরতুবী, শারহ' আসমাইল-উককার (সং., Meyerhoff), নং ২৫৯; (৯) M. Steinschneider, in WZKM, ১৮৯৮ খৃ., ২২০; (১০) তুহ'ফাতু'ল-আহ'বাব (Renaud-Colin), নং ৩০৯।

L. Kopf (E.I.²)/মোহাম্মাদ আব্দুল বাসেত

আফ্সান্তীন (افسنتين) ঃ আফ্সিন্তীন অথবা খুব কদাচিৎ ব্যবহৃত ইফ্সিন্তীন শব্দটি দ্বারা সোমরাজ বৃক্ষ বা এই জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষকে বুঝানো হইয়া থাকে। চিকিৎসা গ্রন্থে ইহাকে প্রায়ই কাশূছ রূমী (كشوث رومى) বলা হয়। প্রাচীন 'আরবী কবিতায়ও শব্দটির সমধাতুজ রূপ ইসফিন্ত" ব্যবহৃত হইত (Noldeke, in Low, পৃ. ৩৮৯)।

আরব লেখকগণ 'আফ্সান্তীন' শব্দটি সম্পর্কে যে সকল তথ্য দিয়াছেন উহার সবই ক্লাসিক্যাল উৎস হইতে গৃহীত। সাধারণত শব্দটির পারসিক, নাবাতীয়, সিরীয়, মিসরীয় ও খুরাসানী উৎসগুলির প্রতি খেয়াল রাখিয়া ইহার বিভিন্ন প্রকারভেদ নির্ণয় করা হইয়াছে। তবে টায়ার ও 'তারসূস' উৎস হইতে প্রাপ্ত প্রকারকেই সর্বোত্তম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহার বিশেষ ধরনের হলুদ রঙের ফুলকে নানাবিধ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হইত।

কেবল বলবর্ধক ও কৃমিনাশক গুণাবলীই নয়, বরং এই গাছটিতে রেচক ও পেশাববর্ধক গুণাবলী ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ গুণ আছে বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিষরোধক ঔষধ হিসাবেও ইহার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। প্লাসটার, তৈল ইত্যাদিতে ইহাকে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। কালির সহিত ইহার রস মিশাইলে উক্ত কালি কাগজ রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে। এই জাতীয় নানাবিধ ব্যবহার ছাড়াও ইহা চুল পড়া বন্ধের ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আলী আত্-তাবারী, ফিরদাওসুল-হি'কমা (সিদ্দিকী), ৪১৮-৯; (২) দাউদ আল-আনতাকী, তায'কিরা, কায়রো ১৯৩৫, ১খ., ৪৯-৫০; (৩) গা'ফিকী (Meyerhoff-Sobhy), নম্বর ২৭; (৪) ইব্নুল 'আওয়াম, ফিলাহ'া (Clement-Mullet অনূদিত), ২খ./ক, ৩০২-৩; (৫) ইব্নুল বায়তার, জামি', বূলাক ১২৯১ হি., ১খ., ৪১-৪৪; (৬) কাযবীনী (Wustenfeld), ১খ., ২৭২; (৭) ইব্ন মায়মূন আল-কুরতুবী, শারহ' আস্মাইল-উক্কার (Meyerhoff), নম্বর ৩; (৮) তুহ'ফাতুল-আহ'বাব (Renoudcolin), নম্বর ১।

L. Kopf (E.I.²)/মোহাম্মাদ মোমতাজ হোসেন

আফসারউদ্দিন আহমদ, মৌলভী ঃ (১৮৮৬-১৯৫৯ খৃ.) সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৬ সনে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম মৌলভী মাহ্তাবউদ্দিন আহ্মদ এবং মাতার নাম মোছাঃ সরুরুন্নেছা। ১৯৫৯ সনের ২৯ জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৌলভী আফসারউদ্দিন আহ্মদ হুগলী মাদ্রাসা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলন শুরু হইলে তাঁহার ভাই মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদসহ তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করেন। সারা দেশে আন্দোলন জোরালো আকার ধারণ করিলে আন্দোলনের অন্যান্য নেতার সহিত তিনি আলীপুর সেন্টাল জেলে অন্তরীণ হন। তিনি অত্র অঞ্চলে পরিচালিত কৃষক প্রজা আন্দোলন এবং স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বগুড়া কৃষ্ণনগরসহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত কৃষক-প্রজা সম্মেলনে যোগদান করিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৫ সনে শেরে-ই বাংলা এ.কে.ফজলুল হক ও স্বীয় ভ্রাতা মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি পুনর্গঠিত হইলে তিনি ইহার সহ-সভাপতি পদে মনোনীত হন। তিনি দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের নদীয়া জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনীতির পাশাপাশি মৌলভী আফসারউদ্দিন আহমদ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ১৯৩০ সালে তিনি 'আজাদ' নামে কুষ্টিয়া থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'শ্বেত ফেরাউন' নামে সম্পাদকীয় রচনার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন।

অত্র অঞ্চলের মুসলিম সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার দূরীকরণে মৌলভী আফসারউদ্দিন আহমদ সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করিয়া বিরাজমান কুসংস্কার দূরীকরণে মুসলমানগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি নাড়ার ফকির বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এ সময় তিনি বাউল সম্রাট লালনের আখড়ায় হামলা চালাইয়া অসংখ্য বাউল ফকিরের গাজার কল্কি, জটাচুল ও দাড়ি মুড়াইয়া তওবা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া ছাড়িয়া দেন।

মৌলভী আফসারউদ্দিনই প্রথম ব্যক্তি যিনি অত্র অঞ্চলের মুসলমানদের সকল প্রকার পেশায় আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় দরিদ্র মুসলমানগণ ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে। সেই যুগে হিন্দু জমিদার প্রভাবিত এই অঞ্চলে মুসলমানদের প্রকাশ্যে গরু যবেহ করিবার সাহস ছিল না। মৌলভী আফসারউদ্দিন কুষ্টিয়া বাজারে প্রকাশ্যে গরু যবেহ করিয়া হিন্দুদের রোষানলে পতিত হন।

মৌলভী আফসারউদ্দিন আহমদ ছিলেন পারিবারিকভাবেই বিদ্যোৎসাহী। অত্র অঞ্চলে সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদান ছিল অসামান্য। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুষ্টিয়ার কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদরাসা, মসজিদ, কুষ্টিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া বালিকা বিদ্যালয়, মাহতাবিয়া হাইস্কুল বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৫৯ সনের ২৯ জানুয়ারী এই নিবেদিতপ্রাণ কর্মবীর অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। বানিয়াপাড়াস্থ পারিবারিক গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুষ্টিয়া জেলা গেজেটিয়ার; (২) কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী; (৩) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর; (৪) জনাব নজমুদ্দিন আহমদ, কুষ্টিয়া।

মাহমুদ জামাল

আফ্সূন (افسون) ঃ যাদুমন্ত্র, যাদু; ব্যুৎপত্তি ও পুরাতন ফারসী ভাষায় ইহার ব্যবহারের জন্য দ্র. Salemann, in Gr. I, Ph, i/l, ৩০৪; বিশেষত H. W. Bailey, BSOAS, ১৯৩৩-৫, ২৮৩ প.। বর্তমানে পারস্যে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের প্রতিকারার্থে যাদুমন্ত্র বুঝাইতে এই শব্দটির ব্যবহার হয়। কিছু সংখ্যক দরবেশ, যাঁহারা সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি বশ করিবার শক্তি রাখেন বলিয়া দাবি করেন, তাঁহারা সামান্য বখশিশ লইয়া ইহাদের দংশন হইতে নিরাপদে থাকার জন্য যাদুমন্ত্র অন্যদেরকে শিখাইয়া থাকেন। অনেক সময় শব্দটি শরীরের মন্ত্রপূত একটি অংশকেও বুঝাইয়া থাকে, যেমন ডান অথবা বাম হাত এবং অনেক সময় ইহা দ্বারাই এই রকম প্রাণীগুলিকে ধরা হইয়া থাকে (Polak, Persion, i, 348)।

Cl. Huart (E.I.²)/এ.এফ.এম. হোসাইন আহমদ

আফ্সূস (افسوس) ঃ মীর শের 'আলী ইব্ন সায়্যিদ 'আলী মুজ'াফ্ফার খান-এর কবিনাম; তাঁহার বংশের ধারা ইমাম জা'ফার আস্'-স'াদিক (র)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ইরানের খাওয়াফ (خواف) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এই বংশেরই জনৈক সায়্যিদ 'আলিমু'দ্-দীন হ'াজ্জী খানীর ভ্রাতা সায়্যিদ বাদ্রুদ্-দীন ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং আগ্রার সন্নিকটে নারনাওল (نارنول) নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মুহাম্মাদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খৃ.)-এর শাসনকালে আফ্সূস-এর পিতামহ সায়্যিদ গুলাম মুস্তফা দিল্লী আগমন করেন এবং নওয়াব স'াম্স'াম'দ্-দাওলাহ খান-এর সভাসদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য সায়্যিদ গুলাম আলী খান, 'উম্দাতু'ল-মুলক আমীর খান-এর সভাসদ ছিলেন। আফ্সূস দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই স্থানে উদার সংস্কারমুক্ত শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৪৭ খৃ.-এ যখন আততায়ীর হাতে নওয়াব নিহত হন, তখন আফ্সূসের বয়স ছিল এগার বৎসর। এই সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিজের সঙ্গে পাটনা লইয়া যান এবং তিনি নওয়াব জা'ফার 'আলী খান উরফে মীর জা'ফার-এর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। উপরিউক্ত নওয়াবের পদচ্যুত হওয়া পর্যন্ত তিনি পাটনাতেই ছিলেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌ ও সেখান হইতে হায়দরাবাদ চলিয়া যান এবং সেইখানেই তাঁহার ইন্তিকাল হয়। আফ্সূস তাঁহার পিতার হায়দরাবাদ গমনের দুই বৎসর পূর্বে লক্ষ্ণৌতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। নওয়াব সালার জাঙ্গ ইব্ন ইসহ'াক' খান-এর তরফ হইতে তাঁহার জন্য বৃত্তি নির্ধারিত ছিল এবং তিনি দ্বিতীয় সম্রাট শাহ 'আলাম-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্যা জাওয়ান বাখ্ত (জাহানদার শাহ্)-এর (যিনি দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ আগমন করিয়াছিলেন) সভাসদ হইয়াছিলেন।

তিনি কয়েক বৎসর লক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত করেন, তৎপর নওয়াব আসিফুদ-দাওলার নাইব মীর্যা হ'াসান রিদ'া খান সেই স্থানের রেসিডেন্ট কর্নেল ডব্লিউ. স্কট (W. Scott)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত করান, যাহার সুপারিশে তিনি ১২১৫/১৮০০-১ সালে কলিকাতা চলিয়া যান এবং সেইখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভারতীয় শাখায় হেড মুন্শী পদে নিযুক্ত হন।

লক্ষ্ণৌতে অবস্থানকালে আফ্সূস একটি হিন্দুস্তানী 'দীওয়ান' (কাব্য সংকলন) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে শায়খ সা'দীর গুলিস্তানেরও উর্দূ অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা ১২১৬/১৮০৩ সালে বাগ'-ই উর্দূ নামে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই অনুবাদের ভূমিকায় আফ্সূস আত্মজীবনী লিখিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে আমাদের তথ্যের সর্বপ্রধান উৎস। কলিকাতায় অবস্থানকালে আফ্সূস কবি সাওদা-এর 'কুল্লিয়াত'-এর সম্পাদনা করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য মুন্শী কর্তৃক ফারসী হইতে উর্দূতে অনূদিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থের পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করেন। তিনি পাতিয়ালার মুন্শী সুজন রায় কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত খুলাস'াতুত-তাওয়ারীখ নামক ভারতবর্ষের ইতিহাস (১১০৭/১৬৯৫-৯৬)-এর প্রথমাংশেরও উর্দূতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কাজ জি. এইচ. মরিংটন (G. H. Morington)-এর আদেশে আরম্ভ করা হইয়াছিল, যাহা ১২২০/১৮০৫ সালে "আরাইশ-ই মাহফিল" নামে সম্পূর্ণ

হয়। ১৮০৮ খৃ. কলিকাতায় প্রথমবারের মত ইহা মুদ্রিত হয়। জন শেকস্‌পিয়ার (John Shakespeare) এই গ্রন্থের প্রথম দশটি অধ্যায় ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং স্বীয় গ্রন্থ 'মুন্‌তাখাবাত-ই হিন্দী'-এর অন্তর্ভুক্ত করেন (ডাবলিন ১৮৪৭)। এম. জে. কোর্ট (M. J. Court) ইংরেজীতে এই পুস্তকখানার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করিয়াছেন এবং ১৮৭১ খৃ.-এ উহা এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (২য় সং., কলিকাতা ১৮৮২ খৃ.)। গার্শিন দে তাসসী (Garcin de Tassy) ও স্প্রেঙ্গার (Sprenger) [Oudh Catalogue, পৃ. ১৯৮]-এর উক্তি অনুযায়ী আফ্‌সূস ১৮০৯ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Garcin de Tassy, Histoire de la Litterature Hindouie et Hindoustanie (২য় সং, প্যারিস ১৮৭০ খৃ., ১খ., ১২০-১৩৬; (২) J. F. Blumhardt, Catalogue of Hindi, Panjabi and Hindustani Mss. in the Brtish Museum, London 1899, No. 72; (৩) মীর্যা 'আলী লুত্‌ফ, গুলশান-ই হিন্দ (উর্দূ ভাষায় সমকালীন উৎস), লাহোর ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৪৭-৫০; (৪) নাওওয়াব মুহাম্মাদ মুসতাফা খান শেফ্‌তাহ্‌, গুলশান-ই বেখার (ফারসী), লক্ষ্ণৌ ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ২৩-৪; (৫) মুহ'ম্মাদ ইয়াহ্‌য়া তান্‌হা, সিয়ারুল্‌মুস'ান্নিফীন (উর্দূ), দিল্লী ১৯২৪ খৃ., ১খ, ৭৯৮৭; (৬) সায়্যিদ মুহ'ম্মাদ, আরবাব-ই নাছ'র-ই উর্দূ (উর্দূ), হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, পৃ. ৯১-১০৯; (৭) রাম বাবু সাকসেনা (R. B. Saksena), A History of Urdu Literature, এলাহাবাদ ১৯২৭ খৃ., পৃ. ২৪৪-৫।

J.F. Blumhardt-Sh. Inayatullah (E.I.[2])/
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

আফাবী'হ (افاويه) ঃ আফ্‌ওয়াহ-এর ব.ব. একবচনে ফূহ, পরিপাকের সাহায্যার্থে খাদ্য ও পানীয়কে সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত মসলা ও সুগন্ধি। এইগুলি সাধারণত উদ্ভিজ্জ সামগ্রী এবং উহাদের অন্তর্নিহিত উদ্বায়ী তৈল অথবা তীব্র গন্ধযুক্ত পদার্থের মাধ্যমে সক্রিয় হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত এইরূপ গুল্মাদির স্ব স্ব মৌলিক অংশ (ফল ও বীজ, ফুল ও কোরক, খোসা, শিকড় ইত্যাদি) অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ অদ্যাবধি কোথাও বাস্তবে কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত ইহা লক্ষ্য করিয়াই আবূ হ'ানীফা আদ-দীনাওয়ারী (৩য়/৯ম শতকের শেষ) উল্লেখ করিয়াছেন, আল-আফ্‌ওয়াহ্‌-র বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণী (আস'নাফ ওয়া আনওয়া') রহিয়াছে এবং পরে তিনি যু'র-রুম্মা ও জামীল (আল-উযরী)-র একটি করিয়া চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহার মর্মানুযায়ী আফওয়াহুন-নাওর ও আফওয়াহুল-বুকূল (পুষ্পজ ও উদ্ভিজ্জ)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে (কিতাবুন-নাবাত-[উদ্ভিদ গ্রন্থ]-এর অংশ, সম্পা. B. Lewin, Wiesbaden ১৯৭৪, ২০০ পত্র, নং ৭৫৭)। ইব্‌ন কু'তায়বার উয়ূনুল-আখবার (৩খ., কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০, ২৯৬-৯) গ্রন্থে মাস'লিহুত্‌ তা'আম শিরোনামে একটি অস'ম্ব তালিকার সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাতে লবণ (মিল্‌হ')-এর ন্যায় অতি সাধারণ উপাদানও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দৃশ্যত এই ক্ষেত্রে মাস'লিহ'-এর সহজ অর্থ হইতে "মসলা, খাদ্যের ঘ্রাণবর্ধক"। আরবী ভাষায় আফাবী'হ-এর অর্থ 'ইত্'র, তীব্র (সুগন্ধ, আতর) ও আক্কার (ব.ব. আকাকীর, উক্কার) ভেষজ পদার্থ হইতে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করা হয় নাই (দ্র. 'আত্'ত'ার)। অভিধানবেত্তাগণ সুগন্ধিতে যাহা মিশ্রিত হয় তাহাকে আল-আফ্‌ওয়াহ এবং খাদ্যে যাহা মিশ্রিত হয় তাহাকে আত-তাওয়াবিল বলিয়া থাকেন (দ্র. Lane-এর গ্রন্থে 'ফূহ' প্রবন্ধ)।

আল-আফাবী'হ সম্বন্ধে রচিত স্বতন্ত্র পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সকল বস্তু সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে উদ্ভিদবিদ্যা, ঔষধ প্রস্তুতি বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, পণ্য বিষয়ক পুস্তিকা, বিশ্বকোষ ও অন্যান্য গ্রন্থে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর কিছুমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে আল-মাস্'উদীর মুরূজ গ্রন্থে (১খ, ৩৬৭) যাহাতে প্রধান প্রধান পঁচিশটি মসলা তালিকাভুক্ত হইয়াছেঃ (১) সুন্‌বুল (সুগন্ধ ঘাসবিশেষ), (২) লবঙ্গ, (৩) চন্দন কাঠ, (৪) জায়ফল, (৫) গোলাপ, (৬) সালীখা (চীন দেশীয় দারুচিনি), (৭) যার্‌নাব, অর্থ অনিশ্চিত, তু. Maimonides, শার্‌হ আসমাইল-উক্কার, সং. Meyerhof, নং ১৩৭; (৮) কিরফা দারুচিনি, (৯) কারনুওয়া (sonchus) নামক এক প্রকার উদ্ভিদ? তু. ইব্‌নুল-বায়তার, আল্‌-জামি', বূলাক, ৪খ., ১৭, অনু. Leclerc, নং ১৭৭৫); (১০) কাকুল্লা (এলাচ); (১১) কুবাবা (কাবাব চিনি); (১২) হালবুওওয়া (ছোট এলাচ); (১৩) মান্‌শিম (Carpobalsam); (১৪) ফাগীরা (ফুলের হলুদ নির্যাস=xanthoxylum); (১৫) মাহলাব (তিক্ত চেরী ফল); (১৬) ওয়ার্‌স (Flemmingia rhodocarpa; (১৭) কুসত (costus); (১৮) আজ'ফার (আত-তীব), (Strombus lentiginosus); (১৯) বিরান্‌ক (Elemmingia rhodocarpa); (২০) দার্‌ও (সুগন্ধ গঁদবিশেষ); (২১) লাযান (Ladanum); (২২) মায়আ (Storax বৃক্ষের সুগন্ধ আঠালো নির্যাস); (২৩) কান্‌বীল Mallotus Philippinensis); (২৪) কাসাবুয যাবীরা (calamus); (২৫) যাবাদা (civet গন্ধ গোকুল)। এখানে লক্ষণীয়, প্রাচীনতম ও সর্বাধিক ব্যবহৃত মস্‌লা গোলমরিচ (fulful) যাহার প্রায় সাত শত প্রকার রহিয়াছে, এই তালিকায় অনুপস্থিত।

শায়খ আবুল-ফাদ্'ল জা'ফার আদ্‌-দিমাশ্‌কী (সম্ভবত ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী)-র বাণিজ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য পুস্তকে পণ্য বিষয়ক অধ্যায়ে গ্রন্থকার সাকাত (বহুবচনে আসকাত, প্রকৃত অর্থে বর্জন) শিরোনামে কতিপয় মসলার তালিকা প্রদান করিয়াছেন (যাহা মাস্‌উদী প্রদত্ত তালিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন) কিতাবুল-ইশারা ইলা মাহাসিনিত্‌-তিজারা, কায়রো ১৩১৮/১৯০০, পৃ. ২১-৪। অপ্রধান মসলা (আস্‌-সাকাতুস-সাগীর) শিরোনামে তিনি কেবল রাওয়ান্দ (rhubarb) তালিকাভুক্ত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দ্রব্যকে গুরুত্বহীন বলিয়া বর্জন করিয়াছেন; কিন্তু 'প্রধান মসলা' (আস্‌-সাকাতুল-কাবীর)-এর তালিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (১) নীল, (২) বাক্কাম (সাপান কাঠ), (৩) ফুলফুল (মরিচ), (৪) লুবান (লোবান), (৫) মাস্‌তাকা (সুগন্ধ গঁদ), (৬) দারসীনী আত্‌-তা'আম (খাদ্য-দারুচিনি), (৭) আল (হলুদ-আদা), (৮) যান্‌জাবীল (আদা), (৯) যুরুনবাদ (redowary-root), (১০) খূলানজান (galingale-আম-আদা), (১১) কুসত্‌ (costus), (১২) লাযান (ladanum পাহাড়ী

গোলাপের নির্যাস); (১৩) ইহ্লীলাজাত (এক প্রকার myrobalan বা কুল), এই তালিকা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য E. Wiedemann, Aufsatze zur arabischen wissensc haftogeschichte, সম্পা. W. Fischer, Hildesheim 1970, ii, ll,05; H. Ritter, in Isl, ৭খ., ১৯১৭, ১৭ প.।

বিক্ষিপ্ত অথবা অবৈজ্ঞানিকভাবে বিন্যস্ত মসলা সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রত্যাশিতভাবেই 'আরবী ও ফারসী বিশ্বকোষসমূহে স্থান লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে প্রাথমিক বক্তব্য ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আল-খাওয়ারিযমী প্রণীত মাফাতীহু'ল-'উলূম (সম্পা. van Vloten, Leiden 1895) গ্রন্থের চিকিৎসা অধ্যায়ে (১৬৯-৮০), নুওয়ায়রীর নিহায়াতুল-আরাব গ্রন্থে প্রচুর উপাদান প্রদান করা হইয়াছে; ইহার দ্বাদশ খণ্ডের (কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭) সম্পূর্ণটাতেই এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে; যথা গন্ধদ্রব্য (তীব), সুগন্ধ ধূপ (বাখূরাত), বহু প্রকারের Galia moscata (গাওয়ালী), বিভিন্ন (নুদূদ) সহযোগে মুসব্বর হইতে প্রস্তুত সুগন্ধি, চোলাই বা পাতনকৃত বস্তুসমূহ (মুসতাকতারাত), তৈল (আদ্‌হান) ও কতিপয় সুগন্ধি (নাদূহ'াত)। এই সকল বর্ণাঢ্য শিরোনামের অধীনে আমরা পূর্বে বর্ণিত কতিপয় মসলার বর্ণনাও দেখিতে পাই, যথা চন্দন কাঠ (৩৯-৪২), বালশাম নির্যাস (৪৩ প.), লবংগ (৪৫-৮), costus (৪৯-৫১) ইত্যাদি। এই সকল বর্ণনাই অন্যান্য এমন বস্তুর সুদীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে যেগুলি কেবল আপত্তি সাপেক্ষ মসলারূপে পরিগণিত হইতে পারে অথবা একেবারেই মসলারূপে গণ্য হইতে পারে না। মধ্যযুগের ইউরোপের ন্যায়ই গুড়া মসলাতে প্রায়শই, বিশেষত সংকটকালে ভেজাল মিশ্রিত করা হইত। এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল স্মরণ করি জাওবারীর (অনু. ৬১৫/১২১৮) কিতাবুল-মুখ্তার ফী কাশ্ফিল-আস্‌রার ওয়া হাতকিল আসতারা নামক মৌলিক গ্রন্থটি। অভিযোগ করা হয়, ইহাতে বণিকগণকে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবলম্বিত প্রতারণামূলক কৌশলাদি সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে। প্রাচ্যে ইহা কয়েকবার মুদ্রিত হয়। জরুরী ভিত্তিতে ইহার একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা রহিয়াছে। (বর্তমানে S. Wild কাজ আরম্ভ করিয়াছেন)। মসলা ও সুগন্ধিতে ভেজাল সম্পর্কিত অংশটি E. Wiedemann জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন (পূ. গ্র., ১১৭০, ১খ., ৬৭৯-৮২)।

যেহেতু এরূপ কোন মসলার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর যাহা একই সঙ্গে ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হইত না। সুতরাং মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, মসলা সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা বিশদ বিবরণ ভেষজ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এইগুলি মূলত Discorides (দ্র. ডিয়ুসকূরিদীস)-এর Materia medica-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এই গ্রন্থটি প্রারম্ভিক যুগেই আরবীতে অনূদিত হয় এবং ইসলামী বিশ্বে ইহা নূতন নূতন সংকলনে বাঁচিয়া আছে। চতুর্দিকে সম্প্রসারিত আরব বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যেসব নূতন নূতন ঔষধের সন্ধান লাভ করে তাহাও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। একদিকে এইসব উপকরণ ভেষজশাস্ত্র ও ভেষজ প্রস্তুতি গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহার বিকাশ ইব্‌নুল-বায়তারের প্রসিদ্ধ সংকলনে একটি নিশ্চিত পর্যায়ে উপনীত হয়, অন্যদিকে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় সাধারণ ঔষধ (দ্র. তি'ব্ব) সম্পর্কিত সার-সংকলনের ভেষজ প্রস্তুতি অংশে। তবে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই সকল গ্রন্থে মসলাসমূহের উল্লেখ ও বর্ণনা মূলত তাহাদের ভেষজ গুণের জন্য, খাদ্যের চাটনিরূপে নহে।

অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মসলাকেও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিলাস দ্রব্যরূপে বিবেচনা করা হইত। উভয় পণ্যকেই প্রায়শ একই সঙ্গে সর্বাপেক্ষা লাভজনক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (Mez, Renaissance, ৪৫২ প.)। মিসরে বিনিয়োগের জন্য বহুকাল খাদ্যশস্যই ছিল সর্বাপেক্ষা লাভজনক। কিন্তু ক্রুসেডের পর হইতে উহার স্থান দখল করে মসলা ও ভেষজসমূহ। মধ্যযুগের শেষাংশে মসলার ব্যবসা, বিশেষত গোলমরিচের ব্যবসা, প্রধানত মিসরীয় ও ভেনেসীয়গণের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। আয়্যূবী ও মামলূক আমলের মসলা ব্যবসা সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট জরীপ পাওয়া যায় G. Wiet, Les marchands d' epices sous les sultans mamlouks, in Cahiers d'histoire egyptienne, serie vii (১৯৫৫), ৮১-১৪৭-এ। ইহাতে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত রহিয়াছে। অবশ্য ইহাতে গ্রন্থকার কোন বিশেষ মসলা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া সাধারণভাবে মসলা ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সুলতানগণের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় বণিকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী এই বাণিজ্য পরিচালনা করিত এবং ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে মসলা মিসর হইয়া লোহিত সাগরের পথে অথবা সিরিয়া হইয়া পারস্য উপসাগরের পথে ইউরোপে চালান করিত। এই সকল বাণিজ্য সংস্থা ও তাহাদের একচেটিয়া সুবিধা সম্পর্কে বিশেষত ইয়ামান ও মিসরের মধ্যে মসলা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী ধনবান কারিমী (দ্র.) সম্পর্কে কিছু বিশদ তথ্য বর্তমান আছে। ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপীয় বন্দরসমূহে আয়্যূবীগণ দ্বারা আবদ্ধ এবং মামলূক ও উছমানী তুর্কীগণ কর্তৃক পরিচালিত 'মসলার যুদ্ধ' উভয় পক্ষই প্রচণ্ডতা ও নির্মমতার সহিত চালাইতে থাকে। অভ্যন্তরীণ নীতিও কঠোরভাবে পরিচালিত হয়, বিশেষত মামলূকগণ দ্বারা ৮৩২/১৪২৯ সালে বারসবায় মরিচ ব্যবসায়ে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিন বৎসর পর তিনি তাঁহার নিকট কিছুকাল পূর্বে ৫০ দীনার দরে বিক্রিত গোলমরিচ প্রতি 'হিম্‌ল' ৮০ দীনার দরে ক্রয় করিতে পাইকারী ব্যবসায়িগণকে বাধ্য করেন। তবু কানসাওহ আ-গাওরী এই একচেটিয়া অধিকার কেবল বজায়ই রাখেন নাই, বরং তিনি বণিকগণের উপর কঠোর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেন। মিসরীয় দালালদেরকে উচ্ছেদ করার প্রত্যাশাই স্পেনীয় ও পর্তুগীজগণকে সরাসরি ভারতের পথ অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু ১৬০৭ সালে মালাক্কা বিজয়ের পর মসলা ব্যবসায়ের একাধিপত্য পর্তুগীজগণের নিকট হইতে ওলন্দাজগণ ছিনাইয়া নেয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age, ii, Leipzig ১৮৮৬ (নূতন মুদ্রণ আমস্টারডাম ১৯৫৯), পৃ. ৫৬৩-৬৭৬; (২) S. Y. Labib, Handelsgeschichte Agyptens im Spatmittelalter (1171-1517), Wiesbaden ১৯৬৫ (মূল্যবান প্রমাণসহ অত্যন্ত শক্তিশালী অনুসন্ধান, দ্র. নির্ঘণ্ট); (৩) L. Kroeber,

Zur Geschichte Herkunft und Physiologie der Wurz und Duftstoffe. মিউনিক ১৯৪৯, স্থা.; (৪) F. A. Fluckiger, Pharmakognosie des Pflanzenreiches, বার্লিন ১৮৯১, নির্ঘণ্ট; (৫) H. A. Hoppe, Drogenkunde, হামবুর্গ ১৯৫৮; (৬) The Legacy of Islam, ২১৭, ২২৭,২৩৪, গ্রন্থপঞ্জীসহ ২৪৩। চিকিৎসা ও ভেষজশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত নির্বাচনসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ (৭) ইব্ন সীনা, আল্-ক'নূন ফিত্-তি'ব্, ১খ., বূলাক ১২৯৪ হি., ২৪৩-৪৭০; (৮) বীরূনী, কিতাবুস-স'য়দালা, সম্পা. ও অনু. হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ, করাচী ১৯৭৩; (৯) Maimonides, শারহু আস্মাইল উক্কার, Un glossaire de matiere medicale, সম্পা. M. Meyerhof, কায়রো ১৯৪০, নির্ঘণ্ট; (১০) ইব্নুল-বায়তার, আল-জামি' লিমুফ্রাদাতি'ল-আদ্বি'য়্যা ওয়াল-আগ্'যি'য়া, ১-৪খ, বূলাক ১২৯১ হি, আংশিক অনু. L. Leclerc in Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque Nationale, ২৩খ., প্যারিস ১৮৭৭, ২৫খ., ১৮৮১, ২৬খ., ১৮৮৩।

A. Dietrich (E.I.2)/আবদুল বাসেত

আফামিয়া বা ফামিয়া (افامية او فامية)ঃ হামাত হইতে ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ওরোন্টেস নদীর দক্ষিণ তীরে উহার উত্তরমুখী বাঁকে অবস্থিত সেলিউসির শহর আপামিয়া (Apamea)। সাসানী ১ম খুস্রু (৫৪০ খৃ.) কর্তৃক সিরিয়া অভিযানকালে ইহা অধিকৃত ও বিধ্বস্ত হয়। 'আরবদের সিরিয়া বিজয়ের পর এখানে উযরা ও বাহ্রা উপজাতীয়গণ বসতি স্থাপন করে। একমাত্র হামদানী আমলে ও প্রাথমিক ক্রুসেডের সময় ইহা আলেপ্পোর একটি শক্তিশালী ঘাঁটিরূপে পুনরায় গুরুত্ব লাভ করে। সিরিয়ায় সালজূক শক্তির পতনের পর আফামিয়া আরব খালাফ ইব্ন মুলাইব কর্তৃক ফাতিমীদের পক্ষে ৪৮৯/১০৯৬ সালে অধিকৃত হয়। হাশীশী ঘাতকদের (আল-হ'শ্শাশূন হাতে তাঁহার নিহত হইবার পর ৫০০/১১০৬ সালে ইহা টানক্রেড (Tancred)-এর অধিকারে আসে এবং ল্যাটিন আর্চ বিশপের সদর দফতরে পরিণত হয়। ইনাব (Inab)-এ তাঁহার বিজয়ের পর নূরুদ্-দীন মাহ'মূদ ১৮ রাবী'উল-আওয়াল, ৫৪৪/২৬ জুলাই, ১১৪৯ সালে ইহা পুনর্দখল করেন, কিন্তু ৫৫২/১১৫৭ সালের প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে ইহার দুর্গসমূহ বিধ্বস্ত হয়। প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহার পশ্চিমে পরবর্তী কালে নির্মিত দুর্গ অবস্থিত। ইহা বর্তমানে কা'ল্'আতুল-মুদীক নামে পরিচিত (আল-মাদীক অর্থ অগভীর স্থান)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইয়াকূ'বী, বুলদান ,৩২৪ (২) ইয়াকূ'ত, ১খ., ৩২২-৩; (৩) ইব্নুল কালানিসী, য'য়লু তারীখ দিমাশ্ক, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্নুল আদীম, তারীখ হ'লাব, ১খ., ২খ., দামিশ্ক ১৯৫১-৪, নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্নুল-আছীর, ১১খ, ৯৮ (ভ্রান্ত সাল); (৬) E. Honigmann, Ostgrenze des byzantinischen Reiches, ব্যাসেল্স ১৯৩৫, নির্ঘণ্ট; (৭) C. Cahen, La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, প্যারিস ১৯৪০, নির্ঘণ্ট; (৮) J. Richard, Notes sur l'archidiocese d'Apamee in Syria, ২৫শ, ১০৩-৮; (৯) E. Sachau, Reise in Syrien u. Mesopotamien, Leipzig ১৮৮৩, ৭১-৮২; (১০) R. Dussaud, Topographie historiqe de la Syrie, প্যারিস ১৯২৭, ১৯৬-৯। আফামিয়ার হ্রদ (বুহ'য়রা) ও সন্নিহিত এলাকায় ওরোনটেসের রাজত্বের জন্য আরও দ্রষ্টব্যঃ (১) কাল্কাশানদী, G. Demombynes, La Syrie a l'epoque des Memelouks, প্যারিস ১৯২৩, ১৭, ২২-৩; ও (২) J. Weulersse, L'Oronte, etude de fleuve, তুরস ১৯৪০।

H.A.R. Gibb (E.I.2)/আবদুল মান্নান

আফার (দ্র. দানকালী)

'আফীফ আল-কিন্দী (عفيف الكندى) (রা) আল-আশ্'আছ ইব্ন ক'য়স-এর চাচাত ভাই এবং কাহারও মতে তিনি আল-আশ্'আছ ইব্ন ক'য়স-এর চাচা। আত-তাবারী এই অভিমত দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি তাঁহার ভাই। অধিকাংশের মতে তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই। আবূ না'ঈম দৃঢ়তার সহিত ইহা সমর্থন করিয়াছেন (আল-ইসাবা, ১/৪৮৬)। বাওয়ারদীর মতানুসারে 'আফীফ নামটি তাস্'গ'ীর-এর সহিত 'উফায়ফ (দ্র. ইসাবা, ১খ., ৪৮৭)।

'আফীফ আল-কিন্দীকে 'আফীফ ইব্ন ক'য়স্ ইব্ন মাদীকারিবও বলা হয়। কাহারও মতে আফীফ ইব্ন মাদীকারিব। কেহ কেহ বলেন, আফীফ আল্-কিন্দী একজন সাহাবী। তিনি ঐ 'আফীফ ইব্ন মাদীকারিব হইতে ভিন্ন, যিনি উমার (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উমার-এর মতে তাঁহারা উভয়ই এক। ইব্ন মান্দা বলিয়াছেন, আফীফ ইব্ন কায়স আল-কিন্দী আল-আশ্আছ ইব্ন কায়স-এর বৈপিত্রেয় ভাই ও চাচাত ভাই।

ইব্ন হিব্বান বলেন, তিনি একজন সাহাবী এবং তাবারী বলেন, তাঁহার নাম শুরাহবীল এবং আফীফ তাঁহার উপাধি। জাহি'জ বলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম শারাহ'ীল (شراحيل) এবং তিনি তাঁহার একটি কবিতায় 'আফীফ' শব্দটির ব্যবহার করিবার কারণে তাঁহার এই উপাধি হয়।

আল-বাগ'াবী আবূ ইয়া'লা ও নাসাঈ আল্-খাসাইস গ্রন্থে ও আল্-উকায়লী দু'আফা (ضعفاء) গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, আসাদ ইব্ন ওয়াদা'আ বর্ণনা করেন, আবূ ইয়াহ্য়া ইব্ন 'আফীফ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি জাহিলী যুগে মক্কায় আসিয়াছিলাম আমার পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু মাল-সামান কিনিবার উদ্দেশে। আমি আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিলাম এবং তাঁহার নিকট বসিয়া কা'বা ঘরের দিকে তাকাইতেছিলাম। সূর্য তখন আকাশে আলোর বলয় সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সময় একজন যুবক আসিলেন এবং কা'বার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণে এক বালক আসিল এবং উক্ত যুবকের ডান দিকে দাঁড়াইল। ইহার পর এক মহিলা আসিলেন এবং তিনি তাঁহাদের উভয়ের পিছনে দাঁড়াইলেন। তাহার পর উক্ত যুবক রুকূ' করিলেন এবং তাঁহার সহিত বালকটি ও মহিলাটিও রুকূ' করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলেই রুকূ' হইতে উঠিলেন এবং তাঁহারা সিজদা করিলেন। ইহা দেখিয়া আমি 'আব্বাসকে বলিলাম হে 'আব্বাস! ইহা তো

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার! তিনি বলিলেনঃ হাঁ, আমি 'আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তিনি উত্তরে বলিলেন, ইনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এই বালকটি আমার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র আলী এবং এই মহিলাটি এই ব্যক্তির স্ত্রী খাদীজা। তিনি আরও জানাইলেন, মুহাম্মাদ আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, আসমান ও যমীনের মহান প্রভু তাঁহাকে এই ধর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন। আব্বাস আরও বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এই তিনজন ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে আর কেহ এই দীনের উপর নাই। 'আফীফ বলেন 'তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করিলাম, যদি আমি চতুর্থ ব্যক্তি হইতে পারিতাম! তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া পরবর্তী কালে দুঃখ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, ১খ., ৪৮৭; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, ৩খ., ৪১৪-১৫।

এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

আল-আফীফী, আবদুল-ওয়াহ্হাব (العفيفى عبد الوهاب) ঃ ইব্‌ন 'আবদিস-সালাম ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হিজাযী শাযিলিয়্যা তারীকাভুক্ত মিসরীয় সূফী, যাঁহার নামানুসারে ইহার একটি শাখার নামকরণ করা হইয়াছে আল-'আফীফিয়্যা। মিনয়াত 'আফীফ (বর্তমান মিনুফিয়্যা প্রদেশ)-এ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আল-আযহার-এ মালিকী মাযহাব-এর মুফ্‌তী সালিম ইব্‌ন আহ্‌মাদ আন্‌-নাফ্‌রাবী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুস্‌তাফা আস্‌-সিকান্দারানী আস্‌-সাব্‌বাগ-এর মত বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা আলিমের নিকট অধ্যয়ন করার পর তিনি মাদ্‌রাসাতুল-আশ্‌রাফিয়্যায় ইমাম মুস্‌লিম-এর সাহীহ্ পড়ান ও শাযি'লিয়্যা তারীকা ভিত্তিক এক নিরাসক্ত জীবনপথে নিজকে সীমাবদ্ধ রাখেন। মরক্কোর ত'ায়্যিবিয়্যা [দ্র.] (ওয়ায্‌যানী শারীফ)-এর প্রতিষ্ঠাতার পুত্র মাওলা আহমাদ আত্‌-তিহামী আত্‌-তাওওয়াতী (মৃ. ১৭১৫ খৃ.) কর্তৃক তিনি এই তারীকা (দ্র.)-তে দীক্ষিত হন; তাঁহার নিকট হইতে তিনি 'খিলাফাত' (দ্র.)-ও লাভ করেন। ইহা ছাড়াও তিনি খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার 'ইজাযাত ও খিলাফাত' বা মুরীদ করার সনদ প্রাপ্ত হন; মুস্‌ত'াফা কামালুদ্‌দীন আল-বাক্‌রী (দ্র.) তাঁহাকে ইহা প্রদান করেন।

মাম্‌লূক আমীরগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তাঁহারা তাঁহার ক'াস্‌রুশ্‌-শাওকস্থ বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। যে সমস্ত অনুদান তাঁহাকে উপহারস্বরূপ দেওয়া হইত সেইগুলির অধিকাংশই তিনি উদারতার সহিত স্বীয় মুরীদগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। এই সমস্ত কারণে আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নত তাঁহার শিষ্যদের দল বর্ধিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে।

১২ স'াফার, ১১৭২/১৫ অক্টোবর, ১৭৫৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। কায়িত বায়-এর মসজিদের নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার কবরটি ১১৭৮/১৭৬৪-৬৫ সালে জলস্রোত ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই ঘটনার পরে সেই একই এলাকায় আরও অনেক উচ্চ স্থানে তাঁহার মৃতদেহ পুনরায় কবরস্থ করা হয়। সেইখানে তাঁহার কবরের উপর একটি গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত ও ইহার সংলগ্ন বেশ কয়েকটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। এইগুলির নির্মাণ ব্যয় বহন করেন মাম্‌লূক আমীর মুহাম্মাদ কাতখুদা আবাজা, যিনি ছিলেন মুহাম্মাদ বে আবুয্‌-যাহাব (দ্র.)-এর পূর্ববর্তী কাতখুদা (দ্র.)। 'আবদুর-রহমান জাবারতীর বর্ণনামতে ('আজাইবুল-আছার, বূলাক ১২৯৭, ১খ., পৃ. ১২২০ প., ৪খ., পৃ. ১৬৩) উক্ত ঘটনা ঘটা পর্যন্ত তাঁহার বার্ষিক জন্মোৎসব (যাহা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্য করিয়াছিলেন) উদ্‌যাপিত হয় নাই যেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ইহা কায়রোতে অন্যতম বৃহৎ জনপ্রিয় জন্মোৎসবে পরিণত হয় (তু. J.W. Mc Pherson, The Moulids of Egypt, কায়রো ১৯৪১, পৃ. ৫০, ১৭৪; Murray, Handbook of Egypt, ১৮৮৮,পৃ. ২০৯) এবং আট দিনব্যাপী স্থায়ী থাকে (তু. আলী মুবারাক, খিতাত, ৫খ., ৫০ প, ১৬খ., ৭৩)। Mc Pherson-এর মতে (ঐ, পৃ. ১৭৪) ১৯৪০ খৃ., পর্যন্ত জন্মোৎসব আর উদ্‌যাপিত হয় নাই, কিন্তু ১৯৫০-এর দিকে ইহার উদ্‌যাপন আবার অনুষ্ঠিত হয় [তু. মাজাল্‌লাতুল-ইসলাম ওয়াত-তাস'াওউফ, ১খ. (কায়রো ১৯৫৮), সংখ্যা ৬, পৃ. ৮২]।

আল-'আফীফী নিজে কোন পুস্তকাদি লিখেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশাবলী তাঁহার অন্যতম শিষ্য 'আবদুর-রহমান ইব্‌ন সুলায়মান আল-গুরায়নী কর্তৃক রিসালাতুস্‌-সিল্‌সিলা গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং এইগুলি আহমাদ য়ার্‌রূক কর্তৃক বিধিবদ্ধ শাযি'লী শিক্ষাবলীকে প্রতিফলিত করে। যাররূক-এর ওয়াজ'ীফা (দ্র.) যাহা সাফীনাতুন্‌-নাজাত (লিমান্ ইলাল্লাহি ইল্‌তাজা') নামে পরিচিত, উহা শাযি'লী তরীকার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত এবং এই তরীকার সদস্যগণের জন্য নির্দিষ্টকৃত দৈনিক ইবাদাত কর্মের অংশ হিসাবে অবলম্বন করা হইয়াছে। তাঁহার দুইটি পুস্তিকা রিসালাতু'ল উসূল ও রিসালাতুল-উম্মাহাত। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে তাঁহাদের নিকট মানসম্মত পঠনযোগ্য পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হয়।

আল-'আফীফিয়্যা তরীকার অনুসারীরা আয্‌-যুবায়র ইব্‌ন 'আওওয়াম (রা) [দ্র.]-কে অনুকরণ করিয়া হলুদ বর্ণের পাগড়ী পরিধান করিতেন বলিয়া বিভিন্ন কারণে তাহাদের সমালোচনা করা হইত। একটি হাদীছ অনুসারে আয্‌-যুবায়র (রা) বদ্‌র-এর যুদ্ধের দিন হলুদ বর্ণের পাগড়ী পরিধান করিয়াছিলেন। এই বর্ণের পাগড়ীর সমর্থনে ইব্‌রাহীম আস্‌-সাজীনী কর্তৃক লিখিত 'আল-আমানুল-আক্‌বার ফী 'আয়নি মান্ আন্‌কারা লিব্‌সাল-আস্‌ফার' শীর্ষক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি এই তরীকা প্রকাশ করিয়াছে।

আল-'আফীফিয়্যা তারীকার দুইটি শাখা ১৯৫৮ খৃ. মিসরে বিদ্যমান ছিল (তু. মুহাম্মাদ মাহমূদ আলওয়ান, আত্‌-তাস'াওউফুল-ইসলামী, রিসালাতুহু ওয়া-মাবাদিউহু, মাদীউহু ওয়া হ'াদি'রুহু, কায়রো ১৯৫৮, পৃ. ৭২, ৭৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আলী মুবারাক, খিতাত, ১৬খ., ৭২ প.; (২) আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কূহিন, তাবাকাতুশ্‌-শাযিলিয়্যা আল-কুব্‌রা, কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮-৯, পৃ. ১৫৭ প.; (৩) মুহাম্মাদ আল-বাশীর জাফির, আল-ইয়াওয়াকীতুছ-ছামীনা ফী আয়ানি 'আলিমিল-মানীনা, কায়রো ১৩২৪-৫১/১৯০৬-৭। এই তিনটি জীবনী গ্রন্থ মূলত (৪) আবদুর-রহমান আল-জাবারতী, আজাইবুল-আছার, ১খ., ২২প. হইতে পুনরায় উপস্থাপিত। সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ (৫) মুহাম্মাদ খালীল আল-মুরাদী, সিল্‌কুদ্‌-দুরার ফী

আয়ানিল-কারনিল আশার, ইস্তাম্বুল/বূলাক ১২৯১-১৩০১/১৮৭৪-৮৩, ৩খ., পৃ. ১৪৩। এই গ্রন্থখানি ব্যবহার করিয়াছেনঃ (৬) ইয়ূসুফ ইব্‌ন ইস্মাঈল আন-নাবাহানী, জামি কারামাতিল-আওলিয়া, কায়রো ১৩২৯/১৯১১, ২খ, ১৩৯। উনবিংশ শতাব্দীর ২য় ভাগে আল-আফীফীর মসজিদের নির্মাণ সম্পর্কে দ্র. (৭) আলী মুবারাক, খিতাত, ৫খ., ৫১। মসজিদটির প্রাঙ্গণে সমাহিত আল-আফীফীর বংশধরগণ ও উলামা সম্পর্কে তথ্যের জন্য দ্র. (৮) আবুল-হাসান নূরুদ্দীন আলী ইব্‌ন আহমাদ আল-সাখাবী, তুহাফাতুল আহবাব ওয়া বুগয়াতুত্-তুল্লাব ফিল-খিতাতি ওয়াল-মাযারাতি ওয়াত্-তারাজিমি ওয়াল-বিকাইল-মুবারাকাত, কায়রো ১৯৩৭, পৃ. ৫৪। নিবন্ধে উল্লিখিত আহমাদ আয্-যাররূক, আবদুর রহমান আল-গুরায়নী ও ইব্‌রাহীম আস্-সাজীনীর পুস্তিকাগুলি (৯) আফীফী আল-ওয়াককাদ, "হিদায়াতুস-সাইল ইলা মাজমূ' ইর্-রাসাইল" (কায়রো ১৩১৬ হি.) শীর্ষক একটি গ্রন্থ সংগ্রহে প্রকাশ করিয়াছেন। তরীকাটির ওজীফা ও সনাদ্ (দ্র.)-এর (একটি শায়খ হইতে অন্য শায়খের নিকট ক্রমান্বয়ে নামিয়া আসার) ধারাবাহিক তালিকা (যাহা নিবন্ধে উল্লিখিত আবদুর্-রহমান গুরায়নীর পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে); (১০) আবদুল-কাদির যাকী, আন্-নাফ্‌হুল-আলিয়া ফী আওরাদিশ্-শাযিলিয়্যা, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ২২০, পুনঃর্মুদ্রণ, তারাবুলুস (লিবিয়া) ১৯৭১-এও প্রকাশিত হইয়াছে। (১১) আফীফিয়্যা তরীকার অন্যতম খলীফা সায়্যিদ আবদুন্-নাবী মুহাম্মাদ খাদির, 'আল-ইরশাদাতুদ্-দীনিয়্যা', আল-মিন্‌য়াঃ তা. বি. (১৯৭০)। ধর্মীয় শিক্ষা ও সূফী অনুশীলনের এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানা এই তরীকার সদস্যদের জন্য লিখিত। তরীকাটির দু'আ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ঃ (১২) ফুআদ রামাদান, মাজ্‌মূ'আত আহ্‌যাব, কায়রো তা. বি. ও (১৩) আহমাদ হাসান (সম্পা.), মাজ্‌মূ'আত আওরাদ ওয়া আহযাব লিস্-সাদাশ শাযিলিয়্যা, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২-৩।

F. De Jong (E.I.²)/ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

আফীফুদ-দীন আত-তিলিমসানী (দ্র. আত-তিলিমসানী)

আফ্রিকা (افريقه) ঃ মহাদেশ (সন্নিকটবর্তী দ্বীপগুলিসহ প্রায় ১,১৬,৮৪,০০০ ব. মা.; জনসংখ্যা আনু. ২৬,৩০,০০,০০০), জিব্রালটার প্রণালী দ্বারা ইউরোপ হইতে ও সুয়েজ খাল দ্বারা এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন। উপকূলভাগে খাঁড়ির অভাবহেতু স্বাভাবিক বন্দর নাই বলিলেই চলে; জলবায়ু নানা স্থানে নানা ধরনের, প্রধানত মালভূমি। সর্বোচ্চ শৃংগ মাউন্ট কিলিমানজারো (১৯,৫৬৫ ফুট)। আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ ভিক্টোরিয়া, পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। বহু নদী দ্বারা বিধৌত; তন্মধ্যে নীলনদ, নাইজার, কঙ্গো, ও য্যামবীযি প্রধান। মরুভূমির মধ্যে সাহারা বিখ্যাত; ইহার প্রান্তদেশে সাভানা তৃণ অঞ্চল। বিষুবীয় আফ্রিকার পশ্চিম অংশ ঘন অরণ্যাঞ্চল। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার (খৃ. পূ. ৩০০০ বৎসর আগের) বিবেচনায় আফ্রিকা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া দাবি করিতে পারে। কার্থেজের পরাজয়ের (খৃ. পূ. ১৪৯) পর উত্তর আফ্রিকায় রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব মুসলিম অভিযানের (৭ম-১১শ শতকে) ফলে আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। উত্তর আফ্রিকার মুসলিমগণ (প্রধানত মূর) ইউরোপীয় দেশসমূহে পর্যায়ক্রমে অভিযান চালনা করেন এবং ১৫শ শতকে এই অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। ১৪৮৮ খৃ. পর্তুগীজ কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া নৌপথে ভারত মহাসাগরের নূতন নৌপথ আবিষ্কারের সঙ্গে আফ্রিকার উপকূলাঞ্চলে ইউরোপীদের আবিষ্কার অভিযান শুরু হয়। পর্তুগীজদের পরে ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ, বৃটিশ ও ফরাসী বণিকগণ আফ্রিকায় উপনীত হয়। অতঃপর এই মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ উন্মুক্ত হওয়ায় ইহার বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া যায় এবং ব্যাপক আকারে উপনিবেশসমূহ গড়িয়া উঠে। ১৯১২ খৃ. মিসর, ইথিওপিয়া ও লাইবেরীয়াকে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দিয়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের দখলে যায়। আফ্রিকায় যেসব শক্তির স্বার্থ অপেক্ষাকৃত কম ছিল তন্মধ্যে বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও স্পেন উল্লেখযোগ্য। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকাস্থ ইতালির উপনিবেশসমূহ জাতিসঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান উত্তর আফ্রিকাতে পরিচালিত হয় এবং ১৯৪৩ খৃ. অক্ষ শক্তির (Axis Power) পরাজয়ে এই রণাঙ্গনে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৫ সালে আফ্রিকার শুধু ইথিওপিয়া, মিসর, লাইবেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন স্বাধীন ছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরই আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হইয়া উঠে। ১৯৫৬ খৃ. মরক্কো, তিউনিসিয়া ও সূদান প্রজাতন্ত্র, ১৯৫৭ খৃ. ঘানা, ১৯৫৮খৃ. গিনি ও ১৯৬০ খৃ. ফরাসী ক্যামেরুন স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩-এ নিঅ্যাসাল্যান্ড ও রোডেশিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৫৮-এর নয়া ফরাসী শাসনতন্ত্র ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, ফরাসী বিষুবীয় আফ্রিকা, মদাগাসকার (মালাগাছি প্রজাতন্ত্র) ও অন্যান্য রাজ্যে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করে। নাইজিরিয়া, সোমালিয়া ও টেগোল্যান্ডকে অচিরেই স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৯৫৯ খৃ. সূদানী প্রজাতন্ত্র ও সেনেগাল প্রজাতন্ত্র মিলিয়া মালী ফেডারেশন গঠন করে এবং ঘানা ও গিনি স্বাধীন আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসংঘ (Union of Independent African States) গঠন করে। ১৯৫২ খৃ. ইরিত্রীয়া (Eritrea) ইথিওপিয়ার সঙ্গে ফেডারেশন গঠন করে, ১৯৬২ খৃ. উহা ইথিওপিয়ার সঙ্গে সম্মিলিত হয়। ১৯৫৭ খৃ. তানজিয়ার এলাকা মরক্কোর সঙ্গে যুক্ত হয়; ১৯৫৮ খৃ. স্পেনীয় মরক্কো ও স্বাধীন মরক্কোর অংগীভূত হয়। ১৯৬০ খৃ. আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ উন্নতির শিখরে পৌঁছে। ঐ বৎসর ফরাসী অধিকৃত প্রাক্তন উপনিবেশসমূহ হইতে নিম্নোক্ত দেশগুলি স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে ঃ ক্যামেরুন (পূর্বোক্ত সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (মধ্যআফ্রিকীয় প্রজাতন্ত্র), চাদ, কংগো প্রজাতন্ত্র (রাজধানী ব্রাযাভিল; Republic of Congo, Fr. Republique Du Congo), দাহোমি, গাব, আইভরি কোস্ট, মালাগাছি, মালী (প্রাক্তন সূদানী প্রজাতন্ত্র (Sudanese Republic), মৌরিতানিয়া, নাইজার, সেনেগাল ও আপার ভোল্টা। এই সকল ছাড়াও ১৯৬০ খৃ. সংগ্রামবিধ্বস্ত কংগো (প্রাক্তন বেলজিয়ান কংগো, এখন কংগো প্রজাতন্ত্র, রাজধানী লীওপোল্ড ভিল, নূতন নাম কিন্‌শাসা), ফেডারেশন অব নাইজিরিয়া (নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্র), সোমালিয়া ও টেগো স্বাধীন হয়। ১৯৬১ খৃ. স্বাধীন হয় সিয়েরালীওন ও

(Collier's Encyclopedia-এর সৌজন্যে)
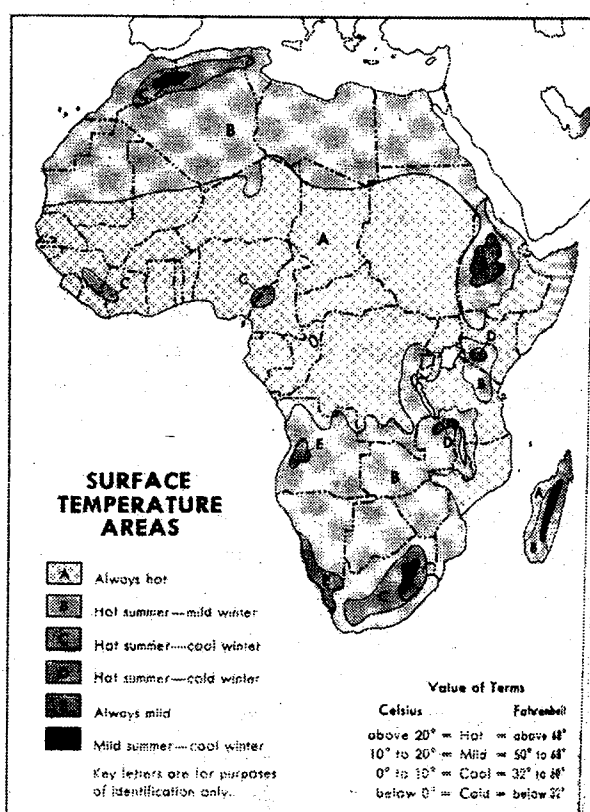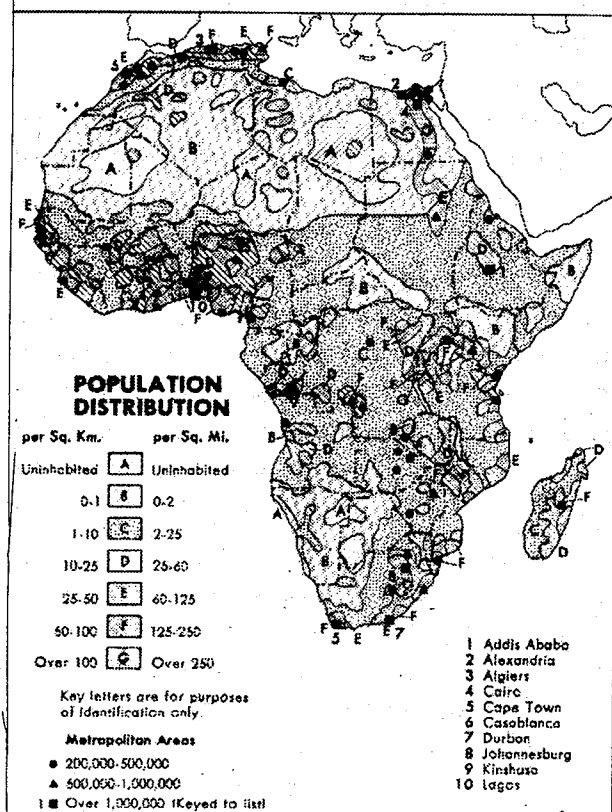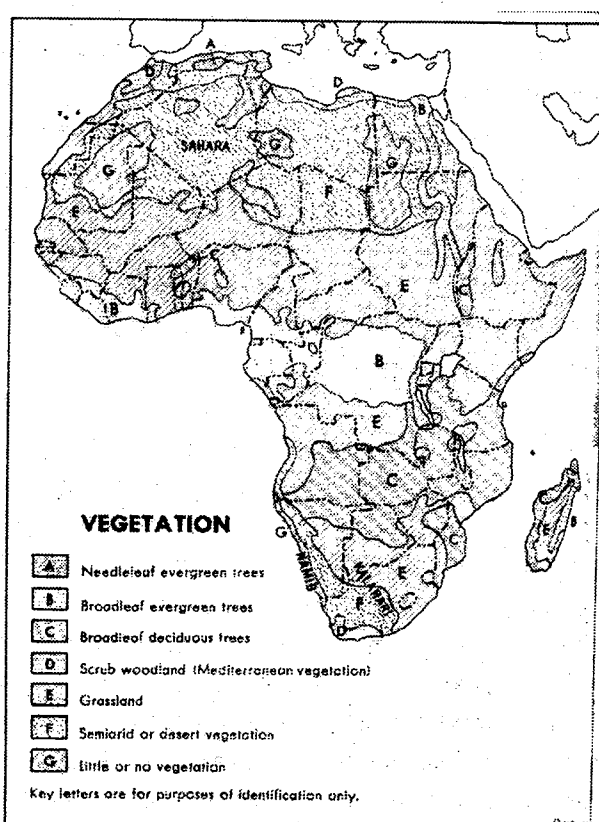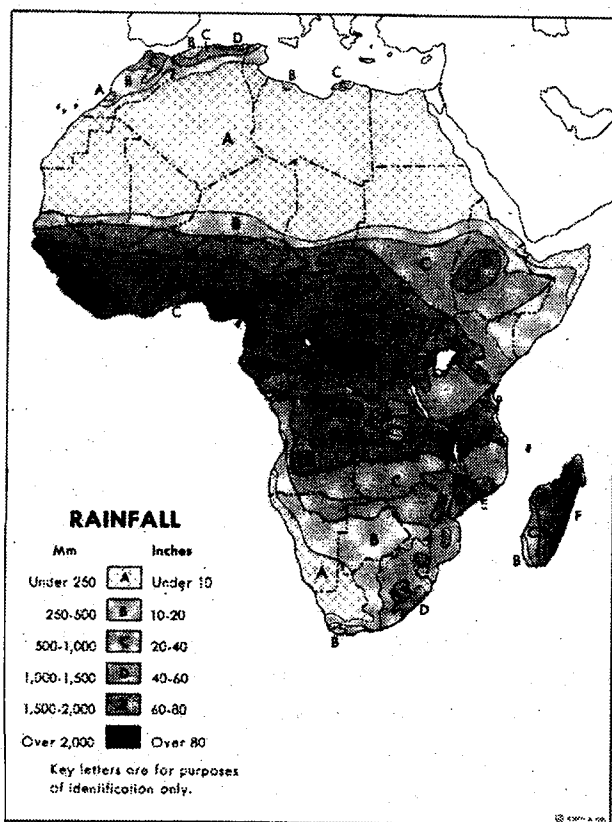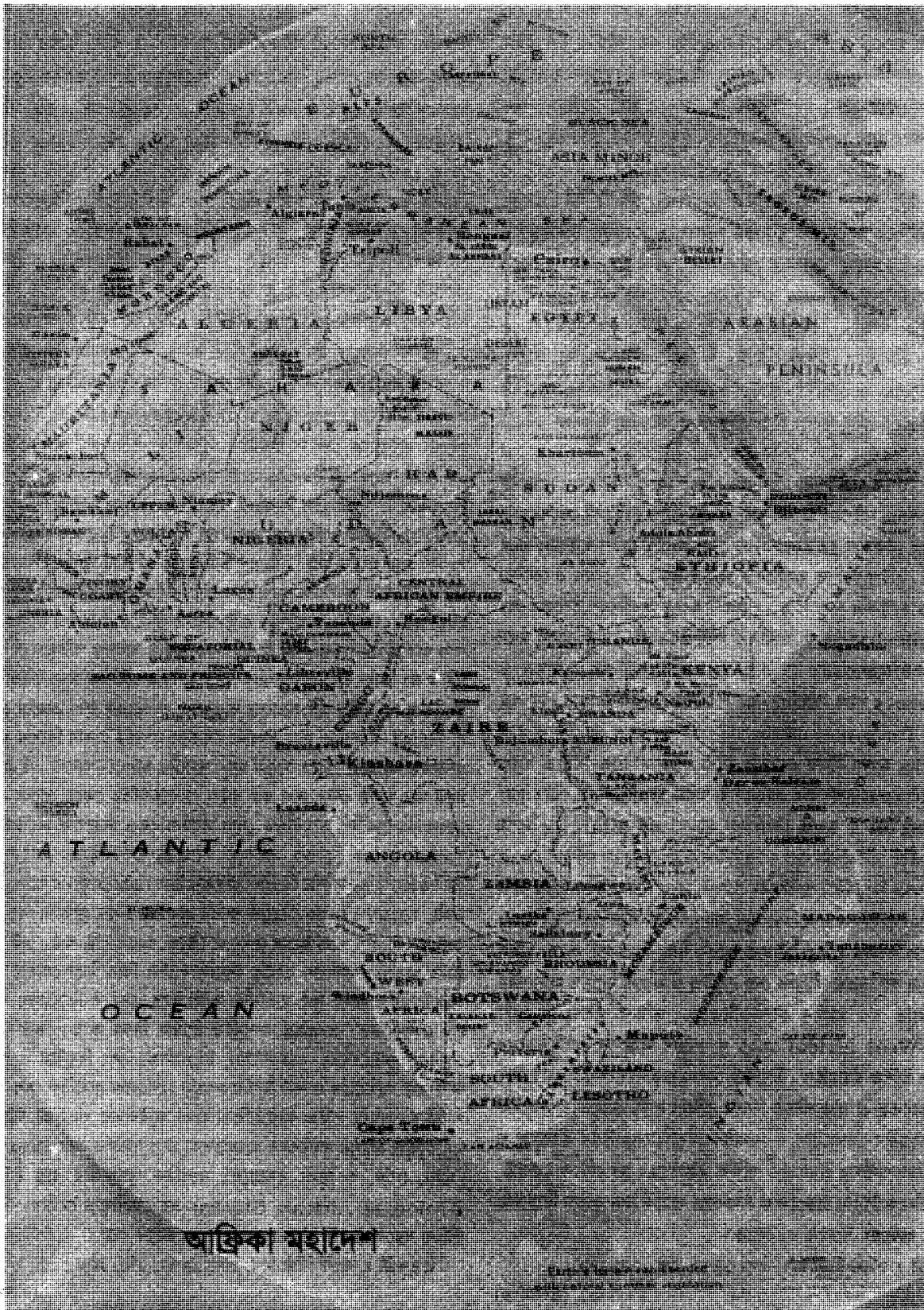
(Collier's Encyclopedia-এর সৌজন্যে)

টাংগানিকা। ঐ বৎসরই দাহোমি পর্তুগীজ অধিকৃত একটি অঞ্চল (Sao Joao Baptista de Ajuda) দখল করিয়া লয়, আর প্রাক্তন বৃটিশ ক্যামেরুন, নাইজিরিয়া ও রিপাবলিক অব ক্যামেরুন (বর্তমান ফেডারেল রিপাবলিক অব ক্যামেরুন)-এর মধ্যে বিভক্ত হয় এবং প্রাক্তন ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকার স্থানে একটি প্রজাতন্ত্র (রিপাবলিক) স্থাপিত হয়। ১৯৬২ খৃ. উগান্ডা, আলজিরিয়া, রুয়ান্ডা প্রজাতন্ত্র (Republic of Rwanda) ও বারানডী রুরুন্ডি রাজ্য পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬৩ খৃ.-এর প্রথমদিকে আফ্রিকায় খুব কম সংখ্যক ইউরোপীয় উপনিবেশই অবশিষ্ট ছিল। একমাত্র পর্তুগালই কোনক্রমে বিস্তীর্ণ উপনিবেশ রাখিতে সমর্থ হয়। পর্তুগালের অধিকারে তখনও এই সকল দেশ ছিল ঃ অ্যাংগোলা, কাবিনডা (Cabinda), মোয্যমবিক, পর্তুগীজ গিনি, সাঁওঁ তুমে (Sao Tome) ও প্রীনসীপে। স্পেনের অধিকার ছিল স্পেনীয় সাহারা, ঈফনী, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ও স্পেনীয় গিনি। ফরাসীদের আফ্রিকাসহ অবশিষ্ট উপনিবেশসমূহের মধ্যে ফরাসী সোমালীল্যাণ্ড ও কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, ফরাসী কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত বিদেশীয় অঞ্চল এবং রিইউনিয়ন দ্বীপটি ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত একটি বিদেশীয় প্রদেশরূপে বিবেচিত হইত। বৃটেনের অধিকারে তখনও মরিশাস দ্বীপটি ছিল; বাসুটোল্যান্ড (বর্তমান লেসোথো), বেচুয়ানাল্যান্ড (বর্তমান বতসওয়ানা) ও সোয়াযিল্যান্ড বৃটিশ হাইকমিশনের কর্তৃত্বে ছিল। বৃটিশ আশ্রিত যানজিবার ১৯৬৩-এর ১০ ডিসেম্বর ও কেনিয়া ১২ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। বৃটিশ রাজকীয় উপনিবেশ সেশেল্ (য) (Seychelles) ১৯৬৫ খৃ. স্বাধীনতা পায়। ১৯৬৪-এর জানুয়ারি মাসে যানজিবার প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং কিছু পরে টাংগানিকার (প্রজাতন্ত্র, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৬২) সঙ্গে সম্মিলিত হইলে উভয় রাষ্ট্রের মিলিত নাম হয় তানযানিয়া (Tanzania)। প্রাক্তন স্বায়ত্তশাসিত দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং বৃটিশ আশ্রিত অঞ্চল উত্তর রোডেশিয়া ও নিঅ্যাসাল্যান্ড মিলিত হইয়া স্বল্পকাল স্থায়ী ফেডারেশন অব রোডেশিয়া অ্যান্ড নিঅ্যাসাল্যান্ড গঠিত হয়; তৎপর ১৯৬৪-এর ৭ জুলাই নিঅ্যাসাল্যান্ড মালাবি (Malawi) নামে স্বাধীন হয় এবং রোডেশিয়া অল্প সময় বৃটিশ কমনওয়েলথে থাকিয়া ১৯৬৫ খৃ. একতরফা (বেআইনী) স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইংল্যান্ডের রাণী কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর তথায় থাকিয়া যান, যদিও প্রধান মন্ত্রী আযান (ঈঅ্যান) স্মিথ তাহাকে গভর্নর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরবর্তী কালে বৃটিশ সরকার ইহার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। বৃটিশ ও ফরাসী আশ্রিত আফ্রিকীয় অঞ্চলের প্রায় সব স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা (South-West Africa) ১৯২১ খৃ. দক্ষিণ আফ্রিকা ডোমিনিয়নের অছিগিরিতে অর্পিত হইয়াছিল (লীগ অব নেশন্স কর্তৃক)। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ঐ অঞ্চলটিকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতেছে। অনেক রাষ্ট্রেই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্ভব হইয়াছে ও হইতেছে; স্বৈরশাসনের প্রবণতাও লক্ষিত হইতেছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে সাহায্য দান করিয়া নিজ নিজ প্রভাবাধীনে আনিবার প্রচেষ্টায় রত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৪৮-৪৯।

(সংকলিত)

আফ্রো-এশীয় ব্লক (Afro-Asian Bloc) ঃ আধুনিক কালে সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ এবং বিশ্বের ব্যাপারে প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও যৌথ পরামর্শ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে স্বাধীন জাতির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ হইতে ১৯৬২ পর্যন্ত আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় ৪০টি দেশ স্বাধীন হইয়াছে (১৯৬৪-এর শেষে আফ্রিকায় ৩৮টি দেশ স্বাধীন ছিল), বিশেষ করিয়া জাতিসংঘের কার্যাবলীতে এই নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সহযোগিতাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫০ হইতে জাতিসংঘের আফ্রিকা ও এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের ব্যাপারে ঘরোয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সমাবেশ হয় ১৯৫৫ খৃ.-এ বানদুং সম্মেলনে। দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর কোরিয়া, ইসরাঈল ও জাতীয়তাবাদী চীন ব্যতীত আফ্রিকা ও এশিয়ার তৎকালীন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ২৯টির প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রথমোক্ত দেশ কয়েকটিকে সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিগণ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা ও জাতিসঙ্ঘে নিজেদের মধ্যে একতা রক্ষা করিতে সম্মত হন। ১৯৬২ খৃ. নাগাদ জাতিসঙ্ঘে তাহাদের সংখ্যা জাতিসঙ্ঘের মোট সদস্য সংখ্যার প্রায় অর্ধেক হইয়া দাঁড়ায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার ঔপনিবেশিকতাবাদ অবসানের দাবি জ্ঞাপনের ব্যাপারে তাহাদের সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। অবশিষ্ট অছিরাজ্য ও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দানের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাইয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা প্রধানত আফ্রো-এশীয় গ্রুপের চেষ্টাতে সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৬০ খৃ.-এ গৃহীত এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন তদারকের জন্য তাহারা ১৯৬১ খৃ. সাধারণ পরিষদকে দিয়া ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে একটা বিশেষ কমিটি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া লইতে সক্ষম হয়। অন্যান্য ব্যাপারে অবশ্য এই গ্রুপের মধ্যে তত ঘনিষ্ঠ ঐক্য দেখা যায় নাই। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আফ্রো-এশীয় ব্লকের সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিস্ট ঘেঁষা জাতিগুলিরও নিরপেক্ষ জাতিগুলি ও পারস্পরিক রক্ষা চুক্তির মারফত পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত যুক্ত জাতিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ বিদ্যমান ছিল। ১৯৬১ খৃ.-এ ঘানা, গিনি, মালী, মরক্কো ও মিসর (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র)-এর প্রতিনিধিগণ যখন ক্যাসাব্লাংকা গ্রুপ গঠন করেন তখন ঐ বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায়। এই কয়টি জাতি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ঘোষণা করে, আলজিরিয়ার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে এবং জাতিসঙ্ঘের কংগো (লিওপোল্ডভিল) প্রজাতন্ত্র সম্পর্কীয় নীতির নিন্দা করে। তিউনিসিয়া, কেনিয়া, লাইবেরীয়া, নাইজিরিয়া, টাংগানিকা এবং বিষুবীয় ও পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ প্রাক্তন উপনিবেশগুলি (শেষোক্ত ব্রাযাভিল গ্রুপ বলিয়া পরিচিত) লইয়া গঠিত মনরোভিয়া গ্রুপ অধিকতর পাশ্চাত্য সমর্থক। মনরোভিয়া গ্রুপের জাতিগুলি ক্যাসাব্লাংকা গ্রুপ সমর্থিত এবং ১৯৬১ খৃ.-এ (ঘানা, গিনি, ও মালী সমবায়ে) সংগঠিত আফ্রিকীয় রাষ্ট্র ইউনিয়ন (Union of African States)-এর কেন্দ্রীভূত মৈত্রীর পরিবর্তে শিথিল ধরনের জোট গঠনের অনুকূলে মত প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৫০।

(সংকলিত)

আল্-আব্ওয়া (الابواء) ঃ মক্কা হইতে মদীনাগামী পথের পার্শ্বস্থ কিনানার বানূ দামরা এলাকায়, আল-জুহ্'ফা হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। কাহারও কাহারও মতে এই নামটি ছিল আসলে সেখানে অবস্থিত একটি পাহাড়ের। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা আমিনা মদীনা (ইয়াছ্রিব) হইতে মক্কা ফিরিবার পথে এই স্থানে মারা যান এবং এইখানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তাঁহাকে মক্কাতে কবর দেওয়া হইয়াছিল (ত'াবারী, ১খ., ৯৮০)। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে কুরায়শগণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে অভিযানে স্বয়ং অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল এই আল-আব্ওয়া ও নিকটবর্তী ওয়াদ্দান অভিমুখে। কথিত আছে, মক্কার কুরায়শগণ ৩/৬২৫ সালে মদীনা অভিমুখে অভিযান করিয়া এই আল্-আব্ওয়াতে পৌঁছিলে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাটি খুঁড়িয়া আমিনার দেহাবশেষ তুলিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ কুরায়শ তাহাতে আপত্তি করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ১০৭, ৪১৫; (২) ইব্ন সা'দ, ১/১খ., ৭৩-৪; ২/১খ.,৩; (৩) তাবারী, পৃ. ১২৬৬-৭০; (৪) ওয়াকি'দী, ed. Wellhausen, ১৩০; (৫) ইয়াকূ'ত, ১খ., ১০০; (৬) Caetani, Annali, i, 157, 461; (৭) A. Sprenger, Die alte geographie Arabiens, 155 (তু. Burckhardt, Travels in Arabia, ii, 112 প.)।

W. Montgomery Watt (E.I.²)/হুমায়ুন খান

আবওয়াব (দ্র. দারবান)

আব্কায়ক (ابقايق) ঃ (শুদ্ধ রূপ বুক'য়ক'), সাউদী আরবের আল-হ'াসা' প্রদেশের একটি শহর ও তৈলক্ষেত্র। বর্তমান শহর হইতে প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে বালুকাভূমিতে বুকায়ক-এর স্বল্প গভীর পানির উৎস (নাবা)-এর নাম হইতে গৃহীত বুকায়ক ও আল-বাক্কা (একই পানির উৎস, উত্তর দিক হইতে দূরে নয়) আরবী মূল ধাতু বাক্কা-এর অর্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এই বাক্কার অর্থ পানি, ছারপোকা নয়। বেদুঈনগণ ঐ শহরের অবস্থান আবাল কিদান (যুবক উষ্ট্রের আবাস) নামে জানে।

আল-বায়দা-এর গভীর বালিয়াড়ি দ্বারা বেষ্টিত আব্কায়ক (৪৯° ৪০ পূ. দ্রাঘিমা, ২৫° ৫৫ উত্তর অক্ষাংশে) আজ-জাহরান ও আল-হুফহুফ-এর প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অভ্যন্তরীণ 'আরব ও পারস্য উপসাগরের আদ্-দাম্মাম ও রাস তান্নূরা সংযুক্তকারী প্রধান সড়কের উপরে এবং তদুপরি সাউদী সরকারের রেলপথ (আদ্-দাম্মাম—আর-রিয়াদ)-এর উপরে বিদ্যমান। ক্যালিফোর্ণিয়া এ্যারাবিয়ান-স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী কর্তৃক ১৩৫৯/১৯৪০-এ তৈলখনি আবিষ্কারের পূর্বে, (বর্তমানে এ্যারাবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানী) তথায় বসতি ছিল না। ১৩৭২/১৯৫২ সালে ১৩১০ জন আমেরিকানসহ লোকসংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ ছিল।

আমেরিকার ভূ-তত্ত্ববিদ Max Steineke বলিয়াড়ির এই মরুভূমিতে তৈল বাহির করিবার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী। তৈল খনি প্রায় ৩২ মাইল দীর্ঘ এবং সাড়ে ৫ মাইল প্রস্থ। এক সময়ে এই তৈল খনি পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল উৎপাদক খনি ছিল। ১৩৭০/১৯৫১ সালে ৬১ টি নলকূপ হইতে প্রত্যহ ৬,০০,০০০ ব্যারেল (৯০,০০০ টন) তৈল উত্তোলন করা হইত।

W. E. Mulligan (E.I.²)/এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

আবকারিয়ূস (ابكاريوس) ঃ ইসকান্দার আগা ইব্ন ইয়াকূ'ব, জন্মগতভাবে আরমানী ছিলেন। বৈরূতে জীবন অতিবাহিত করেন এবং অতি আগ্রহের সহিত 'আরবী কবিতা চর্চায় সারা জীবন মগ্ন ছিলেন। 'নিহায়াতুল-আরাব ফী আখ্বারিল-'আরাব' নামক তাঁহার লিখিত পুস্তক (Marsailles ১৮৫২ খৃ.), যাহা সংশোধনের পর 'তাযয়ীনু নিহায়াতিল-আরাব' নামে ১৮৫৮ খৃ. বৈরূতে মুদ্রিত হয় (আল-ওয়াত'নিয়া প্রেস ১৮৬৭ খৃ.)। ইতোপূর্বে উহা ইউরোপে খুব প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে উহা পরিত্যাজ্য বলিয়া গণ্য করা সমীচীন। উহার উৎস আবুল-ফারাজ ইস'ফাহানীর কিতাবুল-আগ'ানী ও 'আবদুল-ক'াদির আল-বাগ'দাদীর খিযানাতুল-আদাব। তাঁহার ইংরেজী-আরবী অভিধানের তৃতীয় মুদ্রণ আনু. ১৮৯২ খৃ. বৈরূতে সম্পন্ন হয়। [সারকীস তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহের মধ্যে কোন অভিধানের উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য এমন একটি অভিধান সংকলন তাঁহার ভ্রাতা আব্কারিয়ূস ইয়ূহ'ান্নার (মৃ. ১৮৮৯ খৃ.) প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, যাহার তৃতীয় সংস্করণ বৈরূতে ১৯০৩-১৯০৭ খৃ. মুদ্রিত হইয়াছে]। লেবানন-এর একটি ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি কায়রোর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (কুতুবখানাহ্ আল-খাদীবি'য়্যা, ৫খ., ১৭১)। [তাঁহার অন্যান্য আরও মুদ্রিত পুস্তক আছে, যাহার জন্য দ্র. সারকীস, উমূদ, ২৪]। ১৩০৩/১৮৮৫ সনে আব্কারিয়ূস-এর মৃত্যু হয়।

Brockelmann (দা. মা. ই.)/ এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

আবখায (ابخاز) ঃ ১। প্রকৃতপক্ষে আব্খায বা আফ্খায শব্দটি প্রাথমিক মুসলিম উৎসসমূহে জার্জিয়া বা জার্জিয়ান বুঝায় (সঠিকভাবে জুর্যান, দ্র.)। কারণ (নিম্নে ২নং-এর অধীনে তুলনা করুন), আবখাযিয়া হইতে নির্গত একটি রাজবংশ প্রাথমিক আব্বাসীদের সময় জর্জিয়া শাসন করে। আল-মাসউদী, ২খ., ৬৫ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় উত্তর কুর-এ আবখাযী রাজবংশ ও জর্জিয়ান নৃপতিদের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। যথার্থভাবে আবখায নামে অভিহিত সম্প্রদায়টি সম্ভবত কেবল ইব্ন রুস্তা, ১৩৯, কর্তৃক বর্ণিত কাহিনীতে উল্লিখিত হইয়াছে (লূগার শব্দটি আওগায পঠিত হয়)। [মারকুয়ার্ট, (Marquart), স্ট্রীফযোগ Streifzuge], ১৬৪-৭৬ ও হু'দূদুল-'আলাম, ৪৫৬ প. দ্র.] বিশেষভাবে ইব্ন রুস্তা ইহাদেরকে খাযার রাজ্যের শেষ প্রান্তবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২। আব্খায—কৃষ্ণসাগর তীরস্থ পশ্চিম ককেশিয়ার একটি ক্ষুদ্রতর গোত্র। ইহারা নিজেদেরকে বলিত আপস্-ওয়া (Aps-waa) এবং ইহারা Psow (প্সাউ) নদী (গাগ্রির উত্তরে) ও দক্ষিণে ইঙ্গুর নদীর মোহনার মধ্যে প্রধান গিরিশ্রেণী ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দী (সম্ভবত অনেক পূর্ব) হইতে এই গোত্রের একাংশ প্রধান গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া কুবান নদীর দক্ষিণস্থ উপনদীগুলির তীরে বসতি স্থাপন করে।

প্রচীন কালে আব্খায জাতি আবাসগই (Abasgoi, Arrian কর্তৃক) বা আবাসগি (Abasgi, Pliny কর্তৃক) বলিয়া উল্লিখিত হয় (তু.কন্টারিনি-Contarini ১৪৭৫ খৃ.) এভোকাযিয়া (Avocasia). প্রাচীনতর রূশ গ্রন্থে ওবেযি (Obezi), তুর্কীতে আবাযা (Abaza)। প্রাকোপিয়াস (Procopius), (৫ম শতাব্দী খৃ.)-এর বর্ণনানুযায়ী তাহারা লাজে (Lazes)-দের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই সময় আব্খাযিয়া হইতে কন্সটান্টিনোপলে খোজা ক্রীতদাসগণকে আনা হইত। জাস্টিনিয়ান দ্বারা অধিকৃত হইবার পর আব্খাযিয়াগণকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। জর্জিয়ার ইতিহাস (Brosset, Histoire de la Georgie, ১খ., ২৩৭-৪৩) অনুসারে আরব সেনাপতি মারওয়ান কুরু ('বধির মারওয়ান') দারিয়াল (Darial) ও দারবান্দ (Darband) গিরি সংকট অধিকার করিয়া আব্খাযিয়া (যেখানে জর্জিয়ার রাজা মির ও আর্চিলে [Mir & Arcil] পলায়ন করিয়াছিলেন) আক্রমণ করেন এবং সুখুম (Sukhum) ধ্বংস করেন। জর্জিয়ান ও আব্খাযিয়ানদের আক্রমণের সহিত আমাশয় ও বন্যার সংযোগ ঘটায় তাঁহার সৈন্যদলের বিপুল ক্ষতি হয় এবং তিনি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। এই ইতিহাসের তারিখগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে। মারওয়ান কুরু নামটি সম্ভবত মুহ'াম্মাদ ইব্ন মারওয়ান অথবা তৎপুত্র মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদকে বুঝায় অর্থাৎ ঘটনাটি ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগের সহিত সম্পৃক্ত (তু. আল্-বালাযু'রী, ২০৫, ২০৭-৯)। ৮০০ খৃস্টাব্দের দিকে আব্খাযগণ খাযারদের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করে। আন্চাবাদ (Ancabad) হইতে আগত স্থানীয় রাজবংশের রাজপুত্র (এরিস্তাভি) দ্বিতীয় লিওন (Leon) খাযার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং কুতায়সিতে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিফ্লীস-এর শাসনকর্তা ইস্হ'াক ইব্ন ইসমাঈলের আমলে (আনু. ৮৩০-৫৩ খৃ.) আব্খাযগণ আরবদের কর দান করে বলিয়া কথিত আছে। আব্খায রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী যুগ ছিল ৮৫০-ও ৯৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল। এই সময় তাহাদের রাজারা আব্খাযিয়া, মিনগ্রেলিয়া (Mingrelia-Egrisi), ইমেরেটিয়া (Emeritia) ও কার্টলিয়া (Kartlia) শাসন করিতেন এবং আর্মেনিয়ার ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতেন। তখন হইতে জর্জিয়ান ভাষা আব্খাযিয়ার শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়। ৯৭৮ সালে আব্খাযিয়ার রাজকুমারী গুরানদুখ্ত-এর পুত্র জর্জিয়ার বাগ্রাতী রাজবংশের ৩য় বাগরাতে আব্খাযিয়ার সিংহাসন অধিকার করিয়া ১০১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত জর্জিয়ান ভূমি একত্র করেন। তাঁহার মাতার ওয়ারিছী স্বত্বের উপর তাঁহার প্রাথমিক সফলতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া এবং পরবর্তী কালে গৃহীত উপাধিতে 'আব্খায-রাজ' উপাধি প্রাধান্য লাভ করায় মুসলমানরা জর্জিয়ান রাজ্যকে (ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত) আব্খাযিয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

১৩২৫ খৃস্টাব্দের দিকে শার্ভাশিদ্যে (Sharvashidze) বংশ [রুশ ভাষায় শের ভাসিদ্যে শিরওয়ান শাহ (দ্র.)-দের বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত] আব্খাযিয়ার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (রাজা ৬ষ্ঠ বাগ্রাত-এর অধীনে) শার্ভাশিদ্যেগণকে দেশের রাজারূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৪৫৯ খৃস্টাব্দে লিখিত ত্রেবিযোন্দের সম্রাটের এক পত্রের মর্মানুসারে দেখা যায়, আব্খাযিয়ার রাজাগণের ৩০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী ছিল।

কৃষ্ণ সাগরের পূর্বতীরে উছমানীদের বসতি স্থাপনের পরে আব্খাযরা তুরস্ক ও ইসলামের প্রভাবের আওতায় আসে। তবে খৃস্ট ধর্ম স্থানচ্যুত হয় ধীর গতিতে। লুক্কা-র ডোমিনিকান John-এর মতে তাঁহার সময় পর্যন্ত (১৬৩৭ খৃ.) আব্খাযরা খৃস্টান বলিয়া পরিচিত ছিল যদিও খৃস্টান আচার-আচরণ আর প্রতিপালিত হইত না। জর্জিয়া হইতে পৃথক হওয়ার পর আব্খাযরা পিটযুন্দ (Pitzund)-এ অবস্থিত তাহাদের নিজস্ব ক্যাথলিক পুরোহিতদের অধীন ছিল (ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই কথার উল্লেখ দেখা যায়)। ৮টি বৃহৎ ও প্রায় ১০০টি ক্ষুদ্র গির্জার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি আব্খাযিয়ায় বিদ্যমান আছে বলিয়া কথিত হয়।

১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা লিওন কর্তৃক তুর্কী আধিপত্য স্বীকৃতির পরে শার্ভাশিদ্যে বংশ ইসলাম গ্রহণ করে। এই কারণে লিওনকে সুখুম (Sukhum) দুর্গ প্রদত্ত হয়। আব্খাযরা ইতোপূর্বে আনুমানিক ১৭২৫-৮ খৃস্টাব্দে ইহা অবরোধ করিয়াছিল। রাজনৈতিকভাবে দেশটিকে তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। (১) উক্ত শার্ভাশিদ্যের অধীনে গাগ্রি (Gagri) হইতে গালিদয্গা (Galidzga) নদী পর্যন্ত উপকূলবর্তী প্রকৃত আব্খাযিয়া; (২) যেবেলদা (Tzebelda)-র উচ্চভূমি কোন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত; (৩) গালিদয্গা নদী হইতে ইংগুর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলবর্তী সামুরযাকান (Samrzakan) জনপদ (শার্ভাশিদযের বংশের এক শাখা কর্তৃক শাসিত,পরবর্তী কালে মিনগ্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত)।

১৮০১ খৃ. রাশিয়া কর্তৃক জর্জিয়া অধিকারের পর আব্খাযদের এই নূতন শক্তিশালী প্রতিবেশীর সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হয়। প্রথম চেষ্টা করেন আমীর কালাশ বেগ (Kelesh-Beg) ১৮০৩ খৃ., কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহা পরিত্যক্ত হয়। ১৮০৮ খৃ. এই আমীরের গুপ্তহত্যার পর তৎপুত্র সাফার বেগ রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসেন এবং স্বীয় ভ্রাতা পিতৃহন্তা আরসালান বেগের বিরুদ্ধে উহার সাহায্য দাবি করেন। ১৮১০ খৃ. রুশীয়রা সুখুম অধিকার করে। সাফার বেগ খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়া জর্জ নাম ধারণ করায় তাহাকে প্রিন্সরূপে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু তখন হইতে সুখুম একটি রুশ রক্ষীদলের দখলে থাকে। সাফার বেগের দুই পুত্র ডেমেট্রিয়াস (Demetrius) (১৮২১) ও মাইকেল (Mic-hael -১৮২২)-কে (তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার পরে) রুশ সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। তাহাদের শাসন সুখুম-এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার রক্ষীদল কেবল সমুদ্রপথেই রাজধানীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিত। আনাপা (Anapa) হইতে পোতি (Poti) পর্যন্ত সমগ্র উপকূল এলাকা (১৮২৯ খৃ. আদ্রিয়ানোপলের সন্ধিসূত্রে) অন্তর্ভুক্তির ফলে রাশিয়ার অবস্থান স্বভাবতই শক্তিশালী হয়। কিন্তু ১৮৩৫ খৃস্টাব্দেও কেবল দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বিযবিব (Bzbib) জেলাই প্রিন্স মাইকেলের দখলে ছিল বলিয়া কথিত হয়। অন্যান্য অংশ তাঁহার মুসলিম চাচাদের শাসনাধীন থাকে। পরবর্তী কালে রুশদের সাহায্যে মাইকেল প্রায় অপ্রতিহত শাসকরূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তুর্কীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

রুশদের দ্বারা পশ্চিম ককেশিয়ার চূড়ান্ত বিজয়ের পর (১৮৬৪) অন্যান্য দেশীয় রাজবংশের ন্যায় শার্ভাশিদ্য বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৮৬৪

খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে প্রিন্স মাইকেলকে তাহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিতে হয়। সুখুমের একটি বিশেষ প্রদেশরূপে আব্খাযকে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পিটযুন্দ (Pitzund), ওচেমচিরি (Ocemciri) ও যেবেলদা (Tzebelda) এই তিন জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খৃ. কর ধার্য করার উদ্দেশে নূতন শাসনকর্তা আব্খাযদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিলে এক বিদ্রোহ ঘটে। পরবর্তী কালে বহু আব্খায তুরস্কে চলিয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আব্খাযিয়ার লোকসংখ্যা হয় ৯০,০০০ এবং সমস্ত আব্খাযের (অর্থাৎ আব্খাযিয়ার বাহিরে উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী লোকদেরসহ) ১,২৮,০০০ বলিয়া হিসাব করা হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পরে আব্খাযিয়ার জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৬৫ হাজারে দাঁড়ায়। প্রায় জনশূন্য যেবেলদা জেলার মর্যাদা হারায় এবং একটি বিশেষ Settlement Curator (Popecitel naszeleniya)-এর অধীনে স্থাপিত হয়। পরে সমগ্র আব্খাযিয়াকে সুখুম কালে (সুখুম কাল'আ) জেলা নামে কুতাইস (Kutais) সরকারের একটি অংশে পরিণত করা হয়। দেশান্তর গমনের ফলে ইহাদের জনংখ্যা পুনরায় কমিয়া যায়, বিশেষত তুর্কী সৈন্যদের অবতরণের (১৮৭৭) দরুন পার্বত্য গোত্রগুলির বিদ্রোহে আব্খাযদের যোগদানের পর। ১৮৮১ খৃ. আব্খায্দের সংখ্যা মাত্র ২০,০০০ বলিয়া গণনা করা হয়। তুরস্কে আব্খায্দের কোন হিসাব পাওয়া যায় না।

৩। সোভিয়েত আব্খাযিয়া ১৯১৮ খৃ. স্বল্প কালের জন্য ও পরিশেষে ১৯২১ খৃ. সোভিয়েট আধিপত্য ঘোষিত হয়। ১৯৩০ খৃ. আব্খাযিয়া একটি স্বায়ত্তশাসিত গণতন্ত্ররূপে (A.S.S.R.) জর্জিয়ান গণতন্ত্রের (S.S.R.) অংশে পরিণত করা হয় এবং ১৯৩৭ খৃ. ইহার জন্য একটি বিশেষ শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। আবখাযিয়ার জনসংখ্যা ৩,০৩,০০০; কিন্তু এই সংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রকৃত আব্খাযিয়ান। ১৯৩৯ খৃ. সোভিয়েট ইউনিয়নের আব্খাযিয়ানদের সংখ্যা (অর্থাৎ স্পষ্টতর Cerkesia-এর উত্তরস্থ উপনিবেশগুলিসহ) ছিল সবসুদ্ধ ৫৯,০০০। রাজধানীতে (সুখুম) ৪৪,০০০ অধিবাসী আছে। এই প্রজাতন্ত্রটি উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসলের জন্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার পানি-সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে কাজে লাগান হইয়াছে (১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ৩৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল)। ককেশিয়ার ভাষাগুলির বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ জেনারেল ব্যারন পি. কে. উসলার (P.K. Uslar) [১৮৬৪খৃ.] যখন আব্খায বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন এবং একজন পুরোহিত ও দুইজন আব্খায জাতীয় কর্মচারী যখন বাইবেলের একটি ইতিহাস সঙ্কলন করেন, সেই সময় হইতে আব্খাযি বর্ণমালার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯১০ খৃ. নয়া সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা ডিমিট্রি গুলিয়া (Dimitri Gulia) (জ. ১৮৭৪) একটি জনপ্রিয় কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার পরে আরও গদ্য লেখক (জি.ডি. গুলিয়া প্যাপাসকিরি) ও কবি (কোগোনিয়া-Kogonia ১৯০৩-২৯) [এল. কিভিৎসিনিয়া-L.Kvitsinia] বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আব্খাযিয়ান লোকগীতি সংগৃহীত ও পাঠ্য পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে।

আব্খায বহু 'উপাদানে গঠিত' ভাষা কেরকিস ভাষার ন্যায় একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরাঞ্চলের Bzib উপ-ভাষায় ২টি স্বরবর্ণ ও ৬৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং দক্ষিণের Abzu ভাষায় ৫৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ রহিয়াছে। আব্যু ভাষাটি সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। অধুনা ইহা প্রয়োজনীয় পরিবর্ধনসহ জর্জিয়ান বর্ণমালায় লিখিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. F. Brosset, Hist. de la Georgie; (২) J. Marquart, Osteuropaische und ostasiatische Streifzuge, Leipzig 1903, Russian standard work (upto 1826) ঃ (৩) N. Dubrovin, History of the war and of the Russian rule in Caucasia, St. Petersburg 1871; দ্র. also an anonymous but competant riview of Dubrovin in the Sbornik swed. o kawkazskikh gortsakh, 6th part Tiflis 1872; (৪) p. Zubow kartina kawkazskago kraya. St.Petersburg 1834-5;(৫) A. Dirr,Einfuhrung in das Studium der Kaukas, Sprachen, 1940;(৬) G. Deeters, Der abchasische Sprachbau, in NGW Gott. 1913 iii/2, 289-303. In Russian: (৭) N.Y.Mar, Abkhaszkiy slovar, and the recent works by Serdiucenko and Tobil on nothern Abkharian dialects (1947-9).

W. Barthold-[v.Minorsky] (E.I.²)/ড. এম, কাদির

আব্জাদ (بجد) ঃ মুখস্থ করার সুবিধার্থে ২৮টি আরবী বর্ণমালাকে ভাগ করিয়া যে আটটি শব্দে বিন্যস্ত করা হইয়াছে, আব্জাদ উহাদের মধ্যে প্রথম শব্দ। আল-মাশরিক ('আরব ও তৎসংলগ্ন এলাকা)-এ শব্দগুলির ক্রম ও উহাদের স্বরচিহ্ন সাধারণত এইরূপ ابجد-هوز-حطى-كلمن-سعفص-قرشت-ثخذ-ضظغ.

আল-মাগরিবে (উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও পর্তুগাল) পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম শব্দের মধ্যে অক্ষরপুঞ্জের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে সেই পার্থক্য দেখান হইলঃ

ابجد-هوز-حطى-كلمن-صعفض-قرست-ثخذ-ظغش.

এই শব্দগুলির স্বরচিহ্নেও পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাচ্য (আল-মাশরিক) ক্রমের প্রথম ছয়টি অক্ষরপুঞ্জে ফিনিশীয় ভাষার বর্ণমালার ক্রম যথাযথভাবে বর্তমান রহিয়াছে। শেষের দুইটি অতিরিক্ত অক্ষরপুঞ্জে শুধু 'আরবীতে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই একত্র করা হইয়াছে। এইজন্য দুইটিকে روادف (বাহনের পিছনে আরোহণকারী) বলা হয়।

কার্যকারী দৃষ্টিভঙ্গীতে পরীক্ষা করিলে বর্ণমালার এই ক্রমসজ্জায় কৌতূহলের একটি মাত্র কারণ আছে। তাহা এই যে, (ইয়াহূদী-গ্রীকদের ন্যায়) প্রতিটি বর্ণেরই ইহার স্থান হিসাবে একটি সাংখ্যিক মূল্য নির্ধারিত করা হইয়াছিল। এই আটাশটি অক্ষরকে ১টি করিয়া তিনটি বর্ণশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যথাঃ

(১) প্রথম বর্ণ (الف) হইতে নবম বর্ণ (ط) পর্যন্ত একক সংখ্যা সূচিত হয়; যথাঃ الف =১, ب=২, ط=৯; (২) দশম বর্ণ (ى) হইতে

১৮তম বর্ণ (ص) পর্যন্ত দশক সংখ্যা সূচিত হয়, যথাঃ ى=১০, ل=২০, ص=৯০; (৩) ১৯তম বর্ণ (ق) হইতে ২৭তম বর্ণ (ظ) পর্যন্ত শতক সংখ্যা সূচিত হয়; যথাঃ ق= ১০০, ظ= ৯০০; সর্বশেষ অক্ষর غ -এর সাংখ্যিক মান হইল ১০০০। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম অক্ষরপুঞ্জের অক্ষরগুলির সংখ্যামান উল্লিখিত অক্ষরপুঞ্জ বিন্যাসদ্বয়ের প্রেক্ষিতে পৃথক হইবে। উদাহরণ রূপঃ بسم الله الرحمن الرحيم -এর সংখ্যামান এইরূপঃ

(ب) +২ (س) ৬০+(م) ৪০+(ا) ১+(ل) ৩০
+(ل) ৩০+(ه) ৫+(ا) ১+(ل) ৩০+(ر)
২০০+(ح) ৮+ (م) ৪০+(ن) ৫০+(ا)
১+ (ل) ৩০+(ر) ২০০+ (ح)
৮+ (ى) ১০+ (م) ৪০=৭৮৬।

সংখ্যা হিসাবে 'আরবী অক্ষরের ব্যবহার সর্বদাই সীমাবদ্ধ ও ব্যতিক্রমরূপে হইয়া আসিতেছে, ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার হয় না। কারণ আসল সংখ্যা (দেখুন, গণিতশাস্ত্র প্রবন্ধ, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় সংস্কারণ) অক্ষরের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঐগুলি এখনও ব্যবহৃত হইতেছে ঃ (১) উসতুরলাব (Astrolabe) নামক যন্ত্রে সংখ্যাসূচক অক্ষরের ব্যবহার; (২) উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যথা জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির সন-তারিখ জ্ঞাপক খণ্ড পদ্যে (শিলালিপি প্রভৃতিতে) ইহা এক বিশিষ্ট রীতিতে ব্যবহৃত হয়, ইহাকে আল-জুম্মালও বলা হয় (দেখুন, গণিত ও ইতিহাস প্রবন্ধ, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ); (৩) ভাগ্য গণনা, শুভাশুভ নির্ণয় ও কয়েক প্রকার বিশেষ উপলক্ষের তারিখ লিখিবার কাজে ব্যবহার (যথাঃ ب-২, د-৪, و-৬, ح-৮ ইত্যাদি সংখ্যা (بدوح); এখনও উত্তর আফ্রিকার 'তালিব' [ফকীর বা যাহারা তাবীয (تعويذ) লেখা, ঝাড়ফুঁক দেওয়া প্রভৃতি কাজ করে] টোনা, টোটকা প্রভৃতি কতগুলি কাজের জন্য বিশিষ্ট নিয়মে গাণিতিক মানের ভিত্তিতে অক্ষরের ব্যবহার করে। এই নিয়মকে ايقش। বলা হয়; ايقش।-এর বর্ণগুলির ক্রমিক মান নিম্নরূপ ঃ ১, ১০, ১০০, ১০০০। যাহারা এই প্রকার 'আমল করে দেশীয় ভাষায় তাহাদেরকে يقاش বলে; (৪) বর্তমান কালের রীতি অনুসারে পুস্তকের ভূমিকা ও সূচীপত্রের পত্রাঙ্ক নির্দেশে ব্যবহার; এইরূপ স্থলে ইউরোপীয়গণ রোমীয় অঙ্ক (যথা i, ii, v, ইত্যাদি) ব্যবহার করেন।

আরবী বর্ণমালার এই আবজাদী বিন্যাস যদিও নিশ্চিতই বহু পুরাতন, তথাপি বর্ণের ধ্বনি অথবা আকৃতির সহিত এইগুলির কোন বিশেষ সামঞ্জস্য নাই।

প্রথম ২২টি বর্ণের বিন্যাস 'রা'স শামরা'য় (লাযিকিয়া বা atakia-র নিকট অবস্থিত একটি আরব গ্রাম) আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন ফলকেও রহিয়াছে। এই ফলকে খৃ. পূ. চতুর্দশ শতাব্দীর উগারীয়দের ব্যবহৃত তীরাক্ষর বর্ণমালারও তালিকা রহিয়াছে। উগারীর ভাষা প্রাচীন হিব্রু ভাষার সহিত সম্পর্কিত একটি সামী (Semitic) ভাষা (Ch. Virolleaud, L'abecediairede Ras Shamra, in GLECS, 1950, P. 57)। সুতরাং অন্তত এই আবজাদী বিন্যাসের মূলত কান'আনী হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ইহাও সত্য, হিব্রু ও আরামী বর্ণমালাতেই এই বিন্যাস প্রণালী বর্তমান আছে এবং নিঃসন্দেহে 'আরবগণ হিব্রু বর্ণগুলি এই ক্রমবিন্যাস প্রণালীসহ উক্ত ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। অন্যদিকে 'আরবগণ অপর সামী ভাষাগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, উপরন্তু তাহারা গভীর আত্মসম্মান জ্ঞান ও জাতীয় গৌরববোধের অধিকারী ছিল, তাহাদের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতাও ছিল। এইসব কারণে তাহারা এই বর্ণমালা বিন্যাস প্রণালীর অর্থাৎ আব্জাদ প্রভৃতি (যাহা তাহারা ঐতিহ্য হিসাবে পাইয়াছিল আর যাহা তাহাদের জন্য বোধগম্য ছিল না) উদ্ভবের অপর কারণ অনুসন্ধান করিত। এই সম্পর্কে তাহারা যাহা বলিয়াছে যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, এইগুলি কাল্পনিক কাহিনীমাত্র। একটি বর্ণনা এইঃ মাদ্‌য়ানের ছয়জন বাদশাহ 'আরবী বর্ণমালাকে তাঁহাদের নামানুসারে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। আর একটি বর্ণনা হইল, বর্ণমালার ক্রমবিন্যাসের প্রথম ছয়টি শব্দ ছয়জন দেবতার নাম। তৃতীয় আর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, উহা সপ্তাহের দিনগুলির নাম। Sylvestre de Sacy উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছেন, এই সমস্ত বর্ণনায় শুধু প্রথম ছয়টি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া শুক্রবারের নাম ثخذ না বলিয়া عروبة বলা হইয়াছে। এই সমস্ত সন্দেহযুক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, পূর্বে 'আরবী বর্ণমালায় শুধু ২২টি হরফ ছিল, গ্রহণযোগ্য হইবে না (J. A. Sylvestre de Sacy, Grammaire arabe, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৯ম ভাগ)। 'আরবদের মধ্যেও এমন বড় বড় ব্যাকরণবিদ, যথা আল-মুবাররাদ, আস্-সীরাফী প্রমুখ ছিলেন যাঁহারা আবজাদ সম্বন্ধীয় এই সকল কাল্পনিক গল্প বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহারা পরিষ্কার বলিয়াছেন, এই সমস্ত মুখস্থ করিবার পক্ষে সহায়ক শব্দগুলি 'আরবী নহে।

কিন্তু এই সমস্ত কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যেও একটি কথা উল্লেখযোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন, মাদ্‌য়ানের ছয় বাদশাহ্‌র মধ্যে এক বাদশাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন (كان رئيسهم)। ইনি ছিলেন كلمن তাঁহার নাম সম্ভবত ল্যাটিন 'elementum' (প্রথম, প্রাথমিক) শব্দের সহিত সম্পর্কিত ছিল। বর্ণমালার দ্বিতীয় ক্রমবিন্যাস, যাহা এই আবজাদী বিন্যাসের সঙ্গেই বর্তমান এবং বর্তমানে যাহা প্রচলিত সে সম্বন্ধে দেখুন, বর্ণমালা প্রবন্ধ (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় সংস্করণ)।

ইহার উপর বলা যায়, উত্তর আফ্রিকার বিশেষণ পদ ابوجادى। এখনও প্রাথমিক, নূতন ও অপরিপক্ক (শাব্দিক অর্থে যাহা এখনও বর্ণমালার পর্যায়েই আছে) অর্থে ব্যবহৃত হয় (তুলনা করুন, ফারসী ও তুর্কী ابجد خوان। ইংরেজী abecedaran,জার্মান Abeschuler)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Lex., দ্র. আবজাদ শব্দ;(২) তাজুল'-আরূস د ج ب ধাতুগত শব্দ; (৩) আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৪-৫; (৪) Cantor, Vorl. uber Gesch. d. Math., তৃতীয় সং., ১খ., ৭০৯; (৫) Th. Noldeke, Die semitschen Buchstaben-namen, in Beitrge zur semit. Sprachwiss, 1904, 124; (৬) H. Buetr, wieist die Reihenfolge der Bichstaben im Alphabet zustande gekommen ZDMC, 1913, p. 501;(৭) G.S. Colin, De I'origine grecque des "chiffrs de Fes" et de nos 'chiffres

arabes' JA, 193, p., 1933; (৮) J. Fevrier, Historie de I' ecriture, 1948, P. 222; (৯) D. Diringer; The Alphabet, 1948; (১০) M.G. de Slane, Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, i, 241-253; (১১) E. Westermarck, Ritual and belief in Morocco, i,144; (১২) E. Doutte, Maige et religion dans I'afrique. du Nord, p. 179-195.

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ/ দা. মা. ই)

'আব্দ (عبد) ঃ ক্রীতদাস, ভৃত্য।

(১) সামাজিক ও আইনগত অর্থে

(ক) প্রাচীন 'আরবে দাসপ্রথাঃ দাসপ্রথা একটি অতি প্রচীন প্রথা। প্রচীন পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 'আরবেও ইহার প্রচলন ছিল। ইয়াহূদী, খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্মেও দাসপ্রথার সমর্থন রহিয়াছে। ইসলাম শুধু সেই সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে দাসে পরিণত করিতে অনুমতি দেয়, যাহারা মুসলিম দেশের প্রজা নহে অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিবদ্ধ অপর দেশের প্রজা নহে।

পুরুষ ক্রীতদাসকে সাধারণত 'আরবীতে 'আব্দ (ব.ব. 'আবীদ= عبيد) অথবা মামলূক (مملوك দ্র.) এবং স্ত্রী দাসকে আমাঃ (امة) অথবা জারিয়াঃ (جارية) বলা হইত।

দাসত্ব প্রথাটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মর্মপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। عبدى 'আমার দাস' বা امتى 'আমার দাসী' এইরূপ কথা তিনি পসন্দ করিতেন না। তিনি নির্দেশ দেন, তাহাদেরকে হয় فتاى আমার যুবক, فتاتى আমার যুবতী বা غلامى আমার বালক বা ছোকরা- এই জাতীয় আখ্যায় সম্বোধন করিতে হইবে (বুখারী, রাশীদিয়া, ১খ., ৩৪২)।

শিশু ও নারী যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে যুদ্ধে বন্দী হইত তাহাদেরকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত না করিলে প্রাচীন প্রথানুযায়ী তাহারা দাসে পরিণত হইত। এইভাবে বানূ মুসতালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহু স্ত্রীলোক মুসলিমগণের হস্তগত হয়। ইহাদের মধ্যে জুওয়ায়রিয়া বিন্ত আল-হারিছও ছিলেন। ইনি ছাবিত ইব্ন কায়সের অংশে পড়েন। ছাবিত তাঁহাকে মুক্তিপণে আযাদী দিতে রাযী হইলেন এবং পণের পরিমাণও নির্ধারিত হইল। জুওয়ায়রিয়া তখন মহানবী (স)-এর নিকট মুক্তিপণ আদায়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহানবী (স) তাঁহার মুক্তিপণ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। তিনি মহানবী (স)-এর মহানুভবতা দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। মহানবী (স) তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই অপ্রত্যাশিত শুভ পরিণয় মুসলিমগণকে বানূ মুসতালিকের অন্যান্য নারী বন্দীদেরকে মুক্তি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ তাঁহারা চিন্তা করিলেন, মহানবী (স) যেই গোত্রের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, সেই গোত্রের কোন নারীকেই ক্রীতদাসীরূপে রাখা উচিৎ হইবে না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় 'আরবে ইসলাম-পূর্ব যুগে ক্রয়সূত্রে ও লুণ্ঠন মাধ্যমে স্বাধীন লোককে বন্দী করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবার প্রথাও ছিল। উদাহরণত যায়দ ইব্নুল-হ'রিছ'র নাম করা যায়। যায়দ ছিলেন সম্ভ্রান্ত বানূ কাল্ব গোত্রের সন্তান। একদিন শৈশবকালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজ গোত্রে গমন করিতেছিলেন । এমন সময় কয়েকজন অশ্বারোহী হঠাৎ তাঁহাদেরকে আক্রমণ করে। যায়দ তাহাদের হাতে বন্দী হন। তাহাদের নিকট হইতে হযরত খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা হ'াকীম ইব্ন হিযাম তাহাকে খরিদ করেন এবং তাঁহাকে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট বিক্রয় করেন দোসাদুক। মহানবী (স)-এর সহিত খাদীজার বিবাহ হইলে তিনি যায়দকে উপঢৌকনস্বরূপ মহানবীকে প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) অচিরেই তাঁহাকে মুক্তি দিলেও যায়দ তাঁহার নিকটেই থাকিয়া যান। মহানবী (স) তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ ও প্রতিপালন করেন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কয়েকজন কালব গোত্রীয় ব্যক্তি মক্কায় যায়দকে দেখিয়া চিনিতে পারেন এবং তাঁহার পিতাকে এই সংবাদ দেন। যায়দের পিতা পুত্রকে মুক্ত করার জন্য দ্রুত মক্কায় উপস্থিত হইয়া মহানবী (স)-কে বলিলেন, আমরা উহার মুক্তিপণ দিতেছি, আপনি উহাকে স্বাধীনতা দিন। মহানবী (স) যায়দকে পিতার সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু যায়দ মহানবী (স)-এর নিকট অবস্থান করাই অধিকতর শ্রেয় মনে করিলেন।

সেই সময় বহু 'আরবও ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব হইতেই দাসে পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম-পূর্ব আরবে বহু কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় ক্রীতদাস 'আরবে ছিল। ইহাদেরকে আফ্রিকা ও 'আরবের উত্তরাঞ্চল হইতে আমদানী করা হইত (G. Jacob ,Altarab. Beduinenleben, 2nd ed., P.137; 'আন্‌তারা মু'আল্লাকা শ্লোক ২৭, সম্পা. Arnold, p.153)। কথিত আছে, 'উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম এই নীতি নির্ধারণ করেন, যুদ্ধবন্দীই হউক অথবা মূল্য প্রদানে ক্রয় করাই হউক, কোন অবস্থাতেই কোন 'আরবকেই ক্রীতদাসে পরিণত করা যাইবে না, শুধু অনারবগণই ক্রীতদাসে পরিণত হইতে পারিবে (তু. A. Von Kremer. Kulturgesch. des orients unter den chalifen.i.104)। যাহা হউক, ইসলামী শারী'আতে কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিমকে ক্রীতদাসে পরিণত করা নিষিদ্ধ। কাজেই মুসলিম পিতা-মাতার জন্য সন্তান বিক্রয় নিষিদ্ধ (তু. E.W.Lane, Modern Egyptians, i, ch. vii, Domestic Life; the lower orders)। উত্তমর্ণও তাহার মুসলিম খাতককে ঋণের দায়ে দাসরূপে বিক্রয় করিতে পারে না। রোমান আইনে উহা সিদ্ধ ছিল। কিন্তু দাসগণ পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করিলেও (অধিকাংশই তাহা করিত) তাহারা দাস থাকিয়া যাইত। স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রয়সূত্রে দাসে পরিণত করা প্রথম চারি খলীফার যুগে অজ্ঞাত ছিল। অন্তত তাঁহাদের আমলে ক্রয় দ্বারা দাস সংগ্রহের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না (Syed Ameer Ali, Spirit of Islam , London, p. 267)। কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, উক্ত প্রকার বিক্রয় 'আদালতে অগ্রাহ্য।

(খ) কুরআন ও হাদীছ- এ عبد শব্দের ব্যবহার

ইসলাম-পূর্ব 'আরব ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের দাসগণের দুরবস্থা সম্পর্কে কুরআনের কয়েক স্থানে আলোকপাত করা হইয়াছে। যথা ১৬ ঃ

৭৫ আয়াত; অন্যপক্ষে কুরআনে দাসগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার আদেশ প্রদান করে (৪ ঃ ৩৬; ১৬ ঃ ৭১)। দাসগণকে তাহাদের স্বাধীনতা ক্রয়ের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য যাকাত-সাদকার অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা কুরআনে রহিয়াছে। কুরআনের ভাষায় (فك رقبة ঘাড় ছাড়ান) অর্থাৎ দাসের মুক্তি একটি অতি পুণ্য কর্ম। একই অর্থে فى الرقاب (একবচন رقبة) অথবা تحرير رقبة কুরআনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনিচ্ছাকৃত হত্যা দণ্ড (৪ঃ ৯২), শপথ ভঙ্গ করার অপরাধ স্খালন (৫ঃ ৮৯) এবং জিহারের [দ্র,] কাফফারা (৫৮ ঃ ৩) স্বরূপ দাসকে স্বাধীনতা প্রদানের বিধান যেই সকল আয়াতে রহিয়াছে তাহাতে 'রাকাবা ও রিকাব' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রীতদাসদের সহিত সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (২৪ঃ৩১-৩৩) তাহাতে উল্লিখত হইয়াছে, পরিবারের অন্য সকলের সহিত দাসগণের সম্পর্ক সম্মানজনক ও বন্ধুত্বমূলক হইতে হইবে। ক্রীতদাসীদেরকে যৌনবৃত্তিতে নিয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (২৪ঃ৩৩)। ২৪ঃ৩৩ আয়াতে ক্রীতদাস প্রার্থনা করিলে তাহাকে কিতাবা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা দানের লিখিত চুক্তির সুযোগ দিতে আদেশ করা হইয়াছে। কুরআনের একটি অভিনব বিধানে বিবাহের ব্যাপারে মুশরিকা (অংশীবাদী) স্বাধীন স্ত্রী বা পুরুষ অপেক্ষা মুসলিম ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাসকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে (২ঃ২২১)।

প্রাক-ইসলামী যুগে মেয়েরা সাধারণ তৈজসপত্রের শামিল ছিল। ক্রীতদাসী ছিল নিম্নতর, যৌন মিলনসহ মালিক তাহাকে সর্বপ্রকারে ব্যবহার করিত। ইসলাম প্রত্যক্ষভাবে এই প্রথা নিষিদ্ধ করে নাই; কিন্তু দাস-দাসীর বিবাহের আদেশ দিয়া (২৪ঃ৩২) পরোক্ষভাবে এই প্রথার ক্রমোচ্ছেদের পথ করিয়াছে। দাসী সন্তানের জননী (উম্মুল-ওয়ালাদ দ্র.) হইয়া পড়িলে সে প্রায় স্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

হাদীছ সংগ্রহগুলিতে সাধারণত তিনটি অধ্যায়ে দাসদের বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়ঃ اعتاق (দাসকে মুক্তি দান), الولاء (মুক্তিদাতা ও মুক্তদাসের পারস্পরিক উত্তরাধিকার সম্পর্ক) ও كتابة (পণের বিনিময়ে মুক্তিদানের লিখিত চুক্তি)। হাদীছে ক্রীতদাসদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে বরাবর আদেশ করা হইয়াছে। তাহারা মুসলিমগণের ভ্রাতা। যে ক্রীতদাসকে প্রহার করিবে সে ঐ দাসকে মুক্তি দিলেই তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। বিভিন্ন অপরাধের জন্য গোলাম আযাদ করা একটি বিশেষ নীতি। বিভিন্ন অবস্থায় দাসদের দণ্ডবিধি, দাস ক্রয়-বিক্রয় ও তাহাদের বিবাহের ব্যাপারে যে সকল খুঁটিনাটি বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন দেখা গিয়াছে (তু. Wensinck, Handbook, দ্র. Slaves, Manumission etc.)। দাসমুক্তি সম্পর্কে বর্ণিত অনেক হাদীছে ক্রীতদাসী 'বারীরা'-এর উল্লেখ দেখা যায়। হযরত 'আইশা (রা) মুক্তিদানের জন্য বারীরাকে ক্রয় করিতে চাহেন। তাঁহার মনিব পক্ষ এই শর্তে বিক্রয় করিতে রাযী হয়, মুক্তি দানের পর ولاء অর্থাৎ উত্তরাধিকারের স্বত্ব তাহাদের (মনিবপক্ষের) হাতেই থাকিয়া যাইবে। এই শর্তের বিরোধিতায় মহানবী (স) বলেন ঃ انما الولاء لمن اعتق (যে স্বাধীনতা দিবে উত্তরাধিকার তাহারই)। তারপর তিনি এই জাতীয় শর্তে বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দেন (বুখারী, রাশীদিয়্যা, ১খ., ৩৪৩ প.)।

(গ) শারী'আতে ক্রীতদাস সম্পর্কে বিধান

হাদীছের ন্যায় ফিক্হশাস্ত্রেও বিভিন্ন অধ্যায়ে দাস সম্বন্ধে বিধানসমূহ ছড়াইয়া রহিয়াছে। অধুনা বিভিন্ন প্রধান বিষয়গুলি নানা পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে (তু. Juynboll, Handleiding, p. 232 প; Bergstasser, Grundzge, p. 38 প.; Santillana, Istiuzioni, p.111 প.)।

তাত্ত্বিক বিচারে ক্রীতদাসের কোন অধিকারই নাই। অন্যান্য দেশের আইনের ন্যায় মুসলিম আইন অনুসারেও তাহারা বস্তু মাত্র, তাহাদের মনিবের সম্পত্তি। মনিব তাহাদেরকে কতকগুলি ক্ষেত্র ব্যতীত বিক্রয়, দান, মাহর প্রদান অথবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে পারে। তাহারা কোন লেনদেনের পক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা কিছু হস্তান্তর বা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। মুকাতাব ইহার ব্যতিক্রম, কারণ সে অর্থ উপার্জনের অধিকারপ্রাপ্ত। তাহারা অভিভাবক বা ওয়ালী হইতে পারে না। তাহারা যাহা আয় করিবে তাহা তাহাদের মনিবের হইবে। মুকাতাব ইহারও ব্যতিক্রম। ক্রীতদাস কোন বিচারালয়ে কোন মামলায় সাক্ষী হইতে পারে না। সে কেবল মনিবের অনুমতিক্রমে (প্রতিনিধি বা কর্মচারীরূপে) তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন চুক্তি করিতে অথবা দায়িত্ব লইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে مأذون له বা অনুমতিপ্রাপ্ত বলা হয়।

ক্রীতদাসী ও তাহার মনিবের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের কোন অবকাশ নাই। কারণ বিবাহ বন্ধন একটি সীমিত সম্পর্ক মাত্র স্থাপন করে, অথচ মনিব দাসীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে। বিবাহের সহিত মাহরের সম্পর্ক অপরিহার্য, অথচ দাসী মাহরের মালিক হইতে পারে না; অন্যপক্ষে তালাক দিলেও দাসীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। সুতরাং বিবাহ করিবার জন্য দাসীকে আযাদ করিতে হইবে। ক্রীতদাসও অনুরূপ কারণে তাহার মহিলা মনিবকে বিবাহ করিতে পারে না। ব্যাপারটি একান্তভাবে আইনগত (statutory)। ক্রীতদাসীর সহিত অপর ক্রীতদাস বা স্বাধীন ব্যক্তির বিবাহ বৈধ। ক্রীতদাস-দাসিগণ তাহাদের মনিবের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিতে পারে। তাহারা শুধু দুইটি পর্যন্ত (স্বাধীনই হউক অথবা ক্রীতদাসই হউক) স্ত্রী রাখিতে পারে। কিন্তু মালিকীদের মতে তাহারা স্বাধীন পুরুষের ন্যায় চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় ক্রীতদাসও মাহর দিতে বাধ্য এবং তজ্জন্য সে উপার্জনের অনুমতি লাভ করে। ক্রীতদাসীর মাহর তাহার মনিব পায়, কারণ ক্রীতদাস-দাসী কোন সম্পত্তির অধিকার লাভ করে না। ক্রীতদাস তাহার স্ত্রীকে দুইটি মাত্র তালাক দিতে পারে। দাসী স্ত্রীর 'ইদ্দাত স্বাধীনা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তবে ব্যতিক্রম এই যে, কোন ক্রীতদাসীর স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার 'ইদ্দাতের মেয়াদ ২ মাস ৫ দিন, ৪ মাস ১০দিন নহে এবং তালাক বা অন্য কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে 'ইদ্দাতের মেয়াদ হয় দুই কু'রূ' (দ্র. 'ইদ্দাত), তিন কু'রূ' নহে। বিবাহিতা ক্রীতদাসীর গর্ভস্থ সন্তানের মালিক হইবে তাহার মনিব।

একজন স্বাধীন ব্যক্তি শারী'আত অনুযায়ী অপর কাহারও ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সন্তান এই ক্রীতদাসীর মনিবের ক্রীতদাস হইবে। এইজন্য অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে কেবল নিম্নলিখিত শর্তেই একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসীর মধ্যে বিবাহ

হইতে পারে ঃ (১) যদি সেই স্বাধীন ব্যক্তি অবিবাহিত হয়; (২) যদি স্বাধীনা স্ত্রীলোকের যোগ্য মাহর দিবার সংগতি তাহার না থাকে; (৩) অবিবাহিত থাকিলে তাহার পক্ষে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে; (৪) ক্রীতদাসীটি মুসলিমা হইতে হইবে (৪ঃ২৫)। হানাফীগণ আহ্ল কিতাব অর্থাৎ খৃষ্টান ও ইয়াহূদী ক্রীতদাসীর সহিত এই প্রকার বিবাহ সমর্থন করেন। তাহারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তীর্দ্বয়কে অবশ্য পালনীয় মনে করেন।

মনিবের ঔরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান হইলে স্বাধীন পিতার অনুবর্তিতায় সন্তানও স্বাধীন হইবে। এই নীতি সর্বপ্রথম ইসলামই প্রবর্তন করে। ইসলাম-পূর্ব 'আরবে এই প্রকার সন্তান মাতার অনুবর্তীরূপে ক্রীতদাস শ্রেণীভুক্ত হইত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খাঁটি 'আরবগণ ভাবিতেই পারিত না যে, ক্রীতদাসীরা তাহাদের মনিব অর্থাৎ স্বাধীন সন্তান (যাহারা পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে দাসী মায়ের মালিক হইতে পারে) প্রসব করিবে। ইসলামী সমাজে ক্রীতদাসী, এমনকি খলীফার জননীও হইতে পারে (দেখুন J. Wellhausen, Die Ehe bei den alten Arabern, in NGW Gott. phil.-hist., kI,; 1893,p.440; A von Kremer, পৃ. স্থা., ii, 106; G. Jacob,পৃ. স্থা., p. 213; Aghani, vii. 149; তু. J.L. Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, London 1831, i, 182)।

যে ক্রীতদাসীর গর্ভে তাহার মনিবের ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাকে উম্মু ওয়ালাদ (ام ولد) অর্থাৎ তাহার সন্তানের মাতা বলা হয়। উম্মু ওয়ালাদ মনিবের মৃত্যুর পর আপনাতেই স্বাধীন হইয়া যায়। মনিবের উম্মু ওয়ালাদকে বিক্রয়, দান প্রভৃতি কোন প্রকারেই হস্তান্তর করিতে পারে না।

মুসলিম মনিবের শুধু তাহার মুসলিম, ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিতে পারে (মুশরিক দাসীর সহিত নহে)। শাফি'ঈ ফকীহগণ আধুনিক খৃষ্টান ও ইয়াহূদীগণকেও যথাক্রমে 'ঈসা (আ) ও উযায়র (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণে মুশরিক শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। সুতরাং এই বিশ্বাস পোষণকারী ইয়াহূদী ও খৃষ্টান দাসীর সহিত মুসলিম মনিবের সঙ্গম নিষিদ্ধ।

ক্রয় অথবা অপর কোন সূত্রে যে ব্যক্তি ক্রীতদাসীর মালিক হয়, তাহার জন্য ঐ ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী নহে—ইহা নিশ্চিতরূপে জানার পূর্বে সহবাস নিষিদ্ধ, যেন ক্রীতদাসীর গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে। এইজন্য তাহাকে এক ঋতুকাল বা ঋতুহীনা হইলে এক মাস অপেক্ষা করিতে হয়। 'আরবীতে ইহাকে ইস্তিবরা' (استبراء) বলা হয়।

(ঘ) স্বাধীনতা প্রদান ও উত্তরাধিকার

ইসলামে গোলাম আযাদ করা একটি অতিশয় পুণ্য কাজ। ইহার জন্য পরকালে পুরস্কারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি একটি মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবে সে পরকালে জাহান্নামের অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবে (বুখারী, রাশীদিয়্যা, ১খ., ৩৪২)।

যদি কোন ক্রীতদাস একাধিক ব্যক্তির এজমালি সম্পত্তি হয় এবং তাহাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার অংশ স্বাধীন করিয়া দেয়, তবে স্বাধীনতা প্রদানকারী সক্ষম হইলে অন্য অংশীদারদের অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া দাসটিকে সমগ্রভাবে আযাদ করিয়া দিবে। ঐ ব্যক্তি তাহাতে সক্ষম না হইলে শুধু তাহার অংশই স্বাধীন হইবে। এই প্রকার দাসকে বিভক্ত (مبعض) দাস বলা হয়।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, উম্মু ওয়ালাদ তাহার মনিবের মৃত্যুতে আপনাতেই আযাদ হইয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহার নিকটতম কোন আত্মীয়ের দাসে পরিণত হইলে সেও আপনাতেই স্বাধীন হইয়া যায়। শাফি'ঈ মতে এই অবস্থায় শুধু মালিকের সরাসরি ঊর্ধ্বতন (পিতা, পিতামহ ইত্যাদি) অথবা অধস্তন (পুত্র, পৌত্র ইত্যদি) আত্মীয়ই দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। মালিকীদের মতে তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নিও মুক্তি পাইবে। হানাফীদের মতে যে আত্মীয়দের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ (মুহাররাম), তাহাদের প্রত্যেকেই মুক্তি লাভ করিবে।

যদি কেহ তাহার ক্রীতদাসকে বলে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ হইবে, তাহা হইলে ঐ ক্রীতদাসকে মুদাব্বার (مدبر) এবং এই ব্যবস্থাটিকে তাদবীর (تدبير) বলে। হানাফী ও মালিকী ফাকীহদের মতে একবার তাদবীর ঘোষণা করিলে তাহা বাতিল করা যায় না। শাফি'ঈদের মতে দান, হেবা (هبة) ইত্যাদি যেমন, তাদবীরও সেইরূপ বাতিল করা যায়। সুতরাং মুদাব্বারকে হস্তান্তর করা যায় এবং হস্তান্তরিত হইলে তাদবীর বাতিল হইয়া যায়। তবে এই বিষয়ে সকলেই একমত, মনিবের মৃত্যু হইলে তাদবীর অবশ্যই কার্যকরী হইবে যদি তাহা বাতিল না করা হয় বা দাসটি হস্তান্তরিত না হয়।

কিতাবাত (كتابة আত্মক্রয়) সূত্রে স্বাধীনতা লাভের উপায়।

প্রাচীন আরবেও এই প্রথা বর্তমান ছিল (উপরে উল্লিখিত জুওয়ায়রিয়া প্রসঙ্গ ও কুরআন ২৪ঃ৩৩ তুলনীয়)। ইহা স্বাধীনতা প্রদানের চুক্তিমূলক উপায়। ইহাতে ক্রীতদাস তাহার স্বাধীনতার জন্য মনিবকে নির্ধারিত মূল্য প্রদানের অঙ্গীকার করে তখন এই দাসকে বলা হয় মুকাতাব (مكاتب)। শাফি'ঈদের মতে এই পণ দুই অথবা তিন কিস্তিতে দেয়। এই চুক্তি মালিক বাতিল করিতে পারে না, ইচ্ছা করিলে মুকাতাব ইহা বাতিল করিতে পারে। মালিক ক্রীতদাসকে চুক্তিকৃত অর্থ উপার্জন করিতে দিতে বাধ্য। ক্রীতদাসও নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকে। মুকাতাব হস্তান্তরযোগ্য নহে।

ক্রীতদাসকে তাহার স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় সাহায্য করাও অতিশয় পুণ্যজনক। শফি'ঈদের মতে মনিবের কর্তব্য নির্ধারিত মূল্য কিছুটা হ্রাস করা। গোলাম আযাদ করার কাজে যাকাত ও অন্যান্য সাদকার কিছু অংশ ব্যয় করার নির্দেশ রহিয়াছে। যদি কোন ক্রীতদাস কিতাবাত প্রার্থনা করে এবং স্বাধীনতার পর জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে মালিকের কর্তব্য তাহাকে কিতাবাতের সুযোগ প্রদান করা। মুসলিম জনগণ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য চুক্তিকৃত অর্থ তাহাকে দেওয়া, যদিও ইহা বাধ্যতামূলক নহে। উমার (রা), ইব্ন আল-জুরায়জ প্রমুখ অনেকের মতে ইহা বাধ্যতামূলক (বুখারী, রাশিদিয়্যা, ১খ., ৩৪৭)।

যে দাস বা দাসী মুকাতাব, মুদাব্বার, মুবা'আদ অথবা উম্মু ওয়ালাদ কোন শ্রেণীতেই পড়ে না, তাহাকে কি'ন্ন (قن) বলা হয়।

স্বাধীনতা প্রদানের আইনগত পরিণাম, উত্তরাধিকারের অধিকার ও অভিভাবকত্ব (الولاء)

মুক্ত দাস মুক্তিদাতা মনিবের অভিভাবকত্বাধীন থাকে। সে যদি কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে মুক্তিদাতা তাহার উত্তরাধিকারী হয়। মুক্তিদাতার মৃত্যুতে তাহার পুরুষ উত্তরাধিকারী (عصبة) এই (ولاء) অধিকার লাভ করে। ক্রীতদাসীর বিবাহে তাহার মনিবই ওয়ালী (অভিভাবক) হয়। মুক্ত ক্রীতদাস নিহত হইলে মুক্তিদাতা তাহার রক্ত মূল্য পাইবে ইত্যাদি।

(২) ধর্মীয় দৃষ্টিতে عبد

কুরআনে 'আব্দ-রাব্ব, এই সম্পর্কটি আল্লাহ্ ও মানুষের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবিরূপে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। عبد শব্দের অর্থ দাস বা ভৃত্য; رب-এর অর্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রতিপালক, প্রভু (রাব্ব দ্র.)। এই অর্থে 'আব্দ শব্দের ব্যবহার প্রাগৈসলামিক। ইসলাম-পূর্ব যুগে 'আব্দ শব্দযোগে গঠিত যে সকল নাম দেখা যায়, তাহাতে উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই ধরনের নামের প্রথমাংশে থাকিত 'আব্দ ও দ্বিতীয়াংশে থাকিত কোন উপাস্যের নাম (তু. Wellhausen, Reste Arabischen heidentums, পৃ. ১ প.)। মুসলিম জগতে সর্বাপেক্ষা বহুল ব্যবহৃত নামের অন্যতম 'আবদুল্লাহ (عبد الله) নামটি প্রাগৈসলামিক। মুসলিম আমলে 'আব্দ ও আমা (امة) শব্দদ্বয়ের সহিত আল্লাহর বহু গুণগত নামের (আল-আসমাউল-হুসনা) কোন একটিকে যোগ করিয়া, যথা 'আবদুর-রহমান, 'আবদুল-হাকীম, আমাতুল-বারী ইত্যাদি নাম গঠনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অপরপক্ষে ইহার বিপরীত মুশরিকদের নাম হইত, যেমন 'আবদুল-উয্যা, 'আবদুশ-শাম্স ইত্যাদি। ইবিদ (عبد) শব্দযোগে সিরিয়ান খৃষ্টানদের নামকরণও এই শ্রেণীরই।

কুরআনে বহুবচনে 'ইবাদ (عباد) শব্দটি নিষ্ঠাবান বিশ্বাসিগণের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৫ঃ৬৩ ও ৪৩ঃ১১-এ ব্যবহৃত 'ইবাদুর-রহ্মান পরবর্তী কালে বহুল প্রচলিত 'আবদুর-রহমান নামের প্রেরণাস্বরূপ মনে হয়। সাধারণ মনিবের দাসত্ব ও আল্লাহর দাসত্বে তাত্ত্বিক পার্থক্য রহিয়াছে, যদিও عباد শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে ব্যবহৃত হয় (সূরা ঃ ১০৯ দ্র.)। এই পার্থক্য শব্দের ধর্মীয় অর্থ হইতে উদ্ভূত।

সূফী পরিভাষানুসারে রুবূবিয়্যা (ربوبية)-এর বিপরীত উবূদিয়্যা (عبودية) শব্দটি বান্দার আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝায়। উবূদিয়্যা পর্যায়ে উন্নীত মুসলিম আত্মা প্রশান্ত ও আত্মতুষ্ট (مطمئنة) (dict. of Techn. Terms, p. 958)। 'উবূদিয়্যা শব্দে 'ইবাদা শব্দ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ বুঝায়। 'ইবাদা দ্বারা মোটামুটিভাবে শুধু শারী'আতে নির্দেশিত কর্তব্যগুলি সামাধা করা বুঝায় (ইবাদা দ্র.)। 'আব্দ শব্দের ধর্মীয় পরিভাষাগত ব্যবহার হাদীছের একটি নিষেধাজ্ঞায় রূপ লাভ করে। ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ কোন মনিব তাহার দাসকে 'আব্দী (عبدى-আমার দাস) বলিবে না, বরং ফাতায়া (فتاى-আমার যুবক) বা গুলামী (غلامى-আমার বালক) বলিবে (বুখারী, রাশীদিয়্যা, ১খ., ৩৪৬)। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্রই।

'আব্দান (عبدان) ঃ ইব্ন রিযাম (দ্র.ফিহ্রিস্ত, ১৮৭) এবং আখু মুহ্সিনের বর্ণনানুযায়ী (যাহা আন-নুওয়ায়রী কারামিতা অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহার সংক্ষিপ্তসার আল-মাকরীযী ইত্তি'আজুল-হু'নাফায় (Bunz) [পৃ. ১০৩ প.] প্রদান করিয়াছেন। ইহাও নিঃসন্দেহে ইব্ন রিযামের বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, 'আবদান দক্ষিণ ইরাকের কারামিতার (দ্র.কারামিতা) প্রধান হামদান কারমাত-এর ভগ্নিপতি ও প্রতিনিধি ছিলেন। যখন সালামিয়ায় অবস্থিত ইসামা'ঈলী সদর দফ্তর তাঁহাদের কর্মকৌশল পরিবর্তন করিল, তখন 'আবদান বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু ২৮৬/৮৯৯ সনে অনুগতদের নেতা যিক্রাওয়ায়হ-এর ইঙ্গিতে নিহত হন। স্পষ্টত ওয়াকিফহাল আখ্ মুহ্সিন ও ইব্ন রিযাম-এর বর্ণনা ইব্ন হাওকাল (Kramers, পৃ. ২৯৫) কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। ইহার পরও 'আব্দানের অনুসারিগণ দক্ষিণ ইরাকে কয়েক বৎসর বিদ্যমান ছিল। মনে হয়, রক্ষণশীল ফাতিমীগণ 'আব্দানদিগের স্মৃতিকে পুনর্বাসিত করিয়াছেন। দাস্তূরুল-মুনাজ্জিমীন-এর লেখক (M. J. de Goeje, Memoire sur les Carmathes, ২০৪) তাঁহার 'দ্বিতীয় আত্মগোপনকারী ইমামের সর্বাধিক খ্যাত সহযোগীদের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন'। কথিত আছে, তাঁহাকে একজন গ্রন্থকারও সাজানো হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'ঈসা ইব্ন মূসা নিজে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার চাচার প্রতি আরোপ করিয়াছেন (আখ্ মুহ্সিন, আন-নুওয়ায়রী ও আল-মাকরীযী, ইত্তি'আজ, পৃ. ১৩০)। যাহা হউক, ফিহ্রিস্ত ১৮১ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে যাহার লেখক হিসাবে 'আব্দানকে দেখানো হইয়াছে। B. Lewis, The Origins of Ismailism, ৬৮ পৃষ্ঠায় দাবি করা হইয়াছে যে, 'আব্দানের লিখিত অনেক গ্রন্থ সিরিয়ার ইসমাঈলীদের নিকট রক্ষিত আছে। আরও তু. W. Ivanow, A. Guide to Ismaili Literature, পৃ. ৩১ (আরও দ্র. কারামিতা)।

S. M. Stern (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন

আল-'আব্দারী আবূ 'আবদিল্লাহ (দ্র. ইব্নুল-হাজ্জ)

আল-'আব্দারী (العبدرى) ঃ অর্থাৎ কুরায়শ গোত্রের 'আব্দু'দ-দার ইব্ন কুসায়্যি-এর বংশধর মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন সা'উদ আবী মুহাম্মাদ, ভ্রমণ কাহিনীর উপর লিখিত একটি গ্রন্থ 'আর-রিহলা আল-মাগ্রিবিয়্যা'-এর গ্রন্থকার। ২৫ যু'ল-কা'দা, ৬৮৮/১১ ডিসেম্বর, ১২৮৯ সনে ভ্রমণে রওয়ানা হওয়ার কালে তিনি মগাডোরের নিকট হাহা গোত্রের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় নাই। যদিও তিনি 'রিহ্লা'-এর বিজ্ঞ গ্রন্থকার হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তবুও জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত কোনও তথ্যে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। ইব্নুল-ক'াদী (জাযওয়াতুল-ইক্তিবাস, মুদ্রণ ফাস, পৃ. ১৯৯; দুর্রাতুল-হিজাল, ১খ., ১২৪) ও মাক্কারী (Analectes, 789, 866) তাঁহার সম্পর্কে শুধু তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি সূফী হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং ওয়ালীগণের তরীকার প্রতি তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে বলিয়াছেন, তিনি তিউনিসে শায়খ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ আল-আনদালুসীর নিকট হইতে সূফী খিরকা লাভ করিয়াছিলেন

(MS. Algiers, fol. 1546)। রাজনীতিতে তিনি বানূ 'আবদিল ওয়াদ-এর বিরুদ্ধে মারীনীদের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া বুঝা যায়। আর সম্ভবত এই কারণেই তিনি ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিলমিসানে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সফরকালে তিনি যাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন শারাফুদ্-দীন আল-দিময়াতী (আয-যাহা, তাযকিরা, ৪খ., ২৭৮), প্রসিদ্ধ হাদীছশাস্ত্রবিদ ইব্ন দাকীক আল-'ঈদ (আস-সুয়ূতী, হুসনুল-মুহাদারা, ১খ., ১৪৩), যায়নুদ-দীন ইব্নুল-মুনায়্যির (ইব্ন ফারহূন, আদ-দীবাজ, পৃ.২০৫; আহমাদ বাবা, নায়ল, পৃ. ১৯১), তিউনিসে আবদুল্লাহ ইব্ন হারূন আত-তাঈ আল-কুরতুবী, কায়রাওয়ানে আবূ যায়দ 'আবদুর-রহমান ইব্নুল-আসাদী, আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-কারাফী প্রমুখ। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ (দ্র. ইব্নুল-হাজ্জ) ও আবুল-কাসিম ইব্ন রিদওয়ানকে তাঁহার শাগরিদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি কাহারও কাহারও সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছেন (যেমন মা'আলিমুল ঈমানের গ্রন্থকার আদ-দাব্বাগ) এবং কাহারও কাহারও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন (যেমন ত্রিপোলীর আবূ 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদিস্-সায়্যিদ)।

তাঁহার গ্রন্থের গুরুত্ব উহার ভৌগোলিক বিবরণের জন্য নহে; তিনি আল-বাক্রীর কিছু কিছু সমালোচনা করিয়াছেন যদিও তাহা তেমন প্রামাণভিত্তিক নহে। তিনি (নিজে) ভূগোলবিদ নহেন। অন্যান্য ভূগোলবিদের অনুসরণে তিনি বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহাও খুব মূল্যবান নহে। তাঁহার ভাষার আলংকারিক ব্যঞ্জনায় কেবল সাহিত্য রসিকগণই কিছুটা আগ্রহ বোধ করিতে পারেন। 'রিহ্লা'-(ভ্রমণ কাহিনীর) লেখক অপরাপর গ্রন্থকার (যেমন আল-বালাবীর রিহ্লা, ইনি ৭৩৭-৪১/১৩৩৬-৪০ সনে বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন) তাহাদের তালিকায় তাঁহার নামভুক্ত করা ভিন্ন এই রচনার বিশেষ কোন মূল্য নাই। 'আবদরীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আলিম ও ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা। আল-মাগরিব অঞ্চলের পণ্ডিতগণের ইতিহাস সম্পর্কে তাহার টীকাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান বিশেষ। তদানীন্তন রীতি অনুসারে 'ইজাযা' (সনদ গ্রহণ)-এর প্রতি তিনিও আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার পুত্রের জন্য যাঁহাদের নিকট হইতে 'ইজাযা' লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। এইভাবে 'রিহ্লা' গ্রন্থ সনদদাতা শিক্ষকবর্গ ও বিভিন্ন পুস্তক সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে (Barnamadj, Fahrasa), ইহার মাধ্যমে আমরা প্রাচীন, তৎপরবর্তীকালীন ও সমকালীন পুস্তকসমূহ যেগুলি সাধারণভাবে পঠিত হয় সেগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। তিনি তাঁহার গ্রন্থ কুরআন কারীমের কিরাআত ও ব্যাকরণ সম্পর্কে স্পেনবাসীদের শেষ যুগের রচনাবলীকে প্রাধান্য দিয়াছেন, পদ্যের ক্ষেত্রে উত্তর আফ্রিকার ক্লাসিক যুগ-পরবর্তী কাব্যসমূহ এবং দীর্ঘ কবিতাসমূহের মধ্যে মহানবী (স)-এর প্রশংসায় রচিত আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-কুরাশী (মৃ. ৪৬৬/১০৭৩)-এর আল-কাসীদাতুস-সাকরাতিসিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন এতদ্ব্যতীত ইহাতে, তাখমীসুল মুন্ফারিজা-র উল্লেখ রাহিয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁহার নিজের কিছু কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেমন ইহাদের একটি হইল তাঁহার পুত্রের প্রতি নৈতিক উপদেশ সম্বলিত, অপরটি হইল সুলতান সালাহুদ্-দীন ইউসুফ ইব্ন আয়্যুবের প্রতি খৃষ্টানদের কবল হইতে ইসলামী ভূখণ্ডকে উদ্ধার করার আবেদন সম্বলিত।

১৪শ শতক হইতে ১৮শ শতকের মাগরিবের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাহিত্য রিহ্লা (১৮৮৩ সালে ইহার মূল পাণ্ডুলিপির একটি অনুলিপি করা হইয়াছে)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ইব্ন বাত্তূতা আলেকজান্দ্রিয়ার ফির'আওনদের (২খ., ২৯-৩০) সম্পর্কে বর্ণনা ইহা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অপর পর্যটক আল-বালাবী, আহমাদ বাবা, ইব্নুল-কাদীর ন্যায় জীবনী লেখকগণও তাঁহার গ্রন্থ হইতে বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। সমসাময়িক ইফরীকিয়্যা ও আল-মাগরিবের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলিয়া ধরাই 'রিহ্লা' রচনার নৈতিক উদ্দেশ্য। আর এই কারণেই গ্রন্থটি আকর্ষণীয় প্রামাণ্য দলীল হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) Brokelmann, I, 634, S1, 883 (add Mss Algiers 1017; Fez, Karawiyyin 1297); (২) আহমাদ বাবা, Nayl, marg. of Ibn Fahun, dibadj, 68; TA, iii, 379; B Vincent, in JA, 1845, 404-8; (৩) M. Cherbeonneau, in JA, 1854, 144-76; (৪) R. Dozy, Cat. Lugd. Bat, iii 137; (৫) M. Reinaud, Geographie d' Aboulfida, i, xxxvi; (৬) Motylinski, in Bull. Soc. de Geogr. d'Alger, 1900, 71-7; (৭) W. Wright, in Introd. of Ibn Djubayr. Rihla, 1907, 16-7; (৮) E. Rossi, La cron di Ibn Galbun,12; (৯) W. Hoenerbach, Das Nordafri-Kanische Itinerar des Abdari, Leipzig 1940.

Muh. Ben Cheneb-W. Hoenerdach (E.I.[2])

মুহাম্মদ রইছ উদ্দীন

আব্দাল (ابدال) ঃ স্থলাভিষিক্ত অর্থে 'আরবী বদল শব্দের বহুবচন। সূফীগণের মতে, ওয়ালীগণের একটি স্তর বা পর্যায়ের নাম আব্দাল। সাধারণের দৃষ্টিতে অগোচর (رجال الغيب) থাকেন (তু. গায়ব প্রবন্ধ)। সূফীদের বিশ্বাস ইহারা বিশ্বের যথাযথ ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সূফী সাহিত্যে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে ওয়ালীগণের শ্রেণী বিন্যাস সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত মত দেখা যায় না। আবদালের সংখ্যার ব্যাপারেও অনেক বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন ইবন হাম্বালের মতে তাঁহারা সংখ্যায় ৪০ জন (মুসনাদ, ১খ., ১১২); হুজবীরীর ধারণায় তাঁহারা ৩০০ জন (কাশফুল-মাহজূব [Zhukowsky], পৃ. ২৬৯, নিকলসন কর্তৃক অনূদিত পৃ. ২১৪)। সর্বাধিক স্বীকৃত মতে ওয়ালীগণের শ্রেণী বিন্যাসের (১) শীর্ষ স্থানে আছেন কু'ত'ব আজম (ক'ত'ব দ্র.); আর আবদাল পঞ্চম স্তরে অবস্থান করেন। কুত্ব-এর নিম্ন ও আবদালের উপরে রহিয়াছেন (২) কুত্ব-এর দুইজন معاون অর্থাৎ সহকারী; (৩) পাঁচজন আওতাদ (اوتاد) বা 'উমূদ (عمود) অর্থাৎ কীলক বা খুঁটি; (৪) সাতজন আফরাদ

(افراد) অর্থাৎ অতুলনীয় ব্যক্তি; (৫) আবদাল। প্রতিটি শ্রেণীর ওয়ালী একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করেন এবং বিশিষ্ট কার্যে নিযুক্ত থাকেন। যখন কোন শ্রেণীতে কোন স্থান খালি হয়, তখন পরবর্তী শ্রেণীর একজনকে উন্নীত করিয়া সেই স্থান পূর্ণ করা হয়। প্রয়োজনমত পানি বর্ষণ, শত্রু প্রতিরোধ, বিপন্ন মুক্তি ইত্যাদি কাজ আব্‌দালের মাধ্যমে বা তাঁহাদের সুপারিশের কল্যাণে হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। আব্‌দাল-এর একবচন বাদলা, কিন্তু সাধারণত একবচনে বাদীল (যাহার বহুবচন ব্যাকরণানুসারে বুদালা- بدلاء) ব্যবহৃত হয়। তুর্কী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় আব্‌দাল শব্দটি অধিকাংশ সময় একবচনে ব্যবহৃত হয় (তু. আওলিয়া')।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Flugel, in ZDMG, 20, 38-39 (সেখানে প্রাচীনতম গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ রহিয়াছে); (২) Vollers, ঐ, ৪৩খ., ১৪৪ প.; (৩) হাসান 'আদাবী আন-নাফাহতুশ-শাযিলিয়্যা, ২খ., ৯৯ প. (সেখানে প্রায় বারংবার গৃহীত শ্রেণীবিন্যাস দেওয়া আছে); (৪) A. von Kremer, Gesch. d. herrsch. Ideen, p. 172 প; (৫) Barges, Vie du celebre marabout Cidi Abou Medien, Paris 1884, preface; (৬) Blochet, Etudes sur 'esoterisme musulman, in JA, 1902, i, 529, II, 49 প.; (৭) Concordance de la tradition musulmane; (৮) L. Massignon, Passion d'al-halladj, p.112 প.।

I. Goldziher

উছমানী শাসনকালে দরবেশদের বিভিন্ন সম্প্রদায় আব্‌দাল ও বুদালা শব্দকে দরবেশ অর্থে ব্যবহার করিত (উদাহরণত খালওয়াতীয়া), তু. ইউসুফ, ইব্‌ন ইয়াকূব, মানাকিব শারীফ ও রাও তারীকাত-নামা-ইয়া পীরান ও মাশায়িখ-ই তারীকাত-ই 'আলিয়্যা-ই খালওয়াতিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১২৯০/১৮৭৩, পৃ. ৩৪। ইহাতে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, শায়খ সুম্বুলসিনান নিজ দরবেশ সম্প্রদায়কে আব্‌দালা বলিয়া সম্বোধন করিতেন)। যখন দরবেশ সম্প্রদায়ের পূর্বেকার সম্মান আর রহিল না, তখন তুর্কী ভাষায় 'আবদাল ও বুদালা' শব্দ দুইটি একবচনরূপে অবজ্ঞার সহিত নির্বোধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'বুদালা' শব্দটিকে স্থূল দেহ অর্থে তুর্কী শব্দ 'বুত' হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে করা ভুল (K.Lokotsch, Etymologiches Worterbuch der europaischen Worter orintalischen Ursprungs, হাইডেলবার্গ ১৯২৭, পৃ. ২৮)। কারণ বুলগেরীয় সারবীয় ও রুমানীয় ভাষাগুলিতেও 'বুদালা' এই সর্বজনস্বীকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

H. J. Kissling (E.I.[2]) মুহাম্মদ আনছার উদ্দীন

'আব্‌দালী (عبدلى) ঃ বহুবচন 'আবাদিল, 'আবাদিলা এবং তুরফাতু'ল আসহাব নামক গ্রন্থে 'আবদিলিয়্যিন যাহা সমষ্টিবাচক নামে বর্তমানে দক্ষিণ 'আরবের লাহ্‌জ নামক স্থানের অধিবাসীদের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আহামাদ ফাদলের ধারণা, 'আব্‌দালী শব্দের ব্যবহারের ধারা ঐ সময় হইতে হইয়াছে যখন শায়খ ফাদল ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সালাহ ইব্‌ন সাল্লাম ইব্‌ন 'আলী আস্‌-সাল্লামী আল-'আবদালী লাহাজকে যায়দী ইমামের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া (১১৪৫/১৭৩২-৩) একটি রাজবংশের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন যাহার অধীনে উহা অদ্যাবধি শাসিত হইয়া আসিতেছে (দ্র. লাহজ)। তুরফাতুল-আসহাব নামক গ্রন্থে (৭ম/১৩শ শতকে) উল্লেখ করা হইয়াছে, আবাদিলের আসল গোত্র খাওলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলহাফ ইব্‌ন কুদাআ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আল-খায্‌রাজী তাহাদের দক্ষিণ ইয়ামানের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Pearl Strings, ৫খ., ২১৭)। আর ল্যান্ডবার্গ (Landberg) বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, তাহারা আজ পর্যন্ত তাহাদের পুরাতন আবাসভূমিতেই বসবাস করিতেছে। অন্ততপক্ষে ফাদল্ ইব্‌ন আলীর সময়ে তাহারা ইয়াফিঈ মৈত্রী সংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর তাঁহার নিজ শাখা আস-সাল্লাম ইয়াফিঈ অঞ্চলে খানফার-এ ও মুখায় প্রতিনিধিত্ব করিত। আহমাদ ফাদ্‌ল বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার সময়ে ঐ রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ ছিল আসাবীহ্‌, যাহারা ছিল হিময়ার আল-আসগার-এর বংশধর, আসবাহ ইব্‌ন আম্‌র-এর বংশোদ্ভূত। তাহারা আল-হাম্‌দানীর সময়েও সেখানে বসবাস করিত। অবশিষ্ট আল-কাহতানের বিভিন্ন গোত্র, যেমন আজালিম, জাহাফিল, ইয়াফি, আকারিব, হাওয়াশিব আমিরা-এর সহিত সম্পর্কিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী আল-হাওতায় বর্তমানে বিভিন্ন গোত্রের লোক বসবাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের অনেক গোত্রের লোক ও আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূত লোকেরাও শামিল রহিয়াছে। বানূ মারওয়ান গোত্রের একটি শাখার নাম আবাদিল, যাহারা সাউদী সীমানার মধ্যে অবস্থিত আসীরের দক্ষিণ প্রান্তে বসবাস করিতেছে (দ্র. Philby, Arabian Highlands)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মালিকুল-আশরাফ উমার ইব্‌ন ইয়ূসুফ, তুরফাতুল- আসহাব, দামিশ্‌ক ১৩৬৯ হি.; (২) F. M. Hunter and C . W. H. Sealy, An Account of the Arab Tribes in the Vicinity of Aden ; (৩) C. Landberg, Etudes sur les dialeetes de L'Arabie meridionale; (৪) আহমাদ ফাদ্‌ল ইব্‌ন আলী মুহ্‌সিন আল-আবদালী, হাদিয়্যাতুয-যামান, কায়রো হি. ১৩৫১-এ, অনেক উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

C. F. Beckingham (E.I.[2])/মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন

আব্‌দালী (ابدالى) ঃ ইহা একটি আফগান গোত্রের প্রাক্তন নাম, বর্তমানে দুররানী নামে পরিচিত। গোত্রটি আফগানের সারবানী শাখার অন্তর্গত। তাহাদের নিজ ঐতিহ্যানুযায়ী তাহারা আবদাল (অথবা আওদাল) ইব্‌ন তারীন ইব্‌ন শারখাবূন ইব্‌ন কায়স-এর নামানুসারে তাহাদের নামকরণ করিয়াছে। চিশ্‌তিয়া তরীকার খাজা আবূ আহ্‌মাদ নামক জনৈক আবদাল বা দরবেশের কর্মচারী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আবদাল (অথবা আওদাল) নামে আখ্যায়িত করা হইত। আবদালীগণ দীর্ঘদিন কান্দাহার প্রদেশের বাশিন্দা ছিল। কিন্তু প্রথম শাহ্‌ আব্‌বাসের রাজত্বের প্রথম দিকে গালযাঈ গোত্রের চাপের মুখে তাহারা হারাত প্রদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। শাহ্‌ আব্‌বাস পুপালযাঈ গোত্রের 'সাদু' নামক জনৈক ব্যক্তিকে মীর-ই আফাগিনা উপাধিতে ভূষিত করিয়া গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিলেন। শাহ্‌ আব্‌বাসের প্রতি অনুগত থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক শত বৎসর পরে গালযাঈদের মত কার্যত নিজেদেরকে স্বাধীন করিয়াছিলেন। নাদির শাহ্‌ (দ্র.) আবদালীদের দমন

করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নমনীয়তা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের অনেককে তাঁহার সৈন্যবিভাগে ভর্তি করিলেন। এই আবদালীগণের মধ্যে মুহাম্মাদ যামান খান সাদুযাঈর দ্বিতীয় পুত্র আহমাদ খান অন্যতম। নাদির শাহের অধীনে তাহারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করায় নাদির শাহ্ আবদালীগণকে পূর্ব আবাসভূমি কান্দাহারে পুনর্বহালের মাধ্যমে পুরস্কৃত করিলেন। ১৭৪৭ খৃ. নাদির শাহের হত্যার পর আহমাদ শাহ্ নিজেকে কান্দাহারের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন স্বপ্নের ফল হিসাবে কিংবা সাবার শাহ্ নামক ফাকীরের প্রভাবে আহমাদ শাহ্ 'দুর্‌র-ই দুর্‌রানী' (সকল মুক্তার সেরা মুক্তা) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গোত্র সেই সময় হইতে দুর্‌রানী বংশ হিসাবে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। পুপালযাঈ ও বারাকযাঈ তাঁহার গোত্রের দুইটি প্রধান শাখা। বর্তমান আফগানিস্তানের রাজবংশ শেষ বাদশাহ জহীর শাহ ক্ষমতাচ্যুত এই শেষোক্ত গোত্রভুক্ত (দুর্‌রানী বংশের ইতিহাসের জন্য দুর্‌রানী ও আফগানিস্তান শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Elphinstone, Caubul, London 1842, ii, 95; (২) আব্দুল কারীম, তারীখ-ই আহ্‌মাদ, কানপুর ১২৯২/১৮৭৫, পৃ. ৩-৪, (৩) মুহাম্মাদ হায়াত খান, হায়াত-ই আফগানী (ইংরেজী অনু. শিরোনাম-আফগানিস্তান, ৫১); (৪) মুহাম্মাদ মাহ্‌দী কাওকাবী আসতরাবাদী, তারীখ-ই নাদিরী, বোম্বাই, পৃ. ৪-৬; (৫) B. Dorn, History of the Afghans, ii, 42; (৬) L. Lockhart, Nadir Shah, London 1938, P. 3, 4, 16, 29, 31,-4, 52-4, 113-4, 120, 101; (৭) K. Fraser-Tytler, Afghanistan, P. 8, 62.

(L. Lockhart) (E.I.²)/মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন

'আব্দী (عبدی) : 'উছমানী ঐতিহাসিক যে সকল 'উছমানী ঐতিহাসিক 'আব্দী উপাধি (মাখ্‌লাস্) গ্রহণ করিয়াছিলেন (তু. Babingar, পৃ. ৪২২) তাঁহাদের মধ্যে খাওয়াজা প্রধান য়ূসুফ আগা-এর সচিব (কাতিব) আবদীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চতুর্থ মুহাম্মাদের পুত্র যুবরাজ মুস্‌তাফার খত্‌না উপলক্ষে ১৬৭৫ সালের জুন/জুলাই মাসে আদ্রিয়ানোপলে অনুষ্ঠিত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ ও রাজকুমারী খাদীজার সহিত দ্বিতীয় উযীর মুসতাফা পাশার বিবাহ অনুষ্ঠানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন (তু. Hammer Purgstall, ৬খ, ৩০৭ প. ও ৩১৩ প.)। ইহাতে তাঁহার মনিব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। ছদ্মনামে লেখা রচনায় উক্ত খত্‌না অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ততর বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই 'মাজ্‌মা'ই সূর-ই হুমায়ূন' শিরোনামে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা আবদীর বর্ণনা হইতে ভিন্নতর (ভিয়েনার পাণ্ডুলিপি, ১০৭২-এর একাংশ Hammer-Purgstall-এর সময় হইতে হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগ অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে; Hammer-এর অনুবাদ, ৬খ., ৭০৪ হারাইয়া যাওয়া অংশকে প্রতিস্থাপন করিয়াছে; Hamburg-এর পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা or ২৬৯, বর্তমান পাণ্ডুলিপির তালিকামাত্র)। 'আবদীর বিবরণের ফলে প্যারিসে সেই ছদ্মনামী লেখকের নামও ছড়াইয়াছে (তুর্কী পরিশিষ্ট, সংখ্যা ৮৮০) এবং ইহা Etienne Roboly-এর Jeune de langues-এর অনুবাদের সহিত বাঁধানো অবস্থায় প্যারিসে সংরক্ষিত আছে। 'আবদীর গ্রন্থের মধ্যে প্যারিসে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে (তুর্কী পরিশিষ্ট, সংখ্যা ৫০১, অসমাপ্ত) এবং সংখ্যা ১০৪৫ (উত্তম পাণ্ডুলিপি), R. Tschudi, Basle-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও ইস্তাম্বুল, কুতুবখানা-ই মিল্লী, সংখ্যা—২৭৭ (৪১৪) সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Babinger, পৃ. ২১৭ প.; (২) J. H. Mordtmann, in Isl., ১৯২৫, পৃ. ৩৬৪।

Fr. Babinger (E.I.²)/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আব্দী (عبدی) : পাঞ্জাবী কবি আ'বদুল্লাহ লাহোরীর কবি নাম, পাবে 'আব্দী কবি নামে বেশ কয়েকজন কবি আত্মপ্রকাশ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল : (১) 'আবদী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ কৃধান (?), বাতু-এর অধিবাসী এবং মুহতাদী পুস্তিকার প্রণেতা, (৯৯৭/১৫৮৮); (২) 'আব্‌দী, 'আব্‌দুল্লাহ্ লাহোরী, 'বারান্ আনওয়া' গ্রন্থের প্রণেতা (১০২৫-১০৬৫/১৬১৬-১৬৫৪); (৩) 'আব্‌দী, 'আবদুল্লাহ খেশগী ক'াসূ'রী, মা'আরিজুল-বি'লায়াত-এর রচয়িতা; (৪) 'আবদী, ফিক্'হ' হিন্দী-এর প্রণেতা; এবং (৫) 'আব্‌দী, গুজরানওয়ালা জেলার রাসূল নগরের অধিবাসী 'আবদুল্লাহ ক'ায়স'ার শাহী ইব্‌ন শায়খ মুহ'াম্মাদ য়াহ্‌য়া ইব্‌ন শায়খ গুল মুহ'াম্মাদ প্রমুখ। ইঁহাদের মধ্যে বারান আনওয়া প্রণেতা 'আবদুল্লাহ লাহোরীর মত আর কেহ তত প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। সর্বপ্রথম মিয়াঁ মুহ'াম্মাদ বাখ্‌শ (র) ১২৭২/১৮৫৫ সনে 'সায়ফু'ল-মুলূক' গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে কয়েক পৃষ্ঠা আলোচনা করেন। পরবর্তী কালে সকল লেখক তাঁহার পরিবেশিত তথ্যের অনুকরণ করিতে থাকেন।

তাঁহার পিতার নাম জান মুহ'াম্মাদ (কুশতা, পাঞ্জাবী শাইরান দাঁ তাযকিরা, পৃ. ৫৯)। তিনি সাহিওয়াল জেলার পাক পাট্টন তহসীলে হানিস নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। যৌবনকাল তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেন; অতঃপর লাহোর আগমন করেন এবং লুহারী দারওয়াজা-এর অভ্যন্তরে চক ঝাণ্ডা-এ হযরত শায়খ হাস্‌সূ তীলী (মৃ. ১০১১/১৬০২)-এর প্রতিবেশী হন (মিয়াঁ মুহ'াম্মাদ বাখ্‌শ, সায়ফুল মুলূক, পৃ. ৪৪৪)। মিয়াঁ নূর মুহ'াম্মাদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। নাক'ী মুহ'াম্মাদ ও তাক'ী মুহ'াম্মাদ নামে নূর মুহ'াম্মাদের দুই পুত্র ছিল। নাক'ী মুহ'াম্মাদ নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তাক'ী মুহ'াম্মাদের এক সন্তান ছিল মুহ'াম্মাদ 'আশিক' (পূ. গ্র., পৃ. ৪৪৬)। তিনি লাহোরের লূহারী দারওয়াযা-এর অভ্যন্তরে স্বীয় নামানুসারে আশিক আবাদ নামে একটি মহল্লা প্রতিষ্ঠিত করেন।

মিয়াঁ মুহ'াম্মাদ বাখ্‌শ (র) মিয়াঁ নূর মুহ'াম্মাদের উল্লেখ পূর্বক লিখেন, তিনি অনেক প্রচলিত পুস্তকের টীকা লিখেন এবং পিতা তাঁহাকে মুদাক্'কি'ক' (সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন) উপাধিতে ভূষিত করেন (পূ. গ্র., পৃ. ৪৪৬)।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে মিয়াঁ মুহ'াম্মাদ বাখ্‌শের সমনামের অন্য কয়েকজন কবির আবির্ভাবের দরুন সংশয়ের উদ্রেক হয়। বিখ্যাত টীকাকার ও ব্যাখ্যাতা নূর মুহাম্মাদ মুদাক্'কি'ক' লাহোরী (আলমগীর-এর শাসন আমলে) আত-তাস্'রীফ-এর ব্যাখ্যায় স্বীয় বংশ তালিকা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন: 'নূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ফীরোয ইব্‌ন ফাতহু'ল্লাহ লাহোরী'। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, নূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ 'আবদী ও নূর মুহাম্মাদ মুদাক্'কি'ক' ইব্‌ন মুহাম্মাদ ফীরোয দুইজন পৃথক ব্যক্তি।

'আব্দী প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত 'ইল্ম ফিক্'হ-এর খেদমত করেন এবং ফিক'হী মাস্আলাসমূহ পাঞ্জাবী কাব্যে সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেন এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রণয়ন করেন। নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ (১) তুহ'ফা (১০২৫/১৬১৬); (২) নাস্'সুল-ফারাইদ (১০৩২/১৬২২); (৩) খুলাস'া-ই মু'আমিলাত (১০৪৩/১৬৩৩); (৪) আন্ওয়া'উল-'উলূম (১০৪৪/১৬৩৪); (৫) মা'রিফাত-ই ইলাহী (১০৪৫/১৬৩৫); (৬) খায়রুল-'আশিক'ীন-বৃহৎ (১০৫৪/১৬৪৪); (৭) শারহ' সিরাজী (১০৫৮/১৬৪৮); (৮) খায়রুল 'আশিক'ীন ক্ষুদ্র (১০৬৫/১৬৫৪); (৯) হি'স'ারুল ঈমান; (১০) সায়কাল আওওয়াল; (১১) সায়কাল দুওয়াম; (১২) হ'াম্দ ওয়া ছ'ানা।

'আব্দী কর্তৃক প্রণীত পুস্তকের বর্তমান সংখ্যা এগার। কিন্তু যেহেতু তাঁহার প্রণীত পুস্তক বারান্ আনওয়া এখন পর্যন্ত হস্তগত হয় নাই, তাই বাধ্য হইয়া মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী কর্তৃক প্রণীত একখানি পুস্তক সংযোগ করিয়া বার সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে (কুশতাহ্ পাঞ্জাবী শাইরান দাঁ তাযকিরা, পৃ. ৬০)।

বারান্ আনওয়া গ্রন্থটি খুবই জনপ্রিয়। বেশ কিছু সংখ্যক কবি উহার অনুকরণে পুস্তকাবলী রচনা করেন। হ'াফিজ মুহাম্মাদ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সাহায্যে উহার সংশোধন, সমন্বয় সাধন ও টীকা সংযোজন করেন, যাহাতে হাফিজ মুহাম্মাদ ফার্সী ভাষায় আনওয়া পুস্তকের জটিল স্থানসমূহের সমাধান, দুর্বল বর্ণনাসমূহের প্রতি ইংগিত ও গ্রন্থকার 'আবদী-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করেন। এই ব্যাখ্যাসম্বলিত গ্রন্থটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়।

'আব্দীর পারিবারিক বাসস্থান লাহোরের প্রাচীন জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রসমূহের অন্যতম ছিল। অধিকাংশ মুসলিম মনীষী ও জ্ঞানসাধক তথায় আগমন করিলে তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। সায়ফুল-মুলূক গ্রন্থের রচয়িতা মিয়াঁ মুহাম্মাদ বাখ্শ লাহোরী আগমন করিলে তাঁহারই বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তিনি এইখানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সায়ফুল-মুলূক (১৮৫৫) সংশোধন করিয়া উহার রচনা সমাপ্ত করেন এবং গ্রন্থের শেষভাগে এই জ্ঞান সাধক পরিবারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, তাঁহাদের জ্ঞান সম্পর্কিত অবদান ও জ্ঞান-সাধকদের প্রতি তাঁহাদের মেহমানদারির উল্লেখও করেন (সায়ফুল-মুলূক, পৃ. ৪৪৬)।

'আব্দীর যুগে পাঞ্জাবী ভাষাকে হিন্দীও বলা হইত। তিনি স্বয়ং লিখেনঃ

দীনী মাস্আলাসমূহ বুঝিয়া 'আব্দী বলেন আমীন
হিন্দী ভাষায় ফিক'হশাস্ত্র বুঝিয়া তবে কর ইয়াকীন।

'আব্দী মূলত শার'ঈ বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাহিত্য চর্চা করিতেন, এই কারণে স্বভাবতই তাঁহার ভাষায় আরবী ও ফারসী শব্দসমূহ অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় এবং কুশ্তাহ্-এর মতে (পৃ. ৬০) বারান আন্ওয়া গ্রন্থে পুটুহারী ও হিন্দী শব্দসমূহও পাওয়া যায়।

'আবদীর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সন এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। অবশ্য তাঁহার জীবনকাল গ্রন্থ রচনা ও প্রণয়ন হিসাবে ১০২৫/১৬১৬ হইতে ১০৬৫/১৬৫৪ পর্যন্ত ধরা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আব্দী, আবদুল্লাহ লাহোরী, বারান্ আনওয়া, লাহোর ১৩১৬ হি.; (২) মাহমূদ শীরানী, পাঞ্জাব মেঁ উরদূ, ওয়াহ'ীদ কু'রায়শী সংকলিত, লাহোর ১৯৬৩; (৩) হামীদুল্লাহ শাহ হাশিমী, পাঞ্জাবী আদাব কী মুখতাস'ার তারীখ, লাহোর হইতে প্রকাশিত; (৪) 'আবদুল-গ'াফ্ফার কু'রায়শী, পাঞ্জাবী আদাব কী কাহানী, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (৫) আহমাদ হুসায়ন কু'রায়শী, পাঞ্জাবী আদাব কী মুখতাসার তারীখ, লাহোর ১৯৭২; (৬) মিয়াঁ মুহাম্মাদ বাখ্শ, সায়ফুল-মুলূক, ঝিলাম ১৯১৪; (৭) 'আবদুল হ'ায়্যি, নুযহাতুল-খাওয়াতি'র (আরবী), ৬ষ্ঠ খণ্ড, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য; (৮) মিয়াঁ মাওলা বাখ্শ কুশতাহ্ অমৃতসরী, পাঞ্জাবী শাইরান্ দা তায'কিরা, লাহোর ১৯৬০; (৯) Catalogue of the Arabic, Persian and : Sprenger Hindustani manuscripts of the Libraries of the Kings of Oudh, কলিকাতা ১৮৫৪।

মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদী (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ ইসলাম গনী

'আবদী (দ্র. আবদুল্লাহ মেশগী)।

'আব্দী এফেন্দী (عبدى افندى) ঃ একজন উছমানী ঐতিহাসিক। তাঁহার জীবন সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা যায়, তিনি ১৭৩০-১৭৬৪ খৃ. পর্যন্ত সুলতান প্রথম মাহমূদ ও তৃতীয় মুসতাফার অধীনে কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ, যাহা শুধু আবদী তারীখী অথবা তারীখ-ই সুলতান মাহমূদ খান নামে খ্যাত, প্রধানত পেত্রোনা (Patrona) খালীলের বিদ্রোহ-পূর্ব ঘটনাবলী ও বিদ্রোহ (১৭৩০-৩১ খৃ.) সম্পর্কীয় বর্ণনার সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থটি উক্ত বিদ্রোহ সম্পর্কীয় তথ্যের সমসাময়িক কালের অন্যতম প্রধান উৎস। ইহার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে (আস'আদ এফেন্দী, সংখ্যা ২১৫৩ ও মিল্লাত কুতুবখানেসী, সংখ্যা ৪০৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. R. Unat, 1730, Patrona Ihtilali hakkinda bir eser Abdi tarihi, Ankara 1943; (২) Osmanli Muellefleri, iii, 106; (৩) Inonu ansiklopedisi, i, 31; (৪) Ahmed Refik, Lale dewri, Istanbul, 1331, 116, 125, 140; (৫) Ramiz Tedhkiresi, MS. Millet Kutubkhanesi, 762, 185; (৬) Sefinet ul-Ruasa, 83 প., 90 প. For the MSS FM Istanbul Kutub haneleri Tarih-Cografya Yazmalari Kataloglari, I : Turkee Tarih –Yazmalari, 2nd fasc., Istanbul 1944, 103 প.।

Fr. Babinger (E.I.²)/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আব্দী পাশা (عبدى پاشا) ঃ তুরস্কবাসী ঐতিহাসিক। আবদুর-রহমান আবদী পাশা বসফরাসের তীরে অবস্থিত আনাতুলি হিসারীর অধিবাসী। তিনি সিরায়তে (সুলতানী মহলে) শিক্ষা লাভ করেন এবং পরিশেষে সুলতানের একান্ত সচিব (সিরর কাতিবী)-এর পদ লাভ করিতে সক্ষম হন। মুহ'াররাম ১০৮০/জুন ১৬৬৯ সনে তিনি একজন উযীরের মর্যাদাসহ নিশানজী পদে উন্নীত হন এবং পরে তিনি রাজধানীর কাইম-মাসাম নিযুক্ত হন। এপ্রিল ১৬৭৯ সনে তিনি বোসনিয়ার (Bosnia) গভর্নর হন। পরবর্তী বৎসর তিনি আবার নিশানজী হন, মার্চে

তথাকথিত প্রাসাদ উযীর, ১৬৮৪ সনের আগস্ট মাসে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন (তু. Hammer-Purgstall, vi, 379)। ১৬৮৬ সালে তিনি পদচ্যুত হন এবং পরবর্তী বৎসর মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৬৮৮ সালে তিনি রুমেলিয়ার গভর্নর এবং পরবর্তী বৎসর ক্রিটের গভর্নর হন। সেখানে তিনি রাজাব ১১০৩/মার্চ ১৬৯২ সালে ইন্তিকাল করেন।

'আব্দী পাশাকে সাধারণত সরকারীভাবে নিযুক্ত প্রথম ইতিহাস লেখক (ওয়াক'আই' নাব'ীস) বলিয়া বর্ণনা করা হয়, যদিও ইহার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে (তু. Ismail Hakki Uzuncarsili, Osmanli devletinin Merkez ve bahriye teskilati, Ankara 1948, 64-8)। তবে একথা সত্য, তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের একটি ইতিহাসের গ্রন্থকার। গ্রন্থটিতে মুহাম্মাদ ৪র্থ-এর রাজত্বকাল (১০৫৮/১৬৪৮) হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ রামাদান, ১০৯৩/৫ অক্টোবর, ১৬৮২ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা রহিয়াছে। গ্রন্থখানা তারীখ-ই ওয়াকাই (تاريخ وقائع) নামে আখ্যায়িত (Hadjdji Khalifa, ed. Flugel, no. 14523)। গ্রন্থটি ওয়াক'ই' নামা-ই আবদী পাশা নামেও খ্যাত এবং ইহা সুলতান মুহাম্মাদ ৪র্থ-এর নামে উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Babinger; অন্যান্য পাণ্ডুলিপি ঃ Istanbul, Baghdad Koshku, 217, Khaled Ef., 615 (তু. Isl., 1942 207) and Istanbul Kutuphaneleri Tarih-Cografya Yazmalari, Kataloglari xi: Turkce Tarih Yazmalari, 2nd fasc., Ankara 1944, III f. Etienne Roboly কর্তৃক কিছু অংশের ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে সংরক্ষিত আছে, Suppl. turc, 867 (Blochet, Cat. ii, 78)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Babinger, 227f. (with further reference); (২) Inonu, Ansikolpedisi, i, 30; (৩) Hammer-Purgstall, iii, 558 f.

Fr. Babinger (E.I.²)/মুহাম্মাদ রইছ উদ্দীন

আবওয়াব (দ্র. দারবান্দ)।

আবদুন-নাবী (عبد النبى) ঃ শায়খ সদর ইব্ন শায়খ আহমাদ ইব্ন শায়খ আবদুল-কুদ্দূস গানগূহী (মৃ. ৯৪৪ হি.)। তাঁহার বংশ পীর বংশ হিসাবে বিখ্যাত ছিল (মুনতাখাবুত্ তাওয়ারীখ, ৩খ., ৭৯)। আসল বাসস্থান গানগূহ অঞ্চলের আন্দরী নামক স্থানে। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গুণের অধিকারী, জনপ্রিয় বুযুর্গ এবং চিশ্তিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। সম্রাট সিকান্দার লোধী (لودهى) (১৪৮৯-১৫১৭ খৃ.) তাঁহার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাকে বিভিন্ন কারণে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে মতভেদ রহিয়াছে; মতবিরোধে জড়িত দলসমূহ স্ব স্ব প্রমাণ উপস্থিত করত তাঁহাকে ভাল বা মন্দ আখ্যায়িত করিয়াছেন। মোটকথা তিনি সম্রাট আকবারের রাজত্বকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। শায়খ 'আবদুন-নাবী জীবনের প্রারম্ভে ইবাদাত-বন্দেগী ও সাধনার প্রতি খুবই ঝুঁকিয়া পড়েন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি পবিত্র মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে হাদীছবিদদের নিকট হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (আখবারুল-আখয়ার, পৃ. ২১৩)। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনি প্রথমত চিশতিয়াপন্থী এবং উক্ত তরীকাপন্থীদের ন্যায় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত (سماع সামা)-এর পক্ষে অভিমত পোষণ করিতেন। কিন্তু পবিত্র মক্কা নগরী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শায়খ 'আবদুন-নাবী সামা-এর বিরুদ্ধে একখানা পুস্তিকা রচনা করেন, যাহাতে তাঁহার পিতা কর্তৃক রচিত পুস্তক দার বারা-ই জাওয়াযি সামা-এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাতে পিতা-পুত্রের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, যাহা পরিণামে পুত্রের যশ সৃষ্টির কারণ হয় (মুন্তাখাবুত্-তাওয়ারীখ, ৩খ., ৮০)। শায়খ স্বীয় শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের মতের বিরুদ্ধে হাদীছবিদদের পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি তাকওয়া-পরহেযগারী, ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগী ছাড়াও তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মীয় আদেশ-উপদেশ ইত্যাদিতে অধিক সময় ব্যয় করিতেন। সম্রাট জালালদ্দীন আকবারের মন্ত্রী মুজাফফার খানের সুপারিশক্রমে হি. ৯৭২ সনে তিনি সাদ্রুস-সুদূর (صدر الصدور=প্রধান মুফতী) পদে নিয়োজিত হন (আখবারুল-আখয়ার, পৃ. ২১৩)। ভাতাদি (مدد معاش) ও লাখেরাজ জায়গীর প্রদান তাঁহার দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল (মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ, ৩খ, ৮০)।

জালালুদ্দীন আকবার প্রাথমিক পর্যায়ে শায়খ সদরের প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং মাঝে মাঝে হাদীছ শিক্ষার ক্লাসে অংশগ্রহণের উদ্দেশে তাঁহার গৃহে গমন করিতেন। একবার তিনি শায়খ সদরের পাদুকা স্বহস্তে উত্তোলন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখেন। তাঁহার আদেশে শাহ্যাদা সালীমও শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহচর্যের মাধ্যমে আকবারের অবস্থার এমন পরিবর্তন হয় যে, তিনি জামা'আতের সহিত নামায আদায় করা ছাড়াও স্বয়ং আযান দিতেন, ইমামতির দায়িত্ব পালন করিতেন এবং স্বহস্তে মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। মা'আছি'রুল-উমারা (২খ., ৫৬১) নামক গ্রন্থে আছে, আকবার যৌবনে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে যা 'আফরানের ছিটা মাখানো পোশাক পরিধান করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়াছিলেন। শায়খ সদর উহা নিষেধ করিলেন এবং নিষেধের মাত্রা এমনি কঠোর ছিল যে, তাঁহার যষ্ঠির অগ্রভাগ সম্রাটের পরিচ্ছদ স্পর্শ করে। সম্রাট পরম বিশ্বাস ও আস্থার কারণে উহাতে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন।

তাঁহার এই কঠোর ও অশিষ্ট আচরণের (যাহা তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল) মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। এই সময় সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়, মসজিদের ইমামগণ যদি স্বীয় জীবন ভাতা ও লাখেরাজ জায়গীর প্রাপ্তির নির্দেশনামায় সদ্রুস্-সুদূরের স্বীকৃতি ও স্বাক্ষর লাভ না করেন, তবে তাহারা উহার আয় প্রাপ্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। ইহাতে লোকদের জন্য সদ্রুস্-সুদূরের স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়। কথিত আছে, এই সুযোগে শায়খ সদরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রিশওয়াত (ঘুষ) গ্রহণ আরম্ভ করে। এই ব্যাপারে আকবারের নিকট ব্যাপকভাবে অভিযোগ পৌঁছিতে থাকে এবং পরিণতিতে তিনি সাদ্রুস্-সুদূর পদের বিলোপ সাধন করিয়া উক্ত দায়িত্ব প্রাদেশিক পর্যায়ে এক একজন আমীরের উপর ন্যস্ত করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রভাবশালী সভাসদ মাখদূমুল-মুল্‌ক (দ্র.) বিদ্বেষ ও রাজদরবারের নূতন রীতিনীতি শায়খ্‌ সদরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। মাখ্‌দূমুল-মুল্‌ক ইবাদতখানার বিতর্কসমূহে তাঁহার সমালোচনা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখেন। উহাতে এমন অভিযোগও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, শায়খ আবদুন-নাবী জনৈক মীর হাবাশকে রাফাদ' (রাফিদ'ী) হওয়ার অপবাদ দিয়া ও খিদি'র খান শিরওয়ানীর বিরুদ্ধে হযরত নবী কারীম (স)-এর প্রতি বেআদবি ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের অপবাদ আনিয়া তাহাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাইয়াছেন। মাখদূমুল-মুল্‌ক তাহার বিরুদ্ধে এই কথাও বলেন, শায়খ সদর স্বীয় পিতার অবাধ্য সন্তান ছিলেন। কেননা তিনি পিতার বিরুদ্ধে পুস্তক (সামা সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে) রচনা করিয়াছেন। সুতরাং পিতার অবাধ্য সন্তানের পশ্চাতে সালাত বৈধ নহে। প্রত্যুত্তরে স'দরুস্‌-সু'দূরও মাখদূমুল-মুল্‌কের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন।

স্বভাবত এইসব সমালোচনার কারণে ধর্মীয় পরিবেশ কলুষিত হয়। আবুল-কালাম আযাদ (দ্র.) বাদায়ূনীর বরাতে তাযকিরা নামক পুস্তকে এই সকল কলুষতার জন্য মাখদূমুল-মুল্‌ক ও সদ্‌রুস্‌-সু'দূর-এর ব্যক্তিগত সংকীর্ণতাকে দায়ী করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-এর অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা আমাদের যুগে মুসলিম জাতি ও ধর্মের পরিসরে পরিদৃষ্ট হইতেছে উহার জন্য মন্দ আলিমরাই দায়ী। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ও দীনের বিষয়ে তস্কর"।

অন্যদিকে আবুল-ফাদ্‌'ল, ফায়দ'ী এবং দীন সম্পর্কে উদাসীন মুক্তবুদ্ধির সমর্থক লোকেরা আকবারকে আলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদানে লিপ্ত ছিল, তদুপরি তখন হিন্দুদেরও কার্যকর প্রভাব ছিল। সদ্‌রুস্‌-সুদূর আকবারের হিন্দু পত্নী জুধাবাঈ-এর পুরোহিতকে মহানবী (স)-এর প্রতি বেআদবি প্রদর্শনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। বিরোধীরা তাঁহার বিরুদ্ধে এই ঘটনাটিকে ব্যবহার করে। নবী কারীম (স)-এর প্রতি অমুসলিম ভর্ৎসনা কারীর ব্যাপারে ফিক্‌'হ্‌ সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সম্রাটের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করা হয় এবং বলা হয়, শায়খ 'আবদুন-নাবী ঐ পুরোহিতকে হত্যার পূর্বে সম্রাটের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এসব কারণে আকবার খুবই রাগান্বিত হন এবং একটি সভা আহ্বান করেন এবং উক্ত সভায় এক সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে আলিমদের সকল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিলুপ্তি সাধন করেন (দ্র. আকবার, মাখদূমুল-মুল্‌ক)।

এই ঘটনার পর মাখদূমুল-মুল্‌ক ও শায়খ আবদুন-নাবী উভয়কে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করা হয়। পবিত্র নগরীদ্বয় (মক্কা ও মদীনা) হইতে উভয়ের প্রত্যাবর্তনও একই সময়ে সংঘটিত হয়। এইদিকে তাঁহাদের শত্রুরা তাঁহাদের ব্যাপারে সম্রাটের নিকট নানা ধরনের সংবাদ প্রদান করিতেছিল। অবশেষে নির্দেশ প্রদান করা হয়, শায়খ আবদুন-নাবী যেন ফতেহপুর সিক্রিতে দরবারে উপনীত হন। আকবারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শায়খ সদর মদীনায় যে প্রচার চালান উহার খবরও সম্রাটের নিকট পৌঁছায়। ইহাতে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। সম্ভবত আবুল ফাদ্‌ল ও অন্যদের ইঙ্গিতে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এতদুদ্দেশে ঘটনা দাঁড় করানো হয়, ভ্রমণকালে সফরসঙ্গী ও মক্কা-মদীনার আলিম ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছিল উহার হিসাব প্রদান করিতে হইবে। ঘটনার অনুসন্ধানের দায়িত্ব আবুল-ফাদ'লকে প্রদান করা হয় এবং সদ্‌রুস্‌-সুদূরকে তাহার হস্তে অর্পণ করা হয়। কথিত আছে, উক্ত সময়ে হি. ৯৯২ সনে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গলা টিপিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয় (মা'আছিরুল-উমারা, ২খ., ৫৬৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, সংকলন কাবীরুদ্দীন আহমাদ ইত্যাদি, কলিকাতা ১৮৬৫-১৮৬৯ খৃ.; (২) শাহ নাওয়ায খান, মা'আছি'রুল-উমারা, ৩খ., কলিকাতা হি. ১৩০৯ খৃ.; (৩) আবুল-কালাম আযাদ, তাযকিরা, ১৯১৯ খৃ.; (৪) মুহাম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, দারবার আকবার লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (৫) 'আবদুল-হ'াক্‌'ক- আখবারুল-আখয়ার দিল্লী ১৯১৪ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ ইকরাম, রূদ-ই কাওছ'র, লাহোর, সংকলন।

আ. দ. ইরশাদ (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল

আবদুর রশীদ (দ্র. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ)

আবদুর রশীদ খাঁ, হাজী (حاجى عبد الرشيد خان) ঃ ৮৮৯-১৯৭১, কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৃটিশ শাসনাধীন বঙ্গ প্রদেশ ছিল তাঁহার কর্মস্থল। তিনি ১৯০১ খৃ. এন্ট্রান্স ও ১৯০৩ খৃ. এফ. এ. পাস করিবার পর আইন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯০৫ খৃ. তিনি নোয়াখালীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। একই সঙ্গে তিনি সমাজসেবা ও রাজনীতির চর্চাও করিতে থাকেন। ১৯০৬ খৃ. তিনি নোয়াখালী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ১৯১৩ খৃ. নোয়াখালী জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরবর্তী বৎসর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরই তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক খান সাহেব উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯১৯ খৃ. তিনি হজ্জ পালন করেন পর বৎসর তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বৃটিশ সরকার প্রদত্ত 'খান সাহেব' উপাধি ত্যাগ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁহার কারাদণ্ড হয় এবং ১৯২১ খৃ. তিনি কারামুক্ত হন। কারাগারে তিনি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কারাসঙ্গী ছিলেন।

১৯২২ খৃ. তিনি নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ খেলাফত কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসরই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ঐ দলের সহ-সভাপতি হন। ১৯২৫ খৃ. দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহযোগী হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি কর্পোরেশনের সহকারী নির্বাহী অফিসার নিযুক্ত হন। ১৯৩২ খৃ. পর্যন্ত তিনি কর্পোরেশনে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি কলিকাতায় নিজের বাড়ী তৈরি করান এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বসবাস করিতে থাকেন। পরবর্তী কালে ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। আরও পরে ১৯৭০ খৃ. অবশ্য তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) চলিয়া আসেন। এখানেই তিনি ১৯৭১ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

তিনি অত্যন্ত ভাল বক্তা ছিলেন। হজ্জযাত্রীর রোজনামচা নামক হজ্জের অভিজ্ঞ তাসম্বলিত একখানা পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আমীনুর রশীদ চৌধুরী প্রণীত, আব্দুর রশীদ খানের জীবনী (নোয়াখালী পৌরসভার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত)।

ড. এম. আব্দুল কাদের

আবদুর রশীদ, মুহাম্মদ (محمد عبد الرشيد) ঃ ডক্টর, ১৯১৯ সালে ১৬ জানুয়ারী সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার বগাড়ুবি গ্রামে জন্ম, পিতার নাম মুহাম্মদ সাদ। হবিগঞ্জ হাই স্কুল হইতে ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর সিলেট শহরে আসিয়া মুরারী চাঁদ (বর্তমানে গভর্নমেন্ট) কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের মানসে আবদুর রশীদ সেই বৎসরই কলিকাতায় গমন করেন এবং শিবপুরে অবস্থিত বেংগল ইঞ্জি নিয়ারিং কলেজে পুরকৌশল বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরকৌশলে বি.ই. ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় পড়ালেখায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বেশ কয়েকটি পদক পান। যেমন ১৯৪১ সালে স্টেলার মেমোরিয়াল মেডেল ও স্টেট মেমোরিয়াল মেডেল, ১৯৪২ সালে ট্রেভর মেমোরিয়াল পুরস্কার ও মেডেল। ১৯৪১ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি মুসাম্মাত তাজুন্নিসা খাতুনের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪২ সালে আসাম সরকারের অধীনে প্রকৌশলী হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন। ৩০-১১-১৯৪২-এর নিয়োগপত্রের বরাতে ৩ ডিসেম্বর সকালে তিনি সিলেট ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে অস্থায়ী প্রকৌশলী হিসাবে কাজে যোগদান করেন এবং সিলেটের উত্তরে হরিপুর অঞ্চলের সড়ক নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বৎসর পর ১৯৪৩ সালের ২২ ডিসেম্বর তিনি সিলেট ডিভিশনের অধীনে হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের দায়িত্ব বুঝিয়া নেন এবং ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে গৌহাটি সড়ক উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে তাঁহাকে শিলচরে বদলি করা হয় এবং তিনি কাছাড় ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলীর অধীনে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে আবদুর রশীদ ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া (বিভাগীয় ডেপুটেশনে) উচ্চ শিক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পেন্‌সিলভেনিয়ার পিট্‌স্‌বার্গে অবস্থিত কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রকৌশল বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারীতে তাঁহাকে মাস্টার অব সায়েন্স ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের ২৭ তারিখে কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বর্তমানে কার্নেগীমেলন ইউনিভার্সিটি) তাঁহাকে ডক্টর অব সায়েন্স ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীতে ভূষিত করে। ডি.এস.সি.-তে তাঁহার অভিসন্দর্ভের (thesis) শিরোনাম ছিল "Mechanics of prestressed reinforced concrete beams in bending"। আজ-কালকার নির্মাণ কাজে Prestressed Concrete-এর ব্যবহার সুপ্রচলিত হইলেও সেই সময় উহা ছিল অজানার অন্ধকারে।

উচ্চ শিক্ষা শেষে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। ঢাকা ছিল তখন পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী। ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পদের জন্য ড. এম.এ. রশীদ এই বৎসরের ২৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। প্রফেসর পদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকায় কমিশন ড. রশীদকে সহকারী প্রফেসর পদে নিযুক্তি দেন। জনশিক্ষা পরিচালক আশাহত ড. রশীদকে প্রারম্ভিক উঁচু বেতনের আশ্বাস দিলে তিনি ১৯৪৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহকারী প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন। কয়েক মাস পর ১৯৪৯ সালে অধ্যক্ষ হাকিম আলী ড. রশীদকে পুরকৌশল বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন। ড. রশীদই ছিলেন ঐ কলেজের প্রথম বাংগালী অধ্যক্ষ। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ (১৯৪৮-৫১) জনাব হাকিম আলী ছিলেন পাঞ্জাবী এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ (১৯৫১-৫৪) টি.এইচ. ম্যাথুম্যান ছিলেন বৃটিশ। এই দেশে প্রকৌশল শিক্ষার ভবিষ্যত নির্মাণে ড. রশীদের ষোল বৎসরব্যাপী নেতৃত্বের অবিস্মরণীয় ইতিহাসের শুরু তখন হইতেই। টেক্সাস এ. এন্ড. এম. কলেজের সহিত যুগান্তকরী শিক্ষা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই চুক্তির ফলে বিদেশ হইতে কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসিয়া যোগদান করেন এবং এই দেশ হইতে বেশ কিছু শিক্ষকের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভের পথ সুগম হয়।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার ড. রশীদকে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য মনোনীত করে। ঐ কমিশনের প্রকৌশল শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিখ্যাত সুপারিশের পিছনে তাঁহার প্রচুর অবদান ছিল। সুপারিশটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"A technical university or institute of engineering and higher technology should be established both in East and West Pakistan."

সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি করিয়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ড. রশীদকে প্রজেক্ট কমিটির সদস্য মনোনীত করে এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন ও অধ্যাদেশ প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

ইতোমধ্যে ১৯৬১ সালের ১ এপ্রিল ড. রশীদ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রথম কারিগরী শিক্ষা পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্তির কথা উঠিলে ড. রশীদই মনোনয়ন লাভ করেন এবং ১৯৬১ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি কারিগরী শিক্ষা পরিচালকের দায়িত্বের অতিরিক্ত খণ্ডকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কারিগরী শিক্ষা পরিচালকের পদ হইতে অব্যাহতি লইয়া ড. রশীদ ১৯৬২ সালের ১ জুন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন

ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড. রশীদই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রাথমিক ঝড়ঝাপটা কাটাইয়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে থাকে। কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসের সম্প্রসারণের কাজ ড. রশীদের তত্ত্বাবধানে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। ফলে নূতন নূতন ছাত্রাবাস ও শিক্ষক কর্মচারীদের বাসভবন নির্মিত হইতে থাকে। জাতির প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৬ সালে ড. রশীদকে সিতারা-ই পাকিস্তান খেতাব ও পদকে সম্মানিত করে। ঐ বৎসরই তিনি ব্যাংককে অবস্থিত এশিয়ান ইনস্টিটিউটঅব টেকনোলজীর ট্রাস্টী হইবার গৌরব অর্জন করেন। সেই সময়ে এই ইনস্টিটিউটের নাম ছিল Seato Graduate School of Engineering. ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ড. রশীদ দীর্ঘ বার বৎসর সেই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৬ সালের ১ জুন ড. রশীদ দ্বিতীয়বারের মত ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। কিন্তু চার বৎসরের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৭০ সলের ১৬ মার্চ ঐ পদে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালের শেষদিকে ড. রশীদ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৩ সালে শিল্পকারখানার শ্রমিকদের মজুরি কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেন।

১৯৭৫ সালে ড. রশীদ বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া যায়। ঐ সময়ে তিনি সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বল্প খরচে অসংখ্য বাসভবন নির্মাণ করান এবং দেশের উন্নয়ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ড. রশীদ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

ড. এম. এ. রশীদকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগে প্রফেসর (ব্যক্তিগত চেয়ারে) পদে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি সানন্দে সম্মতি জানান এবং ১৯৭৯ সালের ১৫ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৮০ সালে তাঁহাকে জনতা ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেকটর্স-এর চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালের অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্থের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রপ্রধানগণ ড. এম. এ. রশীদকে কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশনের সভাপতি মনোনীত করেন। ১৯৮২ সালের ১ জুলাই হইতে ড. রশীদের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা ছিল।

১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে ড. রশীদকে IDA-এর ঋণের টাকায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউগুলির উন্নয়নকর্ম মূল্যায়নের দায়িত্ব দেওয়া হইলে তিনি অতি উৎসাহভরে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের মানসে বিমান পথে ঈশ্বরদী রওয়ানা হন। পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ বিমান বন্দরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং বগুড়া পর্যন্ত ড. রশীদকে সঙ্গ দানের অভিলাষ প্রকশ করেন। ড. রশীদ তাঁহার স্বভাবসুলভ ভংগীতে বলেন, কাহারও তাঁহার সহযাত্রী হইবার প্রয়োজন নাই এবং তিনি একাই গাড়িতে করিয়া বগুড়া যাইবার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে তিনি তাঁহার বাসভবনে নামাইয়া দেন এবং একাই বগুড়ার পথে রওয়ানা হন। স্টিয়ারিং সিস্টেমে গোলমাল থাকার কারণে পথিমধ্যে চালক গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলে। ফলে গাড়ীটি রাস্তা হইতে গড়াইয়া পড়ে এবং একটা গাছের সহিত ধাক্কা খায়। তখন আনুমানিক দুপুর সাড়ে বারোটা। দুর্ঘটনায় চালক ও ড. রশীদ দুইজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ড. রশীদ এক মারাত্মক আঘাত পান। পথচারীরা তাঁহাকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। ডাক্তারগণ ড. রশীদের পরিচয় খুঁজিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় জরুরী খবর পাঠান। বিশেষ হেলিকপ্টারে করিয়া ড. রশীদকে পাবনা হাসপাতাল হইতে ঢাকাস্থ পি.জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দেশের সেরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। তাঁহার চিকিৎসার জন্য নয়াদিল্লী হইতে একজন স্নায়ুশল্যবিদকে ঢাকায় আনা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি অস্ত্রোপচারের পূর্বেই জটিলতার শিকার হন এবং ১৯৮১ সালের ৬ নভেম্বর অপরাহ্নে ইন্তিকাল করেন। পরদিন ৭ নভেম্বর সকাল আটটায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে তাঁহার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই তাঁহার লাশ দাফনের জন্য তাঁহার গ্রামের বাড়ি সিলেটের হবিগঞ্জের বগাডুবিতে হেলিকপ্টারযোগে লইয়া যাওয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার দুই পুত্র স্থপতি, এক পুত্র যন্ত্রকৌশলী ও কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার। একমাত্র কন্যা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

ড. রশীদ পাকিস্তানের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং আমেরিকার সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারস-এর ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি। তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৭৬ সালে আইভরী কোস্টের আবিদজান-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সেশনে, ১৯৭৭ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আলী আহমাদের জানাযা অনুষ্ঠানে এবং লিবিয়ার জাতীয় দিবসের সপ্তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের তিনি প্রধান ছিলেন। ১৯৭৭ সালে সৌদী আরবে প্রেরিত হজ্জপ্রতিনিধি দলেরও তিনি নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানী সফর করেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুনের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত।

ড. জামীলুর রেজা চৌধুরী

আবদুর রহমান খাঁ (عبد الرحمان خان) ঃ খান বাহাদুর, আলহাজ্জ (১৮৯০-১৯৬৪), শিক্ষাবিদ, জ. ভান্ডারীকান্দি, উপজেলা শিবচর, জেলা মাদারীপুর। মাদারিপুরে ও বরিশাল জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং শেষোক্ত স্কুল হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই.এ. এবং ঢাকা কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীর এম.এ.

(১৯১৩)। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপনা দ্বারা কর্মজীবন শুরু (১৯১৪)। দীর্ঘ দিন শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। তিনি অখণ্ড বঙ্গদেশের সহকারী শিক্ষা ডিরেক্টর (এ.ডি.পি.আই.) পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সনে সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কলিকাতা হইতে ঢাকায় চলিয়া আসেন। অধ্যক্ষ থাকাকালে কলেজটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বেসরকারী কলেজের শিক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্টরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৪ সনের ২৩ নভেম্বর সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) কুরআন শরীফ (বাংলা অনুবাদ, ৩ খণ্ড); (২) পাঁচ সূরা শরীফ; (৩) জওয়াহিরুল কুরআন; (৪) শেষ নবী; (৫) হাদীছ শরীফ (৩ খণ্ড); (৬) ইসলাম পরিচিতি; (৭) ইসলামিক তমদ্দুন ও পাকিস্তান; (৮) মুসলিম নারী; (৯) নয়া খুতবা ইত্যাদি। তিনি গণিতশাস্ত্রে কয়েকখানি স্কুল পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৩৭; (২) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা-১ হইতে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭২ সং., পৃ. ১৫২।

মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আবদুর রহমান খান (عبد الرحمن خان) খান বাহাদুর, আলহাজ্জ (১৮৯০-১৯৬৪ খৃ.) শিক্ষাবিদ ও লেখক। তিনি বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ভাণ্ডারিয়া কান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাদারীপুরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি বরিশাল জেলা স্কুল হইতে ১৯০৮ খৃ. কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই. এ., ঢাকা কলেজ হইতে বি.এ. এবং ১৯১৩ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্বের সহিত গণিত এম.এ. পাশ করেন। আবদুর রহমান খান ১৯১৪ খৃ. ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকরূপে এবং শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে দীর্ঘদিন চাকুরী করেন। তিনি ১৯২৬ খৃ. শিক্ষা বোর্ডের সচিব, ১৯৩৩ খৃ. স্কুল পরিদর্শক এবং ১৯৩৯ খৃ. অবিভক্ত বাংলার সহকারী সরকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। তিনি ১৯৪৫ খৃ. সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খৃ. দেশবিভাগের পর তিনি কলিকাতা হইতে ঢাকায় চলিয়া আসেন। ১৯৪৮ খৃ. তিনি জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত এই পদে কর্মরত থাকেন।

তাঁহার অধ্যক্ষ থাকাকালে ঐ কলেজে বি.এ. ও বি.কম. কোর্স চালু এবং নাইট শিফট প্রবর্তনসহ কলেজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ১৯৫৪ খৃ. ঢাকায় কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও জনহিতকর কার্যক্রমে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ গ্রাম ভাণ্ডারিয়া কান্দিতে পিতার নামে আদালত মেমোরিয়াল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আবদুর রহমান খান চাকুরির পাশাপাশি সাহিত্য সৃষ্টিতেও বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কয়েকটি স্কুল পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও তিনি ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্যমূলক কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইলঃ কুরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ ৩ খণ্ড, পাঁচ সূরা, জাওয়াহিরুল কুরআন, হাদীস শরীফ, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, সহীহ্ বুখারী শরীফ (১৯৬১ খৃ.), মোসলেম নারী (১৯২৭ খৃ.), শেষ নবী (১৯৪৯ খৃ.) ইসলাম পরিচিতি (১৯৫২ খৃ.), ইসলামী তমদ্দুন ও পাকিস্তান আন্দোলন (১৯৫৬ খৃ.), নয়া খুত্‌বা, আমার জীবন (১৯৬৪ খৃ.) ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থপতি ডঃ ফজলুর রহমান খান তাঁহার পুত্র। শিক্ষা ও জনহিতকর কাজে বিশেষ অবদানের জন্য বৃটিশ সরকার তাঁহাকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুর রহমান খান, আমার জীবন, বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম ১৯৬৪ খৃ.; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড ঢাকা ১৯৭২ খৃ.; (৩) চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৭; (৪) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., পৃ. ১৮৩; (৫) Bangladesh District Gazetteer- Faridpur, 1977, p. 252; (৬) Abul Fazal Shamsuddin ed., who's. who in Bangladesh, Tribhuj prakashani, Uttara, Dhaka 1992.

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আবদুর রহমান চৌধুরী (عبد الرحمن چودهری) ঃ বিচারপতি, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থানাধীন বিখ্যাত উলানিয়া জমিদার পরিবারের সন্তান। ১৯২৬ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আলহাজ্জ খান বাহাদুর আব্দুল লতিফ চৌধুরী কাউন্সিল অব স্টেটস অব ইন্ডিয়া ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরীর মাতামহ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কাজী বাড়ির খান বাহাদুর আলহাজ্জ জহিরুল হক ছিলেন বৃটিশ ইন্ডিয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং মুসলিম হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার এক জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আব্দুর রহমান চৌধুরীর চরিত্রের মধ্যে আভিজাত্যের অহংবোধের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, বরং তাঁহার মধ্যে গণমুখী চেতনা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় সৈনিকের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

অন্যায়ের কাছে আব্দুর রহমান চৌধুরীকে আপোস কিংবা মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই। তিনি তাঁহার বিবেচনায় ন্যায় প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যখনই তিনি তাঁহার ধারণায় অসংগতি লক্ষ্য করিতেন তখনই সেই সব অন্যায়ের সরাসরি প্রতিবাদ জানাইতেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত কোন উপহার নয়, বরং তাহা হইতেছে একটি স্বাধীন দেশের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। নাগরিকদের

জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের জন্য নাগরিক নয়। এই অধিকারসমূহ যে অপহরণ করা যায় না তাহা জাতিসংঘ সনদেই স্বীকৃত ও গৃহীত এবং বাংলাদেশও এই সনদে ও বিভিন্ন ঘোষণায় একটি স্বাক্ষরদাতা দেশ"।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল তাঁহার ছাত্র জীবনের সূচনা। তিনি ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলা স্কুলে হইতে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য ডি. সিলভা স্বর্ণ পদক লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি কলিকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এম.এ. ও এল.এল.বি. ডিগ্রী লাভ করেন।

সমকালীন ছাত্র রাজনীতিতে আব্দুর রহমান চৌধুরী সক্রিয় ছিলেন এবং ছাত্র জীবনেই নিজ আসনটি দখল করিয়া নিতে পারিয়াছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে আব্দুর রহমান চৌধুরী সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের ১৯৪৮-১৯৪৯ সালের ভি.পি. নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছাত্র যুব সম্মেলনে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং মাতৃভাষা বাংলাকে মহিমান্বিত করিবার জন্য দুঃসাহসিকভাবে এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্ভবত ইহাই প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ হিসাবে বিরল দৃষ্টান্ত হইয়া আছে। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেও উজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং টিমের নেতৃত্ব দেন।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে আব্দুর রহমান চৌধুরীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের একজন। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র চার মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ভাষা আন্দোলনের রূপকার অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন আব্দুর রহমান চৌধুরী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ইহাই ছিল প্রথম প্রতিবাদ সভা। শেষে একটি মিছিলও বাহির হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন আব্দুর রহমান চৌধুরী।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসিলে তাঁহার সহিত ছাত্র নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে আব্দুর রহমান চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দেন। এই বৈঠক প্রসঙ্গক্রমে ছাত্রদের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিটি গুরুত্বের সহিত উত্থাপিত হয়। তিনি পুনঃগঠিত ও সম্প্রসারিত প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসিলে তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দাবি সম্বলিত যে ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সেই স্মারকলিপি প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তৎকালীন ছাত্রনেতা আব্দুর রহমান চৌধুরীর উপর। তিনি সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বটি কৃতিত্বের সহিত পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্মারকলিপিতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক দাবির ভিত্তিতে আমাদের জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপরেখা প্রণীত হইয়াছিল।

আব্দুর রহমান চৌধুরী ১৯৫৫ সালে ঢাকা হাই কোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে হইতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৯৫৫-১৯৬৮ সালে জনাব চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৯ সালে একই বারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

আব্দুর রহমান চৌধুরী তদানিন্তন অল পাকিস্তান বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন এবং তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তান বারের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালেই তিনি ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালক নির্বাচিত হন। ইতোমধ্যে একজন আইনজীবী হিসাবে আব্দুর রহমান চৌধুরীর সুনাম ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে।

১৯৭৩ সালে তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ দশ বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনাব চৌধুরী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি হিসাবে তিনি তাঁহার দীর্ঘ কর্মময় জীবনে দক্ষতা, সততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলেন, "আজ আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই, সম্মান ও মর্যাদা নেই, এমনকি স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। আমাদের অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ আছে, বিপরীতে আছে অত্যন্ত সামান্য প্রশাসন, বহু সংখ্যক সরকারী সেবক, তবে নিতান্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণ জনসেবা। আইন আছে প্রচুর কিন্তু নেই আইনের শাসন"।

মূল্যবোধের অবক্ষয় বিচারপতি চৌধুরীর মনে সব সময় পীড়া দিত। তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের স্থান দিয়াছেন সর্বোচ্চে। তাঁহার কয়েকটি অবিস্মরণীয় রায়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এইগুলির মধ্যে রক্ষীবাহিনী, কিংফিশারীজ, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, ডি.আই.টি. প্রভৃতি মামলার রায় উল্লেখযোগ্য।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইন প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও সভাপতিত্ব করিয়াছেন এবং ঐ সকল সভা-সমিতিতে বিভিন্ন বক্তৃতায় আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বাংলাদেশ প্রথমবারের মত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলে ১৯৭৮ সালে বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ দলের উপনেতা হিসাবে যোগদান করেন।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগাল এফেয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এই প্রতিষ্ঠানটি

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টের সাথে সংযুক্ত। দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের লইয়া ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি "লিবার্টি ফোরাম"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফোরাম সামরিক শাসন হইতে গণতন্ত্রের উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী বাংলাদেশ-বোসনিয়া সলিডারিটি ফ্রন্টের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, জাতীয় যক্ষ্মা সমিতি (নাটাব), বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতি প্রভৃতির আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের প্রেসিডেন্ট ও বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী ১৯৯৩ খৃ. জানুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কামিনী কুমার দত্ত স্মারক বক্তৃতামালা প্রদান করেন। ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী "প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম স্বর্ণ পদক" লাভ করেন।

১৯৪৮ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের সৈনিক, আইনের শাসনের প্রবক্তা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা, আমাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রাণপুরুষ, জাতির বিবেক হিসাবে খ্যাত বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী ১৯৯৪ সালের ১১ জানুয়ারী ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী (উৎস) : বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর পুত্রদ্বয়, তাঁহাদের সরবরাহকৃত কিছু কাগজ ও একটি স্মরণিকা।

গাজী শামছুর রহমান

আবদুর রহীম, স্যার (سر عبد الرحيم) : তিনি ইংরেজী ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলভী আব্দুর রব। তিনি তৎকালীন বাংলার মেদেনীপুর জেলার জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতামহও ছিলেন একজন জমিদার এবং তখনকার সময়ের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা অর্থাৎ ডেপুটি কালেক্টর। অত্যন্ত ধনাঢ্য ও সুশিক্ষিত পরিবারে আব্দুর রহীমের জন্ম। স্যার আব্দুর রহীমের মধ্যে তাঁহার পিতা ও পিতামহের প্রতিভার বংশগত স্বাক্ষর দেখা যায়। আব্দুর রহীম মেদিনীপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হইতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কলেজে তাঁহার অধ্যয়নকালীন জীবন ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। ২০ (বিশ) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। বি.এ. পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম.এ.পাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অত্যুজ্জ্বল সাফল্যের পর আব্দুর রহীম ব্যারিস্টার হইবার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। বার-এ্যাট ল-তে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আইনশাস্ত্রে ভূপালের বেগম বৃত্তি প্রদান করেন। তিনি বিলাতের মিড্ল টেম্পলে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ সালে ব্যারিস্টারী পাশ করেন।

১৮৯০ সালের শেষদিকে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলিকাতা বারে আইন পেশায় তালিকাভুক্ত হন। তিনি প্রেসিডেন্সী টাউনে আইন ব্যবসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারী পড়িবার সময় তিনি ইসলামী আইন ও ফৌজদারী আইন পাঠের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ইসলামী আইনবিদ হইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং এই প্রস্তুতি পর্বে তিনি মুগল সম্রাটদের আমলের আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত ইসলামী আইনের মূল পুস্তকসহ বহু সংশ্লিষ্ট পুস্তক গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। ইহার সাথে সাথে তিনি কলিকাতা বারে ফৌজদারী আইনজীবী হিসাবে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আব্দুর রহীম ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি তাঁহার জীবনের প্রাথমিক চিন্তা-চেতনা পরবর্তী জীবনে কার্যকরী করিয়াছেন।

তিন-চার বৎসরের মধ্যেই পেশায় প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করেন এবং একজন ন্যায়বান বিজ্ঞ আইনজীবী হিসাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার ফলে তিনি সরকার কর্তৃক ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ইহা তাঁহার চাকুরী জীবনের প্রথম ধাপ। পরবর্তীতে তিনি কলিকাতার ফোর্ট ইউলিয়ামে গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার হিসাবে তিনি ১৮ মাস দায়িত্ব পালন করেন। তৎপর তিনি আইন পেশায় ফিরিয়া যান। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলিকাতা হাই কোর্টের আপীল বিভাগে একজন দক্ষ এ্যাডভোকেট ও প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী আইনবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উক্ত সুনামের ফলে ও ফৌজদারী আইনে অর্জিত জ্ঞানের জন্য তিনি কলিকাতা শহরের উত্তর বিভাগের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্বে সাধারণত এই পদে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হইত না। এখানেও তিনি একজন দক্ষ, ন্যায়বান ও মার্জিত ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০০ হইতে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বারের আকর্ষণে তিনি পুনরায় ১৯০৩ সালে আইন পেশায় ফিরিয়া আসেন। তিনি তাঁহার পূর্বের স্থান, বিশেষ করিয়া ফৌজদারী মামলার আপীল বিভাগে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

স্যার আব্দুর রহীম ইসলামী আইনের উপর মৌলিক উৎস গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার ফলে এই বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি ইসলামী আইন বিষয়ে টেগোর আইনবক্তা হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি এই লেকচার দিয়াছিলেন। ইহা ১৯১১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় প্রকৃত সূত্র ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য আইনজীবীদের নিকট এই বইখানি ছিল মহামূল্যবান। তিনি ঐ বৎসর মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে যোগদান করেন।

আইনবিদগণ মনে করিতেন, ইসলামী আইন কোন বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। স্যার আব্দুর রহীমের 'মুসলিম আইনবিদ্যা' নামক গ্রন্থখানি এই ভ্রান্তি অপনোদন করে। যাহারা ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আইনবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে আগ্রহী তাহারা এই বইখানি পাঠে প্রচুর উপকার লাভ করেন। আইনবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় মুসলমান আইনবিদগণ যে অবদান রাখিয়াছিলেন তাহা এই বইতে স্পষ্টভাবে পরিবেশিত হইয়াছে।

সাংবিধানিক আইন, প্রশাসনিক আইন এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের কাজ করে যে আইন সেই আইনগুলির পরিবেশন ছিল

আইন সাহিত্যে স্যার আব্দুর রহীমের মূল অবদান। ভারতবর্ষে যখন মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছিল তখন উক্ত আইন বিষয়ক রচনা ছিল অত্যন্ত হিতকর। তিনি এই বইয়ের উপসংহারে অমুসলমান দেশে মুসলমানদের কর্তব্য বিবৃত করিয়া এই আইন বর্তমান পরিস্থিতিতেও কার্যকর তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

মুসলিম আইনের সাধারণত ২টি দিক আছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। একটি পার্থিব দিক যাহা আদালত কর্তৃক কার্যকর হয়, আর একটি আধ্যাত্মিক দিক যাহা প্রত্যেক মুসলমানের বিবেককে প্রভাবান্বিত করে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তাঁহার রাজ্যের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবশ্যই মুসলিম আইন বলবৎ করিতে বাধ্য। একজন মুসলমান অমুসলমান রাষ্ট্রে বসবাস করিলে তিনি অবশ্যই মুসলিম আইনের বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ যতদূর সম্ভব মানিয়া চলিবেন। আর যদি কেহ তাহা না করেন তাহা হইলে তিনি ধর্মীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন। কোন মুসলমানের যদি অমুসলিম রাষ্ট্রে তাহার নিজের ও সম্পদের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকে তাহা হইলে তাহাকে নিজ মুসলিম রাষ্ট্রে প্রত্যাগমন (হিজরত) করা উচিত।

মুসলিম আইন অনুযায়ী যে কোন অত্যাচার-নির্যাতন মুসলমান হিসাবে প্রতিহত করা উচিত। আর যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে উহা হইবে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল, আইনে যাহা কঠিনভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

টেগোর আইন বক্তৃতা আবদুর রহীমকে পাণ্ডিত্যের শীর্ষস্থানে উন্নীত করে এবং তাঁহার পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করে। যখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জন্য একজন মুসলমান জজ চাওয়া হয় তখন প্রেসিডেন্সীতে আবদুর রহীম ব্যতীত কোন সুযোগ্য মুসলমান জজ ছিলেন না বলিয়া স্বাভাবিক কারণেই মাদ্রাজ হাইকোর্ট তাঁহাকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করিয়া ব্যাপক লাভবান হয়।

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে আবদুর রহীম জজ হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দায়িত্ব গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে যথার্থভাবে একজন সুদক্ষ বিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেস-ল-এর উপর তাঁহার দখল কিছুটা কম ছিল, তবে তাঁহার প্রগাঢ় সাধারণ জ্ঞান, মৌলনীতি বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও ন্যায়বিচারে নিরপেক্ষ দূরদৃষ্টি, বিবেক ও বুদ্ধির ব্যবহার তাঁহাকে বিচক্ষণ বিচারকে পরিণত করে। ফৌজদারী মামলার বিষয়ে তাঁহার বিচারশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বাদী পক্ষের মামলার সামান্যতম ত্রুটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। বিচারপতি আবদুর রহীম শুধু নিজেকে আইনের ব্যাখ্যা ও আইন প্রশাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি মনে করিতেন, তদানীন্তন ভারতবর্ষে প্রচলিত আইনের কারণে যদি জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব হয় তাহা হইলে তাহা রোধ করিবার জন্য বিচারকগণের কিছু দায়িত্ব রহিয়াছে। বিচারকগণ উক্ত বিষয়ে আইন সংশোধনের জন্য জনগণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন।

নিউ ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং ওয়ার্কস মামলায় তাঁহার রায়ের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি লক্ষণীয়, "প্রেস আইনের চারি নম্বর ধারাটি এই আইন দ্বারা স্থানীয় সরকারকে এমন ব্যাপক ও মুক্ত ক্ষমতা প্রদান করে যে, এই আইন দ্বারা ছাপাখানা পরিচালনা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা দুরূহ হইয়া পড়ে। সংবাদপত্রের কর্তব্য হইল সমাজের জন্য কল্যাণকর জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ প্রকৃতির তথ্যাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ করা"। এই আইন বলে আপত্তিজনক মনে করিলে যে কোন সংবাদপত্র সরকার বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা রাখিত। সংবাদপত্র প্রত্যক্ষভাবে ও অবিচলভাবে সরকারের অনুগত থাকিলেও এবং সাধারণভাবে সম্পাদকের বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত হইলেও এমন কোন লেখা যদি কখনও অসাবধানতাবশত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যাহা চারি নম্বর ধারার বিপদকে আকর্ষণ করিতে পারে, সেই ক্ষেত্রে প্রেস আইনের উক্ত ধারায় আপত্তিকর উল্লেখ করিয়া সরকার বিচার না করিয়াই জামানত বাজেয়াপ্ত, এমনকি সংবাদপত্র বন্ধ করিতে পারে।

সাময়িকীর প্রভাব জনজীবনে হিতকর হইলেও ইহা সরকারকে পত্রিকার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নিবৃত্ত করিবে না। ভারতীয় সংবাদপত্র এই আইন পাসের পূর্বে যে পরিধির মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিত, এই আইন পাশ হইবার ফলে সেই পরিধি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং নির্বাহী সরকারকে এই আইনের মাধ্যমে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়ায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঘটাইয়াছে।

১৯১২ সালে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যপদ লাভ করেন। তখন মাদ্রাজ সাপ্তাহিক নোটে মন্তব্য করা হয়ঃ বড়দিনের ছুটির পরে হাই কোর্ট খুলিলে বিচারপতি আবদুর রহীম আর আমাদের সহিত থাকিবেন না। তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করিয়াছেন। বিচারপতি হিসাবে তিনি তাঁহার নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে আবদুর রহীম যখন পুনর্বার হাই কোর্টের বিচারক হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন তখন এই পত্রিকা তাঁহার সম্পর্কে উল্লেখ করেঃ

"বিচারপতি আবদুর রহীম তাঁহার স্থায়ী স্থান হাইকোর্টে ফিরিয়া আসার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁহার অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মহামান্য বিচারক বর্তমানে প্রধান বিচারপতি পদ লাভ করিয়াছেন ইহা সময়োচিত। আমরা নিশ্চিত, বিলাতে তাঁহার স্বল্পকালীন অবস্থান হাইকোর্টের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় আরো ভাল ভূমিকা রাখিতে সাহায্য করিবে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সকল সভ্য দেশের মত বিলাতেও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা স্বাধীন ও পবিত্র দায়িত্ব এবং আইন পেশা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে"।

১৯১৬ সালের জুলাই হইতে অক্টোবর পর্যন্ত একইভাবে ১৯১৯ সালের জুলাই হইতে অক্টোবর পর্যন্ত বিচারপতি আবদুর রহীম ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলায় তাঁহার নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বে ধারণা করা হইত, তাঁহাকে স্থায়ীভাবে মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব প্রদান করা হইবে। যখন হইতে আমরা তাঁহাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে পাইয়াছিলাম আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না, তিনি তাঁহার দায়িত্বের কারণে ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং স্বাধীনতা ও সংহতি সমুন্নত রাখিতে পরিবেন।

আইন সাম্রাজ্যের বাহিরে শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি একটি স্থায়ী অবদান রাখেন। তিনি অনেক বৎসর যাবত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন বক্তৃতা করেন। উভয় বক্তৃতায়ই তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উদার মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৬ সালে

উদ্দতুল-'উলামা নামে অত্যন্ত প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি মাজলিসু'ল-'উলামা নামে ১৯১৭ সালে তানজোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের সম্মেলনেরও সভাপতি ছিলেন।

মাদ্রাজ আসার পূর্বে তিনি মুসলিম লীগ গঠনের পুরোধা ছিলেন এবং ইহার সংবিধান তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯০৬ সালে লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাতকারে তিনি অল-ইন্ডিয়া ডেপুটেশন-এর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ মোহাম্মদী শিক্ষা সমিতি ও আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি মাদ্রাসা-ই আজম, পরিদর্শক বোর্ড ও মাদ্রাজে গভর্নমেন্ট মোহামেডান কলেজের সভাপতি ছিলেন। তিনি মাদ্রাজের কসমোপলিটন ক্লাবেরও সভাপতি ছিলেন।

আইন, রাজনীতি, সমাজসেবা, শিক্ষা ও শিল্প, সকল ক্ষেত্রেই স্যার আবদুর রহীম সুস্পষ্টভাবে তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সকল সময়ই এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করিবার আশা পোষণ করিতেন।

স্যার আবদুর রহীম ১৯০৮ সালে সরকারী চাকুরীতে তাঁহার কৃতিত্বের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কায়সার-ই হিন্দ পদক লাভ করেন। তিনি ১৯১৯ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। কয়েক বৎসর পর বাংলায় ফোর্ট উইলিয়ামের নির্বাহী পরিষদের সদস্য থাকাকালে কে. সি. এস. আই. পদকে ভূষিত হন।

মাদ্রাজে যাওয়ার কিছু দিন পরই তাঁহাকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ফেলোশীপ প্রদান করা হয় এবং ১৯১০ সালের ৩১ মার্চে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানের জন্য মনোনীত করিয়া তাঁহাকে সম্মান জানানো হয়।

স্যার আবদুর রহীম কলিকাতা শহর ও ইহার পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী আইনসভার একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সংসদে ইনডিপেনডেন্ট পার্টির একজন নেতা এবং সাধারণ বিষয়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংবাদপত্র বিলের উপর ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সংসদীয় বৈঠকে তিনি বিলের উপর ইনডিপেনডেন্ট পার্টির মনোভাব পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি বলেন,

"আমরা সবাই এক সুরে হিংস্রতা, হত্যা ও নিষ্ঠুর বলাৎকারের মত অপরাধ, যে উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হউক না কেন, যাহা দুষ্কৃতিকারীদেরকে উৎসাহী করে, তাহার প্রতিবাদ জানাই। অপরাধ, হিংস্রতা ও হত্যার মত অপরাধকে উৎসাহিত করে এই ধরনের বক্তৃতা ও লেখার ব্যাপারেও আমরা নিন্দা প্রকাশে একমত।

"আমার বিশ্বাস, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচলিত এই ধরনের অপরাধকে উৎসাহ প্রদানকারী লেখাকে প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সন্দেহ নাই, এই বিল প্রতিরোধের চাইতেও ব্যাপক। এই দেশে সংঘটিত কিছু সংখ্যক অপরাধ প্রতিরোধই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই বিলের প্রস্তাবনায় যে সত্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা হইল, দেশের সমস্ত সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল, আমরা সরকারের হাতে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার পক্ষপাতী নই, বরং সরকার যাহাতে সহিংসতার মত অপরাধ ও হত্যা প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহাতে আমরা সরকারকে সহযোগিতা করিতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, যদি তাহা দেশের রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নের খাতিরে করা হইয়া থাকে। আমরা সরকারের সহিত যতদূর সম্ভব কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত। তবে এই মুহূর্তে দেশের সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার কোন যৌক্তিকতা রহিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না"।

তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন, যদি বিলটি গৃহীত হয় তবে ইহা দেশের সমস্ত প্রকাশনা শিল্পের উপর আঘাত হানিবে।

আবার ১৯৩১ সালের ১ অক্টোবর যখন ভারতীয় সংবাদপত্র (জরুরী ক্ষমতা) বিল আইন সভাতে আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হয় স্যার আবদুর রহীম তখন দৃঢ়ভাবে সরকারের হাতে প্রকাশনা সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। ইনডিপেনডেন্ট পার্টির নেতা হিসাবে বৈদেশিক সম্পর্ক বিলের ব্যাপারে তাঁহার মনোভাব ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।

১৯৩১ সালের শেষভাগে প্রবর্তিত দ্বিতীয় বিলে স্যার আবদুর রহীমের তীব্র বিরোধিতা ভারতে স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁহার সর্বকালের সংগ্রামের প্রমাণ বহন করে।

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, ভারতের বাজেট সম্পূর্ণভাবে না হইলেও বহুলাংশে সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে ভারত সরকারের খরচের উপর ব্যয় সংকোচন নীতি পালন করিয়া তৈরি করা উচিত। স্যার আবদুর রহীম তাঁহার বক্তব্যে আইন সভার আলোচনার অসারতা তুলিয়া ধরেন এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের মনোভাবের সমালোচনা করেন।

স্যার আবদুর রহীমের স্মৃতি, তাঁহার দীর্ঘ ও বহুমুখী বিচার বিভাগীয় অভিজ্ঞতা, ইসলামী চিন্তা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিশালতা, আমলাতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে আপোসহীন ও দৃঢ় অবস্থান, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার উপর সুচিন্তিত মতামত, বিশেষত মুসলমানদের স্বীকৃত নেতা হিসাবে তাঁহার অবস্থান এই দেশবাসীর মনে চিরঅম্লান থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Eminent Indian Judges, Mittal Publications, New Delhi.

গাজী শামছুর রহমান

আবদুর রহীম, শেখ (عبد الرحيم، شيخ) ঃ ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার বশীরহাট মহকুমার মুহাম্মাদপুর গ্রামে জন্ম। নানা প্রতিকূল অবস্থায় কলিকাতা সিটি স্কুলের এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়ার পর তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হয়। তিনি ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে সুধাকর নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি মিহির ও সুধাকর নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে তিনি মোসলেম হিতৈষী নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটির সম্পাদনা করেন। তিনি সাংবাদিকতা ও ধর্মগ্রন্থ রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হজরত মুহাম্মদের জীবন চরিত্র ও ধর্মনীতি। ইহা ১৮৮৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৩১ খৃ. ১৪ জুলাই পরলোকগমন করেন।

স. ই. বি.

আবদুর রসূল (عبد الرسول) ঃ (১৮৭২-১৯১৭) আইনজীবি, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। আবদুর রসুল বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গুণ্যক গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবেই পিতা গোলাম রসুল ইন্তিকাল করিলে তাঁহার মায়ের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহে তিনি সফলভাবে লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। তিনি ১৮৮৮ খৃ. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করেন।

আবদুর রসুল ১৮৮৮ খৃ. উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড গমন করেন। তিনি ১৮৯২ খৃ. লন্ডনের কিংস কলেজ হইতে প্রবেশিকা, ১৮৯৬ খৃ. অক্সফোর্ডের জোনস্ কলেজ হইতে বি.এ. এবং ১৮৯৮ খৃ. এম.এ. পাস করেন। একই বৎসর তিনি মিডল টেম্পল হইতে বার এট-লি পাশ করেন এবং সাথে বিসিএল (Bachelor of Civil Law) উপাধি লাভ করেন। শুধু বাঙালীদের নয় ভারতীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম বিসিএল ডিগ্রীধারী। তিনি পূর্ববঙ্গের প্রথম মুসলমান ব্যারিষ্টার। দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থানকালে বিশিষ্ট ভারতীয়দের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে।

১৮৯৯ খৃ. তিনি দেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। আবদুর রসুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক মতভেদের কারণে নিয়োগ বাতিল করা হয়। মূলত বঙ্গ বিভাগের (১৯০৫ খৃ.) বিরোধিতার মধ্য দিয়াই তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি প্রথমত কংগ্রেসের রাজনীতির সহিত যুক্ত থাকিলেও পরবর্তীতে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম মিলন ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। আবদুর রসুল আইনজীবি হিসাবে অল্প সময়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ হিসাবেও অগ্রভাগে স্থান লাভ করেন। তিনি ১৯০৬ খৃ. বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি মুসলিম লীগের (ঢাকা ১৯০৬ খৃ.) পাল্টা সংগঠন হিসাবে ইন্ডিয়ান মুসলমান এসোসিয়েশন (কলিকাতা ১৯০৭ খৃ.) গঠন করেন এবং ইহার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বাংলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের সহযোগিতায় তিনি "দি মুসলমান" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। আবদুর রসুল ১৯০৯ খৃ. মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ১৯১২ খৃ. চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ১৯১৬ খৃ. লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। চট্টগ্রাম বিভাগের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন হইতে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

আবদুর রসুল ১৯১৭ খৃ. বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতার জাতীয় কলেজ (স্থা. ১৯০৬ খৃ.), বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠায় তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। আবদুর রসুল ছিলেন একজন কৃতি ছাত্র, বিশিষ্ট বাগ্মী, তীক্ষ্ণ আইনবেত্তা, সাহসী, নিষ্ঠাবান ও সৎ রাজনৈতিক নেতা এবং একজন অসাধারণ মানুষ হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ৩ আগস্ট, ১৯১৭ খৃ. মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবেদার রসুল বকুল, আবদুর রসুল ঃ জীবন কর্ম, উৎস প্রকাশন, ঢাকা ২০০৩ খৃ.; (২) চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৭; (৩) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., খণ্ড-১, পৃ. ১৮৩; (৪) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পা., কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৯৩১; (৫) দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১০ অক্টোবর, ২০০৩।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আবদুর-রাযযাক কামালুদ্দীন (عبد الرزاق كمال الدين)ঃ ইবন জালালুদ্দীন ইসহাক সামারকান্দী ইরানী ঐতিহাসিক, সুপরিচিত মাত্'লা-ই-স'াদায়ন ওয়া মাজমা'উল বাহ্‌রায়ন নামক গ্রন্থের প্রণেতা, শা'বান, ৮১৬/নভেম্বর ১৪১৩-এ হারাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় জুমাদাল উখ্‌রা ৮৮৭/জুলাই-আগস্ট ১৪৮২-এ ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পিতা শাহ্‌রুখের সেনানিবাসের ইমাম ও কাযী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বিভিন্ন গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার কাছে বিভিন্ন ধরনের শার'ঈ মাস্‌আলার সমাধান বর্ণনা করিতেন (মাত্'লা', ২খ., ৭০৪, ৮৭০, তু. ৭০৬)।

তিনি প্রচলিত ধরনের শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'আবদুল-ক'াহ্‌হার। তাঁহার পিতা যখন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আল্-জাযারী (মৃ. ৮৩৩/১৪২৯)-কে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম পড়িয়া শুনান, তখন তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন (ঐ, ২খ., ৬৩১, ১২৯৪) এবং ইজাযা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ইন্তিকালের পর তিনি তাঁহার বড় ভাইদের সঙ্গে শাহ্‌রুখের দরবারে যোগদান করিতেন; কিন্তু ৮৪১/১৪৩৭-৩৮ সনে তিনি যখন আর্-রিসালাতুল্-'আদুদিয়্যা-র উপর রচিত তাঁহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাদশাহ্-এর নামে উৎসর্গ করিলেন এবং উহা তাঁহাকে উপহার দিলেন, তখন তাঁহাকে চাকুরিতে নিয়োগ করা হয় এবং নিয়মিত শাহী দরবারে উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। দুই বৎসর পর শাহী দরবারের আলিমগণ কর্তৃক তাঁহার পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং তাঁহার বেতন ও ভাতা মঞ্জুর করা হয় (ঐ, ২খ, ৭০৪, ৭৩১ প.)।

রামাদান ৮৪৫/জানুয়ারী ১৪৪১-এ আবদুর-রাযযাককে রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতবর্ষে পাঠানো হয় এবং রামাদান ৮৪৮/ডিসেম্বর, ১৪৪৪-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার দৌত্যকর্ম এবং এতদ্‌লব্ধ ফলাফলের জন্য দেখুন মাত'লা', ২খ., ৭৮৩; T. W. Arnold, The Caliphate, Oxford 1924, 113)। অনুরূপভাবে তাঁহাকে রাষ্ট্রদূত করিয়া জীলানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। একই বৎসর মিসরে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শাহ্‌রুখের ইন্তিকালের দরুন ইহা বাতিল করা হইয়াছিল। উপরিউক্ত বাদশাহ্‌র ইন্তিকালোত্তর সময়ে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী মীর্যা আবদুল-লাতীফ, মীর্যা আবদুল্লাহ ও আবুল-ক'াসিম বাবুরের অধীনে চাকুরি করেন, কাহারও অধীনে স'াদ্‌র এবং অন্যদের অধীনে নাইব ও খাস হিসাবে (দেখুন ঐ, ২খ., ১৪৪০)। তিনি শেষোক্ত শাহ্‌যাদার অধীনে, যিনি তাঁহাকে স্বীয় আস্থাভাজনদের মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন (ঐ, ২খ., ১১১৯)। ৮৫৬/১৪৫২ সনে মীর্যা বাবুর, শারাফুদ্দীন আলী ইয়ায্দীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত ইয়ায্দে ছিলেন এবং ৮৫৬/১৪৫২ সনে তিনি ঐ একই শাহযাদার সঙ্গে ছিলেন যখন তিনি সামারকান্দ অবরোধ করিয়াছিলেন যে শহরে আবদুর-রায্যাকের অনেক বন্ধু ও পুরাতন পরিচিত লোক ছিল (মাত্'লা, ২খ., ১০৪১, ১০৭৮)। ৮৬৬/১৪৬২ সনে কর নির্ধারণের জন্য তাঁহাকে আসফুযারে প্রেরণ করা হইয়াছিল (bunica bastan)। ইহার অল্প কিছুদিন পর সুলতান আবূ সাঈদের অধীনে ৩ জুমাদাল-উলা, ৮৬৭/২৪, জানুযারী, ১৪৯৩-এ উযীর খাজা কু'ত্'বুদ্দীন তাউস সিমনানী তাঁহাকে শাহ্রুখ খান্কাহ্র শায়খ (গভর্নর) নিয়োগ করেন (মাত'লা', ২খ., ১২৭০) যে পদে তিনি আমৃত্যু বহাল ছিলেন।

মাত'লা' গ্রন্থে ঈলখান আবূ সাঈদের জন্ম (৭০৪/১৩০৪-৫) এবং সিংহাসন আরোহণের (৭১৬/১৩১৬-৭) সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ ৭১৭-৮৭৫/১৩১৭-১৪৭১ সনসমূহের ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৮৩০/১৪২৬-৭ সন পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনার জন্য প্রধানত হাফিজ-ই আবরূ-এর যুব্দাতুত-তাওয়ারীখ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা কোন ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৮২৩৫/১৪২০-২ পর্যন্ত চীনে দৌত্য কাজের বিখ্যাত বিবরণীও যুবদা হইতে নেওয়া হইয়াছে। ৮৩০-৮৭৫/১৪২৬-৭১ সন পর্যন্ত সময়-কালের তথ্যের জন্য আবদুর-রায্যাক-এর গ্রন্থ হইতেছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎসসমূহের অন্যতম। তু. আবদুল-ওয়াসি' আন্-নিজামী-এর তাক্'রীজ (তাঁহার জন্য দেখুন হাবীবুস-সিয়ার, ৩খ., ৩, ৩২৮)। মাতলা-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৪০ নং পৃষ্ঠায় প্রাথমিক যুগের এবং স্বয়ং হাফিজ-ই আবরূ যেই সময়ের লোক ছিলেন সেই সময়ের ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতমুক্ত বর্ণনার জন্য হাফিজ-ই আবরূ-র নিকট আবদুর-রায্যাকের ঋণী থাকিবার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় একটি সংস্করণ লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিনে, নভেম্বর ১৯৩৩ হইতে আরম্ভ হইয়া পরবর্তী মাসসমূহে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে দুই খণ্ডে একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (লাহোর ১৩৬০/১৯৪১ এবং ১৩৬৪/১৯৪৯)।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইউরোপের প্রায় সকল বড় বড় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন উহা প্রাচ্যে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দ্বিতীয় খণ্ডের একটি স্বহস্ত লিখিত কপি লাভ করিয়াছে। ইহা গ্রন্থকার কর্তৃক ১৭ রাবী'উল-আওওয়াল, ৮৭৫/১৩ সেপ্টেম্বর, ১৪৭০-এ সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ ১৮ শা'বান, ৮৮৫/২৩ অক্টোবর, ১৪৮০-এ সমাপ্ত করেন। E. Quatremere, The Notices et extraits, xiv, Part I-এ ; H. M. Elliot-ও তাঁহার History of India, iv, 89-126-এ এই গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃতি দিয়াছেন (দ্র. Storey)। মাত'লা' (২খ., ১৯০) হইতে আমরা জানিতে পারি, আবদুর-রায্যাকও হারাত এবং ইহার জেলাসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মাত'লা'-এ কোন কোন স্থানে (উদাহরণস্বরূপ ২খ., ৯৫১, ১২০৮) তিনি তাঁহার নিজস্ব কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Storey, ii, 293-8; (২) W. Barthold,Turkistan, 56; (৩) Khwandamir, Bombay 1857, iii/3. 335.

W. Barthold—Mohammad Shafi (E.I.[2])/
আবদুল মালেক

'আবদুর-রায্যাক কামালুদ্-দীন (عبد الرزاق كمال الدين)ঃ ইব্ন আবিল গানাইম আল-কাশানী (বা কাশী বা কাসানী, একজন খ্যাতনামা সূফী গ্রন্থকার। হাজ্জী খালীফার বর্ণনা অনুসারে (সম্পা. Flugel, ৪খ., ৪২৭) তিনি ৭৩০/১৩২৯ সালে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু হাজ্জী খালীফা এই নামের অপর একজন ঐতিহাসিক মাত'লাউ'স-সা'দায়ন-এর গ্রন্থকারকে তিনি বলিয়া ভুল করিয়া অপর এক স্থানে (২খ., ১৭৫) বর্ণনা করেন, তিনি ৮৮৭/১৪৮২ সালে ইন্তিকাল করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার নামও কামালুদ্দীন আবুল-গ'নাইম 'আবদুর-রাযযাক' ইব্ন জামালুদ্দীন আল-কাশী আস্-সামারকান্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। জামীর বর্ণনা অনুসারে (নাফ্হ'াতুল-উন্স, St. Guyard কর্তৃক বর্ণিত) তিনি নূরুদ্দীন 'আবদুস্-স'ামাদের শিষ্য এবং রুকনুদ্দীন 'আলাউদ্-দাওলা (মৃ. ৭৩৬/১৩৩৬)-এর সামসাময়িক ছিলেন, যাঁহার সঙ্গে আবদুর-রায্যাকের তীব্র বিতর্ক (বাদানুবাদ) বিদ্যমান ছিল। এই বিতর্কের আশু কারণ হইল, সুলতানিয়া অভিমুখী রাস্তায় 'আলাউদ-দাওলার জনৈক শিষ্য আমীর ইক্বাল সিস্তানীর সঙ্গে ইব্ন আরাবীর ধর্মমতের বিতর্কিত বিষয়ের উপর আবদুর-রায্যাকের আলোচনা শুরু হয়। জামী এই বিষয়ে আলাউদ-দাওলার নিকট লিখিত আবদুর-রায্যাকের একটি দীর্ঘ চিঠির উল্লেখ করিয়াছেন। চিঠিতে আবদুর রায্যাক উল্লেখ করেন, তিনি আলাউদ-দাওলার গ্রন্থ 'উরওয়া' সম্প্রতি পাঠ করিয়াছেন। গ্রন্থটি ৭২১/১৩২১ সালে রচিত। অতএব, আবদুর-রায্যাকের মৃত্যু সাল ৭৩০/১৩২৯ হওয়া সঠিক বলিয়া মনে হয়। অতঃপর ইহাও স্বীকার করিতে হয়, আবদুর-রায্যাক পারস্যের ঈলখানীদের অধীন, বিশেষত আবূ সাঈদের শাসনামলে (৭১৬-৩৬/১৩১৬-৩৫) জিবাল প্রদেশে (কাশানে) ছিলেন।

তিনি ছিলেন অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। সেইগুলির মধ্যে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে Tholuck আবদুর-রায্যাকের গ্রন্থ লাত'ইফুল-ই'লামকে স্বীয় গ্রন্থ Die Speculative Trinitatslehre des Späteren Orients (পৃ. ১৩-২২, ২৮ প.)-এ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইহার রচয়িতাকে জানিতেন না। Sprenger ১৮৪৫ খৃ. কলিকাতা হইতে তাঁহার ইস'তি'লাহ'াতুস-সূ'ফীয়া বা Dictionary of The Technical terms of the Sufies-এর প্রথম অর্ধাংশে প্রকাশ করেন। Hammer-Purgstall কর্তৃক দ্বিতীয় অংশের সারমর্ম Jahrbuc- her der Literatur (৮২খ., ৬৮ প.)-এ দেওয়া হইয়াছে। Tholuck আবদুর-রায্যাকের গ্রন্থটিও ব্যবহার করিয়াছেন এবং গ্রন্থকারের বরাতে

ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন (পৃ. স্থা. পৃ. ৭, ১১, ১৮, ২৬, ৭৩)। এই গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কেননা গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক নিজেই লিখিয়াছেন, তিনি আল-হারাবী প্রণীত মানাযিলুস্-সাইরীন-এ ব্যাখ্যা লেখার পর এই গ্রন্থটি লিখিয়াছেন। আল-হারাবীর গ্রন্থে যে সকল সূফী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, অথচ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই, এই গ্রন্থে তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইব্নুল-'আরাবী প্রণীত ফুসূসুল-হি'কাম (কায়রো ১৩০৯ হি.)-এর তাঁহার কৃত ভাষ্যে ও তাঁহার রচিত তাবী'লাতুল-কুরআন-এ যে সকল বিষয়ের অপর্যাপ্ত আলোচনা রহিয়াছে, উক্ত গ্রন্থটিতে তিনি সেই সকল সূফী বিষয়ের ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছেন। হ'াজ্জী খলীফার (২খ., ১৭৫) মতানুসারে আবদুর-রায্যাকের তাবীলাতে মাত্র প্রথম ৩৮টি সূরার তাফসীর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বার্লিনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৮৭২-এ সমস্ত কুরআনের তাফসীর রহিয়াছে, যদিও বাহ্যত ইহা একটি সার-সংক্ষেপ। তৎপ্রণীত রিসালা ফিল-ক'াদ'া ওয়াল-ক'াদার তাক্দীর ও ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে রচিত। ফারসী ভাষায় সর্বপ্রথম ইহা অনূদিত হয় JA. ১৮৭৩; (সংশোধিত সংস্করণ ১৮৮৫); পরে St. Guyard কর্তৃক ইহার মূল পাঠ (Text) প্রকাশিত হয় (১৮৭৯ খৃ.)। পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। মনে হয়, রচনাটি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কেননা হ'াজ্জী খলীফা (৩খ., ৪২৯) ইহার জবাবে ইব্ন কামাল পাশা, তাশ-কোপরো যাদাহ ও বালী খালীফা সূফীয়াহ্বী-এর বরাতে তিনটি উত্তর দিয়াছেন। তিনি ইব্নুল-ফারিদ-এ কাসীদা আত্-তাইয়াতুল-কুব্রা-এ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন (কায়রো ১৩১০ হি.)। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলী রিসালাতুস-সার্মাদিয়্যা-নিত্য অস্তিত্ব সম্পর্কীয় একটি মতানুসারে রচিত ; রিসালাতুল-কুমায়লিয়্যা কুমায়ল ইব্ন যিয়াদের ফিল-হ'াকী'কা'া সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আলী (রা)-এর দেয় পরম্পরাগত উত্তরের আলোচনায় রচিত (তু. বার্লিন পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৩৪৬২, হ'াজ্জী খলীফা, ৪খ., ৩৮ ; JA. পৃ. ১৪, ৮৩); ইব্নুল-আরাবী-এর গ্রন্থ মাওয়াকি'উন্-নুজূম-এর একটি ব্যাখ্যা মিস'বাহু'ল-হিদায়া-কে সংযোজন করিয়াছেন (৫খ., ৫৮৭)। এই সকল পাণ্ডুলিপি বরাতের জন্য দ্র. Brockelmann, ২খ., ২০৩, ২০৪, পরিশিষ্ট, ২খ., ২৮০, ২৮১; The Gotha Cat. সংখ্যা ৭৬, পৃ. ২ ও Palmers Trinity College Cat. পৃ. ১১৬।

'আবদুর-রায্যাকে'র দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান কি ছিল, তাহা উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি পাশ্চাত্য আরবের মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ইবনুল-আরাবীর মতের (স্কুলের) একজন সূফী ছিলেন। তিনি কিছুটা স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার পক্ষপাতী হইলেও স্বীয় উস্তাদের চিন্তার সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যায় অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনটি বৃহৎ ধর্মতাত্ত্বিক বিভাগঃ পরম্পরাগত বর্ণনার অনুসারী (নাক্'ল), বুদ্ধিবৃত্তির অনুসারী ('আক্'ল) ও গূঢ় রহস্যের উন্মোচনকারী (কাশ্ফ)-এর মধ্যে তিনি তৃতীয় দলের অনুসারী ছিলেন। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তিনি কোন্ ধর্মমতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম দ্বারা ইহা কখনও বুঝা যায় না। সম্ভবত অন্য অনেক সূফীর মত তিনি এই সকল বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিতেন না অথবা শেষ বয়সে ফিক্'হশাস্ত্রের দিক হইতে জাহিরীতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, যেমন ধর্মতত্ত্বের বিচারে বাহ্যত তাঁহাকে বাতিনীদের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়। তাঁহার গ্রন্থ তাবী'লাত নামকরণ দ্বারাও ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে, তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থকে তাফসীর না বলিয়া তাবী'ল বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ইস্'তিলাহ'াত ও রিসালা ফিল-ক'াদ'া ওয়া'ল-ক'াদ্'ার নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে আমরা এরিস্টোটলের চিন্তাধারা, নব্য-প্লেটোবাদী অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব এবং নবী-কাহিনীর স্বাভাবিক সম্মিলন দেখিতে পাই। এই সকল উপাদান ইব্নুল-'আরাবীর মধ্যেও বর্তমান; তবে 'আবদুর-রায্যাক' সম্ভবত শেষোক্ত উপাদানটিকে তুলিয়া ধরার অধিকতর আগ্রহী। কেননা তাঁহার ধারণা, ইহাতে তিনি তাঁহার আবশ্যিক ধর্মীয় নিষ্ঠা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন। 'আবদুর-রায্যাক' মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিরংকুশভাবে অস্বীকার করা হইতে দূরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা ছিল তিনি ইবনুল-'আরাবীর অদৃশ্যবাদকে পরিহার করিবেন। এতদুদ্দেশে তিনি চিন্তার স্বাধীনতা ও পরকালে পুরস্কার ও শাস্তির জন্য ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের উপর একটি সম্ভাব্য ভিত্তি স্থাপন করার প্রয়াস পান। তাঁহার এই পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ কোন ঘটনার জন্য দায়ী মুখ্য শক্তি, বিশ্ব-গঠনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশে তিনি সূফী পদ্ধতিতে বিশ্বের অবস্থার বর্ণনা শুরু করেন। ইহা নব্য-প্লেটোবাদী ধারণা ; সবার উপর আল্লাহ, তিনি অদ্বিতীয় ; আল্লাহ্ হইতেই একটি কর্মশীল নিঃসরণের মধ্য দিয়া সার্বজনীন বুদ্ধি (العقل الأول) উৎসারিত। ইহাকে প্রাথমিক বা সার্বজনীন আত্মা (الروح الأول) ও সর্বোচ্চ জ্ঞান (العلم الأعلى)-ও বলা হইয়া থাকে, ইহা হইতে দুই প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়ঃ (১) আধ্যাত্মিক, ইহা আল-আস্'লুল-আওয়ালের একটি শক্তি, যাহাকে আল্লাহ্র সত্তা হইতে পৃথক বিবেচনা করিতে হইবে এবং ইহা বিশেষ বুদ্ধি দ্বারা অধিকৃত। ইহা আল-'আক'লুল-আওওয়ালের একটি অংশ, যাহাকে ধর্মের ফেরেশ্তা বলিয়া মনে করা হয়; (২) বাহ্যিক, ইহাকে সার্বজনীন আত্মা বলা যায় (نفس); পরিশেষে পার্থিব উপাদান (মাটি, পানি ইত্যাদি) প্রাকৃতিক শক্তি ও নীতিসহ বিকাশ লাভ করে। সার্বজনীন বুদ্ধিতে আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসের উপমা বর্তমান এবং এই বুদ্ধি সরাসরি আল্লাহ্ দ্বারা পরিচিত। ফেরেশ্তা ও বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্র অসীম শক্তিমত্তার বিকাশ লাভ ঘটে। এইজন্য এই জগতকে শক্তি জগত (عالم القدرة) বলা হইয়া থাকে। এই ফেরেশ্তাগণ স্বীয় পূর্ণতা দ্বারা অন্য অপূর্ণ বস্তুসমূহের পূর্ণতা দান করেন। এইজন্য এই জগতকে সংস্কার জগত (عالم الجبروت) বলা হয়। কেহ কেহ ইহার (جبر) শব্দের ভিন্ন অর্থ করিয়া ইহাকে বাধ্যতার জগত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কেননা ফেরেশ্তাগণ অপূর্ণ বস্তুসমূহকে পূর্ণতা লাভে বাধ্য করে। এই জগতকে গ্রন্থমাতা (ام الكتاب)-ও বলা হইয়া থাকে (কুরআন, ১৩ঃ ৩৯; ৪৩ ঃ ৪)। ইহা হইতেই আল্লাহ্র সকল রহস্যের জ্ঞান উৎসারিত হয়। এই জগত কালের বন্ধন ও পরিবর্তন হইতে মুক্ত। অপরদিকে সার্বজনীন আত্মার জগতকে 'প্রশাসনিক জগত' (عالم الملكوت) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ইহা পার্থিব জগতের অধিকতর কাছাকাছি। সার্বজনীন বুদ্ধিতে বর্তমান উপমা এই জগতে সাধারণ ধারণায় পরিণত হয়। এই ধারণা আরও বিশিষ্ট,

সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইয়া উর্ধ্ব জগতের বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার মধ্যে খোদিত হইয়া আমাদের জ্ঞানের নিকটতর হয়। সার্বজনীন বুদ্ধির অংশ ফেরেশ্তাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মেলামেশা করে। মানুষের কল্পনা জগতের সহিত ইহার সাদৃশ্যের ফলে ইহাকে কল্পনা জগত (عالم الخيال) ও নিকটতর আকাশ (السماء الدنيا) বলা হইয়া থাকে। এখান হইতেই সকল সৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হয় (عالم الشهادة)। সকল প্রকার আন্দোলন ও নির্দেশের উৎপত্তিস্থল ইহাই। এখানেই পদার্থের পরিমাপ ও কারণসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়। আমাদের ন্যায় আকাশের জীবসমূহেও বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা সার্বজনীন বুদ্ধির ন্যায় বর্তমান। সার্বজনীন আত্মাও বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই জগতের সকল ঘটনা ও পরিবর্তন ইহারই উপর নির্ভরশীল (তু. আল-গায্যালীর পরিকল্পনা প্রকার বিভাগ, JAOS, ১৮৯৯, পৃ. ১১৬ প.)।

এতদ্ব্যতীত বিশ্বের এই গঠন মানুষের শরীরের অনুরূপ যেমন বিশ্ব-জগত ক্ষুদ্র পৃথিবীর অনুরূপ; মস্তিষ্ক যেমন মানুষের চালনা শক্তির কেন্দ্র, তদ্রূপ সার্বজনীন শক্তি বা বুদ্ধি স্থির নক্ষত্রমণ্ডলের উপরস্থিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চতুর্থ আকাশ অর্থাৎ সৌরমণ্ডল, যাহা সকলকে জীবন দান করে, সার্বজনীন আত্মার কেন্দ্র, মানুষের মধ্যে তাহা হইল অন্তর, যেখানে বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার অবস্থান। অতএব চতুর্থ মণ্ডল মানব বক্ষের ন্যায় এবং সূর্য যেন শারীরিক অন্তর। সূর্যের স্বাতন্ত্র্য জৈবিক আত্মার ন্যায়, অন্তরে যাহার অবস্থান এবং যাহা মানবিক জীবনের উৎস।

সৃষ্টির এই পরিকল্পনা তাকদীরের সহিত ইহার সম্পর্কের ভিত্তিতে ইহার জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয় ঃ প্রথম কাদা, দ্বিতীয় কাদার, তৃতীয় ইনায়াত। কাদা অর্থ সার্বজনীন বুদ্ধির জগতে সকল বস্তুর সার্বজনীন নমুনার উপস্থিতি। কাদার অর্থ অস্তিত্বশীল বস্তু বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া পার্থিব রূপ ধারণার্থে সার্বজনীন ভাষার জগতে আগমন করা। ইহার পর এইসব নমুনা উহাদের সৃষ্টির কারণসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন করে এবং অনির্দিষ্ট সময়ে ইহা প্রকাশিত হয়। ইনায়াত ব্যাপক অর্থে আল্লাহ্র দূরদর্শিতার অপর নাম। ইহা কাদা ও কাদারের উপর এমনভাবে ব্যাপ্ত, যেমনভাবে উহারা বাস্তব প্রতিটি বস্তুকে ধারণ করে। ইহা ঐশী জ্ঞান, যাহা সকল বস্তুর উপর সার্বজনীন ও নিরংকুশভাবে পরিব্যাপ্ত। ইহা কোন স্থানের মধ্যে নয় ; কারণ ইহা আল্লাহ্র জ্ঞান। তাঁহার সত্তার পূর্বে তাঁহার সত্তার উপস্থিতি ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। ইহা একক জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য এবং ইহার মধ্যে তাঁহার সত্তায় নিহিত সকল গুণ বর্তমান। অধিকন্তু যদিও কাদা আল্লাহ্র ইনায়াতের একটি অংশ, তথাপি সার্বজনীন বুদ্ধির জগতে ইহার পূর্ণতা লাভ ঘটে। সার্বজনীন বুদ্ধিকে কোন কোন সময় সংরক্ষিত ফলক (اللوح المحفوظ)-ও বলা হইয়া থাকে। কেননা উহাতে সকল সাধারণ ধারণা অপরিবর্তিতরূপে সংরক্ষণ করা হয়, যাহা একক স্বর্গীয় আত্মার দিকে ধাবিত হয়। অতঃপর ইহা হইল আত্মার কাদারের জগত, যাহা প্রতিটি বস্তুকে গতিশীল করে। এই গতি স্বর্গীয় বস্তুর বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার ফল, যাহা উহাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সার্বজনীন জ্ঞানে বর্তমান। এই বস্তুসমূহ সার্বজনীন বুদ্ধির অংশরূপে সার্বজনীনতা লাভের চেষ্টা করে। স্তরে স্তরে উহারা উর্ধ্বদিকে যাইতে থাকে এবং প্রতি স্তরে উহারা সেই ভিত্তি হইতে উহাদেরকে অগ্রে আকর্ষণকারী নব পাতন লাভ করে। প্রতি চলনে উহারা পার্থিব বস্তুসমূহের উপর যোগ্যতানুসারে প্রভাব ফেলে এবং যেমনভাবে সার্বজনীন আত্মার জগতে পরিবর্তন আসে, তেমনিভাবে পার্থিব জগতেও পরিবর্তনের ধারার সূচনা হয়। এই পরিবর্তন হয়ত পরিপূর্ণ সৃষ্টি অথবা ধ্বংস অথবা এই দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী যাহা শুধু অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। পরিশেষে কুরআনের সূরা তূরের প্রথম ছয় আয়াতের আবদুর-রায্যাককৃত তাফ্সীরের দ্বারা বুঝা যাইবে, তিনি কুরআনের আয়াতের কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। والطور وكتاب مسطور .... والبحر المسجور "তূর পাহাড়ের কসম, প্রশস্ত পত্রে 'লিখিত গ্রন্থে'র কসম, উঁচু ছাদের কসম, স্রোতস্বিনী সমুদ্রের কসম", والبيت المعمور অর্থ চতুর্থ আকাশ অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের (সূর্যাকাশের) আত্মা। এইজন্য ঈসা (আ), যিনি ছিলেন আল্লাহ্র আত্মা (روح الله) মৃতকে জীবিত করা যাহার মু'জিযা ছিল, তাঁহাকে সেই আকাশে স্থান দেওয়া হইয়াছে, الطور অর্থ আরশ, যেথায় সার্বজনীন বুদ্ধির অবস্থান। লিখিত গ্রন্থের অর্থ কাদা যাহা সেই বুদ্ধির মধ্যে বর্তমান এবং বিস্তৃত পত্রের অর্থ সার্বজনীন বুদ্ধি। উঁচু ছাদ দ্বারা নিকটতর আকাশকে বুঝায়, যেথায় ঐশী আত্মার একক অবস্থান। প্রতিষ্ঠিত গৃহের উল্লেখের পর উঁচু ছাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা সেই আকাশ হইতেই আকৃতি মর্ত্যে আসে এবং 'প্রতিষ্ঠিত গৃহ' হইতে সার্বজনীন আত্মার শ্বাস নির্গত হয়। ইহার সম্মিলনে জীবন্ত বস্তুর পূর্ণতা লাভ ঘটে। প্রবহমান সমুদ্র দ্বারা সেই প্রাথমিক পদার্থকে বুঝায়, যাহা সর্বত্র বিস্তৃত ও আকৃতিতে পূর্ণ।

এখন প্রশ্ন জাগে, অনুরূপ নীতির সঙ্গে তাক্দীর, ইচ্ছার ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কিরূপ? ইহা একটি অতীব জটিল বিষয়। ইহাতে একটি দূরবর্তী প্রাথমিক কারণ অন্তর্ভুক্ত এবং মিশ্রণ ও পারস্পরিক ভাগাভাগির অসীমত্ব দ্বিতীয় কারণের নিকটতর। সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি শুধু নিকটবর্তী কারণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আমরা সৃষ্টি ও ফয়সালার সাধারণ শক্তিকে স্বীয় ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত করি অথবা শুধু প্রাথমিক কারণকে সামনে রাখিয়া তাকদীর-এর (জাব্রিয়্যা) প্রবক্তা হইয়া পড়ি। উভয়টিকেই সামনে রাখিয়া ইহার ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। যে কোন বিষয়ে সামগ্রিক কারণ, যেখানে মানবিক ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে, অবশ্যই অনেক মৌল ধাতুর সংযোজন হইবে। ইহাদের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি। এই ইচ্ছা অপরাপর কারণগুলিকে গতিশীল করে। প্রকাশ্যভাবে তাহা করা না হইলেও তাকদীরের ধারণায় এই চিন্তাটি নিহিত যে, আল্লাহ্র মীমাংসা-শক্তির একটি অংশ মানুষের মধ্যেও বর্তমান। আল্লাহ্র প্রকৃতিতে স্বাধীনতা থাকিলে ইহা হইতে নির্গত পদার্থেও ইহা থাকা অপরিহার্য। ইব্ন 'আরাবীর মতে বিশ্বে বহুত্ব থাকিলেও আল্লাহ্র প্রকৃতিতে একত্ব বর্তমান এবং একত্বের এই প্রকৃতি সমগ্র সৃষ্টি জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আবদুর-রায্যাক বিশ্বের পারস্পরিক মিশ্রিত কারণসমূহের আধিক্যের উপর জোর দিয়াছেন। তাহা ছাড়া কর্মের উন্নতির ধারায় জীবন, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের আধিক্যের অপরিহার্যতা প্রমাণের উপর জোর দিয়াছেন। আল্লাহ্র প্রকৃতি শুধু

উপর হইতেই শাসন করে না, বরং সৌরমণ্ডলের (চন্দ্রের অধীন) বস্তুর মধ্য দিয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়। আবার বিশ্বে ও মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহু কারণের মধ্যে ধর্মের প্রভাব এবং নবীদের উৎসাহ ও ভীতি অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের সেই সমস্ত প্রভাবকে আমাদের স্বাগত জানান উচিত। কেননা ইহা আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি পরিপূর্ণ নীতির অংশ। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? সেইখানে ভাল-মন্দ কেন? এখানেও আবার একটা কিছু উহ্য আছে, যাহাকে এক স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পদার্থের বিভিন্ন প্রকার বিভাগ রহিয়াছে—আমার্জিত ও মার্জিত। পদার্থ যেরূপ হইবে, তদনুরূপ আত্মা লাভ করিবে। এইজন্য আত্মারও প্রকারভেদ রহিয়াছে। এই আত্মা ও পদার্থের সংমিশ্রণে স্বভাব ও চরিত্র গঠিত হয়। অতঃপর পার্থিব শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বীয় উন্নতি লাভ করা আত্মার কাজ। আবদুর-রায্যাকের মূল ধারণা বাহ্যত ইহাই। কিন্তু তিনি অধিকতর ব্যাখ্যার সুযোগ দেন নাই। অধিকন্তু তিনি প্রাচীন ধর্মীয় ধারণা পোষণ করেন অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টিই উত্তম, অন্যথায় আল্লাহ্ অধিকতর উত্তমের জন্ম দিতেন। আবার সকল বস্তু একই রূপ হইলে পৃথিবীতে সংগঠন ও বিন্যাস সম্ভব হইত না। এই অসম্পূর্ণ বস্তুর প্রতিও অবিচার করা হইত। কেননা অপূর্ণতার জন্য তাহাদেরকে সৃষ্টি করা হইত না। সকল বস্তুর স্থান পাওয়া উচিত। সেই সমস্ত স্থানকে ব্যবহার করা সেই সমস্ত বস্তুর কাজ। আল্লাহ্ বস্তুর স্বাতন্ত্র্য জানেন এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী প্রতিদানের ব্যবস্থা করিবেন। কবীরা গুনাহ্ মূর্খতার ফল; আল্লাহ্ও তাহাদের সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করিবেন। এখানে জীবন যেইভাবে চলিতেছে ভবিষ্যত জীবনও সেইভাবেই চলিতে থাকিবে। কেহ কেহ সেখানে শান্তি লাভ করিবে। আবার কেহ কেহ স্বীয় অক্ষমতার দরুন অপবিত্রতা স্খালনের নিমিত্ত শাস্তি লাভ করিবে। কিন্তু এই শাস্তি চিরস্থায়ী হইবে না। এই স্থানে আবদুর-রায্যাকের বর্ণনা সম্ভবত অধিকতর অসন্তোষজনক। এইখানে তিনি সাধারণ ইসলামী ধারণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রতার অনুমতি দেয় কিনা, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ইহা বুঝিতে হইবে, আত্মা দেহ হইতে পৃথক হওয়ার পর হয়ত আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে অথবা অপর কোন পার্থিব জীবনে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। দর্শন ও ধর্মীয় অপরাপর ইসলামী পুস্তিকার ন্যায় এই প্রবন্ধটিরও শ্রোতাদের রুচি অনুযায়ী রচিত হইয়াছিল এবং ইহা সামগ্রিকভাবে আবদুর-রায্যাকের হৃদয়ের আওয়াজ ছিল না। বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ মোটামুটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এই দর্শন ইব্ন 'আরাবীর ধর্মমতের চাইতে ইসলামী আকীদার অধিকতর কাছাকাছি, কিন্তু আখিরাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যতদূর নিকটতর বলিয়া মনে হয়, ততটুকু নিকটতর নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) St. Guyard, in Journ. As., 7th. Ser ১খ., ১২৫ প., প্রধান বরাত ইহাই; (২) Brockelmann, ২খ., ২০২-২০৩ (এখানে তাঁহাকে দুইজন পৃথক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে), Sup., ২খ., ২৮০-২৮১।

D. B. Macdonald (E.I.[2])/মাহ্বুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুর-রাউফ ইব্ন 'আলী আল-জাবী (عبد الرؤف بن على الجاوى) ঃ আল-ফান্সূরী আস্-সিনকিলী একজন ধর্মীয় শিক্ষক। আনুমানিক ১৬২০ খৃস্টাব্দে Singkel নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানটি (Singkel) কানসূর (সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে) নামক স্থানের উত্তরে অবস্থিত। তিনি ১৬৯৩ সালের পরে ইন্তিকাল করেন এবং Acheh নদীর মোহনায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি উনিশ বৎসর পর্যন্ত আরবদেশে শিক্ষা লাভ করেন। আহ্মাদ আল-কুশাশী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ইব্রাহীম আল-কূরানী কর্তৃক তিনি শাত্ত'তারিয়্যা তরীকায় দীক্ষিত হন। ১৬৬১ সালের দিকে তিনি Acheh-এ ফিরিয়া আসেন। এই সময় তাঁহার অনুসারিগণ কর্তৃক এই তরীকা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, বিশেষত জাভায় ছড়াইয়া পড়ে। এই তরীকার যিক্র সম্পর্কীয় উপদেশমালা তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য (মুখ্য) বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তাঁহার অধিকাংশ রচনাবলী মালয় ভাষায় রচিত; কিন্তু কিছু কিছু রচনা আরবী ভাষায় রচিত। তবে প্রতিটি আরবী বাক্যের শেষে মালয় ভাষায় ইহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। তদীয় গ্রন্থ কিতাবু 'উমদাতিল-মুহ্'তাজীন ইলা সুলূকিল-মাস্লাকিল মুফ্রিদীন-এ এই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় স্বীয় দলের আকীদার সারমর্ম উপস্থাপনে তিনি আস্-সানূসীর উম্মুল বারাহীন-এর অনুরূপ রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি সপ্তস্তর মতবাদকে স্বীয় সূফী তরীকার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই তরীকার আকীদা এই যে, মানুষ আল্লাহ্র প্রতিবিম্বস্বরূপ। তিনি তাঁহার বিভিন্ন রচনায়, যথা কিফায়াতুল মুহ্'তাজীন, দাক'াইকুল-হ্'রূফ ও বায়ান তাজাল্লী-এ ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রচলিত ধর্মমতের সীমা লংঘন করেন নাই। তিনি সপ্তদশ শতকের শুরুতে Acheh-এ প্রচলিত চরম রহস্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। একই সঙ্গে তিনি আর-রানীরী (দ্র.)-র চরম বিতর্ক হইতেও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আবদুর-রাউফ বিভিন্ন আরবী তাফ্সীর হইতে গৃহীত সংক্ষিপ্ত টীকাসহ মালয় ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করিয়াছেন (আত-তারজুমানুল মুস্তাফীদ)। তিনি মালয় ভাষায় মু'আমিলাত সম্পর্কিত শাফিঈ ফিক্'হ্-এর একটি পুস্তিকাও রচনা করিয়াছেন। ইহাকে স্পষ্টত আর-রানীরী-র ইবাদত সম্পর্কীয় আলোচনা গ্রন্থ 'আস-সিরাতুল মুসতাক'ীম'-এর পরিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তৎকৃত আরবী গ্রন্থাবলীর অনুবাদ এতই আক্ষরিক যে, আরবী ভাষার জ্ঞান ব্যতিরেকে ইহা বোধগম্য হয় না। অধিকন্তু কোথাও কোথাও অনুবাদ বিভ্রাটও বর্তমান। আল-মাওয়া'ইজু'ল-বাদী'আ গ্রন্থটির অনুবাদক তিনি ছিলেন কিনা তাহা সুনিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ইহা ৩২টি 'হাদীছ কু'দসী'-এর জনপ্রিয় আরবী সংকলন ও অপরাপর আঠারটি উপদেশমালার মালয় অনুবাদ। আরও কিছু রচনাবলী তাঁহার রচনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। যথা মালয় ভাষায় বিরচিত আখিরাত বিষয়ক সূফী কাব্য শাঈর মা'রিফাত। প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার রচিত নহে। তাঁহার ইন্তিকালের পর কুওয়ালা-এর তক্করূপে (Teungku dikuala) তাঁহার প্রতি এতই সম্মান প্রদর্শন করা হয় যে, জনসাধারণের মতে Acheh-এ তাঁহার জন্যই ইসলামের আগমন ও প্রসার ঘটিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Snouck Hurgronje, The Achehnese, ২খ., ১৪ প.; (২) D. A. Rinkes,

Abdoerraoef van Singkel, ১৯০৯; (৩) P. Voorhoeve, in TBG. ১৯৫২, পৃ. ৮৭ প. (বায়ান তাজাল্লীর সংস্করণ ও আবদুর-রাউফের রচনাবলীর তালিকাসহ অপরাপর মালয় প্রবন্ধ); আরও তু. BTLV, ১৯৫১, পৃ. ৩৬৮, 'আবদুর-রাউফের রচনাবলী ঃ মিরআতুত্-তু'ল্লাব (ফিক্'হ সম্পর্কীয়)। ইহার ভূমিকা S. Keyser কর্তৃক সম্পাদিত হয়, BTLV, ১৮৬৩, পৃ. ২১১ প.; উদ্ধৃতি, সম্পা. A. Meursinge, Hand book, ১৮৪৪; আত্-তারজুমানুল-মুসতাফীদ, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি. (দুই খণ্ড); আল-মাওয়া'ইজু'ল-বাদী'আ, জাম্'উ-জাওয়ামি'ইল-মুস'ান্নিফাত, বূলাক (তা. বি.); এই গ্রন্থটির চতুর্থ অথবা পঞ্চম সংস্করণ মক্কা হইতে ১৩১০ হিজরী সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

P. Voorheoeve (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুর রাউফ দানাপূরী (عبد الرؤف دانا پورى) ঃ পূর্ণ নাম আবুল-বারাকাত মুহাম্মাদ আবদুর-রাউফ দানাপূরী, একদিকে যেমন একজন সুপ্রসিদ্ধ আলিম, অপর দিকে একজন হাকীম বা সুচিকিৎসক ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল প্রচুর।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার সুপ্রসিদ্ধ দানাপুর শহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বিখ্যাত আলিম মাখদূমুল-মুল্ক শারাফুদ-দীন ইয়াহ্'য়া মুনীরীর নবম অধস্তন বংশধর ছিলেন। দানাপূরের প্রসিদ্ধ আলিম শাহ্ আক্বারের নিকট কুরআন পাঠ ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রথমে আরা জেলায় ও তৎপর উড়িষ্যা প্রদেশের কটক শহরে দারুল-'উলূম মাদ্রাসাতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর লাখ্নৌতে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহে অধ্যয়নপূর্বক আরবী ভাষা, তাফসীর, হাদীছ, ফিক'হ্, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি লাখনৌ-এর তিব্বিয়া কলেজ হইতে ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ উছমানিয়া ইউনিভারসিটিতে কিছুদিন গবেষণার কাজ করেন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় রামাদানিয়্যা মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং ইউনানী মতে চিকিৎসাও করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতার খবর চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল। তিনি ধর্মীয় জটিল প্রশ্নের যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে এমন সুনিপুণভাবে জবাব দান করিতেন যে, উহা শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত। ইহাতে তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি শিক্ষকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি কলিকাতার ২৯/২ নং চুনাগলিতে একটি তিব্বী দাওয়াখানা স্থাপন করিয়া চিকিৎসা কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেইসঙ্গে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং কয়েকজনকে বিনা পারিশ্রমিকে হাদীছ শিক্ষা দান করিতেন।

একদিকে তখনকার মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অপরদিকে ঔপনিবেশিক পরাধীনতার গ্লানি তাঁহার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তিনি 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন এবং অবশেষে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা আযাদ সুব্হ'ানী, সি. আর. দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৯২২ খৃস্টাব্দে কারাবরণও করিয়াছেন। কংগ্রেসে থাকিয়া মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়িলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিলেন। প্রায় তিন বৎসরকাল কংগ্রেস হইতে পৃথক থাকার পর তিনি ১৯৩৬ সনে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি কলিকাতা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি 'বোর্ড অব ইউনানী ফ্যাকাল্টি' ও "আনজুমান-ই আতি'ব্বা-ই বাংগালা"-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিনি যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছিল।

একজন সুলেখক হিসাবেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার লিখিত ৬২ খানা বই উর্দুতে তাঁহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আসাহ্হুস্-সিয়ার (اصح السير) ইসলাম আওর মাদানী মাসাইল, তিরয়াক, আল-বুরহান, ইয়াদ্গার, মাসাইল কুরবানী প্রভৃতি। আসাহ্হুস সিয়ারের বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ও দাওয়াখানা অদ্যাবধি কলিকাতার চুনাগলিতে তাঁহার নামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী ৮২ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। মানিক তলার পেশাওরী গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আবদুর-রাশীদ ইব্ন আবদিল-গাফূর (عبد الرشيد بن عبد الغفور) ঃ আল-হুসায়নী আল-মাদানী আত-তাত্তাবী একজন ফারসী অভিধান প্রণেতা। তিনি তাত্তা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বংশগত দিক দিয়া তিনি ছিলেন একজন সায়্যিদ। ১০৬৯/১৬৫৮ সালের পরে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ফারহাঙ্গ-ই রাশীদী বা রাশীদী ফারসী নামক একখানি ফারসী অভিধান। ইহা ১০৬৪/১৬৮৩-৮৪ সালে সংকলিত এবং ১৮৭৫ সালে Bibliotheca Indica-এ প্রকাশিত প্রথম সমালোচনামূলক অভিধান। Spliethe ইহার ভূমিকা (মুকাদ্দামা)-এর সংশোধন করেন Grammaticae persicae aeregulae (Halle 1846); আবদুর-রাশীদ মুন্তাখাবুল-লুগাত বা রাশীদী আরাবী-ফারসী অভিধান (১০৪৬/১৬৩৬-৩৭) সম্রাট শাহজাহানের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন (সংস্করণ ঃ কলিকাতা ১৮০৮, ১৮১৬, ১৮৩৬; লক্ষ্ণৌ ১৮৩৫, ১৮৬৯; বোম্বাই-১২৭৯/১৮৬২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Blochmann, in JRAS Bengal, ৩৭ খ., ২০প.; (২) Rieu. Cat. of Pers. MSS., ৫০১, ৫১০ ; (৩)

Pertsch Verz. d. pers. Handschr., Berlin, সংখ্যা ১৯৮-২০০।

M. Th. Houtsma (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূয়া

আবদুর রাশীদ, মুহাম্মদ (محمد عبد الرشيد): বংশানুক্রমঃ মুহাম্মাদ আবদুর রাশীদ ইব্ন মুনশী আবদুর রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ বাখ্শ ইব্ন বালাকী ইব্ন চেরাগমুহাম্মাদ ইব্ন হিম্মত।

বংশীয় উপাধি ঃ রাজপুত;

ইল্মী উপাধী ঃ নু'মানী (ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন ছাবিত আল-কূফী (র)-এর নামানুসারে);

প্রকৃত আবাসস্থল ঃ জয়পুর, রাজস্থান, হিন্দুস্তান;

হিজরত ঃ করাচী, পাকিস্তান;

জন্ম ঃ ১৮ যিল্কাদ, ১৩৩৩/২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫;

জন্মস্থান ঃ জয়পুর।

চার বৎসর বয়সে আপন চাচা হাফেয 'আবদুল কারীম ইব্ন মুহাম্মাদ বাখ্শ (র)-এর নিকট আল-কুরআনুল কারীমের সবক নেন। ফারসী ভাষায় প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়েন নিজ পিতা মুন্শী আবদুর রাহীম (র)-এর নিকট ইহার পর মাদ্রাসা আন্ওয়ারে মুহাম্মাদীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আজমীরি দরওয়াযার বাহিরে অবস্থিত মাদ্রাসা তালীমুল ইসলামে ভর্তি হন। সেইখানে মুন্শী ইরশাদ আলী খান, মুনশী সাত্তার আলী খান, মুনশী আবদুর কায়্যূম নাতিক ও মুনশী সাঈদ হুসায়ন প্রমুখের নিকট ফারসী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের পাঠ সমাপ্ত করেন।

ইহারপর মীযানুস-সারফ হইতে মিশ্কাতুল-মাস'বীহ' পর্যন্ত পাঠ্যসূচির সকল কিতাব উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা ক'াদির বাখ্শ বাদায়ূনীর কাছে পাঁচ বৎসরের ও কম সময়ে (জুন ১৯২৮-মে ১৯৩২) সমাপ্ত করেন। মাওলানা ক'াদির বাখ্শ-এর নিকট সহীহ বুখারীরও কিছু অংশ পড়েন। এই সময়ই আল্লামা আবদুল হাই লাখনাবী (র)-এর রচনাবলী অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং হাফিয যাহাবী (র) রচিত রিজালশাস্ত্রের সুবৃহৎ গ্রন্থ মীযানুল ইতিদাল আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন।

এইখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া শায়খুল হাদীছ আল্লামা হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকী (র)-এর সান্নিধ্যে দুই বৎসর অবস্থান করেন। আল্লামা টোংকী সেই সময় দারুল উলূম নদওয়াতুল 'উলামা লাখনৌ-এর শায়খুল হাদীছ ও মুহ্তামিম ছিলেন। এই দুই বৎসর তাঁহার কাছে হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ পড়ার পাশাপাশি শাস্ত্রীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী ও মুক'াদ্দামা মুসলিমের দরস অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিপক্কতার সাথে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করেন। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী (র)-এর ভাষ্য অনুযায়ী, "তিনি ছিলেন হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকীর সবচেয়ে প্রিয় ও মেধাবী ছাত্র এবং তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণার সবচেয়ে বড় বাহক ও সংরক্ষণাকারী" (পুরানে চেরাগ, ১ খ., ১৯৯)।

মাওলানা হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকী ছিলেন হযরত হাজী ইম্দাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)-এর খলীফা। মাওলানা নু'মানী (র) তাঁহার সাথে সাক্ষাতের কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার হাতে বায়'আতও হন। বায়আতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহাকে যিকিরের সবক দেন এবং বলেন, "আগর কোয়ী আল্লাহ কা নাম পুঁছে তো বাতা দেনা" (যদি কেহ আল্লাহর নাম জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে বলিয়া দিও)। ইহা মূলত এক ধরনের ইজাযত।

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ মাওলানা মাহমূদ হ'াসান টোংকী (মাওলানা হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকীর আপন বড় ভাই)-এর তলব পাইয়া মাওলানা হ'ায়দার হ'াসান খান মাওলানা নু'মানীকে তাঁহার নিকট দক্ষিণ হায়দরাবাদে পাঠাইয়া দেন। সেইখানে তিনি আল্লামা মাহ্'মূদ টোংকী (র)-এর সাথে পূর্ণ চার বৎসর মু'জামুল-মুস'ান্নিফীন-এর সংকলন ও গ্রন্থনার কাজ করেন।

জামি'আ উছমানিয়া হায়দরাবাদের দীনিয়াত বিভাগের প্রধান আল্লামা মানাজি'র আহ'সান গীলানী (১৩১০-১৮৯২/১৩৭৪/১৯৫৬) তাঁহাকে ১৯৩৮ খৃ. সালে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে নিম্নোক্ত সনদে ভূষিত করেন ঃ

"মৌলভী আবদুর রাশীদ (মৌলভী ফাযিল ও মুনশী ফাযিল-পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি)-কে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। সরকারী বিভিন্ন পরীক্ষা ছাড়াও তিনি হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ আলিম ও দারুল উলূম-নাদওয়াতুল 'উলামার প্রধান শিক্ষক মাওলানা হ'ায়দার হ'াসান টোংকীর কাছে ইসলামী জ্ঞানে, বিশেষত হাদীছ.শাস্ত্রে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছেন। ইহার পর তিনি মু'জামুল-মুস'ান্নিফীন-এর সংকলক হযরত মাওলানা মাহ'মূদ হা'সান টোংকীর সাথেও কাজ করিয়াছেন। হুকূমতে আসিফিয়্যার তত্ত্বাবধানে বিপুল অর্থ ব্যয় উপরিউক্ত গ্রন্থটির বিন্যাস ও গ্রন্থনার কাজ চলিতেছে এবং ইহার কয়েকটি খণ্ড বৈরূত হইতে প্রকাশিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল 'আলিমের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁহার বর্তমান যোগ্যতা ও ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতার ভিত্তিতে ইসলামী উলূমের সংকলন ও বিন্যাস কিংবা ইফ্তা ও ক'াদা সম্পর্কিত যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন এবং তিনি এই কাজ অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারেন"।

মানাজি'র আহ'সান গীলানী

মাওলানা নু'মানী ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত দিল্লীর নাদওয়াতুল-মুস'ান্নিফীনের সদস্য ছিলেন। সেইখানেই তিনি লুগাতুল কুরআন সংকলন করেন; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (আল-কুরআনের শব্দঅভিধান) অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার রচনাশৈলী এমন যাহা দ্বারা ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠক সকলেই উপকৃত হইতে পারেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটির মাধ্যমে নাদ্ওয়াতুল- মুস'ান্নিফীন-এর মর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহা তৎকালীন মাসিক পত্রিকাগুলির অভিমত হইতে প্রতীয়মান হয়।

১৯৪৭ খৃ.-এর ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান হিজরত করেন এবং দুই বৎসর পর্যন্ত দারুল উলূম টেণ্ডুআল্লাহ্য়ার সিন্ধু-এ ফিক্'হ, উসূ'ল ও উলূমুল- হাদীছের সর্বোচ্চ স্তরের কিতাবসমূহের শিক্ষা দেন।

সেইখান হইতে তিনি অব্যাহতি গ্রহণ করিলে 'আল্লামা আবদুর রহমান কামিলপুরী (খলীফা হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র) তাঁহাকে এক চিঠিতে লিখেন, "গতকাল আপনার চিঠি পাইয়া বিস্তারিত অবস্থা জানিতে পারিলাম। চিঠি পড়িয়া খুব কষ্ট পাইলাম। জনাবের চলিয়া আসার ফলে একটি দীনী প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আপনি যেসব

বৈশিষ্ট্যর অধিকারী তাহাতে মনে হইতেছে আপনার পদে এমন কাহাকে পাওয়া এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন হইবে এবং খুবই কঠিন হইবে... ।"

বান্দা নাকারা আবদুর রহমান কামিলপুরী
টেণ্ডুআল্লাহয়ার, ৩০ যিলকদ, ১৩৭১ হি.

১৯৫৫ সালে তাঁহাকে আল্লামা ইয়ূসুফ বানূরী (র) (১৩২৬-১৩৯৬) নিজ প্রতিষ্ঠান জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া 'আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী টাউন, করাচীতে ডাকিয়া নেন। সেইখানে তিনি ১৯৬৩ খৃ. পর্যন্ত হাদীছ, ফিক্'হ ও উসূ'লের বিভিন্ন কিতাবের দরস দিতে থাকেন। জামিআর মুখপত্র মাসিক 'বায়্যিনাত'-এর প্রকাশনা তিনিই শুরু করেন এবং প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত তিনিই ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

১৯৬৩ খৃ. তিনি জামিআ ইসলামিয়া ভাওয়ালপুরে তাশরীফ লইয়া যান। সেইখানে ১৯৭৬ খৃ. পর্যন্ত প্রথমে হাদীছ বিভাগের উপপ্রধান হিসাবে ও পরে তাফসীর বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৬ খৃ. করাচী ফিরিয়া আসিলে আল্লামা বান্নুরী (র) দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ডাকিয়া নেন এবং একাধারে মাজলিসুদ-দাওয়া ওয়াত্-তাহ্'ক্'ীকি'ল- ইসলামী-এর সদস্যপদের পাশাপাশি গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষা বিভাগসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁহার হাতে উপর করেন। ইন্তিকালের কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই সকল দায়িত্ব সামাল দিয়া আসিতেছিলেন। ১৪১২ হিজরীর শা'বান মাসে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তিনি নিজেই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন।

জামিআতুল 'উলুমিল ইসলামিয়ায় অবস্থানের এই সুদীর্ঘ সময়ে জামি'আর হাদীছ ও ফিক'হ বিভাগের শিক্ষা সমাপনকারীদের সকলের থিসিসের তত্ত্বাবধান ও সংশোধনের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

১৪১২-১৯৯২ সাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টাফকোয়ার্টারে নিজ পুত্র ড. আবদুশ শাহীদের বাসভবনে অবস্থান করেন। বেশীর ভাগ সময় যিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকিতেন। তাঁহার লেখালেখির কাজও অব্যাহত ছিল। কিন্তু অসুস্থতার প্রাবল্যের দরুন এই সময় স্বতন্ত্র কোন কিতাব রচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে জীবনের শেষ পর্যন্ত আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্রাসা নামীয় একটি ইসলামী ইনস্টিটিউটের সহীহ বুখারী ও শারহু' মা'আনিল-আছার-এর সবক পড়াইছেন।

রচনাবলী অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইলমী বিষয় ভিত্তিক তাঁহার গবেষণাধর্মী রচনার সংখ্যা পনেরোর অধিক। ইহা অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন ঃ

১. লুগাতুল কুরআন (উর্দূ)

২. আল-ইমাম ইবনু মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস্ সুনান (আরবী)

এই কিতাবটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ' আবূ গু'দ্দাহ (র) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ বৈরূত হইতে ইহার পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই কিতাব সম্পর্কে মুহাদ্দিছ আবুল ওয়াফা আফগানী (র) (১৩১০ হি.-১৩৯৫ হি.) ১৩৭৩ হিজরীর এক চিঠিতে লেখেন, 'আপনি এই কিতাবে এমন অনেক কিছু উদঘাটন করিয়াছেন যাহা হাফিজ যাহাবী (র) ও হাফিজ ইব্ন হ'াজার (র)-ও করেন নাই।

৩. ইব্ন মাজাহ আওর ইলম হাদীছ (উর্দূ)

৪. মাকানাতুল ইমাম আবী হ'ানীফা ফি'ল-হ'াদীছ' (আরবী)

এই কিতাবটিও শায়খ আবদুল ফাত্তাহ' (র) বৈরূত হইতে প্রকাশ করিয়াছেন।

৫. আত্-তাকীবাত আলাদ-দিরাসাত (আরবী)

৬. আত-তা'লীক'াত আলা যাব্বি যুবাবাতিদ দিরাসাত (আরবী)

৭. আত-তা'লীকুল' কা'বীম আলা মুক'াদ্দিমাতি কিতাবিত্তা'লীম (আরবী)

এই কিতাব সম্বন্ধে মুহাদ্দিছ আবুল ওয়াফা আফ্গানী (র) মাওলানা নু'মানীর কাছে লেখা ২২ জুমাদাল উলা, ১৩৮১ হিজরীর এক চিঠিতে বলেন, 'আল হাম্‌দুলিল্লাহ! কিতাবটির তা'লীক' ও টীকা-টিপ্পনী খুবই মূল্যবান, আলিমগণ ইহা যথেষ্ট মূল্যায়ন করিবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁহার ফয়েয ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। আপনি ইহার জন্য বিরাট মেহনত ও শ্রম ব্যয় করিয়াছেন। কত জায়গা হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন! মাশাআল্লাহ আল্লাহপাক আপনার কলমে বরকত দান করুন; আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রমের উত্তম বিনিময় দান করুন। তা'লীকটি এতই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, অন্য সব কাজ বন্ধ রাখিয়া আদ্যপান্ত পড়িয়া শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত তাহা হাত হইতে রাখিতে পারি নাই'।

৮. তাবসি'রা বার মাদখাল লিলহ'াকিমি আন-নায়সাবূরী

ইহছাড়া কয়েকটি কিতাবের পাণ্ডুলিপি এখনও পড়িয়া আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটির কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

স্বতন্ত্র রচনাবলী ছাড়াও ইসলামী বিভিন্ন বিষয় এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর ইলমী বিষয়ের উপর প্রায় সত্তরটি প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন যাহার অধিকাংশই দিল্লীর বুরহান ও করাচীর বায়্যিনাত-এর মত গুরুত্বপূর্ণ মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সবগুলির সমষ্টি মাক'ালাতে নু'মানী নামে প্রকাশিত হইতেছে।

আরব ও 'আজমের সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক আলিমগণ তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের উপর আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে নিজেদের রচনাবলীতে তাঁহার আলোচনার উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার মতামত গুরুত্বের সহিত মূল্যায়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এমন রহিয়াছেন যাঁহারা তাঁহার উস্তাদের সমপর্যায়ের। এই ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তাঁহারা হইলেন মুফতী মাহদী হ'াসান শাহ্জাহানপুরী (১৩০০ হি.-১৩৯৭ হি.), মাওলানা আবুল ওয়াফা আফ্গানী (১৩১০ হি.-১৩৯৫ হি.), শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ১৩১৫হি.-১৪০২), আল্লামা মুহাম্মদ ইয়ূসুফ বানূরী (১৩২৬ হি.-১৩৯৭ হি.) ও শায়খ আবদুল ফাত্তাহ' আবূ গু'দ্দাহ (১৩৩৬ হি.-১৪১৭ হি.) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

সংস্কার ও পূর্ণতা দান, প্রমাণপুষ্টতা ও পরিমার্জন, দূরবর্তী উৎস হইতে পর্যাপ্ত তথ্য আহরণ এবং সুদৃঢ় ও সুনিপুণ উপস্থাপনা তাঁহার রচনার সাধারণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার ব্যাপারে আরব বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ' আবূ গুদ্দাহ মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন ঃ

العلامة الناقد الضليع الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني المولود سنة ١٣٣٣ ه صاحب التعليقات والتدقيقات والجولات الظافرة في ميادين العلم.

"ইসলামের সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আবদুর রাশীদ নু'মানী (র) (জন্ম ১৩৩৩ হি.) যিনি একাধিক টীকাগ্রন্থের প্রণেতা, বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উদ্‌ঘাটক এবং 'ইলমের ময়দানে একজন সফল অভিযাত্রী" (ফিক্‌হ আহ্‌লিল ইরাক ওয়া হ'াদীছুহুম ঃ ১০০, উপমহাদেশে হানাফী হাফিয়ে হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণের জীবনী শিরোনামের অধীনে) মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী (১৩৩২ হি.-১৪২০ হি.) পুরানে চেরাগ ১/২০১-২০২-এ মাওলানা হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকীর জীবনীতে লেখেন ঃ

"মাওলানার যোগ্যতম শাগরিদ এবং তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানগত চিন্তাচেতনার উত্তরাধিকারী আমাদের বিজ্ঞ বন্ধু মাওলানা আবদুর রাশীদ নু'মানী জয়পুরী। বর্তমানে তিনি দীনিয়াত ইউনিভার্সিটি, ভাওয়ালপুর-এর শায়খুল হাদীছ। তাঁহার ইলমী অবদানসমূহ কোনরূপ পরিচয়দানের মুখাপেক্ষী নহে। তিন খণ্ডে রচিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ লুগ'াতুল কু'রআন এবং ইলমী ও গবেষণাধর্মী রচনা আল-ইমাম ইব্‌ন মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান তাঁহার ব্যাপক অধ্যয়ন ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে।

তিনি কযেক বৎসর আবাসে ও প্রবাসে মাওলানার সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় থাকাকালীনও এবং টোংক-এ অবস্থানকালেও তাঁহার ফয়েয ও বরকত লাভ করিয়াছেন এবং মাওলানার গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হইয়াছেন। মাওলানার সম্পর্কও তাঁহার সাথে অত্যন্ত গভীর ছিল এবং তিনি তাঁহার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন"।

একটি ঐতিহাসিক সত্যের উদঘাটন

হাদীছ সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কীয় আলোচনায় বিস্তর গবেষণার পর তিনিই সর্বপ্রথম এই বাস্তব সত্য উদঘাটন করেন যে, ফিক্‌'হী বন্যাসে সহীহ হাদীছের সর্বপ্রথম সংকলনের সৌভাগ্য যিনি অর্জন করিয়াছেন তিনি হইলেন ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) (৮০হি.-১৫০হি.)। সংকলনটির নাম কিতাবু'ল-আছ'ার যাহার বহু নুস্‌খা ও বহু বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি নুস্‌খা ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। (এক) ইমাম আবূ ইয়ূসুফ (র) বর্ণিত কিতাবুল-আছার (দুই) ইমাম মুহ'াম্মাদ (র) বর্ণিত কিতাবুল-আছার। উল্লেখ্য, মূল সংকলকের পরিবর্তে কিতাবটি তাঁহার দুই বর্ণনাকারীর নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রকাশকগণ আবূ ইয়ূসুফ ও মুহ'াম্মাদ (র)-এর নামে উহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই ঐতহিসিক বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁহার পাঁচ-ছয়টি কিতাবে অত্যন্ত সারগর্ভ ও তথ্যবহুল এবং গবেষণাধর্মী ও পর্যালোচনামূলক আলোচনা করিয়াছেন যাহা তাঁহার সমসাময়িক নবীন ও প্রবীণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিছ ও ইতিহাসবিদগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। এমনকি তাঁহারা স্ব স্ব কিতাবে সেই গুলির উদ্ধৃতিও দিয়াছেন।

হাদীছ ও অন্যান্য উলূমে শারী'আয় তাঁহার আলী সনদ

হাদীছশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী আলী সনদের সন্ধান করা সুন্নাতে মুআক্কাদা; কিন্তু প্রকৃত আলী সনদই হচ্ছে যেখানে মাধ্যম কম এবং সনদে বিদ্যমান সকলেই ছি'ক'া ও নির্ভরযোগ্য। মাওলানা নু'মানীর এই ধরনের একাধিক আলী সনদ ছিল। নিম্নে শুধু দুইটি সনদ উল্লেখ করা হইল ঃ

১. প্রথম সনদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নু'মানী (১৩৩৩হি.-১৪২০হি.) ক-হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকী, খ-মিয়া নযীর হু'সারন দেহলভব গ-শাহ ইসহ'াক' দেহলবী, ঘ-শাহ আবদুর আযীয দেহলবী, ঙ-শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাই দেহলভী (১১১৪হি.-১১৭৬হি.)। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র)-এর একাধিক কিতাবে তাঁহার বিভিন্ন সনদের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। যেমন আল-ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতি ইস্‌নাদ ইতহাফুন নাবীহ ফীমা ইয়াহ্‌'তাজু ইলায়হিল মুহ'াদ্দিছ ওয়াল-ফাক'ীহ, ইনসানুল আয়ন ফী মাশাইখিল হ'ারামায়ন।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) সমকালীন মুসনিদ ছিলেন। উপমহাদেশের অধিকাংশ সনদের তিনি কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছিলেন। উপরিউক্ত সনদ অনুযায়ী মাওলানা নু'মানী ও তাঁহার মাঝে মাত্র চারটি মাধ্যম।

২. দ্বিতীয় সনদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রাশীদ নু'মানী (১৩৩৩হি.-১৪২০হি.) ক-হায়দার হাসান খান টোংকী ও মাহমূদ হাসান খান টোংকী, খ-ক'াদী হু'সায়ন মুহসিন আনস'ারী, গ-মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসির হাযিমী, ঘ-ক'াদী মুহাম্মাদ ইবন আলী শাওকানী (১১৭২হি.-১২৫৫হি.)। কাদী শাওকানীর সনদ স্বরচিত গ্রন্থ ইতহাফুল আকাবির বি-ইস্‌নাদিদ্ দাফাতির-এ রহিয়াছে।

এই দুইটি সনদে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ ও মাওলানা নু'মানীর মাঝে মাত্র তিনটি মাধ্যম।

১৩৮৬ হিজরীতে মাওলানা নু'মানী সর্বপ্রথম হজ্জ পালন করেন এবং সেই সময় তিনি হিজাযের বড় বড় আলিমদের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁহাদের সাথে ইলমী বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। কয়েকজন হইতে হাদীছের ইজাযাতও লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ'য়া ইব্‌ন আমান আল-কুতবী (১৩১২ হি.-১২৮৭হি.), শায়খ আলাবী ইব্‌ন আব্বাস আল-মাক্কী (১৩২৭হি.-১৩৯১হি.)। এই আলিমগণ তাঁহাদের ইজাযতনামায় তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত সম্মানজনক ও সুউচ্চ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

গুণাবলী

১. তাঁহার স্বভাবে অমুখাপেক্ষিতা ও দুনিয়া-বিমুখতা এবং বিনয় ও নম্রতার প্রবল প্রাধান্য ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ইল্‌মী পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা ছিল না। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার মাওলানা আহ'মাদ রিযা বিজনূরী (১৪১৮হি.) তাঁহার ইলমী পর্যালোচনার ধরন উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, ".....তাঁহার সবকয়টি কিতাব গভীর ও দীর্ঘ অধ্যয়নের ফল এবং উচ্চতর গবেষণার প্রমাণ বহন করে। বিভিন্ন ভূমিকা ও টীকাগ্রন্থে তাঁহার গবেষণাধর্মী চিন্তাভাবনা আল্লামা কাওছ'ারী (র)-এর চিন্তাভাবনার সহিত অনেকাংশে মিলিয়া যায়। এইজন্য তাঁহার স্পষ্টভাষিতা ও দ্বিধাহীন সমালোচনা কাহারো কাহারো কাছে রূঢ় মনে হয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ইন্‌সাফপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সৎসাহস ও নির্ভীক বক্তব্য প্রশংসার দৃষ্টিতে

দেখিয়া থাকেন" (আন্ওয়ারুল বারী শরহু সাহীহিল বুখারী, উর্দূ, দ্বিতীয় অংশের ভূমিকা ১৭৯)।

২. তিনি আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণের সহিত গভীর মহব্বত রাখিতেন। তাসাওউফ ও সুলূক এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মাওলানা ইল্য়াস দিহলাবী (১৩০৩হি.-১৩৬৩হি.), মাওলানা আবদুল ক'াদির রায়পুরী (১৩৮২হি.), শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া কান্দালাবী (র) (১৩১৫হি.-১৪০২হি.)-এর দীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। যুবক বয়সেই মাওলানা হ'ায়দার হ'াসান খান টোংকীর ইজাযত লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য মাশাইখও তাঁহাকে খিলাফত দান করেন। তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী (র) (১৩৩২হি.-১৪২০হি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. সময়ের মূল্যায়নের ব্যাপারে তিনি একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কখনো এক মুহূর্ত অপ্রয়োজনীয় কাজে কাটাইয়াছেন বলিয়া কোন ঘটনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি প্রতিটি মুহূর্তে কোন না কোন নেক কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। অধিকাংশ সময় পড়া, পাঠদান কিংবা লেখালেখির মধ্যে তিনি মশগুল থাকিতেন।

৪. ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরবশ ছিলেন। তাহাদের তা'লীম ও তরবিয়াতের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত তিনি কাজ করিতেন, কেহ অসুস্থ হইয়া গেলে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও যথাসাধ্য আর্থিক সহযোগিতাও করিতেন।

৫. কিতাব সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড আগ্রহ রাখিতেন, যেই কারণে আর্থিক অসংগতি সত্ত্বেও তাঁহার কুতুবখানায় এত প্রচুর ও দুর্লভ কিতাবাদি ছিল যাহা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কুতুবখানাতেও পাওয়া সুকঠিন ব্যাপার।

৬. স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে তিনি সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। হাদীছে বর্ণিত দু'আসমূহ ও নববী যিকিরসমূহের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। জামা'আতের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান থাকিতেন।

৭. অর্থ ও মর্ম বুঝিয়া আল-কুরআন তিলাওয়াত করা তাঁহার সাধারণ ও নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল।

৮. অপ্রয়োজনীয় বা সংশ্লিষ্টহীন কোন ব্যাপারে দখল দেওয়া তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাববিরোধী কাজ ছিল। কখনও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে তিনি দখল দিতেন না।

৯. হাদীছ শরীফে আছে ঃ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء "কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় নিজেকে অপদস্ত করা"। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে নিজেকে অপদস্ত করা হয়? ইরশাদ করিলেন, সাধ্যের উর্ধ্বে দায়িত্বের বিষয়ে আগ্রহী হওয়া" (জামে তিরমিযী, ৪খ., ৪৫৩, কিতাবুল ফিতান, বাব নং ৬৭), মাওলানা নু'মানী এই হাদীছের উপর পুরোপুরি আমল করিতেন।

ইন্তিকাল

২৯ রাবী'উছ-ছানী, ১৪২০/১২ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। জানাযার নামায তাঁহার ভাই আল্লামা আবদুল হালীম চিশ্তী পড়ান এবং করাচী ইউনিভার্সিটির কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সংশ্লিষ্ট পত্রাবলী; যাহা প্রবন্ধকার নিজে মাওলানা নু'মানী (র) হইতে লাভ করিয়াছেন। কোন কোনটির ফটোকপি প্রবন্ধকারের কাছে রহিয়াছে। আর কোন কোনটি গায়াতুল আমানীতে হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে। সবকয়টির মূলকপি মাওলানা নু'মানীর ব্যক্তিগত কুতুবখানায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইগুলির বর্তমান উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র ড. আবদুশ শাহীদ নু'মানী যিনি বর্তমানে জামি করাচীর আরবী বিভাগের প্রফেসর; (২) স্বরচিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী, যাহা প্রবন্ধকার খোদ আবদুর রাশীদ নু'মানী হইতে লাভ করিয়াছেন এবং করাচী হইতে প্রকাশিত মাসিক বায়্যিনাত পত্রিকায় তাহা হুবহু প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত তথ্যাবলী। কেননা প্রবন্ধকার প্রায় ছয় বৎসর তাঁহার নিকট ছিলেন। ইহার মধ্যে তিন বৎসর তাঁহার ছাত্র হিসাবে অতি নিকটে থাকিবার সুযোগ হইয়াছে এবং ১৪০৮ হি. হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সহিত সম্পর্ক বজায় ছিল; (৪) মাওলানা রুহুল আমীন ইব্ন হুসাইন আহমাদ ফরিদপুরী, গায়াতুল আমানী ফী তারজামাতি শায়খিনা আন-নু'মানী রচনাকাল ১৪১১হি.; মাওলানা আবদুর রাশীদ নু'মানী (রহ) খোদ রচনাটির তথ্য-উপাত্ত প্রদান করিয়াছেন এবং নিজে আদ্যপান্ত পড়িয়াছেন; (৫) শায়খ যাহিদ কাওছারী, ফিক্'হু আহলিল ইরাকী ওয়া হাদীছুহুম, তাহকীক আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ, ১০০; (৬) আল-ইমাম ইব্নু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান (শায়খ আবদুর ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (র)-এর ভূমিকা); (৭) মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীছ (শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (র)-এর ভূমিকা); (৮) লুগাতুল কুরআন (প্রকাশকের ভূমিকা); (৯) তাবসিরা বার আল-মাদ্খাল (প্রকাশকের ভূমিকা); (১০) মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী (র), পুরানে চেরাগ, ১খ., ১৯৯, ২০১-২০২; (১১) মাওলানা আহমাদ রেযা বিজনূরী, আনওয়ারুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী, ২খ., ২৭৯; (১২) শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা, আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ-দীন, ৭৬; (১৩) মাক'ালাতুন, নু'মানী (প্রকাশকের ভূমিকা) (১৪) বায়্যিনাত, করাচী; জুমাদাল উখরা, ১৪২০হি.; (১৫) মাসিক সুলূক ও ইহসান করাচী, খণ্ড ১২ , সংখ্যা ৫, জুমাদা উলা ১৪২০হি.; (১৬) আনওয়ার মাইনা, লাহোর, জুমাদাল উলা ১৪২০হি.; (১৭) আল-হাক্ক, আখোরাহ, খটক-সারহদ্দ, পাকিস্তান ১৪২০হি.।

আবদুল মালেক

'আবদুর-রাহ্মান (عبد الرحمن) ঃ মারওয়ান বংশের রাজপুত্র ছিলেন, যিনি আন্দালুসিয়াতে (স্পেনে) উমায়্যা রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন; এই নামে তাঁহার ৪জন উত্তরাধিকারী ছিলেন।

১। প্রথম আবদুর-রাহ্মান আদ্-দাখিল (প্রবেশকারী) উপাধিধারী, ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন হিশাম (দ্র.) ১১৩/৭১৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার যৌবনে আব্বাসীগণ যখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেফতার করিবার জন্য খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তিনি গোপনে ও সুকৌশলে ফিলিস্তীন-এ পলায়ন করেন এবং তথা হইতে তৎকর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস বাদ্র-এর সমভিব্যাহারে প্রথমে মিসর ও পরে ইফ্রীকিয়্যা গমন করেন। কায়রাওয়ান (Qayrawan)-এ কিছুদিন অবস্থান করার পর তৎকালীন গভর্নর আবদুর-রাহ্মান ইব্ন হাবীব-এর বৈরী মনোভাবের কারণে তাঁহাকে মাগরিব-এ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেইখানে তাহার্ত অঞ্চলে কিছুকাল

অতিবাহিত করার পর প্রথমে মিক্নাসার বার্বার গোত্রের এবং পরে নাফ্যা গোত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই গোত্র দুইটি মরক্কোর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের অধিবাসী ছিল। ইহাদের সঙ্গে পূর্ব হইতেই তাঁহার পারিবারিক একটা সম্পর্ক ছিল। কেননা তাঁহার মাতা এই গোত্র হইতেই যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে নীত। কিন্তু এই নবাগত মুহাজিরের আচরণ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা বার্বার গোত্রীয় জনগণ সুনজরে দেখিতেছে না টের পাইয়া আবদুর-রাহমান তাঁহার ভৃত্যের সহায়তায় স্পেনে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আবদুর-রাহমান ইব্ন মুআবিয়া অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ও প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধিবলে ঐ সময়ে আইবেরীয় উপদ্বীপে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরবের কায়সী দল ও ইয়ামানী দলকে পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, উহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ইতোপূর্বে বাল্জ ইব্ন বিশ্র (দ্র.)-এর সঙ্গে অনুচর হিসাবে উমায়্যাদের যে 'মাওয়ালীগণ' স্পেনে আগমন করিয়াছিল তিনি তাহাদের সমর্থনও অর্জন করিতে সক্ষম হন। ইহারা স্থানীয়ভাবে একটি সিরীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া তুলিয়াছিল এবং আন্দালুসিয়ার দক্ষিণে এক বিরাট অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বাদ্‌র যখন এইভাবে সুযোগ সৃষ্টি করিল তখন আবদুর-রাহমান ১ রাবীউল-আওওয়াল, ১৩৮/১৪ আগস্ট, ৭৫৫ সালে Almunecar অবতরণ করিয়া উপদ্বীপে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহার সার্বভৌম ক্ষমতা দাবি করিয়া বসিলেন। আন্দালুসিয়ার গভর্নর ইউসুফ ইব্ন আবদির-রাহ্মান আল-ফিহ্‌রী কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। আবদুর-রাহ্মান-এর সৈন্যদল অবিরাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিনি সেভিল-এ প্রবেশ করেন (শাওওয়াল ১৩৮/মার্চ ৭৫৬) এবং ১০ যুল-হাজ্জ/১৫ মে কর্ডোভার উপকণ্ঠে ইউসুফ আল-ফিহ্‌রীকে পরাজিত করিয়া রাজধানী দখল করেন এবং নিজেকে আন্দালুসিয়ার আমীর বলিয়া ঘোষণা করেন।

কর্ডোভায় উমায়্যা বংশীয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর তেত্রিশ বৎসরের উর্ধ্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অধিকাংশ সময় শুধু রাজধানীতেই তাঁহার অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজে ব্যয় করেন। তাঁহার এই সাফল্যের খবর পূর্বাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল এবং অচিরে উমায়্যা বংশের অনুচর ও সমর্থকগণ তাহাদের আধিপত্য পুনস্থাপনকল্পে দলে দলে স্পেনের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কেননা পূর্বাঞ্চলে ইতোমধ্যেই তাঁহাদের আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল। শীঘ্রই কর্ডোভা শাসককে বহুবিধ রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পূর্বতন শাসক (ওয়ালী) ইউসুফ আল-ফিহ্‌রী কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া কর্ডোভা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আবদুর-রাহমানের নিকট ১৪১/৭৫৮ সালে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হইলেন এবং পরবর্তী বৎসর টলেডোর নিকটে নিহত হইলেন। পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে রাজ্যে যেমন অসন্তোষ বিরাজমান ছিল অনুরূপভাবে আবদুর-রাহ্মানের নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। ইহার কারণ বিবিধ। একদিকে স্পেনের নওমুসলিমদের প্রতি পাহাড়ী অঞ্চলের বার্বারদের শত্রুতা, অপরদিকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুতরাং আবদুর-রাহমানকে বিভিন্ন স্থানে এইসব বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৪৬/৭৬৩ সালে আরবপ্রধান আল-'আলা ইব্ন মুগীছ আল্-জুযামীর বিদ্রোহ এবং ১৫২/৭৬৯ সালে সানতাভার (Santaver) জেলায় (বর্তমানে যাহা কুয়েনকা [Cuenca] প্রদেশ নামে পরিচিত), বার্বার গোত্রের শাক্য়া (Shakya) শাখার বিদ্রোহ। পরবর্তী কালে উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে কিছু সংখ্যক আরব গোত্রপ্রধান একটা রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া শার্লামেনের (Charlemagne) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাতে সে নিজেই পিরেনীজ (Pyrenees) অতিক্রম করিয়া ফিরিঙ্গী সৈন্যদলের সেনাপতি হিসাবে ১৬২/৭৭৮ সালে সারাগোসা অবরোধ করেন। কিন্তু শীঘ্রই রাইনল্যান্ড (Rhineland)-এ ফিরিয়া যাইবার আহ্বান তাঁহাকে এই অবরোধ তুলিয়া লইতে হয়। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁহার সৈন্যদল Ronces Valley-এর সংকীর্ণ উপত্যকায় বাস্ক (Basques) গোত্রীয় সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অনেকেই নিহত হয় (episode of Roland, Duke of Brittony)। এইদিকে আবদুর-রাহমানও এই সুযোগে সারাগোসা অবরোধ করিলেন এবং কিছু দিনের জন্য উহা দখল করিয়া নিলেন। কিন্তু ইতোপূর্বে যে শহরগুলির পতন ঘটিয়াছিল খৃষ্টানদের নিকট হইতে সেইগুলি পুনরুদ্ধারের আশা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এইভাবে ১৬৯/৭০৫ সালে Gerona (Djarunda) ফিরিঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গেল।

ইহার ৩ বৎসর পর ২৫ রাবী'উছ-ছানী, ১৭২/৩০ সেপ্টেম্বর, ৭৮৮ সালে ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আবদুর-রাহমান-১ কর্ডোভায় মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য তখন কর্ডোভার অবস্থা খুবই অনিশ্চিত ছিল। তবে তিনি দামিশকের ভূতপূর্ব খিলাফাতের তুলনায় কিছুটা নিম্নমানের হইলেও কর্ডোভায় একটা শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছিলেন এবং যতদিন আন্দালুসিয়ার মারওয়ান বংশীয়গণ সিরিয়ার ঐতিহ্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমুন্নত রাখিতে পারিয়াছিল ততদিন পর্যন্ত উল্লিখিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। যাহা হউক, এই বহিরাগত শাসক আবদুর-রাহমানের সাফল্য পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, এমনকি আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফার আল্-মানসূর তাঁহার সাহস ও প্রসংশনীয় উদ্যমের জন্য তাঁহাকে সাকর (শাহীন) কুরায়শ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. mus, I, 91-138; (২) Anonymas, اخبار مجموعة (দ্র.), 46-120; অন্যান্য আরবী সূত্র ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. Hist. Esp. mus., I, 91, টীকা ১।

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল লতিফ

আবদুর-রাহমান (عبد الرحمن) ঃ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আমের ওরফে স্যাঁচুয়েলো (Sanchuelo) বা ছোট স্যাঁচো [কেননা মায়ের দিক দিয়া তিনি প্যাম্পলোনার বাস্ক্রাজ স্যাঁচো গার্চে (Sancho Garces) দ্বিতীয় এ্যাবারকা (Abarca)-এর পৌত্র ছিলেন]। তিনি বিখ্যাত Major doms (প্রাসাদ সচিব) আল-মানসূর (দ্র.) মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আমের-এর পুত্র ছিলেন। তখনকার নামমাত্র খলীফা উমায়্যা

বংশীয় দ্বিতীয় হিশাম আল-মুআয়্যাদ বিল্লাহ-এর সম্মতিক্রমে ১৬ সাফার, ৩৯৯/২০ অক্টোবর, ১০০৮ সনে আবদুর-রাহমান তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল-মালিক (দ্র.) আল-মুজাফ্ফার-এর মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

দাম্ভিক ও চরিত্রহীন আবদুর-রাহমান স্যাচো তেমন মেধাসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি কর্ডোভায় ক্ষমতা লাভ করার পর মুহূর্ত হইতে ভুলের পর ভুল করিয়াই চলিলেন এবং এইভাবে জনগণের আস্থা হারাইলেন। দ্বিতীয় হিশামের নিকট হইতে খিলাফাতের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়া তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের (রাবী'উল-আওওয়াল ৩৯৯/ নভেম্বর ১০০৮ সালে মূল দলীলটির পাঠ (Text) সংরক্ষিত আছে। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন কর্ডোভার জনগণের মনপূত হয় নাই। কেননা তাহারা ইতোমধ্যেই আবদুর-রাহমানের কার্যকলাপে আমের বংশীয় বারবার গোত্র-ঘেঁষা মনোভাবে অতিষ্ঠ হইয়াছিল। আবার ভুল পথে চালিত হইয়া তিনি যখন শীতকালের মাঝামাঝি লিওন রাজ্য আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তখন কর্ডোভায় একটি বিরোধী দল গঠিত হইল এবং সুযোগ বুঝিয়া উমায়্যা বংশীয় মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ইব্ন 'আবদিল-জাব্বারকে সিংহাসনে বসাইল, যাহার সর্বপ্রথম কাজ ছিল মাদীনাতুয-যাহ্‌রা-এর আমের বংশীয় সকল নাগরিকের গৃহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার আদেশ জারী করা। এই ঘটনা আবদুর-রাহমানের মনে তেমন কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। তিনি পুন কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যদল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং পরে রাজধানীর অদূরেই ৩ রাজাব, ৩৯৯/৩ মার্চ, ১০০৯ সনে উমায়্যা বংশীয় মিথ্যা দাবিদার কর্তৃক প্রেরিত অনুচরদের দ্বারা ধৃত এবং পরে নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : E. Levi-Provencal, Hist, Esp. Mus., ii, 291-304.

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুর লতিফ

আবদুর-রাহমান খান (عبد الرحمن خان) : (আনু. ১৮৪৪-১৯০১ খৃ.) আফগানিস্তানের আমীর, আফদ'াল খানের পুত্র। আফগানিস্তানে বারাক্‌যাঈ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্ত মুহাম্মাদ খানের জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আফদ'াল খান। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে আবদুর-রাহমান খান আফগান তুর্কিস্তানে গমন করেন। তাঁহার পিতা তথায় বাল্‌খের গভর্নর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। যুবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনেক কয়টি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ইহার ফলে কাতগান, বাদাখশান ও দারওয়ায পর্যন্ত দোস্ত মুহাম্মাদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। দোস্ত মুহাম্মাদ ১৮৬৩ খৃ. মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ পুত্র আফদ'াল খান ও আ'জ'াম খানকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শের আলীকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করেন। সুতরাং শের আলীর উত্তরাধিকার পঞ্চসালা ভ্রাতৃহত্যা যুদ্ধের কারণ ঘটে এবং উহাতে উনিশ বৎসরের তরুণ বয়সে আবদুর-রাহমান জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা আফদ'াল খান সাময়িকভাবে সফলতা লাভ করিলেও পরে পরাজিত হন এবং তাঁহাকে বন্দী করা হয়। আবদুর-রাহমান বুখারায় পলায়ন করেন। আবদুর-রাহমান ১৮৬৬ খৃ. শের আলীর কান্দাহারে অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শের আলীর দলত্যাগী সেনাপতি রাফীক খানের সহায়তায় কাবুল অধিকার করেন। শের আলীর সৈন্যবাহিনী সায়দাবাদে পরাজিত হওয়ায় গযনীর পতন ঘটে। অতঃপর আফদ'াল খানকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহার নামে মুদ্রা জারী করা হয়। ১৮৬৭ খৃ. কিলাত-ই গিলযায় নামক স্থানে শের আলী আবার পরাজিত হন এবং কান্দাহার হইতেও বিতাড়িত হন। সেই বৎসরই আফদ'াল খান ইন্তিকাল করেন। যদিও আবদুর-রাহমান আশা করিয়াছিলেন, জনসাধারণ তাঁহাকে আমীররূপে গ্রহণ করিবেন কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য আ'জ'াম খানের দাবিকে সমর্থন করাই তিনি অধিকতর সুবিধাজনক মনে করেন। ইহাতে জটিলতা দেখা দেয়। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনীকে শের আলী ও তাঁহার পুত্র ইয়া'কূ'ব খান গয্‌নীর সন্নিকটে যানাখান নামক স্থানে পরাজিত করেন। ফলে আবদুর-রাহমান গৃহহীন হইয়া পড়েন এবং প্রথমে ওয়াযীরিস্তান ও পরে ইরান গমন করেন। ইহার পর মাশহাদ হইতে কারাকুম মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি খীওয়া ও সামারকান্দ উপনীত হন। জেনারেল Kaufmann, তাশ্‌কান্দের রুশ গভর্নর জেনারেল তাঁহাকে স্বাগত জানান। আবদুর-রাহমান তাঁহার নিকট শের আলীর বিরুদ্ধে সাহায্যের অনুরোধ করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হয়; কিন্তু তাঁহার জন্য ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং সামারকান্দে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ১৮৭৮-৮০ খৃস্টাব্দের দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক শের আলীর পরাজিত হওয়া পর্যন্ত এগার বৎসর তথায় অবস্থান করেন। শের আলীর পলায়ন ও মৃত্যু, তাঁহার উত্তরাধিকারী ইয়া'কূ'ব খানের উচ্ছৃঙ্খল উপজাতিদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার অক্ষমতা ও বৃটিশ রেসিডেন্ট Cavagnari-এর হত্যার কারণে ইয়া'কূ'ব খানকে ভারতে নির্বাসিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইহাতে আফগানিস্তানের সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়ে। আমু দরিয়ার দিকে রাশিয়ার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হইবে—যাহাতে ইহা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সংঘর্ষরোধক নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (buffer state) হিসাবে কাজ করিতে পারে। ১৮৮০ সালের জুলাই মাসে কাবুলের সবচাইতে শক্তিশালী প্রার্থী আবদুর-রাহমান খানকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, বৃটেন তাঁহাকে কাবুলের আমীর হিসাবে স্বীকৃতি দানে প্রস্তুত; তবে বৃটেনকে তাঁহার বৈদেশিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিতে হইবে। বৃটেন তাঁহাকে ইহারও নিশ্চয়তা দেয়, তাঁহার রাজ্যের উপর অনাহূত কোন হামলা হইলে বৃটেন তাহা প্রতিরোধে তাঁহাকে সহায়তা করিবে। ৩১ জুলাই-১ আগস্ট ১৮৮০ সালে যিম্মা কনফারেন্সে আবদুর-রাহমান খান এই সকল শর্ত গ্রহণ করেন (বৈদেশিক বিষয়ক বিভাগের দলীল-পত্রাদি ৬৫, ১১০৪ : কেবিনেটের ব্যবহারের প্রয়োজনে মুদ্রিত)। তিন বৎসর পর লর্ড Ripon এই চুক্তি নবায়ন করেন। তিনি আমীরকে তাঁহার বাহিনীর বেতন দান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করার জন্য ১২,০০,০০০ টাকা বার্ষিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। বৃটেন এখন এমন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে, যাহার সীমারেখা অজ্ঞাত। অতএব আবদুর-রাহমানের শাসনামলের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আফগানিস্তানের সীমারেখা

যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করা। পান্‌জদিহ্ (দ্র.)-এর ঘটনার ফলে ১৮৮০ খৃ. রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা প্রকট হইয়া উঠিলেও ১৮৮৬ খৃ. এ্যাংলো-রাশিয়ান একটি সীমান্ত কমিশনের মাধ্যমে যুল-ফিকার হইতে Dukci-এর মধ্যরেখা পর্যন্ত অর্থাৎ আমু দরিয়া হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূর পর্যন্ত আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ত নির্ধারিত হয়। ১৮৮৮ খৃ. সীমান্ত নির্ধারণের কাজ সমাপ্ত হয়। ১৮৯৫ খৃ. পামির চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার সহিত সীমান্ত বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এই চুক্তি দ্বারা ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও Tagdumbash-এর মধ্যবর্তী স্থানে আফগান সীমান্ত নির্ধারিত হয়।

রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির প্রতি আবদুর-রাহমানের মনোভাব বৃটিশের অনুকূলে থাকিলেও সীমান্তের পাঠান গোত্রসমূহের অঞ্চল তাঁহার দখলে আনয়ন করার বাসনা থাকায় ইংরেজ-আফগান সম্পর্কের উন্নতি হইতে পারে নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ডুরান্ড (Durand) চুক্তির ফলে পারস্পরিক তিক্ততা কিছুটা হ্রাস পায়; কারণ চুক্তি দ্বারা ভারত ও আফগানিস্তানের সীমারেখা চিহ্নিত হয় যাহা আমীর বা ভারত সরকার কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারত সীমান্ত এলাকায় আফগান চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভারত সীমান্তে ব্যাপক অসন্তোষের জন্য তাহারা আংশিকভাবে দায়ী ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ভারত সীমান্ত অঞ্চলে যতগুলি বিরোধ দেখা দিয়াছে, ইহার পশ্চাতে আফগানিস্তানের হস্ত সক্রিয় ছিল।

স্বদেশে আবদুর-রাহমানের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হইল, তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃ. তিনি শক্তিশালী গোত্র গালযাঈকে দমন করেন। ১৮৮৮ খৃ. আ'জ'াম খানের পুত্র ইস্‌হ'াক' খানের বিদ্রোহ দমন করা হয়। পরিশেষে মধ্যআফগানিস্তানের অবাধ্য গোত্রকে প্রবল সংঘর্ষের পর আবদুর-রাহমান খানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা হয়। তিনি ১৮৯৬ খৃ. চিত্রলের পশ্চিমস্থিত অমুসলিম অঞ্চল কাফিরিস্তান অধিকার করেন এবং তথাকার অমুসলিম অধিবাসীদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৯০১ খৃ. আবদুর-রাহমান ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র হ'াবীবুল্লাহ খান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Parliamentary Papers, Central Asia ১৮৮৪-৮৫, ১৮৮৭, ১৮৮৮; (২) T. A. Gray, My Residence at the court of the Ameer, ১৮৯৫; (৩) S. Wheeler, The Ameer Abdur Rahman, ১৮৯৫; (৪) সুলতান মুহাম্মাদ খান, Life of Abdur Rahman, দুই খণ্ড ১৯০০, প্রথম খণ্ড আমীর আবদুর-রাহমানের আত্মজীবনীর অনুবাদ; (৫) C. C. Davies, The Problem of the North-West Frontier, ১৮৯০-১৯০৮, ১৯২৩; (৬) W. K. Fraser-Tytler, Afghanistan. ১৯৫০; (৭) M. Longworth Dames. Encyclopaedia of Islam, লাইডেন, আফগানিস্তান শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.।

C. Collin Davies (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আব্‌দুর-রাহমান ইব্ন আওফ (عبد الرحمن بن عوف)ঃ (রা) বানূ যুহ্‌রা গোত্রীয়, অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী। ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁহার নাম ছিল আব্‌দ আম্‌র (আল-বুখারী, কিতাবুল ওয়াকালা, বাব ২)। তবে আল-ইস্‌তীআব (২খ., ৩৯০)-এ পূর্বে তাঁহার নাম আবদুল-কা'বা ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (আরও দ্র. বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., ২০৩ ও আয্-যাহাবী, সিয়ারা আ'লামিন্-নুবালা, ১খ., ৪৬, ৪৯)। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (স) তাঁহার নাম রাখেন আবদুর-রাহ্‌মান, তাঁহার উপনাম আবূ মুহাম্মাদ।

পিতার মত তাঁহার মাতাও ছিলেন বানূ যুহ্‌রা গোত্রের। তাঁহারা ছিলেন চাচাত ভাই-বোন। বংশপরম্পরা ছিল নিম্নরূপঃ আবদুর রাহ্‌মান ইব্ন আওফ ইব্ন আব্‌দ আওফ ইব্ন আব্‌দ ইব্‌নিল হারিছ ইব্ন যুহ্‌রা ইব্ন কিলাব। তাঁহার মাতার বংশপরম্পরা হইল আশ্-শিফা বিন্‌ত আওফ ইব্ন আব্‌দ ইব্‌নিল হারিছ। ষষ্ঠ উর্ধ্বতন পুরুষ কিলাব-এর পর্যায়ে মহানবী (স)-এর বংশের সহিত তাঁহার বংশ মিলিত হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি মহানবী (স)-এর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। লোকসংখ্যায় বা ধন-সম্পদে তাঁহার গোত্র বানূ যুহ্‌রা কুরায়শদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। কা'বা ও হারাম শরীফের তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত কোন পদ এই গোত্রের ভাগে পড়ে নাই।

ইব্ন সা'দ উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমুল-ফীল অর্থাৎ আব্‌রাহার অভিযানের (দ্র. আব্‌রাহা) দশ বৎসর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই হিসাবে তিনি মহানবী (স) অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট, কিন্তু আসলে তের বৎসরের ছোট ছিলেন এবং উমার (রা)-এর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। আল-ইসাবা গ্রন্থে ইব্ন হাজারও শেষোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

তাঁহার পিতা আওফ ছিলেন ব্যবসাজীবী। একবার উছমান (রা)-এর পিতা আফ্‌ফান ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর চাচা ফাকিহ্ ইব্ন মুগীরা সমভিব্যাহারে ব্যবসা ব্যপদেশে ইয়ামান গিয়াছিলেন। আব্‌দুর-রাহ্‌মানও এই সময়ে পিতার সহিত ছিলেন। পথে বানূ জাযী গোত্রের লোকদের হাতে তাঁহার পিতা ও ফাকিহ্ উভয়ই নিহত হন। আবদুর-রাহ্‌মান সেই স্থানেই পিতৃহত্যার বদলা লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহানবী (স) যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন তখন আবদুর রাহমানের বয়স ছিল সাতাইশ কি ত্রিশ বৎসর। তিনি অত্যন্ত সৎ ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। এক বর্ণনামতে ইসলাম-পূর্ব যুগেই তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর আহবান ও প্রচেষ্টায় তিনি শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন ত্রয়োদশতম মুসলিম। তখনও মহানবী (স) আর্‌কাম (রা)-এর গৃহকে গোপন প্রচারের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেন নাই।

আবিসিনিয়া ও মদীনা উভয় স্থানের হিজরতে আবদুর-রাহমান (রা) শামিল ছিলেন। নবুওয়াতের পঞ্চম সনে আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রথম পনের জনের তিনি ছিলেন অন্যতম। দুই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মক্কায় রাখিয়া তিনি একাই হিজরত করেন। কিছুদিন পর তিনি আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে মদীনায় হিজরত করেন। ইব্ন ইস্‌হাক-এর বর্ণনামতে মদীনায় হিজরতের পর কতিপয় মুহাজির সাহাবীর সহিত তিনিও খায্‌রাজ গোত্রের সা'দ ইব্ন রা'বী (রা)-এর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন (বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ, বাব ৬৮-তেও এই বর্ণনার সমর্থন বিদ্যমান)।

বুখারী (কিতাবু মানাকিবিল-আনসার বাব ১৫, মুআখাত)-তে উদ্ধৃত হইয়াছে, আবদুর-রাহমান (রা)-এর উক্তিঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমার ও সাদ ইব্ন রাবী-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী; কিতাবুল-বুয়ূ, বাব ১ ও কিতাবুল-মানাকিব, বাব ৫০-এ।

আনসার সাহাবীগণের সহিত এই ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মুহাজির সাহাবীগণের সাহায্য করা। এই বিষয়ে আবদুর-রাহমান (রা)-র আন্সারী ভ্রাতা সাদ ইব্ন রাবী একটি তুলনাহীন নজীর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবদুর-রাহ্মান বর্ণনা করেন, সাদ ইব্ন রাবী আমাকে বলিলেন, আনাসারগণের মধ্যে আমি একজন অতি সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার অর্ধেক সম্পদ আপনাকে প্রদান করিতেছি আর আমার দুই স্ত্রীর যাহাকে আপনার পসন্দ হয়, তাহাকে আমি তালাক দিব, আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। আবদুর-রাহ্মান উত্তরে বলিয়াছিলেন, এইগুলির আমার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্ আপনার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে বরকত দিন! ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই স্থানে কোন বাজার আছে কি? সাদ বলিলেন, হাঁ, কায়নুকা বাজার। আবদুর রাহ্মান পরদিন ভোর হইতেই কিছু ঘি ও পনির লইয়া ব্যবসা শুরু করেন (বুখারী)। তাঁহার ব্যবসায়ে এত উন্নতি হইতে লাগিল যে, তিনি বলেন, একটি পাথরের টুকরা হাতে লইলেও মনে হইত ইহাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য আমার হস্তগত হইবে (ইব্ন সাদ, ৮৯)। একবার তাঁহার এক বাণিজ্য কাফেলা আসিলে মদীনায় আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। খাদ্য বোঝাই সাত শত উষ্ট্র উক্ত কাফেলায় ছিল (সিয়ার আলামিন্-নুবালা, ১খ., ৫০)। ব্যবসা শুরুর কিছুদিন পরই তিনি আন্সারদের কুদাআ গোত্রের কন্যা সাহ্লা বিন্ত আসিমের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বুখারীতে একাধিকভাবে এই বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে। মহানবী (স) তাঁহার শরীরে বাসর অনুষ্ঠানের রং (জাফ্রানী রং, ইব্ন সাদ, ৮৯) দর্শন করিয়া বলিলেন ঃ কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, জনৈক আন্সারী কন্যার সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মহানবী (স) বলিলেন, মাহ্র কি দিয়াছ? তিনি বলিলেন, খর্জুর বীচি পরিমাণ এক টুকরা স্বর্ণ। তিনি (স) বলিলেন, একটি বক্রী দ্বারা হইলেও ওয়ালীমা কর (সিয়ার আলামিন-নুবালা)।

আবদুর-রাহ্মান (রা) প্রতিটি গায্ওয়ায় (দ্র.) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্ন সাদ, ৯০)। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা বুখারীর সাহীহ্-এর মাধ্যমে প্রমাণিত। বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের তালিকায়ও তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে (কিতাবুল-মাগাযী, বাব ১৩)। বদ্র যুদ্ধে তাঁহার সহিত সম্পর্কিত বহু বিবরণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুইটি সমধিক প্রসিদ্ধ (ক) আবূ জাহ্লকে হত্যা করিবার জন্য কৃত সংকল্প আফ্রার দুই তরুণ পুত্র মুহাম্মাদ (স) ও সুসংবাদ আবূ জাহলকে চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছিল, (খ) পূর্ব সখ্যের কারণে আবদুর-রাহমান উমায়্যা ইব্ন খালফ ও তাহার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন (বদ্র দ্র.)।

উহুদ যুদ্ধের সময় মহানবী (স)-এর উপর যে আক্রমণ হইয়াছিল সেই সময় যে কতিপয় সাহাবী তাঁহার নিকট ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম (ইব্ন সাদ, ৯০)। সেইদিন আবদুর-রাহ্মান-এর শরীরের একুশটি স্থানে আঘাত লাগিয়াছিল। পায়ের আঘাতের ফলে বাকী জীবন তাঁহাকে খোঁড়া হইয়া চলিতে হইয়াছিল (ইস্তীআব, ২খ., ৩৯১)।

শত শত মুজাহিদ সম্বলিত একটি বাহিনীর নেতৃত্বে শাবান ৬/ডিসেম্বর ৬২৭ সালে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহাকে দূমাতুল-জান্দাল-এ প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাত্রার সময় মহানবী (স) স্বহস্তে তাঁহার মাথায় কাল বর্ণের একটি পাগড়ী পরাইয়া তাঁহার হাতে একটি পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। দূমা পৌঁছিয়া তিনি তিন দিন পর্যন্ত লোকদেরকে ইসলামের আহ্বান জানান। ফলে খৃস্টানপ্রধান কাল্ব গোত্রের আসবাগ ইব্ন আম্র ও তাঁহার সম্প্রদায়ের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (স)-এর নির্দেশে আসবাগ দুহিতা তুমাদির-কে তিনি বিবাহ করেন। এই মহিলার গর্ভেই সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ বর্ণনাকারী আবূ সালমা-এর জন্ম হইয়াছিল (ইব্ন সাদ)। মক্কা বিজয়ের পর খালিদ ইব্নুল-ওয়ালীদ (রা)-কে ও হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবদুর-রাহ্মানকে মহানবী (স) ইসলাম প্রচারের জন্য বানূ জাযীমা-র নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সাীহ মুসলিমের কিতাবুস্ সালাত ও কিতাবুত্ তাহারাতে উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, আবদুর-রাহ্মান গায্ওয়া তাবূক-এ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসনাদ আহ্মাদ (৩খ., ১৩০, সংখ্যা ১৬৬৫)-এ উল্লেখ আছে, তাবূক-এ মহানবী (স)-এর দেরি দেখিয়া একদিন তিনি ফজরের সালাত-এ ইমামাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিছনে সালাত আদায় করিলেন।

নবী করীম (স)-এর পর তিনি খলীফা আবূ বাকরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। উসামা বাহিনীকে বিদায় জানাইবার জন্য (হি. ১১) আবূ বাক্র (রা) যখন ছাউনিতে যান, তখন আবদুর-রাহমানও তাঁহার বাহনের লাগাম ধরিয়া পদব্রজে তাঁহার সাথে গিয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১/৪খ., ১৮৫০)।

হি. ১১ সনে আবূ বাক্র (রা) নিজে হজ্জ-এ যাইতে পারেন নাই। এক বর্ণনায় ঐ বৎসর তিনি আব্দুর-রাহ্মান (রা)-কে আমীরুল-হাজ্জ নিযুক্ত করিয়াছিলেন (আত্-তাবারী, ১/৪খ., ২০১৫)। কিন্তু পরবর্তী সনে কে আমীরুল-হাজ্জ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এই সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, ঐ বৎসরও তিনি আমীরুল হাজ্জ ছিলেন (পূ. গ্র.; ২০৭৮)। হি. ১৩ সনে ইন্তিকালের পূর্বে আবূ বাক্র (রা) যখন উমার (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি এই বিষয়ে অন্যদের মধ্যে আবদুর-রাহ্মান (রা)-এর সহিতও পরামর্শ করিয়াছিলেন। হি. ১৩ সনে উমার (রা) হজ্জে যাইতে পারেন নাই। তিনিও ঐ বৎসর আবদুর-রাহমানকে আমীরুল-হাজ্জ নিযুক্ত করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., ২১৪৬, ২২১২)। উমার (রা)-এর খিলাফতকালে উছ্মান (রা)-এর মত আবদুর-রাহমান (রা)-কেও খলীফার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ বলিয়া মনে করা হইত। খলীফার নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে সাধারণত এই দুইজনের মারফতেই তাহা করা হইত (পূ. গ্র., ২২১২)। উমার (রা)-এর আমলে গঠিত সর্বোচ্চ পরিষদ (মুজ্লিসুশ-শূরা)-এর তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সক্রিয় সদস্য। ইব্ন সাদ তিনজন আনসারীর নামের সহিত আবদুর-রাহ্মানের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

হি. ১৪ সনে যে বিরাট মুসলিম বাহিনী ইরাকে প্রেরিত হইয়াছিল, আবদুর-রাহমান (রা) ইহার দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় লোকেরা সম্পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণের জন্য উমার (রা)-এর

উপর চাপ দিতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় আবদুর-রাহ্মান (রা) এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় বলিয়াছিলেন, আমীরুল-মুমিনীন! এই দায়িত্ব আমার উপর ছাড়িয়া দিন। আপনি মদীনায় অবস্থান করিয়া সৈন্যদল প্রেরণ করিতে থাকুন। আপনার জানা আছে, আল্লাহ্ মুসলিম সেনাদলকে কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। সেনাদল যদি পরাজিত হয়, তবে উহা আপনার পরাজয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু আপনি যদি উপস্থিত থাকেন তবে পরাজিত হইলে বা শহীদ হইলে আমার আশংকা হয়, মুসলমানদের উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহার এই ভাষণের যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব কাহার উপর ন্যস্ত করা যায়, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। উমার (রা) এই বিষয়ে দোদুল্যমান হইয়া ছিলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট নাজ্দ হইতে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর চিঠি পৌঁছিল। আবদুর-রাহ্মান (রা) তখন এই দায়িত্বের জন্য সাদ (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। সকলেই তাহা গ্রহণ করিলেন (আত্-তাবারী, ১/৪খ., ২২১৩-১৫)।

ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এইবার তিনি উমার (রা)-কে সেনাপতির দায়িত্ব লইয়া যুদ্ধে শরীক হওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর সাহাবীগণ তাঁহার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং সিদ্ধান্ত হয়, উমার (রা) মদীনায় অবস্থান করিয়া সেনাদল প্রেরণ করিবেন (আল-ফারূক ১১৫, ফুতূহুশ্-শাম-এর বরাতসহ)। এই সময় তিনি জিহাদে যোগদানের উদ্দেশে শাম যাত্রা করিয়াছিলেন।

বায়তুল-মাক্দিস্ জয়ের পর যে চুক্তি হইয়াছিল, আবদুর-রাহ্মান ইহাতে একজন সাক্ষী হিসাবে দস্তখত করিয়াছিলেন। হি. ১৫ সালে জাবিয়া নামক স্থানে উমার (রা)-এর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (আত-তাবারী, ২৪০৬)।

এই বৎসরই দীওয়ান (সরকারী ভাতা প্রাপকদের তালিকা) প্রণয়নকালে আলী (রা) ও তাঁহার প্রস্তাব ছিল, দীওয়ানের সর্বপ্রথম নাম হইবে আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমার (রা)-এর। কিন্তু উমার (রা) মহানবী (স)-এর পিতৃব্য আব্বাস (রা)-এর নাম সর্বপ্রথম এবং মহানবী (স)-এর নিকট-আত্মীয়গণকে তাঁহাদের নৈকট্যের ক্রমে দীওয়ানে স্থান দান করিলেন (পূ. গ্র., ২৪১২)।

তাঊন আম্ওয়াস ('আম্ওয়াস নামক স্থানে সেনা ছাউনিতে মহামারী)-এর সময় আবদুর-রাহ্মান (রা) শাম-এ ছিলেন। উমার (রা) তখন রাজ্য পরিদর্শনে সারগ নামক স্থানে পৌঁছেন্। মহামারীর কথা শুনিয়া তিনি আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু আবূ উবায়দা (রা) প্রমুখ সেনাপতিগণ ইহার বিরোধিতা করেন। আবদুর-রাহ্মান (রা) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে আসিয়া এই বিষয় জানিতে পারিয়া আবদুর-রাহ্মান (রা) মহানবী (স)-এর এই হাদীছটি বর্ণনা করেন, "কোন স্থানে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিতে পাইলে সেখানে যাইও না। আর পূর্ব হইতে সেখানে অবস্থান করিলে পলায়নের উদ্দেশে বাহির হইও না।" উমার (রা) বলিলেন, তোমার উপর আমাদের সকলের পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি আল্লাহ্র শোক্র করিলেন এবং সঙ্গীদেরকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সহীহ্ বুখারীতে (কিতাবুত্-তিব্ব) সালিম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্র উক্তিতে দেখা যায়, আবদুর-রাহ্মান (রা) বর্ণিত এই হাদীছই ছিল উমার (রা)-এর ফিরিয়া যাওয়ার কারণ (আত্-তাবারী, ২৫১৩)।

নিহাওয়ান্দ যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ সভার বৈঠকে তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে এই যুদ্ধে আমীরুল-মুমিনীনের উপস্থিতির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন (আত্-তাবারী, ২৬১০)। ফাত্হুল-ফুতূহ (নিহাওয়ান্দ)-এর গানীমা বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মস্জিদে নববীতে রাখা হইয়াছিল। উমার (রা) ইহার জন্য পাহারার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলে কতিপয় সাহাবীকে লইয়া আবদুর রাহ্মান (রা) এই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন (পূর্ব বরাত, ২৬৩০)। হি. ২৩ সনে উমার (রা) জীবনের শেষ হজ্জ করেন। উম্মাহাতুল-মু'মিনীন [মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণ]-ও এই সফরে ছিলেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উছমান (রা) ও 'আবদুর-রাহ্মান (রা)-কে প্রদান করা হইয়াছিল (সহীহ বুখারী, কিতাবু জাযাইস্-সায়দ)। ইহার কিছুদিন পর ২৫ যুল্-হিজ্জায় মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর দাস ফীরূয আবূ লূলূ-এর হাতে ফজরের সালাতে ইমামাতকালে আমীরুল-মুমিনীন উমার (রা) আহত হন। তিনি তখন আবদুর-রাহ্মান (রা)-কে টানিয়া আনিয়া অবশিষ্ট সালাতের ইমামাতের জন্য দাঁড় করাইয়া দেন। আবদুর-রাহমান (রা) সংক্ষিপ্তভাবে সালাত সম্পূর্ণ করিলেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আত তাবারী, ইব্ন সাদ)। উছমান (রা), আলী (রা), সাদ (রা), যুবায়র (রা) ও 'আবদুর-রাহমান (রা) এই পাঁচজন সাহাবী উমার (রা)-এর মরহেদ কবরে রাখিয়াছিলেন। শাহাদাতের সময় উমার (রা) খলীফা নিযুক্তির উদ্দেশে যে ছয়জনকে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, আবদুর-রাহ্মান (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। উছমান (রা)-কে খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

হি. ২৪ সনে উছমান (রা) অসুস্থতার দরুন হজ্জে শরীক হইতে পারেন নাই। তিনি সেই বৎসর আবদুর-রাহ্মান (রা)-কে আমীরুল হাজ্জ নিয়োগ করিয়াছিলেন। হি., ২৯ সনে উছমান (রা)-এর সহিত তিনিও হজ্জে যোগদান করেন। সালাত চার রাকআত না দুই রাকআত, ইহা লইয়া উছমান (রা)-এর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হয়, তাবারীতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। উছমান (রা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সময় তিনি উছমান (রা)-কে বলিষ্ঠ সমর্থন দান করেন এবং সর্বদা তাঁহাকে সৎ পরামর্শ দান করিতে থাকেন। আবদুর-রাহমান (রা) ৭৫ বৎসর বয়সে (ইব্ন সাদ) ৩১/৬৫২ সালে ইন্তিকাল করেন। আল-ইসাবায় মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই অধিকতর সঠিক বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার ওসিয়াত অনুযায়ী (আল-ইস্তীআব) উছমান (রা) তাঁহার সালাতে জানাযায় ইমামতি করেন। বাকী নামক কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

'আবদুর-রাহ্মান (রা) অতি ধনশালী সাহাবী ছিলেন। তাঁহার আয়ের উৎস ছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে তিনি বিরাট খামার ও ভূ-সম্পত্তিরও মালিক ছিলেন। মদীনার হাশ্শ (ইব্ন সাদ), বানূ নাদীর (দ্র.) হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ অংশ (পূর্ব বরাত), জুরফ (ইসতীআব) ও মক্কার পৈতৃক বাসভূমি (আযরাকী) ছিল তাঁহার ভূ-সম্পত্তি। শাম অঞ্চলের (দ্র. শাম) সালীল নামক ভূমি মহানবী (স) নিজে তাঁহার জন্য প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন। যেহেতু

শাম তখনও বিজিত হয় নাই, সেহেতু উহা তাঁহার নামে লিখিয়া দিয়া যান নাই (ইব্ন সাদ)।

তাকওয়া, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালবাসা, সত্যবাদিতা, সদাচার, দানশীলতা, আত্মত্যাগ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, আমানতদারি, বিনয়, কোমলতা, রুগ্নের সেবা, সাহস ইত্যাদি ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দানশীলতা ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের প্রবণতা ছিল প্রবাদের মত। জাতীয় ও ধর্মীয় কাজে অনেক বিরাট অংক তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। তাবূকের যুদ্ধের জন্য তিনি চারি হাজার দিরহাম দান করিয়াছিলেন। দুই দুইবার তিনি চল্লিশ হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ওয়াক্ফ করিয়াছিলেন। জিহাদের জন্য পাঁচ শত ঘোড়া ও পাঁচ শত উষ্ট্র দিয়াছিলেন (উস্দুল-গাবা)। একবার উছমান (রা)-এর নিকট একটি ভূখণ্ড চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রয় করিয়া সমুদয় অর্থ বানূ যুহ্রার দরিদ্র লোকদের ও উম্মুল-মুমিনীনগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন (ইব্ন সাদ)। মৃত্যুকালে তিনি পঞ্চাশ হাজার ঘোড়া আল্লাহ্র রাহে ওয়াক্ফ করিয়া গিয়াছিলেন এবং বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের প্রত্যেকের নামে চারি শত দীনার করিয়া ওসিয়্যাত করিয়া গিয়াছিলেন (ঐ সময় উছমান (রা)-সহ এক শতজন বদ্রী সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন (উস্দুল-গাবা)। উম্মুল-মুমিনীনগণের জন্য একটি বাগান ওসিয়াত করিয়াছিলেন। এই বাগানটি ৪ লক্ষ দিরহামে বিক্রয় হইয়াছিল। সাধারণ দান-খয়রাত ছাড়াও তাঁহার এইরূপ দানের বহু নজীর রহিয়াছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের নিকট তাঁহার মর্যাদা ছিল অতি উচ্চ। তিনি ছিলেন 'আশারা মুবাশ্শারা (দ্র.)-এর অন্যতম। ওয়াকিদীর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, মহানবী (স)-এর যুগ হইতে যাঁহারা ফাতওয়া দিতেন, আবদুর-রাহ্মান ছিলেন তাঁহাদের একজন (ইসাবা)। আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফতকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মীরাছ সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিলে আবদুর-রাহমান (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী উহার সমাধান করা হইয়াছিল। আবূ নুআয়ম (র) বর্ণনা করেন, 'আবদুর-রাহ্মান (রা) প্রমুখাৎ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনাকালে তাঁহার সম্পর্কে উমার (রা) মন্তব্য করিয়াছিলেন, العدل الرضى (ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তোষজনক)। উমার (রা)-এর খিলাফতকালে ফিক্হশাস্ত্রের যে অংশটুকু বিন্যস্ত হইয়াছিল, উহাতে আবদুর-রাহ্মান (রা)-এর অভিমতও স্থান পাইয়াছিল। তৎকালে জ্ঞানচর্চার জন্য মাঝে মাঝে যেসব আলোচনা সভা বসিত, উহাতে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করিতেন। ইন্তিকালের সময় উমার (রা) আবদুর-রাহ্মান (রা) সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "তিনি সঠিক মতামত দিয়া থাকেন, আল্লাহ্র অনুগ্রহে তিনি ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। (তিনি যদি খলীফা মনোনীত হন) তবে তাঁহার নির্দেশ তোমরা মানিয়া চলিও" (আত-তাবারী, ২৭৭৯)। আবদুর-রাহ্মান (রা)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তিনি অগ্নি উপাসকদের নিকট হইতে জিয্য়া কর আদায় করিয়াছিলেন (বুখারী, কিতাবুল-জিয্য়া ও আল মুওয়াদাআ মাআ আহ্লিল-জিয্য়া ওয়া আল-হার্ব, বাব ১)। তিনি ২০ পুত্র ও ৮ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন বলিয়া বর্ণনায় পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সাদ, ১/৩খ., ৮৭-৯৭; (২) আত্-তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্নুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ৩খ., ৩১৩-১৭; (৪) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ২খ., ৯৯৭-১০০১; (৫) সিয়ার আলামিন্-নুবালা, ১খ, ৪৬-৬১; (৬) আয্-যুরকানী, আল-আলাম; (৭) আল-বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., নির্ঘণ্ট; (৮) মুঈনুদ্দীন নাদবী, সিয়ারুস্-সাহাবা, ২খ., মুহাজিরীন, প্রথম খণ্ড, আজামগড় ১৯৫১ খৃ.।

ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুর-রাহমান ইব্ন 'আবদুল কাদির (عبد الرحمن بن عبد القادر) ঃ আল-ফাসী মরক্কোবাসী একজন আলিম, ১০৪০/১৬৩১ সালে ফেয নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৯৬/১৬৮৫ সালে সেই শহরেই ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁহার পিতা আবদুল-কাদির ইব্ন আলী (দ্র.) ও অন্য শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞানের প্রশস্ততা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে সকল জীবনীকার প্রশংসামুখর। বলা হয়, তিনি মালিকী আইনশাস্ত্র, ফিক্হ, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাস বিষয়ক প্রায় এক শত সত্তরেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে বিশেষভাবে আইনশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞরূপে বিবেচনা করা হয়। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে আল-'আমালুল-ফাসী ফেয-এর সামাজিক প্রথার একটি বৃহৎ সংকলন। কাদী 'ইয়াদ-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আশ্-শিফা-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিফতাহুশ-শিফা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আল-উক্নূম ফী মাবাদিইল-'উলূম নামে রাজায ছন্দে একটি দীর্ঘ নীতিগর্ভ কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal Hist. Chorfa, 266-9 (সূত্রসহ); (২) Brockelmann, ii, 612, Sii, 694.

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা

'আবদুর-রাহমান ইব্ন আবদিল্লাহ (عبد الرحمن بن عبد الله) ঃ আল-গাফিকী আন্দালুসের গভর্নর (ওয়ালী)। তিনি ১১১ হিজরীর শেষদিকে অথবা ১১২/৭৩০ সালের প্রথমদিকে উক্ত পদে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ আল-আশ্জা'ঈ-র স্থলাভিষিক্ত হন এবং মৃত্যু (১১৪/৭৩২) পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইতিপূর্বেও তিনি সাময়িকভাবে দুই মাসের (১০২/৭২১) জন্য আন্দালুসের গভর্নর ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন তাবিঈ। সততা ও তাকওয়া-র জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি Gaul আক্রমণে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই অভিযানেই তাঁহার জীবননাশ ঘটে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার এই অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল ছিল Tours (ফ্রান্স)-এর সেন্ট মার্টিন গির্জা (Basilica)। তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং Pamplona হইতে বাহির হইয়া Roncesvalles-এর গিরিপথ দিয়া Bordeaux আক্রমণ করেন এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। কারণ Aquitania-এর Duke Eudes তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিতে অসমর্থ হন। অতঃপর তিনি Loire-এর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ফিরিঙ্গীদের (Franks) ডিউক Charles Martel তাঁহার গতিরোধ করেন। Poitiers শহর হইতে প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইহাতে আবদুর-রাহমান পরাজিত হন। ফিরিঙ্গীদের (Franks) ইতিহাসে এই যুদ্ধ Poitiers-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। আরবগণ এই যুদ্ধকে

বালাতুশ-শুহাদা (শাহীদানের লাশ-রচিত উঁচু বাঁধ) নামে অভিহিত করে। আবদুর-রাহমানসহ অসংখ্য মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া উত্তরজীবী অবশিষ্ট মুসলমানগণ বিক্ষিপ্তভাবে Narbonne-এর দিকে ফিরিয়া আসে। রামাদান ১১৪/৭৩২ সালের অক্টোবরের শেষভাগকে এই স্মরণীয় যুদ্ধের তারিখ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal Hist. Esp. mus., ১খ., ৪০, ৫৯-৬২; (২) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, ৫খ., ১৭২-১৭৫, বৈরূত ১৯৬৪।

E. Levi-Provencal (E.I.²)/মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা

আবদুর-রাহমান ইব্ন আবী বাক্র (عبد الرحمن بن ابى بكر) ঃ (রা) আবূ আবদিল্লাহ (আবূ মুহাম্মাদ ও আবূ উছমান) প্রথম খালীফা আবূ বাক্র (রা)-এর পুত্র। তাঁহার ও আইশা (রা)-এর মাতা ছিলেন উম্ম রূমান। কথিত আছে, তাঁহার আসল নাম ছিল আবদুল-কা'বা অথবা আবদুল উয্যা। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুর-রাহ্মান রাখেন। তিনি অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদ্র (দ্র.)-এর যুদ্ধে তিনি মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উহুদ-এর যুদ্ধেও তিনি মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি হুদায়বিয়্যার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করিয়া পিতার সহিত বাস করিতে থাকেন। পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সকল জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি আইশা (রা)-এর পক্ষে ছিলেন যদিও তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ খলীফা 'আলী (রা)-র পক্ষে ছিলেন। পরবর্তী কালে মিসরের গভর্নর তদীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র-এর বিরুদ্ধে আম্র ইব্নুল-আস কর্তৃক সৈন্য প্রেরণের সময় তিনি আমর-এর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ভ্রাতা (মুহাম্মাদ)-এর জীবন রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে উমায়্যা শাসনামলে তিনি হুসায়ন ইব্ন আলী (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্নুয-যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাহাদেরকে মদীনার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দরূপে মনে করা হইত, যাঁহারা ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়াকে খলীফারূপে মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আবদুর-রাহমান স্বভাবত বীর ও সাহসী ছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী ব্যক্তি। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁহার পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সহীহ বুখারীর বর্ণনানুসারে আবদুর-রাহমান ৫৮/৬৭৮ সালে মক্কার পার্শ্ববর্তী হুবায়শী নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে মক্কা শরীফে দাফন করা হয়। কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় ৫৩ হিজরী অথবা অন্যান্য সনের উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন আবূ বাক্র (রা)-এর সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সহীহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে তাঁহার বর্ণিত অনেক হাদীছ রহিয়াছে। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খিলাফতের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহার খিলাফতকে রাজতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। ইব্ন মুসায়্যাব হইতে বর্ণিত আছে, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার পরিবারে চারি পুরুষ ছিলেন সাহাবী অর্থাৎ তাঁহার পিতামহ, পিতা, তিনি নিজে ও তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, উয়ূন, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৮৬; (২) আন্-নাবাবী, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৩৭৭; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসুদুল-গাবা, ৩খ., ৩০৪; (৪) আত্-তাবারী, তারীখ, ১খ., ১৯৪০ খৃ.; (৫) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mahmmad, ২খ., ২২৬; (৬) Weil, Gesch. d. Chalifen, ১খ., ২৭৫; (৭) Wellhousen, Das arab. Reich. u. Sein Sturz, পৃ. ৮৯; (৮) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ২খ., ৩৯৯, আবদুর-রাহমান ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন উছমান প্রবন্ধ, মিসর ১৯৩৯ খৃ.; (৯) আল-হাকেম, আল-মুসতাদ্রাক, ৩খ., ৩৭৪, ৪৭৬; (১০) আল-বুখারী, ২খ., ৯০৬; (১১) আল-ইস্তীআব, ২খ., ৪০৫; (১২) তাহযীবুত্-তাহযীব, ৬খ., ১৪৬, হায়দরাবাদ সংস্করণ (দাক্ষিণাত্য); (১৩) মুঈনুদ্দীন নাদবী, মুহাজিরীন, ১খ., ৩৭৩।

M. Th. Houtsma (E.I.¹)/মাহবুবুর রাহমান ভূঁঞা

আবদুর-রাহমান ইব্ন আলী (দ্র. ইব্ন দারবা)

আবদুর-রাহমান ইব্ন ঈসা (দ্র.) ইব্নুল-জাররাহ)

আবদুর-রাহমান ইব্ন উমার (عبد الرحمن بن عمر) আস্-সূফী আবুল-হাসান একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ১৪ মুহার্‌রাম, ২৯১/৮ ডিসেম্বর, ৯০৩ সালে রায়-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩ মুহার্‌রাম, ৩৭৬/২৫মে, ৯৮৬ সালে ইন্তিকাল করেন। ৩৩৭/৯৪৮-৯৪৯ সালে তিনি উযীর আবুল-ফাদ্র ইব্নুল আমীদের নিকটে ইস্ফাহানে ছিলেন এবং ৩৪৯/৯৬০-৯৬১ সালে নিঃসন্দেহে তিনি একই শহরে আদুদুদ-দাওলার দরবারে ছিলেন। তিনি ছিলেন আদুদুদ-দাওলার দরবারী জ্যোতির্বিদ। আদুদুদ দাওলা তাঁহার তিনজন উস্তাদের জন্য গৌরববোধ করিতেন। তাঁহারা হইলেন ব্যাকরণশাস্ত্রের আল-ফারিসী, জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকায় (astronomical table) ইব্নুল-আলাম ও নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আবদুর-রাহমান আস্-সূফী (ইব্নুল কিফতী, আরও দ্র. ইয়াকূত, ইরশাদ, ৩খ., ১০)। স্থির নক্ষত্রের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থটি তাঁহার সবচেয়ে পরিচিত গবেষণাকর্ম (সুওয়ারুল-কাওয়াকিবিছ ছাবিতা, বিভিন্ন নামেও গ্রন্থটির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়া থাকে)। গ্রন্থটি ৩৫৫/৯৬৫ সালের দিকে রচিত এবং আদুদুদ দাওলার নামে উৎসর্গীকৃত। ইহাতে দুইভাবে নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ (এক) জ্যোতির্বিদদের রীতি অনুসারে (টলেমীর মতানুসারে); (দুই) 'আরবদের আনওয়া' সম্পর্কিত বর্ণনা অনুযায়ী গ্রন্থটিতে চিত্র সমেত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রণেতার নিজস্ব ভাষ্য অনুযায়ী ইহা আল-বীরূনী (দ্র.) কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল (দ্র. H. Suter, Beitrage zur Geschichte der Mathematik bei den Griechen und Arabern, Erlangen, 1922, 86)। তিনি ইহা নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধীয় গোলক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থটির ভূমিকাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উতারিদ ইব্ন মুহাম্মাদ প্রণীত নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কীয় একটি গ্রন্থও দেখিয়াছিলেন। প্রণেতার পুত্র কর্তৃক ৪০০/১০০৯-১০ সালে নকলকৃত ও চিত্র সংযোজিত একটি প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি Bodleian লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন যুগের রীতি মাফিক চিত্র সংযোজিত ইহার আরও অনেক পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (দ্র. J. Upton,

Metropolitan Museum studies, ১৯৩৩, পৃ. ১৮৯-১৯৯; K. Holter, Die Islamischen Miniatur Handschriften vor 1350, Zentralbl. f. Bibliotheks wesen, ১৯৩৭, পৃ. ২-৫; তু. Ars Islamica, ১৯৪০, পৃ. ১০)। গ্রন্থটির ভূমিকা মূল পাঠ ও অনুবাদ Caussin de Perceval কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, Notices et Extraits, ১২ খ, ২৩৬, H. C. F. C. Schjellerup কর্তৃক পুরা গ্রন্থটি অনূদিত হইয়াছিল, Description des etoiles fixes par Abd al-Rahman al-Sufi, St. Petersburg ১৮৭৪ খৃ.। গ্রন্থটির আরবী মূল পাঠ মুহাম্মাদ নিজামুদ্দীনের সম্পাদনায় ১৯৩৩ সালে হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূল পাঠটি প্রধানত প্যারিসে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (উলূগ বেগের পাণ্ডুলিপি)-র অনুরূপ। তাঁহার অপরাপর সংরক্ষিত গ্রন্থের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক একটি সারগ্রন্থ astrolabe-এর ব্যবহার সম্পর্কে রচিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ। আদুদুদ-দাওলার জন্য আস্-সূফী কর্তৃক নির্মিত রৌপ্য গোলক কায়রোর ফাতিমী প্রাসাদের গ্রন্থগারে সংরক্ষিত হইয়াছিল (ইব্নুল কিফ্তী, পৃ. ৪৪০)। স্থির নক্ষত্রসমূহের উপর রচিত গ্রন্থ উরজুযা যাহা তাঁহার এক পুত্রের প্রতি আরোপিত, ইহার জন্য দ্র. Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ৮৬৩; ইহা সুওয়ার নামক গ্রন্থের হায়দ্রাবাদ সংস্করণের শেষে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৮৪; (২) ইব্নুল কিফ্তী, পৃ. ২২৬; (৩) আল-বীরূনী, আল-আছারুল-বাকিয়া (সম্পা. Sachau), ৩৩৬, ৩৫৮ (ইংরেজী অনু., পৃ. ৩৩৫-৫৮); (৪) M. Steinschneider, ZDMG, ১৮৭০, পৃ. ৩৪৮-৫০; (৫) Suter, পৃ. ৬২, তু. Nachtrage, Abh. Zur Gesch. d. math. Wisensch., ১৯০২, ১৬৬; (৬) Hauber, Isl. ১৯১৮, পৃ. ৪৮-৫৪; (৭) Brockelmann, ১খ., ২৫৩; পরিশিষ্ট, ১খ., ৩৯৮।

S. M. Stern (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুর-রাহমান ইব্ন কাসিম (দ্র. ইবনুল-কাসিম)

আবদুর-রাহমান ইব্ন খালদূন (দ্র. ইব্ন খালদূন)

'আবদুর-রাহমান ইব্ন খালিদ (عبد الرحمن بن خالد)ঃ ইবনুল-ওয়ালীদ আল-মাখযূমী বিশ্ববিশ্রুত আরব সেনাপতি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর একমাত্র জীবিত পুত্র। ইয়ারমূক যুদ্ধে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি সেনাবাহিনীর একটি দল (Squadron) পরিচালনা করেন। পরবর্তী কালে মুআবিয়া (রা) তাঁহাকে হিমসের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি সিরিয়া হইতে আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। ইরাকে গৃহযুদ্ধের সময় জাযীরার অভ্যন্তরে কয়েকটি ইরাকী অভিযান সফলতার সঙ্গে প্রতিহত করিয়া সিফফীনে গিয়া তিনি মুআবিয়া (রা)-এর সঙ্গে যোগদান করেন এবং তখন তাঁহাকে পতাকাবাহী (নিশান বরদার) নিযুক্ত করা হয়। প্রাপ্ত বিবরণমতে খিলাফতের সম্ভাব্য দাবিদাররূপে মুআবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ৪৬/৬৬৬ সনে মুআবিয়া তাঁহার খৃষ্টান ডাক্তার ইব্ন উছালের দ্বারা কৌশলে বিষ প্রয়োগ করিয়া 'আব্দুর রাহমানকে হত্যা করেন। অবশ্য ইহার অব্যবহিত পরেই ইব্ন উছালও নিহত আবদুর-রাহমানের জনৈক আত্মীয় দ্বারা নিহত হন। ইব্ন কাছীর এই বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে আমীর মুআবিয়া (রা)-এর কোন হাত ছিল বলিয়া স্বীকার করেন নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮খ., ৩১)। এইচ ল্যামেনস (H. Lammens) নামীয় এক খৃস্টান গ্রন্থকার (ইরাকী উৎস হইতে প্রাপ্ত) উক্ত বিবরণের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, হিমসে খৃস্টান বিরোধী উৎপীড়নমূলক ঘটনাবলীই এই বিবরণের ভিত্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, আনসাব, in G. Levi della Vida, It Califfo Muawiya I, Rome 1938, nos. 269, 281; (২) আত-তাবারী, ১খ., ২০৯৩, ২৯১৩; ২খ., ৮২-৩; (৩) ইয়াকূবী, ২খ., ২৬৫; (৪) দীনাওয়ারী, ১৬৪, ১৮৩, ১৯৭; (৫) নাস্র ইব্ন মুযাহিম, ওয়াক্আতু সিফ্ফীন, কায়রো ১৩৬৫হি, নির্ঘন্ট; (৬) আগানী, ১৫খ., ১৩; (৭) তাহযীব তারীখ ইব্ন আসাকির, ৫খ., দামিশ্ক ১৩৩৩ হি., ৮০; (৮) H. Lammens, Etudes sur le regne de Moawia I er, Paris 1908, 3-15, 218 প.।

H. A. R. Gibb (E.I.[2])/শেখ আবদুল লতিফ

আবদুর-রাহমান ইব্ন তাগায়িরাক (عبد الرحمن بن طغايرك) ঃ সালজূক শাসনের দ্বিতীয় যুগের এক প্রভাবশালী তুর্কী আমীর। তাঁহার পিতা সুলতান বারকিয়ারুক-এর আমীর ছিলেন এবং জায়গীর হিসাবে খাল্খাল (দ্র.) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুলতান মাসউদ, আবদুর-রাহমানকে ফাখ্রুদ্দীন (দীনের গৌরব) উপাধি প্রদান করিয়া ১১৪১ খৃ. 'হাজিব কাবীর' (প্রধান রক্ষী) নিয়োগ করেন। ১১৪৫ খৃ. যখন বুযাবে ও আব্বাস সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল, তখন আবদুর-রাহমান তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করেন। অতঃপর আযারবায়জান ও আর্‌রানের শাসন ক্ষমতা স্বনামে পরিবর্তন করাইয়া সুলতানকে পাহারা দিতে লাগিলেন, যেন সুলতান এক ধরনের বন্দী! পরিশেষে সুলতান অতিষ্ঠ হইয়া প্রধান রক্ষীকে সংহারের নিমিত্ত স্বীয় জনৈক নির্ভরযোগ্য অনুচরকে গোপনে নির্দেশ দেন। ১১৪৬-১১৪৭ খৃ. আবদুর-রাহমানকে গান্জা (জান্যা)-র নিকটবর্তী স্থানে হত্যা করা হয় (ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, ১১খ., ১১৬, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Recueil de textes relat. a l'hist. des Seldjoucides, ২খ., ১৭০ প.; (২) ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, নূরেন্‌বার্গ, ১০খ., ১৯৬ প.।

M. Th. Houtsma (দা. মা.ই.)/মুহাম্মদ হাসান রহমতী

আবদুর-রাহমান ইব্ন মারওয়ান (عبد الرحمن بن مروان) ঃ ইব্ন ইউনুস ইব্নুল-জিল্লীকী (গ্যালিসিয়ানের পুত্র) নামে খ্যাত ছিলেন। ৩য়/৯ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আন্দালুসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি উহার বিখ্যাত নায়ক ছিলেন। তিনি পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলের মেরিডায় বসতি স্থাপনকারী নও মুসলিম (মুওয়াল্লাদূন) পরিবার হইতে উদ্ভূত, যদিও তাঁহার পিতা কর্ডোভা অধিপতির পক্ষে এই শহরের গভর্নর ছিলেন। তিনি ২৫৪/৮৬৮ সালে

উমায়্যা আমীর মুহাম্মাদ (১)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আমীর তাঁহাকে অবরোধ করেন এবং শহরটি আত্মসমর্পণের পরে তিনি আবদুর-রাহ্‌মানকে কর্ডোভায় বসবাস করিতে বাধ্য করেন। সেখানে ২৫৪/৮৭৫ সাল পর্যন্ত বসবাস করার পর তিনি মেরিডা অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উমায়্যাদের প্রতি তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করেন। এখানে তিনি এ্যালেঞ্জ (Alange- হিস্‌নুল-হানাশ) দুর্গে তাঁহার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। কিন্তু অচিরেই পুনরায় তাঁহাকে আমীর মুহাম্মাদ (১ম)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং আমীর তাঁহাকে বাদাজোয নামক স্থানে বসবাস করিতে নির্দেশ দেন। অল্পকাল পরেই ইব্‌নুল-জিল্লীকী আবার পোর্ট (বুরতুকাল)-এর শাসনকর্তা সাদূন আস্-সুরুন্‌বাকী এবং আসটুরিয়াস ও লিওনের রাজা ৩য় আল্‌ফন্‌সো-এর সমর্থনে আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বিদ্রোহিগণ আমীরের অনুগত বাহিনীপ্রধান হাশিম ইব্‌ন আবদিল-'আযীযকে সেররা ডি এসট্রেলা (Serra de Estrella) অঞ্চলে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন এবং খৃষ্টান রাজার নিকট সমর্পণ করেন। অবশ্য পরে খৃষ্টান রাজা বিরাট মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। ইব্‌নুল-জিল্লীকী সঙ্গত কারণেই কর্ডোভা সরকারের পক্ষ হইতে এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার আশংকা করিয়া রাজা ৩য় আল্‌ফন্‌সোর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে আট বৎসর থাকার পর ২৭১/৮৮৪ সালে তিনি বাদাজোয-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুকৌশলে কর্ডোভা প্রশাসনের সহিত একটি অলিখিত সমঝোতায় উপনীত হন। ইহার ফলে গুয়াদিয়ানা উপত্যকা হইতে বর্তমান পর্তুগালের দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে তিনি শাসনদণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করেন। আমীর আল-মুনযির ও আমীর আবদুল্লাহ্‌র আমলে আবদুর-রাহমান ২৭৬/৮৮৯ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করেন এবং রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার পুত্র মারওয়ান তাঁহার মৃত্যুর পর মাত্র দুই মাস কাল রাজ্য শাসন করেন। ইহার পর তাঁহার পৌত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদির-রাহমান শাসন ভার লাভ করেন। তিনি ৩১১/৯২৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র আবদুর-রাহমান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইব্‌নুল-জিল্লীকীর এই প্রপৌত্র অবশেষে ৩১৮/৯৩০ সালে উমায়্যা আমীর আব্‌দুর রাহমান (৩য়)-এর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হায়্যান, মুক্‌তাবিস, Chronicle of the reign of the Emir Muhammad I; (২) F. Codera, Los Benimeruan en Meriday Badajoz, Estudios crit. de hist. ar. esp., ix, 48 ff; (৩) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus. I, 255 ff., 386; ii, 24-5.

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/শেখ আবদুল লতিফ

'আবদুর্-রাহ্'মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নিল আশ'আছ (দ্র. ইব্‌নুল-আশ'আছ)।

'আবদুর্-রাহ্'মান ইব্‌ন রুসতাম (দ্র. রুসতামী)।

'আবদুর্-রাহ্'মান ইব্‌ন সামুরা (عبد الرحمن بن سمرة) ঃ (রা) ইব্‌ন হ্'াবীব 'আবদ শাম্‌স ইব্‌ন 'আবদ মানাফ ইব্‌ন কু'স'ায়্যি একজন আরব সেনাপতি। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল 'আবদুল-কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম রাখেন আবদুর রাহমান। খলীফা 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফতকালের পরবর্তী বৎসরগুলিতে রাবী' ইব্‌ন যিয়াদের স্থানে সিজিস্তানে সর্বপ্রথম সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হন। তিনি যারান্‌জ ও যামীন দাওয়ার জয় ও কিরমান-এর শাসনকর্তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতের পর 'আবদুর রাহ'মান তথা হইতে চলিয়া যান। ইহার পর চীনা সূত্র অনুসারে তৃতীয় য়ায্‌দাগির্‌দ-এর পুত্র ফীরূয সিজিস্‌তানে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন (Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue occidentaux, পৃ. ২৭৫ ২৭৯)। 'মুআবি'য়া (রা) কর্তৃক 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমিরকে হ্'াসান ইব্‌ন 'আলী (রা) [দ্র.]-এর নিকট প্রেরণের সময় 'আবদুর-রাহ'মানও প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমেরকে পুনরায় বস্‌রা ও পূর্বাঞ্চলের গভর্নর (ওয়ালী) নিযুক্ত করা হইলে তিনি ৪২/৬৬২ সালে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন খাযিম ও 'আবদুর-রাহ'মানকে পূর্ব-খুরাসান ও সিজিস্তানে আবার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন। ৪৩/৬৬৩ সালে 'আবদুর-রাহ'মান পুনরায় সিজিস্তান অধিকার করেন এবং কয়েক মাস অবরোধের পর কাবুল অধিকার করেন। ইহার পর তিনি রুখ্‌খাজ (Arachosia) ও যাবুলিস্তানে (গযনী অঞ্চল) সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময় সম্ভবত ৪৫/৬৬৫ সালে কাবুলে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি আবার কাবুল আক্রমণ ও অধিকার করেন। পরবর্তী কালে আমীর মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে সরাসরি খলীফার অধীনে নিযুক্ত করেন; কিন্তু যিয়াদকে বসরার ওয়ালী নিযুক্ত করার কিছুকাল পরেই 'আবদুর-রাহ'মানকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করা হয়। তিনি কাবুল হইতে তাঁহার সঙ্গে করিয়া কয়েকজন যুদ্ধবন্দী নিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বসরার প্রাসাদে কাবুলের স্থাপত্যের অনুকরণে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। তিনি ৫০/৬৭০ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। পরবর্তী শতাব্দীতে তাঁহার বংশধরগণ তথায় একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী গোত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বালাফুরী, ফুতুহ', পৃ. ৩৬০, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৭খ., ২, ১০০-১০১; (৩) আত্-তাবারী, ১খ., ২৮৩১, ২খ., ৩, ৩খ., ২২; (৪) আল-ইয়া'কূ'বী, কিতাবুল-বুলদান, পৃ. ২৮০, ২৮১-২৮২, ২৯৬ (অনু. Wiet, পৃ. ৮৯-৯১, ১১৭); (৫) তারীখ-ই সীসতান, তেহ্‌রান ১৩১৪ হি., পৃ. ৮২-৮৯ (উপাখ্যানের সংযোজন); (৬) Caetani, Annali, ৭খ., ২৭৮; (৭) Chronographia, পৃ. ৩১৩-৫৪৯ ও স্থা.; (৮) J. Marquart, Eranshahr, বার্লিন ১৯০১, পৃ. ৩৭, ১৯৯, ২৫৫; (৯) ঐ লেখক, Festschrift E. duard Sachau, বার্লিন ১৯১৫, পৃ. ২৬৭-২৭০।

H. A. R. Gibb (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুর্-রাহ্'মান ইব্‌ন হ্'াবীব (عبد الرحمن بن حبيب) ঃ ইব্‌ন আবী 'উবায়দা (অথবা আবদা) আল-ফিহ্‌রী একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ, 'উক্'বা ইব্‌ন নাফি'-এর প্রপৌত্র, উমায়্যা খিলাফাতের শেষদিকের ইফ্‌রীকিয়্যার স্বাধীন গভর্নর। তাঁহার পিতা হ্'াবীব সূস, সিসিলী

ও মরক্কোর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় আবদুর রাহমান যুবক বয়সের হইলেও এই অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১২৩/৭৪১ সালে বার্বারদের ও নিয়মিত আরব বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাঁহার পিতা হ'াবীব ও প্রদেশের গভর্নর কুলছু'ম ইব্ন ইয়াদ-এর মৃত্যু হইলেও আবদুর-রাহমান ছিলেন জীবিতদের অন্যতম। তিনি সেখান হইতে স্পেনে চলিয়া যান। কিন্তু তথায়ও জীবনের ভয়ে তিনি ১২৭/৭৪৫ সালে ইফ্রীকিয়্যা ফিরিয়া আসেন। সেখানে তিনি ইফরীকিয়্যার প্রকৃত গভর্নর হ'ান্জ'ালা ইব্ন সাফওয়ান আল-কালবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দুই বৎসর পরে নিরুপায় হইয়া আবদুর রাহমান-এর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। আবদুর রাহমান ক'ায়রাওয়ান-এর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেন। ১৩৫/৭৫২ সালে তিনি কয়েকটি বড় বড় অভিযান, বিশেষ করিয়া সিসিলী ও সারদিনিয়া-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় সিরিয়ায় উমায়্যা খিলাফাতের পতন হওয়ার ফলে তিনি ক্ষমতায় আসিতে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হন নাই। মনে করা হয়, প্রথমদিকে তিনি আব্বাসী খিলাফাতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু খলীফা আল-মানসূ'র কর্তক প্রেরিত একটি অপমানজনক বাণীতে ক্ষিপ্ত হইয়া কিছুদিন পরই তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর খলীফার প্ররোচনায় তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহার ধ্বংস সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব, তাহাদেরই একজন ইলয়াস ইব্ন হ'াবীব কর্তৃক আবদুর-রাহমান নিহত হন; ইল্য়াস কায়রাওয়ান অধিকার করেন (১৩৭/৭৫৫)। আবদুর-রাহমানের পুত্র হ'াবীব তাঁহার অপর পিতৃব্য তুনসের গভর্নর 'ইমরান ইব্ন হ'াবীব-এর সহায়তায় শীঘ্রই অন্যায় দখলকারীর উপর আক্রমণ করেন এবং নিজেকে ইফ্রীকয়্যার কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপরিউক্ত আবদুর-রাহমান-এর সমসাময়িক আবদুর রাহমান ইব্ন হ'াবীব আল-ফিহরী নামে অন্য এক ব্যক্তি ছিলেন, যাহাকে প্রথমোক্ত আবদুর-রাহমান হইতে পার্থক্যের জন্য আস্-সিক্লাবী ছদ্মনামে অভিহিত করা হইত এবং তিনি স্পেনে 'আব্বাসী আবদুর রাহ'মান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে ১৬২/৭৭৮-৯ সালে তিনি Valencia-এর নিকটে নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন ইয'ারী, আল-বায়ান, ১খ., ৫৬, ৬০ প., ৬৭, অনু. Fagnan, পৃ. ৬২প., ৭৩প.; (২) হু'মায়দী, জায্ওয়াতুল-মুকতাবিস (তান্জী), কায়রো ১৯৫৩, সংখ্যা ৫৯৪; (৩) আদ্-দাব্বী, সংখ্যা ১০০৬; (৪) ইবনুল-আছ'ীর, ৫খ., ২৩৫ প., অনু. Fagnan, (Annales du Magrib et de l'Espagne), পৃ. ৭৪-৮১; (৫) আন্-নুওয়ায়রী, History of Africa, সম্পা. Gaspar Remiro, গ্রানাডা ১৯১৯, পৃ. ৩৮-৪০; (৬) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, ১খ., ২১৮ প.; (৭) G. Marcais, Berberie Musulmane, পৃ., ৪৫; (৮) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ১খ., ৪৭, ৯৭, ১২১-১২২।

E. Levi-Provencal (E.I.2)/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুর রাহ'মান ইব্ন হ'াস্সান আল-আন্সারী (عبد الرحمن بن حسان): মদীনা ও দামিশ্ক-এর প্রাথমিক ইসলামী যুগের কবি। জন্ম আনুমানিক ৬/৬২৭-২৮ সনে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্তুতি কবিতা রচয়িতা বিখ্যাত কবি হ'াস্সান ইব্ন ছ'াবিত (রা) [দ্র.]-এর পুত্র। উমায়্যা রাজধানী পরিদর্শন ব্যতীত তিনি মনে হয় সারা জীবন মদীনাতেই কাটাইয়াছেন। ইব্ন হ'াজারের মতে তিনি আনুমানিক ১০৪/৭২২-৩ সনে ৯৮ চান্দ্র বৎসর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। স্বীয় পিতার ন্যায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা শেষের দিকে খলীফা 'উছ'মান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ ও আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফাতের দাবির প্রবল সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে অনুরূপভাবে আবদুর-রাহমান নিজেও তৎকালীন বিবাদসমূহে জড়িত হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে ছিল আলী বংশের কবি ও সমর্থক ক'ায়স ইব্ন আমর আন্-নাজাশী (দ্র.)-এর সহিত কলহ। মনে হয় 'আবদুর-রাহমান স্পষ্টতই কোপন স্বভাব ও কলহপ্রিয় লোক ছিলেন। সমসাময়িকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিতে ভালবাসিতেন। উমায়্যা বংশের ভবিষ্যৎ খলীফা মারওয়ান-এর ভ্রাতা কবি আবদুর-রাহমান ইব্নুল-হ'াকাম-এর সহিতও তিনি বিবাদে লিপ্ত হন (দ্র. আগ'ানী, ১খ., ১৩, ১৫০-৪, ১৪, ১২৩ প., সং. বৈরূত, ১৩খ., ২৭৯-৮৬, ১৪খ., ২৮৪প.)। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়ার সঙ্গেও তাঁহার কলহ বাঁধে। আবদুর রাহমানের একটি কবিতার প্রেমভিত্তিক সূচনায় (নাসীব-এ) ইয়াযীদের ভগিনীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের অভিযোগে এই কলহের সূত্রপাত হয় (দ্র. Lammens, Etudes sur le regne du calife omaiyade Moawia Ier, in MFOB, ii (1907), 149-51)। শুধু মু'আবি'য়া (রা)-র মধ্যস্থতায় কবি ইয়াযীদের প্রতিশোধ হইতে রক্ষা পান, তবে হয়ত এই ঘটনা সাধারণভাবে আনসারদের বিরুদ্ধে রচিত ইয়াযীদের পোষ্য কবি আল্-আখত'াল-এর ব্যঙ্গ কবিতার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে। আবদুর-রাহমান তাঁহার কনিষ্ঠতর সমসাময়িক আনস'ারী কবি আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-আহ'ওয়াস-এর বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে হি'জাযী আল্-আহ'ওয়াস-এর কাব্যধারা এবং পরবর্তী উমার ইব্ন আবী রাবীআর কাব্যধারার ক্রান্তিলগ্নের কাব্য-নির্দেশন হিসাবে ইহা গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই কাব্য প্রতিভায় তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রেষ্ঠতর।

আবদুর-রাহ্মানের পুত্র সা'ঈদ উক্ত হিজাযী গীতি ঐতিহ্যের কবি ছিলেন। আগানী ও অন্যান্য সূত্রে উদ্ধৃত নিদর্শন হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁহার জীবনের কিয়দংশ হিজাযে, বাকী অংশ ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদিল-মালিকের দরবারে সিরিয়ায় এবং পরে হিশামের খিলাফাতকালে আবদুল-মালিকের পুত্র ওয়ালীদ-এর দরবারে অতিবাহিত করেন। তাঁহার মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত (দ্র. R. Blachere, hist. de la litt. arabe, iii, 625 and Sezgin, GAS, ii, 423)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানীতে আবদুর-রাহ্মানের পৃথক জীবনী নাই, তবে তাঁহার সম্পর্কে বরাতের জন্য দ্র. উহার বর্ণাক্রমিক তালিকা (Tables alphabetiques); (২) তাবাকাত সাহিত্য ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্ত বরাত প্রদত্ত হইয়াছে, Blachere, op. cit., ii. 316-17; (৩) Sezgin, ii, 422-3; (৪) Brockelmann, S I, 68;(৫)

যিরিক্‌লী, আ'লাম, ৪খ., ৭৪; প্রধান সাহিত্যের জন্য আরও দ্র. (৬) F. Schultess, Uber dem Dichter al Nagasi und einige Zeitgenossen, in ZDMG, liv (1900), 421-74 (আয্-যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার-এর মুওয়াফ ফাকি'য়্যাত হইতে তথ্য সংগৃহীত; (৭) Lammens, পৃ. স্থা.; (৮) ডব্লিউ আরাফাত, দীওয়ান হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছ'াবিত, লন্ডন ১৯৭১, ১খ., ভূমিকা, পৃ. ৬-৭। তাঁহার কাব্যকর্মের বিদ্যমান কবিতা ও খণ্ডাংশসমূহ পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়াছেন এস. মাক্কী আল-আনী شعر عبد الرحمن بن حسان الانصارى নামে, বাগদাদ ১৯৭১ খৃ.।

C. E. Bosworth (E.I².Suppl.)/ আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী

আবদুর্-রাহমান ইব্‌ন হিশাম (عبد الرحمن بن هشام) ঃ মরক্কোর আলাবী (দ্র.) বংশীয় সুলতান, ১২০৪/১৭৮৯-৯০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ রাবী'উল-আওওয়াল, ১২৩৮/৩০ নভেম্বর, ১৮২২ সনে ফেয নগরে তাঁহাকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তাঁহার চাচা মাওলায় সুলায়মান (দ্র.) তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় তিনি চাচার স্থলাভিষিক্ত হন। যদিও তিনি কোন বড় রকমের বিরোধিতা ব্যতীত সুলতান হিসাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, তবুও তাঁহার শাসনামলে তাঁহাকে বিভিন্ন গোত্রের কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ১২৪০/১৮২৪-২৫ সনে, ১২৫৯/১৮৪৩ সনে, ১২৬৯/১৮৫২ সনে, ১২৭৪-৫/১৮৫৭-৮ সনে যেম্মুর গোত্রের, ১২৪১/১৮২৫ সনে বানূ যারওয়াল, ১২৪৩/১৮২৭-৮ সনে শিদ্‌য়ামার, ১২৬৫/১৮৪৯ সনে আমীর ও যা'আইর-এর ও ১২৬৯/১৮৫৩ সনে বানূ মূসা গোত্রের বিদ্রোহ। তবে এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিল ১২৪৪/১৮২৮ সনের শারারদা (Shararda) ও ১২৪৭-৮/১৮৩১-২ সনের ওয়াদায় বাহিনীর (Geysh) বিদ্রোহ। সুলতান অচিরেই ফাযুল্-জাদীদ ঘাঁটি অবরোধ করিলেন, যেইখানে বিদ্রোহীরা ব্যূহ রচনা করিয়াছিল এবং শহরটি দখল করিয়া বিদ্রোহীদেরকে মাররাকুশের নিকটবর্তী রাবাত ও আল-আরাইশ (Larache)-এ বিতাড়িত করিলেন।

ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কতিপয় প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণে তাহাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং এইজন্যই তিনি আগ্রাসন ও সম্প্রসারণের পূর্ব পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যদের তানজিয়ার অবরোধ এবং ১৮২৯ খৃ. তাহাদের বাণিজ্যিক নৌবহর আটকাইয়া রাখায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অস্ট্রিয়া কর্তৃক আল-আরাইশ, আরযিলা ও তিত্‌তাবীন-এ বোমা বর্ষণ সুলতানের লুণ্ঠনকারী নৌবহর পুনঃনির্মাণের প্রয়াস স্তব্ধ করিয়া দেয় এবং আল্‌জিরিয়াতে ফরাসীদের সামরিক বিজয় প্রাক্তন রিজেন্সীর আওতাভুক্ত এলাকায় সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ পরিহার করিতে সুলতানকে বাধ্য করে। ১৮৩০-২ খৃষ্টাব্দে তিনি তেলেমসেন (Tlemcen), মিলিয়ানা ও মিডিয়াতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পান, কিন্তু তথায় গোলযোগ সৃষ্টির কারণে ও ফরাসী সরকারের প্রতিবাদের মুখে সকলকে ফিরাইয়া আনিতে ও তাহাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৪ খৃ. পর্যন্ত আল্‌জিরিয়ার জিহাদের নেতা আবদুল-ক'াদিরকে তিনি নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন দান করেন এবং পরে তাঁহার মিত্র (আবদুল-ক'াদির) সংগ্রাম জারী রাখিবার জন্য মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুলতান ফরাসীদের বিরুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। আবদুর্ রাহ্‌মান এই সমস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন, যথা ইজলী (Isly)-র যুদ্ধ (১৪ আগস্ট, ১৮৪৪) এবং তাঞ্জিয়ারও মোগাদার-এ বোমা বর্ষণ (৬ ও ১৫ আগস্ট)। ফলে তিনি আমীর আবদুল-ক'াদিরকে আইনের আশ্রয়চ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হন এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে আমীর ফরাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার প্রজাকুলের ধর্মান্ধতার জন্য এমন কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল, যাহার ফলে বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁহার একটা বিরক্তিকর সম্পর্ক সৃষ্টি হইল। যেমন ১৮৪৩ খৃ. স্পেনের রাজদূত ডারমন (Darmon)-এর হত্যা; ১৮৫৫ সনে ফরাসী দেশীয় পল-রে (Paul Rey)-এর হত্যা ও কোরাউড রোজ (Courraud Rose) নামীয় বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন। তবে তিনি সাধারণত হুমকি অথবা শক্তি প্রয়োগ, যথা ১৮৫১ খৃ. সালে (Sale)-এর উপর বোমা বর্ষণের পূর্বেই বৈদেশিক শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিতেন।

তাঁহার শাসনামলেই পর্তুগাল ১৮২৩ সালে, ইংল্যান্ড ১৮২৪ সালে, সার্দিয়া ১৮২৫ সালে, স্পেন ১৮২৫ সালে, ফ্রান্স ১৮২৫ সালে, পুনঃ ১৮৪৪ সালে, অস্ট্রিয়া ১৮৩০ সালে, নেপল্‌স্ রাজ্য ১৮৩৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্র ১৮৩৬ সালে, সুইডেন ও ডেনমার্ক ১৮৪৪ সালে মরক্কোর সহিত তাহাদের বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন অথবা নবায়ন করিয়াছিল।

মাওলায় 'আবদুর্-রাহ্‌মান পূত চরিত্রের অধিকারী একজন সুশাসক ছিলেন। তাঁহার আমলে অনেক স্মৃতিসৌধ মেরামত অথবা নির্মিত হইয়াছিল। যথা ফেয-এ মাওলায় ইদ্রীসের মস্‌জিদ, মেক্‌নেস সালে (Meknes Sale)-এ জামে মস্‌জিদের মিনার ও রক্ষা প্রাচীর, তাঞ্জিয়ার-এ নৌবন্দর, সাফী, মাযগান, মাররাকুশ-এর (যথাক্রমে আবূ হ'াস্‌সান কান্নারিয়্যা, আল-উস্‌তা-র মসজিদ ও আগদাল-এর) উদ্যান ইত্যাদি। তিনি মেকনেস (Meknes)-এ ২৯ মুহ'াররাম, ১২৭৬/২৮ আগস্ট, ১৮৫৯ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আন্-নাসিরী আস্-সালাবী, আল-ইসতিক্'সা, কায়রো ১৩১২ হি., ৪খ., ১৭২-২১০, অনু. E. Fumey, AM, 1907, 105-209; (২) ইব্‌ন যায়দান, তারীখ মিক্‌নাস, রাবাত ১৯৩৩, ১খ., ২০৫-২৩১, ৪খ., ৮১-৩৫৯; (৩) Freiherr von Augustin, Marokko, Pest 1845; (৪) L. Godard, Description et histoire du Maroc, Paris 1860, ii, 585-629; (৫) J. Caille, Le dernier exploit des corsaires du Bou Regreg. Hesp, 1950, 429-37; (৬) Les relations de la France et du Maroc sous la deuxieme republique, Actes du congres historique de centenaire de la revolution de 1848, 397-408; (৭) La France et le Maroc en 1849, Hesp., 1946, 123-55; (৮) Au lendemain de la bataille de l'Isly, Hesp., 1948, 383-401; (৯) Charles Jagerschmidt,

charge d'affaires de France au Maroc (1820-1894), Paris 1952; (১০) Ph. de Cosse-Brissac, Les rapports de la France et du Maropc pendant al conquete de l'Algerie (1830-1847), Paris 1931.

Ph. De. Cosse-Brissac (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল লতিফ

আবদুর রাহমান কাশগারী (عبد الرحمن كاشغرى)ঃ মাওলানা (খৃ. ১৯১২/১৯৭১) হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হশাস্ত্র, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। জন্ম গণচীনের কাশগারে। জন্মভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে ভারতে আগমন করেন (১৯২২) এবং লাখনৌর নাদওয়াতুল-উলামা প্রতিষ্ঠিত দারুল-উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিয়া (১৯২২-৩০) হাদীছ, তাফসীর ও আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শিক্ষাশেষে একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন (১৯৩১-৩৮)। এই সময় লাখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফাদিল-ই আদাব সনদ লাভ করেন। অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় (১৯৩৮-৪৭) ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় (১৯৪৭-৫৫) ফিক্‌হ ও উসূল-এর প্রভাষকরূপে কাজ করেন। শেষোক্ত মাদ্রাসায় এডিশন্যাল হেড মাওলানা পদে উন্নীত হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত উহাতে বহাল ছিলেন (১৯৫৬-৭১)। ১৯৭১ খৃ. পহেলা এপ্রিল তিনি ঢাকায় ইনতিকাল করেন এবং স্থানীয় আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন চিরকুমার; তাঁহার ব্যবহার ছিল অমায়িক। অধ্যাপনার কাজে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অবসর সময়ে তিনি গ্রন্থ রচনা ও সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি আরবীতে উত্তম মানের কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছেন।

রচনা ঃ আয-যাহারাত (الزهرات) এই আরবী কবিতা সংকলনটি (১১০ পৃষ্ঠা) মাসউদ আলাম নাদাবী লিখিত ২৯ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকাসহ লাখনৌ হইতে প্রকাশিত হয় (১৯৩৫)। ভূমিকা লেখক সংক্ষেপে কবি কাশগারীর জীবন, সাহিত্যকর্ম ও কাব্য আলোচনাপূর্বক তাঁহার স্বভাবসুলভ কবি-মানস ও সৃজনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই কবিতাগুলি ভাষা ও সাহিত্য মানের বিচারে বৈশিষ্ট্যময়। এই সংকলনটি কবির স্বাধীনতাবোধ, জাতীয়তাবোধ, প্যান-ইসলামী ভাবধারা ও দারিদ্র্য-পীড়িত মানবতার প্রতি মমত্ববোধের পরিচায়ক। তিনি আল্লামা ইক্‌বালের মুসলিম জাগরণ ও কর্মদর্শনের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর মৃত্যু (১৯৫৩) উপলক্ষে রচিত তাঁহার আল-'আবারাত (العبرات) শীর্ষক একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সাময়িকী সাওতুল-মাদ্রাসা-য় প্রকাশিত হয় (১৯৫৬)। আধুনিক আরবীর একটি মূল্যবান অভিধান (المفيد। আল-মুফীদ) তিনি সংকলন করিয়াছেন। ইহা ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯৬১)। ৭২২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইহার প্রথম ভাগে রহিয়াছে আরবী-উর্দূ-বাংলা প্রতিশব্দনিচয়; ২৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ভাগে স্থান পাইয়াছে উর্দূ-বাংলা আরবী শব্দসম্ভার। মিহাক্কুন্-নাক্‌দ (محك النقد) নাক্‌দুশ্-শি'র (نقد الشعر), আল-মুহ'ব্বার-ফিল-মুআন্নাছ ওয়াল-মুয'াককার (المحبر فى المونث والمذكر), শি'র ইব্‌ন মুকবিল, ইযালাতুল-খিফা' আন খিলাফাতিল-খুলাফা (ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء) ও ফরহাংগ-ই কাশগারী (فرهنك كاشغرى) তাঁহার প্রকাশিত রচনা। আরবী শব্দরাজির পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নির্ণয় বিষয়ক আল-মুহ'ব্বার ফি'ল-মুআন্নাছ ওয়াল-মুয'াক্কার গ্রন্থটি ও ফরহাংগ-কাশগারী শীর্ষক ইংরেজী-উর্দূ-বাংলা পারিভাষিক সংকলনটির পাণ্ডুলিপি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় সংরক্ষিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুর-রাহমান কাশগারী, আয্-যাহারাত (الزهرات), লাখ্‌নৌ ১৩৫৪/১৯৩৫, ভূমিকা ; (২) আবদুর-রাহমান কাশগারী, আল-মুফীদ (المفيد), গবেষণাও প্রকাশনা বিভাগ, মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা ১৩৮০/১৯৬১ ভূমিকা; (৩) আবদুস সাত্তার, মাওলানা, তারীখ মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ১৯৮-২০০; (৪) নূর মুহাম্মাদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ৩০৬।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

আবদুর-রাহীম ইব্‌ন আলী (দ্র. আল-কাদী আল-ফাদিল)।

আবদুর-রাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (দ্র. ইব্‌ন নাবাতা)।

আবদুর-রাহীম খান-ই খানান, মির্যা (مرزا عبد الرحيم خان خانان) ঃ একজন সেনাধ্যক্ষ, রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আকবারের প্রধান ওয়াকীল [অভিভাবক] বৈরাম খাঁর পুত্র। ১৪ স'ফার, ৯৬৪/১৬ ডিসেম্বর, ১৫৫৬ তারিখে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারা কোয়ূন্‌লূ তুর্কমানদের বাহারলু বংশধারাভুক্ত ছিলেন। জামাল খান মেওয়াতীর এক কন্যা তাঁহার মাতা এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা বাদশাহ্ হুমায়ূনের বেগম ছিলেন। তাঁহার চারি বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা নিহত হন। তদবধি আকবার নিজে তাঁহাকে লালন-পালন করেন এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনিই তাহাকে মির্যা খান উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৫৭২ খৃ.-এ তিনি বাদশাহ আকবারের সঙ্গে গুজরাট যান এবং বারাহার সয়্যিদ আহমাদের অধীনস্থ পাতান জেলার ভারপ্রাপ্ত হন। এই জেলার সীমার মধ্যেই তাঁহার পিতা নিহত হইয়াছিলেন।

জুমাদা'ল-উলা ৯৮১/ আগস্ট ১৫৭৩ তারিখে তিনি গুজরাটে আকবারের ঐতিহাসিক সসৈন্য অভিযানে সঙ্গী হন। তিনি সারনালের যুদ্ধে মধ্যভাগের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী মির্যাদের ক্ষমতা লোপ পায়। ১৫৭৬ সালে তিনি গুজরাটের গভর্নর নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে ওয়াযীর খান হারাবীকে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। ঐ বৎসরই তাঁহাকে মেওয়ার (মেবার) অভিযানে প্রেরণ করা হয়। তিনি ১৫৭৮ সালে গোগুন্ডা ও কুমভালমীর বিজয়ে সাহায্য করেন। পরম আস্থার নিদর্শনস্বরূপ সম্রাট তাঁহাকে ১৫৮১ সালে মীর আর্‌দ' নিযুক্ত করেন। এই পদে ইতোপূর্বে সাতজন কর্মকর্তা একত্রে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহাকে রানথামবোর-এর জায়গীর প্রদান করিয়া ঐ এলাকা শান্ত করিতে আদেশ করা হয়। ১৫৮২ সালে তাঁহাকে আকাবরের ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র সালীমের আতালীক নিযুক্ত করা হয়। ১৫৮৩ সালে তাঁহাকে মুজ'াফ্‌ফার শাহ গুজরাটীর বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি চরম অসুবিধার মধ্যে সারখেজ ও নাদোত-এর দুই যুদ্ধে (মুহ'াররাম ৯৯২/জানুয়ারী ১৫৮৪) মুজ'াফ্‌ফরকে পরাস্ত করেন।

বিজয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে খান-ই খানান উপাধি দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে তৎসময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫০০০ সৈন্যের মানসাবদারের পদে উন্নীত করা হয়। তিনি গুজরাটের শাসন ক্ষমতায় থাকেন, কাথিয়াওয়াড় পর্যন্ত মুজ'াফ্ফারের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং নওয়ানগর জয় করেন। ১৫৮৫ খৃ.-এ তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে মুজ'াফ্ফার পুনরায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিয়া ঐ প্রদেশটিকে শান্ত করেন। পরবর্তী বৎসর যুগ্ম গভর্নর প্রথা চালু হইলে কুলিজ খান তাঁহার সঙ্গে ঐ প্রদেশের শাসন ক্ষমতা পান। নামমাত্র গভর্নর রাখিয়া ১৫৮৭ খৃ.-এ তাঁহাকে দরবারে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৫৮৯ খৃ.-এ গুজরাটের শাসন ক্ষমতা তাঁহার স্থলে তাঁহার স্ত্রী মাহ্ বানূ-এর ভ্রাতা মির্যা আযীয কুকাকে প্রদান করা হয়।

একই বৎসর তাঁহাকে দরবারের সর্বোচ্চ পদে অর্থাৎ ওয়াকীল হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং জৌনপুর জায়গীর দেওয়া হয়। ঐ বৎসরই তিনি ওয়াকি'আত-ই বাবুরী নাম দিয়া বাবুর-নামার ফার্সী অনুবাদ সম্রাটকে উপহার দেন। ১৫৯০-১ খৃ.-এ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার জৌনপুর জায়গীর পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে মুলতান ও তাক্কার জায়গীর দেওয়া হয়, কান্দাহার বিজয় অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহাকে মির্যা জানী বেগ তারখানের নিকট হইতে থাটটা পুনরুদ্ধার করিতে প্রেরণ করা হয়। আবুল-ফাদলের মতে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্তির আশায় তিনি কান্দাহারের পরিবর্তে থাট্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে কান্দাহার অভিযানের দায়িত্ব আকবারের পুত্র দানিয়ালের উপর ন্যস্ত হয়। ১০০০/১৫৯১-২ সালে থাট্টা অভিযান সমাপ্ত হয়। মির্যা জানীবেগ নিজ কন্যাকে আবদুর-রাহীমের পুত্র শাহ্ নওয়ায খান (ইরিজ)-এর সহিত বিবাহ দেন এবং আবদুর-রাহীমের সঙ্গে দরবারে আসেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযানে সেনাপতি পদে নিযুক্ত যুবরাজ দানিয়ালকে সহায়তা করিতে ১৫৯৩ খৃ.-এ তিনি নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার পরামর্শক্রমে উক্ত অভিযান বাতিল করা হয়। দুই বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য অভিযানের ভার আকবারের অন্য পুত্র মুরাদের উপর ন্যস্ত হইলে আবদুর-রাহীমকে ভিলসার জায়গীর দিয়া যুবরাজকে সাহায্য করিবার আদেশ প্রদান করা হয়। সাময়িক বিরতি ব্যতীত পরবর্তী ত্রিশ বৎসর তাঁহার কার্যক্রম দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁহার বিলম্বের জন্য মুরাদ তাঁহার সহিত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন এবং ১৫৯৭ খৃ.-এ যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিজাপুরের সুহায়ল খানের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করেন, তাহা ব্যতীত অন্য অভিযানে শাহযাদা তাঁহার সক্রিয় সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। শাহযাদার সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিরূপ থাকিলে ১৫৯৮ খৃ.-এ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে ডাকিয়া পাঠান হয়।

মুরাদের মৃত্যুর পর দানিয়ালকে ১৫৯৯ খৃ.-এ দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত করা হয়। আবদুর-রাহীমকে তাঁহার সাহায্যে ও চাঁদ বীবীর বীরত্বে রক্ষিত আহমাদ নগর অবরোধ করিতে প্রেরণ করা হয় এবং আহমাদনগরের পতনের পর দানিয়ালকে উহার শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং আবদুর-রাহীমের কন্যা জানি বেগমের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ১৬০১ খৃ.-এ আবদুর-রাহীমকে আহমাদনগর যাইতে ও ঐ এলাকা শান্ত করিতে আদেশ দেওয়া হয় এবং পরের বৎসর বেরার, পাথরী ও তেলিঙ্গানার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সালীম যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন আবদুর-রাহীম দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বপদে বহাল রাখেন এবং মুক'াররাব খানকে আশ্বাস প্রদানের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রেরণ করেন। আহমাদনগরের নিজাম শাহী বংশের সেনাপতি মালিক আমবার যখন মুগলগণ কর্তৃক হৃত রাজ্য উদ্ধারের দুঃসাহসিক অভিযান করেন, তখন আবদুর-রাহীম সম্রাটকে আশ্বাস দেন, যথেষ্ট সাহায্য পাইলে তিনি সত্বর জয়লাভ করিতে পারিবেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র পারভেয-এর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রধানত সেনাপতিদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবে আবদুর-রাহীম ১৬১০ খৃ. মালিক আমবারের সহিত এক অসম্মানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তাঁহাকে অপমানের সহিত দরবারে ডাকিয়া পাঠানো হয় এবং অব্যবস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অবিলম্বে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পরের বৎসর কাল্পী ও কনৌজ জেলার বিদ্রোহ দমনের দায়িত্বসহ জায়গীর দেওয়া হয়।

যেহেতু দাক্ষিণাত্যে মুগলদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না, তাই আবদুর-রাহীমকে পুনরায় ১০২১/১৬১২ সনে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পূর্বাবস্থা পুনরুদ্ধার করা ছাড়া তিনি অধিক কিছু করিতে পারিলেন না। পরে ১৬১৬ খৃ. শাহযাদা খুররামকে (পরে শাহজাহান) এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পারভেযের স্থলে পাঠান হয়। মালিক আমবার পরাস্ত হন এবং ১৬১৭ খৃ.-এ এক সন্ধির মাধ্যমে মুগল বিজয় সমাপ্ত হয়। কিন্তু পুনরায় ১৬২০ খৃ.-এ আমবার মুগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং শাহজাহান কর্তৃক পরাজিত হন। ১৬২২ খৃ.-এ আবদুর-রাহীমসহ শাহজাহানকে দাক্ষিণাত্য হইতে ডাকিয়া আনিয়া পারস্যের কবল হইতে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য পরিচালনা করিতে হুকুম দেওয়া হয়। শাহজাহান হুকুম অমান্য করিয়া বিদ্রোহ করেন। আবদুর-রাহীম তাঁহার সাহায্যে যোগ দেন, কিন্তু সম্রাটের বাহিনীর সেনাপতি মাহাবাত খানের সহিত যোগাযোগ রাখায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে শান্তি স্থাপনের আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। যখন তিনি রাজকীয় বাহিনীর নিকট পৌছান তখন বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি রাজকীয় বাহিনীতে যোগদানে রাযী হইলেও তাঁহাকে অন্তরীণ রাখা হয়।

১৬২৫ খৃ-এ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান, তাঁহার সম্মান ও উপাধি পুনঃপ্রদান করেন এবং উপহারস্বরূপ এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। বিদ্রোহী মাহাবাত খানের অধীনে বন্দী বাদশাহ মুক্ত হইলে 'আবদুর-রাহীম বিদ্রোহী সেনাপতির বিরুদ্ধে অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ১৬২৬ খৃ.-এর শেষদিকে এই অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হুকুম দেওয়া হয়। প্রস্তুতি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি লাহোরে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দিল্লী পৌছিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ১০৩৬/১৬২৭ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার কবর শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারের সন্নিকটে এখনও বিদ্যমান। তিনি চার পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে মির্যা ইরিজ শাহ নাওয়ায খান নামে খ্যাত ৫০০০ সৈন্যের সেনাপতি হন এবং ১৬১৯ খৃ.-এ ইনতিকাল করেন। মির্যা দারাব, দারাব খান নামে খ্যাত— একজন প্রখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। শাহজাহান নিজে বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে

বাংলাদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন; ইনি মাহাবাত খানের হাতে ধৃত হইয়া ১৬২৫-৬ খৃ. নিহত হন। মির্যা রাহ'মান-দাদ (মৃ. ১৬১৯ খৃ) ও মির্যা আমরুল্লাহ অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মির্যা আবদুর-রাহীম একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। রাহীম ছদ্মনামে তিনি এই চার ভাষাতেই কবিতা রচনা করিতেন। ভক্ত আবেগে ভরপুর হিন্দী কবিতা রচনার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। শিল্প ও শিক্ষার তিনি একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাআছি'র-ই রাহীমী নামক পুস্তকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কবিদের এক দীর্ঘ তালিকা রহিয়াছে। তাঁহার মাহাত্ম্য ও উদারতা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার উদারতা বহু ক্ষুদ্র উপাখ্যান বিদ্যমান। তাঁহাকে কখনও কখনও প্রতারণা ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হইলেও অন্য যে কোন মুগল সেনাপতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের সমস্যা সম্পর্কে তিনি অধিকতর উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন।

ধর্মমতে তিনি প্রকাশ্যভাবে সুন্নী ছিলেন। শায়খ আহমাদ সারহিন্দী ও শায়খ আবদুল-হাক্ক দিহ্লাবী-এর মত ধর্মীয় নেতাগণ তাঁহাকে গোঁড়া মনে করিলেও তাঁহার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সূফীপন্থী ও উদার। তিনি তাকিয়্যা অভ্যাস করিতেন এবং গোপনে শীআ মতবাদ অনুসরণ করিতেন, এইরূপ অভিযোগ সমসাময়িক প্রমাণাদি হইতে সঠিক প্রমাণিত হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-ফাদ'ল, আকবার-নামাহ্, ৩খ.; (২) নিজামুদ্দীন আহ্মাদ, তাবাকাত-ই আকবারী, ২খ., বিশেষভাবে ৩৭৫-৯১; (৩) তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, Rogers ও Beveridge কর্তৃক অনূদিত; (৪) মু'তামাদ খান, ইকবাল নামাহ-ই জাহাঙ্গীরী, বিশেষ করিয়া পৃ. ২৮৭-৮; (৫) আবদুল-বাকী নিহাওয়ান্দী, মাআছির-ই রাহীমী; (৬) ফিরিশতা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী; (৭) আবূ তুরাব ওয়ালী, তারীখ-ই গুজরাত, কলিকাতা ১৯০৯ খৃ; (৮) মুহাম্মাদ মাসূম, তারীখ-ই সিন্ধ, বোম্বাই ১৯৩৮, পৃ. ২৫০-৭; (৯) ইন্শা-ই আবুল-ফাদল, ১২৬২ হি., ১খ., নং ৯, ২খ. (প্রথমার্ধ); (১০) মাকতূবাত ইমাম রাব্বানী, লক্ষ্ণৌ ১৯১৩, ১খ., নং ২৩, ৬৭, ৬৯, ১৯১, ২১৪, ২খ., নং, ৮, ৬২, ৬৬, ৬৭; (১১) আবদুল-হাক্ক দিহ্লাবী, মাজমূ'আ-ই কিতাবুল-মাকাতীব, দিল্লী ১৩৩২ হি., নং ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২২; (১২) শাহ্ নাওয়ায খান, মাআছিরুল-উমারা, ১খ., ৬৯৩-৭১৩; (১৩) আঈন-ই আকবারী, Blochmann কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা ১৯২৭ খৃ., ১খ., টীকা ৩৫৪-৬১; (১৪) দেব প্রসাদ মুনসিফ, খান খান নামাহ্ (হিন্দী); (১৫) মায়া শঙ্কর ইয়াজনীকা, রহীম রত্নাবলী (হিন্দী)।

এম. নুরুল হাসান (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

আবদুল আওয়াল (عبد الأول) ঃ জৌনপুরী, মাওলানা (হি. ১২৮০-১৩৩৯), ইসলাম প্রচারক। জন্ম কলিকাতা। পিতা মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরীর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অল্প বয়সে সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা গৃহশিক্ষকের নিকট। লাখনৌর ফিরিঙ্গী মহলের বিখ্যাত মাদরাসায় উচ্চ শিক্ষা ও মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবী এবং পরিশেষে মাওলানা লুৎফর রহমান বর্ধমানীর নিকট আরবী সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করেন। হাদীছ ও তাফসীরে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি দুই বৎসর মক্কায় অবস্থান করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম শ্রেণীর বক্তা এবং আরবী ও উর্দূ ভাষার লেখক হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন।

আরবী সাহিত্যের 'আত-তা'রীফ', 'হাম্মাদিয়া', 'শরহে কাসীদা', 'বানাত সু'আদ', 'শরহে সাব'আ' মু'আল্লাকা', 'মুফীদু'ল মুফতী', 'আন-নাফহ'াতুল আমবার' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এলাকায় চালু বিভিন্ন মাদরাসার কতকগুলি আরবী ও উর্দূ পুস্তকের তিনি প্রণেতা। ঢাকার চকবাজার জামে মসজিদে অবস্থান করিয়া তিনি তারাবীহ্র নামাযে ইমামতি করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নওরোজ কিতাবিস্তান বাংলা বাজার, ঢাকা-১ হইতে প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ', ১খ., ১ম সং, ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১৫৪; (২) ৩২/এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬, পৃ. ৩৮।

মুহাম্মদ ইলাহী বখ্শ

আবদুল আওয়াল, মাওলানা (مولنا عبد الأول) ঃ ১৮৯৮ খৃ. যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত বেরুইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটিতে থাকে। পিতা মাওলানা কামালুদ্দীন অত্যন্ত যত্নের সহিত তাঁহার প্রতিভার লালন করিতে থাকেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা স্থানীয় মক্তবে সম্পন্ন হয়। কিছুদিন স্থানীয় স্কুলে শিক্ষা লাভের পর দীনী শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের উদ্দেশে মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং তথা হইতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত ১ম বিভাগে এম. এম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে নিজ এলাকাকে মুক্ত করিতে এবং দীনী শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন। সর্বপ্রথম তিনি চিত্রা নদীর পার্শ্ববর্তী নহাটা বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। ইহা ছাড়া ১৯২৪ খৃ. পুলুম স্কুল ও পানিঘাটা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় উক্ত এলাকায় আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। মাওলানা আবদুল আওয়াল স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বলে আপন এলাকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে অনেকখানি সফলকাম হইয়াছিলেন।

অতঃপর মাওলানা সাহেব রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ খৃ. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ১৯৩৬ খৃ. ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি/প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি সমাজ সংস্কারমূলক যথেষ্ট কাজ করেন এবং জনগণের পূর্ণ আস্থা লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বেরুইল সিদ্দীকিয়া মাদরাসা, বেরুইল গার্লস হাই স্কুলসহ বেশ কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেক্রেটারী হিসাবে সেইগুলির পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি/প্রেসিডেন্ট ছাড়াও জেলা বোর্ডের সদস্য, স্কুল বোর্ডের সদস্য, জেলা ফুড কমিটির সদস্য ও জজের জুরীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৬ খৃ. তিনি মুসলিম লীগের তরফ হইতে যুক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য (এম. এল. এ.) নির্বাচিত

হইয়াছিলেন। তিনি যশোহরবাসীর তরফ হইতে বিভিন্ন সমস্যার কথা আইন পরিষদে তুলিয়া ধরেন এবং উহার সমাধান করিয়া দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। তিনি খুবই সরল জীবন যাপন করিতেন। সামান্য একটি কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করিয়া নিজ জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার আরবী হস্তলিপি ছিল খুবই সুন্দর। তিনি সম্পূর্ণ কুরআন শারীফ নিজ হস্তে লিখিয়া যান, যাহা আজিও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এই মহান সমাজ সেবক ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রাখিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যশোহরের মুসলিম মনীষী (একটি গবেষণামূলক রচনার পাণ্ডুলিপি), মাদ্রাসা-ই আলিয়ার গবেষণাগারে সংরক্ষিত; (২) মরহুমের ব্যক্তিগত ডায়েরী হইতে গৃহীত তথ্যাবলী।

মুহাম্মদ ইসলাম গনী

আবদুল আযীয (عبد العزيز) ঃ মাওলানা (১৮৯৩-১৯৫৯ খৃ.), বৃহত্তর ঢাকা জেলার খ্যাতিমান 'আলিম, শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিবিদ। মাওলানা আবদুল আযীয নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার কুমরাদী গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৮৯৩ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রায়পুরা থানার চরসুবর্দী নিউ স্কীম জুনিয়র মাদরাসা হইতে ১৯১৬ খৃ. প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিসহ জুনিয়র মাদরাসা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯২০ খৃ. ঢাকা মুহসিনিয়া নিউ স্কীম মাদ্রাসা হইতে ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ করেন। 'আবদুল আযীয ১৯২২ খৃ. ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত আই. এ. পাশ করেন। এইখানে তিনি মওলানা ইসহাক বর্ধমানী ও আবু নাসের ওহীদের নিকট তাফসীর ও হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৩ খৃ. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনীহা থাকায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১৯২৪ খৃ. ভারতের দেওবন্দ দারুল-উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এইখানে তিনি দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিখ্যাত আলিমদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ খৃ. ফাযিল পাশ করেন। ইহার পর তিনি সমাজসেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রামীণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি স্বীয় গ্রামে ১৯২৭ খৃ. কুমরাদী দারুল উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এতীম শিশুদের লালন ও শিক্ষার নিমিত্ত ১৯২৩ খৃ. একই স্থানে একটি এতীমখানা স্থাপন করেন। ১৯৩৫ খৃ. ভারত শাসন আইনের অধীন ১৯৩৭ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নারায়ণগঞ্জ পূর্ব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের এই নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী সুলতান উদ্দিনকে (পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর) পরাজিত করিয়া বংগীয় আইনসভার সদস্য (MLA) নির্বাচিত হন। আইন সভায় তিনি কৃষক প্রজাদলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৩ খৃ. আবদুল আযীয মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৬ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে একই আসন হইতে বংগীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মুসলিম লীগ দলীয় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। মুসলীম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ খৃ. সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল প্রবল মুসলিম লীগবিরোধী। এতদ্সত্ত্বেও মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনের প্রাণপ্রিয় সংগঠন মুসলিম লীগ ছাড়িয়া তিনি অন্য কোন দলে যোগদান করেন নাই। ১৯৫৪ খৃ. পূর্ব বাংলার আইন সভার নির্বাচনে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শিবপুর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। ইসলাম ও সমাজসেবার জন্যই আবদুল আযীয রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ইসলামী শিক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেক ওল্ড স্কীম ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য লাভে সমর্থ হয়। অসাধারণ অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে তৎকালীন প্রতিকূল পরিবেশে অজপাড়াগাঁয়ে তিনি দুইটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করিয়াছেন। মুসলিম লীগের নেতা হইয়াও তিনি মুসলিম লীগের অনেক নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ১৯৪১ খৃ. তিনি ঢাকা জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সহজ ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার কোন ভীতি ও সংকোচ ছিল না। ১৯৩৭ খৃ. আইন সভার কার্যক্রম চলাকালে নামাযের বিরতি চাহিয়া প্রথমে তিনি ব্যর্থ হন। পরে একদিন তিনি আইনসভার মধ্যেই দাঁড়াইয়া আসরের আযান দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে আইন সভার পার্শ্বেই যথারীতি আযান ও নামাযের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আবদুল আযীয ১৯৫৯ খৃ. ঢাকায় ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার গ্রামের মাদ্রাসার নিকট দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৯৫ খৃ.; (২) মুহাম্মদ আবদুল ওহাব, কর্মবীর মাওলানা আবদুল আযীয, আল-ফালাক, দারুল উলূম বার্ষিকী, ১৯৬০ খৃ.; (৩) দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৮ মে, ১৯৫৯ খৃ.; (৪) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., ২৩ খ., দ্র. শিবপুর শিরো.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঁঞা

'আবদুল-'আযীয (عبد العزيز) ঃ বত্রিশতম উছমানী সুলতান, সুলতান ২য় মাহ্‌মূদ (দ্র.)-এর ৩য় পুত্র। ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ জুন, ১৮৬১ সালে স্বীয় ভ্রাতা আবদুল-মাজীদ (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলকান প্রদেশসমূহ (Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina এবং Bulgaria) ও ক্রীট (Crete)-এর বিদ্রোহ, যাহার ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করে। ১৮৭০ খৃ. হইতে ইস্তাম্বুলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের পরিবর্তে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায়, এমনকি তুর্কী রাষ্ট্রপ্রধান মাহমূদ নাদীম পাশাকে অনেক সময়ই রুশ প্রতিনিধি জেনারেল Ignatief-এর সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে হইত। উছমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল, যথা শ্লাভ, আলবেনিয়া, এমনকি মিসর ও আরব অঞ্চলেও অসন্তোষ সৃষ্টি করার জন্য রাশিয়া চেষ্টা করে।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা সত্ত্বেও তানজীমাত (দ্র.) অর্থাৎ সংস্কার কার্যক্রম পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রাদেশিক প্রশাসন পুনর্বিন্যস্ত করা হয় (বিলায়াত

সম্পর্কিত আইন, ফরাসী আইনের আদর্শে প্রণীত, ১৮৬৭ খৃ.), ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের সংস্কারেও কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় (১৮৬৭)। ফ্রান্সের পরামর্শ অনুযায়ী ২টি পরিষদ গঠিত হয়। মুসলমান ও খৃষ্টান সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ (শূরা-ই দাওলাত), বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি পরিষদ (দীওয়ান-ই আহ্কাম-ই আদালিয়্যা, ১৮৬৮ খৃ.)। শিক্ষানীতিও ফরাসী শিক্ষা পদ্ধতির আদর্শে পুনর্গঠিত হয় এবং Galata-Saray নামক স্থানে একটি Lycee (মাধ্যমিক স্কুল) খোলা হয়। উছমানী খিলাফাতের সকল নাগরিকের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ফরাসী শিক্ষক ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দিতেন (১৮৬৮ খৃ.)। একটি বিশ্ববিদ্যালয় (দারুল-ফুনূন)-ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে সৈন্যবাহিনী, বিশেষত নৌবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করা হয়। বিদেশী নাগরিকদেরকে স্থাবর জ্ঞাসম্পত্তি লাভের অধিকার প্রদান করা হয় (১৮৬৭ খৃ.)। তবে অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্যান্য প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বাজেটে ঘাটতি এগার কোটি বিশ লক্ষে গিয়া দাঁড়ায়। যখন বুঝা গেল, সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, তখন রুশ রাষ্ট্রদূতের পরামর্শে রাষ্ট্রীয় ঋণ বাবদ দেয় সুদ মাত্র অর্ধেক প্রদত্ত হয় এবং রাষ্ট্রকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করা হয়। জাতীয় অর্থনীতির দুরবস্থা, আর্থিক সংকট ও বলকান প্রদেশসমূহের বিদ্রোহের ফলে সংস্কারসমূহের বাস্তবায়ন কঠিন হইয়া পড়ে। বৃহৎ শক্তিবর্গও সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপ ছিল। এইদিকে রক্ষণশীল তুর্কীগণ এইসব সংস্কার প্রয়াসকে ধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করিত এবং নব্য তুর্কীগণ মনে করিত এইগুলি যথেষ্ট প্রগতিশীল নহে। ফলে সারা দেশে সুলতানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে তাঁহাকে ১৮৭৬ সালের ৩০ মার্চ ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাহ্মূদ জিলাদ্দীন, মিরআত-ই হাকীকাত, ইস্তাম্বুল ১৩২৬ হি.; (২) ইব্নুল-আমীন মাহ্মূদ কামাল, Osmanli devrinde son Sadralazamlar, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, হাতিরাত-ই আতিফ Toem, ১৫খ., ৪০; (৪) ঐ লেখক, সুলতান আবদুল আযীয দাইর Toem, ১৫খ., ১৭৭; (৫) আবদুর-রাহ্মান শারফ, Sultan Abdul Azizin vefati intihar mi katil mi Toem, ১৪খ., ৩৪১; (৬) Ismail Hakki Uzuncarsilioglu, Sultan Abdulaziz vakasina dair vaka nuvis Lutfi Efendinin bir rislesi, Bell. vii[2], পৃ. ৩৪৯; (৭) আহ্মাদ সাইব, ওয়াকাআই সুলতান আবদুল-আযীয, কায়রো ১৩২৬ হি.; (৮) Milliger, (Osman Seyfi Bey), La Turquie sous le rigne d'Abd'ul-'Aziz, প্যারিস ১৮৬৮ খৃ.; (৯) A. D. Mordtmann, Stambul und das Moderne Turkentum, Leipzg ১৮৭৭-১৮৭৮; (১০) আহ্মদ মিদ্হ'াত, উস্স-ই ইন্কিলাব, ইস্তাম্বুল ১২৯৫ হি.; (১১) আহ্মাদ বাদাবী কুরান, Inkilap Tarihimiz ve Ittihad ve Terakki, ইস্তাম্বুল ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২২-২৩; (১২) A. de Castov, Musulmans et Chretiens de Mohamed le Prophete au Sultan Abd-ul-Aziz Khan, ইস্তাম্বুল ১৮৭৪ খৃ.; (১৩) The memoirs of Ismail Kemal Bey, ed, Sommerville Story, London 1920; (১৪) E. Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, প্যারিস ১৮৮২-৮৪ (তুর্কী অনু., ইস্তাম্বুল ১৮৯৮ খৃ.); (১৫) M.B.C. Collas, La Turquie en 1864, প্যারিস ১৮৬৪ খৃ.; (১৬) A. Ubicini, Etat present de l' Empire Ottoman, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ.।

E. Z. Karal (E.I.[2])/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল আযীয (عبد العزيز) ঃ বি. এ. খান বাহাদুর (খৃ. ১৮৬৭-১৯২৬), নোয়াখালী জেলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ, ধর্ম প্রচারক, সমাজকর্মী এবং ইংরেজী শিক্ষা ও নারী জাতির শিক্ষার অগ্রদূত। তিনি ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম গ্রাজুয়েটদের অন্যতম। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৬৩) ফেনী থানার (বর্তমানে জেলা) গুতুমা গ্রামে জন্ম (সেলিনা বাহার জামান, সবার আজিজ সবার প্রিয়, ১১-১২)। তাঁহার পিতা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কমিশনারের সহকারী। সাহিত্য ও কলাবিদ্যা চর্চার প্রতি বালক আবদুল আযীযের আগ্রহ ছিল। কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ পিতা তাঁহাকে তাহাতে নিরুৎসাহিত করেন, তবে ইংরেজী শিক্ষায় প্রেরণা দেন।

ঢাকা ছিল তখন উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। বন্ধু বজলুল করীম, ফজলুর রহীম প্রমুখসহ নৌকাযোগে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা গমন করিয়া তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের পশ্চাদ্বর্তিতা লক্ষ্য করিয়া তিনি ইঁহাদের ও বরিশালের হেমায়েতুদ্দীনের (পরে খান বাহাদুর) সহযোগিতায় সুহৃদ সম্মেলনী নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচার কার্যে রত হন। অচিরে বিভিন্ন স্থানে ইহার কয়েকটি শাখাও গঠিত হয়। এইসব সমিতির মারফতে মেয়েদের শিক্ষা দান করিয়া পরীক্ষা গ্রহণান্তে সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইত। তাঁহার স্ত্রী রাবেয়া খাতুন চৌধুরানীও এই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

এই সমাজসেবা তাঁহার পড়াশুনার অন্তরায় হয় নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যথারীতি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন মুসলমান গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তিনি 'বি. এ.' সাহেব নামে পরিচিত হন। ১৮৮৮ খৃ. তিনি শিক্ষা বিভাগের অধীন চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ১৮৯০ (মতান্তরে ১৯১০) খৃ. চট্টগ্রামের সহকারী স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে উন্নীত হন এবং শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদে (১৯১৫) তরক্কী লাভ করেন। বাঙ্গালা ও আসামের দশটি জেলা ছিল তাঁহার অধীন। যোগ্যতার সহিত বহু বৎসর এই পদে চাকুরী করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। চাকুরিতে তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার হিসাবে সরকার তাঁহাকে খান বাহাদুর উপাধিতে (১৯২৪) ভূষিত করেন।

তিনি ছিলেন একজন জনদরদী সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি। অনুন্নত মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। চট্টগ্রামে তিনি কবীরুদ্দীন মেমোরিয়াল হল ও ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোস্টেল (দোতলা ছাত্রাবাস) নির্মাণ করেন এবং মুসলমান শিক্ষা সমিতি প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। গরীব মুসলমান ছাত্ররা তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইত। তাহাদের উপকারার্থে তিনি তাঁহার দুই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির একাংশ ওয়াক্ফ করিয়া দেন। তাঁহার জ্ঞান-হিতৈষণার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে চট্টগ্রামের নাগরিকেরা শহরের একটি রাস্তার নাম রাখিয়াছে খান বাহাদুর আযীয রোড।

সাহিত্য ও কলাবিদ্যার চর্চা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া কবিতা রচনার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মশহূর শিক্ষাবিদ মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ আল-'উবায়দীর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি 'ওবায়দী বিয়োগে' নামক যে শোকগাঁথা রচনা করেন, তাহা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। কবিতা কলিকা নামক একখানা কবিতার বই তিনি রচনা করেন (সেলিনা বাহার জামান, পৃ. গ্র., ১৭)। নজরুল ইসলাম তাঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার নামে (বাংলার আজীজ) রচনা করেন। তাঁহার গোটা পরিবার বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহ্মুদ ওরফে মাদু মিঞা সাব-রেজিস্ট্রারের পদ হইতে জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের পদে উন্নীত হন এবং খান সাহেব খেতাব লাভ করেন। সরকারী মুখতার (পি. পি.) খান বাহাদুর বজলুর রহীম চৌধুরী ছিলেন তাঁহার ভগ্নিপতি এবং সুসাহিত্যিক হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও বেগম শামসুন্নাহার মাহ্মুদ তাঁহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রী। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৫৫; (২) নোয়াখালী গেজেটিয়ার (১৯৭৭), ২৩২-২৩৩; (৩) নোয়াখালী পৌরসভা প্রকাশিত শতবর্ষ পুস্তিকা, ৮৯-৯০; (৪) অধ্যাপিকা সেলিনা বাহার জামান ও প্রাক্তন পি. পি. আমীনুর রসূল, 'সবার আজিজ সবার প্রিয়', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.।

ড. এম. আবদুল কাদির

'আবদুল-'আযীয আস্-সাঊদ (দ্র. সাঊদী রাজপরিবার)

'আবদুল-'আযীয ইফেন্দী (দ্র. কারা চেলেবি যাদে)

'আবদুল-'আযীয ইব্ন 'আবদির-রাহমান (عبد العزيز بن عبد الرحمن) ঃ ইব্ন ফায়সাল আস-সুঊদ আনু. ১২৯১-১৩৭৩/আনু. ১৮৮০-১৯৫৩), সাউদী আরব রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ্ (রাজত্বকাল ঃ ১৩১৯-৭৩/১৯০২-৫৩)। তাঁহার মাতার নাম সারা বিন্ত আহ্'মাদ আস্-সুদায়রী। চার বৎসর বয়সের সময় 'আব্দুল-'আযীযকে একজন শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করা হয় এবং এগারো বৎসর বয়সে তিনি হাফিজ হন। একই সময় (১৩০৯/১৮৯১) আল্-মুলায়দা-তে হাইলের আল রাশীদ [দ্র.] সুঊদদের পরাজিত ও নাজ্দ্ হইতে বিতাড়িত করেন। সুতরাং 'আবদুল-'আযীয পরবর্তী সময়ে তাঁহার পিতার নির্বাসনস্থান আল্-কুওয়ায়তে বড় হইতে থাকেন।

১৩১৯/১৯০২ সালে এই তেজস্বী যুবক আর-রিয়াদ পুনর্দখল ও রাশীদী গভর্নরকে বিতাড়িত করিয়া তথায় সুঊদী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্য নাজ্দ্ শীঘ্রই সুঊদদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্-কাসীম [দ্র.] ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের শাসনভুক্ত হয়। ১৩৩০/১৯১২ সাল নাগাদ "আবদুল-আযীয সমগ্র নাজ্দ্ এলাকায় সুঊদী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯১২ খৃ.-এ 'আবদুল-'আযীয এক সুচিন্তিত নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতি অনুযায়ী ওয়াহ্হাবী অধ্যুষিত কৃষি খামার এলাকাগুলিতে বেদুঈন বসতি স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ইহাদের সদস্যগণ আল্-ইখ্ওয়ান (ভ্রাতৃবর্গ) [দ্র.] নামে পরিচিত ছিল। এই আন্দোলন একই সঙ্গে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের প্রসার ঘটায় এবং একটি নূতন সামরিক শক্তির জন্মদান, সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ইহাতে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আন্দোলনের চরম উন্নতির সময় এইরূপ ১৫০টি বসতি গড়িয়া ওঠে যাহার একেকটিতে ১০,০০০ লোক বসবাস করিত। ইখ্ওয়ানীগণ পরবর্তী কালের বিজয়সমূহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে, কিন্তু পরিশেষে বাদশাহ্র বিরুদ্ধে ধর্মীয় শৈথিল্যের অভিযোগ আনয়ন করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতঃপর স্বয়ং ইখ্ওয়ান প্রতিষ্ঠাতাই তাহাদের আবার দখল করেন (১৩৪৮/১৯৩০)।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 'আবদুল-'আযীয আরবের পূর্বাঞ্চল হইতে উছমানী তুর্কীদের বহিষ্কার করিয়া নিজ রাজ্যসীমা সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। 'আবদুল-'আযীযের জন্য এই বিশ্বযুদ্ধ ছিল সতর্কতার সহিত অপেক্ষা করিবার সময় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র তিনি রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। জাবাল শাম্মার [দ্র.] ১৩৪০/১৯২১ সালে অধিকৃত হয় এবং উহার অধীনে রাজ্যসমূহ পরের বৎসর দখলে আসে। ১৩৩৭/১৯১৯ সালে 'আবদুল- 'আযীয হাশিমীদের সহিত এক গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ১৩৩৮/১৯২০ সালে আসীর [দ্র.]-এর উচ্চভূমি দখল করিয়া লন। হাশিমীদের সহিত তাঁহার এই তিক্ত বিবাদের পরিসমাপ্তির সূচনা ঘটে যখন হাশিমী বাদশাহ আল-হু'সায়ন খিলাফাতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আত্মতৃপ্তিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন (১৩৪২/১৯২৪)। হাশিমীদের মহানবী (স)-এর বংশধর হওয়া ও আল-হিজাযে দীর্ঘ দিনের কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ইখ্ওয়ানগণ তাঁহাদের মুকাবিলা করত আত্-তাইফে প্রবেশ করে এবং মক্কা উহার দরজা ইখ্ওয়ানদের জন্য খুলিয়া দেয়। ১৩৪৪/১৯২৬ সাল নাগাদ 'আবদুল-'আযীযকে আল্-হিজাযের বাদশাহরূপে ঘোষণা করা হয়। তাঁহার রাজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল এবং বহু শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথমবারের মত এক সংযুক্ত আরব রাষ্ট্ররূপে উপদ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। এতদ্ব্যতীত পবিত্র স্থানসমূহের দায়িত্ব ভালরূপে পালিত হওয়ায় 'আবদুল্-'আযীয একটি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক নেতা হইতে মুসলিম ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হন। অবশিষ্ট রহিল আল-ইয়ামানের সহিত তাঁহার বিরোধ; বৈদেশিক সংঘাতের সামরিক বিজয় ও তাহার পর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইহার নিষ্পত্তি ঘটে (১৩৫২/১৯৩৪)। একই বৎসর তিনি তাঁহার সরকারকে সুসংহত করেন সুঊদী-আরব সাম্রাজ্য গঠনের মাধ্যমে। 'আব্দুল্-'আযীয তাঁহার পরাজিত শত্রুদের সহিত মহানুভবতার পরিচয় দান করিতেন, বিশেষ করিয়া আল্-ইয়ামানে বিজ্ঞতার সহিত অত্যাচার ও নিপীড়ন হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়াছিলেন। এই ক্রান্তিকালের অধিকাংশ সময় বৃটেনের সহিত আলাপ-আলোচনাতেও ব্যয়িত হয়; ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমান্তরেখা নির্ধারিত ও চিহ্নিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি আনুষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু কিছুটা মিত্রশক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি জাতিসংঘ ও আরব লীগে যোগদান করেন।

দেশের ভিতর এই পরাক্রমশালী বাদশাহ ঐতিহ্যগত নীতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন, তবে উহাতে তাঁহার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন এবং আমেরিকা পরিচালিত পেট্রোলিয়াম শিল্পকে

একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে প্রথম বাণিজ্যোপযোগী যে তৈল-সম্ভারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর সময় উহার দৈনিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছিয়াছিল এবং উহা হইতে বার্ষিক ২০ কোটি ডলার রাজস্ব পাওয়া গিয়াছিল তৈল হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব দ্বারা বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়, যথা পানি সরবরাহ, বিমানবন্দর নির্মাণ, টেলিফোন ও বেতার কেন্দ্র স্থাপন, সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, গভীর সমুদ্র বন্দর, রেল সড়ক, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় স্থাপন। 'আবদুল-'আযীয বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, তবে এই বিষয়ে কুরআনের অনুশাসন মানিয়া চলিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী একসঙ্গে রাখেন নাই। প্রধানত তাঁহার অধিক বিবাহের কারণ ছিল বিভিন্ন গোত্রের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন।

সর্বোপরি 'আব্দুল-'আযীয তাঁহার দেশের আধুনিকায়নের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন আরব উপদ্বীপের মহান নেতাদের অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমীন আর্‌-রায়হ'ানী, তারীখ নাজ্‌দ ওয়া মুল্‌হ'াকাতিহ্‌, বৈরূত ১৯২৮ খৃ.; (২) A. Rihani, Ibn Sa'oud of Arabia : His People and His Land, লন্ডন ১৯২৮ খৃ.; (৩) ফুআদ হাম্‌যা, আল-বিলাদুল্‌-'আরাবিয়্যা আস্‌-সুঊদিয়্যা, মক্কা ১৯৩৬ খৃ.; (৪) হ'াফিজ ওয়াহ্‌বা, জাযীরাতুল আরাব ফিল্‌-ক'ারনিল-ইশরীন, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৫) 'আবদুহ্‌, ইন্‌সানুল জাযীরা আরদ জাদীদ লি-সীরাতিল্‌-মালিক 'আবদুল-'আযীয আস্‌-সুউদ, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৬) H. St. J.B. Philby, Sa'udi Arabia, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ. (৭) স'লাহু'দ্দীন আলমুখ্‌তার, তারীখুল্‌- মাম্‌লাকাতিল-'আরাবিয়্যা আস্‌-সু'উদিয়্যা, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.; (৮) হ'াফিজ ওয়াহ্‌বা, খামসূন 'আম ফী জাযীরাতিল-আরাব, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (৯) সুউদ ইব্‌ন হায্‌লুল্‌, তারীখ মুলক আল-সু'উদ, আর্‌-রিয়াদ ১৯৬১ খৃ.; (১০) D. Howarth, The Desert Ding. a life of Ibn Saud, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ.; (১১) আমীন সাঈদ, তারীখুদ্‌-দাওলাতিস্‌-সু'উদিয়্যা, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.; (১২) G. Troeller, The birth of Saudi Arabia: Britain and The rise of the house of Sa'ud, লন্ডন ১৯৭৬।

R. Bayly Winder (E.I.[2] Suppl.)/মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল-'আযীয ইব্‌ন মার্‌ওয়ান (عبد العزيز بن مروان) ঃ উমায়্যা খলীফা ১ম মারওয়ানের পুত্র এবং খলীফা 'উমার ইব্‌ন 'আবদিল-'আযীযের পিতা। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মিসরের প্রাদেশিক শাসক করিয়া পাঠান, পরে খলীফা 'আবদুল-মালিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও সেই নিয়োগ বহাল রাখেন। মিসরে দীর্ঘ ২০ বৎসর অবস্থানকালে 'আবদুল-'আযীয নিজেকে জনগণের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী একজন সুযোগ্য শাসক বলিয়া প্রমাণিত করেন। ৬৯/৬৮৯ সালে খলীফার বিদ্রোহী সেনাপতি 'আমর ইব্‌ন সা'ঈদ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। অতঃপর ক্রুদ্ধ খলীফা তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজনকেই হত্যা করিতে উদ্যত হন। তখন 'আবদুল-'আযীয তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিয়া খলীফার ক্রোধানল হইতে সকলের জীবন রক্ষা করেন। জীবনের শেষদিকে 'আবদুল-'আযীয তাঁহার নিজ ভাই 'আবদুল-মালিকের দুঃখজনক আচরণ হেতু মানসিক কষ্ট পান। মারওয়ান তাঁহাকে 'আবদুল-মালিকের পরবর্তী খলীফা মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু 'আবদুল-মালিক নিজ দুই পুত্র আল-ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিবার উদ্দেশে ভাইকে প্রাদেশিক শাসকের পদ হইতে অপসারিত করিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পরিকল্পনা করেন। আর ঠিক সেই সময়েই দামিশ্‌ক-এ 'আবদুল-'আযীযের মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযু'রী, আনসাব, ৫খ., ১৮৩-৫; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৫খ., ১৭৫; (৩) ত'াবারী, ২খ., ৫৭৬; (৪) ইব্‌নুল আছ'ীর, ৪খ., ১৫৬; (৫) ইয়া'কূবী, ২খ., ৩০৬; (৬) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়ান্‌-নিহায়া, ৯খ., ৫৭-৫৯; (৭) আয্‌-যুরক'ানী, আল-আ'লাম, উল্লিখিত শিরোনামে; (৮) G. Weil, Gesch d. chalifen, i, 349; (৯) A. Muller, Der Islam im Morgenund Abendlend, i, 383 প.; (১০) H. Lammens, Etudes sur le siecle des Omayyades, 310-1; (১১) Caetani and Gabrieli, Onomasticon, ii, 171.

K. V. Zettersteen (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

'আবদুল-'আযীয ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (عبد العزيز بن محمد) ঃ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আস্‌-সান্‌হাজী আল্‌-ফিশ্‌তালী, মরক্কোর লেখক, জ. ৯৫৬/১৫৪৯ সনে, মৃ. মার্‌রাকুশে ১০৩১/১৬২১-২ সনে। তিনি সা'দী সুলতান আহ্‌'মাদ আল্‌-মান্‌সূ'র আয্‌-যাহাবী (দ্র.)-এর আমলে রেকর্ড বিভাগের প্রধান (ওয়াযীরুল্‌-কালামিল-আলা) এবং সরকারী ইতিহাস রচনার দায়িত্ব (মুতাওয়াল্লী তারীখিদ্‌-দাওলা) নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সেইগুলির মধ্যে কিছু ইতিবৃত্ত লেখক আল্‌-ইফ্‌রানী (দ্র.) কর্তৃক রচিত নুয্‌হাতুল-হাদী পুস্তকের দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। আল-ফিশ্‌তালী 'নাফ্‌হু'ত্‌-ত'ীব" গ্রন্থের লেখক আল-মাককারী (দ্র.)-র সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন এবং তিনি "মানাহিলুস-স'াফা ফী আখ্‌বারিল-মুলূকিশ্‌-শুরাফা" নামে তাঁহার কাল পর্যন্ত সা'দী রাজবংশের ইতিহাস রচনা করেন। উহা ব্যতীত তিনি অনেক প্রশস্তিমূলক কবিতাও রচনা করেন। সেইগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া "মাওলূদিয়্যাত" উল্লেখযোগ্য। মার্‌রাকুশ-এর আল-বাদী রাজপ্রাসাদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কৃত লিপির আকারে যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলিও তাঁহারই রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-ক'াদী, দুর্‌রাতুল্‌-হিজাল (সম্পা. Allouche), রাবাত ১৯৩৬, নং ১০৫৬; (২) ইফ্‌রানী, নুয্‌হাতুল-হাদী (সম্পা. Houdas),১৬৪, ১৬৭ প.; (৩) মাক্‌কারী, বূলাক, ৩খ., ৮; (৪) খাফাজী, রায়হ'নাতুল-আলিব্‌বা, কায়রো ১২৯৪ হি., ১৮০; (৫) ক'াদিরী, নাশ্‌রুল-মাছ'ানী, ফেয, ১খ., ১৪০-২; (৬) Levi-Provencal, Hist. Chorfa, 92-97; (৭) Brockelmann, S II, 680-1.

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

'আবদুল-'আযীয ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন নুস'ায়র (عبد العزيز بن موسى بن نصير) ঃ আইবেরীয় উপদ্বীপ বিজয়ী

বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতি মূসা ইব্ন নুস'ায়র-এর পুত্র। তাঁহার পিতা ৯৫/৭১৪ সালে সিরিয়া (শাম) অভিমুখী হইলে তিনি আল-আন্দালুস (স্পেন)-এর প্রথম গভর্নর হন।•যাইবার কালে মূসা তাঁহাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মুসলিম অগ্রগতি অব্যাহত রাখেন এবং যেসব অঞ্চল মুসলিম অধিকারে আসিয়াছে সেগুলিতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশ্রুতি মতে তাঁহার শাসনামলে ইভোরা (Evora), সান্টারেম (Santarem) ও কইমব্রা (Coimbra) শহরগুলি সমেত বর্তমান পর্তুগালের অংশ এবং নিম্ন-পিরেনীয অঞ্চলে পাম্পপ্লোনা (Pamplona) হইতে নারবোন (Narbonne) পর্যন্ত বিজিত হয়। তিনি নিজে মালাগা (Malaga) ও এলভিরা (Elvira) দখল করেন; তৎপর মুরর্সিয়া (Murcia) অঞ্চল পদানত করেন এবং গথ শাসক থিওডেমির (Theodemir) [যাহার নামে তুদমীর (দ্র.) জেলার নামকরণ করা হয়]-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। সেই সন্ধিপত্রের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য অনুলিপি অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে।

'আবদুল-'আযীয সর্বশেষ ভিজিগথ রাজা রডারিক (Roderic)-এর বিধবা পত্নী এগিলোন (Egilon)-কে বিবাহ করেন। কথিত আছে, এগিলোন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মু আসিম নাম ধারণ করেন। এই রাজকন্যাটি শাসক 'আবদুল-'আযীয-এর উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই নিজের লোকজন তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়ে এবং পরে এরূপ অভিযোগও উত্থিত হয় যে, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। ৯৭ হিজরীর রাজাব মাসের গোড়ার দিকে (মার্চ ৭১৮) তিনি নিজ স্থায়ী বাসস্থান সেভিল-এ যিয়াদ ইব্ন উয্রা আল-বালাবী নামক জনৈক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার মামাতো ভাই আয়্যূব ইব্ন হ'বীব আল-লাখ্মী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 30-34 ও তাহাতে উক্ত বরাতসমূহ; ১, ৮, n. i.; (২) আল-আ'লাম, উল্লিখিত শিরোনামে।

Levi-Provencal (E.I.2)/ হুমায়ুন খান

'আব্দুল 'আযীয ইব্ন বায (عبد العزيز ابن باز)ঃ সঊদী আরবের গ্রান্ড মুফতী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন চ্যান্সেলর, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ 'আব্দুল 'আযীয 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন বায ১৩৩০ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সঊদী আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি শায়খ ইব্ন বায নামে সমধিক পরিচিত। ১৩৪৬ হিজরীতে অর্থাৎ মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে চোখে দূরারোগ্য ব্যাধি দেখা দেয় এবং ২০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৩৫০ হিজরীতে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহার হৃদয়ে চোখের জ্যোতির পরিবর্তে ঈমানের চোখের জ্যোতির দান করেন। তিনি ছিলেন স্মৃতিশক্তির নে'মতের, অধিকারী, তিনি ছিলেন নাজ্দের প্রবীণ 'আলিমদের সর্বশেষ ব্যক্তি। মহান আল্লাহ তাঁহাকে 'ইল্ম ও তাক'ওয়ার পাশাপাশি বান্দাদের খেদমত করিবার তৌফিক ও সাহস দুইটিই দান করিয়াছিলেন। সঊদী আরবসহ গোটা বিশ্বের আহ্লে ইলমের কাছে তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। বহুমাত্রিক পাণ্ডিত্ব ও নিরন্তর আমলের কারণে সঊদী রাজ-পরিবারের উপর ছিল তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। ফাহ্দ ইব্ন আবদুল 'আযীয ও রাজপরিবারের সদস্যদের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য এক মহান সাধক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে অতি মাখামাখির ফলে সঊদী রাজপরিবারে উগ্র আধুনিকতার যে প্রলয়ঙ্করী সয়লাব আসিয়াছিল ইব্ন বাযের হিদায়াতী প্রচেষ্টায় তাহা কিছুটা স্তিমিত হয়। সঊদী আরবের প্রশাসনকে ইসলামী শারী'আর ভিত্তিতে পরিচালিত করিবার ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকা ছিল নীতি নির্ধারকের।

সঊদী আরবের দুঃখ ও সুখের উভয় যমানা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল ইব্ন বাযের। রাষ্ট্রের অভাবের দিনে তিনি যেমন ধৈর্য ও সাহস হারান নাই, তেমনি বিত্ত ও নে'মতের দিনেও শোকর করিতে ভুলেন নাই। রাষ্ট্রীয় যে কোন সংকট সন্ধিক্ষণে সঊদী সরকার তাঁহার মতামত চাহিতেন এবং তাঁহার প্রাজ্ঞ অভিমত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হইত। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মিসর, ইরাক, আরব আমীরাতকে যেই হারে নগ্নতা ও ইউরোপীয় আধুনিকতা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে তাহার তুলনায় সঊদী আরবের জীবনধারায় যে ইসলামী মেজায পূর্ণ মাত্রায় না হইলেও আজও অনেকাংশে কার্যকর, সন্দেহাতীতভাবে তাহা ইব্ন বাযের দাওয়াতী মেহনতের ফল। দূর অতীত হইতে আরব উপদ্বীপে (জাযীরাতুল আরাব) অবস্থিত তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহের প্রতি তাগূতী ও ইঙ্গ-মার্কিন-ইয়াহূদী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে। কারণ উপসাগরীয় এলাকা হইতেছে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত উবর ভূমি। ইয়াহূদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ পারসিকসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন কাজ, চাকুরী ও চিকিৎসার নামে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এইসব বিধর্মীর অবাধ বিচরণের ফলে আরব বিশ্বের ইসলামী সংস্কৃতি ও লালিত ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। অথচ বিশ্বনবী (স)-র ঘোষণা হইল জাযীরাতুল আরবের সীমানায় কোন ইয়াহূদী থাকিতে পারিবে না। জনৈক প্রশ্নকারী ইব্ন বাযকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি যে ফতওয়া দান করেন তাহা মুসলিম চেতনাকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করিতে পারে। ফাতওয়াটি ইব্ন বাযের মজমূ'আয়ে ফাতাওয়া, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সং, ১৪২০ হিজরী, ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। নিচে ফাতওয়াটির অনুবাদ ঃ

প্রশ্ন ঃ হযরত নবী কারীম (স) বলেন, "জাযীরাতুল আরাব দুইটি পরস্পর বিপরীত (ইসলাম ও অন্য কোন ধর্ম) একসাথে চলিতে পারে না"। অথচ এই জাযীরাতুল আরবের অধিকাংশ এলাকায় অমুসলিম শ্রমিক-কর্মচারীর সমাবেশ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি এত দূর গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এই বিধর্মীদের জন্য পৃথক উপাসনালয় নির্মাণের প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে খৃষ্টান, ইয়াহূদী, হিন্দু ও শিখসহ কোন অমুসলিম জাতি যেন আর অবশিষ্ট নাই। এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে শারী'আতের দৃষ্টিতে সরকারের দায়িত্ব কি আমরা জানিতে চাহি।

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, "জাযীরাতুল আরবে দুইটি ধর্ম (ইসলাম ও অন্য কোন ধর্ম) একসাথে চলিতে পারে না"। বিশুদ্ধ সূত্রে ইহাও বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম (স) জাযীরাতুল আরব হইতে ইয়াহূদী-নাসারাদের বহিষ্কার করিবার নির্দেশ

দিয়াছেন। তিনি ইহাও নির্দেশ দিয়াছেন, "সমস্ত জাযীরাতুল আরবে একমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যেন অবশিষ্ট না থাকে" এবং তিনি তাঁহার ওফাতকালে ওসিয়াত করিয়াছেন, "জাযীরাতুল আরব হইতে মুশরিকদের বাহির করিয়া দাও"।

এই সমস্ত নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এতদঞ্চলের সরকারগুলির দায়িত্ব হইতেছে, তাহারা নবী কারীম (স)-এর অন্তিম শয্যায় বর্ণিত এই গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়াত কার্যকর করা, যেমন তাহা কার্যকর করিয়াছিলেন হযরত উমার (রা)। তিনি খায়বার হইতে ইয়াহূদীদের শুধু বহিষ্কার নয়, দেশান্তরও করিয়াছিলেন। অতএব সউদী আরবসহ উপসাগরীয় অঞ্চলের সরকারগুলি, বিশেষত আরব উপদ্বীপের সরকারগুলির করণীয় দায়িত্ব হইতেছে, তাহারা যেন এইসব অঞ্চল হইতে সমস্ত অমুসলিম, যথা ইয়াহূদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও পৌত্তলিক হিন্দুসহ অপরাপর সমস্ত কাফিরকে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করে এবং এই সমস্ত অঞ্চলে একমাত্র মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে যেন স্বাগত না জানায়, ইহা তাহাদের উপর ওয়াজিব। নিখুঁত শারীআতের মৌলনীতির ক্ষেত্রে ইহা একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা।

সারকথা, জাযীরাতুল আরব হইতে সমস্ত কাফিরকে বাহির করিয়া দেওয়া মুসলিম উম্মাহর জন্য ওয়াজিব। আর ইহাও ওয়াজিব যে, তাহারা একমাত্র মুসলমান শ্রমিক নিয়োগ করিবে। এমনকি যাহারা শুধু মুখের দাবিতে মুসলমান তাহাদেরকেও নয়, বরং যাহারা বাস্তব অনুশীলনেও মুসলমান তাহাদেরকে নিয়োগ প্রদান করিবেন। অতএব যাহারা অন্য দেশের মুসলিম কর্মচারীদের মুখাপেক্ষী হইবেন তাহারা ঐসব দেশের অভিজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া কার্যক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করিবেন যাহাতে এইরূপ মুসলমান নিয়োগ দেয়া যায় যাহারা নামায-রোযাসহ শারী'আতের যাবতীয় আহকাম অনুসরণ করেন। তাহা ছাড়া এই সরকারগুলির উচিত, কাফিরদের নিকট হইতে কোনরূপ সেবা ও শ্রম গ্রহণ না করা। তবে হাঁ, একমাত্র শারী'আতের মানদণ্ডে কোন অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হইলে ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন ঃ কোন বিশেষ কারণে অমুসলিমদের জন্য উক্ত এলাকায় উপাসনালয় নির্মাণ জায়েয হইবে কি?

উত্তর ঃ গোটা জাযীরাতুল আরবের কোথাও ইয়াহূদী-নাসারাসহ অন্য যে কোন কাফিরদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ করা কখনও জায়েয নয়। যদি কোন উপাসনালয় স্থাপিত হইয়া যায়, সামর্থ্য অনুসারে তাহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া ওয়াজিব এবং শাসকবর্গের কর্তব্য হইতেছে তাহা নির্মূল করা যাহাতে সম্পূর্ণ জাযীরাতুল আরবের কোথাও শিরক-কুফরের কেন্দ্র অবশিষ্ট না থাকে। এমনকি জাযীরাতুল আরবের এক ইঞ্চি মাটিতে কোন গির্জা বা বিজাতীয় উপসনালয়ের কোন চিহ্নও থাকিবে না।

শায়খ বিন বায ছিলেন আহলে ইলম জ্ঞানী-গুণীর মূল্যায়নকারী, দীনের সেবকদের খাদেম, প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও সময়ের প্রতি যত্নশীল এক কর্মব্যস্ত বুযুর্গ। ৬০ বৎসর ধরিয়া তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কাজ করিয়াছেন, এমনকি পুরা জীবনে তিনি একদিনের জন্য জুমু'আ ও দুই ঈদে ছুটি ভোগ করেন নাই।

ভারতীয় উপমহাদেশ, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহারা দীনের খেদমত আঞ্জাম দিতেছেন সেইসব ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা কমবেশী শায়খ বিন বাযের বাসা ও দফতরে ভিড় জমাইতেন সুপারিশ, সাহায্য ও মতবিনিময়ের জন্য। পারতপক্ষে তিনি প্রত্যেকের বক্তব্য শুনিতেন, কোন না কোনভাবে আগন্তুকদের সাহায্য করিতেন। প্রতিটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল তাঁহার দফতরে। অন্ধ হইয়াও উপস্থিত বুদ্ধি সহকারে প্রতিটি বিভাগ পরিচালনা করিতেন এবং কোন সিদ্ধান্ত দিতে তাড়াহুড়া করিতেন না। প্রতিদিন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের কিছু অংশ শুনিতেন, এমনকি রেডিও-টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবরেরও খোঁজ রাখিতেন। অশীতিপর এই জ্ঞানতাপস ছিলেন অতিথি বৎসল। প্রত্যহ ৫০/৬০ জন মেহমানকে সঙ্গে লইয়া তিনি খাবার গ্রহণ করিতেন। বিভিন্ন শহর-নগর হইতে যখনই কোন মানুষ তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইত তিনি তাহাকে খাবারের দাওয়াত দিতেন।

বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী শায়খ বিন বাযের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "আবদুল-'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন বায দাওয়াতের ময়দানে আমার অন্যতম সাথী ছিলেন। যখনই তাঁহার সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছে আমি তাঁহার ইলমী, রূহানী ও দাওয়াতী ব্যক্তিত্বের মাঝে দীনের দরদ ও জযবা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে দাওয়াত, সংস্কার এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর পাইয়াছি। ইব্ন বায মূলত নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও কর্মনিষ্ঠার এক ব্যতিক্রমধর্মী নমুনা ছিলেন। ইসলামী শিক্ষা ও দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও কর্মতৎপর ব্যক্তিদের তিনি বড়ই সহযোগী ছিলেন। শায়খের মৃত্যুতে আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ এক দীনী ব্যক্তিত্বকে আমরা হারাইয়াছি"।

তাঁহার জীবন ছিল আমলের সৌন্দর্যে ভরপুর। তাঁহার শক্তিশালী ঈমান মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত। তাঁহার সত্য প্রকাশে স্পষ্টতা আহলে ইল্‌মের জন্য আদর্শ। সাধারণত কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তিনি ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী ছিলেন। তাঁহার মহৎ উদ্যোগ, পরোপকার, ইলমী ও দীনী অবদান অনস্বীকার্য।

বিন বায ছিলেন নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাবাহী। বক্তৃতায়, আলোচনায়, লেখায় ও গ্রন্থনায়, ওয়াজ ও নসীহতে শিরক ও বিদ'আতের বিরোধিতা অনায়াসে প্রকাশ পাইত। কুরআন ও হাদীছ ছিল তাঁহার গবেষণার মূল সূত্র। তাঁহার বক্তৃতার ধরন আক্রমণাত্মক ছিল না, বরং নরম সুরের আমেজে ছিল ভরপুর। সিনিয়র মন্ত্রীর মর্যাদা পাইয়াও তিনি দরবেশী জীবন যাপনে ছিলেন অভ্যস্ত। মাযহাবী চিন্তাধারার দিক দিয়া সউদী রাজপরিবার ছিলেন হাম্বলী। অপরদিকে বিন বায কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী আলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। ভাল-মন্দ পার্থক্য করার গুণ ছিল তাঁহার সহজাত। মক্কা উম্মুল কু'রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর এবং বর্তমান লাক্ষ্ণৌ দারুল উলূম নদওয়ার শিক্ষা বিভাগের ডীন ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদবী বলেন, "বিন বাযের মত আলিম প্রতি যুগে জন্মলাভ করে না। চোখের জ্যোতি না থাকা সত্ত্বেও তিনি যেইভাবে বিশাল ও বহুমাত্রিক খেদমত আঞ্জাম দিয়াছেন তাহা একমাত্র চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ খাস তওফীক দিয়াছেন তিনিই করিতে পারেন"।

বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্জ সম্পন্ন করেন। রিয়াদের বিশিষ্ট উলামার কাছে তিনি দীনী 'ইলম হাসিল করেন। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও তিনি সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৩৫৭ হিজরীতে সউদী আদালতের বিচারক নিযুক্ত হন এবং বিচারক জীবনের পাশাপাশি জ্ঞান অন্বেষায় বিপুল সংখ্যক ইসলামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি এমন বুৎপত্তি অর্জন করেন যে, কোন হাদীছ শুনিলেই ইহার যথার্থতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক মন্তব্য করিতে পারিতেন। বর্তমান যুগে এই পর্যায়ের হাদীছ গবেষক দুর্লভ না হইলেও সুলভ নয়। ভারতের লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য ও আরব সভ্যতার প্রফেসর ড. ইউনুস নিগরামী বলেন, "আমার বিরাট সৌভাগ্য যে, আমি বিন বাযের অন্যতম ছাত্র ছিলাম। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কাছে শারহু 'আক'ীদাতিত'-ত'াহ'াবিয়া অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি তাঁহাকে অতি উঁচু স্তরের মর্যাদাবান ইসলামী চরিত্রের অধিকারী পাইয়াছি। সত্যিকার অর্থে মরহুম শায়খ ছিলেন আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞান সাধনায় সালাফে স'ালিহ'ীনের সাচ্চা প্রতিনিধি"।

বিন বায তাঁহার সমসাময়িক কালের বিজ্ঞ উলামা, হাদীছ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে দীনী 'ইলম হাসিল করেন। নিম্নে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল ঃ

১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল লাতীফ ইব্ন 'আবদুর রাহ্মান ইব্ন হাসান, বিচারপতি, রিয়াদ। ২. সালিহ ইব্ন 'আবদুর আযীয ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব। ৩. সা'দ বিন হামাদ ইব্ন আতীক, বিচারপতি, রিয়াদ। ৪. হামাদ ইব্ন হারিছ, এটর্নী ষ্টেট ব্যাংক, রিয়াদ। ৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল লাতীফ আলে শায়খ, গ্র্যাণ্ড মুফতী, সউদী আরব। ১৩৩৪ হিজরী থেকে ১৩৫৭ হিজরী পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে বিন বায উলূমে শারী'আহ্ হাসিল করেন। ৬. সা'দ ইব্ন ওয়াক্কা'স' আল-বুখারী, মক্কা ১৩৫৫ হিজরী সালে তাঁহার কাছে বিন বায ইলমে তাজবীদ শিক্ষালাভ করেন।

বিন বায দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অনেক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র তৈরী করিতে সক্ষম হন। সউদী আরব ও উহার বাহিরে বিভিন্ন দেশে এইসব ছাত্র দক্ষতার সাথে দীনী খেদমত আঞ্জাম দেন। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্তগণ সবিশেষে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. আবদুল্লাহ আল-কানহাল, (২) রাশিদ ইব্ন সালিহ্ আল-খালীল, (৩) 'আবদুর রাহমান ইব্ন নাসির আল-বারাক, (৪) আবদুল-লাতীফ ইব্ন শাদীদ, (৫) আবদুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন কাউদ, (৬) আবদুর রাহমান আল-জালাল, (৭) স'ালিহ' ইব্ন হালিল, (৮) ফাহ্দ ইব্ন হালিল, (৯) আবদুল আমীম ইব্ন আল-ক'াসিম, (১০) উমার আল-আবীদ, (১১) আবদুল আজীম আল-সাদাহান, (১২) সা'দ আল-বারীক, (১৩) পুত্র আহ'মাদ ইব্ন বায, (১৫) মুহাম্মাদ আল শাওয়ির, (১৬) ড. ইয়ূনুস নিগরামী নদবী।

পেশা জীবন ও দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ ঃ বিন বায দীর্ঘ জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিয়া দীন ও মিল্লাতের বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দেন। নিম্নে তাহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদে উল্লেখ করা হইল ঃ

১. আল-খারাজ অঞ্চলের বিচারক, ১৩৫৭ হিজরী হইতে ১৩৮১ হিজরী পর্যন্ত মোট ১৪ বৎসর।

২. প্রভাষক, মা'হাদ আল-'ইলমী, রিয়াদ ১৩৭২ হিজরী; প্রফেসর, ইসলামী আইন, তাওহীদ ও হাদীছ শরীআহ কলেজ, রিয়াদ ১৩৭৩ হিজরী।

৩. ভাইস চ্যান্সেলর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১ হিজরী হইতে ১৩৯০ হিজরী, ৯ বৎসর।

৪. চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, ১৩৯০ হিজরী হইতে ১৩৯৫ হিজরী, ৫ বৎসর।

৫. চেয়ারম্যান, ইসলামী গবেষণা, ইসলামী আইন, দাওয়াত ও ইরশাদ (সরকার কর্তৃক পরিচালিত), ১৩৯৫ হিজরী হইতে ১৪১৪ হিজরী।

৬. সিনিয়র মন্ত্রীর মর্যাদায় গ্র্যান্ড মুফতী, সউদী আরব, ১৪১৪ হিজরী হইতে মৃত্যু পর্যন্ত।

৭. চেয়ারম্যান, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সউদী আরব।

৮. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, রাবিত'া আল-'আলাম আল-ইসলামী, মক্কা।

৯. চেয়ারম্যান, সর্বোচ্চ পরিষদ, আন্তর্জাতিক মসজিদ কমিটি, সউদী আরব।

১০. চেয়ারম্যান, ইসলামী ফিক্'হ একাডেমী, মক্কা, রাবিত'া আল-'আলাম আল-ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত।

১১. সদস্য সিন্ডিকেট, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।

১২. সদস্য, সর্বোচ্চ পরিষদ, ইসলামী দাওয়াহ্ সংস্থা (রাষ্ট্র পরিচালিত)।

শায়খ বিভিন্ন দীনী গ্রন্থ রচনা করেন যাহা ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ব্যতিক্রমধর্মী গুরুত্বের দাবি রাখে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের শিরোনাম বর্ণনা করা গেল ঃ

১. মাজমূ'আ ফাতাওয়া (বিভিন্ন প্রবন্ধ ও ফাতওয়া সংকলন, ছয় খণ্ড), ২. আল-ফাওয়াইদুল-জালিয়্যা, ৩. তাওদ'ীহু'ল-মাসালিক (হজ্জ 'উমরা ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা বিষয়ক পুস্তক), ৪. "আত-তাহবীরু মিনাল বিদআহ্' (শবে বরাত, পনের শা'বান, মীলাদুন্নবী এবং খাদিমে হুজরায়ে নাবাবি'য়্যা শায়খ আহমাদের নামে প্রচারিত কাল্পনিক স্বপ্নের অপনোদন বিষয়ক ৪টি প্রবন্ধ), ৫. রিসালাতানি মু'জিযাতানি ফিয-যাকাত ওয়াস-সাওম', ৬. 'আল-'আকীদাতুস-স'াহ'ীহ'া, ৭. সিহাহ সিত্তার গ্রন্থের ভাষ্য,৮. 'ইক'মাতুল বারাহীন 'আলা হু'কমিন মিন ইসতিগাছি বিগায়রিল্লাহ্'।

অন্তিম যাত্রা ঃ বিন বায পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ৯০ বৎসর এক গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকার রাখিয়া বিগত ১৩.০৫.৯৯ খৃ. ২৭. ০১.১৪২০ হি. সকাল বেলা তাইফে ইন্তিকাল করেন। শায়খ গ্রীষ্মকালে নিয়মানুযায়ী তাইফে অবস্থান করিতেন। বার্ধক্য জনিত কারণে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটিলে তাঁহাকে তায়েফের আল-হুদা হাসপাতালে স্থানান্তরের পথে ২৭ মুহ'াররাম, ১৪২০/১৩ মে, ১৯৯৯ তারিখে এ্যাম্বুলেন্সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি ইনতিকাল করেন।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

'আবদুল-'আযীয ইব্ন ইয়ূসুফ (عبد العزيز بن يوسف) ঃ (আবুল-ক'াসিম আল-হাক্কার?) বুওয়ায়হী আমীর 'আদুদ্দ্-দাওলা (দ্র.)-এর শাসনামলের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত সচিব

ও বিশ্বাসভাজন উপদেষ্টা ছিলেন। পরবর্তী কালে পর্যায়ক্রমে তিনি তিনবার উযীর ছিলেন এবং আমীরের পুত্রদ্বয় স'মস'ামুদ-দাওলা ও বাহাউদ-দাওলার (দ্র. নিম্নে) কারণে তিনবার নিগৃহীত হন। পিটারম্যান (Petermann) ৪০৬ (Ahlwardt, ৮৬২৫) পাণ্ডুলিপিতে ব্যাপকভাবে সংরক্ষিত সরকারী চিঠিপত্রাদির (ইন্শা') তিনি রচয়িতা ছিলেন। অবশ্য এই অংশ 'আদু'দুদ-দাওলার শাসনামল পর্যন্ত সীমিত ছিল (ইহাতে যে অংশগুলির অভাব আছে তাহা আছ-ছা'আলিবীর ইয়াতীমাত (২খ., ৮৯-৯০)-এ উল্লিখিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহা তাঁহাকে তাঁহার দুইজন সমসাময়িক ব্যক্তি আবূ ইসহা'ক' আস্-সাবি ও ইব্ন আব্বাদের সমমর্যাদা দান না করিলেও আমীরের রাজত্বকালের বর্ণনার জন্য এই রচনা সংগ্রহ ঐতিহাসিকদের আলোচ্য ব্যক্তি হওয়ার যোগ্য মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ শুজা' আর্-রুযরাওয়ারী, মিস্কাওয়ায়হ-এর তাজারিবুল-উমাম-এর ধারাবাহিক গ্রন্থ, সম্পা. ও অনু. Amedroz and Margoliouth, The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ৩খ. ও ৪খ., (নির্ঘণ্ট, দ্র. ৭খ., ২)-এর; (২) ছা'আলিবী, ইয়াতীমা, পূ. স্থা.; (৩) Cl. Cahen, Une correspondance buyide inedite, in Studi orientalistici, Levi della Vida, ১খ, ৮৫-৯৬; (৪) J. Chr. Burgel, Die Hofkoir-respordenz Adud al-Daulas, Wiesbaden ১৯৬৫; (৫) H. Busse, Chalif und Grosskonig, die Buyiden im Iraq (৯৪৫-১০৫৫), বৈরূত ১৯৬৯, esp. 240 ff.

Cl. Cahen. (E.I.[2] Suppl.)/মুহাঃ আবূ তাহের

'আবদুল-'আযীয ইব্নুল-ওয়ালীদ (عبد العزيز بن الوليد)ঃ'উমায়্যা খলীফা ১ম আল্-ওয়ালীদের পুত্র। ৯১/৭০৯-১০ সালে তিনি তাঁহার চাচা মাসলামা ইব্ন 'আবদুল-মালিক-এর নির্দেশক্রমে বায়যান্টীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং ইহার পরবর্তী বৎসরগুলিতেও তিনি একই শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আরো কয়েকটি যুদ্ধে যোগদান করেন। ৯৬/৭১৪-৫ সালে আল-ওয়ালীদ পূর্বের স্থিরীকৃত উত্তরাধিকারী সুলায়মান ইব্ন আবদুল-মালিককে বঞ্চিত করিয়া নিজ পুত্র 'আবদুল 'আযীযকে উত্তরাধিকারের মনোনয়ন প্রদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দাবিক-এ সুলায়মানের মৃত্যুর (৯৯/৭১৭) পরে আবদুল-আযীয সিংহাসন দাবি করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু ইতোমধ্যে 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীযকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করা হইলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন। 'আবদুল-'আযীয ১১০/৭২৮-৯ সালে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ১২১৭ প.; (২) ইব্নু'ল-আছীর, ৪খ., ৪৩৯ প.; (৩) ইয়া'কূ'বী, ২০ খ., ৪৩৫ প.; (৪) G. Weil, Gesch. d. Chalifen, i, 511 প.; (৫) A. Muller, Der Islam im Morgen und Abendland, i, 436; (৬) Caetani-Gabrieli, "Onomasticon, ii, 986.

K. V. Zettersteen (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

'আব্দুল-'আযীয ইব্নুল হাজ্জ ইব্রাহীম (عبد العزيز بن الحاج ابراهيم) ঃ আছ-ছামীনী আল-ইস্জানী, বিখ্যাত ইবাদী আলিম, জন্ম আনুমানিক ১১৩০/১৭১৭-৮ সালে, সম্ভবত ওয়ার্জলান (Ouargal)-এ এবং মৃত্যু রাজাব ১২২৩/আগস্ট ১৮০৮ সালে বানূ ইস্জান (Beni Isguen)-এর মজাবে, যেখানে তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে জারবা-র শায়খ আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্'য়া ইব্ন স'ালিহ্'-এর অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেন। বর্তমান ইবাদীদের মতে 'আবদুল-'আযীয মযাববাসী বিখ্যাত আলিমদের অন্যতম। সেইখানে তিনি তাঁহার ঐকান্তিক ধর্মপরায়ণতা ও অনন্যসাধারণ বোধশক্তি, গভীর প্রশান্তি, পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিস্ময়কর সাধনার সুখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

'আবদুল-'আযীয ধর্মতত্ত্ব ও আইন বিজ্ঞান (ফিক্'হ) সম্পর্কে ডজনখানিক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিতাবুন-নীল ওয়া শিফাউল-'আলী তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট রচনা (১৩০৫/১৮৮৭-৮ সনে কায়রোতে স্বাক্ষরকৃত—autographed)। গ্রন্থটি খালীল-এর মুখতাস'ার-এর নমুনায় পরিকল্পিত কিন্তু দীর্ঘতর শৈলীতে রচিত ইবাদী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা; উমান, জাবাল নাফূসা, জার্বা ও মযাবের ইবাদী 'আলিমদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত (সমস্তই সহজে শনাক্ত করা যায়)। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য E. Zeys এই গ্রন্থ হইতেই তথ্য সংগ্রহ করেন। 'আব্দুল-'আযীযের অন্যান্য গ্রন্থ 'তাক্মিলাতুন-নীল' প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে তিউনিসিয়ায় প্রকাশিত, আল্-ওয়ারদুল-বাস্সাম ফী রিয়াদিল-আহ'কাম, ফিক্'হের সারসংক্ষেপ, যাহাতে প্রধানত কিয়াস ও রায় সম্পর্কীয় সমস্যার আলোচনা রহিয়াছে। 'মা'আলিমুদ-দীন" ইবাদী মতবাদের এক যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিরোধী সম্প্রদায়ের যুক্তির খণ্ডন (অপ্রকাশিত); মুখ্তাস'ারুল-মিস্'বাহ মিন কিতাবি আবী মাস্আলা ওয়াল-আল্ওয়াহ্ উত্তরাধিকার প্রশ্ন সম্বন্ধীয়; ইক্দুল-জাওয়াহির পুস্তকটি আল-জায়তালী প্রণীত ক'নাতি'রুল-খায়রাত গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ইবাদাত ও ধর্মবিষয়ক সাধারণ বিবরণ (অপ্রকাশিত); মুখ্তাস'ারু হু'কূ'কিল-আয্ওয়াজ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে (অপ্রকাশিত); "তাজুল-মান্জূ'ম মিন্ দুরারিল-মিন্হাজিল-মা'লূম" উমানী ফিক্'হ-এর বিরাট গ্রন্থের সংক্ষেপ (অপ্রকাশিত); তাআজুমুল-মাওজায়ন (অথবা যুন্-নূরায়ন) আলা মারজিল বাহ্'রায়ন (অপ্রকাশিত); আল্-আস্রারুন-নূরানিয়্যা প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে (১৩০৬/১৮৮৮-৯ সালে মিসরে স্বহস্তে লিখিত); "আন্-নূর" ধর্মের প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য সম্পর্কে (১৩৯৬/১৮৮৮-৯ সালে মিসরে স্বহস্তে লিখিত); মুখতাস'ারু হ'াওয়াশিত্-তার্তীব হাদীছ সম্বন্ধে বিভিন্ন ইবাদী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Zeys, Legislation mozabite, son origine, ses sources, son present, son avcnir, প্যারিস ১৮৮৬ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Lemariage et sa dissolution dans la legislation mozabite, in Rcv. alg de leg. ct de jurisp., আল্জিয়ার্স ১৮৮৭-৮; (৩) M. Morand, Introduction a l'etude du droit musulman algerien, আলজিয়ার্স ১৯২১ খৃ.; (৪) আতফিয়্যাশ,

রিসালা ফী বা'দ তাওয়ারীখ আহ্‌ল ওয়াদী মযাব, ১৩২৬/১৯০৮, ৪৭-৪৮; (৫) S. Smogorzcwski, Abdal-Aziz, ses ecrits et ses sources (অপ্রকাশিত)।

A. De Motylinski-T. Lewicki (E.I.2)/শিরিন আখতার

'আবদুল-'আযীয ইব্‌নুল হ'াজ্জাজ (عبد العزيز بن الحجاج) ঃ ইব্‌ন আবদিল-মালিক, উমায়্যা সেনাপতি। তিনি চাচাত ভাই ৩য় ইয়াযীদের বিশ্বস্ত সুহৃচর এবং তাঁহার অতি গুরুত্বপূর্ণ সহকারিগণের অন্যতম ছিলেন। পূর্ব হইতেই খলীফা আল-ওয়ালীদের শাসনামলে ইয়াযীদ যখন খলীফা বিরোধী অসন্তোষ সৃষ্টির নেতৃত্ব দান এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন তিনি ইয়াযীদকে সাহায্য করেন। তাহারা দামিশ্‌ক-এ একটি সেনাদল গঠন করিতে সক্ষম হন এবং 'আবদুল-'আযীয প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়া আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইয়াযীদের ভাই আব্বাস খলীফার সহায়তার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তখন 'আবদুল-'আযীয তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। স্বল্পকাল পরে 'আবদুল-'আযীয বাখরা-র প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া সেখানে অবস্থানরত খালীফা আল্-ওয়ালীদকে হত্যা করেন। ইহা ১২৬/৭৪৪ সালের ঘটনা। অতঃপর ইয়াযীদকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু হিম্‌স (Emesa)-এর অধিবাসিগণ হত্যাকারী খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাহারা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া দামিশ্‌ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। ইয়াযীদ তাহাদের বিরুদ্ধে দুইটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বিদ্রোহিগণ যখন একটি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিল সেই সময় 'আবদুল-'আযীয অপর বাহিনী লইয়া আক্রমণ করত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এইভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

সেই একই বৎসর ইয়াযীদ তাঁহার ভাই ইব্‌রাহীমকে এবং তৎপর 'আবদুল-'আযীযকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া ইন্তিকাল করেন। হিম্‌স-এর অধিবাসিগণ পুনরায় এই নূতন শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে অস্বীকৃতি জানায়—খলীফাও রাজধানীর বাহিরে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইব্‌রাহীমের আদেশে 'আবদুল-'আযীয হিম্‌স অবরোধ করেন, কিন্তু আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান প্রদেশের শাসনকর্তা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া পশ্চাদপসরণ করেন। হিম্‌সবাসিগণ মারওয়ানের বাহিনীর নিকট নগরতোরণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পরলোকগত খলীফার অনুসারীরা স'াফার ১২৭/নভেম্বর ৭৪৪ সালে 'আয়নুল-জারর-এ পরাজিত হইলে মারওয়ান দামিশ্‌ক-এ নিজেকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'আবদুল-'আযীয ইব্‌নুল-হ'াজ্জাজ ২য় আল-ওয়ালীদের অনুসারীদের হাতে নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ১৭৯৪ প.; (২) ইব্‌নুল আছীর ৫খ., ২১৫ প; (৩) G. Weil, Gesch. d. Chalifen, i, 669 প.; ইহা ছাড়া আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ প্রবন্ধ দ্র.।

K. V. Zetterstccn (E.I.2)/হুমায়ুন খান

'আবদুল আযীয ইব্‌নুল হ'াসান (عبد العزيز بن الحسن) ঃ মরক্কোর সুলতান (১৮৯৪-১৯০৮)। Wcisgcrber-এর মতে তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮ এবং Doutte ও Saint-Rene Taillndier-এর মতে ১৮ রাবী'উল-আওওয়াল, ১২৯৮/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সুলতান মাওলায় আল-হ'াসান, মাতা সির্কাশীয় (Circasian) বংশোদ্ভূতা লাল্লা রুকায়্যা। তাঁহার পিতা ৯ জুন, ১৮৯৪-এ এক যুদ্ধে নিহত হইলে 'আবদুল-'আযীযের শিক্ষক, হ'াজিব (Chamberlain) আহ্'মাদ ইব্‌ন মূসার (যিনি বা আহ্‌মাদ নামে পরিচিত ছিলেন) সাহায্যে তিনি রাবাতে সুলতানরূপে ঘোষিত হন। পুরস্কারস্বরূপ তিনি আহ্'মাদকে রাজ্যের প্রধান উযীর নিযুক্ত করেন। 'আবদুল-'আযীয উযীর আহ্'মাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৩ মে, ১৯০০) রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে মরক্কো মোটামুটি ঐতিহ্যবাহী ধারায় শাসিত হয়।

এই অভিভাবকের মৃত্যুর পরে 'আবদুল-'আযীয কিছু সংখ্যক ইউরোপীয়দের প্রভাবে পড়েন, তাহাদের অন্যতম ছিলেন শারীফী পদাতিক বাহিনীর প্রশিক্ষক স্যার হ্যারি ম্যাক্‌লীন (Harry Mc Lean)। তিনি সুলতানের আধুনিকতার প্রবণতাকে উৎসাহ যোগান, যাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই শারীফী রাজপ্রাসাদগুলিতে ফটো-ক্যামেরা, বিলিয়ার্ড টেবিল ইত্যাদির প্রবেশ ঘটে। ফলে মরক্কোর গোড়াপন্থীদের মনে আঘাত লাগে এবং অর্থ ব্যয়ও প্রচুর হয়। তদুপরি ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'আবদুল-'আযীয প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা ও কর মওকুফ প্রথা বাতিল করিয়া ন্যায়ভিত্তিক রাজস্ব পদ্ধতি (তারতীব) প্রচলন করিবার পরিকল্পনা করেন। ফলে জিলানী ইব্‌ন ইদরীস আয্-যারহূনী আল-ইয়ুসুফী, (ডাকনাম বূহামারা বা আবূ হামারা) নামক জনৈক আন্দোলনকারী (রূগী) তাযা (Taza) নামক জেলায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে সুলতানের ভ্রাতা বলিয়া প্রচার করেন এবং ফেয্-এর পূর্বদিকের অঞ্চলের উপর আধিপত্য অর্জন করেন (১৯০২); পরের বৎসর (১৯০৩) রাজধানীরই পতন ঘটার আশংকা দেখা দেয়।

অপরদিকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ মরক্কোতে বসবাসরত ইউরোপীয় অধিবাসিগণের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের (region of Figuig) ঘটনাবলী দমনের জন্য এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় গোষ্ঠী কর্তৃক সুলতানকে প্রদত্ত মোটা অংকের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার জন্য শারীফী সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। সেই চাপের প্রভাব বিভিন্ন ঘটনাতে প্রকাশ পায়। যথা ৩১ মার্চ, ১৯০৫ তারিখে জার্মান সম্রাট ২য় উইলিয়াম-এর তাঞ্জিয়ার সফর, যাহার ফলে শেষ পর্যন্ত Algeciras Conference আহ্বান করা হয়। Act of Algeciras (সম্পাদন ৭ এপ্রিল, ১৯০৬)-কে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের দাবির নিকট 'আবদুল-'আযীযের নতি স্বীকাররূপে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে মরক্কোতে জনগণের নিকট তিনি অধিকতর অপ্রিয় হইয়া পড়েন। অতঃপর আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সুলতানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাসাব্লাঙ্কাতে (Casablanca) ফরাসী বাহিনী অবতরণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার এক ভ্রাতা মাওলায় 'আবদুল-হ'াফীজ'কে মার্‌রাকুশ-এ সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হয় (১৬ আগস্ট, ১৯০৭)।

ইহার প্রতিরোধকল্পে 'আবদুল-'আযীয ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে মার্‌রাকুশে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু ১৯ আগস্ট তারিখে ওয়াদী তাস্‌সাউত (Tassa'ut)-এ সংঘটিত বূ-আজীবার যুদ্ধে তাঁহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাঁহার ভ্রাতার বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। 'আবদুল-'আযীয কাসাব্লাঙ্কাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে ১৯০৮ সালের ২১ আগস্ট তারিখে সিংহাসন ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ইহার পরে স্বল্পকাল তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করেন এবং পরে রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঞ্জিয়ারে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি সেখানেই পরলোকগমন করেন (১০ জুন, ১৯৪৩)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন যায়দান ('আবদুর-রাহ্'মান), আদ্-দুরারুল ফাখিরা, রাবাত ১৯৩৭, পৃ. ১১১-১১৭; (২) E. Aubin, Le Maroc d' aujourd'hui, Paris 1904; (৩) G. Veyre, Au Maroc, dans l'intimite du sultan, Paris 1905; (৪) Cte. Conrad de Buisseret, A la cour de Fez, Bruxelles 1907; (৫) W. B. Harris, Morcco that was, Edinburgh 1921; (৬) G. Saint-Rene Taillandier, Les origines du Maroc francais recit d'une mission (1901-1906), Paris 1930; (৭) A. G. P. Martin, Le maroc et l'Europe, Paris 1928; (৮) F. Weisgerber, Casablanca et les Chaouia en 1900, Casablanca 1935; (৯) ঐ লেখক, Au seul du Maroc moderne, Rabat 1947; (১০) H. Terrasse, Histoire du Maroc, ii, Casablcnca1950.

R. Le. Tourneau (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

'আবদু'ল-'আযীয, শাহ (شاه عبد العزيز) ঃ মুহাদ্দিছ দিহ্‌লাবী শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহ্‌লাবীর পুত্র, ২৫ রামাদা'ান, ১১৫৭/১১ অক্টোবর, ১৭৪৬। তাঁহার জন্মতারিখ নির্দেশক নাম 'গু'লাম হ'ালীম' (আব্‌জাদ্-এর হিসাবে এই শব্দ দুইটি হইতে জন্মতারিখ নির্ণয় করা যায়) [হ'ায়াত-ই ওয়ালী, পৃ. ৩২০] তুহ্'ফাতু ইছনা 'আশারিয়্যা (পৃ. ২) গ্রন্থে এই নামটিই উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্যকালেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফ্‌জ করেন, তাজ্‌বীদ ও কি'রাআত শিক্ষা করেন। এগার বৎসর বয়সে তাঁহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। তাঁহার পিতা স্বীয় খলীফাদের মধ্যে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। মাত্র দুই বৎসরেই তিনি আরবী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময়কর দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যম ও মেধার নজীর বিরল (হ'ায়াত-ই ওয়ালী, পৃ. ৩২১)।

অতঃপর পিতার অধ্যাপনাচক্রে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই চক্রে শুধু আলিম সমাজে খ্যাত অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধাসম্পন্ন ছাত্রই অংশগ্রহণ করিতেন (হ'ায়াত-ই ওয়ালী, পৃ. ৩২২)। ষোল বৎসর বয়সে তিনি তাফ্‌সীর, হাদীছ, ফিক'হ, উসূ'ল, 'আক'াইদ, মানতিক, কালাম, জ্যামিতি, গণিত জ্যোর্তিবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুরআন মাজীদের প্রতি। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা তাঁহার উস্‌তাদকে তাঁহাকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দানের জন্য বিশেষ তাগিদ দিতেন।

প্রথম হইতেই তাঁহার আলোচনার রীতি ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন এবং প্রাঞ্জল। কোন কঠিন বিষয়কে তিনি এমন সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করিতেন যে, পণ্ডিত ব্যক্তিরাও আশ্চর্য হইয়া যাইতেন (হ'ায়াত-ই ওয়ালী, পৃ. ৩২২)। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ষোল বৎসর বয়সে অধ্যাপনার পৈতৃক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন হইতে মৃত্যু অবধি তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, রচনা ও সংকলন, তাব্‌লীগ, মুরীদগণের তা'লীম ও শিষ্যদের সাধনা পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকেন (ইত্‌হ'াফুন-নুবালা, পৃ. ২৯৬)। জনৈক আলিম তাঁহাকে সিরাজুল-হিন্দ উপাধি প্রদান করেন, যেমন চেরাগ দেহ্‌লী উপাধি দেওয়া হইয়াছিল শায়খ নাস'ীরুদ্দীন চিশ্‌তীকে (আল-য়ানিউল-জানী)।

তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অতুলনীয়। অনেক অখ্যাত পুস্তকাদির সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি তিনি মুখস্থই লিখাইতে পারিতেন। তিনি বাতিনী ও রূহানী জগৎ বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করিলে মনে হইত যেন সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়াছে। কথা বলিলে উপস্থিত শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নূরে উদ্ভাসিত হইয়া যাইত (হ'ায়াত-ই ওয়ালী, পৃ. ৩২৬)। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এতই বাস্তবধর্মী যে, তিনি সৎ নিয়াতে ইংরেজী শিক্ষা করার ফাতওয়া প্রদান করেন (ফাতাওয়া-ই 'আযীযিয়্যা, ১খ., ১৮৬)। তাঁহার মৃত্যুর ৫০/৬০ বৎসর পরও অধিকাংশ আলিম এইরূপ স্থির মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন।

প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবার শিক্ষা নিকেতনে (درسگاه) ওয়াজ করিতেন। ইহাতে অসংখ্য আগ্রহী শ্রোতা যোগদান করিত। তাঁহার বাচনভঙ্গি এতই চিত্তাকর্ষক ছিল যে, বিভিন্ন মায্‌হাব ও জাতির লোকেরা তাঁহার আলোচনায় তৃপ্ত হইত। তাঁহার কোন কথা কাহারও মনে কষ্টের কারণ হইত না (হ'ায়াত-ই ওয়ালী, পৃ. ৩২৭)।

সমসাময়িক কালে তিনি ছিলেন আলিম ও শায়খদের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁহার শিষ্যত্ব বড় বড় আলিমেরও গর্বের বিষয় ছিল। তাঁহার রচনাবলী পণ্ডিতদের কাছে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয় (ইত্‌হ'াফুন-নুবালা, পৃ. ২৯৬-২৯৭)।

রামাদান ১২৩৯/এপ্রিল ১৮২৪-এর শেষদিকে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। পীড়া বাড়িয়া গেলে নগদ ও সমস্ত সম্পত্তি তিনি শারী'আত মুতাবিক ভ্রাতুষ্পুত্র ও যু'ল-আর্‌হ'ামদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তাঁহার পরিহিত বস্ত্র দ্বারাই তাঁহার কাফন দানের ওসি'য়াত করেন। ৭ শাওওয়াল, ১২৩৯/ ৫ জান, ১৮২৪ সালের রবিবার সকালে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসরের কিছু বেশী। পরপর পঞ্চান্নবার তাঁহার জানাযা-র নামায আদায় করা হয় (আর-রাওদু'ল-মাস্‌তূর, পৃ. ২০০-২০১)। দিল্লীর তুর্কী দরজার বাহিরে পারিবারিক গোরস্থানে পিতার কবর বরাবর তাঁহাকে দাফন করা হয় (দ্র. William Bell মিফতাহু'ত-তাওয়ারীখ, পৃ. ৩৮১প.)।

সন্তান-সন্ততির মধ্যে তাঁহার মাত্র তিন কন্যা ছিল। একজনের বিবাহ হয় ভ্রাতুষ্পত্র ঈসা, দ্বিতীয় জনের মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি এবং তৃতীয়

জনের স্ববংশীয় শাহ্ মুহ'াম্মাদ আফ্দা'ল-এর সঙ্গে। তৃতীয় কন্যার পুত্র শাহ্ মুহ'াম্মাদ ইস্‌হ'াক' ও শাহ্ মুহ'াম্মাদ ইয়া'কূ'ব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু ১২৫৬ হি. তাঁহারা ভারত হইতে মক্কায় হিজরত করেন (তাঁহার ছাত্রদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-য়ানিউল্-জানী, পৃ. ৭৫ প.)। তাঁহার রচনাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) তাফসীর ফাত্‌হি'ল-'আযীয, সাধারণত তাফসীর আযীযীরূপে পরিচিত। প্রথম খণ্ড শুরু হইতে ২য় পারার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত। ২য় ও ৩য় খণ্ড শেষ দুই পারার তাফসীর (১ম প্রকাশ, কলিকাতা ১২৪৮ হি.)। ইহার উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে (মুক'াদ্দিমা তাফসীর ফাত্‌হি'ল 'আযীয-এর লিখিত পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. ফিহরিস্ত কুতুব আরাবী, রামপুর, ১খ., ৪৩)।

(২) তুহ'ফা ইছ'না 'আশারিয়্যা (১২০৪ হি.) [মাল্‌ফূজাত, পৃ. ২৩] মাত্‌বা' ছ'ামার হিন্দ, লক্ষ্ণৌ ১৮৭৯ ও ১৯০৫ (দ্র. Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ., ৮৫২)। আরকট-এর নওয়াব ইহা আরবীতে অনুবাদ করাইয়া আরবদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন (মালফূজাত, প্রাগুক্ত)।

(৩) বুস্‌তানুল-মুহ'াদ্দিছ'ীন, দিল্লী ১৮৭৬, ১৮৯৮ খৃ., লাহোর ১৮৮৪ ও ১৮৯৩ খৃ.। ইহার উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) 'আজালা-ই নাফি'আ (উস্‌ূলে-ই হাদীছ সম্পর্কে), মাতবা' মুজ্‌তাবাঈ, দিল্লী ১২১২ হি.।

(৫) সির্‌রুশ্-শাহাদাতায়ন (কারবালার ঘটনা), দিল্লী ১২৬১ হি.। সায়্যিদ আলী আকবার ইজ্'হারুস-সা'আদা নামে ইহার একটি ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (Storey, পৃ. ২২৩ ও ৯০৩)। তাঁহার একজন শিষ্য মাওলাবী সালামাতুল্লাহ দামিশ্‌কী তাহ'রীরুশ-শাহাদাতায়ন নামে ইহার একটি ফারসী ভাষ্য ১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার হস্তলিখিত কপি আলীগড় ও বাঁকীপুরে সংরক্ষিত আছে।

(৬) 'আযীযুল ইক্'তিবাস ফী ফাদ'াইলি আখয়ারিন-নাস (খুলাফা-ই রাশিদীন-এর মর্যাদা সম্বলিত হাদীছ ও ঐতিহাসিক বিবরণের সংকলন, দিল্লী ১৩২২ হি.)। হস্তলিখিত কপি রামপুর ও আসাফিয়ায় সংরক্ষিত। ইহার ফারসী ও উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭) মীযানুল 'আকাইদ, দিল্লী ১২৩১/১৯০৩।

(৮) ফাতাওয়া আযীযী (ফারসী), দুই খণ্ড (দিল্লী ১৩৪১ হি.)। ইহাতে সাওয়ালাত 'আশারা ও কতিপয় পুস্তিকাও সংযোজিত হইয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ডের উর্দূ অনুবাদ মাওলাবী নওয়াব আলী ও মাওলাবী আবদুল-জালীল (১৩১৩ হি.) হায়দরাবাদ, দক্ষিণাত্য হইতে প্রকাশ করেন।

(৯) রাসাইল খাম্‌সা (ফারসী), ইহার কোন কোন পুস্তিকা ফাতাওয়া-এর অন্তর্ভুক্ত।

(১০) তাহ্'কীকু'র-রু'য়া (ফারসী)।

(১১) মাল্‌ফূজাত শাহ আবদুল আযীয (ফারসী), মাতবা মুজ্‌তাবাঈ মীরাট (১৩১৪/১৮৯৭)। ইহার উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদক মুহ'াম্মাদ 'আলী লুত্'ফী ও মুফ্‌তী ইনতিজামুল্লাহ শিহাবী (সং. Pakistan Educational Publishers, করাচী ১৯৬০)।

হায়াত-ই ওয়ালী গ্রন্থে শার্‌হ মীযানিল-মান্‌তিক ও হাওয়াশি-ই বাদীউল-মীযান-এর নামের উল্লেখ রহিয়াছে। তদুপরি তাযকিরা-ই 'আযীযিয়্যা গ্রন্থে মীযানুল-বালাগাত (রামপুর সংকলন, ফিহরিস্ত, ১খ., ৫৫৯-এ ইজাযুল-বালাগা)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকাশ সম্পর্কে জানা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত রিসালা-ই 'আক'াইদ (আরবী) ও উহার হ'াশিয়াতে চিঠিপত্র ও তাঁহার রচিত ফারসী কবিতাও রহিয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. তারাজিমুল-ফুদ'ালা, পৃ. ৪৬ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফাদ'ল ইমাম খায়রাবাদী (মৃ. ১২৪৪ হি.), তারাজিমুল-ফুদালা, ed. Pakistan Historical Society, Karachi, পৃ. ১৫, ৩০; (২) সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান, আছারুস-সানাদীদ, ৪খ., ৬৯; (৩) রাহীম বাখশ হায়াত ওয়ালী (উর্দূ), আফদালুল-মাতাবি', দিল্লী ১৩১৯ হি., পৃ. ৩৩৮-৩৪২; (৪) ঐ লেখক, হায়াত আযীযী; (৫) কাদী মুহাম্মাদ বাশীরুদ্দীন, তায্‌কিরা-ই আযীযিয়্যা, কামালাত আযীযীসহ, মুবারাক আলী খান রচিত, মাত্‌বা মুজ্‌তাবাঈ, মীরাট ১৮২৬ খৃ.; (৬) সিদ্দীক হাসান খান, আব্‌জাদুল-উলূম (আরবী), ১২৯৬ হি., পৃ. ৯১৪; (৭) ঐ লেখক, তিক্‌সারু জুনূদিল-আহ্‌রার, মাত্‌বা শাহজাহানী, ভূপাল ১২৯৬ হি.; (৮) ঐ লেখক, ইত্‌হাফুন-নুবালা, মাত্‌বা কানপুর, ১২৮৮ হি., পৃ. ২৯৬; (৯) মুহাম্মাদ ইসরাঈল গৃধ্‌রাবী, ওয়ালিয়্যুল্লাহ; (১০) রহমান আলী, তাযকিরা উলামা হিন্দ, লক্ষ্ণৌ ১৩৩২/১৯১৪; (১১) ফকীর মুহাম্মাদ জাহ্‌লামী, হাদাইকুল হানাফিয়্যা, পৃ. ৪৭০; (১২) আর-রাওদুল মাম্‌তূর ফী তারাজিমি উলামা-ই শারহিস-সুদূর, মুফীদ আম, আগ্রা ১৩০৭ হি.; (১৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আত্-তিরহুতী, আল-ইয়ানিউল-জানি (কাশফুল আস্‌তার কিতাবের হাশিয়াতে, দিল্লী ১৩৪৯ হি., পৃ. ৭৩-৭৯); (১৪) বাশীর আহমাদ দিহ্‌লাবী, ওয়াকিআতু দারিল হুকূমাত দিহ্‌লী; এতদ্ব্যতীত মালফূজাত ও অন্যান্য গ্রন্থের ভূমিকায়ও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়; (১৫) আবদুল হায়্যি, নুয্‌হাতুল-খাওয়াতির, ১খ., ২৪।

গুলাম রাসূল মিহর (দা.মা.ই.)/ মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল আলী (عبد العلی) ঃ নওয়াবযাদা, এ.এফ.এম., বাংলার বিশিষ্ট মনীষী; নওয়াব আবদুল লতীফের কনিষ্ঠ পুত্র। জ. কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন (১৯০৬); কিন্তু ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক রচনার জন্য তিনি সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি 'Bengal Past and Present' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে ভারত সরকারের রেকর্ডকীপার নিযুক্ত হন (১৯২১)। ১৯৩৮ সনে সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন সময় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ইন্ডিয়ান মিউযিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ড ও ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রেকর্ডস কমিশনের সেক্রেটারী এবং রোটারী ক্লাবের প্রথম ভারতীয় সভাপতি ছিলেন। বিশ শতকের ২য় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও উহার এখতিয়ার সম্পর্কিত বাদানুবাদে তাঁহার মন্তব্য ছিল দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ বিনীতভাবে বঙ্গভঙ্গ রহিত আইন মানিয়া লইয়াছে। ইহার পুরস্কারস্বরূপ ঢাকায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পকেট সংস্করণ স্থাপন করা হইতে জনগণের এই সাধারণ বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক্ষেত্র যথাসম্ভব বর্ধিত করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ই যথোপযুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু তদ্দারা পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের আদৌ কোন উপকার হইবে না। দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নাগালের বাহিরে এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিলাসমাত্র। আমার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুগপৎভাবে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হইবে এবং পূর্ব বাংলা তথা আসামের সমস্ত কলেজগুলিকে উহার সভ্য বা সহযোগী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে"। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁহার এই পরিকল্পনা আংশিক বাস্তবায়িত হয়। মৃত্যু ১৯৪৭ খৃ.। কলিকাতা গোবরা গোরস্তানে তাঁহার কবর বর্তমান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা-১ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ', প্রথম খণ্ড, প্রথম সং. ১৯৭২, পৃ. ১৫৫; (২) ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬, পৃ. ৩৮; (৩) বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৫, পৃ. ১৯।

আবদুল ওদুদ, কাজী (عبد الودود قاضى) : ডাকমান ফতু মিঞা, ১৮৯৪—১৯৭০, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, সাহিত্যিক, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। জ. কুষ্টিয়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে, পিতা কাজী সৈয়দ হোসেন ওরফে ছগীর কাজী।

তাঁহার পিতা কলিকাতায় রেলওয়ের কর্মচারী ছিলেন; আনু. ১৯২১ খৃ. মৃত্যুকালে হাওড়ার স্টেশন মাস্টার ছিলেন। তিনি ১৯১৩ খৃ. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৭ খৃ. তথা হইতে বি. এ. পাশ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্যসেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯১৮ খৃ. তাঁহার গল্প সংকলন মীর পরিবার ও ১৯১৯ সনে তাঁহার উপন্যাস নদীবক্ষে এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিরাজ বৌ-এর সমালোচনা প্রকাশিত হইলে তাহা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ দেশবরেণ্য সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

১৯১৯ খৃ. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন। এই সময়ে ঢাকা কলেজে (তৎকালীন সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) বাংলা ভাষা অধ্যাপনার জন্য একজন মুসলিম প্রভাষক নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা সাহিত্য সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ কাজী আবদুল ওদুদকে উক্ত পদে ১৯২০ খৃ. নিয়োগ করা হয়। ঢাকা কলেজে চাকুরীকালে তিনি নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত তাঁহার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (জোহরা মঞ্জিল) কবি-সাহিত্যিকদের বৈঠকের অনুষ্ঠান করিতেন। উহাতে স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করা হইত। তাঁহার মত এত দীর্ঘকাল একটানা সাহিত্য-সাধনার নজীর এদেশের মুসলিম সমাজে বিরল। সম্ভবত তিনিই একমাত্র মুসলিম লেখক যিনি সাহিত্য-সাধনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিন্তাবিদ আবদুল ওদুদ যেমন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানসের অধিকারী ছিলেন, তেমনই তাঁহার রচনাশৈলীও একান্তভাবে স্বকীয় ছিল। তবে সর্বোপরি তিনি ছিলেন বুদ্ধিমুক্তির সাধক। পরাধীন ভারতের বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে আন্দোলনটি উপযুক্ত সময়ের অনেক পূর্বে পরিচালিত হয়। তিনি যখন ঢাকা কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক আর আবুল হুসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক, তখন উভয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী তারিখে ঢাকার বৃহত্তম মুসলিম ছাত্রাবাস 'মুসলিম হল'কে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সাহিত্য-সমাজ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। আধুনিক জগতের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ও যুক্তিবাদের আলোকে বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের তৎকালীন সমাজ-চিন্তা, ধর্ম-চিন্তা ও মূল্যবোধের বিচার করাই ছিল সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য। মরহুম কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, কবি আবদুল কাদির প্রমুখ যাঁহাদের অনেকেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়ন করেন নাই, মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রভাবে আজ তাঁহারা বাংলা সাহিত্যগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক মুখপত্রের নাম ছিল শিখা; মাত্র ৫ বৎসর পর শিখার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

যুক্তিবাদ ও আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পর্দাপ্রথা, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ললিতকলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্নে সাহিত্য-সমাজের বৈশিষ্ট্যমূলক নিজস্ব মতামত ছিল। এই সকল বিষয়ে সাহিত্য-সমাজীরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) হইতে শুরু করিয়া জগতের বিভিন্ন মহাপুরুষের নিকট হইতে তাঁহাদের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে প্রেরণা লাভ করেন। যাহা হউক, ১৯০৬ খৃ. মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে কাজী আবদুল ওদুদ প্রতিষ্ঠানটির বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য Parkinsons রোগে ভুগিয়া তিনি ১৯৭০ খৃস্টাব্দে ১৯ মে তারিখে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছে শুনিতে পাইয়া তিনি জনজাগরণের সপক্ষে পরম আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তাঁহার রচনাবলী : (১) মীর পরিবার (গল্প সংকলন), (২) নদীবক্ষে (উপন্যাস), (৩) নবপর্যায় (প্রবন্ধ সংকলন), (৪) রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (কাব্য সমালোচনা), (৫) সমাজ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ সংকলন), (৬) হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (বিশ্ব ভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা), (৭) পথ ও বিপথ (একাংক নাটক), (৮) আজকার কথা (প্রবন্ধ সংকলন), (৯) কবিগুরু গ্যেটে (চরিত কথা ও সাহিত্য পরিচয়), (১০) আজাদ (উপন্যাস), (১১) তরুণ (গল্প ও নাটিকা সংকলন) (১২) নজরুল প্রতিভা (সমালোচনা), (১৩) Creative Bengal, (বিভিন্ন বাংলা প্রবন্ধের অনুবাদ), (১৪) স্বাধীনতা-দিনের উপহার (প্রবন্ধ সংকলন), (১৫) শাশ্বত বঙ্গ (প্রবন্ধ সংকলন), (১৬) বাংলার জাগরণ (বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতা), (১৭) শরৎচন্দ্র ও তারপর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা), (১৮)

Tagore's Role in the Reconstruction of Indian Thought (গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধ), (১৯) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (সাহিত্য সমালোচনা), (২০) হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (জীবন চরিত), (২১) পবিত্র কোরআন (তরজমা), (২২) ব্যবহারিক শব্দকোষ (বাংলা ভাষার অভিধান)। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলীর (১) আত্মকথা (অসমাপ্ত) ও (২) নানা কথা (ডায়রি) প্রভৃতি রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর অবদান, প্রবন্ধ ওদুদ-চর্চা, সাঈদ-উর-রহমান, একাডেমী পাবলিশার্স, ৩ কলেজ স্ট্রীট, মীরপুর ঢাকা-৬, পৃ. ৭০, ৭১; (২) কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, দ্বিতীয় সং ১৯৮৩, পরিশিষ্ট দ্র., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার সহযোগিতায় প্রকাশিত; (৩) কাজী আবদুল ওদুদ, কোরআনের আল্লাহ প্রবন্ধ—শাশ্বত বঙ্গ (গ্রন্থপঞ্জীর ২ নং ক্রমিক দ্র., পৃ. ৩৬-৩৭); (৪) কাজী আবদুল ওদুদ সম্মোহিত মুসলমান, প্রবন্ধ—শাশ্বত বঙ্গ (২ নং ক্রমিক দ্র.), পৃ. ৩৯৫; (৫) কাজী আবদুল ওদুদ, ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি, প্রবন্ধ—শাশ্বত বাণী (২ ক্রমিক দ্র.), পৃ. ৩৩-৩৫; (৬) আজহারুল ইসলাম, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ একটি স্মরণীয় নাম, প্রবন্ধ—শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ. ২৯৯।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

'আবদুল-ওয়াদ (عبد الواد) ঃ (বানূ আবদিল-ওয়াদ অথবা যায়্যানী বনূ যায়্যান), একটি বার্‌বার রাজবংশ, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তিলিমসান (দ্র.)-এ এই বংশের রাজধানী ছিল এবং পুনঃপুনঃ প্রতিরোধের মুখে মধ্যমাগরিব পর্যন্ত (বর্তমান মরক্কোর সীমান্ত হইতে বিজায়া-র মধ্যরেখা পর্যন্ত। তাহাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনা অনুযায়ী বানূ আবদুল-ওয়াদ যানাতা (زناتة) "দ্বিতীয় গোত্রের উপগোত্র" ছিল। বানূ মারীন, বানূ তুজীন, বানূ রাশিদ ও বানূ মাযাবের ন্যায় তাহারা বানূ ওয়াসীনের বৃহৎ শাখা যানাতার পরিবারভুক্ত ছিল। প্রতিবেশী ও আত্মীয় বানূ মারীন ও বানূ তুজীনের মত যাযাবরের জীবন যাপন করিয়া তাহারা একদা আওরাস পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড দখল করিয়াছিল। বানূ হিলালের আক্রমণের (৫ম/১১শ শতাব্দী) ফলে এই যানাতা যাযাবররা পূর্বদিকে বিতাড়িত হইয়াছিল এবং তাহাদের ভূখণ্ড আরব যাযাবরদের কাছে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বর্তমান ওরানু প্রদেশের উঁচু মালভূমিতে বসতি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শুরুতে আল-মুওয়াহ্‌হিদূন (الموحدون) কর্তৃক দেশটি বিজিত হইলে ইহা বানূ আবদুল-ওয়াদের জন্য সৌভাগ্য বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহারা নিজেদেরকে মাররাকুশের খলীফাদের অনুগত ও উপকারী মিত্র হিসাবে প্রমাণিত করিয়াছিল, বিশেষত ঐ সময়ে যখন আল-মুরাবিতী বানূ গানিয়ার লুটতরাজ ইফ্‌রীকিয়্যা ও মধ্যমাগরিবে (৫৮১—৬০০/১১৮৫—১২০৩) ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল। আল-মুওয়াহ্‌হিদূন সেনাদলকে তাহারা যে সাহায্য করিয়াছিল তাহার পুরস্কার পাইয়াছিল। প্রতিবেশী কেন্দ্রসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার এবং সেখানকার অধিবাসীদের দেশান্তরে চলিয়া যাওয়ার কারণে ঐ কেন্দ্রগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহারা সাফল্যজনকভাবে তিলিম্‌সান রক্ষা করায় শহরটির জনসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৬৩৩/১২৩৫ সালে বানূ আবদুল-ওয়াদের নেতা য়াগ্‌মুরাসান (কিংবা অধিক শুদ্ধ— ইয়াগাম্‌রাসান) ইব্‌ন যায়্যান উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার ভাইয়ের নিকট হইতে পরিবারের সকল শাখার উপর আধিপত্য লাভ করেন। এই পদমর্যাদা গোত্রসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত হইলে জারীকৃত একটি শাহী ফরমান দ্বারা ইহা অনুমোদিত হয়।

একটি চিত্তাকর্ষক যাযাবর দলের শায়খ, য়াগ্‌মুরাসান যিনি তাঁহার উপজাতীয় লোকদের ও তাহাদের মেষপালগুলিকে পর্যায়ক্রমে মরুভূমি হইতে ওরান প্রদেশের সমতল ভূমিতে পরিচালনা করিতেন এবং যিনি কেবল যানাতা গোত্রের বার্‌বার উপভাষা বলিতে পারিতেন, এইভাবে তিনি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। অধিকন্তু তাঁহার মধ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার গুণাবলী, কর্মশক্তি, সহযোগীদের একসঙ্গে কাছে রাখিবার মত প্রয়োজনীয় দক্ষতা, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, জাঁকজমকপ্রিয়তা ও উদার ভাবভঙ্গী বিদ্যমান ছিল। অন্যূন ৪৮ বৎসর স্থায়ী (৬৩৩-৮১/ ১২৩৬-৮৩) রাজত্বকালে তিনি এমন অনেক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যাহা সর্বদা তিলিম্‌সান রাজ্যকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই বিপদসমূহ একদিকে উপজাতির পূর্ববর্তী জীবনের উত্তরাধিকার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল যাহা বার্বারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছিল, অপরদিকে উহা নূতন পরিস্থিতির ফল হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার মধ্যে বানূ আবদুল-ওয়াদ নিজেদেরকে জড়িত পাইল। সামন্তরাজ হিসাবে কর্তব্যে থাকিয়া সর্বশেষ আল-মুওয়াহ্‌হিদ খালীফাগণকে মারীনিদের (বানূ মীরন) মুকাবিলায় সমর্থন করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইতিপূর্বে ফেয-এর মনিব বনিয়াছিলেন। ৬৪৬/১২৪৮ সনে আল-মুওয়াহিদদের পতনের দরুন তাঁহাকে মারীনিদের মুখামুখী হইতে হইল। বানূ মারীন ও আবদুল-ওয়াদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। ইহা দুইটি জ্ঞাতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবেশী দুইটি রাষ্ট্রের উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে অসাধারণভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল।

এইগুলি ছিল প্রধান ঘটনা যাহা আবদুল-ওয়াদের বাহ্যিক ইতিহাসের ধারা পরিচালিত করিয়াছিল। য়াগ্‌মুরাসান এই সব ঘটনা সংগঠনের কথা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইতিহাসের সূত্রে যতদূর জানা যায়, মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার পুত্র উছমানকে অন্য শক্তিসমূহের সহিত তাহাকে কি ধরনের আচরণ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার নকশা বাতলাইয়াছিলেনঃ মাগরিবের মারীনিদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক মনোভাব ও সুযোগমত তিউনিসের হাফসী রাজ্যের মুকাবিলায় রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা গ্রহণ— এই রাজনৈতিক ওসিয়াতের সাথে সাথে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ স্বয়ং য়াগ্‌মুরাসানের কর্মকুশলতা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। যথা যানাতা গোত্র ও মধ্যমাগরিব রাজ্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, যথা মাগরাওয়া ও বানূ তুজীন-এর মুকাবিলায় তাঁহার দৃঢ়তা। অনুরূপভাবে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন উপদ্বীপে তাহাদের সাধারণ শত্রু মারীনিদের তৎপরতা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি গ্রানাডার সুলতান ও ক্যাস্টাইলের খৃস্টান রাজার সহিত ত্রিপক্ষীয় মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তিলিমসানের বিরুদ্ধে ফেয-এর সংগ্রাম, উত্তর আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশে পশ্চিমা প্রতিবেশী মারীনীগণ কর্তৃক আব্দুল-ওয়াদ রাজ্য আক্রমণ হইতেছে এই ইতিহাসের মুখ্য প্রসঙ্গ এবং ইহা দ্বারা এই ইতিহাসের স্তরসমূহ চিহ্নিত করার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। য়াগ্মুরাসানের পুত্র উছমানের আমলে প্রথম স্মরণীয় প্রাসঙ্গিক ঘটনা ছিল, মারীনী সুলতান আবূ ইয়াকূব কর্তৃক তিলিমসানের দীর্ঘ অবরোধ। তিনি কঠোর অবরোধের মাধ্যমে আট বৎসর ধরিয়া (৬৯৮—৭০৬/ ১২৯৮—১৩০৬) ইহাকে বাহিরের সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আল্-মানসূরায় শিবির শহর নির্মাণ করিতে শুরু করিয়াছিলেন (দ্র. আবূ যায়্যান-১)। এই সময়ে তিলিমসানের পতন ঘটে নাই। আবূ হাম্মু ১ম (দ্র.)-এর আমলে পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের পর আবদুল-ওয়াদগণ পুনরায় মারীনী আবুল-হাসান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল (দ্র. আবূ তাশুফীন-১)। ইহার পর ৩০ রামাদান, ৭৩৭/২ মে, ১৩৩৭ সনে ঝটিকাবেগে তিলিমসান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। শহরটি দশ বৎসর মরক্কোর শাসনাধীন থাকে। আবূ সাঈদ ও আবূ ছাবিত ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক ৭৪৯/১৩৪৮ সনে তিলিমসান বিদেশী (পরাধীনতার) জোয়াল হইতে মুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু ৭৫৩/১৩৫২ সনের পুনরায় মারীনী সুলতান আবূ ইনান কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল এবং ৭৬০/১৩৫৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত বানূ আবদুল-ওয়াদ ইহা পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই।

মরক্কো কর্তৃক দুইবার অধিকারের ফলে আবদুল-ওয়াদদের ইতিহাসে যে বিরতি আনয়ন করিয়াছিল ইহার প্রভাব তাহাদের সকল কর্মক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় আবূ হাম্মু (দ্র.)-এর আমলে (৭৬০-৯১/১৩৫৯-৮৯) রাজ্যটি পুনরায় কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তিউনিসিয়ার হাফ্সী রাজ্যের দিকে তাঁহার রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল (বিজায়া-এর বিরুদ্ধে ৭৬৭/১৩৬৬ সনের অভিযান বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল) এবং বানূ মারীনী-এর আক্রমণ একটা পুনঃপুনঃ হুমকি হিসাবে বিরাজ করিতেছিল। বানূ মারীনী-এর সহিত সংগ্রামও ইতিপূর্বে বিভিন্ন কারণে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রথমত, তাফিলাল্ত (দ্র.) ও মূলূয়া উপত্যকার (ওয়াদী মালবিয়্যা) মাকিল বংশীয় আরবগণ যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহার কারণে। দ্বিতীয়ত, মারীনীদের নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল তিলিম্সানকে রাজ্যভুক্ত করার চেয়ে আবদুল-ওয়াদ বংশীয় খিলাফাতের কোন মিথ্যা দাবিদারকে সমর্থন করিয়া তিলিম্সানকে একটি করদ রাষ্ট্রে পরিণত করা। তৃতীয়ত, তিলিম্সানের সুলতানদের নিজেদের রাজধানী রক্ষার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা ও ইহার শাসনকর্তার স্বীয় যাযাবর মিত্রদের কাছে আশ্রয়ের উদ্দেশে অস্থায়ীভাবে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার কারণে।

ইহা হইতেছে অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবদুল ওয়াদদের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাসমূহ। আরও এক শত পঞ্চাশ বৎসরের জন্য যে সময়ব্যাপী রাজবংশটি বাঁচিয়াছিল তাহারা আর কখনও তাহাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হইতে পারে নাই। ইহা সত্য, মরক্কোর তরফ হইতে তাহাদেরকে ভয় করিবার আর কিছুই ছিল না। কারণ সেখানে দুর্বল বানূ ওয়াত্তাস ইতোপূর্বেই বানূ মারীনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু নেতৃত্ব তিউনিসের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। বানূ হাফ্স (দ্র.)-এর শেষ শক্তিশালী শাসকদ্বয় আবূ ফারিস (৮২৭/১৪২৪) ও উছমান (৮৭১/১৪৬৬) তাঁহাদের বংশের প্রথম শাসকগণের ঐতিহ্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে তিলিম্সানের বিরুদ্ধে অনেক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা 'আবদুল-ওয়াদ রাজ্যে নিজেদের পসন্দসই সামন্ত শাসক নিয়োগ করিতে থাকেন।

বানূ আবদুল ওয়াদ-এর শাসকগণের তালিকা ঃ (১) আবূ ইয়াহয়া য়াগাম্রাসান ইব্ন যায়্যান (৬৩৩-৮১/১২৩৬-৮২); (২) আবূ সাঈদ উছমান-১ ইব্ন য়াগাম্রাসান (৬৮১-৭০৩/১২৮২-১৩০৩); (৩) আবূ যায়্যান-১ (দ্র.) মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান (৭০৩-৭/১৩০৩-৮); (৪) আবূ হাম্মূ-১ মূসা ইব্ন উছমান (৭০৭-১৮/১৩০৮-১৮) ও (৫) আবূ তাশতফীন-১ আবদুর রাহমান ইব্ন মূসা (৭১৮-৩৭/১৩১৮-১৩৩৭)।

বানূ মারীন রাজত্বকালের প্রথম বিরতিকাল ১২ বৎসর। (৬) আবূ সাঈদ উছমান-২ ইব্ন আবদির রাহমান ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন য়াগাম্রাসান স্বীয় ভ্রাতা আবূ ছাবিতের সহিত একযোগে রাজত্বকারী (৭৪৯-৫৩/ ১৩৪৮-৫২)।

বানূ মারীন রাজত্বকালের দ্বিতীয় বিরতিকাল ৭ বৎসর (৭) আবূ হাম্মূ-২ মূসা ইব্ন আবী ইয়াকূব ইয়ূসুফ ইব্ন আবদির-রাহমান ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন য়াগাম্রাসান (৭৬০-৯১/১৩৫৯-৮৯); (৮) আবূ তাশুফীন-২ আবদুর রাহমান ইব্ন মূসা (৭৯১-৬/১৩৮৮-৯৩); (৯) আবূ ছাবিত-২ ইয়ূসুফ ইব্ন আবদির রাহমন (৭৯৬/১৩৯৩); (১০) আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্ন মূসা ৭৯৬-৭/১৩৯৩-৪); (১১) আবূ যায়্যান-২ মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা (৭৯৭-৮০২/১৩৯৪-৯); (১২) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ-১ ইব্ন মূসা (৮০২-৪/১৩৯৯-১৪০১); (১৩) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ-১ ইব্ন মূসা (৮০৪-১৩/১৪০১-১১); (১৪) আবদুর রাহ্মান ইব্ন মুহাম্মাদ ৮১৩-৪/১৪১১); (১৫) সাঈদ ইব্ন মূসা (৮১৪/১৪১১); (১৬) আবূ মালিক আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মূসা (৮১৪-২৭/১৪১১-২৩); (১৭) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদির রাহ্মান (৮২৭-৩১/১৪২৩-৭, ৮৩৩-৪/১৪২৯-৩০); (১৮) আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্ন মূসা (৮৩৪-৬৬/১৪৩০-৬১); (১৯) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ-৩ আল-মুতাওয়াক্কিল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়ূসুফ (৮৬৬-৭৩/১৪৬১-৬৮); (২০) আবূ তাশুফীন-৩ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৭৩/১৪৬৮); (২১) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ-৪ আছ-ছাবিত ইব্ন মুহাম্মাদ মুতাওয়াক্কিল (৮৭৩-৯১০/১৪৮৬-১৫০৪); (২২) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ-৫ আছ-ছাবিত ইব্ন মুহাম্মাদ-৪ (৯১০-২৩/১৫০৪-১৭); (২৩) আবূ হাম্মূ-৩ মূসা ইব্ন মুহাম্মাদ-৩ (৯২৩-৩৪/১৫১৭-২৭); (২৪) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ-২ ইব্ন মুহাম্মাদ-৩ (৯৩৪-৪৭/১৫২৭-৪০); (২৫) আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ-৬ ইব্ন আবদিল্লাহ (৯৪৭/১৫৪০; (২৬) আবূ যায়্যান-৩ আহমাদ ইব্ন আবদিল্লাহ (৯৪৭-৫০/১৫৪০-৩, ৯৫১-৫৭/১৫৪৪-৫০) ও (২৭) আল-হাসান ইব্ন আবদিল্লাহ (৯৫৭/১৫৫০)।

রাজ্যটির অনারোগ্য দুর্বলতা ইহার অভ্যন্তরীণ কলহ এবং বিদেশীদের লোভ ইহার ইতিহাসের শেষ অধ্যায় রচনা করিয়াছে অর্থাৎ ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বশ্যতা স্বীকার ও অবক্ষয়ের যুগ। তিলিম্‌সান ক্রমশ স্পেনীয়দের আধিপত্যে চলিয়া যায় (যাহারা ৯৫১/১৫০৯ সালে ওরানের সর্বময় কর্তত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন)। তৎপর ৯২৩/১৫১৭ সালে আলজিরিয়ার তুরস্ক দেশীয় লোকদের আধিপত্যে, পুনরায় স্পেনীয়দের হাত হইতে তুরস্ক দেশীয় লোকদের নিকট, অবশেষে মার্‌রাকুশের বানূ সা'দ রাজাদের আধিপত্যে চলিয়া যায় এবং তাহাদের নিকট হইতে ১৫৭/৯৫৫০ সালে তুরস্ক দেশীয় লোকগণ কর্তৃক ইহা অধিকৃত হইয়াছিল।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মারীনী জ্ঞাতিবর্গের রাজ্যের তুলনায় আবদুল ওয়াদদের রাজ্য জনসংখ্যা, উর্বর জমি ও নগরীর দিক দিয়া কম ঐশ্বর্যশালী এবং প্রতিটি বিষয়ে অনুন্নত ছিল। এই কারণে ইহা উত্তর আফ্রিকা কিংবা স্পেনে বড় ধরনের সামরিক উদ্যোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিল না। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ইহাকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ইহার লোভী প্রতিবেশীদের আক্রমণের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল। আরবগণ কর্তৃক, বিশেষত বানূ আমের ও সুওয়ায়দের প্রধান হিলালী গোত্রসমূহ কর্তৃক (যাহারা ওরান জেলার সমতল ভূমি আক্রমণ করিয়াছিল) তাহাদের দখলকৃত স্থানটির যাযাবরদের উপর যবরদস্তিমূলক সহযোগিতা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আরবগণ সেনাদল যোগান দিয়া যাহা সহজেই সমাবেশ করা যাইত এবং কর আদায়কারী হিসাবে কাজ করিয়া বিনিময়ে অল্প কিছু পাইতেন, কিন্তু রাজবংশের সংকটকালে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া সর্বদা লাভবান হইতেন, তাঁহাদের সাহায্যেই মরক্কোর অধীনতা হইতে তিলিমসানের মুক্তি লাভ সম্ভব হইয়াছিল। আবদুল-ওয়াদ রাজ্যের বহু অংশ জায়গীর আকারে তাহাদের হাতে চলিয়া যায়।

রাজ্যের এই বিপজ্জনক অবস্থা ও সামান্য সম্পদ সত্ত্বেও যাহা তিলিমসানের শাসকদেরকে সৌখিন জীবন যাপনের কিংবা ফেযের রাজাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইমারতাদি নির্মাণ করিবার অবকাশ দেয় নাই, আবদুল-ওয়াদরা মারীনীদের বহু পূর্বেই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। য়াগাম্‌রাসানের রাজত্বকাল হইতেই তাহাদের প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দ বানূ মারীন কর্মচারী অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য ও কর্তব্যপরায়ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথমভাগে এই শাসনকর্তা তাহার নিজ পরিবারে সদস্যগণের মধ্য হইতে উযীর নিয়োগ করিতেন। চতুর্থ শাসক আবূ হাম্মূ-১-এর আমলে, যিনি ইব্‌ন খাল্‌দূনের মতে (Berberes, ii, 142; অনু. iii, 384) রাজ্যটির প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির অবসান ঘটান এবং ইহার প্রতি প্রকৃত শাহী দরবারের শিষ্টাচার আরোপ করেন। ওযারতের দায়িত্ব আনদালুসীগণের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং এই পদ্ধতি পঞ্চম সুলতানের আমলেও অব্যাহতভাবে চালু ছিল। মারীনী রাজত্বের বিরতির ফলে এক নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হইল। ইহাতে দেখা গেল, উযীর যিনি সাধরণত শাহী বংশোদ্ভূত হইতেন, তিনি একাধারে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ও সুলতানের নায়েব হইয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া লইতেন। ফেযের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হাজিবের (প্রধান রাজকীয় তত্ত্বাবধায়ক) ক্ষেত্রে ইহা লক্ষণীয়, ফেযে এই উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি প্রায়ই রাজপরিবারে সুপরিচিত, অথচ সাধারণ পরিবারে অনুজ্জ্বল অতীতের কোন লোক হইতেন, কিন্তু এমন ব্যক্তিকে হাজিব নিযুক্ত করা হইত যিনি আইনশাস্ত্রবিশারদ ও অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ হইতেন।

মারীনী রাজত্বের বিরতির পরে হাজিব উপাধি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মরক্কোর দখল যেমন আবদুল-ওয়াদ রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে উহার উন্নয়ন ধারাও ব্যাহত করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খালদূন, ইবার, ৭খ., ৮২-১৪৯,-Hist. des Berberes, ed. de Slane, ii, 109-204, transl. de Slane, iii, 340-495; (২) ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন খালদূন, বুগ্‌য়াতুর-রুওওয়াত ফী যিকরিল-মুলূক মিন বানী আবদিল-ওয়াদ, সম্পা. ও অনু. (৩) তানাসী, নাজ্‌মুদ-দুর্‌র ওয়াল-ইক্‌য়ান ফী বায়ান শারফ বানী যায়্যান, আংশিক অনু. J. J. L. Barges (Hist. des Beni Zeian, rois de Tlemcen), Paris 1852; (8) ইব্‌ন মার্‌য়াম, আল-বুস্‌তান, Biographies des Saints et Savants de Tlemcen, ed. M. Ben Cheneb, Algiers 1908; অনু. I. Provenzali, Algiers 1910; (৫) Leo Africanus, Description de l'Afrique, ed. Ch. Schefer. iii, Paris 1898; (৬) আবদুল-বাসিত, ইব্‌ন খালীল, সম্পা. ও অনু. R. Brunschvig (Dcux recits de voyage incdits en Afrique du Nord au XVeme siecle), Paris 1936; (৭) J. J. L. Barges, Compliment a l'Hist. des Beni Zeian, Paris 1887; (৮) ঐ লেখক, Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, Paris 1859; (৯) Brosselard, Inscriptions arabes de Tlemcen R A fr., 1859-62; (১০) ঐ লেখক, Memoire epigraphique et historique sur les tombeaux des emirs Beni Zeiyan, JA, 1876; (১১) W. Marcais, Musee de Tlemcen (Musees de l'Algeric et de la Tunisic), Paris 1906; (১২) G. Marcais, Les Arabes en Berberie, Paris 1913; (১৩) ঐ লেখক, Le Makhzen des Beni Abd al-Wad, Bull de la Societe de geographic et d'archcologic d'Oran, 1940; (১৪) W. and G. Marcais, Les monumcnts arabes de Tlemcen, Paris 1903; (১৫) G. Mareais, Tlemcen (Les villes d'art celebres), Paris 1950; (১৬) Zambaur, 77-8. বানূ আবদিল ওয়াদ-এর ও প্রতিবেশী রাজবংশগুলির ইতিহাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় এই রাজবংশগুলির ঐতিহাসিকগণ (তু. বানূ মারীন ও হাফসী প্রবন্ধদ্বয়ের গ্রন্থপঞ্জী) প্রায়ই বানূ আবদিল ওয়াদ-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

G. Marcais (E.I.[2])/মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আবদুল ওয়ালী (عبد الولی) ঃ খান সাহেব, [১৮৫৫-১৯২৬] খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত সুরুলিয়া গ্রামের এক খানদানী জমিদার পরিবারে তাঁহার জন্ম (১৮৫৫ খৃ.)। ইনি 'আরবী ও ফারসী ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দিল্লীর সম্রাট শাহ্জাহানের আমলে (১৬২৮-১৬৫৯) পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহাদের অনেকেই দিল্লীর দরবারে উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের কেহ কেহ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানিত 'মুল্লা' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার জনৈক ঊর্ধ্বতন পুরুষ রাজকার্য ব্যাপদেশে বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা অঞ্চলে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন। সুরুলিয়া অঞ্চলে তিনি প্রচুর জমিদারী লাভ করেন (JASB, Calcutta, vol. xxiii, 1927, P. cl xxv)। আবদুল ওয়ালী সাহেব এই জমিদার বংশেরই সন্তান।

তাঁহার শিক্ষা জীবন শুরু হয় কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায়। পরে যথাক্রমে সেন্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পরে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতার মুখপত্রে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, তিনি কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের রেজিস্ট্রেশন বিভাগে বিভিন্ন মর্যাদায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণ করেন (১৯১১ খৃ.)। বাল্যকাল হইতেই দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই বিষয়ে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ইংরেজী ভাষায় ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক। তিনি কিছু কিছু রচনা উর্দূ ও ফারসী ভাষাতেও লিখেন। বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকাতেই তাঁহার রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। যেমন The Journal of Indian Antiquary, The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, The Journal of Moslem Institute, The Calcutta Review, The Anthropological Society of Bombay ইত্যাদি।

শুধু ইংরেজি, উর্দূ ও ফারসী ভাষাতেই নয়, সমকালীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সম্প্রতি প্রাপ্ত বোম্বাই হইতে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার একটি ইংরেজি নিবন্ধে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বোম্বাই নৃতত্ত্ব সমিতির মুখপত্রে [Journal of the Anthropological Society of Bombay, vol. v, No 4. 1900]। প্রবন্ধটির নামও বিচিত্র ঃ Some Curious Tenets and Practices of Certain Class of Fakirs in Bengal. অর্থাৎ বাংলাদেশের বিবিধ ফকীর শ্রেণীর আচার-আচরণের বিচিত্র কথা। এই প্রবন্ধে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মরমী কবি লালন শাহ ও তাঁহার সম্প্রদায় সম্পর্কে এমন সব তথ্য পাওয়া যায়, যাহাতে পরবর্তী কালে লালন শাহ সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্নের সদুত্তর মিলে। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার তিনিই অন্যতম পথিকৃৎ। বহু প্রাচীন আরবী ও ফারসী শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ করিয়া মুসলিম বাংলার ইতিহাস উদ্ধারেও তিনি বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদের প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার তাঁহার একটি প্রধান কীর্তি। জানা যায়, এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে যখন তাঁহার সর্বশেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইতেছিল, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল একাত্তর বৎসর। ইহার অল্পদিন পরেই (২৪/১১/১৯২৬) তিনি কলিকাতায় ইন্তিকাল করেন।

খুলনা জেলা গেজেটিয়ার হইতে জানা যায়, আবদুল ওয়ালী উর্দূ ও ফারসী ভাষাতেও বই-পত্র লিখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া ফারসী ভাষাতে মধ্যএশিয়ায় রুশীয় প্রাধান্য সম্পর্কে লিখিত তাঁহার রচনাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করিয়া তিনি তৎকালীন ভারতীয় 'কেন্দ্রীয় মুহাম্মদীয় সমিতি' (Central Mohammadan Association) কলিকাতা হইতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। বইখানি ১৯০০ খৃ. আগ্রা হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত আবূ সাঈদ ইব্‌ন 'আবদিল খায়র রচিত রুবাইয়্যাত বা চতুষ্পদী কবিতাবলীর একটি তরজমাও তিনি প্রকাশ করেন [Bangladesh District Gazetteers of Khulna, 1978, p. 284]।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাস্থ এশিয়টিক সোসাইটির সহিত একজন সদস্য হিসাবে যুক্ত হন। সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর যাবত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তিনি এই সোসাইটির খিদমত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteers of Khulna, 1978; (২) Asiatic Society of Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal (J A S B), vol. XXIII, 1927; (৩) Anthropological Society of Bombay, Journal of the Anthropological Society of Bombay, 1900, vol. v, No. 4; (৪) Shamsuddin Ahmad, Inscriptions of Bengal, vol. IV. Varendra Musium, East Pakistan, Rajshahi 1960; (৫) মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ.।

মুহম্মদ আবূ তালিব

'আবদুল ওয়াসি' জাবালী (عبد الواسع جبلی) ঃ বাদী'উয্ যামান্ 'আবদুল-ওয়াসি' গার্‌জিস্তানের এক আলাবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (যাবীহুল্লাহ্ সাফা, তারীখ আদাবিয়াত দার ঈরান, ২খ., ৬৫০, ৬৫১)। তিনি মুর্‌গাবের উপত্যকার পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'জাবালী' বলা হইত। তাঁহার রচনাবলী হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তবে কবিতায় তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সমসাময়িক গুরী, গায্‌নাবী ও সাল্‌জূক বাদ্‌শাহ্‌দের সম্পর্কে কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন তুগ্‌রিল তাকীন ইব্‌ন মুহাম্মাদ। তিনি ৪৯০ হিজরীতে খাওয়ারিয্‌ম অধিকার করেন (রিদা যাদাহ শাফাক, তারীখ আদাবিয়াত ঈরান, তেহরান ১৩২৪ শ., পৃ. ২০০)। অপর একজন ছিলেন বাহ্‌রাম শাহ্ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ গায্‌নাবী

(৫১০/১১১৬-৫২০/১১৫৭)। আবদুল-ওয়াসি তাঁহার খ্যাতির প্রথম চারি বৎসর শেষোক্ত জনের দরবারে কাটান। বাহ্‌রাম তাঁহার রাজ্যের অবস্থার অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সান্‌জারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সান্‌জার স্বয়ং সৈন্যসহ গয্‌নী গমন করেন (৫১০ হি.)। দাওলাত শাহের বর্ণনানুসারে আবদুল ওয়াসি সান্‌জারের প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তারীখ গুযীদাহ্-এ উল্লেখ রহিয়াছে, সান্‌জার এই প্রশংসামূলক কবিতাটি শ্রবণ করিয়া জাবালীকে সংগে করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে প্রতিপালন করেন।

"দেশে পূর্বপুরুষদের একজন উত্তম উত্তরাধিকারীর আগমন ঘটিল, তিনি হইলেন মীর তাজুদ্দীন মালিক আবুল ফাদ্‌ল নাস্‌র ইব্‌ন খাল্‌ফ" (দীওয়ান জাবালী, জামে' মাসজিদ পাণ্ডুলিপি, বোম্বে)। সম্ভবত উক্ত আমীরের মন্ত্রী ছিলেন জামালুদ্দীন আলী ইব্‌ন আস্‌'আদ—যাঁহার প্রশংসায় বলা হইয়াছে, আলী ইব্‌ন আস্‌আদের কৃতিত্ব (পাণ্ডিত্য) ও সৌভাগ্য এই যে, সমগ্র জগত তাঁহার সৌন্দর্যে আলোকিত (কাসাইদ জাবালী, হাবীবগঞ্জ পাণ্ডুলিপি)। পরে তিনি সীস্‌তানে এবং সেইখান হইতে ইরাক গমন করেন। তথায় ৫১১/১১১৭ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহের ইন্তিকাল হইলে তাঁহার পুত্র সাল্‌জূকের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করেন।

ইহার পর আবদুল-ওয়াসি তাঁহার অপর একজন প্রশংসিত ব্যক্তি কুতবুল-মুলূক ফার্‌রুখ শাহের দরবারের সহিত যুক্ত হন, যিনি ছিলেন তামীরাক ইব্‌ন আতাবেকের বংশধর। তিনি কুত্‌বুল মুলূক ফাররুখ শাহ্‌কে তামীরাক ইব্‌ন আতাবেক-এর বংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করেন, সম্ভবত যিনি তামীরাক ইব্‌ন আমীর ফার্‌রুখ শাহ্ ছিলেন। তিনি মালিক শাহ্ সাল্‌জূকী (মৃ. ৪৮৬/১০৯৩)-এর সৈন্যদলের বাম ব্যূহ (মায়সারা) পরিচালনা করিয়া কাওয়ার্‌দ ইব্‌ন চাগ্‌রী বেগের সংগে ৪৬৬/১০৭৪ সালে হামাদানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (আখবারুদ-দাওলাতিস সালজূকিয়্যা, পৃ. ৫৬, ৫৭)। তিনি কুত্‌বুল মুলূক ফাররুখ সাহের প্রশংসায় অপর একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সেই কুত্‌বুল মুলূকের কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

ইহার পর জাবালী খুরাসানের রাজধানী মার্‌ব শাহ্‌জাহান-এর দিকে অগ্রসর হন। ফিরদাওসুল হিকমা, বার্লিন ১৯২৬-এর ভূমিকারও পৃ. ৩-এ মার্‌বকে তাবারিস্তানের অঞ্চলের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। সান্‌জারের প্রশংসায় রচিত আরও কিছু কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সানজারের উপাধি তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ (মৃ. ৫১১/১১১৭)-এর সময়পর্ব পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন ছিল এবং ভ্রাতার মৃত্যুর পর সান্‌জারের উপাধি হয় মু'ইয্‌যুদ্দীন (ইব্‌ন খালদূন, উর্দূ অনুবাদ, ১খ., পৃ. ৮৫)। এইজন্য ইহা প্রতীয়মান হয়, এই কাসীদা ৫১১/১১১৭ সালের পরবর্তী কালে রচিত। এই কাসীদার সংগে সান্‌জারের আমীর মাজদুদ্দীন আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন জাফার আল-মুসাবীর প্রশংসায় রচিত অপর একটি কাসীদা রহিয়াছে।

মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, জাবালীর বর্ণনানুসারে ফালাকুদ্দীন ছিলেন খুরাসানের সিপাহ্‌সালার। তিনি তাঁহার সৈন্যদলসহ খুরাসান হইতে খাওয়ারিয্‌ম গমন করেন। তথায় তাঁহার সৈন্যবাহিনী তাঁহার সহযোগিতায় তুমুল যুদ্ধ করে এবং শত্রুদলকে পরাভূত করে। তাঁহার খাওয়ারিয্‌মে অবস্থানকালে হারীর অধিবাসিগণ নিরস্ত ছিল। তথাকার জনসাধারণ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। অনেকে আফগানের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। মারবের মহান ব্যক্তির প্রেরিত সৈন্যদল হারীতে পদার্পণ করিলে সকল দুর্ভাবনার অবসান ঘটে এবং স্বস্তি ফিরিয়া আসে। তাহাদের আগমনের পূর্বে সাহায্যকারিগণ আত্মগোপন করিয়াছিল। জনসাধারণ হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে নির্ভয় হইল এবং দুর্বলেরা স্বস্তি বোধ করিল (ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিনের ভূমিকা, লাহোর ১৯৪৮, পৃ. ১৪৭৫)। তিনি জাবালীর এমন কিছু কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই ফালাকুদ্দীন আলী হারাতে একটি মিম্বার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রাসাদ নির্মাণের বর্ণনা সম্বলিত জাবালীর অপর একটি কাসীদা রহিয়াছে। ফালাকুদ্দীন এই প্রাসাদটি মুহাম্মাদ নাক্‌কাশ রৌপ্যকার দ্বারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্ভবত সেই ফালাকুদ্দীন আলীর প্রতিনিধি (নাইব) ছিলেন আবদুস সামাদ, যাহার প্রশংসায় জাবালী কয়েকটি কাসীদা রচনা করিয়াছেন। একটি কাসীদায় তাঁহাকে নাইব-ই ওয়াযীর-ই আজাম (উযীরে আজমের প্রতিনিধি) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আবদুস সামাদ খুরাসানে ছিলেন। একটি কাসীদায় তাঁহাকে সারাখ্‌সী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বলা হইয়াছে, কবি তাঁহার সংগে তথায় গমন করিয়াছিলেন। মুআয়্যিদুল ইসলাম আবুল মাআলী দিয়াউদ্দীন মাওদূদ আহমাদ আসামীও জাবালীর একজন প্রশংসিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও কখনও গযনীতেও অবস্থান করিতেন। কবি আনওয়ারী তাঁহার একটি কাসীদায় মাওদূদের উল্লেখ করিয়াছেন। মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদও জাবালীর একজন প্রশংসিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বিগত শাসকদের মধ্যে তিনি কে ছিলেন তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। জাবালী তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে সাহিত্যিক সাবির ও রাশীদুদ্দীন ওয়াত্‌ওয়াতেরও প্রশংসা করিয়াছেন।

'আবদুল ওয়াসি অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিক, শত্রু ও মিত্রদের দ্বারা কঠোরভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন। তিনি সমসাময়িক ব্যক্তিদের খিয়ানত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে পরীক্ষক এবং প্রকাশ্যে ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলেন। এতদুভয়ের পক্ষ হইতে আমার ভাগ্যে দুইটি জিনিস জুটিয়াছেঃ শত্রুদের পক্ষ হইতে শত্রুতা এবং মিত্রদের পক্ষ হইতে ছলনা।

'আবদুল ওয়াসি' সাধারণ ভঙ্গিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু স্বীয় মেধা ও কাব্য প্রতিভাবলে তিনি তাঁহার কবিতাকে অলংকরণ, অভিনবত্ব ও শব্দ সংযোজনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছেন। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, আলংকারিকতা, বর্ণনায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি বিষয় তাঁহার কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আরবী কবিতায়ও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার 'মুলাম্মা' মাহ্‌জূব'-এ দুইটি কাসীদার উল্লেখ পাওয়া যায় (লুবাবুল-আলবাব, ২খ., ১০৮, ১১০)। ফিহ্‌রিস্ত কিতাব খানা-ই ইন্ডিয়া অফিস (ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ২খ., ৬৩৯)-এ জাবালীর মৃত্যু সাল ৫৫৫/১১৬০ উল্লেখ রহিয়াছে এবং সম্ভবত ইহা সঠিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাসাইদ জাবালী, হাবীবগঞ্জ (পাণ্ডুলিপি) ; (২) দীওয়ান জাবালী, জামে' মাসজিদ, বোম্বে; (৩) দীওয়ান জাবালী, পাঞ্জাব (মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরীর বরাতে); (৪) আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ কালাতী ইস্‌ফাহানী, মুনিসুল আহরার, হাবীবগঞ্জ; (৫) মুহাম্মাদ আওফী লুবাবুল-আলবাব, লাইডেন ১৯০৩; (৬) Browne, তায্‌কিরা-ই দাওলাত শাহ্, ১৯০১; (৭) তারীখ ইব্‌ন খাল্‌দুন, অনু. হাকীম আহমাদ হুসায়ন ইলাহাবাদী; (৮) আবুল হাসান আলী ইব্‌ন নাসির আল-হুসায়নী, আখ্‌বারুদ্-দাওলাতিস সাল্‌জূকিয়্যা, পরিশিষ্ট, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর (আগস্ট ১৯৪৮); (৯) রিদা যাদাহ্ শাফাক, তারীখ আদাবিয়াত-ই ঈরান, তেহরান ১৩২৪ শ.; (১০) যাবীহুল্লাহ সাফা, তারীখ আদাবিয়াত দার ঈরান, তেহরান।

গুলাম মুস্‌তাফা খান (দা. মা. ই.)/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল-ওয়াহ্হাব ইব্‌ন 'আব্‌দির-রাহমান ইব্‌ন রুস্‌তুম (দ্র. রুস্‌তুমী)।

'আবদুল-ওয়াহ্হাব (عبد الوهاب) ঃ তাজুদ্দীন আল-মলিকুল মান্‌সূর ইব্‌নুল-মালিক আল-মুজাহিদ শামসুদ্দীন আলী (ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন তাজুদ্দীন) ইয়ামানের তাহিরী রাজবংশের একজন শাসক। তিনি তাঁহার পিতৃব্য যুবায়দের মৃত্যুর পর ৮৮৩/১৪৭৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮৯৪/১৪৮৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকেন। তিনি খুবই সাহসী শাসক ছিলেন। তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সহিষ্ণুতা, কূটকৌশল ও ব্যবস্থাপনায় বিশিষ্ট দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সালাহুদ্দীন 'আমেরুজ্-জাফির (عامر الظافر) উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Jehannesen, Historia Jemanae, পৃ. ২১৪-২৯; (২) আস্-সাখাবী, আদ্-দাওউ'ল-লামি', ৫খ., ১০০, কায়রো ১৩৫৪ হি.; (৩) আয্-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৪খ., ৩৩২-৩৩৩, কায়রো মুদ্রণ।

A. Bell (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল ওয়াহ্হাব বুখারী, শায়খ, (عبد الوهاب بخارى، شيخ) ঃ মুসলিম ভারতের সূফী সাধক। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ আল-হুসায়নী আল-বুখারীর পুত্র এবং সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারীর উত্তরসূরি। সায়্যিদ জালালুদ্দীন মধ্যএশিয়া হইতে মুলতানে আগমন করেন এবং পরে তাঁহার পীর মুলতানের শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যা সুহ্‌রাওয়ার্‌দীর আদেশক্রমে উছ-এ বসতি স্থাপন করেন। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার বংশধরগণ প্রখ্যাত সুহ্‌রাওয়ার্‌দিয়া তরীকার সাধকে পরিণত হয়। আবদুল ওয়াহ্হাব ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন উছ নামাক স্থানে এবং পরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি মুলতান গমন করেন। তিনি আহ্‌মাদাবাদ (গুজরাট)-এ শায়খ আহ্‌মাদ খাত্তুর নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বলিয়া জানা যায়। কিশোর বয়সেই তিনি হজ্জ করিতে আরবদেশে গমন করেন এবং সেখানে অবস্থানের সময় স্থানীয় আলিমগণের সাহচর্যে উপকৃত হন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। কেননা উছ ও মুলতানের অধিকাংশ সুহ্‌রাওয়ার্‌দী সাধক এখানেই একত্র হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি শায়খ ইয়ূসুফ মুলতানীর পুত্র ও সুলতান বাহ্‌লুল লোদীর জমাতা শায়খ আবদুল্লাহ সুহ্‌রাওয়ার্‌দীর মুরীদরূপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার কিছু কাল পরে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ করিতে আরবদেশে গমন করেন। প্রথমবার তিনি স্থলপথে পরিভ্রমণ করিলেও এইবার তিনি গুজরাট হইতে জাহাজযোগে ভ্রমণ করেন।

১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিলে স্বয়ং সুলতান তাঁহাকে এক জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনায় সম্মানিত করেন। ৯১৫/১৫০৯ সালে সুলতান তাঁহাকে ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্যই (বর্তমান মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) মধ্যভারতীয় দুর্গ নারওয়ার-এ প্রেরণ করেন। সুলতান এই দুর্গটি সদ্য অধিকার করিয়া ইহার নাম করেন হিসার-ই মুহাম্মাদ। শায়খুল ইসলামরূপে কর্মরত থাকিয়া তিনি মসজিদ ও মাদরাসাসমূহের নির্মাণকার্য তদারক করিতেন এবং কতিপয় মসজিদে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁহার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। সেই বৎসরই আবদুল ওয়াহ্হাব বুখারী তাঁহার রচিত কুরআন-এর ভাষ্য সমাপ্ত করেন। ইহাতে প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সূফী দৃষ্টিকোণ হইতে। তাঁহার এই গ্রন্থখানি বর্তমানে অবলুপ্ত; কেবল শায়খ আবদুল হাক্ক-এর রচিত আখবারুল আখয়ার-এ কতিপয় উদ্ধৃতির কথাই জানা যায়।

আবদুল ওয়াহ্হাব বুখারীর সাহচর্য শাসক শ্রেণীর নিকট সুলতানের সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং ইহার ফলে কতিপয় আলিম ও সূফী বুখারীর সুপারিশে ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্র হইতে বৃত্তি ও ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। কিন্তু সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার সহিত বুখারীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কথিত আছে, শায়খ নারওয়ার হইতে আগ্রা আগমনের পর সুলতানকে দাড়ি রাখিতে উপদেশ দান করেন। কারণ কোন মুসলিম নৃপতির পক্ষে দাড়ি কামানো শোভন নহে। সুলতান এই বিষয়ের আলোচনা পরিহার করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারে সুলতানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শায়খ তাঁহার অঙ্গীকার আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। ইহার পর সুলতান বিরক্ত হইয়া নীরব থাকেন। শায়খ-এর প্রস্থানের পর তিনি তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং মন্তব্য করেন, শায়খ তাঁহার প্রতি সুলতানের অনুগ্রহের জন্য দাম্ভিক হইয়া পড়িয়াছেন এবং তিনি ইহা জানেন না, একমাত্র সুলতানের অনুগ্রহের জন্যই জনগণ শায়খের পদচুম্বন করে। জনৈক সভাসদের মাধ্যমে সুলতানের সকল মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হইলে শায়খ ঘৃণাভরে আগ্রা ত্যাগ করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় দিল্লীতে নির্জন বাসে কাটাইয়া দেন। তিনি ৯৩১/১৫২৫ সালে ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লীতে তাঁহার পীর শায়খ আবদুল্লাহ্‌র সমাধির নিকটে সমাহিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শায়খ রিযকুল্লাহ্ মুশ্‌তাকী, ওয়াকিআত-ই মুশ্‌তাকী, Ms. British Museum Add, ১১খ., ৬৩৩; (২) শায়খ আবদুল হাক্ক মুহাদ্দিছ, আখবারুল আখয়ার, দিল্লী ১৯১৪; (৩) 'আবদুল্লাহ, তারীখ-ই দাউদী, সম্পা. শায়খ আবদুর রাশীদ, আলীগড় ১৯৫৪; (৪)আহ্‌মাদ ইয়াদগার, তারীখ-ই শাহী, সম্পা. হিদায়াত হোসেন, কলিকাতা ১৯৩৯; (৫) আহ্‌মাদ খান, শাজারা-ই সুহ্‌রাওয়ার্‌দ, Ms. Riza Library রামপুর;

(৬) Epigraphia Indica, আরবী ও ফারসী পরিশিষ্ট, ১৯৬৫, সম্পা. Z.A. Desai, কলিকাতা ১৯৬৬।

I. H. Siddique (E.I.[2] Suppl.)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবদুল ওয়াহ্হাব (عبد الوهاب)ঃহাসান হুস্‌নী ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন আবদিল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন ইয়ূসুফ আস্-সুমাদিহী আত্-তুজীবী ২১ জুলাই, ১৮৮৪-তে তিউনিসে জন্ম এবং তিউনিসের উপকণ্ঠ সালামবো (Salammbo) নামক স্থানে নভেম্বর ১৯৬৮-তে মৃত্যু। তাঁহার জন্ম হয় তিউনিসীয় রাষ্ট্রের সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক পরিবারে এবং তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের লেখক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। একই নামের অধিকারী তাঁহার পিতামহ আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন ইয়ূসুফ বে (Bey)-দের অমাত্যবর্গের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসন ও আচরণ বিধি (Protocol) সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁহার পিতা ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল ওয়াহ্হাব ছিলেন ইউরোপ পরিভ্রমণকারী বিভিন্ন তিউনিসীয় প্রতিনিধিদলের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও দোভাষী। এতদ্ব্যতীত তিনি ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে (Protaetorete) বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে ছিল গাবেস ও মাহ্‌দিয়ার গভর্নর (আমিল) পদ। ইতিহাসের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং মরক্কোর একখানা ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তবে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে আবদুল ওয়াহ্হাব প্যারিসে তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাকে তিউনিসে প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করিতে হয়, যাহা খৃ ১৯০৫ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

১৯২৫ খৃস্টাব্দে জাবানিয়ানা (Djabanyana), ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মাহ্‌দিয়া ও ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে নাবেউল (Nabeul)-এর গভর্নর বা আমীর থাককালীন তিনি এই সকল অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার সাধনে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি জাবানিয়ানা-এর কায়দাত (Caidate)-এ বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, মাহ্‌দিয়াতে তিউনিস-এর ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং মাহ্‌দিয়া ও নাবেউল-এর গ্রন্থাগারসমূহের জন্য পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

তিউনিসের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে প্রত্যাবর্তন করিলে ১৯৩৯ খৃ. অবসর প্রদান করার পর তাঁহাকে হাবুস (ওয়াকফকৃত সম্পত্তি)-সমূহের তদারকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মে ১৯৪৩ হইতে জুলাই ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন তিউনিসের Lamine (বা প্রথম আল-আমীন)-এর Minister of the Pen (অর্থ ও অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের মন্ত্রী)।

তিউনিসিয়া স্বাধীনতা অর্জন করার পর ১৯৫৭ হইতে ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা ইন্সটিটিউট পরিচালনা করেন এবং এই সময়ে তরুণ তিউনিসীয়গণকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। দেশের বিভিন্ন অংশে তিনি পাঁচটি যাদুঘর স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে চারটি ছিল আরব-ইসলামী শিল্পকলাসমূহের যাদুঘর। তাঁহার সকল ব্যক্তিগত সংগ্রহ তিনি এই সকল যাদুঘরে দান করেন। একই সংগে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে এবং তাঁহার উৎসাহে ও সহায়তায় রচিত বিভিন্ন পণ্ডিতের পুস্তকসমূহের মুখবন্ধ রচনা দ্বারা শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমে উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

তিউনিসিয়ার ঐতিহাসিক পদে তাঁহার দায়িত্ব সক্রিয় রূপ লাভ করে ১৯০৫ খৃ. হইতে খাল্‌দূনিয়্যা (দ্র.)-তে তিউনিসিয়ার ইতিহাস এবং ১৯১৩ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত Ecole Superieure de Langue et Litterature Arabes-এ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে। বিভিন্ন পদে তাঁহার বদলি এই ব্যাপারে সহায়ক হইয়াছিল। ১৯২০ খৃ. তিনি ছিলেন তিউনিসের প্রধান মহাফেজখানার অধ্যক্ষ এবং সেখানে তিনি কার্ড-ইনডেক্স (Card-index=পৃথক পৃথক কার্ডে লিখিত সূচী) পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ইহার পর তিনি হাবুস (ওয়াক্‌ফ)-এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিউনিসিয়ার বিভিন্ন অংশে গভর্নর থাকাকালে তিনি দেশের বাস্তব অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভে সমর্থ হন এবং ইহার সাম্প্রতিক ইতিহাস, এই পর্যন্ত অবহেলিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ইহার জনগণ, তাহাদের প্রজাতি বিজ্ঞান ও স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute des Etudes Islamiques-এ একটি বক্তৃতামালা প্রদান করেন।

১৯৩২ খৃ. কায়রোর আরবী ভাষা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি ইহার সদস্য ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে এইখানে তিনি আল-মাগ্‌রিব-এর তিনটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বিভিন্ন কমিশনের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম সভ্যতার মানের সহিত আধুনিক কালের প্রয়োজনের সমন্বয় সাধনে সামঞ্জস্য আনয়নের প্রচেষ্টায় তাঁহার সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা প্রয়োগে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত করেন। ইহা ছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠাকাল হইতে দামিশ্‌ক একাডেমীর সদস্য, বাগদাদ একাডেমীর সদস্য, ১৯৩৯ হইতে ফরাসী Academie des Inscriptions et Belles Lettres ও Egyptian Institute-এর পত্র সদস্য, মাদ্রিদের ইতিহাস একাডেমির সদস্য ও ইসলামী বিশ্বকোষের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিউনিসীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯০৫ খৃ. হইতে তিনি অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। একই সংগে তিনি বহু সংখ্যক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং ইহার মাধ্যমে বহু প্রাচ্য ও প্রাচ্যের পণ্ডিতদের সহিত ফলপ্রসূ ও সুদীর্ঘ সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন।

১৯৫০ খৃ. কায়রো একাডেমী, আলজিয়ার্স একাডেমী ও ইহার পর ১৯৬০ খৃ. ফরাসী একাডেমীর প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি (Doctor honoris Causa) এই পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিশ্চিত করিলেও তাঁহার (হাসান হুসনী আবদুল ওয়াহ্হাব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে-১৯৬৮ খৃ. ৭ নভেম্বর) তিউনিসীয় সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ছিল তাঁহার দীর্ঘ ও শ্রমপূর্ণ জীবনের সাফল্যের শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি।

তাঁহার রচনাসমূহ হইতেছে ঃ (ক) আরবী ভাষায় (১) আল-মুন্‌তাখাবুল মাদ্‌রাসী মিনাল আদাবিত্-তূনিসী, তিউনিস ১৯০৮, ১৯৪৪ খৃ. কায়রোতে পুনঃপ্রকাশিত এবং পুনরায় ১৯৬৮ খৃ. নূতনরূপে ও আল-মুজমাল নামক শিরোনামে তিউনিসে প্রকাশিত; (২) রিসাতুল আকীক্ ফী হাদারাতিল কায়রাওয়ান ওয়া শাইরিহা ইব্‌ন রাশীক, তিউনিস ১৯১২; (৩) খুলাসাতু তারীখ তূনিস, তিউনিসিয়ার ইতিহাসের সারসংক্ষেপ ১৯১৮ হইতে ১৯৫৩

সালের মধ্যে তিনবার প্রকাশিত এবং প্রতি সংস্করণেই সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত; (৪) আল-ইরশাদ ইলা কাওয়াদিল-ইকতিসাদ, তিউনিস ১৯১৯; (৫) শাহীরাতুত্-তূনিসিয়াত, তিউনিস ১৯৩৪, ২য় সংস্করণ ১৯৬৬; আল-মাজাল্লাতুয-যায়তূনিয়াতে প্রকাশিত, আত্-তারী, তিউনিস, মে ১৯৪০; (৬) নিস্সীম ইব্ন ইয়াকূব, আন্-নাদওয়াতে প্রকাশিত, তিউনিস জানুয়ারী ১৯৫৩; (৭) আল-ইনায়া বিল-কুতুব ওয়া জাম্ইআ ফী ইফরীকিয়্যা আত-তূনিসিয়া, in RIMA, ১খ. (১৯৫৫), ৭২-৯০; (৮) আল-ইমাম আল-মাযারী, তিউনিস ১৯৫৫; (৯)ওয়ারাকাত আনিল হাদারাতিল আরাবিয়্যা বিইফরীকিয়্যা আত্-তূনিসিয়া, তিউনিস ১৯৬৫-৭২ (৩ খণ্ড); (১০) আল-আরাব ওয়াল-উমরান বি-ইফ্রীকিয়া, আল-ফিক্র-এ (ডিসে. ১৯৬৮), ২৮-৩১।

(খ) ফরাসী ভাষায় ঃ (১) La domination Musulmane en Sicile, তিউনিস ১৯০৫; (২) Coup d'oeil general sur les apports ethniques etrangers en Tunisie তিউনিস ১৯১৭; (৩) Le development de la musique arabe en Orient, au Maghreb et en Espagne, তিউনিস ১৯১৮; (৪) Un temoin de la conquete arabe de I' Espagne, তিউনিস ১৯৩২; (৫) Deux dinars normands frappes a mahdia, in Rt (১৯৩০), ২১৫-১৮; (৬) Un tournant de l'histoire aghlabide, l'iusurrection de Mansur Tunbudhi, seigneur de la Muhammadiyya, ঐ (১৯৩৯), ৩৪৩-৫২; (৭) Du nom arabe de la Byzacene, ঐ (১৯৩৯), ১৯৯-২০১; (৮) Villes arabes disparues, in Melanges W. Marcais, প্যারিস ১৯৫০, ১-১৫; (৯) Le Regime foncier en Sicile au Moyen-Age (IX e et X e s), কিতাবুল আমওয়াল (মূল আদ্-দাউদী)-এর সম্পা. ও অনুবাদ (F. Dachraoui-এর সহযোগিতায়), Etudes d'Oricntalisme dediees a la mcmoire d'E. Levi-Provençal, প্যারিস ১৯৬২, ২খ., ৪০১-৪৪।

(গ) পাণ্ডুলিপির সম্পদনা ঃ (১) ইব্নুল খাতীব-এর আমালুল-আলাম ইফ্রীকিয়্যা ও সিসিলী সম্পর্কিত অংশ, Centenario della nascita di M. Amari-তে প্রকাশিত, পালেরমো ১৯১০, ২খ., ৪২৩-৯৪; (২) ইব্ন সারাফ-এর রাসাইলুল ইন্তিকাদ, দামিশক্ ১৯১২; (৩) আল-মাআররী-র মালকাউস্ সাবীল, দামিশ্ক ১৯১২; (৪) ইব্ন ফাদ্লিল্লাহ আল-উমারী-এর ওয়াস্ফ ইফ্রীকিয়্যা ওয়াল-আন্দালুস, তিউনিস ১৯২০; (৫) আস সাগানীর কিতাব ইয়াফ্উল, তিউনিস ১৯২৪; (৬) আল-জাহিজ-এর আত্-তাবাস্সুর বিত্-তিজারা, দামিশ্ক ১৯৩৩, কায়রো ১৯৩৫ ও বৈরূত ১৯৬৬; (৭) আদাবুল মুআল্লিমীন, মুহাম্মাদ ইব্ন সাহনুন প্রণীত, তিউনিস ১৯৩৪; (৮) অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থকারের আল-জুমানা ফী ইযালাতির-রাতানা, কায়রো ১৯৫৩; (৯)আত-তিজানীর রিহ্লা, তিউনিস ১৯৫৮।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আরবী ও ফরাসী ভাষায় কতিপয় প্রবন্ধ, কতিপয় এখনও অপ্রকাশিত, অন্যগুলি ইসলামী বিশ্বকোষ ও তিউনিসিয়া, ইউরোপ ও প্রাচ্যের বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে (তালিকার জন্য দ্র. আল-ফিক্র, ডিসেম্বর ১৯৬৮, ৯৬), উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকাসহ। উল্লিখিত শিরোনামের কোন কোনটি ওয়ারাকাত-এ পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কারণ হয় এইগুলি প্রসঙ্গক্রমে উপযোগী অথবা এইগুলির মূল সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদির অধিকাংশই তিউনিসিয়ার আরব ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতি উৎসর্গীকৃত। তিনি উহা এমন দৃশ্যপটে (Perspective) পরিবেশন করিয়াছেন যাহা সাহিত্য ও সংগে সংগে ভাষাগত ও ধর্মীয় অনুসন্ধানকে অন্তর্ভুক্ত করে, অথচ বাস্তব বিজ্ঞানসমূহ ও শিল্পকলাকে অবজ্ঞা করে না। এই সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম যাহা তাঁহার জীবনের ষাট বৎসরব্যাপী নিরলস গবেষণার ফসল। কিতাবুল-'উম্র তাঁহার জীবন কর্ম যাহা তাঁহার মরণোত্তরকালে কয়েকটি খণ্ডে বিন্যস্ত, এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। ইহাতে আরব বিজয়ের পর হইতে যাঁহারা তিউনিসিয়ায় বাস করিতেন এবং কাজ করিতেন, তেমন কয়েক সহস্র পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের জীবন কাহিনী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। সম্ভবত এই রচনাকর্মটি তিনি ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দেই 'তারীখ তূনিসিল-কাবীর, তিউনিসিয়ার মহা ইতিহাস নামে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন (খুলাসাতু তারীখ তূনিস-এর তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ) এবং একজন তিউনিসীয় পণ্ডিত M. el Aroussi el Metor-এর নিকট উহার প্রকাশনার দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন (দ্র. আল-ফিক্র [ডিসেম্বর ১৯৬৮], পৃ. ৪৮)।

উপন্যাস শ্রেণীর তাঁহার একমাত্র পরিচিত নিরীক্ষামূলক রচনা ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি ছোট গল্প Derniere veillee a Grenade, (La Renaissance nord-Africaine, তিউনিস নং ৩, মার্চ ১৯০৫)। হামাদী সাহ্লী কর্তৃক আরবীতে অনূদিত এই গল্পটি কিসাস পত্রিকায় (তিউনিস, নং ১৭, অক্টো. ১৯৭০) প্রকাশিত। তাঁহার সকল গবেষণা ও অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য আরব-মুসলিম সভ্যতার পুনর্জাগরণ। উপরন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার প্রতিভা তাঁহার এই সকল রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার রচনাশৈলী ও কাব্যিক কল্পনার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. Ch. Bouyahia, review of Warakat ii, হাওলিয়্যাতুল জামিআ আত-তূনিসিয়া, ৪খ., ১৯৬৭ খৃ., ১৬৬-৭০)।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক অবদানের অপরিমিত সম্পদের মাধ্যমে তিউনিসিয়ার আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া আরব মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিসরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্বচ্ছ প্রকাশভংগী ও শ্লেষবর্জিত সুঠাম রচনাশৈলীর মাধ্যমে হাসান হুস্নী আবদুল ওয়াহ্হাব-এর ঐক্যের বৈচিত্র্যময় রচনাবলী ইতিমধ্যেই বহু যুগের পণ্ডিত ও গবেষকগণকে উদ্দীপিত করিয়াছে। অধিকন্তু এই পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাজলিস-এর প্রভাব বর্তমানেও একই প্রকার শক্তিশালী। এই মাজ্লিস সম্ভবত তিউনিসিয়াতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের শেষ নিদর্শন এবং তাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি বিদ্যায়তন। কয়েক সহস্র খণ্ড পাণ্ডুলিপির যে সংগ্রহ তিনি

তিউনিস জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেন তাহা তাঁহার নামীয় সংগ্রহে প্রদর্শিত এবং জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব অসামান্য (দ্র. হাওলিয়্যাতিুল জামিআ আত-তূনিসিয়্যা, ৭খ. (১৯৭০), ১৩৩-২৭২-এ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা ও আল-ফিকর পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯৬৮), ৮৫-৭, তিউনিসিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের পুরস্কার গ্রহণকালে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণে এই দানের ঘোষণা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত আবদুল ওয়াহ্হাব হাসান হুসনীর জীবনী সম্পর্কে একমাত্র উৎস (১) তাঁহার আত্মজীবনী, প্রধানত তিউনিস-এর দৈনিক আল-আমালে প্রকাশিত, ৮ নভেম্বর, ১৯৬৮; (২) আল-ফিক্র, ডিসেম্বর ১৯৬৮, ১৭-৯৫; (৩) হাওলিয়্যাতুল জামিআ আত-তূনিসিয়্যা, ৬খ. (১৯৬৯), ৩৫-৫৫; (৪) ওয়ারাকাত, ৩খ., ১৯৭২, ১১-২৯; (৫) মুহাম্মাদ মাহ্দী আল্লাম, আল-মাজমাইয়্যুন, কায়রো ১৯৬৬, ৬৬-৮ ও হিলাল নাজী, হাসান হুসনী আবদুল ওয়াহ্হাব, আল আদীব, বৈরূত এপ্রিল ১৯৬৭, আল-ফিক্রে (নভে. ১৯৬৮) পুনঃপ্রকাশিত; (৬) তাঁহার রচনাবলীর জন্য Ch. Bouyahia, ওয়ারাকাত-এর ৩ খণ্ডের সমালোচনা, হাওলিয়্যাত..., ৩খ. (১৯৬৬), ২১৫-২৭, ৪খ. (১৯৬৭), ১৬১-৭০; ১১খ. (১৯৭৪), ২৭৫-৯৪; (৭) ঐ লেখক, হাসান হুসনী আবদুল ওয়াহ্হাব, in হাওলিয়্যাত..., ৬খ.,(১৯৬৯), ৭-৯; (৮) M. Chemli, শাহীরাতুত্-তূনিসিয়া-এ সমালোচনা, হাওলিয়্যাত-এ, ৩খ. (১৯৬৬), ২৮৭-৯২; (৯) Hamzaoui, মাসালিকুল-লুগা মিন খিলাল হায়াত 'আবদিল ওয়াহ্হাব ওয়া আমালিহ্ বিমাজমাইল লুগা আল-আরাবিয়্যা, হাওয়লিয়্যাত-এ, ৪খ. (১৯৬৯), ১১-৩৩; (১০) ঐ লেখক, l'Academie e langue arabe du Caire histoire et ocuvre, তিউনিস ১৯৭৫, ৯৭-৯ ও নির্ঘণ্ট; (১১) সারকীস, মু'জামুল-মাতবূআত কায়রো ১৯২৮, ৭৫৮-৯; (১২) মুহাম্মাদ মাসমূলী, হাসান হুসনী আবদুল ওয়াহ্হাব হালমাতা? আল-ফিক্র-এ (ডিসেম্বর ১৯৬৮), ৩৮-৪২; (১৩) Ch. Klibi, ঐ ৭৬-৮২; (১৪) A Demcerseman, In mcmoriam, in IBLA, ১৯৬৮, নং ২, পৃ. ১-৪।

Ch. Bouyahia-(E.I.²Suppl.)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবদুল ওয়াহ্হাব (عبد الوهاب) ঃ মাওলানা, ১৮৯০-১৯৭৬ খৃ.। প্রখ্যাত আলিম ও আধ্যাত্মিক নেতা, সাধারণত পীরজী হুজুর নামে পরিচিত। তিনি কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্শী আহ্সানুল্লাহ একজন ধর্মভীরু লোক ছিলেন।

নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষ সমাপ্তনের পর তিনি ঢাকার মুহ্সিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশে তিনি দেওবন্দ গমন করেন এবং তথায় হাদীছ ও ফানূনাত (মান্তিক, হিকমাত ইত্যাদি) অধ্যয়ন করেন। প্রসিদ্ধ আলিম আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী হাদীছে তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। প্রসিদ্ধ কারী আবদুল ওয়াহিদ এলাহাবাদী দেওবন্দীর নিকট তিনি ইল্‌মে কিরাআত শিক্ষা করেন। তিনি শারীআতের জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে ইলমে মারিফাত শিক্ষার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দান করেন। এই ক্ষেত্রে ইল্‌ম অর্জনেও ব্রতী হন এবং মাওলানা জাফর আহমাদ উছমানী (র) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। মাওলানা উছমানীর মাধ্যমে উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম ও ওয়ালী মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) হইতেও মারিফাত-জ্ঞান (পত্র-বিনিময় দ্বারা) লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়্যা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। বাংলা ১৩৩৯ সনে তাঁহার প্রচেষ্টায় ঢাকার বড় কাটরায় হুসায়নিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি মুহ্তামিম (অধ্যক্ষ) ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু আলিম দেশ-বিদেশে ধর্মীয় কাজে ব্যাপৃত আছেন। বিদআত, সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা উচ্ছেদে মাওলানার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠার সহিত সুন্নাতের অনুসরণ করিতেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া তিনি একটি অনাড়ম্বর আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৭৬ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে (ঢাকার) আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ২৯৮; (২) মাসিক তাহযীব, ৪র্থ বর্ষ, বিশেষ উলামা স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

মুহাম্মাদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

আবদুল ওয়াহাব (مولنا شاه عبد الوهاب) ঃ মাওলানা, শাহ্ বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুযুর্গ 'আলিম ও শিক্ষাবিদ। ১৩২০/১৯২০ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত রুহুল্লাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল হাকীম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি হাটহাজারী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় লাভ করেন। অতঃপর ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ সাহারানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় উচ্চতর দীনী ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করেন। তবে শেষে দেওবন্দের বিখ্যাত দারুল-উলূম-এ 'আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী প্রমুখের কাছে সর্বোচ্চ হাদীছ ও তাফসীরশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সনদ লাভ করেন।

জাহিরী ইল্‌ম অর্জন করিবার পর তিনি হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর হাতে আধ্যাত্মিক বায়আত হন এবং থানা ভবনে অবস্থিত খানকাহ-ই ইমদাদিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের সাধনা শেষে মাওলানা থানবীর খিলাফাত লাভ করিবার পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ দান করিতে থাকেন। কিছু দিন পর প্রথমে ইহার নায়েব মুহতামিম, অতঃপর মুহতামিম বা পরিচালক নিযুক্ত হন।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অধিক সময় তিনি বাংলা-বার্মা-আসামের সর্বাপেক্ষা বড় দীনী কেন্দ্র হাটহাজারী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা শাহ আবদুল ওয়াহাব মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সহস্রাধিক দীনী মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এবং দীনী তালীম ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নতির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন।

তিনি ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার মানসে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নায়েবে আমীর ও নেজামে ইসলাম পার্টির বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করেন। তদানীন্তন পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তানে ইসলামী হুকূমত ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁহার কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। দেশে-বিদেশের অসংখ্য আলিম ও সাধারণ মানুষ তাঁহার হাতে বায়'আত হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিশিষ্ট খলীফাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিত্ব হইলেন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবদুল-আজীজ, শায়খুল হাদীছ মাওলানা গাযী মুহাম্মাদ ইসহাক, শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবদুল গনী, মুজাহিদ আলিম মাওলানা খাজা সাঈদ শাহ, মাওলানা ফয়যুর রহমান প্রমুখ। ৯ শাবান, ১৪০২/২ জুন, ১৯৮২ সালে বুধবার সন্ধ্যায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা; (২) মুফ্তী ফয়জুল্লাহ/মুফতী ইজহারুল ইসলাম, হায়াত-ই মুফতি-য়ি আজম, কুতুবখানাহে ফায়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; (৩) মাওলানা হাফিজ জুনায়দ, দুরুখসানদাহ সিতারাহ, বাবুনগর মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; (৪) আল-বেদা স্মরণিকা, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; (৫) মাওলানা হাফিজ ফয়য আহমাদ ইসলামাবাদী, তাযকিরা-ই জমীর (র), আনজুমান-ই ইসলাহুয-যমীর, পটিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

আবদুর রহীম ইসলামবাদী

আবদুল ওয়াহিদ (عبد الواحد) ঃ মাওলানা, দারুল উলূম দেওবন্দের অনুকরণে বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন সৃষ্টিকারী বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষাবিদ ও সংস্কারক। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম জেলার হাওলা গ্রামে এক মুন্সেফ পরিবারে জন্ম। চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর ভারতের বিখ্যাত দারুল-উলূম দেওবন্দের মাওলানা ইয়াকূব প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমদের কাছে অধ্যয়ন করিয়া সনদ লাভ করেন।

পরে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল মাওলানা ফাজলুর রাহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদীর হাতে বায়'আত হন এবং খিলাফাত লাভ করেন। কোন কোন লেখকের মতে মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর খিলাফাতও তিনি লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেওবন্দ আন্দোলনের অনুকরণে শিক্ষা ও দীনী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় তিনি বহু ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন এবং ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা ও বিদ'আতের প্রতিরোধের সার্বিক প্রচেষ্টা চালান। ইহার জন্য তিনি একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০১ খৃ. তিনি কতিপয় সুবিজ্ঞ সতীর্থের সহযোগিতায় হাটহাজারীতে দারুল-উলূম মুঈনুল ইসলাম নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। উহাতে সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশে ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে মাওলানার অবদান স্মরণীয়। তাঁহার সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে এই দেশ হইতে অনেক ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি ও আচার-পদ্ধতি বিদূরিত হয় এবং দেশে সুন্নাত তরীকার প্রসার ঘটে। ১৩২৫/১৯০৭ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাফেজ ফয়েয আহমাদ, তাযকিরা-ই যমীর, আনজুমানে ইসলাহুয-যমীর, যমীরিয়া মাদরাসা, পটিয়া, তা.বি., চট্টগ্রাম; (২) মুফতী ফয়যুল্লাহ ও মুফতী ইজহারুল ইসলাম, ফয়যিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, ১৩৯৭ হি., চট্টগ্রাম; (৩) নূর মুহাম্মাদ আযমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি., ঢাকা; (৪) হাফেজ জুনায়েদ, দারাখসিন্দায়ে (দুরুখশিন্দা) সিতারা আযীযুল উলূম মাদ্রাসা, বাবুনগর, ফটিকছড়ি, তা.বি., চট্টগ্রাম; (৫) আল-বিদা স্মরণিকা, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী চট্টগ্রাম ১৯৮২ খৃ.।

আবদুর রহীম ইসলামাবাদী

আবদুল ওয়াহিদ আর-রাশীদ (দ্রঃ আল মুওয়াহ্হিদুন)

'আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আলী (عبد الواحد بن على)ঃ আত্-তামীমী আল-মাররাকুশী আবূ মুহাম্মাদ, ১৩শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে ঘটনাপঞ্জীর একজন মাগরিবী লেখক। জন্ম মার্রাকুশে ৭ রাবীউছ-ছানী, ৫৮১/৮ জুলাই, ১১৮৫। কিছু আত্মচরিত জাতীয় বৃত্তান্ত (Data) ব্যতীত যাহার সাহায্যে আমরা কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া তাঁহার জীবনচরিত সম্পূর্ণ করিতে পারি, তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আমাদের অন্য কোন তথ্য জানা নাই। তিনি বাল্যকালে ফেযের উদ্দেশে নিজ শহর ত্যাগ করেন যেখানে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অবশ্য তিনি স্পেনে যাইবার পূর্বে অনেকবার আল-মুওয়াহ্হিদূন শাসকদের এই রাজধানীতে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ৬০৫/১২০৮-৯ সালে তিনি সেভিলে ছিলেন এবং দুই বৎসরের জন্য কর্ডোভায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কিছু কালের জন্য মাররাকুশে গমনের পর তিনি সেভিলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন যেখানকার আল-মুওয়াহ্হিদ গভর্নর তাঁহাকে স্বীয় চাকুরিতে নিয়োগ করেন। ৬১৩/১২১৭ সালের শেষের দিকে তিনি প্রাচ্য ভ্রমণে বাহির হন এবং এই সূত্রে তিনি ইফ্রীকিয়্যা ও তৎপর মিসর গমন করেন। মনে হয়, তিনি জীবনের শেষ অবধি প্রাচ্যে ছিলেন। তাঁহার নিজ সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি ৬১৭/১২২০ সালে দক্ষিণ মিসরে (Upper Egypt) এবং ইহার তিন বৎসর পর মক্কায় ছিলেন। ৬২১/১২২৪ সালে সম্ভবত বাগদাদে তিনি তাঁহার আল-মুজিব ফী তালখীস আখবারিল-মাগরিব নামক গ্রন্থখানি সংকলন করেন যাহা R. Dozy কর্তৃক "The History of Almohads" (লাইডেন ১৮৪৭, ২য় সং. ১৮৮১) এই শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল (ফরাসী অনু. E. Fagnan, আলজিয়ার্স ১৮৯৩)।

মুজিব গ্রন্থটিতে আল-মাগরিবের মুসলিম ইতিহাস, মুমিনী রাজত্বকাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থকার আল-মুওয়াহ্হিদুন রাজত্বকালের সরকারী ঘটনাবলীর উপর নির্ভর না করিয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই এই রাজবংশের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় এই বংশের প্রাথমিক যুগের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার কাছে আন্দালুসীয় ঘটনাপঞ্জী-লেখক ও হাদীছশাস্ত্রবিদ আল-হুমায়দীর কিছু গ্রন্থ ছিল। আবদুল ওয়াহিদের গ্রন্থখানি সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস, বিশেষত স্পেনে মুলূকুত্-তাওয়াইফ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র)-এর শতাব্দী কালব্যাপী শাসনামলের সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদানে ভরপুর হওয়ায় উহার মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Pons Boigues, Ensayo biobibliografico, 413; (২) Brockclmann, ১খ., ৩৯২, পরিশিষ্ট, ১খ., ৫৫৫।

আবদুল করিম (عبد الكريم) ঃ মওলবী, (১৮৬৬-১৯৪৩)। ইতিহাস লেখক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ। জন্ম পাঠানটুলা, সিলেট। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৮৬ সনে ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর প্রথমে সহকারী স্কুল পরিদর্শক ও পরে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিভাগীয় পরিদর্শক ছিলেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রথম স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন ফেলো ও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও আরবী ভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তৎপ্রণীত 'ভারতবর্ষে মুসলামান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) বহুদিন প্রচলিত ছিল। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ 'মক্তব ও মাদরাসার বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ও তাহার সংস্কার'; Hints on English pronunciation; Hints on class management and method of teaching; Islam : Universal Religion of peace and progrees; History of Hindu-Muslim Rait. তিনি শ্রীহট্ট ছাত্র সম্মেলনে (১৯১৯), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি লীগ সম্মেলনে (১৯৩০), সুরমা উপতাকা রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মেলনে (১৯২০) ও কলিকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটির (১৯২৮) বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি কাউন্সিল অব স্টেট-এ বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিতেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তিনি তাঁহার ৫০ হাজার টাকার দুইটি বাড়ী দান করেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় বাস করিতেন। রাঁচিতে ইন্তিকাল করেন (১৯৪৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬, পৃ. ৩৯; (২) বাংলা একাডেমী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮৫, পৃ. ১৯; (৩) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১৫৬।

E. Levi-Provencal (E. I.²)/মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আবদুল করীম (عبد الكريم) ঃ সাহিত্য বিশারদ, ১৮৭১-১৯৫৩ খৃ. চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনশী নূরুদ্দীন এবং পিতামহের নাম মুহাম্মাদ নবী চৌধুরী। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা কাদির রাজার বংশ নামে খ্যাত। শেখ জাতীয় মল্ল বংশের আদি পুরুষ হাবিলাস মল্ল এক সময়ে চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক দ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহারই নামানুসারে এই দ্বীপের নাম হয় হাবিলাস। কয়েক পুরুষ পরে এই বংশেরই আবদুল কাদির ওরফে কাদির রাজা হাবিলাস দ্বীপ হইতে সুচক্রদণ্ডীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারই পৌত্র আবদুল করীমের পিতামহ মুহাম্মদ নবী চৌধুরী। আবদুল করীমের জন্মের আগেই তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করেন। শৈশবে আবদুল কারীম পিতামহ, পিতামহী, মাতা ও চাচার আদরে লালিত হন। তাঁহার দাদার বর্তমানে পিতার মৃত্যু হয় বলিয়া সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই পিতামহ মুহাম্মদ নবী চৌধুরী তাঁহার অপর পুত্র মুন্‌শী মুহাম্মদ আয়নুদ্দীন চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মাত্র এগার বৎসর বয়স্ক আবদুল করীমের বিবাহ দেন। ইহার পাঁচ বৎসর পর আবদুল করীমের মাতা ইন্তিকাল করেন।

শৈশবে আবদুল করীম বাড়ীতে আরবী পড়েন এবং পরে গ্রামের মধ্যবঙ্গ ইংরেজী স্কুলে বাংলা শিখেন। অতঃপর পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এফ. এ. পড়িবার জন্য চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন। দুই বৎসর লেখাপড়া করার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা না দিয়াই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়।

এই সময় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে কিছুদিন চাকুরী করার পর সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলে অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিন পরে তিনি চট্টগ্রাম প্রথম সাব-জজের আদালতে শিক্ষানবীশ (এপ্রেন্টিস) পদে যোগ দেন। ১৮৯৭ সালে তিনি দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালতে বদলি হইয়া পটিয়া গমন করেন।

বাল্যকাল হইতেই আবদুল করীমের পুঁথিপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি পাঠে গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় হইতেই পত্রিকাদি পাঠে মন দেন এবং নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি হোপ' (The Hope), 'প্রকৃতি' ও 'অনুসন্ধান' নামক দুইখানি বাংলা সাপ্তাহিক এবং একখানি মাসিক পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁহার জীবনে একমাত্র শখ ছিল সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক হওয়া। সাময়িক পত্রিকার জন্য তিনি এত উৎসাহী ছিলেন যে, কোথাও হইতে কোন অর্থ পাইলেই তিনি নূতন পত্রিকার গ্রাহক হইতেন, এমনকি এক সময়ে তিনি একই সংগে চল্লিশখানি পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রিকা সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন।

আবদুল করীমের সাহিত্যিক জীবনে পত্রিকা পাঠের মতই আরও একটি শখ ছিল পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও ইহার তথ্য অনুসন্ধান করা। তিনি পুঁথি সংগ্রহের এই অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতামহ মুহাম্মদ নবী চৌধুরীর কাছে। পিতামহ কিছু হাতের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইগুলি দেখিয়াই আবদুল করীমের দৃষ্টি প্রাচীন সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি এই সাহিত্যের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এই গবেষণাই তাঁহাকে উত্তরকালে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়ক হয়।

পিতামহের সংগ্রহ হইতে চণ্ডীদাসের কিছু পদ সংকলিত করিয়া 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' শিরোনামে অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কবি নবীন চন্দ্র সেন তখন আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব আজীবন অক্ষুণ্ন ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি আলো পত্রিকায় আলাওল গ্রন্থাবলীর কাল নির্ণয় শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। শরৎচন্দ্র দাস তাঁহার এই প্রবন্ধটি পড়িয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এই তরুণ কালে একজন যশস্বী লেখক হইতে পারিবেন।

তিনি যখন পটিয়ায় দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালতে চাকুরী করিতেছিলেন, তখন নবীন চন্দ্র সেন কমিশনারের পার্সনাল এসিস্ট্যান্ট হইয়া চট্টগ্রামে বদলি হন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন এবং আবদুল করীমের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তাই তিনি আবদুল করীমকে কমিশনার অফিসে এ্যকটিং ক্লার্করূপে বদলি করাইয়া আনিলেন। ১৮৯৮ সালে আবদুল করীম এখানে যোগদান করেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল! নবীন চন্দ্রের ঈর্ষান্বিত বিরোধী দল তাঁহাকে কুমিল্লায় বদলি করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল করীমের চাকরীও গেল।

এই সময় চট্টগ্রামের আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়। আবদুল করীম সেই চাকুরী লাভ করেন এবং সাত বৎসর সেখানে বহাল থাকেন। তাঁহার মতে এইখানেই তাঁহার চাকুরী ও সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ কাটে। তখনকার দিনে এমন কোন সাময়িক পত্র ছিল না যাহাতে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয় নাই। এমনকি এককালে তাঁহার লেখা প্রায় ৩০ খানি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তাঁহার বহু লেখা 'সাহিত্য', 'সাহিত্য সংহতি', 'সুধা', 'পূর্ণিমা', 'অর্চনা', 'ভারত-সুহৃদ', 'অবসর' 'আলো', 'প্রদীপ', 'বীরভূমি', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রকৃতি', 'আরতি', 'আশা', 'জ্যোতি', 'নবনূর', 'কোহিনূর', 'ইসলাম প্রচারক', 'এডুকেশন গেজেট' ইত্যাদি পত্রিকায় ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আবদুল করীম কতকগুলি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় 'নবনূর' প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। পরে সৈয়দ এমদাদ আলী অসুস্থ হইয়া পড়িলে আবদুল করীমের সম্পাদনায়ই ইহা বাহির হয়। 'সওগাত' পত্রিকাও তিনি কিছুদিন সম্পাদনা করেন। 'পূজারী' নামক একটি পত্রিকা ও চট্টগ্রামে 'সাধনা' পত্রিকাও তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করেন। 'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদনার সহিতও তিনি জড়িত ছিলেন।

সাহিত্য অনুশীলনীর ক্ষেত্রে আবদুল করীমের প্রধান কীর্তি পুঁথিপত্র ও প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকদের বিবরণ সংগ্রহ। তিনি এই কাজে নিরলস পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। পুঁথি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে।। কিন্তু কোন প্রতিকূলতাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, বিশেষত মুসলিম বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি লিখিবার জন্য আবদুল করীমের মূল্যবান সংগ্রহ ভবিষ্যৎ গবেষককে পথ নির্দেশ করিতে সহায়ক হইবে। তাঁহার কর্মস্পৃহা, উদ্যম ও উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি যখনই কোন পুঁথি পাইতেন, তখনই তাহা পড়া শুরু করিয়া দিতেন এবং তাঁহার পরিচায়িকা লিখিয়া রাখিতেন। কোন পুঁথি মূল্যবান মনে হইলে সেই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। এইভাবে সারা জীবন ধরিয়া এক একটি করিয়া পুঁথি পরিচায়ক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক পরিচায়ক মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রবেশদ্বারের কৃত্তিকা ও প্রদীপস্বরূপ।

তিনি তাঁহারই সংগৃহীত প্রায় ছয় শত হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দিয়া গিয়াছেন। এইগুলি পণ্ডিতদের সম্পাদনায় কোনদিন প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হইবে। আবদুল করীমের প্রচেষ্টায় যথোপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদানের সম্যক মূল্যায়ন সম্ভবপর হইয়াছে। বাংলার মুসলিমদের যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল, তাঁহাদেরও যে নিজস্ব ঐতিহ্য-চেতনা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ছিল, তাহা আবদুল করীমই অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার বলে বিশ্বের দরবারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ব্যক্তি জীবনে বহু ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং আজীবন অসচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়াও তিনি ছিলেন তাঁহার সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। বস্তুত আবদুল করীরেম কর্মোদ্যমের উৎসই ছিল ঐতিহ্যবোধ ও সংস্কৃতিপ্রীতি এবং তাঁহার লক্ষ্য ছিল সেই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।

১৯০৬ সালে চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টর মৌলবী আবদুল করীমের সহায়তায় আবদুল করীম ইনসপেক্টর অফিসে কেরানীর চাকুরী লাভ করেন। ইহার পর তিনি আর চাকুরী পরিবর্তন করেন নাই। ২৮ বৎসর এইখানে চাকুরী করিয়া ১৯৩৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরও আমৃত্যু তিনি সাহিত্য সংগ্রহ ও সাহিত্য অনুশীলনীর কাজ নিরলসভাবে করিয়া যান।

বাংলার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। আর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তাঁহার সহযোগিতায় লাভবান হইয়াছে। তাঁহার উৎসাহে অনেক শিক্ষিত তরুণ সাহিত্য সেবায় মন দিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

আবদুল করীমের রচিত নিজস্ব কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা মৌলিক গ্রন্থ নাই। তিনি প্রাচীন কবিদের অনেক পুঁথি সম্পদনা করিয়াছেন। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' তিনি ও ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক দুইজনেই মিলিতভাবে রচনা করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু গবেষণা করিয়াছেন তাহাই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনা প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি সেইগুলি গুছাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশের অবকাশ পান নাই। কিন্তু মৌলিক রচনা না থাকিলেও তাঁহার সম্পাদিত পুঁথিপত্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। এই সকলের মধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম গবেষণা শক্তি, অপরিসীম সাধনা ও গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনায় যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব রহিয়াছে তাহাতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই।

কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে এই বারখানি 'পুঁথি সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত হয়ঃ (১) রাধিকার মানভঙ্গ-নারায়ণ ঠাকুর, ১৯০১ খৃ.। (২) বাঙ্গালী প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১খ., ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ; (৩) ঐ, ১খ., ২য় সংখ্যা, ১৩২৩; (৪) সত্য নারায়ণের পুঁথি কবি বল্লভ, ১৩২২; (৫) মৃগলুব্ধ-দ্বিজ রতি দেব. ১৩২২; (৬) মৃগলব্ধ সংবাদ-রাম রাজা, ১৩২২; (৭) গঙ্গা মঙ্গল-দ্বিজ মাধব, ১৩২৩; (৮) জ্ঞান সাগর-আলীরাজা ওরফে কানু ফকীর, ১৩২৪; (৯) শ্রী গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-বাসুদেব ঘোষ, ১৩২৪; (১০) সারদা মঙ্গল-মুক্তরাম সেন, ১৩২৪; (১১) গোরক্ষ বিজয়-শেখ ফয়জুল্লাহ্, ১৩২৩; (১২) আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৩২৫।

'ইসলামাবাদ' গ্রন্থখানি সৈয়দ মুর্তজা আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আবদুল করীমের সংকলিত পুঁথি পরিচিতি' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল করীম কর্তৃক প্রদত্ত 'বাংলা পুঁথির পরিচায়িকা' প্রকাশ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত লুপ্ত খনির সন্ধান সুধী সমাজে তুলিয়া ধরে। গ্রন্থখানির একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রকাশ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও তিনি পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'পুঁথি পরিচিতি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেইগুলির শিরোনাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবদুল করীমের সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য পদে বরণ করে এবং এক সময় তিনি ইহার সহ-সভাপতির পদও অলংকৃত করেন। পরিষদের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ সালে এই সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন মূল সভাপতি। ১৯০৯ সালে চট্টগ্রামের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁহাকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করে। ইহার পর নদীয়ার সাহিত্য সভা তাঁহাকে 'সাহিত্য সাগর' উপাধি প্রদান করে। তিনি তৎকালীন শিক্ষিত জনগণের কাছে যে স্বীকৃতি ও সম্মান পাইয়াছেন তাহার তুলনায় এই সকল উপাধি অতি নগণ্য। বাঙ্গালী সুধী সমাজে তিনি সাহিত্য বিশারদ নামেই পরিচিত।

আবদুল করীমের অবস্থা কোনদিন সচ্ছল ছিল না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন তাঁহার শরীরও কোনদিন খুব ভাল থাকে নাই। তিনি দারিদ্র্যের নিপীড়নে অনেক সময় অনেক কষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু কোন দিনই ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই এবং সাহিত্য সাধনা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। সাহিত্য সাধনায় রত থাকিয়া ধনোপার্জনের লোভকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি খুবই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, ইহাতে বিলাস ব্যসনের কোন স্থান ছিল না। তিনি প্রকৃত পণ্ডিতের মতই সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মুতাবিক ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১৩ আশ্বিন এই কালজয়ী মহাপুরুষ ইন্তিকাল করেন। মরণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) পুঁথি পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৫৮; (২) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলিকাতা ১৩০৯, ১৩১২; (৩) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৯৬৫; (৪) ধারণী, ঢাকা ১৯৭৯; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ., ১৫৬, ঢাকা ১৯৭৫; (৬) ড. দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯২৬; (৭) ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৪৩; (৮) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪খ., ঢাকা ১৯৬৮; (৯) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৫৬; (১০) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা ১৯৬৪।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

আবদুল করীম, শাহ মুহাম্মাদ (عبد الكريم شاه محمد)ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের একজন মুহাক্কিক আলিম, সূফী সাধক, লেখক ও হক্কানী পীর। জন্ম ১৮৫২. খৃ. যশোহর শহরের উপকণ্ঠে খড়কী (পূর্ব নাম খিড়কী) নামক মহল্লায় এক পীর খান্দানে। তাঁহার পূর্বপুরুষ শাহ্ সূফী সুলতান আহমাদ মুগল সম্রাট আকবারের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) দিল্লী হইতে যশোহর আগমন করেন। চাঁচড়া (যশোহর)-র তদানীন্তন রাজা তাঁহাকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। তিনি রাজবাড়ীর খিড়কী এলাকায় খানকাহ স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তথায় গড়িয়া উঠে এক জনবহুল জনপদ। সূফী সুলতান আহমাদের অধস্তন ৫ম পুরুষে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা শাহ্ মুহাম্মাদ সালীমুদ্দীন চিশ্তীও একজন কামিল দরবেশ ছিলেন।

আবদুল করীম শিশুকালেই পিতৃহারা হন। তিনি তাঁহার দাদা শাহ্ কালীমুদ্দীন চিশ্তী (র)-এর তত্ত্বধানে লালিত-পালিত হন। দাদার নিকট দীনী ইলমের প্রাথমিক তালীম গ্রহণ করিয়া স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার দাদা ইন্তিকাল করেন। তিনি কলিকাতা যাইয়া মাদরাসা আলিয়ায় ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সহিত জামা'আতে উলার পরীক্ষা পাশ করেন। মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি জেলা স্কুলে হেড মৌলবী হিসাবে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিবার পর তাঁহার হৃদয় ইলমে তাসাওউফ শিক্ষা লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠে। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের হুঁশিয়ারপুর জেলায় অবস্থিত মৌজা কোট আবদুল খালিক নামক স্থানের প্রখ্যাত সূফী সাধক ও পীর শামসুল কাওনায়ন খাওয়াজা আবূ সা'দ মুহাম্মাদ আবদুল খালিক-এর নিকট মুরীদ হইয়া তাসাওউফ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তিনি সুদীর্ঘ বার বৎসর কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করেন এবং ইলমে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পীর তাঁহাকে নকশবান্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, কাদিরিয়া, চিশ্তিয়া ও সুহ্রাওয়ার্দিয়া তরীকার খিলাফত প্রদান করিয়া স্বদেশে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দান করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করার পরপরই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হাজার হাজার মানুষ আসিয়া তাঁহার নিকট মুরীদ হইতে থাকে। অনেক বিধর্মী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তিনি সমাজের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট শির্ক, বিদ্আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় কর্মবীর মুন্শী মোহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ্ সামাজিক কুসংস্কার, এক শ্রেণী হিন্দুদের অপপ্রচার ও খৃষ্টান মিশনরীদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নম্র ও বিনয়ী ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করিত। তিনি যশোহর, খুলনা, রংপুর, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি খানকাহ্ ও মসজিদ স্থাপন করেন।

মাওলানা আবদুল করীম একজন সুসাহিত্যকও ছিলেন। তিনি এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব নামক তাসাওউফের একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯ খৃ., পৃ. সংখ্যা ২৯৮। ইহাতে তিনি তাসাওউফের জটিল দার্শনিক তত্ত্বের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সম্ভবত

বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থখানিই তাসাওউফ সম্পর্কিত সুলিখিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৭৫ খৃ., প্রকাশক তাঁহার পৌত্র পীর শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুল মতীন।

শাহ্ আবদুল করীম ১৯১৫ খৃ. ১৬ ডিসেম্বর খড়কীস্ত তাঁহার নিজ খানকাহে ইন্তিকাল করেন এবং সংলগ্ন পারিবারিক কবরগাহে সমাহিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাহ মোহাম্মাদ আবুল খায়ের, সন্ধানে, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৫; (২) সূফী গুলাম সিদ্দী, তুহ্‌ফা-ই বাংগালা (উর্দূ), লাহোর ১৯২০; (৩) আলী শাহ্, ইন্‌তিখাব মাছনাবী শরীফ (উর্দূ), লাহোর; (৪) প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল হাই প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৩, ঢাকা; (৫) মুহম্মাদ আবূ তালিব, মুন্‌শী মোহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ্ ঃ দেশ-কাল-সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৪।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

'আবদুল-কাদির (عبد القادر) ঃ স্যার, শায়খ উর্দূ ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও উপ-মহাদেশের বিশিষ্ট আইনবিদ, ১৮৭৪ খৃ. লুধিয়ানায় (পাঞ্জাব, ভারত) জন্ম। এইখানে তাঁহার পিতা শায়খ ফাতহুদ্দীন অর্থ বিভাগে চাকুরীরত ছিলেন। তাঁহার পিতৃভূমি কাসূরে (জেলা লহোর, পাকিস্তান) তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯০ খৃ. লাহোরের এম.বি. হাই স্কুল (বর্তমানে সেন্ট্রাল মডেল হাই স্কুল) হইতে এন্ট্রাস এবং ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ফোরম্যান ক্রিশ্চীয়ান কলেজ, লাহোর হইতে বি.এ. পাশ করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া কিছুদিন মন্টগোমারী (বর্তমানে সাহীওয়াল)-তে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু ছাত্রজীবন হইতেই সাংবাদিকতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তাই শীঘ্রই লাহোরে আসিয়া The Punjab Observer-এর সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন (১৮৯৫ খৃ.)। ১৮৯৮ খৃ. তাঁহাকে প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ১৯০১ খৃ. তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'মাখ্‌যান' চালু করেন। এই সময়েই কিছুকাল তিনি ইসলামিয়া কলেজে (লাহোর) অধ্যাপনার দায়িত্বও পালন করিতে থাকেন। ১৯০৪ খৃ. শায়খ 'আবদুল-কাদির আইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত চলিয়া যান। ১৯০৭ খৃ. তিনি বার-এট-ল. ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইউরোপ ভ্রমণ করিতে করিতে দেশাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি কিছু দিন তুরস্কেও অবস্থান করেন। সেইখানে তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া সুল্‌তান আবদুল হামীদ তাঁহাকে হামীদিয়া পুরস্কার প্রদান করেন। (এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত মাখ্‌যানের সাহিত্য বিভাগে তাঁহার বিভিন্ন নিবন্ধে, উপরন্তু তাঁহার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা মাকাম-ই খিলাফাতে দ্রষ্টব্য)। দেশে ফিরিয়া তিনি দিল্লীতে ওকালতি শুরু করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতেও মাখ্‌যান চালু ছিল। এখন উহা দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া তাঁহার আনুকূল্যে শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম-এর তত্ত্বাবধানে তামাদ্দুন পত্রিকাও চালু করা হয়। ১৯০৯ খৃ. তিনি লাহোর চলিয়া যান এবং আইন পেশায় বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৯১১ খৃ. তাঁহাকে সরকারী উকীল নিযুক্ত করা হয়। লায়ালপুরে আট বৎসর তিনি এই পেশায় নিয়োজিত থাকেন। এইখানে তাঁহার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে তিনটি নূতন হাই স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯২০ খৃ. পুনরায় তিনি লাহোরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২১ খৃ. তিনি লাহোর হাই কোর্টের জর্জ নিযুক্ত হন; কিন্তু শীঘ্রই চাকুরী ছাড়িয়া রাজীনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯২২ খৃ. পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য, ১৯২৩ খৃ. সহ-সভাপতি এবং ১৯২৪ খৃ. সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৫ খৃ. পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী এবং ১৯২৬ খৃ. League of Nations-এর ৭ম অধিবেশনে ভারতের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯২৭ খৃ. অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্সের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। এই বৎসরই তাঁহাকে রাজস্ব সদস্য নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৮ খৃ. তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। ১৯২৯ খৃ. তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর সদস্য এবং ১৯৩০ খৃ. লাহোর হাই কোর্টের এডিশনাল জজ নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খৃ. ইংল্যান্ডের ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি লন্ডন যান। সেইখানে তিনি পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। ১৯৩৯ খৃ. তাঁহাকে ভারতের ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১৯৪২ খৃ. তিনি ভাওয়ালপুর হাই কোর্টের চীফ জাস্টিস পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ খৃ. এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ১৯৪৮ খৃ. মাখ্‌যান পুনরায় চালু হয়। এই সময়েই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দূ সাহিত্যে এম. এ. ক্লাস চালু হয়। তখন তিনি অবৈতনিকভাবে এই বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তিনি ১৯৫০ খৃ. ৯ ফেব্রুয়ারী ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও নীতিবান লোক ছিলেন। এই কারণেই তাঁহার বাসস্থান (দিলকুশা, টেম্বল রোড, লাহোর) ছিল বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি সকলেরই মিলনকেন্দ্র। তাঁহার জীবন সঙ্গিনীও উর্দূর উন্নতি ও ব্যাপক প্রচলনের ব্যাপারে সজীব আগ্রহ পোষণ করিতেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে শায়খ মানজূর কাদির পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা আইনবিদ। তিনি লাহোর হাই কোর্টের চীফ জাস্টিস এবং এক সময় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীও ছিলেন।

শায়খ আবদুল কাদির বিভিন্ন কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আজীবন উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের খিদমত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খৃ. 'মাখ্‌যান' পত্রিকা চালু করেন। ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত কার্যত উহার প্রধান সম্পাদক এবং ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। উর্দূ সাহিত্যকে মাখ্‌যান এক নূতন শৈলীর সহিত পরিচিত করিয়া তোলে। উহার লেখকদের অধিকাংশই পরে দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যক হিসাবে পরিগণিত হন। সেই সকল সাহিত্যিকের রচনা 'ইন্‌তিখাব-ই মাখ্‌যান'-এ প্রকাশিত হয়।

শায়খ আবদুল কাদির-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা ঃ (১) মাকাম-ই খিলাফাত, যাহা ইসলামী রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া তুরস্কের সফরনামাহ; (২) The New School of Urdu Literature, লাহোর ১৮৯৮ খৃ. (৩য় সংস্করণ, শিরোনামঃ (Famous Urdu Poets and Writers in 19th Century); হালী, আযাদ, নাযীর আহমাদ-সারশার ও শারার-এর উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ; (৩) তীন আফ্‌সানে (অর্থাৎ 'তাজদার বীবী কা বেতাজ শাওহার', ওয়াতান আখির ওয়াতান হায়; দিলহী তু হ্যায়), তাসাদ্দুক হুসায়ন তাজ, হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) সংকলিত ১৯৩৮ খৃ.; এদ্ব্যতীত তাঁহার বহু সংখ্যক রচনা বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উহার মধ্যে পঞ্চাশেরও অধিক রচনা মাখ্‌যান-ই আদাব' (ফীরোয সন্স, লাহোর)-এ চয়ন করা হয়। তিনি বহু গ্রন্থের ভূমিকা ও মুখবন্ধও লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ইকবালের বাঙ্গ-ই দারা ও হাফীজ জালান্ধারীর শাহ নামাহ-ই ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকটি সাহিত্যিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা ও বহু শিক্ষা কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। তিনি মুসলমানদের প্রসিদ্ধ শিক্ষা সংগঠনসমূহের (যথা মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স, আঞ্জুমান-ই হিমায়াত-ই ইসলাম-এর সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক, উদ্যোগী ও কর্মতৎপর সদস্যও ছিলেন; বহুদিন পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন।

শায়খ আবদুল কাদির উর্দূ গদ্যকে সহজ, সরল ও গতিশীল পদ্ধতিতে তুলিয়া ধরেন, অধিকন্তু উর্দূ ভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর দাপটকে প্রতিরোধ করেন, সাংবাদিকতার সিংহ দরজা খুলিয়া দেন এবং নিজে লিখিয়া আমাদের সারা বিশ্বে জ্ঞানের যে উপাদান ছড়াইয়া রহিয়াছে কিভাবে উহা একত্র করিয়া নিজেদের জন্য একটি সোনালী প্রাসাদ নির্মাণ করিতে পারি— তাহার পথ নির্দেশ করেন (সালাহ উদ্দীন আহমাদ, আবদুল কাদির, এক সাহিব-ই তারয ইনশাপারদায)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাক্সীনা, তারীখ-ই আদাব-ই উর্দূ, অনুবাদ, মীর্যা মুহাম্মাদ আসকারী, ২য় সংস্করণ, গদ্যাংশ, পৃ. ৮৬, ৮৭; (২) বাড়কা বাচপান, লাহোর হইতে প্রকাশিত; (৩) মুহ্‌য়িদ্দীন কাদির, যোর উর্দূ কে আসালীব-ই বায়ান; (৪) সালাহুদ্দীন আহ্‌মাদ, আদাবী দুন্‌য়া, লাহোর, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ খৃ.; (৫) আওরাক-ই নাও, লাহোর (স্যার আবদুল কাদির নাম্বার); (৬) শায়খ মুহাম্মাদ নাসীর হুমায়ূন, শায়খ স্যার আবদুল কাদির, লাহোর ১৯৬০; (৭) সাফিয়্যা নাকাবী, উর্দূ আদাব উনীসাবী সাদী মে, মাকালা-ই এম. এ. (উর্দূ), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাঞ্জাব; (৮) আজহার মুহাম্মাদ খান, স্যার আবদুল কাদির, মাকালা-ই এম. এ. উর্দূ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাঞ্জাব।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল কাদির আল-কুরাশী (عبد القادر القرشى) ঃ পূর্ণ নাম মুহ্‌য়িদ্দীন আল-কাদির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসরুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন অবিল-ওয়াফা হানাফী, ফিক্‌হশাস্ত্রের মিসরী অধ্যাপক ও জীবনীকার। জন্ম শাবান ৬৯৬/মে-জুন ১৯৯৭, মৃত্যু ৭ রাবী-১, ৭৭৫/২৭ আগস্ট, ১৩৭৩।

বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হানাফী শাস্ত্রবিদগণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়া ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যা (হায়দরাবাদ ১৩৩২/১৯১৩-৪) সংকলনের জন্য তিনি সমধিক খ্যাত। ইহা একটি মূল্যবান হাওয়ালা (reference) গ্রন্থ। এই বিশেষ বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণত ইহাকেই প্রথম গ্রন্থরূপে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। যেই দেশে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন সেইখানে হানাফী মায্‌হাবের প্রতিনিধিত্ব দুর্বল ছিল এবং যেই সময়ে রচনা করেন তাহাও ছিল এই মায্‌হাব পুনর্জাগরণের ঠিক পূর্ব যুগ। ইহাতে তথ্য কম থাকিলেও পারস্যের বিভিন্ন স্থানীয় ইতিহাস হইতে সংগৃহীত উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আবদুল কাদির ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর একখানি জীবনী গ্রন্থ (আল-বুসতান ফী মানাকিব ইমামিনা আন্-নু'মান (Duw-এ ব্যবহৃত, ১খ., ২৬ প.) রচনা করেন। ৬৯৬/১২৯৭ ও ৭৬০/১৩৫৯ সালের মধ্যে ইন্তিকাল করিয়াছেন— এমন বিখ্যাত ব্যক্তিগণের আর একটি জীবনী গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তাঁহার অন্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আইন বিষয়ক সাধারণ পাঠ্য বই, টীকা ও নির্দেশিকা গ্রন্থ। (তাঁহার গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য ইব্‌ন কুতলুবুগা, সম্পা. Flugel, পৃ. ২৮ ও ইব্‌ন তূলূন দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ii, 96 f., S II, 89। অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (২) ইব্‌ন হাজার, ইনবা সটীক ৭৭৫; (৩) ইব্‌ন তূলূন, গুরাফ [পাণ্ডুলিপি শেলুদ (Shelud) 'আলী ১৯২৪, পত্র ১৪১ খ., ১৪২ ক] ও ইবনুল ইমাদ, শাযারাত, ৬খ., ২৩৮। তাঁহার জীবন ও কর্মের জন্য দ্র. (৪) Djaw, যথা ১খ., ২১, ৯৩ প., ২৯২, ৩০৪, ৩২৩, ৩৪৬, ৩৫৩, ৩৬৭; ২খ., ১২১, ১২৭, ১৮৭, ২০৪, ২২৯ প., ৪২৮, ৪৩১ প., ৪৪০, ৪৪৪, ৪৪৫ প.।

F. Rosenthal (E. I.²)/হুমায়ুন খান

'আবদুল কাদির আল জীলানী (عبد القادر الجيلانى) ঃ বা আল-জীলী (র), পূর্ণ নাম মুহ্‌য়িদ্-দীন আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী সালিহ জংগী দোস্ত। ইনি একজন খ্যাতিমান সূফী ও ধর্ম প্রচারক, তাঁহার নামে কাদিরিয়া তরীকার নামকরণ হইয়াছে। ৪৭০/১০৭৭-৮ সনে জন্ম ও ৫৬১/১১৬৬ সনে মৃত্যু। তাঁহার জীবনচরিতগুলি বিবিধ কাহিনীতে পরিপূর্ণ— তবে তাহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পিতৃকুলে তিনি মহানবী (স)-এর দৌহিত্র হাসান (রা)-এর সরাসরি বংশধর ছিলেন বলিয়া দাবি করা হয়।

'আবদুল্লাহ্ আস্-সাওমাঈর কন্যা ফাতিমা তাঁহার জননী ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাঁহারা দুইজনই দরবেশ ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নাম বলা হইয়াছে নীফ বা নায়ফ; উহা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে জীলান এলাকায় অবস্থিত। আঠার বৎসর বয়সে তিনি পড়াশুনার জন্য বাগদাদে প্রেরিত হন। সেইখানে প্রথমে মাতাই তাঁহার খরচপত্র চালাইতেন। তিনি তাব্‌রীযী (মৃ. ৫০২/১১০৯)-র নিকট ভাষাতত্ত্ব ও কয়েকজন শায়খ বা উস্তাদের নিকট হাম্বালী (মতান্তরে শাফিঈ) ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তিনি সাধারণত হিবাতুল্লাহ্ আল-মুবারাক ও আবূ নাস্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্-বান্নার মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছ উদ্ধৃত করেন। তাঁহার ৪৮৮/১০৯৫ ও ৫২১/১১২৭ সনের মধ্যবর্তীকালীন জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায়, এই সময় তিনি সম্ভবত হজ্জ সম্পন্ন করেন, বিবাহও করেন। কারণ তাঁহার পুত্র-কন্যার মধ্যে একজনের জন্ম ৫০৮/১১১৪-৫ সনে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কবরের খাদেম ছিলেন। আবুল খায়র হাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম আদ্-দাব্বাস (মৃ. ৫২৩/১১৩১)-এর নিকট তিনি সূফীবাদ শিক্ষা করেন। দরবেশ বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি থাকায় আল্লামা শা'রানীর তালিকায় তাঁহার নাম আছে। এক সাক্ষাৎকারে ইনি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেই আবদুল কাদির সূফী মতে দীক্ষিত হইয়া পড়েন বলিয়া প্রকাশ। আবুল খায়রের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাঁহার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হয়। আবুল খায়রের খান্‌কাহ্‌র মধ্যে একজন ফকীহ্ ব্যক্তির অনুপ্রবেশ অন্যান্য শিক্ষারত সাধকের ক্ষোভ

প্রকাশের কারণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিছুকাল পরে আবদুল কাদির সূফী পরিচ্ছদ (খিরকা) লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। বাগদাদের বাবুল আযাজ্-এর নিকট হাম্বালী ফিক্‌হের একটি মাদ্‌রাসা ছিল। সেই মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ কাদী আবূ সা'দ মুবারাক আল-মুখাররিমী তাঁহাকে খির্কা দান করেন। ৫২১/১১২৭ সনে সূফী ইয়ূসুফ আল-হামাযানী (৪৪০/৫৩৫/১০৪৮-১১৪০)-র উপদেশে তিনি প্রকাশ্যে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা ছিল অল্প। ক্রমশ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বাগদাদের হাল্‌বা দ্বারের বক্তৃতাকক্ষে আসন গ্রহণ করেন কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলায় তাঁহাকে দরজার বাহিরে যাইতে হয়। সেইখানে তাঁহার জন্য একটা রিবাত (খানকাহ্) নির্মিত হয়। ৫২৮/১১৩৩-৪ সনে জনসাধারণের চাঁদায় পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাগুলি মুবারাক আল-মুখাররিমীর (সম্ভবত তখন মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত) মাদ্‌রাসার এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আবদুল কাদিরকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কার্যপ্রণালীর প্রকৃতি ছিল সম্ভবত জামালুদ্দীন আল-জাওযীর অনুরূপ। ইব্‌ন জুবায়র তাঁহার অতি সুস্পষ্ট বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। শুক্রবার প্রাতে ও সোমবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার মাদ্‌রাসাতে ওয়াজ করিতেন, রবিবার প্রাতে করিতেন তাঁহার খানকায়। তাঁহার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে দরবেশ বলিয়া প্রসিদ্ধি, কেহ বা (যেমন জীবন-চরিত লেখক সাম'আনী) অন্যরূপ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণে অনেক ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ইসলামে দীক্ষিত হয় বলিয়া কথিত আছে। অনেক মুসলমানও ইহাতে উচ্চতর জীবন লাভ করেন। বহু স্থানে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সেই সকল স্থান হইতে তাঁহার নিকট প্রায়ই প্রচুর নযর-নিয়ায আসিত। ইহা দ্বারা তাঁহার ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করা হইত। দেশের সকল অংশ হইতে তাঁহার নিকট শার'ঈ মাস্‌আলা সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রেরিত হইত। তিনি সংগে সংগেই এইগুলির উত্তর দিতেন বলিয়া কথিত আছে। খলীফাগণ ও উযীরগণ তাঁহার ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

'আবদুল কাদির (র)-এর সমস্ত গ্রন্থই ধর্ম সংক্রান্ত এবং প্রধানত তাঁহার ধর্মাপদেশ বা বক্তৃতা সম্বলিত। তাঁহার নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির কথা জানা যায়ঃ(১) আল্-গুন্‌য়া লিতালিবি তারীকিল-হাক্‌ক, ধর্মানুষ্ঠান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক (কায়রো ১২৮৮ হি.); (২) আল-ফাত্‌হুর-রাব্বানী, ৫৪৫-৫৪৬/১১৫০-১১৫২ সালে প্রদত্ত ৬২টি ধর্মোপদেশ, পরিশিষ্টসহ (কায়রো ১৩০২ হি.). পাণ্ডুলিপিতে সময় সময় সিত্তীন মাজলিস নাম দৃষ্ট হয়; (৩) ফুতূহুল গায়ব, বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত ও তাঁহার পুত্র আবদুর রাযযাক কর্তৃক সংকলিত ৭৮টি ধর্মোপদেশ; শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুকালীন ওসিয়াত, পিতৃকুল ও মাতৃকুলে তাঁহার বংশ বিবরণ, হযরত আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রমাণ ও তাঁহার কয়েকটি কবিতা আছে (আশ্-শাত্তানাওফীর বাহ্‌জাতুল আস্‌রারের হাশিয়া, কায়রো ১৩০৪ হি.); (৪) হিযবু বাশাইরিল- খায়রাত সূফী মতে প্রার্থনা (আলেকজান্দ্রিয়া ১৩০৪ হি.); (৫) জিলাউল খাতির (হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত), ধর্মোপদেশ-সংগ্রহ; ইহার প্রথমটি ও ৫৭তমটির তারিখ একই এবং শেষটি ও দ্বিতীয় পুস্তকের ৫৭তম বক্তৃতা অভিন্ন, সম্ভবত ইহা একই পুস্তকের অপর নাম; (৬) আল-মাওয়াহিবুর-রাহমানিয়া ওয়াল-ফুতূহুর রাব্বানিয়্যা ফী মারাতিবিল আখলাকিস সানিয়্যা ওয়াল-মাকামাতুল ইরফানিয়্যা, ইহা রাওদাতুল জান্নাতের ৪৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, সম্ভবত ২ বা ৩ নং পুস্তকের সহিত অভিন্ন; (৭) ইয়াওয়াকীতুল হিকাম (হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত); (৮) আল-ফুয়ূদাতুর রাব্বানিয়া ফিল-আওরাদিল কাদিরিয়া প্রার্থনা সংগ্রহ, কায়রো ১৩০৩ হি.; (৯) বাহ্‌জাতুল আস্‌রার ও অন্যান্য জীবন-চরিত বিষয়ক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ধর্মোপদেশ (ইন্ডিয়া অফিসের পাণ্ডুলিপির তালিকায় ৬২২ নং পুস্তক ইহার অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি; ফার্সী লেখকগণ সাধারণত এইগুলিকে মাল্‌ফূজাত-ই কাদিরী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন)।

এই সকল গ্রন্থে আবদুল কাদির (র) একজন সুযোগ্য ধর্মশাস্ত্রবিদ ও আগ্রহী, অকপট ও বাগ্মী প্রচারকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বহু ধর্মোপদেশ তাঁহার গুন্‌য়ার অন্তর্ভুইক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে দশ ভাগে বিভক্ত ৭৩টি ইসলামী ফির্কা (ধর্ম সম্প্রদায়)-র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সময় সময় তিনি মুবাররাদ প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কুরআনের প্রাচীন ভাষ্যকার ও সূফী-দরবেশদের উল্লেখ অধিক করিয়াছেন। এই পুস্তকে সর্বত্র সংযতভাবে তিনি প্রকৃত সুন্নী মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, কুরআনের কয়েকটি গূঢ়ার্থবোধক ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে কতকগুলি 'যিকির' ৫০ বা ১০০ বার পড়িবার সুপারিশও ইহাতে করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তকের ধর্মোপদেশগুলি মুসলিম সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পদ। এইগুলির মর্মবাণী হইতেছে দান-খয়রাত ও বিশ্বপ্রেম। তাঁহার বক্তৃতায় সূফী পরিভাষার ব্যবহার নিতান্ত বিরল, সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে বুঝিতে খুব অসুবিধা হইবে এমন শব্দ একটিও নাই; বক্তৃতাগুলির সাধারণ আলোচ্য বিষয় হইল কিছুকাল যুহ্‌দ অর্থাৎ ত্যাগব্রত পলনের প্রয়োজনীয়তা, এই সময়ের মধ্যে সাধক যেন নিজেকে পৃথিবীর আসক্তি মুক্ত করিতে পারেন, তৎপর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিষয় ভোগ ও অন্যান্যকে দীক্ষা দান করিতে পারেন। ইহলোকের পুরস্কারই হউক আর পরলোকের পুরস্কারই হউক, প্রতিটি বস্তুই হইতেছে সাধক ও আল্লাহ্‌র মধ্যে পর্দা এবং সাধকের চিন্তা কেবল আল্লাহ্‌র দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত-এই সূফী মতবাদও তাঁহার লেখার একটি প্রধান প্রসংগ, এমনকি নিজেদের পরিজনকে বাদ দিয়াও দরবেশদেরকে দান করার জন্য শ্রোতাদের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বক্তা নিজের কথা খুব কমই বলিয়াছেন এবং তাহাও খুব সংযতভাবে। তিনি নিজেকে 'পৃথিবীর লোকের স্পর্শমণি' বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে কে উদাসীন, কে সমুৎসুক তিনি পৃথক করিতে পারেন। পক্ষান্তরে তিনি জোরের সহিত দাবি করেন, কেবল আল্লাহর অনুমতি লাভের পরেই তিনি বক্তৃতা দেন।

'আবদুল কাদির (র) সম্পর্কে তাঁহার শিষ্য 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগ্‌দাদী, আবদুল মুহ্‌সিন আল-বাস্‌রী ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাস্‌র আস্‌-সিদ্দীকী প্রদত্ত বিবরণ (আন্‌ওয়ারুন-নাজির নামে অভিহিত, বাহ্‌জাতুল আস্‌রার, ১০৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) বর্তমানে পাওয়া যায় না।

সাম'আনী-র চরিতাভিধানে 'জীল' শিরোনামের নিম্নে তাঁহার নাম লিখিয়া পরে খানিকটা জায়গা খালি রাখা হইয়াছে। সামআনীর পুত্র তাঁহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা রক্ষিত আছে, তাহা সম্মানসূচক, কিন্তু উচ্ছ্বাসপূর্ণ নহে। মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আবদুল্লাহ্ আল্-মাক্‌দিসী তাঁহার জীবনের শেষ ৫০

দিন তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন। তিনি লিখিয়াছেন, বাগদাদের লোকেরা শায়খ জীলানীকে অত্যন্ত সম্মান করিত। তিনি অনেক কারামাত দেখাইয়াছেন বলিয়াও তাহারা প্রকাশ করে; কিন্তু লেখক নিজে একটিও দেখেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক আবুল ফারাজ ইব্‌নুল জাওযী বক্তা হিসাবে তাঁহার সফলতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, ভাবাবেগে তাঁহার কতিপয় শ্রোতার মৃত্যু ঘটে। এই লেখকের পৌত্র মিরআতুয-যামান গ্রন্থে শায়খ জীলানীর কয়েকটি কারামাতের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইব্‌ন আরাবী (জন্ম ৫৬০/১১৬৫)-র গ্রন্থে তাঁহাকে ন্যায়বান, সেই যমানার কুতুব (আল-ফুতূহাতুল মাক্কিয়্যা, ১খ., ১২৬), এই তরীকার বাদশাহ্, মানুষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক (ঐ, ২খ., ২৪) ও একজন মালামাতিয়্যা (৩খ., ৪৪) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবদুল কাদির (র) মাতৃগর্ভে থাকিতেই আল্লাহ্‌র তারীফ করেন, এই বর্ণনাও ইব্‌ন আরাবীর বরাত দিয়া উদ্ধৃত করা হয়। ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৪ খৃ.) মৃত জনৈক গ্রন্থকারের বাহ্‌জাতুল আসরার নামক গ্রন্থে আবদুল কাদির (র) দ্বারা সম্পাদিত এমন বহু কারামাতের বিবরণ আছে যাহা বহু সাক্ষীপরম্পরা দ্বারা সমর্থিত। তদ্দর্শনে ইব্‌ন তায়মিয়্যা (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) ঘোষণা করেন, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যাহা যাহা দরকার, এই বর্ণনাগুলিতে সেইগুলির সবই রহিয়াছে; তবে অন্যেরা ততটা বিশ্বাস করেন না। অলীক কাহিনী আছে বলিয়া যাহাবী পুস্তকখানা পাঠের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন, পক্ষান্তরে ইব্‌নুল ওয়ার্‌দী (তারীখ, ২খ., ৭০ ও ৭১) তাঁহার পুস্তকে ঐ সকল কাহিনী বর্ণনা করেন। শায়খের মুখে নানা দাম্ভিক উক্তি তুলিয়া দিয়া কেহ কেহ আরও অধিক বিরক্তির কারণ ঘটাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাহ্‌জাতুল আস্‌রারে প্রথমে কতকগুলি লোকের তালিকা দিয়া বলা হইয়াছে, তাঁহারা শায়খকে বলিতে শুনেন, আমার পা প্রত্যেক দরবেশের ঘাড়ের উপর। অনুরূপভাবে তিনি নাকি দাবি করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানের সত্তরটি দ্বারের (যাহার এক একটা স্বর্গ-মর্তের দূরত্ব অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত) অধিকারী ইত্যাদি। 'আবদুল কাদির (র)-এর পরবর্তী কালের অনুসারিগণ যেমন ফারসী পুস্তক মাখাযানুল কাদিরিয়া (বৃটিশ মিউজিয়াম, ২৪৮ নং পাণ্ডুলিপি)-র লেখক প্রথমোক্ত উক্তিটি সার্বজনীন প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা বলা তাঁহার পক্ষে ন্যায়সংগতই হইয়াছে। অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ লেখকেরা (যথা দামীরী, ১খ., ৩২০) ইহাতে শুধু তাঁহার উচ্চ মর্যাদারই সাক্ষ্য দেখিতে পান। আবদুল কাদির (র)-এর প্রামাণ্য রচনায় এই শ্রেণীর উক্তি পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না (তবে তাঁহার প্রতি আরোপিত কয়েকটি কবিতায় অনুরূপ উক্তি আছে); এইগুলি সম্ভবত তাঁহার ভক্তবৃন্দের অতি উৎসাহের ফল। তাঁহারা তাঁহাকে দরবেশদের সুলতান বলিয়া অভিহিত করেন এবং মুশাহিদুল্লাহ্, আমরুল্লাহ্, আমানুল্লাহ্, নূরুল্লাহ্, কুতুবুল্লাহ্, সায়ফুল্লাহ্, ফারমানুল্লাহ্, বুরহানুল্লাহ্, আয়াতুল্লাহ্, গাওছুল্লাহ্, আল-গাওছুল আজাম— এই সকল প্রশংসাসূচক শব্দের কোন একটির যোগ ভিন্ন কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন না। বাংলাদেশের লোকেরা তাঁহাকে 'বড় পীর সাহেব' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাঁহার সন্তানদের মধ্য নিম্নোক্ত এগারজন পিতার পদাংক অনুসরণ করেন বলিয়া বাহ্‌জাতুল আসরারে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ ঈসা (মিসরে মৃ. ৫৭৩/১১৭৭-৮), 'আবদুল্লাহ (বাগদাদে মৃ. ৫৮৯/১১৯৩), ইব্‌রাহীম (ওয়াসিতে মৃ. ৬৯২/১১৯৬), 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব (বাগদাদে মৃ. ৬৯৩/১১৯৭), ইয়াহ্‌য়া ও মুহাম্মাদ (বাগদাদে মৃ. ৬০০/১২০৪), আবদুর রায্‌যাক (বাগদাদে মৃ. ৬০৩/১২০৭), মূসা (দামিশ্‌কে মৃ. ৬১৮/১২২১), আবদুল আযীয (সিন্‌জারের অন্তর্গত জিয়াল গ্রামে হিজরত করিয়া মৃ. ৬০২/১২০৫), 'আবদুর রাহমান (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) ও আবদুল জাব্বার (মৃ. ৫৭৫/১১৭৯-৮০)। পিতা সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তীর প্রসারে তাঁহার সন্তানদেরও অবদান রহিয়াছে।

সিব্‌ত ইবনুল জাওযীর মতে খলীফা নাসিরের রাজত্বে তাঁহার উযীর আবূ ইয়ূনুসের দাবিতে আবদুল কাদির (র)-এর পরিবার সাময়িকভাবে বাগদাদ হইতে নির্বাসিত হন। মোংগলরা বাগদাদ অধিকার করিলে তাঁহাদের কয়েকজন নিহত হন, কিন্তু উল্লিখিত স্বল্পকাল ভিন্ন কাদিরিয়া তরীকার কেন্দ্র বরাবর বাগদাদেই রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Ahlwardt, আবদুল কাদির (র)-এর জীবন চরিত গ্রন্থের একটি তালিকা তাঁহার Verz. der arab. Handschr., Nos. 10072-92-এ দিয়াছেন। তন্মধ্যে যেই জীবন চরিতসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এইঃ (১) আশ-শাত্তানাওফী, বাহ্‌জাতুল আস্‌রার (কায়রো ১৩০৪ হি.); (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আত-তাদাফী, কালাইদুল জাওয়াহির (কায়রো ১৩০৩ হি.); (৩) মুহাম্মাদ আদ-দিলাঈ, নাতীজাতুত্ তাহ্‌কীক্ (ফাস ১৩০৯ হি.), অনু. Weir, JRAS, 1903. এতদ্ব্যতীত (৪) গিব্‌তাতুন নাজির, ইব্‌ন হাজার কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত (Ahlwardt-এর তালিকায় নাই), সম্পা. E. D. Ross (কলিকাতা ১৯০৩ খৃ.)। সম্ভবত (৫) যাহাবীর তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে প্রদত্ত জীবনীই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার অধিকাংশ ইব্‌নুন- নাজ্জারের (JRAS-এ প্রকাশিত, ১৯০৭ খৃ., পৃ. ২৬৭ প.) বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি শায়খ সানূসী আবদুল কাদির (র)-এর একখানি জীবনী লিখিয়াছেন বলিয়া কথিত। যে সমস্ত আধুনিক ইউরোপীয় লেখক আবদুল কাদির (র) ও তাঁহর কাদিরিয়া তরীকা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন ঃ (৬) L. Rinn, Marabouts et Khouan (Paris 1884); (৭) A Le Chatclier, Confreries Musulmanes du Hedjaz (Paris 1887); (৮) Depont et Coppolani, Confreries Religieuses musulmanes (Algiers 1897); (৯) Carra de Vaux, Gazali (Paris 1902); (১০) W. Braune, Die Futuh al-Gaib des 'Abd al-Qadir, Berlin 1933; (১১) M. A. Aini, Un grand Saint del Islam, Abd al-kadir Guilani, Paris 1938; (১২) G. W. J. Drewes and Poerbatjaraka, De mirakelen van Abduclkadir Djaelani, Bandoeng 1938; (১৩) Brocklmann, GAL^2, i, 560 sqq, SI, 777 sqq.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

'আবদুল কাদির (عبد القادر) ঃ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইয়ূসুফ আল-ফাসী, মরক্কোর ফাসিয়্যন পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিনিধি। আল-কাসরুল কাবীর-এ ১০৭৭/১৫৯৯ সালে জন্ম, ১০৯১/১৬৮০ সালে

মৃত্যু। তিনি শাযিলীদের যাবিয়া প্রধান ছিলেন। তিনি একটি ফাহ্‌রাসা ও হাদীছ বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক খ্যাতি ১৭শ শতকের শুরুতে মরক্কোর সূফীবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধিরূপে। তাঁহার বংশধরগণ বর্তমানে ফেযের ধর্মীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজাত শাখারূপে গণ্য। (শহরের অধিবাসিগণকে বলা হয় আহল ফাস যাহাতে ফাসিয়্যি পরিবারের সদস্যগণ হইতে তাহাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করিলে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ E. Levi-provencal, Hist. Chorfa, পৃ. ২৬৪-৫ (বরাতসহ)।

E. Levi-Provencal (E.I[2])/হুমায়ুন খান

'আবদুল কাদির ইব্ন 'উমার আল-বাগদাদী (عبد القادر بن عمر البغدادى)

ঃ সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ, জন্ম বাগদাদ ১০৩০/১৬২১, মৃ. কায়রো ১০৯৩/১৬৮২। বাগদাদে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়; সেইখানে তখন সাফাবী ও উছমানী তুর্কীদের মধ্যে প্রবল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ১০৪৮/১৬৩৮ সুলতান ৪র্থ মুরাদের সেনাপতিত্বে তুর্কীরা বাগদাদ পুনর্দখল করিলে তখন আবদুল কাদির দামিশ্‌কে চলিয়া যান। ইতোমধ্যে তিনি আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দামিশ্‌কে তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন কামালুদ্দীন আল-হুসায়নী সিরিয়ার নকীব ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্‌য়া আল-ফারাইদীর নিকট আরবী শিক্ষা লাভ করেন। ১০৫০/১৬৪০ সালে তিনি কায়রো গমন করিয়া আল্-আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও বিজ্ঞানসমূহ অধ্যয়ন করেন। তথায় তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে আল-খাফাজী ও ইয়াসীন আল-হিমসীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের দরুন স্বয়ং আল-খাফাজী তাঁহার সঙ্গে অনেক কঠিন বিষয় আলোচনা করিতেন। আল-খাফাজীর মৃত্যুর পর ১০৬৯/১৬৫৯ তাঁহার পাঠাগারের প্রধান অংশ আবদুল কাদিরের আয়ত্তে আসে। পরে তিনি উহার গ্রন্থ সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে, উক্ত পাঠাগারে বহু পণ্ডিতের টীকা সম্বলিত খাস-আরব (আল-আরাব আল-আরিবা) কবিগণের রচিত এক হাজার 'দীওয়ান' ছিল। তাঁহার এই পাঠাগার সেই যুগে ছিল অনন্যসাধারণ (দ্র. খিযানা, ১খ., পৃ. ২)। তিনি যুলকা'দা ১০৭৭ ইসতাম্বুল সফর করেন কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যেই কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই বৎসরই তিনি মিসরের গভর্নর ইব্‌রাহীম পাশা কাতখুদার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তাঁহাকে অশেষ সম্মান প্রদর্শন ও অতি ঘনিষ্ঠ সহচররূপে গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পর কাতখুদা গভর্নর পদ হইতে অপসারিত হন এবং সিরিয়ার মধ্য দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (দামিশ্‌কে পৌঁছান হি. ১০৮৫)। 'আবদুল কাদিরও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন এবং আদ্রিয়ানোপলে একসঙ্গে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি তুরস্কের বিজ্ঞ ওয়াযীর আজাম আহমাদ পাশা আল-ফাদিল কপরুলু যাদার সঙ্গে পরিচিত হন এবং ইব্ন হিশামের শারহ বানাত সুআদ গ্রন্থের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়া তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। আবদুল কাদিরের জনৈক পুরাতন বন্ধুর পুত্র আল-মুহিব্বী এই সময়ে তাঁহাকে আদ্রিয়ানোপলে দেখেন এবং লিখেন, আবদুল কাদির সেই সময়ে তুরস্কের সকল বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া কায়রো চলিয়া যান, যদিও পরে আবার তিনি তুরস্কে ফিরিয়া আসেন। এইবার চোখের রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় দৃষ্টিহীন হইয়া কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অল্পকাল পরেই ইন্তিকাল করেন।

আল্-হারীরীর সম্পূর্ণ মাকামাত, বহু আরবী 'দীওয়ান' ও সংখ্যাহীন ফারসী ও তুর্কী কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। সূক্ষ্ম সমালোচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং আরবী ভাষাতত্ত্ব, 'আরবী কবিতা, 'আরব ও পারস্যের ইতিহাস, 'আরবী প্রবাদ ও কিংবদন্তী সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

তিনি বেশ কিছু সংখ্যক কার্যকর পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে (১) 'খিযানাতুল আদাব ওয়া লুব্বু লুবাবি লিসানিল আরাব' (কায়রো ১২৯৯/১৮৮২, ১৩৪৭/১৯২৮-৯ [শাহিদ ৩৩১ পর্যন্ত মুদ্রণের পর ১৩৫৩ সনে ইহার মুদ্রণ কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল "যেইটি ৯৫৭ "শাওয়াহিদ, গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন]। আর-রাদী আল-আসতারাবাদী (মৃ. ৬৮৬/১২৮৭) তাঁহার রচিত ইবনুল হাজিবের কাফিয়্যার শারহ' নামে একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তিনি ৯৫ পৃ. শওয়াহিদ গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১০৭৩/১৬৬৩ সালে কায়রোতে ইহা রচনা শুরু করেন এবং সেখানেই ১০৭৯/১৬৬৮ সালে সমাপ্ত করেন (মাঝখানে তাঁহার ইসতাম্বুল সফরের কারণে স্বল্পকালের জন্য লেখা বন্ধ ছিল) এবং সুলতান ৪র্থ মুহাম্মাদকে (১০৫৮-৯৯/১৬৮-৮৭) উহা উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থ মূলে সম্ভবত আট খণ্ডে বিভক্ত ছিল (দ্র. আল-মুহিব্বী)। (২) আর্-রাদী রচিত ইব্ন হাজিবের শাফিয়্যার ভাষ্যে উল্লিখিত শাওয়াহিদ-এর একটি ব্যাখ্যা পুস্তক; উহার সঙ্গে তিনি শাফিয়্যার উপর আল-জারাবার্দীর শার্হ-এ উদ্ধৃত 'শাওয়াহিদের' একটি 'শার্হ' সংযোজন করেন। (৩) ইব্ন হিশামের 'শার্হ বানাত সুআদ'-এর ব্যাখ্যা পুস্তক (Gloss) [পাণ্ডুলিপি রামপুর লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১. ৫৮৩]। (৪) 'শার্হুল মাকসূরাতিদ-দুরায়দিয়্যা; (৫) 'লুগাত-ই শাহনামা' (ed. c. Salemann, st Petersburg 1895); (৬) 'শারহুত-তুহ্‌ফাতিশ শাহিদিয়্যা বিল-লুগাতিল আরাবিয়্যা'। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিসহ উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির জন্য দ্র. Brockelmann, S II, 397 ও খিযানা-র ১৩৪৭ সংস্করণের ভূমিকা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ আলাবী মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্‌র ইব্ন আহমাদ জামালুদ্দীন আল-শিল্লী আল্-হাদ্‌রামী, ইকদুল জাওয়াহির', রামপুর লাইব্রেরী, ১খ., ৬৪১; নং ১৭৩, পৃ. ৪৪৫; (২) আল-মুহিব্বী, "খুলাসাতুল-আছার", ২খ., ৪৫১-৪; (৩) I Guidi, Sui poeti citati nell, opera Khizanat al-adab", in the 'Atti' Acad., Lincei, 1887; (৪) আবদুল আযীয মায়মানী, ইক্‌লীদুল-খিযানা (খিযানাতুল আদাব"-এ যে গ্রন্থাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে উহার নির্ঘন্ট), লাহোর ১৯২৭; (৫) "শাওয়াহিদ-এর বর্ণানুক্রমিক তালিকা ('আয়নীর তালিকাও দ্র.) যাহা ১২৯৯ হি.-র পরে সঙ্কলিত (এই প্রবন্ধের লেখক মুহাম্মাদ শাফী কর্তৃক মক্কায় সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি); (৬) সামী বে, কামূসুল আলাম, ৪খ., ৩০৮৩; (৭) Brockelmann, II, 286, S II, 397.

Mohammad Safi (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

'আবদুল কাদির ইব্ন গায়বী আল-মারাগী (عبد القادر بن غيبى المراغى) ঃ আল-হাফিজ পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিষয়ক লেখক, ৮ম/১৪শ শতকের মাঝামাঝি আযারবায়জান-এর অন্তর্গত (Bouvat, in J. A., 1926) মারাগাতে জন্মগ্রহণ করেন। আনুমানিক ৭৮১/১৩৭৯ সনে তিনি ইরাকের আল-জালাইরী সুলতান আল-হুসায়ন (১৩৭৪-৮২ খৃ.)-এর দরবারের অন্যতম গায়ক হন। ইব্ন গায়বীর নিজস্ব বর্ণনামতে তিনি সুলতান হুসায়ন-এর দরবারের প্রসিদ্ধ গায়ক রিদাউদ্দীন রিদ্ওয়ান শাহ-এর সহিত সংগীত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া নির্ধারিত এক লক্ষ দীনার পুরস্কার লাভ করেন। কাহারও মতে তিনি কিছু দিনের জন্য তুর্কী সুলতান বায়াযীদ (১৩৮৯-১৪০৩ খৃ.)-এর নিকট চলিয়া যান। পরবর্তী সুলতান আহ্মাদের আমলে তিনি দরবারের প্রধান গায়কের পদ লাভ করেন এবং ৭৯৫/১৩৯৩ সনে তৈমূর লঙ কর্তৃক বাগদাদ দখলের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। তৈমূর অন্যান্য বিজ্ঞজনের সহিত তাঁহাকে নিজ রাজধানী সামারকান্দে লইয়া যান এবং সেইখানে তিনি সংগীতজ্ঞদের নেতা ও তৈমূরের প্রিয়পাত্র হন। ৮০১/১৩৯৯ সনে তাঁহাকে তাব্রীয-এ দেখা যায়; সেইখানে তিনি তৈমূরের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র মীরান শাহের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। মীরানের খামখেয়ালীপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রমোদ সহচরদের দায়ী করা হয়। গায়বীও ছিলেন তাহাদের অন্যতম। সেইজন্য তৈমূর ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। গোপন সূত্রে সংবাদ পাইয়া আবদুল কাদির পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং পূর্বতন পৃষ্ঠপোষক বাগদাদের সুলতান আহ্মাদ জালাইরীর নিকট "কালান্দার"-এর ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভে সক্ষম হন। ৮০৩/১৪০১ সনে তৈমূর তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। গায়বী ছিলেন হাফিজ-এ কুরআন, উপস্থিত বুদ্ধিবলে তিনি কুরআনের কতিপয় আয়াত এমন চিত্তাকর্ষকভাবে আবৃত্তি করেন যে, তৈমূর মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং পুনরায় দরবারে বহাল করেন। পরবর্তী কালে তিনি সুলতান শাহ্রুখ (১৪০৪-১৪৪৭ খৃ.)-এর দরবারে চার উজ্জ্বল রত্ন-এর অন্যতম রত্নরূপে খ্যাতিমান হন। ৮২৪/১৪২১ সনে তিনি তুরস্কের সুলতান ২য় মুরাদের জন্য একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা নিজ হাতে সুলতানকে উপহার প্রদানের ইচ্ছায় সামারকান্দ হইতে ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রুসায় তুর্কী দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পরে তিনি আবার সামরকান্দে ফিরিয়া আসেন এবং হারাত-এ ইন্তিকাল করেন (৮৩৮/মার্চ ১৪৩৫)।

'আবদুল কাদির তাঁহার জীবনকালে ও পরবর্তী কালেও একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। রাওদাতুল জান্নাত-এর লেখক মুঈনুদ্দীন ইস্ফিযারী তাঁহাকে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি ও চিত্রকর—এই তিন গুণের অধিকারী প্রতিভারূপে প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষত সঙ্গীত প্রতিভার জন্যই তাঁহাকে অতীত যুগের গৌরব বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। অত্যন্ত দক্ষ উদী (عودى) বা বীণাবাদক হিসাবে ও অনবদ্য সঙ্গীত স্রষ্টা (তাস্নীফী)-রূপে খ্যাতি অর্জন ছাড়াও তিনি সঙ্গীততত্ত্ব ও সঙ্গীতকলায় বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেন। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ রচনা "জামিউল আলহান" (Ency. of Music)-এর স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডের Bodleian লাইব্রেরী ও ইস্তাম্বুলের নূর উছমানিয়্যা লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিখানি তিনি তাঁহার পুত্র নূরুদ্দীন আবদুর রামানের জন্য লিখিয়াছিলেন ৮০৮/১৪০৫ সনে এবং ৮১৬/১৪১৩ সনে তিনি স্বয়ং ইহাকে পরিমার্জিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি ৮১৮/১৪১৫ সনে সুলতান শাহ্রুখের নামে উৎসর্গ করা হয়। লেখক স্বয়ং গ্রন্থখানির কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৮২১/১৪১৯ সনে লিখিত নামবিহীন একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের পাণ্ডুলিপি, যাহা Bodleian লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। স্পষ্টতই সেই বইটি বায়সুনগুর-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল। ঐ একই লাইব্রেরীতে রক্ষিত একটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সংস্করণ মাকাসিদুল আলহান (সঙ্গীতের মর্মকথা) আনুমানিক ৮৩৪/১৪২১-৩ সনে রচিত হয়। Leiden-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ পায়, গ্রন্থটি তুরস্কের সুলতান ২য় মুরাদ-এর নামে উৎসর্গ করা হয়। সঙ্গীত বিষয়ক তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ কান্যুত-তুহাফ অর্থাৎ সঙ্গীত (দুর্লভ) ভাণ্ডারে লেখকের স্বরলিপি সংযোজিত ছিল। কিন্তু গ্রন্থটি রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার সর্বশেষ রচনা শারহুল আদওয়ার (সাফীউদ্দীন রচিত কিতাবুল আদওয়ার-এর টীকা গ্রন্থ) নূর উছমানিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। Leiden-এ তাঁহার নামাঙ্কিত তুর্কী ভাষায় রচিত একখানি সংক্ষিপ্ত কিতাবুল-আদওয়অর রহিয়াছে। উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি আরবী, ফারসী ও তুর্কী সঙ্গীতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জামে'-তে তাঁহার রচিত স্বল্প সংখ্যক মাত্র সঙ্গীত টিকিয়া থাকিলেও তুর্কী ভাষায় যাহাকে বলে 'কি'আর', এই শ্রেণীর বহু সঙ্গীত কণ্ঠ হইতে কণ্ঠপম্পরায় অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

তাঁহার এক পুত্র আবদুল আযীয যিনি ১৪৩৫ খৃ. উছমানী দরবারে স্থায়ীভাবে থাকিয়া যান বলিয়া মনে করা হয়, তিনি 'নাকাওয়াতুল আদ্ওয়ার" স্বনির্বাচিত সঙ্গীত ধারার একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তুরস্কের সুলতান ২য় মুহাম্মাদের (মৃ. ৮৮৬/১৪৮১) নামে তাহা উৎসর্গ করেন। তাঁহার দৌহিত্র মাহ্মূদ সুলতান ২য় বায়াযীদ (মৃ. ৯১৮/১৫১২)-এর আমলে বর্তমান ছিলেন, তিনি মাকাসিদুল আদ্ওয়ার (ধারা বা রীতির মর্ম) নামক একটি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই উভয় গ্রন্থই নূর উছমানিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খাওয়ানদামীর, ৩খ., ৩, ২১২, দাওলাতশাহ, নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) শারাফুদ্দীন য়াযদী, জাফার নামাহ্, ১খ., ৬১৯; (৩) ইংরেজী সংস্করণ History of Timur Bec (1723), ১খ., ৪৩৯, ৫৩৭-৮; (৪) মুনাজ্জিম বাশী, ৩খ., ৫৭; (৫) Belin, Notice sur Mir Ali-Chir llevai, in JA, 1861, i, 283-4; (৬) Barbier de Meynard, Chronique Persane d'Herat, JA, 1862, ii, 275-6; (৭) Browne, iii, 191, 384; (৮) Ra'uf Yekta, La musique turque (Lavignac, Encyclopaedia de la musique. pp. 2977-9; (৯) Ethe and Sachau, Catalogue of Perisan.... MSS. in the Bodleian Library, pp. 1057-63; (১০) Catalogus codicum orientalium Bibl. Acad. Lugduno Bataviae, 1851-77, ii, 302-5; (১১) Nuru Othmaniyya Kutubkhana defteri, Istanbul, Nos, 3644. 3646, 3651; (১২) J.

B. N. Land. Tonschriftversuche und Melodieproben aus dem muhammedanischen Mittelalter (Vierteljahrsschrift fur Musikwissens chaft, ii, 1886); (১৩) Farmer, Histoy of Arabian Music, 1929, 198-200.

H. G. Farmer (E.I.2)/হুমায়ুন খান

আবদুল কাদির ইব্ন মুহ্য়িদ্দীন হাসানী (عبد القادر بن محى الدين الحسنى) ঃ ১৮০৮-১৮৮৩ খৃ. ফরাসী অধিকারকালে আল্‌জিরিয়ার মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, জাতীয় নেতা; আমীর আবদুল কাদির নামে সুপরিচিত। মাসকারার বিশ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ওয়াদিল হাম্মাস-এর কায়তানা (قيطنة -Guetna) নামক স্থানে ১২২৩/১৮০৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবারের ছিল রীফ্-এ উদ্ভূত হাশিমীগণের মধ্যে বসতি স্থাপনকারী। পিতা তাঁহার বিশেষ সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তিনি প্রথমে আর্‌যিউ (Arzew)-তে ও পরে ওরান (Oran)-এ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১২৪৪/১৮২৮-২৯ সনে বিবাহ করিয়া মক্কা শরীফে হজ্জে গমন করেন। তিনি গভীরভাবে ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পিতার নির্দেশে তিনি নিয়মিত শরীর চর্চা করিতেন এবং তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। সৎ গুণাবলী ও দানশীলতার জন্য এতদ্‌ঞ্চলের জনগণের উপর তাঁহার পিতার বিপুল প্রভাব ছিল।

আল্‌জিয়ার্স দখলের (৫ জুলাই, ১৮৩০ খৃ.) পরে দেশটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফরাসিগণ যে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাহা মুহয়িদ্দীনকে খৃস্টান শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণায় উৎসাহিত করে এবং তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অতি শীঘ্রই তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আবদুল কাদিরকে নিজের স্থানে মাস্‌কারার আমীর মনোনীত করেন এবং ৫ রাজাব, ১২৪৮/২২ নভেম্বর, ১৮৩২ তারিখে বানুল হাশিম, বানূ আমের ও আলগারাবা তাঁহাকে আরবদের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করে। আবদুল কাদির পিতার আরবধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ্যতার সহিত নেতৃত্ব দান করেন। দেশবাসিগণের একটি অংশের অসহযোগিতা এবং ওরান ও মোস্‌তাগানেমে তাঁহার সমর্থকগণের ব্যর্থতা (১৮৩৩ খৃ.) সত্ত্বেও আবদুল কাদিরের তেজোদীপ্ত ভূমিকাহেতু ফরাসী শক্তির পক্ষে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হইল না। ৪ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৪ খৃ. জেনারেল Desmichels-এর বাহিনীর সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হয়। ইহাতে জেনারেল Desmichels প্রতিপক্ষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়া নূতন আমীরুল মুমিনীন আলজিয়ার্স পর্যন্ত তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তার করেন (এপ্রিল ১৮৩৫), কিন্তু নূতন করিয়া সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রথমে ফরাসী সেনাপতি Clauzel ও পরে Bugeaud মাকতা (Macta) -তে তাহাদের পরাজয়ের (২৮ জুন) প্রতিরোধস্বরূপ মাসকারা জ্বালাইয়া দেয় (৬ ডিসেম্বর), তেলমসেন দখল করে (১৩ জানুয়ারী, ১৮৩৬) এবং ওয়াদি সিক্কাক (Wadi Sikkak)-এ এক বড় বিজয় লাভ করে (৬ই জুলাই); কিন্তু এই সমস্ত সাফল্যই নিষ্ফল হয়। আবদুল কাদিরের বাহিনী তিন তিনবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও আশ্চর্য সাংগঠনিক ক্ষমতা দ্বারা অবিলম্বে আবার তিনি তাহাদের পুনর্গঠিত করেন। তখন ফরাসী বাহিনীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে এবং তাহাদের অধিকৃত শহরগুলি সবই অবরুদ্ধ হয়। আক্রমণের পর আক্রমণে ফরাসী সৈন্যগণ বিপর্যস্ত হইতে থাকে এবং স্থানীয় যাহারা তাহাদের সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল তাহাদেরকেও মারাত্মক শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কনস্টানটাইনের (Constantine) বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে পশ্চিম অঞ্চল যাহাতে নিরাপদ থাকে সেই উদ্দেশে লুইফিলিপ সরকার তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে সচেষ্ট হয়। তাফনার সন্ধি স্বাক্ষর (৩০ মে, ১৮৩৭) করত Bugeaud ইতিপূর্বে Desmichels কর্তৃক কৃত ভ্রান্তি আরও মারাত্মকরূপে করিয়া বসেন। ফরাসী বাহিনী ওরান, আরযিউ মোস্তাগানেম, বিলদা (Blida) ও কোলিয়া (Kolea) দখলে রাখিলেও সমগ্র ওরান প্রদেশ, আল্‌জিয়ার্স প্রদেশের অংশ ও টিটারী (Titteri)-এর সমগ্র বায়লিক (baylik) এলাকা আমীরের করতলগত হয়।

'আবদুল কাদির ১৮৩৭ খৃ. জুন হইতে ১৮৩৯ খৃ. নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির সুযোগে বিজিত এলাকা সুসংহত করিতে থাকেন। তাগদেমে (Tagdempt) রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি নূতন রাষ্ট্র জুড়িয়া ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং পশ্চিমে মরক্কো সীমান্ত হইতে পূর্বে কাবিলিয়া (Kabilya) পর্যন্ত সকল গোত্রের আমীর, প্রয়োজন হইলে বলপূর্বক, মনোনীত করেন। এইভাবে সাহারা পর্যন্ত তিনি সকলের আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করেন।

Tafna-চুক্তির সীমানা সংক্রান্ত শর্তের অস্পষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সফরকালে আবদুল কাদির এমন কোন কোন এলাকাতে গমন করেন, যাহা ফরাসীগণ চুক্তি অনুযায়ী তাঁহার রাজ্য সীমার বহির্ভূত বলিয়া মনে করে। তখন মার্শাল ভালী (Valee) তাঁহার নিকট একটি অতিরিক্ত সন্ধিপত্রের খস্‌ড়া পেশ করেন, যাহাতে ফরাসীদের মতানুযায়ী আমীরের আধিপত্যে স্বীকৃত এলাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত ছিল। উহাতে আমীর কর্তৃক দাবিকৃত এলাকা খর্ব করিয়া দেখানো হয়। আমীর চুক্তিনামা সংশোধনের প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেন। ডিউক অব অরলীনস তাহার লৌহ ফটক অভিযান কালে কন্‌সটনাটাইনের সঙ্গে আলজিয়ার্স সংযোগ সাধন করিলে আমীর নূতন করিয়া খৃস্টান ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন ও নূতনভাবে সংঘর্ষ শুরু হয়। ২০ নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃ. আমীরের বাহিনী মিতিজা (Mitidja) আক্রমণ করত খামারসমূহ লুণ্ঠন এবং বাশিন্দাদের হত্যা করে। তখন আলজিয়ার্সের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। ফরাসী বাহিনী মিলিয়ানা (Miliana) ও পরে মেডিয়া (Medea) অধিকার করিলেও (মে-জুন ১৮৪০) বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গরক্ষী বাহিনীর জন্য তাহারা যে রসদবাহী যানবাহন (Convoy) পাঠাইত সেগুলি ক্রমাগত আক্রমণের সম্মুখীন হইতে থাকে। বূয়োঁ গভর্নর জেনারেলরূপে মনোনীত হইলে (২৯ ডিসেম্বর, ১৮৪০) ঘটনার গতিধারা পরিবর্তিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন, 'আবদুল- কাদিরের ক্ষমতা খর্ব না করা পর্যন্ত ও "সীমিত অধিকার"-এর পরিবর্তে ক্রমাগত আক্রমণের নীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আলজিরিয়া কোনদিন সংঘাতমুক্ত হইবে না। ১৮৪১ হইতে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি তাগদেম, মাসকারা, বোগহার, তাযা, সাইদা, তেলেমসেন, সেবদু ও নেদরোমা দখল করেন এবং 'আবদুল-

কাদিরকে বন্দী করিতে ও তাঁহার সমর্থকদের ধ্বংস করিবার জন্য সৈন্যদের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। আমীরের অস্থায়ী রাজধানী স্মালা (Smala)-র পতন ঘটিলে উহা তাঁহার জন্য মারাত্মক আঘাতস্বরূপ হয়। অতঃপর বিভিন্ন গোত্রীয়গণ ফরাসী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে থাকে। শক্তিক্ষয় ও শত্রুধাবিত অবস্থায় 'আবদুল-কাদির বৎসরের শেষভাগে মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি পুনরায় সেনাবাহিনী সংগঠন করিতে থাকেন এবং একই সঙ্গে ফরাসীদের সহিত মরক্কোর সম্পর্কে ফাটল ধরাইতে চেষ্টা করেন।

তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই লা মরিসিয়ে (Moriciere), লাল্লা মাগনিয়া (Lalla Maghnia) দখল করিলে পুনরায় সংঘাত বাঁধে কিন্তু ফরাসীরা তাঞ্জিয়ার ও মোগাডোর (Mogador)-এ বোমা নিক্ষেপ করিলে (৬ ও ১৫ আগস্ট, ১৮৪৪) ও ঈজলী (Isly)-তে ফরাসী বাহিনী বিজয় লাভ করিলে (১৪ আগস্ট) মরক্কোর সুলতান মাওলায়ে 'আবদুর-রাহ্‌মান বাধ্য হইয়া এই আশ্রিত বন্ধুকে সমর্থন দান করিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহাকে অবাঞ্ছিত বলিয়া ঘোষণা করেন। তেজস্বী পুরুষ 'আবদুল-কাদির ১৮৪৬ খৃ. পুনরায় আলজিরিয়াতে আবির্ভূত হন এবং তাঁহার নেতৃত্বে চতুর্দিকে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সিদি ইব্‌রাহীম-এর যুদ্ধে (২৩ সেপ্টেম্বর) তাঁহার প্রথম সাফল্য লাভ ঘটিলে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে এবং 'আবদুল-কাদিরকে মরক্কোতে বিতাড়িত করিতে অন্তত ১৮ বাহিনী (সর্বমোট ১,০৬,০০০) ফরাসী সৈন্যের একযোগে আক্রমণের প্রয়োজন হইয়াছিল। ফলে আমীর 'আবদুল-কাদির পুনরায় মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন (জুলাই ১৮৪৬)। দুঃখের বিষয়, এইবার তিনি মরক্কো সুলতানের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। সুলতান তাঁহাকে ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করেন। সেইখানকার উপজাতীয়দের আক্রমণ ও শারীফী সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনের ফলে 'আবদুল-কাদির পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আলজিরিয়াতে প্রবেশ করেন এবং অনন্যোপায় হইয়া ড্যুক দ্য উমাল (Duc d' Aumale)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

ফরাসীরা যদিও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাঁহাকে 'আক্কা' (Acre) অথবা আলেকজান্দ্রিয়াতে থাকিতে দেওয়া হইবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা 'আবদুল-কাদিরকে তাঁহার পরিবার-পরিজন ও পরিচারকবৃন্দসমেত প্রথমে ফ্রান্সের তুলনে (Toulon), পরে পাউতে (Pau) এবং তারপরে অ্যামবয়েজ (Amboise)-এ বন্দী অবস্থায় রাখে। ১৮৫২ খৃ. ফরাসী সম্রাট ৩য় নেপোলিয়ন তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া ভাতা মঞ্জুর করেন। 'আবদুল কাদির প্রথমে তুরস্কের Brusa-তে (১৮৫৩) ও পরে দামিশ্‌কে (১৮৫৫) গিয়া বাস করিতে থাকেন। শেষোক্ত শহরে একবার (জুলাই ১৮৬০) মুসলিম জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া খৃষ্টান আদিবাসীদের সকলকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দিয়া ফরাসী কনসাল ও ২০,০০০ খৃষ্টানের জীবন রক্ষা করেন। বাকী জীবন তিনি ধর্মকর্ম ও দান-খায়রাত করিয়া অতিবাহিত করেন। তিনি দর্শনতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধ, কাব্য ও অন্যান্য রচনা লেখেন। দর্শনের প্রবন্ধটি "Rapple a l intelligent, avis a l' indifferent' নামে অনূদিত হয়। 'আরবীয় অশ্ব সম্পর্কেও তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। সুকৌশলী ও অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী এই স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা দামিশক-এ মারা যান (২৬ মে, ১৮৮৩ খৃ.)।

'আবদুল-কাদিরের পরাজয়ের পরে আলজিরিয়া এক শত বৎসর ফরাসী শাসনাধীন থাকে। পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিলে ফ্রান্স আলজিরিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে (৪ জুলাই, ১৯৬২)। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে আলজিরিয়ার ৪র্থ স্বাধীনতা বার্ষিকীতে তাঁহার দেহাবশেষ বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সিরিয়া হইতে আলজিরিয়াতে আনিয়া নূতনভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

'আবদুল'-কাদিরের রচনাবলী ঃ নুয্‌হাতুল-খাতির ফী কারীদি'ল-আমীর 'আবদি'ল-কাদির, একটি কাব্য সংগ্রহ (কায়রো তা. বি.); দেখুন H. Peres, Les poesises d' Abd el-Kader Composees en Algerie et en France (Cinquantenaire de la Faculte des Lettes d' Alger, 1932, 357-412)। যিক্‌রা'ল-'আকিল ওয়া-তান্‌বীহু'ল-গাফিল, (বৈরূত, তা. বি.), ইহা Gustave কর্তৃক Rappel a l' intelligent, avis a l' indifferent" নামে ফরাসী ভাষায় অনূদিত, প্যারিস হইতে ১৮৫৮ খৃ. প্রকাশিত ; বিশাহু'ল-কাতাইব ('আবদুল-কাদিরের নিয়মিত বাহিনীর জন্য সৈনিক জীবনের নিয়মাবলী), V. Rosetty কর্তৃক "Lespectateur militaire"-তে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৪-তে প্রকাশিত ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত, L. Patorni কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, আলজিয়ার্স ১৮৯০ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Paul Azan, L Emir Abdel-Kader, Paris 1925, সংযোজন অংশে পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য মুদ্রিত সূত্রের নাম রহিয়াছে যাহা এই প্রবন্ধের লেখক Ph. De Cosse Brissac ব্যবহার করিয়াছেন; (২) Bibliographie militaire des Ouvrages ..... relatifs a l' Algerie, a la tunisie et au Maroc, Paris 1930, vol. i, 126-219, vol. ii, 300-6; (৩) M. Emerit and H. Peres, Le texte arabe du traite de la Tafna, in RA fr. 1950; (৪) M. Emerit, L' Algerie a l'epoque d' Abd el-Kader, Paris 1951(Collection de documents inedits sur l'histoire de l'Algerie, 2nd Series, vol. iv); (৫) La crise syrienne et l'expansion Economique franccaise en 1860, in Rev. Hist., 1952; (৬) W. Blunt, The Desert Hawk, London 1947; (৭)Ency. Britt., 1964 ed., vol. I. article Abdel-Kader, p. 28, Algeria 616-17; (৮) Columbia Viking Desk Encyclopaedia, "Abdul Kadir"; (৯) A. W. Palmer, Dictionary of Modern History, 1789-1945", article "Algeria", Crenet Press, London; (১০) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ.; (১১) Col. H. Churchill, The Life of Abdul Kader (1867).

Ph. De Cosse-Brissac (E.I.2) / হুমায়ুন খান

(শাহ) 'আবদুল-কাদির দিহ্লাবী (شاه عبد القادر دهلوى) ঃ ইব্ন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ ইব্ন শাহ 'আব্দুর-রাহীম ১১৬৭/১৭৫৩ সনে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ-র নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। তিনি তাফ্সীর, হাদীছ ও ফিক্হশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহভক্ত, স্বাধীনচেতা ও আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল (متوكل) ছিলেন। মূদিহুল-কুরআন (موضح القرآن) নামক কুরআন মাজীদের তৎকৃত উর্দূ অনুবাদ (ব্যাখ্যা ও টীকাসহ) তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ। এই অনুবাদ ও টীকা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার একটি সংস্করণ T.P Hugh-র ভূমিকা ও পাদরী E. M. Wherry-র সংস্করণসহ ল্যাটিন বর্ণমালায় ১৮৭৬ খৃ. কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ স্বীয় ভ্রাতা শাহ রাফীউদ্-দীনকৃত অনুবাদ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অধিক পরিচ্ছন্ন এবং ইহার বাক্রীতি উন্নত মানের বলিয়া মনে হয়। শাহ সাহেব ১২৩০/১৮১৪-১৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান বলেন, "বিভিন্ন বিশ্বস্ত লোকের বহু বর্ণনায় জানা গিয়াছে, তিনি যে বিষয়ে যাহা কিছু বলিতেন তাহা হুবহু বাস্তবে রূপ লাভ করিত। অত্যধিক বিনয় ও সৌজন্যবশত তিনি কাহাকেও কোন আদেশ দিতেন না—বলিতেন না, 'এইখানে বসুন বা ঐখানে বসুন'। কিন্তু আল্লাহ্র তরফ হইতে মানুষের মনে তাঁহার প্রতি এমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি আপ্লুত ভয় বিরাজমান থাকিত যে, এমনকি শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁহার দরবারে বিনীতভাবে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রাখিয়া বসিয়া পড়িতেন এবং তাঁহার কোনরূপ ইঙ্গিত ও অনুমতি ব্যতীত কথা বলার সাহস পাইতেন না; কথা বলার সুযোগ পাইলে ও দুই এক কথার বেশী কিছু বলার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেন না" (আছারুস্-সানাদীদ্, ৪খ., ৯৪-৯৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ খান, আছারুস-সানাদীদ, দিল্লী ১৯৬৪ খৃ., ৪খ., ৯৪-৯৫; (২) 'আব্দুল-হায়্যি, নুযহাতল খাওয়াতির, ৭খ., ২৯৫-২৯৬; (৩) মাওলাবী রাহ্মান আলী, তায্কিরা উলামা-ই হিন্দ্, অনু. মুহাম্মদ্ আয়্যুব কাদরী; (৪) সিদ্দীক হাসান খান, আল-ইক্সীর ফী উসূলিত্-তাফ্সীর, কানপুর ১২৯০ হি., পৃ. ৬-১০; (৫) মুহাম্মাদ রহীম বাখ্শ, হায়াত ওয়ালী, লাহোর, পৃ. ৬৩৫-৬৪১; (৬) তারীখ আদাবিয়্যাত-ই মুসালমানে পাকিস্তান ওয়া হিন্দ্, ৫খ., ফারসী-আদাব (তৃতীয়), মুদ্রণে পা াব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর; (৭) Gracin de Tassey, Hist. de la litt. Hindouie et Hindoustanie, (২য় সং) প্যারিস ১৮৭০, ১খ., ৭৬ প.; (৮) ঐ লেখক, Chrestomathie hindoustanie, Journal des Savants, প্যারিস ১৮৭২ খৃ., পৃ. ৪৩৫-৪৪৩; (৯) Blumhard, Suppl. Catalogue of Hindustani books in the Libr of the Brit. Museum, লন্ডন ১৯০৯ খৃ., ২১৫-২২২ প.; (১০) Ram Babu Saxena, Hist. of Urdu Literature, Allahabad 1940.

শাহ 'ইনায়াতুল্লাহ (দা. মা. ই) /মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

'আবদুল-কাদির বাদাউনী (দ্র. বাদাউনী)

'আবদুল-কায়স (عبد القيس) ঃ [বিরল রূপ 'আব্দ কায়স (عبد قيس)] অর্থাৎ কায়স (দেবতা)-র দাস। পূর্ব 'আরবের একটি প্রাচীন গোত্র, যাহার সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য (নিসবা) 'আব্দী বা 'আব্কাসী। 'আব্দুল-কায়স গোত্রীয়রা আধুনিক কালের আল-আরিদ প্রদেশে বসবাসকারী গোত্রদের সহিত সম্পর্কিত। তথা হইতে উহারা উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্তমান 'সুদায়র' ও দক্ষিণ-পূর্ব আল-খারজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পরবর্তী কালে উত্তর আরবীয়দের বংশ পরিচিতিতে এই গোত্রটিকেই রাবী'আ (দ্র.) নাম দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই গোত্রের কিছু অংশ পৃথক হইয়া যাযাবর জীবন যাপন করিতে থাকে, তাহাদের কিছু লোক তুওয়ায়ক পাহাড়ী বাঁধের অভ্যন্তরে ও কিছু লোক বহির্ভাগে। 'আবদুল-কায়স গোত্র এই বহির্ভাগ অঞ্চলে ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা পূর্ব 'আরবের দুইটি বৃহৎ মরূদ্যান অঞ্চলে অর্থাৎ অন্তর্দেশের বাহরায়ন ও উপকূলের কাতীফ-এ গিয়া বসতি আরম্ভ করে। আল-বাহরায়ন মরূদ্যানটি [যাহা দশম শতাব্দীতে আল-আহ্সা (দ্র.) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে আল-হাসা (দ্র.) নামে পরিচিত] বিভিন্ন কূপ, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ঝরনাধারায় সিঞ্চিত, উহাদের বৃহত্তমটির নাম (আয়ন) মুহাল্লিম। এই জেলাটি উত্তরদিকে 'আয়নায়ন (আল্-'উয়ূন) পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দ্বাদশ শতাব্দীতে দারুণভাবে বালুকাকীর্ণ হইয়া যায়। দক্ষিণ দিকে ইহা আল-কাছীব-এর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। ইহার রাজধানী ছিল 'হাজার' এবং নগর দুর্গ আল-মুশাক্কার। জুওয়াছা নামে অপর একটি দুর্গঘেরা স্থানও ছিল। উপকূলবর্তী মরূদ্যানবিশিষ্ট জেলাটি উত্তরে সাফ্ওয়া (মধ্যযুগের পূর্বে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না) হইতে দক্ষিণে জাহ্রান পর্যন্ত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল কাতীয়-এর নিকটবর্তী যারা।

আবদুল-কায়স্ 'শান্ন' ও 'লুকায়য' এই দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। লুকায়য গোত্রটি নুক্রা, আদ্-দীল, 'ইজ্ল ও মুহারিব ইব্ন 'আম্র কাবীলার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। শেষোক্ত তিনটি স্বগোত্রীয় আন্মার হইতে স্বতন্ত্র পরিচিতির জন্য আল-উমূর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল। বানূ আনমার গোত্র 'আমের ইব্নুল হারিছ (যাহার উপগোত্র বানূ মুরুরা ও বানূ মালিক) ও জাযীমা ইব্ন 'আওফ (ইহার উপগোত্র 'আবদ শাম্স, হিয়ায় [কিতাবুল-ইশতিকাক, পৃ. ১৯৭ হায়্যি] এবং 'আমর তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী গোত্র হারিছ [ইব্ন মু'আবিয়া]-এর বিরুদ্ধে 'বারাজিম' নামে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন (শাখা গোত্রদ্বয় সমন্বয়ে গঠিত)।

বানূ মুহারিব বাহ্রায়ন-এর মরূদ্যানের গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিত। স্বয়ং হাজার-এর অধিবাসীরা ছিল গোত্রীয় বন্ধনমুক্ত মিশ্র গোষ্ঠী। সম্ভবত যারা ও অন্যান্য উপকূলীয় শহরের অবস্থা একই ছিল। ইহাদের জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশই ছিল অনারব (ইরানী, ভারতীয়, ইয়াহূদী ও মেন্ডীয়-খৃষ্ট ধর্মবিরোধী সম্প্রদায় বিশেষ) ধারণা করা হয়, সংখ্যায় কম হইলেও হাজারবাসীদের অবস্থাও একই ছিল। কাতীফ অঞ্চলে জাযীমা ইব্ন 'আওফ ও জাহ্রানে নুকরা গোত্রের বসবাস ছিল। ভূমির মালিকানা সম্পর্কে আমরা এই মাত্র জানি, পূর্ব 'আরবের জাওফ নামক স্থানের (দারা আদ-দার 'আয়ন দার-এর আশেপাশে) সুলাসিল নামক মরূদ্যানের মালিক ছিল জনৈক

'আমের। গ্রীষ্মকালে উত্তর 'আরবের 'আবদুল-কায়স, শান্ন, 'আমের ইব্‌নুল-হারিছ ও আল-'উমুর গোত্রের লোকেরা একত্রে ওয়াদী ফারূক-এর অভ্যন্তরে যাযাবর জীবন যাপন করিত। নুক্‌রা গোত্রের লোকেরা কাতার-এর দক্ষিণ-পূর্বে জাহরান ও বায়নুনা-র মধ্যবর্তী অঞ্চলে (এই স্থানেই গোত্রের শেষ বস্তি লু'বা-র সন্ধান করিতে হইবে) পশু চারণ করিত।

মরূদ্যান অঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় প্রাচীন কাল হইতেই হিজরত শুরু হইয়াছিল। কিছু লোক আরবের অন্য উপকূলীয় অঞ্চলে, 'উমান-এর দিকে (নুকরা ও দীল-এর ক্ষুদ্রাংশ, 'আওয়াক, 'উমুর ও আনমার-এর ভ্রাতৃবৃন্দ ইত্যাদি) এবং কিছু লোক ইরানের উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। বলা হয়, আবদুল-কায়স গোত্র পূর্ব আরবে প্রবেশকালে তথায় ইয়াদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের সংগে তাহাদের সাক্ষাত হইয়াছিল। তখন তাহারা ইরাকের দিকে অভিপ্রয়াণ (migration) করিতেছিল। তাহাদের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী ছিল (বাকর-রাবী'আ-র শাখা) কায়স ইব্‌ন ছা'লাবা যাহারা 'আরিদস্থ বাড়ীঘর ছাড়িয়া ছাজ কাজিমা-ফাল্‌জ আল্‌-বাতিন অঞ্চলে পশু চারণ করিত। 'আবদুল-কায়স-এর শত্রু গোত্র বানূ সা'দ ইব্‌ন তামীম দাহ্‌না-র উভয় পার্শ্ব ওয়াদী ফারূক ও ওয়াদিস-সাহ্‌বা পর্যন্ত বিচরণ করিত।

দ্বিতীয় শাপূর-এর সময় হইতে (৩১০-৭৯ খৃ.) উপকূলীয় মরূদ্যানগুলি সরাসরি ইরানের শাসনাধীন ছিল। দেশের অভ্যন্তরভাগ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কিন্দা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্দা রাজ্যের পতনের পর ৫৩০ খৃস্টাব্দের দিকে উক্ত বংশের একটি সগোত্র শাখা হাজার অঞ্চল শাসন করিতে থাকে। এই বংশের বিলুপ্তির পর ইরানীদের সহায়তায় হীরা-র লাখ্‌মীগণ বাহরায়ন অধিকার করিয়া লয়। তৃতীয় নুমান-এর সময় (৫৭৯-৬০১ খৃ.) লাখ্‌মীগণ লুণ্ঠন অভিযান দ্বারা শান্ন ও লুকায়য্‌দের প্রতিবন্ধকতাকে বিদূরিত করে। লাখ্‌মীদের পতনের পর দেশটি জনৈক বিশ্বস্ত 'আরবের সহায়তায় মুশাক্‌কার দুর্গে বসবাসকারী এক ইরানী ইসপাহবায সেনাপতি দ্বারা শাসিত হয়। এই অঞ্চলের শাসক ও 'আবদুল-কায়স গোত্রীয়রা পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রেরিত প্রতিনিধি ও তাঁহার প্রেরিত চিঠিকে স্বাগত জানায়। 'আবদুল-কায়স গোত্রের লোকেরা মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট গিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই গোত্রের নেতা মুনযির ইব্‌ন 'আইয ও আল্‌-জারূদ ইব্‌ন 'আম্‌র এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রিদ্দার ফিতনার সময় 'আবদুল-কায়স গোত্রের কিছু লোক আল্‌-জারূদ (আল-হারিছ আল-জাযীমী)-এর নেতৃত্বে মদীনার অনুগত থাকে। কিন্তু অন্যরা কায়স-ইবন ছা'লাবা গোত্রের সরদারের নেতৃত্বে একজন লাখ্‌মীকে নিজেদের শাসক বলিয়া ঘোষণা করে। মুসলমানগণকে 'জুওয়াছা' নামক স্থানে অবরুদ্ধ করা হইলেও তাহারা অবিচল থাকে। মুসায়লিমা পরাজিত হইলে মুসলমানগণের সাহায্যকারী বাহিনীর আগমনে তাহারা নিজেরাই অগ্রসর হইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ করে (১২/৬৩৩)। তবে ৬৩৪ খৃস্টাব্দের শরৎকালের পূর্বে যারা-য় অবরুদ্ধ ইরানীদেরকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা সম্ভব হয় নাই।

মুসলিম বিজয়ের ফলে হিজ্‌রতের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। বানূ লাবু (শান্ন ও লুকায়যের তুলনায় প্রাচীনতর গোত্র) পারস্য উপসাগরের তীরে ফারস-এর বিপরীত দিকে একটি অভিযানে অংশগ্রহণ করে এবং প্রধানত তাওয়াজ নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। এই হিজরতের গতি বিশেষত বসরার দিকে ছিল। কূফায় 'আবদুল-কায়স গোত্রের বিশেষ শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কূফার বাহিনীর সঙ্গে তাহারা মুসিল-এর দিকে এবং বসরার বাহিনীর সঙ্গে খুরাসানে গিয়া উপনীত হয়। ৭১৫ খৃস্টাব্দে তথায় তাহাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। 'আবদুল-কায়স গোত্রীয়গণ নববিজিত প্রদেশসমূহের রাজনীতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিত। কূফার শী'আ পরিবেশে তাহারা শী'আ এবং বসরা ও খুরাসানে তাহারা গোত্রীয় কোন্দলের অংশীদার ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম তাপস হাসান আল্‌-বাস্‌রীর পূর্বসূরী হারিস ইব্‌ন হায়্যান এই গোত্রের লোক ছিলেন।

স্বদেশে 'আবদুল-কায়স গোত্রীয়গণ ইয়ামামা কেন্দ্রিক নাজ্‌দার খারিজী আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার বিফল প্রচেষ্টা করিয়াছিল (৬৭/৬৮৬-৮৭)। এই সময় বিভিন্ন গোত্রের অবস্থানে পরিবর্তন শুরু হয়। 'আবদুল-কায়স গোত্র সমষ্টির কেবল জাযীমা ইব্‌ন 'আওফ ও মুহারিব তাহাদের পুরাতন আবাসস্থলে থাকিয়া যায়। মুহারিব 'উকায়র পোতাশ্রয়ের উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। 'আম্‌র ইব্‌নুল-হারিছ জাহ্‌রানে ও বাহ্‌রায়ন-এর একটি ছোট দ্বীপে (সিত্‌রা-য়) থাকিয়া যায়। 'আবদুল-কায়স গোত্রের অবশিষ্ট অঞ্চল (তামীম গোষ্ঠীর) সা'দ অধিকার করিয়া লয়। সা'দ বাহ্‌রায়ন-এর অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং আল-আহসা' জনপদের পত্তন করে। তাহারা যখন বসরায় উপনীত হয়, সম্ভবত তখন 'উমানের আযদ গোত্র উপকূল অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে (৬০/৬৮০-এর দিকে)। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'আবদুল-কায়স গোত্রীয়দের সংগে সুদায়র-এর তুআম তাওয়াম/তুওয়ায়ম মরূদ্যান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে পূর্ব আরবে একটি মরূদ্যান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জনৈক আয্‌দী যারা নামক স্থান, জাযীমা ইব্‌ন 'আওফ গোত্রের ইব্‌ন মিস্‌মার কাতীফ ও 'আবদুল-কায়স গোত্রোদ্ভূত বানূ হাফ্‌স্ সাফ্‌ওয়া শাসন করিতে থাকেন। বাহ্‌রায়নের অঞ্চলটি দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। হাজার-এ আল্‌-'আয়্যাশ আল-মুহারিবীর শাসন ও জুওয়াছায় বানূ মালিক গোত্রোদ্ভূত 'উরয়ান-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪৯-৫৪/৮৬৩-৬৮ সালে একজন প্রকৃত অথবা মিথ্যা দাবিদার আলী বংশীয় বাহরায়ন-এ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রথমে সে হাজার-এ এবং পরে আল-আহসার বানূ সা'দ গোত্রে স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষা করে। পরিশেষে সে মরু অঞ্চলের দিকে চলিয়া যায়। সেখানে তামীম গোত্রীয় ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে সদ্য হিজ্‌রতকারী লোকদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করে। উরয়ান অন্য আবদুল-কায়স গোত্র প্রধানদের সহায়তায় অনেক কষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। পরবর্তী কালে তাহারা বসরার যাঞ্জী (দ্র. যাঞ্জ) দাসদের এক বিরাট অভ্যুত্থান সংগঠিত করে।

উপরিউক্ত গোত্রসমূহ ও বেদুঈনরা, যাহারা পরবর্তী কালে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল এবং কাতীফ-এর সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা কারামিত্বা আন্দোলনের প্রচারক আবূ সা'ঈদ আল-জান্নাবীর সমর্থক হইয়া পড়ে।

২৬৮/৮৯৯ সালে কারামিতা বিপ্লব সংঘটিত হয়। প্রথমে কাতীফ-এর পতন হয়। পরে যারা-কে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে খলীফার বাধাদান সত্ত্বেও হাজার অধিকৃত হয়। আল্-আহ্সা কারামাতিয়্যাদের (দ্র.) পূর্ব আরব্ অঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত হয়। এই শাসনের উৎখাত হয় ৪৬৯/১০৭৬-৭৭ সালে বানূ মুর্‌রা গোত্রের উপগোত্র বানূ 'উয়ূন অর্থাৎ আলু-ইব্‌রাহীম দ্বারা। কিন্তু এই নূতন বংশেরও শীঘ্রই পতন শুরু হয়। কেবল দ্বাদশ শতকের শেষদিকে এই পতন রোধের চেষ্টা করা হয়। ১২৪৫ খৃস্টাব্দের দিকে 'আবদুল-কায়সের এই শেষ বংশটিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'আলী ইব্‌নুল-মুকাররাব আল-উয়ূনী কবিতা চর্চার মাধ্যমে গোত্রের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। কারণ 'আরব জগত অনেক পূর্ব হইতেই অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া পূর্ব আরবের মরূদ্যান-গুলি নবাগতদের দ্বারা আবাদ হইয়া গিয়াছিল।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'আবদুল-কায়স গোত্রের বিরাট অংশই খৃস্টান ছিল বলিয়া মনে হয়। কয়েকটি নামই তাহাদের আদিম পৌত্তলিকতার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন বানূ শান্-এর 'আম্‌র আল-আফ্‌কাল, 'আব্‌দ শাম্‌স, 'আব্‌দ 'আম্‌র (?)। আফকাল (বেবিলনীয় শব্দ اپ كلو। অর্থ পুরোহিত)-এর পদটি, অন্যান্য গোত্রের ন্যায় আরবের প্রাচীন নাগরিক সভ্যতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশত আরবের প্রাচীন নাগরিক কিংবদন্তী আমর আল-আফকালকে hybris অর্থাৎ বিদ্রোহ ও অহংকারের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন।

ইব্‌নুল কাল্‌বীর আল-মুখতাসার-এর বিচারে আবদুল-কায়সের বংশতালিকা অন্যান্য আরব গোত্রের বংশতালিকার তুলনায় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। Wustenfeld-এর ১নং বংশতালিকায় অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। ইব্‌ন হায্‌ম-এর জাম্‌হারাতু আন্‌সাবিল-আরাব-এ কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রুটি শুধু মুদ্রিত পাঠেই নহে, বরং রামপুর ও বাঁকীপুরের উত্তম পাণ্ডুলিপিতেও বর্তমান। প্রথমত, অন্যান্য সূত্র হইতে জানা অনেক পুরুষ (بطن)-এর সেখানে উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়ত, এই গোত্রের কয়েকজন সাহাবী অথবা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে প্রেরিত গোত্রের প্রতিনিধিগণের অবস্থান নির্দেশে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। অধিকন্তু এই বংশতালিকায় খলীফা মানসূর-এর দরবারের এক কর্মকর্তাকে উক্ত সাহাবী ও প্রতিনিধিগণের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এই গোত্র বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র)-এর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (আল-ইকদ, ২খ., ১১৯)। প্রসিদ্ধ খাতীবদের মধ্যে মাস্‌কালা ইব্‌ন রাকাবা ও তাঁহার দুই পুত্র (আল-মাআরিফ, পৃ. ২০৫) উল্লেখযোগ্য।

এই গোত্রের কবিদের সম্পর্কিত বর্ণনাতেও অনুরূপ অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, যেমন নুক্‌রা গোত্রের আল-মুছাক্‌কিব, আল-মুমায্‌যাক এবং শান্ন গোত্রের ইয়াযীদ ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন খাযযাক। ইয়াযীদ (কাহারও মতে মুমায্‌যাক) দর্শক হিসাবে স্বীয় দাফনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একটি অভিনব বিষয়। জারীর-এর সমসাময়িক বসরার কবি আস্-সালাতান শান্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইরানে বসবাসকারী যিয়াদুল-আজাম, বানূ আমের ইব্‌নুল-হারিছ্-এর মাওলা (মিল) ছিলেন (খিযানা, ৪খ., ১৯৩; আগানী, ১৪খ., ৯৮)।

কবি আল-মুছাক্‌কিব তাঁহার কবিতায় অসংখ্য ফারসী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা অন্যত্র ব্যবহৃত ছিল না। অধিকন্তু তাঁহার কবিতায় কিছু জটিল বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উহাকে কোন নির্দিষ্ট কথ্য ভাষার সংগে সংশ্লিষ্ট বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আবদুল-কায়সের ভাষাকে বাহ্‌রায়নের ভাষা বলিয়াও চিহ্নিত করা যায় না। (এইখানে বাহরায়ন দ্বারা প্রদেশ বুঝানো হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে পরিভাষায়ও ইহার এই অর্থ) আরব ভাষাবিদগণ ইহাকে নিম্নমানের বলিয়া মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূত, ৩খ., ৪১১; (২) আল্-হামদানী, পৃ. ১৩৬ প.; (৩) আল্-মাস্‌উদী, তান্‌বীহ, পৃ. ৩৯২ প.; (৪) Wustenfeld, Wohnsitze und Wanderungen der arab. Stamme, পৃ. ৭৪-৭৬; (৫) ঐ লেখক, Bahrein und Jemama, পৃ. ১-১৩; (৬) ইব্‌ন সা'দ, ১/২ খ., ৫৪; ৫খ., ৪০৬ প., ৭/১ খ., ৬০ প., ৯৫; (৭) তাবারী, ২খ., ১২৯১; (৮) Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, পৃ. ৫৩, ৫৭, ৬৭; (৯) J.Wellhausen, Die religiospolit. Opposition- sparteien, পৃ. ২৯ প., ৫৮; (১০) ঐ লেখক, Das arabische Reich und sein Sturz, পৃ. ৪৪ প., ১৩০, ২৮৪ প., ২৫৮, ২৬৬; (১১) J. M. de Goeje, La fin de I'empire des Carmathes du Bahrain, JA. ১৮৮৫, ১-৩০; (১২) von Oppenheim, Die Beduinen, vol. iii (সম্পা. W. Caskcl), পৃ. ১৫-১৯, ১৩০ প.; (১৩) ইব্‌ন দুরায়দ, আল্-ইশতিকাক, পৃ. ১৯৬-২০২ (সম্পা. Wustenfeld) (আবদুল-কায়স গোত্রের কবিদের সম্পর্কে অধিকতর জানার জন্য দ্র. আল-মাদাইনী, আশ্‌রাফু আবদিল-কায়স); (১৪) আল-আস্‌মাইয়্যাত, সংখ্যা ৫০; (১৫) আল-মুফাদ্‌দালিয়্যাত, সংখ্যা ২৮, ৭৬-৮১, পরিশিষ্ট সংখ্যা ৪ ; WZKM ১৯০৪, ১ প.; (১৬) ইব্‌ন কুতায়বা, আশ্-শি'র, প., ২৩৩ পৃ. ২৫৭ প.; (১৭) আগানী, ৫খ., ৩১৪, ১৪খ, ৯৮ প.; (১৮) আলী ইব্‌নুল-মুকার্‌রাব, দীওয়ান, বোম্বে ১৩১০ হি.।

W. Caskel (E.I.[2]) এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল-কায়্যুম (عبد القيوم) ঃ সাহিবযাদাহ, স্যার, ১৮৬৪ খৃ. স্বীয় পিতৃভূমি টুপী (মারদান জেলার সাওয়াবী তহসীল) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানটি উক্ত অঞ্চলের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত যেখানে সিন্ধু নদ পর্বত অতিক্রম করিয়া সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। পিতৃকুলে তিনি লূধী বংশোদ্ভূত এবং মাতৃ ও পত্নীকুলে কুঠামুল্লা বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কুঠামুল্লা একজন সূফী সাদক এবং আখুন্দ (اخوند)-এর সমসাময়িক ছিলেন। সাহিবযাদাহ্-র পিতা সাহিবযাদাহ আবদুর রউফ-এর পঞ্চম পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত সূফী সাধক বাবা 'আবদুল-কারীমের অন্যতম বংশধর। সাহিবযাদাহ আবদুর-রাউফ সাওয়াবী তহসীলের অন্তর্গত কুঠাহ পল্লীর বিখ্যাত বুযুর্গ সায়্যিদ আমীর (র)-এর ভাগিনা ও জামাতা ছিলেন। তিনি বাগ্মী ও লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত তিনটি বই, যথা মাহাওল, হাশিয়া ফুসূল ও শিহাব ছাকিব প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিবযাদাহ্ 'আবদুর-রাউফ ২৬ বৎসর বয়সের শহীদ হন এবং সাহিবযাদাহ্ 'আবদুল-কায়্যুম দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্বেই পিতৃছায়া হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহার শৈশবেই তাঁহার মাতা ইন্তিকাল করেন। এইজন্য পিতার মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার সহোদরা কৃঠায় মামা সায়্যিদ আহমাদের নিকট প্রতিপালিত হন। মামার তত্ত্বাবধানেই সাহিবযাদাহ্ সাহিব প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে কিছু অধিক বয়সে তিনি পেশাওয়ারের এডওয়ার্ড হাই স্কুলে ভর্তি হন। ম্যাট্রিক পাস করিবার পর তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রথমে পাটওয়ারী হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে নায়েব তহসীলদার পদে উন্নীত হন। ১৮৯৪ খৃ. সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ইহার বিশ বৎসর পর পদোন্নতি লাভ করিয়া শেষে এক বৎসরের জন্য পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োজিত হন। ১৯১৯ খৃ. তিনি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিবযাদাহ্ আবদুল-কায়্যুম খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ফলে তিনি পাঠানদের মধ্যে অত্যধিক জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাহারা তাঁহাকে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনের অধিকারী দেখিতে ভালবাসিতেন। বৃটিশ সরকারেরও তাঁহার প্রতি খুবই আস্থা ছিল। ইহাতে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Olaf Caroe, The Pathans, লন্ডন ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৪২৪)।

যে তিন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ শাসনামলে তাঁহাদের (পূ. ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপসমূহকে সফল করিতে অসাধারণ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সাহিবযাদাহ্ আবদুল-কায়্যুম তাঁহাদের অন্যতম গ্র., পৃ. ২১)। যখন স্যার জর্জ রূস কেপল (Roose Kepple) সীমান্ত প্রদেশের কুরাম ও খায়বার অঞ্চলের পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন এবং কিছু সময়ের জন্য উক্ত দায়িত্বের সহিত স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্বও তাহার উপর ন্যস্ত হয়, তখন তিনি খায়বারের আফ্রিদী গোত্রকে যাহারা ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিল, বশীভূত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে তিনি সাহিবযাদাহ্ আবুদল-কায়্যুমের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেননা তিনি আবদুল-কায়ূমের যোগ্যতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে রূস কেপলের সহিত সাহিবযাদাহ্ সাহিবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে (কীরূ, পৃ. ২৪)। রূস কেপল আবদুল-কায়্যুম ও কাদী আবদুল-গানীর সহযোগিতায় ইংরেজী ভাষায় পাশতু ভাষার একখানা সুন্দর ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিবযাদাহ্ সাহিবের উপর ইংরেজ শাসকদের যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল উহার কারণেই সীমান্ত প্রদেশের তৎকালীন ঘটনা প্রবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দলীলসমূহে তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের কৃষ্ণ পর্বতের (Black Mountain) যুদ্ধ, সামানার ঘটনা (১৮৯১ খৃ.), তীরার ঘটনা (১৮৯৭-১৮৯৮ খৃ.), যাখাহ্খীলের ঘটনা (১৯০৮ খৃ.), আফগান বাউন্ডারী কমিশন (১৮৯৪-১৮৯৫ খৃ.) ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ খৃ.)।

সাহিবযাদাহ্ সাহিব ইংরেজ সরকারকে প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে ১৮৯৮ খৃ. খান বাহাদুর, ১৯০৮ খৃ. সি. আই. এ., ১৯১৫ খৃ. 'নাওওয়াব' ও ১৯১৭ খৃ. স্যার (K. C. I. E.) উপাধি লাভ করেন। তদুপরি ১৯২৯ খৃ. তিনি 'কায়সার-ই হিন্দ' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সাহিবযাদাহ্ 'আবদুল-কায়্যুম নিজ প্রদেশের জন্য যে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার স্বদেশবাসী খুব সন্তুষ্টই ছিল। সেই যুগের যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তাঁহারা তাঁহার দেশপ্রেম ও পারস্পরিক সহযোগিতার কাহিনীসমূহ উৎসাহভরে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সীমান্তবর্তী গোত্রসমূহের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে সদাচরণ ও পারস্পরিক সমঝোতার নীতি অব্যাহত রাখিবার ব্যাপারে তিনি উভয় পক্ষের জন্য অত্যন্ত সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত কৌশল অবলম্বনের কারণে উক্ত অঞ্চল অনেকাংশে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত ছিল এবং ইংরেজ সরকারের নিকট তাহাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিবযাদাহ্র বিরাট অবদান তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। সেইজন্য তিনি সীমান্ত প্রদেশের স্যার সায়্যিদ নামে খ্যাতি অর্জন করেন। সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের কোন কলেজ না থাকায় উক্ত অঞ্চলের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানগণ মাট্রিক পাসের পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে আলীগড় কলেজে ভর্তি হইত। সাহিবযাদাহ্ আবদুল-কায়্যুম ১৯১৩ খৃ. স্যার জর্জ রূস কেপলের সহায়তায় পেশাওয়ারে ইসলামিয়া কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বর্তমানে উহা পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ)। সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণে ইসলামিয়া কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। সাহিবযাদাহ আবদুল-কায়্যুম উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ২৪)। তিনি আমৃত্যু কলেজ কাউন্সিলের অবৃত্তিক সচিব ছিলেন।

স্যার উলফ কীরূর বিবরণে প্রকাশ, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নাওওয়াব হোতীর ন্যায় সাহিবযাদাহ্ পাঠানদের মাঝে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৪২৬)।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান মধ্যম পন্থা ও দেশপ্রেম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৯০১ খৃ. সীমান্ত প্রদেশকে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশে পৃথক করা হইয়াছিল। ১৯০৯ ও ১৯১৯ খৃ. উপমহাদেশকে যে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল, সীমান্ত প্রদেশকে উহা হইতে বঞ্চিত করা হয়। ১৯২৩ খৃ. ভারতীয় আইন সভায় সীমান্ত প্রদেশকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয়। তখন উক্ত প্রদেশ হইতে মুহাম্মাদ আক্বার খান হোতীসহ সাহিবযাদাহ আবদুল কায়্যুমকেও মনোনীত করা হয়। তিনি ১৯২৩ খৃ. হইতে ১৯৩২ খৃ. পর্যন্ত উক্ত আইন সভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

সাহিবযাদাহ্ আবদুল-কায়্যুমের রাজনৈতিক জীবনের সারমর্ম এই যে, তিনি একদিকে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের জন্য অধিকতর রাজনৈতিক অধিকারসমূহ আদায় করা এবং অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী ধারার অধিকতর শিক্ষার প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের সমাপ্তির পর (যাহাতে সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল) উক্ত প্রদেশে লাল পোশাকধারী 'খুদাঈ খিদমাতগার'

আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে। ইহা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল। খান ভ্রাতা ডক্টর খান সাহিব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'আবদুল-গাফ্ফার খান উক্ত আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন।

১৯৩০-১৯৩২ খৃ. সাহিবযাদাহ লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২ খৃ. ভারতবর্ষে আইনের সংশোধনী বাস্তবায়িত হইলে সাহিবযাদাহ আবদুল-কায়্যুম সীমান্ত প্রদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রদেশে লাল পোশাকধারী কংগ্রেস দলের বিজয় হইলে তাঁহার মন্ত্রিত্বের সমাপ্তি ঘটে এবং ডক্টর খান প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সীমান্ত প্রদেশের এই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব স্বীয় গ্রাম টুপীতে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে ১৯৩৭ খৃ. নভেম্বর মাসে ইন্তিকাল করেন (মুহাম্মাদ ইয়ূনুস. Frontier Speaks, পৃ. ১৯৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Olaf Caroe, The Pathans, লন্ডন ১৯৬২ খৃ., উর্দূ অনু. সায়্যিদ মাহবূব আলী, পাশ্তু একাডেমী, পেশাওয়ার ১৯৬৭ খৃ.; (২) মুহাম্মাদ ইয়ূনুস, Frontier Speaks, লাহোর তা. বি.; (৩) ফারিগ বুখারী ও রিদা হামদানী, আটাক কে উস্পার, লাহোর তা. বি.; (৪) আল্লাহ বাখ্শ ইয়ূসুফী, সারহাদ আওর জাদ্দ ওয়া জাহাদ-ই আযাদী, কেন্দ্রীয় উর্দূ বোর্ড, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৫) Diwan Chand Obhrai, The Evolution of North-West Frontier Province, পেশাওয়ার ১৯৩৮ খৃ.; (৬) আবদুল-কায়্যুম, Gold and Guns on the Pathan Frontier, বোম্বাই ১৯৪৫ খৃ.; (৭) ইহসানুল্লাহ খান, নাওয়াব স্যার সাহিবযাদাহ আবদুল-কায়্যুম, খায়বার ম্যাগাযিন, ১৯৭২-১৯৭৩ খৃ., ইংরেজী অংশ, পৃ. ১৩-১৭; (৮) সাহিবযাদাহ্ আবদুল-কায়্যুম, রিপোর্ট ইবতিদাঈ দারুল-উলূম ইসলামিয়্যা, পেশাওয়ার ১৯১৩ খৃ.; (৯) আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী, খুত্বা-ই সাদারাত, পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত জামইয়্যাত-ই উলামা-ই হিন্দ-এর কনফারেন্সে প্রদত্ত, ১৯২৭ খৃ.; (১০) J. W. Spain, The Pathan Border Land, হেগ ১৯৬৩ খৃ.; (১১) ডক্টর লাল বাহা, Administration of N.W.F.P., 1901-1919 (লন্ডন ইউনির্ভাসিটিতে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত সন্দর্ভ); (১২) নাসরুল্লাহ খান নাস্র, সাহিবযাদাহ স্যার আবদুল-কায়্যুম খান, পাশতু পত্রিকা, পেশাওয়ার ১৯৬৯; (১৩) Administration Report of N. W.F.P., 1932-1937.

হাফিজ আবদুল-কুদ্দূস ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/
মু. আবদুল আউয়াল

'আবদুল-কারীম ইব্ন ইব্রাহীম আল্-জীলী (عبد الكريم بن ابراهيم الجيلى) ঃ একজন প্রসিদ্ধ সূফী সাধক যাঁহার জন্ম আনুমানিক ৭৬৮/১৩৬৫-৬৬ সালে এবং মৃত্যু সম্ভবত ৮১১ হিজরীর পর। ইহা ৮২০ (১৩০৮-১৪১৭) হিজরী পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে হইয়াছিল। তিনি নিজেকে বাগদাদের অধিবাসী এবং গাওছুল আজাম আবদুল-কাদির জীলানী (র)-এর কন্যার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। এই কারণেই তাঁহাকে আল্-জীলী বলা হয়। জানা যায়, তিনি কাদিরিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন এবং তাঁহার মুর্শিদ ছিলেন শায়খ শারাফুদ-দীন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম আল-জাবার্তী। তিনি ভারত সফর করিয়াছিলেন এবং মুরশিদের সহিত কিছুকাল ইয়ামানেও অবস্থান করেন। তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে বিশটির মত সংরক্ষিত আছে (Brockelmann, GAL, ২খ., ২০৫) এবং অনুরূপ সংখ্যক রচনা বিলুপ্ত।

আল-জীলীর আকীদা (বিশ্বাস) আশ্-শায়খুল-আক্বার মুহয়িদ-দীন ইব্নুল-আরাবীর শিক্ষাসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন আল-জীলীও লিখিয়াছেন, তাহা উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অথবা ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হইয়াছে। এই আকীদার কেন্দ্রবিন্দু ওয়াহদাতুল উজূদ (وحدة الوجود=সর্বেশ্বরবাদ)-এর ধারণা অর্থাৎ সৃষ্টির সকল বিকাশ ঐ একান্ত সত্তা (ذات واجب)-এর প্রকাশ, যাহার সম্ভাবনা অসীম যদিও তিনি সকল উপমার উর্ধ্বে এবং অবিভাজ্য অস্তিত্ব (غير منقسم هويت)-এর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান। আল-জীলী দুনিয়াকে বরফের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্কে এক গোপন সত্য (حقيقت مستور)-রূপে পানির তুল্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন যাহা হইতে বরফের সৃষ্টি। এই বরফ আবার পানিতে রূপান্তরিত। এইজন্যই স্রষ্টার তাৎক্ষণিক প্রকাশ (فورى تجلى)-এর জন্য সূফীগণের মন সদা উজ্জ্বল থাকে। এই উপমায় ওয়াহ্দাতুল-উজূদ-এর মত হামাহ্ উস্ত (همه اوست ঃ সকল কিছুই তিনি)-এর ধারণা নাই। আল্লাহ এমনভাবে দুনিয়ায় রূপ লাভ করেন না যেইভাবে পানি বরফের রূপ ধারণ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রকাশ আমাদের চিন্তানুভূতির উর্ধ্বে অবস্থিত যাহা কোন উদাহরণ দ্বারা সঠিকভাবে উপস্থাপিত করা অসম্ভব। আল্-জীলীর চিন্তাধারার বুনিয়াদী বিষয় প্রায়শ অপ্রাকৃতিক বৈপরীত্য (ما بعد الطبعى تناقض)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও ইহার ব্যাখ্যা অনেকাংশে বিতর্কমূলক। ইব্নুল-আরাবীর রচনাবলী অপেক্ষা তাঁহার রচনায় অধিক সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তাঁহার বিখ্যাত কিতাব আল-ইন্সানুল-কামিল মরক্কো হইতে সুদূর জাভা পর্যন্ত সূফী দর্শনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহাকে ইব্নুল আরাবীর অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সাধারণভাবে গোটা সূফীবাদের উপর প্রথম সুবিন্যস্ত সংকলন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত গ্রন্থে তিনি আল্লাহ্র যাত (ذات)-এর অভিব্যক্তি (مظهريت) সূফী সুলভ আল্লাহ্র সান্নিধ্য প্রাপ্তির (وجدان) স্তরসমূহ, বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে তাজাল্লীর (تجلى) রূপ, মানব সত্তার আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিসমূহ, বিশ্বজগতের বিভিন্ন স্তর ও মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়াছেন।

ইনসান কামিল বা পরিপূর্ণ মানব [যাহার মধ্যে আল্লাহ্র (ذات) অস্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ] ধারণা ইতিপূর্বে ইব্নুল-আরাবী প্রকাশ করিয়াছেন। সূফী দর্শনের ইহা একটি বুনিয়াদী ধারণা যাহা কুরআন কারীমে আদম সৃষ্টির বর্ণনা হইতে সরাসরি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্, আদাম (আ)-এর স্বীয় আত্মা ফুঁকিয়া দেওয়ার কথা (ونفخت فيه من روحى) ১৫ ঃ ২৯ এবং আদাম (আ)-কে সকল নাম শিক্ষা দেওয়া (وعلم ادم الاسماء كلها) ২ ঃ ৩১-র ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই মানুষ নিজ সত্তায় মৌলিকভাবে আল্লাহ্র পূর্ণতম প্রতিবিম্ব এবং তাঁহার ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ বিরাজমান। মানব সত্তার মধ্যে

সমগ্র সৃষ্টির বিন্যাস কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের অস্তিত্ব ও প্রজ্ঞা-এই দুইয়ের বুনিয়াদী ঐক্য অনুধাবন করিতে হইবে। বোধি (تعقل)-ই মানব জ্ঞানের উৎস মূল। এই বোধিতে সকল বস্তুর জ্ঞান নিহিত আছে; কারণ সকল বস্তুই মানুষের সত্তায় বিধৃত। এই বিষয়ে আল-জীলীর রচনা হইতে একটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল ঃ মানবকুলের প্রত্যেক সদস্য অন্য সব সদস্যকে বিনা ব্যতিক্রমে পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে শামিল রাখে। তাহার সীমা নির্ধারণ দৈবাৎ ঘটে, পার্থক্য শুধু এই, কোন মানুষ বস্তুকে সুপ্ত শক্তি (القوة) দ্বারা নিজের সাথে শামিল করিয়া রাখে, কিন্তু সত্যিকারভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত কতিপয় মানুষ, যথা আম্বিয়া ও আওলিয়া প্রতিটি বস্তুকে নিজেদের সত্তায় শামিল রাখেন।

ইনসান কামিল বা পরিপূর্ণ মানুষ বলিতে ঐ সকল কুত্ব (قطب)-কে বুঝায় যাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে অস্তিত্বের সকল বস্তু হয়। সত্তা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কুত্ব-এর মর্যাদা একক ব্যক্তিসম হয়। অবশ্য তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে থাকেন এবং নানা ধর্ম ও মায্হাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এইভাবে কুত্ব অনেক নামে পরিচিত হন। প্রতি যুগে তিনি এমন নামে পরিচিত হন যাহা তাঁহার সেই যুগের অস্তিত্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহার যৌগিক অংশগুলি অস্তিত্বের গূঢ় রহস্যের (حقائق وجود) সহিত ঐক্যপূর্ণ (مطابقة)। তিনি তাঁহার অবস্তু সুলভ প্রকৃতি (غير مادى)-র ভিত্তিতে উচ্চতর সত্যের (حقائق) সহিত ঐক্য স্থাপন করেন এবং শরীরী প্রকৃতির ভিত্তিতে নিম্নতর সত্যের সহিত ঐক্য রক্ষা করেন। তাঁহার আত্মা আল্লাহ্ আরশের মত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ আদম (আ)-কে তাঁহার নিজ রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন .... একজন পরিপূর্ণ মানবের সহিত আল্লাহ্র সম্বন্ধ এমন যেমন দর্পণের সম্বন্ধ ঐ ব্যক্তির সহিত যে নিজ প্রতিবিম্ব ইহাতে লক্ষ্য করে। কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতে ইহার প্রতিই ইংগিত করা হইয়াছে ঃ

انَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۔ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۔

"আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানাত অর্পণ করিয়াছিলাম, উহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ"(৩৩ ঃ ৭২)।

ইহার ব্যাখ্যায় বলা হয়, মানুষ তাহার স্বভাবের প্রতি অত্যাচারী এবং সে তাহার স্বীয় মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অনবহিত। মানুষের আত্মা আল্লাহ্র আমানতের যোগ্য স্থান, কিন্তু সে সেই সম্পর্কে অজ্ঞ (আল-ইন্সানুল কামিল' শিরোনামের অধ্যায়)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-কারীম আল-জীলী, আল-ইনসানুল কামিল ফী মা'রিফাতিল-আওয়াখির ওয়াল-আওয়াইল, কায়রো হি. ১৩০১, ১৩০৪, ১৩১৬, ১৩২৮; (২) ঐ লেখক, আল-কাহ্ফ ওয়ার-রাকীম ফী শারহ বিস্মিল্লাহির-রহমানির-রাহীম, হায়দরাবাদ ১৩৪০হি.; (৩) আন-নাওয়াদিরুল-আয়নিয়্যা ফী বাওয়াদিরিল-গায়নিয়্যা; (৪) R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921 খৃ., পৃ. ৭৭ প., ১৪৩; (৫) De l' Homme, Extraits traduits par Titus Burckhardt, Universal Coll "Soufisme" আলজিরিয়া ও লিওন ১৯৫৩ খৃ.; (৬) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফুজ-জুনূন (Flugel ed.), সংখ্যা ১০৮৯; (৭) Max Horten, Die Philosophie des Islam, মিউনিখ ১৯২৪, পৃ. ১৫৬; (৮) Loth's Catalogue of the Arabic manuscripts in the Library of the India Office, no. 66-667, 693; (৯) R. A. Nicholson, Quest, Sufi doctrine of the Perfect Man, ১৯১৭ খৃ., পৃ. ৫৪৫; (১০) Schreiner, ZDMG, ৫২০ খ.; (১১) Hurgronje, Arabic en oest-Indie, লাইডেন ১৯০৭, পৃ. ১৫; (১২) Vollers, Katal, লাইপজিগ, পৃ. ৬৯; (১৩) আরও দ্র. প্রবন্ধ সূফীবাদ।

Titus Burckhardt (দা.মা.ই.) / আবদুল বাতেন ফারুকী

আবদুল-কারীম কাশ্মীরী, খাওয়াজা (عبد الكريم كشميرى) ঃ ইব্ন আকিবাত মাহ্মূদ ইব্ন বুলাকা ইব্ন মুহাম্মাদ রিদা, জনৈক হিন্দ-পারস্য ইতিহাসবিদ। বাহ্যত তাঁহার একটিমাত্র গ্রন্থ 'বায়ান-ই ওয়াকি' রক্ষিত আছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, নাদির শাহ যখন দিল্লীতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালান তখন তিনি উক্ত শহরে অবস্থান করিতেছিলেন (১১৫১/১৭৩৯)। নাদির শাহ-এর দফ্তর তত্ত্বাবধায়কের সহযোগিতায় তিনি শাহের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং মুৎসুদ্দী (মুতাসাদ্দী) পদে অধিষ্ঠিত হন। এক স্থানে তিনি নিজেকে নাওয়াব নাজির-এর নায়েব ও অন্য স্থানে তাঁহার সচিব (আমীন) বলিয়া লিখিয়াছেন (দ্র. ১ম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, একাদশ অধ্যায়)। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনী সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নাদির শাহ-এর সহিত তূরান, খুরাসান, মাযান্দারান ও কায্বীন গমন করেন। তিনি ১১৫৪/১৭৪১ সনে কায্বীন উপস্থিত হন, হজ্জ পালনের জন্য তিনি হিজায গমনের অনুমতি লাভ করেন। তাঁহাকে হজ্জ করার সুযোগ দেওয়া হইবে — চাকুরীতে যোগদানের সময় তাঁহার সহিত এই ওয়াদা করা হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রপথে হিন্দুস্তান প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০ জুমাদাল-আখিরা, ১১৫৮/২১ জুলাই, ১৭৪৩ তারিখে দিল্লী পৌঁছান।

এইরূপ মনে করা হয়, বায়ান-ই ওয়াকি' গ্রন্থটি চারটি পরিচ্ছেদ এবং একটি পরিশিষ্টের উপর বিন্যস্ত করা হইয়াছিল (পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী)। কিন্তু পরবর্তী কালে উহাকে ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়, যাহার শেষ পরিচ্ছেদ পরিশিষ্ট। ইহা পরিচিত পাণ্ডুলিপিসমূহের কোথাও পাওয়া যায় না। এই হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থে নাদির শাহ-এর পূর্ণ ইতিহাস অর্থাৎ তাঁহার জন্ম ও প্রতিপালন, উত্থান ও ক্ষমতা লাভ হইতে তাঁহার মৃত্যু (১১৬০/১৭৪৭) পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। উহার সংগে সংগে তিনি সেই যুগের ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহেরও (মুহাম্মাদ শাহ ও শাহ আলাম-এর যুগ) (১১৯৮/১৭৮৪) বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপির 'Ethe' সংখ্যা ৫৬৬-তে কেবল ১১৯৯/১৭৮৫ পর্যন্ত সময়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

খাওয়াজা-এর বর্ণনা পদ্ধতি সহজ ও সাবলীল, বাক্য গঠন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। তাঁহার রচনায় তিনি মূল ঘটনাবলীর চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি নির্দ্বিধায় নাদির শাহ-এর সমালোচনা করেন এবং হিন্দুস্তানের ভয়াবহ লুটতরাজের ক্ষয়ক্ষতির উল্লেখ করেন। তিনি শাহ্-এর পুরাতন বন্ধু-বান্ধব ও সভাসদ (যাঁহাদের মধ্যে হাকীম বাশী আলাবী খান অন্যতম) এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে শাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। তিনি স্বকীয় পর্যবেক্ষণলব্ধ বহু তথ্য সংযোজন করেন। ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি যে সকল স্থানে গমন করেন সেইখানের অবস্থা সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিবরণ সন্নিবেশিত করেন। মূল বায়ান-ই ওয়াকি' গ্রন্থটি রিসার্চ সোসাইটি অব পাকিস্তান-এর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত, লাহোর, ১৯৭১ খৃ.। ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আংশিক অনুবাদের জন্য দ্র. Storey, পৃ. ৩২৭। তিনি যে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন উহার সহিত নিম্নোক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহও দ্রষ্টব্যঃ (১) পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরীর সূচী (ফারসী) লাহোর, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৫১ (ইবরাত মাকাল নামটি অত্র পাণ্ডুলিপিতে ভুলবশত লিপিবদ্ধ) ইহাতে ১১৯৮ হি. পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে এবং এই কপি ১২৩০/১৮১৫ সনে লিখিত হইয়াছে; (২) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, শীরানীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ (১১৮৫/১৭৭১); (৩) অত্র নিবন্ধকারের নিজস্ব পাণ্ডুলিপি (১২১৪/১৮০০, যাহা ১১৯৩/১৭৭৯ সনের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Elliot and Dowson, History of India, ৭খ., ১২৪ প.; (২) Ch. Rieu, Cat. of Pers. MSS. (Brit. Mus.), পৃ. ৩৮২; (৩) Storey, 11/2, ৩২৬ প.; (৪) L. Lockhart, Nadir Shah, London ১৯৩৮খৃ. পৃ., ৩০১।

মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ ইসলাম গনী

আবদুল-কারীম বুখারী (عبد الكريم بخارى) ঃ পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিক। তিনি ১২৩৩/১৮১৮ সালে মধ্যএশিয়ার দেশগুলির (আফগানিস্তান, বুখারা, খীওয়া, খোকান্দ, তিব্বত ও কাশ্মীর) মধ্যকার ভৌগোলিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ১১৬০ হিজরী সাল (আহমাদ শাহ দুররানীর সিংহাসনে আরোহণ) হইতে লেখকের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত উক্ত দেশসমূহের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 'আবদুল-কারীম ১২২২/১৮০৭-৮ সালেই তাঁহার মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া জনৈক রাজদূতের সঙ্গে কন্সটান্টিনোপল গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন (সম্ভবত ১২৪৬/১৮৩০ সালের পরে তাঁহার মৃত্যু হয়)। খলীফার দরবারের অনুষ্ঠানাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক 'আরিফ বে-র উদ্দেশে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার একমাত্র পাণ্ডুলিপিখানি Ch. Schefer 'আরিফ বে-র স্টেট লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করেন এবং PELOV-এ প্রকাশ করেন (মূল পাঠ বূলাক-এ ১২৯০/১৮৭৩-৪ সালে মুদ্রিত হয়। ফরাসী অনুবাদ প্যারিস হইতে ১৮৭৬ খৃ. প্রকাশিত হয়)। 'Histoire del' Asie Centrale' গ্রন্থটি মধ্য এশিয়ার, বিশেষ করিয়া বুখারা, খীওয়া, খোকান্দ-এর, আধুনিক কালের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

W. Barthold (E. I.²) হুমায়ূন খান

আবদুল-কারীম মুনশী (عبد الكريم منشى) ঃ পূর্ণ নাম মুনশী মৌলবী মুহাম্মাদ আবদুল-কারীম আলাবী, ১৯শ শতকের মধ্যভাগের ইন্দো-ফারসী ঐতিহাসিক। তিনি সম্ভবত লক্ষ্ণৌ ('তারীখ-ই পাঞ্জাব' ২, 'মুহারাবা' ২১) বা কানপুরের (মুহারাবা ৩) অধিকারী ছিলেন। তিনি ইতিহাস পাঠে গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং অবসর জীবন যাপনকালে আস্-সুয়ূতীর তারীখুল-খুলাফা ও তারীখ মিস্র আরবী হইতে ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং ফার্সীতে ইব্ন খাল্লিকান-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক বইও তিনি ইংরেজী হইতে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া গল্পের বই, সমগ্র আরব্য উপন্যাস, বাংলার ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। কলিকাতা হইতে ১৮৮১ খৃ. ৪ খণ্ডে প্রকাশিত Beale, Oriental biogr. Dict.-তে লিখিত আছে, মুনশী 'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন', সেই অনুসারে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ১৮৫১ খৃস্টাব্দের শেষভাগের পরে ধরা যায় না। 'মুহারাবা-র (ভূমিকায়) ১৮৪৮ ও সেপ্টেম্বর ১৮৫১ সালে তাঁহাকে জীবিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ফার্সী গ্রন্থাবলীর মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাস বিষয়ে নিম্নলিখিত তিনটির লিথোগ্রাফ করা হইয়াছিল। সতর্কতার সঙ্গে বস্তুনির্ভর ইতিহাস রচনার জন্য এবং সহজ, প্রাঞ্জল ভাষা ও পরিচ্ছন্ন বর্ণনার জন্য তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছেঃ (১) মুহারাবা-ই কাবুল ওয়া কান্দাহার, লিথোগ্রাফে ছাপা, লক্ষ্ণৌ ১২৬৪/১৮৪৮ ও কানপুর ১২৬৭/১৮৫১। ইহাতে জেনারেল পোলক (Pollock)-এর অভিযানকাল পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৪২) আফগান যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। লেখক সেই সময়পর্বের কাবুল ও কান্দাহার অভিযানের ইতিহাসের একটি খসড়া তৈরি করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২৬৩/১৮৪৭ সালে তিনি শাহনামার অনুকরণে রচিত 'আকবার-নামাহ' নামক একটি মাছনাবী কাব্য পাঠ করিয়া বইটিতে সংযোজন ও সংশোধন করেন এবং স্থানে স্থানে মাছনাবী হইতে উদ্ধৃতিও সংযোজন করেন। এই কবিতাটি বেশ দীর্ঘ (সর্বমোট ৮৬৩২টি শ্লোকে সমাপ্ত), ১ম দফতর 'জাফার নামাহ্' নামে খ্যাত, ৫ম অধ্যায় (মাদ্হ শাহ্-ই জাম্জাহ') ১২৬০/১৮৪৪ সালে ২ দফতরে সম্পূর্ণ করেন। মুনশী কাসিম জান (মির্যা কাসিম বেগ, বালদা-ই শাহজাহানাবাদ-এর অধিবাসী;পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ৩টি পাণ্ডুলিপির একটিতে এই সংযোজন রহিয়াছে, যেইগুলি ১৮৪৭ খৃ. আগ্রাতে অনুলিপি করানো হয়)। কবি স্বয়ং এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন (এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য আক্বার নামাহ্, দফতর ১-এর খাতিমা, ভিত্তি করিয়া রচিত, মুহারাবা, পৃ. ৪ দ্র.)।

তাই কাসিমের 'আকবার-নামাহ্' (উপরিউক্তগুলি ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির জন্য এবং ১২৭২ হি. সনের আগ্রা সংস্করণের জন্য Storey, ii/2, 802 দ্র.) ও হামীদ কাশ্মীরীর 'আকবার-নামাহ্' এই উভয় গ্রন্থে (কাবুল ১৩২০ শামসী) বিষয়বস্তু, ছন্দ ও রচনাকালের দিক হইতে (উহাও ১২৬০ হিজরীতে সমাপ্ত হয়) যথেষ্ট মিল রহিয়াছে বলিয়া উভয়কে একই গ্রন্থ মনে করা ঠিক নহে, যেমন Evanow (Descript. Cat. of the Pers Mss. in the Curzon collection, 12, no. 22) ভুলবশত কাসিমের 'আকবার নামাহাকে' হামীদ কাশ্মীরীর 'আকবার নামাহ্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

A. S. B.-এর কার্জন সংগ্রহে (Ivanow-এর উপরোল্লিখিত ক্যাটালগ (দ্র.) 'মুহারাবা-এর একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

(২) 'তারীখ-ই পাঞ্জাব তুহফা লিল-আহবাব' (বা তুহফা-ই আহবাব, মাতবা মুহাম্মাদী হইতে, সম্ভবত লক্ষ্ণৌ) ১২৬৫/ ১৮৪৯ সালে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত। ইহার বিষয়বস্তু ইংরেজ-শিখ যুদ্ধ। বইটি দুই হামলা-তে বিভক্ত, প্রথম হামলাতে ১ম শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৬ খৃ.) এবং দ্বিতীয় হামলাতে ২য় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৯ খৃ.) আলোচিত হইয়াছে। এইরূপ লেখার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে যে ইংরেজরা জয়ী হইয়াছিল (ভূমিকা) তাহা দেখানো।

ইংরেজ সামরিক অফিসারগণের প্রদত্ত বর্ণনা ও সমসাময়িক উর্দূ সংবাদপত্রসমূহে সরকার আরোপিত বিধিনিষেধ পার হইয়া প্রকাশিত বিবরণের ভিত্তিতে বইটি রচিত। বইটিতে কিছু সংখ্যক চিত্তাকর্ষক দলীল রহিয়াছে। যথা শিখ শাসনামলে পাঞ্জাবের রাজস্বের খতিয়ান, ইংরেজ-শিখ সন্ধির চুক্তিপত্র, তৎকালে পাঞ্জাবে জনগণের উদ্দেশে জারীকৃত বৃটিশদের ঘোষণাসমূহের মূল পাঠ অথবা সারাংশ, শিখদের কামানের গায়ে খোদিত লিপি ইত্যাদি।

(৩) তারীখ-ই আহমাদ' (তারীখ-ই আহমাদ শাহী), ১২৬৬/১৮৫০ সালে লক্ষ্ণৌ হইতে লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রিত (বইটির পাণ্ডুলিপির জন্য Storey, ii/2, 403 দ্র.] শুজা'উল মুল্ক দুররানী [উপরের (২) দ্র.] কর্তৃক লুধিয়ানা ত্যাগ করিয়া বৃটিশ সরকারের সহায়তায় পূর্বপুরুষের সিংহাসন পুনরুদ্ধার (১২৫৫/১৮৪১) পর্যন্ত অংশের ইতিহাস রচনা সমাপ্ত করিবার পরে লেখক দুররানীগণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় হাত দেন। ১২১২/১৭৯৭ সাল পর্যন্ত (যামান শাহ-এর রাজত্বের প্রায় মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত) কালের ইতিহাসের জন্য তিনি দীর্ঘকাল যাবত আফগানিস্তানে বসবাসকারী ঐতিহাসিক ইমামুদ্-দীন-এর হুসায়ন শাহী বা তারীখ হুসায়নী (দ্র. Rieu, Cat. Pers. Mss. Br. Mus, iii, 904 b)-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন। রাজবংশের পতন পর্যন্ত পরবর্তী কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কাবুল, কান্দাহার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ হইতে আগত তথ্য- সচেতন, নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী পর্যটকগণের বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করেন (আহমাদ শাহী, ৩খ., ৫১১)। আবদালীদের বংশতালিকা প্রদানের পরে তিনি আহমাদ শাহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ইতিহাস বর্ণনা করেন। গ্রন্থটির শেষ অংশে তিনি যামান শাহ-এর প্রধান প্রধান আমীরের বর্ণনা, পাঞ্জাবের একটি ভৌগোলিক বিবরণ ও কাবুল-কান্দাহার- হারাত-চিশ্ত সড়কের বিভিন্ন ধাপ বা অংশের বর্ণনা (চিশতিয়া দরবেশগণের মাযারের তালিকাও দেওয়া হইয়াছে) এবং তুর্কিস্তান ও উহার শাসক নারবূতা বে সম্বন্ধে একটি অধ্যায় রহিয়াছে। গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে শুজাউল-মুলক-এর মৃত্যু, আফগানিস্তান হইতে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার এবং তৎসঙ্গে পাইন্দা খানের ১৭জন পুত্রের নামের তালিকা বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি ও 'মুহারাবা' ছিল আমীর হাবীবুল্লাহ খানের আদেশে সঙ্কলিত আফগানিস্তানের ইতিহাস 'সিরাজুত-তাওয়ারীখ' (কাবুল ১৩৩৭ হি.) রচনার তথ্যাবলীর প্রধান দুই উৎস-গ্রন্থ।

'তারীখ-ই আহমাদ শাহী' গ্রন্থের একটি উর্দূ সংস্করণ মীর ওয়ারিছ আলী সায়ফী কর্তৃক অনূদিত হইয়া ওয়াকিআত-ই দুররানী নামে লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে কানপুর হইতে ১২৯২/১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

E. Edwards-এর মতে, তিনি A Dictionary of Anglo- Persian homogeneous words etc. (বোম্বাই ১৮৮৯; বোম্বাই ১৮৮৯)-এরও সংকলক (Cat. of the Persian Printed Books in the British Museum, London 1922, 21)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storey, ii/2, 402-4, ii/3, 673; (২) O. Mann, Quellenstudien zur Geschichte des Ahmed Sah Durrani, ZDMG, 1898, 106 প.; (৩) তুর্কিস্তান সম্পর্কিত অধ্যায়ের ফরাসী অনু. Fr. transl. of the chapter on Turkistan, Ch. Schefer, Historire de l'Asie Centrale par Mir Abdoul Karim Boukhary, Paris 1976, 280 প.।

Muhammad Shafi (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আবদুল-কারীম ইবন আজারাদা (দ্র. ইব্ন 'আজারাদ)।

আবদুল গণী (عبد الغنى) ঃ মিঞা, খাজা, নওয়াব, স্যার (K.C.S.I.) ১৮১৩-৯৬, ঢাকার নওয়াব, সমাজসেবী, দানবীর; জনগণের নিকট তিনি 'গণী মিঞা' নামে সুপরিচিত। কাশ্মীরের সম্ভ্রান্ত খাজা বংশোদ্ভূত তাঁহার পূর্বপুরুষ খাজা আবদুল-হাকীম ও তাঁহার ভাই খাজা আবদুল্লাহ নওয়াব আলীবর্দী খানের রাজত্বকালে আদি নিবাস কাশ্মীর হইতে সিলেটে আসিয়া চামড়ার ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায় বুদ্ধিতে আবদুল্লাহ তাঁহার ভাই অপেক্ষা অধিক দূরদর্শী ছিলেন। তখন ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমল। ইংরেজদের এদেশীয় অনুচর পার্শ্বচর বেনিয়া মুৎসুদ্দী অল্পকালের মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিতেছিল। ইংরেজদের সান্নিধ্য লাভের কিছু সুযোগ তখন ঢাকাতেও ছিল। আবদুল্লাহ সিলেটের ব্যবসায় গুটাইয়া ১৭৮০-র দশকে ঢাকায় চলিয়া আসেন। কিন্তু ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হন এবং আর্মেনিয়ানদের সহযোগীরূপে লবণের ঠিকাদারি করিতে থাকেন। ১৭৯৬ আবদুল্লাহর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হাফীজুল্লাহ যে তিনজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে একটি যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তাহাদের নাম কোজা জোহানেস, কোজা ডাকোস্তা ও কোজা মাইকেল। আবদুল্লাহর ধীসম্পন্ন বংশধরেরা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে তেজোদীপ্ত নবজাগরণের কল্যাণপ্রসূ মন্ত্রে উদ্দীপিত করেন। সেইজন্য খাজা বংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯০৬ সনের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করিয়া ও পরবর্তী কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিয়া এই বংশেরই নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তির প্রাথমিক সূত্রপাত করেন।

গণী মিঞা পিতা খাজা আলীমুল্লাহ জীবদ্দশায় আপন সততা, বিচক্ষণতা ও জনপ্রিয়তার জন্য তৎকালীন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা ও পাবনা জেলায় বিস্তৃত পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম জমিদারীর কর্তৃত্বভার লাভ করেন। তিনি ছিলেন এক অনন্য বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কুশাগ্রধী ব্যক্তি; জ্ঞানীগুণীজনকে তিনি যথাযোগ্য সমাদর করিতেন। তাঁহার ছাত্রজীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য

তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই। তিনি ১৮৭২ সনে তাঁহাদের বাসবনটিকে প্রায় পুনর্নির্মাণ করিয়া তৎপুত্র খাজা আহসান উল্লাহর নামানুসারে উহার নাম রাখেন 'আহসান মঞ্জিল'।

আহসান মঞ্জিলে খাজা আবদুল গণী যে শান-শওকতের দরবার বসাইতেন তাহা নওয়াবী আমলের নায়েব-নাজিমের দরবারকেও হার মানায়। ন্যায়বিচারের জন্য, সাহায্যের জন্য, ঝগড়া-বিবাদ মিটাইবার জন্য, নৈতিক মান-সম্মান রক্ষার জন্য, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে শৃংখলা নিশ্চিত করিবার জন্য, এমনকি সরকারি আমলা-পুলিশের যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষার জন্য প্রতিদিন শত শত লোক তাঁহার দরবারে আরযি পেশ করিত। সালিসের মাধ্যমে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার শক্তিতে খাজা আবদুল গণীর সমকক্ষ এদেশে আর কেহই ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সালিসী শক্তির একটি জ্বলন্ত প্রমাণ ১৮৬৯ সনের শীআ-সুন্নী মহাদাঙ্গা দমন। পুরনো নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় যে প্রতিপত্তিশালী শীআ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ওয়াহহাবী ও ফরায়েজীরা তাহাদেরকে নির্মূল করিবার জন্য এক দাঙ্গায় মাতিয়া উঠে। কোম্পানীর সরকার সেই দাঙ্গা দমনে অপারগ হইলে খাজা আবদুল গণী উহাতে হস্তক্ষেপ করেন। তিন দিনের মধ্যেই শান্তি স্থাপিত হয়। সেই সালিস উপলক্ষে খাজা সাহেব ২০ হাজার লোককে চার দিন যাবৎ প্রীতি ভোজে আপ্যায়িত করেন।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, সমাজের মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় সমাজের সকল ধরনের কলহ-কোন্দল মিটমাট করা সম্ভব। এই ব্যাপারে আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়ার একেবারেই প্রয়োজন নাই। বিচারপ্রার্থী আদালতে যাইয়া কিভাবে সর্বস্বান্ত হয় তিনি সে সম্পর্কে শত শত গল্প বলিতেন। এই ধরনের একটা গল্প বলিয়া তিনি তাঁহার আপোস-নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা শুরু করিতেন। তাঁহার জমিদারীতে প্রজাদের উপরে কঠোর নির্দেশ ছিল, জমিদারীর সালিস শেষ হওয়ার আগে যেন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়। তাঁহার জমিদারীতে সর্বনিম্ন আদালত ছিল গ্রাম। নগরীকে তিনি বহু পঞ্চায়েতী মহল্লায় ভাগ করেন এবং প্রতিটি মহল্লার জন্য একজন মহল্লাদার বা মহল্লা-সরদার নিযুক্ত করেন। সামাজিক প্রথা, আইন-শৃংখলা রক্ষা ও নৈতিকতা রক্ষা করা ছিল মহল্লা সরদারের দায়িত্ব।

সরকার ১৮৬৭ সনে খাজা আবদুল গণীকে গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। পরবর্তী বৎসর তিনি বাংলার গভর্নরের আইন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। শীআ-সুন্নী দাঙ্গা দমনের পর সরকার তাঁহাকে Companion of the Star of India (C.S.I.) পদবীতে ভূষিত করেন। ১৮৭৫ সনে 'নবাব বাহাদুর' উপাধি দান করিয়া খাজা আবদুল গণীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৮৭৭ সনে এই ব্যক্তিগত 'নবাব বাহাদুর' উপাধিকে বংশানুক্রমিক নবাব উপাধিতে রূপান্তরিত করিয়া গোটা খাজা পরিবারকে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮৬ সনে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেরা সম্মানবাহী Knight Commander of the Star of India (K.C.S.I.) উপাধি লাভ করেন। উনিশ শতকে বঙ্গদেশে অন্য কোন নেতাই সরকার ও জনগণ উভয় মহল হইতে এত সম্মান ও প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৭ সনে উপমহাদেশের প্রথম আযাদী সংগ্রামকালে (ইংরেজের মতে সিপাহী বিদ্রোহ) খাজা সাহেব মুজাহিদগণকে বাস্তব সাহায্য দান হইতে বিরত থাকেন। তবে যুদ্ধশেষে ধৃত সিপাহিগণকে সামরিক বিচারে ফাঁসির আদেশ দিলে তিনি তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদে তিনি ৪ বৎসর পর্যন্ত কমিশনারের বেসরকারি দরবারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান।

উনিশ শতকের আন্তর্জাতিক নগরী ঢাকা অপরিচ্ছন্ন নোংরা রাস্তাঘাট ও খালের পূতিগন্ধময় পরিবেশের জন্য কুখ্যাত ছিল। জনৈক বিদেশী পর্যটকের ভাষায় 'ঢাকা শহরের পূতিগন্ধ দুই মাইল ভাটি হইতেই নাকে লাগিত'। ধোলাই খাল, বুড়ীগঙ্গা নদী ও ডোবা-নালা ছিল পানীয় জলের উৎস। সেজন্য প্রতি বৎসর কলেরা, বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি মহামারীতে বহু নগরবাসী প্রাণত্যাগ করিত। অথচ অর্থাভাবে ১৮৬৪ সনের ১ আগস্ট তারিখে স্থাপিত ঢাকা পৌরসভার পক্ষে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর ছিল না। এই বিষয়ে ১৮৭৪ সনের জানুয়ারী মাসে খাজা সাহেবের উদ্যোগে ঢাকা নগরীর সমস্ত গণ্যমান্য ও ধনাঢ্য বাসিন্দাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে তিনি সকলকে ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা দিতে অনুরোধ জানান। উক্ত বৈঠকে ভাওয়ালের রাজা, কাশিমপুরের রাজা, পুবাইলের জমিদার ও বিত্তশালীদের মধ্যে রামকুমার বসাক ও রূপলাল দাস হাযির ছিলেন।

কিন্তু কেহই এই ব্যাপারে অর্থ সাহায্য দিতে রাযী না হওয়ায় তিনি একাই দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত করান। ১৮৭৮ সনে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস-এর উদ্বোধন করেন। হিতৈষী এই দানবীর কেবল উনিশ শতকের সত্তরের দশকে যে সকল জনকল্যাণমূলক কার্যে দান-খয়রাত করেন, ধর্মীয় দান বাদে তাহার হিসাব এইরূপ ঃ

ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ লক্ষ ৫০ হাজার
বাকল্যান্ড বাঁধ	৩০ হাজার
দুর্ভিক্ষ তহবিল ১৮৭৩-৭৪	২৫ হাজার
উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ তহবিল	১০ হাজার
ঘূর্ণিঝড় রিলিফ তহবিল	৯ হাজার
মিটফোর্ড হাসপাতাল, মহিলা ওয়ার্ড	২০ হাজার
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ লজ	১২ হাজার
কলিকাতা জুওলজিক্যাল গার্ডেন	১০ হাজার
ফরাসী-জার্মান যুদ্ধ রিলিফ ফান্ড	৩ হাজার
কাপ্তান রিলিফ ফান্ড	১ হাজার
জুলফা দুর্ভিক্ষ ফান্ড	৫ শতক
আয়ারল্যান্ড ও দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফান্ড	৬ হাজার
মক্কায় নহর-ই যুবায়দা সংস্কার	৪০ হাজার
	মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৫ শত টাকা

১৮৭৭ সনে নওয়াব আবদুল গণী তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নওয়াব খাজা আহসান উল্লাহকে তাঁহার সুবিশাল জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৮৯৬ সনে এই পরহিতব্রতী সমাজদরদী দানবীর ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. সিরাজুল ইসলাম, প্রবন্ধ "ঢাকার নবাব পরিবারের উত্থান-পতন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা", ৭ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৮ আগস্ট, ১৯৭৮, পৃ. ১৯-২৬; (২) ড. মুনতাসীর মামুন, প্রবন্ধ "ঢাকার নবাব-মোগল ও কোম্পানী আমল", ঐ রচনা, পৃ. ২৭-৩৩; (৩) ঐ লেখক, রচিত প্রবন্ধ 'পুরনো ঢাকার ঘরবাড়ী', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা ৮৬, পৃ. ২৮; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৭২; প্রকাশক নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা-১, পৃ. ১৫৯; (৫) তারিখে কাশ্মিরীয়ানে ঢাকা, খাজা আবদুর রহমান; (৫) Bangladesh District Gazetteer, Dacca B.G. Press, Dacca 1975, ১৯৪, ২৮৫, ৪১৭, ৩৫৪, ৪৩২।

আবদুল গফুর (محمد عبد الغفور) ঃ প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ আবদুল গফুর চট্টগ্রামের পটিয়া থানার রশিদাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (১ জুলাই, ১৯৩১ খৃ.)। পিতার নাম মুহম্মদ আবদুল জলীল। কওমী মাদ্রাসায় অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁহার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথমে চট্টগ্রামের যীরী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন (খৃ. ১৯৩৬-১৯৩৮)। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় এখানেই তাঁহার হাতে খড়ি। অতঃপর দারুল উলূম আলীয়া মাদ্রাসা হইতে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষা পাশ করেন (যথাক্রমে খৃ. ১৯৩৯, ১৯৪১ ও ১৯৪৩)। কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হইতে তিনি মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন (খৃ. ১৯৪৫)। চট্টগ্রাম সরকারি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ হইতে (বর্তমান হাজী মহসিন কলেজ) আই.এ. পাস করেন (খৃ. ১৯৪৭, প্রথম বিভাগ, মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবী বিষয়ে বি.এ. অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন (১৯৫০ খৃ. প্রথম শ্রেণী, মেধা তালিকায় প্রথম স্থান)। একই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একই বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন (১৯৫১ খৃ., দ্বিতীয় শ্রেণী, মেধা তালিকায় প্রথম স্থান)। কওমী মাদ্রাসা, সরকারি মাদ্রাসা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবাদে তিনি এইসব শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ সম্পর্কে অবহিত হন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর আদর্শের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন (অস্তমিত সূর্যের ঝিলিক ঃ আ.ক.ম. আবদুল কাদের, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, চট্টগ্রাম, জুন-জুলাই '৯৪, পৃ. ২৯)।

১৯৫২ সালে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে Epigraphical Assistant পদে যোগ দেন এবং ১৯৬১ সালে Assistant Superintendent পদে উন্নীত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি Superintendent পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর 'আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ খৃ.)।

প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল গফুর ১৯৬০ সালে পশ্চিম জার্মানির হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "The Ghorids History, Culture and Administration 535-612/1148-1215" শীর্ষক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করিয়া পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 'আরবী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সূফীবাদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯৬৫-১৯৬৯ খৃ. তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে Honorary Reader হিসাবে দায়িত্বে পালন করেন। ১৯৫৮ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে Pre-History and Proto-History তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত Iranian Art and Archaeology কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত International Orientalists Congress-এ তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল গফুরের সমগ্র রচনাকর্ম ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। The Calligraphers of Thatta গ্রন্থখানি তাঁহার অন্যতম কীর্তি, যা সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সমাদৃত (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮ খৃ., দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৮ খৃ., করাচী)। Muslim Architecture and Art Treasure in Pakistan ও Common Cultural Heritage of Iran and Pakistan গ্রন্থদ্বয়ের তিনি অন্যতম রচয়িতা (প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৬৫ ও ১৯৬৯ খৃ.)। ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম ঐতিহ্যের উপর দেশে ও বিদেশে তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয় ঃ

১. "An Anthropological Recoceonnalsance" in West Pakistan (১৯৫৯ খৃ.);

২. A Persian Inscription of Shah Hasem Argun (১৯৬২);

৩. The Relation of the Ghorids with the Caliph. (১৯৬৪);

৪. Two Lost Inscriptions relating to the Arab conquest of the North-West Frontier of Hind-Pakistan sub-Continent Ancient Pakistan (১৯৬৪);

৫. Fresh Light of the Sultan Gaji Inscription of Sultan Jalal Uddin Muhammad Shah (১৯৬৫);

৬. Influence of Hafiz on Bengali Literature (১৯৬৫);

৭. Figural Representation on a Muslim Tomb of Thatta (১৯৬৬);

৮. Bird and Snake Representation on the Toub of a Tarkhan (১৯৬৬);

৯. 14 Kufic Inscriptions of Banbtore, the site of Daihul (১৯৬৬);

১০. Muslim Architecture of Sind (১৯৬৬);

১১. Influence of Iran on the Ancient History of Pakistan (১৯৬৭);

১২. Legacy of Iran in Bengal (১৯৬৮);

১৩. Inscription of Bagh Hamja Mosque (Chittagong) (১৯৭০);

১৪. Archaeological Research in Bangladesh (১৯৭২)।

এতদ্ব্যতীত তিনি বাংলা ভাষায় বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি আ.ক.ম. আবদুল কাদের ও ড. এ. কিউ. এম. শামসুল আলম রচিত হাদীস সংকলনের ইতিকথা এবং ড. এ.এম. আবদুল গফুর চৌধুরী বিরচিত আরবী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়ের মূল্যবান ভূমিকা রচনা করেন। তাঁহার গবেষণা নির্দেশনায় কয়েকজন গবেষক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক হইলেও বর্তমানে তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা সন্তান জীবিত আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, জুন-জুলাই, ১৯৯৪ খৃ.; (২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ফার্সী বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অফিসে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত নথি ও পারিবারিক সূত্র।

আ.ক.ম. আবদুল কাদের

আবদুল গফুর সিদ্দিকী (عبد الغفور صديقى) ঃ (১৮৭২-১৯৫৯), অনুসন্ধানবিশারদ, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার খাসপুর গ্রামে জন্ম। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। কর্মজীবনে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ছিলেন এবং পিতার পুস্তক প্রকাশনী দেখাশুনা করিতেন। তিনি 'হাবলুল মতীন' (বাংলা সংস্করণ) ও 'সন্ধ্যা' নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন। ১৯৫০ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি পাকিস্তানে আসেন এবং খুলনা জেলার দৌলতপুরের নিকটবর্তী দামোদার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পুঁথি সাহিত্যের সংগ্রহ ও গবেষণা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। পুঁথি সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার আলোচনা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তৎপ্রণীত 'বিষাদ সিন্ধু'র ঐতিহাসিক পটভূমি গ্রন্থটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এদেশে হিজরতের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত মুসলমানী পুঁথিগুলি উদ্ধার করেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ (১) শহীদ তিতুমীর (১৯৬১); (২) মুসলমান ও বঙ্গ সাহিত্য (১৯২২); (৩) 'বিষাদ সিন্ধু'র ঐতিহাসিক পটভূমি। তিন খণ্ডে বিভক্ত তাঁহার আত্মজীবনীখানি প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই। তিনি ১৯৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশিত চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৫, পৃ. ২২; (২) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১৫৯; (৩) ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭৬, পৃ. ৪০।

আ.ক.ম. আবদুল কাদের

আবদুল গানী ইব্ন ইসমাঈল (عبد الغنى بن اسماعيل) ঃ আন্-নাবুলুসী,সূফী, ধর্মতাত্ত্বিক, কবি, পর্যটক ও বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক। ৫ যু'ল-হিজ্জা, ১০৫০/১৯ মার্চ, ১৬৪১ সালে দামিশ্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়কার সিরিয়ায় ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শাফি'ঈ মাযহাবভুক্ত ছিলেন (যদিও তাঁহার পিতা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন) এবং বহুকাল দামিশ্কে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। মুহিব্বী তাঁহার প্রপিতামহের নাম 'শায়খ মাশাইখি'শ্-শাম (খুলাসা, ২খ., ৪৩৩) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অল্প বয়সেই তিনি সূফীতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী হইয়া কাদিরিয়া ও নাকশবান্দিয়া তরীকা গ্রহণ করেন এবং সেই তরুণ বয়সেই দীর্ঘ সাত বৎসর যাবৎ নিজ গৃহে নির্জনে সাধনা করেন। সেই সময়ে তিনি ইবনুল আরাবী, ইব্ন সাব'ঈন ও আফীফুদ্দীন আত্-তিলিমসানীর গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। এই সময়ে রীতি বিরোধী আচরণের দরুন তিনি শারী'আত বিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত হন। রাসূলগণের (আ) প্রশংসায় রচিত তাঁহার প্রাথমিক কালের একটি কাব্য 'বাদী'ইয়্যা' এমন অনন্য শিল্পনৈপুণ্য সমৃদ্ধ ছিল যে, অনেকে ইহা আদৌ তাঁহার রচনা কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। পরে তিনি নিজেই সেই বইয়ের একটি ভাষ্য লিখিয়া সকল সন্দেহের নিরসন ঘটান। ১০৭৫/ ১৬৬৪ সনে তিনি প্রথম ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করেন, ১১০০/১৬৮৮ সনে বিকা ও লেবানন সফর করেন, ১১০১/১৬৮৯ সনে জেরুসালেম ও হেব্রন (Hebron), ১১০৫/ ১৬৯৩ সনে মিসর ও হিজায এবং ১১১২/১৭০০ সনে ত্রিপোলী সফর করেন। প্রথম সফর ব্যতীত বাকী সমস্ত ভ্রমণের সফরনামা লেখেন। তাঁহার গ্রন্থের সর্বমোট সংখ্যা (ছোট-বড় বিবরণীসমেত) ২০০ হইতে ২৫০খানা। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন মুস্তাফা আল বাক্রী (দ্র.)। তিনি ২৪ শাবান, ১১৪৩/৫ মার্চ, ১৭৩১ দামিশ্কে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ সূফীতত্ত্ব, কাব্য ও ভ্রমণ কাহিনী। সূফীতত্ত্বের রচনাসমূহ প্রধানত ইবনুল আরবী, আল-জীলী, ইবনুল ফারিদ ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর ভাষ্য। এইসব ভাষ্যতে তিনি কেবল ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্তসারই রচনা করেন নাই, বরং সুবিখ্যাত ভাষ্যকারগণের ঐতিহ্য অনুসারে স্বকীয় চিন্তাধারার দ্বারা উহা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সেই টীকা ও ব্যাখ্যাসমূহ কখনও বা কষ্টকল্পিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পুরাপরি সূফীতত্ত্ব ভিত্তিক না হওয়ায় উহাকে সাধারণভাবে তাঁহার ধর্মীয় ও তত্ত্বগত চিন্তাধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলা যায়। আবদুল গানী তাঁহার কয়েকটি ভাষ্য গ্রন্থেই দুইটি ভিন্ন সূফী চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন আন্দালুসীয় মাগরিবী ধারা (আবূ মাদ্য়ান, ইব্ন মাশীশ, শুশ্তারী, সানূসী) এবং পারস্য-আনাতোলীয় ধারা (আওহাদুদ-দীন নূরী, মাহমূদ উসকুদারী, মুহাম্মাদ বিরগালী)। নিজ তরীকাসমূহ সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থ লেখেন, যেমন লেখেন মাওলাবী তরীকা সম্বন্ধে। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে তিনি ওয়াহ্দাতুল উজূদ

ধারণা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেইসব মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাঁহার বিশাল দীওয়ান-এর প্রথম খণ্ড।

তাঁহার কাব্য রচনাবলীর প্রধান সংগ্রহ দীওয়ানুদ-দাওয়াবীন। উহাতে অন্তর্ভুক্ত সূফীতত্ত্ব বিষয়ক প্রথম খণ্ড (কায়রোতে প্রকাশিত ১৩০২ হি.) ব্যতীত রহিয়াছে আরও তিনটি খণ্ড। সবই অপ্রকাশিত যাহাতে আছে যথাক্রমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর না'ত বা প্রশস্তি, সাধারণ প্রশস্তিমূলক কবিতা, পত্রাবলী ও প্রেমের কবিতা। কিন্তু তাঁহার সমগ্র কবিতার সংগ্রহ এইগুলিতেই সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার অন্যান্য রচনারও অনেক কয়টি কাব্যাকারে রচিত এবং কবি ইব্ন হানী আল-আন্দালুসীর কবিতার যে ভাষ্য তিনি পদ্যে লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কাব্যপ্রীতির পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। জীবিতকালে, এমনকি মৃত্যুর পরেও তাঁহার কবি খ্যাতি ছিল বিরাট (দ্র. আমীর হায়দার, Le Liban, সম্পা. রুস্তুম, ১খ., ৮ প., ২২প. ও তাঁহার "মুওয়াশ্শাহ" ব্যবহারের জন্য Hartmann, Muwassah, 6)।

সফরনামাতে বিবরণ প্রদানকালে (উপরে দ্র.) ভৌগোলিক বা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ দান 'আবদুল গানীর উদ্দেশ্য ছিল না। সফরনামাগুলি বরং তাঁহার নিজস্ব রূহানী অভিজ্ঞতারই বিবরণ। সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপরে উহা যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। তাঁহার রচনা পরবর্তী কালের পর্যটকগণ (যথা দামিশ্ক-এর মুস্তাফা আল-বাক্রী ও মিসরের আস্'আদ আল-লুকায়মী)-এর জন্য ভ্রমণ কাহিনী রচনার আদর্শ হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি তাফসীর, হাদীছ, কালাম, ফিক্হ, খওয়াবনামাহ (স্বপ্নের ব্যাখ্যা), তৎকালীন অধ্যাত্মবাদ ও কুসংস্কার বিষয়ক তথ্যাবলীর খনিস্বরূপ, কৃষি, ধূমপানের অনুমতি ও অন্যান্য আরও বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি বিষয়বস্তুর দিক হইতে অতি ব্যাপক ও বিশ্বকোষ প্রকৃতির।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুরাদী, সিলকুদ্-দুরার, ২খ., ৩০-৮; (২) জাবার্তী, আজাইবুল আছার, ১ খ., ১৫৪-৭; (৩) মুস্তাফা আল-বাক্রী, আল-ফাত্হুত্-তারিয়্য ফিশ-শায়খ আবদিল গানী, পাণ্ডুলিপি এই প্রবন্ধের লেখক এ.এস. খালিদীর ব্যক্তিগত সংরক্ষণে; (৪) ইবনুল আরাবী, ফুসূসুল হিকাম, সম্পা. আফীফী (কায়রো ১৯৪৬), ১খ., ২৩ (৫) এ. এস. খালিদী, রিহলা ইলা দিয়ারিশ-শাম (জাফফা ১৯৪৬); (৬) রুওওয়াদুন নাহ্দাতিল হাদীছা (বৈরূত ১৯৫২), পৃ. ৩৪; (৭) R.A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism (Cambridge 1921), 143 প.; (৮) L. Massignon, La passion de al Hallaj, স্থা.।

W.A.S. Khalidi (E.I.[2]) হুমায়ূন খান

আবদুল গোফরান (عبد الغفران) : খান বাহাদুর (১৮৮৮-১৯৪৯), নোয়াখালী জেলার সাবেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, নামজাদা নেতা ও এককালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী, ১৮৮৮ খৃ. ২৯ জানুয়ারী, মুতাবিক ১২৯৫ বঙ্গাব্দ ১৫ আষাঢ়, বর্তমান ফেনী জেলার সরিষাদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ ঘাসী ভুঞা অন্যত্র হইতে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পিতা নাজমুদ্দীন ভুঞা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। শৈশবেই মাতা-পিতাহীন হইয়া তিনি স্নেহময়ী বিমাতা বিলকীস বানুর যত্নে লালিত-পালিত হন। আবদুস সুবহান নামক তাঁহার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বৈমাত্রের ভ্রাতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই ইয়াতীম বালকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তাঁহাকে ফেনী হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৬ খৃ. এই স্কুল হইতে এন্ট্রান্স (বর্তমান এস. এস. সি.) পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসার ইংগ-ফারসী বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে দুই বৎসর পড়িয়া আই. এ. (বর্তমানে এইচ.এস.সি.) পাস করার পর ১৯০৮ খৃ. তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯১০ খৃ. কৃতিত্বের সহিত বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৪ খৃ. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি নোয়াখালী শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন। একজন বিচক্ষণ উকীল হিসাবে শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে। তাঁহার দীর্ঘদেহী সুন্দর চেহারা ও অমায়িক ব্যবহার সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। শহরের প্রসিদ্ধ দারোগা বাড়ির সিরাজুল হক খাঁর কন্যা আজমাতুন্নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯২২ খৃ. আবদুল গোফরান খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা পশ্চাদ্বর্তী বলিয়া তিনি স্কুল-কলেজ ত্যাগ না করিতে তাহাদের পরামর্শ দেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা এবং খেতাব বর্জনেরও তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁহার চাচা শ্বশুর হাজী আবদুর রশীদ খাঁ অসহযোগ আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহাকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

আইনে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া ওকালতি আরম্ভ করার পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই সরকার তাঁহাকে সরকারী উকীল (পি.পি.) নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিত্বকালের কয়েক বৎসর ব্যতীত আজীবন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসের এক রিপোর্টে জেলা জজ চমৎকার মামলা পরিচালক ও জুরীকে বুঝাইতে উস্তাদ বলিয়া তাঁহার তারিফ করেন।

ওকালতি আরম্ভ করার বৎসরই তিনি লোকাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট পাইয়া তিনি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন এবং তিন বারে ১২ বৎসর এই পদে কাজ করেন।

সি. আর. দাশ যেমন কলিকাতা করপোরেশনে মুসলমান-হিন্দুদের চাকুরীর অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, আবদুল গোফরান সাহেবও নোয়াখালী জেলা বোর্ডের চাকুরীতে সম্প্রদায় ভিত্তিক হিস্সার প্রবর্তন করেন। ফলে বঞ্চিত মুসলমানরা কিছু চাকুরী লাভের সুযোগ পায়। তিনি জেলা বোর্ডে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রবর্তন, পল্লী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও পরিদর্শনের সুবিধার জন্য থানায় থানায় বিশ্রামাগার ও ডাক বাংলো নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। গরীব মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যের জন্য তিনি জেলা বোর্ড হইতে বৃত্তি দানেরও ব্যবস্থা করেন।

গোফরান সাহেব চারিবার নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং শহরবাসীর স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা

গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে শহরে গরু যবেহ করা যাইত না— তিনিই প্রথম ইহা প্রবর্তন করেন এবং বাঁধ নির্মাণ করিয়া নোয়াখালী শহরকে মেঘনার ভাঙ্গন হইতে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এই সংগ্রাম তখন সফল হয় নাই।

নোয়াখালী জেলায় সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেন এবং নোয়াখালী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অবৈতনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এইজন্য তিনি যে ভাতা পাইতেন তাহা আহমদিয়া হাই স্কুলের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতেন। তাঁহার সুপরিচালনায় সমবায় ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়; ফলে অংশীদাররা ভাল লভ্যাংশ পাইতে থাকে। ২৪-১১-৩১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার সম্মান, প্রতিপত্তি ও কার্যদক্ষতার তারিফ করিয়া এক মন্তব্য লিখেন, উহাতে তাঁহাকে জেলার প্রভাবশালী লোক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। জনাব গোফরান ছিলেন একজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। নোয়াখালী আহমদিয়া হাই স্কুল, আহ্‌মদিয়া মাদ্‌রাসা, কারামাতিয়া মাদ্‌রাসা ও নোয়াখালী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতায় বিশেষ উপকৃত হয়। তাঁহার চেষ্টাতেই কারামাতিয়া মাদ্‌রাসা প্রয়োজনীয় জমি পায়।

মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার আগ্রহ ছিল আন্তরিক। জনমত উপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার কন্যাদেরকে বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া দেন। এই দৃষ্টান্তের ফলে অচিরে তাঁহার বহু অনুসারী জুটে এবং মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অধঃপতিত মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনে মুসলিম লীগের কার্যক্রমে দৃঢ় আস্থাবান জনাব গোফরান প্রথম হইতেই মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং বৎসরের পর বৎসর তিনি নোয়াখালী জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আমরণ এই পদে বহাল ছিলেন।

১৯২৯ ও ১৯৩৫ খৃ. ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনাব গোফরান বংগীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং যোগ্যতার সহিত তাঁহার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৬ খৃ. তিনি নাজিমুদ্দীন উযীর সভায় বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের উযীর নিযুক্ত হন। খাদ্য সরবরাহে অব্যবস্থার দরুন ১৯৪৪-৪৫ সনে বাংলাদেশে অনাহারে অর্ধ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। কাজেই এই পদটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী সুহরাওয়ার্দী উযীর সভায় খোদ হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব এই ওযারতির দায়িত্বে ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের দরুনই জনাব গোফরানের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৪৬ সনে কলিকাতা ও বিহারের দাংগায় হাযার হাযার মুসলমান নিহত ও বাস্তুহারা হন। গান্ধীজী তখন বিহারে যান নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে ইহার প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালীতে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান রায়ত ও খাতকদের দীর্ঘকালের অসন্তোষ দাংগায় রূপান্তরিত হইলে গান্ধীজি সরেজমিনে হিন্দুদের বহুল প্রচারিত দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার জন্য নোয়াখালী আগমন করেন। এই সময়ে গোফরান সাহেব ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করেন।

তিনি ছিলেন পরদুঃখকাতর; তবে কিঞ্চিৎ কড়া মেযাজী। করোনারী থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হইয়া ১৯৪৯ সনের ৯ অক্টোবর তিনি কুমিল্লা হাসপাতালে ৬৪ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে সরিসাদী মসজিদের নিকট দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নোয়াখালী পৌর সভার শতবর্ষ পূর্তি (১৯৮২)-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ (পৃ. ১০০০, ১০১); (২) বি. আর. নিজাম লিখিত 'গোফরান সাহেবের জীবনী', (৩) Bangladesh District Gazetteers, Noakhali, Dacca 1977, 52, 211.

ড. এম আবদুল কাদের

(মাওলানা) আবদুল জব্বার (عبد الجبار) ঃ (র) বায়তুশ শরফের পীর, মহান বুযুর্গ, ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে ও সমাজসেবায় যাঁহার অবদান অনন্য। ১৩৫২/১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সালে আপার বার্মার থাংগু জেলার পিনজুলুক রেলওয়ে স্টেশনস্থ বাঙ্গালী কালোনীতে তাঁহার জন্ম (দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ মার্চ, ১৯৯৮ খৃ.; মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, স্মরণ সংখ্যা, মে ১৯৯৮, পৃ. ৬৭)। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী ওয়াছিউদ্দিন মিয়াজী এবং মাতার নাম ফিরোজা খাতুন। পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন ধর্মভীরু, দানশীল। তাঁহার পিতা ব্যবসা ব্যাপদেশে বার্মায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা ১৩৫৫/১৯৩৬ সালে চিকিৎসার্থে চট্টগ্রামের বাড়িতে আসেন এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন, তখন আবদুল জব্বারের বয়স মাত্র চার বৎসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কর্তৃক বার্মা আক্রান্ত হইলে জাপানী বোমা হামলায় তাঁহার পিতার বসতবাড়ি ও ব্যবসা ধ্বংস হইয়া যায় এবং ইহার পরিণতিতে পরিবারটি নিঃস্ব হইয়া পড়ে। কথিত আছে, তাঁহার পূর্বপুরুষ আরবদেশ হইতে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে এতদৃঞ্চলে আগমন করেন এবং পরে চট্টগ্রামে পৌছিয়া এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। বড় হাতিয়া যে পাড়ায় তাঁহাদের বাস তাহা মিয়াজী পাড়া নামে পরিচিত। কারণ তাঁহার পূর্বপুরুষগণ এখানে মিয়াজী পদবীতে খ্যাত হন (পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃ. ৬৭)।

ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের মকতবে তাঁহার লেখাপড়া শুরু হয়। তিনি স্থানীয় গারাঙ্গিয়া মাদ্রাসার ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা হইতে ১৩৭৩/১৯৫৩ আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা হইতে তিনি ১৩৭৩/১৯৫৩ সালে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী মেধাবী ছাত্র। জামা'আতে পাঞ্জম হইতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ডের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর ১৩৭৪/১৯৫৪ সালে জানুয়ারী হইতে ১৩৮৮/১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তিনি পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিছ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ হইতে ১৩৯০/১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁহার পীরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তরীকতের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ সালে তাঁহার মুরশিদ শাহ সূফী মীর মুহাম্মদ আখতার মক্কা মু'আজ্জামায় ইন্তিকাল করিলে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তী কালে তিনি বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই দায়িত্ব পালন করেন (দ্বীন-দুনিয়া, পৃ. ৬৮)। উল্লেখ্য, আলিম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৩৬৭/১৯৪৭ সালে শবে বরাতে তিনি তাঁহার পীরের নিকট বায়'আত হইয়াছিলেন।

তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারার সংস্কার সাধন করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মুহাদ্দিছ, তাই তিনি সূফী ধারায় অনুপ্রবিষ্ট বিদ'আতসমূহের মূলোচ্ছেদ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনধারা ছিল শারী'আতের আলোকোজ্জ্বল পথে পরিচালিত। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনাচার তাঁহার পরিচিত সকল শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করে। কোন ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গে আসিলে সে তাঁহাকে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যোগ্যতায় অসাধারণ মানুষ হিসাবে দেখিতে পাইত। তিনি কখনও তাঁহার নামের সহিত 'শাহ' শব্দটি যোগ করেন নাই। দেশব্যাপী বহু পাকা ইমারত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইলেও তিনি আজীবন একটি পর্ণ কুটিরেই বসবাস করেন। নিজের বাসভবন নির্মাণের স্থানটুকুও ইয়াতীমখানার জন্য দান করিয়া যান। সূফী সাধনার এই সিলসিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, পীরের পুত্র পীর না হইয়া মুরীদগণের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

তাঁহার সমাজভিত্তিক জনহিতকর কর্মকাণ্ডের একটি বাস্তবভিত্তিক সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী ছিল যাহাকে প্রচলিত আধ্যাত্মিক ধারায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ফলে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান মিশনারীরা এই মাঠ দখল করিয়া মানুষকে পথভ্রষ্ট করিতেছে। আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ নামের অরাজনৈতিক ও মসজিদ ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে তিনি সারা দেশ ব্যাপিয়া একটি সুসংগঠিত ও সুশৃংখল মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সংগঠনের পরিচালনায় দশটি প্রকল্পের অধীনে মোট ৪৬৩টি কর্মসূচী চালু আছে। এই যাবত উক্ত সংগঠন 'বায়তুশ শরফ' নামে ৬০টি মসজিদ, ১৩টি ইয়াতীমখানা, ১০টি হিফজখানা, ঢাকায় দারুশ শেফা হাসপাতাল, কক্সবাজারে বায়তুশ শরফ হাসপাতাল ও শিশু হাসপাতালসহ পাঁচটি হাসপাতাল, ১৮৮টি দীনী প্রতিষ্ঠান, বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদ্রাসাসহ ১০টি মাদ্রাসা, ৫টি প্রাইমারী স্কুল, ৩২টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ৭টি ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বেশ কয়েকটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে, যাহাতে বেকার যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়া কর্মক্ষম করিয়া তোলা হয়।

পীর সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তথায় কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বলিতে গেলে বর্তমান সূফী ধারার অনুসারিগণের মধ্যে তিনিই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অমুসলিমগণের মধ্যে সেবাকর্মের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণে ব্রতী হন। ফারসীতে একটি প্রসিদ্ধ বাণী "তারীকাত বাজুয খিদমাতে খালক নীস্ত" (মানবসেবাই তরীকতের শিক্ষা) এই সেবা সংগঠনের অন্যতম শ্লোগান। এই বাণী মূলত মহানবী (স)-এর হাদীছ "যে মানুষের সেবা করে সেই সর্বোত্তম মানুষ" হইতে নিঃসৃত।

পীর সাহেব কেবল একজন সূফী দরবেশই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সরলপ্রাণ ধর্মীয় নেতা, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষানুরাগী, সুলেখক, সুবক্তা, দরদী সমাজসেবক, সংস্কারক ও সার্থক প্রশিক্ষক। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি আঞ্জুমানে ইত্তেহাদকে একটি মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন। এই সংগঠনের আওতায় তিনি বহু মানুষকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করিয়া আত্মনির্ভরশীল জীবন যাপনে সমর্থ করিয়া তুলিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মধু ও আতরের ব্যবসা করিতেন। আলিম সমাজকেও তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজকল্যাণ ফেডারেশন ১৪১২/১৯৯১ সালে দেশের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক হিসাবে তাঁহাকে স্বর্ণপদক প্রদান করে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এবং চট্টগ্রামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি কার্যকর অবদান রাখেন। তিনি ইসলামী ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিলের আজীবন সভাপতি ছিলেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন।

অভিজ্ঞতার বিনিময় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি মধ্যপ্রাচ্য ও ইংল্যান্ড-আমেরিকাসহ প্রায় বিশটি দেশ সফর করেন। ১৯৬৪ খৃ. হইতে তিনি প্রতি বৎসর হজ্জে গমন করেন এবং জীবনে তেত্রিশবার হজ্জ করেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী হিসাবে তিনি থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারেও অংশগ্রহণ করেন। দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের গতিধারা সম্পর্কেও তিনি সদা সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁহার সমমনা কতক বিজ্ঞ আলিমের সমন্বয়ে 'ইত্তেহাদুল 'উম্মাহ' নামক সংগঠনের মাধ্যমে দেশের 'আলিম সমাজকে একই মঞ্চে একতাবদ্ধ করিতে ১৪০৩/১৯৮২ হইতে ১৪১১/১৯৯০ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই পদক্ষেপ সফল হয় নাই।

প্রকাশনা ঃ মাওলানা আবদুল জব্বার বিশাধিক গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক। তাঁহার গ্রন্থাবলীর নাম ঃ (১) রফিকুছ ছালেকীন; (২) কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের তত্ত্ব; (৩) শরিয়ত ও তরিকতের আদব; (৪) আউযুবিল্লাহ শরীফের তাফসীর; (৫) জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব; (৬) কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব; (৭) জেহাদে আকবর; (৮) শরীয়ত ও মারেফাতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা; (৯) আল-মুনাব্বেহাত; (১০) রুহের খোরাক; (১১) প্রেমিকদের তোহ্ফা; (১২) চল্লিশ হাদিস ও চল্লিশ বাণী; (১৩) এলমে তাসাউফের হাকিকত; (১৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আওলিয়ার গুরুত্ব; (১৫) সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা ও দ্বীনিয়াত; (১৬) তালিমে হজ্জ ও যিয়ারত; (১৭) আছরারুল আহকাম; (১৮) পবিত্র রমজানের কয়েকটি উপদেশ ও জরুরী মাসায়েল; (১৯) আসমাউল হুসনা। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি আরও পাঁচটি পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁহার দরবার হইতে ১৪০১/১৯৮০ সাল হইতে 'মাসিক দ্বীন ও দুনিয়া' নামক একটি ইসলামী পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার স্থাপিত ছাপাখানা হইতে ইসলাম বিষয়ক পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই মহান সাধক ও সমাজসেবক ২৬ যুল-কা'দা, ১৪১৯/১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ (১১ চৈত্র, ১৪০৪) রোজ বুধবার সকাল সাড়ে সাতটায় নিজ হুজরাখানায় ৬৫ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। বৈবাহিক জীবনে তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক। চট্টগ্রামস্থ বায়তুশ শরফ মসজিদ সংলগ্ন বাগানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাসিক দ্বীন ও দুনিয়া, মে ১৯৯৮ খৃ. (স্মরণ সংখ্যা), বিশেষত এই পত্রিকার ভিত্তিতে নিবন্ধটি রচিত হইয়াছে; (২) দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ মার্চ, ১৯৯৮ খৃ. সংখ্যা; (৩) আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সেবক বায়তুশ শারফের পীর সাহেব, আল-আছরার (বিশেষ প্রকাশনী), ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, জানুয়ারী ১৯৯৭ সংখ্যা।

মুহাম্মদ মূসা

আবদুল জব্বার খান (عبد الجبار خان) ঃ (১৯০২-১৯৮৪ খৃ.) বিচারপতি, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পীকার। আবদুল জব্বার খান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচর গ্রামে ১৯০২ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৯ খৃ. বরিশাল জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং ১৯২১ খৃ. বরিশাল বি. এম.কলেজ হইতে আই.এ. পাশ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৪ খৃ. আরবীতে বি.এ. (সম্মান), ১৯২৫ খৃ. এম.এ. (প্রথম শ্রেণী) এবং ১৯২৭ খৃ. আইনে বি.এল. ডিগ্রী লাভ করেন।

আবদুল জব্বার খান ১৯২৯ খৃ. বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে (বিচার) যোগদান করিয়া কর্মজীবন শুরু করেন। চাকুরী জীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি ১৯৪৬ খৃ. সাব অর্ডিনেট জজ, ১৯৫০ খৃ. অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ১৯৫১ খৃ. খুলনায়, ১৯৫২ খৃ. যশোরে, ১৯৫৪ খৃ. ময়মনসিংহে এবং ১৯৫৬ খৃ. করাচীতে জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ খৃ. তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিচারপতি থাকাকালীন তিনি সিলেটে পুলিশের গুলিবর্ষণ ঘটনায় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন।

১৯৬২ খৃ. ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক দল পাকিস্তান মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৬৪ খৃ. তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সভাপতি এবং নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতির পদ লাভ করেন।

আবদুল জব্বার খান ১৯৬৫ খৃ. মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় বরিশাল হইতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একই বৎসর ১০ জুন তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খৃ. ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তিনি অত্যন্ত পরিচিত। তাহার দুই পুত্র এনায়েতউল্লাহ খান ও ওবায়েদ উল্লাহ খান এবং কন্যা সেলিমা রহমান বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আরেক কন্যার জামাতা বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস। আবদুল জব্বার খান কর্মজীবনে স্কুল-কলেজসহ বহু সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৪ খৃ. তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পা., চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (২) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ.; (৩) সাইফউদ্দিন সম্পা., বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস, জেলা প্রশাসন, বাকেরগঞ্জ ১৯৯০ খৃ.; (৪) সিরাজ উদ্দিন আহমদ, বরিশালের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

'আবদুল জাব্বার ইব্ন 'আবাদির-রাহমান (عبد الجبار بن عبد الرحمن) আল-আয্দী খুরাসানের গভর্নর (ওয়ালী)। ১৩০/৭৪৭-৮ ও ১৩৩/৭৫০-১ সালে উমায়্যাদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে তিনি আব্বাসীদের সমর্থন দান করেন এবং খলীফা আস সাফ্ফাহ ও আল-মানসূরের আমলে পুলিশ বাহিনীর (شرطة) অধিনায়ক নিযুক্ত হন। শেষোক্ত খলীফা ১৪০/৭৫৭-৮ সালে তাঁহাকে খুরাসানের গভর্নর করিয়া পাঠান। আবদুল জাব্বার সেই প্রদেশে গিয়া আলী বংশীয়গণের সমর্থক হইবার অভিযোগে স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রতি ভয়ানক নির্যাতন শুরু করেন, কিন্তু তাঁহার সেই নিপীড়নমূলক আচরণে কিছু কিছু আব্বাসী সমর্থকও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়া মনে হয় (আত্-তাবারীর ফার্সী সংস্করণে সেইরূপই বর্ণিত আছে)। সেই কারণেই খলীফা তাঁহাকে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন। উক্ত ঘটনাসমূহের পরে খলীফা ও গভর্নরের মধ্যে যেই কয়েকটি চাতুর্যপূর্ণ পত্র বিনিময় হয় সেইগুলি দ্বারা এই সন্দেহই প্রমাণিত হয়। অবশেষে আল-মানসূর তাঁহার পুত্র আল-মাহ্দীর অধীনে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন (১৪১/৭৫৮-৯)। খলীফার সেনাবাহিনী আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারূর আর রূয-এর জনসাধারণ উদ্যোগী হইয়া আবদুল জাব্বারকে বন্দী করে এবং আল-মাহ্দীর নিকট অর্পণ করে। আবদুল জাব্বার খলীফা আল-মান্সূরের সম্মুখে নীত হইলে তাঁহাকে নির্যাতন করিয়া হত্যা করা হয় (সম্ভবত ১৪২/৭৫৯-৬০-এর প্রথম দিকে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইয়াকূবী, নির্ঘণ্ট; (২) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৩) Chronique de tabari (Persian), অনু. H. Zotenberg, iv, 378-80, (৪) S, Moscoti, La rivolta di Abd al-Gabbar, in Rend, Linc, 1947, 613-5,

S, Moscati (E I.2) হুমায়ুন খান

আবদুল জাব্বার ইব্ন আহমাদ (عبد الجبار بن احمد)ঃ ইব্ন আবদিল জাব্বার আল-হামাযানী আল-আসাদাবাদী আবুল হাসান শাফিঈ মাযহাবভুক্ত মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্ববিদ। জন্ম আনু. ৩২৫/৯৩৬ সালে, বাগদাদে বসবাস করিতেন। পরে মুতাযিলাবাদের গোঁড়া সমর্থক সাহিব ইব্ন আব্বাদ কর্তৃক আহূত হইয়া ৩৬৭/৯৭৮ সনে রায়-এ গমন করেন। পরবর্তী কালে তিনি সেই প্রদেশের প্রধান কাদী নিযুক্ত হন। সেইজন্যই পরবর্তী মুতাযিলী সাহিত্যে তাঁহাকে কাদিল-কুদাত বলিয়া উল্লেখ করা হয় (তাঁহার সঙ্গে ইব্ন আব্বাদ-এর সম্পর্ক লইয়া প্রচলিত কাহিনীর জন্য ইয়াকূত রচিত ইরশাদ, পৃ. ২, ৩১২, ৩১৪ দেখুন)। ইব্ন আব্বাদ-এর মৃত্যুর পরে তিনি শাসক ফাখরুদ-দাওলা কর্তৃক পদচ্যুত ও বন্দী হন। কারণ তিনি তাঁহার পরলোকগত পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করিয়াছিলেন (ইরশাদ, ১খ., ৭০-৭১, ২খ., ৩৩৫)। তাঁহার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না, পুনরায় তিনি চাকুরীতে পুনর্বহাল হইয়াছিলেন কি না তাহাও সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি ৪৫১/১০২৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার দলের ধর্মীয় মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে বিশাল আকারের আল-মুগনী গ্রন্থে (ডা. তাহা হুসায়নের তত্ত্বাবধানে ১৯৬৮ খৃ. কায়রোতে প্রকাশিত)। ইহার প্রধান অংশ সংরক্ষিত আছে সান'আতে (দ্র. ফিহরিস্ত

কুতুবিল-খিযানাতিল মুতাওয়াক্কিলিয়্যা, পৃ. ১০৩-৪); কয়েক খণ্ড আছে কায়রোতে, সেইগুলি সান'আ হইতে আনীত হইয়াছিল (দ্র. খ. য়. নামী, আল-বাছাতুল মিসরিয়্যা লিতাস্বীরিল মাখ্ত্বূতাতিল আরাবিয়্যা, কায়রো ১৯৫২, পৃ. ১৫)। তাহার দলের ধর্মীয় মতবাদের আরেকটি সহজ সারগ্রন্থ 'আল-মুহীত বিত্-তাক্লীফ', তাঁহার ছাত্র ইব্ন মাত্তাওয়ায়হ (দ্র.) কর্তৃক সঙ্কলিত। উহার কয়েক খণ্ড সানআতে আছে, ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১০২ (১খ., বার্লিন ৫১৪৯; তায়মূরিয়্যা, আক্যাইদ, পৃ. ৩৫৭. খণ্ড অংশ লেনিনগ্রাদে, দ্র. A. Borisov, Les Manuscripts Mutazilites de la Bibliothcque Publique de Leningrad. Bibliografiya vostoka, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৬৩-৯৫)। নবুওয়াত সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা গ্রন্থে (তাছবীত দালাইলিন নুবুওওয়াত সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ শাহীদ আলী পাশা ১৫৭৫, তু. H. Ritter, Isl. 1929, পৃ. ৪২) অন্য মতবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধেও, বিশেষ করিয়া শী'আ দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। শারহুল উসূলিল খামসা (Vat. 1028) তাঁহার অপর একটি দলীয় মতবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার অন্যান্য যেই সকল রচনা বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে সেই সবের জন্য দ্র. Brockelmann। তবে কেবল তাঁহার নিজের রচনা হইতেই তাঁহার চিন্তাধারার পদ্ধতি পুনর্গঠন করা সম্ভব নহে। পরবর্তী মুতাযিলীগণেরও সকল রচনা , তন্মধ্যে ধর্মীয় মতবাদ বিষয়ক যায়দী লেখকগণের গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত (প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিজের গ্রন্থসমূহও ইয়ামানের যায়দীগণ কর্তৃকই রক্ষিত হইয়াছে) যাহা তাঁহার মতবাদ বিষয়ক বিবরণে পূর্ণ মু'তাযিলীবাদের শেষ পর্যায়ে তিনিই ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা অদ্যাবধি সঠিকভাবে পর্যালোচিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূসাঈদ আল-বায়হাকী, শারহ উয়ূনিল শাসাইল, পাণ্ডু. Leiden, Landberg, 215, পত্র 123v125v, সেখান হইতে আল-মুরতাদা (al-Mu'tazila, Arnold), পৃ. ৬৬ প.; (২) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, পৃ. ১১, ১১৩; (৩) আস্-সুবকী, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ১১৪, ২১৯-২০; (৪) ইব্নুল আছীর, ৮খ., ৫১০-১, ৯খ., ৭৭-৮ ২৩৫; ১০খ., ৯৫; (৫) Goldziher, Isl. 1912, পৃ. ২১৪; (৬) M. Horten, Die Philosophischen Systeme, P. 457-62; (৭) A.S. Tritton, Muslim Theology, p. 191-3, আবদুল জাব্বারের তাবাকাতুল-মু'তাযিলা ছিল আবূ সাইদ আল-বায়হাকী কর্তৃক তাঁহার শারহ উয়ূনিল মাসাইল গ্রন্থের ভূমিকাংশে লিখিত তথ্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ মুতাযিলার ঐতিহাসিক বিবরণ লেখার প্রধান উৎস। ইব্নুল মুরতাদা আল-বায়হাকীর বিবরণকেই সামান্য সংক্ষেপিত আকারে গ্রহণ করেন (সম্পা. Th. W. Arnold) ।

S.M. Stern (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

'আব্দুল-জালীল, সায়্যিদ (سيد عبد الجليل) ঃ বিলগ্রামী, ১৩ শাওয়াল, ১০৭১/২ জুন, ১৬৬১ সালে ভারতের বিলগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিলগ্রাম আগ্রা ও অযোধ্যার একটি প্রসিদ্ধ কস্বা, যাহা কনৌজের সন্নিকটে অবস্থিত। দুইটি কস্বার মধ্য দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত। তাঁহার পিতার নাম সায়্যিদ আহমাদ। তিনি ছিলেন হযরত হুসায়ন (রা)-এর বংশধর। তাঁহার পূর্বপুরুষ সায়্যিদ মুহাম্মাদ সুগরা, সুলতান ইল্তুত্মিশ (৬০৭/১২১০-৬৩৩/১২৩৫)-এর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিলগ্রাম গমন করেন তথাকার হিন্দু রাজাকে হত্যা করিয়া বিলগ্রাম জয় করেন এবং সেখানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। সুলতান তাঁহাকে 'উশর (উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ) আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি ১৪ শা'বান, ৬৪৫ সালে বিলগ্রামে ইন্তিকাল করেন। সেই সময় হইতে সুলতান ইবরাহীম লোদীর শাসনকাল পর্যন্ত (৯২৩/১৫১৭-৯৩০/১৫২৬) তাঁহার বংশধরগণ 'উশর' আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাদশাহ বাবুরের সময় এই ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। সায়্যিদ 'আবদুল-জালীল ছিলেন সায়্যিদ মুহাম্মাদ সুগ্'রা-র অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ। মুহাম্মাদ সুগরার ইন্তিকালের পর সায়্যিদ 'আবদুল-জালীলই সর্বপ্রথম সরকারী চাকুরীতে অংশগ্রহণ করেন।

'আবদুল-জালীল বিলগ্রামে লালিত-পালিত হন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার উস্তাদদের মধ্যে সায়্যিদ সা'দুল্লাহ বিলগ্রামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া শায়খ গুলাম নাক্শবান্দী লাখ্নাবীর নিকট সাহিত্য শিক্ষা করেন। ইহার পর দিল্লী গিয়া সায়্যিদ মুবারাক 'আবদুল হাক্ক হাক্কীর নিকট হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন করত সনদ লাভ করেন। ১১০৪/১৬৬৩ সালে জীবিকার সন্ধানে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, কিন্তু ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১১১১/১৬৯৯ সালে আবার সেই দিকে যাত্রা করেন এবং বিজাপুর পৌঁছিয়া আওরঙ্গযেবের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। আওরঙ্গযেব তাঁহার মেধা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যোগ্য পদে নিয়োগ করেন। সম্রাট তাঁহাকে কিছু জায়গীর দান করেন এবং গুজরাট (পাঞ্জাবের) ঘটনাবলীর সংবাদ পরিবেশক (وقائع نكارى) ও সৈন্যবাহিনীর বেতন দানের (বাখ্শীগিরী) দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রায় চারি বৎসর উক্ত দায়িত্ব পালনের পর ১১১৬/১৭০৪ সালে তিনি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি ভাকার ও সীওয়াসতান (সিন্ধু)-এর সংবাদ পরিবেশক এবং সৈন্যদের বেতন দানের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি নিজে ভাকারে অবস্থান করেন এবং তাঁহার জামাতা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আশরাফকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সীওয়াসতানে প্রেরণ করেন। ফাররুখসিয়ার-এর শাসন আমলে (১১২৪/১৭১৩- ১১৩১/১৭১৯) এক ভুল বুঝাবুঝির দরুন তিনি আবার চাকুরীচ্যুত হন; কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই পুনরায় বহাল করা হয়। এইবার তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট অঞ্চলে গমন করেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা সায়্যিদ মুহাম্মাদ নূহকে নিজ প্রতিনিধিরূপে তথায় প্রেরণ করেন। পরিশেষে ১১৩০/১৭১৮ সালে স্বীয় পুত্র মীর সায়্যিদ মুহাম্মাদের উপর নিজ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তিনি স্বদেশে চলিয়া যান। কিন্তু এক বৎসর স্বদেশে অবস্থানের পর তিনি দিল্লী গমন করেন এবং সম্রাটের দরবারে আসা-যাওয়া করিতে থাকেন। পরিশেষে ২৩ রাবীউল-আওওয়াল, ১১৩৮/৭ ডিসেম্বর, ১৭২৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মরদেহ বিলগ্রামে নীত হয় এবং সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। 'হাসসানুল-হিন্দ' উপাধিতে খ্যাত সায়্যিদ গুলাম 'আলী আযাদ তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায়, বিশেষত হাদীছ, আস্মাউর রিজাল, সীরাত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আরবী, ফারসী,

তুর্কী ও হিন্দী এই চারিটি ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। ইতিহাস বর্ণনায়ও তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ১০ যুল-হিজ্জা, ১১১১/২২ এপ্রিল, ১৭০০ সালে আওরঙ্গযেব মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়া সাতারা দুর্গ অধিকার করিলে তিনি এগারটি তারীখী (আজাদ পদ্ধতি) খণ্ড কবিতা রচনা করেন এবং একটি পুস্তিকা আকারে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। এই পুস্তিকার নাম ছিল গুল্যার ফাত্‌হ্ শাহ্ হিন্দ ও তাওয়া নামা-ই ফীরূযী শাহ্ 'আলামগীর। এই উভয় নাম হইতে ১১১১ হিজরী সালের তারিখ বাহির হয় (দ্র. হায়াতে জালীল, ২খ., ৪৪)

রচনাবলী ঃ ইন্‌শা-ই জালীল, ফারসী ভাষায় রচিত, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়, ৩৭ পৃষ্ঠা। পুস্তকটি চিঠিপত্রের সংকলন নয়, বরং ইহাতে আওরঙ্গযেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় ও বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা রহিয়াছে ; (২) মান্‌শাআত জালীল, তাঁহার চিঠিপত্রের একটি সংকলন। ইহা The Oriental Miscellany-এর প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা হইতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিল। বর্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ্য। গদ্যে লিখিত উপরিউক্ত দুইটি পুস্তক ছাড়া কাব্যে তিনি কয়েকটি মাছনাবী ও কাসীদা রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মাছনাবী আমওয়াজু'ল-খিয়াল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তটি প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি বিলগ্রামের প্রশংসা সম্বলিত, কিন্তু ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এইগুলি প্রথম যৌবনের রচনা। তাই তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে এইগুলি অধিকতর তেজোদ্দীপক। ইহাতে একজন হিন্দী সঙ্গীতজ্ঞের আলোচনায় একটি অধ্যায় রহিয়াছে এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের বর্ণনা রহিয়াছে। হায়াত-ই জালীল-এ তাঁহার রচিত 'আরবী, ফারসী ও হিন্দী কবিতার একটি সারসংক্ষেপ রহিয়াছে (২খ., ১২-৮৪)। উপরিউক্ত দুইটি ফারসী পুস্তক ছাড়া দুইটি আরবী গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ (১) আল-হুকমুল-ইরফানিয়্যা, ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'আরবী-ফারসী পাণ্ডুলিপিতে ড. নাযীর আহমাদ এই পুস্তকটির উল্লেখ করিয়াছেন। Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যায় এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল; (২) আর্-রিসালা ফী ইব্‌তালি জুয্‌ইন লা ইয়াতাজায্‌যা, গুলাম 'আলী আযাদ সুব্‌হাতুল-মারজানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পুস্তিকাটি বর্তমানে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম আলী আযাদ, মাআছিরুল-কিরাম, ১খ., ২৫৭; (২) ঐ লেখক, সুব্‌হাতুল-মারজান, পৃ. ৭৯; (৩) নাওয়াব সিদ্দীক হাসান, আবজাদুল-উলূম, পৃ. ৯০৭; (৪) ফাকীর মুহাম্মাদ, হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, পৃ. ৪৩৭; (৫) রাহমান 'আলী, তাযকিরা উলামা-ই হিন্দ্, পৃ. ১০৮; (৬) Beale, An Oriental Biographical Dictionary পৃ. 8; (৭) মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ, তায্‌কিরা উলামা-ই হিন্দ্, পৃ. ৫৩; (৮) নিজামুদ-দীন বাদায়ূনী, কামূসুল-মাশাহীর, ২খ., ৫৬; (৯) মাক্‌বুল আহমাদ সামাদানী, হায়াত-ই জালীল, এলাহাবাদ সংস্করণ; (১০) যুবায়দ আহমাদ, Contribution of India to Arabic Literature, পৃ. ২০৯, ৩৫৫, ৪১৮।

যুবায়দ আহমাদ (দা.মা.ই.)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল-ফাত্তাহ ফূমানী (عبد الفتاح فومنى) ঃ ইরানী ঐতিহাসিক। সম্ভবত ১৭শ খৃ. শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি গীলানের প্রাচীন রাজধানী ফূমানে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন (Ch. Schefer, Christ. Pers., ii, 93) এবং রাজপ্রাসাদের উযীর বিহ্‌যাদ বেগ কর্তৃক আনু. ১০১৮ বা ১০১৯/১৬০৯ বা ১৬১০ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হন। অতঃপর আরো কয়েকজন উযীরের অধীনে চাকুরী করিবার পরে 'আদিল শাহ তাঁহাকে ইরাকে লইয়া যান। তিনি ফার্সী ভাষায় 'তারীখ-ই গীলান' নামক ৯২৩/১৫১৭ হইতে ১০৩৮/১৬২৮ পর্যন্ত সময়ের গীলানের ইতিহাস রচনা করেন। এই বইটি বি. ডর্ন (B. Dorn) কর্তৃক (ভূমিকায় সংক্ষিপ্তসারসহ) প্রকাশিত হয়। ইহা জাহীরুদ-দীন (দ্র.) ও 'আলী ইব্‌ন শামসুদ-দীন (দ্র.)-এর লিখিত ইতিহাসের পরিপূরক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Abdul Fattah Fumeny's Geschichte von Gitan (vol. iii of B. Dorn, Muhammad Quellen Zur Geschichte d. Sudl. Kustentader des Kaspischen Meeres.)।

C.L. Huart-H. Masse (E.I.²) / হুমায়ুন খান

আবদুল মওদুদ (عبد مودود) ঃ (১৯০৮-১৯৭০ খৃ.) বিচারপতি, ইতিহাসবিদ ও লেখক। আবদুল মওদুদ ভারতের পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার ওয়ারী গ্রামে ১৯০৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম.এ. এবং পরবর্তীতে বি.এল. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৩৬ খৃ. মুন্সেফ পদে যোগদান করিয়া বিচার বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন এবং অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করেন। ১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ববঙ্গে চলিয়া আসেন এবং ঢাকায় স্থায়ী নিবাস গড়েন। আবদুল মওদুদ ১৯৬৭ খৃ. পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন মহকুমা ও জেলায় সাবজজ ও জেলা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ খৃ. তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৮ খৃ. অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের (বর্তমান বাংলা একাডেমী) চেয়ারম্যান হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন।

চাকুরীকালীন তিনি গবেষণার কাজকর্মও চালাইয়াছেন। তাঁহার গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্যও ছিল মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল মুসলিম মনীষা (১৯৫৫ খৃ.), পৃথিবী ও পাশ্চাত্য জগত (১৯৬৪ খৃ.), শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই (১৯৬৪ খৃ.), হযরত ওমর (রা) (১৯৬৭ খৃ.), দি ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদ, ১৯৬০ খৃ.), ক্রিমিনাল (১৯৬৯ খৃ.), মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর (১৯৬৯ খৃ.), ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে, কামেল নবী। ইহার মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থটি তাঁহার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। বইটিতে তিনি তৎকালীন উনিশ শতকে এই উপমহাদেশে হিন্দুদের তুলনায় পিছাইয়া পড়া মুসলমানদের শিক্ষা, চাকুরি, স্বাস্থ্যসহ সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। বৃটিশ সিভিলিয়ান হান্টারের লেখা দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থটি আবদুল মওদুদ অনুবাদ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের একটি বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন। হান্টার উক্ত বইয়ে

দেখাইয়াছেন যে, মুসলমানগণের গরিব হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সেই সকল মুসলমান কিভাবে বৃটিশ ও প্রতিবেশী হিন্দুদের যৌথ চক্রান্ত ও অসহযোগিতায় মাত্র এক শত বৎসরের ব্যবধানে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। মুসলিম সমাজে তাঁহার বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন। ২১ জুলাই ১৯৭০ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পা., চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (২) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, ঢাকা, ১৯৭৫ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আবদুল মতিন চৌধুরী (عبد المتين چودهرى) ঃ (১৯২২-৮১) বাংলাদেশের বিজ্ঞান অঙ্গনে সুপরিচিতিদের অন্যতম। ১৩৪১/১৯২২ সনের ১ মে লক্ষ্মীপুর (সদর) থানার অন্তর্গত মহাদেবপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বজলুর রহমান চৌধুরী ও মাতার নাম ফয়জুন্নেসা। বাল্যকাল হইতেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। যোগ্যতার সহিত ১৯৪২ সনে পদার্থবিদ্যায় বি.এসসি. অনার্স ও ১৯৪৩ সনে এম.এসসি. পাশ করেন। কিছুকাল এলাহাবাদের আবহাওয়া দফতরে কাজ করিয়া ১৯৫০ সনে তিনি লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি দুইটি পৃথক শাখায় ডক্টরেট লাভ করেন। প্রথমে আবহাওয়া বিজ্ঞানে চিগাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও পরে এক্সরে কেলাসতত্ত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে (১৯৫৬)।

জীবনে আবদুল মতিন চৌধুরী অনেক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেন। পাকিস্তান আমলে তিনি প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা ছিলেন। আণবিক শক্তি কমিশনের মেম্বার, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁহাকে বঙ্গবন্ধু পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন (১৯৭৩)। ১৯৭৭ সনে তিনি বোস প্রফেসার নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে ভিজিটিং প্রফেসার হিসাবে লন্ডনে গমন করেন। কয়েক মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া পূর্বের চাকুরিতে যোগদান করেন এবং এই পদে বহাল থাকিয়া ১৯৮১ সনের ২৭ জুন ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নোয়াখালী পৌরসভা প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্তি (ড. আলী আসগর খাঁ লিখিত প্রবন্ধ, ১০৬-৮ পৃ. এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীপুর পি.টি.আই.-র ইনস্ট্রাকটর আবদুল মালেক চৌধুরীর নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ।

ড. এম. আবদুল কাদের

'আবদুল-মাজীদ ১ম (عبد المجيد الاول) ঃ তুরস্কের উছমানী সুলতান ২য় মাহ্মূদের পুত্র; মাহমূদের দ্বিতীয় স্ত্রী (কাদিন) বায্ম-ই আলাম (যিনি একজন খ্যাতিসম্পন্না মহিলা ছিলেন)-এর গর্ভে ১৪ শাবান (১১ নহে), ১২৩৮/২৫ এপ্রিল, ১৮২৩ সালে শুক্রবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। মিসরীয় সেনাধ্যক্ষ ইব্রাহীম পাশা (দ্র.)-র নিকট 'নীযীব'-এর যুদ্ধে তুর্কীদের পরাজয় (২৪ জুন)-এর কিছুদিন পর ১৯ রাবীউছ-ছানী (২৫ নয়), ১২৫৫/১ জুলাই, ১৮৩৯ সালে তিনি পিতার মসনদে আরোহণ করেন। এই সময় পাশ্চাত্যের শক্তি জোটে তুরস্ক (কিন্তু ফ্রান্স নহে) প্রথম বারের মত যোগদান করিলে 'উছমানী সাম্রাজ্য রক্ষা পায় (Convention of London, 15 July, 1840)। আবদুল-মাজীদ তাঁহার পিতার আরদ্ধ সংস্কারকার্য অব্যাহত রাখেন।

তাঁহার শাসনকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি গুলখানার খাত্ত-ই শারীফ বা খাত্ত-ই হুমায়ূন-এর সরকারি ফরমান (২৬ শাবান, ১২৫৫/৩ নভেম্বর, ১৮৩৯)। দ্বিতীয় ঘটনা ক্রিমিয়া (Crimea)-এর, ইহা ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে শুরু হয় এবং প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ৩০ মার্চ, ১৮৫৬ সালে শেষ হয়। সরকারী ফরমানের জন্য দ্র. তান্‌জীমাত, গুলখানা, খাত্ত-ই হুমায়ূন, Uthmanlis, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের জন্য Uthmanlis প্রবন্ধ ও সাধারণভাবে ইতিহাস গ্রন্থাদি। উল্লেখ্য যে, বুলগেরীয় দানিউব তীরে সিলিস্ত্রিয়া (Silistria)-এর খ্যাতনামা প্রতিরক্ষা ঘটনা (১৯ মে-২৩ জুন, ১৮৫৪)-কে নামিক কামাল (দ্র.) তাঁহার একটি বিখ্যাত কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার শাসনামলে অবিরত বিশৃংখলা, বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল; যথাঃ কুর্দিস্তানে (১৮৪৭), দানিউবীয় রাজ্যসমূহে (১৮৪৮), বোসনিয়ায় (১৮৫০-১৮৫১), মন্টিনিগ্রো-য় (১৮৫২-৫৩), লেবানন-এ (১৮৪৯), জিদ্দা, লেবানন ও সিরিয়ায় (১৮৬০); বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়া বিদ্রোহের উল্লেখ নাই বা করা হইল।

আইন প্রণয়ন ছাড়াও 'আবদুল-মাজীদ অনেক সংস্কার সাধন করেন। যেমন প্রশাসনিক (এয়ালেত বা বিলায়েত অর্থাৎ প্রদেশসমূহের প্রশাসন), সামরিক প্রশাসন (৬ সেপ্টেম্বরের আইন, ১৮৪৩; দ্র. রেদীফ), শিক্ষানীতিমূলক (ইদাদী বা সামরিক প্রস্তুতিমূলক স্কুল ১৮৪৫ রুশদিয়া, বালক-বালিকাদের জন্য উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ১৮৪৭; দারুল-মাআরিফ, ১৮৪৯; মাক্তাব-ই উছমানী, প্যারিসের Ecole Ottomane (১৮৫৫) এবং মুদ্রা সংস্কার (অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উৎকৃষ্ট খাদমিশ্রিত মুদ্রা, বিশেষত বিশ পিয়াস্টার 'মাজীদিয়া' ১৮৪৪ সাল হইতে প্রবর্তিত হয়)। অধিকন্তু তিনি কয়েকটি হাসপাতাল ও অন্যান্য ইমারত (যথা দোলমা বাগচা-র প্রাসাদ, ১৮৫৩) নির্মাণ করেন, Fossati কর্তৃক আয়া-সুফিয়া মসজিদের মেরামতকরণ (২০ জুলাই, ১৮৪৯), সরকারী কাগজপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম খাযীনা-ই আওরাক (১৮৪৫) স্থাপন, প্রথম French Theatre অথবা Giustiniani কর্তৃক নির্মিত Crystal palace প্রথম সালনামাহ বা রাজকীয় বর্ষপঞ্জী তাঁহার শাসনামলেই (১৮৪৭) প্রবর্তিত হয়। তাঁহার সময় হইতেই শাহযাদাগণের সহজ উপাধি হয় আফেন্দী।

'আবদুল-মাজীদ ছিলেন প্রথম সুলতান, যিনি ইউরোপীয় ভাষা (ফ্রেন্স) বলিতে পারিতেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও ভদ্র। কিন্তু অনিয়মিত জীবন যাপনের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য সর্বদাই খারাপ থাকিত। তিনি অমিতব্যয়ী ও বিলাসী হইলেও সাহসী ছিলেন। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে Kossuth ও অন্যান্য হাঙ্গেরীয় রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে অস্ট্রিয়ার কাছে হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করিয়া তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তুর্কীদের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় সদাশয়, ভদ্র ও উন্নততর সংস্কৃতিবান সুল্তানের আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহার নম্র ও আকর্ষণীয় আচরণ তাঁহার মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় বহন করে [Mgr. Louis Petit, ছদ্মনাম Kutchuk

Efendi, এ্যাথেন্স-এর ক্যাথলিক বিশপ, Les Contemporatains no, 333, Maison de la Bonne presse, 1899).

১৭ যুলহিজ্জা, ১২৭৭/২৫ জুন, ১৮৬১ সালে দেশব্যাপী আর্থিক সংকটের মধ্যে যৌবনেই তিনি ইন্তিকাল করেন। সুলতান সালীম মসজিদের নিকটে একটি সাধারণ কবরে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার শাসনকালের খ্যাতনামা উযীরদের মধ্যে (Grand viziers) তিনজনের বিবরণের জন্য দ্র. রাশীদ পাশা, 'আলী পাশা ও খুসরাও পাশা। তাঁহার সময়ে বৈদেশিক কূটনীতিকদের মধ্যে ইস্তাম্বুলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন Stratford Canning (Lord Stratford de Redcliffe)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (তুর্কী ঐতিহাসিক) (১) লুত্ফী আফেন্দী, আহমাদ রাসিম, কামিল পাশা [তারীখ-ই সিয়াসী], আত-তারীখী, ২খ., ১৯৮ প.; পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ঃ (২) Iorga, Lavallee, de la Jonquiere, আহমাদ রাফীক, Tuirkiyede Multedjiler Meselesi, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ (হাঙ্গেরীয় উদ্বাস্তু); (৩) A. de Caston, Constantinople en 1869, পৃ. ৩০৬; (৪) Debidour, Hist. Diplomatique de l'Europa, 1891, ১ম খণ্ড, নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, La question d'Orient. Mahmoud, Mehemet Ali, Abdul-Medjid, in Lavisse and Rambaud, Hist. Gen., X, 924-46 (সূত্রসহ); (৬) Destrilhes, Confidences sur la Turquie, 1855; (৭) E. Enault, Constantinople et la Turquie, 1855, 431-45; (৮) de Flers Vers l'Orient, 383; (৯) G. Fossati, Aya Sofia as recently restored, London-Paris 1852; (১০) খালীল (Halil) গানিম, Les Sultans Ottomans, 1902, ii, 218-253; (১১) E. Hollander, La Turquie devant l'opinion publique 1858; (১২) Lettres du marechal de moltke sur l'Orient, ২য় সং, প্যারিস, পৃ. ৩৭১; (১৩) উছমান নূরী ইরগিন, তুর্কী মাআরিফ তারীখী, ১৯৪০ খৃ., ২য় খণ্ড; (১৪) ঐ লেখক, Istanbul sehreninleri, 1927 49-80, (১৫) Ed. Thouvenel, Constantinople sous Abdul-Medjid, Revue des Deux Mondes. I Jan. 1840; (১৬) A. Ubicini, La Turquie actuelle, 1855, 102-30; (১৭) Ulung Igdemir, Kuleli, vak'asi hakkinda bir arastirma, Ankara 1937; (১৮) Youssouf Razi, Souvenirs de Leila Hanoum sur le harem imperial, Paris 1925, 33-46; (১৯) Enver Koray-এর ঐতিহাসিক গ্রন্থপঞ্জী, নং ৭১, ১০৬১, ১৭২৭, আঙ্কারা ১৯৫২; (২০) আবদুল-মাজীদ-এর সাংবিধানিক ফরমানের জন্য দ্র. JA, ১৯৩৩, পৃ. ৩৫৭-৩৫৯; (২১) বিশদ প্রবন্ধ, তুর্কী বিশ্বকোষ, যথা Inonu Ansiklopedisi, Istanbul Ansiklopedise; (২২) তুর্কী ইয়াহূদীদের জন্য দ্র. M. Franco Essai sur l'hist. des Israelites de l'Emp. Ott., 1897, 143-60; (২৩) Jewish Encyclopaedia, আবদুল মাজীদ নিবন্ধ দ্র.।

J. Deny (E.I.2) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল-মাজীদ ২য় (عبد المجيد الثانى) ঃ তুরস্কের শেষ উছমানী খলীফা, সুলতান আবদুল-আযীয (দ্র.)-এর পুত্র। তিনি ১৮ নভেম্বর, ১৯২২-এ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী কর্তৃক খলীফা নির্বাচিত হন এবং স্বীয় চাচাতো ভাই ৫ম মাহমূদ (ইনি সালতানাত বিলুপ্তির পর ১ নভেম্বর, ১৯২২, একটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। কয়েক মাসের মধ্যেই মুস্তাফা কামাল কর্তৃক আনকারায় স্থাপিত সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধবাদীরা খলীফার চারিদিকে একত্র হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। ১৯২৩ খৃ. ২৯ অক্টোবর মুস্তাফা কামাল তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র (Republic) ঘোষণা করিলে সকল বিরোধের অবসান হয়। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী কর্তৃক খিলাফাত বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরের দিন 'আবদুল-মাজীদ ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। ২৩ আগস্ট, ১৯৪৪ তিনি প্যারিসে ইন্তিকাল করেন। হায়দরাবাদের প্রাক্তন নিজাম মীর উছমান আলী খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আজাম জাহ-এর সঙ্গে খলীফা আবদুল-মাজীদ-এর কন্যা শাহযাদী দুর্‌র-ই শাহওয়ার-এর বিবাহ হয়। উক্ত শাহযাদীর পুত্রই ছিলেন হায়দরাবাদের সর্বশেষ নিজাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Discours du Ghazi Moustafa Kamal, President de la Republique Turque, Leipzig 1927; (২) COC, 1944-1945, p. 105.

(E.I.2, দা.মা.ই.) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল-মাজীদ ইব্ন আবদিল্লাহ (দ্র. 'আবদুন)

আবদুল মান্নান, মাওলানা (مولانا عبد المنان) ঃ একজন খ্যাতনামা 'আলিম, মুহাদ্দিছ ও রাজনীতিক। 'কাশিয়ানী হুযূর' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানাধীন ভাটাই ধোবা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪০-এর দশকে জন্মগ্রহণ করেন। কাশিয়ানী থানার মাজড়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯৫৫ খৃ. তিনি গাওহর ডাঙ্গা মাদ্‌রাসা হইতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করিয়া দাওরা-ই হাদীছ পাশ করেন। এইখানে তিনি মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (দ্র.), মাওলানা আবদুল হাফীয হাজিগঞ্জী মাওলানা মাজহারুল হক চাট্টগামী ও মাওলানা আবদুস্ সাত্তার খুলনাবী প্রমুখ-এর নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দাওরা-ই হাদীছ পাশ করার পর তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর শিক্ষকতার পর হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি দারুল উলূম দেওবান্দ গমন করেন। ৩ বৎসর তিনি সেইখানে অধ্যয়ন করেন। এইখানে তাঁহার উস্তাদ ছিলেন শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফাখ্রুদ্দীন মুরাদাবাদী (র), শায়খুল মুহাম্মাদ ইবরাহীম বালিয়াবী (র), কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব (র) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও মুহাদ্দিছবৃন্দ।

অতঃপর তিনি 'তাখাস্‌সুস্ ফিল-হাদীছ' (হাদীছ শাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা) কোর্স করার জন্য বিন্নুরী টাউন করাচী গমন করেন। সেইখানে তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আল্লামা ইয়ূসুফ বিন্নুরী (র), মুফতী ওয়ালী হাসান টুংকী (র) ও মাওলানা ইদরীস কান্ধলাবী (র) প্রমুখ খ্যাতিমান 'আলিম ও মুহাদ্দিছ-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ১৯৬৭ খৃ. তিনি উক্ত ডিগ্রী লাভ করেন। করাচী থাকাকালেই তিনি ই'লাউ'স-সুনান গ্রন্থের লেখক 'আল্লামা জাফর আহমাদ 'উছমানী (র)-এর দার্‌স (পাঠচক্র) হইতেও উপকৃত হন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার নিকট বায়'আত হন।

অতঃপর দেশে ফিরিয়া তিনি পুনরায় দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহর ডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘকাল তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীছ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হাদীছের খিদমত আঞ্জাম দেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব ও গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত মাদ্‌রাসা ছাড়াও তিনি ১৯৭৯-৮৫ সাল পর্যন্ত যাত্রাবাড়ী জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়াতে শায়খুল হাদীছ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকার লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিছ-এর দায়িত্ব পালন করেন।

হাদীছের খিদমত ছাড়াও সাংগঠনিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি খুবই দূরদর্শিতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। মুজাহিদ আজম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) প্রতিষ্ঠিত 'খাদেমুল ইসলাম জামাত'-এর তিনি দীর্ঘকাল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'খাদেমুল ইসলাম ছাত্র যুব পরিষদ'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলাদেশের শতধা বিভক্ত আলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একই প্লাটফরম হইতে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করার লক্ষ্যে গঠিত হয় 'বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ'। উক্ত পরিষদের তিনি ছিলেন মহাসচিব। তিনি জামেআ ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্‌রাসার 'মজ্‌লিসে শূরা'র সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য মস্‌জিদ ও মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সহিত সরাসরি তিনি জড়িত ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'খিলাফাত আন্দোলন-এর আমীর হযরত হাফেজী হুযূর (দ্র.)-কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। একই উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে 'ইসলামী ঐক্যজোট' প্রতিষ্ঠায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯০-এর দশকে হানাদার রুশদের কবল হইতে আফগানিস্তান মুক্ত হওয়ার পর সেইখানকার নির্যাতিত আফগানদের অবস্থা সরেজমিনে ও স্বচক্ষে দেখার জন্য বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কিছু আলিম-এর একটি প্রতিনিধি দল আফগানিস্তান সফর করেন। মাওলানা আবদুল মান্নান (কাশিয়ানী হুযূর) ছিলেন উক্ত দলের অন্যতম সদস্য।

হাদীছ শিক্ষাদানের পাশাপাশি মাওলানা আবদুল মান্নান বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। 'শরীয়তের দৃষ্টিতে বীমা ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড', 'তিন তালাক ঃ সমস্যা ও তার সুষ্ঠু সমাধান', 'নাফেউল খালায়েক' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৬ সাফার, ১৪২৪/১৯ এপ্রিল, ২০০৩ সালে উত্তরাস্থ আল-আশরাফ জেনারেল হাসপাতালে তিনি ইন্তিকাল করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। তিনি মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইন্তিকালের সময় তিনি ৭ পুত্র ৭ কন্যা রাখিয়া যান। গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার হিফ্‌যখানার দক্ষিণ দিকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাসিক আল-আশরাফ, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, সূত্রাপুর, ঢাকা, জুন ২০০৩ খৃ.; (২) মাসিক কওমী কণ্ঠ, ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মতিঝিল, ঢাকা, জুলাই ২০০৩ খৃ.; (৩) মরহুম-এর পারিবারিক সূত্র।

আবদুল-মালিক ইব্ন কাতান (عبد الملك بن قطن) ঃ আল-ফিহ্‌রী ছিলেন আন্দালুসের গভর্নর। আবদুর-রাহমান ইব্ন আবদিল্লাহ আল-গাফিকী (দ্র.) ১১৪/৭৩২ সালে Gaul (ফ্রান্স)-এর অভিযানে শাহাদাত বরণের পর আবদুল-মালিক এই পদে অধিষ্ঠিত হন। ১১৬/৭৩৪ সালে তাঁহাকে উকবা ইব্নুল-হাজ্জাজ আস্-সলূলীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হয়। কিন্তু ১২৩/৭৪০ সালে আবার তিনি উক্ত পদে পুনর্বহাল হন। তিনি মদীনার আন্‌সার-এর সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন, দামিশ্‌কের খলীফার প্রতি তাঁহার মনোভাব ছিল কিছুটা বিরূপ। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। বার্বারগণ Iberian peninsula-র বিভিন্ন দ্বীপে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অল্প কালের মধ্যে কর্ডোভাকেও বিপদাপন্ন করিয়া তোলে। এই সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ও স্বীয় সামরিক শক্তির অপ্রতুলতার দরুন নিজের পসন্দ-অপসন্দের কথা ভুলিয়া তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন জুন্দ (বাহিনী)-এর অন্তর্ভুক্ত একটি আরব দলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে এই আরব বাহিনীগুলি উত্তর আফ্রিকার সাব্‌তা (Ceuta) দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। আবদুল-মালিক তাহাদের স্বীয় সেনাপতি বালজ (দ্র.)-এর নেতৃত্বে জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রমের অনুমতি দেন। এই সৈন্যশক্তি বৃদ্ধির দৌলতে এবং তিনবার বার্বারগণকে পরাজিত করায় তিনি সংকটমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় শক্তিতে বলীয়ান সিরীয় বাহিনী যুলকাদা ১২৩/ সেপ্টেম্বর ৭৪১ সালে অনায়াসে আবদুল-মালিককে অপসারিত করে এবং তদস্থলে সেনাপতি বাল্‌জ-কে গভর্নর (ওয়ালী) নিযুক্ত করে। নূতন গভর্নরের প্রথম নির্দেশাবলীর একটি ছিল পূর্বোক্ত বৃদ্ধ গভর্নরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ১খ., ৪১, ৪৩-৪৭; (২) আল-আলাম, আবদুল-মালিক নিবন্ধ দ্র.।

E. Levi-Povencal (E.I.[2]) এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল-মালিক ইব্ন নূহ (দ্র. সামানী)

আবদুল-মালিক ইব্ন মার্‌ওয়ান (عبد الملك بن مروان) ঃ উমায়্যা বংশের পঞ্চম খলীফা, রাজত্বকাল ৬৫-৮৬/ ৬৮৫-৭০৫। সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার জন্ম ২৬/৬৪৬-৭ সালে, পিতার নাম মার্‌ওয়ান ইব্নুল-হাকাম (দ্র.) এবং মাতা আইশা বিন্‌ত মু'আবিয়া ইব্নিল-মুগীরা। দশ বৎসরের বালক হিসাবে তিনি খলীফা উছমানের বাড়ী আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে মু'আবিয়া তাঁহাকে বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত মদীনা বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন। প্রথম ইয়াযীদ (৬২-৩/৬৮২-৩)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়াইয়া

পড়িবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায় ছিলেন। বিদ্রোহীদের দ্বারা উমায়্যাগণ বিতাড়িত হইলে তিনি পিতার সহিত শহর ত্যাগ করেন। কিন্তু মুসলিম ইব্ন উকবার নেতৃত্বাধীন সিরীয় বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি মুসলিমকে শহর ও উহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানপূর্বক তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর হাররার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে মদীনাবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করেন (২৭ যুলহিজ্জা, ৬৩/২৭ আগস্ট, ৬৮৩)। পিতা নিহত হইবার (রামাদান ৬৫/এপ্রিল-মে ৬৮৫) পর আবদুল-মালিক খলীফারূপে উমায়্যা সভাসদগণের স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। মারজ-রাহিত-এর যুদ্ধ সিরিয়ার উপর উমায়্যাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং মিসর পুরুদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভাই আবদুল-আযীয (দ্র.)-এর কঠোর নিয়ন্ত্রণে শাসিত হইতে থাকে। তবুও যুফার ইব্ন হারিছ উত্তরে কিরকিসিয়াতে কায়স গোত্রের সহায়তায় ৭১/৬৯০-১ সাল পর্যন্ত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। বায়যান্টাইনগণ সীমান্তে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করিতে থাকে, এমনকি তাহারা ৬৮/৬৮৮ সালে এ্যানটিওক (Antioch) পুনর্দখল করিয়া লয় এবং খোদ সিরিয়ার অভ্যন্তরে মারদাইতদেরকে সাহায্য প্রদান করিতে থাকে। মক্কায় আবদুল্লাহ ইব্নুয্-যুবায়র (দ্র.) খলীফারূপে ঘোষিত হন এবং অন্তত নামেমাত্র হইলেও সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশেই স্বীকৃতি লাভ করেন। তাহা সত্ত্বেও আবদুল-মালিক সাফল্যের সহিত পরিস্থিতি মুকাবিলা করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিরিয়ার নেতৃত্বে আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

প্রথমে অবশ্য ইরাক ও প্রাচ্য ভূখণ্ডসমূহ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদকে উপজাতীয়গণ বিতাড়িত করে। তিনি মেসোপটেমিয়াতে কূফা বাহিনীর একটি আক্রমণ প্রতিহত করিতে (রামাদান ৬৫/মে ৬৮৫) সক্ষম হইলেও কূফা ও বসরা পুনর্দখল করিতে ব্যর্থ হন। অল্প কিছুকাল পরেই শী'আ নেতা মুখ্তার (দ্র.) কর্তৃক কূফা অবরুদ্ধ হয় এবং তাহার দল সিরীয়দের সহিত একটি অমীমাংসিত যুদ্ধের (যুলহিজ্জা ৬৬/ জুলাই ৬৮৬) পর উহার পরবর্তী মাসে ইবরাহীম ইব্নুল-আশ্তার-এর নেতৃত্বে খাযির নদীর তীরে উবায়দুল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য ইরাক মুস্আব ইব্নুয যুবায়রের শাসনাধীন থাকে। উল্লেখ্য যে, তাঁহার সেনাপতি আল-মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরা বসবার সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া হাররা নামক স্থানে রামদান ৬৭/এপ্রিল ৬৮৭-এ মুখতারের বাহিনীকে পরাজিত এবং কূফা পুনর্দখল করেন। ইরাকের ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে ও নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য আবদুল-মালিক ৬৯/৬৮৯ সনে গ্রীক সম্রাটের সহিত একটি দশ বৎসরের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী গ্রীক সম্রাট বার্ষিক করের বিনিময়ে সিরিয়া হইতে মারদাইতগণকে গ্রীক ভূখণ্ডে অপসারিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আবদুল-মালিক দামিশ্ক হইতে মুস্আবের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, কিন্তু রাজধানীতে তাঁহার আত্মীয় আমর ইব্ন সা'ঈদ আল্-আশদাক (দ্র.)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। আমর স্বীয় বাসভবনে নিজেকে সুরক্ষিত করেন, কিন্তু খলীফার আগমনে জীবন ও মুক্তির অঙ্গীকার পাইয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু আবদুল-মালিক তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিছুকাল পরেই তাহাকে বন্দী করেন এবং সাধারণ বিবরণ অনুযায়ী নিজ হাতে প্রাণদণ্ড কার্যকরী করেন। পরবর্তী বৎসর (৭০/৬৯০) আবার মুসআবের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়, কিন্তু উভয় পক্ষই মেসোপটেমিয়ায় নিষ্ফলভাবে একে অপরের সম্মুখীন হয়। তৃতীয় বৎসর আবদুল-মালিক কির্কীসিয়াতে কয়েক মাসের জন্য যুফারকে অবরোধ করিয়া তাঁহার অভিযান শুরু করেন। তিনি মেসোপটেমিয়ার উজান (Upper) অঞ্চল পুনর্দখল করেন এবং কায়সীদের দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইরাকে প্রবেশ করেন। মাস্কিন-এর নিকট দায়রুল-জাছালীক নামক স্থানে মুসআব ও ইবনুল-আশ্তার উভয়ে পরাজিত এবং নিহত হন (১৭ জুমাদা-১ম বা ২য়, ৭৩/অক্টোবর বা ৩ নভেম্বর, ৬৯১)। আল- মুহাল্লাব বসরার সৈন্যদের লইয়া খারিজীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। ইরাকীদের অধিকাংশ এই সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যাহা তাহাদের দুঃখ- দৈন্য ও ক্ষয়-ক্ষতি ভিন্ন কিছুই দিতে পারে নাই। খলীফা কূফা প্রবেশ করিলে প্রদেশটি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই আল-হাজ্জাজের অধীনে ২০০০ সিরীয় সৈন্যের একটি বাহিনী মক্কায় ইবনুয্-যুবায়রের সহিত বোঝাপড়া করার জন্য প্রেরিত হয়। আল-হাজ্জাজ তাইফে যাত্রা বিরতির পর ১ যুলকাদা, ৭২/২৫ মার্চ, ৬৯২ তারিখে মক্কা অবরোধ করেন। কিঞ্চিদধিক ছয় মাস পর ইব্নুয্-যুবায়র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং শহরের পতন ঘটে (১৭ জুমাদা-১ম বা ২য় ৭৩/৪ অক্টোবর বা ৩ নভেম্বর, ৬৯২)। আল-হাজ্জাজকে হিজাযের গভর্নরের পদ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

ইরাক পুনর্দখলের ফলে আবদুল-মালিকের পক্ষে খারিজীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর কূফা ও বসরার সম্মিলিত বাহিনী ইয়ামামার নাজ্দিয়্যাকে ৭৩//৬৯২-৩ সনে মুশাহ'হ'ার নামক স্থানে পরাজিত করে। কিন্তু অধিকতর বিপজ্জনক ও ধর্মীয় গোঁড়ামিপূর্ণ আযারিকা পারস্যে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে, এমনকি আল-মুহাল্লাবের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধক্লান্ত মুকাতিলাও এই গুরু দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে। অবশেষে আবদুল-মালিক ৭৫/৬৯৪ সালে আল-হাজ্জাজকে কূফার শাসনভার গ্রহণের জন্য সেখানে বদলি করেন। তাহার নিষ্ঠুরতা ও সক্রিয় সমর্থনের ফলে আল-মুহাল্লাব তিন বৎসরব্যাপী এক অভিযানে আযারিকাকে দমন করিতে সমর্থ হন। ইতোমধ্যে মেসোপটেমিয়ার রাবী'আ উপজাতির মধ্যে নূতন করিয়া খারিজী অভ্যুত্থান ঘটে। তাহারা শাবীব-এর নেতৃত্বে কূফা ভূখণ্ড পদদলিত এবং মাদাইন অবরোধ করে (৭৬-৭/৬৯৫-৬)। পারস্য হইতে প্রত্যাহৃত কূফার মুকাতিলা শাবীবের হাত হইতে তাহাদের নগরীকে মুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে আল-হাজ্জাজ ৪০০০ সিরীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহারা আক্রমণকারীদের বিতাড়িত এবং শাবীবকে হত্যা করার (৭৭ হিজরীর শেষ দিকে/৬৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে) পর তাবারিসতানে আযারিকার আরব অংশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পায়। একই বৎসর (৭৮/৬৯৭) খুরাসানের এক বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগে আবদুল-মালিক এই প্রদেশটিকেও আল-হাজ্জাজ-এর শাসনাধীনে আনয়ন করেন। আল-হাজ্জাজ

আল-মুহাল্লাবকে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে উহার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। আল-মুহাল্লাব অল্প কিছুকাল পরেই মধ্যএশিয়ার দিকে তাহার অভিযান পুনরায় শুরু করেন, কিন্তু ৮২/৭০১-২ সালে তাহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খুব কম সাফল্যই অর্জিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহার পুত্র ইয়াযীদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। একই সময়ে সিজিস্তানে নিযুক্ত আবদুর-রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নিল-আশ'আছ আফগানিস্তানে কূফা ও বসরার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নিম্নজাতের রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদের সমালোচনা করায় ইব্নুল-আশআছ ও অভিজাত শ্রেণী ক্রোধান্বিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (৮১/৭০০-১) এবং ইরাক প্রত্যাবর্তন করেন। অল্প সংখ্যক সিরীয় সৈন্য ও তাহাদের সমর্থকগণ প্রদেশের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে না পারায় কিছু সময়ের জন্য অবস্থা চরম সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু সিরিয়া হইতে আগত অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহীদেরকে দারুল-জামাজিম নামক স্থানে পরাস্ত করা হয় (জুমাদা-২য়, ৮২/জুলাই ৭০১) এবং পুনরায় দুজায়ল তীরে মাসকিন নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা হয় (শাবান ৮২/অক্টোবর ৭০১)। অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে সিজিস্তান ও খুরাসান অভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয় যেখানে ইয়াযীদ ইব্নুল-মুহাল্লাব তাহাদেরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় (৮৩/৭০২)। একই বৎসর আল-হাজ্জাজ সিরীয় সৈন্যদের জন্য ওয়াসিত-এ একটি নূতন সৈন্য শহর নির্মাণ করেন। এই ঘটনাটি উমায়্যা খিলাফাত ও আরব সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি যুগ সন্ধিক্ষণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তখন হইতে একটি স্থায়ী সিরীয় দখলদার বাহিনী ইরাকের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হইল এবং কূফা ও বসরার মুকাতিলাকে আর কখনো যুদ্ধের জন্য তলব করা হয় নাই। আরও বারোটি বৎসরের জন্য আল-হাজ্জাজের কঠোর শাসন, শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে এবং ইরাকের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করে, কিন্তু তাহা করা হইয়াছিল 'আরব গোত্রগুলির, বিশেষত কূফার উপজাতীয়দের তিক্ত অসন্তোষের বিনিময়ে।

মুসলিম শাসক আবদুল-মালিক প্রবর্তিত নূতন স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিতে (বায়যান্টাইন) সম্রাটের অস্বীকৃতির ফলে বায়যান্টাইনদের সহিত পুনরায় ৭৩/৬৯২ সালে যুদ্ধ বাঁধে। খলীফার ভাই মুহাম্মাদের নেতৃত্বাধীন সিরীয় বাহিনীর আনাতোলিয়া ও আরমেনিয়া আক্রমণে কিছু প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও তাহারা খুব সামান্য স্থানই দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তবে তাহারা পরবর্তী খলীফার অভিযানের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। উত্তর আফ্রিকার হাস্সান ইব্নুন-নু'মানের নেতৃত্বে মিসরের মুকাতিলা ইফ্রীকিয়ার দক্ষিণাংশ পুনরাধিকারের পর নৌবাহিনীর সমর্থনে কার্থেজ অভিমুখে অগ্রসর হয় (৭৮/৬৭৯)। গ্রীকদের সাহায্যকারী নৌবহর পরাজিত ও কার্থেজ অধিকৃত হয় এবং এইরূপে পরবর্তী বিজয় অভিযানের জন্য কায়রাওয়ানে একটি নিরাপদ ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

আবদুল-মালিক এই সকল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কলহ ও বৈদেশিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময় করিয়া লইয়াছিলেন। উপজাতীয় বিভেদপ্রবণতার প্রতিকার ছিল কেন্দ্রকে শক্তিশালীকরণ। এই উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল অর্থ দফতরগুলিতে গ্রীক ও ফারসীর পরিবর্তে আরবীর প্রচলন। উহা ছিল প্রদেশগুলির বিভিন্ন প্রকার কর ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও একত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রশাসনের উপর মুসলিম প্রভাব বিস্তারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। সম্রাটের প্রতিচ্ছবি সম্বলিত বায়ান্টাইন দিনারিয়াস-এর পরিবর্তে কুরআনের আয়াত সম্বলিত মুসলিম দীনার প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী স্বর্ণমুদ্রা চালু করার সিদ্ধান্তে ইহা আরও স্পষ্টরূপে প্রকট হয়। উমায়্যা বংশীয়, বিশেষ করিয়া আল-হাজ্জাজ-এর প্রতি পরবর্তী যুগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী বিশ্বাসের আওতায় শৈশব হইতে লালিত-পালিত মুসলিম শাসকদের এই প্রথম পুরুষের মধ্যে ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। অপর একটি ও অধিকতর সুদূরপ্রসারী সংস্কার ছিল হারকাত (স্বরচিহ্ন) ও নুকতা (হরফচিহ্ন)সহ পবিত্র কুরআনের কপি প্রস্তুত করাইয়া বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ। আবদুল-মালিক জেরুসালেমের কুব্বাতুস-সাখরা (দ্র.)-এরও নির্মাতা ছিলেন।

তাঁহার আমলের শেষাংশ সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ শক্তি বৃদ্ধির স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু তিনি উত্তরাধিকারের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আবদুল-মালিক-এর উত্তরাধিকারীরূপে মারওয়ান তাঁহার ভাই আবদুল-'আযীযকে মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল-মালিক তাঁহাকে নিজ পুত্র আল-ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অনুকূলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আবদুল-মালিকের মৃত্যুর (শাওয়াল ৮৬/অক্টোবর ৭০৫) মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে জুমাদা ১-৮৬/ মে, ৭০৫ সালে মিসরে আবদুল-আযীযের মৃত্যু হইলে ঠিক সময়মত একটি কোন্দল এড়ানো সম্ভব হয়। আবদুল-মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-ওয়ালীদ (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, বালাযুরী, ইয়াকূবী, মাস'উদী, ইব্নুল-আছীর প্রমুখের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থাবলী; (২) ইব্ন সা'দ, ৫খ., ১৬৫-৭৫; (৩) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্ন কুতায়বা, উয়ূনুল-আখবার, নির্ঘণ্ট; (৫) খিলাফতের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থাবলী (উমায়্যা শীর্ষক প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য); (৬) J. Walker, Catalogue of the Arab-Sassanian Coin (in the B. M.) ও উমায়্যা মুদ্রার অন্যান্য ক্যাটালগ; (৭) Caetani, Chronographia, A. H. ৮৬, প্যারা ৩১ (পৃ. ১০৪০-১); (৮) ইব্নুত-তিকতাকা, আল্-ফাখ্রী, সম্পা. Derenbourg, পৃ. ১৬৭-৭৩।

H. A. R. Gibb (E.I.²) / মু. আবদুল মান্নান

আবদুল-মালিক ইব্ন মুহাম্মাদ (عبد الملك بن محمد)ঃ ইব্ন আবী 'আমের আল-মু'আফিরী, আবূ মারওয়ান আল-মুজাফ্ফার, স্পেনের উমায়্যা খলীফা ২য় হিশাম আল-মুআয়্যাদ বিল্লাহ-এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (حاجب) আল-মানসূর (দ্র.)-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ৩৯২/১০০২ সালে মাদীনাতুস-সালিম (Medina-cali)-এ পিতার মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন মুস্লিম স্পেনের প্রকৃত শাসনকর্তা।

আল-মানসূর-এর দ্বিতীয় পুত্র 'আবদুল-মালিক ৩৬৪/৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা আয্-যাল্ফা একজন উম্মু ওয়ালাদ ছিলেন। আবদুল-মালিকের জন্মের পর তিনি কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে 'আবদুল-মালিক মরক্কো ও উত্তর স্পেনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযানে প্রধান সেনাপতি হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জন

করিয়াছিলেন। ৩৮৮/৯৯৮ সালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রাদেশিক শাসক পদের দায়িত্বে মরক্কো প্রেরণ করেন। তিনি ফেয-এ অবস্থান গ্রহণ করেন; কিন্তু পর বৎসরই তাঁহাকে কর্ডোভায় ফিরাইয়া আনা হয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্পেনের আরব-ইতিহাস হইতে শাসনকর্তা হিসাবে 'আবদুল-মালিকের বিস্তারিত বিবরণ আমরা অবগত হইয়াছি। ইহা পাঠে অনুমিত হয়, 'আবদুল-মালিক পিতার প্রতিভার অধিকারী না হইলেও শাসন বিষয়ক কূটকৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার সাত বৎসরের শাসনামলকে পাশ্চাত্যে উমায়্যা খিলাফাতের পতনের পূর্বে আন্দালুসের ইতিহাসে শেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

'আবদুল-মালিক পিতা মানসূর-এর অনুসৃত কর্মকৌশলের অনুসরণ করেন। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের (ছুগূর) বৈরী খৃষ্টানদের প্রতিরোধের নীতি অব্যাহত রাখেন। এই উদ্দেশে তিনি প্রতি বৎসর আন্দালুসের কোন না কোন সীমান্ত এলাকায় সামরিক অভিযানে বাহির হইতেন। ৩৯৩/১০০৩ সালে তিনি Hispanic March (বিলাদুল-ইফ্‌রাঞ্জ)-এ তাঁহার বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী বারসেলোনা (Barcelona)-এর সন্নিহিত এলাকা বিধ্বস্ত করে এবং শত্রুর ৩৫টি দুর্গ নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। ৩৯৪/১০০৪ সালে তিনি Castille-এর Count. Sancho Garcia-এর এলাকা আক্রমণ করেন। কাউন্ট সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং পরবর্তী বৎসর Galicia ও Asturias-এর বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে 'আবদুল মালিককে সাহায্য করেন। ৩৯৬/১০০৬ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি ফিরিঙ্গী অঞ্চল রিবাগোরযা (Ribagorza) আক্রমণ করেন। পরবর্তী বৎসর Clunia দুর্গের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানটি ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি দুর্গটি জয় করিয়া ধ্বংস করিয়া দেন। এই বিজয়ের জন্য 'আমেরী হাজিব ('আবদুল মালিক) 'আল-মুজাফ্‌ফার'-এর সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হন। ৩৯৮/১০০৭ সালে 'আবদুল-মালিককে আবার Sancho Garcia ও Castille-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। পরবর্তী বৎসরও তিনি একই অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু Castille-এর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতিকালে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৬ সাফার, ৩৯৯/২০ অক্টোবর, ১০০৮ সালে কর্ডোভার নিকটে ওয়াদী আরমিলাত-এর প্রান্তে ইন্তিকাল করেন।

'আবদুল-মালিক আল-মুজাফ্‌ফার তাঁহার সাত বৎসরের শাসনামলে আরব আভিজাত্যের বিরুদ্ধে স্লাভ ভাষাভাষী (সাকালিবা) উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি অনুকূল নীতি দ্বারা কর্ডোভার শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোর সংরক্ষণ করেন। 'আবদুল-মালিকের হঠাৎ মৃত্যুতে দ্বিতীয় 'আমেরী শাসক তদীয় ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আবদুর-রাহ্‌মান Sanchuelo-এর হস্তক্ষেপ ছিল বলিয়া যে অনুমান করা হয় তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না (দ্র. স্পেনের বানূ 'আমের ও বানূ উমায়্যা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন বাস্‌সাম, আয্‌-যাখীরা, ৪খ., (ed. in Preparation); (২) ইব্‌ন ইযারী, আল-বায়ান, ৩খ., ৩-৩৭ (অনু. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne[2], iii, 185-214); (৩) ইব্‌নুল-খাতীব 'আমালুল-'আলাম, পৃ. ৯৭-১০৪; (৪) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. mus., ii, 273 (গ্রন্থপঞ্জী সূত্রসমূহ, টীকা ১), ২৯০ প.।

E. Levi-Provencal (E.I.[2]) / মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল-মালিক ইব্‌ন যুহ্‌র (দ্র. ইব্‌ন যুহ্‌র)

আবদুল-মালিক ইব্‌ন সালিহ (عبد الملك بن صالح) ঃ ইব্‌ন 'আলী খলীফা আবুল-আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ ও আবূ জা'ফার আল-মানসূরের চাচাত ভাই ছিলেন। হারূনুর-রাশীদের রাজত্বকালে আবদুল-মালিক বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৭৪/৭৯০-১ সনে, ১৮১/৭৯৭-৮ সনে ও কতিপয় লেখকের মতানুযায়ী ১৭৫/৭৯১-২ সনে, যদিও অন্যান্য সূত্র উল্লেখ করে, শেষোক্ত বৎসর 'আবদুল-মালিক নহেন, বরং তাঁহার পুত্র 'আবদুর-রাহমান, সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি কিছু কালের জন্য মদীনার গভর্নরও ছিলেন এবং একই দায়িত্ব মিসরেও পালন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তিনি খলীফার সংশয় এড়াইতে পারিলেন না। ১৮৭/৮০৩ সনে পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং ১৮৩/৮০৯ সনে আর-রাশীদের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। নূতন খলাফী আল-আমীন তাঁহাকে মুক্তি দিয়া ১৯৬/৮১১-২ সনে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'আবদুল-মালিক তৎক্ষণাৎ আর-রাককার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থ হইয়া কিছুদিন পরেই ঐ শহরে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু সন ১৯৬/৮১১-২ আল-মাসউদী কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে (তান্‌বীহ, ৩৪৮)। কিন্তু একই লেখক (মুরূজ, ৪খ., ৪৩৭, ১১৯৭ হি., বলিয়াও উল্লেখ করন। আবার ইব্‌ন খাল্লিকান ১৯৩ হি. উল্লেখ করেন (অনু. de Slane, ১খ., ৩১৬), এমনকি ১৯৯ হি.-ও বলা হইয়াছে (ঐ, ৩খ., ৬৬৫, ৬৬৭)। কথিত আছে, কয়েক বৎসর পর খলীফা আল-মানূন তাঁহার সমাধি ধ্বংস করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। কেননা কথিত আছে, আমীন ও মামূনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালে আবদুল-মালিক কখনও মামূনের আনুগত্য স্বীকার করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ., ৬১০ প.; (২) ইব্‌নুল-আছীর, ৬খ., ৬৪প.; (৩) ই'য়াকূবী, ২খ., ৪৯৬ প.; (৪) মাস্'উদী, মুরূজ, ৪খ., ৩০২-৫, ৩৫৬, ৪১৯প., ৪৩৭ প; (৫) বালাযুরী, ফুতূহ, ১৩২, ১৫৫, ১৭০, ১৮৫; (৬) Brooks, Byzantines and Arabs in the Time of the Early Abbasids, The English Historical Review, ১৫খ., ৭২৮প., ১৬খ., ৮৪প.; (৭) ওয়াসিয়্যাত 'আবদিল-মালিক লিইব্‌নিহি কাবলা ওয়াফাতিহি, সম্পা. L. Cheikho, in Machriq, ২৫খ., ৭৩৮-৪৫।

K. V. Zettersteen (E.I.[2]) / এ. বি. এম. আবদুর রব

আবদুল-মালিক ইব্‌ন হিশাম (দ্র.ইব্‌ন হিশাম)

'আবদুল-মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম (عبد المطلب بن هاشم) ঃ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পিতামহ। তিনি পুত্র আবদুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর পৌত্র বালক মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মৃত সন্তান আবদুল্লাহ্‌র প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তানটি প্রশংসিত (محمد) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় আবদুল-মুত্তালিব পৌত্রের নাম রাখিলেন মুহাম্মাদ। আবদুল

মুত্তালিব-এর প্রকৃত নাম ছিল শায়বা। তাঁহার মাতা সালমা ছিলেন মদীনার বানূ নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। শায়বার পিতা হাশিমের সহিত সালমার এই চুক্তি হয়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সালমা মদীনায় থাকিবেন। অল্পদিন পর ভ্রমণকালে হাশিমের মৃত্যু হয়। শায়বা মদীনায় জন্মগ্রহণ করিয়া বড় হইতে থাকেন। পরে তাঁহার চাচা মুত্তালিব ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শায়বাকে মক্কায় লইয়া আসেন। মক্কার লোক অপরিচিত বালক শায়বাকে মনে করিল, সে মুত্তালিবের দাস। সুতরাং তাঁহার নাম হইয়া পড়িল আবদুল-মুত্তালিব। নাওফাল নামে আবদুল-মুত্তালিবের চাচা তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার মাতৃকুলের আত্মীয়গণ নাওফালকে উহা দিতে বাধ্য করেন। আবদুল-মুত্তালিব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রুদ্ধ শুষ্ক যমযম কূপটি পুনর্খনন করান এবং কুরায়শ গোত্রের অন্য লোকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহাতে নিজের মালিকানা বহাল রাখিতে সমর্থ হন। ইহার ফলে তিনি তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পানি বিতরণের অধিকার লাভ করেন (তু. শায়বা প্রবন্ধ)। আব্রাহা-র মক্কা অভিযানের সময় তিনি কুরায়শদের শায়খ ও তাহাদের দূতরূপে আব্রাহার নিকট অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার প্রাপ্ত হন। ইয়াকূবীর গ্রন্থে (Houtsma সম্পা., ২খ., ৮প.) তাঁহার সম্পর্কে কতিপয় অতিরঞ্জিত উপাখ্যান পাওয়া যায়, এমনকি তাঁহাকে ধর্ম সংস্কারকরূপেও চিত্রিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, তিনি বহু রীতিনীতির প্রবর্তন করেন যাহা পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সামঞ্জস্যশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার উপনাম দেওয়া হইয়াছে আবুল-হারিছ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, আল-মাসউদী তাঁহার মুরূজ (প্যারিস সং., ৪খ., ১২১)-এ মক্কার গোত্রগুলির মধ্যে বানুল-হারিছ ইব্ন 'আব্দিল মুত্তালিব-কে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের অধস্তন গোত্র বলিয়াছেন, অথচ সাধারণ বংশ বিবরণ অনুযায়ী বানুল-হারিছ হাশিমীদের শাখা হিসাবে বানূ মুত্তালিবের সমান্তরাল স্তরের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ., ৯৩৭ প., ৯৮০, ১০৮২ প., ১০৮৭ প.; (২) ইব্ন হিশাম, ১খ., ৩৩প., ৭১, ৯১ প., ১০৭ প.; (৩) ইব্ন সা'দ, ১খ., ৮১ প.; (৪) Sprenger, Das Leben und dic Lehre des Mohammad, iii, p. cxliv; (৫) Wustenfeld, in ZDMG, vii, 30-35; (৬) Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, i, 259; (৭) Muir, The Life of Mahomet (Ist. ed.), i, p. ccli প.; (৮) Caetani, Annali dell' Islam, i, 110-120; (৯) Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 113 প.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

'আবদুল-মুমিন ইব্ন 'আলী (عبد المؤمن بن على)ঃ ইব্ন 'আলবী ইব্ন ইয়ালা আল-কূমী মুহাম্মাদ তাওহীদের সংস্কার আন্দোলন অর্থাৎ তাহরীকুল-মুওয়াহ্হিদীন-এর নেতা মাহ্দী ইব্ন তূমার্ত-এর স্থলবর্তী আল-মুওয়াহহিদূন এবং বানূ মুমিন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র, মরক্কো ও স্পেনের আল-মুরাবিতূন বংশের স্থান দখল করিয়া মাররাকুশকে নিজের রাজধানীতে পরিণত করেন।

আল-মুওয়াহ্হিদূন আন্দোলনের সূচনা ও 'আবদুল-মুমিনের শাসনামলের ইতিহাস বর্তমানে যথেষ্ট স্পষ্ট ও অনাবৃত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে নূতন কয়িয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। কারণ সৌভাগ্যবশত ইস্কোরিয়াল (Escurial) কুতুবখানায় কোন এক অখ্যাত লেখকের "কিতাবুল-আন্সাব" শীর্ষক নানাবিধ রচনার একটি সংকলন প্রবন্ধকারে হস্তগত হয়। ইহাতে ইব্ন তূমার্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া এইগুলির মধ্যে মাহ্দীর এক সাথী ও স্থলবর্তী আবূ বাকর ইব্ন 'আলী আস্-সি'মৃহ'াজী ওরফে বায়য'াক'-এর নিজের লেখা একটি আলোচনাও রহিয়াছে। উহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য (E. Levi-Provencal, Documents inedits d'histoire almohade, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.)। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভের পর আল-মুওয়াহ্হিদূন আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ইবনুল-কাত্তান-এর নাজমুল জুমান গ্রন্থের একটি খণ্ডও পাওয়া গিয়াছে (ইহার আংশিক প্রকাশ করিয়াছেন E. Levi-Provencal, Six Fragments inedits d'une chronique du debut des Alomohades Melanges Rene Basset, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ২খ., ৩৩৫-৩৯৩)। এতদ্ব্যতীত 'আবদুল-মুমিনের ঘনিষ্ঠ ও তাঁহার স্থলবর্তীদের সরকারী চিঠিপত্রের একটি সংকলনও হস্তগত হইয়াছে (E. Levi-Provencal, Trente-sept lettres officielles almohades, রাবাত ১৯৪১ খৃ.; Un recueil de letires officielles almohades, "ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", প্যারিস ১৯৪১ খৃ.)। এইরূপে পরবর্তী কালের আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনারাজির উপর নির্ভর করা ছাড়াই সেই যুগের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে। এই যুগের অধিকাংশ সন ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে ইসলামী মাগরিব উহার ইতিহাসের অনুপম বিপ্লব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। আর এই বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

যেই অবস্থায় ইব্ন তূমারত ও তাঁহার শিষ্য আবদুল মুমিনের সাক্ষাত হয়, প্রত্যক্ষদর্শী বায়য'াক' দ্বারা যদি উহা সমর্থিত না হইত, তাহা হইলে উহাকে নিছক কল্পকাহিনী মনে করা যাইত। আবদুল-মুমিন ছিলেন বহিরাগত আরব বার্বার কূমিয়া (كومية) গোত্রের একজন সাধারণ ছাত্র। এই গোত্রটি ছিল বংশগতভাবে যানাতা গোত্রগুলির অন্যতম। তাহারা নাদ্রুমার অদূরে সেই এলাকার উত্তরে বসবাস করিত। বর্তমানে উহা ওয়াহ্রান (وهران-Oran) অঞ্চল নামে পরিচিত। 'আবদুল-মুমিন তাঁহার শিক্ষকের মত তাড়াহুড়া করিয়া নবী কারীম (স)-এর বংশধর হওয়ার দাবি করেন নাই। তিনি এই দাবি করিয়াছেন অনেক পরে, প্রাচ্যে কিংবা আফ্রিকায় যাইয়া বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশে অল্প বয়সে (সঠিক জন্মতারিখ এখনও জানা সম্ভব হয় নাই)। তিনি তাঁহার চাচা ইয়া'লূ (يعلو)-র সহিত নিজ গ্রাম তাজিরাঃ (Tagra) ত্যাগ করেন। কিন্তু এই সফরে বিজায়া (Bougie)-এর আগে যাইতে সক্ষম হন নাই। এই শহরের উপকণ্ঠে মাল্লালা নামক স্থানে ইব্ন তূমার্তের সহিত 'আবদুল-মুমিনের সাক্ষাত হয়। ইব্ন তূমার্তকে তখন ফাকীহ-ই-সূসাঃ বলা হইত। তখন তিনি মরক্কো

প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। সেই সময় শিষ্যদের একটি ক্ষুদ্র দল ইব্‌ন তূমার্‌তের সহিত ছিল। তিনি আবদুল-মুমিনকেও শিষ্যদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময়ে ইব্‌ন তূমার্‌ত 'আবদুল-মুমিনকে মুওয়াহ্‌হিদী মতবাদের দীক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহাদের এই সাক্ষাত সম্ভবত ৫১১/১১১৭ সালে হইয়াছিল।

উপরিউক্ত সাক্ষাতের দিন হইতে ৫২৪/১১৩০ সালে মাহ্‌দীর মৃত্যু পর্যন্ত 'আবদুল-মুমিন তাঁহার মুরশিদের সমর্থনে অত্যন্ত কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন। ইব্‌ন তূমার্‌ত তাঁহার শিষ্য 'আবদুল-মুমিনকে নিজের হারগা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করত আপন করিয়া লন। তিনি তাঁহাকে নিজের দশ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদেরও সদস্যপদ দান করেন। তিনি দলের সকল সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। মুওয়াহ্‌হিদূন-এর যুদ্ধ পরিষদের পরামর্শ বৈঠকে 'আবদুল-মুমিনের অভিমতের বিরাট প্রভাব ছিল। এই আন্দোলনের অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য আবূ হাফস্ উমার আল-হিনতাতীর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি লাভ করেন। এই ব্যক্তিই ইব্‌ন তূমারতের মৃত্যুর পর নিজেই মাহ্‌দীর স্থলবর্তীরূপে নির্বাচিত হইবার জন্য তীনমাললাল-এর পাহাড়ী বার্বারদের সম্মত করান। এইরূপ হতবুদ্ধিকর অবস্থায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে আবদুল-মুমিনের স্থলবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ইহার পর তিনি জনগণের বায়'আত বা আনুগত্যের আস্থা ভোট গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি এক রাজনৈতিক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই পরিস্থিতিতে তাঁহাকে কতকগুলি ঘটনার মুকাবিলা করিতে হয়। এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া রাজনীতিবিদ, সেনাপতি ও বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে সংগঠিত এমন একটি সংগঠনের নেতা হিসাবে 'আবদুল-মুমিন নিজের বিশেষ যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। অন্যান্য বিষয় ছাড়া তাঁহার প্রথম কাজ ছিল আল-মুরাবিতূন-এর শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। ইতোপূর্বে এই সংগঠনের বুনিয়াদ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগ্য অনুকূল হওয়ায় তিনি এই কাজে আশাতীত সফলতা অর্জন করেন।

৫২৭/১১৩৩ সালে 'আবদুল-মুমিনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ঘোষণা হয়। আর সেই দিন হইতেই তাঁহার শাসকজীবন শুরু হয়। মৃত্যু পর্যন্ত (৫৫৮/১১৬৩) তিনি শাসক পদে সমাসীন থাকেন। এখানে তাঁহার শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

'আবদুল-মু'মিনের শাসনকালের প্রথম পর্যায় ছিল মুওয়াহ্‌হিদূন-এর জন্য মরক্কোর সমগ্র ভূখণ্ড দখল করা। বিজয় অভিযানের এই ধারা দীর্ঘ কালব্যাপী প্রলম্বিত ও কঠিন প্রতিপন্ন হয়। তিনি মুসাহ্ ও দারা (দার'আ উপত্যকা ঃ وادى درعة) আক্রমণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তরে আতলাস পর্বতমালা পরিবেষ্টিত আল-মুরাবিতূন-এর দুর্গগুলিতে অভিযান পরিচালনা করেন। এইসব দুর্গ মরুভূমির দিকের, এমনকি মরক্কোর রাজধানীর দিকের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার পর তিনি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। তিনি দামনা ও দায়-এর দুর্গঘেরা শহর দখল করেন। এইরূপ অগ্রসর হইয়া তিনি ৫৩৪-৩৫/১১৪০-১১৪১ সালের মধ্য আতলাস ও তাফীলালত (تافيلالت)-এর খেজুর বাগানসমৃদ্ধ এলাকাগুলি দখল করেন। এইবার আল-মুওয়াহ্‌হিদূন বাহিনী মরক্কোর উত্তরাঞ্চলের দিকে গতি পরিবর্তন করে। তাহারা জাবালার পাহাড়ী এলাকায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া তারা (تازا) অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গ জয় করে। সেইখান হইতে তাহারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় নিম্ন স্থল লাও, বাদিস, নাকূর ও মালীলা উপত্যকা ও উত্তর ওয়াহ্‌রান (وهران) এলাকার বিভিন্ন গোত্রকে মুওয়াহ্‌হিদ আন্দোলনের সমর্থক ও অনুগত করার কাজ শুরু করে। এইভাবে 'আবদুল-মুমিন একজন বিজয়ীর বেশে নিজের গ্রাম তাজিরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়ে 'আবদুল-মুমিনের পতাকাতলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য সমবেত হয়। এতদিন তিনি গেরিলা রণকৌশল অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার তিনি নিজেকে বেশ শক্তিশালী অনুভব করেন, পার্বত্যাঞ্চলে গেরিলা (Guerrilla) আক্রমণের পরিবর্তে আল-মুরাবিতূন-এর বিরুদ্ধে রণাংগনে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৫৩৭/১১৩৪ সালে আমীর 'আলী ইব্‌ন ইয়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন ইন্তিকাল করিলে 'আবদুল-মুমিনের সংকল্প বাস্তবায়ন সহজসাধ্য হয়। কারণ মরহূম আমীরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তাশুফীন একটি টলটলায়মান সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় আমীরের স্থলবর্তী মনোনয়নের প্রশ্নে লাম্‌তূনা ও মাস্‌সূফা (مسوفة) গোত্রের দলপতিদের মধ্যে সংঘাত চলিতেছিল। মুরাবিতরা অপর একটি প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাহাদের অত্যন্ত অনুগত ও অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন ক্যাটালান রিভারটার (Catalan Reverter)। তিনি ছিলেন খৃষ্টান সাহায্যকারীর বাহিনীর সেনাপতি। ৫৩৯/১১৪৫ সালে তিনি পূর্ব মরক্কোতে মুওয়াহ্‌হিদূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যান। অবশেষে তাওহীদ আন্দোলনে যানাতা গোত্রের অন্তর্ভুক্তির ফলে শক্তির পাল্লা বিদ্রোহী আন্দোলনের দিকে আরও ঝুঁকিয়া পড়ে। তিলিমসান নামক স্থানে 'আবদুল মুমিন ও তাশুফীন ইব্‌ন আলীর বাহিনীর মধ্যে মুকাবিলা হয়। মুরাবিতরা ওয়াহ্‌রান (Oran)-এর দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেই বৎসর অর্থাৎ ৫৩৯ হিজরীতে তাশুফীন ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যান। এইবার মুওয়াহ্‌হিদূনের জন্য ফাস (ফেয)-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলিয়া যায়। তাহারা প্রথমে ওয়াজদা ও পরে আজারসীফ (Guercif) অধিকার করে। অতঃপর ৫৪০/১১৪৬ সালে উত্তর মরক্কোর রাজধানী (ফাস) নয় মাস অবরোধের পর অধিকার করা হয়। ইহার পর মিকনাসা ও সালে অধিকারের পালা আসে।

বিজয় অভিযানের এই ধারা মরক্কো অধিকারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মুরাবিতূনের এই সদর দফতরে হামলাকারীদের বাধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শহরের অবরুদ্ধ বাহিনীকে আক্রমণকারীর সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করিতে হয় (শাওয়াল ৫৪১/এপ্রিল ১১৪৭)। ইহার পর মুরাবিতদের গণহত্যা করা হয়। নিহতদের মধ্যে শাহ্‌যাদা ইসহাক ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইয়ূসুফও ছিলেন। এইবার আবদুল-মুমিনের বংশ তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত সদর দফতর লাভ করেন। 'আবদুল-মুমিন মুরাবিতদের প্রাসাদ নিজের বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন করেন। প্রাসাদের অদূরে তিনি জামি'উল-কুতুবিয়্যীন নামক এক বিরাট মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। ইহার আকাশচুম্বী মিনার আজও মরক্কোর আকাশে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মুরাবিতদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হওয়ায় 'আবদুল মুমিন নিজের নূতন রাজ্য সুসংহত করিবার সুযোগ লাভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আল-মুওয়াহ্হিদূনের রাজনৈতিক পদ্ধতি বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করেন। তবে তিনি উহা সম্প্রসারিত করিয়া নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি তাঁহার সমর্থকদের নূতন করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ইহাদের মধ্যে কয়েক সহস্র যাহাদের আনুগত্য ও ধর্মীয় চেতনা সন্দেহজনক প্রমাণিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এইবার তিনি অনুভব করেন, তাঁহার বিজয়ের সীমা আল-মাগরিবের মুরাবিতী এলাকা অতিক্রম করিয়া উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

এই সময় উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা জয় করা খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। বিজায়া ও কায়রাওয়ানের সান্হাজী বংশের শাসনের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বেদুঈন গোত্রগুলি সারা দেশে পঙ্গপালের মত ঘুরিতেছিল। সিসিলীর (সাকালিয়া)-র নৃপতি দ্বিতীয় রোজারের নেতৃত্বে নরম্যানরা উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করিতেছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে এই এলাকায় মুওয়াহ্হিদূনের আক্রমণকে সঠিক পদক্ষেপ গণ্য করার সংগত কারণ ছিল। কেননা এই আক্রমণ ছিল কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। ৫৪৬/১১৫১ সালে আবদুল-মুমিন সালে (Sale) নামক স্থানে তাঁহার বাহিনী সমাবেশ করেন। ইহার পর অপ্রতিরোধ্য গতিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হন। তিনি পর্যায়ক্রমে আলজিরিয়া, বিজায়া ও বানূ হাম্মাদ-এর দুর্গ অধিকার করেন এবং সাতীফ (سطيف) -এর নিকট বেদুঈন আরবদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইতোপূর্বে তাহারা বানূ হাম্মাদের কর্মচারী ছিল। ইহার পর তিনি এইসব যাযাবরের সহযোগিতা গ্রহণের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করেন এবং আপাতত তিউনিসিয়ার দিকে অধিক অগ্রসর হওয়া হইতে বিরত থাকেন।

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকা অধিকার করিতে 'আবদুল মুমিনের আট বৎসর সময় লাগে। তিনি মাগরিবে (মরক্কো) আবূ হাফ্স উমার আল-হিন্তাতীকে নিজের প্রতিনিধি মনোনীত করেন। নিজে ছয় মাস সফরের পর জুমাদাছ-ছানিয়া ৫৫৪/ জুন ১১৫৯ সালে তিউনিস শহরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। এই শহর অধিকারের পর তিনি আল-মাহ্দিয়্যা আক্রমণ করেন। সেই সময় দুর্গবেষ্টিত এই দুর্ভেদ্য শহরটি ছিল সিসিলীর দ্বিতীয় রোজারের (Roger) অধিকারে। এইখানে তাহার বিরাট বাহিনী মোতায়েন ছিল। মুহাররাম ৫৫৫/ জানুয়ারী ১১৬০ সালে 'আবদুল-মুমিন এই শহর দখল করেন। এই অভিযানকালে তিনি সূসা, কায়রাওয়ান, সাফাকাস, কাফ্সা, কাবুস ও ত্রিপোলীও অধিকার করেন। ইহার পর 'আবদুল-মুমিন মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন। এইখান হইতে তিনি ৫৫৬/১১৬১ সালে স্পেনের দিকে রওয়ানা হন।

৫৩৯/১১৪৫ সালে তিলিমসান বিজয়ের পর হইতেই স্পেন উপদ্বীপে মুওয়াহ্হিদদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ববর্তী বৎসর মুরাবিতদের নৌবাহিনী প্রধান ইব্ন মায়মূন যিনি 'আবদুল-মুমিনের সঙ্গে যোগদান করেন, কাডিয (Cadiz) অধিকার করিয়া তাঁহার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মুওয়াহ্হিদদের একটি বাহিনী ৫৪১/১১৫৭ সালে শারিশ (Jerez), নিব্লা (Niebla), শিলব (Silves), বাজাহ, বাদাজোয (Badajoz), মার্তুলা এবং সর্বশেষে ইশবীলিয়ার দুর্গবেষ্টিত শহরগুলি অধিকার করে। ৫৪৯/১১৫৪ সালে গ্রানাডার মুরাবিতী শাসক শহরটি নূতন শাসকদের হাতে অর্পণ করেন। ৫৫২/১১৫৭ সালে আল মেরিয়া শহর খৃষ্টানদের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করা হয়। খৃষ্টানরা এই শহর দখল করিয়া এইখানে জাঁকিয়া বসার পর স্পেনের ব্যাপারে খৃষ্টানদের মনোভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে (জাবালুল-ফাত্হ বা বিজয় পাহাড় নামে অভিহিত) নিজের কেন্দ্রীয় শিবির স্থাপন করেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি ইহা নূতন করিয়া নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি শীত মওসুমে দুই মাস অবস্থান করেন এবং জায়্যান (Jaen)-এর দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। সেইখানে ইব্ন মারদানিশ (দ্র.)-এর ভাড়াটিয়া বাহিনী লুটতরাজে লিপ্ত ছিল।

৫৫৮/১১৬২ সালের শুরুতে 'আবদুল-মুমিন মরক্কো প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে সালে (Sale)-র বিপরীত দিকে এক বিরাট এলাকা রিবাতুল-ফাত্হ-এ সমবেত করেন। এই স্থানকে বর্তমান রাবাত বলা হয়। সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল আর একবার স্পেন উপদ্বীপ আক্রমণ করা। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এক দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টদায়ক রোগ ভোগের পর জুমাদাছ-ছানিয়া, ৫৫৬/মে ১১৬৩ সালে 'আবদুল-মুমিন ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর মাস ও সাল সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক অভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু দিন-তারিখের ব্যাপারে তাঁহারা ঐকমত্যে পৌঁছিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃতদেহ সালে হইতে তীনমাল্লাল লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানে মাহ্দী ইব্ন তূমারতের কবরের নিকট তাঁহাকে দাফন করা হয়।

সম্ভবত মরক্কো বিজয়ের সময়ই 'আবদুল-মুমিন তাঁহার সঙ্গী-সাথীদেরকে তাঁহার জন্য 'আমীরুল-মুমিনীন' উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছিলেন। মুরাবিতরা তাহাদের শাসকদের জন্য আমীরুল মুসলিমীন উপাধি ব্যবহার করিত এবং এইরূপ প্রাচ্যে বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করিত। অপরপক্ষে 'আবদুল-মুমিন উমায়্যা রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাবাধীন প্রতিষ্ঠিত মুরাবিতদের রীতিনীতি পরিহার করিয়া একটি নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং ইহাতে তিনি নিজের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক চাহিদার প্রতিও দৃষ্টি রাখেন। এই সঙ্গে তাঁহার এই ইচ্ছাও কার্যকর ছিল যে, প্রথম হইতে মুওয়াহ্হিদ মতবাদে দীক্ষিত বার্বার গোত্রীয় সঙ্গী-সাথীরা যেন অসন্তুষ্ট হওয়ার সুযোগ না পায়। উক্ত ব্যবস্থার অনেক বিধিবিধান আজও মরক্কোর মাখযান ব্যবস্থার অংশ হিসাবে কার্যকর রহিয়াছে। দেওয়ানী ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে স্পেনীয় বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হইতে হয়। এইসব অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মুরাবিতদের দরবারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

'আবদুল-মুমিনকে স্বীয় বংশধর হইতে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ব্যাপারে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় নাই। ৫৪৯/১১৫৪ সালে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৫৫১/১১৫৬ সালে তিনি তাঁহার অন্যান্য পুত্রকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির শাসক নিয়োগ করেন। মুওয়াহ্হিদ মতবাদের ধর্মীয় ব্যবস্থার

উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রত্যেক পুত্রের জন্য একজন করিয়া উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

'আবদুল-মুমিন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ধরনের অনুমান ভিত্তিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে যেসব সুকীর্তি প্রকাশিত হইয়াছে, এইগুলি প্রথমদিকে কেহই 'আবদুল-মুমিনের অবদান হিসাবে স্বীকার করেন নাই। প্রথমদিকে ও ইব্‌ন তূমারতের মৃত্যুর পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাঁহাকে একজন কোমল প্রকৃতির দুর্বল ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ও সমর্থক আবূ হাফ্‌স 'উমার ঈন্‌তীর (আল-হিন্‌তাতী) পরামর্শ মতে চলিতেন, কিন্তু পরবর্তী কালে 'আবদুল-মুমিন ব্যাপক আকারে উন্নত মানের সামরিক ও রাজনৈতিক যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁহার আশেপাশের আবেগপ্রবণ বার্বার মুওয়াহ্‌হিদদের সুকৌশলে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। আফ্রিকার আরবদের অনুগত শক্তিতে রূপান্তরিত করার পর তিনি তাহাদের সন্তুষ্টি অর্জন করেন। সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ণধার ও মাহদীর ধর্মীয় নীতিমালার রক্ষক হিসাবে তিনি তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত বিচক্ষণতা, শক্তিমত্তা ও অনেকটা কঠোরতার সহিত সম্পন্ন করেন। বস্তুত এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই তিনি ও তাঁহার বংশ সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের শুরুতে প্রদত্ত মৌলিক গ্রন্থাবলীর বরাত ছাড়াও আবদুল-মুমিনের জীবনী সম্পর্কে সন ও তারিখের বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জী উৎস হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারেঃ (১) 'আবদুল-ওয়াহিদ আল-মাররাকূশী, আল্-মুজিব (সম্পা. Dozy); (২) ইব্‌ন আবী যার', রাওদুল-কিরতাস (সম্পা. Tornberg), ফেয; (৩) আল-হুলালুল্-মাওশিয়্যা, সম্পা. Allouche-ইবনুল আছীর, ১খ., নির্ঘণ্ট; (৪) ইবনুল-খাতীব, আমালুল আলাম; (৫) ইব্‌ন খালদূন, তারীখুল-ইবার, মূল পাঠ, ১খ., অনু. Hist. des Berberes, ২খ.; (৬) আয্-যারকাশী, তারীখুদ-দাওলাতায়ন, তিউনিসিয়া ১২৮১ হি.; (৭) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, ১খ., ৩৯০-৩৯৯; (৮) G. Marcais, La Berberie musulmane et l'Orent au moyen Age, প্যারিস ১৯৪৬ খৃ., ২৬২-২৬৪; (৯) H. Terrasse, Histoire du Maroc, মুদ্রিত দারুল-বায়দা ১৯৪৯ খৃ., ১খ., ২৮২-৩১৬; (১০) C. A. Julien, Histoire de L' Afrique du Nord de la conquete arabe a 1830, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., ৯৩-১১২; (১১) Levi-Provencal, Notes d'histoire almohade, Hesp., ১৯৩০, ৪৯-৯০; (১২) ঐ লেখক, Islam d' Occident, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., ১খ., ২৫৭-২৮০; (১৩) A. Huici, La Historia y la leyenda en los origenes del imperio almohade And., ৩৩৯ প.।

E. Levi-Provencal (E.I.²)/আবদুল আউয়াল

আবদুল লতীফ, নবাব (عبد اللطيف، نواب) ঃ ১৮২৮-১৮৯১, বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্যতম নেতা, ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামের বাযী পরিবারের সন্তান। তাঁহার পূর্বপুরুষ আবদুল-ওয়াহিদ (বা ওয়াহীদ) বাদশাহ্ আওরঙ্গযেবের নিকট হইতে লা-খারাজ বার খাদা (১৬ বিঘায় এক খাদা) জমি প্রাপ্ত হন। ইহাতে গ্রামটি বারো খাদিয়া নামে পরিচিত। এই কাযী পরিবারের দ্রুত বংশবিস্তারের ফলে পারিবারিক সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হয় এবং আবদুল লতীফের পিতা ফকীর মুহাম্মদ অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করেন এবং তাঁহার আত্মীয় সদর দিওয়ানী আদালতের উকিল মুন্‌শী বাকাউল্লাহ-এর নিকট আশ্রয় লাভ করেন।

কলিকাতায় আবদুল লতীফের জন্ম, তিনি পিতার মধ্যম পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গফুরের সহিত তিনি কলিকাতা মাদ্‌রাসায় বিদ্যাভ্যাস করেন এবং 'আরবী, ফারসী ও ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রাজ্য-রাজত্ব হরণকারী ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণে, বিশেষত ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরোক্ষ কুফল লক্ষ্য করিয়া মুসলিম 'আলিমগণ যখন ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন তখন মুসলিম জনগণ ইংরেজী শিক্ষা হারাম বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যেই কয়েকজন লোক এই প্রতিকূল পরিবেশ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন এবং অবস্থাদৃষ্টে উহা অপরিহার্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, এই দুই ভাই তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আবদুল লতীফ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন; তৎপর তিনি কলিকাতা মাদ্‌রাসায় ইংরেজী শিক্ষকের পদ লাভ করেন। সুশ্রী চেহারা, মার্জিত আচরণ ও পরিপাটি এবং তৎসহ ইংরেজী শিক্ষার দরুন তিনি ইতোমধ্যে উচ্চতর ইংরেজ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। ফলে বাঙ্গালার ডেপুটি গভর্নর স্যার হার্বাট ম্যাডক তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। তিন মাস পরে তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার Justicc of the peace নিযুক্ত হন। পরবর্তী জানুয়ারীতে তাঁহার উপর নবগঠিত কলারোয়া (পরে সাতক্ষীরা) মহকুমার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়, কিন্তু কিছুদিন পর (১৮৫৪) তাঁহাকে হুগলী জেলার কুখ্যাত মহকুমা জাহানাবাদে বদলি করা হয়। সেইখানে দুষ্কৃতিকারীদের দমনে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ফলে ১৮৫৯ সনে তিনি আলীপুরে বদলি হন। ১৮৬৪ সনে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত আলীপুর পুলিস কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। শেষের দিকে কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদেও কাজ করেন। অতঃপর তাঁহাকে শিয়ালদহ পুলিস কোর্টে বদলি করা হয় (১৮৭৭ খৃ.)। ছত্রিশ বৎসর চাকুরীর পর এই পদ হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন (১৮৮৫ খৃ.)।

সরকার তাঁহাকে ৫০০ টাকা হারে বিশেষ পেনশন দানের ব্যবস্থা করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল ভূপালের নবাবের প্রধান মন্ত্রীর পদেও কাজ করেন।

যোগ্যতার দরুন আবদুল লতীফ অনেক বেসরকারী পদে কাজ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন। স্যার সায়্যিদ আহমাদ (আহমাদ খান দ্র.)-এর ন্যায় তিনি ছিলেন নব্যপন্থী বাঙ্গালী মুসলমানদের নেতা। কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকায় তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সায়্যিদ আহমাদ খানের ন্যায় তিনিও মুসলমানদের যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ হন। তিনি মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রী আইন পাস করাইবার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেন। এই আইনের আওতায় কাদী (قاضى - Marriage Registrar)-এর পদ

সৃষ্টি হওয়া বহু বেকার আরবী শিক্ষিত মুসলমানের কর্মসংস্থান হয়। তিনি ছিলেন এই আইন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য। সেন্ট্রাল ইগযামিনেশান কমিটি, ইন্‌কাম ট্যাক্সের বোর্ড অব কমিশনার্স, আলীপুর রিফর্মেটরী স্কুলের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট-এর সভ্য হিসাবেও তিনি যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ স্থাপিত হয়। সেইখানে মুসলিম ছাত্রগণ এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষার সমমানের ইংরেজী পড়িতে পারিত। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হাজী মুহাম্মাদ মুহ্‌সিনের বিরাট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হইতে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা হুগলী কলেজে ব্যয়িত হইত। আবদুল লতীফের চেষ্টায় সরকারী তহবিল হইতে উক্ত পরিমাণ টাকা কলেজের জন্য বরাদ্দ করা হয়। হাজী মুহ্‌সিনের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ের দ্বারা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীতে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপিত ও পরিচালিত হয় এবং মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়।

বিবাহিত দেশীয় লোকেরা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের দারান্তর গ্রহণ বৈধ করার জন্য যেই আইন রচিত হয় (১৮৬৫ খৃ.) ইহার বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইলে আবদুল লতীফের চেষ্টায় সরকার মুসলমানদেরকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি দান করেন। তিনি কলিকাতা ও হুগলী মাদ্‌রাসার সংস্কার কার্যেও যথেষ্ট সহায়তা করেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিতৃষ্ণা দূর করার উদ্দেশে ১৮৬৩ খৃ. তিনি মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন। স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান এই সমিতির এক অধিবেশনে বক্তৃতা দেন। আলীপুরে প্রথম কৃষি প্রদর্শনী (১৮৬৩ খৃ.) ও কলিকাতায় প্রথম আদমশুমারী (১৮৬৫ খৃ.) উপলক্ষে নানা গুজবের সৃষ্টি হইলে তিনি ইশ্‌তেহার জারী করিয়া তাহা প্রশমিত করেন। সায়্যিদ আহ্‌মাদ বেরেলবীর নেতৃত্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিলে আলিমগণ ভারতবর্ষকে দারুল-হারব (দ্র.) ঘোষণা করেন। মুজাহিদগণ প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই বিপদে ইংরেজরা আবদুল লতীফের শরণাপন্ন হইলে তিনি জৌনপুরের মাওলানা কারামাত আলী (র)-এর নিকট হইতে এক ফাতওয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, যাহাতে ভারতবর্ষ দারুল-ইসলামরূপে চিহ্নিত হয়। ফলে এক শ্রেণীর মুসলমান কতকটা শান্ত হয় (১৮৭০ খৃ.)।

বলকান যুদ্ধের সময় (১৮৮৬ খৃ.) ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলে আবদুল লতীফ এক সভা ডাকিয়া আহত তুর্কী সৈন্যদের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব পাস করাইয়া ও যুদ্ধে যোগদানের জন্য মহারাণীর নিকট এক আবেদন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আর একবার মুসলমানগণকে শান্ত রাখিতে সক্ষম হন।

প্রতিদানে ইংরেজরা তাঁহাকে নানা সম্মানে ভূষিত করিতে থাকে। তিনবার (১৮৬২, ১৮৭০ ও ১৮৭২ খৃ.) তিনি ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৩ খৃ. হইতে ১৮৭১ খৃ. পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ও ১৮৬৪ খৃ. হইতে ১৮৮৫ খৃ. পর্যন্ত শহরতলীর মিউনিসিপ্যালিটি সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খৃ. তিনি বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বেঞ্চের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃ. তাঁহাকে খান বাহাদুর, ১৮৮০ খৃ. নবাব ও ১৮৮৩ খৃ. সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আবদুল লতীফের পিতা ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। তিনি জামিউত-তাওয়ারীখ নামে ফারসীতে বিশ্ব ইতিহাসের একখানা সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। আবদুল লতীফ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার এই সাহিত্যিক গুণ প্রাপ্ত হন। স্ব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সভায় তিনি কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদান করিয়া (১৮৬০) পরে তিনি উহার কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। সোশাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহার প্রভাবে ডাঃ মহেন্দ্র নাথ বিজ্ঞান সভার জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করেন। বস্তুত বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি অমুসলিমদেরও যথেষ্ট উপকার করিয়া যান। আবদুল লতীফের সুনাম বাংলার সীমা ছাড়াইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হাবীবুল্লাহ বাহার প্রণীত নওয়াব লতীফ ও বিভিন্ন সাময়িকী।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আবদুল মোনায়েম খান (عبد المنعم خان) ঃ আইনজীবি, রাজনীতিবিদ ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। আবদুল মোনায়েম খান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার হুমায়ুনপুর গ্রামে ১৮৯৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমর আলী খান। মোনায়েম খান ১৯১৬ খৃ. ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা, ১৯১৮ খৃ. আই.এ., ১৯২০ খৃ. ঢাকা কলেজ হইতে বি.এ. এবং ১৯২২ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এল. ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯২৪ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় তিনি বি.এল. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক এবং ছাত্র জীবনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রথম সেক্রেটারী।

১৯২৭ খৃ. তিনি ময়মনসিংহ জেলা বারে যোগদান করিয়া আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯৩৫ খৃ. মুসলিম লীগে যোগদানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জেলা শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার আমন্ত্রণে ১৯৩৬ খৃ. কায়দে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ময়মনসিংহ সফর করেন এবং তিনটি জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৪৬ খৃ. মুসলিম লীগের ডাকে জেলার বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী লইয়া তিনি ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড গঠন করেন এবং ইহার প্রথম সালার-ই জেলা নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খৃ. তিনি পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। মোনায়েম খান ১৯৪৮ খৃ. পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য এবং ১৯৬২ খৃ. বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ময়মনসিংহ-৮ আসন হইতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আয়ূ্যব খানের মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন।

এই সময়ে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাতটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও তহবিল বরাদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি গভর্নর থাকাকালে মেডিকেল কলেজসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি

এল.এম.এফ. ডাক্তারদের সংক্ষিপ্ত এমবিবিএস কোর্সে অধ্যয়নেরও ব্যবস্থা করেন। আবদুল মোনায়েম খান ২৮ অক্টোবর, ১৯৬২ খৃ. হইতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৯ খৃ. পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। এই সময়ে দেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ও কৃষি খাতে অবকাঠামোগত সুবিধাসহ প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও তিনি বহু সামাজিক ও স্থানীয় সংস্থার সহিত জড়িত ছিলেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ময়মনসিংহ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য, ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সদস্য ও পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার ছিলেন। মোনায়েম খান ১৯৪৬ খৃ. হইতে ১৯৫৪ খৃ. পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ১৯৪৮ খৃ. পূর্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ খৃ. ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সহকারী সচিব নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খৃ. উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার সময়ে সুভাষ বসুর সহিত বন্যার্তদের মধ্যে তিনি ত্রাণ বিতরণ করেন। ১৯৩৮ খৃ. তিনি ফ্লাউড কমিশনের সামনে বাংলার দরিদ্র কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ দেন।

তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আয়্যুব খানের একান্ত অনুগত ও দোসর ছিলেন। আয়ুব খানের প্রতি তাঁহার এই অন্ধ আনুগত্যের বিষয়টি পূর্ব পাকিস্তানবাসী মোটেই পছন্দ করিত না। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বলিয়াই দেশবাসীর ধারণা ছিল। পাকিস্তানের সামরিক শাসকের আনুগত্যের কারণেই ১৯৬২ খৃ. হইতে ১৯৬৯ খৃ. পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলন, আওয়ামী লীগের ছয় দফা, এগার দফা আন্দোলন, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৬৯ খৃ. প্রবল আয়্যুব বিরোধী গণ-আন্দোলনের সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ হইতে অব্যাহতি পান। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক হইবার কারণে তিনি ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেন নাই। আবদুল মোনায়েম খান রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সফরে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষা জানিতেন। ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১ খৃ. তাঁহার বনানী বাসভবনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার গুপ্ত হামলায় তিনি আহত হন এবং পরে হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। তাহাকে বনানীস্থ বাসভবন সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্থান বাগ-ই মোনায়েম-এ দাফন করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মোঃ নূরুল ইসলাম, গভর্নর মোনায়েম খানকে আজ যে চোখে দেখছি, ঢাকা ২০০০ খৃ.; (৩) শামসুজ্জামান ও সেলিনা হোসেন সম্পা., চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ২৪-২৫; (৪) সিরাজুল ইসলাম সম্পা., বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

'আবদুল-লাতীফ আল-বাগদাদী (عبد اللطيف البغدادى) ঃ পূর্ণ নাম মুওয়াফফাকুদ-দীন আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়ূসুফ, তাঁহাকে ইব্নুল-লাব্বাদও বলা হয়। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বান ও বৈজ্ঞানিক ৫৫৭/১১৬২-৩ সালে বাগদাদে জন্ম এবং সেইখানেই ৬১৯/১২৩১-২ সালে মৃত্যু। তিনি বাগদাদে ব্যাকরণ, আইন (ফিক্হ), হাদীছ ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেন (আত্মজীবনীতে তিনি সমসাময়িক যুগের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন) এবং জনৈক উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিশ্বপরিব্রাজক পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র, প্রধানত ইব্ন সীনার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকৃতি বিজ্ঞান ও আলকেমি (রসায়নবিদ্যা) অধ্যয়ন করেন। ৫৮৫/১১৮৯-৯০ সালে তিনি মুসিল গমন করেন (সেখানে তিনি আস্-সুহ্রাওয়ার্দী আল-মাকতুল-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। কিন্তু সেইগুলিকে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন)। পরের বৎসর তিনি দামিশ্ক-এ গমন করেন। সেইখান হইতে আক্কা-র বহির্ভাগে সুলতান সালাহুদ-দীনের শিবিরে যান (৫৮৭/১১৯১)। সেইখানে তিনি বাহাউদ্দীন ইব্ন শাদ্দাদ ও ইমাদুদ্-দীন আল-ইসফাহানীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং আল-কাদী আল-ফাদিল-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেখান হইতে তিনি কায়রো গমন করেন এবং তথায় তিনি মূসা ইব্ন মায়মূন এবং জনৈক আবুল-কাসিম আশ-শাফিঈর সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পান এবং তাঁহাদের মাধ্যমে আল-ফারাবী, আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডার ও থেমিসটিয়াস-এর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে তাঁহার দৃষ্টি ইব্ন সীনা ও আলকেমি হইতে এইদিকে আকৃষ্ট হয়। ৫৮৮/১১৯২ সালে জেরুসালেমে তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন-এর সাক্ষাত লাভ করেন। অতঃপর দামিশক গমন করেন এবং সেখান হইতে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি জেরুসালেম যান এবং ৬০৪/১২০৭-৮ সালে পুনরায় দামিশ্ক-এ গমন করেন। কিছুকাল পরে তিনি আলেপ্পো হইয়া ইর্যিন্জান-এ আলাউদ্দীন দাউদ-এর দরবারে উপস্থিত হন। সালজূক কায়কুবায ইরযিন্জান দখল করিলে আবদুল লাতীফ আরযেরুম সফরে যান এবং অতঃপর ইরযিন্জান হইতে কামাখ, দিউরিগি ও মালাতিয়া হইয়া আলেপ্পোতে প্রত্যাবর্তন করেন (৬২৬/১২২৮-৯)। ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি জন্মস্থান বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং সেইখানেই ইন্তিকাল করেন।

আবদুল লাতীফ তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যেসব গ্রন্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায় সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে আল-ইফাদা ওয়াল-ই'তিবার, ইহা মিসরের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। গ্রন্থটি ইউরোপে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। S. de Sacy, Relation de l'Egypte par Abd al-Latif, Paris 1810 ; অন্যগুলি ভাষাতত্ত্ব, হাদীছ, চিকিৎসাশাস্ত্র, অঙ্ক ও দর্শন বিষয়ক (তাহার অধিবিদ্যা বা metaphysics বিষয়ক পুস্তকের জন্য P. Kraus, BIE, 1941, 277 দ্র.)। মোঙ্গল অভিযান সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনাটি আয-যাহাবী গ্রহণ করেন (তু. J. de Somogyi, Isl., 1937, 106 প.)। ইব্ন আবী উসায়বি'আ বাগদাদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তথ্য প্রদানকালে তাঁহার নোট উদ্ধৃত করিয়াছেন (তু. নির্ঘণ্ট)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ২খ., ২০১-১৩ (তাঁহার আত্মজীবনী ভিত্তিক); (২) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ., ৯ প.; (৩) আয-যাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, MS Oxford, ১খ., ৬৫৪, পত্র ১৬-৭; (৪) L.

Leclerc, Hist. de la medicine arabe, ২খ., ১৮২; (৫) Brockelmann, i, 632, S. i, 880.

S. M. Stern (E.I.2) / হুমায়ুন খান

'আবদুল-লাতীফ ভাটাঈ (দ্র. ভাটাঈ 'আবদুল-লাতীফ)।

আবদুল-লাতীফ কামতামুলিসী (দ্র. লাতীফী)।

আবদুল হাই সিদ্দিকী (عبد الحی صديقی) ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ নাসর, বংশীয় উপাধি সিদ্দিকী।

উপমহাদেশের একজন মুহাক্কিক 'আলিম, বিখ্যাত ওয়াইজ, সমাজ সংস্কারক, হক্কানী পীর ও সূফী। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ অবদান ছিল। ১৩২৩/১৯০৩, পৌষ ১৩১০ বঙ্গাব্দে তিনি ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা শাহ সূফী আবূ বাক্র সিদ্দিকী (দ্র.), যিনি আমীরুশ-শারী'আ ও মুজাদ্দিদে যামান বলিয়া খ্যাত। তাঁহার মাতা নেজিয়া খাতুনও বিদুষী মহিলা ছিলেন। কথিত আছে, পিতা ও মাতা উভয়েরই বংশীয় সম্পর্ক ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত রহিয়াছে। সেই কারণে তাঁহারা সিদ্দিকী উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। আবদুল হাই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার লেখাপড়া শুরু হয় গৃহে মাতার কাছে। ৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ফুরফুরা মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। এখান হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি পিতার সান্নিধ্যে থাকিয়া ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিন-এর উপর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাংলা ১৩৩০ সনে তিনি পিতার সহিত হজ্জ ও যিয়ারত করার উদ্দেশে মক্কা মুআজজামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় যান। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পিতার সহিত বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। দীনী জলসা ও মাহফিলে পিতার সহিত যোগদান করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে ওয়াজ-নসীহত করিতেন। কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ, 'আকাইদ, মানতিক, ফালসাফা, ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যে তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফারসী ও উর্দু কাব্যেও তাঁহার দখল ছিল।

তাঁহার পিতার ইন্তিকালে (২৫ মুহাররাম, ১৩৪৫/১৭ মার্চ, ১৯৩৯) তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পিতার আরব্ধ কার্যাবলী সম্পন্ন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও শিরক, বিদআত ও কুফরীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। সমাজে বিরাজিত যাবতীয় অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি রুখিয়া দাঁড়ান।

তাঁহার পিতার ইন্তিকালে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন ও জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সভাপতির দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই সময় যশোহর, নদীয়া, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে খৃস্টান মহিলা মিশনারীরা পল্লীতে যাইয়া সরলমনা মুসলিম মহিলাগণকে খৃস্টান বানাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তিনি আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন-এর সদস্যগণকে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ফলে খৃস্টান মিশনারীদের এই প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হয়। তাঁহার নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামা ভারতে মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তদানীন্তন নিখিল বাংলা ও আসামে তাঁহার নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামা শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার লক্ষ্য ছিল শারী'আতী সমাজ গঠন ও স্বাধীনতা অর্জন। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পশ্চিম বাংলা, আসাম ও পূর্ববংগ (বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে পাকিস্তান সমর্থনকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের পশ্চাতে তাঁহার অশেষ অবদান ছিল।

তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন ঃ জমিয়তে ওলামায়ে হানাফীয়া, সিদ্দিকীয়া নূরুল ইসলাম বায়তুল মাল, হিজবুল্লাহ প্রভৃতি। মানব জাতির কল্যাণে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাই তিনি ১৯৬০ খৃস্টাব্দে খিদমতে খাল্ক ও ইশাআতে ইসলামের জন্য শেষোক্ত সংগঠন বিশ্ব ইসলামী মিশন কুরআনী সুন্নী জমঈয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ গঠন করেন। লেখনী, বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ, গবেষণা ও মানবসেবার মাধ্যমে সুন্দর ব্যবহার ও হিকমতের সহিত মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

তিনি বাংলা ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। আশ্বিন ১৩৫০/রামাদান ১৩৬২ সালে তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কলিকাতা হইতে নেদায়ে ইসলাম নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অদ্যাবধি কলিকাতা ও ঢাকা হইতে পৃথক পৃথকভাবে এই মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে ঢাকা হইতে তাঁহার নির্দেশে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মানবতা'।

তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে প্রচুর ইসলামী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। নারী শিক্ষার প্রতি তিনি অত্যধিক জোর দিতেন। তিনি বলিতেন, "কেবল পুরুষ জাতির শিক্ষা ও প্রগতি দ্বারা সমাজের জাগরণ আসিবে না। নারী জাতিরও শিক্ষা সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। আদর্শ মাতা না হইলে আদর্শ সন্তান আশা করা যায় না" [দ্র. মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, হযরত মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র)-এর জীবন ও বাণী, পৃ. ৩১]। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ফুরফুরার অদূরে অবস্থিত চকতাজপুর নামক স্থানে পশ্চিমবংগ সিদ্দীকা গার্লস হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসার ছাত্রীদের জন্য ইহার সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসও নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ভারত বিভক্তির পর ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হইলে পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে এক সংকটের সম্মুখীন হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারত সরকার পুনরায় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা চালু করেন। পুনরায় মাদ্রাসা বোর্ড ও মাদ্রাসাসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসে (দ্র. কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্র পরিচিতি, ১৯৭১ খৃ.)।

মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী পশ্চিম বংগ, আসাম, বিহার ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরকে ইলমে তাসাওউফ-এর শিক্ষা দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তাঁহার মুরীদের সংখ্যা অসংখ্য। ভারত ও বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তাঁহার ভক্ত ও মুরীদ আছে। তিনি মুরীদগণকে

কাদিরিয়া চিশতীয়া, নাকশবন্দীয়া, মুজাদ্দাদিয়া ও মুহাম্মাদীয়া তরীকার সবক দিতেন।

বিভিন্ন স্থানে তিনি খানকাহ স্থাপন করেন। পাবনা জেলার পাকশীতে স্থাপন করেন এক শত স্তম্ভবিশিষ্ট একটি খানকাহ্। ইহার নাম 'রিয়াযুল-জান্নাত'। ঢাকার মীরপুর এলাকায় অবস্থিত দারুস্-সালামেও তিনি একটি খান্কাহ স্থাপন করেন। এই দুই খানকাহ্তে প্রতি বৎসর ঈসালে ছাওয়াব-এর মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ওয়াইজ ছিলেন। তাঁহার ওয়াজ শুনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমিত। সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে তাঁহার ওয়াজ এমনভাবে রেখাপাত করিত যে, শ্রবণকারী অনেকেই সত্যিকার ইসলামী যিন্দেগীতে ফিরিয়া আসে। আজীবন তিনি দীন ইসলামের বাণী পৌঁছাইবার উদ্দেশে নিরলসভাবে ভারতের নানা জায়গায় ও বাংলাদেশের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ওয়াজ-নসীহত করিয়া মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধিকাংশ সভাতেই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের কর্তব্য, দায়িত্ব ও মানসিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতেন। রাজনীতিও বাদ যাইত না। তিনি বলিতেন, স্বাধীনতা ও মানবতা দুইটি কথা। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে মানবতা নাই। আর মানবতাহীন স্বাধীনতা মূল্যহীন (দ্র. মহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র)-এর জীবন ও বাণী, পৃ. ১৩৭, কলিকাতা, মার্চ ১৯৮৩)। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। তিনি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন। তাঁহার জীবনে বহু কারামাত প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহার জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে কায়্যূম-ই যামান আখ্যায়িত করিয়াছেন। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ মে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হইয়া তিনি কলিকাতার সেন্ট মারিস নার্সিং হোমে ভর্তি হন এবং ২৪ জুমাদাল-আওয়াল, ১৩৯৭/১৩ মে, ১৯৭৭/৩০ বৈশাখ, ১৩৮৪ শুক্রবার দিবাগত রাত ১১ ঘটিকায় উক্ত নার্সিং হোমেই ইন্তিকাল করেন। ১৪ মে রবিবার অপরাহ্নে তাঁহাকে ফুরফুরা গ্রামে তাঁহার পিতার মাযারের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ দিয়াউল-হাদী. নূরানী যিন্দিগী (উর্দূ), কলিকাতা ১৯৭৭; (২) মাওলানা মোহাম্মাদ রুহুল কুদ্দুস, অস্তমিত বঙ্গরবি, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮১; (৩) দেওয়ান মুহাম্মাদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকীর (র) জীবনী ও টেপ রেকর্ড হইতে সংগৃহীত বক্তৃতা, রাজশাহী ১৩৯৭ হি.; (৪) ঐ লেখক, হকিকতে ইনসানিয়াত, ২য় সং, পাবনা ১৯৭৮; (৫) সম্পাদক ডাঃ মোহাম্মদ আমীর আলী, নেদায়ে ইসলাম, মাসিক পত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৯ নং হালদার লেন, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৫০/রমযান ১৩৬২; (৬) মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (র)-এর জীবন ও বাণী, কলিকাতা ১৯৮৩; (৭) মোঃ আবদুস সাত্তার, ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলার জীবনচরিত, ২য় সং, ঢাকা ১৯৮৫; (৮) সম্পাদক মোঃ আমানউল্লাহ, সাপ্তাহিক মানবতা, ৫ম বর্ষ, ১-৪ সংখ্য, ঢাকা ১৯৮৪; (৯) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯৭, ঢাকা; (১০) মওলানা রুহুল আমীন, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৩৯১-৯২, কলিকাতা; (১১) মুহাম্মদ মতীউর রাহমান, আঈনা-ই উওয়ায়সী, পৃ. ২৪৬; (১২) কাজী আবদুল মান্নান, ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৭।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

'আবদুল-হাক্ক (عبد الحق) ঃ বাবা-ই উরদূ, ডক্টর আবদুল-হাক্ক নামে পরিচিত, জন্ম খৃ. ১৮৭০, স্বীয় পৈত্রিক গৃহ হাপুড় (জেলা মীরাট, উত্তর প্রদেশ, ভারত) -এর নিকট এক মৌজায়। পিতা শায়খ আলী হুসায়ন পাঞ্জাবের রাজস্ব বিভাগের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। ফলে আবদুল-হাক্ক-এর শৈশব মধ্যপাঞ্জাবে অতিবাহিত হয়। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর আলীগড় মাদ্রাসাতুল-উলুম হাই স্কুলে তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। পরে আলীগড় হইতে ১৮৯৪ সনে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমদিকে তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল গণিত। কিন্তু বি.এ.-তে তিনি দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং বন্ধু মহলে অনেক দিন পর্যন্ত "দার্শনিক" আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। আলীগড়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্যার সায়্যিদ (দ্র. আহমাদ খান) ও মাওলানা হালী (দ্র.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহারাও আবদুল-হাককে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বি.এ. পাস করিবার পর তিনি বোম্বাই গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল নওয়াব মুহসিনুল-মুল্ক-এর সচিবরূপে কাজ করেন। সেখান হইতেই কর্নেল আফ্সার জাংগ তাঁহাকে হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) লইয়া যান এবং আসাফিয়্যা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আফ্সার জাংগ ইংরেজীতে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য লইতেন। ১৮৯৬ সনে তাঁহারই নামানুসারে 'আফসার' নামে একটি উরদূ মাসিক পত্র তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পর তিনি উহার সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন। তের বৎসরেরও অধিক কাল তিনি উক্ত পদে কর্তব্যরত থাকেন। ১৯১২ সনে তিনি শিক্ষা বিভাগে আওরাংগাবাদ প্রদেশের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ নিযুক্ত হন। একই বৎসরের শেষদিকে আলীগড় শিক্ষা কন্ফারেন্স তাঁহাকে সেই সংগঠনের উরদূ উন্নয়ন শাখার সচিব মনোনীত করেন। এই শাখা ১৯০৩ সনে স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সচিবদের মধ্যে মাওলানা শিবলী ও মাওলানা হাবীবুর রাহমান খান শিরওয়ানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

হায়দরাবাদের উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাওলাবী আবদুল-হাক্ক-এর উদ্যম ও প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ ছিল। উহার জন্য উরদূ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিবার জন্য সর্বপ্রথম সংকলন ও অনুবাদ প্রতিষ্ঠান তাঁহারই তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয় (খৃ. ১৯১৬ সনের শেষদিকে)। কয়েক বৎসর পরে আওরংগাবাদে উছমানিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। উহার প্রথম অধ্যক্ষও তিনিই নিয়োজিত হন। বিশ বৎসরের অধিক কাল সরকারী কর্তব্য সম্পাদন করত খৃ. ১৯৩০ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উরদূ বিভাগের প্রধান পদে নিয়োজিত হন এবং উরদূ ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনের জন্য তাঁহার পূর্ণ বেতন ও পেনশন ব্যতীত বার্ষিক বার হাজার টাকা মন্জুর করা হয়। খৃ. ১৯২৪ হইতে আন্জুমান তারাক্কীয়ে উরদূ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং উহার বিভিন্ন কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছিল। তখন উরদূ অভিধান সংকলনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে

থাকে। ফলে অন্য কোন কাজের জন্য তিনি মোটেই সময় পাইতেন না। এই সময় গান্ধীজী একটি ভাষাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং উহার এক সভায় (এপ্রিল ১৯৩৬) তাঁহাকেও আমন্ত্রণ জানান। এই সূত্রে তিনি অবগত হন, কংগ্রেসপন্থিগণ শুধু উর্দূ ভাষারই বিরোধী নয়, বরং উহার লিখন পদ্ধতি পর্যন্ত বিলোপ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহাতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি আলীগড়ে (অকটোবর ১৯৩৬) এক বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে উর্দূ ভাষার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের প্রশ্নটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ফলে এই উদ্দেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহার পরিচালন-ভার আন্‌জুমান তারাক্কীয়ে উর্দূর উপর এবং প্রকৃতপক্ষে মাওলাবী আবদুল হাক্ক-এর উপর ন্যস্ত হয়। উক্ত সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়, আন্‌জুমানের প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে ইস্তফা দেন এবং আওরংগাবাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের আকর্ষণ কাটাইয়া নিজের ও আন্‌জুমানের সমুদয় জিনিসপত্রসহ খৃ. ১৯৩৮ সনে দিল্লী চলিয়া আসেন। ডাক্তার আনসারীর বাসভবন ১নং দরিয়াগঞ্জে তিনি আন্‌জুমানের সদর দফতর স্থাপন করেন এবং খৃ. ১৯৪৭ পর্যন্ত নিজেও সেইখানে বাস করিতে থাকেন। ভারত বিভাগ-পরবর্তী ভয়ংকর দাংগা-হাংগামার সময় হিন্দু দুষ্কৃতিকারিগণ আন্‌জুমানের দফতর আক্রমণ করে এবং মাওলাবী সাহেবের ব্যক্তিগত সমুদয় সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নেয় ও আন্‌জুমানের বহু কাগজপত্র, দলীল-দস্তাবেজ ধ্বংস করে। এতদ্ব্যতীত লাইব্রেরীর প্রধান অংশ ভারত সরকার জবরদখল করিয়া নেয় এবং আন্‌জুমানের প্রায় তিন লক্ষ টাকা, যাহা হায়দরাবাদ ইমপেরিয়াল ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা ছিল, তাহা আটক করে। পাঁচ বৎসর পূর্বে (খৃ. ১৯৪২ সনে) তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় (প্রায় ৪৭ হাজার টাকা) আন্‌জুমানকে দান করিয়াছিলেন। তৎপর যে সামান্য ব্যক্তিগত সঞ্চয় জমা হইয়াছিল তাহাও হায়দরাবাদের ব্যাংকগুলি তাঁহাকে প্রদান করে নাই। এই প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় তিনি করাচী আগমন করেন (খৃ. ১৯৪৮)। সারা জীবন পরিশ্রমের ফলে হিন্দুস্তানে যে পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ধ্বংস হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তিনি কখনও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। তাঁহার এই ঐকান্তিক আন্তরিকতার বরকতেই তিনি করাচীতে নূতন করিয়া আন্‌জুমানের পূর্ণ কর্মতৎপরতা উজ্জীবিত করিতে সমর্থ হন। নূতন পুস্তকাদি ও উচ্চ মানের সাময়িকপত্র আবার প্রকাশিত হইতে থাকে। সাধারণ ও বিশিষ্ট পাঠকদের জন্য দুইটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। উর্দূ টাইপ ও লিথো প্রেস স্থাপিত হয়। সর্বোপরি উর্দূ কলেজ নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধীতব্য সমস্ত বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা উর্দূ ভাষার সাহায্যে সফলভাবে পরিচালিত হইতে পারে। পরবর্তী কালে উক্ত কলেজে বিজ্ঞান শাখা খোলা হয়। ছাত্রসংখ্যা সর্বদাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরীক্ষায় সাফল্যের কষ্টিপাথরে এই কলেজ একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সহকর্মীদের সহিত মতবিরোধের প্রেক্ষিতে তাঁহার শেষ জীবন বিশেষ সুখের হয় নাই। আন্‌জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দূর কর্মতৎপরতায়ও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উর্দূ কলেজের উন্নতি ব্যাহত হয়, আন্‌জুমানের প্রকাশনার সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে, উহার দুইটি সাময়িকী বন্ধ করিয়া দিতে হয়; উর্দূ ও 'কাওমী যাবান' নামক সাময়িকপত্র দুইটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। তবে সরকারী সাহায্যে উর্দূ উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব ইহার প্রতি ন্যস্ত হয়তাহা ছিল নূতন গবেষণা রীতি অনুসরণ করিয়া উর্দূ ভাষার একটি বৃহৎ অভিধান প্রস্তুত করা। মাওলাবী 'আবদুল-হ'াক্'ক'কে উহার প্রধান পরিচালক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরে প্রস্তাবিত অভিধানের সংকলনের কার্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি ইস্তফা দেন। এই সময়ে তিনি উর্দূ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাক্তন প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন করত বারংবার উহার আবশ্যকতার প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকেন। এই প্রস্তাবের সমর্থন ও প্রচারের উদ্দেশে লাহোরে একটি বিরাট উর্দূ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি নিজেই উহার সভাপতিত্ব করেন (১৯৫৯ খৃ.)। খৃ.১৯৬০-এ তিনি স্বীয় চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন। খৃ. ১৯৬১ সনের গ্রীষ্মকালে তাঁহার অন্ত্রের পুরাতন ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং খৃ. ১৯৬১ সনের ১৬ আগস্ট হৃৎপিণ্ডের ক্যান্‌সার রোগে তিনি করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন। সৌর বৎসরের হিসাবে তিনি ৯২ বৎসর ও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। করাচীতে আন্‌জুমানে তারাক'কীয়ে উর্দূ ভবনের সীমানার মধ্যে তাঁহাকে দাফন করা হয়। আব্‌জাদী হিসাবে 'গাফারাল্লাহু লাহু' তাঁহার ওফাতের হিজ্‌রী তারিখ।

তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। প্রায় সংসারত্যাগীর ন্যায় অতি সরল জীবন-যাপন করিতেন। ধন, খ্যাতি, সম্মান ও প্রভাবের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। পাকিস্তানে আসার পরে হায়দরাবাদ রাজ্য তাঁহার পেনশন বন্ধ করিয়া দেয়। পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে মাসিক পাঁচ শত টাকার একটি বৃত্তি মঞ্জুর করে। ইহারও অধিকাংশ তিনি আন্‌জুমানের কাজেই ব্যয় করিতেন। একটানা চল্লিশ বৎসর উর্দূ ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থ ও উৎসর্গীকৃত প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন, তাহার নজীর বিরল। গান্ধীজীর সহিত বিরোধ বাঁধিবার পর তিনি আট-নয় বৎসর পর্যন্ত ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যেই স্থানে উর্দূ প্রচলন ছিল না, সেইখানে উহা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেইখানে উহা প্রচলিত ছিল তথায় উহার শক্তি বৃদ্ধি করেন। বিভিন্ন স্থানে আন্‌জুমানের শত শত শাখা স্থাপন করেন। মক্তব, মাদ্‌রাসা ও গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উর্দূ ভাষার অনুকূলে বড় বড় সমাবেশ ও উর্দূ বিরোধী প্রচেষ্টার প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। দেশীয় রাজ্য ও বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসকদের মুকাবিলা করেন। এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের কাহিনী অতি দীর্ঘ। তারীখ-ই পাঞ্জাহ সালা-ই আনজুমান-ই তারাক'কী-ই উর্দূ নামক পুস্তকে ইহার বিবরণ পাঠ করা যাইতে পারে।

বয়স বৃদ্ধির সহিত তাঁহার জ্ঞানচর্চা ও লেখনীর গতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শুধু তাঁহার চিঠিপত্রের সংখ্যাই এক লক্ষের উপর অনুমান করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই সারগর্ভ, চিত্তাকর্ষক ও প্রাঞ্জল রচনার নিদর্শন। পুস্তক-পুস্তিকা সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনামূলক মন্তব্য কয়েক হাজারে উপনীত হইবে। স্বতন্ত্র পুস্তক তিনি খুব অল্পই লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও অন্য লোকের আগ্রহে, বরং জবরদস্তিতে ছাপা হইয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) আজামুল-কালাম ফী ইরতিক'াইল্-ইসলাম ঃ (দুই খণ্ড, খ ১, আগ্রা ১৯১০ খৃ. ও খ২, লাহোর ১৯১১ খৃ.) পুস্তকখানি আসলে মাওলাবী চিরাগ 'আলী ইংরেজীতে রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধানত 'আবদুল-হ'াক্'ক-এর তরজমা (ও ভূমিকা)-র দরুনই ইহার নাম বাঁচিয়া রহিয়াছে। (২) ক'াওয়া'ইদ-ই উর্দূ ঃ অতি পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টির সহিত তিনি নূতন পদ্ধতিতে এই পুস্তকখানি সংকলন করেন। এক বন্ধু এই পুস্তকের খসড়া লইয়া গিয়া গ্রন্থকারের অসম্মতি সত্ত্বেও লাখনৌ হইতে প্রকাশ করেন। পুস্তকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অধিকাংশ মাদ্রাসায় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। অবশেষে তিনি ব্যাকরণের ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও কিছু সংযোজনসহ উহা মুদ্রণের অনুমতি দেন। উর্দূ ভাষায় এইরূপ বিশদ ও মূল্যবান ব্যাকরণের পুস্তক এই পর্যন্ত সংকলিত হয় নাই (৩৬০ পৃ. সম্বলিত)। পুস্তকটি বারবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। (৩) মুক'দ্দামাত-ই 'আবদিল-হ'াক্'ক ঃ হায়দরাবাদে থাকাকালে তিনি বহু পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, যাহা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। মীর্যা মুহাম্মাদ বেগ ইহাদের এক সংগ্রহ দুই খণ্ডে হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশ করেন (খৃ. ১৯৩৪)। ইহার পরেও তিনি প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। (৪) তানক'ীদাতে-ই 'আবদিল-হ'াক্'ক ঃ দুই খণ্ড (খৃ. ১৯৩৪) উর্দূ সাহিত্যে নবতর দৃষ্টিভংগীমূলক সমালোচনা রচনায় তিনি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় যখন হইতে রিসালা-ই উর্দূ সাময়িকী প্রকাশিত হইতে থাকে (১৯২১ খৃ.), তখন হইতে তাঁহার লেখনীপ্রসূত বহু সমালোচনা প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে সংকলিত সমালোচনা ইহাদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তাহা সত্ত্বেও সমালোচনায় তাঁহার প্রশস্ত দৃষ্টি ও রচনা মাধুর্য উহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। (৫) আদাবী তাব্সিরা ঃ বিভিন্ন পুস্তক সম্পর্কে তাঁহার মতামতের এক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ , লাখনৌ দানিশ মাহ'াল হইতে খৃ. ১৯৪৭ সনে প্রকাশিত হয়। (৬) উর্দূ কী ইব্‌তিদাঈ নাশ্'র ও নুমা মেঁ সূ'ফিয়া-ই কিরাম কা হি'স্'সা' এই প্রবন্ধটি প্রথম উর্দূ সাময়িকীতে (খৃ. ১৯৪৫) এবং পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে (১৯৫৩ খৃ.) মুদ্রিত হয়। প্রাচীন উর্দূ সম্পর্কে একটি অতি জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। আরও কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা "উর্দূ" মাসিক পত্রে প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ও পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। যথা (৭) মারহূম দিহ্‌লী কলেজ (খৃ. ১৯৪৫)। (৮) মরহাটী পার ফার্‌সী যাবান কে আছারাত (খৃ. ১৯৩৩) ও (৯) স্যার সায়্যিদ আহ্'মাদ খান, হ'ালাত ও আফ্‌কার (১৯৫৯ খৃ.)। (১০) চান্দ হাম-'আস'র ঃ ব্যক্তিগত আংগিকের এই চিত্তাকর্ষক পুস্তকটি ১৯৪৫ খৃ. সনে প্রকাশিত হয়। এই পর্যন্ত ইহার কয়েকটি সংস্করণ বহু সংযোজনসহ মুদ্রিত হইয়াছে (আন্‌জুমান তারাক্'কী-ই উর্দূ, করাচী ১৯৫৩ খৃ. ও উর্দূ একাডেমী সিন্ধু, করাচী ১৯৫৯ খৃ.)। এই পুস্তকে লেখকের শ্রেষ্ঠতম লিখনশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। (১১) খুত'বাত-ই "আবদিল-হ'াক্'ক ঃ লেখকের প্রকাশ ক্ষমতা ও তাঁহার প্রবল প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নমুনা সম্ভবত তাঁহার লিখিত বক্তৃতাতেই পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যে পরিপূর্ণ এবং সর্বপ্রকার কৃত্রিমতামুক্ত। প্রথমে ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১খ., ১৯৩৯ ও ২খ., ১৯৪৪ খৃ.)। পরবর্তী কালে অতিরিক্ত সংযোজনসহ এক খণ্ডে প্রকাশিত হয় (তা'বই 'ইবাদাত বেরলবী, ১৯৫২ খৃ.)। (১২) উর্দূ-ই মুসাফ্‌ফা মাওলাবী 'আবদুল হ'াক্'ক-এর চিঠিপত্রের সংগ্রহ (তা'বৃই 'আবদিল-হ'াক্'ক জুবিলী কমিটি, লাহোর ১৯৬১ খৃ.)। চিঠিপত্রের অন্যান্য সংগ্রহ। (১৩) মকতূব-ই বাবা-ই উর্‌দূ, হাকীম মুহাম্মাদ ইমাম ইমামীর নামে লিখিত (করাচী খৃ. ১৯৬০)। (১৪) মাক্‌তূবাত-ই 'আবদিল-হ'াক্'ক (সম্পা. জালীল কিদ্‌ওয়াঈ, করাচী ১৯৬২ খৃ.)। (১৫) বাঁছ্‌ কে খুতূ'ত (২খ., হায়দরাবাদ [দাক্ষিণাত্য] খৃ. ১৯৪৪)।

উর্দূ ভাষার প্রতি মাওলাবী 'আবদুল-হ'াক্'ক-এর আর একটি স্মরণীয় অবদান, প্রাচীন উর্দূ বা দাখ্‌নী (دکھنی) ভাষায় লিখিত বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি তিনি ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করেন, উহাদের কঠিন পাঠোদ্ধার করেন এবং উহাদের গুরুত্ব প্রথমবারের মত বিদ্বান সমাজে প্রকাশ করেন। এই বিরাট গবেষণা দ্বারা উর্দূ ভাষা আরও কয়েক শতাব্দীর অধিক প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং উহার ইতিহাসের ধারাই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপিগুলি সম্পর্কে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি 'উর্দূ' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি দাখ্‌নী ভাষার পুস্তকেও তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয় যাহা তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে সংশোধন ও শব্দার্থ-তালিকাসহ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যথাঃ (১) শাফীক' আওরাংগাবাদী, চামানিস্তান-ই শু'আরা, আওরাংগাবাদ ১৯২৮ খৃ.; (২) ফাইক', মাখ্‌যান-ই শু'আরা', আওরাংগাবাদ ১৯৩৩ খৃ.; (৩) তামান্না আওরাংগাবাদী, গুল-ই 'আজাইব, আওরাংগাবাদ ১৯৩২ খৃ.; (৪) নুস্'রাতী, গুলশান-ই ইশ্‌ক; করাচী ১৯৫২ খৃ.; (৫) মুল্লা ওয়াজ্‌হী, সাব্‌রাস, করাচী ১৯৫২ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, কুতুব মুশ্‌তারী, করাচী ১৯৫৩ খৃ.; এই বিষয়ে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র পুস্তক হইল ঃ (১৬) নুস্‌রাতী, মালিকুশ-শু'আরা' বিজাপুর (দিল্লী ১৯৪৪খৃ.)। ইহাতে এই প্রাচীন কবির রচনা ও শিল্প সম্পর্কে গবেষণা ও সমালোচনা রহিয়াছে। এইভাবে 'আবদুল-হ'াক্'ক-এর অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টায় এবং তাঁহার সংশোধনসহ প্রাচীন উর্দূ কবিদের বেশ কিছু সংখ্যক জীবনী প্রাচীন গ্রন্থ ও কাহিনী হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, [যথাঃ (১) মাস'হ'াফী, তায্'কিরা-ই হিন্দী, আওরাংগবাদ ১৯২২ খৃ.; (২) ঐ লেখক, রিয়াদু'ল-ফুস'হা', আওরাংগবাদ ১৯৩৪ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, 'ইক্'দ ছু'রায়্যা, আওরাংগাবাদ ১৯৩৪ খৃ.; (৪) মীর, যিক্‌র মীর, আওরাংগাবাদ ১৯২৮ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, কিতাবুশ-শু'আরা', আওরাংগাবাদ ১৯৩৫ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, ইনতিখাব-ই কালাম-ই মীর, ষষ্ঠ মুদ্রণ, করাচী ১৯৫০ খৃ.; (৭) ক'াইম চান্দপুরী, মাখযান-ই নিকাত, আওরাংগাবাদ খৃ. ১৯২৯ খৃ.; (৮) গারদীযী, তারীখ-ই রীখ্‌তা গূয়ান, আওরাংগাবাদ ১৯৩৩ খৃ.; (৯) ইন্‌শা, দারয়া-ই লাত'াফাত, আওরাংগাবাদ ১৯৩৫ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, কাহানী রানী কেতকী আওর কুন্‌ওর উদেভান, করাচী ১৯৫৫ খৃ.; (১১) তাবান, দীওয়ান, আওরাংগাবাদ ১৯৩৫ খৃ.; (১২) মীর 'আম্মান, বাগ ওয়া বাহার, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিল্লী ১৯৪৪ খৃ.; (১৩) ইন্‌তিখাব-ই দাগ, দিল্লী ১৯৪৬ খৃ.; (১৪) মীর আছার, খাওয়াব ও খিয়াল, ২য় সং. করাচী খৃ. ১৯৫০ খৃ.;]। এই পুস্তকগুলির জন্য তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাও লিখিয়াছেন।

মাওলাবী 'আবদুল-হাক্'ক-এর সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে নিম্নের প্রকাশনাগুলিও উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ (১৭) উর্দূ স'ারফ ও নাহ্'ও'

আওরাংগাবাদ ১৯৩৪ খৃ.; (১৮) উর্দূ যাবান মেঁ ইস্‌তি'লাহ'াত কা মাস্‌আলা, করাচী ১৯৪৭ খৃ.; (১৯) স্যার আগা খান কী উর্দূ নাওয়াযী, করাচী ১৯৫১ খৃ.; (২০) পাকিস্তান মেঁ উর্দূ কা আলমিয়া, করাচী ১৯৫৮ খৃ.; (২১) উর্দূ বা-হ'ায়ছিয়াত-ই যারী'আ-ই তা'লীম-ই সাইন্‌স, করাচী ১৯৫৯ খৃ.; (২২) ক'াদীম উর্দূ, করাচী ১৯৬১ খৃ.; (২৩) উর্দূ ইয়ুনিওয়াসিটি, ওয়াক'ত কা আহাম্ম তাকাদা, করাচী ১৯৬০ খৃ.। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকপত্র, যথা উর্দূ, হামারী যাবান, কাওমী যাবান, দাকান রিবিউ, পাঞ্জাব রিভিউ, মুআল্লিম-ই নিসওয়ান, মাজাল্লা-ই উছ'মানিয়া ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে যাহা এখন পর্যন্ত কোন মুদ্রিত সংগ্রহে স্থান পায় নাই। (২৪) ইংরেজী উর্দূ অভিধান The Standard English-Urdu Dictionary, আওরাংগাবাদ ১৯৩৭ খৃ. তাঁহার আর একটি প্রসংশনীয় অবদান যাহাতে প্রায় দুই লক্ষ শব্দের উর্দূ প্রতিশব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আজ পর্যন্ত উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন উর্দূ-ইংরেজী অভিধান প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তারীখ-ই পাঞ্জাহ্ সালা, আঞ্জুমান-ই তারাক্কী উর্দূ, করাচী ১৯৫৩ খৃ.; (২) রিসালা-ই জাওহার, জামিআ মিল্লিয়্যা, আবদুল হাক্ক সংখ্যা, দিল্লী, ১৯৩০ খৃ.; (৩) মুকাদ্দামাত আবদুল-হাক্ক, হায়দরাবাদ ১৯৩১ খৃ.; (৪) The Sind Observer, ইংরেজী বার্ষিকী, করাচী ১৯৪৮ খৃ.; (৫) মাসিকপত্র আশ্-শুজা, 'আবদুল-হাক্ক সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৫৭ খৃ.; (৬) মাহানামা হাম কালাম, করাচী, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ১৯৬১; (৭) মাজলিস, হায়দরাবাদ (অন্ধ্র প্রদেশ), মাওলাবী আবদুল-হাক্ক নম্বর, সংখ্যা ১ ও ২ (অক্টোবর ১৯৬০ ও জানুয়ারী ১৯৬১); (৮) কাদী আবদুল-ওয়াদুদ, আবদুল-হাক্ক বা হায়ছিয়াত মুহাককিক, মাআসির, পাটনা (সংখ্যা ১৫, ১৬); (৯) উর্দূ, বাবায়ে উর্দূ নম্বর, করাচী ১৯৬১ খৃ.; (১০) কাওমী যাবান, বাবায়ে উর্দূ নম্বর, করাচী ১৯৬৩ খৃ.;(১১) ঐ সাময়িকী, বাবায়ে উর্দূ নম্বর, করাচী ১৯৬৪ খৃ.; (১২) নাকদ্-ই-আবদুল-হাক্ক, সম্পা. সায়্যিদ মূঈনূর-রহমান, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (১৩) সুরূর মাখদূম, ডক্টর মাওলাবী আবদুল হাক্ক বা হায়ছিয়াত নাছর নিগার, এম.এ. (উর্দূ) থিসিস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; (১৪) মুহাম্মাদ আজমল খান ওয়াজীহ, মাওলাবী আবদুল-হাকক বাহায়ছিয়াত নাককাদ. এম.এ. (উর্দূ) থিসিস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইহাতে অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জী দেখা যাইতে পারে।

সায়্যিদ হাশিমী ফরীদাবাদী ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/
আবদুল হক ফরিদী

আবদুল-হাক্ক খায়রাবাদী (عبد الحق خیر آبادی) ঃ শাম্‌সুল-উলামা 'আল্লামা 'আবদুল-হাক্ক খায়রাবাদী, উমারী [উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা)-এর বংশধর], খায়রাবাদের শ্রেষ্ঠ আলিমদের অন্যতম। খায়রাবাদের এই 'আলিম বংশ যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম ভারতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। 'আবদুল-হক্ক-এর পিতা ফাদ্‌লে হাকক খায়রাবাদী (দ্র.) ও দাদা ফাদ্'লে ইমাম খায়রাবাদী (দ্র.) এই বংশে প্রসিদ্ধ উস্তাদরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

আবদুল হাক্ক-এর জন্ম ১২৪৪/১৮২৮-২৯ সালে দিল্লীতে। মানকূল (কুরআন ও হাদীছভিত্তিক বিদ্যা) ও মা'কূ'ল (বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যা) উভয়ই তিনি স্বীয় পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন এবং প্রায় বার বৎসর বয়সে ছাত্র জীবন সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত হন। যৌবনেই তাঁহার জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে বিদ্যোৎসাহী নেতৃবৃন্দ তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া পড়িলেন। ইন্‌তিজ'ামুল্লাহ শিহাবীর বিবরণমতে আবদুল হাক্ক প্রথমে আলোর রাজ্যে নিমন্ত্রিত হন এবং তথায় প্রচুর সম্মান ও গৌরবে ভূষিত হন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সমস্ত পরিবেশ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। আবদুল হাক্ক-এর পিতা ফাদ্‌লে-হাক্ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া জারী করেন। ইংরেজ সরকার তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে নির্বাসন শাস্তি দেয়। এই সময় আবদুল-হাক্ক আলোর হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন (ফাদ্‌লে হাক্ক খায়রাবাদী আওর পহেলী জংগে আযাদী, পৃ. ৪২)। কোন কোন জীবনী লেখক বলেন, ১৮৫৭ খৃ. আবদুল-হাক্ক দিল্লী হইতে লাখনৌ আসিয়া তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমার তদবীর করেন। অতঃপর কিছুদিন তিনি খায়রাবাদে অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে টোঁংক রাজ্যের নওয়াব সাহেব ওয়াযীরুদ্-দাওলা মুহাম্মাদ ওয়াযীর খান বাহাদুর (১৮৩৫-১৮৬৪ খৃ.) তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তথায় দুই বৎসর থাকেন (তায্‌কিরা-ই উলামা-ই হিন্দ, উর্দূ তরজমা, পৃ.২৭৯)। অতঃপর তিনি অধ্যাপকরূপে কলিকাতা মাদ্‌রাসা আলিয়ায় যোগদান করেন, কিন্তু কলিকাতার আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হইল না। নওয়াব কাল্‌ব 'আলী খান (১৮৬৫-১৮৮৭ খৃ.) তাঁহাকে রামপুরে আমন্ত্রণ করিয়া নিজেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১২৮৬/১৮৬৯ সাল হইতে ১৩০০/১৮৮৩ সাল পর্যন্ত রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ (প্রাচ্য শিক্ষার পরিচালক) পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (পৃ. গ্র., পৃ.১৭৯, হাকীকাত-ই রামপুর, ক্রোড়পত্র ১, পৃ. ৫)। কাল্‌ব আলী খানের পুত্র মুশতাক আলী খান (১৮৮৭-১৮৮৯ খৃ.)-এর সময়ে আবদুল-হাক্ক খায়রাবাদ চলিয়া যান। পরে নিজাম আসাফ জাহ্-এর আগ্রহে তিনি হায়দরাবাদে উপস্থিত হন। কিন্তু শীঘ্রই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ দিকে মুশতাক আলী খানের পরে তাঁহার পুত্র নওয়াব হামিদ আলী খান (১৮৮৯-১৯৩০ খৃ.) রামপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলে আবদুল-হাক্ককে রামপুরে আমন্ত্রণ করেন এবং উচ্চ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (তাযকিরা, পৃ. ২৮০; নুয্‌হাতুল-খাওয়াতির, ৮খ., ২২২)। শেষ বয়সে আল্লামা অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া পড়েন। তাহা সত্ত্বেও নওয়াব সাহেব উস্তাদের প্রতি আগের মতই সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকেন (ফাদ্‌লে হাক্ক খায়রাবাদী, পৃ. ৪২)।

১৮৮৭ খৃ. সরকার তাঁহাকে শামসুল-উলামা' খেতাব প্রদান করে। শেষ বয়সে তিনি খায়রাবাদে ফিরিয়া আসেন। সেখানে ২৩ শাওওয়াল, ১৩১৬/১৮৯৯ সালে ইন্তিকাল করেন। শায়খ সাদের দারগায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। কবি আমীর মীনাঈ কবিতা রচনা করিয়া আব্‌জাদী হিসাবে তাঁহার মৃত্যু তারিখ লিপিবদ্ধ করেন (পৃ. গ্র., পৃ. ৪৮; তায'কিরা, পৃ. ২৮০)। উহার শেষ ছত্র হি. ১৩১৬ –آرامگہ امام وقت است

এই ছত্রের শাব্দিক অর্থ ঃ যুগশ্রেষ্ঠ ইমামের বিশ্রামস্থল।

তিনি যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও ইল্ম কালামে তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য ও উসূলে ফিকাহ (ফিক্হ-এর মৌলনীতি)-এর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'ইল্ম কালাম সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করে (পূ. গ্র. পৃ. ১০)। তিনি আল্লাহ বাখ্শ তুনিসবী চিশ্তীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন (তায্কিরা, পৃ. ২৮০)।

সামাজিক জীবনে 'আবদুল-হাক্ক ছিলেন প্রাচ্য সভ্যতা, বিদ্যা ও সৌজন্যের আদর্শ। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন প্রাচীন দিল্লীর ঐতিহ্যের অনুসারী (ফাদল-ই হাক্ক খায়রাবাদী, পৃ. ৪৭, ৪৮)। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অমায়িক ও বিনয়ী। যে ব্যক্তি তাঁহাকে কেবল সালাম জানাইতে গমন করিতেন, তিনিও তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার সান্নিধ্যে কাটাইয়া দিতেন। তিনি মুক্ত হস্তে টাকা-পয়সা ব্যয় করিতেন। খাদেমগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক সময় স্বীয় সন্তানদেরকে ধমক দিতেন। তিনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন। তাঁহার বাপ-দাদার জীবন ও নিজের শৈশব দিল্লীতে অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহাদের পারিবারিক ভাষা ছিল দিল্লীর বিশুদ্ধ (টেক্সালী) উর্দূ (পূ. গ্র., পৃ. ৪৫-৪৭)। তাঁহার বাক্যালাপে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও যুক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। উপরন্তু কবিতা ও গল্পের সংমিশ্রণে উহা চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইত (নুয্হা, ৮খ., ২২৩)। 'আবদুল-হাক্কই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি উর্দূ ভাষায় রীতিমত দর্শনের পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যুব্দাতুল-হিক্মা নামক তাঁহার এই পুস্তকে যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও ইলাহিয়্যাত (অধিবিদ্যা) আলোচিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম দার্শনিক সমস্যাকে অতি প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উর্দূ ভাষায় প্রকাশ শক্তির বাস্তব প্রমাণ দিয়াছেন। পুস্তকখানি দিল্লীর আফদালুল্-মাতাবি নামক প্রেসে ১৩৩১ হিজরীতে মুদ্রিত হয় (ফাদল হাক্ক খায়রাবাদী, পৃ. ৪৮)। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক ঃ (১) তাস্হীলুল-কাফিয়া (১২৮৬ হি.); (২) শারহ আলা হিদায়াতিল-হিকমা আব্হারীকৃত (ভারতে মুদ্রিত ১২৯৭ হি,); (৩) আল্-হাশিয়া 'আলা লিওয়াইল-হুদা, মুহিব্বুল্লাহ বিহারীকৃত (নিজামী প্রেস, কানপুর ১২৮৭ হি.); (৪) আল-হাশিয়া 'আলা শারহিস্-সুল্লাম, কাদী মুবারাককৃত (লাখ্নৌ) (৫) শারহ আলাল্-মির্কাত (লাখ্নৌ) ; (৬) আল-হাশিয়া 'আলা-হাশিয়া মীর যাহিদ 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (৭) আল্-হাশিয়া 'আলা শারহি'স্-সুল্লাম লি-হাম্দিল্লাহ; (৮) শারহ 'আলা মুসাল্লামিছ-ছুবূত; (৯) শারহ সালাসিলিল-কালাম; (১০) রিসালা ফী তাহ্কীকি'ত তালাযুম; (১১) আল-জাওয়াহিরুল-গালিয়া ফিল্-হিক্মাতিল-মুতাআলিয়া; (১২) শারহ আক'াইদিন-নাসাফী; (১৩) তাক্মিলাতু মাবাহিছিল-হাদিয়্যাতিস্-সা'ঈদিয়্যা, কায়রো ১৯০৪ খৃ.।

বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ ঃ হাকীম বারাকাত আহমাদ টোনকী, ফাদ্ল হাক্ক রাম্পূরী, 'আলী আহমাদ খান আসীর বাদাউনী, হাকীম আসাদুল-হাকক্ খায়রাবাদী (আবদুল-হাক্ক খায়রাবাদীর পুত্র)। শায়খ ইক্রাম-এর বাক্যানুসারে শিব্লী নু'মানীও খায়রাবাদীর শিষ্য ছিলেন (রূদ-ই কাওছার, পৃ. ৬১৬), কিন্তু সুলায়মান নাদ্বী ইহা স্বীকার করেন না (হ'য়াত শিব্লী, পৃ. ৭৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-হায়্যি, নুযহাতুল-খাওয়াতি'র, ৮খ. (সংকলকের পুত্র আবুল-হাসান 'আলী দ্বারা বিন্যস্ত ও সমাপ্ত), দাইরাতু'ল-মা'আরিফিল উছমানিয়্যা, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২২২-২২৪; (২) ইনতিজামুল্লাহ্ শিহাবী, মুফতী, ফাদলে হাকক্ হায়দরাবাদী আওর পাহ্লী জাংগে আযাদী (জেনারেল পাবলিশিং হাউস, করাচী ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৪১-৪৮;(৩) মুহাম্মাদ ইক্রাম আলাম, হাকীকাত-ই রামপুর (নিজামী প্রেস, বাদায়ুন ১৯৪০ খৃ.), পৃ. ৩৭ ও ক্রোড়পত্র ১, পৃ. ২, ৫, ২০; (৪) সায়্যিদ আলী আসগার, দাওর-ই আয়্যাম (টোংক রাজ্যের ইতিহাস সিরিজ, সংখ্যা ২), মুফীদ আম প্রেস, আগ্রা ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৩৩; (৫) শায়খ মুহাম্মাদ ইক্রাম, রূদে কাওছার, লাহোর ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৬১৬; (৬) সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্বী, হ'য়াতেয় শিব্লী (মা'আরিফ প্রেস, আজামগড় ১৯৪৩ খৃ.).পৃ. ৭৯ ও ভূমিকা পৃ. ২২, ২৩; (৭) সায়্যিদ মুহাম্মাদ আহ্মাদ আল-হাশিমী আল-বিহারী, আহ্সানুল-কালাম ফী মা য়াউম্মুল-আজ্সাম (জায়্যিদ বার্কী প্রেস, দিল্লী ১৯২৬ খৃ.), পৃ. ৮-১২; (৮) আবদুল হাক্ক খায়রাবাদী, যুবদাতুল-হিক্মা (আফদালুল- মাতাবি, দিল্লী ১৩৩১ হি.); (৯) সার্কীস, মুজামুল-মাত্বুআত (সারকীস প্রেস, কায়রো ১৯২৮ খৃ.), স্তম্ভ ৮৫৩; (১০) রাহমান আলী, তাযকিরা উলামায়ে হিন্দ (উর্দূ তরজমাঃ মুহাম্মাদ আয়ূব ক'াদিরী, পাকিস্তান হিস্টরিকাল সোসাইটি, করাচী ১৯৬১ খৃ.), পৃ. ২৭৯-২৮০, উক্ত পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জীও উল্লেখ করা হইয়াছেঃ (১১) বাগী হিন্দুস্তান, পৃ. ১৯৭-২২৩; (১২) তায্কিরা-ই কামিলান রামপুর, পৃ. ১৯৯-২০১; (১৩) আবজাদুল-উলূম, পৃ. ৯২৪; (১৪) সিয়ারুল উলামা', পৃ. ১৭, ১৮; (১৫) মুহাম্মাদ ইদ্রীস নিগরামী, তয্কিরা উলামা-ই-হাল, লাখ্নৌতে মুদ্রিত।

আব্দুন্ নাবী কাওকাব (দা.মা.ই.) / আব্দুল হক ফরিদী

'আবদুল -হাক্ক আবূ মুহাম্মাদ (দ্র. মারীনিউস)

'আবদুল-হাক্ক হাক্কী (عبد الحق حقى) ঃ ইব্ন সায়ফুদ-দীন মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী আল-বুখারী আল-ক'াদিরী আবুল-মাজ্দ; দিল্লীতে জন্ম, মুহাররাম ৯৫৮/ জানুয়ারী ১৫৫১ এবং দিল্লীতেই মৃত্যু, ২ রাবীউছ-ছানী ১০৫২/৩০ জুন, ১৬৪২। তিনি শায়খ আবদুল-হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী নামেও পরিচিত ছিলেন; হ'াক্'কী ছিল তাঁহার কবি নাম। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বুখারার অধিবাসী ছিলেন। এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পারদর্শী, তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীছশাস্ত্রের চর্চা জনপ্রিয় হইয়া উঠে। বাইশ বৎসর বয়সে ছাত্র জীবন সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুকল ফায়দী ও মীর্যা নিজামুদ্-দীনের সাহচর্যে ফতেহ্পুরে অবস্থান করেন, কিন্তু এই পরিবেশের প্রতি তিনি বিমুখ হইয়া পড়েন (বিশেষ করিয়া ফায়দীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে দেখুন ঃ (ক) বাদায়ূনী, ৩খ., ১১৩, ১১৫ প.; (খ) কিতাবুল-মাকাতীব ওয়ার-রাসাইল (হাশিয়া); (গ) আখ্বারুল-আখয়ার, দিল্লী ১৩৩২ হি., পৃ. ১৬০.; (ঘ) দিল্লীর গ্রন্থকারগণের সম্বন্ধে তাঁহার রচিত পুস্তিকা, পৃ. ২০ এবং (ঙ) ফায়দীর বিদ্রূপাত্মক কাব্য হাফত

ইক্'লীম "দিল্লী" শিরোনামে। ৯৯৫ হিজরীর প্রথমদিকে তিনি হজ্জে যাওয়ার মানসে গুজরাট বন্দরে গমন করেন, কিন্তু পরের বৎসর জাহাজে মক্কা যাত্রার সুযোগ পান (আয্'কার-ই আব্রার অর্থাৎ গাওছীর গুলয'ার-ই আব্রার পুস্তকের উর্দূ তরজমা, আগ্রা ১৩২৬ হি., পৃ. ৫৯৯)। তিনি হিজাযে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। ৯৯৮ হিজরীর শা'বান মাসে তিনি যে সেইখানে ছিলেন তাহা নিশ্চিত (দেখুন শারহ মুক'াদ্দিমাতিল-জাযারিয়্যা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, পত্র ৪ক; গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত উক্ত পুস্তকের আর এক কপির ফটোর জন্য দেখুন GALS, ১খ., ৭৭৮)। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূ'ফী সাধনায় উচ্চতর শিক্ষা তিনি সেখানকার বিখ্যাত উলামা ও শায়খদের কাছে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত যাদুল-মুত্তাকীন পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। দিল্লী প্রত্যাগমনের পর বায়ান্ন বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। ১০২৮/১৬১৯ সনে তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহার জ্ঞান-গরিমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন (তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, আলীগড় ১৮৬৪ খৃ., পৃ. ২৮২)। জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহান অনেক সময় তাঁহার সুপারিশে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের অভাব পূর্ণ করিতেন (আবদুল্লাহ খেশ্গী, মুখ্তাসার মা'আররিজুল-বিলায়া, ১০৪৪ হি. সংকলিত , পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি, পত্র ২৫৮ খ)। খেশগী এই শ্রদ্ধেয় শায়খের একটি পুস্তিকার পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া বলেন, তিনি শায়খ আহ'মাদ কাবুলীর শারী'আত বিরুদ্ধ উক্তিসমূহের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন (মুজাদ্দিদ আল্ফ ছানী, মৃ. ১০৩৪ হি.)। সম্ভবত পরে এইসব মতভেদ সন্তোষজনকভাবে মীমাংসিত হয় (দেখুন তিকসার জুয়ূদুল-আহ্রার, সিদ্দীক হাসান খান, ভূপাল ১২৯৮ হি., পৃ. ১৮৫)। তিনি জনাব শায়খ আসাদুদ্-দীন শাহ্ আবুল-মা'আলীর সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য লাহোরে গমন করেন এবং বিশ দিন তাঁহার সাহচর্যে ছিলেন। শাহ্ আবুল-মা'আলীর অনুরোধে তিনি ফুতূহু'ল-গায়ব পুস্তকের ফারসী তরজমা করেন এবং ব্যাখ্যা লিখেন (ফুতূহু'ল-গায়ব, লাহোর ১২৮৩ হি., পৃ. ৩১৪)।

তাঁহার কবর দিল্লীর হাওয-শাম্সীর নিকট অবস্থিত। দেওয়ালের উপর একটি ফলকে সংক্ষেপে শায়খের জীবনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে (পূর্ণ পাঠের জন্য দ্র. গুলাম 'আলী আযাদ, মা'আছিরুল-কিরাম, ১৩২৮ হি., পৃ. ২০১)। ফার্সী পাঠের আরবী তরজমার জন্য দেখুন গুলাম আলী আযাদ, সুবহাতুল-মারজান, বোম্বাই ১৩০৩ হি., পৃ. ৫২; আখবারুল-আখয়ার, পৃ. ৬; W. Beale, মিফ্তাহু'ত-তাওয়ারীখ, কানপুর ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ২৪৬ এবং বাশীরুদ্-দীন আহ'মাদ, ওয়াকি'আত হু'কূমাত দিহ্লী, আগ্রা ১৯১৯ খৃ. ৩খ., ৩০৫; শেষোক্ত পুস্তকে ইহাও উল্লিখিত আছে, শায়খের যেসব বংশধর দিল্লীতে বাস করেন তাঁহারা এখনও প্রতি বৎসর তাঁহার উরস পালন করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নূরুল-হাক্ক মহান পিতার পদাংক অনুসরণ করিয়া অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার অন্য এক পুত্র আলী মুহাম্মাদ "ফরহাংগ জামিউল-জাওয়ামি" নামে একখানা অভিধান সংকলন করেন।

মহান শায়খ তাঁহার রচিত তালীফুল-কালবিল-আলীফ-বি-কিতাবাত ফিহ্রিস্তিত্-তাওয়ালীফ-এর সহিত একটি পুস্তিকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে দিল্লীর সাহিত্যিক ও কবিদের উল্লেখ রহিয়াছে (উর্দূ সাময়িকী "তারীখ," হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১, ৩ ও ৪ খণ্ড)। এই পুস্তিকায় তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত তাঁহার ৪৯ খানা গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন। উহাদের শেষ পুস্তকখানা পত্রাবলীর সংগ্রহ যাহা কিতাবুল-মাকাতীব ওয়ার-রাসাইল নামে মুদ্রিত হইয়াছে (উপরে দেখুন)। লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপক ওয়াযীরুল-হাসান 'আবিদীর নিকট উক্ত পত্রাবলীর তুলনাকৃত একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই পুস্তকে ৫৭টি পত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরে আরও ১১টি পাওয়া যায়। আরও পরে দুইটি, সর্বশুদ্ধ ৭০টি পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পুস্তকটির মুদ্রিত সংস্করণেও এই সংখ্যাই দৃষ্ট হয়। হিজায হইতে প্রত্যাগমনের পরই তিনি এই সমস্ত রচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে একটি দীওয়ানও আছে (যাহার জন্য দেখুন "আলফী", সংখ্যা ৪৮, সুব্হ' গুলশান, ভুপাল ১২৯৫ হি., পৃ. ১৪১)। অন্যান্য রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১-৩) [হাদীছ সংক্রান্ত] লামাহ'াতু'ত্-তান্ক'ীহ; ইহা আত্-তাব্রীযীর মিশ্কাতুল-মাসাবীহ পুস্তকের 'আরবী ভাষ্য। আশ'আতুল-লামা'আত, লখ্নৌ ১২৭৭ হি., মিশকতের পূর্ণ ভাষ্য (ফারসী)। আল-ফীরূয আবাদী রচিত সিফরুস-সা'আদা-র ফারসী ভাষ্য (দেখুন সূরী, পৃ. ১৮১)।

(৪-৭) [জীবনী] আখবারুল-আখয়ার ফী আস্রারিল-আব্রার, আওলিয়ায়ে কিরামের জীবনী, অধিকাংশই হিন্দুস্তানের সহিত সম্পর্কিত। যুব্দাতুল-আছার, শায়খ 'আবদুল-ক'াদির জীলানী (র)-এর জীবনী, যাদুল-মুত্তাকীন, তাঁহার পীর ও উস্তাদগণের জীবনী।

(৮) যি'করুল-মুলূক ঃ গূরী বংশীয় সুলতানদের সময় হইতে আকবারের যুগ পর্যন্ত সময়ের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ (Story, Persian Literature, লন্ডন ১৯০০ খৃ., পৃ. ৪৪১)।

(৯) জায্'বুল-কু'লূব ইলা দিয়ারিল-মাহ্বুব মদীনা মুনাওয়ারার ইতিহাস যাহা প্রধানত আস-সাম্হূদী রচিত ওয়াফাউল-ওয়াফা ইলা দারিল-মুস্'ত'াফা হইতে গৃহীত (দ্র. Storcy রচিত উপরে উল্লিখিত পুস্তক, পৃ. ৪২৭)।

(১০) মাদারিজুন-নুবুওওয়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিশদ জীবনী (দ্র. Storey রচিত পৃ. ১৯৪)। এই পুস্তকের উর্দূ তরজমা, মিনহাজুন-নুবুওওয়াঃ লক্ষ্ণৌ ১২৭৭ হি.।

(১১) (তাসাওউফ) মিফতাহু'ল-ফুতূহ, ফুতূহুল-গ'ায়ব-এর ভাষ্য।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) উপরিউক্ত উৎস ব্যতীত দেখুন, আখবারুল-আখ্য়ার ও তারীখ (উপরিউক্ত পুস্তকাদিতে তাঁহার নিজস্ব লিখিত বিবরণী); (২) তাবাকাত-ই আকবারী, ২খ., ৪৬৪ (ইংরেজী তরজমা Bib. Ind., কলিকাতা ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৬৯২); (৩) 'আবদুল হামীদ, বাদশাহ নামাহ্, Bib. Ind., ২খ., ৩৪২; (৪) মুহাম্মাদ সালিহ, 'আমাল সালিহ্, Bib. Ind., পৃ. ৩৮৪; (৫) নাওওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, ইতহাফুন-নুবালা', কানপুর ১২৮৯ হি., পৃ. ৩০৩; (৬) তিক্সার, পৃ. ৬৩; (৭) আছ'ারুস-সানাদীদ, কানপুর ১৯০৪ খৃ., পৃ. ৬৩; (৮) Dowson and Elliot, The History of India, ৬খ., ১৭৫ প. ও ৪৮৩ হইতে ৪৯২; (৯ ও ১০) ফারসী পাণ্ডুলিপির তালিকা by Rieu (বৃটিশ

মিউযিয়াম) ও by Pertsch (বার্লিন); (১১) পেশাওয়ার লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকা, পৃ. ৪৮, ১৭৩, ২০৩, প., ২৭৩, ২৭৭; (১২) Storey, Persian Literature, লন্ডন ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৯৪ প., ১৮১, ২১৪; (১৩) যুবায়দ আহমাদ, The Contribution of India to Arabic Literature, নির্ঘন্ট; (১৪) সায়্যিদ আহ্মাদ কাদিরী, তায্কিরা শায়খ 'আবদি'ল-হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী, পাটনা ১৩৭০ হি.; (১৫) খালীক আহ্মাদ খান নিজামী, হায়াত শায়্খ 'আবদি'ল-হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী, দিল্লী ১৩৭৩ হি., বুরহান পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ৩, মার্চ ১৯৫৭ খৃ.; (১৬) খাওয়াজা হাসান নিজামী, হায়াত শায়খ 'আবদিল-হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী, দিল্লী ১৯৫৩ খৃ.।

মুহ'ম্মাদ শাফী' (দা.মা.ই.)/ আবদুল হক ফরিদী

আবদুল-হাক্ক হামিদ (عبد الحق حامد) ঃ কবি, জন্ম ২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫২। ইনি ইয্মীর হইতে আগত একটি প্রাচীন 'আলিম খান্দানের সহিত সম্পৃক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই বংশ কিছুকাল মিসরে অবস্থান করিয়াছিল। ইঁহার দাদা 'আবদুল-হাক্ক মুল্লা শাহী দরবারে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। দ্বিতীয় মাহমূদের শাসন আমলের শেষের দিকে যাহা ১৮২৬ খৃ. আরম্ভ হয় এবং যিনি সাম্রাজ্যকে নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন, 'আবদুল-হাক্ক মুল্লা সেই খলীফার দরবারে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। একটি নূতন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে তাঁহার বিরাট অবদান ছিল। তিনি মাঝে মাঝে কাব্য রচনা করিতেন। 'তারীখ-ই লিওয়া' নামক একটি ডায়েরী তাঁহার স্মারক হিসাবে রখিয়া গিয়াছেন। রামী (Rami)-র ব্যারাকে থাকিয়া খলীফা কি প্রকারে ১৮২৮ খৃ. রুশ যুদ্ধ চলাকালে নূতন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন উক্ত ডায়েরীতে মুল্লা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার দুই ভ্রাতাও গ্রন্থকার ছিলেন। হামিদ-এর পিতা খায়রুল্লাহ্ আফান্দী সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার প্যারিস ভ্রমণের ডায়েরী লিখিয়াছেন (যাহা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই)। তুর্কী ভাষার প্রথম নাটক 'হি'কায়াত-ই ইব্রাহীম পাশা' তিনিই রচনা করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশেই হামিদ যৌবনে উপনীত হন। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন Circassian মহিলা। জননীর বাল্য জীবনের স্মৃতিকাহিনী তাঁহার মননশীলতাপূর্ণ পটভূমিকার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিল রূপকাহিনীর স্পর্শ। ফলে জ্ঞান ও কল্পনার দ্বৈত প্রভাব হামিদের রচনায় বরাবর পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার শিক্ষা শুরু হইয়াছিল একটি নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়ে। পিতার সহিত প্যারিসে গমন করিবার পরও তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা চলিতে থাকে। তখন তাঁহার বয়স এগার বৎসর। প্যারিস হইতে ইস্তাম্বুল প্রত্যাগমন করত কিছুদিন পরে তিনি তেহরান গমন করেন। তাঁহার পিতা সেইখানে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োজিত ছিলেন। তেহরানে তাহার শিক্ষা, বিশেষত 'আরবী-ফারসীর শিক্ষা, তিনি গৃহ-শিক্ষকদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন তাহসীন আফিন্দী। তিনি হামিদের মনে গভীর রেখাপাত করেন। ইহারই প্রভাবে হামিদের প্রাথমিক রচনাগুলিকে (যাহার মধ্যে "গারামে" নামক একটি ছন্দোবদ্ধ কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত) ইসলামী 'আক'াইদের সহিত পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের প্রাথমিক সংঘাতের চিত্তাকর্ষক আলেখ্যরূপে স্মরণীয় করিয়া রখিয়াছে।

পিতার মৃত্যুর পর হামিদ ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যান এবং সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। খৃ. ১৮৭৬ সনে তিনি প্যারিসে দ্বিতীয় সচিব নিযুক্ত হন। ইতোপূর্বে ১৮৭১ খৃ. তিনি আদিরনা (Edirne)-এর এক বিখ্যাত পীর খান্দানের কন্যা ফাতিমা খানামের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। প্যারিসে তুরস্কের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিদ্হ'াত পাশার সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। এই সময়ে লিখিত তাঁহার পত্র ও পুস্তকাদি হইতে তাঁহার তখনকার মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইবার প্যারিস হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহাকে পূতী (Poti, রাশিয়া), তৎপর গুলুস (Golos, গ্রীস) ও সর্বশেষে বোম্বাইতে কন্সাল নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৫ খৃ. বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার স্ত্রী মারা যান। এই দুর্ঘটনা হামিদ ও তাঁহার কাব্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ঐ বৎসরই তাঁহাকে প্রথমে লন্ডনে প্রথম সচিব ও পরে হেগে (The Hague) মিনিস্টার নিযুক্ত করা হয়। পরে দ্বিতীয়বারের মত লন্ডনে প্রথম সচিবের পদে এবং আরও কিছুদিন পরে সেই দূতাবাসেই পরামর্শদাতা (Advisor) নিয়োগ করা হয়। ১৯০৮ খৃ. সিনেটের সদস্য মনোনীত করা হয়। সেই সময় তিনি ব্রাসেল্সে (Brussels) রাষ্ট্রদূত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সিনেটের উপ-সভাপতিরূপে কাজ করিতেছিলেন। যখন সিনেট বিলোপ করা হয়, তখন তিনি ভিয়েনায় (Vienna) চলিয়া যান। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার প্রাক্কালে তিনি ভিয়েনা হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৯২৮ খৃ. তাঁহাকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ১৯৩৭ খৃ. তিনি মারা যান। পূর্ণ জাতীয় মর্যাদায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁহার রচনাবলী ঃ (১) য়ূরোপ গমনের পূর্বে (১৮৭৩-১৮৭৬ খৃ.) ঃ 'মাজারা-ই ইশ্ক', সাব্র ও ছাবাত, ঈচলী কীয, দুখ্তার-ই হিন্দূ ও নজীফা; (২) ইউরোপ ভ্রমণ ও বিয়োগের মধ্যবর্তী কাল (১৮৭৬-১৮৮৫ খৃ.)ঃ নিস্তারন, তারিক ইয়া খুদ উন্দালিস ফাতিহী', 'সাহ্রা' তায্দ ইশবির; (৩) ১৮৮৫ হইতে ১৯০৮ খৃ. পর্যন্তঃ মাক্বার, উলূ', হাজ্লা, বুনলর উদর দীওয়ানালীক লরম ইয়া খূদ বাল্দা বির সাফীলে নিনহাস্ব-ই হালী; (৪) ১৯০৮ হইতে ১৯২৩ খৃ. পর্যন্ত ঃ যায়নাব' ১৮৮৭ খৃ. লিখিত 'বালাদান বির্সিস', ইল খান', লিবার্টে (Liberte), ওয়ালিদাম, তুরখান', ইলহাম-ই ওয়াতান', মাক্তূবলার, ১, ২, আবদুল্লাহ সাগীর, ফিস্ন্তেন-১৮৮৭, তায়ীফ্লার গাচীদী', ইয়াদগার-ই হার্ব', ইব্ন মূসা, ১৮৮১ খৃ., ইয়াবাঞ্জী দুস্তরার,আরযীলার, কাহ্বা ঃ (বির সাফলীনিন ঃ হাস্ব-ই হালী), খাকান, হাপ ওয়াহিক (কবিতার প্রথম সংগ্রহ), নাটক ঃ জুনূন-ই ইশ্ক' ও কয়েকটি চিঠি ও শেষ নাটক কানূনী নিন বিজ্দান আযাবী' (যাহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই), তয্কিরাঃ (জীবন স্মৃতি Memoirs, যাহা কোন কোন সাময়িকীতে প্রকাশিত হইতেছিল, পুস্তকরূপে মুদ্রিত হয় নাই)।

হামিদের প্রথম নাটক 'মাজারা-ই ইশক' তাঁহার যৌবনের রচনা প্রয়াস। ইহাতে প্রথম হইতেই যে রোমান্টিক উপাদান বিদ্যমান ছিল তাহা পরবর্তী রচনায় আরো বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। 'সাব্র ও ছাবাত' ও 'ঈচলী কীয' লোক-কাহিনীর উপাদানসমৃদ্ধ ও রম্যরসে পরিপূর্ণ। হামিদ তাঁহার আত্মীয় আহ্মাদ ওয়াফীক পাশা (দ্র.)-র চিন্তাধারায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তবুও তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর সর্বপ্রথম ও গভীরতম প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল শিনাসী মতবাদ। হ'ামিদ দ্বিতীয় যুগের নব্যপন্থীদের দলভুক্ত ছিলেন, অথচ শিনাসীরা ছিল প্রথম যুগের নব্যপন্থী। বয়স অল্প থাকায় হ'ামিদ নামিক কামাল-এর নেতৃত্বাধীন "নব্য তুর্ক" আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন নাই, তবুও উক্ত আন্দোলনের রচনাবলী তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইহা সত্য যে, হ'ামিদ একজন আদর্শ মানবের সন্ধানে নামিক কামাল-এর অনুসরণ করিতেছিলেন, তবে তুর্কী কাব্যে একটি নবীন ধারার প্রবর্তনে তাঁহার যে সাফল্য তাহাই ছিল তাঁহার প্রকৃত অবদান। তাঁহার নাটক "দুখতার-ই হিন্দূ" পুস্তকে তিনি একটি ছোট কবিতা জুড়িয়া দিয়াছেন যাহাতে কয়েকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ঃ প্রথমত অন্ত্যমিলের প্রাচীন ধারার পরিবর্তন, দ্বিতীয়ত কাব্যের প্রচলিত বিষয়বস্তু ও উপমারীতি পরিহার, তৃতীয়ত জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করত কাব্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ। তাঁহার কাব্য সংগ্রহদ্বয় অর্থাৎ 'বালদা' ও 'সাহ্‌রা'-তে যাহা আংশিকভাবে প্যারিসে লিখিত হইয়াছিল, উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য অধিকতর পরিস্ফুট। তৃতীয় সংকলন 'বুন্‌লার উদুর' পুস্তকে তিনি এক অভিনব ও উন্নততর রীতির দক্ষ শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন পর্যন্ত কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকিলেও তাঁহার ভাব ও ভাষায় চিত্তাকর্ষক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির রহস্যকে পুনর্বার আবিষ্কারের আনন্দ তাঁহার রচনায় প্রতিভাত হইয়াছে। নিঃসন্দেহে এই কারণেই তাঁহার কাব্যে সর্বেশ্বরবাদের ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে হামিদ যেইসব কবিতা রচনা করিয়াছেন উহাতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী প্রস্ফুটিত হইয়াছে অর্থাৎ মাকবার, উলু ও হাজলা, 'মৃত্যু কল্পনার তীব্রতা 'গারাম' পুস্তকেও বিদ্যমান, তবে উপরিউক্ত কাব্যে বিশেষ প্রকট। ইহাতে মানুষের অদৃষ্টের সমস্যাসমূহকে অন্তরের বেদনার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। যেই সমাজ ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের পবিত্রতা হারাইয়া পরিবর্তনশীল পৃথিবীকে আতংকের দৃষ্টিতে দেখিতেছিল সেই সমাজের প্রভাব, তদুপরি প্রথম যৌবনে মিয়া পাশার রচিত 'তার্‌কীব বান্দ' ও 'তার্‌জী' বান্দ' নামক দুইটি কবিতার সংগ্রহ অধ্যয়নের সাহিত্যিক প্রভাব এতদুভয় তাঁহার মর্মযাতনাকে তীব্রতর করিয়া তোলে। মাকবার নিঃসন্দেহে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। মনে হয় স্ত্রী ফাতিমার ভাবমূর্তি হামিদের মনে সর্বদা ভাস্বর ছিল। এইখানে উল্লেখ্য, তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী নেলী (Nelly) যাহাকে তিনি ইংল্যান্ডে বিবাহ করিয়াছিলেন, অনেকটা প্রথম স্ত্রীর সদৃশ ছিল। হামিদ এই পর্যায়ে যে সমস্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কল্পনার ঐশ্বর্যে না হউক, চিন্তাধারায় ভিকটর হুগোর (Victor Hugo) কবিতা, বিশেষত তাঁহার Dieu (দিউ) ও লা ফ্যাঁ দে সাতান (La Fin de Satan)-এর সমতুল্য। ইংল্যান্ডে নিযুক্তির পরে তিনি যেইসব কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে দার্শনিক অন্বেষা বেশী না থাকিলেও পরিণত কাব্যিক কল্পনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যেমন তাঁহার "হাইড পার্ক দিয়া চলিতে" নামক কবিতাটি তুর্কী ভাষায় প্রকৃতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যত কবিতা রচিত হইয়াছে তাহাদের শ্রেষ্ঠতমগুলির অন্যতম। দুঃখের বিষয়, সুলতান আবদুল-হামীদ ইস্তাম্বুলের পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের তৃতীয় পর্যায় অচিরেই শেষ হইয়া যায়।

'দুখ্‌তার-ই হিন্দূ'র ভূমিকায় হামিদ রোমান্টিক ও বিদেশী নাটকের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণের কথা প্রকাশ করিয়া দেন। তখন হইতে তাঁহার সমস্ত নাটকেই, এমন কি 'ইশবার', নিস্‌তারিন' অথবা 'তিযার'-এর মত নাটক, যাহা বিষয়বস্তুর দিক হইতে প্রাচীন ফরাসী নাটকের নিকটতর মনে হয় তাহাতেও তাঁহার উপরিউক্ত মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। হামিদের নৈরাশ্য রাজনৈতিক কারণ প্রসূত এবং তাঁহার নাটকগুলি কখনও মঞ্চস্থ হইবে না – এই অনুভূতি হইতে উদ্ভূত। ফলে তাঁহার এইসব নাটক দার্শনিক চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে নাটকীয় উপাদান হয়ত মোটেই থাকে না কিংবা থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার আধিক্যে চাপা পড়িয়া যায়। যদিও 'ফিন্‌তান' ইংরেজদের সমাজ জীবনের আলেখ্য বলিয়া দাবি করে এবং 'রুহ্‌লার' ও 'তায়িফ্‌লার গাচীদী'-র সংলাপে মানবের অদৃষ্ট সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে, তবুও তাঁহার অধিকাংশ নাটকই ঐতিহাসিক। এইগুলি প্রাচীন ভারত, গ্রীস (ইশ্‌বার), ইরাক (সারদানাপাল), মধ্যএশিয়ায় তুরস্কের ইতিহাস ও আন্দালুসের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত। ইশবার যাহার সম্পর্কে মনে করা হয়, হ'ামিদ র‍্যাসীন (Racine) [ফরাসী কবি মৃ. ১৬৯৯ খৃ.)-এর আলেকজান্ডার ও Corneille (ফরাসী নাট্যকার মৃ. ১৬৮৪ খৃ.)-এর রচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন, এই পুস্তকে শান্তিবাদ ও দেশপ্রেমের ওকালতি করা হইয়াছে এবং 'তারিক' নাটকে নামিক কামালের মতবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই নাটকগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই, ইহাতে হামিদ নারী জাতিকে জীবনে তাহাদের ন্যায্য মর্যাদা প্রদান করিতে চাহিয়াছেন। যায়নাব ইব্‌ন মূসা (যাহা তারিক-এর পরিশিষ্ট) ও ফিনতান পুস্তকে হামিদকে সেক্সপিয়ারের অনুসারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তুর্কী কাব্যের উপর হামিদ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। 'ছারওয়াত-ই ফুনূন' ও 'ফাজ্‌র-ই আতী' এই উভয় যুগের সহিত সম্পৃক্ত লেখকগণ হামিদের প্রভাবাধীন এবং ভাষা ও আংগিকের ক্ষেত্রে তাঁহার সৃজনমূলক ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অনুসারী ছিলেন। তিনি তুর্কী কাব্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নব নব ছন্দই কেবল প্রবর্তন করেন নাই, বরং মাত্রাভিত্তিক ছন্দেও (Quantitative verse) কাব্য রচনা করিয়াছেন, এমনকি অমিত্রাক্ষর ছন্দ (blank verse) কাব্য রচনার পরীক্ষাও তিনি চালাইয়াছিলেন। নাটকে তাঁহার সংলাপের ভাষা সাধারণের বাক্যালাপের ভাষার নিকটতর ছিল। ১৮৮৫ খৃ. তাঁহার যে প্রভাব শুরু হইয়াছিল তাহার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল বলা যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। কারণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার পুস্তকগুলি সেই সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. Horn, Geschichte der Turkischen Moderne, 34 ff.; (২) Gibb, Ottoman Poerty, i, 133-35, iv, p. vii.; (৩) রিদা তাওফীক, আবদুল হাক্ক হামিদ ও মুলাহাজাত-ই ফাল্‌সাফাসী, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ.; (৪) তুর্ক যুর্‌দ মাজমুআসী, ৯খ., সংখ্যা ১৩, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ.; (৫) উলকু মাজমূআসী, ২খ., সংখ্যা ৫১, আনকারা ১৯৩৭ খৃ., উভয় সাময়িকীর কবি সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যা ছিল; (৬) সাব্‌রী আসাদ সিয়াউশগিল, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, 'আবদুল-হাক্ক হামিদ প্রবন্ধ; (৭) মুহাম্মদ কাপালান, 'গারামা' দাহ্‌ কী ইজ্‌তিমা'ঈ ও ফাল্‌সাফী ফিক্‌রলর, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য

অনুষদ, তুর্ক দিলী ও আদাবিয়্যাতী দুরগীসী, ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ২৪৬-৬০; (৮) ঐ লেখক, তাবী'আত কারশিসিন্দা, আবদুল-হাক্ক হামিদ, ঐ, ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩৩৩-৩৪৯, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ১৬৭-১৮৭; (৯) আহমাদ হামদি তানপিনার, ১৯ আসির তুর্ক আদাবিয়্যাতী তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ২৮৭-৪৬৬।

A. Hamdi Tanpinar (দা.মা.ই.) / আবদুল হক ফরিদী

আবদুল হাকিম (عبد الحكيم) ঃ খান বাহাদুর (১৯০৫-১৯৮৫), বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক। মানিকগঞ্জ জেলার হাজীনগর গ্রামে (উপজেলা হরিরামপুর) জন্মগ্রহণ করেন (২ ডিসেম্বর, ১৯০৫)। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী ওয়াসীম উদ্দীন আহমদ; মাতার নাম নাসীমুন নিসা। নিজ গ্রামে নানা মুনশী ফাহীমুদ্দীন আহমদের গৃহে শিক্ষা জীবনের শুরু। পাটগ্রাম এম. ই. স্কুল হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষা ও ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন (১৯২২ খৃ.)। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হইতে আই. এসসি. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯২৪ খৃ.)।

উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে অনার্সসহ বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রাজা কালিনারায়ণ রায় বৃত্তি লাভ করেন (১৯২৭ খৃ.)। পরবর্তী বৎসর তিনি গণিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সেই বৎসরই লিটন স্কলারশিপ ও ঢাকার নওয়াব প্রদত্ত একটি সম্পূরক বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাথেমেটিক্যাল টাইপসহ অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন (১৯৩০ খৃ.); পরবর্তী কালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনুপস্থিতিতে এম.এ. ডিগ্রী প্রদান করে (১৯৩৪ খৃ.)।

কর্মজীবনে তিনি স্বল্পকাল করটিয়া সাদত কলেজ ও কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন; অতঃপর শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন ব্রাঞ্চে মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে স্থায়ী নিয়োগ লাভ করেন (১৯৩১ খৃ.)। অল্পকালের মধ্যে পদোন্নতি লাভ করিয়া বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৩৪-৩৮ খৃ.)। অতঃপর তৎকালীন বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৩০ বাস্তবায়নের জন্য প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হন। এই পদে (১৯৩৮-৪৩ খৃ.), বিশেষত পূর্ববঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এই সময়ে তিনি 'বাংলার শিক্ষক' নামে শিক্ষা বিষয়ক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকা রেঞ্জ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক (১৯৪৩-৪৭ খৃ.),পূর্ব পাকিস্তানের সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক (১৯৪৭-৫৬ খৃ.) ও জনশিক্ষা পরিচালক (১৯৫৬-৫৯ খৃ.)-রূপে দায়িত্ব পালন করেন। শেষোক্ত পদে থাকাকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সদস্য-সচিবরূপে কাজ করেন (১৯৫৬ খৃ.)।

শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘ কর্মজীবনে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এদেশে শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় একজন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) আধুনিক শিক্ষক (১৯৩৮); (২) গ্রামের উন্নতি; (৩) অঙ্কের বই; (৪) The Reconstruction of School Education (১৯৪৮); (৫) শিশুর মন ও শিক্ষা; (৬) ইতিহাস শিক্ষক; (৭) ভূগোল শিক্ষক; (৮) Better School (Government publication, ১৯৫৭); (৯) সার্থক শিক্ষা (১৯৬০); (১০) আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান (১৯৬১); (১১) পড়া ও লেখা শিখানো (১৯৬২); (১২) শিক্ষা সমন্বয় (১৯৬৩) ও (১৩) বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র উপাখ্যান (১৯৬৬)।

তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি চার খণ্ডে বিশাল 'বাংলা বিশ্বকোষ' সম্পাদনা। ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম-এর উদ্যোগে সংকলিত এ যাবৎ কালের এই সর্ববৃহৎ বাংলা গ্রন্থের তিনি প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন (১৯৬১-৭৬ খৃ.)। গ্রন্থটির বিভিন্ন খণ্ড ১৯৭২ হইতে ১৯৭৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। দেশের শতাধিক বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক, সংকলক, লেখক ও সম্পাদনা সহকারীরূপে এই প্রকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাবিদ ও গবেষকরূপে তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন। যথা 'খান সাহেব' (১৯৩৯), 'খান বাহাদুর' (১৯৪৪) ও 'একুশে পদক' (১৯৮২)। এতদ্ব্যতীত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর ফেলো ও সভাপতি (১৯৮১) নির্বাচিত হন। কর্মবহুল জীবন যাপন করিয়া ১৪ জুন, ১৯৮৫ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঢাকার বনানীতে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) District Gazetteers—Dacca 1975; (২) History of Services (Govt. of Bengal).

ড. আ. ম. শরফুদ্দীন

আবদুল হাকীম (عبد الحكيم) ঃ আনু. ১৬২০-১৬৯০ খৃ.। নোয়াখালীর একজন প্রাচীন কবি ও পুঁথি সাহিত্য রচয়িতা। পিতা শাহ্ আবদুর-রায্যাক; পীর শিহাবুদ-দীন মুহ'ম্মাদ; জন্মস্থান সুধারাম। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। নোয়াখালী, কুমিল্লা ও বাকেরগঞ্জ জেলায় এ যাবত তাঁহার নিম্নলিখিত আটখানা পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে ঃ (১) ইউসুফ-জোলেখা (যুলায়খা); (২) লালমতি ছয়ফুলমুল্লুক (সায়ফুল-মুল্ক); (৩) শিহাবুদ্দীন নামা; (৪) নূর নামা; (৫) নসিহৎ নামা; (৬) চারি মকামভেদ; (৭) কারবালা ও (৮) শহরনামা।

ইউসুফ-জোলেখা ও লালমতি ছয়ফুল মুল্লুক চিত্তাকর্ষক উপন্যাস। ইহা কলিকাতা 'হবীব' প্রেস হইতে মুদ্রিত (তা. বি.) হয়। 'চারি মকামভেদ' কাব্যে শারী'আত, তরীকাত, হাকীকাত ও মা'রিফাত—এই চারিটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়। 'নূর নামা' একখানা মা'রিফাতী পুস্তক। 'নসিহত নামা'য় মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনুসরণের জন্য হাদীছ ও কুরআন হইতে মনোরম ভাষায় উপদেশ সংকলিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'শিহাবুদ্দীন নামা' পীর প্রশস্তি ও 'কারবালা' ইয়াযীদের সৈন্যদলের সহিত অসম যুদ্ধে ইমাম হুসায়ন (রা) নিধনের মর্মন্তদ কাহিনী।

পূর্ব বংগের মুসলমান, বিশেষত বুনিয়াদী পরিবারগুলি তখন উর্দূ ভাষায় কথা বলিতেন এবং বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন, এমনকি বাংলার পরিবর্তে উর্দূকেই তাঁহারা বাংগালী মুসলমানের মাতৃভাষা বলিয়া দাবি করিতেন। কবি আবদুল হাকিম ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কবিতায় বাংলা ভাষার গুণকীর্তন করেন। তাঁহার ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। এই কবির পুস্তকগুলি এককালে দক্ষিণ-পূর্ব বংগে জনপ্রিয় ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১খ., ৩য় সং. (১৯৮১), ২১৪-২১৬; (২) লালমতি ছয়ফুলমুল্লুক, নোয়াখালী পৌরসভা প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্তি, পৃ. ৮৮; (৩) Bangladesh District Gazetteers Noakhali, 1977, পৃ. ২৩০-২৩১; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ (১৯৭২), ১খ., ১৬৩।

ড. এম. আব্দুল কাদির

(মিয়াঁ) 'আবদুল-হাকীম কাকাড় (عبد الحكيم كاكڑ) ঃ (জ. আনু. ১০৭০/১৬৫১-মৃ. ১১৫৩/১৭৪০) বিখ্যাত 'আলিম ও অন্যতম আল্লাহাভীরু বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার অনেক কারামাতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম ছিল সিকান্দার শাহ্ এবং তিনি আফগানদের কাকাড় সম্প্রদায়ের সানাটিয়া গোত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি বেলুচিস্তানের পাশীন তহসীলভুক্ত খান্‌যূ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ছিলেন নিরক্ষর, কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতে বিদ্যা শিক্ষায় ব্রতী হন। যৌবনে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে তিনি প্রথমে কান্দাহার, কাবুলের পূর্বে অবস্থিত নানগারহার অঞ্চলে এবং পরে পেশাওয়ারে গমন করেন। সেখানে তিনি প্রচলিত বিদ্যাসমূহ, যথা সারফ, নাহ্ও, বালাগাত, ফিক্হ, হাদীছ, তাফ্সীর, যুক্তিবিদ্যা (মানতিক), ধর্মতত্ত্ব (কালাম) ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করিয়া ভাল 'আলিম হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পার্থিব জগৎ হইতে বিমুখ হইয়া স্বীয় অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি সায়্যিদ লাল জিয়ূ নান্‌গার হারীর হস্তে বায়'আত হন। অতঃপর তিনি পেশাওয়ারে মিয়াঁ 'আবদুল-গাফূর পেশাওয়ারী ও লাহোরে হাফিজুল্লাহ ইয়ার লাহোরীর নিকট গমন করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি নাক্শবান্দিয়া তরীকার ও শায়খ আহ্মাদ সিরহিন্দী (র) [দ্র.] প্রবর্তিত মুজাদ্দাদিয়া তরীকার শিক্ষা লাভ করেন।

মিয়াঁ 'আবদু'ল-হ'াকীম পেশাওয়ার ও লাহোরে ঐ সকল বুযুর্গের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পুনরায় কান্দাহারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি এবং কারামাতসমূহের খ্যাতি আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহার প্রতি সকল শ্রেণীর মানুষ ঝুঁকিয়া পড়ে। তাঁহার খানকাহ্ (خانقاه) কান্দাহারের পুরাতন শহরের নিকট অবস্থিত ছিল। সেখানে অদ্যাবধি লোকেরা যিয়ারতের উদ্দেশে গমন করিয়া থাকে। জনসাধারণের গমনাগমনের ফলে ইহা বহু লোকের সমাবেশের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। কান্দাহারের নৃপতি শাহ হুসায়ন হূতাক ইব্ন হাজী মীর ওয়ায়স খান জুব্বা পরিধানকারী এই দরবেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া বিপদাশঙ্কা অনুভব করিতে লাগিলেন। উক্ত আল্লাহ প্রেমিকের আধ্যাত্মিক শক্তির ফলে কান্দাহারের রাজপ্রাসাদ 'নারাঞ্জ' (نارنج) প্রকম্পিত হইতেছিল। ইহাতে বাদশাহ্র পারিষদবর্গ তাঁহাকে কান্দাহার হইতে দূরে কোথাও অপসারণের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। অতএব হুসায়নের নির্দেশে মিয়াঁ 'আবদুল-হাকীম স্বীয় শিষ্য ও অনুগামীদের এক বিরাট দলসহ ১১৪৬/১৭৩৩ সনে কান্দাহার পরিত্যাগ করেন এবং বেলুচিস্তানের লূরালায়ী অঞ্চলে অবস্থিত 'তেলে চুটিয়ান' হাল চুটিয়াল নামক গ্রামে গমন করিয়া সেখানে অবস্থান করেন। মিয়াঁ সাহেব ১১৫৩/১৭৪০ সনে উক্ত গ্রামে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মাযারে অদ্যাবধি জনগণ যিয়ারতের উদ্দেশে গমন করে।

মিয়াঁ 'আবদুল-হাকীম তাঁহার সময়ে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সকল খানের সহিত সম্পর্ক বজায় রখিতেন। খান (গোত্রপ্রধান)-গণ তাঁহার মুরীদানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কান্দাহারে নাক্শবান্দ তরীকা তাঁহার মাধ্যমেই প্রসার লাভ করে। তাঁহার মুরীদদের মধ্যে মিয়াঁ নূর মুহাম্মাদ দুররানী ও নূর মুহাম্মাদ মুরাদী নিজেদের 'ইলম ও কারামাতের কারণে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। মিয়াঁ আবদুল-হাকীমের রচনাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) ইখ্‌তিসার হিসনুল-ঈমান, ফার্‌সী ভাষায় ('আকাইদ সম্পর্কীয়); (২) মাজমূ'আ রাসাইল দার মাসাইলি তাসাওউফ ওয়া তারীকাত, ফারসী ভাষায়; (৩) রিসালা তাসাওউফ, ফারসী ভাষায়, উহাতে তাসাওউফ-এর বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষিত আলোচনা করা হইয়াছে; (৪) রিসালা, যাহাতে মিয়াঁ 'আবদুল-হাকীম স্বীয় উস্তাদ মীর সায়্যিদ লাল নানগার হারী ইব্ন সায়্যিদ হাবীব-এর নিকট যে যে বিষয়ে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা রহিয়াছে; (৫) রাসাইল হিকমিয়া; (৬) রিসালা মিয়াঁ আবদুল-হাকীম, শারী'আত, তরীকত, হাকীকত, নাফী ও ইছবাত, তাসাওউফ এবং সুলূক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসাইল যাহা তিনি তাঁহার উস্তাদ হাফীজুল্লাহ ইয়ার লাহোরীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুল্‌তান মুহাম্মাদ খালিস কান্দাহারী, তারীখ-ই সুলতানী, বোম্বাই ১২৯৮ হি., ১খ., ৭; (২) শের মুহাম্মাদ খান গান্ডাহাপূরী, খুরশীদ-ই জাহান, লাহোর ১৮৯৪ খৃ.; (৩) হাফিজ খান মুহাম্মাদ কাকাড়, মুক'দ্দামা-ই মুখ্‌তাসার হিসনিল-ঈমান, কোয়েটা ১৯৫২ খৃ.।

'আবদু'ল-হ্যায়্য হাবীবী আফগানী (দা.মা.ই.) / মোঃ আব্দুল আউয়াল

আবদুল হাকীম (عبد الحكيم) ঃ হাকীম, খাস মুজাদ্দিদী (র) মুরশিদ, শায়খ ও হাকীমি চিকিৎসক, পূর্ণ নাম শায়খ হাকীম আবদুল হাকীম খাস মুজাদ্দিদী (র)। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী রমযান ১৯১৯ খৃ. ভারতের চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বশির হাট মহকুমাধীন হাসনাবাদ থানার কল্‌তলা গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সরদার পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা ইসরার আলী ওরফে আমীনুদ্দীন (র) ছিলে কাদিরিয়া-চিশ্‌তিয়া-নক্শবান্দী-মুজাদ্দিদী তরীকার একজন প্রসিদ্ধ শায়খ। তিনি (তাঁহার পিতা) শায়খ মাওলানা রিয়াসাত 'আলী খান শাহজাহানপুরী (র)-এর একজন সুযোগ্য খলীফা ছিলেন।

আবদুল হাকীম প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা তাঁহার পিতা-মাতা ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিশোর অবস্থায় তাঁহার পিতার মুরশিদ মাওলানা রিয়াসাত আলী খান শাহজাহানপুরী (র) তাঁহাকে স্বীয় তরীকায় বায়'আত করাইয়া তাসাওউফের সবক দেন। বাল্যাবস্থায় তাসাওউফের পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এন্ট্রাস পরীক্ষার পূর্বে সূফীতত্ত্বের প্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তাঁহার অমনোযোগিতা সৃষ্টি হয়।

অতঃপর তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য আসামের জংগলে হিন্দু-বৌদ্ধ সাধকের নিকট "যোগবাদ" এবং হিমালয় পাদদেশের নিকটবর্তী বর্ধমান ও পাতিয়ালা রাজার পুরোহিতদের নিকট রাবনের পঞ্চবান ও সম্মোহন বিদ্যা বা যাদুবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন।

ইতোমধ্যে তিনি মাজযূব ফকীর মুমতায 'আলী শাহ (র)-এর সাহচর্য লাভের জন্য তাঁহার সাথে সুন্দরবন যান। কথিত আছে যে, মাজযূব ফকীরের সুদৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি বাঘের পিঠে চড়িয়া সুন্দরবনে ভ্রমণ করিতেন।

উক্ত ফকীরের ইন্তিকালের পর তিনি হযরত খানজাহান 'আলী (র)-এর মাযারে অবস্থানরত হযরত সুন্দর আলী শাহ (র)-এর সাহচর্যে আড়াই বৎসর অবস্থান করেন। আরও কথিত আছে যে, এই পর্যায়ে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা-মদীনা শরীফে সশরীরে উপস্থিত হইয়া আহকামে হজ্জসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। সুদীর্ঘ নয় বৎসরে তিনি তাসাওউফও সাময়িক সম্মোহনী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। অতঃপর দীর্ঘ দিনের অনুশীলিত নাক্শবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, কা'দিরিয়া ও চিশ্তিয়া তরীকায় পুনরায় স্বীয় পিতার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা ও মুরশিদের নিকট হইতে সকল তরীকার সম্মিলিত কামালাত সহজেই লাভ করেন। ইতোমধ্যে তিনি মনিন্দ্রনাথ মুখার্জীর নিকট হইতে হাকিমী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন "লাল ফৌজে" যোগ দেন এবং কিছু দিন চট্টগ্রাম জেলে কারাবরণ করেন। অতঃপর ইউ.পি.-র ফকীর পীর পাগারুর আন্দোলনে যোগ দেন। শেষে সক্রিয় রাজনীতি হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি হাকিমী চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

বৈবাহিক জীবনে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হইয়া তিনটি বিবাহ করেন। তাঁহার তিন স্ত্রীর গর্ভে ছয় পুত্র সন্তান এবং তিন কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

১৯৪৭ খৃ. দেশবিভাগের পর হাকীম সাহেব বশিরহাট হইতে বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় হিজরত করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করেন। তিনি চার তরীকায় খিলাফাত লাভ করিবার পর যুগের প্রয়োজনে তাঁহার মাধ্যমে সংস্কার সাধিত শুধু 'খাস মুজাদ্দিদিয়া তরীকার সিলসিলা জারী রাখেন।

তিনি তাসাওউফকে কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করিয়া উহাকে যুগোপযোগী ও সহজসাধ্য পদ্ধতিতে উপস্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন, তরীকাকে বিদ'আতমুক্ত করেন এবং খাস মুজাদ্দিদী তরীকা প্রচলিত করেন। খাস মুজাদ্দিদিয়া তরীকা নামে উহা পরিচিত হয়। তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রায় চল্লিশোর্ধ খলীফা মনোনীত করেন, কিন্তু কাহাকেও গদ্দীনশীন করিয়া যান নাই, যদিও খলীফাগণের মধ্যে তাঁহার এক সন্তানও ছিলেন। তাঁহার খলীফাগণের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হইলেন ঃ আল্লামা মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ডা. নঈম আহমদ, মরহুম অধ্যাপক আমীর আলী, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, খায়রুল আহসান, আবদুল করীম, সুলায়মান। তিনি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার মুরীদদেরকে সুলতানুল আযকার শিক্ষা দিতে সক্ষম ছিলেন।

বলা হয় যে, তাঁহার প্রত্যেক সালিকই স্বীয় সবক মাক'ামের হালাত হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-এর রিসালা ও মাক্তূবাত শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝিতে পারিত এবং বর্তমানেও পারিতেছে। তিনি সব সময় সাদা লুঙ্গী ও গোল পাঞ্জাবী পরিধান করিতেন এবং মাথায় সাদা রুমালকে পাগড়ী হিসাবে ব্যবহার করিতেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করিতেন এবং সালিকদিগকে অনুরূপ করিতে নির্দেশ দিতেন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল ও জামাআতের আকীদা পোষণ, হানাফী মাযহাবের অনুসরণ, মুজাদ্দিদীয়া তরীকার আদলে আত্মশুদ্ধি এবং আহকামে শারী'আহ-এর পূর্ণ অনুসরণ করিতে সবাইকে নির্দেশ দিতেন। সর্বপ্রকার শির্‌ক ও বিদ'আত হইতে দূরে থাকিতে তিনি নির্দেশ করিতেন। এই মহান মুরশিদ ১৯৮১ খৃ. ১৯ অক্টোবর রোজ সোমবার বিকাল ৩.৪৫ মিঃ নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মাযার সাতক্ষীরা কাটিয়াস্থ খান্‌কাহ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ভূমিকা মাবদা' ওআ মা'আদ, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র), অনুবাদ মাওলানা মাহবুবুর রহমান, খাস মুজাদ্দিদীয়া প্রকাশনী, সাতক্ষীরা; (২) মোঃ মামুনুর রশীদ, তুমি তো মোর্শেদ মহান, সেরহিন্দ প্রকাশনী, ঢাকা।

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান

(মুল্লা) 'আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী (ملا عبد الحكيم سيالكوٹی) ঃ ইঁহার শৈশব জীবনের তথ্যাদি বিশেষ জানা যায় নাই। তাঁহার পিতার নাম শামসুদ্দীন। বাসস্থান পাঞ্জাবের ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ সিয়ালকোটে। শামসুদ্দীনের পিতৃকুল বা মাতৃকুল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, 'আবদুল-হাকীমই এই বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্ঞান-গরিমার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার জন্মের তারিখও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর সহপাঠী ছিলেন, যিনি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই সূত্রে অনুমান করা হয়, 'আবদুল-হাকীম হযরত মুজাদ্দিদের অন্তত তিন-চার বৎসরের বড় ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদের জন্ম হইয়াছিল ৯৭১/১৫৬৩ সনে। সুতরাং 'আবদুল-হাকীমের জন্ম ইহার তিন-চার বৎসর পূর্বে হওয়া সম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার সমবয়সী ছিলেন। জীবনীকারগণ লিখিয়াছেন, 'আবদুল-হাকীম দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং ১০৬৮/১৬৫৭ সনে ইন্তিকাল করেন (শাহজাহান নামাহ্)।

এই সময় মাওলানা কামালুদ্দীন কাশ্মীরী (মৃ. ১০১৭/১৬০৮) কাশ্মীর হইতে হিজরত করত সিয়ালকোটে বসতি স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ধর্মভীরুতার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিষ্যত্বে 'আবদুল হ'াকীম স্বীয় শিক্ষাপর্ব পরিপূর্ণ করেন। মুজাদ্দিদ আলফে ছানী এবং সাদুল্লাহ খান, যিনি পরে শাহজাহানের উযীর আজম নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মাওলানা কাশ্মীরীর শিষ্য ছিলেন। এই তিনজনই আন্তরিক বন্ধুত্ব ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পরেই ইঁহারা যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যান তখনও তাঁহাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ১০২১/১৬১৩ সনে 'আবদুল-হাকীম যখন তাঁহার কোন শিষ্যের মাধ্যমে মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী বিরচিত একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পান তখন তিনি তাঁহাকে আন্তরিক

শ্রদ্ধা জানাইয়া একটি পত্র লিখেন যাহাতে মুজাদ্দিদ সাহেবকে "ইমামে রাব্বানী, মাহ্'বূবে সুব্হ'ানী, মুজাদ্দিদ-ই আলফে ছানী' বলিয়া সম্বোধন করেন। মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী উপাধিটি এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ইহা তাঁহার অন্যান্য উপাধি, যথা "ক'ায়্যূম-ই আওওয়াল" ও "খাযীনাতুর-রহ'মাত" হইতে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করে। 'আবদুল-হাকীম তাঁহার এত ভক্ত হইয়া উঠেন যে, ১০২৩/১৬১৪ সনে তিনি সিয়ালকোট হইতে সির্হিন্দ গমন করত মুজাদ্দিদ-ই আলফই ছানীর বায়আত (আনুগত্য) গ্রহণের সম্মানে ধন্য হন এবং স্বীয় পীরের 'মুজাদ্দিদ আল্ফে-ছ'ানী' হইবার প্রমাণস্বরূপ 'দালাইলু'ত-তাজদীদ' নামক একখানা পুস্তিকা রচনা করেন। মুজাদ্দিদ সাহেব 'আবদুল-হাকীমকে 'আফতাব্-ই পা ব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

যদিও আকবার (দ্র.)-এর দরবারে পৌঁছার সুযোগ তাঁহার হয় নাই তবুও ঐ সময় আকবারের লাহোরস্থিত সরকারী মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেইখানে তিনি বহু বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা ও অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে লাহোরী ফাদি'ল নামে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসন আরোহণের পর যে সমস্ত জ্ঞানী ও গুণীজনকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গীরও প্রদান করিয়াছিলেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি আগ্রা (আকবারাবাদ) মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। শাহজাহানের দরবারের বিখ্যাত কবি হাজী মুহাম্মাদ জান কুদ্সীও তখন ঐ মাদ্রাসায় পড়াইতেন। 'আবদুল হাকীম এক সময় শাহজাহানের দরবারে পৌঁছিয়া যান। শাহ্জাহানের দরবার তখন বহু ইসলামী দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে 'আবদুল হাকীমের মর্যাদা বিশেষ উচ্চ ছিল। কিছুদিন তিনি শাহ্যাদাদেরকেও শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। শাহজাহান তাঁহাকে মালিকুল-'উলামা (জ্ঞানীদের বাদশাহ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং রৌপ্য দ্বারা তাঁহাকে ওজন করাইয়া সমওজনের ছয় হাজার করিয়া টাকা দুইবার উপহার দেন। শাহজাহানের শাসন আমলে তাঁহাকে বার্ষিক সোয়া লাখ টাকা আয়ের জায়গীর প্রদান করা হইয়াছিল। কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ উহা ভোগ করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে ইংরেজদের সময় উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। 'আবদুল হাকীম ২১ রামাদান, ১০৬৮/১৬৫৭ সনে স্বগৃহেই ইন্তিকাল করেন এবং সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। এই তারিখ সম্পর্কে কিছু মতভেদ রহিয়াছে।

সন্তান ঃ 'আবদুল-হাকীমের কেবল এক পুত্রের নাম জানা গিয়াছে। তাঁহার নাম ছিল 'আবদুল্লাহ এবং উপাধি ছিল 'আল-লাবীব' (মনীষী)। তিনি জ্ঞানে-গুণে পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পূত চরিত্রের দরুন লোকেরা তাঁহাকে 'ইমাম-ই ওয়াক'ত্' উপাধি দিয়াছিল। আওরঙ্গযেব 'আলামগীর তাঁহার জ্ঞান ও গুণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় যে সমস্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি তাঁহার প্রাপ্য ছিল তাহা সমস্তই অক্ষুণ্ন রাখা হইয়াছিল, বরং কিছুটা বৃদ্ধিও করা হইয়াছিল। 'আলামগীর তাঁহাকে আজমীরের 'স'াদ্র-ই আজাম' নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। 'আবদুল্লাহ লাবীব নিজে গ্রন্থকার ও সংকলক ছিলেন।

শিষ্যবৃন্দ ঃ 'আবদুল-হাকীমের বহু বিশিষ্ট শিষ্য থাকিবে বলিয়াই মনে করা হয়। তবে কেবল দুইজন শিষ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। একজন মুল্লা 'আবদুর-রাহীম সাম্ভালী, যিনি শিক্ষা সমাপনান্তে মুরাদাবাদে কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, সায়্যিদ ইসমাঈল বিলগিরামী। তিনি দেওয়াবাসী মুল্লা 'আবদু'স-সালাম-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত সিয়ালকোটে গমন করেন এবং তাঁহার (সিয়ালকোটীর) শিষ্যদলে যোগদান করেন। গুলাম আলী আযাদ তাঁহার মাআছিরুল-কিরাম পুস্তকে উভয়ের সম্পর্কে লিখিয়াছেন। তবে অন্যান্য সূত্র হইতে আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়।

'আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী একই সঙ্গে বুদ্ধিভিত্তিক (علم عقلى) ও ওহীভিত্তিক জ্ঞানের (علم نقلى) অধিকারী ও তাঁহার যুগের বিখ্যাত জ্ঞানী ছিলেন। জীবদ্দশাতেই তাঁহার খ্যাতি কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ফলে হ'াজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬৮/১৬৫৭) তাঁহার রচিত 'কাশফুজ-জুনূন' নামক পুস্তকে তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মুহ'াম্মাদ স'ালিহ্-কানবুহ লিখিয়াছেন, আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাবলে তিনি প্রাচীন মনীষীদের সমুদয় বিশিষ্ট রচনাবলী আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফলে তিনি বহু বুদ্ধিদীপ্ত ও অর্থপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মুল্লা 'আবদুল হ'ামাদি লাহোরী লিখিয়াছেন, গুণগ্রাহী বাদশাহ্দের নামে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক রচনা উৎসর্গ করিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দিদের শ্রেষ্ঠ মুরীদ মাওলানা মুহ'াম্মাদ হাশিম "যুবদাতুল-মাকামাত" পুস্তকে লিখিয়াছেন, হযরত মুজাদ্দিদ বলিতেন, মাওলানা আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী বুদ্ধিভিত্তিক ও ওহীভিত্তিক বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং সেই সময় সারা ভারতে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। আবুল-ফায়দ কামালুদদীন তাঁহার "রাওদ'া-ই ক'ায়্যুমিয়্যা" পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'আল্লামা সিয়ালকোটী সেই যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও উচ্চ মানের গ্রন্থকার ছিলেন। গুলাম আলী আযাদ তাঁহার 'মাআছিরুল-কিরাম' পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-তপস্বী ও সমসাময়িক জ্ঞানীদের তিনি গৌরব ছিলেন। সত্য বলিতে কি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য সমুদয়ের জ্ঞানে ভারত ভূমিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ আবির্ভূত হন নাই। ফাক'ীর মুহাম্মাদ ঝিলামী (পরে লাহোরী) স্বরচিত "হ'াদীক'াতুল-হ'ানাফিয়্যা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী, ফাক'ীহ (আইনবিশারদ), হাদীছবেত্তা, তাফসীরকার, বিশেষত বুদ্ধিভিত্তিক শাস্ত্রে অনন্য ও উচ্চ মানের গ্রন্থকার ছিলেন।

বিখ্যাত রচনাবলী ঃ (ক) তাফসীর বিষয়ক (১) হ'াওয়াশী 'আলা তাফ্সীরিল-বায়দ'াবী, তাফ্সীর বায়দাবীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ প্রথম দুই সূরার তাফসীর। এই অংশের ভাষ্য কতিপয় আলিমই লিখিয়াছেন। কিন্তু আবদুল-হাকীমের ভাষ্যই ছাত্র ও শিক্ষক মহলে অধিকতর প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ। হাজ্জী খালীফা কাশফুজ-জুনূন-এ উহার সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মাদ মুহিব্বী, খুলাসাতুল-আছার ফী আ'য়ানিল-ক'ার্নিল-হাদী 'আশার পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ (আরবী ভাষায়) "আমি উহা দেখিয়াছি এবং কতিপয় সূক্ষ্ম আলোচনা অধ্যয়ন করিয়াছি"।

অধ্যাপক মার্গোলিয়থ (Margolioth) Chrestomathia Baidawiana পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আমি উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছি", (মুদ্রিত); (২) হ'াশিয়া 'আলাল-কাশ্শাফ (তাফ্সীর কাশ্শাফ-এর ভাষ্য, অপ্রকাশিত)। (খ) ফিক্হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র বিষয়কঃ (৩) হ'াশিয়া 'আলাত-তালবীহ (তাল্বীহ নামক পুস্তকের ভাষ্য), প্রকাশিত; (৪) হ'াশিয়া 'আলাল-হুসামী, হুসামী নামক পুস্তকের ভাষ্য (মুদ্রিত)। (গ) কালামশাস্ত্র বিষয়ক ঃ (৫) হ'াশিয়া 'আলাল-খিয়ালী (মুদ্রিত); (৬) হ'াশিয়া 'আলা শারহিল্- 'আক'াইদিল-জালালী (মুদ্রিত); (৭) হ'াশিয়া 'আলা শারহিল-মাওয়াকি'ফ (মুদ্রিত); (৮) আর-রিসালাতুল-খাক'ানিয়্যা যাহার অপর নাম আদ-দুরারুছ- ছামীন (অপ্রকাশিত); (৯) যুব্দাতুল-আফকার (অপ্রকাশিত)। (ঘ) মানতিক (তর্কশাস্ত্র) ও দর্শন বিষয়ক ঃ (১০) হ'াশিয়া 'আলা মীর কুত্বী (অপ্রকাশিত); (১১) হ'াশিয়া 'আলা হ'াশিয়াতি মাতালি'ইল-আনওয়ার (মুদ্রিত); (১২) হ'াশিয়া 'আলা কুত্বী (অপ্রকাশিত); (১৩) হ'াশিয়া 'আলা মায়বুযী (অপ্রকাশিত)। (ঙ) আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্র বিষয়কঃ (১৪) হ'াশিয়া 'আলাল-মুত'াওওয়াল (মুদ্রিত); (১৫) হ'াশিয়া 'আলা হ'াশিয়াতি 'আবদিল-গ'াফূর (মুদ্রিত); পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য দেখুন Brockelmann ও যুবায়দ আহ'মাদ ঃ Contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature.

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও তাঁহারই রচনা। কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই বা কোথাও পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে বলিয়াও জানা যায় নাইঃ (১) হ'াশিয়াতু শারহি' হি'ক্মাতিল-'আয়ন; (২) হ'াওয়াশী বার শারহ' মারাহিল-আরওয়াহ ; (৩) শায়খ 'আবদুল-ক'াদির জীলানী রচিত গু'নয়াতুত-ত'ালিবীন পুস্তকের ফারসী তরজমা (এই তরজমা ১৩০০ হি. দিল্লীতে মুদ্রিত হইয়াছে); (৪) আল্-ক'াওলুল-মুহ'ীত' বি-তাহ্'কীকি' জালি মুআল্লিফ ও জালি বাসীত ; (৫) হ'াশিয়াতু শারহি তাহয'ীব; উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ব্যতীতও আবদুল-হাকীম-এর কোন কোন রচনা ও সংকলনের নাম পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ স'ালিহ্, 'আমাল-স'ালিহ, ১৯৩৯ খৃ., ৩খ., ৩৮৩; (২) মুহাম্মাদ আসলাম ইব্ন মুহা'ম্মাদ হ'াফিজ', ফারহাতুন-নাজি'রীন, লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিন ১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত; (৩) গুলাম আলী আযাদ, মাআছিরুল-কিরাম, ১খ., ২০৪; (৪)ঐ লেখক, সুব্হাতুল-মার্জান, পৃ. ৬৬; (৫) আল-মুহিব্বী, খুলাসাতুল-আছর ফী আ'য়ানিল-ক'ারনিল-হাদী 'আশার, ২খ., ৩১৮; (৬) নওয়াব সিদ্দীক হাসান আবজাদু'ল-'উলূম, পৃ. ৯০২; (৭) ফাকীর মুহাম্মাদ ঝিলামী, হ'াদাইকু'ল-হ'ানাফিয়্যা, পৃ. ৪১৪; (৮) Bale, An Oriental Biographical Dictionary, revised and enlarged by Keenc; (৯) খুদা বাখ্শ, মাহ'বুবুল-আল্বাব ফী তা'রীফিল-কুতুবি ওয়াল-কুত্তাব, পৃ. ১৭৪; (১০) আবদুল-হায়্যি ফিরিংগী মাহাল্লী, তারবুল-আমাছি'ল, পৃ. ২৫২; (১১) রাহমান আলী. তাযকিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১১০; (১২) Brockelmann, ১খ., ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৫, ৩০৪, ৪১৭, ৪২৭, ৪৬৬ এবং ২খ., ২০৯, ২১৪, ২১৭ ও পরিশিষ্ট, ১খ., ৫০৯, ৫১৭, ৫৩৩, ৭৪০, ৭৫৯ ও ২খ., ২৮৯, ২৯০, ২৯৩, ৩০১, ৬১৩; (১৩) মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ, তায'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ৩৬; (১৪) নিজামুদ্দীন বাদায়ূনী, ক'ামূসুল-মাশাহীর, ২খ., ৫৭; (১৫) মুহ'াম্মাদুদ্দীন ফাওক', সাওয়ানিহ' আল্লামা আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী, লাহোর ১৩৪২ হি.; (১৬) যুবায়দ আহমাদ Contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, ১৯৬৮ খৃ., দ্র. আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী; (১৭) আবদুল-হায়্যি, নুযহাতুল-খাওয়াতি'র, ৫খ., ২১০; (১৮) আবদুল হামীদ লাহোরী, পাদশাহ নামাহ্, কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ.; (১৯) আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী, আছ-ছ'াক'াফাতুল-ইসলামিয়্যা ফিল-হিন্দ, দামিশক ১৩৭৭ হি.; (২০) আবদুর-রাহমান অমৃতসরী, সিয়াহাত-ই হিন্দ, লাহোর ১৯০৯ খৃ.; (২১) সাবাহুদ্দীন আবদুর রাহমান, বায্ম-ই তায়মূরিয়্যা, আজমগড় ১৩৬৭ হি.।

যুবায়দ আহ্মদ ও আমীনুল্লাহ ওয়াহীর

সংযোজন ঃ মুল্লা আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটীর রচনা ও সংকলনের পরিধি বিশেষ প্রশস্ত। তিনি 'ইলমে কালাম, তাফ্সীর, মানতি'ক (তর্কশাস্ত্র) দর্শন, 'আরবী ব্যাকরণ, উসূ'ল ফিক'হ ও ফারাইদ'শাস্ত্রে (দায়ভাগ) পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন এবং এই সকল বিষয়েই তাঁহার সংকলনাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও ইসলামী আকাইদ সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ ছিল গভীর। সুপরিচিত বহু পাঠ্যপুস্তকের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা ছাড়াও কয়েকটি স্বতন্ত্র পুস্তক তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহাদের ভিত্তিতে তিনি জ্ঞান জগতে সুপরিচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরূপে বিরাজমান। উপমহাদেশের মুসলিম 'আলিমগণের সারিতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। আবদুল-হাকীমের সংকলনগুলি সাধারণত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী মুগল সম্রাট শাহ্জাহানের নামে উৎসর্গীকৃত। মুল্লা 'আবদুল-হামীদ লাহোরী পাদশাহ নামাহ্ (১/২ ৩৪০) পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ তাঁহার রচিত বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি গ্রন্থ গুণগ্রাহী বাদশাহের নামে প্রচলিত।

শাহজাহানের আমলে যে সমস্ত মহান জ্ঞানী ও গুণী জ্ঞানের উদ্যান অন্তরের রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত করিয়াছেন মুল্লা আবদুল-হাকীম তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুত তিনি সেই যুগের জ্ঞানীদের সম্রাট এবং বহু উচ্চ স্তরের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা পুস্তকগুলি 'আরবী মাদ্রাসা ও শিক্ষাপীঠের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। প্রতি যুগের জ্ঞানী-গুণী মহলে তাঁহার গ্রন্থগুলি সমাদৃত হইয়াছে এবং শিক্ষার্থিগণ প্রভূত উপকৃত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলি কেবল সমসাময়িক যুগেই সমাদর লাভ করে নাই, বরং পরবর্তী কালেও জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া আসিতেছে। তাঁহার ইন্তিকালের বহুকাল পরে আযাদ বিলগিরামী লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা আরব ও আজমের বিভিন্ন জাতির মধ্যে জনপ্রিয় (সুব্হাতুল-মার্জান, পৃ. ৬৬)। বিলগিরামী (মাআছিরুল-কিরাম, ১খ., পৃ. ২০৪) ইহাও লিখিয়াছেন, "তাঁহার (আবদুল হাকীমের) রচনাবলী 'আরব এবং 'আজমে সমভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত"। আমাদের সমসাময়িক হাফিজ আবদুর-রাহমান অমৃতসরী ইসলামী রাজ্যগুলি ভ্রমণান্তে দেশে প্রত্যাগমনের পর বলিয়াছিলেন, আড়াই শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও আবদুল-হাকীমের গ্রন্থসমূহ জ্ঞানাকাশে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় জ্যোতিষ্মান

এবং উহাদের জনপ্রিয়তায় কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তিনি সিয়াহ'াত-ই হিন্দ নামক ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন, "ইরাক, সিরিয়া ও ইস্তাম্বুলের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার পুস্তকগুলি পাঠ্য তালিকাভুক্ত দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। .... হিন্দুস্তানের বাহিরে ইসলামী দেশগুলিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন অন্য কোন হিন্দুস্তানী গ্রন্থকারের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই"। আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটীকে সকলে 'উচ্চ স্তরের রচনা ও শ্রেষ্ঠ সংকলনের অধিকারী' বলিয়া স্মরণ করিয়াছে। তাঁহার সমুদয় রচনা 'আলিম সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত ও প্রিয়, বিশেষত রূম দেশের আলিমগণের নিকট। তাঁহারা উক্ত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে গর্ব বোধ করেন। গ্রন্থগুলি গর্বের উপযোগী বটে (নুযহাতুল-খাওয়াতি'র, ৫খ., ২১০)।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংকলন : হ'াশিয়া তাফ্সীর বায়দ'াবী, এই ভাষ্যটি দ্বিতীয় পারার ৩/৪ অংশ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। ইহা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিশেষ কার্যকর ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা সম্বলিত। ইহার কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ তাফ্সীর বায়দাবীর কঠিন শব্দাবলী ও বাগধারার ব্যাকরণ এবং ভাষাগত সমীক্ষা ও ব্যাখ্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অস্পষ্ট ও অবোধ্য বাক্যগুলি সহজবোধ্য করা হইয়াছে। আল্লামা বায়দাবী বর্ণিত হাদীছসমূহের খতিয়ান লওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত হাদীছের বর্ণনাকারীদের উল্লেখ বায়দাবী করেন নাই সেই সমস্ত হাদীছের সনদসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং যে হাদীছসমূহের প্রতি তিনি কেবল ইংগিত করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বায়দাবী ছিলেন শাফিঈ মতের অনুসারী, অপরপক্ষ আবদুল-হাকীম ছিলেন হানাফী। কাজেই তিনি স্বীয় চিন্তাধারার সপক্ষে পরিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দর্শন : হিদায়াতুল-হি'কমাত—শায়খ আছী'রুদ্দীন 'উমার আল-আব্হারী প্রণীত। ইহার দুইটি প্রসিদ্ধ ভাষ্য মুল্লা হু'সায়ন ইব্ন মু'ঈন মায়বুযী প্রণীত "মায়বুযী" ও মুল্লা স'াদরুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম প্রণীত "স'াদ্‌রা"। আমাদের 'আরবী মাদ্‌রাসাসমূহে হিদায়াতুল-হিকমাতের এই উভয় ভাষ্য বিশেষ গৌরব ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও সর্বত্র ইহাদের অধ্যয়ন জনপ্রিয়। আবদুল-হাকীম "মায়বুযী"র ভাষ্য লিখিয়াছেন যাহা "আল-হাশিয়া 'আলাল-মায়বুযী" বা "আল-হ'াশিয়া আলা শারহি হিদায়াতি'ল-হি'কমা" নামে পরিচিতি এবং মূল পুস্তকে বর্ণিত সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সহজবোধ্য করিতে বিশেষ সহায়ক।

যুক্তিবিদ্যা (মানতি'ক) : আশ্-শাম্সিয়্যা নাজমুদ্দীন আল-কাতিবী প্রণীত সুপরিচিত গ্রন্থ। ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন কু'ত্'বুদ্দীন মাহ্'মূদ ইব্ন মুহাম্মাদ। উক্ত ভাষ্যের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন সায়্যিদ শারীফ আল-জুরজানী। প্রথমটি 'ক'ুত্'বী' এবং দ্বিতীয়টি 'মীর ক'ুত্'বী' নামে পরিচিত। 'আবদুল হাকীম এই উভয় ভাষ্যের হ'াশিয়া লিখিয়াছেন। প্রথমটির নাম "আল-হ'াশিয়াতু 'আলা ক'ুত্'বী' এবং দ্বিতীয়টির নাম আল- হ'াশিয়াতু 'আলা মীর ক'ুত'বী অথবা 'হ'াশিয়াতুশ্-শাম্সিয়্যা নামে বিখ্যাত। গ্রন্থগুলি যুক্তিবিদ্যার সূক্ষ্ম বিতর্কিত প্রশ্নাদি সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনায় পরিপূর্ণ। এইসব ভাষ্য তিনি স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ আল-লাবীব-এর অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ...... ভাষ্যগুলি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "এইগুলি এমন এক সম্পদে পরিণত হইয়াছে যাহার উপকারিতা অসংখ্য এবং এমন সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে যাহার মুক্তাসমূহ অতুলনীয়"।

'আরবী ব্যাকরণ (নাহ্'ও) : ইব্ন হ'াজিব প্রণীত 'আল-কাফিয়া' 'আরবী ব্যাকরণের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহার বহু সংখ্যক ভাষ্য লিখিত হইয়াছে। তবে মুল্লা জামী-র ভাষ্যই বেশী প্রসিদ্ধ। মুল্লা জামীর শিষ্য ছিলেন মুল্লা 'আবদুল-গ'াফূর লারী। তিনি শারহ্'-ই-জামীর একটি অসম্পূর্ণ হ'াশিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন। আবদুল-হাকীম উক্ত অসম্পূর্ণ হ'াশিয়া সম্পূর্ণ করেন। তাহার পর লারীর হ'াশিয়াকে আরও সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার একটি অতিরিক্ত হ'াশিয়া রচনা করেন। এই হ'াশিয়া দুইটি 'হ'াওয়াশী আবদুল গ'াফূর আল-লারী' ও হ'াশিয়া আল -হাশিয়াতি 'আবদি'ল-গ'াফূর নামে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত 'আবদুল-হাকীম শারহ্-ই জামীর একখানা স্বতন্ত্র ভাষ্যও (হ'াশিয়া আলা শারহ' জামী) রচনা করেন।

অলংকারশাস্ত্র (বালাগ'াত) : অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবনকারী ও তাহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যাদাতা যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পাক-ভারত উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার নাম আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী। তিনি মুল্লা সা'দুদ্দীন তাফ্তাযানী প্রণীত 'আল-মুত'াওওয়াল' নামক গ্রন্থের অত্যন্ত বিশদ ও কার্যোপযোগী একখানি হাশিয়া লিখিয়াছেন, নাম 'হ'াশিয়াতুন 'আলাল-মুত'াওওয়াল', আস্তানা ১২৯০ হি.। গ্রন্থটি তুরস্ক ও পাক-ভারত উপমহাদেশের আলিম সমাজের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

তরজমা : গুন্য়াতুত-তালিবীন শায়খ 'আবদুল-কাদির জীলানীর একটি বিশ্ব-বিখ্যাত রচনা। আবদুল-হাকীম তাঁহার সমসাময়িক একজন নামকরা সূফী শায়খ বিলাওয়াল কাদিরী লাহোরীর অনুরোধে ফারসী ভাষায় উহার তরজমা করেন। তরজমার শুরুতে আবদুল্লাহ আল-লাবীব লিখিত একটি ভূমিকা রহিয়াছে যাহাতে উক্ত হইয়াছে, এই তরজমা শায়খ জীলানীর রূহ'ানী অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে।

'ইলমুল-কালাম : ইলম কালাম সম্পর্কে দুইটি বিখ্যাত পুস্তক রহিয়াছেঃ আল-'আক'াইদুন-নাসাফিয়্যা (ইমাম নাজমুদ্দীন আবূ হ'াফস 'উমার ইব্ন মুহ'াম্মাদ আন-নাসাফী প্রণীত) ও আল-আক'াইদুল-আদু'দিয়্যা (কাযী 'আদু'দুদ্দীন আবদুর রাহ'মান ইব্ন আহ্'মাদিল-আয়জী প্রণীত)। মুল্লা সা'দুদ্দীন মাসঊদ তাফতাযানী 'আক'াইদ নাসাফী-র ভাষ্য ও মুল্লা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ আদ-দাওয়ানী 'আক'াইদ আদুদীর ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য দুইটি (মূল পাঠ ও হ'াশিয়াসহ) ইলম কালাম-এর অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইসলামী বিদ্যালয়সমূহে উহাদের অধ্যয়ন ইলম কালাম-এর অপরিহার্য পাঠ্য। পরবর্তী আলিম সম্প্রদায় ইহাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং ইহাদের অসংখ্য ভাষ্য ও হ'াশিয়া প্রণীত হয়। আবদুল হাকীমও ইহাদের অতিরিক্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা দানের কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করেন। তিনি আকাইদ আদুদিয়্যা-র হাশিয়া দাওওয়ানীর ভাষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করেন। আল আকাইদুন নাসাফিয়্যার হাশিয়া আহ'মাদ ইব্ন মূসা আল-খায়ালী প্রণীত শারহু'ত-তাফ্তাযানী-র উপর ভিত্তি করিয়া তিনি রচনা করেন (হ'াশিয়া

'আলা হ'াশিয়াতিল-খায়ালী পুস্তকটি আস্তানা, দিল্লী ও কাযান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে)। খায়ালীর ভাষ্যের উপর অনেক হাশিয়া লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আবদুল-হাকীমের হ'াশিয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই টীকাকার সমস্ত কঠিন বিষয়ের এমন সমাধান দিয়াছেন যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে খায়ালীর গ্রন্থ সহজবোধ্য হইয়া গিয়াছে।

'আদুদুদ্দীন আল-আয়জীর আর একটি যুগ-বিখ্যাত রচনা আল-মাওয়াকি'ফ। সায়্যিদ শারীফ আল-জুরজানী উহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন, উহা শারহু'ল-মাওয়াকি'ফ নামে বিখ্যাত। এই ভাষ্যটির আবার অসংখ্য ভাষ্য, টীকা, টীকার উপর টীকা রচিত হয়। শারহু'ল-মাওয়াকি'ফ-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশদ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় লেখকও ছিলেন এই সিয়ালকোটী (হাশিয়া আলা শারহিল-জুরজানী, আস্তানা ১২৬৯ হি.)।

'আবদুল-হাকীম-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'আর-রিসালাতুল-খাক'ানিয়্যা'। ইহা 'আদ্-দুররাতুছ-ছ'মীনাতু ফী ইলমিল ওয়াজিবি তা'আলা" নামেও পরিচিত। মাওলানা আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী স্বরচিত পুস্তক 'আছ ছ'াক'াফাতুল-ইসলামিয়্যা ফিল-হিন্দ' গ্রন্থে (পৃ. ২৩৮) 'ইল্‌ম কালাম সম্পর্কীয় পুস্তকের প্রসংগে আবদুল হাকীম-এর ভাষ্যটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থটির রচনার কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লিখিত হইয়াছে। ইরানের শাহ স'াফী ইনতিকাল করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শাহ আব্বাস সিংহাসন আরোহণ করেন। মারহূম বাদশাহের মৃত্যুতে শোক ও শাহ আব্বাসের সিংহাসন আরোহণে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশে সম্রাট শাহজাহান ইরানে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। সেই সময় উপমহাদেশকে বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লালনকেন্দ্র গণ্য করা হইত। ইরানের ওয়াযীর আ'জাম (খালীফার সুলতান) ই'তিমাদুদ্-দাওলা এক জ্ঞানী সম্মেলনীতে শাহজাহান প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সদস্যগণকে প্রশ্ন করেন, ইমাম গাযালী বিশ্বের প্রাচীনত্ব, আল্লাহর জ্ঞান ও দৈহিক পুনরুত্থানের অগ্রাহ্যতা প্রসঙ্গে দার্শনিকদের বিরোধিতা করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন আলিম এই সকল প্রশ্নে ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। এই বিষয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত কি? ... প্রতিনিধি দলের সদস্য মুহাম্মাদ ফারূক' (মুশারিফ) ও মুহি'ব্ব 'আলী (বিবরণ লেখক) এই সমস্ত সূক্ষ্ম প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই। শাহজাহানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছা মাত্র তাঁহার ওয়াযীর আ'জ'াম মুল্লা সা'দুল্লাহ খান মুল্লা 'আবদুল হাকীমকে উপরিউক্ত প্রশ্নত্রয় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা রচনা করত দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন যাহাতে উহা ইরানে প্রেরণ করা যায় (মুল্লা সা'দুল্লাহ খানের এই পত্রের জন্য দেখুন ফিহ্‌রিস্ত মাখতূ'ত'াত নাদিরা, আসাফিয়্যা কুতুবখানা, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৫৭ হি., ২খ., ৩১৯)। মুল্লা আবদুল হাকীম তাঁহার 'আর-রিসালাতুল-খাকানিয়্যা-র শেষ দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে বিশ্বের নবত্ব, প্রাচীনত্ব, দৈহিক হ'াশর ও পুনরুত্থান সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রধানত উহার ধারা ছিল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কে। এই কারণে পুস্তকটি 'আল্-খাকানিয়্যা ফী মাব্‌হাছিল 'ইল্‌ম্' ও 'রিসালা আবদুল-হাকীম আস্-সিয়ালকোটী ফী ইলমিল-ওয়াজিবি তা'আলা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মুল্লা 'আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী আল্লাহ তা'আলার আবশ্যিক জ্ঞান বিষয়ক আলোচনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেনঃ (১) প্রথম আলোচনা উহার সমর্থনে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের প্রত্যায়ন সম্পর্কে); (২) দ্বিতীয় আলোচনা তাঁহার জ্ঞান কী ও কেমন সেই বিষয়ে; (৩) তৃতীয় আলোচনা তাঁহার জ্ঞানের সর্বব্যাপকতা সম্পর্কে।

আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অস্তিত্বের সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন, কতিপয় প্রাচীন দার্শনিক ব্যতীত সকল বিদ্বানই ইহা মানিয়া লইয়াছেন যে, দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাহাদের বক্তব্য, যদিও আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার সৃষ্টি ঘটিয়াছে তাঁহার অজ্ঞাতে। ইহার দৃষ্টান্ত সূর্যের মত যাহার কিরণরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে, কিন্তু সূর্য স্বয়ং তাহার এই বিশ্বব্যাপী গুণ সম্পর্কে অবহিত নহে। বিশ্বকে আলোকিত করিবার ব্যাপারে তাহার কোন সাত্তিক বা সচেতন ইচ্ছার অবকাশ নাই, বরং এই কার্য তাহার প্রকৃতিজাত অর্থাৎ অস্তিত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। মুল্লা আবদুল-হাকীম প্রাচীন দার্শনিকদের এই অদ্ভুত ও বিরল মতবাদের অখণ্ডনীয় জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ইহা স্বীকার করা হয়, আল্লাহ তা'আলার সত্তা জ্ঞানহীন এবং স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞান নাই তবে ইহার অর্থ হইবে যে, (আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন) তিনি জ্ঞান দ্বারা ভূষিত নহেন। ইহা এমন একটি কথা যাহা কোন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রাচীন দার্শনিকদের আরও একটি প্রমাণ রহিয়াছে। তাহারা বলেন, জ্ঞান একটি সম্পর্ক এবং যে কোন সম্পর্ক দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে স্থাপিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ঃ জ্ঞানী ও জ্ঞেয়। আল্লাহ তা'আলা যদি জ্ঞানী হন তাহা হইলে স্বীয় সত্তা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকিতে হইবে। এই কথাটি বুদ্ধির পরিপন্থী। কারণ ইহাতে আল্লাহ্‌র দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। মুল্লা আবদুল-হাকীম এই আপত্তির দুই পন্থায় জবাব দিয়াছেন। প্রথম কথা, জ্ঞান সম্পর্ক নহে, বরং 'সম্পর্ক সত্তার গুণ'। দ্বিতীয়ত, যদি জ্ঞানকে সম্পর্কও স্বীকার করা যায়, তবুও কোন বিপত্তির কারণ নাই এবং ইহাতে আমাদের আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে 'দ্বিত্ব'-এর শিকার হইতে হয় না। কারণ একই বস্তু যুগপৎ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার ধারক হইতে পারে।

অন্য আলোচনাটি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কীয়। মুল্লা 'আবদুল-হাকীম বিভিন্ন মতবাদ পেশ করত লিখেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞান হয় তাঁহার নিজস্ব সত্তা বা পৃথক কোন বস্তু। যদি কোন পৃথক বস্তু হয়, তবে হয় আত্মনির্ভর হবে, না হয় আল্লাহ তা'আলার সত্তার উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন দার্শনিকদের বক্তব্য, আল্লাহ্‌র জ্ঞান তাঁহার নিজস্ব সত্তাই। কিন্তু আশা'ইরার মত, আল্লাহর জ্ঞান তাঁহার সত্তার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে আশা'ইরার মত, "নিজস্ব সত্তাও নয় বা অপরও নয়। প্ল্যাটো আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, উহা 'স্বর্নিভর সত্তা'। তৃতীয় আলোচনা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতা সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান কি কেবল বড় বড় বিষয়ে সীমাবদ্ধ, না ছোট বড় সব উহার আয়ত্তে? মুল্লা 'আবদুল-হাকীম লিখিয়াছেন, সমস্ত ধর্মের অনুসারিগণই এই বিষয়ে একমত, আল্লাহ সব

কিছুই জানেন, উহা বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক, আংশিক হউক বা সার্বিক হউক। অপরপক্ষে অধিকাংশ দার্শনিক আল্লাহ তা'আলার আংশিক জ্ঞান অস্বীকার করেন।

মুল্লা আবদুল-হাকীম নিজে বিশ্বাস করিতেন, সার্বিক বা আংশিক সমস্তই আল্লাহ্র জ্ঞানের আয়ত্তে এবং উহা প্রকাশ্যে অস্বীকার করিলে শাস্ত্র ও ইজমা'-কে প্রত্যাখ্যান করা, এমনকি পরিণামে শারী'আতকে বাতিল করা হয়, তাহা সত্ত্বেও এই বিষয়ে ব্যাখ্যা (তা'বী'ল)-এর অবকাশ রহিয়াছে।

কিয়ামত, শারীরিক পুনরুত্থান, বিশ্বের নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম গাযালীর মত (দার্শনিকদের প্রত্যাখ্যান) পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উলামা ও মুসলিম দার্শনিকদের মতামতও উল্লেখ করিয়াছেন এবং মুহ'াক্কিক্ দাওয়ানী ও ইমাম রাযীর মতামত বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার পর নিজের মত নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ কিরয়াছেন ঃ

আমার বক্তব্য, দৈহিক পুনরুত্থান অস্বীকার করত তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কেননা কুরআন মাজীদের সূরা ইয়াসীন-এর শেষাংশে স্পষ্ট ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। মুহ'াক্কি'ক দাওয়ানী-র বিশ্বাস, দৈহিক পুনরুত্থান ও বিশ্বের নিত্যতা পরস্পর বিরোধী মতবাদ। উভয়কে একসঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব (বিশ্বের নিত্যতা ও দৈহিক পুনরুত্থান-এর সমন্বয় অসম্ভব)। দাওয়ানীর-র এই মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া মুল্লা 'আবদুল-হাকীম নিজের দাবি উহার প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় আকাশের খণ্ডবিখণ্ড ও ধ্বংস হওয়ার কথা বিবৃত আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেনঃ

"আমি বলি, উভয় মতবাদের সমন্বয় অসম্ভব। কারণ হাশর সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সমুদয় আসমানের বিচূর্ণ, ধ্বংস হওয়া এবং ভাঁজ করার কথা রহিয়াছে। অপরপক্ষে যাঁহারা বিশ্বের নিত্যতায় বিশ্বাসী তাঁহারা উহার ধ্বংস দূরে থাকুক, উহাতে ছিদ্র করা পর্যন্ত অসম্ভব মনে করেন"।

আল্লাহর জ্ঞান (ও অন্য সদ্‌গুণাবলীর)-র প্রশ্ন গ্রীক দর্শন প্রভৃতি মুসলিম দার্শনিক ও আলিমদের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতেই আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সর্বপ্রথম ইমাম গাযালীই এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার পর অন্য উলামা' উহার অগ্রগতি সাধন করিতে থাকেন। অবশেষে মুল্লা আবদুল-হাকীম 'আর-রিসালাতুল-খাকানিয়্যা' রচনা করেন। পরবর্তী সুধিগণও এই বিষয়ের চর্চা জারী রাখেন। তবে মনে হয় যেন তাঁহাদের সকলেই মুল্লা আবদুল-হাকীমের পুস্তিকা দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তর্কশাস্ত্রের বিখ্যাত ভারতীয় রচনা 'সুল্লামুল-'উলূম' (মুল্লা মুহি' বব্বুল্লাহ বিহারী, মৃ. ১১১৯ হি., প্রণীত) এবং উহার বিখ্যাত ও সুপরিচিত ভাষ্যসমূহে 'আর-রিসালাতুল-খাকানিয়্যা'-র বিশিষ্ট উপাদানসমূহই নব নবভাবে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কাদী মুবারাক (মৃ. ১১৬২ হি.), মুল্লা হ'াসান (ম. ১১৯৯ হি.) ও সাম্প্রতিক কালে বাহরুল-উলূম (মৃ. ১২৩৫ হি.), মাওলানা 'আবদুল-হ'াকীম ফিরিঙ্গী মাহাল্লী (মৃ. ১২৮৫ হি.) এবং আরও অনেকে এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, মুল্লা আবদুল-হাকীমের 'আর-রিসালাতুল-খাকানিয়্যা' সকলেরই পথের জ্যোতি ছিল এবং সকলেই উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের ন্যায় মুল্লা 'আবদুল-হাকীমেরও জনহিতকর ভবন নির্মাণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু স্থান সিয়ালকোটে তাঁহার নির্মিত কয়েকটি ভবন আজ তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইবার পরেও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার নির্মাণমূলক আগ্রহের প্রমাণ দিতেছে। সিয়ালকোট শহরের নিকটেই তাঁহার বাসস্থান মিয়ানাপুরে তিনি একটি বিরাট মাদ্‌রাসা ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই সেই মাদ্‌রাসা যেইখানে কেবল এই উপমহাদেশেরই নহে, বরং বিদেশ হইতেও বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী আসিয়া ভিড় করিত। এই মাদ্‌রাসায় তাহাদের বিনা খরচে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং তাহারা কেবল নিজস্ব ব্যক্তিগত খরচ বহন করিত। এই মসজিদ আজও সিয়ালকোটের তাহসীল বাজারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার নির্মাণ তারিখ ১০৫২/১৬৪২ সন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (ড. গুলাম মুহ'য়িদ-দীন সূ'ফী ঃ Kashir কাশির, পৃ. ৩৭৮)। মসজিদ ও মাদ্‌রাসা ব্যতীত একটি পান্থনিবাস, হ'াম্মাম, একটি বিশাল দীঘি ও একটি প্রকাণ্ড ঈদগাহ সিয়ালাকোটের এই মহান পুরুষের স্মৃতি বহন করে। ইহাদের মধ্যে দীঘি ও ঈদগাহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-হামীদ লাহোরী, পাদশাহ নামাহ্, কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ.; (২) আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী (লাখনাবী), আছ-ছাকাফাতুল-ইসলামিয়্যা ফিল-হিন্দ, দামিশক ১৩৭৭ হি.; (৩) আবদুল-রাহমান অমৃতসরী, সিয়াহাত-ই হিন্দ, লাহোর ১৯০৯ খৃ.; (৪) সাবাহুদ্দীন, বাযম-ই তায়মূরিয়্যা, আজমগড় ১৩৬৭ হি.; (৫) গুলাম মুহাম্মাদ আবদুস-সামাদ, তাওয়ারীখ-ই সিয়ালকোট, সিয়ালকোট ১৮৮৭ খৃ.; (৬) ডক্টর সায়্যিদ আবদুল্লাহ, চন্দরভান ব্রাহ্‌মান, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিন, লাহোর, আগস্ট ১৯২৮; (৭) মিরযা আহমাদ বেগ লাহোরী, মাকামাত-ই হাজ্জী বাদশাহ (পাণ্ডুলিপি আহমাদ হুসায়ন কিলাদারীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার) গুজরাত; (৮) উমী চান্দ, তাওয়ারীখ-ই সিয়ালকোট; (৯) বাহাউল-হাক্ক কাসিমী, তাযকিরা-ই আসলাফ, লাহোর ১৩৮১ হি.; (১০) বাখ্‌তাওর খান, মিরআতুল-'আলাম, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিন, লাহোর আগস্ট-নভেম্বর ১৯৫৩; (১১) এম. এস. কমশীরেট Imperial mughal Farmans in Gujerat, Journal of the University of Bombay, ৯খ., ১ ভাগ, জুলাই ১৯৪০; (১২) দারাশিকূহ সাফীনাতুল-আওলিয়া (পাণ্ডুলিপি), অধ্যাপক আহ্‌মাদ হুসায়ন কিলাদারী; (১৩) হাফিজ গুলাম মুরতাদা, শারহ সুল্লামুল-উলূম, মা'আরিফ পত্রিকায়, আজমগড় ৯৩খ., ৬ষ্ঠ সং.; (১৪) গুলাম সার্‌ওয়ার চিশ্‌তী, খাযীনাতু'ল-আসাফিয়া, লাখনৌ ১৮৭৩ খৃ.; (১৫) এস. এম. ইকরাম, রূদ-ই কাওছ'ার, লাহোর ১৯৫৮ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, Hstory of Muslim Civilization in India and Pakistan, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (১৭) ডক্টর ইকবাল হুসায়ন, চন্দরভান ব্রাহ্‌মান, Islamic Culture, হায়দরাবাদ ১৯৪৫ খৃ.; (১৮) ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী, হাদয়াতুল-'আরিফীন, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ.; (১৯) মুহাম্মাদ খায়রুদ্দীন এলাহাবাদী, তায'কিরা-ই 'উলামাই-ই জৌনপুর, পাণ্ডুলিপি,

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লাহোর; (২০) মুহাম্মাদ সালিহ কান্জাহী, সিলসিলাতুল-আওলিয়া, পাণ্ডুলিপি, আহমাদ হুসায়ন কিলদারী; (২১) কালীমুল্লাহ ও আবদুল-কারীম কিলাদারী, তাযকিরা-ই হানাফিয়্যা; (২২) মুহাম্মাদ মিয়াঁ দেওবন্দী, উলামা-ই হিন্দ কা শানদার মাদী, দিল্লী ১৯৬৪ খৃ.; (২৩) খাওয়াজা মুহাম্মাদ আজাম, তারীখ-ই কাশমীর আজামা, লাহোর ১৩০৩ হি.; (২৪) মুহাম্মাদুদ্দীন লাহূরী, রাওদাতুল-উদাবা, লাহোর ১৮৭৮ খৃ.; (২৫) মুহাম্মাদ ফাদিল আকবারাবাদী, মাখ্বারুল-ওয়াসিলীন, মুসতাফাঈ প্রেস; (২৬) আবূ মুহাম্মাদ মুহয়িদ্দীন, তারীখ-ই কাবীর-ই কাশ্মীর, অমৃতসর ১৩২২ হি.; (২৭) শাহ নাওয়ায খান, মাআছি'রুল-উমারা কলিকাতা ১৮৮৮ খৃ.; (২৮) মুহাম্মাদ সাকী মুস্তাইদ খান, মাআছির-ই আলামগীরী, কলিকাতা ১৮৭১ খৃ.; (২৯) মু'তামিদ খান, ইকবাল নামাহ-ই জাহান্গীরী, কলিকাতা ১৮৬৫ খৃ.; (৩০) আবুল-হাসানাত নাদ্বী, হিন্দুস্তান কী ক'াদীম ইসলামী দার্সগাহে, অমৃতসর ১৩৪১ হি.; (৩১) মুহাম্মাদ হায়াত নাওশাহী, তাযকিরা-ই নাওশাহিয়া (পাণ্ডুলিপি, আহমাদ হুসায়ন কিলাদারী); (৩২) রাশীদ নিয়ায, তারীখ-ই সিয়ালকোট, শিয়ালকোট ১৯৫৮ খৃ.; (৩৩) ডক্টর জি. এম. ডি. সূফী, Kashmir, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (৩৪) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্লাবী, আনফাসুল-'আরিফীন, দিল্লী ১৯১৮ খৃ.; (৩৫) আয্-যিরিকলী, আল-আলাম, কায়রো ১৯২৭ খৃ.; (৩৬) আমীনুল্লাহ ওয়াছ্'ীর আল-রিসালাতুল-খাক'ানিয়্যা, Journal of the Research Society of Pakistan, লাহোর, ২ বালাম, খণ্ড ২, এপ্রিল ১৯৬৫ খৃ.; (৩৭) ঐ লেখক, মাওলানা আবদুল-হাকীম সিয়ালকোটী, মাসিকপত্র ছাকাফাত, লাহোর, এপ্রিল-জুন ১৯৬৭.; (৩৮) ঐ লেখক, আর-রিসালাতুল-খাক'ানিয়্যা, মাসিকপত্র ইরশাদ, সিয়ালকোট, মে-জুন ১৯৭৩; (৩৯) ঐ লেখক, Mulla Abdal-Hakim of Sialkot, his life and works (গবেষণামূলক সন্দর্ভ যাহা পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ১৯৬৯ খৃ. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা হয়); (৪০) শাব্বীর আহমাদ খান, আদ-দুররাতুছ'-ছ'ামীনা (ইংরেজী ভাষায়) Journal of the Research Society of Pakistan, লাহোর, অকটোবর ১৯৬৪ খৃ.।

আমীনুল্লাহ ওয়াছ্'ীর (দা.মা.ই.) / আবদুল হক ফরিদী

আবদুল হামিদ খান ভাসানী (عبد الحميد خان بهاشانى) ঃ পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল হামিদ খান, মাওলানা ভাসানী নামেই দেশে-বিদেশে সুপরিচিত। বিপ্লবী জননেতা, জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সংগ্রামী রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশে রব্বানী হুকূমাত প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক। সিরাজগঞ্জ জেলার সাবেক পাবনা ধানগড়া গ্রামে ১৮৮০ সালে এক কৃষিজীবী পরিবারে জন্ম। তিনি তাঁহার পিতা-মাতার তিন পুত্রের অন্যতম। তাঁহার একজন ভগ্নিও ছিলেন। আবদুল হামিদ খান ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা শরাফত আলী খানের মৃত্যুর অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার সকল ভ্রাতা-ভগ্নি মারা যান। আবদুল হামিদ খানের লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁহার মাতা ও চাচাদের উপর।

আবদুল হামিদ খানের অভিভাবকগণ তাঁহাকে সিরাজগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে চঞ্চল বালক আবদুল হামিদ খানের পক্ষে বেশী দূর লেখাপড়া করা সম্ভব হয় নাই। লাঠিখেলা, যাত্রা ও কবিগানের আসর তাঁহাকে মাদ্রাসার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইত। সেইকালে যাত্রা ও কবিগান ছিল প্রধানত প্রচারমূলক ও কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটিশ বিরোধী। আবদুল হামিদ খানের কিশোর মন ইহাতে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাতে জনগণের সুখ-দুঃখের সহিত কৈশোর হইতেই তাঁহার একাত্মতাবোধ জন্মে। এই সময়ে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার শক্তি উপলব্ধি করেন।

তিনি যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে শৈশব হইতেই জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ইহাদের শোষণ ও জুলুম হইতে দেশের মজলুম ও বঞ্চিত মানুষকে বাঁচাইবার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে সৃষ্টি হইতে থাকে। সংগ্রামী চেতনা তাঁহাকে বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী করিয়া তোলে। এই সময়ে স্থানীয় জমিদার-মহাজনগণ তরুণ আবদুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হইলে তাঁহার শিক্ষক মওলানা আবদুল বাকীর পরামর্শে তিনি সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করেন। ইহার পর শাহ সায়্যিদ নাসিরুদ্-দীন বাগদাদীর সাহচর্যে তিনি প্রথমে মোমেনশাহীর উপকণ্ঠে কাস্পা গ্রামে সাড়ে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁহার সংগেই তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে আসামের ধুবড়ী মহকুমার জলেশ্বর যাত্রা করেন। তিনি জলেশ্বরে থাকাকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার মুর্শিদ শাহ্ সাহেব ছিলেন একজন কামিল সূফী। আবদুল হামিদ খানের তরুণ বয়সে শাহ সাহেবের দীর্ঘ সাহচর্য তাঁহার চিত্তকে আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত করিয়া তোলে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের জন্য আবদুল হামিদ খান ১৯০৭ সালে দেওবন্দ (দ্র.) যান। এইখানে দুই বৎসর অবস্থানকালে তিনি শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্লাবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হন। ১৯০৯ সালে জলেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আবদুল হামিদ খান বুঝিতে পারিলেন ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সংগে সম্পর্কিত সকল ক্রিয়াকাণ্ডই ইহার পরিমণ্ডলে পড়ে। তাই রাজনীতিকে বাদ দিয়া ইসলামের জীবন পদ্ধতি সফল হইতে পারে না। এইজন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানবতার মুক্তি আনয়নের জন্য তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৯১৮ সালে জীবনের প্রথম হজ্জ উদ্যাপনের পর তিনি দেশে ফিরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করেন। স্বরাজ আন্দোলন, কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন তখন প্রবল। মাওলানা এইসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি জীবনের প্রথম কারাবরণ করেন ১৯১৯ সালে। ১৯২৩ সালে জলেশ্বর ত্যাগ করিয়া তিনি আসামের ভাসান চর-এ বসতি স্থাপন করেন। ভাসান চরে অবস্থানকালে তিনি কিছুকাল কাগমারীর গহীন জংগলে অতিবাহিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে মাওলানার আসাম জীবনের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল এই ভাসান চর। এই ভাসান চর হইতেই পরবর্তী কালে তাঁহার নামের সংগে 'ভাসানী' শব্দটি যুক্ত হইয়াছে। জমিদার মহাজনের শোষণ-জুলুম, বাড়ী-ঘর হইতে উৎসাদিত ও নদী-ভাংগনে সর্বহারা রংপুর, দিনাজপুর, মোমেনশাহী ও ফরিদপুর জেলার হাজার হাজার ছিন্নমূল কৃষক বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে আসামে প্রবেশ করিতে শুরু করে। কোথাও বা জংগল কাটিয়া, পতিত জমি আবাদ করিয়া, কোথাও বা জমি খরিদ করিয়া তাহারা আসামে বসবাস করিতে থাকে। আসামে লক্ষ লক্ষ একর জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে, সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে এই খবর প্রচারিত হইতে থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আসামের বিভিন্ন জেলায় বহিরাগতরা বসতি স্থাপন করিয়া আসামকে শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রথমদিকে ইহাদের আগমন অভিনন্দিত হইলেও কালক্রমে আসামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ শ্রেণীটি আতংকিত হইয়া উঠে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও আদি অধিবাসীদেরকে ইহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে থাকে। সরকারকে ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই শ্রেণীটি চাপ সৃষ্টি করে। আসাম সরকার তখন আসামের আদি অধিবাসীদের স্বার্থে একটি 'কলোনাইজেশন স্কীম' প্রবর্তন করে। এই স্কীম অনুযায়ী বহিরাগতরা কোথায় বসতি স্থাপন করিবে তাহা চিহ্নিত করিবার দায়িত্ব কলোনাইজেশন অফিসারের উপর অর্পিত হয়। এইখান হইতেই 'লাইন প্রথা'র সূচনা। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ তারিখের এক পত্রে দেখা যায়, কামরূপের ডেপুটি কমিশনার এক সীমারেখা টানিয়া বহিরাগতদের বসবাসের জন্য এলাকা চিহ্নিত করিয়া দেন। ১৯১৯ সালের মার্চ তারিখের আর একটি পত্রে দেখা যায়, নওগাঁর ডেপুটি কমিশনারও অনুরূপ নির্দেশ জারী করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই কুখ্যাত 'লাইন প্রথার' পটভূমিকা (এ. জেড. আবদুল্লাহ্, লাইন প্রথার পটভূমিকা)।

বিশ শতকের চতুর্থ দশকে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বয়স্কদের ভোটাধিকার ভারতীয় রাজনীতি চিন্তা-ভাবনার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। লাইন প্রথা দ্বারা আবাদ নিয়ন্ত্রিত হইল বটে, কিন্তু সর্বহারা বহিরাগতদের আগমন ও বসতি স্থাপন স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। আইনত ভারতের যে কোন নাগরিকেরই ভারতের যে কোন প্রদেশে সম্পত্তি ক্রয় ও বসতি স্থাপনের অধিকার আছে। সর্বহারার দল বাংলাদেশ হইতে এই অধিকারেই জীবন ও জীবিকার তাগিদে আসামের অনাবাদী ও পতিত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহাতে স্থানীয় কায়েমী স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়ে এবং বহিরাগতদের নিকট জমি বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য দাবি তোলে। বহিরাগতদের শতকরা নব্বইজনই মুসলমান। ইহাদের প্রবেশ বন্ধ করিতে না পারিলে বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিক রাজনীতি তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আসামে মুসলিম প্রাধান্য অনিবার্য হইয়া উঠিবে, এই আশংকায় তাহারা বহিরাগতদের আসাম হইতে বিতাড়নের জন্য 'বাংগাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে এবং সর্বত্র লাইন প্রথা প্রবর্তনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ফলে গহীন অরণ্য সাফ করিয়া, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের সাথে মরণপণ লড়াই করিয়া যাহারা আসামের পতিত ও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী অঞ্চলগুলিকে ধনধান্যে সোনার এলাকায় রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহারা ইতিহাসের জঘন্যতম নির্মমতার শিকার হইয়া পড়িল। মাওলানা ভাসানী এই বিপন্ন মানবগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার জন্য অমিত বিক্রমে সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সংগ্রামের শুরুতে ইহাদের সংগঠিত করিয়া একটি দুর্বার রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা ছিল তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা ও নেতৃত্বের এক অনন্য নিদর্শন (পৃ. গ্র.)।

এই সময় আসামের গৌরীপুরের হিন্দু মহারাজা তাঁহার জমিদারীতে গরু জবাই বন্ধ করিয়া দিলে মওলানা ভাসানী মুসলমানদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে তুমুল আন্দোলন শুরু করেন এবং লাইন প্রথা ভংগ করেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন চলিতে থাকে। মাওলানা ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তাঁহার ডাকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সারা প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে এবং মাওলানাসহ হাজার হাজার কর্মী কারাবরণ করেন। আসামে তখন কংগ্রেসী শাসন চলিতেছিল। সিলেটে কোতয়ালী থানায় মুসলিম লীগ পতাকা উত্তোলন করিতে গিয়া আলকাছ নামক এক কর্মী কংগ্রেসী সরকারের গুলিতে শহীদ হন।

মজলুম মানুষের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি জীবনে বহু সম্মেলন সংগঠিত করেন। ভাসান চরের ১৯২৩ সালের সম্মেলন ইহাদের অন্যতম। তখন হইতেই তিনি ভাসান চরের মাওলানা তথা 'মাওলানা ভাসানী' নামে পরিচিত হইয়া উঠেন। তাঁহার পরবর্তী সম্মেলনগুলির মধ্যে সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক কাওয়াখোলা সম্মেলন (১৯৩২), পোড়াবাড়ী সম্মেলন (১৯৪৬), কাগমারী সম্মেলন (ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭), মহীপুর ও সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেকসিং সম্মেলন (১৯৭০), পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলন (১৯৭১), সন্তোষে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সম্মেলন (৯ জানুয়ারী,'৭১), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১২ ডিসেম্বর, '৭৩), চাষী সম্মেলন (৭-১২-৭৫) ও তাঁহার জীবনের সর্বশেষ 'খোদায়ী খিদ্‌মতগার' সম্মেলন (১৩-১১-৭৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা ভাসানী আসামে বসতি স্থাপন করিলেও রাজনৈতিক কারণে ও কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিম বংগ, দিল্লী, বোম্বাই, দেওবন্দ, রামপুর, আমরূহা, লাহোর, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়াছেন। তিনি একাদিক্রমে এগার বৎসর আসাম আইন সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আসাম প্রাদেশিক পরিষদে বাংগালীদের জন্য নয়টি আসন সংরক্ষিত হয়। তিনি আসামে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, পশু হাসপাতালসহ তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাঁহার ভক্তরা কাগমারীর নামকরণ করেন 'হামিদাবাদ'।

কংগ্রেসের সম্প্রদায়িক চরিত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি ১৯৩৬ সনে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন। ১৯৩৫ সনে আমরূহার উলামা সম্মেলনের পর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সন হইতে

আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি থাকাকালে তাঁহার নেতৃত্বের প্রভাবে আসাম মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের এক দুর্বার আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৯৪০ সনে ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যোগদানের পর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ঐ বৎসরই তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ করেন। গণভোটে সিলেট পাকিস্তানের সাথে যোগ দেয়; এই সময় সিলেটে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা গিয়াছিল তাহার মূলে ছিল মাওলানার দীর্ঘ দিনের শ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও মাওলানা ভাসানী আসামে অবস্থান করিতেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই আসামের কংগ্রেসী বরদলই সরকার মাওলানাকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৪৭ সনের শেষদিকে তাঁহাকে আসাম হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ১৯৪৮ সনের প্রথমদিকে তিনি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল পূর্ব বংগে আগমন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হইলে তাঁহার নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে এক রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয় (১১ অক্টোবর, ১৯৪৯)। তিনি এই সময় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুদিন পর তিনি গ্রেফতার হন (১৬ অক্টোবর, ১৯৪৯)। কয়েক মাস পর জেলখানায় অনশন ধর্মঘট শুরু করিলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় (১৯৫০)। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। খিলাফাতে রাব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাশিম সারা পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর ময়মনসিংহে আসিয়া প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান করেন। ১৩৫৩ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র.), হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (দ্র.) ও মাওলানা ভাসানী সম্মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। অতঃপর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় (১৯৫৪) এবং পূর্ব বংগে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটে। এই বৎসরই মওলানা ভাসানী ইউরোপ সফর করেন এবং স্টকহোম শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৫০ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগ হইতে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষিত হয়। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে একমত হইতে না পারিয়া তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া প্রথমে কৃষক সমিতি (১৯৫৬) এবং পরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি [(ন্যাপ) (জুলাই ১৯৫৭)] গঠন করেন। ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিলে তিনি অন্তরীণ হন। মুক্তি লাভের পর তিনি মহাচীন সফর করেন (১৯৬৩) এবং পর বৎসর হাভানায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন ১৯৬৪)। ঐ বৎসরই জানুয়ারী মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুব প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের স্থলে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ডাক দেন। পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্মিলিত বিরোধী প্রার্থী হিসাবে তিনি মুহতারামা ফাতিমা জিন্নাহ্‌র নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৬৮-৬৯ সনের তদানীন্তন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনেও মাওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দান করেন। এই আন্দোলন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার ইঙ্গিত দেন (৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০)।

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক সরকার সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্বিচারে হত্যালীলা চালাইলে তিনি দেশত্যাগ করিয়া (১৬ এপ্রিল, ১৯৭১) ভারতে যান এবং সেইখানে প্রায় নয় মাস তাঁহাকে নজরবন্দী অবস্থায় কাটাইতে হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (২২ জানুয়ারী, ১৯৭২)। তৎকালীন সরকারের ক্রিয়াকলাপে ও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় মাওলানা ভাসানী বিক্ষুব্ধ হন এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখপত্রস্বরূপ তিনি 'হক কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন, ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার নামে বাংলাদেশকে শোষণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অবাধ চোরাচালানের মাধ্যমে এই দেশের সম্পদ ভারতে পাচার হইয়া যাইতেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মাদ্‌রাসা শিক্ষা উচ্ছেদের ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম হইতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ তুলিয়া দেওয়া, রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করা প্রভৃতি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী জোরালো প্রতিবাদ করেন। এই সকল কারণে তদানীন্তন সরকার তাঁহাকে সন্তোষে গৃহবন্দী করিয়া রাখে। গৃহবন্দী থাকাকালে দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার আজীবন লালিত জীবন-দর্শনের বাস্তব রূপায়ণের জন্য 'হুকুমাত-ই রব্বানীয়া' সমিতি গঠন করেন (১৯৭৪)। রব্বানী দর্শনের দর্শনিক 'আল্লামাঃ আযাদ সুবহ'নী (দ্র.)-এর নিকট মাওলানা ভাসানী পাকিস্তানে আন্দোলনের শুরুতে এই দর্শনের ভিত্তিতে একটি শোষণহীন ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন (১৯৪৬)। তরুণ বয়স হইতেই মাওলানা ইসলামকে একটি সাম্যবাদী, শোষণ ও জুলুম বিরোধী সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। সর্বহারাদের মুক্তির সংগ্রামে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির নিস্পৃহতার দরুন তিনি বামপন্থীদেরকে সংগঠিত করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বামপন্থিগণ ব্যর্থ হইলে তাঁহার জীবনের শেষ পর্যায়ে রব্বানী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য উপরিউক্ত সমিতি গঠন করেন। তিনি বলিতেন, "সব কিছুরই মৌসুম আছে। পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এখন সমাজতন্ত্রের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সময় উপস্থিত"।

ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সন্তোষে তাঁহার সহচর ও কর্মীদের প্রথম বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইতোপূর্বে চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের মহানায়ক মাও-সে-তুং-এর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি মাও-সে-তুংকে বলিয়াছিলেন, জীবনের রূহানী দিক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে বাদ দিয়া বিপ্লব কখনও চিরস্থায়ী সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মাওলানা বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাবে মাও-সে-তুং একটা বিশ্বধর্ম সম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্টকহোম ও কিউবায়

বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ইসলামের দর্শন ও বাণী বিশ্বে স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাঁহার হুকূমাতে রাব্বানিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার জীবন-দর্শন রূপায়ণের পরিণত পদক্ষেপ। সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মাওলানা ঘোষণা করেনঃ

"হুকূমতে রব্বানিয়ার মূল কথাঃ আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন। এই সমিতি সমাজতন্ত্রবাদীদের মত কেবল লা ইলাহা-ই কায়েম করিবে না, সেখানে ইল্লাল্লাহ্‌র বীজও বপন করিবে। তাহাদের কোন কাজে আত্মতুষ্টি (নফসানিয়াত) থাকিবে না। এই সমিতি যেমন হক্কুল্লাহ আদায় করিবে, ঠিক তেমনি হক্কুল ইবাদও করিয়া যাইবে। তাই এই সমিতি মানুষের যেমন বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইবে, সংগে সংগে তেমনি আত্মিক শক্তির বিকাশও ঘটাইবে। আল্লাহ 'রব' গুণে গুণান্বিত হইয়া শুধু সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছেন না— সব কিছুকেই বিশেষ উদ্দেশ্যে লালন-পালন করিতেছেন। স্রষ্টার এই পালনবাদের আদর্শই হইল রবূবিয়াত। সকল কর্মসূচী ও পরিকল্পনায় রবূবিয়াতের আদর্শ যে রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হইবে তাহাই হুকুমাতে রব্বানিয়া। সেই রাষ্ট্রে থাকিবে স্রষ্টার পালনবাদ, মানুষের শাসনবাদ নহে" (দ্র. মাওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, পৃ. ৭০-৭১)। তাঁহার আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁহার সম্পাদনায় 'World Peace' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৯৭৫)।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সীমান্তে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা শুরু হইলে (জানুয়ারী ১৯৭৬) মাওলানা ভাসানী সীমান্ত সফর করিয়া জনগণকে এই হামলা প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত করেন। ভারত কর্তৃক একতরফা ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির অভাবে যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল সংগঠিত করেন এবং নিজে মিছিল পরিচালনা করেন (মে ১৯৭৬)। ১৩ নভেম্বর, ১৯৭৬ মাওলানা তাঁহার জীবনের সর্বশেষ খোদায়ী খিদমতগার সম্মেলনে আল্লাহর সৃষ্টির খেদমতের এক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী পেশ করেন। খোদায়ী খেদমতগার সম্মেলনের কয়েক দিন পর হজ্জ করিবার জন্য তিনি মক্কা শারীফ রওয়ানা হইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু হজ্জে আর যাওয়া হইল না। মাত্র চারদিন পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। পরদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে কয়েক লক্ষ শোকাভিভূত ভক্ত ও অনুরাগীর উপস্থিতিতে মরহূমের সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঐদিনই তাঁহাকে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী সন্তোষে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশে মাওলানা ভাসানীর গঠনমূলক ও স্থায়ী কীর্তিগুলির মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলী কলেজ (কাগমারী), হাজী মুহসিন কলেজ (মহীপুর,বগুড়া), হাক্কুল-ইবাদ মিশন, শেরে বাংলা হাসপাতাল (সন্তোষ), নজরুল সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একাডেমি ও ছাত্রাবাস (সন্তোষ), সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইহার অধীনে নার্সারী স্কুল, বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ, পীর শাহ যামান পশু হাসপাতাল, উইভিং স্কুল, সেরিকালচার প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা ভাসানী প্রথম বিবাহ করেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের বগুড়ার পাঁচবিবি থানার বীর নগর গ্রামে। ইহার পর তিনি আরও দুইবার বিবাহ করেন। কিন্তু দুইজনই মাওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী আলিমা ভাসানী মাওলানার সন্তোষের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রথম ও তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভের সন্তানাদি রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন খুবই স্নেহপরায়ণ, সদালাপী ও হাস্যরসিক। তিনি আদর্শের ব্যাপারে কঠোর ও আপোসহীন ছিলেন। মাওলানা ভাসানী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আগমনের পর হইতে সন্তোষেই বসবাস করিতে থাকেন। ঐতিহাসিক চারাবাড়ী সম্মেলনের পর (১৯৪৬) তিনি পীর শাহ যামান দীঘি দখল করেন। পরগনা খোশনোদপুরে যাহা সন্তোষ নামে পরিচিত হয় উহা ছিল একটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। ঐ এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য ঐ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া পীর শাহ যামানকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে ষড়যন্ত্র করিয়া উহা প্রভাবশালী এক হিন্দু পরিবার দখল করিয়া লয় এবং সন্তোষে জমিদারীর পত্তন করে। মাওলানা ভাসানী এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন।

মাওলানা ভাসানী দীর্ঘদিন রাজনীতি করিয়াছেন, আন্দোলন করিয়াছেন এবং বহু বৎসর তিনি আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে অনেক সরকারের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ধন-লালসা ও পদের মোহ মাওলানাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহানবী (স)-এর সরলতার আদর্শকে তিনি জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আজীবন তিনি পর্ণ কুটিরে বাস করিয়াছেন, লুংগী, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর তালপাতার আঁশের টুপি পরিয়া তিনি সকল মহলে বিচরণ করিয়াছেন এবং বিদেশের রাষ্ট্রদূতগণকে তাঁহার কুটিরে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। ইসলামী সরলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে আসিয়া প্রবল প্রতাপশালী শাসকরাও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়াছেন। কথায় নহে, কাজে ও আচরণে ইসলামী জীবনাদর্শকে তিনি জীবনে প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে মাওলানা ভাসানী এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আরেফিন বাদল (সম্পা), মাওলানা ভাসানী, ১ম সং, ধানসিঁড়ি প্রকা., ঢাকা ১৯৭৭; (২) ফিরোজ আল-মুজাহিদ, মাওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ১ম সং, ঢাকা ১৯৮২; (৩) 'মজলুম জননেতা', সচিত্র স্বদেশ, জাকিউদ্দিন আহম্মদ (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ঢাকা ; (৪) নব জাগরণ, আবুল কাশেম এডভোকেট (সম্পা.), মাওলানা ভাসানীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশিত 'ভাসানী স্মরণে' সংখ্যা, ঢাকা-১৭; (৫) এ. জেড. আব্দুল্লাহ্, লাইন প্রথার পটভূমিকা, সিলেট ১৯৪৬; (৬) মাওলানা ভাসানী, রবূবিয়তের ভূমিকা, সন্তোষ, টাঙ্গাইল; (৭) ঐ, তোমরা রব্বানী হইয়া যাও, সন্তোষ, টাঙ্গাইল; (৮) ঐ, সাপ্তাহিক হক কথা, ৯৭ সংখ্যা, ১৭ নভেম্বর, সন্তোষ, টাঙ্গাইল ১৯৭৮; (৯) খন্দকার ইলিয়াস, ভাসানী যখন ইউরোপে, ২য় সং, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৮; (১০) দৈনিক দেশ, ১৭ নভেম্বর, ঢাকা ১৯৮০; (১১) আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সম্পা), ওয়ার্ল্ডপীস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল, মার্চ ১৯৭৫।

শাহেদ আলী ও আবূ সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী

'আবদুল-হামীদ ১ম (عبد الحميد–١) ঃ উছমানী সুলতান। ৫ রাজাব, ১১৩৭/২০ মার্চ, ১৭২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ যুল-কাদা, ১১৮৭/২১ জানুয়ারী, ১৭৭৪-এ তাঁহার ভ্রাতা মুস্তাফার স্থলাভিষিক্ত হন।

আবদুল-হামীদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাশিয়ার সহিত তাঁহার দেশ যুদ্ধরত। আর্থিক সংকট, বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ ও ক্রমাগত ব্যর্থতা জনিত নৈরাশ্যের কারণে তুরস্কের জন্য এই সংঘাত বন্ধ করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়ায়। একই সময় রাশিয়াতে Pugacev বিদ্রোহের ফলে রাশিয়া অবিলম্বে শান্তি স্থাপনের আহ্বানকে স্বাগত জানাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু নূতন সুলতান কোন প্রকারের একটি বিজয় ব্যতীত যুদ্ধ বন্ধ করিতে আগ্রহী ছিলেন না এবং তদনুযায়ী তুর্কী শাসকবর্গ শান্তি আলোচনার জন্য রুশ প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যান করেন। পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয় এবং Kozludja-তে তুর্কী সেনাবাহিনী পরাস্ত হয়। এই বিপর্যয় প্রধান মন্ত্রী মুহসিন-যাদা মুহাম্মাদ পাশার সদর দফতর শুমলা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং রুশ সেনানায়ক Rumjancev-এর নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন।

১২ জুমাদাল-উলা, ১১৮৮/২১ জুলাই, ১৭৭৪ সালে Kucuk Kaynardje (দ্র.) নামক শহরে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটে। উক্ত শহরের নামে পরিচিত এই চুক্তি সম্পূর্ণভাবে রুশগণের নির্দেশমত প্রণীত হয়। এই চুক্তির শর্তাবলীর অন্যতম ছিল ক্রিমিয়াকে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। ইহা ছাড়া রুশগণ Azof (আযোফ) সাগরের উপকূলবর্তী বিভিন্ন দুর্গ, বৃহৎ ও ক্ষুদ্রতর কাবারতায়-এর ভূমিসমূহ, নিপার ও বুগ নদীর মধ্যবর্তী এলাকার নিয়ন্ত্রণ, কৃষ্ণ সাগরে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা ও প্রণালীর মধ্য দিয়া বাণিজ্যিক নৌবহর প্রেরণের অধিকার লাভ করে। তবে তুরস্কের জন্য ইহার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অংশ ছিল, কয়েকটি ধারায় এমন ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাতে রাশিয়া গোঁড়া খৃস্টান তুর্কী নাগরিকগণের নিরাপত্তা বিধানের দাবি করিতে পারিত। ইহার প্রতিদানে অবশ্য খলীফারূপে সকল মুসলিম নাগরিকের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কিত অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত সুলতানের একটি দাবি রাশিয়া স্বীকার করিয়া নেয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পর অস্ট্রীয়াও তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং বুকোভিনা যাহা এতদিন মোলদাভিয়া-র অংশ ছিল, দখল করিয়া নেয় (১৭৭৫ খৃ.)।

১৭৭৪ খৃস্টাব্দে পারস্যের সৈন্য কুর্দিস্তান আক্রমণ করিলে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে মামলূক শাসনের অবসান ঘটাইবার লক্ষ্যে বাগদাদে উছমানী সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুর্কী সরকার তাহাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং পরবর্তী বৎসর পারস্যের হস্তে বসরার পতন ঘটে। ১৭৭৯ সালে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে পারস্যদেশীয়রা বসরা ত্যাগ করে এবং মামলূক সুলায়মান আগাইহা পুনর্দখল করেন এবং সেই সময় তাঁহাকে আল ইরাক-এর তিনটি পাশালীক এলাকা প্রদান করা হয় (১১৮০ হি.)।

Kucuk Kaynardje শান্তি চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয় Catherine ক্রিমিয়া অধিকারে তাঁহার লক্ষ্যে অবিচল থাকেন, অন্যদিকে তুর্কী সম্রাট এলাকাটিকে পুনরায় ইহার পূর্বাবস্থায় তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আনয়নে তৎপর হন। এই কারণে ক্রিমিয়া বিভিন্ন রুশ হস্তক্ষেপ ও সংঘাতের এলাকায় পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত শান্তি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত প্রণালী ও তুরস্কের গোঁড়া খৃস্টানগণের নিরাপত্তা বিধানসূচক ধারাসমূহ এই দুই দেশের মধ্যে বিবাদের বিষয়রূপে পরিগণিত হইতে থাকে। এক পর্যায়ে ক্রিমিয়া প্রশ্নে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে নূতনভাবে যুদ্ধ প্রায় সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ক্রিমিয়া সম্পর্কিত ধারাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যাসহ ঐ চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং ১০ মার্চ, ১৭৭৯ সালে ইস্তাম্বুলের আয়নালী-কাওয়াক-এর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে উহা স্বাক্ষরিত হয়।

কিন্তু ইহার পরে ২য় ক্যাথেরীন তুরস্কের বিরুদ্ধে ২য় জোসেফ-এর সহিত (ইনি মারিয়া থেরেসার পর অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন) এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করিয়া খান শাহীন গিরায়-এর বিরুদ্ধে ক্রিমিয়াতে বিদ্রোহ সংঘটনে ইন্ধন জোগায় এবং ইহার অজুহাতে ক্রিমিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহা রাশিয়ার অধিকারে আনয়ন করে। ১ম 'আবদুল-হামীদ এই তৎপরতায় গভীরভাবে মর্মাহত হইলেও তাঁহার নিজ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সম্পর্কে সমধিক অবহিত থাকায় ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ইহার পরেও যখন রুশ সম্রাট (Czarina) সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহার পৌত্র কনস্টানটাইন পাভলোভিচ-এর অধীনে একটি গ্রীক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তুর্কী সুলতানের পক্ষে ক্যাথেরিন ও জোসেফ-এর তুর্কী বিরোধী কার্যকলাপ আর সহ্য করা সম্ভব হইল না।

শান্তির জন্য সুলতানের গভীর আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও ক্রিমিয়ার অধিকৃত অঞ্চল প্রত্যর্পণের একটি অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রধান মন্ত্রী কোজা (Kodja) ইয়ূসুফ পাশা রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৭৮৭ খৃ.)। পরবর্তী কালে সুইডেন এই যুদ্ধে তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। কিলবুরুন (Kilburun) অভিমুখে তুর্কী নৌবহরের একটি আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং রুশগণ ওচাকভ (Ocakov) দুর্গটিকে অবরুদ্ধ করে। অবশ্য তুর্কী সেনাবাহিনী অস্ট্রীয় অভিযানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে এবং দানিউব নদীর গতিপথে পরিচালিত আক্রমণ ধারায় অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীকে ভিদিন ও স্লাটিন-এ দুইবার পরাস্ত করিয়া বানাত আক্রমণ করে। অপরপক্ষে তুর্কী নৌবহর ওচাকভ দুর্গটিকে সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘ প্রতিরোধের পর দুর্গটির পতন ঘটিলে ইহার সকল অধিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। দুশ্চিন্তা জর্জরিত আবদুল-হামীদ-এর স্বাস্থ্য ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং এই সংবাদ শ্রবণে তিনি ১১ রাজাব, ১২৩০/৭ এপ্রিল, ১৭৮৯ সালে আকস্মিক হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তিকাল করেন।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া প্রায় বৃদ্ধ বয়সে আবদুল-হামীদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একজন সফল ও উদ্যমী শাসকরূপে বিবেচনা করা যায় না। তথাপি তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী মানবপ্রেমিক ও উদার হৃদয় ব্যক্তি। সেই কালের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রিগণকে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করেন এবং তাঁহাদের

কার্যাবলী সম্পাদনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি সিরিয়াতে প্রভূত প্রভাবশালী জাহিরুল-উমারকে শাস্তি প্রদানের জন্য জেযাইরলি হাসান পাশার নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং মিসরের বিদ্রোহী মামলূক বে-গণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তাঁহার শাসনামলে তুর্কী সরকার ককেশিয়া অঞ্চল সম্পর্কে একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং Circassian গোত্রসমূহকে সভ্য করিয়া তাহাদের তুরস্কের প্রতি অনুগত করিতে চেষ্টা করেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি সোগুজুক (Soegudjuk) ও আনাপা (Anapa)-র উন্নতি সাধন করেন। অপরপক্ষে রুশগণ তাঁহার এই নীতির বিরোধিতায় জর্জিয়গণকে সমর্থন দান করে।

'আবদুল-হামীদ-এর মন্ত্রীবর্গের অন্যতম প্রধান ও সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন খালীল হামীদ পাশা। তিনি ছিলেন সংস্কারপন্থী এবং তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃদ্ধ সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে তরুণ যুবরাজ সেলীমকে (পরবর্তীতে ৩য় সেলীম) অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। তবে তাঁহার আমলেও তাঁহার উদ্যোগে কামান বাহিনীকে পুনর্গঠিত ও সুসংহত করা হয়।

'আবদুল-হামীদ-এর রাজত্বকালের কীর্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-অফিসারবৃন্দের উচ্চতর শিক্ষার জন্য রাজকীয় নৌ-প্রকৌশল বিদ্যালয়ের (মুহান্দিস্খানে-য়ি বাহ্‌রী-য়ি হুমায়ূন) প্রতিষ্ঠা এবং ইব্রাহীম মুতেফের্‌রিকার মুদ্রণালয়টির পুনঃচালুকরণ (ইহা ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল)। এতদ্ব্যতীত তিনি বসফরাস-এর তীরে বেলেরবেয়ি ও মিরগূন মসজিদ দুইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যথা গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, লংগরখানা ও ফোয়ারা ইত্যাদি স্থাপন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াস'ীফ, তারীখ, ২খ., ইস্তাম্বুল ১২১৯ হি.; (২) 'আসি'ম, তারীখ, ১খ., ইস্তাম্বুল তা. বি.; (৩) জেওদেত, তারীখ, ২খ-৪খ., ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি.; (৪) আহমাদ রাস্‌মী, খুলাস'াতুল-ইতিবার, ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি.; (৫) মুহাম্মাদ সাদিক, ওয়াকাই-ই হামীদিয়্যা, ১২৮৯ হি.; (৬) আয়ওয়ানসারায়ী হুসায়ন, হাদীকাতুল-জাওয়ামি', ২খ., ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি.; (৭) ইসমাঈল হাক্কি উযুনচারসিলি, হালিল হামীদ পাশা, Turkiyat Mec., 1936.; (৮) Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, ফরাসী অনু., ১৬ খ., প্যারিস ১৮৩৯ খৃ. ও উছমানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ; (৯) A. Sorel, La question d'Orient, প্যারিস ১৮৭৮ খৃ.; (১০) Baron de Tott, Memoires. আমস্টারডাম ১৭৮৫ খৃ.; (১১) G. Norandounghian, Recueil d'actes internation- aux de l'Empire Ottoman, ৪খ., প্যারিস ১৮৯৭-১৯০৩ খৃ.; (১২) S. H. Longrigg, Four centuries of Modern Iraq, অক্সফোর্ড ১৯২৫ খৃ., ১৮০-৯৬; (১৩) T.W. Arnold, The Caliphate, অক্সফোর্ড ১৯২৪ খৃ., ১৬৫-৬।

M. Cavid Baysun (E.I.[2]) / মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন

'আবদুল হামীদ ২য় (عبد الحميد) ঃ গাযী), ৩৬তম উছমানী সুল্‌তান এবং 'আবদুল-মাজীদ (দ্র.)-এর ৩০ সন্তানের মধ্যে ৫ম পুত্র, জন্ম বুধবার ২১ সেপ্‌টেম্বর, ১৮৪২ খৃ.। শৈশবে তিনি গম্ভীর প্রকৃতি ও স্পর্শকাতর ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল না। কথিত আছে, তিনি সংঘাতময় যৌবন অতিক্রম করত এক মিতাচারী পারিবারিক জীবনধারা অবলম্বন করেন। ফলে তাঁহাকে অন্যায়ভাবে 'পিন্‌তী হামীদ বা কন্‌জুস হামীদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। অপবাদটি কাস্‌সাব রচিত একটি প্রহসন হইতে গৃহীত। প্রথম হইতেই তিনি ধার্মিক ব্যক্তি, সূফী, গণক ও যাদুকরদের (যেমন সায়দা-র শায়খ 'আবদুর-রাহ'মান আস্‌সূর, জ্যোতিষী আবুল-হুদার আদিরূপ, যিনি পরবর্তী কালে আবদুল হামীদের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন) সাহচর্য বিশেষভাবে পসন্দ করিতেন।

১৮৭৬ খৃ. পহেলা সেপ্‌টেম্বর তিনি তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মুরাদ-এর স্থলাভিষিক্ত হন। মুরাদকে তরুণ তুর্কীদের সাহায্যে অপসারিত করা হইয়াছিল। ইহাদের নেতা ছিলেন সুবিখ্যাত মিদ্‌হ'াত পাশা (দ্র.) যিনি পূর্বে সুল্‌তান আবদুল আযীয-এর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি তখন সার্বিয়ার যুবরাজ মিলান (Milan) ও মন্টিনিগ্রো-র প্রথম নিকোলাস (Nicholas)-এর বিরুদ্ধে এক অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য শক্তির হস্তক্ষেপ রোধ করিবার উদ্দেশে মিদ্‌হাত পাশার সহিত একমত হইয়া 'আবদুল-হামীদ ইস্তাম্বুলে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্‌বান করেন। উহার উদ্বোধন তারিখেই (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃ.) তিনি এক 'খাত্‌'ত'-ই হুমায়ূন' (শাহী ফার্‌মান) জারী করেন। এই ফরমানের মাধ্যমে বুনিয়াদী সংবিধান (কানূন আসাসী) প্রবর্তন করা হয় যাহাতে দুই কক্ষবিশিষ্ট বিধান সভার পত্তন হয়। এই বিধান সভার অধিবেশন সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত আহ্‌'মাদ ওয়াফীক' পাশা (দ্র.)-এর সভাপতিত্বে ১৭ মার্চ, ১৮৭৭ খৃ. আহ্‌বান করা হয়। পরে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮-এ উহা অনির্দিষ্ট কালের (প্রকৃতপক্ষে ত্রিশ বৎসরের) জন্য মুলতবী হইয়া যায়।

'আবদুল-হামীদের শাসনামলে তুরস্ককে দুইটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। একটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে (খৃ. ১৮৭৭-৭৮) এবং অপরটি গ্রীসের বিরুদ্ধে(১৮ এপ্রিল হইতে ৫ জুন, ১৮৯৭)। অবশেষে সুলতানকে মেসিডোনিয়া সংক্রান্ত এক জটিল সংঘাতের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে বিভিন্ন জাতি জড়িত হইয়া পড়ে যাহার ফলে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অগ্রসর হয় এবং পরিণামে 'তরুণ তুর্কী' বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। ১৯০৮ খৃ. ৫ জুলাই উপ-মেজর (কুল আগাসী) নিয়াযী বে রাস্‌নার পার্বত্য পথে অগ্রসর হন এবং মুনাস্‌তির অধিকার করেন। ২৩ জুলাই বার্লিনের ভূতপূর্ব সামরিক এ্যটাচি মেজর (বেন বাশী) আনওয়ার বে সালোনিকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুল্‌তান নব্য-তুর্কীদের চাপে নতি স্বীকার করেন এবং যে বিধান সভা তখনও সরকারী বর্ষপঞ্জীতে বিধৃত ছিল উহাকেই ২৪ জুলাই তারিখে পুনর্বহাল করেন। পরে এই তারিখটি জাতীয় দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হইতে থাকে।

১৯০৯ খৃ. ১৩ এপ্রিল ধর্মের নামে উদ্বুদ্ধ কয়েকটি সৈন্যদল হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু এই সময় মার্শাল মাহ'মৃদ শাওকাত-এর

নেতৃত্বে তৃতীয় মেসিডোনীয় বাহিনী দুর্বার শক্তিতে এই বিদ্রোহ দমন ও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন এবং ইস্তাম্বুল সংবিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে পলায়মান ও বিক্ষিপ্ত 'তরুণ তুর্কী' দল তথায় ফিরিয়া আসে (২৪ এপ্রিল)। ১৯০৯ খৃ. ২৮ এপ্রিল বিধান সভায় উভয় কক্ষ জাতীয় আইনসভারূপে মিলিত হইয়া একটি ফাত্ওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া 'আবদুল-হামীদকে পদচ্যুত করে। ফাত্ওয়াটি ঐ দিনই চাহিয়া লওয়া হইয়াছিল। উহাতে একটি অদ্ভুত অভিযোগ ছিল, 'আবদুল-হ'ামীদ ধর্মীয় পুস্তকাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ রিশাদ পঞ্চম মুহাম্মাদ নামে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

'আবদুল-হ'ামীদকে সালোনিকায় নির্বাসিত করা হয়। ১৯১২ খৃ. বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহাকে বস্ফোরাসের তীরে অবস্থিত Beylereyi প্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৮ খৃ. ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি নিউমোনিয়া রোগে তথায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার দাদা দ্বিতীয় মাহ্'মূদের কবরস্থানে (তুরবা) তাঁহাকে দাফন করা হয়।

'আবদুল-হ'ামীদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুইটি বৈশিষ্ট্যঃ একচ্ছত্র ক্ষমতা ও ইসলামী সংহতি।

১। **একচ্ছত্র ক্ষমতা** (ইস্তিব্দাদ)ঃ যদিও তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন, তবুও 'আবদুল-হামীদের পূর্বপুরুষেরা প্রশাসনের ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহারা সাধারণত তাঁহাদের নির্বাচিত ও পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী (স'াদরে আ'জ'াম)-র হাতেই প্রশাসন ব্যবস্থা ন্যস্ত রাখিতেন। ইঁহারা তাঁহাদের ওয়াকীল-ই মুত'লাক' (কেহ কেহ যাহার অনুবাদ করিয়াছেন Vicar Absolute)-রূপে গণ্য হইতেন। উযীর আ'জ'াম-কে 'বাবা-ই আলী' মহান দ্বারও বলা হইত। 'আবদুল-হামীদ এই ব্যবস্থার বিপরীত স্বীয় প্রতিপত্তি ও অধিকার বৃদ্ধির উদ্দেশে রাজপ্রাসাদ বা শাহী দরবারকে অধিকতর গুরুত্ব দান করেন। ফলে বাবা-ই 'আলী ও সুলতানের প্রাসাদের মধ্যবর্তী একটি প্রশাসন ব্যবস্থার পত্তন হয় যাহাকে 'মা বায়ন' বলা হইত। ইল্দিয প্রাসাদের মধ্যে 'মা বায়ন' একটি পৃথক অট্টালিকা ছিল যাহাতে রাজসংসারের সরকার (হ'াজিব বা 'মাবায়ঞ্জী) ও দরখাস্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা বা পেশকারগণের দফতরসমূহ অবস্থিত ছিল। এইজন্যই 'মা বায়ন'-এর (প্রকৃতপক্ষে সুলতানের) প্রথম সচিব, যথা তাহ্'সীন পাশা অথবা দ্বিতীয় সচিব, যথা (প্রকাশ্যে নিন্দিত সিরিয়ানিবাসী) 'ইয্যাত 'আবিদ-এর এত প্রতিপত্তি। ইল্দিয প্রাসাদ [যাহাকে সংক্ষেপে ইল্দিয (দ্র.) বলা হইত] উহার হারেম ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহের সমন্বয়ে একটি ছোটখাট শহরে পরিণত হইয়াছিল যাহাতে কয়েক সহস্র নাগরিক বাস করিত। শহরটি রহস্যাবৃত হইয়া লোকদের কল্পনাকে মোহগ্রস্ত ও আতংকিত করিত, অনেক সময় বিনা কারণেই।

এই ব্যবস্থা এমন সময় প্রবর্তিত হয় যখন দেশে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন ধূমায়িত হইতেছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের উদ্ভব ছিল স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ১৯০৫ খৃ. একটি আরমেনীয় বোমার আক্রমণ হইতে 'আবদুল-হ'ামীদের নিষ্কৃতি তাঁহার অসাধারণ সৌভাগ্যের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। যেই শংকা ও সন্দেহ তাঁহার সারা জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এই ঘটনা উহাকে আরও প্রকট করিয়াছিল। তিনি গুপ্ত খবর ও গোয়েন্দাগিরি উৎসাহিত করেন। ফলে উহা এক অবিশ্বাস্যরূপ জটিল জাল বিস্তার করে। 'খাফিয়্যা' (গুপ্ত) শব্দটির ব্যবহার গুপ্ত পুলিশ অর্থে এত ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল যে, অবশেষে উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সর্বস্তরের গোয়েন্দাই খাফিয়্যা পদবাচ্য হইয়া যায়। লিখিত অভিযোগসমূহ 'জুর্নাল' নামে পরিচিত ছিল। ইহার আসল অর্থ 'দৈনিক প্রশাসনিক বিবরণী'। শব্দটি প্রথমে মিসরের মুহ'াম্মাদ 'আলীই এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২। **বিশ্ব মুস্লিম ঐক্য** (Pan Islamism)ঃ খলীফারূপে ইসলামের রক্ষক হিসাবে স্বীয় ভূমিকার প্রতি 'আবদু'ল-হ'ামীদ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন (১৮৭৬ খৃ.-এর সংবিধানের ৩ ধারা)। তিনি জামালুদ্-দীন আফ্গ'ানী (দ্র.)-কে বিশেষ সম্মান দান করিতেন। কারণ আফগানী শী'আদেরকে সুন্নীদের সহিত একত্র করিবার আশ্বাস তাঁহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে আফ্গানীর এই মহতী প্রচেষ্টা সফল হইতে পারিল না।

'আবদুল-হ'ামীদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ Arminius Vambery নামক জনৈক তুর্কী ভাষাভাষী হাঙ্গেরীয় ইয়াহূদী খলীফাকে এইসব ব্যাপারে উৎসাহিত করিতেন। ইহার একটি সুফল হইয়াছিল। খলীফা ইসলামের পবিত্র স্থানগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হিজায রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই রেলপথের সামরিক গুরুত্বও ছিল। কারণ ইয়ামানে প্রায়ই গোলযোগ লাগিয়া থাকিত। সংগত কারণেই 'আবদুল-হ'ামীদ এই প্রকল্পের জন্য গর্ববোধ করিতেন। এই প্রকল্পের সমুদয় ব্যয় কেবল মুসলিম জনগণের চাঁদা ও 'হিজায ডাক টিকিট' বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা হইয়াছিল। রেলপথের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ১৯০০ খৃস্টাব্দের পহেলা সেপ্টেম্বর, 'আবদল-হ'ামীদের খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হইবার ২৫তম বার্ষিকী দিবসে। ১৯০৮ খৃ. উক্ত রেলপথ মদীনা পর্যন্ত পৌছে। তাবাহ্ ও 'আকাবা উপসাগর সম্পর্কে তুর্কী-ইংরেজ বিরোধ এই প্রকল্পের পরোক্ষ ফল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ প্রথমবারের মত সরকারীভাবে মিসরের স্বার্থ রক্ষকরূপে উদিত হয়।

বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য (Pan-Islamism) সম্পর্কিত অপর একটি উদ্যম ততটা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। 'আর্তুগ্রিল' নামক একটি কাষ্ঠ-নির্মিত ও ক্রুস চালিত প্রশিক্ষণ জাহাজ জাপানে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু উহা জাপানের সাগর-তীরের দৃষ্টি সীমায় পৌঁছিয়া নিমজ্জিত হয় (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯০ খৃ.)।

'আবদুল-হ'ামীদকে কেহ কেহ অনুদার ও সংস্কার বিরোধী বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু তাঁহার আমলে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রশংসা না করিয়া বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলে অবিচার করা হইবে।

তাঁহার দেহ ছিল সুগঠিত, নাসিকা উন্নত ও চক্ষু দীপ্তিমান। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পৃষ্ঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ ও গম্ভীর। তাঁহার পোশাক ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা, অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক। অপরাপর 'উছমানী সুলতানদের সাক্ষাৎ পাওয়া ছিল দুষ্কর। কিন্তু সাক্ষাতপ্রার্থী তাঁহার কাছে সহজেই আগমন করিতে পারিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ছিল যেমন তীক্ষ্ণ,

স্মৃতিশক্তি ছিল তেমনি অসাধারণ। তাঁহার কর্মক্ষমতা ছিল অসীম এবং যাবতীয় কাজ নিজের হাতেই করিতে চাহিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উল্লিখিত পুস্তকগুলি যদিও তুরস্কের সাধারণ ইতিহাস নহে (অনেকগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে লিখিত), তবুও সবই পূর্ণ বা আংশিকভাবে 'আবদুল-হ'ামীদ সম্পর্কে লিখিত (ইউরোপে অন্য কোন সুলতান সম্পর্কে এত অধিক গ্রন্থ লিখিত হয় নাই)। এই গ্রন্থপঞ্জীতে 'আ, 'A' সংকেত, 'আবদুল-হ'ামীদ নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) 'আবদুর-রাহমান শারীফ ও আহ্মাদ রাফীক, সুলতান 'আ ছানিয়া (দাইর 'আয্ল ও তাদফীন অর্থাৎ পদচ্যুতি ও দাফ্ন), ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ.; (২) 'আলী হ'ায়দার মিদ্হ'াত বে, Midhat-Pacha. sa vie, son oeuvre (৫ম অধ্যায়), প্যারিস ১৯০৮ (তুর্কী সংস্করণ, কায়রো ১৩২২/১৯০৬); (৩) ঐ লেখক, হাতিরা লারিম, ১৮৭২-১৯৪৬ খৃ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৯৪-২১৬; (৪) 'আলী নূরী, Unter dem Scepter des Sultan, বার্লিন ১৯০৮ খৃ.; (৫) 'আলী ভাহবী বে, Penseeset souvnirs de l'ex-sultan `A.,প্যারিস, তা. বি.; (৬) P. Anmeghian, Pour le jubile du Sultan, ব্রাসেল্স ১৯০০ খৃ.; (৭) B. Bereilles, Les Turcs, প্যারিস ১৯১৭ খৃ., ৮ম অধ্যায়; (৮) V. Berard, La politiquer du Sultan, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ.; (৯)H. Borotra, Letters orientales,প্যারিস ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ৭৪-৭৬, ৯০-৯২; (১০) Bresnitz von Sydacoff,' A. und die Chritenvervolgungen in der Turkei,বার্লিন ১৮৯৬ খৃ.; (১১) G. Charmes, L'aveir de la Turquie.-Le panislamisme, প্যারিস ১৮৮৩ খৃ. (একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক পুস্তক); (১২) দামাদ মাহ্'মূদ পাশা, Lettre au sultan A, প্যারিস ১৯০০ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, Protestation, প্রকাশনার স্থান ও তারিখের উল্লেখ নাই (তুর্কী সংস্করণ মুদ্রিত, কায়রো); (১৪) Anna Bownan (Blacke) Dodd, In the Palace of the Sultan, নিউ ইয়র্ক ১৯০৩ খৃ, (১৫) G. Dorys (ছদ্মনাম), 'A. intime (৭ম সংস্করণ), প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক ১৯০১ খৃ.), জার্মান অনুবাদ (মিউনিক ১৯০২ খৃ.); (১৬) E. Fazy, Les Turcs d'aujourd, hui oule grand Karagheuz, প্যারিস ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ২১৭-২৬১ (তুর্কী) অনুবাদক জামীল যাকী ও রাফীক নুয্হাত (Newzat), প্যারিস ১৮৯৮ খৃ.; (১৭) P. Fesch, Consple aux derniers jours d' A., প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (১৮) P.Fremont, 'A. et son regne, প্যারিস ১৮৯৫ খৃ.; (১৯) E. Freville, Deux audicnce imperiales, রাঈম্স (Reims) ১৯০৩ খৃ.; (২০) A. Fua, 'A. et Mourad V, masque der fer, প্যারিস ১৯০৯ খৃ.; (২১) G. Gaulis, La ruine d'un empire 'A., ses amis et ses peuples, প্যারিস ১৯১৩ খৃ.; (২২) R. Gillon, Vers Stamboul, suivi d'une annexe sur le regime hamidien et la Turquie constiutionnelle, Courtrai ১৯০৮ খৃ.; (২৩) G. des Godins de souhesnes, Au pays des Osmanlis,প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., ১৪শ অধ্যায়ঃ Flagorneries; (২৪) J.Grand-Carterct, Une Turquie nouvelle pour les Turcs-La Turquie en images, প্যারিস ১৯০৮ খৃ. (ব্যঙ্গ চিত্রের অনুলিপি); (২৫) C. Hecquard, La Tarquie sous 'A, ব্রাসেলস ১৯০১ খৃ.; (২৬) হিদায়াত, A. revolutionnaire., যুরিখ ১৮৯৬ খৃ.; (২৭) P. Imbert, La renvation de l'Empire Ottoman., প্যারিস ১৯০৯ খৃ. (হাসান ফর্হাত এংগেলকৃত তুর্কী অনুবাদ, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১৩); (২৮) ইসমাঈল কামাল বে, The memoirs of, সম্পা. Sommer- ville Story, লন্ডন ১৯২০ খৃ.; (২৯) কামিল পাশা, খাতিরাত, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১৩; (৩০) কামিল পাশানিন আয়ান রাঈসী সা'ঈদ পাশা জাওয়াবলারী, ইস্তাম্বুল ১৩২৮/১৯১২; (৩১) A. H. Kober, Zwischen Donau und Bosporus, মুদ্রণ Frankfart/M.; (৩২) de Keratry, Mourad n, প্যারিস ১৮৭৮ খৃ. (একটি উৎকৃষ্ট ও নিরপেক্ষ গ্রন্থ); (৩৩) K. Kuntzer, 'A. und die Reformen. ড্রেসডেন ১৮৯৭ খৃ.; (৩৪) E. Le Jeune and Diran Bey, Comment on sauve un empire ou S.M. le sultan ghazi 'A. Khan ll, প্যারিস ১৮৯৫ খৃ.; (৩৫) A. de Lusignan, The twelve years' reign of 'A., লন্ডন ১৮৮৯ খৃ.; (৩৬) MacColl (Malcolm), Le sultan et les grandes Puissances, ইংরেজী হইতে অনুবাদ, প্যারিস ১৮৯০ খৃ.; (৩৭) F. MacCullagh, The fall of A., লন্ডন ১৯১০ খৃ.; (৩৮) মুহ'াম্মাদ মাম্দূহ পাশা, তাস'বীর-ই আহ্'ওয়াল, তানবীর-ই ইস্তিক'বাল, ইযমীর ১৩২৮/১৯১৬; (৩৯) ঐ লেখক, খাললার ইজ্লাসলার, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১৩, পৃ. ১৩৩-১৭৮; (৪০) মালিক খানুম,'A.'s daughter, the tragedy of an Ottoman Princess, লন্ডন ১৯১৩ খৃ.; (৪১) মুহাম্মাদ আবুল-হুদা আফান্দী, হাযাদীওয়ান ('আবদুল-হ'ামীদের প্রশংসায় লিখিত 'আরবী কবিতাসমূহ), কায়রো ১৮৯৭ খৃ.; (৪২) মুস্তাফা রাফীক, Ein Kleines Sundenrgister 'A. 's Dem jungturkischen Komite in Genf zugeeignct, জেনেভা ১৮৯৯ খৃ.; (৪৩) N. Nicolaides, S.M. Imp. 'A. Khan, ll, sultan, refrmateur et reorganisateur, ব্রাসেল্স ১৯০৭ খৃ.; (৪৪) ঐ লেখক, S.M.I.A., Khan ll, l'Empire ott. et les puissances balkaniques, ব্রাসেল্স ১৯০৮ খৃ.; (৪৫) ঐ লেখক, Lettre ouverte a S.M l. le Sultan 'A. Khan ll, রোম ১৯০৮ খৃ.; (৪৬) সুলতানা নিভীশা, My harem life, an intimate autobiography of the Sultan's favourite, লন্ডন ১৯৩৯ খৃ.; (৪৭) 'উছমান নূরী আরগীন, 'আবদুল-হ'ামীদ ছ'ানী ও দাওর-ই সুলতানাতী, ইস্তাম্বুল ১৩২৭/১৯১১; (৪৮) O.P., Mourad V, vrai khlife, sultan legitime

et 'A. ll usurpereur. Lettre a S. M. l'Emp. d, Allemagne, প্যারিস ১৮৯৮ খৃ.; (৪৯) E. Pears, Life of 'A., লন্ডন ১৯১৭ খৃ.; (৫০) ঐ লেখক, Forty years in Consple., ১৮৭৩-১৯১৫ খৃ., লন্ডন ১৯১৬ খৃ.; (৫১) L. Radet ও H. Lebrun, Refution des accusations dirigees Contre le sultan 'A. ll, Paris 1882 A. C.;(৫২) P. de Regla (P.A. Desjardin), La Turquie Officelle, প্যারিস ১৮৮১ খৃ.; (৫৩) ঐ লেখক, Au pays de l'espionnsge, Les Sultans Mourad V et 'A. ll, প্যারিস তা. বি.; (৫৪) A. Renouard, Chez les Turcs en 1881, প্যারিস ১৮৮১ খৃ., ১৩ শ অধ্যায়; (৫৫) G. Rizas, Les mysteres de Yildiz ou A., sa vie politique et intime, Consple ১৯০৯ খৃ.; (৫৬), G. Roy, A., Le Sultan rouge প্যারিস ১৯৩৬ খৃ., (জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস); (৫৭) G. Sabungi ও L. Bari, Jehan Aftab, the sun of the world, 'A. S last love, Detroit (জার্মানী) ১৯২৩ খৃ.; (৫৮) সাঈদ পাশানীন, খাতিরাতী, ইস্তাম্বুল ১৩২৮/১৯১২; (৫৯) সাঈদ পাশানীন, কামিল পাশা খাতিরাতিনা জাওয়াকনারী শারকী রুমেলী, মিস্‌র ও আরমানী মাস্‌আলা লারী, ইস্তাম্বুল ১৩২৭/১৯১১; (৬০) H. de Sehwiter, 3 Sultans, d' Abdul Aziz a'A, প্যারিস ১৯০০ খৃ.; (৬১) B. Stern, 'A, ll, seine Famili und sein Hofstadt, বুদাপেস্ট ১৯০১ খৃ.; (৬২) ঐ লেখক, Der Sultan und seine Politik, লাইপজিগ ১৯০১ খৃ.; (৬৩) ঐ লেখক, Jungturken und Verschworer, লাইপজিগ ১৯০১ খৃ.; (৬৪) তাহসীন পাশা, 'আবদুল-হামীদ ও ঈলদীয হাতিরালারী, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ.; (৬৫) ইয়ূসুফ ফাহ্‌মী বা জোসেফ ফাহ্‌মী, Les coulisses hamidiennes devoilees par un Jeune Turc, ১৯০৪ খৃ.; (৬৬) যি-য়া শাকির একিন্‌চী সুলতান হ'ামীদ, ইস্তাম্বুল ১৩৪৩ হি.।

'আবদুল-হ'ামীদের উযীরে আজামদের জন্য দেখুন ইব্‌নুল আমীন মাহ'মূদ কামাল ঈনাল, উছমানলী দাওরিন্‌দা সূন সাদ্‌রআজামালার, ইস্তাম্বুল ১৩৪০-১৩৫০ হি., সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ এই স্থানে করা হয় নাই।

J. Deny (E.1.[2])/ আবদুল হক ফরিদী

'আবদুল-হ'ামীদ দানিশ্‌মান্দ (عبد الحميد دانشمند)ঃ জন্ম রাজশাহী জেলা শহরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চার ঘাট থানার এলাকাধীন বাঘা নগরে। পিতার নাম শাহ দাওলা যাঁহার পূর্বপুরুষ শাহ 'আব্বাস শাহ মাখদূম-এর সঙ্গে আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে বাগদাদ হইতে আগমন করেন। স্থানীয় সামন্ত রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে তুরকান শাহ নামে এক মুসলিম দরবেশ তাঁহার দলবলসহ নিহত হন। কথিত আছে, ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশেই শাহ্‌ মাখদূম এখানে আগমন করিয়াছিলেন। জানা যায়, তাঁহার পিতা শাহ দাওলা খাঁটি ওয়ালী ছিলেন। তিনি স্থানীয় লাশকারদার-এর কন্যা যীবুন-নিসাকে বিবাহ করেন। ইনিই 'আবদুল-হ'ামীদ দানিশ্‌মান্দ-এর মাতা। শাহ দাওলা ও তৎপুত্র 'আবদুল-হ'ামীদ বাঘায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মাদ্‌রাসা ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে এতদ্‌ঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিল।

খৃ. ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'আবদুল-লাত'ীফ নামে জনৈক ভ্রমণকারী বাঘায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'রোজনামচাহ্' পুস্তকে বাঘার মনোরম দৃশ্য ও সম্পদের প্রশংসা করিয়াছেন। বাংলার সুলতান 'আলাউদ-দীন হু'সায়ন বাঘার বিখ্যাত দীঘি খননে ও একটি মসজিদ নির্মাণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন (৯৩০/১৫২৪)।

কিংবদন্তী আছে, শাহ দাওলার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া সম্রাট শাহজাহান তাঁহার উত্তরাধিকারীদেরকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন (১০৩৩/১৬২২)।

বাঘার দরগাহ চত্বরে মসজিদ ও দীঘি সংলগ্ন গোরস্তানে শাহ দাওলা ও 'আবদুল-হ'ামীদ দানিশ্‌মান্দের সমাধি অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ তালিব, মুহম্মদ, হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ (র)-এর জীবনেতিহাস, ঢাকা ১৯৬৯, ২য় সং ১৯৭৯; (২) বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, ঢাকা ১৯৬৮; (৩) বাঘা শরীফের ইতিহাস (মৎ লিখিত পাণ্ডুলিপি); (৪) বাঘার রঈস বংশের পারিবারিক বংশবৃত্তান্ত ও কুরসী নামা, কলমী পুঁথি, নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত পাঠাগারে সংরক্ষিত; (৫) Abid Ali Khan Sahib, Memoirs of Gour and Pandua; (৬) L.S.S. Omalley, Bengal District Gezetteers, Rajshahi, Calcutta 1916; (৭) Shamsuddin Ahmad, Inscriptions of Bengal, vol. iv, Varendra Research Musium, Rajshahi 1960 ; (৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Ist vol. 1904.

মুহাম্মদ আবূ তালিব

'আবদুল-হ'ামীদ বাঙালী (عبد الحميد بنغالى) ঃ শায়খ (র), সংক্ষেপে শায়খ হ'ামীদ বাঙালী। তাঁহার পীর শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র) কর্তৃক প্রদত্ত আরবী ভাষায় লিখিত খিলাফাত নামাতেও তাঁহাকে মাওলানা শায়খ হ'ামীদ বাঙালী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বাঙালী উপাধিটি আসলে ছিল তাঁহার 'নিস্‌বাত' বা দেশ সম্পর্কীয় সম্বন্ধবাচক উপাধি। তাঁহার বাঙালী উপাধি ধারণ সম্পর্কে আরও জানা যায়, শায়খ মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর ৬৬ জন খালীফার মধ্যে একাধিক 'আবদু'ল-হ'ামীদ বিদ্যমান ছিলেন। যেমন 'আবদুল-হা'মীদ বিহারী, হ'ামীদুদ্‌-দীন আহ'মাদাবাদী প্রভৃতি। শায়খ হ'ামীদ 'বাঙালী' উপাধি এই সব হামীদ হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।

'আবদুল-হ'ামীদ বাঙালী বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের বাশিন্দা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শায়খ 'আবদুল-আহাদ, দাদা 'আবদুল-কুদ্দুস (র)। তাঁহার দাদা একজন বিখ্যাত সূফী-সাধক ছিলেন। তিনি হযরত রুক্‌নুদ-দীন (র)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।

আবদুল-হামীদ বাঙালী দীনী 'ইলম শিক্ষার জন্য লাহোর গমন করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে আগ্রায় হযরত খাওয়াজা 'আবদুর-রহ'মান মুফতী সাহেবের আবাসে কিছুদিন অবস্থান করেন। মুফতী সাহেব প্রথমে তাঁহাকে বেশ অহংকারী হিসাবে দেখিতে পান। তিনি বলিয়াছেন, একদিন তাঁহার বাড়ীতে বুযুর্গানে দীনের বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। 'আবদুল-হ'ামীদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শায়খ মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-সহ অনেক বুযুর্গ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তি করেন। শায়খ মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র) সেই সময়ে আগ্রায় ছিলেন। একদিন মুফ্‌তী সাহেবের বাড়ীতে 'ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে আলাপ হইতেছিল। হ'ামীদ বাঙালীও সেইখানে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ শায়খ মুজাদ্দিদ (র) সেখানে আগমন করেন। তিনি শায়খ হ'ামীদকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি হ'ামীদ সাহেব যে। আপনি এত কাছে আছেন, অথচ খবরটা জানিতেই পারিলাম না!" এই কথা বলিয়াই তিনি তাওয়াজ্জুহ্‌র দৃষ্টিতে বার কয়েক তাঁহার পানে তাকাইয়া মুরাকাবায় নিবিষ্ট হইলেন। শায়খ হ'ামীদ বেশ বিব্রত বোধ করিবেন। কিন্তু শায়খ মুজাদ্দিদ (র) অল্পক্ষণের মধ্যেই মুরাকাবা শেষ করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন। হ'ামীদ বাঙালীও অসহায়ের মত তাঁহার পিছে পিছে ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু শায়খ মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। হ'ামীদ বাঙালী তাঁহার গৃহদ্বারে এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে মুরীদ করিলেন।

হ'ামীদ বাঙালী দুই বৎসর শায়খ মুজাদ্দিদ (র)-এর আহচর্যে ছিলেন। শায়খ মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খিলাফাত প্রদান করেন। ৬৬ জন খলীফার মধ্যে হ'ামীদ বাঙালীর মর্যাদা ছিল পঞ্চম। 'আবদুল-হ'ামীদ বাঙালী (র)-এর মাযার বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হযরত শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী প্রদত্ত আরবী খিলাফাতনামা; (২) ডক্টর বিনয় ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ/১৯৫৭ খৃ.; (৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, বিংশ ভাগ, কলিকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ/১৯১৩ খৃ.; (৪) শামসুদ্দীন আহমদ, Inscriptions of Bengal, vol. iv, বরেন্দ্র মিউজিয়াম, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত, রাজশাহী ১৯৬০ খৃ.; (৫) মুহাম্মদ ওবায়দুল হক, তায্‌'কিরা-ই সূফীয়ান-ই বাঙ্গাল (উর্দূ), মারাকায-ই উর্দূ বোর্ড, ১৯৬৩; (৩) ঐ বাংলা অনুবাদ, এ.এফ.এম. আবদুল আযীয ও এস. সিদ্দীক খান, ইস্টবেঙ্গল সিণ্ডিকেট, ৩৯ পাটুয়াটুলি, নভেম্বর ১৯৬১ খৃ.।

মুহাম্মদ আবু তালিব

'আবদুল-হ'ামীদ (عبد الحميد) ঃ ইয়াহ'য়া ইব্‌ন সা'দ, আরবী ভাষায় পত্র রচনার বিশেষ একটি পদ্ধতির প্রবর্তক, কু'রাশী 'আমের ইব্‌ন লুআয়্যি-এর মাওলা (মিত্র)। তিনি সম্ভবত আল-আনবার-এর অধিবাসী ছিলেন এবং হিশাম-এর প্রধান সচিব মাওলা সালিম-এর অধীনে উমায়্যা সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি একজন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর সহিত সংযুক্ত হন, মারওয়ান খলীফা পদে আসীন হওয়ার পরে তিনি তাঁহার প্রধান সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রভুর অতি দুঃসময়েও তাঁহাকে তিনি পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সাধারণত বলা হয়, তিনি ২৬ যুল-হিজ্জা, ১৩২/৫ আগস্ট, ৭৫০ সনে বূসীরে তাঁহার মনিবের সহিত একই পরিণতি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বিপদ এড়াইবার জন্য তাঁহারই একজন শিষ্য ইব্‌নুল-মুক'াফ্‌ফা'-এর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং বন্দী করা হয়। বানুল-মুহাজির নাম ধারণ করিয়া মিসরে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বসবাস করিতে শুরু করেন এবং আহ'মাদ ইব্‌ন তূ'লূন-এর অধীনে কয়েকজন সচিবের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন।

'আবদুল-হ'ামীদ-এর এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রচনাসমূহের মধ্যে ছয়টি প্রচলিত রাসাইল, কতিপয় সরকারী চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত চিঠি রহিয়াছে। এইগুলি তাঁহার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন রচনারীতির পরিচয়। মারওয়ানের পুত্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারী 'আবদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত সুদীর্ঘ পত্রটি হইল তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত রচনা। ইহাতে তিনি ব্যক্তিগত চরিত্র, রাজদরবারের অনুষ্ঠানাদি ও যুদ্ধ সম্পর্কে উপদেশ আবদুল্লাহ্‌কে প্রদান করিয়াছেন। ইহা আরবী কাব্য ও বাগ্মিতার উপমা, ছন্দ ও বাগধারার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু বহু স্থানে বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনুমিত হয়, এই বৈশিষ্ট্য (যাহা প্রাচীন ও পরবর্তী 'আরবী সাহিত্য সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না)-এর সূত্র উমায়্যা সচিবালয়ে গ্রীক প্রভাবের মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য দাপ্তরিক (Official) রাসাঈল-এ একই ধরনের রীতি লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পত্রাবলী যাহা সচিবগণ (কুত্‌তাব)-এর উদ্দেশে রচিত, ইহাতে তিনি তাহাদের পদ ও দায়িত্বের মর্যাদা তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সকল পত্র অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল ও অকপট। ইব্‌নুল-মুক'াফ্‌ফা'র রচনা ও ফারসী গ্রন্থাদি হইতে পরবর্তী কালে উদ্ধৃতির সংগে ইহার বিষয়বস্তুর তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহা সাসানী সচিবালয়ের ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ইহার বহু স্থলে ইরানী দাবীরদের (dibhers) নীতিমালা ইসলামী ছাপসহ পরিবেশিত (দ্র. A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides, কোপেনহেগেন ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৩২ প.)। তাঁহার অন্য একটি রচনা ইরানী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার নীতির বিবেচনায়ও আরবী ঐতিহ্য হইতেও পৃথক। উক্ত রিসালায় একটি শিকারের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং স্পষ্টতই রচনার এই ঘটনাটি সভাসদগণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে লিখিত। রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রদত্ত প্রথম রিসালায় উদ্ধৃত নীতিমালাসমূহের বৃহদংশ সাসানী দরবারের আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যবহার বিধি হইতে গৃহীত। তবে সামরিক উপদেশাবলী গ্রীক রণকৌশল দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাব সাহিত্যকর্মসূত্রে বা বায়যান্টীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসিয়াছে।

এইজন্য দেখা যায়, ইহাদের আগত প্রতীয়মান অসংগতি থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী কালের সমালোচকগণ কর্তৃক 'আবদুল-হ'ামীদ সম্পর্কে প্রদত্ত বিবিধ মন্তব্য যুক্তিসংগত। একদিকে বলা হয় (যেমন আল-'আসকারী, দীওয়ানুল-মা'আনী, ২ খ., ৮৯), 'আবদুল-হ'ামীদ ফার্সী ভাষা হইতে সরকারী পত্রাবলীর রচনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া সেইগুলি আরবী ভাষায়

রূপান্তরিত করেন এবং ঠিকভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁহার সম্পর্কে বলা যায়, (যেমন ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্‌বিহ, আল-'ইক'দুল-ফারীদ, ২খ., [১৬৯ ১৩২১ হি.] ৪খ., ১৬৫ (১৩৬৩/১৯৪৪) 'তিনি প্রথম বাক্যালংকারের কুঁড়ি উন্মোচন করিয়াছেন, ইহা প্রস্ফুটনের পথ সুগম করিয়াছেন এবং কাব্যকে করিয়াছেন শৃংখলমুক্ত'। তিনি সংক্ষিপ্ত বিদ্রূপাত্মক কবিতারও একজন সুনিপুণ রচয়িতা ছিলেন, ইহার বহু উদাহরণ আদাব রচনাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহশিয়ারী, যারা; (Mzik), পৃ. ৬৮-৮৩ (কায়রো ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৪৫-৫৪); (২) ইসতাখ্‌রী, পৃ. ১৪৫; (৩) ইব্‌ন খাললিকান, সংখ্যা ৩৭৮ (অনু. de Slane, ২খ., ১৭৩-৫); (৪) জামহারাতু রাসাইলিল-'আরাব, সম্পা.আ.য. স'াফ্‌ওয়াত, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ২খ., ৪৩৩-৮, ৪৭৩-৫৫৬ (ইব্‌ন আবী তাঁহির তায়ফূর-এর পাণ্ডুলিপি হইতে রাসাইল-এর সংস্করণ); (৫) ম. কুর্‌দ 'আলী, রাসাইলুল-বুলাগা'2 কায়রো ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৭৩-২২৬; (৬) ঐ লেখক, MMIA, ৯খ, ৫১৩-৩১, ৫৫৭-৬০০ (-উমারাউল-বায়ান, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ১খ., ৩৮-৯৮) ; (৭) ত'াহা হু'সায়ন, মিন্ হাদীছিশ-শি'র ওয়ান-নাছ্'র, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৩৪-৫২; (৮) Brockelmann, S I, পৃ. ১০৫।

H, A. R. Gibb (E.I.[2]) / মুহম্মদ আবদুস সাত্তার

(ডঃ) আবদুল হামীদ, মুহাম্মদ (دُكْتُرْ عبد الحميد محمد) ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার বাবুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মাতার নাম জয়নব বেগম। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি ১৯৫৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৫৯ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অর্থনীতি বিভাগ হইতে ১৯৬৩ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন।

ইহার পর তিনি ম্যানচেষ্টার হইতে ১৯৬৯ সালে এম. এ. ও ১৯৭২ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি গবেষণা কাজে, বিশেষত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ১ জুলাই, ১৯৭৩ হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ পর্যন্ত ঐ বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর কলা অনুষদের নির্বাচিত ডীন হিসাবে ১০ অক্টোবর, ১৯৮০ হইতে ২৩ অক্টোবর, ১৯৮২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৭ মার্চ, ১৯৭৫ হইতে ৬ মার্চ, ১৯৭৮ পর্যন্ত শের-ই বাংলা ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট (২৩. ১. ৮৯ হইতে ১১. ১. ৯১ পর্যন্ত) ও সিনেট (৫. ৯. ৮৩ হইতে ১১. ১১. ৯৩ পর্যন্ত) সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে তিনি লণ্ডনের Wye কলেজে ভিজিটিং ফেলো হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৮৩ ও ১৯৯১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ তাঁহার কর্মমুখর জীবনে ১৯৯১-৯৫ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জুলাই ২০০০-এ অবসর গ্রহণের পর তিনি নভেম্বর ২০০০-এ ঢাকায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের জন্য তিনি তহবিল সংগ্রহ করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাহা হস্তান্তর করেন।

মুহাম্মদ আবদুল হামিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গবেষণার একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেন। অর্থনীতি বিভাগ হইতে তাঁহারই উদ্যোগে Rural Development Studies নামে একটি গবেষণা সিরিজ প্রকাশনা শুরু হইয়াছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে স্বনির্ভর আন্দোলনের মূল্যায়ন এবং কৃষিতে যান্ত্রিক সেচ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে পল্লী জীবনে কি গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা তুলিয়া ধরাই ছিল তাঁহার গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত সিরিজে প্রকাশিত তাঁহার রিসার্চ মনোগ্রাফসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ

(1) Integrated Rural development Programme : An Evaluation of Natore and Gaibandha Projects (1973)

(2) Swanirvar Bangladesh (1976)

(3) Christian Service Society, Dacope, Khulna (1976)

(4) Swanirvar Karmashuchi : Bogra A.H. College (1976)

(5) Swanirvar Kazipukur (1976)

(6) Ganamilan, Gurudaspur, Natore (1976)

(7) CORR-CARITAS, Bangladesh (1976)

(8) A Study of the BADC Deep Tubewell Programme in the North-Western Region of Bangladesh (1977)

(9) Swanirvar Gram Sarkar and the Case of Sadullapur Model (1980)

(10) Shallow Tubewells Under IDA Credit in North West Bangladesh (1982)

(11) Bangladesh Shallow Tubewells Project Credit 724-BD Completion Report (1983)

(12) Survey of Privatization of Repair and Maintenance Facilities for Irrigation (1984)

(13) Low Lift Pumps under IDA Credit in South-East Bangladesh, A Socio-Economic Study (1984)

(14) Review of Land Acquisition Process (1985)

(15) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কৌশল পুনঃ প্রণয়ন (১৯৮৮)

পল্লী উন্নয়ন বরাবরই তাঁহার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় তিনি যেমন রেশম চাষ নিয়া আগ্রহ দেখাইয়াছেন তেমনি খেসারী ডাল খাওয়ার ফলে সৃষ্ট ল্যাথাইরিজম বিষয়ে জানিতে তাঁহার আগ্রহের এতটুকু কমতি ছিল না। এক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মগুলি হইল ঃ

(1) Lathyrism in Bangladesh : An Agro-Economic Survey (1986)

(2) Socio-Economic Viability of Sericulture Industry in Bangladesh (1985)

(3) Silk Sector in Bangladesh : A Selective Overview (1991)

অধ্যাপনা জীবনের শেষের দিকে ইসলামী অর্থনীতির প্রতি তিনি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান। তাহার ফলে তিনি ইসলামী অর্থনীতির উপর সম্মান শ্রেণীর জন্য ইংরেজী ভাষায় Islamic Economics : An Introductory Analysis শীর্ষক প্রথম প্রামাণ্য পাঠ্য বই রচনা করেন। ইসলামী অর্থনীতিঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (২য় সংস্করণ ২০০২ খৃ.) শিরোনামে বাংলায় বইটির সফল অনুবাদ করেন অত্র নিবন্ধকার ও তাহারই প্রিয় সহকর্মী। দরিদ্র জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাহাদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য বিভিন্ন এন.জি.ও. পল্লী এলাকায় যেই কাজ করিয়া যাইতেছে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সেই কাজে অংশগ্রহণ করিলে তিনি তাহার মূল্যায়নেও সচেষ্ট হন। এই কাজে তাঁহার সহযোগী ছিলেন অত্র নিবন্ধকার। দুই বৎসরের গবেষণার ফলে প্রকাশিত হইল The Role of Islamic Bank in the Development of Small Enterpreneurs : An Emperical Investigation (2001)।

তাঁহার গবেষণা গ্রন্থ Irrigation Technologies in Bangladesh (1978) এই দেশের কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ল্যাথাইরিজম ও রেশম চাষ সম্পর্কিত তাঁহার গবেষণাকর্মগুলি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার লেখা পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ (১৯৮৮) এখনও বহুল পঠিত পুস্তক। তিনি দুই ডজনেরও বেশী পি-এইচ.ডি. ও এম. ফিল গবেষণা তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাংকসহ দেশ-বিদেশে বহু আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত রিসার্চ মনোগ্রাফ ও প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স প্রভৃতিতে যোগদানের জন্য তিনি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। সেই সবের মধ্যে রহিয়াছে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট ও সৌদী আরব।

তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, সফল গবেষক, সমাজহিতৈষী এবং এক অসাধারণ দরদী মানুষ। তাঁহার বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে তিনি আরও যেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলঃ সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (১৯৯১-৯৫), সিনেট সদস্য, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪-৯১), সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (১৯৮১-৮৩), সদস্য, ইউনেস্কো বাংলাদেশ কমিশন (১৯৮০-৮২), কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (১৯৭৫-৭৭) এবং সিনিয়র ফেলো, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (১৯৭৪-৮২)।

তিনি ছিলেন সরল ও অকপট প্রকৃতির মানুষ। ছাত্র-শিক্ষক, শত্রু সকলের সহিত তিনি হাসিমুখে মেলামেশা করিতেন। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার ছাত্রদেরকে মুগ্ধ করিত। মুহাম্মদ আবদুল হামিদ ১১ নভেম্বর, ২০০২ রবিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ফুসফুসের ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও পুত্রবধূ এবং পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া যান।

শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

'আবদুল-হ'ামীদ লাহোরী (عبد الحميد لاهورى)ঃ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, লাহোরের অধিবাসী। স্বীয় রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন (আবুল-ফাদ্'ল, আকবার নামাহ্)। মুগল সম্রাট শাহজাহান তাঁহার খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান। সেই সময়ে তিনি পাটনা (Rieu,২৬০) অথবা থাঠ্যায় (বাঁকীপুর, ৭খ., ৬৮) অবস্থান করিতেছিলেন। 'আবদুল-হ'ামীদ দরবারে উপস্থিত হইলে সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে স্বীয় রাজত্বকালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। তিনি 'বাদশাহ নামাহ' নামে দুই দশকের ইতিহাস দুই খণ্ডে রচনা করেন (হি. ১০৫৭)। সম্রাট শাহজাহানের মন্ত্রী সা'দুল্লাহ খান গ্রন্থটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড 'আবদুল-হ'ামীদ দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কারণে রচনা করিতে সক্ষম হন নাই। 'আবদুল-হ'ামীদের জনৈক শিষ্য ও সহায়ক মুহ'াম্মাদ ওয়ারিছ' উহা রচনা করেন (হি. ১০৬৭)। 'আলাউল-মুলক তুনী [খান সামান যিনি পরে ফাদি'ল খান উপাধিতে ভূষিত হন এবং সম্রাট আওরাঙ্গযীবের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইবার কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন (১০৭৩/১৬৬৩ সন)] গ্রন্থটি পরীক্ষা করেন।

বাদশাহ নামার প্রথম খণ্ড ১০৩৭/১৬২৭ সন হইতে ১০৪৭/১৬৩৭ সন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১০৪৭/১৬৩৭ সন হইতে ১০৫৭/১৬৪৭ সন পর্যন্ত ঘটনাবলীর উপর রচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রায় ঐ সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা মুহ'াম্মাদ আমীন কর্তৃক রচিত বাদশাহ নামায় লিপিবদ্ধ আছে। তবে ইহাতে সম্রাট শাহজাহানের পূর্ববর্তী ও তাঁহার বাল্যকালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয় নাই। উভয়ের রচনা পদ্ধতি ও অধ্যায় বিভক্তিকরণ রীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। 'আবদুল-হ'ামীদ রচিত বাদশাহ নামার উভয় খণ্ডে শাহজাহানের যুগে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সম্রাট পরিবারের অবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমন, সৌর ও চান্দ্র নববর্ষের উৎসবাদি, পুরস্কার বিতরণ, নবনির্মিত প্রাসাদসমূহের বর্ণনা, কাশ্মীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, শাহযাদাদের বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ইসলামী অনুষ্ঠান উপলক্ষে দান-খায়রাত ও পুরস্কার প্রদান ও দরবারী জীবনের বিভিন্ন অবস্থা। উভয় খণ্ডের পরিশেষে শাহযাদাদের ও সভাসদদের পদবীসমূহ যাহা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হইত,

ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হইয়াছে। আলিম, শায়খ (পীর), বিজ্ঞানী ও কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিয়া উভয় খণ্ড সমাপ্ত করা হইয়াছে। 'বাদশাহ নামাহ' শাহজাহান যুগের ঘটনা প্রবাহের উপর একটি প্রামাণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ হইতে উপমহাদেশের এবং ইউরোপের বিভিন্ন ঐতিহাসিক, বিশেষত ইলিয়ট ও ডাউসন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১)C.A Story, Persian Literature, ২খ, ৩য় অধ্যায়; (২) Rieu, Catalogue of the Persian MSS. in the British Museum, London; (৩) মুহ'াম্মাদ স'ালিহ' কানবূহ, 'আমাল-ই স'ালিহ', কলিকাতা সংস্করণ; (৪) গু'লাম হু'সায়ন খান, সিয়ারুল- মুতাআখখিরীন, ২খ, ৬২১-৪০।

সম্পাদকমণ্ডলী (দা.মা.ই.) / মোঃ আবদুল আউয়াল

'আবদুল-হ'ায়্যি ফিরংগী মাহ'ল্লী (عبد الحى فرنكى محلى) ঃ আবুল-হ'াসানাত মুহ'াম্মাদ, হিন্দুস্তানের হ'ানাফী ধর্মীয় 'আলিম। তিনি আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর বংশধর। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ জনৈক বুযুর্গ মদীনা মুনাওওয়ারা হইতে হিজরত করত হারাতে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার বংশধর শায়খ নিজ'ামুদ্দীন আনস'ারী আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ সুহালীতে আবাস গ্রহণ করেন (বর্তমান উহা ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত)। তাঁহার বংশধর মুল্লা কু'তু'বুদ্দীন-কে যমীনদারী সংক্রান্ত বিবাদে স্থানীয় উছমানী শায়খগণ হত্যা করে। তৎপর তাঁহার বংশধরগণ লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া ফিরিংগী মহল্লায় বসবাস আরম্ভ করেন। অযোধ্যার সুলতানী আমলে এই স্থানে এক ফিরিংগী ব্যবসায়ীর বাস ছিল বলিয়া স্থানটি ফিরিংগী মহল্লা নামে পরিচিত। পরে উক্ত ফিরিংগী ব্যবসায়ী সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে স্থানটি শাহী অধিকারে আসে। মুল্লা কু'তু'বুদ্দীন-এর বংশধরগণ লক্ষ্ণৌ আগমন করিলে মহল্লাটি তাঁহাদের দান করা হয়। 'আবদুল-হ'ায়্যি শায়খ নিজ'ামুদ্দীনের অষ্টম ও সাহাবী আবূ আয়্যূব আনস'ারী (রা)-এর ২৭-তম অধস্তন পুরুষ।

মাওলাবী 'আবদুল-হ'ায়্যি ২৬ যু'ল-কা'দা, ১২৬৪/২৪ অক্টোবর, ১৮৪৮ তারিখে রোজ মঙ্গলবার বান্দাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নওয়াব যু'ল-ফিক'ারুদ্-দাওলার মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি দশ বৎসর বয়সে কুরআন মাজীদ হিফজ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফারসী পুস্তকাদিও পাঠ করেন। তিনি এগার বৎসর বয়সে পিতার নিকট যথারীতি বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন শুরু করেন এবং পনর বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপন করেন।

যাবতীয় পাঠ্য বিষয় তিনি তাঁহার পিতা মাওলাবী 'আবদুল-হ'ালীমের কাছে শিক্ষা করেন (ব্রকেলম্যান, পরিশিষ্ট, ২খ., ৮৫৬)। জ্যোতির্বিদ্যার কতিপয় পুস্তকও তিনি অধ্যয়ন করেন তাঁহার নানা মাওলাবী নি'মাতুল্লাহ (মৃ. ১২৯০ হি.)-এর কাছে। ১২৭৯/১৮২৬ সনে পিতার সহিত হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য হিজায গমন করেন। পরে ১২৯২/১৮৭৫ সনে একাকী পবিত্র নগরীদ্বয় যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেইখানে যেই সকল হাদীছবিদের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা দানের অনুমতি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শায়খ আহ'মাদ ইব্ন যায়নী দাহ্লান, বায়তুল-হ'ারামের মাদ্রাসার মুদাররিস ও শাফি'ঈ উস্তাদ শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ 'আরাব শাফি'ঈ, মস্জিদে নববীর মাদরাসার মুদাররিস ও মাওলানা 'আবদুল-গ'ানী ইব্ন আবূ সা'ঈদ মুজাদ্দিদী হ'ানাফী দিহ্লাবী। মদীনাপ্রবাসী মাওলানা ফিরিঙ্গী মাহ'াল্লী ২৯ রাবী'উল-আওওয়াল, ১৩০৪/সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সনে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎস্বভাব সম্পন্ন, উদারমনা, সদালাপী, সুবক্তা ও বাগ্মী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সুন্নাতের অনুসারী। তাহার শিক্ষাদান ও অধ্যাপনায় বহু শিক্ষার্থী উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তায'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ প্রণেতা মাওলাবী রহ'মান 'আলীর নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নওয়াব সি'দ্দীক হ'াসান ভূপালীর সহিত পত্রের মাধ্যমে তাঁহার তর্ক-বিতর্ক চলিত। তাঁহার মৃত্যুতে নওয়াব সাহেব বিশেষভাবে শোকার্ত হন। তিনি বলিতেন, 'আবদুল-হ'ায়্যি ফিরিঙ্গী মাহাল্লীর তিরোধানের পর এখন আর কাহার সহিত জ্ঞানচর্চা করা যায়?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উচ্চতর পাঠ্যপুস্তকের ভাষ্য ও টীকা লিখিয়াছেন যাহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মহলে বিশেষ জনপ্রিয়। মাহ্'মূদ ইব্ন সুলায়মান আল-কাফ্ফাবী প্রণীত আ'লামুল্-আখয়ার পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার ও সংযোজনসহ আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল-হ'ানাফিয়্যা (দিল্লী ১২৯৩ হি., কায়রো চারবার মুদ্রিত, কাযান ১৯০৩ খৃ.) নামে তিনি যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন জীবনী ও রিজালশাস্ত্রের উহা একটি মূল্যবান উৎস। তাঁহার অন্যান্য রচনার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(ক) স'ারফ (আরবী ব্যাকরণ-শব্দ প্রকরণ) বিষয়ে ঃ (১) তিবয়ান শারহ' মীযান আস্-স'ারফ (ফারসী); (২) তাকমিলাতুল-মীযান (ফারসী); (৩) শারহ' তাকমিলাতিল-মীযান; (৪) امتحان الطلبة فى الصيغ المشكلة; (৫) চাহার গুল, মুনশাআবে উল্লিখিত কতিপয় ক্রিয়ার তা'লীল (পরিবর্তন)।

(খ) নাহ্'ও-আরবী ব্যাকরণ-বাক্য প্রকরণ বিষয়ে ঃ (৬) ازالة الجمد عن اعراب الحمد لله اكمل الحمد; (৭) خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام;

(গ) মুনাজ'ারা (বিতর্কশাস্ত্র) বিষয়ে ঃ (৮) আল-হাদিয়্যা-তু'ল-মুখ্তারিয়্যাতুন-নাদিয়্যা (ব্রকেলম্যান, সংখ্যা ৩৫, ৪০) শারহুর্ রিসালাতিল-আদুদিয়্যা।

(ঘ) মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) বিষয়ে ঃ (৯) হিদায়াতুল-ওয়ারা ইলা লিওয়াইল-হুদা (গু'লাম য়াহয়া ভাক্কারীর টীকা যাহিদিয়্যার পরিশিষ্ট; (১০) মিস্'বাহ'দ-দুজা ফী লিওয়াইল-হুদা; (১১) نور الهدى لحملة لواء الهدى; (১২) التعليق العجب لحل حاشية الجلال على التهذيب। তু. ব্রকেলম্যান, ২খ., ৮৫৭ সংখ্যা ৭; (১৩) حل المغلق فى تحقيق المجهول المطلق।

(ঙ) হি'কমাত বিষয়ে ঃ (১৪) الكلام المتين فى تحرير البراهين; (১৫) ميسر العسير فى بحث المثناة بالتكرير; (১৬) الافادة الخطيرة فى بحث نسبة سبع عرض شعيرة কাদী যাদাহ কৃত 'মুলাখ্খাসু'ল—হায়আত'-এর শরাহ-তে চাগমীনীর একটি ব্যাখ্যা সম্পর্কে।

(চ) ইল্‌ম কালাম বিষয়ে ঃ (১৭) আল-মা'আরিফ হ'াশিয়াতু শারহি'ল্‌-মাওয়াকিফ।

(ছ) চিকিৎসা বিষয়ে ঃ (১৮) শারহু'ল-মূজায।

(জ) জীবনী ও ইতিহাস বিষয়ে কতিপয় গ্রন্থ যেইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ (১৯) আল্‌-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল্‌-হ'ানাফিয়্যা; (২০) তারাবুল-আমাছি'ল ফী তায'কিরাতিল-আওয়াইল; (২১) النصيب الاوفر فى ترلجم علماء المائة; (২২) خير العمل فى تر اجم علماء فر نجى الثالك عشر; (২৩) حسرة العالم بوفاة مرجع العالم محل;

(ঝ) ফিক্‌'হশাস্ত্রের একচল্লিশটি গ্রন্থ যাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ (২৪) القولء المنثور فى هلال خير الشهور; (২৫) الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهار; (২৬) الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة; (২৭) আল-কালামুল-জালীল ফী মা য়াতা'আল্লাকু বিল-মিন্‌দীল; (২৮) তুহ্‌'ফাতুন-নুবালাই ফী জামা'আতিন-নিসা ; (২৯) হাদিয়াতুল-মুতাদীন বি-ফাত্‌হি'ল-মুক্‌'তাদীন; (৩০) الفلك المشحون فى انتفاء; (৩১) تحفة الطلبة فى تحقيق الراهن والمرتهن بالمرهون; (৩২) নুয্‌হাতুল-ফিক্‌রি ফী সাম্‌হ'াতি্‌য-যি'ক্‌র; (৩৩) مسح الرقبة সা'বাহ'াতুল- (ব্রকেলম্যান ঃ সিয়াহ'াতুল) ফিক্‌র ফিল-জাহ্‌রি বিয্‌-যিক্‌র; (৩৪) খায়রুল-খাবার ফী আযানি খায়রিল-বাশার; (৩৫) المهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة; (৩৬) গ'ায়াতুল-মাক'াল ফীমা য়াতা'আল্লাকু বিন-না'আল; (৩৭) ইফাদা (ব্রকেলম্যান, সংখ্যা ২৬); (৩৮) ঈদ'াহ'; (৩৯) আল-ক'ান্‌ত'ারা ফী আহ্‌'কামিল-বাস্‌মালা; (৪০) امام ودع; (৪১) الكلام فى ما يتعلق بالقرائة خلف الامام; (৪২) الاخوان عما احدثوه فى جمعة آخر رمضان যাজ্‌রু আরবাবির-রায়্যান আন্‌-শুরবিদ-দুখান; (৪৩) ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان; (৪৪) اكام النفائس فى اداء الاذكار بلسان فارس; (৪৫) আল্‌-ইনসাফ ফী হুক্‌মিল-ইতিকাফ; (৪৬) اقامة الحجة على ان الاكثار فى التعبد ليس ببدعة; (৪৭) আল-কাওলুল-হাযিম্‌ ফী সুকূতিল-হাদ্দি বি-নিকাহিল মাহারিম (القول الحازم فى سقوط الحد بنكاح المحارم); (৪৮) 'উম্‌দাতুর-রি'আয়া ফী হ'াল্লি শারহিল-বি'ক'ায়া; (৪৯) القول الاشرف فى الفتح عن المصحف।

(ঞ) উস্‌'ল ফিক্‌'হ্‌ বিষয়ে ঃ (৫০) আওদ'াহ' (তাল্‌বীহ-এর ভাষ্য)

(ট) ইল্‌ম কালাম বিষয়ে ঃ (৫১) হ'াশিয়া 'আলাল-খিয়ালী; (৫২) حاشية على شرح عقائد النسفى।

(ঠ) ইলম হাদীছ সম্পর্কে ঃ (৫৩) আত-তা'লীকুল-মুমাজ্জাদ (ব্রকেলম্যান, সংখ্যা ১৬) التعليق الممجد على موطأ امام محمد; (৫৪) الاثار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة।

(ড) উস্‌'ল হাদীছ বিষয়ে ঃ (৫৫) জাফারুল-আমানী ফী শারহি' মুখতাসারিল্‌-জুরজানী। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার আরও কতিপয় রচনা রহিয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (৫৬) আল-লাতাইফুল-মুস্‌তাহ্‌ সানা বি-জাম্‌ই খুতাবিন্‌ লি-শুহূরিস্‌-সানা[১](اللطائف المستحمنة بجمع خطب لشهور السنة)। ইহাতে বৎসরের বার মাসের প্রতি জুমু'আর জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অর্থপূর্ণ ভাষায় রচিত খুত্‌বা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আরও দেখুন ব্রকেলম্যান ২খ., ৮৫৭, সংখ্যা ৩, ৪, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২০, ২৭, ৩১, ৩৬—৩৯, ৪৩-৪৬।

গ্রন্থগুলির অধিকাংশই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। পাণ্ডুলিপিগুলি ফিরিঙ্গী মহল্লার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আরও দেখুন ব্রকেলম্যান, পরিশিষ্ট, উল্লিখিত স্থানে; তথায় উপরিউক্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের হাওয়ালা প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-হ'ায়্যি ফিরিঙ্গী মাহ'ল্লী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়া গ্রন্থের শেষাংশে স্বলিখিত জীবনী; (২) মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-হ'ামীদ ফিরিঙ্গী মাহ'ল্লী সারাপা গাম সাওয়ানিহ আখ্‌ আ'জাম; (৩) রাহ্‌মান আলী, তায'কিরা-ই উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১১৪; (৪) 'ইনায়াতুল্লা ফিরিঙ্গী মাহ'ল্লী, তায্‌'কিরা-ই উলামা-ই ফিরিঙ্গী মাহ'ল্লী, ('আবদুল-হ'ায়্যি ফিরিঙ্গী মাহ'ল্লী প্রসঙ্গ); (৫) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত'বু'আত, কায়রো ১৯২৮ খৃ., কলাম ১৫৯৫-১৫৯৭; (৬) ব্রকেলম্যান, ২খ., ৮৫৭ প. (১৮ ও ১৯ নং পুস্তক ভুলক্রমে ইঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে)।

যুবায়দ আহ্‌মদ (দা.মা.ই.)/ আবদুল হক ফরিদী

আবদুল হালীম গজনবী (عبد الحليم غزنوى) ঃ স্যার, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতীয় রাজনীতির প্রখ্যাত নেতা। এই সময় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত কর্ণধার। সদ্যোত্থিত মুসলিম সমাজের যে কতিপয় নেতা তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ লইয়া আসিয়াছিলেন স্যার আবদুল হালীম গজনবী। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার টাংগাইল মহকুমার দেলদুয়ার গ্রামের বিখ্যাত জমিদার পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার শিক্ষাজীবন মূলত বিদেশে অতিবাহিত হয়। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ গযনী হইতে এই দেশে আগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্যার আবদুল করীম গজনবী ছিলেন নরমপন্থী বৃটিশভক্ত ও সেই সময়ের একজন বিখ্যাত দেশনায়ক। বৃটিশ শাসকেরা স্যার আবদুল হালীমকে সুনজরে দেখিতে পারে নাই। স্যার আবদুল করীমকেই তাহারা বেশী পসন্দ করিত। এই জন্য তাহারা ছোট গজনবীকে বলিত 'ভ্রান্ত গজনবী' (Wrong Gaznavi) এবং বড় গজনবীকে বলিত সঠিক গজনবী (Right Gaznavi)। আবদুল হালীম গজনবী ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ। কংগ্রেসের সাথেও তিনি বেশী দিন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারেন নাই। ১৯০৬ খৃ. সুরাট কংগ্রেসে 'বঙ্গ ভঙ্গ' আন্দোলন লইয়া মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

অতঃপর তাঁহাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সুদীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। সব কিছুতেই তাঁহার সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিদৃষ্ট হইত। ১৯২৬ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ অলঙ্কৃত করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃ. নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের কানপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব

করেন। ১৯৩০-৩ খৃস্টাব্দে তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিতে অনড় থাকেন। ১৯৩৫ খৃ. ভারত শাসন আইন রচনার কাজে তিনি গঠনমূলক অবদান রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতি হিসাবে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে 'নাইট' (Knight) উপাধি দানে সম্মানিত করেন। স্যার আবদুল হালীম কলিকাতার শেরীফের পদও অলস্কৃত করেন। ইহা ছাড়া তিনি রেলওয়ে বোর্ডের স্টাট্যুটরী কমিটি, রিজার্ভ ব্যাংক ও বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পরামর্শদাতা বোর্ডের সদস্য হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৯৪৫ খৃ. পর্যন্ত তিনি ঢাকা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ছিলেন। বস্তুত শিক্ষা ও অর্থনীতিতে তাঁহার মতামতের গুরুত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হইত। ভারতবর্ষে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ইন্ডিয়া স্টীমশিপ কোঃ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দে ভারত শাসন আইনে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি সর্বতোভাবে বাস্তব স্বীকৃতি লাভ করে। গোলটেবিল বৈঠকে ও জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটিতে স্যার আবদুল হালীম গজনবী যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা সত্যই তুলনাহীন। বৈঠককালে লক্ষ্য করা যায়, গান্ধীজীর অসহযোগের কলা-কৌশলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বিচলিত। অপরপক্ষে মুসলিম নেতাদের মধ্যেও মতবিরোধ সঙ্কটজনক আকার ধারণ করে। স্যার আবদুল হালীম গজনবীর দৃঢ় মনোবল স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিকে সফল করিতে সহায়ক হইয়াছিল।

বস্তুত স্যার আবদুল হালীম গজনবীর নিকট মুসলিম জাতি অশেষ ঋণী। ১৯৫৬ খৃ. ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১৬৩-৬৪; (২) শামসুজ্জমান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পা., চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।

ড. এম. আবদুল কাদের

'আবদুল্লাহ (عبد الله) ঃ উপন্যাস, লেখক খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক; প্রকাশ ১৯৩৩ খৃ.। মুসলিম সমাজচিত্রমূলক এই উপন্যাসের নায়কের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। ৩১৯ পৃষ্ঠার উপন্যাসটি ৪১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসটি ৩০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখার পর ইমদাদুল হক ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তাঁহার খসড়া অনুসরণ করিয়া তদীয় বন্ধু ও শিক্ষাবিদ আনোয়ারুল কাদির ইহার রচনা সমাপ্ত করেন। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য দেখা যায়, তবে চিত্রকর ইমদাদুল হকের লেখায় মনস্তাত্ত্বিক আনোয়ারুল কাদির প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ কেবল শ্রেষ্ঠ মুসলিম সামাজিক উপন্যাসই নয়, বাংলার উপন্যাস সাহিত্যেও ইহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কাহারও মতে ইহা শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ-এর সহিত একই আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শরৎচন্দ্রের ন্যায় পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী কাজী ইমদাদুল হক এই উপন্যাসে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের দোষত্রুটি সহানুভূতির সহিত অংকিত করিয়াছেন। মুসলিম সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দা সমস্যা, অন্ধ পীরভক্তি ও ধর্মের নামে সংস্কারপ্রীতি তাঁহার লেখনীর জাদুস্পর্শে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে সংস্কারকামী নবীন ও সংস্কার পরিপন্থী প্রবীণের দ্বন্দ্বে নবীনের জয় ও প্রবীণের পরাজয়ের শুভ সূচনা হইয়াছে। উপন্যাসে আবদুল্লাহ, আবদুল কাদের ও হালিমাকে নবীনপন্থীদের এবং আবদুল্লাহ্‌র শ্বশুর সৈয়দ সাহেব ও আবদুল্লাহর স্ত্রী সালেহাকে প্রাচীনপন্থীদের মুখপাত্ররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু নবীনদের বিজয় সূচনা করিতে গিয়া লেখক কোথাও বিদ্রূপ করেন নাই এবং আগাগোড়া সহানুভূতি ও সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। আবদুল্লাহ-র মত মুসলিম সমাজের এমন নিখুঁত চিত্র আর কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না। উপন্যাসটির ভাষাও সাবলীল।

উর্দূ পাঠকদেরকে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি আব্‌দুল হক্ ফরীদী (এ. এফ. এম. আবদুল হক) উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। পাকিস্তান সরকারের প্রকাশনা সংস্থা 'পাকিস্তান পাবলিকেশান্স' আনু. ১৯৫৩ (?) সনে করাচীতে ইহা প্রকাশ করে। পাঠক সমাজে অনূদিত গ্রন্থটি সমাদৃত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ (عبد الله) ঃ ১৮৮২-১৯৫১, জর্দানের বাদশাহ্ (১৯৪৬-৫১), শরীফ হুসায়নের পুত্র, জ. মক্কা। ইব্‌ন সাঊদের কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে হিজায হারাইতে হয়। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮ খৃ.) তুর্কীর বিরুদ্ধে আরব বিপ্লবের নেতৃত্ব করেন। গ্রেট বৃটেন কর্তৃক সৃষ্ট ট্র্যান্স-জর্ডানের আমীর ছিলেন (১৯২১-৪৬)। তিনি বৃটিশ নীতির সমর্থক ও হাশিমী বংশের অধীনে যুক্ত আরবের পক্ষপাতী ছিলেন। বৃটিশদের দ্বারা যুদ্ধবিদ্যায় দীক্ষাপ্রাপ্ত নিজস্ব 'আরব বাহিনী লইয়া ১৯৪৮ খৃ. ইসরাঈল আক্রমণ করেন এবং নবগঠিত ইয়াহূদী রাষ্ট্রের কিছু অংশ দখল করিতে সমর্থ হন। তিনি আততায়ী কর্তৃক জেরুজালেমে নিহত হন (১৯৫১ খৃ.)।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ আরচিবল্‌ড্ হ্যামিলটন ঃ স্যার, ১৮৭৬ (?), ইংরেজ ব্যারোনেট, খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, ১৯২৩ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন, পূর্ব নাম স্যার চার্লস এডওআর্ড আর্‌চিবল্‌ড্ ওয়াটকিন্‌স হ্যামিলটন। তিনি রয়াল ডিফেন্স কোর-এ লেফ্‌টেন্যান্ট ও সেলসী-কন্‌জারভেটিভ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ 'ইমাদী (عبد الله عمادى) ঃ মাওলানা, মৃ. ১৯৪৭, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, উর্দূ সাহিত্যিক ও উচ্চ শ্রেণীর সাংবাদিক। দীর্ঘকাল লাহোর যামীন্দার' ও সিতারায়ে সু'বৃহ' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুত-তারজামা বিভাগে অনুবাদ ও রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ খেশ্‌গী 'আবদী (عبد الله خویشکی عبدی) ঃ ক'াসূরী, বাদশাহ শাহজাহান ও আলামগীরের যুগের একজন

আলিম, কবি, ঐতিহাসিক, জীবনীকার ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার রচিত যে গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেইগুলির মধ্যে আখ্বারুল-আওলিয়া' ও মা'আরিজুল-বি'লায়া— এই দুইটি গ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'আবদুল্লাহ খেশ্গী ইব্ন 'আবদি'ল-ক'াদির ইব্ন আহ'মাদ শূরয়ানী বিশিষ্ট আফগান গোত্র খেশ্গী-এর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। ক'াসূ'র-এ বসতি স্থাপনকারী খেশ্গী পীর ওয়াতূ শূরয়ানী (মৃ. ৫৫০/১১৫৫)-এর বংশে তাঁহার জন্ম হয় (মা'আরিজুল-বি'লায়া, পাণ্ডুলিপি, পত্র ৫৪১ ক)। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'উবায়দুল্লাহ। কিন্তু 'আবদুল্লাহ নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। চিশ্তিয়া পীরগণের প্রতি অত্যধিক ভক্তির কারণে তিনি তাঁহার নামের সহিত 'গু'লাম মু'ঈনুদ্দীন' (অর্থাৎ খায়াজা মু'ঈন উদ্দীনের গোলাম) বিশেষণটি যোগ করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় কখনও কখনও শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন বলিয়া 'খালীফাজী' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিলেন (পূ. গ্র., আখ্বারুল-আওলিয়া, পাণ্ডুলিপি, ভূমিকা)। তাঁহার কবিনাম ছিল 'আব্দী (পূ. গ্র., পত্র ৩৮৪ ক)। ১০৪৩/১৬৩৩-এর দিকে তিনি কাসূরে জন্মগ্রহণ করেন (আহ'ওয়াল ও আছ'ার 'আবদিল্লাহ খেশ্গী কাসূরী, লাহোরে মুদ্রিত, পৃ. ২৭)। ১০৭৭/১৬৬৬ সনে তাঁহার এক পুত্র মুহ'াম্মাদ মু'তাসি'ম বিল্লাহ জন্মলাভ করে। তাঁহার পিতামহ আহ্'মাদ শূরয়ানী (মৃ. ১০৩০/১৬২০) একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও তাঁহার যুগের একজন বড় ফাক'ীহ ছিলেন (পূ. গ্র., পত্র ৫৯ আলিফ; মা'আরিজু'ল-বি'লায়া, পত্র ৩৬৯ আলিফ, বা)। 'আব্দী ক'াসূ'রেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে লাহোরে মিয়া মুহ'াম্মাদ স'াদিক', মিয়া মুহ'াম্মাদ সা'ঈদ ও শায়খ নি'মাতুল্লাহ-এর নিকট প্রচলিত বিষয়াদি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর এক বৎসর কাল ক'াসূ'রে শিক্ষাদান করেন। ইহার পর জীবিকার অন্বেষণে দিল্লী গমন করেন এবং নওয়াব দিলীর খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন; ১০৯৪/১৬৮২ পর্যন্ত তাঁহার নিকটই অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি বেশ কয়েকজন শায়খ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকট প্রচলিত বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন। শায়খগণের মধ্যে ছিলেন শায়খ ফাত্হু'ল্লাহ আহমাদাবাদী, শায়খ 'আবদুর-রাহ'মান রাফী আহমাদাবাদী, শায়খ পীর মুহাম্মাদ লাখ্নাবী (মৃ. ১০৮৫/১৬৭৪), মাওলানা খাজা আলী, শায়খ মুহাম্মাদ রাশীদ জৌনপুরী (মৃ. ১০৮৩/১৬৭২), শায়খ 'আবদুল-লাত'ীফ বুরহানপুরী (মৃ. ১০৬৬/১৬৫৫), শায়খ বুরহানুদ্দীন বুরহানপুরী (মৃ. ১০৮৩/১৬৭২), শায়খ হ'াবীব শাহ দাওলা দারয়াঈ গুজরাতী (মৃ. ১০৮৭/১৬৭৫), মীর সায়্যিদ আহ'মাদ গীসূদারায (মৃ. ১০৮৪/১৬৭৩), শায়খ 'আবদুল-খালিক' খেশ্গী কাসূরী প্রমুখ। 'আব্দীর জীবন একদিকে যেমন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, তেমন অপরদিকে আমীর-উমারা' ও রাজসভাসদদের সাহচর্যেও তাঁহাকে দেখা যাইত। ১০৬৬/১৬৫৫ সনে তিনি বাহ'রুল-ফিরাসা নামে দীওয়ান হ'াফিজ'-এর একটি ভাষ্য লিখেন। ইহার ভূমিকায় শাহজাহানের প্রশংসায় একটি স্বরচিত ক'াসীদাও সন্নিবেশিত করেন। ১০৬৬/১৬৫৫ হইতে ১০৯৪/১৬৮২ সাল পর্যন্ত তিনি নওয়াব দিলীর খানের সভাসদ ছিলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্য অভিযানে তিনি দিলীর খানের সহগামী হইয়াছিলেন। খৃ. ১৬৬৫-তে আলামগীর যখন রাজা জয়সিংহকে বীজাপুর অভিযানে প্রেরণ করেন, তখন 'আবদীও রাজার সহগামী হন (মা'আরিজুল-বি'লায়া, পত্র ৫৬৭ আলিফ)। দাউদ খান হু'সায়ন যাঈ-এর ফরমায়েশে তিনি জামি'উল- কালিমাত নামে শায়খ 'আবদুল-লাত'ীফ বুরহানপুরীর পত্রাবলী সংকলন করিয়াছিলেন। হ'াসান খান ও সা'ঈদ খান খেশ্গীর ফরমায়েশে আস্রার-ই মাছ'নাবী নামে মাওলানা রূমীর মাছ'নাবী'র একটি ভাষ্য রচনা করেন।

তাঁহার রচিত বেশ কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ঃ (১) আখবারুল-আওলিয়া, ১০৭৭/১৬৬৬-এ কাসূর অঞ্চলের আফগানী ও গায়র আফগানী শায়খগণের জীবনী গ্রন্থ। ইহার চতুর্থ অধ্যায় তাহ'ক'ীক'-ই নাসাব-ই আফগানান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থটি কাসূরের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের একটি প্রাচীনতম ও মূল্যবান উৎস। (২) মা'আরিজুল বি'লায়া, ১০৯৬/১৬৮৪-তে সমাপ্ত। ইহা উপমহাদেশের প্রাচীন ও 'আব্দীর সমসাময়িক শায়খগণের একটি বিস্তৃত জীবন-চরিত। ইহাতে চারি শতাধিক শায়খের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে 'আবদী একটি অভিনব রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। শায়খগণের জীবনী আলোচনার পাশাপাশি তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত মূল পাঠ বা পূর্ণ পাঠও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এইভাবে মা'আরিজুল-বি'লায়া-এর মাধ্যমে প্রায় ৩৫টি তাসাওউফ সংক্রান্ত পুস্তকের মূল পাঠ আমাদের হাতে আসিয়াছে। মুফতী গুলাম সার্ওয়ার লাহোরী খাযীনাতুল-আস্'ফিয়া গ্রন্থটির উপকরণ সম্ভবত এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মা'আরিজুল-বি'লায়া গ্রন্থটিও পাঞ্জাবের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এতদ্ব্যতীত 'আব্দী ইহাতে মুজাদ্দিদ আল্ফে ছ'ানী (র) (দ্র.) ও তাঁহার আন্দোলনের বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্নজনের বিরূপ মতামতও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে ঐ যুগের ধর্মীয় কর্মধারা ও মানসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে ইহাতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রন্থটি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইহার দুইটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। 'আব্দী রচিত বহু পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ

(১) বাহ্'রু'ল-ফিরাসা আল-লাফিজ ফী শারহি দীওয়ান-ই খাওয়াজা হাফিজ; (২) খুলাসাতুল-বাহ্র কাদীম ওয়া জাদীদ; (৩) জামিউল বাহ্রায়ন ফী যাওয়াইদিন নাহ্রায়ন; (৪) খুলাসাতুল-বাহ্র ফী ইল্তিকাতিদ-দুরার; (৫) আস্রার-ই মাছ্নারী ওয়া আনওয়ার-ই মানাবী; (৬) তাহ্কীকুল মুহাক'কিক'ীন ফী তাদ্ক'ীকি'ল-মুদাক'কি'নীন; (৭) ফাওয়াইদুল-'আশিক'ীন; (৮) বাহারিস্তান, শার্হ' গুলিস্তান; (৯) তুহ্'ফা-ই দুস্তান শার্হ'-ই বুস্তান; (১০) জামি'উল-কালিমাত, কাসূরের বন্ধুদের নামে শায়খ আবদুল-লাত'ীফ বুরহানপুরীর পত্রাবলী; (১১) তাল্ক'ীনুল-মুরীদীন; (১২) তাল্ক'ীনুত- ত'ালিবীন; (১৩) মাজ্হারুল-ওয়াজুদ ওয়া মাজ্'হারুশ-শুহুদ; (১৪) মুহ'াকামাতুল- 'উলামা ফী ইখতিলাফিস্-সূ'ফিয়্যা ওয়াল-ফুক'াহা; (১৫) রাহ'াতুল-আশবাহ ফী শারহ' নুযহাতিল-আরওয়াহ'; (১৬) মুবায়্যিনাতু ইশরাকি'ল-লুমু'আত; (১৭) মাখযানুল-হ'াক'াইক', শারহ কান্যিদ-দাক'াইক'; (১৮) দীওয়ান আবদী ইত্যাদি।

'আবদীর মৃত্যুসাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১১০৬/১৬৯৪-তে তুহ্'ফা-ই দুস্তান নামক গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, অন্তত হি. ১১০৬ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

পরিতাপের বিষয়, 'আবদীর রচনা পক্ষপাতমুক্ত নয়। তিনি তৎরচিত জীবনী গ্রন্থসমূহ সকল সিলসিলার শায়খগণের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু মুজাদ্দিদী সিল্সিলার শায়খগণকে তিনি কেবল উপেক্ষাই করেন নাই, অধিকন্তু মা'আরিজুল-বি'লায়াত গ্রন্থে এই সিল্সিলা সম্পর্কে বিরূপ মতামতসমূহ সংকলিত করিয়াছেন। তাঁহার এই বিরোধিতা ও পক্ষপাতের পিছনে নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) 'আবদীর পিতা ও মাতামহ সকলেই চিশ্তী সিল্সিলার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। (২) যে সমস্ত সূফীর তিনি সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই গোঁড়া ওয়াহ'দাতুল-ওয়াজূদপন্থী ছিলেন। তাঁহার উপর শায়খ মুহ'ম্মাদ রাফীক' জৌনপুরীর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর শায়খ জৌনপুরী অধ্যাপনার কাজ পরিত্যাগ করিয়া ইব্ন 'আরাবী (দ্র.)-এর রচনাসমূহ অধ্যয়ন ও এইগুলির ভাষ্য রচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। পীর মুহ'ম্মাদ লাখনাবীর সামা' (سماع ঃ ভাবসঙ্গীত) ও ওয়াহ্দ'াতুল-ওয়াজূদ দর্শনের প্রতি 'আবদীর উৎসাহ ও আকর্ষণ সর্বজনবিদিত। শায়খ বুর্হানুদ্দীন বর্হানপুরী শাত্'তা'রী-র দৃষ্টিভঙ্গী ও ওয়াহ্দ'াতুল-ওয়াজূদ সম্পর্কে তাঁহার ভাষ্যের প্রভাবও 'আব্দীর উপর অতি প্রকট। ফলে মুজাদ্দিদ আলফে ছ'ানী (দ্র.)-এর পত্রাবলীতে ওয়াহ্'দাতু'ল-ওয়াজূদের বিরোধিতা দর্শন করিয়া স্বভাবতই তিনি মুজাদ্দিদী তরীকা সম্পর্কে বিরূপ হইয়া উঠেন এবং উহাকে তাঁহার বিরোধিতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। (৩) 'আবদী তাঁহার সমসাময়িক অপর এক পীর শায়খ 'আবদুল-লাতীফ মুজাদ্দিদ আলফে ছ'ানী ও শায়খ আদাম বানূড়ী-র অনুসারিগণকে মুলহি'দ যিন্দীক' বা আল্লাহদ্রোহী বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন এবং সালাতে তাঁহাদের ইক্'তিদা জাইয নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিতেন (মা'আরিজুল-বি'লায়া, পত্র ৬৪৬ খ.)।

যাহা হউক 'আবদী তাঁহার শায়খগণ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ও নিজস্ব ধারায় ওয়াহ্দ'াতু'ল-ওয়াজূদ-এর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্ফী বা আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে মতভেদ সহিষ্ণুতার সহিত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ফলে তিনি মুজাদ্দিদ আলফে ছানীর বিরোধিতায় ব্যাপৃত হন (দ্র. আহ'ওয়াল ওয়া আছ'ার, 'আবদুল্লাহ খেশ্গী, পৃ. ১৪৫—১৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল্লাহ খেশ্গী কাসূরী আখ্বারুল-আওলিয়া' (হস্তলিখিত) ১০৭৭, হি. ১১১৪ লিখিত, মালিকানা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ তায়্যিব হামদানী, কাসূর; (২) ঐ গ্রন্থকার, মাআরিজুল-বিলায়াত, (হস্তলিখিত) হি. ১০৯৬, হি. ১১১১ লিখিত, যাখীরা আযার, গ্রন্থাকার, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর H—২৫; (৩) ঐ গ্রন্থকার, আস্রার-ই মাছ'নাবী ওয়া আওয়ার-ই মা'নাবী (হস্ত লিখিত) হি. ১১০০ পর্যন্ত, গ্রন্থগার পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর সংখ্যা ش-৫২, ৮৭১/ معين-مث; (৪) ঐ গ্রন্থকার, বাহারিস্তান (হস্তলিখিত) হি. ১১০৫, মালিকানা, মুহাম্মাদ শাফী লাহোরী, সংখ্যা ৩১২; (৫) ঐ গ্রন্থকার, তুহফা-ই দুস্তান (হস্তলিখিত) হি. ১১০৬, গ্রন্থগার, মাওলাবী নাবী বাখ্শ হাল্ওয়াঈ মারহূ'ম, লাহোর; (৬) ঐ গ্রন্থকার, বাহ্রুল-ফিরাসা (হস্তলিখিত) [হি. ১০৭৭ পূর্বা], গ্রন্থাগার, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, লাহোর; (৭) মুহাম্মাদ শাফী, লাহোরী য়াদ দাশ্তাহা মুতাআল্লিক বাহ্ কাসুর (হস্তলিখিত), বর্তমানে উহা তাঁহার উত্তরাধিকারী আহ্মাদ রাব্বানী-র মালিকানায়; (৮) কাসিরুল-মুখালিফীন (হস্তলিখিত) (হি. ১০৮৮-এর পর) [মুজাদ্দিদ আল্'ফ ছানীর মত খণ্ডন করিয়া লিখিত], মালিকানা মুহাম্মাদ ইক্বাল মুজাদ্দিদী ; (৯) গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতুল-আস্ফিয়া লাখ্নৌ খৃ. ১৮৭৩; (১০) তাসাদ্দুক হাসয়ন মূসাবী, ফিহ্রিস্ত মাখতূতাত কিতাবখানা আসফিয়্যা, মুদ্রিত দাক্ষিণাত্য; (১১) লুবাবুল মাআরিফিল-ইলমিয়্যা, ইসলামিয়্যা কলেজ, পেশাওয়ার-এর পাণ্ডুলিপি তালিকা) পেশাওয়ার; (১২) মুহাম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদী, আহ্ওয়াল ওয়া আছার আবদুল্লাহ খেশগী কাসূরী, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (১৩) Storey, Persian Literature, ১/২, খ. লন্ডন ১৯৫৩ খৃ.; (১৪) Marshall, Mughals in India, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (১৫) Rossand Browne, Cat. of two collections, Persian and Arabic MSS. India Office, লন্ডন ১৯০২ খৃ.; (১৬) Ethe, Cat. Persian MSS. India Office; (১৭) মীতরা, কে. এম., Cat. MSS.,কপূরথলা গ্রন্থাগার, ১৯২১ খৃ.; (১৮) সায়্যিদ আবদুল্লাহ, Cat. Persian Urdu and Arabic MSS পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগার, vol. I, Fasc. ii, লাহোর ১৮৪৮ খৃ.; (১৯) নাযীর আহ্ম'াদ, Notes on Improtant Arabic and Persian MSS, in Various Libraries in India, ১৩ খ. (খৃ. ১৯১৭) ও ১৪ (১৯১৮ খৃ.), Asiatic Society of Bengal; (২০) মুহাম্মাদ শাফী লাহোরী, An Afghan Colony at Kasur ও Islamic Culture, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, জুলাই ১৯৩১ খৃ.।

মুহাম্মাদ ইক্'বাল মুজাদ্দিদী (দা.মা.ই.)/ফরীদুদ্দীন মাসউদ

আবদুল্লাহ আল গাযনাবী (দ্র. আল-গাযনাবী)

'আবদুল্লাহ আল-গ'লিব বিল্লাহ (عبد الله الغالب بالله)

ঃ আবূ মুহ'ম্মাদ, সা'দী বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠাতাদের জনৈক মুহ'ম্মাদ আশ্-শায়খ আল-মাহ্দীর পুত্র, রামাদ'ান ৯৩৩/জুন ১৫২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ২৯ যুলহিজ্জা, ৯৬৪/২৩ অক্টোবর, ১৫৫৭ সালে তাঁহার পিতা তুর্কী দেহরক্ষীদের দ্বারা নিহত হইলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৮ রামাদ'ান, ৯৮১/২১ জানুয়ারী, ১৫৭৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সুলতান ছিলেন।

সামগ্রিকভাবে তাঁহার শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। কেননা তাঁহার মনে ভয় ছিল, যে তুর্কীগণ তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে এবং কিছুদিন পরেই মরক্কোর উত্তর অংশ আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং যাহারা তাঁহার তিন ভ্রাতা আল-মা'মূন, 'আবদুল মালিক এবং আহ্'মাদকে আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহারা যে কোন সময় তাঁহার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারে। অতএব তিনি স্পেনীয়দের সঙ্গে শান্তিচুক্তির কৌশল

অবলম্বন করেন। Penon de Velez-এর দাবি ত্যাগ (১৫৬৪ খৃ.), শাফশাওয়ান (Shafshawan)-এর কর্তৃক গ্রহণ (১৫৬৭ খৃ.) ও Moriscos-এর বিদ্রোহের সময় (১৫৬৮-৭১ খৃ.) তিনি খুবই অস্থির ও চিন্তিত ছিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তির সঙ্গেও তাঁহার সুসম্পর্ক ছিল। Navarre-এর রাজা Antonie de Bourbon-এর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র ৫০০ সৈন্যের বিনিময়ে আল-কাস্রুস-সাগীর উক্ত রাজাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইংল্যান্ডের সহিতও তাঁহার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। তিনি পর্তুগীজদের অধীনে Mazagan দুর্গটি জয় করিবার জন্য স্বীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ-এর অধীনে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪ মার্চ হইতে ৩০ এপ্রিল, ১৫৬২ সাল পর্যন্ত অবরোধে দুর্গটি জয় করা সম্ভব হয় নাই। অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর সৈন্যবাহিনী ফিরিয়া আসে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তিনি তাঁহার পিতার আরব্ধ কার্যাদি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি কোন প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই, বিশেষ করিয়া পরিবারের লোকজন সম্পর্কে তাঁহার মনে আশংকা ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি Tlemcen-এর স্বীয় ভ্রাতা আল্-মা'মূনকে গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করান এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল-ক'াদির-এর জনপ্রিয়তায় ভীত হইয়া তাঁহাকেও হত্যা করেন (৯৭৫/১৫৬৭-১৫৬৮)। কতিপয় ধর্মীয় নেতাকেও তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন বলিয়া মনে হয়। ইয়ূসুফীয় তরীকার কয়েকজন সদস্যকে হত্যা বা বন্দী করেন। ফাকীহ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ-আল আন্দালুসীকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতার অপবাদে মার্রাকুশে শূলদণ্ড দেওয়া হয় (যুল'-হিজ্জা, ৯৮০/৯১ এপ্রিল, ১৫৭৩)। তিনি মার্রাকুশে কয়েকটি প্রসিদ্ধ ইমারত নির্মাণ করেন, যথা ইব্ন ইয়ূসুফ মাদ্রাসা। Diego de Torres-এর ধারণা, মার্রাকুশের 'মাল্লাহ' তাঁহার দ্বারাই বর্তমান অবস্থানে নির্মিত হইয়াছিল। তিনি আগাদীর (দ্র.) বন্দরের প্রতিরক্ষার জন্যও একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্নুল কাদী, দুররাতুল-হিজাল (All Ouche), ২খ., ৩৪২-৩৪৩ (নং ৯৫১); (২) জান্নাবী, আল-বাহ্'রুয্-য'াখ্খার, অনু. Fagnan, Extraits inedits relatifs au maghreb, Alger ১৯২৪, পৃ. ৩৪৫-৪৮; (৩) Chronique anonyme as'dienne (G.-S. Colin), রাবাত ১৯৩৪, পৃ. ৩০-৪০, অনু. Fagnan, Extraits, ৩৮৩-৩৯৩; (৪) আল্-ইফ্রানী (Eloufrani), নুয্হাতুল-হাদী (Houdas), ৪৫-৪৭, অনু. Haudas, ৮২-১০১; (৫) আন্-নাসি'রী আস্-সালাবী, আল ইস্তিক্'স'া, কায়রো ১৩১২/১৮৯৪, ৩খ., ১৭-২৬, অনু. আহ'মাদ আন্-নাসি'রী আস্-সালাবী, AM, ৩৪খ., ৬১-৯১; (৬) Diego de Torres, Histoire des Cherifs (ফরাসী অনুবাদ), প্যারিস ১৬৬৭ খৃ., ১খ., ২১৯-২২৬; (৭) Marmol, L'Afrique (ফারসী অনুবাদ,) প্যারিস ১৬৬৭, ১খ., ৪৮২-৪৮৫; (৮) Sources inedites de l'histoire du Maroc, lerc serie, France, ১খ., ১৭০-৩৩৮; (৯) Angleterre, ১খ., ২৩-১২২; (১০) A. Cour, L'etablissement des Cherifs au Maroc, প্যারিস ১৯০৪, ১৩০-১৪০; (১১) H. Terrasse, Histore du Maroc, ২খ., Casablanca ১৯৫০, পৃ. ১৭৯-৮৩; (১২) দা.মা.ই., ১২খ., ১৩৯৩/১৯৭৩।

R. Lc Tournea (E.I.²)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল্লাহ নাদ্বী (عبد الله ندوى) ঃ মাওলানা আবূ 'উবায়দ শায়খ, জ. আনু. ১৯০০ খৃ., বীরভূম জেলায় নানূর থানায় নূরপুর গ্রামে, মৃ. ঢাকা জেলার টঙ্গী শহরে।

বালক 'আবদুল্লাহ বিভিন্ন যোগ্য শিক্ষকের নিকট ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। লক্ষ্ণৌ নাদওয়াতুল-'উলামায় দার্জা-ই তাকমীল-ই দীনিয়াত পরীক্ষা পাশ করায় তিনি নাদবী নামে পরিচিত হন। উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং কিছুদিন তথায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন (আরাফাত, ১৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা)। তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ রহমানিয়া মাদ্রাসায়ও একাধিকবার শিক্ষকতা করেন (ঐ, ১৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা)। উপরে উল্লিখিত পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ভূপালের তদানীন্তন বিদ্যোৎসাহী নওয়াব নাদ্‌বীকে ভূপালে আমন্ত্রণ জানাইয়া সম্মানিত করেন।

দেশে ফিরিয়া সাঁইথিয়া বড়সিজা ইর্ফানুল-উলূম মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (মাসিক আহ্লে হাদীস, মার্চ-এপ্রিল ১৯২৫)। অতঃপর তিনি কলিকাতার মিস্রীগঞ্জ মাদ্রাসায় ও মুরশিদাবাদ জেলার ভাবৃতা মাদ্রাসায় কর্মরত ছিলেন।

১৯৩৮ খৃ. তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭ খৃ.) ফলে মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হইলে তিনি ঢাকায় আগমন করেন এবং শেষ জীবনে সিলেট সরকারী মাদ্রাসায় বদলি হইয়া অবসর গ্রহণ পর্যন্ত অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন।

অবসর জীবনে তিনি ঢাকার মাদ্রাসাতুল-হাদীছ-এ শায়খুল হাদীছরূপে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দক্ষতার সহিত আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং আরবীতে বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভবত কোন সংগ্রহ বিদ্যমান নাই।

সম্পাদনা পরিষদ

'আবদুল্লাহ পাশা (عبد الله پاشا) ঃ মুহ'সিন যাদাহ চেলেবী ছিলেন একজন তুর্কী রাষ্ট্রনীতিবিদ ও সেনাপতি। তিনি ছিলেন মুহসিন চেলেবীর পুত্র এবং আলেপ্পোর এক ব্যবসায়ী পরিবারসম্ভূত। তিনি ১১১৫/১৭০৩ সালে টাঁকশালের (দারবখানাহ্) নিরীক্ষক (আমীন) হিসাবে অর্থ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। এই বিভাগের সচিব (দাফ্তার দার) ছিলেন তাঁহারই ভ্রাতা মুহাম্মাদ আফেন্দী। প্রধান উযীর চূর্লুলু (Corlulu) আলী পাশার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ (১৭০৭-১০) হয় এবং তিনি তুর্কী দরবারের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। ১১২৬/১৭৩৪ সালে কায়তাস বেগ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আবদুল্লাহ পাশাকে মিসর পাঠানো হয়। তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন এবং

কায়তাসের মস্তক তুর্কী সুলতানের দরবারে প্রেরণ করেন। ১৭১৫ হইতে ১৭৩৭ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামরিক দায়িত্বপূর্ণ পদ পূরণ করেন, যথা Morea-এর সচিব (দাফ্তারদার), Lcpanto (আয়নাবাখতী)-এর গভর্নর (মুহ 'াফিজ), পাশার মর্যাদাসহ কাপূজী (প্রশাসন-এর প্রধান), শাহী মুহ 'াফিজ খানাহর প্রধান (নিশানজী), জানিসারী রক্ষীবাহিনীর প্রধান (আগা), Vidin, Rumeli ও Bosnia-এর প্রশাসক (Beylerbey)। Bender-এ তিনি সেনাপতি (সার-ই আস্কার) ছিলেন। ১৭৩৬ সালে রাশিয়া যখন ক্রিমিয়া আক্রমণ করে এবং অস্ট্রীয়া দানিউব অঞ্চলে অনুপ্রবেশের হুমকি দেয়, তখন তিনি Bessarabia-তে সেনাপতি ছিলেন। Niemirov (Poland)-এর আলোচনা যখন ব্যর্থ হইল তখন সুলতান মাহ 'মূদ ১ম (১৭৩০-৫৪) তাঁহাকে আবদুল্লাহ পাশা উপাধি দিয়া প্রধান উযীর নিযুক্ত করেন (৬ রাবীউছ-ছানী, ১১৫০/৩ আগস্ট, ১৭৩৭)। আবদুল্লাহ পাশা যুদ্ধ পরিচালনা করেন, কিন্তু তুর্কী দরবারের ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে ব্যর্থ হন। চারি মাস পর তাঁহাকে ইস্তাম্বুলে ডাকিয়া আনা হয় এবং নবনিযুক্ত প্রধান উযীর ইগেন (Yegen) পাশার হাতে প্রধান উযীরের সীলমোহর হস্তান্তর করিতে তিনি বাধ্য হন (রামাদান ১১৫০/১৯ ডিসেম্বর, ১৭৩৭)। তবে তিনি বিভিন্ন দুর্গের অধিপতি ও কয়েকটি প্রদেশের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যান। ১১৬২/১৭৪৯ সালে নব্বই বৎসর বয়সে Trikala, Thessaly নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ পাশা Kucuk Kaynardje-এর সন্ধিতে (১১৭৪ হি.) স্বাক্ষর করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Hammer-Purgstall, iv, 330, 340; (২) সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ৩খ., ৩৭৯; (৩) N. Jorga, Gesch. des osm. Reiches, iii, 430, 434.

E. Rossi (E.I.[2]) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ য়ূসুফ 'আলী, 'আল্লামা (عبد الله يوسف على علامة) ঃ এম. এ., এল. এল. এম. (কেমব্রিজ), বার অ্যাট ল ঃ আই. সি. এস. সি., বি. ই., ১৮৭২-১৯৫৩ খৃ., প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তানায়ক, লেখক, শিক্ষাবিদ ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রবিশারদ; পিতা খান বাহাদুর ইয়ূসুফ আলী। বোম্বাইয়ের উইলসন কলেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডনের লিংকন্স্ ইন-এ শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৫ খৃ. ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। বিভিন্ন সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, ভারত সরকারের অর্থ-দফতরের আন্ডার-সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯১৪ খৃ. ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। নাগপুরে (১৯১০ খৃ.) ও কলিকাতায় (১৯৩২ খৃ.) অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা আন্তঃসম্মেলনে সভাপতি ছিলেন। লীগ অব নেশনস্-এর ৯ম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে (১৯২৮ খৃ.) অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিষয়ক বিভাগে হিন্দী, ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-রীতির অধ্যাপক (১৯১৭-১৯১৯), ইমপেরিয়াল ইন্সটিটিউটের ভারত বিষয়ক কমিটির সদস্য ও বিশেষ কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান (১৯১৬-১৯), হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী (১৯২১-২২), লাহোর ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৯২৫-১৯২৭ এবং ১৯৩৫-৩৭), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য; ধর্মের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিশ্ব-সম্মেলনের কর্ম-পরিষদ-সদস্যপদসহ বহু গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে (১৯১৮) ও হল্যান্ড (১৯২০)-এ সফল বক্তৃতা করেন। ১৯২৯-৩০ খৃ বিশ্ব সফর করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শিক্ষা-সফর করেন। পাক-ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। পুরাতত্ত্ব, ভাস্কর্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছেঃ দি ইন্ডিয়ান মুহামেডান্স (১৯০৭); মেস্ট্রোভিক অ্যান্ড সার্ভিয়ান স্কাল্পচার (১৯১৬); মুস্লিম এডুকেশনাল আইডিয়াল্স (১৯২৩); ইসলাম এ্যাস এ ওয়ার্ল্ড ফোর্স (১৯২৬); ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউরোপ (১৯২৬); পারসোনালিটি অব মুহাম্মাদ দি প্রফেট (১৯২৯); লাইফ অ্যান্ড লিটারেচার (১৯৩৬); মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া (১৯৩২) ; রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোশাল ইকুয়্যালিটি (১৯৩৬), ইসলামিক হিস্ট্রি, ইটস স্কোপ অ্যান্ড কনটেন্ট (১৯৩৬); দি মেসেজ অব ইসলাম (১৯৪০)। সর্বোপরি পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনার জন্যই তিনি পাক-ভারত ও ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই অনুবাদ ও ভাষ্যের নাম, ইংলিশ ট্রান্স্লেশন অ্যান্ড কমেন্টারি অন দি কুরআন (১৯৩৪-৩৮ খৃ.)। শেষ জীবনে ইংলন্ডে বসবাস করেন এবং সেখানেই মৃত্যু হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ সারী (দ্র. সারী আবদুল্লাহ ইফেন্দী)

'আবদুল্লাহ সুল্তানপূরী (عبد الله سلطان پوری) ঃ মাখ্দূমুল-মুল্ক নামে অভিহিত, সুল্তানপুরের (পাঞ্জাব) শায়খ শাম্সুদ্দীনের পুত্র, ১০ম/১৬শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ভারতীয় আলিম। তিনি সির্হিন্দের মাওলানা 'আবদুল-ক 'াদিরের নিকট শিক্ষালাভ করেন। একজন সুপণ্ডিত হিসাবে ও মুসলিম আইনশাস্ত্র (ফিক 'হ্), ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসে অগাধ জ্ঞানের কারণে খ্যাতি অর্জন করেন। সম্রাট হুমায়ূন (দ্র.) তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং শের শাহ্ (৯৪৭-৫২/১৫৪০-৫) তাঁহাকে স 'াদ্রুল-ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেন। ইস্লাম শাহ (৯৫২-৬১/১৫৪৫-৫৪)-এর অধীনে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে সম্রাটের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ৯৬২/১৫৫৫ সালে ক্ষমতায় পুনরাগমনের পর হুমায়ূন তাঁহাকে শায়খুল-ইসলাম উপাধি দান করেন এবং পরবর্তী সম্রাট আক্বার (দ্র.)-এর আমলে তিনি মাখ্দূমুল-মুলক উপাধি লাভ করেন। ৯৮৭/১৫৭৯ সালে তিনি হিজায গমন করেন, সেখানে মক্কার মুফ্তী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন। মাখ্দূমুল-মুলক হজ্জ পালন না করিয়াই ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কথিত আছে, তিনি এই মর্মে এক ফাত্ওয়া জারী করেন, ভারতীয়দের জন্য হজ্জ অত্যাবশ্যকীয় নহে। কারণ মেরী ও যীশুর ছবিসম্বলিত ইউরোপীয় পাসপোর্ট ব্যতীত সমুদ্র পথে যাতায়াত করা যায় না এবং স্থলপথেও শী'ঈ মতাবলম্বী পারস্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

মাখ্দুমুল-মুলক আক্‌বারকে ধর্মীয় উচ্চ মর্যাদা প্রদানকারী ৯৮৭/১৫৭৯ সালের স্বীকৃতিসূচক ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং আবুল-ফাদ্'লের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি ৯৯০/১৫৮২ সালে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-ফাদ'ল, আকবার-নামাহ, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৯৭৩-৮৭ খৃ.; (২) 'আবদুল-ক'াদির বাদাউনী, মুন্‌তাখাবুত্-তাওয়ারীখ, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৬৪-৯ খৃ.; (৩) শাহ্ নাওয়ায খান, মাআছিরুল-উমারা, ৩খ., Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৮৮-৯১ খৃ.; (৪) আযীয আহমাদ, Studies in Islamic culture in the Indian environment, অক্সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২৯-৩০, ১৬৮-৯; (৫) S. A. A. Rizvi, Religious and intellectual history of the Muslims in Akbar's reign, নয়াদিল্লী ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৭১২ ও নির্ঘণ্ট।

M. Athar Ali (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আবদুল্লাহ (হাসরাতী) (عبد الله حسرتى) ঃ রিয়াযুল-আখবার পত্রিকার সম্পাদক, কবি ও সাহিত্যিক। তাঁহার জীবনকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছু অংশ পর্যন্ত। কীফার কিরদার নামক তাঁহার রচিত একটি বিখ্যাত উর্দু উপন্যাস রহিয়াছে। দীর্ঘদিন যাবৎ লাহোরে পণ্ডিত জনার্দনের সংসর্গে ছিলেন। তাঁহার জন্ম তারিখ, বাসস্থান ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ক'ায়জী (عبد الله بن اوس بن قيظى) ঃ (রা) ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জু'শাম ইব্‌ন হ'ারিছ'া একজন আনসারী সাহাবী ও মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আওস গোত্রের বানূ হ'ারিছ'া উপ-শাখার একজন সদস্য। মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে প্রামাণ্য উৎস হইতে সঠিক কোন তথ্য অবগত হওয়া যায় না। তাঁহার পিতা আওস ইব্‌ন ক'ায়জ'ীও মহানবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি, তাঁহার দুই ভ্রাতা ভ্রাতা কিনানাও আরাবা ও মহানবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কিনানা পিতার সহিত উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আরাবা-র বয়স তখন অল্প ছিল বলিয়া মহানবী (স) যুদ্ধে তাঁহাকে অংশগ্রহণ করিবার অনুমতি দান করেন নাই। আবদুল্লাহ্‌র উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, তৃতীয় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স দশ বৎসরের কম ছিল না।

'আবদুল্লাহ্‌র পিতা আওস ইব্‌ন ক'ায়জ'ী একজন যোদ্ধা ও বীর ছিলেন। 'আবদুল্লাহও পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ১ ও ৩খ., মিসর ১৯৩৯ খৃ.; (২) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহয'ীব, ১খ., সম্পা. আবদুল-ওয়াহ্হাব ও আবদুল-লাতীফ, মিসর তা. বি.; (৩) ইবনুল-আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, ৩খ., তেহরান ১৯৬৬ খৃ.।

এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হু'যায়ফা (عبد الله بن اوس بن حذيفة) ঃ (রা) ছ'াকীফ গোত্রের একজন সদস্য ছিলেন। ছামূদ জাতির অবশিষ্ট বংশধর হইতে পরবর্তী কালে ছ'াকীফ গোত্রের উদ্ভব হইয়াছে। মাক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী স্থানে ছ'াকীফ গোত্রের বাস। আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজার একটি রিওয়ায়াত হইতে জানা যায়, ছ'াকীফ গোত্রের যে প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আগমন করিয়াছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওস উঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইব্‌ন ফাতহ্'ন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, ছ'াকীফ গোত্রের উক্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রামাণ্য উৎস হইতে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওস সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর, মুসতাফা মুহাম্মাদ প্রেস, ১৯৩৯ খৃ., ২খ., ২৭৯; (২) আল-কু'রতু'বী, আবূ 'উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ক'াস্'দ ওয়াল-উমাম, কায়রো সাআদা প্রেস, ১৩৫০ হি.।

এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আক্'রাম (عبد الله بن اقرم) ঃ ইব্‌ন যায়দ (রা) খুযাআ গোত্রের সদস্য। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী খুযা'আ গোত্র নবী (স)-এর সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। অপরপক্ষে বাক্‌র গোত্র মক্কার কুরায়শ গোত্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল। সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করিয়া বাক্‌র গোত্র অতর্কিতে খুযাআ গোত্রের উপর রাত্রিতে আক্রমণ চালাইলে মহানবী (স) কুরায়শদের ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকৃতি জানাইলে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গের অপরাধে মহানবী (স) মক্কায় অভিযান চালাইয়া প্রায় বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। প্রামাণ্য কোন উৎস হইতে তাঁহার জন্ম, মৃত্যু তারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে তাঁহাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁহার ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। বুখারী ও আবূ হ'াতিম মহানবী (স)-এর সহিত তাঁহার সাহচর্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আক্‌রাম মহানবী (স)-এর নিকট হইতে তাঁহার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ-র সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আহ্‌মাদ, নাসাঈ ও তিরমিযী দাউদ ইব্‌ন ক'ায়সের সূত্রে আবদুল্লাহ-র পুত্র 'উবায়দুল্লাহ-র নিকট হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা 'আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতা আকরামের সঙ্গে নিম্‌রা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় উষ্ট্রারোহী কাফেলার একটি দল সেই স্থানে অবতরণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতার সহিত সেই কাফেলার নিকট আসিয়া মহানবী (স)-কে সিজদারত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। আল-বাগ'াবী অপর একটি হাদীছ তাঁহার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব প্রমাণের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আক্‌রামকে মহানবী (স)-এর সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ., ২৭৬, মিসর ১৯৩৯ খৃ., নং ৪৫৩৬; (২) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহ্‌য'ীব, সম্পা. 'আবদুল-ওয়াহ্‌হাব ও আবদুল-লাতী'ফ, মিসর তা. বি., ১খ., ৪০২; (৩) ইব্নুল-আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, ৩খ., তেহরান ১৩৭৭/১৯৬৬।

এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

'আবদুল্লাহ ইব্ন আফ্‌ত'াস (عبد الله بن افطس) ঃ স্পেনের রাজবংশ বানূ আফ্‌ত'াস (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার উপাধি ছিল আল-মানসূ'র। তিনি ৪২২/১০৩১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বানূ আফত'াস-এর বার্বারী বংশের সহিত ছিল তাঁহার রক্ত সম্পর্ক। সেই কারণে তিনি ইব্নুল-আফত'াস নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস্‌লামা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Hugvliet, Spec, c. litt. Grient, exhibens divcrsourm Scriptorum Locos de regia Aphtasdarum Familia ইত্যাদি, লাইডেন ১৮৩৯ খৃ.।

(E.I.[2])/ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্‌দ (عبد الله بن عبد) ঃ (রা) তাঁহাকে 'আব্‌দ ইব্ন 'আব্‌দ আছ-ছু'মালী আবুল-হ'াজ্জাজ ও ইব্ন আবিদও বলা হয়। ইব্নুস-সাকানের মতে আবুল-হ'াজ্জাজ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। আবূ যুর'আ আদ-দিমাশক'ী ও ইব্নুস-সাকানের বর্ণনামতে তিনি একজন সাহাবী। ইব্ন সুমায়-এর বর্ণনামতে তিনি সাহাবীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আযদ গোত্রের ছুমালা শাখায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি হিম্‌স-এ বসবাস করেন। 'আবদুর-রহমান ইব্ন আবী 'আওফ আল-জারাশী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ২০১; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৯, নং ৪৮০৬; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস- স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩২২।

ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্‌দ ইব্ন হিলাল (عبد الله بن عبد بن هلال) ঃ আল-আনস'ারী (রা) তাঁহাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন হিলাল ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্‌দ হিলালও বলা হইয়া থাকে। তিনি কু'বা-র অধিবাসী ছিলেন। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার পিতা দু'আ ও বরকত হাসিলের জন্য তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে লইয়া যান। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। তিনি সারা রাত্রি নামায পড়িতেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখিতেন। তাঁহার মাথায় অত্যধিক ঘন চুল ছিল, যদ্দরুন্ চুল আচড়ানো মুশকিল হইয়া পড়িত। মৃত্যুর সময় চুল-দাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছিল। বিশ্‌র (মতান্তরে বাশীর) ইব্ন ইমরান তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৯, নং ৪৮০৫; (২) ইব্নুল-আছ'ীর, উস্‌দুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২০১; (৩) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইস্‌তী'আব, ১খ., ৩৬৭; (৪) আয-য'াহাবী, তাজ্‌রীদ আসমাই'স-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩২২।

ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্‌দ নাহ্‌ম (عبد الله بن عبد نهم)ঃ আল-মুযানী (রা), প্রসিদ্ধ মুযায়না গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষের মাতা মুযায়না বিন্‌ত কাল্‌ব-এর নামানুসারেই এই নামকরণ। বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুগ'াফ্‌ফাল (রা) ইব্ন 'আব্‌দ নাহ্‌ম (রা)-এর চাচা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল 'আবদুল 'উযযা। ইসলামে দীক্ষিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহা পরিবর্তন করিয়া 'আবদুল্লাহ্ নাম রাখেন। তাঁহার উপাধি 'যু'ল-বি'জাদায়ন' (ডোরাকাটা দুই কাপড়ের অধিকারী)। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) এই উপাধি দেন। ছোটবেলা তিনিই ইয়াতীম হইয়া চাচার নিকট লালিত-পালিত হন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ চাচার নিকট পৌঁছিলে তিনি তাঁহার দেয়া সকল কিছু ছিনাইয়া লইবার হুমকি দেন; কিন্তু তিনি ইসলামের উপরই অবিচল ও অটল থাকেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চাচা যাহা কিছু তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, সব কিছুই ছিনাইয়া লয়, এমনকি পরনের কাপড়ও। এই করুণ ও অসহায় অবস্থায় মাতার নিকট আসিলে মাতা তাঁহাকে একখানি কাপড় দেন যাহা দুই ভাগ করত একাংশ পরিধান করিয়া ও অপরাংশ গায়ে জড়াইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে আসেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স) 'যু'ল-বি'জাদায়ন' উপাধি প্রদান করেন। ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে ইসলামের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ দেখিয়া তাঁহার গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে নিষেধ করে এবং চাপ সৃষ্টির জন্য মাত্র একখানি কাপড় রাখিয়া আর সব কিছুই ছিনাইয়া লয়। উক্ত কাপড় দুই ভাগ করিয়া পরিধান করত তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে হাযির হন; তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে উক্ত উপাধি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলে নিমগ্ন থাকিতেন। আর এই সবই তিনি উচ্চৈঃস্বরে করিতেন।

৯ম হিজরীর রাজাব মাসে তাবূকের যুদ্ধে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাত্রিবেলায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা) তাঁহাকে দাফন করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-ও তাঁহার কবরে অবতরণ করেন। 'উমার ইব্ন শিব্বা-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (স) পাঁচজন সাহাবীর কবরে অবতরণ করেন, 'আবদুল্লাহ্ যু'ল-বি'জাদায়ন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার দাফন শেষ করত রাসূলুল্লাহ্ (স) কিবলামুখী হইয়া দুই হাত তুলিয়া দু'আ করেন ঃ اللهم انى أمسيت عنه راضيا فارض عنه "হে আল্লাহ্! আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিও"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১২২, ১২৩; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৮, ৩৩৯, নং ৪৮০৪; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., ২৯৯; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, ১খ., ৩৪৯।

আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দ মানাফ (عبد اللّٰه عبد مناف)ঃ (রা) ইব্নুন-নু'মান আল-আন্স'ারী আস-সুলামী, আবূ ইয়াহ'য়া। 'উরওয়া ইব্ন শিহাব, মূসা ইব্ন 'উক'বা ও ইসহ'াক' বলেন, তিনি বদ্র ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩৩৮; (২) ইব্নুল-আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ২০০।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল-ক'াদির (عبد اللّٰه بن عبد القادر)ঃ মালয় উচ্চারণ .. .. ক'াদির, পদবী মুন্শী অর্থাৎ ভাষা- শিক্ষক, "মালয় সাহিত্যের রচনাশৈলীতে বহু নূতন ধারার প্রবর্তক' (R O. Winstedt, A History of Malay Literature, JMBRAS, 1940, ch. xii)। তিনি ১৭৯৬ খৃ. মালাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ইয়ামান হইতে আগত সেই শায়খ 'আবদুল-ক'াদির-এর পুত্র, যেই দেশে তিনি প্রথম বসতি স্থাপন করেন। 'আবদুল্লাহ শৈশবে তাঁহার পিতার নিকট মালয় ভাষা শিক্ষা করেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতা মালয় ভাষার একজন অভিজ্ঞ শাস্ত্রী ছিলেন। তিনি মালয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ও বিদ্বান মালয়বাসীদের সংগে মেলামেশা করিয়া নিজেকে ভাষাবিশারদরূপে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। তিনি বহু বিদেশী ভাষা শিক্ষা করেন আর ক্রমাগত Farquhar, Raffles ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারক Milne, Morrison, Thomson প্রমুখ ইউরোপীয়গণের সাহচর্যের ফলে তাঁহার জ্ঞানচর্চা নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সিংগাপুর প্রতিষ্ঠার (১৮১৯ খৃ.) অব্যহিত পরেই তিনি ঐ শহরে বসতি স্থাপন করিয়া নানা উপায়ে জীবিকা অর্জন করিতে থাকেন। তিনি দোভাষীর কাজ করেন, মালয় ভাষায় শিক্ষাদান ও পত্র রচনা করেন এবং খৃষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অনুবাদে North, Keasberry ও অন্যান্য মার্কিন ধর্মপ্রচারকগণকে সাহায্য করেন।

মালাক্কা উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলব্যাপী বিভিন্ন মালয় রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত ভ্রমণ পথের বর্ণনাসমেত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার Bahwa ini Kesah Pu-layar-an Abdllah, ben Abdul Kadir, Munshi, deri Singapura ka-Kalantan নামক পুস্তকখানি ১৮৩৮ খৃ. সিংগাপুরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মালয় ভাষায় সাবলীল অভিনব গদ্যরীতি প্রবর্তন করা হয়। যে সাহিত্য রচনার রীতি-পদ্ধতি বিশ শতকের গ্রন্থকারগণ কর্তৃক অনুসৃত হওয়াতে মালয় ভাষার বিকাশ সাধিত হইয়া শেষ পর্যন্ত উহা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে, এই গ্রন্থকারকে তাহার পথিকৃৎ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

হি'কায়াত 'আবদুল্লাহ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা তাঁহার স্মৃতিকথা হইলেও তিনি ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে Farquhar, Raffles (তিনি যাহাদের সচিব ছিলেন) প্রভৃতি রাজনীতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ভারতীয় অপেক্ষা ইউরোপীয় প্রশাসনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলিষ্ঠ প্রচার করিয়াছেন, যদিও একই সঙ্গে তিনি বৃটিশ ও ওলন্দাজ প্রশাসনেরও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির রচনা ১৮৪৩ খৃ. সমাপ্ত হইলেও কতিপয় সংযোজনসহ ১৮৪৯ খৃ. উহা লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়। উহার প্রথম সংস্করণের কতিপয় কপিতে ইরেজীতে শাসনকর্তা Butterworth-এর নামে উৎসর্গ লিপি রহিয়াছে এবং উহাকে মালয় সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বলিয়া মন্তব্য করা হয়। তাঁহার স্মৃতিকথায় 'আবদুল্লাহ তৎকৃত কতিপয় পুস্তকের নামোল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একখানি ছিল সিংগাপুরে সংঘটিত এক অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনামূলক কাব্য। উক্ত অগ্নিকাণ্ডে গ্রন্থকারের সকল জিনিসপত্রই বিনষ্ট হয়। পুস্তকখানির নাম ছিল Sha'ir Singapura dimakan api, ১৮৪৩ খৃ. উহা মালয় ও ল্যাটিন লিপিতে মুদ্রিত হয়। তবে এই নামে বর্ণিত তালিকায় যে পাণ্ডুলিপির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে উহাতে এই কবিতাটি স্থান পায় নাই, বরং তৎপরিবর্তে ১৮৪৭ খৃ. সংঘটিত অপর এক অগ্নিকাণ্ডের পর রচিত Sha'ir Kampong Gelam terbakar শীর্ষক অনুরূপ একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত।

Cermin Mata নামক সাময়িক পত্রে 'আবদুল্লাহ কতিপয় প্রবন্ধ লেখেন। হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় পৌছিবার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৪ সনে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জিদ্দা পর্যন্ত তাঁহার সমুদ্র-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ Cermin Mata-তে প্রকাশিত হয়।

এই সকল মৌলিক গ্রন্থ ব্যতীত 'আবদুল্লাহ তামিল ভাষায় সম্পাদিত পঞ্চতন্ত্র (ভারতীয় নীতিগল্প সংগ্রহ) পুস্তকখানিতে Hikayat panja Tanderan নামে মালয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং Malay Chronicles (Sedjarah Melayu) সম্পাদনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. O. Winstedt-এর পূর্ববর্ণিত গ্রন্থ; (২) Pelayaran ka-Kclantan, 1o সং., সিংগাপুর ১৮৩৮ খৃ. ('আরবী ও পাশাপাশি রোমান বর্ণলিপিতে); (৩) ঐ, ২য় সং, ১৮৫২, লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত; (৪) পুনর্মুদ্রিত Maleisch Leesbock, 4de stukje, by j. pijnappel, লাইডেন ১৮৫৫ খৃ. (২য় সং, ১৮৭১ খৃ.); (৫) ed. h. c. Klinkert, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (Pelayaran ka-Djudah; টীকা সমেত) ও R. Brons Middel কর্তৃক রোমান বর্ণে রূপান্তরিত, লাইডেন ১৮৯৩ খৃ.; (৬) মালয় সাহিত্য ২য় সিরিজ (দুই খণ্ডে), সিংগাপুর ১৯০৭, ১৯০৯ খৃ. (রোমান ও 'আরবী বর্ণে) ও পুনর্মুদ্রিত; (৭) অনুবাদ ঃ ফরাসী, E. Dulaurier, প্যারিস ১৮৫০ খৃ. (সটীক); (৮) ওলন্দাজ ভাষায় j. j. de Hollander (de Gids ১৮৫১ খৃ., সংক্ষেপিত); (৯) জাভা (javannese) ভাষায়, বটাভিয়া ১৮৮৩ খৃ.; (১০) ইংরেজীতে A. E. Coope, সিংগাপুর ১৯৪৯ খৃ. (সটীক); (১১) Sha'ir Singapura terbakar ঃ P. Faver, L incndie de Singapour, in Melanges Or., publ. Ec. Langues Or Viv.. ১৮৮৩, (১৮৪৩ সনে রোমান বর্ণে মুদ্রিত মূল পাঠ মালয় বর্ণলিপিতে রূপান্তরিত); (১২) Sha'ir Kampng Gelam terkakar, ১ম, সং., একখানা গুটান কাগজে লিথোকৃত, সিংগাপুর ১৮৪৭; (১৩) রোমান বর্ণে

রূপান্তরিত একখানি মালয় কাব্য সংগ্রহে, বহুবার মুদ্রিত (৩য় সং. সিংগাপুর ১৮৮৭ খৃ.); (১৪) Hikayat Abdullah. ১ম সং, সিংগাপুর ১৮৪৯ খৃ. (autogr); (১৫) ২য় সং. R. As. Soc. সিংগাপুর ১৮৮০ খৃ.; (১৬) H. C. Klinkert সম্পা., লাইডেন ১৮৮২ খৃ. (টীকাগুচ্ছসহ); (১৭) সম্পা. W. G. Shellabcar, মালয় সাহিত্য, ৪র্থ সিরিজ (২খণ্ড), সিংগাপুর ১৯০৭, ১৯০৮ খৃ. (রোমান ও 'আরবী বর্ণে, সম্পা.) ;(১৮) j.T. Thomson, ইংরেজি অনু., লন্ডন ১৮৭৪ খৃ.; (১৯) ইং অনু., W.G. Shellabear, সিংগাপুর ১৯১৮ খৃ.; (২০) G. Niemann-কৃত, ওলন্দাজ (সংক্ষেপিত) অনু. (TNI, ১৮৫৪), (২১) তু. c. Hooykaas, Over Maleise Literatuur, ২য় সং. ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১০১ প. ; (২২) Kissah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ka-Mekah, সকল সং. অসম্পূর্ণ (Cermin Mata. সিংগাপুর ১৮৫৮ খৃ.); (২৩) বাতাভিয়া ১৮৬৬ খৃ.; (২৪) Klinkert সং. রোমান বর্ণে BP-তে, ১৯১১, ১৯২০ খৃ. ; সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানির কপি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে (পাণ্ডুলিপি Klinkert 63) ; (২৫) ওলন্দাজ ভাষায় অনু. Klinkert, BTLV ১৮৬৭ খৃ.; (২৬) Hikayat pandjatand-eran, ১৮৩৫ সনে সমাপ্ত; (২৭) ১ম সং. লিথোমুদ্রিত, সিংগাপুর, তা. বি.; (২৮) ২য় স., সিংগাপুর ১৮৬৮ খৃ.; (২৯) H.N.v.d. Tuuk,সম্পা. Maleisch Leesbock, vi (সটীক), লাইডেন ১৮৬৬, ১৮৭৫, ১৮৮১ খৃ.; (৩০) C.A. van. Ophuysen সম্পা., লাইডেন ১৯১৩ খৃ.; (৩১) H.C. klinkert, ওলন্দাজ ভাষায় অনু. Zaltbommel ১৮৭১ খৃ.; (৩২) জাপানী ভাষায় অনু., বাটাভিয়া ১৮৭৮ খৃ.; (৩৩) Sedjarah Melayu, সিংগাপুর তা. বি. (১৮৩১সনের পরে); (৩৪) H.C. Klinkert,বিকৃত পুনঃসং., লাইডেন ১৮৮৪ খৃ. উহার সিংগাপুর সং. ও Dulaurier ও Shellabears-এর-সং.গুলির ভিত্তি; (৩৫) Hikayat Dunia তা. বি. (এশিয়া ও আফ্রিকার ইতিবৃত্ত); (৩৬) hikayat pada menyatakan perihal Dunia, সিংগাপুর ১৮৫৬ খৃ. (ভূগোল গ্রন্থ)।

C.A. van Ophuysen—P. Voorhoeve (E.I.2) / মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল-গা'ফির (عبد الله بن عبد الغافر) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন মুক্তদাস ছিলেন। আবূ মূসা ও ছাবিত আল-বানানী তাঁহার নিকট হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছবিদদের মতে উহা জাল হাদীছ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৩৩৭-৮; (২) ইব্নুল আছ'ীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ২০০।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল-মাদান (عبد الله بن عبد المدان) ঃ (রা) সাহাবী ছিলেন (ইব্ন হি'ব্বান)। ইব্ন সা'দ ও ত'াবারী বলেন, তিনি নবী কারীম (স)-এর নিকট তাঁহার গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, আমার নাম 'আবদুল হ'াজার। নবী কারীম (স) বলিলেন, তোমার নাম এখন হইতে 'আবদুল্লাহ। নবী কারীম (স)-এর ইন্তিকালের পর রিদ্দার ফিত্নার সময় তিনি তাঁহার গোত্রকে ইসলাম ত্যাগ না করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা)-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আল-মারযুবানী বর্ণনা করেন, তিনি ও তাঁহার পুত্র মালিক উভয়ে 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার-এর বন্ধু ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 'আলী (রা)-এর পক্ষ হইতে ইয়ামান-এর গভর্নর ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস। আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর পক্ষ হইতে বুস্র ইব্ন আর্তাত-এর ইয়ামান পৌছার সংবাদ শুনিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস আপন শ্বশুরকে তথায় নিজ প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া তথা হইতে নিজে সরিয়া পড়েন। অতঃপর বুস্র-এর সহিত যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ,তাঁহার পুত্র মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস-এর দুই পুত্র নিহত হন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি তাঁহাদের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৮; (২) ইব্নুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ২০০।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল-মালিক (عبد الله بن عبد الملك) ঃ ইবন মারওয়ান, খলীফা 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (দ্র.)-এর পুত্র। ৬০/৬৮০-৮১ সালে অথবা ইহার কিছু পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে, ৮৩/৭০৪ সালে তাঁহার বয়স ছিল ২৭ বৎসর। তিনি দামিশকেই লালিত-পালিত হন এবং পিতার সংগে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একজন স্বাধীন সেনাপতি হিসাবে তাঁহাকে সর্বপ্রথম দেখা যায় ৮১/৭০০-০১ সালে পূর্বাঞ্চলীয় রোমানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি অভিযানে। ইহার পর ৮২/৭০১-২ সালে আল-আশ'আছে'র বিরুদ্ধে হ'াজ্জাজকে সাহায্য করার জন্য মুহ'াম্মাদ ইব্ন মারওয়ানের সংগে তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। তিনি দায়রুল-জামাজিমের চুক্তি-আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ইহার পরপরই তিনি আবার পূর্বাঞ্চলীয় রোমানদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন এবং ৮৪/৭০৩-৪ সালে আল-মাসীসা জয় করিয়া ইহাকে একটি সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করেন। স্বীয় পিতৃব্য 'আবদুল 'আযীয ইব্ন মারওয়ানের মৃত্যু হইলে ৮৫/৭০৪ সালে তিনি মিসরের 'ওয়ালী' নিযুক্ত হন। ১১ জুমাদাল-উখ্রা তিনি ফুসতাতে প্রবেশ করেন। 'আবদুল 'আযীযের সকল প্রকার প্রভাব মুছিয়া ফেলার উদ্দেশে তিনি সমস্ত কর্মচারী পরিবর্তন করেন। বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁহার অনেক প্রশাসনিক দুর্নীতির উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তিনি রাজধানীর সরকারী দফতরে 'আরবী ভাষা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশাসন দামিশ্‌কে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। ৮৮/৭০৬-০৭ সালে তিনি সাময়িকভাবে দামিশক গমন করেন এবং

৯০/৭০৮-৭০৯ সালে তাঁহাকে স্থায়ীভাবে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনা হয়। তিনি বহু উপহার সামগ্রীসহ সিরিয়া যাত্রা করেন; কিন্তু উরদুন প্রদেশে খলীফার নির্দেশে তাঁহার নিকট হইতে এইসব সামগ্রী ছিনাইয়া নেওয়া হয়। ইহার পর তিনি রাজনৈতিক অংগন হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়েন। আল-ইয়া'কূ'বী কেবল এতটুকু বর্ণনা করেন, 'আব্বাসী শাসনামলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কথিত আছে, 'আব্বাসী খলীফা আস্-সাফ্ফাহ্' ১৩২/৭৪৯-৫০ সালে তাঁহাকে আল-হ'ীরা নামক স্থানে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন তাগ্'রীবিরদী, ১খ., ২৩২; (২) আল-মাক্'রীযী, আল-খিত'াত, ১খ., ৯৮, ৩০২; (৩) F. Wustenfeld, Die Statthalter von Agypten, ১খ., ৩৮ প.; (৪) আত্-ত'াবারী, ২খ., ১০৪৭, ১০৭৩, ১১২৭, ১১৬৫; (৫) ইব্নুল-আছ'ীর, ৪খ., ৩৭৭, খৃ. ৩৯৮; (৬) Wellhausen, NGWGott., ১৯০১ খ., face. ৪, পৃ. ২০; (৭) আল-ইয়া'কূ'বী, ২খ., ৪১৪, ৪৬৬; (৮) Papyri Schott-Reinhardt, ১খ., ১৫ প., ২৮ প.।

C.H. Becker (E.I,[2])/এ. এন. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল মুত্ত'তালিব (عبد الله بن عبد المطلب) ঃ ইব্ন হাশিম ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন কু'স'ায়্যি (قصى) হযরত মুহ'াম্মাদ (স) -এর পিতা। আবূ ত'ালিব ছিলেন তাঁহার সহোদর। তাঁহাদের মাতার নাম ফাতি'মা বিন্ত 'আমর ইব্ন 'আইয' ইব্ন ইমরান মাখ্যূমী। 'আবদুল্লাহ ও উম্মুল-হ'াকীম আল-বায়দ'া যমজ ছিলেন। ইনি ছিলেন পিতা 'আবদুল-মুত্ত'তালিবের শেষ সন্তান। তাঁহারা ছিলেন দশ বা বার ভাই (সীরাতুন-নবী)। ভ্রাতাদের মধ্যে আয-যুবায়র, আবূ ত'ালিব, আবূ লাহাব, হাম্যা (রা) ও 'আব্বাস (রা) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শেষোক্ত দুইজন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আবদুল্লাহ সম্ভবত ৫৫৪ খৃ. নাওশীরওয়ানের রাজত্বের ২৪তম বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে কুরবানীর ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়, তাঁহার পিতা 'আবদুল-মুত্ত'ালিব মানত করিয়াছিলেন, তাঁহার দশটি পুত্র যৌবনে উপনীত হইলে একটিকে আল্লাহ্র নামে কুরবানী করিবেন। এই আশা পূর্ণ হইলে তিনি লটারীর মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ্কে কুরবানীর জন্য মনোনীত করিলেন (সীরা ইব্ন হিশাম, যি'কর 'আবদিল-মুত্ত'তালিব)। এই প্রেক্ষিতে মহানবী (স)-কে 'ইব্নুয-য'বীহ'ায়ন [কুরবানীকৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পুত্র ইস্মাঈল (আ) ও 'আব্দুল্লাহ্] বলা হইয়া থাকে। 'আবদুল্লাহর ভগ্নিগণের কাতর অনুরোধ ও কুরায়শদের আবেদনক্রমে তাহাকে কুরবানী না করিয়া তদস্থলে এক শত উট কুরবানী করা হয় (শিব্লী সীরাতুন-নাবী, ১খ.)

সিয়ার গ্রন্থসমূহের বিবরণ অনুসারে কাবীলা যুহরা-র বিশিষ্ট মহিলা আমিনা বিন্ত ওয়াহ্ব ইব্ন 'আব্দ মানাফ-এর সহিত (সম্ভবত নাওশীরওয়ানের রাজত্বের ৪০তম বর্ষে) 'আবদুল্লাহ্র বিবাহ হয়। সীরাতুন্-নাবীতে এই সময় তাঁহার বয়স ১৭-এর বেশী এবং আয্-যুর্কানী ১৮ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আমিনা)।

কুরায়শগণের ঐতিহ্যানুসারে 'আবদুল-মুত্ত'তালিবের পুত্রগণের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। আয্-যুরক'ানীর (পৃ. ১০৯, ১১০) বিবরণ অনুসারে 'আবদুল্লাহ বিবাহের পর একটি কুরায়শী কাফেলার সহিত ব্যবসা উপলক্ষে শাম গমন করেন। সেইখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফিরিবার পথে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিলে তিনি মদীনায় যাত্রাবিরতি করেন এবং তথায় বানূ নাজজার তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করে। কাফেলার লোকেরা মক্কায় 'আবদুল-মুত্ত'তালিবকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'ারিছ'কে (বালাযুরীর বিবরণ অনুসারে যুবায়রকে) মদীনায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তথায় গিয়া ভ্রাতাকে জীবিত পান নাই। এক মাস রোগভোগ করিয়া যুরক'ানীর (পৃ.-১০৯) বিবরণ অনুসারে ১ রামাদ'ান (অক্টোবর ৫৭০) এবং ওয়াকি'দী 'আ ফীলের ৪ মাস ১৭ দিন পূর্বে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ বলেন, আবওয়ায় তাঁহাকে দাফন করা হয়, কিন্তু তাবারীর বর্ণনায় মদীনাতেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ১৮ বৎসর। ইহাই অধিক নির্ভরযোগ্য। বালাযু'রী ও অপরাপর কতিপয় উৎসে তাঁহার বয়স ২৫, ২৮ ও ৩০ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র সন্তান মহানবী (স) তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পর (রাবী'উল-আওয়াল ফীল বর্ষ) জন্মগ্রহণ করেন। মহানবী (স) পিতার মীরাছস্বরূপ ৫টি উট, কিছু বক্রী, একটি তলোয়ার, একজন দাসী (উম্মু আয়্মান) লাভ করেন (বালাযু'রী, আন্সাবুল-আশরাফ, ১খ., ৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন হিশাম, ৯৭-১০২; (২) ইব্ন সা'দ, ১/১খ., ৫৩-৬১; (৩) ত'াবারী, ১খ., ৯৬৭, ৯৭৯-৮০, ১০৭৪-১০৮১; (৪) বালাযু'রী, আন্সাবুল-আশ্রাফ, ১খ., নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্ন হ'াযম, জাম্হারাতু আনসাবিল-'আরাব, পৃ. ১, ১৫; (৬) ইব্ন সায়্যিদিন-নাস, 'উয়ূনুল-আছার (৭) ইব্নুল ক'ায়্যিম যাদুল, মা'আদ; (৮) মাকরীযী আল-ইমতা'; (৯) আয্-যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবিল-লাদুন্নিয়্যা; (১০) মুহ'াম্মাদ ইবরাহীম মীর, সীরাতু মুস্তাফা, ১ম খণ্ড; (১১) শিবলী, সীরাতু'ন-নাবী, ১ম খণ্ড; (১২) মুহ'াম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসূরপুরী, রহমাতুল লিল-'আলামীন, ২খ., ৯৯-১০২।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী উমায়্যা (عبد الله بن عبدالله بن ابى امية) ঃ আল-মাখ্যূমী (রা), নবী কারীম (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামার ভ্রাতুষ্পুত্র। জীবনীকারদের এক সম্প্রদায় তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। আবূ উমার বলেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। আবূ হ'াতিম বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। তাবারী বলেন, তিনি তাঁহার পিতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নবী কারীম (স)-এর ইন্তিকালের পরেও জীবিত ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ৮ বৎসর ছিল। আল-ওয়াকি'দী বলিয়াছেন, তিনি নবী কারীম (স)-এর নিকট কুরআন হিফ্জ করিয়াছিলেন। ইব্ন হি'ব্বান পরে তাঁহার পূর্ব মত পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে তাবি'ঈ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইমাম বুখারী (র)-ও তাঁহাকে তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। আল-বাওয়ারদী, ইব্ন যুবায়র, ইব্ন কানি' প্রমুখ তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'উর্ওয়া ইব্নুয-যুবায়র ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদির রাহমান ইব্ন ছাওবান, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী উমায়্যা হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন, তিনি (আবদুল্লাহ) নবী কারীম (স)-কে মাত্র একটি কাপড় পরিধান করিয়া নামায আদায় করিতে দেখিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন কাপড় তাঁহার পরনে ছিল না। অনেকের মতে 'উর্‌ওয়া 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমায়্যা হইতে বর্ণনা করিতে পারেন না। কারণ 'উরওয়া 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমায়্যাকে দেখেন নাই। যেহেতু তিনি ('আবদুল্লাহ) তাইফ-এর যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এই নিসবাত হইয়াছে তাঁহার পিতামহের দিকে অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ) ইব্‌ন আবী উমায়্যা। ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র বলিয়াছেন, ইমাম মুসলিম (র) বলেন, 'উর্‌ওয়া 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী উমায়্যা হইতে উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সত্য নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৬; (২) ইব্‌ন 'আব্‌দিল-বার্‌র, আল-ইসতী 'আব (উক্ত আল-ইস'াবা, ২খ.-এর হাশিয়ায়), পৃ. ৩৩৭; (৩) ইবনুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৯৮।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উতবান (عبد الله بن عبد الله بن عتبان) ঃ আল-উমাবী আল-আন-সারী (রা) হাফিজ আবূ মূসা সনদ সহকারে হাফিজ আবুশ-শায়খ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি (আবুশ-শায়খ) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে তিনি (আবদুল্লাহ্) সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের ও কোন একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি চুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রিদ্দা অধ্যায়ে সায়ফ ইব্‌ন 'উমার তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, খলীফা 'উমার (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহকে নাসীবীন-এর অধিবাসীদের নিকট পাঠাইবার জন্য সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্'কাস (রা)-এর নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি ('আবদুল্লাহ) ছিলেন একজন সাহসী বীরপুরুষ, সম্ভ্রান্ত সাহাবী, আনসার নেতা ও আনসারদের বানুল-হুবলার মিত্র। সা'দ (রা) 'উমার (রা)-এর নিকট গমনকালে তাঁহাকে কূফায় স্বীয় প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। যখন 'উমার (র) সা'দকে বরখাস্ত করিলেন তখন 'আবদুল্লাহ্‌কে তাঁহার স্থলে বহাল করিলেন। অতঃপর তাঁহার পরিবর্তে যিয়াদ ইব্‌ন হ'ান্জ'লাকে গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। 'উমার (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্-এর নেতৃত্বে ইসফাহান অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্য তথায় প্রবেশ করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়ারাক'া আর-রিয়াহ'ী ছিলেন তাঁহাদের অগ্রভাগে। তিনি পারস্য সৈন্যর অগ্রবর্তী দলের নেতাকে হত্যা করেন। অতঃপর তাহাদের সহিত সন্ধি হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৬-৭; (২) ইবনুল -আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৯৯।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (عبد الله بن عبد الله) ঃ (রা) ইব্‌ন উবায়্যি ইব্‌ন মালিক ইব্‌নিল-হারিছ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গ'ানাম ইব্‌ন 'আওফ ইবনিল খাযরাজ আল-আন্‌স'ারী আল-খাযরাজী। উক্ত সালিম বৃহৎ উদরবিশিষ্ট হওয়ার দরুন তাঁহাকে 'আমা-হু'বলা' নামে অভিহিত করা হইত। তিনি আনস'ারদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ্‌র পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি 'ইব্‌ন সালূল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সালূল ছিলেন খুযাআ গোত্রের একজন মহিলা ও উবায়্যির মাতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি ছিল মুনাফিকদের সরদার, আর তাঁহার পুত্র ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল আল-হুবাব। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম রাখিলেন 'আবদুল্লাহ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বদ্‌র, উহুদ ও অন্যান্য সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত 'আইশা (রা) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন শিহাব, 'উরওয়া ও অন্যরা তাঁহাকে বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন হি'ব্বান বলিয়াছেন, তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। উহুদের যুদ্ধে তাঁহার নাক কাটা গিয়াছিল এবং নবী কারীম (স) তাঁহাকে স্বর্ণের নাক তৈরি করিয়া পরিধান করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নবী কারীম (স)-এর ওয়াহ্‌য়ি লেখকদের অন্যতম ছিলেন। খলীফা আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাতকালে ভণ্ড নবী মুসায়লিমা আল-কায্‌যাব-এর বিরুদ্ধে ১২ হিজরী সালে ইয়ামামাতে রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদ হন।

ইবনুল আছীর উল্লেখ করিয়াছেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা 'আবদুল্লাহর পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যিকে তাহাদের নেতা নির্বাচন করিয়া তাহার উপর সকল কাজের দায়িত্ব অর্পণ করত তাহাকে রাজমুকুট পরাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু নবী কারীম (স) মদীনায় হিজরত করিয়া আসিবার পর তাহারা এই মত পরিবর্তন করিলেন। ইহাতে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি নবী কারীম (স)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হইল। ইহাতে তাহাকে অহংকারে পাইয়া বসিয়াছিল এবং সে অন্তরে মুনাফিকী ভাব লুক্কায়িত রাখিল। বানুল-মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি বলিয়াছিল, "মদীনায় ফিরিয়া গেলে সম্মানিত ব্যক্তিরা ইতর ব্যক্তিদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে"। এই সময় তাহার পুত্র 'আবদুল্লাহ নবী কারীম (স)-কে বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সে-ই ইতর। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনিই সম্মানিত। আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে হত্যা করিব, অথচ আল্লাহ্‌র কসম! খায্‌রাজ গোত্রের সকলেই জানে, তাহাদের মধ্যে কেহই আমা হইতে তাহার নিজ পিতার প্রতি অধিকতর সদ্ব্যবহার করে না। কিন্তু আমার আশংকা হয়, আপনি অন্য কোন মুসলমান ব্যক্তিকে এই কাজের অনুমতি দান করেন এবং সে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া আমার পিতা ('আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি)-কে হত্যা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পিতার হত্যাকারীকে জীবিত অবস্থায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করিতে দেখা আমার সহ্য নাও হইতে পারে। সুতরাং আমি তাহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইব। ফলে একজন কাফিরের জন্য একজন মুসলমানকে হত্যা করিয় ফেলিবা এবং এইজন্য আমাকে জাহান্নামে যাইতে হইবে। নবী কারীম (স) বলিলেন, "তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিবে, সে যতদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন তাহার সহিত

সদয় ব্যবহার করিব, যাহাতে লোকেরা একথা বলিতে না পারে, মুহাম্মাদ (স) তাঁহার সঙ্গিগণকে হত্যা করেন। তোমার পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং তাহার সহিত ভালভাবে জীবন যাপন কর"।

অতঃপর যখন তাঁহার পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যির মৃত্যু হয়, তখন 'আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে আপনার জামাটা দান করুন। ইহা দ্বারা আমি আমার পিতাকে কাফন দিব। আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন এবং তাহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিবেন"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তাঁহার জামা দান করিলেন এবং বলিলেন, "গোসল ও অন্যান্য কাজ হইতে অবসর হইলে আমাকে সংবাদ দিও"। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহার জানাযা পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন উমার (র) তাঁহাকে বিরত রাখিয়া বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযাঃ পড়াইবার জন্য আপনাকে কি নিষেধ করেন নাই?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন মুনাফিকদের জন্য মাগফিরাত চাওয়া এবং না চাওয়া এই দুইয়ের যে কোন একটির এখতিয়ার আমাকে দেওয়া হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাহার জানাযা পড়াইলেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের আয়াত নাযিল করিয়া আদেশ দিলেন, হে নবী! উহাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইবে না, তাহারা তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে" (৯ ঃ ৮৪)। ইহার পর হইতে তিনি মুনাফিকদের জানাযার সালাত পরিত্যাগ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৫-৬; (২) ইব্‌ন আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (উক্ত আল-ইসাবা, ২খ., ৩৩৫-৭-এর হাশিয়ায়); (৩) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৯৭।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমাদ

'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল-'আব্বাস (عبد الله بن العباس او عباس) ঃ বা 'আব্বাস ل ব্যতিরেকে, আবুল 'আব্বাস, তাঁহার কুন্‌য়া, উপাধি আল-হি'ব্‌র (বা হি'বরুল-উম্মা) অর্থাৎ মহাজ্ঞানী বা আল-বাহ্'র অর্থাৎ সাগর। কারণ তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফাক'ীহ ও মুফাস্‌সির। ইনি 'আবদুল্লাহ নামক পাঁচজন বিশিষ্ট সাহাবীর অন্যতম (ইকমাল)। তিনি মহানবী (স)-এর পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। উম্মুল-মুমিনীন মায়মূনা (রা) তাঁহার আপন খালা ছিলেন (আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্‌সিরূন, ১খ., ৬৫ প.)।

প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ইসলাম ধর্মবিশারদ বলিয়া মনে করা হইত। কুরআন কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির দরুন তাঁহাকে রাইসুল-মুফাসসিরীন অর্থাৎ তাফ্‌সীরকারদের প্রধান বলিয়া অভিহিত করা হইত। তিনি এমন এক সময়ে কুরআন কারীমের ব্যাখ্যাদানে আত্মনিয়োগ করেন, যখন মুসলিম সমাজে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআন কারীমের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারেই এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁহার গোত্র বানূ হাশিম শি'ব আবী ত'ালিবে অন্তরীণ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল (ইবন হ'াযম, জামহারা আনসাবিল 'আরাব, পৃ. ১৮)। তাঁহার মাতা লুবাবা বিনতুল-হ'ারিছ হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেহেতু তাঁহাকে আশৈশব মুসলিম বলিয়া গণ্য করা হয়।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে অভ্রান্ত জ্ঞান-সাধনা ও গবেষণার প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। অতি শীঘ্র তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মলাভ করে, সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মহানবী (স) সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন এবং জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একত্র হইতে থাকে। কেবল স্মৃতিশক্তিই তাঁহার জ্ঞান-গরিমার ভিত্তি ছিল না, বরং তাঁহার নিকট বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত সংকলনের এক বিরাট সম্ভারও মওজুদ ছিল। নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিন বিভিন্ন বিষয়ে (যথা তাফসীর, ফিক্‌হ, মহানবী (স)-এর গাযওয়া বিষয়াদি, ইসলাম-পূর্ব যুগের ইতিহাস, প্রাচীন আরবী কাব্য) বক্তৃতাও দান করিতেন। কুরআন কারীমের শব্দ ও বাক্যধারা ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন আরব কবিদের কাব্য হইতেও উদ্ধৃতি দান তাঁহার রীতি ছিল। এই রীতি অনুসরণের ফলে আলিমদের মধ্যে প্রাচীন আরবী কাব্যের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি যেহেতু একজন সুবিজ্ঞ ফিক্'হবিদ ছিলেন সেহেতু সাধারণ লোকগণ তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া গ্রহণ করিত। বহু গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া দানের জন্য তিনি অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছু ফাতওয়ার সমর্থনে পরে তাঁহাকে প্রমাণ পেশ করিতে হইয়াছিল। কয়েকটি ব্যাপারে তিনি তাঁহার অভিমত প্রত্যাহারও করিয়াছিলেন (দেখুন' ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী ফাত্‌হু'ল-বারী, কায়রো ১৩২৫ হি., ৯খ., ১৩৮)। কুরআনের মর্ম সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ও ভাষ্যসমূহ একত্র করিয়া পরবর্তী কালে কতিপয় সংকলনও প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাঁহার সরাসরি শাগরিদগণের কোন না কোনজনের সহিত ঐ ভাষ্যের সনদ সম্পৃক্ত রহিয়াছে (আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৩)। তাঁহার ফাত্‌ওয়াসমূহের সংকলনও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐ সমস্ত তাফসীরের বিভিন্ন হস্তলিখিত কপি বা মুদ্রিত কপি আজও বিদ্যমান (Goldziher, Richtungen, পৃ. ৭৬; আরও দেখুন Brockelmann, ১খ., ১৯০; পরিশিষ্ট, ১খ., ৩৩১; আত্‌-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্‌সিরূন, ১খ., ৮১প.)। এই সংকলনগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে কিছু মতভেদ রহিয়াছে। এই বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বাল্যকাল হইতে মহানবী (স)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ৮/১০ বৎসর তাঁহার সান্নিধ্যে কাটাইয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর তিনি খ্যাতনামা প্রবীণ সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে মহানবী (স)-এর হাদীছ শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার বিশেষ প্রয়াস পান। হাদীছ গ্রন্থসমূহে তাঁহার ১৬৬০টি হাদীছ স্থান লাভ করিয়াছে (ইব্‌ন হাযম, اسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد مع جوامع السيرة পৃ. ২৭২; আত-তাফসীর

ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১খ., ৬৫)। সদ্ব্যবহার, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা ও আল-কুরআন সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারণে উমার (রা) তাঁহাকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন, কঠিন সমস্যায় তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন এবং অধিকাংশ সময় তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। তিনি বলিতেন, ইব্ন আব্বাস তোমাদের সকলের অপেক্ষা বড় বিদ্বান (هو اعلمكم) 'উমার (রা) তাঁহার সম্পর্কে আর ও বলিতেন, ইনি فتى الكهول - 'তরুণ প্রবীণ' অর্থাৎ বয়সে তরুণ, জ্ঞানে প্রবীণ, (له لسان سؤل وقلب عقول) তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী। তাঁহার সম্পর্কে আলী (রা) উক্তি করিয়াছেন, "কুরআন কারীমের তাফ্সীর বর্ণনার সময় মনে হয় যেন তিনি একটি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরাল হইতে অদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।" ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিতেন, "ইনি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।" ইব্ন উমার (রা) বলিতেন, "হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-এর উপর যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইব্ন 'আব্বাস এই উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।" মুহ'ম্মাদ হু'সায়ন আয্-য'াহাবী (আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১খ., ৬৫ প.) ইব্ন আব্বাসের বিদ্যাবত্তার পাঁচটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ (১) মহানবী (স) নিজে তাঁহার জন্য এই দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে কিতাব ও হি'কমতের জ্ঞান, দীন সম্পর্কে অনুধাবন এবং কুরআন ব্যাখ্যার প্রজ্ঞা দান কর;" (২) নবী পরিবারে তাঁহার প্রশিক্ষণ লাভ; (৩) বড় বড় সাহাবীগণের সংসর্গ লাভ; (৪) অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান। তিনি বিখ্যাত আরব কবি উমার ইব্ন আবী রাবীআ রচিত কাসীদার আশিটি পঙক্তি মাত্র একবার শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, বাব আখবারুল-খাওয়ারিজ)। (৫) তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সহিত বহু জিহাদে তিনি শরীক হইয়াছেন ঃ মিসরে (১৮/৬৩৯ ও ২১/৬৪১ সালের মধ্যবর্তী কালে), ইফরীকিয়ায় (২৭/৬৪৭), জুরজান ও তাবারিস্তানে (৩০/৬৫০) এবং বহু পরে কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে (৪৯/৬৬৯) [এই যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (দ্র.)-ও যোগদান করিয়াছিলেন]। জঙ্গে জামাল (উষ্ট্র যুদ্ধ ৩৬/৬৫৬) ও সিফ্ফীন (৩৭/৬৫৭)-এ তিনি আলী (রা)-এর সেনাদলের একটি বাহুর সেনাপতি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) ও তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রা)-এর বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। উভয়েই তাঁহাকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। আলী (রা) ও তৎপুত্র আল-হু'সায়ন (রা)-এরও তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত। আলী (র) খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইব্ন 'আব্বাস রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। 'আলী (রা)-এর খিলাফতকালেও শুধু তিন অথবা চার বৎসরকাল রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'উছ'মান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় স্বীয় গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই বৎসর ইব্ন 'আব্বাসকে আমীরুল-হজ্জ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই কারণে 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতকালে তিনি মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন। ইহার কিছুদিন পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 'আলী (রা)-এর নিকট আনুগত্যের শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার উপর গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব অর্পিত হয়। বসরা অধিকারের (৩৬/৬৫৬) পর তিনি তথাকার ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত হন। ৩৭/৬৫৭ সনের সি'ফ্ফীন চুক্তিতে তিনিও দস্তখত করিয়াছিলেন। ঐ চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা)-এর বিরোধ নিরসনকল্পে দুইজন বিচারক নিযুক্ত করা হইবে। আহ্‌ল হারূরার (দ্র. হারূরার) সহিত আলোচনাকালে ইব্ন আব্বাস (রা) এই কথা প্রমাণের প্রয়াস পান, সালিসী প্রস্তাব মানিয়া লওয়া শারী'আতের বিধানানুসারেই হইয়াছিল। কিছুদিন পর কতিপয় কারণে তিনি বসরা পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া যান। বসরা ত্যাগের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়, যথা ৩৮/৬৫৮, ৩৯/৬৫৯, ৪০/৬৬০ সন। তবে ইহা যে ৩৮/৬৫৮ সনে ঘটিয়াছিল উহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রতি বরাবর অনুগত ছিলেন—এই মর্মে যেই সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় সেইগুলির বিশ্বস্ততা বিবেচনাসাপেক্ষ। আলী (রা)-এর সহিত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সম্পর্কচ্ছেদের বর্ণিত কারণগুলি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। লাইডেন হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধকার এইগুলির উপর অহেতুক ও অযৌক্তিক গুরুত্ব দিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর মত একজন মহান ফাকীহ ও মুফাস্সিরের মর্যাদার কথা বিবেচনা করিলে এইগুলির সত্যতা সন্দেহপূর্ণ হইয়া উঠে। তৎযুগের গ্রন্থসমূহে এই ধরনের বিতর্কিত বিবরণের যে উল্লেখ দেখা যায় পাশ্চাত্যের লেখকগণ অসৎ উদ্দেশ্যে সেইগুলিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে বিতর্কিত বক্তব্য প্রচার করা সত্ত্বেও মুসলিম জনমনে তাঁহার যেই সম্মান ও মর্যাদা ছিল তাহা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার বিতর্কমূলক পদক্ষেপসমূহের পিছনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান ছিল।

আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর ইব্ন 'আব্বাস (রা) যেই সমস্ত ঘটনায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন সেইগুলির বিবরণও স্পষ্ট নহে। আল-হ'াসান (রা) তাঁহাকে স্বীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর সহিত সন্ধির প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইহা স্পষ্ট নহে, ইব্ন 'আব্বাস (রা) এই প্রচেষ্টা নিজেই শুরু করিয়াছিলেন অথবা আল-হ'াসান (রা)-এর নির্দেশে উহা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ইব্ন 'আব্বাস (রা) নিজেই খিলাফাতের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইয়া দিয়াছিলেন। আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ইব্ন 'আব্বাস (রা) হিজাযেই অবস্থান করিতে থাকেন। ঐ সময় আপাতদৃষ্টিতে বানূ হাশিমের ও নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একাধিকবার তাঁহাকে রাজধানী দামিশ্কে যাইতে হইয়াছিল।

আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর যেই সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে সম্ভবত সেইগুলি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে তাঁহার ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে টানিয়া আনে। প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য বিবরণ হইতে এতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যায়, যখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) মক্কায় স্বতন্ত্র খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত করেন তখন ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর কর্মধারায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত ছিলেন। কারণ ইব্ন

'আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-এর পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্নুল-হ'ানাফিয়্যা তাঁহাকে খলীফারূপে মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে ইব্নুয্-যুবায়র (রা) উভয়কে মক্কা হইতে বহিষ্কার করেন। হি. ৬৪/৬৮৩ সালের অবরোধকালে তাঁহারা মক্কায় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তখনও ইবনুয্ যুবায়র (রা)-এর বিরোধিতা করিতে থাকেন। ফলে উভয়কে বন্দী করা হয়। আল-মুখতার এই পরিস্থিতিতে কূফা হইতে বিরাট এক অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। এই দল অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া উভয়কে মুক্ত করে। এই সময় পবিত্র মক্কা নগরীকে রক্তপাত হইতে রক্ষা করার কৃতিত্ব ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রাপ্য। শেষ বয়সে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি তাইফে অতিবাহিত করেন এবং সেইখানেই ৬৮/৬৮৭ সালে ইন্তিকাল করেন (আল-আ'লাম, ৪খ., ২২৮)। কতিপয় প্রাচ্যবিদ কর্তৃক ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর উপর অলীক অপবাদ প্রদান ও ইহার জওয়াব সম্পর্কে দেখুন মুহাম্মাদ হুসায়ন আয-যাহাবী, আত-তাফ্সীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১খ., ৭১ প.।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) সাহাবীগণকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি বসরার ওয়ালী থাকাকালে আবূ আয়্যুব আনস'ারী (রা) একদা তাঁহার নিকট স্বীয় অভাবের কথা ব্যক্ত করেন। আবূ আয়্যুব (রা) মদীনায় সর্বপ্রথম মহানবী (স)-এর মেহমানদারি করিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া ইব্ন 'আব্বাস (রা) উদার হস্তে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। চল্লিশ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং বিশজন খাদিম ও গৃহের সমস্ত তৈজসপত্র তিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন (সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ৩খ, ২৩৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিয়ার গ্রন্থ যাহা সংখ্যায় বহু, তবে এই সকল গ্রন্থে ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে একই ধরনের তথ্যের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে; (২) ইব্ন সা'দ, ২/২খ., ১১৯-২৩, ১২৫; ৪/২খ., ৪ ও ৫খ., ৭৪-৫ ২১৬-৭, ২৩১ ও নির্ঘন্ট; (৩) আল-বালাযু'রী, আনসাব, পাণ্ডুলিপি প্যারিস, পত্র ৭১৪-৭৩১; (৪) আল-কাশ্শী, মা'রিফা আখ্বারুর-রিজাল, বোম্বাই তা. বি., পৃ. ৩৬-৪২; (৫) ইবনুল আছ'ীর উস্দুল গ'াবা, কায়রো ১২৮০-৬ হি., ৩খ., ১৯২-৫; (৬) ইবনুল-জাওযী, মিরআতুয-যামান, পাণ্ডুলিপি প্যারিস (আরাবী) ৬১৩১, পত্র ১৮৭ খ-১৯০খ.; (৭) আয-যাহাবী, মা'রিফাতু'ল-কু'র্রা, পাণ্ডুলিপি, প্যারিস Anc F. ৭৪২-তালিকা ২০৪৪, পত্র ৫খ.,-৬খ.; (৮) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, কলিকাতা ১৮৫৬-৯৩ খৃ., ২খ., ৮০২-১৩, সংখ্যা ৯১৪৯; (৯) ঐ লেখক, তাহয'ীবুত-তাহয'ীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-২৭ হি., ৫খ., সংখ্যা ৪৭৪; (১০) হ'াজ্জী খলীফা, ২খ., ৩৩২-৩, ৩৩৫, ৩৬১ (সংখ্যা ৩২৬৭), ৩৭৭ (সংখ্যা ৩৩৮৯), ৩৪৮ (৩১৭৫), ৪৫৬ (সংখ্যা ৩৭০৬); ৪খ., ৩৬৩ (সংখ্যা ৮৭৮৯); ৬খ., ৪২৫ (সংখ্যা ১৪১৮৯); ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর পক্ষে ও বিপক্ষের রচনাসমূহ, ১খ., ৭৯ ও ৩খ., ১৪৪। রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা হিসাবে ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তথ্য ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যথা (১১) নাস'র ইব্ন মুযাহিমুল-মিনকারী, ওয়াকি'আ সি'ফ্ফীন, কায়রো ১৩৬৫ হি. নির্ঘন্ট; (১২) আত্-তাবারী, ১খ., ৩০৩৮ (দেখুন পৃ. ৩০১১, ৩০৪৫ ইত্যাদি), ৩০৯২, ৩১৪৫, (দেখুন পৃ. ৩২২৯-৩০), ৩১৮১, ৩২৭৩, ৩২৮৯, ৩৩৫৪, ৩৩৫৮-৯, ৩৩৬৭, ৩৩৬৮, ৩৩৭০, ৩৪১৩, ৩৪৪৯, ৩৪৫৩-৬; ২খ, ২, ৮৬, ১৭৬, ২২২, ২৭৩-৫ ও নির্ঘন্ট; (১৩) ইবনুল-আছীর, ৪খ., ৯, ১০৫-৬ ও নির্ঘন্ট।

আদব গ্রন্থসমূহেও তাঁহার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, যথা (১৪) ইব্ন আব্দ রাব্বিহি, আল-ইক্দ, ২খ., ২৯৫-৭, ৩০১, ৩২৩-৪ ও নির্ঘন্ট, in Muhammad Shafi, Analytical indices to The K. al-'Iqd, কলিকাতা ১৯৩৫-৩৭ খৃ.; (১৫) আল-মাস্উদী, মুরূজ, ৪খ., ২২৮-৩০৩, ৩৩০, ৩৩৭, ৩৫৩-৪, ৩৮২, ৩৯০, ৩৯২, ৪১০, ৪৫১; ৫খ., ৮ প., ১৯, ১০৬-১১৩, ১২১-৫, ১২৯-৩১, ১৭৩, ১৭৭-৯, ১৮৪-৫, ১৮৭-৮, ২৩১-৩ ও নির্ঘন্ট। আরও বরাতের জন্য দেখুন Caetani, Chronographia Islamica, ৬৮ হি.-এর অধীনে প্যারা ২৮; আয্-যিরিক্লী, আল-আ'লাম; উক্ত শব্দের ধাতুতে; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ৩খ.।

আধুনিক গ্রন্থকারদেরঃ (১৬) A. Sprenger, das leben und die Lehre des Mohammed, Berlin 1869, i, xvii, iii, CVI et seq; (১৭) J. Wellhausen, Das arabischen Reich, Bcrlin 1902, 69-70; (১৮) ঐ লেখক, Reste arabischen Heidenthums, Berlin 1887-97, 12, et scq; (১৯) Caetani, Annali, Indices, vols ix and x, স্থা. particularly i, Intr. par. 24-5 and 38a. H., qar, 219-27; (২০) H. Lammens, Etudes sur le regne du Calife Omayade Mo'awia Ier, Indcx; (২১) I. Goldziher, Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leiden 1920. 65-81 and Indcx; (২২) L. Veccia Vaglieri, II Conbitto Ali Muawiya e La Secessione Krarigita riesa minati alla luce di fonti abodite, In Annali Ist Univ. or Napdi-ta N.s.iv, স্থা. cspecially 75-6.

L. Veceia Vaglieri (E.I²) (দা.মা.ই.) / ফরীদুদ্দীন মাস্উদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল-জাহ্'ম (عبد الله بن ابى الجهم) ঃ (রা) ইব্ন হু'য'ায়ফা ইব্ন গ'ানিম ইব্ন 'আমির আল-কু'রাশী -আদা'বী। পিতা আবুল জাহমের নাম ছিল 'আমির, ভিন্ন মতে উবায়দুল্লাহ।

'আবদুল্লাহ-র বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইবনিল-খাত্'ত'াব। তাঁহাদের উভয়ের মাতার নাম ছিল উম্মু কুলছূ'ম বিন্ত জারওয়াল আল-খুযাইয়া। মাতা উম্মু কুলছূ'ম উমার (রা)-এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে আবুল-জাহাম (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। ইব্ন সা'দ বলিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পিতা আবুল জাহামসহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে সিরিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং আজ্নাদায়ন (اجنادين)-এর যুদ্ধে শরীক হইয়া শাহাদাত বরণ করেন। ভিন্নমতে তিনি আজনাদায়ন যুদ্ধের পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৩৫; (২) ইব্ন হ'াজার, আল-ইসস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ.,

২৯০, সংখ্যা ৪৫৯৪; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আস্মাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩০২, সংখ্যা ৩১৯৮।

এ. এইচ. এম. তাকী

'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (عبد الله بن ابى اوفى) ঃ (রা) পুরা নাম 'আলকামা ইব্ন খালিদ ইব্ন হারিছ ইব্ন আবী উসায়দ ইব্ন রিফা'আ ইব্ন ছা'লাবা, বানূ আস্লাম গোত্রে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম আবদুল্লাহ এবং উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, ভিন্নমতে আবূ মু'আবিয়া। শেষোক্তটিকে ইমাম বুখারী (র) সঠিক বলিয়া মনে করেন। তবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা নামেই অধিক প্রসিদ্ধ।

হুদায়বিয়া সন্ধির অব্যবহিত পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ায় গমনকালে তিনি নবী কারীম (স)-এর সঙ্গী ছিলেন। বায়'আতুর-রিদওয়ান বা বায়'আতুশ-শাজারায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হুদায়বিয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি খায়বার যুদ্ধে শরীক হন। অতঃপর তিনি হুনায়নের যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে তিনি তাঁহার হস্তে যে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন উহার ক্ষতের চিহ্ন আজীবন ছিল। তিনি সর্বমোট সাতটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইসলামের জন্য যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। কোন কোন যুদ্ধে তাঁহাকে পঙ্গপাল খাইয়াও জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছে।

নবী কারীম (স)-এর সময়কাল হইতে খলীফা 'উমার (রা)-এর খিলাফাত কালের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। কূফার বসতি গড়িয়া উঠিলে তিনি কূফায় আগমন করেন এবং তথায় নিজ গোত্রের মহল্লায় বসবাস করেন। তখন হইতে খলীফা আলী (রা)-এর যুগ পর্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। অনুমিত হয়, এই সময়ে তিনি বাড়ীর চারি দেওয়ালের মধ্যে নিরিবিলি জীবন যাপন করেন। কথিত আছে, আলী (রা)-এর খিলাফাত কালে খারিজীগণ বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকে নবী কারীম (স)-এর এই বাণী ঘরের বাহির করে— "সুসংবাদ তাহাদের জন্য যাহারা বিদ্রোহিগণকে হত্যা করিবে এবং বিদ্রোহীরা তাহাদের হত্যা করিবে"। বিদ্রোহীদেরকে নির্মূল করার জন্য তিনি নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অন্যান্য মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করেন।

বলা বাহুল্য, তিনি নবী কারীম (স)-এর অত্যন্ত ভক্ত সাহাবী ছিলেন। নবী কারীম (স)-এর মুখ হইতে অনেক হাদীছ শোনার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা) হইতে বর্ণিত ৯৫টি হাদীছ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ১০টি ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে এবং ৫টি শুধু ইমাম বুখারী (র) ও ২টি শুধু ইমাম মুসলিম গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি শারী'আতের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। বিতর্কিত বিষয়সমূহে সঠিক সিদ্ধান্ত (ফাতওয়া) জানার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিত। একদা খায়বারের উৎপন্ন দ্রব্য কিভাবে খরচ করা হইবে—এই সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হইলে বিষয়টি তাঁহার নিকট পেশ করা হয়। তিনি বলিলেন নবী কারীম (স)-এর যুগে খায়বারের উৎপন্ন দ্রব্য বন্টনের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। প্রত্যেকে প্রয়োজন মুতাবিক উহা হইতে গ্রহণ করিত।

তিনি বাল্যকালেই নবী কারীম (স)-এর শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার পিতা দান বা সাদাকাসহ নবী কারীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে নবী (স) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ! আবূ আওফার পরিবারের প্রতি রহম করুন।

নিবেদিতপ্রাণ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা কখনও নবী (স)-এর আদেশ এক চুলও লঙ্ঘন করেন নাই। একদা তাঁহার অত্যন্ত আদরের কন্যা ইন্তিকাল করিলে বাড়ীর সকলেই ক্রন্দন শুরু করিল। এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি নবীর নির্দেশ ভুলেন নাই। তিনি বাড়ীর সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সাবধান! উচ্চস্বরে কেহ ক্রন্দন করিবে না। কারণ নবী কারীম (স) উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অবশ্য অশ্রু ফেলিতে পার।

তিনি দীর্ঘ আয়ু পাইয়াছিলেন। উমায়্যা যুগ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি দাড়ি ও মাথায় মেহেদীর খেজাব লাগাইতেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। এই অবস্থায় তিনি ৮৬/৮৭ হি. সালে কূফায় ইন্তিকাল করেন। কূফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৫০১; (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১২১; (৩) ইব্ন সা'দ, তাবাকাতুল-কাবীর, বৈরূত তা. বি., ৬খ., ২১; (৪) মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী, সিয়ারুস-সাহাবা, আজমগড় ১৯৫৫, ৭খ., পৃ. ১।

এম. এ. আজীজ খান

'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী ইসহাক (عبد الله بن ابى اسحاق) ঃ আল-হাদ্রামী, বসরার একজন ব্যাকরণবিদ ও কারী। তিনি ১১৭/৭৩৫-৩৬ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার শায্যা কিরাআত (বিরল পঠন) ইব্ন 'আব্বাস হইতে কিরাআতের পঠন ও বর্ণনা অব্যাহত রাখে এবং 'ঈসা ইব্ন 'উমার আছ-ছাকাফী ও আবূ 'আম্র ইব্নুল-আ'লার কিরাআতকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলিয়া মনে হয়, তিনিই সর্বপ্রথম প্রকৃত 'আরবী ব্যাকরণবিদ ছিলেন (তু. ইব্রাহীম মুস্তাফা, Actes du XXI Congies des Orient, পৃ. ২৭৮-৯)। তাঁহার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আরোহ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় প্রমাণ (কিয়াস)-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পর্কে ইহাও বলা হইয়া থাকে, তিনি সন্দেহজনক ক্ষেত্রে কর্মকারকের (নাস্ব) প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার সম্পর্কে ইহা ছাড়া আর কিছু জানা যায় না, তিনি একজন অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং এইজন্য তিনি 'আরবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ফারাযদাক তাঁহাকে তীব্র কুৎসার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন। কেননা তিনি ফারাযদাকের কিছু কিছু ত্রুটি নির্দেশ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-জুমাহীর মূল বর্ণনা, তাবাকাত, সম্পা. Hell, পৃ. ৬-৮-এর বিষয়বস্তুকে ইব্ন কুতায়বা আংশিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আশ-শি'র, পৃ. ২৫; (২) যুবায়দী, তাবাকাত, সম্পা. Krenkow, in RSO, 1919 খৃ., পৃ. ১১৭; (৩) সীরাফী, আখবারুন্-নাহবিয়্যীন, সম্পা. Krenkow, পৃ. ২৫-২৮; (৪) আনবারী, নুযহা, পৃ. ২২-২৫; (৫) ইবনুল-জাযারী, কুররা', সংখ্যা ১৭৪৭; (৬) সুয়ূতী, মুয্হির, ২খ., ২৪৭; (৭) Flugel, Gramm. Schulen. পৃ. ২৯; অধিকন্তু. তু. আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৯, ৩০, ৪১, ৪২; (৮) আগানী, ১ম সংস্করণ, ১১খ., ১০৬।

Ch. Pellat (E.I.[2]) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমায়্যা (عبد الله بن ابى امية) ঃ (রা) ইব্ন মুগীরা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন মাখযূম, মাখযূম গোত্রের একজন সদস্য। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার পিতার নাম হুযায়ফা (কোন কোন বর্ণনায় সাহ্ল) ও উপনাম আবূ উমায়্যা। হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামার ভ্রাতা ছিলেন 'আবদুল্লাহ, এই সম্পর্কে তিনি মহানবী (স)-এর শ্যালক। তাঁহার মাতার নাম 'আতিকা বিন্ত 'আবদিল মুত্ত'ালিব ইব্ন হাশিমা। 'আতিকা ছিলেন মহানবী (স)-এর ফুফু। এই দিক হইতে আবদুল্লাহ মহানবী (স)-এর ফুফাত ভ্রাতা। 'আবদুল্লাহ্-র পিতা আবূ উমায়্যা হজ্জ যাত্রীদলের রসদ সরবারাহকারী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমায়্যা প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের ও মহানবী (স)-এর ভীষণ শত্রু ছিলেন। ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর প্রচারিত বাণীর উপর তিনি প্রথম দিকে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহার বিরোধিতা ও অবিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেঃ "কখনও তোমাতে (হে মুহ'ম্মাদ) আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসরিত করিবে" (১৭ ঃ ৯০)। প্রাণপণে ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন ঘটাইয়া মক্কা বিজয়ের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত প্রচারের অগ্রগতিতে তিনি বাধা সৃষ্টি করিতে থাকেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে মক্কার অনতিদূরে সাকিয়া ও 'আর্জের মধ্যবর্তী রাস্তায় তিনি ও আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হ'ারিছ' মহানবী (স)-এর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু প্রথমত তাঁহাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। পরে মহানবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামার সুপারিশে তাঁহারা উভয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হাসিল করেন এবং উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করিবার ফলে 'আবদুল্লাহ একজন মুসলমান হিসাবে মহানবী (স)-এর সহিত মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি হু'নায়ন ও ত'াইফের যুদ্ধে মহানবী (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। তাইফের যুদ্ধে (৮/৬৩০ সনে) প্রতিপক্ষের তীরের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহাকে সাহাবী হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনা আছে। তাঁহার সম্পর্কে যায়নাব বিন্ত আবী সালামার সূত্রে উম্মু সালামা হইতে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহানবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বলিয়াছেন, মহানবী (স) তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন এমতাবস্থায় যে, সেইখানে একজন খোজা পুরুষ 'আবদুল্লাহ্কে বলিতেছিলেন, "হে 'আবদুল্লাহ! আল্লাহ্ যদি তাইফ বিজয় দান করেন, তাহা হইলে তোমাকে নৃত্য পরিবেশনকারিণী গায়লানের এমন কন্যাদের সন্ধান দান করিব যাহাদের সম্মুখ ভাগে (পেটে) চারটি ও পশ্চাদ্ভাগে আটটি মেদবহুল ভাঁজ পরিদৃষ্ট হয়। মহানবী (স) ইহা শুনিয়া উম্মু সালামাকে সাবধান করিয়া দেন যেন এই জাতীয় খোজা পুরুষ ভবিষ্যতে আর তাঁহাদের নিকট না আসে। ইহা ছাড়াও হাদীছের সাহীহ গ্রন্থে তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৭৭, সংখ্যা ৪৫৪৩; (২) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., আল-ইস'াবা-র হ'াশিয়া, ২খ., ২৬২; (৩) ইব্নুল-আছ'ীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১১৮।

এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাক্র (عبد الله بن ابى بكر)ঃ আল-মিয়ান্জী 'আয়নুল্-কু'দাত আল-হামায'ানী নামে অভিহিত, শাফি'ঈ ফাকী'হ ও সূফী-শহীদ, হামাযানে ৪৯২/১০৯৮ সালে জন্ম। বংশপরম্পরায় এক মনীষীকুলে তাঁহার জন্ম; তিনি 'আরবী ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে, ১৪ বৎসর বয়সে পরিণতি লাভের পূর্বেই, তাঁহার প্রথম গ্রন্থের রচনা শুরু করেন এবং প্রথম যৌবনেই তিনি সূফীবাদে দীক্ষিত হন। ৫১৭/১১২৩ সালে ২৫ বৎসর বয়সে মহান ইমাম মুহ'াম্মাদ আল্-গ'াযালীর ভ্রাতা আহ্'মাদ আল্-গ'াযালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে বলিয়া অনুমিত হয়। তিনিই তাঁহাকে সূফী ধ্যান ও অনুশীলন (রিয়াদ'াত)-এর তা'লীম দেন বলিয়া কথিত আছে এবং এইরূপে তাঁহার আধ্যাত্মিক দীক্ষা পরিপূর্ণ হয়। তাঁহার অন্যান্য শিক্ষক ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হাম্মূয়া ও জনৈক বারাকা।

তাঁহার আধ্যাত্মিক খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মৌখিক ও লিখিত শিক্ষাদানে তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করিতেন। এই কাজ করিতে গিয়া তিনি কোন কোন সময় স্বীয় শক্তির সীমা ছাড়াইয়া যাইতেন এবং তারপর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দুই বা তিন মাস বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কার্যাবলী শীঘ্রই গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তাঁহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করিয়া তোলে। নবূওয়াতের প্রকৃতি ও সূফী শায়খের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কিত তাঁহার শিক্ষা ও তাঁহার ব্যবহৃত সূফী পরিভাষা যাহাতে তাঁহাকে নবূওয়াতের একজন দাবিদার বলিয়া মনে হইত— এইসবের প্রতিবাদে রক্ষণশীল ধর্মবিদগণ ইরাকস্থ সাল্জূক উযীরের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করেন। ফলে উযীর তাঁহাকে বাগদাদে কারারুদ্ধ করেন। এইখানেই তিনি তাঁহার আত্মসমর্থনমূলক রচনা শাক্ওয়াল্-গ'ারীব রচনা করেন। কয়েক মাস গর তাঁহাকে মুক্তি দান করা হয় এবং তিনি হামাযান প্রত্যাবর্তন করেন। অল্প কিছুকাল পরই সাল্জূক সুলতান মাহ্'মূদের (রাজত্বকাল ৫১১-২৫/ ১১১৮-৩১) আগমনের সময় ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬-৭ জুমাদাছ-ছানী, ৫২৬/৬-৭ মে, ১১৩১ সালের রাত্রিবেলা তাঁহাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আল্-হামাযানীর হঠাৎ মৃত্যুতে সম্ভবত তৎকর্তৃক একটি সূফী খানকাহ নির্মাণ, একটি সূফী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও একজন উত্তরাধিকারী মনোনয়ন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার বহু সংখ্যক উত্তম গ্রন্থ সর্বদাই পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছে।

তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার শাক্ওয়াল্-গারীব 'আনিল-আওত'ান ইলা বুল্দানিল উলামা', 'আরবী ভাষায় লিখিত একটি আত্মসমর্থনমূলক রচনা, সম্পা. ও ফরাসী অনু. মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল-জালীল, JA (১৯৩০), ১-৭৬. ১৯৩-২৯৭; সম্পা. 'আফীফ 'উসায়রান, মুস'ান্নাফাত-ই 'আয়নিল-কু'দা'ত-ই হামাযানী, তেহরান ১৩৪১/১৯৬২; ইংরেজী অনু. A. J. Arberry, A Sufi martyr, the apologia of Ain al-Qudat al-Hamadhani, লন্ডন ১৯৬৯; রিসালা-ই লাওয়াইহ্ ফারসী ভাষায় লিখিত আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পর্কিত রচনা, সম্পা. রাহ'ীম ফার্মানিশ, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮; যুব্দাতুল-হ'াক'াইক', 'আরবী ভাষায় লিখিত, সম্পা. উপরিউক্ত; 'উসায়রান, তাম্হীদাত অথবা যুব্দাতু'ল-হা'কা'ইক' ফী কাশ্ফিদ্-দাক'াইক, ফারসী ভাষায় লিখিত, সম্পা. উপরিউক্ত উসায়রান, তুর্কী ভাষায় দুইবার অনূদিত; নামাহা অথবা মাকতূবাত, মাকাতীব, ফারসী ভাষায় লিখিত চিঠিপত্রাদি,

সম্পা. 'আলী নাক'ী মুন্‌যাবী ও 'উসায়রান, ২খ., বৈরূত ও তেহরান ১৩৯০/১৯৭১; রিসালা য়ায্‌দান শিনাখ্‌ত, সম্পা. রাহমান কারীমী, তেহরান ১৩২৭/১৯৪৮ এবং আহ্‌'ওয়াল ওয়া আছ'ার, সম্পা. ফারমানিশ, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯।

গ্রন্থপঞ্জী : সান্‌দিলাহী, মাখ্‌যানুল-গ'রাইব, Bodl. ফারসী পাণ্ডুলিপি ৩৯৫, ১৫২৩; (২) Brockelmann, I, ৪৯০, SI ৬৭৪-৫; (৩) F. Meir, Stambuler Handshriften dreier hersischer Mystiker, in Isl., xxiv (১৯৩৭), পৃ. ১-৯।

J.K. Teubner (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী বাকর ইব্‌ন রাবী'আ (عبد الله بن ابى بكر بن ربيعة) : (রা), বিখ্যাতি বানু সা'দ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার দাদী ছিলেন নবী কারীম (স)-এর ধাত্রীমাতা হালীমা (রা)। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৮৪; (২) ইব্‌নুল-আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৩৬।

এম. এ. আজীজ খান

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদ (عبد الله بن ابى حدرد) : (রা) একজন সাহাবী। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কুন্‌য়া (উপনাম) আবূ মুহ'াম্মাদ। তাঁহার কুলজী নিম্নরূপঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদ সালামা (ভিন্নমতে 'উবায়দ) ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন আবী সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন শায়বান ইব্‌ন আল-হ'ারিছ' ইব্‌ন ক'ায়স ইব্‌ন হাওয়াযিন ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন আফসা আল্‌-আসলামী। তিনি হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। তৎপর খায়বার ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ফারূক' (রা)-এর সহিত তিনি জাবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আবূ বাক্‌র (রা) ও 'উমার (রা) হইতেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যায়দ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন কুসায়ত, আবূ বাকর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হ'ায্‌ম ও তাঁহার পুত্র ক'াক'া প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ নিম্নরূপঃ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' সূত্রপরম্পরায় ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদ হইতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদের কাছে জনৈক ইয়াহূদীর চারি দিরহাম পাওনা ছিল। উক্ত দিরহাম পরিশোধ করিতে বিলম্ব হওয়ায় ইয়াহূদী ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ করে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইয়াহূদীর পাওনা পরিশোধ করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। তখন ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যে আল্লাহ সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার পাওনা পরিশোধ করিবার মত সামর্থ্য আমার নাই। তবে আমি তাহাকে এই মর্মে অবহিত করিয়াছি, আপনি আমাকে খায়বার যুদ্ধে পাঠাইবেন এবং আমি আশা করি, সেখানে যে গনীমতের মাল পাওয়া যাইবে তাহা হইতে আপনি আমাকে কিছু প্রদান করিবেন, তাহা দ্বারা আমি ইয়াহূদীর প্রাপ্য আদায় করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে পুনরায় ইয়াহূদীর প্রাপ্য আদায় করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) যখন কাজ করার তিনবার নির্দেশ প্রদান করিতেন, তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করা যাইত না। অনন্তর ইব্‌ন আবী হ'াদরাদ বাজারের দিকে রওয়ানা হন। তাঁহা পরিধানে ছিল লুংগি হিসাবে ব্যবহৃত একটি চাদর এবং মাথায় ছিল পাগড়ী। তিনি পাগড়ী মস্তক হইতে খুলিয়াই লুংগীরূপে পরিধান করিলেন এবং পরিধান হইতে চাদর খুলিয়া ইয়াহূদীকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত চাদর বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে ইয়াহূদী সম্মত হয় এবং চারি দিরহামের বিনিময়ে উক্ত চাদর তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করে। এই ঘটনার পর এক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাসূলের সাহাবী! আপনার এহেন অবস্থা কেন? তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এতৎশ্রবণে উক্ত মহিলা নিজের চাদর খুলিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইব্‌ন আবী হ'াদ্‌রাদ ৮১ বৎসর বয়সে হিজরী ৭১ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হ'াজার আল্‌-'আস্‌ক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৯৪-২৯৬; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা ফী মা'রিফাতিস-স'াহ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৪১-১৪২; (৩) আল-খাতীব ওয়ালিয়্যুদ্‌-দীন, ইক্‌মাল ফী আসমাইর-রিজাল (আসহ্‌হুল-মাত'াবি', করাচী), পৃ. ৫৩০; (৪) ইব্‌ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতুল-কুব্‌রা বৈরূত, ৪খ., ৩০৯।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হ'াবীবা (عبد الله بن ابى حبيبة) : (রা) আল্‌-আদ্‌রা ইব্‌ন আল-আয'আর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আল-ইতাফ দাবীআ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আওফ আল্‌-আওসী আল্‌-আন্‌সারী একজন সাহাবী। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী কু'বা-র অধিবাসী এবং 'আমর ইব্‌ন 'আওফ বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বায়'আতে রিদ্‌'ওয়ান-এ শরীক ছিলেন। তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ নিম্নরূপঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইম্‌সা'ঈল বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হ'াবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে কি লাভ করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন কুবায় আমাদের মসজিদে আগমন করেন তখন আমি সবেমাত্র শৈশবে পদার্পণ করিয়াছি। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার ডান পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর নবী কারীম (স) পানীয় দ্রব্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পানীয় উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহা পান করেন। তিনি আমাকে অবশিষ্ট পানীয় দিলে আমি তাহা পান করি। ইহার পর তিনি নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তিনি পাদুকাদ্বয় পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় করিতেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হাজার আল্‌-আস্‌কালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৪; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গ'াবা ফী ম'রিফাতিস-স'াহ'াবা, তেহরান ১৩৭৭, ৩খ., ১৪১; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আস-মাইস্‌-সাহাবা, বৈরূত তা. বি, ১খ., ২৯৬, নং ৩১৩০।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র আছ্‌-ছা'লাবী (عبد الله بن عمرو الثعلبى) : (রা) 'উমার ইব্‌ন শায়বা সাহাবীদের তালিকায়

তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আশ-শা'বী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমরকে বানূ ছা'লাবা, বানূ 'আব্বাস ও বানূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন গ'াত'াফান গোত্রের শাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৫১, নং ৪৮৪৫।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ইব্ন হ'াযম (عبد الله بن عمرو بن حزم) ঃ (আল-আনসারী রা) 'আম্মারা ইব্ন 'আমর ইব্ন হাযম (রা)-এর সহোদর ছিলেন। যুদ্ধের বিবরণসম্বলিত আল-মাগ'াযী অধ্যায়ে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁহার সংগে সম্পর্কিত বিশেষ কোন ঘটনার কথা জানা যায় না (ইব্ন মান্দা ও আবূ নু'আয়ম)। ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী বলেন, 'আলী (রা)-এর গুণাবলী (মানাকি'ব 'আলী) বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থে আল-মুগ'ীদ 'ইব্নুন-নু'মান এই অভিমত ব্যক্ত করেন। এই 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর উহুদের যুদ্ধে তীরন্দাযদের নেতা ছিলেন। তবে সহীহ হাদীছ দ্বারা ইহা সমর্থিত নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৫০; (২) ইব্নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৩৩।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হ'ারাম (عبد الله بن عمرو بن حرام) ঃ (রা) আল-আন্‌স'ারী, আল-খাযরাজী, আস-সুলামী। বিখ্যাত সাহাবী জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা)-এর পিতা এবং এই কারণেই তিনি আবূ জাবির উপনামে (কুন্‌য়া) অভিহিত। আপন গোত্রের অন্যতম নেতা (নাক'ীব) ছিলেন তিনি। 'উরওয়া ইব্ন শিহাব, মূসা ইব্ন 'উক'বা, ইব্ন ইসহ'াক প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে আবূ জাবির 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) বায়'আত 'আক'াবা, বদ্‌র ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন; তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁহার হত্যাকারীর নাম উসামা আল-আ'ওয়ার ইব্ন 'উবায়দ, মতান্তরে আবুল-আ'ওয়ার আস-সালিমীর পিতা সুফ্‌য়ান ইব্ন 'আবদ শাম্‌স। তাঁহাকে ও 'আমর ইব্নুল জামূহ'কে একই কবরে দাফন করা হয়। এই 'আমর ইব্নুল-জামূহ' ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর-এর ভগিনী হিন্‌দ-এর স্বামী অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর-এর ভগ্নিপতি ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পুত্র জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, ছয় মাস পরে আমি আমার পিতার জন্য একটি পৃথক কবর খনন করিয়া তাঁহাকে উহাতে স্থানান্তরিত করি। তখন তাঁহার কিছু দাড়িতে মাটি লাগিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার আর কিছুই বিকৃত ও পরিবর্তিত হইতে দেখি নাই। 'আবদুর-রহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আবদির-রহমান ইব্ন আবী সা'সা'আ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি শুনিয়াছেন, উহুদের যুদ্ধে ৪৬ বৎসর পর ঐ যুদ্ধের শহীদ ও একই কবরে সমাহিত 'আমর ইব্নুল-জামূহ ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হারাম-এর কবর স্থানান্তিরিত করিবার উদ্দেশে খনন করা হইলে দেখা যায়, তাঁহাদের দেহ এতটুকুও বিকৃত হয় নাই। মনে হয় যেন তাঁহারা মাত্র গতকাল শহীদ হইয়াছেন! শাহাদাতকালে তাঁহাদের একজন ক্ষতস্থানে হাত রাখিয়াছিলেন, ঐ অবস্থায়ই তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল। এতদিন পর কবর খুঁড়িয়া দেখা গেল, তাঁহার ঐ হাতটি তখনও ক্ষতস্থানেই স্থিত রহিয়াছে। হাতটি ক্ষতস্থান হইতে সরাইয়া আবার ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় পূর্ব স্থানে ফিরিয়া যায়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হ'ারাম-এর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহার পুত্র জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্‌র বর্ণনায়। ইব্নুল-মুনকাদির হইতে বর্ণিত আছে, আমি জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "উহুদের দিন শহীদ হইবার পর আমার পিতার নাক-কান কর্তিত মৃতদেহের সামনে আমি কাঁদিতে লাগিলাম, তখন একদল লোক আমাকে বারণ করিল। এমন সময় আমার ফুফু ফাতি'মা বিন্‌ত 'আমর আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ফাতি'মা বিন্‌ত 'আমরকে বলিলেন, "কাঁদিও না, যতক্ষণ তোমরা তাঁহার লাশ না উঠাইয়াছ ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাঁহাদের ডানা দিয়া ছায়া দিয়া রাখিতেছেন।" একই হাদীছ কিছুটা ভিন্নতর ভাষায় অন্যান্য বর্ণনাকারী কর্তৃক জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

আর একটি হাদীছে জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ হে জাবির! তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন? আমি জবাবে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা শহীদ হইয়াছেন, কিন্তু তিনি কিছু ঋণ ও পোষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাকে (তোমার পিতার মর্যাদা সম্পর্কে) একটি সুসংবাদ দিতেছি। আল্লাহ্ কখনও পর্দার আড়াল ছাড়া কাহারও সহিত কথা বলেন নাই। কিন্তু তিনি তোমার পিতার সহিত সামনাসামনি কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিয়াছেনঃ হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি আমার নিকট যাহা খুশী চাহিতে পার, আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করিব। তোমার পিতা তখন বলিল, হে প্রভু! আমি চাই, তুমি আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠাও এবং আমি আবার যেন তোমার পথে শহীদ হই। আল্লাহ্ বলিলেনঃ আমার বিধান তো এইরূপ, পৃথিবীতে পুনরায় আর কেহ ফিরিয়া যাইবে না।

উহুদ অভিযানের প্রাক্কালে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) পুত্র জাবিরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস! আমি নিজেকে প্রথম শাহাদাতের তালিকায় দেখিতে পাইতেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত তোমার চেয়ে প্রিয়তর আর কাহাকেও এই পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতেছি না। আমার কিছু ঋণ রহিয়া গিয়াছে। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিও। আমি তোমাকে তোমার বোনদের সহিত ভাল আচরণ করিবারও ওসিয়াত করিতেছি"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি. ২খ., ৪৫০; (২) ইব্নুল -আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৩১-৩; (৩) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী 'আব, পৃ. ৩৬৭-৮।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হ'ান্‌হ'ালা (عبد الله بن عمرو بن حنظلة) ঃ (রা) তাঁহার নাম সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী ইব্ন মানদার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, ইহা নিছক একটি ধারণামাত্র। 'আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার পিতা ও রাফি' ইব্ন খাদীজ হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি এইরূপঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রত্যেক কামিল মুসলিমের উপর শুক্রবারে গোসল ও মিসওয়াক করা ওয়াজিব (ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি, ২খ., ৪৫১ (২) ইবনুল-আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, মিসর ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৩৩।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নিল হ'াদরামী (عبد الله بن عمرو بن الحضرمي) ঃ (রা) বানূ উমায়্যা গোত্রের হ'ালীফ (মিত্র) ও আল-'আলা ইবনুল হ'াদ'রামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। আল-ওয়াকি'দী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। 'উমার ইব্নুল খাত্'ত'াব (রা) হইতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা 'আমর ইব্নুল হ'াদারামী প্রথম হিজরীতে কাফির অবস্থায় মারা যায়। ইব্ন হ'াজার আল-আসকালানী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময় 'আবদুল্লাহর বয়স ছিল প্রায় নয় বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি.,২খ., ৩৫১; (২) ইব্নুল আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, মিসর ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৩৩; (৩) ইব্ন আব্দিল বার্র, আল-ইসতীআব, পৃ. ৩৭১।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (عبد الله بن عامر) ঃ বসরার শাসনকর্তা, ৪/৬২৬ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা 'আমির ইব্ন কুরায়য মহানবী (স)-এর ফুফু বায়দা' বিন্ত 'আবদিল মুত্'ত'ালিবের পুত্র। হযরত 'উছ'মান (রা) ২৯/৬৪৯-৫০ সালে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর স্থলে 'আব্দুল্লাহ্কে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইহার অব্যবহিত পরই 'আবদুল্লাহ পারস্যে অভিযান করেন এবং ইসতাখার, দারাবজিরদ ও জুর (ফীরূয আবাদ) অধিকার করেন। ফলে সম্পূর্ণ প্রদেশটি মুসলমানগণের হস্তগত হয়। ৩০-৩১/৬৫১ সালে তিনি খুরাসানের দিকে অগ্রসর হন এবং Ephthalite-দেরকে পরাজিত করত মারব (مرو) বাল্খ ও (৩২/৬৩৫ সালে) হিরাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রদেশটি অধিকার করেন। খুরাসানের শাসনভার তাঁহার সহকারিগণের হাতে ন্যস্ত করিয়া হজ্জের পর বস্‌রায় ফিরিয়া আসেন। হজ্জের সময় মুহাজির ও আনসারগণকে বিপুল দান ও উপঢৌকন প্রদান করায় সাধারণ মানুষের মনে এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন। ৩৫/৬৫৬ সালে খলীফা হযর 'উছ'মান (রা)-কে সাহায্য করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। পরে হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধে বসরায় সৈন্যদল গঠনে 'আইশা (রা), ত'ালহ'া (রা) ও যুবায়র (রা)-কে সহায়তা করেন। উষ্ট্র যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর নিকট পরাজিত হইয়া আবদুল্লাহ বানূ হুরকুসের জনৈক ব্যক্তির আশ্রয়ে দামিশ্কে চলিয়া যান এবং মু'আবি'য়া (রা)-র পক্ষে শামিল হন। তিনি হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর সহিত আলোচনার উদ্দেশে মু'আবি'য়া (রা) কর্তৃক ৪১/৬৬১ সালে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই বৎসর তিনি পুনরায় বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার সহকারী সেনাপতিগণ ৪২-৪৩/৬৬২-৬৪ সালে খুরাসান ও সিজিসতান পুনরায় অধিকার করেন। গৃহযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলগুলি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে সিন্ধুর দিকেও একটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। আরব কাবীলাগুলির সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল কোমল ও প্রীতিপূর্ণ। মু'আবি'য়া (রা) ইহা ভাল চোখে দেখিতেন না। ফলে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ইহার পর তিনি আমৃত্যু মক্কায় বসবাস করেন। ৫৯/৬৮০ (বা ৫৭/৫৮) সালে তাঁহার ইন্তিকাল হয়।

কেবল সামরিক যোগ্যতার জন্যই 'আবদুল্লাহ বিখ্যাত ছিলেন না, দানশীলতা, চারিত্রিক গুণাবলী ও বহু জনক্যাণমূলক কাজের জন্যও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। জনকল্যাণমূলক কাজসমূহের মধ্যে বসরায় দুইটি খাল ও নাহ্র উবুল্লা খনন, আন-নিহাজ ও ক'ারয়াতায়ন-এর বৃক্ষরোপণ ও আরাফাতে হ'াজ্জীদের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্ন সা'দ, ৫খ., ৩০-৩৫; (৩) ইয়াকূ'বী, ২খ., ১৯১-৫ ইত্যাদি; (৪) ঐ লেখক, বুলদান, নির্ঘণ্ট; (৫) বালাযুরী, ফুতূহ, ৫১, ৩৫১ প.; (৬) ঐ লেখক, আনসাব, ৫খ., নির্ঘণ্ট; (৭) মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াবীব, আল-মুহ'াববার, ১৫০; (৮) আল- আগ'ানী, নির্ঘণ্ট; (৯) তারীখ-ই সীসতান, পৃ. ৭৯ প., ৯০-১; (১০) ইবনুল আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, ৩খ., ১৯১-২; (১১) আল-ইসতী'আব, ১খ., ৩৭৫; (১২) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩খ., ১৩-১৪; (১৩) B. Spuler, Iran in frucislamischer Zeit, Wiesbaden 1952, 17 প.; (১৩) J. Walker, Catalogue of the Arab-Sassanian Coins in the B. M., London 1941, index.

H. A. R. Gibb (E.I.²)/ ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমির আল-বালাব'ী (عبد الله بن عامر البلوى) ঃ (রা) সাহাবী আন্‌সার-এর বানূ সা'ইদা গোত্রের হ'ালীফ (মিত্র) ছিলেন। তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩২৮, নং ৪৭৭৩; (২) ইবনুল-আছ'ীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৯০।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (عبد الله بن عامر) ঃ ইব্ন উনায়স (রা), তিনি বানূ 'আমির গোত্রোদ্ভূত সাহাবী ছিলেন। ইয়া'লা ইবনুল আশ্‌দাক' হইতে বর্ণিত আছে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা) স্বীয় গোত্রীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সহিত করমর্দন করেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন ঃ তুমি সম্মানিত দূত। পরদিন প্রত্যূষে বানূ 'আমিরের লোকেরা তাঁহার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) 'আল্লাহ বানূ 'আমিরের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না' কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আয-য'াহবী এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন (তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩২০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩২৮, নং ৪৭৭২; (২) ইব্নুল আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৮৯-৯০।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী (عبد الله بن على) ঃ খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ' ও খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূ'র-এর চাচা। শেষ উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান-এর বিরুদ্ধে আব্বাসীদের সংগ্রামে 'আবদুল্লাহ-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বৃহৎ যাব-এর চূড়ান্ত যুদ্ধে (জানুয়ারী ৭৫০) তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধেই মারওয়ান খিলাফাত হারান। পলায়ন করিবার সময় 'আবদুল্লাহ মারওয়ানের পশ্চাদ্ধাবন করেন, ক্ষিপ্র গতিতে দামিশ্‌ক দখল করেন, ফিলিস্তীনের দিকে অগ্রসর হন এবং পলায়নপর খলীফার পিছনে মিসর পর্যন্ত গমন করেন। উমায়্যা বংশের সদস্যদের নিধনের ব্যাপারে তিনি তাঁহার ভ্রাতা দাউদ ইব্ন 'আলী অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি তাহাদেরকে সমূলে উৎপাটন করিবার উদ্দেশে যে কোন পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ফিলিস্তীন থাকাকালে তিনি

তাহাদের প্রায় ৮০ জনকে একই সাথে হত্যা করেন। এই জাতীয় নিষ্ঠুরতা নবাগত শাসকের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বিদ্বেষের জন্ম দেয়। ফলে প্রথম মু'আবি'য়ার বংশধর আবূ মুহ'াম্মাদ ও কিননাসরীন-এর শাসনকর্তা আবুল ওয়ারদ ইব্‌নুল কাওছার-এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা প্রথমে একটি 'আব্বাসী সেনাবাহিনীকে পরাভূত করিলেও ১২৩/৭৫০ সালে মারজুল আখরাম নামক স্থানে আবদুল্লাহ কর্তৃক ইহারা পরাজিত হয়। সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ পরবর্তী কালে আব্বাসী খিলাফাতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হইয়া দাঁড়ান। খলীফা আস-সাফফাহ'-এর মৃত্যুর পর তিনি খিলাফাত দাবি করেন। তাঁহার এই দাবির ভিত্তি ছিল উমায়্যাদের বিরুদ্ধে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাহা ছাড়া তিনি আরও দাবি করিয়াছিলেন, আস-সাফ্ফাহ' তাঁহাকে খিলাফাত প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বায়যানটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তাঁহার পরিচালনাধীন ছিল। যখন তিনি জানিতে পারিলেন, খুরাসানের পরাক্রান্ত শাসনকর্তা আবূ মুসলিম খলীফা আল-মানসূ'রের পক্ষ সমর্থন করিবার ঘোষণা দিয়াছেন এবং 'আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীর ১৭০০০ খুরাসানীকে হত্যা করেন। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এই খুরাসানী সৈন্যরা কখনও আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। অতঃপর অবশিষ্ট সৈন্যসহ তিনি আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। জুমাদাছ-ছানী ১৩৭/ নভেম্বর, ৭৫৪ সালে নাসীবীন নামক স্থানে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁহার ভাই বসরার শাসনকর্তা সুলায়মানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলায়মান বৎসর কয়েক পর পদচ্যুত হইলে খলীফা আল- মানসূ'রের আদেশে 'আবদুল্লাহকে বন্দী করা হয়। প্রায় সাত বৎসর বন্দী থাকার পর ১৪৭/৭৬৪ সালে তাঁহাকে এমন একটি ঘরে স্থানান্তর করা হয় যাহার ভিত্তিমূলকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুদিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহাতে যে কোন মুহূর্তে ঘরটি ধ্বসিয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ঘরটি তাঁহার উপর ধ্বসিয়া পড়ে এবং তিনি নিহত হন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর ছিল বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত-তিওয়াল (Guirgass); (২) ইয়াকু'বী; (৩) বালাযু'রী, ফুতূহ; (৪) তাবারী; (৫) মাসউদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; (৬) আগ'ানী, Tables; (৭) Fragm, Hist. Arab, De Goeje and de Jong, স্থা.; (৮) J. Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, 341-5; (৯) L Caetani, Chronographiea Islamica, Rome 1912, Under the relevant years; (১০) L. Caetani, G, Gabrieli, Onoma Sticon Arabicum, Rome 1915, 731; (১১) L Caetani, Chronològia generale del bacino medirranco, Rome 1923, under the relevant years; (১২) S. Mascati, Le Massacre des Umayyades, in Archiv Orientalni 1950, 88-115; (১৩) মুহ'াম্মদ ইব্‌ন হ'াবীব, আল-মুহ'াববার; (১৪) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজূমুয যাহিরা, ২,৭; (১৫) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ৫খ., ২১৫; (১৬) আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১০. ৮; (১৭) ইব্‌ন-কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১০খ., ১০৪।

K.V. Zettersteen- S. Moscati (E.I.²) / মু. তাহির হুসাইন

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ্'মাদ (দ্র. বানূ সা'দ)

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (দ্র. আহমাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল)

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (দ্র. আলাবী)

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসকানদার (عبد الله بن اسكندر) ঃ আশ-শায়বানী, বানূ শায়বান (দ্র.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর, যারাফশান নদীর দুইটি শাখার মধ্যবর্তী দ্বীপ মিয়ানকাল-এর আফারীন কেনত শহরে ৯৪০/১৫৩৩-৪ সালে জন্ম [Dragon Year ১৫৩২-৩-এর উল্লিখিত চক্রের (Cycle) বৎসর হিসাবে ইহা অধিকতর সঠিক বলিয়া অনুমিত]। এই প্রতিভাবান ও ধীসম্পন্ন নৃপতির পিতা [(ইসকান্‌দার খান), পিতামহ (জানী বেগ) ও প্রপিতামহ] আবুল খায়র (দ্র.)-এর পুত্র খাজা মুহ'াম্মাদকে অতি সাধারণ, এমনকি প্রায় বুদ্ধিহীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। রাজ্য বণ্টনের সময় কারমীনা ও মিয়ানকাল অঞ্চলদ্বয় জানি বেগ (৯৩৫/১৫২৮-৯)-এর ভাগে পড়িয়াছিল। 'আবদুল্লাহ্‌র যখন জন্ম হয় তখন তাঁহার পিতা ইস্‌কান্দার আফরীনকেন্‌ত-এর শাসনকর্তা ছিলেন। সম্ভবত পরে তাঁহার জনৈক ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি কারমীনায় দেশান্তরী হন। এইখানেই 'আবদুল্লাহ শাসনকর্তা হিসাবে প্রথমবারের মত ৯৫৮/১৫৫১ সালে স্বীয় যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পান। তাশ্‌কানদ-এর নাওরূয আহমাদ খান ও সামারকান্দ-এর আবদুল লতীফ খান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন ইস্‌কান্দার আমু দরিয়া অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণ প্রতিহত করেন ও সফলভাবে শত্রুগণকে পিছু হটাইয়া দেন। পরে তিনি পশ্চিমে বুখারা এবং পূর্ব-দক্ষিণে কাবশী ও শাহ্‌র-ই সাবয পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পান। শুরুতে তিনি তেমন স্থায়ী সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, এমনকি তাঁহার পিতা যেই সমস্ত এলাকা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন ঐ সকল এলাকা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ৯৬৩/১৫৫৫-৬ সালে মায়মানা পলাইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই বৎসর (যু'ল-ক'া'দা/ সেপ্টেম্বর -অক্টোবর ১৫৫৬) তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী নাওরূয আহমাদ খান ইন্তেকাল করেন। ইনি ৯৫৯/১৫৫২ সাল হইতে তাশ্‌কান্দ-এর অধিপতি ও উয্‌বেক জাতির খান ছিলেন। আবদুল্লাহ কালবিলম্ব না করিয়া কারমীনা ও শাহ্‌র-ই সাব্‌য অঞ্চলে স্বীয় অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রাজাব ৯৬৪, মে ১৫৫৭ সালে বুখারা অধিকার করেন এবং তখন হইতে ইহাই ছিল তাঁহার রাজধানী। শা'বান ৯৬৮/ এপ্রিল-মে ১৫৫৭ সালে তিনি পিতার নামে স্বীয় শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে পিতৃব্য গীব মুহ'াম্মাদকে অপসারণ করেন ও দুর্বলচিত্ত পিতাকে উযবেক জাতির খান হিসাবে ঘোষণা করেন। বহুদিন পর ৯৯১/১৫৮৩ সালে জুমাদাল-আখিরা/জুন মাসে পিতার মৃত্যু হইলেই কেবল আবদুল্লাহ সিংহাসন আরোহণ করিতে সম্মত হন। রাজ-পরিবারের বিদ্রোহী ও অবাধ্য সহযোগীদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তিনি ৯৮১/১৫৭৩-৭৪ এ বাল্‌খ, রাবী'উল-আখির ৯৮৬/১৫৭৮ সালে সামারকান্দ, ৯৯০/১৫৮২-৮৩ সালে তাশকান্দ ও সিয়ার (Syr) নদী (সায়ফন)-এর উত্তরের অবশিষ্ট অঞ্চল এবং ৯৯১/১৫৮৩ সালে ফারগানা অধিকার করেন। এই সমস্ত বিজয় অভিযান ব্যতীত আবদুল্লাহ ৯৯০ হি.-এর প্রথমভাগে / ১৫৮২- এর বসন্তকালে উলুগ তাগ পর্যন্ত তৃণাবৃত নিষ্পাদপ (Steppes) প্রান্তর

অঞ্চলে অভিযান চালান। ৯৯৬/১৫৮৭-৮৮ সালে সংঘটিত তাশ্‌কান্দের একটি মারাত্মক বিদ্রোহ দমন করেন এবং Steppes অঞ্চলের বহু দূর পর্যন্ত শত্রুর অনুসরণ করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্বে বাদাখশান ও পশ্চিমে খুরাসান, জীলান ও খাওয়ারিযম জয় করেন। প্রথমে ১০০২/১৫৯৩-৯৪ সালে খাওয়ারিযম অধিকার করিয়াছিলেন, পরে সেই স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলে ১০০৪/১৫৯৫-৯৬ সালে উহা পুনরায় স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। পূর্ব-তুর্কিস্তানে প্রেরিত অভিযানের ফলে কাশগার ও য়ারকান্দ রাজ্য দুইটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। পুত্র 'আবদুল মুমিনের সহিত বিবাদ ঘটায় আব্দুল্লাহর জীবনের শেষ বৎসরগুলি অতিশয় দুঃখ ও বিষাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়। 'আবদুল-মুমিন ৯৯০ হি. সালের শেষভাগ (১৫৮২ খৃ.) হইতে বৃদ্ধ পিতার পক্ষে বাল্খের শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন। আবদুল্লাহ যেমন তাঁহার পিতা ইসকানদারের আমলে প্রকৃত শাসনদণ্ডের পরিচালক ছিলেন, তেমন 'আবদুল মুমিনও পিতা 'আবদুল্লাহর বার্ধ্যকের সুযোগে শাসনদণ্ডের মালিক হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় ক্ষমতা লাঘবের সামান্যতম প্রস্তাব শুনিতেও 'আবদুল্লাহ রাযী ছিলেন না। এই অবস্থায় একমাত্র ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতাই পিতা-পুত্রের প্রকাশ্য বিরোধ বন্ধ করিতে সফল হয় এবং 'আবদুল মুমিন পিতার বাধ্য হইতে সম্মত হন। পিতা-পুত্রের এই মনোমালিন্যের সংবাদ পাইয়া উপজাতিসমূহ তাশ্‌কান্দ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনীকে তাশকান্দ ও সামারকান্দের মধ্যবর্তী স্থানে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের বিরুদ্ধে অপর একটি শাস্তিমূলক অভিযানের শুরুতে 'আবদুল্লাহ সামারকান্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন (hen বর্ষের ১০০৬-এর শেষ/ খৃ. ১৫৯৮-এর প্রারম্ভ)। ইহার ছয় মাস পর প্রজাদের হাতে 'আবদুল মুমিন নিহত হন। খুরাসান ও খাওয়ারিয্‌ম-এর বিজিত অঞ্চলসমূহ হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং উযবেকদের নেতৃত্ব পরিচালনাও অন্য এক পরিবারের হাতে চলিয়া যায়। আবদুল্লাহ দেশের শাসন-শৃঙ্খলা সংস্কারে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা রাজ্যাধিকার অপেক্ষা অনেক বেশি স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি নূতনভাবে রাজ্য শাসন পদ্ধতি, বিশেষত মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নূতন পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর কাজ, যেমন সেতু, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। লোক-কাহিনীতে এই ধরনের নির্মাণ কার্যের সুখ্যাতি তীমূর বা আবদুল্লাহর প্রতি আজ পর্যন্ত আরোপ করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) এই রাজ্যপালের জীবন চরিত : ৯৯৬/১৫৮৭-৮৮ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা তাঁহার অনুরাগী লেখক হাফিজ তানীশ শারাফ নামাই শাহী (ফারসী) গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। সাধারণভাবে এই গ্রন্থটি আবদুল্লাহ নামাহ নামে খ্যাত (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে); (২) তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা (বিশেষ করিয়া শেষ জীবনের ঘটনাসমূহ) সমকালীন ইরানী লেখক ইসকানদার মুনশী, তারীখ-ই আলাম আরা-য়ি আব্বাসী (১ম শাহ আব্বাসের জীবনী, তেহরান খৃ. ১৮৯৭); (৩) উক্ত গ্রন্থ দুইটির উদ্ধৃতি Welyaminowzernow, Izslycdowaniya o Kasimowskikh tsaryakh i tsarewicakh, ii (in the trudi wostoc, otd, imper, arkhcol, obshc, X. German অনু. Leipxig 1867) and before that in his moncti bukharskiya i khiwskiya; (৪) মাহমূদ ইব্ন ওয়ালী প্রণীত অল্প পরিচিত গ্রন্থ বাহ্‌রুল আসরার হইতে Zapiski wostoc, otd imper, rusK, arkheol, obshc, xv-এ গ্রন্থকার দ্বারা উদ্ধৃত অংশসমূহ দ্র. বাহ্‌রুল আসরার সম্পর্কে তু. Ethe, India office Cat. no. 575; (৫) Vambery, Gesch. Bochara's ও তাঁহার অনুসারী Howorth, Hist. of the Mongols, ii/2-তে প্রদত্ত তথ্য সতর্কতার সহিত গ্রহণীয়।

W. Barthold (E.I.²) ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন ইসমা'ঈল (عبد الله بن اسماعيل) : মরক্কোর একজন 'আলাবী (দ্র.) সুলতান। তাঁহার প্রথম রাজত্ব কালের সূচনা হয় ৪ শা'বান, ১১৪১/৫ মার্চ, ১৭২৯ সালে, আর সর্বশেষবারের রাজত্বকালের অবসান ঘটে তাঁহার মৃত্যুতে ২৭ স'াফার, ১১৭১/১০ নভেম্বর, ১৭৭৫ সালে।

আরব ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি পাঁচবার সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন এবং প্রতিবার তিনি পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইহার কারণ ছিল, মাওলায় ইসমা'ঈল (দ্র.)-এর সময়ে রাজ্যে যেই উৎকৃষ্ট প্রশাসন ও শৃংখলা ছিল তাহা এই যুগে অতীত যুগের স্মৃতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। 'আবদুল্লাহ যেই সময় ক্ষমতা লাভ করেন তখন তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা 'আহমাদ আয-য'াহাবী ও 'আবদুল মালিক দুই বৎসর যাবত সিংহাসন লাভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ইহারা উভয়ই ছিল দুর্বল ও বাগাড়ম্বরসর্বস্ব। ফলে 'আবদুল্লাহর পিতার হাবশী বাহিনী 'আবীদ আল- বুখারী, উদায়ার গীশ (দ্র. জায়শ) গোত্র এবং মধ্য ও কেন্দ্রীয় আতলাস-এর বার্বারদের মধ্যে সংঘর্ষের আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি মাওলায় ইসমা'ঈলের পুত্র সংখ্যা ছিল বহু। আর তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখিত। প্রথম হইতে 'আবদুল্লাহও ছিলেন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। এই সমস্ত কারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুধাবন করা যায়, সেই যুগে মরক্কো কেন এত বিশৃংখলা ও অরাজকতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

'আবীদ আল-বুখারীর বাহিনী 'আবদুল্লাহর মাতার প্রচেষ্টায় তাহাকে সমর্থন দেয় এবং ক্ষমতাসীন করে। শীঘ্র 'আবদুল্লাহ ফেয নগরীর সমর্থন হারান এবং ছয় মাস পর্যন্ত অবরোধ রাখিয়া তাহাদের বিরোধিতা দমন করিতে সমর্থ হন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেন। কিন্তু মধ্য-আতলাসের বিপদসংকুল অভিযান পরিচালনার ফলে 'আবীদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাঁধে এবং তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৭৩৪ সালে তাহার মাতৃগোত্রের নিকট ওয়াদী নূন-এ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তদস্থলে তাহার ভ্রাতা 'আলী আল-আরাজ সিংহাসনারোহণ করেন। ১৭৩৬ খৃ. পুনরায় 'আবদুল্লাহকে ডাকিয়া আনা হয়। কয়েক মাস পর 'আবীদ বাহিনী তাঁহাকে পুনরায় বহিষ্কার করিয়া দেয়। তিনি বার্বারী আইত ইদরাসান-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার স্থলে তাহার দুই ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ ইবনুল 'আরাবিয়্যা ও আল-মুসতাদী পরপর সিংহাসনারোহণ করেন। ১৭৪০ খৃ. পুনরায় 'আবদুল্লাহকে ডাকা হয়। তিনি আল-মুস্তাদী ও তাঁহার মিত্র তান্‌জিয়ার-এর পাশা আহ'মাদ আররীফী-এর সহিত সংঘর্ষের সম্মুখীন হন। এই অবস্থায় 'আবীদ বাহিনী ইসমা'ঈলের অপর পুত্র যায়নুল 'আবিদীনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বার্বারদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ নূতন সমর্থক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন এবং তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই বৎসরই তিনি ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন, অতঃপর আল-মুসতাদী ও আর-রীফীকেও পরাভূত করিতে সক্ষম হন এবং মরক্কোতে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু একটির পর একটি

করিয়া নূতন নূতন হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। সাথে সাথে 'আবদুল্লাহও স্বীয় সাহায্যকারী পরিবর্তন করিতে থাকেন। কোন সময় তিনি আবীদের আশ্রয় লইতেন, কোন সময় উদায়া আর কোন কোন সময় বার্বারদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মাররাকুশ-এর গভর্নর মুহ'াম্মাদের পক্ষে ১৭৪৮ খৃ.-এ পুনরায় আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করা হয়। তবে এই পুত্র তাঁহার প্রতি অনুগত প্রমাণিত হন এবং অরাজকতা ও বিশৃংখলা সত্ত্বেও তিনি পিতার মৃত্যু পর্যন্ত পিতার রাজত্ব বহাল রাখেন। আবদুল্লাহ কিছুকাল মেকনেস নামক স্থানে এবং কিছুকাল ফেযের নিকটবর্তী একটি গ্রামের বাড়ি দাবদ্বীবাগ-এ অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যায়্যানী, Le Maroc de 631 a 1812 (Houdas), Paris 1886, 35-67; (২) tyad. Haudas, পৃ. ৬৪-১২৭; (৩) AKensus, আল-জায়শুল 'আরাম্‌রাম, লিথো, কেথ ১৩৩৬/১৯১৮, ইহাতে আয্-য্যায়্যানী-র বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে; (৪) নাসিরী সালাবী, আল-ইসতিকসা, ৪খ., কায়রো ১৩১২/১৮৯৪, পৃ. ৫৯-৯১; (৫) বর্ণনা E. Fumey, AM, ১৯১৬, ৯খ., পৃ. ১৭১-২৭০; (৬) L. de Chenier, Recherches Historiques sur les Maures; (৭) H. Tarrasse Histoire do maroc et histoire de l'Empire de Maroc, ৩খ., প্যারিস ১৭৮৭, ৪৩০-৬৫ ২খ., Casablanca ১৯৫০, পৃ. ২৮২-৬।

R. Le Tourneau (E.I.[2]) ফরীদুদ্দীন মাসউদ।

আবদুল্লাহ ইবন উতায়ক (عبد الله بن عتيك) ঃ মহানবী (স)-এর সাহাবী; সালমা বংশ নবী (স)-এর হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে। বদর ব্যতীত সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। হি. ৬-এ নবী (স) তাঁহাকে চারি ব্যক্তির আমীর নিযুক্ত করিয়া আবূ রাফি' ইয়াহূদীকে হত্যা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবূ রাফি' মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। 'আবদুল্লাহ (রা) রাত্রিকালে তাহাকে হত্যা করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় দুর্ঘটনায় তাঁহার একটি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। নবী (স)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি স্বহস্তে ভগ্ন হাড়কে সংযুক্ত করেন। হি. ৯-এ বানূ তাঈ গোত্রের মূর্তি বিনষ্ট করিয়া 'আলী (রা) যেই ধনসম্পদ আনয়ন করেন, উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। বীর সাহসী এই সাহাবী প্রথম খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। মুসনাদে তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-আসকালানী, ইসাবা, ২খ., মিসর ১৩২৮ হি., পৃ. ৩৪১, নং ৪৮১৬।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন মাসঊদ (عبد الله بن عتبة بن مسعود) ঃ আল-হুজলী বিখ্যাত সাহাবী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদের ভ্রাতুষ্পুত্র, কূফার বিখ্যাত তাবি'ঈ, মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় জন্ম। মহানবী (স) তাঁহার জন্য দু'আ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-আসকালানী, ইসাবা , ২খ, পৃ. ৩৬৬, হাশিয়া, মিসর ১৩২৮ হি.।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (عبد الله بن انيس) ঃ আল-জুহানী (রা) উপনাম আবূ ইয়াহয়া। প্রামাণ্য উৎস হইতে তাঁহার জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য অবগত হওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করিয়া জানা যায়, তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং আনসার গোত্রীয় বানূ সালামার হ'ালীফ মিত্র ছিলেন। আল-ওয়াকি'দী বলিয়াছেন, তিনি কু'দা'আ গোত্রের আল-বারক ইবন ওয়াবরার বংশধর ছিলেন। আল-বারকের বংশধর জুহায়না গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার বংশ-তালিকা নিম্নরূপঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স ইব্‌ন আস'আদ ইব্‌ন হ'ারাম ইব্‌ন হ'াবীব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গ'নাম ইবন কা'ব ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন নাফাছা ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন ইয়ার্‌বু ইব্‌ন বারক্ ইব্‌ন ওয়াবরা। বারকের ভ্রাতার নাম কালব ইব্‌ন ওয়াবরা। গোত্রের পরিচয়ে তাঁহাকে জুহানী কুদাঈ ও সুলমা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কোন কোন সূত্রে তাঁহাকে মুহাজির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁহাকে দেরীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যাইতে পারে, মহানবী (স)-এর ইসলাম প্রচারের সময় তাওহীদের বিষয়বস্তু বুঝিবার মত তাঁহার বয়স হইয়াছিল এবং জন্ম মক্কা কিংবা উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে হইয়াছিল। হিজরাত করিবর পর তিনি আনস'ারদের বানূ সালামার হ'ালীফ হিসাবে গণ্য হইলে তাঁহাকে আনস'ারী আখ্যায়িত করা হয়।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স মহানবী (স)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরের মধ্যে 'আতি'য়্যা, আমর দামরা, আবদুল্লাহ, জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আনস'ারী ও আরও অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আনস'ার সদস্যদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মদীনার সালামা গোত্রের মূর্তি ধ্বংসসাধনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে মহানবী (স)-এর সহিত শরীক হইয়াছিলেন। ইব্‌ন ইয়ূনুস বলিয়াছেন, তিনি দুই কিব্‌লার (বায়তুল মুকাদ্দাস ও কা'বা শারীফ) দিকে মুখ করিয়া নামায সমাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি কিবলা হিসাবে বায়তুল্লাহকে নির্ধারণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর সম্ভবত তিনি মদীনা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। যতদূর জানা যায়, তিনি প্রথমে মিসর ও পরে ইফরীকি'য়্যায় (আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল) গমন করেন। ইহার পর তিনি পর্যায়ক্রমে গাযা ও সিরিয়ায় বসবাস করেন। তিনি পরিণত বয়সে সিরিয়ায় ভিন্নমতে, মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। অনেক মূল্যবান হাদীছের তিনি সংরক্ষক ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এক সময়ে তিনি গাযায় বাস করিতেন। তিনি কিসাস (দ্র.) সম্পর্কে একটি দুষ্প্রাপ্য হাদীছ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। আল-বুখারী উল্লেখ করিয়াছেন, জাবির এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়সের নিকট হইতে উক্ত হাদীছ সংগ্রহ করেন। আল-বুখারী, আবূ দাঊদ ও আত-তিরমিযী বিভিন্ন সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়সের বরাতে মহানবী (স)-এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (স)-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীছের উল্লেখ করা যায়ঃ (১) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স রাসূলুল্লাহ (স)-কে লায়লাতুল ক'াদ্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে মহানবী (স) বলিয়াছিলেন, তিনি ঘর হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং ঐ রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। ঐ রাত্রি ছিল রামাদানের ২৩ তারিখ। (২) উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (স) একটি পানির

মশক আনিবার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দান করেন। তাঁহার নিকট মশক আনা হইলে তিনি উহার মুখ খুলিয়া পানি পান করেন। (৩) তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, মহানবী (স) বলিয়াছেন, কাবীরা গুনাহ্র মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাপ হইতেছে আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং কাহারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশে মিথ্যা শপথ করা। আমার জীবন যাঁহার হাতে সেই মহাপ্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে যদি কোন ব্যক্তি মাছির ডানার ন্যায় সামান্যতম মিথ্যা শপথও করে তাহা হইলে উহা তাহার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত পাখির বাসার ন্যায় অবস্থান করিতে থাকিবে।

'আবদুল্লাহর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইব্ন ইয়ূনুসের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার মৃত্যু সন ৮০/৬৯৯, আবূ উমার-এর মতে ৭৪/ ৬৯৩, কিন্তু প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার মৃত্যু সন ৫৪/৬৭৪। আল-বুখারী তাঁহার মৃত্যু আবূ ক'তাদা (রা)-এর পরে নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'লানী, আল-ইস'াবা, ৩খ., মিসর ১৯৩৯ খৃ.; (২) ঐ লেখক, তাকারীবুত তাহ্যীব, ১খ., সম্পা. আবদুল ওয়াহ্হাব ও আবদুল লাতীফ মিসর; (৩) ইব্ন 'আবদিল, বারর, আল-ইস্তী'আব, ৩খ., মিসর ১৯৩৯ খৃ.; (৪) ইবনুল আছ'ীর, উস্দুল-গ'াবা, ৩খ., আল মাক্তাবাতুল ইসলামিয়্যা তেহরান ১৯৬৬ খৃ.; (৫) ইব্ন সাদ, ত'াবাক'াত, ৩-৫ খ., বৈরূত তা. বি।

এ কে এম ইয়াকুব আলী

'আবদুল্লাহ ইব্ন উব্যায়্যি ইব্ন সালূল (عبد الله بن ابى بن سلول)

ঃ সালূল উবায়্যির মাতার নাম, খায্রাজ গোত্রের শাখা আওফ-এর অন্তর্ভুক্ত বানুল হুবলা (বানূ সালিম নামেও প্রসিদ্ধ)-এর প্রধান এবং মদীনার বিশিষ্ট লোকদের অন্যতম। হিজরতের পূর্বে ফিজার যুদ্ধের কেবল প্রথম দিন সে খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের নেতৃত্ব দিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। বু'আছ যুদ্ধেও সে শামিল হয় নাই। কারণ যামিনস্বরূপ আটককৃত কতিপয় ইয়াহূদীকে বানূ বায়াদার অন্যতম সরদার 'আমর ইব্নু'ন-নু'মান অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। ফলে উক্ত সরদারের সহিত 'আবদুল্লাহ্র বিবাদ ঘটে। সম্ভবত 'আবদুল্লাহ উপলব্ধি করিয়াছিল, একই গোত্রে পরস্পর ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। 'আমরের উচ্চকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও তাহার আশংকা ছিল। উৎসসমূহের অধ্যয়নে বুঝা যায়, মদীনায় মহানবী (স)-এর আগমন না ঘটিলে সম্ভবত 'আবদুল্লাহ তথাকার রাজারূপে বরিত হইত। মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত মদীনার প্রায় সকলেই যখন ইসলাম গ্রহণ করেন 'আবদুল্লাহ্ও অধিকাংশের অনুসরণ করে। কিন্তু তাহার এই ইসলাম গ্রহণের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে সে রাঈসু'ল-মুনাফিক'ীন (মুনাফিক নেতা)-রূপে প্রসিদ্ধ। ২/৬২৪ সালে বানূ কায়নুকা-এর বিরুদ্ধে মহানবী (স) কর্তৃক অভিযান প্রেরণকালে 'আবদুল্লাহ মহানবী (স)-এর নিকট তাহাদের অনুকূলে সুপারিশ করে। কারণ জাহিলী যুগে সে তাহাদের হ'লীফ (বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ) ছিল। সে তখন এই কথার উপর জোর দিয়াছিল, শীঘ্র মক্কাবাসীদের আক্রমণাশংকা রহিয়াছে আর এই কাবীলাটি যোদ্ধৃদল হিসাবে খুবই গুরুত্বের অধিকারী। উহুদ যুদ্ধ (৩/৬২৫) সম্পর্কিত পরামর্শ সভায় 'আবদুল্লাহ্র প্রস্তাব ছিল মদীনার অভ্যন্তরে থাকিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করা। প্রথমে মহানবী (স)-এরও এই মত ছিল। কিন্তু পরে অধিকাংশ সাহাবীর মতানুসারে মদীনার বাহিরে যাইয়া শত্রুর মুকাবিলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে 'আবদুল্লাহ উহাকে সমর্থন করে নাই এবং পরে তাহার তিন শত অনুসারীসহ মুসলিম বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনাটি দ্বারা 'আবদুল্লাহ্র কাপুরুষতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাহার আনুগত্যহীনতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে (দ্র. ৩ঃ ১৬০-৬২)। এতদিন পর্যন্ত মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে 'আবদুল্লাহর ক্রিয়াকলাপ মৌখিক সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর সে তাঁহার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মহানবী (স) বানূ নাযীরকে তাহাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলে ইহা অমান্য করিতে তাহাদেরকে 'আবদুল্লাহ্ কেবল প্ররোচনাই দেয় নাই, অধিকন্তু সামরিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেয়। মুরায়সী অভিযানকালে পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া 'আবদুল্লাহ্ মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্তের প্রয়াস পায় এবং তাঁহাকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার মনোভাব সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। ইহার অব্যবহিত পরই সে উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা)-এর কুৎসা রটনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। মহানবী (স) এই ব্যাপারে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। যদিও পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পরস্পরের সম্পর্ক তিক্ত ছিল, তবুও এই সময় এই সত্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠে, 'আবদুল্লাহর সমর্থক কেহ নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতেই সে মুনাফিকদের নেতা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান শত্রুরূপে পরিচিত হয়। ইহার পর মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে 'আবদুল্লাহ্র পক্ষ হইতে চক্রান্ত সৃষ্টির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। গায্ওয়া তাবূকেও সে অংশগ্রহণ করে নাই। ইহার কিছুদিন পর ৯/৬৩১ সালে তাহার মৃত্যু ঘটে। 'আবদুল্লাহ্র পুত্রের অনুরোধে দয়াপরবশ হইয়া মহানবী (স) নিজে তাহার জানাযা পড়ান এবং কাফনের জন্য স্বীয় জামা প্রদান করেন। তবে কুরআন কারীমে ভবিষ্যতে মুনাফিকদের জানাযা পড়াইতে মহানবী (স)-কে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয় (৯ঃ ৮০ও ৮৪)। 'আবদুল্লাহ্র বৈরী আচরণ সত্ত্বেও মহানবী (স) তাহার সহিত ব্যবহারে চরম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'আবদুল্লাহ্র পুত্রের নামও ছিল 'আবদুল্লাহ্ (রা)। ইহা ছাড়া তাহার কয়েকজন কন্যাও ছিল। তাঁহারা সকলেই খাঁটি মুসলিম ছিলেন, বিশেষত পুত্রের আন্তরিকতা অনেক উচ্চ স্তরের ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, ৪১১-৩, ৫৪৬, ৫৫৮, ৫৯১, ৬৫৩, ৭২৬, ৭৩৪, ৯২৭, (২) ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (৩) Wellhasusen, Muhammed in Medina, Berlin 1882, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্ন সা'দ ৩/২খ., ৯০, ৮খ., ২৭৯; (৫) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, ২০৭, ২৫৩ ইত্যাদি ; (৬) Caetani, Annali, ১খ., ৪১৮, ৫৪৮, ৬০২ ইত্যাদি। (৭) আল-বালাযু'রী, আনসাবুল আশরাফ, ১খ., নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্ন হ'াযম, জাওয়ামি'উ'স্-সীরা, নির্ঘণ্ট; (৯) ঐ লেখক, জামহারা আন্সাবিল-'আরাব, নির্ঘণ্ট; (১) আয্-যিরিকলী, আল-আ'লাম, শিরোনাম, বিশেষত গ্রন্থপঞ্জী; (১১) আস-সামহূদী, ওয়াফাউল-ওয়াফা, কায়রো ১৯০৮ খৃ., ১খ., ১৪২; (১২) ইব্নুল-আছীর, ১খ., ৫০৬ প.; (১৩) তাফসীর গ্রন্থসমূহ, যথা ইব্ন জারীর, রূহ'ল-মা'আনী, রাহ'রুল-মুহ'ীত'; ৪২ ঃ ১১ আয়াত-এর তাফসীর।

W. Montgomery Watt (E.I.² /দা.মা.ই.)/ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (عبد الله بن عمر) ঃ ইব্ন 'আব্দিল-'আযীয, উমায়্যা খলীফা ২য় 'উমার (র)-এর পুত্র। ১২৬/৭৪৪ সালে ৩য় ইয়াযীদ কর্তৃক ইরাকের গভর্নর (ওয়ালী) নিযুক্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই তথাকার সিরীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অভিযোগ ছিল, নূতন গভর্নর তাঁহাদের তুলনায় ইরাকীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ২য় মারওয়ানের খিলাফাত লাভের পর 'আলী (রা)-এর ভ্রাতা জা'ফার (রা)-এর বংশধর 'আবদুল্লাহ ইব্ন মু'আবিয়া (দ্র.) কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার তাঁহাকে কূফা হইতে বহিষ্কৃত করেন। ইহার পর তাঁহারা তাঁহাদের প্রচারণা অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত করেন। মারওয়ান ইরাকের শাসনভার আন-নাদ্'র ইব্ন সা'ঈদ আল-হারাশীর কাছে হস্তান্তরিত করিলে 'আবদুল্লাহ্ বলিষ্ঠভাবে পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। 'আবদুল্লাহ্ হীরায় থাকাকালে আন-নাদ'র কূফায় উপস্থিত হন এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এমন সময়ে উভয়েরই দুশমন খারিজী নেতা দ'াহ্'হ'াক ইবন্ ক'ায়স আসিয়া উপনীত হন। ফলে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী একত্র হইয়া দা'হ্'হ'াক-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রাজাব ১২৭/এপ্রিল ৭৪৫-এ দাহহাক উভয়েরই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কূফা জয় করেন। 'আবদুল্লাহ্ ওয়াসিত'-এর দিকে হটিয়া যান। উভয় গভর্নরের মধ্যে আবার পূর্বেকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দ'াহ্'হ'াকই এই দ্বন্দ্বের নিরসন করেন। তিনি শহরটি অবরোধ করেন যাহা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অতঃপর 'আবদুল্লাহ্ আবার দ'াহ্'হ'াক-এর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। পরিশেষে মারওয়ান তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। সাধারণ বর্ণানুযায়ী তিনি হ'াররান-এর কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মহামারীতে (প্লেগ) আক্রান্ত হইয়া ১৩২/৭৪৯-৫০ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ১৮৫৪ প. ; (২) ইবনুল-আছ'ীর, ৫খ., ২২৮প.: (৩) G. Weli, Gesch. d. Chalifen; (৪) J. Wellhausen, Das arab. Reich, পৃ. ২৩৯ প. ; (৫) Caetani and Gaberieli, Onomasticon, ২খ., 982।

K. V. Zettersteen (E.I.[2])/ এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (عبد الله بن عمر) ঃ (রা) দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, মহানবী (স)-এর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, একজন প্রসিদ্ধ রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী)। তিনি সাধারণত ইব্ন 'উমার নামে পরিচিত। হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে পিতার সহিত একই সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। পিতার হিজরতের কিছু পূর্বে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধে শরীক হইতে চাহিলে বয়স অল্প বলিয়া মহানবী (স) তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল পনর বৎসর। পরবর্তী কালে বয়সের অংকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এই ঘটনাটিকে নজীর হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইব্ন 'উমার মহানবী (স)-এর সহিত পরবর্তী সমস্ত যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। খুলাফা-ই রাশিদীনের শাসনামলে প্রেরিত বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাতকালে (১০/৬৩২-১৩/৬৩৪) নবূওয়াতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা ও তু'লায়হ'া-র বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে (১২/৬৩৩) ইব্ন 'উমার (রা) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত 'উছমান (রা) মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ্'-এর সাহায্যার্থে উত্তর আফ্রিকার অবশিষ্ট অঞ্চল আয়ত্তাধীন করার জন্য মদীনা হইতে যে সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইব্ন 'উমারও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (২১/৬৪১)। ৩০/৬৫০-১ সালে তিনি সা'দ ইবনুল-'আস'-এর অধীনে জুরজান ও তাবারিস্তান অভিযানে গমন করেন এবং ৪৯/৬৬৯ সালে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়ার নেতৃত্বে বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন হযরত 'উমার (রা)-এর মৃত্যুর পূর্বে তৎকর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে। এই উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য হইতে একজনকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। তবে ইব্ন 'উমারের বেলায় শর্ত ছিল, তিনি নিজে খলীফা মনোনীত হইতে পারিবেন না। উপদেষ্টা পরিষদ সমান দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে যে কোন এক পক্ষে তাঁহার ভোট দানের অধিকার ছিল। পরবর্তী কালে তিনবার তাঁহাকে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় ঃ(১) হযরত 'উছমান (রা)-এর মৃত্যুর (৩৫/৬৫৫) পর, (২) হযরত 'আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা)-এর মধ্যে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় এই বিরোধ মীমাংসাকল্পে দুইজন মীমাংসাকারী (ছালিছ) নিযুক্ত করার কালে (৩৭-৩৮/৬৫৭-৫৮, (৩) প্রথম ইয়াযীদের মৃত্যুর (৬৪/৬৮৩) পর। কিন্তু তিনি তিনবারই উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে সর্বসম্মত রায়ের প্রত্যাশী ছিলেন। এইজন্য তিনি হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পর হযরত 'আলী (রা)-কে খালীফা মনোনয়নের সময় মুসলমানদের ঐকমত্যের অপেক্ষায় 'আলী (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। পরবর্তী কালে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের সময় তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মু'আবি'য়ার উত্তরাধিকার নীতির বিরোধী ছিলেন, এইজন্য তাঁহার পুত্র ইয়াযীদের জন্য বায়'আত দাবি করিলে তিনি প্রথমে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু মু'আবি'য়া (রা)-এর মৃত্যুর পর সম্ভাব্য ফিত্না এড়ানোর জন্য তিনি ইয়াযীদের বায়'আত গ্রহণ করেন।

ইব্ন 'উমার প্রশাসনিক কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হন নাই, বরং ইহা হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক কাজে অতিবাহিত করেন। বর্ণিত আছে, ধর্মীয় নির্দেশের বিশ্লেষণে ভুল হওয়ার আশংকায় তিনি কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ইব্ন 'উমার ছিলেন ধর্মপ্রাণ। মহৎ ও নিঃস্বার্থ চরিত্রের জন্য তিনি সর্বত্র উচ্চ সম্মান পাইতেন। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের একজন সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসাবেও তিনি শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন। সাহাবীদের মধ্যে তাঁহাকে অন্যতম মুফতী সাহাবীরূপে গণ্য করা হয়। তিনি ৬০ বৎসর যাবত এই দায়িত্ব আনজাম দিয়াছেন। জীবনী গ্রন্থসমূহে তাঁহার জীবনের এমন সব আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে, যেগুলি তাঁহার মেধা, তাক্'ওয়া, সততা ও সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, সকল কাজে ভারসাম্য বজায় রাখা, বিলাস-ব্যসনের প্রতি নিরাসক্তি প্রভৃতি গুণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। তিনি নিজের পক্ষ হইতে রিওয়ায়াতের মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেন না। তিনি ২৬৩০ টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য শিষ্যের মারফত তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহ উত্তরকালে

অনুসন্ধানকারীদের হস্তগত হয়। হাদীছ বর্ণনায় (مالك عن نافع ابن عمر) এই সনদটিকে বিশুদ্ধতম সনদ (اصح الاسانيد كلها) বলিয়া বিবেচনা করা হয় (আল হাকিম, মা'রিফাতু 'উলূমি'ল-হাদীছ, পৃ. ৫৩)। ইব্ন 'উমার রাসূলুল্লাহ (স)-এর বেশীর ভাগ বৈঠকেই উপস্থিত থাকার চেষ্টা করিতেন। কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে সাহাবীদের হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্ণনা সম্পর্কে জানিয়া লইতেন।

ইব্ন 'উমার (রা) ৭৩/৬৯৩ সালে ৮৪ বৎসর বয়সে রক্তদুষ্টির ফলে ইন্তিকাল করেন। রক্তদুষ্টির কারণ ছিল, হজ্জের সময় 'আরাফাত হইতে ফিরার পথে হ'াজ্জাজের একজন সিপাহী তাহার বর্শার নিম্নাংশ ইব্ন 'উমারের পায়ে ঢুকাইয়া দেয়। হ'াজ্জাজ তথায় গমন করিয়া সিপাহীকে শাস্তি দানের জন্য তাঁহার নিকট সিপাহীর পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি এই বলিয়া হ'াজ্জাজকে তিরস্কার করেন, এই পবিত্র স্থানে সিপাহীকে অস্ত্র সমেত ঢুকিবার জন্য কেন অনুমতি দেওয়া হইল?

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৪/১খ., ১০৫-১৩৮, ৩/১খ., ২১৪, ৩/২খ., ৪২, ১/৪খ., ৪৯,৬২ ; (২) ইব্ন খাল্লিকান, বূলাক, ১২৭৫ হি., ১খ., ৩৪৯-৩৫০, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, সংখ্যা ২৯৭; (৩) আবূ নু'আয়ম, হি'ল্য়াতুল-আওলিয়া', ১খ., ২৯২-৩১৪; (৪) ইব্নুল-জাওযী, প্যারিস পাণ্ডুলিপি, (আরবী), নং ৬১৩১, পত্র ২২৭ক-২২৯খ; (৫) ইব্নুল-আছীর, উস্দ, কায়রো ১২৮৫ হি., ২খ.,২২৭-২৩১; (৬) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, কলিকাতা ১৮৫৬-১৮৯৩, পৃ.৮৪০-৮৪৭: (৭) মুস্'আব আয্-যুবায়রী, নাসাব কুরায়শ (সম্পা. Levi-Provencal), পৃ. ৩৫০-৩৫১; (৮) ত'াবারী, নির্ঘন্ট দ্র.; (৯) মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ., ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০০, ৪০২ ৫খ., ৪৩, ২৮৪-৮৬, দ্র. নির্ঘন্ট; (১০) ইব্নুল আছ'ীর, ৪খ., ২৩০, ২৯৫-৯৬, দ্র. নির্ঘন্ট; (১১) ইব্ন-কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯খ., ৪-৫; (১২) আয-য'াহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা', ৩খ., ১৩৪-১৬১; (১৩) ঐ লেখক, তা'রীখুল-ইসলাম, ৩খ., ২১৮; (১৪) ঐ লেখক, তায্'কিরাতুল-হু'ফ্ফাজ, ১খ., ৩৫; (১৫) Muir, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall; (১৬) Wellhausen, Muhammed in Medina; (১৭) Lammens, Etudes sur le regne du calife omaiyade moawia Ler (MEOB 1908).

L. Veccia Vaglieri (E.I.² দা.মা.ই.) /
এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব (عبد الله بن وهب) ঃ

আবরাবাসী, একজন খারিজী নেতা। তিনি ছিলেন একজন তাবি'ঈ এবং বাজীলা গোত্রের সহিত সম্পর্কিত। বীরত্ব ও তাক্'ওয়ার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন এবং তিনি "যু'ছ্-ছ'াফিনাত" (কড়াওয়ালা) উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন। বহুদিন যাবত বারংবার সিজ্দার দরুন তাঁহার কপালের চামড়ায় দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস (রা)-এর অধীনে ইরাকে এবং হযরত 'আলী (রা)-এর অধীনে সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আলী (রা) কর্তৃক স্বীয় পক্ষ হইতে মধ্যস্থতা নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হারূরা' নামক স্থানে হযরত 'আলী (রা)-এর দলত্যাগী (খারিজী)-দের সহিত মিলিত হন। শাওওয়াল ৩৭/মার্চ ৬৫৮ সালে শেষবারের মত কূফা ত্যাগের কিছু পূর্বে খারিজীরা তাঁহাকে স্বীয় কমান্ডার (আমীর) নির্বাচিত করে। ৯ সাফার, ৩৮/১৭ জুলাই, ৬৫৫ সালে নাহ্রাওয়ান-এর যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১খ., ৩৩৬৩-৬, ৩৩৭৬-৮১: (২) মুবাররাদ, আল-কামিল, পৃ. ৫২৭, ৫৫৮ প.; (৩) দীনাওয়ারী, (ed. Guirgass and Rosen), পৃ. ২১৫-২৪: (৪) বালাযু'রী, আনসাব (in Levi della Vida, RSO , ১৯১৩, ৪২৭-৫০৭: (৫) বার্‌রাদী, কিতাবুল-জাওয়াহির, কায়রো ১৩০২ হি.; (৬) R. Brunnow, Die Charidschiten,পৃ. ১৮ প.; (৭) J. Wellhausen, Religiospol, Oppositionsparteien, পৃ. ১৭ প.; (৮) Caetani, Annali, ৩৮ হি., স্থা. (অতিরিক্ত সূত্র প্যারা ২৬৭); (৯) L. Veccia Vaglieri; 11 Conflitto' Ali-Mu'awiya, in Ann. Dell' Ist, Univ. Orient di Napoli, 1952, 58 প.।

H.A.R. Gibb (F.1.²) এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্ন ক'ায়স (عبد الله بن قيس) ঃ

ইব্ন খালিদ আল-আনস'রী আল-খায্‌রাজী (রা), তাঁহাকে ইব্ন হুবায়শও বলা হয় (ইস'াবা, ১খ., ৩৩৯), মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ জানা যায় নাই। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহ'াম্মদ ইব্ন 'উমার আল-আন্স'ারীর বর্ণনামতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু ওয়াকি'দীর বর্ণনামতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে ইন্তিকাল করেন (ত'াবাক'াত, ৩খ., ৪৯৪, ৪৯৫)। 'আবদুর রাহ'মান ও 'উমায়রা নামে তাঁহার দুই সন্তান ছিল; স্ত্রীর নাম সু'আদ বিন্ত কায়স ইব্ন মুখাল্লাদ (ত'াবক'াত, ৩খ, ৪৯৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ২খ., ২৪৪; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৩৯, ৩৪০, নং-৪৮০৭; (৩) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪৯৪, ৪৯৫; (৪) আয্-য'াহাবী, তাজরীদ আস্মাইস-স'াহ'াবা, ১খ., ৩২৯; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৩২১; (৬) ইদ্‌রীস কান্ধলাবী, সীরাতুল-মুস'ত'াফা, ১খ., ৬১৫; (৭) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ., ২৪৮।

আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম (عبد الله بن خازم) ঃ

আস-সুলামী, খুরাসানের প্রাদেশিক শানকর্তা, ৩১/৬৫১-৫২ সালে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির (দ্র.) কর্তৃক খুরাসানের প্রথম অভিযানের সময় ইব্ন খাযিম অগ্রবর্তী সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন যাঁহারা সারাখ্স অধিকার করেন। কোন কোন বর্ণনানুসারে তিনি ৩৩/৬৫৩-৫৪ সালে কারিন-এর নেতৃত্বে সংঘটিত একটি বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি এই প্রদেশের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। তবে হয়ত ইহা ৪২/৬৬২ সালের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে হইয়াছিল। ইব্ন 'আমির দ্বিতীয়বারের মত বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে (৪১/৬৬১) ক'ায়স ইব্নুল-হায়ছাম আস-সুলামীকে খুরাসানে গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং বাল্খ ও সিজিস্তান পুনর্দখলকল্পে 'আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম ও 'আবদুর রহ'মান ইব্ন

সামুরা-কে প্রেরণ করা হয়। কায়সকে শাসনকর্তা নিয়োগের পরবর্তী বৎসর সংঘটিত হায়াতিলা (Ephthalite) সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ তিনি দমন করিতে ব্যর্থ হইলে ইবন 'আমির তাঁহার স্থলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৪৫/৬৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি খুরাসানে অবস্থান করেন। পরে যিয়াদ তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসেন।

সাল্ম ইব্ন যিয়াদের সেনাদলের সহিত ইব্ন খাযিম পুনরায় খুরাসান যাত্রা করেন (৬১-২/৬৮০-৮২)। প্রথম ইয়াযীদের মৃত্যুর পর সাল্ম নিজে পদত্যাগ করিয়া ইব্ন খাযিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে মনোনীত করেন (৬৪/৬৮৪)। মারব'-এর তামীম গোত্রীয় শানসকর্তাকে পরাজিত করিয়া ইব্ন খাযিম উহা অধিকার করেন। তিনি তামীমীদের সহযোগিতায় দীর্ঘ সংগ্রামের পর মারবআর-র-রূয ও হারাতের বাক্র গোত্রীয় শাসনকর্তাদেরকে পরাভূত করেন। এই বিজয়ের পর বানূ তামীম তাঁহার বিরুদ্ধে একাদিক্রমে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। এই সময় তিনি ইব্ন যুবায়র (দ্র.)-এর পক্ষ হইতে খুরাসানের নামমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। ৭২/৬৯২ সালে খলীফা 'আবদুল-মালিক তাঁহার প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে খুরাসানের শাসনকর্তা পদের সাত বৎসরের নিশ্চয়তা দানের প্রস্তাব দিলে ইব্ন খাযিম ক্রোধভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে খলীফার পক্ষ হইতে ইব্ন খাযিমের অধীনে মারব'-এর উপশাসনকর্তা বুকায়র ইব্ন বিশাহ ইব্ন তামীমীকে উক্ত প্রস্তাব দেয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। বুকায়র তাঁহাকে (সম্ভবত ৭৩/৬৯২-৯৩ সালে যখন তিনি তৎনির্মিত তিরমিয' কিল্লায় পুত্র মূসার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছিলেন) আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন।

পরবর্তী কালে ইব্ন খাযিমের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে কিংবদন্তীর ন্যায় বহু কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। ফলে অধিকাংশ ঘটনার সঠিক তথ্য বাহির করা দুষ্কর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, নির্ঘন্ট (অনু. Zotenberg, ৪খ., ৬৩-৫, ১১৩-৪); (২) আল-বালাযু'রী, পৃ. ৩৫৬ প., ৪০৯, ৪১৩প.; (৩) ইয়া'কূ'বী, ২খ., ২৫৮, ৩২২-৪; (৪) ঐ লেখক, বুলদান, ২৭৯, ২৯৬-৯; (৫) মুহ'াম্মাদ ইবন হ'াবীব, আল-মুহাব্বার, পৃ. ২২১-২, ৩০৮; (৬) নাক'াইদ জারীর ওয়াল-ফারাযদাক', নির্ঘন্ট ; (৭) আল-কালী, য'ায়লুল-আমালী, পৃ. ৩২; (৮) Wellhausen, Arab. Reich, পৃ. ২৫৮-৬২; (৯) Caetani, Annali, ৭খ., ২৭৫ প., ৪৯৩ প.; ৮খ., ৩-৮; (১০) Barthold, Turkestan ২য়. সং., পৃ. ১৮৪; (১১) Marquart, Eransahr, Berlin 1901, পৃ. 69, 135; (১২) J. Walker, Catalogue of the Arab-Sassanian Coins (বৃটিশ মিউজিয়াম). লন্ডন ১৯৪১ খৃ., নির্ঘন্ট; (১৩) R. Ghirshman, Les Chionites-Hephtalites, পৃ. ৯৯-১০১; (১৪) অন্য বরাতসমূহের জন্য Caetani, Chronographia, পৃ. ৮৫৩।

H.A.R. Gibb (E.I.²) ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন ছাওর (দ্র. আবূ ফুদায়ক)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন ছ'াবিত আল-আনস'ারী (عبد الله بن ثابت الانصاري) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তাঁহার উপনাম আবূ উসায়দ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একজন খাদিম ছিলেন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন ছ'াবিত আল-আনস'ারীর বরাতে আবুত্-তু'ফায়ল তৈল ব্যবহার সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন হি'ব্বানের মতেও তিনি একজন সাহাবী। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আব্দিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., পৃ. ৮৭৫; (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১২৭; (৩) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৮৪, নং ৪৫৭৪।

মোঃ আবদুস সালাম

'আবদুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা (عبد الله بن ثعلبة) ঃ ইব্ন সু'আয়র (রা) কেহ কেহ তাঁহার দাদার নাম আবূ সু'আয়র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইমাম বুখারী (র) আত-তা'রীখ গ্রন্থে বলিয়াছেন, ছা'লাবা ইব্ন সু'আয়র ও ছা'লাবা ইব্ন আবী সু'আয়র অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। তিনি 'উযবা গোত্রজ ছিলেন। আর এই 'উযবা গোত্র তাঁহার পিতার মাধ্যমে মদীনার বিখ্যাত যুহরা গোত্রের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ও তাঁহার গোত্র মদীনার অধিবাসী ছিলেন।

তাঁহার জন্ম-সন সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি হিজরতের চারি বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কাহারও মতে তিনি হিজরতের পর জন্মলাভ করেন। একটি বর্ণনামতে তিনি মক্কা বিজয় বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হইলে তিনি তাঁহার মস্তক ও মুখমণ্ডলে হাত বুলাইয়া তাঁহার জন্য দু'আ করেন। ইমাম বুখারী (র)-ও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত কি না সে সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যমান। আল-বাগ'াবী বলিয়াছেন, তিনি নবী কারীম (স)-কে দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ হি'ফজ' করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্ন হি'ব্বান তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইবনুস-সাকান বলিয়াছেন, তাঁহাকে সাহাবী বলা হয়। তবে তিনি নবী কারীম (স) হইতে যেই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহা দারাকু'ত'নী স'াদাক'াতু'ল-ফিত'র অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হাদীছ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে বলিয়া ইবনুস-সাকান মন্তব্য করিয়াছেন। আর ইমাম বুখারী (র) উহাকে মুরসাল (দ্র. হাদীছ) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ইহাই সঠিক মত। কেননা নবী কারীম (স) হইতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার ('আবদুল্লাহ) হাদীছ শ্রবণ এবং নবী (স)-এর সাহচর্য সম্পর্কে বর্ণনায় কোন উল্লেখ নাই। সরাসরি নবী কারীম (স) হইতে তাঁহার হাদীছ বর্ণনা সম্পর্কে মতবিরোধ থাকিলেও সাহাবীদের নিকট হইতে তাঁহার হাদীছ বর্ণনা সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। আবূ হ'াতিম বলিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ শৈশবে নবী কারীম (স)-কে দেখিয়াছেন।

তিনি জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকিতেন। ইমাম বুখারী (র) ইব্ন শিহাব হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার (ইব্ন শিহাব-এর) মামা তাঁহার ('আবদুল্লাহর) কাছে নাসাবনামা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি একদিন তাঁহাকে ফিক্'হের মাস্আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে সা'ঈদ ইবনুল-মুসায়্যাবের নিকট যাইতে উপদেশ দেন।

তিনি স্বীয় পিতা, 'উমার, 'আলী, সা'দ, আবূ হুরায়রা, জাবির (রা) প্রমুখ সাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যুহরী, তাঁহার ভাই

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম, সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম প্রমুখ রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

জন্ম-সনের ন্যায় তাঁহার মৃত্যু-সন সম্পর্কেও মতভেদ আছে। তিনি ৮৭ অথবা ৮৯ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল তিরাশি, মতান্তরে তিরানব্বই বৎসর। কেহ কেহ ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন্ হ'াজার, ইস'াবা, মিসর ১৩৫৮/১৯৩৯, ১খ., ২০১, ২খ., ২৮৬; (২) ঐ লেখক, তাহয'ীবুত-তাহয'ীব, ১৬৬, ভারত ১৩২৬ হি., ৫খ.; (৩) ইব্‌নুল-আছ'ীর, উসদুল-গ'াবা, ইসলামিয়া প্রেস, তা.বি., ৩খ., ১২৮; (৪) ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, নাহদা প্রেস মিসর, তা.বি., ৩খ., ৮৭৬।

মোঃ আবদুল হক

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার (عبد الله بن جعفر) ঃ

ইব্‌ন আবী ত'ালিব, চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। 'আবদুল্লাহ্‌র পিতা শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মুসলিমগণের প্রথম আবিসিনীয় হিজরতে শরীক ছিলেন। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, সেখানেই 'আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। মাতার দিক হইতে তিনি ছিলেন মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার মাতা ছিলেন আস্‌মা' বিনতে 'উমায়স আল-খাছ'আমিয়া। কয়েক বৎসর পর 'আবদুল্লাহ্‌র পিতা পুত্রসহ মদীনায় আগমন করেন। 'আবদুল্লাহ তাঁহার দানশীলতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'বাহ্‌'রুল-জূদ' অর্থাৎ দানসাগর। 'আলী (রা)-এর খিলাফাত ও তৎপরবর্তী যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে 'আবদুল্লাহ্‌র নাম পরিলক্ষিত হইলেও মনে হয় তিনি রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নাই। মিসরের রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বহ ভূমিকা তাঁহার ছিল না। মিসরের বিচক্ষণ ও সাহসী শাসনকর্তা ক'ায়স ইবন সা'দ-এর মর্যাদা লাঘব করার উদ্দেশে তাঁহাকে যখন 'আলী (রা)-এর সমক্ষে সন্দেহের পাত্র বলিয়া চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয় তখন ক'ায়সকে বরখাস্ত করিতে 'আবদুল্লাহ 'আলী (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 'আলী (রা) তাঁহার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং ক'ায়সের স্থলে মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র (রা)-কে শাসনকর্তা নিয়োগ করার মত দুঃখজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র মিসর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার হইয়া পড়ে। ৩৬/৬৫৬-৫৭ সালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ৬০/৬৮০ সালে ইয়াযীদ খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে কূফার অধিবাসিগণ হু'সায়ন ইবন 'আলী (রা)-কে কূফায় আসিতে এবং নিজেকে খলীফারূপে ঘোষণা করিতে প্ররোচিত করে। সেই সময় 'আবদুল্লাহ কতিপয় লোকসহ এইরূপ ভয়াবহ সফরে যাত্রা হইতে হু'সায়ন (রা)-কে বাধা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। 'আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু সাল সম্পর্কে সাধারণভাবে হি. ৮০ বা ৮৫ সনের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হি. ৮৭ বা ৯০ সনের উল্লেখ দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১খ., ৩২৪৩ প., ২খ., ৩ প. ও ৩খ., ২৩৩৯ প.: (২) ইব্‌নুল -আছীর, ৩খ., ২২৪ প.; (৩) আন্-নাওয়াব'ী, পৃ. ৩৩৭ প.; (৪) আল্-ইয়া'ক্'বী, ২খ., ৬৭, ২০০, ৩৩১; (৫) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ., ১৮১, ২৭১., ৩১৩, ৩২৯, ৪৩৪; ৫খ., ১৯, ১৪৮, ৩৮৩ প.; (৬) Lammens, Etudes sur le regne du calife Omaiyade Moawia ler, in MFOB, index.

K. V. Zettersteen, (E.I.²) / ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাবির আল-'আবদী (عبد الله بن جابر العبدى) ঃ

(রা) একজন সাহাবী। কোন কোন জীবনী লেখক তাঁহার নাম 'আবদুর-রহ'মান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানীর মতে 'আবদুল্লাহ নামই সঠিক। তাঁহার পিতা 'আবদুল-ক'ায়স গোত্রের ১৪ জন সদস্য সম্বলিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিয়াছিলেন। তখন 'আবদুল্লাহ তাঁহার পিতার সহিত মদীনায় (৮ হি.) গমন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাবির হইতে যেই হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে উহা নিম্নরূপ ঃ তিনি বলেন, "আমি আমার পিতার সহিত 'আবদুল- ক'ায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদেরকে চারি প্রকারের পাত্রে পান করিতে নিষেধ করেন। (১) الحنتم পাকা লাউয়ের শক্ত বহিরাবরণ বা খোসা (বাওস), (২) الدباء সবুজ রঙে রঞ্জিত কলস, (৩) النقير খেজুর বৃক্ষের গুঁড়ি খোদাইকৃত পাত্র, (৪) المزفت আলকাতরার প্রলেপ আবৃত পাত্র (যাহাতে মাদক দ্রব্য চোলাই করিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল)। অতঃপর আমি আমার পিতার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর হজ্জ পালন করিতে যাই। আমরা যখন মিনায় পৌঁছিয়াছিলাম তখন আমার পিতা আমাকে বলিলেন, আমাকে হ'াসান ইব্‌ন 'আলী (রা)-র নিকট লইয়া চল, আমরা তাঁহাকে সালাম জানাইব। অতঃপর আমরা হ'াসান ইব্‌ন আলী (রা)-র খিদমতে গমন করি। তিনি আমার পিতাকে দেখামাত্র খোশআমদেদ জ্ঞাপন করিলেন এবং মজলিসে তাঁহার জন্য স্থান করিয়া দিলেন। এই সময় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে (কলসে রক্ষিত) নাবীয (نبيذ) পান করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা পান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। আমার পিতা তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ওমুকের পিতা! এই সম্পর্কে আমাদেরকে নবী (স) যেই নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পর কি এই অনুমতি আপনি প্রদান করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেনঃ হাঁ, তোমাদের পরবর্তী কালে ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার আদি বাসস্থান বাহ্‌রায়ন-এ ছিল এবং পরবর্তী কালে তিনি বসরায় বসবাস করিতে থাকেন। তিনি উষ্ট্র (জামাল) যুদ্ধ (৩৬/৬৫৬) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৩০; (২) ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, কায়রো, তা.বি., ৩খ., ৮৭৭; (৩) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৮৬; (৪) 'আলী ইবন সুলত'ান আল-ক'ারী, মির্‌ক'াতুল-মাফাতীহ'., মুলতান ১৯৬৬, ১খ., ৮৮; (৫) আয-য'াহাবী, তাজরীদ, বৈরূত তা.বি. ১খ., ৩০১, নং ৩১৮৭।

ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জারাদ (عبد الله بن جراد) ঃ

(রা) ইব্‌নিল-মুনতাফিক' ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন 'উক'ায়ল আল-'আমিরী আল-উক'ায়লী। বংশ তালিকার বিবরণে কিছু মতপার্থক্য পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী, ইয়াকূ'ব ইব্‌ন সুফয়ান ও ইব্‌ন মাকূলা তাঁহার সাহাবী হওয়া সম্পর্কে একমত। ইয়া'লা ইবনুল-আশদাক ও আবূ ক'াতাদা আশ-শামী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। একটি হাদীছ নিম্নরূপঃ কবি লাবীদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে কবিতার দুইটি পংক্তি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন ঃ

الا كل شيء ما خلا الله باطل–وكل نعيم لامحالة زائل

"সাবধান! আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই নশ্বর এবং সব উপভোগ্য বস্তু অবশ্যই ধ্বংস হইবে।"

প্রথম পংক্তি সম্পর্কে নবী (স) বলিলেন, "লাবীদ, তুমি সত্য বলিয়াছ", কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "লাবীদ, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ।" কেননা জান্নাতের উপভোগ্য বস্তু বিনষ্ট হইবে না।

তাঁহার বর্ণিত অন্য একটি হাদীছ হইল ঃ নবী (স) বলিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি এমন একজন যিম্মীর উপর অত্যাচার করে যে আনুগত্য স্বীকার করত জিয্য়া আদায় করে, আমি তাহার প্রতিপক্ষ।"

আবূ ক'তাদা আশ-শামী 'আবদুল্লাহ ইব্ন জারাদ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেনঃ বানূ মুযায়নার জনৈক ব্যক্তির সহিত আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। লোকটি নবী (স)-কে বলিল, "হে রাসূলুল্লাহ, আমি একটি সন্তান লাভ করিয়াছি, আপনি একটি উত্তম নাম বলিয়া দেন।" নবী (স) বলিলেনঃ তোমাদের নামগুলির মধ্যে ভাল নাম হইল আল-হ'ারিছ ও হ'াম্মাম এবং অতি উত্তম নাম 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহ'মান। তবে এই হাদীছটির সনদে ত্রুটি আছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন জারাদ যাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন জারাদ যাঁহার নিকট হইতে ইয়ালা ইব্নুল -আশদাক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ে একই ব্যক্তি নহেন।

ইব্ন হি'ব্বান 'আবদুল্লাহ ইব্ন জারাদ-এর মৃত্যুর সন ভুলবশত ১৬৪ হি. বর্ণনা করিয়াছেন, তাই তাঁহার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। যদি ইব্ন হি'ব্বান-এর বর্ণনা সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বলা যায়, ১৬৪ হিজরীতে যেই আবদুল্লাহ ইব্ন জারাদ ইন্তিকাল করিয়াছেন তিনি সাহাবী নহেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন-হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., পৃ. ২৮৮ ; (২) ইব্নুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., পৃ. ১৩৩ ; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩০২।

এফ.এম.এ.এইচ. তাকী

'আবদুল্লাহ ইব্ন জিওদাত (দ্র. জেওদেত)

'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ'শ (عبد الله بن جحش) ঃ (রা) কুরায়শের শাখা বানূ উমায়্যার হ'ালীফ (মিত্র) বানূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের সন্তান। তাঁহার মাতা উমায়মা বিন্ত 'আবদিল-মুত্ত'ালিব ছিলেন মহানবী (স)-এর ফুফু। 'আবদুল্লাহ তদীয় ভ্রাতা 'উবায়দুল্লাহ ও আবূ আহ্'মাদের সহিত শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা 'উবায়দুল্লাহ-এর সহিত তিনিও আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরতে শামিল ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং সেইখানেই মারা যায়। 'আবদুল্লাহ মক্কায় ফিরিয়া আসেন। তিনি একটি হি'লফ (চুক্তিবদ্ধ গোত্রসমষ্টি)-এর নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন এবং তাঁহার ভগ্নি যায়নাব (দ্র.)-ও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরে মদীনায় হিজরত করেন। 'আবদুল্লাহ নাখ্লার মুসলিম সারিয়্যা (শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ উদ্দেশে প্রেরিত অভিযাত্রী দল)-এর নেতা ছিলেন, বদ্রেও তিনি শরীক ছিলেন। উহুদে যখন শহীদ হন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪০-৫০ এর মধ্যে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৩খ., ৬২-৬৪; (২) ইব্নুল-আছীর, উস্দ, ৩খ., ১৩১ ; (৩) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, আবদ শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

W. Montgomery Walt (E.I.[2])/ ফরীদুদ্দীন মাসঊদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ্'আন (عبد الله بن جدعان) ঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগের তায়ম ইব্ন মুর্রা গোত্রের একজন বিশিষ্ট কুরায়শ সরদার। বাণিজ্যিক কাফিলা পরিচালনা ও দাস ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করত তৎকালীন মক্কায় শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন (জাহি'জ; আল-মাহ'াসিন, van Vloten পৃ. ১৬৫; এই গ্রন্থটি ভুলক্রমে জাহি'জ-এর প্রতি আরোপিত হয়; ইব্ন রুস্তা, পৃ. ২১৫ ; আল-মাস্'উদী, মুরূজ, ৬খ., ১৫৩ প.; Lammens, La Mecque a La vcille de l'Hegire, নির্ঘণ্ট)। তিনি প্রচুর বিলাসসামগ্রী সংগ্রহ করেন। সোনার পেয়ালায় মদ্য পান করিতেন বলিয়া তাহাকে 'হাসিউ'য-য'াহাব' (حاسى الذهب) নামে বিদ্রূপ করা হইত। জারাদাত 'আদ (جرادت عاد) "আদের দুই ফড়িং) বা জারাদাতান নামে প্রসিদ্ধ তাহার দুইজন গায়িকা দাসী ছিল যাহাদের তিনি উমায়্যা ইব্ন আবিস্-সাল্তকে উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছিলেন। বর্ণাঢ্য মেহমানদারির সুবাদে তিনি কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হইয়াছিলেন (আল-আগ'ানী, প্রথম সং., ৮খ., ৪; আছ-ছা'আলিবী, ছিমার, পৃ. ৪৮৭ প., দেখুন "জীফান ইব্ন জুদ্'আন" কিংবদন্তীমূলক শিরোনামে)। ফলে তিনি কবিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন; তবে কিছু নিন্দাবাদ (هجو)-এরও শিকার হন (আল্-জাহি'জ, আল-হ'ায়াওয়ান, দ্বিতীয় সং, ১খ., ৩৬৪, ২খ., ৯৩)। সমকালীন রাজনীতিতেও তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন (আল-আগ'ানী, ১৯খ., ৭৬)। তিনি হি'ল্ফুল-ফুযূ'ল নামে প্রসিদ্ধ মক্কার আন্তঃগোত্র সংঘ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন (ইবন হিশাম, পৃ. ৮৫ ; আল-ইয়া'কূ'বী, ২খ., ১৬; Lammens, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪ প.)।

মক্কাবাসীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, দাস ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে 'আবদুল্লাহ এমন বিপুল ঐশ্বর্য অর্জন করিয়াছিলেন, জনগণের মধ্যে ইহাই প্রচারিত হউক। ফলে তাঁহার ঐশ্বর্য লাভ সম্পর্কে তৃতীয় শতক/নবম শতকের দিকে নানা কিংবদন্তীর উদ্ভব ঘটে। বলা হয়, 'আবদুল্লাহ আসলে ইয়ামানের পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লিখিত এক বীর পুরুষ। তিনি বিখ্যাত শাদ্দাদ ইব্ন 'আমর (দ্র.)-এর সমাধির সন্ধান পাইয়াছিলেন (ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ, তীজান. ৬৫ প.)। আরও বলা হয়, তিনি ছিলেন 'সু'লুক' (কপর্দকহীন ফকীর)। স্বগোত্রীয়রা তাহাকে কাবীলা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তিনি মাঠে-ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি একদিন স্বর্ণ ও মহামূল্য রত্নরাজি পরিপূর্ণ একটি প্রাচীন সমাধির সন্ধান পান। ইহাতে তিনি প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন (আল-হামদানী, ইকলীল, ৮খ., ১৮৩ প.; আদ-দামীরী, ছু'বান শিরোনামের অধীন; আল-জাহি'জ; আল-বায়ান, সম্পা. সানদূবী, ১খ., ৩১)।

একটি বর্ণনানুসারে (নিঃসন্দেহে ইহা মনগড়া হইবে) ইয়ামানের বার্কুল গিমাদ নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয় (ইয়াকূ'ত, ১খ., ৫৮৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১খ., ১১৮৭, ১৩৩০; (২) মাক'দিসী 'আল-বাদ' ওয়াত-তা'রীখ, সম্পা. Huart, ৪খ., ১২৮ ও ৫খ., ১০৩; (৩) ছা'আলিবী, ছিমার, পৃ. ৫৩৯ ; (৪) আগ'ানী, প্রথম মুদ্রণ, ৮খ., ২-৬ ;

(৫) ইব্ন দুরায়দ, আল-ইশ্তিক'াক, পৃ. ৮৮; (৬) ইয়াকূ'ত, ৪খ., ৬২১; (৭) মাসউদী, আত্-তানবীহ্, পৃ. ২১০, ২১১, ২৯১ (অনু. Carra de Vaux, পৃ. ২৮২-৪, ৩৮১); (৮) শিবলী, আকামুল-মারজান, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ১৪১; (৯) Caussin de Perceval, Essai, ১খ., ৩০০-৫১ ও স্থা.; (১০) Barbier de Meynard, Surnoms et sobriquets (J/A, 1907), পৃ. ৬৬; (১১) O. Rescher, Qaljubi's Nawadir, Stuttgart 1920, no. 101.

Ch. Pollat (E.I.2) / ফরীদুদ্দীন মাউসদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (عبد الله بن جبير) ঃ (রা) ইব্ন নু'মান ইব্ন উমায়্যা ইব্ন ইমরিইল-ক'ায়স, খাওয়াত ইব্ন জুবায়র-এর সহোদর ভাই ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহাকে মদীনাবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বায়'আতুল-'আক'াবা ও বদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ। বুখারী শারীফে আল-বারাআ ইব্ন 'আযিব-এর হাদীছে 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, নবী (স) উহুদের যুদ্ধে পশ্চাৎ গিরিপথ সংরক্ষণের জন্য যে পঞ্চাশজন তীরন্দাযকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) ছিলেন তাঁহাদের নেতা। এই যুদ্ধে মুশরিকরা যখন পরাজিত হইল, তখন তীরন্দায বাহিনী গনীমতের মাল গ্রহণের জন্য ধাবিত হইলে তিনি তাঁহাদের নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ নিষেধ অমান্য করেন। মাত্র ১০ জন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যান এবং যুদ্ধ করিয়া সকলেই শাহাদাত বরণ করেন যাহার ফলে মুসলিম বাহিনী মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ত'াবাকা'ত, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ২খ., ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৭; ৩খ., ৫৩, ৪৭৫, ৪৭৬; (২) ইবনুল আছীর, উস্‌দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৩০-৩১; (৩) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৮৬, সংখ্যা ৪৫৮২।

এফ. এম. এ. এইচ. তাকী

'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'ারিক (عبد الله بن طارق) ঃ (রা) ইব্ন 'আমর ইব্ন মালিক আল-বালাবী। আন্‌সারদের বানূ জা'ফার গোত্রের হ'ালীফ (মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ)। বদ্‌র ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। যে ছয়জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক তৃতীয় হিজরীর শেষদিকে 'আদ'াল ও আল-ক'ারা-এর একদল লোক পবিত্র কুরআন ও দীনী জ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'ারিক (রা) তাঁহাদের অন্যতম। যাত্রাপথে হুয'ায়ল গোত্রের মালিকানাধীন আর-রাজী' নামক পানির কূপে উপস্থিত হইলে সঙ্গের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য হুয'ায়ল গোত্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন সাহাবীগণ বাধ্য হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফলে মারছ'াদ (রা), খালিদ (রা) ও 'আসি'ম (রা) শাহাদাত বরণ করেন এবং খুবায়ব (রা), যায়দ (রা) ও 'আবদুল্লাহ (রা) বন্দী হন। বন্দীদের মক্কা লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে আজ-জাহ্‌রানে 'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'ারিক স্বীয় হাত বন্ধনমুক্ত করিয়া তরবারি ধারণ করেন। শত্রুরা একটু দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে তিনিও শহীদ হন। আজ-জাহ্‌রানে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। কবি হ'াস্‌সান ইব্ন ছাবিত (রা) তাঁহার শোকগাঁথামূলক কবিতায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'ারিক সহ উল্লিখিত সাহাবীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩২৮, সংখ্যা ৪৭৬৯; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গ'াবা ফী মা'রিফাতিস-স'াহ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৮৮; (৩) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত তা. বি., ২খ., ৫৫, ৫৬।

মুহাম্মদ ফজলুল রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'াহির (عبد الله بن طاهر) ঃ জন্ম ১৮২/৭৯৮, মৃত্যু ২৩০/৮৪৪, একজন কবি, সেনাপতি ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খলীফার খুবই আস্থাভাজন এবং খুরাসানের প্রায় স্বাধীন একজন নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পিতা ত'াহির ইবনুল হু'সায়ন শক্তিশালী তাহিরী (দ্র.) বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রায় হইতে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত তাহিরীগণের রাজত্ব ছিল। ইহার রাজধানী ছিল নায়্‌স্যাবুর (নীশাপুর)।

২০৬/৮২১-২২ সালে খলীফা আল-মা'মূন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'াহিরকে আর্-রাক্‌কা ও মিসরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। নাস্'র ইব্ন শাবাছকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রেরিত সেনাদলের সেনাপতিত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। নাস'র প্রথমে আল-মামূনের ভ্রাতা আল-আমীনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন এবং মেসোপটেমিয়া অধিকারের চেষ্টায় ছিলেন। নাস'রকে পরাজিত করিয়া ২১১/৮২৬-২৭ সালে 'আবদুল্লাহ মিসরে উপনীত হন। স্পেনীয় শরণার্থীদের কারণে মিসরের অবস্থা তখন অরাজকতাপূর্ণ ছিল। তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শরণার্থীদের হোতাগণকে সত্বর গ্রেফতার করেন এবং সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করেন।

বাবাক-এ খুররামীর বিদ্রোহ দমনকল্পে আল-জিবালের দীনাওয়ার নামক স্থানে তিনি যখন সৈন্য সমাবেশে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁহার ভ্রাতা খুরাসানের শাসনকর্তা ত'াল্‌হ'া-র মৃত্যু হয়। ফলে খলীফা আল-মা'মূন ২১৪/৮২৯-৩০ সালে তাঁহাকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুবিজ্ঞ প্রমাণিত হন। তিনি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় একটি স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন, বিত্ত ধনীদের জুলুম হইতে দরিদ্রদের রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং অতি দরিদ্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বিস্তার করেন। নায়সাবূর অঞ্চলে সেচের পানি লইয়া খুবই মামলা-মকদ্দমা হইত। 'আবদুল্লাহ এই বিষয়ে সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ পন্থা উদ্ভাবনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পানি সিঞ্চনের অধিকার ও নিয়ম-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া 'কিতাবুল-আনহার' নামক একটি পুস্তক সংকলন করেন। বহু শতাব্দী পর্যন্ত পুস্তকটি এই ক্ষেত্রে দিশারীর মর্যাদা পাইয়া আসিতেছিল (তু. A. Schmidt, Islamica, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১২৮)।

তিনি আল-মু'তাসি'মের খিলাফাতকালে ২১৯/৮৩৪-৩৫ সালে 'আলাবী খিলাফাতের দাবিদার মুহ'াম্মাদ ইবনুল-কাসিমের বিদ্রোহ দমন করেন এবং ২২৪/৮৩৮-৩৯ সালে আল-আফ্‌শীনের ইঙ্গিতে তাবারিস্‌তানের ইস্‌বাহবাদে আল-মাযিয়ার (দ্র.)-এর সৃষ্ট একটি মারাত্মক বিদ্রোহ দমন করেন। তৎকালে তাবারিস্‌তান ছিল খুরাসান শাসনকর্তার অধীন।

গারদীযী বর্ণনা করেন, 'আব্দুল্লাহ একবার আল-মু'তাসি'মের কিছু সমালোচনা করিয়াছিলেন। ফলে আল-মু'তাসি'ম তাঁহার আনুগত্যের প্রতি এমনভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খলীফা হওয়ার পর একাধিকবার 'আবদুল্লাহকে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু প্রতিবারই উহা ফাঁস

হইয়া যায়। আসলে যাহাই হউক না কেন, বাহ্যত খলীফা তাঁহাকে খুবই সম্মান করিতেন। ধর্মবিরোধী বিশ্বাসের অভিযোগে 'আবদুল্লাহর অনমনীয় শত্রু আল-আফ্‌শীনের বিচার চলাকালে আল-আফ্‌শীন তীব্র কণ্ঠে এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, খলীফা 'আবদুল্লাহ্‌র পক্ষপাতিত্ব করেন। খলীফা আল-মু'তাসি'ম নিজে উক্তি করিয়াছিলেন, তদীয় ভ্রাতা খলীফা আল মা'মূন যেই চারজন মহান ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া শাসনকার্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন 'আবদুল্লাহ তাঁহাদের মধ্যে একজন এবং নিজে এই ধরনের কোন ব্যক্তি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই বলিয়া আল মু'তাসি'ম দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (বিস্ময়করভাবে উক্ত চারজনের সকলেই ছিলেন ত'াহিরী বংশোদ্ভূত)।

ত'াহিরী বংশোদ্ভূত অন্য শাসকদের ন্যায় 'আবদুল্লাহ্‌ও অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। বাগদাদে তাঁহার বিরাট এক প্রাসাদোপম মহল ছিল। রাজকীয় অধিকারবলে মহলটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল (مامن)-রূপে গণ্য ছিল। নগরের শাসনকর্তা ইহাতে বাস করিতেন। তাহিরীগণের হাতে দীর্ঘদিন এই নগরের কর্তৃত্ব ছিল (Le Strange, Baghdad, 119)।

'আবদুল্লাহ একজন সংস্কৃতিবান বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞানিগণকে সম্মান করিতেন এবং ভালবাসিতেন। 'আরব বনাম ইরানী সাংস্কৃতিক বিতর্কে (শু'উবিয়্যা আন্দোলন) সেই যুগের বড় বড় মনীষী জড়িত ছিলেন, ইহাতে আবদুল্লাহ 'আরব সংস্কৃতির প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনি নিজে একজন সংগীতজ্ঞ ও উঁচু স্তরের কবি ছিলেন। তিনি আল-হ'ামাসা-র সংকলক প্রসিদ্ধ আরব কবি আবূ তাম্মামের সদয় অভিভাবক ছিলেন। কবি আবূ তাম্মাম বহু কবিতায় তাঁহার গুণকীর্তন করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ তিন দিন টনসিল ও গলার ঘা রোগে আক্রান্ত হইয়া ৪৮ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। অধিকাংশ 'আরব ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু ছিল ১১ রাবী'উল-আওয়াল, ২৩০/২৬ নভেম্বর, ৮৪৪ সোমবার (অথচ ২৬ নভেম্বর ছিল বুধবার)। ঐতিহ্যানুসারে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ত'াহির পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। মৃত্যুকালে 'আবদুল্লাহ্‌র অধীনে প্রদেশগুলির রাজস্ব আয় দাঁড়াইয়াছিল চার কোটি আশি লক্ষ দিরহাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ৩খ., ১০৪৪ প.; (২) ইবনুল আছীর, ৬খ, ২৫৬ প., ৭খ., ৯প.; (৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, অনু.de Slane, ২খ., ৪৯; (৪) ইব্‌ন তাগরীবির্‌দী, সম্পা. Juynboll, ১খ, ৬০০ প.; (৫) ইয়া'কূবী, ২খ., ৫৫৫ প.; (৬) গার্‌দীযী, যায়নুল আখ্‌বার, পৃ. ৫-৯; (৭) আল-খাতীব, তারীখ বাগদাদ, ৯খ., সংখ্যা ৫১১৪; (৮) Weil, Chalifen, ২খ., ২০১ প.; (৯) Barthold, Turkestan, পৃ. ২০৮ প.; (১০) আবূ তাম্মাম, আল-হামাসা, সম্পা. Freytag, পৃ. ২; (১১) আরও বরাতের জন্য দ্র. Caetain ও Gabrieli, Onomasticon Arabicum, ২খ., ৯৭৩।

E. Marin (E.I.[2]) ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দ'াম্‌রা (عبد الله بن ضمرة) ঃ (রা) ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন 'আব্‌দিল-'উয্‌যা আল-বাজালী। তাঁহার কন্যা উম্মুল-কাস্‌সাফ-এর বর্ণনানুযায়ী একদিন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন দ'াম্‌রা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে কতিপয় সাহাবীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। উপস্থিত সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন ইয়ামানী। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ এখনই এই পথে ইয়ামানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগমন করিবে। সকলেই অপেক্ষমাণ। দেখা গেল, জারীর ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ আসিতেছেন। তিনি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিলেন। সকলে একসাথে সালামের জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জন্য নিজের চাদর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, জারীর! তুমি ইহার উপর বস। জারীর সকলের সহিত বসিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলে সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেনঃ জারীরের জন্য আপনাকে আজ যাহা করিতে দেখিলাম, আর কাহারও জন্য তাহা করিতে দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হাঁ, ঠিকই বলিয়াছ। এই লোকটি তাঁহার বংশের মহৎ ব্যক্তি। তোমাদের নিকট যখন কোন বংশের মহৎ ব্যক্তির আগমন ঘটে, তোমরা তখন তাঁহাকে সম্মান করিও।" 'আবদুল্লাহ (রা) বসরায় বসবাস করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী আল-ইস'াবা ফী তাম্‌য়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩২৭, সংখ্যা ৪৭৬৭; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা ফী মা'রিফাতিস-স'াহ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৮৮; (৩) আয্‌-য'াহাবী, তাজরীদ, আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩১৯, সংখ্যা ৩৩৬৮।

মুহাম্মদ ফজলুল রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাদ্‌র (عبد الله بن بدر) ঃ (রা) ইব্‌ন বা'জা ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন খিশান জুহারী মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার উপনাম আবূ বা'জা। ইব্‌ন সা'দ তাঁহাকে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন হ'াজার 'আসক'ালানীর মতানুসারে তিনি হিজরতের প্রথমদিকে মুসলমান হন। ইমাম বুখারী, আবূ হ'াতিম ও ইব্‌ন হি'ব্বানও তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে ইব্‌ন শাহীন বর্ণনা করেন, যখন নবী কারীম (স) মদীনায় আগমন করেন, তখন 'আবদুল-'উয্‌যা ইব্‌ন বাদ্‌র তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন। সংগে ছিল তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতা আবূ রাও'আ (ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ৩৩৩) যিনি তাঁহার চাচাতো ভাইও ছিলেন। নবী কারীম (স) তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার নাম কি?" উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আবদু'ল উয্‌যা। নবী কারীম (স) বলিলেন, "না, তোমার নাম 'আবদুল্লাহ।" অতঃপর নবী কারীম (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ গোত্র হইতে তোমরা আসিয়াছ?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "বানূ গ'ায়্যান গোত্র হইতে।" নবী কারীম (স) বলিলেন, "না, বরং তোমরা বানূ রুশ্‌দান হইতে।" তাঁহাদের মহল্লার নাম ছিল গাবী। নবী কারীম (স) উহার নাম দিলেন রুশ্‌দ এবং আবূ মারু'আকে বলিলেন, "ইন্‌শা আল্লাহ, তুমি শত্রুর হাত হইতে নিরাপদ থাকিবে।"

ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি কুর্‌য ইব্‌ন খালিদ আল-ফিহ্‌রীর নেতৃত্বে 'উরায়নীদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, 'উক'ল ও 'উরায়না গোত্রের একদল লোক নবী কারীম (স)-এর নিকট আসিয়া মুসলমান হয় এবং মদীনাতেই তাহারা অবস্থান করিতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার কারণে তাহাদের পেট ফুলিয়া যায় এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যায়। নবী কারীম (স) তাহাদের একপাল উট দিয়া বলিলেন, "এইগুলিকে মুক্ত মাঠের মধ্যে চরাও এবং উহাদের দুধ পান কর।" অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। অনন্তর তাহারা ধর্মত্যাগ করিয়া নবী কারীম (স)-এর রাখালকে হত্যা করিয়া উটগুলি লইয়া পলায়ন করে। তাহারাই ইসলামের ইতিহাসে 'উরায়নিয়্যন'

নামে কুখ্যাত। নবী কারীম (স) তাহাদের পশ্চাতে এক অশ্বারোহী বাহিনী কুর্য ইব্ন খালিদ আল-ফিহ্রী (রা)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন বাদর (রা) ছিলেন তাঁহাদের একজন। নবী কারীম (স) দু'আ করিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাহাদের জন্য রাস্তা সংকীর্ণ করিয়া দাও।" সুতরাং তাহারা রাস্তা ভুলিয়া গেল এবং মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হইল।

মক্কা বিজয়ে মুসলমান গোত্রসমূহের সকলেই অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকের জন্য ছিল পৃথক পৃথক পতাকা। বানূ জুহায়না গোত্রের চারজন পতাকাবাহীর মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন বাদ্র ছিলেন অন্যতম।

তাঁহার দুইটি নিবাস ছিল। একটি ছিল মদীনায় এবং অপরটি জুহায়নার পার্বত্য অঞ্চলে। তবুও তাঁহাকে মাদানী সাহাবী বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। মদীনায় মসজিদে নববীর পর যে মসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয় উহাতে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন বাদ্রের দান উল্লেখযোগ্য।

এই নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ইসলামের খেদমত করিয়া মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসনকালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পুত্র বা'জা তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই পুত্রের নাম ছিল মু'আবি'য়া।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, ১খ., ২৮০, সংখ্যা ৪৫৫৭, (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১২৩-৪; (৩) আবুল বারাকাত 'আবদুর-রাউফ, আস'াহ্হুস-সিয়ার, করাচী ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১০৯; (৪) মুঈনুদ্দীন আহমাদ নদবী, সিয়ারুস-স'াহ'াবা, আজমগড় ১৯৫৫ খৃ., ৭খ., ১২৮; (৫) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত, তা. বি., ১খ., ৩৩৩; (৬) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আস্মাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত, তা. বি., ১খ., ২৯৯, সংখ্যা ৩২৬২।

এম. এ. আজীজ খান

আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল (عبد الله بن بديل) ঃ (রা) ইব্ন ওয়ারাক'া ইব্ন 'আবদিল-উয্যা আল-খুযা'ঈ মক্কার বিখ্যাত বানূ খুযা'আ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উপনাম আবূ আম্র। তিনি ও তাঁহার পিতা বুদায়ল গোত্রপতি ছিলেন। স্বীয় গোত্রে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাঁহার পিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখানে উল্লেখ্য, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তাঁহার গোত্র মুসলমানগণের সাথে যোগ দেয়। কেহ কেহ বলেন, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। অধিকাংশের মতে তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তাঁহার পিতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই সঠিক মত। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা। মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তাইফ ও তাবুক অভিযানে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে গোলযোগ নিরসনে তাঁহার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিজরী ২৩ সালে যখন আবূ মূসা আশআরী 'কাম' ও 'কাশান'-এর গোলযোগ নিরসনে ব্যস্ত, তখন 'উমার (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়লকে তাঁহার সাহায্যে প্রেরণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইসফাহানের দিকে অগ্রসর হন। তথাকার শাসনকর্তা কাদুস্ফান শহর ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন এই শর্তে, শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা নিরাপত্তা কর দিয়া এইখানে থাকিতে চায় তাহারা থাকিতে পারিবে এবং যাহারা শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায় তাহারা চলিয়া যাইতে পারিবে। 'আবদুল্লাহ তাহাদের শর্ত মানিয়া লইলেন। ইস্ফাহান দখল করিবার পর তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকার দিকে অগ্রসর হন। কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত এলাকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিজরী ২৮ সালে 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে তিনি তিব্স ও কারীন দুর্গ জয় করেন। ইহার ফলে তিনি খুরাসান জয়ের পথ সুগম করিয়া দেন।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি 'আলী (রা)-এর পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার মতে আলী (রা) ন্যায়ের উপর এবং মু'আবি'য়া (রা) অন্যায়ের উপর ছিলেন। তাই তিনি ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

কিছু দিন যুদ্ধ বিরতির পর আবার যখন সিফ্ফীনের যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আলী (রা) তাঁহাকে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি বহু খণ্ডযুদ্ধে মু'আবি'য়া (রা)-এর সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করেন। এক সময় তিনি একদল সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মুআবিয়ার পক্ষ হইতে আবূ আ'ওয়ার সুল্মা একদল সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলে। 'আবদুল্লাহ যেইদিকে অগ্রসর হইতেন সেইদিকেই মু'আবি'য়ার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত। এক পর্যায়ে তিনি আমীর মু'আবিয়ার অতি নিকটে গিয়া পৌছেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া মু'আবিয়া তাঁহার সৈন্যদেরকে আবদুল্লাহ্র প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা চতুর্দিক হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রস্তরের আঘাতে বীরবর 'আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম যুহ্রী বলেন, 'উছমান (রা)-এর হত্যার পর গোলযোগ চলাকালে মুসলিম জাহানে কুরায়শ গোত্রে মু'আবি'য়া ও 'আম্র ইব্নুল-আস; ছাকীফ গোত্রের মুগীরা, আনসারদের মধ্যে কায়স ইব্ন সা'দ এবং মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল ছিলেন কূটনীতিতে সর্বাপেক্ষা চতুর।

আবূ নু'আয়ম সকলের মতের বিপক্ষে বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে ছোট বালক ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বৎসর। ইব্ন হিব্বান তাঁহাকে তাবিঈদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তবে অধিকাংশের মতে তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হইয়াছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি একজন সাহাবী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, ১খ., ২৮০; (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ৩খ., ১২৪; (৩) মুঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী, সিয়ারুস-সাহাবা, আজমগড় ১৯৫৫ খৃ., ৭খ., ১২৯।

এম. এ. আজীজ খান

'আবদুল্লাহ ইব্ন বুলুগ্গীন (عبد الله بن بلوكين) ঃ ইব্ন বাদীস ইব্ন হাবূস ইব্ন যীরী, গ্রানাডা রাজ্যের যীরী (দ্র. যারী ও আন্দুলুস) সান্হাজী বারবারী বংশের তৃতীয় ও শেষ শাসনকর্তা; ৪৪৭/১০৫৬ সালে জন্ম, ৪৫৬/১০৬৪ সালে পিতা বুলুগ্গীন সায়ফুদ-দাওলার মৃত্যুতে তিনি পিতামহ বাদীস ইব্ন হাবূসের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি গ্রানাডার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার ভ্রাতা তামীমুল-মু'ইয্য মালাগার স্বাধীন শাসক হইয়াছিলেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে একের পর এক বিপর্যয়, প্রতিবেশী মুসলিম রাজন্যবর্গের সহিত সামরিক সংঘর্ষ এবং Castille-এর শাসনকর্তা ষষ্ঠ আলফন্সো-র সহিত

সমঝোতা রক্ষায় আবদুল্লাহর রাজত্বকাল অতিবাহিত হয়। স্পেনে আল-মুরাবিতূন-এর হস্তক্ষেপকালে তিনি আয-যাল্লাকা (দ্র.) ও Aledo-র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু খৃষ্টান শাসনকর্তার সহিত আপোস করিতে যাইয়া অচিরেই তাঁহাকে সিংহাসন হারাইতে হয়। ৪৮৩/১০৯০ সালে ইয়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন তাঁহার রাজধানী অবরোধ করেন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দক্ষিণ মরক্কোর আগমাত নামক স্থানে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। সেই স্থানে 'আবদুল্লাহ্র শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

মরক্কোয় নির্বাসন জীবনকালে আবদুল্লাহ আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেন। ফাস-এর জামি'উল-কারাবিয়্যীন-এর গ্রন্থাগারে কতিপয় পর্যায়ে উহার সম্পূর্ণ কপি পাওয়া গিয়াছে। "আত-তিব্য়ান 'আনিল হাদিছাতিল-কাইনা বিদাওলাতি বানী যীরী ফী গার্নাতা" নামক তাঁহার এই আত্মজীবনীটি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের স্পেনীয় ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলীল। রাজ্যের বিপৎকালীন পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহর স্বকীয় ভূমিকা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত করার প্রয়াসে উক্ত গ্রন্থে যে সুদীর্ঘ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও ইহাতে ৪৭৮/১০৮৫ সালে ষষ্ঠ আলফন্সো কর্তৃক Toledo অধিকার এবং পরবর্তী বৎসর এই উপদ্বীপে আল-মুরাবিতূনের আগমনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে কালানুক্রমে বর্ণনা করা হইয়াছে। একই সঙ্গে ইহাতে উচ্চ স্তরের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও বিদ্যমান। ফলে ইহার আলোকে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের স্পেনীয় মুসলিমগণ যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলার শিকার হইয়াছিল, তাহার একটি সুস্পষ্ট চিত্র ইহাতে পাওয়া যায় যাহা তৎকালীন স্পেনের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যগণের (মুলূকুত-তাওয়াইফ) ইতিহাসে অস্পষ্ট। তৎকালে খৃষ্টানগণের পুনরায় স্পেন অধিকারের প্রবল প্রচেষ্টার চিত্রও উহাতে বিদ্যমান। এই আত্মজীবনীতে আবদুল্লাহর শাসন আমলের পূর্ববর্তী যুগের যেই তথ্য পাওয়া যায় তাহাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব। মুসলিম স্পেনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যখন উত্তর আফ্রিকার রাজন্যবর্গের হস্তে স্থানান্তরিত হইতেছিল তখনকার স্পেনের অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থকে একটি নির্ভুল দিশারী হিসাবে মনে করা উচিত।

E. Levi-Provencal কর্তৃক And.-এ উক্ত তিব্য়ান-এর বিভিন্ন খণ্ড অনুবাদ ও ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে (And., ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২৩৩-৩৪৪; ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ২৯-১৪৫; ১৯৪১খৃ., পৃ. ২৩১-২৯৩)। বর্তমানে উদ্ধারকৃত সম্পূর্ণ মূল আরবী পাঠও প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি স্পেনীয় অনুবাদ (E. Levi-Provencal and E.Garcia Gomez, Las "Memorias" de 'Abd Allah ultimo rey ziri de Granada) প্রকাশিত হইবার কথা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) And., খৃ. ১৯৩৬, পৃ. ১২৪-২৭-এ 'আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইব্ন ইযারী ও ইব্নুল-খাতীব কর্তৃক লিখিত জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে; (২) ইব্নুল খাতীব, আমালুল-আলাম (Levi-Provencal), পৃ. ২৬৮-৭০; (৩) নুবাহী, আল-মার্কাবাতুল-উল্য়া (Levi-Provencal), পৃ. ৯৩-৪; (৪) R. Menendez Pidal, La Espana del Cid, ৩য় সং, Madrid 1947 খৃ., নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, Leyendo las "Memorias" del rey ziri 'Abd Allah, And ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১-৮; (৬) E. Levi-Provencal, Esp. Mus., ৪খ.।

Levi-Provencal (E.I.²)/ফরীদুদ্দীন মাসউদ

আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্র (عبد الله بن بسر) ঃ (রা) হিজরতের পূর্বে মদীনায় বানূ মাযিন গোত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে হিমসে বসবাস করেন। তাঁহার উপনাম ছিল কাহারও মতে আবূ বুস্র এবং কাহারও মতে আবূ সাফ্ওয়ান। বানূ মাযিন ও বানূ সুলায়ম গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল। এই কারণে ইমাম বুখারী, ইব্ন মান্দা ও আরও অনেকে তাঁহার নামের শেষে আস্-সুলামী আল-মাযিনী সংযোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্নুল-আছীর-এর মতে একই ব্যক্তিকে দুইটি গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। তবে তাঁহাকে সালামী বলা যাইতে পারে। কারণ বানূ সালমা ও বানূ মাযিন উভয় গোত্র আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তিনি, তাঁহার পিতা-মাতা, ভ্রাতা আতিয়্যা ও ভগ্নী সাম্মা' সকলেই সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী কারীম (স) হইতে সরাসরি এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি ৯৪ বৎসর বয়সে হি. ৮৮ সনে সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। সিরিয়ায় সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন। আবুল-কাসিম ইব্ন সা'দ ও আবূ নু'আয়ম-এর মতানুসারে তিনি এক শত বৎসর বয়সে হি. ৯৬ সালে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারীও আত্-তারীখুস-সাগীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্র হইতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (স) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, এই যুবক এক শত বৎসর বাঁচিবে। নবী কারীম (স)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সিরিয়ায় বসবাসকারী সাহাবীদের মধ্যে আবূ উমামা (রা)-এর পরে আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্র (রা) জীবিত ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে হাবীব ইব্ন উছমান হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি নবী (স)-কে দেখিয়াছেন?' উত্তরে তিনি বলিলেন, "তাঁহার (নবীর) ওষ্ঠের নীচে থুতনিতে কয়েকটি সাদা দাড়ি ছিল।"

এতদ্ব্যতীত আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজার সুনানে সালীম ইব্ন আমির সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্র হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নবী কারীম (স) আমাদের নিকট আগমন করিলে আমরা তাঁহার সম্মুখে খেজুর ও মাখন উপস্থিত করিলাম। তিনি খেজুর ও মাখন খুব পসন্দ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৮১, নং ৪৫৬৪; (২) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১২৫।

এম. এ. আজীজ খান

'আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূন (عبد الله بن ميمون) ঃ ইনি ছিলেন আল-হারিছ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আ আল-মাখ্যূমী (ইব্নুয-যুবায়র কর্তৃক নিযুক্ত বস্রার গভর্নর, দ্র. আত-তাবারী, নির্ঘণ্ট) পরিবারের মিত্র (مولى)। ইছ্না 'আশারিয়্যা শী'ঈ সাহিত্যে তাঁহাকে ইমাম জা'ফ'র আস্-সা'দিক'-এর একজন রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী) হিসাবে

গণ্য করা হইয়াছে (আল-কুলায়নী; ইব্ন বাবুয়াহ; আত্-তূসী, স্থা.; Ivanow, Alleged Founder, পৃ. ১১-৬০; অধিকন্তু শী'ঈ রিজাল বিষয়ক গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য, যথা আল-কাশ্শী, মা'রিফাত আখ্বারিত-তূসী, ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১৬০; আন্-নাজাশী, আর-রিজাল, পৃ. ১৪৮; আত্-তূসী, ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১৯৭; সুন্নী রিজাল গ্রন্থাবলীতেও তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ আয্-যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, ২খ., ৮১; যিনি প্রাথমিক যুগের সুন্নী বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়াছেন; ইব্ন হ'াজার, তাহযীবুত্ তাহযীব, ৬খ., ১৪৯)। ইমাম জা'ফার আস্-স'াদিক' ১৪৮/৭৬৪ সালে ইন্তিকাল করেন, অতএব আবদুল্লাহর জীবনকাল ছিল হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ। তাঁহার পিতার নাম মায়মূন আল-কাদ্দাহ (আন্-নাজাশীর বর্ণনা অনুসারে 'যে তীর ধারাল করে, চক্ষুরোগ চিকিৎসক নহে)। ইছনা 'আশারিয়্যা সূত্রসমূহ তাহার পিতাকে ইমাম জাফার আস্-সাদিকের পিতা মুহাম্মাদ বললেন বাকিরের একজন সহচর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসমাইলী বরাতসমূহও মায়মূন ও 'আবদুল্লাহকে ইমাম বাকি'র ও ইমাম জা'ফারের সহচররূপে উল্লেখ করিয়া থাকে (তু. Lewis, Origins, পৃ. ৬৫-৭)।

ইসমাঈলী বিরোধী লেখকগণ, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শুরু হইতে ইসমাঈলী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে 'আবদুল্লাহ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ও বিচিত্র কাহিনীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল বর্ণনার সূত্র হইল সেই ইব্ন রিযাম (৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথম দিকে), ফিহরিস্তের ১৮৬ পৃষ্ঠায় যাহার বর্ণনা উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই কাহিনী অনুসারে মায়মূন আল-কাদ্দাহ একজন বারদেসানী [পরবর্তী কালের চরিতকারগণ তাঁহাকে ইব্ন দায়সান' মনে করিয়াছেন। দায়সানের সঙ্গে তাঁহার কথিত সম্পর্কের কারণ সম্ভবত এই, তিনি ইব্ন দায়সান (Bardesanes)-এর একজন প্রকাশ্য অনুসারী ছিলেন] চরমপন্থী, আবুল-খাত্ত'াব (দ্র.)-এর একজন অনুসারী এবং মায়মূনিয়্যা দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ নবূওয়াত দাবি করিয়াছেন এবং স্বীয় দাবি প্রমাণের জন্য ভেলকিবাজি প্রদর্শনের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, জাগতিক প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশে তিনি একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে তিনি ঈমানকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করেন। ইহাদের সর্বশেষ স্তর ছিল নির্লজ্জ নাস্তিকতা ও লাম্পট্য। তাঁহার দাবি ছিল, তিনি প্রতীক্ষিত মাহ্দীরূপে মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলের পক্ষ হইতে মনোনীত হইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারই জন্য কাজ করিতেছেন। 'আবদুল্লাহ আহ্ওয়াযের নিকটবর্তী কূ'রাজুল-আব্বাসের বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে আস্কার মুকরাম নামক স্থানে, পরে বস্রায় এবং পরিশেষে সিরিয়ার সালামিয়্যা নামক স্থানে স্বীয় প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করেন। সেইখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আত্মগোপন অবস্থায় অতিবাহিত করেন। কাল নিরূপণে ভুল করিয়া ইব্ন রিযাম তাঁহার জীবনকাল ৩য়/৯ম শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সালামিয়্যায়ই অবস্থান করেন যদ্দিন না উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দী (দ্র.) দাবি করেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈলের বংশধর এবং তথা হইতে ইফরীকিয়ায় পলাইয়া যান। সেইখানে তিনি ফাতিমী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইব্ন রিযামের এই কাহিনীটি খুবই প্রচার লাভ করে এবং পরবর্তী কালের ইসমাঈলী বিরোধী সকল রচয়িতা কাহিনীটি নকল করেন (তাঁহাদের নায়ক হইলেন আখূ মুহ'সিন যাঁহার বর্ণনা আন্-নুওয়ায়রী ও আল-মাক্'রিযীর উদ্ধৃতি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং ইব্ন শাদ্দাদ, যিনি মায়মূনের নামের সঙ্গে আবূ শাকির উপনাম (কুন্য়া) সংযোজন করিয়াছিলেন (তু. আল-খায়্যাত', আল-ইন্তিসার, পৃ. ৪০, ১৪২; আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৩৩৭ ও Ivanow বর্ণিত ইছনা আশারিয়্যা উপাখ্যানসমূহ, Alleged Founder, পৃ. ৯১ প. ও G. Vajda, RSO, ১৯৩৭, পৃ. ১৯২, ১৯৬, ২২৪)। এই কাহিনীটি কিছু পরিবর্তন ও সংযোজনসহ (তু. Lewis, Origins, পৃ. ৫৪-৬৩) সুন্নী চরিতকারদের নিকট ইসমা'ঈলীদের উত্থান সম্পর্কিত একটি প্রমাণ্য বর্ণনারূপে পরিগণিত হয়। ফাতিমীদের উর্ধ্বতন পুরুষ কাহারা, এই বহু বিতর্কিত ও আপাত দৃষ্টিতে অসাধ্য সমস্যাটির আলোচনা (দ্র. ফাতি'মী ও ইসমা'ঈলিয়্যা) অপ্রাসংগিক হইলেও এতটুকু বলা প্রয়োজন, ফাতিমীগণ মায়মূন আল-কাদ্দাহ-এর বংশধর ছিলেন, কথাটি কেবল ইসমা'ঈলী মতবাদের প্রবল শত্রু ইব্ন রিযামই বর্ণনা করেন নাই, বরং কোন কোন ইসমা'ঈলী আন্দোলনের সমর্থক দলও এই ধারণা পোষণ করিত, এমনকি খলীফা আল-মু'ইয্যয-এর কোন কোন অনুসারী তাঁহাকে মায়মূনের বংশধর মনে করিলে স্বয়ং খলীফা তাহাদের সঙ্গে এই বিষয়ে বিতর্ক করিতে হইত ('ইমাদুদ্দীন ইদ্রীস কর্তৃক উদ্ধৃত আল-মুইয্যয-এর চিঠি দ্রষ্টব্য; Ivanw ইহাকে ১৯৪০ সালে J. of the Bombay Branch of the RAS-এর ৭৮-৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। আন্-নু'মান রচিত কিতাবুল-মাজালিস ওয়াল-মুসায়ারাত, পাণ্ডুলিপি SOAS লন্ডন, সংখ্যা ২৫৮৩৪, পত্র ৭৬-এর একটি বর্ণনা দ্বারাও তথ্যটি অধিকতর প্রত্যয়ন ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে, যাহা এই নিবন্ধের নিবন্ধকার কর্তৃক প্রকাশিত মায়মূন ও 'আবদুল্লাহ অথবা তাঁহাদের বংশধরদের সঙ্গে ইসমাঈলীবাদের কোনরূপ ইসমাঈলী বিরোধীদের বানোয়াট বলিয়া উল্লেখ করেন। দ্র. The rise of the Fatimids, বোম্বাই ১৯৪২ খৃ., বিশেষত পৃ. ১২৭-৫৬; The Alleged Founder of Ismailism, বোম্বাই ১৯৪৬ খৃ.)। কিন্তু এই বিষয়টি বোধগম্য নয়, ইসমাঈলীবিরোধিগণ এই বিষয়ে দুর্নাম করার জন্য শুধু মায়মূন ও আবদুল্লাহকে কেন বাছিয়া লইল। ইহা আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, কোন কোন প্রাচীন ইসমাঈলী দল কি করিয়া শত্রুদের দেয়া অপবাদের ভিত্তিতে উহাদেরকে তাহাদের নেতৃবৃন্দের পূর্বপুরুষরূপে গ্রহণ করিল। B. Lewis-এর The Origins of Ismailism, Cambridge ১৯৪০-এর (বিশেষত ৪৯-৭৩ পৃষ্ঠায়) সামগ্রিকভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, মায়মূন ও 'আবদুল্লাহ এমন একটি চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা ছিলেন, যাহা দ্বারা ইসমা'ঈলীবাদের বিকাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, যদ্দারা বিষয়টির নিশ্চিত সমাধান দেওয়া যায়। ইহা সম্ভব যে, ইসমা'ঈলী আন্দোলনের শুরুর দিকে (২৬০/৮৭৩) আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূনের কোন বংশধর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং ইসমাঈলীবাদের সহিত কিছু সংখ্যক কা'দ্দাহ'ীদের এই সম্পর্কের ভিত্তিতে কাহিনীটির অবতারণা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বরাতসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে।

S. M. Stern (E.I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহামন ভূঞা

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ ০৯/ইবিপ্র/পুনমু/১/২০০৩(উন্নয়ন)/৩২৫০